বিলে যে দিনে ও রাত্রে কত ফুলই ফুটিয়া থাকে, কোনটি রক্তাভ, কোনটি শ্বেত, কোনটি বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। কোনটি দিনের বেলায় পাপড়ি মেলে, কোনটি বা রাত্রে পাপড়ি মেলে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যদি বিলে নৌকায় যাও তবে ফুল তুলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। যতই মৃণালের সঙ্গে সঙ্গে ফুল টানিয়া তুলিবে ততই তুলিবার ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে। পুরীর সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইবার যেমন একটি মোহ থাকে, এও সেইরকম।

আবার জল যখন শুকাইতে আরম্ভ করে তখন মাছ ধরা আরম্ভ হইয়া যায়। বিলে ও খালে বাঁশের বাঁধন পড়ে, সরু সরু কঞ্চি গায়ে গায়ে গাঁথা। তাহার ভিতর মাছ আটকাইয়া গেলে আর বাহির হইতে পারে না। মাঝে মাঝে উপুড় করা নৌকাও আছে জলের ভিতর ডোবানো। নৌকায় ডাল পালা ও শেওলা দাম দিয়া খোলটা ভরতি করিয়া রাখা হয়, সেই খোলের ভিতর কই, মাগুর আর সিংগি মাছ ঢুকিয়া পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না।

ফরিদপুর, রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের ভিতর জেলে আর নমশূদ্র অনেক ঘর আছে। একজন উচ্চবর্ণের ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশ তো জেলে-চাঁড়ালেরই দেশ।" চাঁড়ালের ঘরের মেয়েরা বিধবা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না বটে, কিন্তু রক্ষিতা থাকিতে তাহাদের আপত্তি নাই, সমাজে তাহা নিন্দনীয় নয়।

আর আছে বুনোর দল। বুনোরা একরকম অস্পৃশ্য বলিয়াই গণ্য হয়, কিন্তু তাহাদের দিয়া ধান ভানানো বা মাটি কাটানো (অর্থাৎ যেসব কাজ শ্রমসাধ্য) প্রভৃতি কাজে কাহারও আপত্তি হয় না।

ধান ভানার পর ঝাড়িয়া বাছিয়া চালগুলি ঘরে তুলিয়া দিয়া যখন বুনোর বউ আঁচলে খুদগুলি বাঁধিয়া নিয়া বাড়ি যায় তখন যে বাড়ির সে ধান ভানিয়াছে সেই বাড়ির গৃহিণী হয়তো তাহাকে বলেন, "দেখি লো বুনো বউ, কতগুলো খুদ বার করেছিস?" অথবা কোন সহৃদয়া গৃহিণী হয়তো বলেন, "মাথাটা পাত দেখি, একটু তেল ঢেলে দি, মেয়ে এসে এখানেই দুটো পেসাদ পেয়ে যাবি।"

ফরিদপুরে মিশন হাউসের মিশনারী-গণের এই বুনোপাড়ার দিকেই বিশেষ করিয়া দৃষ্টি থাকে, যেমন ভাগাড়ের মরা-গরুর উপর থাকে শকুনির তীক্ষ্নদৃষ্টি।

ফরিদপুরে মিশন হাউস একটি নয়, তিনটি বড় বড় অট্টালিকা। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট—দুই দলেরই মিশন হাউস আছে। তবে ফ্রি চার্চ মিশনই বেশী জমকালো।

আমি দেখিতাম আমার বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া মিশন হাউসের দিকে যাইতেন। বুঝিলাম, সেখানে তাঁহার কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে। কি সে আকর্ষণ? বন্ধু অল্পদিন হইল বিবাহ করিয়াছেন, বৌটির উপর তো তাঁহার খুবই অনুরাগ বলিয়াই মনে হয়। এবার তিনি আই এ পরীক্ষা দিয়াছেন, পরীক্ষার পর নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়া আসি[illegible] জন্য তাঁহার বাবা পত্রে জানাইয়াছিলে[illegible] তিনি পিতার আদেশ অবশ্য অবহে[illegible] করেন নাই নববধূ তো এখানেই আ[illegible] তবে কি তিনি হঠাৎ খ্রীষ্টের অনু[illegible] হইয়াই উঠিলেন?

বন্ধু নিজেই একদিন রহস্য [illegible] করিলেন, বলিলেন, "জুলাই মাসের [illegible] তো আর কলকাতায় যাচ্ছি না, এর [illegible] বৌটার যাতে পড়াশুনো একটু এগিয়ে[illegible] সেজন্য মিশনের মিস্ রোজকে [illegible] ছিলাম। মিস রোজ তো খুশী হ[illegible] রাজী হয়েছেন, কিন্তু বাবা যে [illegible] গোঁড়া, রাজী হবেন কিনা বুঝতে প[illegible] না। বাবা নিজে যা বোঝেন তা ছাড়া [illegible] তো আর কারও কথা শুনবেন না। [illegible] মিস্ রোজ যে কি রকম ভাল মেয়ে[illegible] তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে সেই [illegible] ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার [illegible] তিনি একেবারে নিজের পরমাত্মীয়ের [illegible] ব্যবহার করেন। একদিন চল্ না [illegible] হাউসে, আলাপ করে আসবি।"

শুনিয়া একটু ভাবনা হইল। একদিন মিস্ রোজকে চোখেই দেখি[illegible]

মিস্ রোজ আসিয়াছিলেন না[illegible] বাড়ি। নাজিরবাবুর দুই মেয়ে সু[illegible] মনোরমা গার্লস স্কুলের ছাত্রী [illegible] মিস্ রোজের প্রিয়পাত্রী।

প্রিয়পাত্রী যে, তাহা বুঝিতে [illegible] লাম তখনই, যখন দেখিলাম মিস [illegible] নাজিরবাবুর বাড়ির সম্মুখের বা[illegible] ভিতর ঢুকিয়াই সুরমা ও মনো[illegible] দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

সুরমা ও মনোরমা দুই বো[illegible] বছরের ছোট বড়, একটির বয়স [illegible] আর একটির বয়স দশ। আমি গার্ল[illegible] উহাদের আবৃত্তি শুনিয়াছি, সেই [illegible] উহাদের বয়সও জানিয়াছিলাম। [illegible] সময় ছোটলাট যখন পূর্ববঙ্গে [illegible] তখন এই স্কুলের মেয়েরা একটি[illegible] গাহিয়া তাঁহাকে ফুলের মালা দি[illegible] গানটি অবশ্য স্কুলের পণ্ডিত ম[illegible] রচনা। গানটার কিছু কিছু মনে অ[illegible]

"বঙ্গরাজ, বঙ্গে আজ কি দেখিতে অ[illegible]
পূর্ববঙ্গ ভঙ্গপ্রায় জঠরের অনলে।
যদি রাজ দয়া করে আসিলে বঙ্গে
নিরন্নেরে অন্ন দিয়ে রাখ প্রাণে সকলে

গানে অবশ্য আরও ন[illegible]

আবেদন-নিবেদন ছিল, শেষের ছত্রটি ছিল এই রকম ঃ—

দুঃখিনী বঙ্গের মেয়ে,
আজ কি কহিব তোমা পেয়ে,
পল্লীতে পদ বাড়াইয়া দেখ গিয়ে সদলে।

সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা এই বাংলা দেশ, পূর্ববঙ্গ তো শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ এবং মৎসাশী বাঙ্গালীর মৎস্যনিকেতন। তবু তো দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ আর অন্নকষ্ট—এ যেন এক চিরন্তন ব্যাপার। লোকের পরনে বস্ত্র নাই, হয়তো মাসের পর মাস পদ্মের নাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়াই তাহাদের দিন কাটাইতে হয়, চ্যাঁপের খই ভাজিয়া তাহাই খাইয়া কতলোক প্রাণধারণ করিতেছে। সেদিন এই কথাই মনে উঠিয়াছিল। কেন এমন হয়?

সুরমা ও মনোরমা দুই বোনই বেশ 'আপ্ টু ডেট' মেয়ে, স্কুলেও তাহাদের সুখ্যাতি আছে, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সেদিন তাহারাই প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। আজ দেখিলাম তাহাদের আর এক ভিন্ন রূপ, দুই হাতে কাদা মাখা, কাপড়েও কাদা লাগিয়াছে। দুই বোন নিজের নিজের খেলাঘর গোবর মাটি দিয়া নিকাইতেছে, সেই অবস্থাতেই মিস রোজ তাহাদের দুই বোনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "আঃ দুষ্টু মেয়েরা, তোমরা তোমাদের গোলাপীদিদিকে ভুলি গেলে?" সুরমা তখনই উত্তর দিল, "না সিস্টার, ভুলি নাই আমরা, আপনিই আমাদের ভুলিয়াছেন।"

মিস্ রোজ সংশোধন করিলেন, "নো, নো, নট সিস্টার, আমি তুমাদের গোলাপীদিদি। আমার মা নাম রাখিয়াছিলেন রোজালি। বাংলায় ইহার অর্থ হয় গোলাপফুল। আমি তোমাদের গোলাপীদিদি।"

ইহার পর মিস্ রোজ, তাহারা তাহাদের খেলা ঘরে কি কি রন্ধন করিবে ও কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে তাঁহারও নাম থাকিবে কিনা সে খবর জানিতে চাহিলেন। তাহার পর প্রার্থনা পুস্তকখানি হাতে লইয়া অন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ইঁহারা 'জেনানা মিশন' কার্যে অর্থাৎ অন্তঃপুরের প্রচারকার্যে নিযুক্তা হইয়া-

ছেন। যে সকল মহিলা এই কাজে আছেন তাঁহাদের মধ্যে মিস্ গিলবার্ট বহু বৎসর পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে প্রচারকার্য করিয়াছেন। এখন ফরিদপুরেই স্থায়ী-ভাবেই আছেন এবং বয়সও ষাট বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইনি সেবাকার্যে বিশেষ করিয়া প্রসূতি পরিচর্যায় এমন নিপুণা যে, সকল গৃহস্থের বাড়ি হইতেই তাঁহার আহ্বান আসে এবং তিনিও ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের বাড়িতেই ডাকিবামাত্র উপস্থিত হন। ডাল ভাত—তরি-তরকারি যে যাহা দেয় হাতে মাখিয়া তাহাই খান, কাঁটা চামচ বা চেয়ার টেবিলের কোন বালাই নাই; হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক হাতে কলার পাতায় রাখা ভাত মাখিয়া অন্য হাতে সেই মাখা গ্রাস রাখিয়া তাহাই আহার করিতেছেন এই দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন।

আমার বন্ধুর বাড়িতেও অল্পদিন আগেই একটি নূতন শিশু আসিয়াছে তাঁহার মায়ের ক্রোড়ে। আঁতুড় ঘরে প্রথম হইতেই মিস্ গিলবার্ট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার সহযোগিনীরূপে আরও এক-জন মিশনারী মহিলা ছিলেন, তিনি মিশনের জন্যই ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া-ছেন, তাঁহাকে মিস্ এাডথ বলা হয়। অবশ্য হাড়িনী ধাত্রীও সেদিন একজন ছিল।

এইভাবে এই মিশনারী মহিলারা প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন এবং চিনি মাখানো কুইনিনের বাড়র মত প্রচার-কার্যও সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া যান। এ বিষয়ে তাঁহাদের তৎপরতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ডাক্তারের আসল উদ্দেশ্য যেমন রোগ আরোগ্য করা, ইঁহাদেরও আসল উদ্দেশ্য থাকে পাপরোগে পীড়িত জনগণকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করা। এই কার্যের জন্য তাঁহারা কি পারিশ্রমিক পান তাহা অবশ্য আমার জানা নাই।

কলিকাতায় দেখিয়াছি জেনানা মিশনের শিক্ষয়িত্রীরা বাড়ি বাড়ি পড়াইতে যান। তাঁহারা অবশ্য মেম নন, তাঁহারা বাঙ্গালী খৃষ্টান। এখানে মেমেরা গৃহস্থের বাড়িতে অনেক সাহায্য করেন, যেমন রোগীর সেবা বা প্রসবকার্যে সাহায্য প্রভৃতি। তবে মেম অবশ্য সব বাড়িতে ঘরে দুয়ারে ঢুকিতে পান না, স্বতন্ত্র একটা ঘরে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হয়, সেখানে তিনি যখন বাইবেল পড়েন বা গান করেন তখন বাড়ির মেয়েরা অবশ্য উপস্থিত থাকেন, না হইলে অভদ্রতা হয়, কিন্তু পরে আবার তাঁহারা কাপড় কাচেন, মেমের ছোঁওয়া কাপড় তো আর হিন্দুর ঘরে চলে না।

কিন্তু আঁতুড় ঘর অশুচি স্থান, কাজেই মেমের সেখানে যাওয়াতে আপত্তি ওঠে না। নবজাত শিশুর জন্য মিশন হইতে জামা পাউডার সাবান প্রভৃতি অনেক কিছু তাঁহারা সঙ্গে আনেন, সেগুলিও নিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

মিশনারী মহিলাগণের মধ্যে মিস্ রোজই ছিলেন খুব অল্প বয়স্কা অল্প বয়সে তিনি কেন যে বাড়ি ছ দূর দেশে প্রচারকার্যে জীবন ন করিয়াছেন বলা যায় না। কিন্তু মুখে কোন দুঃখের ছায়া দেখিতে নাই। সর্বদাই হাসি খুশী, বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েকে নানাবিধ উপহার তিনি অল্প দিনেই এত বশ ফেলিতেন যে ছেলে মেয়েদের মা তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল, বো সেই খাতিরেই বন্ধুর নববিবাহিতা ব ইংরাজী পড়াইতে নিয়মিতভাবে মুন্সেফবাবুর বাড়িতে আসিতে লাগি

বউটি কলিকাতার মেয়ে, কলিকাতাতেই ছেলেবেলায় কাটা পড়াশুনাতেও অনেক দূর হইয়াছে। কাজেই মিস্ রোজ এমন পাইয়া বোধ হয় খুশীই হইয়া তাই তিনি বাইবেলের জন্য বেশী স দিয়া পড়ানোর দিকেই সময় দিতেন। গান গাহিতেও ততটা ছিলেন না।

কিন্তু অন্য কোন মিশনারী যেদিন আসিতেন সেদিন বাহিরের হইতেই সুরের ঝঙ্কার শুনা শুনিতাম কাঁপানো গলায় দিশি গুলিকে বিদেশী সুরে গাওয়া হই

মিস্ গিলবার্ট তাঁহার পুস্তক হইতে গান করিতেন ঃ—

"যীশুর শোণিতস্রোত বহিছে অ
তারিতে আমার মত পাপীরে।
আমি শুনিলাম যীশুর স্বর—
ওহে পাপী অভাগা
তুল তুল যে ক্রুশ বাঁধিরে।"

মিস্ গিল্‌বার্টের সঙ্গে প্র একখানি বই থাকিত, সেই ভিতরের প্রথম দুটি পৃষ্ঠা গা রংয়ের, শেষের দুটি পৃষ্ঠা ধবধ আর মাঝের দুটি পৃষ্ঠা ঘোর এই বই খুলিয়া মিস্ গিলবার্ট একই কথার পুনরাবৃত্তি করি "এই দেখ গাঢ় কালো রং, মানুষ দারুণ পাপী, তাহার হৃদয় কালো। এই দেখ বরফের মত শ সেই কালো মন কি করিয়া এ হইল?" মাঝের পৃষ্ঠা খুলিয়া

"এই''দেখ রক্তবর্ণ, যীশুর শোণিত। পাপীর জন্য যীশু ক্রুশে প্রাণ দিলেন। সেই রক্তই মানুষের কালো মন ধুইয়া দিবে, করিয়া দিবে তুষারের মত সাদা। যীশুর যে শরণ লইবে তাহারই পাপ মোচন হইবে, না হইলে শেষ বিচারের পর হইবে অনন্ত নরকে বাস।"

—বাউলের গান, বৈষ্ণবগণের গান, ফিকিরচাঁদ ফকিরের গান, দেখিতাম সবই বদলাইয়া লইয়া গাওয়া হইত।

'হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্যগতি নাই'র স্থানে করা হইয়াছে 'যীশুর শরণ বিনা পাপীর অন্য গতি নাই।' কিম্বা
"পার কর গৌরাঙ্গ তরঙ্গ মাঝারে,
নিদানের কান্ডারী তুমি জানি পরাপরে।"
বদলাইয়া
"পার কর যীশু হে পাপ তরঙ্গ মাঝারে,
তুমি বিনা পাপীগণে কে আর নিস্তারে।"
করা হইয়াছে।

মুন্সেফবাবু মিশনারী মেমেদের বাড়িতে আসা যাওয়া একেবারেই পছন্দ করিতেন না, কিন্তু গৃহিণীর ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেন না। গৃহিণীর সন্তান হওয়ার সময় এই মিশনারী মেমেরা ছিল বলিয়াই তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই। বাড়িতে মাথার উপর তো কেহই নাই, ইহারা কি যত্নই না করিয়াছে। ছেলেকেও নাওয়ানো ধোয়াওনো পর্যন্ত সবই করিয়াছে, একদিন সারারাত্রিই এ বাড়িতে কাটাইয়া দিল, কি না, ছেলে সর্দিতে হাঁসফাঁস করিতেছে। অপরে কে কোথায় এমন করিয়া যত্ন করে।

কিন্তু কর্তা তবুও মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেখ, ওরা লোক সুবিধের নয়, ঐ মেম মাগী বৌমার কাছে রোজ রোজ আসে এ আমার মোটেই ভাল লাগে না। বৌমা ছেলেমানুষ, পড়ানোর সময় তুমি বরং একটু ওঘরে থেকো, কি জানি কি মতলব ওদের, কিছুই বলা যায় না।"

বধূর এক কাকা ফরিদপুরের কাছেই থাকেন, পল্লী অঞ্চলে বাড়ি, সেখানে জমিদারি আছে। কাকা একদিন ভাইঝিকে নিতে আসিলেন, শ্বশুর শাশুড়ী আপত্তি করিলেন না। বধূও যেন কিছুদিনের জন্য মুক্তির আস্বাদ পাইবে বলিয়া খুশী মনেই নৌকায় রওনা হইল।

সারারাত্রি চাঁদের আলোয় নৌকা চলিতেছে, আর বিলের শোভা দেখিতে দেখিতে বৌর খুশির সীমা নাই। পনেরো দিনের মাত্র ছুটি, এই পনেরো দিন পরে কাকা নিজেই আবার ফিরাইয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া কথা দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পনেরোদিন আর পার হইল না, শ্বশুরের বদলীর খবর আসিয়াছে, ফরিদপুর হইতে তাঁহাকে বিদায় লইতে হইবে, তাই দেওর নিতে আসিল।

বৌটির এত শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে অবশ্য মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় কি? কাকিমা নূতন গুড়ের পায়েস রাঁধিবেন বলিয়া আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু পায়েস আর তাহার খাওয়া হইল না, দেওর বলিল এখন না রওনা হইলে কাল সকালে পৌঁছানো যাবে না। কাকাও পৌঁছাইতে সঙ্গে আসিলেন।

বধূ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ হইয়াছে। পেয়াদারা আসিয়া

সর্বত্রই যেন বিশৃঙ্খল ভাব।

মাঠের পথ দিয়া মিস্ রোজ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন দেখিয়া বৌ তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে আসিল। মিস্ রোজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসতেছেন, বেশ বোঝা গেল তিনি খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন।

আমি সামনের বারান্ডায় জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদার তদারক করিতেছিলাম; কেননা বন্ধু কলিকাতায়, এখন আমিই তাঁহার প্রতিনিধি। এবার আমারও আসিয়াছে বিদায়ের পালা।

ঘরের মধ্যের কথাও কানে আসিতেছিল, "ওঃ মাই ডার্লিং, আমার প্রিয়তমা ছোট-বৌ, তুমি যে চলিয়া যাইতেছ আমি তাহা জানিতাম না। আমি ঘুমাইতেছিলাম, যীশু আমাকে ডাকিলেন,—যীশু বলিলেন "ওঠো, জাগো, তোমার ছোট-বৌ চলিয়া যাইতেছে।"

একি ব্যাপার? এ যে স্বপ্নে দেব দর্শন! হিন্দুর দেশে আসিয়া খৃষ্টীয় প্রচারিকারও মনে হিন্দুর ধর্মভাবের প্রভাব জাগ্রত হইল না কি? না, বাইবেলেও স্বপ্নে প্রত্যাদেশের কথা অনেক স্থানে আছে। ধর্ম জিনিসটাই এক রহস্য।

তেরো বৎসরের একটি মেয়ে বিদেশিনীর এই ভালবাসায় যে মুগ্ধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য কি। মিস্ রোজ বৌটির হাতে একখানি বই দিয়া বলিলেন, "তুমি একটি দেববালা, যীশুকে স্মরণ রাখিবে। তোমার গোলাপীদিদিকে ভুলিও না।" এই সব কথার কিছু কিছু কানে আসিল, আমার মনে হইল বৌটি যেন কাঁদিতেছে।

কিন্তু মুন্সেফবাবুর সেদিন রওনা হওয়া স্থগিত রহিল, কেননা সেদিন ফরিদপুরের উকীলগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিবার আয়োজন হইয়াছে। বারের খ্যাতনামা উকীল প্রসন্ন সান্যাল মহাশয় হইয়াছেন বিদায়-ভোজের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই বাড়িতে ফরিদপুরের সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ সকলেই সে রাত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এ রকম ভোজে খাদ্য ও পানীয় দুয়েরই আয়োজন থাকিত, অর্থাৎ ভোজটি হইত দেশী ও বিলাতী উভয় রকমের। রুচি অনুসারে নিমন্ত্রিতগণ কেহ বা খাদ্য কেহ বা অধিক পরিমাণে পানীয়ই গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা পানীয় বর্জন করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরে এবং স্বতন্ত্রভাবে আহার্য পরিবেশিত হইত। তখনকার দিনে এইরকম নিয়ম ছিল। অর্থাৎ আমি এখানে সালের মফঃস্বল টাউনের বিদায় বর্ণনা দিতেছি।

সুতরাং নিমন্ত্রণ শেষে নি যখন মধ্য রাত্রে বাড়ি ফিরিলে একটু শোরগোল হইবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে গোলমালটা যেন থামিতে চাহিতে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আরও মনে হইল গো আসিতেছে নন্দীদের বাড়ির দিক সেখানে একদল লোক জমিয়া গিয়

নন্দীকর্তা মহাধনী ব্যবসায়ী মারা গিয়াছেন। অল্পদিন আগে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধে কলিকাতার বিখ্যাত কীর্তন আনা হইয়াছিল, কীর্তনের জন্য।

নন্দীকর্তার পাট ও তামাকের ছিল রংপুরে, সেখানে তাঁহার তালুকও আছে। বাড়িতে প বেশী নয়, বড়ছেলে ভোলানাথ ন তিনিই এখন কারবারের মালিক একটি ছেলে। আর মেয়েদের মধ্যে গৃহিণী, বড়বৌ সুষমা, বিধবা ছে ভগবতী আর এক বিধবা ননদ।

ছোটবৌ পরমাসুন্দরী। কিন্তু তাহার বড়ই অসুন্দর। বিধবা মা মেয়ে নিয়া ভাই ভাজের গঞ্জনা সহ্য করিয়া কাটাইতেছিল, নন্দীকর্তা মেয়ে দে মুগ্ধ হইয়া বৌ করিয়া ঘরে আনি কিন্তু বৌ ঘরে আনিবার পর দু ম কাটিল না, ছোট ছেলে মারা গেল স ঘাতে। 'বিষকন্যা' আর কাহাকে ব সেই বৌ যদি শাশুড়ী পিসশাশুড় চোখের বালি হয়, যদি উঠিতে ব তাহাকে লাথি ঝাঁটা খাইতে হয়, তবে দোষটা কার? দোষটা তার ভাগ্যের শাশুড়ী পিসশাশুড়ীর?

"শ্বশুর ভাল বাসিতেন, তা বাসি না কেন, তিনিই তো ঐ কালসাপিনী ঘরে আনিয়াছিলেন। আর ভাসুর ভোল নাথ—সেও বোধ হয় ভাদ্রবৌকে পছ করিত, কিন্তু বৌটা ভাসুরের সাম বাহির হইতে নাই বলিয়া তার ত্রিসীমানা মাড়াইতে চাহিত না। আরে বাপু, এখ আর অত সব কে মানে? ভাসুর য 'পানটা দাও', 'জলটা দাও' বলে তা ঘরে

'গায়ে' দিয়ে আসতে দোষ কি? আসলে বৌটা ছিল কুঁড়ের হদ্দ।"

ইদানীং আবার মিস্ স্টিল বলে মিশন হাউসের এক মেমের আনাগোনা চলছিল নন্দীবাড়ী, কি জানি কি হ'তে কি হ'য়ে গেল?" এই সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে নন্দীবাড়ীর দিকে গেলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি হ'য়েছে।

অবশেষে শুনিলাম, সেই বৌটিকে পাওয়া যাইতেছে না। ভাসুর নিমন্ত্রণ-বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই নাকি ভাই-বৌর ঘরের দরজা ঠেলিয়াছিল, ভেজানো ছিল দরজা, ধাক্কায় খুলিয়া গেলে দেখা গেল ঘরে বৌ নাই।

বৌ এদানীং ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইত না, শাশুড়ী পাড়ার মেয়েদের কাছে বলিয়াছিলেন, "বৌর উদুরী হয়েছে, কবিরাজী চলছে।" "চৌদ্দ কি পনেরো বছরের একরত্তি মেয়ে, তার হ'ল কি না উদুরি! এ এক তাজ্জব বটে। কলিকাল কিনা।" লোকে এই কথাই অবশ্য বলিত।

"তা, ভোলানাথ এসেই নিজের ঘরে না গিয়ে ভাই-বৌর শোবার ঘরের দরজাতেই বা ধাক্কা দিল কেন?" এ প্রশ্নও উঠিয়াছিল।

"আঃ তার কি তখন মাথার ঠিক ছিল? পা টলছে, তখন শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। আর ভোলানাথের একটু 'বার দোষ' আছে সে কথা অবশ্য সকলেই জানে, কিন্তু এদিকে একেবারে মাটির মানুষ। দায়ে অদায়ে ধার চাইতে গেলে কখনও কাকেও 'না' বলে না।" এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর ও নানা কথা শুনিতে শুনিতে বাড়ি ফিরিলাম। কিন্তু বৌটির যে কি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না।

শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি নন্দীবাড়ীতে এক প্রলয় কাণ্ড।

মিশনের বড়সাহেব ফাদার রেভারেন্ড ম্যাকসুইনি এবং তাঁহার সঙ্গে মিশনের লোকজন, পুলিসের লোকও সঙ্গে আছে দেখিলাম। নন্দীবাড়ি একেবারে লোকে ভরতি। বৌটি কি তবে মারা পড়িয়াছে? আত্মহত্যা করিয়াছে? না, খুন হইয়াছে?

না সে সব কিছু নয়। বৌটি গতরাত্রে পলাইয়া গিয়া মিশনের আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং রাত্রেই সেই শিশুকে ও তাহার মাতাকে ব্যাপ্টাইজ্ করা হইয়াছে।

এখন মিশনের আশ্রিত সেই শিশু ও তাহার মাতার সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে স্বয়ং রেভারেন্ড ম্যাকসুইনি পুলিস লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

"মাতার সম্পত্তি? হিন্দুঘরের বিধবার আবার কি সম্পত্তি থাকিবে?" "হাঁ ছিল, বৌটির শ্বশুর যে পাকা উইল করিয়া গিয়াছেন, সেই উইল রেজেস্টারীও হইয়াছে। সে উইল তো আর রদ্ হইবে না।"

মিশনের লোকেরা বৌটির ঘরে যাহা কিছু আসবাব ছিল সবই বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমি দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম বাড়ির সম্মুখে একখানি মর্থিলিখিত সুসমাচার চার খণ্ড ছেঁড়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে, "প্রিয়তমা ছোটবৌকে গোলাপীদিদির স্নেহের উপহার।"

মুন্সেফবাবু উত্তেজিতভাবে স্ত্রীকে বলিতেছেন, "দেখলে তো যা বলেছিলাম তা ফললো কিনা। ঘরের ঝি বৌ বার করে নিয়ে যাওয়াই ঐ মেম মাগীদের ব্যবসা। হিন্দুর বাড়ি এসে এই উৎপাত, তাতে আবার তোমরা দাও প্রশ্রয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "থাম, থাম, তোমরা আর কথা বোল না। ঘরের বৌ ঝি! কি আমার ঘরের বৌয়ের উপর দরদ গো। ঐ ভোলানাথ—ও কি কম পাত্র? বৌটাকে ওই তো নষ্ট করলে। আর শেষ কালে কি না ও আর ওর মা দুজনে মিলে জড়ি-বুটি খাইয়ে বৌটাকে মেরে ফেলছিলো, আমি বাগদী বুড়ির মুখে সব শুনেলাম। তাই তো বৌটা অমন করে প্রাণ নিয়ে পালালো। বৌতো মন্দ ছিল না, ছুঁড়ি দিনরাত কাঁদতো। আমি তো চোখেই দেখেছি। ইদানীং কাউকে বৌয়ের ঘরেই ঢুকতে দিত না। যেমন শাশুড়ী তেম্নি ধাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী, বৌটার কি খোয়ারই না করেছে। হিন্দুর বাড়ি বলে আর লাফিও না, হিন্দুর মান-মর্যাদার তোমরা আর রেখেছ কি?

জিনিসপত্র সব বাহির করিতেছে, বাড়ির সর্বত্রই যেন বিশৃঙ্খল ভাব।

মাঠের পথ দিয়া মিস্ রোজ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন দেখিয়া বৌ তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে আসিল। মিস্ রোজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসতেছেন, বেশ বোঝা গেল তিনি খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন।

আমি সামনের বারান্ডায় জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদার তদারক করিতেছিলাম; কেননা বন্ধু কলিকাতায়, এখন আমিই তাঁহার প্রতিনিধি। এবার আমারও আসিয়াছে বিদায়ের পালা।

ঘরের মধ্যের কথাও কানে আসিতেছিল, "ওঃ মাই ডালিং, আমার প্রিয়তমা ছোট-বৌ, তুমি যে চলিয়া যাইতেছ আমি তাহা জানিতাম না। আমি ঘুমাইতেছিলাম, যীশু আমাকে ডাকিলেন,—যীশু বলিলেন "ওঠো, জাগো, তোমার ছোট-বৌ চলিয়া যাইতেছে।"

একি ব্যাপার? এ যে স্বপ্নে দেব দর্শন! হিন্দুর দেশে আসিয়া খৃষ্টীয় প্রচারিকারও মনে হিন্দুর ধর্মভাবের প্রভাব জাগ্রত হইল না কি? না, বাইবেলেও স্বপ্নে প্রত্যাদেশের কথা অনেক স্থানে আছে। ধর্ম জিনিসটাই এক রহস্য।

তেরো বৎসরের একটি মেয়ে বিদেশিনীর এই ভালবাসায় যে মুগ্ধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য কি। মিস্ রোজ বৌটির হাতে একখানি বই দিয়া বলিলেন, "তুমি একটি দেববালা, যীশুকে স্মরণ রাখিবে। তোমার গোলাপীদিদিকে ভুলিও না।" এই সব কথার কিছু কিছু কানে আসিল, আমার মনে হইল বৌটি যেন কাঁদিতেছে।

কিন্তু মুন্সেফবাবুর সেদিন রওনা হওয়া স্থগিত রহিল, কেননা সেদিন ফরিদপুরের উকীলগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিবার আয়োজন হইয়াছে। বারের খ্যাতনামা উকীল প্রসন্ন সান্যাল মহাশয় হইয়াছেন বিদায়-ভোজের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই বাড়িতে ফরিদপুরের সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ সকলেই সে রাত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এ রকম ভোজে খাদ্য ও পানীয় দুয়েরই আয়োজন থাকিত, অর্থাৎ ভোজটি হইত দেশী ও বিলাতী উভয় রকমের। রুচি অনুসারে নিমন্ত্রিতগণ কেহ বা খাদ্য কেহ বা অধিক পরিমাণে পানীয়ই গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা পানীয় বর্জন করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরে এবং স্বতন্ত্রভাবে আহার্য পরিবেশিত হইত। তখনকার দিনে এইরকম নিয়ম ছিল। অর্থাৎ আমি এখানে ১২৯৬ সালের মফঃস্বল টাউনের বিদায়ভোজেরই বর্ণনা দিতেছি।

সুতরাং নিমন্ত্রণ শেষে নিমন্ত্রিতগণ যখন মধ্য রাত্রে বাড়ি ফিরিলেন তখন একটু শোরগোল হইবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হইল গোলমালটা যেন থামিতে চাহিতেছে না উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আরও মনে হইল গোলমালটা আসিতেছে নন্দীদের বাড়ির দিক থেকে সেখানে একদল লোক জমিয়া গিয়াছে।

নন্দীকর্তা মহাধনী ব্যবসায়ী ছিলেন মারা গিয়াছেন। অল্পদিন আগে তাঁহার মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই শ্রাদ্ধে কলিকাতার বিখ্যাত কীর্তনীয়াকে আনা হইয়াছিল, কীর্তনের জন্য।

নন্দীকর্তার পাট ও তামাকের আড়ত ছিল রংপুরে, সেখানে তাঁহার অনেক তালুকও আছে। বাড়িতে পরিবার বেশী নয়, বড়ছেলে ভোলানাথ নন্দী—তিনিই এখন কারবারের মালিক—তাঁহার একটি ছেলে। আর মেয়েদের মধ্যে নন্দী গৃহিণী, বড়বৌ সুষমা, বিধবা ছোটবৌ ভগবতী আর এক বিধবা ননদ।

ছোটবৌ পরমাসুন্দরী, কিন্তু ভাগ্য তাহার বড়ই অসুন্দর। বিধবা মা মেয়েটিকে নিয়া ভাই ভাজের গঞ্জনা সহ্য করিয়া দিন কাটাইতেছিল, নন্দীকর্তা মেয়ে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌ করিয়া ঘরে আনিলেন কিন্তু বৌ ঘরে আনিবার পর দু মাস কাটিল না, ছোট ছেলে মারা গেল সর্পাঘাতে। 'বিষকন্যা' আর কাহাকে বলে সেই বৌ যদি শাশুড়ী পিসশাশুড়ী চোখের বালি হয়, যদি উঠিতে বসিতে তাহাকে লাথি ঝাঁটা খাইতে হয়, তবে সে দোষটা কার? দোষটা তার ভাগ্যের না শাশুড়ী পিসশাশুড়ীর?

"শ্বশুর ভাল বাসিতেন, তা বাসিবে না কেন, তিনিই তো ঐ কালসাপিনীকে ঘরে আনিয়াছিলেন। আর ভাসুর ভোলানাথ—সেও বোধ হয় ভাদ্রবৌকে পছন্দ করিত, কিন্তু বৌটা ভাসুরের সামনে বাহির হইতে নাই বলিয়া তার ত্রিসীমানা মাড়াইতে চাহিত না। আরে বাপু, এখন আর অত সব কে মানে? ভাসুরে যদি 'পানটা দাও', 'জলটা দাও' বলে তা ঘরে

গিয়ে' দিয়ে আস্‌তে দোষ কি? আসলে বৌটা ছিল কুঁড়ের হদ্দ।"

ইদানীং আবার মিস্‌ স্টিল বলে মিশন হাউসের এক মেমের আনাগোনা চলছিল নন্দীবাড়ী, কি জানি কি হ'তে কি হ'য়ে গেল?" এই সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে নন্দীবাড়ীর দিকে গেলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না, কি হ'য়েছে।

অবশেষে শুনিলাম, সেই বৌটিকে পাওয়া যাইতেছে না। ভাসুর নিমন্ত্রণ-বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই নাকি ভাই-বৌর ঘরের দরজা ঠেলিয়াছিল, ভেজানো ছিল দরজা, ধাক্কায় খুলিয়া গেলে দেখা গেল ঘরে বৌ নাই।

বৌ এদানীং ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইত না, শাশুড়ী পাড়ার মেয়েদের কাছে বলিয়াছিলেন, "বৌর উদুরী হয়েছে, কবিরাজী চল্‌ছে।" "চৌদ্দ কি পনেরো বছরের একরত্তি মেয়ে, তার হ'ল কি না উদুরি! এ এক তাজ্জব বটে। কলিকাল কিনা।" লোকে এই কথাই অবশ্য বলিত।

"তা, ভোলানাথ এসেই নিজের ঘরে না গিয়ে ভাই-বৌর শোবার ঘরের দরজাতেই বা ধাক্কা দিল কেন?" এ প্রশ্নও উঠিয়াছিল।

"আঃ তার কি তখন মাথার ঠিক ছিল? পা টল্‌ছে, তখন শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। আর ভোলানাথের একটু 'বার দোষ' আছে সে কথা অবশ্য সকলেই জানে, কিন্তু এদিকে একেবারে মাটির মানুষ। দায়ে অদায়ে ধার চাইতে গেলে কখনও কাকেও 'না' বলে না।" এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর ও নানা কথা শুনিতে শুনিতে বাড়ি ফিরিলাম। কিন্তু বৌটির যে কি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না।

শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি নন্দীবাড়ীতে এক প্রলয় কাণ্ড।

মিশনের বড়সাহেব ফাদার রেভারেণ্ড ম্যাকসুইনি এবং তাঁহার সঙ্গে মিশনের লোকজন, পুলিসের লোকও সঙ্গে আছে দেখিলাম। নন্দীবাড়ি একেবারে লোকে ভরতি। বৌটি কি তবে মারা পড়িয়াছে? আত্মহত্যা করিয়াছে? না, খুন হইয়াছে?

না সে সব কিছু নয়। বৌটি গতরাত্রে পলাইয়া গিয়া মিশনের আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং রাত্রেই সেই শিশুকে ও তাহার মাতাকে ব্যাপ্তাইজ্‌ করা হইয়াছে।

এখন মিশনের আশ্রিত সেই শিশু ও তাহার মাতার সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে স্বয়ং রেভারেণ্ড ম্যাকসুইনি পুলিস লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

"মাতার সম্পত্তি? হিন্দুঘরের বিধবার আবার কি সম্পত্তি থাকিবে?" "হাঁ ছিল, বৌটির শ্বশুর যে পাকা উইল করিয়া গিয়াছেন, সেই উইল রেজেস্টারীও হইয়াছে। সে উইল তো আর রদ্‌ হইবে না।"

মিশনের লোকেরা বৌটির ঘরে যাহা কিছু আসবাব ছিল সবই বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমি দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, বাড়ির সম্মুখে একখানি মুদ্রিত সুসমাচার চার খণ্ড ছেঁড়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে, "প্রিয়তমা ছোটবৌকে গোলাপীদিদির স্নেহের উপহার।"

মুন্সেফবাবু উত্তেজিতভাবে স্ত্রীকে বলিতেছেন, "দেখ্‌লে তো যা বলেছিলাম তা ফল্‌লো কিনা। ঘরের ঝি বৌ বার করে নিয়ে যাওয়াই ঐ মেম মাগীদের ব্যবসা। হিন্দুর বাড়ি এসে এই উৎপাত, তাতে আবার তোমরা দাও প্রশ্রয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "থাম, থাম, তোমরা আর কথা বোল না। ঘরের বৌ ঝি! কি আমার ঘরের বৌয়ের উপর দরদ গো। ঐ ভোলানাথ— ও কি কম পাত্র? বৌটাকে ওই তো নষ্ট করলে। আর শেষ কালে কি না ও আর ওর মা দুজনে মিলে জড়ি-বুটি খাইয়ে বৌটাকে মেরে ফেলছিলো, আমি বাগ্‌দী বুড়ির মুখে সব শুনেলাম। তাই তো বৌটা অমন করে প্রাণ নিয়ে পালালো। বৌতো মন্দ ছিল না, ছুঁড়ি দিনরাত কাঁদতো। আমি তো চোখেই দেখেছি। ইদানীং কাউকে বৌয়ের ঘরেই ঢুকতে দিত না। যেমন শাশুড়ী তেম্‌নি খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী, বৌটার কি খোয়ারই না করেছে। হিন্দুর বাড়ি বলে আর লাফিও না, হিন্দুর মান-মর্যাদার তোমরা আর রেখেছ কি?

আমাদের দেশে বিয়ের প্রথা আজও অতীত যুগের ধারাকেই বহন করে চলেছে। সানাইয়ের ঐক্যতান, ফুলের সৌরভ এবং নতুন জামাকাপড়ের সম্ভার আজও আমাদের বিবাহবাসরকে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরে তোলে। আর এই আনন্দময় পরিবেশে বিবাহ হয়ে ওঠে একটী স্মরনীয় ঘটনা। বিয়ের ভোজ এই শুভ অনুষ্ঠানের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেইজন্যেই আজ হাজার হাজার পরিবার, যাঁরা নিমন্ত্রিতদের সবচেয়ে ভালধরনের খাবার পরিবেশন করতে চান—নানারকম লোভনীয় খাবারদাবার রান্না করে থাকেন ডালডা মার্কা বনস্পতি দিয়ে। তাঁরা জানেন ডালডা কত ভাল এবং বিশুদ্ধ। এছাড়াও ডালডার খরচ কত কম!

যে কোন জায়গায় ডালডা হচ্ছে বিবাহভোজ এবং আনুসাঙ্গিক আনন্দ চঞ্চলতার নিত্যসঙ্গী।

ডালডা মার্কা বনস্পতি

HVM. 265-X52 BG

ভেনডুরাথের নৌ শিক্ষা কেন্দ্রে

নরেশচন্দ্র বসু

পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র জনগণকে সামরিক শিক্ষা দান করা জাতীয় শিক্ষারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করে। ভারতবর্ষও স্বাধীনতা লাভ করবার পর এইদিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

ভারতবর্ষ চিরদিনই অহিংসার বাণী প্রচার করে এসেছে এবং আজও পণ্ডিত নেহরু সেই বাণীরই ধ্বজা বহন করছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? ভারতের নীতি বিদেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা নয়, বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে নিজের দেশকে রক্ষা করা। বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্য চাই সুশিক্ষিত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। শুধু সংগ্রামের জন্য নয়, শান্তির সময়েও সেনাদলের প্রয়োজন আছে। এদেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব প্রায়ই ঘটে থাকে। সেই সময় শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্যও সেনাদলের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। [illegible] স্থলপথে বা জলপথেও দেশের রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কারণ [illegible] বৈচিত্র্যে স্থলবাহিনী এখানে সামান্যই [illegible] পারে। প্রয়োজন এখানে নৌবাহিনীর। [illegible] বছর আগে ইংলন্ডের [illegible] পেরেছিলেন যে [illegible] ইংলন্ডকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন এক বিরাট নৌবাহিনীর। সেই নৌবাহিনীর [illegible] আজও [illegible]। ভারতবর্ষ ইংলন্ডের নৌবাহিনীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাদেরই সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী নৌ বিভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৌশিক্ষা কেন্দ্র "ভেনডুরাথ" আজ এশিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই শিক্ষা-কেন্দ্রের বয়স না দশ বছরের বেশী নয়। গত মহাযুদ্ধের শেষাশেষি সামরিক প্রয়োজনে এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কালক্রমে সেই বীজই মহীরুহে পরিণত হয়েছে, ভরে উঠেছে ফলে ফুলে।

জীবন সায়াহ্নে যখন ছেলে ঠ্যাঙ্গানোর কাজটাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছিল, তখন অযাচিতভাবে হঠাৎ একদিন এন সি সি'র জুনিয়ার বিভাগে প্রি কমিশন ট্রেনিং-এর জন্য ডাক এলো। এ ডাক যেন বৈচিত্র্য-হীন জীবনে এক মুঠো রঙ ছড়িয়ে দিয়ে গেল। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে, নাগরিক জ্ঞানে, দেশপ্রেমে সর্বদিকে, সর্বক্ষেত্রে যুবকদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হলে স্কুল পাঠ্যতালিকাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সেখানে অতিরিক্ত কিছুর। সেই অতিরিক্ত কিছু হিসেবে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (National Cadet Crops) বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। আমাদের কাজ হবে নিজেদের শিক্ষা গ্রহণের পর ছাত্রদের ঐসকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। গত মহা-যুদ্ধের বহু আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে (U. T. C. বা ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর) সামরিক শিক্ষা দান করা হ'ত। কিন্তু এ শিক্ষা কেবলমাত্র কুচকাওয়াজে বা সাময়িকভাবে বন্দুকাদির ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিমান-বাহিনীতে ছাত্রো যে শিক্ষা গ্রহণ করতো, তা কেবলমাত্র পুস্তকের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে এক অধিবেশনে এই

নেভিগেশন ও ডাইরেকশন বিদ্যালয়। দক্ষিণ দিকে RADAR নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

গানারি (Gunnery) বিদ্যালয়। ১৯৫২ সালে তিনকোটি মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে

শিক্ষা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিস্তৃত করে দেবার এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র পদাতিক বাহিনীতে নয়, নৌ ও বিমান বাহিনীতেও ছাত্রেরা পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে এবং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে বলে স্থির হয়। সবচেয়ে বড় কথা, ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে ছাত্রীরাও ইচ্ছে করলে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষার্থীদেরই "ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর" বা "জাতীয় সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনী" বলে অভিহিত করা হয়।

ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করাও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে বা ছাত্রেরা ইচ্ছুক ও উপযুক্ত বিবেচিত হলে পরবর্তী জীবনে তাদের এই সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনীর মধ্য থেকেই সরকারী সেনাবাহিনীতে (Regular Army) গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র এইদিকে নয়, বর্তমানে নানাপ্রকার সমাজ উন্নয়নের কাজে যথা:—রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন ইত্যাদি কাজেও এই শিক্ষার্থী বাহিনী স্বেচ্ছায় কাজ করে ভারতের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করছে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদির পর একদিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা পাঁচজন কোচিনের 'ভেনড়ুরথি'র দিকে যাত্রা করলাম।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের এক বিচ্ছিন্ন অংশের ওপর কোচিন বন্দরের অবস্থিতি। কোচিন রাজ্য বৃটিশ কোচিন, মাত্তেনচারী, আরনাকুলাম, ভেনড়ুরথি ও নিচুড়ে নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কোচিন রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ও রাজধানী ছিল আরনাকুলাম। ভেনড়ুরথি বা ওয়েলিংডন দ্বীপের অপর দিকেই এর অবস্থান। কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে ভেনড়ুরথিও একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। আরনাকুলাম ও কোচিন বন্দরের সঙ্গে দুটো সেতুর দ্বারা ভেনড়ুরথি যোগাযোগ রক্ষা করছে। মালয় ভাষায় একটা কিংবদন্তী আছে যে, নিকটবর্তী ভলগাটিক দ্বীপেরই একদিন অংশ ছিল বর্তমান ভেনড়ুরথি। একদিন প্রভাতে দেশবাসী আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে, ভলগাটিকের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আর তার মধ্যে দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে আরব সাগরের জলধারা। দেশবাসী এই স্থানের নাম দিল 'ভেনড়ুরথি' অর্থাৎ "বিচ্ছিন্ন দেশ"। ভেনড়ুরথির আয়তন প্রায় পাঁচ মাইল—সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র—বাহিরের অধিবাসীদের বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। চারি পার্শ্বে জলধারার সমুদ্রের ন্যায় গর্জন বা স্ফীতি নেই—আছে নিম্ন স্রোত—যার ভয়ে সকলেই ভটস্থ। নিকটবর্তী কোচিনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুলাংশে মিল আছে। পানাপুকুর মশার সংকীর্তন কদলী বৃক্ষের কিউ বাংলাদেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন স্তরের। অধিকাংশই ধীবর শ্রেণীর। পুরুষ ও নারী সমভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। কি পোশাকে—কি আহারে-বিহারে সামান্যতম প্রাপ্তিতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মনে হয়, তাদের পক্ষে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করা যত সহজ, জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করা তত সহজ নয়।

৯ই জুলাই, শনিবার আমরা কোচিনে পৌঁছাই। সেইদিনই নিত্যকার ব্যবহার উপযোগী বস্ত্রাদি আমাদের দিয়ে দেওয়া হ'লো। ১১ই জুলাই, সোমবার থেকে

নিয়মিত ক্লাশ আরম্ভ হ'ল। মোটামুটি-ভাবে ভোর ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজের সময়। কিন্তু ভোর পাঁচটায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত না করতে পারলে আর সারাদিনেও তা সমাপ্ত করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। ছ'টার মধ্যে শরীর চর্চার জন্য উপস্থিত হতে হয়, জের চলে প্রায় প'য়তাল্লিশ মিনিট। তারপরে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা—ব্রেক ফাস্টের সময়—ইতিমধ্যে পোশাক বদলের হ্যাংগাম আছে। সাড়ে সাতটা থেকে দশটা প্যারেড, দশটা থেকে দেড়টা থিওরিটিক্যাল ক্লাশ। দেড়টা থেকে আড়াইটে লাঞ্চের সময়। পুনরায় চারটে থেকে পাঁচটা কোনপ্রকার খেলাধুলো, সাঁতার বা নৌকো চালানো ইত্যাদি। আটটা থেকে ন'টা ডিনারের সময়। মোটামুটি এই হ'ল নিত্যকার কার্যসূচী। তার মধ্যে কোনদিন ব্যায়ামের বদলে সাঁতার বা থিওরিটিক্যাল ক্লাশের মধ্যে sailing বা নৌকোয় কি করে পাল টাঙগাতে হয় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। শিক্ষাদানের প্রণালী কত নিখুঁত হতে পারে তা এখানে শিক্ষা গ্রহণ না করলে বোঝা শক্ত। এই শিক্ষার মধ্যে প্রত্যেকের পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের খুঁটিনাটি ও পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত। আর দেওয়া হ'ত কথাবার্তার স্টাইলের ওপর, বিতর্কের ওপর, নিয়মিত উপস্থিতি ও নিয়ম নিষ্ঠার ওপর। এই নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি প্রত্যেকেই বিশেষ সতর্ক ছিল। প্রত্যহ ভোরবেলায় যাতে প্রত্যেকের নিয়মিত ঘুম ভাঙ্গে সেদিকে সকলেই সজাগ ছিল। কোন কারণ বশত কারুর ঘুম না ভাঙ্গলে অন্য কেউ তাকে ডেকে দিত। এই ঘুম ভাঙ্গার প্রতি উৎকণ্ঠার সুযোগ নিয়ে একদিন ভট্টাচার্য্য—একজন সহকর্মী, রাত্রি তিনটের সময় পাঁচটা বেজেছে বলে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কোনরকম সন্দেহ পোষণ করেনি—ঘড়িতে সময় দেখা সত্ত্বেও—কারণ প্রত্যেকেই ভেবেছিল, তাদের ঘড়ি হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, না হয় ঠিকমত সময় দিচ্ছে না। এ সামান্য ঘটনা প্রত্যেকেই যে কি পরিমাণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রাত্রি যাপন করতো তারই সামান্য নিদর্শন।

এই নৌকাগুলি নিয়েই ছাত্রেরা sailing ও pulling অভ্যাস করে

বিতর্ক বা পরীক্ষা কোনটাই আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হবার সময় দেওয়া হ'ত না। হঠাৎ ক্লাশে গিয়ে দেখতাম যে, বোর্ডে বিতর্কের বিষয় দেওয়া রয়েছে এবং ছাত্রদের অর্ধচন্দ্রাকারে বসবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতো এন সি সি'র জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ, সাব লেফটেন্যান্ট এবং সি ডবলিউ ছাত্রেরা। একজন বা দু'জন লেঃ কম্যান্ডার, তিন চারজন লেফটেন্যান্ট, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন। আমাদের দু'টি বিতর্ক হয়েছিল এবং দু'টিই খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। একটি—"হিন্দীকে কি ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত" ও অপরটি "বর্তমান ছাত্র-দের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার কারণ কি?" বলা বাহুল্য যে, দুটিতেই বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং হিন্দীর পরিবর্তে বাংলাভাষার পক্ষ নেওয়ায় প্রায় একক হয়ে ২০।২৫ জনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। বিতর্ক ছাড়া আর একটি বিষয় ছিল—বক্তৃতা। পূর্ব প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে মঞ্চে দাঁড়াবার পর প্রত্যেককে একটি বিষয় বলে দেওয়া হ'ত এবং তার ওপর দু' মিনিট বক্তৃতা দিতে হ'ত। এই বক্তৃতা যে কোন বিষয় নিয়ে হতে পারে, তবে সাধারণত ব্যক্তি বিশেষের উপরই নির্দিষ্ট হত। এই ব্যক্তি বিশেষও মঞ্চ বা পর্দা, খেলার মাঠ বা ইতিহাসের পাতা থেকে স্থান পেতেন। যেমন নেলসন, ক্যাথারিন, পীটার দি গ্রেট, রিটা হেওয়ার্থ, সোফেন [illegible], আর কৃষ্ণান ইত্যাদি।
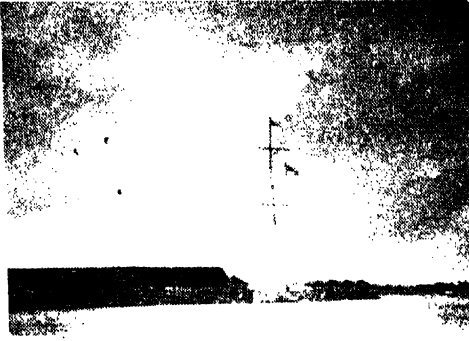
পতাকাদণ্ড

উপরের পতাকাটি কমোডর ইন্-চার্জ অফ কোচিনের। দ্বিতীয় পতাকা—স্থানটি যে "যুদ্ধ প্রতিষ্ঠান" সেটি নির্দেশ দিচ্ছে। এই পতাকাটি প্রত্যহ প্রাতে ৮টায় ওঠান ও সন্ধ্যা ৬টায় নামানো হয়
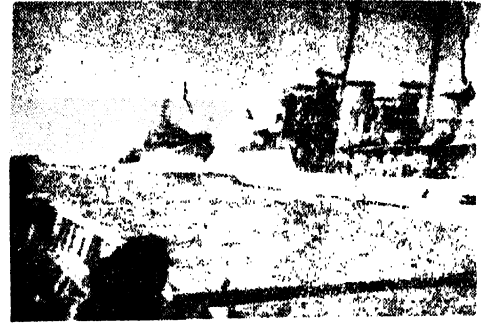
একাদশ ডেস্ট্রয়ার বাহিনীর অন্যতম ডেস্ট্রয়ার রাজপুত ও রণজিৎ। ত্রিনকোমালি যাবার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য 'ভেনডুরাথি'তে বিশ্রাম নিচ্ছে

১৭ই অগাস্ট সি. এন. এস. কারলিল (Rear admiral S. H. Carlill— Chief of Naval Staff) এলেন কোচিন পরিদর্শনে। তাঁর জন্য এক গার্ড অফ অনারের ব্যবস্থা হ'ল। বিচিত্র পোশাকে, অস্ত্রের ঝনঝানির মধ্যে যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলাম—তখনকার মনের অবস্থা, মনের সে অনুভূতি, বোঝাই এমন ভাষা আমার নেই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চৌদ্দ জন ট্রেনিং-এর জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনজন সিনিয়র ও এগারজন জুনিয়র বিভাগে। এগারজনের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশ থেকে, দু'জন করে বিহার ও কোচিন থেকে এবং দিল্লী ও অন্ধ্র থেকে একজন করে। এর মধ্যে সিনিয়র বিভাগে একজন স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ও জুনিয়র বিভাগে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একজন দৈহিক অক্ষমতার জন্য ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতের সামরিক বিভাগের নৌ-বাহিনী—যার সঙ্গেই আমার পরিচয় হ'ল ঘনিষ্ঠ, তার প্রধান সেনাধ্যক্ষের অধীনে চারজন ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করেন। তাঁরা যথাক্রমে কমোডর ইন্ চার্জ অফ বম্বে (Commodore in Charge of Bombay), কমোডর ইন্ চার্জ অফ কোচিন (Commodore in Charge of Cochin), ন্যাভেল অফিসার ইন্ চার্জ অফ ভিজাগাপট্টম (Naval Officer in Charge of Vizgapattam), ও ফ্ল্যাগ অফিসার ফ্লোটিলা ইন্ ইণ্ডিয়ান ফ্লীট (Flag Officer Flotilla in Indian Fleet) এর মধ্যে কমোচিনের (কমোডর ইন্ চার্জ অফ কোচিনের সংক্ষিপ্ত রূপ) অধীনে আছে (ক) জাহাজ, (খ) বিমান কেন্দ্র ও (গ) বিদ্যালয়।

(ক) জাহাজঃ জাহাজের মধ্যে বর্তমানে আছে আই. এন. এস. মগর (I. N. S. MAGAR)।

(খ) বিমান কেন্দ্রঃ—নৌ বাহিনীর বিমান কেন্দ্রের পরিচালনার ভার ১৯৫৩ সালে অসামরিক বিভাগের হাত থেকে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৩ সালের মে মাসে এর আই. এন. এস. গরুড় (I. N. S. GARUDA) নামকরণ হয়। বিষ্ণুর বাহন গরুড় দ্রুতগতির জন্য বিখ্যাত। সেই অর্থেই বিমান কেন্দ্রের নামকরণ হয়েছে।

(গ) বিদ্যালয়—বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে গানারি এবং নেভি-গেশন ও ডাইরেকসন বিদ্যা-লয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল ছাত্রেরা, স্পেশ্যাল এনট্রির ঐ বিভাগের ছাত্রেরা, কমিশন ওয়ারেণ্ট বা ওয়ারদির ছাত্রেরা সকলেই ভেনডুরথির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষাধারার একাংশ গ্রহণ করে। কর্মচিনের অধীনে আছে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলিঃ (ক) বেসিক ও ডিভিশনাল, (খ) সীম্যানস্ ইউনিট, (গ) নেভিগেশন ও ডাইরেকশন, (ঘ) সিগন্যাল, (ঙ) গানারি, (চ) টর্পেডো, (ছ) এ্যাণ্টি সাবমেরিন, (জ) ডাইভিং ও (ঝ) ট্যাকটিক্যাল। কেবলমাত্র এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা নয়, যাতে দেশের নানাপ্রকার ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, ফ্রিগেট ইত্যাদির দ্বারা শক্তি-বৃদ্ধি হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। রাণা, রাজপুত, রণজিৎ, গঙ্গা, গোদাবরী, গোমতী প্রভৃতি বিভিন্ন নাম-ধারী ডেস্ট্রয়ার; যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি ফ্রিগেট আমাদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করেছে। আই এন এস দিল্লী অপেক্ষাও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হয়ে 'নাইগেরিয়া' নামক ক্রুজারটি "মাইসোর" নামে ১৯৫৭ সালের মধ্যেই ভারতের তীরে দেখা দেবে। এছাড়া বাসেইন, বিমিলপটম্ নামে মাইন সুইপারগুলি প্লিমাউথ বন্দর ত্যাগ করে ভারতের দিকে যাত্রা করেছে। বিভিন্ন বিভাগে এই প্রকার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করেই প্রাক্তন প্রধান নৌ-সেনাধ্যক্ষ স্যার মার্ক পিজে গত ১১ই জুলাই নূতন দিল্লীতে ভারতের নৌবাহিনী সম্বন্ধে উক্তি করেছিলেনঃ—

"We can to-day claim to have perhaps the best naval training facilities in the East, and we have not only achieved self sufficiency in training of our own personnal, but are also able to undertake the training of officers and men from the commonwealth and foreign navies."

দু' মাসের ট্রেনিংএর পর প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা গৃহীত হোল। তারপর একদিন "ভেনডুরথির" মায়া ত্যাগ করবার জন্য আদেশ এলো। প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিদের অর্থ অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাদের বাকি ছিল অগাস্টের মাঝামাঝি তাদেরও সেই অর্থ এসে গেল। কেবলমাত্র বাঙলা দেশের প্রতিনিধিরাই না পেলেন অর্থ, না পেলেন পর পর ছয়টি টেলিগ্রামের জবাব। কোনটাই পাঠাবার দরকার মনে করলেন না বাঙলার কর্তৃপক্ষ। ২৬শে অগাস্ট—অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিছানা-পত্তর বাঁধতে আরম্ভ করলেন। আমরা পোস্ট অফিস আর 'ভেনডুরথি'র কর্তৃপক্ষের দরজায় মাথা ঠুকে বেড়াতে লাগলাম। ২৭শে আগস্ট বেলা ১১টার সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের অর্থ দিয়ে বেলা ৩টের গাড়িতেই কোচিন ছাড়বার আদেশ দিলেন। বেলা ১টার সময় ক্যাপ্টেন এসে এক ওয়াইন আউট পার্টিতে আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে গেলেন। এই সব পার্টিতে যেটা সর্বাগ্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ব্যবহার। হাসি-ঠাট্টায়, রংগ-রসে তাঁরা আসর সরগরম করে তুলতেন। ভুলে যেতাম উভয়ের মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য। কিন্তু ঘরের বাইরে আসার সংগে সংগে তাঁরা যেন ফিরে পেতেন প্রাক্তন অবস্থা। আমাদের কোর্স অফিসার লেঃ অরোরা কারুর অসুখবিসুখের সংবাদ পেলে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এসে তার সুবিধা-অসুবিধার কথা জেনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁদের দৃষ্টি যেমন ছিল সজাগ, তেমনি তাঁরা ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন।

বেলা আড়াইটের সময় কোনরকমে জিনিসপত্তর বেঁধে উঠে বসলাম ট্রাকে। ট্রাক ছুটে চললো—স্টেশনের দিকে। মনে পড়ে যাচ্ছে দু' মাসের বহু টুকরো স্মৃতি। বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ যেন নিমেষে ভেঙে গেল। হঠাৎ খট্ করে আওয়াজ হোল। তাকিয়ে দেখলাম সিংহ-দরজার প্রহরী আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। তাকে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। ট্রাক ছুটে চললো। আস্তে আস্তে সিংহ-দরজার দ্বার গেল বন্ধ হয়ে—চিরকালের মত কি না কে জানে?

রত্নাকর

আজ যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের "রেনেসাঁস" বা পুনর্জাগরণ হয়েছে, আজ যেমন খেয়াল, ঠুংরী ও রাগপ্রধান গান শোনবার জন্য সাধারণ লোকও পাগল, যেমন পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন প্রকৃতির সাংগীতিক সম্মেলন, সমিতি প্রভৃতির প্রযোজনার সংবাদ পাওয়া যায়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে—পঞ্চাশ কেন পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেও সে রকম কিছু ছিল না। এখন খেয়াল ঠুংরীর যুগ চলেছে, তখন ছিল ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার যুগ, যার ভিতর ধ্রুপদেরই স্থান ছিল মুখ্য। তখন উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিবেশন হোত মুষ্টিমেয় কয়েকজন সংগীত বিলাসীর মধ্যে, যাঁরা হয়েছিলেন অভিজ্ঞ সংগীত কুশলী অথবা সংগীত শিল্পে অনভিজ্ঞ হয়েও শুনে শুনে যাঁদের কান তৈরী হয়ে গিয়েছিল, যার দরুণ তাঁরা সংগীতের ভালমন্দ বুঝতে পারতেন, তারতম্য বিচার করতে পারতেন। এ প্রকার সংগীতের সহিত সাধারণ লোকের কোন সম্বন্ধই বা কোন পরিচিতিই প্রায় ছিল না। যদি বা কখনও জনসাধারণের কোন ক্ষুদ্র অংশ স্রেফ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ছিটকে আসার মত এমনি এক জলসায় ঢুকে পড়তেন তো ধ্রুপদীদের আলাপের 'নোম্ তোম্'-এর ঠেলায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে আসর ছেড়ে পালাতেন। আমি কতবার যে কত লোকের মুখে ধ্রুপদ গানের নিন্দা শুনেছি, "কি সে লাউ-এর খোলের ওপর চাপড়ে চাপড়ে আঁউ আঁউ করছে" আর সংখ্যা নেই। সে যুগে মেয়েদের কানে বরং ও ধ্রুপদ গানের সাদাসিদে বিস্তার সহ্য হোত, কিন্তু খেয়ালের হাঁ-হাঁ হুঁ হুঁ তানকর্তব তাঁদের বরদাস্ত হোত না। তানকর্তবকে তাঁরা বলতেন, "গলায় আঙুল দিয়ে বমি করা।" মেয়েরা সাধারণত ধর্মগতপ্রাণ। কাজেই কীর্তন, ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্বমূলক গান, শ্যামা সংগীত প্রভৃতি গম্ভীর রসপূর্ণ গানই শুনতে তাঁরা ভালবাসতেন। এমন কি আধুনিক গানকেও অনেকে রুচিসম্মত মানতেন না। সাধারণ সভায় কবিগুরুর রাগপ্রধান গানগুলিরই প্রচলন ছিল। সংগীত কলায় অ-দীক্ষিত জনসমুদয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোন তোয়াক্কাই রাখতেন না।

এ সম্পর্কে আমার এক দাদাবাবুর কাছে, রাণাঘাটের খ্যাতনামা খেয়ালী জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনী সংক্রান্ত এক সুন্দর গল্প শুনেছি। ইনি, শুনেছি, পশ্চিম থেকে কোন্ এক মুসলমান ওস্তাদের ঘরানা গান শিখে এসেছিলেন। বহুবর্ষ প্রবাস বাসের পর যখন তিনি গ্রামে ফিরলেন, তখন তাঁর সংসারে একমাত্র অভিভাবিকা, এক বন্ধ্যা পিসী জীবিতা। এই পিসী একদিন জগদীশবাবুকে বললেন, "হ্যাঁরে, জগু, লোক মুখে শুনছি, তুই নাকি বিদেশ থেকে খুব ভাল গান শিখে এসেছিস? তা কি শিখলি, আমাকে একটু শোনা দিকি!" জগদীশবাবুর তো মহাস্ফূর্তি, পরিবারের একমাত্র প্রাণী তাঁর গান শুনতে চেয়েছেন! ছুটে নামিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর মূল্যবান তম্বুরা, সেটিকে গিলাপ থেকে খুলে সুর বাঁধতে লেগে গেলেন। আনুষ্ঠানিক পর্ব গুলি সম্পাদন করতে করতেই প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হোল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক শঙ্খ ধ্বনিতে আচ্ছন্ন হতে আরম্ভ করেছে। পিসীও তাঁর মালা গাছটি নামিয়ে নিয়ে জপ করবার জন্য তৈরী হচ্ছেন এবং মনে মনে গান শোনার আগ্রহে অধীর অপেক্ষায় জগদীশবাবুর কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছেন। আশা, গানটি শেষ হলে পূজো কার্যে মন সন্নিবেশ করবেন। জগদীশবাবু অবশেষে গান ধরলেন—ইমনের অতি সাবেকী খেয়াল, "আল্লা মাণ্ডি আ—"। সন্ধ্যা হয়েছে, পিসীর জপে বসতে দেরী হয়ে যাবে, তাই জগদীশবাবু তাঁর একঘণ্টা ধরে আলাপচারী ক্রিয়াটিকে স্থগিত রেখে সরাসরি গান ধরে দিলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিল না যে, পিসীর অনভ্যস্ত কানে কঠিন খেয়াল গান অতি অদ্ভুত ও বিশদৃশই শোনাবে। কিছুক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভ্রাতুষ্পুত্রের "আল্লা"

"আর্দালা"-র কেরদানি শুনে পিসী আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, "ও বাবা জগু, থামু, বাবা, তুই থাম। তোর ঐ গানে তুইও এলুলি, আমারেও এ্যালালি।" জগদীশবাবু লজ্জিত হয়ে গান বন্ধ করে দিলেন। এ রকম ঘটনা কেবল অতীতেই যে ঘটত, তা নয়, আমাদের সময়েও ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। কলেজে পড়ার সময় আমি আমার এক আত্মীয়কে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিদের নিকট নিয়ে গিছলুম। ভদ্রলোক তো আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেনই, উপরন্তু ২।৩ খানি ভাল গান শুনিয়ে আমাদের খাতির করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমরা রাস্তায় এসে পড়লুম, তখন সমবয়সী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যারে, কু—, কেমন গান শুনলি?" প্রশ্ন শুনে আত্মীয় তো প্রথমে চমকে উঠল, পরে উত্তর দিলে, "গান—! ওই গোদা বাঁদিরের মত 'অয়্' 'অয়্' করাকে তুমি গান বল?" বন্ধুটি আমার ছিলেন গ্রামীণ, কাজেই তার ভাষাও ছিল গ্রাম্য দোষে দুষ্ট। তবুও তার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের এই বঙ্গদেশে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বেও গানের হাওয়া কোন্ দিকে বইত।

এই হাওয়ার গতি কোন্ দিকে বইত এবং কেমন ভাবেই বা বইত, এ সম্বন্ধে এখানে আরও দু একটি উদাহরণের অবতারণা করলে কোন ক্ষতি নেই। কেবল নৃত্যকলাই লোকসমাজে হেয় ছিল তা নয়, সকল রকম সঙ্গীতকলাও সেই সঙ্গে ভদ্রঘরের অপাংক্তেয় ছিল। কলিকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর আমি একবার আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মশায়কে বলেছিলুম, "আমায় পশ্চিমে পাঠিয়ে দিন, আমি গান শিখব।" তিনি তো আমার স্পর্ধা দেখে অবাক্ হয়ে শুধু বললেন, "গান শি—খ—বি!" ভাগ্যিস্, ব্যাপার ঐখানেই মিটে গিছল, নৈলে কথাটা জানাজানি হয়ে যদি আমার জ্যেষ্ঠতাতের কর্ণে উঠত, তাহলে সম্ভব আমি অক্ষত থাকতুম না সেদিন। বলা বাহুল্য, পড়াশুনার চেয়ে গানবাজনায় আমার শখ ছিল বেশী। আমার এক মামা ছিলেন, তিনি সামান্য কিছু গান-বাজনা জানতেন এবং দু একখানি বাঙলা গান ভালই গাইতেন। গলা আমার মন্দ ছিল না, তাই গান গাইবার হুকুমনামাটুকু পেয়েছিলুম তাঁর কাছ থেকে, শুধু কোন্ কোন্ গান গাইতে পাব, তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম ছিল। যেমন ধরুন, "এমন যে হবে, প্রেম যাবে তা কভু মনে ছিল না" বা "নিমিষেরি দেখা যদি পাই হে তোমারি," এমনি ধরনের গান গাওয়া বেবাক্ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু "জন্মাষ্টমী" পালার সব গান গাইবার অধিকার ছিল, কেননা পালাটি কৃষ্ণের জন্মলীলা বিষয়ক, অতএব ভক্তিরসাত্মক। দ্ব্যর্থবোধক রবীন্দ্রগীতি সেকালের গোঁড়া হিন্দুসমাজের ভীতির বস্তু ছিল। "চিরসুন্দর তুমি, আমার আঁখি সদা তোমায় হেরিতে চায়," এমন গান গাওয়াও মুশকিল ছিল। বাড়ীতে "কৃপণের ধন" পালা ছিল। গুরুর অভাবে অগত্যা রেকর্ডের গানই আমাদের কণ্ঠে তুলে গানের স্টক বাড়াতে হোত। একদিন এমনি ঐ পালার এক গান, "সেই নৈহাটীর ঘাটে, বসে পৈঠের পাটে, খেলা করেছি ফুল ভাসিয়ে জলে......" মনের আনন্দে গাইছি, এমন সময় দেখি, সেই মামা একদম সামনে এসে হাজির। মুখের উপর এক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "বেশ, বেশ, লক্কা পায়রার মত মাথায় ঝুঁটি, আর মুখে খাঁচ পায়রার মত বকবকমকম গান। হচ্ছে তোমার ব্যবস্থা, কাল সকালেই।" সেদিন শনিবার ছিল,

পরদিন রবিবার, অফিস নেই। সকাল-বেলাই নাপিত ডেকে, সামনে দাঁড়িয়ে (পাছে বিদ্রোহ করে বসি) আমার চুল-গুলির এমন কদমছাঁট ছাঁটিয়ে দিলেন যে, একমাস আমি আর মাথা তুলতে পারিনি, গান গাওয়া তো দূরের কথা। জানিনে, সমবয়সীদের মধ্যে আমার মত ভুক্তভোগী কেউ আছেন কিনা, তবে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, আমি সেটুকু কবুল করেই ফেললুম। আমার সেই দূর-সম্পর্কীয় মাতুল আজ আর ইহজগতে নেই। থাকলেও হয়ত তিনি 'প্রোটেস্ট্' করতেন। বলতেন, "যা করেছিলুম, তোরই ভালর জন্যই করেছিলুম, তোরই চরিত্রের বাঁধনের জন্য এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলুম, নৈলে বয়ে যেতিস্। উচ্ছন্ন তো যেতে বসেছিলি?"

গানবাজনা করলে যে উচ্ছন্ন যায়, নরক যাবার পথ যে প্রশস্ত ও পরিষ্কার হয়, কেবল বখাটে ছেলেরাই যে গান-বাজনা করে, এ ধারণা ঘরে ঘরে বদ্ধমূল ছিল। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মাতুলের আর অপরাধ কি? সঙ্গীতকলারূপে পুষ্পের মধ্যে নৈতিক অবনতি বিষাক্ত সর্পের ন্যায় সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকে। অতএব ভদ্রলোকের ছেলের গানবাজনা করতে নেই, তখন সমাজ ব্যবস্থার গৃহসূত্রে এমনিতর ছিল। অথচ আজ এই সঙ্গীত-কলার পুনর্জাগরণের দিন অতীতের প্রসঙ্গ বিচার করে আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনে। সত্যিই কি সঙ্গীতকলার পরিপোষণ আমাদের শনৈঃ শনৈঃ নৈতিক অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে? তখনকার দিনে গায়কমহলে মদ্যপানটি চারুকলার বাহন বা অনুচর ছিল। অধিকাংশ কলা-বিদ্ই এই নেশার বশীভূত ছিলেন। চরিত্রের শুধু এই দুর্বলতাটুকুই আমার চোখে ধরা পড়েছে, আর কিছু পড়েনি। আমি অবশ্য বাইজী বাড়ীতে সারেঙ্গী বা সংগতকারদের কথা বলছিনে। আমার আপনার মত যাঁরা ভদ্রবংশোদ্ভূত, তাঁদের সম্বন্ধেই আলোচনা করছি। আমার যত-দূর বিশ্বাস, পিছন পানে ফিরে দৃষ্টি দিলে এমন কিছুই আমরা দেখতে পাইনে যার আপেক্ষিক বিচারে আমাদের এই আধুনিক যুগকে খেলো হয়ে যেতে হয়। সে যুগে যে সুরার প্রস্রবণের ফেনিল উচ্ছ্বাস ঘরে ঘরে ছুটত, সে প্রস্রবণের দর্শন এ যুগে কদাচিৎ মেলে। আর নৈতিক অধোগতি? আমি 'নৈতিক' অর্থে 'চারিত্রিক' বিবেচনা করছি। সে হাঁড়ির খবর জানা এখনও যত মুশকিল, তখনও তত মুশকিল ছিল। কথা হচ্ছে, অন্ধ গোঁড়ামি ছিল প্রাচীন যুগের মাতুলদের মাপকাঠি, তাই তাঁরা প্রতি ঝোপের মধ্যে শার্দুল মরীচিকার সন্দর্শন করতেন। আধুনিক মাতুলেরা মাঠের মধ্যে ঝোপের চিহ্নও রাখেননি, সব নির্মূল করে রেখেছেন।

॥ আট ॥

সালুয়ালাঙ্ গ্রামের ওপর জা কুলি মাসের রাত্রি এখন নিথর হয়ে গিয়েছে। কেসুঙে কেসুঙে পাহাড়ী মানুষগুলো নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্ধকারের সঙ্গে কুচি কুচি বরফের কণা ঝরছে আকাশ থেকে। মোরাঙের মধ্যে পেনু্য কাঠের মশাল এখন নিভে গিয়েছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে একটুকু রক্তাভাও বেরিয়ে আসছে না বাইরে।

হিমার্ত বাতাস মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে আছড়ে পড়ছে বনশীর্ষে। এই তুষারঝরা রাত্রি, এই হিমাক্ত বাতাস, এই নিবিড় অন্ধকার! পাহাড়ী জনপদটা জা কুলি মাসের ভয়াল রাত্রির থাবা থেকে দাঁড়ির লেপের নীচে ডুব দিয়েছে। একটা নিটোল আর মসৃণ ঘুমের অতলান্তে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

কোথায়ও এতটুকু শব্দ নেই। নিথর জনপদ। এমন কী টেফোয়া আর কুকুর-গুলো পর্যন্ত একটু উত্তাপের প্রার্থনায় পাহাড়ের ভাঁজে ঢুকে গিয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে হিমাক্ত পাথরের ওপর স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে পালিত মোষের দল।

অনেক দূরে পোকারি কেপুঙ্ থেকে একটা মশালের আলো মোরাঙের দিকে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য ক্ষীণ আলোক-বিন্দু। চারপাশের কঠিন অন্ধকারকে প্রাণান্ত সংগ্রামে সামান্য সরিয়ে একটু পথ করে নিতে পেরেছে। মশালের চার-পাশে এক রহস্যময় আবছায়া; আর সেই আবছায়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের কণা উড়ছে।

একটু একটু করে মশালের আলোটা মোরাঙের পেছনে এসে দাঁড়ালো। পাশে অতল খাদ। বনের বাঁধনে জটিল হয়ে পাহাড়ের দেহ খাড়া নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। মশালের নিস্তেজ দৃষ্টি খাদের গভীরে পৌঁছাতে পারে নি। চারপাশ থেকে গাঢ় কুয়াশা আলোক বিন্দুটির কণ্ঠনলী চেপে ধরেছে। নিজেকে এতটুকু বিস্তার করতে পারছে না মশালটা।

মশালের দু'পাশে দুটি নারী মূর্তি। জঙ্ঘা থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত দাঁড়ির লেপ দিয়ে জড়ানো। তাদের ভৌতিক ছায়া এসে পড়েছে মোরাঙের দেওয়ালে। ছায়া দুটো কাঁপছে।

মোরাঙের দিকে দু'জনে চনমন চোখে তাকালো। তারপর একজন ভীরু ভীরু গলায় বললো, "খুব সাবধান মেহেলী, ওরা জানতে পারলে একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটবে। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"ভয় করলে কেসুঙের খাতে (ঘরে) ফিরে যা লিজোমু।। তুই আমার আসটাকে (দাদা) না পিরীত করতি! তুই তো আট্‌সার লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) ছিলি! তোর মত মেয়েকে মী (বর্শা) দিয়ে ফুঁড়ে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখা দরকার।" মেহেলীর চোখদুটো আগ্নেয় হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য! লিজোমু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো না। শুধু ফিস ফিস গলায় সে বললো: "খোন্‌কেকে খাদে ফেলে দিয়েছে সদ্দার। সে কী আর বেঁচে আছে?"

"খাদে ফেলার সময় একপাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি। এই ঘন বন; এর মধ্যেই হয়তো কোথায়ও আটকে আছে আট্‌সা (দাদা)। তুই একটু দাঁড়া, আমি নীচে নেমে দেখে আসি। এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি; খবদ্দার মোরাঙের ওরা যেন টের না পায়!" শেষের দিকে গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠলো মেহেলীর; "তুই দেখিস, আট্‌সা (দাদা) মরে নি। ও ঠিক আবার বেঁচে উঠবে। যদ্দিন সেরে না ওঠে, তদ্দিন লুকিয়ে রাখতে হবে গাছের ওপরের খাতে (ঘরে)।"

মোরাঙটার দিকে শঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে নিল লিজোমু: "আমার

পরদিন রবিবার, অফিস নেই। সকাল-বেলাই নাপিত ডেকে, সামনে দাঁড়িয়ে (পাছে বিদ্রোহ করে বসি) আমার চুল-গুলির এমন কদমছাঁট ছাঁটিয়ে দিলেন যে, একমাস আমি আর মাথা তুলতে পারিনি, গান গাওয়া তো দূরের কথা। জানিনে, সমবয়সীদের মধ্যে আমার মত ভুক্তভোগী কেউ আছেন কিনা, তবে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, আমি সেটুকু কবুল করেই ফেললুম। আমার সেই দূর-সম্পর্কীয় মাতুল আজ আর ইহজগতে নেই। থাকলেও হয়ত তিনি 'প্রোটেস্ট' করতেন। বলতেন, "যা করেছিলুম, তোর ভালর জন্যই করেছিলুম, তোরই চরিত্রের বাঁধনের জন্য এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলুম, নৈলে বয়ে যেতিস্। উচ্ছন্ন তো যেতে বসেছিলি?"

গানবাজনা করলে যে উচ্ছন্ন যায়, নরক যাবার পথ যে প্রশস্ত ও পরিষ্কার হয়, কেবল বখাটে ছেলেরাই যে গান-বাজনা করে, এ ধারণা ঘরে ঘরে বদ্ধমূল ছিল। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মাতুলের আর অপরাধ কি? সঙ্গীতকলারূপ পুষ্পের মধ্যে নৈতিক অবনতি বিষাক্ত সর্পের ন্যায় সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকে। অতএব ভদ্রলোকের ছেলের গানবাজনা করতে নেই, তখন সমাজ ব্যবস্থার গৃহ্যসূত্রে এমনিতর ছিল। অথচ আজ এই সঙ্গীত-কলার পুনর্জাগরণের দিন অতীতের প্রসঙ্গ বিচার করে আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনে। সত্যিই কি সঙ্গীতকলার পরিপোষণ আমাদের শনৈঃ শনৈঃ নৈতিক অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে? তখনকার দিনে গায়কমহলে মদ্যপানটি চারুকলার বাহন বা অনুচর ছিল। অধিকাংশ কলা-বিদ্ই এই নেশার বশীভূত ছিলেন। চরিত্রের শুধু এই দুর্বলতাটুকুই আমার চোখে ধরা পড়েছে, আর কিছু পড়েনি। আমি অবশ্য বাইজী বাড়ীতে সারেঙ্গী বা সঙ্গতকারদের কথা বলছিনে। আমার আপনার মত যাঁরা ভদ্রবংশোদ্ভূত, তাঁদের সম্বন্ধেই আলোচনা করছি। আমার যত-দূর বিশ্বাস, পিছন পানে ফিরে দৃষ্টি দিলে এমন কিছুই আমরা দেখতে পাইনে যার আপেক্ষিক বিচারে আমাদের এই আধুনিক যুগকে খেলো হয়ে যেতে হয়। সে যুগে যে সুরার প্রস্রবণের ফেনিল উচ্ছ্বাস ঘরে ঘরে ছুটত, সে প্রস্রবণের দর্শন এ যুগে কদাচিৎ মেলে। আর নৈতিক অধোগতি? আমি 'নৈতিক' অর্থে 'চারিত্রিক' বিবেচনা করছি। সে হাঁড়ির খবর জানা এখনও যত মুশকিল, তখনও তত মুশকিল ছিল। কথা হচ্ছে, অন্ধ গোঁড়ামি ছিল প্রাচীন যুগের মাতুলদের মাপকাঠি, তাই তাঁরা প্রতি ঝোপের মধ্যে শার্দুল মরীচিকার সন্দর্শন করতেন। আধুনিক মাতুলেরা মাঠের মধ্যে ঝোপের চিহ্নও রাখেননি, সব নির্মূল করে রেখেছেন।

॥ আট ॥

সা ল্যমালাঙ্ গ্রামের ওপর জা কুলি মাসের রাত্রি এখন নিথর হয়ে গিয়েছে। কেসুঙে কেসুঙে পাহাড়ী মানুষগুলো নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্ধকারের সঙ্গে কুচি কুচি বরফের কণা ঝরছে আকাশ থেকে। মোরাঙের মধ্যে পেনু্য কাঠের মশাল এখন নিভে গিয়েছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে একটুকু রক্তাভাও বেরিয়ে আসছে না বাইরে।

হিমার্ত বাতাস মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে আছড়ে পড়ছে বনশীর্ষে। এই তুষারঝরা রাত্রি, এই হিমাক্ত বাতাস, এই নিবিড় অন্ধকার! পাহাড়ী জনপদটা জা কুলি মাসের ভয়াল রাত্রির থাবা থেকে দাঁড়ের লেপের নীচে ডুব দিয়েছে। একটা নিটোল আর মসৃণ ঘুমের অতলান্তে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। নিথর জনপদ। এমন কী টেফোয়া আর কুকুরগুলো পর্যন্ত একটু উত্তাপের প্রার্থনায় পাহাড়ের ভাঁজে ঢুকে গিয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে হিমাক্ত পাথরের ওপর স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে পাংশিত মেঘের দল।

অনেক দূরে পোকরি কেপুঙ থেকে একটা মশালের আলো মোরাঙের দিকে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য ক্ষীণ আলোকবিন্দু। চারপাশের কঠিন অন্ধকারকে প্রাণান্ত সংগ্রামে সামান্য সরিয়ে একটু পথ করে নিতে পেরেছে। মশালের চারপাশে এক রহস্যময় আবছায়া; আর সেই আবছায়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের কণা উড়ছে।

একটু একটু করে মশালের আলোটা মোরাঙের পেছনে এসে দাঁড়ালো। পাশে অতল খাদ। বনের বাঁধনে জটিল হয়ে পাহাড়ের দেহ খাড়া নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। মশালের নিস্তেজ দৃষ্টি খাদের গভীরে পৌঁছাতে পারে নি। চারপাশ থেকে গাঢ় কুয়াশা আলোক বিন্দুটির কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। নিজেকে এতটুকু বিস্তার করতে পারছে না মশালটা।

মশালের দু'পাশে দুটি নারী মূর্তি। জঙ্ঘা থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত দাঁড়ের লেপ দিয়ে জড়ানো। তাদের ভৌতিক ছায়া এসে পড়েছে মোরাঙের দেওয়ালে। ছায়া দুটো কাঁপছে।

মোরাঙের দিকে দুজনে চনমন চোখে তাকালো। তারপর একজন ভীরু ভীরু গলায় বললো, "খুব সাবধান মেহেলী, ওরা জানতে পারলে একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটবে। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"ভয় করলে কেসুঙের খাতে (ঘরে) ফিরে যা লিজোমু। তুই আমার আসটাকে (দাদা) না পিরীত করতি! তুই তো আট্‌সার লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) ছিলি! তোর মত মেয়েকে মী (বর্শা) দিয়ে ফুঁড়ে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখা দরকার।" মেহেলীর চোখদুটো আগ্নেয় হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য! লিজোমু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো না। শুধু ফিস ফিস গলায় সে বললো; "খোনকেকে খাদে ফেলে দিয়েছে সর্দার। সে কী আর বেঁচে আছে?"

"খাদে ফেলার সময় একপাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি। এই ঘন বন; এর মধ্যেই হয়তো কোথায়ও আটকে আছে আট্‌সা (দাদা)। তুই একটু দাঁড়া, আমি নীচে নেমে দেখে আসি। এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি; খবরদার মোরাঙের ওরা যেন টের না পায়!" শেষের দিকে গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠলো মেহেলীর; "তুই দেখিস, আট্‌সা (দাদা) মরে নি। ও ঠিক আবার বেঁচে উঠবে। যদ্দিন সেরে না ওঠে, তদ্দিন লুকিয়ে রাখতে হবে গাছের ওপরের খাতে (ঘরে)।"

মোরাঙটার দিকে শঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে নিল লিজোমু; "আমার

কিন্তু অন্য ভয় করছে মেহেলী। আনিজার ভয়ে সন্দার খোন্‌কেকে ঐ খাদে ফেলে দিয়েছে। খোন্‌কেকে তুলে আনলে যদি আনিজার রাগ এসে পড়ে।"

আতঙ্কে মুখখানা নিরক্ত হয়ে গেল মেহেলীর। তাই তো! এ দিকটা সে একবারও ভেবে দেখে নি। আনিজা! ঐ একটি নামে ধমনীর ওপর রক্ত উথলপাথল হয়ে ওঠে। চেতনাটা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে। একবার ঢোক গিললো মেহেলী। পাহাড়কন্যা সে, হাতের মুঠিতে একটা বিশাল বর্শা ধরা থাকলে শত্রুর হৃৎপিণ্ড সে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। প্রয়োজন হলে অতিকায় মেরিকেৎসুর একটি আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারে বুনো মেন্‌জোর মাথা। কিন্তু এই একটি নামের মুখোমুখি হয়ে মেহেলী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই কোথা থেকে সারা ধমনীটাকে মাতিয়ে মাতিয়ে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গেল। একটা বিচিত্র দুঃসাহস কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সব ভীরুতা মুছে গেল পাহাড়ী মেয়ের চেতনা থেকে।

মেহেলী বললো; "আট্‌সা (দাদা) নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই বনের মধ্যে একটু একটু করে পচে মরবে সে! দেখি না, যদি বাঁচাতে পারি!"

"কিন্তু আনিজার রাগ! আর সন্দার জানতে পারলে—" বাকীটুকু আর শেষ করতে পারলো না লিজোমু। একটা স্পষ্ট অপমৃত্যুর আশঙ্কায় গলাটা আপনা থেকেই বুঁজে এলো।

"যা হবার হবে। আমার অত ভয় নেই। আনিজার রাগ পড়লেও মরবো, সন্দার জানতে পারলেও বাঁচবো না। তুই ওপরে দাঁড়া লিজোমু। আমি একবার খাদে নামছি।"

আর দাঁড়ালো না মেহেলী। মশালটা বাঁ হাতের থাবায় চেপে ধরে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচের খাদের দিকে নেমে গেলো সে। আর একটা প্রেত-মূর্তির মত মোরাঙের পাশে, তুষারঝরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রইলো লিজোমু।

পাহাড়ী অরণ্য। গহন আর নীরন্ধ্র। মশালটা নিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে

ঘুমছে মেহেলী। গাছের ফাঁক দিয়ে, ঝোপের পাশ দিয়ে পথ করে করে এগুতে হচ্ছে। দু'টো চোখের দৃষ্টিকে মশালের আলোর চেয়েও তীক্ষ্ণতর করে একটি মানব দেহের সন্ধানে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে সে। খোনুকের দেহের এতটুকু আভাস কোথায়ও পেলেই, সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর দু'টি বাহুর বেষ্টনে বনশয্যা থেকে তুলে নিয়ে আসবে। মেহেলীর স্থির বিশ্বাস, খোনুকের দেহটা খাদের অতলে গাড়িয়ে যায় নি। এই বনের কোথায়ও, নিশ্চয়ই কোন শিকড়ে, কী গাছের ডালে, কী ঝোপের চূড়ায় আটকে রয়েছে।

হিমঝরা এই বনের মধ্যে শ্বাপদের চিহ্ন মাত্র নেই। গুহার সংকীর্ণ বিস্তারের মধ্যে বিশাল দেহ গুঁজে গুঁজে একটু উত্তাপ সৃষ্টি করছে তারা। বাঘ, চিতা কী বুনো মোষ জা কুলি মাসের এই প্রখর শীতের বিক্রমে তাদের সহজ বিচরণের রাজ্য থেকে পলাতক হয়েছে। ফেরারী হয়েছে।

জঙ্ঘার নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অনাবৃত। শীতের রাত্রি শরীরের সেই অংশটুকুর ওপর কেটে কেটে বসছে। পা দুটো যেন পক্ষাঘাতের তাড়নায় অসাড় হয়ে আসতে শুরু করেছে।

সামনের ভীমবো গাছের দেহে কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছে একটা কালো রঙের লতা। আচমকা মেহেলীর মশালটা কেমন করে যেন সেই লতায় গিয়ে লাগলো। সাঁ করে লতাটা সোজা হয়ে গেল; তারপরেই কালো বিদ্যুতের মত পাশের একটা ঝোপের ওপর অদৃশ্য হলো। লতা নয়, একটা পাহাড়ী অজগরের বাচ্চা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেহেলী। মাত্র একটি সন্ত্রস্ত মুহূর্ত। তারপরেই আবার নীচের দিকে পা চালিয়ে দিল সে।

জা কুলি মাসের রাত্রি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অসহ্য শীতে আঙুলের ডগাগুলো চিন্ চিন্ করতে শুরু করেছে। চামড়া চৌচির করে ফিন্‌কি দিয়ে যেন এখুনি রক্ত ফেনিয়ে ফেনিয়ে বেরিয়ে আসবে।

অসহায় চোখে চারদিকে একবার তাকালো মেহেলী। কোথায়ও খোনুকের চিহ্ন মাত্র নেই! চারদিকে নিবিড় বন আর ক্রুর অন্ধকার হা-হা গ্রাস মেলে রয়েছে। পাহাড়ী মেয়ে মেহেলীর বুকের মধ্যে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। সমস্ত দেহটা শির্ শির্ করে উঠলো।

পাশেই কোন একটা গুহা থেকে এই অতল খাদ কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলো একটা ক্ষ্যাপা মেনজো। সেই গর্জনের প্রতিধ্বনি দু'পাশের পাহাড়ে আছাড়-পিছাড়ি খেতে খেতে অনেকক্ষণ জেগে রইলো। কোথায় কোন্ বনচূড়া থেকে প্রেতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো এক ঝাঁক ট্যান্‌ডেন্‌লো পাখি। পাখি নয়, যেন আনিজার কান্না! বাইরেই কেবল হিম ঝরছে না, অপরিসীম ভয়ে সারা দেহের রক্ত গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ হয়ে ধমনীর ওপর আছাড় খেতে লাগলো মেহেলীর। নিষ্প্রাণ একখণ্ড শিলামূর্তির মত পাহাড়ের একটা খাঁজের মধ্যে বসে পড়লো মেহেলী। আর হাতের থাবা থেকে মশালটা ছিটকে পড়েছে পাহাড়ী ঘাসের ওপর।

শুক্‌নো পাহাড়ী ঘাস! জা কুলি রাত্রির হিমে ভিজে গিয়েছিল; আচম্‌কা পেন্যু কাঠের মশালের শিখা লেগে দাব-দাহের মত জ্বলে উঠলো। শীতে আড়ষ্ট দু'টি হাত আর দু'টি পা সেই আগুনের দিকে প্রসারিত করে দিল মেহেলী।

সারা দেহের পেশীতে পেশীতে চেতনা ছিল না মেহেলীর। একটু একটু করে আগুনের উত্তাপে রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো অনাবৃত হাত-পায়ে। জা কুলির রাত্রির এই হিমঝরা শীতে দাবাগ্নির শিখাটুকুতে মধুর আরাম রয়েছে।

সেই আগুন এক সময় নিস্তেজ হয়ে এলো। ঊর্ধ্বমুখ শিখা ক্ষীণ হলো। বিষণ্ণ রক্তাভায় নিঃশেষ হলো দাবাগ্নি। আচম্‌কা সেই ক্ষীণ রক্তাভায় সামনের দিকে তাকাতেই, সারা দেহে কেমন একটা শিহরণ

খেলে গেল মেহেলীর; স্নায়ুগুলো ঝঙকার দিয়ে উঠলো। সামনের একটা ভেরাপাঙের ঝাঁকড়া মাথায় একটি মানুষের দেহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই খোনকে।

পাহাড়ী ঘাসের আগুন ক্ষীণতর হচ্ছে। বিষণ্ণ রক্তাভা মুছে আসতে শুরু করেছে। সহসা রক্তে রক্তে প্রখর উত্তেজনা তরঙ্গিত হতে শুরু করলো মেহেলীর। জা কুলি রাত্রির হিমে শরীরটা অসাড় হয়ে এসে-ছিল। সে কথা ভুলে গেল মেহেলী। বিদ্যুতের স্পর্শে যেন লাফিয়ে উঠলো সে। তারপর পেন্যু কাঠের মশালটা পাহাড়ী ঘাসের আগুনে গুঁজে দিল। কিন্তু আশ্চর্য! নিভন্ত আগুনে মশাল জ্বলে উঠলো না।

একপাশে মশালটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেহেলী। তারপর নিরুপায় চোখে একবার এদিক সেদিক তাকিয়ে নিল। কিন্তু জা কুলি মাসের এই তুষার-ঝর-ঝর রাত্রি বড় নির্মম, ভীষণ নিষ্ঠুর। এতটুকু আগুন, এতটুকু উত্তাপের আভাসকে টুঁটি টিপে ধরার জন্য চারদিক থেকে থাবা শানিয়ে ওত পেতে রয়েছে সে।

নাঃ, একটা শিলামূর্তির মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। যেমন করে হোক, খোনকের দেহের কাছে এখনি পৌঁছাতে হবে মেহেলীকে। পাহাড়ী ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প আগুনের আলো আছে। সেটুকু ভরসা করেই মেহেলীর দেহমনে প্রেরণার উচ্ছ্বাস খেলে গেল। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সামনের ভেরাপাঙ্ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো মেহেলী।

পাহাড়ের এই অতলদেশে কোথাও এককণা আলোর উৎসাহ নেই। শুধু পাহাড়ী ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু আগুন আনিজার রক্তচোখের মত জ্বলছে। দুটো হাত বাড়িয়ে হিমাক্ত গাছের কান্ডটাকে আলিঙ্গন করলো মেহেলী। তারপর তর তর করে একটা বনবিড়ালের মত একেবারে মগডালে উঠে এলো।

নিকষ অন্ধকার। পাহাড়ী ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে যে রক্তাভ আগুনের কণা-গুলো জ্বলছিল, তার রেশ এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারে নি। আন্দাজে আন্দাজে হাতিয়ে একবারে সেই নর-দেহটির কাছে চলে এসেছে মেহেলী। এমন কী তার হাতখানা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে। বিশাল গাছ বেয়ে এই মগডালে উঠে আসতে হাঁপানি ধরে গিয়েছিল মেহেলীর। দ্রুততালে কয়েকটা নিঃশ্বাস পড়লো তার। ঘন ঘন। ফুসফুস ভরে বার কয়েক বাতাস টেনে নেবার পর নিজের দেহ থেকে দড়ির লেপখানা খুলে ফেললো মেহেলী। তারপর অসাড় আর জ্ঞানহীন নরদেহটির চারদিকে নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে দিল।

অনাবৃত দেহ। শীতের রাত্রি চারদিক থেকে নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেহেলীর ওপর। মনে হলো, দাঁতে দাঁতে নখে নখে এই হিমঝরা রাত্রি তাকে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে। আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতিটি অনুপলে এই রাত্রি তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে।

গাছের মাথা থেকে সেই নিশ্চেতন নরদেহটিকে পিঠের ওপর তুলে নিল মেহেলী। গুরুভার সবল দেহ। মেরুদণ্ডটা বেঁকে যাবার উপক্রম হলো মেহেলীর। দড়ির লেপের দুটি প্রান্ত দিয়ে নিজের পেটের সঙ্গে নরদেহটিকে বেঁধে নিল মেহেলী। পাহাড়কন্যা সে। পাথরের মত কঠিন তার দেহের পেশী-ভার। ধীরে ধীরে সতর্কভাবে পা ফেলে
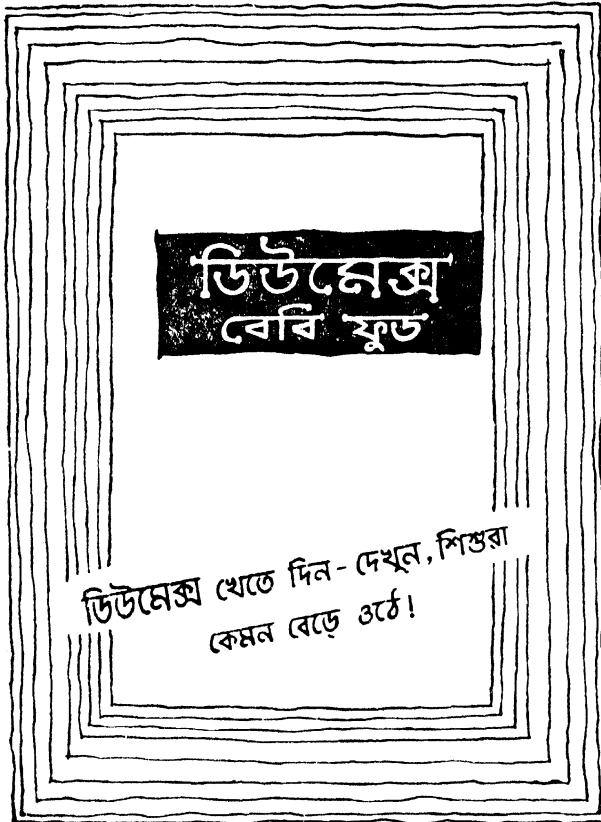
ফলে • সরু প্রশাখা থেকে মোটা শাখায়, তারপর বিশাল কান্ড বেয়ে বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো মেহেলী।

নীচে নেমে আবার বার কয়েক ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানলো মেহেলী। তারপর আশ্চর্য শীতল নরদেহটিকে আবার পিঠের ওপর তুলে নিল। তারও পর পাহাড়ের খাড়া দেহ বেয়ে বেয়ে, বন্ধুর চড়াইর দিকে উঠতে লাগলো। পিঠের ওপর অচেতন মানুষটির দেহভারে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে মেহেলী। মেরুদন্ডটা টন্ টন্ করছে: যেন দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে সেটা। দু হাত দিয়ে সামনের পাতা-লতার বাধা সরিয়ে সরিয়ে এগুচ্ছে মেহেলী।

সহসা ডান পাখানা পিছলে গেল মেহেলীর। ছিট্‌কে একটা পাহাড়ী গর্তের মধ্যে পড়ে গেল সে। কোমরের ওপর প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। মনে হচ্ছে, নিম্নাঙ্গটা দেহ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। জা কুলির রাত্রির এই আঘাত। মজ্জায় মজ্জায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে তার। তীব্র গলায় আর্তনাদ করে উঠলো মেহেলী: "আ-উ-উ-উ-"

কয়েকটি মাত্র ক্লিষ্ট মুহূর্ত। তারপরেই আবার খাড়া হয়ে উঠলো মেহেলী। ইতিমধ্যে নরদেহটিকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছিল সে।

নিস্তব্ধ আর নির্জন পাহাড়ী চড়াই। পিঠের ওপর একটি অচেতন মনুষ্য দেহ ছাড়া আর কোথায়ও কোন প্রাণের সাড়া নেই। এই মুহূর্তে একটা হিংস্র শ্বাপদের চোখে খানিকটা নীল আগুন দেখতে পেলেও আশ্বস্ত হতে পারতো মেহেলী। কিন্তু এই জ্বালা শীতের রাত্রিতে একটি আরণ্যক মেন্‌জোর সান্নিধ্য পর্যন্ত নেই কোথায়ও।

এক সময় পাহাড়ী খাদের অতল থেকে ওপরে উঠে এলো মেহেলী। একেবারে মোরাঙের পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই। মোরাঙের জোয়ান ছেলেরা দড়ির লেপের নীচে একটি মসৃণ স্বপ্নের লূতাতন্তু দিয়ে মনোরম এক জাল বুনে চলেছে এখন। সেই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে একটিমাত্র মুখ। সে মুখ তাদের লগোয়া লেন্‌দের (প্রেমিকাদের) মুখ।

একবার নীচের দিকে তাকালো মেহেলী। তারপর ফিস ফিস গলায় ডাকলো; "লিজোমু, এই লিজোমু--"

কোন উত্তর নেই কোথায়ও।

আবারও ডাকলো মেহেলী; "এই লিজোমু!"

পাহাড়ী খাদের ওপরে এই মোরাঙের কিনারে লিজোমু নামে কোন নারীর কণ্ঠে জবাব ফুটে বেরুলো না। নিশ্চয়ই সে এই শীতের রাত্রির অবিরাম প্রহার থেকে পালিয়ে দড়ির লেপের উষ্ণ আরামে এতক্ষণে আত্মসমর্পণ করেছে।

সহসা মোরাঙের মধ্যে মৃদু কলরব জেগে উঠলো। জেনুর মধ্যরাত্রি। আগে গ্রামে গ্রামে সমস্ত নাগারা একবার জেগে ওঠে। নাগা পাহাড়ের এ একটা প্রচলিত রীতি।

আর দাঁড়ালো না মেহেলী। মোরাঙের কিনার থেকে একটা উল্কার মত পাশের টিলার দিকে উঠে গেল সে। এই রাত্রিবেলায় সর্দার তার পিঠের ওপর খোনকের দেহটি দেখতে পেলে আর উপায় রাখবে না। নিদারুণ আতঙ্কে পায়ের পেশীতে পেশীতে দুর্বার বেগ নেমে এলো। এই জা কুলির হিমার্ত রাত্রিতে দরধারায় ঘাম ছুটতে শুরু করেছে মেহেলীর।

এক এক করে নুগ্যার কেসুঙ্, কাতির কেসুঙ, নিসুরি কেসুঙ্ পেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে চলে এলো মেহেলী। চারপাশে ঘন কুয়াশার পর্দা নেমে এসেছে। নানা কেসুঙের ঘরগুলোতে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু দেখা যায়। মাঝ রাত্রিতে পাহাড়ী প্রথা অনুযায়ী সমস্ত সালুয়ালাঙ্ গ্রামখানা ঘুমের অতলতা থেকে জেগে উঠেছে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। মুঠি মুঠি কাঁচা তামাকপাতা চিবিয়ে, কী বাঁশের পানপাত্রে কয়েক চুমুক রোহি মধুর মৌতাত দিয়ে স্নায়ুগুলোকে প্রখর করে তুলবে পাহাড়ী মানুষগুলো। তারপরেই আবার দড়ির লেপের নীচে মসৃণ একখানা ঘুমের সাধনায় হারিয়ে যাবে।

কখন যে বিশাল খাসেম গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল ছিল না মেহেলীর। এখন আর অস্বস্তি নেই। অন্তত সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত। সকালের আলোতে পাহাড়ী মানুষগুলির হিংস্র চোখ খুলবার আগেই সে খোনকেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে।

একসময়ে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে গাছের ওপরে উঠে এলো মেহেলী। কাঁধের ওপর সেই অচেতন নরদেহ। গাছের ডালে ছোট্ট একখানি ঘর। লতার বাঁধন আর আতামারী পাতার চাল। এই ঘরখানা মেহেলীর। রাত্রে এই ঘরেই তার নিঃসঙ্গ বিছানা পাতা হয়। কুমারী মেয়ের একক শয্যা পাহাড়ী পুরুষের কামনা থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে যেন উঠে এসেছে।

ধীরে ধীরে মাচার ওপর নিশ্চেতন

মানুষটাকে শুইয়ে দিল মেহেলী। তারপর একটা টেশঙের ছাল নিজের সারা গায়ে জড়িয়ে মানুষটির ওপর ঝুঁকে পড়লো। মাথার ওপরে আতামারী পাতার চাল; চারপাশে বাঁশের দেওয়াল আর সমস্ত দেহে টেশঙ ছালের স্নেহ। সব মিলিয়ে একটা করোফ আরামের পরিমণ্ডল।

মেহেলী ডাকলো; "আট্‌সা (দাদা), এই আট্‌সা (দাদা)—"

নিরুত্তর পড়ে রইলো মানুষটি। একটু চুপ করে রইলো মেহেলী, তারপর একখানা হাত সেই হিমদেহের ওপর বিছিয়ে দিল। শেষমেষ একটু একটু করে ঝাঁকানি দিতে লাগলো সে। নাঃ, জীবনের কোন লক্ষণ, চেতনার কোন আভাষই নেই সেই দেহে। অনেকক্ষণ আগে খোনকেকে ঐ খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সন্দার। জা কুলি রাত্রির হিমে হিমে একেবারে জমাট বরফ হয়ে গিয়েছে তার দেহ। মানুষটির নাকের কাছে হাত রাখলো মেহেলী। অনেকটা বিরতির পর গরম নিঃশ্বাসের ক্ষীণ এক একটা ধারা তিরতিরিয়ে পড়ছে হাতের ওপর। এই নিঃশ্বাসের মধ্যে প্রাণের আশ্বাস খুঁজে পেলো মেহেলী। খোনকে বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা অপূর্ব পুলকের শিহরণ খেলে গেল মেহেলীর। তার এই দুঃসাহস, আনিজার বিরুদ্ধে এই সক্রিয় প্রতিবাদ তবে ব্যর্থ হয় নি।

ঘরের এক কোণে মাটির পাত্রে এক-রাশ নিভু নিভু আগুন রয়েছে। হামা-গুড়ি দিয়ে আগুনের কাছে চলে এলো মেহেলী। সেই অগ্নিপাত্রটার ঠিক পাশেই অনেকগুলো বাঁশের চোঙা; রোহি মধুতে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। একটা পানপাত্র তুলে ঢক্ ঢক্ করে আকণ্ঠ রোহি মধু গিলে নিল মেহেলী। শরীরটা এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে; শীতার্ত ইন্দ্রিয়গুলো বেশ সক্রিয় হচ্ছে তার। এখন হিমঝরানো জা কুলি রাত্রির সঙ্গে অনেক-ক্ষণ সংগ্রাম করতে পারবে মেহেলী।

বাঁশের পাটাতন থেকে আগুনের আধারটা তুলে নিল মেহেলী। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আবার সেই মানুষটির কাছে চলে এলো। আগুন নিভে এসে-ছিল, ফুসফুস শূন্য করে জোরে জোরে কয়েকটা ফুঁ দিল মেহেলী। ওপরের সাদা রঙের ছাই সরে গিয়ে আগুনটা রক্তমুখ হয়ে উঠলো।

পাটাতনের একপাশে একপিণ্ড কার্পাস তুলো পড়েছিল। সেটা তুলে আগুনের পাত্রটার ওপরে মেলে ধরলো মেহেলী। বেশ গরম হয়ে উঠলো তুলোর পিণ্ডটা। পরম মমতায় সেই গরম তুলো দিয়ে সেঁক দিতে শুরু করলো মেহেলী। বার বার। নিশ্চেতন দেহটা একটু একটু করে প্রাণিত হলো; তারপর থর থর করে কেঁপে উঠলো।

সহসা ঘটে গেল ঘটনাটা। সেঁক দিতে দিতে মেহেলীর হাতখানা মানুষটার বুকের কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু, হাতড়ে হাতড়ে একখানা বিশাল ক্ষত সেই বুকের কোথাও আবিষ্কার করতে পারলো না মেহেলী। তবে, তবে এ কে? এ দেহ কার? পাহাড়ী খাদের অতল প্রদেশ থেকে জা কুলি মাসের এই হিমাক্ত রাত্রিতে কার দেহ বয়ে এনেছে মেহেলী? এ তো খোনকে নয়!

আনিজা! আনিজা! খাসেম গাছের মগডালে কুমারী মেয়ের এই ছোট্ট শোয়ার ঘর। এই ঘরে কী খোনকের বদলে কোন প্রেতাত্মার দেহ তুলে আনলো মেহেলী। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইলো মেহেলী। কিন্তু অতিকায় একটা থাবা দিয়ে কে যেন তার কণ্ঠনলী চেপে ধরেছে। একটু বিবর্ণ শব্দও মুক্তি পেলো না মেহেলীর গলা থেকে। অপরি-সীম আতঙ্কে একেবারে শিলীভূত হয়ে গিয়েছে যেন মেহেলীর সারাটা দেহ।

গাছের ওপর এই শূন্যের আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাবার এক দুর্বার প্রেরণা খেলে গেল মেহেলীর দেহমনে। কিন্তু প্রাণান্ত চেষ্টাতেও একটা পা বাঁশের সিঁড়ির দিকে বাড়িয়ে দেবার সামর্থ্যটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। নিষ্প্রাণের মত বসেই রইলো মেহেলী।

জমাট অন্ধকার। এক সময় সামনের নিঃসাড় দেহটা থেকে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি শুনতে পেলো মেহেলী; "আ-উ-উ-উ—"

নাঃ, আনিজা নয়। একটি জীবন্ত মানুষের সাহচর্য রয়েছে এই ছোট্ট ঘর-খানার মধ্যে। খানিকটা সাহস ফিরে এলো মেহেলীর স্নায়ুগুলোতে। সাহস নয়, দুঃসাহস। সহসা আগুনের পাত্রটা মানুষটির মুখের কাছে নিয়ে এলো মেহেলী। এক অদম্য কৌতূহলে তার নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠেছে।

অগ্নিপাত্রটার ওপর ঝুঁকে বারকয়েক জোরে জোরে ফুঁ দিল মেহেলী। আর সেই রক্তাভ আগুনের আলোতে মানুষটির মুখখানা দেখে চমকে উঠলো সে। খোনকে নয়, এ টিজু নদীর ওপারের কেলুরি গ্রামের ছেলে সেঙাই। তাদের শত্রুপক্ষ। আশ্চর্য হয়ে গেল মেহেলী। তবে কী পাহাড়ী খাদের গভীর পাতাল থেকে শত্রুপক্ষের ছেলেকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে এসেছে সে। তারপর পরম মমতায় নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে! কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলো মেহেলী।

"আ-উ-উ-উ—" এবার দেহটা নড়তে শুরু করেছে। আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গলায় আর্তনাদ করে উঠছে সেঙাই।

সেঙাই! তাদের শত্রুপক্ষের ছেলে। সহসা কয়েকদিন আগের একটা মোহন বিকেল চেতনার মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দিল যেন মেহেলীর। সেদিন জোহেরি বংশের দুর্দান্ত যৌবনের মুখোমুখি হয়েছিল সে। একটা মৃত্যুমুখ বর্শার ফলা তার দিকে তুলে ধরেছিল সেঙাই।

আশ্চর্য! রোজ টিজু নদী ডিঙিয়ে কী এক অসহ্য আকর্ষণে ওপারের ঐ
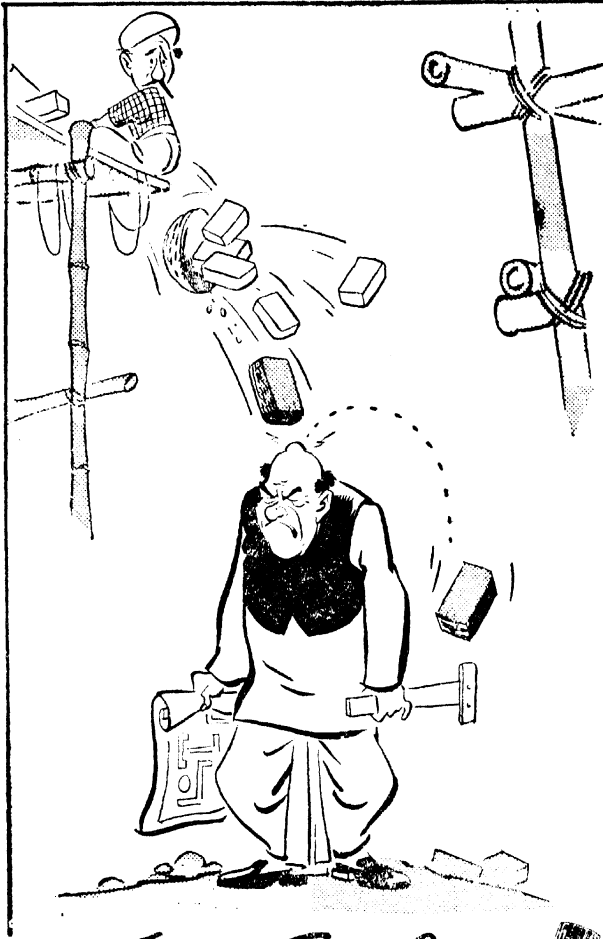
নিঃশব্দ ঝরনাটার পাশে চলে যেত মেহেলী। একটা ট্যান্‌ডেন্‌লো পাখীর মত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্নান করতে বড় ভালো লাগতো। বিচিত্র যোগাযোগ, সেই ঝরনার পাশেই দেখা হয়েছিল সেঙাইর সঙ্গে। বর্শা তুলে ধরেছিল বটে, কিন্তু তুচ্ছ একটু আত্মসমর্পণ করতে আর তাকে আঘাত করেনি শত্রুপক্ষের ছেলে সেঙাই। পাহাড়ী জোয়ানের পিঙ্গল দুটি চোখে বিচিত্র এক ভাষা দেখে তার যৌবন মৌখ কেকোয়েন ঘু খলির মত টঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। সমস্ত পেশীগুলো ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠেছিল। সোনালী বুক, নিটোল দেহ, মসৃণ অঙ্গ। এক অনাস্বাদিত সংকেত শিহরিত হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ী কুমারীর যৌবন জলপ্রপাতের মত উদ্দাম। সেদিন সেঙাইর বর্শার নীচেই নিজেকে সমর্পণ করেনি মেহেলী। সেদিন ধারালো থাবায় থাবায়, একটি নির্মম আলিঙ্গনের নীচে তাকে যদি জোহেরির বংশের এক ক্ষ্যাপা জোয়ান উন্মত্ত হয়ে ভোগ করতো; তা হলে হয়ত সে চরিতার্থ হতে পারতো। তার নিজেকে সমর্পণ সার্থক হয়ে উঠতো। কিন্তু সেদিন সেঙাই চলে গিয়েছিল। তারপর আরো দু' একদিন সেঙাইর খোঁজে গিয়েছে মেহেলী, কিন্তু শত্রুপক্ষের জোয়ান আর তার দৃষ্টিতে ধরা দেয়নি।

সেদিনের বিকেলকে নিয়ে একটি বন্য কামনার জ্বালার কথা থাক। একটি হিসাব কিছুতেই মিলছে না মেহেলীর। এই জঙ্গল খাদের মধ্যে কী করে এসে পড়লো সেঙাই? টিজু নদী ডিঙিয়ে এই সালুয়ালাঙ্ গ্রামের পাহাড়ী খাদে কীসের সন্ধানে এসেছিল সে?

"আ উ উ-উ " আর্তনাদটা এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চকিত হয়ে উঠলো মেহেলী। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে রোহি মধুভরা একটা বাঁশের পানপাত্র নিয়ে এলো। তারও পর হাতিয়ে হাতিয়ে সেঙাইর মুখখানা খুঁজে বের করলো। ঠোঁট দুটো জুড়ে এসেছিল সেঙাইর। ডান হাতের আঙুল দিয়ে মুখটা ফাঁক করে দিল মেহেলী। তারপর বাঁশের পানপাত্র থেকে বিন্দু বিন্দু রোহি মধু ঢেলে

দিতে লাগলো জিভে। প্রথমে চেটে চেটে সেই উষ্ণ পানীয়ের আস্বাদ নিতে লাগলো সেঙাই; তারপর ঢক্ ঢক্ করে গিলে পানপাত্রটা শূন্য করে দিল।

মেহেলী ডাকলো; "এই সেঙাই, এই—"

দেহটা আবার নিষ্পন্দ হয়ে গিয়েছে। নিরুত্তর পড়ে রইলো সে।

এবার দু' হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিল মেহেলী। তবু কোন জবাব নেই সেঙাইর তরফ থেকে। তেমনি নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রয়েছে সেঙাই।

সমস্ত দেহের রক্তকণাগুলো সরীসৃপের মত কিলবিল করতে শুরু করেছে মেহেলীর। একটি কঠিন পেশী জোয়ান ছেলে, এই শীতের রাত্রি, সেই জোয়ান ছেলেটিকে আগুনের তাপে তাপে কবোষ্ণ করে তুলেছে; রোহি মধুর রমণীয় সৌরভ দিয়ে তার স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করে তুলতে চেয়েছে মেহেলী। কিন্তু এ কী হলো? সেঙাইর হিমার্ত দেহের শুশ্রূষা করতে করতে একটা বিচিত্র সম্ভাবনা শিরায় শিরায় বিদ্যুতের মত বয়ে গিয়েছে তার। এই কুমারী গৃহ দুটি পাহাড়ী যৌবনকে সার্থক করে তুলতে পারে। এই নিঃসঙ্গতা মনোরম হয়ে উঠতে পারে। মেহেলী ভুলে গিয়েছে খোনকের কথা। রক্তে রক্তে তার আদিম অরণ্য ডাক দিয়েছে।

একটা ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত সেঙাইর পাশে বসে বসে ফুলছিল মেহেলী। এই শীতের হিমে আচমকাই যদি শত্রুপক্ষের পুরুষ তার কাছে এসে পড়েছে, তবে কেন সে তার কুমারী-হৃদয়কে অক্ষত রেখে যাবে! বুকের ভেতর মেহেলীর ফুসফুসটা ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল; প্রচণ্ড উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল সারা দেহ।

সহসা সেঙাইর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মেহেলী। তারপর দুটি বাহুর প্রখর আলিঙ্গনে বেষ্টন করে ধরলো সেঙাইর দেহটা। তার ধারালো নখ কেটে কেটে বসে গেল সেঙাইর বুকে পিঠে, গলায়- ঘাড়ে।

নয়াল সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে কয়েকটা আগ্নেয় নিঃশ্বাস পড়লো সেঙাইর বুকে। মেহেলী চাপা গলায় গর্জন করে উঠলো; "এই সেঙাই, এই—"

নিথর হয়ে পড়ে রইলো সেঙাই। মাঝে একবার শুধু অপরিসীম ক্লান্ত গলায় আর্তনাদ করে উঠলো সে; "আ-উ-উ-উ—"

হিস্ হিস্ করে উঠলো মেহেলী; "তুই জোয়ান, তুই পাহাড়ী মরদ না!"

মেহেলীর আলিঙ্গন তীব্র হলো, তারপর তীব্রতর। তার শাণিত নখ আর দাঁতগুলো ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো সেঙাইর দেহ।

"আ-উ-উ-উ—"

সমস্ত শরীরটা শিথিল হয়ে গিয়েছে সেঙাইর। পাহাড়ী কুমারী মেহেলী তার দেহের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে, তার মনের সমস্ত কামনার আগুন দিয়ে, তার বন্য উত্তেজনা দিয়ে আর ধারালো নখ-দাঁতের প্রহার দিয়েও সেঙাইকে অনুভূতির ব্যগ্রতায় ফিরিয়ে আনতে পারলো না।

জা কুলি মাসের একটা উত্তেজিত রাত্রি মেহেলীর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

এক সময় পাহাড়ের ওপর আলোর অস্পষ্ট আভাস দেখা দিল। ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ছায়া-ছায়া আলো এসে পড়েছে খাসেম গাছের এই ছোট্ট ঘরখানায়।

সেঙাইর বুকের পাশে সারারাত বসেছিল মেহেলী। এবার ধীরে ধীরে মাথা তুললো সে। প্রথম ভোরের এই ছায়া-ছায়া আলোতে সেঙাইর দিকে তাকিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল তার চেতনায়। কী ভয়ানক, কী বীভৎস দেখাচ্ছে সেঙাইকে! (ক্রমশ)

POND'S
COLD CREAM

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর পূর্বে 'লিখি কেন' লিখি। একটি ছোট বই-এর আকারে বেরোয়, আরো অনেকে লিখেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, আমার কোনো রচনার মূলে যাকে প্রেরণা বলে, তা ছিল না। তবে প্রত্যেকের পিছনে খোঁচা ছিল। হয় বুদ্ধিগত—কারুর সঙ্গে মতের মিল হয়নি, না হয় ব্যক্তিগত—কোথাও আঘাত পেয়েছি। সবই যেন পাল্টা জবাব দিয়েছি। ওগুলো গাঁট। 'মনে এলো' লিখছি কিন্তু খোঁচা খেয়ে নয়। একটু সামান্য যে নেই তা নয়। সঙ্গীত নিয়ে অনেকদিন আলোচনা করলাম; সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, অথচ লোকে আমার বক্তব্য ভুলে গেছে। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে খানিকটা অন্য ধরনের নভেল লিখলাম, অথচ 'নব্য কথাসাহিত্যের ধারা' নামের প্রবন্ধগুলিতে নাম গন্ধ নেই। মার্কসিজম, প্ল্যানিং, সাহিত্যালোচনা নিয়ে অনেক লিখেছি—সে সব ভুলে গেছে আজকালকার চিন্তাশীলের দল। তাদের দোষ নেই, বিদেশে থাকি, অনেক বছর বাংলা লেখা প্রায় বন্ধ, আমার বইগুলোও দোকানে পাওয়া যায় না। তবু অভিমান যে হয় না বলতে পারি না। এইটুকুই যা কিছু খোঁচা। তবে যা এখন লিখছি সে সম্বন্ধে নিজের কোনো বিশেষ মোহ নেই। এই বয়সে আমি যা, তাই হওয়াই সঙ্গত। অর্থাৎ কোনো সাহিত্য-সৃষ্টি করছি না। তবু মনে হচ্ছে যে, এটাও আমার মানসিক অভিব্যক্তির একটা ধাপ হবে।

৭।২।৫৬

এখানে যুবা বয়সের শিক্ষকদের মন নঞর্থক। জনকয়েকের ছাড়া। নঞর্থক—যদি কিছু নতুন কথা ওঠে তবে যদি আগ্রহ জাগে কদাচ—ত' সেটা অচল প্রমাণ করবার জন্য যা কিছু বুদ্ধি তা খরচ হয়ে যায়। সদর্থক—অর্থাৎ আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা করবার তৎপরতা। অত্যন্ত অদ্ভুত লাগে অল্পবয়সীদের মধ্যে মুশকিলের ফর্দ শুনতে। কারণ জানি—কিন্তু নঞর্থককে সদর্থকে পরিণত করা যায় কিভাবে? এক ধৈর্য—এই যুগে ভারতবর্ষের পক্ষে ধৈর্য নিরাগ্রহ আলস্যের নামান্তর। দুই—ডায়েলেক্‌টিক। তাতে কবে পরিবর্তন হবে বলা যায় না। না হয় সংখ্যা গুণে পরিণত হোলো কোনো না কোনো ক্ষণে, কিন্তু সে গুণ বে-গুণও হতে পারে। ফ্রান্সে পুজাডিজম্‌ এল—কম্যুনিস্ট দলের সংখ্যা বৃদ্ধির পরে। ডায়েলেক্‌টিককেও চালাতে হয় ঠিকমত। গতি অধোগতি হতেও পারে, উন্নতিও হতে পারে। মোটের ওপর, গড়পড়তা, একটা না একটা দিকে উন্নতি হচ্ছে হয়ত বলা যায়, কিন্তু সে উন্নতিতে অধোগতির ক্ষতিপূরণ নেই, সান্ত্বনা নেই। নঞর্থক মনোভাব সদসৎ বিচারবুদ্ধির লক্ষণ নয়, জাড্যের চিহ্ন।

জড়তা তমোগুণের মধ্যে পড়ে। কিন্তু জড়ভরত ছিলেন যোগী। তাঁর জড়তা কেবল চিত্ত নয়, দেহবৃত্তিরও নিরোধ। অন্য ধরনের জড়তা মনবিহীন—একাধিক আমেরিক্যান নভেলে তার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা ক্যালিবানের বংশধর। আমাদের দেশের জড়তা গতিহীনতা—ইনার্শিয়া। স্ট্যাটিক অবস্থারও নীচে: এর শক্তি আছে কিছু না করতে দেবার। অর্থনীতিতে গ্রোথের চর্চা চলছে—সেখানে স্ট্যাটিক বিশ্লেষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে নাজেহাল হচ্ছি। কেন? আমার মতে তার কারণ এই: স্ট্যাটিক অবস্থাকে আমরা নির্জীব ভারসাম্যের অবস্থা ভাবি। কিন্তু এই অবস্থার জীবন আছে। সেটা বাধা দেয়। অর্থাৎ আমাদের 'থিওরী অব্‌ ইনার্শিয়া' নেই। সেইজন্য দেরাদুনে আমি বল্লাম ঐতিহ্যের স্বভাব বুঝতে। রাজ্যপাল ও ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ ভাবলেন, আমি আলিগড়ে এসে হিন্দু ও ঐতিহ্যবাদী হয়ে গেছি, আমার বিপ্লবী মনোভাব ঘুচে গেছে। তা নয় মোটেই। অগ্রসৃতির বাধা কি বুঝতে চাই। সব সমাজ-শাস্ত্রীদের বোঝা উচিত, অর্থশাস্ত্রীদের বিশেষত। এই যে প্ল্যান প্ল্যান করে মরছি তবু লোকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করছে না কেন? কিসের বাধা? কেন বাধা? এই জড়তা, এই ইনার্শিয়া—যাকে চটে
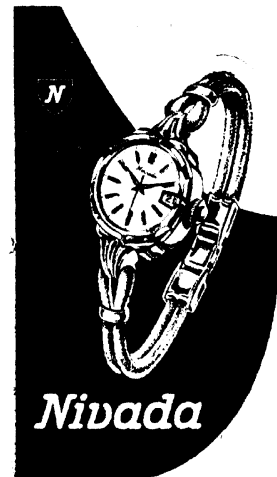
আমরা স্টুপিডিটি বলি—সেইটাই প্রধান সমাজ-শক্তি। ভীষণ জোর তার, কারণ সেটা জড়, বিশুদ্ধ ম্যাটার। এবং আমাদের মধ্যে তিন ভাগ জড়, আর বাকীটা ভাব, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাশ্যনালিজমের আওতায় বেড়ে উঠেছে আমাদের অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, বিজ্ঞান। তারই ফলে ভাবি সব রীজন-এর প্যাঁচে ফেলব। তা হয় না। ইকনমিক্সে থিওরী অব্ স্টুপিডিটি নেই, চেষ্টা যে চলছে অবশ্য তার প্রমাণ পেয়েছি) খৃষ্টান ধর্মে যেমন ডক্‌ট্রিন অব্ ঈভিল আছে। দুটোয় জড়াপট্টি খেয়ে গেছে—খৃষ্টান ধর্মের ঈভিল এখন কম্যুনিজম, কিছুদিন আগে যেমন ক্যাপিট্যালিজম।

অন্ধকারের, তমসার নিজের জীবন আছে। গিরিশ ঘোষের কবিতায়—শীকারের ভালো গল্পে—স্যাঁ এক্‌-সুপেরির রচনায় তার খবর আছে। নিজের এক রাতের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাতে গাছের গুঁড়ি অনাহত ধ্বনিতে কম্পিত হয়। সে-ধ্বনি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে—কানাকানি গুজ গুজ ফুস করে—ভয়ে শেয়াল ডাকে না—নিঃশব্দ, অথচ ধ্বনির কালো জোয়ার বয়।

আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে কালীপুজো হয়েছে। হালিসহরে প্রকাণ্ড শ্মশানকালীর তান্ত্রিক পুজো দেখেছি ভয়ে বুক কাঁপত। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্করী আমি যে জাড্যের কথা বলছি সেটা ভয়ঙ্কর নয়, মা কালীর নয়, বলির বোকা পাঁঠার হতে পারে। বুদ্ধির মধ্যে গাধার ছবিটা মনে আসছে তাও ও শূন্যবাদের নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ সদর্থক। পাশ্চাত্য দর্শনের সক্রিয়তা (activism) মানুষ ওজন জ্ঞান হারায়। কাজের পাল্লায় মানুষ ভদ্র থাকতে পারে না। কর্মদর্শন (philosophy of work) য়ুরোপের অনেক ক্ষতি করেছে। (পীফার নামে একজন নতুন জার্মান দার্শনিক অবসরের ওকালতী করেছেন—টি এস এলিয়ট ভূমিকা লিখেছেন।) ওটা ক্যাল-ভিনিজম্ আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল—যান্ত্রিক সভ্যতার ষড়যন্ত্র। চীনেরা ঠিক ব্যাপারটা বুঝেছিল, তাই তারা আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত, ভদ্র,

বিদগ্ধ জাত। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। তাও এর জন্যে ওরা সদর্থক নিষ্ক্রিয়তা, কিংবা নিষ্ক্রিয় সদর্থকতার উত্তরাধিকারী। ওদের বিপ্লবের অন্তরে এক নীরবতা ও শান্তি রয়েছে—সেই ভাণ্ডার থেকে ওরা শক্তি আহরণ করে। ওরা জড় নয়। তাই ওদের sense of humour অত সূক্ষ্ম। সে-রসিকতা পরিস্থিতি-সাপেক্ষ।

দুটো উদাহরণ মনে পড়ছে। সেবার কোলকাতায় নিখিল বিশ্বের ধর্ম-সভা বসল। (World Congress of Faiths) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা রচনা পড়া হয় মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও কি একটা পড়েন মনে আসছে না। সে যাই হোক—দিন কয়েক সভা চলবার পরে, একদিন বেশ একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল। আমরা ভাবলাম এই গেল বুঝি সব ফেঁসে। একটু আশাও করছিলাম। যখন সুর চড়েছে তখন, সভাপতিমশাই ডাকলেন চৈনিক প্রতিনিধিকে। কিমোনো পরা ভদ্রলোক, একটু খুঁড়িয়ে সামনে এলেন। বেশ খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লেন, ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে—"When the waters are dirty it is best not to stir them!" এবার মিনিটখানেক চুপ—তারপর কিমোনোটি গুছিয়ে নিয়ে পেছনের এক চেয়ারে বসে পড়লেন। সারাদিনে এই তাঁর একমাত্র বক্তৃতা। বলা বাহুল্য ঘোলা জল জাদু-মন্ত্রে থিতিয়ে গেল।

সেবার বিলেতে একটি চীনে ছাত্রী জুটল। ছোট ছোট চোখের পিটপিটে চাউনী দুষ্টুমী মাখান। বক্তৃতায় সময় এ-বই ও-বই পড়তে বলি, কখনও কামাই করে না, অথচ নোট নিচ্ছে মনে হয় না। খাবার-দাবার সময় অত্যন্ত যত্ন করে। ঘোর ক্যাথলিক—অথচ বাবা পিকিং-এর মস্ত প্রোফেসর, এক ভাই এন্‌জীনিয়ার, আরেক ভাই জেনারেল—এ-মেয়ে দেশে ফিরবে না। বলে আমার ধর্মাচরণে বাধা ঘটবে। আমার খুব রাগ হতো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতাম কর্মপ্রবাহে ঝাঁপ দেওয়াই মনুষ্যোচিত ব্যবহার, কর্তব্য—স্ত্রী-জনোচিত ত' বটেই—তা ছাড়া মেয়েদের ধর্ম-টর্ম হয় না। মা জ্যাঠাইরা জপ করবার সময় বলতেন, "আরেকটা মাছ ভাজা খা—ওতে 'ফস্‌ ফস্‌' আছে।" মেয়েটি নীরবে শুনত, আর দেখলাম ওকে কচ্ছপে কামড়েছে। যাই হোক, দেশে ফিরছি, মেয়েটি হাওয়া জাহাজে সময় কাটাবার জন্য একটি ছোট্ট বই উপহার দিলে। জাহাজে বসে খুলে দেখি এই লেখা,

"The pursuit of book-learning brings about daily increase. The practice of Tao brings about daily loss. Repeat this loss again and again and you arrive at inaction. Practise inaction, and there is nothing which cannot be done".—তারপর নাম সই 'কন্যাসম' ইত্যাদি। এ মেয়ে চীনে, পেকে ক্ষীর। ভারতীয় হলে দু-এক ফোটা চোখের জল থাকত। আমাদের জড়তা এ জাতেরই নয়। লোকে বলে, আমরা ভাবি খুব স্পিরিচুয়াল। ছাই! বিশুদ্ধ জড়।

এবার ভাবছি রোজ সন্ধ্যার সময় গাছের তলায় আরাম-কেদারায় শুয়ে পাতা আকাশ আর তোতা পাখী দেখব। একবার প্রায় মাসখানেক ঐ করেছিলাম, এক সাধুর নির্দেশে। কিন্তু একলা নীরবে থাকার কি জো আছে! যে-কাজ করি তাকে কাজ বলি না, সেটা ফাস্।

৮।২।৫৬

সরকারী চাকুরিতে ভালো ভালো নতুন বৈজ্ঞানিক, ইকনমিস্ট, সংখ্যাবিদ্ ঢুকে পড়ছে। মোটা মাইনে পায়, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে চায় না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র এত মাইনে,

গবেষণার এত যন্ত্রপাতি, এত সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না। সরকারী ল্যাবরেটারিতে পড়াতে হয় না সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ত্রিশ ঘণ্টা। এবং সব চেয়ে বড় কথা, একবার ঢুকে পড়লে কাজ সম্বন্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একটা বড় প্রোজেক্ট এল, তার এক অংশ তুমি পেলে, সেইটে নিয়ে পড়ে থাক, কিছু নোট লেখ ভালো, বাইরের কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে না, কেননা সবই গোপন। অতএব আন্তর্জাতিক কাঠগড়ায় তোমার কাজের যাচাই নেই। যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা নীচু গ্রেড থেকে ওপরের গ্রেডে ওঠবার জন্য। সেটা অনিবার্য। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি, এবং সরকারের খ্যাতি। দু'দিক থেকেই নতুন কাজে বিশেষ লাভ নেই। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ গোপন রাখার কিছু মানে আছে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের ইকনমিস্ট গোষ্ঠীরও (প্যানেল) রচনাগুলি সিক্রেট্। সরকারের প্রতি ডিপার্টমেন্টেই প্রায় আজকাল বহু ইকনমিস্ট নিযুক্ত আছেন। তাঁদের কাজও গোপন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি ওপরের আদেশানুসারে প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ এই সব গবেষকদের বিশেষ কোনো স্বাধীনতা নেই। ছোট সমিতিতে তাঁদের মধ্যে বয়স্করা মুখ খুলতে পারেন। অথচ ডিমক্রাসির অর্থ এইঃ যে খবর সরকারের কাছে আছে ও আসছে সেই পুরো খবরের ওপর আমার-তোমার পুরো অধিকার আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স সেইজন্য হোলো ডিমক্রাসির প্রধান অস্ত্র। অথচ সরকার একে নিজের ব্যবহারে লাগাতে চায়। আমেরিকার বহু দোষ আছে, কিন্তু তার সরকারের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা সরকারী রিপোর্টে ও স্ট্যাটিস্টিক্সেই পেয়েছি। আমাদের সরকারের প্রকৃত সমালোচনা অডিট, এস্টিমেট প্রভৃতি রিপোর্ট ভিন্ন অন্য কোনো সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় কি? মনে ত' পড়ছে না। দ্বিতীয় Evaluation report-এ দু'একটা সাফ্ সাফ্ কথা ছিল। ইভ্যালুয়েশ্যন করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টেরই দরকার হতো না, যদি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিমক্র্যাটিক সত্য সন্ধানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বোধ হয় আমরা এখনও পুরোপুরি ডিমক্র্যাটিক হই নি; ভারতের এই পরিস্থিতিতে হয়ত বাড়াবাড়ি আত্ম-বিশ্লেষণ ভালোও নয়, জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস ত' চাই। সব মানি, কিন্তু এটা বদভ্যাসে দাঁড়াতে পারে। তার লক্ষণও পেয়েছি। তা ছাড়া, সরকারের আর কংগ্রেস পার্টির কাজ যেন এক হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারী গবেষকদের আর্থিক অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থা মঙ্গলকর নয়। তাদের মধ্যে হতাশা দেখেছি। অনেকেই দোকান সাজান পছন্দ করছেন না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা মাথা এখনও ঘামাচ্ছেন না বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে তাঁরাও হয়ত বলবেন যে, নিজের মতো নতুন কাজ করবার স্বাধীনতা তাঁদের কমে আসছে।

॥ সংবাদ চিত্রের পিছনে যাঁরা ॥

নীরোদ রায়

কত পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল সেই প্রেস-ফটোগ্রাফারকে, যাঁর তোলা ছবি পরদিন পত্রিকায় দেখে আপনারাই বলেছিলেন—'বাঃ একখানা ছবি বটে!'

আপনি তারিফ করেছিলেন ছবিটার। কিন্তু, যিনি অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে এ-ব্যাপারটাকে এতটা ইণ্টারেস্টিং ক'রে তুলেছিলেন—তাঁর কথা আপনার একবারও মনে হ'ল না। সে রইল অচেনা, অজানা হয়ে আপনার কাছে।

সত্যিই প্রেস-ফটোগ্রাফাররা থাকেন নেপথ্যে। এঁদের হাতের ঐ ক্যামেরা যন্ত্রটি দিয়ে কত লোককে, কত দেশকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন জগতের কাছে। কত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন ছবির ভিতর দিয়ে। নিজেরা সর্বদা ক্যামেরার পিছনে থেকে আনন্দে কাজ ক'রে যাচ্ছেন—দশের জন্য, দেশের জন্য। এঁদের আনন্দ, এঁদের স্বার্থ সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করা। উপযুক্তভাবে ছবি পরিবেশন করতে না পারলে দুঃখিত হন এঁরা আন্তরিকভাবে—যেমনটি হন বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের জন্য আহারের সম্পূর্ণ আয়োজন করতে না পারলে।

আহারই তো বটে। সংসারের লোকের চোখের ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা পরিতৃপ্তি দিয়ে মেটায় এই সংবাদ-চিত্রে। সংবাদ-চিত্রের সহযোগিতায় কোন ঘটনার বিবরণ যতটা অন্তরস্পর্শী হয়, ততটা হয় না শুধু লেখার বিবরণে। রিপোর্ট পড়ে ঘটনার খবরাখবর জানা যায়, কিন্তু ছবি দেখে উপলব্ধি করা যায় ঘটনার গুরুত্ব। ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সকলেরই মনে সমানভাবে দাগ কেটে দেয় একটি সংবাদ-চিত্র। কথায় বলে—'একটি ছবি একলক্ষ কথার সমান।' কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভেবে দেখলে তাই তো দাঁড়ায়।

লেখার বিবরণ দিয়ে পত্রিকার আট কলম ছড়ানো ট্রেন-দুর্ঘটনার যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছিল, তার প্রকৃত ভয়াবহ রূপটা বোঝা গিয়েছিল সঙ্গের ঐ ছবিগুলো দেখে। উঃ সে কী বীভৎস দৃশ্য! ইঞ্জিনটা উল্টে আছে চাকা ওপরদিকে, রেল-লাইন মুচড়ে দাড়ির মত এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে আছে। বগিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর হতভাগ্য যাত্রীর দল অদৃষ্টের ফেরে কি নিদারুণভাবে পরকালের যাত্রী হয়েছে!

ঘটনার খবর সংবাদপত্র অফিসেই আসে প্রথম। টেলিফোনেই হোক, আর অন্য কোন সূত্রেই হোক, খবরটা পাওয়া-মাত্র রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার ছোটেন। ছোটেন গাড়ি করে, প্লেনে চড়ে—সে যেভাবেই হোক, যত সত্বর সম্ভব পৌঁছুতে হবে ঘটনাস্থলে।

সময় নেই। মনে এদের অস্বস্তি, ছটফট উদ্‌গ্রীব ভাব। কখন পৌঁছবো? কি সর্বনাশ দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! আর বেশীদূর নেই, কয়েক মাইল মাত্র।

পথ খারাপ। গাড়ি আর যাবে না।

এ আর এমন কি? পায়ে হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে। হেঁটে পৌঁছুবার উপায় থাকলেই হ'ল।

হেঁটে চলেন ফটোগ্রাফার ক্যামেরার বোঝা নিয়ে। ফ্ল্যাশ-লাইট, বাল্ব, যাবতীয় সরঞ্জাম। যেন পদাতিক সৈন্য চলেছে সম্মুখের রণক্ষেত্রে। ডবল-মার্চ ক'রে হেঁটে চলেন ফটোগ্রাফার, ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।
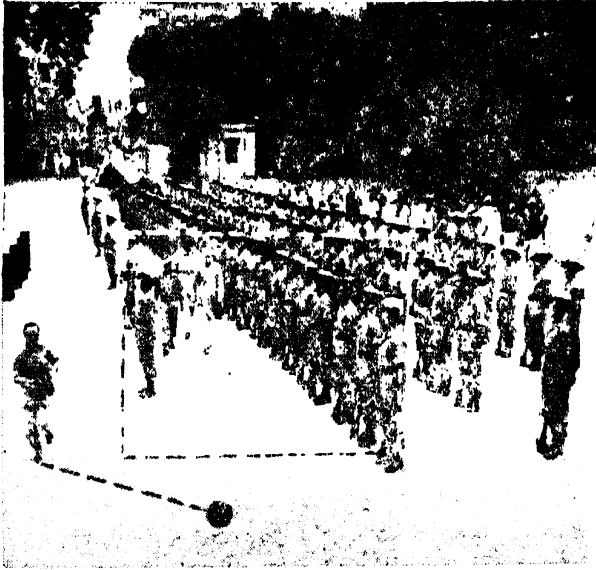
সাধারণ একজন শৌখিন ফটোগ্রাফারের গৃহীত এই চিত্রে বোঝা যাচ্ছে প্রেস-ফটোগ্রাফার কোথা থেকে কিভাবে ঠিক ছবি তোলেন। নীচের ছবি এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে

দোর আর সইছে না, হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন প্রেস-ফটোগ্রাফার।

রিপোর্টারঃ দাঁড়াও ভাই, আমি আর ছুটতে পারছি না ওভাবে।

ফটোগ্রাফারঃ তুমি পরে এসো, তোমার রিপোর্ট ঠিকই পাবে। আমি এগিয়ে যাই। না হলে জানো তো, সব সরিয়ে ফেললে আমার ছবি মার যাবে।

ঘেমে-নেয়ে, হাঁফিয়ে ঘটনাস্থলে পেঁছে অন্যদিকে খেয়াল নেই ফটো-গ্রাফারের। ঘটনার সব রকমের বিবরণ তুলে নেয় ক্যামেরায়। এবার বসে ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে নেয়। ভেবে দেখেন আর কিছু বাকী রইল নাকি।

বাকী নেই। তাই ব'লে বিশ্রাম করা চলবে না। ছুটতে হবে এক্ষুনি, সময় নেই আর বেশী।

পত্রিকা অফিসে পেঁছে ফিল্মটা ডেভেলপ করতে হবে, ফিল্ম শুকোতে হবে এবং তাই থেকে প্রিন্ট ক'রে ঘটনার বিরণ বুঝিয়ে দিতে হবে নিউজ-এডিটরকে।

নিউজ-এডিটর উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন অফিসে। খবর দিয়ে রেখেছেন ব্লক-মেকারকে। রাত যতই হোক, হোক না রাত একটা-দুটো—ব্লক দিতেই হবে। পত্রিকার সম্মুখের পৃষ্ঠার অন্য খবর সরিয়ে দিয়ে ফাঁকা রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন সহকর্মীদের। আগে এই ঘটনার রিপোর্ট ও ফটোগ্রাফ, তারপর অন্য সংবাদ। অফিসেও ব্যস্ততার শেষ নেই।

ছবি তৈরী হ'ল।

নিউজ-এডিটরকে দেওয়া হল সব বুঝিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে নিউজ-এডিটর ছবি বেছে নিয়ে ছবির পেছনে লিখলেন—৫ কলম, ৪ কলম।

পিয়ন ছুটলো সেই ছবি নিয়ে ব্লক-মেকারের কাছে।

নিউজ-এডিটরকে ছবি বুঝিয়ে দিয়ে, এবার স্বস্তি পেলেন ফটোগ্রাফার। স্বস্তি পেয়ে বুঝতে পারলেন তিনি পরিশ্রান্ত।

ব্যস্ততার ভেতর প্রেস-ফটোগ্রাফারদের মাঝে মাঝে ঝুঁকি আসে। দারুণ ঝুঁকি।

-ফাস্ ভাব।

এয়ার পোর্ট।

জওহরলাল নেহরু প্লেন থেকে নামলেন, করজোড়ে।

ফ্ল্যাশ্, ফ্ল্যাশ্—ক্লিক্ ক্লিক্। এদিক থেকে, ওদিক থেকে।

নেহরুর প্রীতি-আলিঙ্গন—দু'জনের।

ফ্ল্যাশ্—ফ্ল্যাশ্।

এবার ফটোগ্রাফারদের অনুরোধঃ একটু এদিকে অনুগ্রহ ক'রে। আপনি একটু পেছনে যান্। আপনি স্যার ওখানেই থাকুন। ইয়েস্—ইয়েস্।

এবার ছুটলেন প্রেস-ফটোগ্রাফাররা নেহরুর আগে আগে। সারিবদ্ধ নেতাদের পরিচয় পালা। সেখানেও—ক্লিক্ ক্লিক্—ফ্ল্যাশ।

তারপর আর কিছু?

নিশ্চয়ই আছে—গার্ড অব্ অনার।

এবার অতটা ভাববার কিছু নেই। নেহরু সৈনিকদের সামনে দিয়ে এগিয়ে আসবেন আস্তে আস্তে। ফটোগ্রাফাররা যথেষ্ট সময় পাবেন লাইনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবার জন্য।

তারপর?

আর কিছুই নেই।

তবুও ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা রেডি করা থাকে। বলা যায় না, নেহরু আবার কি করে বসেন। হয়তো তাঁর গলার মালাটা ছুঁড়েই দেবেন ঐ ছেলেমেয়েদের দিকে!

ওসব কিছু করলেন না। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলেন হঠাৎ। কি দেখে আহ্লাদের হাসি হাসছেন?

তাই তো! একটি ছোট্ট মেয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তোড়াটা হাতে তুলে দেবার আগেই, নেহরু কোলে তুলে নিলেন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটিকে। যেন দাদুর কোলে নাত্নী!

ক্লিক্ ক্লিক্ চলছে একদিক ওদিক থেকে।

নেহরু এবার গাড়িতে উঠলেন। টুরার গাড়ি। গাড়িতে বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি এগিয়ে চললো, দু'দিকে সারিবাঁধা উৎকণ্ঠিত জনতা।

ততক্ষণে প্রেস-ফটোগ্রাফাররা ছুটে গিয়ে অপেক্ষা করছেন ঠিক জায়গা মত।

দূর পল্লীগ্রামে বাউলের একতারার সুর পরীক্ষা করছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

করজোড়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জনতার ভিতর দিয়ে চলে গেলেন।

ফটোগ্রাফাররা শেষ করলেন এইখানে।

মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের তো ব্যাপার! কিন্তু এইটুকু সময়ে যে ঝড় ব'য়ে গেল এয়ারপোর্টে, তার চোটেই মাথা গুলিয়ে গেছে ফটোগ্রাফারদের। দারুণ পরিশ্রান্ত বোধ করেন। এতক্ষণ মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা ফুলে উঠেছিল একটা সমস্যা নিয়ে। এইটুকু সময়ে কতগুলো দিক ঠিক রাখতে হয়েছে! ক্যামেরার ফোকাস্, স্পীড, এ্যাপারচার, লাইট ঠিক রেখেও, শাটার টেপা সময় মত হয়েছিল কিনা! মুহূর্তের পরিবর্তনে সব ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। তবে, অভ্যাসের বশে ছবি ঠিক হবে—এই আশায় ফটোগ্রাফাররা ফিরে আসেন সন্তুষ্ট চিত্তে।

প্রেস-ফটোগ্রাফীর অভ্যাস চাই। টেকনিকের অভ্যাস। ক্যামেরার টেক্‌নিক নয়, নিউজ-টেকনিক।

রিপোর্ট লেখা আর সাধারণ রচনার ভিতর পার্থক্য আছে। রিপোর্ট আর প্রবন্ধ রচনা এক নয়। স্বতন্ত্র টেকনিক। তেমনি স্বতন্ত্র সাধারণ ফটোগ্রাফী আর প্রেস-ফটোগ্রাফী।

ঘটনার একটি বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ ভঙ্গিতে গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রেস-ফটোগ্রাফী। কখন, কোথায়, কিভাবে ছবিটা তুললে অর্থপূর্ণ হবে এবং তাতে

সংবাদের মূল্য থাকবে, তা বিবেচনা ক'রেই ছবি তোলেন এ'রা। উদাহরণ হিসেবে এখানের দুটো ছবি নেহরুর 'অভিবাদন গ্রহণ' বা 'গার্ড অব্ অনার' দেওয়া হ'ল। সাধারণ লোকের তোলা আর প্রেস-ফটোগ্রাফারের তোলা ছবির পার্থক্য বোঝা যাবে এখানে।

ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে সেবার সংবাদ চিত্রে এত ছবি ছাপা হয়েছিল ... বাহবা পেয়েছিলেন সেই ফটোগ্রাফার যিনি একটা অস্বাভাবিক ছবি তুলেছিলেন।

ছবিটি ছিল চার্চিলের। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার খবর পেয়ে চার্চিল কি রকম মুখভঙ্গি ক'রে বসেছিলেন ঘরের ভেতর একা। ফটোগ্রাফার কত বুদ্ধি করে লুকিয়ে চুরিয়ে এই ছবি তুলেছিলেন, এবং এই অস্বাভাবিক ছবির মূল্য হয়েছিল সব থেকে বেশী।

বুদ্ধি খেলাতে হয়, কত ভাবতে হয়, একটা কিছু নতুন পাবার আশায়। স্বাভাবিক চিত্র বেশী খোঁজেন না।

মানুষকে কুকুর কামড়ালে সংবাদ হয় না, সংবাদ হয়—যদি কুকুরকে মানুষ কামড়ায়। এটা অস্বাভাবিক, তাই এটা সংবাদ।

পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, তাঁর দফ্তরে বসে কোন একটা কিছু করা তেমন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর দফ্তর ছেড়ে গ্রামের ভেতর কোথাও এক দরবেশের একতারায় হাত দিয়ে সঙ্গীত উপভোগ করাটা বেশ অস্বাভাবিক। দফ্তরের ছবিতে কোন একটা ব্যাপার-বিশেষে গুরুত্ব থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামের এক দরবেশের সঙ্গে এই ব্যাপারটি যে একদিকে বিশেষ মূল্যবান। এটা অস্বাভাবিক—কারণ শহর ছেড়ে অনেক দূরে গ্রামের ভেতর সুন্দর এক পরিবেশের এক ছবি, যে ছবি সচরাচর পাওয়া একটু কঠিন। এ ছবিতে বিশেষত্ব আছে পূর্ণমাত্রায়।

তাই ব'লে প্রেস-ফটোগ্রাফাররা বিশেষত্বহীন ছবি তোলেন না তা নয়। তোলেন বৈকি! মিটিং মিছিল হ'লে প্রেস-ফটোগ্রাফাররা ছবি তোলেন—বক্তৃতা দেওয়া আর জনসমাবেশের ছবি। এসব তো মামুলী ধরনের ছবি, হামেশাই ছাপা হয় পত্রিকায়। ও ধরনের ছবি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, প্রশংসাও করে না ফটোগ্রাফারের। তবে হ্যাঁ, তার ভেতর একটু বিশেষত্ব থাকা ছবি তোলেন কয়েকজন। তাঁরা একটু বেশী হুঁশিয়ার।

মাদ্রাজের গত আবাদী কংগ্রেসে অধিবেশন চলবার সময় কে জানতে পেরেছিল যে নেহরু একটা তাকিয়া ছুঁড়ে দেবেন আর একজনের দিকে লক্ষ্য করে?

লক্ষ্য করেছিলেন একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার। তাই এতগুলো ক্যামেরার ভিতর তাঁর ক্যামেরার ফ্লাশ্ জ্বলে উঠেছিল ঠিক সেই সময়। ছবিখানা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল পত্রিকায় ছাপা হবার পর।

এভাবে সংবাদ-চিত্রের মারফত কত যে ঘটনার স্মৃতি থেকে যায় তার হিসাব

রাজাজী ব্যারাকপুরের গঙ্গাবক্ষে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জন দিচ্ছেন

রাখে না কেউ। কিন্তু এইসব ছবি এককালে বহু মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ছবি ইতিহাস হয়ে থাকে পরবর্তীকালের লোকদের কাছে। ছবিগুলো হয় দলিলের নামিল।

রাজাজীর ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে সই মহাত্মা গান্ধীর চিতা-ভস্ম বিসর্জনের ছবি একটি মূল্যবান দলিল বলা যেতে পারে। সারা ভারতবাসী জাতির জনকের শোকে মুহ্যমান হয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিল। রাজাজীর হাতের পাত্রাধার থেকে মহামানবের শেষচিহ্ন এই চিতা-ভস্ম গঙ্গায় মিশে গেল। কিন্তু স্মৃতি হয়ে রইল সেই চিত্র।

বিচার বুদ্ধিতে পারদর্শী না হলে প্রেস-ফটোগ্রাফীর কাজ তেমন ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেস ফটোগ্রাফারদের থাকতে হবে ঈগল পাখির মত সুতীক্ষ্ম নজর। সতর্ক থাকতে হবে সর্বদাই ছবি তোলার সন্ধানে। পরিশ্রমশীল হতে হবে যথেষ্ট। তার চেয়ে কঠোর কাজ করতে হবে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে।

প্রেস-ফটোগ্রাফারদের সাহসের তারিফ করতে হয়। কোথাও আগুন লেগেছে, ফায়ার-ফাইটাররা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আগুন নিভোতে, কাছে এগুতে পারছে

ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ছবি তোলার জন্য। ভ্রূক্ষেপ নেই বিপদের।

তারপর, কোথাও বা পুলিসের গুলী চলেছে। গুলীর কাছে সবাই সমান, ফটোগ্রাফার বাদ যাবে না। তবুও এরা মানতে রাজী নন। উত্তেজিত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ছবি তুলতে এগিয়ে যান। ভয় নেই মোটেই, বেপরোয়া সবাই।

প্রেস-ফটোগ্রাফারদের জীবন কাটে এমনি ক'রে কর্মময় ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে। কাজ ক'রে যান নিরলস মনে। স্পষ্ট সত্যবাদীর দীক্ষা নিয়ে এ'রা কঠোর পরিশ্রম করতে পেছপা হন না। বিপদ ব'লে কোন জিনিস মানেন না, এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করেন না এ'রা।

এ'দের সমাদর নেই একথা বলা চলে না। সমাদর আছে কর্মক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে সমাদর পেয়ে থাকেন এ'দের কর্মধারার জন্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে এ'রা ক্যামেরার পেছনে থাকার মত জীবনটাকে পিছনে ফেলে রাখেন। কাজের তুলনায় এ'দের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়, সুখের নয়।

আমি ভারতবর্ষের কথাই বলছি।

খঞ্জরি

সুবীন দত্ত

ার সারেঙ্গী-শিক্ষার ব্যর্থ অভি-
যানে অনেক দুয়ারে আমি
াম। তারই আর একটি
। এখানে পেশ করছি। হোসেন
ায়ার জীবনরাগিণীর মতো কড়ি
লের মূর্ছনা এ-কাহিনীর সুরে
এ যেন সাদাসিধে আলাহিয়া—
া রাগ।

* * *

ধনমুক্ত হয়ে ভূতপূর্ব গুরু,
হোসেন, চলে গেলেন আবু
ের পীঠস্থানে, তাঁর পরমগুরু—
র সন্ধানে। আর ফিরবেন না।
বলে গেলেন ওস্তাদ বড়ে মিঞার
সারেঙ্গী শিখতে।

ার যাকেই হোক্, এই বড়ে মিঞাকে
জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, যে
ন সাহেবের কাছে আমার সারেঙ্গী
র হাতে খড়ি। প্রথম আলাপের
ল-জবাবেই মিঞাসাহেবের অকারণে
য় কথা বলা, পটাহচ্ছেদী অট্টহাসির
তা—সব কিছুই পীড়া দিচ্ছিল।
আবার হোসেনের স্বৈরিণী বেগম
বলতে হয় যে, হোসেনেরই প্রিয়শিষ্য
পার্থ রায়ের সঙ্গে বিবিসাহেবা গৃহত্যাগ
করেছেন, তাহলে যেন আমার নিজের
ঘরেরই কোনো গোপন কলঙ্ককথা বড়ো
রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রচার করা হয়ে
যাবে।

তবু বলতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু
এই এক বিষয়ে বড়ে মিঞাকে সেদিন
ভুল বুঝেছিলাম।

হোসেন সারেঙ্গীয়ার নাম করতেই
মিঞার কুৎসিত মুখখানিতে শ্রদ্ধা ফুটে
উঠল। গলাটা খাটো করে বললেন, "হ্যাঁরে,
তুই কি দেখেছিলি, ওয়াহিদন বাঈ
এখনও তেমনি সুন্দর দেখতে আছে?
আর যার সঙ্গে চলে গেল সে ছোঁড়াটাও
নাকি সুপুরুষ? কিন্তু কী আফসোসের
কথা বল্ দিকি, হোসেনের মতো
স্বামীকে, হোসেনের মতো গুরুকে এরা
এমন করে চোট্ দিল! জাহান্নমেও এদের
জায়গায় হবে না।"

মুক্তপুরুষ হোসেনের কাছে যে এই
ঘটনা অতি তুচ্ছ, আর এ আঘাতকে যে
তিনি আঘাত বলে নেন নি, আমার মুখে
অবিশ্বাসের হাসি হেসে বড়ে মিঞা
বললেন, "হ্যাঃ, হ্যাঃ, কী যে বাজে কথা
বলিস্, তুই!"

* * *

আমার সারেঙ্গীটা টেনে নিলেন
বড়ে মিঞা। ছড় বুলিয়ে মিনিটখানেক
সুর বের করেই খপ্ ক'রে যন্ত্রটা শত-
রঞ্জির ওপরে ফেলে দিলেন।

'হাঁ হাঁ' করে সেটিকে আমি কোলে
তুলে নিয়ে আহত অঙ্গের মতো ঘুরিয়ে
ফিরিয়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করলাম,
কোথাও কিছু ভাঙল কিনা।

অপ্রসন্নমনে মিঞাসাহেবের দিকে
চেয়ে দেখি, তাঁর কুৎকুতে চোখদুটির
যেটিকে আগে ছোট মনে হয়েছিল সেটিকে
এবার বড়ো মনে হ'চ্ছে আর অন্যটির
আকার ইতিমধ্যে ছোট হয়ে গেছে।

এ আবার কেমনতর চোখ রে বাবা!
কোথায় ওস্তাদ হোসেনের সেই ক্ষমা-
সুন্দর দৃষ্টি আর কোথায় এই নয়ন-
শলাকার ঠোক্কর!

আমার সারেঙ্গীটিকে বড়তরফ ক'রে
দিয়ে বড়ে মিঞা বললেন, "ইয়ে কোই
সাজ (বাদ্যযন্ত্র) হ্যয়? আমকা পেড়েসে

সারেঙ্গী থোড়াহি বনায়া যাতি হ্যয়। চল্ মেরা সাথ, শেঠ দুনীচাঁদজীকা খাস সারেঙ্গী তুঝে দিলায় দেঙ্গে ইস্‌বখ্‌ত।" এই বলে হিড়হিড় করে আমায় টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন দুনীচাঁদ শেঠের আস্‌লি হাতীর দাঁতের দস্তকারী কাজ করা তুঁতকাঠের পুরোনো এক সারেঙ্গী সেকেন্ডহ্যান্ড বাজনার দোকান থেকে কিনিয়ে আনতে। আমকাঠের বাজনা অচল।

হ্যাঁ, এই পঁচিশবছর পরেও স্পষ্ট মনে পড়ে, মহিষশকট-চালকের মতো শক্তি রাখতেন বড়ে মিঞা। ডাম্বেল ভাঁজা আমার আঠারো বছরের সবল পেশী-গুলো তাঁর কব্জির চাপে টনটন করেছিল বহুক্ষণ।

* * *

সাবেকী আমলের এক বনেদী বাড়ির প্রকাণ্ড একটি অন্ধকার ঘরকে নিজের কৃতান্তসদৃশ দেহের ঘনিমা দিয়ে আরও অন্ধকার করে তশ্‌রিফ রাখতেন বড়ে মিঞা।

প্রথম দিনের তালিম।

শেঠ দুনীচাঁদের খাস সারেঙ্গীর তরফ বাঁধছেন মিঞাসাহেব। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি তার তিনি সুরে মিলিয়ে নিচ্ছেন। বদাকার কঠিন আঙুল—কিন্তু তারের সংস্পর্শে এসে সেগুলি কেমন যেন নরম হ'য়ে আসছে। জোরে টিপলে যেন কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে, তাই আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্ম জোয়ারির তারগুলিকে। মজা লাগছে তাই দেখে, মনে ভরসাও জাগছে ধীরে ধীরে, সংগীতে নিরাশ করলেন না বড়ে মিঞা।

নাঃ, বাধা পড়ল। ঝমর্ ঝমর্—মোটা মলের আওয়াজ দরজার বাইরে, সেইসঙ্গে ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং। মিঞা-সাহেব সচকিত হয়ে উঠলেন। যে চোখটা এতক্ষণ ছোট দেখাচ্ছিল দপ্ ক'রে সেটা বড়ো হয়ে অন্যটি ছোট হ'য়ে গেল।

যেন হাতেনাতে ধরা প'ড়ে গেলেন বড়ে মিঞা। সত্রাসে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। মাথা ফিরিয়ে দেখি বিশাল দরজার প্রস্থের প্রায় সমস্তটি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিষমর্দিনী। তাঁর সাইজ-মাফিক এক হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল; গলায় তার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা।

"কে'ও? নয়া সাকিরেদ মিল্ গয়া! অব মেরা দুধ-কা দাম মিলেগা কেয়া?"

স্পষ্ট কথা, মানে বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। দুধের দাম মিঞাসাহেবের দেনা হয়েছে গোয়ালিনীর কাছে; এখন আমার গুরুদক্ষিণায় বকেয়া মিটবার আশা।

বছর ত্রিশ বত্রিশের হামিদাবানু-মার্কা মহিয়সী গোপনারী। তার সামনে করালকান্তি ওস্তাদ আমার পাশ্‌টে মেরে গেলেন; একটা দেঁতো হাসি হেসে নজরটি পাল্টে যা বললেন তার মানে হল, "বসতে আজ্ঞা হয়, মালিকা, দুধের দাম তো নেবেই, কিছু উপরি আগে নাও।"

প্রাপ্য আদায়ে বদ্ধপরিকর মালিকাকে আর কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দুনীচাঁদ শেঠের প্রকাণ্ড সারেঙ্গীটার কান নির্মমভাবে মুচড়ে বড়ে মিঞা জোরে টানলেন ধনুকের মতো বিরাট ছড়টি রিন্ রিন্ ক'রে উঠ্‌ল সুরে বাঁধা তরফের তারের সারি।

এই হাতে—যে হাতে চাবুকই ভালো মানায়, এ দিয়ে এমন মনমাতানো মীড় বেরোয় কেমন করে!

'অঃ-হো', গোপবালার গলা থেকে অর্ধস্ফুট একটি শব্দ বেরুল। লক্ষ্য করে দেখলাম, তার আয়তনেত্রে যেন আমেজ লেগেছে, নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। আবেগে বিহ্বলা নারী!

সারেঙ্গীর সুরের মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন মিষ্টি গলায় চাপা এক গুন-গুনানি শুনতে পাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে হদিস পাইনে। মিঞাসাহেবের মুখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে গেছে। বাজাতেই বাজাতেই বলে ওঠেন, "কী হ'ল পিয়ারী, গলা ছাড়।"

চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে গোপিনী উত্তর দেয়, "ব্যস্, ব্যস্, বড়ে মিঞা এবার থামাও তোমার বাজনা, থাক্‌গে তোমার দেনা পারো তো কিছু টাকা আমায় দিও এ মাসে, হোরি আসছে, বোন দুটোকে কিছু পোশাকী কাপড় কিনে দেব। হ্যাঁ, দেখো, হোরির সময়ে এবারে কিন্তু আমায় ভালো করে বাজনা শোনাতে হবে সারারাত, ছোড়ুঙ্গী নাহি।" দুলে উঠল বরবপু, কণ্ঠে ফুটে উঠল আকিঞ্চন।

বাজনা থামিয়ে বড়ে মিঞা বলেন, "তোমাকে আমি কী শোনাবো, পিয়ারী? ঐ পোষা মেনীটার মতোই সপ্তসুর তোমার কাছেই বাঁধা আছে। হোরিকা রাত তোমার ইন্তাজারে থাক্‌ব, তুমিই আমাকে গান শোনাবে।"

মিঞাসাহেবের দিকে এক চাক্‌লা হাসি ছুঁড়ে, শরীরটাকে একটা পাক দিয়ে রামপিয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাজনাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিকট মুখ ক'রে, অভ্যাসমতো একচোখ ছোট ক'রে দরজার দিকে তাকান বড়ে মিঞা। মোটা মেনীটা তখনও যায় নি। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর গা এলিয়ে ঘাড় কাৎ

আমার সারেঙ্গী-শিক্ষার ব্যর্থ অভিযানে অনেক দুয়ারে আমি ঘুরেছিলাম। তারই আর একটি পরিচ্ছেদ এখানে পেশ করছি। হোসেন সারেঙ্গীয়ার জীবনরাগিণীর মতো কড়ি ও কোমলের মূর্ছনা এ-কাহিনীর সুরে দুর্লভ। এ যেন সাদাসিধে আলাহিয়া—বেলাওল রাগ।

* * *

বন্ধনমুক্ত হয়ে ভূতপূর্ব গুরু, ওস্তাদ হোসেন, চলে গেলেন আবু পাহাড়ের পীঠস্থানে, তাঁর পরমগুরু—সাঁইয়ের সন্ধানে। আর ফিরবেন না। আমায় বলে গেলেন ওস্তাদ বড়ে মিঞার কাছে সারেঙ্গী শিখতে।

আর যাকেই হোক্, এই বড়ে মিঞাকে মোটেই জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, যে হোসেন সাহেবের কাছে আমার সারেঙ্গী শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রথম আলাপের সওয়াল-জবাবেই মিঞাসাহেবের অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলা, পটাহচ্ছেদী অট্টহাসির স্থূলতা—সব কিছুই পীড়া দিচ্ছিল। যদি আবার হোসেনের স্বৈরিণী বেগম ওয়াহিদন-বিবির কথা ওঠে, যদি এঁকে বলতে হয় যে, হোসেনেরই প্রিয়শিষ্য পার্থ রায়ের সঙ্গে বিবিসাহেবা গৃহত্যাগ করেছেন, তাহলে যেন আমার নিজের ঘরেরই কোনো গোপন কলঙ্ককথা বড়ো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রচার করা হয়ে যাবে।

তবু বলতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই এক বিষয়ে বড়ে মিঞাকে সেদিন ভুল বুঝেছিলাম।

হোসেন সারেঙ্গীয়ার নাম করতেই মিঞার বসন্তচিহ্নিত মুখখানিতে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। গলাটা খাটো করে বললেন, "হ্যাঁরে, তুই কি দেখেছিলি, ওয়াহিদন বাঈ এখনও তেমনি সুন্দর দেখতে আছে? আর যার সঙ্গে চলে গেল সে ছোঁড়াটাও নাকি সুপুরুষ? কিন্তু কী আফসোসের কথা বল্ দিকি, হোসেনের মতো স্বামীকে, হোসেনের মতো গুরুকে এরা এমন করে চোট্ দিল! জাহান্নমেও এদের জায়গায় হবে না।"

মুক্তপুরুষ হোসেনের কাছে যে এই ঘটনা অতি তুচ্ছ, আর এ আঘাতকে যে তিনি আঘাত বলে নেন নি, আমার মুখে এ কথা শুনে অন্য সবাইয়ের মতোই অবিশ্বাসের হাসি হেসে বড়ে মিঞা বললেন, "হ্যাঃ, হ্যাঃ, কী যে বাজে কথা বলিস্, তুই!"

* * *

আমার সারেঙ্গীটা টেনে নিলেন বড়ে মিঞা। ছড় বুলিয়ে মিনিটখানেক সুর বের করেই খপ্ ক'রে যন্ত্রটা শতরঞ্জির ওপরে ফেলে দিলেন।

'হাঁ হাঁ' করে সেটিকে আমি কোলে তুলে নিয়ে আহত অঙ্গের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করলাম, কোথাও কিছু ভাঙল কিনা।

অপ্রসন্নমনে মিঞাসাহেবের দিকে চেয়ে দেখি, তাঁর কুৎকুতে চোখদুটির যেটিকে আগে ছোট মনে হয়েছিল সেটিকে এবার বড়ো মনে হ'চ্ছে আর অন্যটির আকার ইতিমধ্যে ছোট হয়ে গেছে।

এ আবার কেমনতর চোখ রে বাবা! কোথায় ওস্তাদ হোসেনের সেই ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি আর কোথায় এই নয়ন-শলাকার ঠোক্কর!

আমার সারেঙ্গীটিকে বড়তরফ ক'রে দিয়ে বড়ে মিঞা বললেন, "ইয়ে কোই সাজ (বাদ্যযন্ত্র) হ্যয়? আমকা পেড়েসে

সারঙ্গী থোড়াহি বনায়া যাতি হ্যয়। চল্ মেরা সাথ, শেঠ দুনীচাঁদজীকা খাস সারঙ্গী তুঝে দিলায় দেঙ্গে ইস্‌বখ্‌ত্।" এই বলে হিড়হিড় করে আমায় টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন দুনীচাঁদ শেঠের আস্‌লি হাতীর দাঁতের দস্তকারী কাজ করা তুঁতকাঠের পুরোনো এক সারেঙ্গী সেকেন্ডহ্যান্ড বাজনার দোকান থেকে কিনিয়ে আনতে। আমকাঠের বাজনা অচল।

হ্যাঁ, এই পঁচিশবছর পরেও স্পষ্ট মনে পড়ে, মহিষশকট-চালকের মতো শক্তি রাখতেন বড়ে মিঞা। ডাম্বেল ভাঁজা আমার আঠারো বছরের সবল পেশী-গুলো তাঁর কব্জির চাপে টনটন করেছিল বহুক্ষণ।

* * *

সাবেকী আমলের এক বনেদী বাড়ির প্রকান্ড একটি অন্ধকার ঘরকে নিজের কৃতান্তসদৃশ দেহের ঘনিমা দিয়ে আরও অন্ধকার করে তশ্‌রিফ রাখতেন বড়ে মিঞা।

প্রথম দিনের তালিম।

শেঠ দুনীচাঁদের খাস সারেঙ্গীর তরফ বাঁধছেন মিঞাসাহেব। পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে প্রতিটি তার তিনি সুরে মিলিয়ে নিচ্ছেন। কদাকার কঠিন আঙুল —কিন্তু তারের সংস্পর্শে এসে সেগুলি কেমন যেন নরম হ'য়ে আসছে। জোরে টিপলে যেন কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে, তাই আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্ম জোয়ারির তারগুলিকে। মজা লাগছে তাই দেখে, মনে ভরসাও জাগছে ধীরে ধীরে, সঙ্গীতে নিরাশ করবেন না বড়ে মিঞা।

নাঃ, বাধা পড়ল। ঝমর্ ঝমর্— মোটা মলের আওয়াজ দরজার বাইরে, সেইসঙ্গে ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং। মিঞা-সাহেব সচকিত হয়ে উঠলেন। যে চোখটা এতক্ষণ ছোট দেখাচ্ছিল দপ্ ক'রে সেটা বড়ো হয়ে অন্যটি ছোট হ'য়ে গেল।

যেন হাতেনাতে ধরা প'ড়ে গেলেন বড়ে মিঞা। সত্রাসে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। মাথা ফিরিয়ে দেখি বিশাল দরজার প্রস্থের প্রায় সমস্তটি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিষমর্দিনী। তাঁর পায়ের কাছে ঘাড় বেঁকিয়ে এসে বসল সাইজ-মাফিক এক হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল; গলায় তার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা।

"কে'ও? নয়া সাকিরেদ মিল্ গয়া! অব মেরা দুধ-কা দাম মিলেগা কেয়া?"

স্পষ্ট কথা, মানে বুঝতে এক মুহূর্তেও দেরি হয় না। দুধের দাম মিঞাসাহেবের দেনা হয়েছে গোয়ালিনীর কাছে; এখন আমার গুরুদক্ষিণায় বকেয়া মিটবার আশা।

বছর ত্রিশ বত্রিশের হামিদাবানু-মার্কা মহিয়সী গোপনারী। তার সামনে করালকান্তি ওস্তাদ আমার পাশটি মেরে গেলেন; একটা দেঁতো হাসি হেসে নজরটি পাল্টে যা বললেন তার মানে হল, "বসতে আজ্ঞা হয়, মালিকা, দুধের দাম তো দেবেই, কিছু উপরি আগে নাও।"

প্রাপ্য আদায়ে বদ্ধপরিকর মালিকাকে আর কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দুনীচাঁদ শেঠের প্রকান্ড সারেঙ্গীটার কান নির্মমভাবে মুচড়ে বড়ে মিঞা জোরে টানলেন ধনুকের মতো বিরাট ছড়টি রিন্ রিন্ ক'রে উঠ্‌ল সুরে বাঁধা তরফের তারের সারি।

এই হাতে—যে হাতে চাবুকই ভালো মানায়, এ দিয়ে এমন মনমাতানো মীড় বেরোয় কেমন করে!

'অঃ-হো', গোপবালার গলা থেকে অর্ধস্ফুট একটি শব্দ বেরুল। লক্ষ্য করে দেখলাম, তার আয়তনেত্রে যেন আমেজ লেগেছে, নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। আবেগে বিহ্বলা নারী!

সারেঙ্গীর সুরের মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন মিষ্টি গলায় চাপা এক গুন-গুনানি শুনতে পাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে হদিস পাইনে। মিঞাসাহেবের মুখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে গেছে। বাজাতেই বাজাতেই বলে ওঠেন, "কী হ'ল পিয়ারী, গলা ছাড়ো।"

চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে গোপিনী উত্তর দেয়, "ব্যস্, ব্যস্, বড়ে মিঞা এবার থামাও তোমার বাজনা, থাক্‌গে তোমার দেনা পারো তো কিছু টাকা আমায় দিও ও মাসে, হোরি আসছে, বোন দুটোকে কিছু পোশাকী কাপড় কিনে দেব। হ্যাঁ, দেখো, হোরির সময়ে এবারে কিন্তু আমার ভালো করে বাজনা শোনাতে হবে সারারাত, ছোড়ুংগী নাহি।" দুলে উঠল বরবপু, কণ্ঠে ফুটে উঠল আকিঞ্চন।

বাজনা থামিয়ে বড়ে মিঞা বলেন, "তোমাকে আমি কী শোনাবো, পিয়ারী? ঐ পোষা মেনীটার মতোই সপ্তসুর তোমার কাছেই বাঁধা আছে। হোরিকা রাত তোমার ইন্তাজারে থাক্‌ব, তুমিই আমাকে গান শোনাবে।"

মিঞাসাহেবের দিকে এক চাক্‌লা হাসি ছুঁড়ে, শরীরটাকে একটা পাক দিয়ে রামপিয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাজনাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিকট মুখ ক'রে, অভ্যাসমতো একচোখ ছোট ক'রে দরজার দিকে তাকান বড়ে মিঞা। মোটা মেনীটা তখনও যায় নি। ঠান্ডা মেঝের ওপর গা এলিয়ে ঘাড় কাৎ

ক'রে দুই চোখের একটি বুজে মিঞার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন মিঞার চাউনিকে ভেংচাচ্ছে। আমি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ ফেরালাম। আড়চোখে দেখি, ব্যাপারটা মিঞাসাহেবের নজর এড়ায়নি; যত আক্রোশ তাঁর পড়ল গিয়ে বেড়ালটার ওপর। এক টুক্রো রজন তুলে নিয়ে নিরীহ জীবটিকে সই করে মারলেন ছুঁড়ে মিঞাসাহেব।

"এঃ, যেমন মনিব তার তেমনি বিল্লী। ঘী-মাখ্খম খেয়ে খেয়ে দুটোরই গতর হয়েছে দেখো না। জানিস্ এই রাম-পিয়ারীটা আমার এক গুরুভাইয়ের মেবারু (স্ত্রী), ভারি মিঠে ঠুংরি গাইত আগে। বিধবা হওয়ার পরে দুধের কারবার ধ'রে আর খেয়ে খেয়ে ওই লাশ-খানা বাগিয়েছে, গলাটাও গেছে খারাপ হবে।" মিঞাসাহেবের প্রকাশভঙ্গিতে রুচির বালাই নেই।

* * *

রামপিয়ারীর বেড়ালটা ইদানিং ওস্তাদের ঘরে এসে মহা উৎপাত করছে। দাম বাকী পড়া সত্ত্বেও রোজই দেখি, রামপিয়ারী নিজেই এসে এক জামবাটি ভর্তি দুধ দিয়ে যায়। সেই দুধ জ্বাল দিয়ে নিত্যই ক্ষীর খাওয়া চাই মিঞা-সাহেবের।

বেড়ালটা প্রায়ই এসে ঢাক্নি উল্টে ক্ষীরটা চেঁছেপুছে খেয়ে যায়। মারমুখো হয়ে ওস্তাদ কখনও ছাতা নিয়ে, কখনও বা সারেঙ্গীর ছড় নিয়েই তাকে তাড়া করেন। মার্জারপুঙ্গব যেন জাদু জানে; মিঞার তাড়া খেয়েই যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এসব ঘটে রামপিয়ারীর অসাক্ষাতে। তার সামনে তার সাধের মেনীর গায়ে হাত তোলবার সাহস ওস্তাদ রাখেন না। বেড়ালটাও সেটা বেশ বোঝে। মনিবের সঙ্গে এলে নির্ভয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

কাতরভাবে মিঞা অনুযোগ করেন, "তোমার বিল্লীটা আমায় উপোস করিয়ে মারবে; জানোই তো রাত্রে আমি ক্ষীর-টুকু ছাড়া আর কিছু খাইনে, তাও এটা মাসের মধ্যে পনেরো দিন খেয়ে ফেলে।"

"বেশ করে, সামলে রাখতে পারো না তোমার রাজভোগ? তোমারই বা কিসের? দাম তো দাও না কখনও ভুলেও।" যেন ঠাস্ ঠাস্ ক'রে পিয়ারীর কথাগুলো চপেটাঘাত করে মিঞার মুখের ওপর।

দামের উল্লেখ হ'তেই ওস্তাদ কথা ঘুরিয়ে নেন। ছড় টেনে সুর দিয়ে বলেন, "সেই গানটা গাও না, পিয়ারী, সেই হিন্দোলটা।"

"রাখো তোমার আদিখ্যেতা। আমার বুঝি কামকাজ নেই? আমার একটা ভঁয়সীর বাচ্চা হবে, এই এখন-তখন অবস্থা, তার দেখ্ভাল্ না ক'রে এখন গাইব গান?" সকোপে দুমদাম্ করে পা ফেলে মালিকা প্রস্থান করেন। ওস্তাদ মিটিমিটি হাসেন।

একদিন মিঞাসাহেবের আস্তানায় পৌঁছে দেখি বেশ মোটাসোটা একটা নেড়িকুত্তার ছানাকে কোলে নিয়ে ওস্তাদ খুব আদর করছেন।

আমাকে সগর্বে বললেন, "এই দেখ্ সুদিল্, এটাকে পুষেছি; এবার ওই মুট্কীর বিল্লীটা জব্দ হবে।"

আমি বললাম, "এতটুকু বাচ্চা ওই মস্ত বেড়ালটার সামনে যে মারা পড়বে।"

ওস্তাদ দমেন না, "কোই ফিকির নেই, এটাকে আমি গোস্ত্ খাইয়ে খাইয়ে দুহপ্তার মধ্যেই জওয়ান ক'রে তুল্ব।"

পরের দিন পৌঁছেই শুনি তুলকা-লাম কাণ্ড। কুকুর ছানাটাকে নির্মমভাবে ঠেঙাচ্ছেন মিঞাসেহেব আর পাড়া মাত করে সেটা চেঁচাচ্ছে; দূরে একটা উঁচু পাঁচিলের ওপর ব'সে মেনী মুখ মুছছে।

আমি কাছে গিয়ে ওস্তাদকে থামাতে তিনি বললেন, "বেটা আজ বিল্লীটার সঙ্গে ভাব করে একসঙ্গে গিয়ে আমার ক্ষীরটুকু মেরেছে। যা ফেলে দিয়ে আয় বেটাকে রাস্তায়।"

বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে মাইলখানেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসি।

* * *

বসন্তপূর্ণিমা এসে গেল। দোলপর্বে বড়ে মিঞার সান্ধ্য আসরে আমার নিমন্ত্রণ। বললেন, তাঁর কে এক বেরাদার গাইয়ে সেদিন বসন্তরাজকে অভিনন্দন জানাবেন 'ফাগুয়া'-র গান গেয়ে; তাছাড়া রামপিয়ারীর গানও শোনবার মতো।

পড়ন্ত বেলায় গুরুগৃহে উপস্থিত হয়ে দেখি, সেখানে সেই অবেলাতেও হোলিখেলার মাতামাতি চলেছে। আবীর-গুলালে ঘরখানি ছেয়ে ফেলে মিঞা-সাহেব বালসুলভ উল্লাসে দাপাদাপি করছেন। মেঝেতে ফাগের পুরু আস্তরণ দেখে মনে হয় সকাল থেকেই এইরকম চলেছে। চারপাঁচজন নিমন্ত্রিত। বেশভূষায় বোঝা যায় বড়ে মিঞার মতো এঁরাও পেশাদার শিল্পীসম্প্রদায়ভুক্ত।

আবীরের কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই ব্যাঘ্রঝম্প দিয়ে ওস্তাদ আমায় জাপটে ধরলেন। একেই তো বাতাসে বাতাসে নাকে মুখে রঙ ঢুকেছে, তারওপরে এই প্রেমালিঙ্গনে

মুখ থেকে আবার ভরভর করে সুরার গন্ধ বেরুচ্ছে। মিঞার থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ঘরের বাইরে পালিয়ে এলাম।

বিকেলের আলো তখন প্রাঙ্গণে এক হলুদ আভা বিকিরণ করছে। সামনে চেয়ে দেখি দূর থেকে একটা লালের ঢেউ এদিকে এগিয়ে আসছে। ঝমর্-ঝমর্—ঝুমুর-ঝুম্—ঠুং-ঠুং।

আগে রামপিয়ারী, পেছনে দুটি তরুণী। পরনে তাদের বাসন্তী রঙে ছোপানো সস্তা মলমলের থান, সামনে কুঁচি দেওয়া; উত্তমাঙ্গ বেষ্টন করেছে টকটকে লাল ওড়না দিয়ে। সিঁথি থেকে পা অবধি রুপোর অলঙ্কার।

মাথায় গাগরী নিয়ে ঘরে ঘরে যাঁরা দুধের পসরা ক'রে বেড়ান, তাঁদের চলনের সাবলীল ছন্দ, দেহের সতেজ ঋজুতা, উৎসবশেষে নূপুরনিক্কণ—সবটা মিলিয়ে মনে হ'ল গোষ্ঠের রাখাল আমি দাঁড়িয়ে আছি আর বিলাসিনী গোপিকারা চলেছেন কুঞ্জের পথ বেয়ে, শ্যামসমাগমে।

পায়ের কাছে ঠুং-ঠুং ধ্বনি আর মিউ মিউ শব্দে চৈতন্য হ'ল। রামপিয়ারীর মেনীটা পায়ে গা ঘসছে।

তরুণীদের বাইরে দাঁড়াতে বলে গোপীশ্রেষ্ঠা গজগমনে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তুমুল হৈ হৈ বেধে গেল ভিতরে।

"আরে, আরে, তোমার প্রতীক্ষা করে করে হেদিয়ে গেছি আমরা, এসো এসো পিয়ারী, আমার অন্ধেরা গরীবখানা আলো ক'রে বস" উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে মিঞা-সাহেব স্বাগত জানালেন।

খল্‌খল্ করে হেসে উঠে পিয়ারী বললেন, "বসছি, বসছি, ব্যস্ত কেন, বাইরে আমার বোন দুলারী আর কিশোরী আছে তাদের আগে ভেতরে আনি।"

"তাই নাকি, সচ্? কী আনন্দ, কী সৌভাগ্য আমাদের," এক দৌড়ে ওস্তাদ ঘরের বাইরে এসে কেষ্টঠাকুরটির মতো ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে গেয়ে উঠলেন,

"আয়ো ফাল্গুনমাস মধু উপজায়ে
খেলন লাগে হোরি।"

কিশোরী দুলারী খল খল করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। একজন ফস্ করে ওড়নার তলায় লুকোনো একটা পিচকারী বের করে খানিকটা রঙ্ মিঞার মুখে ছিটিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে, "আরে আমার নন্দকিশোর, খুব যে তোমার রং ঢং!"

মিঞার বেরাদারেরাও দু'একজন বেরিয়ে এসেছেন। একজনের হাতে দেখি বাঁশের একটা আড় বাঁশী।

ছোটটি—বোধহয় কিশোরী তারই নাম—বাঁশীওয়ালাকে খানিকটা গুলাল ছুঁড়ে মেরে নৃত্যভঙ্গি করে বলল, "এ-জী মুরলী মনোহর, বজাও তুম্হারা বান্‌সরী, ময়্ নাচুঙ্গী।"

বাঁশীর সঙ্গে দুলারী গেয়ে ওঠে,
"আরে হারে কাহ্নাইয়া
পিয়ারাকি বংশীওয়ালা,
মুরলীওয়ালা, বংশীওয়ালা,
যমুনাকা নীরে তীরে ধেনু চরাওরে।"
সকলে হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢোকে।

ঘরের বাইরেই এই মাতামাতি, ভিতরে আজ না জানি কী হবে! আবহাওয়াটা গোলমেলে ঠেকছে। যাব কি যাব না, ভাবি। নাঃ, গানবাজনা শুনতেই হবে; আর নাচ দেখাটাই বা বাদ যায় কেন?

আমার মেনীটা যেন পায়ে ধাক্কা দিয়ে বলছে, "চলো না, চলো না, দেরি করছ কেন?"

ইতস্তত করে ঘরে ঢুকলাম।

সত্যিই আঁধার ঘর আলোয় ভ'রে গেছে। রুপোলী-বেগুনী আর হলদে ছোঁওয়া লাল আলো। সেইসঙ্গে আছে সদ্যরঞ্জিত শাড়ির রঙের গন্ধ আর আছে সুগন্ধি আবীরগুলালের সৌরভ।

মাঝখানে আসন নিয়েছে পিয়ারী। রূপে মেলে না কিন্তু বৃষভানুনন্দিনী শব্দের ধ্বনিটি রামপিয়ারীর আয়তনের সঙ্গে বেশ মানানসই। দু'পাশে বসেছে দুলারী আর কিশোরী, যেন বৃন্দা-ললিতা।

চাঁদির থাঞ্জারিভরা মেঠাই এল আর এল সরবৎ। তবকে মোড়া পানও এল।

একথা সেকথার মধ্যে গেলাসে চুমুক দিয়ে পিয়ারী বলল, "ভালো ঠান্ডাই বানিয়েছ তো, ওস্তাদ, ও-বেলা যে দুধ পাঠিয়েছিলাম তাই দিয়ে বুঝি?"

কিশোরী সাগ্রহে তার গেলাসটা ওঠাল। পিয়ারী একটানে সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, "তোরা আজ আর খাবি না, বাড়িতে আজ ক' লোটা ভাঙের সরবৎ খেয়েছিস বল দেখি? শেষে নেশা লেগে যাবে।"

"বা, রে, তাই বলে ওস্তাদের দেওয়া ঠাণ্ডাই খাব না? মিঞা রাগ করবে যে" কিশোরী বলে।

ওস্তাদ বলে, "ঠিকই তো, খাবেই তো, আজকের দিনে মানা করো না, পিয়ারী।"

কিশোরী আবার গেলাসের দিকে হাত বাড়ায়। রামপিয়ারী ফের বকুনি দিয়ে উঠতেই কিশোরীর হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা সরবৎ ছলকে মেঝেতে পড়ে গেল। কোথা থেকে বেড়ালটা গুটি গুটি এসে চক্ চক্ করে সেটা চেটে নিল।

হো-হো করে হেসে মিঞাসাহেবের সেই বাঁশীওয়ালা বেরাদার বলে "পিয়রীবিবি, এবার তোমার বিল্লীর নেশা হয়ে যাবে।"

ওদিকে ওস্তাদ ততক্ষণে সুর মিলিয়ে সারেঙ্গীতে তার ধরেছেন তিলক-কামোদের। কিশোরী মুখ ভার করে ছিল, সুর শুনেই খুশী হয়ে দিদিকে বলে ওঠে, সেই গানটা গাওনা, দিদি।"

সরবতের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে পিয়ারী সুর ধরেঃ

"তরণতন আকুল বঁয়ঠে শ্যামসুন্দর
মুরলী বজাওবে সব কো মনোহরলীনে"

ঝুমঝুম করে নূপুর বেজে ওঠে। কিশোরী ছন্দে ছন্দে উঠে দাঁড়ায়, দুলারীকে ইশারা করে।

নাচে কিশোরী—নাচে রাধা—দুলে দুলে তালে তালে নৃত্যচ্ছন্দ; তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুলারী, কৃষ্ণের ভঙ্গিতে।

একজন তবলায় বোল তুললেনঃ

তাথেই তা থৈ থৈ
থৈয়া থৈয়া থৈয়া থৈ।

পিয়ারীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিশোরী গেয়ে ওঠে,

"নিরখ মুখজ্যোত কোটিচন্দ্রহার
অ্যায়সে লিয়ে ত্রিভুবন লোক বশকিনে"

ওস্তাদের সারেঙ্গী যেন কথা বলে। ডাকে—রাধা! রাধা!

লহরা বেজে চলে।

দুলারী যেন আর নারী নয়। পটের কৃষ্ণের দুষ্টু হাসিতে মিষ্টি মুখখানা ভরিয়ে তুলেছে, যেন তার ছলাকলা দিয়ে আকুল রাধাকে আজ কতই যাতনা দেবে।

কতক্ষণে নাচ থামল ভুলে গেছি, আমাতে ছিলাম না।

গান থামিয়ে পিয়ারী বাঁশীওয়ালাকে বলল, "ওহে যমুনাপরসাদজী, আমরা তো অনেক নাচলাম গাইলাম, এবার তোমরা কিছু শোনাও।"

যমুনাপ্রসাদের হয়ে ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, "জরুর পিয়ারী, গাইবে বৈ কি! তার আগে এস একটু সরবৎ খেয়ে নেওয়া যাক্।"

এবারে সকলেই খেল। রামপিয়ারী কিশোরী-দুলারীকে মানা করল না; নেচে নেচে মেয়েদুটোর পিপাসা পেয়েছে নিশ্চয়ই, খাক্ একটু।

তারপরে হ'ল ফাগুয়া আর চৈতার গান। পুরুষেরা গানে গানে মেয়েদের টিটকারি দেয়, মেয়েরা সুরে সুরে কলি বেঁধে তাদের কথা কাটে, হয় তক্রার, হয় তুমুল কপট কলহ। তারপরেই সকলে একসঙ্গে হেসে গেয়ে ওঠে। ওস্তাদের সারেঙ্গীও যেন হাসতে থাকে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে। রাত কত? সিদ্ধির সরবৎ আগে যে একটু আধটু খাইনি তা নয়, কিন্তু এত কড়া ঠাণ্ডাই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে শুনতে পেলাম, পিয়ারী ভৈরবীতে সুর তুলেছেঃ

"বারাজোরি নাহি রে কাহ্নাই,
পানিয়া ভরণে মোরি গাগরি গিরায়ে
করকেলরাই।"

* * *

আমার সারেঙ্গী শিক্ষা-বিভ্রাটের দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ হ'বে না যদি এর পরের ঘটনা অকথিত থাকে।

টাকা দিয়ে রামপিয়ারীর দুধের হিসেব মিটল না কিছুতেই। একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে জানলাম, রাজা-জমিদারদের নেকনজরে থেকে ওস্তাদের যা' আয়, মিতব্যয়ী হ'লে সেকালে কলকাতায় একখানা বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সে সময়ে স্কচ্ হুইস্কির দাম কম থাকলেই বা কি হ'বে, পরিমাণের কোনো কণ্ট্রোল তো ছিল না আর মিঞাসাহেবের ইয়ার-বন্ধুরও অভাব ছিল না।

মিঞার বাজেট কিছুতেই সমতা রক্ষা করতে পারত না।

একদিন আমার সামনেই এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বোধহয় আগের রাত্রের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ হিসেবের বাইরে হ'য়েছিল; ওস্তাদের ঘরে ঢুকে দেখি মাথার বালিশটাকে পাশ-বালিশে পরিণত ক'রে, খোলপরানো শারেঙ্গীটির ওপরে মাথা রেখে বে-কায়দায় শুয়ে আছেন মিঞাসাহেব।

আমি গলাখাঁকারি দিয়ে তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। পলকের জন্যে একটি চোখ খুলে আমায় দেখে নিয়েই পাশ ফিরে আগের মতোই নাক ডাকাতে লাগলেন বড়ে মিঞা।

চুপ ক'রে ব'সে আছি, হঠাৎ বাইরে পরিচিত শব্দ হ'ল—ঝমর্, ঝমর্, ঠুং-ঠুং-ঠুং।

বরাবরই দেখে আস্‌ছি জাগ্রত বা ঘুমন্ত, পিয়ারীর মলের আওয়াজ দূরে থেকে ভেসে আসামাত্রই কানখাড়া হ'য়ে ওঠে মিঞাসাহেবের, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে নিপুণ হাতে মিঠি মিঠি রাগরাগিণীর টুকরো বাজিয়ে সুরপিপাসু গোয়ালিনীকে মোহিত ক'রে ফেলেন। রাম-পিয়ারীর দুধের দাম আর আদায় করা হ'য়ে ওঠে না।

তিড়িং ক'রে লাফ দিয়ে উঠলেন আমার গুরুদেব। তাড়াতাড়ি আমার রজনটা চেয়ে নিলেন। কিন্তু ছড়িতে রজন মাখিয়ে কোনো ফল হ'ল না। মাথার চাপে সারেঙ্গীর তাঁত, তার, সবই বেসুরো হ'য়ে গেছে। বশীকরণ সম্মোহন সবই বিফল হ'ল এ-যাত্রা।

পিয়ারী আজ রণবেশে উপস্থিত। তিনপেড়ে পাছাপেড়ে শাড়ির আঁচলটা গাছকোমর ক'রে বাঁধা। এক ফর্দ গহনাও দেখলাম বেড়েছে—গলায় পরেছে ভারি এক হাঁসুলি।

বড়ে মিঞা রাশভারী ভাব এনে গম্ভীর গলায় বললেন, "দুধের হিসেবটা নিয়ে, পিয়ারী, পরে এসো, এখন আমি সাকরেদকে তালিম দিচ্ছি।"

"দাঁড়াও তা'র আগে আমি তোমায় কিছু তালিম দিয়ে নিই" গর্জন ক'রে উঠ্‌ল রামপিয়ারী।

এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ফস্ ক'রে গলার হাঁসুলিটা খুলে ধেয়ে গেল ওস্তাদের দিকে।

মিঞা প্রস্তুত ছিলেন। এক-লাফে কোণে দাঁড়-করানো আলমারীটার পেছনে লুকিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "তুমি যা' চাও তাই হবে পিয়ারী, এখন বল সাঙ্গা না নিকে, যে মতেই চাও তা'তেই রাজী; বিয়ে আমি তোমায় করবই, খোদা কসম্। আর দেখো, তোমার বিল্লীটাকে ডেকে নাও, আমি নড়তে পারছি না আর বেটা আমায় আঁচড়াচ্ছে; বড্ড লাগ্‌ছে।"

বড়ে মিঞা আর রামপিয়ারীর সাঙ্গাতে উপস্থিত ছিলাম আমি। মিঞাসাহেবের চেষ্টায় সেই দিনই দুলারী কিশোরীরও বিয়ে হ'য়ে গেল যমুনা প্রসাদ আর তা'র ভাইয়ের সঙ্গে।

বিয়ের পরে বড়ে মিঞা সাড়ম্বরে পত্নীগৃহে গমন করে সেখানেই চিরতরে অবস্থিত হলেন।

এর পরে ওস্তাদের মন মেজাজে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখিনি, অল্প যে ক'টা দিন আমি তাঁর সাকরেদী করেছিলাম।

কেবল একদিন কী নিয়ে যেন মিঞা-সাহেবকে রামপিয়ারীর কাছে খুব লাঞ্ছিত হ'তে হ'ল। মুখরা গৃহিণীর গঞ্জনা থামবার পরে আমার সামনেই মিঞা সখেদে স্বগতোক্তি ক'রে ফেললেন, "হায় হায়, দুধ!"

চায়ের লোভেই হোক আর আড্ডার লোভেই হোক, মণিময়ের রোড কমিটির বৈঠক বেশ জমে উঠল। শুধু স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্রই নয়, আশেপাশের দু' চারজন বয়স্ক ভদ্রলোকও এই বৈঠকে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে সবাই জবরদখল কলোনীর বাসিন্দা নন, কলোনীর বাইরে নিজের টাকায় জায়গা জমি কিনে বাড়িঘর তুলেছেন এমন কয়েকজন গৃহস্থও আছেন। এ অঞ্চলে মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এঁদেরই বেশি। ডাক্তার রামগোপাল মুখুয্যে এঁদের একজন। মোটাসোটা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকে আড়ালে আবডালে বলে, আসলে উনি ডাক্তারী পাশ করেননি। শুধু বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার জোরে পসার জমিয়েছেন। পাশ করা ডাক্তারদের চেয়ে উদ্বাস্তু কলোনীগুলির মধ্যে ওঁর পসার বেশি। যদিও কীর্তিনগরের অভিজাত পাড়ায় এম বি পাশ ছোকরা ডাক্তার সুকুমার মিত্রই সবচেয়ে বেশি কল পায়—আর ইদানীং কলোনীর মধ্যেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। তবু এখন পর্যন্ত রামগোপালের হাত যশ যথেষ্ট, আর ডাক্তারিতে এই হাতের ওপরই কপাল। শুধু লম্বা ডিগ্রী আর বড় হরফের সাইন-বোর্ড থাকলেই ডিসপেনসারিতে রোগীর ভিড় হয় না।। ওষুধের মধ্যে যে মন্ত্রের জোর আছে তার প্রমাণ দিতে হয়। প্রতিযোগিতায় সুকুমারের দিক থেকে রামগোপালের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তাঁর ক্ষেত্র আলাদা, ভিজিটের হারও কম। তবু রামগোপাল এখন থেকেই সতর্ক হচ্ছেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী, সর্বজনীন দুর্গা, কালী সরস্বতী পুজো কিংবা যে কোন ধরনের সভাসমিতিতে ডাক পড়লেই তিনি উপস্থিত হন। অনেক সময় না ডাকলেও তিনি নিজেই ছেলেদের ডেকে খোঁজ-খবর নেন। বাজারে কি রাস্তার মোড়ে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে দেখা হলে মিষ্টি ভাষায় কুশল প্রশ্ন করেন। সবাই লক্ষ্য করে, আগে এতটা সামাজিক আর সমাজহিতৈষী ছিলেন না রামগোপালবাবু। কণ্ঠস্বরেও এতটা মাধুর্য ধরা পড়ত না। সুকুমার এ পাড়ায় ঢুকে পড়বার পর থেকে তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। খুব সাবধানে রোগীদের কাছে তিনি সুকুমারের নিন্দাও করেন। হেসে হেসে খানিকটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে বলেন, 'সুকুমার বেশ চালাক চতুর, চটপটে, সেকথা হাজার বার স্বীকার করি। কিন্তু শুধু স্মার্ট হলেই ভালো ডাক্তার হওয়া যায় না। বরং ওকালতির ব্যাপারে ওটা সদ্‌গুণ। পেটে তেমন কিছু থাক আর না থাক, মুখে কথা ফুটলেই হ'ল। কিন্তু শুধু মুখ থাকলেই ডাক্তারী করা যায় না। এতে মাথার দরকার। স্থির বুদ্ধির দরকার। সে বুদ্ধি অবশ্য বয়সের সঙ্গে আসে। সুকুমারের বয়সই বা এমন কি।'

পাকিস্তানের বাড়িঘর সময় থাকতেই রামগোপাল বিক্রি করেছিলেন। সেই টাকায় এখানে বিঘাখানেক জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। ফুল আর তরকারির বাগান করেছেন। ডাক্তার হিসেবে তিন-চার বছরের মধ্যে যেভাবে পসার জমিয়ে তুলেছেন তাতে ওঁর বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। রামগোপালবাবু সুকুমারের মত সুট পরেন না। ধুতি পাঞ্জাবি পরেই কলে বেরোন। থাকেনও খুব অনাড়ম্বর সাদাসিধেভাবে।

রোড কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে যখন রামবাবুর নাম প্রস্তাব করা হ'ল কেউ আপত্তি করল না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে এমন আর কে আছে এখানে। রামবাবুই বরং মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'দেখুন, ওসব পদটদ আমাকে দেবেন না। পদই হচ্ছে বিপদের কারণ। আমাকে এমনিই কমিটির মধ্যে রাখুন। আমি সাধ্যমত আপনাদের সেবা করব। আমার ডিসপেনসারি-ঘর রয়েছে। তাছাড়া, ওর পাশের ঘরটাও তো প্রায় খালি পড়ে থাকে। যদি দরকার বোধ করেন আপনাদের কমিটির মিটিং মাঝে মাঝে সেখানেও করতে পারেন মণিময়বাবু।'

মণিময় বলল, 'নিশ্চয়ই। ঘরটা আমরা আপনার কাছে থেকে চেয়ে নেব ভেবেছিলাম। আপনি না চাইতেই অনুমতি দিলেন। প্রেসিডেন্টের বাড়ি আমাদের স্থায়ী অফিস হবে।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন দু'জন সদানন্দ সাধুখাঁ। বড় রাস্তার মোড়ে মুদি দোকানের মালিক। উদ্বাস্তু নন এখানকার পুরোন বাসিন্দা। খাটো ধুতি আর ময়লা ফতুয়া পরে বেড়ালেও ও৭

অভিজ্ঞতা আর পাকা দাড়ি আছে। বিষয়-বুদ্ধির কথাও সবাই স্বীকার করে। দু' নম্বর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে বীরনগর কলোনীর প্রেসিডেন্ট জিতেন বিশ্বাসের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় এম ই স্কুলের হেডমাস্টার সুধাংশু পোদ্দারকেই পদটি দেওয়া হ'ল। এবার নির্বাচনের পালা। ছাত্র আর অল্পবয়সী ছেলেরা একবাক্যে মণিময়ের নাম করল। মণিময় বলল, 'আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছিই। এখানকার যাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা তাঁদের কাউকে সেক্রেটারী করুন। যাঁরা দিনরাত থাকবেন—'

সুনীল আর শীতাংশুর দল আপত্তি করে বলল, 'দিনরাত থাকাটাই বড় কথা নয় মণিময়দা। যিনি দিনরাত এ নিয়ে ভাববেন, কাজ করবেন তাঁর ওপরই সব দায়িত্ব থাকবে। আমরা আপনাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে দেব না।'

রামগোপালবাবু নিজেই শেষ পর্যন্ত বিতর্কের মীমাংসা ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, 'মণিময়বাবু যে সবকিছুর মূলে, তাঁর উৎসাহে আর কিছু না হোক আমরা এখানে পাঁচজনে জড় হয়েছি, রাস্তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। তবু তিনি এ অঞ্চলের বাসিন্দা না হওয়ায় যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তাই আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সুনীল বলল, 'বলুন।'

রামগোপালবাবু বললেন, 'আমি বলি মণিময়বাবু আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে থাকুন। অবশ্য উনিই সব করবেন, করাবেন। আর সদাসর্বদা আমরা যাকে হাতের কাছে পাব তেমন একজনকে আমরা সেক্রেটারী করে রাখি।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আমাদের শীতাংশুকে —'

রামগোপালবাবু হেসে বললেন, 'এটা ঠিক আপনার মত বিচক্ষণ লোকের কথা হ'ল না মণিময়বাবু। শীতাংশু শক্ত হ'লেও ছাত্র, বয়স অল্প। তাছাড়া পড়া-শুনার চাপ আছে, পরীক্ষার ভাবনা আছে। ঘাড়ে আরো পাঁচরকমের দায়িত্ব চাপিয়ে ওকে অসুবিধেয় ফেলা কি ঠিক হবে। তার চেয়ে আমাদের সুবিনয় চক্রবর্তীর কথাটা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কালো, ছিপছিপে একটি যুবক প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'না না ডাক্তারবাবু, আমাকে এর মধ্যে টানবেন না। আমি বাইরে থাকি সেই ভালো।'

বছর তিরিশেক বয়স হবে সুবিনয়ের। ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। রামগোপাল-বাবু বললেন, 'বাইরে থাকবে কেন। বরং ভিতরে থাকলেই তুমি ভালো কাজ করতে পারবে। বলা কওয়া, বক্তৃতা দেওয়া তোমার বেশ অভ্যাস আছে। সরকারী অফিস টফিসগুলির সঙ্গেও জানা-শোনা আছে তোমার। কাজ করতেও পার। সেক্রেটারী পদের তুমিই যোগ্য লোক সুবিনয়।'

স্টেশনের ধারে একটি স্টেশনারি দোকান আছে সুবিনয়ের। স্কুল সীজনে পাঠ্য বই-টইও রাখে। কেউ কেউ বলে, ডাক্তারবাবুর কিছু অংশ আছে দোকানের। কেউ বলে, অংশ নয়, শুধু মূলধনের সুদ নেন তিনি। কারো ধারণা, বিপত্নীক রামগোপাল সুবিনয়ের তরুণী স্বাস্থ্যবতী বোন সুলতার পাণিপ্রার্থী। সেইজন্যেই ওর ওপর তাঁর স্নেহের মাত্রাটা বেশি। কিন্তু ওর যোগ্যতার কথাও অবশ্য অনেকে স্বীকার করে থাকেন। সভা-সমিতি সংগঠনের কাজে সুবিনয়ের দক্ষতা আছে। কল্যাণ পাঠচক্র নামে একটি লাইব্রেরীও সে এর মধ্যে গড়ে তুলেছে। এই পাঠচক্রকে কেন্দ্র করে ছোট খাট একটি দলের অধিপতি সুবিনয় চক্রবর্তী।

সুবিনয়ের নাম ওঠায় মণিময় ব্যাপারটা একটু চিন্তা ক'রে দেখল। এর আগে ওই কল্যাণ সঙ্ঘের কোন ছেলেকে মণিময় পায়নি। তারা একটু দূরে দূরেই রয়েছে। বেশ বোঝা গেছে, শীতাংশুদের দলের সঙ্গে তাদের একটা রেষারেষি আছে। মণিময়ের মনে হল, এই উপলক্ষে ওই দলটিকে যদি হাতে পাওয়া যায় তাহ'লে জনবল আরো বাড়বে। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে দলাদলির তীব্রতাটাও কমে আসবে।

তাই শীতাংশু আর সুনীলের গম্ভীর মুখ চোখে পড়া সত্ত্বেও মণিময়

রামবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে। আপনাদের যদি সবাইর মত থাকে সুবিনয়বাবুই সেক্রেটারী হবেন রোড কমিটির।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'মণিময়বাবু, একটা কথা বলব।'

'বলুন।'

সুবিনয় বলল, 'আমরা যা করছি তা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মত হচ্ছে। রাস্তা কি ক'রে হবে, টাকা-পয়সার সংস্থান কোত্থেকে করব, আসুন আগে আমরা তাই ঠিক করি। কমিটি টমিটি নিয়ে মাথা ফাটাফাটি পরে করলেও চলবে। তার আগে কাজটা কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া যাক।'

মণিময় বলল, 'ঠিক বলেছেন, কাজটাই লক্ষ্য। বিনা কাজে কমিটি ফরম করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে কাজের সুবিধের জন্যই আমাদের এ ধরনের কিছু একটা করে নেওয়া দরকার। না হ'লে বাইরের পাঁচজনের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল হয়। তারপর দরকার মত এ কমিটি আপনারা ফের ঢেলে সাজতে পারবেন।'

বুড়ো সাধুখাঁ মশাই বললেন, 'কলকের তামাকের মত। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মণিময়বাবু। আপনাদের এখানে তামাক টামাকের বুঝি কোন ব্যবস্থা নেই?'
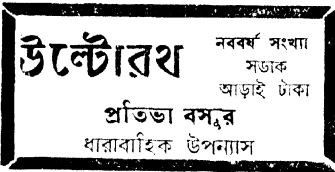
সুবিনয় শীতাংশুদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখানে সবই আগুন। তামাকেরই শুধু অভাব আছে।'

রামগোপালবাবু বললেন, 'না না, অভাব কেন থাকবে সাধুখাঁ মশাই। এই নিন, আসুন।' পকেট থেকে তিনি দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরলেন।

সিগারেট ধরিয়ে সাধুখাঁ বললেন, 'বুড়ো মানুষের একটা পরামর্শ যদি শোনেন মণিময়বাবু তো বলি।'

মণিময় বলল, 'নিশ্চয়ই শুনব। শুনব বলেই তো আপনাদের এখানে ডেকে এনেছি সাধুখাঁ মশাই।'

সাধুখাঁ বললেন, 'আপনার নাম শুনেছি। আর মানুষটিও যে খুব কাজের তাতো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। বিয়ে থা করে আর পাঁচজনের মত গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে আপনি নিজের ঘরে কায়েমী হয়ে বসেননি। দশজনের উপকারের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। সকলের জন্যে প্রাণ কাঁদে বলেই বেরোতে পেরেছেন। আপনার মত মানুষ হয় না।'

মণিময় লজ্জিত হয়ে বলল, 'অত প্রশংসা করবার মত কিছু নেই সাধুখাঁ মশাই। আপনার পরামর্শের কথা এবার শুনি।'

সাধুখাঁ শান্তভাবে বললেন, 'আপনারা এই রাস্তা টাস্তার মতলব ছাড়ুন। দু' মাইল প্যাকা রাস্তা তৈরি করা কি সোজা কথা? এ কি দু' চার শ' কি দু' চার হাজার টাকার কাজ। এই রিফিউজিদের ভিতর থেকে এত টাকা আপনি তুলবেন কি ক'রে? পুজো পার্বণে দু' আনা চার আনা চাঁদাই এদের কাছ থেকে আদায় করা শক্ত আর কিনা আপনি সড়ক বানাবেন?'

সদ্যনির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে মণিময় এমন নৈরাশ্যের কথা আশা করেনি। সে হঠাৎ কোন জবাব দিল না।

সাধুখাঁ বলতে লাগলেন, 'মুদি দোকান চালিয়ে বুড়ো হয়ে গেলাম। মনে করবেন না শুধু চাল ডাল তেল নুন নিয়ে কারবার করেছি আর কিছু চিনিনি। ব্যবসা চালাতে হ'লে সবচেয়ে বেশি কারবার করতে হয় মানুষের সঙ্গে আমরা ব্যবসায়ীরা পাঁচরকম মানুষকে যেমন চিনি, আপনারা তা চিনবেন কোত্থেকে। তেমন অভিজ্ঞতা আপনাদের আসবে কোত্থেকে। তাই বলি, কাজ করতে যখন নেমেছেন সত্যিকারের কাজ করুন। বুঝে শুনে কাজ করুন। যেখানে যা মানায় যা রয়সয় তাই করুন মণিময়বাবু ভালো স্কুল করুন, হাসপাতাল করুন কাজের কি অভাব আছে নাকি।'

মণিময় বলল, 'আপনার কথা ভেবে দেখব সাধুখাঁ মশাই।'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখবেন। আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ। একটু ভাবলেই সব বুঝতে পারবেন। কি সম্ভব, কি অসম্ভব তা টের পাবেন। আপনার এত কষ্ট, এত হেনস্ত জলে না যায় মণিময়বাবু, আমার সেই ভয়।'

মণিময় বলল, 'আপনার উপদেশের কথা আমরা মনে রাখব সাধুখাঁ মশাই। যদি তেমন বুঝি রোড কমিটিকে স্কুল কমিটি কি হাসপাতাল কমিটি ক'রে নিলেই হবে। আপনাদের আশীর্বাদে আমরা এখানে সবই করব, স্কুলও করব, হাসপাতালও করব। কিন্তু তার আগে রাস্তার কথাটাই ভাবছি। এ আমাদের কাজে নামবার রাস্তা, কাজ শুরু করবার রাস্তা। শুধু পায়ে হাঁটবার রাস্তা নয়। আমরা যাই করি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আপনার উপদেশ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন, এ আশা নিশ্চয়ই করতে পারি।'

সাধুখাঁ বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যখনই ডাকবেন তখনই হাজির হব। তাতে কোন সন্দেহ রাখবেন না মণিময়বাবু।'

এরপর প্রবীণরা আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন। সাধুখাঁ পথে যেতে যেতে রামগোপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি ধারণা ডাক্তারবাবু?'

রামগোপালবাবু বললেন, 'আমার ধারণা, মণিময় একটা বদ্ধ উন্মাদ। নিতান্ত ছেলেমানুষ। বিয়ে থা না করলে, ঘর সংসার না করলে কেউ কেউ ওই রকমই থেকে যায়। তাদের গ্রোথ হয় না।'

সাধুখাঁ হেসে বললেন, 'তাহ'লে আপনি জেনে শুনে ওইসব ছেলেমানুষের দলে নাম লেখালেন যে।'

রামগোপাল বললেন, 'কি করব মশাই। দশে চক্রে ভগবানকে পর্যন্ত ভূত হতে হয়। কমিটিতে একজন ডাক্তারকে ওরা নেবেই। আমাকে যদি না পায় সুকুমারকে ওরা ডেকে নেবে।'

সাধুখাঁ হেসে বললেন, 'আপনার কোন ভাবনা নেই। রাস্তা টাস্তা কিছু হবে না ডাক্তারবাবু। দু' দিন বাদে সবাই যে যার পথ দেখবে। তবে ট্যাঁক থেকে যতদিন পয়সা খসাতে না হয় কমিটিতে নাম রাখতে আপত্তি কি।

প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসিডেণ্ট দুজনে একমত হয়ে যাঁর যাঁর বাড়ির পথ ধরলেন।

মণিময়দের মিটিং তারপরেও অনেকক্ষণ অবধি চলল। কাগজ কলম নিয়ে একটা পিটিশনের খসড়া করে ফেলল মণিময়। সরকারের ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের কাছে কীর্তিপুরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সবিনয়ে আবেদন জানাল। এতগুলি মানুষের যাতায়াতের অসুবিধার কথা, বর্ষাকালে জলে কাদায় চরম দুরবস্থার কথা খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করল। তাদের বক্তব্য যে যথার্থ তা চোখে দেখে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে আহ্বান জানাল। একটু অদল-বদল ক'রে এই আবেদনেরই দু' তিন রকমের খসড়া তৈরি হ'ল কলকাতার খবরের কাগজগুলির জন্যে। এক দফা ইংরেজী, কয়েক দফা বাংলা। মণিময়ের মুসাবিদার মুনশীয়ানা দেখে সবাই তারিফ করল। সুবিনয় উচ্ছ্বসিত হল সবচেয়ে বেশি। সুখ্যাতি ক'রে বলল, 'মণিময়বাবু, পিটিশনের হাত আপনার সত্যিই পাকা, এমন দরখাস্ত লিখতে আমাদের অন্তত তিনটে কলম ভাঙত।'

দলবল নিয়ে সুবিনয় বিদায় নেওয়ার পর শীতাংশু বলল, 'মণিময়দা, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা বলব।'

মণিময় হেসে বলল, 'বল।'

ওরা কি বলবে মণিময় তা জানে। তবু ওদের মুখ থেকে কথাটা আর একবার শুনতে চায়।

শীতাংশু বলল, 'ওই কল্যাণ সঙ্ঘ আমাদের সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে এসেছে। ওরা লাইব্রেরী করেছে, আমাদের ডাকেনি। ওদের কোন ফাংশনে আমাদের যেতে বলেনি। বরং আমাদের ফাংশন ওরা দু' দুবার ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। সেই কল্যাণ সঙ্ঘের সেক্রেটারীকে আপনি রোড কমিটির খোদ সেক্রেটারী ক'রে দিলেন। এর পর আর আমাদের থাকা চলে না মণিময়দা। নিজেদের দলের কাছে আমরা আর মুখ দেখাতে পারব না।'

ভণ্টু মুখ ভার ক'রে বলল, 'আমাদের বাধ্য হয়ে রিজাইন করতে হবে মণিময়দা।'

সুনীল বলল, 'তুই থাম ভণ্টু, আর জ্বালাসনে। আমাদের কারোরই নাম কমিটিতে নেই। ছাত্র আর ছেলেমানুষ এই অজুহাতে আমাদের সবাইকে ও'রা বাদ দিয়েছেন। বড়দের মাঝে শুধু বুড়োদের রেখেছেন কমিটিতে। তা রাখুন, কিন্তু ওই কল্যাণ সঙ্ঘকে আনলেন কেন।'

মণিময় বলল, 'নইলে ওরা অকল্যাণ আনত। শীতাংশু সুনীল আমার কথা শোন তোমরা। রাস্তার কাজটা একা কল্যাণ সঙ্ঘেরও নয়, তোমাদের শক্তি সঙ্ঘেরও নয়। সব সঙ্ঘকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে, তবে যদি কিছু করে ওঠা যায়।'

সুনীল বলল, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের কিছুতেই মিলবে না। তেলে জলে কোনদিন মেলে? আপনি সে চেষ্টা করবেন না মণিময়দা। তাতে মিছিমিছি অনর্থ হবে।'

মণিময় একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, শুধু রাস্তার কাজ তোমরা এক সঙ্গে কর। পুজো পার্বণ, জয়ন্তী টয়ন্তী আলাদা আলাদাভাবে করলেই হবে।'

তারপর ভণ্টুকে কাছে ডেকে তার পিঠে হাত রেখে মণিময় বলল, 'এই কমিটিতে তোমাদের নাম অবশ্য দেওয়া যায়নি ভণ্টু। তাই ব'লে ভেব না, কাজ থেকে তোমাদের বাদ দিয়েছি। নাম যাদেরই থাকুক, কাজ তোমরাই করবে। সেই প্রথম দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেনসিল দিয়ে কাগজের টুকরোয় যে নামগুলি লিখে নিয়েছিলাম তার একটিও আমি ভুলিনি ভণ্টু। এ কমিটির কত অদল-বদল হবে, কিন্তু সেই লিস্ট থেকে একটি নামেরও নড়চড় হবে না,• একথা জেনে রেখ।'

তখনকার মত শীতাংশুরা বিদায় নিল। ওদের পুরোপুরি খুশি করতে পারেনি একথা বেশ বুঝতে পারল মণিময়। কিন্তু উপায় কি। ছেলেদের এই দলাদলিকে আর বিবাদ সে অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারে না। এদের নীতিগত আদর্শগত যে কোন বিরোধ আছে তা নয়। শুধু ব্যক্তিগত আধিপত্যের স্পৃহায়

এরা আলাদা আলাদা দল বেঁধেছে আর প্রাণপণে দলাদলি করছে। মণিময় ভাবল, এই ছেলেমানুষী শুধু ছেলেদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বয়স্কদের দলাদলিও প্রায় এই ধরনের। রাজনৈতিক হোক আর অরাজনৈতিকই হোক, দলভেদের মূলে নীতির ভেদ সামান্য, মতের ভেদ সামান্য, ব্যক্তিগত সুবিধা সুযোগ, খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাটাই বেশি। ছদ্মবেশী এই বাসনাকে স্বীকার করা সহজ নয়, চিনতে পারা সহজ নয়, ত্যাগ করতে পারা আরো কঠিন। রাজনীতির নেতা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু অধিপতির সিংহাসন ছাড়লে তাঁর রইল কি?

মণিময় ভাবল, শক্তি সঙ্ঘ আর কল্যাণ সঙ্ঘের দলাদলি সে সময়মত মিটিয়ে দেবে। দু' একদিনে হবে না, দু' একটা বৈঠকের ব্যাপারও এ নয়: এক সঙ্গে কাজ করতে করতেই ওদের বিরোধের শেষ হবে ব'লে মণিময় আশা করল।

পরের সপ্তাহে খবরের কাগজের চিঠিপত্রের স্তম্ভে মণিময়ের চিঠি বেরোল। কীর্তিপুরের এই রাস্তাটি যে কত অব্যবহার্য হয়েছে, সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ভালো একটি পাকা রাস্তার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা মণিময় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে এবং রাস্তা তৈরির কাজে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা আর রাজ্য সরকারের সহানুভূতি কামনা করেছে।

কাগজের এই খোলা চিঠি পড়ে কীর্তিপুরের কয়েকটি চায়ের দোকানে, কল্যাণ সঙ্ঘের লাইব্রেরীতে আর যেসব গৃহস্থ খবরের কাগজ নিয়ে থাকেন তাঁদের বাড়িতে কিছুদিন আলোচনা সমালোচনা হ'ল। বাস আর ট্রেনের নিয়মিত যাত্রীরাও আলাপের একটা নতুন বিষয় পেলেন।

'কি মশাই, রাস্তা তাহ'লে সত্যিই হচ্ছে?'

'আপনিও যেমন। কাগজের এডিটরকে ধরে দুঃখ দুর্দশার ফিরিস্তি বের করতে পারলেই যদি রাস্তা বেরোত তাহ'লে এতদিন মানুষের বহু রোজগারের রাস্তা খুলে যেত।'

'শুধু রোজগারের দিকটাই ভাবছে কেন? রাস্তাটা হয়ে গেলে উপকার তো সকলেরই হবে।'

'দেখুন, যারা চালাক মানুষ তা এক ঢিলে দুই পাখী মারতে জানে পরের উপকারও করে, নিজের উপকার করে। তার ফলে পেটও ভরে, আবা নাম-ডাকও হয়।'

'আহা, আগে দেখুনই ব্যাপারখানা।'

অমিয়ভূষণের বাড়িতেও এই চিঠি নিয়ে ননদ-ভাজে একটু রসালাপ হ গেল। কল্যাণীরই আগে চোখে পড়ল তিনি কাগজখানা হাতে নিয়ে ননদে কাছে গেলেন। তাকে ডেকে বললে 'মণিময়ের চিঠিটা দেখেছ নাকি করুণা

করুণা একটু বিস্মিত হয়ে বল 'কিসের চিঠি?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'আহা, অম ক'রে চমকে উঠলে কেন? মুখ বন্ধ ক চিঠি নয়, তাহ'লে তোমার হাতেই আ পড়ত। খোলা চিঠি, কাগজের সম্পাদক লেখা। কিন্তু লিখেছে এই কীর্তিপুরে রাস্তা নিয়েই। এত জায়গা থাক কীর্তিপুরের রাস্তার দিকে কেন চে পড়েছে ভদ্রলোকই জানেন। আর একব
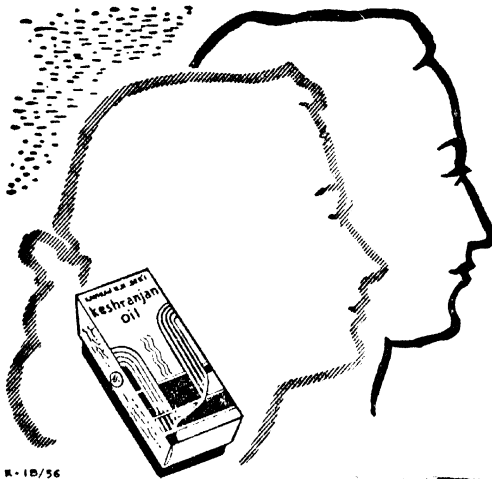
ভদ্রমহিলারও অবশ্য কিছু কিছু জানবার কথা।'

করুণা হঠাৎ চোখ তুলে বলল, 'বউদি, এসব ঠাট্টা তামাসার আর কোন মানে হয় না। তুমি তো জানো, অনেক-দিন আগেই সব চুকে বুকে গেছে।'

কল্যাণী কোমলস্বরে বললেন, 'এত সহজেই কি যেতে দেওয়া যায় করুণা। তোমার দাদা বলছিলেন, মণিময়বাবুকে আর একদিন এখানে ডাকবেন।'

করুণা বলল, 'আমি দাদাকে বলে দিয়েছি, ফের যদি তিনি এসব কাণ্ড করেন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

কল্যাণী বললেন, 'কি জানি। আমার তো মনে হয়, এই রাস্তা তোমাদের মিলনের নতুন পথ খুলে দেবে। একা একা তো কেউ একটা রাস্তা বেঁধে তুলতে পারে না। দশজনের সাহায্য তাকে নিতেই হয়। হয়ত এই উপলক্ষে ফের তোমাদের যোগাযোগ হবে।'

করুণা একটু হাসল, 'তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই বউদি! তাছাড়া, যোগাযোগ যদি চাইতাম তাহ'লে উপলক্ষের অভাব হ'ত না। কিন্তু আমি তা চাইনে। মোটেই চাইনে।

চিঠি বেরোল। সরকারী দপ্তর থেকেও আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার এল। তারপর ফের সব চুপচাপ। কমিটির মিটিং আর বসে না। রাস্তা নিয়ে কোন দিক থেকে আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

সুবিনয় একদিন হেসে বলল, 'আর কি, মণিময়বাবু, হয়ে গেল। এবার রোড কমিটির সংকারের জন্যে একটি মিটিং ডাকুন। আমরা মেম্বোররা দই চিঁড়ে দিয়ে ফলাহার ক'রে যার যার বাড়ি ফিরি।'

মণিময় বলল, 'আপনি সেক্রেটারী হয়ে এই কথা বলছেন?'

সুবিনয় বলল, 'না বলে করি কি? সব যে জুড়িয়ে গেল। আর কিছু না হোক, হৈ চৈ করাটা যে দরকার। একেবারে চুপচাপ থাকার চেয়ে মিটিং ডেকে গলা ছেড়ে বক্তৃতা করা ঢের ভালো। অন্তত কমিটির মুখাগ্নি করার অধিকার কার, আমার না আপনার, তাই নিয়ে আমরা একটা বিতর্ক সভা ডাকতে পারি। তাতেও উত্তেজনা কম হবে না।'

মণিময় ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলল, 'আপনি দেখছি ঠাট্টা ক'রেই সব উড়িয়ে দিতে চান।'

সুবিনয় গম্ভীরভাবে বলল, 'না তা চাইনে। সত্যিই একটা কিছু করতে চাই। আমরা দু' একখানা চিঠি ছেপে দিব্যি চুপচাপ বসে আছি। লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা করছে। সেই কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'
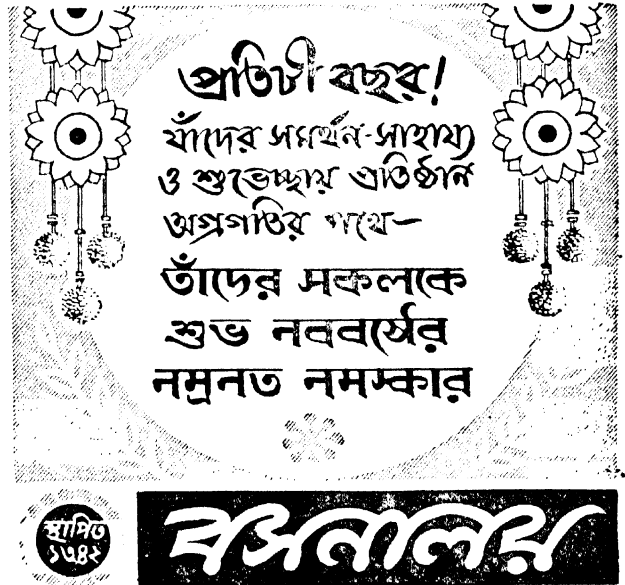
সুবিনয়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল। মণিময় সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি একেবারে চুপচাপ বসে আছি তা ভাববেন না। যেটুকু করবার তা ক'রে যাচ্ছি। তবে লোককে দেখাবার মত কিছু করা দরকার। একথা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

আরো দিনকয়েক বাদে মণিময় রোড কমিটির সদস্যদের জানিয়ে দিল, তার আমন্ত্রণে পূর্ত বিভাগের উপমন্ত্রী স্বয়ং কীর্তিপুর দেখতে আসছেন। রাস্তার অবস্থাটা তিনি নিজের চোখে দেখবেন। এখানকার বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের কথা নিজের কানে শুনবেন। তারপর সরকারী তরফ থেকে কতদূর কি করতে পারবেন না পারবেন, নিজের মুখেই জানিয়ে যাবেন সেকথা। কীর্তিপুরের বাসিন্দারা যেন তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্যে তৈরি হয়।

খবরটার মধ্যে সত্যিই উত্তেজনা ছিল। এর আগে কোন রাজপুরুষ এ অঞ্চলে আসেননি। মণিময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ ছিল, যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল তারা পর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল। উৎসাহী শশিভূষণ, সুনীল আর ভণ্টুর দল মণিময়কে ঘিরে ধরল। প্লাকার্ডে, পোস্টারে রাস্তার দু'দিকের কোন একটি গাছও আর অনাচ্ছাদিত রইল না।

(ক্রমশ)

চিত্রগ্রীব

কলকাতা

আন্তর্জাতিক ক্যালেণ্ডার প্রদর্শনী সমিতির উদ্যোগে গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউসএ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ক্যালেণ্ডার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ বছর ক্যালেণ্ডার এসেছিল অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রহ্মদেশ, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস, হংকং, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইজরাইল, ইতালী, জাপান, মাল্টা, নেদারল্যাণ্ডস, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন, সুইৎসারল্যাণ্ড, তুর্কী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া এবং পঃ জর্মনী—এই আটাশটি রাজ্য থেকে। সবচেয়ে বেশীসংখ্যক নমুনা পেশ করেছিলেন এবার নেদারল্যাণ্ডস এবং উৎকর্ষের দিক থেকেও এঁরাই এ বছর আর সব দেশকে পিছনে ফেলে গেছেন। নেদারল্যাণ্ডস-এর নমুনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেটাল টিউব ফ্যাক্টরী 'এক্সেলসিওর' কোম্পানীর পুরাতন পথিকৃত শিল্পিগণ কৃত ছবির সংগ্রহ, ফিলিপস রক্সেন উইস্‌পু-এর ভ্যানগগ অঙ্কিত ছয়টি ছবির সংগ্রহ এবং জুইড নেডারল্যাণ্ডস ড্রুকোরিজ ও এন ভি ড্রুকোরিজ কচ অ্যাণ্ড নাটেপ-এর কার্টুন

ইতালী

ক্যালেণ্ডার দুটি। কার্টুন ছবি সংগ্রহ করে ক্যালেণ্ডার করার রেওয়াজ আমাদের দেশে এখনও হয় নি; সুতরাং এগুলি চোখে নতুন ঠেকলো। অনেকের কাছে সুন্দরীর মুখাবয়ব বা অঙ্গসৌষ্ঠবের আবেদন অন্য ছবির তুলনায় বেশী, অনেকে আছেন যাঁরা চান একটু পরিমার্জিত রসবুদ্ধির খোরাক, আবার অনেকে আছেন যাঁরা সন্তুষ্ট হাসির ছবি পেলে। সুতরাং নানান রুচির লোকের জন্যে প্রয়োজন নানা ধরনের আর্ট ওয়ার্ক। কিন্তু বেশীর ভাগ বিজ্ঞাপনদাতারই ধারণা যে, সুন্দরী রমণীর মুখাবয়ব ছাড়া আর কিছুই দর্শকের মনে ধরবে না; ফলে যা বিজ্ঞাপন বাজারে প্রকাশ হয়, তার শতকরা নব্বইটিতে পাওয়া যায় একঘেয়ে নারী প্রতিকৃতি। একবার কলকাতার কোনও একটি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন এজেন্সীর শিল্প-পরিচালক কথায় কথায় জানিয়েছিলেন তাঁর এজেন্সীর জন্যে নিখুঁতভাবে অঙ্গসৌষ্ঠব আঁকতে পারে, এমন একজন শিল্পীর বিশেষ প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে তিনি নারী অঙ্গসৌষ্ঠবের কথাই বুঝিয়েছিলেন, কেননা ঐ জাতের ছবিই তাঁর মক্কেলরা বুঝি পছন্দ করে থাকে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আমার মনে হয়, শিল্পীরা ও শিল্প-পরিচালকেরা মক্কেলদের দোহাই না দিয়ে যদি সত্যিকার রসাত্মক কিছু সৃষ্টি করার দিকে মন দেন, তার ফল ভালই হবে। কার্টুন, আধুনিক আর্ট, প্রাচীন চিত্র, উডকাট, বাঙলা-উড়িষ্যার পট প্রভৃতি ক্যালেণ্ডারে ব্যবহৃত হলে তা নতুনত্বও হবে, রসিকসমাজে আদরও পাবে নিশ্চয়। খরচ করতে পিছপাও নন, এমন প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, কিন্তু দেখা যায় বেশীরভাগ সময়ই এঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করে তৃতীয় শ্রেণীর ছবি ছেপে কেবল ভস্মেই ঘি ঢেলেছেন। এখানে প্রদর্শিত ভারতীয় ক্যালেণ্ডারগুলির মধ্যে এই জাতের ক্যালেন্ডারের সংখ্যাই ছিল বেশী। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এসব ক্যালেন্ডার প্রদর্শন করা আদৌ সমীচীন নয়। 'এণ্ট্রী ফী' দিলেই তা প্রদর্শনযোগ্য সাব্যস্ত হবে—এ কেমনধারা যুক্তি? আর সবচেয়ে বড় কথা ভারতের মান অন্যদেশের কাছে এভাবে ছোট করলে তাকে কোনমতেই সমর্থন করা যেতে পারে না। ভারতীয় ক্যালেণ্ডারগুলির মধ্যে সত্যই প্রদর্শনযোগ্য নিদর্শন ১০টি কি ১২টির বেশী ছিল না। তার মধ্যে

জাপান

উদয়, ভিলার শীতল পাটির উপর পুতুল জোড়া ক্যালেণ্ডারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান এয়ার লাইন সীসটেম-এর ক্যালেণ্ডার উত্তর আমেরিকার দৃশ্যাবলীসমূহে বেশ প্রীতিকর কিন্তু এঁদের গতবারের আফ্রিকার জন্তু-জানোয়ারের ছবির ক্যালেণ্ডারটি আরও আনন্দদায়ক ছিল। আমেরিকার প্রভাবে জাপানের অবনতি লক্ষ্য করে সত্যই মর্মাহত হতে হয়। এঁদের বেশীর ভাগ ক্যালেণ্ডারেই পশ্চিমকে অনুকরণ করার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্টির ব্যাপারে অনুকরণ তা যতই নিখুঁত হোক না কেন, আদৌ প্রশংসনীয় নয়। যে জাত উকিওয়ে কাঠখোদাই শিল্পের স্রষ্টা, সারা বিশ্বে যে শিল্পের তুলনা মেলে না, সে জাত আজ পাশ্চাত্যের সস্তা মার-প্যাঁচ অনুকরণ করে চলেছে দেখে, সত্যই দুঃখ হয়। চীনাদের যে তিনটি ক্যালেণ্ডার প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে একটিতে কিছুটা রুশ প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু তা হলেও চৈনিক সুকুমার শিল্পের মেজাজ বেশ স্পষ্ট। অন্য দুটি নিদর্শন প্রকৃতই রসোপেত। চেকোশ্লোভাকিয়ার সেন্ট্রোটেক্স, চেকোশ্লোভাক সিরামিক্স, কোভো এবং সোলো মাচ ওয়ার্কস-এর ক্যালেণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ফরাসী এয়ার ফ্রান্স, বিলাতী বি ও এ সি এবং আমেগ ক্যালেণ্ডারগুলি, মার্কিন শ' বারটনের ক্যালেণ্ডারগুলি এবং তুর্কীর আর্ট ক্যালেণ্ডারগুলি উল্লেখযোগ্য।

গতবারের তুলনায় এবারের প্রদর্শন ব্যবস্থা অনেক সুচারুভাবে হয়েছিল। ক্যাটালগ-এ নম্বর ছিল বটে, কিন্তু প্রদর্শনীয়গুলির গায়ে কোনও নম্বর না থাকায় নাম খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল, শুধু এইটুকু খুঁত ছাড়া আর কোনও খুঁত চোখে পড়েনি। এবারের এই মনোরম এবং সার্থক প্রদর্শনীর জন্য কর্তৃপক্ষ অবশ্যই অভিনন্দন দাবী করতে পারেন। ভবিষ্যতে স্বদেশ এবং বিদেশ থেকে এঁরা আরও সমর্থন পাবেন আশা করি।

॥ ১৮ ॥

১৯৪৮ সালটির মত বছর আমার জীবনে আর আসেনি। এ বছরে আর পাহাড়ে ওঠা হয়নি। কোন পাহাড়েই না। তার বদলে আমাকে ছুটতে হয়েছিল তিব্বতে। ন' মাস ধরে ঘুরেছি। গিয়েছি লাসায়, গিয়েছি তারও পিছনে আরও অনেক জায়গায়। পশ্চিমী লোকেদের কাছে তিব্বত এক নিষিদ্ধ দেশ কিন্তু বৌদ্ধদের কাছে এ এক মহা পুণ্যস্থান। এ এক মহাতীর্থ। এভারেস্টে ওঠার সংগ্রামের মত আমার স্মৃতিতে এই তিব্বতে আসাটা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

সুইসদের সংগে গাড়োয়াল অভিযানের পর বাড়িতে তো ফিরে এলাম, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। আগেও যেমন ছিল, দিনগুলো পরেও তেমন কাটতে থাকল। আমার যা কিছু সঞ্চয় দার্জিলিঙে আসতেই তা খরচ হয়ে গেছে। চাকরির নাম গন্ধও নেই। ধারে কাছে কোন অভিযানও নেই। হেমন্তকাল নিষ্কর্মা গেল। শীতটা কাটল অতি কষ্টে। আঙ্‌লাহমু সেই আমার কাজেই করে যাচ্ছে। মেয়ে দুটো, পেমপেম আর নিমা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। তাদের আরও খাবার চাই। আরও পোশাক চাই। কিন্তু ও দুটোই তারা কদাচিৎ পায়। আমার মনে বিরক্তি জন্মে। রাগ হয়। তিক্তভাবে নিজেকেই

জিজ্ঞাসা করি, "এখন উপায় কি? করবোটা কি? আমার টাইগার মেডেলটা কি ধুয়ে খাব?" ওদিকে বিপদের উপর আরও বিপদ বাড়ে। আমার শাশুড়ী শয্যাশায়ী আছেন বছর দুয়েক। তাঁর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। তারপর অনেক ভুগে ভুগে মারা যান। তখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর বছর। মরবার আগে বুড়ি একদিন তাঁর সেই রুগ্ন শীর্ণ হাতখানা আমার মাথায় রেখে আমাকে আশীর্বাদ করেন। বলেন, তাঁর যেরকম সেবা শুশ্রূষা আমি করেছি, তার জন্য ভগবান আমার মঙ্গল করবেন। তোমার ভাল হবে। বুড়ি যা বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তা ফলেছে। তার মৃত্যুর পর আমাদের অবস্থা একটু একটু করে ভাল হতে থাকে। আর এর পর থেকে কখনও খুব বেশি খারাপ হয়নি।

পরের বছর বসন্তকালে শুনলাম, দার্জিলিঙে এক সাহেব এসেছেন। ইতালীয়ান। নাম অধ্যাপক গুসিস্ তুচ্চি। সাহেব বড় মজার লোক। প্রাচ্য শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। লোকটি খুব বিখ্যাত। এর

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

মধ্যেই বার সাতেক তিব্বতে গে
এবারে আবার যাবেন, তাই
তোড়জোড় করবার জন্য, লো
নিয়োগ করতে দার্জিলিঙে এসে
সর্দার কর্মপাল লোক যোগানোর
নিয়েছেন। খবরটা শোনা মাত্র
ছুটলাম। আশা ছিল, একটা
জোটাতে পারব। গিয়ে শুনি, লো
যা নেবার এর মধ্যেই তা নেওয়া
গেছে। তারা সিকিমের পথে গ্যা
রওনা দিয়েছে। খুবই হতাশ হ
বেশ দমে গেলাম। কিন্তু কয়ে
পরেই হঠাৎ আমার ভাগ্য
গেল। অধ্যাপক তুচ্চি খবর পা
ছেন, যেসব লোক তাঁকে পা
হয়েছে তাদের দেখে তিনি খুশী হ
তিনি জানিয়েছেন, তাঁকে অন্তত এ
এমন লোক পাঠানো হোক, যে হি
হিন্দুস্থানী, নেপালী আর ইংরে
মোটামুটি জানে। আর আমি ঠিক
ভাষাগুলোই কিছু কিছু জানি।
একদিন সকালে আমার ডাক প
কর্মপালের অফিসে, আর সেইদিনই
বেরিয়ে পড়লাম গ্যাংটকের পথে।

অধ্যাপক তুচ্চি, লোকটি বড় অ
যে কয়জন আমার মনে গভীরভাবে
রেখেছেন, তুচ্চি তাঁদের একজন। সা
বড় গম্ভীর, নিজের কাজে এে
তন্ময়। কিন্তু অধিকাংশ পাহাড়-
সাহেবদের মেজাজ যেমন শান্ত শিষ্
মেজাজটি তেমন নয়। ইনি বড় বদ
কখন কিসে যে তার মেজাজ বিগড়ে
বলা মুশকিল। পান থেকে চুন খ
কি অমনি তা বোমার মত ফেটে
গ্যাংটক্ পৌঁছে দেখি, তিনি যে
তাঁর ভাড়া করা শেরপাদের উপর অ
হয়েছেন তা নয়। শেরপারাও
বিলক্ষণ ভয় করতে শুরু করেছে।
বললে, সাহেব খুব কড়া আদমী,
সঙ্গে পোষাবে না। তারা সব

পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে লাগলাম

যেতে চায়। সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বুঝলাম, ওরা কথাটা মিথ্যে বলেনি। দেখা হতে না হতেই সাহেব হড়বড় হড়বড় করে বিভিন্ন ভাষায় আমাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। উঃ, সে কথার কি তোড়! কথা তো নয়, বট্ বট্ বট্ বট্ বট্ বট্, যেন মেশিনগানের গুলি। তারপর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা যাও, তোমাকে নিয়ে নিলাম।" সাহেবের চাকরি নিয়ে নেওয়ায় অন্যান্য শেরপারা ভাবলো আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। কিছুদিন পরে সেকথা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আমি অধ্যাপক তুচ্চিকে ভালবাসতেও শুরু করেছি।

তোড়জোড় সম্পূর্ণ হলে আমরা গ্যাঙটক্ থেকে উত্তরে যাত্রা করলাম। অধ্যাপক তুচ্চি আর আমি ছাড়া এই দলে আরও তিনজন ইতালিয়ান, তুচ্চির সহকারী, একজন শেরপা, পাচক, আর একজন মঙ্গোলীয় লামা ছিল। এ লামা দার্জিলিঙ থেকে লাসায় ফিরছিলেন। আর ছিল স্থানীয় কুলীরা। এদের এক একটা দল কিছুদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল তারপর এক নতুন দল এলে পরে এদের বদলী করা হচ্ছিল। আমরা এবারে যত ভারবাহী পশু নিয়েছিলাম তেমনটি খুব কম অভিযানে দেখা যায়। শ'খানেক ঘোড়া আর খচ্চর এবার আমাদের সঙ্গে ছিল। সিকিম সরকার ওগুলো ধার দিয়েছিলেন। খচ্চরগুলো বইছিল মাল, আর ঘোড়াগুলো আমাদের। খাবার-দাবার আর সাজসরঞ্জাম এসব ক্ষেত্রে যেমন থাকে, তা তো ছিলই। তাছাড়া, তুচ্চি সাহেব অনেক বাক্স আর অনেক ঝুড়িও নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেসব জিনিস তুচ্চি সাহেব সংগ্রহ করবেন সেসব বয়ে আনবার জন্যে এই বিরাট সম্ভার আমরা নিয়ে চলেছি। আমাদের সঙ্গে আর ছিল বন্দুক আর নানা ধরনের অনেক তৈরি মাল। তিব্বতীদের উপহার দেওয়া

পেছনে পড়ে থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘা

হবে বলে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রথম থেকেই এসব যান-বহরের ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল। সাহেব বললেন, "খবরদার, আমাকে বিরক্ত কোরো না। ঝামেলা আমি মোটেই পছন্দ করি না।" শুধু বলাই নয়, সাহেব তাঁর নিজের বাক্স প্যাটরার চাবিও আমার হাতে তুলে দিলেন, আর রাস্তার খরচা বাবদ এক গাদা টাকা। সাহেবের সঙ্গে কাজ করা খুব কঠিন হতে পারে, কিন্তু সাহেব আমাকে যে এতটা বিশ্বাস করলেন তাতে আমি খুশী হলাম। খানিকটা আত্ম-প্রসাদও লাভ করলাম।

সিকিমের ছোট বড় পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমার এতদূরে যাওয়া। অভ্যেস তো নেই। আমার পিঠ ব্যথা করতে লাগলো। এর থেকে যদি পায়ে হেঁটে চলতাম তবে আমার পা দু'টো কম ব্যথা করতো। কখনও কখনও আমরা একটানা অনেক পথ পার হয়ে যাই। কখনও আবার একটুখানি গিয়েই থেমে পড়ি। সবই তুচ্চি সাহেবের মর্জিমাফিক ঘটবে। কেউ জানে না, কখন তাঁর যাবার ইচ্ছা হবে। কেউ জানে না কখন তিনি থামবেন আর বোধহয় ভগবানও জানেন না কখন তাঁর কোন্ শহরে বা কোন্ গুম্ফায় যাবার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠবে। জানেন শুধু তিনি। তাঁর যদি ধারণা হয় যে, অমুক শহরে কি অমুক গুম্ফায় গেলে তিনি একটা কিছু পাবেন তক্ষুণি হুকুম দেবেন সেই দিকে ছুটতে। বলেছি তো যে, সাহেব বিরাট পণ্ডিত। তিনি এই দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। এত জানেন, য এদেশের লোকেরাও জানে না আর তিনি ভাষা যে কতরকম জানেন, তার হিসাব রাখা আমার অঙ্কের বিদ্যেয় কুলোয় নি এমন কি, আমার সঙ্গেও যখন কথ বলতেন, তখনও তাঁর মুখ দিয়ে তিন চারটে ভাষা বেরিয়ে যেতো। হয়ত শুরু করলেন এক ভাষা দিয়ে, কয়েকটা কথ বলতে না বলতেই পট্ করে অন্য ভাষ চলে এলো, তারপরে হয়ত আর একটা ভাষা দিয়ে কথাটা শেষ করলেন। সত্যি বলতে কি, শুধু দুটো ভাষার ব্যবহা করবার সুযোগ আর আমরা পাইনি তার একটা হল সাহেবের নিজের মাতৃ ভাষা, ইটালিয়ান, আর বাকীটা হ আমার, শেরপা।

সাহেবের কাছ থেকে নানা জিনি শিখলাম। যেসব আমি কখনও জানতাম না। আমার এইবারকার ভ্রমণটা একেবা ইস্কুলে যাবার কাজ করে দিল। গুম্ শুধু পাথর দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি যে নয়, এর মধ্যে শুধু যে ভিক্ষুর থাকেন তা নয়, তা জানলাম। দেখল এর মধ্যে আরও কত জিনিস আছে কত পুরোনো পাণ্ডুলিপি। কত পুরো চিত্র। আর শিল্পের নিদর্শন। প্রত্যেকটির ইতিহাস আছে। মানে আ আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বাঁ পাশে রে এগিয়ে চললাম। এই যে পাহাড়, য আমি এতো ভালো জানি, এই যে কাঞ্চ জঙ্ঘা, এর সম্পর্কেও অনেক নতুন ক

অনেক নতুন জিনিস শিখলাম। আশ্চর্য, এসব তো কিছুই জানতাম না। এখন জানলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যে চারটে তিব্বতী শব্দ আছে। 'কাঙ্' মানে তুষার। 'চেন্' মানে বিরাট। 'দ্জোদ্' মানে ভাঁড়ার অথবা সম্পদ। আর 'ঙ্গা' মানে পাঁচ। কাজেই সব মিলে মানে দাঁড়ালো "পাঁচটি সম্পদের অধিকারী বিরাট হিমগিরি"। এই হোল কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর সেই পাঁচটি সম্পদ কি? না, নুন (ৎসা), সোনা আর দামী খনিজ (সের ধাঙয়ী), পবিত্র পুঁথি আর সম্পদ (ধামচয় ধাঙ্নর্), অস্ত্রশস্ত্র (ম্ৎসোন্) আর শস্য ও ভেষজ (লো-থগ্ ধাঙ্ মেন্)। এরপর থেকে শিখলাম যে, আমাদের এই যে পাহাড়গুলো, এরা শুধুমাত্র হিম তুষারের জিনিস নয়। এগুলো ইতিহাস আর উপকথার খনিও বটে। এসব আমি কখনো ভুলিনি।

পেছনে পড়ে থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘা। পেরিয়ে গেলাম তিব্বতের আকাশ ছোঁয়া সীমান্ত। পৌঁছলাম ইয়াটুঙ্ শহরে। আর এইখানেই কিছু গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম। তুচ্চির সঙ্গে আর যে তিন-জন ইতালিয়ান সাহেব ছিলেন, তাঁর সঙ্গী, তাঁদের তিব্বতে ঢোকার ছাড়পত্র ছিল না। আর তাঁরা জেনম্যান্ সাহেবের মত লুকিয়ে চুরিয়ে যাবার কায়দাটা রপ্ত করতে পারেননি। তাই তাঁদের ফিরে যেতে হল। আর আমরা বাকী যে ক'জন রইলাম তাদের আশ্রয় দিতে তিব্বতীরা কুণ্ঠিত হোল না। সিকিমিদের মতো আমাদের মালপত্র বওয়ার কাজে জন্তু-জানোয়ার ধার দিতেও তারা পেছপাও হল না। খুব শিগ্গিরই সে শহর ছেড়ে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম। পথঘাট তুচ্চির সব জানা। তিনি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। আমিও তিব্বতে বার দুয়েক এসেছি। তবে এদিকে নয়। এভারেস্ট অঞ্চলে। রঙ্বুক্ পর্যন্ত। এদিকটা আমার কাছে একেবারে নতুন। আমার রক্তের স্পন্দন দ্রুততর হ'ল। চোমোলাঙ্মার পাদদেশে এসে এক চরম উত্তেজনায় আমার দেহ যেমন থর থর কেঁপে উঠতো ঠিক তেমনিভাবে এবারও কাঁপতে লাগলো। এবার তাহ'লে লাসায় যাচ্ছি। সত্যি সত্যি লাসায়! (ক্রমশ)

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু সমস্যাই বর্তমানে সব চেয়ে বড়।—"কিন্তু তার সমাধানও সব চাইতে সহজ অর্থাৎ—'Grin and Endure' বলেছেন শ্রীযুক্ত সি সি বিশ্বাস, —বিশ্বাস করুন, আর না-ই করুন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পাক্ প্রেসিডেণ্ট ইস্কিন্দার মির্জা নাকি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরের মুক্তি-সাধন-সংকল্প হইতে পাকিস্তানকে

বিচ্যুত করিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই।—"পৃথিবীতে সে শক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু ভূস্বর্গ কাশ্মীরেই হয়ত তা আছে; কথাটা মির্জা সাহেব ভেবে দেখবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম রাজাজী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।—"কংগ্রেস বহুদিনের পুরনো নৌকো কিনা, কাজেই 'ফুটো' হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভাবছি, সব নৌকো ছেড়ে দিলে বৈতরণীর কি হবে"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কাম্লা রোগে মৃত্যু রোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে লোকসভায় তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে, এমন কি তাঁর পদত্যাগ দাবী পর্যন্ত করা হইয়াছে।—"সমালোচকের সঙ্গে আমরাও একমত; জ্বর, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত হলেও নয় কথা ছিল, কাম্লো রোগে মৃত্যু, সত্যিই বড় অন্যায় কথা"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নাকি বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের জনৈক অল্পবয়সী সহযাত্রী বলিলেন—"তা রয়েছে বৈকি, একটা U S A আর একটা U S S R; ঐ S R-টি-ই যত গোলমেলে!!"

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁর সমস্ত রাজনীতিতে দুই রকম গলায় কথা বলিয়া আসিয়াছেন—এই মর্মে মন্তব্য

করিয়াছেন বিলাতের "ডেইলি টেলিগ্রা কাগজ। শ্যামলাল বলিল—"সমস্ত রা নীতিতে টেলিগ্রাফের মতো সবার পা কি আর শুধু টরে-টক্কা আর টক্কা-ট বলা সম্ভব?"

* * *

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্প সংগীতকে তার ন্যায্য স্ব দেওয়া হয় নাই বলিয়া অভিমত প্র করিয়াছেন শ্রীমতী কমলাদেবী চ পাধ্যায়। "কিন্তু দুঃখ করার কিছু ে তাঁর কোন অনুরোধ থাকলে পেশ ক পারেন, অনুরোধের আসরে ঠিক জা রাখা হবে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের সংবাদে শুনি যে ভালো ফল দেখাইতে পা নাই বলিয়া সেখানকার শিক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।—"মনে সেখানেও লোগুলো স্কুল ফাইনালে কঠিন প্রশ্ন করার প্রশ্রয় দিয়েছিলে মন্তব্য করিলেন অন্য এক কি সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁর এক সাম্প্র ভাষণে বলিয়াছেন যে, গণৎকা নাকি সাংঘাতিক লোক। "নেহরুকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁর রাজনীতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু তাই 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' ব্যাপারে তো তাঁর মত গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে স নয়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

মাদ্রাজে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ে "ফ্যান্সি ড্রেস্" প্রতিযোগি সেখানকার পরিষদের বিরোধী । নেতা নাকি একটি অত্যাধুনিকা তর রূপসজ্জা লইয়া প্রতিযোগিতায় যো করিয়াছিলেন।—"পরিষদেও যদি অ নিকারা বিতর্কে যোগদানের স পেতেন, তাহলে সরকার পক্ষ স ঘায়েল হতেন; আগামী ইলেকশনে সাধারণ কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখবে

বৌদ্ধ দর্শন

বৌদ্ধদের দেবদেবী। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩, টাকা।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য রচিত "বৌদ্ধদের দেবদেবী" গ্রন্থখানি বহুদিনের অভাব পূরণ করিয়াছে। এই পুস্তকটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে তন্ত্রগ্রন্থ "সাধনমালা"র বিভিন্ন ধ্যান-সমূহে বর্ণিত নানা দেবদেবীর রূপ ব্যাখ্যা একদিকে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে সেইগুলির রূপ-বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করাইবার সার্থক প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকখানি দেখিলে বোঝা যায় যে, ইহা লেখকের পূর্বপ্রকাশিত ইংরাজি গ্রন্থ "Indian Buddhist Iconography"র মূল ধারা অবলম্বনে লিখিত। উল্লিখিত গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে Alice Getty's "Gods of Northern Buddhism" নামক পুস্তকখানিও বৌদ্ধ মূর্তিলক্ষণ সম্বন্ধে যে যথেষ্ট আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেবিষয়ে পণ্ডিত সমাজ অবহিত আছেন।

বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্রীভট্টাচার্যের সমস্ত মতগুলি পাঠকগণের গ্রহণযোগ্য না হইতেও পারে। যথা পৃঃ ১১তে লেখক বলিয়াছেন "এবে সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় এ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধগণের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল।" ভারহুত, বুদ্ধগয়া, সাঁচী এবং অমরাবতীর চিত্রার্ধ (relief) ভাস্কর্যে বোধিসত্ত্বরূপের প্রাধান্য এবং মথুরার খৃঃ প্রথম শতকের অর্পিত বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে "অসম্মানকর" এই কথাটির তাৎপর্য বোধ কঠিন। পৃঃ ১৩-১৪য় তিব্বতের ধর্মপুস্তকে উল্লিখিত তন্ত্রের উৎপত্তি স্থল উড্ডিয়ানকে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত বজ্রযোগিনী গ্রামে নির্দেশ করিবার যুক্তিটিও সর্বজন গ্রাহ্য নাও হইতে পারে।

পুস্তকটি সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। লেখক সম্প্রতি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত নানা মূল্যবান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বৌদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। কিন্তু গত দশপনের বছরের মধ্যে বাঙলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বৌদ্ধ দেবদেবীর বহু উল্লেখযোগ্য মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এইসব মূর্তির কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিলে গ্রন্থখানির গুরুত্ব বর্ধিত হইত সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন "পঞ্চরক্ষা", "অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিসমূহের অপূর্ব চিত্ররূপের কিছু কিছু পরিচয় থাকিলে পুস্তকটি অধিকতর গৌরব-

মণ্ডিত হইত। গ্রন্থে একটি শব্দসূচী থাকিলেও পাঠকগণের সাহায্য হইত। মুদ্রণ ও পারিপাট্যে গ্রন্থটি বিশ্বভারতীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। ডাঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থখানি শিক্ষার্থী ও জনসমাজের নিকট নিশ্চয়ই যোগ্য সমাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
৮০।৫৬

জীবনী

নিবেদিতা: শ্রীমতী লিজেল রেম্‌ঃ অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবীঃ প্রকাশকঃ শ্রীবিমলশঙ্কর ধর, উমাচল প্রকাশনী, ৫৮।১।৭-বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ঃ মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন, ভারতের অনাগত মহামানবের তুমি হয়ে ওঠো একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মা। বস্তুত আয়র্লণ্ড-দুহিতা মার্গারেট ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের সেবিকা, বান্ধবী ও মা ই হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলতেন 'লোকমাতা'। সার্থক হয়েছিল এই নাম।

শিশু বয়স থেকেই সত্যানুসন্ধানের অভীপ্সার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল মার্গারেটের জীবনে। তাঁর ছেলেবেলার পরিবেশ ছিল অধ্যাত্মজীবন গড়ে-ওঠারই অনুকূলে। ঠাকুর্দা ধর্মযাজক ও বিপ্লবী, পিতাও হয়ে উঠলেন তাই। কিন্তু মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পিতা ত্যাগ করলেন ইহলোক। এলো সংসারিক বিপর্যয়। বিদ্যালয়ের জীবন সমাপ্ত করে ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর জীবিকা গ্রহণ করল মার্গারেট তখন ওর বয়স মাত্র আঠারো বছর। কেসউইকের বোর্ডিং স্কুল। কিন্তু একুশ বছর বয়সে আবার কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন, রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষিকার পদ। শুধু শিক্ষিকা নয়, মার্গারেট ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রেক্সহ্যামের দরদী সমাজ সেবিকা এবং বিভিন্ন কাগজে সামাজিক নিবন্ধের রচয়িত্রীও। কর্মক্ষেত্রের আবার পরিবর্তন। শিক্ষকতাই বটে, তবে এবার চেস্টারে, তার দু'বছর পরে লণ্ডনে। প্রথমে মিসেস ডি-লীউর নতুন ধরনের স্কুলে—উইম্বলডনে। এর পরে ঐ উইম্বলডনের আরেক অঞ্চলে নিজস্ব 'রাস্কিন স্কুল'এ। শিক্ষকতার কর্ম ছাড়াও সমাজ ও সাহিত্যসেবা অক্ষুণ্ণ আছে মার্গারেটের। সেণ্ট জেমস গেজেটের সম্পাদক আর ম্যাকনীল ও মার্গারেটের চেষ্টায় গড়ে উঠল বিখ্যাত সাহিত্য সমিতি, 'সিসেম ক্লাব।' এইখানেই গড়ে ওঠে ক্রমে তার নীড়বাঁধা ও ভালবাসার স্বপ্ন, আবার অকস্মাৎ একদিন তা ভেঙেও যায় খান্‌খান্‌ হয়ে। ভগ্নহৃদয়ে গেল সে হ্যালিফ্যাক্সে বান্ধবীর কাছে, তার বুকে পড়ে শিশুর মতো কাঁদল। তারপরে সপ্তাহ শেষে বান্ধবীর সান্ত্বনার শান্তি ফিরে পেয়ে চলে এল আবার লণ্ডনে। বান্ধবী বলেছিলেন, 'এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে।' বস্তুত হলও তাই। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় সবে মগ্ন হয়েছে মার্গারেট, এমনি সময়ে ঠিক স্বর্ণমুহূর্তেই প্রথম সাক্ষাৎ স্বা বিবেকানন্দের সঙ্গে।

জীবনের ধারা যেন ক্রমশ আমূল পরি বর্তিত হয়ে গেল। অন্ধকারে যেন ফু উঠল আলো। এলেন নিবেদিতা ভারতবর্ সেবার কাজ নিয়ে। সেবিকা, বান্ধবী মাতারূপে ভারতীয়ের বিশেষত বাঙালীর জ যা তিনি করে গেছেন, তার কাহি চিরস্মরণীয়।

ভগ্নী নিবেদিতার কর্মবহুল ও আধ্যাত্মি জীবনকে কেন্দ্র করে শ্রীমতী লিজেল রে ভারতবর্ষে এসে নিজে প্রামাণ্য উপকরণ সংগ্র করে অবশেষে রচনা করলেন ফরাসী ভাষ নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী—Nivedit Fille dei Inde. এটি প্যারিসে প্রথ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। অনুবা করেছেন নারায়ণী দেবী, এটিই সম্ভবত তাঁ প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। অনুবাদের আসরে হঠা নেমে লেখিকা একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়ে ছেন সবাইকে। সাবলীল, স্বচ্ছন্দই শুধু ন অনুবাদের ভঙ্গী, অতি আন্তরিক ও দরদ পূর্ণও বটে। মনেই হয় না যে অনুবা পড়ছি। এদিক দিয়ে লেখিকা যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা বিস্মৃত হবার নয়।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সবই সুন্দর গ্রন্থখানি চিত্রসম্বলিতও বটে। গ্রন্থটি ছোট বড়ো সবার কাছেই সমান আদৃত হোক, এই কামনা।
৪৬০।৫

অভিধান

সংসদ বাঙলা অভিধান—শ্রীশৈলেন বিশ্বাস এম এ কর্তৃক সংকলিত ও কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, অধ্যাপক ডক্ট শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ৯। মূল্য ৭।০ টাকা।

বড় অভিধান ভারী বলিয়া সব সম নাড়াচাড়া করিবার পক্ষে অসুবিধা, আবা ছোট অভিধানের দ্বারাও ছাত্র, শিক্ষক সাহিত্যিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকে প্রয়োজন সাধিত হয় না। এই অসুবিধা দূ করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচ্য অভিধা খানি সংকলিত হইয়াছে। এখানিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী সমস্ত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রদে সুবিধার জন্য বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকা প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবল বর্তমান কালে অপ্রচলিত হইলেও যথাসম্ভ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যেসব পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্য পুস্তকাদিতে আজ কাল প্রচলিত বা ব্যবহৃত হয় সেগুলিও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সংকলয়িতা এই অভিধানে সাধারণত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তি বানান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে সাধারণের সুবিধার জন্য প্রচলিত বানা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। মোটামুটি

ভাবে অভিধানখানাকে বৈয়াকরণ এবং বৈজ্ঞানিক বিধির দিক হইতে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য কোনদিক হইতে ত্রুটি করা হয় নাই। পরিশিষ্টে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা সংযুক্ত হওয়াতে অভিধানখানির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভিধান সংকলন ও পরিবেশন সংকলিতার প্রভূত অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে অভিধানখানিকে সকলের আধুনিকতম প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে উপযোগী করিবার জন্য খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রণ পারিপাট্য এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আলোচ্য অভিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নির্ভুল তকতকে ঝকঝকে সুন্দর কাগজে সাদৃশ্য প্রচ্ছদপটযুক্ত বইখানি দেখিতে আনন্দ হয় এবং হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেও স্বাচ্ছন্দ আছে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ। সুসংকলিত সুমুদ্রিত এবং সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ এই অভিধানখানি বাংলা ভাষার বিশেষ অভাব মোচনে সাহায্য করিবে। সর্বত্র ইহা সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ১৪।৫৬

অনুবাদ সাহিত্য

দুই ধ্রুব: ভি এস খান্দেকর: অনুবাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়: বলাকা পাবলিশার্স ৪৫, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯: দাম সাড়ে চার টাকা।

অনুবাদকর্মের ক্ষেত্রে সাধারণত পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকেই অনুবাদকের বা প্রকাশকের লক্ষ্য পড়ে সহজে কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেরও সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। সেদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক অবশ্যই প্রশংসাভাজন হবেন।

ভূমিকায় অনুবাদক বলেছেন, "গ্রন্থকার শ্রী ভি এস খান্দেকর আধুনিক মারাঠী সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য।" মারাঠী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধারণভাবে অত্যন্ত সংকীর্ণ, সুতরাং এ উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা চলে না। ভূমিকাতেই দেখতে পাচ্ছি লেখক বইটির অনুবাদ করেছেন ১৯৩৮ সালে এবং প্রকাশিত হলো ১৯৫৫ সালে। শ্রীখান্দেকরকে 'আধুনিক সাহিত্যিক' বলা অনুবাদকের অভিরুচি কিন্তু ১৯৩৮ সালের বই পড়ে "আধুনিক" মারাঠী সাহিত্যের নিদর্শন লাভ করা যাবে কিনা সেটা বিবেচ্য। আমাদের বাংলা উপন্যাসের ১৯৩৮ সালের রচনা-ভঙ্গিমার সঙ্গে আজকের দিনের উপন্যাস-রচনার নিয়ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করলে দেখা যাবে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু দিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই ঘটনাটি ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা প্রশ্ন নয় ঘটাটা স্বাভাবিক এটা বলা চলে। আধুনিক মারাঠী

জাতীয় স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে লোকে মনে করছে। এ অবস্থায় কোটলেওয়ালার নীতি সিংহলে জনসাধারণের অপ্রিয় না হয়ে পারে না। শ্রীবন্দরনায়ক SEATO শ্রেণীর চুক্তি থেকে সিংহলকে দূরে রাখবেন।

সিংহলকে কমনওয়েল্থভুক্ত "ডোমিনিয়ন" থেকে কমনওয়েল্থবহির্ভূত রিপাবলিকে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি M. E. P.'র নির্বাচনী ইস্তাহারে ছিল। সিংহলকে কিছুকালের মধ্যে রিপাবলিকে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা হবে আশা করা যায় কিন্তু সিংহলকে কমনওয়েল্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীবন্দরনায়ক সচেষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। শ্রীবন্দরনায়ক বলেছেন যে, তাঁর পররাষ্ট্র নীতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতির অনুরূপ হবে। শ্রীনেহরু কমনওয়েল্থের সঙ্গে ভারতের যোগ রক্ষা করার কিরূপ পক্ষপাতী তা সুবিদিত। তাছাড়া, শ্রীবন্দরনায়ক নিজেই ভারতের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন, কমনওয়েলথের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলা যায়। অতএব নূতন সরকারের আমলে সিংহল কমনওয়েলথ্ ছাড়ার চেষ্টা করবে এরূপ সম্ভাবনা অল্প।

কোটলেওয়ালার কর্তৃত্বের অবসানের সম্ভাবনায় সিংহলের চা-বাগান প্রভৃতির বিদেশী, বিশেষত বৃটিশ মালিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু M. E. P.'র নির্বাচনী ইস্তাহারে যাই থাক শ্রীবন্দরনায়ক বলেছেন যে, বিদেশী মালিকের কারবার, কারখানা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার ইচ্ছা তাঁর নেই; সিংহলের স্বার্থের জন্য সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনোচিত কন্ট্রোল প্রবর্তন করতে পারেন, হয়তো বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কোনো প্রতিষ্ঠান স্বহস্তে নিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কিছু বাজেয়াপ্ত করার কথাই উঠে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী স্বার্থ সম্পর্কে ভারত সরকার যে-নীতি অনুসরণ করছেন সিংহল তার চেয়ে উগ্রতর কিছু করার চেষ্টা করবে না। নূতন ব্যবস্থায় ভারতের সঙ্গে বৃটেন তো বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং মনে হয়, বেশ দু' পয়সা করে মোটের উপর খুশীই আছে। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সিংহলের সম্বন্ধেও সেইরকমই বোধ হবে কিন্তু এই প্রথম ধাক্কাটার সময়েই একটা "গেল গেল" রব উঠবে। লাভের লোভটা কিঞ্চিৎ সংযত করতে পারলে আর এতো উদ্বেগের কারণ থাকে না।

যেমন, যদি অতিলোভ না থাকত তবে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের "নিরাপত্তার" জন্য মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলির ঘাড়ে চেপে সেখানে সামরিক ঘাটি রাখার চেষ্টা হ'ত না। ভদ্র বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ্ থেকে সমস্যাটা দেখলে সমস্যাটা আপনিই ছোটো হয়ে যেতো। তৈল "নিরাপদ" করার জন্য সামরিক ঘাটি রাখা দরকার। এটা একেবারে বাজে কথা। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল কিছুমাত্র বিপন্ন নয়, যদি কিছু বিপন্ন হয়ে থাকে সে হচ্ছে অতিলোভী মুনাফাখোরী। বেচারা সৌদী আরব, ইরাক বা ইরাণ অতো তেল দিয়ে করবে কী? তারা তো বেচার জন্য ব্যাকুল। ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক পাহারা তুলে নিলেই সোভিয়েট এসে বসবে এবং সৌদী আরব, ইরাক বা ইরাণের কাছ থেকে ইঙ্গ-মার্কিনদের চেয়েও কম দরে সব তেল টেনে নিয়ে যাবে, এটা নিছক মিথ্যা কথা। উচিত বাজার দর দিয়ে তেল কিনতে প্রস্তুত থাকলে পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যপ্রাচ্যের তৈল থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনই আশংকা নেই।

সিংহলেও সামরিক ঘাটি নিয়ে মুশকিল আছে। সিংহলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের দু'টি সামরিক ঘাটি আছে—নেগোম্বেরে বিমানঘাটি এবং ট্রিনকোমালির নৌ-ঘাটি। এইগুলো নিয়ে গোল বাধবে। শ্রীবন্দরনায়ক বলেছেন যে, তাঁরা বিদেশী সামরিক ঘাটি এবং বিদেশী সৈনা সিংহলে থাকতে দেবার একান্ত বিরোধী। কিন্তু ভারত সাগরে বৃটিশ তথা পশ্চিমা শক্তিদের নৌ এবং বিমানবহরের প্রয়োজনের দিক থেকে এই দু'টি ঘাটির গুরুত্ব সমধিক। সুতরাং এগুলি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সহসা হাতছাড়া করতে রাজী হবেন না। এক্ষেত্রে ভারত সরকা[র] সিংহলকে কী পরামর্শ দিবেন নিশ্চ[য়] করে বলা যায় না। ভারত নিজের ভূমিতে বিদেশী সামরিক ঘাটি করতে দেওয়া কথা ভাবতে পারে না, অন্য কোনে দেশেও বিদেশী সামরিক ঘাটি থাক সাধারণভাবে এরূপ নীতিও ভার[ত] স্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ভারতে নিজের নৌবহর বর্তমানে অনেকাংশে বৃটিশ নৌবহরের উপর নির্ভরশীল পৃথিবীর এই অংশ থেকে বৃটিশ [নৌ]বহরের সহসা বিদূরিত হওয়া ভা[রত] সরকারের কাম্য কিনা সন্দেহ। সুত[রাং] এ বিষয়ে নূতন দিল্লী যদি কলম্বো[কে] একটু ধীরে চলার পরামর্শ দেয় [তো] আশ্চর্য হব না। তবে নেগোম্বো [ও] ট্রিনকোমালির ঘাটিগুলিকে ক্রমশ অ[ন্যত্র] সরিয়ে নেবার কথা বৃটিশ গভর্নমেন্[ট] চিন্তা করতে হবে—যেমন সুয়েজ [থেকে] সরে সাইপ্রাসকে গড়তে হচ্ছে, ত[বু] সাইপ্রাসেও শান্তি মিলছে না।

সর্বশেষ প্রশ্ন—শ্রী বন্দর[নায়ক] সিংহলের প্রধান মন্ত্রী [...] সিংহলের ভারতীয়-বংশজাতদের স[...] নিয়ে যে দুই সরকারের মধ্যে [...] রয়েছে সেটা কি মিটবে? মিটবে [...] বলা যায় না। এইটুকু বলা যায় শ্রী বন্দরনায়কের গভর্নমেণ্ট [...] শ্রী নেহরুর গভর্নমেণ্ট অধিকতর স[...] ভূতির সঙ্গে পরস্পরের দৃষ্টি[...] বুঝবার চেষ্টা করবেন। ১০।।
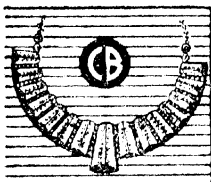
প্রগল্‌ভ হাসির উচ্ছ্বাস
"চিরকুমার সভা"

এটা এখন হাসির ছবির মরশুমে চলছে বলা যায়। বড়ো পরিচালক থেকে একেবারে নীচের ধাপের পরিচালক সকলেরই দৃষ্টি ঐদিকে। এই সপ্তাহেতেই তো রয়েছে দুখানি হাসির ছবির বিষয়ে আলোচনা। একখানি হচ্ছে "চিরকুমার সভা" যার মুক্তিলাভ ঘটছে আগামী ১লা বৈশাখ, আর অপরখানি গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "সাবধান"। অবশ্য দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশপাতাল। "চিরকুমার সভা" রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেই এবং দেবকীকুমার বসুর পরিচালনার কাজে বেশ একটা উপভোগ্য রসের বস্তু পরিবেশিত হয়েছে বলা যায়। তার পাশে "সাবধান"-এর আর নাম করা চলে না। "চিরকুমার সভা" বেশ একটা রঙ্গময়তার ভোজ। আর, "সাবধান"কে বলা যায় তেলেভাজা খাওয়া অম্বলের ঢেঁকুর। থাক সে তুলনা। রঙ্গে রসে ও সুরের প্রস্রবণে অবগাহন হয়ে মনকে বসন্তের হাওয়ায় ফুরফুরে করে তোলার যে আয়োজন রবীন্দ্রনাথ করে রেখেছেন, পরিচালক দেবকীকুমার বসুর হাত মারফৎ রঙ্গপ্রিয়দের কাছে তা এক হুল্লোড়ে কান্ড বাঁধিয়ে হাজির করে দিয়েছে।

* * *

"চিরকুমার সভা" বাঙলার এক অমর নাট্যসৃষ্টি। প্রথমে অবশ্য উপন্যাসরূপেই এর প্রকাশ, পরে কবি তাকে নাটকাকারে গ্রথিত করেন। শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদনযুক্ত এমন রসালো নাটক বাঙলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। বহু দল বহুবার নাটকখানি অভিনয় করেছে; অক্ষয়, চন্দ্রবাবু, রসিকদা, পূর্ণ চরিত্রগুলি অভিনয় করে অনেক শিল্পী নাম করেছেন। সবাক চিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের ছবিখানি আগেকার সবায়ের কৃতিত্বকে কয়েক ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য তৈরী জিনিসই, কিন্তু বাহাদুরী হচ্ছে তাকে সাজিয়ে ঠিকমতো উপস্থাপনের মধ্যে, যে কাজে দেবকীকুমার তাঁর রঙ্গবিকাশ নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত পরিচয় দান করেছেন। মূলত

—শৌভিক—

নাটকখানিকেই অনুসরণ করা হয়েছে, তাই সংলাপাংশই বেশী। তবে রসের কথা এবং তার মধ্যে অগাধ বৈচিত্র্য, আর কথার সঙ্গে রসকে উস্কানি দেবার মতো যথাযথ রঙ্গময় অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াকলাপের সংযোজনা কৌতুক উপভোগ্যতাকে যথেষ্ট সরস করে তুলেছে। এইখানেই ফুটে

উঠেছে দেবকীকুমারের পরিচালনা বৈশিষ্ট্য। কোন সাধারণ পরিচালকের হাতে হয়তো পূর্ণমাত্রায় একটা সস্তা স্ল্যাপস্টিক কমিকে দাঁড়িয়ে যেতো, তবে দেবকীকুমার সে রকম অধঃপতন থেকে কাহিনীটিকে বাঁচিয়েই রেখেছেন। অবশ্য ট্রিটমেন্টটা গিয়েছে সস্তামীর খুব ধার ঘেঁষেই।

* * *

বছর পঞ্চাশেক আগেকার শহুরে সমাজের পটভূমি, দেশোদ্ধারের কাজে ব্রতীদের কাছে যখন বিয়েটা একটা মহাবিঘ্ন। এদেরই দলের কজন সভা—অক্ষয়, বিপিন, শ্রীশ আর পূর্ণকে নিয়ে

চিরকুমার সভা; সভাপতি চন্দ্রবাবু। অক্ষয় বিয়ে করেছে, এখন তার লক্ষ্য শালীকা নীপবালা ও নীরবালাকে পাত্রস্থ করা। শাশুড়ী জগত্তারিণী দেবীর চাপে পড়ে এ বাড়ির পোষ্য বৃদ্ধ রসিকদাদু দুই কুলীন পাত্র এনে হাজির করলেন, দুই অতি গবেট। অক্ষয় ওদের এমন নাজেহাল করলে যে, ওরা সরে পড়তে পথ পেলে না। মেজশালী বিধবা শৈলর সংগে পরামর্শ করে ঠিক হলো, সে পুরুষ সেজে

চিরকুমার সভার সভ্য হবে এবং
থেকে পাত্র গেঁথে নিয়ে আসবে। প্র
সভার দপ্তর উঠে এলো এ বা
বিপিন ও শ্রীশ প্রথম দিনই অন্তরাল
মেয়েলী কণ্ঠের গান শুনে কৌত
হলো। পূর্ণর কৌতূহল
পড়েছিল চন্দ্রবাবুর বাড়িতে সভা থ
তার ভাগ্নী নির্মলার ওপরে। রসি
মধ্যস্থতায় বিপিন ও শ্রীশের ওপর
বালা ও নীরবালার ক্রমে আকর্ষণ
হলো। ওদিকে জগত্তারিণী
জ্যেষ্ঠা কন্যা পুরবালাকে নিয়ে কাশ
গিয়ে সেখানে দুটি পাত্র ঠিক
এলেন। রসিকদাদাই সে বিপর্যয়
বিপিন-শ্রীশকে রক্ষা করলেন পাত্র দু
ভুল ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়ে। দেশের
মেয়েদেরও অধিকার সাব্যস্ত হ
নির্মলাও সভার সভ্যা হলো।
সভ্যদের মধ্যে কৌমার্য ব্রত উ
দেবারও প্রস্তাব হলো। তারপর
নির্দিষ্ট দিনে সবাই এসে জমায়েত হ
আর সেইখানেই হলো মধুর মিলনোৎ

• • •

জানা গল্প, বিস্তৃত করে
এখানে প্রয়োজন নেই। এক একটি
এক রকমের চরিত্র। অভিনয়ে সব
মনে থাকবে চন্দ্রবাবুর চরিত্রে অ
চৌধুরীকে। আত্মভোলা, অবিবা
বাদভঙ্গোশ এই চরিত্রটিতে অ
চৌধুরী মঞ্চেও অভিনয় করেছেন,
এক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়িও যেন ভ
লাগলো। পূর্ণ ও নির্মলার প
এপাশে আর ওপাশে থেকে ঠারে
দুজনের আলাপ করার সশঙ্কিত
সলজ্জ প্রয়াসের অভিনয়ে যথাক্রমে উ
কুমার ও যমুনা সিংহ ছবির অন
প্রধান উপভোগ্য অংশ সৃষ্টি করে
বোনেদের মধ্যে ছোট বোন নীরব
চরিত্রে অনিতা গুহকেই বেশী ভ
লাগবে। পুরবালা, শৈল ও নীপব
চরিত্রে আছেন যথাক্রমে ভারতী
শোভা সেন ও তপতী ঘোষ।
পাকিয়ে তোলায় রসিকদাদার রসিক
জহর গাঙ্গুলী জমিয়েছেন। বেস
শুধু হয়েছেন মূলে গায়েন অক্ষ
চরিত্রে নীতিশ মুখোপাধ্যায়।
এইটেই হলো কথায়, গানে সব

"চিরকুমার সভা"-তে অনিভা গুহ, শোভা সেন ও তপতী ঘোষ

সুরেলা চরিত্র; ওর গানগুলি যেন ওর মুখেরই নয়, একটা অস্বস্তি এনে দেয়। জহর রায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়কে দুই গবেট কুলীন পাত্র সাজিয়ে হাসাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ওরা ওদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হাসিয়েছেনও প্রচুর; কিন্তু যে ধরনের রূপসজ্জা ও আচরণ ওদের দেখানো হয়েছে, তা যেন এ কাহিনীর পরিবেশে খাপ খায় না। এমনি অসম উপাদান আরও আছে। বিপিন ও শ্রীশের চরিত্রে যথাক্রমে জীবেন বসু ও প্রশান্তকুমারকে অসহায়ভাবে দেখে তবু মানায়, কিন্তু নৃপবালা ও নীরবালার ভূমিকার কথা মনে করলে দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়কে ভাগিয়ে দেবার হেতু পাওয়া যায় না।

*   *   *

সঙ্গীতমুখর কাহিনী, বেশী গান অক্ষয় আর নীরবালার; গানগুলি পাওয়ার গুণে ছবির গুণ বাড়িয়েছে। কাহিনীর মধ্যে গানের কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত এই রচনায় পাওয়া যায়। সন্তোষ সেনগুপ্ত আবহ-সঙ্গীতের দিক থেকে বেশ একটা মিষ্টি ও হাল্কা আবহাওয়া রক্ষা করে গিয়েছেন। বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ইউনিবক্সের বাজনা কাজে লাগিয়েছেন। বিশু চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজ বেশ ভালো, স্ট্যাণ্ডার্ডের ছবির উপযোগীই হয়েছে। বিশেষভাবে প্রশংসনীয় কাজ দেখিয়েছেন শিল্প-নির্দেশে সৌরেন সেন; ছবির অঙ্গকে চমৎকার একটা পারিপাট্য এনে দিয়েছেন। শ্যামসুন্দর ঘোষের শব্দ-গ্রহণও স্পষ্ট। সম্পাদনা করেছেন গোবর্ধন অধিকারী।

পিছনপানে টান

ভাবসম্পদে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, রচনাবিন্যাসে এবং কলাকৌশলের সৌকুমার্যে গর্ব করার যোগ্যতা যেমন বাঙলা চিত্রশিল্পের আছে, তেমনি আমরা কতটা পিছিয়ে পড়ে আছি তাও স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই যেন মাঝে মাঝে আসে "সাবধান"। বঙ্গবাণী পিকচার্সের এই নতুন ছবিখানি নিতান্তই অবোধ লোকের হাতে তৈরি বলে প্রগতি-বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দিক থেকেও সাধারণের পাতে দেবার অযোগ্য উপাদান। প্রহসন, কিন্তু একটা আকাট গোঁড়ামিভরা মনের পরিচয়, যে মনের ধারণা মেয়েদের চাকরি করতে যাওয়াটা সংসারের সমাজের এবং মেয়েদের নিজেদের জীবনে মহা অনর্থসূচক। গল্পও এই নিয়েই, তবুও কোনরকম বৈচিত্র্যও যদি থাকতো তাহলেও কথা ছিল। কিন্তু একাধারে কাহিনীকার, চিত্রনাট্যরচয়িতা এবং পরিচালক সুধীর ঘোষ কতকগুলি মামুলি ধরনের রগড় সৃষ্টি করে হাসাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া ছাড়া কোন প্রতিভা-

শরৎচন্দ্রের "মামলার ফল"-এ অসিতবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দীপ্ত কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় দিতে পারেন নি।

* * *

আরম্ভটা বড়োদের অফিসে স্কুলের ছাত্রদের মতো তামাসার আমদানী করে হাসানো। বড়োবাবুর টাক মাথায় চক ছুঁড়ে মারা, যে চকটি দিয়ে ছোটবাবু সাইনবোর্ডে ম্যানেজারের চেহারাটা বানরের মতো করে এঁকে বড়বাবুর টাক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে। তাই নিয়ে হুলুস্থুল, আর সেই গোলমাল শুনে মালিক বাবু সাহেবের টেবিলের নীচে লুকনো। ছোটবাবু প্রণতির মেসে হঠাৎ ঝি মারফৎ আশ্রয়ের জন্য হাজির কমলা নামে এক সুন্দরী তরুণী। এ এক উদ্ভট সংঘটন। এই কমলাকে নিয়েই মেসের একটি ছেলে ভাগলো এবং পরে দেখা গেল, কমলা এক অফিসের লম্পট মালিকের বৌ বনে গিয়েছে। কিন্তু তার জন্য কমলাকে এ-মেসে এনে তোলার কোন অর্থই বোঝা গেল না। বোঝা যায় ন এমন আরও ঘটনাও অবশ্য আছে। যাক, প্রণতি গ্রামে ফিরলো; গ্রামে তার বে আর তার পালক অপুত্রক কাকা-কাকিমা ঘটনা এমন তৈরি করা হলো যাতে রাতে ভাইপো আর বউয়ের কথা পাশের ঘরে কাকা-কাকিমার কানে পৌঁছে রঙ্গ সৃষ্টি করে দেয়। রুচিও বটে! গ্রাম থেকে ফিরতেই প্রণতি পেলে বরখাস্তের চিঠি বেকার হয়ে সে আলাপ জমালে এক গণৎকারের সঙ্গে আর তারই কাছে এক খানা ঘর ভাড়া নিয়ে অসুখ হওয়া মিথ্যা খবর পাঠিয়ে বৌ লতাকে নিজে কাছে আনিয়ে নিলে। বেকার হওয়া কথাটা আর লতাকে জানালে না।

* * *

প্রণতির একটা মতলব ছিল। চাকরি খোঁজে যতো বিজ্ঞাপনে সকলেই চায় মে কর্মী। তাই প্রণতি নিজের চাকরি বিষয়ে হতাশ হয়ে লতাকে লেখাপ শিখিয়ে কেতাদুরস্ত করে তুললে, যাতে চাকরি করতে পারে। ইতিমধ্যে সংসারে খরচ চালাতে প্রণতি লতার সব গহন খুইয়ে বসলো। লতা গোড়ায় চাকরি নিতে নারাজী হয়, কিন্তু সংসার যখ অচল তখন অগত্যা রাজী হলো এব এমনি মজা যে, একটা অফিসে দরখাস্ত নিয়ে যেতেই শুধুমাত্র তার চেহারা দেখে মালিক চাকরি দিলে। এই মালিক পূর্বোল্লিখিত কমলার রক্ষক। লত অবশ্য সিঁদুর মুছে 'মিস' বলে পরিচ দিলে। লতাকে দেখেই মালিকের ম পড়লো তার ওপর; ফলে লতার কো কাজ নেই, মালিকের পাশে বসে থাকা শুধু। দেখতে দেখতে লতা সেক্রে কাটিয়ে মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। অফিসের পর মালিকের সঙ্গে এখান-সেখান ঘুরে দেরী করে বা ফিরতে লাগলো। স্ত্রী চাকরি করে, আ স্বামী অর্থাৎ প্রণতি রান্না করে তাকে খাওয়া দাওয়া দেখে না হেসে উপা নেই। দেরী করে বাড়ি ফেরা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহও মজার ব্যাপার একদিন হঠাৎ মালিকের সঙ্গে লতাকে বেড়াতে দেখলে প্রণতি। পরদিন প্রণ লতাকে বের হতে নিষেধ করলে; লত নিষেধ না শুনে বেরিয়ে পড়লো; প্রণ

রাস্তায় গিয়ে তার পথরোধ করলে। রাস্তায় ওদের সেই কলহ শুনে পথচারী অন্য রকম ব্যাপার মনে করে প্রণতিকে দিলে কষিয়ে দু-চার ঘা। সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গণৎকার বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা ফন্দী করলে প্রণতি।

* * *

ইদানীং আর তার প্রতি স্বামী নজর দেয় না বলে কমলার মনে সংশয়। খোঁজ নিয়ে জানলে কোন এক লতাকে নিয়ে স্বামী ব্যস্ত থাকে সর্বক্ষণ। সেদিন সন্ধ্যায় লতার আসবার কথা; কমলাও হাজির হলো সেখানে; লতার কাছে তার মালিকের স্বরূপ খুলে গেল। তার শয়তানী খপ্পর থেকে নিজেকে কোন রকমে রক্ষা করে লতা বাড়িতে এসে দেখলে ঘরে এক মহিলার সঙ্গে স্বামী প্রণতি আর গণৎকার চা-পানে রত। মহিলাটি হলেন প্রহেলিকা দেবী; নারী-মঙ্গল অগ্রাধিকার সমিতি খুলেছিলেন মেয়েদের সব কাজে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে। কিন্তু মেয়েরা প্রেম করতে তার কাছ থেকে বিঘ্ন পাওয়ায় সমিতি ভেঙে যায়। প্রণতি একবার এই সমিতিতে চাকরির খোঁজে যায় এবং সেই সময়েই প্রহেলিকা দেবীর সঙ্গে আলাপ। সেই সূত্র ধরে সেদিন ওর সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখিয়ে লতাকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই ওকে নিয়ে বাড়িতে বসে এই চা-পান। এ দৃশ্য দেখাবার জন্য নারী অগ্রাধিকার সমিতির কোন দরকার ছিল না। লতা বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে দেখেই তো ক্ষেপে গিয়ে বঁটি এনে হাজির। ওদের ভেতরে মিটমাট হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো প্রহেলিকা দেবী প্রণতির ভাঁওতায়। নেহাৎই জোড়াতালি দিয়ে মেলানো সস্তা গল্প।

* * *

মেয়েদের চাকরি করার বিড়ম্বনা, আর সেই সঙ্গে নারীর অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় কুহেলিকা দেবীর নাজেহাল হওয়ার যে সব ঘটনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সে সবের পরিকল্পনার মধ্যে একেবারেই সেকেলে অনগ্রসর মনেরই ছাপ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, প্রণতির গোড়ার অফিসে মালিক বাবুসাহেবের মেয়ে-এসিস্টেণ্ট রাখা হবে শুনেই যে ভঙ্গি দেখা গেল এবং লতার অফিসের মালিকের যে শয়তানী

রূপকমল চিত্রের "বেগুনহ"তে সাকিলা ও কিশোরকুমার

আচরণ দেখানো হয়েছে, তার দ্বারা কি এইটেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, তামাম অফিসই মেয়েদের কাজ করার পক্ষে অতি অনুপযুক্ত স্থান? প্রহসন হলেও তার মাত্রা তো থাকা চাই! আনসান্ সব ঘটনা, হাসির বলেই যা চালিয়ে দেওয়া যায়, নয়তো কতো যে অসংলগ্নতা তার ইয়ত্তা নেই। তার বিস্তারিত ফিরিস্তী দেওয়া বৃথাই, কেবল জায়গা ভরাট করা। গল্পের প্রতিপাদ্য যদি এই থাকতো যে নারীর প্রকৃত স্থান হচ্ছে গেরস্থালী এবং সেই-মতো ঘটনা সাজানো হতো, তাহলে না হয় একজনের গোঁড়ামীর একটা মত বলে মনে করা যেতো, কিন্তু সেদিক থেকেও তো কোন সঙ্গতি নেই। এখানে হাস্যকর অবস্থার অবতারণা করে স্রেফ এই মাত্রই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, চাকরি-স্থল মেয়েদের জন্য নয়, কারণ ওখানে কেবল মেয়ে-ধরাদের বিচরণ; আর অপরের সঙ্গে প্রেম করায় বাধা থাকলে মেয়েরা

চেংগিস খাঁর অভিযান কাহিনী "হলকু"-তে মীনাকুমারী

তাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে রাজী নয়।

* * *

প্রতিপাদ্য যাই হোক, প্রচুর হাসির যাতে উৎপাদন হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার নিদর্শন ভূমিকায় বহু কৌতুক-শিল্পীর সমাবেশ। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন, নবদ্বীপ হালদারও আছেন; জহর রায়ও আছেন, তুলসী চক্রবর্তী-মলিনা দেবীও আছেন। আরো আছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, খগেন পাঠক, বেচু সিংহ প্রভৃতি। মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, চিত্রা মণ্ডল, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন। হাস্যকর ব্যাপার বলে হাসি পায়, কিন্তু শিল্পীদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলার মতো জোর বা সঙ্গতি নেই কোন চরিত্রেই। কলা-কৌশলের কোনদিকেই প্রশংসার কিছু নেই - সি টিমের মতো কাজ সর্বক্ষেত্রে। ছবিখানির সংগঠনে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণে তারক দাস; শব্দ গ্রহণে গৌর দাস; সংগীত পরিচালনায় বীরেন ভট্টাচার্য; শিল্প-নির্দেশে গৌর পোদ্দার এবং সম্পাদনায় রবীন দাস।

নতুন নাট্যালয় "বিশ্বরূপা"

থিয়েটার চলছে না, চলছে না বলতে বলতে থিয়েটার বেশ ভালোভাবে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভালো থিয়েটার-বাড়ি নেই বলতে বলতে প্রথমে একটি হলো, তারপর হলো আর একটি। প্রথমে স্টার থিয়েটার ভেঙেচুরে নতুনের মতো হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। তারপর রঙমহল চেহারায় আরও নতুনত্ব ফুটিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করলে। নাট্যালয়ের শ্রী খানিকটা ফিরলো। এর পরে বিশ্বরূপা নতুন সাজের যে ফিরিস্তি দিচ্ছে তা ঠিক ঠিক হয়ে উঠলে কলকাতার নাট্যালয়ের চেহারাটা বেশ জমকালো হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। শুধু কলকাতারই বা কেন, বিশ্বরূপাকে যেভাবে রূপায়িত করা হবে বলে ঠিক হয়েছে তার সব কিছু হলে এটি সমগ্র ভারতেরই শ্রেষ্ঠ নাট্যগৃহতে পরিণত হয়ে উঠবে।

* * *

বিশ্বরূপা হচ্ছে শ্রীরঙ্গমের পরিবর্তিত নাম। নামটি যেমন একেবারেই নতুন করে নেওয়া হয়েছে নাট্যগৃহটির চেহারাও হচ্ছে একেবারে নতুন। মূল প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে থাকছে দেওয়াল, তাও পূর্বদিকের দেওয়াল সরিয়ে হলের প্রস্থ বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। আর থাকছে মঞ্চটি, তবে সেখানেও আগেকার বত্রিশ ফিট প্রসারকে ভিতর দিকে ঠেলে চৌত্রিশ ফিটে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। মঞ্চের ঘূর্ণায়মান অংশের বেড় রাখা হচ্ছে বত্রিশ ফিট। এরপর ভারতের কোথাও এতো প্রশস্ত মঞ্চ আর দ্বিতীয়টি নেই; তবে কলকাতা ছাড়া বাঁধা মঞ্চ আর আছেই বা কোথায়! দোতলায় গ্যালারি বসানো, এইটেই যা পুরনো আমলের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা নয়তো প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে প্রায় সবই থাকছে আধুনিক ব্যবস্থা। গরমের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো ঠিক হয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শ নিয়ে এঁরা জানলেন যে, ও ব্যবস্থায় শব্দ বসে যাবার সম্ভাবনা আছে, হলের বেশীদূর পর্যন্ত না পৌঁছতে পারে। মঞ্চ থেকে কথা যাতে হলের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছয় তার জন্য দেয়ালের চুনবালির সঙ্গে এক বিশেষ উপকরণ মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে আওয়াজ জোরালো শোনায়। গরম হাওয়া নিষ্ক্রমণ এবং শীতলবায়ু প্রবাহিত করিয়ে দেবার পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেল। নতুন মেক-আপ ঘর তৈরি হচ্ছে পুরুষদের পাঁচটি আর মহিলাদের চারটি; একটি বড়

ঘর রাখা হচ্ছে ভাড়াটে দলদের ব্যবহারের জন্য। ভাড়াটেদের জন্য আর রাখা হচ্ছে প্রায় দশটি তৈরি দৃশ্যপট, নিজেদের নাটকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা তো থাকছেই। দোতলার গ্যালারি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের আসন থাকছে মোট ন'শ। আসনগুলি বসবার সুবিধের জন্য চওড়া রাখা হচ্ছে বাইশ ইঞ্চি; সচরাচর থাকে আঠারো-বিশ।

*   *   *

দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্যের আরো ব্যবস্থা থাকছে। যথা, প্রতি অংক শেষে বিরাম-কালে নিজেদের ছোকরাদের দিয়ে প্রেক্ষা-গৃহ মধ্যে পানীয় জল বিতরণ, জল-খাবারের জন্য সস্তা মূল্যের ক্যান্টিন, বেড়াবার জন্য পাদপোদ্যান ইত্যাদি। উদ্যানে থাকছে আলোয় জলমল দুটি ফোয়ারা, আর একাংশে মহিলাদের এবং অপরাংশে পুরুষদের বিশ্রাম নেবার স্থান। প্রেক্ষাগৃহের পশ্চিমদিকে এই উদ্যান। থিয়েটার দেখতে শিশুদের নিয়ে গিয়ে বিব্রত হয়ে না পড়তে হয় এই কথা মনে রেখে দোতলায় এক নার্সের রক্ষণাবেক্ষণে উপস্থিত বারোটি শিশুকে একটি নার্সারিতে রেখে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাস্তা থেকে ঢুকেই সামনে খোলা জায়গায় মোটরগাড়ি রাখার ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে শ' দুই সাইকেলও। এই প্রাঙ্গণের মাঝে শিল্পী বেদী, তারপরই লবী, দু'পাশে টিকিট ঘর। লবির দেয়ালের গায়ে থাকবে বাঙলা মঞ্চের আরম্ভ থেকে এপর্যন্তকার প্রখ্যাত শিল্পীদের প্রতিকৃতি। পূর্ব ও পশ্চিমের এক এক পাশে স্বতন্ত্র করে মহিলা ও পুরুষ দর্শকদের পরি-সজ্জাগার। মঞ্চ প্রসঙ্গে আলোকপাত ব্যবস্থার কথাটা বলা হয়নি। তাপস সেনকে এইদিকের ভার দেওয়া হয়েছে এবং শোনা গেল, এমন সব বাতি আমদানী করা হচ্ছে যা ভারতের কোথাও নেই। এইসব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

*   *   *

এই বৈশাখের মধ্যেই 'বিশ্বরূপা'র দ্বারোদ্ঘাটন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেন। উদ্বোধনী নাটক হবে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন"। কথাশিল্পী নিজেই এর নাট্যরূপ দান করছেন। পরিচালনা ব্যাপারে অভিনবত্ব হচ্ছে যে, কোন নিয়মিত পরিচালকের হাতে না দিয়ে পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছে লেখক স্বয়ং তারাশংকরের হাতে এবং তাঁর সঙ্গে থাকছেন অপর দুই প্রখ্যাত কথাশিল্পী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদের মধ্যে এ পর্যন্ত যোগদান করেছেন বসন্ত চৌধুরী (মঞ্চে এই প্রথম), নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যো-পাধ্যায়, আদিত্য ঘোষ, বিমান বন্দ্যো-পাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, সন্তোষ সিংহ, শান্তি গুপ্তা, কমলা (ঝরিয়া), তপতী ঘোষ, পূর্ণিমা প্রভৃতি। আরও কয়েকজন নামকরা শিল্পীর যোগদানের সম্ভাবনা আছে। এমেচার দলে নাম করেছেন এমন কয়েকজন শিল্পীকেও গোড়া থেকে নিলে আরো ভালো হয়; তেমন শিল্পীর অভাবও নেই। কোন বিজ্ঞাপন না দিতেই এখানে নাট্যাভিনয়ে যোগদান করার জন্য প্রায় আড়াই হাজার দরখাস্ত এসেছে, তার মধ্যে শতাধিক মহিলা এবং মহিলাদের মধ্যে দশ বারোজন আছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। এ পর্যন্ত দু' একজন মাত্র এ সম্প্রদায়ের পুরুষ বা মহিলাকে মঞ্চ কি পর্দায় অবতরণ করতে দেখা গিয়েছে। সন্তোষ সিংহ থাকবেন অভিনয় শিক্ষা-দানে, আর সংগীত পরিচালনায় এই প্রথম কমল দাশগুপ্ত মঞ্চে যোগদান করছেন। সব শুনে বড়াই করার মতো একটি নাট্যালয় উদ্বোধিত হতে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই সঙ্গে এই আশাই করতে হয় যে, "বিশ্বরূপা" সমগ্র বাঙলা নাট্যালয়েরই নবরূপান্তর ঘটাতে যেন সক্ষম হয়।

সচিত্র সাহিত্য সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা	... ...	
শহরে বার্ষিক	... ...	১২,
ষাণ্মাসিক	... ...	৬।°
ত্রৈমাসিক	... ...	৪৷৹
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০,
ষাণ্মাসিক	... ...	১০,
ত্রৈমাসিক	... ...	৫,
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২,
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৪,
ষাণ্মাসিক	... ...	১২,

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা
৪ সুতারাকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

একলব্য

আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বাঙলা ও বোম্বাইয়ের খেলা দু'দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর শেষ পর্যন্ত দুই দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দুই দলই ৬ মাস ৬ মাস করে বিজয়ীর ট্রফি অধিকারে রাখবে। প্রথম ৬ মাস ট্রফিটি অধিকারে রাখবে বোম্বাই; দ্বিতীয় ৬ মাস গতবারের বিজয়ী বাঙলার অধিকারে থাকবে। নক আউট হকি প্রতিযোগিতায় যুগ্ম বিজয়ী হবার ঘটনা এই প্রথম নয়। গতবার ভারতের জাতীয় হকি এবং সুপ্রসিদ্ধ বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ফলে জাতীয় হকিতে গতবার মাদ্রাজ ও সার্ভিস টীম এবং বেটনে ওয়েস্টার্ন রেল এবং উত্তর প্রদেশ যুগ্মভাবে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। নক আউট প্রতিযোগিতার অর্থঃ একে একে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে 'আউট' করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে হবে। যদি কাউকে আউট করা না যায় তবে বিজয়ী কিসের? নক আউট প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে দুটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা প্রতিযোগিতার নিয়মানুগ মীমাংসা নয়, একটা মধ্যপন্থা ব্যবস্থা।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় এ বছর ৮টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ভূপাল দল শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারেনি। ফলে বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, দিল্লী ও হায়দরাবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছে। পুরুষদের হকি খেলার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের নিরিখে মেয়েদের খেলার তুলনা করলে অবশ্য ভুল করা হবে, তবুও বলবো আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় কারো কারো খেলায় পুরুষোচিত নৈপুণ্যের অভাব দেখা যায়নি। স্টিক চালনার নিপুণতায় অনেকেই দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ভারতে খেলাধূলোর প্রসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, তারা চলতে চাইছেন পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে; কিন্তু পুরুষদের মত তাদের মধ্যেও দলীয় কোন্দলের ফলে হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থাতেই হোচট খাবার আশংকা দেখা যাচ্ছে। মহিলাদের হকি খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতে এখন দুটি এসোসিয়েশন বিদ্যমান। একটি 'উইমেনস হকি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া', যার প্রধান দপ্তর মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। আর একটি বাঙলার 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস হকি এসোসিয়েশন'। ভারতে মহিলাদের হকি খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য সূচনায় বোম্বাই ও বাঙলার উদ্যোগে একটি এসোসিয়েশনই গঠিত হয়েছিল। দলীয় কোন্দলের ফলে এখন দুটি এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রাজ্য দলের মধ্যেও ভাঙ্গাগড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন দল ফেডারেশনের অনুরক্ত, কোন দল সংশ্লিষ্ট হকি এসোসিয়েশনের সঙ্গে। উইমেনস হকি ফেডারেশনের পরিচালনায় আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতার একটি অনুষ্ঠান আগেই শেষ হয়েছে, এবার উইমেনস হকি এসোসিয়েশনের পরিচালনায় আন্তঃরাজ্যের আর কটি অনুষ্ঠান শেষ হল। মধ্য প্রদেশের উইমেনস হকি ফেডারেশন রাজকুমারী অমৃতকুমারী শিক্ষা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন, তারা আন্তর্জাতিক হকি সংস্থারও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। এই বছরই তারা অস্ট্রেলিয়ায় একটি হকি দল পাঠাচ্ছেন। কিন্তু বাঙলার নিখিল ভারত মহিলা হকি এসোসিয়েশনের অনুমোদিত দলগুলি থেকে কাকেও গ্রহণ করছেন না। ফলে অস্ট্রেলিয়ায় যে দলটিকে পাঠান হবে, সেটি ভারতের সর্বসম্মত প্রতিনিধিমূলক দল নয়, সুতরাং দলটি শক্তিহীন হতে বাধ্য। উইমেনস হকি ফেডারেশনের সভানেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা আছেন লেডি চন্দুলাল ত্রিবেদী। এদিকে উইমেনস হকি এসোসিয়েশনের উপরও দেখছি লেডি প্রতিমা মিত্রের যথেষ্ট সহানুভূতি। প্রাক্তন দুই রাজ্যপালের দুই সহধর্মিণী লেডি চন্দুলাল ত্রিবেদী ও লেডি প্রতিমা মিত্র আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে পরস্পরবিরোধী দুই প্রতিষ্ঠানের গণ্ডগোলের কি অবসান হতে পারে না?

× × ×

ভারতের প্রধান ফুটবল কেন্দ্র কলকাতায় প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিট করে ৫০ মিনিট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের কোন কোন

আন্তঃ রাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উৎসবে বোম্বাই দলের মার্চ পাস্টের দৃশ্য

...নে ৩০ মিনিট করে পুরো এক ঘণ্টা খেলার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ফুটবল সংস্থাই কলকাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকালের সঙ্গে কলকাতার খেলার সময়ের বিরাট পার্থক্য। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকাল ৯০ মিনিট। আমাদের খেলার সময়ের প্রায় দ্বিগুণ। ফলে বিদেশী দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়। খেলার শেষদিকে খেলোয়াড়দের চোখে মুখে শ্রম কাতরতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। শ্রমশীলতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ১৯৬০ সালের মধ্যে আস্তে আস্তে খেলার সময় বাড়িয়ে ভারতে ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকাল ৯০ মিনিট করবেন বলে স্থির করেছেন। আমাদের অভিমত, আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ৯০ মিনিট ফুটবল খেলা সহজ কথা নয়; আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি আমাদের দেশে যারা ৭০ মিনিট খেলতে অভ্যস্ত শীতপ্রধান দেশে তাদের ৯০ মিনিট খেলতে দম ফুরোবে না। সে যাই হোক, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন আস্তে আস্তে খেলার সময় বাড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ফুটবল সংস্থা আই এফ এ কিন্তু খেলার সময় বাড়াবার ঘোর বিরোধী। আই এফ এর যুক্তিও খণ্ডন করা কষ্টকর।

এখানে খেলোয়াড়দের সপ্তাহে চার পাঁচটি করে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। ক্লাবের খেলা, অফিসের খেলা, কোন সময় বা কলেজের খেলা। তার উপর আছে আবার বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ উপরোধে অপর দলের হয়ে আশে পাশের খেল—কলকাতার ফুটবল সমাজে 'খেপ' বা 'ভাড়াখাটা' নামে যা পরিচিত। সুতরাং খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য, তাদের খাদ্য এবং পরিবেশের বিবেচনায় খেলার সময় বাড়ানো কোন মতেই উচিত নয়,—আই এফ এ সম্পাদকের এই অভিমত। খেলোয়াড়ও মানুষ—সপ্তাহে চার পাঁচ দিন শ্রমজনিত ফুটবল খেলায় যাদের অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে তাদের খেলার সময় বাড়াবার কোন অর্থ হয় না। তারপর খেলার সময় বাড়াবার অন্য অসুবিধা অফিসের চাকরি। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই চাকুরিজীবী। অফিসের ছুটির পর মাঠে আসতেই অনেকের দেরি হয়ে যায় এবং ৫০ মিনিটের খেলা শেষ করতেই অনেক সময় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সুতরাং অফিসের চাকরি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ সবকিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে খেলার সময় বাড়াবার উপায় কোথায়? খুবই সত্যি কথা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ইউরোপ বা অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়রাই বা ৯০ মিনিট খেলে কিভাবে? আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার সদস্য ভারতকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন তথা আই এফ এ'কে সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। লীগ প্রতিযোগিতার বেশীর ভাগ খেলা অল্প সময় খেলে দুই একটি নক আউটে বেশী সময় খেলার কোন অর্থ হয় না। শ্রমশীলতার পরীক্ষা লীগ প্রতিযোগিতায়ই হওয়া উচিত। আই এফ এ কি লীগ খেলার স্থায়িত্বকাল ৩০ মিনিট করে ৬০ মিনিট করতেও অনিচ্ছুক?

× × ×

মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোটেলের দ্বিবার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খেলাধুলো ও আমোদ প্রমোদের এক চমৎকার আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ করে বিধানসভার সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। দৌড় টানাটানি, মুষ্টিযুদ্ধ ও রিলে রেস সম্পন্ন হবার পর সবাই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকেন 'ফ্যান্সি ড্রেস' দেখবার জন্য। দেখা যায় এক মধ্যবয়সী তীর্থযাত্রী লাঠি ভর করে এগিয়ে আসছেন; জিজ্ঞাসা করে জানা যায় তাঁর গন্তব্যস্থান বারাণসী। একটু পরে সভাক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে এক অত্যাধুনিক সুন্দরী বালিকার। কিন্তু সুন্দরীর মুখে গোফ দেখে সভায় হাসির হুল্লোড় খেলে যায়। তখন আর কারোই বুঝতে বাকী থাকে না বালিকাবেশী ভদ্রলোক বিধানসভার বিরোধী দলপতি কম্যুনিষ্ট লীডার পি রামমূর্তি ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু তীর্থযাত্রী কে? তিনি কি মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ। হ্যাঁ
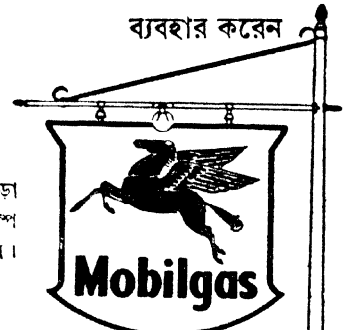
[illegible]য়ার, পুলিস ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এখনও [illegible]বানীপুরের খেলা বাকী। এ পর্যন্ত ভবানী-[illegible]রে ক্লাব ৪টি ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৬টি [illegible]য়েণ্ট নষ্ট করেছে; কাস্টমস ও ইস্টবেঙ্গল [illegible]াব নষ্ট করেছে ৭টি করে পয়েণ্ট। সবচেয়ে [illegible]ম পয়েণ্ট নষ্ট করেছে অপরাজিত মোহন-[illegible]গান ক্লাব। দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণের [illegible]মুখীন অরোরার সঙ্গে ড্র করে তাদের [illegible]কটি পয়েণ্ট হারাতে হয়েছে। অনেকটা পচা [illegible]ামুকে পা কাটবার মত।

হকি লীগের নিয়মানুসারে নীচের দুটি [illegible]াবকে আগামীবার দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে [illegible]বে। ডালহৌসী ক্লাব ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণের বিধানে পড়েছে ১৬টি খেলায় মাত্র চারটি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে; এখন পর্যন্ত জয়লাভে অসমর্থ। ডালহৌসী বাকী [illegible]টি খেলায় পুরো পয়েণ্ট পেলেও ভাগ্য বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করতে পারবে না। এখন প্রশ্ন, আর কোন দলকে ডালহৌসীর সঙ্গী হতে হবে। ইতিমধ্যে বি জি প্রেস ১২ পয়েণ্ট পেয়ে লীগের খেলা শেষ করেছে। সুতরাং অরোরা, উয়াড়ী, পোর্ট কমিশনার্স—যারা এখনো ১২ পয়েণ্ট সংগ্রহ না করায় শঙ্কিত হয়ে আছে—তাদের অন্ততঃ ১৩ পয়েণ্ট লাভ করতে হবে। বি জি প্রেসের মত আর একটি বা একাধিক দল যদি ১২ পয়েণ্টে লীগ শেষ করে, তবে অবতরণের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আবার খেলার প্রশ্ন উঠতে পারে।

এ পর্যন্ত লীগের কোন খেলাই দর্শক-মনে সত্যিকারের আনন্দ দিতে পারেনি। অনেকটা মামুলিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অধিকাংশ খেলা।

লীগ কোঠায় কে কোথায়

[১১-৪-৫৬]

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
মোহনবাগান	১৭	১৫	২	০	৩৮	১	৩২
ভবানীপুর	১৫	১২	২	১	২৬	৭	২৬
মহমেডান	১৪	১০	২	২	২৬	৬	২২
কাস্টমস	১৪	৮	৫	১	২৪	৫	২১
ইস্টবেঙ্গল	১৩	৭	৫	১	১৬	৫	১৯
এরিয়ান্স	১৩	৫	৫	৩	১০	৭	১৫
[illegible] স্পোর্টস	১৫	৬	৩	৬	১৩	১৬	১৫
[illegible]	১৪	৪	৬	৪	১২	১৭	১৪
[illegible]	১৫	৪	৫	৬	১৪	১৭	১৩
[illegible]	১৫	৩	৭	৫	৯	১৭	১৩
[illegible]	১৬	৪	৫	৭	১০	২০	১৩
[illegible]	১৩	৫	২	৬	১০	১১	১২
[illegible] পুলিস	১৫	৫	২	৮	১৮	২৫	১২
[illegible]র্স	১৬	৪	৪	৮	১২	২৫	১২
বি [illegible] প্রেস	১৮	৪	৪	১০	৯	২১	১২
উয়াড়ী	১৬	৩	৫	৮	৮	১৯	১১
পোর্ট কমিশনার	১৩	৪	২	৭	১৪	১২	১০
অরোরা	১৬	১	৭	৮	৬	২১	৯
ডালহৌসী	১৬	০	৪	১২	৩	৩৪	৪

খেলাধুলোর খবরাখবর

অলিম্পিকের হকি টীম—মেলবোর্ন অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় এবছর ১৬টি দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে। এই ১৬টি দেশকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের বিজয়ীকে খেলতে হবে মূল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে। যোগদানকারী দেশগুলির নাম—বেলজিয়াম, বৃটেন, জার্মানী, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়, পর্তুগাল ও মিশর।

মাইল দৌড়ে ল্যাণ্ডির চতুর্থ অভিযান—এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী দৌড়বীর জন ল্যাণ্ডি আবার ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ দৌড়ে পার হয়েছেন। মেলবোর্নের অলিম্পিক পার্কে এক মাইল দৌড়তে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলীটের এবার সময় লেগেছে ৩ মিনিট ৫৮.৬ সেকেণ্ড। অবশ্য ১৯৫৪ সালে ফিনল্যাণ্ডের টুর্কুতে ৩ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডে মাইল পথ দৌড়ে তিনি যে রেকর্ড করে রেখেছেন আজ পর্যন্ত তিনি বা আর কেউ তা অতিক্রম করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক ফুটবল—ইউরোপ সফরের প্রথম খেলায় শক্তিশালী বৃটিশ ফুটবল টীম ১—০ গোলে পর্তুগালকে হারিয়ে দিয়েছে। লিসবনে পঞ্চাশ হাজার দর্শকের সামনে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড [illegible] ২২ মিনিটের সময় খেলার একমাত্র গোলটি করেন। বৃটিশ খেলোয়াড়দের উন্নত ফুটবল কৌশল এবং সব সময়ের আধিপত্য সত্ত্বেও পর্তুগালের গোলরক্ষক [illegible] সদ্ব্যবহার করতে পারলে খেলাটি অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হওয়া অসম্ভব ছিল না।

আন্তর্জাতিক হকি—এক আন্তর্জাতিক হকি খেলায় বৃটেন ৪—১ গোলে জার্মানীকে হারিয়ে দিয়েছে। বৃটেন এবং জার্মান দলে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেরই দুই দেশের অলিম্পিক টীমে স্থান পাবার সম্ভাবনা।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাডমিণ্টন—যুক্তরাষ্ট্র ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলায় ডেনিস চ্যাম্পিয়ান [illegible] কোবেরো আমেরিকা চ্যাম্পিয়ান জো অ্যালস্টনকে ১৭—১১ ও ১৫—৮ গেমে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। ডাবলসের খেলায় কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেন ফাইনালে হারিয়েছে মালয় জুটি ওং পং লিম ওই টেক হককে।

জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ—কটকের বড়বাটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্কুল ছাত্রদের জাতীয় খেলাধুলায় মধ্য প্রদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ছাত্রদের মধ্যে মধ্য প্রদেশ পেয়েছে ৪২ পয়েণ্ট। মধ্য প্রদেশের পরেই পেপসু ও বাঙলার স্থান। এই দুই রাজ্যের স্কুল ছাত্ররা ৩২ পয়েণ্ট করে অর্জন করেছে। ছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় মধ্যপ্রদেশ পেয়েছে ৪৬ পয়েণ্ট আর উড়িষ্যা ৪২ পয়েণ্ট। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় খেলাধুলার এটা ছিল দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। এবারকার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে দিল্লী, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পেপসু ও পশ্চিম বাঙলার ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশ্ব টেবিল টেনিস—টোকিওতে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভায় ঠিক হয়েছে ১৯৫৭ সালের বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা স্টকহলমে অনুষ্ঠিত হবে। তারপর প্রতি বছর বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না হয়ে দুবছর পর পর বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের পর বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসবে ১৯৫৯ সালে।

আন্তঃকলেজ হকি—গত দুবছরের চ্যাম্পিয়ন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ আন্তঃকলেজ হকি লীগ প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে এবারও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। তিনটি গ্রুপে আন্তঃকলেজ হকি লীগ পরিচালনা করা হয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স, বঙ্গবাসী ও স্কটিশ চার্চ কলেজ তিনটি গ্রুপে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় এই তিনটি কলেজের মধ্যে আবার লীগ প্রথায় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ স্কটিশ চার্চ কলেজকে ২—১ গোলে এবং বঙ্গবাসী কলেজকে ১—০ গোলে পরাজিত করে লীগ বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে।

দেশী সংবাদ

৩রা এপ্রিল—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ আজ লোকসভায় পাঞ্জাব রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটি গঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেন। উহাতে পাঞ্জাব রাজ্যকে পাঞ্জাবী ভাষাভাষী এবং হিন্দী ভাষাভাষী দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভিলাই ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য ও নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী এম এল থেবর আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।

৪ঠা এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে নেতাজী তদন্ত কমিটির প্রথম অধিবেশন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যকার অধিবেশনে শ্রী এম এল থেবর সাক্ষ্য দেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এলাহাবাদে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত বর্তমানে শিল্প বিপ্লবের দ্বারদেশে উপনীত।

৫ই এপ্রিল—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বিকানীরে এক জনসভায় সীমান্ত সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে বলিয়াই সীমান্ত অঞ্চলে হাঙ্গামা বাধাইতেছে।

শিলংএ সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, নাগা বিদ্রোহীরা নাগা পাহাড় এলাকায় সাতজন অনুগত নাগা নেতাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্তত চারজনের শিরচ্ছেদ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় উদ্বাস্তু সমস্যাকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থারূপে গণ্য করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

৬ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দির হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেলিয়াঘাটায় সংক্রামক রোগের হাসপাতালটির দুইটি ব্লকের নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। চারতলা বিশিষ্ট উক্ত হাসপাতালে প্রায় ৬৫০টি শয্যা থাকিবে।

৭ই এপ্রিল—ভারত সরকার আজ ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত এলাকাসমূহের দশ মাইলের সীমানার মধ্যে যে কোন বিমানকে কয়েকটি শর্ত ব্যতীত ভারতীয় এলাকায় উড়িয়া আসিতে বা ভারতীয় এলাকা দিয়া উড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

আজ বোম্বাই বিধান সভায় রাজ্য পুনর্গঠন খসড়া বিল ১৯৮—২৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

আজ কলিকাতায় নিঃ ভাঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন শুরু হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবসিরুদ্দিন সভাপতির ভাষণে জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজকে গ্রন্থ-সচেতন করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আজ কলিকাতা যাদুঘরে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলনের ৩৫তম দিবসে অদ্য ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় ১৪ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। এ পর্যন্ত এলাকায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৮৫৫।

৮ই এপ্রিল—জনসাধারণকে ক্যান্সার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার উ[দ্দেশ্যে] আজ কলিকাতায় 'বিশ্ব ক্যান্সার দিবস' [পালন] করা হয়।

বিহারের অন্তর্গত জামুই মহ[কুমার] শিমুলতলায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্[তুদের] পুনর্বসতির উদ্দেশ্যে তথাকার গৃহ রিকুইজিশন করার নিমিত্ত বিহার স[রকার] এক পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া প্রক[াশ]

বিদেশী সংবাদ

৪ঠা এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় [পুত্র] শ্রীমণিলাল গান্ধী আজ দক্ষিণ আ[ফ্রিকায়] ডারবানের নিকটবর্তী ফিনিক্সস্থিত [তাঁহার] বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। [তিনি] কিছুকাল যাবৎ পীড়িত ছিলেন।

৫ই এপ্রিল—পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী পাক জাতীয় প[রিষদে] জানান যে, পূর্ব পাকিস্থান সীমান্তে [বহু] সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করা হই[য়াছে]

৬ই এপ্রিল—পাকিস্থানের প্রধান [মন্ত্রী] চৌধুরী মহম্মদ আলী আজ পাকি[স্থান] জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, বহ[ু] কাশ্মীর সমস্যাটি পুনরায় নিরাপত্তা প[রিষদে] অবশ্যই উত্থাপন করিতে হইবে।

৭ই এপ্রিল—মস্কোর সংবাদে [প্রকাশ] সোভিয়েট নৌবহরের সর্বাধিনায়ক এড[মিরাল] নিকোলাস কুজনেৎসভকে পদচ্যুত [করিয়া] তাঁহার স্থানে এডমিরাল সার্জ গোরস[কভকে] নিয়োগ করা হইয়াছে।

মরক্কো আজ এক অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে স্বাধীনতা লাভ করিল। স্পেন ও ম[রক্কোর] এক যুক্ত ঘোষণায় এই সংবাদ ঘোষণা হয়।

৮ই এপ্রিল—সিংহলের সাধারণ নি[র্বাচনে] এ পর্যন্ত ৬৫টি আসনের ফলাফল [ঘোষিত] হইয়াছে। তন্মধ্যে মহাজন একসথ পে[রামুনা] (ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট) একক বৃহত্তম [দল] হিসাবে ৪২টি আসন লাভ করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—১৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেশ
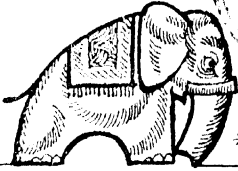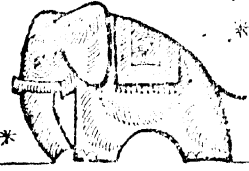
DESH : 6 Annas
SATURDAY, 21ST APRIL 1956

২৩ বর্ষ ॥ ২৫ সংখ্যা ॥ ৷৶০
শনিবার, ৮ই বৈশাখ ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি

গত ১৭ই এপ্রিল আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সাহিত্যের ডক্টর' উপাধিতে বিভূষিত করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঁকুড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এদেশের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অবদান অসামান্য। সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া তিনি অপ্রতিহত উদ্যমে জ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রখর মনীষার প্রভাবে এদেশের সংস্কৃতিকে অশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর। এই বয়সেও বাণীর চরণমূলে তাঁহার তপস্যা চলিয়াছে। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বে তাঁহাকে সাহিত্যাচার্যের সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিনে তাঁহার প্রতি নিজেদের কর্তব্য প্রতিপালন করিলেন ইহা সুখের বিষয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের জ্ঞান সাধনা অর্ধ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। কটকের র‍্যাভেনশা কলেজের অধ্যাপক স্বরূপে তিনি ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সংযোগ ঘটে এবং রামেন্দ্রসুন্দরের তিনি সাহচর্য লাভ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের জ্যোতিষজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণা এদেশের বিদ্বজ্জন সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'নব্য ভারত' 'প্রবাসী' 'দাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে বহু বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এগুলি সংকলিত হইলে জ্ঞান-সম্পদে জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাম্প্রতিক রচনাগুলির মধ্যে 'পূজা পার্বণ,' 'পৌরাণিক উপাখ্যান', 'বৈদিক দেবতা ও কৃষ্টিকাল' এই তিনখানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের যে সব অমূল্য রত্ন এতদিন পর্যন্ত অতীতের অন্ধকার গর্ভে নিহিত ছিল বিদ্যানিধি মহাশয় অতীতের মনীষার আলোকসম্পাত করিয়া সেগুলি চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বৈদিক যুগের সংস্কৃতি সহজে ধারণায় আনা কঠিন, কতদিন পূর্বের সেসব ব্যাপার! বিদ্যানিধি মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অন্তত ৮ হাজার বৎসর পূর্বেকার সেই ঐতিহ্য। সে দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে রহস্যময় এক রাজ্যের আমরা সন্ধান পাই এবং সেই যুগের মানব-সাধনার পরিচয়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। সুদীর্ঘ জ্ঞানানুশীলনের প্রভাবে অতীত কালের আবরণ উন্মোচন করিয়া জাতির ঐতিহ্যকে যিনি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, তাঁহার সাধনা সার্থক। সিদ্ধ পুরুষ তিনি। তিনি আমাদের সকলের নমস্য।

সাহিত্যের স্ফুরণ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি নিখিল ভারত পাঞ্জাবী সম্মেলনে এদেশের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণকে সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষা ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাষার শিকড় মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার। ভাষার মূলের সংযোগ মাটিতে না থাকিলে কোন ভাষাই উন্নতি করিতে পারে না। মৃত্তিকার রস হইতে বঞ্চিত হইলে ভাষা জীবনহীন হইয়া পড়ে; ফলত তখন কোন ভাষাকে চাপাইবার কিংবা দলাইবার প্রয়োজন হয় না, আপনা হইতেই ভাষার মৃত্যু ঘটে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে ভাষার বিকাশ এবং সাহিত্যের পরিস্ফূর্তির সহজ এবং স্বাভাবিক ধারার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; বস্তুত ভাষা সহজ করাতে সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক সকলেরই সুবিধা; কিন্তু ভাষা সহজ করিতে চাহিলেই তো সহজ করা যায় না। কথাটা শুনিতেই সহজ; কিন্তু সহজ করিয়া বলা কিংবা লেখা ততটা সহজ নয়। বৃহত্তের সংবেদনের-পথেই সত্যের সহজ এবং স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটে। জাতির সংস্কৃতির এবং ঐতিহ্যের মূলীভূত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সেক্ষেত্রে মননের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া লইতে হয়। সাধকের দৃষ্টি। সে দৃষ্টির মূলে থাকে আত্মভাবনা; অন্য কথায় আধ্যাত্মিক সত্যের উন্মেষেই এমন রসানুপ্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের বর্তমান সাহিত্য-সাধনার

সার্বজনীন সত্যের সাক্ষাৎ সম্পর্কগত প্রাণ-শক্তির স্ফুরণ ঘটিতেছে না, এজন্য সাহিত্যের সৃষ্টি সমষ্টি-জীবনকে পরিপুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সমগ্রের জন্য তপস্যার প্রেরণা হইতে ভাষা এবং সাহিত্যের সাবলীল এবং সহজভঙ্গী বা রচনা শৈলীর পরিস্ফূর্তি সাধিত হয়। এখানে পরধর্ম ভয়াবহ। বাস্তবিকপক্ষে এই পরধর্মের প্রভাবে পড়িয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে অনেক জট পাকাইয়া উঠিতেছে এবং প্রাদেশিকতার গন্ডী এড়াইয়া পারস্পরিক নৈকট্যবোধ জাতির অন্তরে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে না।

মানবতার আহ্বান

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আসাম এবং সৌরাষ্ট্র সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তিন লক্ষ একর জমি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। জমি যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন উদ্বাস্তুদিগকে দলে দলে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, ইহাই মনে হইতে পারে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ উল্লাস বোধ করিবার কারণ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে জমি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট হইবে, সে জমি কেমন আগে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। প্রত্যুত পুনর্বাসন সচিবের উক্তি এই সম্বন্ধে আমাদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। তাঁহার উক্তি অনুসারে বিহার এবং মধ্য প্রদেশের কিছু জমি ছাড়া অন্য জমিগুলি এখনও অন্নসংস্থানের উপযোগী নয়। এ জমিগুলিতে এখনও জল সেচ, বনোচ্ছেদ এবং অন্যভাবে সেগুলির চাষোপযোগী উন্নয়ন সাধন করা আবশ্যক। উদ্বাস্তু সমস্যা আজ নূতন নয়, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দুর্গত এই সব নরনারীদের জন্য নেতাদের মুখে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের নানাভাবে অভিব্যক্তি সত্ত্বেও এতদিন পরে ইহাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যে জমি জুটিয়াছে, দেখা যাইতেছে সেগুলিও অকেজো। এমন সব জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাঠাইলে তাহার ফল কি হইবে সহজেই অনুমেয়। নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া উদ্বাস্তুরা যখন ফিরিয়া আসিবার জন্য পথ খুঁজিবে তখন দোষ হইবে তাহাদের। তাহারা নিষ্কর্মা, তাহারা প্রাদেশিক মনোবৃত্তি বিশিষ্ট এই সব অপবাদ তাহাদের উপর চাপাইয়া তাহাদের দুঃখের ভার বাড়াইয়া তোলা হইবে। দুর্গত মানুষের এমন বেদনা আমাদিগকে যেন আর দেখিতে না হয়, কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের এই অনুরোধ।

গ্রন্থ-পার্বণ

পুণ্যদিন ২৫শে বৈশাখকে ঘিরে বাঙলার সমাজজীবনে আর এক নতুন পার্বণের শুরু হোক—এ আবেদন আমরা জানিয়েছি। সমাগত এই দিনটির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের। সাতদিনব্যাপী গ্রন্থ-পার্বণের অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠুক—এই কামনা করি। —সম্পাদক দেশ

দায়িত্ব কাহার

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানগণ যাহাতে একটা মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন, এজন্য মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ভারত এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের একটি মিলিত বৈঠক হইবে স্থির হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দার্জিলিংয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম নিরোধ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকারের নিকট ৫টি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে স্থির করা হয়। প্রস্তাবগুলিতে পূর্ববঙ্গ এবং ভারতের মধ্যে যাতায়াতে সুবিধা বৃদ্ধি, ছাড়পত্রের কড়াকাড়ি না রাখা, পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে মণিঅর্ডার পাঠানোর ব্যবস্থা, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশন এবং খেলাধুলা প্র[illegible] সাহায্যে সমধিক সংযোগ সাধন, [illegible] বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা[illegible] সুযোগ বৃদ্ধি এবং চাকুরীতে নি[illegible] সংখ্যালঘুদের অস্ত্রের লাইসেন্স প্র[illegible] এবং সরকার হইতে তাহাদের যেসব বাড়ী ও সম্পত্তি দখল করা হই[illegible] সেগুলি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সুপ[illegible] করা হইয়াছিল। ঢাকার বৈঠকে [illegible] সরকারের পক্ষ হইতে এই সব প্র[illegible] হয়ত উপস্থাপিত করা হইবে, [illegible] ইতোমধ্যেই পাকিস্থান সরকারের [illegible] হইতে নূতন চাল সুরু হইয়াছে। [illegible] যাইতেছে, পাকিস্থান সরকার সর[illegible] ভারতের প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি না [illegible] উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক [illegible] চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। বাহুল্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পুনরাবৃত্তির উদাম। কিন্তু পাকি[illegible] সরকারের মতিগতির ফলে নে[illegible] লিয়াকৎ আলী চুক্তি বাতিল [illegible] গিয়াছে, সুতরাং নূতন কোন চুক্তির [illegible] যে আশাপ্রদ হইবে ইহা মনে করা [illegible] না। প্রকৃতপক্ষে যে সময় নেহরু-লিয়[illegible] আলী চুক্তি সম্পাদিত হয়, এখন [illegible] অবস্থা তেমন নাই। নেহরু-লিয়[illegible] আলী চুক্তি পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু [illegible] বাস্তুত্যাগ নিরুদ্ধ করিতে পারে [illegible] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে মুসলমান বাস্তুত্যাগ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া[illegible] শুধু তাহাই নয়, যে সব মুসল[illegible] উদ্বাস্তুরূপে পূর্ববঙ্গে গিয়াছি[illegible] তাহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাব[illegible] করিয়াছেন, বলা চলে। ফলতঃ পূর্ব[illegible] হইতেই বাস্তুত্যাগীরা পশ্চিমব[illegible] আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে বা[illegible] ত্যাগী হিসাবে কেহ পূর্ববঙ্গে যাইতে[illegible] না। সুতরাং সমস্যাটি উভয় রাষ্ট্রের প[illegible] পারস্পরিক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পা[illegible] স্থান সরকার ভারতকে এই সূত্রে নিজে[illegible] দলে ভিড়াইয়া এতৎসম্পর্কিত তাঁহা[illegible] কলঙ্ককে চাপা দিবার চেষ্টায় আছে[illegible] তাঁহাদের নীতির এইরূপ গতি [illegible] নূতন নয়। আমরা আশা করি, ভা[illegible] সরকার এই ফাঁদে পা দিয়া রা[illegible] আদর্শ এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে রা[illegible] হইবেন না।

এই সপ্তাহে মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের বৃটেন পরিদর্শন শুরু হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাঁরা সদলবলে বৃটেনে পৌছবেন। সম্প্রতি মিঃ ম্যালেনকভ কয়েকদিন বৃটেনের আতিথ্য গ্রহণ করে দেশে ফিরে গেছেন। মিঃ ম্যালেনকভের চেহারা, চালচলন ও কথাবার্তা বৃটিশ জনসাধারণের মনে একটা প্রীতিপূর্ণ অমায়িকতার ছাপ রেখে গেছে। মিঃ ম্যালেনকভের ভ্রমণের খবরাখবর থেকে মনে হয় যে, বৃটেনের তাঁকে যেমন ভালো লেগেছে, বৃটেনকেও তাঁর তেমনি ভালো লেগেছে।

মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ সম্বন্ধে ঠিক এরকম হবে কিনা বলা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে মিঃ ম্যালেনকভ সম্বন্ধে তেমন কোন বিরূপ মনোভাব বৃটেনের ছিল না বা প্রচারের চেষ্টাও হয়নি। বরঞ্চ স্তালিনের মৃত্যুর পরে মিঃ ম্যালেনকভ যখন সোভিয়েটের প্রধান মন্ত্রী হন, তখন এই ধারণাই চালু হয় যে, ডিক্টেটরী শাসনের উগ্রতা হ্রাস এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্বন্ধ সহজতর করার দিকে মিঃ ম্যালেনকভের ঝোঁক। প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুতিতে মিঃ ম্যালেনকভের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। মিঃ ম্যালেনকভ, মিঃ বুলগানিন, মিঃ খ্রুশ্চেভ সকলেই স্তালিনের অনুচর ছিলেন এবং স্তালিনের জীবদ্দশায় স্তালিন-নীতির সমর্থন করেই ক্ষমতার পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু স্তালিনের কর্তৃত্বকালের অনেক নৃশংস কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের উপর যেমন ফেলা যায়, মিঃ ম্যালেনকভের উপর তেমন ফেলা যায় না। সেইজন্য লন্ডনের পোলিশ, চেকোশ্লোভাক ও ইউক্রেনিয়ান রিফিউজিরা মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য যেমন সচেষ্ট হয়েছে, মিঃ ম্যালেনকভের বেলায় সেরূপ হয়নি। অবশ্য মিঃ ম্যালেনকভের আগমনের রাজনৈতিক গুরুত্বও তেমন ছিল না। মিঃ ম্যালেনকভ সোভিয়েটের পাওয়ার প্ল্যান্টের মন্ত্রী হিসাবে এসেছিলেন বৃটেনের পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি দেখতে, কোন উচ্চগ্রামের রাজনীতিক আলোচনার জন্য নয়। মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের আগমনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রাজনীতিক। তাঁরা সোভিয়েটের উচ্চতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আসছেন এবং তাঁদের সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা নিশ্চয়ই হবে।

কেবল বিদেশী রিফিউজীরা নয়, বৃটিশদের মধ্যেও একদল আছে, যারা মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের আগমন পছন্দ করছে না। গত বছর জেনেভায় চার-প্রধানের বৈঠকের সময়ে স্যার অ্যান্টনী

ইডেন সোভিয়েট নেতাদের বৃটেনে আসার আমন্ত্রণ জানান এবং সোভিয়েট নেতারা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তারপর যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে বৃটেনে, বিশেষ করে টোরী পার্টির মধ্যে একদলের নিকট সোভিয়েট নেতাদের বৃটেনে নিমন্ত্রণ করে আনাটা মোটেই ভালো লাগছিল না। রুশ নেতাদের ভারতভ্রমণকালীন উক্তিতে এরা আরো চটে যায়, এমন কি নিমন্ত্রণ বাতিল করা হোক বলেও একটা রব ওঠে। অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাতে কান দেন নি।

তবে একথাও ঠিক যে, রুশ-নেতারা বৃটেনে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, সেটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টও চান না। তার একাধিক কারণ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই বৃটিশ তথা পশ্চিমা শক্তিদের নীতির সঙ্গে সোভিয়েট নীতির বিরোধ চলছে। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আলোচনা চলছে, কিন্তু উভয়পক্ষ একমত হয়ে একটা সমাধান ঘটবে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ অস্ত্রসজ্জার ব্যয়ভার কমাতে সকলেই চায়। বিশেষ করে বৃটেনের যে রকম আর্থিক অবস্থা, তাতে অস্ত্রসজ্জার ব্যয়ভার না কমাতে পারলে বৃটিশ রপ্তানি-শিল্পের ক্রমশ সংকট ঘনিয়ে আসবে এবং তার ফলে বৃটিশ জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বিশেষভাবে আহত হবে। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ও পশ্চিমা শক্তিদের নীতি খাটছে না, সেখানে সোভিয়েট প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। SEATO এবং বাগদাদ প্যাক্টে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হচ্ছে অথচ সেগুলি ত্যাগ করে অন্য নীতি উদ্ভাবনের শক্তির পরিচয়ও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার আণ্টনী ইডেনের গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা দিন দিন অধিকতর প্রকট হচ্ছে। অনেকের মনে হচ্ছে যে, সোভিয়েটের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলে বৃটেনের নানাদিকের সমস্যা লঘু হয়ে আসবে। এ অবস্থায় মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভ যদি বৃটেনে এরূপ ধারণা জন্মাতে সমর্থ হন যে, তাঁরা লোক ভালো এবং সোভিয়েট রাশিয়া বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহশীল, তাহলে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের **পক্ষে বর্তমান বৃটিশ নীতি (বা নীতির অভাব) চালিয়ে যাওয়া আরো কঠিন হবে।**

তাও বা যদি বৃটেনের একলার পক্ষে একটা পরিষ্কার পথ বেছে নেওয়া সম্ভব হোত। কিন্তু বৃটেনকে আমেরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে এবং হবে। মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভকে নিয়ে যদি বৃটেনে খুব বেশি "ঢলাঢলি" হয়, তবে আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া মোটেই ভালো হবে না। এ ভয়ও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আছে। অথচ আমেরিকার সঙ্গেও বৃটিশ নীতির ঠিক মিল হচ্ছে না। আমেরিকা বাগদাদ চুক্তির সমর্থক অথচ বাগদাদ চুক্তিকে নষ্ট করার জন্য যে সৌদী আরব নানাপ্রকার চেষ্টা করছে, তার উপরে আমেরিকা চাপ দিতে রাজী হচ্ছে না—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই ক্ষোভ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তারপর আর এক মুশকিল বাধিয়েছে ফ্রান্স। বাগদাদ চুক্তি ফ্রান্সের একেবারেই পছন্দ নয়। কেবল বাগদাদ চুক্তি নিয়ে নয়, সম্প্রতি ফরাসী প্রধান মন্ত্রী তামাম সামরিক চুক্তি, জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ এবং নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে পশ্চিমা শক্তি-গোষ্ঠীর একতার মূল ভিত্তির দৌর্বল্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ অবস্থায় মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চেভের বৃটেন পরিদর্শন যদি অতিমাত্রায় "সফল" হয়, তবে পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে আরো আশংকার কারণ হবে।

পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে বর্তমান আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবের সুযোগ সোভিয়েট নেতারা নিশ্চয়ই নিতে চেষ্টা করবেন। সোভিয়েট নীতির একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বৃটেন ও ফ্রান্সকে আমেরিকা থেকে যতটা সম্ভব আলগা করা। অবশ্য বৃটেন ও ফ্রান্স আমেরিকা থেকে আলগা হতে পারে না, কিন্তু এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হওয়া সম্ভব (এবং সেটা প্রায় হয়েছে) যাতে মানসিক একতার অভাবের দরুণ পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে সোভিয়েট ব্লক সম্পর্কে একটি সুসঙ্গত একমুখী নীতি কার্যত অনুসরণ করা কঠিন হয়। নিরস্ত্রীকরণ, জার্মান সমস্যা, মধ্যপ্রাচ্য, **সুদূর প্রাচ্য—কোন ক্ষেত্রেই পশ্‌ শক্তিদের নীতি এখন আর একসুরে ব নয়। এক সময় ছিল, যখন আমে তাড়া দিলে সকলে একসুরে গাই বাধ্য হোত। সে অবস্থা এখন নে হঠাৎ একটা চরম সংকট উপস্থিত হ হয়ত আবার সে অবস্থা ফিরে আস পারে, কিন্তু সে অবস্থা যাতে না আ যাতে ভয় খেয়ে বৃটেন, ফ্রান্স আমেরিক পক্ষপুটে আশ্রয় নেবার জন্য না ছে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সেই চে করছেন।**

সোভিয়েটকে ভয় করার কারণ নেই এই ধারণা পশ্চিমা জনসাধারণের মধ্যে জন্মানোই এখন সোভিয়েট নীতির প্র উদ্দেশ্য, কারণ এই ধারণা যতো দৃঢ় হ NATO, SEATO, বাগদাদ চুক্তির ক্রমশ ততো শিথিল হবে। কি আপাতত এই NATO-SEAT বাগদাদ চিহ্নিত জগতের পরিবর্তে কোনরকম জগৎ কল্পনা করার প পশ্চিমা গভর্নমেণ্টগুলির নেই যাচ্ছে। অন্যদিকে সোভিয়েটের সু হচ্ছে এই যে তার পক্ষে বন্ধুত্বের সেটা আন্তরিক হোক বা না হো প্রকাশ করাই যথেষ্ট, কারণ সোভিয়েট বন্ধুত্বের আগ্রহ যদি আন্তরিক না হ সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব গিয়ে পড় পশ্চিমা গভর্নমেণ্টগুলির উপর। সুতর পশ্চিমা শক্তিগুলিকে সোভিয়েট একরকম কোণঠাসা করেছে, সেইজন্যই এতো ভয় পাচ্ছে মিঃ বুলগানিন ও মিঃ খ্রুশ্চে বৃটেনের জনসাধারণকে মুগ্ধ ক ফেলেন। অবশ্য পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠী নায়কগণের যদি নূতন পথে চিন্তা করা সাহস থাকত, তবে এতো ভয় পাবা কোনো কারণ ছিল না। তাঁরা যদি বেড় ভাঙ্গার কাজে সোভিয়েটকে সাহসের সঙ্গে আহ্বান করতে পারতেন, তবে সোভিয়ে নেতাদেরও একটু ঘাবড়াতে হোত। দু ব্লকের জনসাধারণের মধ্যে সাক্ষাৎ-পরিচয় ও লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বানই সোভিয়েট চ্যালেঞ্জের একমাত্র সদুত্তর হতে পারে।

১৭।৪।৫৬

ধারা থেকে মাণ্ডু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

শীতের মধ্যাহ্নশেষে ধার বা ধারা নগরী থেকে গিরিদুর্গ মাণ্ডু অভিমুখে আমার যাত্রা শুরু হল। পথ-মধ্যস্থ গ্রাম 'নালচা' পর্যন্ত মধ্যভারতের স্বাভাবিক রুক্ষ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করে আমাদের যাত্রী ও ডাকবাহী বাস নালচায় খানিক বিশ্রাম নিল, তারপর আরও কিছু ডাক ও যাত্রী সংগ্রহ করে মন্থর থেকে মধ্যগতিতে চলা আরম্ভ করল মাণ্ডুর পথে। ক্রমে আকাশ-ছোঁয়া মাঠের সীমান্তে নীলিমাময় হয়ে উঠল বিন্ধ্যাচল। আমার ও বিন্ধ্যের মাঝে সীমাহীন পথ বোধ হয় খুঁজে পেল দিগন্তের ঠিকানা, তাই সে গিরিরাজের উত্থান-পতনে ক্ষণে ক্ষণে ছন্দপতিত হয়ে দু'একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে হারিয়ে গেছে কোথায়।

অতীতের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আজ রূপ নিয়েছে রূপকথায়। সেকালে কোন এক দিনমজুর কাঠুরে একদিন উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর পাহাড়ী পথে দমভাঙা ওঠানামা করে যখন পেট-ভরা খিদের আধপেটা রোজগার নিয়ে পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরমুখো চলছিল হয়ত তখন কোন ভাগ্যদেবতার দাক্ষিণ্যে পথে পড়া পরশ-পাথরের ছোঁয়াচ লেগেছিল তার কুঠারে। তারপর কুটিরে ফিরে ক্ষীণ দীপশিখার আলোয় দেখে তার চিরসাথী কঠিন কুঠারের রূপালী রঙ কখন যেন নরম সোনালীতে পরিণত হয়েছে। কুঠারের এ ধর্ম-পরিবর্তন তার কাছে হয়ে দাঁড়াল চরম বিপর্যয়। বিভ্রান্ত

মাধ্যমে প্রচারিত হল লোহার কুড়ুল সোনা হওয়ার গল্প। রাজার হুকুমে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। আঁদাড়-পাঁদাড়, বন-বাদাড় খুঁজতে খুঁজতে শেষে এক জায়গায় সন্ধান মিলল পরশ পাথরের। সেইখানে গড়ে উঠল এমন এক নগর, যার সমকক্ষ নাকি সেদিন আর কোথাও ছিল না। সেই নগরেরই আজকের নাম মাণ্ডু।

মাণ্ডুর এ পথের হদিশ জুগিয়েছে সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতক। কান্য-কুব্জের গুর্জর-প্রতিহার রাজন্যদের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে হয়ত নির্মিত হয়েছিল গিরিদুর্গ মাণ্ডু। রথচক্র-চর্চিত সেদিনের এ পথ মুখরিত থাকত নরপতি, সেনাপতি অথবা গজ-অশ্ব-সেনাবাহিনী এবং তাদের কলরব-বৃংহিত ও হ্রেষারবে।

তারপর মালবে প্রবল হয়ে উঠেছিল পরমার সম্প্রদায়। উজ্জয়িনী ছিল স্বাধীন পরমার রাজাদের প্রাথমিক রাজধানী। ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হ'ল ধারা নগরী, পরমার রাজারা ধারাকেই নির্বাচিত করলেন তাদের রাজপুরী। রাজার পর রাজা এল গেল, ধাপের পর ধাপ গৌরবের সোপান অতিক্রম করে চলল ধারা। পরমার এবং ধারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে, একে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হল। প্রচলিত প্রবচন হয়ে উঠল—

যহাঁ পঁওয়ার তহাঁ ধার।
ধার বিনা পঁওয়ার নেহী।
অউর নহী পঁওয়ার বিনা ধার॥

এ খ্যাতি চরমে পৌঁছল মহারাজাধিরাজ মুঞ্জ এবং সম্ভবত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ ভোজের সময় (সম্ভবত ১০১৮—৬০ খৃঃ অঃ)। সমসাময়িককালে ভারতীয় বরপুত্র ভোজরাজের সমকক্ষ সর্বগুণবিভূষিত রাজা উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে বিরল। ভোজ-বিদ্যা শুধুমাত্র ভোজবাজীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জ্ঞানী-সান্নিধ্যে তিনি অমর—'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ,' 'রাজমার্তণ্ড' এবং 'রাজ-মৃগাঙ্ক' ইত্যাদি নন্দনতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতারূপে; শিল্পীর কাছে তিনি অমর 'সমরাঙ্গন-সূত্রধার' নামক শিল্পশাস্ত্রের রচয়িতারূপে; জন-মনে তিনি অমর বীর্যবান নরপতিরূপে। মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবচনঃ—

কাঁহা রাজা ভোজ।
অউর কাঁহা গাঙ্গু তেলী॥

বোধ হয় এটি দিগ্বিজয়ী তেলেঙ্গানা অধিপতি চোলরাজ গঙ্গাইকোণ্ডা চোল অর্থাৎ রাজেন্দ্র চোলের (সম্ভবত ১০১২—৪৪ খৃঃ অঃ) সঙ্গে ভোজরাজের জ্ঞান, বিদ্যা, শৌর্য-বীর্যের তুলনামূলক অভিব্যক্তি। স্থানীয় এক প্রাচীন কাহিনী সমসাময়িককালে ভোজরাজের জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করছে। মহারাজা ভোজ একবার বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করছিলেন। সেই সময় জনসাধারণ তাদের পুণ্যবান রাজা স্বর্গত বলে ধারণা করে নিয়েছিল।

আলমগীর দরওয়াজা

(বিক্রমাদিত্য-পরিষদ মহাকবি কালিদাস নন) দেখতে পেয়ে তাঁকে তাঁর প্রিয় রাজধানী ধারার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস কবিতাছন্দে উত্তর দিলেন--

অদ্যধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ বিদ্যালোক প্রাপ্ত হওয়ার আজ ধারা নগরী আধারহীনা, দেবী সরস্বতী আশ্রয়হীনা এবং পণ্ডিত-সমাজ খণ্ডিত। এ সংবাদ শ্রবণে দেশ-প্রাণ ভোজরাজ শোকাহত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। তখন কবি কালিদাস আর এক শ্লোক বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন---

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ মণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে
ভোজরাজে ভুবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার আজ ধারা নগরী সর্বদা আধারযুক্তা, দেবী সরস্বতী সর্বদা ভোজাশ্রিতা এবং পণ্ডিতকুল জয়মণ্ডিত। আজ আর এই সর্বশাস্ত্রবিদ্ মহৎকর্মী রাজা ভোজের শিল্প-নিদর্শন কালজয়ী হয়ে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সরস্বতীর লীলা-ক্ষেত্র, মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বখ্যাতা নগরী ধারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রিক্তা। তবু নর্মদার দক্ষিণে ঊনবিংশতি কোটি বা ঊনগ্রামে এবং ইন্দোর থেকে শ'খানেক মাইল দূরে মালবের দক্ষিণ-পূর্বে নর্মদা তীরে নেমাবরে আর কৃষ্ণাসিন্ধু তীরে বিহার নগরে তার অল্প কিছু ছিটেফোঁটা চিহ্ন এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। সমগ্র মালবের এ সৌভাগ্যসময় মালব--রাজধানী ধারার মাত্র ২২ মাইল দূরে বিরাজমান বিন্ধ্যাচলের এ পরমাসুন্দরী শ্যামল-স্নিগ্ধ গিরিদুর্গ মাণ্ডু, নিশ্চয়ই ঐ সব সর্বগুণগ্রাহী পরমার রাজাদের সৃজনশীল আশীর্বাদে বঞ্চিত ছিল না।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম বাসের ব্যালকনিতে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে গিরিরাজ বিন্ধ্য। পথের পাশে কালকবলিত জীর্ণ মুশাফিরখানা ও মসজিদ হিন্দুযুগ থেকে আমার চিন্তা মুসলমান আমলে ফিরিয়ে দিল। পথ হঠাৎ ঘুরে গেল বিন্ধ্যের অন্তর্দেশে। কাকড়া-খো এর গভীর খাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হিমালয়কে মনে পড়ছিল। তেমনি অতলস্পর্শী খাদ, শীতে অপরাহ্ণের আবছা কুয়াশা গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে তেমনি উপরে উঠছে। অভাব শুধু দেওদার-শাল-সেগুনের সে গগনচুম্বী উচ্চতার এবং সেই সঙ্গে সে শ্যামলিমার। রুক্ষ আবহাওয়ার মধ্যে দু'চারটে নানাজাতীয় গাছ এদিক-ওদিক থাকলেও তাদের উচ্চতা বিন্ধ্যের মতই সীমাবদ্ধ।

ভারতে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক রূপ ছিল, খাইবার গিরিবর্ত্ম-পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বছর বছর লুঠতরাজ ও কর আদায়ের প্রয়োজনে আক্রমণ এবং পরে নিজ দেশে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করা। ক্রমে তারা বিজিত স্থানে বসবাস আরম্ভ করলেন,

প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারত মুসলমানের কবলিত হ'ল। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সামস-উদ-দিন ইলতুমিস মালব আক্রমণ করে উদ্যান নগরী উজ্জয়িনী, বিদিশা ইত্যাদি জয়োল্লাসে ধ্বংস করে দিল্লী ফিরে যান। কিছুদিন পরে দিল্লীর সুলতান আলা-উদ-দিন খিলজীর হুকুমে তাঁর সেনাপতি আইন-উল-মুলুকে সম্ভবত নপুংসক মালিক কাফুর ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে মাণ্ডু দুর্গ আক্রমণ করে পরমার রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ করেন। সেই সময় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ ভারতও ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে। এই সব লুণ্ঠনধর্মী, ধ্বংসকামী সেনাদলে সৃজনশীল শিল্পী বা যোগ্য স্থপতির সঙ্গ সম্ভব ছিল না, যুদ্ধের প্রয়োজনে কারিগর বা কর্মকার শ্রেণীর সাহায্যই তাঁদের কাম্য ছিল। তাই সঙ্গে নিতেন মিস্ত্রী, কামার ছুতোর ইত্যাদি কারুশিল্পীদের। যখন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজা ধ্বংস করে হঠাৎ তাদের ঈশ্বর উপাসনার ভক্তি জাগতো, তখন বিজিতের ভগ্ন ধর্মমন্দির থেকে মাল-মশলা আর স্থানীয় শিল্পীস্থপতিকে ব্যবহার না করে, দ্রুত মসজিদ নির্মাণের আর কোন উপায় খুঁজে পেতেন না। তাছাড়া ধর্মানুষ্ঠানের পুঁথিগত নিয়ম-কানুন ছাড়া শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার মত জ্ঞানও তাদের ছিল না। ফলে প্রাথমিক মসজিদ, মহল ইত্যাদিতে তুর্কী, আফগান বা পাঠানী স্থাপত্যরীতির সঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন স্থাপত্য প্রায়ই মিলে-মিশে গেছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় দিল্লীর প্রাচীন কুতুব এলাকার কোয়াত-উল-ইসলাম মসজিদে। এখনও সেখানে প্রস্তর-স্তম্ভে কিছু কিছু হিন্দু মূর্তি অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। আর মাণ্ডুর এই প্রাথমিক ইসলাম স্থাপত্যেও যথেষ্ট হিন্দু, জৈন প্রভাব দেখতে পেয়েছি।

এধার-ওধার আরও কয়েকটি জীর্ণ সরাইখানা ও কোতোয়ালীর ভগ্নাবশেষ পেরিয়ে পথ হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল একপাশে অতলস্পর্শী খাদ আর অন্য পাশে গগনস্পর্শী পর্বতের মধ্যে। মাঝে মাঝে [illegible] পথ দু'পাশেই গভীর খাদ রেখে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড় পাড়ি দিয়েছে। এমনি এক পথযোজক পেরিয়ে কালপুরুষের খবরদারী উপেক্ষা করে দুঃসাহসী সুলতানী সড়ক আমাদের হাজির করল উত্তরের প্রথম দুর্গতোরণ আলমগীর-দরওয়াজার মধ্যে। ইতিহাসের পাতায় প্রথম পরিচিত হই শাহেনশা' আলমগীরের সঙ্গে। চমকিত হয়েছিলাম সে চরিত্রের বিভিন্নতা দেখে। আজ সন্ত্রস্ত হলাম বাদশাহ আলমগীরের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধবর্জিত মাণ্ডু দুর্গের দম্ভোদ্ধত গম্ভীর আলমগীর দরওয়াজায় প্রবেশ মুহূর্তে। তারপর আর এক মোড়ে ভাঙ্গা দরওয়াজা পেরিয়ে দিল্লী-মুখী দিল্লী দরওয়াজাকে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে খিড়কীদুয়ার গাড়ি-দরওয়াজার পথে দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার পেলাম আমরা জনসাধারণ।

সন্ধ্যা আগত, শ্মশান স্তব্ধ; জীর্ণ দম্ভাহত, প্রাসাদস্তূপ পিছনে ফেলে বিস্ময়-বিমূঢ় আমাকে নিয়ে বাস এসে থামলো দুর্গমধ্যস্থ গ্রামে। বাস থেকে নেমে একজন লোকের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম। আমার এ স্বল্পভার 'হ্যাভার-স্যাক' আমি নিজেই বহনে সক্ষম হলেও ঐ বোঝা বহনের ছুতো করে অন্তত একজন প্রাণী বা পথপ্রদর্শকের সঙ্গ পাব এই আশায়। এ মৃতের রাজ্যে সবই প্রাণহীন লাগে, কেমন যেন গা ছমছম করে। বহুকষ্টে লোক যোগাড় হলো, তাকে সঙ্গী করে 'রেস্ট' হাউস অভিমুখে রওনা হলাম। এখানে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, বাস থেকে নেমেই স্বাবলম্বী হতে হয়। অবশ্য ভাগ্যবান হলে দু-একজন ভারবাহীর হদিস মিলে যেতেও পারে। এদিক-ওদিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তকমা আঁটা মসজিদ, মাজার, মাদ্রাসা, মঞ্জিল, মহল, তার মধ্যে দিয়ে পথ।

রূপোর কাঠি ছোঁয়াব মত এ রাজপুরীর প্রাণ-ভোমরার খোঁজে কোন সে রাজপুত্র কোথায় অপেক্ষায় রয়েছে, কোথায় বা সেই অনন্ত সুপ্তিমগ্না রাজকন্যা, কোন পুরীতে পাব সেই প্রসাদী বিল্বপত্রের স্তূপ, যার নীচে অস্ত্র নিয়ে আগামী রাত্রের বিভীষিকা

থেকে নিরাপদ হ'ব। পথ ক্রমে অন্ধকার এক তোরণের মধ্যে নিয়ে হাজির করল। সন্তর্পণে অন্ধকার পেরিয়ে আসতে গোধূলির ম্লান আলোতে দেখি সত্যই প্রবেশ করেছি এক রাজপুরীতে। কল্পলোকের সৌন্দর্য ছোঁয়া এ প্রাসাদপুরী যেন "এপার গংগা ওপার গংগা মধ্যিখানে চর"। ওপারে মুঞ্জতালাও, এপারে কাপুরতলাও, মধ্যিখানে যোজকের মত জাহাজ-মহল। হয়ত ওখানে পাব রূপকথার সাগর-ছেঁচা সৌন্দর্যময়ী সেই মেয়ে, জীবন্মৃতা সেই রাজকন্যাকে।

সঙ্গীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নির্দেশনামা পড়ে বুঝলাম তাবেলীমহল অর্থাৎ হাতীশালা-ঘোড়াশালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। দোতলামহল, দোতলার নীচে ছিল আস্তাবল আর উপরে ছিল পাশের তোরণ-রক্ষিণী-বাহিনীর আবাস। বাদশাজাদীর অন্দরমহলে, ক্রীড়া সরোবরের সামনে পুরুষ বা খোজাবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত ছিল, তাছাড়া ইতিহাসের নজিরও পেলাম জাহাজমহলের স্রষ্টা গিয়াস-উদ-দিন খিলজীর (১৪৬৯ খৃঃ অঃ) নিশ্চিন্ত রাজত্বে হুরীর সাম্রাজ্য ছিল এখানে। পাঁচ হাজার তুর্কী, পাঁচ হাজার বিভিন্ন দেশীয় ললনা একুনে পনের হাজার নির্বাচিতা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী খিলজী সাহেবের দেহচর্যা থেকে দেহ-রক্ষা পর্যন্ত সব জানানা-মর্দানার কাজেই নিযুক্তা ছিল এখানে। শাহী খানদানের খাস-খানা বা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ছাড়া পুরুষের এখানে প্রবেশ নিষেধ। শংকাকুল মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম—হে অনধিকার প্রবেশকারী, নন্দনবীর পত্রপুষ্পে বাঁদি নাদান স্বস্থানে থাকবে তো!

মধ্যভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাবেলী-মহলকে রেস্ট হাউস নির্বাচন করে রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। একতলার একটি আধুনিক রেস্তরাঁ, দোতলার বিশাল কক্ষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বাসগৃহ ও ভোজনকক্ষ বানান হয়েছে। সামনে বৃহৎ বারান্দা কাপুরতলাওএর উপর পর্যন্ত প্রসারিত। তিনতলার ছাদে দু'টি মধ্যম আকারের গম্বুজ পাহারা দিচ্ছে চতুর্দিকের সীমানাকে। কুর্ণিশ করে এসে দাঁড়াল রেস্ট হাউসের রক্ষক বা চৌকিদার। পথ দেখিয়ে দোতলায় এনে, আকাশ ছোঁয়া দরজাটি কাঁধের কুলুপে একজোড়া চাবি লাগিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল সে। নীরব নিস্তব্ধ এ পুরীর উপস্থিত আমিই একমাত্র জীবন্ত বাসিন্দা, অতএব প্রথম কক্ষই আমার জন্য নির্বাচিত হল একেবারে গম্বুজের নীচের ঘরে। এত সুবন্দোবস্তযুক্ত রেস্ট-হাউস এদিকে আর কোথাও দেখিনি। প্রতি ঘরের সঙ্গে শৌচঘর। প্রতি ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া, তার উপর টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, আয়না, আরাম-কেদারা, খাট, বিছানা ইত্যাদি—একেবারে এলাহি কারবার। যোগ্য স্থানের যোগ্য ব্যবস্থা। এমন কি রেস্ট-হাউসটিতে বিজলীবাতির বন্দোবস্তও আছে, অবশ্য সেটা চালু করা হয় কোন রাজনীতিক বা শিল্পপতি, নিদেনপক্ষে সরকারী ভৃত্যদের প্রয়োজনে, আমার মত কলাবিদ্ অধমদের জন্য কেরোসিন বাতির ব্যবস্থা।

(ক্রমশ)

॥ ১৯ ॥

"ওঁ মনি পদ্মে হুম্।"

ইংরেজ সাহেবরা আমাকে বলেছিলেন যে, কথাটা তাঁদের কানে শোনায় "মনি পেনি হুম" এর মত। কথাটা আমরা বারবার উচ্চারণ করে থাকি। এ হোল বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র এক মন্ত্র। কথাটার মানে হল পদ্মের মধ্যে মণি আছে। কিন্তু ওটা বাইরের মানে। এর ভিতরের যে মর্মকথা, তার মানে শুধু কয়েকজন জ্ঞানী লোকই বুঝতে পারেন। যেখানে-যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব আছে, বিশেষ করে তিব্বতে, সেই সব জায়গায় এই মন্ত্র অনবরত উচ্চারিত হতে শোনা যায়। ঘর্ঘর ঘোরা প্রার্থনা চক্রের পার্শ্বে, পত্ পত্ ওড়া প্রার্থনা পতাকার নীচে ওই একটি মন্ত্রই খোদা আছে।

"ওঁ মনি পদ্মে হুম্......ওঁ মনি পদ্মে হুম্......"

তিব্বত এক পুণ্য তীর্থ। আর সকল তীর্থের সার এই লাসা। খ্রীষ্টানদের কাছে জেরুজালেম বা মুসলমানদের কাছে মক্কা যা বৌদ্ধদের কাছে লাসা হোল তাই। জীবনে একবার অন্তত লাসায় যাব, এ-কামনা প্রত্যেক বৌদ্ধই করে থাকেন। সে বাসনা আমার বাবা মার'ও ছিল। লাসায় যাবার এক তীব্র বাসনা বহুদিন ধরে তাঁরা মনে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে আর সেখানে যাওয়া হয়ে উঠলো না। আর আজ আমি চলেছি লাসার দিকে। চলেছি লাসায়। এ তো শুধু আমার আশাই সফল করতে নয়, ওঁদের অতৃপ্ত কামনার আগুনে তৃপ্তির আহুতি দিতেও। যারা আমার প্রিয়জন, যারা আমার পরিজন, স্বজন, তাঁদের সকলের হয়ে আমি চলেছি লাসায়। ইয়াকের মাখন কিনেছি, প্রদীপ জ্বালাব। মঠে মঠে, গুম্ফায় গুম্ফায় তাঁদের সকলের কল্যাণে প্রদীপ জ্বালাব। প্রার্থনা চক্রগুলো ঘুরে চলেছে। ঘর্ঘর ঘর্ঘর। আর ওই চক্রগুলোর মধ্যে মন্ত্রলেখা পার্চমেন্ট কাগজের যেসব বাণ্ডিল, তারাও ঘুরে চলেছে। আমার পরলোকগত শাশুড়ীর আশীর্বাদের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। হয়ত তারই কল্যাণে এখানে আসতে পারলাম।

আমি আমার সেই শাশুড়ীর হাতে সমর্পিত হয়, তার জন্য বিশেষ করে আমি প্রার্থনা করলাম। আমরা বলে থাকি, লাসায় যে আসেনি, তার জীবনই বৃথা। এতদিন তার এ ভয় ছিল। এবার আমার সেই ভয় একেবারে সার্থক হয়ে উঠল।

আমি ধর্মভীরু লোক। ভগবানে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি ভগবান বুদ্ধের পথে। বাড়িতে প্রার্থনার একটা জায়গাও আছে। হয় একখানা ঘর কিংবা ঘরের একটা কোণ। প্রার্থনার জায়গা। বৌদ্ধ মাত্রেই এই জায়গাটুকু রেখে থাকে। আমি ধার্মিক, কিন্তু গোঁড়া নই। আচার-অনুষ্ঠানে আমার অত আস্থা নেই, বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই কুসংস্কারে। আমার জীবনে বহু পাহাড়ে চড়েছি। কিন্তু সেখানে দৈত্য-দানবের বাস, একথা ভাববার অবকাশ খুব বেশি পাইনি। আর ভূত-প্রেত, না, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে উঠতে পারিনি। এই তো কয়েক বছর আগেও একটা ভূতের খোঁজে, ভূত নয় পেত্নী, বেরিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা আমাদের তুঙ্‌সাঙ্ বস্তীতে নাকি নেকনজর ফেলেছিলেন। তাঁর কথা বস্তীর লোকেদের মুখে মুখে ফিরছিল। তাঁর সন্ধানে আমিও ঘুরেছিলাম। কিন্তু হায়! দেখা পাইনি। ভূতপ্রেতের মত ধর্মের গোঁড়ামিও আমি মানিনে। আমি অন্যান্য ধর্মের এমন অনেক

লাসার বাজার

লোককে জানি, যাঁদের বিশ্বাস করতে দেখেছি, বলতে শুনেছি যে, তাঁরা ভ্রান্ত, বৌদ্ধদের পথই একমাত্র পথ। ঠিক পথ। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া জানি না। লামা নই। পণ্ডিতও নই। ধর্মাধর্মের আমি কিছুই না জানি। কিন্তু আমি অনুভব করি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, এই পৃথিবী এতো বড় যে, এর মধ্যে অনেক মত, অনেক পথ, অনেক বংশ, অনেক ধর্ম, অনেক জাতি অনায়াসে এক-সঙ্গেই থাকতে পারে। অনায়াসে। ওরা সব ঈশ্বরেরই প্রকাশ। আর ঈশ্বর যেন এক মহিমময় পর্বত। তাঁর কাছে এগিয়ে যাও, ভয়ে ভয়ে নয়, ভালবেসে। সেইটেই হোল বড় কাজ।

অন্তত আমি তো তাই বুঝি।

সত্যিকারের ধর্ম এক জিনিস। আর তার বাইরের রূপ, তার আচার-অনুষ্ঠান, দুঃখের বিষয়, অনেক সময় অন্য জিনিসও হয়ে দাঁড়ায়। তাই অন্যান্য ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মেও এমন অনেক জিনিস হামেশা ঘটে, যার সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনার খুব বেশি কিছু সম্পর্ক থাকে না। আমাদের লামাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী লোক আছেন। তাঁরা সত্যিকারেরই জ্ঞানী।

প্রাচীন সব পুঁথি

খুব সুপণ্ডিতই তাঁরা। অধ্যাত্মবাদী। তাঁদের মধ্যে আবার এমন লোকেরও দেখা পাওয়া যায়, যাঁরা শুধু গরু চরাবারই উপযুক্ত। গরু-ভেড়ার তদারকি ছেড়ে মানুষের আত্মার তদারকের ভার তাঁরা যে কেন নিলেন, সেকথা ভেবে অবাক হতে হয়। এই জাতীয় লোকেরা সন্ন্যাসী হয়েছেন শুধু যে পরের ঘাড়ে চেপে রাজার হালে থাকার জন্যেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ বিষয়ে শেরপাদের মধ্যে প্রচলিত ভারি একটা সুন্দর গল্প আছে। গল্পটা আমার খুব ভাল লাগে। শুনে আমার মনে হয়েছে এটা একেবারে বানানো কথা নয়। গল্পটা দুজন লামা সম্পর্কে। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। একবার এক বাড়িতে এসে দেখলেন, সেখানে এক স্ত্রীলোক শুয়োরের মাংস রান্না করছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা লক্ষ্য করতে লাগলেন, ভং বং করে মন্তর ঝাড়তে লাগলেন, আর ঘুরঘুর করে তাঁদের প্রার্থনা চক্রটি ঘোরাতে লাগলেন। এমন সময় মেয়েটি উনুন ছেড়ে অন্য একটা ঘরে গেল। সেও জায়গাটি ছেড়েছে আর লামাদের একজন তড়াক করে উনুনের সামনে গিয়ে খপ্ করে মাংসটা তুলে নিয়েছে। কিন্তু সেটা মুখে পোরবার আগেই মেয়েটি আবার ফিরে এলো। তাই দেখে সেই লামা তাড়াতাড়ি তাঁর তেকোণা টুপীর মধ্যে মাংসটা ঢুকিয়ে দিলেন। দিয়ে গুটি গুটি সেই স্থানটি ত্যাগ করবার উপক্রম করলেন। কিন্তু মেয়েটি উনুনের দিকে নজর দেবার আগেই লামাদের ডেকে বলল তার জন্যে একটা প্রার্থনা করতে। আর অমনি তাঁরা প্রার্থনায় বসে গেলেন। কয়েক মিনিট বেশ কাটল। হঠাৎ আর একজন লামা দেখলেন যে, তাঁর বন্ধুর টুপীর মধ্যে দিয়ে মাংসটা গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর বন্ধুকে সাবধান করাও চাই, আর মেয়েটির চোখে ধুলো দেওয়াও চাই। তাই এই লামা মহাপ্রভুটি একটু নতুন ধরনের মন্তর ছাড়তে শুরু করলেন। "ওঁ মনি পদ্মে হুম, মাংসটা বেরিয়ে পড়েছে হুম, ওঁ মনি পদ্মে হুম, মাংস হুম, বেরিয়ে পড়েছে হুম।" কিন্তু সেই লামা তার বন্ধুর এই হুম-হাম্-এ কান না দিয়ে হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করে প্রার্থনা মন্ত্র পড়তে থাকল আর কেমন এক

অদ্ভুতভাবে নাচতে শুরু করে দিল। অন্য লামাটিও মরিয়া হয়ে উঠলো। সেও জোরে জোরে বলতে লাগল, "ওঁ মনি পদ্মে হুম্, ওঁ মনি পদ্মে হুম্, ওঁ মাংস হুম্।" কিন্তু ইতিমধ্যে তার বন্ধুটি এমন লাফাচ্ছে যে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে শত শত দৈত্য-দানো গিয়ে হানা দিয়েছে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "ধ্যাত্ তেরি তোর মাংস, গোটা শুয়োরটা দাপাদাপি করলেই বা কি আসে যায়। এদিকে আমার চাঁদি যে পুড়ে গেল বাবা!"

যা হোক, লামার টুপীর নীচে গরম মাংস যোগান দিতে আমি মোটেই ব্যতি-ব্যস্ত নই। এভারেস্ট থেকে আমি ফিরে আসবার কিছু পরে একটা মঠে আমাকে মোটা রকম চাঁদা দিতে বলা হয়েছিল। মঠটা দার্জিলিংয়ের কাছেই। কিন্তু ভেবে-চিন্তে দেখে আমার মন এতে সায় দিল না। আমি দেখলাম, তার থেকে এ টাকাটা গরীব লোকদের জন্য হোস্টেল বা সরাইখানা বানাবার কাজে ব্যয় করলে সৎকাজ করা হবে। সন্ন্যাসীদের হাতে টাকাটা পৌঁছলে হয়তো তাঁরা নিজেদের সেবায় উৎসর্গ করে দেবেন।

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনও বলছি যে, ধর্মে আমার প্রীতি আছে। মনে হয় বেশিই আছে। কেননা, ধর্মের মধ্যে যা সত্য, তার প্রতি আমার বিশ্বাস অবিচলিত। যা লোক দেখানো, যা ভড়ং, তাতে আমার কোন বিশ্বাস নেই। এভারেস্টে উঠে আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল। ভগবান আমার সমস্ত চিন্তা জুড়ে বসেছিলেন। ঠিক এই ভাব তিব্বতে যাওয়ার সময়ও আমার ছিল। এবারেও শুধু ভগবানকেই ভেবেছি। আমার বাবা-মার কথা, আমার শাশুড়ীর কথাও আমার বারবার করে মনে হচ্ছিল। ভগবানে তাঁদের বিশ্বাস কত অটুট। আমি জানতাম, আমার এই যে তীর্থযাত্রা, এ শুধু আমার জন্যই নয়। ওঁদের জন্যও।

ওঁ মনি পদ্মে হুম্ . ওঁ মনি পদ্মে হুম্

আমরা 'মনি' প্রাচীরগুলোকে আমাদের বাঁদিকে রেখে পার হয়ে গেলাম। এই-ভাবেই এগুলো আমরা পার হয়ে থাকি। 'সেরতেন'-এর লম্বা লম্বা সারিগুলোও পেরিয়ে গেলাম। এরা মৃতদের আত্মা-গুলো রক্ষা করে। পত্-পত্-ওড়া প্রার্থনা পতাকা ছাড়িয়ে গেলাম। ছাড়িয়ে গেলাম ঘর্ঘর-ঘোরা প্রার্থনা চক্র আর প্রাচীন মঠগুলো। উঁচু মালভূমির উপর একা-একা এরা কেমন দাঁড়িয়ে আছে।

লাসার এক পাঠশালা

অবশেষে লাসা যাচ্ছি। লাসায়।

গাংটক থেকে আমাদের কুড়ি দিন লাগল। যখন আমরা চলতাম, চলতাম খুব দ্রুতই। অন্তত ওই অঞ্চলের পক্ষে ওটা খুবই দ্রুতবেগে চলা। অধ্যাপক তুচ্চি ক্লান্তি কাকে বলে জানেন না। সহিষ্ণুতা তাঁর ধাতে লেখাই নেই। কখনও কখনও মঠে মঠে আমাদের থামতেও হোত। যদি কোন প্রাচীন কিছু পাওয়া যায়, সেই কারণে। প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, কি কোন শিল্প, সেই সব সংগ্রহ করবার জনাই তুচ্চি সাহেব এবারে বেরিয়েছেন। কিন্তু পথে ঘাটে যেসব টুরিস্ট দেখা যায়, এই সাহেব তাঁদের মত নন। তিনি পরিষ্কার জানেন, কি তিনি চান আর কি চান না। প্রায়ই দেখতাম তুচ্চি সাহেবের জ্ঞান দেখে লামারা অবাক হয়ে যেতেন। তাঁদের কাছে যেসব জিনিসপত্র আছে, তার খবর তাঁদের থেকেও তিনি ভাল রাখতেন। রাত্রে নিজের তাঁবুতে বসে তিনি কাজ করতেন।

মন্দিরের পর মন্দির

পড়তেন। নোট লিখতেন। গভীর রাত পর্যন্ত। সেই সময় কেউ যদি তাঁকে বিরক্ত করতো তো ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। তারপর রাতদুপুরে কি শেষ রাত্রের দিকে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন। আমাদের ডেকে বলতেন, "ওহে, আমার কাজ সারা। ওঠো ওঠো, এবার রওনা দিতে হয়।" আর তৎক্ষণাৎ আমাদের উঠতে হোত আর যাত্রাও করতে হত।

তারপর সেই স্মরণীয় দিন এল। অবিস্মরণীয় দিন। এক সোনালি সকালে সামনে তাকিয়ে দেখি আর ধূলিময় প্রান্তর নেই। ইয়াকের পাল নেই। জনহীন মঠগুলোও নেই। কয়েকটা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ কোলের মধ্যে শোওয়া এক বিরাট নগরী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পর রাস্তা, চত্বরের পর চত্বর, বাজারের পর বাজার আর মন্দিরের পর মন্দির। লোকজনের ভীড়, জীব জন্তুর ভীড়। আর সবকিছু ছাড়িয়ে শহরের প্রান্তে পোটালার বিরাট প্রাসাদ ঝকমক্ করছে। এই হোল দালাই লামার বাড়ি। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। মনে-মনে আউড়ে নিলাম প্রার্থনার মন্ত্র। আর তারপর ঢুকে পড়লাম লাসায়।

তুচ্চি সাহেব এখানে বেশ পরিচিত ব্যক্তি। তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন। আমরা খুব সমাদর পেলাম। আর পেলাম থাকবার জন্যে এক বিরাট বাংলো। অভ্যর্থনাও অনেক পাওয়া গেল। সরকারী আর বেসরকারী দুই রকমেরই। কিছু কিছু অভ্যর্থনা শহরের বাইরে, মাঠে, ঘোড়ার পিঠে চড়েই দেওয়া হলো। এ-দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। আমি যে কে, তা এখানকার লোক প্রথমে ধরতে পারেনি। আমার মুখ অনেকটা তিব্বতীদের মত। কিন্তু পোশাক, আদবকায়দা ভিন্ন। আবার যখন দেখলো যে, আমি তাদের ভাষা বলতে পারি, তখন তো সবাই থ মেরে গেল। যখন তারা শুনলো যে, আমি শেরপা, তখন তারা পাহাড় আর পাহাড়-চূড়া সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। এক অভ্যর্থনা সভায় আমি জাঁদরেল সব সরকারী কর্মচারীদের সাহেবদের সঙ্গে গাড়োয়াল হিমালয়ের অনেক ফটো দেখালাম। অন্যান্য পাহাড়ের নামও শোনেনি। কিন্তু একটি পাহাড়কে চেনে। সবাই চেনে। সেটা হোল চোমোলাঙমা। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কি মনে কর যে, কেউ একদিন এর উপর উঠতে পারবে? সত্যি সত্যি পারবে?" আমি জবাব দিলাম, "মানুষের পক্ষে তো অসম্ভব কিছু নেই। যদি চেষ্টা করে তবে একদিন সে উঠবেই।" তারপর তারা বললে, "তোমার ভয় করে না? সেখানে যে দেবতারা থাকেন, দৈত্যেরা থাকে।" এবার আমি বললাম, "আমি তো মরতে ভয় পাই না। পথ দিয়ে চলতে গেলেও তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাহলে আর পাহাড়ে উঠতে ভয় পাব কেন?"

(ক্রমশ)

নীলগিরির টোডা আদিবাসী

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম তটের প্রহরী পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নীলগিরি মালভূমিতে গিয়ে মিশেছে। চিরশ্যামল পাহাড়ের প্রাচীরের বিষম চতুর্ভুজের মধ্যে দক্ষিণের টোডা আদিবাসীর বাস। '৫১ সালের জন-গণনায় নীলগিরি জেলার টোডাভাষাভাষী-দের সংখ্যা মাত্র ৮৭৯; স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় আধাআধি। '৪১ সালের আদম-সুমারীতে টোডা বা টুডা আদিম সমাজের মোট সংখ্যা নিরূপিত করা হয়েছিল ৬৩০।

ভারতের আদিম জনসমষ্টির অত্যন্ত নগণ্য অংশ টোডা উপজাতি। কিন্তু জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে এই পরিমিত গোষ্ঠী বহুদিন থেকে বাইরের জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহির্জগতের মানুষের কৌতূহল যে সব সময় কল্যাণকর হয়েছে, তা কিছুতেই বলা যায় না। টোডাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে, সে অনুপাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও দরদ দিয়ে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও চেষ্টাই হয়নি। নীলগিরির পাহাড়ের গায়ে উটকামণ্ড, ওয়েলিংটন প্রভৃতি শৈলাবাস গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ-মালভূমির রৌদ্রদগ্ধ মানুষ শান্ত, শীতল শৈলাবাসে গিয়ে ভিড় করেছে। আবার পাহাড়ের ঘন বন-আবরণ পরিষ্কার করে চা ও কফির ক্ষেত, ফলের বাগান এবং বিলেতী শাকসব্জীর বাগিচা গড়ে উঠেছে। সে কাজে ভারতীয়, অ-ভারতীয় বহু জনসমাগম নীলগিরিতে হয়েছিল। ১৮৬৮ খৃঃ ডক্টর শর্ট এ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অত্যন্ত নির্মম ভাষায় বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় চা-করদের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক যৌনব্যাধি সরল আদিবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। বিত্তশালী ক্ষমতাবান বহির্জগতের লালসার শিকার হয়েছে প্রায় সমস্ত টোডা রমণী। পরবর্তী যুগে টোডাদের সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থকার ডাঃ রিভারস বা থার্স্টন এই সিদ্ধান্তকে অত্যুক্তিপূর্ণ বলেছেন। কিন্তু সভ্য-মানুষের সংস্পর্শে এসে টোডারা যে রোগদুষ্ট হয়েছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি।

টোডা আদিবাসী সমাজ তাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে, এমন কি, কিম্বদন্তীর কাহিনীর মধ্যেও অতীত দিনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। নৃতত্ত্ববিদেরা বহু রকমের বিচিত্র অনুমান করেছেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তকে সপ্রমাণ করার জন্য উপযুক্ত তথ্য উপস্থিত করতে পারেন নি। টোডাদের সুঠাম স্বাস্থ্যবান দেহ, উন্নত নাসিকা দেখে অনেকে রোমকদের সঙ্গে নীলগিরির এই আদিবাসী সমাজের যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ভাষাবিদ্ বারনার্ড স্কিমিড টোডা বাক্যাবলীর দুই-তৃতীয়াংশই তামিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিশপ কল্ডওয়েলের অভিমত অনুরূপ। ডক্টর পোপ কিন্তু টোডা ভাষাকে প্রাচীন কন্নড় ভাষার এক কথিত ও বর্তমানে প্রায় লুপ্ত রূপ বলে উল্লেখ করেছিলেন। ডক্টর রিভারসের মতে টোডারা প্রতিবেশী

টোডা

টোডা তরুণী

বড়গাদের কাছে ভাষার শব্দসম্ভারের জন্য ঋণী।

নীলগিরির বনাচ্ছাদিত মালভূমিতে আরও কয়েকটি আদিবাসীর বাস। কোটা উপজাতিরা টোডাদের উৎসব অনুষ্ঠানে বাজনা বাজায় এবং কৃষির সাধারণ যন্ত্রপাতি দা, কুড়াল, ছুরি প্রভৃতি সরবরাহ করে। প্রতিদানে আগেকার দিনে কোটাদের কোনও দাম দিতে হতো না। উৎসবে যে মোষ টোডারা বলি দিত, তার মাংস কোটারা নিয়ে যেতো এবং মৃত পশুও কোটারা খেতো। টোডারা সম্বর ছাড়া অন্য কোনও মাংস খায় না। মোষ বলি প্রতিটি শুভকাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু সে মাংস কেউ খায় না। বড়গা আদিবাসীরা টোডাদের ইন্দ্রজালশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভীত। টোডা পুরোহিতের কোপদৃষ্টি তাদের গোপাল বা গ্রামের উপর পড়লে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ইরুলা উপজাতিও টোডাদের আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু আগেকার দিনে নীলগিরির সুউচ্চ প্রাচীর এই দুই খন্ড জাতির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছিল। টোডারা প্রতিবেশী কুরুম্বর আদিবাসী-দের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। কিছুদিন আগেও আপদে-বিপদে, রোগে-ভোগে টোডারা কুরুম্বর ওঝাকে ডেকে নিয়ে আসতো।

টোডাদের জীবিকা সংস্থানের প্রধান উপায় মহিষ-ধন। অর্ধবন্য মহিষ পাল প্রতি পরিবারের প্রধান সম্পত্তি। বৃটিশ শাসনের আগে সমস্ত নীলগিরি উপত্যকাই তাদের চারণভূমি ছিল। মহিষ দলকে নিয়ে ভ্রাম্যমান আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড়ের কোলে 'ঝুম' প্রথায় কিছু কিছু চাষবাস করতো। তারপর বহিরাগত মানুষের আনাগোনায় জমির পরিমাণ সংকুচিত হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে টোডা মন্ডকে (গৃহকে কেন্দ্র করে জনসমষ্টি) স্বতন্ত্র পাট্টা দেওয়া হলো। প্রথমে ঝুম প্রথায় যে সমস্ত জমি তারা কখন না কখন চাষ করত, তার সবটার উপরই টোডা মণ্ডের অধিকার স্বত্ব মেনে নেওয়া হয়। পরে আইন পরিবর্তন করে মোট জমির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। জমি হস্তান্তরিত করার অধিকার বন্ধ করার আগে, বহিরাগত মানুষে অনেক টোডা জমি হস্তগত করে, এখন চারণভূমি, পূজো ও মৃতদেহ সৎকার স্থান এবং বাসভূমি আইনত কোনও টোডার কাছ থেকে বাইরের কেউ কিনতে পারে না।

টোডা পুরুষের ঘন কুঞ্চিত কেশদাম এবং গালভরা দাড়ি তাকে প্রাচীন প্রাজ্ঞের পর্যায়ভুক্ত করে। উন্নত, বলিষ্ঠ দেহাবয়বের মধ্যে বিরাট চোখ এবং পরিষ্কার দন্তপাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার, নাসিকাও সমুন্নত। টোডা রমণী যৌবনে বিশেষ সুন্দরী। কেশ পরিচর্যা একটু স্বতন্ত্র রকমের। ছোট ছোট বেণী পাকিয়ে দুপাশের ঘনকাল কেশরাশিকে টোডা স্ত্রীলোক বহু আয়াসে সাজিয়ে রাখে। অঙ্গাবরণের বৈচিত্র্যে টোডা পুরুষকে আরও গাম্ভীর্য ও বিশালতা দান করে। অন্তর্বাস কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত সামান্য এক টুকরো কাপড় (কুভন)। কিন্তু তার উপরে মোটা পুটকুলি চাদর দিয়ে টোডা যুবক বৃদ্ধ নিজেদের আবৃত করে। পুটকুলির রঙ সাদা, কিন্তু চারদিকে গাঢ় লাল আর সবুজ চওড়া পাড়। মেয়েদের অলঙ্কার খুব পরিমিত। গলায় রুপো বা মুদ্রার হার। অনেকে কড়ি ও পুঁতির আভরণেও সজ্জিত হয়। মেয়েদের বস্ত্রাবাসও পুরুষের মত, তবে পুটকুলি পরার ধরন আলাদা।

বেশ পারিপাট্য এবং দেহ-সৌন্দর্য দেখার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বীভৎস

গন্ধ। টোডাদের সান্নিধ্যে এসে একটু অপ্রতিভ হয়েই কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। শুনেলাম, মাখন এবং সর মাখিয়ে পুটকুলিকে মজবুত করা হয়। তারই দুর্গন্ধ টোডা গৃহ ও পরিবেশকে মশগুল করে রাখে। দিল্লীতে আগত টোডা দলকে দেখতে গিয়ে তাই একটু সন্ত্রস্তই হয়েছিলাম! ২৬শে জানুয়ারীর লোক-নৃত্য উৎসবে যোগদানকারী দলকে সম্ভবত নীলগিরির থেকে তালিম দিয়ে নিয়ে আসা হয়। মাখনের পরিবর্তে পাউডার, এসেন্সের দ্বারাই বস্ত্র ও দেহ-সজ্জা করা হয়েছে, তা বুঝলাম।

টোডাদের মধ্যে একশ' বছর আগেও স্ত্রী-শিশু হত্যা এবং বহুপতিক বিবাহ-বিধি প্রচলিত ছিল। আজ তার বিবরণ কেবলমাত্র গত যুগে লিখিত বইপত্র থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব। স্ত্রী-সন্তানকে শৈশব অবস্থাতেই কেন হত্যা করা হত, এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ পণ্ডিতেরা করেছেন। মাতা নিজের যৌবনকে অকালে সন্তান পরিচর্যায় নষ্ট করতে চাইতো না বলেই এ-বিধি প্রচলিত ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। টোডা গ্রামবৃদ্ধরা পণ্ডিতদের বলেছিল যে, অসহনীয় দারিদ্র্যই তাদের এই সাংঘাতিক শিশু-হত্যায় প্রবৃত্ত করাত। আগেকার দিনে নাকি একটি মণ্ডে সবার পরিধানের জন্যে একটিমাত্র বহির্বাস পুটকুলি থাকত। একজন বাইরে গেলে আর সবাইকে ঘরে থাকতে হতো।

প্রভাতে উদিত সূর্যকে টোডারা ভক্তি-ভরে প্রণাম করে। চন্দ্রও অন্যতম উপাস্য দেবতা। ধরিত্রী ও আকাশের স্রষ্টা কাজেভগ দেব। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অদৃশ্য সে দেবের উদ্দেশ্যে আদিবাসীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এবং প্রার্থনা করে যে, তাদের গৃহ, পরিবার, পরিজন এবং মহিষপাল যেন সুরক্ষিত থাকে। মৃত মানুষের আত্মা বলির মহিষাত্মার সঙ্গে মাকুর্তি গিরিশৃঙ্গ পার হয়ে অমরাবতী আমনাদে যায়। পথে কিন্তু জোঁকময় এক জলাশয় পার হতে হয় সরু সুতোর উপর দিয়ে। পাপীরা সে-নদী অতিক্রম কিছুতেই করতে পারে না। সুতো ছিঁড়ে দুষ্টাত্মা জলে পড়ে যায় এবং অনন্তকাল ধরে জোঁকময় জলাশয় পুকেরিজেন-এ তাকে কাটাতে হয়। যে লোক দান-ধ্যান করে না, অনবরত প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে এবং চুরি করে, তার ভাগ্যে জোঁকপূর্ণ অনন্ত নরক অবধারিত। এর বেশি কোনও অপরাধ এই আদিবাসী সমাজে কেউ করে না।

সর্বপ্রথম টোডা এন এবং তার পৌত্র বেটোকান মুগয়ার অধিষ্ঠাতা দেবরূপে পূজিত হয়। ওয়াইনড় তালুকে নম্বল-কোড়ে বেটোকান স্বামী কোভিল বা মুগয়াদেবের মন্দির আছে। প্রতিবেশী হিন্দু মন্দিরেও সন্তান প্রাপ্তির আশায় টোডারা মানত করে। অনেকে আবার সন্তান না জন্মানো পর্যন্ত চুল কাটে না। দেবের বরলাভে অভীষ্ট সিদ্ধি হলে, মাথার জটা দেবস্থানে কেটে ফেলাই বিধেয়।

কোনও মণ্ডে কেউ মারা গেলে আশে-পাশের মণ্ডে খবর দেওয়া হয়। শবকে পরিপাটি করে নতুন পুটকুলি পরিয়ে, তার অলংকার দিয়ে সাজিয়ে শবাধারে স্থাপন করা হয়। ঘরের মধ্যে প্রদীপ ও ধূপদানিতে কর্পূর জ্বলে। সেদিন মণ্ডের কোনও অধিবাসী বা সমাগত বন্ধু-বান্ধবেরা খাদ্য গ্রহণ করে না। পরদিন শবাধারে ধনুর্বাণ, গুড়, নারকেল, কলা, তামাক, বাঁশ, কড়ি প্রভৃতি রাখা হয় এবং ঘি দিয়ে সব কিছু শবের সঙ্গে দাহ করা হয়। এর প্রায় দু মাস পরে কেদু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃতের আত্মীয়জন সম্পূর্ণরূপে অশৌচমুক্ত হয়। সেদিন সযত্নে রক্ষিত মৃতের কেশরাশিকে ঘিয়েতে ভিজিয়ে দাহ করা হয় এবং কোটা বাদক দলের উপস্থিতিতে পবিত্র শোলা-কুণ্ডে অর্ধবন্য মহিষ বলি দেওয়া হয়।

নীলগিরির উপত্যকায় ৫।৬টি স্বতন্ত্র কুটীর নিয়ে এক একটি টোডা গ্রাম বা উপনিবেশ। কুটীরের আকার অনেকটা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ির উপরিভাগের মত। সাধারণ টোডা বাসগৃহ প্রায় দশ ফিট উঁচু, বিশ ফিট লম্বা এবং দশ ফিট চওড়া। এত বড় আবাসের প্রবেশপথ কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় আর

একটু স্থূলকায় অনভিজ্ঞের পক্ষে রীতিমত প্যাঁচ কষে প্রবেশদ্বার পার হতে হয়। ঘরে কোনও রকম দুয়োর, জানলা নেই এবং বসবাস, রান্নাবান্নাও ঐখানেই হয়। ফলে ঘর অপরিচ্ছন্ন, ধোঁয়া ও কালিতে ভরা। প্রতি গ্রামেই একটি বিশেষ কুটীর-তিরিব্রি মহিষপালের পুজো ও পুজারীর জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। পুরোহিত পালাল বা পালকারপাল গ্রামবৃদ্ধদের সম্মতি নিয়ে নিযুক্ত হয়। পৌরোহিত্য করার সময় কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, যদিও বিবাহিত লোকের পক্ষেও এ-পদ অধিকার করা সম্ভব। কিন্তু সে অবস্থায় স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতে হয়। তিরিব্রিতে কোনও নারীর প্রবেশ অধিকার নেই। একমাত্র বালকের দল ছাড়া অন্য পুরুষের পক্ষেও মহিষ-মন্দিরে প্রবেশে প্রচুর বিধিনিষেধ আছে। মহিষপালের তদ্বির-তদারক করার জন্যে রাখাল কালতমাককে নিযুক্ত করা হয়। পুজো অনুষ্ঠানেও কালতমাক পুরোহিতকে সাহায্য করে এবং গ্রাম-

টোডা

জ্যেষ্ঠদের মত নিয়ে কালতমাকও পুরোহিত পদে উন্নীত হতে পারে। তিরিব্রিতে বিশেষ এক স্ত্রী-মহিষের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয় এবং প্রতিদিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুরোহিত এই স্ত্রী-মহিষের পুজো করে।

টোডা বিবাহবিধি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। আগে এক পরিবারের বিভিন্ন সহোদর ভাইরা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করত। সন্তানের পিতৃত্ব নিরূপণ করার জন্যে বিশেষ এক বিধি প্রচলিত ছিল। পুসুতপিনি অনুষ্ঠানে গর্ভবতী স্ত্রীকে সে ধনুক উপহার দিতো, সেই সন্তানের জনকরূপে স্বীকৃতি লাভ করতো। যে কোনও ভাই এভাবে পিতৃত্বের অধিকারী হতে পারলেও সাধারণত বড়ভাই ধনুক দান করতো। পরে প্রয়োজনবোধে অন্য কাউকে দিয়ে ধনুক দিয়ে পিতার নাম পরিবর্তন করার বিধিও প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে খুব বিস্তৃত কিছু না জানলেও একথা একরকম নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহুপতিক বিবাহ বন্ধনে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। শিশুহত্যা বন্ধ হয়ে যাবার পর স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার বিষমতাও অনেক কমে যায়। তখন প্রত্যেক ভাই-ই বিবাহ করতো, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক দুইজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। যে কোনও ভাই অন্য ভ্রাতৃবধূর স্বামীর সুযোগ গ্রহণ করারও অধিকারী ছিল। ধীরে ধীরে অবশ্য এ ব্যবস্থাও লোপ পেয়েছে। বর্তমান টোডা রমণীর স্বামী একজনই এবং বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পর তা সাধারণত স্থায়ীই হয়।

[illegible]টা নেই বলে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি [illegible]। শিবনারায়ণবাবু যে সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বলছেন তা হলো উনবিংশ শতাব্দীর ডিকাডেন্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আদর্শ; গোটের The Sorrows of Werther এর মধ্যেও ছিল অবক্ষয়ের বীজ। সে আদর্শ বাতিল হয়ে গেছে।

শিল্পীর সৃষ্টির অনুভূতি অনেক অভিজ্ঞতার মিশ্রিত ফল। আমরা ভাত খাই, ডাল খাই, মাছ খাই; এদের সারাংশ নিয়ে সৃষ্টি হয় রক্ত,— যে রক্ত আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। রক্তের মধ্যে ভাত-ডাল-মাছের আলাদা চেহারা খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্পী ও সাহিত্যিকের অনুভূতির মধ্যেও যদি পৃথক অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করা না যায় তাহলে তার অর্থ এ নয় যে সে অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বঞ্চিত। জীবনের সকল অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপ কেউ কি দিতে পেরেছেন? কোন কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশের অন্তরালে থাকতে হয়। পায়খানা বাড়ির পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বাড়ির সমগ্র রূপ দেখবার জন্যই কি তার স্থান বৈঠকখানার পাশে হবে? ইতি— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি [illegible]—এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করে [illegible] কথা যোগ করা যেতে পারে। প্রথম কথা এই যে বাংলা লিপিতে Goethe নামের শুদ্ধ স্বাভাবিক অনুলিখন কোন নিয়মানুসারেই সম্ভব নয়। গেটে, গ্যেটে, গ্যোটে [illegible] জানিনে। বাংলা সাহিত্যে Goethe সম্পর্কে যা একটিমাত্র প্রামাণ্য বই আছে তাতে কাজী আবদুল ওদুদ গ্যেটে লিখেছেন। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমরা কাজী সাহেবেরই অনুসরণ করব। বিশেষত যখন সমস্ত ভুল অনুলিখনের মধ্যে এইটেই কিছুটা কম দৃষ্টিকটু।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটের তুলনার ভিত্তি এক হতে পারে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উভয়ের কৃতিত্বের সাদৃশ্য। জার্মান এবং বাংলা ভাষার তথা সাহিত্যের শ্রী ও ছন্দ এঁরা গোড়া হতে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে ভাষায় আমরা এখন লিখি, পড়ি, ভাবি সে প্রধানত এঁদেরই সৃষ্টি। ভাষা মানে সঙ্গে সঙ্গে মনন ও অনুভূতির ছাঁদও বটে। আমাদের যে যার, জার্মান কিংবা বাঙালী, ইতিহাস-সচেতনতার ভিত্তিতে এ তুলনা দেখি। কিন্তু তাঁদের কীর্তির মূল্য-বিচার করলে তুলনাটা কেমন দাঁড়াবে?

যদি Renaissanceএর uomo Universaleএর আদর্শেই মাপতে হয় তাহলে আমার মতে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত হবেন। সাহিত্যের দরবারের বাইরে গ্যেটের কীর্তি কিছু রঙ্গমঞ্চ নিয়ে experimentএ এবং কিছু বিজ্ঞানের কতিপয় আবিষ্কারে। রবীন্দ্রনাথের experimentএর ক্ষেত্র যে বৃহত্তর ছিল সেটা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান কিছু নেই, বাংলা ভাষাতত্ত্বের চর্চা বাদ দিলে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের স্বভাব ও রীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ও সুস্থ ছিল। গ্যেটের জীবতত্ত্বে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবান আবিষ্কার রইলেও তিনি যে আধুনিক বিজ্ঞানকে মূলত সম্পূর্ণই ভুল বুঝেছিলেন একথা আজ অনস্বীকার্য। এ ছাড়া সংগীত, নাটক ও চিত্রকলার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন না পেলেও ভালো আসনই যে পাবে বলা যায় না কি? গ্যেটে এসব দিকে কিছুই করে যেতে পারেননি, এমন কি করতে পারতেন এমন আশাও দিতে পারেননি। প্রতিভার উচ্চ নাগালে কে বড় জানিনে, প্রতিভার ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রনাথকেই বড় বলে মনে হয়।

সাহিত্যের খাসদরবারে গ্যেটের রচনার মধ্যে কালোত্তীর্ণ হয়েছে একটি মহাকাব্য, কয়েকটি খণ্ডকাব্য, অল্প কিছু lyric কবিতা, কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী, একটি উপন্যাস এবং তাঁর মুখের কথার একটি সংকলন। এইরকমই আধুনিক জার্মান সাহিত্যরসিকদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের রচনার বিচার এখনো অতদূর এগোয়নি। মনে হয় এর চেয়ে খুব বেশী ওঁরও থাকবে না। কীর্তির পরিমাণ দিয়ে অবশ্য এঁদের কারও বিচার হবেনা। হবে কীর্তির মধ্যে প্রকাশিত অভিজ্ঞতার ও ব্যক্তিত্বের মূল্যে। কিন্তু তাহলে আমরা তুলনার সীমা ছাড়িয়ে তার কাছে এসে পৌঁছবো উভয়ের মধ্যে যা অতুলনীয় ও অনুপম!

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়ের বক্তব্য মনে হচ্ছে এসব ছাড়িয়ে, কবিদ্বয়ের মধ্যে যে দুই জীবনদর্শন মূর্ত হয়েছে তাদেরই নিয়ে। গ্যেটে ক্রান্তদর্শী নন, তিনি মানবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথ কোন অর্থেই লোকায়তবাদী নন, তিনি transcendenceকেই ভেবেছেন। তাই বলে গ্যেটে কি মানুষকে বিশ্ব হতে আলাদা করে দেখেছেন কখনো, তিনি কি সত্য promethean বিদ্রোহের কবি? অথবা রবীন্দ্রনাথই কি দান্তে, মিল্টন, এলিয়টের মত মানুষকে অতিক্রমণ করতে চেয়েছেন কখনো? গ্যেটের প্রকৃতিবাদ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ কি পরস্পরের শত্রু? ইউরোপের স্থানীয় ইতিহাসের ঘটনাচক্রে উদ্ভূত মানব-কেন্দ্রিকতা ও অধ্যাত্মকেন্দ্রিকতার যে বিরোধ এঁরা দুজনেই তার ঊর্ধ্বে। মানববাদ বনাম অধ্যাত্মবাদ, লোকায়তবাদ বনাম অতীন্দ্রিয়-বাদ এসব ছাঁচ ছোটখাটো লোকের গায়ে বসতে পারে, এঁদের নিঃশেষিতভাবে বুঝতে তারা কাজ দেবেনা। একদিকে ফাউস্ট কাব্যের সমাপ্তি আরেকদিকে গোরার কাহিনীশেষ আমার একথার যাথার্থ্যবিচারে নজীর দেখাতে

পারে। গোটে ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মহাকবি, উভয়েই সমগ্রভাবে আমাদের প্রিয়; এই কারণেও যে তাঁরা দুজনেই আপন আপন সীমার মধ্যে এমন কিছু দেখেছেন ও দেখিয়েছেন যার মধ্যে মানবত্ব ও দেবত্ব পৃথক নয়। ইতি— **পুণ্যশ্লোক রায়, শান্তিনিকেতন।**

'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা'

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকার ২৩শ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যায় [illegible] চৌধুরী 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, আমি তার অনেকাংশের সঙ্গেই একমত হতে পারছি না। 'সংস্কৃতি' কথাটির বিশেষত্ব লক্ষ করার জন্যে তিনি যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন, আপাত দৃষ্টিতে [illegible] বলে মনে হতে পারে; কিন্তু [illegible] সংকীর্ণতা [illegible]। আমি তাঁর অসংলগ্ন যুক্তির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করব।

তিনি বলেছেন, 'স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা দেশে [illegible] ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রায় [illegible]।' এই উক্তিটি অত্যন্ত [illegible] এবং [illegible]। স্বাধীনতালাভের আগে কি এদেশের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা ছিল না? না কি বাঙালী সংস্কৃতি [illegible] বছরের মধ্যেই [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করেছেন, অথচ দেখা যায়, তিনি নিজেও [illegible] এক ধরনের [illegible] [illegible] প্রভাবিত। তাঁর [illegible] কথায় বলা যায়, [illegible] টিকিয়ে রাখার [illegible] নেই।'

আবার, 'সংস্কৃতি সম্মেলন' সম্পর্কে তাঁর [illegible] ধরনের। গানের জলসাকে কেউ কেউ সাংস্কৃতিক সম্মেলন বা তার অংশ হিসেবে মনে করতে পারে, কিন্তু [illegible] না এইসব জলসাকে 'সংস্কৃতি'র অংশ বলে মনে না নেবেন কেন? **কারণ,** সর্বজনগ্রাহ্য 'সংস্কৃতি' নামে কোনো দৃশ্য-গোচর বস্তু আমাদের জানা নেই।

এক জায়গায় তিনি একটি মারাত্মক মন্তব্য করেছেন, যা প্রত্যাহার করা উচিত। 'এই ধরনের (অর্থাৎ নাচ, গান ছবি আঁকা) সবটি প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগরণের পরিপন্থী যদি হয়, তবে তারা সংস্কৃতি বিরোধী।' সবটি প্রচেষ্টা আবার কেমন করে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগরণের পরিপন্থী হয়, তারপর শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতি বিরোধী হয়ে পড়ে, তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। পাণ্ডিত্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার বস্তু কিন্তু দুর্বোধ্যতা, পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের প্রতি ঐকান্তিকতা আর অসংলগ্নতা, কারো কারো কাছে উপাদেয় মনে হলেও, সত্যিকারের সংস্কৃতিবানদের কাছে নয়। **ভবদীয়—অসীম গুপ্ত, কলকাতা।**

॥ নয় ॥

দক্ষিণ পাহাড় থেকে এখন কুয়াশা সরে গিয়েছে। উত্তর পাহাড়ের ঘন সবুজ উপত্যকা রোদের আলোতে ঝলমল করে উঠেছে। কাল রাত্রিতে আকাশ থেকে যে রাশি রাশি তুষারকণা ঝরে ছিল, সূর্যের উত্তাপে টলটলে জল-বিন্দুর আকারে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে।

আর পাহাড়ের চড়াইতে এই ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম সালুয়ালাঙ জেগে উঠেছে। কেসুঙে কেসুঙে নানা মানুষের কলরবে, ভাট পাখির চীৎকারে, কুকুর আর শুয়োর-গুলোর অবিশ্রান্ত চেঁচামেচিতে উদ্দাম পাহাড়ী জীবনের পরিচয়।

খাসেম গাছের মগডালে একটি নিঃসঙ্গ কুমারী মেয়ের নিশানা। তার ওপর একটু একটু করে চোখ মেললো সেঙাই। পিঙ্গল দৃষ্টি এখন রক্তপদ্ম। বেশীক্ষণ একসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে পারছে না সেঙাই। অপরিসীম ক্লান্তিতে চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে আসছে। প্রচণ্ড নেশার পর পেশীগুলো যেমন শিথিল হয়ে আসে, ঠিক তেমনি এক অবসাদে দেহের গ্রন্থিগুলো যেন বিস্রস্ত হয়ে গিয়েছে সেঙাইর।

কিছু সময় নির্জীব পড়ে রইলো সেঙাই। তারপর আবার চোখ মেললো। চোখ মেললো, কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না। তার দৃষ্টির সামনে পাহাড়ী পৃথিবী আশ্চর্য শূন্য হয়ে গিয়েছে। উপত্যকার ওপর এই রোদের রঙ, দক্ষিণ পাহাড়ের সানুদেশে এই নিবিড় বন—সব এক অতল ছায়ালোকের আড়ালে আবছায়া হয়ে গিয়েছে। মাথার রগগুলো ঝন্ ঝন্ করে ছিঁড়ে পড়ছে। মজ্জায় মজ্জায় এক তীক্ষ্ন যন্ত্রণা চমক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আরো অনেকটা সময় পার হয়ে গেল।

এবার চারদিকে একবার চনমনে চোখ-দুটো ঘুরিয়ে নিল সেঙাই। পাহাড়ী মাটি থেকে অনেক উর্ধ্বে শূন্যাশ্রয়ী এই ঘর। নীচে বাঁশের পাটাতন। একপাশে গোটা কয়েক রোহি মধুভরা বাঁশের পাত্র। স্তূপাকার কাপাস তুলোর পাঁজ; টেশঙ আর খোসের কাঁচা ছাল থেকে উগ্র দুর্গন্ধ,—এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কিছু নেই। আর কেউ নেই।

একসময় নিজের দিকে তাকালো সেঙাই। সারা দেহে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। টকটকে পাহাড়ী রক্ত হিমে হিমে জমে কালো হয়ে গিয়েছে। কপাল, গলা, বুক—দেহের প্রতিটি প্রদেশে ফালা ফালা আঘাতের চিহ্ন। কোথায়ও বা নখ আর দাঁতের অগভীর ক্ষতরেখা।

নিজের দেহের এই বীভৎস আঘাত-গুলোর কথা ভাবছে না সেঙাই। তার চেতনার মধ্যে চমক দিয়ে যাচ্ছে কালকের হিমাক্ত রাত্রিটা। অস্পষ্ট কতকগুলি ছবি। তাদের ধারাবাহিকতা নেই; অবিচ্ছিন্ন কোন সংগতি নেই। ছাড়া-ছাড়া, আবছা-আবছা, খণ্ড-খণ্ড। অসম্পূর্ণ কতকগুলো ছবির মিছিল সেঙাইর স্নায়ুর ওপর দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে।

এই সালুয়ালাঙ গ্রাম! তার মোরাঙ! খোনকের বুকের ক্ষতমুখে মেটে রঙের হৃৎপিণ্ড! তামুন্যু! এই গ্রামের সর্দার! মোরাঙের দরজায় মশাল ধরে দাঁড়িয়ে-ছিল মেহেলী! এক সময় খোনকেকে পাহাড়ী খাদে ফেলতে এসেছিল এই গ্রামের কয়েকটি জোয়ান ছেলে। তার আগেই খানিকটা নীচের দিকে নেমে একটা বিশাল পাথরের চাঁই ধরে আশ্রয় নিয়ে-ছিল সেঙাই। তার পর হিম আর হিম। অজগরের বিষের মত জা কুলি রাত্রির হিম তার দেহটাকে জর্জরিত করে দিয়েছিল। অবশ হয়ে গিয়েছিল চেতনাটা। এক সময় খোনকেকে খাদে ফেলে গিয়েছিল জোয়ান

ছেলেরা। খাড়াই পাহাড়ের দেহ বেয়ে বেয়ে, নিবিড় বনের ফাঁক দিয়ে গুমু গুমু শব্দ করতে করতে নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল খোনকের দেহটা। তারপরেই আশ্চর্য হিমে হাতের থাবা শিথিল হয়ে গিয়েছিল সেঙাইর। আর অস্পষ্ট চেতনার মধ্যে সে বুঝতে পারছিল, তার দেহটা শূন্যে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু মনে নেই সেঙাইর।

কিন্তু এই মুহূর্তে সেঙাইর দুর্বল স্নায়ুগুলো কিছুতেই ধরতে পারছে না, কেমন করে এই অচেনা ঘরের মধ্যে সে চলে এলো? কে তাকে এই নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়ে দিয়ে গেল?

সহসা বাঁ দিকে তাকালো সেঙাই। একটা কাঠের পাত্রে একপিণ্ড ভাত, খানিকটা ঝলসানো মাংস আর বাঁশের পানপাত্র ভরে রোহি মধু রয়েছে। তার পিঙ্গল পাহাড়ী চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। মনে পড়লো, কাল দুপুরের পর এককণা ভাত তার পেটে পড়েনি। আর কিছু ভাবনার সময় নেই। পেটের মধ্যে ক্ষুধার ময়ালটা এতক্ষণ পাক দিচ্ছিল। অপরিসীম অবসাদের জন্য ক্ষুধার বোধটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে ছিল সেঙাইর। এই মুহূর্তে ভাতের পাত্রটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে সেই ময়ালটা দাপাদাপি শুরু করে দিল।

বুক হিঁচড়ে হিঁচড়ে পাত্রটার কাছে এলো সেঙাই। ভাতের পিণ্ডটার ওপর এক আস্তর পাহাড়ী পিঁপড়ে জমে রয়েছে। সেদিকে এতটুকু ভ্রূপাত নেই সেঙাইর। ব্যগ্র একখানা থাবা পাত্রটার দিকে প্রসারিত করে দিল সেঙাই। তারপরে অতিকায় গ্রাসে গ্রাসে ভাতের পিণ্ড, আর ঝলসানো মাংস নিঃশেষ করে ফেললো। একপাশে বাঁশের পানপাত্রটা পড়েছিল; সেটা তুলে এক চুমুকে ছেদহীন শূন্য করে দিল সেঙাই।

এখন অবসাদ অনেকটা মুছে গিয়েছে সেঙাইর ইন্দ্রিয়গুলো থেকে। অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। ভাত, মাংস আর রোহি মধু থেকে প্রাণকণা নিয়ে নিয়ে শরীরটা রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠলো সেঙাইর। এতক্ষণ শুয়েছিল সেঙাই, এবার বাঁশের পাটাতনের ওপর উঠে বসলো।

কিছুটা সময় পার হলো। একসময় নীচের দরজার কাছে এসে মুখখানা বকের মত বাড়িয়ে দিল সেঙাই। অপরিচিত গ্রাম। টিলায় টিলায়, পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অজানা মানুষের জটলা। উলঙ্গ মেয়েরা সরু বাঁশের ফাকা দিয়ে তুলো পিঁজছে; কেউ কেউ ন্যু দিয়ে দড়ির লেপ বুনছে। আরো দূরে মেয়ে-পুরুষেরা একসঙ্গে বেতের ত্রিকোণ আখুত্সা (চাল রাখার ঝোড়া) বানাচ্ছে। নারী পুরুষের যৌথ পরিশ্রমে এই আদিম পাহাড়ী গ্রাম একটু একটু করে নিজের সংসার রচনা করে চলেছে। কেউ কেউ পাথরের ওপর বর্শার ফলা শানিয়ে নিচ্ছে। এই প্রতিকূল প্রকৃতি। হিংস্র মেনুজো কী মেন্ডো, হিংস্রতর প্রতিবেশী গ্রাম—তাদের সঙ্গে সহবাস। অতএব, ধারালো বর্শার চেয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতা আর কার সঙ্গে সম্ভব! রোদের আলোতে ঝকমক করে উঠছে বর্শার ফলাগুলো।

গাছের ওপর ছোট্ট ঘরখানায় নিশ্চুপ বসে রইলো সেঙাই। একটি মানুষও তার পরিচিত নয়। এই অজানা গ্রামে এখন নামা ঠিক নিরাপদ হবে না। ঐ বর্শার ফলাগুলো তা হলে চৌফালা করে ফেলবে তাকে। আগে রাত্রি নামুক, তারপর দেখা যাবে। অন্ধকারের সাহায্য ছাড়া এই পাহাড়ী গ্রামে নেমে আসা কোনমতেই সম্ভব নয়। চারপাশে মৃত্যু ওত পেতে রয়েছে। ভাবতেও পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর মেরুদণ্ড বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করলো।

বাঁশের মাচানের ওপর শুয়েছিল সেঙাই।

দূর থেকে মোষ-বলির বাজনা ভেসে আসছে। মৌথিকেকোয়েনঘন খঞ্জির গম্ভীর শব্দ উপত্যকার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্রাম্-ম্-ম্-ম্-ম্ — সেই সংগে খড়্গের ভয়ংকর আওয়াজ। বাজনার শব্দে নেশা ধরে গেল সেঙাইর। বন্দী শ্বাপদের মত গর্জন করে উঠতে চাইলো সেঙাই। কিন্তু না, এই অচেনা গ্রামের মানুষগুলো একবার টের পেলে আর রেহাই থাকবে না। অতএব, বুকের মধ্যে নিরুপায় গর্জনটাকে স্তব্ধ করে দিতে হলো সেঙাইর।

এখন সবে মাত্র দো পো (দুপুর)। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘরের মধ্যে নির্বাসিত থাকতে হবে তাকে। অসহায় আক্রোশে ফুঁসতে লাগলো সেঙাই।

অচমকা বাঁশের সিঁড়িতে শব্দ উঠলো। আর সেই শব্দটা পাহাড়ী গ্রামের মাটি থেকে এই ঘরের দিকে উঠে আসছে। চমকে উঠলো সেঙাই; তারপর দ্রুত নীচের ফাঁকটার কাছে চলে এলো।

বাঁশের সিঁড়িটা সরাসরি পাটাতন ভেদ করে ওপরে উঠে এসেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলো মেহেলী।

পদশব্দে চমকে উঠেছিল সেঙাই। মেহেলীকে দেখে বিচিত্র বিস্ময়ে পিঙ্গল চোখ দুটো ভরে গেল তার। নির্নিমেষ মেহেলীর দিকে তাকিয়েই রইলো সে।

মেহেলী বললো; "কী রে, উঠে পড়েছিস্ দেখছি"—

সেঙাইর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দপ্ করে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো মেহেলীর। সহসা সাঁ করে ঘরের এক কোণ থেকে লোহার একটা মেরিকেত্সু তুলে এনে সেঙাইর দিকে তাক্ করলো সে।

মাথার ওপর উদ্যত মেরিকেত্সু। আর পাহাড়ী মেয়ের দু চোখে নিশ্চিত ঘাতনের ঝিলিক। অসহায় করুণ হয়ে এলো সেঙাইর দৃষ্টি। আর্ত গলায় সে বললো, "আমাকে মারিস্ নি মেহেলী; কাল রাত্রে খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। এই দেখ, মাথা-হাত-পা কেটে ফালা ফালা হয়ে গেছে।"

উবু হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেহেলী। এবার লোহার মেরিকেত্সুটা বাঁশের পাটাতনের ওপর নামিয়ে সেঙাইর পাশে এসে বসলো সে।

সেঙাইর দৃষ্টি থেকে তখনো বিস্ময়ের চমকটা একেবারে মুছে যায়নি। ফিস্ ফিস্ গলায় সে বললো; "তুই এখানে কী করে এলি মেহেলী!"

"বাঃ, বেশ বললি তো! আমাদের বস্তীতে আমি থাকবো না।" খিল খিল করে একটা অবাধ জলপ্রপাতের মত হেসে উঠলো মেহেলী।

"আমি এখানে এলাম কী করে?"

"খাদের বন থেকে আমি তুলে নিয়ে এসেছি।"

স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতায় পিঙ্গল চোখ দুটো কোমল হয়ে এলো সেঙাইর। গলাটা কেমন যেন মন্থর শোনাচ্ছে, তার; "তুই না তুলে আনলে আমি মরেই যেতাম মেহেলী। তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস।" সেঙাইর দৃষ্টিটা মেহেলীর মুখের ওপর এখনও নিষ্পলক হয়ে রয়েছে।

হাসির জলপ্রপাত এবার উদ্দাম হয়ে উঠলো মেহেলীর; "বাঁচাবার জন্যে তোকে তুলে আনি নি সেঙাই। ভালো করে মারার জন্যে তোকে এনেছি। তুই আমার আটসাকে (দাদা) মেরেছিস! তার শোধ তুলবো না? থুকুঙ নুর (সন্ধ্যা) সময় মোরাঙের সামনে তোকে বলি দেওয়া হবে। এইবার গিয়ে জোয়ান ছেলেদের বলে আসবো।"

"মেহেলী!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সেঙাই।

"কী বলছিস?" পাহাড়ী মেয়ের সারা মুখে তীব্র রেখায় একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো।

"সেদিন আমাদের বস্তীতে তুই গিয়েছিলি। সেদিন আমিও তোকে মারতে পারতাম। কিন্তু মারিনি। আজ আমাকে বাঁচা তুই।" কেলুরি গ্রামের পাহাড়ী যৌবনকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। সেঙাইর কান্নাকে একটু একটু করে উপভোগ করলো মেহেলী।

"তুই আমার আটসাকে (দাদা) মেরেছিস! তার কী হবে?"

"তোর আটসা কে?" চমকে উঠলো সেঙাই।

"খোনকে। খোনকেকে ওরা কাল খাদে ফেলে দিয়েছিল আনিজার ভয়ে। আটসাকে খুঁজতে খাদে নেমেছিলাম। অন্ধকারে ভুল হলো। আটসার বদলে আমার পিঠে চড়ে তুই এলি।" একটু থামলো মেহেলী, তারপর বললো, "সারা চু কেতো খো (সকাল) ধরে আটসাকে খুঁজে এলাম। খাদের কোথায়ও তাকে পেলাম না। হয়ত মেনজোরা তাকে খেয়ে ফেলেছে।"

পাহাড়ী মেয়ে মেহেলীর সমস্ত মুখখানা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। দুটি কাঁপিশ চোখের মণি চৌচির করে কয়েক বিন্দু লবণাক্ত জলের আভাসও বেরিয়ে এলো। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই গর্জে উঠলো মেহেলী; "তুই এই বস্তীতে এসেছিলি কী করতে? মরতে? জানিস সবাই জেনে ফেলেছে, তুই আমার আটসাকে (দাদা) মেরেছিস। আমাদের বস্তীর ছোকরারা তোকে পেলে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়বে।"

"কে বলেছে, আমি খোনকেকে মেরেছি?" বিবর্ণ গলায় প্রশ্নটা ফুটে বেরুলো সেঙাইর।

"সালুনারু। তোদের বস্তীর বেঙকিলানের বউ। সে সব বলে দিয়েছে আমাদের সর্দারের কাছে।"

দুর্বল স্মৃতির ওপর কালকের সন্ধ্যাটা ছায়াপাত করলো সেঙাইর। পাহাড়ের একটা ভাঁজ থেকে সে দেখেছিল সালুনারুকে। অগ্নিমুখ একটা মশাল নিয়ে সালুনারু অনেক দূরের কেসুঙগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

শিথিল গলায় সেঙাই বললো, "ও, সালুনারু, তবে তোদের বস্তীতে এসে আস্তানা গেড়েছে। আমাদের বস্তী থেকে ও পালিয়ে এসেছে; সর্দার ওকে পেলে মী (বর্শা) দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবে একেবারে। জানিস, কী শয়তানী ঐ সালুনারু।"

"কী করেছিল সালুনারু?"

"সেদিন তোর আটসা (দাদা) খোনকেকে আমি মী (বর্শা) দিয়ে ফুঁড়েছিলুম, সেদিন রাত্তিরে বেঙকিলান

তো রেনজি আনিজার রাগে পাহাড় থেকে পড়ে মরলো। এক তাজ্জবের ব্যাপার সেটা। আমি, রেঙকিলান, ওঙলে আর পিঙলেই তো বস্তীতে ফিরে যাচ্ছি। আচমকা সালুনারুর মত গলায় রেঙকিলানকে রেনজি আনিযার ডাকলো। রেঙকিলান তো আচেলা (বাইরের পাহাড়) দিকে চলে গেল।"

"তারপর?" মেহেলীর চোখেমুখে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল।

"সকাল বেলা সালুনারু এলো রেঙকিলানের খোঁজে। সে নাকি আগের রাত্তিরে রেঙকিলানকে ডাকে নি আচেলা (বাইরের পাহাড়) থেকে। বস্তীর জোয়ানরা খুঁজতে বেরুলাম, তারপর খাদের মধ্যে দেখলাম, রেঙকিলান মরে পড়ে রয়েছে।"

"শেষে কী হলো?"

"কী আবার হবে? আমাদের সদ্দারের সঙ্গে বচসা করলো সালুনারু, রেনজি আনিজাকে গালাগালি দিল। তারপর সদ্দার যেই দা (বর্শা) নিয়ে উঠলো, সে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।"

"কী সব্বনাশ! রেনজি আনিজাকে গালাগালি দিল সালুনারু?" বিস্ময়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠলো পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী।

দূরের কোন একটা কেসুঙ্ থেকে মোষ বলির বাজনা ভেসে আসছে। গম্ভীর আর ভয়ংকর শব্দ তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে এই নগণ্য পাহাড়ী জনপদটুকুর ওপর দিয়ে।

ওপরে আতামারী পাতার চাল। তার ফাঁক দিয়ে দুপুরের রোদ এসে পড়েছে ঘরখানায়। মোহন রোদ। ভা কুর্নি মাসের সূর্য বড় সুস্বাদু, বড় মনোরম।

সহসা গাছের ওপরে আসিম এই গৃহকোণ থেকে সব কথারা হারিয়ে গেল। সেঙাই তাকালো মেহেলীর দিকে। মেহেলী তারই দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে। সেঙাই আর মেহেলী। টিজু নদীর এপার আর ওপার। পোকরি আর জোহেরি বংশের দুই বন্য যৌবন মুখোমুখি হয়েছে। সালুয়ালাঙ আর কেলুরি গ্রামের দুই শত্রুপক্ষ দুজনের সারা দেহে আরণ্যক কোন ভাষা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

মেহেলী এক সময় বললো, "কাল সারারাত তোর পাশে আমি বসেছিলাম সেঙাই। আঁচড়েছি, কামড়েছি, তবু তোর কোন সাড়া পাইনি।"

"কাল কী আমার জ্ঞান ছিল? কত ওপর থেকে খাদে পড়ে গেছিলাম। তুই না থাকলে কী আমি বাঁচতাম। এই দেখ্ গায়ে চাপ চাপ রক্ত জমে রয়েছে। বস্তীতে ফিরে একেবারে ভামন্যুর (চিকিৎসক) কাছে যেতে হবে।"

"আমাদের বস্তীর ভামন্যুর (চিকিৎসক) কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবো তোকে। ঠিক সন্ধ্যের পর।"

একটু সময়ের বিরতি। তারপর আবার মেহেলী বললো, "তুই আটসাকে (দাদা) মারলি কেন, বল তো?"

"আমার আভঙকে (ঠাকুরদা) তোদের বস্তীর লোকেরা মেরেছিল। তার শোধ নেবো না?" দুটো চোখ ধক্ ধক্ করে উঠলো সেঙাইর।

"ও। সেই জন্যে বুঝি আটসাকে (দাদা) মারলি। বেশ, শোধবোধ হয়ে গেল।"

"হু, শোধবোধ হলো।"

"আচ্ছা সেঙাই: আমি শুনেছি, তোদের আর আমাদের এই দুটো বস্তী মিলিয়ে একটা বস্তী ছিল অনেককাল আগে। তার নাম কুরগুলাঙ। টিজু নদীর দুধারের লোকেদের মধ্যে খুব খাতির ছিল, পিরীত ছিল।"

"আমিও তাই শুনেছি। আমাদের সদ্দার মোরাঙে বসে গল্প বলেছিল।"

মেহেলী বললো; তার কণ্ঠে আশ্চর্য কেমন শোনাচ্ছে: "আচ্ছা, আমাদের বস্তীর লোক তোর আভাঙুর (ঠাকুরদা) মুণ্ডু কেটেছিল। তুইও আমার আটসাকে (দাদা) মারলি। শোধবোধ হয়ে গেলো। এবার দু বস্তীতে আবার পিরীত হতে পারে না? বেশ হয় তা হলে। তোদের ঐ ঝরনার জলে চান করতে যেতে আমার এত ভালো লাগে!"

"হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু শোধ আর নিতে পারলুম কই? খোনকেদের মুণ্ডুটা তো আর কেটে নিয়ে যেতে পারি নি। অথচ তোরা আমার আভাঙুর মাথা কেটে এনেছিলি সেদিন।" অত্যন্ত বন্য হয়ে এলো সেঙাইর চোখ দুটো। সারা মুখে চাপ চাপ রক্ত; এই মুহূর্তে অত্যন্ত বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে।

ধূসর অতীতের স্মৃতি নিয়ে দুটি

পাহাড়ী যৌবন কখনও কোমল, কখনও ভয়াল, কখনও স্বপ্নাতুর আবার কখনও নির্মম হয়ে উঠতে লাগলো।

আবোল-তাবোল কথার তুফান উঠলো এক সময়। কোন পারম্পর্য নেই, কোন সঙ্গতি নেই, সুন্দর কোন বিন্যাস নেই কথাগুলোর মধ্যে। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চকিতে সরে সরে আসতে লাগলো সেঙাই আর মেহেলী।

বাইরে মোষ বলির বাজনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দ্রাম্-ম্-ম্-ম্—। দ্রাম্-ম্-ম্-ম্ চরম মুহূর্ত বোধ হয় উপস্থিত হয়েছে। অতিকায় একটা কালো জানোয়ারের দেহ থেকে এই মুহূর্তেই বিশাল মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। টকটকে তাজা রক্তে লাল হয়ে যাবে পাহাড়ী গ্রামের মাটি।

মেহেলী বললো: "আমাদের এই সালুয়ালাঙ্ বস্তীতে কেন এসেছিলি, বললি না তো সেঙাই?"

"তোর খোঁজে। আমাদের ঝরনায় আজকাল আর যাস না?" তৃষিত চোখে তাকালো সেঙাই।

"না। সর্দার যেতে বারণ করে দিয়েছে।"

সহসা নীচের মাটি থেকে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এলো গাছের ওপরের এই ঘরখানায়: "মেহেলী, এই মেহেলী। কী করছিস ঘরে?"

নীচে বাঁশের পাটাতন-কাটা দরজা। সেখান দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিল মেহেলী: "কী আবার করবো? এই যাচ্ছি রে পলিঙা।"

খাসেম গাছটার ঠিক ছত্রখান শিকড়-গুলির কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক নগ্নাঙ্গী মেয়ে। নাম তার পলিঙা। সে আবারও বললো: "কাটাির কেসুঙে মোষ বলি হয়েছে। দেখবি আয়। মাংস আনতে যাবি না?"

"যাই।" মুখখানা ঘরের মধ্যে এনে সেঙাইর দিকে তাকালো মেহেলী: "এবার যাই। খুকুগু নুর (সন্ধ্যা) সময় আবার খাবার আর রোহি মধু নিয়ে আসবো। তামুন্যের (চিকিৎসক) কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে আসবো তোর গায়ে দেবার জন্যে।"

সেঙাই বললো: "খুকুগু নুর (সন্ধ্যা) সময় আমি চলে যাবো। অন্ধকার

না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তোদের বস্তীর লোকদের বলিস না মেহেলী।" কাতর আর্তি ফুটলো সেঙাইর গলায়।

"অত সহজে যেতে হবে না। ঐ খাদ থেকে পিঠে করে এনেছি, সারা রাত তুলো গরম করে সেঁকে সেঁকে তোকে বাঁচিয়েছি। সে কী মাগনা? যতদিন আমার সাধ না মিটবে, ততদিন এই ঘরেই আটকে থাকতে হবে তোর। একটু একটু করে তোকে খুন করবো আমি। সারা জীবন তোকে এই ঘরে আটকে রাখবো।" পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী অপরূপ রহস্যময়ী হয়ে উঠলো। মুনিয়া পাখির মত একবার ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো সে, তারপর বাঁশের সিঁড়িটার দিকে পা বাড়িয়ে দিল। নীচের মাচানে তারই জন্য অপেক্ষা করছে পলিঙা।

কাল রাত্রিরে টিজু নদীর কিনারায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসেছিল ওঙলেরা। আকাশের এক কোণে আনিজা উইখুর ছায়াপথ। বিশাল রেখায় ফুটে ছিল। ছড়িয়ে ছড়িয়ে একেকটা তারা নিস্তেজ আলো দিচ্ছিল। আর টিজু নদীর পারে নিবিড় পাইন বনের মধ্যে পেন্যুকাঠের মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল।

এক সময় ওঙলে বলেছিল, "কী করা যায় বল দিকি? কোনদিক থেকে তো কোন আওয়াজ পাচ্ছি না।"

"তাই তো!" সকলেই মাথা নাড়লো।

"সেঙাই উদিকেই যে গেছে, তার ঠিকই বা কী আছে?" ওঙলে আবারও বলেছিল।

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" অনেক জোয়ান গলায় একই সমর্থন।

পিঙলেই বললো," নিশ্চয় উদিকেই গেছে। সেঙাই সেই যে মেহেলীর কথা বললো, মেহেলী তো সালুয়ালাঙ বস্তীর মেয়ে। তার তল্লাসেই ও বস্তীতে গেছে সেঙাই।"

"হু-হু, খুব পিরীত করে সেঙাই, মেহেলী হলো তার লাগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা)।" এবার সরব হয়ে উঠেছিল আর একটি জোয়ান ছেলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পেন্যু কাঠের মশাল শুধু দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। জাকুলি মাসের রাত্রি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। হিমের দাঁত কেটে কেটে বসেছে অনাবৃত দেহগুলোর ওপর। মশালের অগ্নি-বিন্দুর চারপাশে সাদা-সাদা ঘন কুয়াশা ঘুরপাক খেয়েছে।

কে যেন বললো, "বড় শীত ওঙলে, কী করা যায় এবার? আর এখানে বসে থাকা যাবে না। নির্ঘাৎ মরে যাবো।"

ওঙলে বলেছিল," তাই তো! সালুয়ালাঙ বস্তীটাও তো মড়ার মত পড়ে রয়েছে। সেঙাইর মাথা মী (বর্শা) দিয়ে গেঁথে নিয়ে যেতে পারলে তো এতক্ষণ হল্লা করে পাহাড় ফাটিয়ে ফেলতো শয়তানের বাচ্চারা।"

"হু-হু" সকলেই গোলাকার কামানো মাথা ঝাঁকিয়েছিল।

ওঙলে আবারও শুরু করেছিল, "এক কাজ করি আয়, আমরা হল্লা শুরু করে দি। যদি সত্যি সত্যি সেঙাইর মাথা নিয়ে থাকে, ঠিক সাড়া দেবে।"

"হু-হু।"

একটু পরেই টিজু নদীর নীলধারাকে চমকে দিয়ে অনেকগুলো পাহাড়ী জোয়ানের গলায় গর্জন উঠেছিল। সে গর্জনে শিউরে উঠেছিল আকাশের আনিজা উইখুর ছায়াপথ।

"হো—ও—ও—ও য়া আ—আ—"

"হো—ও—ও ও—য়া—আ—আ—"

একসময় গর্জনের রেশ থেমে গেল। টিজু নদীর কিনারায় অনেকগুলো পাহাড়ী জোয়ান উৎকর্ণ হয়ে রইলো। তাদের এই হুংকারের প্রতিধ্বনি নদীর ওপারে অনেক গলায় বেজে ওঠে কী না? এই গর্জনের জবাব দেয় কী না ওপারের পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙ?

কিছু না! তাদের এই আদিম আহ্বানের উত্তর ভেসে এলো না এপারে। সালুয়ালাঙ বস্তীটা একেবারেই নিষ্প্রাণ হয়ে রয়েছে যেন!

অনেকক্ষণ পরে ওঙলে বলেছিল, "এই তো! ওপারে সেঙাই যায় নি মনে হচ্ছে। তবে সে গেলো কোথায়? কী বলিস তোরা, যাবি না কী সালুয়ালাঙ বস্তীতে?"

ওঙলের প্রশ্নমালার জবাব দেবার আগেই কয়েকটা গলায় আনন্দিত শব্দ উঠেছিল: "মেন্‌জো (চিতাবাঘ), হুই যে মেন্‌জো—"

জোয়ান মানুষগুলোর কৌতূহল চোখের পিঙ্গল মণিতে এসে ঘন হয়েছে। সামনে, ঠিক টিজু নদীর মাঝামাঝি একটা কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মেন্‌জোটা। দু চোখের তরল আগুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু পাশের উপত্যকার ওপর ফেলছিল সে। নিরাপদ শান্তিতে এই জাকুলি মাসের হিমাক্ত রাত্রিরে সে বেরিয়ে এসেছিল গুহাশয্যা থেকে। মসৃণ আর উত্তপ্ত একটি ঘুমের অতল তলায় ডুবে যাবার আসক্তি তার হয়তো নেই।

পরম আরামে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার মৃদু গর্জন করে উঠেছিল মেন্‌জোটা: "ঘো—উ—উ—ম্—ম্—ম্—"

ওঙলে বললো: তার গলাটা জাকুলির রাত্রির ভৌতিক অন্ধকারে আশ্চর্য ফিস্ ফিস্ শুনিয়েছিল, "তোরা সব বস্। আমি আর পিঙলেই যাচ্ছি। মী (বর্শা) দিয়ে মেন্‌জোটাকে ফুঁড়ে আনবো। তারপর মশালের আগুনে ঝলসে খাওয়া যাবে। বড় ক্ষিদে পেয়ে গেছে। খবরদার, হল্লা করবি না কেউ।"

ওঙলে আর পিঙলেই ধীরে ধীরে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে টিজু নদীর দিকে

নেমে গিয়েছিল। আর খানিকটা উঁচুতে রাশি রাশি খাসেম বনের মধ্যে কয়েকটা রক্তবিন্দুর মত জ্বলছিল পেন্যু গাছের মশালগুলো। আর সেই রক্তবিন্দুগুলো ঘিরে ঘন হয়ে বসেছিল কেলুরি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। জা কুলি মাসের এই প্রথম রাত্রি ভয়ানক হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

একসময় থমকে দাঁড়ালো পিঙলেই আর ওঙলে। এখান থেকে বর্শার সীমানায় পাওয়া যাচ্ছে মেন্জোটাকে।

বাতাসের মত অস্পষ্ট শুনিয়েছিল ওঙলের গলা: "এখানে দাঁড়া পিঙলেই। আমি আগে তাক্ করি। তারপর তুই মী (বর্শা) ছুঁড়বি।"

একটি মাত্র মুহূর্ত। সাঁ করে ওঙলের থাবা থেকে উল্কার মত ছুটে গিয়েছিল বর্শাটা। অব্যর্থ লক্ষ্য। কোমরের ঠিক ওপরে গিয়ে এক হাত লম্বা ফলাটা গিঁথে গিয়েছিল। টিজ্যু নদীকে শিউরে দিয়ে হুংকার দিয়ে উঠেছিল মেন্জোটা:

"হো—উ—উ—ম্—ম্—"

এবার পিঙলেইর মুঠিতে বর্শাটা আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই মেন্জোর গলার সঙ্গে মিলিয়ে একটি মানবিক কণ্ঠ শোনা গেল। মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে কণ্ঠ এই বনভূমি, জা কুলি মাসের এই রহস্যময় রাত্রিকে চৌচির করে আর্তনাদ করে উঠেছিল: "আ উ —উ উ—"

"হো—উ—উ—ম্—ম্—" টিজ্যু নদীর ওপারে নিবিড়-বন উপত্যকার মধ্যে মেন্জোটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মানবিক গলার আর্তনাদও মিলিয়ে গিয়েছিল।

পিঙলেইর থাবাটা স্থির হয়েছিল আকাশের দিকে। আর একেবারে শিলীভূত হয়ে গিয়েছিল ওঙলে। দুজনে এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু কাঁপছে না। দু জোড়া চোখ শুধু নিষ্পলক হয়ে টিজ্যু নদীর ওপারে তাকিয়েছিল।

"হো—উ—উ—ম্—ম্—"

"আ—উ—উ—উ—"

একটি হিংস্র শ্বাপদের আর একটি মানুষের আর্তনাদ ওপারের উপত্যকায় একসময় ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল।

ভয়ে, আতঙ্কে এতক্ষণ শিলীভূত হয়ে ছিল দুজনে।

এবার ওঙলে বললো, তার গলায় বিভীষিকা কেঁপে উঠলো: "টেমি খামকোয়ান্যু (বাঘ-মানুষ)। ও নির্ঘাৎ টেমি খামকোয়ান্যু! শিগগির চল্। মেন্জো চালান করলে একেবারে সাবাড় হয়ে যাবো সব।"

"হু-হু-" শিহরিত গলায় দুটি শব্দ ফুটে বেরিয়েছিল পিঙলেইর।

তারপর সমস্ত শরীর থেকে সব নিষ্ক্রিয়তা ঝরে গিয়েছিল ওঙলে আর পিঙলেইর। টিজ্যু নদীর কিনার থেকে নদীর দেশে ওপারের উপত্যকা থেকে চলে এসেছিল দুজনে। পেছন দিকে তারা একবারও তাকায়নি কেউ। বার বার তাদের মনে হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মেন্জো নিঃশব্দে থেকে থাবা মেলে, গ্রাস মেলে সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। আর উপায় নেই, আর রেহাই নেই। টেমি খামকোয়ান্যুর ক্রোধ থেকে তাদের দুজনের কেউ রক্ষা পাবে না। তারা কী জানতো! ঐ মেন্জোর কটুস্বাদ মাংসের পেছনে একটা টেমি খামকোয়ান্যুর ভয়ংকর উপস্থিতি রয়েছে!

তীরের মত ছুটতে ছুটতে পেন্যু কাঠের মশালগুলোর কাছে এসে পড়েছিল দুজনে। জা কুলি মাসের এই হিম-ঝর-ঝর রাত্রিতে দুজনের দেহ বেয়ে বেয়ে দরদরধারায় ঘাম ঝরছিল। বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁফাতে শুরু করেছিল ওঙলে আর পিঙলেই।

পেন্যু কাঠের মশালের চারপাশে জোয়ান ছেলেরা অসহ্য শীতে কুঁকড়ে গিয়েছিল। হিমের প্রহার থেকে নিজেদের দেহগুলো বাঁচাবার জন্য কুণ্ডলী পাকিয়েছিল; তারপর পরস্পরের গায়ে গায়ে ঘষে খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি করে নিচ্ছিল।

চমকে জোয়ান ছেলেরা তাকালো ওঙলে আর পিঙলেইর দিকে, "কী রে? কী ব্যাপার? মেন্জোটা কই?"

গলা থেকে আতংক ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল ওঙলের, "শিগগির উঠে পড়, টেমি খামকোয়ান্যু (বাঘ-মানুষ)! ঐ মেন্জোটার পেছনে রয়েছে। চল্, চল্, বস্তীর দিকে ভেগে পড়ি—"

"টেমি খামকোয়ান্যু!" একটা ভীত আর সন্ত্রস্ত কোলাহল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো জোয়ানগুলোর মধ্যে। ছিলাকাটা ধনুকের মত সাঁ করে উঠে দাঁড়ালো সকলে। পাহাড়ী মাটির গর্ভে পেন্যু কাঠের মশাল পোঁতা রাখা হয়েছিল। পট্ পট্ করে সেগুলো তুলে ফেললো তারা।

ওঙলে বললো: "বস্তীর দিকে পালাই চল। ঐ টেমি খামকোয়ান্যু (বাঘ-মানুষ)। যদি মেন্জো চালান করে দেয়, তাহলে নির্ঘাৎ সাবাড় হয়ে যাব। চল্ চল্ দৌড়ো, দৌড়ো—"

অসহ্য এক তাগিদের প্রেরণায় জোয়ান মানুষগুলো খাড়া চড়াইর দিকে উঠতে লাগলো। সাঁ সাঁ করে পেন্যু কাঠের মশালগুলো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন বলেছিল: "সেগুই কে [illegible] তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমরা শয়তানের বাচ্চা, আগে টেমি খামকোয়ান্যুর (বাঘ-মানুষ) হাত থেকে জান বাঁচা।"

আর একটি গলা ফুটে বেরিয়েছিল: "এ নির্ঘাৎ ঐ নানকোয়া বস্তীর মেজিচিজ্যু। এই পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ পাহাড়ের বনে ওর মেন্জো পোষা রয়েছে। রাত্রিবে মেন্জো নিয়ে সে বেরোয় ইদিক-সিদিক—"

পাহাড়ী ঘাসের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় কেলুরি গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল। জোয়ান ছেলেরা রুদ্ধশ্বাসে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যাচ্ছিল।

(ক্রমশ

জল-বিদ্যুতের ভূমিকা

বি এন চৌধুরী

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট একটি জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করছেন, তারই প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের শীতেও শৈলাবাসে যেতে হচ্ছে। আয়োজন প্রচুর, অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণ। সহকারী ইঞ্জিনীয়াররা ও জরীপের যন্ত্রপাতি ত আছেই, তা ছাড়া সঙ্গে আছেন সরকারের বিভাগীয় ফটোগ্রাফার মিঃ হালদার।

ঘড়িতে ১০-২৫ মিঃ বাজতেই নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস সশব্দে হুইসল্ দিয়ে মন্থর গতিতে স্টেশন থেকে বার হয়ে গেল। স্টেশনের কর্মচারীবৃন্দ অন্য অনেক দৈনন্দিন কাজের মত এ কাজটিও সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

হালদার মশায়ের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। সদাপ্রফুল্ল, হাস্যরসিক ও সর্বোপরি অমায়িক সাদাসিধে ব্যবহার। ফটোগ্রাফীকে জীবনের পেশা হিসাবে নিলেও এখন সেটা তাঁর নেশার মত দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক আলাপের পর হালদার মশায় জানতে চাইলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ফটোগ্রাফারের প্রয়োজনীয়তার কথা। পরিহাসতরল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "রাজনৈতিক নেতাদের মত ইঞ্জিনিয়ারদেরও কি আজকাল নিজেদের প্রচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?" জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ফটোগ্রাফীর গুরুত্ব যে কী তা হালদার মশায়কে উপলক্ষ্য করে সকলকেই বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সব পরিকল্পনার স্থান প্রায় সবক্ষেত্রেই লোকালয় হতে দূরে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিবৃত অত্যুচ্চ পর্বতমালার ভিতর অবস্থিত, যেখানে পার্বত্য নদী পাথরের উপর দিয়ে বনা-হরিণীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে আপন বেগে নেমে যায় সমতলভূমির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির লীলাভূমি সেই সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত আধুনিক সভ্যতার বিশেষ কোন ছাপই পড়েনি। সেখানে পৌঁছন যেমন বিপদসংকুল, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়-বহুল, তেমনি সেখানকার জীবনধারণ প্রণালী যাযাবরদের কথা অহরহ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রকম স্থান থেকে যে সব প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে তারই উপর নির্ভর করে রচনা হবে পরিকল্পনার খসড়া। সেই খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞরা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন, যাচাই করে দেখবেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে। তথ্য সংগ্রহের ও তার পারি-পার্শ্বিক স্থানের ফটো থেকে তাঁরা এ প্ল্যানের নির্ভরতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। যদি বিশেষজ্ঞরা সন্তুষ্ট হন, যদি তাঁদের চুলচেরা পরীক্ষার আগুন সসম্মানে পার হয়ে আসতে পারে আমাদের সংগৃহীত এই সব তথ্য, তবেই মিলবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পরিকল্পনাকে রূপদান করবার ছাড়পত্র।

আমার কথার জের টেনে বলে যেতে থাকে শিক্ষানবীশ ইঞ্জিনীয়ার ঘোষ। "আর সেই ছাড়পত্র পেলেই, যে স্থান এতদিন সকলের অজ্ঞাতে গভীর জঙ্গলে শ্বাপদকুলের ক্রীড়াভূমি হয়েছিল, সেই স্থানে গড়ে উঠবে বিরাট কলোনী, তৈরি হবে জল বাঁধবার ড্যাম ও বিদ্যুৎ তৈরির পাওয়ার হাউস। বড় বড় বিদ্যুৎবাহী লাইন চারিদিকে বহুদূরে পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেই জল-বিদ্যুৎ, লোকের মুখে মুখে সেই জায়গার নাম ফিরবে ডি ভি সি কিংবা ভাকরা-নাঙ্গাল-এর মত। তৈরি করব আমরা বাংলার একটি গৌরবময় স্থায়ী সম্পদ।"

ভবিষ্যতের সেই চিত্র যেন ঘোষের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, নবীনের আশা আনন্দ ও উৎসাহের প্রাবল্যে তার মুখ চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

হালদার মশায়ের চাকুরিজীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানাবিধ অভিজ্ঞতায় মনের ভাণ্ডার ভরপুর। ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের বহু জায়গায়, সাহচর্য লাভ করেছেন বহু দিকপালের। অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনীর সরস বর্ণনা দিয়ে

লাডাং হতে গন্তব্যস্থানের নদীর দৃশ্য

আসর মাত করে ফেললেন। দীর্ঘ পথ-যাত্রার একঘেয়েমি হালদার মশায়ের কৃপায় একেবারেই বুঝতে পারা যায়নি। পরের দিন বেলা প্রায় দুটোর সময় সদলবলে গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী শহরে পৌঁছন গেল।

শৈলাবাসের জন্য শহরটির খ্যাতি আছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সেখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে পূর্বাহ্নেই আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। সৌজন্যতাবশত তিনি অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন সহকারী এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গাঙ্গুলী ও সহকারী ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সেন। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার অবাঙ্গালী, সম্প্রতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের চাকুরি নিয়ে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি চাকুরি জীবনের বহুলাংশ এমন সব জায়গায় কাটিয়েছেন যেখানকার শীত ও গ্রীষ্ম দুটো সমানভাবেই প্রচণ্ড। এখানকার আবহাওয়ায় সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন এবং সপরিবারে Home Comfort-এ আছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী ও মিঃ সেন সপরিবারে বাস করলেও তাঁদের জীবনযাত্রাটা বিশেষ সুখের হয়নি। প্রকারান্তরে দুজনেই অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন কলকাতায় বদলি হয়ে ফিরে আসবার জন্য। বাঙ্গালীর "ঘরমুখো" বলে যে অপবাদ আছে তার জন্য নয়, কারণটা উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। গাঙ্গুলী মশায় বৎসরাধিক হল এখানে আছেন এবং আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন, বহু অর্থব্যয়ে ও চিকিৎসা সত্ত্বেও তা হতে নিরাময় হয়ে উঠতে পারেননি।

সেন মশায়ের বয়স সাতাশ কিংবা আঠাশ। বছর দুই হল বিবাহ করেছেন। বিবাহের কিছু পরেই কলিকাতা হতে এখানে বদলির খবর শুনে খুশিতে উপচে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন একান্নবর্তী সংসারের হৈ-চৈ হতে দূরে সরে গিয়ে নিভৃতে কুঞ্জ রচনা করবেন নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে, হনিমুনের কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করবেন মনের স্বাদ মিটিয়ে। কিন্তু বিধি বাম এত সুখ কপালে সইল না। আসবার মাস কতক পরেই মিসেস সেন শয্যা নিলেন, দেখা দিল একটির পর একটি নানাবিধ অসুখ। কয়েক মাস সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ও সেবাশুশ্রূষা করেও যখন আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখতে পেলেন না, তখন জীবনযুদ্ধে হার মেনে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। এখন একটি-মাত্র ক্ষীণ আশা, যদি কলকাতার পরিচিত আবহাওয়ায় স্ত্রী নিরাময় হয়ে উঠতে পারেন। সেন দম্পতি উভয়েই স্বল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় অমায়িক এত অসুস্থতা সত্ত্বেও অতিথি পরিচর্যার খ্যাতি আছে সেন জায়ার বন্ধুমহলে।

দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটানর জন্য গাঙ্গুলী ও সেন উভয়েই

আমাদের অভিযানে সংগী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সানন্দে রাজী হওয়া গেল।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার রাস্তার নির্দেশ আমাদের অজানা। সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ম্যাপের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ম্যাপ থেকে বুঝা যায় যে, এই শহর হতে আমাদের গন্তব্যস্থান প্রায় ৭০ মাইল দূরে। যানবাহনের উপযোগী রাস্তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় ৬০ মাইল দূরবর্তী কিরিম্ নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম পর্যন্ত। সেখান হতে আরম্ভ হয়েছে সরকারের সংরক্ষিত দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দশ মাইলব্যাপী সেই জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছতে হবে লাডাং নামক ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী বস্তীতে। লাডাং থেকে পায়ে চলা পথের ক্ষীণ রেখা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে সোজা নেমে গিয়েছে নদীগর্ভে, আমাদের গন্তব্যস্থলে।

নির্দিষ্ট সময়ে সহকারী ইঞ্জিনীয়ার সেনের তত্ত্বাবধানে দুইটি লরীতে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও মজুরদের কিরিমের পথে রওনা করে দেওয়া গেল। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিযানের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত ও কষ্টসহিষ্ণু মজুর যোগাড় করে দিয়েছিলেন। সুষ্ঠুভাবে এই বৃহৎ কর্ম সমাধানের পিছনে গাঙ্গুলী ও সেন মশায়দের অবদানও বড় কম ছিল না। তাঁদের মধুর ব্যবহারে অনুরক্ত কর্মচারিবৃন্দ সকলেই অকৃপণভাবে সাহায্য করেছিলেন অভিযানের সাফল্য কামনায়।

পরদিন সকাল ৭টার সময় কিরিম অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। আমরা গাড়ীও সঙ্গে ছিল নেপালী ড্রাইভার লামাবাহাদুর ও দুইজন স্থানীয় মজুর। পার্বত্য জাতির কুলপঞ্জীতে লামাবাহাদুর কুলীন, তথাগত বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। ভাবলেশহীন প্রশান্ত মন, বচনে স্বল্পভাষী, বিনয়ে তৃণাদপি সুনিচেন। উদরের তাড়নায় উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থান ও ব্যবধান হাতের রেখার মত তার সুপরিচিত। একই লোককে একাধারে চালক ও পথপ্রদর্শক-রূপে পেয়ে অভিযানের পক্ষে শুভলক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। রাস্তায় ক্রমাগত ঝাঁকানি খেতে খেতে বেলা ১২টা নাগাদ কিরিমে যখন পৌঁছন গেল তখন শরীরের হাড়গুলোর স্বস্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের বহু জিজ্ঞাসাবাদ করেও লাডাং-এর পথের সঠিক নির্দেশ যখন পাওয়া গেল না, তখন লামাবাহাদুর "চলিয়ে সাব্, হাম জানতা হ্যায়" বলে আশ্বাস দিল তার স্বভাবগম্ভীর বিনম্র বচনে। সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে আমরাও অসহায়ভাবে ঝাঁপ দিলাম অনিশ্চিতের পথে।

রাস্তার চারিদিকেই পাশাপাশি সাজান চায়ের বাগান। প্রত্যেক বাগানের ভিতর দিয়ে মাকড়শার জালের মত অগণিত রাস্তা চলে গিয়েছে দিক-বিদিকে। তাদের কোন্‌টি যে আমাদের বাঞ্ছিত সড়ক তা জানতে হলে ফলিত জ্যোতিষের শরণাপন্ন হতে হয়। বহু ঘুরপাক খেয়ে বেলা ২টা নাগাদ একটি শুষ্ক প্রশস্ত নদীর ধারে এসে হাজির হওয়া গেল। ওপারে গভীর জঙ্গল। নিকটবর্তী একটি পাহাড়ী কুলীর সঙ্গে অনেকক্ষণ যুক্তি-পরামর্শের পর লামাবাহাদুরের ধ্যান-নিমিলিত নেত্রে ফুটে উঠল খুশির ঝিলিক। দৃঢ় বিশ্বাসে নদী পার হয়ে গাড়ি ছাড়লো সে ওপারের জঙ্গল অভিমুখে। পথের নির্দেশ নেবার সময় "হাতী" শব্দটা কয়েকবারই শুনেছিলাম দুজনেরই মুখে। কৌতূহল দমন করা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেই নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লামাবাহাদুরের প্রশান্ত বদন, আফসোস করলো সাহেবদের ঘুর পথে এনে কষ্ট দেওয়ার জন্য। সহাস্য মুখে জানালো যে, বুনোহাতীর বাসস্থান হিসাবে এই জঙ্গলটির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। মাসকতক আগে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি হাতীর একটি সাহেবকে খতম্ ক'রে ফেলার কাহিনী জানে এখানকার সকল অধিবাসীই। এই কুখ্যাত জঙ্গল পেরিয়ে যে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে একথা যদি তার আগে জানা থাকত তা হলে কি আর—। লজ্জায় ক্ষোভে ম্রিয়মান হয়ে পড়লো অহিংসার বিনীত সেবক। সুসংবাদ সন্দেহ নেই। জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে আমাদের মধ্যে। পাণ্ডুর মুখ নিয়ে সকলেই বিস্ফারিত চোখে জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছি সম্ভাবিত দুর্ঘটনার দর্শন আশঙ্কায়। রাস্তার দুই ধারেই ঘন জঙ্গল, সামনে দশ ফুট চওড়া অপ্রশস্ত রাস্তা।

চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। কেমন যেন একটা শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজ করছে সর্বত্র। মনের আনন্দে হালদার মশায় তুলে চলেছেন একটির পর একটি ছবি নানাবিধ ফিলটারের সাহায্যে, একাধিক দৃষ্টিকোণ হতে। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি ইউরোপীয় পোশাকধারী এক ব্যক্তি আমাদের দর্শন আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। সাক্ষাৎ হতেই আভূমি নত হয়ে সেলাম জানিয়ে হাতে দিলেন একখানি পত্র। পত্র লিখেছেন আমাদের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার। সুদীর্ঘ পত্রে পত্রবাহকের কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন তাকে আমাদের অভিযানে সঙ্গী করে নেবার জন্য। পত্রবাহকের আদি জন্মস্থান পাঞ্জাবে, নাম শর্মা। রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে পাওয়ার হাউসের ফোরম্যান। দীর্ঘ কুড়ি বছর আগে সুদূর পাঞ্জাব হতে বাংলায় এসেছিলেন জীবিকা অন্বেষণে। বহু স্থান ঘুরে এখানে এসে মেলে চাকুরি, সমাধান হয় উদর পূরণের সমস্যার। চাকরির প্রথম পর্বে বৎসরান্তে একবার যেতেন আত্মীয়স্বজনের কাছে নিজের জন্মভূমিতে। কয়েক বৎসর পর একটি স্থানীয় পার্বত্য দুহিতার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে দেশের মায়া কাটালেন পাঞ্জাব তনয়, নীড় রচনা করলেন তাকে নিয়ে পাওয়ার হাউসের নিকটবর্তী বস্তী অঞ্চলে। যে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘরে ঘরে আলো জ্বালে, তাপ দেয়, আর দেয় আরাম ও একাধিক স্বাচ্ছন্দ্য, সেই বিদ্যুৎ সরবরাহের পিছনে আছে শর্মাজীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিঃশব্দ অবদান। মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং সদাহাস্যমুখই শর্মাজীর একমাত্র পরিচয় নয়। এর কর্মকুশলতার আসল রূপ ফোটে যে কোন জরুরী অবস্থায়, আশু অচল অবস্থার সম্ভাবনায়। যখন সন্ধ্যা সমাগমে ঘরে ঘরে একটির এর একটি আলো জ্বলে ওঠে, লাল হয়ে ওঠে অগনিত বৈদ্যুতিক হিটার ও চুল্লীর মুখ, প্রতি মিনিটে বিদ্যুতের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলে, পাওয়ার হাউসের মেশিনে তীক্ষ্ম সাইরেনের মত আওয়াজ ওঠে, সুইচ বোর্ডে demand meter-এর কাঁটা নিরাপদ সীমারেখার ধারে এসে থর থর ক'রে কাঁপে, ছোট লেক্ সদৃশ জলাধারে সঞ্চিত জলের লেভেল্ ভয়াবহভাবে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে, তখন শর্মাজী যে মূর্তি ধারণ করেন, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না আগেকার সেই সহজ, সরল, অমায়িক মানুষটিকে। প্রচণ্ড শীতেও গায়ের কোট খুলে ভ্রূকুটি কুটিল ভয়াল মুখভাব নিয়ে চরকির মত সারা পাওয়ার হাউসে ঘুরে বেড়ান তিনি। কখন কোন্ মেশিনের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করেন, পরমুহূর্তেই চেপে ধরেন অন্য মেশিনের জল-নিয়ন্ত্রণের গভর্নরের হাতল। মুহূর্তে মধ্যেই আবার তীব্র স্বরে অকথ্য ভাষায় ভৎসনা করেন কোন অধস্তন কর্মচারীকে তার সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিতে। রাত্রি নয়টার পর ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে বিদ্যুতের চাহিদা, ফিরে আসে পাওয়ার হাউসের শান্ত স্বাভাবিক আবহাওয়া। সাইরেনের বদলে অলস মন্থর গতিতে চলার গুঞ্জন শোনা যায় মেশিনের অভ্যন্তর হতে। গায়ে কোট চাপিয়ে উত্তেজনা শেষে অবসাদগ্রস্ত মন নিয়ে ফিরে যান শর্মাজী নিজের গৃহের উদ্দেশে। দিনের পর দিন এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে আসছে তার জীবনে বিগত বহু বৎসর ধরে। যে জলের খেলায় কেটে গেল তার অর্ধেক জীবন, সেই জল হতে কেমন করে জন্ম হয় বিদ্যুতের, সে-রহস্য জানবার জন্য শর্মাজীর আগ্রহ প্রবল, কৌতূহল অসীম। স্বল্পশিক্ষার জন্য আকুপাকু করেও ভেদ করে উঠতে পারেন না অজ্ঞানতার অন্ধকার, হয়ে ওঠে না সমস্যার সমাধান। এই অভিযানে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা থাকায় ছুটে এসেছেন সব কিছুকে পিছনে ফেলে রেখে। এ-ছাড়াও শিকারে শর্মাজীর লক্ষ্য প্রায় অব্যর্থ। উপঢৌকন স্বরূপ অপর্যাপ্ত বন্য পশুপক্ষীর মাংস ও নদীর মৎস্য সরবরাহ করে রাজকীয় আহারের ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিতেও কসুর করেন ন তিনি। রাজী হতেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে পুনরায় আভূমি নত হয়ে সেলাম জানালেন। বন্য কুক্কুট মাংসের প্রাপ্তির সম্ভাবনায় রসনা এখন হতেই লোলুপ হয়ে উঠলো। ভগবান বোধকরি অলক্ষে হাসলেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য
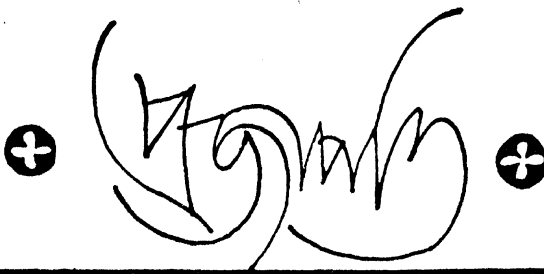
আগাছা কাঁকর আর নর্দমা-নালা জঙ্গল-জোড়া শহর প্রান্তে মানুষের নতুন নগর পত্তন হচ্ছে।

গৃহহারা মানুষ নতুন করে সংসার পাতছে। একদা চাকুরি করতে এসে মানুষের এই ঘর বাঁধবার অপরাজেয় সাধ দেখে অবাক হয়েছিলাম। সব খুইয়েও নতুন করে বাঁচবার আশ্রয়কে কে না চায়? সরকারী পুনর্বাসনে কাজ পেয়েছিলাম। চাকুরিটা আমার ভাল লাগেনি; মানুষের শত দুঃখের কাহিনী। নষ্ট সাধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃখবাদ আমার স্বভাব হয়ে উঠল।

মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার মত বিশুদ্ধ জীবিকার ভাবনাটা যেমন আকাশ-কুসুম, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আশ্রয়ও প্রায় তেমনি অভাবাত্মক। অস্তিত্বের এই সব নিরর্থ কাকে না বইতে হয়? জীবনের নানা অন্ধখাদে মানুষের মুখে যে লাবণ্যের অবিরল বিরহ জেগে থাকে সেই লাবণ্য যোজনার স্বপ্নই আমাদের অরূপ অস্তিত্বের সদর্থ বলে দেয়।

আমার ঘরের ভাঙা দেয়ালের নিচে প্রায়ই দেখি কত পিঁপড়ে এসেছে, কি এক অনির্দেশ্য একত্র-বোধ সম্মিলিত করেছে ওদের। শুঁড় উঁচু করে হাঁটছে, ফিরছে—একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে একটি বোধের বার্তা সংক্রামিত করে দিচ্ছে।

রোজই রিলিফ অফিসের গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে এসে থামে দেশছাড়া মানুষদের পাড়ায়। চুপ করে, অন্ধকার মুখে মেখে একদল মানুষ এসে দাঁড়ায় আমার সামনে, যেন তারা স্কুলের অপরাধী ছাত্র! অভাবের কঠিন পেষণে তারা মানুষের সব পাঠ ভুলে গেছে, কেবল শীত থেকে উষ্ণতার ভিক্ষা, রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি হতে আশ্রয়, ক্ষুধার অবিরাম তাড়না থেকে খাদ্যের অলস্য বাঞ্ছা।

সেদিন উদ্বাস্তুদের নতুন বসতগুলির পথে শ্যাওলা-জমা দেওয়াল-ঘেরা একটি পাঁচিল ঘরের কাছে কে একজন আমাকে ডাকলে—"শুনুন এদিকে, মা একবার আপনাকে ডাকছে।"

দেখলুম, একটি ছোট মেয়ে ডাগর চোখ মেলে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। করুণ ঔৎসুক্যে প্রজাপতির মত চল চল করছে দুটি চোখ। অনেকের কাছ থেকে অনুনয়ে প্রায় ভিক্ষার আহ্বান শুনেছি, যেখানে আমাকে দুরতিক্রম্য ব্যবধানে সরকারী কৃপাহীন যন্ত্রের মত ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটির ডাক যেন স্বতন্ত্র।

বললুম—আমাকে ডাকছ? কেন?

অবাক না হলেও বিমূঢ়তা আমার কতখানি মেয়েটি যেন বুঝেছিল—বললে, হাঁ, হাঁ, আপনাকে, আপনি ছাড়া কে ঘর চাইবার টাকা দেন, কে কম্বল দেন? আপনিই তো রিলিফ অফিসার?

—কিন্তু তোমাদের এই বাড়ির নাম তো আমার লিস্টে নেই— ইতস্তত করে বললুম।

—থাকবে কেন, আমরা কি ভিক্ষুক, নাকি? আমার মার কিছু টাকা রিলিফ নেবার কেন আছে! আমার বাবাকে তো আপনি জানেন! মা বলছে আপনি আমার বাবার বন্ধু, তাই একবার ডাকছে।

সেই ছোট্ট মেয়েটির কথায় হেরে গেলুম, ওকে অনুসরণ করলুম। দু চোখে আমার ওর কিশোর মুখের রূপ জড়িয়ে গেল, লাল ফিতের একটি পদ্মাদেলক ওর কাল বিনুনির পিঠে। গোধূলির আলোয় জবা ফুলের মত আমার চোখে লাগল।

সেই পোড়ো বাড়ির আসবাবহীন একটা

ঘরে এসে আমার অনুমান যথোচিত হ'ল। জুঁই ফুলের মত একটি শীর্ণমুখ অপেক্ষা করছে। সেই কিশোরীর মা। সুন্দরী বললে তাকে বর্ণনা করা হয় না। সাদা শাড়ি পরনে তাকে মনে হল, নিঃশেষিত প্রদীপ-শিখা যেন, হাওয়ায় কাঁপছে।

আমাকে চিনতে পার মিতা, দুষ্টুটা ঠিক তো পারল তোমাকে ডেকে আনতে?

চমকে উঠলুম এমন অন্তরঙ্গ আহ্বান শুনে।

সেই মহিলা একটি বেতের মোড়া দিয়েছিলেন আমাকে বসতে। নিজের ডাকনাম এমন অন্তরঙ্গভাবে ব্যবহৃত হতে আমার বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। আমাকে বসতে অনুরোধ করে বললেন, 'রোজই তোমাকে দেখি আর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।'

বললুম, 'কিন্তু আপনাকে আমি তো চিনতে পারছি না।'

—কি করে পারবে! যুগ কেটে গেছে, অনেক বদলেছি যে. বেতগায় তুমি তোমার মার সঙ্গে কত আসতে, তোমার সুন্দর মুখের প্রশংসা সব মেয়েদের মুখে মুখে ফিরত। তুমি কিন্তু সেই ছেলে মানুষের মত সুন্দরই রয়েছ।

নিজের সুন্দর মুখের কথায় বিব্রত হলুম, বললুম, 'কিন্তু বেতগাতে আমি বেশী দিন ছিলুম না, সবাইকে মনে পড়ে না।'

—বিনুদাকে, বিনুদাকে মনে পড়ে না?

—খু-উব, তাকে ভুলিনি, তার কাছে আমার পাঠ শুরু, কিন্তু আপনি বিনুদার—?

—বেশী বয়সে উনি আমাকেই বিয়ে করলেন, সে-ও আজ বার বছর হল। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলছিলেন উনি।

আশ্চর্য বোধ হল—বিনুদা, যিনি আমার কিশোর অস্তিত্বে অসম্ভব গল্পের জাল বুনেছিলেন তাঁর স্ত্রী! এ কোন্ রাজকন্যা?

বিস্ময়ে বললুম, 'বিনুদার স্ত্রী আপনি?'

বিনুদার স্ত্রীকে দেখলুম। রৌদ্র ও মেঘের মত স্মৃতি যেন সরোবরের আয়নায় মুখ দেখল। বিনুদার কথায় বিনুদার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিনুদা—যার ফুল ও প্রজাপতির শখ ছিল, যিনি কবিতা লিখতেন, রাজনৈতিক অপরাধে ধরা পড়তেন, যার নাম ইংরাজ সরকারের ত্রাস সঞ্চারী ছিল, ইংরাজ সরকারের জেলে থেকে থেকে যার বক্ষপঞ্জরে পচন ধরেছিল, সেই বিনুদাকে আবার দেখব যে এ-যেন হারান রূপকথার রাজাকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। আর কেউ না জানুক বিনুদাকে আমি যে কি চোখে দেখেছিলুম তা কি বিস্মৃত হতে পারি? বিনুদার কথাগুলি কত নিস্তব্ধ মুহূর্তে এখনও আমার মনকে দোলা দেয়। তিনি বলতেন—মানুষের দেহের যে আশ্চর্য প্রাণলীলা, মনের লাবণ্যে যা অপরিসীম সুন্দর, সাধ ও সাধনার সংগে অনুরণিত, সেই দেহে যতদিন যে কোনও রকমের আঘাতের কারণ রইবে ততদিন মানুষের চোখের জলের অপচয় থামবে না। বিনুদার মত পাথরের শরীরে আগুনের মত চোখে দু ফোঁটা শিশিরের মত চোখের জলও দেখেছিলুম। মনে পড়ছে তিনি সেদিন বলেছিলেন—জান সেই সুন্দর দেহে আমারই হাত নির্মম হয়েছে, এই হাত বহু হত্যায় লিপ্ত হয়েছে। গীতায় যে কর্মের কথা বলা হয়েছে তার কথা বলে গেলেন, কতদিন [illegible] থেকে যদি না মুক্ত হইতেম তবে এই দুঃসহ কর্মের গ্লানি আমাকে নিঃশেষ করত।

সেই বিনুদা যিনি পাকিস্থান ছেড়ে আসেননি বলে জানতুম, তাকে আবার দেখব যে কি ভাগ্য! কেমন আছেন বিনুদা, বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলুম।

কোথায় যেন গেছেন, স্বাস্থ্য ও'র ভাল নয়। আর একদিন এসে ও'কে দেখে যেও' বৌদি বললেন, তোমাকে একটু চা দিতে পারলুম না। বলে তিনি ব্যস্ত হলেন মিঠুকে ডাকলেন, — মিঠু — মিঠু...... দুষ্টুটা সারাদিন খেলায় মেতে আছে স্কুলে তো পড়াতে পারিনে, বাবার কা থেকে ফুল-প্রজাপতির শখ পেয়েছে, ও মুখ থেকে শোনা গল্পে মেতে র সারাদিন।

মিঠু দৌড়ে এসে বললে—কেন ডাক মা, তমালকে পাচ্ছিনে খুঁজে! মিঠু মুখে উদ্বেগ, যেন ওর ছোট ভাইকে খুঁজে পায়নি।

—পাবি, পাবি এখন, যাতো এই তো মিতু কাকুর জন্যে একটু মিষ্টি নিয়ে আয়

মিঠু একটু নারাজভাবে তাকিয়ে ছিল। আমি সংকোচে বললুম, ও-সব কেন বৌদি তার চেয়ে মিঠু যাক তমালকে খুঁজুক।

মিঠু কিন্তু পয়সা নিয়ে তখনই চলে গেল।

—দরিদ্র হলেও তোমার মত আত্মীয়কে একটু মিষ্টি মুখ না করিয়ে আমার সুখ নেই বুঝলে, বলে তিনি হাসলেন। এত সহজে বৌদি আমাকে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন যেন আমাদের জন্মান্তরের সুবাদ। বসেছিলেন আর জানালায় এসে মিঠুর জন্যে পথ চেয়ে বলছিলেন—তমাল হল মিঠুর নূতন প্রজাপতি, মটরশুঁটির বাগানে ওকে দু দিন দেখা গেছে। ঘরের লোক নয়তো যে ডাকলেই সে আসবে।

একটু থেমে আমার কাছে এসে হঠাৎ জল ছল চোখে বললেন—জান এই প্রজাপতির মত আমাদের সব সুন্দর স্বপ্ন মন মধুরে পাওয়া একদিন কোথায় পাখা মেলে উধাও হয়ে যায় আর ফিরে আসে না। তোমার বিনুদাকে নূতন দেশ গড়ার স্বপ্নে, ফুল ও প্রজাপতির বাগানের শখে আর মগ্ন দেখবে না। একদিন ভালবেসে আমাকে বিয়ে করেছেন, কিন্তু আমার ভালবাসা ওঁকে আর উৎসাহিত করে না। পাকিস্থান ছেড়ে এলেন যেদিন, বললেন,—হেরে গেছি আমরা, স্বার্থদুষ্ট রাজনীতি আমাদের আদর্শকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে এসে অবধি ওঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। কোনও কাজই করতে পারেন না, বলেন অসৎ অর্থে যে অন্ন জোটে তা কদন্ন। সরকারী কাজে ঘৃণা, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে উনি কি আর একটা কাজ পেতেন না?

আমি বললুম, সরকার তো আজ দেশের লোকের, সেখানে কাজ নিতে আপত্তি হলে ঠগ বাছতে যে গ্রাম উজাড় হবে, বৌদি!

বৌদি বললেন—আমিও বলেছি, কিন্তু উত্তরে তোমার বিনুদার উত্তেজনাই বেড়েছে, বলেছে,—কারা আছে আজ! সেই ইংরাজের জেলে খুন হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকেই আজ স্বার্থান্ধ জোঁকের মতই নিযুক্ত দেখনি? কোথাও তোমার বিনুদার ঠাঁই নেই, সব জায়গা থেকে পালিয়ে এসেছেন। শেষ পুঁজি গেছে। একদিন অভাবের তাড়নায় বললাম সরকারী ঋণ নেবার কথা। শুনে সে কি রক্তচক্ষু তোমার বিনুদার, চিৎকার করে বলে উঠল, এতদিন যা খুঁজেছি সেই খোঁজার কি শেষ হয়ে গেছে যে আমাকে ভিক্ষুকের দলে ঠেলে দিতে চাও? আমি অর্থ, যশ সব খুইয়ে যে দুঃখপথের পথিক হয়েছি সে কি এই ভিক্ষার জন্যে! আমি না কি সংসারের তুচ্ছ কামনায় দারিদ্র্যকে ভয় করি!

কিন্তু আমি কি করি বলতো? একবেলা একমুঠো হলে, অন্যবেলার শূন্য ঝুলি আমাকে উন্মাদ করে দেয়, ওই কচি মেয়েটার মুখ চেয়ে আমি স্থির থাকতে পারি না। বৌদির চোখে জল টল টল করে উঠল। বলল, কেঁদেছি আর ভেবেছি আমার ভালবাসার বুঝি জোর নেই, আমি এই সমাজের কাছেই সাহায্যের আবেদন জানাব, নইলে মিঠুকে বাঁচাব কেমন করে, ওকেই বা সুস্থ করে তুলব কি করে?

বিমূঢ় হয়ে আমি ভাবলুম, বৌদির এই এতটুকু কামনা কি সুন্দর নয়, সৎ নয়, যখন সে জীবনের সহজ সংরক্ষণের জন্যে সমাজের কাছে সহায়তা কামনা করে? কিন্তু বিনুদার যে অসুখ তাকে নিরাময় করানো সহজ নয়। ব্যর্থ অনুশোচনায় ভেবেছি, এ অসুখ তো সৎ মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এ যেন অর্জুনের বিষাদ সংশয়ের মত—কোনমতেই সে অন্যায় সাধন করবে না, দুরাত্মা আত্মীয়কেও সে নিধনে লিপ্ত হবে না। যে-সমাজে অহরহ অন্যায় সাধন বিনা নিশ্বাস নেবার ঠাঁই নেই, প্রচুর বঞ্চনা ও মৃত্যুর উপরে নিজেকে সংস্থিত করার অবকাশ নেই, সেখানে সৎ মানুষের জীবন মাত্রেই বিড়ম্বনা। তাকে পাগলই হতে হয়, তার অসুস্থ বোধের অবসান ঘটে না। বিনুদার মুখের কথায় আমি কত বড় আদর্শের প্রেরণা পেয়েছি একদিন, ভাবলুম। বিনুদার মনোরম স্বপ্নে আমার কৈশোর কেটেছে। তখন খুঁজেছি, আজও খুঁজেই চলেছি কী যেন। ভাল ছাত্র হবার তাগিদ নয়। বড় চাকুরে হবার আশা নয়, আমরা দেশের পরাধীনতার কঠিন কারাগারকে উন্মাদের মত ভেঙে ফেলতে চেয়েছি। আজ আর কি কেউ আমাদের মত স্বপ্ন দেখে?

সেই শুভদিন অতঃপর এল, পর অধীনতা মুক্ত স্বতন্ত্র সত্তায় বিপুল ভারতবর্ষের সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের দিন এল। কিন্তু বিনুদা এই সব দিনে
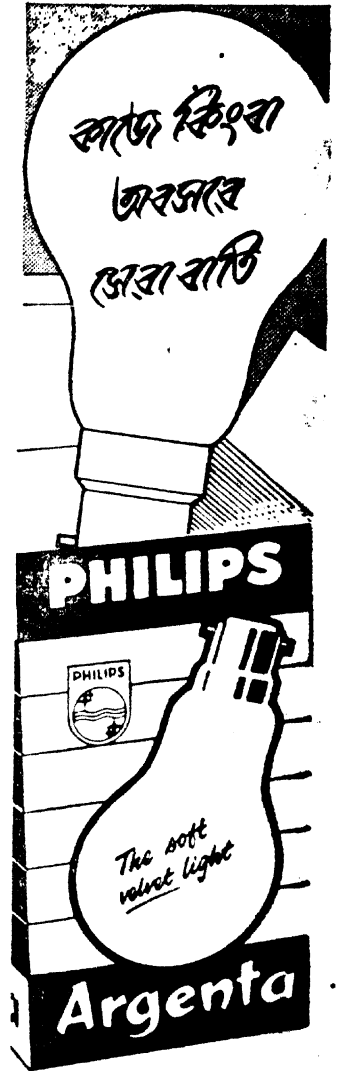
সুস্থ বোধ করলেন না, স্বার্থদুষ্ট রাজনীতি, পুরনো সমাজের পাঙ্কিলতা, গৃধ্নুতায় নূতন দিনের গায়ে ক্ষতের মত তার চোখকে পীড়িত করল, চোখ থেকে সেই পীড়া মনে বাসা নিল। মস্ত স্বপ্নের অবলম্বন তাঁর, নীল প্রজাপতির মত পাখা মেলে উধাও হল, আশা রইল না বিনুদার। আমি ভেবেছি বর্সাতিহারা মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব কিন্তু মানুষের মনের পুনর্বাসন কোন্ পুণ্যবলে যে সম্ভব, জানি না।

ওদের দারিদ্র্য যে কতটা তা ঘরের আসবাব ও শয্যাতেই আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু কী সুন্দর রুচি! কাঁট কাঁসার গ্লাস আর বাসনে, মাটির কুঁজো, ছেঁড়া খদ্দরের চাদরে ঢাকা একটি বিছানায়, জীবনের শুচিতা যেন জড়িয়ে ছিল, আর উৎসবান্ত প্রতিমার মত বৌদির সেই শীর্ণ

উজ্জ্বল রূপ পবিত্র অন্তরঙ্গতায় আমি মনেপ্রাণে মেখে নিলুম।

উঠে আসার সময় বললুম, 'তোমার একটা আয়ের সংস্থান না করতে পারলে আমি বুঝি তোমাদের কোনও কাজেই লাগব না! কিন্তু তার আগে?'—পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে বললুম—'এইটে বিনুদার জন্যে মিঠুর জন্যে নিতে তুমি নারাজ হয়ো না বৌদি!'

বৌদির কুণ্ঠা ও ভয় ছিল মনে। বললে, তোমার বিনুদা যদি জানে, তবে ও'র অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না।

টাকাটা নিলে বৌদি, পথ পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল। মিঠু দৌড়ে এসে বললে, মিতাকাকু, আমার 'তমালবীথি' দেখে যাও। দেখলাম সেই দরিদ্রতম জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষার মত কটা ক্রিসেন্থিমামের স্পর্ধিত সৌন্দর্য, আর মটরশুটি আনাজের একফালি বাগানে নীল প্রজাপতি উড়ছে।

বৌদি হেসে বললেন, মেয়ে আমার ওর বাবার কাছ থেকে কবির স্বভাব পেয়েছে। ও'র মুখে শুনে ওর প্রজাপতির বাসার নাম রেখেছে তমালবীথি।

মিঠু ওর ঢলঢল চোখ দুটি মেলে বললে, আমার তমাল আর বীথির ঘর, ভালবাসলে না। তমালবীথি নাম, কাকু?

আমি বলেছি, খুউব সুন্দর এই ঘর, এ যেন মস্ত কবির দেওয়া নাম।

মিঠুর প্রজাপতির ঘরের মতন সব ঘরের রচনাই তো সূর্যের মত সত্য।

হেসে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সেদিন বলেছিলুম,—বৌদি তোমার মিঠুর জগতে আমারও প্রজা হবার বড় লোভ রইল।

এর পর রোজই আমি বিনুদার বাসায় না গিয়ে পারিনি। বিনুদার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হল, ও'র অপ্রকৃতিস্থতার কিছু বুঝিনি। কেবল উনি আমাকে কিছুতেই চিনতে পারলেন না। বৌদি আমার অনেক পরিচয় দিয়ে হতাশ হয়ে বললে, মিতাকে ভুলে গেলে?

গম্ভীর দীর্ঘ সুপুরুষাকার বিনুদা স্থিরকণ্ঠে আমাকে বলেছেন, মাপ করবেন, আপনাকে চিনতে পারলুম না। একটা বিমর্ষতা ও'র চোখে, আমার মন হাহাকার করে উঠল—সেই চোখের আশ্চর্য আগুন কই বিনুদার?

আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বৌদি মোমবাতি জ্বাললে। বললে, তেল ফুরিয়ে গেলে অন্ধকারটা মারাত্মক হয়ে ওঠে। স্নিগ্ধ হাসি জেগেছিল ও'র মুখে, অতল কান্নার মেঘে এক ঝলক সূর্য যেন।

আমি বললাম, বৌদি এ রকম মারাত্মক অন্ধকার নিয়ে কি বিলাস ভাল আমাকে তোমার কিছু কাজে লাগতে দাও।

—কি করবে তুমি? বৌদি উন্মুখ হয়ে প্রশ্ন করলে। আমি ভেবে পাইনি কি করতে পারি আমি। বিনুদার চিকিৎসার ভাবনাটা আমার কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমস্ত প্রস্তাবটাই অর্থহীন বুঝেছি। আসলে বিনুদা স্মৃতিভ্রংশের উপসর্গটা স্বোপার্জিত তিনি তাঁর বিরাট আদর্শকে খুইয়ে নিজের স্মৃতিকে ভোঁতা করে দিতে চেয়েছেন। মাতাল মদ না খেতে পেলে যেমন নিঃস্ব বোধ করে, বিনুদা অবস্থাটা তেমনি মর্মান্তিক। শুনে ছিলাম বিনুদা দিনের উজ্জ্বল আলোয় রাত্রি মেনে ঘুমোন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যোগীর মত পরিহার করেন। ভাবতে পারতাম না বিনুদার মত মানুষের এমনি অসহায়তা। কিন্তু বৌদি সন্ন্যাসিনী হবার কোনও কারণ ছিল না তার দেহে যৌবন, শরীরের ক্ষুধা অস্তিত্বের বাসনা যে কত সুন্দর ও বৌদির মত মন ও রূপ যে মেয়ের আ সেই বুঝবে অন্য কেউ নয়।

আমি বৌদিকে একটি সেলাইয়ের কল পুনর্বাসন দপ্তর থেকে এনে দেবা প্রস্তাব করলুম সেদিন। বললুম, সেলা করে স্বল্প আয় তুমি নিজেই করে নি পার।

বৌদি বলেছিলেন, তোমার বিনু তাতে কি রাজী হবেন, সুখী হবেন?

সেদিন সেলাইয়ের কলটা নি গেলুম। বৌদি বললেন, এনেছ সর্বনাশ!

আমি বললুম, বিনুদাকে আ বুঝিয়ে বলি।

বিনুদার সামনে কলটা নি

বললুম, এইটে বৌদির জন্যে এনেছি সরকারী ঋণে, আপনি অসুস্থ, বৌদি এতে কাজ করলে কিছু আয় হবে।

নিঃশব্দে মেশিনটা দেখলেন বিনুদা, হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, না-না, না-না ও সব নিয়ে আমার কাছ থেকে চলে যাও তোমরা। হঠাৎ বিনুদা চুপ করে গেলেন। ব্যথিত আবেগে আমাকে বললেন, আপনি বুঝি আমার সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে পড়েছেন?

বিনুদার কথাটা নিষ্ঠুর হয়ে বাজল, বললুম, বিনুদা আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—না, না, নাও আমার থেকে সব কেড়ে নাও তোমরা, তবু আমার ভাবনা আমারই থাক—।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাগানে মিঠুর সঙ্গে সেই মানুষটাকে শিশুর মত তখনই হাসতে দেখেছি।

বৌদি বললেন, দেখলে তো, কিন্তু ওঁর পাগলামীর তো কিছুই দেখলে না। মনে হয় ওঁর খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়াও বুঝি ভাল। বৌদির চোখে জল, জোৎস্নার চূর্ণ চূর্ণ আলোক, আর দুঃখী হাওয়ার স্বর তার সুরে সুরে ছড়িয়ে গেল। সেই বিষাদ প্রতিমা আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে তখন। বলেছি, না, বৌদি না, এমনতর মরে যাওয়ার মারাত্মক বিলাস তোমাকে ছাড়তে হবে, অসুস্থ মানুষের আবেগের কাছে হেরে যেতে দেব না তোমায়, তোমাকে মিঠুকে বাঁচতেই হবে, বিনুদাকেও সুস্থ করে তুলতে হবে।

এতাবৎ আমি বৌদির সংসারে অন্তরঙ্গ অধ্যায় হয়ে উঠেছিলুম, কারণ সংসারের মধ্যে থেকে আমিও বড় একলা বোধ করতুম। বৌদিকে আমার মনের সুন্দর রচনার মধ্যে রম্য আধার বলেই মনে হয়েছে। চায়ের পেয়ালা পিরিচ, জমান দুধ কিনে এনে বৌদিকে দিয়েছি, বলেছি, চায়ের আসরটা তোমার এখানেই হোক না বৌদি।

বৌদি হেসে বলেছেন, আমার হাতের চা, না মুখের সুন্দর রূপ—কোনটা তোমার কাছে লোভনীয়, সত্যি করে বলো তো?

বলেছি, দুটোই। ঠাট্টা করো না বৌদি, বিনুদার কথাটা সত্যি হলে আমি মরে যাব।

বিকেলে সামনের খোলা বাগানে শতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা চা খেয়েছি। বিনুদা প্রায়শ অনুপস্থিত থাকতেন, হয় ঘুমোতেন, নয় তো স্টেশনের লাইন ধরে কোথায় বেড়াতে চলে যেতেন। বহুদূরে থেকে আমরা তাঁর পশমের জহর কোটটা লক্ষ্য করে বলতুম, বিনুদা চলে গেলেন। আমি বৌদিকে বলেছি—ঠিক বৌদি। বিনুদা তার যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে সময়ের সঙ্গে নির্বাসিত হয়ে গেছেন, আমাদের সুন্দরের সাধের মত

এই নির্বাসন, মিঠুর বাগানের প্রজাপতির মতই যেন গ্যাঁট ছেড়ে তারা সতত দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যায়!

সেইদিন বিনুদা ঝড়ের মত কোথা থেকে হঠাৎ ফিরেছিলেন। আমাদের চায়ের আসরে এসে চায়ের পেয়ালা পিরিচগুলি তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিলেন, রোষকম্পিত স্বরে বললেন, এই কি তোমাদের বিলাস আনন্দের সময়?

আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলুম, বিনুদা সেইখানেই থামলেন না, দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে যৎসামান্য আসবাব ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন, সেলাইয়ের কলটা বাইরে এনে আছড়ে ফেললেন। চিৎকার করে বলছিলেন, নিয়ে যাও এই পাপ, আমার ঘর থেকে সব নিয়ে যাও।

বৌদি বাধা দিতে গিয়েছিলেন, বিনুদা সমস্ত শক্তিতে বৌদিকেও দূরে ঠেলে ফেললেন। বৌদির হাতের আঙুল কেটে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমি যখন সেই রক্ত বন্ধ করতে গেলুম তখন বিনুদাকে উন্মত্তের মত চিৎকার করে বলতে শুনেছি, ওরা আমার স্ত্রীকেও কেড়ে নিতে চায়!

বৌদির চোখে ধারা, অবিচলিত মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

বিনুদার চোখেও বুঝি জল ছিল দেখলুম মিঠু এসে বাবার হাত ধরে ডেকে নিয়ে গেল—দেখবে এস বাবা তুমি আমার তমালবীথি ঘর ভেঙে দিয়েছ দেখ ওরা কোথায় চলে গেছে। বিনুদা যেন মন্ত্রতাড়িত মৌনতায় বাগানে এসে গম্ভীর বিষাদে তাকিয়ে রইলেন, গভীর অনুতাপে দেখলেন, একটা ডাল-ভাঙা ক্রিসান্থিমামে নীল প্রজাপতি তার ব্যথ কম্প্র ডানা মেলে দিয়েছে।

সেই দুঃখদৃশ্য আর আমি সহ্য করতে পারিনি, বৌদির কাছে বিদায় চাইতে বললে,—না, যেও না, আজ যে কথা তোমাকে বলতে চাই আর কোন দিনও তা বলা হবে না।

আমি বুঝেছিলাম, বৌদি কি বলবেন, যে-কথাটা আমার মনেপ্রাণে গাঁথা হয়ে গেছে, কেবল বৌদির মুখ থেকে সেই কথাটা শোনারই যা অপেক্ষা

বৌদি বলল, তুমি কি বুঝবে মিতা ঐ মানুষটার আদর্শ, ঐ মানুষটার স্বপ্ন একদিন আমাকে কী উন্মাদ করেছিল, কী তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমাকে ভরে দিয়েছিল, কিন্তু আজ ওর চোখে স্বপ্ন নির্বাসিত, ওর মন আর দেহ মর্মান্তিকরূপে বিকল, আমার প্রেম আমাকে এমন নিঃস্ব করেছে কেন? তোমার সুন্দর মুখের অনুরাগ, তোমার যৌবনের স্বপ্নই শুধু আমার এই দুঃখ-দিনের সম্বল, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝবে, তুমি কি আমার বাঁচার পথ বলে দেবে?

আমি দেখছিলুম বৌদির অমন সুন্দর চোখের আলো যেন নিভে এল, সমস্ত শরীর যেন ব্যথায় কেঁপে উঠেছিল—বললে, আমার হাত ধরে বললে—আজ তুমি যাও, জানি তুমিও আমাকে পাগল ভাবলে।

আমি কি করব, আমি যে মানুষটা [illegible] মানুষদের বড় ভেবে বন্দনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখেছি, কী অন্ধকার মুখে মেখে অভাবের কঠিন শাসনে তারা সংসারের সব পথেই ভুলে গেল, তাদের সঙ্গে বিনুদা, বৌদি, মিঠুকে একাসনে তুলি কেমন করে?

বিচিত্র জীবনপ্রবাহে এ এক অভাবনীয় আলোড়ন, যার ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিতে চাইলে। দেখেছি মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব, কিন্তু মানুষের মনের কি তা সম্ভব? ভেবে কূল পাইনি।

একদিন বৌদিদের এলাকা ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হল, খুব তাড়াতাড়ি একটা বদলির আদেশ এল। এমনি করে যে চলে আসতে হবে, তা কি আমি আগে বুঝেছি। বৌদিকে আমি ভালবেসেছিলুম, ভেবেছিলুম সে নির্বাসিত রাজকন্যা, রাত্রির অন্ধকার যার শরীরে বাঁধা। শীতের কুয়াশায় দেখি সে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ডাকলে সাড়া মেলে না। কনকচাঁপার রঙ-গোধূলিতে তার শরীর কাঁপে। প্রশ্ন করি যদি, কি করবে এখন? সে কথার উত্তর মেলে না। তার সেই সুন্দর মুখ দূর থেকে দূরে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে।

বৌদির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে আমি কি সেই সুন্দর দুঃখই কামনা করেছি, সেই চিরপ্রবাস যা শত সাধ্য-সাধনায়ও ভাঙবে না।

বৌদি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছে—মা তোমার বিয়ে দেন না?

হেসে আমি বলেছিলাম, তোমার মত মেয়ে পেলে তো আমার পছন্দ হবে! দ্বিতীয়তে রুচি নেই।

পকেট থেকে বদলির চিঠিটা দেখালুম। বললুম, এই প্রবাস আপাতত অবধারিত। আমার চোখেও জল এসেছিল। সংসারের সব সুন্দর বাসনা তো নিরঙ্কুশ নয়। একদা বিনুদার অনন্য দীপ্তিই আমার মনকে স্পর্শাতুরা করত। সেই আদর্শ-অবিচলিত সৌম্য মানুষটি যে সমুদ্রের তপশ্চর্যায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিলে, তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে আনার কোনও আশাই রইল না। কিন্তু বৌদির যৌবন যে আরও কিছু চেয়েছিল, একটি সুন্দর মুখের, সার্থক সাধের, সফল স্বপ্নের অনুরাগবাঞ্ছিত বন্দনার অপেক্ষায় যার জীবন মধুর হতে চেয়েছিল, তাকেও সংসার থেকে নির্বাসিত হতে হল।

আমি যখন এই নিষ্ঠুর সত্যের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, তখন আমার মনও হাহাকার করে উঠেছে। যে সমাজটা অনেক অপেক্ষায় সুন্দরের আসন করে দেবে তার বড় দেরি, বড় দেরি।

অনেককাল মফঃস্বলবাসী হয়ে আবার আমার সুপ্ত লোভ জেগে উঠল, বৌদিদের দেখব। মিঠুর জন্যে খেলনা কিনেছিলুম, বৌদির জন্যে একটা নীলাম্বরী শাড়ি। ফিরে গিয়েছিলুম সেই উদ্বাস্তুদের পাড়ায়। কিন্তু শ্যাওলা-ঢাকা পুরোন দেওয়ালের সেই ঘরটা আর খুঁজে পেলুম না; সেখানে মস্ত বাড়ি উঠেছে। বাড়ির সামনে নানা মরসুমী ফুল ছেয়ে আছে। কি আশ্চর্য, বাগানের ক্রিসান্থিমামে সেদিনও নীল প্রজাপতি ব্যথাকম্প্র ডানা মেলে বসেছিল, দেখলুম যেন আমাদের সুন্দর সাধের বাঞ্ছনার মত দূর থেকে দূরে উদাসী হাওয়ায় ডানা মেলে সে ভেসে গেল!

চক্রদত্ত

মানুষের শরীর ধারনের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে দেহের নানাবিধ ব্যাধিজনিত. কষ্ট দূর করার জন্য রাসায়নিক পদার্থ আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই সব রাসায়নিক পদার্থ শুধু যে মানুষের দেহের জন্য কাজে লাগে তা নয়, গাছপালার পুষ্টিসাধনের জন্যও অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। মানুষের শরীরে ব্লাড প্লাজমা কমে গেলে "ডেক্সট্রান্স" বলে এক রকম রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়। ডেক্সট্রান্স চিনি থেকে তৈরি হয়। যদি কোনও জমিতে এই ডেক্সট্রান্স মেশান যায় তাহলে ঐ ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি খুব বেড়ে যায়। ঐ জমিতে উৎপন্ন গাছপালাতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়াম জোগান দেয়। সাধারণ জমিতে গাছ-পালার যে রকম বৃদ্ধি হয়, ডেক্সট্রান্স মিশ্রিত জমির গাছ তার চেয়ে অন্তত শতকরা ৭০ গুণ বেশী বাড়ে। ডেক্সট্রান্স ব্যবহার করা খুব ব্যয়সাধ্য নয়।

*

লোকে কথায় বলে এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। কিন্তু আজকালকার দিনে এক গাছের অংশ নিয়ে অন্য গাছের অংশে জোড়া লাগানর পদ্ধতি হিসাবে "গ্রাফটিং" কথাটির সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত হয়েছি। শুধু গাছ কেন, মানুষের বেলাতেও স্কিন গ্রাফটিং অর্থাৎ শরীরের এক জায়গার চামড়া অন্য জায়গায় জোড়া দেওয়ার কথা আমরা জানি। এই রকম চামড়ায় তালি মারার ব্যাপারে যতটা সম্ভব নিজের দেহের চামড়া হলেই ভাল হয়। অবশ্য সব সময় নিজের শরীরের চামড়া পাওয়া সম্ভব হয় না, তখন অপরের দেহের চামড়া নিয়ে তালি দিতে হয়। ডিউক য়ুনিভার্সিটির ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, মানুষের দেহের একটুকরো চামড়া ল্যাবরেটরীতে রেখে নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঐ চামড়ার টুকরোটি আকারে প্রায় ১০ গুণ বাড়িয়ে তোলা যায়। সাধারণত মানুষের দেহ পুড়ে গেলেই স্কিন গ্রাফটিং-এর প্রয়োজন হয়, তখন ঐ পোড়া অংশ থেকে এক টুকরো চামড়া কেটে লেবরেটরীতে রেখে প্রায় ১০ গুণ বাড়িয়ে নিতে পারা যায়। এই কারণে আজকাল কোনও মানুষ পুড়ে গেলে তার দেহের পোড়া অংশ থেকে অল্প একটু চামড়া কেটে ঐ ল্যাবরেটরীতে রাখার ব্যবস্থা হয়, ফলে ঐ চামড়া দশ গুণ বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর চামড়া সংগৃহীত হয়।

*

লনের ঘাস ছাটিতে হলে লন মোয়ারের দরকার। যখন এই মোয়ার চালান হয়, তখন লোহার তৈরী বিভিন্ন অংশ, যেমন রোলার, কাটার এবং চাকা থেকে একটা বিরক্তিকর শব্দ হতে থাকে। অবশ্য এই শব্দ থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই না পেলেও একটু চেষ্টা করলেই কিছুটা শব্দ বন্ধ করা যায়। যেমন লোহার চাকা দুটোর ওপর যদি একটা করে রবারের আবরণ দিয়ে নেওয়া যায়। আর এটা খুব সহজেই করা যায়। যে কোন পুরান মোটরের রবারের টিউব থেকে চাকার মাপে টিউব কেটে নিয়ে কোন রকম রবার আঁটবার আঠা দিয়ে এটা লোহার চাকার ওপর সেঁটে দেওয়া হবে। ছবিতে দেখান হচ্ছে যে, চাকার ওপর রবারের টিউব লাগান হচ্ছে এবং টিউবের অংশ কতটা কাটা হবে।
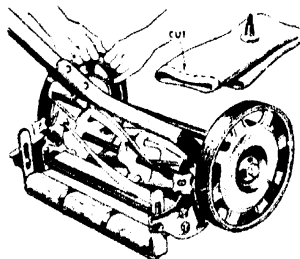
লন্ মোয়ারে রবারের টিউব লাগান

*

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এক নতুন ধরনের হেলিকপ্টার তৈরী করবার বন্দোবস্ত করছে। অবশ্য এই নতুনত্ব হচ্ছে 'গ্যাস টারবাইন' ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটি প্রথমে গ্যাস তৈরী করে সেই গ্যাস ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগান একটা স্যাফট্ বা ডান্ডাকে ঘোরাবে। এই ঘোরার ফলে স্যাফ্টের সঙ্গে লাগান 'রোটরস', যার সাহায্যে মাথার ওপর পাখাগুলো চলে, সেটাকে ঘোরাতে থাকবে। এই নতুন গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিনের সুবিধা অনেক, যেমন দেখতে ছোট, ওজনে কম, সহজেই লাগান যায়, চালাবার খরচ কম ইত্যাদি। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে, এই নতুন ইঞ্জিন লাগানর দরুণ হেলিকপ্টারটি খুব অল্প কাঁপবে ফলে আরোহী এবং চালকেরা আরাম বোধ করবে।

*

তোতলামি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটু চেষ্টা করলেই সারান যায়। এর জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা দরকার। সাধারণত তোতলারা যদি একটা কথা বার বার চিৎকার করে আস্তে আস্তে বলবার চেষ্টা করে তাহলে ক্রমশই তোতলামিটা কমে আসবে। এর জন্য একলা বসে বসে কোন ঘরে চিৎকার করে কোন কিছু পড়া অথবা কিছু মুখস্থ বলবার চেষ্টা করা ভাল। ইংলন্ডের অনেক হাসপাতালে শব্দতত্ত্ববিদ্‌রা এই নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং করছেন। তাঁদের মতে ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জন তোতলার তোতলামি সেরে গেছে দেখা যায়। এর জন্য এঁরা তোতলাদের একটা করে হেড-ফোন পরতে বলেন। হেড-ফোন থাকার ফলে তোতলাদের নিজেদের শব্দ তারা এত বেশী জোরে শুনতে থাকবে যে, তারা নিজেদের শব্দ বলে বুঝতেই পারবে না। হেড-ফোন পরে কোন সহজ বই থেকে চিৎকার করে কিছু পড়া দরকার। এই রকমভাবে অভ্যাস করতে থাকলে ক্রমশ তোতলামির উন্নতি হচ্ছে দেখা যাবে এবং দু' থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই উন্নতি সহজেই লক্ষ্য করা যাবে।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অন্য দিকে বে-সরকারি চিন্তা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান এই কয়টিঃ—(১) বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যতটুকু জানি, ও যেটুকু জানি তা যদি বলি, তবে বন্ধুরা চটে যাবেন, ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মভঙ্গ হবে। কাকে কাকের মাংস খায়ও না। তবে নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চিন্তা, নতুন গবেষণা যে হচ্ছে না সকলেই জানেন। আমার বিশেষ বক্তব্য এইটুকুঃ আমাদের রিসার্চ এখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক—রোমাণ্টিক, নামজাদা অধ্যাপকরা এই বিষয়ে এখনও সচেতন নন। অথচ এ-যুগে ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ কেবল অসম্ভব নয়, অনৈতিহাসিক। এখন দল বেঁধে কাজের যুগ। তাদের বেশী রিসার্চটাকেই সোস্যালাইজড না করে উপায় নেই। প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বাদ দিচ্ছি। আর চিন্তাই বা এমন কি নতুন পাচ্ছি। ভারি মজার ব্যাপার ঘটছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিষয়ের চিন্তা প্রায় অ-সমাজিক কাজ হয়ে উঠল। একে 'ফিলজফাইজিং' নাম দেওয়া হয়।

(২) এক একটি পলিটিক্যাল পার্টির একটা না একটা ছোট-খাট গবেষণা-কেন্দ্র আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রই এখন যা কিছু কাজ করে। একটু একঘেয়ে, তবে ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। সোস্যালিস্ট পার্টির খোঁজ পরিষদ এখন নিখোঁজ। কম্যুনিস্ট পার্টির রিসার্চ সেকশন এখনও গঁদ আর কাঁচির ওপরই নির্ভরশীল।

(৩) রিজার্ভ ব্যাংকের রিসার্চ সেকশনই এখন দেশের উৎকৃষ্ট গবেষণা-কেন্দ্র। এর পার্টি লাইন নেই; তথ্যগুলিও নির্ভরযোগ্য; এবং প্রবন্ধগুলিও সারবান।

(৪) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউটের সব কাজ জানি না। তবে যটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। এর কাজের একাংশের সঙ্গে আমি যুক্ত—সে-অংশটির মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

(৫) বাকী রইল আমাদের সংবাদপত্র ও পত্রিকা। 'ক্যাপিটাল', 'কমার্স' 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' আর 'ইকনমিক উইকলি' আমি প্রায়ই পড়ি। এর মধ্যে শেষেরটিকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ। হয়ত অন্যগুলি বেশী তথ্য দিতে পারে না, কিন্তু ইকনমিক উইকলির এমন সংখ্যা দেখিনি যাতে অন্তত একটা প্রবন্ধ আমাকে ভাবিয়ে তোলেনি। চিন্তার খোরাক শচীন চৌধুরী জোগান দিতে জানে। সে একটি চমৎকার গোষ্ঠী তৈরী করেছে,—সব নতুন বুদ্ধিমান অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিকরাই সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল সমাজতত্ত্বেরই দিক থেকে তার সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রামজীবনের বিশ্লেষণ অপূর্ব। দেশে সে গবেষণার নতুন ধারা খুলে দিল। (এ-কথা সায়েবে মানে।) বাংলা সরকার ছাপিয়েছেন কৃপা করে—ফলে বড় কেউ বইখানি পড়তে পায় না।

দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষজ্ঞদের রচনা বেরোয়। যে কাগজের পয়সা আছে সেই পারে। রবিবারের সংখ্যায় একাধিক ভালো লেখা পড়েছি। হয়ত গবেষণা নয়, শুধু পাঠ্য।

(৬) নানাপ্রকারের চেম্বার্স অব কমার্সেরও রিসার্চ সেকশন আছে। যা-কিছু লেখা আমার চোখে পড়ে তাতে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাই না। এখনও দেশী ধনিকতন্ত্র এমন অপক্ব যে, অবজেকটিভ ছাঁচ দিতেও ভয় পায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও সংখ্যা সরকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক গবেষণার প্রায় সবটুকুই—দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা সংগ্রহ করছেন নিশ্চয়। কিন্তু সব যেন ছেঁড়া ছেঁড়া। এখনও ফল প্রকট হয়নি।

(৭) ল্যাজের দিকে রেডিওর বক্তৃতা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য—এ-সব বক্তৃতা শুনি। মনে হয় পলিটিক্যাল লেকচার শুনছি। ভালোর সংখ্যা নিতান্ত কম। কোথায় বি বি সি-র থার্ড প্রোগ্রাম—আর কোথায় আকাশবাণী। সবই প্রায় বাণী! প্ল্যানিং সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি কিন্তু ভালো। আমরা 'টক' দিতে জানি না—অত্যন্ত ডাইড্যাক্টিক। সবই

প্রায় ধর্মোপদেশ, সার্মন অর্থাৎ বিষয়ের ওপর কম দখল ভরাই উপদেশের মাটি দিয়ে।

৯।২।৫৬

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কিভাবে সাজান যায়, তাই নিয়ে প্রায় বিনিদ্র অবস্থায় কাটছে। কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। University Grants Commission. Planning Commission, আর Inter-University Board—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যদি একটি যুক্ত সমিতি বসে ও অনবরত সারা বছর ধরে কাজ করে যায়, তবে কিছু আশা থাকে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না মনে হয়। অন্য দিকে আমাদের মিথ্যা দম্ভ, রোম্যাণ্টিক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মনোভাব কিছু কমবে। সত্যই আমরা এই নতুন দেশের জন্য বেশী কিছু করে উঠতে পারছি না। আর্থিক দৈন্য জানি—সব জানি—পঁচিশ বছর যে লেকচারার ছিল সে হাড়ে হাড়ে জানে। তবু সন্দেহ হয়, আমাদের কর্তব্যের হানি হচ্ছে। এ-অবস্থায় সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি, গল্পগুজোব কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারছে না। কেবল কফি আর সিগারেটই চালাচ্ছি। কিছুই যেন হল না। অথচ কিছু চাই। নচেৎ দেশ ডুববে।

১০।২।৫৬

আজ সারা বিকেল দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যানের খসড়াটা পড়লাম। এক চটকায় গোটা কয়েক ধারণা ভেসে এল। মন দিয়ে বহুবার পড়লে হয়ত মতামত তৈরী হবে। আপাতত ধারণা মাত্র। সবটা দৈনিকে বেরিয়েছে কি না জানি না।

প্রথম প্ল্যানের খসড়ার চেয়ে এটার আকার ছোট। একটু যেন তাড়াতাড়ি লেখা বিশ্লেষণের অংশ যৎসামান্য, নেই বল্লেই চলে।

যাদের কাজ নেই তাদের কাজ হবে না। নতুন যারা আসবে তাদের কিছু কাজ জুটবে। কিছু নিশ্চয়, কিন্তু কতটা নিশ্চয় বলা হচ্ছে না। এক কোটি আন্দাজ মাত্র। ছোট ইনডাস্ট্রি ও কুটীর-শিল্পের কাজ তৈরী করবার কতটা ক্ষমতা, তার হিসাব পাকা কি? ছোট ইনডাস্ট্রির বহু সংজ্ঞা দেখেছি—কোনটা ধরব? বিদেশী কর্জ ও সাহায্যের হিসেব প্ল্যান-ফ্রেমের হিসেবের দ্বিগুণ। কোন্ ভরসায় দ্বিগুণ হলো? যে-কারণ দেখান হয়েছে, সেটা ফিকে আশা মাত্র। ইনফ্লেশনের ভয় যেন একটু বেশী পেলাম। অতট খরচের প্রায় আধখানা গ্যাপ্ সাম পারব কি? অবশ্য শেষ র‍্যাশনিং। খসড়ার মধ্যে অনেক কথা রয়েছে, যা মনে হয় যেন স্রোতটি একটানা দোটানার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা [illegible] যথা ১৯৪৮ সালের পলিসি পরিবর্ত ইচ্ছা। তবু দোটানার লক্ষণ দেখব "Rapid industrialisation is t[illegible] the core of developme[illegible] —একধারে, আর অন্য ধারে [illegible] ইনডাস্ট্রি তার একটা সংজ্ঞা না বুঝলাম এবং কুটীর-শিল্পের উঁচ সাহায্যে কনজিউমার গুডস্ যথার্থ বাড়ান। দুটোর মধ্যেকার ফাঁক 'ইনটেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট' এই কথা [illegible] 'পেপার' করা হয়েছে। 'ইনটেগ্র শব্দটির বহু প্রয়োগ সংশ্লেষণ "It is not enough in the conte[illegible] of planning to think merely [illegible] terms of a balance between su[illegible] plies and demands in aggrega[illegible] terms, what is required [illegible] balance between requireme[illegible] and availabilities especially [illegible] key resources at all stages. [illegible] great deal of continuous techn[illegible] cal and statistical [illegible] is necessar[illegible] for the purpose." তারপর [illegible] সমস্যার উল্লেখ এক লাইন [illegible] প্রথম বাক্যটি সকল অধ্যাপ[illegible] অবধান করুন। বেশ কথা—অর্থা[illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণ অচল [illegible] মানি। দ্বিতীয় বাক্যটি [illegible] আমার এইখানে একটি ছো[illegible] কথা মনে উঠছে। আমার মতে what is required is not balance but a little unbalance, যা থেকে সামলান যায়, যেটা হোঁচ[illegible] খাওয়া না। এইভাবের যৎসামান[illegible] অসমতা গতির ধর্ম। এক বছরে[illegible] হিসেবে নিশ্চয়ই ব্যালান্স—কিন্তু এক পাঁচ-বছরের পর যদি অন্য পাঁচ-বছর আসে এবং আসবেই, কারণ কাল নিরবধি, তো 'অ্যাভেলিবিলিটিজ' অর্থাৎ প্রোডাক[illegible] শনের দিকেই ঝোঁক দিতে হবে 'রিকোয়ারমেণ্টস্' ত' বেড়ে চলবেই লোক-সংখ্যা কিছু কমছে না, আম[illegible] বাণপ্রস্থও নিচ্ছি না এবং ইনডাস্ট্রিয়া[illegible] লিজেশন আরম্ভ হলে থামেও না। অবশ্য

key resources at all stages-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ' কথাই বলা হয়েছে এখানে। তার বৃদ্ধিতে সময় লাগে—ততদিন? 'প্রোডাকশন গুডস্'-এর অ্যাভেলেবিলিটিজ বাড়াবার জন্য 'কনজিউমার গুডস্'-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ'-এরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি চাই, [illegible] ইন্‌ফ্লেশন অনিবার্য। এখন দেখা গেছে যে, একই ক্যাপিটালের ব্যবহারে কিছুকাল পর্যন্ত ছোট কারবার ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্যাপিটাল গুডস্-এর উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী, কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল টাইমের পর শেষেরটা হুড়মুড় করে বেড়ে যায়। অতএব ব্যাপারটা [illegible] নয়, [illegible]—ঐ ক্রিটিক্যাল টাইম-এর একটা হিসেব চাই—সেটা কি পাঁচ বছর [illegible] ধরা যায়? [illegible]

[illegible] specially of key resources at all stages বলা হয়েছে। অ্যাভেলেবিলিটিস্-গুলোকে টোটাল হিসেবেই দেখে ধরবে। [illegible] দুটো ভাগ করা যায় সুবিধের [illegible]। [illegible] তাই ছিল। এ [illegible] একটা কথার (ইন্টিগ্রেল) পাতে পাতে [illegible]। [illegible] দেখেছি, [illegible] সম্ভব [illegible] হয়, সেখানে আর কিছু না বলতে [illegible] কো-অপারেশনই একমাত্র পথ। 'ওরে বাপু, প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর, তোরা ঝগড়া [illegible]—সবই ইন্টিগ্রেল ভারতমাতার [illegible]। 'ওরে বাপু ক্যাপিটাল গুডস্ ইন্ডাস্ট্রি আর কটেজ এ্যান্ড হাউসহোল্ড্ ইন্ডাস্ট্রি—তোদের মধ্যে ঝগড়ার কোনো কারণ নেই, সবই ইন্টিগ্রেল প্রডাক্সন-এর যোগান দিচ্ছিস।' এটা পলিটিক্যাল গৃহকর্তার দৃষ্টিভঙ্গী, তাই এর ভিত্ত কম্প্রমাইস্। অথচ বলতে হবে ইকনমিক দৃষ্টিভঙ্গী!

দ্বিতীয় প্ল্যানিং-এর (এইটেই প্রথম) চতুর্থ উদ্দেশ্য—

'Reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power!"

খাশা! ইন্‌কাম্ অ্যান্ড ওয়েল্থ্ দুইই আছে, কিন্তু প্রপার্টি কথাটির নামোল্লেখ নেই। এ সম্বন্ধে আমি যত বিলেতী বই ও প্রবন্ধ পড়েছি তাতে জানি ইন্‌কাম্ অ্যান্ড ওয়েল্থ্-এর দরুণ অসমতা ফিস্‌ক্যাল মেজার্স দিয়ে খানিকটা কমলেও যতক্ষণ প্রপার্টি-র আরও মৌলিক ও আরো সাংঘাতিক অসমতা কমানো না যায় ততক্ষণ আয় ও ধনের বিভাগটা প্রায় তেমনই থাকে, তার গঠনমূলক পরিবর্তন হয় না। (অন্য উপায় কালডর-এর মতানুসারে ব্যয়ের ওপর জবরদস্ত কর বসানো। সেটা ত মার্শাল, পিগু, কীন্‌স্ লঙ্ঘন সম্ভব নয়। কালডরের মতে ইনকাম-এর অর্থ ব্যাপক হওয়া চাই; তার মধ্যে ক্যাপিটাল গেইনস্ এ্যান্ড অন্যর ক্যাজুয়াল রিসিপ্টস্ আসা উচিত; এবং তার ওপর এনুয়েল ট্যাক্স্ এসেস্‌ড্ অন প্রপার্টি। এই দুটো অস্ত্রে তবেই ইনকাম ট্যাক্সের যা কিছু ন্যায়সঙ্গত ইকুইটি সাধন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তিনি জোর করেই বলছেন যে ইন্‌কাম-এর এমন কোনো অবজেক্টিভ সংজ্ঞা সম্ভব নয় যার দ্বারা খরচ করবার ক্ষমতা (স্পেন্‌ডিং পাওয়ার) মাপা যায়।)

ডিস্ট্রিবিউশান অব ইকনমিক্ পাওয়ার সম্বন্ধে খসড়াটি নীরব। এ-নীরবতা ভয়াবহ। অর্থনৈতিকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামান না বলেই কি? অথচ সবই ত শেষে পাওয়ারের ভাগ বাঁটোয়ারা।

১৮৫৭

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

স্মরণীয় ১৭৫৭ সাল! এই ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে 'ক্লাইভের খঞ্জর' 'বাঙালীর খুনে লাল' হইয়া গিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারত ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব 'সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে ধৃত হইয়া ঘাতকের অস্ত্রে নিহত হন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর জাফরের বেনামিতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া বসিলেন।

"বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী
দেখা দিল
রাজদণ্ডরূপে।"

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় শতবর্ষ পরের কথা। ইংরেজী ১৮৫০ সাল। ইংরেজ শাসনের জগদ্দল পাথর ভারতবর্ষের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। তুষার কিরীটী হিমাচলের পদপ্রান্ত হইতে সমুদ্র ফেন-চুম্বিত কন্যাকুমারী, ঊষর সিন্দুর ধূসর মরুপ্রান্তর হইতে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ ইংরেজের জয়নাদে মুখরিত। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর অভিনব সাম্রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছে। শিখ, মহীশূর এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাম ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

১৮৫৬ সালে বড়লাট লর্ড ডালহৌসী অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড ক্যানিং তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন তখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। কোনকালে যে ইহার অবসান হইবে তাহাও বোধ হয় কেহ ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দিগন্তে খণ্ডমেঘের আনাগোনা চোখে পড়িত। লর্ড ডালহৌসীর ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের মূলদেশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কি কারণে, কেমন করিয়া, তাহাই বলিতেছি।

লর্ড ডালহৌসী ছলে বলে, কৌশলে বহু দেশীয় রাজার রাজ্য গ্রাস করেন। তাঁহার স্বত্ব লোপ নীতি (Doctrine of Lapse) এবং তৎকর্তৃক কানপুরের অদূরে বিঠুরে নির্বাসিত পেশোয়া দ্বিতীয়

তাঁতিয়া তোপী

বাজিরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি আট লক্ষ টাকা তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবকে না দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে একটা সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বেই অযোধ্যার রাজচ্যুত নবাবের অন্যতম পরামর্শদাতা আহমদ উল্লা, নানা সাহেব এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, নানা সাহেবের অনুগত কর্মচারী তাঁতিয়া তোপী এবং আজিম-উল্লা খাঁ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই; বিহারের জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কুনওয়ার সিং, এবং নামশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরুজ প্রভৃতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বি[illegible] ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতে আরম্ভ করি[illegible] ছিলেন।

কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসন্তো[illegible] কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাব[illegible] ছিল না। কোম্পানী কর্তৃক জমিদারদিগে[illegible] জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিবার নীতির ফ[illegible] এক গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট ঘনাইয়[illegible] আসিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসির শাস[illegible] কালে নিযুক্ত ইনাম কমিশনের সুপারি[illegible] ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎস[illegible] একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই ২০,০০[illegible] জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। এ[illegible] সমস্ত জমিদার এবং ইঁহাদের কর্মচার[illegible] ও অনুচরবৃন্দ বৃত্তিহীন হইয়া পড়ে[illegible] অনেকেরই দুর্দশার একশেষ হয়।

এদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক ইংরেজী শিক্ষা, রেল, [illegible] প্রভৃতির প্রবর্তন ও প্রসার রক্ষণশী[illegible] সম্প্রদায়ের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল[illegible] অনেকেই সন্দেহ করিলেন যে ভারতী[illegible] সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতবাসী[illegible] ধর্ম ভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানী করা হইয়াছে। খ্রীষ্টা[illegible] মিশনারীদিগের কার্যকলাপে এই সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়। স্বধর্মের মহিমা কীর্তন অপেক্ষা পরধর্মের, বিশেষত সর্বপ্রাচীন হিন্দু ধর্মের, নিন্দাবাদেই ইঁহাদে[illegible] অনেকের বেশী উৎসাহ দেখা যাইত। 'মূর্তিমান দুর্নীতি এবং হিন্দুধর্ম একই কথা!'

Crystallised immorality an[illegible] Hinduism are the same thin[illegible] ইঁহাদেরই একজনের কথা। কথাটা বল[illegible] হইয়াছিল সিপাহী যুদ্ধের অনেক পরে।

শাসন কার্যে নিযুক্ত ইংরেজ রাজ-পুরুষগণের অকারণ ঔদ্ধত্যে জনসাধারণও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এ[illegible] সমস্ত রাজপুরুষের মধ্যে অযোধ্যার চী[illegible] কমিশনার সার কাভারলি জ্যাকসনের না[illegible] উল্লেখযোগ্য। ভারতে ইংরেজ শাসনে[illegible] প্রধান সহায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রভুভক্তি এবং আনুগত্যেও ভাটার টা[illegible] ধরিয়াছিল। ইংরেজ অমিতবলশালী ত্রিভুবনে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই এই ছিল

এতদিন সাধারণ ভারতবাসীর ধারণা। কিন্তু প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯—৪২) এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) এই ধারণা দূর করিতে সহায়তা করিয়াছিল। ইংরেজের শক্তিমত্তায় ভারতবাসীর আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী তের বৎসরে সিপাহী বাহিনী চারবার—১৮৪৪, ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫২ সালে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। অন্যান্য কতকগুলি কারণেও সিপাহী বাহিনী উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। ইহার নিয়মানুবর্তিতাও হ্রাস পাইতেছিল। ইহার উপর যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় বাহিনীতে নব-প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেলের টোটা মুড়িবার কাগজে শূয়োর এবং গরুর চর্বি মিশ্রিত এই কথা প্রকাশ পাইল, তখন সিপাহী বাহিনীর প্রধূমিত অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য-সৌধের মূলদেশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। টোটা মুড়িবার কাগজে শূয়োর এবং গরুর চর্বি কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। এমন কি প্রধান কারণও নহে।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই উপকারের দামও দিতে হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা ইংরেজের দৃষ্টিতে বহু পূর্বেই সেটা ধরা পড়িয়াছে। ১৮১৮ সালে স্যর টমাস মনরো বড়লাট লর্ড হেস্টিংসকে লেখেন যে স্বাধীনতা, জাতীয় চরিত্র এবং যা কিছু জাতিকে মহীয়ান, মর্যাদা-পন্ন করে তাহার বিনিময়ে ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে হইয়াছে

"....but these advantages are dearly bought. They are purchased by the sacrifice of independence, of national character, and of whatever renders a people respectable.... The consequence, therefore, of the conquest of India by the British arms would be, in place of raising, to debase a whole people"—Sir Thomas Munro to Lord Hastings).

১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্যারাকপুর এবং বহরমপুরের সিপাহীগণ প্রথম বিদ্রোহ করে। কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় অল্পেই গোলমাল থামিয়া গেল। ইহার পর ১০ই মে মিরাটে সিপাহীবাহিনী বিদ্রোহী হইল। বিদ্যুৎগতিতে এই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ১২ই মে দিল্লী ইংরেজের হাতছাড়া হইয়া গেল। মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। উত্তর ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত সর্বত্র ইংরেজ অধিকার লুপ্ত হইল। বিপ্লবের অগ্নিশিখায় আকাশ রাঙিয়া উঠিল। লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি জায়গায় সিপাহী সৈন্য হত্যার তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল।

বাহাদুর শাহ

কর্তৃপক্ষ এই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে গোড়ার দিকে তাঁহাদিগকে খুবই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অতর্কিত আঘাতের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে চার মাসের বেশী সময় লাগে নাই। তাহার পর উপর্যুপরি প্রচণ্ড আঘাতে বিদ্রোহের মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে বেশী দিন লাগিল না। বিদ্রোহের সময় এবং তাহার পর শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে হৃদয়হীন বর্বরতার পরিচয় প্রদান করেন, যে কোন সভ্যজাতির পক্ষেই তাহা কলঙ্কের

কথা। তৈমুরলঙগী এবং নাদিরশাহী বর্বরতাও বুঝি তাহার তুলনায় ছেলেখেলা। অনেক জায়গায় বিচারের নামে ভারতীয়দিগকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইল। অনেক ইংরেজ এই সময় স্বেচ্ছায় ভারতীয় হত্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।*

"The days of Timur and Nadir Shah were remembered, but their exploits were eclipsed by the new terror, both in extent and the length of time it lasted. Looting (in Delhi) was officially allowed for a week, but actually lasted for a month, and it was accompanied by wholesale massacre.

In my own city and district of Allahabad, and in the neighbourhood General Neill held his 'Bloody Assizes'. 'Soldiers and civilians alike were holding Bloody Assize, or slaying natives without any assize at all, regardless of age or sex......the aged, women, and children (were) sacrificed as well as those guilty of rebellion.' They were not deliberately hanged, but burnt to death in villages—perhaps now and then accidentally shot.' 'Volunteer hanging parties went into the districts and amateur executioners were not wanting to the occasion.'—The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, p. 270).

বিদ্রোহের অবসানে ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ইংল্যাণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে চলিয়া গেল (১৮৫৮)।

সিপাহী যুদ্ধের কারণ, ইতিহাস বা ফলাফল সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু এই যুদ্ধ যে আসলে কি সে সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ বিদ্যমান। প্রবীণ ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সিপাহী যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু বিতর্কের অবসান হইবে আশা করা যায়।

বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ লেখকদিগের লেখা বিকৃত, অতিরঞ্জিত বর্ণনার উপরেই সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের জন্য নির্ভর করিতে হইত। দেশের লোক এ সম্পর্কে কি বলে তাহা [illegible] চেষ্টাও কেহ করে নাই। [illegible] শতকের গোড়ার দিকে বীর সাভারকরের "The History of the War of Independence" নামক গ্রন্থে সিপাহী যুদ্ধের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা হয়। [illegible] সিপাহী বিদ্রোহের উপর নূতন আলোক সম্পাত করে। [illegible] এই গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করিয়া ইহার প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

স্যার জন্‌ লরেন্স প্রমুখ ইংরেজদের মতে সিপাহী যুদ্ধ কেবল আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান মাত্র, আর কিছু নহে। বন্দুকের টোটা [illegible] চর্বিমাখা কার্তুজই ইহার কারণ। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার জন্‌ সিলির মতে সিপাহী বিদ্রোহ [illegible], দেশ-সমর্থনহীন এবং দেশপ্রেমহীন বিদ্রোহ ("...wholly unpatriotic and selfish Sepoy Mutiny with no native leadership and no popular support.") মাত্র। ইংরেজ সেনাপতি আউটরামের মতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসন্তোষ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের ফলে
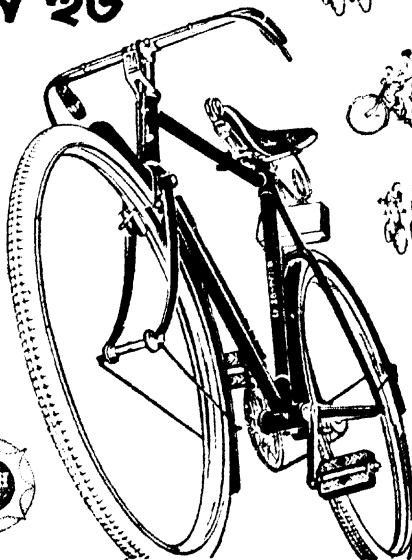
সিপাহী যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল। এদিকে আবার সাভারকরের মতে এই যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। অশোক মেহ্‌তার "১৮৫৭, দি গ্রেট রিবেলিয়ন" পুস্তিকাতেও এই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনি।

১৮৫৭ সালের পূর্বেও বার বার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা শোনা যায়। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় অব্যবহিত পর হইতেই এই প্রকার বিদ্রোহের সূচনা হয়। ইহাদের মধ্যে ১৭৬৯-৭৪ সালে ধলভূমের রাজাদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ সালের বেরিলি বিদ্রোহ, ১৮৩১ এবং ১৮৫৭ সালে বসিরহাট এবং ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহ, ১৮৪৯, ১৮৫১, ১৮৫২ এবং ১৮৫৫ সালের মোপ্‌লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (Civil Disturbances during the British Rule in India (World Press Ltd, Calcutta) [illegible])

এই সমস্ত অভ্যুত্থানের [illegible] [illegible], অসন্তুষ্টি, [illegible] লোকের উস্কানির ফল মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেবল উস্কানিতে বিদ্রোহ হয় না, হইতে পারে না। [illegible] [illegible] অসন্তোষের বীজ না থাকিলে [illegible] চাষ হয় না। বাহির হইতে [illegible] [illegible] করা যায় না। [illegible] [illegible] এই [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] উপর ইংরেজ [illegible] স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই এই প্রতিরোধ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ বিরুদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামগুলির মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বপ্রধান।

সিপাহী যুদ্ধকে যাঁহারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তিগুলি সহজেই উড়াইয়া দেওয়ার মত নহে। তাঁহারা বলেন যে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্য কোন ভারতীয় নৃপতিই ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। গোয়ালিয়রের সার দিনকর রাও এবং হায়দরাবাদের সার সালার জঙ্গ সর্বতোভাবে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। স্বাধীন নেপাল রাজ্যের মন্ত্রী রাণা জঙ্গ বাহাদুর এবং পাঞ্জাবের সদ্য স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট শিখগণও ইংরেজদিগের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দেশের সর্বত্র জনগণের সমর্থন বা সক্রিয় সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মই হয় নাই। আজও কি আমরা 'একজাতি, একপ্রাণ হইতে পারিয়াছি?

তবে কি সিপাহী যুদ্ধ সাধারণ বিদ্রোহ মাত্র? একটু তলাইয়া দেখা যাক্‌। সত্য বটে যে, স্বত্ব এবং বিত্তভ্রষ্ট আভিজাত সম্প্রদায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যে এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই বিদ্রোহের ধাক্কা প্রধানত সিপাহী বাহিনীকেই সামলাইতে হইয়াছে। সিপাহী বাহিনীর এই অভ্যুত্থান যে পূর্ব-পরিকল্পিত এবং ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইবার জন্যই সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

"It was manifest to all that the Mutiny was not, as at first supposed, of a partial or local character, but the result of a deep-laid, well-ordered, and widely spread conspiracy for the overthrow of the British dominion, for the expulsion of the Christians and Christianity from India. A time was fixed for striking the final blow, and for general rising and massacre of the Europeans. The somewhat premature outbreak at Meerut [illegible] this—led to the discovery of the fearful plot, and [illegible] providentially put the Europeans on their guard."—The Martyrs of Allahabad: Memorial of [illegible] Arthur Marcus Hill Cheek of the Sixth Native Bengal Infantry by the Reverend Robert Meek, p. 10.

সিপাহী সৈন্য ব্যতীত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীও সিপাহী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে যে প্রকার [illegible] বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ইহার পিছনে জনগণের সক্রিয় সহানুভূতির কথা অনুমান করিতে তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বে-সামরিক ভারতীয়দিগের হতাহতের সংখ্যা হতাহত সিপাহীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা কম নহে। বিদেশীয়দিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইতে

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই

হইবে এই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। তাহাদের শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না। বহু স্থানেই বে-সামরিক অধিবাসিগণ সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। বে-সামরিক অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহারা অনেকে সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়াছিল। অনেক জায়গায় সরকারের সহযোগীদিগের হুক্কা পানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জেনারেল হ্যাভেলকের বাহিনীকে নদী পার করিতে নৌকা বা নৌকা-মাঝি পাওয়া যায় নাই। কানপুরে শ্রমিকদিগকে জোর করিয়া সরকারী কাজে লাগানো হইয়াছিল। রাত্রিতে তাহারা কাজ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল। বে-সামরিক ভারতীয় অধিবাসীগণ অনেক জায়গায় ইংরেজদিগের সহিত মেলামেশা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের যুগে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয়। সম্রাট বাহাদুর শাহের আদেশে দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজস্থানের রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার একখানা পত্রে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া স্বাধীনতা উদ্ধারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে দেখিতে পাই।

("It is my ardent wish to see that the Feringi is driven out of Hindustan by all means and at any cost. It is my ardent wish that the whole of Hindustan should be free. But the Revolutionary War that is being waged for the purpose will not be crowed with success unless a man capable of sustaining the whole burden of the movement, who can organise and concentrate the different forces of the nation and will unify the whole people in himself, comes forward to guide the rising. I have no desire left of ruling over India, after the expulsion of the English for my own aggrandisement. If all of you native Rajas are ready to unsheathe your sword to drive away the enemy, then I am willing to resign my imperial powers and authority in the hands of any confederacy of native princes who are chosen to exercise it").

মোগল-মারাঠার পূর্ব শত্রুতার কথা ভুলিয়া নানা সাহেব এই সময় মোগল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

দুইটি কারণে সিপাহী যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরু পূর্ণ স্থানের দাবী করিতে পারে। প্রথম এই যুদ্ধ সমগ্র দেশের বিরাট একটা অংশে সর্বসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং মর্যাদা পুন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। সেই কারণেই ই স্মরণীয়। দিল্লী, উত্তর প্রদেশ এবং বিহা ও মধ্য ভারতের অনেকখানি জায় জুড়িয়া এই যুদ্ধ জাতীয় মু সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। এ সমস্ত অঞ্চলের কি সাধা মানুষ, কি অভিজাত সম্প্রদায়, সকলে পর-শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য সর্ব পণ করিয়াছিল। যোগ্যতর নেতৃত্ব এ সুষ্ঠুতর পরিচালনায় এই আঞ্চলি প্রয়াস সর্বভারতীয় সংগ্রামে পরি হইতে পারিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারা তাহার ফলে নূতন খাতে প্রবাহি হইতে পারিত। দ্বিতীয়ত, সিপাহী যু ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে এক যুগের সূচনা করে। সর্দার পাণিক্ক কথায়—

"It is a Great Divide in mod Indian history......!"

॥ এগারো ॥

মহুয়াগাছ আছে তো ঢের আমাদের এই গাঁয়ে,
দুপুরে বিকেলে সকলবেলা মহুয়া ঝরায়,
হিংসুটি এই হাওয়ায় আলসে রোদের কালে
আজকে মিতা মহুয়াফুল নাই বা কুড়ালে।

॥ বারো ॥

ঐ রাস্তার অশ্বত্থটা ডাল ছড়িয়ে রোজই বাড়ে,
লোকেও বলে—'ঐ লোকটার আইবুড়ো এই মেয়েটারে,'
যতোই বড়ো হয়ে উঠি, ওদের তাতে কি আসে যায়?
ধার ধারিনে ওদের কিছু, বাপ-মা আমার আমায় খাওয়ায়।

॥ তেরো ॥

মাটিতে পাথরগড়া দালান,
আকাশে সোনায় গড়া দালান,
হিহিড়ির সোনার দালানঃ বারোটা দরজা—
সে-দুয়ার কেমন ক'রে খুলে,
আমি ভিতরে যাই চ'লে,
হিহিড়ির সোনার দালানঃ বারোটা দরজা!

॥ চৌদ্দ ॥

আমরা মেয়েরা জুটেছি, কেবলি মাঠে-মাঠে ঘু'টে কুড়োই,
সই বলেঃ 'ভাই কারাম-ডাল ১, আইবুড়ো হয়ে রইলি তুই।'

॥ পনেরো ॥

আমার বয়সী মেয়ে তো আর দেখিনে হেথায়,
আমি তো সেই কুমারী সেই আজো বুড়ি,
যাবোই আমি যাবোই চ'লে আর কোনো গাঁয়।
—না রে বোকা, গাছে হেলান দিয়ে
চাঁদের দিকে মুখ ক'রে তাকিয়ে
বলুঃ আমাকে দাও গো তুমি মনের মত জুড়ি।

॥ ষোলো ॥

মা-ও গেলো ম'রে, বাবাও গেলো ম'রে,
কে আর বলবে, 'এসে বোস্ মা ওরে,'—
ঐ কলাগাছ মা আমাদের ঐ কলাগাছ বাবা,
আজ আমাদের ঐ বলছেঃ 'এসে বোস্ মা ওরে।'

॥ সতেরো ॥

কুঁড়ের সামনে কলাগাছটায় আছিস্ পলুপোকা,
মা আর বাবা দুজনেই তো গেছে,
কে আর তোদের দেখাশুনো করবে, পলুপোকা?

॥ আঠারো ॥

ও ভাই, তোমার গা-টি ছিলো পিছলে-পড়া আলোর ঝলক হেন,
কোমর ছিলো ছিপ্‌ছিপে ঠিক চাবুক যেন,
কই, সে-শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

—এমনি থেকে নয় রে বউদি নয়,
চান্দো আমায় গড়েছিলো মনের মতো ক'রে,
যিশু মুসার নজর লেগে সব গিয়েছে ঝ'রে।

॥ উনিশ ॥

আমরা অনেক ভাইয়ের দল ঘরে আছে ঢোলক মাদল,
হেলে দুলে বাজাই মাদল ঢোলক,
কোলের ছেলে নামিয়ে দিয়ে জোটে অনেক লোক!

॥ কুড়ি ॥

দিদি, পুবের থেকে হু-হু বাতাস পশ্চিমে ঐ ছোটে,
তাল পাতারা কেঁপে ওঠে,
মাথার ছাতা প'ড়ে যে যায়, হু-হু বাতাস ছোটে।

॥ একুশ ॥

কে রে সে-লোক, মাথায় কালো ছাতা,
মোরগচুড়োর মতো পাগড়ি বাঁধা,
যে তোকে পান দিচ্ছিল সে কে রে?

—বসুছি পরে, বউদিদি, জল দাও তো, পাতো পিঁড়ি,
বউদি, তোমার ভাই হ'তে ও যাচ্ছে যে কিন্তিরেই!

॥ বাইশ ॥

নাগড়া মাদল মা আর বাবার প্রাণে,
নাগড়া মাদল বাজছে সুরে সুরে,
তাই শুনে আর চেয়ে ওদিকপানে
পদ্মপাতার মতন আমি কাঁপি সুরের টানে।

॥ তেইশ ॥

মা-বাবা আমার দূরের চাঁদের মতো,
বউদিদি আর দাদা যেন দুটি তারা,
জন্মেছি আমি সুবর্ণরেখার কূলে,
তাই তো আমার নামটি সূর্যমণি।

॥ চব্বিশ ॥

কাঁদিবড় ফুল ক্ষেতের পাড়ে-পাড়ে—
গাছে চড়তে গিয়ে দেখি বেলা ডুবলো সই,
আঁচলে ফুল বাঁধতে গিয়ে রাত যে আরো বাড়ে—
মালা গাঁথতে গিয়ে আবার সূর্য উঠলো ঐ।

॥ প'চিশ ॥

ওগো, আমার রাখালিয়া, কেমন ক'রে
শুকিয়ে যাচ্ছো ওরে?

---

১ মূল শব্দটি হলো কারাম-ডৌবাস; এই গাছের দুটি ডালকে যেমন আলাদা করা যায় না, দুটি সখীর মিতালি তেমনি সদাই হবে—'কারাম ডাল' পাতানোর উৎসবে এই ইচ্ছা জানানো হয়।

গরু চরাই, বাঁশী বাজাই, আর বেহালা ব'য়ে
যাচ্ছি কাহিল হ'য়ে।

॥ ছাব্বিশ ॥

দামোদরের মাঝখানে এই মাঝদামোদর নদীর মাঝে,
চাকল্‌দা গাছ আছে,
কারাম গাছের তলায় কাঁপে বেনা গাছের শিষ,
নীলরঙা সব পাখির সারি গাছের শিষের কাছে,
ভাব্‌ছে তারাঃ বাপ-মা তাদের রাজা-রাজড়া যেন,
ভাবছেঃ তাদের ভাই-বেরাদার সাহেব-সুবোর মতো।

॥ সাতাশ ॥

মাদলিয়া, কই তোমাদের আনন্দ কোথায়?

বাসায় রেখে এসেছি সেই মোদের আনন্দ,
পেটারিতে ফেলে এলাম পিতল-গড়া বাঁশীটি হায়।

॥ আঠাশ ॥

হাটের পথে চলেছো মা, ফেরার পথে এনো,
আমার তরে একটি সোনার ছাতা।

এ-পথেই তো যাই, বাছা, আমি হাটেই তো যাই,
সোনার ছাতা কিন্‌বো না রে, একটি ছাতা কিন্‌তে যে চাই,
যে হবে তোর চিরদিনের নিজের ধন যেন।

॥ উনত্রিশ ॥

ঐ পাঁজা ফের পাইনি ওর তিন তিনটে ঢোলা,
রসিক বটে বাজিয়ে দুইজন,
তাদের দেখে তাদের বাদ্য শুনে
আমি যে হই আপন হারা বিভোল-ভোলা।

॥ ত্রিরিশ ॥

জন্ম থেকে মা আর বাবা আমায় বলেছেঃ
'ওরে বাছা খুব ক'রে কাজ কর,
ঢোল বাজিয়ে পাল্‌কি ক'রে বউ আন্‌বো তোর।'
আজকে কিনা ভেবে চিন্তে পায়ে হাঁটা বিয়ে দিচ্ছে আমায়,
আজকে আমি কেমনতরো বর!

॥ একত্রিশ ॥

কামারবন্ধু, গ'ড়ে দিয়ো তুমি আমার হাতের তরে,
নীলমুঠি এক কম্প্রকাজললতা,
ভুলিসনে মাগো বউ তোল্‌বার ডালার পরে
সিন্দুর-শাড়ি সাজিয়ে দেবার কথা।

॥ বত্রিশ ॥

আজ দুপুরেই কাল দুপুরের সেই
বিয়ের পাতার মণ্ডপ গেছে শুকিয়ে,
বড়ো বউদিদি, বুঝিনে তো আমি শুকিয়েছি নাকি ঝিমিয়ে?
কালকে দুপুরে খেয়েছি যে মনে নেই।

॥ তেত্রিশ ॥

ঘটকালি কে করেছিলো এত বিরাট ঘরে,
ভয় করেনি তার?
ব'সে থাক্‌লে গা ছমছম্‌ করে,
দাঁড়ালে যে কেমন করে, গাছের মতো গা
শিউরে ওঠে, শরীর কাঁপে ডরে।

॥ চৌত্রিশ ॥

কোন্‌ পাহাড়ের পাখি রে এই কানাই,
অনেক পাতার শালগাছে যার মন?
বল্‌ না কালের ছেলে রে এই পড়তে-জানা কানাই,
একটি বউয়ের সঙ্গে যে চায় বউয়ের অনেক বোন।

॥ প'য়ত্রিশ ॥

আমরা দু-বোন্‌, আমরা দুটি জা,
শাকপাতা খাইনা,
গুড় ঢেলে ফের তাকে ভিজাই দুধে,
নানান্‌-হাতের ছোঁয়া-লাগা দই খেতে চাই না।

॥ ছত্রিশ ॥

আমরা ছিলাম দুটি প্রাণের সই,
গহীন বনে রাতের তলে হারিয়ে গেছিলাম,
বেয়ান্‌ হয়ে মিলেছি ফের দুটি প্রাণের সই!

॥ সাঁইত্রিশ ॥

মা যে আমায় কাজের কথা বল্‌তো নিশিদিন,
আজকে শুধু বিদায়-কথা শুনি মায়ের মুখে!

॥ আটত্রিশ ॥

পথে-পথেই চলেছিলাম, মাঝ-রাস্তায়
এসে দাঁড়াই, খুঁজি তোমায়, জীবন,
পিতল দিয়ে গড়া তোমার বাঁশীর কথায়,
ভুলাও আমায়, ভুলাও, আমার জীবন।

॥ উনচল্লিশ ॥

সূর্য পূজায় লাগিয়েছি কতো মন্দারমুলীফুল,
কুয়ারিদশায় মাথায় গুঁজেছি কতো,
দূরে চলি আমি, যথের ধনের মতো
বাঁধা পড়ে তুই রইলি পিছনে, মন্দারমুলীফুল।

অবনীন্দ্র শিল্পমেলা

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

আজ প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ুমের দোতলার বারান্দায় রবীন্দ্র-ভারতীর উদ্যোগে শিল্পগুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি, নক্‌শা বই, খেলেনা ইত্যাদির এক অপূর্ব মেলা বসেছে। এমন অনেক ছবি এই মেলায় দেখলাম, যা জীবনে আগে কখনও দেখবার সুযোগ আমার হয়নি; শপথ করে বলতে পারি, সে-সুযোগ আমার মত বহুলোকের হয়নি।

যে-কোন সৃষ্টিধর প্রতিভাই জৈব; জীবধর্ম ও প্রাকৃতিক নিয়মানুগ। তার বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে। মাটি ভেদ করে বীজ নবজন্ম লাভ করে; তারপর ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মের বশে, মাটি থেকে রস আহরণ ক'রে, চারদিকের আলো বাতাস আহরণ ক'রে ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। মহৎ প্রতিভ[ার] অন্যতম লক্ষণও এই জৈব নিয়[মে] বৈশ্যতা। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষা য়ুরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতির ভেত[র] দিয়ে, অনুকরণের পথে; সে-পথ অবনীন্দ্র মানসের পক্ষে জৈব বা প্রাকৃতিক ছিল না। ভারতীয় বুদ্ধি, বোধ ও কল্পনা বিস্তারের রাজপথ তখন সবেমাত্র পায়ের নীচে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে, নতুন পথের নিশানা কেবলমাত্র দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় মনোবিকাশের নতুন ভূমি তৈরী হচ্ছে। সেই নব ভূমি ভেদ করে অবনীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ; তারপর একদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সৃষ্টি-ক্ষেত্র—অজন্তা-বাঘ-এলোরা, মুঘল-রাজস্থানী-পাহাড়ী কলমের শিল্পদৃষ্টি, রীতি ও পদ্ধতি—লোকায়ত জীবনের স্বপ্ন ও কল্পনাক্ষেত্র থেকে উত্তাপ ও আলোক আহরণ করে, অন্যদিকে জাপানী ও চীনা, এমন কি সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য শিল্প-দৃষ্টি থেকে রস, রূপ ও রীতি আহরণ করে সেই প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি।

মহৎ প্রতিভার আর একটি লক্ষণ তার সৃষ্টির প্রাচুর্য ও সমগ্রতা। ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ুমের অবনীন্দ্র মেলায় চিত্রনিদর্শনই আছে কমবেশি চারশো; এর বাইরেও দেশে-বিদেশে নানা সংগ্রহে ছড়ানো অনেক ছোট বড় ছবি আছে যা এই মেলায় দেখানো সম্ভব হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের সক্রিয় সৃষ্টিগর্ভ শিল্পজীবন প্রায় পঞ্চাশ বছরের মোটামুটি ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রায় ছয় শত উল্লেখযোগ্য চিত্র রচনা যে কোনো মহৎ শিল্পীর শিল্প-প্রজনন ক্ষমতার অপূর্ব পরিচয় বলে গণ্য হবে, যে-কোনো কালে। আর জীবনবোধের বৈচিত্র্যময় সমগ্রতার পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নেই, একথা যাঁরা বলেন তাঁরা এ-সম্বন্ধে ভারতীয় মানসের প্রকৃতি ঠিক জানেন, এমন মনে হয় না। এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, অবনীন্দ্র মানস ভারতীয় চিন্তার গভীর গহনে অবগাহন করে সুখ দুঃখ শোক আনন্দময় জীবনের গভীর গম্ভীর উপলব্ধির মধ্যে বিচরণ করেনি। তাঁর ব্যক্তি-মন ছিল শিশুসুলভ; শিশুর সারল্য, তার সীমাহীন কৌতূহল ও বিস্ময়, শিশুর খেলা ও খেলেনা, রূপ-

অবনীন্দ্রনাথ — স্বকৃত প্রতিকৃতি

...র মধ্যে শিশুমনের বিহারের যে আনন্দ; সেই সারল্য, বিস্ময় কৌতূহল চপলতা ও আনন্দ অবনীন্দ্র চিত্তকে অধিকার করে রেখেছিল মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিতে এই লক্ষণগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, শুধু তাঁর সাহিত্য রচনায়, গাছের ডাল ও কুটকড়, পাথরের নুড়ি দিয়ে তৈরী খেলনাগুলোতে নয়, তার ছোট বড় চিত্রগুলোতেও যেমন কৃষ্ণমঙ্গলের এবং চণ্ডীমঙ্গলের ছবিগুলোতে। তাঁর নক্সাগুলোর মধ্যে খেলাচ্ছলে আঁকা পশু পক্ষী, গাছপালা ইত্যাদির মধ্যেও এই শিশুসুলভ মন ধরা পড়ে। চোখে কৌতূহল ও বিস্ময় নিয়ে অবাধ রূপকল্পনার মধ্যে স্বচ্ছন্দবিহারও এই শিশুপ্রকৃতির অন্যতম লক্ষণ।

একথাও সত্য যে, তিনি প্রাণরস আহরণ করেছেন আমাদের চোখের সামনে স্ফুরিত বস্তুময় সংগ্রাম মুখর জীবনের ভেতর থেকে ততটা নয়, যতটা আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাণ ইতিহাসের ভেতর থেকে, কথা ও কাহিনীর ভেতর থেকে, সাহিত্যের ভেতর থেকে; সেই জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেছে, যে জীবন সরল ও প্রশান্ত, যে জীবনের ছন্দ ধীর মন্থর ও সংবেদনশীল, যে জীবনের লয় মৃদু, যে জীবনের দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও মেদুর, যে জীবন চিত্রময়। ঠিক চিত্রের এই ধর্মকে প্রকাশ করবার জন্যই তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল নূতন আঙ্গিক সৃষ্টির। ঠিক এই কারণেই তাঁর ছবিতে আলোছায়ার নাটকীয় প্রাখর্যকে তিনি স্থান দেননি, আলো ও ছায়ার খেলা এই দৃষ্টিতে সংযমিত। ঠিক একই কারণে জলে ধোয়া ছবিগুলিতে তার বর্ণের বিন্যাসও স্নিগ্ধ, মৃদু ও মেদুর। কোনো রঙই তার প্রখর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়। গড়নের ডোল তিনি ধুয়ে ধুয়ে প্রশান্ত বিস্তৃতির সমতলতায় ব্যাপ্তি দান করেছেন। আর তার রেখাগুলি তিনি টেনেছেন অতিমৃদু কোমল ছন্দে, গানের সুরের গীতিমালায়। সব জড়িয়ে তাঁর ছবিতে অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি প্রশান্ত সমতল ব্যাপ্তি, যা মানবজীবনের সমগ্রতার অন্যতম ধর্ম, ভারতীয় চিন্তার অন্যতম প্রধান মর্ম। অবনীন্দ্রনাথ রেখায় ও রঙে একদিকে শিশুসুলভ সারল্য কৌতূহল ও বিস্ময়, অন্যদিকে গভীরতর জীবনবোধের প্রশান্ত ব্যাপ্তির অপূর্ব কাব্য রচনা করে গেছেন সারাজীবন ধরে। এইখানেই তাঁর সৃষ্টির মহিমা। এই মহিমার সুষ্ঠু ও সমগ্র পরিচয় যাঁরা পেতে চান, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মেলা তাঁদের পক্ষে সুদুর্লভ সুযোগ।

আমরা আমাদের মূঢ়তায় শিল্পের বিচার করি শিল্পীকে বাদ দিয়ে, শিল্পের দেশ ও কালকে বাদ দিয়ে শুধু শিল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে, সেই আঙ্গিকের নানা অভাব, তার উপর নানা প্রভাব ইত্যাদির ইতিহাস আলোচনা করে। এর প্রয়োজন নেই, একথা কিছুতেই বলা চলে না, কিন্তু সে-প্রয়োজন গৌণ। শিল্পীর ব্যক্তিগত জৈব মানস তার নিজস্ব আঙ্গিক নিজেই উদ্ভাবন করে, রচনা করে, জৈব নিয়মের বশেই। অবনীন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন। জল রঙের ব্যবহার, ধুয়ে ধুয়ে রঙের প্রাখর্যকে মৃদু মেদুরতায়, ডোলের নতোন্নতকে প্রশান্ত সমতলতায় যা অবনীন্দ্র-আঙ্গিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা অবনীন্দ্রনাথ উদ্ভব করেছিলেন নিজের জীবনবোধকে প্রকাশ করবার জন্যেই। তাঁর জীবনের গভীরতর প্রেরণার উৎসের দিকে তাকালেই একথা আর অস্বীকার করা যায় না। এই কারণেই তিনি মহৎ শিল্পী; তিনি জীবনকে প্রকাশ করেছেন, জীবনের সর্বব্যাপী সমগ্রতায় না হতে পারে, কিন্তু তার একটি ব্যাপ্ত, সার্থক ও অর্থময় দিককে তো বটেই। যাঁরা পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামী বলে পরিচিত, তাঁরা অধিকাংশই শুধু তাঁর আঙ্গিকের অনুগামী হয়েছেন, তাঁর জীবন-উৎসের সন্ধান করেননি, তাঁর জীবনবোধের স্পর্শলাভ করেননি। সেই কারণেই, তাঁদের অনেকের রচনা অর্থবহ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

ভারতশিল্প পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অনেকেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। এ-মূল্য তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য, কিন্তু সে-মূল্য ঐতিহাসিক মূল্য এবং সেই হিসেবে কিছুটা বাহ্য। সময় এসেছে, শিল্পী হিসেবেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্য-বিচারের। এই মেলা তার অপূর্ব সুযোগ। শুধু তাঁর জলে ধোয়া ছবির মাধ্যমেই নয়; অন্য অনেক আঙ্গিকেই প্রকাশের নানা সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন। পোর্ট্রেট-রচনার স্বকীয়তায়, আমাদের লোকায়ত পটশিল্পের নূতন রূপায়নে, রঙের বিন্যাস ও ডোলের বিভিন্ন নতোন্নতের পরীক্ষা তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব এই মেলার অনেক ছবিতে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে। আঙ্গিক-রচনার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যদি প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ হয়, তাহলে অবনীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র ও বিরাট একথা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্র-ভারতী এই বিচিত্র ও বিরাট প্রতিভার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের যে-সুযোগ রচনা করে দিয়েছেন, এজন্য, সরকারী ও ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি রসিক ও বোদ্ধামাত্রেরই সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

কলকাতা

রবীন্দ্র-ভারতীর ব্যবস্থায় গত ৭ই এপ্রিল থেকে কলকাতার যাদুঘরে শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্র-প্রদর্শনী চলছে। এক সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকৃত এত ছবি এর আগে আর কখনও কলকাতার জনসাধারণের দেখবার সুযোগ হয়নি। ৩ শতাধিক নিদর্শন নানা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে চয়ন করে এনে এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই বিরাট ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষ শিল্প-রসিক সমাজের কাছে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ছবিগুলির মধ্যে পাশাপাশি যথেষ্ট ব্যবধান থাকায় এবং এগুলি এক সারিতে চোখের সমান উচ্চতায় খাটানো হওয়ায় নিরীক্ষণ করতে কোনও অসুবিধা হয় না। প্রদর্শন ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি নেই সে কথা স্বীকার করি; তবে অবনীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শন করার পক্ষে দুর্জয় গ্রীষ্মকাল খুব অনুকূলে বলে মনে হয় না। এই
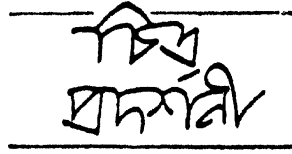
প্রখর তপন তাপে কোনও সুকুমার কলা মন দিয়ে দেখবার মত মেজাজ থাকে না, আর এ সময় বহিরাগত দর্শকের সংখ্যাও শীতকাল অপেক্ষা অনেক কমে যায়।

আরব্য রজনীর একটি দৃশ্য

সুতরাং প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা শীতকালে হলেই সব দিক থেকে ভাল হত।

এ প্রদর্শনীতে যে সব ছবি দেখার সুযোগ হল তার মধ্যে বেশীরভাগই শিল্পগুরুর স্বকীয় ওয়াশ টেকনিকে অঙ্কিত, অর্থাৎ বিলাতী জল-রঙ টেকনিক-এর সঙ্গে জাপানী রং লেপন করে কাগজ ধুয়ে ফেলার প্রকরণ সংমিশ্রণে তিনি যে অভিনব রচনা-শৈলীর সৃষ্টি করেছিলেন, সেই শৈলী প্রয়োগে ছবিগুলি রচিত। ছবিগুলির মেজাজে যেমন বিদেশীয়ানার লক্ষণ নেই তেমনি স্বদেশীয়ানারও লক্ষণ খুব প্রকট নয়। এ মেজাজ একান্তই অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়। উদাহরণ হিসাবে যদি কৃষ্ণ-লীলা সিরিজ-এর ছবিগুলি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য/ এখানে ভারতীয় অলংকরণের ঘুচেছে, ফলে এগুলি পাশ্চাত্য চারও নয় অলংকারপ্রধান ভারতীয় নয়। এগুলি সম্পূর্ণ অবনীন্দ্রনাথের আগে যার না। গাছপালা, ফুল-ফল এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর ছবিতে পেয়েছে এমন যা দেখা-রূপের নয়, কেবল এদের প্রকারভেদের মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করে গেছেন। শিল্পের ষড়ঙ্গ' পুস্তিকায় প্রা চিত্রবিদ্যার ষড়ঙ্গ, রূপভেদাঃ প্রমা ভাব, লাবণ্যযোজনম্‌, সাদৃশ্যম্‌ বর্ণিকাভঙ্গম্‌ সম্বন্ধে তিনি বিস্তা ব্যাখ্যা করেছেন বটে, কিন্তু নিজে চিত্রকলায় এই ষড়ঙ্গ কোথাও চলেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর ম সেকালেই শাস্ত্রের নিয়ম ধরে চলবার ঠেকা পদে পদে এসেছিল, একালেও য প্রাচীন পন্থায় শিল্পশাস্ত্র ধরে চলা হ তবে সেই কালের আর্টের সঙ্গে সেই স কালের বাধানিষেধগুলির পুনরাবৃত্তি একালের শিল্পে কি উপযোগী, অনুপযোগী বিচার করার ভার একালে শিল্পী ও শিল্পরসিকের উপরই ছা রয়েছে। সেকালের স্তরের উপর একালে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা সেকালটা সিন্দবাদের বুড়োর মত একালের ঘাড়ে উঠে বসল, এ বড় বিষ প্রতিষ্ঠা বাড়ির ভিত উঠে এল ছাদে উপর, খুব একালের বাস্তু শিল্পীর মতেও এটা ভয়ংকর ব্যাপার।

যে সময় ই বি হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়, সেই সময় তিনি মোগল, পারশিয়ান, কাঙড়া এই সব আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তাদের নৈপুণ্য এবং অলংকরণ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সেই পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য কৃষ্ণলীলা আঁকতে লেগেছিলেন, তবে 'ভারতমাতা' চিত্রেই তিনি সর্বপ্রথম কিছুটা কৃতকার্য হন এবং ওমর খৈয়াম, আরব্যরজনী প্রভৃতি সিরিজএ তাঁর মোগলকলম স্টাইল চরম পরিণতি লাভ করে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মোগল আর্ট-

আরব্যোপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত

। পুনরাবৃত্তি করেছেন, একথা কোনও ট সমালোচকের বলার ক্ষমতা নেই। নি মোগল আঙ্গিকের কষ্টটুকু বাদ য়ে কেবল রসটুকুই গ্রহণ করেছিলেন ং ভাবব্যঞ্জনায় ও আপন রুচিবোধে কে এক অভিনব ধারায় রূপান্তরিত রেছেন।

দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু য়েছে সেই সময় ভারতে এলেন জাপানী ল্পী ওকাকুরা। তিনি ভারতীয় শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরই উৎসাহে টাইকোয়ান ও হিসিদা ভারতে আসেন ভারতীয় শিল্পকে জানবার জন্য ও বোঝবার জন্য। টাইকোয়ান শিখলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ভারতীয় শিল্পের লাইন এবং তার পরিবর্তে তিনি শেখালেন অবনীন্দ্রনাথকে জাপানী ছবির টেকনিক। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছিল পশ্চিমা রীতিতে, সে রীতিকে তিনি সম্পূর্ণ
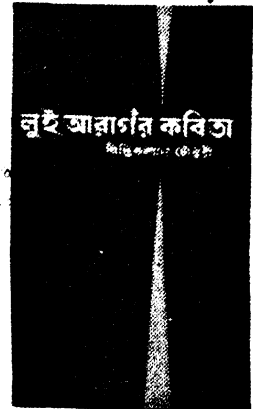
তালাক দিতে পারলেন না। পশ্চিমা রীতির সঙ্গে জাপানী রীতির পরিণয় ঘটল তাঁর হাতে, ফল হ'ল—'অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ।' এই রীতিকে তিনি শেষ পর্যন্ত আর ত্যাগ করতে পারেন নি। ওদিকে ইউরোপে হুইসলারও একসময় জাপানীদের প্রভাবে ভীষণভাবে পড়ে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের সঙ্গে জাপানী মেজাজের পরিণয় ঘটিয়ে ছবি আঁকতে লেগেছিলেন। তাঁর নৈশ ওড়নার অন্তরালে আবছায়া 'ব্যাটারসী ব্রীজ', 'ক্রেমোর্ন

বিরহ

লাইটস' প্রভৃতি ছবির সঙ্গে হকুশাই বা হিরোসিজে প্রভৃতি জাপানী শিল্পীদের কোন কোন 'উকিওয়ে' চিত্রমালার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথেরও কোন কোন ছবিতে ঐ আঁধারে ঢাকা মায়ালোকের সন্ধান মেলে। যাই হোক এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হয়েছে মুঙের সিরিজ, কৃষ্ণলীলা সিরিজ, তাজ সিরিজ, যাত্রা পালা সিরিজ, পুরী সিরিজ, মোহমুদ্গর সিরিজ, জীব জন্তু সিরিজ, ফাল্গুনি সিরিজ, মুসৌরী সিরিজ, দার্জিলিং সিরিজ, খেলার সাথী সিরিজ, রাঁচি সিরিজ, দেওঘর সিরিজ, ওমর খৈয়াম সিরিজ, সাহাজাদপুর সিরিজ, মুখোশ সিরিজ, আরব্য রজনী সিরিজ, কবি কঙ্কন চণ্ডী সিরিজ, কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ, ছায়া ছবি সিরিজ, পারাবত সিরিজ এবং হিতোপদেশ সিরিজ। এ প্রদর্শনীতে মাস্টারপিস ছবির সংখ্যা এত বেশী যে প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা এই অল্পস্থানের মধ্যে একেবারেই অসম্ভব। অবনীন্দ্রনাথের মতন নিজের মনের মধ্যে সকল প্রাণের রূপকে অনুভব করতে, দরদ দিয়ে জগতটাকে দেখতে, বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হতে আমাদের দেশে আর কোনও শিল্পীকে আজও দেখা যায় নি।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার ভাষাকে কোন কোন শিল্প বিশেষজ্ঞ ভারতীয় ভাষা এবং এই ভাষাতেই ভারতীয় শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন করা উচিত বলে মন্তব্য করে থাকেন। এঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু 'ভারতীয়' কথাটি সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া যায় না। এ ভাষা অবনীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়। এ ভাষায় যদি কেউ চিত্র রচনা করতে যায় সে ঠকবে পদে পদে। কোনপথে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ পরম মণিটি আবিষ্কার করেছেন সে আঁধিসন্ধি খুঁজে বার করা খুব কঠিন কাজ। তাঁর কথাতেই বলি 'সপ্ত স্বর্গ, সাত কাণ্ড, অষ্টাদশ পর্ব এরই ছাঁচের মধ্যে কাব্য গড়লেই সেটা মহাকাব্য যে হয় না তা বহুবার প্রমাণ হয়েছে বঙ্গসাহিত্যে।'

তাঁর লেখা বই এবং শেষ বয়সের শিল্প কর্ম কাটুম কুটুম খেলনার নিদর্শনও এখানে কিছু কিছু প্রদর্শন করা হয়েছে। —চিত্রগ্রীব

দিল্লী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুইটি চিত্র ও একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রথম শ্রীসত্যেন ঘোষালের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ভারতস্থিত বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়, দিল্লী পলিটেকনিকের চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নবম বার্ষিক প্রদর্শনী—পলিটেকনিক ভবনে ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ ইহার উদ্বোধন করেন। তৃতীয়, বৃটিশ মুদ্রণ ও গ্রন্থ প্রদর্শনী—ইহা বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ও স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী, লেডী মাউণ্টব্যাটেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মুখে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী

পারাবত ও নারী —লক্ষ্মীমাথুর

রাধাকৃষ্ণণ বৃটিশ কাউন্সিল ভবনে ইহার উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে কলিকাতা আর্ট কলেজে নিযুক্ত থাকিলেও সত্যেন ঘোষাল দিল্লী শিল্পিমহলে সুপরিচিত; কারণ এককালে তিনি পলিটেকনিকের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ইতিপূর্বে তিনি এখানে প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এদেশে এবং বিশেষ করিয়া বিদেশে থাকাকালীন (তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন) রচিত সর্বসমেত ৩৬ খানি রচনা তিনি প্রদর্শনীতে পেশ করেন। যাঁহারা এই

ল্পীর পূর্ব প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, হারা ইহার রচনা রীতির পরিবর্তন শ্যই লক্ষ্য করিবেন। পূর্বকালীন নাবলীর মধ্যে ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব ট ছিল এবং রেখা ও বর্ণ ব্যবহারের দিয়া তাহা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া- ল। আধুনিক রচনাবলীর মধ্যে যে দেশীয় প্রভাব দেখা যায় না, তাহা নহে রে এগুলি সরলতা ও আন্তরিকতায় রপূর্ণ। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার য় এই যে, সমগ্র রচনাবলী দেখিলেই ল্পীর পরীক্ষামূলক অথচ অনুভূতিশীল নের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশের শকালীন দৃশ্যগুলির মধ্যে তিনি পন বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও ন্তরতার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, অপর- কে আবার কয়েকটি রচনায় প্রাচ্য ও শ্চাত্য রচনা রীতির সমন্বয় সাধন রয়াছেন। কয়েকটি প্রতিকৃতি ও নাড নার মধ্য দিয়া তিনি অসাধারণ প্রতিভার রচয় দিয়াছেন। বর্ণ ব্যবহারেও অনেক ত্রে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। বেশি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বিদেশী নরনারী [illegible] দিগকে বিদেশী দৃষ্টিতেই খিয়াছেন—অর্থাৎ বস্তুবাদী অনেক নার মধ্যেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে [illegible] রচনারীতির প্রভাব [illegible] ড়িয়াছে। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, ল্পীর নিজস্ব [illegible], অর্থাৎ [illegible] ও [illegible] রেখামাধ্যমে তিনি [illegible] করিয়াছেন ফলে সেইগুলি এক একটি বিশিষ্ট ও [illegible] রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। [illegible] "শ্যাম্প, এলিসে প্যারী" চোখে ড়ে পটভূমির নৈশকালীন বৈশিষ্ট্য জায় রাখিয়া মাত্র বহির্ভাগের রেখা- ধ্যমে পশ্চাদ্ভূমিতে উপবিষ্ট [illegible] রূপ ও আকৃতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, হা অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। র পরেই "পিকনিক আণ্ডার এ ট্রী" ল্লেখযোগ্য। সংক্ষিপ্ত ও অপরূপ আকারপ্রধান এই রচনাটি শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচায়ক। প্রতিকৃতির মধ্যে বৃদ্ধ" বার বার চোখে পড়ে—বস্তুতপক্ষে ই রচনাটির মধ্য দিয়া বৃদ্ধ বয়সের শান্ত ও সৌম্য ভাবটুকু সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিল্পী [illegible]

পিকনিক আণ্ডার এ ট্রি
—সত্যেন ঘোষাল

নাড় স্টাডি করিয়াছেন এবং সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত। ইহাদের মধ্যে "ক্লিশ্চিনা" সার্থক রচনা। অপরগুলির মধ্যে "স্টাডি ইন গ্রেজ"-এর নাম করা যাইতে পারে। আকার ও লঘু [illegible] শিল্পী [illegible] পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে [illegible] পনিক অন সেনা, রেস্টিং আণ্ডার এ ট্রি' ও বিশেষ করিয়া 'উইন্টার ইন লণ্ডন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর, সত্যেন ঘোষালের আধুনিকতম রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতিভা ও পরিবর্তনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।
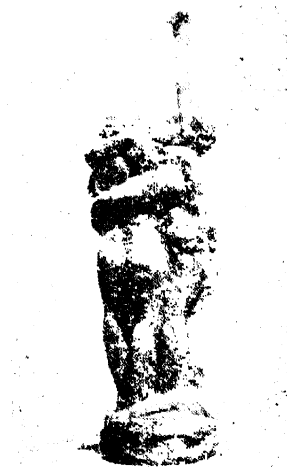
* * *

দিল্লী পলিটেকনিকের নবম বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৬৯ জন ছাত্রছাত্রীর রচিত প্রায় ৪০০ শত নিদর্শন পেশ করা হয়। তৈল, জলরং ও টেম্পারা মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র, প্রতিকৃতি, গ্রাফিক, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, কমার্শিয়াল ডিজাইন, পুস্তকের প্রচ্ছদপট, বস্ত্র- মুদ্রণ প্রণালী ইত্যাদির বহুবিধ নমুনা দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে

সিনিক —ললিতা মিশ্র

আপনাপন ক্ষেত্রে যথার্থ উন্নতি লাভ করিতেছে কি না, তাহার মানদণ্ড নির্ণয় করিবার জন্য প্রতি বৎসরে এহেন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সমীচীন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে নির্বাচন হয় না অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই চিত্র- সংখ্যা বাড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। চারিশত নিদর্শনের মধ্য হইতে অন্তত এক- চতুর্থাংশ অনায়াসেই নাকচ করা যাইত— কারণ কি অঙ্কন রীতি বা কি চিন্তাশক্তির দিক দিয়া এগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর রচনা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৌলিক চিন্তাধারা, স্বকীয়তা ও রচনা বৈশিষ্ট্য ইহাদের

কম্পোজিশন —কুলদীপ ভাল্লা

চিত্রগুলি অনেক স্থলেই প্রশংসা দাবী করিতে পারে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী যেন অল্প বয়সেই অতি-আধুনিকতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, স্বাধীনভাবে কাজ করিলেও অলক্ষ্যে ইঁহারা যেন বিশেষ কোন শিল্পী-শিক্ষকের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে দুই-চারিজনের চিত্র রসোত্তীর্ণ হইলেও ঠিক প্রশংসা দাবী করিতে পারে না। চিত্র-রচনায় ওমপ্রকাশ শর্মা ('কুড়েশিয়া বাগানে' ও 'কোচিন সমুদ্রতীর'), সুরাজ ঘাই ('প্রাকৃতিক দৃশ্য') অমল পাল ('ফুল'), রাজেন্দ্র ধাওয়ান ('সিমলার বাড়ি') ও সীতা সেন ('শীতকাল') পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া "পারাবত ও নারী"র মধ্য দিয়া লক্ষ্মী মাথুর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষমা শুক্ ('ঘট'), এস এস কুলদীপ ('দুই বন্ধু') ও ভগবান শর্মা ('বন্দের শোভাযাত্রা') দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রদর্শনীতে প্রতিকৃতি অংকনের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায় এবং ইঁহাদের মধ্যে টি লাল পুন ও অমল পাল আপনাপন রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রাফিক, মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের নমুনাগুলি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই বিভাগগুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ ঠিকমতো শিক্ষালাভ করিতেছেন। গ্রাফিক বিভাগে সর্বপ্রথমেই সুরাজ ঘাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মৌলিক চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্য দিয়া ইঁহার রচনা শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবপক্ষে এই বিভাগে তিনি ভবিষ্যতে কৃতিত্ব লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুলদীপ ভাল্লা ও বি কে সুলতান দুইজনেই মৃৎ ও বাদির অথচ নানাবিধ মৃৎশিল্পের নিদর্শনের মধ্য দিয়া ইঁহারা তাঁহাদের মৌলিক রচনাধারা ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ভাস্কর্য বিভাগে নানাবিধ মূর্তি রচনার মধ্যে ললিতা মিশ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকের বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন আকারের প্রাচীরপত্র ও বস্ত্র মুদ্রণ ডিজাইনের নমুনা কমার্শিয়াল বিভাগে দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত রেখা ব্যবহার, আধুনিক চিন্তাধারা ও মনোরম পরিকল্পনার জন্য ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বিশেষ করিয়া প্রেমবিহারী লাল প্রাচীরচিত্র অঙ্কনে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন। চিত্রগুলি ঠিক সুনির্বাচিত না হইলেও দিল্লী পলিটেকনিকের ছাত্রছাত্রীগণ যে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন গ্রন্থ তথা চিত্র ও পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ

'শ্যাম্প এলিসে প্যারী' —সত্যেন ঘোষাল

র্শন পেশ করা হয়। অতিপুরাতন ও 'প্রথম গ্রন্থ হইতে কিভাবে ধীরে ধীরে রাজী সাহিত্য তথা সংস্কৃতি প্রসার লাভ রয়া পৃথিবীর সভ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ সন লাভ করে, এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া হার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে হন শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান রয়া বৃটিশ কাউন্সিল শিক্ষিত জন-ধারণ, বিশেষ করিয়া প্রকাশক ও মুদ্রণ ল্পীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থগুলি রুচিসম্মতভাবে পেশ করা া। উইলিয়ম ক্যাক্সটন ১৪৮০ সালে 'নিকলস্ অব ইংলণ্ড" মুদ্রণ করেন। ই গ্রন্থ হইতে মুদ্রিত একটি মূল ষ্ঠার নমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাইটন অ্যাকুয়াটিণ্ট, পুরাতন গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, সূক্ষ্ম কাষ্ঠখোদাই মুদ্রণ, বর্ণমুদ্রণ ইত্যাদির নানা নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এত যত্ন সহকারে এইগুলি সংরক্ষিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে একটিও এতটুকু ম্লান হয় নাই। মুদ্রণ বিভাগে ১৪৭৫ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের মুদ্রণ শিল্প, বিশেষ করিয়া বর্ণমুদ্রণ কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালে 'টাইমস' পত্রিকার জন্য যে নূতন রোমান টাইপ সৃষ্টি করা হয় ও পরে তাহা কিরূপে সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্র মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাহার ইতিহাস জানা যায়। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী মুদ্রণালয় তাহাদের উন্নততর কর্মপদ্ধতি, শিশু ও সর্বসাধারণের পঠনীয় বিভিন্ন গ্রন্থের নমুনা, পুস্তক বাঁধাইবার বিশেষ সরঞ্জাম ও নূতনতর পদ্ধতি নানা ফটোগ্রাফের মধ্য দিয়া প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর, সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া প্রকাশক মুদ্রাকরগণ যে এই প্রদর্শনী দেখিয়া লাভবান হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"চিত্রপ্রিয়"

একটি সংবাদে শুনিলাম, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ঘণ্টায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —“ঘণ্টায় ক'লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি; আর মাথাপিছু তারা কত করে পাবে, সে প্রশ্নও করা চলে না, কেননা তাতে স্কুল ফাইন্যালের অঙ্কের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র”—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু সরকারী দপ্তরে কর্তা এবং কেরানীকুলের মধ্যে যে “জাতি-বৈষম্য” বিদ্যমান রহিয়াছে, অবিলম্বে তাহার উচ্ছেদ সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন। “পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে নেহরুজীর পরামর্শ গ্রহণ করলেও আমরা দেখেছি স্বরাষ্ট্র নীতিতে তা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে শক্ত। V. I. P. আর কেরানী যদি এক হুঁকোতে তামাকই খায়, তবে আর দপ্তরের জলুস রইল কোথায়”—বলে শ্যামলাল।

* * *

চাউলের সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অন্যান্য সব জিনিস যখন দুর্মূল্য হইয়াছে, তখন চাউলের দরও অনিবার্যরূপে বৃদ্ধি পাইবেই। “সুতরাং অন্যান্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হলে চালও দুষ্প্রাপ্য হবেই, Q. E. D.—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ডালহৌসীতে ভূনিম্নস্থ পথ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —“পথচারীদের তাতে হয়ত সুবিধেই হবে, কিন্তু আমরা ভাবছি শোভাযাত্রার কথা, নূতন ব্যবস্থায় তার শোভা বুঝি আর রইল না”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, সর্বসাধারণকে “Book” সম্বন্ধে কৌতূহলী করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের শ্যামলাল বলিল— “তা কৌতূহল আমাদের এখনো কম নয়,

কাঁচা থেকে বুক ফাইন্যাল পর্যন্ত সব আমাদের চাই, সেটা কলকাতারই হোক আর বোম্বাই-মান্দ্রাজেরই হোক”।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, “ভারত মাতা কী” জয়ধ্বনির পর “কর্ণাটক মাতা কী” জয়ধ্বনি শুনিতেছি। কিন্তু বহু-মাতা থাকিলে পরিবারে অশান্তি হয়, তা কি আপনারা জানেন না?” —“নেহরুজীর শ্রোতাদের রসজ্ঞান থাকলে তাঁরা বলতে পারতেন—পরিবারে বহুমাতার জন্যে দায়ী সন্তান নয়”—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মার্কিন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মিঃ রুথার নাকি বলিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিগত যুগের কথা। পর্তুগীজদের উচিত ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভার ত্যাগ করা। —“মিঃ রুথার অব “পর্তুগীজ পাকিস্তান” সম্বন্ধে কিছু বলেন নি; এই কাঁঠালের আমসত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও খুব সীমাবদ্ধ —বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

মঃ মালেনকভ দেশে প্রত্যাবর্তনে পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে নি ঠাট্টা-তামাসা করিতে ছাড়েন নাই, অর্থ লন্ডনে যে তরুণীটি অকস্মাৎ মালেন কভকে চুম্বন করিয়াছিল, তারই ছবি প্রসঙ্গে। মালেনকভ যখন বলিলেন

ছবিগুলি লুকাইয়া ফেলিতে হইবে, ত তাঁর স্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, তাহা কোন লাভ হইবে না, ইতিমধ্যেই কয়েক ছবি তাঁর হাতে আসিয়াছে। —“অতঃ কী ঘটল জানিনে, মালেনকভকে হ Nokay না বলে O.K-ই বলতে হয়ে কিন্তু আমরা ভাবছি স্ত্রীরা সোভি রাষ্ট্রেও শুধুই স্ত্রী”!

* * *

“চিকাগো ট্রিবিউন” কাগজ না মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্র দেশসমূহ আমাদের অর্থ গ্রহণ করিতে

কিন্তু অল্পসংখ্যক নেতাই বন্ধুত্ব ব রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে —“এই হয় বন্ধু, এই হয়,... I lost my money and my friend” সংক্ষেপে বলিলেন বিশুখুড়ো।

্য রচনা

কমলাকান্তের আসর (প্রথম পর্ব)। কমলাকান্ত শর্মা। সোয়ান বুক্‌স্‌, কলকাতা—৯। দাম দু টাকা।

শ্রীকমলাকান্ত শর্মা আনন্দবাজার পত্রিকায় আসর পেতে বসেছেন, তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে এই সংকলন বার করা হয়েছে। ভীষ্মদেব খোসনবীশ যখন ভূমিকা লিখেছেন, তখন তিনিই বোধ হয় নির্বাচনের কাজ করেছেন। ভূমিকায় বলা হয়েছে, কমলাকান্তের পরিচয়দান অনাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে তিনি বহুবার নব জন্মগ্রহণ করেছেন। ...া মিথ্যা নয়; বর্তমান কমলাকান্ত বিজ্ঞতায় যদি বুদ্ধ না হলেও বোধিসত্ত্ব। এবং আসরের ...ত আমসত্ত্বের যে সম্পর্ক, বঙ্কিমী 'দপ্তরের' সঙ্গে নব্য 'আসরের' প্রায় সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ অভিজাত আফিংখোরের থাঁটি ...দুধ কালগুণে ফিকে হয়ে এসেছে। তবে কমলাকান্ত যে বহুরূপী এবং মন্তব্যও নানা-মুখী, তার প্রমাণ এই পুঁথি। এর মধ্যে ...টি বিভাগঃ 'অভিনব অভিধান', 'কাব্য' ও 'কথাপ্রসঙ্গ'। কাব্য বিভাগে বর্তমান ...ের ঘটনা নিয়ে কবিতার আকারে কমলা-কান্তের বক্তব্য পরিস্ফুট। তার মধ্যে বিদ্রূপের ...দু উত্তাপ এবং কোথাও বা প্রকৃত প্রতিভা ...া পড়েছে, যেমন 'ছড়া', 'রকমারি', 'কাক-...' প্রভৃতি রচনাগুলি। কোথাও বা রসিকতা ...মন জমেনি। 'কথাপ্রসঙ্গে' অনেক সাময়িক ...া নিয়ে অর্ধাগম্ভীর টিপ্পনী। এগুলি ...া অর্থাৎ কয়েকটা হালকা উক্তো ...ম, যেমন 'ইলিশ-সংবাদ', 'উদ্বৃত্ত চর্বণ', ...ক টিপ নস্য' প্রভৃতি। স্থানে স্থানে ...ানীতিক উক্তি দেয়, তবে অসংলগ্ন ...কথা নয়। কমলাকান্তের চটুলতাই আসল। ...উ নেই ...া নয়, তবে এসব রচনায় ...দার ও ভঙ্গিমাই প্রধান।

বঙ্কিমের কমলাকান্ত ধনুর্ধর হলেও ...তো সব্যসাচী ছিল না। বর্তমান কমলাকান্ত ...ানী ও ছড়া কাটেন, আবার কাব্যপ্রবণতা ...া করে কবির মতই অরণ্য দর্শন করেন। ...া তিনি কলা দেখান, গদ্য ঠেলা সামলাতে ...ন। তবে তাঁর যাবতীয় দুষ্টামি ও ...ামির প্রতিভা ধরা পড়েছে 'অভিনব অভিধানে'। এই অভিধানে প্রচলিত শব্দের ...ন অর্থ ও ব্যঞ্জনা তিনি যেভাবে আরোপ করেছেন, সেটা 'ব্যাঙ্গ'-রচনার নৈপুণ্য-...। অভিনেতা, অলংকার, উকিল, ...তী পরিবার, কান, খাদ্যাভাব, ঘুড়ি, ...া, জানালা, পরীক্ষা, বনস্পতি প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা সত্যিই ব্রিলিয়েন্ট।

পুস্তকের অঙ্গসজ্জা চমৎকার। কাগজ, ...া ও বাঁধাই সে তুলনায় নগণ্য। প্রকাশক ...া গ্রন্থকারের চেয়ে বুদ্ধিমান। মনে করেন, কমলাকান্তের রচনাগুলিতে রঙীন বুদ্‌বুদেরই ...া, ভিতরটায় ঠাসবুনন বা সারবস্তু না থাকলেও ক্ষতি নেই। 'দপ্তর' ভালো, কিন্তু 'দরীর' খরচ কাজের কথা নয়।

(৭।৫৬)

শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষার ভিত্তি। বনফুল।—প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—আড়াই টাকা।

মোট পাঁচটি হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রবন্ধের সমষ্টি। নাম-প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জির বক্তৃতা। বস্তুত, সব কয়টি প্রবন্ধই বিভিন্ন সভায় পঠিত অভিভাষণ।

'শিক্ষার ভিত্তি' আয়তনে বৃহৎ এবং চিন্তার দিক থেকেও সারবান। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল তাঁর প্রভূত বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন এ-প্রবন্ধে। এবং তাঁর বলার ভঙ্গীটি অত্যন্ত সহজ, সরল, সরসও। সাধারণত এ-ধরনের প্রবন্ধ পড়তে বসার আগেই যে কাঠিন্যের কল্পনায় মনটা বিমুখ হয়ে থাকে, সে-কাঠিন্যের আভাস এখানে বিন্দু-মাত্রও নেই। পাঠকের মনের মধ্যে কখনও কখনও যদি কোনো প্রশ্ন জাগে তবে সে লেখকের মতামত সম্বন্ধে। অবশ্য সে-দিক থেকে এ-প্রবন্ধ (বস্তুত সমগ্র গ্রন্থটি) সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথাই হলো লেখকের মতামত। সার্ধ বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনকে তিনি নির্বিকারচিত্তে প্রায় অস্বীকার করে বসেছেন, অথচ প্রগতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট নয়। প্রাচীন ভারতের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক একটা মোহ আছে, তখনকার দিনের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি সমসাময়িক প্রয়োজনের উপযোগী ছিলো বলেও আমরা বিশ্বাস করি, এখনকার ভারতবর্ষেও সেই আবহাওয়াকে ফিরিয়ে আনার কথাও হয়তো কেউ কেউ ভাবেন, কিন্তু তাই বলে বর্তমানের প্রতি চোখ বন্ধ রেখে সেই পুরাতনকে আবাহন করার মধ্যে প্রগতিবোধের লক্ষণ নেই। বর্তমান কালের পটভূমিতে যে অপাত লক্ষণীয় পরস্পরবিরোধী বহুধা শক্তি কাজ করে চলেছে তাদের গতিকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে পরি-চালিত করে আগে সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে, শিক্ষার ভিত্তিও সঙ্গে সঙ্গেই স্থিরীকৃত হবে। বর্তমানের প্রয়োজনই তাকে তৈরী করে নেবে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা কখনও আরোপিত হতো না, অথচ আজ যদি আমরা সেই পদ্ধতিকেই আরোপ করতে চাই তবে আমরা প্রাচীন ভারতের সম্পূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতিরই বিরুদ্ধাচরণ করবো। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক আশা করি এ-কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন।

'বাঙালীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধটি শুধু যে সুলিখিত তাই নয়, সুষ্ঠু ইতিহাস চেতনারও

একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবাসী বাঙালী বলেই হয়তো লেখক এমন নিবিড়ভাবে বাঙালী জাতটাকে যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন। বাংলা ও বাঙালীকে যে তিনি সত্যি সত্যিই আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ কোথাও নেই। কিন্তু 'কাব্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি পড়ে অনেকেই লেখকের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন। তিনি সত্য-শিব ও সুন্দরের পূজারী এবং নিজেই বলছেন সত্য-শিব ও সুন্দর চিরন্তন, তাহলে তিনি এমন কথা ভাবেন কি করে, যা মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্থান পায়নি, তা আজও সাহিত্যে অপাংক্তেয়। সামাজিক পটভূমিকে আশ্রয় করেই যদি সাহিত্য জন্ম নেয়, তবে সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী এবং যে-কোনো রচনাকার তার আদর্শের দৃষ্টি দিয়েই সত্য শিব ও সুন্দরকে চিনে নেবে। কোনো নামীয় 'ইজম্‌' তো একটা উপলক্ষ মাত্র, যে-কোনো কবি তাকে অবলম্বন করে যদি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন তবে লেখকের আপত্তির কারণ কি? সত্য শিব ও সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয় লেখকও করেননি, সুতরাং অনুভূতি দিয়ে কেউ যদি তাকে বিশেষ রূপে দেখতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়ার কি আছে। সেক্সপীয়র, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আসরে রাজনীতিকে প্রবেশ করতে দেননি তা ঠিক, নানপক্ষে তাঁরা তো 'রেজারেকশন'-এর বিষয়বস্তুকেও গ্রহণ করেননি, তাই বলে, রেজারেকশনের মহত্বকে অস্বীকার করবেন কি লেখক? কী গভীর পঙ্কিলতা থেকে টলস্টয় সত্য শিব ও সুন্দরকে আবিষ্কার করেছিলেন ভাবতেও বিস্ময় জাগে। আসল হচ্ছে হৃদয়ের বিশালতা। তারই জোরে শরৎচন্দ্র মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সময় ও সমাজকে সেক্সপীয়র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথই কি অস্বীকার করতে পেরেছিলেন? এই সময় ও সমাজের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে সত্য শিব ও সুন্দর। পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজকে বাদ দিয়ে আকাশকুসুম যে একেবারেই রচনা করা যায় না তা নয়, কিন্তু সত্য কি সেখানে থাকবে? আসল কথা, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যাই হোক, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক তাঁর নতুন দৃষ্টি দিয়ে সত্য শিব ও সুন্দরের আবাহন অবশ্যই করতে পারেন, প্রাক্তন মহৎ সাহিত্যিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেও। সুতরাং ভিন্নতর আদর্শের প্রতি উষ্মা প্রদর্শন করে লাভ নেই।

আর যে-দুটি প্রবন্ধকে এ-সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে তাদের নাম—'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' ও 'বুদ্ধদেবের জীবনে নারী।'

৫৪২।৫৫

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION IN INDIA : By K. C. Vyas, M.A., Ph.D. Published by Vora & Co., Publishers Ltd., 3, Round Building, Kalbadevi Road Bombay-2, 140 pages. Price Rs. 4|-.

ভারতে ব্রিটিশ সম্পর্কের আদি যুগে খৃস্টান মিসনারীরা যে ধর্মান্তর ... তাগিদেই ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ও ... শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, সে সম্পর্কে ... গ্রান্ট, আলেকজান্ডার ডাফ, উইলসন ... অ্যান্ডারসন প্রভৃতির চেষ্টা; তারপর ... ডিরোজিওর নেতৃত্বে ভারতীয় সমস্ত আদর্শের বিরুদ্ধে বাংলায় 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলন, ... রামমোহন রায়ের ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয়ের জন্য প্রবল আন্দোলন, জনসাধারণ ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সহজলভ্য করার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টা এবং তাতে বিদেশী শাসকদের বাধা প্রদান, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় ভাষায় জাতীয় আদর্শ ... সাধারণের মধ্যে প্রসারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার, শিক্ষায় ধর্মের স্থান সম্পর্কে অ্যানি বেসান্টের প্রস্তাব, শিক্ষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সমন্বয়ের সঙ্গে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা ও শরীর গঠনের দিকে আর্যসমাজের লক্ষ্য এবং ওদিকে স্বামী দয়ানন্দের নেতৃত্বে, উত্তর প্রদেশে ... মধ্যে নারী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা, লর্ড রিপনের শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা বিদেশী শাসকদের দ্বারা অর্থাভাবের অজুহাতে বর্জন, লর্ড কার্জনের ইচ্ছায় ১৯০২ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন এবং তাদের প্রস্তাব, যার উপর এখনকার শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। ১৯১... খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন সভায় গোখেলের "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন", স্বদেশী আন্দোলনের সময় ... এর নেতৃত্বে শ্রীঅরবিন্দকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে প্রথম জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ১৯২০ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা এবং দলে দলে ছাত্রদের সেগুলিতে যোগদান, ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর বনিয়াদি শিক্ষা অনুমোদন এবং পরিশেষে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা—এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পুস্তকটিতে প্রাঞ্জল ও সুসম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষে স্বাধীন ভারতে নাগরিকগঠনে শিক্ষায় ভারতীয় আদর্শ এবং ভারতীয় ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপের প্রস্তাব আছে। ভূমিকায় আচার্য কেসকার ঠিকই বলেছেন যে জাতীয় শিক্ষা আদর্শের ক্রমপরিণতির এই ইতিহাস রচনা করে আচার্য ব্যাস আমাদের প্রচুর উপকার করেছেন। যাঁরা যে কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত তাঁদের পক্ষে এই পুস্তকটি অতি অবশ্য পাঠ্য।

৩৩৮।৫৫

নিয়ে প্রত্যক্ষ চিত্রাঙ্কনেও কবির নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। 'বর্ষার' কবিতাটির মত মিষ্টি লিরিকধর্মী কবিতা বোধহয় অন্যমনস্ক মুহূর্তের রচনা। ২৮৮।৫৫

কৈশোর স্বপ্ন—বৃন্দাবন ঘোষ প্রণীত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লিখিত। লেখকের কবি-প্রতিভা আছে। তাঁহার কবিতাগুলি মনকে নিবিড়-ভাবে স্পর্শ করিয়া সুরে সুরে সঙ্গীতের রীতিতে দূরকে নিকটে আনে এবং মধুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গ দেয়।

গল্প সংকলন

পঞ্চদশী—শ্রীনির্মল দত্ত সম্পাদিত। প্রকাশক : শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়, ১৪৪, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—২।।০ টাকা।

আলোচ্য গল্প সংকলনটিতে সম্পাদকসহ অনেকের গল্প স্থান পাইয়াছে। সবশুদ্ধ পনেরটি গল্প স্থান পাইয়াছে। লেখকদের মধ্যে সব কয়জন যেমন প্রথম সারির নন্, গল্পগুলোও তাই। ৪৯২।৫৫

উপন্যাস

পরিচয়—হিরন্ময়ী বসু। প্রকাশক : শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৲ টাকা।

পিতৃমাতৃ পরিচয়হীনা জবাকে মানুষ করে তুলেছেন মিশনারী স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্ ডরোথী। লেখাপড়া শিখে বড় হবার পর সে যথারীতি প্রেমে পড়ল তার বন্ধু মিলনীর ভাই অভিজিতের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের পূর্বে জানা গেল অভিজিতের পিতাই জবার জন্মদাতা। বিবাহ তাই ভেঙে গেল। অভিজিৎ চলে গেল বিলাতে। মোটামুটি এই হ'ল কাহিনী। এ-কাহিনী লেখিকা সুন্দর-ভাবে চিত্রিত করেছেন, বিশেষ করে মিশনারী স্কুলের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু দোষত্রুটি থাকলেও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়েছে। তবে বর্ণাশুদ্ধি পীড়াদায়ক, এবিষয়ে প্রকাশকের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। ৩২০।৫৫

ভগ্নতরী—রমেন গুপ্ত। প্রকাশক : তারা লাইব্রেরী, ১৪।১, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা। মূল্য—২।।০ টাকা।

সমাজের কলুষতার দিক, যে দিকে ব্যভিচারীর দল সভ্যতার মুখোশ পরে দিনের পর দিন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, তারই একটি চিত্র এঁকেছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে। গল্প বলায় মুনশীয়ানার বিশেষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও সমাজের এই দিকের ছবি আঁকতে সমর্থ হয়েছেন লেখক। লেখকের ভাষা ভাল। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়। ৩৬১।৫৫

অভিসম্বন্দ্বেষু—মনোতোষ [illegible]। প্রকাশক : চক্রবর্তী ব্রাদার্স, [illegible], কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য [illegible] টাকা।

একটি সাধারণ মেয়ের [illegible] কাহিনীতে মেয়েপাড়ি [illegible] সূক্ষ্ম খেলা, তবু ভাল লাগে [illegible] ভাষা, বর্ণনাভঙ্গীও সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসার যোগ্য। [illegible]

শিশু সাহিত্য

শিশুসাথী : সম্পাদক—শ্রী[illegible] কার্যালয় : ৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—প্রতি সংখ্যা [illegible]

এই [illegible] জনপ্রিয় শিশুমাসিক [illegible] সাথী [illegible] বর্ষে পদার্পণ করিল [illegible] [illegible] আছে গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস [illegible] [illegible] ও কবিতা [illegible] [illegible] আকর্ষণ। [illegible] ছবিতে, ছাপায় [illegible] [illegible] শিশুসাথী [illegible] [illegible] মন হরণ করিবে, তাহাতে কোন [illegible] নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সবুজ চিঠি—[illegible] বসু
শত্রু পক্ষের মেয়ে ১ম খণ্ড—মনোজ বসু
দেবী কিশোরী—মনোজ বসু
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
লৌহ কপাট—জরাসন্ধ
পূর্বাপর—শ্রী[illegible]নাথ মিত্র
দেশেদেশে—বিমল মিত্র
অন্যতমা—[illegible]নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
পিয়াপসন্দ—রমাপদ চৌধুরী
জতুগৃহ—সুনীল দত্ত
আমার বাংলা—ক্যালকাটা ইউথ [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত।
রাজমোহনের বৌ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
ধর্মে বাঙালী—শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
শিখার অগ্নি পরীক্ষা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।
আর্সি অল্প মূল্যে কেনা—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।
লণ্ডনের শত্রুচর—দীনেন্দ্রকুমার রায়।
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্—ভক্ত কবি শ্রীমৎ শ্রীজয়দেব গোস্বামী।
শিশু তরু—কল্যাণী প্রামাণিক।
কথমালা—শ্রীআনন্দ।
তুমি শুধু ছবি—অন্নপূর্ণা গোস্বামী।
পরিক্রমা—তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—শৌভিক—

লোকরঞ্জন প্যাথী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের লোকরঞ্জন শাখার স্থাপনা হয়েছে ধরতে গেলে বছর দুই; কল্যাণী কংগ্রেসের সময় ওখানে এবং কলকাতার অনেক স্থানে ওদের প্রযোজনায় পরিবেশিত অনেকখানি নাটক দেখার সুযোগ হয়। সংকীর্তনের বিবরণ পুরনো "দেশ"-এর পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, নতুন করে তার উল্লেখ করতে গেলে লোকে বলবে গায়ে-পা-দিয়ে ঝগড়া। তাই সে প্রসঙ্গ আর উল্লেখ না হয় নাই বা হলো। তারপর থেকে লোকরঞ্জন শাখা সম্পর্কে কোন কিছু লেখবার কোন সুযোগ না থাকায় একরকম ভালোই ছিল। কারণ, দেখা গেছে, এ বিভাগের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দিলেও সংশোধনের জন্য তো কিছু হবারই নয়, [illegible] শুধু চটেই যান।

গ্রামে গ্রামে ওরা থিয়েটার করে বেড়াচ্ছেন, সে খবর শোনা যায় মাঝে মাঝে, [illegible] গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে ওদের অভিনয় বিষয়ে যখন কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা পাওয়া যায় না, তখন এই [illegible] খুশী থাকবার কারণ ছিল যে, [illegible]দের মনোরঞ্জনের জন্য এই লোকরঞ্জন [illegible] তারা নিশ্চয়ই খুশি, আনন্দিত এবং [illegible] বিস্ময়ক বলে উপলব্ধিত হয়। এবার এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে যাবার কোন মানে হয় না। কিন্তু কাল [illegible] ওঁরা গত ১৬ই এপ্রিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভকালীন উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় মিনার্ভা মঞ্চে ওঁদের নবতম নাট্যনিবেদন "পুণ্ডেধন" প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। তাও দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ মন্ত্রিবর্গ, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গ এবং পেটোয়া লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হতো, কারণ মনে মনে তাঁদের যেমনই লাগুক, তাঁদের মুখ থেকে সরাসরি বিরুদ্ধ কিছু শুনতে হতো না। কিন্তু কাল করেছেন তাঁরা ঐ সঙ্গে কজন সাংবাদিক ও সমালোচককেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে। একে সরকারি প্রচেষ্টা অর্থাৎ জনসাধারণের টাকার সঙ্গে যার সম্পর্ক, তার ওপর একনাগাড়ে ঘণ্টা তিনেক সময়ও অতিবাহিত করতে হয়েছে। তবুও কোন রকম মন্তব্য থেকে বিরত হতে পারলেই ভালো হতো, কারণ মন্তব্য শুধু এক কথাতেই সেরে নিতে হয়, আর তা হচ্ছে অনতিবিলম্বে এই লোকরঞ্জন শাখাটির অবলুপ্তির জন্য সুপারিশ।

*　　*　　*

নাটকখানির অভিনয় আরম্ভ হবার আগে স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের পক্ষ থেকে জানান হয় যে, সরকারি প্রচার বিভাগ থেকে নাটকের মাধ্যমে বিবিধ বিষয়ের প্রচারকার্য নির্বাহ করার জন্য এই যে লোকরঞ্জন শাখা—পশ্চিমবঙ্গ সে বিষয়ে ভারতে অগ্রণী। এটা সত্যি কথাই এবং তার জন্য প্রচার বিভাগের গর্বও হতে পারে, কিন্তু যা নাটক তা দেখবার পর প্রচার বিভাগ দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে আশ্চর্য হবার নেই। পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে অল্পদিন হলো "পুণ্ডেধন" নাটকখানি প্রণীত ও প্রযোজিত হয়েছে। দিন পনের আগে এই নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ফুলিয়া গ্রামে, তারপর মিনার্ভায় এই তার দ্বিতীয় অভিনয়। ধরতে হয় যে, বহু টাকাই খরচ হয়েছে নাটকখানি মঞ্চস্থের ব্যবস্থা করতে। স্থায়ী লোকরঞ্জন শাখার নিযুক্ত শিল্পী কর্মীদের মাসিক বেতনের পরিমাণ শোনা যায় হাজার ষোল টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় দু' লাখের কাছাকাছি। এবং গত বারো মাসে শোনা

গেল, এই একখানি নতুন নাটকই তৈরী হয়েছে, কাজেই এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়। লোকরঞ্জন শাখায় সব মিলিয়ে কতোজন লোক নিযুক্ত আছেন জানা নেই, তবে "গুপ্তধন"-এর সংগে সংশ্লিষ্ট আটচল্লিশ জনের নাম পাওয়া গেল। এর মধ্যে রয়েছেন নাট্য রচনা ও পরিচালনায় মন্মথ রায়, সুর-সৃষ্টি প্রযোজনায় পঙ্কজ মল্লিক, সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণে নেপাল নাগ, শিল্প-নির্দেশনায় বুদ্ধ ঠাকুর। এঁরা হলেন মাথার কাজের ... রয়েছেন সহকারীদের মধ্যে নাট্য পরি- চালনায় একজন, সঙ্গীত পরিচালনায় ... জন, ব্যবস্থাপনায় দুজন, আলোকসম্পাতে তিনজন, রূপসজ্জায় দুজন, অভিনয়ে ষোল জন, যন্ত্রবাদ্যে আটজন এবং ... সহকারী দশ জন। এই আটচল্লিশ জন মিলে দু' অংকে মোট দশটি দৃশ্যে ... ঘণ্টাব্যাপী এই যে নাটকখানি প্রস্তুত ... হাজির করেছেন, তা একটা অতি প্রতি ... শীল উপাদান, যাকে সমাজ উন্নয়ন পরি- কল্পনার একটি নিকৃষ্ট ব্যঙ্গ ... অভিহিত করা যায়। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, এই ব্যঙ্গের স্রষ্টা সরকারী বিভাগ।

• • •

এখানে একটা কথা যেন মনে রেখে দেওয়া হয় যে, এই যে নাটক এটা শহুরে লোকের জন্য নয়। যদিও গ্রামের লোকের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী বলেই তা শহুরে- দের মনোরঞ্জনের উপযোগী হবে না, এমন কোন মানে হয় না। তবুও বিতর্ককে খাটো করে দেবার জন্য ধরে নেওয়া গেল যে, লোকরঞ্জন শাখার অন্তর্ভুক্ত প্রতিভাবানদের মতে গ্রামের লোকে এমন জিনিস ভালবাসে যা হয়তো শহুরেদের মনে লাগবার নয়। এবং "গুপ্তধন" নাটকখানির ওপর সেই মনোভঙ্গি থেকেই দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই নাটকের গোড়া অর্থাৎ ঠিক যেদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো, আর শেষ ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ যেদিন থেকে পাঁচ- সালা তথা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবর্তন। ঘটনাস্থল শ্রীপুর নামে একটি গ্রাম। নাটকের কাহিনী একটা সিন্দুককে কেন্দ্র করে। এক ডাকাতের বংশধর হলধর মণ্ডলের পুকুর থেকে পাওয়া দুশো বছর আগেকার এই সিন্দুক। বিরাট তালা মারা কিন্তু এখনও সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিকা জ্বলজ্বলে তার গায়ে! ডাকাত সর্দারের যখন সিন্দুক, নিশ্চয়ই মোহরে ভরা, গ্রামের লোকের তাই প্রত্যয়। হলধরের বড়ো ছেলে বলাই স্বদেশী করে জেল খেটে ফিরে এসেছে। সে জানালে যে, ডাকাতি করা

ধূলোর ধরণীতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

...রই। তবে এখনই সিন্দুক খোলা ...া, এক বছর ধরে গ্রামবাসীকে খাল ...ল আনার ব্যবস্থা করতে হবে, ...উন্নতি করতে হবে, পতিত জমি ...করতে হবে. জঙ্গল সাফ করতে হবে, ...বসাতে হবে, ভালো চিকিৎসার ...করতে হবে। সে সব হলে এক বছর ...সিন্দুক খোলা হবে। সেই শুনেই ...লোক কাজে মেতে উঠলো। এই ...একটা লোভ সৃষ্টি করিয়ে দিয়ে ...উন্নয়ন কাজে যোগদানে গ্রামবাসীকে ...করে তোলার এ এক অসংগত কিম্ভূত পরিকল্পনা! সমাজ উন্নয়ন তত্ত্বেরই তা ব্যতিক্রম।

* * *

তবে ঐ সিন্দুকটি দেখিয়ে দর্শক-মনে একটা কৌতুহল জাগিয়ে রেখে দেওয়া গিয়েছে, এবং সেই কারণেই নাটকখানি শেষপর্যন্ত দেখাতেও হয়। কিন্তু শেষে সিন্দুক খুলতে তার ভিতর থেকে যা বের হলো তা পর্বতের মূষিক প্রসবের চেয়ে অদ্ভুত;—তার মধ্য থেকে বের হল লাল চেলি জড়ানো রাম-সীতা মূর্তি; সংগে সংগে সেই যুগলমূর্তির মুখে 'রঘুপতি

সম্প্রতি কলকাতায় ওস্তাদ আলি আকবর খানের নামে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ আলি আকবরের পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান। ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংগীতশিল্পীদের এ'রা অন্যতম। গুণী শিল্পীদের ঘরানায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কলকাতার সংগীত চর্চা ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ছবিতে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল কর্তৃক সম্বর্ধনারত দেখা যাচ্ছে

রাঘব রাজারাম' গান এবং সেইখানেই যবনিকা। কি অদ্ভূত ছেলেমানুষী, আর এই দেখিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের লোকরঞ্জন শাখা বাঙলার গ্রামের লোককে সমাজ উন্নয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে চায়! ঘটনা, চরিত্রসৃষ্টি এবং অভিনয়াদির কথা না বলাই ভালো, কোন বিষয়ে কাউকে দেখিয়ে দেবার জন্য যে কেউ আছেন, বা তেমন ক্ষমতাবান কাউকে রাখা হয়েছে তার এতোটুকুও নিদর্শন পাওয়া যায় না। আনুসান্ পাগলামী সকলেরই অভিনয়ে। কি সংলাপ! দু'চারটে শালা, বেটাচ্ছেলে, হারামজাদা কথার মাত্রায় জুড়ে গেলেই যেন গ্রাম্য ভাষা হয়ে যায়। মহাজন নায়েব [illegible]

পুরুষ বরাতবাদা, গ্রামের এই তিন কুলক্ষণকে ভাঁড়ের মতো করা হয়েছে, তা হোক, তার রগড় জমবে মনে করে বেলাগাম যা খুশী করেছে, তাও বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু যে সব চরিত্র সিরীয়াস প্রকৃতির সেগুলিরও আচরণ কারুর ঐ ভাঁড়দেরই মতো, কারুর বা মেয়েলীপনা, সবায়েরই চলন, বলন অভিব্যক্তি সমস্ত কিছু দেখে সংশয় থাকে না যে, কিভাবে কি করতে হয় তা দেখিয়ে দেবার মতো কেউ নেই লোকরঞ্জন শাখায়। অন্যান্য ব্যাপারেও তাই। কুঁড়ে ঘরের খড়ের চালার গায়ে জানলা ফোটানো দেখে শিল্প নির্দেশেরও বেশ মজাদার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সর্ব বিষয়েই, গ্রামের লোক রগড় [illegible]

সচিত্র সাহিত্য সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ...	...	
সহরে বার্ষিক ...	...	১১
ষাণ্মাসিক ...	...	[illegible]
ত্রৈমাসিক ...	...	[illegible]
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০
ষাণ্মাসিক ...	...	১০
ত্রৈমাসিক ...	...	[illegible]
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৫
ষাণ্মাসিক ...	...	১১

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্লরকার ষ্ট্রীট কলিকাতা—

চেয়ে গ্রামের লোক যে কতো বুদ্ধু দখাবার মনোবৃত্তিই রয়েছে পরি- হয়ে। এইভাবের নাটক রে সমাজ উন্নয়নে প্রেরণার সঞ্চার দিতে পারে? এতো বড়ো একটা ত-দল রয়েছে যা কোন পেশাদার নেই, কিন্তু এ-নাটকে চারখানি মাত্র এবং তা এমন যে তার পরিবেশের কোন সংগীত পরিচালকেরই জন ছিল না। দেখেশুনে এই মনো- নিয়েই ফিরে আসতে হয় যে, জন- লোককে পোষবার জন্যই যেন এই টের সৃষ্টি, নয়তো আর কোন সত্য, অন্তত 'গুপ্তধন' দেখে তো, যায় না। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই মন একটি শাখা প্রচার বিভাগে দরকার খুবই; তা নিয়ে কোন দ নেই, কিন্তু একটা গোলমাল যে জন্যে সম্পর্ক কিছু সৃষ্টি না এখন যারা রয়েছেন তাদের না তাদের দ্বারা পরিচালিত তাদের অজ্ঞতার জন্য। গভর্ন- দেশে যা হবে তা একটা আদর্শ হবেই বলে আশা করতে হয়, তা না যদি 'গুপ্তধন'-এর মত কীর্তি দেখা হলে নিরাশা বেশী করে বাজে। তেরো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে নাট্যাভিনয় সৃষ্টির দি হাজার কতক টাকা করে পুরস্কার ব্যবস্থা করে দেশে প্রতিযোগিতার া করা হতো তাহলে তা অনেক ভালো! সে সব পথ মাড়ালে বিপদ ছিল, তাই লোকরঞ্জন শাখা কিছু প্রস্তুত করেছেন যা দেখে ও আমোদ লাভ করাটা তিক্ত ওষুধ র মতো মনে হবে।

ালি আকবর খান সংগীত বিদ্যালয়

যন্ত্রসংগীতে অসাধারণ দীপ্ত সংগীত- ভা ওস্তাদ আলি আকবর খান সম্প্রতি বম্বে থেকে তাঁর কর্মস্থল কলকাতায় স্থানান্তরিত করে নিয়ে এসে কলকাতার সংগীত সমাজের গর্ব বাড়িয়ে তোলেন। তারপর অনুরাগীদের আগ্রহে ও উৎসাহে তাঁদের ঘরাণার সংগীত শেখাবারও ব্যবস্থা করে সংগীত-শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। গত ১লা বৈশাখ বালিগঞ্জের ১৬ ম্যান্ডেভিলস গার্ডেন্সে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ গুরুস্থানীয়দের আশীর্বাদ নিয়ে ওস্তাদ আলি আকবর খান সংগীত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের গুণান্বিতা

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সুযোগ্য পুত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সুরবাহারে পুরিয়া-ধানশ্রী রাগের আলাপ করিতেছেন

কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী পুরিয়া ধানশ্রীতে সুরবাহার শোনান। কলকাতায় সাধারণে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। পরে ভ্রাতা আলি আকবর খান কিরোয়ানীতে সরোদ বাজিয়ে শোনান।

মাইহারে সাধক শিল্পী ওস্তাদ আলা- উদ্দীন খানের কাছে ছাড়া ঘরাণার সংগীত শিক্ষার এইটি হবে দ্বিতীয় কেন্দ্র। এখানে অধ্যক্ষ থাকছেন ওস্তাদ আলি আকবর খান, সহঃ অধ্যক্ষা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী এবং অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে থাকবেন শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান, শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি।

একলব্য
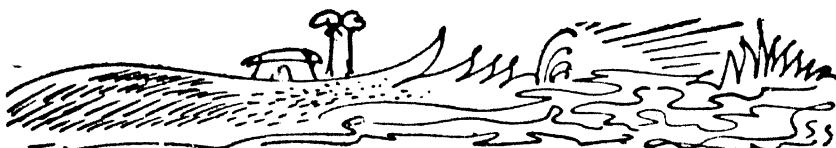
আণবিক ঝড়ে বিধ্বস্ত জাপান ১৯৫২ সালে ঝড়ের গতিবেগ নিয়ে টেবিল টেনিসের বিশ্বসভায় প্রবেশ করেছিল, আজও তার সেই গতিবেগ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, আজও টেবিল টেনিসের জগৎসভায় জাপান শ্রেষ্ঠ দেশ। শুধু শ্রেষ্ঠই নয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। ক'বছর আগেও টেবিল টেনিসের জগৎসভায় জাপানের কোন পরিচয় ছিল না। ১৯৫২ সালে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই জাপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সাগরপারের দিকপাল সব খেলোয়াড়দের একে একে পরাভূত করে জাপানের অখ্যাত ছেলে হিরোজী স্যাটো হন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, জাপ দুহিতা নিশিমুরা ও নারাহারর অসামান্য টেবিল টেনিস প্রতিভা জিতে নেয় কর্বিলন কাপ। বিশ্ব প্রতিযোগিতার ৭টি পুরস্কারের মধ্যে চারটি পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফেরে জাপানের বিশ্বজয়ী টেবিল টেনিস দল। বিশ্ব ক্রীড়াসভায় অনদৃত জাপানের লুপ্ত প্রতিভা স্ফুরণে এশিয়াবাসী মাত্রেই গর্ব-বোধ করে। কিন্তু পাশ্চিমী খেলোয়াড়গোষ্ঠী ক্রীড়াক্ষেত্রে এশিয়ার এই নবজাগরণ সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। জাপ খেলোয়াড়-দের প্রতিভার প্রতি কটাক্ষে এবং স্পঞ্জ র‍্যাকেটের কারসাজি সম্পর্কে তাদের কণ্ঠ হয়ে ওঠে সুউচ্চ। অভিমানেই হক আর অন্য যে কোন কারণেই হক ১৯৫৩ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতা হতে জাপান দূরে সরে থাকে। ১৯৫৪ সালের বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় আবার জাপানের আবির্ভাব ঘটে এবং লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে সোয়েদলিং কাপ, কর্বিলন কাপ এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' জয় করে জাপান আবার নিজেকে টেবিল টেনিসের বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলে প্রমাণ করে। কিন্তু পাশ্চিমী খেলোয়াড়কুলের মিলিত কণ্ঠ এবারও জাপ প্রতিভাকে লঘু করবার জন্য নীরব থাকে না। তাদের উর্বর মস্তিষ্কের আজগুবি কল্পনার ছাঁচে তৈরি হয় 'মেটাবোলিন' নামক উত্তেজক ইনজেকশনের কাহিনী। বলা হয় জাপানী খেলোয়াড়রা খেলার আগে এই উত্তেজক ইনজেকশন নিয়ে ক্রীড়া আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই তাদের এই অসামান্য সাফল্য। তারপর আসে হল্যাণ্ডের উট্রেখ নগরীতে ১৯৫৫ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতা। জাপানের খ্যাতিকে খর্ব করতে পাশ্চিমী খেলোয়াড়কুলের আগ্রহের অন্ত নেই। কিন্তু এখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি; আন্তঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার সোয়েদলিং কাপ আর বিশ্ব প্রাধান্য প্রতি-যোগিতার অজেয় যোদ্ধার ব্যক্তিগত পুরস্কার 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' দুইই জাপানের করায়ত্ত হয়। জাপানের আর এক অখ্যাত তরুণ ছেলে তোশিয়াকী তানাকা হন নতুন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। এর পর জাপানের প্রতিভা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণার পরিবর্তন হয়।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ইচিরো ওগিমুরা

সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নেয়, টেবিল টেনিসে জাপান বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ১৯৫৬ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার পড়ে জাপানের উপর। সম্প্রতি টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত এই বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতায় জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসীর চোখে আরও উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। এবার আন্তঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতায় এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-

বাঁ দিকে—**বিশ্ব টেবিল টেনিসে মহিলা বিভাগের রানার্স মিস কিইকো ওয়াতানাবে**
ডান দিকে—টোকিওতে **বিশ্ব টেবিল টেনিসের এয়োবিংশতি উৎসব উপলক্ষে জাপ সরকার যে ডাক টিকিট ইস্যু করেন, তারই প্রতিলিপি**

শিপের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে জাপান লা করেছে বিজয়ীর সম্মান, তাছাড়া পুরুষদে ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপও জাপানের কা থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন ১৯৫ সালের চ্যাম্পিয়ন ইচিরো ওগিমুরা ফাইন্যালে তিনি তার দেশেরই কীর্তিমা খেলোয়াড় গতবারের চ্যাম্পিয়ন তোশিয়াক তানাকাকে পরাজিত করেন। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউই কোয়ার্টার ফাইন্যালের উপরে উঠতে পারেননি। কোয়ার্টার ফাইন্যালের মধ্যে সবাইকে একে একে জাপ খেলোয়াড়দের কাছে পরাভব স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে জাপানের নিজ অভিযানের মধ্যে প্রায় সমস্ত বিষয়ে বিজয়ীর পুরস্কার করায়ত্ত হলেও একটি বিষয়ে জাপানের সাফল্য কিন্তু এত দিন অপূর্ণ ছিল; রুমেনিয়ার টেবি টেনিস পটিয়সী মিসেস এঞ্জেলিক রোজেনুকে পরাজিত করে তারা এতদি মহিলা বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লা করতে পারেনি। এবারেই জাপ দুহিতা মি টোমি ওকাওয়া ৬ বছরের চ্যাম্পিয়ন টেবি টেনিস সম্রাজ্ঞী রোজেনুর উপর্যুপরি বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব ম্লান করে দিয়েছেন। অবশ্য মিস ওকাও মহিলা বিভাগের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলে এঞ্জেলিকা রোজেনুকে কিন্তু পরাজয় স্বীকা করতে হয়েছে জাপানের আর এক মহিল খেলোয়াড় মিসেস কিয়োকো তাসাকার কাছে মিসেস তাসাকা আবার তৃতীয় রাউণ্ডে মি ওকাওয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

মিসেস তাসাকা ও মিসেস এঞ্জেলিক রোজেনুর দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলার পূ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। তবু যেটুকু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ম হয়, ৬বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনি সম্রাজ্ঞী এঞ্জেলিকা রোজেনু, তার সাফ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, ফলে তিনি অনেক হাল্কাভাবেই মিসেস তাসাকার সঙ্গে খে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হা পানি পাননি। তাসাকা এঞ্জেলিকার কাছ থে প্রথম দুটি গেম পাবার পর এঞ্জেলিকা খেল প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে সতর্কতার সা দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা আরম্ভ করে এঞ্জেলিকার হাতে সব রকমের মার আছে আত্মরক্ষায়ও তিনি সুস্পষ্ট, কিন্তু মিসে তাসাকাও ছাড়বার পাত্র নন। তৃতীয় গে এঞ্জেলিকা এগিয়ে গেলেন, তাসাকাও তা ধরে ফেলতে কসুর করলেন না। 'ডিউসে পর 'ডিউস' হতে আরম্ভ করলো। একক ২১ পয়েণ্টে যে গেমের মীমাংসা হবার ক ৩২—৩০ পয়েণ্টে সেই গেমের মীমাংসা হ তাসাকা হলেন বিজয়িনী। মিসেস তাসা এবং মিসেস এঞ্জেলিকা রোজেনু দুজ

বিশ্ব টেবিল টেনিসে মহিলা বিভাগের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপানের মিস টোমি ওকাওয়া। ফাইনালে ওকাওয়া তাঁর দেশেরই অপর টেবিল টেনিস পটিয়সী মিস ওয়াতানাবেকে পরাজিত করেছেন। ওকাওয়া জাপানী খেলোয়াড়দের স্বভাবসিদ্ধ পেন-হোল্ড গ্রিপে খেলেন না, শেকহ্যান্ড গ্রিপে খেলেন

সন্তানের জননী। শেষদিকে দুজনের খেলাতেই শ্রমজনিত কাতরতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। বিজয়িনী কিয়োকো তাসাকা খেলার শেষে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। মিসেস তাসাকার কাছে টেবিল টেনিস সম্রাজ্ঞী এঞ্জেলিকা রোজেনুর পরাজয় যেমন এবারকার বিশ্ব প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফল, তেমন তৃতীয় রাউণ্ডে ভারতের খেলোয়াড় কে নাগরাজের কাছে প্রাক্তন বিশ্বচাম্পিয়ন জনি লীচের পরাজয়, চতুর্থ রাউণ্ডে বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিজের বিদায় গ্রহণ, জাপানের স্কুল ছাত্র আকিও

মধ্যে কে নাগরাজ ছাড়া আর কেউই ভাল খেলতে পারেননি। নাগরাজকে কোয়ার্টার ফাইনালে আকিও নাহিরার কাছে হার স্বীকার করতে হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরাজই ভারতের একমাত্র এবং প্রথম খেলোয়াড়, যিনি বিশ্ব প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ভারতের অন্যান্য খেলোয়াড়রা সবাই দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদ খেলোয়াড় কে রামকৃষ্ণ ভিয়েৎনামের খেলোয়াড় মাই ভান হুয়ার কাছে পরাজিত হন; বোম্বাই খেলোয়াড় ... ও সুধীর থাকার্সে পরাজয়

ব্যাসকে তৃতীয় রাউণ্ডে হার স্বীকার করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে প্রিসকা নানুস ও মীনা পরাণ্ডে প্রথম রাউণ্ড থেকেই বিদায় গ্রহণ করেন; র‍্যাসেল জন প্রথম রাউণ্ড পার হলেও বেশী দূর এগুতে পারেননি।

মোট ১৬টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় আন্তঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। ভারত সোয়েদলিং কাপের 'বি' গ্রুপে স্থান পায়। ভারতকে চেকোস্লোভেকিয়া, ইংলণ্ড, চীন ও ভিয়েৎনামের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় আর ভারত জয়লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫—২, যুক্তরাষ্ট্রকে ৫—৪ ও পর্তুগালকে ৫—১ খেলায় ভারত পরাজিত করেছে। চেকোস্লোভেকিয়া 'বি' গ্রুপে এবং জাপান 'এ' গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য দুই দেশের মধ্যে যে খেলার ব্যবস্থা করা হয়, তাতে জাপান ৫—১ খেলায় চেকোস্লোভেকিয়াকে পরাজিত করে। তোশিয়াকী তানাকা, ইচিরো ওগিমুরো ও কিমুরুকে সুকেদাকে নিয়ে জাপানের সোয়েদলিং কাপ টীম গঠিত হয়েছিল।

সোয়েদলিং কাপের খেলায় ভারতের খেলোয়াড়গণ কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও মহিলাদের কর্বিলন কাপের খেলায় ভারতের মেয়েরা মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। কর্বিলন কাপে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সংখ্যা ছিল আটটি। এর মধ্যে কোন দেশকেই পরাজিত করতে পারেনি ভারত, ফলে লাভ করেছে সর্বনিম্নস্থান। টেবিল টেনিস বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ রুমানিয়া অপরাজিত থেকেই লাভ করেছে কর্বিলন কাপ। কর্বিলন কাপে রুমানিয়ার এটি পঞ্চম সাফল্য। গত-বরও রুমানিয়া কর্বিলন কাপ ঘরে তুলেছিল। তাছাড়া ১৯৫০, ১৯৫১ এ ১৯৫৩ সালে রুমানিয়া কর্বিলন কাপ লাভ করে। টেবিল টেনিস সম্রাজ্ঞী এঞ্জেলিকা রোজেনু ও মিস এলা জেলারকে নিয়ে রুমানিয়ার কর্বিলন কাপ টীম গঠিত হয়। পুরুষ ও মহিলাদের সাফল্যে নিম্ন প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় যে ৮জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় সেমি ফাইনালে উন্নীত হন, তার মধ্যে ৫জনই জাপানের অধিবাসী বা অধিবাসিনী; বাকি—তিনজনের যিনি সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন, তিনি হচ্ছেন রুমানিয়ার টেবিল টেনিস পটিয়সী মিস এলা জেলার। এলা জেলারকে সেমি ফাইনালে মহিলা বিভাগের রানার্স মিস কিয়োকো ওয়াতানাবের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

* * *

টেবিল টেনিসে জাপানের ক্রীড়াধারা সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সেই ছোট কাঠের স্পঞ্জ র‍্যাকেট, সেই পেনহোল্ড গ্রিপ আর সেই আক্রমণমুখী ক্রীড়াধারা, যার

টেবিল টেনিস-সম্রাজ্ঞী এঞ্জেলিকা রোজেনু তাঁর ছোট মেয়েকে খেলা শেখাচ্ছেন। উপর্যুপরি ছ' বারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন মিসেস রোজেনুকে এবার জাপানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে

আত্মরক্ষার ধার ধারে না জাপানী খেলোয়াড়রা। পেনহোল্ড গ্রিপে ব্যাট ধরে ডাইনে বামে মারের বন্যা ছোটায় তারা। জাপানীদের চাপ মারে থাকে বিদ্যুৎগতি গতিশীলতা। দেহের চঞ্চল ভঙ্গির সঙ্গে খর-ক্ষিপ্র খেলার গতি। তার উপর মারের জোরদারী। মারের তোড়ে টেবিলের উপর ঝড় বয়ে যায়। ব্যাক হ্যান্ডের কোন বালাই নেই। নীচের দিক থেকে হাত টেনে প্রচণ্ড গতিতে বল মারে তারা; ফলে 'অটোমেটিক টপস্পিন' হয়ে বলটি টেবিলের উপর পড়ে অব্যর্থ পয়েন্ট এনে দেয়। টেবিল টেনিসের গুরুজী চেকোশ্লোভাক খেলোয়াড় ভিক্টর বার্না বলেছেন স্পিন হবার আগে যদি ত্বরিতে বলটিকে আঘাত করা যায়, তবে জাপানী খেলোয়াড়দের মারমুখী আক্রমণ প্রতিরোধ করা বেশী কষ্টসাধ্য নয়; কিন্তু ত্বরিতে আঘাত করাই কষ্টকর। তারপর স্পঞ্জ র‍্যাকেটে খেলার ফলে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের চোখ আর কান এক-সুরে বাঁধা শক্ত। কখন বলটি ব্যাটে লাগে বা টেবিলের স্পর্শে লাগে, তা কানে শুনতে পেলে বল প্রতিরোধ করাও সহজ হয়, কিন্তু কানে ব্যাটের শব্দ না এলে হাতেরও তাল কাটার আশঙ্কা প্রতিনিয়ত।

পেনহোল্ড গ্রিপ আর স্পঞ্জ র‍্যাকেট সম্পর্কে বিশ্বের অদ্বিতীয় খেলোয়াড় এবং অভিমত কারোরই অজানা নেই। '[illegible]' খেলোয়াড় ভিক্টর বার্না বহুবার এর বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু স্পঞ্জ র‍্যাকেট সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদের সুর বর্তমানে অনেক খাদে নেমে এসেছে। বিদেশী বহু খেলোয়াড়ই স্পঞ্জ র‍্যাকেট গ্রহণ করেছেন এবং খেলাধূলার সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডানলপ কোম্পানীও স্পঞ্জের 'বার্না ব্যাট' তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। বলা বাহুল্য, বার্না ডানলপ কোম্পানীর এক প্রভাবশালী কর্মী। বার্নার নামে ডানলপ কোম্পানী আগে যে ব্যাট তৈরি করেছেন, তা স্পঞ্জে মোড়া ছিল না। বার্না স্পঞ্জ র‍্যাকেট ডানলপ কোম্পানীর নতুন আবিষ্কার। অবশ্য যে কোন খেলোয়াড়ের হাতে স্পঞ্জ র‍্যাকেট পড়লেই সে খেলার সুচারু শিল্পী হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। রায়ান কেনেডি, ক্লিন, কিথার, এলন হেডেন প্রভৃতি—ইউরোপ ও আমেরিকার যে সব খ্যাতনামা খেলোয়াড় স্পঞ্জ র‍্যাকেটে খেলেছেন, জাপ খেলোয়াড়দের পক্ষে তাঁদের পরাজিত করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। অপরদিকে ইউরোপের কয়েকজন খেলোয়াড় এমন কি ভারতের কৃষ্ণ নাগরাজও রাবার মোড়া র‍্যাকেটে খেলে জাপানীদের যথেষ্টই বেগ দিয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, জাপানীদের ক্রীড়াপদ্ধতির সঙ্গেই স্পঞ্জ র‍্যাকেটের সমন্বয়ে অভাবনীয় সাফল্য। যাই হোক, পেন-হোল্ড গ্রিপ সম্পর্কে বার্নার অভিমত একেবারে প্রতিকূল। এবারেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের পর তিনি পেনহোল্ডের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে যে পেনহোল্ড গ্রিপ একদিন আনাড়ীর গ্রিপ বলে অভিহিত হত, টেবিল টেনিসে জাপানের বিশ্বজয়ের পর আর কেউ তাকে আনাড়ীর অপবাদ দিতে সাহস পায় না। মহিলা বিভাগের নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান জাপানের মিস ওকাওয়া কিন্তু পেন হোল্ড গ্রিপে খেলেন না; শেকহ্যান্ড গ্রিপেই মিস ওকাওয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন। জাপানের টেবিল টেনিস ক্ষেত্রে ইনি এক ব্যতিক্রম।

নীচে এ বছরের আন্তঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা ও বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হ'ল :—

বিশ্ব টেবিল টেনিসে দলগত খেলার ফলাফল

সোয়েথলিং কাপ (এ গ্রুপ)

দল	খেঃ	জয়	পরাঃ	গেমের সংখ্যা স্বঃ	বিঃ
জাপান	৭	৭	০	৩৫	[illegible]
রুমানিয়া	৭	৬	১	৩৪	[illegible]
জার্মানী	৭	৫	২	২৮	[illegible]
হংকং	৭	৪	৩	২৩	[illegible]
সুইডেন	৭	৩	৪	২৩	[illegible]
সিঙ্গাপুর	৭	১	৬	১৯	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৭	১	৬	১২	[illegible]
ফিলিপাইন	৭	১	৬	৮	[illegible]

সোয়েথলিং কাপ (বি গ্রুপ)

দল	খেঃ	জয়	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭	৭	০	৩৫	১১
ইংল্যাণ্ড	৭	৫	২	৩১	১৯
চীন	৭	৫	২	২৯	২১
ভিয়েৎনাম	৭	৫	২	২৭	২২
ভারত	৭	৩	৪	১৮	২৯
মার্কিন যুক্তঃ	৭	২	৫	২৩	২৬
দঃ কোরিয়া	৭	১	৬	১৭	৩৭
পর্তুগাল	৭	০	৭	১৩	৩৭

আন্তঃ গ্রুপ ফাইন্যালের খেলায় জাপান ৫—১ ম্যাচে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে।

করবিলন কাপ

দল	খেঃ	জয়	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ
রুমানিয়া	৭	৭	০	২১	২
ইংলণ্ড	৭	৬	১	১৯	৭
জাপান	৭	৫	২	১৭	৬
মার্কিন যুক্তঃ	৭	৪	৩	১২	১১
দঃ কোরিয়া	৭	৩	৪	১২	১৪
চীন	৭	২	৫	১০	১৫
হংকং	৭	১	৬	৫	২০
ভারত	৭	০	৭	৪	২১

সোয়েথলিং কাপ

আন্তঃ গ্রুপ ফাইন্যালে 'এ' গ্রুপের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জাপান 'বি' গ্রুপের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন চেকোশ্লোভেকিয়াকে ৫—১ ম্যাচে পরাজিত করে।

করবিলন কাপ

রুমানিয়া অপরাজিত থেকে কর্বিলন কাপ লাভ করে।

সিংগলস ফাইন্যাল—সেণ্ট ব্রাইড ভেস

ইচিরো ওগিমুরা (জাপান) ২১—১৩, ২২—২৪, ২১—১৮, ১৮—২১ ও ২১—১৩ পয়েণ্টে তোশিয়াকী তানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ফাইন্যাল—গিস্ট প্রাইজ

মিস টোমি ওকাওয়া (জাপান) ২১—১৫, ১৩—২১, ২৩—২১, ৯—২১ ও ২১—১৬ পয়েণ্টে মিস কিহকো ওয়াতানাবেকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ইরাণ কাপ

ইচিরো ওগিমুরা ও যোশিও তোমিতো (জাপান) ২১—১৩, ২১—১০ ও ২১—১১ পয়েণ্টে আইভান আন্দ্রিয়াদিজ ও লাডিস্লাভ স্টাইপেককে (চেকোস্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—পোপ কাপ

মিসেস এঞ্জেলিকা রোজেনু ও মিস এলা জেলার (রুমানিয়া) ২১—১৭, ১৭—২১, [illegible]—২১, ২১—১৯ ও ২১—৯ পয়েণ্টে মিস কিইকো [illegible] ও মিস [illegible] [illegible] পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—হেক্সেক কাপ

মিসেস এন [illegible] ও [illegible] [illegible] ২১—১৮, ১৩—২১, ২১—১৮, [illegible]—২১ ও ২১—১[illegible] পয়েণ্টে মিস [illegible] [illegible] ও আইভান আন্দ্রিয়াদিজকে (চেকোস্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

* * *

[illegible] মনে হয়, খেলাধুলার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু যদি খেলা [illegible] সঙ্গে খেলোয়াড়দের জড়িত আছেন, [illegible] সবাই [illegible] খেলোয়াড়দের সঙ্গে রাজ-[illegible] কম নিবিড় সম্বন্ধ। [illegible] রাজ-নীতি না থাকলে খেলোয়াড়দের [illegible] সবাই [illegible]। যেখানে সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ জড়িত, সেখানে রাজনীতি আসবেই, বাধা [illegible] কায়েমী স্বার্থের দল থাকলে তো কথাই নেই। যাই হোক, খেলাধুলায় এই রাজনীতি আমার এখনকার আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় খেলার ক্ষেত্রে রাজ-নৈতিক বাধা।

অলিম্পিকের প্রাথমিক ফুটবল খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে জাতীয় চীনের সঙ্গে দুটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। একটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়, অপর খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ফরমোজার তাইপেহে। ইন্দোনেশিয়া জাতীয় চীনের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে খেলার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে। ইন্দোনেশিয়া স্টেডিয়ামে খেলার সময় জাতীয় চীনের পতাকা উড়ানো হবে কি না বা তাইপেহে কি পতাকা উড়ানো হবে, এই সম্পর্কে ইন্দো-নেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শাস্ত্রামিৎ জোজোকে

কর্বিলন কাপ বিজয়ী রুমানিয়া দলের অন্যতমা খেলোয়াড় এবং বিজয়ী ডাবলস জুটির অন্যতমা মিস এলা জেলার

প্রশ্ন করা হলে তিনি নৈর্ব্যক্তিক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সব দেশের রাজ-নৈতিক অস্তিত্ব এখনও স্বীকার করি কোন অনুষ্ঠানে তাদের পতাকা উড়ানোই আমাদের সাধারণ নীতি। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

জাতীয় হকি—এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ থেকে কলকাতায় আরম্ভ হচ্ছে ভারতের আন্তঃ রাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা। এবার-কার প্রতিযোগিতায় ২০টি রাজ্য দলকে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে। জাতীয় হকি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে একমাত্র আসামই এবার অংশ গ্রহণ করেনি। গতবারের যুগ্ম বিজয়ী সার্ভিসেস ও মাদ্রাজ দলকে খেলার তালিকায় দুই দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাঙলা এবং বোম্বাই দলও লাভ করেছে বাছাই দলের সম্মান। ১২ই মে'র মধ্যে জাতীয় হকির সমস্ত খেলা শেষ হবার কথা।

অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে ভারতের মহিলা হকি দল—আন্তর্জাতিক হকি উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতের একটি মহিলা হকি টীম অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছে। মহিলা হকি দলটি সিংহলে ১০ দিন অবস্থান করবে, এর মধ্যে কলম্বোতে এদের তিনটি খেলায় অংশ গ্রহণের কথা আছে। কলম্বো থেকে দলটি যাত্রা করবে সিডনীর দিকে, এখানেই অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক হকি উৎসব। ভারতের পক্ষে যাঁরা সফর করছেন, তাঁদের নাম :—ওয়াই স্মিথ (অধিনায়ক), রুথ ফার্নাণ্ডেজ, ওলগা ভাজ, ওয়েণ্ডি নরিস, ইউলা রডরিগস ও ডোরেন স্মিথ (মধ্য প্রদেশ), জরিনা কুপার (দিল্লী), মেরী ডিসেনা (কলকাতা), কুলবন্ত ঘুমান (পাঞ্জাব), মার্গারেট মার্ক (আজমীর), মেরী ডিস্যুজা, মেরী সাইমস, ম্যানিরা সাকুর ও মার্গারেট কার্স্টেলিনো (বোম্বাই) এবং ভনী ডারাপোর (মহারাষ্ট্র)।

ওয়াই স্মিথ, ডোরেন স্মিথ, ওলগা ভাজ, মেরী ডিস্যুজা ও মেরী ডিসেনা ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রথম ইংলণ্ড সফরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অলিম্পিক ও পাকিস্থান

মেলবোর্ন অলিম্পিকে পাকিস্থানকে হকি, অ্যাথলেটিকস, সাইকেল, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, শুটিং ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। এই সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য পাকিস্থান অলিম্পিক এসোসিয়েশন ৭০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতি-যোগীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—হকি (১৩ জন), অ্যাথলেটিক (১৮ জন), সাঁতার (৫ জন), সাইকেল (৫ জন), মুষ্টিযুদ্ধ (৭ জন), কুস্তি (১০ জন), ভারোত্তোলন (৯ জন), শুটিং (২ জন)। পাকিস্থানের অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ অ্যাথলেটিকসের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করছেন। এশিয়ার ক্ষিপ্রতম দৌড়বীর আবদুল খালিক তাঁদের প্রধান ভরসা। পাক-ভারত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় খালিক পেশোয়ারে অলিম্পিক সময় ১০০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করেছেন।

দেশী সংবাদ

৯ই এপ্রিল—খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন আজ লোকসভায় বলেন যে, আপৎকালীন প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহা মিটাইবার জন্য গবর্নমেন্ট ১০ লক্ষ টন গম এবং ১০ লক্ষ টন চাউল মজুত রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চাউলের মূল্য এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণ নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় চাউলের মূল্য কোন কোন স্থানে ৮৲ টাকা, ৯।০ টাকাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১০ই এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১লা বৈশাখ হইতে ভূমি সংস্কার আইনের বিধানানুযায়ী এই রাজ্যের সর্বত্র ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বিবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেছেন। জমিদারী দখল আইনানুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকা ব্যতীত রায়ত ও অধস্তন রায়তদের জমি আগামী ১লা বৈশাখ হইতে দখলের জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান যোজনার হার আরও কিছুকাল বলবৎ থাকিবে।

১১ই এপ্রিল—বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রতিবাদে অদ্য কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের ৩৮তম দিবসে ৪জন নারীসহ তিনটি দলে ১০৭জন স্বেচ্ছাসেবক ডালহৌসী অঞ্চলে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গ্রেপ্তার হন। অদ্য দমদমেও সংযুক্তির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। দমদম লইয়া এপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৩১টি শহরে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইল বলিয়া জানা গিয়াছে।

১২ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ববঙ্গ হইতে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে আলোচনা কালে বলেন যে, পাকিস্থান সরকার নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিশ্রুতি সর্বাংশে রক্ষা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভারত ঐ চুক্তির প্রতিটি অক্ষর পালন করিয়া চলিয়াছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ আজ লোকসভায় বলেন যে, নাগা পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দকেই আগাইয়া আসিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৩ই এপ্রিল—দিল্লীর রামলীলা ময়দানে

এক বিরাট জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থান মার্কিন সামরিক সাহায্য লাভ করায় কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ভিত্তিমূল ধসিয়া পড়িয়াছে।

আজ কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির একবিংশ সাধারণ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন।

নির্ভীক সাংবাদিক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের দ্বাদশ বার্ষিক তিরোভাব উদ্যাপন উপলক্ষে তাঁহার গুণমুগ্ধ বান্ধবসমাজ কলিকাতায় ও শহরতলীতে বিভিন্ন শ্রাদ্ধ বাসরে সমবেত হইয়া তাঁহার তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৪ই এপ্রিল—নূতন বৎসর ১৩৬৩ সালের পয়লা বৈশাখ দিবসটি অদ্য কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্যাপিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী ডি পি কারমারকার আজ লোকসভায় বলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থা গঠনের সময় আগত-প্রায় এবং এ সম্পর্কে শীঘ্রই লোকসভায় বিবরণ পেশ করা হইবে।

১৫ই এপ্রিল—শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, মেজর জেনারেল কোচারের নেতৃত্বে সম্মিলিত সেনা ও পুলিস বাহিনী সশস্ত্র নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। নাগা পাহাড় এলাকায় সংঘর্ষে ৬জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে।

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ অদ্য এইরূপ আভাস দেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী খাতে যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, ইহার পরিমাণ হয়ত আরও ৩০০ হইতে ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কংগ্রেসের লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ সংশোধন সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬ই এপ্রিল—বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় আজ নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তির পরিবর্তে আর একটি নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে একটি সংযুক্ত আইনসভার মধ্যে থাকিয়া দুইটি রাজ্যের কার্য পরিচালিত হইবে এবং দুইটি রাজ্যের পৃথক সত্তা বজায় থাকিবে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই এপ্রিল—মার্কিন বিমান বাহিনীর জেনারেল ও' ডোনেল আজ করাচীতে বলেন যে, মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুসারে পাক বিমান বাহিনীর জন্য সাজসরঞ্জাম প্রেরণ অদূর ভবিষ্যতেই আরম্ভ করা হইবে।

১০ই এপ্রিল—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থানের তিনটি কাপড়ের কল কয়লার অভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ৮ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে।

১১ই এপ্রিল—সিংহলের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীবন্দরনায়কের পরিচালিত মহাজন একসাথ পেরমুনা দল পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যার জন কোটেলাওয়ালা অদ্য গবর্নর জেনারেলের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

১২ই এপ্রিল—শ্রী এস ডব্লিউ আর ডি বন্দরনায়ক অদ্য সিংহলের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রিসভা ১২জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম এশিয়ায় এক ডিভিসন মার্কিন সাঁজোয়া বাহিনী প্রেরণ করা হইতেছে বলিয়া হার্টফোর্ড টাইমস্‌ পত্রিকায় এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সৈন্যগণকে সৌদি আরবে মোতায়েন রাখা হইবে।

১৪ই এপ্রিল—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি আজ বলেন যে, পাকিস্থান কাশ্মীর বিভাগকে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করিতে পারেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেণ্ট এক। কিন্তু এই একত্ব যথেষ্ট নয়, অনুভূতির দিক হইতে সমগ্র ভারতের একত্বের চেতনা সর্বাধিক গভীর এবং বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। পণ্ডিতজীর মতে এই উদ্দেশ্যটি এখনও সিদ্ধ হয় নাই। সমগ্র ভারতের জনগণের পরস্পরের মধ্যে একাত্মীয়তা এমন বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক যাহাতে রাজ্যগত, ভাষাগত এবং সম্প্রদায়গত বিভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসীরা সকলে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই চেতনা তাহাদের অন্তরে সর্বদা জাগ্রত থাকে। যেদিন সেই চেতনা জাগিবে ভারতকে স্পর্শ করিবার সাহস কোন শক্তির হইবে না। পণ্ডিত নেহরুর উক্তির আন্তরিকতা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। প্রকৃতপক্ষে বাংগালীর জাতীয়তাবাদ এই বোধকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার বেদনাই বাংলার জাতীয়তাবাদকে জীবন্ত করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির রীতি এবং প্রকৃতি এই বোধের বহিরঙ্গ বিকাশ মাত্র। ফলত সাহিত্যিকের সাধনাই সমগ্র ভারতের অখণ্ডত্বের চেতনায় বুদ্ধিগ্রাহ্য বীর্য গড়িয়া তোলে। বাংলার সাহিত্য সাধনায় এই বহ্নিবীর্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে দুর্জয় করিয়া তুলিয়াছিল। নবভারতের গঠনমূলে ব্যবহারিক যন্ত্রকুশলীদের প্রয়োজন বিশেষ রকমেই রহিয়াছে। আমরা তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছি না। এদেশে যন্ত্রবিজ্ঞানী অনেক চাই, আমাদের আবশ্যক পূর্তবিদের—এ সবই সত্য; কিন্তু জাতিকে আত্মচেতনে জাগ্রত রাখিবার জন্য সাহিত্য-সাধকের তপস্যা এবং নিষ্ঠাবুদ্ধির প্রয়োজন সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্রবিজ্ঞান সাধনার মূলে জাতির আত্মচেতনা যদি শক্তি সঞ্চার করে এবং বিদ্যার্থীদের শিক্ষার ভিতর দিয়া শুধু লোহালক্কড়ের বিদ্যার নয়, সেই সঙ্গে দেশ-প্রীতির পথে নবসৃষ্টির প্রেরণা জাগে, তবেই তাহার সার্থকতা।

বৈষম্যের বিলোপ প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কলিকাতায় জৈন ধর্মাবলম্বীদের এক সভায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন প্রেক্ষিতে এদেশের আয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তদনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কাহারও আয় হইলে এই বেশী ভাগ তাহাকে পরার্থে দান করিতে হইবে। জৈন ধর্মের প্রবর্তন মহাবীরের জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ রায় এইরূপ মন্তব্য করেন। মহাবীরের

গ্রন্থ পার্বণ

রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ সমাগত। আমাদের জীবনে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যময় এবং মূল্যবান। তাঁকে স্মরণ করে ও এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে গ্রন্থ পার্বণ প্রবর্তনের যে চেষ্টা আমরা করছি তাতে রবীন্দ্র-স্মৃতি ও সাধনার প্রতি যোগ্য মর্যাদাই শুধু দেওয়া হবে না, আমরা তাঁর একটি ইচ্ছাকে কিছু অংশে পূরণ করতে পারব। জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ পাঠ ও প্রচার যাতে বৃদ্ধি পায়—এই ইচ্ছা তাঁর ছিল। গ্রন্থ পার্বণের মূল উদ্দেশ্য বাঙালী জীবনে গ্রন্থ-পাঠকে আরও ব্যাপক এক অভ্যাসে পরিণত করা। আমাদের আবেদনের ও উদ্দেশ্যের অর্থ আশা করি পাঠক পাঠিকারা অনুধাবন করতে পারবেন এবং গ্রন্থ পার্বণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রয়াস পাবেন।

সম্পাদক দেশ

জীবনাদর্শ রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সৃষ্টসৃষ্ট সকল জীবের প্রতি সমবেদনার উদার অনুভূতিতে কঠোর ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের তেমন অগ্নিময় স্পর্শ অন্তরে উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীই এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শস্থল। ত্যাগ এবং সেবাকে আমাদের রাজনীতিক পরিবেশের মধ্যে কেমন করিয়া সত্য করিয়া তুলিতে হয়, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বীর্যকে তিনি জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া অঘটন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আর তাঁহার জীবনাদর্শ আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রসাধনায় বৈপ্লবিক শক্তি জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইতেছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজেও এই সত্যটি স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি পাটনার সাদকত আশ্রমে যুবকদের নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন গোল ছিল না। ভুল পথ ধরা বরং ভাল, তবু মনের ভিতর লক্ষ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভাব থাকা ভাল নয়। রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে দেশসেবা এবং ত্যাগের আদর্শ জীবনের অঙ্গনে সত্য করিয়া তুলিবার পথেই জাতিকে উন্নতির অভিমুখে বলিষ্ঠ এবং সুনিশ্চিত গতি দান করা সম্ভব হইতে পারে। এক্ষেত্রে কথা ছাড়িয়া আবশ্যক কাজের।

নেতাজীর অনুসন্ধান

নেতাজী তদন্ত কমিটির সভাপতি শা নওয়াজ খান সম্প্রতি কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট কমিটির কার্যক্রমের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, নেতাজী জীবিত আছেন এই বিশ্বাস বিভিন্ন সূত্রে পোষণ করিতেন। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, জাপান সরকার নেতাজীকে কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং জাপান স্বাধীনতা লাভ করিলে একদিন তাঁহার ভারতে আসিবার পথ উন্মুক্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষে শা নওয়াজ কলিকাতার ময়দানে আহূত এক জনসভায় এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। ইহার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি নেতাজী আসিলেন না, এজন্য তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। নেতাজী চীনে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্য শ্রী শিবনের উক্তি এই বিশ্বাস সর্বাধিক দৃঢ়তা সাধন করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চীনে গিয়া নেতাজীর সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এদেশের লোকের সন্দেহের অনেকটা নিরসন হইত বলিয়া মনে হয়।

২৮শে এপ্রিলের পরে ইন্দোচীনে আর ফরাসী সামরিক হাইকম্যাণ্ড থাকবে না। ফরাসী সামরিক হাই কম্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্য অনেক পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। মিঃ এম-এর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্ট ফরাসী স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তির দ্বারা নিজেদের বাধ্য বলে স্বীকার করেন না। ফরাসী গভর্নমেণ্টের যাবতীয় প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মিঃ এম বদ্ধপরিকর। একদিকে মার্কিন সাহায্য নিয়ে তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলছেন এবং অন্যদিকে ভিয়েৎনাম থেকে ফরাসী সৈন্যের অপসারণ দাবী করেছেন। ফরাসীরা সেই দাবী মানতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু বিপদ হয়েছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি কমিশনের, যার সভাপতি হচ্ছে ভারত। ফরাসী হাই কম্যাণ্ড রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্টের উপর কোনো চাপ দিতে পারছিল না। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সারা ভিয়েৎনামে ইলেকশন করা চলবে না, এই প্রতিজ্ঞা থেকে মিঃ এমকে কেউ টলাতে পারছে না। মিঃ এমের জেদের পিছনে অবশ্য রয়েছে মার্কিন সমর্থন। জেনেভা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ইলেকশন হবার কথা এবং গত বছর জুলাই মাসে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্টের মধ্যে ইলেকশনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হবার নির্দেশ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার সে নির্দেশ মানেনি এবং জুলাই মাসে যে ইলেকশন হবে, তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই বিষয়ে জেনেভা চুক্তির শর্ত প্রকৃতপক্ষে বাতিল হয়ে গেছে। অবস্থাটা আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষে অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠেছে, কারণ যে চুক্তির ভিত্তির উপর তাঁদের অস্তিত্ব সেই চুক্তির একটা প্রধান শর্তই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। [illegible] ও কার্যকারিতার কথা ছাড়া কমিশনের নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নও আছে। ফরাসী হাইকম্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলেও, জেনেভা চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসাবে কমিশনের নিরাপত্তার জন্য অন্তত ফরাসী হাইকম্যাণ্ডের একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল। ইন্দোচীনে ফরাসী হাইকম্যাণ্ডের অবসানের পরে আইনের দিক দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আন্তর্জাতিক কমিশন একরকম নিরাশ্রয় হবে বলা যায়। কিছুকাল পূর্বে কমিশনের কোনো কোনো লোকের উপর যে হামলা হয়েছিল, তার স্মৃতি যথেষ্ট আশঙ্কার উদ্রেক করবে। হাঙ্গামার পরে অবশ্য মিঃ এম দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং কমিশনের লোকদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী হাইকম্যাণ্ডের অবসানের পরে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আন্তর্জাতিক কমিশনের অস্তিত্বের কোনো আইনগত ভিত্তিই থাকবে না যদি না দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্ট জেনেভা চুক্তি অন্তত আংশিকভাবেও স্বীকার করে নেন।

অবশ্য কার্যত দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জেনেভা চুক্তির সবটাই যে অস্বীকার করে চলছেন তা নয়। যুদ্ধবিরতির মূল শর্তগুলি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারও মোটামুটি মেনে আসছেন। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতি এবং শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত শর্তগুলি মোটামুটি রক্ষিত হচ্ছে। সে দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিশনের কাজ নিষ্ফল হয়নি। তবে প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে এবং অল্পস্বল্প গোলোযোগ (যেমন লাও'এ) থাকলেও মোটের উপর শান্তি রক্ষিত হচ্ছে। জেনেভা চুক্তির যে-শর্ত কার্যকরী হয়নি এবং হবে বলে আশা কম সে হলো ভিয়েৎনামের একীকরণ সম্পর্কে। ভিয়েৎনামের একীকরণের জন্যই সারা-ভিয়েৎনাম ইলেক্শনের ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। জেনেভা চুক্তির এই দিকটা বাতিল হতে বসেছে। জেনেভা চুক্তির যে-অংশের দ্বারা ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে সেটা মিঃ এম'এর অনুকূলে। কারণ তারই দৌলতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মিঃ এম কর্তৃত্ব করতে পারছেন, শুধু তাই নয়, তিনি ফরাসীদের ভিয়েৎনাম থেকে সরে যেতে বলার সাহস ও সুযোগ পেয়েছেন। জেনেভা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধবিরতিই দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে মার্কিন সাহায্যের জোরে ফরাসীদের সরিয়ে দিয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে খাড়া হবার সুযোগ দিয়েছে। জেনেভা চুক্তি যদি না হোত তাহলে হয় যুদ্ধ চালিয়ে ভিয়েৎমীন এতদিনে সারা ভিয়েৎনাম দখল করে বসত অথবা ফরাসীরা আরো সৈন্যসামন্ত আমদানী করে ভিয়েৎনামের যতটুকু পারে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করত। এর কোনোটাতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বর্তমান গভর্নমেন্টের মতন কিছু থাকত না।

অপর পক্ষে জেনেভা চুক্তির ইলেকশন সম্পর্কিত শর্তগুলি যদি মানতে হয় তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান গভর্নমেন্টের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং মিঃ এম আত্মবিলোপ থেকে বাঁচার জন্য বলছেন, জেনেভা চুক্তি ফরাসীরা সই করেছে, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সই করেনি, অতএব দক্ষিণ ভিয়েৎনাম তা মানতে বাধ্য নয়। যে সব শক্তি মিলে জেনেভা চুক্তি হয়, তার মধ্যে আমেরিকা ছিল না। তবে জেনেভা চুক্তি পালনের প্রতিকূলে কোনো কাজ আমেরিকা করবে না, এই ঘোষণা আমেরিকা করেছিল। যুদ্ধবিরতির দিক দিয়ে আমেরিকা সেই প্রতিশ্রুতি মোটামুটি রক্ষা করেছে, কিন্তু ভিয়েৎনামের একীকরণের জন্য জেনেভা চুক্তির ইলেকশন সম্পর্কিত শর্তগুলি প্রতিপালনের পক্ষে আমেরিকার প্রভাব নিঃসন্দেহ বিপরীত দিকেই নিয়োজিত হয়েছে। ইলেকশন হলে সমগ্র ভিয়েৎনামে ভিয়েৎমীনের অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা, অতএব সারা-ভিয়েৎনাম ইলেকশন হয়, এটা আমেরিকা চায় না।

অর্থাৎ প্রশ্নটা বিভক্ত দেশের দুই অংশের উপর ততটা নির্ভর করছে না যতটা করছে, পিছনে যে-বড়ো শক্তিরা আছে তাদের উপর। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পিছনে যদি আমেরিকা না থাকত, তবে মিঃ এম'এর গভর্নমেন্টের সারা-ভিয়েৎনাম ইলেকশনে [illegible] হওয়ার ফল কী হোত সহজেই [illegible]। সামরিক শক্তিতে উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেন্টের তুলনা হয় না। যুদ্ধ হলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেন্টের পরাজয় এবং [illegible] মধ্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ হলে আমেরিকা পিছনে আছে এবং আমেরিকার টানে SEATOর অন্য শক্তিরাও [illegible] সাহায্যে অগ্রসর হবে এইটুকু মিঃ এম'এর সবচেয়ে বড়ো ভরসা বলে মনে হয় না। আমেরিকা যত ভয়ই দেখাক কার্যকালে নিশ্চয়ই যদি অন্য শক্তিরা সরে থাকতে চায়, তবে পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে আমেরিকা একলা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে যুদ্ধে নামবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্রান্স আবার ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করতে আসবে এবং [illegible] মিঃ এম'এর গভর্নমেন্টের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকায় ফরাসী সেনাবাহিনীর কাজের অভাব নেই। বৃটেনও নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে ইন্দোচীনে যুদ্ধ করতে আসবে না। সেজন্য মিঃ এম'এর বেশি ভরসা কম্যুনিস্ট ব্লকের কর্তাদের উপর। অর্থাৎ তাঁরাই ভিয়েৎমীনকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করবেন।

[illegible] পারে। জেনেভা চুক্তির ইলেকশন শর্ত ভঙ্গ হলে ভিয়েৎমীনের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। যুদ্ধ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জয় করে নেওয়ার মতো শক্তি ভিয়েৎমীনের যথেষ্ট আছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে তার বলবৃদ্ধি হবার পূর্বে আক্রমণ করলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অতি সহজেই জয় করা যাবে। আমেরিকা কার্যত কতদূর দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হবে তা অনিশ্চিত। বর্তমান বৎসরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের বৎসর, এই সময়ে রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট আমেরিকাকে নতুন যুদ্ধে লিপ্ত করতে ভয় পাবে। কারণ তাতে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে রিপাবলিকান পার্টির ক্ষতির সম্ভাবনা। আমেরিকার নিজেরাও [illegible] যুদ্ধে নামতে আগ্রহশীল নয়। [illegible] এক হাতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম [illegible] দেওয়া যাবে [illegible] শক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়।

কিন্তু ভিয়েৎমীনের পৃষ্ঠপোষক চীন ও রাশিয়ার চিন্তা অন্য ধারায় চলতে পারে। ইলেকশনের জন্য যদিও চীন ও রাশিয়া [illegible] কিন্তু আপাতত ভিয়েৎমীন যুদ্ধ করুক এটা [illegible] আমেরিকার হুমকি ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হবারই সম্ভাবনা, তাহলেও হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গিয়ে যদি ব্যাপক যুদ্ধ লেগে যায় সেটা চীন বা রাশিয়ার অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া চীন ও রাশিয়ার কেবল ভিয়েৎনামের বিষয় চিন্তা করলে চলবে না। বর্তমানে একাধিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট ব্লকের কূটনৈতিক সফলতা দেখা যাচ্ছে, এখন কোথাও যদি এমন একটা যুদ্ধ লাগে যাতে কম্যুনিস্ট ব্লক সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বে, তাহলে কম্যুনিস্ট ব্লকের পক্ষে অনেক সুযোগ সুবিধা মাটি হয়ে যাবে। সুতরাং চীন ও রাশিয়া ভিয়েৎমীনকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে চাইবে বলে মনে হয়। জার্মানী ও কোরিয়ার একীকরণের জন্য যদি যুদ্ধ করা সঙ্গত না হয়, তবে ভিয়েৎনামের একীকরণের জন্য যুদ্ধ সমর্থন করা ভালোও দেখাবে না।

জাহাজ-মহল : মাণ্ডু

আমার সীমাবদ্ধ ক্রয়শক্তির কারণে। এতদিন বাদে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, ডিমের ডালনা দেখে চোখ ঝলসে গেল—জিভ সজল হয়ে উঠল। সাহেব দেখছি সত্যই দ্রৌপদী বংশোদ্ভব, তা'ছাড়া, মৃত্যুপুরীর এ অন্ধকারে অমৃতের সন্ধান কি সাধারণে সম্ভব।

সহস্র নাগিনীর দীর্ঘশ্বাসের আকুলতা বিপুল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ঘরের জানলা-দরজায়, মুহূর্তে জানলা খুলে গেল। পৈশাচিক আর্তনাদে তাবেলী-মহলের অন্তরাত্মা থর থর কেঁপে উঠল। মধ্যযুগীয় প্রাসাদ এই বুঝি চুরমার হয়ে যায়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দরজা-জানালা আছাড় পিছাড় খাচ্ছে। চঞ্চল, উত্তাল হাওয়া গুমরে গুমরে উঠছে ক্ষোভে, প্রতিহিংসায়। ভয়ার্ত আমি চকিতে উঠে বসলাম বিছানায়। উপরে তাকাই—গম্বুজের গভীর অন্ধকারে ছাদের ঠিকানা হারিয়ে গেছে, নিরন্ধ্র অন্ধকার যেন গিলতে আসছে আমাকে। হ্যারিকেনের আবছা আলোর আঁধারে নীচে তাকিয়ে দেখি, আলাদিনের কার্পেট, তার উপর খাট এবং আমি, তারা থেকে তারায়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, স্থূল থেকে শূন্যতায়, কি দুর্বার, কি প্রচণ্ড তার গতি। অশরীরী সান্নিধ্য রোমাঞ্চিত করেছে আমাকে। বাতাসের মৃত্যুশীতল স্পর্শ অস্থি-মজ্জা ভেদ করে দেহ এবং দেহীকে পর্যন্ত কম্পিত করে তুলেছে। আবার দমকা হাওয়া গর্জে উঠল, আবার আর্তনাদ, তারপর সেই দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুধিত-পাষাণ নাকি জাগল! তবে কই সে পাগলা মেহের আলীর বরাভয় "সব ঝুটো হায়"।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম জানলা বন্ধ করতে। নিম্নের দু'শ' ফুট উপরে এ মধ্যযুগীয় প্রাসাদ। তার ন-দশ ফুট চওড়া দেওয়ালে আধুনিক সূক্ষ্ম জানলা দরজার সাধ্য কি ঝঞ্ঝা-ধর্মী বাতাসের দুর্বার গতিরোধ করা। হুড়কো, ছিটকিনি, কবে ভেঙে উড়ে গেছে। মেঝের থেকে যথেষ্ট উঁচুতে, প্রশস্ত দেওয়ালের শেষ প্রান্তবর্তী জানলার নাগাল পাওয়া দুষ্কর, শুয়ে পড়ে কোন-রকমে জানলা পর্যন্ত পৌঁছে, ভারী একটা চেয়ারের ঠেকা দিয়ে এসে আবার বিছানার আশ্রয় নিলাম। পরিশ্রান্ত মন ও দেহ কখন যেন আবার নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল।

বাবুর্চি-সাহেবের ডাকে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখি, ট্রে-তে চা ও প্রাতরাশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। সুপ্রভাত জানিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এসে, পরটা ও ডিম সহযোগে চা-পান চুকিয়ে ফেললাম। চিরসঙ্গী ছোট্ট হ্যাভারস্যাকটিতে রঙ-তুলি ও কাগজপত্র ভর্তি করে আর জলভর্তি ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়ে নীচে নেমে কাপুর-তালাও-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম ওকে ভাল করে দেখবার জন্যে। চতুর্দিক পাথরে বাঁধান। এক সময় মাঝখানে দ্বীপের আকারে জলটুঙ্গী ছিল, বাদশা-জাদীদের গ্রীষ্মবিলাসের প্রয়োজনে। আজ তার শুধু ভগ্নাবশেষই সম্বল। প্রকাণ্ড চাতাল তার প্রশস্ত সিঁড়ি নিয়ে কালো জলের অন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নিস্তরঙ্গ সে জল—"ললিত ভুজের মৃণাল পরশে"র অভাবে অভিমানে নীরব হয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে আঁচলা আঁচলা জল নিয়ে, চোখ-মুখ শোধন করে নিলাম, দেখি যদি ৬০০ বছরের পেছনে ফেলে আসা মুসলমানী রঙ বেরঙ আর জৌলস-রোশনাই আমার চোখে ধরা দেয়। শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ল, সিঁড়ির দু'পাশের বাঁধান দেওয়ালের মাঝে একের পর এক খিলান; ভেতরে তার অন্তহীন অন্ধকার। সম্ভবত জাহাজ-মহলের

অলংকরণে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিল দামাস্কাস ও সেখানের কারুশিল্পীরা। তারপর তৈমুরলঙ্ দামাস্কাস বিজয় করে এই বিখ্যাত অস্ত্রশিল্প ও শিল্পীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে, বিশেষ করে মোঘল সাম্রাজ্যে এই মোজেক-অলংকরণ চরম সাফল্যলাভে সমর্থ হয়েছিল। মাঝের ঘরের মত একই রকম বৈঠকী বারান্দা দু'পাশের ঘরেও আছে। পাশের ঘরের সরোবরমুখী দু'টি বারান্দাই জাফরীকাটা মর্মরের জালি আঁটা, পর্দানসীন জানানা-দের প্রয়োজনে। মুঞ্জ সরোবরের দিকে সারি সারি জানলা এবং মহল ও কাপুর-তলাও-এর মাঝে বাগিচার সামনে সারিবদ্ধ দরজা। মাঝের উন্মুক্ত জানালায় বেগম সাহেবার মেজাজ। নূরজাহান হুকুম করলেন, সারা মুঞ্জ ও কাপুর-তলাও এবং তার আশপাশের সব মঞ্জিল-মহল চেরাগ জ্বালিয়ে দেওয়ালীর রোশনাই বানাবার। বাদশাহ্ লিখেছেন, "সেদিনের সে মজলিস্ ছিল অপরূপ। সন্ধ্যায় দুই তালাও-এর কিনারে আর পাশের সব মহলে চেরাগমালা জ্বালিয়ে দিয়ে এল ওরা—এমন বুঝি আর কোথাও আর কখন ঘটেনি। বাতির রোশনাই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তালাও-এর জেলে। রূপে, রসে, সুরে, সরাবে গুলজার হয়ে উঠেছিল এ মহ্ফিল্, পিপাসী সেদিন আকণ্ঠ পানে তৃপ্ত হয়েছিল।" পাশের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠলাম। প্রশস্ত ছাদের দুই প্রান্তে

হিন্দোলা মহল ঃ মাণ্ডু

দু'টি ছত্রী বা হাওয়াঘর, এক একটি আবার তিন ভাগে ভাগ করা। মাঝেরটির ছাদে গম্বুজ আর দু'পাশের দু'টি চার-চালা অনেকটা পিরামিড আকারের ছাদযুক্ত। তিনে মিলে বেশ সুন্দর স্থাপত্যছন্দ সৃষ্টি করেছে। নীচে বড় বৈঠকী বারান্দার উপরে এবং মাঝের ঘরের প্রবেশ দরজার উপরে দু'টি হাওয়া-ঘর আছে। তার ছাদেও প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্যের গম্বুজ, ভেতরের দেওয়ালে হলদে, নীল মোজেকের কাজ এবং লতাপুষ্প অংকিত ভিত্তিচিত্রের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি আবছা হয়ে আছে। প্রাথমিক মুসলমান স্থাপত্য, বিশেষ করে মসজিদে, হিন্দু বৌদ্ধ বা খৃষ্টীয় স্থাপত্যসুলভ পশুপক্ষী, নরনারী অথবা অন্য কোন প্রাণীর চিত্র বা ভাস্কর্য গঠন সম্ভব হয়নি। কারণ ইসলাম ধর্মে কোন [illegible] ভাস্কর্য নির্মাণ কর্ম বলে নির্দেশিত হয়েছে। মুসলমান ধর্মমতে শেষবিচারের ক্ষণে, ক্ষুব্ধ দেবদূত ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ স্বর্গীয় সৃষ্টির অনুকরণ করার অপরাধে দোষী শিল্পীকে তার সৃজিত প্রাণীচিত্র বা ভাস্কর্যে প্রাণ সঞ্চারের আদেশ দেবেন—যা মরজগতের কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হবে না, অতএব দোষমুক্তিও অসম্ভব। অগত্যা ইসলাম স্থাপত্যে জ্যামিতিক বা পত্রপুষ্প অথবা আক্ষরিক অলংকরণ ব্যবহার করতে হয়েছে। উত্তরের ছাদে নীচের মতই হামাম আছে আর তাতে জল সরবরাহের প্রণালী দক্ষিণের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত। দিগন্তের প্রকৃতি কালের জীর্ণতা বক্ষে নিয়ে নবরূপে সজ্জিতা নায়িকার মত সমকালকে আহ্বান করছে ঋতুরঙ্গ রসে। বিন্ধ্যের গিরিশিখর একের পর এক ধাপে ধাপে ওঠানামা করতে করতে শীতের প্রভাতে কুহেলীর অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিতা।

নীচে নেমে পাশের হিন্দোলা মহলের দিকে চলতে লাগলাম। জাহাজ-মহল ও কাপুরতালাও-এর মধ্যে গুল্মের বাগ দিয়ে পথ। কিছুদূর এগিয়ে পথের পাশে ঢিবির উপর একটি ক্ষুদ্র মিনারিকার সামনে পৌঁছলাম। পাশে তার আগল হীন দরওয়াজা, তাকিয়ে দেখি গর্ভগৃহের সিঁড়ি অন্ধকারের মধ্যে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে। তাকে অনুসরণ করে জমি থেকে প্রায় বিশ ফুট নীচে একটি অন্ধকার মধ্যাকৃতি ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছলাম। এদিক ওদিক অন্য ঘরে যাওয়ার রাস্তা, কয়েকটিকে পাথর দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, খোলাও আছে দু'একটা। পাশের ঘরে এলাম, দেয়ালের মধ্য দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে পরের ঘরে। পৃথিবীর আলো ও পার্থিব প্রাণীর অপরিহার্য বায়ুর প্রয়োজনে ছাতের মাঝে মাঝে ছিদ্রসঙ্কুল মিনারিকা। রহস্যঘন অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ঝিকিমিকি আবহাওয়াকে ভয়াবহ করে রেখেছে। সম্ভবত জাহাজ-মহলের ভূগর্ভস্থ গৃহশ্রেণীর অংশবিশেষ এটি। গ্রীষ্মের প্রয়োজনে অথবা নিভৃত বিলাসের জন্য এর সৃষ্টি। সঙ্গী পাঁচসিকার বিজলীবাতির কাছে আর বেশী ভরসা না পেয়ে উপরে উঠে পড়লাম।
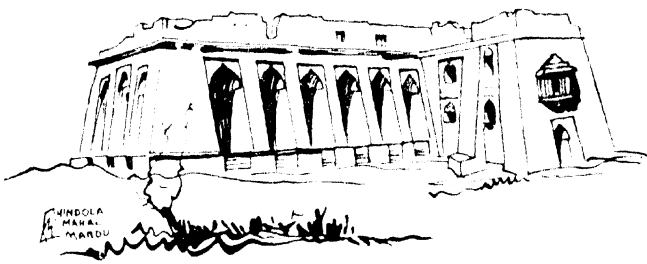
এসে দাঁড়ালাম। সামনে প্রসারিত সংস্কারহীন মুঞ্জতালাও তার উত্তরে এবং পশ্চিমের ওপারে ভগ্নস্তূপে প্রাসাদ-শ্রেণীর এতদিনের নীরবতা যেন মুখর হয়ে আমার মনে ধরা দিল।

শাহেন-শাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রেম-বিহ্বল চোখ সেদিনের এ রূপবতী সরোবর যে রঙদার করে দিয়েছিল তা তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মচরিতে। মোঘল-হারেমের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নূরজাহান বেগম সেদিন সন্ধ্যায় এ প্রাসাদেরই বাসিন্দা ছিলেন (১৬১৬ খৃঃ অঃ)। এ ঘর, এ বারান্দা তখন ইরাক-ইরাণের নক্সীদার কার্পেটে মোড়া ছিল, মখমল-মসলিন ও রেশমী পর্দার ভাঁজে ভাঁজে জৌলসদার হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। সারেঙ্গী ও সরাবের তালে তালে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছিল নর্তকী,

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হিন্দোলা-মহল একান্তই একা। বাইরের দিকে ব্যবহৃত গঠনরীতি, নীচের ন'-দশ ফুট চওড়া দেওয়াল ক্রমে ঢালুভাবে উপরে উঠে চার পাঁচ ফুটে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘরের ভেতর দিকে গাঁথুনি মেঝের সমকোণে উপরে উঠেছে। পাথরে গাঁথা প্রশস্ত মজবুত দেওয়াল বাইরের দিকে নিচের অংশ চওড়া, উপরে সরু। মাঝে মাঝে মোটা দেওয়ালকে আরও মজবুত করার জন্য একই ঢঙে নিচে চওড়া উপরে সরু আরও প্রশস্ত এবং ভারী থামের শ্রেণী। সম্ভবত এর এই বিশেষ গঠনপ্রণালীর জন্যই রসিক স্রষ্টা নামকরণ করেছিলেন হিন্দোলা-মহল। বাড়ীটির নক্সা ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মত। মধ্যে উঁচু লম্বা সভাগৃহ এবং পাশে ছোট ছোট ঘর-বিশিষ্ট দোতলা। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ির বদলে জমি থেকে ঢাল, রাস্তা দোতলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থার স্থানীয় নাম হাতী-[illegible]। মনে হয়, শাহী সওয়ারে যোগদানে অভিলাষী পদানশীন বেগমসাহেবারা হাতী বা চতুর্দোলারোহণে বাইরে একেবারে [illegible] পৌঁছে [illegible]। রসিক স্থপতি [illegible] তাঁর [illegible] উৎকর্ষ দেখিয়েছেন [illegible] মাধ্যমে। অলংকরণের [illegible] ব্যবহার প্রায় গোঁড়ামির পর্যায় পড়েছে। গম্ভীর, প্রশস্ত ও দৃঢ়, ভার গঠনপ্রণালী যে যথেষ্ট রাজকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম, এটি তার সার্থক প্রমাণ। হিন্দোলা-মহলের গঠনকাল গিয়াস-উদ্-দিনের সমসাময়িক, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বলে ধারণা করা হয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে হিন্দোলা-মহলের পশ্চিমদিকে মুঞ্জতালাও এর উত্তর পাশে আরেকটি রাজকীয় প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে এসে হাজির হলাম। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের নির্দেশনামা নজরে পড়ল। প্রাসাদটির নাম তাইখানা এবং চম্পা-বাউড়ী, পাশেই ভূগর্ভের অন্তর্গামী সিঁড়ি বেয়ে নিচের একটি প্রশস্ত কক্ষে পৌঁছলাম। বড় বড় খিলানের উপর ছাত তার উপরে মাটি, মধ্যে মধ্যে আলো ও হাওয়াবাহী সচ্ছিদ্র মিনারিকা। এ ঘর থেকে পর পর অনেক ঘর পেরিয়ে পথ চলে গেছে মুঞ্জতালাও এর পশ্চিম পারে আর একটি ভগ্নপ্রাসাদে এবং মান্ডুর প্রথম ইসলামিক স্থাপত্য দিলওয়ারা মসজিদের ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ শাহ্ তুঘলক (১৩৮৯-৯৪ খৃঃ অঃ) কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় প্রধান দিলওয়ার-খাঁ-ঘোরী ১৪০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্বন্ধ ত্যাগ করে মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান হন এবং ধারা-নগরী ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁরই নির্মিত এ মসজিদ-গাত্রের লিখিত বিবৃতি থেকে জানা যায় এর নির্মাণকাল ১৪০৫ খৃষ্টাব্দ। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই প্রশস্ত কক্ষে ফিরে এলাম, কানে এল নারীকণ্ঠ কাকলী এবং অলঙ্কার শিঞ্জিনী। বুঝি সত্যই কোনো বিস্মৃত-দিনের বাদশাজাদী কবর ছেড়ে উঠে এসেছে বর্তমান এই কলাকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রোমাঞ্চিত দেহে গোলক-ধাঁধার পথে পাড়ি দিলাম। ঘুরে ফিরে বারে বারে সেই একই ঘরে ফিরে আসি, আবার এগোতে শুরু করি আওয়াজ লক্ষ্য করে। পথপ্রান্তে আবছা আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল। দ্রুত পদক্ষেপে এক বিচিত্র জায়গায় এসে পড়লাম, বহু উঁচুতে চক্রাকার উন্মুক্ত পথে সকালের আকাশ উঁকি মারছে। নিচে গোলাকার গভীরতা, চারিদিকে পাথরের বন্ধনী পথের সীমা নির্দেশরত। বন্ধনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি নিচের গভীরে জল চিক্‌চিক্ করছে, তার পাশে স্নানরতা কয়েকটি নারী মনমাতান রঙীন পোশাকে আবৃতা কেউ, কেউবা বিস্রস্তবেশা। আমার আবির্ভাবে সচকিতা হয়ে মৃগ-নয়ন সরমে জলমুখী হল। লজ্জিত হয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। ক্ষণিক নিস্তব্ধে কাটিয়ে মনস্থির করে ফেললাম —দেখাই যদি পেলাম তবে সান্নিধ্য কেন পাব না। আবার সেই আঁখ-মিচৌলি। অনেক ঘোরাফেরা অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর আবিষ্কার করলাম পথ নিম্নগামী।

অন্ধকার ভেদ করে ক্ষুদ্র বিজলীবাতির ভরসায় এগিয়ে চলেছি হুরীর সন্ধানে, ঐ ত' কাকলী-কিঙ্কিনী। দ্রুত, আরও দ্রুত পদক্ষেপে, জলকিনারে পৌঁছলাম। এই তবে চম্পাবাউড়ী। চম্পাবতী রাজকন্যা দেখি আবার ফাঁকি দিয়েছে। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, প্রমাণ শুধু জলরেখা পথ বেয়ে হারিয়ে গেছে আঁধারে। উপরে তাকালাম, উঁচুতে পাওড়ী বা ইঁদারার উন্মুক্ত প্রান্তদেশ, সেখানে আকাশের স্পর্শ। তার নিচে ধাপে ধাপে ঘিরে রয়েছে তাইখানা। আমি প্রায় পঞ্চাশ ফিট নিচে জলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা, খানিক আগেই যেখানে হয়েছিল সুন্দরী সমাবেশ। ছলনাময়ীদের হাসা-লাস্য অস্পষ্ট হয়ে আসছে দূরে, বেশী দেরী করলে রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে না। দ্রুত জলচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। একবার পথ হারাই আবার গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ দৃষ্টি বিজলীবাতির কুহেলিকায় আবিষ্কার করি পথ। কখনও কাছে কখনও দূরে রসিকাদের হাসি আমাকে আহ্বান করে।

ভাববিহ্বল অন্যমনস্ক মন চমকিত হল মুঞ্জতালাও-এর জলস্পর্শে। পথ কি তবে অতলগামী? পাতালকন্যা অনুসরণে সরোবরে তলিয়ে যেতে হবে নাকি! দ্বিধাগ্রস্তমনে কর্মপন্থা চিন্তা করছি, মাথার উপরে মুঞ্জতালাও-এর পাড়ে কে কারা হেসে উঠল আমার বেওকুফিতে। ভগ্ন পথ বেয়ে উপরে উঠলাম। সেখানে কয়েকজন ভীল মরদ ও আওরৎ প্রত্নবিভাগের সংস্কারকর্মে নিযুক্ত। বাধ্য ছেলেটির মত ভারাক্রান্তমনে ধীর পদক্ষেপে চলতে শুরু করলাম। পেছনে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি আমার গতিরোধ করল। ফিরে দেখি ভিলনীরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে, জিজ্ঞাসুনেত্রে মরদরা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

চলতে চলতে উত্তরে আর একটি সুরক্ষিত তোরণ পেরিয়ে এলাম। নির্দেশনামা পড়ে দেখি হাতিপোল দরওয়াজা। পাশেই এ নামকরণের কারণও খুঁজে পেলাম। তোরণের দুপাশে সওয়ারীসহ দুটি হস্তীমূর্তি, হিন্দুভাস্কর্যের মত পাথর কেটে এগুলো তৈরী নয়, গেঁথে দাঁড়িয়ে এর ওপর আস্তর করা হয়েছে, বর্তমানে জীর্ণদশা। দুপাশে দ্বাররক্ষীদের ঘর এবং একটি ঢাকা পথের সংযোগ আছে এ ঘরের মধ্যে। মাণ্ডুর অন্যান্য তোরণ থেকে এর স্থাপত্যের তফাৎ নজরে পড়ল, খিলানের ঢঙ প্রাথমিক মুসলিম রীতির চেয়ে মোঘল রীতিরই ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া পাশেই রয়েছে কামান বসাবার আসন—যা প্রথম যুগের স্থানীয় সুলতানদের অজ্ঞাত অস্ত্র। সম্ভবতঃ এর নির্মাণকাল আকবর কর্তৃক দুর্গজয়ের পর। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে অথবা ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর এখানে দু'বার অবস্থানের কোন এক সময়ে অথবা জাহাঙ্গীরের মাণ্ডু বসবাসের কালে। কিম্বা যুবরাজ খুরম (শাহজাহান) যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন, হয়ত তখনই আত্মরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনে এর উৎপত্তি।

(ক্রমশ)

অশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কবির কাব্যে সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ কাছ থেকে।" [আত্মপরিচয়] এই সংজ্ঞার সঙ্গে তুলনীয় গত শতাব্দীর ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যের দিকপাল Walter Pater-এর দেওয়া সংজ্ঞা:—

"It is on the quality of the matter it informs or controls, its compass, its variety, its alliance to great ends, or the depth of the note of revolt, or the largeness of hope in it, that the greatness of literary art depends, as 'The Divine Comedy,' 'Paradise Lost,' 'Les Miserables,' 'The English Bible,' are great art. Given the condition I have tried to explain as constituting good art;—then, if it be devoted further to the increase of men's happiness, to the redemption of the oppressed, or the enlargement of our sympathies with each other, or to such presentment of new or old truth about ourselves and our relation to the world as may ennoble and fortify us in our sojourn here....it will also be great art." [—Essay on Style.]

পেটারের নাম শুনে কেউ কেউ নাসিকা-কুঞ্চন করতে পারেন তাই বলে রাখি আধুনিক যুগের ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যের দিকপাল আই এ রিচার্ডস তাঁর প্রিন্সিপলস্ অফ্ লিটারারী ক্রিটিসিজম্ বইয়ে পেটারের উক্ত সংজ্ঞার সত্যতা স্বীকার ও প্রশংসা করেছেন।

শেক্সপীয়র এবং গায়টের শ্রেষ্ঠত্বের যে লক্ষণ শিবনারায়ণবাবু ইঙ্গিত করেছেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। মানবচরিত্রের জটিলতা এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতায় বিশ্বসাহিত্যে শেক্সপীয়রের সমকক্ষ বাস্তবিকই দুর্লভ; কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মহত্ত্ব প্রধানত এই সচেতনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, সে সচেতনতা সাহিত্যিক নয় এমন বহু লোকেরও থাকে; শেক্সপীয়রের কৃতিত্ব হচ্ছে মানবচরিত্রের এই বৈচিত্র্যের সার্থক রূপায়ণে।

মানুষের জীবননাট্যে যে বিরোধ আছে—একের সঙ্গে অন্যের কামনার, ইচ্ছার, আইডিয়ার সংঘাত আছে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত আছে, ব্যক্তির নিজের মধ্যেই প্রবৃত্তির সঙ্গে শুভবুদ্ধির দ্বন্দ্ব আছে, এবং সে বিরোধ মানুষের জীবনে অনেক সময় যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী ঘটায় রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে অচেতন বা উদাসীন ছিলেন না; তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটকে, কিছু কবিতায় সে চেতনার পরিচয় আছে, তবে একথা সত্য যে এই বিরোধ এবং ট্র্যাজেডীকেই রবীন্দ্রনাথ একান্ত করে দেখেন নি, তিনি স্বীকার করেন নি যে মানুষের জীবনে এইটাই চরম সত্য, তিনি বিশ্বাস করেছেন যে অন্তরে বাহিরে বিরোধকে মানুষ জয় করতে পারে, বিশ্বাস করেছেন যে সকল বিরোধকে অতিক্রম করে আছে মানুষের মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব। এটা বিশ্বাস, "সত্য স্বীকারের ভয়ও নয়, "আদর্শবাদী শুচিতার মোহ"ও নয়।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সত্তার পূর্ণরূপ দেখেছিলেন বলেই মানুষের কলঙ্কের দিকটা তার প্রকৃতির পঙ্ককুণ্ডের দিকটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মানুষের উপর রবীন্দ্রনাথের অসীম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে খচিত অসীম এই বিশ্বভুবনের এক প্রান্তে অনাদি অনন্তকালের প্রবাহে ক্ষণিকের জন্য উৎক্ষিপ্ত মানুষের এই জীবনটা যে নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহীন, অর্থহীন, প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত অন্ধ পশুর ভূমিকাই যে মানুষের চরম বিধিলিপি—রবীন্দ্রনাথ একথা মানেন নি, তাঁর সমস্ত জীবন, সাহিত্য এই ঘোর নাস্তিত্বের প্রতিবাদ। মানবিকতার কথা যদি হয়, মানুষের জীবনকে, মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী মর্যাদা বোধহয় আর কেউই দেন নি। সাধারণ মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখকে তিনি সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে অসীম জগৎ আর অনন্ত কালের পটভূমিকায় স্থাপন করে মহৎ মর্যাদা, একটা নৈসর্গিক বিরাটত্ব দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো ধর্মীয় অনুশাসন বা আইডিয়ার কাছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, মাহাত্ম্য খর্ব করেন নি; দেশে বিদেশে আইডিয়ার কাছে, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের কাছে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার যে জগৎ-জোড়া বিপুল আয়োজন দেখেছিলেন তিনি সমস্ত জীবন ধরে তার তীব্র, নির্ভীক প্রতিবাদ করে গেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ একথাও স্বীকার করেননি যে, যে-কোন ব্যক্তি বাস্তবে যা আছে তাতেই সে সার্থক, তিনি মানেন নি যে যে-কোন মানুষ যা হয়ে-আছে সেইটুকুর মধ্যেই তার জীবন সফল সার্থক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন যে মানুষের একটা 'হয়ে-ওঠা'র দিক আছে, এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য, সত্য এবং সার্থকতা এই 'যা হয়ে-আছে'র থেকে 'হয়ে ওঠা'র দিকে নিয়ত যাত্রায়।

অন্য যে কোন কবি, শিল্পী, মহাপুরুষের মতো রবীন্দ্রনাথেরও জীবনবোধের সীমা ছিল, তাঁর চেতনা সর্বগ্রাহী ছিল না—একথাটা এতই সত্য যে বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এই সহজ সত্য প্রমাণের দ্বারা তাঁর জীবন বা কীর্তির নিকৃষ্টতা প্রমাণ হয় না। শেক্সপীয়র বা গায়টের জীবনবোধ অন্য অনেকের থেকে গভীর ছিল, মানবপ্রকৃতির ধারণাতীত বৈচিত্র্য ও জটিলতা সম্বন্ধে তাঁরা অনেকের থেকে বেশী সজাগ ছিলেন; অন্যান্য শিল্পস্রষ্টা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং সেই জ্ঞানকে তাঁরা সাহিত্যে সার্থক শিল্পকার্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন; কিন্তু তাঁদের জীবনবোধ মানবচেতনার শীর্ষচূড় শিখর থেকে গভীর তলদেশ পর্যন্ত সমগ্রভাবে নিশ্চয়ই বিস্তৃত হয়নি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের থেকে মহত্তর, পূর্ণতর মানুষ যদি বা হন, মানুষই ছিলেন এবং মানুষের কল্পনার স্বাভাবিক সীমা তাঁদেরো ছিল। শেক্সপীয়রের নাট্যজগতে চরিত্রের বৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কিন্তু বাস্তব জগতের বৈচিত্র্যের তুলনায় তাও নগণ্য; মানুষের চেতনার, চিন্তার অনেকখানি তাঁদের অগোচরে থেকে গেছে। শেক্সপীয়র বা গায়টের মতো রবীন্দ্রনাথের চেতনা এবং মনের অস্তিত্বের নিম্নতম স্তরে পৌঁছোয়নি—সেটা অত সকলের মধ্যেই তাঁর কল্পনার চেতনার সসীমতাই নির্দেশ করে মাত্র। [illegible] রবীন্দ্রনাথের চেতনা, কল্পনা, অনুভূতি এমন সব ঊর্ধ্বে এবং সূক্ষ্ম স্তরে সহজেই পৌঁচেছে যা তাঁদের অনধিগম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের চেতনার, জীবনবোধের [illegible] সূক্ষ্মতা, স্পর্শকাতরতা, [illegible] বাণীরূপ তুলনা সাহিত্যে আর কোথাও আছে জানি না। বিশেষত তাঁর শেষের দিকের অধিকাংশ গান ও কবিতা [illegible] আশ্চর্য [illegible] চেতনার [illegible] সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে [illegible] বিস্ময়কর [illegible] উচ্চতর লোকে মানবচেতনাকে [illegible] করেছে; এগুলি হয়ত সাধারণ [illegible] বাইরে, তাই বলে মানবচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। [illegible] আমাদের কাছে সম্পূর্ণ [illegible], এগুলি থেকে আমরা আনন্দ পেতুম না, উপভোগ করতে পারতুম না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার ক্ষেত্রেও শুচিবায়ুগ্রস্ততার অভিযোগ আনা হয়েছে। পোশাকী শাড়ি-পরা, [illegible] পা-ফেলে চলা বাংলা ভাষার আটপৌরে শাড়ি-পরা সহজ স্বচ্ছন্দ গতির আশ্চর্য রূপ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই, কিন্তু তিনি তাকে নগ্ন করেন নি; তাঁর আটপৌরে শাড়ি-পরা ভাষাও ভদ্র, মার্জিতরুচি, শ্রী ও সামঞ্জস্যযুক্ত, প্রাকৃতজনোচিত ইতরতা যেখানে তার স্বভাববিরুদ্ধ, সেটা এড়িয়ে চলা তার পক্ষে শুচিবায়ুগ্রস্ততা নয়। বাংলা ভাষার লজ্জানিবারণের বাহুল্য জ্ঞান করে সেটা অপহরণ করতে লজ্জা বোধ করেন না এমনতরো বলবান দুঃশাসন আজকাল সাহিত্যসভায় দেখা যাচ্ছে, সেটা আর যাই হোক ভাষা এবং সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের বা সুখের বিষয় নয়। ভাষা এবং সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যই লিখিত-ভাষার খানিকটা শুচিতা রক্ষা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্তব্য; আস্তাকুঁড়কে বাড়ির বাইরে রাখা শুচিবায়ুগ্রস্ততা নয়, স্বাস্থ্য-বিধির একটা মূল নীতি। —মোহিতকুমার মজুমদার, শিলিগুড়ি।

॥ ২৬ ॥

বাড়ির দেয়ালে, ঘরের বেড়ায়, গাছের গায়ে যত পোস্টারই পড়ুক উচ্চ-পদস্থ কোন রাজপুরুষ যে সত্যিই এ পথে আসবেন অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। জিতেন বিশ্বাস আর তার দলের লোকেরা বলে বেড়াতে লাগল, ওটা মণিময়ের একটা চাল। লোককে ভড়কিয়ে দেওয়ার ফন্দি। সময়কালে ... কাজে উপমন্ত্রী উপমন্ত্রী কারোরই দেখা নেই। মণিময় ঠিক সময়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে জানাবে 'আমরা বড়ই দুঃখিত অনিবার্য কারণে......'

আমাদের বাড়িতে, সুবিনয়ের চায়ের দোকানে কোনদিন বা রোডকমিটির প্রেসিডেন্ট রামবাবুর বৈঠকখানায় মণিময়ের দলের ছোট ছোট বৈঠক বসে। শীতাংশু বলে, 'শুনেছেন মণিময়দা, জিতেন বিশ্বাসরা আমাদের বিরুদ্ধে ভাবে লেগেছে?'

মণিময় হেসে বলে, 'লাগুক।'

শীতাংশু বলে, 'আপনি তো বলছেন লাগুক। ওদের প্রোপাগাণ্ডায় যে বার আনা লোক বিশ্বাস করছে।'

মণিময় বলল, 'করুক। আমরা যদি কাজ করতে পারি ষোল আনি লোক আমাদের দলে আসবে এই বিশ্বাস আমাদের থাকলেই যথেষ্ট।'

এরপর জিতেন বিশ্বাসের এই বিরোধিতার কারণ নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা চলে। জিতেন যে কমিটির মধ্যে একজন হর্তাকর্তা হতে চেয়েছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। মণিময় বলেছিল, 'বেশ তো উনি যদি সেক্রেটারী হয়ে খুশী থাকেন তাই হোন না। আমাদের কাজ নিয়ে কথা। কাজ হলেই হল।'

কিন্তু জিতেন বিশ্বাস তাতেও রাজী নয়, সে দলে আসবে না দলের বাইরে থেকে দলাদলি করবে। তাকে বাদ দিয়ে কে এখানে কি গড়ে তোলে তা পরখ করে দেখবে।

সুবিনয় বলল, 'জিতেনবাবু একাই মাঠে নেমে গোল দিতে চান, আর কারো সহযোগিতা চান না। নিজের বাহাদুরিতে দেশোদ্ধার হয় তো হোক, না হয় সে দেশ গোল্লায় যাক, এই বোধ হয় ওঁর মতো।'

মণিময় বলল, 'যাক, সুবিনয়বাবু, অন্যের সমালোচনা করে লাভ কি। তার চেয়ে নিজেদের কাজের আলোচনা ভালো।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'মণিময়দার কেবল কাজ আর কাজ। কিন্তু দাদা কাজের মধ্যে যদি কিছু বাজে কথার আমদানী না করা যায় তাহলে কি আর সে কাজে কোন রস থাকে? মজুরদের ছাদ পিটানো দেখেছেন তো? মজুরনীদের গানের অশ্লীলতায় যত রড়ো পাক লাগে ছাদ তত শক্ত হয়ে বসে। সেজন্যই আপনার আমাদের রোড কমিটিতে কিছু পরচর্চা আর খোসগল্পের জায়গা রাখবেন।'

মণিময় একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু এসব কথায় তার অন্তরের সায় থাকে না। তার ধারণা কাজের মধ্যে অকাজের ভেজাল না মেশানোই ভালো। তাতে কাজ এগোয় না। অনর্থক শক্তি সামর্থ্য আর সময়ের অপচয় হয়। মানুষ যখন সত্যিই নিষ্ঠার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে কাজ করে তখন তার আর মুখের কথার দরকার হয় না, তখন সে হাত দিয়ে কথা বলে।

এই কাজের মধ্যে মত্ত হয়ে থাকার, মগ্ন হয়ে থাকার একটা সহজ প্রবণতা মণিময়ের আছে। অফিসে যতক্ষণ থাকে সে কাজে ফাঁকি দেয় না। নিজের কাজটুকু সে মন দিয়ে করে, শুধু তাই না, অধস্তনদের দিয়ে করিয়েও নেয়। অফিসের একটি সেকশনের অধিপতি মণিময়। পারতপক্ষে তার নিজের সেকশনের সুনাম সে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না। তার ফলে সহকর্মীদের ওপর একটু বেশি চাপ পড়ে। মুখে যাই বলুক, আড়ালে আবডালে তারা মণিময়ের আচার আচরণে তেমন খুশী হয় না। বিদ্রূপ করে বলে, 'অফিসটা যেন মণিময়বাবুর বাবার

অফিস। পান থেকে চুন খসবার জো নেই, পাঁচ মিনিট লেট হবার জো নেই। হয় কৈফিয়ত' চাইবেন, না হয় লেকচার ঝাড়বেন।' :

তা ঠিক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অমনোযোগী অল্পবয়সী সহকর্মীদের সংগে কাজের তত্ত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করবার অভ্যাস আছে মণিময়ের। সে বলে, 'দেখনু, কাজটা পরের, কিন্তু চরিত্রটা পরের নয়, তা নিজেরই। অন্যের কাজে যখন আমরা ফাঁকি দিই নিজেদের কাজ করবার ক্ষমতাটাও সেই সংগে নষ্ট করি। বরং যদি মনে হয় এ মাইনেয় আমাদের পোষাচ্ছে না, অফিসের আবহাওয়া পছন্দ হচ্ছে না, এ কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের আরো ভালো কাজের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ যেন তার মধ্যে কোন ফাঁকি না রাখি। কারণ অন্যকে ফাঁকি দিতে দিতে আমরা শেষপর্যন্ত নিজেকেই ফাঁকি দিই।'

নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই মণিময় অবশ্য তার এই কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা চালিয়ে যায়। কিন্তু সহকর্মীরা এসব তত্ত্বে মোটেই খুশী হয় না। তাদের ধারণা মণিময় তাদের প্রত্যেককে আকেজো প্রতিপন্ন করবার জন্যেই কাজ সম্বন্ধে এ ধরনের বক্তৃতা দেয়।

কীর্তিপুরে এসে শুধু কাজের নতুন ক্ষেত্রই নয়, কয়েকজন নতুন সহকর্মীও পেয়ে গেল মণিময়। সুনীল, শীতাংশু ও ভণ্টুদের উল্লাস উদ্দীপনা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তাকে উৎসাহিত করে তুলল। বাধাবিঘ্ন আর লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বরং মণিময়ের জেদ ও রোখ আরো বাড়িয়ে দিল।

সরকারী মহলে মণিময়ের তেমন যাতায়াত ছিল না। অবশ্য সেখানে গেলে অনেক পরিচিত ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীদের সংগে তার দেখা হয়ে যাবে এ কথা সে জানে। কিন্তু দেখা হলেই যে তাঁরা সেদিনের সেই সৌহার্দকে স্বীকার করবেন এবং তার অনুরোধ রেখে তাকে সাহায্য করতে রাজী হবেন সে সম্বন্ধে মণিময় নিশ্চিত হতে পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল না মণিময়। খোঁজখবর নিতে নিতে এমন দু'একজন বন্ধুর সন্ধান পেল যাঁদের সংগে পূর্তবিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। বার বার দেখাসাক্ষাৎ অনুরোধ উপরোধের পর শেষপর্যন্ত উপমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। আসবার তারিখও তিনি স্থির করে দিলেন।

কীর্তিপুরে তাঁকে অভ্যর্থনার আয়োজন চলতে লাগল। শীতাংশু সুনীলরা বলল, 'খরচের টাকাটা আমরা চাঁদা করে তুলে দিই।'

কিন্তু মণিময়ের প্রধান সহকর্মীরা এতে রাজী হলেন না। মণিময়ও ভেবে দেখল রাস্তা তৈরীর কাজে টাকার জন্যে সকলের কাছে হাত তো পাততেই হবে কিন্তু সামান্য ব্যাপারের জন্যে চাঁদা তুলে ওদের মেজাজ বিগড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জলযোগের ব্যয় সভাপতি রামবাবু নিজেই বহন করতে রাজী হলেন। কারণ [illegible] অতিথিরা তাঁর বাড়িতেই [illegible]। যাতায়াতের খরচও কিছু [illegible] না। থাকি রইল কলাগাছ আর [illegible] দিয়ে তোরণ তৈরী। [illegible] উৎসাহী ছেলের দলই [illegible] চার টাকা যা লাগবে তা [illegible] পারবে।

দু'দিন আগে থেকেই [illegible] নির্মাণের কাজ শুরু হল। [illegible] রাস্তায় দশটি তোরণ তৈরী [illegible] এ কাজে ভণ্টুর উৎসাহই [illegible] সে বলল, 'মণিদা, [illegible] একেকটা নাম রাখলে হয় না?'

মণিময় হেসে বলল, '[illegible] দরকার নেই ভণ্টু। বিনা নামেই [illegible] তোরণগুলি সবাই চিনতে পারবে।'

ঠিক হল সম্মানিত অতিথি [illegible] গাড়িতে করে তোরণের [illegible] যাবেন, কীর্তিপুরের অধিবাসীরা [illegible] দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে অভিনন্দন [illegible] কুমারী কিশোরী মেয়েরা পুষ্পবৃষ্টি [illegible] শঙ্খধ্বনি করবে। তারপর [illegible] বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে [illegible] কপালে চন্দনের ফোঁটা পরানো হবে। [illegible] দের নেতৃত্ব করবে মালা। [illegible] আরো কিছু পরিকল্পনায় [illegible] সদস্যারা তার সাহায্য আর [illegible] নিলেন।

অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার [illegible] যত বেশি লোক সমাগম হয় [illegible] উদ্যোক্তাদের কৃতিত্ব। মণিময় অনুষ্ঠানের একদিন আগে সহকর্মীদের [illegible] প্রত্যেকটি কলোনীর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করে এল, 'আপনারা সবাই যাবেন। সবাই দাবি জানাবেন রাস্তার জন্যে। রাস্তা কারো একার [illegible] রাস্তা যদি হয় তাতে সবাইর সুবিধে হবে।'

মেয়েদের অনুরোধ করবার ভার [illegible] মালা। আরো দু' তিনটি সমবয়সী মেয়েকে সংগে নিয়ে সেও মণিময়দের দলের সংগে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে জিতেন বিশ্বাসের বাড়িতেও উপস্থিত হল মণিময়। [illegible] থেকে একটি ছেলেকে দিয়ে [illegible] পাড়াচ্ছিল জিতেন, মণিময়কে দেখে একটু

গম্ভীরভাবে ডাকল, 'আসুন, বসুন এসে।'

মণিময় মৃদু হেসে বলল, 'আসব, কিন্তু বসব না। আপনি সবাইকে নিয়ে যাবেন। ও'কে রিসিভ করবার সময় সামনে থাকবেন।'

জিতেন বলল, 'কিন্তু আমরা তো সামনের সারির মানুষ নই মণিময়বাবু। যাঁরা সামনে থাকবার যোগ্য, তাঁরাই সামনে দাঁড়াবেন।' মণিময় জিতেনের অভিমান অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'যাবেন।'

জিতেন বলল, 'যাব বই কি অবশ্যই যাব। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটছে কলোনীতে আর আমরা যাব না?'

ফ্রকপরা বার তের বছরের একটি মেয়ে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল, আর আগন্তুকটির পরিচয় ওজন করবার চেষ্টা করছিল। জিতেন তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, 'তুই এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন পুঁটি? যা ভিতরে যা।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে চলে গেল। কিন্তু ওর সেই অপ্রতিভ লজ্জিত দৃষ্টিটুকু যেন চোখে লেগে রইল মণিময়ের।

জিতেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুবিনয় বলল, 'সবাইকে হাতে পায়ে ধরে এই সাধাসাধি আমরা না করলেও পারি। আমার তো মনে হয় এমনিতেই তামাশা দেখবার জন্যে অনেক লোক আসবে, তাদের দোরে দোরে গিয়ে ডেকে আনতে হবে না।'

মণিময় ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তামাশা! আপনার কাছে ব্যাপারটা বুঝি আগাগোড়া একটা তামাশা বলেই মনে হচ্ছে?'

সুবিনয় হেসে বলল, 'কি মুশকিল। আপনি দেখছি ঠাট্টাও বোঝেন না, তামাশাও বোঝেন না। আমি আপনার আমার মত অসাধারণদের কথা বলছিনে, আপনাদের জনসাধারণদের কথা বলছি। তারা তামাশা পেলে আর কিছু চায় না।'

সুবিনয়ের কথা বলবার ভঙ্গি মণিময়ের পছন্দ হয় না। ও সব সময় একটু কায়দা করে কথা বলতে ভালবাসে। সব কিছুকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে চলায় ওর আনন্দ। অবশ্য তার থেকে নিজেকে এবং নিজের কাজকেও সুবিনয় বাদ দেয় না। যেন শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা ভাবালুতার নামান্তর। বুদ্ধির চরম প্রকাশ যেন শুধু ব্যঙ্গে আর বিদ্রূপে। পৃথিবীর সব কিছুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়াতেই যেন সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। জনসাধারণের ওপর সুবিনয়ের মত অমন অনাস্থা নেই মণিময়ের। তাহলে সে নিজে দাঁড়ায় কোথায়? তাহলে তার আত্মবিশ্বাস যে ধসে পড়ে।

সুবিনয়ের কথার জবাবে মণিময় বলল, 'আপনি নিজেকে অসাধারণ মনে করতে পারেন সুবিনয়বাবু, কিন্তু আমি তা করিনে। আমি নিজেকে সাধারণের একজন বলেই জানি। তাই সাধারণের ওপর বিশ্বাসও রাখি।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'আমার নামটা আপনারই নেওয়া উচিত মণিময়বাবু। আমি তা দিতে রাজী আছি। কিন্তু আপনি কি তা বদলাতে চাইবেন? আপনার যে বড় সুনাম। আমার শুধু নামেই সু। কিন্তু আপনি যত বিনয়ই করুন আমরা কেউ নিজেদের সাধারণ বলে ভাবিনে। যার পেটেই দু'এক ফোঁটা বিদ্যাবুদ্ধি আছে সে সেই বিন্দু অতল আর অপার সিন্ধু মনে না করে পারে না। তাছাড়া যে গড়পড়তা হিসেবের রেখা আমরা টানি তা কারো মাথার ওপর দিয়েই যায় না। আমরা সেই সূত্রের কেউ এধারে কেউ ওধারে। আর সেই সূত্রে আমরা সবাই অসাধারণ।'

মণিময় তর্ক করল না। সুবিনয়ের সঙ্গে অত কথা বলতে গেলে কাজ এগোবে না।

উদ্বাস্তু কলোনীগুলি পরিক্রমা শেষ করে সে দলবল নিয়ে কীর্তিনগরে ঢুকল।

শীতাংশু বলল, 'কীর্তিনগরে কি আমাদের যাওয়া ঠিক হবে মণিময়দা? ওখানকার কাউকে তো আমরা কমিটিতে নিইনি। ওরাও কেউ এগিয়ে আসেননি।'

কীর্তিনগর অমনিতেই উদ্বাস্তুপল্লীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন। মণিময় যে নতুন রাস্তা করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে কীর্তিনগরের কোন যোগ নেই। ও নগরের নাগরিকদের নতুন সড়কে পা ফেলবার তেমন দরকার হবে না। তাই এ সম্বন্ধে ওদের উৎসাহ আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। কমিটির মেম্বাররা নিজেদের

মধ্যে আলাপ আলোচনা আর পরামর্শ করেই কীর্তিনগরকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মণিময় আজ নিজে ওদের ডাকবার প্রস্তাব করায় দলের আর সবাই বিস্মিত হ'ল।

সুবিনয়ের ঠোঁটে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক একটু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই। ওখানেও যেতে হবে বইকি। রোড কমিটির সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অনেক রকমের সিদ্ধান্ত আছে তা আমরা মানি মণিময়বাবু।'

মণিময় একটু আরক্ত হয়ে উঠল। করুণার সঙ্গে তার যে আলাপ পরিচয় আছে সে কথা সুবিনয়ও সম্ভবত শুনেছে। তার ইঙ্গিতটা সেইদিকেই। কিন্তু মণিময় তার পরিহাসে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'আমরা তো ওদের কাউকে কমিটিতে আনতে যাচ্ছিনে। গেস্ট হিসেবেই ডাকছি। ওদের মধ্যে বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেকেই আছেন।'

সুবিনয় শীতাংশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে অথচ মণিময়কে শুনিয়ে বলল, 'আর অন্তত একজন বুদ্ধিমতী।'

কীর্তিনগরের পরিচিত কয়েকটি বাড়িতে নিমন্ত্রণপর্ব সারল মণিময়। মৃগাঙ্কদের বাড়িতেও নিমন্ত্রণ করে এল। মৃগাঙ্ক কি প্রভাকর কেউ বাড়ি নেই। তাঁদের সরকারকেই বলে আসতে হল। মণিময় একবার আশা করেছিল, তার নাম শুনে হয়ত এনাক্ষী তাকে ভিতরে ডেকে পাঠাবে, কি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিজেই এগিয়ে আসবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। মালা ভিতর থেকে একবার ঘুরে এল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল আশানুরূপ আপ্যায়ন হয়নি।

মালা বলল, 'আমাদের যা বলবার বলে এলাম। এখন আসবেন কি না আসবেন ও'দের ইচ্ছা।'

সুবিনয় বলল, 'আসবেন আবার কোথায়। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে, ও'রা সভাও দেখতে পারবেন, সভাপতিও দেখতে পারবেন।'

সব শেষে অমিয়বাবুর বাড়ি। এখানে সুবিনয় আর শীতাংশুর বিদায় নিল। বলল, 'বেলা হয়ে গেছে। আমরা অন্য জায়গাগুলি ততক্ষণ সেরে ফেলি। আপনারা ওদিকটা সেরে আসুন।' মালাও চলে যাচ্ছিল। মণিময় বলল, 'না না তুমি থাক, তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

সাড়া পেয়ে করুণাই এসে দোর খুলে দিল। একবার মণিময়ের দিকে আর একবার মালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, তোমরা। এসো।'

গোলমত বাইরের বসবার ঘরখানিতে তাদের ডেকে নিয়ে বসতে দিল করুণা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দাদা তো বাড়ি নেই।'

মণিময় বলল, 'আর কমলাক্ষ?'

করুণা বলল, 'চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর টো টো করবার আরো সুবিধে হয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে টালিগঞ্জে না কোথায় একটা গানবাজনার কলেজ খুলবে সেই তালে আছে।'

মণিময় বলল, 'তোমার মা আর বৌদি বুঝি ভিতরে ব্যস্ত। নিমন্ত্রণটা তোমাকেই করে যাই তাহলে।'

ওদের কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে মালা পুবদিকের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

করুণা সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কি দেখল। আর হঠাৎ কিসের একটা জ্বালা বোধ করল ভিতরে। এই তরুণী মেয়েটিই কি আজকাল মণিময়ের সব প্রেরণা সব কর্মোদ্যমের মূল? এ ধরনের কিছু কিছু কানাঘুষো করুণারও কানে গিয়েছে। কিন্তু সে কান দিতে চায়নি। চোখে দেখবার জন্যেই আজ কি তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মণিময়?

নিজের বিরূপ মনোভাবকে মুখের মৃদু হাসি দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে করুণা বলল, 'কিসের নিমন্ত্রণ? বিয়ের?'

মণিময় এ ধরনের প্রগলভতা আশা করেনি। একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'না বিয়েও নয়, অন্নপ্রাশনও নয়, রাস্তার। শুনেছ বোধ হয় ডেপুটি মিনিস্টার কাল আসছেন আমাদের এখানে। একটা পাবলিক মিটিং এই উপলক্ষে ডেকেছি। আমাদের রাস্তার ব্যাপারটা—।'

করুণা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু ওসব

বড় বড় মিটিংএ আমি গিয়ে কি করব? সাধারণ স্কুল মিস্ট্রেস্। ক্লাসরুমের বাইরে আমাদের ঠাঁই নেই।'

মণিময় বলল, 'ঠাঁই করে নিলেই হয়।'

করুণা বলল, 'রক্ষা করো। সে সাধ গেছে। যাকগে। তোমার নিমন্ত্রণের কথা দাদাকে বলব। ভদ্রতার জন্যে, সৌজন্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদ ছাড়াও মালাকে ডেকে চা দিতে চাইল করুণা। মালার বাবা-মা'র খবর জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু আলাপটা যে জমল না তা কোন পক্ষেরই বুঝতে বাকি রইল না।

খানিকবাদে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিল মণিময়। সে যখন কাছে আসতে চায় করুণা যেন প্রাণপণে তাকে দু'হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ মণিময় উদাসীন, মণিময় নিষ্ঠুর এমন অভিযোগও করুণার কাছ থেকে তার শুনতে হয়েছে। সব গেলেও সব ছেড়ে দিলেও তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকে এটুকুও বোধহয় করুণার ইচ্ছা নয়। কীর্তিনগরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতে আসতে মণিময়ের মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে এসে মালা বলল, 'আজ বোধহয় করুণাদির শরীরটা তেমন ভালো নেই মণিদা। মন মেজাজ খারাপ এমনও হতে পারে।'

করুণাকে দিদি বলার মধ্যে তেমন সঙ্গতি নেই। তা সত্ত্বেও মালা বলে। এ তো আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বের প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক। তবু দু-একদিন মণিময় এ নিয়ে এক আধটু ঠাট্টা তামাশা করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের কথা মণিময়ের মোটেই মনে পড়ল না। সে অন্যমনস্কের মত বলল, 'হুঁ।'

মালা আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মণিময়ের ভাবান্তর দেখে থেমে গেল।

পরদিন বিকেল বেলায় ডেপুটি মিনিস্টার কীর্তিপুরে এলেন এবং সব দেখে শুনে রোড কমিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চলেও গেলেন। সময়ের অভাবে বড় জনসভায় বক্তৃতা করতে তিনি রাজী হলেন না। তবে এইটুকু মণিময়দের আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, এখানকার রাস্তার কথাটা তিনি বিশেষভাবেই ভেবে দেখবেন। তবে কীর্তিপুরের লোকদের একজোট হয়ে অর্ধেক খরচ বহন করতে হবে। তা সে গায়ে খেটেই হোক আর চাঁদা তুলেই হোক। রাস্তার অর্ধেক হবে সরকারী উদ্যোগে আর অর্ধেক বেসরকারী। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্ল্যান আর এস্টিমেট তিনি দাখিল করতে বলে গেলেন রোড কমিটিকে।

কীর্তিনগরের লোকেরা তাঁকে যেভাবে অভিনন্দন জানাল তাতে তিনি নিজে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন জানা না গেলেও কলোনীর অধিবাসীরা যে অভিভূত হল তাতে কোন সন্দেহ রইল না। এমন চাঞ্চল্য আর এতখানি উৎসাহ উদ্দীপনা এ অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। বড় রাস্তার দু'ধারে সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে গেল। বেপরোয়া দুরন্ত দুটি ছেলে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। তিন চারটি কলোনীর কিশোরী মেয়েরা এই প্রথম দলবদ্ধ হয়ে সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাবার সৌভাগ্য লাভ করল।

বাপের অমত সত্ত্বেও জিতেন বিশ্বাসের মেয়ে পুঁটি লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই সারিতে। কিন্তু তার হাতে শাঁখ ছিল না। তার দিকে চোখ পড়ায় মণিময় মালাকে ডেকে বলল, 'ওকে একটা শাঁখ দাও।'

মালা একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কিন্তু বাড়তি শাঁখ তো আর নেই। শাঁখ তো যার যার নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার কথা। তুই যা পুঁটি, বাড়ি থেকে নিয়ে আয় শাঁখ।'

পুঁটি মুখ ভার করে বলল, 'বাড়িতে গেলে আর আসতে দেবে না।'

মণিময় বলল, 'আঃ, তোমার বোনের শাঁখটাই কিছুক্ষণের জন্যে দাওনা ওকে।'

মালা একটু লজ্জিত হয়ে কোত্থেকে একটা শাঁখ এনে পুঁটির হাতে তুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল পুঁটির মুখে। অনেক ভিড় আর কাজের মধ্যেও সেই হাসিটুকু মণিময়ের চোখে লেগে রইল, এক ফোঁটা মধু পড়ল মনের ভান্ডারে। মনে হল, 'এমনি একেকবার একেকজনের ভিতর দিয়েই আমরা অনেক-জনকে পাই। সমগ্র জনসমাজকে ধরা-ছোঁয়ার আর কোন পথ নেই।'

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকেই বলিতেছেন যে, এই মাত্রা বৃদ্ধি যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয় তবু একারের গরমের ধরনটা নূতন; —বাংলার সেই পচা ভাপসা গরম এ নয়, বিহার-যুক্ত প্রদেশের জ্বালা করা গরম। —"প্রকৃতি হয়ত মার্জারের জন্যই তৈরি হচ্ছেন, বলাতো যায় না"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত রায় এবং সিংহ মহাশয়ের মধ্যে সম্প্রতি যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে সে সম্বন্ধে উভয়েই কোন কথা বলিবেন না বলিয়া সম্মত হইয়াছেন।—"এবার শুনছি মার্জারের

বদলে তোমার হৃদয় আমার হৃদয় ব্যাপার অর্থাৎ ইউনিয়ন, সুতরাং একটু চাপাচুপি হবেই। কিন্তু আমরা বলি—গোপন কথাটি রবে না গোপনে, না, না, না—" —শ্যামলাল গানই ধরিয়া ফেলিল।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ জনাব সুরাবর্দী নাকি লিসবনে গিয়া পর্তুগালের পররাষ্ট্র সচিব কুন্হার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে

তাঁহারা নাকি নিজেদের "সম্মিলিত" স্বার্থ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।—"অর্থাৎ পর্তুগীজ এবং পর্তুগীজ-পাকিস্তানের প্রসংগই হয়ত তাঁদের "সম্মিলিত স্বার্থ"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশাই বলিয়াছেন যে, ঘাটতি বাজেট সম্বন্ধে তিনি যতই advice শুনিতেছেন ততই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন।—"অর্থমন্ত্রী মশাই মনে রাখবেন, যত রকম vice আছে তার মধ্যে advice হলো সব চেয়ে বড়"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত পাণ্ডে পার্লামেন্টে প্রশ্ন করিয়াছেন—বিদেশে প্রেরিত সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন কি নাচ-গানেরই ডেলিগেশন?—"আমাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডল অনেকখানি বড় এবং স্বল্প তথায় বহবশ্চ বিঘ্ন্য—সুতরাং সারম ততঃ গ্রাহাম অর্থাৎ নাচ, গাও"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

দিল্লীতে একটি চিড়িয়াখানা তৈরির জন্য জার্মানী হইতে নাকি বিশারদ আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—। "দিল্লীর আন্তর্জাতিক চিড়িয়াখানার পরিকল্পনার জন্য আন্তর্জাতিক know-how-এরই প্রয়োজন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

রানী এলিজাবেথের সম্মাদনে বৃটিশ প্রদত্ত সম্মান বা উপাধি গ্রহণ করিতে নাকি সিংহল অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"Thou too Brutus"!!

* * *

লোকসভার সদস্যদের অনেকেই হিন্দীর বদলে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন তার কারণ তাঁরা হয়ত মনে করেন তাঁদের হিন্দীটা তেমন আসে না, কিন্তু তাঁদের ইংরেজী শুনিলে কোন ইংরেজ হয়ত মনে করিবেন এঁরা বোধ হয় আরবী বলিতেছেন—এইমর্মে মন্তব্য করিয়াছেন শ্রীযুক্ত টেন্ডন।—"কিন্তু কণ্ঠ-লেংগটি জাতীয় হিন্দী আয়ত্ত করতে না
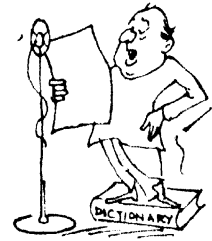
পেরে সদস্যগণ যদি কিলাকে কাঁঠাল পাকায় দিয়া ধরনের হিন্দীতে বক্তৃতা করেন তবে সেটা কি বড় ভালো হবে?" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভের বৃটেনে আগমন উপলক্ষে মিঃ গ্রমিকো বলিয়াছেন, ভারতে এই দুই নেতাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। বৃটেনে এই অভ্যর্থনার রূপ কী হইবে তা এখন হইতে বলা শক্ত।—"সে কথা সত্যি, তবে টমাটোর রস দেওয়া হবে না এবং বুলগানিন ভাই ক্রুশ্চেভ ভাই-ও যে বলা হবে না তা সহজেই অনুমান করা যায়"।

* * *

কলিকাতায় শুনিলাম একটি সমগ্র এশিয়ার পুতুল প্রদর্শনী হইবে।—"খুবই ভালো কথা। কলকাতায় আমরা এদ্দিন পুতুল নাচই শুধু দেখেছি, এবারে পুতুল-প্রদর্শনী হলে মুখ বদলানো যাবে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

১৫

কলকাতা

চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ ফরাসী শিল্পী নিকলাই মিশুটুশকিন-এর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। মিশুটুশকিন ভারতবর্ষে এসেছেন প্রায় এক বছর হল। উত্তর ভারত এবং নেপালের প্রায় সব অঞ্চলই তিনি ভ্রমণ করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলি সবই তাঁর এই ভ্রমণকালের রচনা---নেপাল, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থানের নানা প্রাচীন মূর্তির চিত্ররূপ এবং কিছু কিছু ল্যান্ডসকেপ। ভারতের যত জায়গায় তিনি ঘুরেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে মনে ধরেছে এঁর বারাণসী শহরকে। কাশীর ঘাট, কীর্তন, নৌকাবিহার, রামনগরের রামলীলা এসব তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে বসে গেছে। বারাণসী এঁর এত ভাল লেগেছিল যে ইনি সাহেবী পোশাক ত্যাগ করে ধুতি পাঞ্জাবি পরে খালি পায় সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছেন, কীর্তন শুনেছেন, রামলীলা দেখেছেন এবং যা দেখেছেন তুলির টানে বের করে এনেছেন তার বিশিষ্ট রূপ। ইনি দেখতে জানেন তাই চারদিক এঁর কাছে মনে হয় জীবন্ত। বিষয়কে এমনভাবে দরদ দিয়ে না দেখলে, এমনভাবে একাত্ম না হতে পারলে কি ছবি আঁকা যায়? কাশীতে বন্যা, শ্মশানঘাট, গঙ্গারঘাট, সারনাথ, বুদ্ধ প্রভৃতি থেকে তাঁর শিল্পরসিক ভাবুক মনের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ভারতীয় হলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে কোথাও ভারতীয় আঁচ নেই। মেজাজ এবং ব্যাকরণ সম্পূর্ণ ফরাসী। ইনি মাতীজ-এর শিষ্য বুরেল'-র চেলা, সেই কারণেই সম্ভবত মাতীজ-এর আর্ষ প্রয়োগ এঁর রচনায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কোন কোনও সমালোচক এঁর ছবির মেজাজকে ভারতীয় মেজাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সেটা আদৌ সত্য নয়। "এক জোড়া দেবদেবী", "বুদ্ধের জন্ম", "গয়ার বুদ্ধ মূর্তি" প্রভৃতি ছবিতে ভারতীয় মনোবিকাশের কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় না। শিল্পী যে মনে প্রাণে ফরাসী তাঁর প্রতিটি ছবি থেকেই সে ভাব প্রকাশ পায়। ভারতীয় দৃশ্য পটের এবং ভারতীয় প্রাচীন মূর্তি শিল্পের প্রকারটুকু ধরে বিদেশী শিল্পী সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তি-মনকে প্রকাশ করেছেন। এ হেন শিল্পকলাকে শুধু বাহ্যিক সামান্য সাদৃশ্য ধরে, কোন মতেই ভারতশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। যাই হোক, নেপালের স্কেচগুলি, তিব্বতী লামা, পুরীর জগন্নাথ, গয়ার বুদ্ধমূর্তি, লুম্বিনীর দেবদেবী প্রভৃতি ছবিতে ভারতীয় রসবোধের লক্ষণ না থাকলেও ফরাসী চিত্র হিসাবে এগুলি সার্থক রচনা। ভারতবর্ষের প্রখর সূর্যালোক দেখে নিকলাই-এর ভ্যান গগ-এর কথা মনে পড়ে যায়---"ভ্যান গগ যদি কোনও রকমে ভারতবর্ষে এসে পড়তে পারতেন তাহলে তিনি কোথায় আলো, কোথায় আলো করে পাগলও হতেন না, এবং তাঁকে আত্মহত্যাও করতে হত না।" মন্তব্যটি খুব সত্যি। এঁর বেশীর ভাগ ছবিই জল রঙে স্কেচ নোটস গোছের, সম্ভবত দেশে ফিরে গিয়ে ঐগুলিই আবার ভাল করে তৈল মাধ্যমে আঁকবেন এবং তখনই হবে তাঁর শিল্প-দৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ সুতরাং আমরা এখানে তাঁর চিত্র বিদ্যার শুধু মাত্র একটি ভগ্নাংশের পরিচয় পেলাম। কথা প্রসঙ্গে বুঝলাম ভারতীয় ঋষিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং যামিনী রায়ের প্রতি এঁর অগাধ শ্রদ্ধা।

লুম্বিনীর বুদ্ধমূর্তি (স্কেচ)

নেপালী পরিবার

॥ ২ ॥

সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। এ প্রদর্শনীতে ছিল ১৫ বছর বয়স অবধি ছাত্রছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবি, চামড়ার কাজ, ঝিনুকের কাজ, পাখিরপালকের কাজ এবং কাজকরা মাটির ঘট সরা ইত্যাদি।

ছোটদের শিল্প প্রদর্শনী এর আগেও অনেকবার হয়েছে কলকাতায়, প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করেছি—এদের শিল্পকলা দেখতে দেখতে কখনও ক্লান্তি আসে না। সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের প্রদর্শনী দেখবার সময়ও এর অন্যথা ঘটেনি। প্রত্যেক ছবিতেই কিছু না কিছু নতুনত্ব লক্ষ্য করেছি। ছোটদের মতন অন্য সব কাজ থেকে নির্লিপ্ত হয়ে ছবি আঁকার ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত হতে বড়দের খুব কমই দেখা যায়। ছোটদের কচিগলায় গান, তা যতই বেতাল বেসুর হোক না কেন, যেমন কানে মধু ঢেলে দেয় তেমনি ছোটদের আঁকায় রঙের অপচয়, রেখার বৈলক্ষণ্য, সুরের মধ্যে বেসুর হাজার থাকলেও প্রত্যেকটি রচনা হয়ে ওঠে রসে পরিপূর্ণ একেকটি পাত্র। সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের প্রদীপ সরকারের "মোরগ", মানস মজুমদারের "নাচের দল", স্বাতি রায়ের "লাল পথ" অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের "গ্রাম" আলোক সিকদারের "সূর্যাস্ত", ধ্রুবদেব নন্দীর "নদীরধার" ও "লালমাছ" এবং শ্যামল সেনের "চাষ করা" দেখে সত্যিই আনন্দ পাওয়া যায়। রঙ দেবার, রেখা টানবার প্রবল প্রবৃত্তির ছাপ এ রচনাগুলির জোরালো রঙে, জোরালো রেখার টানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কারুশিল্প বিভাগেও সুন্দর সুন্দর কয়েকটি নিদর্শন চোখে পড়েছিল। আর্টের কৌশল ও সৌন্দর্যের দিক থেকে এ নিদর্শনগুলি পেশাদার কারু শিল্পীর কাজের সংগে পাল্লা দিতে পারে এ কথা জোর করে বলার মতন উদার-দৃষ্টি অবশ্যই আমার নেই তা হলেও এগুলি সুন্দর। অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালে গড়া কিছু চোখে পড়েনি। নন্দা রায়ের ঝিনুকের কাজ "ক্লাউন", আশীষ চক্রবর্তীর পালকের কাজ, ভারতী মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের মলাট ও থলি, পাঁচালী মিত্রের ঝিনুকের কাজ এবং রুমা মুখোপাধ্যায়ের ঝিনুকের "বুদ্ধ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচিত্রিত মাটির ঘট, সরা ইত্যাদির মধ্যেও কয়েকটি তারিফ করবার মত কাজ ছিল।
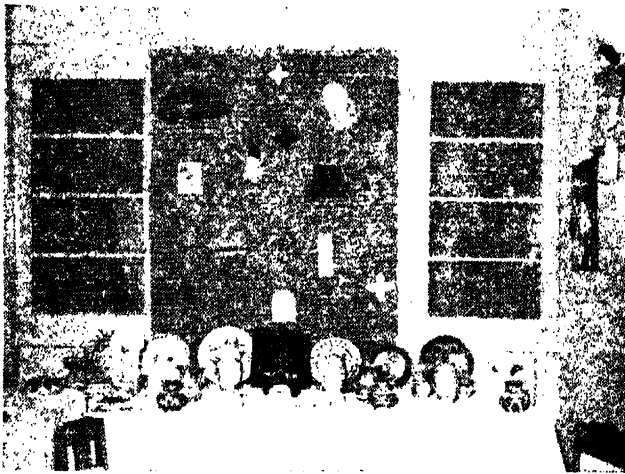
প্রদর্শনীটি চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানোর জন্য কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

ক্লাউন ॥ নন্দা রায়

শিশুদের তৈরী কারুশিল্প

॥ দশ ॥

একেবারে মোরাঙের কাছে এসে থেমেছিল ওঙলেরা। তারপর রীতি-মত হাঁফাতে শুরু করেছিল পাহাড়ী জোয়ানেরা।

মোরাঙের চারপাশে বৃত্তের মত ঘিরে রয়েছে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ মোরাঙের মধ্যে চলে এসেছিল। বিশাল পাথরখানার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষ্যাপা সেণ্টসুঙের মত ফোঁস ফোঁস করছে বুড়ো খাপেগা: "সিজিটোর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে হবে। এত বড় পাপ চলবে না এই বস্তীতে।"

বুড়ো খাপেগার পাশে অতিকায় একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারুয়ামারু। তার চোখ দুটো দপ্ দপ্ জ্বলছে। এই মুহূর্তে সে হত্যা করতে পারে, সে পারে একটা মেন্‌ডার মত গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ওঙলেরা মোরাঙের মধ্যে এসে ঢুকলো: "কী ব্যাপার সদ্দার?"

"কী আবার? সিজিটো ঐ সারুয়া-মারুর বউ জামাতসুর ইজ্জৎ নিয়েছে। ওকে জানে মেরে ফেলে দেবো একেবারে!"

"হু-হু। আমি মোরাঙে এসেছিলাম, সেই ফাঁকে ঐ শয়তান সিজিটোটা হাজির হয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে ঠিক ধরেছি। তা আমাকে ফেলে দিয়ে হুই আচেলার দিকে পালিয়ে গেল সিজিটো। একেবারে কলিজা ফেড়ে রক্ত নিয়ে আনিজাকে দেবো না! ইজাহাণ্টসা সালো—" হাতের থাবায় বিশাল বর্শাটায় ঝাঁকানি দিয়ে, রক্তচোখ দুটোকে আরো দপ্ দপ্ করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সারুয়ামারু।

মোরাঙের বাইরে আকাশ-ফাটানো কোলাহল উঠছে। ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ কেলুরির সমস্ত মানুষ সমস্বরে চীৎকার করে চলেছে। অকারণ। অবারণ।

ওঙলে বললো, "জামাতসু আর সিজিটো কোথায়?"

সারুয়ামারু বন্য গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, "বললুম তো, সিজিটো হুই আচেলার দিকে পালিয়েছে। আর জামাতসুকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে রেখে দিয়েছি। ইজাহাণ্টসা সালো।"

কদর্য গালাগালিতে জা কুলি মাসের রাত্রিটাকে বীভৎস করে তুললো সারুয়ামারু: "সিজিটোর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে তবে এবার ছাড়বো।"

মোরাঙের বাইরে সিজিটোর মা বুড়ি বেঙসানুও সমানে গর্জন করে চলেছে। বিধ্বস্ত দাঁতগুলোতে কড়মড় বাজনা তুলে সে বলছে, "ইজা রামখো। আমার আবার জানতে বাকী আছে। হুই সারুয়ামারুর বউ, হুই জামাতসুর কথা বস্তীর কে-না জানত আবার। শয়তানীর সঙ্গে বস্তীর সব জোয়ানের পিরীত। যত দোষ হলো সেঙাইর বাপের। উ সব চালাকী চলবে না। আপোটিয়া!"

সাঁ করে মোরাঙের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো সারুয়ামারু: "চুপ কর্ বুড়ি মাগী। বেশি বকর বকর করবি তো একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলবো। বেশি সাউকারি করতে হবে না ছেলের হয়ে!" মোরাঙের মধ্যে হুণ্টসুঙ পাখির মত গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে সারুয়ামারু চেঁচিয়ে উঠলো, "হুই সদ্দার, তুই ইদিকে আয়। তুই একবার বল্, ওর ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দেবো।"

কয়েকদিন আগে সূর্য ওঠার রূপকথা নিয়ে সারুয়ামারুর সঙ্গে বুড়ি বেঙসানুর প্রায় একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হচ্ছিল। সেদিন এই কেলুরি গ্রামের সমস্ত মানুষগুলো মৃত্যুমুখ বর্শা বাগিয়ে বেঙসানুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাই আজ আবার সারুয়ামারুর পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতের থাবায় তাদের জামুবো পাতার মত ভয়াল বর্শাফলক। আর গলায় উচ্ছৃঙ্খল চীৎকার।

"হো—ও—ও—আ—আ—আ—"

মশালের আলোতে তাদের ভয়ংকর
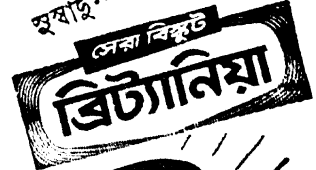
অনার্য দেখাচ্ছে। কে যেন উল্লসিত গলায় বললো, "কই রে সারুয়ামারু, চল্ তাড়াতাড়ি। সিজিটোর ঘরখানা পুড়িয়ে আসি।"

"ও সন্দার, তুই একবার খালি বল্।" অনেকগুলো গলা আগ্রহে ঝকমক করছে; "তুই বললেই আমরা মশাল নিয়ে আসি।"

বুড়ো খাপেগা একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর ভাবরঙগ লক্ষ্য করছিল। এবার সে রায় দিল। সব গলার কোলাহল ডিঙিয়ে তার হুঙ্কার উঠলো আকাশের দিকে, "চুপ কর শয়তানের বাচ্চারা! একেবারে ক্যাচর-ম্যাচর শুরু করে দিয়েছে।"

বুড়ি বেঙসানুর দিকে তাকিয়ে এবার বুড়ো খাপেগা বললো "শোন্ বেঙসানু, সিজিটো ঐ জামাতসুর ইজ্জৎ নিয়েছে। তার দাম দিতে হবে সারুয়ামারুকে। সারুয়ামারু হলো জামাতসুর স্বামী। দুটো শুয়োর আর সাতটা বর্শা দিয়ে দে সারুয়ামারুকে।"

এবার একটা টেফঙের মত চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ি বেঙসানু: "কেন? এর দেবো কেন? ঐ জোরি বংশের বউর ইজ্জৎ এত দামী নাকি?"

চারপাশে বুরোকার মানুষের ভিড়টা একটু চুপচাপ ছিল। আচমকা সকলে আবার সশব্দ হলো। তার মধ্য থেকে বিদীর্ণ হলো সারুয়ামারু: "ইজ্জতের কথা বলছে। বলতে লজ্জা হলো না, কী লো বুড়ি মাগী। লো ইহিআঙশিহু ইহাঙসা! বস্তীর সবাই জানে, তোর সোয়ামী জেভেথাঙের মুন্ডু না কেটে নিয়ে গিয়েছিল সালুয়ালাঙের মানুষ গুলো। তার বদলা নিতে পেরেছিস?"

সকলে মাথা ঝাঁকালো: "হু-হু—"

এবার একেবারে নিভে গিয়েছে বুড়ি বেঙসানু; নিস্তেজ গলায় সে বললো, "আচ্ছা, আচ্ছা। ঐ দুটো শুয়োর আর সাতটা বর্শা দিয়ে তোর বউটার দাম দেবো। আমার স্বামীর মুন্ডুর কথা বললি, সেঙাই যে সেদিন খোনকেকে মেরে এলো। তাতে বুঝি বদলা নেওয়া হয় না!"

"খুব বদলা নিয়েছে!" তাচ্ছিল্যে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল সারুয়ামারুর:

"মাথা আনতে পেরেছে সেঙাই? তোদের জোহেরি বংশের মাথা ওরা নিয়েছে, ওদের পোকার বংশের মাথা যেদিন আনতে পারবি, সেদিন কথা বলবি, হু-হু—"

"হু-হু—" সকলে চক্রাকার কামানো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

দুটো টেবোয়া আর পাঁচটা বর্শার বদলে সারুয়ামারুর বউ জামাতসুর ইজ্জতের দাম ঠিক হয়েছিল। এবার সকলে ছত্রখান হয়ে যার যার কেসুঙের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে।

কে যেন বললো, "আমরা ভাবলাম, সিজিটোটা আলাদা মানুষ। তা নয়!"

"ঠিক বলেছিস।" জা কুলি রাত্রির অন্ধকারে আর একটি কণ্ঠ ব্যঙ্গের রঙে রাঙিয়ে ফুটে বেরুলো, "পরের বউর কাছে পিরীত ফুটাবে না তো কেমনতরো পাহাড়ী মানুষ। জরিমানা দেবে, দুটো মাথা ফাটাবে মেয়েমানুষের জন্যে তো নয়। শুধু বস্তী ছেড়ে কোথায়, কোন্ মুলুকে যে চলে যায় ঐ সিজিটো। আজ দেখলুম, নাঃ, যতই দূর দেশে যাক, যতই সাদা মানুষের গল্প বলুক! আসলে ও পাহাড়ী মানুষই। পাহাড়ী রক্ত রয়েছে ওর বুকে। সে কথা ভুললে চলবে কেন? শয়তানটা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে: এইবার! হো—হো—হো—"

"হু-হু—" আর একজন সায় দিতে দিতে দূরের কেসুঙগুলোর দিকে উঠিয়ে পড়লো: "আজকের রাত্রিটা সিজিটোর গল্প করে কাটানো যাবে বউর সঙ্গে। বড় মজার গল্প।"

সিজিটোর একটা নতুন পরিচয় আবিষ্কার করেছে কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো। আর সেই অপূর্ব মনোরোচক পরিচয়টা নানা রঙের, নানা কথার রসে ডুবিয়ে সারা রাত্রি তারা উপভোগ করবে। এমন এক প্রত্যাশায় সকলে ঝকমক করছে।

মাঝে মাঝে দূরপাহাড়ের চূড়ো ডিঙিয়ে, কত উপত্যকা পেরিয়ে, কত মালভূমি উজিয়ে দূরের শহর-বন্দরে চলে যায় সিজিটো। আশ্চর্য রহস্যময় মানুষ সে। কত বিচিত্র দেশের, কত বিচিত্র মানুষের, কত অস্বাদিত খাবারের গল্প বলে। একই পাহাড়ী জনপদের মানুষ হয়েও সে যেন আলাদা। অনেক স্বতন্ত্র। এই মুহূর্তে জামাতসুর ইজ্জৎ নেবার মধ্যে তারা সিজিটোর আদিম কামনায় তাদেরই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছে। তাদের সঙ্গে সিজিটোর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এটুকু আবিষ্কার করে তারা খুব খুশি হয়েছে।

মোরাঙের চার কিনার থেকে কেলুরি গ্রামের সব মানুষগুলো যার যার কেসুঙে চলে গিয়েছে। চারপাশে একটু আগের কোলাহল একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আচমকা বুড়ো খাপেগা তাকালো ওঙলের দিকে; তারপর বললো, "কীরে, সেঙাই কোথায়? তাকে নিয়ে এসেছিস?"

"তাকে পেলুম না।"

"তাকে না নিয়েই চলে এলি তোরা!" বুড়ো খাপেগার বিবর্ণ চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো।

"কী করবো, তুই বলতো জেঠা: তার খোঁজেই তো গেলুম। টিজু নদীর ওপারে মেনজো নিয়ে বেরিয়েছে টেমি খামকোরানু (বাঘমানুষ)। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যে আসতে পেরেছি, তাই যথেষ্ট!" কেঁপে কেঁপে সন্ত্রস্ত গলায় বললো ওঙলে। একটু আগের মেনজো মারতে যাবার কাহিনী, মেনজোর গায়ে বর্শা লাগার পর মেনজো আর একটি মানবিক গলার আর্তনাদ—কিছুই সে বাদ দিল না।

"হু, বুঝতে পেরেছি। এ ঐ মানকোয়া বস্তীর মোজিচিজুঙের কাজ। ঐ সালুয়ালাঙ আর মানকোয়া বস্তীতে বড় পিরীত। আচ্ছা দেখা যাক, কী করা যায়!" দাঁতে দাঁত ঘষলো বুড়ো খাপেগা।

"আমার মনে হচ্ছে, বুঝলি জেঠা: সেঙাই সালুয়ালাঙে যায়নি। নদীর পারে দাঁড়িয়ে অনেক তড়পালুম। হো-হো করে অনেক হল্লা করলুম। তবু সালুয়ালাঙ বস্তীর কোন সাড়া পেলুম না।" ওঙলে বললো।

"হু-হু": আশ্চর্য গম্ভীর হলো বুড়ো খাপেগার নিরোম মুখখানা। কী একটা ভাবনার অতললোকে সে তলিয়ে গিয়েছে: "তাই তো সেঙাইটা গেল কোথায়?"

এতক্ষণ মোরাঙের বাইরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছিল সারুয়ামারু। এবার সে আয়েহাকাঙে চলে এলো; "দুটো টেবোয়া আর সাতটা মী দিয়ে আমার বউর ইজ্জতের দাম দিলে চলবে না। ঐ শয়তান সিজিটো একবার বস্তীতে ঢুকলে হয়, একেবারে জানে মেরে ফেলবো।"

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা; "চুপ কর শয়তানের বাচ্চা।"

কেলুরি বস্তীটা কাল সারা রাত্রি আর মসৃণ ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়নি। দুটি মানুষ ছাড়া সকলে সিজিটোর এই আদিম পরিচয় নিয়ে রাতভোর গল্প করেছে। রঙে-রঙে, রসে-রসে, আরো অপরূপ করে তুলেছে।

শুধু বুড়ো খাপেগার অতন্দ্র চোখে সেঙাইর মুখখানা বার বার ভেসে উঠেছে। গেল কোথায় ছেলেটা? এই কেলুরি গ্রামের, তার আসাহোয়া জেভে-থাঙের বংশের সম্মান যে রাখতে পারে, সে হলো সেঙাই। তাকে ফিরে পেতেই হবে; সেঙাইর মধ্যে খাপেগা তার নিজেরই যৌবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়। তাকে ফিরে পেতেই হবে।

আর জোরি কেসুঙে বাঁশের মাচানে শুয়ে ধক্ ধক্ করে চোখদুটো জ্বলেছে জামাতসুর। আশ্চর্যভাবে তারা ধরা পড়ে গেল আজ। সিজিটো! সিজিটো! সারুয়া-মারু যখন থাকতো না, এমনি কতদিন রাতে সে এসেছে তার বিছানায়। দু'টি বাহুর বেষ্টনে তার তামাভ অঙ্গশ্রী জড়িয়ে ধরে দূরতম শহর-বন্দরের গল্প বলেছে। তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ফন্দী এঁটেছে। একটি মনোরম স্বপ্নের তুলি দিয়ে জামাতসুর দু'চোখে মোককচঙের মাধুর্য এঁকেছে। এ কাহিনী কেলুরি গ্রামের কেউ জানতো না। সিজিটো জামাতসুর নিভৃত জীবনের ইতিহাস সকলের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে অদৃশ্য ছিল।

সেই সিজিটোই আজ এসেছিল কোহিমা থেকে। সারুয়ামারু কেসুঙে ছিল না। ভরসা পেয়ে সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকেছিলো সিজিটো, "কই লো জামাতসু?"

"এই তো!, আয়, আয়। শয়তানটা ঘরে নেই। মোরাঙের দিকে গেছে।"

একটু আগে জোরি কেস্‌ঙে নাচ-বাজনা হয়েছিল। তারপরেই তল্লাস পড়েছিল সেঙাইর। বুড়ো খাপেগা আর জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে মোরাঙের দিকে চলে গিয়েছিল সারুয়ামারু। সেই মানুষই আচমকা ঘরে এসেছিল কাঁসের খোঁজে; আর এসেই পরস্পরের বাহুবন্দী দু'টি পাহাড়ী নরনারীকে দেখেছিল। বন্য মানুষ! সাঁ করে বাঁশের দেওয়াল থেকে বর্শা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল সারুয়ামারু। অব্যর্থ লক্ষ্য! ফলাটা জামাতসুর মণিবন্ধে গেঁথে গিয়েছিল। আর মাচান থেকে লাফিয়ে একটা উল্কার মত বাইরের পাহাড়ে পলাতক হয়েছিল সিজিটো। সিজিটোর সঙ্গে এই পাহাড় থেকে পালিয়ে মোককচঙে ঘর বাঁধার রমণীয় স্বপ্নটাও ফেরারী হয়েছিল জামাতসুর।

খানিকটা আগে তামুন্যুর কাছ থেকে খানিকটা আরেলা পাতা নিয়ে এসে জামাতসুর মণিবন্ধের ক্ষতে লাগিয়ে দিয়েছে সারুয়ামারু। তারপর বুড়ী বেঙসানুর কাছ থেকে দুটো টেবোয়া আর সাতটা বর্শা এনেছে। জামাতসুর ইজ্জতের দাম। ঘরে এসে হুঙ্কার দিয়েছিল সারুয়ামারু, "দেখ মাগী, তোর ইজ্জতের দাম আদায় করলুম।"

এখন তারই পাশে একটা অতিকায় মোষের মত ভোঁস্ ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে সারুয়ামারু।

ঘুমেরা আজ কোন সুদূরে, কোন আকাশের পরপারে নির্বাসিত হয়েছে। ঘুম আসছে না জামাতসুর। শুধু দুচোখের আয়নায় একটি মুখের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠছে। একটি ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে সে ছবির বাস্তব নাম সিজিটো। সে আজ কত দূরে? ঐ আচেলার বনে বনে সিজিটো কী তার কথাই ভাবছে? তার স্বপ্নই দেখছে!

খোখিকেসারি কেস্‌ঙে আজ বিরাট ভোজ। আওশে ভোজ। এই ভোজের স্বাদকে রসনায় স্থায়ী করে রাখার জন্য মোষ বলি দেওয়া হয়েছে। কেস্‌ঙের সামনে অমসৃণ পাথরের চত্বরটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। মহাকায় প্রাণীটা দু' টুক্‌রো হয়ে দু'দিকে ছিটকে পড়ে রয়েছে।

পলিঙা আর মেহেলী চলে এলো খোখিকেসারি কেস্‌ঙে। কেস্‌ঙের চারপাশে গ্রামের সব মানুষ পাহাড়ী মৌমাছির মত ভন্ ভন্ করছে। এমন একটা ভোজের আনন্দে সকলে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। খোখিকেসারি কেস্‌ঙে আজ সমস্ত গ্রামখানার নিমন্ত্রণ। এই বংশের ছেলে বিয়ে করে সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামটাকে আজ প্রথম ভোজ দিচ্ছে।

বাঁ দিকে সব রান্নার আয়োজন। বড় বড় মাটির পাত্র। পুরুষানুক্রমে পুড়তে পুড়তে পাত্রগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। অতিকায় কাঠের হাতা। অজস্র মানুষের জটলা, উল্লসিত কলরবে সমস্ত খোখিকেসারি কেস্‌ঙটা মুখর হয়ে উঠেছে।

এদিকে আসতে আসতে পলিঙা বললো, "কী লো মেহেলী, তোর লাগোয়া পনুকে (প্রেমিক) তো দেখালি না। শুধু গল্পই বললি তার। কেমন দেখতে লো সেঙাইকে?" খুব মজন্দার চেহারা বুঝি!

চমকে একবার মেহেলী তাকালো পলিঙার দিকে। হ্যাঁ, পলিঙা তার সই। তার কাছে সেই মোহন বিকেলে প্রথম দেখার পর সেঙাইর একটি মনোরম ছবি এঁকেছে মেহেলী। পাহাড়ী কুমারী তার যৌবনের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে সে

ছবিতে রঙ্ দিয়েছে। তার নায়কের রূপ দিয়ে একটি চকিত বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে পলিঙার চেতনায়।

পলিঙা আবারও বললো, "এত ভালো তোর পিরীতের মানুষটা! এত সুন্দর! এত কথা বলেছিস তার সম্বন্ধে। একদিনও তো দেখালি না। দেখালে আমি ভাগিয়ে নেবো না কী?"

চারদিকে একবার চনমন তাকিয়ে মেহেলী বললো, "আজ দেখাবো। খোখি-কেসারিদের মাংস নিয়ে বাড়ী যাবো; তারপর যাবো ডাইনী নাকপোলিবার কাছে। সেখান থেকে ফিরে তোকে দেখাবো সেঙাইকে। খবদ্দার, এ কথা কাউকে বলবি না।"

পাহাড়ী মেয়ে পালিঙার সারা মুখে-চোখে বিস্ময়ের লেখা ফুটে বেরিয়েছে। বিচিত্র আগ্রহে যেন তার পিঙ্গল চোখ দুটো ধক্ ধক্ জ্বলছে। অনেকগুলো কৌতূহল তার প্রশ্নের রূপ নিল, "কোথায় সেঙাই? নাকপোলিবা ডাইনির কাছে যাবি কেন?"

ফিস্ ফিস্ শোনালো পলিঙার কণ্ঠ। দুর্বার বিস্ময়ে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলো ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে উঠলো। পলিঙা বললো, "সেঙাইকে আটক করে রেখেছিস?"

"হু-হু।"

"কারুকে বলিস্ না। তা হ'লে খোঁজ পড়ে যাবে সেঙাইর।"

এবার অত্যন্ত বিশ্বস্ত শোনালো পলিঙার কথাগুলো, "না, না। তুই আমার বন্ধু। তোর ভালবাসার লোককে আমি ধরিয়ে দেবো না। সেঙাই তো এই বস্তীর শত্তুর। ওকে পেলে সদ্দার নির্ঘাৎ বর্শা দিয়ে ফুঁড়বে। ওকে আমি ধরিয়ে দেবো না।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পলিঙার দিকে তাকালো মেহেলী। তাকিয়েই রইলো। তার পিঙ্গল চোখের মণিদুটো আশ্চর্য কোমল হয়ে এসেছে।

এক সময় খোখিকেসারি কেসুঙ্ থেকে আওশে ভোজের মাংস নিয়ে নিল মেহেলী আর পলিঙা। এটি এই পাহাড়ী জনপদগুলির রীতি। আওশে ভোজের দিনে প্রতিবেশীদের মাংস বিতরণ করলে গৃহী জীবন, বিবাহিত যুগলের নীড় রচনা সার্থক হয়ে ওঠে; সুখী হয়।

মাংস নিয়ে ফিরতে ফিরতে মেহেলী বললো, "তুই তোদের কেসুঙে মাংস রেখে আয় আগে। তারপর আমাদের কেসুঙের পেছনে এসে দাঁড়াবি পলিঙা।"

"কেন?"

"কেন আবার? নাকপোলিবা ডাইনীকে দাম দিতে হবে না? তার ওষুধের দাম? সেই যে সেঙাইকে আটক করে চারটে বর্শা আর দু খুদি (আড়াই সের পরিমাণ) ধান নিয়ে যেতে বলে-ছিল?" বাতাসের মত অস্ফুট শোনাচ্ছে মেহেলীর কণ্ঠ, "আচ্ছা পলিঙা, নাক-পোলিবা ডাইনীর ওষুধে কাজ হবে তো!"

"নিশ্চয়ই হবে।"

"আমার বড় ভয় করে বুড়িটাকে।" একটু থামলো মেহেলী। তারপর বললো, "সেঙাইকে আমার চাই। যেমন করে হোক্, ওকে যখন আটক করেছি, ঠিক ধরে রাখবো।"

চোখদুটো মাছের আঁশের মত চক্‌-চক্‌ করছে মেহেলীর।

খোখিকেসারি কেসুঙে আওশে ভোজের সেণ্টসুঙ্‌ বলি দেখতে সবাই চলে গিয়েছে। আয়েহাকাঙে (বাইরের ঘরে) কেউ নেই। ভীরু ভীরু চোখে ভেতরের দিকে একবার তাকালো মেহেলী। নাঃ, তাদের পোকরি কেসুঙ্‌ একেবারে শূন্য। তার বাবা, মা, এমন কী ছোট ছোট ভাইবোনেরা পর্যন্ত সেণ্ট-সুঙ্‌ বলির মজা দেখতে চলে গিয়েছে। নির্মানব এই পোকরি কেসুঙ্‌।

এমন একটা অপূর্ব সুযোগ তার বরাতে লেখা ছিল, তা কী জানতো মেহেলী! সন্তর্পণে বাঁশের মাচানের তলা থেকে চারটে বর্শা, ঝুড়ি থেকে ধান নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা উথাল-পাতাল হচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে নিঃশ্বাস দ্রুত তালে উঠছে, নামছে। বাবার মুখোমুখি হলে আর রেহাই থাকবে না। এই বর্শাগুলো দিয়ে তার চামড়া উপড়ে রোদে শুকোতে দেবে, যেমন করে একটা টেশঙ্‌ কী মেনুজোর ছাল শুকোতে দেয়।

শত্রুপক্ষের ছেলে সেঙাই তার কামনার পুরুষ। তার প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে, প্রতিটি স্নায়ুর জ্বালা দিয়ে সে পেতে চায় সেঙাইকে। তার আদিম আলি-ঙ্গনের মধ্যে ধরতে চায় সেঙাইকে। এ কথা পেলিঙা আর লিজোমু ছাড়া আর কাউকে বলে নি মেহেলী। এ সংবাদ তার আপ্‌ফু জানে না, তার আভ্যু জানে না, কেউ জানে না। একে শত্রু-পক্ষের যৌবন; তার ওপর সেঙাইয়ের জন্য চারটে বর্শা আর দু খুদি ধানের মূল্য দিয়ে মেহেলীর মনোবিলাসকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না তার বাবা। তাই সকলের অগোচরে নাকপোলিবার ওষুধের মূল্য হাতিয়ে আনতে হলো মেহেলীকে।

কেসুঙের পেছনদিকে কথামত দাঁড়িয়ে আছে পালিঙা। তার সঙ্গে লিজোমুও এসেছে।

চারদিকে দুটো পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি দোলাতে দোলাতে পলিঙাদের কাছাকাছি চলে এলো মেহেলী। তারপর ভীরু-ভীরু গলায় বললো, "নাকপোলিবা ডাইনীর কাছে চল্‌।"

তিনজনে উত্তর পাহাড়ের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

বাদামী পাথরের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গটা অন্ধকার গুহায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সুড়ঙ্গের চারপাশে উদ্দাম বন। গুহার মধ্যে পাথরের ভাঁজে ভাঁজে আগুন জ্বলছে। আর সেই ভয়াল অন্ধকারে পাথরের আগুনের পাশে দুটি আগ্নেয় গোলক নির্ণিমেষ ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই ধক্‌ ধক্‌ অগ্নিপিণ্ড দুটি নাকপোলি-বার চোখ।

পাহাড়ী জনপদ থেকে অনেক, অনেক দূরে এই ভয়ঙ্কর গুহার অন্ধকারে অতন্দ্র বসে থাকে ডাইনী নাকপোলিবা। পল-প্রহরের হিসাব নেই, মাস-বছরের, তারিখ-সালের ইতিহাস নেই, এই নির্জন গুহাগৃহে দুটি আগ্নেয় গোলক দিনরাত্রি দূর পাহাড়ের দিকে, উপত্যকার দিকে, অনেক দূরের টিজু নদীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপলক। এই অগ্নিপিণ্ড দুটির নির্বাণ নেই, অবিরাম জ্বলে জ্বলে নিভে যাবার প্রহর কোনকালে আসবে কী না, আশেপাশের পাহাড়ী মানুষেরা তা জানে না।

এদিকে পাহাড়ী মানুষেরা কেউ আসে না। এদিকে নাকপোলিবার ডাইনী নামটা একটা বিভীষিকার মত রাজত্ব করে। ঐ দুটি আগ্নেয় গোলকের ওপর কোন মানুষের ছায়া পড়লে না কী আর উপায় থাকে না। সে মানুষের রক্ত একটু একটু করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তারপর একদিন একটি কঙ্কালের আকার নিয়ে কোন পাহাড়চূড়ো থেকে অতল খাদে আছড়ে পড়ে মরে যায় তাজা পাহাড়ী মানুষটা। তাই ডাইনী নাকপোলিবার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরের পাহাড়ে পাহাড়ে জনপদ রচনা করেছে এই পাহাড়ী মানুষগুলো।

মানুষ আসে না; কিন্তু মাঝে মাঝে আসে পাহাড়ী যৌবন। যুবক-যুবতী। বুকে বুকে তাদের বন্য বাসনার জ্বালা।

কামনার একটি পুরুষ কী একটি নারীর অভাবে পৃথিবী যখন শূন্য হয়ে যায়, যখন প্রেমিক কী প্রেমিকা দুটি বাহুর বৃত্তে ধরা দেয় না, তখন ডাইনী নাকপোলিবার কাছে আসে তারা। ডাইনী নাকপোলিবা। তার তূণে কত ছলাকলার তীর। তার হিসাবহীন বয়সের এই জীর্ণ দেহের হাড়ে হাড়ে, চামড়ার কুণ্চনে কুণ্চনে কত মন্ত্র-তন্ত্র। এই গুহাগৃহে নির্বাসিত থেকে কত আনিজার সঙ্গে সে সই পাতিয়েছে, কত প্রেতাত্মার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা।

পাহাড়ী প্রেম! বন্য মানুষের কামনা! যেমন ভীষণ, তেমন দুর্বার। তখন বিভীষিকা ফেরারী হয়, পলাতক হয়। সাত পাহাড়ের অরণ্যের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে পাহাড়ী যৌবন আসে নাকপোলিবার গুহায়। রাশি রাশি বর্শা আর ধানের বিনিময়ে একটি মন্ত্রপড়া গাছের শিকড় নিয়ে যায়। নাকপোলিবার ঐ শিকড়ের মহিমায় নাকি কামনার মানুষটি একটি পোষা টেফঙের মত ধরা দেয়।

জা কুলি মাসের বিকেল বাইরের উপত্যকায় ঘন রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে। সোনালী আমেজে মাখামাখি হয়ে রয়েছে বন, পাহাড়, মালভূমি।

আচমকা সুড়ঙ্গের ওপর একটি ছায়া পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে গুহাগর্ভের অগ্নিপিণ্ড দুটি তীক্ষ্ন হয়ে উঠলো। কর্কশ গলা ভেসে এলো নাকপোলিবার; "কে? কে ওখানে?"

"আমি সালুনারু।"

"ভেতরে আয়।"

হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মধ্যে চলে এলো সালুনারু। চারপাশে ভয়াল অন্ধকার। যেন আদিম কোন দুর্নিরীক্ষ্য কাল থেকে রাশি রাশি প্রেত ওঁত পেতে রয়েছে নাকপোলিবার গুহায়। এই প্রেতগুলির সঙ্গে নাকপোলিবার দিনরাত্রি সহবাস। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ছম ছম করে উঠলো পাহাড়ী মেয়ে সালুনারুর।

চারপাশে পাথরের ভাঁজে ভাঁজে কাঠের রক্তাভ আগুন জ্বলছে। আগুন নয়, যেন সেই প্রেতাত্মাদের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে।

নাকপোলিবা বললো, "কী চাই তোর? ভালবাসার লোককে বশ করার কায়দা শিখতে এসেছিস? তা দাম এনেছিস? চারটে বর্শা, দু খুদি ধান?"

আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডের ওপর রক্ত চলকে চলকে পড়ছিল সালুনারুর। এবার অনেকটা ধাতস্থ হলো সে; ভালবাসার নাগরকে বশ করতে আসিনি তোর কাছে। ডাইনী হতে এসেছি। আমাকে মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে দে। আমি ডাইনী হবো।"

বলে কী মেয়েটা' বয়সের হিসাব নেই নাকপোলিবার, লেখাজোখা নেই অভিজ্ঞতার। এই অসংখ্য বছরের জীবনে পাহাড়ী উপত্যকায় অজস্র জীবন দেখেছে ডাইনী নাকপোলিবা। কুরগুলাঙ গ্রাম দেখেছে। তারপর সেই কুরগুলাঙ গ্রামের প্রেতাত্মার ওপর কেমন করে গড়ে উঠলো এই কেলুরি আর সালুয়ালাঙ জনপদ, তাও দেখেছে। কত ঝড়-তুফান দেখেছে নাকপোলিবা! পাহাড়ী পৃথিবীর কত জন্ম-মৃত্যু দেখেছে! তার সীমা নেই, তার সংখ্যা নেই। কত যৌবন এসেছে, তাদের ভালবাসার মানুষটিকে বশ করার মন্ত্র নিতে, সুলুক-সন্ধান জানতে। কিন্তু এমন কথা কেউ কোনদিন বলে নি। এমন কথা তার বেহিসাব বয়সের জীবনে কোনদিন শোনে নি ডাইনী নাকপোলিবা।

অগ্নিপিণ্ড দুটো আশ্চর্য বিস্ময়ে সালুনারুর মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। সারা বুকে উল্কি। পৃথিবীর

দিম শিল্প নাকপোলিবার অনাবৃত হে যথেচ্ছ রেখায় আঁকা হয়েছে। র্ণ দুটি স্তনের নীচে বুকটা ধুকপুক র নড়ছে নাকপোলিবার। সে বললো, ী বললি, ডাইনী হবি?"

"হু—হু"—

"কেন? তুই কোন বস্তীর মেয়ে?"

"আমি হুই কেলুরি বস্তীর মেয়ে। মাকে হুই বস্তীর সর্দার ভাগিয়ে য়েছে। ডাইনী হয়ে ওদের সব মারবো। কে পাবো, তাকে শেষ করবো।" পিত একটা অজগরের মত ফণা তুললো ালুনারু। "তুই আমাকে ডাইনী করে ।"

"তুই বিয়ে করেছিস? সোয়ামী াছে?"

"বিয়ে করেছিলাম। সোয়ামীকে রনফু আনিজা মেরে ফেলেছে।"

চকিত হয়ে উঠলো ডাইনী নাক-পোলিবা: "রেনজু আনিজাতে মেরেছে। াম কী তোর সোয়ামীর?"

"রেঙকিলান।"

"রেঙকিলান! রেনজু আনিজা!" নদাঁত মাড়ি বের করে হো হো অট্টহাসি হসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। তার ীভৎস হাসিটা গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আহত হতে হতে মাথা চৌচির করে মরতে লাগলো। হাসির দমকে আগুনের গোলক দুটো একবার নিভতে লাগলো, আবার জ্বলতে লাগলো: রেঙ-কিলান! রেনজু আনিজা! আমিই তো রেনজু আনিজা। আমিই তোর সোয়ামীকে মেরেছি। কী মজার খেলা বল্ তো! রেঙকিলানের নাম ধরে সেদিন দক্ষিণ পাহাড় থেকে ডাক দিলাম। ব্যস্, তারপরেই আচেলা (বাইরের পাহাড়) থেকে খাদে পড়ে একেবারে খতম। আমি এতদিন ভেবেছি, আবার মরলো কী না ছোঁড়াটা। তুই আমাকে বাঁচালি সালুনারু! খেলাটা নতুন ধরেছি কী না? বেশ ভালই জমবে মনে হচ্ছে! হো-হো-হো—"

আবারও হেসে উঠলো ডাইনী নাক-পোলিবা। তার হাসিটা গুহার কঠিন শিলায় শিলায় আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগলো।

"তুই মেরেছিস আমার সোয়ামীকে?" ৫

বাতাসের মত ফিস্ ফিস্ গলায় বললো সালুনারু। কেউ শুনলো না সে কথা। নাকপোলিবা নয়, সালুনারু নিজেও নয়। প্রেতাত্মা! বুড়ী নাকপোলিবা শুধু ডাইনীই নয়, একটা আনিজা! সেই তবে রেঙকিলানকে ডেকে ডেকে বিভ্রান্ত করে খাদের অতলতলায় ফেলে মেরেছে! সালুনারুর মনে হলো, একটা প্রচণ্ড উৎক্ষেপে ক্ষ্যাপা একটা মেন্ডার মত তার দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ডাইনী নাকপোলিবার ঘাড়ের ওপর। তারপর ধারালো নখে নখে, দাঁতে দাঁতে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে। কিন্তু কিছুই হলো না। চারপাশের পাথরের ভাঁজে ভাঁজে প্রেতদৃষ্টির মত আগুন, নাকপোলিবার হাসি, আর কাঁপশ

অন্ধকার। চারপাশে বসে বসে কারা যেন হিম নিঃশ্বাস ফেলছে। একেবারে শিলীভূত হয়ে গেল সালুনারু।

নাকপোলিবা বললো, "ডাইনী হবি, তা দাম এনেছিস ছলাকলা শেখার?"

আড়ষ্ট গলায় সালুনারু বললো, "আমার সোয়ামীর জান নিয়েছিস। ঐ জানের দামে আমাকে ডাইনী করে দে। কেলুরি বস্তীকে আমি সাবাড় করে ছাড়বো।"

"আচ্ছা, তাই দেবো। এখানে থাকতে হবে তোর। পারবি তো?"

বুকটা ছমছম করে উঠলো সালুনারুর; কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, "পারবো।"

আচমকা সুড়ঙ্গের ওপর আবার তিনটি ছায়া পড়লো।

অন্ধকার গুহার মধ্য থেকে তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো নাকপোলিবা; "কে? কে ওখানে। ভেতরে আয় শয়তানের বাচ্চারা।"

"আমরা পিসী।" মেহেলী, লিজোমু আর পলিঙা গুহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো।

নাকপোলিবা বললো, "কী চাই তোদের?"

মেহেলী বললো, "তোর ওষুধের দাম নিয়ে এসেছি পিসী। ওষুধ দে।"

"কই দেখি, দেখি—"

মেহেলীর হাতের মুঠি থেকে চারটি বর্শা আর দু খুদি ধান ছিনিয়ে নিল ডাইনী নাকপোলিবা। সেগুলো পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখতে রাখতে বললো, "কিসের ওষুধ?"

"সেদিন আমি আর পলিঙা এসেছিলুম। তোকে বলে গেলুম, সেঙাইকে আমার মনে ধরেছে। ওকে আমার চাই। আমাদের শত্রু ওরা, তাই বশ করতে হবে।"

"হু-হু। মনে ধরেছে!"

এক কিনার থেকে সালুনারু তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো, "সেঙাই? কোন সেঙাই? কেলুরি বস্তীর সেঙাই না কী?"

"হু-হু।" শান্ত গলায় বললো মেহেলী।

"সেঙাই না তোর দাদাকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে?" বিস্ময়ে বেঁকে গেলো সালুনারুর গলা।

"বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে দাদাকে, তা আমার কী? সে আমার পিরীতের মানুষ। তাকে আমার চাই।" কণ্ঠ কেমন আবিষ্ট হয়ে এলো মেহেলীর।

"চুপ মার সব। কত দেখলাম এই বয়সে! পিরীত হয়েছে, যত শত্রুই হোক! বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে যাক নিজেকে, তবু বিছানায় গেলে তার কথা মনে পড়ে। তাকে না হলে ঘুম আসে না। কী বলিস মেহেলী! মনের মধ্যে যেন বর্শার ঘা মেরে যায় জোয়ানেরা।" হো হো করে গা-ছমছম অট্টহাসি হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা।

কিছু সময়ের বিরতি। সুড়ঙ্গের ওধারে বনময় উপত্যকায় বিকেলের রোদ নিভে আসতে শুরু করেছে। ছায়া ছায়া হয়ে আসছে পাহাড়ী পৃথিবী। আর গুহার অন্ধকার আরো ঘন হচ্ছে, আরো নিকষ হচ্ছে।

এক সময় মেহেলী বললো, "আমার ওষুধ দে পিসী।"

"সেঙাইকে আটক করেছিস তো! তার গায়ে না ছোঁয়ালে সে বশ হবে না। আর একবার ছোঁয়াতে পারলে একেবারে পোষা টেফঙ হয়ে যাবে।"

"হু হু। আটক করেছি আমার শোয়ার ঘরে।"

সেঙাই! উঠে দাঁড়ালো লিজোমু। একটা বিচিত্র সম্ভাবনা তার পাহাড়ী চেতনায় পরতে পরতে দোল দিয়ে গিয়েছে। সে বললো, "আমি একটু বস্তীতে যাবো।"

আর একটি অনুপলও দাঁড়ালো না লিজোমু। সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে একটা ছিলামুক্ত তীরের মত তার নগ্ন দেহটা সাঁ করে বাইরের উপত্যকায় ছিটকে পড়লো।

সেঙাই! ক্ষ্যাপা একটা মেন্ডার মত লাফিয়ে উঠলো সালুনারু। কেলুরি গ্রামের একজনকে অন্তত সে তার থাবার সীমানায় পেয়েছে। কেলুরি গ্রাম! বুড়ো খাপেগা তাকে বর্শা দিয়ে শাসিয়ে দিয়েছে, ও গ্রামে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠলো সালুনারুর। সে বললো, "আমিও যাবো একটু সালুয়ালাঙ বস্তীতে।"

সে-ও আর দাঁড়ালো না। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে তার অনাবৃত দেহটা একটা তীব্রগামী বল্লমের মত বাইরের অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একপাশে নিথর হয়ে বসেছিল পলিঙা আর মেহেলী।

ইতিমধ্যে রাশি রাশি বাঁশের চোঙা বের করেছে বুড়ী নাকপোলিবা। পোড়া চুল, পিঁপড়ের মাটি, গুনু পাতা, আতামারী লতার শিকড় মুঠির মধ্যে নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো সে; মাঝে মাঝে ফু দিয়ে চললো। তারপর মরা মানুষের করোটি আর সেণ্টুসুঙের হাড় সেগুলোতে ঠেকিয়ে মেহেলীর দিকে জীর্ণ হাতখানা প্রসারিত করে দিল নাকপোলিবা; "এগুলো সেঙাইর গায়ে ঠেকাবি। খবদ্দার ও যেন দেখতে না পায়। দেখবি একটা পোকা টেফঙ হয়ে দিনরাত তোর গায়ের গন্ধ শুঁকবে সেঙাই।"

আবারও অট্টহাসি বেজে উঠলো নাকপোলিবার নিদাঁত মুখে। সে হাসি গুহার অন্ধকারে ভয়ানক হয়ে বাজতে লাগলো। (ক্রমশ)

জল-বিদ্যুতের ভূমিকা

বি এন চৌধুরী

॥ ২ ॥

পরদিন প্রাতেই কাজ আরম্ভ করে দেওয়া গেল। প্রথম কাজ হল Y' সদৃশ জায়গাটির তিনটি শাখাতেই নদীগর্ভের পাথর তুলে ফেলে মসৃণ ও সমতল করা। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় বস্তী অঞ্চল থেকে ত্রিশজন মজুর জোগাড় করে এনে শর্মাজী তাঁর কর্মতৎপরতার আর একবার পরিচয় দিলেন। মজুরদের প্রায় অর্ধেকই অল্প-বয়স্কা বস্তী-কন্যা, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে যাদের স্বভাব চটুলতা ও হাস্য-পরিহাস কখনও ম্লান হয় না। সঙ্গে আছেন সর্দার, নাম কাল্লু। জনবহুল শহরে ছোট্ট লাঠি হাতে স্ফীতোদর যে লোকটিকে গজেন্দ্রগমনে কর্মরত মজুর-দের পরিদর্শন করে বেড়াতে দেখা যায়, তার কোনও সামঞ্জস্যই মেলে না কাল্লু সর্দারের প্যাঁকাটির মত ছোটখাট শরীরের সঙ্গে। যে কোন মজুরের চেয়ে হাতে কাজ করেন বেশী, সর্দারিপনা, সীমাবদ্ধ থাকে অবিরাম গলাবাজির মধ্যে। কর্মরত থাকলেও সর্দারের নজর থাকে সর্বত্র। কাজে গাফিলতি দেখলে চিৎকার করে ওঠেন, মেয়ে মজুরদের উদ্দেশে গালা-গালি দেন চরম ভাষায় অম্লমধুর নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করে। মুখে চোখে তীব্র উত্তেজনা নিয়ে শর্মাজী ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন দলে, প্রাঞ্জল পার্বত্য ভাষায় বুঝিয়ে দেন কাজের গুরুত্ব, নির্দেশ দেন সহজ সরল পন্থার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে আসেন আমাদের কাছে অগণিত প্রশ্ন নিয়ে, জ্ঞানের পরিধি বাড়ানর সাধু উদ্দেশ্যে। তিনদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর উপযুক্তভাবে তৈরী হল বিভিন্ন শাখার নদীগর্ভ, তথা আশু পরীক্ষার ক্ষেত্র। ঠিক হল, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পরদিন হতে শুরু করা যাবে বিভিন্ন শাখায় জলের গতি ও পরিমাণের হিসাবনিকাশ।

পরদিন এলোমেলো হাওয়া থামতে বিকাল তিনটা বাজল। তার আগে পরীক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা সমাপ্ত করা হল। 'স্টপ্ ওয়াচ্' হাতে টাইম-রেকর্ডার-দের দাঁড়াবার জন্য একশত ফুট দীর্ঘ স্থানটিতে কুড়ি ফুট অন্তর একটি করে রেখা টানা হল। স্টার্টিং পোস্ট-এ সংকেত জ্ঞাপনের জন্য বসান হল সবুজ আলো। চাকতি নিক্ষেপকারীকে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হল আরম্ভের সীমারেখার প্রায় কুড়ি ফুট আগে। কি পদ্ধতিতে একটির পর একটি চাকতি নিক্ষেপ করা হবে তা তাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়া হল। যথা, বাম তীর (left bank), বাম মধ্যম (left centre), মধ্যভাগ (centre), ডান মধ্যম (right centre), ডান তীর (right bank)। এইভাবে একটি চক্র (cycle) সম্পূর্ণ হলে পুনরায় আরম্ভ হবে বাম তীর হতে। সর্বসুদ্ধ প্রায় পঁচিশ cycle পরীক্ষা করা প্রয়োজন গতিবেগের সুক্ষ্ম হিসাব পেতে হলে। পরীক্ষার প্রথম পর্ব হল প্রাথমিক সংবাদ। যথা, স্থানের নাম, তারিখ, সময়, উচ্চতা, আবহাওয়া, বায়ুর চাপ ও তাপ-মাত্রা, বাতাসের গতি ও গতিমুখ ইত্যাদি। এই সব সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হলে আরম্ভ হল দ্বিতীয় পর্ব—যে পাঁচটি সীমারেখা টানা হয়েছে, সেই সব স্থানে নদীর বিভিন্ন অংশের গভীরতা নিরূপণ করা। সম্পূর্ণ দেশী পদ্ধতিতে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। এ কাজ সমাপ্ত হলে শুরু করা গেল জলের গতি-পরীক্ষা।

"রেডী" বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সতর্ক হয়ে স্টার্টার-এর দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে চাকতি জলে পড়ল, স্টার্টিং পোস্ট অতিক্রম করার মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠলো সবুজ আলো, ক্লিক্ করে পাঁচটি স্টপ্ ওয়াচ্ খোলার আওয়াজ ভেসে এল। স্রোতের মুখে ভেসে চলল রঙিন চাকতি। নিজ নিজ সীমারেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই যিনি যাঁর নিজস্ব ডায়েরীতে সময় লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। শেষ রেকর্ডারের সীমা অতিক্রম করে চাকতি দূরে ভেসে যাওয়ার পর মুহূর্তেই আবার নিক্ষেপ করা হল দ্বিতীয় চাকতি। এইভাবে একটির পর একটি পরীক্ষার কাজ এগিয়ে চলল

একটি শাখায় গতি পরীক্ষা করার পূর্ব মুহূর্তে

একটি শাখায় মনোমত পয়ঃপ্রণালী তৈরি ক'রে সমস্ত নদীটিকে সেই শাখায় প্রবাহিত করা হচ্ছে

নিঃশব্দের মধ্যে দিয়ে মসৃণগতিতে। একটি শাখার পরীক্ষা শেষ করতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। প্রতিদিনই কাজের শেষে তাঁবুতে ফিরে তরুণ ইঞ্জিনীয়ার বোস ও ঘোষ সংগৃহীত তথ্য নিয়ে বসে যান অংক কষতে জটিল ফরমুলার সাহায্যে। ঘণ্টা কতকের মধ্যেই অংক-শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যায় তথ্যের সূক্ষ্মতা ও নির্ভরযোগ্যতা।

সর্বতোভাবে পরীক্ষা শেষ করতে এক সপ্তাহের অধিক দিন কেটে গেল। রোজই দেখি শর্মাজী প্রাতে ও সন্ধ্যা-সমাগমে বন্দুক হাতে জংগলের দিকে যান। ঘণ্টাখানেক পরে রিক্তহস্তে ফিরে এসে লজ্জিতমুখে চুপিচুপি নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢোকেন। শিকার করে অপর্যাপ্ত মাংস সরবরাহের যে দম্ভোক্তি করেছিলেন, তা বুঝি আর থাকে না। রান্নাঘরের অবস্থা চরমে উঠেছে, সংগে আনা আনাজপত্র র‍্যাশন করতে হয়েছে, প্রতিদিন একই ভোজ্যবস্তুতে উদর পূরণই হচ্ছে। রসনার তৃপ্তি রয়ে গেছে বিগত স্মৃতির ক্ষুব্ধ আলোচনার মধ্যে। লক্ষ্য অব্যর্থ হলে কি হবে, শিকারই দৃষ্টিগোচর হয় না, শর্মাজী "সবই নসীব" বলে কপালে করাঘাত করেন। মৎস্য শিকারের জন্য অনেক চেষ্টা করেও স্থানীয় চা-বাগান হতে ডিনামাইট সংগ্রহ হয়ে ওঠেনি। পার্বত্য নদীতে ডিনা-মাইটের সাহায্যে মাছ ধরার পদ্ধতিটা একটু বিচিত্র। খরস্রোতা নদীর বাঁকে বাঁকে প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয় ছোট ছোট স্রোতহীন জলাধার, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর সাময়িক আবাসস্থল। অসংখ্য পাথরে ভর্তি সেই সব জলাধারে সাধারণ পুষ্করিণীর মত জাল ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করতে গেলে জালের মায়া ত্যাগ করতে হয়। একটি বাঁশের চোঙের মধ্যে ডিনামাইট ভর্তি করে প্রায় চার ফুট লম্বা একটি পলতে পরিয়ে দেওয়া হয়। দুইজন স্থানীয় অধিবাসী প্রায় উলংগ অবস্থায় নদীতীরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত পাথর ছুঁড়তে থাকে জলের ভিতর মাছের ঝাঁককে চঞ্চল, ভীত ও চকিত করার উদ্দেশ্যে। পলতেয় আগুন ধরিয়ে ঝটিতি নিক্ষেপ করা হয় নদীগর্ভে। গুরুগম্ভীর চাপা শব্দে জলের তলায় বিস্ফোরণ ঘটে ডিনামাইটের, উপরে

প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মুহূর্তে যে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা অপ্রত্যাশিত না হলেও বিস্ময়কর বটে। ছোট-বড় নানা সাইজের মাছ অর্ধমৃত অবস্থায় জলের উপর ভেসে ওঠে। তীরে অপেক্ষমান দুজন পাহাড়ী সঙ্গে সঙ্গে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরতে থাকে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে কার্য সমাধা না করতে পারলে মাছেদের হতভম্ব নিষ্প্রাণ অবস্থার অবসানে সজীবতা ফিরে আসে, চোখের পলকে লুকিয়ে পড়ে জলাধারের তলদেশে অসংখ্য পাথরের অলিগলিতে।

বহুবিধ অঙ্ক কষে সংগৃহীত পরীক্ষার ফল যাচাই করে দেখা গেল যে, সেগুলি আশাতীতভাবে সন্তোষজনক ও সূক্ষ্ম হয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনার পক্ষে সেগুলিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে। অতঃপর "কৌতূহল অবসানে" সকলেরই গৃহগত প্রাণ উচাটন হয়ে উঠলো প্রত্যাবর্তনের আশু সম্ভাবনায়। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করে গাড়ির বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করা হল। ঠিক হল পরদিন দুপুরে নাগাদ এখানকার তাঁবু গোটানো হবে।

জল মাপার কাজ শেষ হলেও এই অভিযানের আর একটি ছোট পর্ব তখনও বাকী ছিল। সেটি হচ্ছে, পাওয়ার হাউসের স্থান নির্বাচন। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নদীর গতিমুখ ধরে নেমে যেতে হবে প্রায় তিন চার মাইল। সেখানকার উচ্চতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে নির্বাচন করতে হবে পাওয়ার হাউসের অবস্থান। তা না করতে পারলে "হেডের" হদিস পাওয়া যাবে না, কতটা পরিমাণ জলবিদ্যুৎ তৈরী হবে তা রয়ে যাবে অজ্ঞাত। এক কথায় এ কাজটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সহজসাধ্য হলেও, এটি আগেরটির পরিপূরক, একটি ছাড়া আরেকটি অর্থহীন। বিজন বোসের তত্ত্বাবধানে তাঁবু, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম লাডাং-এর পথে রওনা করে দিতে বেলা দুটো বেজে গেল। ঠিক হল আমরা কয়েকজন মজুর সঙ্গে নিয়ে পাওয়ার হাউসের স্থান নির্বাচনে নদীপথ ধরে নেমে যাব। সেখান
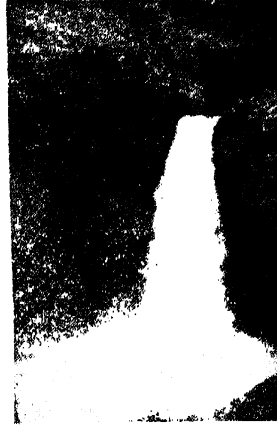
দ্বিধা বিভক্ত নদীর সম্পূর্ণ একটি শাখা প্রায় তিরিশ ফুট নিচে লাফিয়ে পড়ছে

হতে সোজাসুজি পাহাড় বেয়ে লাডাং-এ উঠে এসে প্রধান দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাত্রিবাস করা যাবে।

ভাগ্যক্রমে দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার এবং গাঙ্গুলী মশায়ের নিকট অবগত হওয়া গেল যে, অমাবস্যাও বটে। এরকম অশুভ দিনে অজানা পথে বেরুবার প্রস্তাব উত্থাপনায় পঞ্জিকার অধুনাভক্ত গাঙ্গুলী মশায়ের মুখ মেঘাবৃত হয়ে উঠলো। অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রথমটা আপত্তি করলেও পরে ইষ্টনাম জপতে জপতে সঙ্গী হলেন। নদীর গতিপথ ধরে নেমে যাওয়া প্রথমে সহজসাধ্য বলে মনে হলেও পরে দেখা গেল তা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নীচের দিকে নদীর দুপাশের জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কোন চলতি পথ না থাকায় নদী-তীরের বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। বন্য জন্তুদের চলার ক্ষীণ পথরেখা ধরে ঢুকতে হল জঙ্গলের অভ্যন্তরে। জঙ্গলে দিনের আলো ম্রিয়মাণ, কেমন একটা আলো-আঁধারী থমথমে ভাব।

গাঙ্গুলী মশায়ের প্রভাব সকলের মনে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। দ্বিধাগ্রস্ত মন্থরগতিতে সকলেই অগ্রসর হচ্ছেন কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরে। পথে জলে কচ্ছপ দেখে গাঙ্গুলী মশায় একেবারে হাউ-মাউ করে উঠলেন। বারবেলা ও অমাবস্যার সঙ্গে কূর্ম দর্শনের মত অশুভ লক্ষণের এই স্পর্শযোগের ভয়াবহ পরিণাম আশঙ্কায় প্রলাপ বকতে শুরু করলেন তিনি। এই হঠকারিতার সম্ভাব্য বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে আর একদফা অনুরোধ করলেন পশ্চাদনুসরণের জন্য। দলের অন্য সকলের চিত্তের দৃঢ়তা বুঝি আর থাকে না। জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার প্রাথমিক অভিযানে ইঞ্জিনীয়ারের প্রাণহানি হয়েছে ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল

নয়, কিন্তু কূর্ম সন্দর্শনে অভিযান স্থগিত রাখার নজির শুধু যে অভূতপূর্ব তা নয়, সভ্য সমাজে হাস্যকরও বটে। অনেক বাদানুবাদের পর সকলকে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগেই গন্তব্যস্থানে পেঁৗছনো গেল।

আগত রাত্রির অজানা আশঙ্কায় সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মোটামুটি একটা জায়গা নির্বাচন করে দ্রুত লিপিবদ্ধ করে নেওয়া গেল সেখানকার প্রয়োজনীয় সব খবরাখবর। দ্রুতগতিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকের জঙ্গলে। ম্লান আলোয় বন্যজন্তুর চলার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকি সম্মুখের পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত লাডাং-এর উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন অন্ধকারে চারিদিকের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠলো। সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায় পার্বত্য মজুরেরা পথপ্রদর্শক হয়ে ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে দেখে "bush-craft" কথাটার সম্যক অর্থ উপলব্ধি করা গেল। রাস্তার চড়াই অত্যন্ত তীব্র, অনভ্যাস বশত গতি মন্থর হলেও ঘন ঘন থামতে হচ্ছে বিশ্রামের প্রয়োজনে। পাণ্ডুর মুখে উৎকর্ণ হয়ে শুনি বন্য-জন্তুর নৈশ-জীবনের নানাবিধ ভয়াবহ শব্দ। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় বিশ্রাম স্থগিত রেখে ক্লান্ত অবসন্ন দেহকে টেনে নিয়ে চলতে থাকি উপরের দিকে। প্রায় দুই ঘণ্টা-ব্যাপী অমানুষিক পরিশ্রমের পর রাত্রি নয়টার সময় লাডাং-এর বস্তী অঞ্চলে পেঁৗছনো গেল। অবসাদগ্রস্ত মন ও ক্লান্তিতে অর্ধমৃত দেহ নিয়ে, ক্যাম্পে পেঁৗছেই সকলে শয্যা নিলেন সমস্ত বেশভূষা সমেত।

সদ্য পরীক্ষান্তে প্রবাসী ছাত্রের মত সেদিন তাঁবুতে আমাদের মনে ছুটির আমেজ দেখা দিয়েছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানাবিধ গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেওয়া গেল। মানব-সভ্যতার বাইরে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় নিরাপদে যে এই অভিযান কৃতকার্য হয়েছে, তার জন্য বার বার প্রণাম জানাই ভাগ্য-বিধাতাকে। পরদিন বিদায় নেবার কালে গম্ভীর, প্রশান্ত ও মহিমময় হিমালয়কে দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম।

—সমাপ্ত—

ভাষাগত প্রদেশ গঠন ও বঙ্গ বিহার সমস্যা

প্রবোধচন্দ্র সেন

সৃষ্টিতত্ত্বের দুই দিক্। মূলে যা এক, প্রকাশে তা বিচিত্র। আবার বাইরে যাকে বহু বলে অনুভব করি, অন্তরে তাকেই এক বলে জানি। স্রষ্টার কাজ এককে বিচিত্র করে তোলা। বৈজ্ঞানিকের, দার্শনিকের, ঐতিহাসিকের কাজ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্রের সন্ধান করা। ভারতীয় মনীষা এই তত্ত্বের কথা ঘোষণা করে গেছেন বহুকাল পূর্বেই—য একো অবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি—যিনি এক এবং অবর্ণ তিনিই আপন শক্তির যোগে বহুত্ব ও বিচিত্র বর্ণের বিধান করেছেন এবং তাতেই তাঁর চরিতার্থতা। এই যে বহুত্বময় বৈচিত্র্য তা ঐক্যহীন নয়। ঐক্যহীন বৈচিত্র্যের নামান্তর বিচ্ছিন্নতা; বিচ্ছিন্নতার পরিণাম বিনাশে, প্রলয়ে। সৃষ্টির বিধৃতি বৈচিত্র্যের সংযোগে, বিচ্ছেদে নয়। তাই তো ভারতীয় প্রার্থনা উদ্গীত হয়েছিল—স নো শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু—যিনি এক ও অবর্ণ হয়েও বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করেছেন তিনিই আমাদের শুভ-বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভারতের ইতিহাসবিধাতা তাঁর অন্তরের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা বহুকে মিলিয়ে এক করেছে; আবার সেই ঐক্য বহু বিচিত্র রূপ ধরে বিকশিত হয়েছে,—এই হচ্ছে তার ইতিহাসের প্রথম কথা। এই বৈচিত্র্য যখনই শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে তখনই ঘটেছে ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয়, আবার যখনই অশুভবুদ্ধির দ্বারা বিযুক্ত হয়েছে তখনই ঘটেছে তার অধঃপাত—এই হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা। আর্য-অনার্য, শক-যবন-কুষাণ, আরব-ইরাণ, তুর্কি-পাঠান, পোর্তুগীজ-ফরাসি-ইংরেজের সংমিশ্রণে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তারই রাসায়নিক রূপ ভারতীয় সভ্যতা। এই সভ্যতাই আবার বিচিত্র-রূপে বিকশিত হয়েছে পঞ্চাল-কোশল-মগধে, বঙ্গে-কামরূপে, উৎকলে-অন্ধ্রে, বিদর্ভে-কর্ণাটে, কেরলে-দ্রাবিড়ে। মৌর্য, গুপ্ত, পুষ্যভূতি, প্রতীহার এবং মোগল আমলে ভারতবর্ষ যখনই সংহতি লাভ করেছে তখনই ভারতীয় সভ্যতার প্রকাশ ঘটেছে উজ্জ্বল দীপ্তিতে। আবার যখনই কনোজে-গৌড়ে, দিল্লি-কনোজে, দিল্লি-পুণায় বা পুণায়-নাগপুরে সংঘর্ষ বেধেছে, কিংবা প্রতীহার-রাষ্ট্রকূট, চোল-চালুক্য বা মোগল-মারাঠার বিরোধ জেগেছে তখনই সেই ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করে আশ্রয় করেছে ভারতের মাটিকে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখি, বৈদিক যুগের অবসানে বুদ্ধ-অশোকের আমল থেকেই ভারতীয় চিত্ত আত্মপ্রকাশের জন্য আশ্রয় করেছে প্রাকৃত ভাষাকে। সে প্রাকৃত আবার কালে কালে, দেশে দেশে বিকশিত হয়েছে মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী অর্ধমাগধী মাগধী প্রভৃতি নানা রূপে। এই, বিভিন্নতার মধ্যেও প্রাণরস জুগিয়েছে, ঐক্যরক্ষা করেছে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সেইজন্যই ভারতীয় চিত্ত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশিত হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এই প্রাকৃতগুলিই কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে মধ্যযুগে মারাঠি ব্রজ-ভাষা, আওধি বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। সে যুগে রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের ফলে সংস্কৃত তার পূর্বমর্যাদা থেকে বিচ্যুত হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ও-ভাষা কখনও প্রভাবহীন হয়নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ও-সাহিত্য কখনও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ হারায়নি। তাই দেখি, মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলা, মারাঠি প্রভৃতি ভাষার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও সংস্কৃতের মধ্যস্থতায় তারা পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করেছে। এমন কি, দ্রাবিড়ী গোষ্ঠীর ভাষাগুলিও ক্রমে আর্য গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিকেই এগিয়েছে।

ভারতীয় ইতিহাসের এই পরিণামগত ধারাবাহিকতায় প্রথম ছেদ পড়ল ইংরেজ আমলে। তুর্কি পাঠান প্রভৃতি মুসলমানরা এদেশকেই গ্রহণ করল মাতৃভূমি

বলে এবং এদেশের ভাষাই হ'ল তাদের মাতৃভাষা—ভারতীয় মুসলমানরা যে এখন আর আরবি, ফারসি বা তুরকি ভাষায় কথা বলে না বা সাহিত্য রচনা করে না, তা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বস্তুত ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশেরই মা ছিলেন এদেশীয়; সুতরাং তাদের মাতৃভাষা যে এদেশীয় হবে তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইংরেজ কখনও এদেশকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করেনি, এদেশের ভাষাও তাদের মাতৃভাষা হয়নি। উলটে তাদের ভাষাকেই তারা এদেশের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হয়েছিল। কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছে তারা? প্রায় দু'শো বছরের রাজত্বের পরেও দু'শো জনের মধ্যে একজনের বেশি ভারতীয় ইংরেজি জানে না। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত ইংরেজি-জানা লোককে যদি একত্র করা যায় তাহলে বাংলা দেশের কোনো জেলার ছোট একটি মহকুমাও ভরবে না, কলকাতার লোকসংখ্যার অর্ধেকের সমানও হবে না। ইংরেজ শাসনের শিকড় কখনও ভারতবর্ষের মাটি থেকে রস টানতে পারেনি বা টানতে চায়নি। সেজন্যই সে শাসনকে উপড়ে ফেলা এত সহজ হয়েছে। ইংরেজি ভাষাও তেমনি ভারতীয় জাতির অন্তরে শিকড় বসাতে পারেনি। সুতরাং তার এই কৃত্রিম প্রতিষ্ঠাও অবসিত হতে বেশি সময় লাগবে না; ভারতীয় চিত্তের জাগরণের সংগে সংগেই সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতোই তার বিলয় ঘটবে।

কিন্তু এখানে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। ইংরেজি ভাষাকে আমরা যেন পাশ্চাত্য শিক্ষা সাহিত্য বা চিন্তার সংগে অভিন্ন বলে ভুল না করি। ইংরেজি ভাষা আধুনিক ইউরোপীয় বাণীর বাহন মাত্র; সে বাহন ফরাসি বা জর্মান ভাষাও হতে পারত এবং এখনও পারে। শুধু তাই কেন, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাও সে বাণীর বাহন হতে চলেছে, হবে এবং যত সত্বর হয় ততই মঙ্গল। ইংরেজি ভাষাকে যদি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংগে অভিন্নাত্মা বলে স্বীকার করি, তাহ'লে ইঁদুরটাকেই সিদ্ধিদাতার প্রাপ্য পুজো দেওয়া হবে।

ইংরেজ শাসনের যুগে ইংরেজি ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে তার মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠা থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত করেছে। ফলে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রাণরস সংগ্রহের প্রধান উৎসটিই শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছে। তাই এগুলির পারস্পরিক আত্মীয়তার যোগসূত্রটিও ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অথচ ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভারতীয় ভাষাগুলিকে মাতৃস্তন্য দেওয়া দূরে থাকুক, ধাত্রীস্তন্য দেবার অধিকারীও ছিল না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইংরেজি ভাষার যোগেই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পদ আমাদের চিত্তকে (এবং আংশিকভাবে সাহিত্যকেও) সমৃদ্ধ করেছে। তা ব'লে আমরা যেন সুযোগ প্রণালীটাকে মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য বলে ভুল না করি। ইংরেজির যোগে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা আমাদের চিত্তকে সমৃদ্ধ করেছে প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু সাহিত্যকে করেছে নেহাত পরোক্ষভাবে। আমাদের আধুনিককালের বিদ্যাচর্চার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার বারো আনাই অধিকার করেছে ইংরেজি, আর নেহাতই উপেক্ষাবশে চার আনা অবশিষ্ট রেখেছে ভারতীয় ভাষাগুলির জন্যে। জাতীয় জীবনের চাতুর্বর্ণ্যের প্রথম তিন বর্ণের আসনেই বসেছে ইংরেজি, চতুর্থ আসনে বাংলা প্রভৃতি 'ভার্নাকুলার'গুলি। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ হচ্ছে ব্রাহ্মণের কাজ, সে কাজ চলেছে আধুনিক দেবভাষা ইংরেজিতে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যার গ্রন্থই রচিত হয়েছে ইংরেজিতে। ব্রজেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ-রাধাকৃষ্ণণের দর্শন গ্রন্থ, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাদ - সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান গ্রন্থ, রমেশচন্দ্র-রাখাল দাস-যদুনাথের ইতিহাস গ্রন্থ, এগুলির কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে আমাদের ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজি কোন্ স্থান অধিকার করেছে এবং বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাকে কি পরিমাণে দৈন্যগ্রস্ত করেছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর গ্রন্থাবলীও ইংরেজিতেই রচিত। বিধানসভা, বিচারালয়, সচিবালয় প্রভৃতি ক্ষাত্রকর্মের অধিকারেও ইংরেজিরই একাধিপত্য। আর ব্যাংক, বীমা, আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি বৈশ্যকর্মের অধিকারেও ইংরেজিরই

অসপত্ন অধিকার। আর বাকি রইল শুধু নাটক নভেল কাব্য। এক্ষেত্রে ইংরেজি ভারতীয় ভাষাগুলিকে সামান্য একটু স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করেছে। তারই ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যার বিমাতৃমন্দিরের এক কোণে আমাদের মাতৃভাষার জন্য একটুখানি ঠাঁই করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতেও মাতৃভাষার এই দৈন্যদশা ঘোচবার কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। যে দেশে মাতৃভাষার এই দশা, রাষ্ট্রীয় মুক্তির অধিকারী হলেও মনের ক্ষেত্রে সে দেশ স্বাধীন নয়। জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের মন এখনও ইংরেজির প্রভুত্ব মেনে চলেছে, একমাত্র সাহিত্যে অর্থাৎ রসচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের মন মাতৃভাষাকে স্বীকার করেছে। এইরকম বিভক্ত মন নিয়ে কোনো জাতি কখনও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। দুই নৌকায় পা রেখে অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার কল্পনা শুধু হাস্যকর নয়, বিপজ্জনক।

আমরা মনে করি, ইংরেজি ভাষায় আমাদের অধিকার জন্মেছে। বস্তুত ইংরেজি ভাষাই যে আমাদের মনকে অধিকার করে বসেছে, আমাদের কাঁধ থেকে নামবার নামও করছে না, সেকথা আমরা ভুলেই যাই। ইংরেজি আমাদের জ্ঞান ও কর্মের বাহন হয়েছে এটা একটা ভ্রান্তি; বস্তুত আমরাই ইংরেজি ভাষার বাহন হয়ে পড়েছি। এ বোঝা নামাবার কল্পনা করতেও ভয় পাই।

ভাষা হচ্ছে মনেরই প্রতিরূপ। ভাষার বিকাশেই মনের বিকাশ। ইংরেজি আমাদের মনোবিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতের প্রভাব নষ্ট করে আমাদের ভাষাগুলির উৎসধারাকে দিয়েছে শুকিয়ে এবং এগুলির পারস্পরিক যোগাযোগের পথকে করেছে ব্যাহত। ইংরেজি আমাদের জাতীয় জীবনের উপরের একটি ক্ষীণ স্তরে সঞ্চার করেছে ঐক্যের আস্তরণ আর নীচের স্তরে গভীর করে খনন করেছে দুস্তর ব্যবধান। আজ ইংরেজি-জানা বাঙালি ইংরেজি-জানা মারাঠির খুবই কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু এই মায়াবরণের তলায় সাধারণ বাঙালি ও মারাঠির ব্যবধান যে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে কি? বাংলা ও মারাঠি ভাষা ও সাহিত্য ক্রমেই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বস্তুত ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষা আমাদের চিত্তকে ঐক্যের মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওই আচ্ছাদনের অন্তরালে আমাদের অনৈক্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একে তো আমাদের মনের জ্ঞান ও কর্মের বিভাগে ইংরেজি একচেটে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের মনকে করেছে পঙ্গু—একমাত্র রসসাহিত্যের ক্ষেত্রেই সে পঙ্গু মন কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে—তার উপরে সে মনকে বাঙলায়-মারাঠায় উৎকলে-পঞ্জাবে আসামে-কর্ণাটে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অনতিক্রম্য মোহের পাঁচিল রচনা করে। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, আমাদের মনকে সে প্রচ্ছন্নও করে রেখেছে নানা উপায়ে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের মানচিত্রখানার দিকে তাকালেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। ওই মানচিত্র আসলে ভারতবর্ষের অপমানচিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায় আঠারো বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫) "ভারতবর্ষের স্বাভাবিক জনপদ-বিভাগ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে দেখিয়েছিলাম ইংরেজকৃত ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা কতখানি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। ওই মানচিত্রখানাই ভারতবর্ষের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে তাকে বিকৃত করে দেখিয়েছে। জনগণমন-অধিনায়ক ভারত ভাগ্যবিধাতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট-মরাঠা প্রভৃতি যে জনপদ ও জনগণকে বিকশিত করে তুলেছেন, ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাদের স্থান কোথায়? মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, কেরল, অন্ধ্র প্রভৃতি যেসব জনপদ এক সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছিল, ইংরেজকৃত মানচিত্রে তাদের স্থান ছিল না, এখনও নেই। তারা একেকটি জন ও জনপদকে তিন চার ভাগে ভেঙে ও বহু ভগ্নাংশকে একত্র পুঞ্জীভূত করে

কতকগুলি 'প্রোভিন্স' গঠন করেছিল। অনুবাদে 'প্রদেশ' কথাটি ব্যবহার করায় 'প্রোভিন্স' নামের গ্লানি কতকটা ঘোচে বটে; কিন্তু একথা মানতে হবে যে, ওই সাম্রাজ্যিক প্রভুত্বসূচক বিদেশী শব্দটার দ্বারা যথার্থ 'প্রদেশ'ও বোঝায় না, 'জনপদ'ও বোঝায় না। বস্তুত ইংরেজ প্রায় প্রত্যেকটি জনপদকে পোল্যাণ্ডের মতো খণ্ডবিখণ্ড করে এবং কয়েকটি করে বিচ্ছিন্ন খণ্ডের কৃত্রিম সমাবেশ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের স্বরূপকে তথা তার মানচিত্রকে বিকৃত ও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বদেশের এই কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদে ব্যথিত হয়েই কংগ্রেস এক সময়ে জনপদসূচক প্রদেশ গঠন করে ভারতবর্ষকে স্বরূপে প্রকাশিত করবার সংকল্প করেছিল।

ভারতের জনগণের মন-অধিনায়ক ভাগ্যবিধাতা দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চালনা করে এদেশকে যে বিশেষরূপে বিবর্তিত করেছেন, ইংরেজকৃত মানচিত্র তার প্রতিরূপ নয়। বস্তুত তা ভারতবর্ষের মন-চিত্রও নয়, মান-চিত্রও নয়। তাতে ভারতবর্ষের মনের ছবিও নেই, তার ভাষা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মানও রক্ষিত হয়নি। তাই বলতে ইচ্ছে হয়, সে মানচিত্র হচ্ছে আসলে ভারতবর্ষের অপমানচিত্র বা অপমান-চিত্র। ভারত ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রেত মানচিত্রে ভারতবর্ষের 'জনগণের' মান রক্ষিত হওয়া চাই অর্থাৎ পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি 'জনপদ'সমূহের চিত্র থাকা চাই; তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের 'মনের' চিত্রও পাওয়া যাবে, কেননা জানপদ ভাষাগুলিই ভারতীয় মনের যথার্থ প্রতিরূপ।

কংগ্রেস-সংকল্পিত ভারতবর্ষের চিত্রই ছিল তার যথার্থ মন-চিত্র তথা মান-চিত্র। আজ স্বাধীন ভারত সরকার ওই দীর্ঘকালের সংকল্পিত জনপদ বিভাগের আদর্শ ত্যাগ করে ইংরেজ আমলের আদর্শে প্রোভিন্স গঠনের দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের একমাত্র ওজুহাত প্রশাসনিক সুবিধা। লর্ড কার্জন এক সময়ে ওই প্রশাসনিক সুবিধার ওজুহাতে বাঙলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। আজকের ভারত-সরকারও ঠিক ওই ওজুহাতেই বাঙলা-বিহারকে সংযুক্ত করে নূতন প্রোভিন্স গড়তে উদ্যত হয়েছেন। প্রথমেই বলা যায় যে, এটা ভারতবিধাতার অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসবিধাতার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। ইতিহাস-স্রোতের উল্টো পথে যাত্রা করতে চেষ্টা করলে নৌকোডুবি অনিবার্য।

বাঙলা বিহারকে একত্র জুড়ে ইংরেজ আমলের আদর্শে নূতন 'প্রোভিন্স' তৈরি করাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সংযুক্তি; কিন্তু আসলে তা সংযুক্তিও নয়, সুযুক্তিও নয়, সে হচ্ছে কুযুক্তি। যেখানে অন্তরের মিল নেই, ইতিহাসের প্রবর্তনা নেই, সেখানে সাময়িক কার্যোদ্ধারের প্রয়োজনে বাইরে থেকে তালি দেওয়া জোড়মেলানোকে কুযুক্তি ছাড়া আর কি বলা যায়? তা ছাড়া, এই বহুকথিত সংযুক্তির পক্ষে এতদিন ধরে যত সব যুক্তি দেওয়া হচ্ছে তার একটিকেও সু-যুক্তি বলে গ্রহণ করতে পারিনে, সবই কু-যুক্তি।

বাঙলা-বিহারকে এক রাজ্যে পরিণত করার পক্ষে প্রথম যুক্তি হল, দুই রাজ্যের মিলিত শক্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে শিল্পসমৃদ্ধি-সাধন অর্থাৎ ধনসম্ভার বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, তাতে পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া সহজতর হবে। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এই দুই যুক্তি যথার্থ যুক্তি বলেই গ্রাহ্য নয়। পশ্চিম বাঙলা ও বিহার রাজ্য—শাখা রাজ্য মাত্র, অধিরাজ্য নয়। আর এই দুই রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ মালিকানা স্বত্ব ভারতীয় অধিরাজ্যের, শাখা রাজ্য দুটির নয়। এই রাজ্য দুটির সহায়তায় ভারত সরকার কি উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারেন না? কিংবা শরণার্থীদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করতে পারেন না? আর ভারত সরকার যদি নির্লিপ্ত থাকেন তাহলেও কি ওই রাজ্য দুটি সমবেতভাবে ওই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন না? স্বাতন্ত্র্য বর্জন না করলে কি সমবেত হওয়া যায় না? একাকার না হলে কি ঐক্য হতে পারে না? এক-হেঁশেল না হলে দুই পরিবারে সহযোগিতা চলতে পারে না? স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সংযুক্ত হবার নামই সমবায়, এই প্রাথমিক নীতিটাই ভুললে চলবে কেমন করে?

তৃতীয় যুক্তি ভারতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির অবসান। বাঙলা-বিহার সংযুক্ত হলেই ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। যখন ভারতীয় সবগুলি জনপদই তাদের স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক অর্থাৎ ভাষাগত সীমার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে পরস্পর থেকে বিযুক্ত হচ্ছে, ঠিক তখনই বাঙলা দেশকে তার স্বাভাবিক সীমার অধিকার পরিহার করে বিহারের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রশ্ন উঠল কেন? ভারতীয় ঐক্য কি বাঙলার অধিকার বর্জনের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে? দধীচির অস্থি না হলে ইন্দ্ররাজের বজ্র তৈরি হতে পারবে না, এ বিধান কার তা জানি না। আর কোন্

দেবশত্রু নিধনের জন্য এই বজ্র অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে তাও জানি না। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের এই ইন্দ্রজাল অর্থাৎ ভারতীয় ঐক্য তথা প্রাদেশিকতা-নিরসনের যুক্তিজাল যে বাঙলার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি, তা তো চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছি। অন্ধ্র, কর্ণাট, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি যখন স্বসীমার মধ্যে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ঠিক তখনই বাঙলাকে স্বাধিকার বর্জন করে আত্মসমর্পণ করতে হবে বিহারের সীমাহীন দাবির নিকট, বিহারের সঙ্গে একাকার হয়ে ভারতীয় ঐক্য স্থাপন করতে হবে—এই নির্দেশ ভারতরাষ্ট্রের শীর্ষস্থান থেকে এলেও শ্রদ্ধেয় নয়।

আর প্রাদেশিকতা? নিজের প্রদেশকে অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়, তবে মাসির চেয়ে মাকে বেশি ভালবাসাও অপরাধ। মাকে বেশি ভালোবাসলে মাসি-পিসিরা যদি মুখভার করেন তবে তো সকলকেই নাচার হতে হয়। বিহার উড়িষ্যা অন্ধ্র কর্ণাটের পক্ষে যদি প্রদেশ-প্রীতি অপরাধ না হয়, তবে একমাত্র বাঙলা দেশকেই ওই অপরাধে অভিযুক্ত করে চরম শাস্তির ব্যবস্থা কেন? স্বপ্রদেশের প্রতি একটু বেশি অনুরাগ থাকলে যে অন্য প্রদেশের প্রতি বিরাগ প্রকাশ পায়, এটাই বা কোন্ যুক্তি? তাহলে তো স্বদেশ-প্রীতিও অপরাধ। স্বদেশপ্রীতি বলতেই যদি বিদেশ-বিদ্বেষ না বোঝায়, তবে স্বপ্রদেশানুরাগ বলতেই বিপ্রদেশ-বিরাগ বোঝাবে কেন?

বাঙলা দেশকে বেশী ভালোবাসি বলতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। আমার এই বাঙলাপ্রীতি ভারত-প্রীতি বা বিশ্বপ্রীতির বিরোধী নয়। এই ব্যাপারে আমি ভারতীয় মনীষীদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। 'সোনার বাংলা'র কবি বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের নাম করতে চাই না, বাঙালী বলেই। আন্তর্জাতিকতার পতাকাবাহী ভারত-প্রেমিক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের নামই করব। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস নিবদ্ধ আছে রাজতরঙ্গিণী নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থে। এই ইতিহাস গ্রন্থখানির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন পণ্ডিত জওহরলালের ভগিনীপতি রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিত (১৯৩৫)। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল লিখেছেন—

I have read this story of olden times with interest because I am a lover of Kashmir and all its entrancin beauty, because perhaps, deep down within me and almost forgotten by me, there is something which stirs at the call of the old homeland from whence we came long, long ago.

ভারতপ্রেমিক জওহরলালও যদি তাঁর বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন ও পরিত্যক্ত home land-এর জন্য এমন গভীর অনুরাগ ও আসক্তি অনুভব করতে পারেন, তাহলে আমরাও কি আমাদের বহুধাখণ্ডিত ও লাঞ্ছিত বর্তমান মাতৃভূমির প্রতি বিশেষ অনুরাগ পোষণ করতে পারি না? পণ্ডিতজীর Discovery of India (১৯৪৫) গ্রন্থ থেকেও দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

My love of the mountains and my kinship with Kashmir especially drew me to them, and I saw there not only the life and vigour of the present but also the memoried loveliness of age past.

—তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম উপচ্ছেদ (পৃ ৩১)

My purpose is not to praise Kashmir, though my partiality for it occasionally leads me astray.

—দশম অধ্যায়, চতুর্দশ উপচ্ছেদ (পৃ ৪৭০-৭১)

কাশ্মীর পণ্ডিতজীর বর্তমান প্রদেশ বা পিতৃভূমি নয়; প্রাক্তন এবং বিস্মৃতপ্রায় প্রদেশ ও পিতৃভূমি। তথাপি তার প্রতি তাঁর এই সুযোগ্য সন্তানের এই যে আসক্তি ও পক্ষপাত, তার জন্য তাঁকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়। বরং তাঁর অপরিমেয় ভারতপ্রেম ও বিশ্বপ্রীতি সত্ত্বেও তিনি যে তাঁর পূর্বতন স্বপ্রদেশকে ভুলতে পারছেন না, সে জন্যে তাঁর প্রতি আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধাই হয়। তাঁর এই স্বাভাবিক স্বপ্রদেশানুরাগ তাঁকে আমাদের কাছে অধিকতর হৃদয়বান রূপে প্রতিভাত করে। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, তাঁর কাশ্মীরপ্রীতি যদি অপরাধ না হয়, তবে আমাদের বাঙলাপ্রীতিও প্রাদেশিকতার অপবাদে কলঙ্কিত হতে পারে না। ঈশ্বর গুপ্তের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে—

মেয়ের তনয় যদি দোষের না হয়।
ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়॥

কিন্তু বাঙালীর পক্ষে বাঙলাপ্রীতি গুণ বলে গণ্য না হয়ে দোষ বলেই গণ্য হয়। কারণ সেটা প্রাদেশিকতা। কিন্তু কাশ্মীরপ্রীতি? তার বেলায় 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়' নীতিই প্রযোজ্য।

মনে আছে, বাঙলার আশুতোষ মুখুজ্জে যখন বিহারের সীমার মধ্যে লোকান্তরিত হন তখন কোনো বাঙালী

কবি অনুপ্রাস-যমকের চমক লাগিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন—

বঙ্গ কণ্ঠ শূন্যে ক'রে
বিহার কি হার হরে!

আজ বাঙলার বিরুদ্ধে বিহারের সীমাহীন দাবি সম্বন্ধে তিনি যে কি লিখতেন তা অনুমান করতেও পারি না। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছি যে, বিহার যখন বলে 'নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' তখন সেটা প্রাদেশিকতা হয় না। কেন না, 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়'। কিন্তু ইন্দ্রজালের কোন্ ইন্দ্রজালের প্রভাবে এটা হতে পারে, তা একেবারেই রহস্যাবৃত।

দুই রাজ্য এক হলেই যদি ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বিহার-উড়িষ্যা কিংবা বাংলা-উড়িষ্যা এক হয় না কেন? অন্ধ্র-মাদ্রাজ, গুজরাট-মহারাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয় কেন? আসল কথা, ভারতবর্ষের জনপদগুলি যখনই সাবালক হয়ে ওঠে তখনই সে আপন সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র-ভাবে ঘর পাততে চায়। প্রত্যেক পরিবারেই তা দেখি। ছেলেরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারা স্বভাবতই স্বাধীন জীবন-যাত্রার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে ঘর পাতে, তাতেই যে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে তা তো নয়। বরং যেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সবাইকে এক হেঁশেল হয়ে এক ঘরে বাস করতে হয়, সেখানেই অন্ত-র্বিরোধের অগ্নিতাপ ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত হয়ে সৌভ্রাত্রের ভিত্তিভূমিতে ভূমিকম্প ঘটায়, সে ভূমিকম্পে কখনও কখনও পারিবারিক ভিটামাটিও চৌচির হয়ে যায়। এমনটি হয় না সেখানে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ভাইয়েরা স্বভাবের প্রেরণায় স্বতন্ত্র হয়েও সৌহার্দ্য রক্ষা করে। ভারতবর্ষের জনপদগুলিও সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্যের এই আদর্শই রক্ষা করতে চলেছে। ব্যতিক্রম দেখছি কেবল বাংলার বেলায়। কিন্তু কেন? সেটাই তো রহস্যাচ্ছন্ন।

বাংলা তার ভাষাগত স্বাভাবিক সীমার মধ্যে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সে অধিকার তার ঐতিহ্যগত অধিকার। যে অধিকার ভারতবর্ষের অন্য সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, বাংলার বেলায় তাই অস্বীকৃত হচ্ছে প্রশাসনের অজু-হাতে। তার কারণ কি? এই বিশেষ বিধান কার? এর সদুত্তর পাওয়া যায় নি আজ পর্যন্ত। সীমাহীনতার দাবিদার বিহারের কাছে হার মানতেই হবে, এটাই ভারত-রাষ্ট্র-বিধাতার বিশেষ বিধান? নতুবা ভারতবর্ষের অন্য শাখা রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যে নীতি প্রযুক্ত হয়েছে, বাংলা দেশের বেলায় তা প্রযুক্ত হল না কেন? তাকে অন্য সব রাজ্য থেকে পৃথক করে রাখা হল কেন?

মনের সন্দেহ গোপন না করে খুলে বলতে দ্বিধা করব না। যেখানেই হিন্দীর সঙ্গে অন্য ভাষার বিরোধ ঘটেছে, সেখানেই হিন্দীর কাছে অ-হিন্দীর হার মানতে হয়েছে। এটা কি অহেতুক বা আকস্মিক? যখন দেখি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন থেকে কংগ্রেসের কমিটি বা ভারত সরকার পর্যন্ত রাজ্যভাগ্যনিয়ন্তা-দের অধিকাংশই হিন্দী পক্ষীয়, তখন স্বভাবতই সন্দেহ হয় হয়তো বা নিজের মনের অগোচরেই তাঁরা অ-হিন্দীর প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারেন নি। তা ছাড়া বাংলা ও উড়িষ্যার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার আর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে একথা বলা যেতে পারে বটে যে, ষোল আনা সুবিচারই করা হয়েছে, কিন্তু বাংলা ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক অন্ধতা অর্থাৎ প্রাদেশিক পক্ষ-পাতবশত তা দেখতে পাচ্ছে না। এর উত্তর এই যে, ন্যায়বিচার যে হয়েছে সেটা ভালো করে দেখিয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেওয়া কর্তৃপক্ষেরই রাজনীতিসম্মত কর্তব্য। এ কথাটা সুবিদিত যে, ন্যায়-বিচার করাই যথেষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বোঝানোও চাই যে, সে ন্যায়বিচার পেয়েছে, নতুবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বাংলা ও উড়িষ্যা সম্বন্ধেও ভারত সরকারের বিধান ব্যর্থই হয়েছে। বাঙালী ও ওড়িয়ারা জাতিগত-ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। সে বিশ্বাস, যদি বলা যায় ভ্রান্তি, তবে সে ভ্রান্তি দূরে করবার কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

দেখা গেল, বাংলা-বিহার সংযুক্তির পক্ষে যে-কয়টি যুক্তি দেখানো হয়, তার একটিও প্রত্যয়যোগ্য নয়। এবার দেখা যাক, বাংলার ভাষাসংকটভীতি নিরসনের পক্ষে কি যুক্তি দেখানো হয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা দীর্ঘকাল একরাজ্যভুক্ত ছিল; তখন বাংলা ভাষার উন্নতিই ঘটেছে, অবনতি হয়নি। একরাজ্যভুক্ত থেকেও তামিল-তেলেগু এবং মারাঠি-গুজরাটির অভ্যুদয়ই ঘটেছে, বিলয় ঘটেনি। তবে কেন বিহারের সঙ্গে যুক্ত হতে বাংলার এত ভয়? এর প্রথম উত্তর এই যে, এই রাজ্যগুলি প্রথমাবধি স্বতন্ত্র থাকলেও ও-সব ভাষার উন্নতি হত না? তা ছাড়া, একত্র থেকে উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ্র-মাদ্রাজ ও গুজরাট-মারাঠা এখন যে কারণে স্বতন্ত্র হতে চায়, বাংলাও

সে কারণেই স্বতন্ত্র থাকতে চায় অর্থাৎ বিহারের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তৃতীয়ত, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা যখন এক ছিল, তখন তিনেরই মাথার উপরে ছিল ইংরেজি, কোনো এক অংশের ভাষা অপর অংশের উপরে আধিপত্য করবার কল্পনাও করতে পারত না। এখন হিন্দী ইংরেজিকে অপসারিত করে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি করছে। সুতরাং হিন্দীর কাছ থেকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, এমন কথা বলা যায় না। বরং এখনই হিন্দী বাংলা ভাষার অধিকার সঙ্কোচ ঘটাচ্ছে নানা ক্ষেত্রে (এখানে তার বিস্তৃত পরিচয় দিতে চাই না), ভবিষ্যতে আরও ঘটাতে চেষ্টা করবে, তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা-বিহার এক হলে বাংলার যে আর্থিক ও অন্যবিধ ক্ষতি ঘটবার আশংকা করা হয়, এস্থলে সে প্রসঙ্গ তুলতে চাই না এবং তাকে গুরুত্ব দিতেও চাই না। তাই শুধু ভাষার প্রসঙ্গটাই আলোচনা করলাম।

তবে কি আমি বাংলা-বিহার সংযুক্তির বিরোধী? তার উত্তরে আমি বলব 'শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু', শুভ-বুদ্ধির সংযোগ ঘটুক। যেখানে অন্তরের মিল নেই, শুভবুদ্ধির প্রেরণা নেই, সেখানে শুধু বাইরের সংযোগে ঘটে দুর্যোগ; তাকে সংযুক্তি না বলে কু-যুক্তি বলাই ভালো। আমি বিহারের সঙ্গে বিচ্ছেদ বা বিরোধও চাই না। সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে বাংলা-বিহারের স্বাতন্ত্র্য আমি চাই আপন ভাষার স্বাভাবিক সীমার মধ্যে। আবার সৌহার্দ্যের প্রেরণায় যদি শুভসংযুক্তি ঘটে, আমি তাতেও আপত্তি করব না। তবে শুভসংযুক্তি কাকে বলছি, তা-ও বুঝিয়ে বলা দরকার। প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি, বৈচিত্র্যহীন একাকারত্বে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় আর ঐক্যহীন বৈচিত্র্য বিচ্ছিন্নতারই নামান্তর যার পরিণাম প্রলয়ে বা বিনাশে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বারবারই একথার সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং বাংলা-বিহারের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেও তাদের ঐক্য তথা সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হবে। আবার যদি ওই দুই রাজ্যের সংযুক্তি ঘটাতেই হয়, তাহলেও তাদের বৈচিত্র্যকে মেনে নিতে হবে। নতুবা ইতিহাসের অমোঘ বিধানে ওই দু-এরই মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। ভারত-ইতিহাসের তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ভারতবর্ষে চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, ...বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

—ইতিহাস, পৃ ৬

বাংলা ও বিহারের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যদি উভয়ের সংযুক্তি ঘটানো যায়, তবে তাতে কল্যাণ হবে বলেই মনে করি। কেননা, সে হবে শুভবুদ্ধির সংযুক্তি। কোনো মানবগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় প্রধানত ভাষায়। ভাষা হচ্ছে মানুষের মন তথা তার সংস্কৃতির মুখ্যতম বাহন। সুতরাং ভাষাগত সীমাকে স্বীকার করা চাই। বাংলা-বিহারকে একরাজ্যভুক্ত করলেও উভয়ের ভাষাসীমাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা চাই। পরস্পরের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করলে তবেই দুই জনের মধ্যে যথার্থ বন্ধুতা হয়; এক পক্ষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব বা অস্বীকার করে বন্ধুতা স্থাপন সম্ভব নয়। বাংলা-বিহারের নিরাকার বা একাকার মিলন মিলনই নয়; উভয়ের পূর্ণাঙ্গ সত্তার মিলনই যথার্থ মিলন। শুনতে পাই, প্রশাসনের তথা শিল্পোন্নয়নের সুবিধার খাতিরেই বাংলার স্বাভাবিক ভাষা-সীমা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলা-বিহার যদি একরাজ্য হয় এবং তাতে এক প্রশাসন ও এক শিল্পাদর্শ স্বীকৃত হয়, তবে তো আর প্রশাসনের খাতিরে বাংলার ভাষা-সীমা না মানার কারণ থাকবে না।

এখানে আমি স্পষ্ট করেই বলে রাখছি, যদি বাংলার স্বাভাবিক ভাষা-সীমাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে আমি বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি অন্য কোনো রকম শর্ত করবার পক্ষপাতী নই। ভাষার বৈশিষ্ট্যেই জাতির ব্যক্তিত্বের পরিচয়, সেই ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি চাই, তাহলে বিনা শর্তেই আমি বন্ধুতা অর্থাৎ সংযুক্তি মেনে নিতে রাজি আছি।

নিজের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি যখন চাই, তখন অন্যের ব্যক্তিত্বকেও মেনে

নিতে হবে। তাই আমি মনে করি, বাংলা-বিহারের সংযুক্তি ঘটাতে হলে ওড়িয়াভাষী অঞ্চল তিনটি (সিংভূম সদর, খরসোয়ান ও সেরাইকেলা) উড়িষ্যাকে ফেরত দিতে হবে। বাংলা দেশ উড়িষ্যার প্রতি অবিচারের অংশ-ভাক হতে পারে না। ওদিকে মৈথিলী ভাষাকেও স্বীকার করা চাই, জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও। কলকাতা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় মৈথিলী ভাষাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও তাকে না মানার কোনো কারণ নেই। জাতীয় সংবিধানে স্থান পায়নি বলেই এই সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষাটিকে অস্বীকার করতে হবে, এমন যুক্তি শ্রদ্ধেয় নয়। অর্থাৎ মিথিলাকে আমি কল্পিত যুক্ত রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্য বলে গণ্য করতে চাই। আর চাই মিথিলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে।

সুতরাং ওই রাজ্যটিকে বাংলা-বিহার যুক্তরাজ্য না বলে বলতে হবে বাংলা-বিহার-মিথিলা যুক্তরাজ্য। এত বড় নামে অসুবিধা হলে 'পেপসু'র মতো একটি সংক্ষিপ্ত নাম উদ্ভাবন করে নেওয়া যেতে পারে—যথা, Mi Bib su। কেবল ভাষার তথা শিক্ষার অধিকার ছাড়া এই তিনটি অঞ্চল বা রাজ্যাঙ্গের জন্য কোনো রকম বিশেষ অধিকারের শর্ত রাখা নিষ্প্রয়োজন। তাতে এই তিন অঞ্চলের মধ্যে কোনোরকম স্বার্থ-সংঘাতেরও অবকাশ থাকবে না। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এলাকা প্রসারিত হবে সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলের উপরে। মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্ষৎ মৈথিলীভাষী এলাকার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর বাকি অঞ্চলটুকু থাকবে বিহারের বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্ষদের তত্ত্বাবধানে। তাহলেই ওই তিন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকবে। অতঃপর প্রশাসনের সর্ববিভাগে তারা নির্ভয়ে ও নিঃশর্তভাবে মিলিত হয়ে একটি শক্তি-শালী যুক্তরাজ্য গঠন করে ভারতরাষ্ট্রকে বল দান করতে পারবে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, এখন না হলেও ভবিষ্যতে উঠবেই। সে প্রশ্ন হচ্ছে ভোজপুরী ভাষার প্রশ্ন। ভোজপুরী ভাষা মাগধী প্রাকৃত ভাষারই সন্ততি এবং সে হিসাবে মৈথিলী ও বাংলার সঙ্গে একগোষ্ঠী-ভুক্ত। ভোজপুরীভাষীরা ক্রমশঃই ভাষা সচেতন তথা আত্মসচেতন হয়ে উঠছে। ভোজপুরী ভাষায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে, মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এমন কি এভাষা সম্বন্ধে গবেষণাও চলছে। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সুধাকর দ্বিবেদী, কবি হরি আওধ (অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়) প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মূলত ভোজপুরীভাষী। এই ভাষা সচেতনতা ভোজপুরীভাষীদের ক্রমশঃই সুসংহত করে তুলছে; তারা আর হিন্দিভাষী বলে পরিচিত হতে চাইছেন না; নিজের মাতৃভাষাকেই তারা প্রতিষ্ঠা দান করতে উৎসুক। তাই তাদের মধ্যে ভোজপুরী-প্রদেশের দাবিও ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। যাঁরা রঘুবংশ নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত 'ভোজপুরী' নামক সুপ্রচারিত মাসিক পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁরাই জানেন, স্বতন্ত্র ভোজপুরী প্রদেশের দাবি কতখানি প্রবল। ভোজপুরী-ভাষীদের সংখ্যাও কম নয়, তাদের নিজেদের হিসাবে অন্তত চার কোটি। তার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, আর সাড়ে তিন কোটি সংহত আছে একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে; এই ভূখণ্ডকেই ভোজপুরী প্রদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র শাখা রাজ্যে পরিণত করা তাদের দাবি। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই ভূখণ্ডটি বর্তমানে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বিভক্ত হয়ে আছে। উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের সাতটি জেলা (বস্তী, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, গাজীপুর, বনারস, মির্জাপুর) এবং বিহারের পশ্চিমাংশের পাঁচটি জেলা (চম্পারণ, সারণ, শাহাবাদ, পালামৌ এবং রাঁচি) নিয়ে এই ভোজপুরী প্রদেশ গঠিত হবে, এই তাদের দাবি। এই প্রদেশের যথার্থ সীমা যাই হক না কেন, এই ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবি যে অসংগত নয় এবং আজ হক, কাল হক, এই দাবি যে প্রবল আকার ধারণ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। আমার বিবেচনায় ভোজপুরীভাষীদের এই ভাষাগত সংহতির দাবিকে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতেই হবে, কেননা, তা ভারত-ইতিহাসেরই বিধান বা স্বাভাবিক পরিণতি। এই সুসংহত একভাষিক জন-সমষ্টিকে দুই রাজ্যে বিভক্ত করে রাখা যে অন্যায়, সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

এর প্রতিকারে কি ব্যবস্থা করা যায়, দেখা যাক। বিহারের পাঁচটি জেলাকে উত্তর প্রদেশে চালান দিয়ে ওই অতিস্ফীত রাজ্যটিকে আর ফাঁপানো যায় না; বস্তুত উত্তর প্রদেশকেই আগ্রা ও অযোধ্যা বা পঞ্চাল ও কোশল নামে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত করার পক্ষে প্রচুর ঐতিহাসিক ও ভাষাগত কারণ রয়েছে, কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তাহলে আর বাকি থাকে আর দুটি উপায়—স্বতন্ত্র ভোজপুরী প্রদেশ গঠন করা অথবা ওই প্রদেশটিকে বিহার রাজ্যের সঙ্গে কিংবা বঙ্গ-বিহার-মিথিলা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। যদি স্বতন্ত্র ভোজপুরী প্রদেশ গঠিত হয়, তবে তার রাজধানী হবে বনারস, অর্থাৎ
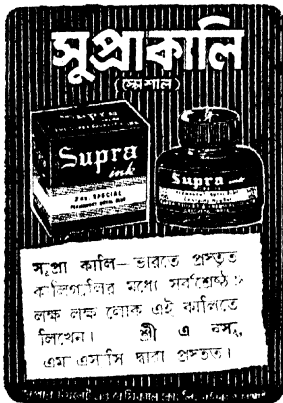
এই প্রদেশটি হবে পুরাকালীন কাশী-রাজ্যের আধুনিক প্রতিনিধি, ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। যদি ভোজপুরী প্রদেশটি বিহার রাজ্যের ভাষাগত অঞ্চলরূপে গণ্য হয়, অর্থাৎ ভোজপুরী-বিহার-মিথিলা যুক্তরাজ্য গঠিত হয়, তবে ধলভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও কিষেণগঞ্জ এই বাংলাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সংগে যুক্ত হলেও উক্ত যুক্তরাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা, ধনসম্পদ ও অন্য-বিধ গৌরব অব্যাহতই থাকবে; বনারস ও পাটনা হবে এই রাজ্যের দুটি প্রধান নগর।

আর ভোজপুরী অঞ্চল যদি বাংলা-বিহার-মিথিলা যুক্তরাজ্যের সংগে মিলিত হয়, তবু বাংলাভাষীর সংখ্যা-গৌরবের হানি ঘটবে বলে আপত্তি করব না। বরং মাগধী প্রাকৃতজাত ভাষাগোষ্ঠী একত্র হল বলে আনন্দবোধই করব। মনে রাখতে হবে, প্রয়াগের পশ্চিমে বারানসী থেকে ভারতের যে পূর্বাংশ, প্রাচীনকালে তা পূর্বদেশ নামে পরিচিত ছিল এবং এই পূর্বদেশের সংস্কৃতিগত একতা বৈদেশিক পর্যটকের দৃষ্টিও এড়াত না। সুতরাং ভোজপুরী, মগধী, মৈথিলী ও বাংলা, এই চারটি সুনির্দিষ্ট ভাষা অঞ্চল নিয়ে একটি নিঃশর্ত যুক্তরাজ্য গঠিত হলেও আপত্তির কারণ নেই। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য যদি অক্ষুন্ন থাকে, তবে প্রশাসনিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিনাশর্তে ও বিনা কুণ্ঠায় সকলের সম-কল্যাণের জন্য যুক্ত হওয়া, তাই তো হল রাজ্য সমবায় নীতির আদর্শ ও লক্ষ্য। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাতে আপত্তি করতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কল্যাণ-বুদ্ধি সর্বত্র সমভাবে প্রকট নয়। এই কল্যাণবুদ্ধির অভাব দেখা যাচ্ছে, প্রধানত ভাষাসীমা স্বীকৃতির বেলায়, বিশেষত হিন্দী ও অ-হিন্দীর সীমা-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। বাংলা ও উড়িষ্যার সীমা নির্ধারণের ব্যাপারই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অথচ বাংলা দেশের পক্ষে এই ভাষাই তার জাতীয় সত্তার একমাত্র ঐক্যসূত্র, তার প্রাণকেন্দ্র। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি—

"বাঙলা দেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সংগে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে, সে তার ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলি। শাসনকর্তারা বাংলা প্রদেশের অংশ প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেননি।...

এই যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে এর সংগে সংগেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান।...এমন দিন ছিল যখন বাঙালী বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত।...আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে।"
—বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮), ৭ম অধ্যায়

বাংলা ভাষা বাঙালিকে মাহাত্ম্য দিয়েছে বটে, কিন্তু তার বিপদ এখনও কাটেনি, বরং আরও ঘনীভূত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থ থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি। তাঁর বক্তব্য বিষয় প্রত্যক্ষত বাংলা ভাষা বিষয়ে না হলেও তাঁর উক্তি আজকের দিনেও সমভাবে প্রযোজ্য।—

"বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চারদিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজ-দরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্ম পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষা প্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নিচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্‌যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে.... শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার ক্ষেত্র এতদূর এগোল যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে।"
—শিক্ষা, শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩)

তৎকালে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উপলক্ষ্য ও লক্ষ্য যাই থাক না কেন, বাংলার বর্তমান দুর্দিনেও যে এই উক্তি স্মরণের সার্থকতা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বহুকাল পূর্বে (১৯১৭) বাংলা ভাষার প্রসংগে বলেছিলেন, "আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙালির ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু" (প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৫৭)। বাংলা ভাষাই যে বাংলা দেশের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন অধিবাসীর সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে তাকে এক করে এক বাঙালি নামে পরিচিত করেছে, রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই বাংলা ভাষাও আজ বিপদের সম্মুখীন। পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার উপরে ঝুলছে উর্দুর খাঁড়া, আর পশ্চিমবঙ্গে ঝুলছে হিন্দীর খাঁড়া। একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবার দাবিতে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী যে বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উপরে আশংকার ছায়াপাত করেছিল, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক করে গেছেন—

"হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের

প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে,—সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ্ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে-নিয়ে-আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্তজয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেইদিন য়ুরোপের বড়দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

—বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮), ৮ম অধ্যায়

যেদিন হিন্দি, ভোজপুরী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলি আপন আপন বিশেষ পরিণতির দিকে সমতালে অগ্রসর হতে থাকবে, সেদিনই হবে আমাদের বড়দিন। কিন্তু তার বদলে যদি হিন্দির প্লাবনে ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যকে ডুবিয়ে দিয়ে একাকার বা নিরাকার সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়, তাহলে দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী।

প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্দিষ্ট পরিণতির পথে এগোলেই আমাদের কল্যাণ, বিপরীত পথে চলবার চেষ্টা করলে সংঘাত ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় ইতিহাসের তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

"ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত।"

—ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০৯)

বাংলা ও বিহারের মিলনসাধন সমস্যার মীমাংসার বেলায় আমরা যেন ভারতীয় ইতিহাসের এই রহস্য ও শিক্ষার কথা না ভুলি। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের মধ্যে শুভ বুদ্ধির সংযুক্তি ঘটুক। সে সংযুক্তি ঘটতে পারে দুই রকমে। এক, বিহার ও পশ্চিম বাঙ্গলার পূর্ণ সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়ে উভয়কে তাদের পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত রেখেই তাদের মধ্যে সৌভ্রাত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করা। দুই, উভয়ের পূর্ণ সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নিঃশর্তভাবে এক শাসনের ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করা। এই দুই উপায়েই সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিম বাংলার (তথা মিথিলা, বিহার এবং উড়িষ্যারও) পূর্ণ সত্তা অর্থাৎ ভাষাধিকারের সীমাকে অকুণ্ঠভাবে মেনে নেওয়া চাই। কেননা, সত্তাহীন মিলন বিলয়েরই নামান্তর। পক্ষান্তরে সশর্ত মিলন, সশস্ত্র সংঘর্ষের সশঙ্ক আয়োজনমাত্র। সুতরাং শর্তহীন মিলনই চাই। কিন্তু শর্ত না চাইলেও স্ব-ত্ব অবশ্যই চাই। স্ব-ত্ব বাঁচালে স্বত্বও বাঁচবে। অন্যথায় অর্থাৎ নিরাকার বা একাকার মিলনের ফলে বাঙালীকে সর্বার্থেই স্বত্বহীন হতে হবে শত শর্ত সত্ত্বেও। অথচ একশ্রেণীর বাঙালীকে আজ এই সত্তাহীন অথচ শর্তময় মিলনের ঝোঁকই পেয়ে বসেছে। মহাপঞ্জাবের পঞ্জাবি ও হিন্দির আঞ্চলিক সত্তা-সংরক্ষিত সংযুক্তির দৃষ্টান্ত দেখেও তাদের চোখ ফুটছে না। তারা ভারতবর্ষের কাছে ঐক্যের আদর্শ স্থাপনের মহৎ ব্রত ধারণ করেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। স্ব-ত্বহীন মিলন মানে যে আত্মবিলয় এবং ভারতবর্ষ যদি এই একাকারত্বের আদর্শ কখনও গ্রহণ করে, তবে তাকে প্রলয়পয়োধিজল থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। ভারতবিধাতা আজ ভারতবর্ষের দিকে দিকে গুজরাট, মারাঠা, কর্ণাট, কেরল, অন্ধ্র, উৎকল প্রভৃতি সমস্ত জনপদেই উজ্জ্বল করে ভাষার প্রদীপ জ্বেলে সহস্র উৎসবের ইতিহাসের পরিণতিস্বরূপে যে মহান দীপালি উৎসবের আয়োজন করেছেন, পশ্চিম বাংলা যদি তার ভাষার স্ব-ত্ব ত্যাগ করে একটি প্রদীপ নিবিয়ে দেয়, তাহলে যে, সমস্ত ভারতবর্ষের উৎসবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ এক শ্রেণীর বাঙালীকে আজ সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে। একরকম মানসিক রোগ আছে, যার প্রভাবে পড়লে মানুষ কিছুতেই আত্মহত্যার ঝোঁক সামলাতে পারে না। সেরকম ঝোঁক আজ ব্যাপকভাবেই দেশে দেখা দিয়েছে। বাংলা দেশে ছিন্নমস্তার উপাসকের অভাব কোনো দিনই ঘটেনি। বহুকাল পূর্বে একবার "একদল আত্মহারা বাঙালি স্ব-ধর্ম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন" দেখে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

"বাঙালি যদি তার স্বধর্ম হারায় তাতে যে শুধু বাংলার ক্ষতি তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে।"

— (প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০)

এর উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, বাঙালীর স্বধর্ম বলতে আজকের দিনে তার ভাষার সত্তা তথা জাতীয় সত্তা দুই-ই বোঝাচ্ছে।

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা
শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ
জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

॥২০॥

লাসাতে আমরা দালাই লামার সঙ্গে দেখা করলাম। একবার নয়। দু' দুবার। এইটেই হলো ওখানে আমাদের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ। পোটালা প্রাসাদে পেঁছিতেই, আমাদের ঘরের পর ঘর, আর বারান্দার পর বারান্দার মধ্য দিয়ে হাজির করা হল তাঁর খাস মহলে। দলাই লামাকে দেখলাম। যদিও তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর, এক বালক মাত্র, তবুও তাঁর মহত্ত্ব কত গভীর, তাঁর আকর্ষণ কত না তীব্র। তাঁর সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে মাথা নত করে বসতে হয়। এই রীতি। কেউ তাঁর চোখাচোখি চাইতে পারে না। তুচ্চি সাহেব পুরানো বন্ধু। তাই শুধু শ্রদ্ধা জানানোই নয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবারও অনুমতি সাহেব পেলেন। ওদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা চললো। আমার কপাল ভাল, ওদের সে আলোচনার সময় আমাকেও সেখানে থাকতে দেওয়া হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও'দের দুজনকে শুধু লক্ষ্য করে গেলাম। ও'দের কথাবার্তাও মন দিয়ে শুনলাম। কথার পালা সাঙ্গ হলে দলাই লামা আমাদের আশীর্বাদ করলেন। আমার হৃদয় পূর্ণ হল। পোটালা প্রাসাদ যখন ছেড়ে আসি তখন বারবার করে মনে পড়ছিল বাবার কথা, মা'র কথা। আর আঙ্-লাহ্মুর মা'র কথাও।

একটু আগে আমি দলাই লামার কথা বললাম। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। তাহলে হয়ত বুঝতে একটু সুবিধে হবে। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের একচ্ছত্র নায়ক এই দলাই লামা। সেখানকার লোক কিন্তু তাঁকে এই নামে ডাকে না। তারা তাঁকে বলে—গ্যাল্‌ওয়া রিম্‌পোচে। গ্যাল্‌ওয়া মানে 'যিনি জয় করেন' কিংবা 'যিনি প্রভুত্ব করেন'। অর্থাৎ ঈশ্বর বা বুদ্ধ। রিম্‌পোচে মানে 'পুণ্যাত্মা'। কখনও কখনও শেষের এই বিশেষণটা প্রধান প্রধান অন্য লামাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হয়। কিন্তু গ্যালওয়া, সে আর কারোর জন্য নয়, শুধু সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির জন্য। যিনি নরদেহে ভগবান,

যে তিব্বতীর কোন ধারণা নেই, সে বুঝতেই পারবে না, দলাই লামা কে। তার কাছে তার নায়কের একটাই মাত্র নাম আছে। আর তা হলো গ্যাল্‌ওয়া রিম্‌পোচে। তিনি অমূল্য রতন। তিনিই বুদ্ধ।

লাসাতে দুজন বিদেশীর সঙ্গেও দেখা হল। তারা জার্মান। হেইন্‌রিক্ হারার্ আর পিটার অফ্‌স্‌নেটার্। ১৯৩৯ সালে নাঙ্গা পর্বত অভিযানে ওরা এসেছিলেন। এর মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় আর ওদেরকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশরা ভারতে অন্তরীণ করে রাখে। কিন্তু ও'রা আটকা থাকবার মত পাত্র নন। পালাবার ফিকিরে থাকেন। তারপর একদিন অসম সাহসের সঙ্গে হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে উপস্থিত হন। সাহেব-দের লাসায় থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়। এসব কথা হারার সাহেব লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'তিব্বতে সাত বছর।' তার মধ্যেই এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। আমার সঙ্গে যখন তাঁদের দেখা হয় তখন তাঁরা লাসাতেই আছেন। তিব্বতকে তাঁরা ভালও বাসেন। সেখানে

থাকতেও চান। কিন্তু ও'দের দেখে মনে হল বাইরের খবরাখবর কিছু জানতে না পারায় ও'রা যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন। হারার্ সাহেব বিশেষ করে জানতে চাইছিলেন পাহাড়ে চড়ার খবরাখবর। যা জানি, বললাম। শুনে সাহেব বললেন, 'তেনজিং, তোমার কপাল খুব ভাল। তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। যে পাহাড়ে খুশি উঠতে পারো। সুন্দর সব অভি-যানের সঙ্গী হতে পারো। আর আমি? দেখ, কেমন বন্দী হয়ে আছি। যুদ্ধবন্দী। এখনও প্রায় সেই বন্দীই। হয়ত আর কখনই পাহাড়ে চড়তে পারবো না।' সাহেব সহসা মৃদু হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি আর আমি, হয়ত একটা পাহাড়ে উঠতেও পারি। চলনা যাই, বেরিয়ে পড়ি। কি বল?' তারপর কিছুক্ষণ আমাদের সলা পরামর্শ চললো। বেশ গভীরভাবেই। কিন্তু কত যে সমস্যা, কত যে বাধাবিপত্তি, তার আর ইয়ত্তা নাই। তার কিছু পরেই আমি লাসা ছেড়ে চলে গেলাম। অবশ্য কয়েক বছর পরেই দার্জিলিঙেই হারার্ সাহেবের সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো। কম্যু-নিস্টরা তখন তিব্বত দখল করে নিয়েছে। দলাই লামা ভারতে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। সাহেব তাঁর সঙ্গে তিব্বতের সীমান্ত শহর ইয়াটুঙ্ পর্যন্ত এসেছিলেন। এখানে এসে দলাই লামা তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। ফিরে গেলেন লাসায়। আর সাহেব একাকী চলে এলেন দার্জিলিঙে। এই সাত বছরে তিব্বতকে তিনি গভীরভাবেই ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিব্বত ছেড়ে আসতে তাঁর খুবই ব্যথা লেগেছিল। হয়ত আর কখনও সেখানে ফিরতেই পারবেন না।

তুচ্চি সাহেবের সঙ্গে আমি লাসায় একমাস থাকলাম। আরপর আবার এক-দিন আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আর সাত-মাস ধরে ঘুরলাম সমস্ত তিব্বতে। সাহেবের মতলব ছিল, তিনি পূর্বদিকে একেবারে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত যাবেন।

শিক্ষা দেওয়ার মত এমন এক পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করার সুযোগ খুব বেশী লোক পায় বলে তো আমার মনে হয় না। স্কুল কলেজে পড়লেও এ বিদ্যে পাওয়া যায় না।

টাকাপয়সার ঝামেলায় তুচ্চি সাহেব বড় কাবু হয়ে পড়েন। ওসব ঝামেলা তাঁর সহ্য হয় না। তাই ক্রমেই ও ঝামেলা তিনি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে থাকেন। শুধু তাই নয় তিনি আমার উপর আরও নানা কাজ ছেড়ে দিতে লাগলেন। কোনো এক জায়গায় তিনি হয়ত কাজে আটকা পড়লেন। তখন আমাকে একাই পাঠিয়ে দিতেন অন্য কোন মঠে। তিব্বতী ভাষায় চিঠি লিখে তিনি কি চান তা বলে দিতেন আর তা যদি সেখানে থাকে তো তাঁর হয়ে দরদস্তুর করে সে সব জিনিস সংগ্রহ করে আনতে বলতেন। আমি আনতামও। তাই লামারা আমার নাম দিয়েছিলেন 'নিয়েবালা'। ম্যানেজার। তুচ্চি সাহেবের দালাল। আর এসব কাজ করে আমারও এত জ্ঞান জন্মাল যে, আমার ক্ষমতা থাকলে তিব্বতের মঠ সম্পর্কে একখানা কেতাবই লিখে ফেলতে পারতাম। সাহেব যা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন তাতে আমাদের বাক্স, প্যাটরা সব ভরে উঠতে লাগল। এমন কি আমারও একটা ছোট খাট সংগ্রহ দাঁড়িয়ে গেল। যা কিছু প্রাচীন, যা দুষ্প্রাপ্য, যা একটু অদ্ভুত ধরনের তার প্রতি আমার নিজেরও একটা আকর্ষণ ছিল। আর যে সুযোগ এবার আমি পেয়েছি তেমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। আজ আমার দার্জিলিঙের বাড়িতে যে সব মুখোশ, তলোয়ার, মাথার টুপি, গলাবন্ধ, পাত্র আর প্রার্থনাচক্র সাজিয়ে রেখেছি সে সবই আমার এইবারের স্মৃতিচিহ্ন। এই যাত্রাতেই সেগুলো সংগ্রহ করে এনেছিলাম।

পোটালা প্রাসাদ। এখানে দলাই লামা থাকেন

কিন্তু তা সম্ভব হল না। কারণ ততদিনে কমুনিস্টরা সে সব অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছেন। তাই তুচ্চি সাহেবের মত লোকও, যিনি ডরডর কাকে বলে জানেন না, সেদিকে গিয়ে আর গোলমালে জড়িয়ে পড়তে চাইলেন না। তার বদলে আমরা তিব্বতের অন্যান্য অংশ একেবারে চষে বেড়ালাম। মধ্য এশিয়ায় যে এত শহর আছে, এত মঠ আছে, এত তীর্থ আছে তা ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। তুচ্চি সাহেবের কল্যাণে সে সব দেখা হয়ে গেল। আমার এই যাত্রার আর তুলনা হয় না। বৌদ্ধদের প্রিয় তীর্থগুলো দেখেছি বলেই শুধু নয়, এমন একজনের সঙ্গে দেখেছি যিনি তাদের আদ্যনাড়ীর খবর জানেন। তাঁর কাছ থেকে আমিও সব জেনে নিয়েছি। মাসের পর মাস ধরে

কিন্তু সব থেকে যা বড় পুরস্কার, কি তুচ্চি সাহেবের কি আমার, তা আমরা পেলাম এই যাত্রার একেবারে শেষ দিকে। এরই জন্যে তুচ্চি সাহেবকে বার বার আটবার তিব্বতে আসতে হয়েছে। গোটা দেশটাকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে হয়েছে। সেটা হল একখানা পুঁথি। ভূর্জপত্রের উপর সংস্কৃত ভাষায় লেখা। প্রায় দু' হাজার

বছর তার বয়স। পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, এ পুঁথির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এতাবৎ কেউই তা খুঁজে পাননি। তুচ্চি সাহেবের মতে তুর্কীস্থানে যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, পুঁথিখানা তখন লেখা হয় সেখানে। তারপর বহু বছর আগে তা তিব্বতে চলে আসে আর আশ্রয় পায় এক সুপ্রাচীন মঠে। সেই মঠের নাম ঘণ্‌গর্‌। অনেক পড়াশুনো করে, বহু গবেষণা করে তুচ্চি সাহেব এই সিদ্ধান্তে পেৌঁছে ছিলেন। তাই আমরা ঘণ্‌গরে পেৌঁছলাম। আর তারপর চলল আমাদের খোঁজাখুঁজি। কাজটা মোটেই সোজা নয়। দেখলাম সেখানকার লামারাও এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর সেই মঠে হাজার হাজার পুঁথি গাদা করা রয়েছে। দিনের পর দিন কেটে গেল। আমরা খুঁজেই চলেছি। আমাদের সারা গা ধুলোয় ধুলোয় ভরে গেল, ছেঁড়া মাকড়সার জালে বহুবার ঢাকা পড়ে গেলাম। আমি খুব দমেও গেলাম। আমি ভাবলাম হয়ত সে পুঁথি এখানে নেই, থাকলেও তা খুঁজে বের করা আমাদের সাধ্য নয়।

কিন্তু তুচ্চি সাহেব হাল ছেড়ে দেবার লোক নন। তাই আমাদের খোঁজায় ছেদ পড়লো না। কোন কাজে একবার যদি তুচ্চি সাহেবের মন বসে যায় তাহলে আর কোনদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না। বেজায় অন্যমনস্ক হয়ে যান। একদিন সকালে দেখি সাহেব তাঁর শার্টটাকে প্যাণ্টের মধ্যে গুঁজতে ভুলে গেছেন। আমি তাঁকে বললাম, "এতো শুভ লক্ষণ। যা খুঁজছি তা হয়ত আজ পেয়ে যাব।" আর সত্যিই তা পেয়ে গেলাম। আর আমিই তা বের করলাম। অনেক পুঁথিপত্রের কবরের ভেতর থেকে সেই জরাজীর্ণ ধূলি ধূসরিত পুঁথিটাকে টেনে বের করেছিলাম। তুচ্চি সাহেব এত সুন্দরভাবে তার বর্ণনা দিয়ে ছিলেন যে, সেটা দেখা মাত্র চিনে ফেললাম। তুচ্চি সাহেবকে সেটা যখন দেখালাম তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

হারার সাহেব (ডান দিকে) দলাই লামার ভাই-এর সংগে বরফের উপর স্কেটিং খেলছেন

তিনি যেন সোনা কি হীরের খনিই একটা পেয়ে গেছেন।

আর আমিও আমার এক পুরস্কার জোগাড় করে ফেললাম। সেটাও কিন্তু সোনা নয়, মনি রত্ন নয় এমন কি দুর্লভ কোনো পুঁথিও নয়, কুকুর। আমি খুব জীবজানোয়ার ভালোবাসি। এখানে লামাদের মধ্যে দেখি দুটো

তিব্বতী লামাদের রাম শিঙা

দলাই লামা আশ্রয় নিতে ভারতে চলেছেন

ঝুমড়ো-চুলো লাসা টেরিয়ার, কুকুর দুটো আমার এত পছন্দ হলো যে আমি সে দুটো চাইলাম। লামারা লোক বড় দয়ালু। তাঁদের হাতও বেশ দরাজ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সে দুটো আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি তাদের একটার নাম দিলাম ঘুঙ্গরু। এই মঠের নামে। আর একটার নাম দিলাম তাসাঙ্‌। তারপর দুটোকে দার্জিলিং নিয়ে এলাম। তাসাঙটাকে পরে আমি আমার বন্ধু আঙলারকেকে দিয়ে যাই। ঘুঙরু আমার কাছেই আছে। আঙলাহমুর সঙ্গে সঙ্গে সেও আমার ঘরসংসার তদারক করে বেড়ায়। আমি একটা মাদী লামা টেরিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছি। তার ছানা পোনায় আমার বাড়ি দিব্যি ভরে উঠেছে। কিন্তু ঘুঙ্গর তাতেও সুখী নয়। তুঙ্‌সুঙ্‌ বস্তীতে যত কুকুরের বাচ্চা ঘুরে বেড়ায় তার আদ্দেকই হচ্ছে হয় ঘুঙ্গরের ছেলে-পুলে আর নাহয় তার নাতিনাতনী।

লামারা কিন্তু সেই সংস্কৃত পুঁথিটার জন্য তুচ্চি সাহেবের কাছ থেকে কোন টাকাকড়ি নেননি। তাঁরা বলেন, জ্ঞান বিক্রীর জন্য নয়। যে চায়, তাকে অমনিই দিয়ে দাও। তাঁরা শুধু বললেন, সাহেব ইতালীতে ফিরে গিয়ে এই পুঁথির একটা নকল রেখে আসলটা যেন তাঁদের ফিরিয়ে দেন। আমরা সেই জায়গা ছেড়ে চলে আসবার আগে সাহেব অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মঠের জন্য পাঁচশো টাকা দিয়ে এলেন।

তিব্বতে এবারে আমাদের অনেক-দিন কাটলো। তুচ্চি সাহেবের শক্ত শক্ত তোরঙ্গগুলো নানারকম দুর্লভ জিনিসে ঠাসা। সাহেব খুব খুশী। তাঁর এই যাত্রা সফল হয়েছে। তাই আবার আমরা দক্ষিণ-মুখো রওনা দিলাম। উঁচু উঁচু গিরিপথ-গুলো পেরিয়ে আবার ঢুকে পড়লাম সিকিমে। ভারতে। যদিও এটা তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই যাত্রাতেই হয়ত বা আমার তিব্বত যাত্রা শেষ হলো। কারণ তার কিছু পরেই তিব্বত কম্যুনিস্ট অধিকারে এসে গেল। আর তিব্বত একেই নিষিদ্ধ দেশ, তার উপর আবার এখন পড়ল আরও কড়া প্রাচীরের আড়াল। শেরপা হিসাবে আমি হয়ত এখান থেকে শোলো খুম্বু গিয়ে সেখান থেকে ভারবাহী পশুর দলের সঙ্গে লাঙ্‌পা লা ডিঙিয়ে তিব্বতে যেতে পারি। সে পথ এখনও খোলা আছে। কিন্তু এখন আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাই যদি যেতে হয় তো সাহেবদের মতো ছদ্মবেশেই যেতে হবে। না হলে হয়ত ওরা আমাকে সন্দেহ করবে। হয়ত বা ফিরিয়েই দেবে।

কিন্তু এখনও অনেক সময় পড়ে আছে, যদি আবার যেতে পারি তো খুশী হব। কৃতজ্ঞ থাকব। ঘুঙ্গর আমাকে তিব্বতের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানকার সুন্দর সুন্দর দামী যে সব জিনিস আমার বাড়িতে আছে তারা আমাকে সেখানকার কথা ভুলতে দেয় না। আরও অনেক স্মৃতি সতত আমার মনে ভাসে। সেই লাসার, পোটালার সেই প্রাসাদের। দলাই লামার। তাঁর আশীর্বাদের। সেই সব পুণ্যতীর্থগুলোর। পাহাড়ের কোলে কোলে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নির্জন সব মন্দিরগুলোর। সব কথা, সব স্মৃতি ভিড় করে আসে। সেই পুণ্যভূমিতে আমার আপনার জনদের জন্য আমার সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রার কথা অক্ষয় হয়ে আছে আমার মনে। এখনও যেন দেখি পত্‌পত্‌ করে প্রার্থনা পতাকাগুলো উড়ছে। এখনও যেন শুনি প্রার্থনাচক্রগুলো ঘর্ঘর করে ঘুরতে ঘুরতে বলছে, ওঁ মণিপদ্মে হুম্‌ ......ওঁ মণি পদ্মে হুম্‌......

(ক্রমশ)

ঋণ

অশোক বসু

সন্ধেবেলায় গলির চায়ের দোকানে চা খেতে এসেছিলাম। সেইখানেই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম দেখা। গোলগাল মুখখানা। নিখুঁত করে দাড়ি গোঁফ কামানো, চোখে চশমা। পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে বয়েস। হৃষ্টপুষ্ট, সহজ, নিরীহ ভালমানুষ গোছের চেহারা। এক কাপ চায়ের সঙ্গে বসে বসে সকাল বেলার দৈনিক কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন। খানিক পরে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে এ পকেট ও পকেট হাতড়ে অবশেষে আমার দিকে চাইলেনঃ দেশলাই আছে দাদার কাছে?

পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। সিগারেটটা ধরিয়ে পরম স্বস্তির সঙ্গে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি বললেন, কাছকাছি কোথাও থাকেন বুঝি?

ভেবেছিলাম অন্য কাউকে বলছেন। কিন্তু চোখ ফেরাতে গিয়ে দেখলাম তিনি আমার দিকেই চেয়ে আছেন। বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই পনরো নম্বরে—

পনরো নম্বর? ওটাতো একটা মেস—

ওই মেসে থাকি আমি।

তিনি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আমার হাতে একটা বই ছিল, হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়ল তাঁর। দেখি দেখি, কি বই ওটা?

বইটা তাঁর হাতে দিলাম। কয়েকটা পাতা উলটিয়ে দেখলেন তিনি। মাঝামাঝি একটা জায়গায় পড়লেনও একটু। তারপর কি যেন মনে হতে লেখকের নাম দেখলেন, দেখে ভ্রূ কুঁচকালেন। হুঁ, ছোকরা রাইটার! তা বইটা কেমন পড়লেন?—তিনি জিজ্ঞাসু মুখটা তুলে আমার দিকে চাইলেন।

বললাম, সবে নিয়ে যাচ্ছি, এখনো পড়িনি।

বইটা বন্ধ করে আমার হাতে ফেরত দিয়ে তিনি বললেন, তা নাটক আর নভেল যাই বলুন না কেন, সে রকম বই আজকাল আর চোখে পড়ে না। কি যেন বলে, ওই শরৎ চাটুজ্যে আর রবি ঠাকুরই দু কলম যা লিখে গেছেন। তারপর আজকাল তেমন আর—কি বলেন য়্যাঁ?

সৌজন্যটা বজায় রাখতে নিঃশব্দে হাসলাম।

কিছুকাল চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, আমি অবশ্যি বইটই বড় একটা পড়ি না। বুঝলেন না, উনিই পড়েন আর এ সব ওনারই কথা। তিনি হাসিমুখে স্ত্রীর মতামতটা নিজের পক্ষে কবুল করলেন।

সেই থেকেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। নাম বললেন পরিমল চক্রবর্তী। এই গলিতেই থাকেন। ওই তো চার নম্বর বাড়িটা। কাজ করেন কি একটা সওদাগরী অফিসে। বললেন যে তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আমার পায়ের ধুলো পড়লে তিনি সুখী হবেন।

সম্মতি জানিয়ে বললাম, যাব বই কি, যাব, কিন্তু আপনিও মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাবেন।

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, যাব না মানে? একশ' বার যাব। আপনি আমার এখানে আসবেন, আমি আপনার ওখানে যাব, ডিভিশন অব্ লেবর্—কি বলেন য়্যাঁ?

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

আমার অবশ্য যাওয়া হলো না, কিন্তু তিনি, পরিমলবাবু, সত্যিই দুদিন পরে এক সন্ধ্যেবেলায় আমার মেসের ঘরে গিয়ে হাজির। বললেন, দেখলেন তো, কথাটা ঠিক রাখতে পেরেছি কিনা!

সন্ধ্যেবেলায় একলা একলা শুয়েছিলাম। এ সময় ভদ্রলোকের সান্নিধ্যটুকু মন্দ লাগল না।

আসুন, আসুন, বসুন। তারপর, কি খবর?

আর খবর! তক্তাপোশের ওপর বসে পড়ে তিনি বললেন, খবর অতি গুরুতর মশাই। দু দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে যে আপনার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের

আলাপ করব, তার কি জো আছে? এই ধরুন না, এক্ষুনি ছুটতে হবে কাঁহা মুল্লুক, সেই চেতলায়। চেতলা কি চাট্টিখানি রাস্তা মশাই?

হঠাৎ চেতলায়? পরিমলবাবুর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

আরে মশায়, হঠাৎ নয়। বেশ কয়েকদিন ধরে উনি বলছেন। একটা গরমজামা বুনবেন, তারই প্যাটার্ন আনতে ওনার খুড়তুতো বোনের কাছে চেতলায় ছোটো। গরীবের দুর্দশাটা একবার বিচার করুন স্যার!

হাসিমুখে বললাম, বেশ তো, তা গেলেনই না হয়।

পরিমলবাবুও হেসে ফেললেন। অবশ্যি এর মধ্যে আমারও যে একটু ইণ্টারেস্ট্ নেই, তা কেমন করে বলি বলুন। ইয়ে, মানে সোয়েটারটা তিনি আমারই জন্যে বুনছেন কিনা।

মাথা দুলিয়ে তিনি অনেকক্ষণ হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, চা খাবেন?

চা? তা চা একটু চললেও চলতে পারে। অবশ্যি বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছি। তা আপনি যখন বলছেন—

চা খেতে খেতে আরও গল্প হলো। পরিমলবাবু বললেন, আপনাকে কিন্তু এ সময় মেসে পাব বলে আশা করি নি। বাইরে কোথায়ও বেরুলেন না?

বললাম, কোথায় আর বেরুই বলুন? সারাদিন খেটেখুটে মেসে এসে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না।

ঠিক, ঠিক কথা। অফিস থেকে ফিরে এসে কারো বেরুতে ইচ্ছে করে? কিন্তু আমার হলো গিয়ে অন্য ব্যাপার। বলে মুখ বেজার করবার চেষ্টা করলেন পরিমলবাবু। কিন্তু পারলেন না, ফের হেসে ফেললেনঃ বুঝলেন না, বিয়ে করলে আপনিও চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না। পারতেন?

আরও গল্প হলো। আরও কিছুক্ষণ পরে পরিমলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি এবার যাই তবে। অনেক দেরি করে ফেললাম। তাছাড়া—বুঝলেন না—দেরি করে ফিরলে উনি আবার রাগ করতে পারেন।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম পরিমলবাবুকে। বললাম, বেশ তো এমনি আসবেন মাঝে মাঝে।

এলামই তো আজ। এখন আপনার যাওয়াটাই যা—

যাব, যাব, ব্যস্ত কি!

পরিমলবাবুর পত্নীভাগ্য ভাল, না ওঁর স্ত্রীর স্বামিভাগ্য ভাল, সে কথাটা আমি ভেবেছি। ভেবেছি আর ভেবে ভেবে ভাবনার কোন কূলকিনারা পাইনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে খুবই সত্যি যে স্ত্রীকে পরিমলবাবু খুবই ভালবাসেন। আর ভালবাসেন বলেই স্ত্রীর আলোচনায় বেশী আনন্দ পান। এর পরে আরও অনেকদিন পরিমলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, গল্পগুজব হয়েছে। স্ত্রী-প্রসঙ্গেই তিনি বেশী গল্প করেছেন। প্রতিটি কথার মধ্যে স্ত্রীর প্রভাবটা সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করেছি আমি।

একদিন এসে বললেন, শুনুন কথা, আমি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছি!

পরিমলবাবুর নধর দেহটার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। অত্যধিক স্থূল অবশ্য তিনি নন, তবে তিনি যে রোগা হয়ে যাচ্ছেন একথা কেমন করে বলি। ও'র সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের। আগে কেমন ছিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা এখন রোগা হয়ে গেছেন কিনা জানি না—তবে আমার মনে হল, নিন্দুকে যা-ই বলুক না কেন, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি এখনও বাহাল তবিয়তেই আছেন।

বসতে বসতে পরিমলবাবু বললেন, আচ্ছা আপনিই বলুন না কেন, সত্যিই কি আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি?

না না, রোগা হতে যাবেন কেন? দিব্যি আছেন। আমি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি।

দেখুন দেখি, মিছেমিছি এ সমস্ত কথা বলে ভয় পাইয়ে দেওয়া অন্যায় নয়?

ভীষণ অন্যায়। কিন্তু এ সমস্ত কে বলে?

কে আবার, উনিই বলেন। বলেন যে খেটে খেটে আমি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছি! দেখুন তো?

হাসিমুখে একটু চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, তা উনি যখন বলেছেন, মানে, উনি আপনাকে খুব ভালবাসেন বলেই বোধ হয় এ সব কথা বলেছেন। নয় কি?

মাথা নীচু করে লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন পরিমলবাবু। ক্ষণকাল কি

ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে হ্যাঁ, উনি আমার শরীরের দিকে একটু নজর রাখেন বই কি। কিসে আমি সুখী হই, কিসে আমি ভাল থাকি, কিসে কি হয়—এই চিন্তাই উনি সব সময় করেন কি না!

এর পরে পরিমলবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ হলো। কেননা পরিমলবাবুর এ ধরনের কথাবার্তায় আমি মোটেই বিরক্ত হতাম না, বরং তাঁর অকৃত্রিম সারল্যে আমি খুশীই হতাম। আর আমি খুশী হতাম বলেই পরিমলবাবু তাঁর মনের সব কথাই অকপটে আমার কাছে বলতে পারতেন। মোটেই কুণ্ঠিত হতেন না আমার সামনে তাঁর সহজ অন্তরটাকে প্রকাশ করতে। আর সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের এতদিন পরেও অমন অটুট ভালবাসা আমি খুব কমই দেখেছি। পরিমলবাবুকে দেখলেই আত্মপ্রসাদে টইটুম্বুর একখানি স্মিত-মুখ দেখতে পেতাম। পরিচয় ঘটত একখানি অনাড়ম্বর, অমায়িক হৃদয়ের সঙ্গে।

সেদিন ছিল শনিবার। বিকেলের উজ্জ্বল নীল আকাশে সজল কালো প্রগাঢ় মেঘ এসে ভিড় জমালো। ভিড় জমালো আর সূর্যের সমস্ত রং মুছে দিয়ে নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে গেল সমস্ত আকাশে। তারপর সেই ভারাক্রান্ত বিকেলে নামলো অঝোর বৃষ্টি। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। ছায়াগলি ঝাপসা করে তাথই তাথই জল পড়ল, মেঘ ডাকল, অন্ধকার হলো চারধার। মেসের আর সবাই কেউ তাসের আড্ডায়, কেউ খোশ-গল্পের মজলিসে গুলজার হয়ে বসল। আমি একটু অন্যরকম মানুষ। চিরকালের দলছাড়া। তবু সেই বর্ষামুখর মেঘমলিন বিকেলে বিহ্বল হয়ে উঠল আমার মন। কর্মব্যস্ত জীবনের এই মেদুর অবকাশটুকু রোমাঞ্চিত করতে কি করবো তাই ভাবছিলাম, এমন সময় ভেজা ছাতাটা দরজার বাইরে বন্ধ করে রেখে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন পরিমলবাবু। ভাবলাম ভালই হলো। কিন্তু এসেই অন্যান্য দিনের মত হাসলেন না, কিংবা হাসিমুখে কিছু বললেনও না পরিমলবাবু। বিছানার ওপর বসে গম্ভীরমুখে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

আমি বললাম, কি হলো পরিমলবাবু, চুপচাপ?

মুখ ফিরিয়ে বিরস-মুখে পরিমলবাবু বললেন, দূর মশাই, সংসার-ফংসার আর ভালো লাগে না ছাই। ইচ্ছে করে যে দিক খুশি চলে যাই। এদিক থেকে আপনারাই ভাল আছেন।

হঠাৎ সংসারের ওপর এই বিরাগ? আমি হাসলাম।

নয়তো কি অনুরাগ হবে মশাই? জ্বলেপুড়ে একশেষ হলাম। জানেন কাল থেকে কিছু খাইনি?

সে কি!

অবশ্যি খাব না কেন, খেয়েছি। খেয়েছি, তবে বাড়িতে নয়, রাস্তার দোকানে। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। বুঝলেন না, দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দীর্ঘ পরিচয়ের পর এই প্রথমবার পরিমলবাবু তাঁর কথার সুর পাল্টালেন। একদিন সংসার মধুময় বলে প্রতিভাত হয়েছিল,

আজ মন্থন শেষে উঠেছে বিষ। সেই বিষে আকণ্ঠ ভরে গেছে পরিমলবাবুর। সেই কথাই ভাবলাম আমি।

আহা, কি হয়েছে শুনিই না? আমি বললাম।

একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, নিজে ধরালেন, তারপর পরিমলবাবু রসিয়ে রসিয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বললেন। অবশ্য আমি যতখানি ভেবেছিলাম তেমন মারাত্মক কিছুই নয়। পারিবারিক জীবনের সেই অনিবার্য ঘটনা, দাম্পত্য কলহ।

সিনেমা দেখা নিয়েই কথান্তর। তারপর কলহ।

কথা ছিল পরিমলবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে দুজনে মিলে সিনেমায় যাবেন। পরিমলবাবুর স্ত্রীর আবার ওই একটা বাতিক—ফি সপ্তাহে সিনেমা দেখবেন। যা হোক, স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকতে বলে তো অফিসে গেলেন পরিমলবাবু। কিন্তু ফ্যাকড়া বাধল ওই অফিসেই। এমনি কপাল, ঠিক সেইদিনই বড়বাবু তলব করলেন পরিমলবাবুকে। এ ফাইল দেখলেন, ও ফাইল দেখলেন, কাজকর্ম ঠিক মত চলছে কি না দেখলেন। উঠতে উঠতে সন্ধে পার। বাড়িতে ফিরলেন যখন তখন সাতটা বেজে গেছে।

সব শুনে পরিমলবাবুর স্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, জানি জানি, ঠিক সময় বুঝেই তোমার কাজের চাপ পড়বে।

কি মুশকিল, আমি তার কি করবো বল? স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন পরিমলবাবু।

যাও যাও, সব জানা আছে—স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে নেন।

একেই সারাদিন খাটুনি গেছে অফিসে, তারপর বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর অকারণ অভিমান—পরিমলবাবুর ভাল লাগল না। তবু সংযতকণ্ঠে বললেন, তুমি কিন্তু মিছেমিছি রাগ করছো। আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করেছি? বেশ তো আজ হলো না, অন্যদিন যাওয়া যাবে।

স্ত্রী কোন উত্তর না দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। পরিবেশটা লঘু করতে পরিমলবাবু হাসলেন। হেসে বললেন, ভাগ্যিস আগে থাকতে টিকিটটা কিনি নি, নইলে পয়সাগুলোই নষ্ট হতো। তাই না?

ফোঁস করে উঠলেন পরিমলবাবুর স্ত্রীঃ বুঝেছি। তা পয়সা বাঁচাবার দিকেই যদি তোমার নজর, সে কথা আগে বললেই পারতে?

আহা, আমি কি তা-ই বলছি?

নয়তো কি ধর্মকথা শোনাচ্ছ? খালি পয়সা আর পয়সা। মাগো, কি কুক্ষণেই না তোমাকে সিনেমা দেখবার কথা বলেছিলাম, এখন পয়সার খোঁটা দিচ্ছ।

পরিমলবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেনঃ দেখ, তোমাকে বোঝানো যাবে না, কারণ তুমি কিছুই বোঝ না। আর কিছুই না বুঝে মেলা আজেবাজে কথা বল।

উঠে দাঁড়ালেন পরিমলবাবুর স্ত্রী। তীব্র কণ্ঠে বললেন, কি বললে, আমি বাজে কথা বলি? আমি কিছুই বুঝি না?

হ্যাঁ, তুমি কিছুই বোঝ না। এবার কঠিন হয়ে এল পরিমলবাবুর গলা।

ইশ, নিজে যেন কতই বোঝেনরে! বুঝে বুঝে আমাকে বর্তে দিচ্ছেন—

দেখ, ভদ্রভাবে কথা বলবে, নয়তো—

বল না, বল না, নয়তো কি? নয়তো আমাকে মারবে এই তো?

না, মারবো না। আর মারবো না তার কারণ আমি ভদ্রলোকেরই ছেলে। কিন্তু তোমার ইতরমিও আমি সহ্য করবো না।

আমি ইতরমি করি? আমি ইতর?

খুব ঝগড়া চলল দুজনের মধ্যে। রাগ করে পরিমলবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন। বাড়িতে ফিরলেন অনেক রাতে। টেবিলের ওপর ভাত ঢাকাই ছিল। কিন্তু ভাত খেলেন না তিনি। মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন। পরিমলবাবুর স্ত্রী সব দেখলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না মুখ ফুটে।

কাজেই আজ সকালেও ভাত খেলেন না পরিমলবাবু।

দেখুন দেখি, কি কাণ্ড! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পরিমলবাবু বললেন, কিছুই বুঝবে না, বলবে না, খালি ঝগড়া করবে।

আমি চুপ করে রইলাম। আর চুপ করে থেকে আপন মনেই হাসলাম। কেননা এ ঘটনার জন্যে পরিমলবাবু যতই দুঃখ করুন না কেন, আমার কিন্তু ভালই লাগল। ভাল লাগল এ জন্যে যে, ভেবে দেখলাম এমনি কিছু একটা ঘটনারই দরকার ছিল ওদের দাম্পত্য প্রেমে। আমি জানতাম, এ না হলে, নিভৃত কুলায়ে আত্মসুখে অন্ধ দুটি কপোত-কপোতীর স্যাঁতসেঁতে কলগুঞ্জনের মত স্ত্রীর উপাখ্যানে পঞ্চমুখ পরিমলবাবুকে আমার আর বেশিদিন ভাল লাগবে না, একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

বর্ষামুখর সে দিনের সেই সন্ধ্যায় পরিমলবাবুকে আমি হাসিমুখেই বিদায় দিতে পারলাম।

তিনদিন পরে পরিমলবাবু আবার এলেন। এ কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আশা করে ছিলাম, উনি আসবেন, আসেন নি। আমি ভেবেছিলাম জল হয়তো অনেক দূরেই গড়িয়েছে। হয়তো ওদের মনোমালিন্য চরমে উঠেছে। কিন্তু দেখলাম সেই কতকগুলো সন্ধ্যার সদানন্দ পরিমলবাবু আবার ফিরে এসেছেন। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান চিবুতে চিবুতে অত্যন্ত পরিচিতের ভঙ্গিতে বিছানার ওপর জাঁকিয়ে বসে বললেন, বুঝলেন না, সোনাদানা দু একটা সময় থাকতে গড়িয়ে রাখা ভাল। তাতে আপনার বিলাসিতাও হল, দু'পয়সার ফুটানিও হলো, আবার টাকাটা সঞ্চয়ও করে রাখলেন। কি বলেন, তাই নয়?

কথাটা মানতে হয় আমাকে। ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে পরিমলবাবু বললেন, য়্যাই দেখুন, আপনাকে বলতেই ভুল হয়ে গিয়েছিল তো! এই তো পরশু, এগারই জুলাই, আমাদের বিয়ের তারিখের য়্যানুয়েল সেরিমনি। যাবেন কিন্তু। গেলে উনি খুবই খুশী হবেন।

কিন্তু-কিন্তু করে বললাম, আমাকে আর এর মধ্যে—

না না না, আপনি যাবেন। যাবেন বৈকি, অবশ্যই যাবেন। না গেলে খুবই দুঃখিত হব। একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কাকেই বা বলবো বলুন, খালি আপনিই।

আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন। বাধ্য হয়ে আমাকে সম্মত হতে হয়।

পরিমলবাবুই উঠে দাঁড়ালেনঃ আজ চলি তবে।

সে কি! এই এলেন, আর এই যাচ্ছেন?

পরিমলবাবু হাসলেনঃ যাচ্ছি কি আর সাধে মশাই? যেতে হচ্ছে। যাব গিয়ে একটা জুয়েলারি দোকানে। কি যেন বলে, একটা গয়না গড়াতে দিয়েছি কিনা। ওই বিয়ের তারিখে ও'কে আর কি, বুঝলেন না, ওটা—ইয়ে, মানে উপহার দেব। —তবে ওই কথাই রইল, কেমন? এগার তারিখে সন্ধের মধ্যেই আমার ওখানে পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন। এগতে এগতে পরিমলবাবু বললেন।

আষাঢ় শেষের একটি ঘনায়মান সন্ধ্যায় হাজির হলাম পরিমলবাবুর বাড়িতে। আমার ওখানে পরিমলবাবু যতবারই এসেছেন ততবারই তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি বলেছি যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি। যেতে পারিনি বলে পরিমলবাবুর কাছ থেকে বিস্তর অনুযোগ শুনতেও হয়েছে। আর অনুযোগ শুনতে হয়েছে বলেই ও'দের বিয়ের তারিখের বার্ষিক উৎসবের আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। তা ছাড়া শুনে শুনে ও'দের ঘরকন্নাটা দেখবার একটু কৌতূহলও আমার হয়েছিল বইকি।

দু হাত বাড়িয়ে পরিমলবাবু আমাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। আসুন আসুন, আসুন।

আমাকে নিয়ে উনি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি চেয়ারের ওপর বসতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে পরিমলবাবু বললেন, সে কি, চেয়ারে কেন, চেয়ারে কেন! ওই বিছানাটার ওপর বসুন। পা তুলে দিয়ে দিব্যি মৌজ করে বসুন দিকিনি!

খবর পেয়ে পরিমলবাবুর স্ত্রীও এলেন। খুব ফরসা না হলেও ফরসা, দোহারা গড়ন। আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটো। অতল, ভ্রমরকালো। টানা টানা আর বড় বড়। আর চোখ দুটো সুন্দর বলেই বোধহয় মুখখানা আরও সুন্দর আর কমনীয় হয়ে উঠেছে। রান্নাঘর থেকেই এলেন বোধহয়। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে। একটা আটপৌরে শাড়ি পরনে আমাকে দেখেই ঘোমটাটা তুলে দিলেন অযত্নবদ্ধ কবরীর ওপর। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে স্মিত মুখে বললেন, আপনার কথা খুব শুনেছি ও'র মুখে।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে বললাম, আমিও কিন্তু ওই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। মানে, আপনার কথাও দাদা খুবেই বলেন। তা আপনার প্রশংসাই করেন অবশ্য।

পরিমলবাবু বলে উঠলেন, সে কি কথা! আমি আবার ওর কথা করে বললাম? আপনি ভারি ইয়ে তো?

চপল মুখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরিমলবাবুর স্ত্রী হাসলেন, তুমি? তুমি কিন্তু বললেও বলতে পার! কিছু আশ্চর্য নেই।

লজ্জিত হয়েছিলেন, তারপর হাসিমুখটা ফিরিয়ে দিয়ে পরিমলবাবু পরিহাসতরল গলায় বললেন, আর তুমি, তোমার কথা? বলব? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো?

কথাটা কি জানি না, তবে দেখলাম পরিমলবাবুর স্ত্রী সলজ্জে থেমে গেলেন আর স্ত্রীকে বেজায় জব্দ করেছেন এমনিভাবে আমার দিকে হাসিমুখে তাকালেন পরিমলবাবু।

আমি ও'দের কথান্তর উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ মনে হলো আমি যেন এখানে নেহাত অবাঞ্ছিত। ও'দের দাম্পত্যালাপ চুরি করে শুনেছি, কারণ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম কি যেন একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না পরিমলবাবু। আমার উপস্থিতিটা খেয়াল করেই শুধুমাত্র হেসেই যেন কথাটার যতি টানলেন।

খেতে বসে একসময় পরিমলবাবু বললেন, মাংসটা কেমন লাগছে সোমনাথবাবু?

গ্র্যান্ড! আমি মুখ তুলে বলি, সত্যি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঠিক সময়মত একটাও জুতসই উপমা মনে আসছে না ছাই!

মাংসের একটা হাড় চুষতে চুষতে

পরিমলবাবু বলেন, শুনলে অবাক হবেন যে, বিয়ের আগে এই মাংসটাই আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতাম না। ওটা ছিল আমার দু' চক্ষের বিষ। হৈ হুল্লোড়ে পড়ে যদিবা দু' এক টুকরো মুখে দিয়েছি, তো কি বলব, খাওয়া ইস্তক কেবলই গা ঘিনঘিন করতে লেগেছে। কে জানে কেন? বিয়ের পরেও তাই। ভুলেও কোনদিন মাংস আনতাম না বাড়িতে। উনিই একদিন জোর করে আনিয়ে রেঁধে বেড়ে খাওয়ালেন। কোনমতে কিন্তু-কিন্তু করে তা খেলাম। হ্যাঁ, খেলাম। আর খেয়েই তো মশাই তাজ্জব বনে গেলাম। এ হ্যাপি স্ট্রেঞ্জ্! বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, মনে হলো ভার্যার হাতে পড়ে বিষও অমৃত হয়ে গেছে। এত সুন্দর সে রান্না। বেবাক খেয়ে ফেললাম। বাস্, সেইদিন থেকে হপ্তায় দু'দিন মাংস না হলেই চলে না আমার।

এই বলে পরিমলবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। যেন কত মজারই কথা।

সুতরাং আমিও হাসলাম।

সব শেষে মিষ্টি এল। আমার পাতেই দিতে যাচ্ছিলেন, আমি শশব্যস্তে বাধা দিয়ে বললাম, না না, আমাকে আর দেবেন না বউদি। আর একটি দানাও আমি খেতে পারবো না।

ওমা, সে কি কথা? কিছুইতো খান নি! না না, দুটো মিষ্টি আপনাকে খেতেই হবে। পেড়াপীড়ি করলেন পরিমলবাবুর স্ত্রী।

যাবার সময় পরিমলবাবুর স্ত্রী বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।

আমি সহাস্যে বলি, আসবো না মানে? আলবৎ আসবো, এক শ' বার আসবো। এসে একেবারে রান্নাঘরে উপস্থিত হব। জানেনইতো মেসের উড়ে ঠাকুরের স্বর্গীয় রান্না খেয়ে খেয়ে জিবটা জুতোর সুকতলাই হয়ে গেছে। অমৃতের আস্বাদ একবার যখন পেয়েছি, তখন সহজে নিস্তার পাবেন না। সাবধান কিন্তু, পেটুক বলে আমার বদনাম আছে।

পরিমলবাবুর স্ত্রীও হাসলেনঃ বেশ তো, আগে আসুনই না।

দরজার সামনে ও'রা দাঁড়িয়েছিলেন। বিদায় জানিয়ে যখন রাস্তায় নামলাম, তখন আমার ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে।

সাত বছর পরে কলকাতায় ফিরছিলাম। এই সাত বছরে কতই না পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতার অফিস থেকে সেই কবে একদিন বরখাস্ত হলাম, চারমাস বেকার থেকে চাকরি পেয়ে ছিটকে গেলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। কোথায় রইলাম আমি আর কোথায় রইল আমার মেস, আমার বন্ধুবান্ধব। কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্কই আস্তে আস্তে মুছে গেল। তবুও ভুলতে পারিনি পরিমলবাবুকে। কতদিন কত নিঃসঙ্গ ছায়াম্লান সন্ধ্যায় বাগানের কোয়ার্টারের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি পোকার ডাক আর অসংখ্য জোনাকির জ্বলা-নেবার মধ্যে দূরের কাঠামবাড়ী রেঞ্জের শাল-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পরিমলবাবুর কথা ভেবেছি। মনে পড়ে গেছে সেই একদিনের মধুক্ষরা কয়েকটি উদ্বেল মুহূর্তের অস্পষ্ট স্মৃতি। কলকাতার সংকীর্ণ গলির দশ-হাতী ঘরের চার দেওয়ালের স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ সেই দাম্পত্য প্রেমের আবেগাকুল উত্তাল সমুদ্র যা একদিন অনুভব করেছিলাম, সুদূর চা বাগানের নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যায়ও তা অনুভব করতে কষ্ট হয়নি।

সুদীর্ঘ সাত বছর পরে কলকাতায় এলাম। এসে দেখি কত কি বদলে গেছে। বাড়ি বেড়েছে, গাড়ি বেড়েছে, লোক বেড়েছে, কমেছে বন্ধুবান্ধব। কে কোথায় আছে কে জানে! সেই ঘটনা-বহুল, কর্মবহুল জীবনের দিনরাত্রির দাগে পরিচিত কলকাতাকে পেলাম না। প্রথমদিন সন্ধ্যায়ই ভাবলাম, একবার ঘুরে আসি সেই অনেকদিন কাটিয়ে-যাওয়া মেসটায়। কয়েকজনের সঙ্গে হয়তো দেখাও হয়ে যেতে পারে।

আশ্চর্যভাবে দেখাও হয়ে গেল পরিমলবাবুর সঙ্গে। মনে হলো, দু'জনেই এক সঙ্গে ট্রাম থেকে নামলাম যেন। হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গলির মুখে। হাতে একটা কাগজের মোড়কে কি যেন। এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে পরিমলবাবুর জামাটায় টান দিলাম। এক হাতে মোড়কটা ছিল তা নইলে দুটো হাতই যদি খালি থাকত তবে আমাকে হয়তো জড়িয়েই ধরতে পরিমলবাবু। গভীর আবেগে আমা একটা হাত চেপে ধরে বললেন, আরে সোমনাথবাবু যে? ওঃ, কদ্দিন পরে তারপর, কোত্থেকে? ভাল আছেন তো সেই জলপাইগুড়ির চা বাগানটায় এখনো নাকি?

মনে পড়ল যাবার আগে প্রথম দু'মাস পরিমলবাবুর সঙ্গে পত্রালাপ চলেছিল বললাম, হ্যাঁ, আনন্দপুর চা বাগানেই থাকি আজকাল। তবু ভাল, কথাটা এখনো মনে রেখেছেন। তা আপনার কি খবর? হাতে ওটা কি?

পরিমলবাবু অল্প একটু হাসলেনঃ আর বলেন কেন! একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছি। ওটা ইয়ে দেব, মানে বুঝলেন না—কি বলতে গিয়ে হঠাৎ সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি বললেন, কী আশ্চর্য! ঠিক এমনি দিনেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল? তবে তো আপনাকে আমার সঙ্গে বাড়িতে যেতেই হবে। আরে বুঝলেন না, আজই যে আমাদের বিয়ের তারিখ মশায়!

এমনি অভাবনীয় যোগাযোগে কম আশ্চর্য হইনি, তবু আমি কয়েকটা মামুলী অজুহাত পাড়লাম। কিন্তু উনি আমার কোন কথাই শুনলেন না। হাত ধরে টানতে টানতে একরকম জোর করেই ও'র বাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন। বললেন, তাও কি হয় মশায়! ঠিক এমনি দিনেই যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তখন ছাড়ছিনে। গরীবের ঘরে যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ আপনাকে করতেই হবে—হ্যাঁ। কি জানেন, আপনি গেলে উনি খুবই খুশী হবেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কতই পরিবর্তন দেখলাম, কিন্তু এই মানুষটার কি একটুও রদবদল হতে নেই? চলতে চলতে সেই আগেকার মতই তিনি স্ত্রীর কথা অবিশ্রান্ত বলে গেলেন। কিসে ও'র স্ত্রী আনন্দিত হন, কি বলেন, কি করেন, কি করতে বলেন—ইত্যাদি। বললেন, শাড়িটার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

নীল শাড়িটা—বুঝলেন না—নীল রং ও'র খুবই পছন্দ। একবার একটা লাল রঙের শাড়ি কিনে এনেছিলাম, আমারই চয়েস। কিন্তু সেই থেকে উনি আমাকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন। ভুলেও যেন লাল রং না আনি। দেখুন মজা? তবে হ্যাঁ, নীল রংটংগুলো পরলে ও'র চেহারা খোলে বটে। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করলে তো? বলবে যে আমি ও'কে ভালবাসি বলেই নাকি আমার চোখে ও সব সময়ই সুন্দর। অর্থাৎ কিনা—যাক্‌গে—কিন্তু আপনিই বলুন সোমনাথবাবু, সত্যিই তাই?

আমি শুধু মুখে হাসলাম।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে শোবার ঘরে বসিয়ে রেখে পরিমলবাবু ভেতরে গেলেন। আর এক মিনিটের নাম করে সেই যে গেলেন, তারপর কতক্ষণ যে আমাকে বসে থাকতে হলো। না এলেন পরিমলবাবু, না ও'র স্ত্রী। এতদিন বাদে পরিমলবাবুর স্ত্রীর ব্যবহারের যে রকম-ফের দেখলাম, সত্যি কথা বলতে কি, তাতে আমি কষ্টই পেলাম। বসে বসে দেয়ালঘড়ির একটানা টিক্ টিক্ শব্দটা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেল, পাশের বাড়ির ছেলেটার একঘেয়ে পড়াটা পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেল, সমস্ত ঘরটাই সেই কবেকার একটি দিনের মধুম্লান স্মৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল, তবু পরিমল-বাবুর স্ত্রী এ ঘরে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন না। আমি ভাবলাম, পরিমলবাবু বোধহয় তাঁকে আমার কথা বলেন নি। কিংবা বলেছেন, কিন্তু তিনি হয়তো এতদিনে চলা-বলায় অনেক প্রাচীন হয়ে গেছেন। তাই আমার সামনে হাসিমুখে সহজ ভঙ্গীতে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন। ভাবলাম, সাত বছর আগেকার সামান্য কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে সময়ের প্রগাঢ় শেওলা জমে উঠেছে। হয়তো তাই-ই পরিচিত নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটলো না।

আমি ভেবেছিলাম পরিমলবাবুর স্ত্রী, কিন্তু তাকিয়ে দেখি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন পরিমলবাবু। হাতে এক গ্লাস জল আর একটা প্লেটে কিছু খাবার। সেগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে টেবিলটা আমার সামনে টেনে দিলেন। দেরি হবার জন্যে প্রথমে মাপ চাইলেন, তারপর বললেন, সামান্য কয়েকটা মিষ্টি বইতো হাতীঘোড়া কিছুই নয়। তা এগুলো বাড়িতেই তৈরি। উনিই সারাদিন বসে বসে বানিয়েছেন বুঝলেন না? তা আমার মনে হয় বাজারের ভেজাল খাবারের চাইতে এগুলো হয়তো ভালই হবে, কি বলেন?

একটা সন্দেশের টুকরো মুখে ফেলে বলি, বাড়িতে বানানো অমৃত আর বাজারের বিষ—কি যে বলেন! বাজারের ছাইপাঁশ খাবার খেয়েই যত রোগভোগ।

এক্‌সাক্টলি সো। পরিমলবাবু বললেন।

চায়ের পেয়ালা হাতে অবশেষে পরিমলবাবুর স্ত্রী ঘরে এলেন। কিন্তু না এলেই যেন ভাল করতেন। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম উনি আমাকে চিনতে পারার কোনই লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বহুদিন আগেকার সেই ক্ষণিক পরিচয়ের রেখায় অত্যন্ত সহজ-ভাবে দূরত্বের যতি টেনে দিয়েছেন। অবনত মুখের অর্ধেকটাই ঘোমটার আড়ালে। অতি কুণ্ঠিতভাবে এগিয়ে এসে ধূমায়িত পেয়ালাটা আমার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। আর পেয়ালাটা নামিয়ে রাখবার সময়ই ও'র মুখটা আমি দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পেলাম, আর দেখেই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম আমি।

চা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন আর সেই মুহূর্তেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরিমলবাবু একটু অবাক হলেন, একটু বা ক্ষুণ্ণ, বাড়িতে তৈরি মিষ্টির সবগুলো না খাওয়ার জন্যে অনুচ্চ কণ্ঠে একটু অনুযোগও করলেন। কিন্তু আমি সত্যি আর খেতে পারলাম না, একটা মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হলো না। বাড়িতে ফেরবার আগে সেই মেসটায় একবার ঘুরে আসবার কথা বললাম। পরিমলবাবু বললেন, বেশ। চলুন, আপনাকে না হয় মেসটা পর্যন্তই এগিয়ে দি।

কথাটা তখন থেকে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত করছিল মনকে। রাস্তায় নেমেই পরিমলবাবুর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, কি হয়েছে বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না? তিনি, আপনার আগের স্ত্রী, মানে সেই আগের-বার যাঁকে দেখেছিলাম—

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন পরিমলবাবু। পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠলেন: ও হো হো, এই কথা? আমি ভাবলাম কি না কি, সীরিয়স্ কিছু বা। রমার কথা বলছেন তো? আরে আপনি যে বছর জলপাইগুড়ি গেলেন, সেই কার্তিকেই রমা মারা গেল! আজকের কথা! কিন্তু একলা মানুষ, কদ্দিন আর একা একা থাকা যায় বলুন? মাস তিন-চার পরেই সেই ফাল্গুনেই পাঁচজনের কথায় বিয়ে করলাম আরতিকে। আপনিও যেমন! কিছুই জানেন না দেখছি। এইটুকুও বুঝলেন না যে সেদিন ছিল আষাঢ়। আর আজ বিয়ের তারিখ ফাল্গুন মাসে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পরিমলবাবু বললেন, সে কি অমন করে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? না না, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, চলুন মেসে পৌঁছে দিগে। তা ছাড়া খালি গেঞ্জি গায়েই বেরিয়েছি—উনি রাগ করবেন। কি রকম শাসন একবার বিবেচনা করুন দেখি? একটু অনিয়ম করেছি কি উনি অনর্থ করবেন।

এই বলে পরিমলবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সেই হাসি—সাত বছর আগের এক মেঘমলিন আষাঢ়-সন্ধ্যায় আর সাত বছর পরের একটি কুয়াশা-ঢাকা শীতসন্ধ্যায়ও যা অবিকল। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি কোথায়ও।

চক্রদত্ত

জগতের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম "পিসার হেলান টাওয়ার"। পিসার এই হেলান টাওয়ার দেখতে এখানে বহু লোক সমাগম হয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, এই টাওয়ারটি রক্ষা করার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইঞ্জিনীয়ারগণ বলেন যে, এই বিশ্ববিখ্যাত টাওয়ারটির একদিক গত ১২ মাসের মধ্যে ১.২ মিলিমিটার জমিতে বসে গেছে। গত ৩৫ বছরের মধ্যে ঐ দিকটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ বসে গেছে। এইভাবে বসে যাওয়ার দরুণ এখন ভিত্তি স্থান থেকে এর চূড়োটা একদিকে ১৪ ফুট ঝুকে পড়েছে। ইঞ্জিনীয়ারদের মতে এইভাবে যদি এটি আস্তে আস্তে পৃথিবীর কোলে আশ্রয় নিতে থাকে, তাহলে প্রায় ২২৫৫ বছরের মধ্যে সমগ্র টাওয়ারটি ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে মুশকিলের কথা যে, পিসার আশেপাশে কোথাও যদি ভূমিকম্প অথবা কোনও কারণে বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে টাওয়ারটি ভূমিসাৎ হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এখন থেকে যদি এর প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড একের পর এক নামিয়ে নিয়ে ঐ জমি বা ওর নিকটবর্তী কোনও স্থানে ভূমিকে নতুন করে রিএনফোর্সড করে নতুন করে টাওয়ারটি তৈরি করা যায়, তাহলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বলাই বাহুল্য যে, এর জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন এবং বর্তমানের প্রশ্ন সেটাকা কোথা থেকে আসবে!

*

ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদানুসারে বানরকুলকেই আমরা মানবকুলের পূর্ব-পুরুষ বলেই জানি। সুইস প্রত্নজীব-বিদ্যাবিশারদ ডাঃ জোহানস্ হারজেলার ডারউইনের এতদিনকার মতবাদ দৃঢ় যুক্তিতর্ক সহকারে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইটালী থেকে একটি প্রস্তরীভূত চোয়ালের হাড় পেয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, বানরকে মানুষের আদিপুরুষ কোনও মতেই বলা যায় না; মানুষ বহু লক্ষ লক্ষ বছরের পুরান স্বতন্ত্র গোত্রের। এই লক্ষ লক্ষ বছর আগের নজির ঘেঁটেও যদি মানুষের আদিপুরুষের সন্ধান করা হয় তাহ'লেও বানরকে কোনও মতেই পূর্বপুরুষ বলা যায় না। কারণ যদিও সেই "পুরাকালের কোনও আদি মানবের সন্ধান আজও পাওয়া যায় তাহ'লে সে এত বেশী দিনের পূর্বের যে, আজকের দিনে দেখে ঠিক বুঝতেও পারব না এবং তার নাম করতেও সাহস করব না।

*

চলচ্চিত্র ক্যামেরা ও টেলিভিশন ক্যামেরার পরিচালকদের আনুষঙ্গিক

সহজ বহনোপযোগী টেলিভিশন বা ক্যামেরাম্যানের ব্যবহারের আলো

বহু সাজসরঞ্জামের মধ্যে একটি খুব শক্তিসম্পন্ন আলো বহন করতে হয়। এই কারণে এইসব সরঞ্জামাদি যত ছোট এবং বহনোপযোগী করা যায় ততই ভাল। আজকাল এই আলোর ব্যবস্থাটা একটু সহজ করা হয়েছে। দু'টি হাল্কা মত রিফ্লেক্টর একটা এলুমিনিয়মের রডের দুদিকে লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে আর এর ব্যাটারী ব্যাগে ভরে কাঁধের পিছনদিকে ফেলে সমস্ত সরাঞ্জামগুলি অনায়াসে বহন করতে পারা যায়। এই সুবিধার জন্য সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানেই স্বচ্ছন্দে ছবি তোলা সম্ভব হয়।

*

চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনও একটি খারাপ হয়ে গেলেই আমরা রীতিমত অসুবিধা বোধ করি। চক্ষু নষ্ট হয়ে গেলে তো জীবন বিফল মনে হয়। তবে যদি অল্প চোখ খারাপ হয় এবং চশমা দিয়ে দেখা সম্ভব হয়, তাহ'লে আর খুব অসুবিধা বোধ করি না। বিশেষত নাকের ওপর চশমাটা থাকা সত্ত্বেও এটিকে আমরা খুব বেশী সৌন্দর্যহানিকর মনে করি না, বস্তুত এটি স্টাইলের অঙ্গাবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কান খারাপ হয়ে গেলেও আজকাল অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্যে শোনার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কানে শোনার যন্ত্রটি এত জটিল যে, এটিকে সৌন্দর্যবর্ধক মনে হয় না, ফলে এটিকে যতটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার ব্যবস্থা করা যায় ততই ভাল মনে হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম একটি নতুন রকম কানে শোনার যন্ত্র বার করেছেন। এতে শুধুমাত্র যন্ত্রধারীর মাথা ছাড়া দেহের আর কোনও অংশেই তার বা ব্যাটারী রাখতে হবে না। সমস্ত যন্ত্রটি কানের পিছন দিকে এক কিউবিক ইঞ্চি মাত্র জায়গা জুড়ে রাখা যাবে। এর সঙ্গের, রিসিভারটি কানের ভিতরে রাখা থাকবে আর একটা পাতলা বাঁকান পাত দিয়ে ব্যাটারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। এর সঙ্গে একটা সুইচ থাকবে এবং মাত্র দু'টি আঙ্গুলের নোখ দিয়েই সুইচটা খোলা এবং বন্ধ করা যায়। কানের পাশটি চুলকানর আছিলায় অনায়াসে সুইচটা খোলা বা বন্ধ করা যায়। যন্ত্রটি এত ছোট্ট যে মেয়েরা চুলের মধ্যে রেখেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে এবং চুলে ঢাকা থাকায় কিছুই বোঝা যাবে না এবং ছেলেরা ব্যবহার করলেও বিশেষভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না। যন্ত্রটি এখনও আমাদের দেশে চালু হয়নি এবং আমেরিকার কোন্ ফার্মে পাওয়া যাবে তারও সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

রত্নাকর

তখনকার দিনে বিশ্বজনসমাজেও যে সংগীতকলা সম্বন্ধে এক অহেতুক কুসংস্কার ছিল এ-কথা আমরা ভালই জানি। অনেকেই আমরা এই অন্ধ-গোঁড়ামির মধ্যে মানুষ হয়েছি, এবং এ-বিষয়ে ভুক্তভোগী। আমাদের মধ্যে এমন খুব কমই আছেন, যাঁদের সংগীতশিক্ষা গুরুজনগণের উৎসাহ-প্রণোদিত হয়ে হয়েছে, অর্থাৎ যাঁদের এ-বিদ্যা লুকিয়ে-চুরিয়ে না শিখতে হয়েছে। অথচ এই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে হঠাৎ এ-জাগরণ কি করে সম্ভব হোল, যার ফলে বীণা-বাদিনী বাগ্‌দেবীর আজ ঘরে ঘরে এমনি ভক্তিভরে পুজো-অর্চনা চলছে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতৃপুরুষগণ কি করে এমন ত্বরিতগতি সংস্কারমুক্ত হয়ে অঘটন সংঘটন করলেন। শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধ আমার মনে হয়, আমরাই বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি। অন্ধ সংস্কার নিদ্রার রূপ ধরে এতদিন আমাদের মানসিক বিকাশরূপী কুম্ভকর্ণকে আতুর করে রেখেছিল। কুম্ভকর্ণের সে যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু কারা এসে এমন অদ্ভুতভাবে পরিস্থিতির লোপ সাধন করে দেশের সভ্যতার গতির মোড় ফিরিয়ে দিলেন, গতিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পথে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন? এবং কেমন করেই বা এ অসম্ভব সম্ভব হোল? এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা আমার মত অনেকেই করেছেন, আমিও করেছি। তবে আমার মনে হয় যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই এই যুগসন্ধিক্ষণে সাংগীতিক রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে এ অসাধ্যসাধনে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

দেশে কণ্ঠসংগীতের যে একেবারেই চর্চা হোত না, তা নয়। চর্চা খুবই হোত, তবে সে সংগীত ছিল মুখ্যত ভক্তিতত্ত্ব-মূলক। যে দেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে সে-দেশ যে সংগীতের সুরের প্লাবনে দিক্‌বিদিক ভাসিয়ে দিতে পারে, এ আমরা সকলেই স্বীকার করি। আর এ-সংগীতশিক্ষায় গুরুজনদেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁরা নিজেরাই অনেক "নন্দদুলালচন্দ্রমা, শিখি চন্দ্রিকালংকৃতি" প্রভৃতি কীর্তন গেয়ে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাতেন। শ্যামাসংগীত, সুরে, অ-সুরে বা বে-সুরেই গাওয়া হোক, তাঁদের প্রিয় ছিল। এমন কি ধ্রুপদ গানেও তাঁদের অরুচি ছিল না। কিন্তু তাঁরা সত্য সত্যই বিশ্বাস করতেন যে,

> "গোরি ধীরে চল গগরিয়া ছলক ন জায়,
> পতলী কমর বলখায়।"
> "বারহ বরসকী মেরী উমরিয়া।"
> "কলকা জোবন, পতলী কমরিয়া।"

ইত্যাদি গান গাইলে ছেলেপিলের উচ্ছন্ন যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই তারা সাধারণতঃ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর উপর হাড়ে চটা ছিলেন, কারণ এ-ধরনের গানকে তাঁরা অশ্লীলই মনে করতেন। কিন্তু আমাদের গুরুজনেরা তখন ভুলে যেতেন যে আমাদের যে বয়স ছিল, সে-বয়সে "কমরিয়া" পাতলা কি মোটা, সে-চিন্তা করবার অভ্যাস আদপেই ছিল না। তাছাড়া, খেয়াল-টপ্পায় শব্দের দিকে ধ্যান না দিয়ে সুর, তাল ও কর্তবের উপরই ধ্যান দেওয়াই দস্তুর। কাজেই, গানের শব্দ নিয়ে আমাদের কখনও মাথা ঘামাতে হোত না। তবুও, আমাদের জীবনে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমরা জানি যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতসমাজে ব্রাহ্মসমাজ ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠল। ব্রাহ্মসমাজে সংগীতের অনুশীলনে কোন বাধা তো ছিলই না, বরং প্রার্থনা, বিবাহ, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে সংগীতকলার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান রচিত ছিল। সংগীতশিক্ষা ভিন্ন কৃষ্টিগত শিল্প অসম্পূর্ণ থাকে, এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। কাজেই কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে নানাবিধ ললিতকলার চর্চার সহিত সংগীতকলারও চর্চার প্রাধান্য ছিল। সেই চর্চা যখন ক্রমশই উচ্চাঙ্গ সংগীতে পরিণত হয়ে ধ্রুপদ-ভাবাপন্ন হোল, তখন এ-দিকে সকলেরই টনক নড়ল। অন্ধ সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাঁরা বিদ্যাকে শুধু গ্রন্থের মধ্যেই আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা তো শান্তিনিকেতনকে "শতহস্তেন" করে রাখলেন, কিন্তু সমাজবন্ধনে যখন ফাটল ধরে, তখন লক্ষ দাগরাজি করেও তার কাঠামো খাড়া রাখা যায় না। দলে দলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে তাঁদের আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সাংগীতিক অনুশীলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। এ-বিষয়ে স্বর্গীয় হরেন ঘোষ বাঙালীর সংস্কৃতি কেবল বাংলায় বা ভারতে নয়, ভারতের বাইরে সমুদ্রপারেও প্রচারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন, সে-কথা আমাদের চিরস্মরণীয় থাকবে। আমরা আজ সকলেই জানি যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বা নৃত্যাচার্য উদয়শংকরের দক্ষিণ-হস্তরূপে স্বর্গীয় হরেন ঘোষ এক নবীন কৃষ্টিময় যুগের প্রবর্তন করে গেছেন।

এই সন্ধিক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট কলেজগুলিও এই প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের উৎসাহেই প্রথম আন্তঃ কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতার পত্তন হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাংলার যে কয়েকটি

নামকরা সঙ্গীতশিল্পীও অংশ গ্রহণ করে এই চারুকলাকে সর্বসাধারণের গ্রাহ্যবস্তু করে তুলতে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন. তাঁদের মধ্যে আজ আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করতে পারি শ্রীঅম্বিকা মজুমদার, 'হর্ষদেব রায়, শ্রীধীরেন ভট্টাচার্য, শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকেই এ দলে ছিলেন। সে আজ বহুবর্ষের অতীত কাহিনী। সকলের নাম মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও বলি যে সে-সময়ে জনকয়েক শিক্ষিত যুবকই সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করে হাতে কলমে সকলকে বুঝিয়ে দেন যে, স্কুল-কলেজের পাঠ্যের সাথে সাথেও ললিতকলার অনুশীলন চলতে পারে, এবং চললে নৈতিক কোন অধোগতি হয় না। এঁদের কয়েকজন প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন, মধ্যে মধ্যে জলসাও করতেন, আবার কলেজে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হতেন। অবশ্য খুব শিক্ষিত অথচ অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ আমাদের বাংলা দেশে যে জন্মাননি তা নয়, যেমন ধরুন, 'রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতি। যদিচ এই উচ্চশিক্ষিত সঙ্গীতকুশলীদের সংখ্যা অত্যন্ত মুষ্টিমেয় ছিল কিন্তু এঁদের পরের যুগেই এ হাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সঙ্গীতশিক্ষা স্কুল-কলেজী বিদ্যার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাব হয়ে গেল। এখন তো লেখাপড়া জানা ছেলে বা মেয়ের গান, বাজনা বা নৃত্য না শেখাটাই এক বিড়ম্বনা।

বাংলাদেশে সমষ্টিগতভাবে ঘরে ঘরে এমন এক কৃষ্টির মশাল জ্বালান, এ-যেন এক ঐতিহাসিক বিপ্লব। আমার মনে হয়, এর মূলে আছে বাঙ্গালীর জাতিগত দুর্বলতাটিকে পরিহার চেষ্টা, এর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার প্রেরণা। বাঙ্গালী দেখলে যে সংসার সংগ্রামে সে যে কেবল পিছিয়েই পড়ছে তা নয়, চারুশিল্পের চর্চা ও অন্যান্য বিদ্যাভাগ্যেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যবাসীদের সহিত সমানতালে অগ্রসর হতে পারছে না। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, সে জ্বলে উঠল এবং জ্বলে উঠে আপন মানসিক দুর্বলতাকে জ্বালিয়ে দিয়ে অপর সকলের সঙ্গে সমান হবার প্রচেষ্টায় প্রাণপণ করে বসল। যে সঙ্গীতকলার সাধনে বাঙ্গালীকে অন্যান্য প্রদেশের লোকে চিরকাল অসম্মান ও অনাদর করে এসেছে, সেই সঙ্গীতকলায় ভারতের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকারে বদ্ধপরিকর হলো। কি কণ্ঠসঙ্গীত, কি যন্ত্রসঙ্গীত কি নৃত্যকলা, সকল বিষয়েই গভীর অনুশীলন চলতে লাগল, যার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতাকাশে আজ বাংলা এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করছে। নৃত্যকলায় যেমন শ্রীউদয়শঙ্করের জয়যাত্রার ভেরীনিনাদ দিকে দিকে ছুটে চলল, যন্ত্রসঙ্গীতেও তেমন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, ওস্তাদ আলি আকবর খান সাহেব, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্রীজ্ঞান ঘোষ, শ্রীপান্নালাল ঘোষ, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণিজনের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষকে তোলপাড় করে তুলল। কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে অবশ্য নানামুনির নানা মত। অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশের কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে এখনও ঠিক প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ের আর্টিস্ট যেমন ধরুন ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ বা পণ্ডিত রাজাভেয়া পুছবালে। তৈরী হননি। আমার কিন্তু এজন্য শোনা কথায় তেমন আস্থা হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাঁদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা হয়, তাঁরা এখনও বয়সে প্রবীণ হয়নি। এখনও শিক্ষার অবসর তাঁদের আছে। আরো কয়েক বৎসর পরে, যখন বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ছাপ এঁদের মুখের উপর পড়বে, তখন এঁদের জ্ঞানভাণ্ডারও প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তখন আর ভারতের কোন প্রদেশেরই স্পর্ধা বা সাহস হবে না, এই বাঙ্গালী কণ্ঠশিল্পীদের সম্বন্ধে অনারূপ অভিমত প্রকাশ করতে। সে দিনেরও বোধ হয় আর দেরী নেই, যখন সঙ্গীতকলার বিভিন্ন শাখাগুলির মার্জিত টেকনিক্ সাধ্যায়ত্ত করবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের লোককে এই বাংলাদেশেই এসে বাঙ্গালীর কাছেই হাত পাততে হবে, এতদিন যেমন আমরা এ-বিদ্যা অর্জন করবার জন্য অবাঙ্গালীর কাছে হাতজোড় করে এসেছি।

মনে মনে যখন সেই হারান দিনগুলির কথা ভাবি, তখন আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে কি ছিল আর কি হয়েছে! যদু ভট্টের শ্রুতিধারী-বিদ্যার বহর দেখে রবাবী কাশিম আলি খাঁ তোবা তোবা করে ত্রিপুরা ছেড়ে পালালেন, পাছে বাঙ্গালী হিন্দুর অধিকারে সেনী ঘরানার কিছু চলে যায়! কত লুকোচুরি করে, কত দেহের রক্ত জল করে, কত ধমক, মার প্রভৃতি খেয়ে সে অতীতকালে সঙ্গীত-শিক্ষা করতে হোত, সে-কথা স্মরণ করলেও মনে আজ ভীতি উৎপন্ন হয়। তখনকার দিনে না ছিল কোন গ্রন্থ, না ছিল কোন নোটেশন। গুরুকরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অধিকাংশ গুরুই ছিলেন অ-হিন্দু, কাজেই হিন্দু শিষ্যদের অন্তেবাসী হওয়ার পক্ষে অনেক অন্তরায় ছিল। যাঁরা ধর্মাধর্ম বিচার করতেন, তাঁরা গুরুগৃহের এক নিরালা কোণে কোনরকমে স্বপাকে রন্ধন করে জীবনধারণ করে গুরুর সেবা করতেন। মুসলমান কখনও হিন্দু শিষ্যের ধর্মের উপর হাত দিতেন না। তা না দিলেও, ব্যাপারটি ছিল জটিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই ওতপ্রোত সম্বন্ধ। এখনও গুরুকরণ আছে, নাড়া বাঁধাও আছে, কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্যের সেই সাধারণপরিচিত সম্বন্ধ টুটে গেছে। এখন হয়েছে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ। কখনও কখনও বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ, সে স্নেহময় গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নয়। শিক্ষার পথ অনেক সরল ও সুগম হয়েছে বটে এবং শিক্ষাকার্যও নিজ ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করছে বটে, কিন্তু তবুও যেন মনে হয়, সেই যে পূর্বের কঠিনের মধ্য দিয়ে কোমলের সন্ধান, সে বস্তুটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। স্বীকার করি, সে-যুগে শিক্ষার সবটুকু নির্ভর করত ওস্তাদের খেয়ালমর্জির উপর, কিন্তু যোগ্য বিবেচিত হলে কোন ওস্তাদ কি তার সাগরীদকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন? তাঁর মন যে চাইবে সর্বস্ব দিয়ে দিতে, উজাড় করে দিতে। তনমন দিয়ে সেবা করলে কোন্ গুরু তুষ্ট না হন! স্বয়ং দেবতাদেরও আমরা স্তবে তুষ্ট করি।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ঃ অমল হোম (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২৲)

সাতটি মাত্র প্রবন্ধের সমষ্টি। তারও কয়েকটা আবার অন্যের চিঠি বা বক্তৃতার অনুলিখন। তবু বইটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রত্যেকের অবশ্যপাঠ্য। শুধু রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্রসমালোচকদের নয়, ইতিহাসের ছাত্রদেরও।

প্রথম প্রবন্ধের নামে বইয়ের নাম। এখানে হোম মশাই সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রকৃতির সমালোচনা করেছেন এবং খুব মৃদু ভাষায় করেননি। এই কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন ছিল, কেননা কোনো কোনো জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল একান্তই অবান্তর ঃ আসল উদ্দেশ্য যেন ছিল "হৈ হুল্লোড়, হুজুগ।" কিন্তু সমালোচকের প্রতিটি মন্তব্য প্রত্যেকের সমর্থন লাভ না করলে বিস্মিত হব না। তিনি বলছেন, "আমি এক্ষেত্রে অধিকারীভেদ মানি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনে সকলেরই, সব প্রতিষ্ঠানেরই অধিকার আছে, একথা আমি স্বীকার করি না।" হোম মশাই নিশ্চয় জানেন, তাঁর এই মত সংকীর্ণ এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কবির কৌতূহলের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে বায়োকেমিস্ট বা বৈয়াকরণরাও নিশ্চয়ই তাঁকে আপন মনে করতে অধিকারী। "নাচ গান আর অভিনয়েই" কবির পূর্ণ পরিচয় নেই বলা বাহুল্য, কিন্তু এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভা অপরূপ বিকাশ লাভ করেনি কি? যাঁরা কবির জীবনদর্শন উপলব্ধি করতে অক্ষম তাঁরা কেন কবির গান গাইবেন না, তাঁর নাটক অভিনয় করবেন না? কবির কীর্তির অন্যান্য দিক উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু কবি নিজেও বোধহয় নৃত্যগীতে তাঁর জন্মোৎসবপালন হোম মশাইর মতো এত নৃশংসভাবে অননুমোদন করতেন না। এই প্রবন্ধেরই শেষে লেখক মানুষ রবীন্দ্রনাথের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরেছেন, যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে "দুঃখ শোক খুব বেশী লোক পায়নি।" এই অন্তরঙ্গ প্রতিকৃতি বোধহয় অনেকেরই অজানা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "জমিদার রবীন্দ্রনাথ"। নামটি পরোপুরি সংগত নয় বোধহয়। কিন্তু জমিদার রবীন্দ্রনাথ কথাটা কিছুদিন আগেও এমনভাবে শোনা যেত যে এই প্রতি-বাদের প্রয়োজন ছিল। নানা দিক থেকে উদাহরণ তুলে লেখক দেখিয়েছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি

খুঁজে পান না "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ-জগৎ সৃষ্টি করবে", তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। "বামমার্গী" রবীন্দ্র সমালোচনা যাদের বিভ্রান্ত করেছে তাঁরা এই রচনাটি পড়লে উপকৃত হবেন। এই প্রবন্ধেরই সংযোজনী কবির "প্রেমের অভিষেক" কবিতা থেকে উদ্ধৃতি। এটি "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ। পরিবর্তিত ভাষ্যের কাব্যগুণ এতে নেই, কিন্তু আন্তরিকতার স্পষ্টতর প্রকাশে তার ক্ষতি-পূরণ আছে।

পরবর্তী প্রবন্ধ ইতিহাসের দিক থেকে সবচেয়ে মূল্যবান। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করে তখনকার ভাইসরয়ের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়লে আজো মন মথিত হয়। হোম মশাই সেই পত্রাঘাতের পরিপ্রেক্ষিতের বিশদ বিবরণই শুধু দেননি, সেদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনিও শোনা যায় তাঁর রচনায়। লক্ষণীয়, হোম মশাই শুধু বিদেশীর সমালোচনা পরিবেশন করেননি; সেই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ যে স্বজাতির আচরণেও ব্যথিত ও নিরাশ হয়ে-ছিলেন তার পরিচয় দেওয়াতে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পূর্ণতা লাভ করেছে। গান্ধীজীর কাছে লেখা চিঠিটি "প্রোফেটিক"।

নাইটহুড ফিরিয়ে দেওয়াটা সত্যিই একটা বিরাট কীর্তি বলে আজ হয়তো অনেকের কাছে মনে হবে না—আজ সবাই শ্রী বা শ্রীমতী—কিন্তু ১৯১৯ খৃস্টাব্দে এর গুরুত্ব কম ছিল না। কিন্তু ওই খেতাব প্রত্যাখ্যানও বড়ো কথা নয়। আসল সত্য এই, শরৎচন্দ্রের ভাষায়ঃ "দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবি-বাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।" ক্ষুব্ধ মূক জাতি সেদিন রবীন্দ্রনাথেরই মুখ দিয়ে কথা কয়েছিল।

পরিশেষে একটি অভিযোগ আছে। রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে অমল হোম অন্যতম। "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" বইয়ের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েও বলব এই কৃপণতা ঠিক সাজে না। কবিকে আর না পাই, কবিস্মৃতি—আর তাঁর কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা এত অল্প লিখবেন, তবে

কবিকে পাব কোথায়? অমল হোমের দায়িত্ব গুরু; তাঁর জানা তথ্যে অধিকার আমাদের সকলের। অধিকারীভেদ তিনি মানুন, কিন্তু আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার তাঁর নেই। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের মতো বই আরো চাই এবং অমল হোমের কাছ থেকে।

অরবিন্দ-রবীন্দ্র—শ্রীরবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা।

পুস্তকখানির বিষয়বস্তু অপূর্ব। ভারতের অধ্যাত্ম-জ্ঞান, সৃষ্টি ও জীবনের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে ভারতের এই দুই বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষীর মত পাশাপাশি দিয়ে লেখক পুস্তকটি রচনা করেছেন। একটির পর একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে আর আমরা পেয়েছি পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা এবং কবিগুরুর কাব্যসাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দীপ্ত কণিকাগুলি। যোগমার্গে যে অপরোক্ষ অনুভূতি আর কবি-মানসের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তারা ত একই হবে, কারণ যা নিগূঢ় সত্য তাকে ত পাওয়া যায় অনুভূতির মাধ্যমেই। তবে Life Devine এবং রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য থেকে বিষয়োপযোগী অংশগুলি উদ্ধার করতে হলে এঁদের দুজনেরই চিন্তাধারার উপর যে সম্পূর্ণ দখল থাকা এবং এঁদের ভাবে যেরূপ অনুভাবিত ও অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজন এঁদের সঙ্গে যে সমদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, আইনজীবী লেখক তার উপযুক্ত বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছেন। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই পুস্তকটি আনন্দ দেবে।

৫৯৬।৫৫

উপন্যাস

সাহসিকা (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। ১৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

এই গল্প অবলম্বন করেই লেখকের "দুই বেয়াই" চিত্রটি আসর জমিয়েছিল। মূল চিত্র-নাট্য থেকে শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপন্যাসান্তরিত হয়ে পুস্তকটি এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রামোদীদের জন্য লিখিত এই উপন্যাস বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভার নিদর্শন খুঁজতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করাই হবে। তবে মহেন্দ্র-প্রতাপ চরিত্রটি যে তাঁর বিচিত্র ভাবভঙ্গী নিয়ে দর্শকদের মতই পাঠকদের মনেও স্থায়ী আসন নিয়েছেন এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অন্তত এই চরিত্রটিকে বাঙলা সাহিত্যে ধরে রাখবার আয়োজন করে বেঙ্গল পাবলিশার্স আমাদের ধন্যবাদের দাবী করতে পারেন। ৬১২।৫৫

এই মর্তভূমি—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হলে বইয়ের এবং লেখকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'অন্য নগর', 'মুখর লণ্ডন', 'দূরের মিছিল' প্রভৃতি গ্রন্থে সুধীরঞ্জন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও সে বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। ভারতীয় দৃষ্টিতে বিলাতের নর-নারী ও সমাজ-জীবন আর বিদেশ থেকে নতুন করে দেখা দেশের মানুষ, জীবন ও সাহিত্য, এই দুটি দৃষ্টিধারার সমন্বয় করে সুধীরঞ্জন সমবেদনা ও আন্তরিকতা দিয়ে কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। নায়ক সুকুমারের অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়েছে এবং রূপ নিতে পেরেছে এই কারণেই। দূরে থেকে সাংসারিক জীবনের দুঃখ ও সমস্যা, বিদেশে গিয়ে নতুন জীবনের সুখ ও বেদনা উপলব্ধি করেছেন বলেই সুধীরঞ্জন এমন একখানি উপন্যাস লিখেছেন। এর মধ্যে মিষ্টত্বের ও সহানুভূতির অভাব নেই। এই মর্তভূমি বাস্তব জীবনের আবাস। শিল্প ও জীবন-আদর্শ মোহভঙ্গের সঙ্গেই জড়িত, এই কথাটি লেখক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

(৪।৫৬)

প্রবন্ধ

THE CARDINAL DOCTRINES OF HINDUISM: By Srimat Puragra Parampanthi. Foreward by Principal J. R. Basu. M.A. (Triple). Published by the Author, from "Viraj", Dr. Basu's Road, Dibrugarh, Assam. 215 pages. Price Rupees Three and Annas Twelve only.

স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল হিন্দু ধর্মের মূলসূত্র ও আদর্শগুলি সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আনা, যাতে সকলে সেগুলিকে নিজেদের জীবনে ব্যবহার করে তাদের আসল মর্মার্থ গ্রহণে সক্ষম হয়। স্বামীজীর এই ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আসামের সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী পরমপন্থী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করে প্রকাশিত করেছেন। এতে হিন্দু ধর্মের মূল সূত্রগুলিই যথাঃ ব্রহ্মতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, চতুর্বর্গতত্ত্ব এবং মুক্তিসাধনায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন যোগতত্ত্ব অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভগবান শঙ্করাচার্যের মতামত উদ্ধৃত হয়েছে। বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ও তন্ত্রের মূল তথ্যগুলির মাধ্যমে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার পরিপূর্ণ রূপটি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পুস্তকটি পড়লে এই কথাই মনে হয় যে, কেবলমাত্র শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করেই তিনি এই অমৃত-বিন্দুটি উদ্ধার করেননি, এই পুস্তকের প্রত্যেকটি মত তাঁর অপরোক্ষ অনুভূতির ফল।

মায়া-তত্ত্বের কঠিন বিষয়টির আলোচনা পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, লেখক তত্ত্বগুলির অন্তরে প্রবেশ করেছেন। হিন্দুধর্ম যে কেবলমাত্র আচার-বিচারের সমষ্টি নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই যে ঈশ্বর রয়েছেন এবং তাঁকে অর্থাৎ নিজেকে খুঁজে বের করবার সাধনাই যে আসলে হিন্দুধর্ম একথা ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ জগতের সমক্ষে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ ধর্মের বহিরঙ্গ নিয়েই আছে। বস্তুত হিন্দুধর্ম স্ত্রীলোকদের এবং অল্প শিক্ষিতদের অন্ধবিশ্বাসের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যেই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মহান আদর্শ ও বিরাট দর্শনকে প্রচার করার একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন এই পুস্তকটি মেটাতে সক্ষম হবে। ৫৫৭।৫৫

DIALECTICAL MATERIALISM : By Maurice Cornforth, volume three, The Theory of Knowledge, First Indian. Edition by National Book Agency Ltd., 12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. 272 pages. Price Rs. 3-12 as.

জ্ঞানানুসন্ধানের একটি পথ, নির্জলা বস্তুতান্ত্রিকতা। সত্যের পূজারীরা যুগে যুগে নানা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে একই লক্ষ্যে। যাকে লক্ষ্য বলে মনে করেছিল সেখানে পৌঁছে দেখছে, গন্তব্য এখনো সুদূরে প্রসারিত। তবু যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথই নতুন পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং সেই পথটাই বাস্তব সত্য, সেই পথ চলা। সে-পথে নব নব বিস্ময়, নূতন লোক, অগণিত যাত্রা সহচরের সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ সেই সামাজিক জ্ঞানই ত আসল জ্ঞান। প্রতিদিনের রূঢ় বাস্তব জীবনে প্রতিক্ষণে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে যে নব নব পরিচয়, সক্রিয় মানস তাই দিয়েই ত' জ্ঞানের দীপ-বর্তিকা জ্বালে। এই ব্যক্তিগত দীপ-শিখাগুলিই একদিন সংযুক্ত দীপ্তিতে সত্যের সূর্যালোকে পরিণত হবে। কিন্তু যারা আরাম কেদারায় শুয়ে শূন্য দর্শনের কুয়াশা রচনা করে, সংশয়ের কথা বলে, মায়াবাদ প্রচার করে তারা ভ্রান্ত, তারা সভ্যতার অগ্রগমনের বাধা, মানবের ভবিষ্যৎকে আগলে রেখেছে।

জ্ঞানানুসন্ধানের এই পথের বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। এটিও একটি পথ। কোন পথ যে সত্য লক্ষ্যে পৌঁছাবে তা কে বলতে পারে। তবে এই পথ নিষ্ঠুরভাবে এক মতানুলম্বী। অপর সমস্ত পথকে উড়িয়ে দিতে চায়, উপহাস করে। তাদের মতে সামাজিক জ্ঞান দেখিয়েছে শ্রেণী বিরোধ। তাই তারা শ্রেণীহীন সমাজ চায়। সামাজিক জ্ঞান প্রমাণ করেছে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীর শোষণ। তাই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তারা চায় সেই শোষক শ্রেণীর বিনাস। এ যাবৎ যত দর্শন আর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে সেসবকে তারা মনে করে ওই শোষণকারী শ্রেণীর ক্রীতদাস, শ্রেণী স্বার্থের পোষক। এই মতের পরিপুষ্টি হয়েছে সাম্যবাদে, বিশেষ করে রাশিয়ায়। এই মতটির প্রাঞ্জল আলোচনা রয়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে। আধুনিক জগতের বহুলোকাশ্রয়ী এই মতটিকে যাঁরা বুঝতে চান পুস্তকটি তাঁদের আনন্দ দেবে। ছাপা ঝরঝরে, বিলাতী ছাপার মত। এদেশী প্রকাশককে বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে লন্ডনের লরেন্স এ্যাণ্ড উইসার্ট লিমিটেড আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। বস্তুতান্ত্রিক সাম্যবাদের এমন সহজ ও সরল অভিব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই পথের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সকলের মতই পুস্তকটিতে দেওয়া আছে। ২৩২।৫৫

নাটক

আধুনিক: শ্রীমোহিতকুমার চক্রবর্তী: প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী: ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট: এক টাকা।

নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো আধুনিক মেয়ের তেজস্বিতা। নাট্যকার শেষ দৃশ্যে সেকথা প্রমাণ করেও ছেড়েছেন। তবে যে রাস্তায় তিনি এগিয়েছেন পাঠকের পক্ষে তা অনুসরণ একটু কণ্টকর। সংলাপ নিতান্ত দুর্বল। ঘটনা সংস্থাপন এবং চরিত্র পরিকল্পনা অপরিণত মনের পরিচয়ের এবং কখনও কখনও হাস্যকর। ৩১৪।৫৫

বিবিধ

যৌন বিজ্ঞান (২য় খণ্ড); **মাতৃমঙ্গল জন্মনিয়ন্ত্রণ।** আবুল হাসানৎ। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য যথাক্রমে ১০,, ৭,, ২, টাকা।

আবুল হাসানৎ মহাশয় যৌন বিজ্ঞান বিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং এ সম্পর্কে তিনি এ দেশীয় জনসাধারণের **মন হইতে** কুসংস্কার, অশিক্ষা, ভীতি, অযৌক্তিক সংকোচ ইত্যাদি মধ্যযুগীয় অন্ধতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া 'মিশন' স্বরূপ যৌন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি **লিখিতেছেন।** পাশ্চাত্ত্য দেশ হইলে আদর্শবাদী এবং বিজ্ঞানী-মন এই লেখকের প্রচুর সমাদর হইত। দুঃখের বিষয় এ-দেশ এখনো অতোটা উদার-দৃষ্টি ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিঞ্চিৎ অবশ্যই হইয়াছে। এবং অসংকোচে বলিতে পারি এই কিঞ্চিৎ অগ্রসরের প্রধান কৃতিত্বই যদি বর্তমান গ্রন্থগুলির লেখককে দেওয়া যায় তাহাতে দোষ হইবে না।

যৌন বিজ্ঞান ২য় খণ্ড গ্রন্থটি মূলত শিশু জন্ম ও তদসম্পর্কিত শাখা বিষয়গুলির বিস্তৃত, বৈজ্ঞানিক আলোচনা। দাম্পত্য জীবন ও সমাজ বিজ্ঞানের কিছু অংশও আছে।

মাতৃমঙ্গল ভবিষ্যৎ মাতার মাতৃত্বের সকল জ্ঞাতব্য তথ্য ও শিক্ষনীয় বিষয়ে একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ। সন্তান পালন বিষয়েও এই গ্রন্থখানি কাজে লাগিবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র কলেবর, অল্পমূল্য হইলেও অসার গ্রন্থ নহে। পাঠক-পাঠিকারা ইহার সারমর্ম বুঝিলে সংসার ও সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে। ৩৫৫।৫৫, ৫৭১।৫৫, ৫৭২।৫৫

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১২।২।৫৬

নতুন আমেরিকান কবিতা কিছু পড়লাম। নতুন কবিরা বোঝাতে চান না, বুঝতে চান। এই ধরনের মন্তব্য সেসিল ডে লিউইস একবার কোথায় যেন, করেছিলেন মনে হচ্ছে। তা হলে কম্যুনিকেশনের সমস্যা রইল না। অবশ্য কবি সর্বক্ষণই জানেন যে বোঝবার প্রয়াসের প্রকাশ থাকা চাই, নচেৎ কলম চলবে না। কিন্তু তার সমস্যা, তার ক্রিয়া পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। প্রয়াস ছটফটানিও হতে পারে। সে-যন্ত্রণা প্রকাশেরও রস আছে, তবে সেটা শান্তিরস নয়। প্রাজ্-এর 'রোমাণ্টিক এগনি'—বইখানিতে তার মারাত্মক সমালোচনা পড়েছি। কিন্তু সাধারণত এই যুগের পাঠক সেই টরচারকে (torture) প্রতিভার সার্থকতা ভাবে—ভাবাই সহজ। বোদলেয়ার, লিওপার্ডি প্রভৃতির কবিতা উপভোগে (অনুবাদে) আমার নিজের এই গন্ডগোল হয়েছে। যথাযথ বর্ণনাই যদি সার্থকতা হয় তবে অন্য কথা। কিন্তু কি জানি কেন, বোধ হয় ভারতীয় বলেই, সার্থকতার রস আসলে শান্তি রসই মনে হয়। লরেন্স্-এর নভেলের চেয়ে তাঁর গল্প, তাঁর গল্পের চেয়ে চিঠি, তাঁর চিঠির চেয়ে তার কবিতা, এবং তাঁর কবিতার চেয়েও তাঁর ইটালি ভ্রমণের নক্সা আমার ভালো লাগে। যতই মানুষ শান্ত কেন্দ্রের দিকে এগোয়, ততই যেন সে সার্থক হয়। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি: দর্শনে পাস্কাল আর কিয়ারক্ গার্ড; দুজনেরই আত্মা মথিত। তবু পাস্কাল শান্ত কিয়ারক্ গার্ড অশান্ত। গান, নাচ বাজনাতেও তাই—বহু আধুনিক সংগীত পরীক্ষা, নৃত্য পরীক্ষা, বাদ্য-পরীক্ষা শব্দের, দেহের, আলোড়ন মাত্র। সমুদ্র মন্থনে অন্তত এক ছটাক অমৃত না উঠলে চলবে কেন? স্পেণ্ডার একে 'স্টিল সেন্টার' বলেছেন। কিন্তু স্টিল্ মানে স্ট্যাটিক নয়। তার মধ্যে আণবিক শক্তি থাকে, যদি ভাঙতে পারা যায় তবেই স্ফুরণ। তার পর সংহতি আনতেই হবে। মিকেল এঞ্জেলোর ছবি ও ভাস্কর্যে অদম্য শক্তির স্ফুরণ ও সংযম দুইই আছে, তবু যেন কোথায় অতিরঞ্জন থেকে যায়। রোঁলা মিকেল এঞ্জেলোর জীবনীতে তার ব্যক্তি-মূলক কারণ দেখিয়েছেন। তবু যেন... ওস্তাদ যখন গাইছেন তখন তাঁর কণ্ঠের নালী ও শিরা ফুলে উঠছে, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে...এই ধরনের খানিকটা যেন। বুঝতে গেলে কষ্টের দাগ গায়ে মেখে থাকে—প্রসবের চিহ্নের মতন। বোঝাতে গেলে দাগ মুছে ফেলতে হয়। এরও বিপদ আছে; না বুঝে বোঝান সাধারণত অত্যন্ত ঝরঝরে হয়। এমন বক্তৃতা, এমন দর্শন, এমন রচনা, এমন চিত্র, এমন কবিতা সংখ্যায় অল্প নয়।

আবার বেশী বুঝলে না কি মানুষ বোবা হয়ে যায়! রমণ-মহর্ষির নীরবতার গল্প শুনেছি। বোঝা আর বোঝান—কবিতায় দুয়ের সামঞ্জস্য কি ভাবে সম্ভব ঠিক ধরতে পারছি না।

সার্থকতা হোলো 'there-it-is-ness'—অর্থাৎ এই তার আদি, এই তার অন্ত। গ্রহণ কর ভালো—না গ্রহণ কর তার ক্ষতি নয়, তোমারই।

১৭।২।৫৬

প্রবোধ (বাগচী) গেল; আবার মেঘনাদও গেল। দুজনেই এক রোগে। মনটা বড় বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। মেঘনাদের সঙ্গে শেষ কথাবার্তায় মনে হয়েছিল যে সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হচ্ছে। বিশেষত বাংলা দেশ সম্বন্ধে। আমি আপত্তি জানাই। প্রমাণ শুনতে তার কত কৌতূহল! রেডিওতে শুনলাম তার "political views extreme" ছিল। কোন্ ভদ্রলোকের ছেলের political views extreme না হয়ে থাকতে পারে! সব কংগ্রেস-ওয়ালা হবে, ভুঁড়ি বাড়াবে, আর বহুমূত্রে ভুগবে, আর যা হচ্ছে তাই ভাল হচ্ছে বলতে হবে! মেঘনাদ ল্যাবরেটারীর বাইরেকার মানুষও হতে পারত—দরকার হলে। এবং দরকার আছে।

প্রবোধ ভারতীয় বিদ্যার স্কলার—রীতিমত স্কলার। সেখানে তার ফরাসী বুদ্ধি বিচার। তার বাইরে তার অন্য একটা রাজ্য ছিল যার ভিত্তি ছিল বিশ্বাস। কত আড্ডাই না জমেছে তার বাড়ি! পরিচয়ের সে ছিল এক প্রধান স্তম্ভ। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার সৌজন্যে, বিনয়ে, সংযত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়নি এমন লোক দেখি নি। ভাইস চান্সলারী না করতে হলে আরো কিছু দিন বাঁচত।

একে একে বাংলার দেউটি নিবছে। এই সব লোকের এই বয়সে যাওয়া অন্যায়! সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ থেকে আরম্ভ। বাংলা শব্দটাই উবে যাচ্ছে যখন তখন আর এতে দুঃখ করে লাভ নেই। পুরবৈয়াঁ হয়েই থাকা যাবে।

২৫।২।৫৬

শাহান শা ইরাণের বাদশা বাড়ির সামনে দিয়ে কনভোকেশন প্যান্ডেলে গেলেন। জানলা দিয়ে ছাত্রদের ঘোড় সওয়ার আর মোটরগাড়ির শোভাযাত্রা দেখলাম। সারাদিন উৎসব চলবে— যোগদানে ইচ্ছে নেই, সামর্থ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টি তাজের কিছু নীচে দেখাবার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। জাকির সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তদারক করছেন শুনলাম। ভারতীয় সরকার পৃথিবীকে জানাচ্ছেন ভারতে মুসলমানদের কত যত্ন কত কদর। ছেলেরা জয়গান করছে শুনতে পাচ্ছি। শোভাযাত্রায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছি আমরা। অবশ্য ডিসিপ্লিনড্ হওয়া যায়, মজাও পাওয়া যায়। তবে ঐ তামাশা! একটি রোমান যুগের কথা মনে উঠছে।

আচার্য নরেন্দ্র দেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় যৎসামান্য ইট ও লাঠি চলেছিল—একজন কনস্টেবলের চোখ গেছে ও একজন অধ্যাপকও শুনেছি মার খেয়েছেন। চমৎকার! অথচ তিনি যখন লক্ষ্ণৌএর ভাইস চান্সেলার, দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে ছাত্ররা একদিনের জন্যও অভদ্রতা করেনি। কেন এমন হয়। অথচ এখন ত' সেখানে শিক্ষক ভাইস চান্সেলার! এলাহাবাদেও তাই ছিল, তবু সেখানেও কেলেঙ্কারী!

কফি খাবার সময় আচার্যজীর কথা মনে হোলো। একটু অবসর পেলেই, একটু সুস্থ হলেই, যখন তখন আমার বাড়ি আসতেন—সময় নেই অসময় নেই কফি। তার পর বইএর কথা, দেশ বিদেশের কথা, কত কথাই না হোতো। ১৯৩৫ সাল থেকে তাঁর পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাঁর কাছে কত ঋণী তা আমিই জানি, এবং বোধ হয় আরো দু' একজন জানেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে আমার হাত কাঁপে—অনেকে অনুরোধ জানিয়েছেন লেখবার জন্য, কিন্তু কলম চলছে না। যদি কখনও বর্তমান মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারি তবে লিখব। তাঁর বিনয়ের, তাঁর সদাচারের, তাঁর বৈদগ্ধ্যের, তাঁর বুদ্ধির, বিদ্যার, সমবেদনার, তাঁর দার্শনিকতার, চারিত্রিক দৃঢ়তার ও নিতান্ত নম্র স্বভাবের বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা, তবু বোধ হয় গুছিয়ে লিখতে পারব না। পণ্ডিতজী ঠিকই বলেছেন, এমনটি আর হয় না, কেবল দেহই তাঁর দুর্বল ছিল। সম্পূর্ণানন্দজী ইঙ্গিত করেছেন পলিটিক্সে তাঁর আসা উচিত হয় নি। আমিও তাঁকে বহুবার এই কথা বলেছি। তিনি তা মানতেন না। তিনি বলতেন প্রথমে তিনি পলিটিশিয়ান পরে তিনি অন্য যা কিছু। এখন মনে হচ্ছে আমাদের পলিটিক্সে জন কয়েক অমন অবান্তর, নন-পলিটিক্যাল জীব থাকলে মন্দ হত না। চেলাপতি ন্যাশন্যাল হেরাল্ডে লিখেছে তার জীবনে মাত্র দু জন লোক ছিল যাদের সঙ্গে কথা কয়ে ফেরবার সময় মনে হত পবিত্র হয়েছি, উন্নত হয়েছি। আমারও তাই মনে হত। অথচ তাঁর সঙ্গে অনেক অ-বাঞ্ছনীয় লোক দেখা করতে যেত, এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা করতেন। তারা যেতে চাইছে না, ডাক্তারে অধীর হয়ে উঠছে, তাদেরও কোনো বক্তব্য নেই, কেবল মতলবই আছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন, ওষুধ শুঁকছেন, আর হাসি মুখে কথা কয়েই যাচ্ছেন। একবার তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনার অসুখ আমি ধরে ফেলেছি' 'কি সেটা?' 'আপনার goodness—ওতে হাঁপানি বাড়ে।' হেসে উত্তর দিলেন, 'অর্থাৎ দুর্বলতা?' 'যাই নাম দিন!' 'লোকে বলে আমি দুর্বল, কিন্তু মোক্ষম জায়গায় দুর্বল নই। ওটা আমার ডিমক্রাসী!' 'তা হলে বলুন রাশিয়ায় হাঁপানি নেই!' বাস্তবিকই তিনি মূল ব্যাপারে অটল ছিলেন, অন্যত্র ছিলেন নিতান্ত নম্র, না বলতে পারতেন না। কড়ি ও কোমলের অমন সমন্বয় দুর্লভ।

কাল টিনবার্গেন এসেছিলেন। বক্তৃতা দিলেন, সারাদিন কথাবার্তা হোলো প্ল্যানিং নিয়ে। যেমন বিদ্যা তেমনই বিনয়। অথচ বিদ্যা সবক্ষেত্রে বিনয়ী করেওনা দেখেছি। আমার একান্ত বিশ্বাস বিদ্যার ভূমি goodness—তার বাংলা কি? অন্তরে সৎ না হলে বিদ্যায় ফাঁকি থেকে যায়। বিদ্যা, একটি

স্বার্থপর পণ্ডিত দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু চরিত্রের গলদ পাণ্ডিত্যে প্রতিফলিত হবেই হবে—ভদ্রতার খাতিরে সমালোচকরা নীরব থাকেন। আচার্যজীর মর্‍্যাল ব্যাপার এ ক'বছর ধরে মনে হচ্ছে। বিনয় ছিল চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায়। সাধারণত এই ধরনের লোক 'লিবারেল' হয়—কিন্তু আচার্যজীর সোশিয়ালিজম ছিল বৈজ্ঞানিক। মূলত তিনি ছিলেন র‍্যাশানালিস্ট এবং পলিটিক্সে মার্কসিস্ট হিউম্যানিস্ট। তিনি লেনিনের সব লেখাই পড়েছিলেন— ইংরেজীতে। লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ—গান্ধীজী ও কার্ল মার্কসের পরেই বোধ হয়।

২৬।২।৫৫

ওয়াল্টার উইস্‌কফ-এর The Psychology of Economics পড়লাম। খুব মজার, কিন্তু ছাত্রদের জন্য নয়। অর্থশাস্ত্র ঘাঁটবার পর, বহুদিন পর বইখানির বক্তব্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়। বক্তব্যটি এই; অর্থনীতির মতামত ও আঙ্গিকের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সামাজিক অবস্থার অভিব্যক্তির সবন্ধ নিগূঢ়। এই যুগে মানুষ পৃথক ও একাকী হয়ে পড়েছে; সমাজের কাছ থেকে কোনো আত্মপ্রতিষ্ঠার সমর্থন পাচ্ছে না; ফলে বিরোধ ও ভয়ভাবনা (anxiety) বাড়ছে; তার সমন্বয়ের ও শান্তির জন্য উপযোগী মতামত তৈরী করে, তাতে বিশ্বাস করে। এই বক্তব্যের প্রমাণ লেখক আডাম স্মিথ থেকে আধুনিক অর্থশাস্ত্রীর রচনায় উদ্ধার করেছেন। আমার অন্তত অবিশ্বাস নেই, কারণ আমি Sociology of Knowledge-এর মূল বক্তব্যে বিশ্বাসী। তবে আমি বলি এই ধরনের ব্যাখ্যা সব অন্ততে সামাজিক বিজ্ঞানের বেলাই খাটে। শ্রম-মূল্যের অবনতির ইতিহাস, ইকুইলিব্রিয়াম বিশ্লেষণের অভ্যুদয়, র‍্যাশনালিজমের উত্থান-পতনের বর্ণনা মনোজ্ঞ। রিকার্ডোর দোটানা অবস্থা আমাদের অপরিচিত নয়। ড্রুকমান গত যুদ্ধের সময় র‍্যাশনালিটির ক্ষয় দেখিয়েছিলেন। উইস্‌কফ্ তারই জের টানছেন অলিগপলি, প্রডাক্‌ট্ ডিফারেন্সিয়েশনের বিচারে এবং অন্যান্য প্রকারের কনজুমার ও প্রডুসারের ব্যবহারে। তাঁর মতে মডেল তৈরীটাও একরকমের ইর‍্যাশনাল ব্যবহার। আমার মতে ওটা র‍্যাশনালিটির চরম পরিণতি। ওর মধ্যে অ-যুক্তি লুকিয়ে আছে এইভাবে; ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ইউটিলিটেরিয়ানিজমের দর্শন অনুসারে ধরে নিতেন মানুষ সত্যই, যথার্থই যুক্তি অনুসারে চলে, অর্থাৎ সে হিসেবী। এখনকার মডেল-বীলডার ভাবেন মানুষ যেন হিসেবী—অর্থাৎ, ধরা যাক সে হিসেবী, প্রথমে গোটাকয়েক ব্যাপারে, পরে আরো বেশী। সত্যকারের হিসেবী আর যেন হিসেবী—এই ফাঁকে যুক্তির ওপর অবিশ্বাস, তার কৃতিত্বে সন্দেহ ধরা পড়ছে। ভেইঙ্গার অনেক দিন আগেই এই 'যেনর' বিশ্লেষণ করেছিলেন। সে যাই হোক, পড়ে মজা পেলাম—বিশেষত ইকনমিক্সে male (labour) আর female (land) principle-এর দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখে। ফ্রয়েড প্রভৃতির বিশ্লেষণে তা হলে কিছু উপকার আছে! কিতু নয়মান্ পড়ে (এখনও বুঝতে পারিনি) নতুন ইকনমিস্ট, রথচাইলডের একটা বক্তব্যে সায় দিতে ইচ্ছে হয়—এখনকার ইকনমিকসে নিউটন, ডারুইন চলবে না; ফ্রয়েডও অচল; এখন কেবল ক্রজউইৎসের যুদ্ধের থিওরী অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজী অব্ পাওয়ার। বাস্তবিকই তাই; এখন থিওরীর চেয়ে পলিসির ওপরই ঝোঁক; অর্থাৎ সবই এখন কলেক্‌টিভ বার্গেনিং-এর ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। তাই মনে হয় কর্তৃপক্ষের ও অর্থনীতিবিদের মধ্যে মহারথীদের ল্যাসওয়েল, রেডি পড়া উচিত। অমাদের প্ল্যানিংএর ঐখানে একটা মস্ত গলদ রয়ে গেল। Mixed Economy হোলো সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর balance of power. এখন না হয় প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্‌টরের Co-existence বল্লাম। কনফিউসাস যাই বলুন না কেন, নাম বদলালে কি ধাতু বদলায়? তাই সোশিয়ালিজম-এর সার কথা Strategic heights অধিকার করা—অর্থাৎ শক্তির বণ্টন, শক্তির খেলা —কেবল নয়মানের দাবা খেলা নয়, যুদ্ধ। উইসকফ্-এর শেষ মন্তব্য এই:

Thus economics has come a long way: from the symbols of labour value, harmony, and equilibrium, through the stage of rational, economic man and markets, to an interpretation which uses stategy and warfare as analogies for economic behaviour and represents economic laws as probabilities. A picture of the individual, the economy, and the universe emerges, full of uncertainties, without ethical guide posts, relativistic, probabilistic, and appropriate to the precarious situation of mankind in mid-twentieth century.

—শৌভিক—

অপটুতা চিহ্নিত হোক

মাঝে মাঝে মনে হয়, সেন্সরের যেমন বড়দের ও সর্বসাধারণের জন্য ছবি মার্কা করে দেওয়ার নিয়ম, তেমনি আরও কতকগুলি দিক বিচার করেও এক একটা মার্কা দেবার ব্যবস্থাও করে দেওয়া দরকার। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পয়সা খরচ করে গিয়ে যাতে বিরক্তি ও আলসেমির অকুল পাথারে পড়তে না হয় দর্শকদের সেই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাইয়ে দেবার জন্য একটা কোন চিহ্ন। এ নাহলে একেবারে অপটু লোকদের হাত থেকে চলচ্চিত্র শিল্পও রেহাই পাবে না, আর দর্শকসাধারণকেও উত্যক্ত হতে হয় না। তিন চার বছর ধরে থেমে থেমে তোলা ছবি কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠানের "লক্ষহীরা", কিন্তু এতো দীর্ঘ সময় পাওয়া সত্ত্বেও এবং কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য গঠন ও পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে থাকতেও তিনি একটা সুসংবদ্ধ শিল্পনাট্যানুগ জিনিস গড়ে তুলতে ভেবে আর যেন কুলকিনারা পাননি। অপটুতা যেমন কাহিনী রচনায় তেমনি চিত্রনাট্য গঠনে এবং চলচ্চিত্রের রূপপ্রকৃতি গঠনে অক্ষমতা, আর তেমনি পরিচালনা ব্যাপারে কল্পনাশক্তির অভাব। কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের বলে চিহ্নিত এই ছবিখানির ঘটনা সমাবেশের মধ্যে একটা যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনের একটু পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে, সমাজের যে ধরনের অন্যায় আচরণ অসহায়া নারীকে প্রাণধারণের জন্য গণিকাবৃত্তির পথে ঠেলে দেয় তারই একটা দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরার চেষ্টা। ঠিকভাবে ধরতে গেলে আবার, স্বামী ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, বা শাশুড়ী গৃহে আশ্রয় দিল না বলেই গণিকাবৃত্তি ছাড়া আর গতি নেই সে-নারীর, এ চিন্তাধারাও এখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিভাবাপন্ন মনের পরিচায়ক নয়। কারণ এখন অসহায়া নারীর জন্যও ভালোভাবে জীবনধারণের অনেক রকমেরই পথ খোলা, সুস্থ ও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার বহুবিধ শান্ত ও সৎবৃত্তি পড়ে রয়েছে। কাজেই এখানে যেমন দেখানো হয়েছে যে, গৃহ থেকে বিতাড়িতা কোন নিরীহ মেয়ের গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া আর গতি নেই, তা এখনকার মনে সায় পাবার মতোও নয়, আর এযুগে কোন কাহিনীর তেমনভাবে পরিচর্যাও হওয়া উচিত নয়।

*　　*　　*

"লক্ষহীরা"-র কাহিনী ঠিক যে কার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, এর উপপাদ্যই বা কি তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত নয়। গল্পের আরম্ভ রাজকুমারী বিনতাকে নিয়ে। সখীপরিবৃতা বিনতা মহাকালের মন্দিরে পুজো দিতে এলো তার বিবাহের দিনে। মন্দিরদ্বারে পথ আগলে শয়ান কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যুবক কৌশিক। শর্ত হলো, মন্দিরে প্রবেশের পথ ছেড়ে দিলে কৌশিক যা ভিক্ষা চাইবে ফিরতি পথে বিনতা তাকে তা-ই দান করবে। পুজো অন্তে

বিনতা চলেই যাচ্ছিল, কৌশিক তাকে তার ভিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। বিনতা তার প্রতিশ্রুতি পালনে প্রস্তুত হলো, কৌশিক চাইলে বিনতার হাতের পুষ্পমালাটি। বিনতা মালাটি এমনভাবে ছুঁড়ে দিলে যে, সেটি পড়লো কৌশিকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে। রাজপুরোহিত হায় হায় করে ছুটে এসে জানালে, মহাকালের কাছে উৎসর্গীত ঐ মালা যার গলায় পড়বে, রাজকুমারীকে তাকেই স্বামী বলে বরণ করে নিতে হবে। বিনতা লুটিয়ে পড়লো মহাকালের বেদিমূলে। রাজা রাণী ছুটে এসে এ বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করলে, কিন্তু বিনতা মহাকালের এ নির্দেশকে অমান্য করতে রাজী হলো না। বিনতা জানালে, মহাকালের সামনে লুটিয়ে পড়ে থাকার সময় সে মানস-চক্ষে দেখেছে, তার স্বামী এক সুপুরুষ যুবা। কুষ্ঠরোগী কৌশিককে মহাকালের নিবন্ধনে বিয়ে করতে হওয়ার এমন চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু জমলো না ঘটনাটি নাটকীয় করে বিন্যাস করতে পারার অপারগতায়। অতি সাদাসিধেভাবে মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের মতো: একটু আবেগও সৃষ্টি করে না। এর পর গল্প বিনতাকে নিয়েই আরো খানিকটা এগিয়ে চললো। বিনতা কৌশিকের কুটিরে গিয়ে উঠেছে: কৌশিক এই ঘটনার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে। কৌশিক জানায় তার এই অবস্থার পিছনে একটা কাহিনী আছে। বিনতা ভিক্ষায় বের হয় এবং দেবী লক্ষহীরা স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা দেয় শুনে বিনতাও সেখানে উপস্থিত হয়। ভিক্ষাগ্রহণকালে বিনতা শুনতে পায় যে, লক্ষহীরা গণিকা, তার এই অর্থ পাপার্জিত। শুনে বিনতা ভিক্ষা নিতে অস্বীকার করে চলে আসে। লক্ষহীরার দম্ভে আঘাত লাগে। স্বয়ং রাজা চিত্রবর্মার রক্ষিতা সে। চিত্রবর্মা বলে লক্ষহীরা তার বিলাস নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। যথারীতি চিত্রবর্মা এলো সেদিন লক্ষ্যহীরার কাছে। লক্ষাহীরা অসুস্থতার ভান করে শুয়ে রইলো। মনে হলো লক্ষাহীরা বোধহয় বিনতার কাছ থেকে পাওয়া অপমান সম্পর্কে অথবা তার প্রতিশোধ নেবার কথা বলবে। কিন্তু তা সে বললে না, তার বদলে লক্ষাহীরা জানালে যে, যে ব্যক্তি কাব্য রচনা করতে জানে না সে ব্যক্তির ওপরে লক্ষাহীরার মন পড়বে না। গল্প একদিক দিয়ে আরম্ভ হয়ে মোড় নিলে আর এক পথ ধরে।

× × ×

চিত্রবর্মার সহচর কুম্ভক পরামর্শ দিলে রাজকবি সুভদ্রকে দিয়ে লক্ষাহীরার স্তুতিতে কবিতা রচনা করে নিয়ে যেতে।

শ্রীমা পিকচার্সের 'মান রক্ষা'-তে যমুনা সিংহ

সুভদ্র জানালে, সে তাতে রাজী আছে, কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে কবিতা তাকে না দেখলে কবিতা রচনার প্রেরণা পাবে সে কোথা থেকে। চিত্রবর্মা একদিন সুভদ্রকে লক্ষাহীরা সকাশে নিয়ে যাওয়া ঠিক করলে। সন্ধ্যায় সুভদ্র তার কুঞ্জে বসে গান গাইছে, লক্ষাহীরা মন্দির থেকে ফেরবার পথে সে গানে আকৃষ্ট হয়ে কবির কুঞ্জ দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালো। গান শেষে কবি দেখলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে যেন তার মানস প্রতিমা। মুগ্ধ কবি তার প্রেম নিবেদন করলে; লক্ষাহীরাও এতোদিনে যেন তার মন সমর্পণ করার মানুষটিকে খুঁজে পেলে। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাহীরা তখনকার মতো বিদায় গ্রহণ করলে। পরদিন চিত্রবর্মা সুভদ্রকে নিয়ে লক্ষ্যহীরার গৃহে উপস্থিত হলো। সুভদ্র দেখে মর্মাহত হলো যে, যাকে সে তার মানস প্রতিমা বলে প্রেম অর্পণ করেছে সে এক গণিকা। পরে লক্ষ্যহীরা এলো কবির কুঞ্জে। কবির কাছে লক্ষ্যহীরা তার গণিকাবৃত্তি অবলম্বনের কাহিনী ব্যক্ত করলে। আগে সে গৃহস্থ বধূ ছিল, নাম ছিল মাধবী। স্বামী তাকে ত্যাগ করে প্রবাসে চলে যাওয়ায় তার ওপর শাশুড়ীর অত্যাচার আরম্ভ হয়। একদিন শাশুড়ী তাকে প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দিলে। মাধবীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো এক প্রতিবেশী

যুবক। এই যুবকই দেখা গেল কৌশিক। মাধবীর অনুরোধে কৌশিক তাকে নিয়ে পেণছে দিলে তার মামীমার গৃহে। কিন্তু এক পরপুরুষের সংগে রাতে পথ অতিবাহন করে আসার দোষ ধরে মামীমাও মাধবীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলে। মাধবী জানালে, সমাজের এই নিপীড়নই তাকে গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করেছে। কবি সুভদ্রর মন গলে গেল মাধবী তথা লক্ষ্যহীরার দুঃখের কাহিনী শুনে। লক্ষ্যহীরাকে কবি গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলো, ঠিক হলো, পরদিন ওরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সে রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাবে। লক্ষ্যহীরা ঘোষণা করলে, সে তার সব স্বর্ণমুদ্রা দান করবে। বিনতা প্রথম লক্ষ্যহীরার গৃহে ভিক্ষা নিতে এসে ফিরে যাবার পর কৌশিক তাকে ভর্ৎসনা করে এই বলে যে, ভিখিরীর অতো বাচবিচার অন্যায় এবং তখন জানায় যে, এর পর লক্ষ্যহীরা কোনদিন স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করলে তারা দুজনে যাবে ভিক্ষা গ্রহণ করতে। লক্ষ্যহীরার শেষ দানের কথা শুনে কৌশিকও বিনতাকে নিয়ে হাজির হলো। লক্ষ্যহীরাকে দেখেই কৌশিক চিনতে পারলে; ভিক্ষা নিতে পারলে না সে। গৃহে ফিরে সে তার অতীত কাহিনী জানালে বিনতাকে। মাধবী মামীমার কাছ থেকে আশ্রয়প্রত্যাখ্যাত হবার পর কৌশিক তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় ধর্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু মাধবী তাতে রাজী হলো না। একদিন কৌশিক মাধবীর কাছে তার মনের অধৈর্যতা প্রকাশ করে ফেললে। পরদিন সকালে কৌশিক দেখলে, মাধবী নিরুদ্দিষ্টা। সেই থেকে সে দেশে দেশে মাধবীর সন্ধান করে ফিরেছে, এইভাবে তাকে ভিক্ষুকের অবস্থায় পড়তে হয়েছে এবং সেই সংগে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাহিনী শেষ করে কৌশিক জানালে, সেই মাধবীর কাছ থেকে সে ভিক্ষা নিতে পারে না, তবে তার মনের অভিলাষ এক রাতের জন্যও মাধবীর হাতে সেবা পাবার। সাধ্বী বিনতা প্রতিশ্রুতি দিলে, স্বামীর অভিলাষ যেভাবেই হোক সে পূরণ করবে।

* * *

সব বিলিয়ে সখীদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্যহীরা কবির কুঞ্জে উপনীত হলো। কিন্তু কোথায় কবি, তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে রাজা চিত্রবর্মা। লক্ষ্যহীরা বুঝতে পারে যে, চিত্রবর্মাই কবিকে কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্যহীরারও সম্বিৎ ফিরে এলো, কবিকে পেতে চাওয়া যেন তার উচিত হয়নি।

বিমর্ষ লক্ষ্যহীরা ফিরলো তার পরিত্যক্ত গৃহে। একটা করুণ গান তার কানে ভেসে এলো। দরজায় দাঁড়িয়ে বিনতা গান গাইছে। লক্ষ্যহীরা কাছে এসে তাকে সম্ভাষণ জানালে। বিনতা জানালে, সে এসেছে ভিক্ষা চাইতে। লক্ষ্যহীরা বললে, একদিন বিনতা ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছে, আজ সে যা-ভিক্ষা চাইবে তা-ই পাবে। বিনতা জানালে, তার স্বামীর অভিলাষের কথা, তবে স্বামীর পরিচয় দিলে না। লক্ষ্যহীরা রাজী হলো কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে হবে জেনেও। সতী নারী স্বামীর জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত; এই নাকি রীতি। বিনতাও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বামীকে গণিকা লক্ষ্যহীরার কক্ষে পেণছে দিয়ে গেল। কৌশিক লক্ষ্যহীরার কাছে তার পরিচয় ব্যক্ত করলে। যথাসময়ে বিনতা স্বামীকে নিয়ে নিজেদের গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলে। ওদিকে লক্ষ্যহীরা তার জীবনের হতাশা জানালে মহাকালের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত। তার মধ্যে পড়ে বনপথ দিয়ে যেতে যেতে কৌশিক হোঁচট খেয়ে পড়লো উপরন্ত এক মুনির ঘাড়ে। মুনি কুপিত হয়ে অভিশাপ দিলে, রাত্রি শেষে প্রথম সূর্যপাতে কৌশিকের মৃত্যু হবে। বিনতা জানালে, সে যদি প্রকৃতই সতী হয় তাহলে সে-রাত্রি আর কখনো প্রভাত হবে না। কিন্তু প্রভাত হলো; আর সঙ্গে সঙ্গেই কৌশিকেরও মৃত্যু হলো। বিনতা হাহাকার করে উঠলো, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলে যে, কৌশিকের কুষ্ঠব্যাধির সকল চিহ্ন মিলিয়ে সে জায়গায় এক দিব্যকান্তি যুবাপুরুষের চেহারা! কৌশিক জীবনও ফিরে পেলে। তারপর তারা তাদের সেই কুটির ছেড়ে যাত্রা করলে, বোধহয় বিনতার বাপের বাড়ি।

* * *

দুর্বল গল্প। ঘটনা বেশ প্যাকিয়ে তোলা বা চরিত্রগুলিকে পুষ্ট করে তুলতে যে রস ও নাট্যজ্ঞান থাকা দরকার তারই হয়েছে একান্ত অভাব। একটা খাপছাড়া ভাবও রয়েছে। গল্প দেখা গেল বিনতাকে নিয়ে, মাঝে কেবল তাকে লুপ্ত করে দিয়ে লক্ষ্যহীরার অবতারণা। আবার লক্ষ্যহীরার পরিনামেরও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা দরকার ছিল। যাকে বলে নাটকীয় সংঘাত, সেটি কোন ঘটনার ক্ষেত্রে জমিয়ে তোলা যায়নি। বৈচিত্র্যহীন দুর্বল ঘটনা ও চরিত্র বলে কারুরই অভিনয়ে এতোটুকুও দীপ্তি ফোটেনি যদিও উত্তমকুমার, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, দীপ্তি রায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ রয়েছেন মুখ্য চরিত্রগুলির রূপায়নে। কমল মিত্র ও চন্দ্রাবতীর মতো শিল্পীকেও মাত্র ক্ষণিকের একটি দৃশ্যে একবার অবতরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, নীলিমা দাস, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি রয়েছেন ছোট ছোট চরিত্রে, কিন্তু কোন সুসার দেয়নি তাতে। অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘ্যের ছবি, কিন্তু তার মধ্যেও অবান্তর দৃশ্য বড়ো কম নয়। কালীপদ সেনের দেওয়া সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া ক'খানি গান না থাকলে এমন নিস্তেজ সংলাপ ও অসাড় ঘটনা দেখতে বসে থাকাই দুরূহ। আবহ সঙ্গীতের পরিচালনায়ও মাঝে মাঝে কোমল রেশটা মনকে পরিবেশানুগ করে দেয়। আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশের কাজ মোটামুটি; ভালো কিছু কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগের অভাব চিত্রনাট্যতেই।

কাজ করেছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর খান। ছবিখানির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং পরিচালক চিত্তরঞ্জন মিত্র।

একলব্য

গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব এবারও হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। মোহনবাগান ক্লাবের এখনও একটি খেলা বাকি এবং এখন পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত না হয়েই তারা লাভ করেছে বিজয়ীর সম্মান। বিজয় অভিযানের মধ্যে যেভাবে মোহনবাগান ক্লাব লীগ লাভ করেছে, তাতে এবারও তাদের অপরাজিত থাকবার সম্ভাবনা।

হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ মোহন-বাগানের কাছে কিছু নতুন ঘটনা নয়; অপরাজিত থেকে লীগ বিজয়ও নয় তাদের নতুন সম্মান। ইতিপূর্বে মোহনবাগান ক্লাব আরও ৪বার লীগ বিজয়ী হয়েছে—এর মধ্যে তিনবারই থেকেছে তারা অপরাজিত। আবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেনি অথচ অপরাজিত থেকে লীগ রানার্স হয়েছে এ ঘটনাও মোহনবাগানের হকি ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, এবার নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব পাঁচবার লীগ বিজয়ী হল। এছাড়া মোহনবাগান ক্লাব তিনবার হয়েছে লীগ রানার্স।

বিশ শতকের প্রথমদিকে বি ই কলেজ, কাস্টমস, গ্রীয়ার প্রভৃতি শক্তিশালী ক্লাব হকি ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে রেখেছে বা তারপর রেঞ্জার্স, পোর্ট কমিশনার্স প্রভৃতি ক্লাব যে উন্নত হকি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছে, তার মধ্যে মোহনবাগান ক্লাব অবশ্য পাত্তা পায়নি। তবুও ১৯৩৫ সালে তাদের প্রথম লীগ বিজয় প্রাক যুদ্ধকালীন ঘটনা। যুদ্ধোত্তর হকিতে মোহনবাগান ক্লাব যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, অন্য কোন ক্লাবই সে প্রতিষ্ঠা বা সে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর হকিতে মোহনবাগানের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। প্রাক যুদ্ধকালীন হকিতে মোহনবাগানের সাফল্য ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর না হলেও পনেরো বিশ বছর আগে যখন সাদায় কালায় ছিল বিরাট পার্থক্য এবং কলিকাতার হকি ক্ষেত্রে সাদারই ছিল প্রাধান্য তখনো যে কয়জন ভারতীয় হকি খেলোয়াড় উন্নত ক্রীড়া চাতুর্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন, তাদের অনেকেই ছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়। ১৯৩৫ সালে ভারতের যে হকি টীমটি নিউজিল্যান্ড সফর করে তার মধ্যে দুইজন ছিলেন বাঙ্গালী খেলোয়াড়। এরা দুইজনই মোহনবাগানের সভ্য। নির্মল মুখার্জি আর প্রভাস দাশ। ভারতের অন্যতম অলিম্পিক অধিনায়ক পার্লামেণ্ট সদস্য জয়পাল সিংও মোহন-বাগানের হকিকে কম সমৃদ্ধ করে যাননি। মোহনবাগানের বর্তমান খেলোয়াড়রা পূর্ব-সূরীদেরই উত্তরসাধক।

* * *

চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রানার্সের প্রশ্ন মীমাংসিত হলেও হকি লীগের কয়েকটি খেলা এখনও বাকি আছে। সুতরাং লীগে কে কয়টি গোল করলেন, কোন দল কাকে পরাজিত করলো এ হিসাব এখানে প্রকাশ না করলে তা অপূর্ণ থেকে যাবে; তাই লীগ অন্তে সমস্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করার ইচ্ছে রইলো। হকি লীগ খেলা এবার মোটেই ভাল

১৯৫৬ সালের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব। (বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে)—ডেভিড, এস রায়, হরজিন্দার সিং, কে সেন (হকি সম্পাদক), ওয়াহিদুল্লা, ধরমপাল সিং ও বি চক্রবর্তী; (বাঁ দিক থেকে বসে) আর মল্লিক, টম্পসন, থাপা, পিয়ারা সিং ও সি এস দুবে

জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি সারা লীগের খেলার মধ্যে একটি খেলার কথাও উল্লেখ করা যায় না, যার উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শকমনে ছাপ রেখে গেছে। নিতান্ত মামুলীভাবেই শেষ হতে চলেছে কলকাতা হকি লীগের খেলা। সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত হকি খেলায় অধুনা ক্রীড়ামানের এই নিম্নগতির কারণ কি? ভারতীয় হকির দিগন্তব্যাপী ঔজ্জ্বল্য আজ ধূলোয় মলিন। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, দারা, পিনিজার, কারএলেনের ক্রীড়া প্রতিভার রূপময় কাহিনী আজ উপকথায় পরিণত হতে চলেছে। ভারতীয় হকির দিকপালদের অতীত কাহিনী কানে শুনলে মনে সন্দেহ জাগে সত্যিই কি আগের দিনের হকি খেলা এত সুষমা মাখানো ছিল? সত্যিই কি হকি স্টিকের সূক্ষ্ম কারিগরি, বল আর স্টিকের নিপুণ স্পর্শের ছন্দোময় অক্রমণধারা সবুজ ঘাষের উপর ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতো? প্রবীয়ান ক্রীড়ামোদী—যাদের চোখের সামনে পুরনো দিনের হকি খেলায় সৌন্দর্য সুষমা স্বপ্নের মত ভেসে আছে, তাদের মতে আজকের দিনের হকি খেলার সঙ্গে পুরনো দিনের ক্রীড়াচাতুর্যের আকাশ-জমিন পার্থক্য। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাঁতার এবং অন্যান্য খেলাধূলায় যেখানে দিনের পর দিন উন্নতি দেখা যাচ্ছে, সেখানে ফিল্ড গেম অর্থাৎ হকি ফুটবল প্রভৃতি খেলার ক্রীড়ামান নিম্নমুখী কেন এটা ভেবে দেখা দরকার।

কলকাতার হকিতে আজকের যে দৈন্যদশা এটা আরম্ভ হয়েছে, ১৯৫৪ সাল থেকে বাইরের খেলোয়াড়ের উপর বি এইচ এর বাধা-নিষেধ আরোপের পর। এবার অবশ্য কলকাতার মাঠে বাইরের কয়েকজন খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটলেও খেলা থেকে উন্নত নৈপুণ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। প্রথম ডিভিশনের ১৯টি ক্লাবের মধ্যে মোহন-বাগানের খেলায় তবুও কিছুটা সঙ্গতি ছিল, যার ফলে মোহনবাগানের লীগ জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আগে যারা লীগ পেয়েছে, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল—

লীগের পূর্ববর্তী বিজয়ী দল

১৯০৫--৬ সাল—বি ই কলেজ; ১৯০৭—ক্যালকাটা; ১৯০৮—বি ই কলেজ; ১৯০৯-১০—কাষ্টমস; ১৯১১—বি ই কলেজ; ১৯১২-১৩—কাষ্টমস; ১৯১৪-১৭—রেঞ্জার্স; ১৯১৮—মিলিটারী মেডিক্যালস; ১৯১৯—গ্রীয়ার; ১৯২০—বি ই কলেজ; ১৯২১--২২—কাষ্টমস; ১৯২৩—গ্রীয়ার; ১৯২৪--২৫—জ্যাভেরিয়ান্স; ১৯২৬--২৭—কাষ্টমস; ১৯২৮--২৯—রেঞ্জার্স; ১৯৩০--৩৩—কাষ্টমস; ১৯৩৪—রেঞ্জার্স; ১৯৩৫—মোহন-বাগান; ১৯৩৬--৩৯—কাষ্টমস; ১৯৪০—বি জি প্রেস; ১৯৪১—পুলিশ; ১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৩—রেঞ্জার্স; ১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৫—মহঃ স্পোর্টিং; ১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৭ খেলা হয় নাই; ১৯৪৮-৪৯—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৫০—কাষ্টমস; ১৯৫১--৫২—মোহনবাগান; ১৯৫৩--৫৪—ভবানীপুর; ১৯৫৫—মোহনবাগান।

* * *

আন্তঃ অফিস ক্রিকেট লীগের যুগ্ম বিজয়ী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাবকে সম্বর্ধনার জন্য ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সঙ্গে তারা টেস্ট ক্রিকেটার পি রায়, যিনি টেস্ট খেলায় মানকড়ের সঙ্গে প্রথম উইকেটের রানে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন, তাকেও সম্বর্ধনা জানান। পি রায় এবং ব্যাঙ্ক দলের খেলোয়াড়দের কয়েকটি পুরস্কারও প্রদান করা হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রী পি গুপ্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন; কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক শ্রী এ এন ঘোষ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী গুপ্ত ও শ্রী ঘোষ খেলাধূলার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই উৎসাহের জন্য কর্তৃপক্ষকে

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাবের প্রীতি অনুষ্ঠানে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি শ্রী পি গুপ্তর কাছ থেকে কৃতী ক্রিকেট খেলোয়াড় পি রায় রৌপ্যাধারে মানপত্র গ্রহণ করছেন

ধন্যবাদ জানিয়ে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের চাকুরি দিয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করেন।

সরকারী এবং বে-সরকারী বহু অফিসেই এখন স্পোর্টস ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছে। ফুটবল ক্রিকেট, হকি, টেবিল টেনিস, ভলিবল প্রভৃতি খেলাধূলার আন্তঃ অফিস লীগও পরিচালিত হচ্ছে। অফিস ক্লাবগুলির মধ্যে খেলাধূলার প্রসার এবং আগ্রহে কিছু কিছু খেলোয়াড়ের কর্ম সংস্থান না হয়েছে এমন নয়। অবশ্য চাকুরি দানের ক্ষেত্রে খেলাধূলাই একমাত্র গুণ বলে বিবেচিত হয় না। কিছু লেখাপড়ার সঙ্গে খেলার নৈপুণ্য আয়ত্ত থাকলে সহজেই চাকুরি জুটে যায়। আমাদের দেশে অর্থকরী বিদ্যাই অভিভাবকের প্রধান লক্ষ্য থাকে। অধিকাংশ অভিভাবকই চান তার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়কে একজন খেলোয়াড়রূপে না দেখে একজন গ্র্যাজুয়েটরূপে দেখতে। ফলে অনেকের ছাত্র-জীবনে স্বাভাবিকভাবেই খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাধা আসে। কিন্তু অভিভাবকরা যদি বোঝেন খেলার মাধ্যমে তার পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হতে পারে, তবে তাদের তরফ থেকেও খেলাধূলা শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ আসা স্বাভাবিক। অবশ্য লেখাপড়ার বদলে খেলাধূলায়ই শুধু উৎসাহ দিতে হবে এটা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য, যেসব ছাত্র লেখাপড়া ও খেলাধূলার দোটানায় এবং অভিভাবকের তাড়নায় অশান্তিতে কাল যাপন করে, তারা কিছুটা শান্তিতে কাল কাটাতে পারবে। আর খেলাধূলার নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠলে কর্ম সংস্থানেও কিছু অসুবিধা হবে না। শ্রী পি গুপ্ত এবং শ্রী এ এন ঘোষ এই জন্যই বোধ হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে খেলোয়াড়দের চাকুরি দিয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করেছেন। দেশের শিল্পপতিদের কাছে আমাদেরও অনুরোধ, তারা যেন বেশী সংখ্যায় খেলোয়াড়দের চাকুরি দিয়ে উৎসাহিত করেন। কারণ অফিসের কাজকর্মের মধ্যে খেলাধূলার চর্চা থাকলে সেখানে একটা সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করে, আর প্রতিদিনের খেলার সংবাদের সঙ্গে বিনা পয়সায় তাদের অফিসের পাবলিসিটিও হয়ে যায়। দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা বা টাটা স্পোর্টস ক্লাবের মাধ্যমে দিল্লী ক্লথ মিল বা টাটা কোম্পানী সারা ভারতের খবরের কাগজে যে পাবলিসিটি পায়, পয়সা খরচ করে এই পাবলিসিটি পেতে হলে তাদের হয়তো অনেক বেশী টাকা খরচ করতে হত, যে টাকা খেলার প্রয়োজনে তাদের খরচ করতে হয় না।

* * *

গত ১৫ই এপ্রিল ২৪ পরগণার জেলা শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের 'নতুন ভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। ২৪ পরগণায় 'জেলা ভবন' নামে পরিচিত এই সুন্দর ছোট বাড়ীটি সোদপুর রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। এখন থেকে এটাই হলো ২৪ পরগণা জেলার খেলাধূলো পরিচালনার প্রধান আস্তানা। শুধু খেলাধূলোরই নয়, এখানে লাইব্রেরী থাকবে, ক্যান্টিন থাকবে, কো-অপারেটিভ স্টোর্স থাকবে, ব্যাডমিণ্টন খেলার জায়গা ও জিমনাসিয়াম থাকবে—তারপর থাকবে বড় হলে লেকচার দেওয়া ও খেলাধূলো এবং শিক্ষা-মূলক ফিল্ম দেখবার ব্যবস্থা জেলা এসো-সিয়েশনের কর্ণধারদের অভিমত: শুধু খেলেই এসোসিয়েশন রাখা যাবে না—ছেলেদের মানুষ করে তুলতে সকল চেষ্টা ও যত্ন দিতে হবে, তাদের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তুলতে হবে। তাই তাঁরা 'জেলা ভবনকে' জেলার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির প্রথম সোপান বলেই মনে করেন—এ ভবন বন্ধুহীনকে বন্ধুর সন্ধান দেবে—এ ভবনের স্নিগ্ধ পরিবেশ বৃদ্ধের শেষ জীবনে স্বস্তির নিশ্বসত্যাগের যায়গা হয়ে উঠবে।

২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কার্যকলাপের যারা কিছু খোঁজ খবর রাখেন তারা জানেন এদের খেলাধূলো পরিচালনার গণ্ডি কত ব্যাপক—কত সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে, এরা বিভিন্ন খেলাধূলো পরিচালনা করে থাকেন। সুদূর কাঁচড়াপাড়া থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত এদের ক্রীড়াক্ষেত্র প্রসারিত। পাঁচটি মহকুমায় এদের অন্তর্ভুক্ত ক্লাবের সংখ্যা কয়েকশত। ৫০টি পুরো আকারের মাঠে এইসব খেলাধূলো পরিচালিত হয়ে থাকে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলি, ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিক কোন কিছুরই অভাব নেই। এসোসিয়েশনের পরিচালকদের মধ্যে নেই ক্ষমতার লড়াই, নেই কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব। 'এক প্রাণ, এক মন একতার' সুরে সুর মিলিয়ে এরা কাজ করে যাচ্ছেন।

একটা জেলা এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় আস্তানা খাড়া করবার জন্য হাজার দশেক টাকা খরচ করা কম কথা নয়। আই এফ এ বা সি এ বি যারা ফুটবল ও ক্রিকেট থেকে বছরে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করেন তাঁরাও আজ পর্যন্ত নিজস্ব কোন ভবন তৈরী করতে-পারেননি। ইডেন উদ্যানে এন সি সি-র মাঠে সি এ বি-র একটি আস্তানা আছে বটে; কিন্তু এন সি সি-র কর্মকর্তারা এটাকে রিফিউজির জবর দখল কলোনী ছাড়া আর কিছু মনে করে না। সি এ বি ও এন সি সি-র মধ্যে সম্পর্কও মধুর নয়। আর আই এফ এ, যারা মাত্র একটি চ্যারিটি খেলার টাকা দিয়েই একটি বাড়ী তৈরী করতে পারে তারা বছর বছর ভাড়া গুণে মরছে কেন বুঝি না। আসল কথা উৎসাহের অভাব, অনুপ্রেরণার অভাব, পরিচালনা পদ্ধতির কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। ক্ষমতার মোহে সবাই ভরপুর। তাই আই এফ এর বাড়ী করবার জায়গা আজও খালি পড়ে আছে।

* * *

স্টেডিয়াম সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারে। ফুটবল, ক্রিকেট বা হকি খেলার পরিচালনা ভার যাদের উপর ন্যস্ত অর্থাৎ যারা ছলেই হক, বলেই হক আর কৌশলেই হক বহুদিন ধরে কলকাতার খেলাধূলার পরি

লনা ভর কুক্ষিগত করে রেখেছেন তারা স্টেডিয়াম' গড়ে তুলবেন এ আশা শহরের ক্রীড়ামোদির মন থেকে বহুদিন উবে গেছে। স্টেডিয়াম সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের আগ্রহ এবং স্পোর্টস বিল পাশ হতে দেখে অনেকের মনেই আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও দেখছি একই নীতি। এই যে বিধান সভার বাজেট অধিবেশন হয়ে গেল, কই স্টেডিয়াম সম্পর্কে তো বাজেটে কিছুই দেখা গেল না, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ার মধ্যেও স্টেডিয়ামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কি বুঝবো ক্রীড়াক্ষেত্রে নরদেবতাদের মত রাজ্য সরকারের নরোত্তমদেরও আছে 'অনেক কাশি, অনেক বাঁশি, অনেক আয়োজন' নেই শুধু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, নেই অন্তর্নিহিত আদর্শের গান।

* * *

বাহাওয়ালপুরের (পাকিস্থান) আগাখান স্পোর্টস ক্লাব ফাইন্যালে বোম্বের সেণ্ট্রাল রেল দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এটা দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলায় কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। পাকিস্থান টীম ফাইন্যালে জয়লাভ করলেও বিজয়ীর পুরস্কার গোল্ড কাপটিকে কিন্তু সংগে নিয়ে যেতে পারবে না। ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব দশ হাজার টাকা মূল্যের এই কাপটি দান করবার সময় এক বিধি আরোপ করে রেখেছেন : কোন অবস্থাতেই কাপটি ভারতের বাইরে যেতে পারবে না। কাপটির নিরাপত্তার জনই বোধকরি ন্যাশন্যাল স্পোর্টস ক্লাবের এই রক্ষাকবচ। কারণ ইতিপূর্বে যে দেশ থেকে রূপোর কাপ ফিরে আসেনি সেদেশে দশ হাজার টাকা দামের সোনার কাপ ছেড়ে দেওয়া যায় কি ভাবে? যাদের দুধ খেয়ে গাল পোড়ে তাদের দই দেখে ভয় আসা স্বাভাবিক।

খেলাধুলার খবরাখবর

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট—ইংলণ্ড সফরের পর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল পাকিস্থান ও ভারতে পাঁচ দিনব্যাপী যে ৪টি টেস্টম্যাচ খেলবে, তার দিন তারিখ এখন পাকাপাকি-ভাবে ঠিক হয়েছে। পাকিস্থানে প্রথম টেস্ট আরম্ভ হবে ১২ই অক্টোবর, ভারতে প্রথম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হবে মাদ্রাজে। ১৯শে অক্টোবর খেলাটি আরম্ভ হবার কথা। বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্ট ২৭শে অক্টোবর এবং কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট ২রা নবেম্বর আরম্ভ হবে।

ড্রবনির পরাজয়—ইটালীতে জেনোয়া আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ৫৪ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ ড্রবনিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ইটালীর উদীয়মান ডেভিস কাপ খেলোয়াড় আয়লা ৬—২, ৬—২ ও ৬—৪ ড্রবনিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন।

আমেরিকার নিগ্রো টেনিস পটিয়সী মিস আলথিয়া গিবসন অস্ট্রেলিয়ার থেলমা লংকে হারিয়ে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন।

জাপান সফরে ভারতের শ্যুটিং টীম—জাপানের সঙ্গে রাইফেল শ্যুটিংয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ভারতের এক রাইফেল স্যুটিং টীম মে মাসের বিশ তারিখে জাপান অভিমুখে যাত্রা করবে। কলকাতায় এক ট্রায়াল শ্যুটিং প্রতিযোগিতার পর জাপানে দল প্রেরণের জন্য ভারতের ৬জন রাইফেল চালক মনোনীত করা হয়েছে। বাঙলার ডাঃ হরিব্যানার্জি হয়েছেন দলের অধিনায়ক। অপর পাঁচজনের নাম—হরিচরণ শা (বাঙলা), ঠাকুর সাহেব অব গংগট (আমেদাবাদ), গণেশ দাশ (বাঙলা), কুমার কেশব সেন (আসাম); স্ট্যাণ্ড বাই—কে ডি সাহা ও মিসেস গীতা রায়।

জাতীয় হকিতে বাঙলা দল—আগামী ২৮এ এপ্রিল থেকে জলন্ধরে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে। বাঙলাকে ৫ই প্রথম খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে মধ্যপ্রদেশের সংগে। বাঙলার পক্ষে যারা মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম ঃ—

গোল—মেণ্ডিস (পুলিশ) ও বি সেন (উয়াড়ী); ব্যাক—স্বরূপ সিং (ইস্টবেংগল), রডরিগস (ইস্টবেংগল) ও ডি ব্যানার্জি (পুলিশ); হাফব্যাক—ক্লডিয়াস (কাস্টমস—অধিনায়ক), ভোলা চক্রবর্তী (মোহনবাগান), ও ডেভিড জুজপেরেরা (ইস্টবেঙ্গল) ফরোয়ার্ড—কুন্দুস (মোহনবাগান); আনোয়ার (পোর্ট কমিঃ), ধরম (মহমেডান), জগদীশ (ইস্টবেঙ্গল), পাল (মোহনবাগান), বুলবুল কারাপিয়া সিং (মোহনবাগান), ও হামিদ (মেহুঃ পিকে (আর্মেনিয়ান্স) স্পোর্টিং)।

দেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—আজ লোকসভায় সহকারী শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী ঘোষণা করেন যে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং সারা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত কার্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আজ কলিকাতায় রেলওয়ে সপ্তাহের শেষ দিবসের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এন সি কাপুর ঘোষণা করেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতের রেলপথসমূহের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাবদ ১১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েকেই ২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে তিন কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবে।

১৭ই এপ্রিল—আজ বাঁকুড়ায় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাঙলার প্রবীণতম মনীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে অনারারী ডক্টরেট অব লিটারেচার উপাধিপত্র গ্রহণ করেন।

অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ আজ লোকসভায় অর্থবিল সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি তুলা বীজ তৈলের শুল্ক পাউন্ড প্রতি ৬ পাই হইতে কমাইয়া তিন পাই করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নিঃ ভাঃ দেশরক্ষা কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে দেশরক্ষা বিভাগের শ্রমিক ও কর্মচারিগণ অদ্য ছাটাই-এর প্রতিবাদে এবং কর্মসংস্থানের দাবীতে কলিকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১৮ই এপ্রিল—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ অদ্য লোকসভায় দীর্ঘ-প্রত্যাশিত রাজ্যপুনর্গঠন বিল এবং সংবিধান (নবম) সংশোধন বিল উত্থাপন করেন।

১৯শে এপ্রিল—আজ কলিকাতা পোর্ট এলাকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কলিকাতা ডকের প্রায় আট হাজার শ্রমিক গত পাঁচ দিন যাবৎ কাজ করিতে অস্বীকার করায় জাহাজে মাল খালাস ও বোঝাই কাজের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ বন্ধ আছে। উহার ফলে ৬৫টি বিদেশগামী জাহাজ বন্দরে আটক পড়িয়া আছে।

আসাম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর সর্বাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল কোচার আজ একটি

বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে নাগা হত্যাকাণ্ড অথবা ঘৃণ্য অপরাধের জড়িত নহে, তাহারা যদি দুই সপ্তাহের বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে, তবে দিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা হইবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

২০শে এপ্রিল—অদ্য কলিকাতায় নে তদন্ত কমিটির সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয়। দিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ডে ডিরেক্টর শ্রীশশধর মজুমদার কমিটির সাক্ষ্য দেন।

রাষ্ট্রপতি শ্রীসৈয়দ ফজল আ শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের স্থলে আস রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীদৌলা আগামী মাসের মাঝামাঝি আসামের রাজ্য পদ ত্যাগ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তা প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে পদ কলিকাতায় আগমনের জন্য মানভূম কে সেবক সঙ্ঘের সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক উ ৭৬ বৎসর বয়স্ক নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘো পরিচালনায় অদ্য বিহার সীমান্ত অতি করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন।

২১শে এপ্রিল—খড়্গপুরে ভারত কারিগরী বিদ্যায়তনের প্রথম সমাবর্ত অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহ দেশবাসীর নিকট দেশে 'ভাবগত ঐ' স্থাপনের এবং দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক একই বিরাট পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এই দিন খ-পুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনল নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন।

গতকল্য শেষ রাত্রে কলিকাতায় জোড়াসাঁকো নন্দ মল্লিক লেনে শ্রীরাধাকিষণ পোদ্দার নামে অনুমান ৪৭ বৎসর বয়স্ক একজন ব্যবসায়ী নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

২২শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ পাটনায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আণবিক শক্তি আজ বিশ্বের সম্মুখে বৃহত্তম জিজ্ঞাসা। মানব জাতির কল্যাণ অথবা ধ্বংসের জন্য আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইবে কিনা শীঘ্রই তাহার জবাব দিতে হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার অদ্য ঢাকায় সাংবাদিকগণকে বলেন যে, এখন হইতে প্রাদেশিক সরকারের সকল বিভাগে চাকুরির শতকরা ২৩টি অ-মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

আজ তেহরানে বাগদাদ চুক্তি পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়।

১৭ই এপ্রিল—আজ রাত্রে সোভিয়েট ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মঃ মিকোইয়ান সরকারীভাবে কমিনফর্ম ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সংবাদ সমর্থন করেন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, গত তিন সপ্তাহ যাবৎ পাকিস্থানী বিমানসমূহ ক্রমাগত পাঞ্জাবে (ভারত) ভারতীয় আকাশ সীমানা লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্থানের নিকট প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল—আজ রুশ প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং মঃ খ্রুশ্চেভ জাহাজযোগে বৃটেনের পোর্টসমাউথ বন্দরে পৌঁছিলে সম্বর্ধিত হন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় পাঞ্জাব হইতে খালের জল সরবরাহের জন্য পশ্চিম পাকিস্থান সরকারের নিকট ভারতের যে ৭০ লক্ষ ২২ হাজার ৫০৫ টাকা পাওনা হইয়াছে, তাহা সত্বর পরিশোধের জন্য ভারত সরকার পাকিস্থানকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—ইস্রাইল ও মিশর তাহাদের সাধারণ সীমান্ত বরাবর বিনাশর্তে যুদ্ধবিরতি পালন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আজ লণ্ডনে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও মঃ খ্রুশ্চেভের সহিত বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন প্রথম আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

২০শে এপ্রিল—সিংহলের গভর্ণর জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলক অদ্য পার্লামেণ্টে তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, সিংহল কোন শক্তিগোষ্ঠীর সহিত নিজেকে যুক্ত করিবে না। তিনি বলেন যে, কাটুনায়ক এবং ত্রিণকোমালীতে অবস্থিত বৃটিশ ঘাটির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হইবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—১০, ষাণ্মাসিক—১০

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২১৫

মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভ বৃটেন পরিদর্শনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। রুশ নেতাদের প্রতি বৃটেনের আতিথ্যে আদরের ন্যূনতা বা আতিশয্য কোনটাই প্রকাশ পায়নি। জনসাধারণের কৌতূহল বা ঔৎসুক্য কোথাও অত্যুৎসাহের রূপ নেয়নি। সবকিছু বৃটিশ দস্তুর-মাফিক হয়েছে। আমেরিকায় যাদের আশংকা হয়েছিল, রুশ নেতারা বুঝি বৃটেনবাসীদের 'জাদু' করে ফেলেন, তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অন্যদিকে যারা ভেবেছিল যে বৃটিশ ও রুশ নেতাদের মধ্যে আলোচনার ফলে অন্ততঃ গোটা কয়েক আন্তর্জাতিক সমস্যা আশু সমাধানের পথে আসবে, তারাও নিরাশ হবে। বস্তুত উপরোক্ত আশংকা এবং আশা কোনটারই দৃঢ় ভিত্তি ছিল না। রুশ নেতাদের সফরান্তে লণ্ডনে যে সরকারী যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে কোনো নূতন মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিদর্শন নেই। যে-সব গুরুতর বিষয়ে মতের অনৈক্য ছিল, সেগুলি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কোনটারই সমাধান হয়নি।

ব্যাপারটা অনেকাংশে গত বছরের চার-প্রধানের জেনেভা মিলনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান না হলেও জেনেভা মিলনের যেমন একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল, তেমনি রুশ নেতাদের বৃটেন পরিভ্রমণেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষের সহ-অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং 'কোল্ড ওয়ারের' উগ্রতা হ্রাসের জন্য উভয় পক্ষের আগ্রহ। কোনো পক্ষই তার নিজের জোট ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত নয়, উভয়েই স্ব-স্ব প্রভাবের ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর এবং তার জন্য ঠেলা-ঠেলি চলবে, একে অপরের অসুবিধার সুযোগ নিতে পারলে ছাড়বে না, তবে কেউই যুদ্ধ চাচ্ছে না। অস্ত্রসজ্জার ভার কমাতেও সকলে চায়, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহের ভাব যে পর্যায়ে এলে অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের একটা কার্যকরী পরিকল্পনায় উভয় পক্ষ সম্মত হতে পারে, তার এখনো দেখা নেই।

কিন্তু অবিশ্বাস দূর না হলে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস হবে না। অস্ত্রসজ্জার হ্রাস না হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে, এই বোধ ক্রমশ বাড়ছে। অর্থনীতির দিক দিয়ে অবিশ্বাসের মূল্য এতো বেড়ে উঠছে যে, কর্তারা রক্ষা করতে হলে বৃটেনের শিল্পবাণিজ্যের আরো প্রসার এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রসজ্জার ভার হ্রাস আবশ্যক। মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলেছেন যে রুশিয়া আগামী পাঁচ বছরে বৃটেন থেকে একশত কোটি পাউণ্ড মূল্যের জিনিসপত্র কিনতে রাজি আছে। বলা বাহুল্য, বৃটেনের পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু এ প্রস্তাবের পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার পক্ষে বর্তমানে গুরুতর বাধা রয়েছে। কম্যুনিস্ট শাসিত দেশসমূহের নিকট অনেক রকমের মাল (তথাকথিত Strategic goods) বিক্রয় বর্তমানে নিষিদ্ধ। পূর্বে যতো রকমের মালের উপর নিষেধ ছিল, তার চেয়ে এখন কিছু কম। বৃটেনের চাপেই এই বাধানিষেধের বহর আমেরিকা কিছু সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়েছে। বৃটেন বাধানিষেধ আরো শিথিল করা বা একেবারে উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। 'Strategic goods'এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা মুশকিল এবং কার্যত দেখা গেছে যে, বাধানিষেধের ফলে কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরই ক্ষতি হয়েছে, কম্যুনিস্ট দেশসমূহের রণশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা হয়নি।

সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট বৃটেনকে যে এক শত কোটি টাকার মূল্যের অর্ডার দিতে প্রস্তুত, তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ নাকি নিষিদ্ধ তালিকার মধ্যে পড়ে। কিন্তু বৃটেন যদি নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত মাল না দিয়ে কেবল অন্য মালগুলি সরবরাহ করতে চায় তবে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট তাতে রাজি হতেও পারেন। যাই হোক অতঃপর কম্যু-নিস্ট দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করার উপর বর্তমান বাধানিষেধগুলি তুলে দেবার জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মার্কিন সরকারের উপর নিশ্চয়ই অত্যধিক চাপ দিবেন। এবিষয়ে মার্কিন গবর্নমেণ্ট কতখানি নরম হবেন বলা যায় না, তবে কিছুটা নরম না হয়ে পারবেন না। মজা হচ্ছে এই যে কম্যুনিস্ট শাসিত দেশসমূহের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমেরিকারই সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, কারণ রপ্তানিযোগ্য মাল উৎপাদনের ক্ষমতা আমেরিকারই সবচেয়ে বেশি।

কম্যুনিস্ট শাসিত দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের জন্য বৃটিশ আগ্রহের আর একটা বড়ো কারণ রয়েছে। বর্তমানে জাপান চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারছে না ফলে অনেক ক্ষেত্রে বৃটিশ ও জাপানী মালের (বিশেষত consumers goods এর) মধ্যে প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছে। আমেরিকা চায় জাপান চীনে যে বাজার হারিয়েছে, সেটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পূরণ করা হবে। বৃটেনের পক্ষে সেটা মোটেই ভালো কথা নয়। জাপান যদি চীনে মাল বেচার সুবিধা পায়, ত

টেনের সংগে তার বর্তমান ও ক্রমবর্ধমান অযোগিতার তীব্রতা হ্রাস পাবে বলে টশ আশা করে। বর্তমানে জাপানী জযোগিতার চাপে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র শিল্প সঙ্কটের আভাস দেখা দিয়েছে।

অন্যদিক দিয়ে জার্মান প্রতিযোগিতাও বৃটেনকে ভাবিয়ে তুলেছে। পশ্চিম জার্মানীতে শিল্পের অদ্ভুত পুনরভ্যুদয় ঘটেছে। কম্যুনিস্ট শাসিত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের বাধা থাকার দরুণ পশ্চিম জার্মানীর যন্ত্রশিল্পের পক্ষে একটা বিরাট রপ্তানী বাজারের দোর বন্ধ হয়ে রয়েছে। পশ্চিম জার্মানী বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে কলকারখানার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে শুরু করেছে, যেসব অঞ্চল পূর্বে বৃটিশ শিল্প নিজের 'স্বাভাবিক' এলাকা বলে মনে করত।

বৃটিশ শিল্পের আর একটা মুশকিলের প্রতি সম্প্রতি মিঃ বেভান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যার সংগে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে। মিঃ বেভান বলেছেন যে, রাশিয়া যে মাল কিনতে চাচ্ছে, সেসব সরবরাহ করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হবে না, যদি না বৃটেন অস্ত্র নির্মাণের কাজ কমিয়ে দেয়। কারণ অস্ত্র নির্মাণ শিল্প যদি তার ইস্পাতের চাহিদা না কমায়, তবে রাশিয়া যে-সব ইঞ্জিনীয়ারিং মালের অর্ডার দিতে চায়, সেসব তৈরি করার মতো উপযুক্ত পরিমাণ ইস্পাত বৃটেন জোগাড় করতে পারবে না। অর্থাৎ বৃটেনের ইস্পাত তৈরির ব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান হারে অস্ত্র নির্মাণ এবং রাশিয়ার অর্ডারী মাল প্রস্তুত করা যুগপৎ সম্ভব নয়। সুতরাং হয় অস্ত্রসজ্জা কমাতে হবে অথবা রাশিয়ার অর্ডার (অন্তত অংশত) প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শিল্পের আয়ের উপর যে-জাতির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে এবং যে-জাতি উন্নত জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত হয়েছে, তার কাছে এটা কতবড়ো মুশকিলের প্রশ্ন তা সহজেই অনুমেয়।

তবে অল্পাধিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা না হলে দুই ব্লকের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের পথ তেমন খুলতে পারে না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানের দিকে বিশেষ অগ্রসর হচ্ছে না। সম্প্রতি লণ্ডনে U. Nএর নিরস্ত্রীকরণ কমিটির যে সাব কমিটির বৈঠক হয়ে গেল তাতে কোনো সমঝোতা হয়নি। এই বৈঠকে আমেরিকা, সোভিয়েট, বৃটেন, ফ্রান্স ও কানাডার প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। দুই পক্ষের মতের মিল ঘটানোর দিক থেকে এই বৈঠক নিষ্ফল হওয়ার পরে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার কিন্তু এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, দুই পক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা আগামী বছর মিটে যেতে পারে।

তবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট সম্প্রতি যে ঘোষণা করেছেন, তাতে আরব-ইজরেল যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকটা কমে গেছে। আরব-ইজরেল ব্যাপারে শান্তিরক্ষার জন্য U. N মারফত যে চেষ্টা হচ্ছে, তাতে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট সাহায্য করবেন, একথা রুশ নেতাদের বৃটেনে আসার পূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল। লণ্ডনে কথাবার্তার পরেও সেটা পুনঘোষিত হয়েছে। কর্নেল নসেরের পক্ষে এতে একটু অসুবিধা হলো, কারণ অতঃপর কম্যুনিস্ট শাসিত দেশ থেকে অবাধ অস্ত্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে গেল। অবশ্য সোভিয়েট ভবিষ্যৎ ভেবেই আরব-ইজরেল ব্যাপারে মধ্যপন্থা গ্রহণ করছেন। মিশর ইজরেলকে আক্রমণ করলে আমেরিকা ও বৃটেন এগিয়ে আসবে। আমেরিকার সৈন্যসামন্ত একবার এই অঞ্চলে প্রবেশ করলে তাদের সহজে স্থানচ্যুত করা যাবে না, অন্তত সেটা আরব শক্তিদের সাধ্যের মধ্যে নয়। তখন হয় সোভিয়েটকে নিজে যুদ্ধে নামতে হবে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে ইতিমধ্যে সোভিয়েট প্রভাবের যে বিস্তৃতি হয়েছে, সেটা বিপন্ন হবে। তারা বুঝেছে, সোভিয়েটকে বাদ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে এখন কিছু করা সম্ভব নয়। ইংরেজরা আশা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের বৃহৎ শক্তি হিসাবে সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের প্রভাবকে যথোচিতভাবে স্বীকার করে নিলে আখেরে বৃটিশ স্বার্থ বিশেষ করে তৈল স্বার্থ, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবে। তা না হলে আরব রাষ্ট্রগুলিকে শান্ত রাখা অসম্ভব। তবে আশা করা যে আরব নেতারাও বুঝেছেন যে, বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ সম্ভবত আর বেশি দিন নেওয়া চলবে না। বৃহৎ শক্তিরা নিজেদের স্বার্থই আগে দেখে।

৭।৫।৫৬

ফ্রয়েড : জন্মশতবার্ষিকী

বিমল কর

গত ৬ই মে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জ্ঞানতীর্থে সিগমণ্ড ফ্রয়েডের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হল। যে ভিয়েনা শহর একদিন এই ইহুদী প্রতিভাকে উপেক্ষা এবং উপহাসের বেশি আর কিছু দেয়নি আজ সেখানকারই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি-কক্ষে বিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তির পাশে এই অবাঞ্ছিত মানুষটির ব্রোঞ্জ-মূর্তির পদতলে পুষ্পার্ঘ সমারোহের অভাব ঘটলো না। আর সেই মূর্তির তলায় সফোক্লিসের নাটক থেকে একটি চরণ উদ্ধার করে খোদাই করা থাকল: প্রসিদ্ধ হেঁয়ালিটির অর্থ ইনিই উদ্ধার করেছেন, অসামান্য শক্তিমান পুরুষ ইনি। *

হেঁয়ালি বই কি। মানুষের মন অদ্ভুত এক হেঁয়ালি হয়েই ছিল এতোকাল। আরিস্টটল আত্মার ব্যাখ্যায় কিছু পথ এগিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মাকে ছেড়ে আসতে পারেননি। তারপর দীর্ঘ দু হাজার বছরেরও বেশি স্নায়ুতত্ত্ব এবং মেটাফিজিক্সের আওতায় দেহ এবং আত্মার যে দ্বন্দ্ব চলেছে তাতে মন এক হেঁয়ালি ছাড়া আর কিই বা ছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে মনের চেহারাকে স্বতন্ত্রভাবে আঁকবার চেষ্টা যাঁরা করছেন সিগমণ্ড ফ্রয়েড নিশ্চয় তাঁদের পথিকৃৎ। মনের হেঁয়ালির কিছু রহস্য যে এই প্রতিভাধর পুরুষ আবিষ্কার করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ নেই।

একজন মন্তব্য করেছেন, খৃস্ট ধর্ম য়ুরোপে ঈশ্বরকে আমদানী করেছিল; মানুষের আত্মাকে বলেছিল অমর, আর প্রচার করেছিল ঈশ্বরই মানুষকে পরিচালিত করেন। এরপর রেনাসাঁ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এসে মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর ও তাদের অমর আত্মাকে কেড়ে নিয়ে গেল। যুক্তিবাদ বললে, ঈশ্বর নেই, অমর আত্মা বলে কিছু নেই, যুক্তিই সব, একমাত্র যুক্তির কাছেই মানুষের দায়িত্ব আছে। তারপর এলেন ইহুদী ফ্রয়েড—ঈশ্বর বর্জিত, যুক্তি-আশ্রিত মানুষের কাছে আর এক নতুন তত্ত্ব নিয়ে। তাঁর কথা, ঈশ্বর নয়—মানুষ নির্জ্ঞানের শক্তিতেই পরিচালিত হয়।

ফ্রয়েডের এই 'নির্জ্ঞান'-তত্ত্ব মানুষের পছন্দ হয়নি। তাদের আঘাত করেছে। এর যথেষ্ট কারণ ছিল। এই তত্ত্ব মানুষের চেহারা বদলে দিতে চেয়েছে। নিজেদের সম্পর্কে ধারণাকে পালটাতে বলেছে, প্রথা সম্মান ভালবাসা প্রীতি—এর সনাতন মূল্যকে নাকচ করে নতুন মূল্য দিতে চেয়েছে, ধর্মের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়েছে। মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দেবার সাধনা যিনি করেছিলেন আর যাই হোক ভুলক্রমেও তাঁর জীবদ্দশায় গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করার রেওয়াজ আমাদের নেই। থাকলে সক্রেটিস বিষের পাত্র হাতে তুলে নিতেন না, গ্যালেলিওকে অকথ্য নির্যাতন সইতে হত

সিগমণ্ড ফ্রয়েড

* সফোক্লিসের নাটকে আছে, পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান ইডিপাস বহুকাল পরে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পিতৃরাজ্য থিবাসে এসে দেখেন—রাজ্যটি এক দানবীর (স্ফিংস) গ্রাসে পড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। এই দানবী এক হেঁয়ালি শুধোয়—যে পারে না তাকেই হত্যা করে। থিবাসে এমন কেউ নেই যে এই হেঁয়ালির অর্থ বলতে পারে। এমন সময় ইডিপাস এসে হাজির। ইডিপাস দানবীর হেঁয়ালির জবাব দিতে পারল। দানবী আত্মঘাতী হল। এরপর ইডিপাস থিবাসের রাণী জোকাসটাকে বিয়ে করে সেখানের রাজা হল। ইডিপাস জানতো না জোকাসটা তার মা, জোকাসটাও জানত না ইডিপাস তার ছেলে। ইডিপাসের ওপর দেবতার অভিশাপ ছিল সে তার বাবাকে হত্যা করবে। মাকে বিবাহ করবে। পিতাকে আগেই সে না জেনে হত্যা করেছে। এবার মাকে বিবাহ করল। এই বিবাহের ফলে জোকাসটার গর্ভে ইডিপাসের সন্তানাদি হয়। ইডিপাস যখন ঘটনাটা জানতে পারল অনুতাপে, গ্লানিতে চোখ অন্ধ করলে। রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

ং শেষ বয়েসে অন্ধ হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী
নাস্তিক বলতেন না এই
ক আমি শতগুণে বাড়িয়েছি,
undred thousand times beyond
belief of the wise men of by-
days'.

ফ্রতিস যদি প্রকৃত জ্ঞানের
গলিও যদি এই বিশ্বের প্রচলিত
র্ণ সীমাকে প্রসার করে থাকেন—
ণ্ড ফ্রয়েড অবশ্যই মনের পরিধিকে
সহস্র গুণ প্রসারিত করেছেন। ক্ষুদ্র
ট আভিধানিক হেঁয়ালি শব্দকে
রিত জীবনের মধ্যে আকার দিতে
রছেন।

॥২॥

১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ার
বার্গে (তখন ছিল অস্ট্রিয়ায়, এখন
চেকোস্লোভাকিয়ায়; আর ফ্রাইবার্গের
ন নাম হয়েছে প্রাইবর) সিগমণ্ড ফ্রয়েড
গ্রহণ করেন। সিগমণ্ডের বাবার নাম
া জেকব ফ্রয়েড। এই ইহুদী ভদ্রলোক
লেন পশম-ব্যবসায়ী। নিম্ন মধ্যবিত্তের
দার। খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না
কবের। ভিয়েনায় যাবার পর তাঁর অবস্থা
রই আরও পড়তে থাকে বলে মনে
য়। জেকব ফ্রয়েডের দুই বিয়ে।
দ্রলোকের বয়স যখন চল্লিশ পার হয়েছে
নি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। একুশ
রের যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করলেন
র গর্ভে প্রথম সন্তান সিগমণ্ড। সিগমণ্ডরা
ই বোনে মিলে (বৈমাত্র ভাই সমেত)
লেন আটজন।

সিগমণ্ডের যখন জন্ম তখন তাঁদের
রিবারিক অবস্থাটা দেখবার মতন।
সগমণ্ডের বৈমাত্র বড় ভাই ইমানুয়েল
তদিনে পিতা হয়ে গেছেন। ভাইপোর
চয়ে সিগমণ্ড বয়সে ছোটই ছিলেন। আর
মানুয়েলের ছোট, সিগমণ্ডের অপর
বমাত্র ভাই ফিলিপ ছিল তাঁর মায়ের
য়েসী।

এই পারিবারিক পরিবেশটা জটিল নয়
কি? চল্লিশোত্তর পিতা, তরুণী মা,
বৈমাত্র ভাইদের একজন পিতার বয়সী
অন্যজন মার সমবয়সী—বন্ধু স্থানীয় হবার
যোগ্য। পারিবারের এই জীবনচক্র কিশোর
ফ্রয়েডের কাছে এক হেঁয়ালি ছিল।
ফিলিপকে তিনি রীতিমত সন্দেহ করতেন।

ফ্রয়েড শিষ্য ডাঃ আর্নেস্ট জোনস
ফ্রয়েডের যে জীবনী দিয়েছেন তাতে দেখা
যায় খুব অল্প বয়স থেকে ফ্রয়েড যৌনতার
হেঁয়ালি সম্পর্কে রীতিমত চিন্তা করতেন।
আবার ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে জানা
যায়, মার ওপর একচেটিয়া অধিকার
বিস্তারের ইচ্ছা তাঁর কম ছিল না।
নির্জ্ঞান মনে এক বছরের শিশু তার মার
কোলের মেয়েটিকে হিংসে করত তাই সে
মরে যাক। সেই বোন অল্প ক'মাস পরে
যখন মারা গেল সত্যি সত্যি—মনে হয় এক
পাপ বোধে সিগমণ্ড পীড়িত হয়েছে। পরে
আর এক বোনকেও সিগমণ্ড প্রচণ্ড হিংসা
করতে শুরু করেছিল। এর সংগে খুব
ভাল সম্পর্ক যেন কোনোদিনই গড়ে ওঠে নি
সিগমণ্ডের। ছেলেবেলায় নিজের ভাই-
বোনদের সম্পর্কে এই রকম হিংসাদ্বেষ
নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল সিগমণ্ড। বাবা
জেকব ছেলেকে মারধোর না করলেও
বেশ কড়া বাপ ছিলেন। নিজের বাবার
সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফ্রয়েড ইঙ্গিত
দিয়েছেন, তিনি চাইতেন তাঁর বাবার আরও
সফল এবং শক্তিমান পুরুষ হওয়া উচিত
ছিল। গরীব পিতা ছেলেকে তেমন ভাবে
পালন করতে পারেন নি। সংসারে
রোজগার করে আনবার জন্যে যুবক
ফ্রয়েডকে গবেষণাগার ছেড়ে আসতে
হয়েছিল। মাকে খুব ভালবাসত সিগমণ্ড।
প্রথম সন্তান হিসেবে মার আদর যত্ন
সবচেয়ে বেশিই পেয়েছিল সে।
কিন্তু ফিলিপ সম্পর্কে রোষ ছিল
সিগমণ্ডের। ফ্রয়েড নিজের মনঃসমীক্ষণ
থেকে জেনেছিলেন, তিনি শৈশবে অন্যান্যদের
মত ইডিপাস গূঢ়ৈষায় (কমপ্লেক্স)
ভুগেছেন। এবং বাবা জেকব তাঁর বিদ্বেষের
পাত্র না হয়ে হয়েছিল ফিলিপ—কেননা সে
ছিল মার সমবয়সী। সিগমণ্ডের ভাইপো
জন ছিল তার খেলার সাথী। প্রায় সমবয়সী
ভাইঝিও (জনের বোন) এক রকম এই দলে
ছিল। শিশু অবস্থা থেকে যৌনতা
বিকাশের যে চিত্র ফ্রয়েড এঁকেছেন—
নিজের জীবনেও তিনি তার ছকের মধ্যে
পড়েছিলেন—এই সত্য (নির্জ্ঞানের সত্য)
তিনি স্বীকার করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

'দেশ' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে তিরিশ হাজারেরও অধিক হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা হইতে পত্রিকাটি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের ফ্ল্যাট মেশিনের পরিবর্তে আনন্দ প্রেসের নূতন রোটারী মেশিনে ছাপা শুরু হইল। ইতি-পূর্বে রোটারী মেশিনে বাংলাভাষার কোন সাময়িকপত্র মুদ্রণ করার প্রয়োজন হয় নাই।

নূতন আকারের প্রতি কলম প্রস্থে দুই ইঞ্চির স্থলে সোয়া দুই ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চির স্থলে দশ ইঞ্চিতে বর্ধিত হওয়ায় ছয় আনা মূল্যেই এখন হইতে ৬৪ পৃষ্ঠার পূর্ব আকারের ৮০ পৃষ্ঠারও অধিক পাঠ্যবস্তু পরি-বেশন করা সম্ভব হইবে।

—সম্পাদক, দেশ

যখন বছর চারেক বয়স তখন পরিবারের
সঙ্গে সিগমণ্ড ভিয়েনা শহরে এসে হাজির
হন। ভিয়েনাই তাঁদের স্থায়ী বাসভূমি
হয়ে ওঠে। ভিয়েনার বিদ্যালয় এবং বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে ফ্রয়েড তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ছাত্র হিসেবে ফ্রয়েড ছিলেন মেধাবী।
ছাত্র জীবনে কখনো নাকি তিনি দ্বিতীয়
হন নি। আমরা যাকে বলি গ্রন্থকীট— এই
বালক ছিল তাই, গ্রন্থকীট। তাঁর বাবা
ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন
থাকা সত্ত্বেও ফ্রয়েডের বয়স যখন সাত-আট
তখন, ফ্রয়েড বলেছেন, তাঁর বাবা তাঁকে
বলেছিলেন—'এ ছেলের কিছু হবে না।'

সতেরো বছর বয়সে ফ্রয়েড গ্র্যাজুয়েট
হন এবং তারপর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন
করতে শুরু করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের
ওপর তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ জেগেছিল
কি না বলা মুশকিল। তাঁর নিজের যা কথা
তাতে মনে হয়, ডাক্তারী করবার জন্যে
কিংবা কোনো রোগ বা রোগের ওষুধ
আবিষ্কারের জন্যে ডাক্তারী পড়তে শুরু
করেন নি। তাঁর অন্য এক উদ্দেশ্য ছিল, সে
উদ্দেশ্য অনেকটা দার্শনিক। তিনি স্বমুখে
বলতেন, যে জগতে আমরা বাস করি। সেই
জগতের কতক কুয়াশা কতক হেঁয়ালি আমি
খুঁজে দেখতে চেয়েছিলাম এবং এ সম্পর্কে
আমার অনুসন্ধানের ফলাফল আমি অন্যদের
সাধনার সংগে যোগ করতে চেয়েছিলাম।

যাই হোক বাইশ বছর বয়সে ফ্রয়েড
চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে এম ডি
উপাধি পান। এরপরও কিছুকাল প্রাণীতত্ত্ব,
জীববিদ্যা, শরীর তত্ত্ব, স্নায়ুতত্ত্ব—ইত্যাদির
পাঠ এবং পরীক্ষায় গবেষণাগারে তাঁর দিন
কেটে যায়। শেষে তিনি গবেষণাগারের
বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই সময়ে
ফ্রয়েড মার্থা নামের এক মেয়ের প্রেমে
পড়েন। বছর কয়েক স্নায়ুরোগের
চিকিৎসা করে কাটে। মার্থাকে বিবাহ
করেন এবং ১৮৮৫ সালে প্যারিসে যান
বিখ্যাত চিকিৎসক শারকোর কাছে পড়তে।

শারকোর সংগে কাজ করার সময় মানুষের
আভ্যন্তরীণ মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে
তাঁর কিছু ধারণা হয়। শারকো
হিস্টেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতেন। এই
চিকিৎসার অন্যতম পদ্ধতি ছিল রুগীকে
সংবেশ (হিপ্নোসিস) করা।

কিছুকাল ভিয়েনার বিখ্যাত চিকিৎসক
ডাঃ ব্রয়ারের সংগে ফ্রয়েড চিকিৎসা
করেছেন। ডাঃ ব্রয়ার একদা ছিলেন
ফ্রয়েডের শিক্ষক সহকর্মী এবং বন্ধু।
ডাঃ ব্রয়ারের এক হিস্টেরিয়া রুগী
আনার চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড
দেখলেন এই সব স্নায়ুরোগী কি করে
নিজের কথা অমর্গল বলে যেতে পারলে
আরাম পায়, মনস্তাপ লাঘব করতে পারে।

এই সব রোগের চিকিৎসার পদ্ধতি
হিসেবে সংবেশ কিংবা কপালের দু-পাশে

আস্তে করে চাপ দেওয়া প্রভৃতি যে সব রীতি আগে চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—ফ্রয়েড দেখলেন তার কোনো প্রয়োজন হয় না। রোগীকে একটি নিরিবিলি চুপচাপ ঘরে সোফায় শুইয়ে তাকে মন খুলে কথা বলতে বললেই সে অনায়াসে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। কথা বলতে শুরু করলে রোগীকে বাধা না দিয়ে তাকে যা খুশি, যা মনে আসে বকতে বললে রোগীর মন আরও সহজভাবে খুশি মতন কথা বলে যায়। এ সব কথা আপাতঃ অসংলগ্ন। কিন্তু এর ভেতর থেকেই মূল কথা বেরিয়ে আসে। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন অবাধ অনুষঙ্গ (ফ্রি এসোসিয়েশন)।

মুক্ত অনুষঙ্গের সময় দেখা গিয়েছিল নিজের কথা বলতে বসে রোগীরা প্রায়ই স্বপ্নের কথা বলত। এ-যাবৎ স্বপ্নকে আমরা অর্থহীন একটা কিছু বলে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলাম। ফ্রয়েডের ধারণা হল—অর্থহীন স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি কিন্তু আপাতঃ-অর্থহীন হলেও স্বপ্ন বাস্তবিক অর্থহীন নয়। স্বপ্নের একটা অর্থ আছে এবং মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে তার কারণও আছে। আস্তে আস্তে ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন, একটা রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়ে স্বপ্নগুলো দেখা হয় বলে এগুলি অর্থহীন মনে হয়। কিন্তু আসলে খুবই অর্থপূর্ণ। আর স্বপ্ন কেন দেখি এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, মানুষের মনে বহু কামনা আছে। বাস্তব জীবনে সে-সব কামনা পূর্ণ হয় না। নির্জ্ঞানের কামনা আমরা জানতে পর্যন্ত পারি না। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এই কামনা এবং ইচ্ছাগুলি পরিতৃপ্তি লাভ করে। স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিয়ে তাঁর তত্ত্ব-সমৃদ্ধ প্রথম ও বিখ্যাত বই 'দি ইন্টারপ্রিটেশান অফ ড্রিমস্' ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল। এই বই নাকি প্রথম আট বছরে মাত্র ছ'শত বিক্রী হয়েছিল।

মুক্ত অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যার পথ ধরে চলতে চলতে ফ্রয়েড মানুষের শৈশব-যৌন-কামনার হদিশ পেলেন। মনের অবদমন ক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, লক্ষ্য করলেন আমাদের সনাতন বোধে যে-সব জিনিসকে গ্লানিময়, পাপ, লজ্জাকর বলে মনে করি—সে সব ইচ্ছা চেপে রাখবার চেষ্টা করার ফলে অবচেতনে অবদমিত হয়ে গূঢ়ৈষার (complex) সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েডের এই নব নব ও বিপজ্জনক আবিষ্কারের কথা শোনবার মতন লোক তখন অতি সামান্যই জুটেছে। ভিয়েনার সামান্য দু'চারজন অনুরক্ত মনোবিদ ও মনোবিজ্ঞানী ছাড়া তাঁর কথা শোনার কেউ ছিল না। এই সামান্য ক'জনকে নিয়ে শুরু হয় 'সাইকোলজিকাল ওয়েডনেস ডে সোসাইটি'।

তবু ফ্রয়েডের এই আবিষ্কার এবং তত্ত্বের কথা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯০৫ সালে ফ্রয়েডের অনুরক্ত এক শিষ্যদল তাঁর কাছে জড়ো হল। দেখতে দেখতে ইয়ুং, আডলার, অটো র‍্যাঙ্ক, জোনস, কার্ল আব্রাহাম, হানস্ শাকস্—এই গোষ্ঠী গড়ে উঠল।

'অনেকে এসেছিল কিন্তু একে একে অনেকেই আমায় ছেড়ে চলে গেল—' এ-রকম আক্ষেপ ফ্রয়েড কখনো করেন নি। কিন্তু যারা একদিন এসেছিল তারা অনেকেই চলে গেল—আডলার, ইয়ুং, অটো র‍্যাঙ্ক। ফ্রয়েডের সঙ্গে মতবিভেদ ঘটেছিল এঁদের।

তারপর দীর্ঘকাল—বছরের পর বছর এই মানুষটি একা—সম্পূর্ণ একা তাঁর সাধনা নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। ভিয়েনা ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি সাগর পার হলো, বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল—তবু ভিয়েনার সেই সাধনার ঘরখানিতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফ্রয়েড তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্যে ও সংকল্পে অবিচল থেকে কাটিয়ে দিলেন। ১৯৩৮ সালে নাৎসি বাহিনী ভিয়েনা ঘিরে ফেলল। সভ্যতার শত্রু এই বাহিনীর হাত থেকে ফ্রয়েডের নিস্তার পাওয়ার কথা ছিল না। আগে বহুবার বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে আশ্রয় নেবার জন্যে আমন্ত্রণ এসেছে—কিন্তু ফ্রয়েড অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে এ-সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। '৩৮ সালের মার্চ মাসে নাৎসিদের ঘেরাওয়ের মধ্যেও তিনি ভিয়েনা ছাড়তে সহজে রাজী হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাঃ জোনস এবং রাজকুমারী মেরি তাঁকে মত বদলাতে বাধ্য করেন। ফ্রয়েড সপরিবারে ভিয়েনা ছেড়ে লণ্ডনে চলে যান। এ-ঘটনার বছর দেড়েক পরে ১৯৩৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ৮৩ বছর বয়সে লণ্ডনে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মারা যান।

॥ ৩ ॥

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে এই মাত্র।

তাঁর মতে মানসক্রিয়া মাত্রেই কারণপ্রসূত। এই কারণ চেতন-মনের গোচরে না থাকতে পারে, অচেতনে অবশ্যই আছে। অচেতন মনকে বলা যাক 'নির্জ্ঞান' মন বা শুধু নির্জ্ঞান (আনকনসাস)। নির্জ্ঞান ক্রিয়াশীল। জ্ঞানের অগোচরে থেকে এই নির্জ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে। মানুষের সংজ্ঞান (কনসাস্) এবং নির্জ্ঞান মনের অবস্থা বুঝতে একটা উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে—যেমন সমুদ্রে ভাসা বরফের পাহাড়। জলের ওপর সামান্যই মাত্র দেখা যায়—জলের তলায় তার অধিকাংশটাই ডুবে রয়েছে। আকৃতিগত পরিমাণেই এই নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের চেয়ে বড় নয়, সংজ্ঞানকে পরিচালিত করছে নির্জ্ঞান।

সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যে আর একটা ভাগ আছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অসংজ্ঞান (প্রিকনসাস)। ধরা যেতে পারে, আসংজ্ঞান—সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যে এমন একটি মধ্যবর্তী স্তর—যার সম্পর্কে সর্বদাই আমরা সচেতন নই—কিন্তু প্রয়োজন হলে যেগুলিকে সামান্য চেষ্টায় সংজ্ঞানে ভাসিয়ে তোলা যায়।

মা এবং শেষ বয়েসে অন্ধ হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী এই নাস্তিক বলতেন না এই বিশ্বকে আমি শতগুণে বাড়িয়েছি, 'a hundred thousand times beyond the belief of the wise men of by-gone days'.

সক্রেতিস যদি প্রকৃত জ্ঞানের, গ্যালেলিও যদি এই বিশ্বের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ সীমাকে প্রসার করে থাকেন— সিগমণ্ড ফ্রয়েড অবশ্যই মনের পরিধিকে শত সহস্র গুণ প্রসারিত করেছেন। ক্ষুদ্র একটি আভিধানিক হেঁয়ালি শব্দকে প্রসারিত জীবনের মধ্যে আকার দিতে পেরেছেন।

॥২॥

১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ার ফ্রাইবার্গে (তখন ছিল অস্ট্রিয়ায়, এখন চেকোস্লোভেকিয়ায়: আর ফ্রাইবার্গের নতুন নাম হয়েছে প্রাইবর) সিগমণ্ড ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। সিগমণ্ডের বাবার নাম ছিল জেকব ফ্রয়েড। এই ইহুদী ভদ্রলোক ছিলেন পশম-ব্যবসায়ী। নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার। খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না জেকবের। ভিয়েনায় যাবার পর তাঁর অবস্থা ক্রমেই আরও পড়তে থাকে বলে মনে হয়। জেকব ফ্রয়েডের দুই বিয়ে। ভদ্রলোকের বয়স যখন চল্লিশ পার হয়েছে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। একুশ বছরের যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করলেন তার গর্ভে প্রথম সন্তান সিগমণ্ড। সিগমণ্ডরা ভাই বোনে মিলে (বৈমাত্র ভাই সমেত) ছিলেন আটজন।

সিগমণ্ডের যখন জন্ম তখন তাঁদের পারিবারিক অবস্থাটা দেখবার মতন। সিগমণ্ডের বৈমাত্র বড় ভাই ইমানুয়েল ততদিনে পিতা হয়ে গেছেন। ভাইপোর চেয়ে সিগমণ্ড বয়সে ছোটই ছিলেন। আর ইমানুয়েলের ছোট, সিগমণ্ডের অপর বৈমাত্র ভাই ফিলিপ ছিল তাঁর মায়ের বয়সী।

এই পারিবারিক পরিবেশটা জটিল নয় কি? চল্লিশোত্তর পিতা, তরুণী মা, বৈমাত্র ভাইদের একজন পিতার বয়সী অন্যজন মার সমবয়সী—বন্ধু স্থানীয় হবার যোগ্য। পারিবারের এই জীবনচক্র কিশোর ফ্রয়েডের কাছে এক হেঁয়ালি ছিল। ফিলিপকে তিনি রীতিমত সন্দেহ করতেন।

ফ্রয়েড শিষ্য ডাঃ আর্নেস্ট জোনস ফ্রয়েডের যে জীবনী দিয়েছেন তাতে দেখা যায় খুব অল্প বয়স থেকে ফ্রয়েড যৌনতার হেঁয়ালি সম্পর্কে রীতিমত চিন্তা করতেন। স্বয়ং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ থেকে জানা যায়, মার ওপর একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের ইচ্ছা তাঁর কম ছিল না। নির্জ্ঞান মনে এক বছরের শিশু তার মার কোলের মেয়েটিকে হিংসে করত চাইত সে মরে যাক। সেই বোন অল্প ক'মাস পরে যখন মারা গেল সত্যি সত্যি—দুঃসহ এক পাপ বোধে সিগমণ্ড পীড়িত হয়েছে। পরে আর এক বোনকেও সিগমণ্ড প্রচণ্ড হিংসা করতে শুরু করেছিল। এর সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক যেন কোনোদিনই গড়ে ওঠে নি সিগমণ্ডের। ছেলেবেলায় নিজের ভাই-বোনদের সম্পর্কে এই রকম হিংসাদ্বেষ নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল সিগমণ্ড। বাবা জেকব ছেলেকে মারধোর না করলেও বেশ কড়া বাপ ছিলেন। নিজের বাবার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফ্রয়েড ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি চাইতেন তাঁর বাবার আরও সফল এবং শক্তিমান পুরুষ হওয়া উচিত

বিজ্ঞপ্তি

'দেশ' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে তিরিশ হাজারেরও অধিক হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা হইতে পত্রিকাটি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের ফ্ল্যাট মেশিনের পরিবর্তে আনন্দ প্রেসের নূতন রোটারী মেশিনে ছাপা শুরু হইল। ইতি-পূর্বে রোটারী মেশিনে বাংলাভাষার কোন সাময়িকপত্র মুদ্রণ করার প্রয়োজন হয় নাই।

নূতন আকারের প্রতি কলম প্রস্থে দুই ইঞ্চির স্থলে সোয়া দুই ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চির স্থলে দশ ইঞ্চিতে বর্ধিত হওয়ায় ছয় আনা মূল্যেই এখন হইতে ৬৪ পৃষ্ঠার পূর্ব আকারের ৮০ পৃষ্ঠারও অধিক পাঠ্যবস্তু পরি-বেশন করা সম্ভব হইবে।

—সম্পাদক, দেশ

ছিল। গরীব পিতা ছেলেকে তেমন ভাবে পালন করতে পারেন নি। সংসারে রোজগার করে আনবার জন্যে যুবক ফ্রয়েডকে গবেষণাগার ছেড়ে আসতে হয়েছিল। মাকে খুব ভালবাসত সিগমণ্ড। প্রথম সন্তান হিসেবে মার আদর যত্ন সবচেয়ে বেশিই পেয়েছিল সে। কিন্তু ফিলিপ সম্পর্কে রোষ ছিল সিগমণ্ডের। ফ্রয়েড নিজের মনঃসমীক্ষণ থেকে জেনেছিলেন, তিনি শৈশবে অন্যান্যদের মত ইডিপাস গূঢ়েষায় (কমপ্লেক্স) ভুগেছেন। এবং বাবা জেকব তাঁর বিদ্বেষের পাত্র না হয়ে হয়েছিল ফিলিপ—কেননা সে ছিল মার সমবয়সী। সিগমণ্ডের ভাইপো জন ছিল তার খেলার সাথী। প্রায় সমবয়সী ভাইঝিও (জনের বোন) এক রকম এই দলে ছিল। শিশু অবস্থা থেকে যৌনতা বিকাশের যে চিত্র ফ্রয়েড এঁকেছেন— নিজের জীবনেও তিনি তার ছকের মধ্যে পড়েছিলেন—এই সত্য (নির্জ্ঞানের সত্য) তিনি স্বীকার করেছেন।

যখন বছর চারেক বয়স তখন পরিবারের সঙ্গে সিগমাণ্ড ভিয়েনা শহরে এসে হাজির হন। ভিয়েনাই তাঁদের স্থায়ী বাসভূমি হয়ে ওঠে। ভিয়েনার বিদ্যালয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফ্রয়েড তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ছাত্র হিসেবে ফ্রয়েড ছিলেন মেধাবী। ছাত্র জীবনে কখনো নাকি তিনি দ্বিতীয় হন নি। আমরা যাকে বলি গ্রন্থকীট— এই বালক ছিল তাই, গ্রন্থকীট। তাঁর বাবা ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও ফ্রয়েডের বয়স যখন সাত-আট তখন, ফ্রয়েড বলেছেন, তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন—'এ ছেলের কিছু হবে না।'

সতেরো বছর বয়সে ফ্রয়েড গ্র্যাজুয়েট হন এবং তারপর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ জেগেছিল কি না বলা মুশকিল। তাঁর নিজের যা কথা তাতে মনে হয়, ডাক্তারী করবার জন্যে কিংবা কোনো রোগ বা রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন নি। তাঁর অন্য এক উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য অনেকটা দার্শনিক। তিনি স্বমুখে বলেছেন, যে জগতে আমরা বাস করি। সেই জগতের কতক কুয়াশা কতক হেঁয়ালি আমি খুঁজে দেখতে চেয়েছিলাম এবং এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধানের ফলাফল আমি অন্যদের সাধনার সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলাম।

যাই হোক বাইশ বছর বয়সে ফ্রয়েড চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে এম ডি উপাধি পান। এরপরও কিছুকাল প্রাণীতত্ত্ব, জীববিদ্যা, শরীর তত্ত্ব, স্নায়ুতত্ত্ব—ইত্যাদির পাঠ এবং পরীক্ষায় গবেষণাগারে তাঁর দিন কেটে যায়। শেষে তিনি গবেষণাগারের বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই সময়ে ফ্রয়েড মার্থা নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। বছর কয়েক স্নায়ুরোগের চিকিৎসা করে কাটে। মার্থাকে বিবাহ করেন এবং ১৮৮৫ সালে প্যারিসে যান বিখ্যাত চিকিৎসক শারকোর কাছে পড়তে।

শারকোর সঙ্গে কাজ করবার সময় মানুষের আভ্যন্তরীণ মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁর কিছু ধারণা হয়। শারকো হিস্টেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতেন। এই চিকিৎসার অন্যতম পদ্ধতি ছিল রুগীকে সংবেশ (হিপ্নোসিস) করা।

কিছুকাল ভিয়েনার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ব্রুয়ারের সঙ্গে ফ্রয়েড চিকিৎসা করেছেন। ডাঃ ব্রুয়ার একদা ছিলেন ফ্রয়েডের শিক্ষক সহকর্মী এবং বন্ধু। ডাঃ ব্রুয়ারের এক হিস্টেরিয়া রুগী আনার চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখালেন এই সব স্নায়ুরোগী কি করে নিজের কথা অমর্গল বলে যেতে পারলে আরাম পায়, সমস্যার লাঘব করতে পারে।

এই সব রোগের চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে সংবেশ কিংবা কপালের দু-পাশে

আস্তে করে চাপ দেওয়া প্রভৃতি যে সব রীতি আগে চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—ফ্রয়েড দেখলেন তার কোনো প্রয়োজন হয় না। রোগীকে একটি নিরিবিলি চুপচাপ ঘরে সোফায় শুইয়ে তাকে মন খুলে কথা বলতে বললেই সে অনায়াসে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। কথা বলতে শুরু করলে রোগীকে বাধা না দিয়ে তাকে যা খুশি, যা মনে আসে বলতে বললে রোগীর মন আরও সহজভাবে খুশি মতন কথা বলে যায়। এ সব কথা আপাতঃ অসংলগ্ন। কিন্তু এর ভেতর থেকেই মূল কথা বেরিয়ে আসে। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন অবাধ অনুষঙ্গ (ফ্রি এসোসিয়েশন)।

মুক্ত অনুষঙ্গের সময় দেখা গিয়েছিল নিজের কথা বলতে বসে রোগীরা প্রায়ই স্বপ্নের কথা বলত। এ-যাবং স্বপ্নকে আমরা অর্থহীন একটা কিছু বলে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলাম। ফ্রয়েডের ধারণা হল—অর্থহীন স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি কিন্তু আপাতঃ-অর্থহীন হলেও স্বপ্ন বাস্তবিক অর্থহীন নয়। স্বপ্নের একটা অর্থ আছে এবং মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে তার কারণও আছে। আস্তে আস্তে ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন, একটা রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়ে স্বপ্নগুলো দেখা হয় বলে এগুলি অর্থহীন মনে হয়। কিন্তু আসলে খুবই অর্থপূর্ণ। আর স্বপ্ন কেন দেখি এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, মানুষের মনে বহু কামনা আছে। বাস্তব জীবনে সে-সব কামনা পূর্ণ হয় না। নির্জ্ঞানের কামনা আমরা জানতে পর্যন্ত পারি না। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এই কামনা এবং ইচ্ছা-গুলো পরিতৃপ্তি লাভ করে। স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিয়ে তাঁর তত্ত্ব-সমন্বিত প্রথম ও বিখ্যাত বই 'দি ইন্টারপ্রিটেশান অফ ড্রিমস্' ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল। এই বই নাকি প্রথম আট বছরে মাত্র ছশত বিক্রী হয়েছিল।

মুক্ত অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যার পথ ধরে চলতে চলতে ফ্রয়েড মানুষের শৈশব-যৌন-কামনার হদিশ পেলেন। মনের অবদমন ক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, লক্ষ্য করলেন আমাদের সনাতন বোধে যে-সব জিনিসকে গ্লানিময়, পাপ, লজ্জাকর বলে মনে করি—সে সব ইচ্ছা চেপে রাখবার চেষ্টা করার ফলে অবচেতনে অবদমিত হয়ে গূঢ়ৈষার (complex) সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েডের এই নব নব ও বিপজ্জনক আবিষ্কারের কথা শোনবার মতন লোক তখন অতি সামান্যই জুটেছে। ভিয়েনার সামান্য দু'চারজন অনুরক্ত মনোবিদ ও মনো-বিজ্ঞানী ছাড়া তাঁর কথা শোনার কেউ ছিল না। এই সামান্য ক'জনকে নিয়ে শুরু হয় 'সাইকোলজিকাল ওয়েডনেস ডে সোসাইটি'।

তবু ফ্রয়েডের এই আবিষ্কার এবং তত্ত্বের কথা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯০৭ সালে ফ্রয়েডের অনুরক্ত এক শিষ্যদল তাঁর কাছে জড়ো হল। দেখতে দেখতে ইয়ুং, আডলার, অটো রাঙ্ক, জোনস, কার্ল আব্রাহাম, হানস্ শাকস্—এই গোষ্ঠী গড়ে উঠল।

'অনেকে এসেছিল কিন্তু একে একে অনেকেই আমায় ছেড়ে চলে গেল—' এ-রকম আক্ষেপ ফ্রয়েড কখনো করেন নি। কিন্তু যারা একদিন এসেছিল তারা অনেকেই চলে গেল—আডলার, ইয়ুং, অটো রাঙ্ক। ফ্রয়েডের সঙ্গে মতবিভেদ ঘটেছিল এঁদের।

তারপর দীর্ঘকাল—বছরের পর বছর এই মানুষটি একা—সম্পূর্ণ একা তাঁর সাধনা নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। ভিয়েনা ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি সাগর পার হলো, বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল—তবু ভিয়েনার সেই সাধনার ঘরখানিতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফ্রয়েড তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্যে ও সংকল্পে অবিচল থেকে কাটিয়ে দিলেন। ১৯৩৮ সালে নাৎসি বাহিনী ভিয়েনা ঘিরে ফেলল। স্বভাবতঃ শত্রু এই বাহিনীর হাত থেকে ফ্রয়েডের নিস্তার পাওয়ার কথা ছিল না। এর আগে বহুবার বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে আশ্রয় নেবার জন্যে আমন্ত্রণ এসেছে—কিন্তু ফ্রয়েড অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে এ-সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। '৩৮ সালের মার্চ মাসে নাৎসিদের ঘেরাওয়ের মধ্যেও তিনি ভিয়েনা ছাড়তে সহজে রাজী হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাঃ জোনস এবং রাজ-কুমারী মেরি তাঁকে মত বদলাতে বাধ্য করেন। ফ্রয়েড সপরিবারে ভিয়েনা ছেড়ে লণ্ডনে চলে যান। এ-ঘটনার বছর দেড়েক পরে ১৯৩৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ৮৩ বছর বয়সে লণ্ডনে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মারা যান।

॥ ৩ ॥

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে এই মাত্র।

তাঁর মতে মানসক্রিয়া মাত্রেই কারণপ্রসূত। এই কারণ চেতন-মনের গোচরে না থাকতে পারে, অচেতনে অবশ্যই আছে। অচেতন মনকে বলা যাক 'নির্জ্ঞান' মন বা শুধু নির্জ্ঞান (আনকনসাস)। নির্জ্ঞান ক্রিয়াশীল। জ্ঞানের অগোচরে থেকে এই নির্জ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে। মানুষের সংজ্ঞান (কনসাস) এবং নির্জ্ঞান মনের অবস্থা বুঝতে একটা উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে—যেমন সমুদ্রে ভাসা বরফের পাহাড় জলের ওপর সামান্যই মাত্র দেখা যায়, জলের তলায় তার অধিকাংশটাই ডুবে রয়েছে। আকৃতিগত পরিমাণেই এই নির্জ্ঞান সংজ্ঞানের চেয়ে বড় নয়, সংজ্ঞানকে পরিচালিত করছে নির্জ্ঞান।

সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যে আর একটা ভাগ আছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অসংজ্ঞান (প্রিকনসাস)। ধরা যেতে পারে অসংজ্ঞান—সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যে এমন একটি মধ্যবর্তী স্তর—যার সম্পর্কে সর্বদাই আমরা সচেতন নই—কিন্তু প্রয়োজন হলে যেগুলিকে সামান্য চেষ্টায় সংজ্ঞানে ভাসিয়ে তোলা যায়।

মোটামুটি সংজ্ঞান অসংজ্ঞানের ভাগ ছাড়া মানুষের আদি দুই প্রবৃত্তি (কাম এবং ক্ষুধা) এবং সভ্যতার দ্বন্দ্ব বোঝাতে ফ্রয়েড আর একরকম শ্রেণী বিভাগ স্বীকার করেছেন। এই বিভাগের তিনটি স্তরঃ ইদ্ (ইড্); অহম্ (ইগো); অধিশাস্তা (সুপার ইগো)। বলা বাহুল্য এই বিভাগ সংজ্ঞান-অসংজ্ঞানের বিভাগের সঙ্গে জটিলভাবে জড়িত।

ইদ কি? আমাদের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির মূল যা নির্জ্ঞানে রয়েছে। নির্জ্ঞান মনের ইদ্ হচ্ছে 'লিবিডো'র উৎস। লিবিডো অর্থে ফ্রয়েডীয় মতে, এ একরকম শক্তি—প্রবৃত্তির শক্তি যাকে 'প্রেম' নাম দ্বারা অভিহিত করা চলে। ফ্রয়েড মনে করেন লিবিডোই হচ্ছে আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার মূল উৎস।

অহম বা ইগো কি? ইদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। ইদের বেপরোয়া দাবী অহম্ মানে না। এ-জগতে বাঁচতে হলে কিছু ছেড়ে ছুড়ে লোভ অসংযম অসংগত কামনাকে হটিয়ে দিয়ে বাঁচতে হবে—এই স্বাভাবিক পথ অহমের।

অধিশাস্তাকে অহমের আরো মার্জিত চেহারা বলা যায়। সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ফলে মানুষ যে পুরুষাগত নীতিবোধ, পাপ-পুণ্যের ধারণা, সামাজিক কর্তব্য অকর্তব্যের জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক নিয়ে বসে আছে তাই অধিশাস্তা বা সুপার ইগো।

ফ্রয়েড মানুষের যৌন বৃত্তির যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় শিশুকাল থেকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে এটি থাকে। যৌনবৃত্তি না বলে শব্দটাকে এখানে 'লিবিডো' ধরাই সমীচীন হবে। কয়েকটি পর্ব (অ্যানাল ফেজ, ফ্যালিক ফেজ, লেটেন্সি, সমরতি, বিপরীত রতি। মোটামুটি এই) অতিক্রম করে একে আসতে হয়। লিবিডোর স্বাভাবিক পরিণতি নারী ও পুরুষের পরস্পরকে অবলম্বন করে তৃপ্তি লাভ।

॥ ৪ ॥

ফ্রয়েডের জীবনী এবং তাঁর মূল তত্ত্বগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর প্রতিভার একটা দিক এতে সামান্য ধরা গেলেও চরিত্র বোঝার উপায় নেই। এই আলোচনায় তার সুযোগও নেই। তবু ক'টি কথা বলা দরকার।

ইহুদী না হলে ফ্রয়েডের প্রতিভা পরিস্ফুট হত না—এমন ধারণা করবার কোনো কারণ নেই। তবে এ-কথা সত্য, যে-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন সে-সমাজ তাঁকে অন্তত তথাকথিত একটি কঠিন বাধা থেকে বাঁচিয়েছে। আমার মনে হয়, সেটি ঈশ্বরের একনায়কত্বে অবিশ্বাস এবং খৃষ্টান ধর্মসুলভ পাপ-পুণ্যের ধারণাকে উপেক্ষা—। অপরটি বলা যায়, স্বাভাবিক এক বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি, স্বাধীন চিন্তা শক্তি, মুক্ত দৃষ্টি। এবং যে ইহুদী সমাজ তৎকালীন সময়ে একঘরে হয়ে থেকে থেকে গায়ে সয়ে গিয়েছিল—একা থাকার শক্তি সংগ্রহ করেছিল—ফ্রয়েড নিজের জীবনে তার প্রেরণা পেয়েছিলেন। নয়তো সবাই যখন একে একে তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে, তাঁর মতবাদ উপহাস, বিদ্রূপ, আক্রমণ এবং সর্বোপরি 'অন্ধকারের পাপ থেকে জাত' বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে—তখনও সংকল্পে অবিচল থাকার মত দৃঢ়তা এবং নিরুদ্বেগ চিত্ত রাখা কি সহজসাধ্য ছিল।

ফ্রয়েডের প্রতিভাকে নীতিবাগীশরা যতই দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করুন—যে কোনো কারণেই হোক ফ্রয়েডের চিন্তা না ছড়িয়ে পড়েছে এমন দেশ ছিল না য়ুরোপে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আইনস্টাইন, টমাস মান, রমাঁ রোলাঁ—ব্যক্তিগত-ভাবে ফ্রয়েডের বন্ধুত্ব কামনা করেছিলেন। টমাস মান ফ্রয়েডের অশীতিতম জন্মদিনে (৬ই মে ১৯৩৬) তাঁর সম্মানে সাধারণের কাছে যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার তুলনা হয় না। ফ্রয়েড অত্যন্ত নির্বিকার এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন এ-সময়ে। জন্মদিনের কোনো উৎসবে যোগদান করেননি। কাউকে বাড়ি বয়ে এসে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়ে যেতে সম্মতি দেন নি। সে-সময়কার য়ুরোপের বহু অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। কিন্তু ফ্রয়েড তাতে বিচলিত হন নি। একটি শুধু ব্যতিক্রম আছে—তাঁর সামনে এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত আবহাওয়ার মধ্যে বসে টমাস মান নিজে তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করে ফ্রয়েডকে শোনান। এই ঘটনা এবং মানের অভিভাষণ উপস্থিত সকলের মধ্যে গভীর দাগ রেখে যায়।

পৃথিবী এই সত্যানুসন্ধী ইহুদী পুরুষকে অপাংক্তেয় করবার বহু চেষ্টা করেছে। মনে হয় পারে নি। ফ্রয়েডের কিছু তত্ত্ব অসত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে ঠিকই—কিন্তু এক জায়গায় তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পথপ্রদর্শক হয়ে থাকলেন এবং ফ্রয়েডের 'নির্জ্ঞান' অপরাজেয় থাকল। থাকবে।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব পাপ-তত্ত্ব, শয়তানের তত্ত্ব—একথা যদি বলেন এবং প্রশ্ন করেন, এতো পাপ লুকিয়ে নিয়ে আমরা আছি? শারকোর একটি প্রিয় কথা ব্যবহার করে ফ্রয়েড যে জবাবটি দিতেন আমাকেও সেই জবাব দিতে হবে—

That does not keep it from existing.

যা আছে তা হয়তো দুর্বিষহ কিন্তু যা আছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার নয়। ফ্রয়েড হয়তো বিশ শতকের নীতিপন্থী মানুষের কাছে অসহ্য হতে পারেন, কিন্তু তিনি আছেন এ-যুগের চিন্তায় এ-সত্য কোনো মতেই অস্বীকার করার নয়।

॥ রেনাসাঁ ও প্রাচীন সাহিত্য ॥

অমরেশ দত্ত

স্বাধীন ভারতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন। যাঁরা এই মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের অনেকেরই সাহিত্যপ্রীতি রাজনৈতিক, কারণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনীতিকদের এই দিকদর্শন করানোর বাসনাটা আমাদের যুগে বা দেশে অস্বাভাবিক নয়, কেন না আর কোনো যুগেই বোধ হয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের উপর এতো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ ও আকাঙ্ক্ষা রাজনীতিকদের ছিলো না, এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমান ভারতের প্রায় সমস্ত মহিমাই রাজনৈতিক। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খাঁটি অরাজনৈতিকপ্রতিভা এদেশে আধুনিককালে জন্মায়নি। ইউরোপকে তার রাজনীতিবাদ দিয়ে ভাবা যায় এবং ভাবলে তার নানা দিকের সত্যসন্ধান ও সৃষ্টির ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়, কিন্তু রাজনীতিবিদদের বাদ দিলে বর্তমান ভারতে কি এবং কাকে নিয়ে জগৎসভায় আমরা গর্ব করতে পারি ভেবে পাইনে। এতো সব বলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে সাহিত্যিকরা প্রাচীন সাহিত্যের কথা ততোটা বলেন না যতোটা তাঁদের বলা উচিত কিংবা যা আসলে তাঁদেরই বলার কথা। ইউরোপে যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি বা সমালোচনা করেন তাঁদের ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেই হয় এবং মূল ভাষার সঙ্গে সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর পরিচিত থাকেন। অন্যপক্ষে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রাচীন বর্জনকে আধুনিকতা বা প্রগতি মনে করেন। অর্থাৎ সংস্কৃত জ্ঞানটা যেন অনেকটা অসংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ হয়ত এই যে, আমাদের রেনাসাঁ এসেছে ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এবং সেইজন্য সাহিত্যিকরা ইংরিজি জানা যতোটা প্রয়োজনীয় মনে করেন, প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান ততোটা আবশ্যকীয় মনে করেন না।

এই অসম্পূর্ণতাটি বুঝতে হ'লে রেনাসাঁর তত্ত্ব, তাৎপর্য ও পরিণতি বোঝা উচিত। রেনাসাঁ একটি নতুন দৃষ্টিকোণ, নতুন জীবনবোধ ও মুক্তির স্বাদ নিয়ে এসেছিল সত্য, কিন্তু তার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতার বিনষ্টির বীজ নিহিত ছিল তার দুষ্কপরিণতি লক্ষ্য করতে ইউরোপকে বহু শতাব্দীর তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। আমাদের দেশে আমরা এখনো তা বুঝতেই পারছি না এবং বুঝবার চেষ্টাও করছি না। সামাজিক ও ধার্মিক কারণে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ এই বিষবৃক্ষের সম্ভাবনার কথা ধারণা করতে পারেনি। নতুন তার হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে অনেক কিছু থেকেই আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাখে। বাইরের জিনিসটাই চোখে পড়ে—ভিতরে দেখার না থাকে সময়, না সাধনা। সেকালে রেনাসাঁর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় বাণী ছিল মুক্তির বাণী, কিসের জন্য মুক্তি, কতোখানি মুক্তি, কি থেকে মুক্তি একথা লোকে যতোটা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ভেবেছে মুক্তির উন্মাদনার কথা। যেমন ফরাসী বিপ্লবের যুগে কবিরা সাম্য মৈত্রীর গভীর তাৎপর্য এক রকম ভুলে গিয়ে কেবল মুক্তির আদর্শ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। শেলীর কাব্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একমাত্র ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেইজন্যই এই আদর্শের পতনে মুহ্যমান হয়ে শেষে পরতন্ত্রী হয়ে পড়েছিলেন। রেনাসাঁর এই মুক্তিস্পৃহা প্রতীকের রূপে প্রকাশ করতে গেলে উল্লেখ করতে হয় লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির খাঁচায় পাখিকে মুক্তি দেওয়ার খেয়ালের। মধ্যযুগীয় ধর্মের শাসন কিংবা গির্জার দাসত্ব থেকে মুক্তি কামনা করা নানা কারণেই স্বাভাবিক ছিল। 'ফিউডেলিজম' তেমন তার শেষ পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, নতুন নতুন শহর গড়ছে, নতুন নতুন ব্যবসা, নানা দেশ ও যন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে একটি সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবও মনে জেগেছে। তার উপর মানবতার বাণী, আশ্বাসের বাণী এসেছে প্রাচীন সাহিত্য থেকে। সুতরাং কিছুটা বিস্ময়, অনেকখানি আনন্দ সম্ভোগ এবং তার চেয়েও বেশী সমস্ত বিশ্বাস সে-যুগের মানুষকে স্বভাবতঃই আত্মহারা করেছে। কিন্তু এই রেনাসাঁর গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মধ্যযুগের অনেক সম্পদ হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছে। বর্জনের প্লাবন যখন আসে তখন না বেছে সব কিছু বর্জন করাই হয় রীতি। মধ্যযুগীয় চিত্র-

কলায় ও সাহিত্যে এবং ব্যাপকভাবে কৃষ্টিতে যে সর্ব ইউরোপীয় রূপ ছিল তা চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করলো। ল্যাটিন ভাষা ও ধর্মের একচ্ছত্রতায় যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল বহু শতাব্দী থেকে, তা নষ্ট হয়ে যেতে এমন কিছু সময় লাগলো না। রেনাসাঁ যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিল তার আলোকসম্পাতে মধ্যযুগকে বুঝবার চেষ্টা যতোটা না তার চেয়ে অনেক বেশী হলো নতুন দিগন্তের সন্ধান। ধর্মে 'রিফরমেশন' হলো, কিন্তু এই নতুন ধর্মের চারিপাশে নতুন গোঁড়ামির নতুন আগাছা জন্মাতে বেশী সময় লাগলো না। মধ্যযুগের ধর্ম অনেক গ্রীকভাব ও তত্ত্ব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল, তাই জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ ধর্মের ভিতর দিয়েও সে-যুগের মনীষীদের চোখে ধরা পড়েছে। এবং এই কারণেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তের মধ্যে এতো জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রত্যয় একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। কিন্তু রেনাসাঁ যুগের মানুষের কাছে দুই যুগের বিভেদ ও বিভিন্নতাটাই যেন একটু বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানে কিংবা বস্তু-দর্শনে হঠাৎ থেকে শুরু করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু জীবন বোধে জীবনের ক্রম-বিকাশ ও অভিব্যক্তি অস্বীকার করা যায় না।

রেনাসাঁর এই একদর্শিতা বা এক-প্রাধান্যের কারণ এই যে, সেই বিশেষ পরিবেশে গ্রীসের বস্তুবাদ ও মানবতা ইউরোপ সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল, কিন্তু গ্রীসের ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিকতা তার দৃষ্টি প্রায় আকর্ষণই করতে পারে নি। ফলে জীবনের কেন্দ্র থেকে ভগবানকে সরিয়ে তার জায়গায় মানুষকে বসিয়েই মানুষ নতুন জগতের স্রষ্টা হতে চেয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষভাবে গ্রীক সাহিত্য যা ইউরোপের নবজীবনের একটি বিশেষ উৎস, তা থেকেও ব্যাপক বা সামগ্রিক জীবনবোধ যা মূল বিশ্বাস, দুঃখের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি বা শুধু পার্থিব সাফল্যের পেছনে জীবনের ট্র্যাজেডিবোধ সে-যুগের মানুষ ততোটা গ্রহণ করতে পারে নি যতোটা পেরেছে মানুষের অজস্র সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতে। তার কারণ এই রেনাসাঁর যুগ মানুষের জয়-যাত্রার যুগ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে এক বিস্ময় থেকে আরেক বিস্ময়ে সে লাফিয়ে চলেছে, বস্তুর জগতকে, প্রকৃতিকে সে অবলীলাক্রমে জয় করে চলেছে—পরি-ণতির কথা সে ভাবেনি, ভাবতে পারে নি। প্রাচীন শিল্পীর কল্পনায়ও মানুষ অসীম শক্তিধর, অসহনীয় দুঃখজয়ী, অসংখ্য অলৌকিক কীর্তির বিধাতা, তবু তাঁর কাছে সমস্ত জগৎটাই নানা সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তিনি অনেক রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আলোড়িত হয়ে কতগুলি মূল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে জীবনের অর্থ ও মূল্য খুঁজে পেয়েছেন। আজকের যুগে এই বিশেষ মানবীয় পরিস্থিতি আমরা বোধহয় সহজেই বুঝতে পারি। অনেক সার্থকতা ও সমৃদ্ধির মধ্যে আমরা যেন আজ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যে 'ফ্রান-কেনস্টাইন'কে যুগ যুগ ধরে গড়ে তুলেছি সে তার ভয়াবহতা নিয়ে নিশ্চিত পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। প্রাচীনের বিশ্বাস ছিল, তাই জীবনের ভয়ংকরতার মধ্যে ও অসহায়তার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে জীবনের মূল্য হারায় নি। মানবতাই যথেষ্ট নয়, একথা বোধহয় আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু কোনো বিশ্বাসকেই যেন ফিরিয়ে আনতে পারছি না। সফোক্লিস তাঁর 'হেরাক্লিস' নাটকে এক জায়গায় বলছেন:

Monster he killed many
But one he could not tame—himself—

আজকের যুগকে যারা বুঝতে চেষ্টা করেন তারা জানেন একথাটি কতো নির্মমভাবে সত্য!

অর্থাৎ রেনাসাঁর এই একদর্শিতার মধ্যে যে অমঙ্গলের আশংকা ছিল, যথেষ্ট গ্রীক ও ল্যাটিন পড়েও সেকালের লোক তা বুঝতে পারেনি। যাঁরা পেরেছিলেন, তাঁরা সহজেই রেনাসাঁর নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে কালোত্তর হতে পেরেছেন। তাই সামান্য গ্রীক ও সামান্যতর ল্যাটিন জেনেও লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি এবং সেক্সপীয়র সকলকালকে চিরকাল করতে পেরেছেন, জীবনের একটি শাশ্বত মূল্য খুঁজে পেয়েছেন। লিওনার্ডোর 'মোনালিসা' আঙ্গিকের দিক থেকে রেনাসাঁর ছাপ বহন করে বটে, কিন্তু 'মোনালিসা'র হাসি কি রেনাসাঁর হাসি—না চিরকালের বিস্ময়? সেক্সপীয়র জীবনের জয় গান গেয়েছেন সত্যি, কিন্তু তার সর্বশেষের কথা কি হেমলেট বলে নি যখন সে তার বাল্য-বন্ধুকে বলছে:

Do you think I am easier to be played on than a pipe? Call me what instrument you will though you may fret me, you cannot play upon me.

কিংবা যখন প্রসপেরো বলেন:

........We are such stuff As dreams are made of and our little life is rounded with a sleep. ....?

তা ছাড়া সেক্সপীয়রের মূল বিশ্বাসের সত্য ও মূল্যবোধও ছিল। গ্রীকরা যেমন 'সফ্রোসিনি' বা মধ্যমার্গে বিশ্বাস করতেন এবং তার থেকে বিচ্যুতিকেই মনে করতেন বিনষ্টির কারণ, সেক্সপীয়রেরও তেমনি বিশ্বাস ছিল মানুষের সততায় ও মহানুভবতায় এবং উপলব্ধির শক্তিতে। তাই অকৃতজ্ঞতাই তাঁর নাটকের মূল বিষয়বস্তু। অর্থাৎ মানুষের সাংসারিক দুর্গতির কারণ বহুলাংশে তিনি দেখেছেন বিশ্বাসহীনতায় ও উপলব্ধির অক্ষমতায় এবং তার শেষ মীমাংসাও খুঁজে পেয়েছেন ক্ষমায় ও একটি লোকোত্তর মহিমার প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতিতে। শিল্পী হিসাবে এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিতে পারতেন না। এই মূল বিশ্বাসের জন্যই তাঁর হাতে দুর্নীতির ছবি জঘন্য হয়ে ওঠে নি। জীবনবোধ থাকলে জীবন-বিরোধিতার ছবি কদর্য হয় না। এবং এই মূল্যবোধের অভাবের জন্যই বর্তমান সাহিত্যে দুর্নীতির ছবি কখনো কখনো অশ্লীল হয়ে ওঠে। এটাই সাহিত্যের অশ্লীলতা। রামকৃষ্ণের ভাষায় মধ্যে খুঁটি শক্ত থাকলে এবং তাকে ভালো করে ধরে রাখলেই চারি দিকে ঘুরে ফেরা যায়। আধুনিক কালের ইউরোপের বহু লেখক প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যের নানা কাহিনীর মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতীক খুঁজে পাচ্ছেন, কিন্তু মৌলিক বিশ্বাসের অভাবে হতাশা ও নৈরাশ্যের পঙ্ক থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারছেন না। 'সার্ত্রের ফ্লাইস' ককতোর 'দি ইনফার্নাল মেসিন' কিংবা ওনীলের 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' নাটকগুলি পড়লেই এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মিলটন সচেতনভাবে মধ্যযুগ ও রেনাসাঁর আদর্শের মধ্যে একটি সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রেনাসাঁর সন্তান মিলটন এতো প্রতিভা সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি—তাই গ্রহণও করতে পারেন নি। হয়ত তাঁর নানা স্বপ্ন ভঙ্গের অভিজ্ঞতাও এর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল, কিন্তু কারণ যাই হোক, 'প্যারাডাইস রিগেন্ড'এর মিলটন কতো সহজেই না সমস্ত প্রাচীনকে অখৃষ্টীয় বলে নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে গেছেন। পরবর্তীকালে গ্যয়টের মধ্যেও এই প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। মিলটনের চেয়ে অনেক বেশী তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীনকে কিন্তু মূলত তিনি সেই রেনাসাঁরই পালিত পুত্র। তাছাড়া তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্যের সুর ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব, শক্তিতে সদম্ভ বিশ্বাস ও ক্ষমতাপ্রবণতা এতো প্রকট যে নিজের ব্যক্তিগত পরিবেশকে অতিক্রম করে প্রাচীনকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

তাই আরো কিছুকাল পরে এই রেনাসাঁ দর্শনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে 'এক্সিসট্যেনশিয়েলিসম্'। ওল্ড টেসটামেণ্ট-এর মানুষের পতনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে জ্ঞানবৃক্ষকেই দায়ী করা হয়েছে মানুষের সব অধোগতি ও অজ্ঞানতার জন্য। আমাদের যুগের একমাত্র টি এস এলিয়টই বোধহয় রেনাসাঁ চিন্তার পরিণতিটি বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে তাঁর কাব্যে সেতুবন্ধনের এতো সার্থক প্রচেষ্টা। তাঁর অনেক লেখায় বিশেষভাবে 'দি ক্যামেলিয়ান্‌স'এ এই চিন্তাটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রাচীনকালের মনীষীরা মানুষকে কেবল বিজেতা কিংবা কেবল এই পৃথিবীরই একটি পৃথকীকৃত সত্ত্ব বলে চিন্তা করতে পারেন নি। মানুষকে তাঁরা সমস্ত বিশ্বের পটভূমিতে বসিয়ে তারই মধ্যে স্বর্গ ও নরক ও উত্থান ও পতনের লীলা দেখেছেন এবং জীবনের অসীম রহস্যের মধ্য দিয়ে কল্পনা করেছেন এক চিররহস্যময় অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক সত্তার। সাধারণভাবে বলতে গেলে রেনাসাঁর যুগে যে চিন্তা ও মননশীলতার পরিধি তৈরী হয়েছিল ইউরোপ আজো তার সীমা উত্তীর্ণ হতে পারে নি। এখানেই তার সমৃদ্ধির মধ্যে নিঃস্বতার ট্র্যাজেডি, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অশান্তির দুঃখ।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনাসাঁ এই একচক্ষু ইউরোপীয় রেনাসাঁর জারজ সন্তান। এর প্ররোচনায় অনেক কিছু পেয়েও প্লেটোর কবির মতো জীবনের সামগ্রিক সত্তা থেকে আরো অনেক দূরে আমরা সরে এলাম। ইংরিজি শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যে রেনাসাঁ এলো তা বহুলাংশেই পুনরাবৃত্তি। ইংরেজদের ইটালী যাওয়ার মতো আমরাও ইংলণ্ডে গেলাম। ধর্মেরও 'রিফরমেশন' হলো। উৎকট স্বাতন্ত্র্য স্পৃহায় 'এলিজাবেথানদের' মতো অনেক উচ্ছৃঙ্খলতাও জীবনে অনেকে দেখালেন। সাহিত্য ও শিল্পের অনেক কাঠামো ও আঙ্গিক আমরা গ্রহণ করলাম। রাজনৈতিক কারণে ও 'ন্যাশানেলিজমের' প্রভাবে ইতিহাস ও পুরাণ মথিত করে অনেক বীর কাহিনীও রচিত হলো। তফাৎ হলো এই যে ইউরোপে রেনাসাঁর ঢেউ এসে লেগেছিল স্বাধীন দেশগুলিতে—আমাদের রেনাসাঁ হলো পরাধীন ভারতবর্ষের রেনাসাঁ। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় ও গবেষণায় আমাদের ধর্মের ও সাহিত্যের অনেক কীর্তি ঘোষিত হলো। কিছু কিছু লোক রেনাসাঁ জ্ঞানের জ্ঞানী ইউরোপের এই জানাটাই যথেষ্ট মনে করে আত্মগৌরবে আপ্লুত হয়ে রইলেন। কিন্তু রেনাসাঁর সবচেয়ে বেশী প্রভাব দেখা গেলো সামাজিক জীবনে, সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির আবেগে, আত্মসচেতনতায় ও নতুনের ধ্যানে। অথচ সর্বদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে কিছুটা প্রতিক্রিয়ারূপে, কিছুটা রাজনৈতিক কারণে ধর্মের আন্দোলনই হলো বেশী। ইউরোপ প্রাচ্যকে নানা কারণে ধর্মের শিক্ষাগুরু বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় নি—তাই আমাদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ অনূদিত হয়ে তাদের এই স্বীকৃতিকে মান্য দিল। কালিদাসের নাটকের ও কাব্যের শিল্পরূপ ও দুর্দম রোমাণ্টিকতা ইউরোপের কাছে মিঠে লাগলেও একটু যেন ফিকে লাগলো—তাই পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলেও ভারতের সাহিত্য মহিমা তার মনে কোনো বিশেষ আলোড়ন বা অস্বস্তি জাগাতে পারলো না। অর্থাৎ ভারতের রেনাসাঁর এক দিকে দেখা গেলো বর্জনের ও মুক্তির কিংবা ইউরোপীয় আদর্শের নির্বিচার গ্রহণের উদগ্র উন্মাদনা, আর অন্য দিকে ধর্মের পুনরুত্থান ও সংস্থাপনের প্রচারকোচিত বাসনা। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের যে সামগ্রিক জীবনবোধ সে দিকে আমরা ফিরেও চাইলাম না। কারণ দূরে খুঁজতে হয় না, কেননা এদেশে রামায়ণ মহাভারত ও ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই পড়া হয়েছে। অথচ আশ্চর্য এই যে কি যেন সূক্ষ্ম উপায়ে আমাদের জীবনে এই প্রাচীন সাহিত্যের গভীর প্রভাব ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে আছে। এখনোও অসাধারণ শক্তিশালীকে আমরা বর্ণনা করি 'কলির ভীম' বলে, অসামান্য দাতাকে 'দাতাকর্ণ' বলে, কুচক্রীকে 'শকুনি' বলে, আদর্শ ভাইদের 'রামলক্ষণ' বলে কিংবা বিদ্রূপার্থে কখনো কখনো বলি: 'কি আমার ধর্মপুত্র রে!' বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত এমন একটি চরিত্রও কি সৃষ্টি হয়েছে যে জীবনের এতো গভীরে প্রবেশ করেছে?

কেউ কেউ হয়ত বলবেন আমাদের জীবনের পরিসর ছোট, সামগ্রী যা আছে তা লিরিকের কিংবা ছোটগল্পের, হয়ত রবীন্দ্রনাথও এটা বুঝেছিলেন; কিন্তু আমাদের জীবনেও তো নানা ভাব ও

চিন্তা, ঘটনা ও বিপ্লবের সংঘাত এসেছে তা নিয়ে কি মহাকাব্য বা মহৎ সৃষ্টি হ'তে পারতো না? আইসল্যান্ডের ল্যাক্সনেসের উপন্যাসে যদি মহাকাব্যের ভঙ্গিমা ও ইঙ্গিত থাকতে পারে, মহা-দেশের মতো ভারতবর্ষে মহান সৃষ্টি হয় না কেন? মহাভারতের দেশের লোক কি রোহিনীকে হত্যা না করিয়ে দুর্নীতি-বিরোধের ইঙ্গিত দিতে পারতেন না? আমার মনে হয় রাজকবি টেনিসনের এক চোখ যেমন ছিল সৌন্দর্যের দিকে আর আরেক চোখ রানী ভিক্টোরিয়ার দিকে, আমাদের তেমনি এক চোখ থাকে ইউরোপের দিকে আর আরেক চোখ নীতিশাস্ত্র কিংবা ধর্মগ্রন্থের পাতা ওলটায়। ইউরোপ যেমন তার প্রাচীনকে সম্পূর্ণ না বুঝে একদর্শী হয়েছে। আমরা তারই অনুকরণে, আমাদের প্রাচীনকে না বুঝে কিংবা সম্পূর্ণ বুঝার চেষ্টা না করে নানা সংশয়ে পথভ্রান্ত হয়েছি। অর্থ ও কামের ভিত্তিতে জীবন বিশ্লেষণ আমরা চিন্তার জগতে বিপ্লব মনে করেছি, কিন্তু প্রাচীনের কবিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সমস্ত সমস্যাকে জীবনে প্রতিফলিত করে দেখেছেন। ইউরোপে তবু প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব সব সময়ই আছে এবং প্রাচীন সাহিত্য পাঠের একটি পরম্পরা এখনো সজীব হয়ে আছে। তাই গিলবার্ট মারির মতো চিন্তাবিদরা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনের মাহাত্ম্যটা বুঝতে পারছেন বা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ইউরোপে হোমার ভার্জিলকে নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা ও গবেষণা হয় তার মতো কিছুটা আলোচনাও যদি আমাদের মহাকাব্যের হতো এবং রেনাসাঁর নতুন দৃষ্টি নিয়ে পুরাতনকে বুঝবার চেষ্টা আমরা করতাম, তা হলে আমাদের সত্যকার ঐতিহ্যের জীবন্ত রূপ আমরা এমন করে হারিয়ে ফেলতাম না। আজকাল স্কুল-কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে রামায়ণ মহাভারতের গল্প পর্যন্ত জানে না। অথচ ঠাকুরমার কোলে বসে প্রকাশ্য রাজসভায় কেশধৃত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাহিনী শুনে যে ছেলে ক্রোধে তরোয়াল নিয়ে ছুটে যেতে চাইত তার ন্যায়-অন্যায় বোধের ভিত্তি গড়বে কি দিয়ে? ভীষ্মের কঠোর প্রতিজ্ঞা, কর্ণের অকুণ্ঠ দান কিংবা পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের যৌবন ও ঐশ্বর্য বিসর্জনের কাহিনী শুনে অভিভূত না হলে সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের মহত্ত্বটা না বোঝাটাই তো স্বাভাবিক। উপদেশের বন্যা কিংবা বক্তৃতার ঝড় উঠিয়ে আলোড়নই করা যায়—গড়া যায় না। মানুষের যে মন গঠন করবে বা সৃষ্টি করবে তাকে কেবল অবস্থার দাস মনে করে মানবত্বের অপমান যেন আমরা আর না করি।

রেনাসাঁ শব্দটির মধ্যে কোথায় যেন যাদু আছে; কেননা, রেনাসাঁ বলতে প্রায়ই আমরা বিরাট কিংবা অপূর্ব কিছু মনে করি। রেনাসাঁর দান বহু ও অনস্বীকার্য, কিন্তু নতুনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সুস্থ ও সামগ্রিক জীবন-বোধ না আসে তা হলে কোনো না কোনো সঙ্গতি আমরা হারাবোই এবং তা আসবে প্রাচীন নবীনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কখনো কখনো নিজের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি ঐতিহ্যবোধ কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে, সমস্ত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ছাপিয়েও যার প্রকাশ মাঝে মাঝে জীবনে ঘটতে দেখা যায়। তাই চার্চিল যখন যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন, ভারতের কেম্ব্রিজ-লালিত প্রধান মন্ত্রী তখন ভারত আবিষ্কার করে বেড়ান। প্রাচীন গ্রীকরা যেমন মধ্যমার্গে বিশ্বাস করতেন, প্রাচীন ভারতেরও তেমনি একটি মূল বিশ্বাস ছিল যাকে এক-কথায় বলতে গেলে বলতে হয় নিষ্কাম-বাদ। অর্থাৎ আসক্তিময় গ্রহণ ও ফল-নির্ধারিত কর্ম তাঁরা মানে করতেন, মানুষকে চিরকাল অশান্তির গোলক-ধাঁধায় ঘুরিয়ে মারে। ফল-নিরপেক্ষ কর্মপ্রবণতাই তো মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করেছে। তবু, প্রতিযোগিতার দৌড়ে, স্বার্থের রেষা-রেষিতে মানুষকে কেবল কতগুলি হাত-পা বানিয়েই কি আমরা নতুন ভারতবর্ষ গড়বো? এই যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজী কি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান করে যাননি? আমার কখনো কখনো মনে হয় গান্ধীজী যেন একটি মহাকাব্যের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের মধ্যে মরজীবন যাপন করে গেলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় যেমন সত্য করে কেউ তাঁকে বুঝল না, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাছে পর্যন্ত তিনি একটি অসম্ভব আদর্শ হয়েই ফটোর ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়ে রইলেন। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সাচ্ছল্যে বর্তমান ইউরোপের সমকক্ষ হওয়ার পরই অন্য কিছু ভাববার সময় আসবে; কিন্তু সে হবে ভিত্তিকে শক্ত না করে প্রাসাদ নির্মাণের মতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থে, ঐশ্বর্যে শুধু সমকক্ষ কেন ইউরোপের চেয়েও বেশী সার্থক আমরা হতে চাইবো, কিন্তু জীবনের সুস্থ মূল্যবোধ হারিয়ে নয়।

আমাদের দেশের কিছু কিছু লোকের গুরুগিরি করার একটি বাতিক ও শখ আছে। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক গুরু হবার আকাঙ্ক্ষা অনেক প্রচারকের প্রকাশ করতে শুনেছি। সাদা চামড়ার লোককেও নাকি এমনি তাদের বিশেষ বোঝা ও সভ্যতা প্রচারের দায়িত্ব বয়ে বেড়াতে হয়। নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে না জেনে এ যেন এক আশ্চর্য রকমের বনের মোষ তাড়ানোর চেষ্টা। অর্থাৎ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ই সমাধান নয়। এ সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি নয় যে খঞ্জের চোখ দিয়ে অন্ধ দেখবে আর খঞ্জ চলবে অন্ধের ঘাড়ে চড়ে। কারণ দুইজনই একদর্শী, এক-চক্ষু।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানা ভয়ংকরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাচীনরা নতুন জগৎ, নতুন সভ্যতা ও নতুন জীবন সৃষ্টি করেছিলেন। নানা ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরাও নতুন জগৎ সৃষ্টির কল্পনা করছি। তাঁদের সাহস ও বলিষ্ঠতা, জীবনবোধ ও বিশ্বাস, অসামান্য মানসিক বিশালতা ও আত্মার ঐশ্বর্য না আনতে পারলে নতুন এক বিশ্বসভ্যতা আমরা গড়ব কি করে বা কি করে আবিষ্কার করবো নানা জীবন-প্রণালীর পেছনের মূলগত ঐক্যকে? জীবনের কতো মূল কাঠামো, নানা জৈবিক ও আধিভৌতিক কতো শক্তির কত লীলা তাঁরা কতো কাহিনীতে কল্পনা করে রূপায়িত করে গেছেন। কলম্বস কিম্বা ভাস্কো ডি গামার অভিযান ও আবিষ্কার কী ওডিসির জীবনরূপকে স্মরণ করিয়ে দেয় না? পরবর্তী কালে জীবনকে যতো 'আর্কিটাইপে'র রূপে কল্পনা করেছি, যেমন সংগ্রাম কিংবা রোমাঞ্চকর অভিযান, বিপদসংকুল পথে যাত্রা কিংবা নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব, ভবসাগর পাড়ি বা মৃত্যু ও পুন-র্জীবনের অনন্তলীলা—তার সমস্তই প্রাচীনেরা কল্পনা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী যা করেছিলেন তা হলো বিশ্বাস ও সামগ্রিক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ ও সুষমা আবিষ্কার করা। রেনাসাঁ আমাদের দৃষ্টি দিয়েছে—দর্শন দিতে পারেনি—জ্ঞান দিয়েছে, প্রজ্ঞা নয়।

॥ ২১ ॥

আমার ঘর, আমার বাড়ির কথা বলেছি। কিন্তু কোথায় আমার ঘর? কোথায় বাড়ি? দেশ? এক হিসাবে তিব্বত আমার আত্মার আশ্রয়। কিন্তু আমার দেহের? আমার দেহটা তো সেখানে বিদেশী। এই যে পাহাড়গুলো, এগুলো তো আমার বাড়ি। হ্যাঁ বাড়িই। কিন্তু সেখানে তো কেউ আর ঘর তুলতে পারে না। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বসবাস করতে পারে না। শোলোখুম্বুও এক সময় আমার দেশ ছিল, কিন্তু আজ সেখানে আমি এক বিদেশী পর্যটক মাত্র। দার্জিলিঙই হোল আমার হালের বসতি। এই আমাদের নতুন দেশ। সত্যিকারের বাস-বসতি।

অবশ্য আমার জাতের সব লোকই কিছু আর এখানে বাস করে না। তাদের বেশীর ভাগ এখনও সেই শোলোখুম্বুতেই পড়ে আছে। কেউ আছে রঙবুকে। কেউ বা কালিম্পঙে। আবার কেউ কেউ ছড়িয়ে আছে নেপালে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এই 'নতুন' শেরপাদের মুখ্য বসতি হোল এই দার্জিলিঙই। এই 'নতুন' শেরপারা, যারা তাদের পুরানো দেশ, জীবন যাপনের পুরানো প্রণালী ছেড়ে দিয়েছে, গিয়েছে নানা অভিযানে, এই আধুনিক জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে পড়েছে, তাদেরই রাজধানী হচ্ছে দার্জিলিঙ। যেখানেই যাই না কেন, লাসায় কি এভারেস্টে, গাড়োয়ালে কি চিত্রালে, দিল্লী, কি লণ্ডনে, সেখান থেকে দার্জিলিঙে ফেরা মাত্র আমার মনে হয়, এই তো "বাড়ি" ফিরে এলাম।

অনেকদিন আগে থেকেই আমার জাতের লোকরা শোলোখুম্বু ছেড়ে আসতে শুরু করেছিল। খুব আগে যারা চলে এসেছিল, তাদের আসার নানা কারণ ছিল। বিভিন্ন ধরনের কাজে তারা লেগে গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ডাঃ কেলাস আর জেনারেল ব্রুসের মত কয়েকজন ব্রিটিশ আবিষ্কারক হিমালয়ে অভিযান চালাতে এসেছিলেন। তাঁরা শেরপাদের পাহাড়ে ওঠার কাজে লাগাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল, পাহাড় চড়া কাজের সব থেকে উপযুক্ত লোক হোল এই শেরপারা। বিশ সালে আর ত্রিশ সালে যেসব অভিযান হয়েছিল, তাতে যোগ দিতে আমার জাতের লোকেরা দলে দলে নেপাল থেকে ভারতে চলে আসে। অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত এমনই দাঁড়াল যে, শেরপারা অভিযাত্রীদের কাছে তাঁবু, খাবার কি দড়ির মতই অপরিহার্য হয়ে উঠলো। এমন কি এও দেখা গেল যে, শেরপাদের গুরুত্ব অভিযাত্রীদের থেকে কোনও অংশে কম নয়। অবশ্য এ কাজ আমার জাতের সব লোকই

বেছে নেয়নি। কিন্তু বেশীর ভাগই নিয়েছে। আর এই কাজে তারা কৃতিত্বের পরিচয় এমনই দিয়েছে যে, আজ শেরপা বলতে লোকে পাহাড় চড়িয়েদেরই বোঝে।

আমরা এসেছিলাম পাহাড়ের কোল থেকেই। আর এখন সেই পাহাড়েই ফিরে যাই। কিন্তু এ যাওয়া একেবারে অন্য ধরনের যাওয়া। যাওয়ার প্রকৃতি কত বদলে গেছে। বদলে আমরাও গিয়েছি। একটা অভিযান থেকে আর একটা অভিযান পর্যন্ত যে সময় সীমা, তার মধ্যেই আমাদের জীবন বদলে যায়। শোলোখুম্বুতে আমরা ছিলাম গেঁয়ো লোক। কিন্তু

[illegible]
[illegible]
[illegible]

দার্জিলিঙে আজরা শহুরে। ফসল ফলানো, গরু চরানো, এই সব কাজের সঙ্গে এখন আর আমাদের কজনের যোগ আছে? চা-বাগানের কথা আমি এর আগে বলেছি। এই চা-বাগানে চা-পাতি তোলার মরসুমে কাজের চাপ যখন খুব বেশী থাকে, সেই সময় কখনো কখনো আমাদের মেয়ে-মরদরা সে সব জায়গায় খাটতে যায়। যুদ্ধের আগে একবার কয়েক মাস আমিও একাজ করেছি। কিন্তু জোয়ানদের বেশীর ভাগই বছরের অর্ধেক সময় কোন না কোন অভিযানের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। যখন সে কাজ থাকে না, তখন তারা দিনমজুরী করে, ঘোড়া-চড়িয়ে বেড়ায়, আর নয়তো গাইডের কাজ করে। যাঁরা এসব জায়গায় বেড়াতে আসেন, তাঁদের এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে, এটা-ওটা দেখিয়ে রুজি রোজগার করে। আমাকে এভারেস্ট থেকে ফিরে আসার পর, আর এসব কাজ করতে হয় না। আমার দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যাক সে কথা, পরে একদিন বলব। কিন্তু এই দার্জিলিঙে বেশীরভাগ শেরপা যা যা করে দিনগুজরান করে, বহু বছর ধরে আমাকে সেই কাজই করতে হয়েছে। এবার সেই কথাটিই বলি।

আমাদের জীবন বদলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কতদূর যে বদলাবে, তা বলতে পারি না। তবে এখনো পর্যন্ত আমরা, শেরপারা সামাজিকভাবে মোটামুটি একই সুতোয়

সপরিবারে তেনজিং

পাঙবোচি গ্রামে শেরপা তরুণী ও শিশুর দল

বাঁধা পড়ে আছি। আমাদের জন্মভূমি অনেকদিন আগেই ছেড়েছি, তা ঠিক। তবু আমাদের সমাজের মধ্যে এখনো পর্যন্ত তেমন বিশেষ টুটফাট ধরেনি। বিয়ে-সাদীও আমাদের সমাজের বাইরের লোকের সংগে খুব বেশী একটা প্রচলন হয়নি। দার্জিলিঙ শহরের একটেরে খাড়া একটা পাহাড়ের নীচে তুঙসুঙ বস্তী। বেশীর ভাগ শেরপার বসতি সেখানে। আর বাদ-বাকী শেরপারা থাকে ভুটিয়া বস্তীতে। সেটাও কাছাকাছি। সিকিমী আর তিব্বতীরাও সেই বস্তীতে বসবাস করে। আমরা মোটামুটি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করি। অনেক জিনিস ভাগাভাগি করে নিই। যেমন একটা বাড়ি, (বাড়িটা সচরাচর হয় কাঠের) দু'তিনটে পরিবার মিলে সে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়। তার রান্নাঘর, তার পায়খানা, তার সব কিছুই সাধারণভাবে ব্যবহার করি আমরা। হালে তুঙসুঙে বিজলীবাতি এসেছে। দু'একটা পরিবার তাদের ঘরে বিজলীর বাতিও নিয়েছে। কিন্তু শেরপাদের বেশীরভাগই রয়ে গেছে সেই আদিম জীবনযাত্রার মধ্যেই। আধুনিক যুগের সুযোগ-সুবিধা এখনও তাদের নাগালের বাইরে।

আমরা গরীব। বেশীরভাগ লোকের মতই গরীব। টাকাপয়সার ধান্দায় সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি খুব সরলও। খুব বেশী ভাবনা-চিন্তার ধার বড় একটা ধারি না। কাজেই দুশ্চিন্তা কিছু থাকলেও তার কেয়ার থোড়াই করি। যখন শোলোখুম্বুতে ফিরে যাই, তখন সেখানে নেপালী টাকা দিয়ে কাজ চালাই। কিন্তু দার্জিলিঙে আমাদের কাজকারবার চলে সব ভারতীয় টাকায়। আমরা যে অভিযানে যাই, তার জন্য যে মজুরী পাই তাও পাই এই ভারতীয় টাকায়। এই টাকার দাম নেপালী টাকার থেকে বেশী। আমাদের মধ্যে কখনো কেউ যদি কিছু টাকা জমাতে পারে তো তারা সেটা পাঠিয়ে দেয় তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে। আপন মুলুকে। কিন্তু সঞ্চয় থেকে দেনার সংগেই আমাদের পরিচয় বেশী। তাই, এই যে আমরা সবাই এক-সংগে মিলেমিশে একটা বড় পরিবারের মত থাকি, তাতে আমাদের ভারি সুবিধে হয়। একের টাকার দরকার পড়লে অন্যে তাকে ধার দেয়। বিনা সুদেই দেয়। একটা অভিযান শেষ হলে আমাদের পাওনাকড়ি চুকিয়ে নেওয়ার সময়ও একে অন্যকে সাহায্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমার নিজের কথাই বলি। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট অভিযানে যাওয়ার সময় দেনায় আমি আকণ্ঠ ডুবে ছিলাম। বন্ধুবান্ধবরা আমার কাছে হাজারখানেক টাকা পেত। যদি অভিযানে আমি এমনভাবে সফল না হতাম, যদি এত টাকাপয়সা নানা জায়গার থেকে উপহার না পেতাম, তাহলে এই সব দেনা শুধতে আমার বহুদিন লেগে যেতো।

আমাদের প্রাচীন আচার আচরণ, ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি এর মধ্যেই অনেকটা উবে গেছে। যা আছে, তারও পরিবর্তন হচ্ছে খুব দ্রুত। প্রাচীন সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকতে, প্রাচীন ঐতিহ্যের দাসানুদাস বনতে আমরা বিশেষ পছন্দ করি না। নতুন চিন্তা, নতুন ভাব, নতুন আচার-ব্যবহার আমরা বেশ তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারি। কোন কোন ব্যাপারে এখনও অবশ্য আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চরণ-ফেলা পথেই হাঁটছি।
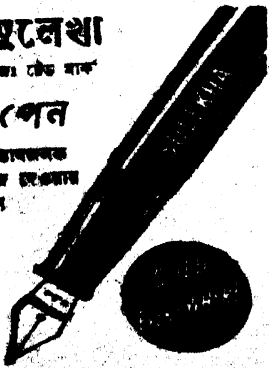
যেমন এই উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা আমাদের নিয়ম, ছোট ছেলেরাই বড়দের থেকে টাকাপয়সার ভাগ বেশী পায় (এ নিয়ম অবশ্য মেয়েদের বেলাতেও খাটে)। তারপর এই বংশগত পদবীটা। এটাও আমরা রেখে দিয়েছি। এই আমার পদবী যেমন ঘাঙলা। আমাদের ঘরে ছেলেমেয়ে জন্মালে, জন্মাবার তিনদিনের দিন তার নাম রাখতে হয়। পরে অবশ্য সেটা বদল করা যায়। অর্থাৎ বদল করার যদি সংগত কারণ থাকে, তবেই বদলানো হয়, যেমন আমার নামটা বদলানো হয়েছিল।

শেরপাদের নাম নিয়ে বাইরের লোকেদের মনে সব সময়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেন হয়? না, অনেকে বলেন, একই নাম তোমরা অনেকেই রাখো। কিন্তু একথাটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। কারণ বৃটিশদের মধ্যে এক স্মিথ নামই তো কত লোকের থাকে। তারপর শিখদের এই যে সিং, এও তো আছে। এতে যদি বিভ্রান্তি না ঘটে তো আমাদের বেলায় কেন ঘটবে তা ভেবে পাই না। আমাদের নাম বা পদবী এর থেকে বেশী কিছু গোলমেলে নয়। আমার মনে হয়, মুশকিলটা বাধে অন্য কারণে। কারণ, মোটামুটি দুটো। প্রথমত, আমাদের এমন কোন পদবী নেই, যেটা নামের শেষে বসালে পরে বিশেষ এক বংশ বা পরিবারের লোক বলে বোঝানো যায় (যেমন ঘোষ কি বোস, চাটুয্যে কি বাঁড়ুয্যে ইত্যাদি—অনুবাদক)। আর দ্বিতীয়ত যেহেতু শেরপা ভাষার কোন লিপি নেই, তাই অন্য ভাষাভাষীরা শেরপাদের নামটি যখন লেখেন, তখন একই নাম এক এক ভাষায় এক এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। অবশ্য বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে হয় না। কারণ যা তুমি জানো না, যা তোমার নাগালের বাইরে, তা ভুল কি ঠিক, সে বিষয়ে তোমার কিছুই এসে যায় না। সোলোখুম্বুতে নাম একটা ধ্বনি, একটা উচ্চারণ মাত্র। তোমার গলায় যে আওয়াজ ফুটে ওঠে, তাই। তার বেশী কিছু নয়। নামটি ধরে ডাকলেই ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু আধুনিক জগতে বিষয়টি বড় গোলমেলে। এখানে নাম ডাকলেই কাজ চোকে না। নানা নামকে নানা কাজে নানাভাবে এখানে যোগান দিতে হয়। তাকে ব্যবহার করতে হয়। কাজে লাগাতে হয়। সব থেকে তাজ্জবের কথা, দার্জিলিঙের যে ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে, সেখানে আমার নামটা কিন্তু অতি সহজে কাজ হাসিল করে দেয়। আমার স্ত্রীকে যখন চেক কেটে দিই (আজকাল প্রায়ই কাটছি) তখন চেকের উপর আঙলাহমু লিখে তার নীচে সই করি তেনজিং। ব্যাস্। কিন্তু বিদেশীদের কাছে, যাঁরা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আঙ্লাহমু নামটা বড় ঘনিষ্ঠ বলে

পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ রায় ও রাজ্যপাল এইচ সি মুখার্জীর সঙ্গে তেনজিং

ঠেকে। তাই তাঁরা তাকে ডাকেন মিসেস তেনজিং। এটা বোধ হয় আমাদের ভাষায় ব্যবহারই করা যায় না। তারপর আমার মেয়ে দুটোর কথা ধরুন। ওরা যে স্কুলে পড়ে, তা সাহেব-মেমরা চালান। স্কুলের খাতায় তাদের যা শেরপা নাম, পেম পেম আর নিমা, তাই লেখানো হয়েছিল। কিন্তু ওইটুকুতে চললো না। তাই তাদের পিছনে আমার নামের মাঝখানের একটা অক্ষর জুড়ে দিতে হল। তাদের নামের পিছনে নোরগে, এই কথাটা সেঁটে গেল। মজাটা হচ্ছে এই যে, এই নোরগের সঙ্গে আমার পারিবারগত উপাধির কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও আমার মেয়েরা মিস্ নোরগে বলেই পরিচিত।

সব ভাষাতেই যেমন সব কথার একটা মানে থাকে, তেমনি এই শেরপা নামগুলোরও মানে আছে। আমার নামটার মানে আমি আগেই বলেছি। "ভগবানের এক বিত্তশালী ভক্ত।" এইবার অন্য নামগুলোর মানে বলি। 'আঙ' এই কথাটা আমরা নামের প্রথমে আখচার ব্যবহার করে থাকি। এটা পুরুষদের

শেরপা মেয়েরা প্রসাধনে ব্যস্ত

নামের আগেও বসাই, মেয়েদের নামের আগেও বসাই। 'আঙ' মানে প্রিয়তম, 'তাসেদ্' মানে সেবাই। 'ফু' (আসলে 'বু') মানে ছেলে। 'নিমা' মানে সূর্য। 'দোরজে' মানে বজ্র। 'নামগিয়াল্' মানে বিজয়ী। আমার অনেক পরিচিত নাম দিনের নাম অনুসারেও রাখা হয়। 'দাওয়া' (সোমবার বেস্পতিবার), 'পাসাঙ্' (শুক্রবার), আর 'পেমবা' (শনিবার)। আমার পদবী যেমন খাড়্‌জা, ওটা এসেছে পূর্বপুরুষের আদি নিবাস থেকে। তেমনি আরও নানা নাম নানা পরিবারের ইতিহাসের কোন ঘটনা থেকে, পরিবারের উৎপত্তিস্থানের নাম থেকেও এসেছে। 'মুরমি', 'শেরাপ', 'সুক্‌পা', 'মেন্‌দাজা' আর 'থাকতুক্‌পা' নামগুলো এইভাবেই এসেছে। এই নামগুলোর খুব চল

আমাদের মধ্যে আছে। তবে এগুলো ব্যবহার করা হয়না কেন, একথা আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব শেরপাদের কানে এগুলো অদ্ভুত শোনায়, তাই তারা এগুলো ব্যবহার করে না। বাঙালীদের কানে বিশ্বম্ভর উজ্জ্বোড়িয়া কি যোগেশ কলকাতা কি মুরারীভূষণ বর্ধমান এ নামগুলো কি উদ্ভট শোনায় না?

এক দেশের লোকের চোখে অন্য দেশের সব লোককেই একরকম লাগে, এ নিয়ে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নানা রসিকতা আছে। আছে বলেই আমার ধারণা। যেসব সাহেবরা অভিযানে আসেন তাঁরা কখনো কখনো বলেন যে, শেরপাদের কে যে কোন জন তা তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ঠিক এই মুশকিলে আমরা, শেরপারাও তো পড়ে যাই। অভিযানকালে প্রায় সাহেবই দাড়ি গজান। সেই দাড়ির জংগলে ঢাকা মুখ দেখে কোন সাহেব যে কে শেরপারাও তা অনেক সময় ধরতে পারে না। মোঙ্গোলিয়ান-দের মত আমাদের মুখেও দাড়ি বড় একটা গজাতে চায় না। বেশীর ভাগ লোকই মাসে একবার করে কামায়। তবে চেষ্টাচরিত্র করলে গোঁফটা আমরা গজাতে পারি। পারি যে, তা গত কয়েক বছরে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। শোলোখুম্বুর অধিকাংশ পুরুষই মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখে, তিব্বতী ধরনে বিনুনি বাঁধে, কানে মাকড়ি পরে, মুক্তোটুক্তোও লাগায়। কিন্তু দার্জিলিঙে এসে যারা বসবাস করতে লেগেছে, বহুদিন হল সেই রীতি তারা পরিত্যাগ করেছে। সেই যে একবার বলেছিলাম, দার্জিলিঙে আসার সংগে সংগে আমার চুল ছেঁটে ফেলেছিলাম, তা আর কখনো বড় রাখিনি। ছোট বয়সে মাকড়ি ছেড়েছিলাম, আর কখনো তা পরিনি। আমার কানে মাকড়ি নেই, কিন্তু তার গর্তগুলো এখনও তার নতিতে রয়ে গেছে।

কালো চুল, কালো চোখ আর হলুদ বাদামী রঙে মেশা নরম ত্বক, এই আমাদের জাতের বৈশিষ্ট্য। দেখতে শুনতে আমরা মোংগলীয়দের মতই। তবে চীনেদের কি তিব্বতীদের মত অমন একই ধরনের চেহারা আমাদের সকলের নয়। আমাদের নাকের গড়ন, চোখের আকারও নানাজনের নানা রকম। লম্বায় আমরা খুব উঁচু নই, বরং কিছু বেঁটে। কিন্তু আমাদের দেহ খুব শক্ত সমর্থ। তবে যে কঠিন পরিশ্রমের কাজ আমাদের করতে হয়, যে ভারী বোঝা আমাদের বইতে হয়, তার জন্য যতখানি শক্তি দরকার তা হয়তো সবসময় সকলের থাকতে পারে না। আমি নিজে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। যখন আমার স্বাস্থ্য সবচেয়ে ভাল থাকে তখন আমার ওজন দাঁড়ায় দু'মণেরও উপর। আমি সাধারণ শেরপাদের তুলনায় কিছুটা লম্বা। কিছুটা পাতলাও বটে।

(ক্রমশ)
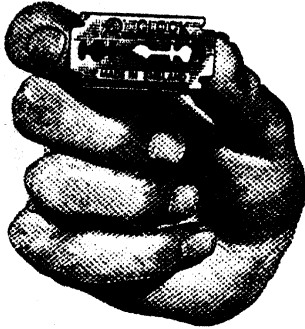
কুমোরটুলীর পটুয়া

নাগরিক
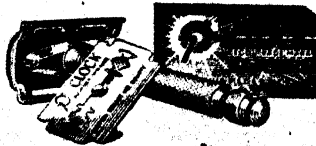
ডেলী টেলিগ্রাফ কিছুতেই ছাপবে না খবরটা। অন্য কেউ ছাপার তাতেও তার ঘোরতর আপত্তি। প্যাভিলিয়নের মধ্যেই লেগে গেল ঝগড়া। ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্জিবিশনের ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়নের মধ্যে বেংগল কোর্ট। তারই মধ্যে কাজ করছেন জি পাল। পুরো নাম গোপেশ্বর পাল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বাস্ট বানিয়ে দিচ্ছেন। যে কোনও ওদেশের

রামকৃষ্ণ

আর্টিস্টের যার জন্য সিটিং লাগে কমপক্ষে কুড়ি দিন, জি পাল কয়েক মিনিট দেখে তাই করে ফেলছেন।

ইডেন গার্ডেনে ১৯২৪ সালে বসল স্যাম্পেল ফেয়ার। তিনশো সেরা সেরা আঁকিয়ে সেখানে জমায়েত হয়েছেন। তারই মধ্যে প্রথম হলেন জি পাল। নির্বাচিত হলেন লণ্ডনের ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্জিবিশনের জন্যে। সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেরা সেরা জিনিস প্রদর্শিত হবে সেখানে।

ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে জি পাল যাচ্ছেন ইংল্যাণ্ডে। হঠাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেনের একদিন চোখ পড়ল। মানুষটা একমনে মাটি নিয়ে বসে কি গড়ে আর ভাংগে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেনের মূর্তি তৈরী হয়ে গেল শিল্পীর হাতে। মহা খুশী ক্যাপ্টেন। নিজ দায়িত্বে শিল্পীকে দিলেন সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কেবিন।

ডিউক অব কনট আসছেন ব্রিটিশ এক্জিবিশনে। জি পাল তাঁর মূর্তি গড়তে চান। কিন্তু উপায় নেই। ডিউক মাত্র পাঁচ মিনিট থাকবেন বেংগল কোর্টে। তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে দেখতে হবে সারা এক্জিবিশন। ফুরসৎ নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁর মূর্তি গড়বেন জি পাল।

তাই গড়লেন। রিপোর্টাররা সে খবর ছাপবে না। একজন ব্রিটিশ প্রজা, তা তিনি যতই ক্ষমতা রাখুন না কেন, বড় হয়ে যাবেন সকলের চোখে, শাসকজাত এ খবর ছাপে কি করে! অতএব ঝগড়া লেগে গেল ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়নের সেক্রেটারী আর রিপোর্টারদের সংগে।

অবশেষে রফা হল। খবরটা তারা ছাপবে। তবে অনেক কম করে। যাতে অনেক খবরের ভিড়ে ও খবরটা বিশেষ কারোর চোখে না পড়ে।

কিন্তু চোখে পড়লো। আর ভিড় বাড়তে লাগলো বেংগল কোর্টে। শেষ অবধি এমন অবস্থা হল যে, বাঙালী শিল্পীর জন্য তৈরী করতে হল কাচ দিয়ে মোড়া আলাদা স্টুডিও।

মুখোমুখি বসে আছি জি পালের স্টুডিওতে। আমি আর মণি পাল, জি পালের ভ্রাতুষ্পুত্র। গল্প হচ্ছে সেকালের। চারদিকে ছড়ানো কত মূর্তি। কোনটার অর্ধেক হয়েছে, কোনটা সবে শুরু হল আবার কোনওটা বা শেষ হয়ে এলো বলে। জি পালের গল্পই হচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডের সব ছবি দেখাচ্ছেন আমাকে ঘুরিয়ে

গোপেশ্বর পাল

ঘুরিয়ে। জি পালের জয়যাত্রার কাহিনী।

প্রসংগক্রমে যদুনাথ পালের কথা এল। জি পালেরও গুরুদেব। মণিবাবু বললেন, জ্ঞান হবার পর যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স একশো পার হয়ে গেছে। রাইটার্স বিল্ডিং, মিউজিয়ম, জেনারেল পোস্ট অফিসের অনেক কাজ তাঁর করা। তবে এখন আর বিশেষ চেনা যায় না। অমন হাত দেখিনি।

চিকের ওপাশে নদীয়ার মহারাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী। এপাশে আমি। পাশে

অহীন্দ্র চৌধুরী

দাঁড়িয়ে মহারাজকুমার। কৃষ্ণনগরের কথাই হচ্ছিল। মাটির পুতুলের কথাও হল। মহারাজকুমার বললেন, কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আসুন। অনেক নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। রাইট স্ট্রীটের বাড়িতেই বা কম কি, আমি মনে মনে ভাবছিলাম।

নবাবী আমল থেকেই কৃষ্ণনগর থেকে পটুয়া আসতো কলকাতায়। একথা বলছে ইতিহাস। আসতো নৌকা চড়ে শীতের গোড়ায়। আশ্বিন, কার্তিক থেকে পৌষ-মাঘ অবধি থাকতো কুমোরটুলীতে। আর তারপর যে যার গাঁয়ে ফিরে যেতো। এমনি করেই নাকি তৈরী হয়েছে কুমোরটুলীর বস্তী।

নবাবী আমলের পুরোতন কারিগরের দোকান এখনও কয়েকটা আছে কুমোর-টুলীতে। রাখিকাপ্রসাদ পাল, কেনুপদ পাল, রামেশ্বর পাল এঁদের কথা আজ আর কে মনে করে বলুন? অথচ এঁরাই ছিলেন নাকি সেদিনকার বড় বড় কারিগর। ইতিহাসে এঁদের নাম নেই। তবু কুমোরটুলীর

কালী প্রতিমা

দু'একজন বৃদ্ধ কারিগর এ'দের নাম আজও স্মরণ করে রেখেছেন দেখলাম।

মহারাণীকে বললাম, আশীর্বাদ করুন।
তিনি বললেন, জয় হোক তোমাদের।

দেশের বাড়িতেই মারা গেলেন জি পাল। কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যাল অফিসে গেছেন কি কাজে। গাঁয়ের ছেলেরা ধরল পথে, এবারের সরস্বতী ঠাকুর গড়ে দিতে হবে। সেই কথাই মনে মনে ভাবছিলেন সম্ভব। ব্লাড প্রেশার ছিল খুব বেশী। মাথাটা কেমন করে উঠল। সেই শেষ।

১৯৪৪ সালের ৮ই জানুয়ারী মারা গেলেন জি পাল।

কিন্তু কুমোরটুলীর আসল পরিচয় জি পাল অ্যান্ড সন্সের স্টুডিও কি মহারাণীর রাইট স্ট্রীটের বাসভবনই একমাত্র নয়। যথাযথ পরিচয় পেতে গেলে আপনাকে যেতে হবে বস্তীতে।

বস্তীতে বসেই কথা বলছিলাম অনেক-দিনের পুরাতন এক কারিগরের সঙ্গে। নাম দীননাথ পাল। পিতার নাম কুঞ্জবিহারী পাল। দোকান প্রায় দু'শো বছরের। তিন-চার পুরুষের ব্যবসা এখানে।

খোলে মাটি, এ'টেল মাটি, তুষ, গোবর এই দিয়ে কারবার। তাই দিয়েই তৈরী হয়ে যাচ্ছে কত প্রতিমা! কি চমৎকার তার গড়ন! সামনে বসে বসে তাই দেখছিলাম। আর বৃদ্ধের কাছ থেকে টুকে নিচ্ছিলাম পুরানো শিল্পীদের নাম।

প্রিয়নাথ পাল, রসিকচরণ পাল, কালোহরি পাল, আলবার্ট হরিচরণ, বেঁটে হরিচরণ, সুরেন্দ্রনাথ পাল, নগেন্দ্রনাথ পাল, বঙ্কিমবিহারী পাল, নিতাইচরণ পাল (এন সি পাল), অন্নদা পাল, গোপেশ্বর পাল, মণি পাল, দুলালচন্দ্র পাল, পটিরাম পাল, জগদীশচন্দ্র পাল, প্রসন্নকুমার পাল, ভুবনমোহন পাল, ক্ষিতীশচন্দ্র পাল (কে সি পাল), অধর পাল, শক্তিকচন্দ্র পাল, রাজেশ্বর পাল, হরিপদ পাল, নীলমণি পাল, বেণীমাধব পাল, মণিমোহন পাল, অতুলকৃষ্ণ পাল (রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ) সুরেন্দ্র পাল, হরিজীবন পাল, কার্তিকচরণ পাল, জিতেন্দ্রনাথ পাল (ফিল্মের কাজ), কেতু পাল, অতুলকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি অনেক আর্টিস্টের নাম করলেন তিনি।

দুঃখ করে বলছিলেন, কত কাজের মানুষ ছিল এর মধ্যে। অথচ কি অসহনীয় দুঃখের মধ্যে দিন কাটিয়ে গেছেন অনেকে। পয়সার অভাবে চাঁদা তুলে সৎকার করতে হয়েছে এমন দু-একজনও আছেন এ নামের লিস্টিতে। একখানি মাত্র পরনে কাপড়। গামছা প'রে সেই কাপড় কেচে রোদ্রে দিয়ে দিন কাটিয়ে গেছেন কেউ কেউ। অনেক শিল্পী মরে গেছে, আগামী দিনে যে সব শিল্পী আসছে, তারা যেন কেউ না মরে, এই কথাটাই লিখে দিও আপনার কাগজে, চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন ভদ্রলোক।

মেসিনপত্রের কথা তুললাম। আজকালকার নতুন যন্ত্রপাতির খবর এ পাড়ায় বড় একটা কেউ রাখে না। দীননাথবাবু তো স্পষ্টই বললেন, হাতে বেঁচে থাক বাবু। কলে কি মানুষ গড়া যায়, না দেবতা গড়া যায়!

এই শ্রদ্ধা, ভক্তি আর বিশ্বাস দিয়ে এ পাড়ায় কিছু প্রতিভা আজও বেঁচে আছে।

এদের ওপরও সরকারের ইনকাম-ট্যাক্স, সেল্‌স্ ট্যাক্সের নোটিশ আসছে। অনেকেই বললেন, বছরে তিন-চার মাস কাজ হয় মাত্র। ট্যাক্স কোথা থেকে দিই বলুন তো!

আর এক জ্বর ঢুকেছে বস্তীতে। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের বুলডজার এগিয়ে আসছে। বস্তী ভেঙে এ্যাসফাল্টের রাস্তা বানানো হবে। তার চারপাশে গড়ে উঠবে ফ্ল্যাটোবল কোয়ার্টার্স। কিন্তু দীননাথ পালেরা কোথায় যাবে বলে দিন?

চন্দন

সমুদ্রের তলায় নেমে ছবি তোলা আজকালকার দিনে একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য নানারকম নতুন নতুন ক্যামেরাও বার হচ্ছে। 'ম্যাসাচুসেট ইন্সটিটিউট অব টেক্‌নলোজি'র ডাঃ হ্যারল্ড ই এজার্টন যে নতুন ক্যামেরাটি বার করেছেন সেটি অন্যান্য ক্যামেরার থেকে একটু বিশেষ ধরনের। এটিই বোধহয় গভীরতম সমুদ্রের ছবি তোলার প্রথম ক্যামেরা। জলের নিচে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ১৭০০০ পাউণ্ড জলের চাপ পড়লেও এই ক্যামেরাটি দিয়ে ভূমধ্যসাগর, লোহিত-সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তলদেশের ছবি তোলায় সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। এই ক্যামেরায় ছবি নিয়ে বহু জলমগ্ন জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে বহু বিচিত্র মাছের ছবি তোলা হয়েছে, এবং আমরা ঐ সমস্ত মাছের খবর কোনও দিনই জানতে পারতাম না।

*

রাশিয়ান ডাক্তাররা মানুষের উচ্চ রক্তের চাপ, অনিদ্রা রোগ এবং মাথা ধরা বৈদ্যুতিক চিকিৎসার সাহায্যে সারিয়ে দিচ্ছেন। রোগী যন্ত্রটির সামনে বসে একটা হাতল ধরবে। এই হাতলটিতে ইলেক্‌ট্রোড থাকে। হাতলটি ধরার পর যন্ত্রটির সাহায্যে খুব উঁচু ধরনের পৌনঃপুনিক ধাক্কার (frequency shocks) সৃষ্টি করা হয়। রোগীকে এইটি ধরতে এক সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগ সময় দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই ধরনের চিকিৎসায় উচ্চ রক্তের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে নেমে যায়।

*

রাশিয়া 'কে ২টেন' নাম দিয়ে এক ধরনের ছোট হেলিকপ্‌টার তৈরী করেছে। এই নতুন হেলিকপ্‌টারটির অনেকগুলি সুবিধা আছে। আকাশে, ওড়ার সময় এর কোন রকম শব্দ হয় না এবং ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারে। প্রয়োজন হলে এটা একটা মোটর লরি অথবা জাহাজের ডেকে খুব অল্প জায়গার মধ্যেই নামতে পারে। আকাশে চলা ছাড়া এটা জলেও মোটর বোটের মতো চলতে পারে। আকাশে ২,৫০০ মিটার উঁচুতে এটা উঠতে পারে। যদি কোন কারণে হেলিকপ্‌টারটির যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে যায় না—এটা নিরাপদেই মাটিতে নামতে পারে। এই রকম নিরাপদে মাটিতে নামতে হেলিকপ্‌টারটির পাখা-গুলি তখন প্যারাসুটের মত কাজ করে।

*

শৌখিন মানুষের শখের ইয়ত্তা থাকে না। বেড়ানোর সুখ যাদের আছে, তাদের পক্ষে ছুটির দিনগুলি ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিতে ভালো লাগে। একঘেয়ে মোটরযোগে কতদূর আর বেড়াতে ভালো লাগবে। কিছুটা মোটরে বেড়িয়ে কিছুটা নৌকা-বিহার মন্দ লাগে না। মোটরে করে নদীর ধারে হয়তো গিয়ে হাজির হওয়া যায়, কিন্তু সব ঘাটেই তো খেয়া নৌকার ব্যবস্থা থাকে না, সেজন্য নিজের সঙ্গে একখানা নৌকা থাকলেই ভালো হয়। নৌকা ঘাড়ে করে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব কিছুদিন আগেও হাস্যোদ্দীপক মনে হতো, এখন আর হয় না। ৫৬ পাউণ্ড ওজনের ৮½ ফুট লম্বা একখানি বোট মুড়ে ভেঁজে সহজেই বহন করা যায়। এই হাল-ফ্যাশনের নৌকাখানি সাত মিনিটের মধ্যেই প্যাক করে নেওয়া যায়। কাঠ দিয়েই তৈরী হয় নৌকাখানি। কাঠের অংশগুলি [illegible] মুড়ে নেওয়ার পর পাতলাম্ভ [illegible] প্যাকেটটি বৃষ্টি-জল থেকে বাঁচা[illegible] জন্য নাইলন বা ভিনিল দিয়ে [illegible] দেওয়া হয়। ইচ্ছা করলে এ্যালুমিনি[illegible] তৈরী দাঁড়ের সাহায্যে চালানো যাবে [illegible] নৌকা; আর না হলে ৩½ অশ্বশক্তি[illegible] মোটর ইঞ্জিনটি জুড়ে দিয়ে বি[illegible] আয়াসেই নৌকা-বিহার করা সম্ভব হবে। সমস্ত নৌকাটিকে ২৪ পাউণ্ড ওজনের দুটি প্যাকেট করে স্বচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

ভাঁজা নৌকা

১নং—প্যাকেট করা অবস্থা; ২নং—খোলা অবস্থা; ৩নং—ভাসমান অবস্থা

প্রেমের প্রার্থনা

শান্তিকুমার ঘোষ

সূর্যের আগুনে থেকে তোমার পবিত্র প্রেম
জ্বেলে নাও তুমি—
রশ্মি যার দীপ্ত করে, গ্লানি হতে মুক্ত করে
নতুন সৃষ্টিতে;
প্রবল প্রখর তেজে তরুগুল্ম দূরে রাখে
থর মরুভূমি।
স্বর্গের আগুনে থেকে মাটির প্রদীপ আজ
জ্বেলে দাও তুমি।
দেখ নাকি রৌদ্রজলে ঝড়ের প্রহারে আমি
কেবল বিক্ষত ঃ
নিরুদ্ধ যৌবন চায় অজস্র পুষ্পিত হতে
অসীম প্রত্যাশে—
অপ্রভার দিকে দিকে ঘৃণার তুষার হায়
জমে ওঠে ততো
কত আর রৌদ্রজলে ঝড়ের প্রহারে হবো
কেবল বিক্ষত।
তারে বাঁধা কত গান থরো থরো প্রতীক্ষায়
যন্ত্রণার ভারে ঃ
চাঁপার আঙুল তুলে কবে তুমি দেবে টান
নিপুণ ছোঁয়ায়;
দিগন্তে শিশির ফেলে পথিকে আনবে ঘরে
নিবিড় অন্ধকারে।
শিলীভূত এই প্রাণ উজ্জীবন পাবে ফের
আলোর সঞ্চারে।

চিরন্তন

নমিতা বসু মজুমদার

শুরু অথচ হল শেষের থেকে।

যে ঘাটে আলো জ্বালিয়ে ফুলদোল থেকে চলে গিয়েছি
জেনেছি সমাপন হয়ে গিয়েছে;
সেই ঘাটে আবার ফিরে এল তরী।
দেখলেম শুকানো ফুলের শুষ্কতায়
চাপা পড়েনি সব লাবণ্য।
ফুরিয়ে আসা প্রদীপের শেষ রেখায় তখনো ঈষৎ রেখা।
তারি থেকে আবার জ্বালিয়ে নিলেম
প্রথম করে সাজা নতুন আমার বাতিটিকে
নতুন তোলা ডালির ফুলগুলিকে
শুকানো ফুলের সাথে মিলিয়ে দিলেম ছড়িয়ে।

নতুন করে হল ফুল উৎসব
শেষ বলব কাকে?
শুধু দীর্ঘদিনের পথ বেয়ে চলে যাওয়ার পরেকার
ফুলদোলে
লাগল অপরাহ্ন বয়সের
আপরাহ্নিক আলোর করুণা;
বুকে তুলে ধরলেম শুকনো ফুলগুলিকে,
নিভন্ত বাতিটিকে
ঘিরে ধরলেম
হাতের স্নেহের আড়ালে।

প্রার্থনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হে আকাশ তুমি আজ বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন্ দূরে নক্ষত্রের আলো।
যে আলো মৃত্যুর মতো সব দিক চিহ্ন মুছে ফেলে
আমাকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে অবহেলে।

তুমি কত ডাক দাও, আমি অন্ধ নির্বোধের মত
সেই ডাক ভুলে গিয়ে পৃথিবীকে খুঁজি ক্রমাগত।
কালের উজান গঙ্গা সমুদ্রের মোহে এসে মেশে
তোমার শৈশব ছেড়ে যৌবনের অগ্নিময় দেশে।

হে আকাশ তুমি আজ বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন্ দূরে নক্ষত্রের আলো।
আবার যেন সে আসে মৃত্যুর মতন যেন আবার নিভৃতে
আমাকে সে নিয়ে যায় অজানিত অন্য পৃথিবীতে।

॥ এগারো ॥

ছিলামুক্ত তীরের মত ছুটে চলেছে লিজোমু। পায়ের নীচ থেকে সরে সরে যাচ্ছে চড়াই-উৎরাই। সরে যাচ্ছে বনময় উপত্যকা আর মালভূমি। এক টিলা থেকে আর এক টিলার ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে লিজোমু। পায়ের নীচে অদৃশ্য হচ্ছে এই পাহাড়ী পৃথিবী; আর অস্ফুট চেতনার পর্দায় সাঁ সাঁ করে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে কতকগুলো মুখ; কতকগুলি ভাবনার রেখা। সেঙাই! খোনকে! মেহেলী!

খোনকেকে সর্দার ফেলে দিয়েছে গভীর খাদের অতল তলায়। খোনকের সঙ্গে সঙ্গে লিজোমুর জীবন থেকে লগোয়া পন্যুর প্রেম কী একেবারেই মুছে গিয়েছে? না, না। টিজু নদীর এপার থেকে সে অনেক-বার দেখেছে সালুয়ালাঙ্ গ্রামের যৌবনকে। সেঙাইকে। এক বিচিত্র নেশায় তার অর্ধস্ফুট মনটা সেঙাইর রূপে রূপে আবিষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া, মেহেলীর কাছে সেঙাইর কথা অনেকবার শুনেছে সে। তার পাহাড়ী মন বার বার দোল খেয়েছে। কিন্তু সেদিন তার জীবনে ছিল খোনকে। লিজোমুর সেঙাইমুখী দেহমন খোনকের প্রখর আলিঙ্গনের নীচে একটু একটু করে নিভে গিয়েছে। অর্ধস্ফুট বন্য মনটা আর দুটি পিপাস চোখ ভরে খোনকে উপস্থিত ছিল কাল পর্যন্ত। কিন্তু এখন আর নেই, আজ আর নেই খোনকে। খোনকে যদি নাই রইলো পৃথিবীতে, তবে কী তার পাহাড়ী যৌবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? রেণু রেণু হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে? কামনারা রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঝরতে থাকবে পাহাড়ের উপত্যকায়? খোনকের মূল্য সে আদায় করবে সেঙাইর কাছ থেকে।

সেও পাহাড়কন্যা। প্রয়োজন হলে পুরুষের যৌবনকে অন্যের কামনা থেকে সে ছিনিয়ে আনতে পারে। তা ছাড়া সেঙাই! মেহেলী তার চোখের সামনে কেলুরি গ্রামের যৌবনকে ভোগ করবে। তা হয় না। তা হতে পারে না। অন্তত খোনকে-হীন এই পাহাড়ী জনপদে লিজোমু তা সহ্য করবে না। খোনকে যদি নাই রইলো, পাহাড়ী যৌবনের দাবী কী তবে চরিতার্থ হবে না? খোনকে নেই, কিন্তু তার কামনার আগুন অন্য পুরুষদেহেও রয়েছে। খোনকে নেই, কিন্তু তার বাগ্র আলিঙ্গন অন্য কারো দুটি বাহুর মধ্যে রয়েছে। সে দেহ, সে বাহু সেঙাইর। সালুয়ালাঙ্ গ্রামের প্রতিপক্ষ সে পুরুষ।

কখন যে বিশাল খাসেম গাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল লিজোমু, খেয়াল ছিল না। চারদিকে একবার চনমন চোখে তাকালো সে। পাহাড়ের অনেক চড়াই-উৎরাই, অনেক টিলাময় উপত্যকা ডিঙিয়ে এসেছে লিজোমু। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুকখানা উঠছে নামছে।

চারপাশে বেলাশেষের রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। রোদের আভাস সরে গিয়েছে দূরের পাহাড়-চূড়ায়।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না লিজোমু। বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে চলে এলো সে।

পাটাতনের ওপর উবু হয়ে বসেছিল সেঙাই। চমকে উঠলো সে; "কে? কে রে মেহেলী এসেছিস না কী?"

অজগরের ফণার মত লিজোমুর জিভ-খানা হিস্ হিস্ করে উঠলো; "কেন? মেহেলী ছাড়া আর কেউ নেই সালুয়ালাঙ্ বস্তীতে?"

"কে তুই?"

"আমি লিজোমু। তুই আমার লগোয়া পন্যুকে মেরেছিস সেঙাই।"

ঘরের মধ্যে তরল-কাজল অন্ধকার। ওপরে আতামারী পাতার চালের ফাঁক দিয়ে বেলাশেষের খানিকটা বিবর্ণ রঙ এসে পড়েছে। কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে পরিবেশটা।

গলাটা এবার কেঁপে কেঁপে উঠলো সেঙাইর; "কে তোর লগোয়া পন্যু?"

"খোনকে।"

"খোনকে!" সেঙাইর গলায় প্রতিধ্বনি উঠলো নামটার।

"হু-হু খোনাকে। তুই খোনাকেকে মেরেছিস। আমার লগোয়া পনু মরেছে তার দাম দিতে হবে।" এই তরল-কাজল অন্ধকারেও লিজোমুর চোখদুটো যেন জ্বলছে।

"কী দাম দেবো!" শিউরে উঠলো সেঙাই; "আমাকে মারিস না। কাল রাত্তিরে আমি খাদে পড়ে গেছলাম। সারা গা ফালা ফালা হয়ে গেছে।"

"না, তোকে মারতে আসি নি সেঙাই। খোনাকের জানের দাম তুই। তুই আমার লগোয়া পনু (প্রেমিক) হ'। তোকে আমি চাই।" সেঙাইর পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো লিজোমু।

"তোকে আমি চাই না। মেহেলী কোথায়? তামুনুর (চিকিৎসক) কাছ থেকে আমাকে ওষুধ এনে দেবে বলেছিল, এখনো এলো না তো।" ছিট্‌কে পাটাতনের আর এক পাশে সরে গেল সেঙাই। তারপর রুদ্ধ গলায় বললো; "তোকে আমি চাই না। তুই ভাগ্।"

"আমাকে তুই চাস্ না। বেশ, তা হ'লে খোনাকেকে ফেরত দে। আমার তো আর লগোয়া পনু নেই।" নীলকান্ত মণির মত লিজোমুর চোখের মণি দুটো দপ্ দপ্ জ্বলছে; "তুই আমার হ। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা তোদের বস্তীতে।"

"আমি পারবো না।"

"পারবি না। মেহেলীর সঙ্গে পিরীত করতে পারবি, অথচ আমার সঙ্গে পারবি না। তোকে পারতেই হবে।" অসহ্য হয়ে উঠলো পেশীগুলো। আচম্কা পাহাড়ী মেয়ে লিজোমু গর্জন করে উঠলো; "তুই আমাকে পিরীত করবি কী না বল্?"

"না।" বিস্বাদ গলায় উচ্চারণ করলো সেঙাই।

"তবে আমার লগোয়া পনু খোনাকেকে তুই মারলি কেন?"

"আমার ঠাকুরদাকে তোরা অনেককাল আগে মেরেছিস। তার শোধ তুললাম। তবু আপসোস রইলো। খোনাকের মাথাটা আমাদের মোরাঙে নিয়ে যেতে পারলাম না।" শেষদিকে কেমন যেন বিমর্ষ শোনালো সেঙাইর কথাগুলো।

"বেশ শোধবোধ হলো। এবার আমাকে তোর লগোয়া পনু (প্রেমিকা) করে নে।"

"না।"

"আচ্ছা, আমার চোখের সামনে মেহেলীর সঙ্গে তোর পিরীত জমতে দেবো না। তোকে আর বস্তীতে ফিরতে হবে না। আমি এখুনি সর্দারকে ডেকে আনছি।" পাটাতনের ফুকর দিয়ে বাঁশের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল লিজোমু।

এক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলো সেঙাই। আচম্কা তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। সব নিষ্ক্রিয়তা দেহ মন থেকে ঝরে গেল সেঙাইর। সে জানে, লিজোমু যেই মাত্র তাদের সর্দারকে সংবাদ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে এই গাছের চার পাশে রাশি রাশি বর্শার ফলায় মৃত্যু ছুটে আসবে। নাঃ, কোনমতেই লিজোমুকে নামতে দেওয়া হবে না খাসেম গাছের মগ-ডালে এই ছোট্ট ঘরখানা থেকে। সাঁ করে পাটাতনের ওপর থেকে মেহেলীর একখানা মেরিকেতসু তুলে নিল সেঙাই। তারপর তাক্ করে ছুঁড়ে মারলো।

অব্যর্থ লক্ষ্য। ধারালো অস্ত্রটা লিজোমুর কোমল বুকের ওপর গেঁথে গেল। ফিনকি দিয়ে পাহাড়ী রক্তের একটা তীক্ষ্ণ ধারা বাঁশের পাটাতনকে স্নান করিয়ে দিল। আর আর্তনাদ করে ঘরের মধ্যেই লুটিয়ে পড়লো পাহাড়ী যুবতী লিজোমু; "আ-উ-উ-উ—"

ইতিমধ্যে একটা বাঁশের পানপাত্র তুলে

নিয়েছে সেঙাই। লিজোমুর অচেতন দেহটার ওপর একটার পর একটা আঘাত দিয়ে চললো সে। অবিরাম। অবিশ্রাম।

এতক্ষণে লিজোমুর দেহটা একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছে। এবার থামলো সেঙাই। লিজোমুকে এই ঘর থেকে ছেড়ে দিলে অনিবার্য মৃত্যু ধেয়ে আসবে; বীভৎস অপঘাত ছুটে আসবে।

পাটাতনের ফুকর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সেঙাই। পাহাড়ী উপত্যকার ওপর থেকে দিন মুছে গিয়েছে। ধূপছায়া অন্ধকার নেমে আসছে উত্তর পাহাড়ের চূড়ায়। আসন্ন রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বিচিত্র সম্ভাবনা খেলে গেল সেঙাইর ভাবনায়।

জা কুলি মাসের রাত্রি অনেক গহন হয়েছে, অনেক গভীর হয়েছে। প্রথম প্রহর পার হয়ে গিয়েছে খানিকটা আগে।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আচমকা সালুয়ালাঙ গ্রামের পাহাড়ী হৃৎপিণ্ডটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। অজস্র গলার গর্জনে শিউরে উঠলো জা কুলি মাসের হিমাক্ত অন্ধকার।

পেনু কাঠের অজস্র মশাল রাত্রিটাকে ফালা ফালা করে ছুটে আসছে খাসেম গাছের দিকে। মশালের পিঙ্গল আলোতে বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করে উঠছে। সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে একটা পাহাড়ী ঝড়। জোয়ান মানুষের ঝড়। মাথায় তাদের মোষের শিঙের মুকুট। দু চোখে নিশ্চিত ঘাতনের ঝিলিক।

একেবারে সামনে রয়েছে সালুনারু আর বুড়ো সর্দার।

সর্দার গর্জে উঠলো: "কোথায় সেঙাই? কেলুরি বস্তীর শয়তান আমাদের খোনকেকে মেরেছে। মুণ্ডু ছিঁড়ে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখবো না আজ? ইজাহান্টসা সালো।"

সালুনারু বললো: "তবে বুঝবো সর্দার তোমার মুরোদ। শুধু কী খোনকেকে ফুঁড়েছে ঐ সেঙাই। মেহেলীর সঙ্গে পিরীত জমিয়েছে। তার বিছানায় রাত কাটাতে এসেছে এ বস্তীতে। গাছের ওপরে ঐ খা-ঙে (ঘরে) আছে।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

সোরগোল উদ্দাম হয়ে উঠছে। রীতিমত তাণ্ডব। সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানেরা কী জানতো, জা কুলি মাসের এই রাত্রিটা তাদের জন্য এমন একটা মৃত্যুর উৎসব নিয়ে আসবে?

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছটার চারপাশ ঘিরে ধরলো জোয়ান ছেলেরা। পাহাড়ী মাটির ভাঁজে ভাঁজে পুঁতে দিল অগ্নিমুখ মশালগুলো। অন্ধকার যেন চারপাশে শিলাময় হয়ে গিয়েছে। সেই কঠিন অন্ধকার চিরে চিরে মশালের শিখা উঠলো লক্ লক্ করে। আলোর বৃত্তগুলির চারদিক ঘিরে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা বরফ ঝরছে। জা কুলি মাসের অসহ্য হিমাক্ত রাত্রি। কিন্তু আদিম এক হত্যার নিমন্ত্রণে সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই হিম-ঝর-ঝর রাত্রির প্রহার তাদের কণামাত্র বিচলিত করতে পারছে না।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

উত্তেজিত গলায় কে যেন বললো: "কী সর্দার, কী করবো এবার?"

আরো একটি গলা ফুটলো: "আমি কিন্তু সেঙাইর মুণ্ডুটা কাটবো।"

"না, আমি, আমি।" অজস্র গলায় এক দাবী, এক কোলাহল নির্ঘোষিত হলো।

"চুপ কর্ টেফঙের বাচ্চারা। ইজাহান্টসা সালো।" বুড়ো সর্দার ধমকে উঠলো। সে ধমকে বুকের ওপর সাপের মাথায় মালাটা শব্দ করে উঠলো। মাথায় মোষের শিঙের মুকুট কাঁপলো; রক্তচোখে সব জোয়ান-গুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো সর্দার বললো: "একজন কেউ উঠে ঐ ঘর থেকে শয়তানের বাচ্চাটাকে ফুঁড়ে নিয়ে আয়।"

প্রখর উত্তেজনায় একজন সিঁড়ির দিকে সাঁ করে ছুটে গেল। ডান হাতের থাবায় একটা অতিকায় বর্শা। বাঁ হাত দিয়ে সিঁড়ির বাঁশ চেপে ধরলো জোয়ানটা। আচমকা পেছন থেকে আর একজন দু হাতের বেষ্টনে কোমর ধরে টেনে নামিয়ে দিল তাকে: "কী রে টেফঙ, মরতে যাচ্ছিস না কী? ওপর থেকে সেঙাই যদি বর্শা হাঁকড়ায়? তখন?"

তাইতো! এ কথাটা আগে ভেবে দেখে নি কেউ? ওপর থেকে সেঙাই যদি বর্শা

চালার ওপর টুপ্ করে একটা পাকা খাসেম ফলের মত নীচে পড়ে যাবে। তাই তো।

বুড়ো সর্দার আগ্নেয় চোখে খাসেম গাছের মগডালে আতামারী পাতা-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাই তো!

আচমকা সালুনারু বললো: "উঠলে নির্ঘাৎ বর্শা দিয়ে ফুঁড়বে সেঙাই। তার চেয়ে পুড়িয়ে মারো।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙ পাহাড়ী মানুষগুলোর গর্জনে শিউরে উঠলো আবার। ঠিক! বড় খাসা বুদ্ধি জুগিয়েছে সালুনারু। সকলে তারিফ করলো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে: "হু, হু, সেই ভালো।"

বুড়ো সর্দার বললো: "কিন্তু আগুন ধরাবো কেমন করে?"

দু' চোখ থেকে রাশি রাশি ঘৃণা ঝরলো সালুনারুর: "এই বুদ্ধিতে সর্দার হয়েছিস্ কেন? বাঁশের ডগায় মশাল বেঁধে আগুন লাগিয়ে দে।"

"চুপ্ কর শয়তানের বাচ্চা। আমার বুদ্ধি নেই।" গর্জে উঠলো বুড়ো সর্দার, কিন্তু গর্জনটা ভয়ানক শোনালো না। মনে মনে সে সালুনারুর খাসা মগজের তারিফ করলো। তারপর জোয়ানদের দিকে তাকালো বুড়ো সর্দার: "যা, বাঁশ নিয়ে আয় খান কয়েক।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছের চারপাশে যে পাহাড়ী জটলা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল, এবার তা উপত্যকার দিকে সাঁ সাঁ করে নেমে গেল।

একটু পরেই খানকয়েক বাঁশ কেটে নিয়ে এলো জোয়ানেরা। তারপর সেই বাঁশের ডগায় মশাল বেঁধে বুড়ো সর্দারের দিকে তাকালো।

বুড়ো সর্দার বললো: "এবার ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দে।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আকাশের দিকে দিকে পাহাড়ী জোয়ানের কণ্ঠ থেকে উল্লসিত চিৎকার উঠলো। সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিমুখ মশালগুলো আকাশের দিকে উঠে গেলো।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আতামারী পাতার চালে আগুন লেগেছে। চারপাশ থেকে লিকলিকে গ্রাস মেলে ঘরখানাকে ঘিরে ধরেছে দাবাগ্নি। জা কুলি রাত্রিকে শতফালা করে আকাশের দিকে দিকে উঠে যাচ্ছে লেলিহ অগ্নিলেখা। খাসেম গাছের মগডালে ঐ মমতাহীন দাবদাহ, আর সেই সঙ্গে এই আদিম হত্যার উৎসবে তাল লয় মিলিয়ে মিলিয়ে অজস্র জোয়ান গলায় আবহ বাজনা বাজছে: "হো-ও-ও-ও-আ-আ। হো-ও-ও-ও-আ-আ"

আচমকা এই দাবাগ্নি আর নীচের এই চিৎকারের চমকিত করে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠলো। খাসেম গাছের শাখায় শাখায় জ্বলন্ত ঘরখানা থেকে সেই আর্তনাদ জা কুলি মাসের এই হিমার্ত রাত্রিটাকে যেন বিদীর্ণ করে ফেললো: "আ-উ-উ-উ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

নীচের পাথুরে মাটিতে অনেকগুলো গলায় অট্টহাসি বেজে উঠলো। খাসেম গাছের মগডালে এই মৃত্যুকে তারা উপভোগ করছে। এই আর্তনাদে উল্লসিত হয়ে উঠছে।

বীভৎস গলায় বুড়ো সর্দার বললো: "শয়তানের বাচ্চাটা মরছে। আমাদের বস্তীর জিতই হয়ে গেছে। সেঙাইর ঠাকুরদাকে অনেককাল আগে আমরা মেরেছি। এবার সেঙাইকে মারলাম। হোঃ—হোঃ—হোঃ—"

"শত্রু মরলো। আজ রাত্তিরে কিন্তু ভোজ দিতে হবে সর্দার।" অনেকগুলো গলায় আনন্দিত কোলাহল উঠলো।

"দেবো। নিশ্চয়ই দেবো রে শয়তানের বাচ্চারা। আজ আমাদের কী আনন্দের দিন। সব কেসুঙ্ থেকে একটা করে টেবোয়া নিয়ে মোরাঙে খাওয়া হবে।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছের মগডাল থেকে ঘরখান আগুনে এখন মুছে গিয়েছে। রাশি রাশি ছাই হয়ে অদৃশ্য হয়েছে আতামারী পাতার ছোট্ট ঘরখানা।

এক সময় পাহাড়ী জোয়ানেরা খাড়া উপত্যকা বেয়ে বেয়ে মোরাঙের দিকে যেতে শুরু করলো। এই খাসেম গাছের তলা থেকে অনেক অনেকদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মশালের বিন্দুগুলো। শুধু একটা ভয়াল সোরগোলের রেশ এখনও ভেসে আসছে, "হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

একটা অতিকায় সাপের কুণ্ডের কিনার থেকে এই আগুনের, এই হত্যার ভয়ঙ্কর উৎসব দেখছিল পলিঙ্গা আর মেহেলী। খাসেম গাছের মগডালে নিষ্ঠুর দাবাগ্নির মত চোখ দুটো জ্বলছিল মেহেলীর। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। সামনে এগিয়ে এলে সেঙাইর সঙ্গে তাকেও ভস্ম হয়ে যেতে হতো। সর্দারের ক্রোধ তাকে ক্ষমা করতো না।

শুধু মেহেলীর দুটি নিরুপায় চোখের দৃষ্টি দেখছিল, কেমন করে সেঙাই নামে
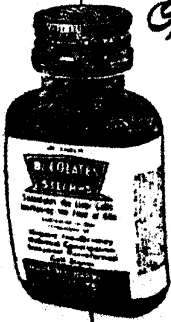
এক রমণীর বন্য স্বপ্ন আতামারী পাতার ঘরে পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। এক সময় হাতের মুঠি থেকে নাকপোলিবার মন্ত্রপড়া ওষুধ ঝুরে ঝুরে করে ঝরে পড়েছিল পাথুরে মাটির ওপর।

মেহেলী তাকালো পলিঙ্গার দিকে, তারপর আশ্চর্য জ্বালাভরা গলায় বললো: "দেখলি কেমন করে পুড়িয়ে মারলো সেঙাইকে!"

সাপেথ ঝোপটার পাশে একেবারে শিলীভূত হয়ে গিয়েছিল যেন পলিঙ্গা। মেহেলীর কথাগুলো তার বিবশ স্নায়ু-গুলোকে ঝাঁকানি দিয়ে গেল: "হু-হু। হুই শয়তানী সাল্লুনারুর কাজ!"

চোখদুটো দুটো ফণার মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে মেহেলীর। আহত একটা অজগরের মত গর্জন করে উঠলো সে: "হু-হু। দেখিস্ ঐ সাল্লুনারুর কলিজা ফেড়ে আমি রক্ত খাবো। কোন্ বস্তী থেকে এখানে এসে শয়তানী শুরু করেছে [illegible]!"

"একটা আস্ত ডাইনী ঐ মাগী। দেখছিস না, কেমন করে ঐ বস্তীর সর্দারকে হাত করে নিয়েছে।"

"আমার কেমন যেন লাগছে পলিঙ্গা। ঐ সেঙাইটা মরে গেল, ওরা পুড়িয়ে মারলো। ঐ সর্দার ঐ সাল্লুনারু, ঐ জোয়ান ছোকরাবা, কাউকে আমি রেহাই দেবো না। আমার পিরীতের মানুষকে ওরা পুড়িয়ে মারলো পলিঙ্গা! এর বদলা আমি নেবো।" প্রতিহিংসায় পাহাড়ী যুবতী মেহেলীর দেহমন উদগ্র হয়ে উঠলো। কান্না নয়, প্রতিটি রক্তকণা যেন তার দাউ দাউ অগ্নিবিন্দু হয়ে জ্বলছে। আর দুটি পিঙ্গল চোখের মণি চৌচির করে, [illegible] দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে শতধারা করে সেই রক্তের কণিকাগুলো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে মেহেলীর।

অনাবৃত দেহ। দু' জনের সারা শরীরে স্বল্পতম আচ্ছাদনও নেই। জা কুলি মাসের হিম নির্মম হয়ে উঠেছে। তবু, মেহেলী কী পলিঙ্গার এতটুকু শিহরণ নেই। সেঙাইর বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি পাহাড়ী যুবতী প্রথমে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তারপর মেহেলীর হৃৎপিণ্ড ভাসিয়ে ফেনায় ফেনায় রক্তের উচ্ছ্বাস আছড়িয়ে পড়েছিল। মেহেলীর সারা দেহে প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোন কামনা ছড়িয়ে নেই এই মুহূর্তে।

মেহেলী চিৎকার করে উঠলো: "এখন কী করি বল্ তো পলিঙ্গা! সেঙাইকে না পেলে শরীরের জ্বলুনি কমবে না আর। কত আশা করেছিলুম। যাতে সেঙাই না ভাগাতে পারে, তার জন্য ডাইনী নাক-পোলিবার কাছ থেকে চাবটে বর্শা আর দু খুদি ধান দিয়ে ওষুধ নিয়ে এলাম। সব ঐ সাল্লুনারু মাগী নষ্ট করে দিল।"

মেহেলীর আরো কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো পলিঙ্গা। তারপর প্রথামত মেহেলীর নগ্ন বুকের ওপর হাতখানা রেখে সে বললো: "কী আর করবি? মোরাঙের একজন জোয়ানকে ধরে লগোয়া পনু (প্রেমিক) বানিয়ে নে। সেঙাই যখন নেই, তখন আর কী করবি মেহেলী?"

"না, না। সেঙাইর মত একটা জোয়ান আছে আমাদের বস্তীতে? সব এক একটা পাহাড়ী টেফঙ্। টেমে নটুঙ্।" দপ্ দপ্ জ্বলে উঠলো মেহেলী।

কিছু সময়ের বিরতি। জা কুলি মাসের সুজুঙ্ পক্ষ সমস্ত আকাশের দিকে দিকে নিশ্ছিদ্র কালো একখানা পর্দা ছড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্য থেকে বিবর্ণ নক্ষত্রের সভা উঁকি দিয়েছে।

এক সময় মেহেলী বললো: "একবার আমার ঘরে গিয়ে দেখবো, পলিঙ্গা? কাল অত উঁচু থেকে খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সেঙাই। কিন্তু মরেনি। আজও তো না মরতে পারে!"

"চল্, চল্—"

দ্রুত পদসঞ্চারে খাসেম গাছটার নীচে চলে এলো মেহেলী আর পলিঙ্গা।

মেহেলী বললো: "তুই নীচে দাঁড়া পলিঙ্গা। আমি দেখে আসি।"

বাঁশের সিঁড়িটা রীতিমত মজবুত। আতামারী লতার কঠিন বাঁধন আগুনের শিখাকে প্রতিঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। তর তর করে একটা বনবিড়ালের মত ওপরে উঠে এলো মেহেলী।

আতামারী পাতার চাল পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাঁশের পাটাতনের ওপর স্তূপাকার হয়ে রয়েছে ঘরপোড়া ছাই। এখন ধূসর ভস্মরাশির নীচে রক্তাক্ত আগুনের বিন্দুগুলি স্তিমিত হয়ে এসেছে। দু' হাত দিয়ে রাশি রাশি ছাই আর অঙ্গার সরিয়ে দেহটা আবিষ্কার করলো মেহেলী। জ্বলন্ত অঙ্গারবিন্দুর আলোতে সে দেহ বীভৎস দেখাচ্ছে। সারা দেহ পুড়ে পুড়ে নারকীয় ক্ষতকগুলি ক্ষতচিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে।

দু' হাত দিয়ে হাতিয়ে হাতিয়ে দগ্ধ দেহটির বুকে আচমকা ঝলসানো স্পন্দনের আভাস পেলো মেহেলী। সঙ্গে সঙ্গে একটা চমক খেলে গেল মেরুদণ্ডটার মধ্য দিয়ে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সমস্বরে যেন

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো মেহেলীর। এ তো সেঙাই নয়।
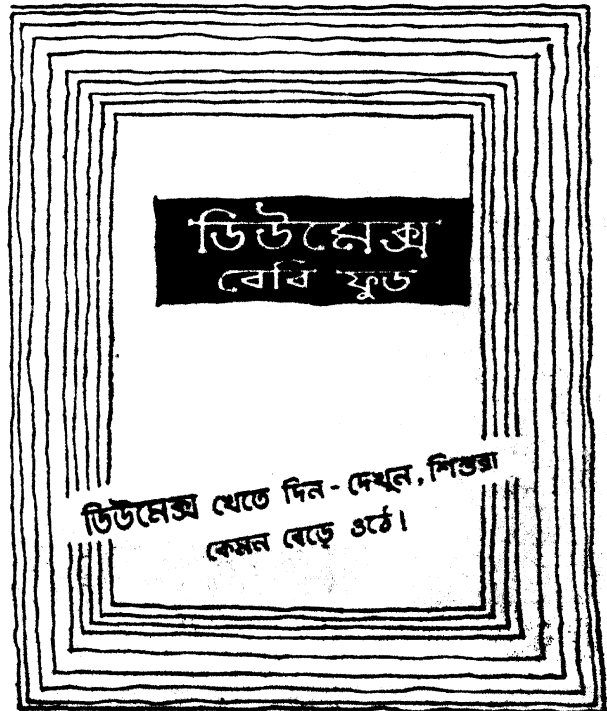
খাসেম গাছের শাখায় বাঁশের পাটাতনের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলো মেহেলী· "এই পলিঙা, ওপরে উঠে আয়। সেঙাই তো নেই, একটা মাগী পুড়ে মরে রয়েছে। অন্ধকারে বুঝতে পারছি না ঠিক।"

এবার দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে এলো পলিঙা। মেহেলীর পাশে নিবিড় হয়ে বসলো সে; চোখমুখ থেকে তার বিস্ময় ঠিকরে বেরুচ্ছে; "কী ব্যাপার মেহেলী? সেঙাই মরেনি! বলিস্ কী?"

"হু, হু, এই দেখ।"

অঙ্গারের রক্তাভ আলোতে মেহেলী আর পলিঙা অনেকক্ষণ ঝলসানো নারীদেহটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এক সময় পলিঙা বললো; "এ নির্ঘাৎ লিজোমু। এই দেখ মেহেলী, বাঁ হাতের দুটো আঙুল নেই।"

"হু, হু। ঠিক-ঠিক।"

"কিন্তু লিজোমু এখানে এসেছিল কেন?"

"কী জানি!"

জা কুলি মাসের রাত্রিতে দু'টি পাহাড়ী যুবতী মুখোমুখি বসে রইল। দু'জনে একেবারেই নির্বাক হয়ে গিয়েছে। একেবারেই নিরুত্তর।

চার পাশে দহনশেষ ঘরের ভস্মশয্যা। মেহেলী কী পলিঙার অস্ফুট পাহাড়ী মন সমস্ত বিচার দিয়ে, সমস্ত বোধ দিয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের বিন্দুতে উপস্থিত হতে পারছে না। কেন? কেন খাসেম গাছের মগডালে এসে একটু একটু করে ঝল্সে ঝল্সে মরলো লিজোমু? মেহেলী কী পলিঙা জানে না কেমন করে সেঙাই নামে একটা নিষিদ্ধ কামনার দিকে খাদিমা পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিল লিজোমু। কিন্তু সে কামনা অধরাই রইলো, শুধু সেই কামনা রাশি রাশি দাবাগ্নি হয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারলো লিজোমুকে।

পলিঙা বললো, "সেঙাই নেই তো এখানে?"

"না, আমি সব ওলট-পালট করে দেখেছি।"

"সে তবে গেল কোথায়?" এক মুহূর্ত ভাবনার অতল তলায় তলিয়ে গেল পলিঙা, তারপর বললো; "সেঙাই নিশ্চয় ভেগেছে। এক কাজ করি আয়, লিজোমুকে আমরা খাদে ফেলে দি। নইলে সদ্দার কাল সকালে খোঁজ নিলে লিজোমুকে পেয়ে যাবে। তারপর সেঙাই আর তোর ওপর ক্ষেপে উঠবে। সদ্দারকে তো জানিস!"

"ঠিক বলেছিস্।"

এক সময় দগ্ধতনু লিজোমুকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে নীচে নেমে এলো মেহেলী আর পলিঙা। তারপর কয়েকটা টিলা ডিঙিয়ে খাড়াই খাদটার কাছে এসে দাঁড়ালো। একটিমাত্র মুহূর্ত। লিজোমুর ঝলসানো দেহটা শূন্যে পাক খেয়ে অতল খাদের গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একটি বন্য পাহাড়ী কামনা জা কুলি রাত্রির অন্ধকারে চিরকালের জন্য মুছে গেল।

পোকরি কেসুঙের কাছে চলে এসেছে পলিঙা আর মেহেলী।

মেহেলী বললো; "লিজোমুর কথা কারো কাছে বলিস না পলিঙা।"

"না, না তেমন আপোটিজ (বন্ধু) আমি না। যা, এবার ঘরে যা। আমি যাই।" সামনের একটা বিশাল টিলার দিকে উঠে গেল পলিঙা।

আর ভীরু ভীরু পা ফেলে পোকরির কেসুঙের সীমানার মধ্যে এসে পড়লো মেহেলী। এখান থেকে পরিষ্কার নজরে আসছে। আয়েহাকাঙে পেন্যু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে মুখোমুখি বসেছে তার আপুফু (বাবা), আর তাদের গ্রামের সর্দার। সামনে রোহি মধুর পূর্ণ পানপাত্র। কাঠের বাসনে খানিকটা ঝলসানো মাংস। সর্দার আর তার বাবার বসবার ভঙ্গিটি বড় ঘনিষ্ঠ, বড় অন্তরঙ্গ।

সেণ্টসুঙ বাঁশের যুপকাষ্ঠটা পেছনে রেখে সাঁ করে বাঁশের দেওয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো মেহেলী। দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে কান আর দু'টি চোখের পিঙ্গল মণিতে কেন্দ্রিত করে উৎকর্ণ হয়ে রইলো সে।

সর্দার বললো: "তোর একটা টেবোয়া দিতে হবে সাঞ্চামখাবা।"

মেহেলীর বাপের নাম সাঞ্চামখাবা। তারিয়ে তারিয়ে সে রোহি মধুর পাত্রটাকে নিঃশেষ করে আনছিল। এবার সে মুখ তুললো; "কেন? টেবোয়া দিতে হবে কেন?"

"আজ শত্রু পুড়িয়ে মেরেছি। হুই কেলুরির বস্তীর সেঙাইকে আজ শেষ করেছি। মোরাঙে একটা ভোজ হবে না?" বুড়ো সর্দার আরো নিবিড় হয়ে বসলো।

"হু, হু, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সেঙাইটা কে?"

"হুই কেলুরি বস্তীর ছেলে। তোর পিসী নিভিংসুকে ছিনিয়ে নিতে এসে যে মরেছিল, সেই জেঙ্কোঙের নাতি।" কানের নীয়েঙ্ গয়না দুলিয়ে দুলিয়ে বললো বুড়ো সর্দার।

লাফিয়ে উঠলো সাঙ্গামখাবা; "বেশ করেছিস সর্দার। পুড়িয়ে পুড়িয়ে মেরে ঠিক করেছিস। একটা কেন? দুটো টেবোয়া দেবো আমি।"

"হু, হু। জানিস ঐ সেঙাই ছোকরা তোর মেয়ের পিরীতের জোয়ান ছিল। রাত্তিরে এক সঙ্গে শোয়ার জন্যে হুই খাসেম গাছের ঘরে তাকে পুষে রেখেছিল তোর মেয়ে। খবর পেয়ে একেবারে জ্যান্ত পুড়ে এলুম। হোঃ-হোঃ-হোঃ—" আস্বেহাকাণ্ড কাঁপিয়ে বুড়ো সর্দারের অট্টহাসি বেজে উঠলো।

"আমার মেয়ে? কে? মেহেলী ঐ শত্রুপক্ষের ছোকরার সঙ্গে পিরীত জমায়? পিরীত পাকায়? একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো না?" রোহি মধুর নেশাতে দু' চোখে দাবাগ্নি হয়ে জ্বলে উঠলো সাঙ্গাম-খাবার; "মেহেলীকে দেখেছিস সর্দার?"

সাঙ্গামখাবার গর্জনে বেড়ার ওপাশের দুটি কান চমকে উঠলো। শিরায় শিরায় যেন হিমবাহ বইতে শুরু করেছে মেহেলীর।

বাঁশের পানপাত্রটা এক পাশে ছুঁড়ে হুংকার দিল সাঙ্গামখাবা; "মেজাজটা ভালো নেই, চারটে বর্শা আর দু' খুদি ধান খোয়া গেছে। ভেবেছিলাম অঙ্গামীদের কাছ থেকে আহোত্ৰেপ (হার) খাবেনুজে (এক ধরনের দা) আর এ্যাকেখা (তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র) বদল করে আনবো! তার ওপর ঐ শয়তানী ইজাহান্টসা সাংলো!"

বুড়ো সর্দার লাল লাল এবড়ো খেবড়ো দাঁত-গুলো মেলে হাসলো; "ওগুলো ঐ মেহেলীই নিয়েছে। সেঙাইকে বশ করার জন্যে ঐ বর্শা আর ধান বদল করে ডাইনী নাকপোলিবার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছে।"

"ডাইনী নাকপোলিবা! কে বললো তোকে?" উঁচু স্বরগ্রাম এবার ফিস ফিসে নেমে এলো সাঙ্গামখাবার।

"সালুনারু বলেছে। সে সব দেখেছে, সে-ই তো সেঙাইকে ধরে দিয়েছে।"

"সালুনারু! ও, কেলুরি বস্তী থেকে যাকে খেদিয়ে দিয়েছে?"

"হু-হু।"

বাঁশের দেওয়ালের ওপাশে একটি মসৃণ নারীদেহে এই জা কুলি মাসের হিমাক্ত রাত্রিতে দরধারায় ঘাম ঝরছে। হৃৎপিণ্ডটা থেমে থেমে আসছে মেহেলীর। বাপ আর সর্দারের কথাগুলো সাপের ফণার মত ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কানের উপর।

এক সময় বুড়ো সর্দার বললো; "এবার মেহেলীকে বিয়ে দিয়ে দে।"

"হু-হু, তাই করতে হবে। নাক্সকোয়া বস্তীর মোজিচিজুঙের বাবা টেনেন্যু মিঙ্গেলু (কন্যাপণ) পাঠাবে বলেছে।"

"মোজিচিজুঙ্! সে তো টোঁম খাম-কোয়ান্যু (বাঘমানুষ)। তার সঙ্গে বিয়ে দিবি?"

"হু-হু। টেনিন্যু মিঙ্গেলু (কন্যাপণ) অনেক দেবে। শত্রুদের একটা জোয়ানকে তো মেরেছিস্। আরো কত জোয়ান আছে কেলুরি বস্তীর। যুবতী বয়েস; তাগড়া ছোকরা দেখলে কী আর শত্রু বলে বাছ মানবে! ঠিক পিরীত পাকিয়ে বসবে।" আশ্চর্য রহস্যময় গলায় বলে উঠলো সাঙ্গামখাবা; "যে বয়সের যে ধরম। তার আগেই বিয়ে দেবো। টোঁম খামকোয়ান্যুই (বাঘমানুষ) সই।"

টোঁম খামকোয়ান্যু! বাঁশের দেওয়ালের ওপাশে কানদুটো আবার চমকে উঠলো।

"হু, হু, ঠিক বলেছিস। আমার মেয়ে ঐ লিজোমুটাকেও বিয়ে দিতে হবে এবার। খোনকেটা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গেই দিতুম। কী আর করা! আনিজাতে টানলো।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো সর্দার; "যাক্, অনেকক্ষণ এসেছি। এবার একটা টেবোয়া দিয়ে দে। মোরাঙের ছোকরারা গিলবার জন্যে বসে রয়েছে।"

"হু, হু, দিচ্ছি। বাইরে চল্।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সাঙ্গামখাবা; "ঐ কেলুরি বস্তীর শয়তান সেঙাই খোনকেকে মারলো। যাক্, তাকে পুড়িয়ে মেরেছিস। দুটো টেবোয়া দেবো আমি। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তোর মেয়েটার সঙ্গে জুড়ে দিতাম।" দেওয়ালের সঙ্গে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে রইলো মেহেলী।

দুজনে বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে এলো। আর দেহটাকে সুক্ষ্মতম করে বাঁশের দেওয়ালের সঙ্গে যেন নিশ্চিহ্ন করে রাখলো মেহেলী।

বুড়ো সর্দার বললো; "তুই মোরাঙে যাবি না?"

"হু, হু যাবো। দুটো টেবোয়া দেবো। আর মাংস খেতে যাবো না।" সেপ্টসুঙ বলির যূপকাষ্ঠের পাশে এসে একবার দাঁড়ালো সাঙ্চামথাবা। তারপর বললো, "পথে মেহেলীকে পেলে একবার পাঠিয়ে দিস তো সর্দার। টেমেঙের মত ছাল তুলে নেবো আজ। আমার চারটে বর্শা, দু-খুদি ধান দিয়ে শত্রুদের জোয়ানকে বশ করার ওষুধ কিনেছে শয়তানী। ইজাহান্টসা সালো!"

"হু, হু। পাঠিয়ে দেবো।"

"চল্, ঐ পেছন দিকে টেবোয়াগুলো রয়েছে।" পোকরি কেসুঙের পেছন দিকে সাঙ্চামথাবা আর বুড়ো সর্দার অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বাঁশের দেওয়ালটার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্তব্য স্থির করে ফেললো মেহেলী। বাবার সামনে গিয়ে ঐ আয়ে-হাকাঙে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না সে। নির্ঘাৎ বর্শা দিয়ে তাকে ফুঁড়ে ফেলবে সাঙ্চামথাবা। জা কুলি মাসের এই রাত্রি-টুকুর জন্য সে পলিঙার বিছানায় আশ্রয় নেবে। সে বিছানা অনেক নিরাপদ। অনেক নির্বিপদ। অনেক নির্বিঘ্ন।

টলতে টলতে বনময় চড়াইটার দিকে উঠতে উঠতে একবার পেছন ফিরলো সেঙাই। অনেক, অনেকদূরে টিজু নদীর ওপারে সালুয়ালাঙ গ্রামখানা এখন জা কুলি রাত্রির অতল তলায় তলিয়ে গিয়েছে।

কপালের দুপাশে রগ দুটো দপ্ দপ্ করে লাফিয়ে চলেছে। খাদের মধ্যে আছড়ে পড়ে সমস্ত শরীরটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সারা দেহে রক্তের স্তবক শুকিয়ে শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে। অনেকটা রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। অবসাদে আর অপরিসীম শ্রান্তিতে পেশীগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসছে সেঙাইর। হৃৎপিণ্ডটাকে উথল-পাথল করে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়তে লাগলো। ঘন ঘন। বার বার।

চেতনাটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। একবার হিমাক্ত পাথরের ওপর বসে পড়লো সেঙাই। তার অস্বচ্ছ ভাবনার আর্শিতে কতকগুলো ঘটনার জটলা হলো। এই দুটো দিন কেমন যেন অসত্য মনে হয়, কেমন যেন অবাস্তব। খোনকে খাদের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে-যাওয়া, মেহেলী, খাসেম গাছের মগডালে আতামারী পাতার ঘর, লিজোমু। এদের মধ্যে যেন কোন সঙ্গতি নেই, মিল নেই। সব যেন বিচ্ছিন্ন, সব গ্রন্থিহীন, সব শিথিলবন্ধ। অন্তত পাহাড়ী মানুষ সেঙাই তার অস্পষ্ট চেতনার মধ্যে এখন তাদের কোন ধারাবাহিক আর সঙ্গত ছবি ধরতে পারছে না।

শুধু মনে পড়ছে লিজোমুকে। উঃ, আতঙ্কে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন শিউরে ওঠে এখনও। শরীরের সমস্ত শক্তি দুটি কব্জীর মধ্যে সংহত করে সে মেরিকেতু-সুটা ছুঁড়ে মেরেছিল লিজোমুর দিকে। বাঁশের পাটাতনের ওপর আর্তনাদ করে আছড়ে পড়েছিল লিজোমু। তারপর বাঁশের পানপাত্র দিয়ে লিজোমুর অচেতন দেহটাকে আঘাতের পর আঘাতে অসাড় করে দিয়েছিল সে। সর্দারকে তার খবর দেবার সব আশঙ্কাই নির্মূল করে দিয়েছিল সেঙাই।

তারপর আর কিছু সময় অপেক্ষা করেছিল সে। যেই মাত্র উত্তর পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যার ধূসর ছায়াপাত শুরু হলো, ঠিক তখনই বাঁশের সিঁড়িটা বেয়ে তীরের মত নীচে নেমে এসেছিল সে। তারও পর ঘন বনের আড়ালে আড়ালে, চড়াই-উৎরাই উজিয়ে, উপত্যকা ডিঙিয়ে, টিজু নদীর গর্জিত নীলধারা পেরিয়ে এইমাত্র এপারে চলে এসেছে সে। আর একবারও সালুয়া-লাঙ গ্রামখানার দিকে তাকায় নি সেঙাই।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনা। তবু যেন মনে হয়, একটা জন্মান্তর ঘটে গিয়েছে। পাথরের টিলায় বসে ফুসফুস ভরে বার-কয়েক নিশ্বাস টেনে নিল সেঙাই। তারপর পাশের একটা মেশিহেঙ ঝোপ ধরে উঠে দাঁড়ালো।

আচমকা সেঙাইর নজরে পড়লো, অনেক, অনেক দূরে সালুয়ালাঙ গ্রামের আকাশ চিরে চিরে আগুনের রেখা উঠছে। সে আগুন জা কুলি মাসের হিমময় অন্ধকারে হিংস্র রক্তলেখার মত ফুটে বেরিয়েছে। সেঙাই জানতেও পারলো না, ঐ আগুন খাসেম গাছের মগডালে সেই আতামারী পাতার ঘরখানাকে গ্রাস করছে। সেই ঘর যে ঘরে একটু আগেও সে বন্দী হয়েছিল। সে জানতেও পারলো না সেঙাই নামে এক বন্য পুরুষ-কামনায় খারিমা পতঙ্গের মত যে নারীদেহটি ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিল, সে এখন ঐ আকাশ-ছোঁয়া দাবাগ্নিতে ঝলসে ঝলসে মরছে।

টিলাটার ওপর থেকে উঠে পড়েছিল সেঙাই। এবার টলতে টলতে উপত্যকার দিকে নামতে লাগলো সে। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে এখনও। তারপরে পাওয়া যাবে তাদের ছোট্ট জনপদ কেলুরির সীমানা।

(ক্রমশ)

ধারা থেকে মাণ্ডু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

দু'পাশে ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ, বন্যতায় আবৃত হয়ে গেছে সব, ভেতরে যাওয়া মুশকিল। আশপাশে নামধাম লিখিত নির্দেশনামা রয়েছে। কোথাও না থেমে এগিয়ে চলেছি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দপ্তরের ঠিকানায়। পথ এসে পৌঁছেছে কালকের সেই প্রথম চেনা গ্রামের মাঝে। সেখানে রাস্তার ধারে, কাঁচা দোতলা বাড়িতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যালয়। দপ্তরখানায় একজন কর্মরত মারাঠী ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। তাঁকে জানালাম, মাণ্ডু দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ শর্মার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্যে আমি এখানে এসেছি। পাশের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন তিনি। একটু পরে উপরে যাবার আহ্বান এল। প্রশস্ত ঘর, একপাশে ফরাস পাতা, তার উপরে লেখার চৌকি ও কয়েকটি তাকিয়া। সামনে রয়েছে কিছু জীর্ণ চেয়ার ও বেঞ্চ। দেওয়ালের গায়ে বই ও কাগজপত্র ঠাসা কয়েকটি আলমারী, আর তার ফাঁকে ফাঁকে বোম্বাই ঢঙে, জল ও পোস্টার রঙে আঁকা মাণ্ডুর নিসর্গ-চিত্র এবং মাণ্ডু দর্শনরত বিখ্যাত রাজনীতিকদের ফটোগ্রাফ। মারাঠী ভদ্রলোক নিচে নেমে গেলেন, আমিও সেই সুযোগে আলমারীর বইগুলিতে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম। হ্যাভেল, ফার্গুসন, গ্রিফিথ, ব্রাউন, ইয়াজদানীর বেশ কিছু খ্যাতনামা এবং দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় বই রয়েছে সেখানে। গুরুকণ্ঠের বিশুদ্ধ হিন্দীতে আকৃষ্ট হয়ে পেছনে ফিরলাম। দেখি, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক সাদাসিদা পোশাকে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলছেন,—"বসুন, কি দিয়ে খাতির করি আপনাকে।" প্রত্যভিবাদন করে ইংরাজীতে বললাম,—"সম্ভবত, আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা বলছি? আমি একজন বাঙ্গালী, কিন্তু ভুল হিন্দী না বলে অশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলছি, দেশীয় ভাষায় অজ্ঞতা ক্ষমা না পেলেও বিদেশী ভাষার অজ্ঞানতা ক্ষমাযোগ্য সেই ভরসায়। ইংরাজীতে উত্তর দিলেন—"কি সৌভাগ্য আমার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশবাসী আপনি, আপনার যোগ্য খাতির যে আমার চিন্তাতীত।" নিজের ক্ষুদ্রতা আমাকে বিচলিত করল—মহৎ এ দুই বঙ্গসন্তানের এ কি দীন প্রতিনিধি আমি। বিনীত হয়ে জানালাম, "এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না, ঘটনাচক্রে আমি ও'দের স্বদেশীয়, নিতান্তই স্বল্পজ্ঞানী চিত্রকর আমি, কোন যোগ্যতাই আমার নেই ও'দের প্রতিনিধিত্ব করবার। আপনার মনের রত্নসাগর থেকে দু' একটি উপদেশ যদি আমাকে দান করেন ত' চিরকৃতজ্ঞ থাকব।" আমার বিনয়কে ভূমিসাৎ করে ভদ্রশ্রেষ্ঠ উত্তর দিলেন—"আপনার বিনয়ই আপনার যোগ্যতার প্রমাণ, শুধু বাঙ্গালী বলেই নয়, একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবেও আপনি আমার বিশেষ সম্মানীয় অতিথি। উপদেশের যোগ্যতা আমার কোথায়, তার চেয়ে আসুন, এখানে আপনার প্রবাসের দিনগুলিতে আলোচনা করে পরস্পরের অজ্ঞতা দূর করি।"

কৃতার্থ হয়ে বসলাম, ইতিমধ্যে এক ছোকরা প্রকাণ্ড এক বাটি গরম দুধ এনে হাজির করেছে। পণ্ডিতজী বললেন, "চা এখানে দুষ্প্রাপ্য, অতএব দুধেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে।" দ্বিরুক্তি না করে প্রায় সেরখানেক দুধ একচুমুকেই মেরে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, সকালবেলা রোজ পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করতে এলে প্রাতরাশের পয়সাটি বাঁচান যাবে দেখছি। তারপর উনি মাণ্ডুর নানা স্থানের কিছু ফটো আর কিছু আঁকা ছবি বার করে দেখাতে লাগলেন। ছবিগুলির কয়েকটি বোম্বাই-এর চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজ, আর কিছু উজ্জয়িনী এবং ধারার চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের। তবে সেগুলির রঙ-ঢঙও বোম্বাই-এর সমগোত্রীয়। দেখে মনে হল, ঐসব চিত্রবিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ শিক্ষকই বোম্বাই চিত্রবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। যদিও মধ্যভারতের শহরে ও গ্রামে মধ্যযুগের রাজপুত ও মোঘল কলমে আঁকা চিত্র ও চিত্রকর এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তাছাড়া, স্থানীয় রাজকীয় ও সরকারী সংগ্রহশালায় রাজপুত, মোঘল এবং এখানকার লোকশিল্পের সংগ্রহ যথেষ্ট আছে;– তবু, কিভাবে বোম্বাইসুলভ পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক শিল্পকর্ম স্থানীয় শিক্ষিত শিল্পীদের এত প্রভাবান্বিত করল ভেবে পেলাম না। পণ্ডিতজীর কাছে জানলাম, বোম্বাই ও আশপাশের শহর থেকে যথেষ্ট দর্শক প্রতিবছরই এখানে আসেন। কিন্তু স্থানীয় স্থাপত্য বা আশপাশের চিত্ররীতি তাদের বিশেষ কিছু প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হ'ল না; বরং বিপরীতই দেখলাম। রৌদ্রস্নাত চড়া রঙ এবং কড়া আলোছায়ার স্পন্দের বদলে, বিদেশী সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন মার্কা ঘোলাটে, ধোঁয়াটে অথবা আন্দাজি রঙে আঁকা নিসর্গ-চিত্র মনে বিরূপ ভাবের উদ্রেক করে।

ক্রমে পণ্ডিতজী স্থানীয় ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করলেন। সম্প্রতি তিনি যথেষ্ট হিন্দু, জৈন ও কিছু বৌদ্ধ মূর্তি স্থানীয় মসজিদ-মহলের ব্যবহৃত পাথর থেকে বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন। জাহাজ-মহলের কাছে, দুর্গ-প্রাচীরের নীচে, পর্বতের গায় একটি অসমাপ্ত গুহাশ্রেণীও আবিষ্কৃত হয়েছে। তা' ছাড়াও, ধারারাজ মুঞ্জের নামানুসারে মুঞ্জতালাওধর নামের সাদৃশ্য, এসব প্রমাণ সহযোগে মাণ্ডুদুর্গের নির্মাণকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। নির্ভুলভাবে বলতে না পারলেও এসব মূর্তি ও অলঙ্করণের রীতি-অনুসরণে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মুঞ্জ-প্রতিহার রাজাদের সমকালে মাণ্ডুদুর্গের প্রারম্ভ অনুমান করেন। দ্বিপ্রহর আগত দেখে ফেরার প্রস্তাব করলাম। পণ্ডিতজী

অনুরোধ করলেন, মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর যেন রেস্ট-হাউসে অপেক্ষা করি বিকালে ও'র টাঙ্গায় একসাথে ঘুরতে বেরোনো যাবে।

বিকালে, মধ্যযুগ-সুলভ ঔদ্ধত্যের প্রতীক সুসজ্জিত সবল অশ্বচালিত ছোট টাঙ্গা চালিয়ে শর্মাজী এলেন। এক সঙ্গে চা-পান সমাপ্ত করে বেরিয়ে পড়লাম মান্ডু দেখতে। প্রথমে এলাম মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান দিলওয়ার-খাঁ-ঘোরীর পুত্র আলফ্-খাঁ, যাঁর সুলতানী নাম হোসঙ্গ-শা-ঘোরীর (১৪০৫—৩২ খৃঃ অঃ) মাজার বা স্মৃতিসৌধে। মালবের সুধী ও শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সুলতান হোসঙ্গাই তাঁর রাজধানী ধারা থেকে মান্ডুতে পরিবর্তন করেন

হোসঙ্গ-শা-ঘোরীর স্মৃতিসৌধ

এবং সেখানে ইসলামী শিল্প-স্থাপত্য ও শাস্ত্রালোচনার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন যে, সমসাময়িককালে ইসলাম সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল মান্ডু। শ্বেত মর্মরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ, কাল তার বর্ণশুচিতা হরণ করেছে। গম্বুজশোভিত চতুষ্কোণ তোরণদ্বার পেরিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলাম। পশ্চিমপাশে লম্বা বারান্দা ও মধ্যে উঁচু চাতালের উপর চতুষ্কোণ স্মৃতিসৌধ, ঊর্ধ্বে বৃহৎ প্রাথমিক মুসলমানী গম্বুজ, তার চারকোণে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের আরও চারটি। নিরাভরণ চাতালের চারপাশে হিন্দু স্থাপত্যরীতির অলঙ্কৃত বন্ধনীর দ্বারা রূপায়িত। সেখান থেকে উঠেছে সাড়ে-একত্রিশ ফুট উঁচু দেওয়াল তার উপরে হস্তীদন্তরূপী ব্র্যাকেট এবং কার্নিশ। তারপর অলঙ্কৃত খিলান-শ্রেণী ও বন্ধনীসমষ্টি এবং সবার উপরে গম্বুজ। সৌধের প্রধান প্রবেশ দরওয়াজাকে ঘিরে আছে অর্ধ-উন্মিলিত পদ্মশোভিত দড়ির মত বন্ধনী, তার দুপাশে জাফরি-কাটা মর্মর-জালি এবং এদিকে ওদিকে মোজেকের কাজ করা নীল তারা। চারপাশের মর্মর-জালি সৌধের অভ্যন্তরে মৃদু আলোকসম্পাত করে সৃজনধর্মী দিগ্বিজয়ী সুলতান হোসঙ্গ-এর অনন্ত ঘুম প্রশান্ত করেছে। অন্দরমহলের নক্সা নীচে চতুষ্কোণ, তারপর অষ্টকোণ, শেষে ষোড়শকোণ। গুরুভার বৃহৎ গম্বুজের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে এই গঠনপ্রণালী। সুলতানের কবর শুভ্র মর্মরখচিত, তাতে স্বল্প হিন্দু ও মুসলমানী অলঙ্করণ, আভরণহীন এ শুচিতা স্থানযোগ্য গাম্ভীর্য রক্ষায় সহায়ক হয়েছে।

পূর্বভূখণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ স্মৃতিসৌধ যে পরবর্তী যুগেও স্থপতি ও শিল্পীদের অভিভূত করেছিল তার প্রমাণ এখানে দক্ষিণ-দ্বারের পাশে মর্মরফলকে ফারসী ভাষায় লিখিত রয়েছে—

"ব তারীখ নাহিম সন্ হজার ও
হফতাদ হিজরী
ফকীর হাফীজ লুৎফুল্লাহ
মাহিন্দিস্ ইবন্
উস্তাদ এহমদ মেমার শাহজাঁহা
নী ব খাজা মাদুরায়,
ব উস্তাদ শিবরাম, ব উস্তাদ
হামিদ, ব জেহত জিয়ারৎ
আমদাবুদ দো কলেমা
য়াদগার ন বিশ্ত।"

অর্থাৎ, ১০১৭ হিজরীতে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ) ফকির হাফীজ লুৎফুল্লাহ মাহিন্দিসের পুত্র ওস্তাদ এহমদ মেমার শাহজাহা, খাজা মাদুরায়, ওস্তাদ শিবরাম এবং ওস্তাদ হামিদ এ পবিত্র সৌধ দর্শনাভিলাষে এখানে এসেছিলেন এবং রচনা করে গেছেন তারই স্মারক এ শিলালিপি। সম্রাট শাহজাহান দরবারের চারজন যোগ্য স্থপতি ও শিল্পী এ'রা। বিশেষ করে, তাজ-স্রষ্টার ঘরওয়ানা অধিকারী লুৎফুল্লাহ পুত্র এহমদ। কারণ, হাফীজ লুৎফুল্লাহ মাহিনদিস্ তাঁর রচিত দেওয়ান-ই-মাহিনদিস্-এ লিখেছেন, তাঁর পিতা শিল্পীশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ আহমেদ-লাহোরী নমাদির-উল-আশার মমতাজমহল স্মৃতিসৌধ, দিল্লীদুর্গ ইত্যাদির দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; এবং ওস্তাদ হামিদও আগ্রার তাজমহলের অন্যতম কৃতী শিল্পী। এখানে এ'দের আগমন হয়েছিল পূর্বসূরীকে শ্রদ্ধা জানাতে। স্মৃতিসৌধ থেকে পশ্চিমের বারান্দায় এলাম। সারি সারি হিন্দু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তম্ভশোভিত লম্বাকৃতি বারান্দা এবং পাশের লম্বা কক্ষ। কক্ষের স্থাপত্য ইসলামী রীতির, উপরে অর্ধগোলাকার গম্বুজধর্মী ছাদবিশিষ্ট। এইখানে সংগৃহীত রয়েছে বিভিন্ন রীতির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষত্বপূর্ণ সামগ্রী, যেমন মুঞ্জতালাও-এর উত্তর পশ্চিম তীরে দিলওয়ারা মসজিদ ও নাহারঝারোয়া বারান্দা এবং সাগরতালাও-এর তীরবর্তী সুলতান মহম্মদ খিলজীর পিতা মালিক মাঘৎ নির্মিত মসজিদ (১৪৩২ খৃঃ অঃ) ইত্যাদি জায়গা থেকে জোগাড় করা হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ মূর্তি ও ভাস্কর্য এবং মুসলমানী মোজেক, রঙীন টালি ইত্যাদি। এই-ই স্থানীয় সংগ্রহশালা।

সাড়ে পাঁচশ বছরের প্রাচীন এ স্মৃতিসৌধ আজও সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। যে বিশেষ মালমশলা ও কারিগরীর সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কাছ থেকে। সরকার মহাশয় যখন আওরঙ্গাবাদে রাওজা রাবিয়া-উদ-দুরানী বা আলমগীর-মহিষীর স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে গল্প শুনেছিলেন—দাক্ষিণাত্যের এ তাজ সৃষ্টির প্রয়োজনে দিল্লী, আগ্রা থেকে মূল তাজ শিল্পীগোষ্ঠীর বংশধরদের আমন্ত্রণ করা হয়। শিল্পীরা মোটা পারিশ্রমিক অগ্রিম নিয়ে সাজ-সরঞ্জাম, মশলাপাতি সংগ্রহ করে আওরঙ্গাবাদে পৌঁছে কাজ শুরু করলেন। কিছুদিন নিয়মিত কাজ চলার পর হঠাৎ একদিন সজাগ আওরঙ্গাবাদের নাগরিকেরা আবিষ্কার করলেন, কর্মরত সব শিল্পী-স্থপতিরা বমাল উধাও হয়েছেন। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল, কিন্তু এদিকে সৌধের কাজ স্থাগিত। বছরের পর বছর কাটে, তাঁদের আর খোঁজ নেই। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল, তারপর যেমন হঠাৎ একদিন শিল্পীরা উধাও হয়েছিলেন তেমনই হঠাৎ একদিন তাঁদের আবির্ভাব ঘটল।

সকালে দেখা গেল, কর্মক্ষেত্র আবার কর্ম-চঞ্চল, শিল্পীরা খুব মনোযোগ সহযোগে যে যাঁর কাজ করছেন। বাদশাহের স্থানীয় প্রতিনিধি হুকুম দিলেন, তাঁদের জবাবদিহি হাজির করতে। নির্বিকার শিল্পীগোষ্ঠী জানালেন, তাঁরা যখন চোর বা জুয়াচোর হিসাবে বাদশাহী কর্মে নিযুক্ত হননি তখন এ সন্দেহ অবান্তর, শিল্পী বা স্থপতি হিসেবে যোগ্য দায়িত্ব বুঝেই তাঁরা কর্ম গ্রহণ করেছেন, স্থাপত্যগত প্রয়োজনেই এ অনুপস্থিতি। মালমশলার দৃঢ়বন্ধন কাল-জয়ী করতে হলে প্রয়োজন তাদের যোগ্য সংমিশ্রণ এবং তারপর ঐ মিশ্রিত মশলার অন্তত দশ বছর মৃত্তিকাগর্ভে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম; তবেই সম্ভব হবে আবশ্যকীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা তাকে প্রাকৃতিক ক্ষয় থেকে যুগ যুগান্ত রক্ষা করবে। তারপর শিল্পীরা মাটি সরিয়ে সেই মিশ্রিত মাল-মশলা বার করে তাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণিত করলেন এবং যথারীতি সৌধ-নির্মাণ কর্মে অগ্রসর হলেন।

হোসংগ স্মৃতিমন্দির থেকে বেরিয়ে পাশের জামা-মসজিদের দিকে এগোতে লাগলাম। মুসলমান ধর্মমন্দির, মসজিদের গঠনপ্রণালী ধর্মানুশাসনে সীমাবদ্ধ। প্রার্থনাকারীর প্রাথমিক কর্ম ওযাজু বা শুচিধৌতির প্রয়োজনে সাধারণত প্রাঙ্গণে থাকে শৌচব্যবস্থা, তারপর ভিতরে থাকে মিম্বার বা উচ্চাসন, যেখান থেকে ইমাম বা ধর্মযাজক তাঁর কুৎবা অর্থাৎ প্রার্থনাস্তোত্র বাণী দান করেন, মিম্বার সাধারণত তিন ধাপ বিশিষ্ট হয়। তবে রাজকীয় মসজিদের রাজকীয় ব্যবস্থা। পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যে থাকে মিরাব, সম্ভবত এই গঠনপ্রণালীটি সংগ্রহ করা হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির থেকে, সেখানে খৃষ্ট বা খৃষ্টভক্তদের প্রস্তর-মূর্তি বসাবার প্রয়োজনে দেওয়ালের মধ্যে যে খিলানাচ্ছন্ন বৈঠকী ব্যবস্থা থাকে তারই অনুসরণে হয়ত মসজিদে মিরাবের উপস্থিতি। মসজিদের কক্ষ হবে অবিভক্ত এবং বৃহৎ, কারণ হিন্দু বা ইসলামী সুফী-সুলভ ব্যক্তিগত প্রার্থনার বদলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনাই ইসলামের নির্দেশ। মক্কাস্থিত প্রধান মুসলমান ধর্মমন্দির ভারতের পশ্চিমে, তাই পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে থাকে মিরাব এবং কাবা নির্দেশক কেবলা। পশ্চিম দেওয়াল হবে নিরন্ধ্র, কারণ ঈশ্বর-প্রার্থনারত ভক্তমন যাতে রন্ধ্রপথদৃষ্ট কোন বস্তু বা প্রাণীর দ্বারা অন্যমনস্ক না হয়ে পড়ে। যদিও মসজিদে গম্বুজ বা মিনারিকা ধর্মগত অবশ্য প্রয়োজনীয় নয় তবুও মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার প্রয়োজনে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তাজমহলের দর্শক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাজের বাগানে, পশ্চিম এবং পূর্বদিকে, একই স্থাপত্যরীতির দুটি মসজিদ আছে।
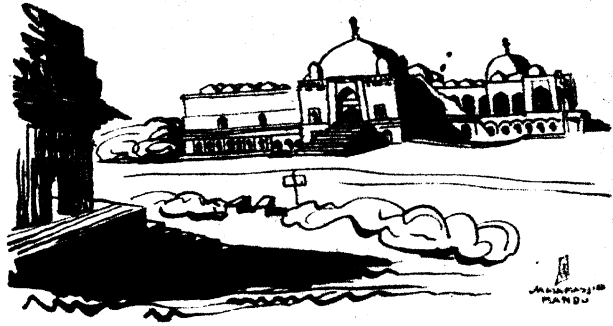
জামা ম সজিদ

পশ্চিমের মসজিদটি নিয়মিত ব্যবহার হয়, কিন্তু পূর্বদিকের মসজিদটি অব্যবহৃত, কারণ এ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে তার প্রবেশপথ, অতএব ধর্মগতভাবে অব্যবহার্য। যদিও স্থাপত্য সৌন্দর্য ও সামগ্রিক ভারসাম্যের প্রয়োজনে এর অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এটি পশ্চিমের মসজিদের জবাব।

জামা মসজিদের গঠন শুরু করেন সুলতান হোসংগশাহ্ এবং শেষ করেন (১৪৫৪ খৃঃ অঃ) মহম্মদ-শাহ-খিলজী, যিনি হোসংগ-পুত্র মহম্মদ-শাহ্-ঘোরীকে বিষপ্রয়োগে নিহত করে (১৪৩৬ খৃঃ অঃ) মাণ্ডুর সুলতানী দখল করেন। সুলতান হোসংগ সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎরূপে জামী মসজিদের পরিকল্পনা করেছিলেন। সম্ভবত মূল পরিকল্পনা দামাস্কাসের বৃহত্তম মসজিদের অনুকরণে প্রস্তুত। তিনশ ফুট বাহুবিশিষ্ট চতুর্বাহু এ মসজিদ, জমি থেকে পনের ফুট উঁচু তার ভিত্। হিন্দু-মন্দিরদ্বারের পরিকল্পনা ও কারুকার্যে অনুপ্রাণিত বিরাট তোরণ এবং সম্মুখের বারান্দা মর্মর মোজেকের সূক্ষ্ম অনুকরণে সজ্জিত, মহাকালের স্পর্শ লেগেছে সেখানে। তিরিশটি রাজকীয় সোপান অতিক্রম করে, গম্বুজশোভিত লম্বা বারান্দা পেরিয়ে বৃহৎ প্রার্থনাকক্ষে হাজির হলাম। বিশাল এ পরিবেশ দর্শকমনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে তার সংযমে, সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে। প্রার্থনাকক্ষের ভিতর থেকে মধ্যের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম, খিলানের ফাঁকে খিলান, তার ফাঁকে আরও খিলান তারপর স্তম্ভসারি। চারিদিকে অলংকারবিহীন সংযত স্থাপত্যে শ্রেণীবদ্ধ ঊর্ধ্বরেখার মধ্যে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি জানতে পারিনি। আলোছায়ার ঝিকিমিকি, কালোছায়ার রহস্য, গগনেন্দ্রনাথ-চিত্রিত রহস্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দিল। দু পাশের দেওয়ালে মর্মর-জালি, তার উপর মোজেকের কাজ করা নীল-তারা অসীমের স্পর্শ এনে দিয়েছে। পশ্চিমের রন্ধ্রহীন দেওয়াল, তাতে পর পর সতেরটি মিরাবে প্রাথমিক মুসলমান রীতির খিলান এবং তার ভিতরে নিষ্কলঙ্ক পালিশ করা কাল পাথর হিন্দু রীতিতে অলঙ্কৃত। মধ্যের মিরাব এবং কেবলা শ্রেষ্ঠতম অলঙ্করণ শোভিত, তাতে অপরূপ ছাঁদের আরবী অক্ষরে কোরাণের উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ধর্ম ও সৌন্দর্যের এ অপূর্ব সমন্বয় সার্থক শিল্পমানসের প্রতীক। মধ্যমিরাবের অনতিদূরেই ইমামের মর্মরখচিত রাজকীয় মিম্বার, ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে, পরিপূর্ণ হিন্দু ছাঁদে তার স্তম্ভ, কার্নিশ ও অলঙ্করণ। তিনটি সুউচ্চ খিলান রয়েছে তিনদিকে, তার উপর নানা ছাঁদে সুশোভিত কথনী, ছাদে ছোট সুশোভিত গম্বুজ। মিম্বার থেকে অনতিদূরে স্পর্শ-কাতর সুলতানকে সাধারণের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য এবং বেগমসাহেবাদের পর্দার

জামা মসজিদের অভ্যন্তর গঠন

প্রয়োজনে প্রশস্ত দ্বিতলে রাজকীয় আসন-ব্যবস্থা। জাহাজ-মহল ইত্যাদি রাজপ্রাসাদ থেকে সুলতান ও তাঁর অন্তঃপুরিকারা যাতে মসজিদের ঐ রাজকীয় আসনে সোজাসুজি পৌঁছতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা হয়েছে সুন্দর গম্বুজ ও অলঙ্করণ শোভিত উত্তরদিকের বিশেষ দরওয়াজার। তারপর ছাদে উঠলাম—সেখানে তিনটি বিশাল প্রাথমিক মুসলমান রীতির গম্বুজ তাকে ঘিরে রয়েছে আটান্নটি ওরই ছোট সংস্করণ। পাশের বারান্দাতেও মাথাভর্তি ছোট ছোট গম্বুজ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সদর-তোরণের মাথায়, সব মাথা ছাড়িয়ে, এক পায় দাঁড়িয়ে আর একটি বড় গম্বুজ। দূরে আশরফি-মহল বা মাদ্রাসার কংকাল এবং মহম্মদশাহ্-খিলজীর রাণা কুম্ভজয়ের(?) প্রতীক বৃহৎ সাততলা বিজয়স্তম্ভের হৃতগর্ব, কালাহত, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু প্রস্তরস্তূপের ধ্বংসাবশেষ। তারপর অনন্ত আকাশ।

ইতিহাসকে বিপথগামী করবার এ এক বিচিত্র কাহিনী। যশোসূর্য উদ্ভাসিত মেবারের প্রতি পরশ্রীকাতর সুলতান মহম্মদ শাহ খিলজী এবং গুজরাটের সুলতান ষড়যন্ত্র করলেন তাকে সংযুক্তভাবে আক্রমণ করবার। মেবারাধিপ রাণা কুম্ভ তখন শতবর্ষপূর্বের আলাউদ্দিন বিধ্বস্ত মেবারকে পুনর্গঠনে ব্যস্ত। কৃষ্ণপ্রেমবিধুরা মীরাবাঈ-এর সঙ্গীত-মূর্ছনা তখন চিতোরের অন্তর-বাহিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—গুজরাট ও মাণ্ডুর সুলতানদ্বয়ের ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হ'ল সেই মুহূর্তে (১৪৪০ খৃঃ অঃ)। জন্মভূমি রক্ষার প্রেরণায় উন্মাদ রাজপুত, রাণা কুম্ভের নেতৃত্বে এগিয়ে এল মালবের উপত্যকায়। রাণা কুম্ভের চৌদ্দ হাজার হস্তীযূথ, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিকের সামনে গুজরাট ও মাণ্ডুর সম্মিলিত বিশাল সৈন্যদল লজ্জা-জনক পরাজয় মানতে বাধ্য হ'ল। রাণা কুম্ভ রচনা করলেন তাঁর বিজয়স্তম্ভ। বীর রাজপুত পরাজিত সুলতান মামুদকে মালবের রাজমুকুটের পরিবর্তে মুক্তিদান করল। এ গ্লানিকর পরাজয়কে ভোলার জন্য এবং বিক্ষুব্ধ প্রজামণ্ডলকে ভোলাবার জন্য সুলতান মামুদ সৃজন করলেন বিজিতের এই বিজয়স্তম্ভ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবুল ফজল রাণা কুম্ভের এই বিজয়গাথার গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা রেখে গেছেন তাঁর ইতিহাসে।

তারপর এলাম গদাশাহ্ বা তিক্কুরাজের প্রাসাদে। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্ খিলজীর (১৫১০—১৫২৬ খৃঃ অঃ) রাজত্বে রাজপুতপ্রধান মেদিনীরায় যে একজন বিশিষ্ট রাজসভাসদ ছিলেন তা তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের আকার এবং সহকর্মীদের ঈর্ষাদত্ত নামকরণ গদা শাহ্ বা তিক্কুরাজ নামে তাঁর স্থানীয় পরিচিতি দ্বারা অনুমান করা যায়। মেদিনী রায়ের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা স্থানীয় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ-শাহ-খিলজীর ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। সুলতান মাণ্ডু থেকে গোপনে পলায়ন করে গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মজফ্ফর-শাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁরই সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে মেদিনীরায়কে দমন করেন। অবশ্য এতে সুফল লাভ ঘটেনি, গুজরাটের পরবর্তী সুলতান বাহাদুর-শাহের সংগে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় ১৫২৬ খৃঃ অঃ বাহাদুর শাহ্ মাণ্ডু দুর্গ আক্রমণ করে অকর্মণ্য সুলতান মহম্মদ-শাহ্-খিলজীকে বন্দী করেন। মাণ্ডু গুজরাটের পদানত হয়। হিন্দোলা-মহল জাহাজ-মহল ইত্যাদি সুলতানী সৌধের কাছে মেদিনীরায়ের প্রাসাদ এবং নবনোক্ত দলে পরিচিত গৃহগুলিতে আছে নিজস্ব দরবারকক্ষ এবং বৃহৎ খিলান ও প্রশস্ত দেওয়ালযুক্ত দ্বিতল বাসগৃহ। দোতলায় দুটি মহাল এবং মধ্যে একটি বড় ঘর তাতে সুদৃশ্য ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষ। ফোয়ারা থেকে সুন্দর জলপ্রণালী বিচিত্র ভঙ্গীতে কক্ষসীমায় পৌঁছেছে, সেখানে হস্তীমুখ, ব্যাঘ্রমুখ ইত্যাদি জলদ্বার দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে। আস্তরণ করা দেওয়ালে মেঝেকের কাছ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি সুগঠিত মিনার, তাতে অবলুপ্তপ্রায় ভিত্তি-চিত্রের ধ্বংসাবশেষ, সম্ভবত রাজপুত কলমে আঁকা। বিস্মৃতির মধ্যে আবছা ধরা দেয় সারঙ্গীর সৌধায় এবং বুকে আঁকা রয়েছে একটি শৌর্যবান পুরুষ ও রূপসী নারী-চিত্র। রসিক তিক্কুক হয়ত রূপায়িত করেছিলেন পরবর্তীদের কাছে তাঁদের কোনো অবিনশ্বর প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবার—মহাকাল তাঁর সে সাধে বাদ সেধেছেন। তবু ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদবিহীন গৃহে প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, যুগ যুগ রোদ-বৃষ্টির স্নেহালিঙ্গন উপেক্ষা করে কি করে তার আজও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাই ভাবছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর 'শিল্পচর্চা'র কথা মনে পড়ল, ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যা দেশ পত্রিকাতে তিনি জয়পুর ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে তার থেকে কিছু বলছি—প্রথমে শ্বেত-মর্মরের গুঁড়ো মোটা-সরু-মিহি ছেঁকে নিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে এবং পাথুরে চুন ঠাণ্ডা জলে ফুটিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার করে অল্প দই মিশিয়ে প্রত্যহ জল পালটিয়ে ৭।৮ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর প্রথমে ঐ মর্মরের দুই ভাগ মোটা গুঁড়ো ও এক ভাগ চুণ শিল-নোড়ায় ভাল করে বেটে মেশাতে হবে। এইবার দেওয়াল পরিষ্কার করে ভিজিয়ে নিয়ে ঐ মিশ্রণের প্রাথমিক প্রলেপ পুরু করে লাগাতে হবে। তারপরে এক ভাগ সরু গুঁড়ো ও এক ভাগ চুণ এবং শেষে দুই ভাগ চুণ ও এক ভাগ মিহি গুঁড়ো পূর্বোক্ত উপায়ে মিশিয়ে ঐ ভিজা দেওয়ালে প্রথমে মাঝারি এবং পরে পাতলা করে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর কয়েকদিন অপেক্ষা করে জমি শুকিয়ে এলে পর কুঁদের বড় কুঁচি দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বেলে পাথরের টুকরা সহযোগে বৃত্তাকারে ঘষিয়ে ঘষিয়ে মাজতে হবে। কিছুক্ষণ মাজার পর যখন জমি তৈরী হবে তখন খুব মিহি গুঁড়ো এবং ছেঁকে নেওয়া কলি চুণের মিশ্রণ তুলি দিয়ে জমির উপর লাগিয়ে নিয়ে আবার বেলে পাথর দিয়ে মাজতে হবে। এবার দোপায়ের ছাঁকা চুণের পাতলা প্রলেপ চার পাঁচবার লাগাতে হবে। তারপর ঐ সাত-সেতে জমিতে প্রথমে কল্পিত চিত্র রেখাঙ্কিত করে অবিচ্ছেদ্যভাবে রঙের কাজ শেষ করতে হবে। সাধারণত জয়পুর ভিত্তিচিত্রে প্রদীপের ভুষা দিয়ে কাল, ছাঁকা পাথুরে চুণ দিয়ে সাদা, গেরিমাটি দিয়ে গৈরিক, এলামাটি দিয়ে হলদে, হরা পাথরের সবুজ এবং মিছরীর জল, নিমপাতার জল, ছেড়ার দুধ, লেবুর রস দ্বারা শোধিত হিঙ্গুল দিয়ে লাল রঙ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। সবার শেষে নারিকেলের তৈলাক্ত অংশের প্রলেপ লাগিয়ে আর একবার পালিশ লাগিয়ে কাজ শেষ করা হয়। মেদিনীরায়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শর্মাজীকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। রেস্ট-হাউস অভিমুখে ধীরপদে চলতে চলতে দেখি, গোধূলির আকাশে চলেছে সাত রঙের মেলামেশা, নিস্তব্ধ-নির্জন বিন্ধ্য-প্রকৃতি নিঃসঙ্গ আমাকে সঙ্গদানে কৃতার্থ করল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রাণাঘাটের সঙ্গীতকলার ইতিহাসে স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কত্থক) মহাশয়ের অভ্যুত্থান এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের রূপ পরিগ্রহ করে এসেছিল। নগেনবাবুর জন্মের বহুপূর্ব হতেই রাণাঘাট এক সাঙ্গীতিক কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত ছিল। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশ অতীতকালে যেমন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, তেমনি ছিলেন ললিত কলার, বিশেষ সঙ্গীতকলার পৃষ্ঠপোষক। তদানীন্তন ভারতে প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ এমন খুব কমই ছিলেন, যাঁরা একবার এঁদের দরবার অলঙ্কৃত না করে গেছেন। কিন্তু তখন সঙ্গীত ছিল সত্য সত্যই দরবারী, মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের লীলা সহচর। নগেনবাবুর আগমনে দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির লোপসাধন হয়। ইনিই সর্বপ্রথম 'জনহিতায় জগদ্ধিতায় চ' সঙ্গীতকলাকে তার উচ্চ বেদী হতে অপসারিত করে, তার অভিনব রূপ লোকসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেন, অর্থাৎ সঙ্গীতের আভিজাত্য গর্ব চূর্ণ করে তাকে গণতন্ত্রবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। এ হিসাবে বাংলায় মুষ্টিমেয় যে কতিপয় কলাকার এই যুগসন্ধিক্ষণে—যখন সর্বসাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোনরূপ প্রচলন বা বিস্তার ছিল না—সঙ্গীতের বিকাশ ও সমষ্টিগত প্রচারের সহায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের অমর নামের সঙ্গে নগেনবাবুরও নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করতে পারি। এই যুগ প্রবর্তকের উৎসাহ ও চেষ্টায় একদিন রাণাঘাটের ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপের মত গানের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। বৈদিক যুগে তপোবনের আশ্রমবাসীদের ন্যায় শিষ্য সাগিদ্দদের জন্য গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা ইনি করেননি সত্য; কিন্তু যেরূপ অকাতরে ও নিঃস্বার্থভাবে ইনি সঙ্গীতকলার সেবা করে গেছেন, সে মহান আদর্শ আমাদের কেবল আশ্রমবাসী মুনিঋষিদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কখনও কারো কাছে এক কপর্দক নেওয়া তো দূরের কথা, ইনি শিষ্যদের কখনও কখনও খাওয়াতেন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন।

নগেনবাবুর জীবনী এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু না হলেও, এ প্রসঙ্গে দু-একটি বিষয়ে আলোকসম্পাতের আবশ্যকতা আছে। নগেনবাবু প্রথম জীবনে কত্থক ছিলেন। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কত্থকরূপী নগেনবাবুর অন্তরালে কতবড় একজন কলাকার অধিষ্ঠান করছেন, এ খবর সর্বপ্রথমেই নগেনবাবুর প্রথম ও প্রধানতম শিষ্য স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু)এর নিকটেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অর্জুন ভিন্ন যেমন আচার্য দ্রোণের গরিমা প্রচারিত হবার সম্ভাবনা ছিল না, তেমনি পদ্মবাবু ভিন্ন

রত্নাকর

নগেনবাবুর পরিচিতি দানও অসম্ভব। গুরু-শিষ্য হলেও এঁরা দুজনে যেন অভিন্নহৃদয় ছিলেন। এর প্রমাণ পাই আমরা এঁদের দেহত্যাগের অদ্ভুত ঘটনার দৃষ্টান্ত হতে। পদ্মবাবু সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেদিন ছিল রবিবার, বেলা ১১টা। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে মৃতদেহ দেখতে দেখতে নগেনবাবু বলে উঠলেন, "পদ্ম তুইও তাহলে আমাকে ছেড়ে চললি? বেনু (দৌহিত্র, ১৮ বৎসর বয়সে মারা যান, অদ্ভুত প্রতিভা ছিল এঁর সঙ্গীতে) যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তখন ভাবলুম, আমার একটা ফুসফুস গেল বটে, কিন্তু আর একটি তো রইল। তা, তুইও চললি যখন, আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি! আমার জন্য একটু জায়গা রাখিস, আমি আসছি।" হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নগেনবাবু বাড়ি ফিরে আসেন। সেই রাত্রিতেই তাঁর প্রবল জ্বর হয় এবং সেই জ্বরেই পর-রবিবারে ঠিক বেলা ১১টায় তাঁর দেহান্ত হয়। আমরা খুব বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, স্বর্গীয় খলিফা বাদল খাঁরও আবিষ্কার এই পদ্মবাবু কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনা ভবিষ্যতের এক প্রবন্ধের জন্য স্থগিত রইল।

১৯৪৫ সালে নগেনবাবুর দেহান্তরের ঠিক বার বৎসর পরে, তাঁর পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে রাণাঘাটে নগেন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিষদ গঠনে নগেনবাবুর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গীয় প্রোফেসর নগেন দত্ত, স্বর্গীয় সুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যম উল্লেখনীয়। পরিষদের প্রধান কার্য হচ্ছে, বৎসরে এক নির্দিষ্ট দিনে সেই স্বর্গীয় আচার্য-স্মরণে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতায় এক সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা। নগেনবাবুর জীবদ্দশাতেও মধ্যে মধ্যে এরূপ সমারোহের ব্যবস্থা হোত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ কোন স্মৃতিবার্ষিকীই অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই, শুনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলুম যে, এ বৎসর সেই স্মৃতিবার্ষিকী বিশেষভাবে পালিত হবে। অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ২৮শে এপ্রিল, শনিবার। শুভদিন, তাই চলে গেলুম রাণাঘাটে। স্থানীয় সিনেমা হলেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। সময় ছিল ৯টা, কিন্তু ঘটনাচক্রে দেরী হয়ে গেল এক ঘণ্টা। শ্রীসোমেশচন্দ্র ঘোষালের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর, পরিষদের সভাপতি শ্রীনলিনীরঞ্জন গোস্বামী স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে সমবেত জনতাকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি ছিলেন প্রোফেসর চিন্ময় লাহিড়ী এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলেনবাবুর ভাষণের পর সভার কার্য আরম্ভ হয় এবং বহিরাগত সকল শিল্পীকে মাল্যবিভূষিত করা হয়। এর পরে পরিষদের সম্পাদক শিববাবুর কার্যবিবরণী পাঠ, ধীরেনবাবুর সভাপতির অভিভাষণ, নলিনীবাবুর সভাপতিকে ধন্যবাদ দান ইত্যাদিতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। কার্যবিবরণীর মধ্যে শ্রীতরুণ ঘোষাল লিখিত নগেনবাবুর জীবনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুরু হয় ধীরেনবাবুর দ্বারা। তিনি গাইলেন ধ্রুপদ, রাগ জয়জয়ন্তী, একটি চৌতালে ও একটি ধামারে। মৃদঙ্গে সঙ্গত করলেন শ্রীহরিশঙ্কর ঘোষ। হরিবাবু মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভ ভট্টাচার্যের শিষ্য। নিবাস শান্তিপুরের নিকট এক গ্রামে। বেশ অমায়িক লোক। সারেঙ্গী বাজালেন

বারাণসী ঘরানার শ্রীরামনাথ মিশ্র। ধীরেনবাবু বড় মিষ্টি গান, কণ্ঠও খুব সতেজ। এই বয়সেও যে তিনি এত সুন্দর গাইতে পারেন, এইটাই আশ্চর্য। ইনি স্বর্গীয় রাধিকা গোস্বামীজীর নিকট ধ্রুপদ ও স্বর্গীয় বাদল খাঁ সাহেবের নিকট খেয়াল শিখেছেন। টপ্পাও ইনি ভাল জানেন। কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষ এঁকে ধ্রুপদ ছাড়া অন্য কোন স্টাইলের গান গাইতে দেন না। না দেওয়াই উচিত, কারণ ধীরেনবাবুর মত গুণীও যদি ধ্রুপদকে পরিহার করে খেয়াল টপ্পার পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহলে ধ্রুপদের তো অকালমরণ ধ্রুবসত্য। চমৎকার লোক ইনি। মগেনবাবুর জীবিতাবস্থায় ইনি আরো দু-একবার রাণাঘাটে এসে গেছেন। কাজেই, ইনি রাণাঘাটবাসীর পরিচিত। সর্বশেষে ইনি বাহারের একখানি পুরাণ ধ্রুপদ গাইলেন, ঝাঁপতাল তালে, "চলত ঘন পবন পুরবৈয়া"। বেশ লাগল। মৃদঙ্গের 'গরজন' অতীতে আসরে মনকে সর্বদাই কোন এক কল্পনালোকে নিয়ে যেত। দেখলুম, মনের সে অনুভূতিকে সেই সুদূর অতীতেই ফেলে রেখে এসেছি, বর্তমানের সঙ্গে যার বিশেষ সম্বন্ধ নেই। তবুও মনে হয় যে, মৃদঙ্গবাদনের পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের বাতাবরণের প্রতিটি রন্ধ্র যেন মন্দ মন্দ কাঁপতে থাকে। সে সময় ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে বাজান তবলা লহরা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে না।

ধীরেনবাবুর পর কুমারী আরতি ভট্টাচার্য গাইলেন বেহাগ রাগে খেয়াল—একটি বিলম্বিত একতাল তানটি ত্রিতালে। এঁর সঙ্গে সঙ্গত করলেন শ্রীচন্দ্রভান। কুমারী আরতি চিন্ময়বাবুর ছাত্রী, বয়স ১৬।১৭। শুনলুম বছর দুয়েক হোল তালিম নিচ্ছেন। আওয়াজ যেমন সুরেলা, গলায় কাজও তেমনি সুন্দর। এই প্রথম তিনি এরকম এক সম্মেলনে গাইলেন। অজানা এক তবলিয়ার সাথে গাইতে প্রথমে এঁর একটু আড়ষ্ট ভাব ছিল, কিন্তু সেভাব কিছু পরে দূর হয়। কুমারী আরতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদই মনে হোল। শ্রীচন্দ্রভান এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক, বয়স ২১।২২। বম্বই-এর দাদর অন্ধ বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র। তবলা শিখেছেন পণ্ডিত বদরী প্রসাদের নিকট, বারাণসী ঘরাণা। শুনলুম, চন্দ্রভানজীর সবরকম বাজেই প্রায় সমান দখল।

কুমারী আরতির পর শ্রীকৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু)র তবলা লহরা এক ঘণ্টা ধরে চলল। সঙ্গীত সমাজে নাটুবাবুর পরিচয় সর্বজনবিদিত। কাজেই তাঁর বাজনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। দিল্লী বা আগ্রাবাজ অপেক্ষা বারাণসীবাজ অপেক্ষাকৃত গড়ো। কাজেই, মনঃসন্নিবেশের কার্যটি অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। মধ্যে মধ্যে ঘন ঘন করতালি দ্বারা

অভিনন্দিত বোধ করি নাটুবাবু ভিন্ন অন্য কেউই হননি। তিনি ঠিক এক ঘণ্টা বাজালেন। নাটুবাবুর পরে খেয়াল গাইলেন শ্রীমতী কল্পনা মুখোপাধ্যায়। ইনি গাইলেন রাগ কেদারা। পরে একটি ঠুংরীও গাইলেন। সঙ্গত করলেন শ্রীচন্দ্রমোহন দাস। কল্পনা-দেবী, শুনলুম স্বর্গীয় ফৈয়াজ খাঁর শিষ্যা। কণ্ঠ খুব তৈরী, ভবিষ্যতে চর্চার সঙ্গে কণ্ঠ যখন আরো সুরেলা হবে, তখন তাঁর গান সত্যই উপভোগ্য হবে।

এ'র পর কুমারী বিশ্বভারতীর কথক নৃত্য পেশ করা হয়। বিশ্বভারতী যখন স্টেজের উপর এলেন, তখন রাত প্রায় ২॥টা, ঘুমে তাঁর চোখ দুটি প্রায় নিমীলিত। একটি ৯ বৎসরের ছোট মেয়েকে প্রায় নিদ্রিতাবস্থা থেকে জাগিয়ে স্টেজের উপর তোলা অত্যন্ত অশোভন। কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে নজর রাখা উচিত ছিল। ধ্রুপদ গানের পরেই অথবা কুমারী আরতির প্রোগ্রামের পরেই বিশ্ব-ভারতীর স্থান হওয়া উচিত ছিল। এছাড়া সিনেমার স্টেজও ছিল নৃত্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কোথাও কোন নৃত্যশিল্পী 'লেভেল' না করা, উঁচুনীচু খাবড়ো ইঁট দিয়ে তৈরী স্টেজে নাচতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। বিশেষ কথক নৃত্য। বিশ্বভারতীর সাথে সঙ্গত করলেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু।

বিশ্বভারতীর পরে, প্রখ্যাত কলাবিদ চিন্ময়বাবু তাঁর প্রিয় নন্দকৌশের খেয়াল ধরলেন, তাল একতালে। সঙ্গত করতে লাগলেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু। চিন্ময়বাবু বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের মধ্যে অন্যতম অতএব এ'র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রাণাঘাটে চিন্ময়বাবুর এই প্রথম পদার্পণ, কাজেই রাণাঘাটবাসী অত্যন্ত নিবিষ্টমনে এ'র গান শুনলেন। আমার মনে হয়, চিন্ময়বাবুর মত Vocalist সমস্ত ভারতবর্ষে কদাচিত মেলে। আর সব চেয়ে বড় কথা, এ'র মহত্ত্ব। চেষ্টা করে এ'কে কখনও পাওয়া যায়নি, এ বদনাম বোধ হয় এ'র বিরুদ্ধে কেউই দিতে পারবেন না। আমার মনে হয় ভাতখণ্ডে স্কুলের ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিনিধি, যিনি প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, সঙ্গীতবিশারদ হয়েও গাইতে পারা যায়। নন্দকৌশের খেয়াল বিলম্বিত একতালা ও মধ্য ত্রিতালায় গাওয়ার পর, শ্রোতৃগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে ইনি একটি কবীরের ভজন গাইলেন, নিজেই হার্মনিয়ম ধরে। গানটি হোল "চলতেকী বেরিয়া, উড়াবে দরিয়া"। আমি ঠিক সারেঙ্গীওয়ালার পিছনে বসেছিলুম। লক্ষ্য করলুম যে, 'মিসিরজী' চিন্ময়বাবুর কোন তানই ঠিক মত সারেঙ্গীতে ওঠাতে পারছেন না। মানি যে, ওরূপ রকমারি তান extempore নকল করা দুঃসাধ্য, তবুও মনে হোল যে 'মিসিরজী'র এখনও তালিম নেবার বয়স ও প্রয়োজন আছে।

এই সম্মেলনে শিল্পী হিসাবে শ্রীবিশ্বনাথ বসুই আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য করে দিয়েছেন। শুনলুম যে, বিশুবাবু রাণা-ঘাটে এর পূর্বে আরো বার ২।৩ বার গিয়ে-ছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গত শোনা আমার পক্ষে এই প্রথম। আমাকে তিনি বাজনার অনেক নমুনা শোনালেন আলাদাভাবে। আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, এ'র ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যদিও ইনিও বারাণসী ঘরানার এবং কণ্ঠে মহারাজজীর প্রত্যক্ষ ও প্রিয় শিষ্য, তবুও এ'র কাছে এতরকম 'বাজ'এর বিভিন্ন বোল আছে আর এত সুন্দরভাবে ইনি বিভিন্ন 'বাজ'এর তুলনামূলক আলোচনা করতে ও হাতে কলমে দেখাতে পারেন যে, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, ২৪।২৫ বছরের এক তরুণের এত অভিজ্ঞতা কিরূপে সম্ভব হোল! আমি এ'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারিনে।

চিন্ময়বাবুর পরে রামকলি রাগে খেয়াল ধরলেন শৈলেনবাবু, তবলায় ছিলেন বিশু বাবু। রামকলির দুরকম মত আছে, শুদ্ধ মধ্যম দিয়ে, অথবা তীব্র মধ্যম দিয়ে। ইনি এ রাগ শুদ্ধ মধ্যম দিয়েই গাইলেন। শৈলেন-বাবুর গলার কাজ বেশ ভাল। এ'র পরে ললিত রাগে খেয়াল গাইলেন পরিষদের শিববাবু। এ'র সঙ্গেও বিশুবাবু সঙ্গত করলেন। শিববাবু উচ্চশ্রেণীর গায়ক এবং সতেনবাবুর দৌহিত্রীপুত্র এবং তাঁর ঘরানার একমাত্র প্রতিনিধি। শিববাবু যখন গান শেষ করলেন তখন ৫টা বেজে গেছে। তারপরে আসরে উপস্থিত হলেন শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী তাঁর সরোদ নিয়ে। ইনি প্রথমে বাজালেন কৌশি ভৈরবী, পরে এক ভৈরবী ঠুংরী এবং এ'র সাথে তবলা সঙ্গত করলেন নাটুবাবু। শ্যামবাবুর সঙ্গীতসমাজে যথেষ্ট নাম আছে। অতএব তাঁর পরিচয়-দানের কোন প্রয়োজন নেই। নাটুবাবু বললেন যে, শ্যাম-বাবু আজকাল ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিচ্ছেন। বাজনা শুনে বেশই বোঝা গেল যে, একটা transition চলছে। শ্যামবাবুর বাজনা শেষ হোল সকাল ৭টার পর। কলকাতার বাইরে যে কোথাও এতবেলা পর্যন্ত প্রোগ্রাম হতে পারে, এ আমার নবীন অভিজ্ঞতা।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সম্মেলনের প্রোগ্রামে কণ্ঠ সঙ্গীতের বড় বেশী প্রাধান্য দেখা গেল। আরো কিছু যন্ত্রসঙ্গীত থাকলে প্রেক্ষাগৃহে আরো বেশী আনন্দবর্ধন করত। আর এক কথা। আমার ধারণা ছিল যে, উচ্চশিক্ষিত গায়ক মহলে মুদ্রাদোষ এখন অতীতের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করেছে। কিন্তু দেখলুম যে, মুদ্রাদোষের বিকৃতি আমাদের প্রকৃতিকে এখনও মুগ্ধ করে রেখেছে। স্বীকার করি, গাইবার সময় একটু আধটু মাথা, হাত নাড়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলে তার একটা সীমা থাকা উচিত। যে মুদ্রাদোষে গায়কের গানাপেক্ষা তার অঙ্গ বিকৃতির প্রতি আমাদের ধ্যান বেশী আকৃষ্ট করে, সে দোষ নিশ্চয় পরিত্যাজ্য।
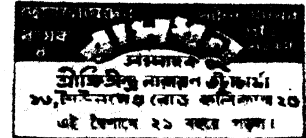
মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গত পঞ্চাশ বছরে একটা যুদ্ধহীন বছর যায়নি—যুদ্ধের ছায়া ত চিন্তাধারায় পড়বেই। মার্জিন্যালিস্টদের বুদ্ধি ও যুক্তি সর্বস্ব ব্যক্তি এখন গত। অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডে তখনকার আবহাওয়ায় ব্যক্তি না থাকলেও তাকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। এখন তার প্রয়োজনও নেই। আর, নেতার ব্যক্তিত্বও এখন ঘুচল—নেতৃত্বও এখন কলেকটিভ। এ-ক্ষেত্রে বীরেন গাঙ্গুলী যাকে group dynamics বলছে তারই চর্চা উপযোগী। আমি তাকে dynamics of power বলতে চাই।

বার্ট্রান্ড রাসেল, জুভেনেল, বাংলায় লাট এণ্ডারসনের শক্তি-বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ল্যাসওয়েলের study of power থেকে আরম্ভ করাই ভালো। বইখানি পাচ্ছি না খুঁজে—কেউ পড়তে নিয়ে গেছে, আর ফেরত দেয়নি। কিংবা হয়ত জঙ্গলে, অর্থাৎ আমার লাইব্রেরিতে কোন শেলফের কোণে লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। হাজার হোক —দেশটা গান্ধীর, রবীন্দ্রনাথের ত! তার ওপর জওহরলাল বলছেন, পৃথিবীতে আমরা শান্তি আনতে চাই, শক্তির দ্বারা নয়, শান্তিপ্রিয়তার দ্বারা!

* * *

আমার বইগুলো সাজিয়ে দিতে অনেকেই চায়। মাত্র দুবার সাজান হয়েছিল। তার পর আর হয়নি। আমার মনের অভিব্যক্তি ও গতিবিধি অনুসারেই বই কিনেছি। আমি চাই যেমনভাবে আমার চিন্তাধারা চলে, সেই সুবিধা অনুসারে বইগুলি চোখে পড়ে। আমার লাইব্রেরী নিতান্ত পার্সনাল, ব্যক্তি-গত, অর্থাৎ আমার ব্যক্তিত্বের চলন্ত ছায়া। হিক্‌স্ পড়তে পড়তে মাইনণ্ড-এর মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা, শিশির মিত্রের একটা পুরোনো বই, পেরি, আর্বান প্রভৃতির মূল্য-বিচারের কথা মনে ওঠে, দেখতে চাই হিক্‌সের পুনর্বিচার দর্শন ও ন্যায়ের ধোপে টেঁকে কিনা। তখনই ওঁদের বইগুলো আমার চোখের সামনে থাকা চাই, শেলফ্ থেকে সহজে উদ্ধার করে পড়তে চাই। অন্যে তা পারবে কেন? কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত বলেই আমার লাইব্রেরীর বাজারে দাম হবে না। একেই ত দামী বইগুলো সস্তায় বেরুচ্ছে। এ-এক প্রকাণ্ড ক্যাপিটালের ক্ষতি। ক্যাল্ডর সাহেবের মতানুসারে সমগ্র ধনের (total wealth) ওপর ট্যাক্স বসালে আমি ত গেছি! হিসেব হবে কিভাবে?

২।৩।৫৬

রেডিওর কোলকাতা কেন্দ্র আমার শোনাই হয় না। আগে আগে নিতান্ত একঘেয়ে ঠেকত—পরে শোনাই ছেড়ে দিলাম। সকলে বলে উন্নতি হয়েছে, তাই অনেক দিন পরে শুনতে বসলাম।

কয়েকজন নামজাদা কবি নিজের নিজের রচনা পড়লেন। দুটি কবিতা বেশ, বাকী-গুলো পানসে লাগল। আমার রুচিরই দোষ নিশ্চয়। কিন্তু ধীরেন্দ্র মিত্রের খেয়াল চমৎকার। সামনে বসে তাঁর গান বোধ হয় শুনিনি। অথচ যতবারই তাঁর গান রেডিওতে শুনেছি, ততবারই খুশী হয়েছি। গলা ভালো, তান-কর্তব ভালো, গঠন পদ্ধতিও ভালো। কার শিষ্য ধরতে পারলাম না। গানের বংশ-মর্যাদা আমি দিই। কেন ঠিক বলতে পারি না। উঁচুকো গাইয়ে-বাজিয়ের মধ্যে যদি প্রতিভা থাকে ত আলাদা কথা—কিন্তু সাধারণত, ঘরানার মধ্যে যে আভি-জাত্য পাই, তার স্থান 'স্বাধীনতা' অধিকার করতে পারে না। অবশ্য প্রতিভার আশীর্বাদে ঘরানা তৈরী হয়, গত পঞ্চাশ বছরে তিনটি প্রায় নতুন ঘরানার জন্ম ও বৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের কেন সব গেলেই বোধ হয় তাই—ইতিহাসের ধারা তৈল ধারাবৎ নয়।

* * *

মালবিকা রায় আমাদের সঙ্গীতের মন্দিরে প্রবেশ করেছে। রাগটি সে প্রকাশ করে, গানের বন্দেশ বজায় রাখে, তান নিখুঁত, সংযত, লয়কে সে শ্রদ্ধা করে, তার গায়নে কোনো রকম বাহুচাল্য নেই। তৃপ্তি পেলাম। রবি রায় মেয়েকে চমৎকার শিখিয়েছে। কোন্ ঘরানা বলব? রবি শ্রীকৃষ্ণরতঞ্জনকারের শিষ্য, অথচ তার নিজত্ব সে কখনও খোয়ায়নি।

৫।৩।৫৬

দুদিন দিল্লীতে বেশ কাটল। প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ প্রোগ্রামের আলোচনার পর সর্দার গুরবচন সিংএর সেরামিক্‌স্ ও শ্রীসত্যেন ঘোষালের নতুন দেশী বিলেতী ছবির প্রদর্শনী দেখলাম। সর্দারজীর প্রয়াস নিতান্ত মূল্যবান। দেশী রঙ ব্যবহার করছেন। রঙ মেশাতে তাঁকে অনেক পরীক্ষা করতে হয়েছে। নীল রঙ খোলে নি কিন্তু। ডেলফট্ ব্লু যে দেখেছে তার চোখে নেশা জড়িয়ে থাকবেই। নুতন ছাত্রীর কাজ সুচারু। লোকজন দেখতে এসেছে এই যথেষ্ট। সত্যেন ঘোষালের পোর্ট্রেটগুলি বেশ। অন্য গুলি কেমন যেন মনে বসল না। আরো মনোযোগ দিয়ে দেখলে হয়ত বসত। সন্ধ্যার সময় প্রদর্শনী যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

প্রশান্তবাবুর দিল্লীর বাড়িতে গেলে আরাম, সুখ, আনন্দ সবই পাই। ঘাসের ওপর, চৌড় গাছের নীচে, অজানা পাতা-বিহীন হলদে ফুলের গাছের পাশে বসে থাকলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তার পর বাছা বাছা লোকেদের সঙ্গে পরিচয়, কথা-বার্তায় বুদ্ধি সজাগ হয়। সব চেয়ে আরাম পাই যত্নে। দিল্লীতে এত কাজ থাকে যে সময়ই পাই না। পৃথিবীর সেরা ইকনমিস্ট আর সংখ্যাতাত্ত্বিকদের প্রশান্তবাবুই কেমন করে যোগাড় করেন ভেবে পাই না—অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মাথা খুঁড়লে পায় না কাউকে—টাকা নেই। দিল্লী-কোলকাতার Statistical Institute সত্যকারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাজ করছেন। প্রকৃত বিশ্বভারতী। প্রশান্ত-বাবু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে ফলবান করছেন দেখে প্রাণ সতেজ হয়ে ওঠে।

এবার দুজন আমেরিকান অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। পল্ বারান স্ট্যান-ফোর্ডের অধ্যাপক। তাঁর লেখা যেখানে বেরোয়, খুঁজে পড়ি। দিল্লী যাবার আগের দুদিন ধরে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরই একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলাম। ভদ্রলোক খুবই কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন তার মধ্যে ধোঁয়া সৃষ্টির প্রয়াস নেই। সাফ্ সাফ্ মোটা কথা। অন্তর্দৃষ্টি আছে গ্রোথ্ ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে। লোকটিকে আমার খুব
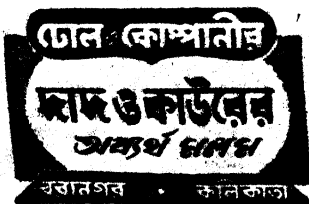
ভালো লাগল—একদম অমর্যাদিত—যা সত্য ভাবেন তাই খোলাখুলি বলেন। এ-ধরনের আমেরিকান দু-একটি দেখেছি। ভালো 'স্পেসিমেন'। এ'কে ভারতবর্ষে আনতে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করি—হয়ে ওঠেনি। তাঁর মতামত অবশ্য আমেরিকা সহ্য করে না—ভদ্রলোকের জায়গাই নেই, যে রিসার্চের জন্য টাকা ওদেশে চাইলেই পাওয়া যায়, সে টাকা তাঁর কাছে আসে না—অর্থাৎ এক-প্রকার একঘরে। অথচ কেউ কিছু করতেও পারে না। জার্মানীতে জন্মকর্ম, এখন আমেরিকান। আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর মনে ধরেনি। আমারও ধরে না, তাই বোধ হয় সহজে ভাব হোলো। পোডিয়া অন্য ধরনের জীব, আসলে রুমানিয়ান, এখন আমেরিকান। নিতান্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ—বারানের সঙ্গে তর্ক হোলো। ভদ্র তর্ক রাত একটা পর্যন্ত।

বারানের কাছে খুব একটা সমর্থন পেলাম। প্ল্যানিং-সংক্রান্ত আমার চিন্তা সুবিখ্যাত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অথচ সাহস-ভরে কিছু বলতেও পারি না। মনে মনে কিন্তু জানি যে মূলে আমার কোনো ভুল নেই। এ-এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা। আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ কোথাও যেন নেই। বুর্জোয়াদের এই সাবধানী মনোভাব সুপরিচিত। কিন্তু ঠিক তাই কি? সে যাই হোক, বারান আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করুক আর নাই করুক আমার মনে খানিকটা বিশ্বাস এনে দিলে। বড্ডই দরকার ছিল।

ছাব্বিশ সাতাশ বছর যখন বয়স তখন ইংরেজীতে আমার প্রথম বই লিখতে আরম্ভ করি। বইখানি কোনো পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পাঠাইনি। আমার মতে যাঁরা ঐ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেই বার জনকে পাঠাই। তাঁরা প্রত্যেকেই চিঠিতে তাঁদের মন্তব্য জানান। বিদেশীর মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বের্গসঁ, হলডেন, হবহাউস, কেসার-লিঙ, ক্লেমেণ্ট ওয়েব প্রভৃতি চিঠি লেখেন। আত্মবিশ্বাসও এলো, কিন্তু ডকটরেট নেওয়া হোলো না, ভাবলাম আর কি দরকার! দুটো মজার ব্যাপার মনে পড়ছে। তখনকার ইংরেজ (স্কেচ) ভাইসচ্যান্সেলার বিশ্বাসই করতে পারেন নি, যে একজন নাবালক লেকচারার—যে আবার গান-বাজনা শুনে ও ছবি দেখে বেড়ায়—সে আবার রাসেল প্রভৃতির কাছ থেকে চিঠি পাবে। বোধহয়, রাধাকুমুদবাবু, কিংবা নির্মল (সিদ্ধান্ত) তাঁকে বলেছিল। তিনি ডেকে পাঠিয়ে চিঠি দেখতে চাইলেন। মাথা গেল গরম হয়ে। তাঁর অবিশ্বাসের ছায়া চোখে ও ভাষায় ফুটে উঠেছিল। আমি বললাম ব্যক্তিগত চিঠি দেখাতে পারব না দেখাতে চাই না। তখন নরম হয়ে বললেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, যদি দেখাও খুশী হব। পরের দিন দেখালাম। চোখ ছানা-বড়া, চায়ে নিমন্ত্রণ, আর বাসি কেক ভক্ষণ।

আরেকটি কথা মনে পড়ছে। আমার বাবা হলওয়েলের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বলতেন, 'দ্যাখ দেখি, এধারে লর্ড-চান্সেলার, আবার যুদ্ধমন্ত্রী, আবার দার্শনিক স্কলার, সব একত্রে......এই না হলে মানুষ! আইনস্টাইন তিনিই বোঝেন। বাবা জানতেন না, যে হলডেন আইনস্টাইন বোঝেননি। সে যাই হোক, বাবার কথা স্মরণ করে হলডেনকে একখানি বই পাঠাই। যখন জ্যাকো বর্ডারে একখানা চিঠি এলো তাঁর কাছ থেকে (তাঁর বন্ধ্যা মা কিছুদিন আগে মারা যান) তখন বাবাকে চিঠিখানি দেখাতে ভীষণ ইচ্ছা হোলো। তখন তিনি কোথায়! এ-সব স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য নিতান্ত ভিকটোরিয়ান নিশ্চয় তবু স্ট্যাণ্ডার্ড সামনে থাকলে সেখানে পৌঁছাতে ইচ্ছে হয় এবং অগ্রসর হবার পথ আবিষ্কার করবার আর যাঁরা স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করে ধরেন তাঁদের কথা মনে এলে চোখে জল আসে।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন খুব। কিন্তু সেরকম স্ট্যাণ্ডার্ডও নাই। এখনকার বাক্তি-গত স্ট্যাণ্ডার্ড কি? বড় চাকরি কর্ম-কুশলতা? তুলনায় (weber) একই বোধ হয় আইডিয়াল টাইপ বলেছেন।

• • •

শৌখিন আর্টের প্রদর্শনী দেখলাম। মেয়েলী হাতের কাজ জুড়ে দিলে মনে হয় যেন একটা ভীষণ বিষাদের ছায়া সমস্ত শৌখিন আর্টের ওপর থাকে। সোশিয়াল রিয়্যালিজম-এর সঙ্গে নড় বিশেষ কিছু হয়নি মনে হোলো। ইতালীয়দের ছবিতে আধুনিকতার প্রভাব পড়েছে—কিন্তু আছ-গেছে। অক্ষরে এচিং ও কাঠের খোদাই চমৎকার—সকবান সমস্ত। এমন সাজান প্রদর্শনী এদেশে দেখিনি। শুনলাম কাঠ-কাটরা আলো স্ট্যাণ্ড, সবই পোল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমাদের প্রদর্শনীগুলি জঘন্যভাবে সাজান হয়। হিংসে হোলো। রাষ্ট্রপতি ভবনের স্থায়ী প্রদর্শনী চোখে দেখা যায় না। ভাগ্যিস কেউ যায় না!

৬।৩।৫৬

মিকোয়ানের বক্তৃতা পড়লাম। স্টালিনের রচনা ক্লাসিক নয় তাও শুনছি। খুশ্চেভের রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে যে তিনি মিকোয়ানের চেয়ে সাবধানী, অত খোলা-খুলিভাবে স্টালিনের সমালোচনা করতে চান না, অথচ গত বৎসর মনে হয়েছিল যে তিনি ম্যালেনকভের তুলনায় স্টালিন-পন্থী। মস্কোতে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি—তোমরা এত স্টালিন-উপাসক কেন? উত্তর ছিল মজার: "ভারতবর্ষে গান্ধীর কত ছবি আছে? কতবার তোমরা তাঁর নাম গ্রহণ কর? অথচ গান্ধী দেশকে গড়ে তোলবার সময় পাননি। স্টালিন দেশকে গড়ে তুলেছেন, নাৎসী পশুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতার কারণ যথেষ্ট নয় কি?" তার পর ছাত্রটি একটি গল্প বলে, 'যখন মস্কোর ওপর জার্মান গোলা বেশী বর্ষণ হচ্ছে তখন স্টালিন ক্রেমলিনের দেওয়ালের বাইরে রাস্তার ওপর বেড়াতেন, দাঁড়াতেন, মুখে পাইপ থাকত,—আর আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হোতো যে মস্কো শত্রুর হাতে পড়বে না।'

আরেকটি ঘটনার স্মরণ হচ্ছে। সুধীনের (দত্ত) বাড়ি—তখন বোধ হয় রাত দুটো কি তিনটে। এক এল বার সে রাতে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার আলোচনা করছিলেন—দু-একটি মজার ব্যাপারও বলছিলেন। সুধীন ও আরো দু-একজন স্টালিন-বিরোধী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্টালিনের বিপক্ষে কড়া মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্টালিনের স্থান রাশিয়াতে লেনিনের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ বেশী—তবে এ-কথা বলা চলে না।' এখন স্টালিন কোথায় পর্যায়। কাকে মনে রাখব কাকে ভুলব এই নির্বাচন পার্টি ঠিক করে দেয় তবে ত দেখছি' কেবল তাই নয়, তখনই সবাইকে মনে করতে হবে, তখনই সকলকে ভুলতে হবে। অবশ্য অন্য দেশেও খানিকটা তাই হয়—যেমন জার্মানদের ইহুদী অত্যাচারের কথা লিখতে এখন বারণ নেই বটে তবে লেখা সমীচীন নয়—একজন ইংরাজের লিখে চাকরি গেল। পার্ল হারবারের বিষয়ে আমেরিকান কাগজে থাকে না। মুক্তাঞ্চলের কিছু জীবন ও কিছু জীবনের এখন অ-পাঠ্য। স্মৃতিশক্তি একটু ত্রেশ্যাণ্ডাক টেবিলে সোশিয়ালাইজড হয়ে গেছে। হাই প্রেসার এডভার্টাইজমেন্টের কাজই হলো ব্যক্তিগত স্মৃতিকে অন্যের হাতে সমর্পণ করা।

ব্যাপারটা দাঁড়াল কৃতজ্ঞতায়। যে-যুগে সবই পরীক্ষামূলক, সবই রেলেটিভ, যে-যুগে 'এবসোলিউট'এর মূল্য নেই, যে-যুগের প্রাণ বিজ্ঞান টেকনলোজি বস্তু পুরাতন যন্ত্রের ব্যবহার মাত্রেই প্রতিযোগিতার অসার্থক ও ক্ষতি সে-যুগে কৃতজ্ঞতা অ-সামাজিক গুণ। তবু মনে হয় কৃতজ্ঞতাই হোলো প্রকৃত solidarity আমাদের দর্শনের ভাষায় বিজ্ঞানের। বন্ধু ঐতিহ্যের আদি জন কৃতজ্ঞ। রাশিয়ানরাও কৃতজ্ঞ—তাঁরে স্টালিনকে টপকে লেনিনের প্রতি। ওদের স্মৃতি লাফিয়ে চলে পিছনে পিটার আইভান পর্যন্ত। স্মৃতি কি এতটাই খামখেয়ালী?

বিকেলের আলো পড়ে আসছিল। তবু তেমন অন্ধকার হয় নি, যতটা বুড়ো মিস্তিরির মনে হচ্ছিল। ছোট কুঠরি, জানলা নেই। খোলা দোর দিয়ে বেশ আলো আসছিল। তবু তার অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। দুপুর থেকে জ্বর অনেকটা কমেছে। গায়ে কপালে হাত দিয়ে তাই মনে হল মিস্তিরির। এখুনি হয়তো কর্তা-বাবুর খোকা-খুকিরা কেউ ওর জন্যে দুধ-চা নিয়ে আসবে। কেমন আছে মিস্তিরি— জেনে যাবে।

কাঁথাখানাকে গুছিয়ে পেতে নেবে বলে উঠে বসলো সে। হাটু দুটো ভীষণ কাঁপছিল। গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো আবার। আলসে তার হাতে কম্বলটা টেনে কোনমতে জড়িয়ে নিল। একটা ফেঁড়ার মধ্যে দিয়ে বার বাঁ পায়ের আঙুল বেরিয়ে পড়েছিল। অস্বস্তিতে সেটা একবার ক্লান্ত একটু চেষ্টা করেই আবার তেমনি শুয়ে রইল। আরামের জন্যে কিছু করে এমন মন আর নেই। হতাশায় এতো শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আজকাল যখনি জ্বর আসে, বিছানাটা ছাড়িয়ে নিয়ে যখনই গড়িয়ে পড়ে তখন প্রতিবারই মিস্তিরির মনে হয়, এই বোধ হয় শেষ। আর উঠে দাঁড়াবে না সে। তা নিয়ে ভয় হয় না। ক্ষোভ জাগে না। ভাবে গেলেই তো হয়। আর কেন? কতদিন আর লোকের দয়া কুড়িয়ে দিন গুণে যাবে? তাতে লাভই বা কি? কোথাও থেকে কোন সুখ পাবে এমন আশা করার সাহসও তার নেই। ত্রিভুবনে কেউ নেই যাকে নিয়ে সুখ ভাগ করে আনন্দ পাবে। পাকা চুলে-ভরা মাথাখানা কারো কোলে রেখে মরতে পাবে এমন সৌভাগ্য কল্পনাও করতে পারে না। থাকার মধ্যে আছে শুধু দুলালী। কিন্তু থেকেও নেই। জীবনে আর ওর মুখ দেখতে পাবে না, মিস্তিরি মনে মনে ভাল করেই জানে। সেই কালো কালো ডাগর দুটি চোখ, তুলতুলে নরম গাল আর ঠোঁট দুটি প্রায়ই মনে পড়ে যায়।

এক একদিন কাজ করতে করতেই হঠাৎ সেই মিষ্টি চোখের চাউনি ভাবনায় ভেসে ওঠে। তখন হাত থেমে যায়। আর চলতেই চায় না। এ বাড়ির বৌ অসময়ে একটু চা তৈরী করবে। বুড়ো তার জন্যে দা হাতে নিয়ে কাঠ কাটতে বসেছে। এমন নিঝুম দুপুরে কি করে হঠাৎ রাজস্থানের সেই গ্রামখানা ভেসে ওঠে। হাজার মাইল পারের সেই গ্রাম, গ্রামে সেই খাপরা-ছাওয়া বাড়ি-খানা, আর সেই বাড়ির ঘুম ভাঙিয়ে ছটফটে কিশোরী দুলালী পায়ে পায়ে রুপোর মল ঝমঝম করে খেলে বেড়াচ্ছে। সব দেখতে পায় সে। মাত্র আট বছর আগেও ঠিক যেমনটি দেখে এসেছে। হাতের দা'খানা হাড়া না খাওয়া পর্যন্ত থেমে থাকে। বৌদি হেঁসেলের দোর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি হলো বুড়ো, ঘুমিয়ে পড়লে না কি?' হাটুতেই কোন-মতে ভিজে গামছাটাকে মুছে নিয়ে মিস্তিরি আবার হাত চালায়।

ওকে কেউ ধমক দিচ্ছে শুনলে কর্তা-মশাই রাগ করেন। বলেন, 'আহা, কেন বেচারিকে শুধু শুধু ব্যস্ত করিস। ওকে নিজের মনেই থাকতে দে না? এসব স্নেহের কথায় বুড়োর চোখে আরও জল এসে পড়ে। ভাবে, নিজের মনে, নিজের মনে কি থাকা যায়? দুলালী কি তাই থাকতে দেবে? না, কখনো দিয়েছে?'

পর পর ক'টা অজন্মার বছর গেল। কচি মেয়ে দুলালীকে রেখে প্যাকেচকে সে বেল-কলোনী খলাপুরে এসে হাজির হল। গাঁয়ের

ক'জন ছিল, তাদের সংগে মিলে ক্রমে ক্রমে রাজমিস্তিরির কাজ শিখলো। কাজ করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে সুদূরে গাঁয়ের বাড়ির সেই দাওয়ার কোণে। যেখানে দুলালীকে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে দেখে এসেছে সে। ছট্‌ফট্‌ করে মন ওদের কাছে এসে থাকার জন্যে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। সাহস হয় না তার। রোজগার তো তখনও এমন কিছু নয়। তাছাড়া গাঁয়ে জমি-জেরাত আছে। মহিষ খামারের দেখাশোনা আছে। উপার্জন আরও খানিক বাড়ুক। ওসব বেচে দিয়ে নিজের কাছে দুলালীকে এনে রাখবে মিস্তিরি। মনে মনে হিসেব কষে আর দিনরাত কাজ নিয়ে পড়ে থাকে।

বৎসরান্তে একবার ক'রে দেশে যায় আর দুলালীর এক এক চেহারা দেখে আসে। ক্রমে কাঁধ ছাড়িয়ে দুলালীর চুল পিঠের ওপর পড়লো। ঘাগরা-কাঁচুলীর সংগে উড়নি গায়ে দেওয়া শুরু করলো।

ছুটি শেষ করে ফিরে আসার সময় আদুরে বেড়ালের মত দুলালী ওর পিঠের ওপর মুখ ঘষতো। বলতো, তোমার কাছে নিয়ে চলো না বাবুজি!

বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে মিস্তিরির হাত থেমে যেতো। কোনমতে একটু জোর আওয়াজ দিয়ে, দাঁড়া না, এইবার ঠিক তোদের নিয়ে যাবো। আর একটু জমিয়ে নিই।

কর্মস্থানে ফিরে আর ফুরসৎ থাকে না। হাতে হাজার কাজ। ইতিমধ্যে সে ছোট ছোট সাব-কনট্রাক্টরি শুরু করেছে। টাকার জোরে যারা ঠিকাদারী করে তাদের কথা আলাদা। রামজীর ভরসায় মিস্তিরি শুধু নিজের কারিগরী বুদ্ধি দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। একদিক সামলাতে অন্যদিকে ঝুঁকি এসে পড়ে। সচ্ছল না হলে কষ্টের মধ্যে দুলালীদের এনে ফেলতে সে চায় না।

ঠিক যখন আনবে আনবে করছে এমন সময় দুলালীর মা মারা পড়লো। দুলালীর বয়স হয়ে গেছে। বিয়েসাদি দেবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। অগত্যা সাগাই করা হয়েই ছিল কিশোরকালে। ঘটা করে বিয়ে দিয়ে দুলালীর মা জামাইকে কাছে এনে রাখলো। জামাই জমিজেরাত দেখাশোনা করে। দুলালীরও আর একা লাগে না। দেখেশুনে মিস্তিরির খুশী হ'ল। ক্ষেত-খামারের কাজের অবসরে এক সময় মেয়ে-জামাইকে আনিয়ে কিছুদিন নিজের কাছে রাখবে, মাঝে মাঝে মিস্তিরির শখ হতো।

তারপর কত বছর ঘুরে গেল।

কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে দোরের দিকে ফিরে শুয়েছিল মিস্তিরি। সামনের বারান্দা দিয়ে কে যেন গেল? উঠে তাকে ডাকতে গেল। দুয়ারে ভর দিয়ে উঁচু হতেই মাথাটা কেমন করে উঠলো। ঘর বারান্দা সমস্ত চোখের সামনে দুলে উঠলো। সারা শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগলো।

এইবার তাহলে সত্যি রামজীর দয়া হল। অস্পষ্ট জ্ঞানের স্বরূপ একটি মুহূর্তে একবার দুলালীর কচি মুখের হাসি ধরা পড়লো। খানিক বাদে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখনও সেই মুখটি।

বিছানা ছেড়ে দোরের কাছে এসে মিস্তিরি পড়েছিল। কর্তামশায়ের ছোট ছেলে ওর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তার নজরে পড়লো। তাড়াতাড়ি এসে সে বুড়োর নাড়ি দেখলে। নাকের কাছে হাত নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস। বেঁচে আছে তাহলে! ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল বুড়ো।

বিছানায় এনে শোয়াতেই বুড়ো চোখ মেললো। ভাল ভাসা নিস্তেজ চোখে সব যেন অচেনা লাগছিল। মুহূর্তে কয়েক এদিক-ওদিকে চেয়ে, বুঝতে পারলো। চিনে নিতে পারলো। অতিকষ্টে বড় করে শ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কে, ছোড়দা?'

'হ্যাঁ, বিছানা ছেড়ে উঠেছিলে কেন?'

'আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।'

'কেন? কি হল আবার?'

যথারীতি অনুনয় করে বললে সে, 'দুলালীকে একটা খৎ লিখে দিতে হবে, ছোড়দা!' কথা শেষ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দশা দেখে মায়া হয়। কর্তামশায়ের

ছোট ছেলে ওর কম্বলখানাকে ঠিকমত করে গায়ে দিয়ে দেয়। বলে, আচ্ছা, দেবো'খন। তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

ওকে উঠতে দেখে বুড়ো আবার তাড়াতাড়ি বলে, 'আজই লিখতে হবে, ভাইয়া।'

'বেশ তো। সন্ধ্যেবেলায় তো 'ডাক'। তার আগে লিখলেই হবে।'

কর্তামশায়ের ছোট ছেলে পাড়ার ডাক্তারকে খবর দিতে বেরোয়। সে জানে, চিঠিতে কি লিখতে হবে। কি হবে সেই চিঠির পরিণাম। কত চিঠিই তো বুড়ো মিস্তির ওকে দিয়ে লিখিয়েছে। মেয়ে-পাগল বুড়োকে দেখে সকলেরই কষ্ট হয়। অথচ মেয়েটা যেন কী! একটা চিঠিরও উত্তর আসতে দেখে নি কেউ।

পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে বুড়ো এসে দাঁড়ালেই চেনা পাঠ প্রতিবারেই লিখতে হয়ঃ অনন্ত সৌভাগ্যবতী সাবিত্রীসমানা দুলালী মাইয়া......কুশল কেমন হ'ল, আমার উসুকের কোন অসুবিধে হল কি না, মিসিরজী, রামভরোস সকলের খবর এক এক ক'রে লিখতে হবে। ক'লাইন করে লিখে লিখে পড়ে শোনাতে হবে। তারপর, কাঁপা হাতে দেশলাইয়ের অনেকগুলো কাঠি নিভিয়ে অতিকষ্টে একটা বিড়ি ধরাবে। হুস্‌হাস করে কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে শুরু করবে নিজের খবর। সে খুব ভেবেচিন্তে গুছিয়ে সাজিয়ে। প্রতি কথাটা মিথ্যে লিখতে হবে। বেশ আছি, বহাল তবিয়তে। কখনো লেখে, স্কুলবাড়ির কাজটা গরমের ছুটির মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই একেবারে সময় পাচ্ছি না। কোথায় ইন্‌স্টিটিউট বাড়ানো হচ্ছে, কোথায় অফিস-ঘর মেরামত হচ্ছে, নতুন নতুন কথা বানিয়ে প্রতিবার বুড়ো তাই লেখায়।

চিঠি লিখে দিতে দিতে কর্তামশায়ের ছেলেরা প্রায়ই ওকে ধমক দেয়, মেয়েকে এসব মিথ্যে খবর দিয়ে লাভ কি? আসল খবর লিখলেই তো হয়, গাঁয়ে জমিজেরাত আছে, সেখানে গেলেই পারো।

বুড়ো মিস্তির শুধু হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

গত বছর কর্তামশায় ওকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে রওনা করে দিতে চেয়েছিলেন। উনি যখন এ জেলার ইঞ্জিনীয়ার তখন বুড়ো ও'র কাছে কাজ করেছে। এ লাইনে সৎ লোক দুর্লভ। সেই এক আধ-জনের মধ্যে বুড়ো একজন। তাই ওর দুরবস্থায় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কর্তামশাই। বুড়ো কিন্তু অনুনয় করে, নেহি হুজুর, আভি নেহি যায় গা।

খানিক বাদেই পোস্টকার্ড আর কলম নিয়ে কর্তামশায়ের ছোট ছেলে বুড়ো মিস্তিরির ঘরে এলো। দোরে ঠেস দিয়ে বসলো। মিস্তির কিছু বলার আগেই শুরু করে দিল, অনন্ত সৌভাগ্যবতী সাবিত্রীসমানা দুলালী মাইয়া......' এর পর কি?

বুড়ো উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। বসে চুপ করে ভাবে খানিক। একসংগে কতগুলো কথা বলে থেমে থাকে। পড়ে শোনাতে বলে না।

শূন্য চোখে চেয়ে থাকে, আর ভাবে। এ তো আর চিরকালের বাঁধা গৎ নয়। অন্য চিঠি। অন্য কথা। দুলালীকে দেখার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে। তাকে কতদিন দেখেনি। সে যেন একবার আসে। কতদিন আদর করেনি তাকে। বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। ইত্যাদি।

চিঠি লেখাতে লেখাতে বুড়োর মনে পড়ে যায়, এমন ধারা বানিয়ে চিঠি লেখার খেলা যখন শুরু হয় নি, তার ঠিক আগেই যে সব চিঠি মেয়ে জামাইকে মিস্তির লিখেছিল, তাতেও, আজকের এই চিঠির মতই, ওকে বুকের রক্ত নিংড়ে কথা খুঁজে আনতে হয়েছে।

সে তো সবেমাত্র দু'বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে মিস্তির বেশ গুছিয়ে বসেছিল। দুলালীর মা অবশ্য তা দেখে যেতে পারে নি। বছর তিনেক আগেই সে মারা গেছে। মেয়ে জামাই দেশের বাড়ি তদারক করে।

এক বিশ্রী বাদলার রাতে কাণ্ডটা ঘটলো। একরাশ টাকার চেক ভাঙিয়ে মিস্তির কলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছিল। রাত্রের ট্রেন। সারাদিন দারুণ পরিশ্রম গেছে। চোখে তাই ঘুমের ঘোর লেগেছিল। খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছেই দেখতে পেল কোমরে জড়ানো টাকার থলির একপাশ ফাঁক হয়ে রয়েছে। দেখে ভয়ে সে শিউরে উঠেছিল। চিৎকার করে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে প্ল্যাটফর্মেই মাথা গুঁজে বসে পড়েছিল। সারা জীবনের পরিশ্রমের সুখ

স্বাদ এক নিমেষে মুছে মিশিয়ে গেল। তারপর আর হাসতে পারে নি মিস্তিরি। যত আশঙ্কা ছিল, তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী পীড়ন সেই থেকে ওকে বার বার ঘা দিয়ে গেছে।

তবু সামলে নেবে ভেবে বুড়ো মিস্তিরি কোমর বেঁধে তারপরও লেগেছিল। কন্‌ট্রাক্‌টের কাজ শেষ করে দেওয়ার দিন ফুরিয়ে আসছে। কাজ বন্ধ রাখা যায় না। চেনা রোজকুলি আর রাজেরা বিনা মজুরিতেই দিনকতক কাজ করলো। বাকীতে মালপত্র কেনা চলছিল।

সেই সময়ে রাজস্থানে দুলালী আর জামাইকে মিস্তিরি বার বার চিঠি দিয়েছিল। সব খবর জানিয়েছিল। কর্মস্থল ছেড়ে তখন সে কোথাও এক পা যেতে পারবে না। চারিধারে এতো দেনা জমা হয়ে আছে। শহর ছেড়ে গেলে পাওনাদারেরা ভাববে সে ফাঁকি দিতে চায়। সব বুঝিয়ে মেয়ে জামাইকে লিখেছিল, আর ওর তরফ থেকে জামাই যাতে জমিজেরাত বেচে দিতে পারে তারই সব কাগজ তৈরী করে পাঠিয়েছিল। দিনের পর দিন চিঠি লেখে। টেলিগ্রাম করে। অপেক্ষা করে বসে থাকে। টাকা আসে না। চিঠিও না।

কতদিন আর বুক দিয়ে ঝড় রোখা যায়। সব ভেঙে গেল। সাজানো ব্যবসা ধসে পড়লো। ঋণের দায়ে হাজতবাস করতে হ'ল না, সে কেবল এইজন্যে যে ধর্মভীরু বুড়োকে সবাই স্নেহ প্রীতির চোখে দেখতো। সবাই জেনেছিল পর পর দুটি মর্মান্তিক আঘাতের কথা।

কর্তামশাই তখন ছিলেন এ জেলার ইঞ্জিনীয়ার। তিনি রিটায়ার করলেন সেই বছরে। বুড়ো মিস্তিরি তাঁর বাসায় এসে আশ্রয় নিল।

ছ ফুট লম্বা শরীর তখন নুয়ে পড়েছে। চওড়া চওড়া হাড়গুলো রোদে পোড়া চামড়ার নিচে থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। বুড়ো মিস্তিরি আর এগারো হাত কাপড়ের সেই রাজস্থানী পাগড়ি মাথায় জড়ায় না। তার খুপোলী চুল আর ঝাপসা চোখে হতাশ বয়সের বিষাদ।

এ বাড়িতে এসে থেকেই বুড়ো মিস্তিরির নতুন খেলা শুরু হ'ল। দুলালী আর জামাইকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখায়। জানায়, কেমন করে সে ধীরে ধীরে তার ভাঙা ব্যবসা আবার গড়ে তুলেছে। কার কার দয়ায় বিনা পুঁজিতে আবার কারবার শুরু করার সুযোগ পেল, তাদের কতগুলো মনগড়া নামধাম লিখে পাঠায়। মিথ্যের পর মিথ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে দুলালীর জন্যে বুড়ো মিস্তিরি এক সচ্ছল সুন্দর ব্যবসার ছবি এঁকে তোলে। কখনো বা লেখে খুব চিন্তায় আছি। বর্ষা এসে পড়লো। অথচ বেল ইয়ার্ডে মাটি কাটার কাজ সব শেষ হয় নি। তাই ব্যস্ত ছিলাম। মাস-খানেক চিঠি দিতে পারি নি।

এই মিথ্যেগুলো লেখার জন্যে যখনি বুড়োকে কর্তামশায়ের ছেলেরা কিছু বলে, ও উত্তর দেয়, আমার যা ভোগ তাতো আমি ভুগছি। ও বেচারিদের আর দুঃখ দিয়ে কি হবে? অন্য ধরনের এই নতুন চিঠিখানা শেষ করে ঠিকানা লিখবে বলে কর্তামশায়ের ছেলে পোস্টকার্ডটা ঘুরিয়ে নেয়। ঠিকানা সকলের মুখস্থ হয়ে গেছে।......কিষণজী লালের কুঠির কাছে......গাঁও......জিলা......বুড়ো মিস্তিরি ওকে বাধা দিল। বালিশের তলা থেকে ছেঁড়া একটা নোটবই বার করলো। সেখানা মুখের কাছে ধরে হিসেবের হিজিবিজি ভরা পাতাগুলোয় চোখ টান করে খুঁজে খুঁজে বার করলো। একটা পাতা খুলে ওর হাতে দিল। তারপর কম্বলখানা বুক অবধি টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

কর্তামশায়ের ছেলে ঠিকানা দেখে অবাক! কই, সে চেনা ঠিকানা তো এ নয়? এ যে... হ্যারিসন রোড...কলিকাতা। সপ্রশ্ন চোখে বুড়োর দিকে চাইতেই বুড়ো ভারি রহস্যের হাসি হাসলো। বললঃ হাঁ, ছোড়দা, ওহি দুলালীকে পাত্তা।'

'তবে খামখা রাজস্থানে চিঠি লিখে কিসে মরছো কেন? মেয়ে তোমার এখানে, তুমি জানো? তবে, এ আবার কি ব্যাপার?'

বুড়ো এবারে আর হাসলো না। একবার চোখ বুজিয়ে গভীর নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল। যেন, দুলালীর কাঁচ আলুতে মুখটি একবার মনে করে নিল। তারপর বললে, আমি সব জানি ছোড়দা! আমার পয়সা পেয়ে জামাই সব জমিজেরাত বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে। ছেলেমানুষ, শুনেছি দলে পড়ে ঝোঁকের মাথায় করেছে। আমি ওদের জন্যে ভুগছি জানলে দুঃখ

শুধু কষ্ট পাবে। আমার পরমায়ু রামজীর দয়ায় তো শেষ হতে চলল। ওরা এখন সুখে থাক। আমি সব খবর পেয়েছি জানতে পারলে দুলালী কি আর শান্তি পাবে?

কলকাতার ঠিকানা দুলালী গাঁয়ের ডাক-

বাবুর কাছে রেখে গিয়েছিল। বুড়োর চিঠি গেলে যাতে ঠিকমত ঘুরে ওর কাছে পৌঁছে যায়। সেই ঠিকানা কিছুদিন আগেই অনেক কষ্টে বুড়ো জোগাড় করেছে।

নতুন ঠিকানাটা লেখার আগে কর্তা-মশায়ের ছেলের হাতের কলমখানা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। ধুলোকাদায় ময়লা বয়সের দাগধরা বুড়োর কালো মুখখানায় দেখবার মত কি যেন আছে। ঠিকানা লিখে নোটবই বালিশের পাশে রেখে সে উঠে এল। বুড়োকে ডাকলো না। বুড়ো মিস্তিরি বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ওকে দেখে ঘরের বাইরে এসে জানালেন, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। বুড়ো মিস্তিরি বোধহয় ও'র মুখের ভাবেই সে কথা বুঝেছিল। কিংবা হয়তো ওর মনের কোণে কোথাও সংকেত ছিল। কর্তামশাই ঘরে এসে ওর বিছানার পাশে দাঁড়াতেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরলো মিস্তিরি। বল্লেঃ হুজুর, অনেক করেছেন আপনি! রামজী আপনার ভাল করবেন। আমার শুধু আর একটি দয়া করুন।'

পা ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ালেন কর্তামশাই, 'অমন করো কেন? কি হয়েছে বলো না?'

'আর কিছু না হুজুর। আমাকে হাস-পাতালে পাঠিয়ে দিন।'

'কেন?'

'কাল যদি দুলালী এখানে আসে, আমায় এমন দেখে সব কথা জানতে পারবে। বড়ো কষ্ট পাবে।'

"ওঃ, এই কথা। বেশ, ওই ঘরে ভালো তক্তাপোশে তোমার একটা বিছানা করিয়ে দিচ্ছি। তা হ'লেই হবে তো?'

'না হুজুর, না, আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'

'আচ্ছা খ্যাপা তো।' বল্লেন কর্তা মশাই—'বেশ, তাই হবে।'

পরের সকালে বুড়োকে বেশ আচ্ছন্ন অবস্থায় হাসপাতালে রেখে আসা হ'ল।

দুপুরে সবাই তখন খাওয়া দাওয়া করে উঠেছে, একা একটি মেয়ে বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকলো। তার পোশাক চেহারা আর উদ্বেগের ভঙ্গি দেখে ওই যে দুলালী তা বুঝে নিতে অসুবিধে হ'ল না।

বুড়ো মিস্তিরিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে শুনে আশঙ্কায় সে কেঁদে উঠেছিল। ওকে জানানো হ'ল, ভয়ের তেমন কিছু নেই। শুধু শুশ্রূষার সুবিধের জন্যে এমন ব্যবস্থা। ভিসিটিং আওয়ার ছাড়া যাওয়া যাবে না বলে তখনকার মত ওকে নিরস্ত করা হ'ল। সত্যিই, মায়ায় টেনে রাখার মত দুলালীর মুখখানি। গলায় হাতে পায়ে বিবিধ গয়না। 'বাবুজী' এখানে নেই আর এখন হাসপাতালে যাওয়া হবে না শুনে গেটের বাইরে গিয়ে হাতছানি দিয়ে কাকে

যেন ডাকলো। একটি পশ্চিমী ছেলে গাছ-তলায় বসেছিল। সে উঠে এল। কর্তা-মশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে বাইরে বসিয়ে রেখেছিলে কেন?'

'নাঃ, ও ফিরতি গাড়িতেই চলে যাবে। ওখানে কাজ আছে।'

'তাই ব'লে, এমন অবস্থায় শ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?'

উত্তর না দিয়ে আর্ত চোখে দুজনে পরস্পরের পানে চেয়ে নিল।

এ বাড়ির সবাই এতোদিনে বুড়োর জামাইএর কার্যকলাপ জেনে গেছে। তাই আপত্তির অর্থ বুঝতে অসুবিধে হ'ল না।

সম্ভবত কথা বদলে নেবার জন্যেই দুলালী জানতে চাইল, 'বাবুজির ঘরটা কোথায়?'

কোণের ছোট ঘরটায় পৌঁছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুলালীর বিস্ময় কাটে না। বার বার জিজ্ঞেস করে, এই ঘর? এই বাবুজীর ঘর? পুরোনো তোরঙ্গটা ওর চেনা, তাই বিশ্বাস করতে হয়। মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথা আর কম্বল পড়ে আছে। একপাশে পেতলের একখানা কাঁসি আর এলু-মিনিয়মের তোবড়ানো ঘটি। দেওয়ালের দড়িতে শতছিন্ন দুটো জামা আর একটা গামছা। এই ঘর? বাবুজি এখানেই থাকতো?

এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে কিছুতেই সে স্বীকার করতে চায় না। বার বার প্রশ্ন করে আর শার্সির দিকে তাকায়।

বিড়বিড় করে ছেলেটি কি যেন উত্তর দেয়।

গিন্নীমা ওদের ঘরের মধ্যে রেখে বেরিয়ে আসছিলেন। মনে মনে তিনি ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছেন মেয়েটার ওপর। এই ঘর? এই পেয়েছে তাই না কতো! নয়তো গাছতলায় মরতে হ'তো বুড়োকে। মেয়েটার দারুণ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গিন্নিমা দাঁড়ালেন। ...তুইও আমায় এতোদিন ধোকা দিয়েছিস। শুধু মিছে কথায় বুঝিয়েছিস। বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, দূর হয়ে যা। সব নিমক-হারামের দল। কিছু চাই না তোদের কাছ থেকে।'

ধমক শেষ করে ছেঁড়া কাঁথার ওপর লুটিয়ে পড়ে দুলালী কাঁদছিল। বুড়োর জামাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গিন্নীমার অবাক লাগে, বিরক্তও বোধ হয়। গলায় ঝেঁঝ এসে পড়ে। দোর ধরে দাঁড়িয়ে দুলালীকে বলেন, বাপের ওপর যদি এতো টান, এতোদিনে একবার এসে খোঁজ নিলেই তো পারতে, বাপু। সে তো মেয়ে মেয়ে করে অস্থির। এবার দুলালী অসহায় পশুর মত কাঁদতে কাঁদতে কোনোমতে কম্বলের ওপর উঠে বসলো। কান্না থামে না। কাঁদবে বই কি? গিন্নীমা বুঝতে

পারেন, বেচারির দুঃখ রাখার জায়গা নেই। শুধু বুড়োর লুকোচুরি নয়, আরও কি নিদারুণ মিথ্যে ওকে বইতে হয়েছে। তিনি জানতে পারেন, কেন বাপকে একবার চোখের দেখা দেখে যেতে পারে নি। দেখা করতে এলেই সব জানতে পারতো বাবুজী, জানতে পারতো দুলালী তার বাপের জন্যে কি কান্ডই না করে বসে আছে।

যে নিমকহারাম জামাই বাবুজীর সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে তাকে পথে বসিয়েছিল, একটা কথা জানায় নি দুলালীকে, কেমন করে দুলালী আর তার ঘর করবে। আসল খবর জানতে পেয়েই গাঁয়ের আর একটি ছেলের সঙ্গে চলে এসেছে সে। ছেলেটি বাংলা মুলুকেই কাজ করে। দুলালী ভেবেছিল, কাছাকাছি থাকলে চোখের দেখা না হলেও বাবুজীর সে খবর নিতে পারবে। প্রথমে সে ভেবেছিল একাই বাপের কাছে পালিয়ে আসে। কিন্তু বাবুজীকে সে খুব চেনে। যাই হোক জামাইএর কাছে আবার তাকে পাঠিয়ে দিত। সে দুশমনের অন্ন কি করে মুখে তুলবে দুলালী।

সে জানতে পেরেছিল, বাবুজী কর্মী লোক। আবার সব বাবসা গুছিয়ে তুলেছে এই ছেলেটা কলকাতা থেকে প্রায়ই আসতো খবর নিয়ে যেতো। দুলালী নিজে তো আসতে পারে না। ওই খবর নিয়েই খুশী ছিল। বাবুজি নিজের কারবার নিয়ে বেশ আছে। কিন্তু তখন কে জানতো, এই ছেলেটাও ধোকাবাজ? তারপর দেশ থেকে রিডাইরেক্ট করা বাবুজির চিঠি সে মাঝে মাঝে পেতো। তাতে তারই সমর্থন ছিল। কেন এমন কথা লিখতো বাবুজি? বাপের আদর খাওয়ার লোভ অনেক কষ্টে দুলালী দমন করে ছিল, বুড়ো অন্তত সুখে থাকুক। সেই নিমকহারাম জামাইএর কথা তার জেনে কি হবে? আর দুলালী যে তারই জন্যে স্বামীর ঘর ছেড়ে পাপ করেছে, শুনলে কি সে সহ্য করতে পারবে? আদর করতে পারবে স্বৈরিণী দুলালীকে?

দুলালীর কাহিনীর সঙ্গে কান্না জড়িয়ে রইল। গিন্নীমায়ের দুই হাত জড়িয়ে সে ভিক্ষে চায়। তোমরা আমায় ঠাঁই দাও মা-লক্ষ্মী। ঘরের সব কাজ আমায় দিয়ে করিয়ে নিও। সব করবো, শুধু আজন্মের সাধ, বুড়ো বাবুজিকে সেবা করার সুযোগ দাও তাকে আমি সব বলে দেবো। পায়ে পড়ে মাফ চেয়ে নেবো।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে বারান্দার পাশে তখনও সেই ছেলেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জ্বলে উঠলো দুলালী। একটা থলিতে সম্ভবত কিছু টাকাকড়ি ছিল। সেটাই দুলালীকে দেবার জন্যে ছেলেটি হাত বাড়িয়েছিল। ঘেন্নায় মুখ কালো করে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দুলালী দ্রুত রিকশায় গিয়ে উঠলো। বিড়বিড় করে বল্লে, এখনও যায় নি মিথ্যুকটা। বেহায়া কোথাকার।

বুড়ো মিস্তিরির বুক ঘে'ষে বসেছে দুলালী—'বাবুজি......বাবুজি......'

ডাক শুনে ঠিক চিনলো মিস্তিরি। চোখ চাইল। হাসলো খুব মিষ্টি করে। সুর টেনে টেনে বল্লে, 'বল দেখি মাইয়া, কি এনেছি তোর জন্যে?

'কি বাবুজি' দুলালী ওর গলায় হাত জড়িয়ে দেয়।

গাঁয়ে ফিরে প্রতিবার দুজনে দেখা হওয়া মাত্তর এই আদরের খেলা হতো। বুড়ো মিস্তিরি যেন হারানো সেই মুহূর্ত ফিরে পেয়েছে। বলে, দ্যাখ, একটা পাকা রাজপুত ঘোড়সোয়ার। মাথায় তাজ, হাতে তলোয়ার। কি রকম পাকানো মোছ! কি বাহার পিরান আর ধুতি—দেখেছিস?

'বাবুজি......বাবুজি......' ডাক দিল দুলালী।

উঁহুঃ এখন দেবো না। আগে আদর কর। এই গালে, এই গালে। বুড়ো মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দুলালীর দিকে রাখলো।

কাঁচ মেয়ের মতই গভীর আগ্রহে দুলালীও সেই বলিকুঞ্চিত কুশ্রী মুখে বার বার চুমু দিল।

বিয়ের পর মাস দুয়েকের মধ্যেই এনাক্ষী বুঝতে পারল তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির মধ্যে ব্যবধানটা শুধু এ বাড়ি ও বাড়ির নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি। এদের চালচলন, জীবন-যাত্রার ধরণ-ধারণা একেবারে আলাদা। এনাক্ষীর শ্বশুর আর স্বামী তিনতলা বাড়িতে বাস করেন দামী আসবাবপত্র ব্যবহার করেন, আহার বিহার, আরাম, আর অবসর যাপনের আয়োজন এখানে যথেষ্ট। রেডিও, গ্রামোফোন, বইভরা আলমারি সবই আছে। বরং অবসর ছাড়া এনাক্ষীর পক্ষে আর কিছু নেই। নিজের হাতে এ বাড়িতে তাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না। দু' একদিন সখ করে রাঁধতে গিয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ী বারণ করে বলেছেন, 'দরকার কি এনা। ও সবের জন্যে তো আলাদা লোক-জনই আছে।' তা আছে। বাড়িতে ঠাকুর আর ঝি চাকরের অভাব নেই। কোন পরিশ্রমের কাজ এনাক্ষীকে করতে হয় না। শুধু নিজে সাজা আর নিজেদের শোবার ঘরখানাকে সাজানো। এ ছাড়া আর কোন কাজ নেই এনাক্ষীর। এই বেকার থাকার অভিযোগই একদিন সে তুলল স্বামীর কাছে। অফিস থেকে ফিরে এসে মৃগাঙ্ক ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিল।
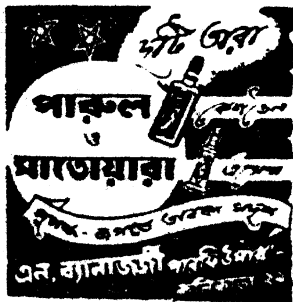
এনাক্ষী সেই চেয়ারের হাতলের ওপর আলগোছে বসে বলল, 'দেখ, বসে বসে আমি যে একেবারে মুটিয়ে গেলাম। এমনিতেই আমাদের একটু মোটা হওয়ার ধাত। তবু আমার মা চল্লিশের কাছাকাছি এসে মোটা হতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু আমি বোধ হয় এই বাইশ তেইশেই মুটিয়ে যাব।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'ভালোই তো। গায়ের অলংকারের মত গায়ের মেদটাও বড়লোকের আভিজাত্য।'

এনাক্ষী মাথা নেড়ে বলল, 'আমি সে আভিজাত্য চাইনে।'

মৃগাঙ্ক হেসে, বলল 'বেশ তো মোটা যখন হবে তখন সে ব্যবস্থা করা যাবে। স্কিপিং করতে পারবে, সিঁড়ি দিয়ে দিনের মধ্যে পঁচিশ বার ওঠা নামা করতে পারবে। তাতেও যদি ক্ষীণাঙ্গী না হতে পার ডাক্তাররা রয়েছেন।'

এনাক্ষী বলল, 'বেশ শরীরের ভাবনাটা না হয় নাই ভাবলাম। কিন্তু মন? মনের চর্চা তো এখানে বন্ধ।'

মৃগাঙ্ক বলল 'সে কি কথা। আর যে কোন অভাবই এখানে থাকুক, জলজ্যান্ত আমি বর্তমান থাকতে হৃদয় মনের চর্চার তো কোন অভাব হওয়ার কারণ দেখিনে। অবশ্য আমার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়ার খেলায় এরই মধ্যে তুমি যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে থাক, সে কথা আলাদা।'

এনাক্ষী কোন জবাব দিল না। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে। মন দেয়া নেয়াটা ওদের কাছে খেলারই সামিল। ইঁট কাঠ লোহালক্কড়ের ব্যবসার ফাঁকে অবসর যাপনের একটুখানি নরম উপকরণ। কিন্তু এনাক্ষীর কাছে তো তা নয়। সে সত্যিই স্বামীকে মন দিতে চায়, তার মন পেতে চায়। শুধু মৃগাঙ্কের অন্দর মহলে নয়, তার অন্তর মহলে প্রবেশ করবারও সাধ এনাক্ষীর।

কিন্তু সে সাধ ঠিকমত মিটতে চায় না। একটা প্রচণ্ড বাধা অনুভব করে এনাক্ষী। প্রথমে ভেবেছিল সে বাধা বুঝি মৃগাঙ্কের দিক থেকে। সেই দোর বন্ধ ক'রে রাখতে চায়, সেই ঢুকতে দিতে চায় না, কিন্তু যত দিন যায়, তত টের পেতে থাকে এনাক্ষী বাধাটা বাইরের নয়, ভিতরের বাধাটা মৃগাঙ্কের নয়, এনাক্ষীর নিজের। এ বাধার নাম বিতৃষ্ণা।

এই বিতৃষ্ণা এনাক্ষী প্রথম বোধ করল প্রভাকরবাবুর বাড়িটার ওপর। বাড়িতো নয় একটি দুর্গ। চারদিকে উঁচু দেয়াল। এই দুর্গের বাইরে বেরোবার অনুমতি পাবে না এনাক্ষী। এত বড় বাড়ি, এতগুলি ঘর, মাঠের মত একটি ছাদ পড়ে রয়েছে। এর বাইরে কোথায় যেতে চায় এনাক্ষী। কি প্রয়োজন তার যাওয়ার।

এর তুলনায় এনাক্ষীর বাপের বাড়িতো খাঁচার মত। কিন্তু খাঁচা হলেও সে খাঁচার দোর ছিল সব সময় খোলা। এনাক্ষী বেশি বেরোত না বটে, কিন্তু যে কোন সময় বেরোবার স্বাধীনতা ছিল। ঘর ছোট হলেও বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে বড় বাড়িটা বৃহত্তর পৃথিবীকে যেন আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। দু' পা বাড়ালেই তো এনাক্ষীর বাপের বাড়ি। কিন্তু বাড়াবার জো নেই। শাশুড়ী বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এ বাড়ির বউ যখন তখন বেরোলে মানের হানি হয়। কোন পাড়া পড়শীর বাড়িতে যাওয়ার জো নেই। তারা সবাই এনাক্ষীর শ্বশুরমশাইর তুলনায় মর্যাদায় খাটো। নিমন্ত্রণ পেলেই তো সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা চলে না। এঁদের সমমর্যাদার আত্মীয়-স্বজন দু'চার ঘর যা কলকাতায় আছেন তাঁদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ক্ষীণ। আর আছে গরীব সাহায্যপ্রার্থীর দল। তারা নানা প্রয়োজনে প্রভাকর আর মৃগাঙ্কের কাছে এসে হাত পাতে। সব সময় যে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় তা নয়। বরং বেশিভাগ সময় মুখ কালো করেই এরা বিদায় নেয়। তাদের বাড়িতে এনাক্ষীদের নিমন্ত্রিত হওয়ার কথা ওঠেই না।

পরিজনদের বাদ দিলে এ-বাড়িতে এনাক্ষীর যাঁরা প্রিয়জন তাঁরা সংখ্যায় মাত্র তিন। শ্বশুর শাশুড়ী আর স্বামী। কিন্তু এই তিনজনের কারো সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্টভাবে মিশতে পারে না এনাক্ষী।

শ্বশুর প্রভাকরবাবু আকারে ক্ষীণকায় হলেও প্রকারে ভারি রাশভারি পুরুষ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন নিজের কাজকর্ম বিষয় আশয়ের আলোচনায় ব্যস্ত দেখা যায়। এনাক্ষী হয়ত কোনদিন তাঁকে এক কাপ ওভালটিন দিতে যায়, কোনদিন বা

এক কাপ দুধ, কি খাওয়ার সময় কোনদিন একটা তরকারি পরিবেশন করে আসে। তিনি হয়ত হেসে বলেন, 'বাঃ বেশ লক্ষ্মী মেয়ে।'

আলাপ পরিচয় এর বেশি এগোয় না। ব্যস্ততা, ঔদাসীন্য, অন্যমনস্কতার ভিতর থেকে এনাক্ষীকে কাছে ডাকবার জন্যে কি তাকে দুটি মিষ্টি কথা বলবার জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর আগ্রহ যে না দেখা যায় তা নয়, কিন্তু সে আগ্রহ তিনি নিজেই দমন করেন। এ সব সময় নিজের বাবার কথা মনে পড়ে এনাক্ষীর। তাঁর সারল্য বাৎসল্যের কথা মনে পড়ে। সেই তুলনায় পিতৃসম শ্বশুরের মনে স্নেহ ভালবাসার কিছু অভাবই যেন বোধ করে এনাক্ষী। শাশুড়ী বিভাবতী তাকে অবশ্য খুবই আদর যত্ন করেন। বার বার বলেন, মৃগাঙ্কের ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম মা। এতদিন আমি ও'কে গড়েছি, এবার তোমার গড়ে নেওয়ার পালা।'

এনাক্ষী মুখ নিচু করে জবাব দেন, 'মা, গড়ে নেওয়ার কি আর সময় আছে?'

বিভাবতী বলেন, 'কেন থাকবে না এনা? আমার মৃগাঙ্ক তো বুড়ো হয়ে যায়নি? কিইবা ওর বয়স।'

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করেন বিভাবতী। দুজনের মধ্যে স্থায়ী মধুর, সুখের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হলে যে অনেক ধৈর্য, সহনশীলতা আর সহানুভূতি থাকা দরকার সে কথা প্রায়ই বলেন।

শুনতে শুনতে কিসের যেন একটা আশঙ্কা অনুভব করে এনাক্ষী। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে বিভাবতীর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার বোঝা কেন তিনি এত তাড়াতাড়ি এনাক্ষীর ওপর চাপাতে চাচ্ছেন? ছ মাসের বেশি যার বিয়ে হয়নি, যে সবেমাত্র সংসার শুরু করেছে তাকে কেন শেষ বয়সের অভিজ্ঞতার কথা জোর করে শুনিয়ে দেন বিভাবতী। এনাক্ষীর ভালো লাগে না, তার মনে হয় শাশুড়ী তাঁর ছেলে সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন, তাঁর ইশারা ইঙ্গিতে অনেক রহস্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট করে খুলে বলেন না তিনি। এই অস্পষ্টতা এনাক্ষীর ভারি খারাপ লাগে। সেভাবে যা স্পষ্ট করে বলা যায় না তা বলতে যাওয়া কেন?

বিভাবতী কথায় কথায় বলেন, 'সংসারের সবাই তো তোমার। দু'দিন বাদে তোমাকেই তো সব গছে নিতে হবে। এখন থেকে দেখে শুনে বুঝে শুনে নাও বাপু।'

মুখে বলেন বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিয়ে দেন না, এনাক্ষীর হাতে কিছু ছেড়ে দেন না। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র জমা খরচের খাতা, সিন্দুকের চাবি সব নিজের অধিকারে রাখেন। এ সব দিকে অবশ্য লোভ নেই এনাক্ষীর। কিন্তু শাশুড়ীর এই অতি সতর্কতা, সব আগলে রাখা; আড়াল করে রাখার ইচ্ছা কেন যেন তেমন ভালো লাগে না এনাক্ষীর। কাউকে 'ঘরে এসো' বলে ডেকে এনে চৌকাঠের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে যেমন হয়, এনাক্ষীর বেলায়ও তাই হচ্ছে।

প্রভাকর বিভাবতী আর মৃগাঙ্ক যখন নিজেদের আলাপ-আলোচনা করেন এনাক্ষী সে গণ্ডির বাইরে পড়ে থাকে। প্রভাকর দেখতে পেলে হয়ত বলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন এনা। এসো এখানে এসে বসো।'

কিন্তু এনাক্ষী তাঁদের বৈঠকে গিয়ে পারত পক্ষে বসে না। বসলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সেখানে। উসখুস করতে করতে হঠাৎ এক সময় উঠে আসে। তার মনে হয় এরা তিনজন মিলে যে ব্যূহ রচনা করেছেন তার মধ্যে এনাক্ষীর ঢুকবার সাধ্য নেই, বোধ হয় ইচ্ছাও নেই।

তাই এত বড় বাড়ি আর এত লোকজনের মধ্যেও এনাক্ষীর একেক সময় মনে হয় সে যেন নিঃসঙ্গ হয়ে রয়েছে। কারো সঙ্গে তার কোন মিল নেই, মিলবার স্পৃহা নেই। কিন্তু এই নিস্পৃহতাও সব সময় নিজের কাছে সহনীয় লাগে না।

ফের একদিন স্বামীর কাছে কাজের কথা তুলল এনাক্ষী। বলল, 'দেখ, চুপ চাপ বসে বসে আমার শরীর যেমন মোটা হচ্ছে, মনেও তেমনি মরচে পড়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে নিজেকে এভাবে আমি আর নষ্ট করতে পারব না।'

মৃগাঙ্ক হেসে উঠল, 'বল কি! ঘরে বসে আবার কেউ নষ্ট হয় নাকি? আমাদের এ বাড়ির ধারণা লোকে বাইরে গেলেই নষ্ট হয় বাইরে থেকেই নষ্ট হয়ে আসে।'

এনাক্ষী বলল, 'এ ধারণা তোমারও আছে না কি?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমার থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না। বাবা যতদিন আছেন, তিনিই সব ধারণ করে বসে থাকবেন।'

এনাক্ষী বলল, 'কিন্তু তুমি তো আর নাবালক নও, যে সব সময় তোমার বাবার ধারণা মতই চলতে হবে। তোমার নিজের

তো আলাদা মত আছে, রুচি আছে, বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে?'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'আস্তে আস্তে। কথাগুলি কোন ঝি চাকরের কানে গেলে তারা ভাববে বিয়ে হতে না হতেই নতুন বউ স্বামীকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।'

এনাক্ষী বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাজে ঠাট্টা রাখ। আগে যা বলেছি, তোমাকে এখনো তাই বলি। আমি চুপ করে ঘরে বসে শুধু বড়লোকের বাড়ির বউ হয়ে থাকব না। আমি বাইরের কাজকর্মও করব।'

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, 'কি কাজ?'

এনাক্ষী বলল, 'যে কোন কাজ। মাস্টারী হোক, কেরানীগিরি হোক, যা পার তাই নেব।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কিন্তু তাতে কতই বা পাবে।'

এনাক্ষী বলল, 'মাইনে পাওয়ার জন্যে তো কাজ নেব না। আমি পঁচিশই পাই, পঞ্চাশই পাই তোমাদের সংসারে তার দরকার হবে না। তা আমি জানি। আমি আমার রোজগারের টাকা গরীব দুঃখীর সাহায্যের জন্যে পাঠাব, কি অন্য কোন সৎকাজের তহবিলে চাঁদা দেব।'

মৃগাঙ্ক হঠাৎ স্ত্রীকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তুমি কেন যৌবনে যোগিনী হতে চাইছ এনা? এত উদাস ভাব তোমার কিসের জন্যে?'

এনাক্ষী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরম ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'তুমি আবার মদ খেয়ে এসেছ?'

স্বামীর আলিঙ্গন থেকে এনাক্ষী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ছিঃ'।

মৃগাঙ্ক একটুকাল চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'অত ছি ছি করবার কি হয়েছে এনা। তুমি পিউরিটান মাস্টারের মেয়ে। এসব আসব চর্চা কোনদিন দেখনি। তাই একটু খারাপ লাগছে। কিন্তু মাস কয়েক আমার সহধর্মিণীরূপে থাকবার পর সব অভ্যাস হয়ে যাবে। দৃশ্য, গন্ধ, গান—সব।

এনাক্ষী মাথা নেড়ে বলল, 'না কোনদিন আমার অভ্যাস হবে না। অভ্যাস হোক তা আমি চাইনে।'

মৃগাঙ্কের যে অল্প স্বল্প পানাভ্যাস আছে তা সে আগেই স্বীকার করেছে। স্ত্রীকে সে যুক্তি দিয়ে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে মদটা দোষের নয়, মত্ততাটাই দোষের। কিন্তু এনাক্ষী কিছুতেই তা মানতে চায়নি। স্বামীর এই অভ্যাসের কথা শ্বশুর শাশুড়ী যে জানেন তা এনাক্ষীর বুঝতে বাকি নেই। মৃগাঙ্কের এই অভ্যাসের কথা প্রথম আবিষ্কার করে সে প্রথমে যেভাবে স্তম্ভ আর বিমূঢ় হয়েছিল তা অবশ্য এখন আর নেই। একেকবার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও বাপের বাড়ির কাউকেই অবশ্য সে একথা বলেনি। কিন্তু তাই বলে মেনেও নেয়নি। বাইরে তর্কবিতর্ক যতটুকু করেছে, তাই দ্বিগুণ বিক্ষোভ আর বীতস্পৃহা সঞ্চয় হয়েছে মনের মধ্যে। অথচ এনাক্ষী তো তৈরী হয়েই এসেছিল। মৃগাঙ্ক যে এনাক্ষীর বাবার মত নয়, দাদার মত নয়, তার আভাস কি সে আগেও পায়নি? তখন ভেবেছিল নতুনত্বে আনন্দ পাবে, বৈচিত্র্যেই খুশি হবে। কিন্তু যে বৈচিত্র্য মনঃপূত নয় তা সহ্য করা যে শক্ত সে কথা টের পেতে এনাক্ষীর বেশি দেরি হলনা। ছ' মাসের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইল। - নতুন কাজ চাই, নতুন আবহাওয়া চাই। বাইরে এনাক্ষীকে বেরোতেই হবে। স্বামী আর শ্বশুরের সমর্থন যদি না পায় তবুও।

ক্রমশ

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

প্রাচীন বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন "ইহাতে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অপেক্ষা বাঙালীর চিত্তধর্মের ক্রমবিকাশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য কিয়দংশে বাস্তব-বিস্মৃত, ইতিহাসের বহির্দেশীয় এই জাতির সাহিত্যে সবিশেষ সঞ্চার করিতে পারে নাই। দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালীর বিপুল সাহিত্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সহিত বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনের যোগাযোগ নির্ণয়ের সামান্য চেষ্টা করিয়াছি।" অপর একস্থানে তিনি লিখেছেন "প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সাহিত্যের মধ্যেই বাঙালীর জীবনধর্ম ও সাধনা মহাদেবের জটা নির্মুক্ত ভাগীরথী-ধারার মত উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।......প্রায় আট শতাব্দী ধরিয়া সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর জীবনচর্যা কখনও স্থূল লৌকিক চেতনার মধ্য দিয়া, কখনও বা সূক্ষ্ম আত্ম-সাধনার রস-বিবক্ষা আশ্রয় করিয়া ক্রমবিকাশ হইয়াছে।"

তারপর দশম শতাব্দীর পালযুগে আর্যেতর সংস্কার, চীনীয় তন্ত্র ও প্রাকৃত আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্র চর্যাপদের পটভূমিকায় বৌদ্ধ প্রাকৃত সমন্বয়, প্রথম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিস্তরে নিদর্শন "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" থেকে আরম্ভ করে তিনি ভারতীয় লোকসংস্কৃতির উত্থান-পতনের পটভূমিকায় বাঙালীর জীবন-ধারা ও তাদের সাহিত্যের রসধারার ক্রমবিকাশের আলোচনা করেছেন, এসে থেমেছেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের দেহান্তে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অবসানে। এই বাঙালীর জীবনে ইংরাজ শাসনের সূচনা। শেষে তিনি একথাও বলেছেন, "প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রধানত গ্রাম্য। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের মত নব বাংলা সাহিত্য আমাদের বাঙালীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে কি? মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি কথাটা প্রায় সত্তর বছর পূর্বে উচ্চারিত হইলেও এখনও কি আধুনিক বাংলা সাহিত্য সর্বসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে?"

শুধু বিদ্যার্থীরা নয়, বিদগ্ধ রসান্বেষীরাও এই পুস্তক পাঠে লাভবান হবেন। সাহিত্য বিচারের পুস্তক হলেও নিজস্ব ভাষা-সম্পদে পুস্তকটি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হবে। পুস্তকটির অঙ্গ-শোভার জন্য প্রকাশক প্রশংসা পাবার অধিকারী। ৪৯৬।৫৫

বাঙালীর ইতিকথা। সমরেন্দ্রকিশোর দত্ত ও অশোক গুহ। পরিবেশক—এম ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোং, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ সিকা।

রাজা-রাজড়া নয়, সামাজিক মানুষের দিকে নজর দিয়েছেন আজকাল ঐতিহাসিকেরা। একটা দেশের প্রকৃত ইতিহাস তো তাই। বাংলাদেশ ও বাঙালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান

করেছেন জ্ঞানী গুণী কয়েকজন ঐতিহাসিক। কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের ফল বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের জন্য। অথচ নিজের দেশ ও দেশবাসীর সংবাদ জানা উচিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও। সে-চেষ্টা এতদিন হয়নি। নীহাররঞ্জন রায়ের বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিও মোটামুটি বড়দের জন্যই। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হবে, বাঙালীর ইতিকথা এ-পথের পথিকৃৎ। এ-গ্রন্থ একেবারে কিশোর-পাঠকদের জন্য এবং সুন্দর গল্পের ঢঙে দিয়ে বলা। ফলে যাদের উদ্দেশ্যে এ-গ্রন্থ রচিত তারা পরিপূর্ণভাবে তার আস্বাদনলাভে সমর্থ হবে। এ-ধরনের বই যতো বেশী প্রকাশিত হয় ততই ভালো। প্রচ্ছদসজ্জা মনোরম। ৫০৯।৫৫

ভ্রমণ কাহিনী

কাশ্মীর — শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ১১১ পৃষ্ঠা, মূল্য চার টাকা।

সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী, ৬৯খানি ছবি সম্বলিত। নিত্যনারায়ণবাবু ইতিপূর্বে অনেক ভ্রমণ করেছেন এবং অনেক বই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর লেখা ভ্রমণ-কাহিনী রসপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য হবে এত জানা কথা। মনে হয় আমাদেরও তিনি সঙ্গে নিয়ে চলেছেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখাতে দেখাতে। অজস্র ছবিগুলি তাঁর সরস বর্ণনার পরিপূরক। বর্ণনা বিদগ্ধও বটে। প্রত্যেকটি স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশেই সেখানকার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক স্থানের সুবিধা অসুবিধা, প্রত্যেকটি যাবার পথ, সবই পাঠক এর মধ্যে পাবেন। আর পাবেন কাশ্মীর রাজবংশের রাজ্যকালীন ইতিহাস, পাকিস্থানী প্ররোচনায় আফ্রিদি প্রভৃতি উপজাতি দস্যুদের দলবদ্ধভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করে লুট, অগ্নিদাহ ও নারী ধর্ষণের নারকীয় তাণ্ডবের রোমহর্ষক কাহিনী। এতে আছে শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত। পুস্তকটি শেষ হয়েছে বাঙলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীরে বন্দী-দশায় মৃত্যুর শোকাবহতায়। কাশ্মীর সম্পর্কে বহুদিনই সকলের প্রগাঢ় কৌতূহল ছিল এবং আজ কাশ্মীর ভারতবাসীদের চিন্তার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। এই পুস্তকখানি পড়লে এই দেশটি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সুতরাং পুস্তকটি জনপ্রিয় হবে বলেই মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক পুস্তকটি অঙ্গশোভা বর্ধনে কার্পণ্য করেননি। ৬।৫৬

জীবনী

বে [illegible] **মহাজীবন**—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ১৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

সচিত্র জীবনী পুস্তক। অতীত যুগের ভিনদেশী মনীষীদের ধ্যানধারণা [illegible] সাধনার ইতিবৃত্ত, তাদের বিচিত্র জীবনের বর্ণাঢ্য কাহিনীগুলি উপন্যাসের মতই কৌতূহলোদ্দীপক। এগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে প্রেরণা জোগাতে সক্ষম হবে। বিষয়গুলি যে কত বিচিত্র তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকেই বোঝা যাবে। সক্রেটিসের জ্ঞানতপস্যা, দান্তের অতীন্দ্রিয় প্রেম, সাহিত্যিক ও সংস্কারক টলস্টয়, মানবতার পুরোহিত চার্লস ডিকেন্স, চিত্রশিল্পী র‍্যাফেল, বায়রনের বিদ্রোহ, এডিসনের বিজ্ঞান-সাধনা, দা ভিঞ্চির বহুমুখী প্রতিভা, অভিনয়শিল্পী হেনরি আর্ভিং, কিপলিং, লোকসেবক লুই পাস্তুর, কূটনীতিবিশারদ বিসমার্ক, ভাস্কর্যশিল্পী মিকেলেঞ্জেলো, বেটোফেনের জীবন-সংগ্রাম, পর্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হেনরি লেয়ার্ড এবং কারুশিল্পী বেল্লিনি। সুখ দুঃখ সমৃদ্ধি দারিদ্র্য সঙ্কটের

মধ্যে দিয়ে এ'দের জীবনের যে বিশেষ ঘটনাগুলি এ'দের প্রতিভার স্ফুরণে সাহায্য করেছিল সেগুলির উপর লেখক সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন।

৬১৭।৫৫

ধর্মগ্রন্থ

১। **আত্মগঠন বা ব্রহ্মচর্য প্রসংগ**—১৷৷০, ২। **দিনলিপি**—৮০, ৩। **বিধবার জীবনযজ্ঞ**—৯।০, ৪। **কুমারীর পবিত্রতা**—৮০, ৫। **কুমারীর পবিত্রতা** (২য় খণ্ড)—৮০। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস কর্তৃক প্রণীত। অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬।১৯এ স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বেনারস হইতে প্রকাশিত।

ব্রহ্মচর্যকে ভিত্তি করিয়া নৈতিক উচ্চজীবনের পথে চরিত্র গঠনের দ্বারা উন্নত জীবনের অধিকারী হইবার উপর পুস্তক কয়েকখানির লেখায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভাষা প্রাণপ্রদ এবং সহজ ও সরল। পুস্তকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার বলিষ্ঠতা সাধনে সহায়ক।

১৮, ২১, ২৪, ১৯, ২০।৫৬

(১) **বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য**—২৷৷০
(২) **সংযম সাধনা**—২।০
(৩) **প্রবুদ্ধ যৌবন**—১।০

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস প্রণীত। অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বেনারস-১ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম পুস্তকখানিতে পবিত্রভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠান্তে আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়াছি। এখানি সত্যই সৎসাহিত্যস্বরূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য। লেখক নিজে ব্রহ্মচারী এবং একজন সাধক। যৌন-রহস্যের ভিতর দিয়া তিনি মানব-জীবনের মূলীভূত মহান্ সত্যকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশসমূহ সাম্প্রদায়িক সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত এবং উদার, নৈতিক শক্তিতে সেগুলি জীবন্ত এবং সংকল্পশীলতার ব্যঞ্জনায় বলিষ্ঠ। মাতৃজাতির প্রতি সহানুভূতির আন্তরিকতার তাঁহার আলোচনা উদ্দীপ্ত এবং মনুষ্যত্বের পথে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল আগ্রহে সেগুলি প্রাণবান। নরনারীর জীবন-সাধনার ভিতর দিয়া জাতির উন্নতি ও কল্যাণ চেতনাকে আধুনিক যৌন-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষায় উদ্দেশ করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতীয় আদর্শের উৎকর্ষকে অভিব্যক্তি দিয়া তিনি পাশ্চাত্যের জড় ভোগমূলক ইন্দ্রিয় লিপ্সার আকর্ষণ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার যে প্রেরণা পুস্তকখানিতে সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা সমাজের সর্বত্র অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।

অপর দুইখানি পুস্তক প্রধানত যুবকদের জন্য লিখিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য এবং সংযম-সাধনার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত কতকগুলি প্রক্রিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। উন্নত জীবনের আদর্শ তরুণদের মধ্যে সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে পুস্তক দুইখানি বিশেষ উপযোগী।

২৩, ২৭, ২২।৫৬

বিবিধ

ঐশ্বর্য তোমার হাতের মুঠোয়ঃ শ্রীপতি চক্রবর্তীঃ কল্যানবগ্রাম, বর্ধমানঃ ১।০

বইটির ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, "আমাদের মধ্যে যাঁহারা জীবনে হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে নিজেদিগকে জানিয়া, তাঁহাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া এবং একটি সুপরীক্ষিত নীতি অনুসরণ করিয়া যশ, অর্থ ও স্বাস্থ্য এক সঙ্গে লাভ করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।" এই বক্তব্যের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে বইটিতে। তবে আলোচনার রীতি স্কুল মাস্টারসুলভ না হলে হয়তো ভালো হতো।

৩১২।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

স্বর্ণ-কুয়াশা—সুনীল ঘোষ।
অনেক গান একটি জীবন—শ্রীকামাখ্যা সরকার।
নির্বোধ—নাটক; সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে একাঙ্কিকা—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।
শোন বলি মায়ের কথা—শৈলেশ ব্রহ্মচারী।
গৌরকথা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার।
সাকেনে বসন্ত—কর্জি গুলিয়া অনুবাদক—সুবোধ রায়।
স্মৃতি-কুসুম—শান্তি দেবী।
ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা—প্রিয়তোষ মৈত্রেয়।
Our Buddha—Mani Bagchi.
গৌতম বুদ্ধ—মণি বাগচি।
পৌরাণিকী—গিরীন্দ্রশেখর বসু।
সেক্‌সপিয়ারের ট্র্যাজেডি—শ্রীহৃষীকেশ তালদার।
বারো ঘর এক উঠোন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
নানা রঙের দিন—সন্তোষকুমার ঘোষ।
কাঞ্চন-মূল্য—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
বিচিন্তা—রাজশেখর বসু।
স্ব-নির্বাচিত গল্প—শিবরাম চক্রবর্তী।
যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ।
গ্র্যান্ড কার্নিভাল হোটেল—আর্নল্ড বেনেট অনুবাদক—শ্রীইন্দুভূষণ দাস।
জংগলে—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
পশ্চিম বঙ্গীয় ভাড়াটিয়া আইন ১৯৫৬—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
সম্ভ্রান্ত অতিথি—শ্রীকালীপদ সেন।
নিঃসংগ—সতীশচন্দ্র দে।
একটি সাচ্চা মানুষের গল্প—বোরিস পোলেভয় অনুবাদক—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়।
পেট্রিয়ট—পার্ল বাক অনুবাদক—পুষ্পময়ী বসু।
ছোটদের গৌতম বুদ্ধ—মণি বাগচি।
তাপসী—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী।
দুই আর দুই—দিলীপ রায়।
হরী—সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
পঞ্চরত্ন—ললিতমোহন ভট্টাচার্য।
নরেশ গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)—সেনগুপ্ত ট্রাস্ট কর্তৃক পি-৯৭, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
যুগে যুগে ভগবান—স্বামী তুলসীয়ানী।
স্মরণীয় যাঁরা—শ্রীঅলককুমার ঘোষ।
আমার দেশ—শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য।
আমাদের শরীর—শ্রীলাবণ্যবিকাশ ঘোষ।
একটি সাঁওতালী গল্প—শ্রীসুকুমার রায়।
গাঁয়ের মেয়ে—শ্রীউমা ঘোষ।
শ্রীচৈতন্য—বাণী গুপ্ত।
ছোট ছোট মন—শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য।
জলের কথা—শ্রীঅমরনাথ রায়।
দুই ভাই—শ্রীঅচিনকুমার চক্রবর্তী।
দেশজননীর ব্রতকথা—শ্রীতারা রায়।
দেশ নায়কের কথা—শ্রীসুনীল ঘোষ।
নতুন বউ—শ্রীদেবেশ রায়।

শ্রী যুক্ত নেহরু এক সাম্প্রতিক ভাষণে জনসাধারণকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। —"প্রস্তুত তারা হয়েই আছে এবং সত্যিকথা বলতে দারিদ্র্য হচ্ছে তাদের জন্ম-শত্রু: সুতরাং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারা চিরকালই চালিয়ে এসেছে। কিন্তু এ যুদ্ধ নেহাৎ ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরামের যুদ্ধ। যা হোক, এবার এটম-হাইড্রোজেন না হলেও অন্তত গ্রেণ্ড খুঁড়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকার কৌশলটা জনসাধারণকে শিখিয়ে দিলে দারিদ্র্যের সাধ্য কী যে তাদের কাবু করে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পূ র্ব পাকিস্তানের মুসলমান মহিলারা নাকি জমিদারী প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য একটি শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। —"জমিদার বেশির-ভাগ হিন্দু, বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুসলমান মহিলারা! হাতে কাজ না থাকলে খৈ না ভেজেও কাজ করা যায়,—অস্যার্থ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আ মেরিকার জনৈক ডাক্তার ঘোষণা করিয়াছেন যে, অচিরেই একজনের হৃদয় তুলিয়া নিয়া অপরের বক্ষে স্থাপন করা সম্ভব হইবে। —"পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম-মহরম দেখে এমনিধারা একটা আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা আমরা আগেই

অনুমানে আঁচ করেছিলাম"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আ মেরিকার অন্য একটি আবিষ্কার সংবাদে জানা গেল এখন হইতে নাকি মশককুলকে জনহিতে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে বিদেশে রপ্তানিকৃত মশের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য মশক ব্যবহার করা হইতেছে। —"বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারতের অন্য একটি গুরুত্ব-পূর্ণ রপ্তানি-শিল্পের সন্ধান পাওয়া গেল; অবশ্য মশা মারতে গালে চড়টা যেমন ছিল, তেমনি হয়ত থাকবে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

স রকারী দপ্তরের বড়কর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য শীঘ্রই একটি অনুসন্ধান কমিটি সংগঠনের ব্যবস্থা

মেজোকর্তা ও খুদে কর্তা
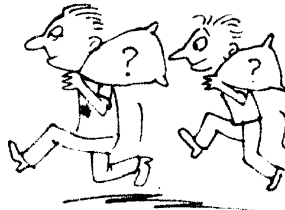
করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"মেজো আর খুদে কর্তারা বেঁচে গেলেন। এ ভালোই হলো, নইলে রকমসকম যা দেখছি এবং শুনছি তাতে বাছবিছি করতে গিয়ে গোটা দপ্তরই হয়ত উজাড় হয়ে যেতো"!!

* * *

এ ইবারে কালবৈশাখী তেমন হইল না, আমরা সেই আলোচনাই করিতে-ছিলাম। বিশুখুড়ো কী বুঝিলেন জানি না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"কলকাতায় নায্য মূল্যের চালের দোকান খোলা হয়েছে, —ঝড়ের পূর্বাভাস"!! আমরা কিছুই বুঝিলাম না, হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেলাম।

* * *

দ্বি তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শুনিলাম প্রায় ত্রিশ হাজার সাধুকে সমাজসেবায় নিযুক্ত করা হইবে; তাঁরা পান-বর্জন, ভেজাল-বর্জন কাজে সমাজকে সচেতন করিয়া তুলিবেন। —"উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু আমরা বলি, এর চেয়ে ব্যাপক দীক্ষার ব্যবস্থা করে যদি স্রেফ গেরুয়া আর চিমটে হাতে দিয়ে জনসাধারণকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে গোটা পঞ্চবার্ষিকীর ঝামেলাই চুকে যায়। আর জনসাধারণের দিক থেকেও তখন—"গবা-ঘৃত ইত্যাদিও থাকবে নাকো বাকি"—দ্বিজেন্দ্রলালের গান উদ্ধৃত করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

লো কসভায় একটি বিতর্ক সংবাদে প্রকাশ যে, কুসম্পত্তিতে নারীকে সমান উত্তরাধিকার দানে নাকি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। —"লেডীস্ সীটে সমানাধিকারে বঞ্চিত থাকার মূলে এই আপত্তির কোন হেতু আছে কি না তা বোঝা গেল না"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

—শৌভিক—

চর্বিত চর্বণ

সেই মুখে তিরিক্ষি অথচ মনে মনে দয়ার সাগর; এই বলে এক, সঙ্গে সঙ্গে কাজে তার বিপরীত; এমনিধারা সেই শোক-জর্জর বাস্তববাগীশ বৃদ্ধ; সেই নিজের ছেলেকে খুইয়ে পরের ছেলের ওপর মায়া করবো না করবো না করেও মায়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়া; সেই শৈশব থেকে বাল্য, বাল্য থেকে কৈশোর পর্যন্ত সঙ্গিনীর বিয়ের দায়িত্ব নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষে কলকাতায় গিয়ে কোন আধুনিকাকে পেয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা; সেই পরের অন্নে মানুষ হবার খোঁটা খেয়ে খেয়ে একদিন অতিষ্ঠ বোধ করে গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং সেই কলকাতার আকর্ষণে ধোঁকা খেয়ে একদিন ঘরে ফিরে আসা—এই উপাদান যা নিয়ে কতো যে ছবি আগে হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই—সেই একই উপাদান নিয়েই তৈরী এস আর প্রডাকসন্সের 'পরাধীন'। এ যা পদার্থ এর জন্যে মধু বসুর মতো পরিচালক নিয়োগের কোনই প্রয়োজন ছিল না; আর মধু বসু পরিচালনায় থেকেও নতুন কোন বৈশিষ্ট্যও এতে ফোটাতে পারেন নি। এমনিই বহুবার-পাওয়া চরিত্র ও ঘটনা যে, ছবিখানি আরম্ভের পর একটা দৃশ্যের কিভাবে পরিসমাপ্তি হবে বা কোন্ ঘটনাটি কোন্ পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যাবে, তা প্রায় মুখস্থর মতো বলে যাওয়া যায়। কৌতূহল বলতে কিছু জাগে না, আর দর্শক-মনে কৌতূহলই যদি না জাগলো তো গল্পের ওপরে আর যে সব কারণে আকর্ষণ ধরে রাখা যেতো, সে সব দিক থেকেও ফাঁকা। মৌলিকত্ব তো নেই-ই কিছুতেই, তার ওপর এমন একটা মাত্রও দৃশ্য গঠিত পাওয়া যায় না, যার মধ্যে নাটকীয় চমক ধরিয়ে দেবার মতোও জোর পাওয়া যায়। গল্পের এই অসারত্ব ও অসাড়ত্ব ছবির যাবতীয় বিভাগেরই কাজের মধ্যেই নিষ্প্রভতার ভাবটাই পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে।

* * *

চিত্রনাট্য রচনারীতির একটা ব্যাকরণ আছে। কোন্ ধরনের ভাবের পর কোন্ ধরনের ভাব যুক্ত করলে দর্শকমনে আবেগের সঞ্চার হওয়ার কথা; কান্নার পর অথবা কান্নার সঙ্গে কিভাবে হাসির অবতারণা রাখতে হয়; কিভাবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত পাকিয়ে তুলতে হয়, এ সবের একটা মাপজোখ আছে এবং "পরাধীন"-এর চিত্রনাট্য রচনায় মনোজ ভট্টাচার্য হয়তো সেই রীতিরই চলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এমন সে-চেষ্টা যে হাতে যুক্তি যেমন অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি রস জমাবারও কোন দম সৃষ্টি হতে পারেনি। গল্প আরম্ভ হলো গ্রামের পথে। এক বিধবা গরুর গাড়িতে চড়ে আসছে, সঙ্গে বছর পাঁচেকের একটি ছেলে। একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। বিধবা ছেলেটিকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার মুখে সদর দরজার ওপরেই দারোয়ানের নাম করতে করতে এক প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালো। ওদের কথাবার্তায় জানা গেল এরা রামতারণ ঘোষাল, বিধবাটি তার পুত্রবধূ এবং ছেলেটি [illegible] একমাত্র সন্তান। দাদা ও বৌদি উঠোউঠি মারা যেতে বধূ নিরাশ্রয় অবস্থায় শিশু সন্তানকে নিয়ে এসেছে মানুষ করবে বলে। কিন্তু ওরা এসে পৌঁছতেই এবং দরজার ভিতরে পা দেবার আগেই রামতারণ জানিয়ে দিলো নিজের পুত্র তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, অপরের ছেলেকে নিয়ে আর সে মায়া বাড়াতে পারবে না, [illegible] অনাত্মীয়বলেই ছেলেটিকে অনায় বিদায় করে দেয়। এই যে দৃশ্যের অবতারণা—জমিদার, তা সে যতো রুক্ষ প্রকৃতিরই হোক, তার গৃহলক্ষ্মী পুত্রবধূ গাড়ি থেকে নামামাত্রই সদরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কড়া কড়া কথা শুনিয়ে ছেলেটিকে বিদেয় করে দিতে বললে, এ ধরনের দৃশ্যবিন্যাস স্বল্প-পরিসর মঞ্চের ওপরে যদিও বা চালানো যায়, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রশস্ত গতি ও ক্ষেত্রে তা চলে না। এর পরের দৃশ্যে রামতারণের প্রকৃতিটা আরও একটু প্রকাশ করার চেষ্টা

'নাগরদোলা'তে ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, অনুপকুমার, ভবেন পাল প্রভৃতি

হয়েছে। প্রজারা ওকে ধরেছে জলকষ্টের জন্য ইঁদারা খুঁড়ে দেবার জন্য। শুনে রামতারণ ঘোষাল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ওদের ভাগিয়ে দেয়, কিন্তু প্রজারা চলে যাবার উপক্রম করতেই তাদের ধমক দিয়ে বসতে বলে তাদের আবেদন মঞ্জুর করে দিলে। রামতারণের প্রকাশ্যে বাইরে আর অন্তরে বারিধি এই যে প্রকৃতি, শুধু সেইটেকেই ছবির একমাত্র উপজীব্য করে রাখা হয়েছে। সন্তুকে তার মাসীর বাড়ি পাঠিয়ে দেবার জন্য বললেও দেখা গেল, ভোরবেলা সন্তুর গায়ের চাদর সরে যাওয়ায় রামতারণ নিজের হাতে সেটা যথাস্থানে সরিয়ে দিচ্ছে এবং রমাকে উপদেশ দিচ্ছে সন্তুকে যত্ন করার জন্য। অর্থাৎ বোঝা গেল, সন্তুর ও-বাড়িতে পাকা আশ্রয় পাওয়া হয়ে গেল।

• • •

ব্যক্তিকে নিষ্প্রয়োজন করে দেওয়ার হাত-সাফাইয়ে চিত্রনাট্য রচয়িতাদের তুলনা নেই। যখন যেখানে যা খুশী এনে হাজির করতেও যেমন, তেমনি কোন দৃশ্য থেকে কিছু অথবা কাউকে বাদ দিয়ে রাখতেও তাদের কোন সংকোচ নেই। যেমন, রমা সন্তুকে নিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছবার পর তার সঙ্গে দেখা করতে এলো প্রতিবেশিনী বিধবা সরযূ। সে সময় সরযূর সঙ্গে দ্বিতীয় আর কাউকে দেখা

গেল না, কিন্তু খানিক পরের দৃশ্যে সতুকে একটি যে বালিকার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখা গেল, জানা গেল যে বালিকাটি সরযূরই কন্যা নিমি. ওরফে নির্মলা। রমার সঙ্গে সরযূর প্রথম সাক্ষাতেই যদি সঙ্গে নিমিকেও দেখা যেতো তো পরবর্তী ঘটনার অর্থাৎ সতুর সঙ্গে নিমির সম্পর্কের একটা কৌতূহলী সূত্র পাওয়া যেতো। সতুর কাছে মার খেয়ে নিমি রমার কাছে নালিশ জানালো, সতু আসতেই রমা তাকে কান ধরে এক-পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। হঠাৎ রামতারণের আবির্ভাব, সতুকে শাসন করা দরকার বলতে বলতে রমাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সতুর শাস্তি দেখে উল্টে রমাকেই তিরস্কার করে বসলো। ইস্কুলে পণ্ডিত রেখে মারে বলে রামতারণ নিজেই সতুকে বাড়িতে পড়াবে ঠিক করলে। সংস্কৃত, বাঙলা, শুভঙ্করী এসব বিষয়ে রামতারণ ঠিকই পড়িয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু ফাঁপরে পড়লো জ্যামিতি পড়াতে গিয়ে। একটি সরল রেখার ওপর আর একটি সরল রেখা যে কি করে দাঁড়াতে পারে, সেটা তার বুদ্ধির বাইরে এবং নাতির কাছে অজ্ঞতা ঢাকা দিতে তার বুজরুকির আর অন্ত রইলো না। খুবেই হাসির ব্যাপার, তবে সরল রেখার ওপর সরল রেখা দাঁড়ানো নিয়ে অন্যথায় পণ্ডিত বৃদ্ধকে নির্বোধ মূর্খ দেখিয়ে হাসাবার এই যে চেষ্টা এটাও কম হাস্যকর নয়। সতুর বড়ো হয়ে ওঠাও বড়ো আকস্মিক; একেবারে ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ পাশ তরুণ তখন; নিমিও বড়ো হয়েছে এবং এখনও তারা ঠিক আগের দিনের মতোই পরস্পরের সঙ্গী। রাতের অন্ধকারে নিমি ঘাটের ধারে গান গায় আর সতু এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়। এর পরই এলো সংঘাত। রামতারণ চাইলে সতুর বিয়ে দিতে এবং মেয়ে দেখা আরম্ভও করলে। এক কন্যাপক্ষ সতুকে পরের আশ্রয়ে মানুষ বলে অভিহিত করে, রামতারণ তার পুত্রবধূকে সেই কথা শোনাচ্ছিল। আড়াল থেকে সতুর কানে শুধু গেল সে যে পরের ভাতে মানুষ এই কথাটুকুই। বাস, তারপরই সে তার দাদু ও পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প তার। সটান হাজির হলো কাকিমা সরযূর কাছে এবং তার কাছে পাঁচ টাকা ভিক্ষে করে নিয়ে জানিয়ে গেল যে, যেখানেই থাক সে, নিমির দায়িত্ব তার। অবশ্য এর আগে এক গেঁজেলের সঙ্গে নিমির সম্বন্ধ আসতেও সতু একথা বলেছিল। রামতারণ সতুর খোঁজে বেরিয়ে স্টেশন থেকে খবর নিয়ে এলো তার কলকাতা চলে যাবার কথা। কিন্তু একমাত্র নিমির সঙ্গেই যাকে কেবল দেখা যায় সেই নিমির বাড়িতে একবার খোঁজ পড়লো না।

• • •

সতু কলকাতায় হাজির হলো তার মাসির বাড়িতে। মাসি তো তাকে দেখেই যাচ্ছেতাই শুনিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। মাসির বিধবা ননদ হঠাৎ সতুর প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তাকে আশ্রয় দিলে। মেসোমশায় যতীন সতুর এক টিউশনি জোগাড় করে দিলে। আধুনিকভাবাপন্ন বলতে ডিনার ও পার্টির ভক্ত গৃহিণী, বেঁকিয়ে ইংরিজী বলা কাপ্টে-নাপ্ট ফিরং যুবকের সমাবেশ ইত্যাদি যা বুঝায়, এ হলো সেই রকমই সিনেমার ছক-কাটা বাড়ি। কর্তা দেবেনবাবু, মিষ্টমুখ, শান্ত লোক, কন্যা সুপ্রিয়া মায়ের ইচ্ছার বিরোধী। সতুর প্রতি সুপ্রিয়া যতো সদয়,

"গরমাগরম" চিত্রে আগা ও নাদিরা

বিক্রেতাফিরৎ যামিনীর ওপর তেমনি চটা। সতুর কাজ সুপ্রিয়ার ছোট ভাইবোনকে পড়ানো। সুপ্রিয়ার সংগ পাবে বলে সতু একটু আগেই এসে হাজির হয়, সুপ্রিয়ার মা সতুর পাণ্ডুরোলিটিজ্ঞানের অভাব নিয়ে তিরস্কার করে। ছেলেমেয়ে দুটি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, পড়া তৈরী করে না; সতু তাদের আটকে রাখলে যতক্ষণ না পড়া তৈরী করবে খেতে যেতে পারবে না। সুপ্রিয়ার মা রেগে টং। সময়মতো না খেলে ছেলেদের স্বাস্থ্য যে ড্যামেজ হবে তাই নিয়ে সতুকে যা-তা শুনিয়ে অপমান করে স্বামীর কাছে গিয়ে অমন টিচারকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বললে। সুপ্রিয়া সতুর প্রতি আকৃষ্ট বা সতু সুপ্রিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠ এ অবস্থাটা ভালো করে না দেখিয়েই সতুর ওপর সুপ্রিয়ার মার বিরক্তি ও বিদ্বেষ দেখানো নেহাৎই খামাকা মনে হয়। যাই হোক, সতু নিজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আগে চাকরি পেয়েই সতু তার দাদুকে একখানা চিঠি লেখে। রামতারণ চিঠি পেয়ে এক একটা কথা পড়ে তার বৌমাকে শোনায় আর তাই নিয়ে উচ্ছ্বাসের বগড় বইয়ে দেয়। প্রায় শ' পাঁচেক ফিট ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে সেই চিঠি পড়া যার মর্ম হচ্ছে, সতু তার মাসির বাড়িতে আছে, চাকরি পেয়েছে এবং একদিন দেশে এসে দাদুর সংগে দেখা করে ক্ষমা চাইবে। চিঠি পাবামাত্রই দাদুর বাজারে দৌড় এবং তরিতরকারী মাছ নিয়ে হাজির, সতু কখন আসবে না-আসবে সেটা খেয়ালই করলে না। এটা শুধু রামতারণের পাগলামি দেখানো আর সে যে কি পরিমাণ সতু-অন্ত প্রাণ এবং যে ব্যক্তি একদিন পরের ছেলের মাথায় জড়িয়ে পড়ার আতংকে ত্রস্ত ছিল সেই ব্যক্তিই তার পাতানো নাতির আসবার অপেক্ষায় সারাদিন না খেয়ে কিভাবে রাত কাটালে, সেইটেই দেখাবার জন্য ঐ সব দৃশ্যের অবতারণা। কিন্তু তাতে আবেগ আর কিই বা যোগ হলো। সতু বাড়ি এলো পরদিন এবং নিমির মার কাছ থেকে নেওয়া পাঁচটা টাকা

শোধ করে দিলে। বিবিকে ... সে গ্রামে তখন নানা কথা উঠেছে, সন্তু, আশা করেছিল সন্তু ফিরে এলে বিয়ের কথা পাকা করবে; কিন্তু কলকাতায় গিয়ে নিমির জন্য পাত্র ঠিক করে দেবে বলে জানাতে সন্তু হতভম্ব হয়ে গেল। এবার রামতারণ সন্তুকে পাকাপাকি-ভাবে বাড়িতে ধরে রাখবার ব্যবস্থায় তার জন্য পাত্রীর খোঁজ বের হলো। রমা জানালো পাত্রী তো পাশেই আছে; সন্তু তো নিমির ব্যাপারে সেবার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে। রাম-তারণ এ কথা শোনামাত্রই নিমিকে ডেকে আশীর্বাদ করে গেলো। সন্তু কলকাতায় ফিরলো মন-মরা হয়ে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার মা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। এমনি মনের অবস্থায় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সন্তু মোটর চাপা পড়ে হাসপাতালে গেল। পর-দিনই কাগজে দেখে শুনে পড়ে মোহনবাবু সুপ্রিয়াকে নিয়ে হাসপাতালে এসে স্পেশাল কেবিনের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। সুপ্রিয়া রইলো তার সেবা করতে। এমন ঘটনা আনতে হলো যাতে সন্তু ডিলিরিয়ামের ঘোরে তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করে ফেলে যাকে সুপ্রিয়া সেবা করতে করতে তা শুনতে পায়। হলোও তাই। সুপ্রিয়া জানতে পারলে সন্তুর সঙ্গে নিমির সম্পর্কের কথা। ঘটনাটা আরও জটিল হলো দাদু হাসপাতালে এসে সন্তুর সান্নিধ্যে সুপ্রিয়াকে দেখতে পাওয়ায়। গ্রামে ফিরে দাদু নিমির জন্য পাত্র ঠিক করে দিতে প্রাণপাত করতে লাগলো। একদিন গরমে ঘুরতে ঘুরতে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে; মরণাপন্ন অবস্থা তার। ওদিকে সুস্থ হবার পর সন্তু সুপ্রিয়ার কাছে হাজির; তার ধারণা ছিল তাকে সেবার মধ্যে দিয়ে সুপ্রিয়া তার মনের কথা ব্যক্ত করে দিয়েছে। এর আগেও যেমন অনেক ছবিতে দেখা গিয়েছে, সেই ছক বাঁধা ত্যাগের কাহিনী এখানেও ঘটলো। সুপ্রিয়া সন্তুর ডিলিরিয়াম থেকে নিমির খবর পেয়েই গিয়েছে, তাই সন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে এমন ভাণ করলে যেন সন্তুর প্রতি তার কোন আকর্ষণ বা মোহই নেই, আর তা প্রমাণ করার জন্য সুপ্রিয়া যামিনী এসে পড়তেই তার প্রতি ঢলে পড়লো। সন্তু শক খেয়ে গ্রামে ফিরলো একেবারে দাদুর রোগশয্যায়। রামতারণ তাকে আর নিমিকে আশীর্বাদ করে নিশ্চিন্ত হলো।

* * *

অতি ছেঁদো গল্প: রামতারণের বাতিকতাই সার, যাকে পাগলামিই বলা যায়, আর পাগল তো তাকে তার পুত্রবধূ পর্যন্তও বলতে ছাড়েনি, এমনিই গল্পের ভাষা। তা ছাড়া কোন একটা ব্যাপারই পুষ্ট করে গড়ে তোলাও নয়। নিমির ওপরে সন্তুর টান, কি সন্তুর ওপরে সুপ্রিয়ার বা সুপ্রিয়ার ওপরে সন্তুর আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি, কোন চারা বুনে গড়ে তোলা নয়, সবই যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে বলেই ধরে নিতে হয়, যেমন লাগে সন্তু কলকাতায় তার মাসীর বাড়িতে গিয়ে ওঠামাত্রই তার মাসী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই তাকে কটূক্তি শুনিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভাগিয়ে দেবার মতোই সূত্রহীন আকস্মিক বলে। চরিত্র বা ঘটনাবলীর মধ্যে মৌলিকত্ব যে নেই সেটা গল্পটি পড়লেই অনুধাবন করা যায়। আর কে যে কার এবং কিসের পরাধীন তারও তো শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসাই হলো না। সবই সেকেলে ব্যাপার বা এখনকার রসবুভুক্ষুর কাছে চর্বিত চর্বণ বলে মনে হবে। অবশ্য মূল গল্পও সেকালেরই লেখা; লেখক নারায়ণ ভট্টাচার্য। তবে অদল-বদল যখন হয়েছেই তখন পরিবেশটা একালের মতো করে নিতে আটকালো কেন? তাতে অন্ততঃ ছবির

"আলিক" চিত্রে ললিতা পাওয়ার, রূপমালা ও সুরৈয়া

"সতী অনসূয়া" -তে বয়স্ক জগদীশ্বর লিলা ও অন্নপূর্ণা

চেহারাটা তো দেখবার মতো হতো। এলোমেলো চরিত্রের এলোমেলো ভাবের জন্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে খানিকটা হাল্কা রস যা উপভোগ করা যায়, তা ছাড়া ছবি একেবারে ফাঁকা। সন্ধ্যারাণী আছেন পুত্রবধূ রমার চরিত্রে, কিন্তু দরকার ছিল না তাকে, কারণ নেই কিছু চরিত্রটিতে। নিমি ও সুপ্রিয়ার চরিত্রে যথাক্রমে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও কাবেরী বোস, এঁদেরই দুজনের ক্ষেত্রে অভিনয়ের কিছুটা সুযোগ ছিল এবং তাঁরা সে সুযোগ কাজে লাগিয়েও দিয়েছেন লোককে ওরই মধ্যে কিছুটা খুশী করার মতো করে। সতুর চরিত্রে নির্মলকুমারও ওদের সঙ্গে চলে যান। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী প্রভৃতিও আছেন ছোট ছোট চরিত্রে এবং তাঁরা থাকার জন্যেই চরিত্রগুলি ওজনে যা ভারি হতে পেরেছে, নয়তো সার নেই। কয়েকখানি গান ভালো; আবহ-সংগীতেও পরিচালক গোপেন মল্লিক ছন্দ বৈচিত্র্য আনার যে চেষ্টা করেছেন, তা অনুভবকে এড়িয়ে যায় না। অন্যান্য কাকুশলীবৃন্দ হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণে বাণী দত্ত, শিল্পনির্দেশে অনিল পাল, গীত রচনায় প্রণব রায় ও সম্পাদনায় শিব ভট্টাচার্য।

খুচরো খবর

চারুচিত্র রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা"-র চিত্ররূপ দানের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র জন্মতিথির দিনে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা ছবিখানির মহরৎ সম্পন্ন করেন, যাতে মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং পৌরোহিত্য করেন ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। জানা গেল, ছবিখানির কিয়দংশ কাবুলে গিয়ে তোলা হবে। নাম ভূমিকার জন্য আগেই ছবি বিশ্বাস নির্বাচিত হয়েছেন এবং মহরতে তাঁকে নিয়ে একটা দৃশ্যও তোলা হয়ে গিয়েছে, নয়তো প্রস্তাব করা যেতো কাবুলে যখন যাওয়াই হচ্ছে, তখন ওখানকার কোন সত্যিকারের কাবুলিকে দিয়ে চরিত্রটি অভিনয় করিয়ে নিলে বোধ হয় অভিনবত্বও বাড়তো এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও নিবিড় করা যেতো। এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং পরিচালনায় আছেন তপন সিংহ।

* * *

মাদ্রাজে তোলা হিন্দী "মীরাবাঈ" ছবিতে ছাড়া সুখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় আর কোন ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বলে শোনা যায়নি। এবার তিনি একখানি বাংলা ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিতে স্বীকৃত হয়েছেন বলে শোনা গেল। ছবিখানি হচ্ছে সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত "মাথুর", যার মহরৎ সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২৩শে এপ্রিল—অদ্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সীমান্তের অপরদিকে (পশ্চিম পাকিস্থানে) সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকার খবর পাইয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অদ্য আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে ৫২জন সত্যাগ্রহী মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

২৪শে এপ্রিল—রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয় বরাদ্দ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী এস সি শা আজ রাজ্যসভায় শ্রী বি এম গুপ্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নূতন শাখা খুলিবার জন্য ভারত সরকার ১০০টি স্থানের তালিকা তৈরি করিয়াছেন।

আজ প্রত্যূষে ৪-২০ মিনিটের সময় নাগপুর হইতে অনুমান ২ শত মাইল দূরবর্তী জলকাপুর ও বিস্বারিজ স্টেশনের মধ্যে কলিকাতাগামী বোম্বাই-কলিকাতা মেল ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় ১৪জন লোক আহত হয়। তন্মধ্যে ২জনের আঘাত গুরুতর।

২৫শে এপ্রিল—লোকসভায় শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর নির্বাচন তিনজন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অবৈধ বলিয়া অদ্য ঘোষিত হয়।

দূরপ্রাচ্য হইতে কলিকাতা বন্দরে আগত একটি জাহাজের নাবিক বলিয়া বর্ণিত এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক পুলিস বে-আইনীভাবে ভারতে আমদানীকৃত ৩২০ তোলা স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে লণ্ডন নগরীর নাগরিক করা হইবে। পূর্বে আর কোন বিদেশীকে এই সম্মান দেওয়া হয় নাই। ভারতে বৃটিশ হাই কমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড এই সংবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—প্রজা সোস্যালিস্ট দলের প্রার্থী শ্রীলালবিহারী দাস গতকল্য রাত্রে খেজুরী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল—রাজ্যসভায় গৃহীত হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে অদ্য লোকসভায় আলোচনা আরম্ভ হয়।

২৮শে এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ সরকার অদ্য হইতে নগরীর একশতটি সুলভ মূল্যের দোকান হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, অশোকস্তম্ভের প্রতীক বিহীন ভারত সরকারের কারেন্সী নোট ও ব্যাঙ্ক নোট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ছয় মাস পরে আর বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩০শে এপ্রিল—অদ্য সকালে ২৪ পরগণার কোন পাটকলের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এস ভট্টাচার্যকে জঘন্যভাবে তাঁহার বাসভবনে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়।

২রা মে—পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ও তাঁহার একান্ত সচিব কলিকাতা হইতে ৯০ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী অঞ্চলে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহাদিগকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লোকসভার উত্তর-পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অপেক্ষা ৩৩০৭৩ ভোট অধিক পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩রা মে—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ৪-৫৫ মিনিটে বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

৪ঠা মে—শুল্ক অফিসারগণ পুলিসের সহযোগিতা বে-আইনীভাবে আমদানীকৃত সুপারি উদ্ধারের জন্য বনগাঁও রেলবাজারে হানা দিলে প্রায় একশত লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা ইষ্টক ও হাতবোমা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। পুলিস আত্মরক্ষার্থে গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ফলে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মারা যায় ও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

৬ই মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, আমার পিতা, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই তিনজন আমার জীবনকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুরের প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস অদ্য অপরাহ্নে দক্ষিণ কলিকাতায় আততায়ীর ছোরার আঘাতে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অদ্য জানা গিয়াছে যে, গতকল্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রে বন্যার জল ১৭ ইঞ্চি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানভূম লোকসেবক সংঘের শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক হাজার সত্যাগ্রহী ১৭৫ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়া অদ্য কলিকাতায় উপনীত হইলে নগরীর অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে তাহাদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়।

৮ই মে—অদ্য ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ রবীন্দ্র-ভারতী গৃহে রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২২শে এপ্রিল—নয়াচীন বার্তা প্রতিষ্ঠানের সংবাদে বলা হইয়াছে, চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মার্শাল চেন ই অদ্য তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামাকে প্রজাতন্ত্রী চীনের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত তিব্বত এলাকায় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিলেন।

২৪শে এপ্রিল—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীহট্টের শ্রীসূর্যমণি দেব ও বরিশালের শ্রীসুনীল গুপ্ত নামে দুইজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৫শে এপ্রিল—বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবীতে অদ্য পূর্ববঙ্গ সরকারী দপ্তরখানার ১২ শত কর্মী সহ ঢাকার চতুর্থ শ্রেণীর অনুমান পাঁচ সহস্র সরকারী কর্মী ধর্মঘট করে। ধর্মঘটীদের এক বৃহদাংশ স্থানীয় হাসপাতালসমূহের কর্মী।

আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে জর্ডনের নিম্ন পরিষদ ফ্রান্সকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিক বলেন যে, রুশিয়ায় মার্চ মাসের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ নূতন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। তাঁহার মতে এই বোমা অধিকতর শক্তিশালী ও উহার ধ্বংসশক্তি অসাধারণ।

২৭শে এপ্রিল—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আজ ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন রাশিয়া পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল—পাকিস্থান নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন বৃটিশ অফিসার লেফটন্যাণ্ট কমাণ্ডার জে এন স্মিথকে ৪২৫০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

২৯শে এপ্রিল—বেলজিয়ামস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীকৃষ্ণ চেত্তুর আজ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন।

১লা মে—নেপালাধীশ রাজা মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অদ্য সকালে হনুমান ধোকা প্রাসাদে পূর্বাঙ্গ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

৩রা মে—ব্রহ্মের শাসকদল ফ্যাসিষ্টবিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগ নিম্ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যে জয়ী হইয়া আরও চার বৎসরের জন্য দেশের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারী হইয়াছেন।

৪ঠা মে—নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য চারিজন সদস্য লইয়া গঠিত মিশন অদ্য টোকিওতে পৌঁছিয়াছেন।

৫ই মে—দুইজন ভূতপূর্ব মুসলিম লীগ মুখ্যমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন ও মিঃ এস আবদুর রসিদ আজ পশ্চিম পাকিস্থানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব কর্তৃক গঠিত রিপাবলিকান দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

৬ই মে—ভারত সরকার পূর্ববঙ্গে বেঙ্গল একাডেমিকে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই একাডেমিতে বাংলা পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাষিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 26th MAY. 1956
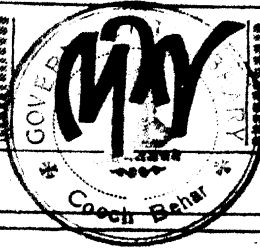
২৩ বর্ষ ॥ ৩০ সংখ্যা ॥ ।৶০
শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

মহাপুণ্যময়ী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সার্ধ দ্বিসহস্রতম বার্ষিকী উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে আমরা তাঁহার লোকোত্তর পবিত্র চরিত্রের অনুধ্যান করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ এবং মনন করিতেছি। তাঁহার চরণে আমাদের অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধ ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার এবং সংস্কৃতির সার্বভৌম বিগ্রহস্বরূপ। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ মানুষকে অমৃতের সন্তান বলিয়া সম্বোধন করেন এবং সেই অমৃতের অধিকারে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য তাঁহারা বিশ্বের মানব-সমাজকে পরম সমাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের সেই আদর্শ নানারূপ সংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মানবের চৈতন্যময় স্বরূপ-ধর্ম বাহ্য আচার-বিচারের সঙ্গে নানারূপ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে বিজড়িত হইয়া মালিন্যগ্রস্ত হয়। স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়াতে সাধারণ মানুষ ক্রীতদাসের পর্যায়ে গিয়া পড়ে। ধর্মের নামে হিংসা, বিদ্বেষ এবং অপ্রেমের অন্ধকারে প্রেতের নৃত্য শুরু হয়। এই ভয়াবহ পরধর্ম হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। নিপীড়িত মানবাত্মার বিপুল বেদনায় প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় ভগবান্ বুদ্ধের জীবনাদর্শ উজ্জ্বল। মানুষের জন্য এই যে বেদনা, ইহার তীব্র তাপেই সত্য ধর্ম দীপ্তি লাভ করে। সমগ্রের জন্য ত্যাগেই প্রকৃত সুখ নিহিত রহিয়াছে। ত্যাগের পথে আনন্দের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ ঘটে। মানুষের পক্ষে অহিংসাই জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।

অহিংসা ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা; ভগবান্ বুদ্ধ ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে মানবতার বৈপ্লবিক প্রেরণায় নববলে জাগ্রত করেন। তাঁহার সাধনার প্রকরণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও কোনদিন প্রাচীন ভারতের ঋষি-প্রণিহিত সাধনার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বুদ্ধের অবদান ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় মানবতার চেতনাকে প্রাণরসে উজ্জীবিত রাখিয়াছে এবং সেই সূত্রে ভারতের সাধনার বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে।

বহু বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া সেই শক্তি এদেশের সংস্কৃতির মূলে বলাধান করিয়াছে।

ভগবান্ বুদ্ধের অবদানের চিন্ময় আশ্রয় অবলম্বন করিয়া এদেশে মহামানবের জাগরণ ঘটে—তাহার ফলে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর সূত্রটি সাক্ষাৎ সম্পর্কে পরিস্ফুর্ত হইবার সুযোগ পায়। সাধকের অন্তর্মুখ চেতনার ভিত্তি হইতে আত্মভাবনাটি জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। দেশের সীমা, জাতির বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ভারত বিশ্বকে আপনার করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশের আর্ত, তাপিত নরনারী করুণার লাবণ্যঘন মূর্তি ভগবান্ বুদ্ধের শরণাগতি অবলম্বন করিয়া ধন্য হয়।

বিশ্বের দিক্‌চক্রবালে হিংসার বিস্ফোর-অগ্নি প্রধূমিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসাধনার সমুন্নতির ফলে জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে নৈকট্য ঘটিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিকতার ভাবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বিশ্বমানবের একাত্মবোধটি আজ সাধনা এবং সংস্কৃতির পথে সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে না। বর্তমান যুগের ইহাই সর্বপ্রধান সংকট। ফলত মানব-সভ্যতা আজ ধ্বংস এবং মৃত্যুর এক মহা সন্ধিক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনাদর্শই বিশ্বকে আসন্ন এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারে।

ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পুণ্য তিথি উদ্যাপন উপলক্ষে আমরা এই সত্য একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছি। মহাভয়ে বিপন্ন আমরা, আমরা আজ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধ আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমার বাণীর মধ্যেই আমি রহিলাম। আমরা আজ সেই বাণীই নিজেরা শুনিব, সেই বাণীই বিশ্ববাসী সকলকে ডাকিয়া শুনাইব। সেই পথই আমাদের পক্ষে ভদ্র। সে পথেই মানুষের কল্যাণ, বিশ্বের মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ঘটিবে এবং মহামৃত্যুভয় হইতে বিশ্ব-মানবসমাজ পরিত্রাণ পাইবে। সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবান্ তথাগতের চরণে আমাদের প্রণতি জীবনে সত্য হোক্, নিত্য হোক্।

অনিশ্চিতের অনাবৃত্তি

নয়াদিল্লী হইতে কর্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা সম্পর্কে রাজ্য কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা কার্যে পরিণত করিবেন। গত ২১শে মে স্বরাষ্ট্র-সচিবের পুনরুক্তিতেও ইহাই দৃঢ় হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা নির্ণীত করিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে একটি বিল প্রণয়ন করা হইতেছে। অন্যান্য রাজ্যের সম্পর্কিত বিলটি লোকসভায় উত্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে এই বিলটির সম্বন্ধেও বিবেচনা করা সম্ভব হইতে পারে, ভারত সরকারের ইহাও অভিপ্রায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে বিহারের নেতারা নিজেদের অসঙ্গত জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের, এখনও ইহাই বিশ্বাস যে, তাঁহারা নিজেদের জিদ ভারত সরকারকে মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে সমর্থ হইবেন। এইজন্য হৈ-হুল্লোড় সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহাদের মনোবৃত্তি অদ্যাপি প্রযুক্ত রহিয়াছে। কয়েকদিন আগে পাটনা হইতে প্রচার করা হয় যে, কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সীমানা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপিত হইবে। বিহারের রাজস্বসচিব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় সেদিন বিহারের বিধানসভায় সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিহার সরকার বিহারের কোন অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মতি দিবেন না। তাঁহার উক্তির অর্থ এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তেরও তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। বলা বাহুল্য, বিহার সরকার এবং বিহারের নেতৃবর্গের এই ধরনের মনোবৃত্তি সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে সমূহভাবে বিপজ্জনক। ইহা তাঁহাদের গৌরবের পরিচায়ক নিশ্চয়ই নয়। বলা বাহুল্য, পুরুলিয়া এবং কিষণগঞ্জের কিছুটা অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে বিহারের বিশেষ কিছু ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিবে, এমন কিছু আশংকার কারণ নাই। বিহারের নেতারাও ইহা বেশই বুঝিতে পারেন। কিন্তু প্রাদেশিকতার অসঙ্গত একটা জিদ তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা এই ব্যাপারটির ভিতর দিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে অনর্থক একটা বিরোধের ভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন। ইহার পরিণতি সম্বন্ধে আমরা এখনও তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে বলি। ফলত ভারত সরকারের পক্ষে তাঁহাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা ছাড়া এখন গত্যন্তর নাই। নতুবা তাঁহাদের নীতির মূলে নিষ্ঠাবুদ্ধির অভাব ঘটে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থার ভাবই ক্ষুণ্ণ হয়। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করা সমগ্র দেশের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্তই অনিষ্টকর। বিহারের নেতৃবর্গ এখনও এই ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করুন, আমরা তাঁহাদিগকে এই পরামর্শই দিব। ফলত তাঁহাদের অন্যায় জিদের ফলে পরস্পরের প্রতিবেশী দুইটি রাজ্যের মধ্যে তিক্ততার ভাব ইতিমধ্যেই সৃষ্ট হইয়াছে। এখন সেই ভাব প্রশমিত হইয়া যাহাতে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়, সেই চেষ্টাই তাঁহাদের করা উচিত।

কাজী নজরুল ইসলাম

২৬শে মে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহার নিরাময় কামনা করিতেছি এবং তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। নজরুল বাঙলার বিদ্রোহী কবি। তাঁহার অগ্নিবীণায় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে বিপ্লবের গীতি বাজিয়া উঠে। সেই গীতি বহ্নিশিখায় বাঙলার অন্তরকে দোলা দেয়। বাঙলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানবতার বেদনায় বিপুল আবর্ত উত্থিত হয়। সেই আবর্ত বাঙলার প্রাণবন্যাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া বজ্র-গর্জনে সকল বাঁধন ছিন্ন করিয়া সমাজ-জীবনে উদার প্রভাব বিস্তার করিতে উন্মুখ হইয়া পড়ে। এইখানেই নজরুলের কবির। তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্তি। এই দিক হইতেই তিনি স্রষ্টা। নজরুলের সৃষ্টি বাঁধন ভাঙিয়া নূতনকে গড়িতে চায়। বস্তুত গতানুগতিক প্রতিবেশের অচলায়তনের মধ্যে এই সৃষ্টি পরিপুষ্টি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই দিক হইতে নজরুলের কাব্য-সাধনা বাঙলা সাহিত্যে তাজা প্রাণ-রসের সাড়া জাগাইয়াছে। বাঙালীর মনের মূলে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া সৃজন-শক্তিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে দুর্দমনীয় একটা গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। প্রত্যুত কবির এই বৈপ্লবিক বীর্যের মূলে এদেশের আত্মমাধুর্যই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। কবি সে বস্তু বাহির হইতে ধার করেন নাই। এই দেশের নরনারীর দুঃখ এবং বেদনা তাঁহার গীতিতে অগ্নিময় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। এইজন্য নজরুলের গীতি রুদ্র হইলেও তাহা সুমধুর; এদেশের জল, বায়ু, এদেশের আকাশ-বাতাসের সঞ্জীবন স্পর্শে সে গীতি ভরপুর হইয়া রসধর্মে প্রচুর। কবির এই সৃষ্টিস্বরূপের সম্পর্কে গেলে আমাদের মন রূপে রূপে ডুবিয়া যায়! আমাদের প্রাণশক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ফলত এই মাধুর্যই কবির অবদানকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছে। নজরুলের গান বাঙলার হাটে, মাঠে, ঘাটে ইহার ফলেই ছড়াইয়াছে। বাঙালীর বড় দুর্ভাগ্য, কবির বীণা আজ নীরব। ব্যাধিতে পীড়িত কবির হাতে আজ তাহা আর বাজে না। বাঙালীর পক্ষে এই দুঃখ বড়ই মর্মান্তিক। কবির জন্মদিনে এই ব্যথাই আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। কবির গীতি বাঙলার আকাশে-বাতাসে যে অনল দীপ্তি ছড়াইয়াছে, তাহা বিস্তারলাভ করুক এবং মানুষের বেদনায় বাঙলার বৈপ্লবিক বীর্য উদ্দীপ্ত করিয়া নব সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করুক, আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রণ শিল্প-শিক্ষা

সম্প্রতি যাদবপুরে মুদ্রণ শিল্প-শিক্ষার একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এদেশে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অভাব ছিল। মুদ্রণ শিল্পের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে খুব সামান্য নয়, একথা সত্য, কিন্তু নিজেদের অধ্যবসায় এবং প্রতিভাই তাঁহাদের প্রতিপত্তির মূলে কাজ করিয়াছে। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী সকলে হয় না। মুদ্রণ-শিল্পের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা অর্জনের দ্বারা এই শিল্প যাহাতে জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করিবার উপযোগী হয়, সেজন্য চেষ্টা হওয়া দরকার। বিশেষত মুদ্রণ শিল্প দিন দিন যেভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এই শিল্পের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের সুবিধা এদেশের বিদ্যার্থীরা যাহাতে লাভ করিতে পারে, এমন সুবিধা থাকা প্রয়োজন। যাদবপুরে যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইল, এই দিক হইতে সেটি নূতন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলিকাতার বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কদের সমবেত প্রচেষ্টার ইহা ফল। তাঁহাদের সকলের সহযোগিতা ইহার মূলে রহিয়াছে। জাতির সংগঠন প্রচেষ্টার পথে এমন সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যুত বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের এইরূপ সহযোগিতা ব্যতীত বিদ্যার্থীদের পক্ষে হাতে-কলমে কাজ শিখিবার সুবিধা হইতে পারে না। আমরা এই শিক্ষায়তনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পাকিস্তানের আভ্যন্তর রাজনৈতিক অবস্থা যেন ক্রমশ বিশৃঙ্খলার দিকেই এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বাস করে একভাষাভাষী পূর্ব বাংলায়। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত যাদের ভাষাও ছচ্ছে বিভিন্ন। উপভাষাগুলি বাদ দিয়ে তিনটি মুখ্য ভাষা—উর্দু, সিন্ধি এবং পুস্তু—পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত। পশ্চিম পাকিস্তান নানা প্রদেশে বিভক্ত থাকলে পূর্ব বাংলাকে চিরকাল দাবিয়ে রাখা যাবে না, বিশেষ করে এই ভয়েই পশ্চিম পাকিস্তানকে "এক ইউনিটে" পরিণত করা হয়েছে। তার জন্য যথেষ্ট জোর জবরদস্তি, অনেক বে-আইনী কাণ্ড এবং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ বহুলোক এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিপক্ষে ছিল, বিশেষ করে সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তাদের একটা ভয় যে, এক ইউনিট হলে পাঞ্জাবী এবং ইউ-পি থেকে আগতদের প্রাধান্য আরো বিস্তারলাভ করবে এবং অন্যদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্ম-প্রকাশ ব্যাহত হবে।

ডক্টর খান সাহেবের সমর্থন পাওয়াতে এক-ইউনিট-ওয়ালাদের খুব সুবিধা হয়। ডক্টর খান সাহেবকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী করার চালটাও বেশ কাজে লেগেছে কিন্তু অধিকাংশ রাজনীতিক যেখানে কোনো নীতির ধার ধারেন না, স্বার্থ এবং ক্ষমতার আকর্ষণই যেখানে সবচেয়ে প্রবল সেখানে প্রকৃত সংহতি সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। পাকিস্তানের প্রথম কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী ভেঙে দিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ যখন কেন্দ্রে মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করেন এবং ডক্টর খান সাহেব সেই মন্ত্রিমণ্ডলীতে যোগদান করেন তখন তিনি কোনো দলের প্রতিনিধি হিসাবে তা করেন নি। পরবর্তী সময়ে যতদিন কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীতে ডক্টর খান সাহেব ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর দলীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু নবগঠিত পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠন করার জন্য যখন তিনি আহূত হলেন তখন সে-সমস্যাটা উৎকটরূপে দেখা দিল। ডক্টর খান সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দিলেন না। তিনি "রিপাব্লিকান পার্টি" বলে একটি নূতন দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান অ্যাসেম্বলীর (পূর্বের বিভিন্ন প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলীর সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত "ইণ্টারিম" আইন পরিষদের) মুসলিম লীগ সর্দার বাহাদুর খানকে দলপতি নির্বাচিত করলেন। সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত সদস্যেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ডক্টর খান সাহেবের নেতৃত্ব স্বীকার

করে রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগ দিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলিও মুসলিম লীগ ত্যাগ করে রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন, এরকম গুজব এবং জল্পনা-কল্পনাও কিছুদিন চলে। চৌধুরী মহম্মদ আলি অবশ্য তা এখনও করেন নি; তবে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদে ডক্টর খান সাহেবের থাকা উচিত এ মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

গভর্নর যখন ডক্টর খান সাহেবকে মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠন করার জন্য আহ্বান করলেন তখন অ্যাসেম্বলীর মুসলিম লীগ বাকী সদস্যেরা "বে-আইনী" বলে রব তুললেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, অ্যাসেম্বলীর মেজরিটি তাঁদের দিকে। সুতরাং মুসলিম লীগ পার্টির দলপতি সর্দার বাহাদুর খানকে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করার জন্য আহ্বান করা উচিত ছিল।

অন্যদিকে রিপাব্লিকান পার্টির পক্ষ থেকে দাবী করা হলো যে, তাদেরই মেজরিটি। অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থাটা কী বুঝা অসম্ভব হলো। গত সোমবার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে এবং তুমুল হট্টগোল চলছে। "স্পীকার" নির্বাচন পর্ব থেকেই বুঝা গেছে, দুপক্ষের কার কতো জোর। "স্পীকার" নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য গভর্নর মিঃ মমতাজ হোসেন

কাজিলবাশকে সভাপতি নিযুক্ত করেন। মিঃ কাজিলবাশ অবশ্য রিপাব্লিকান পার্টির লোক। সভা বসলে গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে মিঃ ফজল আলির নাম এবং বিরোধী দল—মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মীর গোলাম আলি তালপুরের নাম স্পীকারের পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়। উভয়ের পক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হওয়াতে সভাপতি কাজিলবাশের "কাস্টিং ভোটে" মিঃ ফজল ইলাহি স্পীকার নির্বাচিত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুই দলেরই সমান জোর। এমত অবস্থায় যা হবার তাই হচ্ছে। অর্থাৎ পরস্পর গালাগালি এবং হট্টগোল। অ্যাসেম্বলীর কাজ যে ঠিকমতো চলতে পারবে সে আশা দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী দল একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধপরিকর।

সরকারের পক্ষে আরো দু পাঁচজনকে ভাগিয়ে আনা অসম্ভব নয় কিন্তু তাহলেও যে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে তা মনে হয় না। ইতিমধ্যে কোর্টে এক নম্বর মকদ্দমা দায়ের হয়ে গেছে। অ্যাসেম্বলীর একজন মুসলিম লীগ সদস্য লাহোর হাইকোর্টে এই বলে একটি মকদ্দমা দায়ের করেছেন যে, সভাপতির "কাস্টিং ভোটে"র জোরে স্পীকার নির্বাচন অবৈধ হয়েছে। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে যে, কনস্টিটিউশন "সাসপেণ্ড" করা হবে কারণ এরূপ অস্থির রাজনীতিক পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন চলতে পারে না।

এ গুজব সত্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা "কনট্রোলড্ ডেমোক্রেসি"তে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কেবল পশ্চিম পাকিস্তান কনস্টিটিউশন সাসপেণ্ড করলেই কি ল্যাঠা চুকবে? পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ পার্টি কেবল ডক্টর খান সাহেবকে গদিচ্যুত দেখতে পেলেই কি সন্তুষ্ট থাকবে? তারা যে ক্ষমতা চায়। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর দশা কী হবে? কেন্দ্রে মুসলিম লীগ ও ইউনাইটেড ফ্রণ্টের কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট চলছে। পশ্চিম পাকিস্তান অ্যাসেম্বলীর মুসলিম লীগ দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর লীগী সদস্যদের কী নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে? মুসলিম লীগের সভা প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পক্ষ না নিয়ে ডক্টর খান সাহেবের রিপাব্লিকান পার্টির সমর্থক হলেন—এ ব্যাপারটাই কী অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে? পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের মুসলিম লীগী সদস্যেরাও যে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভাব নিয়ে থাকতে পারবেন তাও সম্ভব নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের মূলে টান পড়বে।

ওদিকে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের নিজের বাস্তুভিটা নিয়ে টানাটানি। পূর্ব পাকিস্তানে মিঃ ফজলুল হক গভর্নর হয়ে বসেছেন কিন্তু মিঃ আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ অতিশয় অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই অবস্থা কিছুটা বুঝা যাবে, কারণ আজ (২২।৫।৫৬) ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে। গত কিছুদিন ধরে যেসব খবরাখবর বেরিয়েছে তা থেকে অ্যাসেম্বলীতে মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকসংখ্যা কী-রকম দাঁড়ায় বলা কঠিন। গভর্নমেণ্ট পক্ষ এবং বিরোধী দল স্ব স্ব সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সবরকম চেষ্টা করছেন।

হয়ত দেখা যাবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে রকম হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম অর্থাৎ কোনো পক্ষেরই "stable ministry" করার মতো পিছনে সমর্থন নেই। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গির দরুণ বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আসলে মুসলিম লীগের কোনো নীতির বালাই নেই, প্রায় সবটাই ব্যক্তি বা উপদলগত স্বার্থের কামড়াকামড়ি। এতদিন যাঁরা মুসলিম লীগে ছিলেন এবং এখন রিপাব্লিকান পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বোধ হয় অতি অল্প লোকই আছেন যাঁরা আদর্শের টানে এসেছেন। পূর্ববঙ্গেও, যাঁরা একযোগে গত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন তাঁরাই—সেই সময়ের ইউনাইটেড ফ্রণ্টই—আজ দুই পরস্পরবিরোধী দলে পরিণত হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নির্লজ্জ নীতিবিহীনতার সঙ্গে এক পর্যায়ে না পড়লেও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ইউনাইটেড ফ্রণ্টের দুই তরফের প্রধান নেতা মিঃ ফজলুল হক ও মিঃ সুরাবর্দীর কীর্তিরও তুলনা নেই গত সাধারণ নির্বাচনের পরে পূর্ববঙ্গে যে নূতন আশার আলো দেখা দিয়েছিল এঁদের কার্য এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভের দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুগপৎ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার পরিণাম কী হবে বলা কঠিন। যা অবস্থা তাতে কোথাও এক পক্ষের দ্বারা গভর্নমেণ্ট চালানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। হয়ত উভয় ক্ষেত্রেই কোয়ালিশনের জন্য চেষ্টা ভিতরে ভিতরে চলছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত গভর্নরস্ রুল প্রবর্তিত হতে পারে। নূতন কনস্টিটিউশনে নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধীয় বিধি এখনো স্থিরীকৃত হয়নি। সেটা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী কর্তৃক স্থির হবে। তা নিয়েও যুক্ত নির্বাচন প্রথা অথবা সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রথা হবে তা নিয়েও লড়াই হবে। এইসব হয়ে যাবার পরে জেনারেল ইলেকশন। যদি গভর্নরস্ রুল প্রবর্তিত হয় তবে নূতন কনস্টিটিউশন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত সেটা চলবে—বোধ হয় এইরকম আশ্বাস দেওয়া হবে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ সারা পাকিস্তানেই প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক শাসনের অবসানের অর্থ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সারা দেশ এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে সহজে রাজী হবে না। বিরোধী দলগুলি অন্তত তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারেরও পরিবর্তন অর্থাৎ আরো ব্যাপকতর কোয়ালিশন দাবী করবে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আধা-মিলিটারী কর্তৃত্বের অভ্যুদয় অসম্ভব নয়।

২২।৫।৫৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্য তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল। পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি। শীল সকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি। অর্থাৎ

আমার এই শীল খণ্ডিত হয়নি, এতে ছিদ্র হয়নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয়নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করেনি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিলম্বিত হয়নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলি হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন, তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই:

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে—

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসংগণের সেবা না করা সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজো করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

যে দেশে ধর্মসাধনা বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সংকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতা-পিতাকে পূজো করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

পাপে অনাশক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞ, যথাকালে ধর্মকথা শ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সংকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত

কাম্পিত হয় না, যার লোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছন যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছিনে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনাপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এতো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এতো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মৈত্রী ভাবনা —মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সকল প্রাণী সুখিত হ'ক, শত্রুহীন হ'ক, অহিংসিত হ'ক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হ'ক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীল গ্রহণ শীল-সাধনা প্রয়োজন। কিন্তু শীল-সাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধা হীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এতো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

শান্তপদ লাভ করে, পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনতিমানী হবেন।

তিনি সন্তুষ্ট হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্প-ভোগী, শান্তেন্দ্রিয় সুবিবেচক, অপ্রগল্ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হ'ক, নিরাপদ হ'ক সুস্থ হ'ক।

যে-কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট, কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অনবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হ'ক।

পরস্পরকে বঞ্চনা করো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রু-

নানা দেশের বুদ্ধমূর্তি—দণ্ডায়মান বুদ্ধ
(গান্ধার, ২য় বা ৩য় শতাব্দী)

হীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে। অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রী-ভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে-প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই—সকলের চেয়ে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এ দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না, তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেননি, তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুবই স্পষ্ট করে, বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।*

---

* 'শান্তিনিকেতন' হইতে উদ্ধৃত।

॥ বৌদ্ধধর্ম ॥

প্রমথ চৌধুরী

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"—পূর্বকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হত। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম কি, বৌদ্ধ-সংঘই বা কি, এ-প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না; কারণ বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। "বৌদ্ধ" এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতাম—একটি পাষণ্ড ধর্ম মত; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন ধারণা ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই। আছে শুধু সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে এ-মতের খণ্ডন। সে-খণ্ডন হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙলা দেশে যাঁরা দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করতেন, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। সর্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, অথবা ভাষান্তরে সৌত্রান্তিকবাদ, বৈভাষিক মত ও মাধ্যমিক মতগুলি যে কি, সে সম্বন্ধে অদ্যাবধি এদেশের পণ্ডিত সমাজের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। শংকরাচার্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি হিন্দুধর্মের পুনর্জন্মদাতা এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদকর্তা বলে জগতবিখ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে কেন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হলে শংকরের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই; যা এদেশের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রীরা জানেন না। এখন এই বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের দর্শন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বৌদ্ধ-দর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তাঁর প্রচারিত ধর্মের এবং তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংঘের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংঘ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম।

॥ ২ ॥

আর আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এদেশের সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ। তাই বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তারপর আমরা সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সব বৌদ্ধ ছিলেন; বাঙলা বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ধর্মক্ষেত্র ছিল। বাঙলা ভাষার আদি পদাবলী নাকি বৌদ্ধ দোহা ও আদি ধর্মগ্রন্থ "শূন্যপুরাণ"। এ-যুগের পণ্ডিতদের মতে বাঙলা ভাষার ধর্ম শব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম এবং ধর্মপূজা মানে বুদ্ধপূজা। বাঙলা ভাষার যে সকল ধর্মমঙ্গল আছে, সে সবই নাকি বৌদ্ধ-গ্রন্থ। এবং ময়নামতীর উপাখ্যান বৌদ্ধ-উপাখ্যান। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর আমাদের অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেবদেবী। "তারা" যে বৌদ্ধ-দেবতা—তা ত নিঃসন্দেহ। শীতলাও শুনতে পাই তাই। চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবতা বাশুলীও নাকি বৌদ্ধ-দেবতা, আর বাঙলার পাষাণের পিণ্ডকার গ্রাম্য মঙ্গলচণ্ডী ছিল আদিতে বৌদ্ধস্তূপ। এ অনুমান সম্ভবত সত্য, কেননা, এ সকল দেবদেবী যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের স্বগোত্র নয়—অর্থাৎ বৈদেশিক নয়, তাঁদের বংশধরও যে নয়, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দুস্তরের দু-হাত নিচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বাঙলা দেশের মাটি দুহাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি

"......বাঙলা দেশের মাটি দু হাত খুঁড়লেই অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি......"

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি
(নেপাল ১০ম শতাব্দী)

ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে—মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু হয়েছে, তাহলে সেকথা সত্যের খুব কাছ ঘেঁষে যাবে। যে বৌদ্ধ-ধর্মের নাম পর্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, তারই স্মরণচিহ্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের পাণ্ডিত্যের প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এ অত্যাশ্চার্য ব্যাপার ঘটল কি করে?—ঘটেছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে বর্তমান ইওরোপ, ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

॥ ৩ ॥

বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলে ও, আজও তা কোটি কোটি এশিয়াবাসীর ধর্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে ও নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয়। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশ-সকল থেকেই এদেশের এই লুপ্ত ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থ-সকল উদ্ধার করেছেন এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-সংঘ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করেছি।

সিংহলেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিতসমাজে অদ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম বলে গ্রাহ্য।

সিংহলের মঠে মন্দিরে অযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই পালি ভাষা যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের ভাষা, উত্তরা-পথের না দক্ষিণাপথের, বঙ্গের না কলিঙ্গের, মগধের না মালবের—সে বিষয়ে পণ্ডিতের দল আজও একমত হতে পারেননি।

সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়—উক্ত ধর্মের জন্মবৃত্তান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ-যুগের ইওরোপীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রীদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। এবং এই শাস্ত্র থেকে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা যে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন—বর্তমান যুগে তাই আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি।

॥ ৪ ॥

পালি গ্রন্থ-সকল আবিষ্কৃত হবার কিছু-কাল পরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্বে বৌদ্ধমত যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই দুটি ধারার দুটি বিভিন্ন নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত তা "হীনযান" নামে প্রসিদ্ধ; আর যে বৌদ্ধমত নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে "মহাযান"। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এই দুটি বিভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন—Northern School ও Southern School। অনেক দিন ধরে একদলের ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা "হীনযান"কেই মূল বৌদ্ধমত ও মহাযানকে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন। অবশেষে এই পণ্ডিতের তর্কের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে,—উভয় দলই এখন এ-বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাযান, এ-দুয়ের ভিতর বৌদ্ধ-ধর্মের একই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় [illegible] সাদৃশ্য আছে যে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একই আদি মত থেকে এই দুটি বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে।

"মহাযান" মূলে বৌদ্ধমতই হোক, কিংবা তার অপভ্রংশই হোক, সে মত আমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষনীয় হতে পারে না। প্রথমত, এ-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তারপর চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত

ত্রিরত্ন
সঙ্ঘ বুদ্ধ ধর্ম

অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থই সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুধর্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্মকে উক্ত ধর্মের রূপান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয়-মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব। আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু হয়নি। ও ধর্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্তমান হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাযান মতের সঙ্গেই অদ্যাবধি আমাদের পরিচয় নাম মাত্র।

॥ ৫ ॥

আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য আজ উঠে-পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নয়, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস—এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহ্য ইতিহাস। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম archæology এবং antiquarianism। বৌদ্ধধর্ম এদেশে তার কি নিদর্শন, কি স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান এবং করছি তারই অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও মূর্তির উপরেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল-ক্ষেত্রে মৃত-বৌদ্ধধর্মের বিক্ষিপ্ত অস্থি-সকলই আমরা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অস্থি-সকল একত্র জুড়ে যদি আমরা কিছু খাড়া করতে পারি, তাহলে তা হবে শুধু বৌদ্ধ-ধর্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্মের আত্মার সন্ধান না নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ায়, বলা বাহুল্য আমাদের আত্মজ্ঞান এক চুলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। আর বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই, তিনি তার দেহের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। বৌদ্ধ-স্তূপে তার কাছে একটা পাষাণ স্তূপমাত্রই রয়ে যাবে। ইট, কাঠ, পাথরে গড়া মূর্তিসকল মূক। তারা নিজের পরিচয় নিজমুখে দিতে পারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, ভাষায় যা লিপিবদ্ধ আছে তারই কাছে। সুতরাং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও তাঁর সংঘের অজ্ঞতার উপর বৌদ্ধযুগের বাহ্য ইতিহাসও গড়া যাবে না। আমরা বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির মূর্তির মুখে যে কথা সব দিই, সে কথা আমরা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করি। সাঁচী এবং বারহুত স্তূপের ভিত্তিগাত্র সংলগ্ন মূর্তিগুলির অর্থ ও সার্থকতা তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব যাঁর বৌদ্ধজাতকের সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-ঐতিহাসিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ-চরিত্রের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জনৈক জর্মান পণ্ডিত Oldenburg বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত্র ইতিহাস নয়, কাব্য। এ-কথা সত্য। কিন্তু এ-কাব্যের মূল্য যে তথা-কথিত ইতিহাসের চেয়ে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমতা জর্মান পাণ্ডিত্যের দেহে নেই। এ-কাব্য মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। অতীতে যে বুদ্ধ-চরিত্র কোটি কোটি মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটি কোটি মানবকে মুগ্ধ করবে। এ-কাব্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নেই, যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য তার হৃদয় মনকে স্পর্শ করবেই করবে। যে দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর যে দেশের লোক তাঁর জীবন-চরিত অবলম্বন করে বুদ্ধ-চরিত নামক মহাকাব্য রচনা করেছে—সে দেশও ধন্য, সে জাতিও ধন্য।*

* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থের মুখপত্র।

বাঘ গুহার বহির্ভাগে অঙ্কিত চিত্র (গুহা নং ৪ ও ৫)

॥ ॥

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

'যদি দেখা যায় কোনো একটি নদী যেখান দিয়ে গেচে সেইখানেই তার তীরে তীরে বিশেষ কোনো জাতীয় গাছ জন্মেচে, তা হ'লে এই বুঝতে হবে যে, সেই নদীর উৎসের কাছে এই জাতের অরণ্য আছে এবং অরণ্য থেকে বীজ পড়ে নদীর স্রোতে দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়েচে। তখনকার দিনে ভারতসভ্যতায় কলাবিদ্যার চর্চা বিশেষ সজীব ছিল সন্দেহ নেই, নইলে এই সভ্যতার স্পর্শে দেশান্তরে এই বিদ্যার উৎসাহ এমন প্রবল হয়ে উঠতে পারতো না।'

রবীন্দ্রনাথ

সিগিরিয়া ফ্রেস্কো

যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি সে-যুগে সমগ্র পূর্ব-এশিয়া প্লাবিত করেছিল তার উৎস ভারতবর্ষেরই শিল্প-সাধনা সে কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। প্রাগ্‌-বৌদ্ধযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের নমুনা যদিও আজ আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়, তবু তার অস্তিত্বের কথা পৌরাণিক ভারতের মহাকাব্যগুলির মধ্যে এদিক-ওদিক যথেষ্টই ছড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ ও ঊষার প্রেমকাহিনীতে জানা যায়, প্রেমবিহ্বলা ঊষা তার স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্রকে চিত্রিত করতে বিনীত অনুরোধ করছে সখি চিত্রলেখাকে। আবার দেখি, লঙ্কার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবণের চিত্রশালার উল্লেখ আছে রামায়ণে। তাছাড়া, দেব ও অসুর শিল্পধারার দুজন কৃতী শিল্পী বিশ্বকর্মা ও ময়-এর আলোচনাও রামায়ণে দেখতে পাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে মহাপরিনির্বাণের বহু পূর্বে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে) দেব-শিল্পশৈলী মগধে অব্যাহত ছিল। অপরূপ সে প্রাচীন রূপকল্পের স্রষ্টা ছিলেন দেব-শিল্পিগণ এবং পরবর্তী যুগে সে ধারার বাহক হলেন পুণ্য যান বা যক্ষ শিল্পীরা। কুমারস্বামী বলেছেন, বৌদ্ধ প্রভাববর্জিত ভারতীয় শিল্পের হদিস পাওয়া যায় অশোকের সমসাময়িক ও তাঁর নিকট-পরবর্তী যুগে। সে শিল্পের প্রধান প্রাণবস্তু ছিল প্রকৃতি ও আদিম দেবদেবী; যথা পৃথ্বী, বরুণ, মকর, নাভা, যক্ষ ইত্যাদি। সে শিল্পের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে বেশ... র, পারখাম, সাঁচী, ভারহুত ইত্যাদি প্রাথমিক বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্পে।

বুদ্ধবাণী ও ধর্মমতকে জনমনগোচর করার প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল সম্ভবত কাব্য, নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে। 'সৌন্দর্য আমার কাছে নিগুণ'—একথা রয়েছে দশধম্মসুত্তে। অতএব ধারণা করা যায়, চিত্র ও ভাস্কর্যের দর্শনেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ আবেদনের শক্তি বৌদ্ধসংঘপতিদের তখনও অজ্ঞাত ছিল। 'বিশুদ্ধি মার্গ'-তে বলা হয়েছে আকার এবং আনুষঙ্গিক দ্বারা চেতনাপ্রসূত যে প্রেম এবং ভক্তি তা বিলাস-ব্যসনতুল্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য। চিত্রকর, সংগীতকার, সুগন্ধিকার, সূপকার প্রভৃতিকে বিলাসব্যসনের পরিবেশক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে যুগে। তাই আকারগত সৌন্দর্যের বাহক বলে বৌদ্ধসংঘে নরনারীর অবয়ব চিত্রিত করা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সেকালের চিত্রকর্ম লতাপুষ্প ইত্যাদি রূপায়ণে সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রাচীন হীনযানী এ রীতির সঙ্গে সমসাময়িক জৈন ও কিছু ব্রাহ্মণ্য রীতির নীতিগত মিল ছিল স্পষ্ট।

প্রচলিত হিন্দু চিত্রধারার প্রতিচ্ছ হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক বৌদ্ধ শিল্পকর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিশেষ নিজস্ব প্রয়োজনে ক্রমে তাকে রূপ দিয়েছিল বৌদ্ধ শিল্পধারা। অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অশোকস্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ রূপায়ণে। তার অনুপ্রেরণা সম্ভবত ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল এবং তা ছিল বেশ কিছুটা বৌদ্ধ রীতিবহির্ভূত। তারপর খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে বৌদ্ধ-শিল্প যে রূপ পরিগ্রহ করলো সাঁচী, ভারহুত, বুদ্ধগয়া ইত্যাদির শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে তার প্রমাণ রেখে গেছেন যক্ষ-যক্ষিণী এবং জাতক চিত্রায়ণের মধ্যে। তখনও হীনযান ধর্মানু-শাসনে বুদ্ধমূর্তি রূপায়ণ নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মানুশাসনকে মেনে নিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করলেন শিল্পী তাঁর তীক্ষ্ণধীপ্রসূত প্রতীকের সাহায্যে। মহা-পরিনিষ্ক্রমণ রূপায়িত করতে গিয়ে শিল্পী

রচনা করলেন অশ্ব কণ্ঠক এবং তার সারথী ছন্দককে। আশপাশের দেবকুল তাদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু কণ্ঠকের পৃষ্ঠে আরোহীর অভাব। কারণ সিদ্ধার্থের অবয়ব অঙ্কন তখনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মহান্ এ-বিশেষ যাত্রাকে শিল্পী পবিত্রতা আরোপ করলেন প্রতীকের সাহায্যে। অর্থাৎ গমনোদ্যত এই পবিত্র অশ্বপদসমূহ ভূমিস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে সাগ্রহে ধারণ করেছেন দেবগণ। এই ধরনের প্রতীক ব্যবহারে শিল্পীরা তথাগতকে বহুবারই উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের চিত্রকর্মে। কখনও পদ্ম, কখনও হস্তি, শ্রীপদ, জ্যোতিচ্ছটা, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি নানা প্রতীক বুদ্ধের পরিবর্তে তাঁরা বহু স্থানে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করেছেন।

এই প্রতীকধর্মী হীনযান শিল্পরীতি ক্রমশ মহাযানদের বুদ্ধমূর্তিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস অজন্তা ভাস্কর্য ও ভিত্তি-চিত্রে সুস্পষ্ট। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী চৈত্য ও বিহারগুলিতে হীনযান যুগের অনাড়ম্বর চিত্রণ ও ভাস্কর্য ধারা এবং প্রাচীন কাষ্ঠ-নির্মিত স্থাপত্য প্রণালীর অনুসরণ দেখা যায়। পরে মহাযান মতের প্রসারের সঙ্গে

জলপরী: মধ্য এশিয়ার ডণ্ডন উলিকের প্রাচীর চিত্র (৮০০ খৃঃ)

আড়ম্বরপূর্ণ ভাস্কর্য ও চিত্রধারায় হীন-যানী অনাড়ম্বর দারু স্থাপত্য রীতিবর্জিত হয়েছে। মূলত অজন্তা শিল্পকর্ম বৌদ্ধ-জাতক ও বুদ্ধজীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। কী মূর্তি, কী চিত্র এখানে সবই জীবন্ত সবই চলমান। কালোত্তীর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে সর্বকালীন সভ্যতার নিরিখ কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, উজ্জয়িনী, বিদিশা এমন কী আশপাশের অন্য দেশীয় নগর ও তাদের নাগরিক-নাগরিকারা। জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পারি-পার্শ্বিকতায় চিত্রায়িত হয়েছে নরনারী। কখনও তাদের পশ্চাদ্‌পট গভীর বনানী, কখনও বা সুরম্য উদ্যান। রাজপ্রাসাদে বা রাজপথে, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অথবা গগনচুম্বী নগরাজের পদতলে এদের অবস্থান। গগনচারী অপ্সরা, গন্ধর্ব, দেবদেবী, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-অশ্রু এবং হিংসা-দ্বেষ কিছুই শিল্পীর অগোচর নয়। সুষ্ঠু সাবলীল মানব-মানবীর সঙ্গে সঙ্গে একই স্বাচ্ছন্দ্যে শিল্পী এঁকেছেন পশু-পক্ষী, প্রাণী, জলজ বা বনজ, লতা-পুষ্প এবং প্রাণোচ্ছল বন্যতা।

বাঘ চিত্রগুলিও শিল্পদক্ষতার বিচারে অজন্তারই সমকক্ষ। দুই গুহার চিত্রাবলীই এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে দক্ষ তুলীর টানে জীবন্ত। কিন্তু বাঘে ও অজন্তায় মূলে দুটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। অজন্তার বিষয়বস্তু দেশীয় ভাগই ধর্মমূলক। বুদ্ধ-জীবনী ও জাতক ধরেই তার বিন্যাস। বাঘ কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্তমান। সমসাময়িক মানুষের দুঃখ ও আনন্দ, জীবন ও ধর্মের অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই অসাধারণ চিত্রগুলিতে। দ্বিতীয়ত, অজন্তার ছবি দেখে প্রথমেই মনে হয়, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সেগুলি কল্পিত ও অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু বাঘ দেখে অনুমান করা যায়, একই সময়ে এক বা একাধিক—একই গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীর ঐক্যবদ্ধ চিন্তার বাঘ রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রির ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের বদলে অনিন্দ্যভাবে ধরা দিয়েছে [illegible] সাবলীল চিত্রশৈলী—যা প্রতি রেখায়, প্রতি ঢঙে, প্রতি রঙে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

যুগ পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘপতিরা মেনে নিয়েছিলেন চিত্রকর্মের দর্শনজাত প্রত্যক্ষ অবদানশক্তিকে। লামা তারানাথ বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রসার যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন তার সহগামী দক্ষ সঙ্ঘশিল্পী গোষ্ঠী। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশজ্ঞ ভাষান্বেষী মানুষ সদ্ধর্মেচ্ছায় ও উপদেশের আকাঙ্ক্ষায় যখন ভারতবর্ষের সঙ্ঘগুরুদের অনুরোধ করতেন, জ্ঞানী ভিক্ষু প্রেরণের জন্য তখন সে ডাকে সাড়া দিয়ে যে জ্ঞানী শুরু করতেন এ কষ্টকর সুদূর যাত্রা স্বভাবত তাঁকে বাধ্য হতে হতো ভ্রমণকে সুখকর করবার জন্য গুরুভার ওজনের সীমাবদ্ধতা রক্ষা করা। ফলে বেশী পুঁথিপত্রের বদলে সঙ্গে নিতেন জড়ানো বা দীঘল পট। সম্ভবত সেই দীঘল পটের আজকের প্রতিভূ হলো তিব্বতী ও নেপালী টঙ্কচিত্র।

ইতিহাসে দেখা যায়, বহু ধর্মমত ও পথ তার ভক্তবৃন্দের সাংস্কৃতিক জীবন ও কর্মকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে প্রচণ্ড শক্তি সমস্ত পূর্বদেশ, যথা সিংহল, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, বামিয়ান, খোটান, দাক্তানউইলিস, বাজাকলিক, কিজিল, তুরফান, তুংহুয়ান, চীন, জাপান ইত্যাদিতে জ্ঞানমার্গ ও নৈতিকজীবন, বিশেষ করে তার শিল্পধারাকে যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐসব দেশের শিল্পকর্মের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আজ হয়তো ওসব দেশের অনেক জায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের প্রচলন নেই। তবুও তার শিল্পজীবনে বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে চক্ষুষ্মান দর্শককে তা খুঁজে বার করতে কষ্ট পেতে হবে না।

॥ গৌতমের তপস্যা ॥

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বাংলা দেশের যে সকল মনীষী বৌদ্ধ-ধর্ম ও দর্শনের অনুশীলন ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি গৌরবের আসন জ্ঞানতপস্বী মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০) মহাশয়ের প্রাপ্য। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার রচনাবলী পুরাতন বিশেষ ২ পত্রের পৃষ্ঠাতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বর্তমান রচনাটি আশ্বিন ১৩৩০ সংখ্যা প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত।।

বাল্যকাল হইতেই গৌতমের প্রাণ ধর্মপ্রবণ ছিল। একস্থলে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, গার্হস্থ্য অবস্থাতেই তিনি অনেক সময়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ৩৬, মহা-সচ্চকসুত্ত)।

গৃহ ত্যাগ করিবার পরে তিনি কি ভীষণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা মজ্‌ঝিম-নিকায় নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাঁহার বয়স যখন ৮০ বৎসর, তখন সেই বিষয়ে তিনি সারিপুত্রকে নিজ তপস্যার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাহারই অংশবিশেষ নিম্নে অনূদিত হইল।

চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য

গৌতম সারিপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে সারিপুত্র! আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য প্রতি-পালন করিয়াছি। আমি তপস্বী ছিলাম এবং পরম তপস্বীই ছিলাম। আমি রুক্ষ ছিলাম এবং পরম রুক্ষ ছিলাম। আমি জুগুপ্সিত ছিলাম এবং পরম জুগুপ্সিত ছিলাম। আমি প্রবিবিক্ত ছিলাম এবং পরম প্রবিবিক্ত ছিলাম।"

তপস্বী

"হে সারিপুত্র! আমার তপস্যা এই প্রকার ছিল—

"আমি বিবস্ত্র, মুক্তচার এবং হস্তাবলেহক (যে হস্ত অবলেহন করে) ছিলাম। ভিক্ষা-কালে যদি কেহ বলিত, 'হে ভদন্ত এস', 'হে ভদন্ত দাঁড়াও', আমি তাহা শুনিতাম না। যদি কেহ আমার নিকট আহার্য লইয়া আসিত, বা আমার উদ্দেশে আহার প্রস্তুত করিত, বা আমাকে নিমন্ত্রণ করিত, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম না। কুম্ভমুখ বা কলোপীমুখ হইতে কখন ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না; এড়কা বা দণ্ড বা মুসলের নিম্ন হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। দুজন ভোজন করিতেছে এমন স্থল হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। গর্ভিনী বা স্তন্যদাত্রীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। অভ্যাগত লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। যে স্থলে কুকুর রহিয়াছে, যে স্থলে মক্ষিকা ভনভন করিতেছে, সে-স্থল হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না।

"আমি মৎস বা মাংস বা সুরা বা মৈরেয় বা তুষোদক গ্রহণ করিতাম না।"

"এক গৃহে এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম, দুই গৃহে দুই গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম, সপ্ত গৃহে সপ্ত গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম। এক স্থানের দানে জীবনযাপন করিয়াছি, দুই স্থানের দানে জীবনযাপন করিয়াছি। সপ্ত স্থানের দানের উপর জীবনযাপন করিয়াছি। দিনে একবার আহার করিয়াছি, দুই দিনে একবার আহার করিয়াছি, সাত দিনে একবার আহার করিয়াছি; এইরূপে অর্ধ মাসে একবার মাত্র ভোজন করিয়া বিহার করিয়াছি।"

"শাক ভক্ষণ করিতাম, শ্যামাক ভক্ষণ করিতাম, নীবার ভক্ষণ করিতাম, দর্দুল ভক্ষণ করিতাম, 'হট' ভক্ষণ করিতাম, কেণ ভক্ষণ করিতাম, পিণ্যাক-খৈল ভক্ষণ করিতাম, তৃণ ভক্ষণ করিতাম, গোময় ভক্ষণ করিতাম। বন্য মূল ও ফল আহার করিতাম। বৃক্ষপতিত ফল আহার করিতাম।"

"শোণবস্ত্র ধারণ করিতাম; শ্মশানের বস্ত্র, শবদূষিত বস্ত্র, পাংশুকূলস্থ-বস্ত্র ধারণ করিতাম। তিরীটী-বল্কল ধারণ করিতাম। অজিন ধারণ করিতাম, অজিন হইতে প্রস্তুত বল্কল ধারণ করিতাম। কুশচীর, বল্কল চীর, ফলকচীর, কেশ-কম্বল, বাল-কম্বল ও উলূক-পক্ষ ধারণ করিতাম। কেশ-শ্মশ্রু নির্মূলকারী ছিলাম—কেশ ও শ্মশ্রু তুলিয়া ফেলিতাম।"

"সমুদায় আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতাম, উৎকুটাসনে উপবেশন করিয়া 'উৎকুটক' তপস্যা করিতাম। কণ্টক শয্যাশায়ী ছিলাম, কণ্টকশয্যায় শয়ন করিতাম। তৃতীয়বার স্নান করিবার জন্য সায়াহ্নে উদকে অবগাহন করিতাম। এই-রূপে নানা প্রকারে দেহকে তাপসন্তপ্ত করিয়া বিহার করিতাম। আমার তপস্যা এইপ্রকার ছিল।"
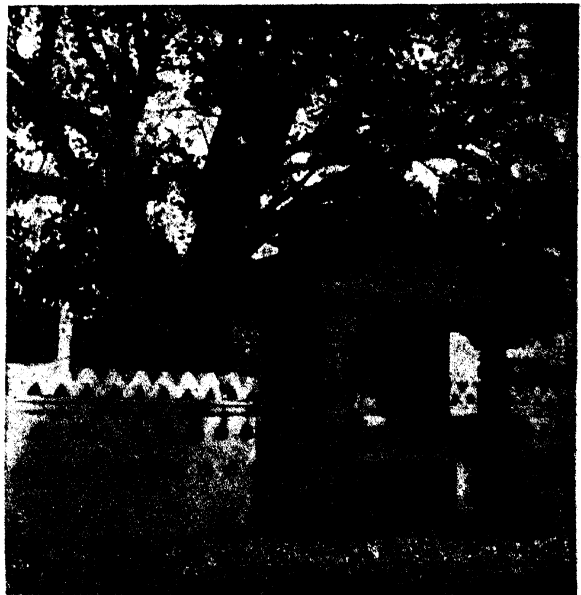
বোধিবৃক্ষ (সারনাথ)—মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদেবমিত্র ধর্মপাল কর্তৃক ১৯৩১ সালে রোপিত বোধিবৃক্ষের চারা হইতে উৎপন্ন ফটো—নীরোদ রায়

পরম রূক্ষ

"আমি 'রূক্ষ' আচরণ করিতাম। বহু বৎসরের ধূলি ও ময়লা দেহে সঞ্চিত হইয়া খসিয়া পড়িত—যেমন তিন্দুক বৃক্ষের স্থান হইতে সঞ্চিত ময়লা ও বল্কলাদি নিপতিত হয়। তখন ইহা মনে হইত না যে, আমি নিজে এই ধূলি ও ময়লা পরিমার্জন করিতে পারি, কিংবা অপর কেহও ইহা পরিমার্জন করিয়া দিতে পারে—হে সারিপুত্র! আমার মনে এ-প্রকার কোনোভাবই আসিত না। হে সারিপুত্র! আমি এই প্রকার রূক্ষ আচরণ করিতাম।"

পরম জুগুপ্সা

"হে সারিপুত্র। আমি এইরূপে জুগুপ্সা-পরায়ণও ছিলাম। অভিক্রমণ ও প্রতিক্রমণের সময়ে আমি স্মৃতিমান হইয়া থাকিতাম। উদকবিন্দু দেখিলেও আমার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইত, মনে হইত ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদিগের যেন কোন অনিষ্ট না করি। হে সারিপুত্র! আমি এইরূপ জুগুপ্সাপরায়ণ ছিলাম।"

সম্ভবত এস্থলে 'জুগুপ্সা' শব্দের অর্থ 'দয়া'।

পরম প্রবিবিক্ত

"হে সারিপুত্র! আমি এই প্রকারে বিবিক্ত-দেশসেবী ছিলাম। হে সারিপুত্র! আমি বনভূমিতে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতাম। হে সারিপুত্র! যেমন অরণ্যচর মৃগ মনুষ্য দর্শন করিয়া, বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থানে উচ্চ স্থলে হইতে উচ্চতর স্থলে

নানা দেশের বুদ্ধমূর্তি—বোধিসত্ত্ব
(ফনদুকিস্তন, মধ্য এশিয়া)

গমন করে, হে সারিপুত্র! আমিও তেমনি গোপালক বা পশুপালক বা তৃণহারক, বা কাষ্ঠহারক বা বনকর্মী দর্শন করিয়া, বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন স্থল হইতে নিম্নতর স্থলে এবং উচ্চ স্থল হইতে উচ্চতর স্থলে গমন করিতাম। এ প্রকার কেন করিতাম? এই জন্য, যে তাহারা যেন আমাকে দর্শন না করে এবং আমিও যেন তাহাদিগকে দর্শন না করি। আমি এই প্রকারে বিবিক্ত-প্রদেশ সেবা করিতাম।"

ভক্ষণ

"হে সারিপুত্র! যখন গোষ্ঠ হইতে গাভী ও গোপালকগণ চলিয়া যাইত, তখন পাদ হস্তে গমন করিয়া দুগ্ধপায়ী তরুণ বৎস-গণের গোময় আহরণ করিতাম। ইহাতে আমার যে মূত্র ও পুরীষ উৎপন্ন হইত, তাহাও ভোজন করিতাম। হে সারিপুত্র! আমি এইরূপ মহা বিকট ভোজন করিতাম।"

আবাস

"হে সারিপুত্র! আমি ভীষণ বনভূমিতে গমন করিয়া বিহার করিতাম। হে সারি-পুত্র! সেই বনভূমিতে বিষম ভীতির উদ্রেক হয়। যাহারা বীতরাগ হয় নাই, সেই বন-ভূমিতে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের লোমহর্ষণ হয়।"

"হে সারিপুত্র! যখন হেমন্তকালে রাত্রিতে হিমপাত হইত, সেই-প্রকার রজনীতে উন্মুক্ত স্থানে বিহার করিতাম, আর দিবা ভাগে বনে প্রবেশ করিতাম। ইহার পরে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে থাকিতাম এবং রাত্রিকালে থাকিতাম বন-ভূমিতে। তখন অশ্রুতপূর্ব এই গাথা আমার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল—"

"তিনি (গ্রীষ্মকালে) উত্তপ্ত, (শীতকালে) শীতার্ত, তিনি একাকী ভয়ানক বনে বাস করেন; তিনি নগ্ন, অনগ্নি, আসীন; তাঁহার মন সুপ্রতিষ্ঠিত; তিনিই মুনি।"

উপেক্ষা-সাধন

"হে সারিপুত্র! শ্মশানে শবাস্থিসমূহের উপরে শয়ন করিতাম। গোপাল বালকগণ সেই স্থলে আসিয়া আমার দেহে নিষ্ঠীবন ও মূত্র ত্যাগ করিত, ধূলি নিক্ষেপ করিত, এবং কর্ণবিবরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিত। হে সারিপুত্র! তখনও তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার মনে পাপচিন্তা আসিত না। হে সারিপুত্র! আমি এইরূপে উপেক্ষা-ভাব সাধন করিতাম।"

দেহ ক্ষয়

"হে সারিপুত্র! অনেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই মত পোষণ করে এবং এই প্রকার বলিয়া থাকে—'আহারেই শুদ্ধিলাভ'। তাহারা বলিয়া থাকে 'একমাত্র কোল-ফল দ্বারাই জীবনধারণ করিব' এবং তাহারা কোল-ফলই ভক্ষণ করে, কোল-চূর্ণই ভক্ষণ, কোলোদকই পান করে এবং নানা প্রকার কোলময় খাদ্য গ্রহণ করে। হে সারিপুত্র! আমিও একটিমাত্র কোল-ফল আহার করিতাম। হে সারিপুত্র! তোমার মনে এই প্রকার চিন্তা আসিতে পারে যে, সে-সময়ের কোল-ফল প্রকাণ্ড ছিল। হে সারিপুত্র! তাহা নহে, এখন কোল-ফল যে-প্রকার, সে-সময়ের কোল-ফলও সেই-প্রকার ছিল। আমি এই-প্রকারে একটি কোল-ফল আহার করিতাম।"

এ স্থলে গোতম কোল-ফলের বিষয়ে যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার পরে মুদ্গ, তিল ও তণ্ডুল কণা বিষয়েও ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন। এক সময়ে কেবল মুদ্গই ভক্ষণ করিতেন, কিছুদিন কেবল তিলই ভক্ষণ করিতেন এবং কখনো বা ভক্ষণ করিতেন কেবল তণ্ডুল। তিনি যে ভক্ষণ করিতেন, তাহাও কেবল একটি কণা।

এই প্রকার বর্ণনা করিবার পরে তিনি সারিপুত্রকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"এই প্রকার আহারে আমার দেহ অত্যধিক শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অল্পাহারে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'আসীতিক পর্ব' বা 'কাল' পর্বের ন্যায় (অর্থাৎ নল-জাতীয় উদ্ভিদের ন্যায়) বিশুষ্ক হইয়াছিল। অল্পাহারে আমার নিতম্ব উষ্ট্র ক্ষুরের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল। অল্পাহারে পৃষ্ঠদণ্ড রজ্জুর ন্যায় উন্নতাবনত হইয়াছিল। যেমন
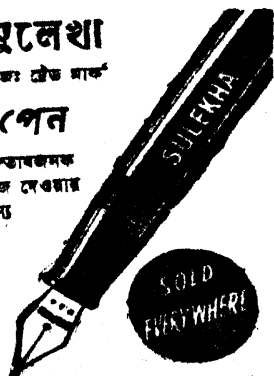
জীর্ণ গৃহের 'গোপানসীসমূহ (অর্থাৎ আড়কাঠাগুলি) 'ওলুগুগা বিলুগুগা' অবস্থায় (অর্থাৎ ভগ্ন অবস্থায়) পরিদৃষ্ট হয়, অল্পাহারের জন্য আমার দেহের পার্শ্বাস্থিসমূহও তেমনি পরিদৃষ্ট হইত।"

"যেমন গভীর কূপে নিম্নগত জল কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, অল্পাহারের জন্য তেমনি আমার অক্ষিকূপের অক্ষিতারকা কোটরগত হইয়া প্রায় অদৃশ্যই হইয়া গিয়াছিল। 'আম-অলাবু' (কাঁচা লাউ) ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যেমন বায়ু ও আতপে শুষ্ক ও সংকুচিত হইয়া যায়, তেমনি অল্পাহারে আমার মস্তকের চর্ম শুষ্ক ও সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল। অল্পাহারে উদরের চর্ম পৃষ্ঠদেশের অস্থিতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। যখন মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাইতাম, তখন অল্পাহারবশত কুব্জ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। সেই বেদনা প্রশমনের জন্য যখন সেই অঙ্গ হস্ত সঞ্চালন করিতাম, তখন সেই স্পর্শে পচিত মূল লোমসমূহ (অর্থাৎ যে লোমের গোড়া পচিয়া গিয়াছিল, সেই লোমগুলি) দেহ হইতে উৎপাটিত হইয়া পড়িত। অল্পাহারের জন্যই এই প্রকার ঘটিয়াছিল।"

অন্যত্র

মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থের মহা-সচ্চক সুত্তেও এই তপস্যার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অংশ কেবল সেই সুত্তেই পাওয়া যায়। এই অংশও গৌতমের উক্তি। তিনি বলিতেছেন—

"লোকে আমাকে দেখিয়া এইপ্রকার আলোচনা করিত—শ্রমণ গোতম কৃষ্ণবর্ণ, কেহ এই প্রকারে বলিত। কেহ বলিত শ্রমণ গোতম কৃষ্ণবর্ণ নহে, শ্রমণ গোতম শ্যামবর্ণ। কেহ বলিত শ্রমণ গোতম কৃষ্ণ বর্ণও নহে, শ্যামবর্ণও নহে, শ্রমণ গোতমের বর্ণ মদ্গুর-সংসার বর্ণেরন্যায়। আমার ত্বকের পরিশুদ্ধ নির্মল বর্ণ অল্পাহারে এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।"

বিফল তপস্যা

মহা সীহনাদ সুত্তে গোতম সারিপুত্তকে দেহক্ষয়ের বিষয়ে যতদূর বলিয়াছিলেন, তাহার পরে এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"হে সারিপুত্র! এইপ্রকার আচরণ করিয়াও, এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও, এইপ্রকার দুষ্কর সাধন করিয়াও মানবধর্মের অতীত পরম আর্যজ্ঞান ও দর্শনলাভ করিতে পারি নাই। যে আর্য-প্রজ্ঞা লাভ করিলে সমুদয় দুঃখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই তপস্যা দ্বারা আমি সেই আর্যপ্রজ্ঞা লাভ করিতে পারি নাই।"—মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থে মহাসীহনাদ সুত্ত।

অন্য এক স্থলে গোতম এই প্রকার বলিয়াছিলেন—

"সেই সময়ে আমার মনে এই প্রকার ভাব হইল—অতীত কালের শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও আমার তপস্যা ভীষণতর। ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ, বেদনা কেহই অনুভব করে নাই। ভবিষ্যৎ কালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করিবে, তাহা অপেক্ষা এই সাধনা ভীষণতর, ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখকষ্ট কেহই অনুভব করিবে না। বর্তমান কালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, তাহা অপেক্ষা এই তপস্যা ভীষণতর, ইহা অপেক্ষা কেহই গুরুতর দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতেছে না। কিন্তু এই প্রকার তীব্র তপস্যা করিয়াও মানবধর্মের অতীত আর্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি নাই। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য পথ থাকিতে পারে। আমার মনে হইল পিতা শাক্য যখন লাঙ্গল * দ্বারা চাষ করিতেন, তখন আমি জম্বুচ্ছায়ায় নিসন্ন হইয়া, সমুদায় কামনা বিসর্জন করিয়া, সমুদায় অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেক-জ ও প্রীতি সুখপূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম। ইহাই ত বুদ্ধত্বলাভের মার্গ হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার একান্ত ক্ষীণ ও দুর্বল দেহে এই প্রকার সুখময় অবস্থা লাভ করা সুকর নহে। সুতরাং স্থূল খাদ্য ও দধি মিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করা যাউক। ইহার পরে আমি স্থূল খাদ্য ও দধিমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম।" মজ্ঝিম-নিকায়, মহাসচ্চক সুত্ত।

মানুষ ধর্মের জন্য কি না করিতে পারে। গোতমের ভীষণ তপস্যার কথা মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এপ্রকার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নহে, তখন তিনি অন্যপথ অবলম্বন করিলেন। এই পথেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

* অতি প্রাচীনকালে জনকাদি রাজগণও স্বহস্তে লাঙ্গল চালাইতেন। রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৬৬।১৩।

॥ গান্ধীর দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ ॥

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় যখন একপক্ষে ভারতের তদানীন্তন সরকার আর অপরপক্ষে জনসাধারণ হিংসায় মত্ত হয়ে হানাহানি করছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বড় বেদনায় গান্ধীজীকে আবেদন জানিয়ে লিখেছিলেন, 'দেশের এই সংকটকালে আপনিই আমাদের মধ্যে মহান নেতারূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সেই অহিংস আদর্শে নিজ বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন, যা ভারতের চিরন্তন আদর্শ। আপনিই এ দুঃসময়ে ভারতকে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাকে সত্যতম জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বুদ্ধ ভগবান সকল কালের জন্যই বলে গিয়েছেন, 'অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় কর, কল্যাণের দ্বারা অকল্যাণকে জয় কর', আপনিও তাই বলেছেন।''

গান্ধীজী স্বীকার করতেন যে, "আমাকে বুদ্ধভক্ত বলাতে আমি মাঝে মাঝে বড় গর্ববোধ করি। আমার জীবনে আমি বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে বহু প্রেরণা পেয়েছি।"

বিশ বছর বয়সে যখন গান্ধীজী বিলেতে ব্যারিস্টারীর পাঠ নিতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথম বুদ্ধের জীবনবাদের সংগে পরিচিত হন এডুইন আর্নল্ডের "লাইট অব এশিয়া" পড়ে। তারপর থেকে বুদ্ধের ভাববাণী তার মনকে ছেয়ে থাকত। সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে গান্ধীজী সারা জীবনই ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, ক্ষমা, ত্যাগ, অকিঞ্চনতা, পশুবলির বিরোধিতা, সর্বজীবে মৈত্রী, সত্য পথ, সত্য বাক, সত্য চিন্তা, সত্য আচরণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মৃত্যুকে তুচ্ছ করার অন্তরশক্তি, দেহের অনিত্যতাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাস — এসব যা কিছুর ওপর ঝোঁক দিয়েছেন, সবই বুদ্ধের জীবনবাদের প্রতিধ্বনিস্বরূপ। গান্ধীজীর সারাজীবন লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করে সর্বজীবে মৈত্রী করুণা প্রবাহিত করার সাধনা, ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনা না করে লোকহিতের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থেকে প্রেমের ব্যাপক প্রচার করার প্রয়াসও বুদ্ধভাবে ভাবিত।

তাঁর মতে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনও ঘটনা থেকেই একথা মনে হয় না যে, তিনি কেবলমাত্র সুনীতির বিধানে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি যে আস্তিক নন এবং হিন্দু ধর্মে অবিশ্বাসী এই মতকে গান্ধীজী আমল দিতেন না। বলতেন "বুদ্ধ মহাহিন্দু ছিলেন। তিনি তো হিন্দুধর্মকে বাতিল করেননি, বরং তার যা কিছু মহত্তম, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। যে সব জ্ঞানদীপ্ত বৈদিক সূত্র কর্মকাণ্ডের আচারে চাপা পড়ে গিয়েছিল, বুদ্ধ সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাঁর যুগে মানুষ যেসব ভাবগর্ভ বৈদিক ব্যাখ্যাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল, সেগুলিকে জাগরূক করেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কৃত করতে চেষ্টা করেছিলেন, অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। একথা সত্য যে, তিনি হিংসায় উৎসাহিত হন, তিনি স্বীয় অকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন, তিনি পৃথিবীর মানুষ রাজাদের মতো বাসনার দাস এবং উৎকোচে তুষ্ট হন বা প্রসাদ বিতরণে যাঁর প্রিয়পাত্র ও প্রতিপক্ষের বিচার আছে, এমন ঈশ্বরে বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন না। ভগবান যে কখনও তাঁর সৃষ্ট অসহায় জীবের বলিদানে ও রক্তপাতে তৃপ্ত হতে পারেন, সর্বশক্তি নিয়ে বুদ্ধ এই মূঢ় ধারণা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরকে তাঁর প্রকৃত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তিনি সোনা আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বুদ্ধকে জানতে গেলে তিনি যে মূল উৎস থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈদিক ধর্মকে জানা একান্ত প্রয়োজন।"

জ্ঞানী ধ্যানী বুদ্ধের চেয়ে প্রেমী প্রার্থনারত বুদ্ধের কল্পনাই গান্ধীজীকে বেশী তৃপ্তি দিত, কারণ তাঁর মতে শুদ্ধ শাণিত বিচারবুদ্ধির অতীত অতীন্দ্রিয় চেতনা ও অনুভূতি মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়, পথনির্দেশ করে। তাঁর নিজের কয়েকটি প্রিয় মতবাদের সমর্থন করতে গিয়েও তিনি বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন, প্রার্থনা, এমন কি চরখার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে সাক্ষী মানলেন বুদ্ধকে, "বিশ্বের তিনটি বড় ধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধ, যীশু আর মহম্মদ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য উপবাস করেছিলেন। তাঁরা এই অনড় সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে, উপবাসকালেই তাঁরা মহাবোধি উপলব্ধি করেন, মহাশান্তির সন্ধান পান।

ধ্যানমগ্ন

ফটো—সুনীল জানা

জীবের জীবন আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের প্রতীক ছিল।" খাদি প্রচারের জন্য ভারতময় ঘুরতে ঘুরতে গান্ধীজী বর্মার বৌদ্ধদের ডাক দিয়ে বল্লেন, "সুতো কাটা তো অহিংসা ও প্রতিবেশীর প্রতি মিত্রতার এক অংশবিশেষ। তোমরা যারা বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী, তারা তো অলস জীবনযাপন করতেই পার না। অহিংসা বলতে সঙ্গীসাথী পড়শীর প্রতি দরদও বোঝায়, যে অলস নিষ্কর্মা সে তো এই অতি সাধারণ সহজ কর্তব্যটুকুও ফাঁকি দিচ্ছে।"

অনেকের কাছে গান্ধীজীর বস্তুসম্পদ বর্জন আর অসহযোগ আন্দোলন নেতিবাচক মনে হত। গান্ধীজী স্বপক্ষে যুক্তি দেখাবার সিংহলী ছাত্রদের এক ভাষণে বলেছিলেন, "যে মহাগুরুকে তোমরা রাজার রাজারূপে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছ, তিনি তাঁর অমৃত মন্ত্র মানুষের গড়া অট্টালিকায় বসে প্রচার করেননি, একটি সুন্দর বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন।" এলাহাবাদের অর্থনৈতিক সমিতিতেও বলেছিলেন, "আজকাল আমরা যদি কিছু টাকা না থাকলে যথাযথভাবে সৎ থাকাও সম্ভব হয় না। বুদ্ধ যীশু নানক কবীর প্রভৃতি সকল ধর্মপ্রাণ সাধকরা এর বিপক্ষে রায় দিয়ে গেছেন। তাঁদের পুণ্য আবির্ভাবে বসুন্ধরা ঋদ্ধিশালী হয়েছিল অথচ তাঁরা সবাই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন।" তিনি সাহস করে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মতও খণ্ডন করতে চেষ্টা করে বলেছিলেন, "কবির নেতিবাচক সকল কিছুর প্রতিই বিরাগ আছে, কিন্তু আমার মনে হয় বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বকে শুধু নেতিবাচক এই আখ্যা দিয়ে তিনি অজ্ঞাতে অবিচার করেছেন। সে হিসেবে আমাদের মুক্তিও নির্বাণের মতো নেতিবাচক অবস্থার পরিচায়ক। নির্বাণ মানে হচ্ছে আমাদের মধ্যে যা কিছু হীন, যা কিছু দুরাচার, যা কিছু দুষ্ট তার নিঃশেষ ক্ষয় ঘটানো। নির্বাণ হচ্ছে পরমা শান্তি, জাগ্রত আনন্দস্বরূপ।"

ভারতের বাইরে অনেক বৌদ্ধ আছেন, যাঁরা আমিষভোজী। তাদের যুক্তি এই যে, নিজে প্রাণী হত্যা করছে না, অতএব তাদের হিংসার পাপে লিপ্ত হতে হচ্ছে না। তারা গান্ধীজীর কাছ থেকে এই জবাব পেয়েছিল যে, 'আমার মতে ভারতে বুদ্ধের বাণী যেমন সত্যভাবে ও পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল, চীন জাপান মালয় বা সিংহলে তেমনটি হয়নি। তোমরা কোথায় একটা প্রাণবান সচল জোরালো মতবাদ মূর্ত করে তুলবে, তা না চিরাচরিত মৃতপ্রাণ শুকনো কাঠামো আঁকড়ে আছ। জগতে বুদ্ধই একমাত্র মহাসাধক, যিনি কার্যকারণের অমোঘ অনুশাসন ও বিধানের ওপর জোর দিয়েছিলেন আর তাঁর ভক্ত হয়ে তোমরা

নানা দেশের বুদ্ধমূর্তি—বজ্রসত্ত্ব
(তিব্বত, ১১০০—১২০০ অব্দ)

নিজেদের কৃতকর্মের ফলের বোঝা এড়িয়ে যাচ্ছ! সেই মহাপ্রাণ বলির পাঁঠা নিজের কোলে তুলে নিয়ে স্পর্ধিত অজ্ঞ ব্রাহ্মণের পশুবলির যুক্তিতে বাধা দিয়েছিলেন, যাঁর বুদ্ধের অমিত প্রেম পুরোহিতদের মন স্পর্শ করতে নাও পারত, তবু তিনি জীবনপণ করে এ হিংস্র প্রথার বিরোধ করতেন। যদি স্বর্গের দেবতার নামে পশুহত্যা পাপ হয় তো মানুষের ভোগ ও লোভ চরিতার্থ করার জন্য পশুবধ কি বিধেয়? এমন করে কদর্য করা ও ব্যর্থ করার জন্যই কি এই মহান বাণী তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন?"

অহিংসার এই বীজমন্ত্র গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করে অপরিমিত প্রেম ও মৈত্রীর পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অহিংসার কিছুটা রূপভেদ ঘটিয়েছেন বলা যায়। তাঁর অহিংসা কেবলমাত্র প্রাণীহত্যা বিমুখতা নয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কলহে যোগদানে বিরতি নয়, জিঘাংসা প্রকাশে মৌনতা অবলম্বন নয়। এ হচ্ছে কার্যে বাক্যে ও চিন্তায় অহিংস হওয়া, মনের অন্তস্থলে অকল্যাণ চিন্তা লুকিয়ে রাখলেও ব্রতচ্যুত ঘটে। অথচ সকল অশুভ প্রথা, নিষ্ঠুর শাসনতন্ত্র এবং দুষ্কৃতকারীকে প্রতিরোধ করা তাঁর ব্রত ছিল। এই বিরোধের ধারাও ছিল কেমন, না যেমন বুদ্ধ বা খৃষ্ট তাঁদের প্রতি কাজের মধ্যে নম্রতা ও প্রেমের পরিচয় দিতেন তেমন। তাঁরা তাঁদের শত্রুর প্রতি অঙ্গুলি হেলানেও বল প্রকাশ করতেন না অথচ যে সত্য পালনের জন্য প্রয়াসী ছিলেন, তার গৌরব রক্ষার্থে সানন্দে আত্মবিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

তারা অবলোকিতেশ্বর ভৃকুটি
(কাশ্মীর ১০ম শতাব্দী)

গান্ধীজী সেই জাতীয় যোগীপুরুষ ছিলেন না যাঁরা নিভৃতে পর্বতে গহ্বরে তপস্যা করেন, যাঁরা লৌকিক জগতের সুখদুঃখে উদাসীন। তিনি জীবনে বহু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, সরকারী অত্যাচারের বহু নির্দয় দৃশ্য, লাঠি, গোলা গুলী বন্দুক জেল ফাঁসির পীড়ন এবং উন্মত্ত অধীর জনতার হিংসোপ্রবণ ধ্বংসসাধনের প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী ছিলেন। তিনি জুলু বিদ্রোহে ও বুয়োর যুদ্ধে আহতদের সেবা করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর জীবনকালেই দুই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের বীভৎস লীলার স্বরূপ তাঁর অজানা ছিল না। অনেক শিক্ষাদীক্ষিত এবং বিজ্ঞানসেবী মানুষেরা আজ যে প্রলয়ংকরী মারণাস্ত্র শানিয়ে চলেছে তাও তিনি দেখেন নি, তবু তাঁর অহিংসায় আস্থা অটল ছিল।

স্বাধীনতার আগে যখন দেশবাসী আত্মকলহে রত থেকে ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করার পথ সুগম করছিল তখনও কাতরচিত্তে তিনি এই কামনা করেছিলেন যে, "যে বিহারে বুদ্ধ জন্মেছিলেন এবং অমেয় প্রেমমৈত্রীকরুণার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন সেই বিহার নিশ্চয়ই আরো একবার নিজ মর্যাদার উচ্চবেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার মহিমাজ্যোতিতে ভারতকে ভাস্বর করে তুলবে।" তাঁর জীবনের সায়াহ্নে হরিজন পত্রিকার একজন পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রভু বুদ্ধ একদা মানুষকে অহিংসার পথে চালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর কি ঘটল? জন-সমাজ আবার তার পুরানো রীতিতে ফিরে গেল, বুদ্ধের শিক্ষা ভুলে গেল।" অপরাজেয় আশাবাদী গান্ধীজী উত্তরে বলেছিলেন, "একমাত্র ভারতেই বুদ্ধ আত্মা জয়ী হয়েছে। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের যা-কিছু শ্রেয় ও কল্যাণকর মতবাদ আয়ত্ত করে নিজস্ব করে নিতে পেরেছিল বলেই ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধমতকে দেশছাড়া করতে পেরেছিল। তার ফলে হিন্দুধর্ম উদারতর হয়।

"মানুষ ক্রমশ অহিংসার পথেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা নরখাদক ছিল। তারপর শিকারের জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে তারা কৃষির শরণ নিল এবং তারপর থেকে অবিরাম চেষ্টার দ্বারা ন্যায়, সত্য, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা প্রভৃতি অহিংসার অধিকতর অনুশীলন আরম্ভ করল....।"

হিংসার অনুগামিনী ও অহিংসার সমাধানগুলো, হিংসানীতির ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'হিংসাকে মানুষের আত্মকলহে তার অনিবার্য ফল সহজেই অনুভূত হয়, কিন্তু বুদ্ধের প্রেমের অবদান আজও লোপ পায়নি। দিনে দিনে উত্তরোত্তর মানুষের সঙ্গে তা পরিণতরূপে মেশা যাবে।' রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলগত স্বার্থের খাতিরে ব্রহ্মবাসীরা তাদের মন্ত্রীকে হত্যা করেছে শুনে গান্ধীজী তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন "একজন প্রকৃত বৌদ্ধকে কেউ ভয় পাবে কেন? বুদ্ধভক্তরা এমন নৃশংস কাজ করল এ বড় পরিতাপের কথা। তোমরা ভারতের বর্তমান হানাহানি ভুলে যাও। এশিয়াকে আবার বুদ্ধবাণীর অনুশীলন করতে হবে এবং জগতকে তার মাহাত্ম্য জানাতে হবে। আজ সর্বত্র তার অভাব ঘটেছে। তোমরা তোমাদের শাশ্বত উত্তরাধিকার ক্ষুণ্ণ করো না। সেই আড়াই হাজার বছরের পুরানো মন্ত্র আজ কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না সত্য, কিন্তু অসীম-কালের পটভূমিতে আড়াই হাজার বছর কতটুকু সময়—একটা ক্ষুদ্র কণামাত্র নয় কি? পূর্ণ বিকশিত প্রেমপদ্ম যা আজ শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে তা আবার চিরমধু-নিঃস্যন্দ অম্লানরূপে ফুটে উঠবে।"

বৌদ্ধযুগের সৌন্দর্য প্রসাধন

জ্ঞানতিলক

বুদ্ধ তথাগত সুন্দরের উপাসনা ত্যাগ করে আসব ক্ষয়ের সাধনাকেই মুক্তিপথের একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে না পারলে এই দুঃখময় জগত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। সত্যসন্ধানী মানুষ যাতে তৃষ্ণার জালে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য শুদ্ধ জীবন যাপনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ভোগ-বাসনা ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে মুক্তি নেই, মায়া-মোহ পরিত্যাগ করতে না পারলে জন্মচক্রের আবর্তন থেকে রেহাই নেই—শিষ্যসংঘের প্রতি ইহাই ছিলো বুদ্ধের অনুশাসন।

সমগ্র বুদ্ধানুশাসনগুলি প্রধানত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক এই ত্রিপিটকে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। প্রথম পিটকে উপদেশচ্ছলে বুদ্ধের বাণী, দ্বিতীয়টিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের নিয়ম-কানুন এবং শেষোক্তটিতে বুদ্ধের দার্শনিক মতবাদ স্থান পেয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ ও বিলাস-ব্যসনের বিষয় বিধিবদ্ধ করবার অবকাশ হয়নি, সর্বোপরি তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের ভাবনাতেই বেশির ভাগ সময় মগ্ন থাকতেন।

শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল মানুষই যে তাঁর কাছে আসতেন এমন নয়। সংসারের বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা নিয়েও বহুলোক তাঁর কাছে এসেছেন। শুভকার্যের প্রাক্কালে তাঁর আশীর্বাদ এবং পরামর্শ চাইতেও কেহ কেহ বুদ্ধের কাছে এসেছেন ত্রিপিটক সাহিত্যে এমন প্রমাণ আছে। এইরূপে বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসাধন চর্চা বিষয়েও কিছু কিঞ্চিৎ উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। সমসাময়িক ইতিহাস থেকে তৎকালীন প্রসাধন চর্চার বহু নজির সংগ্রহ করা যেতে পারে কিন্তু সে বিষয়ের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র পালি সাহিত্য থেকে যেটুকু বিবরণ এ সম্বন্ধে পাওয়া গেছে, সে আলোচনাই এ প্রবন্ধে করা হবে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিনয় পিটক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের আইন-কানুন সম্বলিত সংগ্রহ। এই কারণে এতে সৌন্দর্য চর্চা ও প্রসাধন-উপকরণ সম্পর্কে কোনো বিবরণ থাকা সম্ভব নয়। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থে সে সম্পর্কে কিছু বিবরণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তৎকালে দেশের বেশির ভাগ পুরুষ মাথায় লম্বা চুল এবং মুখে প্রচুর শ্মশ্রু রাখতেন। বহুদিন পরে পরে কেহ কদাচিৎ এসব কাটতেন আর কেহ বা এগুলি কাটবার কোন প্রয়োজন আছে বলেও মনে করতেন না। ফলে চুল ও শ্মশ্রুতে মিলে কারো কারো মুখাবয়ব গহন অরণ্যের আকার ধারণ করতো। তবে এরা যে শ্মশ্রু ও চুলের যত্ন করতেন এমন নয়, বালিতে গর্ত খুঁড়ে জল বার করে তা মাথায় ও মুখে লেপন করতেন। এগুলিতে কেশরাশি বেশ মসৃণ থাকতো। জনসাধারণ দর্পণের ব্যবহার সেকালেও করতো। সকলের গৃহে আবার দর্পণ ছিলো না। যাদের থাকতো না তারা স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিবিম্ব রেখে দর্পণের কাজ সমাধা করতো।

সেকালে অনেকেই বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা রচনা করতেন এবং সেগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হতো। বন্ধুদের উপহার এবং প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এগুলি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করা হতো। বিনয় পিটকে যে প্রকার মালা রচনার বিবরণ দেওয়া আছে এখানে তা উল্লেখ করছি: পুষ্পের বোঁটাগুলিকে এক সারিতে রেখে গাঁথা মালাকে বলা হয় 'একতো বণ্টকো'। বোঁটাগুলিকে ক্রমশ দুই সারিতে রেখে যে মালা রচনা করা যায় তাকে 'উভতো বণ্টকো' বলা হয়। 'মঞ্জরিকো' নামক একপ্রকারের মালা রচনার উল্লেখ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি হবে তার কোনো উল্লেখ নেই। কেহ কেহ 'মঞ্জরিকো' শব্দটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর মালা বলে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে 'বিধূতিকো' নামে অন্য একপ্রকার মালার বিবরণ আছে। পালি সাহিত্যের 'সামন্তপাসাদিকা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সিন্ধুক নামক পুষ্প দিয়ে সূচি কাঠি দ্বারা রচিত মালাকে 'বিধূতিকো' মালা বলা হয়।

বিনয় পিটকে 'বটংসক বা অবতংসক' নামক আর একপ্রকার মালার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণত যে মালিকা কর্ণভূষণরূপে ব্যবহৃত হয় তাকে 'বটংসক' বা 'অবতংসক' বলা হয়। 'আবেল বা আবেল' এই মালার

সঙ্গীত-নৃত্যের পরিবেশে রূপ প্রসাধন
(অজন্তা গুহা চিত্র)

...র স্নানপর্ব (অজন্তা গুহা চিত্র)

অন্য এক নাম 'কর্ণিকা'। কর্ণিকা বিশেষ একটি মালার নাম নয়, কর্ণভূষণরূপে বিরচিত মালাকে 'কর্ণিকা' বলা হয়। 'ওরচ্ছদ' অর্থাৎ বক্ষস্থল আচ্ছাদিত কুসুম-দাম। এই মালা ধারণ করলে সমগ্র বক্ষস্থল পুষ্পশোভিত হয়।

এই পর্যন্ত মালা রচনার বিবরণ দেওয়া গেলো। এসব বিবরণ ব্যতীত বিনয় পিটকে অলঙ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকারের আভরণ সম্পর্কেও কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কুলবধূ ও নারীদের কাছে এই আভরণগুলি প্রসাধন চর্চার প্রধান অংগরূপে ব্যবহৃত হতো। সমাজের বিভিন্ন স্তর ভেদে সকলের গৃহেই অল্পবিস্তর অলঙ্কার থাকতো। শ্রেষ্ঠী, বণিক ও জমিদার প্রভৃতি উচ্চবর্ণের গৃহস্থ নারীদের জন্য বিশেষ প্রকারের অলঙ্কার তৈরী হতো। স্বর্ণকার নিজে বাড়িতে এসে মহিলাদের রুচি অনুসারে অলঙ্কার প্রস্তুত করার বিবরণও ত্রিপিটক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় কন্যা বিশাখার বিবাহে পাঁচশত স্বর্ণকার ডেকে স্বীয় কন্যার জন্য 'মহালতা' প্রসাধন নামক এক-প্রকার অলংকার তৈরী করান। বিয়ের পরে স্বামীগৃহে তার আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে শ্বশুর মৃগার শ্রেষ্ঠী 'ঘনমট্ঠক' নামক আর একপ্রকার প্রসাধন তৈরী করে বুদ্ধের উপস্থিতিতে সেই অলংকার তিনি স্বহস্তে পুত্রবধূকে পরিয়ে দেন। এছাড়াও বিনয় পিটকে আরো কয়েকপ্রকার আভরণের উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া গেলো:

'বালিকা' নামক এক ধরনের হাল্কা অলংকার সেকালে কানের শেষ প্রান্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আধুনিককালের 'দুল' প্রভৃতির সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। 'পমংগ'—এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি হবে সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাষ্যকার বুদ্ধ ঘোষও এর প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হননি। অনুমান অনুরূপ কিছু হবে। 'কটিসুত্তক'—একে কোমর-বন্ধরূপে ব্যবহৃত অলংকার বলে কেহ কেহ ধারণা করে থাকেন। বস্ত্রের উপর সূক্ষ্ম সূচিকার্য দ্বারা এই প্রসাধন প্রস্তুত করা হয়। 'ওবাহিক' বলতে বালা বা কঙ্কণ (Bangle)কে বোঝায়। এই বিষয়ে এর অধিক কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'কায়ুর'—জাতক গ্রন্থের টীকা অনু-যায়ী এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে একপ্রকারের কণ্ঠভূষণ। অন্যত্র কর্ণভূষণের উল্লেখ করা হয়েছে। 'ওবাহিক'য়ের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও 'হস্তাভরণ' বলে আর একটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধ ঘোষ 'ওবাহিক' এবং 'হস্তাভরণে'র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। 'হস্তাভরণ' বলতে কঙ্কণ বা বালা ব্যতীত হাতে ব্যবহারের জন্য অন্য কয়েকপ্রকার অলঙ্কারকে বোঝায়। 'অংগুলি মুদ্দিকা' — আধুনিককালের অংগুরীয়কে বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের অংগুরীয় তৈরী [illegible] পদ্মরাগ ও [illegible] মধ্যে [illegible] করার উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।

পুষ্প দিয়ে রচিত মালিকা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে তৈরী অলঙ্কার বা আভরণ ব্যতীত দেহের বিভিন্ন অংশে, মুখে এবং চোখে ব্যবহারের জন্য বিবিধ প্রকার প্রলেপন প্রসাধনের উল্লেখও ত্রিপিটক সাহিত্যের স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। মহিলাদের মধ্যেই এসব প্রসাধন চর্চার অধিক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। রমণীয় নারীর কমনীয় প্রসাধন চর্চা আজকে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার প্রচলন বহুশত বৎসর পূর্ব হতেই শুরু হয়েছিলো।

ত্রিপিটক সাহিত্যে নারীদের বিভিন্ন সময়ে প্রসাধন চর্চার বর্ণনা এভাবে দেওয়া রয়েছে: স্নানের পরে যাতে দেহময় স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়িয়ে থাকে তজ্জন্য অনূঢ়া ও বিবাহিতা সকল মহিলারাই স্নানের সময় একপ্রকার সুগন্ধি চূর্ণ ব্যবহার করতেন। দেহশ্রীর সাথে মুখাবয়বের স্নিগ্ধ কোমলতা রক্ষার জন্য বহুপ্রকারের প্রসাধন মুখশ্রীর জন্য ব্যবহার করা হতো। সকাল সন্ধ্যায় মেয়েরা 'আলিম্পন', 'চুন্নোলিম্প', 'মুখরাজ্য' প্রভৃতি প্রসাধন দ্বারা রূপ চর্চা করতেন। তখনকার দিনেও মেয়েদের মধ্যে চোখে অঞ্জন ব্যবহারের প্রচলন ছিলো। নারীদের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের অঞ্জনের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কোনো কোনো অঞ্জন ঔষধরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরাও ব্যবহার করতেন। বেশির ভাগ মেয়েরা সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত দেওয়া অঞ্জন ব্যবহার পছন্দ করতো। নগরকুক্কা নামক এক জাতীয় পুষ্প, বিভিন্ন রকমের চন্দন কাঠ ও ভদ্রকুক্কা নামক এক জাতীয় ঘাস দিয়ে এইসব অঞ্জন প্রস্তুত করা হতো। সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, শিং ও গাছ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত সুন্দর সুন্দর অঞ্জন-শলাকারও এ সময় ব্যবহার হতো।

দেহকে মসৃণ এবং কোমল রাখবার প্রয়োজনে মহিলারা দেহে বিভিন্নপ্রকারের প্রসাধন লেপন করতেন। আধুনিককালে মেয়েদের মধ্যে যেমন ললাটে বিভিন্ন রকমের চন্দনের সাজ অংকনের প্রচলন আছে সেকালেও নানাপ্রকারের চিহ্ন এরা ললাটে আঁকাতেন। এই চিহ্নগুলি খুব সম্ভব গোন্দনীয়(?) শিল্পের অনুকরণ বলে মনে হয়। কারণ ভারহুতের শুংগকালীন যক্ষিণী মূর্তিসমূহের কপালে এই ধরনের চিহ্নই অঙ্কিত রয়েছে।

বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে, ভারতীয় শিল্প-সভ্যতা এই যুগে নবরূপ গ্রহণ করেছে। সৌন্দর্য প্রসাধন সাধনার ক্ষেত্রেও এই যুগ পিছিয়ে থাকেনি, পরন্তু বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধ-চর্চা

পার্থ বসু

॥ রাগ মল্লারী ॥

করুণা মেহ নিরন্তর করিহা।
ভাবাভাব দ্বন্দ্বল দলিয়া॥
উইত্তা গঅণ মাঝে অদভুআ।
পেখরে ভুসকু সহজসরুআ॥
জাসু সুনন্তে তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুরে নিঅ মণ দে উলাস॥
বিসঅ বিশুদ্ধে মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥
এ তৈলো এ এত বিসারা।
জোই ভুসকু ফেটই অন্ধকারা॥

'ভাব আর অভাবকে দলিত করে বর্ষণ-মুখর মেঘের মত করুণা ঝরে পড়ল। ভুসকু! চেয়ে দেখ—প্রভাস্বর গগনে সহজস্বরূপের অভ্যুদয়; যার বাণী শুনে ইন্দ্রিয়জাল ছিন্ন হয় আর নিজের বোধচিত্ত নিভৃতে আনন্দ আহরণ করে। বিষয়ের বিশুদ্ধি দ্বারা আনন্দকে অনুভব করে আকাশ-আলোকোজ্জ্বলে চন্দ্রের মত আমার মোহ-অন্ধকারের বিনাশ করেছি। ত্রিলোকে এই ত' বিসারিত—যোগী ভুসকু যার সৌজন্যে অন্ধকার নাশ করেছেন।'

বাংলা ভাষার যাত্রা শুরু হল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহা—নেপালের রাজদরবার থেকে যাকে উদ্ধার করে এনেছেন মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সিদ্ধাচার্যদের এই সব পদে ভাষার লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্যকে অতিক্রম করে রয়েছে নিগূঢ় সাধন-সংকেতের সহজতম পথ-প্রদর্শন।

কিন্তু চর্যাপদের পর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিপুল প্রসারে বুদ্ধনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম বৌদ্ধ-গ্রন্থ কোনটি এবং সত্যিই বৌদ্ধ গ্রন্থ উনিশ শতকের পূর্বে রচিত হয়েছিল কি না, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ রয়েছে। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধনামের, বিশেষত বুদ্ধের সামান্যতম উল্লেখের অভাবের কারণ বিস্ময়কর এবং এখানো অনালোচিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' পুঁথিই বুদ্ধ-সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম রচনা। এই পুঁথিটির লেখক নীলকমল দাস। চট্টগ্রামের পরলোকগত চাকমা রাজার পত্নী কালিন্দী দেবীর অনুরোধে ব্রহ্ম ভাষায় রচিত 'থাড়ুথান্ড' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন শ্রীদাস। এই

নানা দেশে বুদ্ধমূর্তি—বামিয়ানের বুদ্ধ (উচ্চতা ১৭৩ ফিট, আফগানিস্থান, ৬ষ্ঠ শতাব্দী)।

পুঁথিটিতে বুদ্ধের জন্মবিবরণ, ধর্মপ্রচার, নির্বাণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত রয়েছে। রচনার সময় অজ্ঞাত। তবে ডঃ সেনের মতে : 'এ গ্রন্থের যে-পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাহা ১০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কিন্তু ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে একটি রচনায় জানান যে, 'মঘা সমজ্জা' বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ। এটিও অনুবাদ। জনৈক বড়ুয়া কবি রচিত। তাঁর প্রদত্ত সময় অনুযায়ী জানা যায়, ১৮৬০ সনের বহু পূর্বে এই কবি জীবিত ছিলেন এবং ডঃ বড়ুয়ার মতে, পূর্বোল্লিখিত 'বৌদ্ধ-রঞ্জিকা' অনুবাদ-গ্রন্থ ১৮৭০ সনের অব্যবহিত পর প্রকাশিত।

এ-তথ্য সুধীজনবিদিত সত্য যে, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই বিদেশী-রচিত ইংরেজী ভাষার গ্রন্থ পাঠেই। সেজন্যই উনিশ শতকেরও অব্যবহিত পূর্বে, এমন কি উনিশ শতকের প্রথম দিকে বুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কোনো গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। তার কারণ, ইংরেজী ভাষায় আমাদের অনভিজ্ঞতা, অন্তত সামাজিক

অবস্থার উপরেও আমার মতে এইটিই প্রধান কারণ। তারপর বুদ্ধদেবের জীবনী, বাণী, ধর্ম, তাঁর ভ্রমণস্থান প্রভৃতি অবলম্বনে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগারগুলির অব্যবস্থা ও অচেতনতার জন্য মাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি এখানে অনুলিখিত হল। গ্রন্থোল্লিখিত সনই অনুসরণ করলাম।

শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব। সাধু অঘোরনাথ। ১২৮২। 'মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে' মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে। বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু উদ্ধৃতি সহ সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিত। গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ হয়েছিল।

মহাপুরুষ জীবনী। গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নাম অমুদ্রিত। Bengal Library-র শীলে জানা যায় যে, লাইব্রেরি থেকে ১৮৮০ সনে গ্রন্থটি ক্রীত হয়েছিল। তাৎকালিক ভাষা অপেক্ষা যথেষ্ট সহজ ভাষায় বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা।

বুদ্ধদেবচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ। কৃষ্ণকুমার মিত্র। সন ১২৯৪। বেনিয়াটোলা লেন হতে প্রকাশিত। "বুদ্ধ ব্রহ্মে বিশ্বাস করিতেন এবং অদ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রাথমিক বৌদ্ধধর্ম যে ঈশ্বরবাদী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও লেখক দেখিয়েছেন।

বুদ্ধদেবচরিত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১২৯৪ সন। Edwin Arnold-এর 'Light of Asia'র নাট্যানুবাদ এবং শ্রীযুক্ত আর্নল্ডকেই উৎসর্গীকৃত। গিরিশ ছন্দে রচিত এই সুবিখ্যাত নাটকখানি পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্ত।

শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব-চরিত। শরচ্চন্দ্র দেব। পৌরাণিক নাটক। ১২৯৫।

সুত্ত-নিপাত। ধর্মরাজ কর্তৃক অনূদিত। 'সুত্ত-নিপাতে'র সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা পদ্যানুবাদ। ১৮৮৭। এঁরই অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ : সিগালকসুত্র (১৮৮৯), হস্তসার (১৮৯০) প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব—তাঁহার জীবনী ও ধর্মনীতি। ডাক্তার রামদাস সেন। ১২৯৮। গ্রন্থকারপুত্র মণিমোহন সেনের বিজ্ঞাপন হতে জানা যায়, লেখকের "বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করিয়া প্রণয়ন" এই গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর প্রকাশিত এবং তাঁরই "অভিলাষানুসারে" "তাঁহার পরম বন্ধু" "শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের" "শ্রীচরণে" উৎসর্গীকৃত। বিস্তারিত এবং তথ্যবহুল জীবনীটির ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুগ।

বুদ্ধদেব-চরিত। ১১৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, জাতীয় পুস্তকালয় হতে প্রকাশিত। Bengal Library-র ছাপ—১৮৯৮। পড়লে তৎপূর্বে রচিত মনে হয়।

অমিতাভ। নবীনচন্দ্র সেন। ১৩০২ সন বা ১৮৯৫। ২০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই কাব্যের বিষয় বুদ্ধ-লীলার বর্ণনা।

বুদ্ধদেব-চরিত। উপেন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। সন ১৩০১ সাল। প্রাচীন সাধুভাষায় লিখিত জীবনী।

বৌদ্ধমঙ্গল। শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া। পদ্যাকারে মহামঙ্গলসুত্র। ১৮৯০-৯১।

বুদ্ধ-ভজনা। অগগসার। ১৮৯৩।

আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৬। ব্রহ্মসমাজ কমিটির একতম অধিবেশনে অ্যালবার্ট হলে লেখক কর্তৃক পঠিত।

শঙ্কর ও শাক্যমুনি। কালীবর বেদান্তবাগীশ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৭ সনের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ও উক্ত পরিষদ হতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ১৯০০।

বৌদ্ধধর্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৮ সাল। বুদ্ধজীবনী, বৌদ্ধ ইতিহাসের কাল নির্ণয়, বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি, বিস্তার ও ধ্বংস প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল আলোচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশন।

বুদ্ধদেবের স্থান। নববিধানাশ্রিত দাসশ্রী—লিখিত। কলিকাতা বিধান প্রচারাশ্রম। ১৩১০। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে ১৯০৯ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা। বিশ্বধর্মে বুদ্ধের স্থান এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবনচরিত ও উপদেশ। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ। ১৩১১। নবখানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত। শাক্যবংশের পরিচয়, বুদ্ধের পূর্বজন্ম, ইতিহাস, বৌদ্ধ রমণীগণ প্রভৃতি অনালোচিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বুদ্ধবাণী। কবি এডুইন আর্নল্ড প্রণীত 'Light of Asia' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের কাব্যানুবাদ। প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ, ১৩১৬।

শাক্যসিংহ। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৮। সতীশ বিদ্যাভূষণের ভূমিকাযুক্ত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত ... ধ্যানবিবৃতির একটি প্রতিচিত্র আছে।

বুদ্ধ। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আষাঢ়, ১৩১৭। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত।

বুদ্ধ। বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কে ভি সেন এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৭। সচিত্র সংস্করণ।

শাক্যসিংহ। প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ১৩১৮। "বৌদ্ধধর্মের স্থাপয়িতা মহাপুরুষ শাক্যসিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনী।"

মিলিন্দ পঞহো। বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩১৫। এই বিখ্যাত পালি-গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সারকথা বাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দার সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর অনূদিত। ১৩১৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। মুখবন্ধে প্রকাশ, ১৮৮২ সনে লেখক তিব্বতের লাসা নগর হতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের এই গ্রন্থ উদ্ধার করেন। ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মের উপাখ্যান ও পরে সমাক সম্বোধিলাভের বিবরণই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। সহজ ও মূলানুগ অনুবাদ।

গৃহিকর্তব্য। প্রজ্ঞালোক ভিক্ষু অনূদিত। ১৯২২।

শ্রীতপোবন। কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়। অনন্দাশ্রম, বর্ধমান। চৈত্র ১৩২০। পয়ার ত্রিপদীছন্দে রচিত বুদ্ধ-জীবনী।

বুদ্ধের জীবন ও বাণী। শরৎকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩২১। মুকুল দে, সত্যেন্দ্র মিত্র ও মণীভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত চিত্রসম্বলিত। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ভূমিকাযুক্ত।

অমৃতাভ। প্রিয়দর্শন হালদার। কমলা বুক ডিপো। ১৯১৯। বুদ্ধদেবের চরিত্র-পর্যালোচনা।

সৌন্দরানন্দ কাব্য। বিমলাচরণ লাহা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কোম্পানীর প্রকাশন। ১৩২৯। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থের কাব্যটির অনুবাদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকাযুক্ত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব। বিমলাচরণ লাহা। ঐ প্রকাশন। সহজ, কৌতূহলোদ্দীপক 'প্রেততত্ত্ব' সম্বন্ধে লেখকেরই ইংরেজী গ্রন্থের স্বকৃত অনুবাদ। ১৩৩১।

বৌদ্ধ রাজকুমারী। নাটক। ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৮। বুদ্ধের চরিত্র অনুপস্থিত, কিন্তু তাৎকালিক মগধরাজাদের সম্বন্ধীয় এই নাটকটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধ-মহিমার সংগীতসম্বলিত।

বৌদ্ধভারত। শরৎ রায় বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভূষণ। "দেশের ও বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী সুধিগণের গ্রন্থাবলী ও রচনা" অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ১৯২৩।

বৌদ্ধদর্শন। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৩২।

চণ্ডালিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতীর প্রকাশন। ১৯৩৩। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের চরিত্রসম্বলিত নাটক। মূল গল্প রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by Asiatic Society of Bengal, 1382). গ্রন্থের বিবরণ হতে গৃহীত। চার বৎসর পর নাটকটি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়।

নটীর পূজা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৌদ্ধ-যুগের একটি সুবিখ্যাত বিবরণের নাট্যরূপ। ১৯২৬।

[এই প্রসঙ্গে কবির ১৯১২ সনে প্রকাশিত "মালিনী" নাটক উল্লেখ্য।]

বৌদ্ধযুগের ভূগোল। বিমলাচরণ লাহা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কোংর প্রকাশনা। ১৯৩৪। ছাব্বিশখানি চিত্রের সাহায্যে বুদ্ধ-কালীন ও তৎপরবর্তীকালের ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতির ভৌগোলিক বর্ণনা।

গৌতমবুদ্ধ। প্রমথনাথ দাশগুপ্ত। ১৯২৫। বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ।

ছেলেদের বুদ্ধদেব। অমলনাথ রায়। ১৩৩০।

বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩৪০ সন। বুদ্ধদেবের মত ও পথ, নাস্তিকতা কি, দুঃখবাদ, শূন্য ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ। উপসংহারে লেখকের অভিমত: "... বুদ্ধদেবের নামে নাস্তিকতার যে সমস্ত অপবাদ প্রচলিত আছে.... " ঐ অপবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, উহাদের কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই—একেবারেই অমূলক।"

বৌদ্ধভারত। বিমানবিহারী মজুমদার। বৌদ্ধযুগের শাস্ত্রীয় ভারতবর্ষের পরিচয়।

বুদ্ধবাণী। ভিক্ষু শীলভদ্র। ১৯৩৯। 'Paul' Carus-এর Gospel of Buddha-র অনুবাদ। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার ভূমিকাযুক্ত।

বুদ্ধের অভিযান। প্রজ্ঞানন্দ স্থবির সংকলিত। ১৩৪২। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর ভগবান তথাগতের ধর্ম প্রচারের অভিযানই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধ-প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তের দুর্দশা ও এবং সুদীর্ঘ জীবনী ও কার্যাবলীও আছে।

অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। বিশ্বভারতী। ১৩৩১।

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত। মাঘ, ১৩৫৮। বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

বৌদ্ধধর্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পূর্বাশা লিমিটেড প্রকাশিত। ১৩৫৫।

চার পুণ্য স্থান। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মহাবোধি সোসাইটির প্রকাশনা। সচিত্র। ১৩৫৫। কুশীনগর, লুম্বিনী, গয়া ও সারনাথের বিবরণ।

তিন বৌদ্ধ স্থান। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মহাবোধি সোসাইটির প্রকাশনা। ১৩৫৫। ডাঃ কালিদাস নাগের ভূমিকাযুক্ত। তক্ষশিলা, রাজগৃহ ও নালন্দার আলোচনা।

বুদ্ধচরিত। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড। ১৯৪৮।

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ। শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া।

গৌতম বুদ্ধ। তিতলা রায়। ১৯৪৮। শিশুপাঠ্য সচিত্র জীবনী।

অস্থি-সম্বন্ধে। শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া। ১৩৫৭। ডাঃ কালিদাস নাগ লিখিত ভূমিকাযুক্ত।

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

ধম্মপদ পরিচয়। প্রবোধচন্দ্র সেন। বিশ্ব-ভারতী প্রকাশিত।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত। এ মুখার্জি প্রকাশিত। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ও তুলনামূলক ইতিহাস।

বুদ্ধকথা। ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটির প্রকাশনা। ১৩৬২। সাম্প্রতিক প্রকাশিত বুদ্ধজীবনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

গৌতম বুদ্ধ। মণি বাগচী। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৩৬০।

গৌতম বুদ্ধ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সোনার বুকস। ১৩৬৩।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ বহুল প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বসু, ভিক্ষু অনোমদর্শী, প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নালন্দা মহাবিহার

হরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

আশৈশব কল্পনারাজ্যের সাথে বাস্তবের প্রত্যক্ষ পরিচয়। শিশুশ্রেণীর ইতিহাসের পাতায় যার প্রথম প্রকাশ—কৈশোরের অনুভূতিতে যার সুগভীর প্রতিচ্ছবি—যৌবনের শিরা-উপশিরায় নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যার সুমহান ইতিবৃত্তের উদাত্ত ঝঙ্কার—প্রৌঢ়ত্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রতিমুহূর্তে প্রয়োজন হয়েছে যার উৎকর্ষমণ্ডিত মূল্যবান প্রসঙ্গরাজি—সেই নালন্দা মহাবিহার ভ্রমণের সুযোগ এসে গেল জীবনের এক অপ্রত্যাশিত শুভ-লগ্নে।

হাওড়া থেকে জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হলাম আমরা। অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ ক'রে সশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলো উদ্ধত যন্ত্রদানব। একটানা তিনশো দশ মাইল পথ অতিক্রম করে গাড়িখানা পরদিন বেলা আটটা নাগাদ পৌঁছে গেল বক্তিয়ারপুর স্টেশনে। এইখান থেকে গাড়ি বদল করে বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট-রেলওয়েতে তেত্রিশ মাইল রাস্তা যাওয়ার পরই এসে গেল রাজগিরকুণ্ড স্টেশন। এইখানেই নামতে হোল আমাদের।

শীতের দিন। সঙ্গে লেপ-তোশক ছিল সবারই। মেয়েদের সাথে বাক্স-পেঁটরাও কম নেই। যানবাহন বলতে গরুর গাড়ি আর একাগাড়ি। তারই কয়েকটা ভাড়া ক'রে মাইল দেড়েক পথ গেলে পর রাজগীর হাইস্কুল। এই স্কুল-কর্তৃপক্ষই আমাদের অভ্যর্থনা জানাবেন।

নিতান্ত সাধারণ স্টেশন। আশেপাশে কয়েকটি দোকান-পসারী থাকায় ছোটখাটো বাজারের রূপ নিয়েছে। হোটেল আর ধর্ম-শালাও আছে। এরই ভেতর দিয়ে কাঁচা ধুলিরাস্তা ধরে এগিয়ে গেল আমাদের গাড়ি। সাদা-ধুলোয় সাদা হোয়ে গেল মাথার চুল অবধি।

হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আপ্যায়িত করলেন চিঁড়া, দই আর চিনি দিয়ে। আনন্দ-অভিযানে সাধারণ খাদ্যবস্তুও পেয়ে গেল অমৃতের আস্বাদন।

বিকালের দিকে একটি বর্ষীয়সী বাঙালী মহিলা অযাচিতভাবে আলাপ করতে এলেন আমাদের সাথে। এমন মিশুকে প্রকৃতি, প্রাণ-খোলা কথাবার্তা আর পরকে আপন ক'রে নেওয়ার মত দক্ষতা খুব কমই চোখে পড়েছে আমার। গড়গড় ক'রে কত কথাই বললেন তিনি। তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলাম রাজগীর-কুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান ক'রে বাতরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তাঁর আগমন। পাশেই রামকৃষ্ণ আশ্রমে উঠেছেন তিনি। নানা কথার ফাঁকে গোধূলির আকাশে এলো সন্ধ্যার আমেজ। অন্ধকারে আমাদের বসে থাকতে দেখে এই ভদ্রমহিলাই দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিলেন দুটি হারিকেন-বাতি। নইলে সেই পার্বত্য-প্রান্তরে আলোর সন্ধান আর কে দিতো!

পরদিন প্রত্যূষে রওনা হলাম কুণ্ডস্নানের উদ্দেশ্যে। সবুজ সরষে আর কলাই ক্ষেতের মধ্যস্থিত সরু পথের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে মাইলখানেক পথ চলার পরই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থানে। সেদিন ছিল পৌষ-সংক্রান্তির মেলা। আবাল-বৃদ্ধবনিতার কলকোলাহলে একটি বিশেষ দিনে মুখরিত হোয়ে উঠেছে সেই জনমানবহীন পার্বত্য প্রদেশ। চারিদিকে সুদৃশ্য পাহাড় ঘেরা স্বপ্নপুরীর দেশ! অনাদিকাল থেকে প্রবহমান প্রস্রবণগুলির মুখে নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে উষ্ণ জলের ধারা। পর পর চারটি প্রস্রবণের নামকরণ করা হয়েছে গণেশকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড আর মখদুমকুণ্ড। বিভিন্ন কুণ্ডে স্নান ক'রে মনে হোল যেন যুগান্তরের মালিন্য আর গ্লানি নিঃশেষে ধুয়েমুছে নিঃশেষিত হয়ে গেল আজকের এই পুণ্যদিনে।

স্নান সেরে দেখতে এলাম প্রাচীন রাজ-গৃহ। পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা সুরক্ষিত মনোরম প্রদেশ। পাহাড়গুলির নাম বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও শোণগিরি। কুণ্ডনিচয়ের সাথে সংযুক্ত পাহাড়টির অল্প উপরেই রয়েছে একটি গুহা। সেই গুহার উপরে আস্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো ছাদের মত উঁচু একটি জায়গা। এর নাম "জরাসন্ধ কা বৈঠক" বা বৌদ্ধযুগের "পিপ্পলগুহা"। স্থানটির দৈর্ঘ্য ৮১ ফুট, প্রস্থ ৭৮ ফুট এবং উচ্চতা ২৬ ফুট। বড় বড় আস্ত পাথরের গাঁথনি এ-যুগেও অক্ষয় হয়ে আছে দেখলে বিস্ময় জাগে।

এরই নীচে পাহাড়টির গা বেয়ে একটি জঙ্গলাবৃত রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় আর একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুহা। এর নাম সপ্তপর্ণী গুহা। ছাতিমগাছের নাম থেকেই নাকি হয়েছে এর নামকরণ। এই গুহা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে নালন্দার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বৌদ্ধযুগের অধিকাংশ পুঁথি।

এবার কয়েকটা একা ভাড়া ক'রে আমরা পাড়ি জমালাম রাজগৃহের অভ্যন্তরে। উভয় পার্শ্বে উঁচু পাহাড়—সম্মুখে জঙ্গলা-বৃত কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ। বন্ধুর বিপদ-সংকুল পাহাড়ে রাস্তা। তারই মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো আমাদের গাড়ি।

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে দেখতে শুরু করলাম একের পর এক মহাভারত আর বৌদ্ধযুগের আখ্যায়িকাযুক্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি। টেনিসকোর্টের মত একটা সমতল জায়গাকে উঁচু রংগমঞ্চের মত ক'রে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। এইখানেই অজাত-শত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তারপর বিপুলপাহাড় আর রত্নগিরি পার হয়ে এলাম প্রসিদ্ধ গৃধ্রকূট পর্বতে। এইখানেই ছিল বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য "আনন্দের" সাধনাস্থল। এখানের গুহাটিও "আনন্দগুহা" নামেই খ্যাত। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে যেখানে এলাম সেইখানেই হয়েছিল জরাসন্ধ ও ভীম-সেনের মল্লযুদ্ধ। তাঁদের রথের চাকার দাগ এখনও পাথরের বুকে স্পষ্ট হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে মহাভারতের দুটি অসামান্য বীরের শৌর্যবীর্যের।

ফেরার পথে দেখলাম "মণিয়ার মঠ"। গোলাকার কূপের মত একটি স্থান। চারি-দিকের সীমানা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মঠের দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা আছে বাসুদেব, গণেশ, নাগ প্রভৃতির মূর্তি। এর ভেতর পোড়ামাটি, ছাই প্রভৃতি দেখে স্থির করা হয়েছে যে এইখানেই পোড়ানো হোত বৌদ্ধযুগের মৃৎপাত্র। এরই আরও কিছু ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম "শোণ-ভাণ্ডার"। এটি বৈভার পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের পর্বত গুহা। গুহাটি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে এটি মানুষেরই তৈরী। ঠিক যেন দুটি ছোট ছোট একই ধরনের কামরা। একটি ক'রে দরজা আর জানালাও আছে। এটিকে কেউ বলেন জরাসন্ধের ধনাগার আবার কেউ বা বলেন বিম্বিসারের ধনাগার। একটি কক্ষ ভগ্ন। সম্ভবত কামানের আঘাতে এর এই দুর্দশা। কক্ষের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগের দেওয়ালে যে শিলালিপি আছে তার অক্ষর দেখে ৩য়-৪র্থ শতকের বলেই স্থির করা হয়েছে।

এবার এলো ফেরার পালা। মন যেন চায়না ফিরতে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হ'য়ে বিমুগ্ধ হৃদয়ে একের পর এক ছবির মত

নালন্দার মুখ্য স্তূপ

চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে নূতন থেকে নূতনতর বস্তুরাজি আর সংগে সংগে মন-প্রাণ ভরে উঠছে অলৌকিক আনন্দে আর অভাবনীয় বিস্ময়ে। কিন্তু অধিক বিলম্ব হ'লে অধ্যক্ষ মহাশয় চিন্তান্বিত হ'তে পারেন ভেবে বিদায় নিলাম প্রাচীন রাজগৃহের পাদদেশে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলাম আবার সেই রাজগীর হাই স্কুলে।

পরদিন সকালে চা-পানান্তে রওনা হলাম নালন্দা। সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। মেঘলা আবহাওয়ার সাথে শীতের বাতাস শন্‌শন্ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিল খোলা মাঠের ওপর। নালন্দা স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে পিচ্‌-দেওয়া চওড়া রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম মাইলখানেক। এবার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো একটি নবনির্মিত সুদৃশ্য অট্টালিকা। সবাই বললো—"ওই তো নালন্দা"।

মন যেন সায় দেয় না কিছুতেই। দু' হাজার বছর আগেকার ধ্বংসস্তূপ দেখতে চায় যে-মন—তাকে আজকের দিনের আধুনিক আভিজাত্যে ভরা সবুজের পরশ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। পাতা-ঝরার গান যেখানে জাগে—কংকালসার শুকনো-ডালই সেখানের একমাত্র আকর্ষণ।

সুন্দর ডাকবাংলো ধরনের ঝকঝকে গান যেখানে জাগে—কংকালসার শুকনো-বাগিচা। মানুষের হাতের সহানুভূতির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিটি লতাপাতায়। নানান্ রঙের মেলা বসেছে নানান্ ফুলের পাপড়িতে। পাশে কতকটা মজে-যাওয়া দীঘির কালো জল থেকে ঠিকরে পড়ছে কাকের চোখের ছায়া। এইটিই আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গৃহ।

প্রথম যাঁর স্নেহভরা আপ্যায়িতে আমরা ধন্য হলাম, তিনিই বর্তমানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর—ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। আমাদের আসার সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে পূজার বেদী থেকে সোজা উঠে এসেছেন তিনি। কাষায়বস্ত্রপরিহিত, চন্দনতিলকশোভিত এই বৃদ্ধের প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটি দেখে আমাদের মনের পটে মূর্ত হয়ে উঠলো নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ঐতিহ্যের কথা। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মত জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তির অনাড়ম্বর এবং নিরহংকার প্রকৃতিটি যেন শীলভদ্রের দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেই চোখে পড়লো একটি পাথরের বুকে দেবনাগরী হরফে খোদাই করা পালিভাষার তিনটি শ্লোক—

শ্রী নব

নালন্দা মহাবিহার

নমোত্থস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স
বাণগহ মুণিক্কিন্দুহি বুদ্ধ সংবচ্ছরে বরে।
বসুক্কে ভাগসিরে মাসে ছট্ঠিয়ং মুগ্গলে দিনে॥
ভারতে গণরজ্জস্স রট্ঠস্স পতিনা সতা।
রতনেন বিহারস্স ধম্মিকেন সিধীমতা॥
রাজিন্দাদিপপসাদেন নালন্দাপুঞ্ঞভূমিয়ং
নব নালন্দা বিহারস্স নিহিতায়ং সুভাসিলা॥

......কতকটা প্রশস্ত বাঁধানো উঠান।

তারই দুপাশে সারি সারি কয়েকটি কুঠরীতে থাকেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীরা। কোন কোন ঘরে অধ্যাপকরাও আছেন। কি অধ্যাপক আর কি ছাত্র—সকলেরই পরনে গেরুয়া-রঙের কাপড়-জামা। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার রাজ্য থেকে বিলাসিতাকে নির্বাসন দেওয়ায় এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন যে কতখানি, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমাদের চোখে। আলাপ জমাবার লোভে ঢুকে পড়লাম একটি কুঠরীতে। সামনে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ফুটফুটে হাস্যোজ্জ্বল ছাত্রের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি সমাদরে কাছে টেনে নিলেন কত যুগের পরিচিত আত্মীয়ের মত।

ছাত্রটির নাম ভিক্ষু এ এস ভিরাপাণ্ডতো। সুদূর কম্বোডিয়া থেকে জ্ঞানলাভের বাসনায় ছুটে এসেছেন এই মহাবিদ্যালয়ে। সুন্দর সহজ ইংরাজীতে আমার ঔৎসুক্যের মালমশলা জুগিয়ে গেলেন এই সুদূরাগত শিক্ষাব্রতীটি। সত্যিকারের শিক্ষালাভের আনন্দে কত উদার এঁদের মন-প্রাণ!

মিঃ ভিরাপাণ্ডতো অক্লান্ত উৎসাহে বলে যেতে লাগলেন যে, নালন্দার সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যের দিন আর নাই, তবে কাঠামোটাকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা চলছে। এককালে যেখানে পাঁচশো থেকে হাজার ছাত্রের সমাবেশে নালন্দা ছিল গৌরবান্বিত, এখন সেখানের ছাত্রসংখ্যা বাটজন। তবে এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র আসেন। এই বাটজনের ভেতরই রয়েছেন সিংহল, কম্বোডিয়া, লাওস, জাপান, থাইল্যাণ্ড, তিব্বত প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থী। অদূরে শ্যাম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি পৃথক ছাত্রাবাসও আছে। বর্তমানে অধ্যাপক আছেন দশজন। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আগের দিনের নালন্দাতেও যেমন প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের দিকে নজর দিতেন অধ্যাপকগণ—আজও সে-নীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পালির প্রাধান্যই সর্বাধিক। পালি, বুদ্ধলজি, বৌদ্ধদর্শন এবং ভাষাতত্ত্ব—এই বিষয়গুলিই অন্যতম। গৌতম বুদ্ধের বাণীই বুদ্ধলজি। এটি আবার বিনয় এবং অভিধর্ম (চরম শিক্ষা) নামক দু'ভাগে বিভক্ত। হীনযান এবং মহাযান উভয় সম্প্রদায়ই 'বুদ্ধলজির' অন্তর্ভুক্ত। তবে 'ইণ্টারমিডিয়েট' এবং 'বি-এ' স্ট্যাণ্ডার্ডে হীনযানের বিষয়বস্তুগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহাযানের একচেটিয়া অধিকার এম-এ ক্লাসে। তবে এ দুটি সম্প্রদায়ের কোনটিই একক নয়। কারণ পালিভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলতে হীনযান আর মহাযান দুটিই সংশ্লিষ্ট। শিক্ষালাভের মাধ্যম হিসাবে হিন্দী, ইংরাজী এবং পালি—ছাত্রদের সুবিধা অনুসারে তিনটি ভাষাকেই ধার্য করা হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার জন্য এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত মেসেই ব্যবস্থা রয়েছে। মাসিক ত্রিশ টাকার মত খরচা

দিতে হয়: সকালের দিকে একটা সাধারণ জলখাবারও দেওয়া হয়।

......এসব শোনার পর বেলা দশটা নাগাদ রওনা হলাম নালন্দার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখতে। পায়ে হেঁটে আধ মাইল পথ যাওয়ার পর প্রথম এলাম 'মিউজিয়ামে'। স্তূপ-খোদাইএর সময় বৌদ্ধযুগের যেসব জিনিস পাওয়া গেছে, তা সবই সযত্নে রক্ষিত হয়েছে এই মিউজিয়ামে।

মিউজিয়ামের প্রবেশপথেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটি বিরাটকায় মাটির হাঁড়ি। এটির নাম 'টেরাকোটা জার'। সম্ভবত সেকালে এর ভেতর শস্যকণা সঞ্চিত থাকতো। খৃষ্টীয় দশম শতকের মাটির তৈরী পাত্র এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিংশ শতাব্দীর বুকের ওপর।

তারপর মিউজিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম খৃষ্টীয় পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শতকের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। প্রথমেই রয়েছে এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আংশিক খোদাইএর ফলে প্রাপ্ত। তারপর 'বজ্রসারদা' ও বজ্রসত্ত্ব' মূর্তি দুটি ৭ম—৮ম শতকের মগধীয় শিল্পচাতুর্যের বিশিষ্ট পরিচায়ক। 'বোধিসত্ত্বমৈত্রেয়' মূর্তিটি ৭ম শতকের একটি নৃত্যকলার জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ। 'বোধিসত্ত্ব পদ্মনাভি' মূর্তিটি ৯ম—১০ম শতকের পাল রাজবংশীয়দের আমলের শিল্পনৈপুণ্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাঁধানো-ফ্রেমে টাঙানো আছে প্রথম কক্ষের দেওয়ালে। তাতে প্রথম মঠের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বলা হয়েছে শক্রাদিত্য বা প্রথম কুমারগুপ্তের নাম। এঁর সময় দেওয়া হয়েছে ৪১৪—৪৫৫ খৃষ্টাব্দ। নালন্দার অবনতির কারণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে তৎকালীন তান্ত্রিকতার উত্থান। তারানাথ বলেছেন—তুর্কীরা সমগ্র মগধ অধিকার করে এবং নালন্দার বহু আশ্রম ধ্বংস করে। মঠবাসীরা প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে। বস্তুত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বক্তিয়ার খিলজিই, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম ধ্বংসসাধন করেন।

দ্বিতীয় কক্ষে যশোবর্মার (৮ম শতক) এবং বিপুলশ্রীমিত্রের (১২শ শতক) প্রস্তরলিপি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আমাদের। তারপর বিভিন্ন শো-কেসে সজ্জিত সেকালের মাটির তৈরী জলপাত্র প্রদীপ, পেয়ালা, পানপাত্র, ফলক, নল, রেকাব, মস্তাসহ দোয়াত, নরনারীর মূর্তি, হস্তী, রাক্ষস-মূর্তি (কেউ বা পদ্মসহ, কেউ বা কলসসহ), শূকরমূর্তি, শূকরাকৃতি স্ত্রীমূর্তি, হংস, সিংহ, প্রণয়ীযুগল, গণেশ, হরপার্বতী, পদ্মপাণি, লিঙ্গের চতুষ্পার্শে উপবিষ্ট নাগদল, অষ্টভুজ মারীচি একে একে দেখে গেলাম আকুল আগ্রহ নিয়ে। অন্যদিকে নবম-দশম শতকের লৌহনির্মিত কাস্তে, অঙ্কুশ, কাঁচি, বৃহৎ প্রেক, চামচ, কোদালি, ছুরি, চিমটা, কুঠার ব্রোঞ্জ-পিন ঝুলন্ত প্রদীপ প্রভৃতিও সেকালের কুটিরশিল্পের উৎকর্ষেরই পরিচয় দেয়। বুদ্ধের সপ্তমুণ্ডসমন্বিত "কীর্তিমুখ" নামধারী মূর্তিটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংক্ষেপে বলতে হলে এ-কক্ষের দর্শনীয় বস্তু বিভিন্ন প্রস্তরলিপি, মৃৎশিল্প, ইষ্টক, লৌহনির্মিত বস্তুরাজি এবং নালন্দা থেকে প্রাপ্ত বালি-চুনাদির আস্তর বা লেপ (stucco) আর প্রতিমূর্তি নির্মাণার্থ অগ্নিতাপে ইষ্টকবৎ দগ্ধ বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা (Terracota) নির্মিত অগণিত বস্তুনিচয়।

তৃতীয় কক্ষের দর্শনীয় বস্তু ব্রোঞ্জের তৈরী বিভিন্ন মূর্তি এবং জিনিসপত্র, ইষ্টক-লিপি, মাটির তৈরী স্কেল, পাশার গুটি এবং রাজগীর থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন পদার্থ। পাথরের খড়ম, হাতীর দাঁতের চটিজুতা, কাচের তৈরী মালা ও গুটি, কাঠের স্তম্ভ, বুদ্ধের মুকুট, মাটির তৈরী ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির, প্রতিমার বেদী, তূণ, রাজদণ্ড এবং আরও সহস্র বস্তুর সমাবেশে সমগ্র চিত্রশালাটি হয়ে রয়েছে ইতিহাস-রসপিপাসুর অপরিহার্য সঞ্জীবনী-রসায়ন। নানান্ দুর্লভ বস্তুর সমবায়ে এই সাধারণ গৃহটি নিজের বুকে বহন করে চলেছে সে-যুগের ফেলে-আসা দিনগুলির সব-হারানোর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

এবার চিত্রশালাটির কাছে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম নালন্দার আসল ধ্বংসস্তূপের উদ্দেশ্যে। দূর থেকে সাবেক আমলের জমিদারদের পোড়ো-বাড়ির মত একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ফটকের কাছে গিয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ উপভোগ করা গেল অট্টালিকাটির বিশালতা। মানসচক্ষে ভেসে উঠলো এর প্রাচীন যৌবনাবস্থা।

লম্বা একটা হলঘরের মত দুধারে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা চওড়া রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবেশ করলাম অভ্যন্তরভাগে। দেওয়ালগুলি চার হাত পুরু এবং এখনও বেশ মজবুত। ফটকের পরই চওড়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে উপরে উঠলাম আমরা। এইটিই অট্টালিকার সর্বোচ্চ স্থান। সাধারণ দৃষ্টিতে দোতালা বলে প্রতীয়মান হলেও মাটির নীচে এখনও কতদূর অবধি ঘরবাড়ি আছে, কে জানে!

সারি সারি ছোট ছোট একই ধরনের বিভিন্ন কুঠরী। খুব পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রত্যেক কুঠরীতে একটি করে দরজা। জানালার বালাই নেই। প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে পাঁচ হাত লম্বা এবং আড়াই হাত চওড়া একটি ক'রে পাথরের শয্যা (stone-cot)। মাঝে ছাদের মত খোলা জায়গার ওপর রয়েছে ইঁটের তৈরী কুয়া। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাবার যে সাধারণ রাস্তা আছে, তারই ভেতর দিয়ে পৌঁছে গেলাম পাশের বাড়িটিতে। এখানে পাশাপাশি দুটি করে কুঠরী। একটি কুঠরীতে দুটি ক'রে শয্যা এবং সংলগ্ন কুঠরীতে কোন শয্যা নাই। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, শয্যাগৃহে দুজন ছাত্র থাকলেও পাঠাভ্যাসের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তারই জন্য সম্ভবত পাশেই ছিল পাঠগৃহ। এখান থেকে খুব লম্বা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নীচে। এখানে এসেই চোখে পড়লো খুব বড় একটি ইন্দারা। এর চারপাশে প্রশস্ত বাঁধানো চত্বর এবং তার ভেতর দিয়ে জলনিকাশের গভীর নালা দেখে এই জায়গাটিকে সহজেই স্নানের জায়গা বলে অনুমান করা যায়। এর পাশেই যে ঘরগুলি আছে, তার স্তম্ভগুলির যে নিম্নাংশ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলির প্রতিটি একটিমাত্র পাথরের তৈরী।

এবার ডানদিকে ঘুরে ভেতর দিকে আর একটু এগিয়ে গিয়েই পাওয়া গেল পর পর একই সারিতে নটি ছোট ছোট শ্রেণীকক্ষ। এগুলির মজবুত গঠন দেখে বক্তিয়ার খিলজী এগুলিকে সৈন্যাবাস বলে ভ্রম করে সমগ্র মঠটির বুকে হেনেছিলেন রক্তক্ষয়ী মৃত্যুবাণ।

পুরু দেওয়াল, জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা এবং গৃহাভ্যন্তরের সুড়ঙ্গ দিয়ে এক ঘর থেকে আর এক ঘরের যাতায়াত চলাচলের বন্দোবস্ত দেখে পৃথিবীখ্যাত আদর্শ এই বিশ্ববিদ্যালয় যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সাথে সাথে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দিকেও কতখানি সজাগ ছিল, তা স্পষ্ট এবং বাস্তব হয়ে উঠলো আমাদের চোখে।

এরপর এখান থেকে বের হয়ে এসে একটির পর একটি মঠ (monastery) পার হয়ে গেলাম অবাক বিস্ময়, অদম্য উৎসাহ এবং অননুভূতপূর্ব কৌতূহল নিয়ে। প্রথমটি যে রাজা দেবপালের সময়ে সুমাত্রার বালপুত্রদেবের তৈরী, তা জানা গেছে এইখানেই প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে। সময় ৮১৫—৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় জানালার উপর সংস্কৃতিমূলক প্রতিমূর্তি, পূর্ববর্তী মঠগৃহের ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত প্রাঙ্গণ, পুরু দেওয়াল আর জল নিষ্কাশনের নালাই এর বিশেষত্ব। ঠিক এইরকম তেরটি মঠ দেখে গেলাম একের পর এক। প্রত্যেকটির ভেতরেই একটি করে দু'পাশে সারিবদ্ধ কয়েকটি একই মাপের প্রকোষ্ঠ, একটি

করে বৃহৎ আটকোণা ইটের তৈরী ইন্দারা (এদের জল এখনও স্বচ্ছ এবং সুপেয়), এক এক সারিতে ছ'টি করে দু-সারিতে বারোটি হাঁড়ি বসানো যায়, এমন একটি করে বৃহৎ চুলা, অবলম্বন স্তম্ভাদিসমন্বিত সমগ্র সোপানশ্রেণীর উপরে একটি করে ছাদসংলগ্ন আলোক-গবাক্ষ, আর ইট দিয়ে বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে দু'একটি ইষ্টকনির্মিত মন্দির এবং চৈত্যও আছে। একটি চৈত্যের মধ্যে বুদ্ধের বিরাটকায় কৃষ্ণ প্রস্তরমূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মূর্তিটি 'তিলাইয়া বাবা' নামে প্রসিদ্ধ। আজও এ'র নিত্যপূজো হয় ফুল-চন্দনের অর্ঘ্য দিয়ে।

ফেরার পথে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তেতলা বাড়ির সমান উঁচু একটি স্তূপ। পাহাড়ের মত নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে সগর্বে মাথা উঁচু করে এই স্তূপটি যেন আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে নালন্দার অতীত সুমহান ঐতিহ্যের। সোজা খাড়া হয়ে সুন্দর গাঁথনিতে উঠে গেছে এর দেওয়াল। প্রাকৃতিক তাণ্ডব-লীলার প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করে কাল-প্রবাহের আঘাতকে প্রতিহত করে যুগের প্রভাবকে আমল না দিয়ে অক্ষয় এবং অমলিন রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই স্তূপ। কালের বিরুদ্ধে দুর্জয় এর অভিযান, দুর্ধর্ষ এর গঠন, গম্ভীর এর পরিবেশ, দুর্বোধ্য এর ভাষা। খানিকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম এই স্তূপের শিখরদেশে। সমগ্র ধ্বংসস্তূপটা সেখান থেকে মনে হলো ঠিক যেন একটি সুনিপুণ হাতের তৈরী বিচিত্র এক নক্সা। এরই নীচে নেমে এসে চোখে পড়লো অসংখ্য ছোট-বড় গোলাকৃতি সুসজ্জিত চৈত্য আর দেওয়ালের গায়ে বুদ্ধের প্রস্তরখোদিত কারুকার্যমণ্ডিত অসংখ্য মূর্তি। চৈত্যগুলি ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের এবং সিঁড়ি-স্তূপ ও উঁচু-ছাদ পরবর্তী সময়ের তৈরী। এছাড়া রাজগীরের পিপ্পল-গুহা থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি বুদ্ধমূর্তিও এখানের বিশেষ আকর্ষণ।

......সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন রয়েছে নালন্দার নবনির্মিত ছাত্রাবাসে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বোধ হয় অধীর আগ্রহে বসে আছেন আমাদের ফেরার পথ চেয়ে। কিন্তু ফিরবে কে! বিংশ শতাব্দীর যে লোকগুলি আজ ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অতিথি তারা কোথায়? যারা এই কয়েক ঘণ্টা আগে এসে প্রবেশ করেছিলো এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে—বর্তমানের সাথে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাদের মন এখন বিচরণ করছে দেড় হাজার বছর আগেকার এক যুগের বুকে। যে-রাস্তা দিয়ে একদিন চলাফেরা করতো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী সেই রাস্তার পথিক এখন তারা। যে-কক্ষে বসে

একদিন শীলভদ্রের মত ক্ষণজন্মা মনীষী জ্ঞানালোক বিতরণ ক'রে গেছেন বিশ্বের দরবারে—সেই কক্ষ আপন হাতে স্পর্শ করতে পেরে তারা আজ ধন্য। যে-কূপের জল ছিল নালন্দার শিক্ষাব্রতীদের তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম সেই পানীয়ের আস্বাদনে তারা আজ বিভোর।

সত্যই ধন্য—বাস্তবিকই বিভোর আমরা। বিস্ময়ে, পুলকে, প্রত্যক্ষে, কল্পনায় কেমন যেন এক স্বর্গীয় মুখাস্বাদনে ভ'রে উঠলো মনপ্রাণ। এক অভাবনীয় রোমাঞ্চে আত্মহারা হয়ে ভাবাবেগে অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় আবার ফিরে এলাম নালন্দার নবনির্মিত মহাবিদ্যালয়ে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহ আর যত্নের বন্যায় ভেসে গেলাম আমরা। সুবাসিত গোবিন্দভোগ চাল, খাঁটি গাওয়া ঘি, ক্ষেত-লব্ধ তাজা শাক-সব্জি এবং আরও কত কী সংগ্রহ করেছেন তিনি। নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারে এমন তৃপ্তি জীবনে আর পাইনি কোনদিন।

খাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম নিয়ে দেখতে এলাম নালন্দার পালি ইনস্টিটিউটের পাঠাগার। রাশীকৃত দুর্লভ এবং অমূল্য গ্রন্থরাজির অভাবনীয় সমাবেশ। আগের দিনের নালন্দার বিরাটকায় পাঠাগার—যাকে বলা হোত 'ধর্মগঞ্জ'—তার গ্রন্থ-রাজিকে ধরে রাখার জন্য দরকার হয়েছিল 'রত্নসাগর', 'রত্নদধি' আর 'রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। আজকের দিনের এই পাঠাগার সে-তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও বর্তমান ছাত্রসংখ্যার তুলনায় এর আয়োজন অসামান্য। বৃহৎকায় সতেরোটি সুদৃশ্য আলমারীতে ভরা রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের পুঞ্জীভূত জ্ঞানভাণ্ডার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পালি ভাষায় গবেষণা করতে হলে এই পাঠাগারটির সান্নিধ্য এবং সহযোগিতা অপরিহার্য। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে আজও এই পাঠাগার দেশবিদেশের অন্ধকার মনে জ্বালিয়ে দিচ্ছে জ্ঞানের প্রদীপ—যার প্রগতিশীল শিখা থেকে ঠিকরে পড়ছে নিত্য নূতন অবদান আর আবিষ্কারের ঝলক।

......গোধূলির আকাশে যখন শুরু হল রঙ-পরিবর্তনের খেলা—রাগরঞ্জিত পশ্চিমাকাশের বুকে যখন বেজে উঠলো সন্ধ্যার আগমনী—সেই বেদনাবিধুর মুহূর্তে এসে গেল আমাদের বিদায় লগন।

বাইরে এসে নালন্দার পবিত্র মাটি কুড়িয়ে নিলাম মাথার ওপর। মুহূর্তে মনে হল কত যুগের পুঞ্জিত করা আশীর্বাদের স্পর্শ পেলাম আজ। তারপর সেই নীরব, নিশ্চল, যুগের সাক্ষ্য ধ্বংসস্তূপকে জানালাম কোটি কোটি প্রণাম। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র বিহারভূমি আজকের অত্যাচারপীড়িত এবং অনাচার-জর্জরিত পৃথিবীর বুকেও বহন করে চলেছে শান্তির বাণী। যুগস্রষ্টিকারী সেই মহাপুরুষের প্রভাব যুগান্তরেও হয়ে রয়েছে অম্লান।

সকলেই নির্বাক। কলের পুতুলের মত পা ফেলে এগিয়ে চলেছি স্টেশনের পথে। মনপ্রাণ যেন মুগ্ধ কোন্ এক অজ্ঞাত যাদুমন্ত্রের বলে। একবার মনে হল—যদি আর না ফিরতাম! যদি এক হয়ে মিশে যেতাম নালন্দার এই যশোগাথার সাথে—যুগ যুগ ধরে কত মানুষের সাথে হোত পরিচয়—সার্থক হোত জীবন।

নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্পর্শে উজ্জ্বল মনপ্রাণ নিয়ে আবার ফিরে এলাম কোলাহলমুখরিত কোলকাতায়। আবার মানুষের ভিড়—আবার ট্রাম-বাস। তবু তারই মাঝে ভেসে ওঠে নালন্দার স্মৃতি। সে-যে অবিস্মরণীয়।

কাশ্মীর

পুরাণে দেবী ধরিত্রী প্রশ্ন তুলেছেন: প্রভু তোমার আপন স্বরূপ লুকালে কোথায়? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশৃঙ্গমালার বিশাল যোগে কেন তুমি আপনাকে অভিব্যক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণু জবাব দিচ্ছেন: প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দস্বরূপ ক্ষুদ্র মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওখানে প্রস্তর-কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দুর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জরা ও জন্মোল্লাসের অতীত। মহৎ স্থাণুর মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অব্যয়, অক্ষয়।

ধরিত্রী তাঁর শিয়রে ধারণ ক'রে রয়েছেন মহাজটা তুষার-কিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিত নেত্র,—যিনি আত্মস্থিত যোগাসীন। সুদূর দাক্ষিণে ধরিত্রীর চরণ-চুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরঙ্গ-রঙ্গে!

এই ভুবনমনোমোহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সম্রাট অশোক। তিনি ধ্যানস্থ, আত্মসমাহিত। ভারতবর্ষের সুদূর ভবিষ্যতের দিকে এই জগৎবরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠের দৃষ্টি নিবদ্ধ—সাম্প্রতের আবরণ সরিয়ে। দুই হাজার দুশো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সম্রাট। পৃথিবীর প্রথম মানব-সভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি পঞ্চশিলায় ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শে। কিন্তু তবু তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তাঙ্কিত, দৃষ্টি বিষণ্ণ। দেশ-দেশান্তরাগত সন্ন্যাসিগণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে অমিততেজঃ, তুমি কি তুষ্ট নও? আসমুদ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেনি?

সম্রাট ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ষু,—আমি বুভুক্ষু কল্যাণের। বিশ্বমানবের দুঃখ মৃত্যুভয় নিরানন্দ—এরা বিদূরিত না হ'লে কোথা আমার শান্তি, কোথা বা এই দেবভূমি ভারতের আনন্দ? সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কোথা?

কর্তব্য আদেশ করুন, হে ভিক্ষুপতি!

গৈরিক বসনাবৃত নগ্নপদ দারিদ্র্যভূষণ সম্রাট-ভিক্ষু নতজানু হলেন সন্ন্যাসিগণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অশ্রুনয়নে নিবেদন করলেন, মহাত্মন্, ভগবান বুদ্ধের যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সপ্তদ্বীপার তাঁর বাণী নবকল্যাণ চেতনা আনয়ন করুক, বুদ্ধের দৈবসত্তা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের ব্রত। অহিংসার মন্ত্রে পৃথিবী দীক্ষালাভ করুক, প্রেমের মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হোক, ত্যাগের মন্ত্রে তাদের সিদ্ধিলাভ ঘটুক, শান্তিময় সহস্থিতির মন্ত্রে তারা নবজীবন-বেদের ব্যাখ্যা লাভ করুক। আমার নির্বাণ লাভের পূর্বে আমার জীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই, মহাত্মন্!

রাজভিক্ষুর সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল,—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কামনায় কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে গান্ধারের দিকে এবং পূর্বে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর কেউ তখনও জাগেনি। মঙ্গোলিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন; ব্যাক্ট্রিয়া, আসিরিয়া, ইরারখন্দ, চীন—সবাই ঘুমিয়ে। ইউরোপ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় বনে অরণ্যে আর সমুদ্রতীরে; আমেরিকার জন্ম হয়নি। সম্রাট অশোকের আবেদনের ফলে তিব্বতে, মধ্য এশিয়ায় ও গান্ধারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ-সভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে কুনলুন গিরিমালার উত্তরপারে বিশাল তাকলা মাকানের মরুলোকে—ইয়ারখন্দ, খোটান ও কেরেয়া নদের এপারে ওপারে,—যাদের নাম মাসারতাগ, কারাডঙ, দানদান উইলিক, আইপা ইত্যাদি। শত সহস্র বৎসরের বালুর ঝাপটা এই ধ্বংসা-বশেষগুলিকে আজও বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও এদের বালুপাথরের প্রাকার গৌতম বুদ্ধের বাণীকে বহন করছে।

সম্রাট অশোকের এই বিশ্ব-বৌদ্ধবাণী-সাধনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত হবার সৌভাগ্য-লাভ করেছিল কাশ্মীর। প্রথম কাশ্মীর থেকে ভিক্ষুর দল প্রবেশ করেছিল সম্রাট অশোক-শাসিত গান্ধারে,—যে-গান্ধারে এক-দিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভুত্ব ছিল। আজকের মতো সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল 'পুরুষপুর', একালে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশাওয়ার। রাজধানী

পুরুষপুরকে কেন্দ্র করে সমগ্র গান্ধারে বৌদ্ধ সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট-ভিক্ষু অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বৌদ্ধ-সভ্যতা প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সীমানা আজকের মতো চিহ্নিত ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত-মঙ্গোলিয়ার পথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানবধর্ম-নীতি ও সুশাসনের প্রভাবে সকল জাতির মানুষ সেদিন সহজে বশ্যতা স্বীকার করতো। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণে সিংহল ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্রাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করে আনন্দ পেয়েছিল।

এই কীর্তি ভারতের সংস্কৃতির,—কন্যা-কুমারী থেকে কাশ্মীর ছিল এই সংহতি-মন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে এর ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্ঝা, সংহার ও সৃষ্টি, অগণিত দানবীরতার দংষ্ট্রাঘাত, অসুরের করাল-চক্ষু এবং সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও দৈবমানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর—কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও নব-জন্মলাভ ঘটে।

কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পূর্বদিকে তার শাখা-প্রশাখা। উলঙ্গ ফকিরের মতো সে ঊর্ধ্ববাহু, বুভুক্ষায় যন্ত্রণায় সে যেন চির-দরিদ্র। আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবো উত্তর-পশ্চিমে,—ইরাবতী নদী পেরিয়ে যাবো জম্মুর দিকে। পুরাকালে চাক নামক এক বর্বর পার্বত্য জাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামানুসারে চাক্কি নামক একটি চেক্-পোস্ট পাশে রেখে আমরা পাঠানকোট থেকে বেরিয়ে মাধোপুর ও লক্ষ্মণপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত শতদ্রু এবং বিপাশা অতিক্রম করে এসেছি। বস্তুত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোন না কোনও সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধু-নদ না পেরিয়ে উপায় নেই। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ না করলে পার্বত্যভূমিতে পদার্পণ করা যায় না। আসামে ব্রহ্মপুত্র, ভুটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমায়ুনে কোশী আর গঙ্গা-যমুনা,—যেখানে যাও, যে কোন পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রক্ত-রশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতল-সাগর হ্রদ, অতিক্রম করে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই সুদূর উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গুল্মলতায় সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে। দূরে দূরে ধূম্রাভ গিরিশ্রেণীর স্তবকে স্তবকে শ্রাবণ-শেষের বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রজাপতি পতঙ্গেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে সূর্যকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথ আগে ছিল অব্যবহার্য, এখন সে-পথ চিক্কণ ও মসৃণ। শিয়ালকোট থেকে জম্মু ছিল রেলপথ, কিন্তু শিয়ালকোট এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জম্মু মোটরবাসে গেলে সাতষট্টি মাইল।

সমগ্র কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত। পীর পাঞ্জালের এপার হলো জম্মু উপত্যকা, ওপার হলো কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল বহুকাল। জম্মু হিন্দুপ্রধান এবং কাশ্মীর বর্তমানে মুসলিম প্রধান।

মাধোপুর ছাড়িয়ে ইরাবতীর পুল পেরিয়ে লক্ষ্মণপুর পিছনে রেখে আমরা চললুম পশ্চিম দিকে। লাল-দেপুর আর শিবায়ের বনচ্ছায়াময় পাখীডাকা উপত্যকা-পথ মধুর লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের

হায়দরাবাদের মতো পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালভূমির মতো; রুক্ষ বঙ্কিম পর্বতস্তর সানুদেশ লতাগুল্ম বিজড়িত। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছুটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই রক্তবরণ প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এরা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মূল উৎস সম্ভবত পীর পাঞ্জালে, যার ক্রোড়-পর্বত হলো ধবলাধার। কিন্তু এমনটি দেখিনি কোথাও,—এত লাল, এত রক্তের স্রোত। হয়ত একেই বলে রক্তগঙ্গা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল। নাম শম্বা। শম্বা অর্থে বিদ্যুল্লতা; যদি শম্ব হয় তবে বজ্রদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত; ডানদিকে পার্বত্য ক্রোড়ভূমি। বনময় উপত্যকা আর আঁকাবাঁকা গিরি-নদীর উপলাহত স্রোত নিঃঝুম মধ্যাহ্নকে নিবিড় করে তুলেছে। দূর দিগন্তে ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতলের থেকে শিরদাঁড়া ও মেরুদণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা-উপশিরাগুলি উত্তরখণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হলো তার ভূতাত্ত্বিক পঞ্জর-বন্ধন।

কিছু অস্বস্তি ছিল মনে, কিছু বা শঙ্কা। দিল্লী থেকে বাহির হবার কালে কোনও কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভয় দেখিয়েছিলেন, কাশ্মীরে রক্তারক্তি চলছে, ওদিকে নাই গেলেন! সেটা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগস্টের মাঝামাঝি। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে শেখ আবদুল্লা গদিচ্যুত হয়েছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীনগর প্রান্তে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গেছেন—তখনও দুমাস হয়নি। অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় সমগ্র কাশ্মীর উদ্বিগ্ন।

দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মানুষ, কারণ আমরা বাঙালী। জীবরক্ত আমাদের খাদ্য, টাটকা মাছ-মাংসের হৃৎপিণ্ড-ঝরানো রক্ত দেখলে আমাদের মুখ লালাসিক্ত হয়। রক্তাম্বর আমাদের চোখে পবিত্র পরিধেয়। রক্ত-লোভাতুরা মহাকালী আমাদের ইষ্টদেবী। বলিদানের পুণ্যরক্ত দেখলে আমরা ভাবাপ্লুত হই। সন্ধিপূজায় অসুরনাশিনী চণ্ডীর স্তোত্র শুনতে শুনতে আমাদের আবেশ আসে। রক্তজবা আর রক্তপদ্ম আমাদের পূজার উপচার। আমাদের মেয়ে পায়ে পরে আলতা, মাথায় ধরে সিন্দুর। রাঙাপাড় শাড়ী তাদের সকল উৎসবের পরিধেয়। বাঙালী কবি উদয়াস্ত গগনের রক্তচ্ছটায় কাব্যের প্রেরণা পায়। রাজনীতিতেও তাই। ১৯০৫ থেকে ১৯৫০ অবধি বাঙালীর রক্তক্ষরণের কাহিনী। শৈবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করেনি; রক্তবিপ্লবে তারা পেয়েছে আনন্দ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেদিন সংহারমূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেন, বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাঙলার সরকারী প্রতীক হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভয় নেই। এই সেদিনও এক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে! সে যাই হোক, এই প্রকার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে সময়টায় বিস্ময়-বিমূঢ় এবং হতচকিত, ঠিক সেই সময়টিতে অজানা দেশে প্রবেশ করা দুর্ভাবনার কারণ বৈকি। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীর মিলিসিয়ার কর্মতৎপরতা নানাদিকে প্রকট, কখন আগুন জ্বলে ওঠে কে জানে!

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদূর। অনেক বাঁক ঘুরেছি, উপত্যকা আর অধিত্যকার সর্পিল গতি আমাদের মোটর-বাসকে অনেক চড়াই-উৎরাইতে ঘুরিয়ে আনলো। তপ্ত রৌদ্রের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল-কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাঙামাটির অধিত্যকায় শাল-সেগুন-শিমুলের ছায়া-নিবিড় বনে পাখীসমাজের বিশ্রম্ভালাপ চলছে।

পার্বত্য পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির পূজারী। সেই কারণে জম্মু উপত্যকায় প্রায় সর্বত্রই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘুনাথ, কোথাও রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষতলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় পূজা-প্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেব-দেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্টবস্ত্রপরিহিত পূজারী ব্রাহ্মণ; ছোট পাহাড়ের ওই

অনেক উঁচুতে হয়ত চোখে পড়ছে ত্রি-শূলীর মন্দিরে শ্বেত ও রক্ত পতাকা উড্ডীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গুরুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে ভারতীয়ের রক্ত বইছে চিরদিন।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্মু শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছুটি পাওয়া গেল। জম্মু হোলো পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের মিলন ক্ষেত্র।

বড় শহর, মস্ত বাজার হাট। পাহাড়ের সানুদেশে প্রশস্ত উপত্যকায় এই শহর খুবই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্য-দিকে শ্রীনগর, সুতরাং এ শহরে আমদানী রপ্তানির কাজ প্রচুর। বাহির থেকে নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এসে এখানে রাজ্যপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথঘাট অপ্রশস্ত, পার্বত্য শহরে যেমন হয়। কোনদিক ঢালু, কোনদিক বা উঁচু। এটি হলো কাশ্মীর মহারাজার শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজা হরি সিং তাঁর কৃতকর্মের জন্য অন্যত্র নির্বাসিত; তাঁর স্থলে আছেন তাঁরই তরুণ পুত্র করণ সিং, তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মুতে চাউল হলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিন্তু বিস্ময় লাগে যখন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্র। লাউ বেগুন থোড় কচু কাঁচকলা ঝিঙে উচ্ছে ডুমুর কুমড়ো নটে আর শাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বলিষ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশক্তির প্রবল কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার খেয়ে এসেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা তোলেনি একবারও। একবারও শোনা যায়নি, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিপ্লব ঘোষণা করেছে অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ দুর্নাম ওদের নেই। শক্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দুর্বল। ওরা হলো প্রাচীন আর্য জাতির মহৎ বিনষ্টির সাক্ষ্য। ওরা শুধু মধুর স্বভাব, ওরা অতিথিপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত, কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা। যে-কোনো শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভুত্ব করুক, ওরা আত্মসমর্পণ করতে উৎসুক। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বজ্রের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একটি মানুষ, তিনি হলেন বক্সী গোলাম মহম্মদ।

জম্মুর চাউল হলো ভারত প্রসিদ্ধ। এমন মধুর সুস্বাদু ও শুভ্র তার শ্রী। একটি গুজরাটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহারী দোকানে উঠে বসলুম। আমি বাঙালী শুনে দোকানদার

সসম্ভ্রমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবলি দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে মুখর। বলতে বলতে মুসলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপমৃত্যুর জন্য 'শেখসাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হুঁ, কবভি ঝুট নহি বোলতা, সাব! দুনিয়াভর ইনসানকো মালুম হো গৈ।

আমাদের মোটর বাস আবার জম্মু ছেড়ে চললো। বেলা অপরাহ্ন। আমরা এন-ডি-রাধাকিষেণ কোম্পানীর গাড়ীতে যাচ্ছি। এটি লালমোটর, অর্থাৎ ডাকগাড়ী। আমাদের ড্রাইভার অতি ভদ্র এক কাশ্মীরী সৌম্য দর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বত্য পথের বিপদসংকুল বাঁকে-বাঁকে গাড়ী চালাবার জন্য যে ধীর বিচারবুদ্ধি ও সচেতন দৃষ্টি প্রয়োজন, বক্সীজীর অনন্যসাধারণ যোগ্যতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল পদে পদে।

জম্মু থেকে উধমপুর বেশী দূরে নয়। এবার আশেপাশে অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধীরে ধীরে উঠছি চড়াই পথে। নিস্তব্ধ উধমপুর। অদূরে বট-অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্নলোকে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল। পথের বাঁকে রাজার এক উদ্যানবাটির মস্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক ঘাঁটিতে দেখা যাচ্ছে মিলিটারী পোশাকপরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত এবং দূর থেকে চোখে পড়ে একটি টিলা পাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ী। ওখানে শেখ আবদুল্লা সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবদ্ধ। সপরিবারে তিনি বন্দী। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বক্সী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গুরু তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন নিয়মিত। অর্থাৎ চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে—সংবাদপত্রাদি এবং বেতারযন্ত্রসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রাসাদের বারান্দা থেকে সমগ্র জম্মু উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়।

উধমপুর ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। পূর্বদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার, আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পীর পাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধূলির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনির্ঝরিণীরা, ওদের নূপুর নিক্কণ কানে আসছে, শুনতে পাচ্ছি কলকণ্ঠীর গুনগুনানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে, আবডালে। আজ শুক্লা সপ্তমী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দ্রভাগার তীরে-তীরে, তার জন্য তৈরি হচ্ছে ওরা, ওই সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা!'

খদ নামক একটি পাহাড়ী বস্তির কাছে এসে চা-পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ।' কিছু নেই কোথাও, অনেক উঁচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বস্তি। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা যেতো। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য জলধারাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অর্ধচন্দ্রাকার অশ্বক্ষুরাকৃতি। যেমন দেখেছি মুসৌরী ছাড়িয়ে কেম্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপুঞ্জীর ঝরোকা। এতক্ষণে আমরা সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘু, মুখচোরা স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমরা ছোট্ট শৈল স্বাস্থ্যনিবাস বাটোটে এসে পৌঁছলুম।

আমরা মোট জন পঁচিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার টুরিস্টের ভিড় কম। রাজনৈতিক কারণে সকলেই ত্রস্ত। কারো কারো ধারণা পাকিস্থানের পক্ষ থেকে আক্রমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়ীতে স্ত্রীলোক ও শিশুও আছে দুচার জন। কেউ কেউ বমি করতেও আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ 'চক্কর' লেগেছে। একজন আছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মচারী, নাম আয়ার। তাঁর আর্থিক অবস্থার চাকচিক্য ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি যাচ্ছেন কাশ্মীরে স্বাস্থ্যোদ্ধার কামনায়। যুবক বলা চলবে না, প্রৌঢ় বলতে বাধে। সম্ভবত কেউ তাঁকে বলে থাকবে, দুধ খেয়ো খুব, ফল খেয়ো তার চেয়েও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝুড়িতে ফল, দুই পকেটে ফল। গাড়ী কোথাও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকানে, যদি দুধ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আষ্টেক দুধ খেয়েছেন, ফলের রস ঝরেছে তাঁর কোটপ্যাণ্টে। বাটোটের ছায়ান্ধকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েছিলেন। বক্সীজী বারম্বার হর্ন দিচ্ছিলেন গাড়ীতে তাঁর জন্য। এক সময় তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিখুশি। তাঁকে নিয়ে সারাদিন ধরে গাড়ীর মধ্যে চাপা হাসি আর টুকরো কথায় চোখ ঠারাঠারি ছিল। আয়ার ভ্রূক্ষেপ করেননি। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হয়নি।

গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু এবারে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ীর হেড লাইট জ্বলেছে। রাত্রি তার দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পীর পাঞ্জালের চূড়ায়-চূড়ায়। দিনমানে যে-হিমালয় শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক, রাত্রির অন্ধকারে তার দানবাকার মূর্তি হৃৎকম্প আনে। অনেক উঁচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশস্ত পথ নয়। একটু ভুল, একটু অমনোযোগ, একটু বা দৃষ্টিবিভ্রম, অমনি আমাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি। সাধারণত রাত্রের

দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিদ্ধ। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহুল্য, বাইরের দিকে নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাস ভয়ে গাড়ীর মধ্যে বসেছিলুম।

যেদিকে গহ্বর সেইদিকে আমি। গাড়ীর চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয় ইঞ্চিমাত্র ব্যবধান, হেড লাইটের আলোয় তার পরিমাপ করছিলুম প্রতিক্ষণে। কিন্তু আতঙ্কময় বিমূঢ়তারও শেষ আছে এক-সময়ে। যদি হঠাৎ আসে এক ঝলক অরণ্য-পুষ্পের গন্ধ, মৃত্যুভয় মধুর হয়ে ওঠে। যদি হঠাৎ চোখে পড়ে, শুক্লা সপ্তমীর মলিন জ্যোৎস্না বিশাল তির্যক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাঙ্গ দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিস্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের তোরণদ্বার খুলে যায়। একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে।

আমরা যাচ্ছিলুম চন্দ্রভাগার ধারাপথ বেয়ে। ঘূর্ণি লেগেছে তার বক্রবরণ খর-স্রোতে, সেই ঘূর্ণিজল মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় শত শত চন্দ্রঝলকে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাঁকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার, চন্দ্রহাস রাত্রি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির মতো জ্যোৎস্না জ্বলছে খরতর তার প্রবাহে।

সম্মুখের রত্নগিরি দলের চূড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালেন সপ্ত ঋষির দল। পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলো অপ্সরা—জ্যোৎস্না রাত্রে লজ্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহন স্নানে নামে। বন্য কেশরীর রক্তমাখা পদচিহ্ন অনুসরণ করে সিংহশিকারী বল্কলবাসা কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বালুবেলায়। নন্দনকান্তি বিদ্যাধরী ভূর্জপত্রে রক্তিম স্বর্ণাক্ষরে লিখে চলেছে প্রণয় সঙ্গীত। হিমালয়ের গুহাছিদ্র-নিঃসৃত শীতল শ্বাস নিকটবর্তী বেণু বনের মধ্যে প্রবেশ করে আপন মর্মর ধ্বনিতে মধুর সুরযোজনা করে। ময়ূরপঙ্খী কিন্নরদল নৃত্য করে যায় তার তালে তালে। আরণ্যক ঐরাবতেরা এসে তাদের গাত্র ঘর্ষণ করে যায় বিশাল দেব-দারু কাণ্ডে, সেই ক্ষতগাত্রের সুগন্ধে পর্বতশীর্ষ হয় সুবাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লতার আভায় আলোকিত গুহাভ্যন্তরে অরণ্যচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লজ্জাহরণের কিল্লোল বিহ্বল রসরঙ্গলীলা; অবশেষে মেঘের দল নেমে এসে গুহামুখে যবনিকার আবরণ টেনে দেয়। প্রভাতে আসেন সপ্তঋষিগণ স্বর্ণপুষ্প চয়নে। তাঁরা পদচারণা করে যান তুষার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে।

সেই জ্যোতির্লতা আর স্বর্ণপুষ্পের সন্ধানে আমার উৎসুক দৃষ্টি ওই তারকা-স্পর্শী বিরাট হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

রামবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ী আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাত্রের বিপজ্জনক পথ দিয়ে চড়াই ভেঙে চললো।

আতঙ্কে আনন্দে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বিমূঢ় বিস্ময়। দুর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। খাড়া গাঁয়িরে গাড়ী চলছে, তার অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগছে। জ্যোৎস্না রাত্রে বিমানে চড়ে যারা আকাশলোকে বিচরণ করেছে, তারা জানে এ আওয়াজ। বিমান ভেসে চলেছে স্বপ্নসায়রে। ভয়ের চেতনা লোপ পেয়েছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি পড়ে যায় নীচে, তার পরিণাম সম্বন্ধে মন অসাড়। কারণ নীচেকার পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না। কুতব মিনারের শীর্ষে উঠলে ভয় করে, কারণ পতনের ফলে যে শারীরিক সংঘাত ঘটবে, সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্যোৎস্নালোকে দশ হাজার ফুট উঁচু শূন্যে বিমানে বসে আমরা শুধু দেখতে পাই, একটা অবাস্তব মায়াচ্ছন্ন ব্যোমলোক, সেটি শব্দজগতের ঊর্ধ্বে, সেখানে পাখী পৌঁছয় না, প্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনন্ত গগনে সেই আশ্চর্য শূন্য! ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ভেসে চলেছে বিমান, কিন্তু অনুভব করছে না কেউ। প্রচণ্ড গতি, প্রচণ্ডতর বেগ, অথচ বিমানটি স্থির, একটু নড়ছে না, একটু দুলছে না, সে অচঞ্চল গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, তারা নড়ে না, মহাশূন্যও নড়ে না। আরাম গদিতে শুয়ে আরোহীরা নিদ্রিত। কাচের জানলার ভিতর দিয়ে স্থির জ্যোৎস্না এসে পড়েছে হয়তো কোনও এক বিবশা তনুলতার উপরের মুখচন্দ্রমায়।

এখানে অন্য কথা। পর্বতবক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের খদ ভয়ঙ্করীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এপারে বিশাল দেওয়ালগাত্রে যে-সূত্র পথ, তার উপর দিয়ে মোটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিকে দু হাজার ফুট কালো গহ্বর, দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি।

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বাস্তের উৎরাই পথে গাড়ী এসে পৌঁছলো। শরীরের অন্তেতন্ত্রে তখন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকখানি দোকানে অল্পস্বল্প আলো জ্বলছে। আবছা জ্যোৎস্নায় আশপাশ বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি যাত্রিশালার ধারে। এখানে আজকের মতো রাত্রিবাস। রক্ষক হলো এক মাড়োয়ারী। দু' টাকা ভাড়ায় তখনই একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে একটি গিরিনদী। এখানে ওখানে কয়েকখানি দোকানদানি, কাছাকাছি কোথাও আছে একটি ব্যাটারি চার্জ করা বেতারযন্ত্র। আমার খুপসি ঘরখানার কোলে বারান্দা, সেখানে নানা লোকের নানা জটলা। ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

বনময় গিরিনদী ঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই পরম সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রিটি ওই বেতারযন্ত্রের চিৎকারের দ্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে সূচিকাবিদ্ধ হচ্ছিল। এমন বিরক্ত হইনি আর কোনও দিন ওই যন্ত্রটার প্রতি। কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর করে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় পরিবেষ্টিত রয়েছে, এবং অদূরে একটি দোকানে ওই বেতারযন্ত্রের চারিদিকে অনেকগুলি লোক ভিড় করেছে। পাকিস্থানের কয়েক জন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুরুষ করাচী থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাশ্মীরবাসীর উদ্দেশে বেতারে বক্তৃতা করছেন।

বক্তৃতার ভাষাটি উর্দু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারা যাচ্ছিল। 'শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতি এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্থান আজ মর্মাহত এবং অশ্রুভারাক্রান্ত। কাশ্মীরবাসিগণের প্রতি ভারতের অমানুষিক অত্যাচার যে কতখানি বর্বরোচিত, তা পৃথিবীবাসিগণ জানে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শেখ আবদুল্লার প্রতি ভারত যে-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতী সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশুনির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্থান প্রস্তুত। অতএব আমরা পবিত্র কোরানের নামে শপথ করছি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ তোমাদের এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপন্ন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। শেখ আবদুল্লা সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতির সংবাদ শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাকিস্থানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খানের কথা,—যাঁকে রাওয়ালপিণ্ডিতে হত্যা করা হয়। তিনি এক বক্তৃতাকালে ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার উদ্দেশে বলেন, 'কাশ্মীর আপকো বাপকা মিলকিয়াৎ নেহি হ্যায়।' কাশ্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়!

শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার পুরুষানুক্রমিক বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব করে, তবে তাকেই অনুরূপ সম্ভাষণ করা উচিৎ,—আমাকে নয়।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ এই মন্তব্যটি শুনে চুপ করে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ী ছিল উত্তরপ্রদেশে। আজ
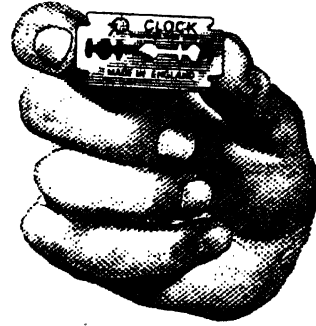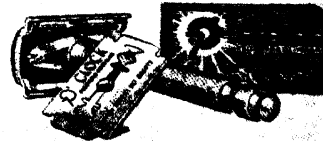
সহসা বেতার যন্ত্রে উচ্চারিত আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতি—এর পিছনে কোনও রহস্যজনক কারণ আছে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

আমার পক্ষে মুশকিল হোলো এই, এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকরা যদি সশস্ত্র এসে কাশ্মীরের উদ্ধারকার্যে লাগে, তবে আমি পালাবো কোথা? তাছাড়া কাশ্মীর উপত্যকার এখনও প্রবেশ করিনি,—এখনও আছি জম্মু প্রদেশে,—সুতরাং ধ'রেই নেবো করাচীর শ্রদ্ধেয় নেতারা সত্যভাষণ করছেন। নেতা মাত্রই সত্যভাষী—এই আমার ধারণা। তবে কি সত্যই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়তে হলো? প্রাদেশিক অভব্য ভাষায় বলতে হয়, একটু ভড়কে গেলুম!

ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। ভিতরে দেখি সেই স্বাস্থ্যান্বেষী ফলভুক মাদ্রাজী ভদ্রলোক কৌপীন মাত্র সম্বল করে প্রাণপণে ডন্-বৈঠক দিতে ব্যস্ত। চেহারাটি তাঁর শীর্ণ,—এ বয়সে এক্সারসাইজের দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি কতখানি সম্ভব বলা কঠিন। আমাকে দেখে তিনি একটু থতিয়ে ইংরেজিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আজ থেকে আমি এ কাজ ধরলুম। এটা দরকার।

আমার মুখে-চোখে প্রশ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। পুনরায় তিনি বললেন, ধরুন কাশ্মীর যদি আক্রান্ত হয়, আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার! দেশের জন্য, জাতির জন্য........

কিন্তু সাতদিনে কি লড়াইয়ের উপযুক্ত শরীর হবে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক তা নয়, তবে মেহন্নত করলে মানুষ সাহসী হয়, জানেন ত?

জানলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, অন্তত ছুটে পালাবার মতো শক্তিও থাকা চাই। আজ একটু গুমোট! আপনি যদি অনুগ্রহ করে বারান্দায় গিয়ে শোন, আমি এ ঘরটায় যা হোক করে থেকে যাই। একখানা খাটিয়াও রয়েছে দেখছি।

এবারে বলতে বাধ্য হলুম, তার চেয়ে ভাল হয় যদি আপনি গিয়ে বারান্দায় শোন,—আপনার এক্সারসাইজ করা ঘর্মাক্ত দেহ একটু স্নিগ্ধও হবে! আমি ঘণ্টাখানেক আগে ওই মারোয়াড়ীর হাতে দুটি টাকাও দিয়েছি!

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর কি মনে হলো, এক সময় জোব্বাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে-রাত্রে তিনি একটি স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলেন, সকালের আগে আর দরজা খোলেন নি।

তাঁর এই দরজা বন্ধের ইতিহাস হয়ত আরও একটু ছিল। আহারাদি সেরে ঘরে ঢুকে একটু সুস্থির হয়ে বসেছি, এমন সময় জনতিনেক স্থানীয় অধিবাসী মহা হল্লা বাধিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। বাইরে একটা গোলমাল বেধেছে। ওদের মধ্যে দুজন মুসলমান এবং একজন এই যাত্রীশালার খিদমদগার। মুসলমান দুজনেই বয়সে যুবক, কিন্তু ওর মধ্যে একজন একটু বেশীমাত্রায় 'দেশী সরাব' পান করেছিল। একটু বেহুঁস, একটুখানি টলটলে।

চেঁচামেচি শুনে বারান্দার ওদিকের ঘরগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে টলটলে যুবকটিকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অন্য যুবকটি ওকে যখন শান্ত করার চেষ্টা পাচ্ছে, ও তখন একখানা ছোরা বার করেছে। ওর ইচ্ছা, ওই শান্তিবাদী যুবকটিকে হত্যা করবে। আশেপাশে লোক হাসাহাসি করছিল। খুনে ব্যক্তিটিকে আমার বিছানায় বসানো হলো বটে, কিন্তু ছোরাখানা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। খুন সে করবেই।

হারিকেন লণ্ঠনে কেরোসিন তেল কম, সুতরাং আলোটা নিভে আসছিল। মদখাওয়া যুবকটি নাকি বেতার যন্ত্রে করাচীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক বাধায় এবং সুস্থ শরীরে বন্ধুর পিঠে ছুরিকাঘাত করা একটু চক্ষুলজ্জার ব্যাপার বলে সে দেশী মদ খেয়ে ছুরি নিয়ে ছুটে আসে। হত্যা সে এখনই করবে, তবে তার আগে আমার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অনুমতি পাওয়া দরকার।

যুবকটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেই দেশলাই জেলে দিলুম। দেখি ওর চোখ দুটো লাল টসটস করছে। হেসে বললুম, যে ব্যক্তি ছুরি মারে, সে কি অনুমতির অপেক্ষা রাখে?

খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রাঙা

চোখ তুলে যুবকটি বললে, আপনি কি মানা করছেন?

বললুম, না, মানা করবো কেন? তবে কাল সকালে মেরো। নৈলে তোমার মতন ভদ্রছেলের নামে এই দুর্নাম রটবে যে, তুমি মাতলামি করতে গিয়ে খুনখারাপি করেছ। বরং বেশ ভেবেচিন্তে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ছুরি মারলে তবেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে!

ছেলেটি হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলো,—ঠিক বলেছেন। একে মেরে যদি ওই পাহাড় ডিঙিয়ে পুণ্ডএর দিকে পালাই, কে ধরছে! সালাম লিজিয়ে, সাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ওই 'দুষমন' বন্ধুটিরই সহায়তা পুনরায় নিতে হলো। অবাধ্য পা দুখানা তার বড়ই টলছিল।

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী। তখনও ঠিক মতো বানিহালের ঘুম ভাঙেনি। রঙীন পাখীরা পীর পাঞ্জাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকায়। বস্তির উত্তর প্রান্তে উপলাহত গিরিনদীর কুলকুলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একটু আধটু চাষ-বাস ও ফলনের কাজ চলছে। দোকানপাট এখনও খোলেনি। রাত্রে যে উত্তেজনাটুকু দেখা গিয়েছিল, সকালে তার চিহ্নমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকম্পের সংগে কাশ্মীর চিরদিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তার বিশেষ কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমাদের গাড়ি প্রস্তুত হলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে—যাকে আজ এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি-ভদ্র মুসলমান যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গুল। শের গুলের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী,—যুবকটি জানালো। ছোরাখানা নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গুল ঘুমোতে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

গাড়ি ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধুর রৌদ্রের দিকে উঠে এলুম। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসংকটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফুলশয্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধার গিরিশ্রেণীতে যেমন কথায় কথায় পাথরের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। শ্রাবণের নূপুর-ঝুমুর শোনা গেলেই মৃৎপিণ্ডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌসুমী ফুল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীর পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য। হাভেলীস্থান, আবটাবাদ, মুজাফরাবাদ, মীরপুর—যেখানে যাও, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকরুণ মায়া কাব্য-ব্যঞ্জনার। প্রতি গুহা-গহ্বরে রেখে যাচ্ছি আমার প্রাণের সুর, প্রতি গুল্মলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি আমার মর্মের বাঁধন, আমার মায়ার কাঁদন।

দেখতে দেখতে প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দিগন্ত। অন্ধকারে নীচের দিকে পড়েছিলুম গত রাত্রে,—যেখানে মানুষের ক্ষুদ্রতার ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিত্তের বিদ্বেষ পারিপার্শ্বিককে বিষাক্ত করছে ক্ষণে ক্ষণে; স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের গ্লানিতে, সংশয় ও ধিক্কারে যেখানে নরক সৃষ্টি হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে পূর্ব দিগন্তের রক্তগিরিদ্বারে উঠে এলে সব তুচ্ছ। এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করছে মুহুর্মুহু। যত উঁচু তত বিস্তার, ততই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখানে থেকে ডাক দাও আরও বৃহত্তর দৈবজীবনকে, হাত বাড়িয়ে যদি সমস্ত আকাশকে আলিঙ্গন করো,—সমগ্র ক্ষুধার্ত প্রাণ যদি ডানা মেলে উড়ে যায় পীর পাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয় ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমন আকাশপথে রাজহংসেরা পাখা মেলে চলে যায় নিরুদ্দেশ লোকে; যেমন পরস্পর তারা কথা কয়, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

চড়াই উঠছে মোটরবাস,—প্রচণ্ড হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। আপার মুণ্ডার দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—সুদীর্ঘ জিগজ্যাগ পথ একবার পূর্বে এবং একবার পশ্চিমে প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজ ভয় নেই গত-রাত্রির মতো; যা কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিলুম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মুখ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দূরে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেকদূরে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফুট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো পর্বতচূড়ার কাছাকাছি স্বল্প-প্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক প্রহরী বানিহাল গিরিগহ্বরের প্রবেশপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমাত্র সুড়ঙ্গ-পথ,—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীর মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহ্বর পথের এপার-ওপার কঠিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। কাজ সমাপ্ত হলে কাশ্মীর অনেকটা সুগম হবে। আমাদের গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়ির কনভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ঢুকলো সেই অন্ধকার গহ্বরলোকে। দীর্ঘ পথ সত্যই অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। পিছনে জম্মু, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক। সত্যি বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য চেতনা লোপ পায়।

সৌর-বিশ্বলোকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি সৃষ্টিকর্তা আপন আশ্চর্য সৃষ্টির দিকে নির্মেঘনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন। বায়ুস্তরের মধ্যে সূর্যরশ্মির যে কাঁপন উত্তর-মেরুতে অরোরার আলিম্পনার সৃষ্টি করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস করে বাঁচি। চতুর্দিকে শত শত মাইল পরিব্যাপ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্ররথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারা এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে পলকে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানা বর্ণে। বায়ুলোকে পরিব্যাপ্ত সূর্য-রশ্মি এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে মুহুর্মুহু: ফলে, দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত হচ্ছে পলকে পলকে। প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে আছি বলেই এই দৃষ্টিবিভ্রম এবং এই অনির্বচনীয় বিস্ময়। সমতলে নেমে গেলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ। পৃথিবীকে আমরা দেখছি একই চেহারায় লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও দেখিনি। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতুম পরিচিত পৃথিবীকে, তবে দৃশ্য-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতুম। পাশের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়িটি দেখলে বৈচিত্র্যবোধের আস্বাদ লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই সুড়ঙ্গ-লোক দিয়ে যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লাভ করতুম।

মিনিট দুই হতচেতন হয়েছিলুম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিলুম দেবতাত্মার শীর্ষলোক। শ্বেতচূড়া একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট হিন্দুকুশ আর কারা-কোরামের প্রত্যন্ত শীর্ষ, গিল্গিটের পারে দুমানি, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার তুষার-শীর্ষ, কোলের কাছে দেখছি হরমুখ, সোনামার্গ আর জোজিলা, বাল্‌তিস্থানের পূর্বলোকে গাসেরব্রুম আর মাসেরব্রুম, তার দক্ষিণে দেবসাই, লাডাখ আর জাসকার গিরিশৃঙ্গমালার অন্তহীন তরঙ্গালোক।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আপার মুণ্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দু'মিনিটের একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মুহ্যমান হয়েছিল, ওটা যেন ফুলের মতো পেয়ে রইলো। শুধু আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশ্মীর ওই দু-মিনিটের মধ্যে নির্ভুল সত্য হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে গাড়ি নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেকদূর নীচে সেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ 'পপলার এভেনু' পথটি ছবির মতো চোখে পড়ে। সমস্ত বিরাট উপত্যকা নীলাভ সবুজ এবং যবার শেষ প্রান্তে একটি সজল শ্যামল শোভার ঝলমল করছে। বুঝতে পারা যায় কাশ্মীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সর্বহারা অনাথিনীর সর্বাঙ্গে হাজার দু' হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র নখের দাগ ও দাঁতের আঁচড় রেখে গেছে।

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ি চললো। চব্বিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলুম। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধরে এসে কাজিকুণ্ডে পৌঁছে বাস থামলো। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদূর মনে পড়ছে আন্দাজ চল্লিশ মাইল পথ। এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তর-পূর্বে পহলগাঁওর দিকে,—অন্যটি উত্তরে অবন্তীপুরা হয়ে সোজা চলে যায় শ্রীনগরের দিকে। ছোট ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আখের চাষ। সব্জি ও নাসপাতির বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়িগুলি ছবির মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘর-দোর ভারতবর্ষে দেখিনি। সস্তায় বিক্রয় নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এটা তাদের প্রথম বাজারে আপেল আসছে অল্পস্বল্প। টসটসে আঙ্গুরের থোকা নিংড়ে খাচ্ছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহনির দ্বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজানা বিদেশীর পৈশাচিক বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্থালী যুগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধরে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নষ্ট হয়নি, এটা ওদের পক্ষে গৌরবের কথা—এ আমি মনে করিনে।

বিতস্তার গৈরিক রক্তিম আঁকাবাঁকা স্রোত চলেছে পাশে পাশে। আশ্চর্য, এত বড় পার্বত্য উপত্যকায় পাথরের জটলা কোথাও দেখছিনে। চারিদিক মসৃণ আর কোমল। প্রথম দেখলুম 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মসৃণ সুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গরুর পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পণ্ডিতানীকে।

গাড়ি ছুটেছে। ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। এক সময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটরবাস এসে পৌঁছলো আধুনিক শ্রীনগর শহরের এক মোটর স্ট্যাণ্ডে। সেখানে টাঙ্গাওয়ালাদের ভিড় জমেছে।

প্রায় আধ মাইল দূরে কাশ্মীর খালসা হোটেলে গিয়ে উঠলুম। (ক্রমশ)

॥ তেরো ॥

পেছন দিকে অর্ধ চক্রাকার পাথরখানার ওপর বসেছিল বুড়ী বেঙ্সানু। তার চোখদুটি আকাশের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। নীলকান্ত মণির মত নির্মল আকাশে খুচোঙনু্য গুটসুঙ্ পাখীর ঝাঁক সাঁতার কেটে চলেছে। এমন সময় সেঙাই এলো।

"আশি, এই আশি—"

"কে? সেঙাই এসেছিস, আয়। মোরাঙে মেয়েদের ঢুকতে দেয় না, তাই তোকে দেখতে যাই না। কেমন আছিস? ভালো তো!" ঘুরে বসলো বুড়ী বেঙ্সানু।

সেঙাইর সাড়া পেয়ে ফাসাও আর নজলি আয়েঙ্কাকাঙ্ থেকে ছুটে এসেছে। এসে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেঙাইর ওপর।

সেঙাই বললে; "মা কোথায়?"

"সে মাগী কি আর আছে! সে গেছে কোহিমা। তোর বাপের কাছে।"

"বাবা বস্তীতে আসে নি আর?"

"আর এলো কোথায় শয়তানের বাচ্চাটা! ঐ সারুয়ামারুর বউ জামাতসুর ইজ্জত নিলে। তারপর সেই রাতেই তো কোহিমা পালালো। আমি বুড়ী শেষকালে জামাতসুর ইজ্জতের দাম দিলাম টেঁঘোয়া আর বর্শা দিয়ে।" দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো বুড়ী বেঙ্সানু; "সেই সায়েব না কী, তাদের সঙ্গেই রয়েছে টেফঙের বাচ্চাটা। টেমে নটুঙ্!"

"মা কার সঙ্গে কোহিমা গেল?"

"সারুয়ামারু কোহিমা গেল দিন সাতেক আগে; তার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে ভেগে পড়েছে। মাগীর তো পুরুষের গায়ের গন্ধ না হলে ঘুম আসে না!" বুড়ী বেঙ্সানু অখন্ড মনোযোগে খেউড় গাইতে শুরু করলো: "অ্যাহে ভু টেলো!"

সেঙাইর সতেজ দেহটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। থরে থরে পেশীগুলিতে দোলানি শুরু হলো: "সারুয়ামারু কই? কোহিমা থেকে ফিরেছে?"

"হু, হু কাল সন্ধ্যার সময় ফিরেছে বস্তীতে।" এবার বিস্বাদ গলায় বুড়ী বেঙ্সানু বললে: "কী খাবি সেঙাই? এবার তো খুনোতে (সিঁড়িক্ষেত) নুদের বীজ বোনা হলো না। তুইও মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়ে ভুগলি? আর ঐ টেফঙের বাচ্চা সিজিটো তো কোহিমা পালিয়ে রইলো। সায়েবদের গায়ে যে কী সোয়াদ মেখে রয়েছে সেই জানে?"

"কী আবার খাবো? জোটেন্যু পাখি মারবো, হুন্টসিঙ্ পাখি মারবো, মেনডা আর মেনজো শিকার করবো। টেরোন্যুপ্যু গেঁথে আনবো। শুধু মাংস খেয়ে একটা বছর কাটিয়ে দেবো। যদ্দিন এই বন আর পাহাড় রয়েছে, আর জানোয়ার পাখি রয়েছে, এই দুখানা হাত রয়েছে, বর্শা আর সুচেন্যু রয়েছে, তদ্দিন না খেয়ে মরবো না কী?" সরাসরি দৃষ্টিতে বুড়ী বেঙ্সানুর দিকে তাকালো সেঙাই। তার পিঙ্গল চোখের মণিদুটো দপ্ দপ্ জ্বলছে।

"সে ঠিক কথা সেঙাই। আমরা পাহাড়ী মানুষ; জন্তুজানোয়ার থাকলেই আমাদের পেট চলে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কী কথা আবার ভাবছিস?" সেঙাইর মসৃণ কপালের ওপর কয়েকটা রেখা ফুটে বেরুলো। আড়াআড়ি রেখা। রেখার আঁকবাঁক।

"বলছিলাম: এক আৎ (বছর) খুনোতে (সিঁড়িক্ষেতে) বীজফসল পড়লো না! যদি ফসলের দেবতার রাগ না পড়ে, তবে তো আমাদের খুনোতে আর ফসল হবে না কোনদিন!"

"আরে হবে, হবে। ফসলের দেবতার নামে একটা সম্বর বলি দিলেই হবে। তুই বোস্ আশি, আমি একটু সারুয়ামারুকে ডাকি।" অর্ধচক্রাকার পাথরখানার ওপর উঠে দাঁড়ালো সেঙাই।

ফাসাও আর নজলিও লাফিয়ে উঠে পড়েছে; "তুই কোথায় যাচ্ছিস দাদা! আমরা যাবো, আমরা যাবো। আমাদের মার কাছে দিয়ে আয়।"

"মার কাছে যাবে! দেখলি না তোদের ফেলে কোহিমা ভাগলো মা আর বাবা! থাম্ সব!" রক্তচোখে তাকালো সেঙাই।

তারপর পাথরখানার ওপর থেকে নীচে নেমে চিৎকার করে উঠলো সেঙাই; "এই সারুয়ামারু, এই সারুয়ামারু—"

মাথার ঠিক ওপরেই চালচিত্রের মত অতিকায় এক শিলাখন্ড। তার পাশেই জোহেরি কেসুঙ্। সেখান থেকে একটি বিরক্ত কণ্ঠ তাড়া করে এলো; "কে? কে ডাকে?"

"আমি সেঙাই! নীচে আয় সারুয়ামারু!"

"যাই।"

একটু পরেই জোহেরি কেসুঙ থেকে এসে দাঁড়ালো সারুয়ামারু। তারপর অর্ধ গোলাকার পাথরখানার ওপর ঝাঁকিয়ে বসলো;

"কী রে সেঙাই, ভালো হয়ে গেছিস দেখছি। গয়া দিমো ?"

"হু, হু, গয়া।"

"এই যে তোর বাবা এই টাকা দিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণের পনেরোটা পাহাড় ডিঙিয়ে মাওএর রাস্তা পাবি। সেখানে প'ক্ প'ক্ গাড়ি পাবি। তাই চড়ে কোহিমা যাবি। তোর বাবা যেতে বলেছে তোকে।" বলতে বলতে হাতের পাতা থেকে একটি রুপোর মুদ্রা বের করে সেঙাইর দিকে প্রসারিত করে দিল সারুয়ামারু।

ঝকঝকে রুপালী মুদ্রা। শুভ্র দ্যুতি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে অভ্ররোদে। বিচিত্র বিস্ময়ে ধাতব বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এ তার অচেনা; এর আগে কোনদিনও এই গোলাকার মুদ্রাটির সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। বুড়ী বেঙসানুও মুদ্রাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে নির্বাক বিস্ময়ে। তার হিসাবহীন বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন একটি পদার্থ অজানাই রয়েছে।

সেঙাই তাকালো বুড়ী বেঙসানুর দিকে। এখনও সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে নি, বস্তুটিকে স্পর্শ করবে কী, করবে না ?

বুড়ী বেঙসানু ভীরু-ভীরু গলায় বললো: "এই সারুয়ামারু, এটা ধরলে আনিজার রাগ এসে পড়বে না তো! এর নাম কী?"

এই ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ। চারপাশে গহন বন। সেই বনে হিংস্র শ্বাপদের অবাধ বিহার। সেই অরণ্যে নিয়তবাহী প্রস্রবণ, কল্লোলিত জলপ্রপাত—তাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় এগুলিই সত্য, এগুলিই গ্রাহ্য। এই পাহাড়ী পৃথিবীর বাইরে তাদের কাছে সমস্ত কিছুই একটি সংশয়ের রেখা দিয়ে ঘেরা। একটি কুটিল সন্দেহে আকীর্ণ। অস্ফুট চেতনার বিচার দিয়ে এই পাহাড়ী মানুষগুলি সবকিছু যাচাই করে তবে গ্রহণ করে। নইলে অপরিচিত কিছুর মুখোমুখি হতে তারা কুণ্ঠিত হয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সমস্ত কেলুরি গ্রামখানাকে উচ্চকিত করে হেসে উঠলো সারুয়ামারু: "কী বোকা তোরা! এর নাম হ'লো টাকা। আনিজার রাগ হবে না এটা ধরলে।"

আশ্চর্য আকর্ষণ! হাতখানা বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিল সেঙাই। তারপর ফিস্-ফিস্ গলায় বলে উঠলো: "এটা দিয়ে কী হয় ?"

"কী না হয় বল্ ? এটা দিলে সব কিছু পাওয়া যায়। ধান, নিমক,—সব, সব পাওয়া যায়।" প্রজ্ঞাবানের মত দেখাচ্ছে এবার সারুয়ামারুকে: "কোহিমা শহরে যাবি যখন, তখন দেখবি কী হয় এটা দিয়ে। এ দিয়ে সব হয়, সব হয়। কালই তুই চলে যা কোহিমা। তোর বাবা তোর জন্যে কাজ ঠিক করে রেখেছে।"

"কাজ! কিসের কাজ ?"

"সেই কাটার কাজ। নাগিনীমারা যেতে হবে। এবার তো আর খুনেতে (পিঁড়ি-স্ক্রতে) নুসুরে বীজ বুনিস নি। ডিমাপুরে হয়ে নাগিনীমারা চলে যাবি। আমিও যাবো। দোইয়াঙ, বেঙমাপানির ওধারে অনেক বস্তী থেকে লোকেরা সব যাবে।"

নাগিনীমারা! ডিমাপুর! বিচিত্র সব নাম, বিচিত্র সব দেশ। এই রুপালী মুদ্রার মতই ঐ নামগুলি সেঙাই কী বুড়ী বেঙ-সানু জানে না। দূর আকাশ, দূর পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় কোন চক্রবেখায় ঐ নামের দেশগুলো বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সে খবরও তাদের জানা নেই। শুধু এক দুর্নিবার কৌতূহল, এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ সমস্ত চেতনাটাকে আচ্ছন্ন করে তুললো সেঙাইর। ডিমাপুর! নাগিনীমারা! কতদূর ? কোন্ সুদূর সেই দেশ ?

পলকহীন তাকিয়েছিল সেঙাই। শুধু হাতের পাতায় রুপালী মুদ্রাটা অভ্ররোদে ঝিকমিক করছে।

সেঙাই আবিষ্ট গলায় বললো: "কাজ করে এই টাকা পাওয়া যাবে ?"

"হু, হু। অনেক পাওয়া যাবে। তোর বাপ ফাদারের কাজ করে অনেক টাকা পায়। তুইও পাবি।" সারুয়ামারু আশ্বাস দান করে চললো।

ইতিমধ্যে সমস্ত কেলুরি গ্রামখানা জমায়েৎ হয়েছে জোহেরি কেসুঙে। সারুয়া-মারু, বুড়ী বেঙসানু আর সেঙাইর চার-পাশে বৃত্তাকারে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলে।

ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ কেলুরিতে এই প্রথম রুপালী মুদ্রার আবির্ভাব। বিস্ময়ে আতঙ্কে সব মেয়েপুরুষ সেঙাইর মুঠির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একসময় সেঙাইর থাবা থেকে টাকাটা তুলে নিল একজন।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলতে লাগলো। তার মুঠি থেকে আর একজন ছিনিয়ে নিল টাকাটা। এই প্রক্রিয়ায় টাকাটি সমস্ত মেয়েপুরুষের জটিল জটলার চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগলো। রুপোলী মুদ্রার এই প্রথম আগমনকে বিস্ময় আর সবাক কৌতূহল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো কেলুরি গ্রামের মানুষেরা।

একসময় অনেকগুলো গলা বেজে উঠলো: "আমরা টাকা পাবো?"

"হু-হু; পাবি। ফাদারকে নিয়ে আসবো বস্তীতে। ফাদার আসতে চেয়েছে, তখন তোরা বলবি টাকার কথা।" তির্যক চোখে সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে পাক খাইয়ে নিয়ে গেল সারুয়ামারু। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ গলায় বললো: "ফাদার এলে তোরা খুশী হবি তো? কেউ বর্শা দিয়ে ফুঁড়বি না তো?"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলো। শেষকালে দ্বিধাভরা গলায় বললো: "তার আমরা কী জানি? সর্দারকে জিগোস করে নে তুই?"

"সর্দার আর সর্দার!" সারুয়ামারুর স্নায়ু স্নায়ু [illegible] গর্জন করে উঠলো। "সর্দার তোদের টাকা দেবে! জানিস, টাকা দিলে সব মেলে। দুনিয়ার সব পাওয়া যায়। নিমক পাওয়া যায়, ধান পাওয়া যায়; গাড়ি চড়া যায়!"

"সব পাওয়া যায়!" কে যেন বলে উঠলো।

মানুষগুলো হতবাক হয়ে গিয়েছে। বলে কী সারুয়ামারু! ঐ সাদা সাদা গোলাকার বস্তুগুলির এত যে মহিমা, তা কী তারা জানতো!

আচমকা মানুষগুলো কলরব করে উঠলো: "ঐ তো সর্দার, ঐ তো সর্দার এসেছে।"

জোহেরি কেসুঙের সামনে চাকচিক্যের মত কালো একখানা পাথর খাড়া উঠে গিয়েছে। সেটা ডিঙিয়ে জোহেরি কেসুঙে চলে এলো বুড়ো খাপেগা।

"কী রে কী ব্যাপার? হল্লা করছিস যে! আরে সারুয়ামারু এসেছিস কখন? কোহিমার গল্প বল শুনি।" এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো বুড়ো খাপেগা।

অনেকগুলো পাহাড়ী গলা উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার করে উঠলো: "সর্দার টাকা, টাকা।"

"টাকা এনেছে সারুয়ামারু। টাকা এনেছে।"

"কই দেখি!" সেঙাইর থাবা থেকে টাকাটি তুলে আবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো বুড়ো খাপেগা; তারপর বললো: "এ দিয়ে কী হবে?"

টাকার মহিমা সম্বন্ধে আর এক পশলা কথা ছড়ালো সারুয়ামারু; "জানিস সর্দার, ফাদার আসবে বলেছে। টাকা দেবে অনেক। তুই বললে তাকে নিয়ে আসবো।"

হিংস্র চোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা; "টাকার বদলা কী দিতে হবে?"

"কিছুই না। খালি যীশু যীশু বলতে হবে। দু'কাঁধে আর বুকে আঙুল ঠেকাতে হবে। আনিজার নামে টেবোয়া বলি দিতে পারবি না—"

সারুয়ামারুর গলা অর্ধপথে থেমে গেল। এর মধ্যে কেলুরি গ্রামের প্রাচীনকাল গর্জন করে উঠেছে। ধূসর চোখদুটি আগুনের হয়ে উঠেছে বুড়ো খাপেগার: "কী বললি শয়তানের বাচ্চা? টেবোয়া বলি বন্ধ করতে হবে! ইজাহান্টসা সালো। একেবারে মী (বর্শা) দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না! তোর ফাদার বস্তীতে এলে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না। ঐ সব কপাল-কাঁধে হাত আমরা দিতে পারবো না।"

চমকে উঠেছে সারুয়ামারু। অপরিসীম আতঙ্কে পেশীগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে তার: "আচ্ছা, আচ্ছা ফাদারকে আসতে বলবো না।"

"খবরদার, তোর ফাদার যেন এ বস্তীতে না আসে। আমাদের টাকা চাই না।"

"আচ্ছা।" কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো সারুয়ামারু। কিন্তু তার চোখদুটি দপ্‌ দপ্‌ জ্বলছে।

"টাকা চাই না। চাই না!" পাহাড়ী পৃথিবী বিদীর্ণ করে অসংখ্য মানুষের গলায় সোরগোল উঠলো: "হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

একসময় বুড়ো খাপেগা বললো: "নিমক এনেছিস কোহিমা থেকে?"

সারুয়ামারু গোলাকার কামানো মাথা-ঝাঁকালো: "হু, হু। আমার আয়েহাকাছে আছে। নিয়ে যাস্‌। এইবার নিমকের দর চড়া। মাথোলার এক খুদি নিমকের বদলা এক খুদি কস্তুরী নিয়েছে কিন্তু।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। এবার কোহিমার গল্প বল সারুয়ামারু।" একখানা বাদামী রঙের পাথরের ওপর বসলো বুড়ো খাপেগা। আর জোহেরি কেসুঙের রক্তাক্ত মাটির ওপর বসে পড়লো কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো।

সারুয়ামারু বললো, "জানিস্‌ সর্দার, একটা ভারী ভালো মেয়ে বেরিয়েছে কোহিমাতে! আমি তাকে দেখেছি। আমাদের পাহাড়ী মেয়ে সে।"

"কী নাম তার?"

"গাইডিলিও! এই বড় মেপে (মাথা), বড় চোখ"। —অপরূপ রূপময় এক পাহাড়ী নারীর বর্ণনা দিল সারুয়ামারু।

"ভালো যে, বুঝলি কী করে?"

"তার চারপাশে কী ভিড়! সে যাকে ছোঁয়, তার রোগ ভালো হয়ে যায়। জোটা

বাপেরা, সান্টামারা, মৌমারা, কোনিয়াকরা সব পাহাড়ী মানুষ তার ভক্ত হয়েছে।"

"ব্যাপার কী?" বিস্মিত গলায় বললো বুড়ো খাপেগা।

"সত্যি কথা। একটুও মিথ্যে নয়। ঐ সেঙাইর বাবা সিজিটোও তাকে দেখেছে। তাকে জিগ্যেস করে দেখিস।"

"ছুঁয়ে দিলে রোগ সেরে যায়?"

"হু, হু। সবাই তাকে রানী বলছে। জোয়ান মেয়ে, ষোল বছর বয়েস হবে।"

আচমকা সাঁ করে উঠে দাঁড়ালো সেঙাই: "আমি কোহিমা যাবো সারুয়ামারু। তুই আমাকে নিয়ে যাবি। রানী গাইডিলিওকে দেখবো।"

"হু, হু যাবি। তোর বাস ভাড়ার টাকা দিয়ে দিয়েছে সিজিটো।" সারুয়ামারু বলে চললো: "কী সুন্দর শহর কোহিমা। এই বস্তী থেকে তোরা তো কোথায় যাবি না। গাড়ি দেখবি—"

"গাড়ি? সে কি?

রহস্যময় গলায় বললো সারুয়ামারু: "সব দেখাবো, তোকে সব দেখাবো।"

দুপুরের রোদ তীব্র হচ্ছে, তীক্ষ্ণ হচ্ছে। নুসু কেহেঙু মাসের এই দুপুরে ফসলের ক্ষেতে ছোট ছোট বাঁশের ঘর থেকে শ্যামল নবাঙ্কুর পাহারা দেয় পাহাড়ী মানুষগুলো। দুষ্ট আনিজার দৃষ্টি থেকে, বুনো সেশটসুঙের মাতলা দাপাদাপি থেকে সিঁড়িক্ষেত রক্ষা করতে হয়। সকলে এক এক করে উঠে পড়লো। শুধু তাদের আবিষ্ট স্নায়ুগুলো দিয়ে, তাদের বিমুগ্ধ ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরে নিয়ে গেল অপরূপ রূপকথার মত কাহিনী। যার নায়িকা রানি গাইডিলিও। যার একটি করস্পর্শে নবজন্মের আশ্বাস আছে। যার একটি ইসারায় জরা-মৃত্যু কোন সুদূরে পলাতক হয়, ফেরারী হয়। রূপকথার বাইরে আর একটি রমণীয় বস্তু তাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেটি একটি রূপোলী মুদ্রা।

সকলে কোহেরি কেম্পও থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একসময় সামনের কাছে পাহাড়খানার ওপারে উঠে এলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "কোহিমা থেকে টাকা পেলো তো?"

"হু, হু, নিশ্চয়ই পাবি।" ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সারুয়ামারু, তারপর ফিস ফিস গলায় বললো, "দেখছিস সদ্দারটা কী শয়তান? আমাদেরকে কিছুতেই যেতে দেবে না! আচ্ছা, দেখা যাবে! যখন সবাইকে নিয়ে আসবে, তখন কী করে ঠেকায় আমিও দেখবো।" শেষপর্যন্ত কণ্ঠটা ষড়যন্ত্রের মত হয়ে এলো সারুয়ামারুর, "ভালোয় ভালোয় বলছি কী না?"

সারুয়ামারুর কথাগুলির দিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সেঙাইর। তার সমস্ত ভাবনাকে প্লাবিত করে রেখেছে দুটি মনোরম বস্তু। একটি রূপোলী মুদ্রা, আর একটি অপরূপা রানী গাইডিলিও। অমনোযোগী গলায় সেঙাই বললো: "রানী গাইডিলিওকে দেখাবি তো!"

"দেখাবো।" এতক্ষণ বিড় বিড় বকছিল সারুয়ামারু, এবার সরাসরি চোখে তাকালো: "তুই কোথায় যাবি সেঙাই? আমি এবার আমাদের কেসুঙে ফিরবো। একটা মাস ধরে শরীরটায় জুত পাচ্ছি না।"

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠলো সেঙাই: "যা, যা। আমি সব বুঝি। টেফের কাছে না গেলে আরাম হচ্ছে না। শরীর খারাপ, অথচ বউটার তো রক্ত গলাচ্ছে পেটে। টাকা রাখবো। এমনিতে গাইডিলিওর কথা শুনবো একটু—"

"বাইরের মোরগুড়ে বসে গল্প বলছে—" আর দাঁড়ালো না মারুয়ামাদু। হন্ হন্ করে জোরি কেসুঙের দিকে পা বাড়িয়ে দিল সে।

আর কালো পাথরখানার ওপর দাঁড়িয়ে পিঙ্গল দৃষ্টিতে মারুয়ামারুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এখনকার মত গাইডিলিও সম্বন্ধে তার উগ্র কৌতূহল মিটলো না। অচরিতার্থ হয়ে রইলো একটি পাহাড়ী মনের প্রখর আগ্রহ।

টেফসেনু মিজেলু! কন্যাপণ! সেই কন্যাপণ এসেছে নানকোয়া গ্রাম থেকে। পাঠিয়েছে মেজিচিজুঙের আপকু (বাবা) যাঙসুঙ। দু'টি জোয়ান ছেলে এসেছিল রেঙমাপানির ওপারে ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম নানকোয়া থেকে। সঙ্গে চারখানা খারে নু্য বর্শা। অতিকায়। সেগুলির গড়নের মধ্যে অতীতের স্বাক্ষর রয়েছে, প্রাচীনত্বের চিহ্ন ফুটে রয়েছে সুস্পষ্ট। আর যৌতুক এসেছে খোঙপসু, কড়ির গয়না। কানের নীয়েঙ্দুল, হাতীর দাঁতের আরুপা হার। এপা মুকুট। তার দু'পাশে মোষের শিঙের বাহার। পিতলের আউসঙজু। আটরু ফুলের কবরীবন্ধ। আর সাধারণ গড়নের পঞ্চাশখানা বর্শা।

নুসু কেহেঙু মাসের প্রথম সকালে জোয়ান ছেলে দু'টি এসেছিল। মেহেলীর বাপ সাঞ্চামথাবা সরস আদরে তাদের নিয়ে বসিয়েছে আরেহাকাঙে। টাটকা চোলাই পীতা মধু দিয়েছে বাঁশের পানপাত্র ভরে, চাকভাঙা সোনালী মধু দিয়েছে। হুন্টসিঙ পাখির মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে কাঠের বাসনে। জোয়ান ছেলে দু'টি বেশ তারিবত করে কাবাবের আস্বাদ নিচ্ছে। তারিয়ে তারিয়ে পীতা মধুর পাত্রে চুমুক দিচ্ছে একজন। আর একজন সোনালী মধু চুকচুক করে মুখের মধ্যে টেনে নিচ্ছে।

সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামখানা চক্রাকারে ঘিরে ধরেছে পোকরি কেসুঙটাকে। সাঞ্চামথাবার আরেহাকাঙে একখানা ত্রিকোণ পাথরের রাজাসনে জাঁকিয়ে বসেছে গ্রামের বুড়ো সর্দার। সালুয়ালাঙ গ্রামের সমস্ত বংশের প্রাচীন মানুষগুলি নিবিড় হয়ে বসেছে। তাদের সামনেও পীতা মধুর পূর্ণপাত্র। হুন্টসিঙ পাখির মাংসের কাবাব।

এখন নুসু কেহেঙু মাসের দুপুর। আকাশের নিঃসীম শূন্যে যেন রাশি রাশি রূপালী অভ্র জ্বলছে। দুপুর জ্বলছে, কিন্তু এই পাহাড়ী পৃথিবীর রোদে জ্বালা নেই। স্নিগ্ধ এক মমতায় এই রোদ মনোরম, বড় আমেজী।

বুড়ো সর্দার বললো: "তোরা তো সব নানকোয়া বস্তী থেকে এলি!"

জোয়ান ছেলে দু'টি মাথা ঝাঁকালো: "হু, হু।"

"তা, টেফসেনু মিজেলু সব এনেছিস?"

"না, সব আনি নি। আজ মেয়ের জন্যে খানিকটা বায়না দিয়ে যাবো। কাল সন্ধ্যার সময় মেজিচিজুঙের পিসী আসবে। সে-ই টেকোয়েঙু কেজিওগু (ঘটকী)। সে এসে বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে গেলে বাকী টেফসেনু মিজেলু দিয়ে যাবো।" হুন্টসিঙ পাখির কাবাবে সুখে কামড় দিয়ে একটি জোয়ান ছেলে বললো।

সহসা বিষণ্ণ গলায় বুড়ো সর্দার বললো; "আমার মেয়ে পিজোমুটার বিয়ে হয়ে যেতো এদ্দিনে। জুকুসিমা বস্তী থেকে তার জন্যেও তো কন্যাপণ এসেছিল।"

"হু, হু—" কাবাবের ওপর লাল লাল দাঁতের কামড় বসাতে বসাতে প্রাচীন মানুষগুলি মাথা দোলাতে লাগলো; "হু, হু, তা হতো।"

বুড়ো সর্দারের বিষাদ তাদেরও যেন স্পর্শ করেছে এই মুহূর্তে।

নানকোয়া গ্রামের একজন জোয়ান ছেলে বললো: "কী হলো তোর মেয়ের? কী রে সর্দার?" ছেলেটির চোখেমুখে আগ্রহ ঝকমক করছে।

"কী যে হলো, তা কী জানি? কেলুরি বস্তীর সেঙাইকে যেদিন পোড়াই, সেদিন থেকেই মেয়েটা নিখোঁজ। মেহুডার পেটে গেল, না রেনজু আনিজা খাদে ফেলে মারলো, না কী বুনো সেণ্টসুঙ শিঙ দিয়ে ফুঁড়ে সাবাড় করলো। জানতেই পারলাম না! না কী ঐ কেলুরি বস্তীর শত্রুরাই বর্শা দিয়ে ফুঁড়লো!" একটা নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস পড়লো বুড়ো সর্দারের।

কিছু সময়ের বিরতি। সাঞ্চামথাবার এই ছোট আরেহাকাঙটা আশ্চর্য স্তব্ধ হয়ে রইলো সহসা। অবিশ্বাস্য নির্বাক!

একসময় আবার বুড়ো সর্দারই বললো; "যেতে দে, যেতে দে। পাহাড়ী মানুষ আমরা। এমনি করেই আমাদের জান সাবাড় হয়।"

"হু, হু।" নানকোয়া গ্রামের যুবক দু'টি কলরব করে সায় দিল।

বুড়ো সর্দার তাকালো সাঞ্চামথাবার দিকে; "কী রে মেহেলীর মামা কই? তাকে খারে নু্য বর্শা দেবে ওরা। নইলে যে ছেলেপিলে হবে না মেহেলীর।"

"সে তো মোককচঙ গিয়েছে নিমকের তল্লাসে।" নিরুপায় গলায় বললো সাঞ্চামথাবা: "তা হলে কী হবে সর্দার?"

"কী আবার হবে? সে আসবে কবে?"

"তার ঠিক-ঠিকানা কিছু নেই।"

"তবে তোর খারে নু্য বর্শা দুটো নিয়ে নে।"

পাহাড়ী মানুষগুলোর মধ্যে বিয়ের প্রাক্‌পর্বে একটি প্রথা রয়েছে। সে প্রথাটি হলো, পাত্রপক্ষ থেকে কন্যাপণ হিসেবে দু'টি খারে নু্য বর্শা মেয়ের বাপকে, আর দু'টি মেয়ের বড় মামাকে দিতে হয়। বড় মামা এই খারে নু্য বর্শার কন্যাপণ না পেলে এদের বিশ্বাস, বিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী

হয় না। সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না। অবশেষে জীবনের এক বন্ধ্যা পর্বে সেই অ-বৎসা নারী ডাইনী হয়ে যায়।

হাতদ্খানা প্রসারিত করে দুটি থারে ন্যু বর্শা নিয়ে নিল সাঙ্গামথাবা। অনেক দিনের প্রাচীন বর্শা। কল্যাণের জন্যই এই বর্শাগুলির প্রচলন। এগুলিকে শান দেওয়া হয় না, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। পরম আদরে বাঁশের খাপের মধ্যে এগুলিকে তুলে রাখা হয়। বিয়ের আগে ছাড়া এদের স্পর্শ করা হয় না; এদের নিশ্চিন্ত আরামের ব্যাঘাত ঘটানো হয় না। তাই রুপা ঝকমক বর্শার ফলকে ফলকে লালাভ কলঙ্ক দেখা জমে রয়েছে।

থারে ন্যু বর্শার ফলা দুটো নিয়ে সঙ্গামথাবা বললো: "তা হলে সন্দার, মেহেলীর মামার কী হবে?"

"মোককচঙে কাউকে দিয়ে খবর পাঠা। আর শোন্, তোদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। শোন্ তোরা।" বুড়ো সর্দার বাইরের দিকে তাকালো।

থাগুঙের সামনে সমস্ত সালুয়ালাঙ্ গ্রামখানা জটিল জটলা করেছে। সর্দারের ডাকে একটা ঠাসবুনন ভিড় ঘন হয়ে এলো: "কী সন্দার? কী বলছিস?"

"সেদিন সায়েবরা এসেছিল, মনে আছে?"

"হু, হু। সায়েবরা কী ভালো? টাকা দিয়েছে। পী (কাপড়) দিয়েছে বড় বড়।" সালুয়ালাঙ্ বস্তীর মেয়েপুরুষ একসঙ্গে শোরগোল করে উঠলো।

"যীশু! যীশু! মেরী, মেরী—" পাহাড়ী পৃথিবী উন্দাম হয়ে উঠলো।

দিন কয়েক আগে সালুয়ালাঙ্ গ্রামে দুজন পাদ্রী এসেছিল। তারা টাকার দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে গিয়েছে। নানা রঙের, নানা আকারের কাপড়-জামার সদাব্রত খুলে দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে দিয়ে গিয়েছে অপরূপ আলোক, একটি পরম মন্ত্র। বেথ্লেহেমের এক ধ্রুবতারাকে এই ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙের আকাশে চিরস্থায়ী করে ফুটিয়ে তোলার সব রকম বন্দোবস্ত করতে তারা কণামাত্র ত্রুটি করে নি। যীশু! এই নামটিকে পাহাড়ী তার আদিম মানুষগুলির অন্তে অন্তে উৎকীর্ণ করতে চেয়েছে পাদ্রী সাহেবরা। সকলের কানে কানে একটি মন্ত্র সঞ্চার করেছে তারা। সে মন্ত্রের নাম যীশু। সকলের আঙুলের ডগায় একটি মাত্র ক্রুশ আকার শিল্প দিয়ে গিয়েছে।

পাহাড়ী মানুষগুলোর কেউ কেউ দুই বাহুসন্ধি, বুক আর দুটি ভ্রুরেখার মধ্য-বিন্দু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পবিত্র ক্রুশ আঁকতে লাগলো।

বুড়ো সর্দার বললো; "কাল সাহেবের লোক এসেছিল আমাদের বস্তীতে।"

"কই আমরা তো জানি না।" পাহাড়ী মানুষগুলির গলায় রীতিমত বিস্ময়। আর সেই বিস্ময় বাতাস চৌচির করে ফুঁড়ে বেরুলো।

"তোরা তখন ঘুমোতে (সিঁড়িক্ষেতে) গিয়েছিলি।"

"আবার টাকা দিয়েছে? মজার মজার কাপড় দিয়ে গেছে আমাদের জন্যে? কী রে সন্দার?" অজস্র বন্য কণ্ঠে প্রশ্নমালা জেগে উঠলা।

প্রশ্নগুলো শুনে বুড়ো সর্দারের ঘন ভ্রুরেখা কাঁকড়া বিছার মত কুঁকড়ে রইলো। কয়েকটি মুহূর্ত! এর মধ্যেই কালকের ঘটনাটা চেতনার ওপর দিয়ে চকিত একটা ছায়াপাতেরই মত সরে গিয়েছে। সকলের অগোচরে পাদ্রী সাহেবের লোকটা তার থাবায় অনেকগুলো রুপালী মুদ্রা গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল। আর আপুফু ফলের রঙের একটা কাপড় দিয়ে ছিল। টাকার মহিমা জানে বৈ কি বুড়ো সর্দার! এর আগেও অনেকবার কোহিমা মাও-এর শহরে-বন্দরে গিয়েছে সে।

পাদ্রী সাহেবের লোক! নামটা ভুলে গিয়েছে বুড়ো সর্দার। তবে মানুষটা তাদেরই মত পাহাড়ী নাগা। তাদেরই মত তার চোখের মণি পিঙগল। কিন্তু পরনে বরফসাদা সাহেবের মতই ধবধবে কাপড়! সে কাপড় হুন্টসুঙ পাখির পালকের মত অকলঙ্ক। কাপড়ের নামও কী একটা যেন বলেছিল লোকটা; সারপ্লিস্ শব্দটিও বেমালুম ভুলে গিয়েছে বুড়ো সর্দার।

পাদ্রী সাহেবের লোক! তাদের দেশের পাহাড়ী পাদ্রী! বুনো সাহেব! সেই মানুষটাই ফিস ফিস্ করে বলেছিল; "তোকে একবার কোহিমা যেতে হবে, ফাদার যেতে বলেছে। আরো টাকা পাবি, কাপড় পাবি। নিমক পাবি। লবণ জলের প্রস্রবণ থেকে লবণ জল গিলে মরতে হবে না। আরো কত কী পাবি?"

টাকা! পী! নিমক! শব্দগুলি লোলুপ পাহাড়ী চেতনার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়েছিল। আঘাতে আঘাতে যেন বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল বুড়ো সর্দারের বন্য মনটাকে। আবিষ্ট গলায় সে শুধু বলতে পেরেছিল, "যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।"

ইতিমধ্যে সাঙ্গামথাবার কেসুঙে মানুষ-গুলো আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে; "কী রে সন্দার বলছিস্ না কেন? দিয়ে গেছে টাকা? পী?"

একটু চমকে উঠলো বুড়ো সর্দার। সরল পাহাড়ী মানুষ সে, মিথ্যাচার করতে বিবেক ঠিক সায় দিয়েও দিচ্ছে না। তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললো বুড়ো সর্দার। সহসা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে; "না রে শয়তানের বাচ্চারা। টাকা দিয়ে কী করবি? জানিস কী করতে হয়! কোহিমা-মোককচঙে কোনদিন গেছিস টেফঙের ছারেরা!"

বুড়ো সর্দার আর মেহেলীর মামা ছাড়া

সালুয়ালাঙ্ গ্রামের আর কেউ শহরে-বন্দরে যায় নি। রুপালী মুদ্রা দিয়ে কী নিদারুণ ভোজবাজী, কী অসম্ভব ভেল্কী খেলা দেখানো যায়, তা তারা কেউ জানে না। শুধু কোলাহল করে উঠলো পাহাড়ী মানুষগুলো: "হু, হু, টাকা দিয়ে আবার কী হবে? দেওয়ালের খুঁটি ফুটো করে রাখবো। সিঁড়িক্ষেতে পুঁতে দেবো। সায়েব বলেছিল, টাকা হলো আউই ভু (জমির উর্বরতার জন্য ভাগ্য-পাথর)। জমিতে পুঁতে দিলে সার ভালো হবে। নুসু ফলবে অনেক। শু (ধান) ফলবে।"

"হু, হু।" তামাকপাতার মত হেজে-যাওয়া মাথাখানা দোলালো বুড়ো সর্দার: "হু, হু, সয়েবের লোক এসেছিল। সায়েব আমাকে কোহিমা যেতে বলেছে।"

আচমকা আয়েহাকাঙের সামনে আলোড়ন উঠলো। বুনো সেংটুসাঙের মত জমায়েৎ মানুষগুলোকে ছত্রখান ক'রে, ধাক্কা মেরে, গুঁতো দিয়ে, ওলট-পালট করে সাঁ সাঁ করে একটা পাহাড়ী তুফান এলো আয়েহা-কাঙে। তুফান নয়, একটি জোয়ান ছেলে। রীতিমত হাঁফাচ্ছে সে, সারা দেহের থরে থরে পেশীভার উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন উঠছে, নামছে।

বাইরের চত্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে মানুষগুলো। ঠাসবুনন ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিতে গিয়ে জোয়ান ছেলেটির ধাক্কায় কেউ পাথরে ছিটকে পড়ে মাথা চৌফালা করেছে, কেউ কেউ আছড়ে পড়েছে রুক্ষ মাটির ওপর। লালাভ মাটির ওপর গড়াগাড়ি দিচ্ছে।

উত্তেজিত গলায় জোয়ান ছেলেটি বললো, "সর্বনাশ হয়ে গেছে সদ্দার—"

"কী ব্যাপার? কী হয়েছে রে ইম্‌টি-টামজাক্?" বুড়ো সর্দারের আশঙ্কার সঙ্গে সালুয়ালাঙের মানুষগুলো তাদের উত্তেজনা মেশালো।

"টিজু নদীর দুই উদিকে সেঙাইকে দেখে এলুম। মেন্‌ডা শিকারে বেরিয়েছে সে: কেলুরি বস্তীর আরো অনেক লোক রয়েছে তার সঙ্গে।" এখনও সমানে হাঁপিয়ে চলেছে ইম্‌টিটামজাক্।

"বলিস কী?" অনেকগুলো গলা শত-চির করে শব্দ দুটি মুক্তি পেলো।

বুড়ো সর্দারের কণ্ঠ চমকে উঠলো: "সে কী! সেদিন তো সেঙাইকে পুড়িয়ে মারলুম!"

"সেঙাইকে পুড়িয়েছিস্! ঐ শয়তানী সালুনারু ভুল খবর দিয়েছিল! ইজা-হান্‌টসা সালো।" মুখখানা কুৎসিত করে কথাগুলো উচ্চারণ করলো ইম্‌টিটামজাক্।

"সালুনারুকে আমি বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো! ওর মাংসের কাবাব দিয়ে আজ বস্তীতে ভোজ হবে।" ছিলাকাটা ধনুকের মত সাঁ করে উঠে পড়লো সর্দার।

আর ঠিক সেই সময় বাইরের ভিড় থেকে একটি নগ্ন নারীমূর্তি সামনের গহন জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে নারীদেহ সালুনারু।

সঙ্গে সঙ্গে একটা শোরগোল উঠলো: সালুনারু পালালো, পালালো।"

"আহে ভু টেলো!" একটা কদর্য গালা-গালি আবৃত্তি করে আবার পাথরখানার ওপর বসে পড়লো বুড়ো সর্দার: "কেলুরি বস্তীর চর ঐ সালুনারু। আর একবার এই বস্তীর সীমানায় দেখলে ওকে ছিঁড়ে ফেলবো টুকরো টুকরো করে।"

সহসা সাঞ্চামথাবা বললো: "সে সব পরে হবে। এখন টেনেন্যু কন্যাপণ নিয়ে নি সদ্দার: কী বলিস তুই?"

"হু, হু।" সায় দিল বুড়ো সর্দার; তার-পর তাকালো নানকোয়া গ্রামের জোয়ান ছেলে দুটির দিকে: "তোদের সঙ্গে তো নতুন কুটুম্বিতা হচ্ছে। মেহেলীকে বিয়ে করবে তোদের মেজিচিজুঙ্। কী বলিস?"

"হু, হু।" একসঙ্গে মাথা দোলালো নান-কোয়া গ্রামের জোয়ান ছেলে দুটি।

"তোরা আমাদের আসাহোয়া (বন্ধু) হবি।"

"হু, হু—"

"বুঝলি তোরা, ঐ কেলুরি বস্তীকে শায়েস্তা করতে হবে। ওরা আমাদের শত্রু।" বুড়ো সর্দার আয়েহাকাঙ্ থেকে তর্জনী প্রসারিত করে দিল। টিজু নদীর ওপারে বনময় কেলুরি গ্রামের দিকে।

"হু, হু।"

সর্দার আবারও গর্জে উঠলো: "দুই বস্তী থেকে চর রেখেছে সালুনারুকে। ঐ মাগীর মুণ্ডু ছিঁড়ে মোরাঙের সামনে গেঁথে রাখবো।"

"হু, হু।"

"তোরা যখন আমাদের আসাহোয়া (বন্ধু), তোরাও আমাদের সঙ্গে একজোট হবি।"

"কেন?"

"কেন আবার? ওদের সঙ্গে যদি লড়াই বাধে, তখন লোক দরকার হবে। সেই জন্যে আমাদের একজোট বাঁধতে হবে।"

"হু, হু।' মাথা ঝাঁকালো জোয়ান দুটি। তারপর বললো: "আমাদের সদ্দারকে সে কথা বলতে হবে। সে বললে, আমরা জান দিতে পারি।"

বুড়ো সর্দার রক্তচোখে তাকালো: "আমাদের সঙ্গে মিলে ঐ কেলুরি বস্তীর সঙ্গে লড়াই না করলে কিন্তু মেহেলীর বিয়ে দেবো না তোদের বস্তীতে। সিধে কথা।"

সাঁ করে পাথরের রাজাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো সর্দার। তার থাবায় থরথর বর্শার ফলায় দুপুরের রোদ ঝকমক জ্বলছে।

(ক্রমশ)

অল্পেতে অনেক

বুদ্ধিমান ক্রেতারা এমন সব জিনিষ চান, যা কোয়ালিটি, ফিনিশ এবং প্রয়োজনীয়তা এ সব কয়টিরই নিখুঁত সমন্বয় হয়। তাই সুদৃশ্য স্টেনলেস স্টীল (Stainless Steel) দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তখন **দেবীদয়ালের** জিনিষই সকলে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে থাকেন। **দেবীদয়ালের** প্রস্তুত সামগ্রী কিনলে সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষই কিনবেন। এ সব জিনিষ কখনও ময়লা হয় না—আপনার সারাজীবন ধরে চলবে, আপনার গৃহের মর্যাদা ও শোভা বৃদ্ধি করবে। যে কয়টি জিনিষের মালিক হলে আপনি গর্ব অনুভব করেন, এই জিনিষ অন্যতম। **দেবীদয়ালের** জিনিষ কিনলে আপনি অল্পেতে অনেক পাবেন।

DEVIDAYAL'S

দেবীদয়ালের

ষ্টেনলেস ষ্টীল

ঔজ্জ্বল্যে ও দীর্ঘস্থায়িত্বে এমন কি রৌপ্যকেও হার মানায় — অথচ মূল্য অনেক কম।

মেসার্স দেবী দয়াল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৩০, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, ত্রিতল,
ফোন—২৪-৪১২৪
কলিকাতা—১৩।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক নয়রাট দেখা করতে এলেন। সেই বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পণ্ডিত নয়রাটের পুত্র। এখন আমেরিকাবাসী, টাটা স্কুল নিয়ে এসেছে সোশ্যাল রিসার্চের উচ্চ পদ্ধতি শেখাবার জন্য। ভারি মজা লাগল এই এক পুরুষে আমেরিকানের মনোভঙ্গির পরিবর্তন দেখে। ভাষায় আমেরিকান ভঙ্গি এসে গেছে, উচ্চারণ এখনও বিদেশী এবং তথ্যের জন্য তত্ত্বকথা আলোচনা ত্যাগ করতে এখনও অভ্যস্ত হন নি। ধরতাই বুলি এসে গেছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি এখনও চাপা পড়ে নি। আমার বক্তব্য ছিল এই: গবেষণার পদ্ধতি (টেকনিক) গবেষণার বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে; গবেষণার বিষয় দেশের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত না হলে থিসীস লিখে ডক্টরেট পাওয়াই সার হবে এবং দেশের সমস্যা তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব বিদেশী পণ্ডিতের কাছে সাহায্য নেওয়ার অর্থ যতটা ভাবা যায় ততটা নয়—এই ছিল আমার ইঙ্গিত—ইঙ্গিতের চেয়েও একটু বেশী। ভদ্রলোক সেটা সহজে ধরতে পেরে ঠাণ্ডাভাবেই উত্তর দিলেন। সময় একটু অধিক লাগল বটে, তবু উত্তরটি যুক্তিপূর্ণ। তিনি কিভাবে রিসার্চ টেকনিক শেখাচ্ছেন বল্লেন। আলিগড়ে নিমন্ত্রণ করব ভাবছি। ভিয়েনা কি ছিল আর এখন কি হয়েছে ভাবলে দুঃখ হয়। অস্ট্রিয়ান স্কুলের চিন্তাধারায় টিউটনিক দোষ কম, ফরাসী গুণই বেশী। অপেরার জন্য?

৩১।৩।৫৬

উণ্ডহ্যাম লিউইস্-এর The Human Age-এর দ্বিতীয় অংশ Monstre Gai ও তৃতীয় অংশ Malign Fiesta শেষ করলাম। সেই পুরানো Childermass-এর জের। লিউইস-এর জোর ভাষা একটু যেন দমেছে। স্যাটায়ার পেকেছে, অর্থাৎ চরিত্রগুলো নিজের বলে দাঁড়িয়েছে। Third City ও Dis-এর বর্ণনা ভয়ঙ্কর, পড়তে পড়তে গা গুলিয়ে ওঠে। পাপে জড়ান অথচ বিবেক রক্ষা এই খৃষ্টান সমস্যা ঠিক বুঝি না। এক্জিস্টেনসিয়ালিস্ট বা যাকে involvement বলেন সেটা কি এই? তাঁদের অ্যাবসার্ড আর এ'র স্যাটায়ার কি এক পদার্থ? দান্তের পারগেটরি আর ইনফারনো-র কথা কেবলই মনে পড়ছিল। তারই আধুনিক সংস্করণ? যদি তাই হয় তবে বলতে হবে যে সর্বজন গৃহীত বিশ্বাসের কাঠামো এই যুগে, অতএব এই বইএ না থাকার জন্য লিউইসের রচনায় করুণা নেই। Lewis lacks compassion। তাই তৃতীয় শহর আর শয়তানের রাজ্য এই পৃথিবীরই বর্তমান সভ্যতার উপসংহার। পুলম্যানের ট্র্যাজেডি তাই। তবু সেই ট্র্যাজিডে গ্রীক কিংবা মধ্যযুগীয় ট্র্যাজেডির মতন চিত্তকে শুদ্ধ করে না। হাতের কাছে ডিভাইন কমেডি-র নতুন অনুবাদ ছিল, গোটা কয়েক অংশ উল্টে পাল্টে দেখলাম। অত অল্প কথায় কতখানি, আর এখানে অত বেশী কথায়, অত চেঁচিয়ে কত কম! যতটা সুখ্যাতি পড়েছিলাম ততটার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। নরক, বিবেক—এ সব ঠিক বুঝি না। ভারতীয় সংস্কার ভিন্ন? মরিয়াক, গ্রাহাম গ্রীন প্রভৃতি কাল্পনিক নভেলিস্টদের রচনা খুবই উপভোগ করি, কিন্তু কেমন যেন হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাংলা ভাষায় ঐ ধরনের বৈষ্ণব নভেল, তান্ত্রিক নভেল বলে কিছু নেই। বৈষ্ণব কবিতা, তান্ত্রিক বেতাল পঞ্চবিংশতি এককালে ছিল। এখন লেখা হলে পড়া যেত—হয়ত তাও বুঝতাম না। মনটাই জগা খিচুড়ী, খানিকটা হিন্দু, খানিকটা অ-হিন্দু, পশ্চিমী—কোনো সেন্স্ অব বিলংগিঙ নেই। হিন্দু গোঁড়ামি দেখলে সায়েব, আর উগ্র সায়েবিয়ানা দেখলে ভারতীয়! এই একশ বছর ধরে খিচুড়িভোগ চলছে দেশে। নিরুপায়!

* * *

জাকির সায়েব সন্ধ্যার সময় এলেন। ঘণ্টা দুই গল্প হোলো। অবসর নিয়ে পড়াশুনো করবেন আর লিখবেন এই আশা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যতদিন একেবারে নষ্ট না হচ্ছে ততদিন তাঁকে ভারতের সেবা করতেই হবে। তাঁর আদর্শবাদ, মহাত্মাজীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা, দেশপ্রেম তাঁকে অব্যাহতি দেবে না। পণ্ডিতজীও ছাড়বেন না। অত্যন্ত সেন্সিটিভ মাইণ্ড, তাই কষ্ট পান। এ লোক আলিগড় ছাড়লে বিপদ, আবার সব ঢিলে হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌ-এর অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। আমরা কলেক্টিভ লিডারশিপ গড়ে তুলতে পারিনি। ইংরেজদের হাজার বছর লেগেছে—তাও যতটা বলে ততটা নয়। সেখানেও দশ বারটা অ-সাধারণ গুষ্টি এখনও নেতৃত্ব করে পড়ছিলাম। ভারতবর্ষ অবতারের দেশ—এটা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ত' এককালে ছিল শুনি! এখন প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানে আকার, সংখ্যা বেড়েছে, একই মানুষ বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে; ফলে কোনটার সঙ্গেই প্রেম হয় না। তা ছাড়া এই ধরনের অ-বাস্তব, অ-সামাজিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দেহ-মন-প্রাণকে, সমগ্র মানুষকে অধিকার করে না। কেন্টার ব্যাগার খাটা! অনেক শিক্ষকের মুখে শুনেছি, ঐ মাসে

তিন শ' টাকার জন্য যতটুকু আইনানুসারে লেকচার দিতে হয় তাই দিলেই যথেষ্ট—তার বেশী কোনো দায়িত্ব নেই। জৈব প্রয়োজন থেকেই সব আগ্রহ ওঠে জানি: কিন্তু ওঠবার পর আগ্রহ ভিন্ন হয়; এক একটি আগ্রহ (ইনটারেস্ট) পেশায় (অকুপেশনে) দানা বাঁধে, পৃথক সত্তা গ্রহণ করে, তাইতে চরিত্র (পার্সনালিটি) পাকে, ফলে বিশেষ মূল্য (ভ্যালুজ) তৈরী হয়—ডাক্তারদের, উকীলদের, এঞ্জিনীয়ারদের, মধ্যযুগের শিল্পীদের যেমন হয়েছিল। সেই মূল্যগুলো যখন ব্যবহারে (কোড্ অব্ কণ্ডাক্ট) পরিণত হয় তখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে ওঠে নতুন লোকের পক্ষে। আমাদের দেশের শিক্ষা কেন্দ্রে তেমন কিছু হয় নি। পুরানো আই-সি-এস দলের একটা কোড্ ছিল। আমরা এখন সব কিছুই করতে পারি, ইন্সিওরেন্স থেকে পাটের দালালি পর্যন্ত। (ইন্সিওরেন্সটা গেল বোধ হয়।) অবশ্য প্রথম থেকেই কোড্ করলে সর্বনাশ: অধ্যক্ষ হাতে মাথা কাটবেন। সব দেশেই মাস্টারদের মধ্যে নোংরামি আছে—অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজেও থুব—কিন্তু এতটা কি? এখানেও কম বেশী আছে, তবু যেন গড়পড়তায়, তুলনায়, বিলেতের চেয়ে এদেশে একটু বেশী। অথচ আমাদের দায়িত্বও বেশী নয় কি? আমরা যে নতুন জাত। কেবল দায়িত্ব বেশী চাই নয়, সেন্স অব্ আর্জেন্সীটাও। কিন্তু কোনোটাই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। যেকালে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে কাজ হোতো সেকাল গত, কবরস্থ, দশ হাত মাটির তলায়। এ-যুগ হিরোয়িক যুগ নয়, রোম্যাণ্টিক যুগও নয়, টীম-ওয়ার্কের যুগ। কিন্তু টীমই তৈরী হচ্ছে না। এখনকার টীম মানে যারা একত্রে ভোট দেবে, তা যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক। ল্যাবরেটারীতে সকলে মিলে একযোগে, এক প্ল্যানের ছকে কাজ করছে ত' শুনি না। আর্টসের ডিপার্টমেণ্টে, ফ্যাকালটীতে সবাই একাকী, প্রত্যেকেই হিরো আর না হিরোর পার্ট চাই! উপায় কি? জানি না। চোখ কান বুজে পড়ে যাও, পড়িয়ে যাও, লিখে যাও—ব্যস্। দশের কথা দেশের কথা ভেবেছ কি মরেছ!

কামুর মীথ্ অব্ সিসীফাস্ চমৎকার লাগল তাই। এর অনেক অংশ Rebel-এর আগের লেখা, কিন্তু ফরাসী জানি না বলে পরে পড়লাম। অনেক ব্যাপারে সায় আছে আমার। আত্মহত্যা ছাড়া—তা এও একপ্রকার আত্মহত্যা বৈ কি! এ-যুগের মানুষ অ্যাবসার্ড, এ-যুগের যুক্তি অ্যাবসার্ড। যারা লাফ্ মেরে ওপারে গেল, ভগবদবিশ্বাসী হোলো তারা শান্তি পেল, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে। কেউ বল্লে বুদ্ধির জয়ের পথে বিশ্বাস, কেউ বল্লে গোড়া থেকেই বুদ্ধির হার—সেই একই কথা। জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়াও যায় না, অথচ চার ধারে অজ্ঞানতা, irrationality; এবং দুয়ের মোকাবিলা, মুখোমুখি—তাই anguish, তাই অন্ত হাত পা বেঁধে মার খাওয়া। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা গ্রহণ না করে উপায় নেই, অথচ করলেও সুখ শান্তির জলাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বাস, গান্ধীরও ছিল তাই। আমাদের, আমার, নেই।

• • •

'শান্তি বর্ধনের লিট্‌ল্ ব্যালে গ্রুপ-এর পঞ্চতন্ত্র দেখে এলাম বোম্বাইএ। মোটামুটি বেশ। আইডিয়াটি ভালো। নাচ, পোষাক কেমন যেন! সংগীতে কিছু ফিল্মী সুর ঢুকেছে। থীম্‌টা বন্ধুত্ব, অথচ প্রোপাগান্ডা নয়। বর্ধন মারা গিয়ে দেশের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর স্ত্রী চালাচ্ছেন। ওঁদের স্কুলটা চলছে এখন। প্রথমে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। বোম্বাই শহরের অনেকেই কালচারের ভক্ত। ভয় হয়। নব্য ধনীরা উৎসাহী হয়ে কালচারের সর্বনাশ করছেন দেখেছি। যাঁরা বলেন সংগীতে 'ইনটারেস্টেড্', আধুনিক সাহিত্যে 'ইনটারেস্টেড্', লোক-সংগীতে, এবস্ট্রাক্ট ছবিতে 'ইন্‌টারেস্টেড্' তাঁরা ভদ্রলোক, নিতান্ত ভদ্র, কিন্তু সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলার পক্ষে নিতান্ত ভয়ঙ্কর। এইসব হস্তী-হস্তিনীদের কাছ থেকে কালচারের সহস্র হস্ত দূরে থাকাই ভালো। 'ইন্‌টারেস্টেড্' 'ইন্‌টারেস্টিং' কথাগুলি নিতান্ত ভুয়ো, ছেঁদো, অন্তঃসারশূন্য, এমন কি ডাহা মিথ্যা। বক্তৃতা দেবার পর ঢুলু ঢুলু চোখে ভি-চোলী আর চকচকে শাড়ি রঙীন ঠোঁটে শীৎকার করে উঠলেন, হাউ ইন্‌টারেস্টিং! বুঝলাম একবর্ণ বোঝেন নি, আর ছে--লী করছেন। তবু মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে হবে! এঁরা পার্টিতে অত মিথ্যা কথা কন কেন? আমাদের মা পিসী মাসীরাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতেন, বাধ্য হয়ে। এঁদের বাধ্যবাধকতা কি? পুরুষদের মিথ্যেতে সাধারণত একটা আশা পূরণ থাকে, একটা কল্পনার খেলা থাকে, কিন্তু এ কেবল বাদুড়ামী। পৃথিবীতে মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে—না থাকলে লক্ষ্মী লক্ষ্মী হোতো না—কিন্তু এইপ্রকার ইন্‌টারেস্টেড্ হবার, হাউ ইন্‌টারেস্টিং বলার সামাজিক উদ্দেশ্য কি ঠিক ধরতে পারছি না। বোম্বাই-দিল্লীর নব্য সমাজ সৃষ্টি করা? হবে বা! সে যাই হোক এই ইন্‌টারেস্টিং শব্দটি শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

৫।৪।৫৬

শহরে হরতাল নতুন সেল্‌স্ ট্যাক্সের বিপক্ষে। আমার সিগারেট ফুরিয়েছে—কোনো সিগারেটই হয়ত পাওয়া যাবে না। অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন ট্যাক্স চাপান

হোলো। উপায় ছিল না—নচেৎ সব মাল গায়েব হয়ে যেত। আমাদের বণিক সম্প্রদায়ের মুখ বড় মিষ্টি, কিন্তু তারা সামাজিক প্রগতির শত্রু। এ'দের শক্তি কত বেশী এ'রা আমাদের বুঝতে দেন না সব সময়, কিন্তু যখন বোঝান তখন হাড়ে হাড়েই বুঝি। প্রতি পরিবারে এ'দের পঞ্চমবাহিনী আছে—বাড়ির গৃহিণীরা। আদ্যাশক্তি ও বণিকশক্তি একত্রিত হলে কোনো প্ল্যানেরই এমন পৈত্রিক শক্তি নেই যার আশীর্বাদে সেটি সার্থক হতে পারে। অবশ্য অর্ডিন্যান্স নামটাই জঘন্য। উত্তর প্রদেশের লেবার এনকোয়ারী কমিটি এক-বাক্যে সিফারিশ করলে যে, মজুরদের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার কম কিছুতেই হবে না। সেটা মাত্র কানপুরের কাপড়ের কলে চালাতে সেকশন ১৪৪-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। (১৪৪ না অর্ডিন্যান্স মনে পড়ছে না।) অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত শহর কানপুর।

শুনেছি শাক সবজি পাওয়া যাবে না। না পাওয়া যাক, ফল? তাও মিলবে না। রুটি মাখন ডিম। তাও না। সম্পূর্ণ হরতাল। অবশ্য বেশী দাম দিলে সবই পাওয়া যাবে শুনেছি। তাই দেওয়া যাবে। কিন্তু মুরগীর ডিমের দাম এত বাড়ে কেন? এর ইকনমিক্সটা কখনই ধরতে পারি নি। মালথাস্-এর ব্যাখ্যা অচল। মার্কস যতদূর মনে পড়ছে এ সম্বন্ধে নীরব। কীন্সের কনজাম্পশান ফাংশান? উঁহু। হীকস? নাঃ। জানালাগুলো ঘাটতে হবে। সিম্‌পেথেটিক বাইক নয়ত? মুরগীর ডিমের দাম কমে বাড়ে কেন তাই জানি না অথচ অর্থনীতির অধ্যাপক! অল্প সময়ের বিশ্লেষণে আমার খানসামা বিশ্বাসী কিন্তু। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: অর্থনীতিতে যে প্রাইস-থিওরী আছে তার সাহায্যে সংসার চলে না, অন্ততঃ আমার সংসার চলে না। মেয়েরা আর বেনেরা সংসার চালায়—জেনে চালায় কিনা জানি না, তবে চলে তাঁদের কৃপায়—অর্থাৎ তাঁদের না হলে চলে না। হগ্ সাইকেল-এর মত এগ্-সাইকেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হবে এখানে রশীদকে—সে বিলেত থেকে বিজিনেস্ সাইকেল-এর থিওরী শিখে এসেছে।

নানাপ্রকারের 'দায়িত্বহীন' মন্তব্য মনে উঠছে। ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অসম্ভব যতক্ষণ এই ট্রেডিং সার্ভিস করায়ত্ত না হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের দিক থেকে বলা চলে আমাদের বণিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি বণিক সম্প্রদায়ের কায়েমী সত্ত্ব অগ্রগতির অন্তরায়। সেল্‌স ট্যাক্স না বাড়ালে ডেভেলপ্‌মেন্টের টাকা আসত কোথা থেকে? অবশ্য পদ্ধতি সম্বন্ধে ও দু-একটা অন্য ব্যাপারে আমার খুব আপত্তি।

মার্কান্‌টিলিজম, কমার্স ক্যাপিটাল সম্বন্ধে যে সব বই পড়েছি তাতে মনে হয় না যে, আমাদের এই বণিকের দল কোনো ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করছেন না। এ'দের সংগে তাঁদের কোনো মূলগত মিল নেই। অর্থনীতির বই-এ পড়েছি স্পেকুলেশন সব সময় নিরর্থক নয়, বাজারের দিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ব্যাপারই অন্য। অবশ্য পৃথিবীতে সবই দরকারী, বিষধর সর্প থেকে খাণ্ডার-দাহিনী শাশুড়ি পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে ওকালতি করা যায়। কালাবাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ওকালতি শুনেছি ও পড়েছি। তবু মনে হয় এগুলো না হলেও চলত। কেবল তাই নয়, এগুলো অন্যায়, গান্ধীজী বলতেন, চরিত্রের দিক থেকে, আমি বলি আর্থিক ডেভেলপমেন্টের দিক থেকেও। ব্ল্যাকমেলিং দেশে বেশ চালু হয়ে উঠল। অথচ বলছি সোসিয়ালিস্ট প্যাটার্ন। ঠিক বুঝি না।

যে যাই বলুক, প্ল্যানিং মানে ফিজিকাল কন্ট্রোল, মালের উৎপাদনের ওপর ও তার বিতরণের ওপর। আপাতত সম্ভব নয় জানি, তবু......।

* * *

ফরাসী দেশে ফ্যাশিজম নতুন রূপ নিয়েছে—Poujadism-এ।

ঐ বণিক সম্প্রদায়ের ট্যাক্স দেবার অনিচ্ছা থেকেই সেটা ফুটে উঠল।

ফরাসী দেশের Poujadism-এর প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত গোটা কয়েক ভালো প্রবন্ধ পড়লাম। ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা ফরাসীরা আর্টে পরিণত করেছে। কেবল ইনকাম-ট্যাক্সই নয়, প্রত্যেক ট্যাক্স। শাসনপদ্ধতি অতটা কেন্দ্রীভূত হলে ফাঁক থেকে যাবেই। এই কেন্দ্রীকরণ চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে চলছে। সেন্ট্রালাইজেশনের বিপদ ঐখানে। মারা পড়ে সংলোকেরা, মধ্যবিত্ত কেরানীরা। তারা সেইজন্য সরকারের ওপর যায় চটে।

চিত্রগ্রীব

১৯ই মে থেকে শ্রী ইন্দ্র দুগারের পঞ্চাশটি ছবির একটি প্রদর্শনী চলছে ২৭ নম্বর চৌরঙ্গীতে। প্রদর্শনীটি আগামী ২৭শে মে পর্যন্ত খোলা থাকবে। শ্রী দুগার বাঙলা দেশের কৃতি শিল্পীদের মধ্যে একজন। ইনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র।

ইদানিং শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় অনেকেরই মত এই যে, প্রকৃতি এবং শিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজন ক্রিয়া চলে সেই নিয়মের অনুরূপ পথ ধরে শিল্পীর সৃষ্টি ক্রিয়া চলে না। সুতরাং প্রকৃতির রূপ যেমন চোখে দেখা যায়, হুবহু সেই রকম ছবিতে যে আঁকতেই হবে তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সত্যিকার শিল্প নিজেই সুন্দর—প্রকৃতির অলঙ্কার পরিয়ে তাকে সুন্দর করে তোলার দরকার হয় না। প্রায় তিন শ' বছর ধরে ইউরোপে শিল্পীরা চেষ্টা করেছিলেন শুধু হুবহু নকল করে প্রকৃতির রূপ ফুটিয়ে তুলতে। ইংরাজীতে এ ধারার নাম রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট। আমাদের দেশেও এই রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট-এর ঢেউ এসে লেগেছিল। তিন শ' বছর খুব কম সময় নয়। একই সুর যদি ক্রমাগত বেজে চলে, তা যতই মধুর হোক না কেন শেষপর্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট দেখতে দেখতেও বিরক্তি এসে গিয়েছিল। তাই আধুনিক কালের শিল্পীরা সাদৃশ্য চিত্রণ ছেড়ে এমন সব ছবি আঁকতে লেগেছেন যে ছবিতে থাকে শুধু শিল্পীর ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন। সাধারণ দর্শকের প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি নেই। আপন মনের কথা অন্যের মনের মধ্যে প্রবেশ করাবারও কোনও চেষ্টা নেই। বিচিত্র ফর্ম সৃষ্টি করার মধ্যে, অপ্রচলিত রং যোগাযোগ করার মধ্যে, রেখা-রং-ফর্ম-এ ছন্দ তোলার মধ্যে অবশ্যই বাহাদুরী আছে, কিন্তু এসব সরল মনের দর্শককে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে চায় এমন ছবি যা তার চোখ এবং মনকে সহজেই তৃপ্তি দিতে পারে এবং যা বোঝবার জন্যে তাকে মাথা ঘামাতে হয় না। ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট ইম্প্রেশনিজম, ফভিজম, কিউবিজম, নিও-প্রিমিটিভিজম, ফিউচারিজম, সুররিয়ালিজম, প্রভৃতি ইজম-এর দোহাই দিয়ে কি বা দেখাতে চাচ্ছে, কি বা জানাচ্ছে শিল্পীরা তার কিছুই বুঝতে পারছে না সে। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গানের পর মিঠে ঠুংরী গান যেমন মন প্রাণ মাতিয়ে তোলে ইজম-এ ভারাক্রান্ত নানা ছবি দেখার পর ইন্দ্র দুগারের ছবিও তেমনিভাবে মনে দোলা দেয়। এঁর ছবির বিষয়বস্তু নৈসর্গিক দৃশ্য। শিল্পী যদিও সাদৃশ্য সত্যের সন্ধানী তা হলেও ছবিগুলি প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। ইনি শিল্পকর্মীর দৃষ্টিতে তো দেখেইছেন সেই সঙ্গে শিল্পরসিক ভাবুকের দৃষ্টিতেও প্রকৃতির রূপকে দেখেছেন যার ফলে রচনাগুলি পেয়েছে সত্যিকার পরিপূর্ণতা।

এক ঝাঁক পাখী —ইন্দ্র দুগার

পাহাড় ও প্রান্তর —ইন্দ্র দুগার

জল রঙের আঙ্গিকে ইনি আয়ত্ত করেছেন নিপুণভাবে। কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য চোখে পড়ে না। ইনি দেখতে জানেন তাই চারদিক এঁর কাছে এত জীবন্ত। প্রকৃতির মধ্যে যা দেখেছেন তুলির টানে বার করে এনেছেন তার বিশিষ্ট রূপ। বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম না হতে পারলে এবং শিল্পে অকৃত্রিম অনুরাগ ও গভীর নিষ্ঠা না থাকলে এমন রূপ ফোটানো যায় না। এঁর টেম্পারায় রচিত ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে মনে ধরার মত ছবি 'গ্রীন সিমফনী' 'এ ড্রিম অব প্যলাস' এবং 'স্প্রিং ফ্লাওয়ার'। ওয়াশ প্রকরণে রচিত ছবিগুলির মধ্যে 'গ্রীষ্মকাল', 'এ ক্লোসিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ' 'টেম্পলস অন পার্শ্বনাথ হিলস' এবং 'টেম্পল অব পার্শ্বনাথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর নিখুঁত পারস্পেকটিভ বোধ ছবিগুলিকে আশ্চর্যরকম বাস্তব করে তুলেছে। তৈল মাধ্যমে আঁকা ছবির মধ্যে 'আন্ডার দি গ্রীন উড ট্রীজ' এবং 'দি ভিলেজ এন্ডস' উল্লেখযোগ্য। তৈল মাধ্যমেও শিল্পী যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন বটে কিন্তু আঁকার ধরন ধারন দেখে মনে হ'ল—বড় ক্যানভাস-এ মোটা রং ও মোটা তুলি ব্যবহার করতে ইনি খুব স্বস্তি বোধ করেন না। তৈল চিত্রগুলি পরিমাপে খুব ছোট হওয়ার ফলে অয়েল পেইন্টিঙের মেজাজ আসে নি। কাছে গিয়ে না দেখলে ওগুলি 'গুয়াশ' বলে ভ্রম হয়। 'এ ভিউ অব চিতোর' 'ডাস্ক ওভার সী' প্রভৃতি ছবি যদি বড় ক্যানভাস-এ আঁকা হ'ত তা হলে ছবিগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা নিশ্চয় সম্ভব হ'ত না।

প্রদর্শনীটি আর্ট রসিক মহলে সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। প্রত্যেক শিল্প শিক্ষার্থীর এ প্রদর্শনী দেখা উচিত তাঁরা যদি জল রঙের হদিস বুঝতে চান।

তারের কম্পোজিশন —উমা সিদ্ধান্ত

মাদার এণ্ড চাইল্ড —আপন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ শিল্পী গোষ্ঠীর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ। শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত, শ্রীকল্যাণ বসু, শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী এবং শ্রীআপন বন্দ্যোপাধ্যায়—এই চারজনে মিলে গঠিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ শিল্পী গোষ্ঠী। এঁরা চারজনেই গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট-এর ছাত্রছাত্রী।

শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্তের শিল্পকর্মগুলিই এ প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য ছিল। 'তারের কম্পোজিশন' 'কাঠের কম্পোজিশন' এবং 'সিমেণ্টের কম্পোজিশন'-এ শিল্পী যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। শিল্পী স্বকীয় রসবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তাঁর ইচ্ছা মতো রূপ গড়েছেন বটে, কিন্তু এই রূপ গড়তেও তাঁকে ব্যাকরণ মানতে হয়েছে নির্দোষভাবে। এ ব্যাকরণ অবশ্য ভারতীয় মূর্তি শিল্পের ব্যাকরণ নয় সেই কারণে গোঁড়া দেশী-পন্থীরা এসব মূর্তির তাল-মানে ভুলভ্রান্তি আবিষ্কার করতেও পারেন। তবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিল্পীর ভারসাম্যবোধ এবং ছন্দবোধ প্রায় নির্ভুল। এঁর স্কেচগুলিও উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের সব শিল্পীদেরই শিল্পকর্ম আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের ছাঁদে সৃষ্ট। পাশ্চাত্য শিল্পের রীতিনীতি ক্রিয়া-কলাপ প্রথা-প্রকরণ মেনে চলে ছবি আঁকলে বা মূর্তি গড়লে সেটা এমন কিছু দোষের হয় না বটে, কিন্তু তা যদি নেহাতই অনুকরণ হয় শিল্প রাজত্বে তার কোনও দাম নেই। একথা নানাভাবে এর আগেও বলেছি, কারণ দেখতে পাই শিল্পে আধুনিকতা আনতে হলে শিল্প শিক্ষার্থীরা, শুধু শিল্প শিক্ষার্থী কেন আমাদের দেশের অনেক নামকরা শিল্পীও ফরাসী চিত্রীদের ধারার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি না করে কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না। সব দেশের প্রথা প্রকরণ অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত, কিন্তু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় ভেবেচিন্তে ক্রিয়া করার কথা ওঠে যাতে মনে না হয় যে রচনাটি কোনও বিদেশী ধারার পুনরাবৃত্তি। আর ব্যক্তিত্বের রসে পূর্ণ হয়ে শিল্পীর স্বকীয়তায় পরিণত না হলে কোনও শিল্প কর্মের কদর নেই। অবনীন্দ্রনাথের আর্টও গড়ে উঠেছিল এখান থেকে সেখান থেকে নানা টেকনিক আদায় করে কিন্তু কোথাও সেই সব টেকনিক তাঁর ব্যক্তিমনকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি সেই কারণেই তাঁর ছবি অত মূল্যবান।

ছবির মধ্যে কল্যাণ বসুর ছবিগুলি অন্যান্যের তুলনায় বেশী আকর্ষণীয়। এঁর 'ব্লু লাইট', 'এগেনস্ট লাইট', 'ব্রাইট লাইট', 'মেন অ্যাণ্ড রোড' প্রভৃতি ছবি উল্লেখযোগ্য। তবে এঁর অ্যানাটমিবোধ তেমন প্রশংসনীয় নয় আর বেশীর ভাগ ছবিতেই ধূসর রং অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়ে বসেছে তার ফলে ছবিগুলি চোখে খুব সুখকর ঠেকে না। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'ইয়েলো ল্যাণ্ড', 'রেস্ট' এবং 'পোরট্রেট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাম্বার ফোর' এবং 'নাম্বার এইট' উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলেরই লক্ষ্য করলাম অ্যানাটমিবোধ এখনও নির্ভুল হয়নি এবং মাঝে মাঝে রঙের অপচয় এবং রেখার বৈলক্ষণ্যও ঘটেছে।

ব্রাইট লাইট —কল্যাণ বসু

উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা সকলেই বয়সে তরুণ এবং এঁদের যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ আছে সুতরাং ভবিষ্যতে এঁদের কাছ থেকে সত্যিকার রসোপেত শিল্প অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। তাই বলি, অনুসন্ধানী মন নিয়ে নানা প্রথা প্রকরণ এঁরা দেশ বিদেশ থেকে আদায় করুন এবং সেই সঙ্গে স্বদেশী আঙ্গিকও শিক্ষা করুন। স্বদেশী স্তরের উপরই নতুন আর্টকে গড়ে তুলতে হবে দেশ বিদেশের প্রথা প্রকরণ বিচার করে এবং ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করে। সেইটেই হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। শিল্পে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে বিদেশী শিল্প নছক নকল করতে গেলে ঠেকতে হবে পদে পদে এবং সে শিল্প রসিক-মহলে কোনও দিনই সমাদর লাভ করবে না।

—চিত্রদীপ

বাজার থেকে কোনও জিনিস কিনতে হলে ভালোমন্দ বাচাই করে নেওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্য গ্রামোফোনের রেকর্ড কিনতে হলে দোকানে বসেই বাজিয়ে দেখে নিতে হয়। এক্ষেত্রে দোকানদারের পক্ষে এক সময়ে একের অধিক খরিদ্দারের উপস্থিতি অসুবিধা ঘটায়। কারণ একজন যে রেকর্ড-খানি বাজিয়ে দেখে শুনে নেবেন, অন্য জন তো আর সেইখানিই নেবেন না। অথচ একই ঘরে একের অধিক রেকর্ড বাজিয়ে শোনা এবং ভালোমন্দ বিচার করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ছোট ছোট ঘরের প্রয়োজন

এই চেয়ারটিতে বসে শুধু মাত্র এই মহিলাটি রেকর্ড শুনছেন

বর্তমানে নতুন ধরনের এক রকম চেয়ার এই অসুবিধা দূর করতে পারে। চেয়ারটির দুপাশের দুই পাখায় দুটি ছিদ্র আছে। ঐ চেয়ারে বসে কয়েক ফিট দূরে রেকর্ড লাগালে চেয়ারে উপবিষ্টা মহিলাটি রেকর্ডের বক্তব্য শুনতে পাবেন। শুধু মাত্র ঐ চেয়ারে উপবিষ্টা মহিলা কিংবা কয়েক ফিটের মধ্যে যারা থাকবে, তারাই শুনতে পাবে। এইভাবে একই ঘরের মধ্যে অনেক জনকে অনেক রকম রেকর্ড শোনান যাবে।

*

মনসা, আকন্দ কিংবা রবার ইত্যাদি জাতীয় গাছের ডাল ভাঙলে বা খোঁচালে দুধের মত এক রকম তরল পদার্থ বার হয়। এগুলি দেখতে দুধের মত হলেও স্বাদে গন্ধে সম্পূর্ণ তফাত। এমন গাছও আছে যার রস, বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ সবই দুধের মত। ডাঃ পল এলেন এই গাছটি লক্ষ্য করেন। কোস্টারিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিকে এই জাতীয় গাছ পাওয়া যায়। এই গাছগুলির ডাল ভাঙলে কিংবা খোঁচালে ঐ দুধের মত পদার্থ বার হয়। ঐ দেশীয়

চক্রদত্ত

লোকেরা ঐ গাছের রস দুধের মতোই প্রীতি সহকারে পান করে। ডাঃ এলেনকে যখন চিনি ও ভ্যানিলার গন্ধ দিয়ে ঐ দুধ পান করতে দেওয়া হল, তিনি পান করার পরও সত্যিকারের দুধের সংগে কোনও তফাত আছে কী না, একথা বুঝতেই পারেন নি। এই দুধ অবশ্য সর্বতোভাবে দুধের মত নয়, কাজেই দুধের বাজারে এর প্রতিযোগিতা চলবে না। গাছের দুধ কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় রাখার পর অল্প স্বল্প তিক্ত ও 'খড়ি খড়ি' হয়ে যায়। আরও দেখা গেছে যে, কুকুর, বেড়াল জাতীয় জীবেরা কিন্তু কোনও সময়েই দুধ বলে এই পদার্থ পান করে না। ঐ দেশে এই গাছগুলোকে 'গাভী বৃক্ষ' বলা হয়।

*

আজকাল প্রায় সর্বত্রই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু পশু-পক্ষী সম্বন্ধে এ বিষয়ে আমরা উদাসীন। পাখি পোষার শখ যাদের আছে, তারা বেশির ভাগ সময়েই পাখির খাঁচাটি ঘরের বাইরে বারান্দা বা দালানে ঝুলিয়ে রাখেন। এতে পাখিটিকে শীতকালে যতটা ঠান্ডা ভোগ করতে হয়, গরমকালে ততই গরমে কষ্ট পেতে হয়। নতুন ধরনের খাঁচাটির দাঁড়টি
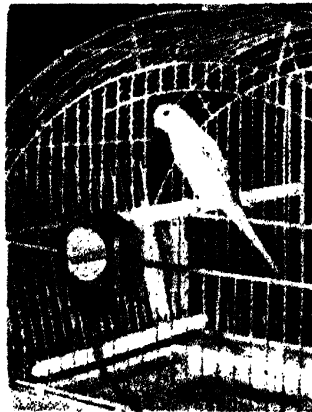
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাখির খাঁচা

বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন। এই দাঁড়ের সংগে একটি বৈদ্যুতিক প্লাগ থাকে এবং ঐ প্লাগ দ্বারা খাঁচার মধ্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া পাখিটি নিজেও প্রয়োজনমত দাঁড়ের ঠান্ডা দিকে কিংবা গরম দিকে বসতে পারে।

*

দাঁত একবার নষ্ট হলে তাকে সুস্থ করা বোধহয় সম্ভব হয় না, এ পর্যন্ত এই ধারণাই আমাদের আছে। আশা করা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই নষ্ট দাঁত পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারবেন। ডাঃ আরভিং গ্লিকম্যান তাঁর গবেষণাগারে পশুদের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পাইওরিয়া ইত্যাদি রোগে দাঁতের যেসব হাড় নষ্ট হয়ে গেছে, সেক্স হর্মোন দিয়ে চিকিৎসা করার ফলে সেই হাড় আবার জন্মেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাইওরিয়া রোগেই দাঁত নষ্ট হয়। ৩৫ বছর বয়সের পর থেকেই দাঁত আলগা হয়ে যায়, তারপর যেসব হাড় দিয়ে দাঁত আটকানো থাকে, সেই হাড়গুলোও নষ্ট হয়ে যায়। ডাঃ গ্লিকম্যান ল্যাবরেটরীতে ১০০টি পশুকে খাদ্যপ্রাণ অভাবযুক্ত খাদ্য খাইয়ে এই রোগগ্রস্ত করে তোলেন। তাদের মধ্যে ৫০টিকে সেক্স হর্মোন চিকিৎসার পর শুধু যে দাঁত পড়া নষ্ট হয় তা নয়, নষ্ট হাড়ের জায়গায় নতুন হাড় জন্মাতে থাকে। এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থা মানুষের প্রতি প্রয়োগ করে দেখা হয়নি।

*

কাটা ছেঁড়া বা পোড়া ঘায়ে বারে বারে ওষুধ লাগান বা ব্যান্ডেজ বাঁধতে হলে রোগীকে খুবই কষ্ট পেতে হয়। বিশেষত, অনেক সময় ক্ষত খুব বেশি হলে চেপে ব্যান্ডেজ বাঁধাও দুষ্কর হয়ে পড়ে এবং সেটা বোধহয় ক্ষতের পক্ষে ক্ষতিকরও হয়। এছাড়া একবার ব্যান্ডেজ বাঁধলে বারে বারে খোলা বা বাঁধা যায় না, অথচ বাঁধা অবস্থায় থাকার দরুণ ক্ষতস্থানের অবস্থা লক্ষ্য করাও যায় না। আজকাল প্লাস্টিক ড্রেসিংএর ব্যবস্থা হচ্ছে। ওষুধ লাগানর পর ব্যান্ডেজ না বেঁধে প্লাস্টিক স্প্রে করে দিতে হয়, তাতে ধুলো, হাওয়া ইত্যাদির হাত থেকে ক্ষতস্থান রক্ষা করাও যায় আবার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে ক্ষতস্থান সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবস্থার একটি অসুবিধা যে, প্লাস্টিক স্প্রে করার সময় কাঁচা ঘায়ে পড়লে আধ মিনিট মত সময় বেশ জ্বালা করে। অবশ্য কোনও এণ্টি-সেপটিক ওষুধ লাগিয়ে যে জ্বালা করে, তার চেয়ে কিছু বেশি জ্বালা হয় না।

২৯

এ্রকের পর এক নৈরাশ্যের আঘাতে কমলাক্ষ প্রায় ভেঙে পড়ল। ঝোঁকের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে নিজেই ভিতরে ভিতরে মনস্তাপে ভুগছিল। তারপর বাবা, মা, ঠাকুরমার সমালোচনা তাকে আরও অতিষ্ঠ করে তুলল। শতদলবাসিনী আর কল্যাণী যেভাবে তাকে গালমন্দ করেছেন, গঞ্জনা দিয়েছেন, অমিয়ভূষণ অবশ্য তেমন স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে দীর্ঘশ্বাস চেপে আক্ষেপের সুরে বলছেন, 'ভালোই করেছ। এদিকে দেনার দায়ে আমি ডুবু ডুবু। তোমার চাকরি ছাড়বার এই তো সময়।'

কমলাক্ষ ভেবেছিল—বলে, 'চাকরি করে আমি যা দিচ্ছিলাম, তা অন্য কিছু করে দেব। আপনি সেজন্যে চিন্তা করবেন না।'

কিন্তু মুখের কথায় এ ধরনের বাহাদুরি দেখান কমলাক্ষের স্বভাব নয়। সে মাথা নিচু করে বাবার তিরস্কার সহ্য করল। তারপর নিঃশব্দে তাঁর সামনে থেকে সরে গেল। ভাবল, এর জবাব নিজের কাজের ভিতর দিয়ে দেবে।

কিন্তু সেই কাজেরও ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। অজয় আর অন্য বন্ধুদের নিয়ে বড় আকারে যে গানের স্কুলটা কমলাক্ষরা খুলতে চেয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠল না। অজয় আর তার অন্য বন্ধুদের মধ্যে মতদ্বৈধের ফলে তা শুধু আলোচনার পর্যায়েই রয়ে গেল। দিন কয়েক বাদে আলাপ-আলোচনাও থামল। প্রচুর সময় আর সামর্থ্য নষ্ট হল। শুধু ছুটোছুটি, হাঁটাহাঁটিই সার হল কমলাক্ষের। তাকে এভাবে মুষড়ে পড়তে দেখে অজয় বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন। স্কুল আমরা একদিন করবই। আজ না হয় দু দিন পরে হবে।'

কমলাক্ষ বলল, 'কোনদিনই হবে না। পাঁচজনকে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করবার শক্তি তোমার নেই অজয়। তাতে অনেক ধৈর্যের দরকার। তাতে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়।'

অজয় উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, 'তুমি যাই বল কমল, তোমার অনেক কিছুর সঙ্গে নিজের মানসম্ভ্রম, হিতাহিত বোধ ত্যাগ করতে আমি রাজী নই।'

অজয়ের ধনী বন্ধু সুশোভন দে পেট্রন হিসেবে এসেছিল। সে টাকা ব্যয় করতে রাজী। কিন্তু সব ক্ষমতা ও নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। কোর্স থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষমতাও প্রকারান্তরে তার হাতে থাকবে। অজয় আর কমলদের মত শিল্পী শুধু সেখানে সাধারণ

চাকুরে হিসাবে স্থান পাবে। এই শর্তে অজয় রাজী হয়নি। কমলের পক্ষেও রাজী হওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু তবু তার মনে হতে লাগল, অজয় আর সুশোভনের মধ্যে একটা আপস-মীমাংসা হয়ে গেলে ভালো হত। যে কোন রকমে হোক স্কুলটা শুরু হয়ে গেলেই চলত। তারপর যার যার দক্ষতা, যোগ্যতার জোরে কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা চলতে পারত। কিন্তু অজয়ের তা ইচ্ছা নয়। সে আগে থেকে সব বুঝে শুনে না নিয়ে কাজে নামতে চায় না। জীবনে সে বহু শিক্ষা পেয়েছে। বহু স্কুল গড়েছে, ভেঙেছে। ও খেলা আর নয়।

অজয় বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'যতদিন আমরা তেমন বড় ধরনের কিছু একটা না করতে পারি, তুমি আমার এই ছোট ঘরেই এস। আমার কিছু ছাত্রকে তোমার হাতে সঁপে দিই। দক্ষিণাটা ভাগাভাগি করে নেব।'

কমলের যখন চাকরি ছিল, তখন বিনা দক্ষিণায়, বিনা ভাগাভাগিতে অজয়ের ছাত্রদের সে বাজনা শিখিয়েছে। আজ মহানুভব হবার, কমলাক্ষকে অনুকম্পা করবার দিন পেয়েছে অজয়। কিন্তু কমল বন্ধুর অনুকম্পা চায় না।

সেদিন দুপুর বেলায় অজয়ের বাসা থেকে সে বিদায় নিল। অজয়ের স্ত্রী সুনন্দা বলল, 'সেকি, এমন অসময়ে না খেয়ে দেয়ে কেউ কি যায়?'

কমল বলল, 'গৃহস্থের কল্যাণের জন্যে খাওয়া-দাওয়া এই ক'দিন ধরে যথেষ্টই তো হল। এবার অতিথির কল্যাণের কথাটা ভাবতে হবে।'

সুনন্দা বলল, 'সময়মত নাওয়া-খাওয়াটা ছেড়ে দিলে অতিথিরই বা কোন্ কল্যাণটা হবে শুনি। একটা শক্ত রকমের অসুখ-বিসুখ করবে। হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না। তাই চান বুঝি?'

মুখ টিপে হাসল সুনন্দা।

কমলাক্ষ বলল, 'হাসপাতালে নয়, একেবারে পাতালে আশ্রয় নিতে চাই।'

সুনন্দা বলল, 'ওরে বাবা, এত বৈরাগ্য

কেন। যেখানেই লুকোন, হাসপাতালের মানুষ আপনাকে খুঁজে বের করবে।'

ইঙ্গিতটা যে মালার সম্বন্ধে তা বুঝতে পেরেও কমলাক্ষ কোন জবাব দিল না। জলযোগের করবার অনুরোধও রাখল না।

রাস্তায় নেমে সে কীর্তিনগরের বাস ধরল। নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা তার মনের মধ্যে থেকে থেকে উঁকি দিতে লাগল, সুশোভনের সঙ্গে সে যদি একটা গোপন চুক্তি ক'রে স্কুলটা আরম্ভ ক'রে দেয় তাহ'লে কেমন হয়। অজয়ের টাকার দরকার না থাকতে পারে। তার প্রচুর ছাত্রছাত্রী। তাদের সেতার, সরোদ শিখিয়ে সে অনেক টাকা পায়। কিন্তু কমলাক্ষ তো এখন প্রায় নিঃসম্বল। মাসে মাসে টাকা দিতে না পারলে পরিবারে তার মান থাকবে না।

কিন্তু কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই সে ধিক্কার দিল। ছি ছি ছি। এমন অদ্ভুত আর অসঙ্গত কথা সে ভাবতে পারল কি করে। অজয়ের মত এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সে প্রতারণা করবে? এই কি তার বন্ধুপ্রীতি? অশুভ চিন্তাটাকে নিন্দায় তিরস্কারে বার বার লাঞ্ছিত করতে লাগল। এমন একটা অবমাননাকর প্রসঙ্গকে কিছুতেই সে আমল দিতে চাইল না। তবু কমলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার কথাটা তার মনে ভেসে উঠতে লাগল। নিজের মনের মধ্যে এই প্রলোভনের অস্তিত্ব যত টের পেল কমল তত তার আত্মগ্লানি বেড়ে চলল।

বাড়ির আদর যত্নের মাত্রা যে অনেক কমে গেছে তা কমলাক্ষের বুঝতে দেরি হল না। সকলের মুখই কেমন গম্ভীর, ভার ভার। কল্যাণী ঘরের মেঝেয় আসন পেতে ছেলেকে খেতে দিলেন। কিন্তু ভালো মন্দ তেমন কোন কথা বললেন না। খাওয়ার পরে শতদলবাসিনী এসে বসলেন কাছে। একথা ওকথার পরে বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর এ কেমন ধারা বলতো।'

কমলাক্ষ বলল, 'কিসের ধারা ঠাকুরমা।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'এই যে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, কেন কিসের দুঃখে শুনি। কোন্ মধুমালা মালঞ্চমালার জন্যে বলতো?'

কমলাক্ষ হেসে বলল, 'মালঞ্চমালা তো আমার সামনেই বসে আছে ঠাকুরমা।'

শতদলবাসিনী বললেন 'ইস্, ও কেবল মুখের কথা। বড় হওয়ার পর আমাকে তুই একটুও ভালোবাসিসনে। তা না বাসিস না বাসিস। কারো মায়া মমতায় আমার আর দরকার নেই ভাই। আমি এখন মায়ার বন্ধন কাটাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু তোর বাপ মার কথাটা তো একবার ভেবে দেখবি। পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা মাত্তর ছেলে। সে যদি এমন বিবাগী বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়ায় বাপ-মার মনে কি কোন শান্তি আসে? তাদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ কমল, তাদের মনের অবস্থার কথাটা ভেবে দেখ।'

কমলাক্ষ বলল, 'হুঁ'।

শতদলবাসিনী বললেন, 'হুঁ নয়, তোদের বাপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতো। চিন্তায় চিন্তায় তার চেহারা কিরকম শুকিয়ে গেছে? হবে না চিন্তা? মাথার ওপর এক কাঁড়ি টাকা দেনা। আমি কি আগে জানি এইরকম হবে? তাহ'লে কে বাড়ি করবার কথা মুখে আনত? তারপর ভালো ঘর বর দেখে মেয়েটাকে বিয়ে দিল। কিন্তু দিলে হবে কি। কপালে যদি শান্তি না থাকে শান্তি কি কেউ গড়িয়ে এনে দিতে পারে?'

কমলাক্ষ একটু চমকে উঠে বলল, 'কেন? ওর আবার অশান্তির কি কারণ হ'ল?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'তুই যে কোন খবর রাখিসনে? বাড়িতেই থাকবিনে তা খবর রাখবি কি ক'রে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেলাম ওর মনে শান্তি নেই। শান্তি কোনদিন পাবে কিনা কে জানে।'

কমলাক্ষ বলল, 'ব্যাপারটা কি খুলেই বল না।'

শতদলবাসিনী গলা নামিয়ে বললেন, 'খুলে বলবার মত কথা নয়রে ভাই। মুখে বলছে শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েরা যদি সোয়ামীর আদর সোহাগ পায়, শ্বশুর শাশুড়ীর হেনস্থা হাসিমুখে সইতে পারে। কিন্তু সোয়ামীর এক ফোঁটা অনাদরও সয় না। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। এই তো আনন্দ ফূর্তির সময়। এখনই যদি যৌবনে যোগিনী হয়ে থাকে তাহ'লে উপায় কি বলতো?'

বললেন না বললেন না ক'রেও অনেক কথাই নাতির কাছে বলে ফেললেন শতদল-বাসিনী। মৃগাঙ্কের স্বভাব চরিত্র যে ভালো নয়, তা তিনি অনেকের মুখেই শুনতে পেয়েছেন। বিয়ের আগে এ ধরনের একটু আধটু কানাঘুষো উঠেছিল। কিন্তু শতদল-বাসিনী গ্রাহ্য করেননি। ভেবেছিলেন; বড়লোকের আইবুড়ো ছেলের বিরুদ্ধে ও ধরনের এক আধটু নিন্দা রটেই। অনেক সময় হিংসে থেকেও এ ধরনের দুর্নাম ছড়ায়। সবাই তো আর মানুষের ভালো দেখতে পারে না। পাড়াপড়শীর দুঃখ

দেখলে অনেকেরই চোখে জল আসে। কিন্তু তার সুখে আনন্দ পেয়ে সত্যিই হাসতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। তাই তিনি ভেবেছিলেন, এসব মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা রটনা। তাই ওসব কথা তিনি তেমন কানে তোলেননি। কিন্তু এখন নাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বড় গোলমেলে লাগছে। স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া সহজসাধ্য নয়। সে সব বুঝতে পারে, সব টের পায়। নিজের স্ত্রীর কাছে পুরুষ নিজের দুষ্কৃতির কথা বেশিদিন লুকোতে পারে না, মৃগাঙ্কও পারেনি। বোধহয় লুকোতে চায়নি। এনাক্ষী চেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শতদলবাসিনী সব টের পেয়েছেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পেরেছেন। সব খুলে না বললেও আভাসে ইঙ্গিতে কিছু কিছু কথা এনাক্ষী বলেওছে।

কমলাক্ষ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'এরই যদি জানতে পারলে, ওকে যেতে দিলে কেন? আর সেই বা ফের গেল কোন্ আক্কেলে?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'ওমা, যাবে না তো কি করবে। এ অবস্থায় দূরে সরে থাকলে তো বেটাছেলে আরো বিগড়ে যায়। রাগ ক'রেই হোক আর মান ক'রেই হোক, এ সময় ঘরের বউয়ের দূরে থাকতে নেই। তাতে বাঁধন পুরুষের আরো বেড়ে যায়।'

কমলাক্ষ বললেন, 'থাক ওসব কথা। তোমাদের ধরন-ধারণের সঙ্গে আমার মোটেই মেলে না। আমি হ'লে পুনটুরিকে যেতে দিতাম না, কিছুতেই দিতাম না।'

শতদলবাসিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বাড়িতে ধরে রেখেই বা কি করতি? তাতেই কি ওর শান্তি হ'ত? ওভাবে যদি মেয়েদের মনে শান্তি আসত তাহ'লে আর কথা ছিল না। দেখছিস তো তোর পিসীর অবস্থা? তোর বাবা কি তাকে আদর যত্ন কম করে? তবু তো সুখ নেই।'

কমলাক্ষ বলল, 'তুমি যা বললে পুনটুরির অবস্থা যদি ঠিক তাই হয়, তাহ'লে ওর চেয়ে পিসীমা ঢের বেশি সুখে আছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'

কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চিন্তাভাবনা চাপা পড়ল কমলাক্ষের। বোনের কথাই ভাবতে লাগল। গোড়া থেকেই মৃগাঙ্কের ধরন-ধারন তার কেমন কেমন লেগেছে। ভদ্রলোককে তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু পুনটুরি নিজে যখন তাকে পছন্দ করেছে, কমল কেন বাধা দিতে যাবে? অপছন্দের কথা বলতে যাবে? আর বললেও কি তার কথা থাকত? কিন্তু এখন কমলাক্ষের মনে হতে লাগল, তার কথা কেউ শুনুক না শুনুক সে যা অনুভব করেছিল তা সবাইকে জানান উচিত ছিল, বাধা দেওয়া উচিত ছিল। বোনের অশান্তির জন্যে কমলাক্ষ নিজেকেও খানিকটা দায়ী মনে করল। মনটা ছটফট করতে লাগল এনাক্ষীর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে, তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে। দেখা হলে কি এনাক্ষী সব তাকে খুলে বলত? আগের মত সব জানাতে পারত? না তা বোধহয় পারত না। এনাক্ষীর বিয়ের পর কমলাক্ষ যতবার তাকে দেখেছে কেমন একটু আড়ষ্টতা লক্ষ্য করেছে। বোনের লজ্জার ধরনে কমলাক্ষ নিজেও লজ্জিত বোধ করেছে। আগের মত ভালো ক'রে কথা বলতে পারেনি। এখন মনে হয়, এনাক্ষীর কুণ্ঠার অন্য কারণ ছিল। সে বাপের বাড়ি এসে দাদাকে খুঁজেছে একথা শুনে কমলাক্ষের মনটা আরো খারাপ হ'ল। খুঁজেছে বলে নয়, খুঁজে তাকে পায়নি বলে। দেখা হ'লে না জানি কত কথাই বলত এনাক্ষী। দাদার কাছে এখন সে হয়ত কোন কথাই গোপন করত না। কমলাক্ষ একবার ভাবল মৃগাঙ্কদের বাড়িতে গিয়ে এনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করে আসে। কোন কথা বলবার সুযোগ যদি এনাক্ষী নাও পায়, তবু তাকে দেখলেই কমলাক্ষ অনেক কথা বুঝতে পারবে।

কিন্তু যাই যাই ক'রে কিছুতেই আর যাওয়া হয়ে উঠল না। অনাহূতভাবে কুটুম্ব বাড়িতে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না, কমলাক্ষ এই সিদ্ধান্তেই অটুট রইল। ভাবল, দিনকয়েক বাদে এনাক্ষীকেই এখানে আনিয়ে নেবে। যে জায়গা কমলাক্ষ মোটেই পছন্দ করে না, সেখানে যাওয়ার তার কি দরকার।

এনাক্ষীর খোঁজ নিতে গেল না কমলাক্ষ, কিন্তু যাওয়া যে উচিত ছিল একথা তার বার বার মনে হ'তে লাগল।

ইতিমধ্যে আরো একটি কাণ্ড ঘটল। রেডিও থেকে তার নামে চিঠি এল, নতুন কণ্ট্রাক্ট করবার আগে আর একবার তার গুণের পরীক্ষা দিতে হবে।

মনটা একেই উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল কমলাক্ষের। তারপর এই চিঠি তার বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিল। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, নতুন কণ্ট্রাক্ট কমলাক্ষ পাক আর নাই পাক, সে আর অডিশন দিতে রাজী নয়।

চিঠির কথাটা কল্যাণী জানতে পারলেন। কল্যাণীর কাছ থেকে অমিয়ভূষণ। তিনি এবারও গম্ভীর হয়ে রইলেন। ছেলের কোন ব্যাপারের মধ্যে তিনি আর থাকবেন না। ওর যা খুশি করুক। কিন্তু কল্যাণী অভিমান ক'রে চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি সোজা ছেলের ঘরে গিয়ে বললেন, 'আচ্ছা কমল, তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞানই হবে না?'

'হবে না যে কি ক'রে জানলে?'

কল্যাণী বললেন, 'আর হয়েছে। তুই যে যাবিনে বলে চিঠি লিখলি তার ফল কি হবে জানিস? ওরা আর তোকে ডাকবে না।'

কমলাক্ষ একটু হেসে বলল, 'না ডাকে নাই ডাকলে মা। আমি বসে বসে আগের মত তোমাকে আমার বাজনা শোনাব। আর কোন শ্রোতার আমার দরকার নেই।'

কিন্তু কল্যাণী ছেলের এই মাতৃভক্তিতে খুশি হলেন না। তিনি বললেন, 'না বাপু, তোমার রকম সকম কিছু আমার ভালো লাগছে না। তুমি মনে মনে কি ভেবেছ বলতো। রাজ্য সুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি ঠিক থাকবে? পৃথিবী সুদ্ধ লোক খারাপ আর তুমিই একমাত্র ভালোমানুষ তাই বোঝাতে চাও নাকি আমাকে?'

কমলাক্ষ একটু হেসে বলল, 'না মা, আমি তোমাকে ঠিক সেকথা বোঝাতে চাইনে।'

কল্যাণী বললেন, 'হেসো না বাপু, তোমার হাসি দেখলে আজকাল আমার গা জ্বালা করে।'

বাপমায়ের সঙ্গে কমলাক্ষের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। সব কথার জবাব হাসি দিয়ে দিতে পারল না কমলাক্ষ। মাঝে মাঝে রূঢ় কথাও মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে পালিয়ে আবার কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কিনা ভাবছে, ছোট একটি ঘটনায় তার সিদ্ধান্ত বদলে গেল। নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে রাস্তায় কয়েকবার দেখাসাক্ষাতের ফলে তার আলাপ জমে উঠল। তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'আমাকে শেখাও তোমার সেতার, আমি তোমার শিষ্য হব।' (ক্রমশ)

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য

সবিনয় নিবেদন,—শ্রীনির্মলনারায়ণ রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যায়ন করেছেন, তার মধ্যে কাব্য ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে। আমার এ বক্তব্য অবশ্যই সাধারণ বক্তব্য। সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রে মূল্যবিচার ব্যক্তিগত মত ও রুচিসাপেক্ষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সামান্যীকরণ সম্ভব।

শ্রী রায়ের লেখা পড়ে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি নেহাতই যেন কাকতালে পাওয়া। কিন্তু ১৯১২ সাল থেকে তার পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতি সারা ইওরোপে হয়েছিল, শুধু জনসাধারণের কাছে নয়, বিদগ্ধ সমাজের কাছেও। ফ্রান্সে, রোমাঁ রোলাঁ, জিদ, পল ভালেরী এঁদের মত লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যাঁরা প্রথম থেকে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়েটস, এজরা পাউণ্ড, রথেনস্টিন। যে ভাবধারা তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, নিজে পারেন নি সেই ভাবধারাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির এটাই মৌল কারণ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে আসে Ezra Pound-এর বিখ্যাত সমালোচনা, গীতাঞ্জলির উপর, যে নিবন্ধে তিনি লিখেছেন

"As the sense of balance came back upon Europe in the days before Renaissance, so it seems to me does this sense of saner stillness come now to us in the midst of clangour of mechanisms.'

এবং ইয়েটস গীতাঞ্জলির যে মুখবন্ধ লিখেছিলেন, তাতেও প্রায় একই চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপীয় কবিদের তুলনামূলক সমালোচনা একমাত্র Times ছাড়া আর কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। গীতাঞ্জলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে :

"They are prophetic of the poetry that might be written in England, if our poets could attain the same harmony of emotion and idea (Times Literary Supplement 7.11.12.)

উদ্ধৃত মতামত থেকে কি মনে হয় যে, রবিঠাকুরের কবিখ্যাতি অযৌক্তিক এবং কাব্য অসার্থক? অন্ততঃ Rolland, Gide এঁদের মতে তো নয়ই।

সংগীত প্রসঙ্গে লেখক সুরকার বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? সুরকার শব্দটা তিনি যদি ইংরেজি Composer শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, অন্তত ভারতীয় মার্গ সংগীতের ক্ষেত্রে সুরকারের কথাই ওঠে না। কারণ আমাদের অধিকাংশ রাগ-রাগিণীকে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলা যায় না। এমন কি তানসেন, বৈজু, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ ইত্যাদি প্রখ্যাত শিল্পীদেরও বিলাতী অর্থে সুরকার বলা চলে না, যদিও এঁদের মধ্যে অনেকেই পুরানো ও প্রচলিত সৃষ্টির জন্য স্বর-পরিবর্তন ও তালমাত্রা বিভাগের পরিবর্তন করে রাগরাগিণীর নূতন রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আর ইউরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের মৌলিক পার্থক্যের জন্য কোন তুলনা এক্ষেত্রে সঙ্গত বলেও মনে হয় না। ভারতীয় প্রাদেশিক ও লোকসংগীতের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টি কোন অংশেই অসার্থক নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ও লোকসংগীতের বিভিন্ন শাখার ছাপ তাঁর সুরে পাওয়া যায়। কর্ণাটকী সুর, মহীশূরী ভজন, পাঞ্জাবি দোহা থেকে আরম্ভ করে বাংলার কীর্তন, বাউল, সারি পর্যন্ত তার অসংখ্য গানে স্থান পেয়েছে। আর সে সুর গ্রহণে যে শুধু অনুকরণ আছে তা নয় আছে নূতন রূপারোপ। ভারতীয় মার্গ সংগীতের ক্ষেত্রে রাগরাগিণী ও তালের অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্যময় কিন্তু সার্থক পরীক্ষা আমরা পাই তাঁর প্রথম দিককার গানে। রাগরাগিণীর বিচিত্র মিশ্রণ আমরা তাঁর একাধিক গানে পেয়েছি। শ্রীরায়ের লেখায় মনে হয় যে, সংগীতক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান যেন শুধুমাত্র তাঁর গানের সংখ্যাধিক্যে। এ ধারণা চিন্তাধারার দীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীরায় আশঙ্কা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবির আখ্যা দিয়ে এদেশে যাঁরা তাঁর গরবে গরবী বিশ্বভূমিকায় তাঁর এ ধরনের মূল্যায়নে সম্ভবত তাঁদের মন উঠবে ভরসা হয় না। এক্ষেত্রে একমাত্র বক্তব্য যে, মূল্যায়ন যেন সৎ ও সত্য হয়। এটাই স্বাভাবিক যে শিল্প-সাহিত্যের একজন মহান শিল্পী সেই ক্ষেত্রের আরেকজন মহান শিল্পীর কাছে নিখাদ পরিপূর্ণ মূল্যায়ন পাবেন। নমস্কারান্তে—বিনীত রজতেন্দু মিত্র।

রবীন্দ্র চর্চা

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

এবারে 'দেশের' চতুর্থ সাহিত্য সংখ্যা বেরুল। প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই সুচারু সম্পাদনার পরিচয়। সব কটি সংখ্যাই তথ্যপূর্ণ। রবীন্দ্রচর্চা সংক্রান্ত আলোচনাগুলি প্রণিধানযোগ্য। গত বছর এ আলোচনা শুরু করেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। এবারেও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের অনুরূপ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। উভয়েই সুচিন্তিত কর্মতালিকা পেশ করেছেন। কিন্তু এর থেকে রবীন্দ্রচর্চা এক বছরে কতদূর অগ্রসর হোল জানা গেল কী? কী কী করতে হবে, কী কী করা উচিত—তার তালিকা দিলেন আপনারা। রবীন্দ্রচর্চার গতিপ্রকৃতির কথা কার কাছে জানতে চাইবো? কাকে শুধাবো এক বছরে আমরা কী করলাম। তালিকার কোন অংশের কাজ শুরু হোল, কোন অংশের সাড়া হোল। এ ধরনের আলোচনার মূল্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের কাছে যেমন, গবেষকদের কাছেও তেমন। তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সুরু, দায়িত্ব বর্তেছে আপনাদের ওপর। সে দায়িত্ব স্বীকার ও পালন কী নিরর্থক না অসম্ভব?

শ্রীযুক্ত সিংহ এক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন; সমাধানের ইঙ্গিত দেননি। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনেক জায়গায় হুজুগপ্রমত্ততা দেখা যায়। আমাদের আতিশয্য দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সিংহ মনে করেন বর্তমানে সবক্ষেত্রেই একটি শুদ্ধ মানসিক মেজাজ উপস্থিত হয়েছে। হয়ত হয়েছে। ভিন্ন মতের লোকও আছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষেও শ্রীযুক্ত সিংহের ধারণা সত্য কী? বাঙলার বাইরে অনেক শক্তিশালী রুচিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছেন, স্বীকার করি। এদের কথা বাদ দিই। ছোট ছোট অনেক দল, সমিতি, ক্লাব রয়েছেন। এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাঁদের রবীন্দ্রভক্তি কতটা জ্ঞানানের খাতিরে, কতটা অন্তরের অনুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। অনেক সময় এঁরা কর্তা হন, উপদেষ্টা হন, পরিচালক হন। এঁদের উৎসবে বহুক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে অপটুতা মেলে। নিষ্ঠার অভাব থাকে। কবিগুরুর গান আর নাটক শেষে রুচিস্পর্শহীন বিচিত্রানুষ্ঠানে দাঁড়ায়। অবাঙালী রবীন্দ্রপ্রেমীরা নিমন্ত্রিত হন। এঁদের তুষ্ট করা কঠিন নয়। তার ওপর ভদ্রতা আছে। এ ধরনের রবীন্দ্রসংস্কৃতি সম্ভোগ তাঁদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কী না জানিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করার সময় আসেনি? আপাতত বিভিন্ন শহরের আশ্রমিক সংঘ এ বিষয়ে সচেতন হতে পারেন। যেখানে সংঘের অস্তিত্ব নেই, অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী বিশিষ্ট কঠোর হতে পারেন। তাতে অপপ্রচার হয়ত কমবে। কিন্তু সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থা কী হবে? ভ্রাম্যমান দল কিছু কাজ করবেন হয়ত। বিদগ্ধ রবীন্দ্ররসিকেরা আরো প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সিংহ ও শ্রীযুক্ত বিশী কেউই ছবির কথা বলেননি। যাই হোক, রুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে বাস করতে সব বাঙালীরই সাধ। কিছু ছবি কয়েকখানা বই, সামান্য ফুল পেলেই খুশী। রুচিভেদে পরিমাণভেদ। গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, রবীন্দ্র, নন্দলালের ছবি দুষ্প্রাপ্য। যামিনী রায়ের ছবিও প্রায় তাই। তার ওপর সংগ্রহের প্রশ্ন, ভাল মন্দ, আসল নকল। আর্থিক অসামর্থ্য। এঁদের বিশিষ্ট ছবিগুলির প্রিন্ট হয় না? সুলভে পরিবেশন করা যায় না? বিশ্বভারতী পত্রিকায় কিছু কিছু ছবি ছাপা হত। তার মান প্রশংসনীয় নয়। আকৃতি সংরক্ষণযোগ্য নয়। Unesco থেকে অজন্তা ও মিশরের কিছু ছবি ছাপা হয়েছে। উত্তম ছাপা। মূল্য সাধারণের আয়ত্তাতীত। বহুত একত্র বলে। মহারথীদের ছবি পৃথকভাবে ছাপালে মূল্য বৃদ্ধি হবে না, ক্রেতা বাছতেও অসুবিধা হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরা এ প্রস্তাবটা বিবেচনা করবেন কী? কার্যকরী হলে অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ভবিষ্যতে গ্রাহকদের বিজ্ঞাপনে টানা যেতে পারে। আর বাজার শুধু বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ হবে না, দুনিয়াজোড়া হবে।

বহু বিদেশী মনীষী নিজেদের ভাষায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। সেগুলির যথাসম্ভব সংগ্রহ ও (ইংরেজী) বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করা যায় না? শুনেছি বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কিছু কিছু উপাদান আছে। কাজ সহজ নয়। আরও দুরূহ কাজ হচ্ছে বিশ্বভ্রমণকালীন বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কবিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংগ্রহ। কাজ দুরূহ বটে কিন্তু বিশ্বভারতী সচেষ্ট হলে একেবারে অসম্ভব বোধ হয় না। নমস্কার। বিনীত—নবকুমার নাথ, বৈঁচিগ্রাম, হুগলী।

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরকে কথিত এবং জি মেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

॥ ২৩ ॥

আমার জীবন একটা নয়, তিনটে, সেকথা আগেই একবার বলেছি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সব শেরপাই তিনটে জীবনের অধিকারী। তাদের একটা জীবন ঘরকন্নার একটা ধর্মের, আর বাকীটা কর্মের। অতীত জীবনে আমরা সবাই চাষবাস করতাম। পশু চরাতাম। শোলো-খুম্বুতে এখনও অধিকাংশ লোক এই কাজই করছে। বর্তমানে ছোট বড় ব্যবসা-দারও আমাদের মধ্যে অনেক রয়েছে। আর ভবিষ্যতে আমি তো মনে করি, আমরা ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, পণ্ডিত, প্রায় সব কিছুই হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু যে কাজ করে পৃথিবীময় আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সেই পাহাড়ে চড়ার কাজ পেলে আমাদের অধিকাংশ লোকই আর কিছু চাইবে না বলে আমার মনে হয়। আমরা পাহাড়ের মজুর হিসেবেই থাকতে চাই। পাহাড়ের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, পাহাড়কে আমরা যা দিয়েছি, তা এতই মূল্যবান যে, তা হারানো আমাদের পক্ষে এক মহা ক্ষতি। হ্যাঁ, ক্ষতিই। অন্তত আমি আমার কায়মনে সেকথা বিশ্বাস করি।

কোন শেরপা ছেলে যখন উপরের দিকে চায়, তখন সে শুধু পাহাড় পর্বতই দেখে। আর সে যখন নিচের দিকে চায়, তখন সে কি দেখে? একটা বোঝা। সে বোঝাটা পিঠে তুলে নেয়, তারপর সোজা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। সোজা অবশ্য যেতে পারে না। তাকে চড়াই উৎরাই ভাঙ্গাতে হয়। এই হোল তার জীবন। বোঝার ভার পিঠে চাপিয়ে চড়াই উৎরাই ভাঙ্গা। তার পক্ষে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তার কাছে এটা অস্বাভাবিকও কিছু ঠেকে না। বরং এইটেই তার কাছে খুব স্বাভাবিক। তার কাছে বোঝাটা এমন কিছু নয়, যা নিয়ে তাকে বিব্রত হতে হয়। সে বোঝার সঙ্গে লড়াই করে না, ঝগড়াও করে না। বোঝাটা তার কাছে প্রায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই সামিল। বোঝাটা একটা ফিতে দিয়ে বেঁধে সেই ফিতেটা আমরা কপালে আটকে নিই। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এইটেই হোল বোঝা বইবার সব থেকে ভাল উপায়। আর ঠিক এই কায়দাটি অনুসরণ করে যে কোন শেরপাই সমতলে প্রায় একশ পাউণ্ডেরও উপর বোঝা বয়ে নিতে পারে। খাড়া পাহাড়ে সত্তর আশি পাউণ্ড বোঝা তারা তো অক্লেশেই বয়ে নেয়। আমাকেও সারা জীবন ধরে, সাম্প্রতিক কয়েকটি বড় বড় অভিযান ছাড়া, এইভাবেই বোঝা বইতে হয়েছে। যখন সর্দার হয়েছি, কিংবা যখন অভিযানের সদস্যের কাজ করেছি, তখন আরো নানারকম দায়িত্বের ভার আমাকে বইতে হয়েছে। কাজেই সাধারণ বোঝা আমি বয়েছি অন্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। আর খুব উঁচুতে উঠে গিয়ে দেখেছি যে, সাহেবদের মতো বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে একটু আরাম পাওয়া যায়।

কোন অভিযানে গিয়ে শেরপারা কি করে, কি তাদের করতে হয়, সে সম্পর্কে অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আলপস্ পাহাড়ের গাইড্‌দের কাজ যেরকম, হিমালয়ের শেরপাদের কাজ সেরকম নয়। আলপসের গাইড্‌রা বহুবার আলপসের উপর উঠেছেন, পথঘাট তাঁদের জানা, তাই নতুন লোককে সহজেই তাঁরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু হিমালয়ের চেহারা একেবারে অন্যরকম। এখানে যেসব পাহাড়ে চড়তে যাওয়া হয়, তাতে আগে আর কেউ চড়েনি। সেসব পাহাড়ের অধি-

নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে নাংপালা অতিক্রম করে চলেছে মোটবাহী ইয়াক

মাথায় বোঝা শেরপারা এগিয়ে চলে

সন্ধিও তাদের অজানা। তাছাড়া, ক করে পাহাড়ে চড়তে হয় তা লোককে শেখাবার মত বিদ্যে আমাদের কারোর নেই। সে শিক্ষাও আমাদের কেউ দেয়নি। অবশ্য বড় বড় অভিযানে গিয়ে তার জন্যে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। হয়নি, তার কারণ যেসব সাহেবের সঙ্গে আমরা এই সব অভিযানে গিয়েছি তাঁরা সব হলেন এক একজন দিগ্বিজয়ী পাহাড় চড়িয়ে। শুরুতে আমরা ছিলাম নবিশ, মোট বওয়া ছাড়া আর অন্য কাজ ছিল না। অনেকদিন ধরে কুলি ছাড়া আমাদের আর কিছু বলা হোত না: 'কুলি'। আমরা এশিয়াবাসীরা আজকাল আর একথাটা মোটেই সহ্য করতে পারি না। অভ্যাসবশে কিংবা কাউকে ক্ষ্যাপাবার জন্য কথাটা এখনো আমরা ব্যবহার করি বটে, নিতান্ত নিজেদের মধ্যেই করি. (অবশ্য নিজেদের বেলায় এই বিশেষণটা কখনোই বসাই না, বসাই অন্যদের বেলায়)। কিন্তু এই কথাটার মানে এত হীন, এমন দাসত্ব-বোধক যে, সাহেবদের কেউ কথাটা বলা মাত্র আমাদের গায়ে এসে লাগে। কিন্তু বেশ অনেকদিন হল এই কথাটা নিয়ে শেরপাদের আর পীড়িত হতে হয় না। আমাদের কুলি বলে ডাকা দূরে থাক, ডাকার চিন্তাটাও লোকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। আপনারা হয়তো পড়ে থাকবেন, "স্থানীয় কুলিদের বিদায় করে দেওয়া হল, কিন্তু শেরপারা চলতে থাকলো।" কিংবা "বেস্ ক্যাম্প থেকে কুলিরা নেমে এল, শেরপারা আরও উঁচুতে উঠে গেল।" এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেছে আর আমাদের সুনাম, আমাদের সম্মান, আর আমাদের গর্ব আমরা একটু একটু করে রোজগার করেছি।

তা বলে বলছি না যে, মোট আমাদের আর বইতেই হয় না। আমরা সকলের চেয়ে বেশী, সবার থেকে ভারি মোট বয়ে, সবার থেকে উঁচুতে যে উঠতে পারি, পৃথিবীর আর কোন লোক যে এ ব্যাপারে আমাদের সমকক্ষ নেই, তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। গৌরব করে থাকি। সাধারণ লোকের মত পাহাড়কে আমরা ভয় করি না। বোঝা পিঠে ফেলে চলে যাই হিমবাহ পার হয়ে, হিমপ্রপাত পেরিয়ে। উঠে যাই গিরিশিরার উপরে। উঠে যাই উঁচু উঁচু পাহাড়ের তুঙ্গে। তুষার ঝড় আমাদের উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যায়, আমাদের মাথার উপরে তুষারের ধস নেমে আসে। এসব কিছু উপেক্ষা করে আমরা চলি। যাই, মানুষের সাধ্যের একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত। সম্প্রতি পাকিস্থানে যে কয়টি অভিযান হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে যেসব জায়গায় শেরপাদের যেতে দেওয়া হয়নি, সেগুলো ছাড়া এই বিশ শতকে হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে যেক'টা বড়সড় অভিযান হয়েছে তার প্রত্যেকটাতে শেরপারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে. সব থেকে উঁচু জায়গায় শিবির স্থাপন করেছে, আর বহু ক্ষেত্রে সাহেবদের সঙ্গে গিরিচূড়াতেও উঠে গেছে।

শুধুমাত্র এই কাজেই আমরা আটকে থাকিনি, এত বছর ধরে নানা অভিযানের সঙ্গী হয়ে হয়ে আমরা পাহাড় চড়বার পদ্ধতিও শিখে নিয়েছি, দক্ষতা অর্জন করেছি। এখন আমরা অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারি। পথ খুঁজে বের করতে পারি, পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটতে পারি। দড়ি-দড়াকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারি, আর পারি কোথায় শিবির স্থাপন করা যেতে পারে, সেই পছন্দসই জায়গাটি নির্বাচন করতে। আমাদের সাহেবদের খিদমত্ কারাটাও আমরা আমাদের কাজের মধ্যে বলে গণ্য করি। তাঁদের জন্য রান্না করি, চা বানিয়ে তাঁদের খেতে দিই, তাঁদের সাজ-সরঞ্জাম ঠিকঠাক আছে কিনা তার তদারক করি। আর তাঁবুর মধ্যে সাহেবরা একটু আরামে যাতে থাকতে পারেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখি। এগুলো করতে যে আমরা বাধ্য তা নয়। এসব করতে আমাদের ভাল লাগে তাই করি। সাহেবরা মনিব আর আমরা চাকর, সম্পর্কটা ঠিক এরকম নয়। আমরা আর সাহেবরা একে অন্যের সঙ্গী। এইসব কাজের পরিবর্তে আমরা পুরস্কার পাই। আমাদের বেতন একটু একটু করে বাড়তে থাকে। সাহেবদের কাছ থেকে আমরা ভদ্র ব্যবহার পাই। সম্মান পাই।

যারা সব থেকে উঁচুতে উঠতে পারে, টাইগার পদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের সম্মান দেবার জন্যে। আমাদের মধ্যে থেকে সর্দারও নিয়োগ করা হয়। এই সর্দারকে যে-কর্তৃত্ব ও যে-দায়িত্ব পালন করতে হয় তার সঙ্গে সেনা বিভাগের সার্জেণ্ট মেজরের তুলনা চলে। এ সবই ভালো লাগে। আমরা খুশী হই। নিজের কাজ অন্যের স্বীকৃতি পাক, এটা সব লোকেই চায়। আমরা যে কাজ করি আমরা তা করতে চাই বলেই করি। তা হাসিল করবার জন্যেই আমরা জন্মেছি। সে কাজ আমরা ভালও বাসি।

শেরপাদের জীবনে হিমালয়ান ক্লাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বহু বছর ধরে এই ক্লাব শেরপাদের ভাল মন্দর সঙ্গে জড়িত। এই ক্লাবের সদস্য বেশীর ভাগই ইংরেজ। কিছু ভারতীয় আর অন্যান্য দেশের লোকও এর সদস্য আছেন। এরা সবাই পর্বতারোহণ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই ক্লাব নিজে কখনও কোন অভিযান সংগঠন করেনি কিন্তু অভিযান সংক্রান্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্তের অনেক কিছুই তাকে করতে হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটা অভিযানেরই এ যেন এক 'ক্লিয়ারিং হাউস'। দার্জিলিঙে এই ক্লাবে একজন সেক্রেটারী থাকেন। সব শেরপাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় রাখতে হয়। কোন অভিযাত্রী দল তাঁকে যখন শেরপাদের নিয়োগ করবার জন্য লেখে তখন তিনি আমাদের ডাকেন। তার-পর আমাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নেন। তিনি আমাদের মাইনে পত্তর

* অনেক সময় কোনো কোনো অভিযাত্রী দলের সদস্যারা তাদের চেনাশুনো শেরপাদের সরাসরি নিয়োগ করে থাকেন, আবার কখন কখন কর্মপাদের মত ঠিকাদাররাও শেরপাদের যোগান দিয়ে থাকে।

আর চাকরীর শর্ত ঠিক করে দেন, যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন আর প্রয়োজন হলে দুই পক্ষেরই ব্যবসায়িক প্রতিনিধির কাজ করে থাকেন। সেই প্রথম আমি যখন শোলোখুম্বু থেকে দার্জিলিঙ চলে আসি, প্রথম এভারেস্ট অভিযানে যাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি, তখন এই ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ কিড্। মিঃ লুডউইগ্ ক্রানেক্ আসেন তারপর। ক্রানেক্ সাহেব অনেক বছর ধরে এই ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনিই প্রথম শেরপাদের কাজকর্মের এক খতিয়ান রাখতে শুরু করেন। বর্তমানে যিনি সেক্রেটারী, তিনি এক মেমসাহেব। তাঁর নাম মিসেস্ জিল্ হেন্ডারসন। তিনি এক বৃটিশ চা-কর সাহেবের বউ। যুদ্ধের পর যে সমস্ত বড় বড় অভিযান হয়েছে সে সবের ব্যবস্থা বন্দোবস্তের সংগে তিনি জড়িত ছিলেন।

এই ক্লাব ও তার সেক্রেটারীরা অনেক ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে শেরপাদের মধ্যে নানারকম অভিযোগ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা এখন আমাদের নিজেদের একটা সংগঠন গড়ে তুলেছি। ১৯২০ সালে আমাদের একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তার নাম ছিল, 'শেরপা বৌদ্ধ এসোসিয়েশন'। তবে সেটা আমাদের ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তিরিশ' দশকে আর যুদ্ধের বছরগুলোয় ওটার কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না। কিছু করেও নি। সম্প্রতি ওটাকে আবার জাগিয়ে তোলা হয়েছে। ওর নাম থেকে বৌদ্ধ কথাটাও ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এর কাজকর্ম আর ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ নেই, পার্থিব যে সব জিনিসের উপর আমাদের সম্প্রদায়ের ভালোমন্দ নির্ভর করে, এখন এটা তারই দেখাশোনা করছে। নানা কমিটির মারফৎ নানা সমস্যা আর নানাবিধ প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা হয়; অবশ্য এর বেশীর ভাগ কাজেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সমাজের একটা উন্নয়ন করা। ধরুন, কোনো পরিবারের রোজগেরে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, দু' সপ্তাহ কি তারও বেশী সময় তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হোল, তখন আমাদের এই এসোসিয়েশন্ তাকে সাহায্য করে। যতদিন না সে ভাল

সামনে বরফের খাড়া পাহাড়

হয়ে উঠছে ততদিন তাকে কিছু টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কেউ মারা গেলে তার সৎকারের জন্য আমাদের এই এসোসিয়েশন থেকে কুড়ি টাকা করে দেওয়া হয়। এখন আবার এটা 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' আর ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। যেসব শেরপা অভিযানে যায় তাদের বেতন যাতে হিমালয়ান ক্লাব থেকে বেঁধে দেওয়া হার থেকে বেশী হয়, তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আর চেষ্টা করা হচ্ছে, অভিযানে গিয়ে কোন দুর্ঘটনায় পড়ে কেউ যদি মারা যায় বা জখম হয় তার জন্য একটা ভালো ক্ষতিপূরণ যাতে আদায় হয়, তার। এই এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে বিরাশি জন। আমি তার সভাপতি। আমি মনে করি, আমরা এই এসোসিয়েশনের মারফতে আমাদের মঙ্গল করতে পারব।

অন্যান্য লোকের মত আমরাও খাওয়া পরার মত ব্যবহারিক বিষয়েই বেশী মনোযোগী। আমরাও আমাদের পরিবারবর্গকে খাওয়াতে চাই, আমাদের ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে চাই, দেনা শোধ করতে চাই আর কিছু সঞ্চয়ও করতে চাই বুড়ো বয়সের জন্য। কিন্তু ঐ যা আগে বলেছি। আমরা আমাদের কাজকে শুধুমাত্র রুজি-রোজগারের উপায় হিসেবেই দেখি না। তার চেয়েও বড় কিছু বলে মনে করি। হয়তো, একথা বলা ঠিক নয়, তবুও বলতে হয় পরিষ্কার একটা ধারণা রাখবার জন্যে। কারণ পাহাড়ে সেই উঁচু জায়গায় উঠে শেরপারা যেসব কাজ করেছে, কেউ কি শুধুমাত্র টাকা রোজগারের জন্যই তাই করে?

আমার মনে পড়েছে পুরানো দিনের সেই সব বড় বড় অভিযানের কথা। ১৯০০ সালে আমাদের জাতের লোকরা প্রথম গিয়েছিল অভিযানে। হিমালয়ের বড় বড় চূড়াগুলি আবিষ্কারকর্তাদের সঙ্গীই তারা হয়েছিল। তারপর বিশ' দশকে এভারেস্টে। ২৬,০০০ হাজার ফুট উঁচুতে আর তারও কিছু উপরে তারা বোঝা নিয়ে উঠেছিল। সেইকালে যাঁরা সব থেকে উঁচুতে উঠেছিলেন, এরা উঠেছিল তারও দু' হাজার ফুট উপরে। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ওঠবার জন্যে শেরপাদের টাকা দেওয়া হয়, তেমন কথা কখনও কেউ বলেনি। তা সত্ত্বেও শেরপারা তিরিশ' দশকে দু' দুবার তাদের সাহেবদের সঙ্গে এমন সব উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিল, আগে যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি। টাইগার লেওয়া আর ৎসেনা বো প্রথম উঠেছিল জনসঙ্ চূড়ায়। পরে, দ্বিতীয়বার লেওয়া উঠেছিল কামেতে'র চূড়ায়। তার পা শীতে জমে গিয়েছিল। পরে তার গোড়ালির অনেকখানিই তাকে হারাতে হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ে অভিযান হয়েছে—কে-২, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নাঙ্গা পর্বত, নন্দাদেবী, অন্নপূর্ণা, আরও আরও। আর এই প্রত্যেক অভিযানেই আমাদের শেরপাদের পদচিহ্ন পড়েছে একেবারে উচ্চতম শিবিরে। ১৯৩৯ সালে কে-২'তে পাসাঙ্ দাওয়া লামা, আমেরিকান সাহেব ফ্রিজ উইসনার-এর সঙ্গে উঠে গিয়েছিল। তারা পৌঁচেছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শিখরের ৭৫০ ফুটের মধ্যে। আর তার পনের বছর পরে ১৯৫৪ সালে এক অস্ট্রিয়ান দলের সঙ্গে সে উঠেছিল চোওয়ূর শিখরে। সপ্তমতম শৃঙ্গে। ১৯৫৩ সালে এভারেস্টে, দক্ষিণ 'কল'-এ পৌঁছেছিলাম আমরা সতেরজন। সে প্রায় ২৬,০০০ হাজার ফুট উঁচুতে। আমি আর একজন উঠেছিলাম আরও কিছু পরে।

মনে পড়ে সেইসব শেরপাদের কথা, যারা অভিযানে গিয়ে আর ফেরেনি। এই হিমালয়ে আমরা যত মরেছি তত আর কেউ না। যত জাতের লোক এই হিমালয়ে এসে প্রাণ হারিয়েছে, আমাদের মৃত লোকদের সংখ্যা তাদের সকলের চেয়ে ঢের ঢের বেশী। ১৯২২ সালে এভারেস্টে সাতজন শেরপা প্রাণ হারিয়েছে। ১৯৩৪ আর '৩৭ সালে নাঙ্গা পর্বতে মরেছে পনেরজন। আরও নানা জায়গায় ডজনে ডজনে। কখনও একা একা, কখনও দু'য়ে দু'য়ে, কখনও বা দু'তিনজন এক সঙ্গে। মৃত্যু হানা মেরেছে নানাভাবে। কখনও ঝড়ে, কখনও তুষার ধসে চাপা পড়ে, কখনও পা ফসকে পড়ে, কখনও বা অসহ্য শীতে জমে, কখনও বা নিরতিশয় অবসাদে এদের জীবন দীপ নিভে গেছে। সচরাচর অবশ্য দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বীরত্বের জন্য, সাহসের জন্য আত্মত্যাগের জন্যও এরা মৃত্যুবরণ করেছে এমন উদাহরণও অনেক পাওয়া যাবে। কে ভুলবে গেলে-র কথা? সেই যে-শেরপা নাঙ্গা পর্বতে, উইলি মেরকল্ সাহেবকে ছেড়ে আসেনি। কোন শেরপাই তার কথা ভুলবে না। তেমনি কেউ ভুলবে না পাসাঙ্ কিকুলি-র কথা। কে-২'তে যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৩০ সালে আমাদের যে কয়জন শ্রেষ্ঠ শেরপা ছিল, কিকুলি তাদের অন্যতম। তার আমলে যত বড় বড় অভিযান হয়েছিল, সে তার প্রায় সবকটাতেই যোগ দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে, কে-২ শৃঙ্গে যে অভিযান আমেরিকানরা চালিয়েছিল, কিকুলি-ই ছিল সেই দলের সর্দার। এই অভিযানেই উইস্নার্ আর পাসাঙ দাওয়া লামা অল্পের জন্য চূড়ায় উঠতে পারেনি। পরে, নেবে আসবার সময় একটার পর একটা গোলমালে পড়তে হয়েছিল এই দলটাকে। ডাডলিং উলফ্ বলে এক সাহেব খুব উঁচুতে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একা। 'বেস্ ক্যাম্পে' সকলে নেমে এলেও উনি আর এসে পৌঁছতে পারেন নি। সাহেবরা সবাই পরিশ্রমে কাতর। অবসাদে আচ্ছন্ন। উপরে ফের ওঠবার সামর্থ্য তাদের কারোরই ছিল না। আবহাওয়া ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিকুলি দমলো না। সে শেরিঙ বলে এক শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে একদিনে ৭,০০০ হাজার ফুট পাহাড় ডিঙিয়ে ষষ্ঠ শিবিরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। পাহাড় চড়ার ইতিহাসে আর কেউ বোধহয় একটানা এত লম্বা পাড়ি মারেনি। পরদিন কিকুলি ষষ্ঠ শিবিরে যে দুইজন শেরপা ছিল তাদের সঙ্গে উঠে গেল সপ্তম শিবিরে, যেখানে উলফ সাহেব পড়েছিলেন। সাহেব তখনও বেঁচেছিলেন। কিন্তু নেমে আসবার মত সামর্থ্য তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। সপ্তম শিবিরটাও আবার এত ছোট যে, শেরপাদের ঘুমোবার মত জায়গা সেখানে ছিল না। তাই তারা সেই রাতে আবার নেমে এল ষষ্ঠ শিবিরে। কিকুলি হাল ছাড়লো না। সে উলফ সাহেবকে নিচে নামিয়ে আনবেই। তাই পরদিন সকালে শেরপা দুজনকে নিয়ে সে আবার উঠে গেল উপরে। উঠে গেল, কিন্তু আর ফিরল না। ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হোল। সেই চতুর্থ শেরপাটি কোনক্রমে ওই শিবির থেকে 'বেস ক্যাম্পে' ফিরে এল। আর সেই বীর 'কিকুলি' আর তার দুজন সঙ্গী অন্য একটি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় দিলো নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে।

এই সব কথা সতত আমার মনে পড়ে। আর আমিও যে শেরপা, সে কথা ভেবে আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আর তাই আমার মনে হয়, যাঁরা এসব কথা জানতে পারবেন, তাঁরা কখনই বিশ্বাস করবেন না যে, শুধু তুচ্ছ দুটো টাকার জন্য আমরা পাহাড়ের উপরে ছুটি।

[ক্রমশ]

হিমালয় পরিক্রমা

দেবতাত্মা হিমালয়। প্রবোধকুমার সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। সাত টাকা।

হিমালয়ের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে স্বতই একটি উপমা মনে আসে। মনে হয়, যেন নিদ্রিত শিশুসন্তানের শিয়রে অতন্দ্র অটল প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছেন তার স্নেহময় পিতা। যেন কোনও অশুভ, কোনও অমঙ্গল তাঁর সন্তানকে স্পর্শ করতে না পারে। ভারতবর্ষ নিদ্রিত দেশ নয়। শিশু-দেশও নয়। বস্তুত, পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড যখন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, সেই সুপ্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের কণ্ঠে জাগরণের মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। তবুও এই উপমাটি মনে আসে। কেন আসে, বলা খুব কঠিন নয়।

প্রথমত, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সাঁচাই এই সুউচ্চ পর্বতমালার দ্বারা ভারতের উত্তর-সীমান্তে এক প্রাকৃতিক রক্ষা-প্রাচীর রচিত হয়েছে। হিমালয়কে তাই যদি আমরা আমাদের নিরাপত্তাবিধায়ক দেবতা বলে মনে করি, তা আদৌ অসংগত হয় না। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের কবিকল্পনাও এই তুষারমৌলি গিরিশ্রেণীকে এক পিতৃপ্রতিম দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেই তৃপ্ত হয়েছিল। যুগযুগান্ত ধরে ভারতভূমি তাঁর স্নেহদৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়েছে। নগাধিরাজের বিপুল হিমপুঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে অসংখ্য নদনদী, তারই জলধারায় উর্বর হয়েছে ভারতবর্ষের মৃত্তিকা, সমৃদ্ধি লাভ করেছে এই ভূখণ্ড, এবং সংসার-জীবনের সর্বকর্ম সমাপনের পর এ-দেশের মানুষ আবার হিমালয়ের স্নেহ ক্রোড়ে গিয়েই তার ঈপ্সিত শান্তির সন্ধান লাভ করতে চেয়েছে। যদি বলি যে, ভারতবাসীর চারিত্রিক প্রবণতা অনেকাংশে এই পর্বতমালার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তো সে-উক্তি অযৌক্তিক হবে না। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের শিল্পবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য এইখানেই যে, এই হিমবন্ত গিরিমালার প্রত্যক্ষ রূপের বর্ণনা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। ভারত-আত্মার উপরে হিমালয়ের সর্ববিসারী প্রভাবের মৌল রহস্যটিকেও তিনি উন্মোচিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি তাই শুধু এর বহিঃসৌন্দর্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকেনি, বহিঃসৌন্দর্যের অন্তরালবর্তী বিপুলগম্ভীর সেই প্রাণৈশ্বর্যের উৎসটিকেও তিনি খুঁজতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষের আত্মিক চেতনার উপরে যার প্রভাব প্রায় অন্তহীন। গ্রন্থের "পূর্বভাষ"-এ তাই তিনি বলছেন, "আমার দৃষ্টি ছিল হিমালয়ের সামগ্রিক চেহারাটার দিকে। এর আনুপূর্বিক বিশালতাকে আমার মনের মধ্যে ধারণ করব, এই ছিল লক্ষ্য। ......এই গ্রন্থে সমগ্র হিমালয়কে তার স্বভাব ও সৌন্দর্যসহ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে।......বীরের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, সন্ন্যাসীর একাগ্র তপশ্চর্যায়, তীর্থযাত্রিদলের পূজাবন্দনায়, কবি শিল্পী দার্শনিকের সৌন্দর্যকল্পনায়—দেবতাত্মা হিমালয় মানুষের চিরবিস্ময়। ......হিমালয়ের আশ্চর্য জগতে আমাদের মনের ছোট বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত,—সেই কারণে বাহিরের থেকে দৃষ্টি ফিরে আসে আপন অন্তরে; সেই দৃষ্টি আনন্দের পরম আস্বাদে মধুর।......আধুনিক কালের জটিল, বঞ্চাবিক্ষুব্ধ এবং ক্লান্তিকর জীবনযাত্রার থেকে যারা মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়, হিমালয় তাদের পক্ষে একটি পরম আশ্রয়। হিমালয়ের অরণ্য-জটলা তার মাটি পাথর তুষার নিক্ষয় ... মিলিয়ে আমার চেতনার জড়ত্বকে ... মুক্তি দিয়েছে। ....হিমালয়ের ডাক দুঃখ ... অনেক সময়ে, কিন্তু দুঃখের মধ্যে প্রাণ-পার্বতীর উদ্বোধনও ঘটায়।"

বাংলা ভাষায় সার্থক ভ্রমণ-কাহিনীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি

অদ্যাবধি যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে, সংখ্যায় তাঁরা সামান্য। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল সেই স্বল্পসংখ্যকদেরই একজন, এবং এ-ব্যাপারে তিনি যে অন্যতম পথিকৃৎ, তাতেও সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু এই গ্রন্থখানিকে ঠিক ভ্রমণ-কাহিনীর পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা, তা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। তার কারণ, গ্রন্থখানি যদিও ভ্রমণভিত্তিক, স্থূল কোনও কাহিনীর অবতারণা করে সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে এখানে রংদার করে তুলবার চেষ্টা করা হয়নি, অধিকাংশ ভ্রমণ-কাহিনীতেই সচরাচর যা করা হয়ে থাকে। স্বীকার করাই ভাল, কাহিনী এ-বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয় এবং তেমন কোনও আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও লেখকের ছিল না। ঘটনার স্থূলতাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি, তথ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তথ্যসর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দেননি, ঘটনা ও তথ্যের মর্মস্থ তত্ত্ব-রসটিকেই তিনি উদ্ধার করে আনতে চেয়েছেন। ফলত, এ-গ্রন্থের সর্বত্রই এমন একটি কাব্যময় সৌন্দর্যবোধের সহজ সঞ্চার ঘটেছে, ভ্রমণ-কাহিনীতে তো বটেই, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যা দুর্লভ এবং পাঠক-চিত্ত যার সান্নিধ্যে এসে একটি গভীর তৃপ্তি পেয়ে থাকে। লেখক তাঁর "পূর্বভাষণ"-এ বলেছেন, "সঠিক তীর্থযাত্রী" তিনি নন। কিন্তু গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করবার পর আমাদের মনে হয়েছে, এক আশ্চর্য তীর্থ-পরিক্রমাতেই তিনি বহির্গত হয়েছিলেন। সে-তীর্থ ধর্মের না হক, সৌন্দর্যের। এবং আনন্দেরও। আর, ধর্মেরই বা নয় কেন। ধর্ম বলতে কি শুধু আচারসর্বস্ব পুজো-পার্বণ বোঝায়? আর-কিছু বোঝায় না? অন্যতর কোনও অর্থ কি তার নেই? যদি থাকে—এবং আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি—তবে সেই অন্যতর, মহত্তর অর্থে লেখকও যে হিমালয়ের দুর্গম শৈলমালায়, তার সুন্দর অরণ্যমেখলায়, তার নির্ঝরের কলহাস্যে ও তার ধ্যানমৌন প্রশান্তির মধ্যে এক অনির্বচনীয় ধর্মতীর্থেরই সন্ধান লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ করি না। সেই তীর্থের যিনি দেবতা, তিনি সৌন্দর্যের দেবতা। শিল্পমাত্রেরই তিনি উপাস্য। "দেবতাত্মা হিমালয়"-এ লেখক সেই সৌন্দর্য-দেবতার বন্দনা-গান গেয়েছেন।

পাঠকের পুণ্য ফলশ্রুতির। হিমালয়ের আহ্বান যিনি শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও সেই আহ্বানে সাড়া দেবার সৌভাগ্য যাঁর হয়নি, এ-গ্রন্থ তাঁর দৃষ্টির সামনে মহৈশ্বর্যময় এক অলৌকিক জগতের দুয়ার খুলে দেবে। লেখকের ভাষা কখনও অন্তরঙ্গ, কখনও গম্ভীর। এবং বর্ণনাও তাঁর অনুপম। "দেবতাত্মা হিমালয়"-এ তাঁর প্রবীণ শিল্পবুদ্ধিরই এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ-গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন শ্রীজওহরলাল নেহরু। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, "হিমালয়ের...মেজাজ-মর্জির সঙ্গে যাঁরা আপন আপন সুর মেলাতে পারেন, তাঁরাই হিমালয়ের রসগ্রহণে সমর্থ হন। এ-গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল আমাদের এই মহান বন্ধু ও সখার সুরে নিজ অন্তরের সুর নিবিড়ভাবে মিলিয়েছেন—এ-কথা তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।"

"দেবতাত্মা হিমালয়"-এর মুদ্রণ এবং অঙ্গ-সজ্জা অত্যন্তই মনোরম। প্রচুর আলোকচিত্র থাকায় গ্রন্থের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থের এটি প্রথম খণ্ড। এ-খণ্ড "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

শিকার কাহিনী

শিকারী জীবন—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ; ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

'শিকারী জীবন'-এর মতন একখানি বই বর্তমানে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে শিকার-কাহিনী নিয়ে যে অন্য কোনও বই লেখা হয়নি, এমন নয়। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, ব্যারিস্টার কুমুদ চৌধুরী খ্যাতনামা ও সাহসী শিকারী ছিলেন এবং তাঁদের কীর্তিকলাপের কথা অবিদিত না হলেও ঠিক এমনভাবে পরিবেশিত হয়নি বলে অনেক লোক তাঁদের শিকারী জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। এইখানেই প্রকাশকের দায়িত্ব ও সহযোগিতার প্রশ্ন আসে। যদি পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, লোভনীয় সজ্জা এবং ন্যায্য মূল্য দিয়ে শিকারের কাহিনী প্রকাশ করা হয়, তা হলে সে বই জনপ্রিয় হতে বাধ্য। লেখক ও প্রকাশক এ ক্ষেত্রে একটি অভাব পূর্ণ করলেন। বাঙালী কেবল বেড়ালের মতন মৎস্য শিকারী ও পক্ষিমাংসভোজী হলে অপবাদের মাত্রা বাড়তে থাকবে। ঘরে বসে কিংবা অবসরমত বিছানায় গড়িয়ে অন্তত জঙ্গলের বেড়াল নিয়ে লেখা বই পড়ুক। প্রসঙ্গত শিকার সংক্রান্ত ইংরেজী সাহিত্যের কথা এসে পড়ে। ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায় বন্য-হস্তী, দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোরদর্শন কুমীর, ব্রহ্ম ও শ্যাম অঞ্চলে মুক্তাদন্ত শঙ্খচূড় ইত্যাদি জীবজন্তুর শিকার নিয়ে কত ভালো বই আছে। 'দী ম্যান-ঈটার্স অভ সাভো' আর হালফিল-লেখা কুমায়ুনের নরখাদক তো ক্লাসিকের পর্যায়েই পড়ে। ব্রেজিলের বিপৎ-সঙ্কুল Matto Grosso-তে ইংরেজ লেখক Julian Duguid-এর Green Hell আর ঐ অঞ্চলেই রুশ শিকারী Sasha Siemel-এর পদব্রজে বর্শা নিয়ে জাগুয়ার-শিকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুধু লোমহর্ষক কাহিনী নয়, চিত্তাকর্ষক সাহিত্যও বটে।

লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ শিকারী-জীবন নিয়ে যে বই লিখেছেন তাতে দুর্গম অরণ্যে দুঃসাহসিক কৃতিত্বের কথা না

জানোয়ার, পাখী থেকে কুমীর, বাঘ-ভালুক এবং সেই সূত্রে নানা দৃশ্যের ও জঙ্গলের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। গল্প বলার একটি সহজ ভঙ্গী ও রসিয়ে বলার ক্ষমতা আছে লেখকের। মধ্যে মধ্যে এমন কয়েকটি 'এপিসোড' বা খণ্ডচিত্রের অবতারণা আছে যে, হাস্য সংবরণ করা কঠিন। পঁচিশ টাকায় জীবিত অথবা মৃত ভালুকের সন্ধান, তন্বী দেবী ও বিপুলা দেবী এবং তাঁদের পতি-দেবতার সরস কাহিনী, 'নন্দ ভাজাড় টিকি পিলাটি' নামক উৎকল-সঙ্গীতের নমুনা, সম্ভূতের যমজ সন্তান অদ্ভুত এবং কিম্ভূতের কথা, তাদের সপ্ত পুত্র আর সপ্ত কন্যার বিচিত্র নামকরণ ইত্যাদি দৃশ্য-কাহিনী সত্যই উপভোগ্য। প্রথম অধ্যায় 'পূর্বাভাস' থেকে শেষ অধ্যায় 'হাজারীবাগের বাঘ' পর্যন্ত একটানা পড়ার সুখ ব্যাহত হয় না, এটা কৃতিত্বের কথা। শেষ পৃষ্ঠায় লেখকের পিতৃ-বিয়োগ-দৃশ্য থাকায় লেখার সুরটা ব্যক্তিগত ও ভারি হয়ে উঠেছে। নইলে আগাগোড়াই হালকা সুরে ও বৈঠকী ঢঙে লেখা। এইখানে একটি ত্রুটির উল্লেখ বোধ হয় মার্জনীয়। কোনও কোনও জায়গায় আভিজাত্যের আবরণ ফেলে দিয়ে ডেমোক্রেটিক হবার চেষ্টা যেন একটু বেশি প্রকট। রচনায় আভিজাত্য গুণ, কিন্তু দোষের নয়। দৃষ্টিভঙ্গী ডেমোক্রেটিক হওয়া ভালো, কিন্তু দিলীপকুমার রায়ের মতন naive style-এ রসিকতা, বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস কিছু অশোভন মনে হয়, যেমন ১১৭ পৃষ্ঠায় পুরীর সমুদ্র-বর্ণনার প্যারাগ্রাফটিতে না ফুটেছে প্রকৃতি, না হয়েছে দর্শন।

তবু সমগ্রভাবে বইখানি ঝরঝরে লেখা। শিকারী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক জীবন ও মানবিক স্পর্শ মোটামুটি ভালোই লাগে। অন্তত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

(৮৭।৫৬)

ইতিহাস

রাজা গণেশের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শৈলশ্রী, ১।১।১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩, টাকা।

বাংলার কোন যথার্থ ইতিহাস নেই, এই বলে বহুকাল আমরা হাহাকার করেছি, কিন্তু চিন্তাশীল গবেষকদের তপস্যায় সে-লজ্জা থেকে এতদিনে আমরা মুক্ত হয়েছি। হয়তো বলা চলতে পারে, যে-ব্যাপক উত্থান,সন্ধান ও পরিশ্রমের প্রয়োজন এ-কাজে, তা সব সময়ে সকলের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, কিন্তু তা হলেও আজকাল অনেকেই যে অত্যন্ত উৎসাহে এই দুরূহ কাজে এগিয়ে আসছেন, সেটাই আশার কথা। অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমরা এ-ব্যাপারে জনকয়েক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অধ্যায়কে অংশ ভাগ করে তার সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করছেন কোন কোন ঐতিহাসিক। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ তেমনি একটি প্রচেষ্টারই ফল।

রাজা গণেশের জীবন ও রাজত্ব সম্বন্ধে ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস-গ্রন্থে যা জানা যায়, তা নিতান্তই প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র এবং তার বহুলাংশই ভ্রমাত্মক, এ-কথা অকুণ্ঠায় ঘোষণা করেছেন লেখক এবং নিজের উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে যতখানি প্রামাণ্য তথ্যের অবতারণা করার প্রয়োজন তাও তিনি করেছেন। সত্যিই তাই। কতটুকু আমরা জানি এই বাঙালী নৃপতির। লেখককে ধন্যবাদ, তিনি এই তথ্যবহুল আলোচনায় সেই প্রবল-প্রতাপশালী অথচ চিরভাগ্যাহত নৃপতির জীবনকথাকে প্রকাশ করে বাঙলার ইতিহাসে একটি নতুন আলোকরশ্মিকে প্রতিভাত হতে দিলেন।

আশ্চর্য রকম আকর্ষণীয় জীবন৹ রাজা গণেশের। হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি ছিল সমান, কিন্তু ধর্মান্ধ নেতা নূর কুতুবল আলমের বিদ্বেষ চিরদিনের মতো ম্লান হয়ে রইলেন। আমরা জানি, তাঁর ছেলে যদু মুসলমান

গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নামে খ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পেছনে রাজা গণেশের কী করুণ, আত্মত্যাগের কাহিনী লুকিয়ে আছে, তা তো আমরা জানতাম না। নিজেই রাজ্য চালাচ্ছেন গণেশ, অথচ নৃপতি তিনি নন, নাবালক মুসলমান পুত্রের প্রতিনিধি মাত্র। এর চেয়ে নাটকীয় ঘটনা রাজকীয় ইতিহাসে আর কি থাকতে পারে!

শুধু তাই নয়, আরও বিস্ময়কর ঘটনা আছে। সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীন এবং পারস্য সম্রাটের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বাংলার। চীনা প্রতিনিধিরা মুগ্ধ বিস্ময়ে বাংলার রাজধানী দেখে গিয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে। পিতার এই পররাষ্ট্রনীতির ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে পুত্র জালালুদ্দিন একবার রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে। সুদূর চীন ও পারস্য রাজ্যের সঙ্গে যিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তিনি কি আরও অন্যান্য দেশের সঙ্গেও সেই বন্ধুত্বের যোগ স্থাপন করেন নি?

রাজা গণেশের আমল এবং চীন ও বাংলার রাজনৈতিক সংযোগ সম্পর্কে দুইটি বিস্তৃত আলোচনা ছাড়াও এ-গ্রন্থে লেখক সমসাময়িক আরও তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন—রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, কবি কৃত্তিবাস এবং চণ্ডীদাস কি বিদ্যাপতির সমসাময়িক?

মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র। আজ আর কেউ চেনে না। সেটা তাঁর নয়, আমাদের লজ্জা। গণেশের সমকালে তিনি উচ্চস্তরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিপদ অলংকৃত করেছিলেন, তিনি তৎকালীন সমাজে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এ সবই একজন ব্যক্তির পক্ষে অসামান্য ব্যাপার সন্দেহ কি! তথাপি তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে, "তিনি। রাজা গণেশের সময় থেকে শুরু করে সুলতান বারবক শাহের সময় পর্যন্ত গৌড় রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ধাপে ধাপে ক্রমশ উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে ছিলেন। গৌড়ের রাজসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ষাট বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি শুধু মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন না, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কুটিল ঘটনাপ্রবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।" সব দিক দিয়ে অনন্যসাধারণ মানুষটি এতদিন বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়েছিলেন। অথচ এই একটি মাত্র জীবনের সত্য উদ্ঘাটনে একটি তমসাচ্ছন্ন অধ্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে পারে।

কবি কৃত্তিবাস আজ আর আমাদের কাছে নতুন নন। তিনি বহু-আলোচিত এবং প্রতিটি বাঙালীর কাছে এখন তিনি একেবারে ঘরের লোক। তথাপি তাঁর বংশ সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন লেখক, যা জানা সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমসাময়িকত্ব প্রমাণের জন্য যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন, তাতে মন তৃপ্ত হয় না। এঁরা দুজনই বাঙালীর হৃদয়ের কবি, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে চাই আমরা। তা ছাড়া, এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু বাকবিতণ্ডা, বহু আলোচনা হয়ে গেছে। মোটামুটি প্রমাণও হয়েছে চৈতন্য-পরবর্তী বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি সমসাময়িক কবি ছিলেন। সুতরাং আমরা লেখকের কাছে আরও কিছু নতুন প্রমাণের প্রত্যাশা করেছিলাম।

বইটির প্রতি প্রকাশক অত্যন্ত অবহেলা প্রকাশ করেছেন। এ-গ্রন্থ সঞ্চয় করে রাখার উপযুক্ত; কিন্তু কাগজ ও মলাট এত খারাপ যে, বেশীদিন এ-বইকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। (৩২।৫৬)

ক লিকাতা কর্পোরেশন অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন যে, অপরিষ্কৃত জল এবং নোংরা বস্তিই প্রতি বছর শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী।—"অতঃপর কলেরা দূর না হলেও এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের তারিফ আমরা করবই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পা ক্‌ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক শুনিলাম নেপালাধীশের অভিষেক সভায় ভারতের উপরাষ্ট্রপতির আসনের সামনে বসিবার জন্য জেদ করিতে

থাকেন এবং আসন না পাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকেন। আমন্ত্রিতদের কেহ কেহ এই নিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাঁর ব্যবহারে হাসাহাসিও করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে হাসাহাসির কিছু নেই, 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা'র অবস্থায় এমন আব্দার হামেশাই শুনতে হয়।"

* * *

ভি য়েনার সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ হারম্যান্ নাকি বলিয়াছেন যে, বর্তমান হারে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ২৫০০ সালে সাহারা মরুভূমি এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু লণ্ডনের মত জনাকীর্ণ

হইবে। শ্যামলাল বলিল—"২৫০০ সালের ভাবনা আমাদের নেই এবং মনে হয় ডাঃ হারমানেরও নেই, সুতরাং আমরা produce more নীতির রদবদলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে"!!

* * *

ট্রামে-বাসে

চা উলের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য শুনিলাম সদাশয় সরকার বিদেশ হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন।—"আমরা আবার নূতন ক'রে স্মরণ করলাম—শস্য শ্যামলাং মাতরম্"!!

* * *

এ কটি সংবাদে প্রকাশ ট্রেনে ভিড় কমাইবার জন্য ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে।—"মোটে ভাড়া না দিয়ে যাঁরা ট্রেনে ভিড় করেন, তাদের কি ব্যবস্থা হবে তা সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শী ঘ্রই নাকি চন্দ্রলোকে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে।—"ব্যবস্থাটা পাকা হলে চন্দ্রলোকে গমনেচ্ছুর অভাব হয়ত হবে না; কিন্তু এই গোলকধাম

খেলার খেলোয়াড়ীরা মনে রাখবেন—এক চিত-এ পুনরায় সংসারে পতন" বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

প ঞ্জিকা সংস্কার কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যাহাতে বৈশাখের পরিবর্তে চৈত্র হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। "কমিটির নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁরা যেন এই সঙ্গে অশ্লেষা এবং মঘারও সংস্কারটা ক'রে রাখেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

চা ষের জমিতে বৃষ্টির আকারে জল-বর্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি "রেইন মাস্টার" নামক একটি যন্ত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"কলকাতায় সম্প্রতি ব্যাঙের দাম চড়েছে; স্বল্পমূল্যে ব্যাঙেরা আর, ডাকতে রাজী নয়, সুতরাং বৃষ্টি হয় না, আরো সুতরাং রেইন মাস্টার কিনতেই হয়। এবারে সুজলা বাংলা আর সুফলা না হয়ে যায় না।"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

রা বণরূপ দুর্নীতি বধ করিবার জন্য কলিযুগে যে শ্রীরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাসারাম হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ নাকি তাহাকে, তৎ অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।—"আমরা লংকাকাণ্ডের আগে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডেই রামায়ণের সমাপ্তিতে দুঃখ বোধ করছি"!!

—মৌলিক—

ভারতীয় চিত্রের আন্তর্জাতিক সম্মান

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব তথা প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফ্রান্সের কাঁ শহরে যেটি অনুষ্ঠিত হয়, আর ইতালির ভেনিসে। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে সংগঠিত ভারত সহ পৃথিবীর নানা দেশের চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজক সঙ্ঘ এই বলে এক আইন প্রণয়ন করে যে, বছরে একটির বেশী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। বর্তমানে কাঁ ও ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসব দুটি সবচেয়ে পুরাতন এবং, বা জনপ্রিয় বিধায় ঐ দুটিকেই কেবল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক উৎসব বলে ধরা হবে এবং ঐ দুই স্থানে এক বছর অন্তর করে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আর কোথাও কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তা প্রতিযোগিতামূলক বলে গণ্য করা হবে না তবে সে রকম উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ছবি পাঠাতে পারে সকল দেশই। কিন্তু সে সব উৎসবে পাওয়া মানপত্র বা সার্টি-ফিকেটকে কোন প্রতিযোগিতায় বিজয়ের নিদর্শন বলে যেন গণ্য করা না হয়। শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনার ঠাঁই শুধু কাঁ আর ভেনিসের উৎসবে রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে লৌহ-যবনিকার দুপারেরই দেশসমূহের মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ ছবি যারা তোলেন তাদের বেশীর ভাগ দেশই যোগদান করেন। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, সুইডেন, জাপান, ভারত প্রভৃতি ছবি পাঠায় এবং পাঠায় তার যা শ্রেষ্ঠ উৎপাদনই। এমনি প্রতিযোগিতায় কোন ছবির বিজয়ীর পুরস্কার লাভ মোটেই সহজসাধ্য নয়। ভারতের ছবি "পথের পাঁচালী" এবার এই অসহজলভ্য বিজয় অর্জনে সফল হয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের কীর্তিমুকুটে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান-মণি গেঁথে দিতে সক্ষম হলো। ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিভার এটা একটা মহান কীর্তি ও কৃতিত্ব।

• • •

আন্তর্জাতিক সম্মান অবশ্য আরো ভারতীয় ছবি আগে পেয়েছে, তবে সবই স্মারক-পত্র বা মান-পত্র, "পথের পাঁচালী"-র মতো একটা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার গৌরব এই প্রথম। ছজন ফরাসী এবং অন্যান্য দেশের পাঁচজন বিচক্ষণ বিচারককে নিয়ে গঠিত জুরীমণ্ডলী একটানা আঠারো ঘণ্টা ধরে প্রদর্শিত ছবিগুলি সম্পর্কে আলোচনা বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকেই মনে করেছিলেন "পথের পাঁচালী" সমগ্রভাবেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গ্রান্ড প্রিক্স' পেয়ে যাবে। কিন্তু খুব সামান্যের জন্যই সেটি ফসকে গিয়েছে এবং সেই সামান্যটি হচ্ছে lobbying অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে দহরম-মহরম বা তদ্বির করা বলে তারই অনুপস্থিতির জন্যে। পাশ্চাত্যে কোন জিনিসের গুণ থাকলেও স্বীকৃত করিয়ে দিতে ঐ দহরম-মহরমের দরকার খুবই। বিশেষ করে কাঁর মতো উৎসবে যেখানে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং আমেরিকার মধ্যে খানাপিনা, আলাপ-আলোচনা, সাংবাদিক বৈঠক, মেশামেশি নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতার ঢেউ বয়ে চলে। নানা দেশের প্রযোজক পরিচালক কলাকুশলী শিল্পীদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের আনাগোনায় শহর সরগরম হয়ে থাকে পক্ষকাল ধরে। এমনটা হতে দেওয়া হয়তো উচিত নয়, কারণ কোন বলিয়ে কইয়ে প্রতিনিধি দল তাদের তদ্বিরের জোড়ে অনেকখানি প্রভাব সৃষ্টি করে দিতে পারে। আর সেই জন্যেই যায়ও সকলে সেখানে দল বেঁধে। তদ্বিরটা কি ধরণের হয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অনেক কিছু আছে যা ছবিতে তুললে তার আসল চেহারা দেখায় না। যেমন বৃষ্টি; সত্যিকারের বৃষ্টি ক্যামারায় তুললে পর্দায় তা সত্যিকারের বৃষ্টির মতো দেখায় না বলে স্টুডিওতে বৃষ্টি তৈরী করে নিতে হয় বৃষ্টিতে নাটকীয়তা প্রয়োগ করতে। কিন্তু "পথের পাঁচালী"তে অতীব নাটকীয়তাপূর্ণ বৃষ্টির দৃশ্য সত্যিকারের বৃষ্টির দৃশ্য তুলেই দেখানো হয়েছে। এমনি আরও বিশেষ কৃতিত্ব ছবিখানিতে আছে যেগুলো প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে প্রচার করতে পারলে

ছবিখানির ওপরে জনুরীদের মায়া হয়তো বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট তথা ছবিখানি নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করছেন তাদেব সেই প্রচার বিভাগ তাম্বিরের কোন ব্যবস্থাই করেননি। ওদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ভার ছবিখানির বৈদেশিক পরিবেশক ছিলেন চৌধুরীর ওপর ন্যস্ত করেই পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগ চুপচাপ রয়ে গেলেন; আর কোন কিছু করার আছে বলে ভাবতেই পারলেন না তারা। এইভাবে তারা একটা মহা সুযোগ নষ্ট করে ফেললেন। ছবিখানি ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগ গোড়া থেকেই কেমন যেন উদাসীন; সেটা মুক্তি-পূর্ব প্রচার ও জনসংযোগ ব্যাপারে এবং মুক্তি ব্যাপারেই দেখা গিয়েছিল। সে যাক। শুধু কানেই নয়, তার আগেও ছবিখানি বহুলভাবেই সম্মানিত হয়েছে চতুর্দিকেই; পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট এমন একখানি ছবির প্রযোজক বলে তাদেরও সুনাম হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কি উচিৎ ছিল না ছবিখানি যারা তৈরী করেছেন সেই পরিচালক কলাকুশলী ও শিল্পীদের যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত করা? একমাত্র অপুর ভূমিকাভিনেতা শ্রীমান সুবীরকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসেবে এক বছরের জন্য পড়বার বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া ছাড়া আর কাউকেই কিছু দেওয়া হয়নি। কিন্তু উচিৎ ছিল নাকি? বিলেতের টাইমস পত্রিকার সমালোচক বাধ্য শ্রীমতী চুণীবালার অভিনয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক। পৃথিবীর এই বয়স্কতম অভিনয়শিল্পীর এই বিস্ময়কর কৃতিত্বকে পুরস্কৃত করার জন্য বহু আগেই প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তা শোনা হয়নি। এখন কি এটা আশা করা খুবই বাড়াবাড়ি হবে যে, কান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতা থেকে "পথের পাঁচালী" ভারতের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করে নিয়ে এল তার জন্য ছবিখানির নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে? তাছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ও তো হচ্ছে ছবিখানি দেশে এবং বিদেশে দেখিয়ে; তার থেকেই না হয় আরও কিছু খরচ বরাদ্দই হলো এ বাবদ। ছবিখানির সমালোচনকালে 'দেশ'এর এই 'রঙ্গজগত'-এই "পৃথিবীরই একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি" বলে যে অভিহীত করা হয়েছিল, আজ তা সত্য প্রমাণিত হলো। "পথের পাঁচালী"র স্রষ্টাকে আবার অভিনন্দন জানাই

* * *

কান উৎসবে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয়েছে ফরাসী ছবি যার মানে হয় "নিরব জগৎ"। ফরাসী নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমান্ডার জাক ইভেস কুসতোর পরিচালনায় সমুদ্র গর্ভে তোলা ডকুমেন্টারি ছবি। প্রযোজনা-পারিপাট্যে শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচিত হয়েছে রুশীয় ছবি "ওথেলো",

প্রযোজক সার্জ ইউকোভিক। জুরীদের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে হেনরী জর্জের তোলা ফরাসী ছবি "পিকাসো রহস্য"। কলাকৌশল কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয় ব্রাজিলীয় ছবি "আণ্ডার দি স্কাই অফ বাহিয়া"; সাদাকালো আলোকচিত্রের জন্য যুগোস্লাভির ছবি "ব্ল্যাক ওয়েভস", কাব্য ও রসের জন্য সুইডীয় ছবি "স্মাইল অফ এ সামার নাইট" এবং ডকুমেণ্টারি ফরাসী ছবি "দি রেড বেলুন"। শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃতা হন আমেরিকার "আই'ল ক্রাই টুমরো"-তে সুশান হেওয়ার্ড। কোন পুরুষ অভিনেতা এবার পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হননি। এই সব বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের চেয়ে কাঁর উৎসবে ডকুমেণ্টারি জাতীয় নাট্যকাহিনীরই বেশী কদর; অর্থাৎ বাস্তবের দিকেই বেশী ঝোঁক।

পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক-নৃত্য একাডেমী

গত পূর্ব বছর রবীন্দ্র জন্মোৎসব তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের সংগীত নাটক নৃত্য একাডেমি স্থাপনার কথা ঘোষণা করেন। আর এ বছরে গত ১৮ই মে রবীন্দ্র ভারতী ভবন প্রাঙ্গণে ডাঃ রায়ই একাডেমী গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বেশ একটা বৈদিক অনুষ্ঠান হলো, সংগীত বিভাগের ছেলেমেয়েরা বেদগান করলেন, বেদের মন্ত্র পাঠ করলেন। ভাষণ দিলেন আচার্য পদে সমাসীন ডাঃ রায়। তিনি বললেন, নৃত্য ও গীতের জন্য বাঙলা দেশ প্রখ্যাত। এ দেশের একটা বৈশিষ্ট্য যখনি কোন বৈষম্য দেখা দিয়েছে তখনি নৃত্য ও গীতের মধ্যে দিয়ে মনকে উঁচুতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়। গানে মন দ্রবীভূত হয়। অন্ত পৃথিবীতে বিবাদ কলহ বিদ্যমান, মানুষে মানুষে যখন মনের মিল নেই, এই অবস্থায় ডাঃ রায় বিশ্বাস করেন যে, বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীতে তার কৃষ্টি ঐতিহ্য প্রচার করতে চায় তো তা নৃত্যকলা শিল্পকলার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়। এইভাবেই পৃথিবীতে একটা আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব। মহৎ জনের স্মৃতি রাখতে স্তম্ভ বা কুতুব গড়তে চাই কারণ, সেটা হয় শিল্প নিদর্শন বলে, আর সেই শিল্পের মধ্যেই মানুষকে পাওয়া যায়। ডাঃ রায় বললেন, রবীন্দ্রনাথকে যদি জীবন্ত রাখতে চাই তাহলে তার কাব্য গীতের মধ্যে দিয়ে দেশের শিল্পকে উন্নততর করতে হবে। বাঙলা দেশে নৃত্যগীতের বিশেষ স্থান আছে। নৃত্যগীত যে জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি আশা করেন সংগীত ভবনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী এই আবেগ নিয়ে কাজ করবেন যে, তারা যা শেখাবেন ও শিখবেন তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যেন দেশের সামনে তুলে ধরতে পারেন। আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সবেরই মধ্যে যদি সুর থাকে তো মনকে তা মোহিত করবে—সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে মনকে উন্নত করতে না পারলে কিছুই হবে না। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় রবীন্দ্র ভারতী পরিকল্পনার জন্য স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদন করেন। রবীন্দ্র ভারতীর গঠনে সকলের সমবেত প্রচেষ্টাকে ডাঃ রায় অভিনন্দন জানান।

আশা করা গিয়েছিল ভিত্তি স্থাপন উৎসবে একাডেমী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। একাডেমী চলবার ও চালাবার নিমিত্ত সঠিক কি পরিকল্পনা করা হয়েছে তার অন্তত কাঠামোটাও পাওয়া যাবে। কিন্তু ডাঃ রায় তো সেদিক দিয়েই গেলেন না এবং আর কোনভাবেও তা জানাবার ব্যবস্থা হলো না। সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা এইমাত্র খবর বের করতে পেরেছেন যে, একাডেমী ভবন নির্মাণে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে এবং নীচের তলায় একটা প্রেক্ষাগার থাকবে। এতো কিছুই জানা নয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ প্রচার দপ্তরকে কিছু জানাবার জন্য অনুরোধ করা হলেও তাদের কাছ থেকেও কোন খবর পাওয়া গেল না। একাডেমী পড়ছে শিক্ষা দপ্তরের ভাগে, সে তরফও নিশ্চুপ। একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হওয়া থেকেই কেমন যেন একটা চুপি চুপি ভাব। যেন কোন পরিকল্পনাই ফেঁদে নেওয়া হয়নি আজও। বেসরকারী সূত্রে যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে একাডেমীটি আসলে একটি স্কুল, নাচ গান অভিনয় শিক্ষার স্কুল। শেষের দুটি বিভাগের অধ্যক্ষ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্য বিভাগের অহীন্দ্র চৌধুরী, এঁরা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকও আছেন। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে একাডেমী বা আকাদমি নামটা এখানে যথার্থ নয়। আর নাচ গান অভিনয় শেখাবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠাতে গভর্নমেণ্টের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখাই বা কেন? ওটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। গভর্নমেণ্ট তার জন্য একটা গ্রাণ্ট-ইন-এড ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত থাকুন। আর যদি একাডেমী স্থাপনই উদ্দেশ্য হয় তো সেটা একাডেমীই হোক, স্কুল মাত্র নয় এবং কিভাবে কি করা হবে না হবে, পরিকল্পনায় কি আছে তা বিশদভাবে সাধারণ্যে জানিয়ে দেওয়া হোক।

''এরাও মানুষ'' এর শতরজনী উৎসব

গত ১৮ই মে মিনার্ভাতে "এরাও মানুষ"-এর শততম অভিনয় রজনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, পুরস্কার বিতরণ করেন সুসাহিত্যিকা শ্রীমতী প্রভাবতীদেবী সরস্বতী। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বহুকাল পর মিনার্ভায় কোন নাটকের শত রজনী উদযাপিত হলো। এরই স্মারক হিসেবে নাটক এবং এই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীকার, নাট্যরূপদাতা, পরিচালক, শিল্পী, ব্যবস্থাপক, সুরযোজক, পটশিল্পী, রূপসজ্জাশিল্পী থেকে প্রত্যেককে পদক প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে একটি বৈশিষ্ট্য এরা দেখান তা

হচ্ছে পদক প্রাপ্তি থেকে দরওয়ান, চাকর, ঝাড়ুদারদেরও প্রযোজক কৃষ্ণমন কুণ্ডু বঞ্চিত করেননি। শুধু তাই নয়, তাদের নাম ধরে সর্বসমক্ষে মঞ্চে ডেকে আর সবায়ের মতো তাদের হাতে হাতে পদক দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে একটা অভিনবত্বও পাওয়া গেল। যে হোক তার যোগ্য মর্যাদা লাভ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় এইটেই সেদিন দেখালেন মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ।

এ মাসের রেকর্ড

কলাম্বিয়া ও এইচ এম ভির সদ্য প্রকাশিত গীতি রেকর্ডের তালিকায় অনেকগুলি ভাল ভাল গান আছে, আর আছে কয়েকখানি রবীন্দ্র-সংগীত। অনেক প্রখ্যাত গায়কগায়িকার সংগে কয়েকজন নূতন শিল্পীও এবার গান দিয়েছেন।

কলাম্বিয়ার রেকর্ড তালিকার মধ্যে দুখানি আধুনিক গানের রেকর্ড আছে। গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (GE 24785) ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (GE 24786)। দুখানি রাগমূলক বাঙলা গান (GE 24787) গেয়েছেন বাণী কোণার আর ইলা চক্রবর্তী গেয়েছেন দুখানি ঘুম-পাড়ানী গান (GE 24788)। এ ছাড়াও "সাগরিকা", "সবার উপরে,", "দেবী মালিনী" ও "শুভরাত্রি" ছবির পাঁচখানা রেকর্ড বেরিয়েছে। এ গানগুলি গেয়েছেন আলপনা ব্যানার্জি, শ্যামল মিত্র, গায়ত্রী বসু, ইরা চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা মুখার্জি।

কবিগুরুর গানের ৪খানি রেকর্ড বার করেছেন হিজ মাস্টারস ভয়েস। সুচিত্রা মিত্রের দুইখানি রেকর্ড (N 82690, N 82698), দুখানি গেয়েছেন শ্যামল মিত্র (N82699), দু'খানি গেয়েছেন শ্রীলা সেন (N 82700)। তালাত মামুদ (তপনকুমার) গেয়েছেন দু'খানি আধুনিক গান (N 82691), উৎপলা সেন—আধুনিক গান (N 82692), সুবীর সেন—আধুনিক গান (N 82693), সতীনাথ মুখার্জি—আধুনিক গান (N 82694), সুপ্রীতি ঘোষ—আধুনিক গান (N82695), তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক গান (N 82696) ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক গান (N82697)। এ ছাড়া "অসবর্ণা" ছবির দু'খানি গান (N 76030) গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

খালি উপন্যাস আর গল্প খালি উপন্যাস আর গল্প

একলব্য

ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়াযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সারা ক্রিকেট বিশ্বে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। অস্ট্রেলিয়ার ইংলণ্ড সফর অনেকদিন আগেই আরম্ভ হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোন টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। জুন মাসের সাত তারিখে নটিংহাম মাঠে আরম্ভ হচ্ছে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই পর্যায়ের প্রথম টেস্ট খেলা। অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলাকে অনেকে ক্রিকেট মাঠে বাঘ সিংহের লড়াই বলে অভিহিত করেন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেস্ট খেলার ব্যবস্থা থাকলেও ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলার মর্যাদা ও আকর্ষণ সত্যই অনন্য। এই দুইটি দেশই টেস্ট ক্রিকেটের পথিকৃৎ। কালের কোন এক অখ্যাত দিনে এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছিল, ক্রিকেটের পুঁথিপত্র ঘেঁটে তার হদিস পাওয়া অবশ্য কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু দুই দেশের সেই প্রথম টেস্ট খেলার আয়োজন ছিল নিতান্তই সামান্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমারোহের মাধ্যমে সেই টেস্ট খেলা আজ এক বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংলণ্ডই ক্রিকেটের জন্মভূমি। এই খেলার প্রতি ইংলণ্ডবাসীর অকৃত্রিম অনুরাগের কথাও সর্বজনবিদিত। ইংলণ্ড যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই ক্রিকেটকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে, যেখানেই রাজ্য বিস্তার করেছে, সেখানকার মাটিতেই পড়েছে ক্রিকেট স্ট্যাম্প। তাই ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশ—অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিংহল, ভারত সর্বত্রই আজ ক্রিকেট খেলার প্রচার ও প্রসার। ভারত অবশ্য এখন আর কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নয়। ভারতের এখন পৃথক মর্যাদা। তবুও ভারতের কতিপয় ধনীর দুলালের মধ্যে একদিন যে ক্রিকেটের নেশা জেগেছিল, এখন সেই নেশা সর্বভারতীয় নেশায় পরিণত হয়েছে, কারো বা পরিণত হয়েছে পেশায়। ভারতের অন্তরের সঙ্গেই এখন ক্রিকেটের যোগাযোগ। যাই হ'ক অতীতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়াই প্রথম ক্রিকেটে হাত পাকায় এবং গুরুমারা বিদ্যা শিখে ইংলণ্ডকে পর্যুদস্ত করতে তাদের বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।

* * *

১৮৬১ সালে ইংলণ্ডের একটি ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর করলেও সেই দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যে খেলা হয়—সেই খেলা আনুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট খেলায় স্বীকৃতি লাভ করে না। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেমস লিলিহোয়াইটের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের যে পেশাদার ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর করে, তাদের খেলাই লাভ করে সরকারীভাবে টেস্ট খেলার মর্যাদা। ১৮৭৬-৭৭ সাল থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬৮ বার। এর মধ্যে ইংলণ্ড জয়লাভ করেছে ৬০টি খেলায়, অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে ৬৯টি খেলায়, ৩৯টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ১৬৮ বার টেস্ট-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ক্রিকেট ইতিহাসে যে কত অধ্যায় রচিত হয়েছে এবং এই খেলাগুলির মধ্যে দুই দেশের ধুরন্ধর বোলার ও ব্যাটসম্যানদের যে কত স্মৃতি বিজড়িত আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ ইতিহাস শুধু দীর্ঘই নয়, বিচিত্রও বটে।

* * *

দীর্ঘ ১৯ বছর পরে ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধার করবার পর ইংলণ্ড গতবারও অস্ট্রেলিয়া থেকে 'অ্যাসেস' নিয়ে ঘরে ফিরেছে। গতবার অস্ট্রেলিয়া টেস্টে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। সোজা কথা বলা যায় গতবারের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খ্যাতি অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম খেলায় তারা অবশ্য ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছিল; কিন্তু তার পরের তিনটি খেলায় দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার চরম ব্যর্থতা। ইংলণ্ড পর পর তিনটি খেলায় জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ করে। শেষের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এর পর থেকেই অস্ট্রেলিয়া এবারের টেস্টের জন্য তোড়জোড় করছে। শক্তিশালী করে দলও গঠন করেছে। ক্রিকেট পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের অভিমত: আয়ান জনসনের নেতৃত্বে এবার যে দল গঠিত হয়েছে, ব্র্যাডম্যানোত্তর যুগে অস্ট্রেলিয়া কোনবার এত শক্তিশালী করে দল গড়তে পারেনি। কি বোলিং, কি ব্যাটিং, কি ফিল্ডিং, সব দিক দিয়েই অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী। অপরদিকে দুইবার উপর্যুপরি 'রাবার' লাভ করায় ইংলণ্ডেরও নিজের উপর অবিচলিত আস্থা। তবে ইংলণ্ডের দুইবারের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক দিক-পাল খেলোয়াড় লেন হাটন খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, ধুরন্ধর খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনও সুস্থ নেই। টেস্ট খেলায় তাঁর অংশ গ্রহণ অনিশ্চিত। তবুও ইংলণ্ড তার ক্রিকেট ঐতিহ্য বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পর্যায়ের খেলার উপর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-খ্যাতিও বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং ক্রিকেট মাঠে এই বাঘ-সিংহের লড়াইয়ের ফলাফলের জন্য সারা-ক্রীড়াজগৎই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ইংলণ্ডের কাউন্টি টীমের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া এই পর্যন্ত ছয়টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে তারা একটি খেলায় জয়লাভ ও একটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছে,—বাকী চারটি খেলা হয়েছে অমীমাংসিত। ডিউক অব নরফোকের দলের সঙ্গে তাদের একদিনব্যাপী উদ্বোধনী খেলাটি হিসেবের মধ্যে ধরলে ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার খেলার সংখ্যা দাঁড়ায় সাত, আর জয়ের সংখ্যা দুই। এ পর্যন্ত কলিন ম্যাকডোনাল্ড, জিম বার্ক, পিটার বার্জ, রিচি বিনাউড ও রে লিণ্ডওয়াল একবার করে সেঞ্চুরী করেছেন; ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন সহ-অধিনায়ক কিথ মিলার। মিলার ট্রিপল সেঞ্চুরী করবার উপক্রম করেছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে—তিনি ২৮১ রাণ করেও নট আউট থাকেন। ম্যাকডোনাল্ডের সেঞ্চুরীকেও শুধু সেঞ্চুরী বললে কম বলা হয়। মাত্র ৫ রানের জন্য তিনি ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত যে কয়টি ম্যাচ খেলেছে, এ সংখ্যায় তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হ'ল।

নরফোকের ডিউকের দল : অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া দল তাদের উদ্বোধনী খেলায় নরফোকের ডিউকের একাদশকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে। এটি ছিল এক দিনব্যাপী খেলা। এ খেলাটিকে অস্ট্রেলিয়ার ইংলণ্ড সফরের 'মুখবন্ধ' বলা যেতে পারে। নরফোকের ডিউকের দলের অধিনায়কত্ব করেন ধুরন্ধর খেলোয়াড় এবং ইংলণ্ডের অবসর-প্রাপ্ত অধিনায়ক লেন হাটন, কিন্তু হাটনকে কোন রাণ না করেই লিণ্ডওয়ালের বলে আউট হতে হয়। ডিউকের দল ১৮৮ রানে ইনিংস শেষ করবার পর অস্ট্রেলিয়া দল ৭ উইকেটে ১৮৯ রান করলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার চৌকস খেলোয়াড় রিচি বিনাউডের মাত্র ৩৫ রানে ৬টি উইকেট লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উরস্টারশায়ার : অস্ট্রেলিয়া

উরস্টার দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পরের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এটি ছিল তিন দিনব্যাপী খেলা এবং উরস্টার দল নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু উরস্টার অধিনায়ক পিটার রিচার্ডসনের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের ফলে উরস্টার

দল পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। অস্ট্রেলিয়ার তিন খ্যাতনামা বোলার লিণ্ড-ওয়াল, ক্রফোর্ড ও বিনাউডের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে উরস্টার দল প্রথম ইনিংসে ৯০ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৪৩৮ রান। ফলে উরস্টারের ইনিংস পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে বিনাউড এই সফরে প্রথম সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিনাউড করেন ১৬০ রান। ম্যাকডোনাল্ডের ৮৬ রানও উল্লেখযোগ্য হয়। উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার মধ্যে উরস্টার ব্যাটিং আরম্ভ করলে তাদের ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে কিন্তু তরুণ অধিনায়ক, ন্যাটা ব্যাটসম্যান রিচার্ডসন একদিকে টিকে থেকে প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সংগে ব্যাট চালাতে থাকেন। দিনের শেষে উরস্টার দল ৯ উইকেটে ২৩১ রান তোলে, বাকি উইকেট আর পড়ে না। পিটার রিচার্ডসন ১৩০ রাণ করেও নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে যেমন দৃঢ়তার সংগে ব্যাটিং করেছেন, তাতে ইংলণ্ডের টেস্ট টীমে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। এই খেলার পর রিচার্ডসন যদি টেস্ট টীমে স্থান পান, তবে কেউই আশ্চর্য হবেন না।

লিস্টশায়ার : অস্ট্রেলিয়া

লিস্টশায়ারের সংগে অস্ট্রেলিয়ার তিন দিনব্যাপী খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ইংলণ্ড সফরে এটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় খেলা। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সহ-অধিনায়ক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় কিথ মিলারের ২৮১ রান লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৯৮ রানে লিস্টারশায়ারের ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে ৬৯৪ রান সংগ্রহ করলে খেলাটি শেষ হয়। লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে এর আগে অস্ট্রেলিয়া দল কোনবার এত বেশী রান সংগ্রহ করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া কেন, যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটে একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই ১৯৫০ সালে লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ২ উইকেটে ৬৮২ রান করেছিল, তারপর অস্ট্রেলিয়া এবার ৬৯৪ রান করলো।

২৮১ রান লাভ মিলারের ক্রিকেট জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। তিন বছর আগে সম্মিলিত সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে ২৬২ রান লাভ ছিল মিলারের জীবনের সবচেয়ে বড় ইনিংস। এবার ২৮১ রান করে তার ব্যক্তিগত রানসংখ্যা আরও এগিয়ে রাখলেন। মিলার ছাড়া জিম বার্কের ১২৩ রানের কথাও বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডে বার্কের এইটিই প্রথম সেঞ্চুরী। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া দলের আর আর ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পিটার বার্জ ১ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেননি, রন আর্চার ৮৮ রান করে আউট হয়েছেন।

লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা না করে বিপুল রান সংগ্রহ করায় 'ডেলী হেরাল্ড', 'ডেলি টেলিগ্রাফ', 'ডেলি মিরর', 'ডেলি এক্সপ্রেস' এমন কি 'টাইমসের' মত সংবাদপত্রে অস্ট্রেলিয়া দলের খেলার বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। এইসব পত্রিকার মতে অস্ট্রেলিয়া দলের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে খেলায় জয়লাভের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে রানের লোভে বিপুল রান সংগ্রহের চেষ্টা করায় খেলাটি 'প্রহসনে' পরিণত হয়েছে। তথ্যের দিক দিয়ে এই রানের কিছু মূল্য থাকলেও খেলা হিসেবে এর কিছুই মূল্য নেই।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান জনসন বিরূপ সমালোচনার উত্তরে বলেছেন—নরফোকের ডিউকের দলের সংগে এক দিনব্যাপী খেলাটি বাদ দিলে এটিকে ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় খেলা বলা যায় এবং ৬জন নতুন খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। সুতরাং তারা যাতে ইংলণ্ডের মাটির সংগে পরিচিত হয়ে নিজেদের উপর আস্থা রেখে খেলতে পারেন তার জন্যই অস্ট্রেলিয়া দলের একটানা ব্যাটিংয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যত তাড়াতাড়ি খেলোয়াড়রা নিজেদের উপর আস্থা পান, সেইটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। আমাদের খেলোয়াড়দের হাত খুলে মারার একটু রেওয়াজ হলে আমাদের ক্রিকেট আকর্ষণহীন হবে না, ইংলণ্ডের ক্রিকেট রস-পিপাসুদের হতাশ হবার কোন কারণ ঘটবে না।

ইয়র্কশায়ার : অস্ট্রেলিয়া

ইয়র্কশায়ারের সংগে অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ খেলাটি বৃষ্টির জন্য এক রকম পণ্ড হয়ে যায়। প্রথম দিন আদৌ খেলা হয় না। দ্বিতীয় দিনও মধ্যাহ্ন ভোজের পর থেকে খেলা আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় খেলাটিকে অমীমাংসিত বলে ঘোষণা করা হয়। ইয়র্কশায়ার দল ৯ উইকেটে ১২০ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর মাত্র ৯৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ইয়র্কশায়ার করে মাত্র ১ উইকেটে ১৯ রান; তারপরই বৃষ্টি আরম্ভ।

ইয়র্কশায়ারের দুই স্পিন বোলার জনি ওয়ার্ডল ও বব এ্যাপলইয়ার্ডের মারাত্মক বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মোটেই সুবিধে করতে পারেনি এবং পাঁচজন খেলোয়াড় কোন রান না করেই আউট হয়েছেন। এক সময় ওয়ার্ডল চারটি বলের মধ্যে দুইটি উইকেট এবং এ্যাপলইয়ার্ড তিনটি বলের মধ্যে দুইটি উইকেট লাভ করেন। লিস্টার-শায়ারের বিরুদ্ধে যে অস্ট্রেলিয়া দল

বিপুল রান সংগ্রহ করে ইংলন্ডের ক্রীড়া সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়েছিল, তারাই ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ৯৪ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। ঘটনার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ক্রিকেট খেলার কি অনিশ্চয়তা!

নটিংহামশায়ার : অস্ট্রেলিয়া

নটিংহামশায়ারের সংগে অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ৮ উইকেটে ৫৪৭ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে নটিংহামশায়ার দল প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে করে ৩৪৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১ উইকেটে ৫৩ রান উঠলে খেলার সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন ম্যাকডোনাল্ড ও তরুণ খেলোয়াড় পিটার বার্জ এবং নটিংহাম দলের পক্ষে ন্যাটা ব্যাটসম্যান ফ্রেড স্টকস এই খেলায় সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ম্যাকডোনাল্ডের রানকে শুধু সেঞ্চুরী বললে অনেক কম বলা হয়। মাত্র ৫ রানের জন্য তিনি ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ফ্রেড স্টকের ডাবল সেঞ্চুরীর জন্যও বাকি থাকে মাত্র ২৯ রান; আর বার্জ রান করেছেন ১৩১; ইংলন্ডে বার্জের এইটিই প্রথম সেঞ্চুরী।

যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটে ইংলন্ডের কোন কাউণ্টি টীম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এত বেশী রান করতে পারেনি, যত রান করেছে নটিংহাম দল। তাছাড়া ফ্রেড স্টকের ১৭১ রানেরও রেকর্ড বলা যেতে পারে। মহা-যুদ্ধের পর কাউণ্টি টীমের সংগে অস্ট্রেলিয়ার খেলায় ইংলন্ডের কোন ব্যাটসম্যান এত বেশী রান করতে পারেননি।

সারে : অস্ট্রেলিয়া

ইংলন্ড সফরের ষষ্ঠ খেলায় অস্ট্রেলিয়া টীমকে প্রথম হার স্বীকার করতে হয় কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ন সারের কাছে। এক দুই উইকেটে নয়, ১০ উইকেটে সারে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সারের এই বিজয়-সাফল্যকে ঐতিহাসিক জয়লাভ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাউণ্টি টীমের কাছে ইংলন্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের পরাজয়ের ঘটনা বেশী নেই। ক্রিকেটের পাঁথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে ১৯১২ সালে হ্যাম্পশায়ারের কাছে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের পর কোন কাউণ্টি দলই অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি। সুতরাং দীর্ঘ ৪৩ বছর পরে সারে অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনার সৃষ্টি করলো বৈকি।

সারের বিজয়সাফল্যই এই খেলার শুধু স্মরণীয় ঘটনা নয়। প্রথম ইনিংসে লেকারের সব কয়টি উইকেট পাবার ঘটনাও ঐতিহাসিক। এর আগে ইংলন্ডের একজন মাত্র বোলার অস্ট্রেলিয়া দলের ১০টি উইকেট লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জন করে ছিলেন। এ'র নাম ছিল এডওয়ার্ড ব্যারেট। ইনিও ছিলেন সারের খেলোয়াড় এবং এই ওভ্যাল মাঠেই ঘটনাটি ঘটেছিল। ১৮৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দল যখন প্রথম ইংলন্ড সফরে আসে, তখন প্লেয়ার্স ও অস্ট্রেলিয়া দলের খেলায় ব্যারেট ১০টি উইকেট পেয়েছিলেন। দীর্ঘ ৭৭ বছর পরে সেই ওভ্যাল মাঠে সারেরই অপর বোলার জিম লেকার অস্ট্রেলিয়া দলের ১০টি উইকেট পেয়েছেন।

টসে হার স্বীকার করেও সারের পক্ষে ১০ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সারের এই ঐতিহাসিক জয়লাভের মূলে আছে লক ও লেকারের মারাত্মক বোলিং আর কনস্ট্যাবলের প্রশংসনীয় ব্যাটিং। লেকার যেমন প্রথম ইনিংসে ৮৮ রানে ১০টি উইকেট পেয়েছেন, লক তেমন দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছেন ৪৯ রানে ৭টি উইকেট। আর সেঞ্চুরী করবার পর কনস্ট্যাবল আউট হয়েছেন ১০৯ রানে।

অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ২৫৯ ও সারে দল ৩৪৭ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার সকলে আউট হবার পর সারেকে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০ রান সংগ্রহ করতে কোনই উইকেট হারাতে হয়নি। খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান জনসন সারে অধিনায়ক সারিজকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করে তার মাথার 'ক্যাপটি' উপহার দেন। আর জিম লেকার প্রথম দিনই লাভ করেন খেলার বলটি যে বলে তিনি লাভ করেন, ১০টি উইকেট। এই বলের সংগেই বিজড়িত থাকবে তার ক্রিকেট জীবনের এক উজ্জ্বল স্মৃতি।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় : অস্ট্রেলিয়া

সপ্তম খেলায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ উইকেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম জয়লাভ করে। অবশ্য ডিউক অব নরফোকের দলের সংগে একদিনব্যাপী খেলাটি হিসেবের মধ্যে ধরলে এটি হয় দ্বিতীয় জয়লাভ। যাই হোক, এ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে লিন্ডওয়াল এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রবার্ট জেমস সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। দুইজনেরই রানের সংখ্যা এক। তবে লিন্ডওয়াল ১১৬ রান করে নট আউট থাকেন, আর জেমস ১১৬ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। খেলার ধারা অনুযায়ী কেম্ব্রিজ দলের ইনিংস পরাজয়ের আশংকা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে রবার্ট জেমসের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ে ফলেই কেম্ব্রিজ দল ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় স্মরণজিৎ সিংও ৫৭ রান করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখান।

প্রথমে ৭ উইকেটে ৪১৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া দল ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দল পরে প্রথম ইনিংসে ১৫৫ রান এবং 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮১ রান করতে সমর্থ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৩ রান সংগ্রহ করতে অস্ট্রেলিয়া দলকে কোন উইকেট খোয়াতে হয় নি।

ইংলন্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের বাকি খেলা

২৩শে মে—লিস্টারশায়ার
২৬শে মে—এম সি সি একাদশ
৩০শে মে—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
২রা জুন—সাসেক্স
৭ই জুন—প্রথম টেস্ট (নটস মাঠ)
১০ই জুন—নর্দাম্পটনশায়ার
১৬ই জুন—কেণ্ট
২১শে জুন—দ্বিতীয় টেস্ট (লর্ডস মাঠ)
২৭শে জুন—ইয়র্কশায়ার
৩০শে জুন—গ্লস্টারশায়ার
৪ঠা জুলাই—সামারসেট
৭ই জুলাই—হ্যাম্পশায়ার
১২ই জুলাই—তৃতীয় টেস্ট (লীডস মাঠ)
১৯শে জুলাই—সি সি জি (ওভ্যাল)
২১শে জুলাই—মিডলসেক্স
২৬শে জুলাই—চতুর্থ টেস্ট (ম্যানচেস্টার)
১লা আগস্ট—সারে
৪ঠা আগস্ট—গ্ল্যামোরগান
৮ই আগস্ট—ওয়ারউইকশায়ার
১১ই আগস্ট—ডার্বি
১৫ই আগস্ট—ল্যাংকাশায়ার
১৮ই আগস্ট—এসেক্স
২৩শে আগস্ট—পঞ্চম টেস্ট (ওভ্যাল মাঠ)
২৯শে আগস্ট—জেণ্টলমেন একাদশ (লর্ডস মাঠ)
১লা সেপ্টেম্বর—হেস্টিংস একাদশ
৫ই সেপ্টেম্বর—কারবারো পিয়ার্সের একাদশ
৮ই সেপ্টেম্বর—মাইনর কাউণ্টিজ
১২ই সেপ্টেম্বর—স্কটল্যান্ড গ্লাসগো
১৪ই সেপ্টেম্বর—স্কটল্যান্ড আবাদিন

* * *

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে ভারত ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। চারটি সিংগলস ও একটি ডাবলস খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে দুটি সিংগলস ও একটি ডাবলসে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় টেনিসের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন কামো ও মিয়াগীকে পরাজিত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আৎসুসি মিয়াগী জাপানের সিংগলস চ্যাম্পিয়ন। জাপ টেনিসে কোশী কামোর স্থান দ্বিতীয়। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, ভারতের খেলোয়াড় কৃষ্ণন ও কুমার দুইজনই সিংগলসের খেলায় জাপ চ্যাম্পিয়ন মিয়াগীকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন, আবার দুইজনই হার স্বীকার করেন

কামোর কাছে। যাই হোক টোকিওর ডেনান কলোসিয়াম' টেনিস কোর্টে ভারতের খেলোয়াড়দ্বয় উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। ভারতকে এখন ডেভিস কাপের ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের খেলার বিজয়ী দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ডিসেম্বর মাসের আগে এই খেলার কোন সম্ভাবনা নেই, সুতরাং ভারতের এখন ৬ মাস বিশ্রাম। ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চল ফাইনালে জাপ-ভারত খেলার ফলাফল:—

সিংগলস—(প্রথম দিন)

আর কৃষ্ণন ৬—৩, ৬—০ ও ৬—৩ সেটে এ মিয়াগীকে (জাপান) পরাজিত করেন।

নরেশকুমার, কে কামোর (জাপান) কাছে ২—৬, ৬—৪, ৬—২, ৪—৬ ও ০—৬ সেটে পরাজিত হন।

ডাবলস (দ্বিতীয় দিন)

আর কৃষ্ণন ও নরেশকুমার ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—১ সেটে এ মিয়াগী ও কে কামোকে পরাজিত করেন।

সিংগলস (তৃতীয় দিন)

নরেশকুমার ৬—৪, ৬—১ ও ৬—১ সেটে এ মিয়াগীকে পরাজিত করেন।

আর কৃষ্ণন কামোর কাছে পরাজিত হন ৮—৬, ৩—৬, ৪—৬ ও ৩—৬ সেটে।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[২২শে মে পর্যন্ত]

লীগ খেলা এখনো জমে ওঠেনি। আবার মাঠে দর্শকেরও অভাব দেখা যাচ্ছে না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখবার জন্যই এই দর্শকসমাগম। এই তিনটি দলের প্রতি খেলাতেই মাঠ প্রায় ভরে যাচ্ছে।

শীর্ষস্থানীয় দলগুলির মধ্যে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে এখন পর্যন্ত একটি পয়েণ্টও নষ্ট করতে হয় নি, তবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই ১৪টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র ক্লাব, যাদের গোলব্যূহ এখনো আছে দুর্ভেদ্য। অর্থাৎ ২২ তারিখ পর্যন্ত মহমেডান কোন গোল খায় নি। অবশ্য তাদের খেলার সংখ্যাও কম। মোহনবাগান পাঁচটি খেলার মধ্যে পাঁচটি খেলায় জয়লাভ করে লীগকোঠার শীর্ষস্থানে রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে প্রথম দুটি খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও রেলওয়ে স্পোর্টসের কাছে একটি করে পয়েণ্ট নষ্ট করতে হয়েছে। পরের দুটি খেলায় জয়লাভ করলেও এখনো নিজেদের আস্থা ফিরে পায় নি। এরিয়ান ক্লাবও আশানুরূপ খেলতে পারছে না। এবারকার দলগুলির মধ্যে এখন পর্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান ক্লাবকে শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। রাজস্থান টীমের কোথায় যেন ঘুণ ধরেছে, তাদের খেলার মধ্যে কোনই প্রাণ নেই।

গোলদাতাদের তালিকায় মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল পাঁচটি গোল করে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। কে পালের পরই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আবিদ ও রেলওয়ে স্পোর্টসের পি কে ব্যানার্জীর স্থান। এ'রা চারটি করে গোল করেছেন; মোহনবাগানের এস ব্যানার্জী গোল করেছেন তিনটি; আর কেউই দুটির বেশী গোল করতে পারেন নি। নীচে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

১৬ই মে

মহঃ স্পোর্টিং (৩) : বালী প্রতিভা (০)
জর্জ টেলিগ্রাফ (২) : কালীঘাট (০)

১৭ই মে

ইস্টবেঙ্গল (১) : রেলওয়ে স্পোর্টস (১)
এরিয়ান (১) : রাজস্থান (০)
বি এন আর (১) : পুলিশ (০)

১৮ই মে

মহঃ স্পোর্টিং (২) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
বালী প্রতিভা (১) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
খিদিরপুর (০) : কালীঘাট (০)

১৯শে মে

মোহনবাগান (৪) : উয়াড়ী (১)
ইস্টবেঙ্গল (১) : পুলিশ (০)
বি এন আর (২) : এরিয়ান (১)

২১শে মে

রেলওয়ে স্পোর্টস (১) : রাজস্থান (০)
কালীঘাট (১) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)

২২শে মে

মোহনবাগান (২) : বালী প্রতিভা (০)
ইস্টবেঙ্গল (১) : বি এন আর (০)
এরিয়ান (১) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

প্রথম ডিভিসন লীগ টেবল

[২২শে মে পর্যন্ত]

	খে	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	৫	৫	০	০	১৪	১	১০
রেলঃ স্পোর্টস	৫	৩	২	০	৫	২	৮
বি এন আর	৬	৩	১	২	৫	৫	৭
মহঃ স্পোর্টিং	৩	৩	০	০	৭	০	৬
ইস্টবেঙ্গল	৪	২	২	০	৩	১	৬
এরিয়ান	৪	২	০	২	৩	৩	৪
রাজস্থান	৪	১	১	২	২	২	৩
খিদিরপুর	৩	১	১	১	১	১	৩
স্পোর্টিং ইউঃ	৪	০	৩	১	১	২	৩
বালী প্রতিভা	৫	১	১	৩	৩	৮	৩
কালীঘাট	৬	০	৩	৩	২	৭	৩
জর্জ টেলিগ্রাফ	৩	১	০	২	২	৪	২
উয়াড়ী	৩	০	১	২	৪	৮	১
পুলিশ	৪	০	১	৩	০	৭	১

দেশী সংবাদ

১৫ই মে—জানা যায়, আগামী ২৬শে মে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই দিনব্যাপী এক বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

১৬ই মে—ট্রেনে অত্যধিক ভিড়ের প্রশ্নে উত্তর হইয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় এরূপ মন্তব্য করেন যে, ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া ট্রেনে ভ্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হইবে কিনা তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন, দুইজন নূতন রাজ্যপাল শীঘ্রই নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য সকালে ৬০টি উদ্বাস্তু পরিবারের মোট ২৩৯ জন উদ্বাস্তু 'মহারাজা' জাহাজযোগে কলিকাতা হইতে আন্দামান রওয়ানা হইয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিস বড়বাজারের আমড়াতলা অঞ্চলে আকস্মিকভাবে হানা দিয়া 'ভেজাল চায়ের গুপ্ত কারখানা', গুদাম ও আড়ত তল্লাসী করিয়া ভেজাল সন্দেহে প্রায় ২০০ বস্তা চা আটক করে।

অদ্য আমদানী ও রপ্তানী বিভাগের চীফ কণ্ট্রোলারের অফিস হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, ভারত সরকার এখন হইতে সরিষার তৈল এবং রাই সরিষার তৈল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৭ই মে—ক্যানিং ইউনিয়নের কুমারস গ্রামের সারদামণি দাসী নামে এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজ বাস্তুভিটাসহ প্রায় তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী কাননে উৎপন্ন ১২ পাউণ্ড চাউল বিমানযোগে ব্রহ্মদেশে পাঠানো হইয়াছে। লুম্বিনিতে উৎপন্ন চাউল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশসমূহে বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

১৮ই মে—অদ্য কলিকাতা পুলিসের গুণ্ডা দমন বিভাগ ১২ ঘণ্টাব্যাপী অনুসন্ধানের পর ভবানীপুরের একটি বাড়িতে মদ চোলাইয়ের একটি বে-আইনী কারখানা আবিষ্কার করে এবং প্রায় ৮০ মণ বে-আইনী মদ উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের একটি ডাকোটা বিমান আমেদাবাদ বিমান ঘাঁটিতে অবতরণকালে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ফলে বৈমানিক ও রেডিও অফিসার সহ দশ ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯শে মে—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় রেল খাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একুনে মাত্র ৬৫ মাইল নূতন রেলপথের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের অধিবাসী বিশেষ করিয়া যাত্রী সাধারণের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

অদ্য আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী ডি পি কামারকার এইরূপ আভাস দেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

আজ রাতে এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রাণাঘাটিয়া ও নবাসী স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক স্থানে আজ বিকাল আন্দাজ ৪ ঘটিকার সময় রাজকোট-জামনগর মেল লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে ১২ জন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছে।

২০শে মে—গত দুই বৎসরে কলিকাতা পৌরসভার মোটর গ্যারেজ হইতে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা মূল্যের অনুমান ১৪,০০০ গ্যালন পেট্রোল উধাও হইয়াছে বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার সাহেবপুর নামক গ্রাম হইতে পুরুষকে বিকলাঙ্গ করিয়া নপুংসকে পরিণত করিবার এক অভিনব ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২১শে মে—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ অদ্য লোকসভায় বলেন যে, গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি বিল প্রণয়ন করা হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্থানে দুর্গত নিরন্নদের জন্য ভারত সরকার তথায় বিনামূল্যে বণ্টনের জন্য পাঁচ হাজার টন চাউল দিতে চাহিয়াছেন।

নাগা পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে সৈন্যবাহিনীর তৎপরতার ফলে [illegible] নাগাগণ চাপে পড়িয়া মণিপুর [illegible] নাগা [illegible]বাসীদের সঙ্গে মিলিয়া [illegible] এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই মে—অদ্য অপরাহ্নে নেপালের গৌচর বিমান ঘাটিতে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ফলে ১৪ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। ৩ জন বৈমানিক সহ ১৯ জন যাত্রী রক্ষা পাইয়াছে।

অদ্য পুলিস ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া ৩৮ সহস্র মণ মজুত খাদ্যশস্য হস্তগত করিয়াছে। গতকল্য হইতে হানা দিতে সুরু করিয়া পুলিস ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় এক লক্ষ মণ খাদ্যশস্য আটক করিয়াছে।

এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত ২৪ ঘণ্টাকালের মধ্যে আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ফরাসী বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে অনুমান ১০০ বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে।

১৬ই মে—সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, অদ্য রাত্রিতে মিশর মন্ত্রিসভা প্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৭ই মে—জাপানী অভিযাত্রী দল এ পর্যন্ত বিশ্বের অপরাজেয় মধ্য নেপালে হিমালয়ের ২৬,৪৫৮ ফুট উচ্চ মানসালু শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার দাবী মানিয়া লওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা মৌলানা ভাসানী আজ অনশন ধর্মঘট ত্যাগ করিয়াছেন।

যে সব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ সামরিক বস্তু কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে প্রেরণ করিতেছে, সে সব দেশ বৈদেশিক সাহায্য পাইবে না বলিয়া মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি স্থির করিয়াছে।

১৮ই মে—পাকিস্থান ফুটবল ফেডারেশনের মুখপত্রের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্থান দল সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও চীনের বিভিন্ন স্থানে খেলায় যোগদান করিবে।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহীরা কর্মতৎপর থাকায় ব্রহ্ম সরকার ৩৭টি নির্বাচন কেন্দ্রে উপর্যুক্ত পরিষদের নির্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন।

১৯শে মে—পাকিস্থান অবজারভারে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল যে, হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পাকিস্থানী বিচারক স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ৬৫ বৎসর বয়সে ১৮ বৎসর বয়স্কা এক আরব উদ্বাস্তু তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। জাফরুল্লা খাঁয়ের প্রথম স্ত্রী পাকিস্থানে বাস করিতেছে।

২০শে মে—অদ্য পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী লীগ পরিষদ পাকিস্থানের সমস্ত সামরিক চুক্তিতে যোগদানের বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্বর্তী আইন সভায় স্পীকার নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী মিঃ ফজল ইলাহী চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোটে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া স্পীকার নির্বাচিত হইয়াছেন।

২১শে মে—প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা কেন্দ্র বিকিনি প্রবাল বলয়ে অদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২৫, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মাদের দেশে বিয়ের প্রথা আজও অতীত যুগের ধারাকেই বহন করে চলেছে। সানাইয়ের ঐক্যতান, ফুলের সৌরভ এবং নতুন জামাকাপড়ের সম্ভার আজও আমাদের বিবাহবাসরকে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরে তোলে। আর এই আনন্দময় পরিবেশে বিবাহ হয়ে ওঠে একটী স্মরণীয় ঘটনা। বিয়ের ভোজ এই শুভ অনুষ্ঠানের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেইজন্যেই আজ হাজার হাজার পরিবার, যাঁরা নিমন্ত্রিতদের সবচেয়ে ভালধরনের খাবার পরিবেশন করতে চান—নানারকম লোভনীয় খাবারদাবার রান্না করে থাকেন ডালডা মার্কা বনস্পতি দিয়ে। তাঁরা জানেন ডালডা কত ভাল এবং বিশুদ্ধ। এছাড়াও ডালডার খরচ কত কম!

যে কোন জায়গায় ডালডা হচ্ছে বিবাহভোজ এবং আনুসাঙ্গিক আনন্দ চঞ্চলতার নিত্যসঙ্গী।

ডালডা মার্কা বনস্পতি

HVM. 265-X52 BG

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 2nd JUNE. 1956

২৩ বর্ষ ॥ ৩১ সংখ্যা ॥
শনিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
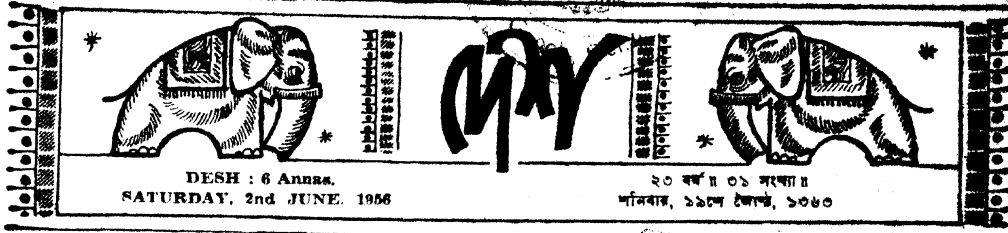
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাহিত্য-প্রচারে ভারত সরকার

ভারত সরকারের পরিচালিত সাহিত্য আকাদামির পক্ষ হইতে সম্প্রতি গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুরু হইবে শোনা যাইতেছে। সংবাদে আরও জানা গিয়াছে যে, সরকার বিশেষভাবে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইবেন। সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। প্রকৃত-পক্ষে বহু প্রাচীন গ্রন্থ বর্তমানে বাজারে মিলে না। অতীতের তুলনায় বর্তমানে দেশের গ্রন্থ-প্রকাশকেরা ক্লাসিক গ্রন্থ প্রকাশে তেমন আগ্রহান্বিত নহেন। লাভের দিকটাতেই প্রধানত তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টি থাকে বলিয়াই এই দিকে তাঁহাদের উদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মুনাফার দিক বড় করিয়া না দেখিয়া শুধু সৎসাহিত্য প্রচারের প্রেরণায় যাঁহারা ক্লাসিক গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি লইয়া থাকেন, এমন প্রকাশকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং সরকার যদি সত্য সত্যই ক্লাসিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশে ব্রতী হন, তবে দেশের সাহিত্যের উন্নয়নের পক্ষে একটি বৃহৎ প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবে। বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যসমূহের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করাও সরকারের পক্ষে কর্তব্য। ইহার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংহতির ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে। বস্তুত সংস্কৃতিই জাতীয় সংহতির ভিত্তি। ভারতে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের মধ্যে সংস্কৃতিগত একটি যোগসূত্র রহিয়াছে। জাতিকে আজ সেই যোগসূত্র ধরাইয়া দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই সঙ্গে বিশ্বের বিখ্যাত সাহিত্যগুলিকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়োজনও রহিয়াছে। আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। চীন, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহের অতীত এবং আধুনিক-কালের সাহিত্য-কীর্তির সহিত ভারতের শিক্ষিতসমাজের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে পরিচয় নাই। ভগবান বুদ্ধের মহা-পরি-নির্বাণ উপলক্ষে আমরা এই সত্যটি বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। ফলত আরব ও ইরানের সাহিত্যের সঙ্গে উর্দু ভাষা এ দেশের কিছুটা যোগ রক্ষা করিতেছে, কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ হইতে বর্তমান ভারত অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। আমাদের রাজনীতিক আদর্শ এবং সহাবস্থান নীতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এই সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার

নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চাউল, বস্ত্র এবং তৈলের এই মূল্য বৃদ্ধি ইতোমধ্যেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনে আর্থিক সংকট নিদারুণ করিয়া তুলিয়াছে। অর্থসচিব শ্রী দেশমুখ সেদিন আমাদিগকে এই সম্বন্ধে আশ্বাস বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার মতে চাউলের এই মূল্য-বৃদ্ধি কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজন ছিল। খাদ্যসচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন সম্প্রতি কলিকাতায় এই সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অর্থসচিবের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। তাঁহার মতে চাউলের এই মূল্যবৃদ্ধির মূলে মজুতদারদের কারসাজী রহিয়াছে। খাদ্য-সচিব ইহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ইহারা সমাজদ্রোহী মতিগতি পরিবর্তন না করে, তবে সরকার তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি কঠোরহস্তে দমন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না। খাদ্যসচিবের উক্তিতে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, চাউলের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকরা লাভবান্ হইতেছে না। পরন্তু কতকগুলি মজুতদার এবং তাহাদের দালালেরাই কৃত্রিমভাবে মূল্য-বৃদ্ধি করিয়া মজা লুটিতেছে। এই শ্রেণীর নরপিশাচদের দৌরাত্ম্যে দেশের লোক দিন দিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যসচিব সত্যই যদি চাউলের দর বৃদ্ধির মূলে ইহাদের ধাপ্পাবাজী ধরিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে কোন্ কোমলবৃত্তির বশে ইহাদিগকে আরও সময় দিতেছেন, আমরা বুঝি না। সরকার-পক্ষের মুখের কথায় ইহারা ভয় পাইবে না, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে কর্তৃপক্ষ এই নিতান্ত সহজ সত্যটি কি এতদিনেও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

শহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ

কলিকাতা শহরে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হয় নাই। কলেরা প্রতিবিধেয় ব্যাধি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জগতের অন্যতম প্রধান নগরী এই কলিকাতায় তাহা বিশেষজ্ঞ মতে অপ্রতিরোধ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উপায় কি? চেষ্টায় ত্রুটি কিছু করা হয় নাই। ইহার মধ্যেই এই সম্পর্কে আলোচনাও বিবেচনা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পৌরসভার কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক হইয়া গেল। সম্প্রতি সরকারী দপ্তরখানায় বহু চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এতদর্থে সম্মিলিত হইয়া-ছিলেন। সব বিষয়ে বিচার-বিবেচনার পর তাঁহারা এই রায় দিয়াছেন যে, শহরের বস্তী অঞ্চলে পরিস্রুত জল সরবরাহ করা কর্পোরেশনের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে শহর-বাসীদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, সরবরাহ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হইবে। এই বোর্ড কবে

গঠিত হইবে, তাহা এখনও সুনিশ্চিত হয় নাই। তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, জল-সরবরাহের অবস্থা সম্বন্ধে কর্পোরেশন হইতে তদন্তের কাজ আগস্ট মাঝের মাঝামাঝি তক্ শেষ হইবে। আপাতত জলের অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পৌরসভা বস্তী অঞ্চলে ৫ হাজারটি নল কূপ বসাইবেন। এই সব নলকূপও অবশ্য এখনই বসানো সম্ভব হইবে না, নবেম্বর মাস পর্যন্ত এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। ফলতঃ এই কয়েক মাস দৈবের অনুগ্রহই বস্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র ভরসা। পৌরসভার এমন সুবিচার এবং সুবিবেচনার জন্য কলিকাতার করদাতৃগণ বিশেষভাবে দুর্গত বস্তী অঞ্চলবাসীরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সন্দেহ কি?

পূর্ববঙ্গে শাসন-সঙ্কট

পূর্ববঙ্গ পুনরায় রাজনীতিক ঘূর্ণি-পাকের মধ্যে পড়িয়াছে। জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার লাটগিরির আমলে মৌলবী ফজলুল হক দেশদ্রোহী আখ্যা লাভ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। তিনি গভর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ববঙ্গের পার্লামেণ্টারী শাসন বাতিল করিয়া দিয়াছেন বা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কার্যত পাকিস্থানের শাসনকার্যে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়ত্র উপদলীয় চক্রান্তের খেলা চলিতেছে। সেখানে জনমতের শক্তি এখনও মাথা বাঁধিয়া উঠিবার সুযোগ কোন দিক হইতে পাইতেছে না। পূর্ববঙ্গে বর্তমানে ভয়াবহ খাদ্য সংকট চলিতেছে। জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত নাই। এই খাদ্য-সংকট হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার প্রশ্নই নেতৃবর্গের প্রধান চিন্তার বিষয়ে পরিণত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু অবস্থাচক্রে সেই প্রশ্নটি এখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। যুক্ত ফ্রণ্ট এবং আওয়ামী লীগ এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। মিঃ আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিত্বের আমলে সংখ্যালঘুদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিবে এবং পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম হ্রাস পাইবে, কেহ কেহ এইরূপ আশা করিতেছিলেন। কেন্দ্রীয় সচিব শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস কয়েকদিন পূর্বেও এইরূপ আশ্বাস ব্যক্ত করেন। কিন্তু সে সবই বানচাল হইয়া গেল এবং সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ পুনরায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। উপদলীয় চক্রান্ত যেখানে এতটা প্রবল এবং নেতৃবর্গের মধ্যে নীতিনিষ্ঠার যেখানে বালাই নাই। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব সেখানে শাসনতন্ত্রের রীতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ববঙ্গের শাসন-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ভিতর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও পরিলক্ষিত হইতেছে না।

আন্দামানে বসতি বিস্তার

সম্প্রতি লোকসভার একটি প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আন্দামানের বসতি বিস্তারের উপযুক্ত স্থানের তিন-চতুর্থাংশ

> **বিজ্ঞপ্তি**
>
> **শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রর উপন্যাস 'উপনগর'-এর ধারাবাহিক প্রকাশ এ-সপ্তাহ থেকে অনিবার্য কারণে বন্ধ রাখতে হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা, আশা করি, লেখক ও সম্পাদককে মার্জনা করবেন। —সম্পাদক 'দেশ'**

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জন্য থাকিবে। এতদিন পরে আন্দামানে বসতি বিস্তারের সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে একটা খোলাখুলি কথা পাওয়া গেল। সহকারী স্বরাষ্ট্রসচিবের এই উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যে সমালোচনা আরম্ভ হয়, তাহাতে কিছু সুফল ফলিয়াছে। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সে প্রশ্ন এই যে, আন্দামানের বসতি বিস্তারের জন্য সবটা জায়গাই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হইল না কেন? ভারতের অন্য কোন প্রদেশের লোকদের মধ্যে অন্যত্র পুনর্বাসনের সমস্যা নিশ্চয়ই দেখা দেয় নাই। সরকারের এইরূপ মনোভাবের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আন্দামানে কিছুসংখ্যক অবাঙালীকে পুনর্বাসনের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সে উদ্দেশ্য কি? তাঁহাদের শাসননীতির ফলে আন্দামানেও ভাষাগত সংকট সৃষ্টি হইবে। অনর্থক আন্দামানে উপনিবিষ্ট পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমাজের মধ্যে এই সমস্যা গড়িয়া তোলা ভারত সরকারের পক্ষে সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ফলত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যই আন্দামানের বসতি বিস্তারযোগ্য সবটা অঞ্চলই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং এই দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য।

ফরাসী প্রভুত্বের অবসান

করিকল, মাহে, ইয়ানাম ও পণ্ডিচেরী এই চারটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ ১৯৫৪ সালের নবেম্বর মাসে ভারতের নিকট প্রত্যর্পিত হয়; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে কোন চুক্তির দ্বারা এই হস্তান্তর কার্যের বৈধতা নিষ্পন্ন হয় নাই। গত ২৮শে মে নয়াদিল্লীতে উভয় সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত হইতে ফরাসীদের প্রভুত্বের অবসান ঘটিল। কিন্তু এজন্য ফরাসী সরকারের ক্ষতি হয় নাই। বর্তমান জগতের সর্বত্র জনগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জাগ্রত জনমতকে পিষ্ট করিয়া বৈদেশিক শক্তির পক্ষে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব পরিচালনা করা নিজেদের স্বার্থের পক্ষেও সুবিধাজনক নহে। প্রত্যুত সেক্ষেত্রে জাতির বৃহত্তর স্বার্থই বিপন্ন হইয়া থাকে। ফরাসী সরকার ভারতের সম্পর্কে এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াই ভারতে তাহাদের ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বিলুপ্তি সাধনে শেষটায় সম্মত হন। ইহার ফলে ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হইল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতিক মর্যাদাই বৃদ্ধি পাইল। ইংরেজ এবং ফরাসীর ন্যায় প্রবল শক্তি ভারত হইতে নিজেদের প্রভুত্ব গুটাইয়া লইল, কিন্তু ক্ষুদ্র শক্তি পর্তুগাল আজও ভারতের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদের জিগীর ছাড়িতেছে। গোয়ার ব্যাপারে আমরা তাহাদের এই নির্লজ্জ বর্বরতার পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু ইহার ফলে তাহাদিগকেই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে ইংরেজ এবং ফরাসীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি তাহাদের শিক্ষা না হয়, তবে শেষ পর্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদিগকে ঠেকিয়া শিখিতে হইবে। জাগ্রত জনমতের গতি রুদ্ধ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। মুক্তির প্রেরণা জাতির অন্তরে যদি একবার জাগিয়া উঠে, তবে পশুশক্তি যতই প্রবল হোক্ না কেন, তাহার গতি প্রতিহত করিতে পারে না, পর্তুগাল তো ক্ষুদ্র!

॥ চট্টগ্রামে নজরুল ॥

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বৃটিশ সরকার দেশব্যাপী বেড়াজাল দিয়ে ছোটবড় কর্মী ও নেতাদের ছেঁকে তুলে জেলখানায় পুরে ফেলে আন্দোলনকে চেপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে দেশের কর্মী ও নেতাদেরই সুবিধে হ'ল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলের ভিতর বিভিন্ন জেলার কর্মীদের পরিচয় হয় আর বন্ধুত্বও পাকাপাকিভাবে গড়ে ওঠে। নরমপন্থীদের থেকে চরমপন্থীদেরই (বিপ্লবী) সুবিধা হয়েছিল বেশী।

১৯২৪ সাল থেকে বৃটিশ সরকার এক এক ক'রে নানা জেলার কর্মী ও নেতাদের ছেড়ে দিতে শুরু করলে। ১৯২৫ সালে প্রায় জেল খালি হ'য়ে গেল। কেবল দুই একজন বিপ্লবী বড়দাদারা জেলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রয়ে গেলেন। অন্যান্য যে সব কর্মীরা বাইরে এলেন তাঁরা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। বিভিন্ন জেলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে চট্টগ্রামের কর্মীরা চট্টগ্রামে 'নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলন' ডাকলেন। যতদূর মনে পড়ে এই সভা তিনদিনব্যাপী চলেছিল। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু; দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও তৃতীয় দিনে পূর্ণচন্দ্র দাস। প্রথমদিনে সভার উদ্বোধন করেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল। উদ্বোধন

[illegible] জন্মদিবসে কবি নজরুল

ফটো : নীরোদ রায়

সঙ্গীতও কবিকেই গাইতে হয়েছিল।

চট্টগ্রামে যাবার পথে কবি নজরুল তাঁর প্রিয় বন্ধু অগ্রজপ্রতিম মোজাফ্ফর আহ্মদের সন্দীপের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। মোজাফ্ফর সাহেবের বাড়ির আদর-যত্নের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। সেখান থেকে চট্টগ্রাম গিয়ে হবিবুল্লা বাহার সাহেবের তামাকুমণ্ডির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। জনাব হবিবুল্লা বাহার ও তাঁহার ভগ্নী সামসুন্নাহার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। এঁদের যে বাড়িতে কবি ওঠেন সে বাড়িটি মস্ত বড় একটি বাগানের মধ্যে ছিল। সেই বাগানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সারবন্দী সুপারী গাছের শোভা। এই বাগানের একটি নির্জন ঘর কবিকে থাকবার জন্য বাহার পরিবার ছেড়ে দেন। এই ঘরে বসে কবি বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। এইখান থেকেই তিনি সম্মেলনে যোগদান করতেন। সম্মেলনের অভিভাষণে কবি নজরুল, সুভাষচন্দ্র, পূর্ণ দাস, ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যুবসমাজকে সোজাসুজি বৃটিশ সরকার ও ফিরিঙ্গির গোলামদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের আহ্বান জানান। যতদূর মনে পড়ে পূর্ণ দাস ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের ভাষণ পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পর কবি বাহার সাহেবের সঙ্গে চট্টগ্রামের নানা জায়গা ঘুরে দেখেন। কর্ণফুলি নদী দেখতে গিয়ে কবি এমনই মুগ্ধ হয়ে যান যে, এক অঞ্জলি জল নিয়ে নদীতে অর্ঘ্য দেন ও 'কর্ণফুলী' কবিতায় লেখেন—

"ওগো ও কর্ণফুলি!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার
কানফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্
তরুণী কে জানে,
"সাম্পান"-নায়ে ফিরেছিল তার
দয়িতের সন্ধানে??
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা
কানফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে
হ'লে কি "কর্ণফুলি"?"

এরপর কবি নজরুল বাহার ও নাহার দুই ভাইবোনকে দু'লাইনে লেখেন—

আলোর মত জ্বলে ওঠ। ঊষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠো।"

বাহার ও নাহার দুই ভাইবোনের যত্নে স্নেহ-পাগল নজরুল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এর পরের কবিতাটিতে লেখেন—

"কে তোমাদের ভালো?
"বাহার" আনো গুলসানে গুল,
"নাহার" আনো আলো।
"বাহার" এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
"নাহার" এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।
তোমরা দুটি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে—নয়ন ভুলালি।
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশধরা করছে কানাকানি।"

'বাহার' শব্দের অর্থ বসন্ত ও 'নাহার' মানে দিন। পরবর্তীকালে 'সিন্ধু হিন্দোল' নামক গ্রন্থটি এই কবিতাসহ বাহার ও নাহারকে কবি উৎসর্গ করেন।

এই 'সিন্দু হিন্দোল' গ্রন্থটিতে 'সিন্ধু' নামক তিনটি কবিতা আছে। তাও ঐ খানেই লেখা। কবি নজরুল চট্টগ্রামে গিয়ে সমুদ্র দেখে কেমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন, তেমনি একটি মত্ততার আবেগ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সময় সমুদ্র ও কবি যেন একই এমনি একটা ভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন কথায় ও ভাবে। পরে কবি নজরুল 'সিন্ধু' কবিতায় 'কবি ও সমুদ্র এক' এই কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির বিরহী।
হে অতৃপ্ত! রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?"

বাহার সাহেবের বাড়িতে লেখেন 'চক্রবাক্' ও 'বাতায়ন পাশে গুবাক সারি', 'শীতের সিন্ধু' প্রভৃতি। বাহার সাহেবের বাগানের নির্জন কক্ষে কবি চখা-চখীর ডাক শুনে চকিত হয়ে উঠতেন, সারি সারি সুপুরী গাছের পাতার শব্দে ভাব-প্রবণ মন মগ্ন হয়ে যেত। তিনি 'চক্রবাক্' কবিতায় লিখলেন—

"ওগো ও চক্রবাকী
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি।"

পরে ফিরে আসবার সময় "বাতায়ন পাশে সুপুরী গাছের সারি'কে বলেন—

"বিদায়, হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী।
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হ'য়ে এল
বিদায়ের রাতি!"

এরপর আরও কয়েকদিন থাকেন 'সাম্পান' মাঝিদের সঙ্গে সাম্পান নৌকোয়। এই মাঝিরা এই নৌকোতেই পরিবার প্রভৃতি নিয়ে বাস করে। এদের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ খুবই কম। এই 'সাম্পানে' থাকাকালীন তিনি অসংখ্য ভাটিয়ালী গান লেখেন।

"নদীরও জল শুকায় রে ভাই
সে জল আসে ফিইরা
আর মানুষ গেলে ফেরে না রে
দিলে মাথার কিরা।
আমি ভালবাইসা গেলাম ভাইসা
আমি হইলাম দ্যাশান্তরী।"

এমনি অপূর্ব সব সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীত 'হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস্' কোম্পানী রেকর্ডের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশন করেছিল। কিন্তু কবির দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কবির বন্ধুরা টাকা ধার দিয়ে অনেকেই তাঁর উপকারের ছলে তাঁর অপকার করেছেন। কবি পত্নীর অসুখের দুশ্চিন্তায় মোটর বিক্রী করে দেন, বালিগঞ্জের জমিও বিক্রী করে দিয়ে নানারূপে পত্নীর চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করে ক্রমে নিঃসম্বল হয়ে পড়েন।

চৈত্র দুপুরের চোখ পাকানো রোদ মাথায় নিয়ে আইসক্রীমের গাড়ি চালিয়ে ভেণ্টু সার্পেণ্টাইন লেনে এসে ঢুকল। একটা অশথ-চারা সবে ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। ভেণ্টু তিন চাকার গাড়িটা সেখানে এনে দাঁড় করায়। গাছের গা ঘেঁষে হলদে রঙের ছ' তলা বাড়ি সার্পেণ্টাইন লেনের আর সব বাড়িকে ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেছে। প্রকাণ্ড হলদে বাড়ির নিচে আইসক্রীমের লাল গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেণ্টু হাতলের বেল্ টিপতে থাকে ক্রিং ক্রিং ক্রিং, ক্রিং ক্রিং......ক্রাং

আর হলদে বাড়িব তিন তলার ব্যাল্কনির রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে বেগুনি ফ্রক-পরা মেয়ে মিণ্ট বেণী দুলিয়ে খিলখিল হাসে। চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় অশথ পাতারা কাঁপে। ভেণ্টুর পরনে নীল ট্রাউজার, শাদা হাত-কাটা শার্ট গায়ে। তেল চুকচুকে কালো চুল ব্যাক্-ব্রাশ করে করে মাথাটা চব্বিশ ঘণ্টা পালিশ রাখতে ওর ত্রুটি নেই। আঠারো বছর বয়সে মুখে কতটা গোঁফদাড়ি গজাতো টের পাবার উপায় নেই। একদিন অন্তর রেজার চালিয়ে ঠোঁট ও গালের চামড়া ভেণ্টু লিচুর খোসার মত খসখসে করে ফেলেছে। অবশ্য তার কারণ আছে। ইদানিং সে কাজটা ভাল জুটিয়েছে। আইসক্রীমের ডজন হিসাবে তার কমিশন। বিক্রী করলেই পয়সা। আর চোখ বুঁজে পার্ক সার্কাস, ওয়েলেসলী, ধরমতলা, মওলালী, সার্কুলার রোড ধরে এদিকে ডক্টর্স লেন, ওদিকে সার্পেণ্টাইন লেন অবধি তিনচাকার গাড়ি চালিয়ে আসতে না আসতে বাক্স খালি হয়ে যায়। তা ছাড়া 'হ্যাপী-বেবি' কোম্পানি থেকে ভেণ্টু অমন চমৎকার নীল ট্রাউজার আর হাফ-সিল্ক-এর একটা শার্টও পেয়েছে। এমনটি সে চেয়েছিল। হাজিরা দিতে দেরি হলে কি

একটু সকালে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এলে বকাবকা নেই, কামাই করলে মাইনে কাটা যাওয়ার প্রশ্ন নেই। 'কমিশন বেসিসে কাজ, কোনো শালার তোয়াক্কা রাখি না, হি-হি!' ভেন্টু হাসে আর শিস দেয় আর গাড়ি চালায় আর—

হুঁ, যেমন এখন, হলদে রঙের জানালা বাড়ির ব্যালকনির তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে পায়ের জোরে ও বেল্ টিপছে ক্রিং ক্রিং ক্রিং......ক্রিং ক্রিং—ক্রাং। আর সেই শব্দ শুনে সোনালী কি বেগুনি ফ্রক-পরা একটি মেয়ে ছুটে এসে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়ায় আর বেণী দুলিয়ে খিলখিল হাসে। কি, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পর পর তিনটে চারটে আইসক্রীম একলা কিনে খায় এমন মেয়ের দেখা ভেন্টু রোজ পায়। পার্ক সার্কাস, ওয়েলেসলী, ধর্মতলা, মওলালীর রাস্তা ঘুরে ঘুরে তারপর রোজ একলা আধ ডজন হ্যাপী-বেবি কিনে খাবে বলে চৈত্রের চোখ পাকানো রোদে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মিণ্টি যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে ভেন্টু সেখানে ছুটে আসে। অশথ গাছ তিন তলার ব্যালকনি অবধি পৌঁছয়নি। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভেন্টু বেল্ বাজায়। আর কাঁঠালচাঁপা রঙের ছোট্ট রুমাল দিয়ে ফর্সা ফুটফুটে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে মিণ্টি বিদ্যুৎবেগে নিচে রাস্তায় নেমে এই এতগুলো আইসক্রীম কিনে আবার তরতর সিঁড়ি বেয়ে তখনি ওপরে উঠে যায়। ক্রিং ক্রিং ক্রিং......ক্রিং ক্রিং ক্রাং......

যেন মিণ্টির আইসক্রীম খাওয়া দেখতে ভেন্টু কিছুক্ষণ তার তিনচাকার সাইকেলের ওপর বসে থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফাঁক বুঝে বিড়িটা সিগারেটটা ধরায়। তার নাক থেকে নীলচে ধোঁয়ার চাকা বেরিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে ওঠে, আর ওপর থেকে মিণ্টির নরম [illegible] ঠোঁটের চাপে আইসক্রীমের দুধ গলে একটা দুটো ফোঁটা নিচে ঝরে পড়ে। খাওয়া শেষ হলে কাঠিটা রাস্তার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেণী দুলিয়ে মিণ্টি খিলখিল হাসে আর ভেন্টু জোরে জোরে বেল্ বাজায়। মিণ্টি আর একটা আইসক্রীম তুলে কামড় বসায়। ভেন্টু মাথা নেড়ে 'গুড বাই' জানিয়ে সাইকেল নিয়ে আর এক দিকে ছোটে। ক্রিং ক্রিং...... ক্রিং ক্রিং......

চৈত্রের চোখ পাকানো রোদ মাথায় নিয়ে সেদিন ভেন্টুর মামা নরহরি মওলালীর মোড়ে যেন ভেন্টুকে ধরতে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল। মামার চেহারা দেখে ভেন্টুর মুখ শুকিয়ে যায়। 'শুয়োরের বাচ্চা, ওই টিঙটিঙে গাড়ি চালিয়ে আর এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে তুমি দিন কাটাচ্ছো, এই করে তোমার ইহকাল কাটবে—'

ভেন্টু মামার মুখের দিকে তাকায় না। মামাকে সে ঘৃণা করে। মামা এবং বাবা দুজনকেই ঘৃণা করে। টিটাগড় চটকলে চাকরি তার বাবার। ভেন্টুকে সেখানে ঢোকানো হয়েছিল। দশদিন। আর কাজ করা পোষায়নি। অতক্ষণ আটকা থাকতে পারে মানুষ! কেঁদে সে টিটাগড়ের কুলি ব্যারাক ছেড়ে এখানে বেলেঘাটায় মামার ডেরায় চলে আসে। কিন্তু জোয়ান ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানোর লোক নরহরি না। পরদিনই বৌবাজারের মনোহর সরখেলের পাইস-হোটেলে সে ভেন্টুকে ঢুকিয়ে দেয়। থালা-বাসন ধোয়ার কাজ। আঠারো টাকা বেতন। তার ওপর হোটেলে খাওয়া থাকা। তার ওপর মনোহরের দেওয়া দুটো খাকি হাফ্ প্যাণ্ট আর একটা হাতকাটা গেঞ্জি। সাত দিন। চব্বিশ ঘণ্টা আটকা থাকতে পারে মানুষ! ভেন্টু বেলেঘাটায় ফিরে গিয়ে নরহরিকে বোঝাতে চেষ্টা করতে নরহরি তার পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল বসিয়ে দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠেছিল : 'কুত্তার বাচ্চা,—আটকা তো সবাই থাকছে রে। গতরে হাওয়া লাগিয়ে রাস্তায় ঘুরে তুই পেটের ভাত যোগাড় করবি, এই মতলবে আছিস নাকি। ভাল চাস তো কাল সকালে হোটেলে ফিরে যা। অত বলে কয়ে সরখেলকে রাজি করিয়েছি, আর সোনার চাঁদ কিনা—'

মার খেয়ে ভেন্টু ভেউ ভেউ কাঁদেনি। সেই বয়েস সে কাটিয়েছে। মুখ নিচু করে থমথমে গলায় বলছিল, দিনে রাতে পাঁচ শ থালা গ্লাস ধুতে হয় তাকে। খেতে বসে পোড়া ভাত শাক চচ্চড়ী আর ডালের জল ছাড়া পাতে অন্য কিছু দেখে না। কয়লা আর চালের বস্তা বোঝাই অন্ধকার গুদোমে রাত্রে ঘুমোতে হয়—

ভেন্টু কথা শেষ করতে পারেনি। নরহরি দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছিল : 'লাট সাহেবের বাচ্চা! পেটে এক ছটাক বিদ্যা নেই যখন, তখন থালা গ্লাস ধুয়ে পয়সা কামানো ছাড়া উপায় কি। হুঁ, শাক চচ্চড়ি আর ডালের জল! কেন, হোটেলের ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা দিয়ে দুবেলা ভাত খাবি ভেবেছিলি নাকি। শুয়োর।'

ভেন্টু আর শব্দ করেনি। মামার ডেরা ছেড়ে সেই রাত্রেই সে পালিয়ে যায়। ট্যাংরার সুকুমারকে ধরে 'হ্যাপি-বেবি' কোম্পানিতে সে কাজ জুটিয়েছে। বেশ ভাল আছে সে। সুকুমার তার বন্ধু। হাতে পয়সা না হওয়া পর্যন্ত ভেন্টু দিনকতক বন্ধুর বাড়িতে ছিল। এখন সে 'হ্যাপি-বেবি' কোম্পানির দারোয়ানদের ঘরে রাত্রে থাকবার জায়গা করে নিয়েছে। সামান্য কিছু দিতে হয় যমুনা সিংকে।

'কি কথা কইছিস না যে বড়?' নরহরি হুংকার ছাড়ল : 'পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো! গোড়ায় ভেবেছিলাম ট্রামে কাটা পড়েছে, নয় তো পেটের জ্বালায় পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে হাজতে পচছে। পরে শুনলাম পাড়ার জলধরের মুখে, না, সোনার চাঁদ দিব্যি আছে। সিগারেট ফুঁকছে, টিঙটিঙে গাড়ি চালাচ্ছে, আর বাবুপাড়ায় ঘুরে ছুঁড়িদের আইসক্রীম বিলোচ্ছে।'

'ওরা কিনে খায় আইসক্রীম।' ভেন্টু বলতে চেয়েছিল, নরহরি তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল : 'হাতের কাজ শিখতে হবে তোকে, বুঝলি, আখেরে সুবিধা হয় এমন কাজ ধরতে হবে।'

ভেন্টু চুপ। নরহরি বলল শশীর সঙ্গে কাল তার দেখা হয়েছিল। হুঁ, ধর্মতলার রেস্টুরেন্টের শশী। সাহেবসুবো রাতদিন ওর দোকানে খেতে আসে। মনোহরের ভাতের হোটেল না। এত বড় রেস্টুরেন্ট। ওরা লোক চাইছে। নরহরিকে এমনও আভাস দিয়েছে শশী যে, যদি তার নিজের লোক কেউ থাকে, এখনি তবে ঢুকিয়ে দিক। ওখানে থেকে যদি চপ্ কাটলেট ডেভিল মোগলাই পরটা তৈরি করতে একবার শিখে ফেলে ভেন্টু, তবে কলকাতা শহরে তাকে ভবিষ্যতে কাজের জন্যে, ভাতের জন্যে ভাবতে হবে না।

ভেন্টু পিটপিটে চোখে মামার মুখের দিকে তাকায়। এমন কি ঠোঁটের ধারে একটু হাসিও উঁকি দেয়। মামা নরহরি দালালি করে খায়। কলকাতা শহরের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে।

'ওরা পোশাক দেবে?' ভেন্টু প্রশ্ন করে।

'পোশাক দেবে মানে: এ-কি তোর

টিঙটিঙে সরফ কোম্পানি।' নরহরি ভেংচি কাটল। 'আচকান পায়জামা। বুঝলি? একদিন অন্তর ধোবা বাড়ি থেকে ধুইয়ে আনা হয়। বাঙালীপাড়ার চায়ের দোকান না। আর থাকা-খাওয়ারই বা কী চমৎকার ব্যবস্থা। হুঁ, শশীর চেহারা ফিরে গেল। বেলেঘেটার বিস্কুট কোম্পানিতে কাজ করত শশীকে মনে আছে তোর?'

ভেন্টু ঘাড় কাত করল। একবার আকাশে চোখ রেখে ভাবল। টিটাগড়ের কুলি ব্যারাকে ক'দিনেই তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। শহরে থেকে কাজ করে খাবে বলে মামার কাছে যা-ও এল, জুটল পচা পাইস হোটেলের থালা-ধোয়ার কাজ।

'আর কী সব খদ্দের!' নরহরি বলল, 'মেয়েছেলে হোক, ব্যাটাছেলে হোক, ওদের পোশাকের কত স্টাইল। আর কত দরাজ হাত! শশী বলছিল দিনে কম-সে-কম পাঁচটা টাকা বকশিশ সে পকেটে ঢোকাবেই। মাইনে পঁয়ত্রিশ। খাওয়া-পরা ফ্রি। তার ওপর মাসের শেষে একশ দেড়শ স্রেফ বখশিশের রোজগার। খাটুনি পোষাবে না এ-বয়সে। না হলে শালা আমিই—'

নরহরি থামে। ভেন্টু তার নতুন রং-করা আইসক্রিমের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে ভাবে। বস্তুত সাহেব পাড়ার হোটেল রেস্টুরেন্টের চাকরির সুখ্যাতি সে মনোহরের হোটেলে থাকতে কর্মচারীদের মুখে শুনেছে। এদিকে তার একটু দুর্বলতা আছে বৈকি। লোভ এখন আরো বাড়ল।

ভেন্টু ঘাড় কাত করল। নরহরি খুশি হয়।

'কাল সকাল দশটার আগে ধরমতলা চলে যা। শশীর সঙ্গে দেখা করবি। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। কোম্পানিকে এখনি গিয়ে এই টিঙটিঙে গাড়ি ফিরিয়ে দে, আর যা মাল এনেছিলি তার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে তোর মাল পাওনা যা হয়েছে সব আদায় করে চলে আয়। কেমন?'

ভেন্টু ঘাড় কাত করে। নরহরি পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল তুলে ঠিকানা লিখে ভাগ্নের হাতে দেয়। ভেন্টু কাগজের টুকরাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে কতক্ষণ চেয়ে থাকে। যখন চোখ তোলে, দেখে নরহরি চামড়ার ফলিও ব্যাগটা বগলে চেপে দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলবে কি না ভেবে ভেন্টু সেটা পরে পকেটে পুরল। ক্রিং ক্রিং ক্রিং...... ক্রিং ক্রিং ......বড় রাস্তার গরম পিচ ছেড়ে ভেন্টু তিনচাকার সাইকেল নিয়ে ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা গলিতে ঢোকে।

শশীর কাছে ভেন্টুকে একটা পোকার মত দেখায়। এই এত বড় শরীর শশীর। পেটটা জয়ঢাকের মত দিন দিন কেবল ফুলছে। অথচ শশী যে ভেন্টুর চেয়ে বয়সে খুব বড় তা না। বেলেঘাটার ছেলে, তার ওপর নরহরির ভাগ্নে। শশী ভেন্টুকে ভীষণ খাতির করতে আরম্ভ করেছে। নিজের হাতে ওকে চপ্ কাটলেট তৈরী করতে শেখাচ্ছে। তেমনি দারুণ গরমে কাজ করতে করতে শশী যখন ঘামতে আরম্ভ করে আর ঘামের স্রোত গলগল করে ওর পিঠ বেয়ে পেট বেয়ে পেন্টুলনের নিচে অবধি গড়াতে থাকে

ভেন্টু তখন তার লাল ভিজে গামছাটা দলা পাকিয়ে শশীর পিঠ পেট চাপড়ে চাপড়ে ঘাম শুষে দেয়। শশী আরামবোধ করে। 'হুঁ, নিচে, আর একটু ভেতরের দিকে, শালা সব ভিজে জেব্‌জেবে হয়ে আছে।' ভেন্টু শশীর পেণ্টুলনের নিচে গামছাটা ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়ে দেয়। 'মাইরি কী নরম হাতখানা তোর।' শশী আরামে চোখে হাসে। ভেন্টুও পিটপিটে চোখ বুজে হাসে। মাংসের কিমা তৈরি করছিল শশী। তা হলেও সেই হাত দিয়েই সে এক সময় ভেন্টুর গালটা টিপে দেয়। 'উঃ লাগে মাইরি,—ছাড়ো।' হাত নামিয়ে শশী হাসতে হাসতে পিঠটা দেয়ালে ছেড়ে দিয়ে মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে। চপের ডেলা সাজানো বড় বারকোশটার ওপর মাছি বিজবিজ করছিল। শশীর পা লেগে বারকোশ নড়ে উঠতে মাছির ঝাঁক ভন্‌ ভন্‌ করে উঠল। একটা পেটমোটা মাছি উড়তে উড়তে ভেন্টুর মুখের গর্তে ঢুকে পড়ছিল। মুখের মাছি তাড়াতে ভেন্টু একদলা থুথু ছিটোয়। খানিকটা শশীর মাথায় বাকি থুথু চপ-এর ডেলাগুলোর ওপর ছিটকে পড়ে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে শশী এক চোখ ছোট করে ভেন্টুর মুখের দিকে তাকায়। 'কি, আজ যাওয়া হবে নাকি সন্ধ্যের পর।'

'সন্ধ্যের পর মানে তো সেই রাত এগারোটা।' একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে ভেন্টু উত্তর দেয় : 'আর একটু সকালে দোকান বন্ধ করলে চলে না?'

শশী মাথা নাড়ে। 'ম্যানেজার শালা এগারোটার এক মিনিট আগে চেয়ার ছেড়ে ওঠে না, দেখছিস তো। কি করে আর—' একটু থেমে পরে গুজগুজে গলায় সে হাসল। 'তা একটু রাত বেশি হলে সুবিধে। খদ্দের কম থাকে।'

'সব মাদ্রাজী আর উড়ে মনে হয়?'

'কেন এ্যাংলো বাঙগালীর অভাব আছে নাকি।'

'চোখে পড়ে না।' বলে ভেন্টু শশীর মোটা থলথলে উরুর ঘামাচি খুটে দেয়। 'তা যা-ই বল বাঙগালী মেয়ের স্বাদের কাছে আর কিছুর—' কথা থেমে গেল ভেন্টুর। দোকানের দেয়ালঘড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বেজে চলল। শশী ভেন্টু কান খাড়া করে শোনে। বারোটা। আরও একটু সময় কান খাড়া রেখে চুপ করে রইল দুজন। ম্যানেজার উঠছে। চেয়ারের শব্দ হয়। টেবিলের টানা থেকে চাবি বার করছে। শশী ভেন্টু খুশি হয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ছুটে দুজন দোকানের সামনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'কিমা তৈরি হয়েছে?' ম্যানেজার প্রশ্ন করে। 'মাংসে কুলোবে তো?'

শশী ঘাড় নাড়ে।

'বড় ড্রামে বারোটার জল ধরে রাখ।'

ভেন্টু ঘাড় নাড়ে।

ম্যানেজার বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ায়।

ভেন্টু শশী ধাক্কাধাক্কি করে কলাপ্‌সিবল দরজা টেনে বন্ধ করে দেয়। ম্যানেজার বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। তা সদর বন্ধ থাকলেও শশী ভেন্টুর বাইরে যেতে কষ্ট নেই। দোকানের পিছনের দরজা খোলা থাকে।

ম্যানেজার চোখের আড়াল হতে ভেন্টু গলা ছেড়ে গান ধরল : ইচিক দানা ইচিক দানা......

শশী চেয়ারের ওপর বসে পড়ে টেবিল চাপড়ে তবলা ঠোকে : 'লেড়কার ওপর লেড়কি নাচে লেড়কা জোয়ানা—'

হঠাৎ গান থামিয়ে ভেন্টু শশীর মুখের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মাইরি, আজ যাবে ওখানে?'

'হ্যাঁ, দোস্ত, হ্যাঁ, বলছি তো নিয়ে যাব তোকে। একটু বেশি খরচপত্র করতে হবে কিন্তুক। মাগী ভারি—'

বেশি খরচের কথায় ভেন্টু কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

'দুটো তো মোটে তন্‌খা আমার পুঁজি, তুমি জান দোস্ত। ক'দিন আর কাজে ঢুকেছি—' একটু চুপ থেকে ভেন্টু শশীকে বোঝায় : 'বাকি যা লাগবে তুমি এবারের মত চালিয়ে দাও। কাল সাড়ে তিন টাকার মত বখশিশ পেলে। নতুন লোক বলে আমায় চিপ্‌ ফিপ্‌ সহজে কেউ দিতে চাইছে না।'

ভেন্টুর কথা শুনে ও তার শুকনো চেহারা দেখে শশী ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। 'তা দেখা যাবে, তখনকার কথা তখন।' বলে চেয়ার ছেড়ে শশী উঠে দাঁড়ায়। 'আয় ইদিকে আয়।'

ভেন্টু শশীকে অনুসরণ করে।

শশী লোক ভাল। ভেন্টু ভাবে। ওকে দিয়ে সব সময় উপকার পাওয়া যাবে। শশী পিছনের ঘরে ঢুকে পা দিয়ে আলু আর পেঁয়াজের খোসাগুলো একদিকে ঠেলে ঠেলে দেয়। ভেন্টু হাত দিয়ে সব তুলে একটা ভাঙগা টিনের মধ্যে রাখে। আবার মাছি ভন্‌ভন্‌ করে। ডিমের খোসা আর চিংড়ি মাছের খোসাগুলো থেকে দুর্গন্ধ উঠছিল। তাই সেখানে মাছিদের ভিড় বেশি। 'ওটা ফেলে দিয়ে আসব, ওটা বাইরে ফেলে দিলে—' শশী মাথা নাড়ে। 'ও রাখ্‌ এখন বাবা, ওটা এখন ধরতে গেলে ঘুমটুম আর হবে না।'

শশী আবার ঘামছে। ভেন্টু টিনটা ছেড়ে দেয়। মাছির ভনভনানি কমে। বাইরে চৈত্রের রোদে আগুন ঝরছিল। 'আয় ইদিকে, আমার কাছে সরে আয়।' শশী মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে কাত হয়ে পড়েছে। চোখ ঢুলুঢুলু। ভেন্টু হামাগুড়ি দিয়ে শশীর কাছে সরে গেল। 'হুঁ, ভিজে গামছাটা কোথায়, দে, দে আর একটু মুছে।' বলে শশী পটাপট সবগুলো বোতাম ছেড়ে দিয়ে পেণ্টুলুনটা ঢিলে করে কোমরের নিচে ঠেলে দেয়। কালো থলথলে প্রকাণ্ড দুটো মাংসপিণ্ড চোখের সামনে ভেসে উঠতে ভেন্টু হি-হি করে হাসে। 'হাসছিস কেন, দে, ভাল করে মুছে দে, শালা ভিজে কেমন জেবজেবে হয়ে আছে দ্যাখ।' হাসি থামিয়ে ভেন্টু শশীর কোমর ও পাছার ঘাম মুছতে থাকে। 'আঃ কি আরাম!' আরামে চোখ দুটো আধ-বোজা হয়ে যায় শশীর। বুঝলি মেয়েমানুষ কিচ্ছু না। বালি, ছাই। শালা ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়। মেয়ে মেয়ে আমরা করি বটে, কিন্তু ও শালার মেয়েমানুষকে আদর করা আর ছাইয়ে জল ঢালা সমান। এমন বজ্জাত বেইমানের জাত তুই দুটো পাবিনে।'

'কেন, কেন শুনি।' নুয়ে ভেন্টু শশীর মুখের কাছে মুখ নিতে শশী হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। 'দেখবি, ওদের খপ্পরে একবার পড়লে বুঝবি।'

মুখ কালো করে ভেন্টু উত্তর দেয়, 'রোজ তো আর যেতে চাইছি না। একবার একদিন।'

শশী কথা বলে না। ভেন্টুর মুখটা টেনে প্রায় মেঝের কাছে নামিয়ে কালো পুরু ঠোঁট দিয়ে সে ওর গাল চেপে ধরে :

'আঃ ছাড়ো, লাগে।' ভেন্টু মাথা তুলতে চেষ্টা করে। শশী একটা গ[illegible]ম নিশ্বাস ছেড়ে ভেন্টুর গাল থেকে মু[illegible]টা সরিয়ে নেয়।

হাতের গামছা দিয়ে গাল মুছতে মুছতে ভেন্টু বলে, 'গোঁফ-দাড়ি গজানো মুখে কি আর ওসব ভাল লাগে।' কিন্তু শশী কথা বলে না। ভেন্টু বলে, 'এ হল গিয়ে, জল দিয়ে দুধের স্বাদ মেটানো। কি, মিছা বললাম?' কিন্তু শশী তথাপি নীরব। ভেন্টু হঠাৎ লক্ষ্য করে শশীর নাক ডাকছে। এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হয়। হাতের ভিজে গামছাটা মেঝের একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তখনি সে উঠতে পারে না। ওধারে দেয়ালের হুকটার দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে কি ভাবে। শশীর মতন সে-ও এক টিপ ঘুমিয়ে নিতে পারত। কিন্তু ইচ্ছা করে ভেন্টু ঘুমটা আসতে দিচ্ছে না। দুটোর আগেই ম্যানেজার ফিরে আসবে। দোকান খুলবে। তখন থেকে খদ্দেরের ভিড়। চপ্-কাটলেট গরম করো, ডিম-পরটা ভাজো। প্লেটে সাজিয়ে এগিয়ে দাও। জল চাই। নুন মশলার কৌটো কোথায়। এক মিনিট দাঁড়িয়ে জিরোবার সময় নেই। শশী আরো বেশি ঘামবে। ভেন্টুর পা দুটো টনটন করবে। ক্ষুধা পাবে। না পাবার আছে কি। সেই কখন বেলা দশটায় বাসি মাংস আর ঠাণ্ডা ভাত খায় দুজন। সারা-দিনের মতন ওই। আর সময় কই ভাত খাবার। আবার সেই রাত বারোটায়। বেশি করে ভাত রান্না হবে তখন। সকালের জন্যে রাখা হবে কিছু। আর টকে-যাওয়া পচে-ওঠা মাংস চপ্ কিছু-না-কিছু তো আছেই। বা আলুর দম।

পেট মোটা ভুসভুসে রঙের একটা বড় মাছি শশীর নাকের ডগায় বসে ঝিমোচ্ছে। ভেন্টু কিছুক্ষণ ধরে ওটাকে লক্ষ্য করছে। শশীর নাক ও চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে ফের দেয়ালের হুকটা দেখল। যেন এবার সে উঠবে, উঠে দাঁড়িয়ে ওধারে দেয়ালের কাছে যেতো। পারল না। পিছনের দরজা দিয়ে হুড়-মুড় করে হোটেল দিলখুসার রসিক এসে ভিতরে ঢুকল। কি ব্যাপার? ভেন্টু চেঁচিয়ে উঠল। শশী ধড়মড় করে উঠে বসে। 'কি হয়েছে রসিক?'

'তোমরা সব এসো, নিউ রেস্টুরেন্টের কালুকে ওরা মারধর করছে।' রসিক হাঁপায়। 'কালুকে ওরা মেরে ফেললে।'

শশী মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পেন্টুলনের বেল্ট কষতে কষতে বলল, 'কেন, কি করেছে কালু? কারা মারছে?'

'পাবলিক। শালার ভদ্দরলোকেরা কি আর এখন ভদ্দরলোক আছে। একটা কিছু পেলেই হল। রসিক হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'এসো, এসো দেরি করলে হবে না।'

'আরে কালু কি করেছিল আগে বল।' শশী বিরক্ত হয়ে ধমক লাগায়। 'পচা চপ্ দিয়েছিল খদ্দেরকে? বেফাঁস কিছু বলেছে কাউকে?'

রসিক মাথা নাড়ল।

'মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে। ওরা তো বলছে—'

'আরে শালা সবটা খুলে বল না কি হয়েছে।' শশী আরো বেশি অস্থির হয়ে ওঠে। লম্বা একটা শ্বাস টানতে তার বুকের চেয়ে পেটটা বেশি ফুলে উঠল। 'কার মেয়েছেলে? তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে। বুড়ো বয়েসে কালু কি—' হঠাৎ ভেন্টুর চোখের দিকে চোখ রেখে শশী ঠোঁট বেকায়। 'যেখানে মেয়ে-ছেলে সেখানেই গণ্ডগোল, বলিনি তোকে একটু আগে, ও শালার জাতকে—'

ভেন্টু ঘাড় নাড়ল।

'আসলে কালুর কোনো দোষ নেই।
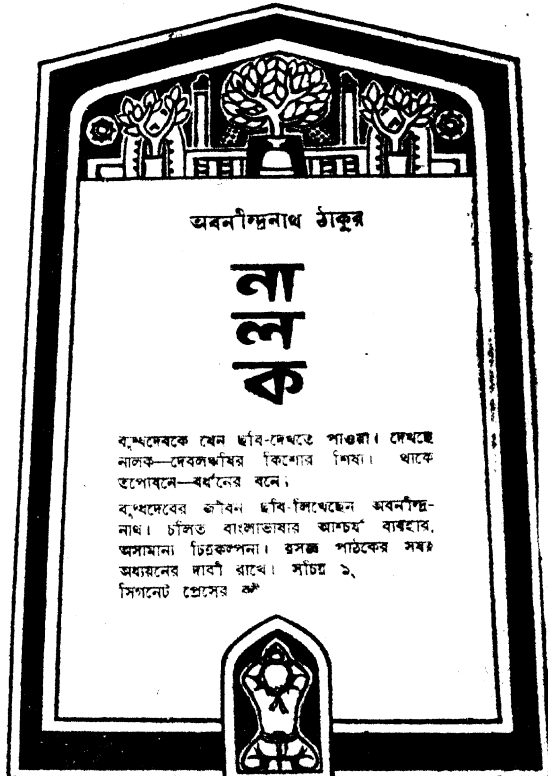
নিউ রেস্টুরেণ্টের পর্দা খাটানো জেনানা কামরাগুলো বেজায় ছোট, তোমরা দেখেছো তো। ওই একটু চলতে গিয়ে গায়ে লেগেছিল, তাতেই—'

'বটে! চল্ চল্।' শশী হুঙ্কার ছাড়ল। হাত বাড়িয়ে দরজার পাল্লা আটকাবার একটা কাঠ তুলে সে সকলের আগে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভেণ্টু ও রসিক ছুটল পিছনে। তিনজন গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠল।

'মেয়েছেলেটা কোথায় এখন?'

'পাবলিককে ক্ষেপিয়ে দিয়ে উনি ট্যাক্সি নিয়ে সরে পড়েছেন।' রসিক গলার অদ্ভুত শব্দ করল। 'হুঃ আমি হলফ্ করে বলতে পারি কালুর দোষ নেই। স্রেফ বদমায়েসী করে ওকে মার খাওয়ালে। আসলে মাগীটাই খারাপ। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলে, কি আর—'

'আয় না দেখি কত জোর রাখে পাবলিক, কেমন ক্ষমতা। রেনবো কাফের ওরা খবর পেয়েছে?'

রসিক ঘাড় নাড়ল।

স্তম্ভিত কেবিনের মদন, রেনবো কাফের পণ্টু, হারান,—পর্যন্ত বেঙ্গল হোটেলের ওরা হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে কালুকে ছাড়াতে পারছে না।'

'বটে! আয় আয়।' শশী হাতের কাঠটা কাঁধে ফেলে আরো জোরে পা চালায়। রসিক ভেণ্টু পিছনে। পেভমেণ্টের পাথর তেতে গরম কড়াই হয়ে আছে। কিন্তু তাতে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠিক দুপুর বলে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া কম চলছিল। যেন চলতে চলতে ভেণ্টু একটু বেশি পিছনে পড়ে যায়। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারছে না। শশী একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ খিঁচিয়ে, 'কিরে, পায়ে বাত নামল তোর?' শুনে ভেণ্টু কথা বলে না। মিটমিট হাসে।

'হুঁ, ঐ তো এসে গেছি।' রসিক আঙুল তুলে নিউ রেস্টুরেণ্টের লাল সাইনবোর্ড দেখায়। দরজার সামনে ভিড়। নিউ রেস্টুরেণ্টের দরজা থেকে শুরু হয়ে ভিড়টা রেনবো কাফের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। যেন ওদিক থেকে আর একদল হৈ-হৈ করে ছুটে এল।

'ঐ, ঐ, কালুর দাড়ি ধরে ওরা টানছে।' রসিক হাত তুলে ঘাড় উঁচু করে ভিড়ের দিকে শশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ঐ ঐ, দ্যাখো আর সব শালাদের কাণ্ড। ও-পাশের পান-সিগারেটের দোকানটা লুঠ করবে এবার।'

'ওখানে কি, ওটা লুঠ করে করবে কি।' বিকৃত স্বর শশীর। 'আমাদের তিন-কড়ির পানের দোকান না?'

'হুঁ হুঁ।' রসিক বলল, 'এখন হাঙ্গামা বেধে গেছে পাবলিকে আর দোকানে। দোকান হোটেল রেস্টুরেণ্ট।'

'বটে!' শশী হাতের কাঠটা মাটিতে ঠুকল। উত্তেজনায় তার প্রকাণ্ড শরীরটা কাঁপছে। যেন এখনি সে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'হেই শালারা, হেই কুত্তার বাচ্চারা!'

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শশীর গর্জন থেমে যায়। তিনকড়ির দোকানের দিক থেকে সোঁ করে একটা সোডার বোতল ছুটে এসে তার কপালে আঘাত করল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে শশী মাটিতে বসে পড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। রসিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে পরে বসে উপুড় হয়ে পরনের লুঙ্গির একটা ধার তুলে শশীর কপাল চেপে ধরল।

ভেণ্টু এবার নিশ্চিন্ত। আর সেখানে দাঁড়ায় না। লম্বা পা ফেলে নিউ রেস্টুরেণ্ট, হোটেল-দিলখুসা, রেনবো কাফে পিছনে রেখে নিজের হোটেলে এসে ঢোকে। সামনের দরজা তালাবন্ধ। ম্যানেজার তখনও ফেরেনি। না ফিরুক। ত্রস্ত সতর্ক পায়ে চপ্-এর ডেলা সাজানো বারকোশটা ডিঙিয়ে চিংড়িমাছ আর ডিমের খোসা ভর্তি টিনের ওধারে সরে গিয়ে দেয়ালের হুক্-এ ঝোলানো শশীর জামার পকেট থেকে মণিব্যাগটা তুলে সে তেমনি শেয়ালের মত নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...... ক্রিং ক্রিং......

ট্যাংরার পচা কারখানার টিঙটিঙে গাড়ি না। নগদ কড়ি টাকা জমা রেখে সাহেবপাড়ার সুইট গার্ল কোম্পানির নতুন ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে বেরোয় সে। শাদা রঙের তিনটে চাকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সোনালী রঙের বাক্সটা সামনে বসানো। তার ওপর আইভি লতার মতন বেঁকিয়ে ঝেঁকিয়ে লেখা 'মিণ্টি মেয়ে' শব্দ দুটো শেষ বেলার কমলা রঙ রোদ লেগে জ্বলছিল। তেমনি পোশাকটিও ভেণ্টু পেয়েছে চমৎকার। আকাশ রঙের হাওয়াই শার্ট, কচি পাতা রঙের ট্রাউজার।

চমৎকার বুটিদার একটা ফ্রক গায়ে মণ্টির। হাসে। যেন ক'দিনে আরো বড় হয়ে গেছে। পা দুটো বেশি লম্বা লাগছে।

'কোথায় ছিলে ক'দিন?'

'অসুখ করেছিল।' নুয়ে বাক্সের ডালা খুলে এক সঙ্গে তিনটে আইসক্রীম তুলল ভেণ্টু।

চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে একটি নতুন শিল্পী সঙ্ঘের পরিচয় পেলাম। ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ ২২শে মে থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত এ'দের একটি চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ'রা দলে বারোজন—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, পাঁচু দাশ, সুবোধকুমার দাশগুপ্ত, শুভময় ধর, আশীষ দত্ত, সমীরচন্দ্র গুই, লক্ষ্মীকান্ত কাশথা, পরেশ পাল, শান্তি পাল, সজল রায় এবং গর্ডন স্লাইড।

এ'দের ছবি তেল রঙ, জল রঙ, চারকোল, প্যাসটেল, কালী এবং পেন্সিলএ রচিত।

আস্তাবল —সজল রায়

এ'দের শিল্প রচনা এখনও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি বটে, কিন্তু অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাবনার লক্ষণ আছে। বিশেষ করে সজল রায়ের ছবিতে শিল্পীর আর্টিস্ট মনের পরিচয় বার বার পাওয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করলে ভবিষ্যতে শিল্পের পরম মণিটি আবিষ্কার করা এ'র পক্ষে অসম্ভব হবে না। ইনি সবরকম মাধ্যমেই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, তবে জল রঙেই এ'র সবচেয়ে সাবলীল টানটোনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ছবিগুলির রঙচঙও বেশ সুন্দর। জল রঙের ছবির মধ্যে আস্তাবলে ঘোড়ার ছবিটি এবং 'সলিটারি প্লেস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লাস-এ আঁকা নিউড ছবিগুলি থেকে শিল্পীর নির্দোষ আনাটমীবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্যাসটেল-এ আঁকা 'নিউলী পারচেজড' এবং মাইসেল্ফ-এর বর্ণবিন্যাস সুখকর।

এ'র পরেই উল্লেখ করতে হয় গর্ডন স্লাইড-এর নাম। ইনি মাত্র চারটি ছবি পেশ করেছেন। তার মধ্যে 'ভিলেজ কর্নার' এবং 'ওয়ে সাইড' যে কোনও প্রথম শ্রেণীর জল রঙ চিত্রীর ছবির পাশে বসতে পারে। চমৎকার রঙ। চমৎকার টানটোন। চমৎকার পারসপেকটিভ। জলরঙে এতটা স্বাচ্ছন্দ্য এ দলের আর কারুর মধ্যে লক্ষ্য করলাম না।

এ ছাড়া শান্তি পালের চারকোল-এ ছাগলের স্কেচ এবং জলরঙে 'কমরেড', শুভময় ধরের পেন অ্যান্ড ইংকএ স্কেচগুলি এবং চারকোল-এ সন্ন্যাসীর স্কেচটি, সমীর চন্দ্র গুইর রাশিয়ান পেস্টবোর্ডের ওপর জলরঙে আঁকা 'লাইট অ্যান্ড শেড' এবং পাঁচু দাশের তেলরঙে আঁকা 'স্টেডী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তেল রঙের ছবি সংখ্যায় যথেষ্ট থাকলেও সত্যিকার বলিষ্ঠ রচনার একান্ত অভাব অনুভব করলাম। ছবি যদি রঙ প্রধান না হয়, সে ছবি থেকে তৈল চিত্রের মেজাজ পাওয়া যায় না। সময়ের গতিতে এবং বার্নিশের কোট পড়ে পড়ে পথিকৃত শিল্পীদের ছবি অনেক সময় অনুজ্জ্বল দেখায়। শিল্পী প্রকৃতপক্ষে ঐ ধোঁয়াটে রঙ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু শিল্প শিক্ষার্থী যদি বার্নিশ করা রঙকে আসল রঙ ভেবে অনুরূপ বর্ণ প্রয়োগ করেন তাঁর ছবিতে সে ছবি রসোত্তীর্ণ হবে কেমন করে? যেখানে আলোছায়ার যোগাযোগে আকৃতির মডেলিংকে প্রকাশ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক শিল্পীরই উচিত। আকৃতির ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে

নামাজের আগে —শান্তি পাল

আলোছায়া —সমীরচন্দ্র গুই

রঙেতে আলো ও ছায়ার অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু রঙের নিজস্ব নিবিড়তা ও বিশিষ্টতা রক্ষা করতে না পারলে ছবিতে ভাব ফোটানো কঠিন এবং রঙের এই নিবিড়তা ও বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হলে কালো রঙের সাহায্যে শেডিং যতদূর সম্ভব বর্জনীয়। কালো রঙকে স্বতন্ত্র রঙ হিসাবে ব্যবহার করায় অবশ্য কোনও বাধা নেই। শিল্পার্থীদের তৈল চিত্রগুলিতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বর্ণ তার স্বরূপে প্রকাশ পায় নি। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ম্লান রঙ ব্যবহার করার ফলে এবং মাঝে মাঝে অত্যধিক কালো মেশানোর ফলে ছবিগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। যাই হোক, কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য থাকলেও 'শিল্পার্থী'দের প্রদর্শনী বেশ উপভোগ্য হয়েছিল, সেকথা স্বীকার করি।

হিমানী যে শুধু প্রসাধনে
পরিতৃপ্তিই দেয় তাই নয়,
প্রসাধনের প্রয়োজন
কতখানি তাও হিমানীর
প্রসাধনী ব্যবহারেই
বুঝতে পারি।
ভারতী দেবী
HIMANI
রূপ-রচনায়
হিমানী স্নো
গ্লিসারিন সাবান
বডি পাউডার · হিমসার তৈল · ক্যান্থারাইডিন

কাশ্মীর

২

হরমুখ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিক্‌চিহ্নহীন সুবিশাল জলাশয়। তার পৌরাণিক নাম হোলো সতীসায়র। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচূড়ো থেকে এবং এই জলাশয়ে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল। হরপার্বতী গেলেন অধিকতর লোভনীয় মানস সরোবরে, ইত্যবসরে জলোদ্ভব নামক জনৈক অসুর এসে অধিকার করলো ওই সতীসায়র। মানুষের উপরে দানবের অনাচার চললো বহুকাল। ওদিকে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি এই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধরে তপশ্চর্যা করছিলেন। সেই তপস্যায় খুশী হয়ে দেবী তাঁর নিকট এক পাখীকে পাঠিয়ে দেন। পাখীর ঠোঁটে ছিল একটি পাথরের টুকরো। ওই পাথরের টুকরোটি জলোদ্ভব অসুরের শিরে ফেলা হয় এবং ক্রমে সেই পাথর বৃহদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোদ্ভব সতীসায়রের নীচে সমাধিস্থ হয় এবং বর্তমান হরিপর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে। সতীসায়রের জল চ'লে যায় বরাহমূলের দিকে, মৃন্ময়ভূমি দেখা দেয় চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত অধিত্যকায় এবং পরবর্তীকালে এই ভূভাগের নাম হয় 'কাশ্যপ-মীর।'

ঠিক এমনি উপকথা শুনে এসেছি নেপালের কাঠমাণ্ডুতে। মঞ্জুশ্রীদেবের খড়্গাঘাতে বাগমতীর সৃষ্টি হয়। নেপাল উপত্যকার সৃষ্টি তখন থেকে। ওদের পূজ্য মঞ্জুশ্রীদেব।

এই সমস্ত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীদের চোখে সত্য হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'সুখী উপত্যকা' এককালে অনবতপ্তা মানসের পদ্মসরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের উপরে বহু অঞ্চলে সেকালের সেই সাগর-উদ্ভূত জীবাণুর নানাবিধ প্রাণময় কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্ত্বিকরা চমৎকৃত।

খৃষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে কোনও নির্দিষ্ট রাজশক্তির খবর পাওয়া না গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। অতঃপর ঐতিহাসিককালে আসেন রাজা প্রবরসেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপুর। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খৃষ্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্রাট অশোক এখানে এসে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করেন। এই রাজভিক্ষুর মহৎ আদর্শকে বরণ ক'রে সনাতনীরাও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেন, সেটি আজও দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তা'র নাম শঙ্করাচার্য। এই সময় তাতার দস্যুর দল কাশ্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সম্রাট কনিষ্ক এসে দাঁড়ান এবং তাঁর রাজত্বকালে দস্যুদল বিতাড়িত হয়। কনিষ্কের কালেই কাশ্মীরের বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধধর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বৎসর অবধি কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হূনরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভৎস অনাচারের দ্বারা কাশ্মীরকে তা'রা শ্মশানে পরিণত করে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বৌদ্ধবিরোধী মিহিরগুল। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান—মিহিরগুলের হাতে তখন বৌদ্ধবিহারগুলি প্রায় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষুরা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু বৌদ্ধ মঠ। শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধবিহারগুলির উদ্ধারকার্য চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্ব আরম্ভ। কবি কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' বলছে, নৃপতিশ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য এলেন, এলেন অবন্তীবর্মণ, এলেন একে একে হিন্দু নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ও হিন্দু ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্য কীর্তি নেই। রাজা ললিতাদিত্য আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সম্রাট অশোক এবং কনিষ্কের পরেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট। এই উপত্যকায় তাঁর বিপুল কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তাঁর মন্দির এবং কাশ্মীর ভূভাগব্যাপী তাঁর স্থাপত্যকীর্তি আজও তাঁর চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবের যুগ।

রাজা ললিতাদিত্য সমগ্র উত্তর ভারত-

দেশে সংখ্যামান প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্ষান্ত হননি। বিস্ময়ের কথা এই, তুরস্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ললিতাদিত্য তুর্কস্ক এবং মধ্য এশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শৌর্য-বলে জয় করেছিলেন। সমগ্র মধ্য এসিয়ার বর্বর জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনী বলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের আমলে তাঁর দিগ্বিজয়-মহিমা এতদূর গৌরবময় হ'তে পেরেছিল যে, প্রতি বৎসর কাশ্মীর জুড়ে মস্ত এক উৎসবের সাড়া প'ড়ে যেতো।

হিন্দু রাজত্বের চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে পার্বত্য উপজাতি দামড়া ও তান্ত্রিয়রা কাশ্মীরের কল্যাণ-যজ্ঞ নষ্ট করতে চেয়েছে বারংবার। অগ্নিসংযোগ, লুট, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কহ্লন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণীতে' তিনি বলছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দু রাজত্বের কালে কাশ্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূভাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদান্ত সংস্কৃতিতে কাশ্মীর ছিল অদ্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মনুষ্যত্ববাদে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্দশ শতাব্দীর তাতার যোদ্ধা জুল্‌ফি কাদির খান আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম্ ভয়ম্ ভীষণম্ ভীষণানাম্! তাঁর এক হাতে শাণিত তরবারি, অন্য হাতে অগ্নিসংযোগের উপকরণ। তাঁর দানবিক লীলায় কাশ্মীর অগ্নিদগ্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ নরনারীকে ক্রীতদাসস্বরূপে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাঙা পথে আসে প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যুদল সহ এবং ওই নিরীহ পঞ্চাশ হাজার নরনারী সমেত তুষারসমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কংকাল খুঁজে পাওয়া যায় হুন্দাদ পর্বতের প্রান্তে আর কোহিস্তানে, হিন্দুকোশ পর্বতমালার আশে-পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায় তলায়। সেকালে কাশ্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি, কিন্তু না ছিল ক্ষাত্রশক্তি, না ছিল বাহুশৌর্য। কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাসে অনাচার এখানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গজনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোদ্ধার দল। এইপ্রকার পাঠান আক্রমণের যুগে সেইকালে কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন একাধিক হিন্দুসম্রাজ্ঞী,—তাতার ও পাঠানদের সঙ্গে বহুবার তাঁরা আপোস নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওদের মধ্যে একজন রাণী অনেককাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন,—যখন তাঁর স্বামী প্রাণভয়ে পলায়ন করেন রাজ্য ছেড়ে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রিপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জা কৌশল-চক্রান্তের দ্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরাণীকে পত্নীরূপে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রাণী আত্মনাশের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

আবার একশো বছর ধরে পাঠান সুলতানদের হাতে কাশ্মীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হতে চলে, স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিমন্দিরগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়। মার্তণ্ড, পাণ্ড্রেথান, গণেশবল, প্রজাবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্বংসস্তূপে ভরে যায়। সুলতান শিকান্দারের বীভৎসতা কাশ্মীরের

পথে পথে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাতার আর পাঠানের কলঙ্ককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় এই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ালেন। তিনি বাদশাহ জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃত্রিম সুহৃদ। তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে বন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে বাঁচালেন। কাগজ, রেশম, শাল—এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। কাশ্মীরী-দেরকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অঞ্চলে জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে লোকসংগীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে' তাঁর ওই সমাধিস্তম্ভটি রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহু শতাব্দী-ব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকাল আর কতটুকু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খান এবং তার পরে-পরে পাঁচ সাতজন দস্যু নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কাশ্মীরীদের পিঠ আবার দুমড়িয়ে গেল। মনুষ্যত্বের শেষ দশায় এসে তারা দাঁড়ালো। কেঁদে কেঁদে অসাড় হয়ে এলো কাশ্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনা-পতিরা কাশ্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আকবর পুনরায় হরিপর্বতের প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তুলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর পুষ্পোদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে পুঁতলেন সর্বত্র। নূরজাহান বানালেন 'পাথর মসজিদ'। জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহজাহানও পিতার অনুসরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পণ্ডিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, অন্যায় রকম কর দিতে তারা বাধ্য হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেইকালে মোগল-রাজের প্রতি-নিধিগণের স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন কাশ্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে' এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশবিক আক্রমণ। আহমদ শা দুরানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবর্তী ষাট বৎসরকাল অবধি সর্বব্যাপী ধ্বংস ও নারীর সতীত্বনাশ ক'রে চললো তারা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের ইতিহাস। ওদের পাশবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মনাশ করাই হোলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে-হাজারে, কাতারে-কাতারে কাশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হোলো; যারা রাজি হ'তে চাইল না তাদেরকে আগুনে পোড়ানো, জীবন্ত সমাধি দেওয়া, শূলে চড়ানো, বনজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবন্ত দেহকে চটের থলেতে মুড়ে ডাল হ্রদে ডুবিয়ে হত্যা—এইসব চললো।

ডাল-হ্রদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে 'বাট-সাজার',—অর্থাৎ হিন্দু-সমাধি। এমনি ক'রেই কাশ্মীরে অ-হিন্দুর, সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে এই হাজার হাজার 'হিন্দু' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হোলো, সেই সময় তারা সদলবলে ফিরে আসতে চাইল। তাদের পিতৃ-পুরুষের ধর্মে,—কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তারা—বারানসীতে সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করলো না। আজ সেই আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বৈকি।

ইতিহাস নয়, কিন্তু কাশ্মীরের বুকের যে যন্ত্রণা—এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি। আফগানী জব্বর খানের অত্যাচারে উন্মত্ত হয়ে পণ্ডিত বীরবল ধর লাহোর থেকে ডেকে আনলেন রণজিৎ সিংহের সেনাপতি রাজা গুলাব সিংকে। তিনি পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জব্বর খানকে বিতাড়িত করলেন। ঊনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম স্বেচ্ছাচারী নয়। হতভাগ্য দরিদ্র কাশ্মীরীরা জোগাতে পারলো না রাজস্ব, সুতরাং তারা নিশ্চিহ্ন হতে লাগলো। দেশে ভূমিকম্প, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাস্তি নেই, অন্নবস্ত্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হোলো। শিখরা পরাজিত হোলো ইংরেজের হাতে।

রাজা গ‍ুলাব সিংহের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হ‍ৃদয় তাঁর কঠিন বটে, কিন্তু শাণিত যুক্তি এবং প্রখর ন্যায়বুদ্ধির গ‍ুণে কাশ্মীরে তিনি সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। গ‍ুলাব সিংহের পৌত্র প্রতাপ সিং অপুত্রক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিং মহারাজা হন। হরি সিং তাঁর রাজনীতিক অদূরদর্শিতা ও চিত্তদৌর্বল্যের জন্য কয়েক বছর আগে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন, এখন তাঁর পুত্র যুবরাজ করণ সিং হলেন কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ।

দেখতে দেখতে ডাল-হ্রদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জ্বলেছে হাউস বোটে আর নেহরু-পার্কের তাঁবুর মধ্যে। ফিরে চললুম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার গ্রথিত। বিতস্তাকে দেখলে কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে হঠাৎ মনে পড়ে। নৌকা, শিকারা ও হাউস বোটের ভিড় পদে পদে। আমি ছিলুম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্রে, জনতার কোলাহলে,—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভিড়ের মধ্যে, নোংরা বস্তির আনাচে-কানাচে, টাঙ্গা ও মোটরওলাদের আড্ডায়, ফলওয়ালা ফেরিওয়ালাদের পাড়ায়-পাড়ায়,—আমার কৌতূহলের সীমা নেই। হরি সিং হাই স্ট্রীটের পাশে রাধাকিষণের মন্দির, পঞ্চমুখী হনুমানজী আর মহারাণীর রামজী মন্দির,—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলমুখর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গ‍ুলাব সিংহের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে বসেছে আজ সরকারী দপ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হোলো গান্ধী ময়দান। একদা মহাত্মাজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিতস্তা। ওপারে দূরে হরিপর্বতের দুর্গ চোখে পড়ে।

শঙ্খঘণ্টারবে নদীতীর মুখর, সূর্যপ্রণাম করছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের মেয়েরা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছে। নামহারা অজানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা সাদা পাগড়ি, বর্ণ গৌর—এরা হিন্দু। সরকারী দপ্তরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যাঙ্কে, কাজ-কারবারে,—যেখানে যাও, সেখানেই পণ্ডিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগৎ। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গরু কাটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গন্ধও নেই কোথাও। হিন্দু পরিবারে অবাধে চাকুরি করে মুসলমান; শিখ হোটেলে নির্বিবাদে রাঁধে মুসলমান,—জাতিভেদ একটুও নেই। মুসলমানের হাতে খাচ্ছে যে কেউ, টাঙাও বাস করছে উভয়ে একত্র। চট্ ক'রে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দু পণ্ডিত আর আর্য মুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে।

ফিরছিলুম পথে পথে। শের-ই-কাশ্মীর পার্কের আনাচে কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে ধারে, ময়দানের আশে পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ির পাড়ায় পাড়ায়। মনে অস্বস্তি ছিল দু' কারণে। পাকিস্তানের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কখন্ এসে পৌঁছয়, কখন বা শ্রীনগরে রক্তারক্তি আরম্ভ হয়। ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে খাল্‌সা হোটেলের সামনে দু' চারটি দোকানের সামনে একদিন একটু হল্লা হয়, দু' একটি লোক বুঝি পুলিসের গ‍ুলীতে মারা যায়,—তারপরে সব শান্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীর পাঞ্জালের চূড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চূড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পালটে যাচ্ছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগ্যহত কাশ্মীর,—আছে তার ঘরে বিদুরের খুদ, আছে সুশীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লৌহধাতু। সমগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে যায়, রূপে আর গ‍ুণে সে লোভের বস্তু। পাঠান, তাতার, হূন, মোগল,—এরা এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে, যাবার সময় হতভাগ্যদের ঘরকন্না ভেঙে দিয়ে মেরে লুট ক'রে নিয়ে গেছে। সতীত্বনাশ আর ধর্মনাশ,—এই হোলো কাশ্মীরের মধ্যযুগের ইতিহাস। মেরুদণ্ড ভাঙা নিরুপায় দুর্বলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বর্বর যুগে যুগে। স্বভাবের কোমলতা তারা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীতির মর্ম, বোঝেনি জ্ঞান বিদ্যা সংস্কৃতির মহিমা,—কিচ্ছু বোঝেনি। চেয়ে-চেয়ে দেখছি, সমস্ত মাঠের তৃণশয্যায় ফুল ফুটে রয়েছে বর্ণবাহার কার্পেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাহাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত্র ফুল। পরিত্যক্ত জঞ্জালের স্তূপ, নালানর্দমার ধার, বাস স্ট্যাণ্ডগুলির ময়লা উঠোন, মাছি ভনভনে দোকানের নোংরা জলের পাশ, ওদের মধ্যে অজস্র অনামা ফুল। ফুটবলের মাঠে ফুল মাড়িয়ে ছেলেরা খেলা করে, মেষ-ছাগল-গরুরা ফুল মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের ধারে, ফুল মাড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে দুর্গম পাহাড়, কাটাধানের মাঠ ফুলে ভরে যায় কথায় কথায়। তলতলে কাশ্মীরের মাটির তলা থেকে হাওয়ায়-হাওয়ায় ফুলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফুল ফুটলো ব'লেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে,—আঙুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হোলো ব'লেই তারা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো মন্দ! খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাশ্মীরে কাঁটাজঙ্গলের ভিড়, যদি দেখতুম প্রাচোর এই নন্দনকাননে পাওয়া যায় বিষাক্ত সর্প, যদি জানতুম অরণ্যে-অরণ্যে দেখা যায় হিংস্র শ্বাপদ। আমরা বাঙালী, কবিতার দেশে

আমাদের জন্ম। গান গেয়ে-গেয়ে আমরা ভাষা সৃষ্টি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আঙ্গুল টিপলে জল ওঠে বাঙ্গালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফুলবাগানে, নদীর কল্লোলের সঙ্গে আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙালী ভালোবাসা জানে, কিন্তু অপমানের বিরুদ্ধে খড়্গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি ধরে বাঙালী। রাষ্ট্রে অধর্ম দেখা দিলে বাঙালী হিংস্র হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জরিত হ'তে থাকলে বাঙালী অপেক্ষা প্রতিশোধপরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি রেখে বাঙালী গীতাপাঠ করে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাশ্মীরকে মানিয়ে যেতো। কাশ্মীরে পাথর নেই, তাই কাঠিন্যও নেই। ওদের ওই লাবণ্যলতাকে নিষ্পেষণ করলে রক্ত ঝরে না, আঙ্গুরের রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদ্রতা, আচরণে নম্রতা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা নেই; রুচিভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে রুক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদ্য। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত নেই, —ওরা সবাই একাকার। যাদের সঙ্গে মতে মিলছে না, তাদেরকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনীতিক অথবা অর্থনীতিক মতবাদ নেই; ওদের একমাত্র কাম্য হোলো যুগ-যুগান্তরের দস্যুতার হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ করেছে।

দেখছি খানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড, দেখছি আইসমোকাম আর গণ্ডার-বল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নিরীহ সংসারযাত্রা অনাহত শান্ত। মাঠে-মাঠে চাষ চলছে ধানের, মন্দিরে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টারব, বিতস্তায় স্নান ক'রে যাচ্ছে মেয়েপুরুষ, কলাবাগানের ধারে লাউমাচার পাশে খেলা করছে শিশুরা, বিছানা রোদে দিচ্ছে মেয়েরা। উপর দিকের দিগন্তে দেবতাত্মা হিমালয়ের আদিঅন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বতমালা গগনের এ প্রান্ত থেকে চ'লে গেছে কোন্ প্রান্তে—সে যেন দিশাহারা নিরুদ্দেশ। ওই পর্বতশ্রেণীর অজানা অনামা গিরি-সংকটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধ'রে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলছে। সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে দুঃসাহসিক বিজয়াভিযান চ'লে এসেছে ওই হিন্দুকুশের তলায় তলায়। প্রাচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণগঙ্গা আর সিন্ধু, পেরিয়ে গেছে টাঙ্গির, কোহিস্তান, হিন্দুরাজ, চিত্রল; পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য নদীপথ; অতিক্রম ক'রে গিয়েছে দুঃসাধ্য গিরিসঙ্কট একটির পর একটি, সেইসব প্রাণীহীন, তরুলতা-হীন, জলচিহ্নহীন দুর্গম তুষারকান্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরি-সংকট আজও রয়ে গেছে মানচিত্রে। চিত্রলের ভিতর দিয়ে দোরান, পঞ্জশির পর্বতমালার ভিতর দিয়ে বলিয়ানপথ,—একটির পর একটি চ'লে গিয়েছে সেই কোথায় আমু-দরিয়ার প্রবাহপথ ধ'রে টারমেজ-এর দিকে।

টারমেজ! চমকে উঠেছিলুম। মনে প'ড়ে গেল প্রাচ্যের মানব সভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে! সেদিন স্মরণীয়কালেরও অতীত। আর্যরা জপে বসেছে হিমালয়ে, তাদের সেই বীজমন্ত্রে ভারতসভ্যতার প্রথম উদ্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তখন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মানুষ,—কি মেয়ে, কি পুরুষ, লজ্জা এসে তখনও পৌঁছয়নি তাদের অঙ্গে অঙ্গে। তারপরে ক্রমে খবর রটে গেল মধ্যপ্রাচ্যের পাড়ায় পাড়ায়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস ব'সে গেছেন বেদবিভক্তিতে। তারপরে দেখতে দেখতে গেল অনেক কাল। জানিনে কত যুগ যুগান্ত। এমন এককালে এই হিমালয়ের গহন রহস্যলোক থেকে উঠে এলো এক তরুণ সুকুমার রাজকুমার,—আর্য তাঁর শাক্যসিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার; হেলাস, শ্যাক, মোঙ্গল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ; গান্ধার তখন ছিল, কিন্তু কনিষ্ক এসে পৌঁছয়নি; তখন অসভ্য জাতিতে ইউরোপ অধ্যুষিত; ইংলণ্ড তখন আদিম সামুদ্রিক জাতির এলাকা,—বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায় জলা-জঙ্গলে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর আর হিন্দু-কুশের শাখাপ্রশাখায়, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশ্যপ হ্রদ পেরিয়ে ওই শাক্যসিংহের পৃথিবীবিজয়ী সভ্যতা আপন অপরাজেয় বীর্যবত্তাকে প্রকাশ করেছে সম্রাট অশোকের উদ্যমে।

এই আমুদরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারত-সভ্যতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং এখানে প্রথম পদার্পণ ক'রে দেখেছিলেন পৃথিবীর বিরাটতম বুদ্ধমূর্তি। এই সকল মহা-

কীর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট কনিষ্ক—ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের তিনি গৌরব। কনিষ্ক তাঁর রাজত্বকালে সম্রাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্যাবর্ত অবধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌদ্ধমঠে হুয়েন সাং বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকুশ আর আমুদরিয়ার মধ্যবর্তী প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার সভ্যতা এই সেদিনও জাজ্বল্যমান ছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হুয়েন সাঙ বলছেন, হুনদের প্রবল ধ্বংসাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও সপ্তম শতাব্দী অবধি ব্যাকট্রিয়ার রাজধানীর প্রান্তে শতাধিক বৌদ্ধ গুম্ফায় প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধভিক্ষু তখনও ছিলেন।

এই টারমেজ আর আমুদরিয়ার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরনে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই টারমেজ আর আমুদরিয়া প্রান্ত অবধি ছিল ভারতের রাজনীতিক সীমানা—যার উপরে প্রভুত্ব ছিল সম্রাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল বৃহৎ পামীর,—আলাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে, কিন্তু আজও কাশ্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরির স্তবকে স্তবকে;—আলাই, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, হরিরুদ্র, হেলমন্দ, পঞ্চশির, কপিশ, ত্রিচিমির, সেবক, শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেকে নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চলতি নিয়মের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গুহায়-গুম্ফায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি, পথে-প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরে-পাথরে খোদিত অশোক আর কনিষ্কের অনুশাসনলিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগোড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের অন্তর্গত —যেখানে গ্রীক ও ভারত সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শিল্পকলার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যার নাম হলো, গান্ধার শিল্প। কিন্তু এই ললিতকলা বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সম্রাট অশোকের সুশাসনকালে সমগ্র কাশ্মীর ও গান্ধারে স্বর্ণযুগের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। ওই হিন্দুকুশের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছে গান্ধার নরনারী। ঝড় উঠেছে ওখানকার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তরে, বালুর আঁধি উঠেছে আমুদরিয়া থেকে হিন্দুরাজ পর্বতমালা পেরিয়ে কাশ্মীরের মধ্যভাগে। রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়ে মোঙ্গল দস্যুরাজ চেঙ্গিস খাঁ ছুটে আসছে ভারতের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠছে চেঙ্গিস। শত শত কোটি স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের জড়োয়া জহরত, পরমাসুন্দরী অনন্তযৌবনা কাশ্মীরী উর্বশীর দল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু 'কাফের' জলা-বিল-উপত্যকা বেষ্টিত শস্যশোভাময় কাশ্মীর ও ভারত,—চঞ্চল হয়ে উঠেছে দস্যুসম্রাট চেঙ্গিস! পরনে বৃষচর্ম, কণ্ঠে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে দানবীয় গতিতে সে আসছে এগিয়ে।

চেঙ্গিস খাঁ বলেছিল, শুধু চাই জয়ের উল্লাস। পদদলিত শত্রুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে রক্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমাত্র আনন্দ। ধ্বংস করবো, লুঠ করবো, —আর সেই ভগ্নস্তূপের জটলায় দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দৃশ্য দেখতে চাই। নারী ও তাদের কন্যাদলের প্রতি পাশবিক অনাচার চালাবো,—এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আগুনে, রক্তে, লুণ্ঠনে, হত্যায়—আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

লক্ষ লক্ষ নরবলি দিল চেঙ্গিস। প্রাণীশূন্য হোলো সমগ্র ভূভাগ। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত রাজপ্রাসাদ আর ধর্মমন্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর আবার এসেছিল ওই চেঙ্গিসের বংশধর তৈমুরলঙ্গ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই আমুদরিয়ার তীরবর্তী টারমেজ। সে পৌঁছেছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্র সহস্র নরমুণ্ড নিয়ে লোফালুফির পর সেও এক লক্ষ ভারতীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈমুরের এক একজন সেনাপতি নিজের সঙ্গে দেড়-শত শিশু, নারী ও পুরুষকে ক্রীতদাস ক'রে নিয়ে যায়। তারা সবাই সমরখন্দে ফিরে গিয়ে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা, হীরা জহরত ও সুন্দরী নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। হিমালয়ের গিরিগুহাবর্ত্মে তাদের কান্না অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমুদরিয়ার অশ্রুনদী আজও বয়ে যায় টারমেজের তীরে তীরে।

হিমালয়ের গর্ভে সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলব্ধ সাংবাদিক বন্ধু এস-কে-ধার-এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন পারলে এলেন গাড়ি নিয়ে সকালবেলায়। জীপ গাড়িতে আরেক তরুণ বন্ধু আছেন মিঃ আচারি। আমাকে নিয়ে যাবেন ওঁরা যুদ্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের 'সীজ ফায়ার লাইন'।

পীর পাঞ্জালের উত্তুঙ্গ গিরিলোক চিরদিন বিশ্বাসঘাতক। ওই গিরিশিখরলোকের দিকে তাকিয়ে আজও প্রতি কাশ্মীরীর হৃৎকম্প হয়। মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো পীর পাঞ্জালের এক একটি চূড়া করাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাশ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাশ্মীর বংশপরম্পরায় অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত। এরা শেখেনি যুদ্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের অভিযান। সেই কারণে কোনওদিন কোনও শত্রুকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

শ্রীনগর ছাড়িয়ে মাইল চারেক দূরে এসে পাওয়া যায় সাঙ্গাটেং,—এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে সেদিন পাকিস্তানী উপজাতীয়

পাঠানদেরকে থামতে হয়েছিল। এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে পাশে গ্রামবাসীদের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাশ্মীরের মিলিসিয়া পুলিস এবং স্বেচ্ছা-সেবকের দল ওদের পথরোধ ক'রেছিল। নগরে যেন ওরা প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে তখন বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য ও সাহায্য শ্রীনগরে এসে পেঁছয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সঙ্গে পাকিস্তানের সদ্ভাব কিন্তু নেই। এরা আফগানিস্তানের সীমান্ত-সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দুয়েরই প্রতি বিরূপ। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিংস্র প্রকৃতি, তাদেরকে উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তা'রা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ত্রীলোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তা'রা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্র যুগিয়ে যাবে। সুতরাং দানবকায় মত্ত হস্তীর দল বিরাট এক দস্যুবাহিনীর আকার ধ'রে রাওয়ালপিণ্ডি, মারী, নাথিয়া-গালি, কোহালা ও দুমেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে কাশ্মীরে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালালো। রক্ত, আগুন আর নারীধর্মনাশ চললো বন্যাবেগে।

ক্যাপ্টেন পাবুলে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ। যেমনই শিক্ষিত ভদ্র, তেমনি শান্ত। আমরা সোজা বরমুলার পথ ধরেছিলুম। পথে পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তির অবশেষ, রাজা অবন্তীবর্মার নানা স্মৃতিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছু কিছু স্থাপত্য। অতি সুন্দর বাঁধানো পথে পড়েছে মধুর রৌদ্র, আশে পাশে টিলা পাহাড়ের গায়ে রঙগীন পাখীরা ডাক দিয়ে যাচ্ছে আসন্ন শরৎকালকে। এখানে ওখানে আপেলের বনে একটু একটু রং ধরেছে।

পাবুলে হাসিমুখে বলছিলেন, এ পথে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রক্ত গড়িয়েছে! তবে কি জানেন, পৃথিবীতে শান্তি ও অহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতিনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিব্যবস্থার ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করা অন্য বস্তু।

গাড়ি চলছে। কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাশ্মীরের এ যুদ্ধ আমরা সম্পূর্ণ জয় ক'রে এনেছিলুম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ চরম আঘাত হানবো, এমন মুহূর্তে হঠাৎ আমাদের থমকে যেতে হোলো।

কেন ?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি অহিংসা-বাদ এবং সাধুতার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকালের একমাত্র নীতি হোলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের কালে হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায় হায় ক'রে উঠলো আমাদের দুর্বলতা দেখে।

তারপর ?

তারপর 'সীজ ফায়ার!' বুক ফুলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাখা দস্যুর দল, আর বুক ফুলিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখুন, তাঁবু ফেলে বসেছে তা'রা দুই পারে—চক্রান্ত চলছে এপারে-ওপারে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সমস্ত রাত ধ'রে হুল্লোড়। সাদা গাড়ি ছুটিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসচ্চরিত্রা ইঙ্গ-মার্কিন মেয়েরা হোলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি সবাই জানে। আপনারা ত' জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বক্সী গোলাম সাহেব তাকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ হ'য়ে রইলুম।

শ্রীনগর থেকে বরমুলা মাত্র চৌত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের দুই ধারে চেনাব আর পপলারের সারি। যেদিকে চাই, যে পাশে ফিরি,—মৃন্ময় কাশ্মীর,—সুন্দর, নধর, পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে,—মনে হচ্ছে, আগামী বর্ষায় গলে যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই কই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠান-টাট থেকে জম্মু আর শ্রীনগর, তেমনি ই পথ সোজা গিয়েছে বরমুলো, উরি, মেল আর কোহালার ঝিলম নদীর পুল পরিয়ে সানি ব্যাঙ্ক হয়ে রাওয়ালপিণ্ডির কে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। ই পথ আমাকে অস্থির করেছিল তরুণ য়সে,—যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়াল-পিণ্ডির ওদিকে।

দুই পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পেরিয়ে ীপ চলেছে। অজস্র ফসল দুই ধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগুলি এখন পরিপূর্ণ। চন্দ্রাজড়ানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কানও অশান্তি অথবা কোলাহল নেই।

এক সময়ে একটি মৃন্ময় টিলা পাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন জীপ গাড়ি থামালেন। আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। আমরা উপরে উঠে গেলুম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন পাকিস্তানের সহায়তায় উপজাতীয় পাঠান দস্যুরা বরমুলা শহরটি প্রায় ধ্বংস ক'রে শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হয় তখন লেফটেনাণ্ট কর্নেল ডি-আর-রে এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সদলবলে তাদের প্রতিরোধ করেন। এইখানে ব'য়ে গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে-রক্ত গড়িয়ে গেছে ক্ষেত খামারে, গেছে অদূরবর্তী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে-হাজারে, কাতারে-কাতারে দস্যুদলের সামনে কর্নেল যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইঞ্চি হ'টে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। সেই অসমসাহসিক প্রকৃত যোদ্ধার হৃৎপিণ্ড থেকে ঠিক এই স্থানে প্রথম রক্ত-বিন্দু ঝ'রে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা রয়েছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দূরে বরমুলায় এসে পৌঁছলুম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়বেষ্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহমূল। সংবাদপত্রে পড়া সেদিনের বীভৎস কাহিনীর কথা স্মরণ ক'রে পা-দুখানা যেন ভারি হয়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট জোসেফস্ কনভেণ্ট। ক্যাপ্টেন বললেন, আসুন, ভেতরে ঢুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশে-পাশে সুন্দর বাগান এবং বসবাসের ঘর। এরই মধ্যে ঢুকে দস্যুরা যে কয়জন শ্বেতাঙ্গ রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাদেরই একজনকে ডেকে ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। শান্ত নম্রমুখী মহিলা। তাঁর চোখে চশমা, মুখের ভাবটিতে বুদ্ধি এবং মাধুর্য এক সঙ্গে মিলেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগুলির নানা বীভৎস কাহিনীর উল্লেখ ক'রে এক

সময় বললেন, আমাদের এক বন্ধু জনৈক ইংরেজ কর্নেলের স্ত্রী এখানে তখন সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কর্নেল এসে তাঁর স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূতা সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। দস্যুরা স্বামী-স্ত্রীকে এই কনভেণ্টের মধ্যেই হত্যা করে এবং শিশুটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে! তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সমস্ত কনভেণ্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এসব আবার নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত্র সেদিনকার 'প্রেতিনী' হয়ে বাস করছি!

মাথা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলুম। পীর পাঞ্জালের দূর সীমানায় এসে এইসব আমাকে দেখে যেতে হোলো।

কনভেণ্টের একটি অংশে প্রসূতি আগার। সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। অধিকাংশই মুসলমানী। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে কয়েকটি মেয়ে হাতের কাজ শিখছে। শিশুরা এক স্থলে ঔষধ-পত্রাদি নিচ্ছে। এক ধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কনভেণ্টের সংগে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা কনভেণ্ট থেকে বেরিয়ে শহর পরিদর্শনে বেরোলাম। না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হচ্ছিল, মাত্র গতকাল সমস্ত শহর জ্বলে পুড়ে কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে পথে সর্বত্র স্তূপাকার ধ্বংস। ক্যাপ্টেন দেখাচ্ছিলেন, অবারিত লুণ্ঠন ও হত্যার কেন্দ্র; শত শত নরনারী পুড়েছে একই অগ্নিকুণ্ডে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে বরমুলা। যেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শান্তি ফিরে এলো, দেখা গেল বরমুলার অন্ধকার শ্মশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্যুরা নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরমুলার আগাগোড়া এই ইতিহাস!

মুসলমানি শহরে, কিন্তু একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সংকীর্ণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘুনাথজীর মন্দিরে তখনও বাজছে শঙ্খ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনার বৃক্ষের ছায়া পড়েছে মন্দিরের সুবর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। বোধ হয় ওপারেও আগুন জ্বলেছিল। মন্দির অংগনে পণ্ডিত-দের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন স্নান ও পূজা-পাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুলে পথের এক স্থলে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ানির বাসিধসা দোতলা বাড়ি এবং ইঁটের দেওয়ালে আজও রয়েছে গুলীর দাগ। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশুকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দস্যুরা শেরওয়ানিকে প্রশ্ন করে, এখনও তিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছেন কিনা। শেরওয়ানি ঘৃণার সংগে এই নরহত্যাকারী দস্যুদলের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরস্কারে ক্রুদ্ধ দস্যুরা তাঁরই বাড়ির দেওয়ালে তাঁকে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে তাঁর দেহকে গুলী-বিদ্ধ ক'রে শতছিদ্র করে!

শেরওয়ানির উদ্দেশে আজ নিত্য প্রণাম জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে 'সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, সুইয়াপুর। সম্ভবত সূর্যপুরের অপভ্রংশ। অনেকে বলে, রাজা অবন্তীবর্মার কালে 'সুইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার ঝিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য এখানে এক নদী-পথ কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা এবং পিছন থেকে এগিয়ে আসে বরমুলা থেকে দস্যুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও নারীহরণ। সেই চূড়ান্ত সংকটকালে কয়েকটি পরিবারের পুরুষে আপন আপন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা ক'রে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সংকটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনা-দল দস্যুদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন শান্তকণ্ঠে বললেন, মুসলমানের উপরে মুসলমানের এই অমানুষিক বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই!

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহুল। বুঝতে পারা যায়, মহাজনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। ক্ষয় ক্ষতি ও ক্ষত মানুষ আবার ভুলতে বসেছে। নতুনকালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে!

যদি কেউ এই মৃত্তিকার লাবণ্যের উপর কান পেতে থাকে, কাশ্মীরের কান্না শুনবে। রক্তপিচ্ছল ভূস্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণা মূর্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবস্ত্রা বিস্রস্তা মৃন্ময়ী এবার তার ধূলিধূসর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধুক। অগ্নিক্ষরা করাল দৃষ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলুক, "হে বিধাতা আমারে রেখোনা বাক্যহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা!" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হূন তাতার মোগল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাংগে নখরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর অনন্ত লাবণ্যের পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা খেলেছে! এবার উঠে দাঁড়িয়ে মুছুক চোখের জল, ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে ডাক দিক্ ওই হরমুখ হিমালয়ের বজ্রপাণিকে,— পশুহননের জন্য পাশুপত অস্ত্র হাতে তুলে নিক্—!

(ক্রমশ)

॥ চৌদ্দ ॥

ব কেলের দিকে নান্‌কোয়া গ্রামের ছেলে দুটি চলে গিয়েছে। বুড়ো র্দার, সালুয়ালাঙ্ গ্রামের প্রাচীন মানুষ-লি পোকরি কেসুঙ থেকে বিদায় নিয়েছে। য়েহাকাঙের সামনে পাহাড়ী মানুষগুলির । জটিল জটলা ছিল, তাও এখন আর নেই।

এখন প্রাক্‌সন্ধ্যা। উত্তর পাহাড়ের ওপর সর ছায়া নেমে আসছে।

সাঁ করে একটা তীরগামী বর্শার মত ায়েহাকাঙে এসে ঢুকলো মেহেলী আর লিঙা। সারাদিন তারা বনময় উপত্যকায় রে ঘুরে শুকনো পাতা আর কাঠ ড়িয়েছে। খবরটা পেয়েছিল তারা। ামের একটি মেয়ে সরস সংবাদটা বেশ সিয়ে রসিয়ে, রঙের চাপান দিয়ে দিয়ে সেছিল।

"বুঝলি মেহেলী, নান্‌কোয়া বস্তী থেকে তোর বিয়ের বায়না এসেছে?"

"বিয়ের বায়না কেন?" চমকে উঠেছিল মেহেলী।

"কেন আবার? তোর যে বিয়ে! ভোজ হবে বেশ। তোর আর কী? এবার বিছানায় পুরুষ পাবি, আমাদের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ছোঁক্ ছোঁক্ করতে হবে না।" রীতিমত একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো যুবতী মেয়েটির। "দেখ গিয়ে তোদের কেসুঙে বস্তীর সব লোক জড়ো হয়েছে।"

কথাগুলো যেন কানের ওপর গরম চর্বি ঢেলে দিয়েছিল। আর একটি মুহূর্ত দাঁড়ায় নি মেহেলী। সমস্ত শরীরটা, এই পাহাড়ী বন, অস্ফুট ভাবনা—সব যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সহসা, সহসাই ওপারের টিলায় উঠে সাঁ সাঁ করে গ্রামের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো মেহেলী; তার পেছন পেছন ছায়ার মত ছুটলো পলিঙা। আর সেই রুদ্ধশ্বাস দৌড় আয়েহাকাঙে এসে থামলো।

মাচানের ওপর বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে রোহি মধু খাচ্ছিল সাঞ্চামথাবা। মেহেলীকে দেখে শান্ত গলায় সে বললো: "এই মেহেলী, তোর বিয়ের ঠিক হলো। হুই নান্‌কোয়া বস্তীর মোজিচিজুঙের সংগে তোর বিয়ে হবে।"

"মোজিচিজুঙ্ তো টেফঙ্ খামকোয়ানু (বাঘমানুষ)! আমি ঐ শয়তানকে বিয়ে করবো না!"

"কী বললি?" গর্জে উঠলো সাঞ্চামথাবা। উত্তেজনায় হাতের পিঠ দিয়ে ঘন ঘন পুরু ঠোঁটদুটো মুছতে লাগলো।

"কী আবার বলবো! আমি ঐ মোজিচিজুঙকে বিয়ে করবো না।" মেহেলীর গলায় রীতিমত যুদ্ধের ঘোষণা।

"ইক্তাহান্টসা সালো!" মুখখানা কদাকার করে কদর্যতম গালাগালিটি উচ্চারণ করলো সাঞ্চামথাবা। নির্বিবাদে, নির্দ্বিধায়: "আমি বিয়ের পণ নিয়েছি, বিয়ে করবে না? বিয়ে করবে না! তোর বাপ্ করবে, তোর মা করবে, আর তুই তো সেদিনকার ছানারে শয়তানের বাচ্চা!"

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললো মেহেলী; "আমি হুই কেলুরি বস্তীর সেঙাইকে বিয়ে করবো। ও আমার লগোয়া পনু—"

কান দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো! বলে কী মেহেলী! বর্শা দিয়ে জিভখানা উপড়ে আনবে না কী মেহেলীর! সাঞ্চামথাবার চোখ দুটো সাপের মত ক্রূর হয়ে উঠলো। তারপরেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সে; "লগোয়া পনু! সেঙাইকে বিয়ে করবি! ইজা রামখো। আজ টেফঙের মত ছাল ছাড়িয়ে ফেলবো তোর—"

মাচানের ওপাশ থেকে একটি অতিকায় বর্শা টেনে নিল সাঞ্চামথাবা। জীমবো পাতার মত খরধার ফলা। সেই ফলায় মৃত্যু ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কিন্তু বর্শা তাক করার আগেই আয়েহাকাঙ থেকে লাফিয়ে বাইরে নামলো মেহেলী, তার পেছন পেছন পলিঙা।

সোনাঝরা বিকেল। সামনের জংগলের ঘনছায়ায় অদৃশ্য হলো মেহেলী আর পলিঙা।

টিজু নদীর কিনারায় এসে পলিঙা বললো; "এবার কী করবি মেহেলী?"

"কী আর করবো? সেঙাইকে খোঁজ করবো। অনেকদিন ওর দেখা পাইনি। কী যে হয়েছে বুঝতেই পারছি না।"

"সেদিন তোর শোয়ার ঘর থেকে ঠিক পালাতে পেরেছিল তো সেঙাই! হুই যেদিন লিজোমুকে ভুল করে পুড়িয়ে মারলো সদার? কী রে মেহেলী? না বস্তীতে ফিরে আর কোন পাহাড়ী মাগীর সঙ্গে পিরীত জমিয়ে তুলেছে?" পলিঙার দুচোখে কৌতুক ঝিকমিক করছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো মেহেলীর! তাই তো, পাহাড়ী পুরুষের মন! সে তো ঘাসের ফলায় শিশিরের পরমায়ু! কেলুরি গ্রামেও তো অনেক কুমারী কন্যা নগ্ন দেহের অপরূপ রূপ খুলে পুরুষের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়! বিভ্রম ছড়ায়! সেই পাহাড়ী রূপকন্যাদের কেউ কী ডাইনী নাকপোলিবার মন্ত্রপড়া শিকড় দিয়ে বশ করলো সেঙাইকে!

কাঁপা-কাঁপা গলায় মেহেলী বললো; "আচ্ছা একবার দেখি! সেঙাইর সংগে না পালালে বাবা আমাকে ঠিক খুন করে ফেলবে। একেবারে খতম। তুই একটু দাঁড়া এপারে, আমি ওপার থেকে সেঙাইর খোঁজ করে আসি। আমি কিছুতেই মোজিচিজুঙকে বিয়ে করবো না।"

পলিঙা বললো; "সাবধানে যাবি; ওরা কিন্তু আমাদের বস্তীর শত্রু!"

টিজু নদী পেরিয়ে সেই নিঃশব্দ ঝর্ণাটার পাশে এসে দাঁড়ালো মেহেলী। কেউ

কোথায়ও নেই। মনে পড়লো: এখানেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সেঙাইর। অনেকটা সময় অপেক্ষা করলো মেহেলী; ঘনবনের ফাঁক দিয়ে জাফরীকাটা রোদ এক সময় মিলিয়ে গেল। তারও পর কেলুরির বস্তীর দিকে পা চালিয়ে দিল মেহেলী।

কর্তব্য সে স্থির করে ফেলেছে। যেমন করে হোক, সেঙাইর সঙ্গে আজ দেখা করতেই হবে। সাঙ্গামখাবার বর্শার সীমানা থেকে, মোজিচিজুঙের বন্ধন থেকে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে সে পলাতক হবে সেঙাইর আশ্রয়ে। সেঙাইকে নিয়ে দূর পাহাড়ের উপত্যকায় ঘর বাঁধবে। সেঙাইর দুটি বাহুর বেষ্টনে পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী এই মুহূর্তে নিরাপদ শান্তি আর নির্বিঘ্ন স্বস্তি আবিষ্কার করলো। তার জীবনে সেঙাইকে বড় প্রয়োজন, নির্মম প্রয়োজন।

খাড়া চড়াই থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে একটা কলরব শুনতে পেলে মেহেলী। মানুষের গলা। চকিত একটা ছায়ার মত বড় পাথরখানার আড়ালে সাঁ করে সরে দাঁড়ালো মেহেলী।

বাঘনখের আঁচড়ের মত ফালি ফালি পথের রেখা। সেই পথ ধরে দুলতে দুলতে আসছে একদল পাহাড়ী মানুষ। তাদের সোরগোলে বনভূমি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই এরা কেলুরি গ্রামের মানুষ। ফুসফুসের মধ্যে নিঃশ্বাসটা আটক করে নিথর হয়ে রইলো মেহেলী।

একটি গলা শুনতে পেলো মেহেলী: "সেঙাইটাকে কোহিমার পথে দিয়ে এলুম তো সর্দার, সারুয়ামারুটাও সঙ্গে গেল। কোহিমা থেকে ফিরবে তো!"

একটি বুড়ো মানুষ, নিশ্চয়ই সে দল-পতি; মাথা ঝাঁকালো: "হু, হু, ফিরবে। নির্ঘাৎ ফিরবে। ঐ যে গাইডিলিওর কথা বলেছিল সারুয়ামারু, কেমনতরো মেয়ে সে, তাই দেখতেই পাঠালাম। নইলে টাকা দিয়েছে বলে কী সিজিটোর কাছে পাঠাতুম নাকি? শয়তানের বাচ্চা ঐ সায়েবরা সারুয়ামারুকে বলে পাঠিয়েছে আনিজার নামে টেবোয়া বলি দিতে পারবি না। আচ্ছা, একবার এই বস্তীর দিকে আসে যেন সায়েবরা!"

কে একজন বললো: "সায়েবরা বড় বশ করতে পারে। ঐ ডাইনী নাকপোলিবার মত। সিজিটো গেলো, সারুয়ামারু গেলো —আর বস্তীতে ফিরে খালি তাদের কথাই বলে ওরা। কী মন্তর যে জানে সায়েবরা! সেঙাইটা কোহিমা থেকে আবার সেরকম না হয়ে ফেরে!"

সর্দার মাথা নাড়লো: "না, না, সেঙাই তেমন ছেলে না।"

সেঙাই তবে কোহিমা চলে গিয়েছে! বুকখানা ধক্ করে উঠলো মেহেলীর। তবে, তবে সে এখন কী করবে? কী সে করতে পারে? কোনক্রমেই নিজেদের কেসুঙে সে আর ফিরতে পারবে না। সাঙ্গামখাবা তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নেবার জন্য বর্শাটাকে নিশ্চয়ই শান দিয়ে চলেছে এতক্ষণ ধরে। আচমকা তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো কথাগুলো; "সেঙাই, সেঙাই কবে আসবে?"

মানুষগুলো একেবারে পাথরখানার সামনে এসে পড়েছিল। মানবিক গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো; "কে? কে?"

সেই সঙ্গে অনেকগুলো বর্শা ঝকমক করে উঠলো।

একজন বললো: "হুই, হুই যে। হুই পাথরের আড়ালে—"

পাথরের আড়াল থেকে আর্তনাদ করে উঠলো মেহেলী; "আমাকে মারিস না, আমাকে মারিস না। আমি মেহেলী; তোদের বস্তীর সেঙাইর লগোয়া লেন্যু।"

ইতিমধ্যে মেহেলীকে চার কিনার থেকে ঘিরে ধরেছে কেলুরি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। ওঙলে, পিঙলেই, পিঙকুটাঙ, এমনি অনেকে। বুড়ো সর্দার খাপেগাও রয়েছে তাদের মধ্যে।

সেঙাই আজ চলে গেল কোহিমায়।

ণ্গ গেল সান্‌রামান্‌। ওঙ্‌লেরা মাও-
় পথে এইমাত্র তাদের তুলে দিয়ে
য়েছে।

বুড়ো খাপেগা বিস্মিত গলায় বললো;
তুই তবে মেহেলী।"

"হু, হু। সেঙাইর লাগোয়া লেন্যু।
ামাকে মারিস না তোরা!" করুণ চোখে
াকিয়ে রইলো মেহেলী।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—" তুমুল সোরগোল
য়ে উঠলো মানুষগুলি।

বুড়ো খাপেগা হুঙ্কার ছাড়লো; "থাম্‌ শয়তানের বাচ্চারা।" তারপরেই মেহেলীর দিকে কোমল চোখে তাকালো সে; "না তোকে মারবো না।"

ওঙ্‌লে বললো; "জোঠা, ওকে নিয়ে চল্‌ আমাদের বস্তীতে। সেঙাই কোহিমা থেকে ফিরলে বিয়ে দিয়ে দেবো।"

কে যেন বললো; "বেশ বাগে পেয়ে গেছি।"

আচম্‌কা মেন্‌জোর মত গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা; "কী, বাগে পেয়ে ওকে ধরে নিয়ে বিয়ে দিতে চাস্‌ টেফঙের বাচ্চারা। তেমনি পাহাড়ী সর্দার আমি না। যুদ্ধ করে ঐ সালুয়ালাঙ্‌ বস্তী থেকে ওকে ছিনিয়ে আনবো; তারপর বিয়ে হবে। আমাদের কলিজায় রক্ত নেই, লড়াই করতে আমরা ডরাই নাকি?"

চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছে বুড়ো খাপেগার। বুড়ো খাপেগা; কেসুরি গ্রামের অতীতকাল সে। আদিম বীরত্বের প্রতীক।

বন্য আর পাহাড়ী পৃথিবীর সে দলনেতা। সহসা বুড়ো খাপেগা তাকালো মেহেলীর দিকে। তারপর বললো; "তুই তোদের বস্তীতে ফিরে যা মেহেলী; তোদের সন্দারকে বলিস, তোকে আমরা ছিনিয়ে এনে সেঙাইর সঙ্গে বিয়ে দেবো। সে যেন ঠেকায়! সেঙাইর আভঙ্কুকে (ঠাকুরদা) তোরা মেরেছিস। তোদের পোকরি বংশের নিত্‌সুকে আনতে গিয়ে সেদিন আমরা হেরে গিয়েছিলাম। এবার তোকে আনতে যাবো। যা, মেহেলী, চলে যা। যুদ্ধ করে না আনলে সে মেয়েমানুষের দাম থাকে না। ফাউ পেয়ে বিয়ে করলে, সে আবার কী পুরুষ!"

"ঠিক, ঠিক! হু, হু—" অজস্র জোয়ান গলায় ঝড় বাজলো; "মেহেলীকে আমরা ছিনিয়ে আনবো সন্দার। তুই চলে যা মেহেলী।"

আচমকা মেহেলী বললো; আকুল হয়ে উঠলো তার সারা দেহ, করুণ হলো চোখ-মুখ: "আমি আমাদের ঐ বস্তীতে আর ফিরবো না সন্দার! তুই আমার বাবা, তুই আমাকে ঐ বস্তীতে যেতে বলিস না।"

"কেন? কী হয়েছে তোদের বস্তীতে?" বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা ফুটলো বুড়ো খাপেগার।

"আমি বস্তীতে ফিরলে আমার বাবা ছাল উপড়ে নেবে।"

"কেন?"

"আমার সঙ্গে ঐ নানকোয়া বস্তীর মেজিচিজুঙের বিয়ে ঠিক করেছে আমার বাবা। আমি সেঙাইকে ছাড়া কারুকে বিয়ে করবো না। তাই পালিয়ে এসেছি।" কথাগুলো কাতর আর্তনাদের মত শোনালো মেহেলীর।

"মেজিচিজুঙ! সে তো টেমি খাম-কোয়ানু (বাঘ মানুষ)! কী সব্বনাশ!" আতঙ্কে ফিস্ ফিস্ শোনালো বুড়ো খাপেগার কণ্ঠ; "তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায়!"

"হু, হু—অনেক টেনেনু মিঙেলু (কন্যাপণ) পাবে কী না?"

"একটা আস্ত সাপুমেচু (ভয়ংকর লোভী মানুষ) তো তোর বাবা।"

"হু, হু, সেই ভয়েই তো পালিয়ে এসেছি। আমাকে তোদের বস্তীতে থাকতে দে সন্দার। নইলে আমাকে সাবাড় করে ফেলবে। আমি বাবাকে বলে এসেছি, সেঙাইকে ছাড়া কারুকে আর বিয়ে করবো না।"

"তাই হবে। তুই চল্ আমাদের বস্তীতে। তোকে ছিনিয়ে নিতে নিশ্চয়ই তোদের বস্তীর সন্দার আসবে। তখন লড়াই হবে।"

"হু, হু।" জোয়ান ছেলেরা চারপাশ থেকে সায় দিল। তাদের হাতের বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করে উঠলো। একটি খণ্ড-যুদ্ধের উত্তেজনা নানা রঙের খেলা খেলে যাচ্ছে তাদের দেহে-মনে, অর্ধস্ফুট চেতনায় চেতনায়।

"চল্ এবার। রাত্তির হয়ে আসছে।" বনময় উপত্যকার দিকে নামতে নামতে বুড়ো খাপেগা বললো, "যাক্, বিনা লড়াইতে তো তোকে নিচ্ছি না। দস্তুরমত লড়াই হবে তোর জন্যে, কী বলিস মেহেলী?"

সকলের সঙ্গে চলতে চলতে মেহেলী বললো, "হু, হু—"

পাহাড়ী অজগরের মত আঁকাবাঁকা পথের রেখা। মসৃণ পীচের পথ। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই দেহ বেয়ে, ঘন বন উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিকায় শিলাস্তূপের বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পথের বিস্তার দুদিকেই। মাও থেকে একদিকে কত শৈলচূড়া পাড়ি দিয়ে সে পথ প্রসারিত হয়ে রয়েছে মণিপুরের দিকে। উত্তর-পশ্চিম কোণে সেই পথেরই আর একটি বাহু কোহিমার প্রান্ত ছুঁয়ে ডিমাপুরের দিকে নেমে গিয়েছে, নেমে গিয়েছে রাঙা পাহাড় আর লামডিঙের রেলের রেখায়!

মাওএর পথ-সন্ধিতে এসে দাঁড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

ডান পাশে পাহাড়ের অতল খাদে দোইয়াঙ নদী কলস্বর হয়ে ছুটছে। পাথরের ওপর আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে ফুলকি ছড়াচ্ছে নীল জলের ধারা। খাদের ওপর উঁচু পাথরের টিলায় দোকানপসার। টিনের চাল, পাথরের মেঝে, বাঁশের মাচানে নানা সম্ভার, কমলালেবু, লবণ, স্যাকা বিড়ি, কাঁচি সিগারেট। আর অতিকায় সব গুদাম—টেশঙের ছাল, টেঞ্জের শিঙ, কস্তুরী, বাঘের ছাল, দাঁত, হাতীর দাঁত দিয়ে ভরাট। বাঁ দিকে পাথর কেটে কেটে অনেকটা উঁচুতে কয়েকটি মণিপুরী হোটেল। টিনের ঘর; সামনে মণিপুরী, ইংরেজি, আসামী আর বাঙলা হরফে হোটেলগুলির নাম লেখা রয়েছে।

বাঁদিকের লবণ-কমলার দোকানগুলিতে বিচিত্র ধরনের কতকগুলি মানুষ। বিচিত্র বিস্ময়ে এই দোকান-পসার, এই অপরিচিত মানুষ, ইম্ফলের দিকে অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া রহস্যময় পথটার দিকে আবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। বিচিত্র সব মানুষ। (এর আগে সেঙাই কোনদিনই পীচের পথ দেখে নি, পাহাড়ী মানুষ ছাড়া এই সব সমতলের মানুষ; যেমন—বাঙালী, আসামী, হিন্দুস্থানীদের দেখে নি। দেখে নি মণিপুরীদের, কাছাড়ীদের।) দুর্বোধ্য তাদের ভাষা। কোনদিন এসব ভাষা শোনে নি সেঙাই।

ফিস্ ফিস্ গলায় সেঙাই বললো, "এই সব কোন্ মানুষ রে সারুয়ামারু? আমাদের পাহাড়ী লোক তো নয়।"

প্রজ্ঞাবানের মত গম্ভীর শব্দ করে হাসলো সারুয়ামারু; "হু, হু, এরা হলো সমতলের মানুষ। খবরদার, এদের সঙ্গে কোনদিন মিশবি না সেঙাই।"
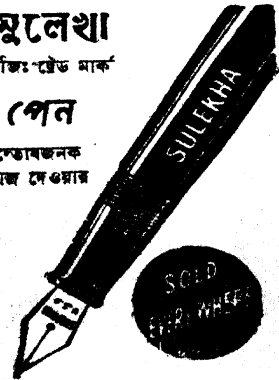
"কেন?"

"কেন আবার? ফাদার বারণ করে দিয়েছে। এরা খুব খারাপ লোক।"

"তাই ন্যাকি?"

"হু, হু" গূঢ় কোন সংবাদ দিয়েছে, মুখখানা এমন ভয়ানক দেখালো সারুয়ামারু, "চল্ না একবার কোহিমাতে, দেখবি, ফাদার সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে। এই আসানুদের (সমতলের মানুষ) মধ্যে বঙ্গালী আছে, অহমিয়া আছে, হিন্দোস্থানী আছে—ফাদার বলে দিয়েছে, ওরা সব শয়তান। খুব সাবধান সেঙাই। কোহিমাতে গিয়ে ওদের পাল্লায় পড়বি না।"

"হু, হু—" মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সেঙাই। তারপর ইম্ফলগামী পথটার দিকে তাকালো; "ঐটা কী রে। সাপের মত এ'কে-বে'কে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। কী ওটা?"

"ওটা পথ। ইম্ফলের দিকে চলে গেছে।"

"ইম্ফল! সে কতদূর?" দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো সেঙাই।

"অনেকদূর! অনেক, অনেকদূর! কিন্তু প'ক্ প'ক্ গাড়িতে সকালবেলা উঠলে ঠিক সন্ধ্যের সময় পৌঁছে দেবে।"

"আমি যাবো ইম্ফলে।"

"যাবি, যাবি। ইম্ফলে যাবি, কত জায়গায় যাবি। আগে তো কোহিমা চল্।" সমানে বকর বকর করে চললো সারুয়ামারু, "খিদে পেয়েছে সেঙাই?"

"হু, হু—"

"চল্, ঐ মণিপুরীদের হোটেলে খেয়ে নি। ইম্ফল থেকে প'ক্ প'ক্ গাড়ি আসতে এখনও দেরী আছে। এমন জিনিস খাওয়াবো, জন্মে কোনদিনই খাস্ নি।" সেঙাইর হাতখানা থাবার মধ্যে বন্দী করে ডান দিকের পাথর-কাটা সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল সারুয়ামারু।

তখনও ইম্ফলের পথটার দিকে, সামনের দোকানপসারগুলোর দিকে, সমতলের মানুষগুলোর দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই। অপরূপ এক পৃথিবীর সিংদরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। টিজু নদীর কিনারে বনময় উপতকায় উপত্যকায় কেলুরি, সালুয়ালাঙ, নানকোয়া, জুকু-মিচা—এই সব পাহাড়ী গ্রামের বাইরে ইম্ফলে যাবার এমন একটা মসৃণ পথ ছিল, এমন সব বিচিত্র মানুষের মেলা ছিল, এমন সব দুর্বোধ্য ভাষার কলতান ছিল, তা কী জানতো সেঙাই? সমতলের মানুষগুলোর দিকে একবার তাকালো সে। কেমন একটা আকর্ষণ বোধ হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিলবার, ওদের কথা শুনবার। কিন্তু নয়; একটু আগেই তাদের সম্বন্ধে মোহভঙ্গ করে দিয়েছে সারুয়ামারু। বিচিত্র এক উত্তেজনায় পেশীগুলো সহসাই প্রখর হয়ে উঠলো তার।

পাথরকাটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সেঙাই। পাশের একটা ঝর্ণা থেকে রবারের নল দিয়ে জল আনা হয়েছে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে ছিটিয়ে কালো পাথরের অমসৃণ চত্বরটাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বরফ-শীতল জল। সারুয়ামারু সেই জলে হাত ধুয়ে নিল, তারপর সেঙাইকে বললো, "হাত ধুয়ে নে সেঙাই। এটা শহর, একটু সভ্য হয়ে চলবি। এ তো আর ঐ সন্দায়ের কেলুরী বস্তী নয়! হু হু।" আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো সারুয়ামারু।

অতিকায় বর্শাটা একপাশে রেখে হাত-পা ধুয়ে নিল সেঙাই। ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত, নীচে জঙ্ঘা পর্যন্ত একটি নীল রঙের পী মৃঙ কাপড় পরেছে সে।

ঘরের ভেতরে এসে টিনের চেয়ার দেখলো সেঙাই, দেখলো কাঠের টেবিল। যত দেখছে, ততই আনন্দিত বিস্ময়ে দুটি চোখ আর মনভরে ভরে উঠছে তার। নানা জিজ্ঞাসায় ইন্দ্রিয়গুলো আন্দোলিত হয়ে উঠছে।
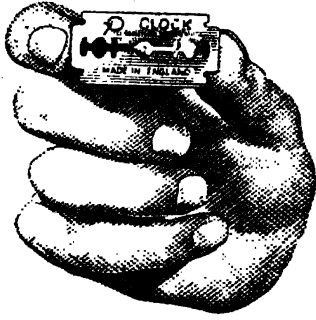
পেতলের থালা আর গ্লাস এলো। তার ওপর মণিপুরী ঠাকুর ভাত, এরংগু (শুটকী মাছের তরকারী), আর শর্যে পাতার ঝোল জাতীয় খানিকটা দিয়ে গেল। তারও পর এলো মাগুর মাছ ভাজা।

পরম তৃপ্তির সংগে সারুয়ামারু সপাসপ ভাতের গ্রাস তুলছে মুখে। আর নিষ্ক্রিয় বসে বসে ঝকঝকে পেতলের থালা আর গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই।

অতিকায় একটা গ্রাস ঠোঁটের কাছে এনে সারুয়ামারু তাকালো সেঙাইর দিকে "কী রে, ভাত খাচ্ছিস না কেন? ঐ এরংগু খেয়ে দেখ—সেগুসুঙের আধপোড়া মাংসের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক স্বোয়াদ পাবি।"

"কিন্তু পেতলের এইগুলো," বাসনগুলির দিকে আঙুল প্রসারিত করে দিল সেঙাই; "এই পেতল দিয়ে তো আমরা নীসে আর নীয়েঙ দুল বানাই। আরুখো (হার) বানাই। এতে খেলে আনিজা গোঁসা হবে না তো!"

"আরে না, না। একটা ছাগী তুই। সব তাতেই খালি আনিজা। আর পেতল; থু থু! তোদের ঐ কেলুরী বস্তীতেই পেতলের দাম রয়েছে; এইসব শহরে ওর কোন দাম নেই। নে, নে খেয়ে নে। এখুনি আবার পক্ পক্ গাড়ি এসে পড়বে।"

সারারাতি উপত্যকা আর মালভূমি, টিলা আর বন আর অসংখ্য শৈলচূড়া উজিয়ে এসেছে দুজনে। পায়ের জোড়ে জোড়ে, হাড়ের সন্ধিতে সন্ধিতে অবসাদ আঠার মত জড়িয়ে রয়েছে। পেটের মধ্যে ক্ষুধার ময়াল পাক দিয়ে উঠেছে। আচমকা সেঙাই পিতলের থালাখানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিমেষে শূন্য হয়ে গেল শুভ্র কয়েকটি অন্নের বিন্দু। মণিপুরী ঠাকুর আরো ভাত ঢাললো সেঙাইর পাতে। তাও নিঃশেষ হলো।

এক সময় খাওয়ার পর্ব শেষ হলো। তৃপ্তির একটা বিশাল উদ্গার তুললো সেঙাই; "ভাত বড় ভালো বানায় তো এরা। আমাদের ভাত একেবারে গলে গলে একশা হয়ে যায়। বস্তীতে ফিরে এমনি করে ভাত পাকাবো এবার। মাংস ছিল না, মাংস না হলে কী ভাত খাওয়া যায়!"

সারুয়ামারু জংগুপি কাপড়ের গ্রন্থি থেকে একটি রুপোলী মুদ্রা বের করতে করতে বললো, "মণিপুরীদের হোটেলে মাংস মেলে না।"

এক সময় একটি টাকা মণিপুরী মালিকের হাতে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দুজনে। সেঙাই আর সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "টাকা দিলি যে!"

"বাঃ রে, টাকা দেবো না! দাম দিতে হবে না। খেলি যে, তার দাম! এবার বুঝলি তো টাকা দিলে সব মেলে শহরে।"

টাকার মহিমা সম্বন্ধে এক প্রস্থ বকর বকর শুরু করলো সারুয়ামারু।

"হু, হু—" মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সেঙাই। সে বুঝেছে। অর্থের পরমার্থ জলের লিপির মত তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে সারুয়ামারু।

কিছু সময়ের বিরতি।

এক সময় সেঙাই আবার বলতে শুরু করলো, "কোথায়, তোর পক্ পক্ গাড়ি? কোথায় রে সারুয়ামারু! কাল সারারাত হেঁটেছি, বড় ঘুম পাচ্ছে।"

"হুই—হুই—" সহসা সামনের দিকে আঙুল প্রসারিত করে দিল সারুয়ামারু।

অনেকদূরে পাহাড়-কাটা পীচের পথ। আঁকাবাঁকা। চড়াই-উৎরাই। সেই পথের ওপর একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে বাসটাকে। একটা খারিমা পতঙ্গের মত সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে।

সারুয়ামারু বললো, "হুই—হুই—হলো প'ক্ প'ক্ গাড়ি—"

নিবিড় বিস্ময়ে চলমান বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এক সময় পাহাড়ী পথের বাঁকে বাসটা অদৃশ্য হলো। তারপর আবার পাহাড়-বনের ফাঁকে ফুটে উঠলো। তার ওপর একটু একটু করে স্পষ্ট হতে হতে মাও-এ চলে এলো।

সারুয়ামারু বললো, "আয় গাড়িতে উঠি—"

"উঠবো! আনিজার গোঁসা লাগবে না তো!" ভীরু ভীরু গলা আশ্চর্য ফিস্-ফিস্ শোনালো সেঙাইর।

"আরো দূর! তুই একেবারে বুনো! ঐ বুড়ো সদ্দারের কাছে থেকে থেকে একেবারে অসভ্য হয়ে রয়েছিস।" একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো সারুয়ামারুর মুখেচোখে, "ঐ শয়তান সদ্দারটা—ওর জন্যে বস্তীর সব মানুষগুলো বুনো হয়ে রইলো—"

"হিজাহান্টসা সাদো!" বাসে উঠতে উঠতে হুঙ্কার ছাড়লো সেঙাই; "খবরদার, সদ্দারকে কিছু বলবি না সারুয়ামারু!" একেবারে গ্রী দিয়ে ফ'ুড়ে ফেলবো না।

একটু দমে গেল সারুয়ামারু। তারপর চকিত দৃষ্টিতে একবার সেঙাইর দিকে তাকালো। আনকোরা পাহাড়ী মানুষ। শহরের রঙ দিয়ে, চেকনাই দিয়ে, ছোঁয়া আর লালসার রস দিয়ে সেঙাইকে তৈরী করে নতুন রূপ দিতে, নতুন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে সময় লাগবে। সারুয়ামারু একবার ভাবলো পাদ্রী সাহেবদের কথা। বেশী সম্মোহন জানে তারা। তাদের স্পর্শে অনেক বেশী কুহক, অনেক ইন্দ্রজাল। সে জানে, কেমন করে তার মত ভয়াল পাহাড়ী মানুষেরও

পাদ্রী সাহেবদের সম্বন্ধে অনুরাগ জন্মেছে একটু একটু করে। এই সেঙাইর মত একদিন সেও এই পাহাড়ী সড়কে ছিল একেবারেই বন্য।

একটু হাসলো সারুয়ামারু; "আচ্ছা, আচ্ছা—একবার কাথাবের পাল্লায় নিয়ে ফেলি তোকে। তখন তোর এত তেজ ফোঁস কোথায় থাকে দেখবো—"

নসু কেহেঙ বাসের দুপুরে। বাসযাত্রীদের মধ্যে আমেজ। এক সময় বাস চলতে শুরু করলো। চাপা-চাপা ছোট চোখ, বুকের ওপর থেকে হাঁটুর নীচু পর্যন্ত কাপড় বাঁধা একদল মেয়ে চারপাশে বসে রয়েছে। রয়েছে একদল পুরুষ। তাদের চোখও তেমনি চাপা-চাপা আর ছোট ছোট।

সারুয়ামারু বললো, "এরা সব মণিপুরী—হুই ইম্ফল থেকে আসছে—"

"হু-হু—" মাথা নাড়লো সেঙাই। একটু আগেই সারুয়ামারু তাদের চিনিয়ে দিয়েছিল।

তাদের মত অনেক পাহাড়ী মানুষও ছড়ানো হয়ে বসেছে এদিক-সেদিক।

ক্রমাগত বাঁক ঘুরেছে বাস। বাঁ দিকে পাথর কাটা দেওয়াল উঠে গিয়েছে দূরতম আকাশে। সেই পাহাড়ের দেহে নিবিড় অরণ্য। বাঁ দিকে দশ ফুট পথের হাতের ওপার থেকে নীচের অতল খাদে নেমে গিয়েছে গহন বন।

সেঙাই বললো, "খাদে পড়ে যাবো, খাদে পড়ে যাবো—"

"আরে না, মা—"

অসহিষ্ণু গলায় চিৎকার করে উঠলো সেঙাই; "আমি নামবো, আমি নামবো।" তারপর বাসের পাটাতনের ওপর উদ্দাম নাচানাচি শুরু করে দিল।

বাসের মধ্যে সোরগোল তুমুল হয়ে উঠলো। সারুয়ামারু দু হাত দিয়ে সেঙাইকে নীচে বসিয়ে দিল। হয়তো আরো কিছু ঘটতে পারতো! কিন্তু তার আগেই বমি করে ফেললো সেঙাই। প্রচণ্ড উৎক্ষেপে চোখমুখ রক্তাভ হয়ে উঠলো তার। সারা দেহে আলোড়ন তুলে গোঙানি বেরুচ্ছে; "ওয়াক্-ওয়াক্-ওয়াক্—"

বাসের দোলায় মাথাটা নাগরদোলার মত বন্ বন্ পাক খেয়েছে সেঙাইর। কিনার থেকে একটা মণিপুরী মেয়ে মাথার ওপর ফু দিতে লাগলো তার। নির্বিরাম। অবিশ্রাম।

বাসটা পাক খেতে খেতে কোহিমার দিকে এগিয়ে চলেছে। সেঙাই বললো, "আনিজা, আনিজা! বস্তীতে ফিরে একটা টেবোয়া বলি দিতে হবে—"

(ক্রমশ)

হীরে-মুক্তো, চুনি-পান্না, সোনা-রূপা
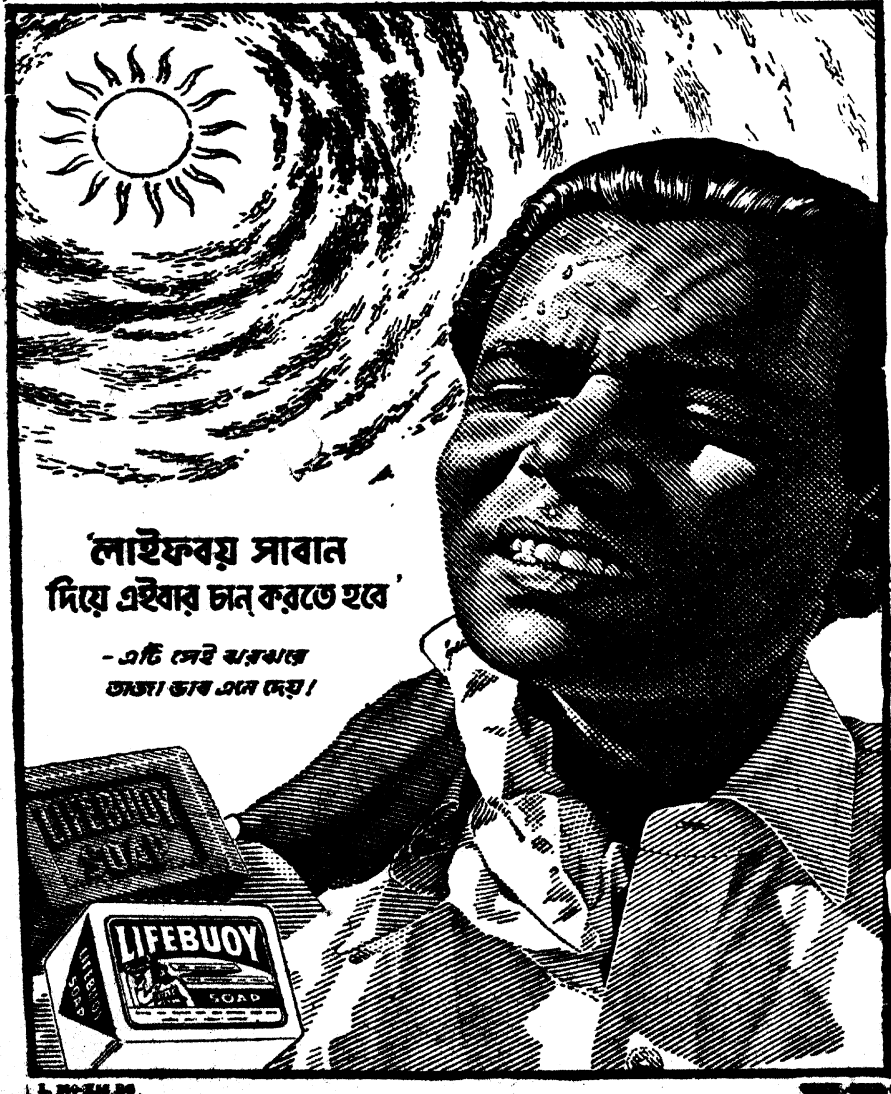
নাগরিক

একবার আগা খাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন জনৈক সাংবাদিক, পৃথিবীতে এমন কি কেউ আছেন কোথাও, যাকে হিংসা করেন আপনিও?

একটুও না ভেবে জবাব দিলেন আগা খাঁ করি। আর যাকে হিংসা করি তিনি অন্য কোনও দেশের লোক নন। লোক এই ভারতবর্ষেরই।

রিপোর্টারেরা অবাক। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। আগা খাঁ সমস্ত খোজা মুসলমান সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের শীর্ষে আছেন। সেই আয়ের পরিমাণ যে কত তা' কেউ জানে না পৃথিবীতে। তবু তিনিও হিংসা করেন আর কারও ধনদৌলতকে, অর্থকে! কে সেই ব্যক্তি?

জিজ্ঞাসা করলেন সেই সাংবাদিক অতি বিনীত কণ্ঠে, যদি আপত্তি না থাকে তো বলুন, কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি?

হায়দরাবাদের নিজাম। আগা খাঁ উত্তর দিলেন। এতে না বলার কি আছে! ওর একটা সুইমিং পুল আছে, তা আগাগোড়া বাছাই-করা হীরে আর মুক্তোখচিত। আমার নেই। বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন খাঁ সাহেব। অ্যান্ড সো জেলাস আই অ্যাম।

একটা হাসির রোল উঠল সাংবাদিকদের মধ্যে।

হীরে-জহরৎ নিয়ে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে একটা প্রাণ ছিল সেকালে। রাজা-মহারাজাদের নিজস্ব জহুরী থাকত। এক-জনে যে ফ্যাশনের শিরপেঁচ পরতেন, আর কেউ তার সন্ধানই পেতো না। মণিকারকে বলা থাকতো এ-ডিজাইন যেন সে কাউকে না দেয়। আর বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে-সব কাজের অধিকাংশই যেত এই বাঙলাদেশ থেকেই। আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়, এই কলকাতা থেকেই।

আরও একটা গল্প বলি। তখনকার আমলের বিরাট এক কোম্পানী খীমজী হংসরাজের মালিক জীবনদাস খীমজী অনেকগুলো পান্না বন্ধক রেখে টাকা দিচ্ছেন বল্লভদাস পারেখ বলে আর এক কোম্পানীকে। স্বভাবতই তিনি কলকাতার আরও কয়েকজন জহুরীকে ডেকেছেন পান্নাগুলোকে পরীক্ষা করবার জন্য। সবাই পরীক্ষা করে বলে গেলেন পান্নাগুলোর দাম হবে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। বন্ধকের কারবারের নিয়ম হোল যা দাম তার অর্ধেক বা কিছু কমবেশী টাকা দেওয়া। সুতরাং জীবনদাস খিমজী আশী হাজার টাকা দিতে রাজী হলেন বল্লভদাস পারেখকে। কথা-বার্তা সব ঠিক। নিমন্ত্রিত জহুরীরা বাড়ি চলে যাচ্ছেন এক এক করে। সেই নিমন্ত্রিত অতিথির দলে ছিলেন একজন বাঙালী মণিকারও। রাস্তায় ফিরছেন ঘোড়ার গাড়িতে। হঠাৎ তার মনে হল কয়েকদিন আগে তিনি 'জুয়েলার্স জার্নাল' কাগজে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলেন যে আসল পাথরের ওপর একটা কেমিক্যাল কোটিং দিয়ে তার জেল্লা বাড়িয়ে পাঁচশো টাকার পাথরকে ওদেশে পাঁচ হাজার টাকার পাথরের মতো করে দিচ্ছে কয়েকজন জুয়েলার। সংগে সংগে গাড়ি থামাতে বললেন তিনি। টেলি-ফোন করলেন খীমজী সাহেবের গদীতে। একটু দাঁড়ান। টাকা দেবেন না। আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে।

নেকলেশ—হীরে বসানো আছে প্রায় সর্বত্র। বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের একটি নমুনা

সন্দেহ! পারেখকে। আরে না না। ও কত বড় ব্যবসায়ী! খীমজীর জবাব এল টেলিফোনে।

বাঙালী মণিকার কিন্তু ছাড়বেন না। তবু দেখে নিতে দোষ কি খীমজী সাহেব। দাঁড়ান না পাঁচ-দশ মিনিট। আমি আসছি।

পান্নার প্যাকেটটা থেকে একটা পান্না হাতে করে তুলে ছুরি দিয়ে তার গায়ে একটা দাগ কেটে ধার থেকে একটু চাপ দিতেই এনামেলের কোটিংটা বেরিয়ে পড়ল। পান্নার জেল্লা হল ম্লান। বাঙালী মণি-কারের হল জয়জয়কার। এ-সব গল্প হলেও সত্যি। সে-শিল্পী আজও বেঁচে রয়েছেন। তার নাম তুলসীচরণ আঢ্য।

ইংরেজ কোম্পানী হ্যামিল্টন, জোসেফসন, প্যারী কি শেঠ বদ্রীদাস, লীলারাম বা বুসেকের দোকানই কলকাতার কয়েকটি মাত্র পুরোনো দোকান নয়। বাঙালীরাও সেদিন কারবারে পেছিয়ে থাকেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের নাম আজকাল আর কেউ মনে করে রাখেন না। চাষাধোপাপাড়ার দোলগোবিন্দ রায়েদের কি কম কারবার ছিল! এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও এদের কারবার ছিল কলকাতায়। কিন্তু আজ তার নাম জানেন ক'জন!

বি সরকার, হরিচরণ আঢ্য, বিনোদবিহারী দত্ত প্রভৃতির কারবার এখনও রয়েছে কল-কাতায়। তবে বি সরকারের আদি দোকানটি কিছুদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। তার পুত্র সি সরকার, পৌত্র এম বি সরকার ইত্যাদিরা কাজ করছেন এখনও। হরিচরণ আঢ্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুলসীচরণ আঢ্যেরও কারবার রয়েছে এখনও।

গল্পই বলি আবার। আর একটা। পুরোনো আমলের সব কথাই যেন গল্পের মতো। নাম বলব না। কলকাতার এক পুরোনো রাজবাড়ির বড়কর্তা একবার ডাকালেন এক বাঙালী মণিকারকে। বাড়িতে নিজের ঘরে বসিয়ে দামী কয়েকটা হীরে বার করে দিয়ে বললেন, স্বদেশী আমল। চাই না আর হ্যামিলটন কি প্যারী কোম্পানীর বাড়ি যেতে। আপনি পরেবেন
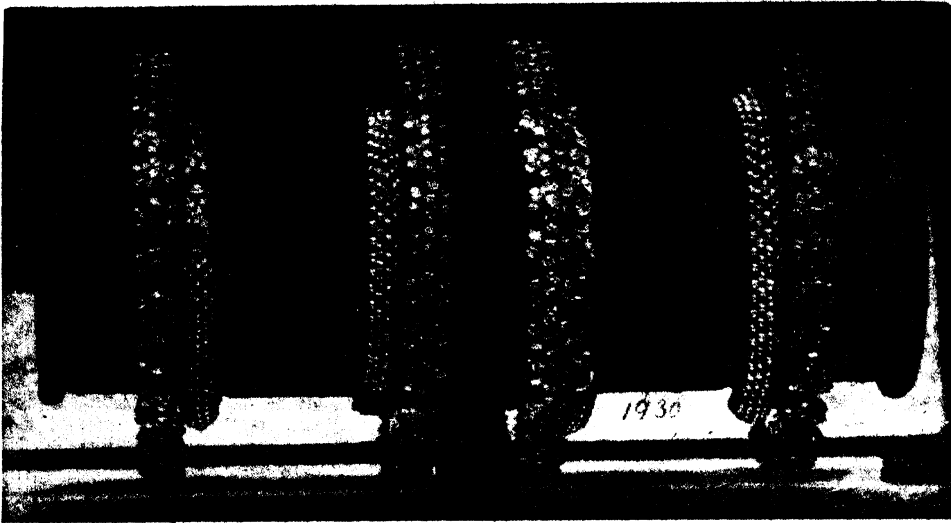
বাজুবী—মাড়োয়ারীর দেশে এর প্রচলন বেশী। বাঙলাতেও আগে চলতো খুব। বালার মতোই অনেকটা দেখতে। এতেও মূল্যবান পাথর বসানো

না এ-কাজ? কেন পারব না। জবাব দিলেন মণিকার। কিন্তু সময় লাগবে দু' মাস। আর মজুরী হাজার টাকা থেকে বারশো টাকার মত। বলেন কি! এত টাকা মজুরী? আচ্ছা ভেবে দেখি। বলে বিদায় দিলেন তিনি মণিকারকে। দিন পাঁচেক বাদে, আমাকে বলছিলেন সেই মণিকার, প্যারী কোম্পানীর মেমসাহেব ডাকলেন আমাকে টেলিফোনে। খুব বড় একটা পার্টি এসেছে। নাম জানতে চাইলাম। শুনে বুঝলাম, তিনি সেই ভদ্রলোক। কাজটা এল আমার কাছেই। প্যারী কোম্পানী তার মজুরী নিলেন দু' হাজার সাতশো টাকা। দু' হাজার টাকা দিলেন আমাকে। আর সেই আমারই তৈরি করা জিনিসের মধ্যে মোহর বসানো প্যারী কোম্পানী। কিন্তু পাথরগুলোর নীচে আমাদের কোম্পানীর নাম আজও খোদাই করা আছে। বলে কথা শেষ করলেন ভদ্রলোক।

এই রকমই ছিল সেকাল। হ্যামিলটন কি জেফারসন ভাল ভাল কাজ করেছে। সুনাম অর্জন করেছে অনেক। কিন্তু তাদের সেই সুনামের আড়ালে আছেন বাঙলার কারিগর।

কয়েকটা নাম আমি সংগ্রহ করেছি। শ্যামচন্দ্র কর্মকার (হ্যামিলটনের বাড়ির কারিগর), নারায়ণচন্দ্র কর্মকার (হ্যামিলটন), জহরচন্দ্র রায় (হ্যামিলটন), ব্রজনাথ দত্ত (রায় বদ্রীদাস), চণ্ডীচরণ (জোসেফসন), হাওড়ার মণিলাল দাস (জোসেফসন), গোষ্ঠবিহারী প্রভৃতি ছিলেন সেকালের বড় বড় শিল্পী। এ'দের হাতেই তৈরি হয়েছে কত অসামান্য কাজ!

এই তো গেল হীরে-মুক্তো, চুনি-পান্নার কথা। দামী দামী পাথরের বৃত্তান্ত। সাধারণভাবে সোনারুপোর ব্যবসার কথা কিছু বলি।

সোনারুপোর ব্যবসাও কলকাতায় অনেকদিনের। বেশির ভাগ দোকানই বৌবাজারে, হ্যারি ঘোষ স্ট্রীটে। কিছু কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেও। উত্তর কি দক্ষিণ কলকাতাতেও দোকানের অভাব নেই। এ-যাবৎ ব্যবসা চলে এসেছে ঘরে ঘরে ঘুরে। শো-রুম করে ব্যবসা করার পদ্ধতি আরম্ভ হয়েছে হালে। বৌবাজারে তো প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দু' তিন হাজার টাকার গ্লাস কিনতে হয়েছে ফ্যাশনের সঙ্গে তাল বজায় রাখতে গিয়ে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেও। অপেক্ষাকৃত ফ্যাশনেবল্ পাড়ায় বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতাতেও সাজিয়ে-গুছিয়ে দোকানে করতে হয়েছে অনেককে। লোহার
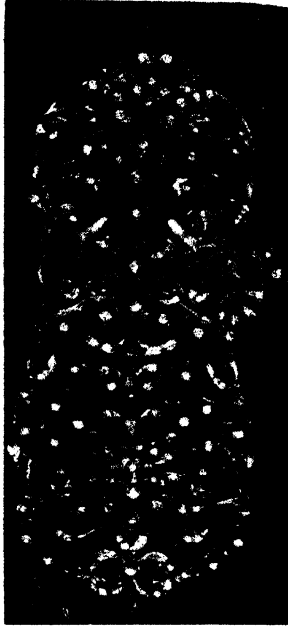
ঠাকুরের কানের গয়না—এর রেওয়াজ আগে ছিল খুবই। এখন কমে আসছে। ঠাকুরের কান সবটা ঢাকা থাকে এতে। মণি-মুক্তো খচিত

গয়নাদের মধ্যে নিক্তি আর সিন্দুক নিয়ে বসে কারবার করবার দিন গত।

সিন্দুকের কথায় মনে পড়ল। অনেক-কাল আগের শোনা এক গল্প। তখনকার এক বিশেষ ধনী কারবারীর কথা। যে কোনও জিনিস খরিদ্দারকে দেবার আগে একবার পাশে রাখা বহু পুরাতন সিন্দুকটা ছুঁইয়ে নিতেন তিনি। কখনো ভুল হতো না। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আর একজন ব্যবসায়ী, সিন্দুকটার গায়ে সবকিছু ছুঁইয়ে নেন কেন আপনি? কেন নিই, জবাব দিলেন তিনি, এর একটা ইতিহাস আছে। একবার অনেককাল আগে একজন খরিদ্দার সাতভরির একটা তাগা করতে দিল আমাকে। মাল ডেলিভারী দেবার পর তিনি বললেন, এতে সাতভরির কম সোনা আছে। তামার তারের গায়ে তখন সোনা সাঁটা হয়ে গেছে। কি করা যায়! আমি নিজে জানি যে ওতে সোনা কম তো নেই-ই, বরং কিছু বেশী আছে। আমরা ভরি প্রতি একপাই-দেড়পাই সোনা বেশী নিয়েই কাজ আরম্ভ করি। খরিদ্দারও মস্ত ব্যবসায়ী। ফাটকা হোল। মিণ্ট থেকে আনা হবে একজন বিশেষজ্ঞ ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে। আগে ভিজিট দিলে মিণ্ট থেকে এক্সপার্ট পাওয়া যেত। কোনও ওজন বা সোনারূপো কি দামী পাথরের মূল্য নিরূপণ করতেন তিনি। তিনি এই তাগার সোনা গালাবেন। যদি সোনা কম হয়, তো আপনার গদীর এই সিন্দুকের মধ্যে যত টাকা, গয়না কি কোম্পানীর কাগজ আছে, তার দাম দেব আমি। যদি সোনা কম না হয়ে বেশী হয় তো সিন্দুক হবে আমার। জিত হল আমারই। আর সেই ফাটকার জেতা হল এই সিন্দুক।

আর আজকাল! বৌবাজারের কোন কোন দোকানে টাকায় চার আনা খাদ দেওয়া হচ্ছে এমন কথাও শুনলাম বাজারে।

সেই ব্যবসা কোথায় গেল যে!

সেল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স বসে গেছে এ-ব্যবসাতেও। আয় কিন্তু কমছে ক্রমেই। রাজা-মহারাজা, বড় বড় জমিদারের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমেই যাচ্ছে কমে। মণি-মুক্তোর গয়না গড়াবে আর কে বলুন? ধনী ব্যবসায়ী গাড়ি বদলাচ্ছেন বছর বছর, বাড়ি বদলাচ্ছেন গাড়িয়াহাটা থেকে ম্যাণ্ডেভীল গার্ডেনসে কি বালিগঞ্জ পার্ক রোডের অধিকতর অ্যারিস্টোক্র্যাট পাড়ায়, কিন্তু এ-সবের দিকে তাদের নজর কদাচিৎ পড়ে।

প্রায় লক্ষাধিক লোক এ-ব্যবসায়ে নানা-ভাবে লিপ্ত রয়েছে। একমাত্র বাঙলাদেশের কথাই বলছি। বৌবাজার, হরি ঘোষ স্ট্রীটের পাড়ায় দেখলাম এর মধ্যেই অনেকে অন্য ব্যবসার কথা ভাবছেন।

মেশিনপত্র কি উন্নততর কেমিক্যালস্ ব্যবহার করে এ-ব্যবসার উন্নতি করবার চেষ্টা করা এখুনি দরকার। এদের মধ্যে যাদের সঞ্চয় কিছু কম তারা আজও হাতেই ডাইস (ছাঁচ) বানাচ্ছে স্টীল খুদে খুদে।

জেফারসনের দোকানে কাজ করতেন, এমন একজন আশী বছরের বৃদ্ধ কারিগরকে দেখেছি গহনার পাড়ায় ভিক্ষে করে বেড়াতে। সামান্য দু' আনা, চার আনা সংগ্রহ করে কোনও মতে কষ্টে দিনযাপন করেন তিনি। চোখে দেখতে পান না ভাল। লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে পথ চলেন। তাকে দেখে আমার অনেককাল আগের শোনা দুটো কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল, পিটে গড়ে মীনা করে, উসকা পরিবার ভুখা মরে। কর্মকার, পটুয়া আর স্বর্ণকার না খেয়েই মারা যায় প্রায়ই।

বৈচিত্র্যে 'বি' এবং 'কে'

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ভাষার গর্বে ইংরাজ গর্বিত। তাদেরও পাতাজোড়া নাম আছে। কিন্তু বিদেশীর বড় নাম দেখলেই তারা ঘাবড়ে যায়। ভাবে ,উচ্চারণ করতে হলে বুঝিবা দাঁত ভেঙে যাবে। ছোট নাম হলে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করে, শেষপর্যন্ত নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়। এরা 'গ্যানডি' বা 'নে-রু'কে ,কোনরকমে আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু রাশিয়ার বড় বড় নাম কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। তার ওপর আছে খবরের কাগজওয়ালাদের জায়গা নিয়ে মারামারি; ঠাঁই নাই একথাটা যেন তাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দুটি নতুন নাম রচনা হল—'বি' এবং 'কে'।

ঠিক সেই সময় বিলেতের কাগজে হৈ হৈ চলেছে বাজেট ও চিত্রতারকা কেলির বিয়ে নিয়ে। লোকে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। গ্রেস কেলিও আমেরিকার মেয়ে, তাকে বিয়ে করছে মনাকোর রাজকুমার; তার সঙ্গে বিলেতের বাজেটের যোগাযোগ কোথায়?

আরও দু'লাইন পড়ে লোকে আশ্বস্ত হয় বি এবং কে আর কেউ নয়, স্বয়ং বুলগানিন এবং খ্রুশ্চেভ। বিলেত সফরে তাঁদের নতুন এই নামকরণ হল। এই প্রসঙ্গে নানান ভাবনা এসে জড়ো হয়। সার ইডেন ও মিঃ ম্যাকমিলান যদি রাশিয়া সফরে যান, সেখানকার লোকে যদি তাঁদের সার 'ই' এবং মিস্টার 'এম' বলে সম্বোধন করে তাঁরা নিশ্চয় তা উপভোগ করবেন। চার্চিল, আইসেনহাওয়ার এবং ডালেস যদি একই সময় ভারতের মাটিতে পা দেন, এবং আমরা তাঁদের সি-আই-ডি বলে সম্বোধন করি, তাহলেও ভুল বোঝাবুঝির কিছু থাকে না। কিন্তু ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মাঁশিয়ে মলে, নবীন চীনের মাও এবং কূটনীতিবিশারদ মলোটভ যদি একই দিনে বিলেতে এসে হাজির হন, তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে! সাংবাদিকদের সমস্যা বটে!

উপক্রমণিকায় আরও একটা বিষয় জুড়ে দেই। হাসিটা তরলতা দোষে দুষ্ট কিনা জানি না, তবে আমাদের দেশেও দেখা যায়, হাসির সঙ্গে হোমরা-চোমরা লোকের সম্পর্ক আদায় এবং কাঁচকলায়। লন্ডনের আবভাব দেখে মনে হয় গোমড়ামুখো হয়ে থাকার একচেটে অধিকার অভিজাত ইংরেজদেরই। ও-গুণটা বিলেত থেকেই ভারতে রপ্তানি। বিলেতে অভিজাত হবার প্রথম পাঠ, আষাঢ়ে মেঘের মত মুখ করে থাকতে শেখা।

বুলগানিন এবং খ্রুশ্চেভ কেমন হবে কে জানে? চার্চিল-চেম্বারলেনের দোসর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সাংবাদিকদের সহায়তায় যেটুকু খবর এলো, তাতে মনে হলো তাঁরা তেমন বেরসিক নন। হয়তবা ঠিক তার উল্টো—হাসি লেগেই আছে মুখে, দুটো কথার সঙ্গে একটা হাসির কথা বলেন। রাশিয়ার লোক নাকি অমনই হয়।

এইত কয়েকদিন আগে রাশিয়ার এক মহারথী, ম্যালেনকভ বেড়িয়ে গেলেন বিলেত। এসেছিলেন পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের নেতা হয়ে। হাসি এবং প্রাণখোলা ব্যবহারে সবার মন জয় করলেন। মনে পড়ে, লিফটে উঠতে যাবেন হঠাৎ কোলাপসিবল দরজাটা ধরে নেড়ে দেখলেন। পরমুহূর্তে হাসিমুখে বললেন, এদেশেও লোহ-যবনিকা আছে; আমরা কিন্তু অনেকদিন তুলে দিয়েছি। আরও মনে পড়ে এক হোটেল দেখতে গিয়েছেন, তন্বী যুবতী ওয়েট্রেস চুম্বন করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে। ইংরেজদের মনে খুব ফুর্তি, বুঝিবা হতবুদ্ধি হয়ে গেল বুদ্ধিমন্ত বৈজ্ঞানিক এবং বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ। কিন্তু আশ্চর্য, ম্যালেনকভের মুখে আগের মতই হাসি, উত্তেজনার আভাসও নেই, যেন মাথায় হাত দিয়ে মেয়েটিকে আশীর্বাদ করলেন। কিছুদূর গিয়ে রুমাল বার করলেন, যেন কি করছেন খেয়ালই নেই, এমনিভাবে মুছে ফেললেন লিপস্টিকের রঙ।

বিদায় নেবার আগে ম্যালেনকভকে ঘেরাও করল সাংবাদিকের দল। প্রশ্নবানের উত্তরে ইংলন্ডের মেয়েরা ভালো সে কথাও তিনি বললেন। তখন প্রশ্ন—কোন ইংরাজ মহিলার সঙ্গে প্রেম করেছেন কিনা?

হেসে জবাব দেন ম্যালেনকভ—দোভাষীর সাহায্যে আর যাই করা যাক, প্রেম করা চলে না।

কিন্তু বুলগানিন এবং খ্রুশ্চেভ বিলেতে পা দিয়ে হাসবার কথা ভুলে যান। কেনই বা হবে না। তাঁরা নামলেন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে, ইডেন করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানালেন। স্টেশনের বাইরে একটা মেয়ে হাতে মাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল, অমনি বলে উঠল—'ইডেন হত্যাকারীর সঙ্গে করমর্দন করেছে।' পরে অভদ্র আচরণের জন্য বিচারের সময় মেয়েটি জানায়, 'না, আমি ওকথা বলিনি, আমি বলেছিলাম, "Eden has shaken hands with murder."

তার অর্থ যাই হোক, সে সময় হর্ষধ্বনি যে হয়নি বলা যায় না। তবে আনন্দিত হবার লোকের সংখ্যাকে বলা যায় মাইক্রসকোপিক মাইনরিটি। অধিকাংশ দর্শকই উৎকর্ষ দেখিয়েছে নবতম প্রকাশ ভঙ্গিমায়। বহু লোক দাঁড়িয়েছিল পোস্টার উঁচু করে। কোনটায় লেখা ছিল—"End Terror, Ukraine", কোনটায় বা "Disband Slave Camps"। একটা পোস্টারে লেখা ছিল "God is love", তার মানে উদ্ধার করার আগেই যা দেখতে পেলাম তা আরও মজার। তাতে লেখা "We want Grace"। বলা বাহুল্য, Grace হলেন গ্রেস কেলি।

তবু হাস্যরসের অবতারণা হলো। তবে পতনেই রসের পতন। তাতে যে রংগ লোকে উপভোগ করলে তাকে হাসি না

লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী (বামে) কর্তৃক 'বি' ও 'কে'-কে (ডাইনে) অভ্যর্থনা

বলে হাসির ফাঁসি বলা যায়। সেইদিনই বিকেলে রাশিয়ার দল শহর ঘুরতে বেরোলেন। ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি দেখে গেলেন 'রয়াল ফেস্টিভাল হলে'। হলের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার টি ই বেন ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। আরও বোঝালেন, হলটা এমনিভাবে তৈরী যে, সংগীতের সংগে সংগে সেও সুরের লহর তোলে। শেষে মন্তব্য করেন—কিন্তু তিন হাজার রাশিয়ান যদি ভেড়ার লোমের কোট এবং টুপি পরে এই হলে গান শুনতে হাজির হয়, এর শব্দ-তরংগ তোলার ক্ষমতা আর থাকবে না।

বুলগানিন গম্ভীর হয়ে গেলেন কথা শুনে। খ্রুশ্চেভ দাঁত কড়মড় করে উঠলেন। রাশিয়ায় ফারকোট পরে কেউ সংগীতকলা উপভোগ করতে যায় না। আমরা ভাল্লুক নই। তুমি যখন মস্কোয় বেড়াতে যাবে, রাস্তায় ভাল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাবে, অমনটি আশা কর না। তবে তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রাস্তায় হাজির করতে পারি।

সেখান থেকে দলবল গেলেন "রয়াল রিসেপশন রুমে" খ্রুশ্চেভ পকেট থেকে কলম বার করলেন, দর্শকদের খাতায় নাম সই করবেন। সুন্দর দেখতে কলমটা, সুন্দর-ভাবে ধরলেন লিখতে। হায় কালি, তুমি বুঝি দেশের মুখে কালি দিলে! কলমে কালি নেই। তিনি হেসে বললেন, ভেবো না আমরা এমন খারাপ কলম তৈরি করি। এটা আমেরিকার তৈরি কলম। সত্যিই সেটা আমেরিকারই দান।

অক্সফোর্ডের এক নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে তাঁদের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে। এখান-কার ছাত্ররা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। বুলগানিন ও খ্রুশ্চেভ সদলবলে হাজির হলেন। দরজা পেরোতে না পেরোতেই বজ্রনিনাদে একটা বোমা ফাটল। সবাই বিব্রত। প্রতিরক্ষিদল ছুটে এলো সেখানে। আসলে সেটা বোমা নয়, বাজি। বুলগানিন মন্তব্য করলেন, ওরা যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট তা কাজেই প্রমাণ করল। সংগের সাথী সেল্উইন লয়েড, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, হেসে বললেন—"এই আমাদের এটম বম।" বুলগানিন তেমনি রসিকতার সুরে উত্তর দিলেন—"তবে বড় ছোট!"

ছাত্ররা অপরিণত বয়স্ক হলে কি হবে, কৃতিত্ব দেখানয় কম যায়নি। অতিথিরা কলেজে পা দিতে না দিতেই সমস্বরে সংগীত সাধনা শুরু করে—"Poor old Joe"! বেচারা "জো" হলেন মার্শাল স্ট্যালিন। আরও পোস্টার ছিল—"Stalin is Proff", "Big brothers is watching you"। বলা বাহুল্য সবগুলোই লেনিনকে স্মরণ করে অতিথিদের উদ্দেশ্যে তীর ছোড়া।

ভারতের অভিবাদন প্রথা বুলগানিন ভোলেন নাই—লণ্ডনে কোন ভারতীয়কে তিনি এইভাবেই অভিবাদন জানান

সবার সেরা গোল বাধল সোস্যালিস্ট নেতাদের সংগে সান্ধ্য ভোজনের টেবিলে। হাসি খুসি নিয়ে সবাই যোগ দিলেন। বিরোধী পক্ষের নেতা গেটস্কেল, বিভান, ব্রাউন জোরে জোরে করমর্দন করলেন, পরিচিত হয়ে ধন্য হলেন। কিছু সময় না যেতেই হাসির বদলে কাশি শুরু করলেন, সোস্যালিস্টরা। তাঁদের সেই কাশিতে কিছু সজারু-কাঁটাও ছিল। খোঁচা খেয়ে খ্রুশ্চেভ ইতিহাসের পাতা উল্টে ইংরেজের স্বরূপ তুলে ধরলেন। মনে হল, এই বুঝি হাত থাকতে মুখে কেন-তে পরিণত হয়—হাউস-অব্-কমনস-এর ঘর "থিয়েটার অব্ ব্যাটল" হয়ে দাঁড়ায়! হায়, "হ্যান্ডশেক" করে যে-ভোজনের শুরু "ফিস্ট-শোকে" তার সমাপ্তি!

পরে খ্রুশ্চেভ মন্তব্য করেন, সোস্যালিস্ট পার্টির সংগে আলাপ আলোচনা চালানোর চেয়ে টোরি পার্টির সঙ্গে চালান সহজ। "আমি যদি ইংলণ্ডে জন্ম নিতাম, টোরি পার্টির সভ্য হতে চাইতাম।"

রাশিয়ার নেতারা দশ দিন ধরে ইংলণ্ডে ঘুরলেন, ফিরলেন, দেখে শুনে বেড়ালেন। অনেকের সংগে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করলেন, ঘন ঘন বৈঠকে বসলেন ইডেন এবং তাঁর দলবলের সংগে। ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। তাঁরা ইডেনকে রাশিয়া বেড়াবার আমন্ত্রণ জানালেন এবং ইডেনও তা গ্রহণ করলেন। হয়ত তিনি আগামী বছর বসন্তকালে রাশিয়া সফরে যাবেন। এবার এলো বিদায় দেবার পালা।

এ'কদিনের ঘটনাবলী পর পর মনে পড়ে। প্রথম দিনের কথা। ভিক্টোরিয়া স্টেশন। রাশিয়ার রথী মহারথীরা যেখানে নামবেন তার কাছেই ছিল সাংবাদিকরা। সাধারণ লোক কাছে পিঠে আসতে পারে নি। তাই বলে স্টেশনের বাইরেও তেমন ভিড় হয়নি। হাজার খানেক লোক হবে। তারাও সকলে আন্তরিকতা দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতে আসেনি। বরং ইচ্ছে ছিল দুটো জুতসই কথা বলে নেবে, একটু খিস্ দেবে কিংবা সবার গলায় গলা মিলিয়ে বলবে "Go Back"; সুযোগ হলে দু-চারটে বড় বড় ছড়াও শুনিয়ে ছাড়বে।

আরও মনে পড়ে ট্রেন থেকে নামতেই ইডেন স্বাগত জানালেন। ছোট্ট ভাষণও দিলেন। রাশিয়ার নেতারা হয়ত এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে হয়। বুলগানিন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল। পকেট হাতড়াতে লাগলেন এক টুকরো লেখা বক্তৃতার জন্যে। খুঁজে পাচ্ছেন না, বোধ হয় হারিয়ে গেছে। ইংরাজ সাংবাদিকরা হাসাহাসি করতে থাকে। কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল, দুটো কথা বলার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু তখনই ছোট্ট সম্ভাষণের উত্তরে ঠিক তেমনি ছোট্ট এবং সংযত উত্তর দিলেন বুলগানিন।

পরে রাশিয়ান এমব্যাসি স্যার ইডেনকে সান্ধ্যভোজনে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে রাশিয়ার নেতাদের বক্তৃতা শুনে ইংরাজরা চমকে উঠল। মিষ্টিমাখানো স্তুতিবাক্য নেই, শ্লেষ নেই, গালিগালাজ নেই। সত্যি কথার সহজ প্রকাশ। খোলা মন নিয়ে এসেছি সদ্ভাব করতে—সংযোগ স্থাপন করতে—ব্যবসার লেনদেন করতে। তোমাদের কম্যুনিস্ট করার স্বপ্ন আমরা দেখি না, ধনতন্ত্রবাদে আমাদের ঢালাই করতে পারবে, এ-কথা ভাবা তোমাদের পক্ষে বাতুলতা। ও-সব চিন্তা ছেড়ে, এস, দুজনে দুই মত নিয়ে বন্ধুভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করি।

লর্ড বিভারব্রুকের কাগজ "ডেলি এক্সপ্রেস" পরের দিন অমনি মন্তব্য করলে, এমন বক্তৃতা ইংরেজ ছাড়া অন্য কারও মগজ থেকে বেরোতে পারে না। ম্যাকলীন ও বার্জেস এখানকার বৈদেশিক দপ্তরে কাজ করতেন। বর্তমানে রাশিয়ান সরকারের আশ্রয়ে আছেন, নিশ্চয় তাঁরা লিখে দিয়েছেন। উদারপন্থী "নিউস ক্রনিকাল" মন্তব্য করলে, বুলগানিন এবং খ্রুশ্চেভকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোম্যাট বলা যায়।

ইংরাজরা দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ল, হ্যারোর বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে খুরচাজোভএর কথা শুনে। বৈজ্ঞানিক খুরচাজোভ এসেছেন রাশিয়ান দলের একজন সভ্য হয়ে। এদেশের সেরা বৈজ্ঞানিকরা আণবিক শক্তির যে ফলাফল এখনো কল্পনাও করতে পারে নি, তারা তা বাস্তবে পরিণত করেছে। এমন কি ঢাকাঢাকি নেই। সমস্ত ফর্মুলা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, কোন পদ্ধতিতে করতে হবে জানিয়ে দিচ্ছেন। বিনামূল্যে জ্ঞানদান। তাই ভাঙিয়ে ইংরাজরা বহুদিন গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে।

প্রেস কনফারেন্সের দিন পেছান হচ্ছে। ইংরাজরা মুখে বলতে লাগল, ভয় পেয়ে গেছেন রাশিয়ার মহারথীরা, ইংরাজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবার ভরসা পাচ্ছেন না। শেষ মুহূর্তে হয়ত তা-না না-না করে সারবে কিম্বা সময় নেই বা অসুস্থ এই অজুহাতে তাও করবে না। ঠিক বিদায় নেবার আগের মুহূর্তে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন 'বি' এবং 'কে'। শুধু ইংরাজ নয়, সারা বিশ্বের সাংবাদিক ছিল সেখানে। সে অনুষ্ঠানে 'বি' ও 'কে' বীরদর্পে সাংবাদিকদের ধরাশায়ী করলেন না ঠিক, তবে তাদের হৃদয় জয় করলেন।

এই অনুষ্ঠানে পূর্ব-পশ্চিমে ব্যবসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁরা বললেন, বৃটেন নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে খুব সজাগ। তবু তারা বাস্তববাদী এবং তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি আছে। সুতরাং দুদিন আগে বা পরে নিজেদের পদমর্যাদা বজায় রেখে কি করে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগসূত্র খোলা যায়, তা তারা ঠিক বার করবে।

তাঁরা আমেরিকা সফর করতে ইচ্ছুক কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে জানান, রাশিয়ার একদল পাচক আমেরিকা বেড়াবার নিমন্ত্রণ পায়; কিন্তু সেখানকার সরকার তাদের আমেরিকা যাবার অনুমতি দেন নি। হয়ত তাঁদের ধারণা রাশিয়ার পাচক নিশ্চয় কাটলেট ছাড়া অন্য কিছু রাঁধে। আর আমাদের প্রসঙ্গে বলতে পারি, কোন ব্যবসায়ী ব্যবসার সুবিধে হবে জানলে সেখানে যেতে পিছপা নয়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—গ্রোমিকো ত ওই কথা ভেবে চুল পাকিয়ে ফেলল। পাশেই বসেছিলেন রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী গ্রোমিকো। সাংবাদিকরা চেঁচিয়ে উঠলেন—মিথ্যে কথা, ওঁর চুল ত কুচকুচে কালো।

খ্রুশ্চেভ হেসে বললেন—আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করছি, এই ধাক্কায় ওর চুল পেকে যাবে।

সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলেন—রাশিয়ায় স্বল্প কয়েক হাতে অসীম ক্ষমতা, একটা বিশ্বের পক্ষেও ক্ষতিকর নয় কি?

প্রশ্ন শুনেই হল ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। তারপর উত্তর এল—সম্প্রতি জন-গণনা হয়নি, তবে ধরা যায় ২০ কোটি লোক আছে রাশিয়ায়, অর্থাৎ ৪০ কোটি হাত। হয়ত সংখ্যা বেড়ে ৩০ কোটিতে দাঁড়াবে, তাহলে হাতের সংখ্যা হবে ৬০ কোটি—তাদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা।

সবার শেষে এক প্রশ্নোত্তরে বুলগানিন বলেন—ইংলণ্ড ভ্রমণ এবং সেখানকার লোকের সঙ্গে আলোচনার ফলে সদ্-অবস্থানের সম্ভাবনা আগের থেকে বেশী হয়েছে এবং ক্রমে এর আরও উন্নতি হবে।

তারপর পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বার করলেন। কাঁটার দিকে লক্ষ্য করেই দোভাষীকে চুপিসারে জানিয়ে দিলেন সময় নেই, এবার উঠতে হয়।

পোর্টসমাউথে তাঁদের জাহাজ 'অর-জনীকীডজে' অপেক্ষা করছে। খুব বেশী লোক নেই। হাজারখানেক হবে। পুলিসের পাহারা গেছে শিথিল হয়ে। কারও মুখে ঠাট্টা নেই, কেউ বলছে না ফিরে যাও, কেউ একটা অশ্রদ্ধার কথা বলছে না। বরং মনে হল, সবার মন বেদনায় ব্যথাতুর। বিদায় দিতে মন সরছে না।

সরকারের পক্ষ থেকে বিদায় দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী সেলউইন লয়েড। বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার পর তিনি বললেন—তোমাদের বিদায় দিতে সত্যি বেদনা বোধ করছি।

জাহাজ ছাড়ার সময় বুলগানিন এবং খ্রুশ্চেভ হাত তুলে বিদায় চাইলেন এবং জানালেন—আমাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে বটে, তবে অন্তরে আমরা আজ ঘনিষ্ঠ।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশেও ঐ বিপদের আশঙ্কা আছে। ইনকাম ট্যাক্সের কত যে ফাঁকি চলছে এখানে তা কহতব্য নয়। একজন বললেন, প্রতি বৎসর একশ কোটির কম নয়। তাঁর বলবার অধিকার আছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য পরের কাছে হাত না পেতে দেশের মধ্যেই একটু কড়াকড়ি করলেই তো হয়! যখন শুনি অমুকের কাছে অত লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স হিসেবে পাওনা এবং সরকার তার অর্ধেক নিতে রাজি হয়েছেন—সমঝোতা হয়েছে, তখন মনে হয় গরীব অধ্যাপক না হয়ে বড়লোক ব্যবসাদার হলেই পারতাম। যুদ্ধের সময় দেখেছি যে, বড়লোক হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

আমার বদ্ধ ধারণা দেশে যথেষ্ট অর্থ আছে। রাজা-রাজোয়াড়ার, মেয়েদের, মোহন্তদের কাছে বিস্তর সোনা রুপো হীরে জহরৎ আছে। ইনকাম ট্যাক্সে ভীষণ ছেঁদা রয়েছে। বণিক সম্প্রদায় সেলস্ ট্যাক্সে খুবই ফাঁকি দেন, ক্রেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। রাষ্ট্র যে সর্বসাধারণের এটা আমরা এখনও বুঝিনি। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া বাহাদুরী ভাবি। ফরাসীরাও রাষ্ট্রকে আপন ভাবে না। পুলিসকে আমরা এখনও শত্রু ভাবি—ফরাসীরাও তাই ভাবে।

পার্লামেণ্টারী ডিমক্রাসী ফরাসীদের কাছে, আমাদেরও কাছে বিদেশী সামগ্রী। ফ্রান্সে ফিনান্স ক্যাপিটালের প্রভাব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালের চেয়ে বেশি। নিচে ছোটখাট বণিক আর চাষী। প্রথম অবস্থাটি আমাদের নয়। কিন্তু এক জায়গায় মিল আছে, সেটা ব্যুরোক্রাসীর ক্ষমতায়। ফ্রান্সের সব প্ল্যানের তলা ফুটো করে দেন ও'রা, আর ডোবান ফিনান্সিয়াররা। আমাদের প্ল্যান যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্ল্যানে ঘোরতর অবিশ্বাসী। আমেরিকায় রুজভেল্টের নিউডীল কর্মচারীদের হাতেই খতম হয়, পিছনে থাকতেন ওয়াল স্ট্রীটের ফিনান্সিয়ার। অথচ রুজভেল্ট দেশের বাছা বাছা লোক নিজের চারপাশে জুটিয়েছিলেন। প্রশান্তবাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একত্র করলেন, প্ল্যান-ফ্রেম তৈরি হল—কিন্তু, কিন্তু হুঁকো নলচে গেল বদলে, রইল কেবল কল্কেটি। খাশা বন্দোবস্ত! পণ্ডিতজী কি বলবেন জানি—আস্তে আস্তে এগুতে হবে, সকলকে নিয়ে, দেখা যাক কি হয়, In the ultimate analysis তাই হবে, আপাতত খেটে যাও, We are doomed to hard labour!

৭।৪।৫৬

কাল 'ভাইভা' পরীক্ষা নিলাম। এরা কীনস্ না পড়ে ডিলার্ড পড়ে, সরকারি রিপোর্টের বদলে বাজারের সস্তা টেক্সট বই ঘাঁটে; দুরকম মাল্টিপ্লায়ারের পার্থক্য জানে, কিন্তু কোন অবস্থায় কোন্‌টা খাটে, তাদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা কি, এদেশে সেগুলি সচল না অচল কিছুই জানে না। তিনটি dissertation, কিন্তু মন্দ নয়—একটার বিষয় ছোট শহরের সোনা-রুপোর কারবার, দ্বিতীয়টির আলিগড়ের কাঁচা ও পাকা আড়তের লেনদেন, আর তৃতীয়টির এই শহরের ঘরবাড়ির সমস্যা। এই ধরনের বাস্তব গবেষণার সাহায্যে যদি কিছু ইকনমিকস্ তৈরী হয়। থিওরী শিকেয় তুলে রাখতে হবে না, মাত্র বাস্তব জগতের ওপর আপাতত বেশ দিনকয়েক জোর দিতে হবে, তবে যদি কিছু হয়।

* * *

শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ যদি আমার হয়ে লেখে, তবে যে কটা কথা খাপছা খাপছা মনে আসছে, সেগুলো অক্ষরে ধরা পড়ে।

(১) পাপ মানতে গেলেই ভগবান মানতে হয় এবং সে ভগবান দুমুখো। (২) দুমুখো ভগবান নিতান্ত পলিটিক্যাল জীব। (৩) আপত্তিটাই বা কি? এযুগের ভগবান ন্যাশনাল নিশ্চয়, কিন্তু ইখ্‌নাটনের মোনোথিয়ীজম্‌ও ত' ইম্পিরিয়াল ছিল! (৩) ভগবান মানব না, পাপ স্বীকার করব, অনন্ত মানব না ক্ষণ মানব, সংসার দুঃখময় মানব না কষ্ট পাব, নিয়ম মানব না পরিবর্তন চাইব, ন্যাচরল ল' মানব না অথচ স্টোইক হব, বিশ্বসত্তা নেই আত্মসত্তা আছে, আত্মা নেই আত্মীয় খুঁজব,—এই হলো আধুনিক মনের দ্বন্দ্ব। বিভক্ত মন নিয়ে মানবিক ঐক্যসাধন অসম্ভব, সম্ভব কেবল কোল্ড ওয়ার। বিজ্ঞানের দোষ নয় কিন্তু। বিজ্ঞানের জন্যই আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই নি। বরঞ্চ বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনতায় বিশ্বাসই জন্মায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ঐক্য হলো পোটেন্শিয়াল ইউনিটি। অপেন্‌হাইমার লিখেছেন পৃথিবীর বাস্তবীয় দ্বৈতভাব (গ্রেট অ্যাণ্টিনোমিস) মানুষকে বিভক্ত করেছে ও সেই সঙ্গে একত্রিতও করেছে। একমত। (৪) বাস্তবিকই কি দ্বৈততা? বোধ হয় তার চেয়েও গভীর—অ্যালিনেশন, সৃষ্টি থেকে ভোগের বিচ্ছিন্নতা। তাই নিরানন্দ, দুঃখ? (৫) উপনিষদের আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের আনন্দ—ধরা যাক এক—ব্যাপারটা কি? ভোগের নয় সৃষ্টির শুনেছি। কিন্তু সৃষ্টিরই বা আনন্দ কি? প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখি, আনন্দ হয় আমার, সূর্যের আবার আনন্দ কি? অথচ প্রতি প্রত্যুষে নতুন সৃষ্টি হচ্ছে, লাল করবীর রঙ বদলাচ্ছে, নিমগাছের ফুল ঝরছে, কচি পাতা গজাচ্ছে, ডালিম গাছ ফুলে ভরে উঠল। আমার ভাল লাগল, আনন্দ হলো

আমার। উদ্দেশ্যহীন প্রকাশ, বিস্তার, স্ফুরণ, এই আনন্দ? না, মেয়েটি প্রথম মা হচ্ছে। তার চোখে আলো পড়েছে, দেহস্ফূর্তি হচ্ছে, একে আনন্দ বলব? প্রকাণ্ড ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন, সুপার কনস্টে-লেশন হাওয়াই জাহাজ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গদ্য, পঞ্চাশতলা স্কাইস্ক্রেপার, রাইটের স্থাপত্য—আনন্দ পাই, ঠিক যা চাইছে তাই; হচ্ছে বলে—ফাংসান্যাল। উপনিষদের আনন্দ এ জিনিস নয়। শক্তির বিকাশে যে আভা প্রকাশ পায়, তাকেই আনন্দ নাম দেব? কথাটার বর্তমান অর্থ আমাকে বুঝতে দিচ্ছে না। আনন্দ, আনন্দময় কোষ, আনন্দলহরী, আবার সাঁওতাল পরগণায় বাঙালীবাবুদের আনন্দধাম। বিয়ের কনের আনন্দপট আর আনন্দনাড়ু, আর বোম্বাই অঞ্চলের আনন্দী রাগ, বিজয়ার দিন আনন্দা লবণ, সবই নন্দ ধাতুর খেল।

নলিনী (গুপ্ত) বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিনি তাঁর নব্য বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান পাঠিয়েছেন। তাঁর যে আমাকে মনে আছে দেখে মনটা কেমন করে উঠল। অনেক রাত্রে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি থেকে
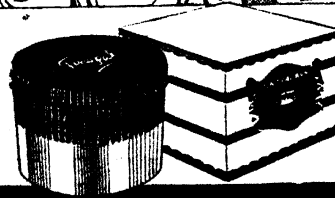
ফিরতাম। কে বলে বাঙলা সাহিত্য মরেছে, কে বলে বাঙালী চিন্তা করে না? কি গম্ভীর মানুষ এই নলিনীবাবু! কি অদ্ভুত ঘন ভাষা, চিন্তা, আর ব্যালান্স! পাণ্ডিত্য এর হজম হয়ে গেছে। অন্য স্তর থেকে ভাবা আর লেখা। অথচ সেদিন বর্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি লম্বা প্রবন্ধ পড়ছিলাম—নলিনীবাবুর নামোল্লেখ নেই। আমি বৈজ্ঞানিক নই অধ্যাত্মজ্ঞানীও নই, অতএব তথ্য ও তত্ত্বে কতটা সত্য আর কতটা ভুল বুঝতে পারলাম না। সত্যেন (বোস) কি বলে? অধ্যাত্মজ্ঞানের দিক থেকে কে বলতে পারে? কিন্তু পৃথক পৃথক সমালোচনা করলে চলবে না। দুটোর ওপরই সমান অধিকার যার আছে, সেই পারবে, যদি অবশ্য সে লিখতে জানে। আমার কোন অধিকারই নেই—কেবল কৃতজ্ঞ হবার অধিকারই আছে।

৯।৪।৫৬

এক চুমুকে অমলের (হোম) 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' শেষ করলাম। গলার কণ্টটা বেঞ্জাইন ভেপারে যাচ্ছিল না, হঠাৎ চলে গেল।

অমৃতসরে মোতিলালজীর ক্রন্দন, রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেওয়া, সি এফ এণ্ডরুজের গুরুদেবের চারদিকে ভয়, শমী 'তাহার পরে আর ফিরিল না', এগুলো অনন্ত মুহূর্ত। এদের ভেতর দিয়ে যে মূল্যজ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে সম্মান দেওয়া প্রকৃত শালীনতার লক্ষণ। মনে রাখা, মনে করিয়ে দেওয়া—এইটাই ঐতিহ্যের প্রাণ-প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা। মার্সেল তাকে বলেন উইজডম, আমরা বলি ঋণ-শোধ।

কিন্তু শোধ কিছুতেই হয় না। রবীন্দ্র-নাথ, গান্ধী, মোতিলাল, জিন্না এঁরা বিপ্লবী মানুষ—ইতিহাস তাঁদের খুলেছে আবার বেঁধেছে। বেঁধেছে, কারণ এঁদের ক্রিয়াকলাপ সাময়িক প্রতিবেশের আশীর্বাদে ঘটেছিল; খুলেছে কারণ এঁদের প্রতিবাদ দুই স্তরের, মৌলিক প্রতিবাদ নিয়তির বিপক্ষে এবং সেই মৌলিক প্রতিবাদের বিপক্ষে মানবিক প্রতিবাদ। দুটো এক হয় যখন, তখন মন, কাজ, সব ঝকঝকে তরতরে, lucid।

কামু লিখেছেন,—

'Opposite the essential contradiction, I maintain my human contradiction. I establish my lucidity in the midst of what negates it. I exalt man before what crushes him and my freedom, my revolt and my passion come together then in that tension, that lucidity and that vast repetition.'

এখনও টেনশন চলছে, এখনও দেশে-বিদেশে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি চলছে—নেই লুসিডিটি—কারণ প্যাসান নেই। বোধ হয় আফ্রিকায় আছে—কামু একপ্রকার আফ্রিকান, তাই বোধ হয় কিছু বুঝেছেন। আগামী ইতিহাসের ঋণ পরিশোধ হয় না, চক্রহারে সুদ বেড়েই যাচ্ছে। পুরোনো কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের প্রয়াস। তার মধ্যে একত্রে থাকবে ঐ ফ্রীডম। ঐ রিভোল্ট আর ঐ প্যাসান। বাকি সব বুদ্ধের বকবকানি।

১০।৪।৫৬

জন গান্‌টারের 'ইনসাইড আফ্রিকা' প্রায় শেষ হলো। প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার বই, কিন্তু ঝর ঝর তর তর করছে। একটা অংশ বাদ পড়ে গেল তবু। মোটামুটি একটা ছবি পেলাম। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টি-টিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজ-এর উপদেষ্টা হয়ে বন্ধু হফস্ট্রা এসেছেন। আফ্রিকার সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। গানটারের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ভিন্ন অন্যত্র যে আলোড়ন চলছে, তার প্রকৃতি জাতীয়তা-বোধ, ন্যাশনালিজম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়ায় সেটা একপ্রকার শ্বেত-জাতির ন্যাশনালিজম। গান্‌টার কোলো-নিয়ালিজম বরদাস্ত করেন না মোটেই এবং এই মন্থনের পর অমৃত উঠবে না গরল উঠবে, সে সম্বন্ধে চিন্তিত। গরল অর্থে তিনি কম্যুনিজমই বোঝেন। তিনি অবশ্য বলছেন, কম্যুনিজমের আশঙ্কা নিতান্ত কম। কিন্তু শঙ্কা আসার কথাই ওঠে না। যদি নির্যাতিত মানুষ প্রোপাগান্ডার জোরেই কম্যুনিস্ট হয় ভাবা যায়, তবে অবশ্য অন্য কথা। আমার এই ধরনের খোঁজাখুঁজি নিতান্তই অ-বৈজ্ঞানিক মনে হয়। অথচ গান্‌টারের রিপোর্ট অদ্ভুত রকমের 'অবজেকটিভ'। এই 'অবজেকটি-ভিটি'র মধ্যে কতই না গোঁজামিল থাকে। চরিত্রাংকণে গান্‌টারের সমকক্ষ দুর্লভ। সোয়াইৎসার, নাসের, এনক্রুমা প্রভৃতির রূপ লেন্‌ ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এল। কত মজার খুঁটিনাটি ঘটনাই না আছে বইখানিতে। একেবারে শ্যেনদৃষ্টি। ঠিক এই ধরনের 'রিপোর্টাজ খাঁটি' আমেরিকান সৃষ্টি। এমন রসাল, জীবন্ত, চলন্ত রূপ, অথচ নির্বাচিত ঘটনাই আশ্রয়—ভূয়োদর্শন থেকেও নেই—একটা মোটামুটি লিবারেলিজম-এর অন্তঃশীল টান রয়েছে। আরেকটুকু ওপাশে ঠেলে দাও ত এরেনবার্গ, আর ওপাশে দাও ত' দিনের, সপ্তাহের, পক্ষের, মাসের ইতিহাস। নতুন আর্ট। গভীর বিশ্লেষণ চেয়ো না কিন্তু। এই মহাভারত কে পড়বে জানি না। গান্‌টার যদি আর পাঁচ বছর পরে এদেশে আবার আসেন ত' নিজেদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। পণ্ডিতজী থাকতে যেন আসেন।

মন্দ হয় না। তাঁর চোখ দিয়ে নতুন

১১।৪।৫৬

আজকের ডাক-এডিশনের ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবরের শীর্ষক "সোভিয়েট লীডারস্ এনগেজমেন্টস ইন ইউ কে রেসট্রিক্‌টেড"—আর কালকের দিল্লী এডিশনের স্টেটস্‌ম্যান-এর ৬ পৃষ্ঠার ৬ স্তম্ভের নীচে সেই একই রয়টারের খবরের শীর্ষক হলো Wider contacts with British people desired, Soviet Leaders U. K. visit' খবর এক, দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। দুইই অবজেকটিভ, দুইই সত্য খবর। ন্যাশনাল হেরাল্ড ইঙ্গিত দিচ্ছে গতায়াতের স্বাধীনতা কেবল রাশিয়াতেই খর্ব হয় না, ইংলণ্ডেও হয়; আর স্টেটস্‌ম্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে রাশিয়ান নেতারা ইংরেজ জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, অতএব সাবধান। শেষেরটি উহ্য। স্টেটস্‌ম্যান-এর সাজান বেশী 'অবজেকটিভ' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—প্রায় নিউট্রাল। ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর সাজানটি ক্রিটিকাল মনে হবে—কিন্তু ক্রিটিসিজম্‌টাও অবজেকটিভ। ন্যাশনাল হেরাল্ড পাঠকের চোখ খোলে, স্টেটস্‌ম্যান চোখের সামনে রাখে। দুটো উদ্দেশ্য ভিন্ন।

স্টেটস্‌ম্যান-এর এক চমৎকার শিল্প-চাতুর্যের কথা স্মরণ হচ্ছে। তারিখ ঠিক মনে নেই। আবাডি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ এবং সোসিয়ালিস্টিক প্যাটার্নের প্রস্তাব যে পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা 'বক্‌সে' একজন ডুবুরি বরফ ভেঙে ওপরে উঠছে এই ছবিটা ছিল। তার তলায় লেখা দি কোল্ডেস্ট পিকচার। এই বিদ্রূপটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। অনেকদিন ছবিটা তুলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম তারিফ জানাব। হয়ে ওঠেনি, কাটিংটা হারিয়ে গেছে, তাই হয়ত কিছু ভুল হতে পারে।

রত্নাকর
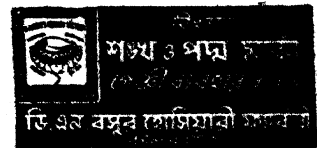
রবিবার ১৩ই মে চেতলা হাইস্কুলে মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত এ জাতীয় কোন অনুষ্ঠানেই ভাগ নেবার অবকাশ আমার ঘটে না। কিন্তু মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যক্রম ছিল এর ব্যতিক্রম। এরূপ ব্যতিক্রমের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম ও প্রধান কারণ, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছেন, তাঁরাই ১৯৪১ সাল হতে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নিয়মিতভাবে মুরারি স্মৃতি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে আসছেন, যে সম্মেলন তানসেন, সদারং, অল ইণ্ডিয়া, এণ্টালি, ডোভার লেন, দক্ষিণ কলিকাতা, ফার্ন রোড প্রভৃতি সম্মেলন অপেক্ষা কলকাতাবাসীর কম সুপরিচিত নয়। দ্বিতীয় কারণ, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকবিভাগে এমন কয়েকজন গুণী শিক্ষকের সমাবেশ আছে, যাঁদের শিক্ষাধীনে সংগীত-শিক্ষা ক্রমশই উন্নততর হবে, এ আশা করা যেতে পারে। সংগীতাচার্য মোহিনীমোহন মিশ্র এই বিভাগের কর্ণধার। মোহিনীবাবু ভবানীপুরের বিখ্যাত গুণী, সংগীতাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। মোহিনীবাবুর কর্তৃত্বাধীনে আছেন স্বর্গীয় সংগীতাচার্য গিরিজা চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীদেবী ভট্টাচার্য, ওস্তাদ মহম্মদ উমর খাঁ সরোদিয়ার সাগির্দ শ্রীসন্তোষ স্বামী, প্রসিদ্ধ কলাকার শ্রীজ্ঞান ঘোষের শিষ্য শ্রীকানাই দত্ত ইত্যাদি আরো অনেক নাম করা গুণী। চতুর্থ কারণ ছিল চেতলা স্কুল, উপস্থিত আমি সেখানে থাকি, তার অতি সন্নিকটেই, কাজেই যাওয়ার কোন হাঙ্গামা ছিল না। এছাড়া, স্কুল-কলেজের কার্যক্রম সাধারণত দীর্ঘক্ষণস্থায়ী হয় না। অতএব রাত্রি জাগরণের আশংকাও ছিল না।

বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র বালিকাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রাম আমার কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল। ইংরাজী প্রবচন "চাইল্ড ইজ্ দি ফাদার অফ্ ম্যান্", অর্থাৎ "শিশু বা সন্তানই মনুষ্যের পিতা," ভুলতে পারি নি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামই বাঙলার সংগীত-সংস্কৃতির মান নির্দেশক। এমনই ধরনের অনুষ্ঠানই আমাদের জাতীয় কৃষ্টির নিশান তুলে ধরে আমাদের জানিয়ে দেয় যে, বাঙলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি না! দু-দশজন খ্যাতনামা কলাবিদের উন্নত সাংগীতিক মান কোন জাতির ললিতকলার ইতিহাস রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সাধারণের ভিতর আর্টের কতটুকু পরিবেশন, তাঁদের উপর আর্টের প্রভাব, আর্টের উৎকর্ষের জন্য তাঁরা কতখানি অংশ গ্রহণ করেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার দ্বারাই আমরা দিগ্‌দর্শন করতে পারি। চেতলার সহিত বহুপূর্বে আমার নিবিড় পরিচয় ছিল। তখন চেতলা ছিল কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেরই মতন সুপ্তিমগন। কলকাতার ঘরে ঘরে আজ নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। তাই ভাবলুম চেতলাতেও নিশ্চয়ই সেই ছোঁয়াচের আভাস লেগেছে, ঘুম ভাঙান সোনার কাঠির স্পর্শে চেতলাও নিশ্চয়ই আজ জেগেছে। কিন্তু বুঝলুম ধারণাই ভুল। বালিগঞ্জ স্টেশন হতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের সংযোগস্থল পর্যন্ত অন্তত এক ডজন সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্শন মেলে। কিন্তু এই ৩০ বৎসরের ব্যবধানে চেতলাতেও এই মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য কোন সাংগীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল না। চিন্তা করলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তাও আবার এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র আজ তিন বৎসর। চেতলার দুর্ভাগ্য বলতে হবে বৈকি! চেতলা কলকাতারই এক অংশ, ডাক বিভাগের ২৭নং জিলার মধ্যে অবস্থিত। দুটি বাস-রুট এই শহরতলীকে কলিকাতার সঙ্গে সংযুক্ত করে রেখেছে, তবুও তার এই দৈন্য, দুর্দশা। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায় যখনই রাস্তা দিয়ে চলি, কোথাও একটু স্বর সাধনের স্বরগ্রাম বা যন্ত্রবাদনের ঝংকার শুনতে পাইনে। শুধু শুনি বেতার যন্ত্রের তারস্বরে বিকট চীৎকার—উচ্চাঙ্গ সংগীতের তানকর্তব নয় বা ন্যাশনাল প্রোগ্রামের শিক্ষাপ্রদ বিশেষত্ব নয়, কেবল কীর্তন ও হাল্কা সংগীত যাতে প্রয়োগ-কৌশল অপেক্ষাকৃত কম। আমি কোন সংগীতের প্রশংসা বা নিন্দা করছিনে, কেবল বলছি যে, সংগীতকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হলে প্রোগ্রামকে শ্রুতিসুখকর করা উচিত। অর্থাৎ তার একঘেয়েমি ভাবকে দূর করতে হবে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উচিত কথা বলতে গেলে পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশেও সর্বপ্রথমে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে সংগীতানুরাগ বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কর্তব্য।

স্থানীয় কয়েকজন সংগীতকলা উৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগীত ও নৃত্যকলায় শিশু-প্রতিভার বিকাশে সহায়তাদানই এ প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর এই সময়ে একটি সংগীত-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং পূজার সময় প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী এক সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন

করেন। গত বৎসর প্রায় ৯০০ ছাত্র-ছাত্রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু চেতলার মত স্থানে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে জীইয়ে রাখা কষ্টসাধ্য। কারণ, কোন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা, চাই তাঁদের ললিতকলার প্রতি গভীর প্রীতি। এই শিক্ষাকেন্দ্রের মতই কলকাতায় আরো অনেক কলাকেন্দ্র আছে, যাঁদের লক্ষ্য উচ্চ হলেও একান্ত অর্থাভাববশত অলক্ষ্যেই অধিষ্ঠান করছেন। দুর্দশায় পতিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি উৎসাহিত করার দায়িত্ব কেবল জনসাধারণের নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও আছে। ললিতকলার অনুশীলন ও লালন, সর্বতোমুখী শিক্ষালাভের এক অপরিহার্য অঙ্গ। অথচ আমরা সর্বাঙ্গীন শিক্ষার অঙ্গহানি করে ললিতকলাটিকেই অবহেলা করে যাই জীবনভর। আর্টের চর্চা নিছক খামখেয়ালী যে নয়, আর্টের সঙ্গে জীবনের যে অন্তগূঢ় সম্বন্ধ আছে, এটি আমরা ভুলে যাই। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সংগীতকলা একদিন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, সে অধিকার আমাদের কায়েম রাখতে হবে।

এ বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমন্মথনাথ দাশ। ইনি মেদিনী-পুরের এক প্রখ্যাত কংগ্রেসকর্মী। মন্মথবাবু তাঁর ভাষণে বলেন, "শাস্ত্রসম্মত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে সংগীতকলা। মুশলিম আমলে অবরোধ প্রথার অত্যাচারে এ বিদ্যা ক্রমশ ভদ্রসমাজ হতে লোপ পেতে বসেছিল। কিন্তু ললিতকলার সে বন্দীদশা অপসৃত হয়েছে। ভারত আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভূমির বিবিধ-প্রকার অন্ধ সংস্কারের অবগুণ্ঠনও খুলতে শুরু হয়েছে। মেয়েরা যাঁরা এতদিন আড়াল আবডালে কালাতিপাত করে এসেছেন, এবার তাঁদের পর্দার বাইরে আনতে হবে। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁদেরই ললিত-কলারূপ তরণীর হাল ধরে তার অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের ১৩ই মে তারিখের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে ছাত্রী সম্মেলন না বলে যদি আমরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব বলি, তাহলেও কোন ভুল হবে না। কেবল যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবতিথির সপ্তাহব্যাপী আড়ম্বরের মধ্যে এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল তা নয়, কার্যসূচীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে অনেকগুলি রবীন্দ্র-সংগীতের প্রযোজনাও করা হয়েছিল। বার্ষিক ছাত্রী-সম্মেলনের দোহাই দিয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে রবীন্দ্র-জন্মতিথি প্রকারান্তরে পালন করেছেন, এজন্য এঁদের সাধুবাদ দিই। এই অবসরে এঁদের দীর্ঘ প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রোগ্রাম দীর্ঘই হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য, কেননা এ জাতীয় বিরামবিহীন অনুষ্ঠানকে দুঘণ্টার অতিরিক্ত স্থায়ী করা উচিত নয়। আর এক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া আবশ্যক—সময়নিষ্ঠা। বাঙালীর ঢিলে-ঢালা স্বভাব ও সময়জ্ঞানের অভাবের জন্য বাঙলার বাইরে বাঙালীর বড় বদনাম। আমাদের কর্তব্য, সময়ের মূল্য সঠিক নিরূপণ করে কার্যারম্ভ করা। ৭টার অনুষ্ঠান যদি ৮টায় আরম্ভ হয়, তাহলে আরো এক ঘণ্টা পূর্ব হতে তোড়জোড়

করতে থাকলে হয়ত ঠিক ৭টায় কার্যারম্ভ করা যেতে পারত। অনুমান করে নিলেই হতো যে, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে ঠিক ৬টায়।

এবারে বিষয়সূচী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। প্রধান অতিথির অভ্যর্থনা, মাল্যবিভূষিতকরণ ও ভাষণের পর একটি স্মরণ-গীতি গাওয়া হয়—"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।" এই সমবেত গীতির দ্বারা শ্রীমোহিনীমোহন মিশ্রের অদ্বিতীয় সংগীত-প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র, স্বর্গত মুরারি মিশ্রের অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। স্মরণ-গীতির পর এ'রা আরো দুখানি রবীন্দ্র-সংগীত গান করেন—"মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই" এবং "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।" গান তিনখানি শেষ হলেই পর পর তিনটি গীতি-নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। তিনটিই রবীন্দ্র-সংগীতের উপর পরিকল্পিত। এগুলি যথাক্রমে "খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো"; "তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি তুমি এসো বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন"; "এবার অবগুণ্ঠন খোলো"। প্রথম গীতি-নৃত্যটি আমার বড় ভাল লেগেছিল, কেননা যাঁরা নাচলেন, তাঁরা সকলেই প্রায় দুধের বাচ্চা। নৃত্য তিনটির পরে কুমারী বন্দনা দাস একটি শ্যামাসংগীত গাইলেন—"দিন কাটে মা চোখের জলে"—দাদরা তালে বেশ লাগল। এর পরে একটি মীরার ভজন গাইলেন—"মগন ভই মীরা হরিকো গুণ গায়", কুমারী নির্মলা মিশ্র। ইনি পরে আরো দুখানি গান করেন, একটি আধুনিক, অন্যটি সুরদাসের ভজন—"মন বিচ্ছুরেতন ছার হোই গো"। নির্মলা দেবী মিশ্র মশায়ের দুহিতা। উপযুক্ত পিতার পুত্রী। গানগুলি ভালই লাগল, তবে বাঙলা গানের বাণী আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। মীরার ভজনের পরে কয়েকখানি সমবেত কণ্ঠে আধুনিক গান হলো এবং তারপরে কয়েকটি নৃত্য। নৃত্যগুলির পরিকল্পনা, সাজসজ্জা সবই ভাল, কেবল মনে হলো একটু বেশী অস্থিরতা সবগুলির মধ্যে। মণিপুরী নৃত্যে কৃষ্ণের তুলনায় রাধাকে অতিরিক্ত ঢ্যাঙা লাগছিল। ছোট স্টেজের পক্ষে বিশেষ সেখানে প্রেক্ষাগৃহ প্রায় স্টেজের গা ঘেঁষা, বড় অশোভন মনে হোল। কুমারী রীণা বোসের নাচ ভালই এবং বড় স্টেজ হলে ঠিক যে মানিয়ে যেত এও জানি। কিন্তু চেতলা স্কুল সংগীত সম্মেলনের ঠিক উপযুক্ত স্থান নয়। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল কুমারী শিবানী দাসের "কালীয় দমন" নৃত্য।

পরিশেষে ভারত নাট্যম্ নৃত্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হবে না। 'ধ্রুপদ-খেয়াল' জাতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সংগীতের মতই 'কথাকলি' 'ভারত নাট্য' উচ্চাঙ্গ নৃত্যসংগীত। প্রথম তো দাদরা তালে যেমন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত হওয়া উচিত নয়, তেমনি উচ্চাঙ্গ নৃত্যসংগীতও হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় কথা, উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে আমরা জননৃত্য যদি অন্তর্গত করি, তাহলে তার ঢং হবে ঠিক যেন খেয়ালের মধ্যে বাউলজাতীয় লোক সংগীতের অনুপ্রবেশ। পরিকল্পনা অভিনব হতে পারে, কিন্তু কতদূর দৃষ্টি সুখকর, একবার আপনাদের বিবেচনা করে দেখতে বলি। তৃতীয় কথা, নৃত্যকলাকে যদি আমরা সত্যই 'ফাইন আর্ট'রূপে গণ্য করি, তবে তার ভঙ্গিমার বিশেষত্বগুলিকে বজায় রাখতে হবে। কিন্তু দেখলুম, মণিপুরী ও ভারত নাট্য নৃত্যে একটু বেশী চপলতা, অতিরিক্ত লম্ফঝম্প। এগুলি ঠিক নয়। প্রত্যেক রাগ যেমন বিভিন্ন রসসৃষ্টি করে, প্রত্যেক নৃত্যেরও তেমনি ছন্দ, গতি, অঙ্গহার, মুদ্রা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য আছে। কথক-নৃত্যে বা মণিপুরী নৃত্যে মুদ্রার প্রচলন নেই। কিন্তু আমরা যদি জবরদস্তি এ দুই নৃত্যের উপর মুদ্রার বোঝা চাপাতে যাই, তাহলে নৃত্যের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যাবে। খেয়ালকে যদি চপলভাবে ঠুংরির ধরনে গাই, তবে সে আর খেয়াল থাকে না, ঠুংরিই হয়ে যায়। মুরারি স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার একটি কথা ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। মৌলিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র কোন কলাবিদ্যায় নিতান্ত সীমিত নয়, তবে তার ব্যবহার জানা চাই। শেষ কথা, উচ্চাঙ্গ সংগীতে সমবেত কণ্ঠে সুর-সারঙ্গের খেয়াল বিলম্বিত একতালায় গান করা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম 'রেজিমেণ্টেশন্'এ শিক্ষণ প্রণালীর পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন হয়, আর্টের সৃষ্টি হয় না। মধ্য-লয়ের গানটি 'সোলো' হলে অনেক বেশী উপভোগ্য হতো।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুরারি স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৫৩ সালে, অথচ এই তিন বৎসরেও এমন একটি ছাত্রী তৈরী হয়নি, যাকে দিয়ে একটু যন্ত্র-সংগীতের নমুনা পেশ করা যেতে পারত। এইটাই আশ্চর্য লাগল। সমালোচনা প্রসঙ্গে ত্রুটি সংশোধনার্থে দু-একটি অপ্রিয় সত্য কথা বললেও, মোটের উপর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রোগ্রাম আমার ভালই লাগল।

॥ ২৪ ॥

এই যে চিঠিপত্তর, এ এক অদ্ভুত চীজ্। আমি না পারি পড়তে, না জানি লিখতে। তবুও বছরের পর বছর আমার কাছে গাদা গাদা চিঠি আসে। এতো, যে গুণে শেষ করতে পারি না। চিঠি আসে ভারত থেকে, ইয়োরোপ থেকে। নানা লোকে লেখেন। নানা খবর তাঁরা জানতে চান। আমি কোন অভিযানে যাচ্ছি কিনা, গেলে, কোন্ দলের সংগে যাচ্ছি, তা তাঁরা জানতে চান। কোন অভিযান থেকে ফিরে এসেও নানা লোকের চিঠি পাই। এইসব চিঠি থেকে জানতে পারি, তাঁরা এই অভিযান সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন, কি তাঁদের পরিকল্পনা ছিল। আমার এমন চিঠিও পাই, যার লেখক শুধু বন্ধুত্বই পাতাতে চান। আমি চিঠিগুলো অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে নিই। সব সময় জবাবও দিই। একজন কাউকে জবাবটা মুখে মুখে বলে যাই, তিনি সেটা যথাযোগ্য ভাষায় লিখে যান। যখন সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না তখন ইংরাজীর স্মরণ নিই। জানি, যার কাছে এটা লেখা হচ্ছে তিনি যদি ভাষাটা নাও জানেন তাহলেও এটা অনায়াসে অনুবাদ করিয়ে নিতে পারবেন। কলম আর টাইপরাইটারের সংগে আমার সম্পর্ক প্রায় ভাসুর আর ভাদ্র-বধুর মতই। তবুও আমার জীবনের অনেক

রোমাঞ্চকর অভিযানের সূত্রপাত ঘটেছে এই দুটো জিনিসের মারফতেই।

১৯৪৮ সালের শীতকালে, আমার সেই পুরানো বন্ধু, দুন্ স্কুলের সেই গিবসন্ সাহেব, যার সংগে বান্দরপুচ্ছে অভিযানে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছ থেকে খবর পেলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশনাল রিসার্চ' সেক্সনে কোন একটা কাজের জন্য তিনি আমার নাম সুপারিশ করেছেন। কিছুদিন পরে সেনাবিভাগ থেকেও আমার ডাক এল। ফলে সেই বছর একবার, আর তার পরের বছর আর একবার, আমাকে সৈন্যদের পাহাড়ে চড়া শেখাবার জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেতে হল। আমি তাদের বিশেষ শিক্ষাদাতা নিযুক্ত হলাম। শুধু যে পাহাড়ে চড়া শেখান হত তাই নয়, শিবির বসান, বাইরে রান্নাবান্না করা, সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা, ওগুলোর হেপাজত করা, বন্য পার্বত্য প্রদেশে গিয়ে বাস করার মতো এই সব নানা ধরণের কাজও তাদের শেখাতাম। এ বড় মজার কাজ। আমার খুব ভাল লাগত। প্রথম বছরটা কুলুতে কাটালাম। পরের বছর গেলাম কাশ্মীর। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল গুলমার্গে। দুটো বছরেই, যে সময়ে আমি কাজে গিয়েছিলাম, তখন সময়টা ছিল শীতকাল। আর

শেরপারা মোট বয়ে দুর্গম পাহাড়ে উঠছে

আমার কাজ ছিল পাহাড়ে চড়া শেখানো।

জায়গাটা ছিল উঁচু পাহাড়ের ওপর। 'স্কী' খেলা খেলবার খুব সুযোগ পেয়েছিলাম। যুদ্ধের সময় সেই যা চিত্রালে এ খেলা খেলেছিলাম, আর তারপর এই প্রথম। সৈন্যদের শিক্ষাদাতা হিসাবে সৈন্যবিভাগ থেকে আমি সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। কিন্তু 'স্কী' খেলা খেলতাম আমার আপন খেয়ালে। নিজের খুশির জন্য। আমার এ কাজের সরকারী রেকর্ড পড়ে আছে শুধু ঘন তুষারের মধ্যে, নানারকম আঁকি আঁকি দাগে।

১৯৪৯ সালের বসন্তকালে দার্জিলিঙে একটা বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটলো। ফ্র্যাঙ্ক্ স্মাইথ দার্জিলিঙে ফিরে এলেন। তাঁকে আমরা স্বাগত জানালাম। এই সেই স্মাইথ সাহেব, যার সঙ্গে আমি একবার এভারেস্টে উঠেছিলাম। হিমালয়ে যতজন অভিযান চালিয়েছেন তার মধ্যে এই স্মাইথ সাহেবই বোধকরি সবথেকে বিখ্যাত। এবার কিন্তু সাহেব কোন অভিযানে আসেন নি। এসেছেন পাহাড়ের ছবি তুলতে। আর পাহাড়ে যেসব ফুল জন্মায় সেগুলোরও ছবি তিনি তুলবেন। (সাহেব এই কাজে খুব পোক্ত।) সাহেবের যোগাড় যন্ত্রের ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করলাম।

আমরা সাহেবকে দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম এ সাহেব ঠিক সেই আগেকার সাহেব নেই। আর বয়সের ভারই তার একমাত্র কারণ নয়। দার্জিলিঙে এক বিখ্যাত শিল্পী আছেন, নাম মিঃ সেইন্। স্মাইথ সাহেব তাঁর অনেকদিনের বন্ধু। সাহেব তাঁর স্টুডিওতে একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চলে আসবার আগে নিয়মমাফিক সেইন সাহেব দর্শকদের খাতায় স্মাইথ সাহেবকে একটা সই দিতে বললেন। যে তার স্টুডিওতে আসতো সেইন্ সাহেব তাঁর খাতায় তাঁরই সই নিয়ে রাখতেন। স্মাইথ সাহেব খাতার কাছে গেলেন। কিন্তু সই করতে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতের কলম হাতেই রইল। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে খাতার দিকে চেয়ে রইলেন।

একটু পরে, একটু হেসে বললেন, "কি আশ্চর্য! মিনিটখানেকের মধ্যে আমার নামটাই আমার মনে এল না।" তারপর খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে খুব যত্নের সঙ্গে সাহেব তার নামটা সই করলেন। কিন্তু তারিখ বসাবার বেলায় আবার গোলমাল বাধলো। সাহেব প্রথমে লিখলেন অক্টোবর। তারপর একটুক্ষণ কি ভেবে সেটা কেটে দিলেন। তারপর আবার একটু ভাবলেন। ভেবে লিখলেন ডিসেম্বর। শেষ পর্যন্ত এই ডিসেম্বরই রেখে দিলেন। আসলে মাসটা ছিল 'মে'।

দু'একদিন পরে সাহেবের সঙ্গে চৌরাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বেক্কায় একটা শক্ পেলাম। আমরা দুজনে কি একটা যেন আলোচনা করছিলাম। কি তা ভুলে গেছি। হঠাৎ দেখি সাহেবের গলার স্বর বদলে গেছে। আমার দিকে চেয়ে বলছেন "তেনজিং, আমার বরফকাটা গাঁইতিটা দাও তো।" ভাবলাম সাহেব বুঝি রসিকতা করছেন। আমিও তেমনি রসিকতা করেই একটা জবাব দিলাম। কিন্তু সাহেব খুব গম্ভীর হয়ে বারে বারে আমাকে ঐ একই হুকুম করতে লাগলেন। সাহেবের ধারণা, আমরা উঠে গেছি একটা উঁচু পাহাড়ে। বুঝতে পারলাম সাহেবের অবস্থা খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তাঁকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হল। সেখানে যখন তাঁকে দেখতে গেলাম তখন তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না। সাহেব চোখদুটো বিস্ফারিত করে চেয়ে আছেন আর বড় বড় পাহাড়ে যে সব অভিযান তিনি চালিয়েছিলেন সে-সবের কথা বকে যাচ্ছেন। ডাক্তাররা বললেন, তিনি একটা অদ্ভুত রোগে ভুগছেন, সে রোগটা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ড এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সাহেবকে বিমানযোগে খুব তাড়াতাড়ি বিলাত পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেখানেও তাঁকে কিছু করা গেল না। কিছুকাল পরে তিনি মারা গেলেন। আর এইভাবে একজন সেরা পর্বতারোহীর জীবনপ্রদীপ নিভে গেল। আর কত তাড়াতাড়ি!

অবশেষে যুদ্ধ কেটে গেল, ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যেসব ঝড় তুফান উঠেছিল তাও থিতিয়ে এল। অনেক বছর পরে আবার দলে দলে অভিযান আসতে শুরু করলো। স্মাইথ সাহেব চলে যাবার পরই দার্জিলিঙে একটা সুইস্ অভিযাত্রী দল এসে পড়লো। এর যিনি নেতা, রেনি ডিটার্ট, আমার এক পুরানো বন্ধু। এবার

এই দলটি এসেছে নেপালের দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাওয়া যায় কি না দেখতে। তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার আগেই টিলম্যান সাহেবের সঙ্গে নেপাল যাবার কথাবার্তা আমার পাকা হয়ে গেছে। তাই আমি এই সুইস্ দলটিকে শেরপা যোগাড় করে দিলাম আর তারপর তাদের শুভেচ্ছা জানালাম।

অবশ্য টিলম্যান সাহেবও আমাদের খুব পুরানো বন্ধু। শেরপাদের এতবড়ো বন্ধু খুব কমই আছে। ১৯৩৮ সালে তাঁর সঙ্গে এভারেস্টে গিয়েছিলাম। তাঁর উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল, এটা আনন্দের কথা। স্মাইথ সাহেবের ঐ শোচনীয় পরিণতিতে আমরা দুজনেই খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। চারজন শেরপা নিয়ে আমি দার্জিলিঙ থেকে কোলকাতায় চলে এলাম। সেখানে সাহেব আর তার দুজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। আর সেখান থেকে আমরা নেপালের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে চললাম। এখানে রাস্তা-ঘাটের প্রকৃতি প্রায়ই বদলাতে লাগলো। পথঘাট সেই আদিম ধরনের। আমরা ভারত থেকে ট্রেনে চড়ে সীমান্তে রক্সৌল শহর পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে লরীতে চড়ে তরাইয়ের জঙ্গল আর ছোটখাটো পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা পৌঁছলাম ভীমপেড়ী। এরপরে আর রেল রাস্তাও নেই, মোটরের রাস্তাও নেই। তাই আমরা পায়ে হেঁটে ছোটখাটো নানা গিরিশিরা অতিক্রম করে নেপাল উপত্যকায় ঢুকে পড়লাম। আমাদের বোচকা-বুঁচকি আমাদের মাথার উপর দিয়ে তার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। আমার সময়টা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। আমার অদ্ভুত লাগছিল। এই তো খুব কাছেই দার্জিলিঙ। এর সীমান্ত থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ১৯৩৮ সালে সোলো-খুম্বু থেকে দ্বিতীয়বার পালাবার পর এই আবার নেপালে ঢুকি। আমার মনে হয় এই উত্তেজনার ছোঁয়া সাহেবদেরও লেগেছিল। কেননা যে দেশে তাঁরা এসেছেন, সে দেশটা পশ্চিমী লোকদের কাছে একেবারে অজানা। নেপালের ইতিহাস যতদূর জানা যায়, দেখা গেছে, নেপাল পশ্চিমের কাছে তার দরজা বন্ধ করেছিল। তার দরজার আগল ছিল তিব্বতের থেকেও শক্ত! তবু তো তিব্বত কখনো সখনো কাউকে না কাউকে সেখানে ঢোকবার অনুমতি দিয়েছে। দু'একটা অভিযানও চালাতে দিয়েছে। কিন্তু এখন, অবশেষে কমিউনিস্টরা এসে যখন তিব্বতের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তখন নেপাল একটু একটু করে তার পর্দা সরাচ্ছে। টিলম্যান আর তার সঙ্গীরাই সব প্রথমে সেখানে ঢোকবার সুযোগ পেলেন।

নাগরিকত্ব একটা অদ্ভুত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যদিও আমি এখন ভারতীয় নাগরিক, আমি আবার নেপালীও। নেপালে জন্মেছিও বটে, আবার নেপাল আমাকে তার নাগরিক বলে স্বীকারও করেছে বটে। কিন্তু খুব কম লোকই আমাকে নেপালী বলে ডাকে, তেমনি ভারতীয় বলেও। কারণ আমার জাত আলাদা। আমার ধর্মও আলাদা। সোলোখুম্বুতে আমরা একবারে একপাশে পড়ে থাকতাম। সমগ্র দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। দেশের অন্যান্য অংশে কি ঘটছে তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র যেতো আসতো না। আমরা আমাদের রীতিনীতি, আমাদের জীবনযাপন প্রণালী নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতাম। যে জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে জড়িত তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না। আমার পরের জীবনে আমি অবশ্য অনেক শিখেছি। আগে যে সব
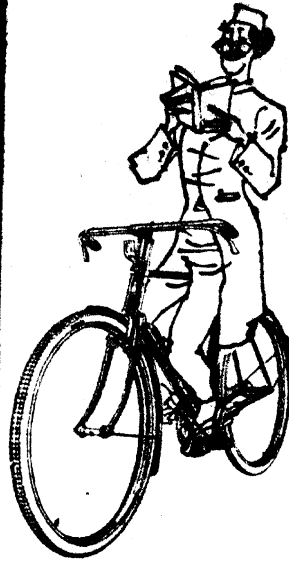
তখন সময়টা ছিল শীতকাল

জিনিস বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতাম, এখন তার কার্যকারণ বুঝতে শিখেছি। যেমন ধরুন নেপাল। নেপাল কেন এতদিন তার দরজা বন্ধ করে ছিল? তার প্রধান কারণ, নেপাল এতদিন শাসিত হচ্ছিলো একটা গোষ্ঠীর দ্বারা। এ গোষ্ঠী রানাদের। রাজার কাছ থেকে তারা ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছিলো। দেশের সমস্ত কিছুর উপর তারা প্রভুত্ব করতো। পাছে বিদেশীরা এসে তাদের প্রভাব ফেলে সব কিছু বদল করে দেয়, এই ভয়ে তারা তাদের ঢুকতে দিতো না। কিন্তু বিশ শতকের এই জগতে এ অবস্থা অনন্তকাল ধরে চলতে পারেনা। হাজার হাজার গুর্খা, নেপালের বীর যোদ্ধারা, যারা দুটো বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করতে গিয়েছিলো, তারা ফিরে এল নতুন নতুন ভাবধারা আর রীতিনীতি সঙ্গে নিয়ে। দেশের ভিতর থেকেও একটা চাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। চাপ পড়ছিল ভারত সরকারের কাছ থেকেও। আর শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নেপালে একটা অভ্যুত্থান ঘটলো। রানা কর্তৃত্বের অবসান ঘটলো। রাজা, যিনি অনেক উদার মতাবলম্বী, অনেক আধুনিকমনা, তাঁর সিংহাসনের অধিকার ফিরে পেলেন। আর তারপর থেকে এক নতুন গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত নেপাল তার আবরণ খুলতে লাগলো, এক নতুন জাতিতে পরিণত হলো।

যাহোক, আমরা ভীমপেড়ী থেকে গিরিশিরার উপর দিয়ে বয়ে চলা উঁচু নীচু কর্কশ পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এগুলাম, নেপালের বিরাট সবুজ উপত্যকার দিকে। যার মাঝখানে কাঠমণ্ডু। আমরা শহরে নেমে এলাম। ফিরে এলাম। অবশেষে ফিরে এলাম সেইখানে। সেই যখন আমার বয়স তের বছর, পালিয়ে ছিলাম বাড়ি ছেড়ে, তারপর এই আবার কাঠমণ্ডুতে ফিরে এলাম। এখন দেখি এমন অনেক জিনিস এখানে হয়েছে যা আগে ছিল না। কত নতুন নতুন বাড়িঘর, বিজলী বাতি, টেলিফোনের তার, এমনকি কয়েকখানা মোটর গাড়িও। (ভারত থেকে এইসব মোটর গাড়ি মানুষের পিঠে করে বয়ে আনতে হত) কিন্তু যতদূর আমার স্মরণ হয় বেশীর ভাগ জিনিসই তেমনি আছে যেমনটি সেই আগে দেখেছিলাম। সেই পুরানো সব আঁকাবাঁকা রাস্তা, ভিড় গিজ্ গিজ্ বাজার, হিন্দু আর বৌদ্ধ মন্দির, সেই সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্তিগুলো, ঠিক তেমনিই আছে। শহর ছাড়িয়ে বাইরে যে উজ্জ্বল সবুজ ধানক্ষেতগুলো, তেমনিই আছে। আর ঐ যে হিমালয়, তুষার-কিরিটী হিমালয়, সেও ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। লাসা গিয়েছিলাম তাই মনে মনে দুটো শহরের তুলনা করতে লাগলাম। দুটোর প্রকৃতি একই রকম। ভাবতে লাগলাম। পৃথিবীতে এই দুটো রাজধানীই বোধকরি পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পেরেছে। আবার দুটো শহরের মধ্যে তফাতও আকাশ পাতাল। লাসা তার উচ্চতা নিয়ে, গভীর নির্জনতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। তার অধিবাসীরা সকলেই এক জাতীয়। বৌদ্ধ। কিন্তু কাঠমণ্ডু, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা জাতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এসেছে। প্রাচ্যদেশে যত ধর্ম আছে তার প্রায় সবই এখানে এসে জমেছে। [ক্রমশ

আচার্য বিনোবা ভাবে দেড় হাজার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদিগকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সময় জমিতে কাজ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন—"পরামর্শটা বাঁকে করে জল

টানা বা রিক্শাটানার হলেই ভাল হতো, কেননা এক হাতের টবের জমি ছাড়া সবাইর পক্ষে জমি সংগ্রহ সহজ নয়"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমির ভিত্তি-স্থাপন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়াছেন—মানুষে মানুষে যে বৈষম্য থাকে সংগীতের মহৎ প্রভাবে তা

দূর হয়। শ্যাম বলিল—"সবিনয়ে বলব তা দূর হয় না। যারা সারাজীবন মা-রে-গা নিয়ে রেয়াজ করেছেন তারা আর কিছুতেই সারে-রে-গায় নেবে আসতে রাজী নন।"

* * *

শিলং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল সেখানকার কোন এক সদাশয় সমাজসেবী জনসাধারণকে "গৃহদান যজ্ঞ" করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এত দানসাগরের পাঁতি হলে শেষ পর্যন্ত হয়ত তিল-বৈতরণীও হবে না"।

* * *

বৃষ্টি হইবে কি হইবে না, এই নিয়া বাজিখেলার অপরাধে পুলিস নাকি কলিকাতাতে সতেরজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—"আবহাওয়াতত্ত্ববিদেরা এই নিয়ে বাজি খেলতে গেলে যে হেরে ঢোল হতেন, তা বাজি রেখেই বলা যায়"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, সাত-তাড়াতাড়ি না করিয়া হিন্দীকে আপনা হইতে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। —শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু যাদের তর সইছে না, তারা লেংগট কণ্ঠে বেঁধেই পায়তারা শুরু করেছেন"!!

* * *

পূর্ব পাকিস্তানের কোন এক গ্রামে নাকি থানার কয়েকটি পুলিস একজোট হইয়া ডাকাতি করিয়াছে। —"ডাকাতরা ডাকাতি করে গেছে অন্তত এই অপবাদ পাক পুলিসকে কেউ দিতে পারবে না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিম পাকিস্তান অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসভার মহিলা সদস্যাগণ চেয়ারম্যানের সংগে করমর্দন করায় জনৈক সদস্য আপত্তি জানাইয়াছেন। —"সতিই অন্যায়, করপীড়ন চলে বলে কি করমর্দনও চলবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী হইতে কোন কোন এলাকায় মেট্রিক প্রথায় ওজন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। —"পাষাণ না ভাঙার ব্যবস্থাটা হয়ত আগের মতোই থাকবে"—বলে শ্যামলাল।

* * *

মুঃ খুশ্চেভ নাকি বলিয়াছেন যে পোশাক পরিহিত না থাকিলে "জার" এবং খুশ্চেভের মধ্যে পার্থক্য ধরা শক্ত। —"নূতন
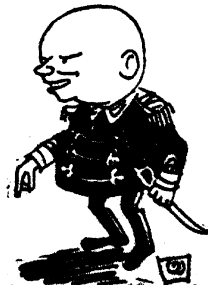
কথা কিছু নয়; খদ্দর এবং গান্ধীটুপি পরা না থাকলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ আর 'তেনাদের' মধ্যে তফাৎ কিছু থাকে না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মার্কিন বিমান হইতে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং শুনিলাম ফল ভালই হইয়াছে। —"আশা করা যায়, কিছুটা গ্রেস দিলে ফাইন্যালটাও তাঁরা পাস করে যাবেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

এপর্যন্ত বাজারে যে ধরনের বালব দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর ভিতরে প্রধান যে দুটি ফিলামেণ্ট থাকে সেগুলো লম্বায় একই মাপের হয়। "জেনারেল ইলেকট্রিক" কোম্পানী এই ফিলামেণ্টগুলি একটু অন্যরকম করবার জন্য পরীক্ষা করে দেখছেন। এরা ফিলামেণ্ট দুটি একই মাপের না করে একটি ছোট ও একটি বড় করে নয়ছেন এবং সমস্তটা মিলিয়ে ফিলামেণ্ট-গুলো "দ" এর মত হচ্ছে। এই নতুন রকম
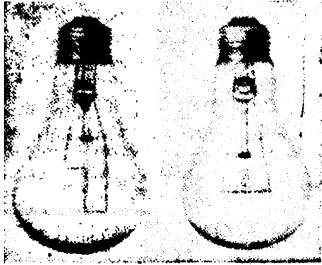
বাঁদিকের বালবটি পুরোন পদ্ধতিতে এবং ডানদিকের বালবটি নতুন পদ্ধতিতে তৈরী

ফিলামেণ্ট করার আলোর জ্যোতি কিছুটা বাড়বে। সাধারণভাবে আমরা যে রকম অল্প শক্তির বালব ব্যবহার করি সেগুলোতে শতকরা ছয় ভাগ জ্যোতি বাড়ে। আর খুব বেশী শক্তিসম্পন্ন বালবে শতকরা ১৫ ভাগ আলোর জ্যোতি বাড়ে। বর্তমানে এরা ১৫০ ও ১০০০ ওয়াটের দুরকম বালব

চক্রদত্ত

তৈরী করেছেন এবং আশা করেন যে, শীঘ্রই কম শক্তির বালবও তৈরী করতে পারবেন।

*

এম ভি জুডি নামে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি জাহাজ বোম্বেতে এসে পৌঁচেছে। এটি সর্বপ্রথম মাছ জমানর জাহাজ। এম ভি জুডির ওজন ১১৫ টন। এতে খুব তাড়াতাড়ি মাছকে ঠাণ্ডা করে জমিয়ে ফেলা যায়। দিনে প্রায় চার টন মাছ এই জাহাজের সাহায্যে জমিয়ে ফেলা যাবে। এর সঙ্গে যে হিমকক্ষটি আছে তাতে দিনে ৭০ টন মাছ জমা করে রাখা যাবে। জাহাজটি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল থেকে মাছ সংগ্রহ করবে। এম ভি জুডি শুধু মাত্র চিংড়ী মাছ সংগ্রহ করবে। এই সংগৃহীত মাছগুলি ভারতের বাজারে পাঠানো হবে না। এগুলো আমেরিকা এবং অন্যান্য বিদেশী বাজারে পাঠানো হবে, কারণ ওদের বাজার দর এদের তুলনায় চড়া। যখন ভারতের পশ্চিম উপকূলে ঘুরে ঘুরে মাছ সংগ্রহ করা হবে তখন ঐ পথ দিয়ে যে সমস্ত জাহাজ বিদেশে যাবে সেই জাহাজে ঐ মাছগুলি বিদেশে চালান দেবে। যে মাছ-গুলি এভাবে পাঠানো সম্ভব হবে না অথবা যথাসাধ্য পাঠানোর পর বাড়তি হবে সেগুলি ভারতের বিভিন্ন বন্দরে হিমকক্ষ সম্বলিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কোল্ড ষ্টোরেজ প্ল্যাণ্টে রাখা হবে। জাহাজটির সমুদয় কর্মচারী ভারতীয় হবে। আমেরিকার একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতবর্ষের টাটা প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে এই জাহাজ পরিচালনার ভার নেবেন।

*

অনেক সময় আমরা তুলনামূলকভাবে বলে থাকি যে, ইঁদুর বেড়ালের মত পটাপট মরছে। অর্থাৎ ইঁদুরের মৃত্যু যেন সহজেই ঘটে। কিন্তু অনেক সময় যে ব্যবস্থায় মানুষের মৃত্যু হয় ঠিক সেই ব্যবস্থায় ইঁদুরের কোনই ক্ষতি হয় না। ক্রিসমাস দ্বীপের কাছে সম্প্রতি বৃটিশরা যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তার অন্যান্য সমস্ত প্রধান প্রধান গবেষণা ছাড়াও বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেছেন যে, ঐ দ্বীপের ইঁদুরগুলি ও দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রের মাছগুলির কোনও ক্ষতি হয় নি। এই কারণে বৈজ্ঞানিকরা ঐ দ্বীপের ইঁদুর ও নিকটবর্তী সমুদ্রের মাছ ধরে গবেষণার জন্য প্রাণীতত্ত্ববিদগণের কাছে পাঠিয়েছেন। এঁদের গবেষণার ফলাফলের ওপর নতুন আবিষ্কার নির্ভর করছে।

*

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার সুস্থ দেহে আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সার্কাসের খেলাতেই দেখা

অগ্নি প্রতিরোধক নতুন ধরনের পোশাক

যায়। সত্যিকারের আগুনের ধারে কাছে যাওয়ার সাহসই খুব কম লোকের থাকে আগুনের মধ্যে যাওয়া তো দূরের কথা। দমকলের কর্মচারীদের আগুন নিভানর জন্য অনেক দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়, কিন্তু আগুনের মধ্যে যাওয়ার সাহস বড় একটা থাকে না এবং গেলেও কার্যোদ্ধার করে সুস্থ দেহে ফিরে আসার সম্ভাবনাও কম থাকে। অনেক সময় বিপদে পড়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে। আজকালকার এলুমিনিয়মের পোশাক পরে, কিন্তু স্বচ্ছন্দেই আগুনের মধ্যে গিয়ে কাজ করা যায়। এতটুকু আঁচও গায়ে লাগে না। পোশাকটির ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড। একরকম অগ্নি-প্রতিরোধক আঁশ দিয়ে এই পোশাক তৈরী হয়, আর এর ওপরে একটা এলুমিনিয়মের আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। এই পোশাকটির ভিতরে অবশ্য কোনওরকম ইনসুলেশন বা আগুন প্রতিরোধক আস্তরণ থাকে না। এই পোশাকটির সবচেয়ে বড় গুণ যে, এটি যতখানি উত্তপ্ত হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগ তাপ বাইরে ছড়িয়ে দেয় এবং ভিতরটা ১০৮ ডিগ্রীর বেশী কখনও উত্তপ্ত হয় না। অবশ্য নিরাপত্তার জন্য পরিচ্ছদধারীকে আগুনের মধ্যে থাকাকালীন সব সময় চলাফেরা করা দরকার, কোনও স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়।

কবিতা

অরণ্য-মরাল। গোবিন্দ চক্রবর্তী। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী বর্তমানকালের একজন বিশিষ্ট কবি। বিশেষ কোনও গোষ্ঠী অথবা দলের তিনি অন্তর্ভুক্ত নন্। তার ফলে কিছু কিছু দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, তাঁর কবিকর্ম সম্পর্কে যতটা আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, তা এখনও হয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়ের নয়, পরিতাপের। এ-কথা বলবার কারণ এই যে, তরুণ কবিদের মধ্যে যাঁরা আপনাপন কাব্যভাবনায় একটি সংশয়াতীত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন। সাময়িক কোনও উন্মাদনায় তিনি কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হননি, বিষয়বিমুখ ভঙ্গীর উৎকট আধিপত্য তাঁর অসহ্য এবং খুব্যেবো কিছু কথা বলেই অধিকাংশ কবির উদ্যম যে-ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়—সন্দেহবাতিকতাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে মানব-জীবনের মৌল কিছু আনন্দ-বেদনার কথাই তিনি শোনাতে চেয়েছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেও তার পরিচয় পাওয়া গেল।

এটি তাঁর দ্বিতীয় বই। প্রথম বইয়ের নাম "উত্তরণ"। মাঝখানে প্রায় বছর দশেকের ব্যবধান। এই দশ বছরে—জাগতিক ঘটনা-পরিবেশের প্রভূত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর শিল্প-প্রত্যয়ের কোনও রূপান্তর ঘটেনি। শুধু একটি বিষয় লক্ষ্য করে আমরা আনন্দিত হয়েছি। আগে তিনি একটু-বা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁর কবিতার বর্ণপ্রলেপেও একটু-বা চড়া রঙের প্রাধান্য দেখা যেত। তাঁর বলবার কথা যদিও বিশেষ-কিছু পালটায়নি, তাঁর কণ্ঠ এখন অনেক নম্র হয়ে এসেছে; আর তাঁর বিষয়-বর্ণনার রঙও এখন আগের চাইতে অনেক বেশী মৃদু, প্রসন্ন। কণ্ঠের এই নম্রতা এবং বর্ণের এই প্রসন্নতাকে একমাত্র তাঁরাই হয়তো প্রত্যয়ের দৌর্বল্য বলে মনে করবেন, নিতান্ত তুচ্ছ কথাকেও যাঁরা উঁচু গলায় ঘোষণা করতে ভালবাসেন। আশা করব, তেমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বিশ্বাস করব, এমন পাঠকও অবশ্যই আছেন, এই নম্রভাষী, শান্তচিত্ত কবির কাব্যভাবনার স্থির, অবিচল লক্ষ্যটিকে যিনি অনায়াসেই চিনে নিতে পারবেন।

গোবিন্দ চক্রবর্তী বুদ্ধিমার্গের পথিক নন। কদাচ ছিলেন না। হৃদয়বৃত্তিই তাঁর প্রধান উপজীব্য। এবং তাঁর কবিতায় একটি উষ্ণ, সংবেদনশীল হৃদয়ের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। "অরণ্য-মরাল"-এর কবিতাগুলিও প্রধানত সেই মমতাময় হৃদয়ের আনন্দ-বেদনার রসেই আপ্লুত হয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত "কোন দিন", "মূক", "কান্না" ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। মাত্র একবার পড়েই এই কবিতাগুলিকে সরিয়ে রাখা যায় না, বারবার পড়তে হয় এবং পড়বার অনেকক্ষণ পরেও পাঠকের চিত্তে একটি শান্ত, করুণ, বিষণ্ণ সুরের ঝঙ্কার বাজতে থাকে।

আর-একটি কথারও উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। গোবিন্দ চক্রবর্তীর বর্ণনার হাত অত্যন্তই দক্ষ; কিন্তু শুধু বহির্দৃশ্যের বর্ণনা নিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, প্রায় সর্বদাই তিনি বাহির ও অন্তরের মধ্যে সাযুজ্য সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। সে-প্রয়াস সর্বত্র সফল হয়েছে, এমন কথা বলব না। কিন্তু তার অন্যনিরপেক্ষ মহত্ত্বকে কে অস্বীকার করবে।

এ-সবই প্রশংসার কথা। এবং "অরণ্য-মরাল"-এর কবি আপন অধিকারেই এই প্রশংসা দাবি করতে পারেন। কিন্তু তার পরেও কিছু কথা থাকে, যা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গোবিন্দ চক্রবর্তী যে আঙ্গিকের আধিপত্যে বিশ্বাসী নন, আগেই তার আভাস দিয়েছি। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, নিজস্ব অধিকারেই কবিতার বহিরঙ্গ যে-কোনও প্রধান কবির কাছে যেটুকু মনোযোগ দাবী করতে পারে, "অরণ্য-মরাল"-এর কবির কাছে তা সে পায়নি। তা যদি পেত, তা হলে তিনি "গগন"-এর সঙ্গে "কখন", কিংবা "ভয়াল"-এর সঙ্গে "মরাল", কিংবা "জীবন"-এর সঙ্গে "আঙ্গন"-এর মিল দেবার আগে আরও দু-একবার চিন্তা করতেন। তা ছাড়া মাত্রা ঠিক রাখবার স্বার্থে "সে" শব্দটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ, এবং "গুটি-গুটি" "চুপি-চুপি", "নূন-নূন", "লাল-লাল" ইত্যাদি দ্বৈত-শব্দের আত্যন্তিক ব্যবহারও সব সময়ে শ্রুতি-সুখকর হয়নি।

"অরণ্য-মরাল"-এর প্রচ্ছদ নিরাভরণ, অথচ সুন্দর।

৩০।৫৬

তৃতীয় নয়ন—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ২বি বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা ৩। দাম—২্

একজন ভাল কবির কয়েকটি মোটামুটি ভাল কবিতার সংকলন। এ কবি সম্বন্ধে একটা বিশেষ আশার কথা এই যে, তিনি সময় সম্বন্ধে অতি বেশী সচেতন নন, এবং কাব্যবস্তু সন্ধানের জন্য তাঁকে দেশী-বিদেশী কবিকুলের কাছে হাত পাততে হয় না। এ কবি আত্মবিশ্বাসী।

তবে তৃতীয় নয়ন পড়ে মনে হলো পূর্ণেন্দু-প্রসাদ পরিপূর্ণ একটি সার্থক কবিতা লেখার চেয়ে নানা বিষয়ে কয়েকটি ভাল কবিতা লিখে উঠতে পারলেই যেন খুশি। এ-গ্রন্থে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাদের সম্বন্ধে বলা যায়, অভ্যাসগত রচনার ফল। ত্রুটি নেই, অথচ দীপ্তিও নেই। আবার এমন কবিতাও আছে যা মনের মধ্যে মধুর একটি অনুভূতির রেশ রেখে

যায়। অবশ্য একজন কবির পক্ষে একাদিক্রমে অনেকগুলো সার্থক কবিতা রচনা করা প্রায় অসম্ভবই।

'তৃতীয় নয়ন' সংকলন থেকে কবির বিশেষ কোন চরিত্রকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা কয়েকটি কবিতার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। তবে এইটুকু লক্ষ্য করা গেল, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্যের বিষয়কে তিনি তাঁর কবিতায় প্রাসঙ্গিক আভাসে ব্যবহার করতে চান। আধুনিক ইংরেজি কবিতায় এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু এ পদ্ধতি যথাযুক্ত না হলে কবিতা এত বেশী অস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রচনা রীতিই সে কবিতার ব্যর্থতার জন্য দায়ী হয়ে পড়ে। তারও দু' একটি নমুনা আছে 'তৃতীয় নয়ন' কাব্য গ্রন্থে। ৫৬।৫৬

ছোট গল্প

জোনাকি—বিমল কর। প্রকাশক—বাসন্তী বুক স্টল, ১৫৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম—২৲ টাকা।

বছর কয়েক আগে যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক রূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে আসছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে লোকচক্ষুর অগোচরে লুপ্ত হয়ে গেছেন, এবং তাঁদেরই অবশিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে যাঁদের নাম এখন বহু পাঠকের মুখে মুখে শোনা যায় বিমল কর সেই দলের। অনেকগুলো গল্প লিখেই যে পাঠকের মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেছেন তা নয়, বস্তুত, তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু নতুনত্ব আছে যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, কিন্তু মনকে ভাবিত করে। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁর বহু-আলোচিত 'হ্রদ' উপন্যাসেই এই নতুনত্ব পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। আপাতভাবে দেখতে গেলে এ নতুনত্ব বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক নয়, বরং বলা যায় এ পথে ইতিপূর্বে পদচারণা করে সার্থকতা লাভ করেছেন একাধিক লেখক। কিন্তু বিমল করের কৃতিত্ব এই যে, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় তাঁর রচনাকে সফল করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, যা বলতে গেলে, একেবারেই অভিনব।

গল্প বা উপন্যাস রচনার কালে বিষয়বস্তুর চেয়ে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হয়েছেন অনেক লেখক, কিন্তু বিষয়বস্তু বা ঘটনাপ্রবাহকে যথেষ্ট স্থান না দিয়ে পারেন নি তাঁরা। বিমল কর তাঁর লেখায় অন্তত ছোট গল্পে, সেই চরিত্রের প্রাধান্য এমনি গভীরভাবে দিয়েছেন যে, বিষয়বস্তুকে মনে হয় একেবারেই উপলক্ষ মাত্র। লিরিক কবিতার ধর্মকে ছোট গল্পে বজায় রাখা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হতে দেখেছি অনেকের লেখায়, সে পরীক্ষাতেই যেন সোজাসুজি হাত দিয়েছেন বিমল কর। এবং মনে হয়, তিনি সার্থকই হয়েছেন; কারণ তাঁর যে কোনো একটি ছোট গল্প পড়লেই বিশেষ কোনো ঘটনায় মনটা আটকে যায় না, অথচ একটা উদাস অনুভূতিতে মন ছেয়ে যায়। একজন লেখকের পক্ষে এর চেয়ে সার্থকতা আর কিসে হতে পারে।

আলোচ্য গল্প সংগ্রহ জোনাকি তার নিদর্শন। বলে রাখা ভালো, আজ পর্যন্ত বিমল করের যত গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার করলে জোনাকির দু' একটি গল্প উৎকর্ষের দিক থেকে তালিকায় নীচের দিকেই থাকবে। তথাপি বলবো, লেখকের চরিত্র প্রকাশের পক্ষে এ সংগ্রহের অন্তত তিনটি গল্পই যথেষ্ট, যথা—উত্তম পুরুষ, বুদ্বুদ, আয়না। 'ম্যাপ' গল্পটি এত সাধারণ যে, প্রকাশ না করলেও ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু 'বৈরী' গল্পটি সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না। সমস্তটা আবহাওয়ায় কেমন একটি মানসিক অসুস্থতা ছড়িয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত একটা মহত্ত্বের পরিণতিতে গিয়ে লেখক পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঘটনাকে। কিন্তু লেখক চরিত্রের জন্যই গল্পটি কেমন যেন অস্পষ্টতার মধ্যে ঘুরাফেরা করে ফুরিয়ে গেল। কেবলমাত্র এই একটি গল্পের ব্যর্থতা দিয়ে প্রমাণ করা যায়, গল্প রচনায় যে পন্থাকে অবলম্বন করেছেন বিমল কর তাতে সার্থকতা লাভ করা খুব সহজসাধ্য নয়। তবে ভরসা এই, তাঁর বহু রচনার সঙ্গে আধুনিককালের পাঠকদের নিবিড় পরিচয় ঘটে গেছে এবং তিনি তাঁর এই রচনার গুণেই তাঁদের মধ্যে নিজের আসনকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন।

সমীর সরকার যে সত্যিকারের একজন গুণী শিল্পী, জোনাকির প্রচ্ছদপট তার একটি ভাল প্রমাণ। ৫৮৭।৫৫

ভারতীয় দর্শন

সাংখ্য ও যোগ—শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ইঁহার লিখিত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বাংলার চিন্তাশীল সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সাংখ্য এবং যোগ এই উভয় দর্শনের অবদান সুপ্রাচীন। সাংখ্যের মননশীলতা সূক্ষ্ম, গভীর এবং ব্যাপক। প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াই ভারতের দার্শনিকতা বিচিত্রভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বহু প্রাচীন এই দর্শনের মূল সূত্রটি এখন আর পাওয়া যায় না। সাংখ্যকারিকা এবং প্রবচন সূত্রের ভিতর দিয়া এই দর্শনের ধারাটি বিস্তার লাভ করিয়াছে। এইগুলির ব্যাখ্যা ভাষ্যের পরবর্তী যুগে সাংখ্য মতের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে সেই পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাচীন এবং আধুনিক সাংখ্যের মতবাদের বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আধুনিক সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদের যুক্তি তিনি খণ্ডন করিয়াছেন এবং বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে মিল কোথায়, পার্থক্যই বা কিরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন। যোগ দর্শনের সারকথাগুলিও তিনি অল্পের মধ্যে বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। তাঁহার বিচার এবং বিশ্লেষণভঙ্গী সুন্দর। এই আলোচনায় আগাগোড়া একটা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা সাধারণত পারিভাষিক জটিলতায় দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে; কিন্তু গ্রন্থকারের আলোচনায় সে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উপলব্ধিতে কোনরূপ অস্পষ্টতা নাই, এইজন্য তিনি সহজ ভাষায় এবং সরলভাবে দুরূহ তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় দর্শনের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি তাঁহার অভিব্যক্তিকে উপাদেয় করিয়াছে। তাঁহার লেখায় আগাগোড়া প্রকৃত পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি পড়িয়া বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। পুস্তকখানি বাংলার চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ৫৮৮।৫৫

রস-নাটিকা

টনসিল—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম সি সরকার এণ্ড সনস লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

একটি বিশেষ ধরনের হাস্যরস পরিবেশনে বিভূতিভূষণ সিদ্ধহস্ত। বরযাত্রী গল্পটি যেদিন প্রথম প্রকাশিত হয়, সেইদিন হইতে তাঁহার খ্যাতির সূত্রপাত। আলোচ্য নাটিকায় সেই বরযাত্রীর দল আবার দেখা দিয়াছে। সেই গোরাচাঁদ, ত্রিলু, রাজেন, ঘোঁতনা ও কে-গুপ্ত সকলেই হাজির। মোটকথা শিবপুরের দল যে যার বৈশিষ্ট্য লইয়া আবার আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। এবার কবি-মানুষ রাজেনের জন্য পাত্রী সংগ্রহের চেষ্টায় বন্ধুরা কেমন করিয়া নাজেহাল হইল, 'টনসিল' তাহারই কাহিনী। পাত্রী ছায়ার স্বাস্থ্য-বৃদ্ধির আশায় চিকিৎসাসংকট এবং টনসিল কাটাইতে গিয়া হাসপাতালে মিস টেম্পল ও ছায়ার দিদিমাকে লইয়া যে সব ফাসাদ ঘটিল, নাটিকায় তাহা নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্যাবিহীন বিশুদ্ধ 'ফান' বা হাস্যরস দিয়া বাংলায় খুব কমই প্রহসন আছে। বিভূতিভূষণ এই হিসাবে অগ্রণী। এই নাটিকার যে ছায়াচিত্র হইয়াছে, তাহা বইখানির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। (৬১৮।৫৫)

অনুবাদ

অন্তরঙ্গ লীলা—স্টিফান জাইগ : অনুবাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শংকর সাহিত্য সংসদ, ১৩ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা ১৫। দাম—২,

মাত্র বারো বৎসরের ছেলে এডগার, বয়ঃসন্ধির কাল পার হতেও সময় আছে অনেক। প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে তার একান্ত আদরের মা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আছে একজন নতুন চেনা যুবকের সঙ্গে। অথচ তাদের এই অভিসারের অর্থ সে বোঝে না। স্বল্প জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে তা বুঝতে চেষ্টা করে এবং মায়ের জন্য নয়, নিজেরই প্রয়োজনে তাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে সে বারবার চরম মুহূর্তে বাঁচিয়েও দেয় মাকে। অথচ সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেও সব কিছু তার জ্ঞানের বাইরে।

শিশু মনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, কিন্তু শিশু সাহিত্য নয়; গড়ে উঠেছে একটি রসঘন, একেবারে একটি আদি রসাত্মক কাহিনী। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে এমনিতেই স্টিফান জাইগ একটি পরম বিস্ময়, তার উপর এখানে পরীক্ষা হয়েছে একটি অত্যন্ত দুরূহ রচনাশৈলীর। সব মিলিয়ে এ এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি মনে হবে পাঠকদের কাছে।

সে সঙ্গে আছেন অনুবাদক শান্তিরঞ্জন। সম্প্রতিকালে যে কয়জন লেখক সাহিত্যের এ শাখাটিকে দিন দিন সমৃদ্ধতর করে তুলছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের একজন। এমন সাবলীল সুন্দর অনুবাদ খুব সচরাচর যে চোখে পড়ে না, তা আশা করি, যে কোন পাঠকই স্বীকার করবেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ চলছে।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সমীর সরকার, এক কথায় চমৎকার। ৫৯৫।৫৫

বুড়ো ও সাগর—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। অনুবাদ : লীলা মজুমদার। মনোমোহন বুক শপ। ১২৩।১এ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

মার্কিন লেখক হেমিংওয়ে কথাসাহিত্যিক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। তাঁরই অন্যতম রচনা ১৯৫৪ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সী' বইখানি এবার বাংলায় অনুবাদ করা হল। কিন্তু অনুবাদ নিতান্তই গতানুগতিক, বৈশিষ্ট্যহীন। বাংলায় মূলের আস্বাদ খুব কম পাওয়া গেল। স্থানে স্থানে ভাষার ও প্রকাশভঙ্গীর দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে। নাম-করা বইয়ের তর্জমা হওয়া ভালো। কিন্তু তার জন্য অনুবাদকের একটা প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং কিছুটা স্বভাব-দক্ষতার প্রয়োজন। ছাপা ভাল নয়, অনেক মুদ্রণ প্রমাদ এবং দামও অকারণ বেশি। (৯২।৫৬)

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আমার বাংলা ২য় গ্রন্থ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সোনার ছেলে—ইন্দিরা দেবী।
ধাকুকার ৪১—শ্রীতারক মিত্র।
রবীন্দ্র দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
মধুবাগ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী।
আচরণাবাদ—পুলকেশ দে সরকার।
বিপ্লব যুগের যুগল বলি—শ্রীরাজকমল নাগ।
বিমানে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি—চার্লস এ লিণ্ডবার্গ অনুবাদক—অ-কু-রা।
হাট বাজারের কথা—শ্রীক্ষিতীশ দেবনাথ।
বাঙ্গালী (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীমোহনচাঁদ সেন।
অঙ্কুর—এমিল জোলা : অনুবাদক—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বন কপোতী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
ভাববাদ খণ্ডন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
সুর ও স্বর—শ্রীবুদ্ধদেব রায়।
জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধান—শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রান্তিক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
নাথ বন্ধু হরিমোহন—শ্রীবংশীচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য।
Pioneers of Freedom—Ogla Frosh.
Chapayev—Dmitry Furmanov.
The Plains are Ablaze—Hsu Kuang-yao.
Looking Ahead—vera panova.
উদ্ভিদ জীবন—গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার।
করে দেখ-২য় খণ্ড—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।
মীরাবাঈ—শ্রীঅনাথনাথ বসু।
ভারতীয় গ্রামীন সংস্কৃতি—শান্তিদেব ঘোষ।
স্ব-নির্বাচিত গল্প—প্রমথনাথ বিশী।
দিবারাত্রির কাব্য—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সিন্দুর টিপ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাগর থেকে ফেরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
সম্রাট—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া আইন-১৯৫৬—শ্রীমনোজমোহন বসু।
২পুর নিষ্কৃতি—শ্রীনরেশচন্দ্র রায়।
শ্রীশ্রীলোকনাথ লীলাটক—শ্রীকেদারেশ্বর সেনশর্মা।
চীন দেখে এলাম-২য় পর্ব—মনোজ বসু।
বাজোয়ারা—দেবেশ দাশ।
কালো ভ্রমর—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
অদৃশ্য শত্রু—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
ড্রাগন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
চাঁপাডাঙার বৌ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইতিকথার পরের কথা—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
যে গল্পে আমেরা বড়ো—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
অজানার দেশে এলা—অনুবাদক অনিলেন্দু চক্রবর্তী।
সুন্দর হে সুন্দর—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।
গল্পের বই—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার।
সহজ রামায়ণ—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার।
পরিচয়—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
গল্পের মতো—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
সতুর্বাদার উপাখ্যান—সতুবদ্যি।
ভারতের মর্মবাণী—নির্মলকুমার সান্যাল ও পরস্পর—শচী মুখোপাধ্যায়।
এক আশ্চর্য মেয়ে—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
গৌতম বুদ্ধ—শ্রীআনন্দ।
ছেলেদের নজরুল—শ্রীরমেন দাস।

তৃষ্ণা

দিলীপকুমার বিশ্বাস
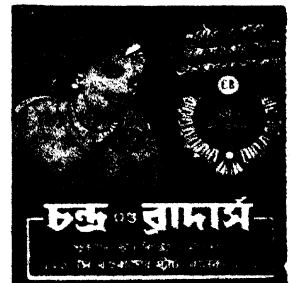
শহরেরও অলিগলি কোনো এক কবোষ্ণ সন্ধ্যায়—
মুছে ফেলে মন থেকে সারাটা দিনের সবই, জলছবি যেন;
অনামনা বাতাসেতে পাখি-শিস্ মৃদু আলাপন,
শিশির-শব্দের মত, তাও শেষ হয়েছে কখন!
কবেকার কার কথা মনে বুঝি পড়ে না; তখনো
ধূপদানী জ্বলে শুধু: পুড়ে পুড়ে স্মৃতি হয়ে সৌরভ ছড়ায়।

'ফের কবে দেখা হবে?' বলে প্রশ্ন করেছিল কোন্ সে দুপুরে
সে এক কোমল কন্যা, বুকে নিয়ে তৃষ্ণার আশ্বাস।
চলন্ত ট্রামের ভিড়ে, অগণন মানুষের আনাগোনা জুড়ে,
কখনো কাকের ডাকে, কখনো বা শ্রান্তিহীন ঝিঁঝিদের সুরে,—
বাতাস করেছে কাণাকাণি, সেই কথা নিয়ে কত বারোমাস!
আগুন-দুপুরে বুঝি সব মিথ্যে ছাই হয়ে গিয়েছিলো পুড়ে।

সে মেয়ের চূর্ণ চুল, চোখের চপল, আর গালের নিটোল
ছিল কি ছিল না, দাঁতে কচি ঘাস কুচি কুচি করা
সেদিনও দেখেছি কিনা,—মনে নেই এতকাল পরে;
এই সব এলোমেলো খুঁটিনাটি ঝরে গেছে সময়ের ঝড়ে।
অন্য কিছু নয়। শুধু মাঝে মাঝে বাতাসের লঘু চলাফেরা
ছোট কটি কথা নিয়ে শুধু শুধু হয়েছে উতল।

কতকাল চলে গেছে। এই হাওয়া। সেই পরিচয়।
ধূপছায়া যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে তবু আজও মনে হয়—
জীবনের রৌদ্রে রাঙা পাখির ডানায় আজও সেই
তোমাকে চাওয়ার মত অপরূপ চাওয়া আর নেই।

দিন যায়

মৃগাঙ্ক রায়

দিন যায়
সমস্ত আকাশ জুড়ে
যায় আমার দিন যায়
আমার সমস্ত দিন তাকিয়ে দেখা
সমস্ত দিনের ছায়া দিয়ে মাপা
দিন যায়
আমার দিন যায়।

কে তুমি এ পথে গেছ ভোরে
কে ফের সন্ধ্যায়।
নদীর আঁচল লাল
রাঙা ধুলো ওড়ে মাঠে মাঠে,
মুণ্ডহীন বুদ্ধমূর্তি, প্রাচীন তালের সারি ম্লান।
ঘরফেরা গরুর গলায়
ক্লান্ত ঘণ্টা বাজে
দিন যায় যেন দিন যায়।
একার প্রচণ্ড ধনুক এ দিগন্ত
পূবের পাহাড় থেকে মুক্ত ক'রে শর
এখনো কাঁপছে। তারই তীক্ষ্ণ মুখে
দিন যায়
যায় আমার দিন যায়
আদি অন্তহীন ভীষণ বিষণ্ণ নির্জনতায়।

পূর্বলগ্ন

নৃপেন্দ্র সান্যাল

এ শূন্য কান্নার ঘরে বল সহসা কে-তুমি এলে,
মৃদু হাতে দ্বার খুলে জানালারও সার্শিটা ঠেলে!
আলো লাগা, হিমগলা ভোর ভীরু পায়
বুঝি চুপিসাড়ে এসে, আড়চোখে কিছু চেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

গতকীর্তি দেহমাপ ঘুমহীন দু'চোখের তলে
কী করুণ ছায়া ঘন, ঘরথেকে আলো প'ড়ে গ'লে
প্রতিবেশী ঝাউ বনে বুটিদার ফুল দিল বুনে,
কখনও শ্রান্ত তাও, জীবনের পরিমাপ গুনে।

ঘণ্টা ও মিনিট ধরে ছোট বড় ঘড়ির কাঁটায়
চলি ফিরি কথা বলি। নিঃঝুম শিশিরের মত ঝরে যায়
দুপুরের রঙ নীল, নির্জন আকাশ থরে থরে,
(মৃত তৃণশয্যা পাতা) গীর্জার মাথার ওপরে।

বৈকালী রঙ মেখে হলুদ পর্দাটা জানালার
লুটোপুটি করে বার বার কয়, বিষণ্ণ হাওয়ার
হাহাকারে পলাতক মন নিয়ে পথে যাই ফিরে।
তারপর ঠিক মিশি পায়ে পায়ে তাল দিয়ে মানুষের ভীড়ে।

লেশমাত্র ভাবহীন স্ফীতমেদ, মেদহীন কেউ,
নাকাল কামনা, আর ঢেউ
কলরোলে একাকার। তরল খুশিতে কেউ খুব কাছে ঘেঁসে
কথা কয় নতমুখে, (নেহাতই বালিকা সে-যে) ঠিক ভালবেসে।

অন্ধকার গাঢ় হলে ঘরে ফিরি কুয়াসার তীরে
তোমার চোখের ছায়া তবুওতো শান্তি দেয়—
প্রার্থনা মিশে যায় কথার শরীরে '

—শৌভিক—

ভারতের পর্দায় বিদেশী ছবি

কোন দেশের ছবি দেখাতে কোনরকম নিষেধ নেই পৃথিবীর যেসব দেশে, ভারত তাদেরই একটি দেশ। তবুও এদেশে যতো বিদেশী ছবি দেখানো হয় তার মধ্যে প্রায় আশীভাগই হচ্ছে মার্কিন, আর বাকি বিশ ভাগের ষোল ভাগ বৃটিশ। তার কারণ সেই বৃটিশ আমলেই এদেশে এই দুই দেশই ছবির ব্যবসা ফেঁদে রেখেছে। বৃটিশরা দেশের দখলদার বলে হতো তাদের দেশ থেকে ছবির আমদানী, আর এদেশে ইংরাজীরই চলন বলে এবং বাজারে জুগিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট ইংরাজী বৃটিশ ছবির অভাব থাকায় মার্কিন ছবিরও চলন হয়। সেই নির্বাক যুগ থেকে এদেশের ছবির

কিন্তু ডাব কর্ম যতোই নিখুঁত হোক এবং তদ্বরুণ খরচের কথা বাদ দিলেও অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, মূল ছবির প্রাণের পরশ তার অধিকাংশেই থাকে না এবং এই আসল অভাবের জন্যই ডাব করা ছবি লোকের পছন্দ হয় না। তাই মূলে ইংরাজীতে তোলা ছবিই চলে ভারতের বাজারে। অনেকের ধারণা যে 'কারেন্সী'র বাঁধাবাঁধির জন্যেই অন্য দেশের ছবি এদেশে

স্টার থিয়েটারে 'পরিণীতা'র শততম অভিনয় উদ্‌যাপন উৎসবে শ্রীমতী চন্দ্রলেখা সিদ্ধান্তের হাত থেকে গ্রন্থরাজি উপহার নিচ্ছেন নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। মধ্যে উপবিষ্ট অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এবং পাশে প্রধান অতিথি শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পর্দা মার্কিন ছবিতেই ছেয়েও যায়; তারও কারণ মার্কিন ছবি বহুল সংখ্যায় পাবার সুবিধে ছিল বলে। সেকালে কিছু কিছু ইতালীয় বা ফরাসী বা জার্মান ছবি যে এসে জুটতো না তা নয়, কিন্তু সবাক হবার পর ভাষার অসুবিধের জন্যে তারও আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। এদেশে চলে বলে ইংরাজী ভাষার ছবিরই আদর —ফলে বিদেশী ছবি বলতে শুধু ইংরাজী ভাষার ছবিরই চল, অর্থাৎ সেই মার্কিন ও বৃটিশ ছবিই শুধু। অন্য দেশ ছবি দেখাতে চায় তো তাদের ছবি ইংরাজী ভাষায় না হলে ইংরাজীতে ডাব করে নিতে হয়, কিছু কিছু ছবি হিন্দীতেও ডাব করে দেখানো হয়েছে।

যথেচ্ছ সংখ্যায় প্রদর্শিত হতে পারে না। এটা যদি সত্যি হতো, তাহলে মার্কিন ছবিও এই বাঁধাবাঁধির খপ্পর থেকে রেহাই পেত না। আসল হচ্ছে ভাষাজনিত অসুবিধা; আর অসুবিধা হচ্ছে মার্কিন

ও বৃটিশ ছবি দীর্ঘকাল ধরে বাজার দখল করে থাকায় সেই বাজারে নতুন কারুর মাথা গলানোর অসুবিধা। ভারতের হাজার তিনেক চিত্রগৃহের মধ্যে নিয়মিতভাবে ইংরাজী বা বিদেশী ছবি দেখিয়ে যায়, এমন একশ চিত্রগৃহ সারা দেশ চুঁড়েও আজ বের করাই মুশকিল। এতো ছোট বাজারে এসে কাড়াকাড়ি করতে প্রবৃত্ত হতে আর কোন দেশই চাইবে না, তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন ও বৃটিশ ছবির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যে হুজ্জত ও অর্থব্যয়ের ধাক্কায় পড়বার সম্ভাবনা, তাতে আশংকা হয়, লাভের কড়ি শেষ পর্যন্ত পিঁপড়ের মুখেই যাবে চলে। এই রকম নানা কারণেই এদেশে দিশী ছবির প্রসারের চাপ সহ্য করেও যেটুকু বিদেশী ছবির বাজার এখনও রয়েছে তা মার্কিন ও বৃটিশ ছবির দখলেই থেকে গিয়েছে। এই মাত্র দুটি দেশের ছবি এদেশে আসায় আমাদের নানারকম ক্ষতি, অসুবিধা ও বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে অনবরতই।

* * *

ক্ষতি হচ্ছেঃ (১) শুধুই মার্কিন ও বৃটিশ ছবি থাকায় অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রের গতি-প্রগতি ও ধারা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের দেশের চিত্ররসিক জনসাধারণ এবং চলচ্চিত্র শিল্পও অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। অন্য দেশের ছবি যখন এদেশের বাজারে দুষ্প্রাপ্য, তা সে যে কারণেই হোক, এ অবস্থার প্রতিকার কিছুটা হতে পারে দেশময় ফিল্ম সোসাইটি প্রবর্তন করে বিদেশ থেকে ছবি আনিয়ে প্রদর্শন ব্যবস্থা দ্বারা। (২) কোন দেশের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সে দেশের সংস্কৃতি, নৈতিক মান ও আচার-আচরণের কিছু কিছুও আভাস পাওয়ার যে সুযোগ থাকে, তা আমরা আমেরিকা ও বৃটেন বাদে আর প্রায় সব দেশ সম্পর্কেই অনবহিত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। ফলে, (৩) এদেশের রুচি ও নৈতিকতা কেবলমাত্র মার্কিন ও বৃটিশ ছবির দ্বারাই প্রভাবিত অথবা বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনাযুক্ত হয়ে রয়েছে এবং অনেকদিন ধরেই তা হয়েও আসছে। অন্য দেশের ছবির মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার মতো অনেক কিছুই আহরণ করতে পারি এবং নেবই বা না কেন, কিন্তু শুধু মার্কিন ও বৃটিশ ছবি থাকায় আমাদের আহরণ ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা একপেশে হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য দেশ সম্পর্কে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পড়ে অনেক জ্ঞান অবশ্যই আহরণ করা যায়, কিন্তু ছবির যে সরাসরি আবেদন ক্ষমতা সেটা তো লাভ করে নিচ্ছে আমেরিকা ও বৃটেন। লোক বিদেশে বেড়িয়েও তো জ্ঞান আহরণ করতে পারে, কিন্তু সে সুযোগ কজন

শান্তারামের পরবর্তী ছবি 'তুফান ঔর দীয়া'তে নবাগতা নন্দা

লোককেরই বা থাকে! সুতরাং শুধু মার্কিন-বৃটিশ ছবির প্রভাবেই কবলায়িত হয়ে থাকতে হচ্ছে। আমাদের দেশে লোকের জীবনে ও সমাজে বিদেশী প্রভাবের যে ছাপ পাই, তার অধিকাংশ তুলে নেওয়া মার্কিন ও বৃটিশ ছবি থেকে। বিদেশী ছবির পৃষ্ঠ-পোষকের অধিকাংশই শিক্ষিত সম্প্রদায়, দেশেও তাদেরই প্রভাব। বিদেশী ছবির মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ জীবনের যে চটক ও জমক, ওদের যে ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তার প্রভাব এদেশের দর্শকদের এক শিক্ষিত শ্রেণীকে এমন উন্নাসিক করে তোলে যে, তারা এদেশের সব কিছুকেই বিদেশের, মানে ঐ দু'দেশের তুলনায় ফেলে হেয় বর্বর বলে প্রচার করতে সংকোচ বোধ করে না। আবার অনেক সময় ছবিতে দেখা ঐ দু'দেশের দৃষ্টান্ত নিয়ে এদেশের রীতি ও নীতির বিরোধিতায়ও দ্বিধা করে না। এ অবস্থার প্রতিকার করা যায় মার্কিন ও বৃটিশ ছবির আমদানী অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে দিয়ে, অথবা এমন ব্যবস্থা করে, যাতে অন্যান্য দেশও এদেশে ছবি দেখাতে প্রলুব্ধ হয়। সরকারীভাবে এর কোন উপায়টিকেই খাটানো সম্ভব নয়। কারণ ভারত অবাধ বাণিজ্যের দেশ; ভারতে ব্যবসা করার যে নিয়মকানুন যে দেশ তা মানবে, সে দেশই এদেশের বাজার খোলা পাবে। একটি দেশ আর এক দেশের সঙ্গে

"পথের পাঁচালী" স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী প্রচেষ্টা "অপরাজিত"তে বালক অপুর ভূমিকায় পিনাকী সেনগুপ্ত

ব্যবসায় পেরে উঠছে না বলে সেই অপারগ দেশটিকে কোনরূপ বিশেষ সুবিধে করে দিয়ে ব্যবসায় দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, তেমন কোন ব্যবস্থাই করা চলতে পারে না।

• • •

একদিক থেকে আবার দেখা যায় এদেশে প্রদর্শিত বিদেশী ছবি ধরতে গেলে ক্রমশঃই যেন অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। যতো ছবি দেখানো হয় তার অধিকাংশই হচ্ছে মার্কিন ছবি, তাই দোষটা মার্কিন ছবিরই বেশী। এ আলোচনাও তাই বলতে গেলে মার্কিন ছবির বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তু ধরে আমাদের দেশে দেখানো বিদেশী ছবিকে, যার মধ্যে মার্কিন ছবিই বেশী, এইভাবে ভাগ করা যায়: (ক) খুন রাহাজানি, গুণ্ডা দৌরাত্ম্য, (খ) নাচগান রঙ্গ কৌতুক ও ফেশান সহযোগে আদিরস পরিবেশন; (গ) যুদ্ধ, (ঘ) এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর চেয়ে শ্বেত-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। এর বাইরে সিরীয়াস বা ভব্য প্রকৃতির ছবি থাকে খুব অল্পই। বেশীদিন দূরে যাবার দরকার করে না, এই বছরেরই তালিকাতে দেখা যায় যে, ১লা জানুয়ারী থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী মোট যে ৮৬ খানি ছবি সেন্সর বোর্ডকে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয় তার মধ্যে ২১ খানি ছবিকেই এদেশে প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বাতিল করতে হয়। আপত্তিকর অংশ কেটে বাদ দিয়ে প্রদর্শনের জন্য সার্টিফিকেট পায় ৩৩ খানি ছবি, এর মধ্যেও আবার ১৫ খানি ছবি সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছবিগুলির ২১ খানির মধ্যে ১৯ খানি হচ্ছে মার্কিন, ১খানি বৃটিশ এবং একখানি রুমানীয়। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট আফ্রিকার পটভূমিতে তোলা আটখানি ছবি এদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে. এর মধ্যে ২ খানি বৃটিশ এবং বাকি সবই মার্কিন। বরাবরই দেখা গিয়েছে যে ওরা আফ্রিকা-এশিয়ার পটভূমিতে ছবি তুললেই ঐ দুমহাদেশের অধিবাসীদের এবং তাদের জীবনধারা এমন দেখায় যাতে শ্বেতজাতির সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্বটাই জাজ্জ্বল্য হয়ে প্রকাশ পায়। হেয় বা অপমানজনক যদি নাও করে তো এরা যে অতি প্রাচীন ও সভ্যজাতি সেটা কিছুতেই ফুটতে দেওয়া হয় না। আফ্রিকার ছবি দেখে দেখে তো এদেশের দর্শকদের ধারণাই হয়ে রয়েছে যে ওদেশটা রাক্ষোস-খোক্কোস আর হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল মহাজঙ্গল ছাড়া কিছু নয়। ভারত পৃথিবীর সব দেশেরই বন্ধু, এবং অন্যদেরও তাই চায়, কাজেই কোন দেশ সম্পর্কে এদেশের লোকের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে, বা কোন দেশকে ছোট করে দেখালে, সে ছবির এদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করাতেই হয়। ভারতে প্রবাসী আফ্রিকার শিক্ষার্থী দল এ নিয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে দরবারও করেছে কিছুদিন আগে। যা একটা দেশের লোকের মনে আঘাত দেয় তা বন্ধ করার জন্যই আফ্রিকার পটভূমিতে তোলা ছবির প্রদর্শন বন্ধ করা হয়েছে। অন্য দেশের প্রতি কটাক্ষপাত বা গালাগাল দেওয়া থাকলে কোন ছবিতে, সে ছবি স্বতঃই আমাদের দেশে দেখাতে দেওয়া যেতে পারে না। আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ, কিন্তু তা আমাদের দেশ পর্যন্ত চালান আসবে কেন? সুযোগ পেলেই মার্কিন ছবিতে তা প্রবিষ্ট করে রাখা হয়, যেমন এই ধরনের উক্তি:

"She spent a long years behind Iron Curtain with considerable damage to her body and soul." "Darkness defeats even the Russians".

ইত্যাদি (নেভার সে গুডবাই)। কিংবা কোন ছবিতে যদি দেখানো হয় জার্মান সৈন্যেরা বৃটিশ বন্দীদের ওপর অত্যাচার করছে (এবাভ আস দি ওয়াটার্স), তেমন অংশ আমাদের দেশের দর্শকদের কাছে কেনই বা পরিবেশন হতে দেওয়া হবে। বাধা হয়েই সেন্সরকে এমন অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। আমেরিকার ছবিতে রেড ইণ্ডিয়ানদের

সাধারণত অতি বর্বর করে দেখানো হয়। তাদের কিন্তু অভিহীত করা হয় শুধু 'ইণ্ডিয়ান' বলে। আমেরিকার লোকে বা পৃথিবীর অন্যদেশের লোক যাতে ঐ 'ইণ্ডিয়ানদের' ভারতবাসী বলেই মনে না করে তাই ওদের রেড ইণ্ডিয়ান বলে অভিহীত করে দেবার জন্য হলিউডের অন্যতম কর্ণধার স্প্যাইরস স্কুরাস ভারতে এলে তাকে বলা হয়েছিল। তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিকার করবেন বলে, কিন্তু তা করা হয়নি। তবুও এদেশে এখনো বহুসংখ্যক ঐ 'ইণ্ডিয়ান'-দের সম্পর্কে ছবি দেখানো হচ্ছে। সেন্সর থেকে যেসব অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় তার অধিকাংশই হচ্ছে মেয়েদের স্বল্প পোষাক বা প্রায় নগ্ন অবস্থা, অনাবৃত বক্ষদোলন, নিতম্ব দোলন, কামোন্মত্ত চুম্বন, মদ্যপান ও ঢলাঢলি, নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড বা মারামারি, 'ইউলিসিস'-এ যেমন জানোয়ার রোস্ট করা, বা পেনিলোপিকে উদ্দেশ করা বলা "We are too many for one bed" (ইউলিসিস) বা "There's not one potential male in town," বা মেয়েকে মায়ের প্রশ্ন "does he ever go beyond kissing" (পিকনিক) ইত্যাদি ধরণের ইয়ার্কির কথা। তবুও এদেশের রুচি অনুযায়ী গর্হিত এমন উপাদান বড়ো কম থাকে না যে সব বিদেশী ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে দেখানো হয় সে সবের মধ্যেও।

"পরিণীতা"র শততম রজনী

একশ রাত ধরে নাটকের অভিনয় এখন যেন আর ঘটনাই নয়। গত সপ্তাহেই তো মিনার্ভায় "এরাও মানুষ" সে কীর্তি দেখিয়েছে; আবার রঙমহলে তো "উল্কা"র চারশ রজনীই এসে পড়লো। তার আগে এই স্টারেই "শ্যামলী" পাঁচশ রাত অতিক্রম করতে বসে গিয়েছে। কাজেই একশ রাতে পৌঁছনো যেন তেমন কোন ব্যাপারই নয়। তবে ব্যাপার বলে গ্রাহ্য হয়ে যাওয়া নির্ভর করে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের ধরনের ওপর। মিনার্ভা থিয়েটার গত সপ্তাহে একটা নতুনত্ব আনেন, সবায়ের সঙ্গে ক্লাক, দরোয়ান ঝাড়ুদারদের পর্যন্ত নাম ডেকে মঞ্চে উপস্থিত করে দর্শকের সামনে তাদের হাতে হাতে পদক প্রদান করে। থিয়েটারের কর্মীদলভুক্ত হলেও দর্শকের সামনে মঞ্চে দাঁড়াবার এই বোধহয় প্রথম সুযোগ পেলো ওরা। ওদের এইভাবে কেউ মর্যাদা দেয়নি এতোদিন। গত ২৪শে মে "পরিণীতা"র শততম অভিনয় উদ্‌যাপন উৎসবটিও স্টারের স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র একটি প্রশংসনীয় ঘটনায় রূপান্তরিত করে তোলেন। এর আগে যখনই কোন বহু-রজনী উদ্‌যাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে উৎসবের স্মারক হিসেবে শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে অলঙ্কার, বস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। এবারে "পরিণীতা"র বেলায় সেসব সামগ্রী না দিয়ে উপহার দেওয়া হয় গ্রন্থ। অত্যন্ত সংস্কৃতিবান রুচির পরিচয় পাওয়া গেল এ থেকে। সবসুদ্ধ সতেরশ' টাকা মূল্যের গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। এক একজনে পাঁচ-সাত-দশখানা করে বই পেয়েছেন। নানা বিষয়েরই বই ছিল—গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, কবিতা, নাটক, স্বরলিপি, নাটকের ইতিহাস, সংগীতের ইতিহাস, কৌতুক রচনা ইত্যাদি। রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বই তো ছিলই, সেই সঙ্গে এখনকার লেখকদেরও অনেকেরই বই ছিল। শিল্পী ও কর্মীদের এক এক করে নাম ডেকে ডেকে কে কি পাচ্ছে, সে বইগুলিরও নাম ঘোষণা করে দেওয়া হতে থাকায় সময় অনেকখানি চলে গেল বটে, কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বেশ একটু কৌতূহলের সাড়া পড়ে যায়। মাঝে মাঝে কৌতুকও লাগছিল, যেমন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ডেকে তাঁর পাওনা বইয়ের নাম ঘোষণা করতে প্রথমেই যেই 'হনুমানের স্বপ্ন' বলে উল্লেখ করা, সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে হাসির কলরোল। যাই হোক এবম্বিধ উপহারের মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে। আর রয়েছে গ্রন্থপাঠে শিল্পী ও কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার একটি সৎ প্রচেষ্টা। এইসব শিল্পী ও কর্মীদের কেউ কেউ হয়তো থাকতে পারেন, যাঁরা বই পড়া বা কেনা তো দূরের কথা, প্রখ্যাত লেখকদের নামও হয়তো শোনেন নি কখনও। এইভাবে উপহার দেওয়া, বইয়ের প্রতি তাঁদের একটা ঝোঁক জাগিয়ে তোলার কাজ করবে। আর বই এমনি জিনিস যে, খানকয়েক জমা হলেই সংখ্যা বাড়িয়ে যাবার ইচ্ছেও অমনি হাজির হয়ে যায়। তাই সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কথা-সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্য কিছু না বলে তাঁর বক্তব্য এই উপহারের বৈশিষ্ট্যের ওপর নিবদ্ধ রেখে বাঙলার গ্রন্থ-রচয়িতাদের পক্ষ থেকে স্টারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজটিতে যথাযোগ্য মর্যাদা আরোপ করে দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষাবিদ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত 'পরিণীতা'র আখ্যানবস্তুর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। নাটকখানির আরও দীর্ঘকাল চলা কামনা করে তিনি বলেন সিনেমার প্রকোপ সত্ত্বেও কলকাতার নাট্যশালা যে বেশ জমিয়ে চলছে, সেটা বিশেষ গৌরবের বিষয়। উপহার প্রদান করেন শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত।

একলব্য

অলিম্পিক প্রস্তাবনা

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সৃষ্টির ইতিহাস অশান্তি ও অমঙ্গলের মাঝে খেলাধুলোর মাধ্যমে শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শান্তিতে বাস করবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। দেশের চরম অমঙ্গল বা যুদ্ধের উন্মত্ততার মাঝে যখন মানুষের মনে অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ, তখন শান্তিতে বাস করবার প্রয়োজন মানুষ আরও বেশী করে অনুভব করেছে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধন কি করে প্রতিষ্ঠা করা যায় তারই উপায় খুঁজেছে মানুষ যুগে যুগে। তিন হাজার বছর আগে কি তার সমসাময়িক কালে 'গ্রীস' ছিল শতধা বিভক্ত। গ্রীসের অগণিত দলপতি ও ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে সব সময়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। বলতে গেলে যুদ্ধের লেলিহান শিখা সমগ্র গ্রীসকেই গ্রাস করে ফেলেছিল—অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্যে গ্রীসের আপামর জনসাধারণের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এই অমঙ্গলের মধ্যেই গ্রীস খেলাধুলো বা দৌড়-ঝাঁপের এক ক্ষুদ্র আয়োজন করে। এই খেলাধুলোর মধ্যেই তারা শান্তি বারির সন্ধান পায়, খেলাধুলোর জ্যোতির্ময় রূপের মধ্য দিয়েই শতধা বিভক্ত যুদ্ধোন্মাদ গ্রীসে শান্তি ফিরে আসে। সেই থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। অনুষ্ঠান ক্ষেত্রের নামানুসারে প্রতিযোগিতার নাম হয় 'অলিম্পিক'। গ্রীসের প্রসিদ্ধ শহর এথেন্সের ১২৫ মাইল দূরে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পটভূমিকায় 'অলিম্পিয়া' নামে এক সুন্দর সমতলভূমি ছিল। এই ভূমি-খণ্ডের একদিকে ছিল খরস্রোতা 'অ্যালফিয়াস' ও 'ক্ল্যাডিয়াস' নদীর মোহনা, অপর তিনদিকে ছিল গাছ পালায় ঘেরা সবুজ পাহাড়। এই 'অলিম্পিক' ভূমি-ক্ষেত্রেই বসেছিল অলিম্পিকের প্রথম আসর, গ্রীকদের সার্বজনীন খেলাধুলো বা দৌড়-ঝাঁপের প্রথম আয়োজন।

ঠিক কত সালে 'অলিম্পিয়ায়' প্রথম খেলাধুলার আসর বসেছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন খৃষ্টপূর্ব ১৪৫০ অথবা তার সমসাময়িক-কাল থেকে 'অলিম্পিক' আরম্ভ হয়। যখনই আরম্ভ হোক খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে অলিম্পিকের প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়।

যুদ্ধোন্মত্ত গ্রীসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক গ্রীসের অধিবাসীরা অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করতো। তাই অলিম্পিক আরম্ভের পূর্বে গ্রীক দেবতা জিয়াসের ৬০ ফুট উঁচু পবিত্র মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তারা সূর্যরশ্মি থেকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতো এবং অগ্নি সাক্ষী রেখে সমস্ত প্রতিযোগী ও বিচারককে ন্যায় নিষ্ঠা, সত্য, প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শপথ গ্রহণ করতে হতো। কখনো কোন প্রতিযোগী বা বিচারক এই শপথ ভেঙে চলেননি, এমন কথা শোনা যায়নি।

খেলাধুলো অলিম্পিকের মূল অনুষ্ঠান হলেও প্রথমদিকে কিন্তু খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গীত, আবৃত্তি, ভোজন ছিল অলিম্পিকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ৪ বছরের ব্যবধানে বসতো এক একটি অলিম্পিক আসর। ৪ বছরের মধ্যে গ্রীসের যে সব অধিবাসী মারা যেতেন তাঁদের আত্মার তৃপ্তি বিধান করা ছিল এই আসরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মৃত ব্যক্তিদের প্রিয় সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি করা হতো, তাঁদের প্রিয় খাদ্য সকলকে পরিবেশন করা হতো, তাঁদের প্রিয় অভিলাষকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা হতো, সঙ্গে সঙ্গে চলতো খেলাধুলো, ভোজন, আবৃত্তি সঙ্গীত ইত্যাদি।

ক্রমে অলিম্পিক গ্রীক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয় এবং অলিম্পিককে আকর্ষণীয় করবার জন্য দৌড়-ঝাঁপ ছাড়া কুস্তি, রথ চালনা, লৌহ চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোঁড়া, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি অলিম্পিক অনুষ্ঠান সংযোজিত হতে থাকে। যে কোন বিষয়ের বিজয়ীকে দেশে রাজার মত সম্মান দান করা হয়। যদিও বিজয়ী হিসাবে তাঁদের প্রাপ্য ছিল অলিভ গাছের পাতার মুকুট। সেকালে যুদ্ধ বিগ্রহের ভয়ে গ্রীসের প্রতিটি নগর পাষাণ-প্রাচীরে ঘেরা থাকতো। অলিম্পিক বিজয়ীকে দেশে ফেরবার সময় প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র করে নগরে প্রবেশ করতে হবে এই ছিল দেশের প্রচলিত রীতি। ফলে যে নগরীর প্রাচীরে যত বেশী ছিদ্র থাকতো সেই নগরীর মর্যাদাও ছিল তত বেশী। অলিম্পিক বিজয়ীরা দেশে ফেরবার পর তাঁদের সম্মানের জন্য ভোজসভা ও সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হতো। নগরের বিশিষ্ট স্থানে নির্মিত হতো অলিম্পিক বিজয়ীর মর্মর মূর্তি।

রোম গ্রীস অধিকার করবার পরও অলিম্পিক অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকে শুধু গ্রীকদের মধ্যে। ক্রমে রোমানরা অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। কয়েকটি অলিম্পিক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় কিন্তু তারপরই দেখা দেয় অলিম্পিকের পবিত্র অনুষ্ঠানে অমঙ্গলের ছায়া। রোমানরা অসৎ উপায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। ফলে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। বিদ্বেষবশে জর্জরিত রোমানরা পরবর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠানে অলিম্পিয়ার বিরাট স্টেডিয়ামে এবং গ্রীক অ্যাথলীটদের বিশ্রামাগারে

অলিম্পিক মশালকে প্রজ্জ্বলিত করবার জন্য গ্রীক নর্তকীরা সূর্য রশ্মি থেকে পূতাগ্নি সংগ্রহ করছেন

আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। গ্রীক জাতির প্রীতির সম্পর্ক এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করবার মিলন কেন্দ্র এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে রোমের সম্রাট থিওডিসাস খৃষ্টপূর্ব ৩৯৮ সালে আইন করে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন।

কিন্তু অলিম্পিকের আত্মা অমর। অলিম্পিক মশালের দীপবর্তিকা অনির্বাণ, অম্লান। তাই প্রায় দুই হাজার বছর আগে রোম সম্রাট থিওডিসাস আইন করে যে অলিম্পিক বন্ধ করে দিয়েছিলেন ১৮৯২ সালে ফ্রান্সের এক মহামতি সেই অলিম্পিকের পুনরানুষ্ঠানে উদ্যোগী হন। এই মহাত্মনের নাম : ব্যারন পিয়ার দ্য কুবার্তিন। মানব কল্যাণ বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুবার্তিন যে আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তন করেছেন সেই অলিম্পিকই এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠান কেন্দ্র, সারা বিশ্ববাসীর প্রধান মিলন-কেন্দ্র, সৌভ্রাত্র বন্ধন দৃঢ় করবার যজ্ঞবেদী।

অলিম্পিক সম্পর্কে মহামতি কুবার্তিনের অভিমত :

"The important thing in the Olympic games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well."

—Baron de Couberlin

অর্থাৎ, "অলিম্পিক ক্রীড়ায় জয়লাভ নয়, অংশ গ্রহণই বড় কথা। জীবনের বড় কথা জয়লাভ নয়, সংগ্রামই জীবনের প্রধান লক্ষ্য।" আধুনিক অলিম্পিকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে পাঁচটি বলয় বা বৃত্ত। এই পাঁচটি বলয় এক সঙ্গে গ্রথিত আছে পাঁচটি মহাদেশের মিলনের প্রতীক হিসাবে।

ব্যারন কুবার্তিন ও তাঁর সহকর্মীরা অলিম্পিকের উৎপত্তি স্থান ঐতিহাসিক অলিম্পিয়া থেকে আধুনিক অলিম্পিক আরম্ভের সংকল্প করলেও গ্রীসে অলিম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গ্রীসের প্রধান নগরী এথেন্স থেকে ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিক আরম্ভ হয়। প্রতি ৪ বছর অন্তর এথেন্স, প্যারিস, সেণ্ট লুই, লণ্ডন, ও ষ্টকহলমে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯১৬ সালের অলিম্পিক বন্ধ থাকে। ১৯২০ সালে এণ্টোয়ার্পে আবার অলিম্পিকের আসর বসে। তারপর আমস্টার্ডাম, লস্ এঞ্জেলস ও বার্লিনে অলিম্পিক সম্পন্ন হবার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কৃষ্ণ ছায়া ঘনিয়ে আসে। ফলে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। মানুষের এমনই স্বভাব একটানা তার কিছুই ভাল লাগে না। তাই মরণ যজ্ঞের পর আবার বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের

প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক বিজয়ী মহিলা এ্যাথলীটের প্রস্তর মূর্তি

জন্য এগিয়ে আসে। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে এবং ১৯৫২ সালে হেলসিংকিতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। এবার মেলবোর্নের পালা। মেলবোর্ন অলিম্পিক প্রকৃতপক্ষে অলিম্পিকের একাদশ অনুষ্ঠান হলেও আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা থেকে ৪ বছরের ব্যবধানে গুনতির হিসাবে এটা অলিম্পিকের ষোড়শ অনুষ্ঠান। এতদিন আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশেই অলিম্পিকের আসর বসে এসেছে। এবার সর্বপ্রথম এশিয়ার শেষ প্রান্তে এবং

গ্রীক ভাস্কর্যে অলিম্পিক মুষ্টি প্রতিযোগিতার এক দৃশ্য

প্রশান্ত মহাসাগরের এপারে অলিম্পিকের আসর বসছে। ২২শে নভেম্বর বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটের সময় মেলবোর্নের বিখ্যাত ক্রিকেট মাঠে পুতাগ্নি দিয়ে অলিম্পিকের দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত করা হবে। দুই মিনিট পরে এডিনবরার ডিউক আনুষ্ঠানিকভাবে ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।

প্রাচীন অলিম্পিকের তথ্যবহুল ঘটনা এবং তার ইতিহাস এত ব্যাপক যে, কয়েকটি অধ্যায়ের একখানি পুস্তকে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। বহু অনুসন্ধানী ক্রীড়া সাংবাদিক এবং খেলাধুলায় উৎসাহী লেখক অলিম্পিক সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করে গেছেন, এখনও অনেকে রচনা করছেন। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক আরম্ভ হতে বেশী দেরি নেই। মাত্র সাড়ে পাঁচমাস সময় হাতে। দেশে দেশে এখন অলিম্পিকেরই প্রস্তুতি চলেছে। সংবাদপত্র অফিসে তার অনেক খবরও এসে পৌঁছুচ্ছে। অলিম্পিক সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর 'দেশের' পাতায় এই সব সংবাদ পরিবেশন করাই আমার উদ্দেশ্য।

• • •

চেকোশ্লোভেকিয়ার বিশ্বখ্যাত এ্যাথলীট দম্পতি এমিল ও ডানা জ্যাটোপেকের সব কিছুই যেন একসূত্রে বাঁধা। দুজনে একই দিনে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছেন। একই সঙ্গে খেলাধুলার চর্চা করেছেন, একই সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শী হয়েছেন, একই সঙ্গে অলিম্পিকে লাভ করেছেন বিজয়ীর সম্মান। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এমিল দূরপাল্লার দৌড়ের তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে লাভ করলেন 'হিউম্যান লোকোমোটিভ' আখ্যা, আর ডানা হলেন মহিলা বিভাগে বর্শা ছোঁড়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে মেলবোর্ন অলিম্পিকের প্রতিযোগী এমিল ও ডানা দুজনেই অনুশীলনে অসুবিধা বোধ করছেন। এমিল জ্যাটোপেক ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির মধ্যে অনুশীলন করলে পায়ের মাংসপেশীতে যন্ত্রণা ও সময়ে সময়ে অবসন্নতা বোধ করেন। আর ডানা জ্যাটোপেকোভার ডান হাতে আঘাত লাগায় অনুশীলন করতে পারছেন না। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই সব কিছুতে দুজনের গতিবিধি যেমন এক সূত্রে বাঁধা, সব কিছুতে এদের যেমন মিল তাতে মনে হয় এক সঙ্গেই এঁরা সুস্থ হয়ে উঠে অলিম্পিকের জন্য অনুশীলন আরম্ভ করবেন।

• • •

অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্যায়ের ফুটবল খেলার জন্য চীন আজ কলকাতায় উপস্থিত। জুন মাসের ৩ ও ৫ তারিখে ফিলিপাইনের সঙ্গে কলকাতায় এদের দুটি খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনেক আলাপ-

াালোচনার পর 'ফিফা' অর্থাৎ ফেডারেশন
ব ইণ্টার ন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন
লার এই দিন তারিখ ঠিক করে দেন।
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা, পিকিং
থবা হংকংয়ে এই ম্যাচ খেলবার জন্য সব
াই প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ফিলিপাইন
তে এই ম্যাচ খেলবার জন্য প্রস্তাব
ায় চীন সানন্দে সম্মতি জানায় এবং দিন
রিখও ঠিক হয়ে যায়। পরে অবশ্য
় তারিখ পরিবর্তনের জন্য ফিলিপাইনের
ক থেকে এক প্রস্তাব আসে, কিন্তু চীন
'ফিফা' কেউই তারিখ পরিবর্তনে রাজী
নি। ফিলিপাইনের জাতীয় ফুটবল দল
ন স্পেন সফর করছে। জুন মাসের ১১
রিখের আগে তাদের ম্যানিলায় ফেরবার
ভাবনা নেই। সুতরাং ভারতের মাটিতে
লিম্পিক ফুটবল খেলার যে আয়োজন
য়েছিল তা এক রকম 'বানচাল' হবারই
ভাবনা। অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে
ফার' নির্দেশে চীন 'ওয়াক ওভার' পেয়ে
তো অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায়
লবার অধিকার অর্জন করবে।

• • •

এমেচার ও পেশাদার খেলোয়াড় নিয়ে
ত ইংলণ্ড টীম এখনও বিশ্বের পরম
ক্তশালী ফুটবল দল। এ বছরও তারা

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক
ব্যারন দ্য কুবার্তিন

শক্তিশালী ব্রেজিল দলকে ৪—২ গোলে এবং বিশ্ব কাপ বিজয়ী পূর্ব জার্মান দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করেছে। কিন্তু শুধু এমেচার খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ইংলণ্ড দলকে বুলগেরিয়ার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে অলিম্পিক ফুটবলের প্রথম পর্যায়ের খেলায়। 'সোফিয়াতে' অনুষ্ঠিত দুই দলের প্রথম খেলায় বুলগেরিয়া ২—০ গোলে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এদের পাল্টা খেলাটি ৩—৩ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই খেলায় ইংলণ্ডের অন্তত ৩—০ গোলে জয়লাভের প্রয়োজন ছিল।

অস্ট্রেলিয়ার ইংলণ্ড সফর

ম্যানচেস্টারে অস্ট্রেলিয়া ও ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টির তিনদিনব্যাপী খেলাটিও অমীমাংসিত থেকে যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারের ন্যাটা ব্যাটসম্যান এবং প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এলান হোয়ারটনের ১৩৭ রান লাভ এই খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রথম ইনিংসের ১০৮ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৬০ রানে শেষ হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার ৬ উইকেটে ২৩৮ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়া এর প্রত্যুত্তরে ১ উইকেটে ৯০ রান করলে খেলাটি শেষ হয়। ইংলণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার এটি ছিল অষ্টম খেলা।

এম সি সি একাদশের সংগে অস্ট্রেলিয়ার পরবর্তী খেলাটিও অমীমাংসিত থেকে গেছে। বৃষ্টির জন্য পুরো তিনদিন খেলাটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এ খেলার সবচেয়ে বড় ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় নীল হার্ভের দ্বিশতাধিক রান। হার্ভের নিপুণ হাতে ব্যাট চালিয়ে খেলে ২২৫ রানের মাথায় আউট হন। প্রসংগত বলা যেতে পারে ইংলণ্ডে তো নটেই হার্ভে এর আগে অন্য কোন খেলাতেও এত বেশী রান করতে পারেননি। এই খেলায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান রাদারফোর্ডও মাত্র ২ রানের জন্য শত রান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

৪২৩ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর এম সি সি ৭ উইকেটে ১৯০ রান করলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে। ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দলের এ পর্যন্ত নয়টি খেলার মধ্যে ৭টি খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। অস্ট্রেলিয়া শুধু হারিয়েছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ উইকেটে আর একই ফলাফলে হার স্বীকার করেছে সারের কাছে।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

লীগের খেলায় মোহনবাগানের অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও গত সপ্তাহে মোহন-বাগানকে প্রথম একটি পয়েণ্ট নষ্ট করতে হয়েছে রাজস্থান ক্লাবের কাছে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী দুইটি দলের মধ্যে এই খেলা দেখবার জন্য মাঠে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়। অবশ্য এবার শীর্ষস্থানীয় দলগুলির কোন খেলাতেই দর্শকের অভাব হচ্ছে না; এরিয়ান ও মোহনবাগানের খেলাতে দর্শকে মাঠ ভেঙে পড়ে। মোহনবাগান এই খেলায়ও জয়লাভ করে অগ্রগতির পথের বাধা পার হয়ে গেছে। আলোচ্য সপ্তাহে

মোহনবাগান ও এরিয়ানের লীগ খেলার এক দৃশ্য। গোল করবার মুখে এরিয়ান খেলোয়াড় দেবগুপ্তের চশমা মুখ থেকে পড়ে যাওয়ায় দেবগুপ্ত 'অন্ধ' হয়ে চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর মোহনবাগান গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জী বলটি প্রতিরোধ করছেন

শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও একটি করে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে খিদিরপুর ও রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। ইস্টবেঙ্গল বালী প্রতিভার কাছে হারিয়েছে আরও একটি পয়েন্ট। তা হলে অপরাজেয় এই শক্তিশালী তিনটি দলের মধ্যে মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। এদের মধ্যে কেউই এ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেনি। বাকী ১১টি ক্লাবকেই হার স্বীকার করতে হয়েছে। এর মধ্যে পুলিস ও কর্ড টেলিগ্রাফে হারের সংখ্যা বেশী—চারটি করে। আর কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও পুলিস এখন পর্যন্ত কোন খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। গোলদাতাদের মধ্যে মোহনবাগানের কে পাল ও এস ব্যানার্জী এবং মহমেডান স্পোর্টিং-এর আমিনের নাম করা যেতে পারে। এরা প্রত্যেকেই পাঁচটি করে গোল করেছেন। এর পরই রেলওয়ে স্পোর্টসের পি কে ব্যানার্জি'র স্থান। তিনি করেছেন চারটি গোল।

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে ইন্টারন্যাশনাল, পোর্ট কমিশনার্স ৫টি করে খেলার মধ্যে একটি করে পয়েন্ট হারিয়ে লীগ কোঠার শীর্ষে অবস্থান করছে। হাওড়া ইউনিয়ন ও অরোরা এখনও রয়েছে অপরাজিতদের তালিকায়। সব চেয়ে বেশী গোল করেছেন ইন্টারন্যাশনালের এস দাশ। এর গোলের সংখ্যা ৬। কাস্টমস ক্লাব এখন পর্যন্ত একটি পয়েন্টও পায়নি, পাঁচটি খেলাতেই হার স্বীকার। অতীতকালে প্রথম ডিভিশনের 'দুর্ধর্ষ' টীম কাস্টমসের সঙ্গীন অবস্থা দেখে অনেকেই আশঙ্কা করছেন তাদের দ্বিতীয় ডিভিশন থেকেও বুঝি নেমে যেতে হয়।

প্রথম ডিভিশন লীগের গত সপ্তাহের ফলাফল:—

২৩শে মে

মহঃ স্পোর্টিং	(০)	:	খিদিরপুর	(০)
উয়াড়ী	(২)	:	পুলিস	(০)

২৪শে মে

মোহনবাগান	(০)	:	রাজস্থান	(০)
এরিয়ান	(১)	:	কালীঘাট	(১)

২৫শে মে

খিদিরপুর	(১)	:	স্পোর্টিং ইউঃ	(০)
বালী প্রতিভা	(০)	:	পুলিস	(০)

২৬শে মে

মোহনবাগান	(২)	:	রেলওয়ে স্পোর্টস	(০)
মহঃ স্পোর্টিং	(২)	:	বি এন আর	(০)
ইস্টবেঙ্গল	(১)	:	কর্ড টেলিগ্রাফ	(০)

২৮শে মে

মহঃ স্পোর্টিং	(০)	:	রেলওয়ে স্পোর্টস	(০)
পুলিস	(০)	:	খিদিরপুর	(০)

২৯শে মে

মোহনবাগান	(১)	:	এরিয়ান	(০)
রাজস্থান	(২)	:	স্পোর্টিং ইউঃ	(১)
ইস্টবেঙ্গল	(০)	:	বালী প্রতিভা	(০)

দেশী সংবাদ

২২শে মে—আজ সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ লোকসভায় ডাঃ গিদোয়ানীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ফিরোজপুরের অগ্রবর্তী ঘাটিসমূহে পুলিস অফিসারের ছদ্মবেশে পাকিস্থানের সেনা বিভাগীয় বহু লোকজনের সমাবেশ ঘটিয়াছে।

একটি সংবাদে প্রকাশ, একদল দুর্বৃত্ত বিলুপ্ত নাগা জাতীয় পরিষদের সহ-সভাপতি ইসকংথেরেন আওর গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। নাগা বিদ্রোহী নেতা ফিজোর সহিত ইসকংথেরেন আওর সংঘর্ষ হয়।

২৩শে মে—পশ্চিমবঙ্গ বন্ধ জয়ন্তী উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ জানাইতেছেন যে, অদ্য এক বিরাট ও আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে রাজ্যব্যাপী বন্ধজয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা সেতু বাঁধের কাজ আরম্ভ হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। উক্ত মহল হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থানই ইহার জন্য প্রধানত দায়ী।

২৪শে মে—ভারতের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় কত লোক চাকরি করিতেছে এবং কত সংখ্যক চাকরি খালি আছে, তাহার হিসাব বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের নিকট পেশের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত ভারত সরকার একটি আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতার পৌরসভার চাকরিতে লোক নিয়োগের প্রশ্নে ইদানীং কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মধ্যে গুরুতর রকমের মতভেদ ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারী ও শ্রমিকগণ তাঁহাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য আগামী ১০ই জুলাই হইতে ধর্মঘট করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

২৫শে মে—বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদাদিতে প্রকাশ যে, নাগা বিদ্রোহিগণ এখন নাগা পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরভাগের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহের এবং নাগা পাহাড়ের সংলগ্ন শিবসাগর জেলার সীমান্ত অঞ্চলের পুলিস ফাঁড়িগুলির উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টায় আছে।

রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এম সি সাহ অদ্য লোকসভায় শ্রী গিদোয়ানীর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, দেশ বিভাগ বাবদ ভারতের নিকট পাকিস্থানের যে ৩ শত কোটি টাকার ঋণ আছে, পাকিস্থানের নিকট হইতে তাহার 'এক পয়সাও' এ পর্যন্ত আদায় হয় নাই।

২৬শে মে—প্রস্তাব হইয়াছে যে, কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বেলগাছিয়া রোডে অবস্থিত ৭২

বৎসরের প্রাচীন পশু-চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতালটি হরিণঘাটায় স্থানান্তরিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে হরিণঘাটার দূরত্ব ৩৪ মাইল।

কাশ্মীর মুসলিম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ পাকিস্থান সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রে কর্নেল শের আমেদের নেতৃত্বে গঠিত 'আজাদ কাশ্মীর সরকারের' পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন।

২৭শে মে—নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বিধান পরিষদের নির্বাচনে গ্রাজুয়েট, শিক্ষক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা নির্বাচনকেন্দ্র হইতে কাহাকেও ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠাইয়া ভোট দিতে দেওয়া হইবে না।

২৮শে মে—কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত মুদ্রণশিল্প শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোককুমার সরকার একটি রোটারী মেশিন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক গৃহীত বর্তমান বৎসরের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল আগামী জুন মাসের শেষ দিকে বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আজ লোকসভায় সামান্য বিতর্কের পর ভারতীয় আয়-কর (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। এখন ইহা রাজ্যসভায় প্রেরিত হইবে।

"পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বসহ" প্রাক্তন চারিটি ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানাম ভারতীয় ইউনিয়নের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া নয়াদিল্লীতে আজ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সহকারী খাদ্যমন্ত্রী মিঃ এম ভি কৃষ্ণাপ্পা আজ লোকসভায় বলেন যে, ১৯৫৬ সালে পাকিস্থান বৃহৎভাবে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি টন ৩৫ পাউণ্ড দরে চাউল আমদানী করিবে।

কলিকাতায় এক বাড়িতে বাজার হইতে ক্রীত একটি বোয়াল মাছের পেটে মানব-শিশুর এক খণ্ড দেহ পাওয়া গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২২শে মে—অদ্য পূর্ব পাকিস্থানের বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে বিধানসভার অধ্যক্ষ মিঃ আবদুল হাকিম পূর্ব পাকিস্থান সরকারের বর্তমান বৎসরের বাজেট পেশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার সাংবাদিকগণকে বলেন যে, গভর্নরকে নিজ ক্ষমতাবলে ১লা জুন তারিখে বাজেট মঞ্জুর করিতে হইবে এবং স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট প্রাদেশিক আইনসভার পাঁচজন সদস্য এবং পার্লামেণ্টের একজন সদস্যকে বন্দিশালা হইতে মুক্তি দিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। জন-নিরাপত্তা আইন অনুসারে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেও গভর্নমেণ্ট মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূত মিঃ জন শেরম্যান কুপার অদ্য ইউরোপের মার্শাল পরিকল্পনার অনুকরণে ভারতবর্ষকে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য দানের আহ্বান জানান।

২৪শে মে—পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব অদ্য প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁহার সরকারের প্রদেশে বলবৎ নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

আজ টোকিয়ো মান-মন্দির হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানের সকল স্থান হইতে তেজস্ক্রিয় বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সচিব মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ আজ বলেন, "যাহারা ধর্ম-বিশ্বাসী, আমরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না।"

২৫শে মে—পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব আজ বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থানের রাজনৈতিক জীবনে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

২৬শে মে—প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা অদ্য শাসনতন্ত্রের জরুরী বিধান অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে শাসনতন্ত্রের প্রয়োগ স্থগিত রাখিয়াছেন।

পাকিস্থানের অন্নাভাবগ্রস্ত অঞ্চলে বিতরণ করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থান সরকারের হাতে ২০,০০০ টন চাউল ও ২০,০০০ টন গম দিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের জুন-জুলাই মাসে এই চাউল ও গম পাকিস্থানে আসিয়া পৌঁছিবে।

পাকিস্থান উহার সীমান্তবর্তী শ্রীনগর, কুমারশাইল, শাহপুর, ফিরোজা ও ভোটমোপার সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। সম্প্রতি যুক্তভাবে যে জরীপকার্য করা হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ সব স্থান ভারতকে হস্তান্তরিত করার কথা।

২৭শে মে—সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন-পুস্তক দোকান যাহাতে পুনরায় দেখা না দিতে পারে, তজ্জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার চারজন শিক্ষাবিদ কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই চারজন শিক্ষাবিদকে তৎক্ষণাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

২৮শে মে—নরওয়েজিয়ান বিজ্ঞান একাডেমির সভায় বক্তৃতাকালে অধ্যাপক হাইমৎস অদ্য ঘোষণা করেন যে, গত শরৎকালে নরওয়েতে অনুমানিক লুপ্ত হস্তী জাতীয় অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—১৫০ আনা। বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে !
এটা অনেক...
অনেক...
বেশী সুগন্ধি !
রেক্সোনা সাবানে এখন
অনেক...অনেক
বেশী সুগন্ধ আছে
দীর্ঘস্থায়ী
Rexona
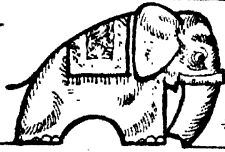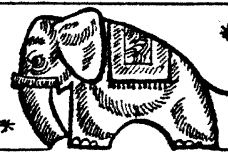
সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

ব্যাধি ও প্রতিকার

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক অধিবেশনে দেশের নানা স্থানে ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক কার্যের নিন্দাবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সমিতি এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, যদি এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের অবসান না ঘটে এবং পারস্পরিক ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতার ভাব বর্ধিত না হয়, তবে গণতান্ত্রিকতার পথে উন্নতির অভিমুখে দেশের গতি রুদ্ধ হইবে। সমিতির এই প্রস্তাব জনমতের দ্বারা সর্বত্র সমর্থিত হইবে এবং এই সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে দেশের শান্তি এবং নিরাপত্তা যদি অব্যাহত না থাকে, তাহা হইলে ব্যাপকভাবে দেশের উন্নতি-সাধনের কোন কার্যক্রমই সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং আতঙ্ককর এই পরিস্থিতির যাহাতে অবসান ঘটে, সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সমগ্র দেশের জনমতকে এ জন্য জাগাইয়া তোলা দরকার। সমিতির গৃহীত প্রস্তাবে দেখা যায়, কয়েক মাস হইতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কয়েক মাসের মধ্যে এই ধরনের কার্যকলাপ কেন এমনভাবে বাড়িল এ সম্পর্কে সকলেরই মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। এ বিচার করিতে গেলে রাজ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি এবং শ্রমিক সমাজের অশান্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। সমিতিও সে কথা বলিয়াছেন। হিংসাত্মক কার্যকলাপ সর্বতোভাবে নিন্দনীয়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সম্বন্ধে সরকারের নীতির ত্রুটি বা দুর্বলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসমীচীনতার কথাও আসিয়া পড়ে। বস্তুত সরকারের সেই সব ত্রুটির সুযোগ লইয়া নিজেদের অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি লোক এই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। এই বিষয় লইয়া পশ্চিমবঙ্গে কোনরূপ অশান্তি ঘটে নাই, এজন্য আমরা বিশেষ গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এখানেও অসন্তোষের কারণ যে ঘটিয়াছে ইহা ঠিক। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা নির্ধারণের জন্য এ পর্যন্ত পাকাপাকি বিধিসংগত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এতৎসম্পর্কিত আইনের খসড়া প্রণয়নে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যে ছিটেফোঁটা জায়গা জুটিয়াছে, বিহারের নেতাদের তদবিরের ফলে তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইতে পারে, লোকের মনে এখনও এই ভয়। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্যগণের মনেও এই উদ্বেগের ভাব বিস্তারলাভ করিয়াছে। তাঁহারা সীমানা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিধিবিহিত করিবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র-সচিবকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বোম্বাইতে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত ঢেবরের একটি উক্তির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। তিনি বলিয়াছেন, "রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে বিহার, বাংলা অথবা এই বোম্বাই সম্বন্ধেও যে কোন সমস্যা দেখা দিবে, শান্তি এবং সহযোগিতার পথেই আমরা তাহার সমাধান করিব।" তবে কি পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নটি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাইতে পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই সম্বন্ধে ভারত সরকার সব কিছু চুকাইয়া ফেলিয়াছেন এবং বাঙলা বিহার সম্পর্কে বিল প্রণয়ন করা হইতেছে। দেশের লোকের মনে ভারত সরকারের নীতির ফলে এইরূপ অসন্তোষের কারণ যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ছিল। বস্তুত শুধু নীতিকথা আওড়াইয়া জনসাধারণের মন হইতে প্রকৃত অসন্তোষের কারণ দূর করা যায় না।

দৈব দুর্যোগ

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বর্তমানে নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত। নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে অকাল বারিদোদয়ে যে সংকট সৃষ্টি করিল তাহাও নিতান্ত সামান্য নয়। শহরের অধিবাসীদিগকে ঝড়বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছে। কলিকাতার রাজপথে প্লাবন-পীড়ন এবং তজ্জনিত যানবাহনের গতি-বিধির বিপর্যয় নূতন কিছু নয়; আমরা সে কথা ছাড়িয়া দিলাম। আগরতলার অবস্থা ভয়াবহ। নদীর বাঁধ ভাঙিয়া বন্যার জলে সহস্র সহস্র নরনারীর অবর্ণনীয় দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। শহরটি সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘূর্ণিবাত্যার ফলে মেদিনীপুর জেলার ব্যাপক অঞ্চলের জনসাধারণের নিদারুণ দুঃখ ও দুর্গতি দেখা দিয়াছে। কাঁথি মহকুমাটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু নরনারী গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থান বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবারের কাকদ্বীপ এবং তালিকো-

ত্তী অঞ্চলের সংবাদ খুবই উদ্বেগজনক। সুন্দরবন অঞ্চলের কাকদ্বীপ অঞ্চল মূহভাবে বিপন্ন হইয়াছে। সেখানে বহু জমি লবণাক্ত জলরাশিতে প্লাবিত হইয়াছে, রাস্তা ভাঙিয়াছে, সেতুপথসমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গত অঞ্চলের সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইয়াছেন। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দেয় এবং সর্বাধিক ব্যাপক অঞ্চলে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষের এই সম্বন্ধে যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক স্বরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ। তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। শিক্ষাদান ব্রত তাঁহার তপস্যা এবং একান্ত নিষ্ঠাবলে সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অপরিসীম। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের আদর্শেরই প্রতীকস্বরূপ, এই প্রতিষ্ঠানের সেবার ভার যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইল। সত্যেন্দ্রনাথের তপস্যা, তাঁহার সাধনা বিশ্বভারতীর গৌরব বর্ধিত করিবে, আমরা এই আশা অন্তরে লইয়া তাঁহার এই অভিনব সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্ববঙ্গের শাসন-সংকট

কয়েকদিন চালু থাকিবার পর পূর্ববঙ্গ হইতে গভর্নরী শাসন প্রত্যাহৃত হইয়াছে। মিঃ আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিমণ্ডল সেখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনের আয়ুষ্কাল কতদিন এই সম্বন্ধে বর্তমানে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। যুক্তফ্রণ্ট দল হইতে আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্ন হইবার পর ফ্রণ্টের শক্তি হ্রাস পায়। ইহার পর ফ্রণ্টের দলের আরও ভাঙন ঘটিয়াছে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বিধানসভায় যুক্তফ্রণ্ট এবং আওয়ামী লীগ আর লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের অবস্থা প্রায় সমান। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ফ্রণ্ট ত্যাগ করিয়া আওয়ামী লীগে যোগদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দলের আওয়ামী লীগে যোগদান যদি সত্য হয়, তবে মিঃ সরকারের পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডল বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে। আওয়ামী লীগের নেতাদের নীতি-নিষ্ঠার সম্বন্ধে অবশ্য স্বতঃই সন্দেহ জাগে, কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের ত্রুটিই শাসনসংকট সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী। দেখা যাইতেছে, তাঁহারা এখন যুক্ত নির্বাচন সমর্থনে স্বীকৃতি দিতে চাহিতেছেন না। তাঁহাদের পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মুস্লিম লীগের দিকেই তাঁহারা কার্যত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। একই সঙ্গে করাচী এবং ঢাকা দুই দিকের গদির উপরই তাঁহাদের নজর রহিয়াছে। ফলত পাক-রাজনীতিতে এই ধরনের সুবিধাবাদ উক্ত রাষ্ট্রের নানা রকমের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারতবিদ্বেষ ভাঙাইয়া সকল দলই নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়াইতে ব্যস্ত আছেন। যুক্তফ্রণ্ট দলও এই মোহে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি এই ভুল তাঁহাদের না ভাঙে তবে পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা কতদিন স্থায়ী হইবে, এবিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

ভারতের সনাতন আদর্শ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি হিংসাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কোন জাতির কলকারখানার হিসাব করিয়া তাহার সভ্যতা নিরূপিত হয় না। আয়-ব্যয়ের হিসাবেও নয়। ফলতঃ প্রত্যেক জাতির কতকগুলি নৈতিক আদর্শ থাকে, সেই আদর্শ রক্ষা করিয়া তাহাদের আচার-বিচারের উপরই সেই জাতির সভ্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। যদি আমরা আমাদের এই বিশিষ্ট নৈতিক আদর্শ হইতে বঞ্চিত হই, তবে বিজ্ঞানের সাধনা কিংবা কারিগরী বিদ্যা আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রস্তাবের মূলীভূত বিষয়ের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জাতির সংস্কৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য হইতে আমাদের দৃষ্টি ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ফলতঃ অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাধনাই যেন জাতির একমাত্র প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং অহিংসা, ত্যাগ ও সেবা এই সব মানবোচিত গুণসমূহের মূল্য আমাদের সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। এমন বিশ্বাস লোকের মনে গড়িয়া উঠিতেছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বলিতে যাহা বলা হয়, জগতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া সে পথে চলা যায় না, এবং সেগুলি আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খায় না। বস্তুত আমরা এই সত্য বিস্মৃত হইতেছি যে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করাও প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রে সেবা, ত্যাগ এগুলির মূল্য থাকিবে না, এই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে এই গতি যদি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে লইয়া না যায়, পক্ষান্তরে স্বার্থসংকীর্ণতা পঙ্কে নিমজ্জিত করে তাহা হইলে জাতি ধ্বংসের অভিমুখেই প্রধাবিত হইবে। প্রত্যুত ভারতকে যদি বিশ্বমানব-সমাজে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়, তবে অহিংসা, সেবা, ত্যাগ প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শগুলিকে ভিত্তি করিয়াই তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে। আর্থিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়া আমরা যেন এইদিক হইতে ভুল না করি।

পীড়িতের প্রতি হৃদয়হীনতা

সম্প্রতি করোনারের তদন্তসূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সত্তর বৎসর বয়স্কা একটি বৃদ্ধা গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় কলিকাতার মেডিকাল হাসপাতালে সমস্ত রাত্রি বিনা চিকিৎসায় উপেক্ষিত থাকে। করোনারের আদালতের জুরিগণ মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে রোগিণীর সমস্ত রাত্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন করা হয় নাই তাহার কারণ বোঝা যায় না। হাসপাতালের হাউস-সার্জন সাক্ষ্য দেন, ২৮শে মার্চ কোন সময়ে আহতা বৃদ্ধাকে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে কেহ রাখিয়া যায়, পরদিন বেলা ১০টার সময় তিনি তাহাকে সেখানে দেখেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৃদ্ধা কোথা হইতে আসিল এবং কিভাবেই বা সে জখম হইল তিনিও কোন খোঁজ খবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কোনো স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া বৃদ্ধার কণ্ঠাস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তাহার গতিবিধির কোন শক্তি ছিল না। এই অবস্থায় তাহাকে গোপনে হাসপাতালের এমার্জেন্সী কক্ষের ভিতর লইয়া গিয়া রাখিয়া আসাও বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সমস্ত রাত্রি হাসপাতালের ডাক্তারের দৃষ্টিতে সে পড়িল না, ইহাও আশ্চর্য ব্যাপার। প্রকৃত বিষয় এই যে, বৃদ্ধা হাসপাতালের লোকজনের দৃষ্টিপথে পড়িলেও তাঁহারা কেহ তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। শহরের হাসপাতালগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে কিরূপ অব্যবস্থা চলে এই ঘটনা হইতেই তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। সব ঘটনা লোকের নজরে পড়ে না, কদাচিৎ দুই একটি বিশেষ কারণে লোকদৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। মানুষের জীবনের প্রতি এই ধরনের নির্মম উদাসীনতার নজীর এখনও শহরের হাসপাতালগুলিতে মিলে, সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে নিদারুণ লজ্জার বিষয়। শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আমরা কতটা মনুষ্যত্ববোধবর্জিত হইয়া পড়িতেছি ইহাই সে পক্ষে প্রমাণ। জাতির পক্ষে ইহার অপেক্ষা বড় কলঙ্কের বিষয় অন্য কিছু থাকিতে পারে না।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিদ্যাসাগর

'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,—৫ই জ্যৈষ্ঠ-এর সংখ্যাটিতে শিবনাথ রায় লিখিত 'ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিদ্যাসাগর' পড়লাম।

এই প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখক বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বহু বিবাহ অথবা বাল্য-বিবাহের কুপ্রথা বন্ধ হল অথচ বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটলো না কেন—এর কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছেন: 'আমাদের দেশের বড়ো বড়ো আন্দোলনের যে আত্মবিরোধ ছিল সেটাই এর কারণ।'

পরিষ্কারভাবে শিবনাথবাবু কিছু উল্লেখ করেননি। আমার মনে হয় স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন না হওয়া ও স্ত্রী-স্বাধীনতার [illegible] ও অর্থনৈতিক প্রসার হতে না দেওয়ার জন্যই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটলো না।

Patriarchal বা পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার ফলে স্বার্থান্বেষী পুরুষেরা সহজেই বুঝেছিল বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহ নানা কারণে অর্থনৈতিক কারণে প্রধান। তাদেরই সুযোগ [illegible] দুটি সমাজের [illegible] বিধবা বিবাহের [illegible] সম্ভব হল না।

[illegible] ও শক্তি, সাহস ও শান্তি সেখানে [illegible] সমাজের অবস্থা সহজেই [illegible] বিধবা বিবাহের প্রচলন [illegible] পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় [illegible]।

[illegible] স্বাধীনতার [illegible] অর্থনৈতিক স্বাধীনতা [illegible] ছিল না [illegible] বলা বাহুল্য [illegible] হিসাবে এমন [illegible] ইদানিং [illegible] স্ত্রীশিক্ষার [illegible] আজও আমরা [illegible] জনসাধারণ সে খবর [illegible] বিধবা বিবাহের আইন করবার সময়।

আশ্চর্য এই যে বিদ্যাসাগর এ [illegible] শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি। আমরা তাঁর বংশধর নয় বলেই সে কাজের ভার কাঁধে নাই নি।

বিশ্বকল্যাণের যেটা [illegible] কথা সে মানব-প্রেম যতক্ষণ না মানুষের প্রাণে [illegible] ততক্ষণ এ অরণ্য রোদনেরই সামিল। ইতি—হিমাংশু পাল, জামসেদপুর—৩।

রবীন্দ্রনাথ ও গায়টে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ ও গায়টে" প্রবন্ধে সাম্প্রতি যে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের হুজুগ প্রবাহিত হয়েছে ও হচ্ছে তার আশু অবসান না এলে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদাকে ঔদাসীনতার পরিচয় প্রদান করা হয়। সর্বোপরি প্রিয় কবির প্রতি থাকে না আমাদের শ্রদ্ধা। আশা করি সবাই এই প্রসঙ্গ থেকে বিরত হবেন এবং এখানে আমার দু'চারটি কথাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ হস্তের দানের কথা আমরা এখনও ভুলতে পারবো না। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় প্রবেশলাভ মনীষী ব্যতীত সাধারণের পক্ষে বেশ আয়াসসাধ্য। আমরা যখন জমিদার রবীন্দ্রনাথকে দেখি তখন তিনি কিষাণের আত্মায় আত্মীয়। সাধারণের সঙ্গে তিনি একাকার। তারপর কিষাণের শরিক না হতে পারায় যে দুঃখ ও অপূর্ণতায় তিনি মর্মাহত, সেই মর্মস্পর্শী অন্তর্বেদনাই তাঁকে তুলে ধরেছে আমার অন্তরীক্ষের বহু ঊর্ধ্বে। সুতরাং এখানেও শিবনারায়ণবাবুর দুরদর্শীতা চরম অর্বাচীনতার পরিচয় বহন করে।

২৬।৫।৫৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীদেবেন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেছেন—'সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের বাস্তবগত মত ও রুচি-সাপেক্ষ'। কথাটি অতীব মনোরম। কিন্তু আমার মনে হয় একথা সাহিত্য-শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই মনোবৃত্তি সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার পরিচায়ক। এবং এতে প্রকারান্তরে শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের বক্তব্যকেই সমর্থন করা হয়। শ্রীশিবনারায়ণবাবুর লেখা নিয়ে নানা আলোচনার মাধ্যমে আমরা কবিগুরুর সম্বন্ধে বহু তথ্য জ্ঞাত হয়েছি।

২৬।৫।৫৬ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় শ্রীনিরঞ্জন নাথ "রবীন্দ্র চর্চা" আলোচনার শেষ পরিচ্ছেদে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি শিবনারায়ণবাবুর মত লোকের ত্রুটি দূরীকরণের এক সুন্দর ও সুষ্ঠু পন্থা বলে দিয়েছেন। এই গুরুদায়িত্ব বিশ্বভারতী সহাস্যে গ্রহণ করলে ও নানা তথ্যাবলী সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রকাশিত হলে আমাদের ভ্রান্তি অপনোদনের পথ সুগম হবে নিঃসন্দেহে। আমার বিশ্বাস কোন আলোচনার সফলতা অর্জন করতে হলে চাই সূক্ষ্ম অনুভূতি। একথা যেন আমরা না ভুলি। এই আমার অনুরোধ। নমস্কারান্তে বিনীত—শ্রীরমেন্দ্র-কুমার সান্যাল, নবদ্বীপ।

প্রায় শতরবিবর্ষে

বিষ্ণু দে

আমি বাংলার লোক. ছিন্নভিন্ন আমার জীবনে
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে. এই নদী এই মাঠ আমজাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষায় নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার।

চোখে কানে ঘ্রাণে দেহে মনে প্রাণে আমার স্নায়ুতে
এ রাঢ় দেশের রং তোমার প্রতিমা হল প্রায় শতরবিবর্ষে •
লক্ষ লক্ষ সত্তার আবৃতে।
সেই সত্য অস্বীকারে আমাদের সামুদ্রিক সূর্যালোক নিভে যাবে,
কৌটিল্য কেবল পাবে ধূর্ত অন্ধকারে তার মৃত্যুর ধিক্কার॥

॥ অ ভি জ্ঞা ন ॥

শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত

মেঘের মতন চোখ জলের প্রতীক্ষা করে. জানি।

সময়ের অশ্বক্ষুরে ইতস্তত ধাবমান কাল
বসন্ত সন্ধানী চোখে যাযাবর সকাল বিকাল
রাতের তারার ছোঁয় থরথর ইথারের ঢেউ
আলোর তীরেতে কাঁপি তুমি আমি কাঁপে আরো কেউ।

ঘুম চোখ ঘিরে
মন ছোঁয় নুয়ে নুয়ে হিমরাত জলের শিশিরে;
কানেকানে ফিসফাস. চেয়ে থাকি স্তব্ধতার চরে
যেখানে প্রান্তরে এক সোনালী হরিণ খেলা করে।
সে-হরিণ এ-হৃদয়—মুঠো মুঠো অন্ধকারে আসে.
স্মৃতি দিয়ে বুক চিরে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে
শীষে-কালো ভারী রাতে সে আবার কৃষ্ণচূড়া হয়—
চেয়ে দেখি কী আশ্চর্য সে আমার—আমারই হৃদয়!
বার বার ডেকে বলি তাকে:

উত্তাল শৈলচূড়ে
দ্রুত পাক্ষিক সময়েরা যায় উড়ে;
আরণ্যবুকে সমুদ্রজলালা ঝি ঝি সংলাপে কাঁপে
শকুন্তলার শিখায়িত প্রেমে, দুর্বাশা অভিশাপে।
তবুতো আসে না কান্না
মনের অতলে খুঁজে দিতে পারো দু'একটা চুনি পান্না?

হৃদয়কে ডেকে ডেকে বার বার এই কথা বলা কি যন্ত্রণা
তুমি বুঝবে না।
তাই মাঝে মাঝে মনে হয়
সকালের মৃত্যুশেষে আবার এ পদাতিক মন নিয়ে আমি
ধুলো মাটি সোনা ভোর দু'চোখে বিবর্ণ হয়ে যায়।
সকালের মৃত্যুশেষে আবার এ পদাতিক মন নিয়ে আমি,
দেখি প্রতি যাম-ই
রোদে ভিজে দুপুরের একী পাগলামি!
তারপর খড়ি-খোপে টুপটাপ বেলা পড়ে যায়;
শত লম্পটের সাথে টলমল পদচারণায়
সন্ধ্যা আসে মুছে যায় রেখা থাকে ঘাসের পাতায়।

সব কথা শেষ। তবু মনে হয় এওতো সব না,
আরো কিছু বাকী আছে জানা।
চারণ চিলেরা তাই দক্ষিণের বিল থেকে আসে
রুপোলী ডানায় তার একই কথা ইঙ্গিতে আভাসে:
আর কত ক্লান্তি নিয়ে কেটে যাবে রাত
আশার শ্রাবণ শেষে নিয়ে এসো প্রতীক্ষা প্রভাত।

এ-হৃদয় তাই বলে: ক্ষয় আছে বলেই তো প্রেম
অভিজ্ঞান এ-জীবনে। এ এক আশ্চর্য জানলেম॥

ভবতু সব্বমঙ্গলং

শুভময় ঘোষ

মাদ্রাজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে কাঞ্জিভরম্। যার ক্লাসিকাল নাম কাঞ্চীপুরম্। এই শহরের মাইল দুয়েক পূবদক্ষিণে সর্বোদয়পুরম্। তার মাঝে পূবদক্ষিণে নারিকেলকুঞ্জের ছোট্ট বেষ্টনীকে আরও পূব-দক্ষিণে রেখে এক বালুভূমি। এখন অবশ্য সেখানে ছাউনির পর ছাউনি। কাঞ্চীপুরম্ শহর ছোট হলেও লোকসংখ্যা পঁচাশি হাজারের কিছু বেশি। শিক্ষিতের হার পঁয়ত্রিশ হাজারের কম নয়। খোঁজ করলে বহু পুরাতন কাব্য কাহিনীতে এর খবর পাওয়া যাবে। অসংখ্য মন্দিরশোভামণ্ডিত এই শহর অতি প্রাচীন-কাল থেকে তার শিল্প ঐতিহ্য এবং তীর্থ-মাহাত্ম্যে ভারতে প্রসিদ্ধ। পল্লবরাজদের সময়ে দক্ষিণভারতে যে মন্দির ও মূর্তি-শিল্প প্রচুর উপকরণ ও সমৃদ্ধি নিয়ে গড়ে উঠেছিল, তার একটি প্রধান অংশ এই শহরে এবং তার পরিপার্শ্বে দেখা যাবে। রাস্তায় দু'পা বেরলেই দেখা যাচ্ছে, গোপুরম, বিমান, রথ, প্রদক্ষিণপথ ইত্যাদি। এত বেশি মন্দির যে তাদের ভরণপোষণও এক সমস্যা। কোনো রাস্তার মোড়ে যেখানে ত্রম্বকেশ্বরের বিশ্রামস্থল ছিল এখন সেখানে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া ঘুমোয়। রেড্ এন্ড হোয়াইটের লেবেল দিয়ে তোরণ সাজান। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতনই সমান পঙ্গু হাড় জিরজিরে মোটর গাড়ি। আর তাদের সারথি ভূতনাথের চেলাই তারা—শুয়ে শুয়ে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে বিড়ি টানে।

তবে বড় বড় মন্দিরগুলো এখনও উৎসবে আনন্দে সর্বমানবের প্রতি তাদের দরাজ দরওয়াজা খুলে রেখেছে। প্রতিদিন চলেছে বিগ্রহের শোভাযাত্রা, বাহকদের কাঁধে দেবতা চলেছেন। পিছনে কিছুদূরে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণকারী জরিদার বাষ্টিপরিহিত, অঙ্গাবস্ত্রম্ কণ্ঠে সংলগ্নিত, শ্বেতউপবীত-ধারী ব্রাহ্মণবর। একাম্বেশ্বর, ভরদরাজ, কামাক্ষা মন্দির এই পুজা উৎসবের সবচেয়ে পুণ্যময় ক্ষেত্র। প্রত্যেকটি মন্দির বহু মহলে বিভক্ত, প্রত্যেকটিতে সুন্দর খোদাই কাজ, যদিও আধুনিক হোয়াইট ওয়শ্ তার সৌন্দর্য প্রাণপণে মেরে দিতে চেষ্টা করেছে। ভরদরাজ মন্দিরের সুন্দর দেয়াল-চিত্রগুলির রঙিনতা চুনকামের শ্বেত অব-লেপের বৈরাগ্যে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলা হয়েছে। সবচেয়ে পুরনো মন্দির হল কৈলাসনাথ এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমাল। একটি শিবের আরেকটি বিষ্ণুর। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই এখানে বেশি। এই দুটি মন্দিরই ৭ম শতাব্দীর। সিংহবাহন

প্রদর্শনী তোরণ ফটোঃ সুপ্রিয় ঠাকুর

স্তম্ভের গম্ভীর সারি আর প্রতি প্রকোষ্ঠে ছোট বড় কত কীর্তি। মহাবলীপুরমের সমসাময়িক এই মন্দির দুটিতে দক্ষিণী মন্দিরের গঠনপদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাধনার চর্চা এ শহরে ছিল, তাদের প্রভাব এই মন্দির দুটিতে রয়েছে। কাঞ্চীপুরমের আরেকটি খ্যাতি তার সিল্ক ও সুতির নক্সা করা সাড়ি, অঙ্গবস্ত্রম এবং বাষ্টির জন্য। এ ছাড়া এর কাছেই রামানুজের জন্মস্থান এবং শঙ্করাচার্যের মঠ।

এই সময়ে চলেছে গরুড়োৎসব এবং কৃষ্ণ চতুর্থীর রথযাত্রা। মন্দির হয়ে উঠেছে বহুমানবের মিলনক্ষেত্র, আধ্যাত্মিক মঙ্গল-ভূমি। ওদিকে দু'মাইল দূরে আধুনিক পুণ্যভূমি সর্বোদয়পুরম্। সেখানেও বহু মানবের মিলনক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আরও ব্যাপকভাবে, পথ খোঁজা হচ্ছে সর্বমানবের মঙ্গলের। কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিক নয়, তার সহযোগে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দৃঢ়ভিত্তি গড়ার নতুন পরীক্ষা চলেছে। এই হল প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার পার্থক্য, যদিও 'ভবতু সব্বমঙ্গলং' এর আদর্শ বহু শতাব্দী থেকে ভারতে প্রবাহিত।

গত ২৬শে মে আচার্য বিনোবা ভাবে কাঞ্চিপুরমে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলেন। ভোর থেকে শহরবাসী সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাঁধে কোলে নিয়ে সমাগত। সেই ভিড় ঠেলে শহরে ঢুকতে বিনোবাজীর তিন ঘণ্টার উপর লেগেছিল। ভোর থেকে প্রত্যাশী জনসমুদ্রের জয়ধ্বনি ও উৎসাহের চাপে সব শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেসে উড়ে যায়। বিনোবা নিজে চেষ্টা করেও তাদের

উৎসাহকে নিয়মে বাঁধতে পারেননি। কখনও কখনও তাঁকে পিছনে দু'তিন ফার্লং ছুটে যেতে হয়েছে। এই মানুষের প্রাচীর ঠেলে এগোন অসম্ভব ছিল। বিনোবাজী পৌঁছলে পরেই সর্বোদয় এবং নঈতালিমের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীরা এলেন।

সম্মেলন হল দুটি। স্যত্তাশে মে যার উদ্বোধন সেটি হল অষ্টম সর্বোদয় সম্মেলন। অখিল ভারত নঈতালিম সম্মেলন তিরিশে মে। এই অবসরে সম্মেলনক্ষেত্র সর্বোদয়পুরমের বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। কাঞ্চীপুরম্ থেকে একটি পাকা রাস্তা গেছে দক্ষিণে। রাত্রে শহর ছেড়ে বেরুলেই দেখা যায় আলোর সমারেশ— যেন অনেকগুলি জাহাজ লক্ষবাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে কবে বন্দরের কাল হবে শেষ। সম্মেলন প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে একটি সুদৃশ্য তোরণ নারকেলপাতা, বাঁশ, মাদুর, দিয়ে তৈরি। সেই প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সামনে, পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখছি বিরাট সম্মেলন-মণ্ডপ, তার বাঁশের খুঁটিতে নিঅন আলোকদণ্ড আর লাউড স্পীকার। সেই মণ্ডপেরও একটি তোরণ রয়েছে, পশ্চিমে। পূবে উঁচু মঞ্চ। পূবে মুখ করে প্রধান তোরণ থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত যদি একটি লাইন টানা যায়, তার বাঁদিকে পড়ে দশ হাজার প্রতিনিধির জন্য বাঁশ ও নারকেল পাতার ছাউনী, সার সার। চৌকোণা ছাউনী। দেয়াল বাঁশের চাঁচের, কোমর পর্যন্ত উঁচু। তারপর ফাঁক, তারও পরে চালা। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের সঙ্গে যোগ করুন আসাম এবং কিছু বিদেশীর দল যথা জাপানী, গ্রীক, জার্মান, আমেরিকান, ইংরেজ। সবাই খদ্দর পরিহিত। কেবল যারা একেবারে গ্রামের অধিবাসী তাঁরা নিজেদের সাজ ছাড়েন নি। তাতে ভালই হয়েছে। এই খাটো খদ্দরের সাদা austerity-র দমবন্ধ করা চাপ মাঝে মাঝে মুক্ত হয়েছে। রাজপুতরা এদিক দিয়ে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বহুবর্ণ। মাথায় পাহাড়ের মত হেলানো পাগড়ি, আঁট করে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে ফিতে দেওয়া কামিজ আর পায়ে মস্ত মস্ত নাগরাই। মেয়েদের রঙীন চুমকি আর মোটা মোটা মল। এই ছাউনিরও বাঁয়ে এখানকার প্রতি মুহূর্তের এনাউন্সমেন্ট অনুসারে চার্টিং হল—তার মাঝে আরও বড়গোছের চৌকোণা চালওয়ালা ছাউনী। ঢোকবার মুখে খাবার টিকিট দেখিয়ে পাত পেড়ে বসতে হবে। একে একে সম্বর, রসম, উপ্পু, [illegible] সামনেই জলের কলের দীর্ঘ সারি, হাতে ঠেলাঠেলি করে হাত একরকম না ধুয়েই অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এই বাঁদিকের সারিতেই রয়েছে সাময়িক ডাক ও তার ঘর। অ্যাম্বুলেন্স-এর খুবই প্রয়োজন, ইতিমধ্যেই এক পাগলা লরী বড় গেট পার হয়ে মণ্ডপের কাছাকাছি দুটো তিনটে লাইট পোস্টে ধাক্কা মেরেছে। এ ছাড়া রয়েছে মাইকে নিরবচ্ছিন্ন ঘোষণা—অমুকের মা, অমুক বাঈ, তাঁর ছেলের সঙ্গে এসেছিলেন এখন ৫নং ছাউনীতে বসে কাঁদছেন, ছেলে যেন এসে তাঁকে নিয়ে যান। বিহারের অমুক প্রতিনিধির রূপোর লোটা খোয়া গিয়েছে, কেউ পেয়ে থাকলে 'কৃপয়া' ফেরৎ দেবেন। আর আসছে থেকে থেকে হাততালি দেওয়া গানের শব্দ 'বিনোবা ভিখারীরে' কি আর কিছু। কখনও রাজস্থানী, কখনও পাঞ্জাবী। নয়ত একসঙ্গে ওড়িয়া আর তামিল, তার

বিনোবা কুটীর ফটো: সুপ্রিয় ঠাকুর

সঙ্গে মারাঠিও। সে এক অপূর্ব শব্দ-প্রাচুর্য। ধ্বনিসংঘাত।

সভামণ্ডপের ডানদিকে, তার মাঝে বিরাট ৬০ একর জমির প্রাঙ্গণের দক্ষিণে স্নিগ্ধ নারিকেলকুঞ্জ ছায়াসন্নিবিষ্ট। তিনদিকে আদিগন্ত কচি ধান গাছে আন্দোলিত সবুজ শোভা। বহুদূর থেকে ছুটে আসছে হাওয়া। নারকেল গাছগুলো নুয়ে নুয়ে উঠছে। তার মাঝেই লাল ইঁটের সারি দেওয়া বালুভূমি আর পথ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অসংখ্যও উত্তরে মুখ করে ইংরেজী 'L' আকারে ছাউনি, নারকেলগাছের তলে তলে। সোজা যে ঘরটি, সেখানেই রয়েছেন বিনোবা ভাবে—এই সম্মেলনের প্রাণকেন্দ্র। লম্বা ঘর। পাতা ও বাঁশের তৈরি। সামনে একটা চালা বের করা, তার নিচে অপেক্ষমান স্বেচ্ছাসেবক। তারপর পূব-পশ্চিমমুখো লম্বা ঘর, তার দেয়াল ফুট দুতিন উঁচু, তারপর ফাঁকা, ওপরে নারকেলপাতার চালা। এই ফাঁকা অংশে হাওয়ায় দুলছে বাঁশের ডালি থেকে উপচে-পড়া অর্কিড। সারা দেয়ালে আল্পনা। একেবারে পশ্চিমে বিনোবাজীর স্নানের ঢাকা জায়গা। সামনের লম্বা ঘরটায় পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে একটা খাটিয়া পেতে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন বিনোবাজী দুপুরবেলা খাওয়ার পর। এ দৃশ্য অনেকবারই দেখা গেছে। সামনে ঢাকা দেওয়া জলচৌকী। এই ঘরেই মেঝেতে মাদুর পাতা; রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাজী, জয়প্রকাশ, ডেবর প্রভৃতিদের সঙ্গে মাদুরে বসে আলাপ করেন বিনোবাজী। বিনোবাজীর ঘরের পর উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দুটি সারি। পশ্চিমে বিনোবাজীর ঘরের কাছের ছাউনির বাঁশের খুঁটি ধরে যিনি বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি জয়প্রকাশের স্ত্রী, আর মেঝেতে বসে দুচারজনের সঙ্গে কথা বলছেন স্বয়ং জয়প্রকাশ। ঐ সামনের কল থেকে যিনি জল নিয়ে পাশের ছাউনিতে ঢুকলেন খালি গা, খদ্দরের লুঙ্গী পরা, উনিই হলেন শঙ্কররাও দেও। ঘরের গায়ে না লেখা থাকলে আমিও চিনতে পারতুম না। তারপরের ঘরে প্রায়ই দেখা যায় একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, জওহরলালের সঙ্গে মুখাবয়বের মিল আছে, ঠিক তেমনি হাসলে পরে চোখের কোণে লম্বা একটি বাঁকা ভাঁজ পড়ে—রামেশ্বরী নেহরু। আরেকটু এগোলেই দেখা যায় রাত্রে বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় খালি গায়ে বসে এক সুদর্শন পুরুষ ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সাগ্রহে আলোচনা করছেন—ইনি কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন ডেবর। ডেবর এলেন ২১শে। সেদিন তাঁর খাদি পর্দা টাঙানো ঘরের সামনেই কৌতূহলী দর্শকদের সবচেয়ে ভিড়। সভার পর হাত জোড় করে হাসিমুখে ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। একটা লাল আভা আছে চেহারায়, যদিও ঘোর গান্ধীবাদী কংগ্রেসী। হাসিটি মধুর, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। উল্টো দিকের সারিতে কাকা কালেলকর শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশ। দীর্ঘউন্নত চেহারা শ্রীআর্যনায়কম, আর আশা দেবী। অন্যান্য ঘরে আরও সব ভারতবিখ্যাত সর্বোদয় কর্মী ও নঈতালিমের প্রচারক। আপ্পাসাহেব পটবর্ধন, অচ্যুতের দাদা, সর্বোদয় সম্মেলনের সভাপতি। দাদা ধর্মাধিকারী। ধীরেন্দ্র মজুমদার। আপ্পা-সাহেবের গ্রামরাজ পরিকল্পনা সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। গান্ধীগ্রামের রামচন্দ্রন। সবাই চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নয়ত ছোট ছোট আলোচনাসভায় ব্যস্ত। এর মধ্যে একজন চটির ওপর তোলা মোটা খাদি-ধুতি পরে, একটা খাটো ফতুয়া গায়ে বুদ্ধি-দীপ্ত কৌতূহলী চোখ বুলিয়ে চারিদিকে দেখে বেড়াচ্ছেন। ছোট ছোট চুল, চোখে চশমা, কখনও হয়ত চিঠি নিয়ে কোথায় ফেলবেন বুঝতে পারছেন না। দর্শকরা

সম্মেলনের প্রধান তোরণ
ফটোঃ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁকে নিজেদেরই একজন ভাবছে। শুনেছি খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে মহাবিপদে পড়েছিলেন। খাবার টিকেট ফেলে এসেছেন, গেটে লোকেরা খুব তম্বী করে অতঃকে ফেলে কোথাকার ডেলিগেট, কী নাম, কোনও পরিচিত নেতার পরিচয়পত্র আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে। এত প্রশ্নের তোড়ে ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে অনেক পরে একটু সুযোগ পেয়ে কোনও রকমে বলেছেন—আমার নাম নবকৃষ্ণ চৌধুরী, উড়িষ্যার ডেলিগেট। তখন আগে কেবা স্থান লইবেক দল তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

সম্মেলনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের প্রতিটি কাজকর্ম নিয়মে বাঁধা। নইলে এই দশ হাজার লোকের চলাফেরা দশ হাজার রকমেরই হত। ভোর সাড়ে চারটায় আর সন্ধ্যা সাতটায় প্রতিদিন প্রার্থনা সভা হয়। বিনোবাজী পরিচালনা করেন। প্রথম দিনের প্রার্থনায় বিনোবা যে ভাষণ দিয়েছেন সেটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। বিনোবা হাঁটেন একেবারে সোজা হয়ে। লম্বা দুটি হাত দুপাশে দুলতে থাকে। পরনে গান্ধীজীর মত ছোট ধুতি, রোদ উঠলে তার খুঁট মাথায় জড়ান। কালো-চুল, সাদা দাড়ি। মোটা কাচের সাধারণ ফ্রেমের চশমা। হাঁটেন বেশ দ্রুত। কথা বলেন অত্যন্ত আস্তে, মাইকে গলা খুব সুন্দর শোনায়—একটু যেন ক্লান্ত, কিন্তু মধুর। প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে স্পষ্ট করে বলেন। মাঝে মাঝে গলা অল্প চড়ে, জোর দিয়ে কিছু একটা বোঝাবার জন্য ডান হাতটা তখন একটু ওঠে, এছাড়া আর কোনও অঙ্গ-ভঙ্গী নেই। খাড়া হয়ে বসে কথা বলেন। দূরাগতধ্বনি, মনে হয় শ্রোতাদের মনের ভিতরেই কেউ কথা বলছে।

বিনোবাজীর প্রথম দিনের প্রার্থনা-ভাষণ শুনে মনে হয়েছে তিনি গান্ধীজীর সাধর্কশিষ্য, ভূদান যজ্ঞের পুরোহিত সমাজ-সেবী, এসব তাঁর আংশিক পরিচয়। তিনি হচ্ছেন মানবপ্রেমী। অন্য পরিচয়গুলি এরই একেকটি বিকাশ। প্রার্থনা সভায় বিনোবা বলেছেন, 'সর্বোদয়ের আদর্শ হল সব মানুষ এক এবং তাদের অন্তরাস্থিত যে আত্মা তা এক এবং অভিন্ন—এই চেতনা লাভ করা ও প্রকাশ করা। গণতন্ত্র কেবল ভোটের ব্যাপারে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করেছে। কিন্তু আত্মার অভিন্ন মিলন গণতন্ত্র মানে নি, কেবল সংখ্যাধিক্যের মতের জোরে সেখানে বড় হয়েছে। সর্বোদয় মানুষের সেই অন্তরের মিলন ঘটানর কাজ গ্রহণ করেছে। ভূদান বা গ্রামদান হল সেই আধ্যাত্মিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ। নিছক ভূমিব্যবস্থা সংস্কার নয়। গ্রামদান ও গ্রামরাজ এই হৃদয়ের উপলব্ধিজাত আন্তরিক সাম্যের প্রচেষ্টা।'

বিনোবার আন্দোলনকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক ভূমিব্যবস্থার সংস্কার বলে ভুল করেছি। এ হল এক নৈতিক আদর্শ। যা শুধু জমি বিলি করেই শেষ হয়না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবনের ভিত্তিরূপে এই আদর্শ রূপ নিতে চায়। পরে জয়প্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা শোনান যাবে।

অশ্রুসজল চোখে জয়প্রকাশ বলছেন—'এই ঋষিতুল্য আচার্যও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন মনে করছেন। আমরা যারা অকল্প দোষে পূর্ণ, আমরা তবে কোথায় দাঁড়াব।'

দের মনোভাব হবে বিনয়পূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের এবং কাউকেই শিক্ষকরা অশিক্ষিত মনে করবেন না। বিদ্যার দম্ভ ত্যাগ করে ছাত্রদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহাসক্ত আত্মীয়ের মত হতে হবে।" বিনোবাজীর এই উক্তি নতুন নয়, কিন্তু বারে বারে একে নতুন করে হৃদয়ে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সম্মেলনের অন্যান্য দিন ভাষণ দেন জয়প্রকাশ, ডেবর, নঈতালিমের সম্পাদক আর্যনায়কম দম্পতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা হিন্দী ভাষায় নটীর পূজা অভিনয় করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডেবর, বিনোবাজী জয়প্রকাশ প্রভৃতি সবাই সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি অভিনয় শেষে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। এই দুই সম্মেলনের প্রথমদিন থেকেই সন্ধ্যায় গানবাজনার আসর চলেছে। প্রথমদিন বিনোবাজীর ঘরের পিছনে শুধু তাঁর জন্যই শান্তিনিকেতনের গাইয়েরা রবীন্দ্রনাথের পূজার গান গেয়েছিলেন। পরের দিন ছিল সবার জন্য বীণা আর মৃদঙ্গম্। মৃদঙ্গের কৌশল মনোমুগ্ধকর। কতরকম ছন্দ ও বড় বড় তেহাইয়ের বৈচিত্র্য। আসর ভাঙলে বাজিয়েকে কৃতজ্ঞতা জানালে পর তিনি হাতজোড় করে বাজনার সমস্ত দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলেন। তৃতীয় সন্ধ্যায় হয়েছিল ভূদান সম্বন্ধে নানা ভাষায় গান। সবকটি সুরই মেঠোসুরে জমিয়ে গাইবার মত। তার মধ্যেও সবচেয়ে জমেছিল সিদ্ধুদেশী শ্রীদুখায়নের "বাপুজীকো কহিয়ো পলটি মোরে রাম রাম।" এছাড়া দক্ষিণ ভারতের প্রতিভাবান শিল্পীদের বাঁশি ও গান ছিল।

সম্মেলন শেষ হল ১লা। সর্বোদয়ের অঙ্গ রূপেই নঈতালিমের আদর্শ প্রচারের কাজ গ্রহণ করা হল। পদযাত্রায় এই শিক্ষা প্রসারের ভারও নেওয়া হল। আর বিশেষভাবে আলোচিত হল উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা। তারপর একে একে যে যার ডেরা ভেঙে চল্লেন—কেউ ঘরমুখো, কেউ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে, কেউ তীর্থদর্শনে। রাস্তায় অগণ্য যাত্রী। গাড়ি ও জনারণ্য। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের সময় থেকেই কাঞ্চীপুরম্ সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্র, কাশীর পরেই তার স্থান—নগরেষু কাঞ্চী। এই সম্মেলনে তার সর্বভারতীয় মহিমা যেভাবে ফুটে উঠেছিল, কাঞ্চীর সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসে এমন আর কখনও হয়নি। ওদিকে গরুড়োৎসবের ঢাকের বাদ্যিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কেবল বিদেশী যাত্রীদের প্রতি গাড়িওয়ালাদের অক্লান্ত ডাক শেষ হচ্ছে না।

চিত্র চরিত্র

পাওনা—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নূতন সংস্করণ। বিহার সাহিত্য ভবন, ২৫।২ মোহন-বাগান রো, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

প্রায় বিশ বছর পরে এ গ্রন্থের নূতন ও শোভন সংস্করণ প্রকাশ করে প্রকাশক বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হলেন। কেদারবাবু শুধুই রস-সাহিত্যিক ছিলেন না, অনুপ্রাসে ও বাক্য-শ্লেষে যাঁর রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নিঃশেষিত। তাঁর মধ্যে একটি সমাজ-সত্তা নীরবে কাজ করে যেত, যেটি অনেক সময়ে তাঁর নিজস্ব ব্যঙ্গ-কৌতুকে প্রচ্ছন্ন থাকত। কথায় ধার তিনি দিতে পারতেন, এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য ছিল তাঁর গভীর সমবেদনা ও জীবন-বোধ। বাঙালী সমাজের অনেক আলস্য অনেক অকর্মণ্যতা নিয়ে তিনি যেমন বিদ্রূপ করেছেন, বাঙালী যৌথ পরিবারের ভাল ও মন্দ সম্পর্কেও তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল তীক্ষ্ণ ও নিপুণ। নক্সায়, গল্পচ্ছলে তিনি সার্বেক আমলের বিস্মৃতপ্রায় অনেক সামাজিক আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে এখন যে সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ে উঠেছে, আজ থেকে সত্তর আশি বছর পূর্বে সেখানে যে সব গ্রামবৃদ্ধ সমাজপতির দল যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, অফিসে বড় সাহেবের মনোরঞ্জন করতেন, আত্মীয়স্বজন ও দুঃস্থ গ্রামবাসীর প্রতিপালন ও সাহায্য করতেন, তার সরস ও জীবন্ত চিত্র কেদারবাবু রেখে গেছেন এই 'পাওনা'য়। কুঠির বাবুদের দৈনিক জীবন, কুঠিয়াল পানসীর নিত্যকর্মপদ্ধতি, ছুটির দিনে অবসর-বিনোদন, গ্রাম-যুবকদের কথাবার্তা, গৃহস্থ সংসারের চিত্র, কৌলীন্য প্রথার বাঙালী নারীর দুঃখ-লাঞ্ছনা ইত্যাদি সে যুগের অনেক খুঁটিনাটি ছবি ও খবর আজকের দিনে একেবারে অতীত হলেও অপ্রয়োজনীয় নয়। ওপারে বালি থেকে কোন্নগর, শ্রীরামপুর আর এ পারে এঁড়েদা, পেনেটি, বারাসত অঞ্চল ছিল কেদারবাবুর এলাকা। এখনকার সমাজ ও যৌথ পারিবারিক জীবন ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন, বড় হয়েছিলেন এবং কর্ম-উপলক্ষ্যে দেশান্তরী ও অবসর নেবার পর প্রবাসী হলেও বাঙালী সমাজ ও জীবনের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তাই হার্দ্যকোও সমালোচনা ও সমবেদনা দিয়ে তিনি সেই সমাজ ও জীবনের মনোজ্ঞ রসচিত্র এঁকে গেছেন। অনুসন্ধানী সমাজজিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে তার কিছু মূল্য এখনও আছে।

৮১।৫৬

বাংলা গানের ইতিহাস

বাঙলার সঙ্গীত। মধ্যযুগ। রাজ্যেশ্বর মিত্র। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বাঙলার সঙ্গীতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করে রাজ্যেশ্বর মিত্র সঙ্গীতরসিক বাঙালী পাঠকের অশেষ ধন্যবাদ পেয়েছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করে সঙ্গীততত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের পরিচয় দিয়ে পাঠকের মনে আশ্বাস জাগালেন।

মধ্যযুগের সঙ্গীততত্ত্বালোচনার পূর্বে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করা হয়েছে। মধ্যযুগে যে সমস্ত শাসক সঙ্গীতচর্চার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে মূলত দুটি সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমত মধ্যযুগে দরবারী সঙ্গীতের দিকে বাঙালী তেমন আকৃষ্ট হয় নি। সাধারণ কাব্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতচর্চাই মধ্যযুগের বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত উত্তর ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা যেভাবে বিস্তারিত হয়েছে বাঙলাদেশে সেভাবে হয়নি। তবুও বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা স্তরে চর্চা বরাবরই ছিল। ভক্তিরত্নাকর ও সঙ্গীততরঙ্গে তার পরিচয় মেলে।

তারপর কীর্তন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লেখক। কীর্তনের জন্ম ও প্রসার, কীর্তনের বৈচিত্র্য, কীর্তনের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রাদির কথা, কীর্তনের বৈচিত্র্যপূর্ণ তাল, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল ও কীর্তনের তালের বৈষম্য, লোকসঙ্গীত ও কীর্তনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য ইত্যাদির স্বচ্ছ আলোচনা রয়েছে।

মধ্যযুগে বাঙলার বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সুরপ্রেমী গবেষক রাজ্যেশ্বরবাবু যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা অভিনব বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, 'Aspects of the Bengali Society' গ্রন্থটিতে শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত মহাশয় মুসলমান আমলের বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন ও তার আলোচনা করলেও সামগ্রিকভাবে সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক আলোচনার অভাব বোধ করেছি সেখানে। মধ্যযুগের সাহিত্যেই এবিষয়ে প্রমাণের সন্ধান। মঙ্গলকাব্যে কতরকম প্রবন্ধসঙ্গীতের প্রচলন বাঙলাদেশে ছিল এবং দরবারী সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ই বা কি তা পাবার উপায় নেই। যা পাওয়া যায় তা হোল নানাপ্রকারের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, শূন্যপুরাণ, মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গল, মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন—মধ্যযুগের এই সমস্ত কাব্য-গ্রন্থ থেকে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখযুক্ত পংক্তি-গুলির সুসংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক। তারপর সেই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন এই চারটি ভাগে ভাগ করে বাদ্য-যন্ত্রগুলির চিত্রসহ ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত দামোদর, নারায়ণ, কুম্ভ, শার্ঙ্গদেবের কাব্য ইত্যাদি। তাদের উল্লেখের কথা উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল তা স্পষ্ট হয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলবার আছে। লেখক চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে চৈতন্যমঙ্গলের নামগত সাদৃশ্য ছাড়া কোন মিল নেই। চৈতন্যভাগবতের সঙ্গে তাও নেই। এই দুটি কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হয়নি।

শেষ আলোচনাটির ভিত্তি হোল ভক্তিরত্নাকর ও সঙ্গীততরঙ্গ। এই দুই গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখক আলাপের রীতি, নিবদ্ধসঙ্গীত, চারটি ধাতু বা কলি, গীতপ্রবন্ধের ছটি অঙ্গ আর পাঁচটি জাতি পরিকল্পনা, শুদ্ধগীত, গীত-প্রবন্ধের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য, প্রাচীনকালের নানা তালবৈচিত্র্য, ঋতুগীত, ধ্রুবপদের উদ্ভব, নানা-প্রকারের গমক ও শেষকালে রাগ ও সুরের পার্থক্যও সংক্ষেপে, সহজভাবে বুঝিয়েছেন।

উর্বী দেবী—সমীর ঘোষ। প্রকাশক : নীরদবরণ ঘোষ, স্টারলাইট পাবলিকেশনস্, ১১।১এ, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলকাতা-২৬। মূল্য—৩৷৷৹

গার্হস্থ্য জীবনের বহু বিচিত্র পরিস্থিতি থেকে অভিনেত্রী উর্বী দেবীতে অরুণার রূপান্তরীকরণ হলো। এই পরিবর্তনের ধারা দেখাতে গিয়ে লেখক যথার্থ ঔপন্যাসিকের উপযোগী ঘটনাচক্র প্রদর্শন করেছেন। তবে কাহিনী-বিস্তারে তিনি যে কোনো মৌলিকতা মুদ্রিত করে দিয়েছেন, একথা বলা যায় না। এ'র ভাষার পারিপাট্য স্বীকার্য এবং তদুপযুক্ত সমৃদ্ধ-আখ্যানের দাবী জানিয়ে শ্রীযুক্ত সমীর ঘোষের পরবর্তী উপন্যাসের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো। (৫৬৭/৫৫)

পঞ্চদীঘির বেদেনী—অমরেন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৩্ টাকা।

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ—সাহিত্যক্ষেত্রে লেখকের সুনামের একটি বিশেষ প্রমাণ। কাহিনীর অপরিচিত পরিবেশ এবং প্রচলিত সমাজবহির্ভূত কয়েকটি চরিত্র, এইসব কারণেও গ্রন্থটির আকর্ষণ পাঠকের কাছে আত্যন্তিক। একটি বেদে-মেয়ের ভালবাসা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি, গ্রামের সাধারণ একটি তাঁতি বালকের প্রীতি সেই বেদে মেয়ের প্রতি, সেই সঙ্গে আছে বেদে-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলের চিত্র। সব মিলিয়ে মনকে অভিভূত করে ধাধার উপকরণ ছড়িয়ে আছে সমগ্র গ্রন্থে। সুতরাং ঘটনার কতটা বাস্তব আর কতটা বাস্তব নয়, সে-বিচার এখানে প্রায় অবান্তর। কারণ যে শিক্ষিত-জনদের জন্য সাহিত্য রচনা তাদের শতকরা প্রায় একশ' জনেরই কোনো অভিজ্ঞতা নেই এই বাস্তবতার সঙ্গে। (৫৬৬।৫৫)

মধুযামিনী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন। মূল্য তিন টাকা।

শৈলজানন্দের নাম দেখিয়া বইখানি হাতে পাইয়াছিলাম। পড়িয়া মনে হইল, কিমত অবস্থায় হোমারেরও যখন মাথা নড়ে, তখন শৈলজানন্দের আত্মবিস্মৃতি এমন কিছু নিদারুণ দুর্ঘটনা নয়। স্বদেশে ও বিদেশে বহু নাম-করা লেখক কখনও কখনও পট-বয়লিং করিয়াছেন, অবস্থা-বৈগুণ্যে এমন রচনা বাজারে ছাড়িয়াছেন, যাহাতে সুনাম রাখা দায়। তবে সেটা অন্তরালবর্তী, লেখক-জীবনের আচ্ছাদিত কৃষ্ণপক্ষ। শৈলজানন্দ প্রতিভাধর লেখক। একদা তাঁর কথা-সাহিত্যিক বিকাশ বিস্ময়কর বলিয়াই সমাদর পাইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানিতে এক বৈশিষ্ট্যহীন প্রতারকের পাল্লায় তরুণীর কৌমার্যহানি কেমন করিয়া নিষ্ঠাবান প্রেমিকের কাছে শেষে মধুযামিনীতে পরিণত হইল, সুরেশ্বর ও প্রতিমার প্রণয়-কথা তাহারই কাহিনী। চরিত্রের কোনও বিবর্তন নাই, আছে শুধু কয়েকটা একটানা ঘটনা। তাও স্থানে স্থানে আকস্মিক ও প্রক্ষিপ্ত। রমানাথ স্পষ্টত মনোবিকলনের নমুনা। সে যাহাই হউক, মেসের জানালা হইতে যুবকের ও পাশের বাড়ির ঈষৎ প্রগল্‌ভা তরুণীর যে আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার মধ্যে শিল্প বা তত্ত্ব-সন্ধান করা সঙ্গত হইবে না। কথাবস্তু, চিত্র ও অঙ্গ-সজ্জা বটতলা উপন্যাসের কথাই স্মরণ করায়। পুরোপুরি 'গ্রাব্ স্ট্রীট' হইলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। কিন্তু কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের সস্তা বা খেয়ো লেখা লইয়া 'নিউ গ্রাব্ স্ট্রীট' খুলিলে প্রকাশকেরও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়। ৭৩।৫৬

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
যৌন জিজ্ঞাসা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
দুশ্চিন্তে যার বাধা চলে না—পত্রিকা সিন্ডিকেট লিঃ, ১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস—
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বোধি দর্শন—প্রদ্যোৎকুমার সেন।
সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী—
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।
বায়গুণাকর ভারত চন্দ্র—
শ্রীমদনমোহন গোস্বামী।
বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী—সোমেন বসু।
রবীন্দ্রনাথ—পুলোমা মাস্ত।
ছোটদের রামকৃষ্ণ—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত।
পতিব্রতা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
ফ্র্যাঙ্কেনস্টিন—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
দেশ প্রেমে ভারতবাসী—শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয়—অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নেতাজী ও মহেন্দ্রজী—শ্রীতরুণবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী।

বিষাক্ত নগরী—শ্রীইন্দুভূষণ দাস।

কলঙ্ক লেখা—শ্রীইন্দুভূষণ দাস।

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত)—পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য।

নিঃসঙ্গ অপথ—শ্রীমতী দত্ত।

গৌতম বুদ্ধ ১ম খণ্ড—মনোরঞ্জন রায়।

ভারতে গোরক্ষা—শ্রীসীতানাথ গোস্বামী।

আপনার অর্থ-ভাগ্য—শ্রীভাস্কর।

কালের গরু—ভাস্কর।

হস্তী কটক—প্রশান্ত চৌধুরী।

Camille — Alexandre Dumas.

Our Hearts—Guy De Maupassant.

Mademoiselle De Maupin—Theophile Gantier.

History of the Candellas—Nemai Sadhan Bose.

কাশ্মীর

৩

গুহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক পুনরায় বাস করেছিলুম পহলগাঁওয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড়জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইটুকুর মধ্যেই কাজ-কারবার ব্যবসা-বাণিজ্য। এপাশের উপত্যকা-পথে উঠে গেছে পাইনের সুদীর্ঘ বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগঙ্গার তীর ধরে চলে গেছে চিড়গাছের অরণ্য। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় অবরুদ্ধ। ওদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিডারবৎ, গুজর জাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগতি। প্রাণী-জগতে কোথাও চাঞ্চল্য নেই। আপন মনে কাজ করে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। সূর্যাস্তকালে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে মেঘের টুকরো নেমে আসে নীলগঙ্গার নীলাভ জলের ধারে,—তারপর যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না রাতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ডুকরে ডুকরে ওঠে নীলগঙ্গা!

পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম।

ছায়ানিবিড় রোমাঞ্চ ছিল কোন এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চূড়ার দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রকৃত নাম হলো, জনকমহল, কিন্তু নাম বদলেছে ইদানীং কালে—যেমন আয়েশ মোকাম! প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্য কীর্তিই প্রধান,—এদের সঙ্গে মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হলো গ্রীক এবং অন্যটি তিব্বতী, যার মূলে ছাপ হলো মঙ্গোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চারশো বছরের মধ্যে অবশ্য একটু-আধটু মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সন্নিকটে যেটি বড় মসজিদ অর্থাৎ শাহ হামদান,—এটিকে 'বৌদ্ধ-মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হলো দেবী কালীশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণ। কাশ্মীরের সর্ব-বৃহৎ জুম্মা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেব-দেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এছাড়া কি আর কোনও জায়গা ছিল না? ছিল বৈ কি। কিন্তু হিন্দু স্থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিরকাল পারদর্শী। পুরীর জগন্নাথ সমুদ্রবেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত ঝিলম শহরের নদী-তীরবর্তী বিশাল শিবশক্তির মন্দির, পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্রশৈলাভাসমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেলুচিস্তানের অঘোর নদীর তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ হিংলাজ দেবী, অগ্নিতীর্থের সোমনাথ, ব্রহ্মপুত্রের পারে কামাখ্যা, বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, কাশীর বেণীমাধব আর আদি-কেশব,—বলে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজপুতে, মহীশূরের যোধপুরে পুনা আর রামেশ্বরম বলতে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদী-তীরে—প্রত্যেক হিন্দু স্থাপত্যের স্থান-নির্বাচনটি হলো সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। এই প্রথম কাশ্মীরে দেখলুম, পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হলো অতর্কিত বন্যাপ্লাবনের দেশ, হঠাৎ আসে বন্যা,—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।

মার্তণ্ড শহরে এলুম। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পাণ্ডাদের। এদেরই পূর্বপুরুষ একদা ধর্মান্তরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাঁই দেয় নি। যেমন গয়ায়, যেমন কাশী আর বৃন্দাবনে, যেমন মথুরা-হরিদ্বার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনি ছিনেজোঁক। সেই একই ব্যবসা পুণ্য-বিতরণের। এখানে সরোবরের তীরে সূর্য-নারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ,—নাম হলো মার্তণ্ড মন্দির। এর স্থাপত্য, কারুকলা এবং অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মার্তণ্ড শহরের বর্তমান নাম ইসলামাবাদ কেন হলো খোঁজ নিইনি, কিন্তু মার্তণ্ডকে অনেকে আবার বলে মাটান্। এখান থেকে অল্পদূরে রাজা ললিতাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপত্য কীর্তি দেখে আসা যায়। কাশ্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পৌঁছলুম। উঁচু-নীচু গলিঘুঁজি বন-বাগান-ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক-ঝরনার পাশে একটি দেবস্থান। সত্যি, যেখানে যাও যেদিকে চাও দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষ্ণু আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর সূর্য। গিরি-শ্রেণীর দিকে তাকাও—অধিকাংশ নাম হলো হরমুখ, হর-মাহেশ, কৃষ্ণগিরি শঙ্করাচার্য, হরিপর্বত, শ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমরনাথ ইত্যাদি। নদীর দিকে তাকাও, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কৃষ্ণগঙ্গা, নীলগঙ্গা, দুধগঙ্গা,
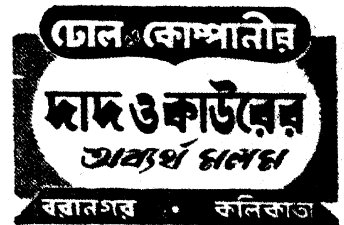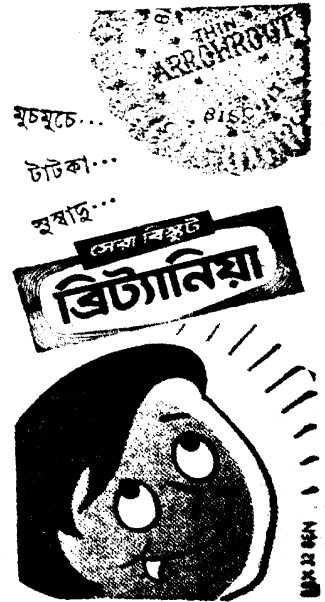
রোমহর্ষী, ভূঙ্গা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতি, ইত্যাদি। নগরগুলির দিকে তাকাও, সুখনাগ, নরনাগ, নাগমার্গ, অবন্তীপুর, মর্জাবিহার, আশুনাগ, রামপুর, চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হ্রদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসায়র, বিষ্ণুসায়র, গঙ্গা ও মনসাবল, উল্লহর—যাকে বলে উলার, বুন্ধবল, গান্ধারবল, নরবল, অমরসায়র, তরসায়র ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্যে কাশ্মীর হলো আধা-আধি আধা-হিন্দু এবং আর্য-বৌদ্ধ। মুসলমান জনসাধারণ যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা—সমস্তটাই মুসলমানবিরোধী। উত্তর ভারত অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়; তাতার মোগল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সঙ্গে ওদের আজও মিল হয় নি। ওদের সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয় হলো কাশ্মীরী হিন্দু। যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানের পরমাত্মীয় হলো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড়। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হলো বহিরঙ্গ, শোণিত-নীতি হলো অন্তর-অঙ্গ।

সাতটি সাঁকোর দ্বারা শ্রীনগরের এপার-ওপার সংযুক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম 'আমিরা কদল।' কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভয় পার হলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। এরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিলুম। এবার এসে উঠলুম ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাগানে তাঁবুর মধ্যে। কাশ্মীরে এসে তাঁবুতে বাস করা আনন্দদায়ক। নিরাপদ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র এসে পৌঁছলো। সদর ইন্টারিয়াসভের ওখান থেকে সোনালি লাল কালিতে ছাপা। বুঝতে পারা গেল, সাংবাদিক বন্ধু নিঃ ধরের উৎসাহ আছে এর পিছনে। অপরাহ্ণে সাড়ে চারটার সময় সুরবাক্ত করণ সিং জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করতে চান।

শ্রীনগরের দক্ষিণ প্রান্তটি হলো মিলিত শহর। রাজার অংশ পেরিয়ে গেলে আধুনিক আবহাওয়া। শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতির পর এখন দিন সপ্তাহ কেটে গেছে, থমথমে ভাবটা আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। প্রধান মন্ত্রী হিসাবে সরকারি শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লৌহমানব' বক্সী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী ও ভয়হীন নেতারূপে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদুল্লার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশাখেলা বিচিত্র। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে এক রাত্রের মধ্যে সরানো হয় এবং পরদিন তিনি যখন গুলমার্গ থেকে তাঁর সহকর্মী মীর্জা আফজল বেগকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার ওদিকে পালাচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। 'প্রজা পরিষদের' সন্দেহ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সংকট-সন্ধিকালে ওখানে গিয়ে পড়ি বলেই ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ

আবদুল্লা কাশ্মীরের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হয় কাশ্মীরের 'ব্যাঘ্র'——শের-ই-কাশ্মীর! কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা তিনি করতে থাকেন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দুই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে পড়ে যান। প্রকাশ, এমনি সময় কাশ্মীরের প্রজা পরিষদের নেতারা এই দুষ্ট চক্রান্তের খবর পান এবং তাঁদের হাতে তৎকালীন কাশ্মীর মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রের নকল ধরা পড়ে। প্রজা পরিষদ আমন্ত্রণ করেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন এবং অন্তরঙ্গ মহলের ধারণা এই, তিনি কয়েকখানি চিঠি নেহরুকে দেখান। নেহরু এতে আস্থা স্থাপন করেন নি। শেখ আবদুল্লা তাঁর বিশ বছরের বন্ধু এবং নেহরু বন্ধুবৎসল। বন্ধুর সংগে আলোচনা না করে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে প্রজা পরিষদের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহরু ও আবদুল্লার সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিদ্ধান্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয় কিনা, একথা শেখ আবদুল্লাকে জানান। আবদুল্লা এতেও আপত্তি জানান। তখন শ্যামাপ্রসাদ স্থির করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভুক্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ করবেন। কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কোনও ছাড়পত্র নেই, এটি ভারত গভর্নমেণ্টেরই প্রবর্তিত। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনওপ্রকার বাধা দেওয়া হয় নি, এমন কি মাধোপুর চেক্ পোস্ট থেকে ইরাবতী নদীর পুলের ওপার পর্যন্ত অনেকটা যেন অভ্যর্থনা করেই নিয়ে যাওয়া হয়।

"To see that his entry into the State without permit was facilitated."

এটি ছিল ভারত সরকারের অধীনস্থ গুরুদাসপুরের কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামাপ্রসাদের শুভযাত্রা কামনা করেছিলেন সেটি ১১ই মে, ১৯৫৩। পুলের ওপারে পৌঁছবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। বিচিত্র সেই গ্রেপ্তার! কাশ্মীর অথবা ভারত—কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র 'দু'মাসের জন্য' আটক করে রাখার সিদ্ধান্তটা একটু নতুন ধরনের, কারণ পরবর্তী ওই দু'মাসকাল পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাঁকে যেতে হচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ ভ্রমণে।

কিন্তু পণ্ডিতজীর মনে বোধ করি স্বস্তি ছিল না। তিনি গেলেন কাশ্মীরে আবদুল্লার সংগে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একটু ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বললেন। পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনা হলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মন্ত্রীর সংগে শেখ সাহেবের মনোমালিন্য ধূমায়িত হতে থাকে এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দু-ভারত-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

গ্রেপ্তারের এক মাস এগারোদিন পরে ২৩শে জুন তারিখে হঠাৎ শেষ রাত্রে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কি না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো সমগ্র ভারত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নেতা ছিলেন না। পূর্ববঙ্গ থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহৎ এবং উদার-প্রাণ দেশনিষ্ঠ কর্মী তিনি দেখেন নি। তিনি সহোদর বিয়োগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের স্বহস্তলিখিত ডায়েরীখানি কাশ্মীরের পুলিস হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহরু। তিনি সান্ত্বনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাঙলার শার্দুল স্বর্গত স্যর আশুতোষের সহধর্মিনী সেই সান্ত্বনা গ্রহণ করেন নি,—

সন্তানবিচ্ছেদাতুরা মহীয়সী মহিলা অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেণ্ট ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে সরকারী ও বেসরকারী লোক নিযুক্ত করা,—এই দুই কাজই পণ্ডিতজীর পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। সম্ভবত তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, এই তদন্তের ব্যাপার নিয়ে পাছে ভারতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু তত্দিনে শেখ আবদুল্লার গভর্নমেণ্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ কথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশহিত সাধকের মূল্যবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতদ্বৈধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপুরী সেদিন দেখে এলুম নিশাত বাগের পিছনে।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এবারে নতুন পথ। শ্রীনগর সুন্দর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনার-উইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্ দিকের ছায়ানিবিড় বনে-বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বপ্নজগতের মতো! দেখছি পাইন-পপলার-চেনার-উইলো-ওয়াল্‌নাটের নিকুঞ্জলোক আশে পাশে,—দেখছি, কিন্তু দেখছিনে! দেখে যাচ্ছে মন, চোখ বোধহয় নয়। মহাকাব্যের পাতায় পাতায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে এই হিমালয়ের অন্তঃইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল থাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উল্টিয়ে। দৃষ্টির সঙ্গে মন যদি সংযুক্ত না থাকে, কিছুই দেখা যায় না। 'অন্যমনস্ক চেয়ে ছিলুম'—মানে, দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্যত্র, তাই কিছু দেখতে পাইনি,—অনেক লোক এই কথা বলে। শকুন্তলা তাকিয়ে ছিল ক্ষুৎপিপাসাকাতর দুর্বাসার প্রতি, কিন্তু মনঃচক্ষু নিবদ্ধ ছিল দুষ্মন্তের দিকে; তাই দুর্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূস্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপত্যকার মতো উঠে গেছে যুবরাজ করণ সিংহের প্রাসাদের পথ। আশেপাশে পরিচ্ছন্ন উদ্যান। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেষ্টিত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। পশ্চিমে বিশাল ডাল হ্রদ—তার জলরাশি সূর্যকিরণে ও রঙিন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তার একাংশে ছবি পর্বতের দুর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চূড়ায় শংকরাচার্যের প্রাচীন মন্দির। উত্তর অঞ্চলে মহারাজা গুলাব সিংহের পুরাতন প্রাসাদ। কিন্তু যুবরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদটি নবনির্মিত। যেমন চারিদিকে আধুনিক সুরুচির শোভা, তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয়। নগরের কোলাহল থেকে দূরে একটি নিভৃত জীবনযাত্রা। আমরা যুবরাজের বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলুম।

সমস্ত ঘরে কাশ্মীরী কার্পেট আর মখমলের কাজ। এখানে ওখানে পড়াশুনোর উপকরণ। কোনো কোনো ফুলদানিতে মৌসুমী ফুলের নানাবর্ণের গুচ্ছ রাখা। একটি টেবিলে কয়েকখানি ছবি,—রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহরু-গান্ধী, এই তিনজন একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুশ্রী ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাচ্ছিনে।

যুবরাজ একসময় সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন। অতি সুশ্রী তরুণ যুবক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দুই চোখ। একটি পায়ে কিছু খুঁত আছে, সামান্য খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁর পরনে সম্পূর্ণ সাদা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিমুখে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। নমস্কার জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর বয়স অতি অল্প, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন সুশ্রী, তেমনি পরমাসুন্দরী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সঙ্গে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্তে।

মোট দশবারো জন আমরা ছিলুম। অন্য সকলেই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচিত, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দূরের মানুষ আপনি। আপনার এই ধুতি পোশাক দেখলে আমরা অবাক হই।

বললুম, এই পোশাকই ছিল ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে তাঁর ছবি দেখছিনে ত?

হাসিমুখে যুবরাজ বললেন, আর বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার বার জোগাড় করেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চলে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবো।

আমরা চামচ দিয়ে খাচ্ছিলুম, যুবরাজ প্লেট থেকে হাতে তুলে নিয়ে সিংগাড়া খাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'যাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন-কাহিনী এর আগে কখনও দেখিনি। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে! সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খুব ভালো লাগে।

পুণ্যতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত্র গত মাসে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষার-লিঙ্গের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্ত্রী ওই দুঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হেঁটে গিয়ে যাত্রা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডাণ্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে এসেছিলেন ক্ষীরভবানীতে। তারপর তিনি যান অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি আত্মসমাহিত হন যে, তীর্থযাত্রীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ বলে পূজো করেন। আশ্চর্য সেই মহাপুরুষ, তাঁর পদস্পর্শে কাশ্মীর ধন্য হয়েছিল!

উচ্ছ্বসিত যুবরাজ একসময় বললেন, দুঃখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাঙলা আমি আজও দেখিনি। মানচিত্রে দেখি বাঙলা অনেক দূরে! বাঙলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের! যদি কখনও যাই আগে যাবো বেলুড় মঠে, আগে দেখবো রামকৃষ্ণের মন্দির! বাঙলা দেশ হোলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললুম, বাঙলা দেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীরের বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাঙলার সংগে।

যুবরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ করে বললেন, জানিনে, কোনোদিন বাঙলা দেশ দেখতে পাবো কি না!

জলযোগের পর আমরা বাইরে এলুম। যুবরানী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হোলো। অতঃপর বন্ধুবান্ধব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেলুম যুবরাজের সংগে,—প্রায় অন্দর মহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিকভাবে বসাটা দেখে খুব আমোদ পেলুম। এটি যুবরাজ-জনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুললুম। তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাঙালী জাতি অত্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানালুম।

যুবরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সংগে আলাপ করে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ ছিলেন —এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। তাঁর মতো ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ নেতা অতি বিরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়েছিলুম। কখনও ভাবিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদের বাড়ির কেউ ভুলতে পারেননি। যেন আমাদের পরমাত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে!

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিলুম। তারই একটি পৃষ্ঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন:

"I have been asked by Sri P. K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do is to send the people of that great land my best wishes. I hope to some day visit your state which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

KARAN SINGH

29th August, 1953
Karan Mahal, Srinagar.

যুবরাজের এই বাণীটি যথাসময়ে দিল্লী ও কলিকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে' প্রকাশিত হয়।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সমগ্র পৃথিবী উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল কাশ্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তরুণ রাজকুমার মাত্র একরাত্রির মধ্যে একটি চলতি গভর্নমেন্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে আরেকটি নূতন গভর্নমেন্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতখানি ছিল, সে আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকখানি চিঠি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ বেনামীতে

নিয়মিত ছাপা হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে শেষপত্রে যুবরাজ করণ সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র ছিলঃ [অনুবাদ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we ought to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also knows this. If the West Bengal Governor Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে যুবরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেলুড় মঠ এবং এখানে ওখানে কিছুদিন পরিভ্রমণ ক'রে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

'দেবতাত্মা হিমালয়'র প্রথম খণ্ডে জনৈক বাঙ্গালী মহিলার উল্লেখ আছে। পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। হিমাংশু বসু ছিলেন আমার সঙ্গে। মহিলাটি আধুনিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া। তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো তাঁর ঠিকানা নিয়ে শ্রীনগরের শহরতলীর এক বাড়িতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে-বাড়িতে চার পাঁচটি পরিবারের মধ্যে দুটি বাঙ্গালী। তিনি আমাদের নাটকীয় আবির্ভাব দেখে সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর স্বামী বিমান-বিভাগে চাকরি করেন, এবং বর্তমানে আছেন দক্ষিণ ভারতে।

একটি বাগানবাড়ির দোতলায় মহিলাটি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বড়জোলা নামক পল্লীতে। রামবাগের পুল পেরিয়ে মহারাজা গুলাব সিংহের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পথটি গিয়েছে বিমানঘাঁটির দিকে, সেই পথের ধারে পপলারের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এঁদের বাগানবাড়ি। পল্লীটি অতি নিভৃত,—বাড়ির গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চলে গেছে, অরণ্যজটিলা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের দিকে।

শ্রীমতী মায়া পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঙ্গে যদি হিমাংশুও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু হিমাংশু তখনই জানিয়ে দিলেন যে, হাউস-বোটে কিছুদিন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাশ্মীরে, তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হওয়া একান্তই দরকার। হাউস-বোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। ডাল হ্রদের আনাচে কানাচে এবং বদ্ধজলার দলাজড়ানো নোংরা জলে হাউস-বোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার খালের মহাজনী নৌকার কথা আমার মনে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মাঝি-মাল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা গুটিয়ে থাকা পছন্দসই হয়নি। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট ঘেরা-টোপের ডিঙ্গি মোতায়েন আছে বটে, যখন খুশি পারাপারও হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত আরামই ওর সঙ্গে যুক্ত থাকুক, স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুণ্ঠিত হয়—এই আমার বিশ্বাস। তাঁবুতে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। সুতরাং হোটেল সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।

আমরা সেদিন চা পান করে পাঁচটায় আমাদের ডাকাতে ফিরে এলাম। কথা রইল পরদিন সকালে মায়া আসবেন আমাদের তাঁবুতে। সমস্ত বাগানবাড়ির পাহাড়পালা এবং ফুলবাগানের মধ্যে আমাদের তাঁবু, কিন্তু রোজ করি উপকরণের কিছু অভাব থাকার জন্য আরামখোরী বলে উৎসাহজনক ছিল না। হিমাংশুর স্বচ্ছন্দ চলাফেরার কোথাও ত্রুটি ছিল,—তার মাথার আছে কিছু ক্যাম্প-খাটও থাকলেই তিনি শান্তিতে ঘুমোন হন। আমি থাকি নিয়ে অসচেতন নিয়ে। নগর শহরের আরামপ্রদ উপাদানের মধ্যে থাকলে আমার পিঠে চিরদিন কাঁটা ফোটে। পদে পদে নিয়মের ব্যতিক্রম না করলে স্বস্তি পাইনে। প্রচুর আহারাদির আয়োজন দেখলে মনে অরুচি আসে। ফলাহারও খেলে শরীর ভালো হয়, একথা শুনলে ফেলে আমার দু-চোখের কিছু জ্বলে ওঠে। আমি আরাম চাইনে, আনন্দ চাই।

বাগানবাড়ির ভিতর ও বাইরের আবহাওয়া পরদিন সকাল থেকে আমাদের ভালো লাগেনি। ভিতরে থাকেন বাড়ির এজেন্ট মিঃ রায় ও তাঁর স্ত্রী। মিসেস রায়ের আগ্রহাতিশয্যেই হিমাংশু এখানে তাঁবুর বন্দোবস্ত করেছেন। সকালবেলায় শুধু মিঃ রায় বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ করেও গেলেন, কিন্তু কোথায় যেন বাতাসটা একটু থমথমে।

সকাল প্রায় নটায় এলেন মায়া এবং [illegible] শ্রীমান শংকর। তাঁবুর সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার সাদা রেশমের শাড়ির উপযুক্ত ছবি কিছুতেই রৌদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁবুর সামনে বাগানে সকালের চায়ের আসর বসে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে স্থির করা গেল, আজ আমরা মোগল গার্ডেনস্ দেখতে যাবো। শংকর জিদ ধরে এই প্রস্তাব করলো, আজ আমরা তিনজনে

তার সারাদিনের অতিথি। তার আতিথেয়তা স্মরণ করে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহুল সেটি নোংরায় আর সংকীর্ণতায় অপরিচ্ছন্ন; ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা,—ওর মধ্যেই বহু ধিকৃত জীবন কিলবিল করে। গলি-ঘুঁজি নর্দমা নোংরা জলে বস্তির যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে পাশে, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ নানা স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ। যারা কাশ্মীর দেখতে যায়, তারা কিন্তু কাশ্মীরীদের প্রকৃত জীবনযাত্রার চেহারা দেখতে চায় না। তারা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা অন্ধকার ছেঁড়া বিছানায়, উচ্ছিষ্টের [illegible] কাদায়, শিকারা আর হাউসবোটের পর্দাঘেরা আড়ালে, [illegible] হোটেলের অলিগলিতে, [illegible] পাহাড়ে, [illegible] ঘাটে ঘাটে, [illegible] আশেপাশে, কুটিরশিল্প কেন্দ্র-গুলির আনাচে-কানাচে ক্ষুধার্ত [illegible] নরনারী ও শিশু [illegible] প্রকৃত কাশ্মীরী,—যারা [illegible] টুরিস্টদের কাছে হাত পেতেছে। [illegible] দর্শনী। ছুটে [illegible] বকশিশ। [illegible] দেখিয়ে [illegible]। চললো সঙ্গে সঙ্গে যদি পায় ছিটে ফোঁটা, যদি পায় [illegible]। [illegible] বউ, [illegible] চাষী—এরা ছুটে এলো পথের ধারে—কেননা টুরিস্ট যাচ্ছে, যদি [illegible] পয়সা বকশিশ পাওয়া যায়। [illegible] ছুটে এলো, [illegible] ছুটে এলো, খেলা ছেড়ে বালক-বালিকা ছুটে এলো, খামারে [illegible] ছুটে এলো। এলো [illegible], এলো মধুরভাষিণী, এলো লজ্জাবতী, এলো হাসামুখ বালক, এলো অশীতিপর বৃদ্ধ—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সন্তান। ওরা শুনেছে এই পথ দিয়ে যাবে ইউরোপীয় টুরিস্ট, ভারতীয় শেঠ আর মহাজন,—ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা ভূস্বর্গবাসী, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজনীতি, জানে না সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মার-খাওয়া দৈন্য-দারিদ্র্যের নরককুণ্ড কাশ্মীরকে। ক্ষুধার অন্নে ওরা খুশী, নিরুপায় জীবনযাত্রায় একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখলে যেন কান্না পায়।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগল গার্ডেন-গুলি পাওয়া যায়। পাশেই বিস্তৃত ডাল-হ্রদ। জলজ লতাদলে আচ্ছন্ন থাকে, তাই এই বিশাল জলাশয়ের নাম ডাল, কিংবা দল কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরো বর্গমাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি ভাসমান বাগান প্রস্তুত করা হয়েছে। ফুলে ফলে সেগুলি আচ্ছন্ন। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রক্তপদ্মের দল,—তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে হ্রদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বতচূড়ার। সূর্যাস্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়ালুম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কৌশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরনা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাশাহি, শালিমার, নিশাতবাগ, নাসিম-বাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। শ্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে একটি নিরিবিলি পার্বত্য অঞ্চলে এসে আমরা পেলাম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখলেই মনে পড়ে যায় জামসেদপুর থেকে আট মাইল দূরের 'ডিমনা' হ্রদটি,—কেউ বলে, ডিমনা। দুটি হ্রদের একই উদ্দেশ্য। এখানেও পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র; সেখানেও তাই—দলমা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাঁধের উপর থেকে নেমে এসে অদূরে একটি সরকারী মৎস্য চাষের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হলুম। অরণ্য জটিলার ছায়াকুঞ্জলোকে পাহাড়ী পাখিদের কূজন-গুঞ্জন চলছে। শংকর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন বন্ধুমহলের সঙ্গে একবার মাত্র বেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে—মাত্র দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিল একটি দম্পতি তাদের শিশুকন্যাসহ। তারা হলো মদনলাল আর সংবতী। এ ছাড়া আর একটি যুবক, নাম বাহাদুর সিং। ওদের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি মুক্ত বিহঙ্গী। পাহাড়ের ঝরনা ছিল অবরুদ্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝরিয়ে নেমে এসেছে। স্বামী সঙ্গে নেই, সেজন্য তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ, কিছু বা অন্যমনা, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর নতুন আলাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দূর-দূরান্তরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুমহলে প্রচার করে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিয়েছেন সর্বাগ্রে।

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমাদের। মোটর প্রায় সর্বত্রগামী,

পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার মাইল হিমালয় ঘুরেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভুলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিসে। এখানে শুনি নূপুরের ঝনক হিমালয়ের নীচে নীচে, পদে পদে শুনি ঠুংরির বোল। হিমালয়ের সেই মহাগম্ভীর অরণ্যালোকের প্রশান্ত উদার গাম্ভীর্য চোখে পড়ছে না, সেই কলমন্দ্রমুখরা জননী জাহ্নবীর পুণ্যে পার্বত্যলোক স্রহ্নপুরা নয়, জটাভস্মমাখা নগ্নদেহ সন্ন্যাসী দলের সেই বেদমন্ত্রধ্বনি মুখরিত পার্বত্য গুহাগহ্বর দেখছিনে কোথাও,—এ যেন সহস্র ভোগ-বিলাসে, উল্লাসে, আলসে, বিবশা মদিরেক্ষণা রসরঙ্গীন উপত্যকা। এখানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমোদ গড়াগড়ি খায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ-কানাচ হলো প্রমোদকানন, প্রতিটি তাঁবুর রহস্য অন্তরালে প্রাণ নিয়ে খেলা, চেনার-উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্য রাত্রির ছায়ানিবিড় জ্যোৎস্নায় কোথাও কোথাও উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আপন বাসনার অসহনীয় যন্ত্রণায় মাতাল হতে থাকে। সুখের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে ছুটি ঘুরিয়ে যে সব রঙ্গীন প্রজাপতি এখানে বেড়িয়ে যায়, তারা কাশ্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দনকানন!

ক্লান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে ডাল হ্রদে। হরি পর্বতে আর শংকরাচার্যের চূড়োয় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরমুখের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইছে ওদিক থেকে।

শংকর হাসিমুখে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও যেতে হবে অনেক দূরে। কিন্তু টাংগায় উঠে তিনি বললেন, শ্রীনগরের ইলেকট্রিক আলো কত কম, দেখছেন ত? তারপর ময়দান ছাড়ালে আর আলো নেই। একলা যেতে আমি পারবো না, আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন। পথ অনেকটা।

অনেকটা পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানকার পথঘাটে ভয়ও নেই। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মধ্যে চোর ডাকাতের উৎপাত সব চেয়ে কম কাশ্মীরে,—এমন নিরাপদ অঞ্চল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। পয়সা কড়ি এরা চেয়ে নেয়, বকশিশ নেয়, এমন কি কৌশলে নেবার চেষ্টাও করে, কিন্তু ছিনিয়ে নেয় না। এমন স্বভাব-ধার্মিক সম্প্রদায় সহসা চোখে পড়ে না, এবং এমন ভীরুপ্রকৃতি জনসাধারণও সচরাচর দেখা যায় না।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বাঁশত-বাজার ছাড়িয়ে ময়দানের ধার দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চলেছে রামবাগের দিকে। শ্রীমতী মায়া বললেন, আজ রাত্রে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিয়ে। আপনি কাল সকালে আমার ওখানে আসছেন ত?

সকালে নয়, দুপুরে।

বেশ, তাই আসুন। আমার বড় দুর্ভাগ্য, আপনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই খুব আমোদে থাকতুম। উনি সকালে যান আপিসে, খাবার সময় আবার আসেন। বাস, সমস্ত দিন ছুটি।

বললুম, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আসতে হুকুম করুন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নিয়ম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। এই পরীক্ষায় উতরে গেলে একটু উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের বিমান বিভাগে বাঙালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাহজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ বাঙালীর হাতের তৈরি। একটি বিমান বিভাগ,—এটি প্রথম প্রথম একদল সম্ভ্রান্ত বাঙালীর চেষ্টায় গোড়ার দিকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় ত্রিশ বছর হতে চললো। দ্বিতীয়টি হলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি বাঙালীর সৃষ্টি, এবং এটির জন্ম হয় কয়েকজন বেসরকারী বাঙালীর চেষ্টায়,—তাঁরা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে তৎকালে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে, এবং তাঁরা একটি বিশেষ আইনবলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানকে হস্তগত করেন।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, যদি অভয় দেন, তবে একটি প্রশ্ন করি।

বলুন?

এমন সুন্দর দেশে সপরিবারে এলেন না কেন?

হাসলুম। বললুম, চারদিকে যে রকম কাঁচা পয়সা ছড়িয়ে চলতে হয়, তাতে ঘটি-বাটি পর্যন্ত না বেচলে এখানে সপরিবারে আসা চলে না। তা ছাড়া কাশ্মীর বেড়ানো ঠিক আমার এ যাত্রায় উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এসেছিলুম অমরনাথে।

তিনি এবার বললেন, দেখুন, এদিকটা কি রকম অন্ধকার হয়ে এলো! দেখছেন ত, লোকজনও নেই। আমাকে অবিশ্যি নিয়মিত আনাগোনা করতে হয় না, তাই রক্ষে। উনি যাবার আগে মোটামুটি সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

হাসিমুখে বললুম, আপনি যে অতিথি-শালা খুলবেন, এ ব্যবস্থাও কি তিনি করে গেছেন?

সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। একজন বুড়ো পণ্ডিত আছে, সে ডাকঘরে চাকরি করে। সে দু' একদিন অন্তর আমার সমস্ত জিনিসপত্র এনে দেয়। আপনি কিছু-মাত্র সংকোচ করবেন না। আরেকটা কথা হয়ত আপনি ভাবছেন, সে আমি জানি। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, সেবার পহলগাঁও থেকে ফিরেই ওঁকে জানাই যে, আপনি আমার এখানে আতিথ্য নিতে রাজি হয়েছেন। উনি তার উত্তরে কি চমৎকার চিঠি লিখেছেন, কাল আপনাকে দেখাবো।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গাড়ি ঘুরলো ডানদিকে। এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘাটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর ধারা পাহাড়তলীর পাশ দিয়ে অন্ধকারে কোথায় চলে গেছে ঠাহর হচ্ছে না। যেখানেই যাক, এ ধারা মিলেছে মূল বিতস্তায়।

মহারাজা গোলাব সিংহের সমাধি এবং শংকর সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালী স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাঙ্গা এক সময় এসে পেণছলো এক বসতিবিরল বাগানবাড়ির গেটের সামনে। এই অঞ্চলের নামই 'বড়জেলা'। গাড়ি থেকে নেমে শ্রীমতী গুপ্তা কথাটা পাকা করে নিলেন,—কাল জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরের দিকে সোজা চলে আসবেন। কোনও সংকোচ করবেন না।

আমাকেও একথা পাকা করে নিতো হলো, তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কাশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরে দিল্লী ফিরতে হবে।

তিনিও জবাব দিলেন, বেশ, তিন রাত্রের বেশি অতিথিদের থাকতে নেই, এই কথা আমি মনে রাখবো। মোট কথা আপনার আসা চাই, নৈলে গুপ্ত সাহেব আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন।

টাঙ্গা-গাড়ির আলোটুকুতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা চলছিল। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেখক-মানুষকে কখনও দেখিনি। তারা কেমন, কিছু জানিনে। কেমন করে তারা বই লেখে, কেমন করে কল্পনায় সব আনে,—ভাবলে অবাক লাগে। আপনাকে কাছে থেকে না দেখলে আমার কিছুতেই চলবে না।

হাসিমুখে এবার গাড়িতে উঠলুম।—বেশ, কাল আসবো।

দাঁড়ান একটু, আগে আমি ভেতরে যাই।—এই বলে তিনি ভীরু পদক্ষেপে ছুটে দিলেন অন্ধকার বাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতালার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রান্না করে রাখবো!

টাঙ্গা ছেড়ে দিল। কিন্তু তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি, হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করবে।

(ক্রমশ)

পাঁচালীকার দাশরথি রায়

রাজেশ্বর মিত্র

"পাঁচালী" শব্দটি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু কেউ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। আসতে পারাও সম্ভব নয়, কেননা কিভাবে যে "পাঁচালী" কথাটি এলো তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না। পাঁচালীর শুদ্ধ নাম হচ্ছে পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা। মংগলকাব্য রচয়িতারা বলেছেন "পাঁচালী প্রবন্ধ"। সংগীতের দিক থেকে প্রবন্ধ বলতে যে কোন গীতরূপ বোঝায় অর্থাৎ আজকালকার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি থেকে সারি, জারি, বাউল, ভাটিয়ালি—সবই এক একটি প্রবন্ধ। সে যুগে প্রচলিত নানা প্রবন্ধাদির মধ্যে পাঁচালীও একটি প্রবন্ধ। এখন কথা হচ্ছে পাঁচালী কথাটি প্রচলিত হবার আগে এই পদ্ধতি কী নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তী পাঁচালীর সংগে তার পূর্ববর্তী রূপের সাদৃশ্য কতখানি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার কেননা এ সম্বন্ধটাই স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের কল্পনা অনুযায়ী পাঁচালীর নানারকম ইতিহাস খাড়া করছি।

এ অনুমান কিন্তু ঠিক যে এই ধরনের গীতরীতির উদ্ভব বহু প্রাচীনকালে হয়েছে। আগেকার দিনে প্রবন্ধ ছিল তিন-রকমের—"সূড়", "আলি" এবং "বিপ্রকীর্ণ"। "আলি" নামটি কেন হ'ল সেটা বলা শক্ত, কেননা এ সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। এই জাতীয় গানগুলি প্রায়ই নানা তালে গাওয়া হত এবং তাল ছাড়া আলাপের ঢংও বিস্তারিত হত। অনেক গান ছিল রীতিমত লম্বা ধরনের—অনেকক্ষণ ধরে গাইতে হত। সংগীতরত্নাকরের মতে ত্রয়োদশশতকে "আলি" জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। এরই একটি রূপ হচ্ছে—"পঞ্চতালেশ্বর"। আলি জাতীয় পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধ ক্রমে "পঞ্চালি" বলে পরিচিত হয়েছিল এমন অনুমান নেহাত অসংগত নয়। এই সব প্রবন্ধ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। "পঞ্চতালেশ্বর" গীতরূপটি ছিল মংগল-বাচক। এর পাঁচটি পদ বিভিন্ন তালে বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে গাওয়া হত। এইসব বাদ্যের মধ্যে ছিল—পটহ, হুড়ুক্কা, শংখ, কাঁসি ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ বীর এবং শৃংগার এই দুইটি রসেই বিরচিত হত। গীতারম্ভে পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে তালের সংযোগ থাকত না অর্থাৎ রাগালাপের পর তালসহযোগে গান আরম্ভ হত। পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধ বাংলাতে এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এইসব গীতরূপ নানাভাবে ভেঙে চুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, ফলে শ্রেণী বিভাগ আর ঠিক রইল না। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধের নাম মাত্র জানা ছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এর উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থেই পাঁচালীকে "ক্ষুদ্রগীত"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনা দেওয়া হয় নি। ক্ষুদ্রগীত বলতে সাধারণ কাব্যসংগীত অর্থাৎ গানের কলি এবং তালের সমন্বয় বোঝায়। এই ক্ষুদ্রগীত ছিল চার প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুপদ আর পাঁচালী (পঞ্চালী)। এই পঞ্চালীর রীতিও ক্রমে অনেক পরি-বর্তিত হয়ে দাশরথির সময় ছড়াকাটায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং এইসব ছড়ায় মাঝে মাঝে ছিল এমন গান যা বলতে গেলে কাব্যসংগীতের কোঠায়ও ওঠে নি। দাশ-রথির প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই সব গানকে কাব্যসংগীতের স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা ক'রে অনেক পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এই সব গানে রাগসংগীতের মাধুর্য আনতে পেরেছিলেন। শ্রীধর যেমন কথকতায় টপ্পার প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, দাশরথিও তেমনি পাঁচালী গানে চমৎকার টপ্পা প্রয়োগ করে একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছিলেন। "ননদিনী বোলো নগরে" গানটি রীতিমত টপ্পা অথচ কি মধুর কাব্যসংগীত। আবার "যদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি"—এই গানটিতে কলকাতায় ব্যবহৃত গানের ধরনের মধ্যে রাগসংগীতের স্পর্শ এনে ঝাঁপতালে রূপপ্রদান করা হয়েছে। পাঁচালী রচনা আরম্ভ করে দাশরথি "যৎ" তালে বহু গান রচনা করেন। লোকে এই জন্য তাঁর নাম দিয়েছিল "যোতো দাশু"। যৎ-এ গান মানেই টপ্পা ঢঙের গান। দাশরথির সব চেয়ে বড় প্রয়াস কিন্তু টপ্পায় উচ্চাংগ সংগীত সৃষ্টি নয়—রাগসংগীতের স্পর্শ দিয়ে পাঁচালীর গানে নতুন নতুন আবেদন আনা। এতে তিনি দুটি রীতিরই একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ললিত, বিভাস, বা সিন্ধু ভৈরবীতে যৎ এবং ঝাঁপতালে তিনি এই সব সৃষ্টি করেন। লোকের মনোভাব অনুযায়ী কিভাবে এই সব পালা জমিয়ে তুলতে হয় তার কৌশল দাশরথি চমৎকার জানতেন। তাঁর পাঁচালী থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি, তাহলে বোঝা যাবে দাশরথি কেমন রসাল করে পৌরাণিক কাহিনীগুলি সংগীত সহযোগে বিবৃত করতেন। তাঁর সুবিখ্যাত "কালীকৃষ্ণ বর্ণন" পালাই ধরা যাক।

রাধা কুটিলার সংগে ঝগড়া করে কৃষ্ণের সংগে মিলিত হয়েছেন। কুটিলা রাগ করে এসে আয়ানকে খবর দিয়ে বল্লেন—"তোর নারী সে রাজার ঝি, ছি ছি রাধা করলি কি, রাখাল লয়ে বনে বনে ভ্রমে। কারেই ভাল মন্দ বলি, রাজার বেটী চন্দ্রাবলী,
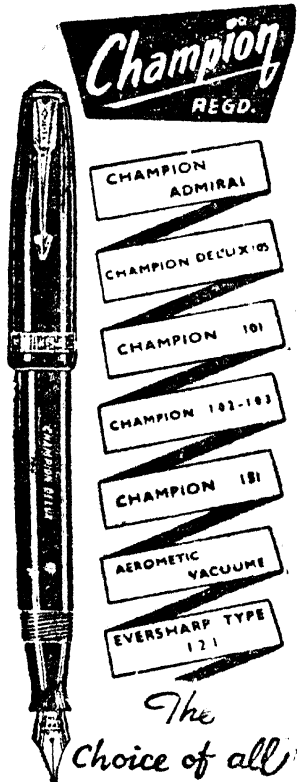
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে॥ তুই করিসনে মনোযোগ কুপথ্যে বাড়িল রোগ, দমন হৈলে এমন হত কি তবে। মেয়েমুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি, নাহলে কেন এমন দশা হবে॥" কথা শুনে আয়ান গেলেন বিষম রেগে। বল্লেন—"আমি আয়ান পাষাণবুকো, আমায় বলে মেয়েমুখো, চল দেখি কোন স্থানে নন্দের বেটা।" এই বলে —"ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী, কুচরী কুটিলে যায় সনে। হস্তেতে লৈয়া কালসাট, ঘন মারে মালসাট, কাট কাট শব্দে যায় বনে॥ দূর হতে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাঁপে থরহরি। ব্যাঘ্র হেরি হরিণী যেন করে। ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চল হরিণী প্রায়, বলে হরি রক্ষা কর মোরে।"

সিন্ধু ভৈরবী

ঐ দেখ আসছে আয়ান, বংশীবিহারী বনমাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন মধুসূদন তোমায়
ভাকে॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে নিকুঞ্জ কেমন করে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে দাও হে অভয়
পদাম্বুজে॥
রাখ হে করুণা করি তব করুণায় শ্রীহরি
সহস্র করিয়ে বারি এসেছিলাম এই কুঞ্জে॥

কৃষ্ণ বল্লেন চিন্তা নাই, তুমি কি ডরাই রাই ক্ষুদ্র আয়ানের দর্প দেখি। চিন্তামণি নাম ধরি, তব চিন্তা নষ্ট করি, তব চিন্তা কি হেতু কিশোরী। দেখ রাই অপরূপ, সম্বরি এই কৃষ্ণরূপ, দাঁড়াতে পারিবে কোন রূপে। শুনে রাধা রসময়ী আমি যার সহায় হই, তার কি ভয় ইন্দ্র চন্দ্র কোপে। এত বলি ঈষৎ হাসি, ত্যজিয়ে মোহন বাঁশী, মদন-মোহন মায়া ছলে। রাধার ঘুচাতে মনের কালি, হইলেন দক্ষিণে কালী, মহাকাল পতিত পদতলে॥ জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিল্বদল, প্যারী করে চরণে অর্পণ। শ্যাম হলেন নিকুঞ্জ শ্যামা, কিবা রূপ নিরুপমা, আয়ান করিছে নিরীক্ষণ।"

এই সব নাটকীয় বর্ণনায় দাশরথি নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। চেহারা রোগা লম্বা, চুল কোঁকড়া আর চোখ দুটি ছিল বিশাল বিস্ফারিত। চারদিকে লোকে তাঁকে ঘিরে বসত। তিনি দাঁড়াতেন ঠিক মাঝখানে। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করে উচ্চারণ করতেন—একবার সামনের দিকে চেয়ে আর দুবার দুপাশে সবাইকে শুনিয়ে। গাইতে উঠে আবশ্যকতা অনুসারে পাঁচালী কিছু পরিবর্তন করে নিতেন। শোনা যায় এক বিয়ায়ের পালা তিনি বড়, ছোট, মাঝারি—এ রকম তৈরি করে রাখতেন। বোধ হয় দক্ষিণা অনুসারে পালার আয়তন কতখানি হবে সেটা ঠিক করা হত। এই আর্থিক ব্যাপার নিয়ে কিছুটা গোলযোগ হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁর ছোটভাই তিনকড়ি ছিলেন ভাল গাইয়ে। দাশরথি ছড়া বলতেন আর তিনকড়ি গাইতেন, তা ছাড়া যন্ত্রাদি বাঁধতে এবং বাজাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। দুভাই মিলে একসঙ্গেই দল চালাচ্ছিলেন কিন্তু শোনা যায় দাশরথি উপার্জিত টাকার অতি অল্পই তিনকড়িকে দিতেন। তাতে তাঁর সংসার চলত না এবং শেষ পর্যন্ত একটা মতান্তরের ফলে তিনকড়ি দাদার দল ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা দল তৈরি করেছিলেন। পাঁচালি গানে দাশরথি সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। সেই অনুপাতে অর্থও তিনি কম উপার্জন করেন নি। অনেক জমিদার গৃহে তাঁর জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল।
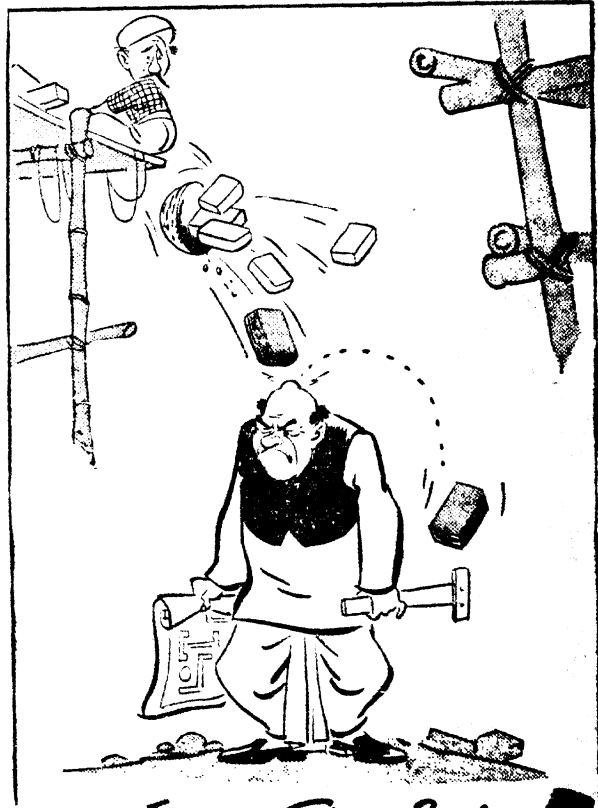
দাশরথি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে বাঁধমূড়া গ্রামে বাংলা ১২১২ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর মামার বাড়ি বর্ধমান জেলার পীলাগ্রামে। দাশরথি বাল্যকালেই তাঁর মামার কাছে চলে আসেন এবং পীলাতেই মানুষ হয়েছিলেন। পীলার পাঠশালায় পড়ে সামান্য ইংরেজিও শিখে-ছিলেন তিনি এবং এই বিদ্যার জোরে সেখানকার নীলকুঠিতে একটা চাকরিও পেয়েছিলেন। মাইনে পেতেন তিন টাকা।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গান বাঁধার শখ ছিল। তাঁর এই প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অক্ষয়া বলে একটি স্ত্রীলোক তার কবির দলে তাঁকে টেনে নিয়ে আসে। অক্ষয়ার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ক্রমে অতিশয় অশোভন হয়ে দাঁড়াল। এই সব কবিগানের সংস্রব থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য তাঁর মামা তাঁকে নীলকুঠিতে চাকরি করে দিলেন কিন্তু দাশরথির চাকরিতে মন উঠল না। তিনি কেবল অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতেন আর কাজে ভুল হত। শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল। দাশরথির তাতে ক্ষোভ ছিল না, তিনি আবার অক্ষয়ার দলে ঢুকে পড়লেন।

গ্রামে আর এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক ছিলেন তিনিও বেশ কিছু অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে আর ঠেসে অনুপ্রাস লাগিয়ে গান বাঁধতেন এবং এই করে নামও করেছিলেন। তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী দাশরথিও প্রচুর অনুপ্রাস সহযোগে কবিগান আর কালী-কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করতে লাগলেন। ক্রমে সেই ভদ্রলোককেও তিনি দক্ষতায় ছাড়িয়ে গেলেন। খ্যাতির প্রথম যুগে এটি দাশরথির কাছে কম গৌরবের বিষয় ছিল না।

ওদিকে মামার শাসনে শৈথিল্য ঘটে নি। কিন্তু শাসন সত্ত্বেও দাশরথি অক্ষয়ার দলের সঙ্গে সংযোগ ঠিক রেখেছিলেন যখন চাকরি করতেন তখনও। অক্ষয়ার দলের যেই বায়না হত, অমনি সে গোপনে গিয়ে দাশরথিকে নিয়ে আসত। দাশরথি রাত্তিরে পালাতেন আর নীলকুঠিতে ফিরতেন সকাল বেলা। চাকরি যাবার পর মামা খোঁজ নিয়ে জানলেন ভাগ্নে পীলার কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন এবং সেখান থেকেই গান গাইতে যান। মামা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে এলেন—অনেক বোঝালেন, তিরস্কার করলেন। গ্রামের মাতব্বর ভৈরব চক্রবর্তীর কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। তিনিও অনেক সৎপরামর্শ দিলেন; কিন্তু দাশরথি তখন কবিগানে মেতে উঠেছেন—এ সব কথা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। তখন চক্রবর্তী মশায় মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—"যাও, আজ থেকে তোমার মুখ দেখব না।" দাশরথি জবাব দিলেন, "—এ মুখও আর দেখাবার নয়।" তারপর ঝগড়াঝাঁটি যখন হয়েই গেল তখন প্রকাশ্য-ভাবেই কবির দলে যেতে লাগলেন এবং গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁরা কবিত্বের দিকে যত না হোক গালাগালিতে তাঁর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রায়ই তিনি যাচ্ছেতাই রকমের গালাগাল খেয়ে আসতেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানের এ হেন লাঞ্ছনা বড়ই পরি-তাপের বিষয় ছিল। তাঁর মামা আর তাঁর বাবার কানেও এ সব খবর পৌঁছোতে দেরি হত না। দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে একদিন তাঁর বাবা আর মামা আবার তাঁকে বোঝাতে বসলেন। বাবা অনেক বুঝিয়ে বল্লেন,—"বাবা দাশু, তোমার গর্ভধারিণী পুণ্যবতী ছিলেন—তোমার এ সব কেচ্ছা শোনবার আগেই তিনি মরে বেঁচেছেন। আমার পোড়া কপাল আমি এই দেখতে শুনতে বেঁচে আছি।" দাশরথির এবার মনে সত্যিই দুঃখ হ'ল। মার কথা স্মরণ করে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর কবির দলে যাবেন না। এর পর থেকে সত্যিই আর কবির দলে যান নি।

দাশরথি যখন পাঁচালী গাইতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স বছর তিরিশ হবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই তিনি পাঁচালীতে বেশ নাম করলেন। মামার বাড়ি ছেড়ে পীলাতেই নিজে বাড়ি করলেন। বিয়ে করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলেন। এবার তাঁর দিন ফিরল। অর্থোপার্জন হ'তে লাগল প্রচুর। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে অভি-নন্দন জানালেন। এর ফলে সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়ল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান কাশীমবাজার, কলকাতার শোভাবাজার—এসব জায়গা থেকে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হ'ল। গ্রামে তাঁর মাটির ঘর ছিল—এবার ঘরবাড়ি পাকা হ'ল। যাঁরা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ক্রমে তাঁরাও খুশি হলেন। সেই ভৈরব চক্রবর্তী যিনি তাঁর মুখ দেখবেন না বলেছিলেন তিনিও একদিন তাঁর কলঙ্কভঞ্জন পাঁচালী শুনে নিজের গায়ের শালজোড়া তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন।

পরবর্তী জীবন তাঁর সুখে এবং সম্মানের সঙ্গেই কেটেছে। ১২৬৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কাশীমবাজারে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গান করতে গিয়েছিলেন—পীড়িত হয়ে ফিরলেন জ্বর নিয়ে। যখন বুঝলেন এই জ্বরে আর সারবে না তখন নিজেই গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। গঙ্গাতীরে তিনি যখন শেষ শয্যায় শায়িত তখন একজন লোক তাঁর অনুরোধে তাঁরই রচিত একটি গান গাইছিলেন। সেটি শুনতে শুনতেই দাশরথি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

দাশরথি তাঁর স্ত্রী এবং একটিমাত্র কন্যা রেখে যান।

দাশরথির সমসাময়িক কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্ত বিশেষ পরিচিত ছিলেন কিন্তু পাঁচালীর রচয়িতা হিসাবে রসিকচন্দ্র রায়ের নাম সে যুগে দাশরথির পরেই করতে হয়। এঁর কয়েকটি গান অতি চমৎকার। রসিক-চন্দ্রের সঙ্গে দাশরথির মাঝে মাঝে দেখা হত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনাও হত।

পাঁচালী গান হচ্ছে আমাদের traditional সঙ্গীতের অন্যতম। এই সঙ্গীতরূপ মুখে মুখে বহুদিন থেকে প্রচারিত হয়ে এসেছে। দাশরথি এই যে সঙ্গীতরূপটি লোকপরম্পরায় পেয়েছিলেন তার মূল আঙ্গিকটি অক্ষুণ্ণ রেখে রাগ-সঙ্গীতের স্পর্শ সঞ্চার করলেন। এই-ভাবে আমাদের traditional সঙ্গীতে একটি পরিবর্তন সাধিত হ'ল কিন্তু তার পাঁচালীর ক্ষয় হ'ল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতকারদের মধ্যে আরও অনেকে এই চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা থেকে এইটাই প্রমাণ হয় যে প্রচলিত সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্যায়ন তাঁরা করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই বহু নূতনত্ব সম্পাদন করা সত্ত্বেও traditional সঙ্গীতের মূলে বা original রূপটি বিকৃত হয় নি। Re-vivalist বলতে যা বোঝায় তা এঁরা ছিলেন না। এঁদের সম্পর্কে এইটাই সব চেয়ে বড় কথা।

॥ পনের ॥

দুপুর পেরিয়ে এখন রোদের রঙে সোনালী আমেজ লেগেছে।

বাস থেকে কোহিমার পথে নামলো সেঙাই আর সারুয়ামারু। বাসের ঝাঁকানিতে আর বমি করে করে কাহিল হয়ে পড়েছে সেঙাই। উজ্জ্বল তামাভ মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বাসে ওঠার জন্য প্রায় গর্জন করে উঠেছিল সেঙাই। কিন্তু সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে এই আকাশ-ছোঁয়া শৈল-নগর দেখতে দেখতে দুটি পিঙ্গল চোখের মণি আবিষ্ট হয়ে গেল। পাহাড়ী মানুষ সেঙাই। বিস্ময়ে আর আগ্রহে সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছে।

বাঁ দিকের পথ ধরে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে।

সারুয়ামারু বললো, "ওই পাক পাক গাড়ি ছেড়ে দিল; ডিমাপুরে যাবে। সেখানে আর একরকম গাড়ি আছে। বড় বড় ঘর, অনেক লম্বা। তার নাম রেলগাড়ি—"

আঁকাবাঁকা পথ। উঁচু-নীচু। চড়াই আর উৎরাই-এর পাশে পাশে পাইনের সারি। বিন্যস্ত। পথের দুপাশে সুন্দর বাড়ি। ওপরে ঢেউটিন কী টালির চাল। পলাস্তারের দেওয়াল। বাড়ির সীমানা ছোট ছোট পাহাড়ি পাদপ দিয়ে ঘেরা।

সেঙাই বললো, "কেসুঙগুলো কী সুন্দর!"

"হু, হু। এ কী আর তোর ঐ কেলুরী বস্তীর কেসুঙ। এ হোল শহর কোহিমা।" সারুয়ামারু হাসলো। এই শহরের যত মহিমা, যত গৌরব, যত মাধুর্য—সব যেন সারুয়ামারুর ঐ হাসিতে চরিতার্থ হলো। এই শহরের গৌরবে যেন তারও একটা ভূমিকা রয়েছে।

অনেক পথ, অনেক বাঁক, অনেক বিচিত্র মানুষের জনতা, অনেক দুর্বোধ্য কলশব্দ ডিঙিয়ে অবশেষে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "তোর ঐ গাড়ি আনিজার নামে বস্তীতে ফিরে একটা টেবোয়া বলি দেবো।"

"চুপ চুপ।"

"চুপ কেন? কেন রে শয়তানের বাচ্চা—" সেঙাইর দুচোখে পিঙ্গল আলো ঝিলিক দিল।

"এটা তোর কেলুরী বস্তী নয়। এটা হলো কোহিমার শহর। তোর ঐ টেবোয়া বলি দেবার কথা শুনতে পাবে ফাদার!" ফিস ফিস গলায় বললো সারুয়ামারু, "ওই দেখ, ওই যে পুলিস। ওদের হাতে বন্দুক রয়েছে। এক গুলিতে একেবারে সাবাড়। মন্দ কথা বলিস না আর।"

সামনের দিকে তাকালো সেঙাই। অপরূপ সুদৃশ্য একটি বাড়ি। ওপরে ঢেউটিনের চাল। চারপাশে নানা রঙের ফুলে ফুলে ইন্দ্রধনুর মায়া। সামনে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটা ঘাসের জমি। সবুজ রেশম। কোমল আর পেলব।

দরজার সামনে অনেক মানুষের জটলা। তাদের মধ্যে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢোলা সাদা পা (কাপড়) পরেছে কেউ কেউ। (এর আগে সাহেবদের দেখে নি সেঙাই)। আচমকা সেঙাইর চোখ দুটো কতকগুলি মানুষের দিকে আটকে গেল। গায়ের রঙ হুস্টোসঙ পাখীর পালকের মত সাদা। চোখে তীক্ষ্ণ নদীর নীলাভ আভাস। তাদের বক্রাকারে ঘিরে রয়েছে অনেক পাহাড়ী মানুষ। আর একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো কয়েকটি লোক। একই রকম পোশাক, হাতে একই রকমের বন্দুক (একটু আগেই বন্দুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সারুয়ামারু)।

সারুয়ামারু বললো, "ওরা হলো আসানারু (সমতলের লোক)। দেখছিস না বন্দুক হাতে রয়েছে। ফাদার বলে, ওরা ভারি শয়তান। আমাদের পাহাড়ী মানুষদের ওরা বড় মারে।"

"হু, হু—মারলেই হলো। বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো না একেবারে—"

"চুপ চুপ—"

সহসা ঘাসের জমির ওপাশ থেকে একটা খুশী-খুশী গলা ভেসে এলো, "আরে সারুয়ামারু যে। এসো, এসো—"

মানুষটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হুস্টোসঙ পাখীর পালকের মত ধবধবে রঙ। একেবারে তাজ্জব বনে গেল সেঙাই। তাদের ভাষা কী চমৎকার রপ্ত করেছে লোকটা।

সারুয়ামারু বললো, "গুড্ নাইট ফাদার—"

হা-হা করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠলো পাদ্রীসাহেব; "এখন নাইট কোথায়? এখনও তো সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি!"

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলো সারুয়ামারু। যে ইংরাজী শব্দ দুটি ব্যাঙের আধুলির মত সে সঞ্চয় করে রেখেছিল এবং যার জন্য তার রীতিমত গর্ব ছিল, তা যে এমন করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ কী জানতো সারুয়ামারু!

"হু-হু—" মাথা নাড়লো সারুয়ামারু।

পাদ্রী সাহেব বললো, "এ কে সারুয়ামারু?"

"এ হলো সেঙাই। তোর কাছে যে সিজিটো কাজ করে, তার ছেলে। তোর কাছে সেঙাইকে নিয়ে এলাম ফাদার!" এবার

সরাসরি দৃষ্টিতে পাদ্রী সাহেবের দিকে তাকালো সারুয়ামারু।

"বাঃ, ভালো ভালো। এসো সেঙাই এসো।"

তিনজনে ঘাসের রেশম-সবুজ জমিটায় চলে এলো। একপাশে কাঠের ক্রস খাড়া হয়ে রয়েছে। ঝকঝকে সাদা রঙ। মানব-পুত্র একদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পুণ্য-রক্তে এই পাপময় পৃথিবীকে স্নান করিয়েছিলেন। এই ক্রুসে তারই পবিত্র স্মরণচিহ্ন।

বিকেলের রঙ গেরুয়া হয়েছে। পশ্চিম পাহাড়চূড়ার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে সূর্যটা, বিকেলের সূর্য। রক্তলাল।

কাঠের একটা বেঞ্চের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে সারুয়ামারু। সেঙাইর দিকে তাকিয়ে সে বললো, "বোস্ সেঙাই।"

এক পাশে অতিকায় বর্শাটা রাখতে রাখতে সেঙাই বললো, "বসবো?"

"হু-হু। এটা তো বসবার জন্যেই। তুই কিছুই জানিস না। এটা কেলুরী বস্তী নয়। হু-হু—এটা কোহিমা শহর।" আর একবার আলোকদান করলো সারুয়ামারু।

ইতিমধ্যে একখানা চেয়ার এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো পাদ্রীসাহেব। তার সঙ্গে এসেছে একটি পাহাড়ী চাকর। চাকরটির হাতে নানা ধরনের কাপড়, আর নানা রঙের খাবার। পাদ্রী সাহেব চাকরটির হাত থেকে খাবার আর কাপড়গুলি তুলে নিয়ে সেঙাইর দিকে হাত প্রসারিত করে দিল, "এই নাও সেঙাই। এগুলো তোমাকে দিলাম। পী (কাপড়) পরবে, আর খাবারগুলো খাবে। কেমন?"

বেঞ্চের ওপর বসে পড়েছিল সেঙাই। তার একেবারে স্পর্শের সীমানায় বিচিত্র এক মানুষ। হুস্টসিঙ পাখীর পালকের মত ধবধবে। টিজু নদীর মত নীল চোখের মণি। পাহাড়ী মানুষ সেঙাইর চেতনায় এই মুহূর্তে এই পাদ্রী সাহেবটিকে বড় অবিশ্বাস্য মনে হলো। মনে হলো এই গোধূলির মোহন রোদে, কোহিমা শহরের এই রেশম-সবুজ ঘাসবন থেকে পাদ্রীসাহেব এক ভোজবাজীর কুহকে যে কোন সময় অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পাদ্রীসাহেব কোমল গলায় বললো, "নাও, ধরো সেঙাই। লজ্জা কী?"

এবার টাপমাল চোখে সারুয়ামারুর দিকে তাকালো সেঙাই। সারুয়ামারু কী প্রেরণা দিতে শুরু করলো। তার গলায় রীতিমত উৎসাহ, "নে, নে, সেঙাই। ফাদার ভালবেসে দিচ্ছে। এমন পী (কাপড়) জন্মেও দেখিস নি। এমন খাবার কোনদিন খাস নি।"

কুণ্ঠিত একটি থাবা প্রসারিত করে কাপড় আর খাবার নিয়ে নিল সেঙাই। তারপর ফিস ফিস করে বললো, "টেশঙের ছাল আনি নি, মেনজোর দাঁত আনি নি, মী (বর্শা) আনি নি—কিছুই তো আনতে দিল না এই সারুয়ামারু। কী দিয়ে বদলা করবো?"

"কিছু দিতে হবে না আমাকে।" শুভ্র মুখখানার ওপর অপরূপ হাসি ছড়িয়ে পড়লো পাদ্রী সাহেবের। পরম বাৎসল্যে চোখ দুটো তার আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে, "আমি এগুলো তোমাকে আদর করে দিলাম। আমাকে ফাদার বলে ডাকবে, বুঝলে।"

হু, হু। ডাকবে বৈ কী? সেঙাইর হয়ে সায় দিল সারুয়ামারু। দস্তুরমত তৎপর হয়ে উঠেছে সে। বেঞ্চ থেকে উঠে একেবারে পাদ্রী সাহেবের অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো সারুয়ামারু, একশবার ডাকবে ফাদার বলে।

সহসা সেঙাই বললো, "আমার বাবা আর মা কই?"

"সিজিটো আর তার বউ তো?"

"হু হু।"

"তারা গ্রীফিথ সাহেবের সঙ্গে গুয়াহাটী গিয়েছে। দু-চার দিন বাদে ফিরবে। তুমি এই চার্চে থাকো কয়েকদিন। ওরা ফিরলে দেখা করো।" এবার পাদ্রী সাহেব তাকালো সারুয়ামারুর দিকে, "তারপর তোমাদের বস্তীর খবর কী সারুয়ামারু। আমরা যে একবার যাবো তোমাদের গ্রামে সর্দারকে বলেছ?"

সারুয়ামারুর মুখরেখার ওপর শঙ্কা ঘনালো। "বলেছিলাম। কিন্তু সর্দার রাজী হচ্ছে না একেবারেই।"

"টাকা দেবো অনেক।"

"তাতেও রাজী নয়। এই সেঙাইকে জিগেস করে দেখ না তুই।"

পাদ্রী সাহেবের সারা দেহে এতক্ষণ হাসির আলো জ্বলছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত হাসিটিও যেন তার সঙ্গে জন্ম নিয়েছে। সারুয়ামারুর কথাগুলো শুনতে শুনতে তার সমস্ত শরীর থেকে হাসির রেখা মুছে গেল। এতক্ষণ বোঝা যায় নি। এবার মনে হলো, পাদ্রী সাহেবের শুভ্র মুখখানা ঘিরে মাকড়সার জালের মত অজস্র কালো কালো রেখার আঁকিবুকি। যেন, কতক-গুলো সরীসৃপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ঝলমলে মুখখানার কোন নেপথ্য থেকে একটি ভয়ংকর মুখ কালো কালো রেখার টানে টানে ফুটে বেরুচ্ছে। একটু আগের স্নিগ্ধ মুখখানার সঙ্গে এ মুখের কোন মিল নেই, করুণার সংগীত অনুপস্থিত।

গম্ভীর মুখে পাদ্রীসাহেব বললো, "হুঁ।" তারপর মনে মনে একটা অ-মিশনারী গালাগালি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কপাল-বুক-বাহুসন্ধি ছুঁয়ে অদৃশ্য রঙের ক্রস আঁকলো। আশ্চর্য সংযম, সে খিস্তিটা জিভ থেকে পিছলে সেঙাইদের কান পর্যন্ত পৌঁছালো না। অবশ্য পৌঁছালেও বিশেষ কোন আশংকার কারণ থাকতো না। কারণ শব্দ-গুলো বিশুদ্ধ ইংরাজী, যে ভাষায় পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে।

পাদ্রী সাহেব এবার কটমট করে তাকালো সারুয়ামারুর দিকে, "কেন কী জন্যে তোমাদের বস্তীতে যেতে দেবে না সর্দার?"

"আমি বললাম, ফাদার টেবোয়া বলি দিতে

দেবে না। ক্রস আঁকতে হবে। যীশু মেরী বলতে হবে। তাতে সদ্দার রাজী নয়। আমাকে তো বর্শা নিয়ে তেড়ে উঠেছিল। আর শাসিয়ে দিয়েছিল, তোর কাদার বস্তীতে এলে জান নিয়ে ফিরতে হবে না।" অপরাধী গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করলো সারুয়ামারু।

"হু, হু—" ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে সেঙাই বললো। "ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, হু, হু। আমাদের বস্তীতে ওসব চলবে না। সদ্দার বলে দিয়েছে সিধে কথা।"

তির্যক চোখে একবার সেঙাইকে দেখলো পাদ্রীসাহেব। তারপর মুখ থেকে মাকড়সার জালটাকে মুছে দিল। সুদূর কোন নেপথ্য থেকে একটি হাসির আভাস ছড়িয়ে সে বললো, "আচ্ছা, আচ্ছা। এখন খাবার খাও, অনেকটা পথ এসেছো। পথে কষ্ট হয়েছে। পরে বোঝা যাবে। এই সারুয়ামারু, তুমি সেঙাইকে সিজিটোর ঘরে রেখে এসো। তাড়াতাড়ি আসবে।"

সেঙাইকে নিয়ে সারুয়ামারু ডানদিকের পাহাড়ের পথটা ধরলো।

আর বেতের চেয়ারখানায় বসে পাদ্রী-সাহেব ভাবতে লাগলো। এই পাহাড়ী পৃথিবী। ইনিজিতেজ আর অ্যাঙ্গেলফিলির দেশ। ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে ক্রিশ্চানিটির আলোকিত রাজপথে এদের তুলে নিয়ে যেতে হবে। সে মিশনারী। একটুকুতে বিচলিত হলে চলবে না। এই পাদ্রী জীবনের নেপথ্যে যে তার একটি ভয়াল জীবন ছিল, সেই জীবনের বাঁকে বাঁকে সব অসংযম, সব বিশৃঙ্খলা, সব উত্তেজনাকে নির্বাসন দিয়ে আসতে হয়েছে। সন্স অব সিনার্সদের এই পঙ্কিল পৃথিবীতে একটি শ্বেতপদ্ম ফুটিয়ে তুলবে সে। ফুটিয়ে তুলবে একটি ধ্রুবলোক। সেই শ্বেত-পদ্মের নাম, সেই ধ্রুবতারার নাম হলো যীশু। নিজের রক্তে পৃথিবীর সব গ্লানি, সব অপরাধ তিনি শোধন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে মানুষের এত বড় দীক্ষা, তার অন্তত উত্তেজিত হওয়া চলে না।

একটু আগে বিড় বিড় করে একটি কদর্য গালাগালি উচ্চারণ করেছিলেন। তার জন্য এখন অনুতাপ হচ্ছে কী! স্নায়ুগুলো রীতিমত পীড়িত হচ্ছে। একটিমাত্র কর্তব্যের প্রেরণায় অ্যাটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ার এই পাহাড়ে এসে উঠেছে সে। এক গোলার্ধ থেকে একেবারে আর এক গোলার্ধে। বেথলেহেমের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে এই মহাদেশের আকাশে স্থির করে রেখে যেতেই এই পাহাড়ে-জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানবপুত্রের কল্যাণজ্যোতি নামাবে এদেশের মানুষগুলির রক্তে রক্তে শ্বেতকণার মত ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার রেহাই নেই।

ভাবনাটা সহসা বিভ্রান্ত হয়ে গেল পাদ্রী সাহেবের। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সারুয়ামারু।

পাদ্রী সাহেব বললো, "সিজিটোর ঘরে রেখে এসেছো সেঙাইকে?"

"হু-হু।"

"তারপর তোমাদের বস্তীর খবর কী? অনেকদিন তোমাকে বলেছি। এবার যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করো। শুধুশুধু রক্তারক্তি হবে, এ আমি চাই না। আমি মিশনারী। অনেক টাকা দেবো তোমাদের। যা চাও, সব মিলবে। খালি তোমাদের খ্রীস্টান হতে হবে।" একটু থামলো পাদ্রী সাহেব। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "থাক, এর মধ্যে টেবোয়া বলি দাও নি তো! ক্রস এঁকেছো? যীশুমেরীর নাম জপেছো?"

সারুয়ামারু বললো, "হু-হু, সব করেছি। তবে কে কেথু মাসে সূর্যের নামে একটা মুর্গি বলি দিয়েছিলাম।"

নাঃ, সংযমকে আর বাঁধ দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই হিদেন পাহাড়ীগুলোর বিবেক বলে কী আত্মসংযমের কোন পদার্থই নেই! তোতাপাখীর মত সে এই সারুয়ামারুকে বুঝিয়েছে। ঐ সব আনিজার নামে কোন প্রাণী-হত্যা করা চলবে না। দুটি বছর ধরে এই বুনো শয়তানের মনটাকে পাল তুলে, গুন টেনে, হালের বৈঠায় মোচড় দিয়ে এই প্যাগান পৃথিবী থেকে বেথলে-হেমের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে পাদ্রী সাহেব। কিন্তু পাদ্রী হলেও সে মানুষ! ছটা বেলাগাম রিপুর জোড়। চাপা গর্জন করে উঠলো সে, "ডেভিল, সন্স অব বিচ—"

পাদ্রী সাহেবের গালাগালির মহিমা আছে। এত আস্তে, মুখের রেখাগুলিকে অবিকৃত করে গালাগালিটা সে উচ্চারণ করে, যাতে মনে হয় বুঝিবা সেণ্ট ম্যাকগ্রেগরের একটা নিরুত্তেজ প্যারাবল আওড়াচ্ছে।

ঠিক এমন সময় এলো আর একজন মিশনারী। তার দিকে তাকিয়ে পাদ্রী সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "এই যে পিয়ার্সন! দেখো—জাস্ট সী—এত করে বুঝিয়েছি, তবু ঠিক আনিজার নামে একটা মোরগ বলি দিয়ে বসে আছে। এত টাকা খরচ, আটলাণ্টিক ডিঙিয়ে এই বুনো

পাহাড়ে এক্সাইলড্ হয়ে থাকার তবে অর্থ কী? একটা লোক যদি ঠিকমত ব্যাপটাইজড না হলো!"

উত্তেজনায় মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গিয়েছে পাদ্রী সাহেবের। বার বার তার সোনা-বাঁধানো একটি গজদন্ত আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। পাদ্রী সাহেব দুজন কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নির্বাক তাকিয়ে রয়েছে সারুয়ামারু। তবু পাদ্রী সাহেবের ভাব-গতিক বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তার মুখেচোখে রীতিমত একটা দুর্যোগের আভাষ পাচ্ছে সারুয়ামারু।

পিয়ার্সন মিটি মিটি হাসছিল। মাত্র কিছুদিন আগে এই কোহিমা শহরে এসেছে সে। বছর পঁচিশ বয়স। সোনালী চুল বাতাসে উড়ছে। চোখের ঘন নীল মণিতে আটলাণ্টিকের আভাষ। থরে থরে পেশীভার বুক আর বাহুসন্ধির দিকে উঠে গিয়েছে। সারা দেহের ওপর সাদা সারপ্লিসটা যেন বড় বেমানান, বড় বেখাপ্পা দেখায়। সাত ফুট লম্বা একটা ঋজু দেহ। মেরুদণ্ডটা সরলরেখায় মাথার দিকে উঠে গিয়েছে। কোহিমার পাহাড়ে-কন্দরে মিশনারীর নিরুত্তেজ জীবনের ভূমিকা যেন কৌতুকের অভিনয় মাত্র। মনে হয়, ঐ সাদা সারপ্লিসটার মতই এই জীবনটাকে ঝেড়ে ফেলে আকাশ ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠতে পারে পিয়ার্সন। আটলাণ্টিকের ওপারে কোন এক ডিউক পরিবারের ছেলে সে। কী এক দুর্বোধ্য খেয়ালে, কী এক দুর্নিবার কৌতুকে মশগুল হয়ে চার্চের চ্যাপেলে চলে গিয়েছিল পিয়ার্সন। গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটি থেকে সরাসরি চার্চের অলটার। সেখান থেকে আটলাণ্টিকের একটা উদ্দাম ঢেউএর মত আছড়ে এসে পড়েছে কোহিমার পাহাড়ে। সমানে মিটি মিটি হেসে চলেছে পিয়ার্সন।

এবার বিরক্ত গলায় পাদ্রী সাহেব বললো, "হোয়াট ডু ইউ মীন্—হাসছো কেন? সিরিয়াস ব্যাপারে হাসি ভাল নয় পিয়ার্সন!"

"আই এ্যাডমিট মিস্টার ম্যাকেঞ্জী!" হাসিটা আঠার মত এখনও আটকে রয়েছে পিয়ার্সনের দুটি রক্তাভ ঠোঁটের ওপর।

দুটি ভ্রূ কাঁকড়া বিছার মত কুঁকড়ে গেল পাদ্রী সাহেব ম্যাকেঞ্জীর। সে বললো, "তোমাকে অনেকবার বলেছি, আমাকে ফাদার বলে অ্যাড্রেস করবে। এটা চার্চের নিয়ম। বাট্ সরি টু ওয়ার্ন—তুমি সে নিয়ম মানছো না।"

"এক্সকিউজ মি। আর এমনটি হবে না।" হাসিটা এখনও স্থির হয়ে রয়েছে পিয়ার্সনের মুখে।

ম্যাকেঞ্জী একবার পিয়ার্সনের দিকে তাকালো, "আচ্ছা দেখা যাবে।" তারপরেই বলে উঠলো, "তুমি বিশেষ কাজকর্ম করছো না। গভর্নমেণ্ট এত টাকা খরচ করে এখানে প্রীচ্ করতে পাঠিয়েছে। তুমি খালি পাহাড়-পর্বত আর ফলস্ দেখে বেড়াচ্ছো।"

মুগ্ধ গলায় পিয়ার্সন বললো, "বাট্ ইউ মাস্ট এ্যাডমিট। ভারি সুন্দর এই নাগা পাহাড়।"

একটা কদর্য ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো ম্যাকেঞ্জীর মুখে; "ভুলে যেয়ো না পিয়ার্সন। ইউ আর নট্ পোয়েট্ বাট্ মিশনারী। কাব্য করার জন্যে এখানে তুমি নিশ্চয়ই আসো নি। এই তো এতদিন এসেছি আমরা, একটা থার্টি কৃশ্চান্ করতে পেরেছি! একটা ভিশান্ থাকা উচিত আমাদের।"

একটু থামলো ম্যাকেঞ্জী। এই থামার মধ্যে যেন আত্মদর্শন হলো তার। তারপরেই বলতে শুরু করলো; "তোমার আর কী? তোমার বাবা ডিউক। একটা হুইমের ঝোঁকে এ লাইনে এসে পড়েছো। দরকার পড়লে ছেড়ে পালাবে। কিন্তু আমরা এসেছি একটা ইন্সপিরেশনের তাড়নায়; একটা ভিশানের প্রেরণায়। কৃশ্চানিটির আলো দিয়ে পৃথিবীর থেকে প্যাগান আর আইডোলেট্রিকে তাড়াতে হবে। আর একটু ভেলুজ আসার আগেই আমাদের কর্তব্য হলো পৃথিবীকে শুদ্ধ করে নেওয়া। ইট্ ইজ নিদার হুইম্ নর গেম্ অব এক্সেন্-ট্রিসিটি। এর নাম সাধনা। মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে হবে। টু বিভিন্—"

সহসা গম্ভীর হলো পিয়ার্সন; "কিন্তু আমার মনে হয়, এ প্রীচিঙের কোন দাম নেই। কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের ধর্মের মধ্যেই এদের বাড়তে দেওয়া উচিত। তা হলেই এদের যথেষ্ট উপকার করা হবে। আমার তো এই কদিন পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে, এই পাহাড়ীদের দেখে দেখে তাই মনে হলো।"

কানের ওপর যেন একটা খরিস সাপের ছোবল পড়েছে ম্যাকেঞ্জীর। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সে; "বলছো কী পিয়ার্সন! আমরা লোকের উপকারই করি। এতটা ফিলানথ্রপি কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। তা ছাড়া এই মানুষগুলো শয়তানের শিকার হয়ে থাকবে! জানো তো, ব্রিটিশ রাইফেল যেখানে গেছে, সেখানেই বাইবেল গিয়ে হাজির হয়েছে। রাইফেলে-বাইবেলে মিলন না হলে পৃথিবীজোড়া রাজ্য করা সম্ভব হতো আমাদের?"

"আপনি কী বলছেন ফাদার? আমরা মিশনারী, আমাদের সঙ্গে রাজ্যজয়ের সম্পর্কটা কী?" বিস্ময়ে গলাটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়লো পিয়ার্সনের।

"ঠিক যে দৃষ্টি দিয়ে দেখছো, তার উল্টো কোণ থেকে ভাবতে হবে। আমরা আগে

ব্রিটিশার, তারপরে মিশনারী! এটা ভুলো না।"

থতমত খেলো পিয়ার্সন। বলে কী ম্যাকেঞ্জী! এ্যাটলাণ্টিকের ওপারে যখন গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটির কলোনেড্ কাঁপিয়ে তার সাত ফুট লম্বা ঋজু দেহটা হাঁটতো, তখন মিশনারী জীবন সম্বন্ধে ধারণা অন্য রকম ছিল পিয়ার্সনের। শুদ্ধাচারে, মানব-প্রেমে সে জীবন অপরূপ। ক্ষমাসুন্দর। মিশনারীর মন আটলাণ্টিকের চেয়েও গভীর, বিশাল আকাশটার চেয়েও ব্যাপক। মিশনারীর কোন জাতি নেই, কুল নেই, গোত্র নেই। যদি কিছুই থেকে থাকে, তাতে মিশনারীর পরিচয় হয় মিশনারী। আর কিছু নয়। কিন্তু কোহিমার পাহাড়ে এসে মোহভঙ্গ হচ্ছে পিয়ার্সনের। কাচের বাসনের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার মনে লালিত মিশনারীর সংজ্ঞাটা।

কঠিন গলায় পিয়ার্সন বললোঃ "কিন্তু অপরের ধর্মে হাত দেওয়াটা কী ঠিক? সে আর এক ধরনের ইম্পিরিয়ালিজম্; সে সাম্রাজ্য মানুষের মনে।"

নাঃ! সংযমকে আর বন্দী করে রাখা সম্ভব নয়। ছয় রিপুর একটি, মনের মধ্যে উথলপাথল হয়ে উঠলো। গর্জন করে উঠলো প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী! এই মুহূর্তে তার দুচোখে প্রস্তর যুগের ছায়া দেখলো পিয়ার্সন। মিশনারী! তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না সারুয়ামারু। তবু তার মনে হলো, যেমন করে একটা নেকড়ে একটা নিরীহ হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে ম্যাকেঞ্জীকে। চমকে উঠলো সারুয়ামারু।

থরথার গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "সেটা তোমার দেখবার কথা নয় পিয়ার্সন! না পোষালে তোমাকে হোমে পাঠিয়ে দিতে হবে। ইউ আর, নো ডাউট্, এ ভেরী ডেঞ্জারাস্ এলিমেণ্ট্। তোমাকে সাবধান করতে বাধ্য হচ্ছি। এ সব ব্যাপার নিয়ে, এ সব কথা বলে এই সব পাহাড়ী মানুষ-গুলোকে বিষাক্ত করো না। এর রিঅ্যাকশান্ খুব খারাপ। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষেও এ ক্ষতিকর। তুমি ছেলেমানুষ। এখনও সমঝে চলো। আগুন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না।"

"থ্যাংকস্! চেষ্টা করবো আপনার কথা-মত চলতে।"

ম্যাকেঞ্জীর মনে হলো, আশ্চর্যভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করলো পিয়ার্সন্। মনে হলো, একরাশ তাচ্ছিল্য বুলেটের মত এসে বিঁধলো চোখেমুখে।

সামনের গেটে ক্যাচ করে শব্দ উঠলো। সেই সংগে একজোড়া ভারি বুটের সদর্প আওয়াজ। এতক্ষণ একটা লক্ষ্মীপ্যাচার মত মুখখানা গম্ভীর হয়েছিল ম্যাকেঞ্জীর। কী এক ভোজবাজীতে খানিকটা হাসি ছড়িয়ে গেল তার সারা দেহে। সহসা উঠে দাঁড়ালো ম্যাকেঞ্জী; "গুড ডে মিস্টার বসওয়েল্। আসুন, আসুন।"

সাদর অভ্যর্থনায় গদগদ হয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী।

"গুড্ ডে ফাদার।" উদ্ধত বুট জোড়া পাথরের উপর মস্ মস্ বাজনা বাজাতে বাজাতে সামনে এসে পড়লো।

মিস্টার বস্ওয়েলের মুখখানা আশ্চর্য গম্ভীর। উদ্ধত চোয়ালটা সামনের দিকে যেন ঝুলে পড়েছে। কাঁপশ দুটি চোখে শুধু কুটিল মেঘের ছায়াপাত হয়েছে। সামনের বেঞ্চখানায় বসতে বসতে বসওয়েল বলল, "সাংঘাতিক খবর ফাদার! সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয়েছে। দ্যাট্ গ্যাণ্ডী—হাফ্-নেকেড্ ম্যান। লোকটা যাদু জানে। একেবারে ভেল্কী লাগিয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়ার মাটি থেকে বৃটিশ রুল একেবারে ওভারথ্রো করে ছাড়বে। নেটিভগুলো ক্ষেপে উঠেছে।"

"কী সর্বনাশ!" আর্তনাদ করে উঠলো প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী, "এখানকার খবর কী? আপনি তো পুলিসের সুপার। কোন গণ্ডগোল হবে না কী?"

একটু হাসলো মিস্টার বসওয়েল। সেই হাসি তার বিশাল মুখখানার ওপর একটি ভয়াল ক্রূরতাকে ফুটিয়ে তুললো, "সেই জন্যেই তো আসা! আমি জানি কেমন করে এই আন্দোলনকে মেশিনগানের মুখে উড়িয়ে দিতে হয়। সারা ইণ্ডিয়ার এজিটেশন ঠাণ্ডা করতে চারটে ঘণ্টাও পুরো লাগে না। ওন্‌লি ইনডিসক্রিমিনেট মেশিনগানিং। যাক, যে কথা বলতে এসেছি ফাদার। আপনার খানিকটা হেল্প চাই—"

"সার্টেন্‌লি—বলুন—"
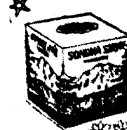
খাশ — আর ভারতীয় ঐক্যসাধনের জন্য জোর এলফন্সো। মধুচুষী, বেগম বাহার, ভূতো বোম্বাই, সিঁদুরে, গোলাপ খাশ আম নয়। বেশী মিষ্টি, বেশী সুন্দর—একটু যেন বেশী বেশী। সামনে একটা মাদ্রাজী আম রয়েছে—খানসামা পছন্দ করে এনেছে। এটা আম নয়, ঐ ধরনের মুখ পার্টিতে দেখেছি।

আমের আস্বাদ বুঝতেন চৌলাখীর নবাব, কদর পিয়ার এক বংশধর। আর বুঝতেন ঠুংরি ও পান-জর্দা। ভালো গানের সময় তিনি গলে যেতেন, নিজেকে সামলাতে পারতেন না। একদিন সকালে কৈসারবাগের এক নবাব-বাড়িতে গান গাইছেন কাশীর বিদ্যাধরী। অমন ভৈরবী অনেক দিন শুনিনি। নবাব সাহেব পাশে বসে, সাড়া নেই, শব্দ নেই, আহা নেই, বাহবা নেই, একেবারে গুম। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, নবাব সাহাব, তবিয়ৎ কেমন? বাড়ির খবর ভালো ত? গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'আজকের কাগজ পড়েছেন?' কিছুই বুঝলাম না। 'ছোট সাহেবের বক্তৃতা পড়েছেন?' 'পড়েছি। কিন্তু......' 'কাল কৈসারবাগের বারদোয়ারিতে আমের নুমায়েশ খোলা হয়েছিল। সেখানে লাট সাহেব কিনা বল্লেন যে, বোম্বাইয়ের এলফোন্সার তুলনা হয় না!' তখন বুঝলাম। 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, উনি আমাদের মেহমান, অতিথি। অতিথি এসে আপনার বল্লেন যে, আপনার পিলাও ভাল নয়, আপনার মুসল্লম ভালো নয়। এ কী রকম আদব!' তাবো অতিরিক্ত কিছু ছিল। চুপি চুপি আপন মনে বল্লেন, 'ইয়ে কভী হো শক্তা!' অর্থাৎ দশেরী সফেদা সমর-বেহেস্ত বাদশা পসন্দ—এদের সংগে তুলনা কি সম্ভব হতে পারে, মানুষে করতে পারে! আবার আস্তে আস্তে বল্লেন, 'বোম্বাইয়ে শুনেছি, লোকে বিবিকে তুম্ বলে ডাকে। তাই হবে না!' লাট সাহেব বোম্বাইয়ের লোক। নবাব সাহেবের সেদিন ঠুংরি শোনাই হলো না। এটা লক্ষ্ণৌ-এর সুখ্যাতি নয়, অন্য শহরের অখ্যাতি নয়—এটা মাত্র রসবিচার, যে-রস গেঁজে যায়নি, তাড়ি হয়নি, গুড়েও পরিণত হয়নি।

১২।৪।৫৬

আমাদের উর্দুর অধ্যাপক সেখ রশীদ সিদ্দিকী রসজ্ঞ ব্যক্তি। হাল্কা প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধহস্ত। নিতান্ত আস্তে কথা কন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। প্রায় রোজই বাগান থেকে ফুল পাঠান, আর কলেজে এসে দুটি গার্ডেনিয়া দেন। বছরের প্রথম সবচে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, এক সায়েরীর সংগে। একদিন বলছিলেন উত্তর প্রদেশের বৈদগ্ধ্য এটাওয়া স্টেশনের ওপারে শেষ হয়ে গেছে। আমি বল্লাম, উনাও পর্যন্ত। তাই থেকে ভংগী, উচ্চারণ, কহন-সহন প্রভৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে কথাবার্তা চলল। এ এক রকম 'U' ও non-'U' শ্রেণীর ভেদ-বিচার।

ছেলেবেলায় বাংলা দেশের, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার পার্থক্য বোঝা যেতো। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলতেন, কৃষ্ণনগর শ্রেষ্ঠ। বিজয় মজুমদার মহাশয় বলতেন কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত গঙ্গার দু-ধারে। রাজসাহী-পাবনায় বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে এক বিশেষ কালচার দেখেছি। কেবল তাই নয়, বাগবাজার-শ্যামবাজার আর কালি-ঘাট-ভবানীপুরে এক ছিল না। বালিগঞ্জের দ্রুত পরিবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটলে নিজেকে বিদেশী মনে হয়। বাংলা দেশের কেন্দ্রগুলি সব লোপাট হয়ে গেল। একজন পুরানো বেহারী ছাত্র বল্লে, ভাগলপুর আর গয়া এখন সব একাকার। কাশী বোধ হয় কাশীই রয়ে গেল, বিশ্ব-নাথের কৃপায় বা!

কারণ আছে। কিছু কারণ জানি। তবু পরিবর্তন বিষাদময়। দুর্গন্ধ নালা আর কে চায়! তবে ভদ্রতা, শালীনতা, বৈশিষ্ট্য ছিন্ন-ভিন্ন হলে 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!' বয়সের চিহ্ন? দোষই বা কি তাতে? Graciously যদি বৃদ্ধ হওয়া যায়, তবে বিক্ষোভের কারণ নেই। এলিয়ট maturity of mannersকে কালচারের অংগ বলেছেন। বুড়ো খোকা বুড়ো খুকী না হলেই হলো, আর সুবর্ণযুগের জন্য হা-হুতাশ না করলেই হলো। ব্যাপারটা কালাতিপাতের স্বীকৃতির সংগে কালের অধীনতা অস্বীকার। কালের টানা-পোড়েন পাকা হলে চরিত্র খাঁটী হয়। কালচার আর ক্যারেক্টার এইখানে এক। ইন্দিরা দেবীকে মনে পড়ছে। আরেকজন পুরুষকে যিনি আমার আত্মীয় ছিলেন।

১৩।৪।৫৬

আজ কি চৈত্র-সংক্রান্তি? আজই কি জেলেপাড়ার সঙ বেরুবে? আজই না চড়ক-পুজো? ছেলেবেলায় একবার চড়কের মেলায় যে দৃশ্য দেখেছি, ভাবলে এখনও ভয় হয়। একত্রে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। পিঠে মোটা লোহার কাঁটা ফুটিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরা, একতলা উঁচু জায়গা থেকে ইঁট-কাঁটা ভরা গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। বুকে রক্ত বইছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চক্ষু আর কাপড় রক্তবর্ণ, আর গলায় মোটা সুতোর মালা। মেলা বসত মুসলমান জোলা তাঁতি পাড়ায়, খেতোম কদমা আর পাঁপর। এককালে ছিল বৌদ্ধ অনুষ্ঠান। এখন মনে হয়, তন্ত্রের অংশও ছিল। বৌদ্ধ-জয়ন্তীর মত হবে শাস্ত্র, কিন্তু শেষ দিকে বাংলা দেশে ব্যাপারটা ঘেন্না হয়ে উঠেছিল। অত বড় ধর্মের জন্মস্থানেই অত অবনতি ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। সমস্তটা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। খড়দার মেলা, মাহেশের মেলা, চড়কের মেলা, কুস্তির মেলা, গেরস্তির মেলা, অনেক মেলা দেখেছি—সব মিলে মিশে এক হয়ে ওঠে। বারোয়ারি অত্যন্ত নিম্নস্তর, কিন্তু এ-রকম অভদ্র নয়। আমার স্বর্গীয় বন্ধু জ্যোতিষ জেলেপাড়ার সঙকে ভদ্র করে তুলেছিল। ভদ্রলোক জ্যোতিষের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে দিয়েছিলেন একবার। জানি না এখন কেমন চলছে। দিল্লীতে যে শোভাযাত্রা হয়, তার মধ্যে ব্যঙ্গ থাকে না এবং সামাজিক ব্যঙ্গের ভেতর দিয়েই জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য মনোভাবের সামাজিক প্রকাশ সম্ভব হয়। একমাত্র Shankar's Weekly যথেষ্ট নয়। অবশ্য এই ধরনের সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে ওপরকার শ্রেণীর চালাকি থাকে, বিরোধের বিষদাঁত এতে ভেঙে যায়, বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন কি আমরা বিপ্লব চাইছি? দিল্লীতে জেলেপাড়ার সঙ দেখালে মন্দ হয় না। রামলীলার কর্ম নয়। দেবাসুরের যুদ্ধ, সৎ-অসতের লড়াই একটু যেন বেশী রকমের অবাস্তব। আমাদের পার্লামেণ্টে যখন বাস্তব সমালোচনা সহজ নয়, তখন জেলেপাড়ার সঙের ওপরই নির্ভর করতে হয় দেখছি। সরকারী কর্মচারী—ব্যুরোক্রাসীকে ঠাট্টা করবার অমন সুযোগ আর কি আছে? বিশেষত যখন আইন তাদের সাহায্য করছে। প্রত্যেক সঙ্ সামাজিক এবং anti-legal, anti-bureaucratic। সঙের হাসি মোটা, চওড়া, খোলা, ঠোঁট-বাঁকান নয়—বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপ নয়, প্রাণখোলা হাঃ, হাঃ, হাঃ। ব্যাপারটা বেশ ডেমক্র্যাটিক অর্থাৎ mediocre—রমনে ভালো।

বর্ণচোরা

সুশীল রায়

শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে নিজের মনের বহুদিনের চাহিদার জোগান দিতে পেরেছেন আদানাথবাবু। এখানে গড়েছেন তিনি নিভৃত এই নিকেতন। নাম শেফালিকুঞ্জ।

শিউলির একটা চারাও নেই এ-তল্লাটে। কিন্তু ফুলের মেলায় ভরা এই এলাকা। চারদিকে ফলের বাগান। যেদিকে চোখ যায়, সেইদিকেই সবুজ আর সবুজেরই বাহার গাঁদার বন।

জীবনের সমস্ত সম্বল একত্র করে আদানাথবাবু এই প্রথম এলাকায় এসে তৈরি করেছেন মনোমত এই বাড়ি। ফটকে শ্বেত-পাথরের উপর কালো হরফে লিখে রেখেছেন শেফালিকুঞ্জ। কালো পাথরের উপর সাদা অক্ষরে নামটা লেখালেই হয়তো আরো শুভ্র সৌন্দর্য ফুটে উঠত নামটার, কিন্তু আদানাথবাবু বাইরের সে সৌন্দর্যের ভক্ত নন, তাঁর মন যে অমল আনন্দে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে—এইটেই তাঁর তৃপ্তি।

বাস-এর রাস্তা পাঁচ মিনিটের দূরত্ব। জনাকীর্ণ শহরের কলরব-কোলাহলের দেশ থেকে এই নিভৃত নিকেতনে পৌঁছতে লাগে পাকা দেড় ঘণ্টা। কাজের জায়গায় যাতায়াত করতে প্রত্যহ তিনটি ঘণ্টা খরচ হয়ে যায় রাস্তায়। কিন্তু এই বাজে ব্যয় উশুল হয়ে যায়, যখনি তিনি পৌঁছে যান এই শেফালি কুঞ্জে।

প্রগাঢ় তৃপ্তির সুবাসে সুবাসিত হয়ে ওঠে তার মন। পুবের বারান্দায় বসে তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন—অগণ্য গাছের অন্ধকার শিয়রের প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ নিটোল চাঁদ। আবার, অমাবস্যার রাতে তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন অনাবিল আকাশের গায়ে নির্মল তারাদের নির্ভেজাল দ্যুতিবিকিরণ।

এমন জ্যোৎস্নাও নেই শহরের ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশে, এমন নিখুঁত অন্ধকারের পুলকও নেই সেখানে।

আদানাথবাবু খুশি। খুশি তিনি নানা কারণে। এখানে এসে তিনি যেন নিজেকেও চিনতে পেরেছেন। জীবনের এতগুলি বছর খরচ করে তিনি যে-জ্ঞান ও যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা অকিঞ্চিৎকর হতে পারে, তবুও সেই জ্ঞান ও সেই অভিজ্ঞতার একটু মূল্য যে আছে—এ বোধ তিনি পেয়েছেন এখানে এসে। এখানে এসে জীবনে সবপ্রথম তিনি খাতির পেয়েছেন, এবং পেয়েছেন শ্রদ্ধা।

টালিগঞ্জ থেকে সোজা গড়িয়া পর্যন্ত টানা পীচের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছের প্রহরী দাঁড়িয়ে। এরই মধ্যে চলাচল করেন আরো পাঁচজনের সঙ্গে আদানাথ মুখোপাধ্যায়। কখনো বাস্-এ, কখনো রিক্শায়, কখনো-বা পদব্রজে। দু'পাশের গাছেরা যেন নীরব নমস্কার জানায় হিল্লোলিত শাখার আন্দোলন দিয়ে দিয়ে। পুলকে শিহরিত হয়ে ওঠে আদানাথবাবুর সর্বাঙ্গ।

কলকাতা যেখানে সম্ভবত সবচেয়ে ঘিঞ্জি, আদানাথবাবু তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় কাটিয়ে এসেছেন সেই তল্লাটে—শ্যামপুকুরে। সেখানে তিনি চোখ ভরে জনতা দেখেছেন, কিন্তু মন তাঁর ভরে নি, জন দেখা হয়নি তাঁর।

কিন্তু এখানে এসে মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। নিছক পাশের বাড়ির লোক নয়, এখানে এসে প্রতিবেশী পেয়ে গেলেন তিনি।

নীচে চারটি ঘর, উপরে তিনটি। নীচের ঘর চারটিই বইয়ে ঠাসা। উপরে তিনটি ঘরে থাকে তিনটি প্রাণী—আদানাথবাবু, বৈদানাথ ও বাসন্তী।

একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট এই সংসার। একটি বুড়ী ঝি আছে, আর জোয়ান একটা ঠাকুর এরা দু-জনাই যেন বাড়ির মালিক। উপরে যে তিন জন থাকে তারা যেন শেফালিকুঞ্জ নামে এই সরাইখানায় তিনজন যাত্রী মাত্র।

বৈদানাথ যখন পাঁচ, আর বাসন্তী মাত্র তিন—সেই সময় আদানাথবাবু বিপত্নীক হন। তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন শেফালি দেবী, কিন্তু মনের সমুখে আজও তিনি বর্তমান। মনের সেই প্রতিবিম্বটা সীসার অক্ষর হয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে ফটকে গাঁথা শ্বেতপাথরের বুকের উপর।

জ্যোৎস্না যখন বন্যা ছড়ায় চৌদিকের গাছের শিয়রে শিয়রে, তখন হঠাৎ কেন-যেন পুরোনো দিনের জীর্ণ স্মৃতি এসে দাঁড়ায় একটা শুভ্র সাজে সুসজ্জিত হয়ে। শেফালির সুবাসে সুবাসিত হয়ে ওঠে মন।

আদানাথবাবু যেন নিজেকেই বলেন, তোমার ছেলেমেয়েকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারলেই আমার তৃপ্তি। তুমি নিজের হাতে এদের মানুষ করবে বলেছিলে। কিন্তু কথা না রেখে তুমি চলে গেলে। আমি তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করব—এই আমার ইচ্ছে। ধনী তারা না হোক, কিন্তু জ্ঞানী গুণী আর মানী হোক—এই আমার চেষ্টা।

মাতার ও পিতার দ্বিবিধ স্নেহ দিয়ে

সযত্নে লালন ক'রে অনেকটা বড় করে তুলেছেন তিনি তাঁর পুত্র ও কন্যাকে।

বৈদ্যনাথ এম-এ পড়ছে, বাসন্তী বি-এ।

অয়স্কান্তবাবু নাকতলা-পল্লীর আদি বাসিন্দে। চার পাঁচ ঘর সংগী নিয়ে তিনি প্রথম এদিকে এসে ডেরা বাঁধেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু উদ্যমে আর উৎসাহে এখনো যেন সাতাশ।

মাথা-ভরতি ধবধবে সাদা চুলের রাশ বুঝি তুলোর মত হালকা—একটু বাতাসেই ফুরফুর করে ওড়ে। কপালের উপর তাঁর পাকা গোঁফজোড়ার মত সাদা একজোড়া ভুরু।

অয়স্কান্তবাবু রোজ সকালে একবার আসেন। দরজার পাশে হাতের লাঠি দাঁড় করিয়ে রেখে মোড়া টেনে বসতে বসতে বলেন, "এখানে ছিল ধুধু মাঠ, সেই মরা মাঠের বুকে প্রাণ নিয়ে এলাম আমরা পাঁচ-ছয় ঘর। আর, আপনি এখানে নিয়ে এলেন মান। আপনার মত জ্ঞানী-গুণী মানুষ পেয়ে আমরা—"

বাধা দিলেন আদ্যনাথবাবু, বললেন, "কার মান কে দিতে পারে অয়স্কান্তবাবু? যার-যার মান তার তার নিজের।"

'অত্যন্ত খাঁটি কথা। যার যার মান তার তার নিজের। কিন্তু পল্লীর মান আনে পল্লীবাসী। তা না হলে অরণ্যও মান্য হয়ে উঠত। কেমন কিনা।"

কথা শুনে হেসে উঠলেন আদ্যনাথবাবু।

অয়স্কান্তবাবু বললেন "মেনে নিন আমার কথা। আর ঝগড়া করবেন না।"

ঝগড়া করেন নি, মেনেই নিয়েছেন আদ্যনাথবাবু। কিন্তু মেনে নিয়ে বিপদ হয়েছে এই যে, অয়স্কান্ত বক্সীর তালে তাল দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। এখানে হাই স্কুল বসাবেন ব'লে অয়স্কান্ত উঠে পড়ে লেগেছেন।

হাই স্কুল সত্যিই বসেছে ঐ সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধের চেষ্টায়। কিন্তু এর কৃতিত্বটা অয়স্কান্ত নিজে নিতে নারাজ, বলেন, "মস্ত লোহার সাঁকো তৈরি করে হয়তো কুলীরাই। কিন্তু সত্যিই কি তারা তৈরি করে? পিছনে থাকে একটা মাথা। আপনি সেই ইঞ্জিনিয়র।"

"আর আপনারা কি?"

অয়স্কান্ত সরল হাসি হেসে সংক্ষেপে বলেন, "মজুর।"

যা ছিল একেবারে গ্রাম, ক্রমে ক্রমে বসতি বেড়ে তাই হয়ে উঠছে একটা শহর। সহস্র পায়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে যেমন এগিয়ে চলে বৃশ্চিক ঠিক সেইভাবে নিঃশব্দ গতিতে লক্ষ পায়ের পদক্ষেপ ফেলে বিশাল শহর যেন এগিয়ে আসছে এইদিকে। বিজলি আলো জ্বলে উঠছে ঘরে ঘরে, রাত বারোটায়ও এ-বাড়ি ও-বাড়ির রেডিয়োতে বেজে উঠছে দিল্লীর প্রোগ্রাম।

কিন্তু হোক শহর, তবুও হৃদয়হীন শহর হয়ে ওঠে না এই পল্লী, হয়ে ওঠে সহৃদয় একটা উপনিবেশ মাত্র। অন্ধচক্ষু শহরের মত পাশের মানুষকে না দেখার মত কুৎসিত রুচিতে বিষাক্ত হয় না এর বাতাস, কাছের মানুষকে অপরিচিতের মত অবজ্ঞা করার আগ্রহও এর জাগে না। যতই বসতি বাড়ুক, তবু সকলেই সকলের যেন চিরচেনা। অন্তরংগ আন্তরিকতা দিয়ে আত্মীয়তার উপনিবেশ হয়ে ওঠে এই অঞ্চল।

আত্মীয়-পল্লীর মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করতে থাকেন আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বেড়ে চলে ক্রমশ।

"আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়ই শুধু নন, আপনি আমাদের আদর্শ।"

কথাটা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন আদ্যনাথবাবু। এমন শ্রদ্ধার আসনে বসে তো আরাম নেই। দায়িত্বের কাঁটা দিয়ে এ-আসন যে ছাওয়া হয়ে থাকে। এ-শ্রদ্ধা অটুট আর অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

আদ্যনাথবাবু বললেন, "বড় দায়িত্বের বোঝা চাপালেন মাথায়। অযোগ্যকে অপর্যাপ্ত দিলে অপচয় হয়।"

"ঠিক কথা বলেছেন। যথার্থ কথা। অযোগ্যকে দিলে অপচয়ই হয় বটে। কিন্তু এখানে অপব্যয়ের কোনো ঝুঁকি নেই।"

হেরম্ব হালদার, দিগিন্দ্র বটব্যাল, মিহির মৈত্র—সকলে প্রায় একসংগেই বলে উঠল—ঐ কথা। কথাটা এরা বলল বটে, কিন্তু গলাটা যেন অয়স্কান্ত বক্সীর।

বিকেলে অয়স্কান্ত এলেন, মোড়া টেনে বসে বললেন, "ওরা নাকি সব এসেছিল সকালে?"

"হ্যাঁ। পাঠিয়েছিলেন বুঝি?"

প্রতিবাদ করে উঠলেন অয়স্কান্ত, বললেন, "পাঠাব কেন? ওরা নিজেরা আসতে জানে না কী, বলল কি ওরা?"

আদ্যনাথবাবু হেসে উঠলেন, বললেন, "যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সব অবিকল গুছিয়ে বলতে পেরেছে।"

"তামাশা রাখুন মশায়।" ধমক দিলেন যেন অয়স্কান্ত, বললেন, "যত গুণী আর যত মানীই হোন, বয়সে আমার অনেক ছোট, সুতরাং শাসন করার অধিকার আমার আছে।"

যেন ধমক খেয়েই চুপ করে গেলেন
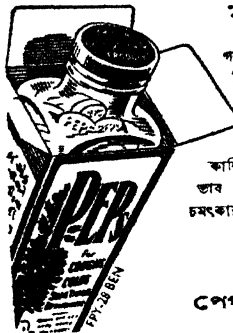
আদ্যনাথ। আর কী কথা বলবেন ভেবে পেলেন না।

অয়স্কান্ত বললেন, "অধ্যাপক অনেক আছেন সংসারে। অধ্যাপকত্ব তো একটা জীবিকা। কিন্তু জীবিকার জন্যে নয়, মানুষের যেটা জীবন তার জন্যেই মানুষে সম্মান পায়। আপনি অধ্যাপক, কিন্তু সেজন্যে আপনার মান নয়। আপনার মান হচ্ছে আপনার লেখা পুঁথির জন্যে। 'ভারতীয় নারীর আদর্শ', 'স্বদেশচিন্তা', 'সামাজিক আচারের উৎপত্তি'—বই তিনটি পড়ে আমি মুগ্ধ মশায়। এ পল্লীর সকলকে আমি পড়াব। তারা দেশ চিনুক, জাতি চিনুক, আত্মজিজ্ঞাসা জাগুক তাদের মনে।"

নিজের প্রশংসা স্বকর্ণে শুনতে শুনতে জড়োসড়ো হয়ে উঠছিলেন আদ্যনাথবাবু। প্রতিবাদ তো আর করা যাবে না, ধমক খেতে হবে। ভর্ৎসনা করার অধিকার যে নিয়ে নিয়েছেন অয়স্কান্ত বক্সী।

নীরবে বসে রইলেন আদ্যনাথ। ভাবতে লাগলেন, অয়স্কান্তের কথা যদি আন্তরিক হয় তাহলে সত্যিই বড় বিপদ। ওঁদের দেওয়া এই শ্রদ্ধার যোগ্য করে রাখতে হবে নিজেকে।

অয়স্কান্ত বললেন, "আপনি নমস্য। বিপত্নীক জীবন হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন পুত্র ও কন্যাকে। দীর্ঘজীবী হোক তারা। আপনার মুখোজ্জ্বল করুক।"

পাঁচ-ছয় বছর আগেও যে-জায়গা ছিল অপরিচিত একটা নিঃস্ব ভূখণ্ড মাত্র। এই কয় বছরে তা হয়ে উঠেছে মস্ত একটি উপনিবেশ। খাঁটি শহরের যাবতীয় সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে, অথচ খাঁটি শহরের নির্মম নির্মোক দিয়ে এর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ওঠে নি। এটা এখানকার একটা বাড়তি লাভ।

শেফালিকুঞ্জ নামে নিভৃত নিকেতনটি এ-পল্লীর সকলেরই মমতায় ধন্য হয়ে আছে। সত্যি, আদ্যনাথবাবু একজন সাধকই বটেন; তাঁর গৃহটি একটি আবাসস্থল যেন নয়, যেন তপস্যার একটি শান্ত আশ্রম।

তিনটি প্রাণী একমনে তপস্যা করে চলেছে এখানে।

আদ্যনাথবাবু যখন ছাতা-হাতে রওনা হন বাস্-রাস্তার দিকে তখন এ-পল্লীর যে-কোন লোকই হোক, সসম্ভ্রমে যেন একটু পথ ছেড়েই সরে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈদ্যনাথ, বিশেষ ক'রে বাসন্তী, যখন বেরোয় তখন রাস্তার দু-পাশের বাড়ির জানলা ফাঁক হয়ে যায়, পর্দার কোণ যায় সরে।

বৈদ্যনাথ উদাস প্রকৃতির, সে ওসব লক্ষ্য করে না, কিন্তু বাসন্তীর সারা শরীরে কাঁটা দিতে থাকে।

বাসায় ফিরে বই-খাতা টেবিলের উপর রেখে বলে, "বড় বিশ্রী সব স্বভাব।"

মেয়ের গলা শুনে বারান্দা থেকে সাড়া দেন আদ্যনাথ—"বিরক্ত হলি কেন রে বাসন্তী?"

বাসন্তী উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে সে ঘরের মধ্যে জামা-কাপড় বদলাতে থাকে।

বাবার পাশের মোড়ায় এসে বসে বাসন্তী, বলে, "রাস্তায় বেরলেই এক সমারোহ আরম্ভ হয়ে যায়। জানলা দরজা দিয়ে সকলে উঁকি দিতে থাকে। কী মুশকিল বল তো!"

মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন আদ্যনাথ, "মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল একটু বেশিই হয়ে থাকে। ওতে বিরক্ত হতে নেই।"

"আমি কি একটা দ্রষ্টব্য জিনিস?"

"উঁহু। তুমি একটা দৃষ্টান্ত। ওদের কাছে তুমি একটা উদাহরণ। এজন্যে গর্ব তুমি কোরো না, কিন্তু এজন্যে আমি গৌরববোধ করছি।"

বৈদ্যনাথ সাতে-পাঁচে নেই। সে খায়দায় পড়াশুনো করে, নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, নীরবে এসে বাড়িতে ঢোকে।

পল্লীর কৌতূহলের অন্ত নেই। শেফালি-কুঞ্জের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর তাদের পুরো নজর।

বুড়ি ঝী-টা তো বলতে গেলে একেবারে অথর্ব, চলা-ফেরা করা বা বাড়ির বাইরে যাওয়া তার সাধ্য নয়। ছোট সংসারের টুকিটাকি বাসন মাজে সে, মসলা বাটে, তরকারী কোটে, উনুনে ধরিয়ে দেয়। রান্না-বান্না থেকে বাকি অন্যান্য কাজ সবই ভীম-প্রসাদের।

এইসঙ্গে আর একটি কাজও আছে ভীম-প্রসাদের, কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

আমরা আপাতত সে-কথা চাপা রাখতে পারি বটে, কিন্তু এই পল্লী খবরটা ভালো করে জানতে চায়।

টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে ভোজ-পুরী পাচক ভীমপ্রসাদ মাথায় গামছা চাপা দিয়ে যখন চাঁটা রোদের মধ্যে বাস্-রাস্তার দিকে রওনা হয়, তখনো ফাঁক হয়ে যায় দু-পাশের কৌতূহলী জানালা, দরজার কপাটও খুলে যায় আধখানা।

আদ্যনাথের, বৈদ্যনাথের কিংবা বাসন্তীর?—কা'র খাবার চলেছে এই ভর-দুপুরে বেলা?

ভীমপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, সে জবাব দেবে না, মুখ টিপে হাসবে।

নীরবে নিভৃতে বয়ে চলেছে শেফালি-কুঞ্জের জীবন। কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো অশান্তি নেই, কলরব-কোলাহল কিছু নেই। নিটোল জলধারার মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে শেফালিকুঞ্জের প্রত্যহগুলি একে একে গড়িয়ে চলেছে।

অয়স্কান্ত বক্সী আসেন; দিগিন্দ্র বটব্যাল, হেরম্ব হালদার, মিহির মৈত্রও আসেন। নিজেদের সুখদুঃখের কথা কিছু বলেন, পল্লীর সৌভাগ্যের জন্যে তাঁরা কতটা গৌরবান্বিত সে-কথাও তোলেন, হাই-স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত, বৈদ্যনাথ ও বাসন্তীর কথাও ওঠে।

অয়স্কান্ত বলেন, "নাতনিদের আমি বলি, তোরা ঘরে বসে অযথা সময় নষ্ট করছিস, কিছু পড়াশুনো কর্, কিছু সেলাই—"

বাধা দেন আদ্যনাথবাবু, একটু হেসে বলেন, "এভাবে উৎসাহ দেওয়া ভালো। কিন্তু তুলনা দিয়ে বলতে গেলে ফল কিন্তু বিপরীত হতে পারে অয়স্কান্তবাবু। মেয়েদের মর্যাদাবোধ বড় সূক্ষ্ম। বলা যায় না, তারাও আবার বলে বসতে পারে—তুমি চেষ্টা ক'রে অন্যকের মতন হলে না কেন, দাদু?"

মাথার সাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবলেন অয়স্কান্ত, বললেন, "ঠিক। মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু আপনার মেয়ের মত যদি তারা হতে পারত তা হলে সুখের অন্ত থাকত না আদ্যনাথবাবু।"

এ কথাতে বাধা দেওয়া যায় না, প্রতিবাদও করা যায় না। আদ্যনাথ চুপ ক'রে গেলেন।

ছেলে-মেয়ের সুখ্যাতি শুনতে খারাপ লাগার কথা নয়। আদ্যনাথের কানের মধ্যে এদের প্রশংসার কথাগুলো গুঞ্জন করতে থাকে। তিনি হঠাৎ ভেবে ফেলেন শেফালি দেবীর কথা। আজ বেঁচে থাকলে এই মধুর গুঞ্জন দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া যেত।

সত্যিই যেন একটা গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। রাত প্রায় এগারোটা বেজেছে। টেবিলল্যাম্প জেলে বৈদ্যনাথ পড়ছে মনে-মনে। উঁকি দিয়ে দেখলেন

আদ্যনাথ। হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর—পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে কে-যেন তর তর ক'রে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ভীত হয়ে উঠলেন আদ্যনাথ, বললেন, "কে? কে ও?"

নীচে থেকে উত্তর এল, "আমি। ভীম।"

"ভীম কে?"

"আমি ভীমপ্রসাদ।"

বাবার ভয়ার্ত গলার আওয়াজে বৈদ্যনাথ ছুটে বেরিয়ে এসে বলল, "কী হয়েছে বাবা?"

বজ্রপাত হয়েছে। বজ্রাঘাত হয়েছে আদ্যনাথের মাথায়।

আদ্যনাথ মাথায় হাত দিয়ে রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর রেখে বললেন, "কিছু না। যাও। পড় গিয়ে।"

বৈদ্যনাথ চলে গেল ঘরের মধ্যে। কিছু বুঝল না সে, কিছু জানার আগ্রহও তার নেই।

একটু পরে বাসন্তী তার ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আদ্যনাথের পাশে দাঁড়াল, বলল, "বাবা, এভাবে দাঁড়িয়ে কেন তুমি?"

দু বার বলে কোনো উত্তর পেল না বাসন্তী, তৃতীয় বার প্রশ্ন করায় আদ্যনাথ শান্ত গলায় বললেন, "এমনি।"

ব'লেই তিনি তীরবেগে তাঁর ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

হতভম্ব হয়ে বাসন্তী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, একটা খটকা যেন লাগল তারও মনে। কিন্তু—

থাক্ কিন্তু। বাসন্তী নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, একটু থামল সে, কী-যেন ভাবল, তার পর ধীরে ধীরে সে তার বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আদ্যনাথ শুয়ে পড়েছেন টান হয়ে, বাবার মাথার কাছে ব'সে ধীরে ধীরে সে বলল, "হঠাৎ কী হল বাবা? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি?"

উত্তর নেই।

বাসন্তী বাবার কানের কাছে ঝুঁকে বলল, "কী হয়েছে, বলতে হবে তোমাকে। বলতেই হবে।"

আর্তনাদের মত শব্দ ক'রে আদ্যনাথ ব'লে উঠলেন, "বজ্রাঘাত।"

"বাজে কথা। বিশ্বাস করি নে।" দৃঢ়-গলায় প্রতিবাদ জানাল বাসন্তী।

চোখের উপর থেকে হাত নামিয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে আদ্যনাথ মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু অন্ধকার ঘরে মেয়ের মুখ তিনি দেখতে পেলেন না।

বাসন্তী আর বসল না। এক টুকরো ঝটিকার মত দমকা বেগে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তার। নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল বন্ধ ক'রে দিল বাসন্তী।

ওই শব্দে চমকে উঠলেন আদ্যনাথ। কিন্তু তাঁর শরীর একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ কী একটা ঘটনা যেন ঘটে গিয়েছে, কী-যেন একটা সর্বনাশ। সেই সর্বনাশের চেহারাটা তিনি স্পষ্ট করে দেখার চেষ্টা করছেন; কিন্তু চোখের দৃষ্টিও বুঝি গেছে ঝাপসা হয়ে, কিছুতে দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

সারা রাত ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ালেন আদ্যনাথ। শরীরের মধ্যে প্রবল-একটা চাঞ্চল্য এসেছে, স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না তাঁকে। মনে হচ্ছে, এ বুঝি তাঁর নিজেরই দোষ। বিপত্নীক জীবনের এ একটা বাড়তি অভিশাপ। মা-মরা সন্তানদের স্নেহমমতা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর দেওয়া সেই স্নেহমমতা বুঝি পর্যাপ্ত নয়। সেই অভিমানে হয়তো এরা তাঁর উপর এই প্রতিশোধ নিচ্ছে। শেফালি দেবীর কথা মনে পড়ল আদ্যনাথের। এই চরম দুর্যোগের দিনে তাঁর উপস্থিতি বড় জরুরী বলে মনে হতে লাগল তাঁর। আজ যদি তিনি থাকতেন তাহলে এমন সাংঘাতিক অঘটন ঘটত না কিছুতে। কী ক'রে তিনি এ-পাড়ায় মুখ দেখাবেন? দৃষ্টান্ত আর উদাহরণ ব'লে যাকে সকলে গণ্য করেছে, সে যদি—

আদ্যনাথ ভাবতে পারেন না। অস্থির অস্থির ঠেকে তাঁর, অসহ্য কষ্ট বোধ করেন তিনি। পায়চারি ক'রে ক'রে রাত্রি ভোর করতে থাকেন।

এ-ঘরে আদ্যনাথ দুঃসহ কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রাত্রিযাপন করছেন, শেফালিকুঞ্জের মর্যাদা-হানির সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন।

আমরাও আদ্যনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যেই এ-ঘরে কাটিয়ে দিচ্ছি সারা রাত। ও-ঘরে বাসন্তী কী করছে, আমরা তা জানিনে।

সকালে আদ্যনাথ যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চোখ-দুটি তখন তাঁর রক্তজবা। সেই রক্তবর্ণ চোখ-দুটি মেলে তিনি বকের পালকের মত দুগ্ধশুভ্র শেফালিকুঞ্জের চারদিকে তাকাতে লাগলেন। মনে হতে লাগল, কে যেন কলঙ্কের কালী গুলে এর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে কাল রাত্রির অন্ধকারে।

সাতে-পাঁচে নেই বৈদ্যনাথ। কিছু জানেও না সে, কিছু জানার আগ্রহও নেই। যথারীতি সে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল।

ভীমপ্রসাদও যথারীতি সকাল বেলার খাবার এনে বৈদ্যনাথের টেবিলে রেখে গেল। খাবার সময় বাসন্তীর ঘরের দিকেও উঁকি দিল একবার। একটু পরে সে-ঘরেও খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল।

লক্ষ্য করছেন আদ্যনাথ। কিন্তু ভীমকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হচ্ছে না।

ভীম বললে, "বাবু, আপনার খাবার।"

"নিয়ে যাও। শরীর ভালো নেই। খাব না।"

ভীমের আপাদমস্তক চেয়ে দেখলেন আদ্যনাথ। এতটুকু জড়তা নেই, এতটুকু আড়ষ্টতা নেই—অদ্ভুত মনের জোর তো ছোকরাটার! আশ্চর্যই লাগে আদ্যনাথের।

বাসন্তী বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসে দাঁড়াল বাবার সামনে, বলল, "আমি একটু বেরুচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ এই সকালে?"

"একটু কাজ আছে।"

মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না আদ্যনাথ, চোখ নীচু করে বললেন, "কলেজ নেই?"

"আছে। কিন্তু সে তো দুপুরে।"

আর কোনো কথা নয়। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল বাসন্তী।

আদ্যনাথ উপর থেকে চুপি করে উঁকি দিলেন, কিন্তু অযথাই উঁকি দেওয়া হল। বাসন্তী নীচে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কী যে হল, আচমকা কেমন করে একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল বোঝা যাচ্ছে না কিছুতে। কী করে এর প্রতিকার হবে, সে চিন্তা এখন বড় নয়; কিভাবে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এখন শুধু সেই ভাবনা।

সকাল গড়িয়ে গিয়ে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। বৈদ্যনাথ স্নানাহার সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বাসন্তী ফিরে এল না এখনো। এত বেলা পর্যন্ত তার ফিরে না আসায় নতুন উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন আদ্যনাথ। এই অবস্থায় তিনিও কলেজে যেতে পারলেন না। চুপ করে বসে বাসন্তীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন আদ্যনাথ—প্রায় দেড়টা। উপর থেকে হাঁক দিলেন, "ভীমপ্রসাদ।"

কিছু-একটা অঘটন যে ঘটেছে, বুঝতে পেরেছে ভীমপ্রসাদও। ডাক শোনা মাত্র সে ছুটে উঠে এল উপরে, বলল, "বাবু।"

ভীমপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন আদ্যনাথ, "দিদিমণি কোথায়?"

ভীমপ্রসাদ বলল, "যাবার সময় তো বলে গেল না।"

"রাসকেল।" রাগে সংযম হারিয়ে ফেললেন আদ্যনাথ। বললেন, "জান

কি না বল। বলে গেলে না বলে আক্ষেপ জানাবার জন্যে তোমাকে ডাকা হয়নি।"

ভীমপ্রসাদ জানে না। আদ্যনাথের সামনে থেকে সে সরে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে আদ্যনাথ নীচে বাসন্তীর গলার আওয়াজ পেলেন। কান পেতে শুনতে লাগলেন তিনি। কথাগুলো বোঝা গেল না। সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দ শুনে আদ্যনাথ শক্ত হয়ে বসলেন।

বাসন্তী। বাসন্তী ফিরেছে। চুল রুক্ষ। মুখ শুকনো। রোদের তাপে চোখ-মুখ বুঝি ঝলসে গেছে।

বাবার সংগে কোনো কথা বলল না, বাবার দিকে তাকালও না। সোজা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে।

ভিতরের চাঞ্চল্য চাপতে গিয়ে বসে বসে পা দোলাতে লাগলেন আদ্যনাথ। ইচ্ছে হতে লাগল উঠে গিয়ে মেয়েটাকে আচ্ছা করে ধমকে দেন। লেখা-পড়া শেখা হল, বুদ্ধি হল, কিন্তু মান-ইজ্জতের জ্ঞান হল না? ইশ, এত বড় আক্ষেপ কি করে চাপা দিয়ে রাখবেন আদ্যনাথ।

কিছুক্ষণ বাদে বাসন্তী এল বাবার কাছে। কোনো অভিযোগ নয়, কোনো অনুনয় নয়, কোনো কৈফিয়তও নয়। সোজাসুজি বাবার মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, "বিদায় নিতে এলাম। পায়ের ধুলো দাও।"

"অর্থাৎ?" দু পা সরিয়ে নিয়ে যেন ফোঁস করে উঠলেন আদ্যনাথ, বললেন, "বিদায় মানে?"

দু-চোখ সজল হয়ে উঠল বাসন্তীর, বলল, "চলে যাব। নিজের সম্ভ্রমের জন্যে এত সজাগ তুমি, নিজের মেয়ের মান রাখতে পারলে না। এ অপমানের মধ্যে আর না আর না আর না।"

কিছুক্ষণ ভাবলেন আদ্যনাথ, জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে শুনি?"

"সে কথা এখন থাক্ বাবা। সবই জানবে। চিরদিন কি নিজেকে গোপন করে রাখতে পারব?"

"তবু।"

"এখন থাক্ বাবা। এখন থাক্।"

বাসন্তী উঠে নিজের ঘরে গেল। একটু পরে আদ্যনাথ বাসন্তীর ঘরের সামনে গিয়ে দু হাতে দরজার দুটি কপাট ধরে দাঁড়ালেন। সব বাঁধা-ছাদা হয়ে গেছে বাসন্তীর—বই, বিছানা, জামা-কাপড়। তিনটি মাত্র পুঁটুলি।

"এ ভালো করছ না বাসন্তী। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

বাসন্তী বলল, "বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভয়েই এতদিন যাইনি। কিন্তু—"

"কি কি কি? কী বললে?" বড় বড় পা ফেলে আদ্যনাথ ঘরের মধ্যে বাসন্তীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। "এর আগেই তবে চলে যাবার প্ল্যান তৈরি ছিল?"

"ছিল। কিন্তু তোমার মায়ায় যেতে পারিনি, তোমার টানে। কিন্তু আর বাধা দিও না বাবা। আমাকে দিয়ে তোমার কোনো মর্যাদা বাড়বে না। দাদা রইল। সব রকমের সম্মান ও সম্ভ্রম সে দেবে।"

"দাদার উপর এ ঈর্ষা কেন?"

"ঈর্ষা নয় বাবা। এ ভরসা।"

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন আদ্যনাথ। হঠাৎ এমন চরম পথ নেবার জন্যে তৈরি হয়ে যাবে বাসন্তী এ তাঁর স্বপ্নেও ছিল না। কাল সারারাত পায়চারি করতে করতে কত রকমের কথা ভেবেছেন, কিন্তু এ ধরনের সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি তাঁর।

"খাওয়া-দাওয়া করবে না?"

"না। ভীমপ্রসাদকে বলে দিয়েছি।"

আদ্যনাথ বললেন, "এর মধ্যে বলা হয়ে গিয়েছে?"

বাবার মুখের দিকে চমকে তাকাল বাসন্তী, বলল, "হ্যাঁ। কেন, বলে এসে ভুল করলাম নাকি?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে আদ্যনাথ বললেন, "যা করতে চলেছ, তার পরিণাম ভেবে দেখেছ তো?"

"উঁহু। ভাবিনি। ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে।"

"কিন্তু বাধা দিচ্ছি বাসন্তী। যেয়ো না। আমার মুখ হাসিয়ো না।"

হাসিই পায় বাসন্তীর। যে-পাপ ঢুকেছে বাবার মনে সে-পাপ যে কত বড় পাক্তি পাপ, তা বুঝি বাবাও আন্দাজ করতে পারছেন না। এ পাপকে আস্কারা একবার যখন দিয়ে ফেলেছেন, তখন আর নিস্তার নেই—ক্রমশই এ বড় হয়ে উঠবে।

বাসন্তী বলল, "বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারবে না আমাকে। উপরন্তু লোক-জানাজানি হবে। তার চেয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে দাও।"

"কোথায় যাচ্ছ? ঠিকানা বল।"

"কিছু ঠিক নেই।"

মনে মনে গুমরাতে লাগলেন আদ্যনাথ, বললেন, "বড়ই দুঃসাহস দেখছি।"

বাবার কথায় কান দিল না বাসন্তী। দরজার কাছে এসে গলা উঁচু করে ডাকল, "ভীমপ্রসাদ!"

"জী।" জবাব এল নীচ থেকে।

"কই, যাওনি এখনো? তাড়াতাড়ি যাও।"

আদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে ও?"

ত্রস্তে মাথার চুল জড়িয়ে নিতে নিতে বাসন্তী বলল, "রিকশা ডাকতে।"

"রিকশায় কদ্দুর যাওয়া হবে? বাস্ পর্যন্ত?"

"না। আর-একটু এগিয়ে। টালিগঞ্জ অবধি।"

মেয়ের এমন গোঁ এতদিন পর্যন্ত একদিনও দেখেননি আদ্যনাথ। আজ তাঁর বড় আশ্চর্যই ঠেকতে লাগল। বললেন, "এমন জেদ তো আগে দেখিনি। বাবাকে এমন অবজ্ঞা আর অগ্রাহ্য কোনো মেয়ে করে না।"

"কোনো বাবাও তার মেয়েকে এমন অসম্মান করে না।" গলাটা যেন কেঁপে উঠল বাসন্তীর।

রিকশার ঘণ্টা বাজল নীচে। ভীমপ্রসাদ উপরে এসে খবরও দিল।

বাসন্তী তাকে ইশারা করল জিনিসপত্র তুলে নেবার জন্যে। ভীমপ্রসাদ জোয়ান ছেলে। একই সঙ্গে তিনটে পুঁটুলি নিয়ে সে নেমে গেল নীচে।

বাসন্তী বাবার পায়ের ধুলো নিল। এবার পা সরিয়ে নিলেন না আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

উঠে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বলল, "আসি।"

উত্তর দিতে পারলেন না আদ্যনাথ।

দু পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল বাসন্তী, বলল, "দাদার সঙ্গে দেখা হল না। তাকে বোলো দেখা করতে।"

"কোথায় গিয়ে দেখা করবে?"

"ভীমপ্রসাদ জানে।"

আর কোনো কথা না বলে বাসন্তী বাড়ির চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেমে গেল।

উপর থেকে আদ্যনাথ দেখলেন—ধীর-গতিতে চলে যাচ্ছে সাইকেল-রিকশা।

ভীষণ শাস্তি দিয়ে গেল মেয়েটা। আচমকা একটা সাংঘাতিক আঘাত দিয়ে গেল। পাড়ার লোককে কী কৈফিয়ত দেবেন ভাবতে লাগলেন আদ্যনাথ। যাতায়াতের অসুবিধা হয় বলে হস্টেলে গেল? কিন্তু এ দুর্বল কৈফিয়তটা টিকবে কতদিন?

কী যেন বলে গেল যাবার সময়? ভীমপ্রসাদ জানে? ও কথাটার মানে কী? ও-ও কি সঙ্গে গেল?

আদ্যনাথ বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারস্বরে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ভীম-প্রসাদ।"

"জী।" সাড়া এল নীচে থেকে।

ওর জন্যে অপেক্ষা করলেন না আদ্যনাথ। নিজেই নেমে গেলেন নীচে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বলে গেল দিদিমণি?"

কথার মানে না বুঝে বেকুবের মত সে তাকাতে লাগল বাবুর মুখের দিকে।

আদ্যনাথ বললেন, "দিদিমণি গেল কোথায় জানিস।"

"না।"

"তবে যে ও বলে গেল তুই জানিস।"

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল ভীম-প্রসাদ। বলল, "ওই কথা বলেছে? তবে বুঝি দাদাবাবুর বাড়ি গেছে।"

"দাদাবাবু কে?"

"দেবকুমার দাদাবাবু।"

"সে কে? তার বাড়ি চিনিস? রিকশা ডাক শিগ্‌গির, রিকশা ডাক। থাক্ থাক্। চল আমার সঙ্গে। রাস্তা থেকে ধরে নেব রিকশা।"

আদ্যনাথ উপরে উঠে গেলেন। বোতাম-হীন পাঞ্জাবিটা গায়ে কোনোরকমে গলিয়ে নিয়ে নেমে এলেন তখনি, বললেন, "আয়।"

ভয় পেয়ে গেছে বুঝি ভীমপ্রসাদ। খেয়াল ছিল না, চট ক'রে সে ব'লে ফেলেছে নামটা। দিদিমণি নিশ্চয় রাগ করবে।

আদ্যনাথ ডাকলেন, "আয়।"

ভীমপ্রসাদ রওনা হল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পা যেন তার চলতে চায় না। দিদিমণির কড়া হুকুমে যে-কথা গোপন রেখেছে এতদিন, বাবুর একটা ঠাণ্ডা আদেশেই সে-কথা সে ফাঁস করে দিল।

আদ্যনাথ বললেন, "হাঁট্। না হয় দৌড় দে ভীমপ্রসাদ। আগে গিয়ে ধর একটা রিক্‌শা।"

ভীমপ্রসাদ আগে আগে হাঁটতে লাগল বড় বড় পা ফেলে। বাঁক নিতে গিয়ে আবার চোখের আড়াল না হয়ে যায় ভীম, এই ভয়ে আদ্যনাথও বড় বড় পা ফেলতে লাগলেন।

রিক্‌শায় ভীমকে পাশে বসিয়ে যেন কত সাহস পাচ্ছেন আদ্যনাথ। মস্ত সহায় ব'লে মনে হচ্ছে ভীমপ্রসাদকে।

আদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে কে আছে রে তোর দাদাবাবুর?"

"কেউ না। বিলকুল একা।"

"কেউ নেই? খাওয়া করে কোথায়?"

"কী জানি। আমি তো অনেকদিন দিয়ে এসেছি খাবার।"

চমকাবারই কথা। গর্তের মধ্যে রিক্‌শার চাকা পড়ায় ভীষণ ঝাঁকি খেলেন আদ্যনাথ। বললেন, "বড় মজার খবর তো। আগে বলিসনি কেন? কী করেন দাদাবাবু?"

"কে জানে। বহুত বই নিয়ে বসে থাকে। বড় বড় কাগজে কী-সব লেখে।"

"দেখতে কেমন রে?"

"খুবসুরত আছে।"

আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না আদ্যনাথ। কালো পীচের সোজা রাস্তা ধ'রে দু পাশের গাছের ছায়ায় ছায়ায় দ্রুতবেগে চলেছে রিক্‌শা।

টালিগঞ্জ ফাঁড়ির একটু আগে এসে রিক্‌শা দাঁড়াল।

ভীম বলল, "এই বাড়ি।"

"কড়া নাড়। ডাক দে।"

ভীম কড়া নাড়তেই দরজা খুলে এক সঙ্গে বেরিয়ে এল দুটো মুখ। সম্মুখে এদের দেখে যেন সচল দুটি প্রাণী হঠাৎ পাথরের মূর্তির মত অচল হয়ে দাঁড়াল।

রিক্‌শা থেকে নেমে আদ্যনাথ বললেন, "আশীর্বাদ করতে নয়, ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

অধ্যাপক তুচ্চি সাহেবের মত টিলম্যান সাহেবের এই অভিযানের উদ্দেশ্যও পাহাড়ে চড়া ছিল না। টিলম্যান সাহেব যদিও পাণ্ডুলিপি কি শিল্প নিদর্শন খুঁজতে আসেননি। তিনি এসেছিলেন এই দেশের অজানা জায়গাগুলো আবিস্কার করতে। টিলম্যান আর তুচ্চি এই দুই সাহেবের কিন্তু একজায়গায় খুব মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বৈজ্ঞানিক। কাঠমণ্ডু থেকে শোলো খুম্বু আর এভারেস্টের দিকে এগিয়ে যাব বলে আমার বড় অবাক লাগছিল। কিন্তু আমরা যাইনি। তার বদলে আমরা উল্টোদিকে হাঁটা ধরলুম। একেবারে পশ্চিমে। এবার আমরা যেদিকে গেলাম সে অঞ্চলের নাম লাঙদাঙ হিমালয়। আগে কখনো এ অঞ্চলে আসিনি। কদিন ধরে আমরা নানা ক্ষেতখামারের মধ্য দিয়ে চললাম। বড় বড় ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট টিলাকে পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমাদের পথে পড়লো গ্রামের পর গ্রাম, পুরোনো দুর্গ আর উচ্চশীর্ষ প্যাগোডা। নেপালীরা বলে এইসব প্যাগোডার জন্ম এখান থেকেই হয়েছে, চীন থেকে নয়। যদিও প্রচলিত ধারণা অন্যরকম তারপর ক্রমেই আমরা বন্য অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আর যদিও পর্বতারোহণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক পাহাড়ে আমাদের চড়তে হয়েছে। আমাদের উত্তরে, পশ্চিম নেপালে বিশাল পর্বতগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি, মানসালু, আরও সব শত শত। এই প্রথম আমি তাদের চোখ ভরে দেখলাম। ঐ একবারই যা দেখেছি।

টিলম্যান সাহেব এই দেশের ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করছিলেন, আর তাঁর দুজন বন্ধু ব্যাপৃত ছিলেন এই অঞ্চলের ফুল আর খনিজ নিয়ে। পুরো তিনমাস ধরে তাঁদের অনুসন্ধান চলেছিল। আর তার রসদ জোগাতে এই তিনটে মাস আমাদের শুধু ছুটতে হয়েছিলো, কখনো উপরে কখনো নীচে, কখনো সামনে কখনো পিছনে, কখনো এদিকে কখনো সেদিকে। কখন কখন আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়তাম, কখন উঠে পড়তাম উঁচু উঁচু পাহাড়ে। বিরাট বিরাট হিমবাহের উপর দিয়ে তুষার ঢাকা নানা গিরিপথ পেরিয়ে আমাদের চলতে হোত আর বেশির ভাগ সময় আমরা এমন পথে এগুতাম যে পথে এর আগে মানুষ কখনো যায়নি। এই সময়ই একবার এক হিমবাহ পার হতে গিয়ে তুষারের উপর যে সূর্যের আলো পড়েছিলো, তার ঝিলিকে আমি সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যাই। জীবনে এই প্রথম। আমার কাছে একজোড়া গভীর কালো চশমা ছিল। তুষারের দেশে চলবার সময়ে সকলের কাছেই তা থেকে থাকে। কিন্তু কেমন করে জানি না, আমি তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর একদিন বরফের এক বিরাট প্রান্তরের উপর দিয়ে হাঁটবার সময় হঠাৎ টের পেলাম আমার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। বারেবারে চোখ দুটো ডলতে লাগলাম, বারেবারেই ধুতে লাগলাম, চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা। আমার সঙ্গীসাথীরা তাদের যথাসাধ্য করলো, কিন্তু বৃথা। যন্ত্রণা বেড়েই চললো। বাড়তে বাড়তে একসময়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। কে যেন আমার চোখে পড়্‌-পড়্‌ করে বর্শা বিঁধিয়ে দিচ্ছে। তীব্র উজ্জ্বল আলোর তীক্ষ্ণ ঝকঝকে এক বর্শা দিয়ে কে যেন আমার চোখে খোঁচা মারছে, কুরে কুরে দিচ্ছে, উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। যেন ছিঁড়ে পড়বে। একসময়ে আমার মনে হোল, চোখদুটো তার কোটর থেকে বেরিয়ে বোধহয় পড়েই যাবে। সেই হিমবাহ যতক্ষণ না পার হয়ে গেলাম ততক্ষণ এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। হিমবাহ পার হবার কিছুদিন পর পর্যন্ত এই যন্ত্রণা ছিল। কিন্তু সুখের কথা আমার এ অন্ধত্ব কিছুদিন পরেই ভাল হয়ে গেল, চোখদুটোর বেশি ক্ষতিও কিছু

নেপালের গ্রাম্য অবস্থাপন্ন গৃহিণীর অলংকার সজ্জা

হয়নি। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে আমি হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম।

এরপর থেকে যে অভিযানে গিয়েছি, সব অভিযানে গিয়েছি, আমার সংগে একজোড়া রঙিন চশমা বেশি করে নিয়ে গিয়েছি।

জংগলের মধ্যে নানারকম দুর্ঘটনায় আমাদের পড়তে হয়। প্রায়ই আমরা হারিয়ে যেতে লাগলাম। বেশিরভাগ সময় অন্যের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটেছিল, কিন্তু কয়েকবার এমনভাবেই হারালাম যে মনে হোল আর বোধহয় পথ খুঁজে ফিরতে পারব না। একবারের ঘটনা বিশেষ করে আমার মনে আছে। সেবারে টিলম্যান সাহেব, দাওয়া নামগিয়া বলে এক শেরপা আর আমি দলছাড়া হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিন ধরে দলের অন্যান্য লোকদের খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যে হোল। কিন্তু আমরা যেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম তেমনিই থাকলাম, না পেলাম আমাদের সংগীদের, না কোন গ্রাম, না কোন পথ, না আর অন্য কিছু। মনে হোল রাতটা বোধহয় খাদ্যহীন, আশ্রয়হীনভাবেই কাটাতে হবে। হঠাৎ আমরা একটু উপর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেই আওয়াজ ধরে এগিয়ে গিয়ে সেই অঞ্চলের খন্ডজাতীয় একজন লোকের দেখা পেলাম। নেপালের এই অঞ্চলের লোক তাদের বলে লিম্বান্। দাওয়া নামগিয়া আর আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, আমাদের গ্রামে নিয়ে যেতে। আমরা লোকটির সংগে দু'একপা এগুতে না এগুতে টিলম্যান সাহেবও এসে আমাদের সংগে যোগ দিলেন। সেই যা আগে বলেছি, টিলম্যান সাহেব যখন অভিযানে বের হন তখন তাঁর গোঁফ, দাড়ি, চুল এমন বেড়ে যায় যে, তাঁকে ঠিক ভালুকের মত দেখায়। আমরা তাঁকে ডাকতাম বালু বলে। তাঁর ভুরু জোড়া বেশ ভারি। সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে। সাহেব যখন পাহাড়ে পর্বতে ঘুরতেন, তখন তুষার পড়ে পড়ে তাঁর ভুরু দুটোর অবস্থা এমন হয়ে যেতো যে, মনে হোত ওটা যেন একটা কার্নিশ কিংবা এক গিরিশিরা! এ জংগলে অবশ্য তুষারের কোন বালাই ছিল না। কিন্তু তাঁর ঝুমরো ঝুমরো চুল আর একগাল দাড়ি মিলে তাঁকে একেবারে বুনো বুনো দেখাচ্ছিল। তাঁর জামার ভিতর থেকেও বুকে পিঠের চুল উঁকি ঝুঁকি মারছিলো। এশিয়ার অন্যান্য অনেক জাতির মতই লিম্বাস্‌দের মুখে গায়ে চুল প্রায় গজায়ই না। এই লোকটি বোধহয় সাহেবের মত এমন অপূর্ব চেহারা আগে আর দেখেনি। ওই একবারই যথেষ্ট। একবার দেখেই লোকটির আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কি যে ঘটলো তা বোঝবার আগেই লোকটা একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো তারপর দে দৌড়। পাঁচটা টাকা আর এক গ্রামে পৌঁছবার আশা, এই দুটো নিয়েই লোকটা হাওয়া হয়ে গেল। আমরা আবার সেই আগেকার মত সংগীহারা দিশাহারা হয়ে ঘুরতে লাগলাম।

রাত্রি হোল। একটা গাছের নিচে বসে রাত কাটাবো বলে ঠিক করলাম। একটু দূরেই শুনতে পাচ্ছি কুল কুল করে একটা নদী বয়ে চলেছে। আমার তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেয়ে আসবার জন্য যেই উঠেছি, টিলম্যান সাহেব আমাকে বাধা দিলেন। ওটা হয়তো বুনো জন্তুদের জল খাওয়ার জায়গা। নেপালের জংগল হিংস্র বাঘ ভাল্লুক আর নানারকম জন্তু জানোয়ারে ভর্তি। আর রাত্রিকালে এইরকম সব জায়গায় তাদের দেখা নিশ্চিত পাওয়া যায়। তাই আমি আবার বসে পড়লাম। সেই গাছের নীচে। আমার ভেতরটা তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। আমার শরীরটা ভিজছিল বাইরের হিমে। সকাল হলে আমরা সেই ছোট্ট পাহাড়ে নদীটার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, টিলম্যান সাহেব যা ভয় করেছিলেন তাইই। নদীর তীরের কাদায় পড়ে রয়েছে বহু জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ!

শেষপর্যন্ত আমরা আমাদের সংগী-সাথীদের খুঁজে পেলাম। আবার চলতে লাগলাম। আবার হারিয়ে গেলাম। আবার দলকে ফিরে পেলাম। আমাদের কুকরীর ঘায়ে বিষুবীয় জংগলের লতাপাতা কেটে আমরা পথ করে নিতে থাকলাম। বরফকাটা গাঁইতির ঘায়ে ধাপ কেটে কেটে পাহাড়ে উঠে গেলাম। টিলম্যান সাহেবের মালপত্র-থলো নানা ধাপে জড়ো উঠলো। আর অনেক রকম ফুল আর কীটপতঙ্গের নমুনায় আমাদের বোঝা ভারী হয়ে উঠলো। প্রায়ই আমরা লিম্বুদের কোন না কোন গ্রামে গিয়ে হাজির হতে লাগলাম আর টিলম্যান

সাহেবের চেহারা দেখে সেসব গ্রামে হৈ চৈ পড়ে যেতে লাগলো। বনের ধারে দেখা সেই লোকটার মত ভয় পেয়ে কখন কখন গ্রাম-শুদ্ধ লোক পালিয়ে যেতো। কখন বা আবার ভয়ের থেকে তাদের কৌতূহল হতো বেশি। তারা সাহেবের চারধারে ভিড় করে দাঁড়াতো, সাহেবের দিকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাতো আর হেসে গড়িয়ে পড়তো। যদি কখনও সেইসব গ্রাম থেকে আমাদের কোন জিনিস কেনার দরকার পড়তো—খাদ্য কি পানীয়, —তখন আমরা সাহেবদের, বিশেষ করে টিলম্যান সাহেবকে আমাদের কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত একটু আড়ালে রেখে দিতাম।

কিন্তু এ সমস্ত লোক আমাদের কখনো বিপদে ফেলেনি। সুখের কথা বুনো জন্তু-জানোয়ারেও কখনো আমাদের উৎপাত করেনি। আমাদের সাথীদের মধ্যে ছিল জোঁকেরা। আর এই পশ্চিম নেপালের মত জঘন্য জোঁকের সমারোহ আমি আর কোথাও দেখিনি। নিচের দিকে যেখানে একটু গরম সেখানে জোঁক সর্বত্র। যেখানে পা ফেলো সেখানে জোঁক, ঘাসের পাশ দিয়ে চলো সেখানে জোঁক, মাথার উপরে গাছের পাতা সেখানে জোঁক, তার নীচ দিয়ে যদি যাও টপটপ করে ঝরে পড়বে তোমার মাথায়। জোঁকের কামড় অবশ্য বিষাক্ত নয়, বড় একটা ব্যথাও হয় না। ব্যথা হয় না বলেই জোঁক যখন লাগে তখন টের পাওয়া যায় না। তুমি তোমার পোশাক খুলে দেখো, একটু সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করে দেখো দেখবে জোঁক লেগে আছে। এগুলো যেমন লম্বা, তেমন কুৎসিত। তোমার মাংসের সঙ্গে লেগে থেকে রক্ত চুষে চুষে, বেলুনের মত ফুলে আছে। বিশেষ করে পায়ে আর গোড়ালিতেই জোঁক লাগে বেশি। রক্ত খাওয়ার আগে এগুলো এতো ছোট থাকে যে সহজেই উলের মোজার ফাঁক দিয়ে, কি জুতোর ফিতে পরাবার ফুটোগুলোর মধ্যে দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় গায়ে নুন মেখে রাখা। নুন ওরা পছন্দ করে না। পোশাক আশাক কেরোসিনে ডুবিয়ে নিয়ে পরলেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু তাতে যা দুর্গন্ধ ছাড়ে তা জোঁকের মতই বরদাস্ত করা যায় না। জোঁক একবার যদি লাগে তবে তাকে টেনে ছাড়ানো যায় না, হয় তাকে পোড়াতে হয় আর নয় কুকরী দিয়ে কেটে ফেলতে হয়।

কি ভাগ্যি, নেপালে কুকরীর অভাব নেই। আর এই অভিযানে গিয়ে কুকরী দিয়ে আমার গা এতবার চাঁচতে হয়েছে যে, আমি সহজেই কোন নাপিতের দোকানে চাকরী পেয়ে যেতে পারি। জঙ্গলে কি করে বাস করতে হয় এবারে তা শিখলাম। আর আমার দেশ সম্পর্কেও কিছুটা জ্ঞান অর্জন করা গেল। তিব্বত - কুলু - কাশ্মীর - নেপাল। দার্জিলিঙে আমার বাড়িতে ফেরবার পথে নামগুলো একটার পর একটা আউড়ে যেতে থাকলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবি, আরও কত দূর আমাকে যেতে হবে? আর কোন্ দেশে? কোথায়?

এবারে গাড়োয়ালে। আবার সেই বান্দর-পুঞ্ছে। সেই 'দুন স্কুল পাহাড়ে।' আবার আমার সেই পুরানো বন্ধু গিবসন্ সাহেবের সঙ্গে।

শীতকালে, চিঠি লেখালেখির মধ্য দিয়ে আমরা ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব পাকা করে রেখেছিলাম। তারপর ১৯৫০-এর বসন্ত-কালে আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম এবার এক পরিচিত রাস্তা ধরে। এবছর তিনজন নতুন লোক পাহাড়ে চড়তে এসেছেন। তাঁদের এই প্রথম পাহাড় যাত্রা। সেই তিন-জনের মধ্যে মেজর জেনারেল উইলিয়ামস্ ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্তা। রয় গ্রীনউড্ ছিলেন সেনা-বিভাগের শিক্ষাদাতা। আর ছিলেন গুরু-দয়াল সিং। দুন স্কুলের তিনি এক তরুণ শিক্ষক। সেই যে ১৯৪৬ সালে আমি আর গিবসন সাহেব বান্দরপুঞ্ছে উঠবার চেষ্টা করেছিলাম তারপর থেকে আরও কয়েকটা চেষ্টা হয়েছে। আমরাও দু'দুবার এই পাহাড়টায় উঠতে চেষ্টা করেছি। আমাদের সেই দু'বারের অভিযান নিয়ে মোট সাতবার বান্দরপুঞ্ছে অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু এপর্যন্ত কেউই সফল হতে পারেনি। "বোধহয় আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।" গিবসন সাহেব মৃদু হেসে বললেন। বললেন, "এটা আমাদেরই বছর, বুঝলে।" গিবসন্ সাহেবের মত আমিও তাই আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এভারেস্টের পরেই আমি এই পাহাড়টাকে ভালোভাবে জানি। তাই ভাবলাম, বানরের পুচ্ছটি ধরে টানবার এই হচ্ছে সবথেকে ভালো সময়। তিব্বতে আর নেপালে শেষবেষ যে দুটো অভিযানের সঙ্গে আমাকে যেতে হয়েছিল তার একটাতেও আমি চূড়োয় উঠবার সুযোগ পাইনি। তাই এবার কাজটা বেশ পছন্দই হয়েছিল। গাড়োয়ালের উঁচু উঁচু পাহাড় আর উপত্যকার পর উপত্যকা পেরিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। অনেক পাহাড়ী নদী পার হয়ে, অনেক উঁচু গিরিপথ ডিঙিয়ে চলতে চলতে আমরা সেই গিরিচূড়ার পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এখানে এর আগে আমি দুবার এসেছি। একবার তের বছর আগে, আর একবার বছর চারেক আগে। আমরা ১৯৪৬ সালের পথ ধরে একটার পর একটা শিবির স্থাপন করে যেতে লাগলাম। কিন্তু এইসব তুষারঢাকা পাহাড়ে যা হয়, পথঘাট একদম বদলে যায়। পাহাড়ের চেহারার প্রায়ই পরিবর্তন হয়। প্রথম শিবির আর দ্বিতীয় শিবিরের মধ্যে যে গিরিশিরাটি পড়লো তা ১৯৪৬ সালের থেকেও অনেক বেশী দুর্গম। একে তো সরু, তার উপর মাথার 'পরে ঝুলে রয়েছে বিরাট বরফের কার্নিশ। খুব সাবধানে, খুব আলতোভাবে এইসব জায়গায় পাহাড়ের উপরে চড়তে হয়। অন্যান্য বারের অভি-যানের থেকে এবারের আবহাওয়া আমাদের খুব ভাল ছিল। আর হিমালয়ে পাহাড় চড়ার চাবিকাঠিই হচ্ছে আবহাওয়ার প্রকৃতি। এখানে এইটেই সব থেকে জরুরী বিষয়. তাই আমরা খুব ভালভাবে কাজ করতে পারলাম। আমরা প্রায় ১৮০০০ হাজার ফুটের উপরে আমাদের তৃতীয় শিবিরটি স্থাপন করতে পারলাম, এখান থেকে চূড়ায় আমাদের হানাটা আমাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়লো।

জেনারেল উইলিয়ামসের বয়স পঞ্চাশ

পার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। আমাদের উচ্চতর শিবিরে উঠে যেতে তাঁর কোন কষ্ট বোধ হল না। সংগী হিসাবেও তিনি চমৎকার লোক। স্বভাবটা তাঁর মধুর, বিবেচনাবোধও যথেষ্ট। তিনি প্রায়ই বলতে লাগলেন, আমরা যেন তাঁর জন্য কোন উদ্বেগ বোধ না করি। তিনি বলতেন, "এই বুড়োটার দিকে আর নজর দিও না তেনজিঙ্। চূড়োয় উঠতে পারায় আর না পারায় আমার বিশেষ কিছু এসে যায় না। তুমি ছোকরাদের দিকে নজর দাও।" আমরা আশা করেছিলাম, তৃতীয় শিবিরটা থেকে সবাই এক সংগে চূড়ার দিকে এগিয়ে যাব, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ঠিক এই সময়ই গুরুদয়াল সিং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক উঁচুতে উঠলে কারো কারো এমন অসুখ হয়। এ পীড়া, উচ্চতার পীড়া। গুরুদয়ালকে নিচে নামান জরুরী হয়ে পড়ল আর গিবসন সাহেব নিজেই একাজে সাহায্য করবেন বলে এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে আমরা ঠিক করলাম আর অপেক্ষা করা নয়। অপেক্ষা করলে এই সুন্দর আবহাওয়া আর নাও থাকতে পারে। তাই ঠিক হ'ল তৃতীয় শিবিরে জেনারেল উইলিয়ামস্ কয়েকজন শেরপাকে নিয়ে সাহায্যকারী দল হিসাবে থাকবেন। আর পরদিন সকালে সার্জেণ্ট গ্রীনউড, শেরপা কিন্ চক্ ৎশেরিং আর আমি চূড়ার দিকে যাত্রা করব। সৌভাগ্য আমাদের পরিত্যাগ করল না। আবহাওয়া তেমনি চমৎকার রয়ে গেল। পাহাড় বেয়ে উঠতেও আমাদের খুব কষ্ট বোধ হচ্ছিল না। অকস্মাৎ, কয়েক ঘণ্টা পাহাড় চড়ার পর, আমরা গিরিশিরার উপরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সেখানেই থেমে পড়লাম। কারণ আর উপরে উঠবার কোন দরকার ছিল না। জায়গাও ছিল না। আমরা এ ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম। বান্দরপুঞ্ছের চূড়ার উপরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ২০,৭২০ ফুট উপরে। এতদিন পরে, শেষ পর্যন্ত বাঁদরের লেজটি পাকড়াতে পারলাম।

আমরা নেমে শিবিরে এসে দেখি গিবসন্ সাহেব গুরুদয়াল সিংকে 'বেস্ ক্যাম্পে' নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আবার উপরে উঠে চলে এসেছেন। সেই রাত্রে আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি আনন্দে উৎসবে ভরে উঠলো। গিবসন সাহেব যে স্বপ্ন এতদিন ধরে দেখে এসেছেন, নিজে একবার বান্দরপুঞ্ছের চূড়ায় উঠবেন, সে স্বপ্ন সফল করার আশা তখনও তিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন। আর তাই, পরের দিন, তিনি জেনারেল উইলিয়ামস্ আর দুজন শেরপা নিয়ে চূড়ার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু যে আবহাওয়া এ ক'দিন ধরে প্রসন্ন হাসি অকাতরে বিলিয়ে দিতে লেগেছিল, সে হঠাৎ বেঁকে বসল। বাতাসের বেগ বেড়ে উঠলো, তুষারের ঘন বৃষ্টি চেপে এলো। আর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ওঁরা সবাই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। পরদিন সকালে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে এল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, এবার ঘাটতি পড়লো আমাদের খাদ্যে। খাবার দাবার যা এনেছিলাম তা প্রায় খতম হয়ে এসেছে। তাই আমাদের সবাইকে নেমে যেতে হল। গিবসন সাহেবের মনোকষ্টের আর শেষ নেই। অনেকদিন ধরে তিনি পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করছেন। এর জন্যে যে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবুও নাগালের মধ্যে এসেও তাঁর স্বপ্ন সফল হলো না। কিন্তু কি আশ্চর্য লোক এই সাহেব। এর জন্য তিনি কোন অভিযোগ করেননি। তাঁর এক সংগী বিপদে পড়েছে, সাহেবের মনে হয়েছিল, তিনিই পারেন তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। আর তাই নিশ্চিত সাফল্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাহেব তার বিপন্ন সংগীকে নিরাপদ করলেন। এই হচ্ছে পাহাড়ী-তরিকা। এ কাজ হচ্ছে পাহাড় চড়িয়েদের কাজ। এ স্বার্থত্যাগ করা একমাত্র পর্বতারোহীদেরই কাজ। সাহেব অদ্ভুত লোক। অদ্ভুত ভালো। তাঁর সংগে যে পাহাড় চড়তে পেরেছি সেজন্য আমি গর্বিত।

নেপালে কুরকীর অভাব নেই

বান্দরপুঞ্ছ থেকে ফেরবার পথে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল যা শীঘ্র ভুলবার নয়। একদিন আমরা দুতিতাল বলে এক হ্রদের তীরে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। খুব পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম তাই রোদ্দুরের মধ্যে মাথাটা টুপি দিয়ে ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে, আধোজাগন্ত অবস্থায় আমার কেমন যেন মনে হোল যে, আমার টুপিটা আগের থেকে অনেক বেশি ভারী লাগছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য আমার হাতটি ধীরে ধীরে টুপির উপর রাখলাম। কিন্তু হাত টুপিতে ঠেকল না, ঠেকলো এক ঠাণ্ডা, পিছল পিছল কিসের গায়ে। একটা সাপ! আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর সেটা আমার টুপির উপর উঠে তারপর টুপিটাকে বেশ করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রোদ পোহাতে আরামে ঢুলতে থাকে। ঘুম আমার মাথায় উঠে গেল। আমি চীৎকার করে সাপ সমেত টুপিটা যতদূরে পারলাম ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। অন্যান্য শেরপারা ঘুমোচ্ছিল। তারাও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তারপর ব্যাপারটা তারা যখন বুঝলো তখন সাপটাকে ধরে মেরে ফেললো। গাড়োয়ালী কুলিরা ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। তারা মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো, কাজটা বড় ভুল হয়ে গেল। তারা বললে, সাপ যখন নিজের থেকে কোন লোকের কাছে আসে তখন সে তার মঙ্গল বয়ে আনে। তাদের বিশ্বাস, মানুষের মাথায় সাপ উঠলে সে রাজা হয়।

কিন্তু আমি মনে করি, একটা সাধারণ লোক হিসাবে থাকাই আমার ভাল। আমার টুপিতে বাঁধবার মত একটা ফিতে জোগাতে পারলেই আমার যথেষ্ট। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

আজকাল বহুবিধ উন্নত স্তরের উড়ো জাহাজ দেখা যায়। বর্তমানের নবতম উড়োজাহাজটি বিশেষ আশ্চর্যজনক। পাইলট অর্থাৎ উড়োজাহাজ চালক মাটিতে বসেই জাহাজটি চালনা করতে পারেন। নতুন ধরনের হেলিকপটার বার হয়েছে সেটিকে চালক মাটিতে বসে রেডিওর সাহায্যে চালাতে পারবে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-মূলকভাবে যতদূর অগ্রসর হওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, সামনে, পিছনে ও পাশে চালনা করা ছাড়াও হেলিকপটারটিকে মাটি থেকে ওঠান ও নামানর ব্যবস্থাও রেডিওর সাহায্যে করতে পারা যাচ্ছে।
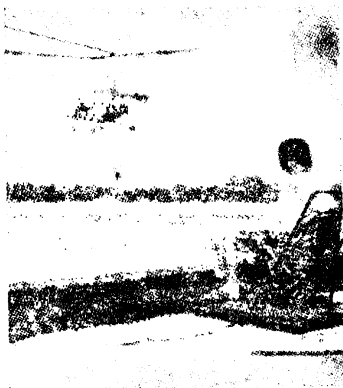
চালকবিহীন হেলিকপটার

পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থানুযায়ী যদিও কৃতকার্য হওয়া গেছে তবুও এখনও পর্যন্ত হেলিকপটারটি ওড়ার সময় একজন পাইলট রাখা হচ্ছে। যদি কোনও কারণে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হেলিকপটারটি পড়ে যাবার উপক্রম হয় তাহলে পাইলট সেটিকে নিজ আয়ত্বে এনে সুব্যবস্থা করতে পারেন।

•

শ বলেন—"খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল" কিন্তু খোকাও ঘুমোয় না পাড়াও জুড়োয় না। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসীর আহ্বান, জুজু-বুড়ির ভয় কিছুই খোকার ঘুমের সহায়তা করে না। ডাঃ মরিস উইটকিন শিশুদের এই অনিদ্রা রোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে দেখেছেন যে, নানা কারণে শিশু সহজে ঘুমাতে চায় না। হয় দাঁত ওঠার জন্য শিশু অসুস্থ থাকে, না হয়তো অত্যধিক আলো অথবা অন্ধকারের ভয় শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। কখনও বা বিছানা যদি ঠান্ডা বা শক্ত হয়, কিংবা গায়ের ঢাকাটা পুরোপুরি না দেওয়ার জন্য, অথবা খুব আঁট সাঁট জামা পরানর জন্য ছেলে ঘুমাতে চায় না। এক্ষেত্রে পিতামাতার এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। তবে ছেলের সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক নয় কারণ শিশু যদি একবার বুঝতে পারে যে, তার অনিদ্রা রোগটি সম্বন্ধে বাড়ির লোকে বিশেষত্ব আরোপ করছে তাহলে শিশুর রোগ বেড়েই চলবে। শিশুর অজ্ঞাতে ঐ সমস্ত অসুবিধাগুলি ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। তাছাড়া সবসময় জোর করে ছেলেকে ঘুম পাড়ানর পদ্ধতি ডাঃ উইটকিন সমর্থন করেন না। কেননা তিনি বলেন সাধারণ ঘড়ির সংগেই যে শিশুদের মনের ঘড়ি সমতা রেখে চলবে তার কোনও মানে নেই। শিশুদের মধ্যে যারা বারমাস অনিদ্রা রোগ ভোগ করে তাদের সম্বন্ধে ডাঃ উইটকিন বলেন যে, হয় তাদের পিতামাতা তাদের প্রতি অতিরিক্ত 'আহা, আহা' ভাব নিয়ে চলেন, না হয়তো মা অতিরিক্ত ক্লান্তিজনিত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ায় শিশু বেশী অব-হেলিত হয়। সেই কারণে মা যদি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সংগে দৃঢ়ভাবে ঘুমানর আদেশ দিতে পারেন তবেই উপকার পাওয়া যায়।

•

আমরা ইতিহাসের পাতায় প্রস্তর যুগ, তারপরে তাম্র যুগ এবং তারপরে লৌহ-যুগের উল্লেখ পাই। কিন্তু এইসব প্রধান প্রধান ধাতু ছাড়াও পৃথিবীতে যে আরও কত রকমের খনিজ পদার্থ আছে ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। এইসব খনিজ পদার্থের প্রয়োজনও নিতান্ত তুচ্ছ নয় এবং এ সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর রাখা ভাল। টিটানিয়ম ধাতুটির ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে জেট ইঞ্জিন তৈরীর পর থেকেই জানা গেছে। সোনা পিটিয়ে কত পাতলা পাতে পরিণত করা যায় সে ধারণা নেই আমাদের। সোনার পাত এত পাতলা করা যায় যে, হাত দিয়ে ছুঁলেই গুঁড়িয়ে যাবে। ইস্পাত তৈরী করতে গেলেই ম্যাঙ্গানিজ লাগে এবং এক টন ইস্পাত তৈরী করতে ১৪ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানিজ লাগে। আর এই ম্যাঙ্গানিজ রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয়। টিনজাত খাবার যে কৌটায় রাখা হয় সেই কৌটাগুলির ভেতরে ইস্পাতের কলাই করা থাকে। শিশুদের গায়ে মাখানর জন্য যে পাউডার ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা ধাতু লিথিয়ম এবং সেটি এক বালতি জলে ফেলে ভাসিয়ে রাখা যায়। আণবিক শক্তির জন্য মানুষ যে, তেজষ্ক্রিয় ধাতুর সন্ধান করে সেটির নাম ইউরেনিয়ম। কানাডা থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দস্তা সমগ্র পৃথিবীতে সরবরাহ করা হয়। এনথ্রা-সাইট কয়লা একরকম খনিজ জ্বালানি, এটি পেনসিলভেনিয়ার মাত্র কয়েকশত বর্গমাইল স্থানের মধ্যেই পাওয়া যায়। যে স্টেনলেস স্টীলের বাসন ব্যবহার করা আজকাল ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই স্টেনলেস স্টীল তৈরী করতে হলে ইস্পাতের সংগে ক্রোমিয়াম এবং দস্তা মিশাতে হয়। সোনা ও প্লাটিনামের অপর নাম 'মহাধাতু'।

চিত্রগ্রীব

ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ড্রাফটসম্যানশিপ-এর 'কয়েকজন' ছাত্র মিলে তাঁদের কলেজ ভবনে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন গত সপ্তাহে। এই ছাত্রগোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছে 'শিল্পী পরিষদ'। এ'রা সব সমেত ১৮৭টি ছবি এবং মূর্তি সাজিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল তেল রঙের কাজ, জল রঙের কাজ, প্যাস্টেল-এর কাজ, টেম্পারার কাজ, উড কাট, পেন অ্যান্ড ইংক স্কেচ এবং টেরাকোটা।

এ'দের চিত্রধারা মোটামুটি প্রথাগত। অর্থাৎ মাস্টার মশাইরা যেভাবে এ'দের শিক্ষাদান করেছেন, সেই সব নিয়মকানুন মেনেই এ'রা ছবি এ'কেছেন; সুতরাং শিল্পীদের ব্যক্তিমনের পরিচয় খুব কমই মিলল। একের সঙ্গে অন্যের রচনার তফাত বোঝা যায় টানটোনে, বর্ণপ্রলেপনে, ড্রইং-এ এবং রচনায় মুন্সিয়ানার তারতম্য বিচার করে। কেউ বা বেশ পটু আবার কেউ বা কাঁচা। মাস্টার মশাইদের কথা অকাট্যভাবে মেনে চলার ফলে এ'দের রচনা হয়ত নির্ভুল হয়েছে, কিন্তু শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা এই দুই দেখার ফলে শিল্প রচনা যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, সে পরিপূর্ণতা নেই এ'দের ছবিতে। শিল্পী যদি স্বকীয় ভাবপ্রবণতা এবং অনুভূতি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে না পারেন, তাহলে সে ছবি রসোত্তীর্ণ হয় না। কল্পনাশূন্য মানসিক অবস্থায় কেবল চোখে দেখা রূপটির পুনরাবৃত্তি করলে আর্টের বিচারে তা উত্তীর্ণ হবে না। কোনও বিশেষ জিনিস দেখে শিল্পীর মনের মধ্যে যে ভাব জেগেছে সে ভাব দর্শকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে তবেই হবে সে রচনা সার্থক। কবি বুদ্ধদেব বসু বর্ষার দিনের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

> সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
> আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন;
> আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
> শোধ ক'রে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।
> রিম ঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
> ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
> পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই;
> স্তম্ভিত কাল মেঘ-মায়ালোকে লীন।

এখানে কবি তাঁর অনুভূতি পরিষ্কারভাবে পাঠকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। বাণীর মাধ্যমে কবির মনের কথা এবং কল্পনা অন্যের মনের মধ্যে প্রবেশ করানো অবশ্যই কিছুটা সোজা; কিন্তু হাজার কঠিন হলেও চিত্রীকে এ কাজ করতে হবে রঙীন আকৃতির মাধ্যমে। সুতরাং দেখা রূপের প্রকারটুকু ধরে তাকে রূপ দিতে হবে নিজের মনের মতন করে, যা থেকে শিল্পীর ব্যক্তি-মনকে চেনা যাবে। তবে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, অনেক বড় বড় শিল্পী আর্ষ প্রয়োগ বেমালুম নিজের রচনায় চালিয়ে দিয়ে দাবী করেন সেটা তাঁর স্বকীয় মনের অভিব্যক্তি বলে। কবিদের মধ্যেও এ রেওয়াজ আছে। এ জাতের রচনাকে অবশ্যই সমর্থন করা যায় না। ১৯৩০ সালে যখন ভীষণ-ভাবে গৃহযুদ্ধ বেধেছে স্পেন-এ সেই সময় পিকাশো রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ছবি 'গুয়েরনিকা'। গুয়েরনিকা স্পেনের একটি ছোট শহরের নাম। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় এই গুয়েরনিকা শহরে অমানুষিক-ভাবে বোমা ফেলা হয়। হাজারে হাজারে নিরীহ শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ প্রভৃতি এখানে মারা যায়। অনেক শিল্পীই যুদ্ধের ছবি এ'কেছেন এবং আঁকেন কিন্তু দেখতে পাই তাঁরা যুদ্ধের দেখা রূপটাই ফুটিয়ে তোলেন। যুদ্ধের বীভৎস রূপ দেখে শিল্পী মনের মধ্যে কেমন বোধ করেছিলেন তা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন পিকাশো এই 'গুয়েরনিকা' ছবিতে। বোমা পড়ার সময়

কম্পোজিসান —সমীরচন্দ্র বসু

ময়লা কাগজ —অমিতাভ সেন

গুয়েরনিকা শহরের বা তার কোনও অংশের কোন সাদৃশ্য অবশ্যই এ ছবিতে নেই। গুয়েরনিকার ওপর যে তান্ডবলীলা চলেছিল সে সময় তা দেখে পিকাশোর মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা তোলপাড় করেছিল 'গুয়েরনিকা' ছবি কেবল সেই অনুভূতিরই প্রকাশ। কেউ যদি এ ছবি থেকে কিছু নকল করে নিজের রচনায় প্রয়োগ করেন তিনি ঠকবেন। সে রচনার কোনও উদ্দেশ্যও থাকবে না, অর্থও থাকবে না। যাই হোক, 'শিল্পী পরিষদের' শিল্পীরা এখনও সকলেই ছাত্র, সুতরাং পরিপূর্ণ শিল্পরচনা এ'দের কাছ থেকে এখনও আশা করা যায় না। তবে এ প্রদর্শনীতে পরিপূর্ণ শিল্পরচনা দেখতে পেলে সত্যিই খুশি হতাম।

'শিল্পী পরিষদের' শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই বেশ সুদক্ষ শিল্পকর্মী, সুতরাং যদি এ'রা কল্পনাশূন্য মানসিক অবস্থায় না রচনা ক'রে ভবিষ্যতে তাঁদের ছবির মধ্যে কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে আপন অনুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন তাহ'লে আশা করা যায়, সত্যিকার পরিপূর্ণ শিল্পরচনা এ'রা সৃষ্টি করতে পারবেন। এ'দের ওপর আস্থা রাখা যায়।
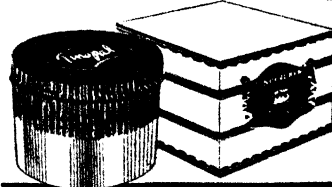
মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প

-- **কমল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সো**ভিয়েট প্রধানমন্ত্রী** বুলগানিন আর সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভকে কলকাতার নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার পর মানপত্রগুলো যে হাতির দাঁতের তৈরি সুদৃশ্য আধারে দেওয়া হয়, সেই শিল্প-

নবাবী আমলের গরুর গাড়ি

কার্যের প্রধান শিল্পী ছিলেন মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্ত শিল্পীদের মধ্যে প্রবীণতম শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভাস্কর। এই সুদৃশ্য গজদন্তের গোলাকার আধার আর তার উপরের সুদীর্ঘ ময়ূরপঙ্খী নৌকাখানি মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। ছজন দক্ষ কারিগরের সাহায্যে প্রবীণ শিল্পী দুর্লভচন্দ্র কত কম সময়ের মধ্যে এই শিল্পকার্য সম্পন্ন করেন, তাঁর কারখানায় আমরা তা দেখেছি। মুর্শিদাবাদের এই বিশ্বখ্যাত শিল্প বর্তমানে যে কয়েকটি ভাস্কর পরিবার রক্ষা করে চলেছেন, সপুত্র শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভাস্কর তাঁদের মধ্যে এখন সর্বাগ্রগণ্য। একই আকারের গজদন্ত আধার দুটি নির্মাণে মোট সাড়ে আঠার সের হাতির দাঁত নেওয়া হয়। তারপর সেই দাঁতকে কেটে কুঁদে ময়ূরপঙ্খী এবং নীচের গোল হাতির দাঁতের চোঙাটি যখন তৈরি হয়ে যায়, তখন সে দুটোর ওজন ছিল মাত্র সওয়া দু সের। মাত্র হাতের সাহায্যে ছজন গজদন্ত শিল্পী সাত দিনের মধ্যে এই অনবদ্য শিল্পকার্য করে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তেমনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা। ১৮৫২ সালে প্রফেসর রয়েল ভারতের শিল্পকার্য সম্বন্ধে বিলাতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন তিনি লন্ডন একজিবিশনে প্রেরিত গজদন্ত শিল্প সম্বন্ধেও বলেছিলেন। ভারতের নানা জায়গা থেকে হাতির দাঁতের কাজ প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়েছিল। প্রফেসর রয়েল বলেছেন, "এদের মধ্যে বহরমপুরের গজদন্ত শিল্পীরা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের কাজ করার একটি ছোট মডেল পাঠিয়েছেন। আর এই কাজ ভারতের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মাত্র কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি।" বহরমপুরের গজদন্ত শিল্পীদের তখনই লন্ডনে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গজদন্ত শিল্পী বলে স্বীকার করা হয়। ১৮৮৮ সালে লন্ডন একজিবিশনেও মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গজদন্ত শিল্পীর সম্মান দেওয়া হয়েছিল। কারণ খাঁটি ভারতীয় আর্টের বৈশিষ্ট্যের ছাপ তাঁদের কাজে পরিস্ফুট ছিল। তারপর ১৯২৪ সালের ওয়েম্বলী একজিবিশনেও মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প আরও খ্যাতি অর্জন করে। এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভাস্করও পদক পেয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প নবাবী আমল থেকে চলে আসছে। সুবে বাংলা-বিহারের নবাবেরা ছিলেন এই শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কে প্রথমে গজদন্ত শিল্প মুর্শিদাবাদে চালু করেন, তা কোথাও পাইনি। তবে এক গল্প আছে যে, তৎকালীন নবাব-নাজিম কানে কাঠি দিতে চাইলে, তাঁকে তখনকার মত কাঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলা-বিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা মাত্র কাঠিই কানে দিলে মর্যাদার হানি হয়, সুতরাং হাতির দাঁতের কারিগর আনা হলো দিল্লী থেকে। দিল্লীতে বহুকাল থেকেই হাতির দাঁতের কাজ হতো। দিল্লীর সেই কারিগর ঘরের দরজা লাগিয়ে কাজ করতেন, আর এক বাঙালী ভাস্করের ছেলে দরজার ফাঁক দিয়ে তাঁর কাজ লুকিয়ে দেখত। এই ভাস্করের নাম তুলসী খাটুম্বা। ইনি হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের ভাস্করদের পরম গুরু, যাঁর নাম নিলেও গজদন্ত শিল্পীরা মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। তুলসী খাটুম্বা কাজ শিখলেন তাঁর বাবার কাছে। আর শেষে বাবার চেয়েও ভাল কারিগর হয়ে উঠলেন। নবাব তাঁকে বেতনভোগী কর্মচারী করে নিয়েছিলেন।
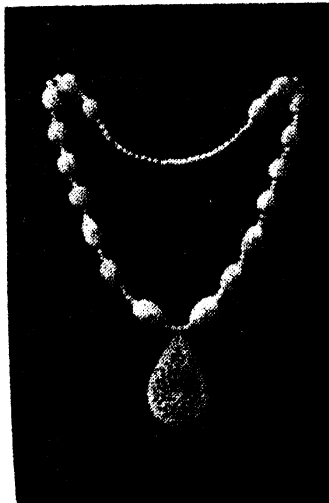
শোনা যায়, একবার তুলসী তীর্থে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নবাব তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজী না হয়ে তুলসীর বাড়িতে পাহারা বসালেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ তুলসী পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন কাশী-গয়া-বৃন্দাবনে। তারপর সতের বছর বাদে মুর্শিদাবাদে ফিরতেই নিজামতে ডাক পড়লো। নবাব তাঁকে আদেশ দিলেন, তাঁর মৃত পিতার হাতির দাঁতে একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করতে। দীর্ঘদিন না দেখলেও তুলসী খাটুম্বা পরলোকগত নবাবের একটি মূর্তি হুবহু তৈরী করে দিলেন। নবাব তাজ্জব বনে যান। তিনি তুলসীর প্রাপ্য সতের বৎসরের বেতন তো দিলেনই, উপরন্তু তাঁকে শহরের মধ্যে মহাজনটুলীতে একখানি বাড়ি দান করলেন। গল্প সত্য হোক্ চাই না হোক্, মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প সূত্রধর জাতীয় ভাস্করদের হাতেই থেকে গেছে। মহাজনটুলী মর্শিদাবাদ শহরের এক অংশের নাম। কিন্তু মহাজনটুলীর কোন্ জায়গায় খ্যাতনামা গজদন্ত-শিল্পী তুলসী খাটুম্বা থাকতেন, তা কেউ বলতে পারে না। সেকালে মুর্শিদাবাদে বাংলার নবাব নাজিম ছাড়াও বহু রাজা-মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার থাকতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদের গজদন্ত-শিল্পীরা প্রতিপালিত হতেন। তারপর নবাব-নাজিমদের নাজিমী গেল, সেই থেকে গজদন্ত শিল্পীদের ব্যবসাতেও ভাটা পড়লো।

হাতির দাঁতের নেকলেস

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গজদন্তশিল্পীরা সূক্ষ্ম কাজ প্রায় বন্ধ করে দিলেন। তখন কাশীমবাজার ও বহরমপুরে বহু ইউরোপীয়ান বাস করতেন, তাঁরা হাতির দাঁতের কাজ পছন্দ করতেন। ১৮১১ সালে যখন কাশীমবাজারের ক্রমে অবনতি হচ্ছে, তখনও রেশমের মত অতুলনীয় গজদন্তশিল্পের খ্যাতিও ছিল, বাজারও ছিল। ভাল শিল্প-কাজ পড়ে থাকতো না, বিক্রয় হয়ে যেতো। গজদন্ত-শিল্পের বাজার তখন মাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নয়, জেলার বাহিরেও ছিল। এককালে বহরমপুরে সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে বৃহত্তম ক্যান্টনমেণ্ট ছিল, তখন হাতির দাঁতের শিল্পকাজ বহরমপুরে কাটতো। সত্যি কথা বলতে কি, মুর্শিদাবাদ ও কাশীমবাজার বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর, মাত্র রেলপথ খুলেছিল বলে গজদন্ত-শিল্প যা হোক টি'কে আছে। একেবারে ধুয়ে-মুছে যায়নি। তখন থেকে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের হাতির দাঁতের কাজ যাচ্ছে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে। ইংরেজ সরকার মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদের গজদন্ত-শিল্পের বিবিধ নমুনা খরিদ করে ইউরোপের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাতেন। ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে সে ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদী গজদন্ত-শিল্পের কিছু কিছু নমুনা এখনও নবাববাড়ি ও কাশিমবাজার রাজবাড়িতে আছে।

শোনা যায়, হাজারদুয়ারীর স্থাপয়িতা নবাব নাজিম হুমায়ুন জা সাগর মিস্ত্রী নামে তৎকালীন এক প্রখ্যাত গজদন্ত-শিল্পীকে দিয়ে নবাববাড়ির একটি ছোট প্রতিকৃতি তৈরী করিয়ে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মকে উপহার পাঠান। তার শতাধিক বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদী গজদন্ত শিল্পের দুইটি নমুনা রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান নেতাকে উপহার দিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জে এখন ১০।১২ ঘর গজদন্ত শিল্পী বাস করে। অথচ উনিশ শতকের শেষভাগে মুর্শিদাবাদ শহরের কাছাকাছি, মাথরা, দৌলত বাজার ও রণসাগর গ্রামেই পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করতো। তাদের বেশীর ভাগই ম্যালেরিয়ার কবলে প্রাণ হারায়, যারা কোনওক্রমে বে'চে যায়, তারাও গ্রাম ছেড়ে বালুচড় বা বহরমপুরে পালিয়ে আসে। মুর্শিদাবাদী গজদন্ত শিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা বর্তমানে খাগড়া-বহরমপুরেই বাস করছে। পরলোকগত নীলমণি ভাস্কর, গিরিশচন্দ্র ভাস্কর ও হরেকৃষ্ণ ভাস্করের পর শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভাস্কর, শ্রীহরিপদ ভাস্কর প্রমুখ কয়েকজন প্রধান। রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে যে ময়ূরপংখী নৌকা উপহার দেওয়া হয়েছে সেই ময়ূরপংখী তৈরী
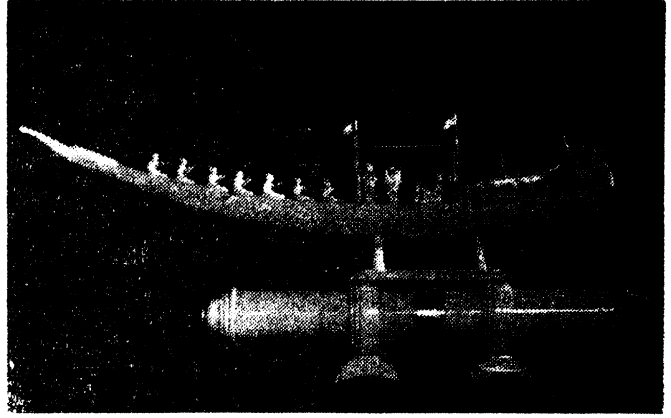
এই গজদন্ত আধারে রুশ-নেতাদের কলকাতায় মানপত্র দেওয়া হয়

হয় শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভাস্করের তত্ত্বাবধানে এবং আরও ছ'জন কারিগরের সাহায্যে। সেই কারিগরদের মধ্যে ছিলেন খাগড়ার শ্রীসুশীল ভাস্কর, শ্রীভক্তিভূষণ ভাস্কর, শ্রীননীভূষণ ভাস্কর ও শ্রীখোকা ভাস্কর এবং জিয়াগঞ্জের শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভাস্কর ও শ্রীমনিমোহন ভাস্কর।

হাওদাসমেত অম্বরী হাতি

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গজদন্ত শিল্পালয়ে বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি ছাড়া প্রাচীন দেবমন্দির, তাজমহল, হাওদা সমেত হাতী, ময়ূরপংখী নৌকা, বিশেষ ধরনের গরুর গাড়ি বা ফরমাইশ মত অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পকার্য ছাড়া তৈরী হয় বহুবিধ অলংকার, পাউডার কেস, চিরুণী, চেন-লকেট, কাগজ কাটা ছুরি, ছাতার বাঁট, লাঠি, স্টেথিসকোপের মুখ প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশীদের চাহিদা মত ম্যাডোনা, যীশুখৃষ্ট, ক্রুশ, মালা প্রভৃতিও মুর্শিদাবাদের কারিগর তৈরী করতো। মোটের উপর নমুনা বা নক্সা দিলে এখানকার গজদন্ত শিল্পীরা যে কোনো শিল্পকার্য করতে পারে। চীন ও জাপানী গজদন্ত শিল্পীদের একটি কারিগরি দেখা যায়, শুক্তির মত দুটো ঝিনুকের স্বল্প ফাঁকের মধ্যে নানাবিধ মূর্তি। তাদের দেখা-দেখি মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পীরাও তৈরী করেছেন ঝিনুকের মধ্যে কর্ণার্জুনের রথ, বা মহাভারতীয় অন্যান্য দৃশ্যের ছবি। এক টুকরো হাতির দাঁত কেটে কুঁদে এই অপূর্ব শিল্পকার্য করা হয়েছে।

প্রায় ৭০।৮০টি যন্ত্রের সাহায্যে গজদন্ত শিল্পীরা কাজ করেন। জোড়া দিয়ে কাজ করা তাঁদের পছন্দ নয়। বরং তারা ছোট ছোট প্রতিমূর্তি গড়বেন, তবু হাতির দাঁত জোড়া দিতে তাঁরা নারাজ। তবে বায়না পেলে সব রকম কাজই তাদের করতে হয়। নানা যন্ত্রের সাহায্যে গজদন্ত শিল্পীরা

এখনও কাজ করে থাকেন। তবে দেখেছি তাঁরা অনেক সময় পালিশ করার জন্যে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা নিয়ে থাকেন, তেমনি কয়েকটা আধুনিক যন্ত্রপাতিও তাঁরা ব্যবহার করেন।

পঞ্চাশ বছর আগে মুর্শিদাবাদের সিভিল সার্জেন মেজর ওয়ালশ্ হাতির দাঁতের কারখানা দেখে লিখেছিলেন যে, জিয়াগঞ্জ এনাতুলীবাগের নীলমণি ভাস্করের কারখানায় তিনি ষোল জন কারিগরকে কাজ করতে দেখেছিলেন। মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পীদের গুরু তুলসী মিস্ত্রী ছিলেন নীলমণি ভাস্করের পূর্বপুরুষ। ১৮৬০ সালেও মুর্শিদাবাদ শহরে এবং তার আশে পাশে অনেক ঘর গজদন্ত শিল্পী ছিলেন। তারপর মুর্শিদাবাদ শহরের অধঃপতনের সংগে সংগে এই শিল্পের অধোগতিও আরম্ভ হলো। মুর্শিদাবাদের পয়সা কমলো, হাতির দাঁতের কাজের খরিদদারও কমলো। তার উপর হাতীর দাঁতের দর বেড়ে গেলো,

পাউডার কেস

ভাস্করদের কারখানাও উঠতে লাগলো। সরকার থেকে কোনো সাহায্য গজদন্ত শিল্পীরা তখন পায়নি। মুর্শিদাবাদ থেকে গজদন্ত শিল্পীরা রোজগারের চেষ্টায় সুদূর দিল্লী, বোম্বাই, চলে যেতে বাধ্য হলো। তারপর গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হাতির দাঁতের কাজের না ছিল সমাদর, না ছিল গজদন্ত শিল্পীদের শিল্প নিয়ে বেঁচে থাকার উপায়। এখনও বহরমপুর জিয়াগঞ্জে যে কয়েক ঘর গজদন্ত শিল্পী আছেন, তাদের মাল কাটাতে ছুটতে হয় কলকাতায় বা দিল্লীতে। স্থানীয় বাজার বলতে কিছু নেই। তবে সরকারী সাহায্য পেলে মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প এখনও টিঁকে থাকতে পারে এবং সে সাহায্যের প্রধান উপায় হচ্ছে হাতির দাঁতের শিল্পকার্যের জন্য বিদেশে বাজার করে দেওয়া।

মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পীরা ভারতীয় বা ব্রহ্মদেশের হাতির দাঁত বেশী পছন্দ করেন। কারণ অন্যান্য দেশের হাতীর দাঁতের তুলনায় আসাম বা ব্রহ্মের হাতির দাঁতে বাটালী চালানো সুবিধে। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁদের শক্ত আফ্রিকার হাতির দাঁতই কিনতে হয় এবং অনেক হাতফের হয়ে আসে বলে আফ্রিকান হাতির দাঁতের দর বেশি পড়ে। সরকারী শিল্প বিভাগ থেকে গজদন্ত শিল্পীদের সুবিধে দরে হাতির দাঁত সরবরাহের ব্যবস্থা হলে সব দিক থেকেই সুবিধে হয়। তৈরী মালের পড়তা কম পড়ে এবং শখের জিনিস হলেও দাম সস্তা হলে সাধারণ লোকের কাছে গজদন্ত শিল্পের আদর হয়। এখন দামের জন্যে সাধারণ লোকে ইচ্ছে থাকলেও একটা হাতির দাঁতের ভাল কাজ কিনতে পারে না। মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প যে আজ চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে, তার অন্যতম কারণ সরকারী শিল্প বিভাগের এই বিখ্যাত শিল্পের প্রতি অনাদর।

হাতির দাঁতের বিভিন্ন ভাগের এক একটা নাম ভাস্করেরা দিয়েছেন। সামনের শক্ত সুচল ভাগকে বলা হয় দাঁশ দাঁত, মাঝের অংশকে বলা হয় খোদিন দাঁত (হিন্দীতে চাট্টা) এবং শেষের মোটা ফাঁপা দিককে বলে গড়ের দাঁত। মাঝের অংশই তিনভাগের মধ্যে মূল্যবান। বর্তমানে ৪০৲।৪৫৲ সের দরে এই দাঁত বিক্রয় হয়। হাতির দাঁতের কোনও অংশই ফেলা যায় না। গুঁড়ো পর্যন্ত আয়ুর্বেদোক্ত তেল তৈরীর জন্যে কবিরাজেরা নিয়ে থাকেন। ভাস্করেরা সব দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করলেও এক সময় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি তৈরী করতেন না। এখন আর সে নিয়ম ততো মানা হয় না। মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প বাংলার তথা ভারতের ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা। এই শিল্প এখন লোপ পেতে বসেছে। এই গজদন্ত শিল্পকে বাঁচাতে হলে, শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই কাঁচা মাল সস্তা দরে সরবরাহের ব্যবস্থা এবং তৈরী মালের জন্যে বিদেশে বাজার। নতুবা নবাবী আমলের এই বিখ্যাত শিল্প একদিন মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একেবারে লোপ পাবে।

—শৌভিক—

"মহাকবি গিরিশচন্দ্র" (উপন্যাস)

জীবনী নিয়ে ছবি তোলা এই প্রথম নয়, এবং যতবারই হয়েছে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ক্যামেরার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে জীবনীকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করে হাজির করা হয়েছে, আর তার জন্যে প্রতিবারই চিত্রনির্মাতারা অসত্য পরিবেশনের দায়ে সাধারণের দরবারে সোপর্দ হয়েছেন। অদ্ভুত সব কৈফিয়ৎ চিত্রনির্মাতারা পেশ করেন। তাদের ধারণা, যা সত্যি ও যা বাস্তব ঠিক তারই রূপায়ন হলে তা নাকি লোকে নেয় না। এ যে কি যুক্তি তা বুঝে উঠতে বুদ্ধিতে কুলনো ভার। আসলে হচ্ছে নতুন সামগ্রী ব্যবহারে কিছুটা আতংক, কিছু আশংকা ও দ্বিধা, কিছু অপারগতা ও অসামর্থ্য, আর হয়তো কিছু সংকোচও। উপন্যাসের চিত্ররূপায়নে যে রকমের সব সামগ্রী তাঁরা ব্যবহার করেন, যা তাদের হাতেই রয়েছে, জীবনীর রূপায়নে তারা সেইসব সামগ্রীই চালিয়েই শুধু দেন না, সেইসব সামগ্রীরই যাতে ব্যবহার করা যেতে পারে সেই মতো করেই তারা জীবনীকেই সাজিয়ে নেন। তাই দেখা গেল, এমকেজী প্রডাকসন্স গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে কল্পনা করেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই জীবনের একাংশ। তার কারণ, রামকৃষ্ণের জীবনীর যে এখন বেশ কাটতি রয়েছে তা অনেক কখানি ছবিতেই প্রমাণিত হয়েছে, আর রামকৃষ্ণকে নিয়ে ছবি তোলাও এখন সড়গড় হয়েছে বেশ। একরকম তৈরীই জিনিস আর তার বাজারও মজুদ। ছবির চিত্রনাট্যে গিরিশচন্দ্রের জীবনীর বাইরে যে চলে যাওয়া হয়েছে সে দোষারোপ যদিও বা পারো না যাচে, তবে জীবনীটি এমনভাবে সাজিয়ে নিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে যে, যে গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করা হলেও তার নাম করতেই যে মহান্ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এটাই হচ্ছে ইতিহাস থেকে বিচ্যুতি। ইতিহাসের যে চরিত্র, ইতিহাসে তাকে যেমনভাবে পাওয়া যায় অবিকল তেমনভাবেই যদি হাজির করে না দেওয়া হয়, তাহলে জনসাধারণকে প্রকৃত জিনিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত করার দায়ে পড়তে হয়। আর গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তো উপন্যাস বানানোর প্রয়োজনই ছিল না, কারণ তার প্রকৃত জীবনটাই নাট্য উপাদানে এতো সমৃদ্ধ। সেই জীবনটাই যথাযথভাবে অনুসরণ করে গেলে কি অপূর্ব ছবিই না সৃষ্টি করে দেওয়া যেতো। তা না করে, নিশ্চিত অর্থাগমের কথাটুকুই শুধু মনে রেখে রামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত যে চরিত্রটি এই "মহাকবি গিরিশচন্দ্র"তে সমাবিষ্ট করা হয়েছে তা গিরিশ প্রতিভার স্তিমিত দিনের ভেবে-নেওয়া কাহিনী বৈ তো নয়।

* * *

কিছুদিন আগে আমেরিকার নট এডুইন বুথের জীবন কাহিনী অবলম্বনে "প্রিন্স অফ প্লেয়ার্স" নামে একখানি ছবি দেখানো হয়। ওটাও উপন্যাসের ঢঙেই সাজিয়ে দেওয়া জীবনী, কিন্তু ওতে বুথের জীবন সংগ্রাম ও তার জীবনের সার্থকতাই পরিস্ফুট করা হয়েছে। এদিক থেকে "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" অনেকটা ব্যর্থই হয়েছে বলতে পারা যায়। বুথের চেয়েও প্রতিভার বহুমুখীতায়, জীবন সংগ্রামে, কর্মকীর্তিতে গিরিশ চরিত্র অনেক বেশী সৌন্দর্য, অনেক বেশী জমকালো। আর ধাপে ধাপে এমনিভাবে গড়ে ওঠা সেই জীবনকে অবিকল তাই-ই রেখে রেখে চিত্র-নাট্য গড়ে নিতে অতোটা ভাবতেও হতোনা, যতোটা ভাবতে হয়েছে সত্যকে উপন্যাসের মতো করে গোছ করে নিয়ে এই ছবিখানির চিত্রনাট্য লিখতে। তবে উপন্যাস বলেই মেনে নিতে যদি মনকে মানিয়ে নিতে পারা যায়, তাহলে অবশ্য "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" একখানি মনোজ্ঞ ছবি দেখার তৃপ্তি পাইয়ে দেয়। অনেক গুণ আছে ছবিখানির, মনকে প্রভাবিত করে রাখার মতো নাট্য-কৃতিত্বও যথেষ্ট। প্রকৃত গিরিশচন্দ্রকে

সম্পূর্ণভাবে না পাওয়া গেলেও পরিচালক মধু বসু ও চিত্রনাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ছবিখানিতে একটি গ্রাহ্য করার মতো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ছবিতে গিরিশচন্দ্রকে পাওয়া যায় একেবারে তৈরি অবস্থাতেই। অর্থাৎ ইংরেজ সওদাগরি অফিসের বুক-কিপার বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে আবহাওয়া ও পরিবেশে মানুষ হয়ে অহরহ বিবিধ প্রকারের সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কালে মহাকবি গিরিশচন্দ্রতে পরিণত হন, সেই কৃতিত্ব ও কীর্তিই অনুপস্থিত। এখানে কাহিনী আরম্ভ যখন গিরিশচন্দ্র অনন্য-সাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এক অভিনেতা হিসেবে নামই করে ফেলেছেন এবং নাটক রচনাতেও হস্তার্পণ করেছেন। যখন গিরিশচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী একটি সন্তান রেখে গতায়ু হয়েছেন, এ তার পরের ঘটনা। বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য দেখে ভুবন-মোহন নিয়োগী, ধর্মদাস সুর প্রমুখ কর্তৃক গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে গ্রাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারের স্থাপনা। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সংযোগ। অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আবিষ্কার। রামকৃষ্ণের থিয়েটার দেখতে আসা। ক্রমেই রামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি। রামকৃষ্ণকে বকলম দেওয়া এবং তাঁর পাদমূলে নিজের সকল পাপ অর্পণ করা। রামকৃষ্ণের মৃত্যু। ভগ্নহৃদয় কিন্তু পুত্রের মুখ চেয়ে এবং শ্রীমার আশীর্বাদ নিয়ে আবার নাটক রচনায় ব্রতী হওয়া। দেশবন্ধু ও বিপিন পালের আগ্রহে দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ। ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং শেষে এক দিন 'বলিদান'এ করুণাময়ের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়া, তারপর মৃত্যু। সবই তৈরি ব্যাপার এবং 'মহাকবি' উপাধিও নামের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া ঐভাবেই, তা নয়তো কিভাবে যে তিনি মহাকবি পদবাচ্য হতে পেরেছিলেন তার কিছুই নেই ছবির এই আখ্যায়িকায়।

* * *

ছবিতে যেমন রামকৃষ্ণের আকর্ষণে ধাপে ধাপে বাঁধা পড়ে যাওয়া এবং এই ব্যাপার নিয়েই গিরিশের মানসিক সংঘাত দেখানো হয়েছে, তেমনি তার আগেকার জীবনটাও ধাপে ধাপে দেখানো উচিত ছিল। কারণ গিরিশচন্দ্র দেশের কাছে রামকৃষ্ণ দেবের এক পরম ভক্তরূপে যতো না পরিচিত, তার চেয়ে বেশী পরিচিত মহা প্রতিভাবান নাট্যকার ও বাঙলা নাট্যশালার জনকরূপে। গিরিশের অভ্যুত্থান সমাজে একটা মস্ত পরিবর্তন আনে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গিরিশের যখন জন্ম তৎকালে প্রমোদ বলতে ছিল যাত্রা, হাফ আখড়াই, তরজা, পাঁচালী আর তার চেয়ে খেলো ধরণের ছিল খেমটা, বাইজী, কবুতর লড়াই ইত্যাদির আমল। গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রচেষ্টা ঐসব প্রমোদের ওপর থেকে একদিকে বাবুদের মনও যেমন ঘুরিয়ে দেয়, তেমনি দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবিশারদ প্রভৃতির মনীষাকেও আকর্ষিত করতে সমর্থ হয়। তখনকার গোঁড়ামীর যুগে থিয়েটার করা এবং বিশেষ করে স্ত্রীলোক নিয়ে থিয়েটার করা ঘেন্নার কথা ছিল। এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের বিতর্কও হয় যার জন্যে বিদ্যাসাগর থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে পিছিয়ে যান। এ ব্যাপারটা ছবিতে এমন নগণ্য পরিচর্যার দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, স্ত্রীলোক নিয়ে থিয়েটার করাটা তৎকালে যে দারুণ একটা প্রতিবন্ধক ছিল, তা মোটে উপলব্ধিই করা যায় না। গিরিশচন্দ্রকে এ প্রতিবন্ধক কাটিয়ে উঠতে বড়ো কম ভুগতে হয়নি। কিন্তু কোথায় সেসব ঘটনা? ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রী প্রবর্তন নিয়ে গিরিশের মনের একদিকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ন্যাশনাল অর্থে জাতীয় নাট্যশালা হবে গর্ব করার মতো, কিন্তু তারা যে-ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তার মধ্যে দীনতা ঢের; তাই ওখানে টিকিট করার তিনি বিরোধী হন। এই বিরোধ এমনি পাকিয়ে ওঠে যে, গিরিশচন্দ্রকে দল পর্যন্ত ছাড়তে হয়।

* * *

তখন যে একে একে কোহিনূর, ক্লাসিক, মিনার্ভা, স্টার প্রমুখ নাট্যালয়গুলি স্থাপিত হয়, তাদের পিছনে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ছিল যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গিরিশের যোগ ছিলই কোন না কোন প্রকারে। গিরিশের জীবনী তথা বাঙলা নাট্যশালার পত্তনের এই ইতিহাসই ছবিখানিতে উহ্য। থিয়েটার খুলে গিরিশকে

সঙ্গে রাখতে শাঁলেদের জিদ এবং তখনকার দিনে বেতন ছাড়া বার্ষিক বিশ হাজার টাকা বোনাস সমেত চুক্তি; এক প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশের সেই টাকা দান এবং ছদ্ম নামে নাটক লিখে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা; তখনকার সওদাগরী অফিসে উন্নতির সম্ভাবনাযুক্ত দেড়শ টাকা মাইনের পাকা চাকরি ছেড়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রতাপ জহুরীর উপরোধে-অনুরোধে একশ টাকার অনিশ্চিত বেতন স্বীকার করে নিয়ে মুমূর্ষু নাট্যালয়কে বাঁচাবার জন্য যোগদান; চালু থিয়েটারের স্বত্বাধিকারত্ব হাতে পেয়েও বিষয়জালে জড়িয়ে পড়লে শিল্পচর্চায় ব্যাঘাতের আশংকায় সহকর্মীদের মধ্যে সেই স্বত্বাধিকারীত্ব ভাগ করে দেওয়া ইত্যাদি উদ্দীপনাময় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই যদি সন্নিবেশিত না থাকে, তো তাকে গিরিশ-চন্দ্রের জীবনী বলে কি করে আখ্যাত করা যায়? গিরিশচন্দ্র শিক্ষালয়ে পড়ে পণ্ডিত নন, নিজের চেষ্টায় নিজে নিজেই দিশী বিদেশী গ্রন্থ পড়ে পণ্ডিত হয়েছিলেন। তার অদ্ভুত দখল ছিল ভাষার ওপরে, যেজন্যে পণ্ডিতজন তাকে বাঙলা ভাষার অভিধান বলে অভিহিত করেছেন। নাটকে ব্যবহার করার জন্য একটা নতুন ছন্দেরই তিনি উদ্ভাবন করেন যা সেই থেকে গৈরিশ-ছন্দ নামে খ্যাত হয়ে আসছে। কিন্তু কোথায় সে পরিচয় এছবিতে? গিরিশচন্দ্র নাটক লেখার আগে থেকেই গান রচনা করেন এবং শত শত গান তিনি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে শ আটেকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অথচ তারই এই জীবনী চিত্রায়নে নতুন করে অপরকে দিয়ে গান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। উপন্যাস করে নিতে হয়েছে বলেই যেমন নতুন সিচুয়েসন সেই সঙ্গে নতুন গানও রচনা করতে হয়েছে। নাটকের অভাব মোচনার্থে তাঁর নিজেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও কম উদ্দীপনাময় অধ্যায় নয়। তাঁর নাটক প্রণয়নের রীতিও ছিল বিচিত্র; মুখে বলে বলে যেতেন আর অপরে তা লিখতো; এক লাইন দ্বিতীয়বার পুনরুক্তি করতেন না। তৎকালে তার ভাব-তন্ময়তা নাটকের মতোই নাটকীয়। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তার বহুবিধ প্রেরণার উপাদান ও উৎস, বহু ব্যক্তি ঘুরে বেড়িয়েছে তার আশেপাশে যাদের তিনি নাটকের চরিত্রে রূপায়িত করে রেখেছেন। ছবির বিন্যাসে এসব নিয়ে চমৎকার পরিবেশ গড়ে তোলা যেতো। এ-টা মস্ত ঘটনা ছিল ১৮৭৬ সালে ড্রামাটিক পারফরমেন্স এক্টের প্রবর্তন দ্বারা নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা, যে আইন এ আমলেও চলে এসেছে। ছবিতে অতি ক্ষীণভাবেই এ ঘটনাটি কেবলমাত্র কথায় বলে দেওয়া হয়েছে। এসবই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। গিরিশচন্দ্র যে ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষ ও মহাকবি কিভাবে হয়েছিলেন, কোন সব ঘটনা ছিল তার মূলে, তার জীবনের সংগ্রামে এই সবই যদি না রইলো তো তার জীবনী হলো কি করে? এটা ঠিক যে গিরিশচন্দ্রের ঘটনাবহুল ও সংঘাতময় জীবনের সব কিছুই একখানি ছবির দৈর্ঘ্যে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়; কিন্তু যেসব ঘটনা তাকে বড়ো করে তৈরি করে দিয়েছে, বা যেসব ঘটনার সঙ্গে তার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে, তার বলতে গেলে কিছুই না রেখেও গিরিশ-জীবনের এই প্রণয়ন সংগত বলে মেনে নেওয়া যায় না।

* * *

'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'তে যে গিরিশ-চন্দ্রকে পাওয়া যায়, তা প্রকৃত গিরিশচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে বিপুল রকমফের ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথায় বলতে হয় তার চরিত্রে ছিল "একাধারে ঔদাস্য ও আমোদ-প্রিয়তা, আলস্য ও উদাম, ধৈর্য ও অস্থিরতা, সাহস ও ভীরুতা, গর্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা, ক্ষিপ্রকারিতা ও দীর্ঘসূত্রতা, বিচারনিষ্ঠা ও হঠকারিতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবপ্রবণতা ও বিষয়বুদ্ধি, সংশয় ও বিশ্বাস, জীবনে মমতা ও বৈরাগ্য, দৈবনির্ভরতা ও পুরুষকার, সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মেলন।" এতো বিপরীতভাবের সমাবেশ ছবির চরিত্রে নেই কারণ তেমন সব ঘটনা জুগিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে কিছু কিছু আছে এবং পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ে ঐ স্বল্পই খানিকটা তবু নাটকীয় ভাবযুক্ত হয়েই ফুটে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, উপন্যাস বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এ গিরিশচন্দ্রও যে একটি অসাধারণ চরিত্র ছিলেন, তা মনে গেঁথে যায় পাহাড়ী সান্যালের অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে। গিরিশচন্দ্রকে অনেক রকমভাবেই পাওয়া না যাওয়ায় গিরিশচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে জানা থেকে বঞ্চিত অবশ্য হতে হয়, কিন্তু যেভাবে তাকে পাওয়া গিয়েছে, তা মনের ওপরে একটা ছাপ দিতে অপারগ হয় না। গিরিশ-চন্দ্র বাদে ছবির প্রধান চরিত্র রামকৃষ্ণ তার কারণ এ আখ্যায়িকা ভক্ত-ভৈরবকে নিয়েই গঠিত। এবারও চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'রাণী রাস-মণি'তে এই ভূমিকায় কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ছবির মান ও আকর্ষণ যেভাবে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন এ ছবিতে তারই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে দেখায় বেটপ-কপাল বিশ্রী চেহারায়, আর তাঁর মৃত্যু-

দৃশ্যটি হয়েছে-ক্রুড। অর্ধেন্দু মুস্তাফী ও অমৃতলাল বসু অতিশয় রসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু যথাক্রমে জহর রায় ও অসিতবরণ চরিত্রদুটিকে অনেকটা ভাঁড়ের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, শিশির ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ প্রমুখ তৎকালের বহু মনীষী-চরিত্রকে দেখানো হয়েছে, কিন্তু গল্পতে মাত্র বুড়িছোঁয়া গোছের হয়ে থাকা ছাড়া তাদের কোন চরিত্রের অবতারণায় কোন নাটকীয়তা নেইও, আর সেগুলির ব্যক্তিত্বও তাই অতি ক্ষীণ হয়েই থেকে গিয়েছে। এসব চরিত্রে অবতরণ করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, অবিনাশ দাস, দেবেন বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ, অজিতপ্রকাশ, সন্তোষ সিংহ, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, বলীন সোম, বিপিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অমৃতলাল মিত্র রূপে বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি অংশ ভালো লাগবে। অভিনেত্রী বিনোদিনীর চরিত্রে সন্ধ্যারাণী থাকার জন্যেই দৃষ্টিতে পড়েন, নয়তো ও চরিত্রটিও বিশেষ গণ্য হবার পর্যায়ে পড়ার মতো করে বিন্যস্ত নয়। মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, সন্ধ্যা দেবী, পূর্ণিমা, মেনকা প্রভৃতি নানা চরিত্রে ছড়িয়ে আছেন কাহিনীতে, চেনা শিল্পী বলেই তাদের চেনা যায় নয়তো বিশেষ কোন নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ নেই তাদের।

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার আমল পর্যন্ত সময়কার পটভূমি রচনায় শিল্পনির্দেশক কার্তিক বসুর দেখাবার অনেক কিছুই ছিল এবং তাতে আখ্যানবস্তুর উপযুক্ত আবহাওয়াটা ফুটতে পারতো, কিন্তু দৃশ্যগুলি কল্পিতই এমনি যাতে সেসব ঝামেলা পোয়ানোরই দরকার করেনি। তেমনি সুযোগ ছিল সংগীত পরিবেশকের। রামপ্রসাদী, কীর্তন কিছু কিছু পরিবেশিত হয়েছে, গিরিশচন্দ্রের নাটকের গানও আছে, ভালোই লাগবে সেগুলি, কিন্তু আরও জমতো যদি সেকালে প্রচলিত আরো দিশী সুর প্রয়োগ করা হতো। সংগীত পরিচালক অনিল বাগচী বেশ শুনতে খানকয়েক গান তৈরী করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু সেকালকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ তিনি নষ্ট করেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্তের কাজ ভালো। শব্দগ্রহণও ভালো এবং বাণী দত্ত মঞ্চে অভিনয়ের অংশগুলিতে প্রেক্ষাগৃহে বসে থিয়েটার শোনার ভাবটা শব্দের রেশেতে কয়েক ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। টেকনিকের দিকে ত্রুটি চোখে পড়ে, যেমন প্রহ্লাদ নাটকাভিনয় দৃশ্যে হিরণ্যকশিপুর সামনে অকস্মাৎ বরাহ অবতারের আবির্ভাব হয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা ছবির কায়দায় সুপার-ইম্পোজিশনে না হয়ে, থিয়েটারের কায়দা প্রয়োগ ক'রেই দেখানো উচিত ছিল। গিরিশচন্দ্র সেকালের কয়েকটি থিয়েটারেই কোন না কোন কালে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মঞ্চ যা দেখানো হয়েছে এমনিই প্রায় একই যে মোটেই মনে হয় না তার মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে অবতরণ।

* * *

"মহাকবি গিরিশচন্দ্র" উপন্যাস হয়ে পড়েছে বলে এবং সে-কারণে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি বলে প্রকৃত গিরিশচন্দ্রকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। সেটা আক্ষেপের বিষয় এবং চিত্রনির্মাতারা দেশের লোকের কাছে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন বলেও তাঁদের অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু উপন্যাসও যদি ঠিকমতো গঠিত হতো! ব্যক্তিপ্রধান আখ্যায়িকায় ব্যক্তির অভ্যুত্থানের ভিত্তিসূত্রই যদি না থাকে, কি করে এবং কি অবস্থার মধ্যে সেই ব্যক্তি গড়ে উঠলো তা যদি উহ্য বা অস্পষ্ট রেখে একেবারে তৈরী মানুষটিকে সামনে তুলে ধরা হয় তাহ'লে সে ব্যক্তিকে হঠাৎ মনে ধরিয়ে নেওয়া যায় না। এখানে যেমন গিরিশচন্দ্রকে পাওয়া যায় তৈরী অভিনেতারূপে, তৈরী নাট্যকাররূপে, কিন্তু তাঁর বড়ো অভিনেতা ও বড়ো নাট্যকার হওয়ার পশ্চাতে যে প্রভাব ও প্রেরণাগুলি কাজ করেছে তা নেইই বলা যায়। গিরিশচন্দ্রকে যাঁরা কিছুটাও জানেন তাঁরা এ অভাব হয়তো মানিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু দেশে তাঁরা অতি সংখ্যাল্প, বেশীর ভাগ লোকই জানেন না এবং তাঁদের কাছে এই অভাবের দরুণ চরিত্রটিই নিভাঁজ ফাঁকা ফাঁকা মনে হবে।

"ঢুলী"রই এক যমজ

"ঢুলী" লিখেছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। গানভর্তি ছবিখানির বক্তব্য ছিল অস্পৃশ্যতা নিয়ে। এক ঢুলীর ছেলে ওস্তাদ গাইয়ে হয়ে উঠে উঁচু জাতের মেয়েকে ভালোবেসে ফেলে, কিন্তু তার জীবন ব্যর্থ হয় জাতে সে ছোট বলে। মানুষ বলেও শিল্পী বলেও সে জাতে উঠতে পারলো না। সদ্যমুক্ত আনন্দ পিকচার্সের "অসমাপ্ত"-ও বক্তব্য ঐ একই এবং এখানিও ঠিক ঐ একই ছাঁচে ঢালা গানভর্তি ছবি। "অসমাপ্ত"র গল্প এক ডোমের ছেলেকে নিয়ে, সাধনা দ্বারা যে ওস্তাদ তবলিয়া হয়ে ওঠে, উঁচু জাতের মেয়ের প্রেমের চোখে পড়ে, কিন্তু সংকীর্ণমন সমাজের বাধায় তারও জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। এ যেন 'ঢুলি'কেই নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঠাঁই পাল্টে বসিয়ে দেওয়া গল্প। এই মিল থাকাতেই এবং "ঢুলী"র সাফল্যের প্রধান

হেতু মনে রেখেই এ ছবির প্রযোজক ঠিক ঐরকমভাবেই গল্পের ধারের চেয়ে সংগীতের ভারেই ছবিখানির কাটতির পথ প্রশস্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর জন্যে আয়োজনও করা হয়েছে প্রভূত। একজনের জায়গায় পাঁচজন সংগীত পরিচালকের হাতে সংগীত পরিবেশনের ভার দেওয়া হয়েছে; বাঙলা গানের চোদ্দজন নামকরা গায়ক-গায়িকার সংগে বম্বাই চিত্রের সেরা গায়িকাকেও রাখা হয়েছে এবং বাজনার জন্যেও ভারতব্যাপী নামকরা জন সাতেক শিল্পীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থাই কিন্তু "ঢুলী"রই অনুসরণ এবং ঐ পথ ধরেই তাকে ছাপিয়ে যাবারও চেষ্টা।

* * *

কাহিনীর মতলবটি ভালো; অস্পৃশ্যতা সমাজে কি ক্ষতি সাধন করছে, কিরকম অশান্তি নিয়ে আসছে গল্পের ছলে তা ব্যক্ত করে দেওয়া। কিন্তু এই ব্যক্ত হওয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণ কোন মনের পরিচয় নেই। এখানে ডোম অন্য যে কোন উঁচু জাতের লোকের সংগে কেবলমাত্র মানুষ হিসেবেই সমান এবং একাসনের জীব বলে পরিগণিত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। এখানে দেখানো হয়েছে, ডোমের ছেলে প্রতিভা ও সাধনার জোরে মহাশিল্পী হয়ে ওঠায় তার গুণের খাতিরেই তাকে উঁচু জাতে ঠাঁই দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন। "ঢুলী"তেও ঠিক এই কথাই তোলা হয়েছিল।" সবচেয়ে যা বিসদৃশ লাগে তা হচ্ছে এমনভাবে গল্প তৈরী যার মধ্যে এই ভাবটাই প্রকাশ পায় যে, ছোট জাতের উঁচু জাতের সংগে এক হওয়াটা নির্ভর করছে উঁচু জাতের ছোট জাতের প্রতি অনুকম্পা, দয়া, করুণা ও সহানুভূতির ওপরেই। এ যেন উঁচু জাতদের উদ্দেশে আবেদন, দেখ, এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর ঢুলি ডোম বলে কাউকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে নীচে ফেলে রাখার দিন নেই, ওদের সহানুভূতির সংগে পাশে টেনে নাও, নাহলেই এখন যেমন ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা তার ফলে কখন কোথায় কি অনর্থ ঘটে যায় কে জানে! এই সংস্কারাচ্ছন্ন ইতিউতি মনোভাবের ওপরেই যে "অসমাপ্ত"র কাহিনীর পরিকল্পনা সেই পরিচয়ই রয়েছে ছবিতে। আর তার সংগে রয়েছে এই সত্যের অনুসরণ যে, প্রেম কোন বাচ-বিচার করে না—"যার সংগে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।"

* * *

দুপুরুষ নিয়ে গল্প। সহায় সম্বলহীনা রমার মা মারা যাওয়াতে গ্রামের শিরোমণি পড়লো ওর প্রতি লোলুপ হয়ে। শিরোমণি একটু বেশীদূর এগোতে যাওয়ায় রমার হাতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। রমা পালিয়ে আশ্রয় নিতে চাইলে নদীর গর্ভে, কিন্তু নিধে ডোম তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ভাইস-চেয়ারম্যান মহেশ্বরের দরজায়। মহেশ্বর আপদ দূর করে দিলে, অগত্যা নিধে জ্ঞানহারা রমাকে নিয়ে তুললে তাদেরই কুটিরে। ব্রাহ্মণ মেয়ে বলে রমাকে নিজের রান্না করে নিতে হয়। নিধে ও রমার সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময় একদিন ওদের মনে প্রেম জাগালে। রমা নিধেকেই বিয়ে করে ডোমের ঘরের বৌ হলো। কালে ওদের একটি সন্তান হলো, নাম প্রতাপ। নিধে তবলা নিয়ে দিনরাত মশগুল। ছোট্ট প্রতাপ তন্ময় হয়ে শোনে। ডোমেদের বড়ো আপনার জন ছিল অমরেশ ডাক্তার। তার স্ত্রী ও মেয়ে বনজা থাকে কলকাতায়। প্রতাপের আগ্রহ দেখে ডাক্তার তাকে নিজেই লেখা-পড়া শেখাতে লাগলো। একদিন এক বাঈজীর সংগে তবলা সংগত করে প্রতাপ তার গুণের পরিচয় দেয়। তারপরই সে তালিম নিতে লাগলো ওস্তাদের কাছে। দীর্ঘদিন শিক্ষার পর ওস্তাদ প্রতাপকে নিয়ে গেল কলকাতায় সংগীত সম্মেলনে বাজাতে। সেখানে প্রতাপ বাজালে বনজার সংগে, সেই ওদের দুজনের আলাপ। বনজা আরও বিস্মিত হলো গ্রামে এসে যখন জানলে প্রতাপ তারই পিতার ছাত্র। বনজার আকর্ষণ প্রতাপের ওপর বাড়তে লাগলো। প্রতাপ ডোম বলে তাকে সকলে যে ঘৃণা করে তা মুখ বুজিয়ে সয়ে গেলেও বনজা পারে না। বনজার বিয়ের সম্বন্ধ হতে লাগলো, কিন্তু বনজা তো তার মন আগেই সমর্পণ করেছে প্রতাপের কাছে। প্রতাপকে পেতে বনজার কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই, কিন্তু প্রতাপেরই ভয় ডোম বলে আকাশের চাঁদ ছুঁতে। মহেশ্বর চেয়েছিল তার ছেলে শিবেশ্বরের সংগে বনজার বিয়ে দিতে, সেদিকে সুবিধে না হওয়ায় বনজা আর প্রতাপকে নিয়ে কেচ্ছা রটনা শুরু করলে। অমরেশ কন্যার বিবাহ ঠিক করলে এক এডভোকেটের ছেলের সংগে। প্রতাপ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু বনজাই তাকে বাক্যবন্ধ করে রাখে, সে যেন গ্রাম না ছাড়ে। বিয়ের পরদিন সকালে, তখনও কুশণ্ডিকা বাকি, মহেশ্বর পাত্রের পিতার কাছে বনজা ও প্রতাপের নামে কেচ্ছার কথা শোনালে। কুশণ্ডিকা আর হলো না, পাত্র চলে গেল। এরপর আবার মহেশ্বর এসেছিল বনজাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব নিয়ে, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হওয়ায় অন্যত্র সে পুত্রের বিয়ে ঠিক করলে। প্রতাপকে ডেকে জানালে আশীর্বাদের দিন তাকে তবলা বাজাতে হবে; প্রতাপ জানালে, সে বাজানো ছেড়ে দিয়েছে। পিতার কথায় রাজী না হওয়ায় পুত্র শিবেশ্বর বাজারের মধ্যে প্রতাপকে ধরে শিক্ষা দিতে গেল, কিন্তু নিজেই অপমানিত হলো। শিবেশ্বর এর শোধ নিলে গুণ্ডা লাগিয়ে প্রতাপের ঘরে আগুন দিয়ে প্রতাপকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে আহত করে। প্রতাপের মৃত্যু হলো। অমরেশ ডাক্তার প্রতাপের সমাধির ওপর একটি প্রস্তর-

ফলক্ বসিয়ে দিলে। বনজা রোজ সন্ধ্যায় সেই বেদীমূলে বসে আকুল হয়ে গান গেয়ে যায়।

* * *

গল্পটি বলা ফ্ল্যাশব্যাকে যার কোন প্রয়োজনই ছিল না, আর তাও প্রতাপের মা রমাকে দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করানোটাও ব্যাকরণের দিক থেকে ভুল। কাহিনীটির পটভূমি অতি পুরনো আমলের; গ্রামের শিরোমণিরাই যেকালে সমাজের হর্তাকর্তা। একটা চিন্তাবৈপরীত্য দেখা যায়। রমা ব্রাহ্মণের মেয়ে হলেও ডোমরা তাকে নিজের জন করে নিতে পারলে, অর্থাৎ এইটেই দেখানো হয়েছে যে, নীচু জাতের মধ্যে উঁচু নীচুর প্রভেদ নেই, অথচ বনজা প্রতাপকে পেতে চাইলো, কিন্তু প্রতাপ বনজাকে গ্রহণ করতে চাইলে না নিজে নীচু জাত বলে। আবার অসহায় বলে রমা ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও ডোমকে বিয়ে করে নিলে, কিন্তু বনজার পিছু থাকায় এবং সমাজের দৃষ্টি তার ওপরে থাকায় প্রতাপের সঙ্গে তার বিয়ে রোধ করে দেওয়া যে হলো, তাতে চিন্তার সংকীর্ণতা ও সংকোচই উপলব্ধি করা যায়। এখন আইনই তো সহায়, সেক্ষেত্রে কেন অমরেশ ডাক্তার তার পুরোনো প্রিয় প্রতাপকেই জামাই করার কথা ভাবতে পারলো না! কিম্বা প্রতাপের মধ্যেই বা বিদ্রোহ জ্বল জাগলো না কেন! বনজার সঙ্গে প্রতাপের বিয়ে না দিয়ে এ কাহিনী অসমাপ্ত রেখে দেওয়াতে অতি ভীরু দুর্বল মনেরই পরিচয় দিয়েছেন কাহিনীকার। তবে মেয়েদের কাছে এ কাহিনীটির একটা বিশেষ আবেদন থাকবে। তার কারণ, রমা বা বনজা এদের মনে উঁচু নীচু বিচারে কোন সায় বা সংকোচ নেই বলে, যে কোন মানুষকে সোজাভাবে শুধু মানুষ বলেই গ্রহণ করে নেবার মতো ওদের যে মন পাওয়া যায় দর্শকমনে তার ছোঁয়াচ লাগবে।

* * *

গল্পের মধ্যে উদ্ভট অস্বাভাবিকত্ব যথেষ্ট। ঘটনাকে ঠেলেঠুলে হাজির করে দেওয়া প্রায়ই। যেমন প্রতাপ ও বনজার দেখা কলকাতার সংগীত সম্মেলনে ঘটাতে হবে ঠিক করেই যেন অমরেশ ডাক্তারের কাছ থেকে স্ত্রী ও কন্যাকে অহেতুক সরিয়ে রেখে দেওয়া; তবলা বাজনায় প্রতাপের গুণপণা প্রকাশ করার জন্যেই যেন পথের মাঝে এক বাঈজীর আবির্ভাব ঘটিয়ে দেওয়া। প্রতাপ তবলা বাজিয়ে কলকাতা থেকে কাপ-মেডেল জয় করে এনেছে অথচ বনজার বাড়িতে গ্রামের লোকের সামনে সে বাজাতে বসলো চৌকাঠের বাইরে,—এটা কোন্ যুগের ব্যাপার? আরও অনেক রকমেরই ছুটি বিচ্যুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। ডোমেদের মুখে এবং মুসলমান ওস্তাদের মুখে এমন ভাষা দেওয়া হয়েছে যা শুনতেই কটু ও হাস্যাস্পদ নয়, চরিত্রগুলিও তার জন্যে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। পরিচালনা কাজে রতন চট্টোপাধ্যায় অতি মামুলী পথ অনুসরণ করে গিয়েছেন। গল্পকে ভরাট করার জন্য গানের প্রয়োগ থাকবে, না গানের বাহন করে গল্পকেই গড়েপিটে নিতে হবে, ছবিখানির বিন্যাসে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বতার পরিচয়ই রয়েছে। বিন্যাস কল্পনাবিহীন।

* * *

পাঁচজন সংগীত পরিচালক—অনুপম ঘটক, অনিল বাগচী, দুর্গা সেন, নচিকেতা ঘোষ ও ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, এরা মিলে এগারোখানি গান পরিবেশন করেছেন। পল্লীগীতি, আধুনিক ও ক্লাসিকের সংমিশ্রণ। তার মধ্যে কয়েকখানি গান ভালোও লাগবে, কিন্তু বেশী ভিড়িয়ে আনতে প্রেমের আধুনিক সুরের গান কখানি বেখাপ্পা হয়ে পড়েছে। তবলার বাজনা ছবিখানিতে একটা প্রধান ভূমিকায় আছে এবং তাল-বাদ্য, শব্দপ্রয়োগ, রেকর্ডিং প্রভৃতি কাজে নিপুণতা রয়েছেও বেশ। ছবির একটি মস্ত আকর্ষণ। তাছাড়া, নিখিল ব্যানার্জির বাজনা, মেয়েদের গান, কাশীর সারেঙ্গীর ছোট তান ব্যবহারের হাতে... বাজনার নির্দিষ্টতে কাজ রয়েছে। ... অসংখ্য হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয় সতীনাথ, সন্ধ্যা অধিকারী, ... চক্রবর্তী, অপরেশ লাহিড়ী, মণ্টু ঘোষ, ভূপেন হাজারিকা, ... সংখ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, আল্পনা ব্যানার্জি, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, বাসন্তী ঘোষ ও বাঁশরী লাহিড়ী। গানের দাপটটা কিন্তু বুঝতে পারা যায় শেষের দিকে প্রতাপের ঘরে আগুন লাগলো থেকে প্রতাপের মৃত্যু পর্যন্ত। পাঁচজন সংগীত শিল্পী দুজন অর্কেস্ট্রা মিলে যে বিপুল আওয়াজ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাতে সুস্থ মানুষেরই প্রাণ ঝালাপালা হয়ে ওঠে, আহত প্রতাপ যে মারা যাবে তাতে আর কি বিচিত্র!

* * *

সংগীতের দিকের মতো অভিনয়ের দিকটাও নামী শিল্পীদের ভিড়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জহর রায় একবার পা টিপছেন দেখিয়েই শেষ, গুরুদাস আছেন কিন্তু ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন, শ্যাম লাহা একবার বসেছেন তবলায় চাঁটি দিতে, সন্তোষ সিংহ, বেচু সিংহ প্রভৃতি একবার শুধু গ্রামের মাতব্বররূপে। ধীরাজ ভট্টাচার্য গোড়ার দিকে নামেন খল শিরোমণির চরিত্রে, তারপর তাঁর কথা ভেবে মনে করে নিতে হয়। ছন্দা দেবী, জয়শ্রী সেন, প্রীতিধারা, অনুভাকে নিয়ে একবার একটা নাচ। আর সে যে কোন্ দেশের ডোমের নাচ দেখবার পর ভাবিয়ে রেখেছে। অথচ এ নাচ

উদয়শঙ্কর অনুমোদিত! রেণুকা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, ধীরাজ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও আছেন কিন্তু তাঁদের চিনে চিনে খুঁজে নিতে হয়। এইভাবে ভিড় বাড়িয়ে গল্পের কোন লাভ হয়নি, তবে যদি এদেরও কিছু দেখাবার মতো নাট্য যোগ থাকতো তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। নজরে যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন নবাগত প্রবীরকুমার, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী ও কাবেরী বসু, এঁদের অভিনয়ই শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলিকে মনে করিয়ে রেখে দেয় এবং কৃতিত্বও পাওয়া যায়। তাছাড়াও, আছেন পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখার্জি ও দীপক মুখার্জি। কলাকৌশলের দিকে প্রশংসা করার কিছু নেই, বরং সংলাপ অস্পষ্ট হওয়ার জন্য শব্দগ্রহণের ওপর সবুরের মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন আলোকচিত্র গ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণে গৌর দাস ও বাণী দত্ত, দৃশ্য-সজ্জায় কার্তিক বসু। তাছাড়া সব বিষয়েই - ছবিখানি তুলতে একটা স্টুডিও কুলয়নি, তুলতে লেগেছে তিনটে স্টুডিও।

বংশমর্যাদার পুরনো কাসুন্দি

একজোড়া নয়, একেবারে দু' জোড়াকে নিয়ে প্রেম করানো হয় ভিত্তিতে বংশমর্যাদা ও ধনশালীতার আভিজাত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ও রাগ-বিরাগ। এই নিয়েই তৈরী সানরাইজ ফিল্মসের নবতম চিত্রনিবেদন "শংকরনারায়ণ ব্যাংক"। মামুলী চিন্তাধারার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতার পরিচয় কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য দিতে না পারলেও কাহিনীটির নামের মতোই কাহিনীর পরিবেশে একটা বৈচিত্র্য পরিবেশনের তিনি চেষ্টা করেছেন। কৃত্রিমতার দোষ থেকে মুক্ত নয় এবং গড়নের মধ্যে একটু বিদেশীয় ধাঁচ থাকা সত্ত্বেও এমন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আছে যা দর্শকমনে কৌতূহল ধরিয়ে রেখে যেতে সক্ষম হয়। আর একটা মস্ত রিলিফ হচ্ছে বাকির জটলা পাকানো ব্যাপারে নিতাই ভট্টাচার্য এবার কিছু সংযমের পরিচয় দিয়েছেন যা ডিবেট থেকে বাঁচিয়ে গল্পকে গল্পই থাকতে সহায়ক হয়েছে। তবে মূল্যহীন তত্ত্বহীন নিছক প্রমোদ।

হরিশঙ্কর ব্যাংকের মালিক। তার বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার ও অংশীদার নারায়ণ ডাকাতের গুলীতে প্রাণ হারায়। তারই স্মৃতিতে ব্যাংকের নাম শংকরনারায়ণ ব্যাংক। নারায়ণের পুত্র গৌতম ও কন্যা দীপা হরিশঙ্করের গৃহে তারই পুত্র শিবশঙ্কর, রামশঙ্কর ও কন্যা মীনার সঙ্গে মানুষ হতে থাকে। হরিশঙ্করের স্ত্রী গৌতম ও দীপাকে তাদের কর্মচারীর সন্তান বলেই জানতো এবং সেইমতো তাদের সঙ্গে ছোট ব্যবহার করতো। এদের মধ্যে গৌতম মীনাকে এবং শিবশঙ্কর দীপাকে ভালবাসতো। হরিশঙ্করের স্ত্রীর কাছে এইটেই বিষম লাগলো। রামশঙ্করও এটা দেখতে পারে না। মীনার এক জন্মদিনে একদিকে গৌতম-মীনা এবং অন্যদিকে শিবশঙ্কর ও দীপাকে একান্তে থাকতে দেখে হরিশঙ্করের স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে গৌতমকে ও দীপাকে কর্মচারীর পুত্র হয়ে চাঁদ ধরবার সাধের জন্য এমন অপমান করলে যে, গৌতম সেই মুহূর্তেই দীপার হাত ধরে সেবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। পাঁচ বছর এদের দেখা নেই। ইতিমধ্যে গৌতম নিজের চেষ্টায় আমদানী-রপ্তানির কাজ ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে একদিন শংকরনারায়ণ ব্যাংকে উদিত হলো। হরিশঙ্করের স্ত্রীর মনোভাব গৌতমের সম্পর্কে পূর্ববৎ। গৌতমের আগের জিদ অপমানের শোধ নিতে হরিশংকরদের বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য ধুলোয় নামিয়ে দেবে। তলে তলে গৌতম ব্যাংকের বেশী শেয়ার কিনে নিতে লাগলো। এই সময়ে পুলিন নামে এক ফাটকাবাজ জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লো রামশঙ্কর। ব্যাংকের টাকা লুট করে সে পালালো। খবর রটতেই ব্যাংক রাণ হবার উপক্রম। শেষে গৌতমই মীনার মুখ চেয়ে তার সর্বস্বের বিনিময়ে ব্যাংক রক্ষা করলে। বলা বাহুল্য, গৌতম আর মীনার দ্বন্দ্বও গেল মিটে, আর শিবশঙ্করও পেলে দীপাকে।

আরম্ভতেই বড়ো কৃত্রিমভাবে ঘটনাকে চড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যে ঘটনায় গৌতমও দীপাকে হরিশঙ্করের বাড়ি ছাড়তে হয়। তারপর থেকে গল্প যেভাবে চলেছে তার মধ্যে সঙ্গত বিন্যাসচাতুর্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর অবশ্য কৃত্রিমতা আবার এসেছে শেষের দিকে। অসঙ্গত ব্যাপার আছে, তবে কম। অন্তত একটি মোটর চলার বহির্দৃশ্য দুবার দেখানোর মতো ত্রুটি দর্শক চোখ এড়িয়ে যায় না, চাবিটির দরুণ পাওয়া গেল দুজনের দুখানা চেক অথচ ব্যাংকে জমা এলো নগদে সাত আর চেকে তিন হাজার টাকা। ভাঙাবার জন্য চেক দীপাকে দিয়ে শিবশঙ্করের বাড়িতে পাঠানো। তবে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী দৃশ্যাবলীর উপস্থাপনে এমন একটা গতি সৃষ্টি করে গিয়েছেন যে, সাধারণ ত্রুটি আঁকড়ে ধরে থাকার অবসর থাকে না। বিমুগ্ধ হবার মতো কিছু নয়, তবে সময় কাটিয়ে দেবার মতো নাট্যরস পাওয়া যায় এবং বিশেষভাবে জমেছে ঐ দু জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনের সংঘাতের সুরটা। গোড়াতে অবশ্য বুঝতে পারা যায় না গৌতম চলে যাবার পর জাহাজ চলা, কুলি খাটানো, জাহাজ থেকে মাল ওঠা-নামার মন্তাজ দেখিয়ে কি ধরনের ব্যবসার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, পরে বলে না দিলে ধরাই যেতো না। ব্যাঙ্ক, ফাটকা বাজার ইত্যাদির সাহায্যে পুরনো ধরনের গল্পেও নতুন পরিবেশ যুক্ত হয়েছে। আঙ্গিক পারিপাট্য গঠনে ছবিখানিতে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব পাওয়া যায়। তার জন্যে আলোকচিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ, শব্দগ্রহণে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিল্প-নির্দেশে সৌরেন সেনের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরের দিক থেকে অনুপম ঘটক গোড়ায় খানিকটা আবহসঙ্গীতে ও গানে মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশ এনে দিয়েছেন; এ ধরনের সুটেড-বুটেড গল্পে অবশ্য তা মানিয়ে গিয়েছে।

ছবিখানির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসার দিক হচ্ছে অভিনয়। কোন একজনকে আলাদা-ভাবে বের করে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় না।

একলব্য

'সুপারস্টেশন' বা সংস্কারের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালীর। বাঙ্গালীর মন নানা সংস্কারে আবদ্ধ। বহুবার যিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন এবং দেব দেবী সম্বন্ধে যার মন চিরদিন অবিশ্বাসী, তিনিও বিপদে পড়লে ঝাড়ফুক এবং কবচ-তাবিজে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। আমাদের সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের খেলোয়াড় তথা খেলাধুলোর পরিচালক এবং দর্শকরাও এই সংস্কারমুক্ত নন। শুনেছি ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালের কোন কোন দর্শক আজও মোহনবাগানের খেলার দিন সেই জামা পরে মাঠে আসেন যে জামা পরে ১৯১১ সালের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা দেখেছিলেন। এই শোনা কথার মধ্যে হয়তো অতিশয়োক্তি আছে। কারণ ১৯১১ সালের পরিধেয় আজ আর পরা সম্ভব নয়, তবে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত, সযত্নে রক্ষিত জীর্ণ জামা জুতো হয়তো সঙ্গে করে আনা সম্ভব। অনেকে আনেনও। তাছাড়া বাতিকের তো অভাব নেই। যে জায়গাটিতে বসে আগের দিন ইস্টবেঙ্গলকে জয়লাভ করতে দেখেছি আজও সেই জায়গায় বসা চাই, এমন মনোভাব বহু দর্শকের মধ্যেই বিদ্যমান। এ ছাড়া প্রিয় দলের খেলার দিন কালীঘাটে অথবা গৃহদেবতার কাছে পুজো মানৎ করা তো অনেক দর্শকের অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ গেল দর্শকদের কথা। সংস্কারের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রাও কম যান না। কালীঘাটের মন্ত্রপূত সিন্দুর বিন্দু ললাটে ধারণ করে ১১ জন খেলোয়াড় খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এ দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ে। অন্যে পরে কা কথা ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্লাব মোহনবাগান, ফুটবল, ক্রিকেট, হকিতে যাদের বিজয় সাফল্যের অন্ত নেই তারাও খেলার আগে কোন ফটোগ্রাফার টীমের ফটো তুলতে চেষ্টা করলে তাকে তাড়া করতে কসুর করেন না। কোন্ আদি কালে নাকি এক উল্লেখযোগ্য খেলার আগে টীমের ফটো তোলবার পর মোহনবাগানের হার হয়েছিল সেই থেকে খেলার আগে টীমের 'ফটো' না দেওয়া তাদের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু ফটোগ্রাফার কেন, কলকাতার এক বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক সম্বন্ধেও মোহনবাগান ক্লাবের 'কুসংস্কার' ভয় আছে। ইনি মাঠে উপস্থিত হলে নাকি মোহনবাগানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফুটবল ক্ষেত্রে অবশ্য এ'র বেশী 'আনাগোনা' নেই, তবু যেদিনই মাঠে উপস্থিত হন সেদিনই নাকি মোহন-

প্রজাতন্ত্র চীনের অলিম্পিক ফুটবল দল। কলকাতায় প্রথম প্রদর্শনী খেলায় চীন দল মোহনবাগান ক্লাবকে ৮—১ গোলে পরাজিত করে এ দেশের প্রদর্শনী খেলায় গোল সংখ্যার এক নতুন রেকর্ড করেছে।

বাগানের বিপর্যয় ঘটে। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে মোহনবাগান ও চাইনিজ অলিম্পিক টিমের খেলার দিন এই সাংবাদিককে এ বছর মাঠে প্রথম উপস্থিত হতে দেখেছি এবং এইদিনই মোহনবাগান ক্লাবকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ৮—১ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, মোহন-বাগানের সুদীর্ঘ ইতিহাস খুঁজলে সে পরাজয়ের দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। মোহনবাগানের এই কলঙ্কময়লিন পরাজয়ের সঙ্গে সাংবাদিকের উপস্থিতির কার্যকারণ সম্পর্ক নেই জেনেও সংস্কারবদ্ধ মোহনবাগান ক্লাব-পরিচালকদের কাছে প্রস্তাব করছি তাঁরা যেন প্রতি খেলায় এই

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অধিনায়ক আয়ান জনসন

সাংবাদিককে খেলা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং খেলার আগে খেলোয়াড়দের ফটো তুলতেও যেন অনুমতি দেন। কারণ, শক্তিশালী মোহনবাগান ক্লাব রোজ হার স্বীকার করবে না, আস্তে আস্তে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনও সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবে।

* * *

কলকাতায় চাইনিজ অলিম্পিক টিমের তিনটি প্রদর্শনী খেলার মধ্যে প্রথম খেলা অনুষ্ঠানের পর এ সপ্তাহের লেখা শেষ করতে হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ক্রীড়া-শৈলীর পরিচয় দিয়ে প্রথম খেলায় চাইনিজ দল মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়েছে ৮—১ গোলে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও রোভার্স বিজয়ী শক্তিশালী মোহনবাগান ক্লাবের এই শোচনীয় পরাজয় বিস্ময়ের বিষয় হলেও ক্রীড়াধারা অনুযায়ী খেলার ফলাফল অসংগত হয়নি বরং খেলার ধারা অনুযায়ী চাইনিজ দল আরও বেশী গোলে জয়লাভ করলেও অশোভন হত না। প্রজাতন্ত্র চীনের জাতীয় ফুটবল দলের খেলায় উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য ও চমৎকার সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া গেছে। সমস্ত সময়ই তারা মোহনবাগানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আক্রমণ চালায় এবং প্রতি অর্ধে চারটি করে গোল করে। চীন দলকে খেলতে হয়েছিল ভিজা এবং জলসিক্ত মাঠে। ভিজা মাঠে চীন নাকি খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। তবুও নতুন পরিবেশের মধ্যে নয়া চীনের জাতীয় দল মোহনবাগানকে যেমন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করে পরাজিত করেছে তাতে তাদের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যায়। চীন দলের খেলা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ভিজা মাঠে খেলতে অভ্যস্ত না হলেও ভিজা মাঠে খেলার ফলেই তারা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এতগুলি গোল করতে সমর্থ হয়েছে। শুকনো মাঠে তারা এভাবে গোল করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে আমার মনের কোণে ঘোর সন্দেহ আছে। যাই হক কলকাতার তিনটি খেলার পর আগামী সংখ্যায় এদের খেলা সম্পর্কে আরও আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

* * *

কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ক্লাবগুলির মধ্যে যে একটা রেষারেষির ভাব বিদ্যমান আছে, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। এ কথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই যে, এই রেষারেষির পরিবেশ সুস্থ নয়। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় শীর্ষ-স্থানীয় ক্লাবগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাবই প্রবল। তাই মোহনবাগান ক্লাবকে চীন দলের কাছে ৮—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে দেখে বৈরীভাবাপন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষের পুলকিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকে হয়েছেনও। খেলার মাঠে অনেকের চোখেমুখেও তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে চীন দল যেমন খেলেছে তাতে যে কোন দলেরই তাদের হাতে এমন শোচনীয় পরাজয় ঘটতে পারতো। বাইরের একটি দলের কাছে ভারতের পরম শক্তিশালী মোহনবাগান দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে মোহনবাগানের কলঙ্কের চেয়ে ভারতের জাতীয় ফুটবলের কলঙ্কই বেশী। প্রজাতন্ত্র চীনে বেশীদিন ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়নি, নয়া চীন ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছে মুক্তি সংগ্রামের পর। মাত্র সাত আট বছরের চেষ্টায় চীনের পক্ষে যদি ফুটবল খেলায় এতখানি উন্নতি করা সম্ভব তবে অর্ধ-শতাব্দীর প্রচেষ্টায়ও ভারত ফুটবলে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেছ না কেন তার তথ্যানুসন্ধানে সময় এসেছে। এ তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব শুধু আই এফ এ বা এ আই এফ এফ-এর নয়, এ তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের,—এ তথ্যানু-সন্ধানের দায়িত্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় সমস্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষের।

* * *

নটিংহ্যামশায়ারের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে আরম্ভ হয়েছে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বহু আলোচিত টেস্ট পর্যায়ের প্রথম খেলা। সারা ক্রিকেট বিশ্ব এই খেলার ফলাফলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই পর্যায়ের টেস্ট খেলা নিয়ে আলোচনা আজই আরম্ভ হয়নি। গতবার ইংলন্ড দলের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বিদেশে আরম্ভ হয়েছে এই আলোচনা। দীর্ঘ ২০ বছর পরে ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে কাল্পনিক 'এ্যাসেসের' পুনরুদ্ধার করেছে ইংলন্ড দল।

ইংলন্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক পিটার মে

গতবারও তারা এ্যাসেস অধিকারে রেখেছে। এবার অস্ট্রেলিয়া এ্যাসেস পুনরুদ্ধার করতে পারবে কিনা? কোন্ দল শ্রেষ্ঠ? ব্যাটিংয়ের দিক দিয়ে কারা বেশী শক্তিশালী? কাদের বোলিং ইংলন্ড 'টার্ফে' বেশী কার্যকরী হবে? কোন দলে কতজন ন্যাটা খেলোয়াড় আছেন? তারা বোলার ও ব্যাটসম্যানদের কেমন বেগ দেবেন? মারাত্মক বোলারের প্রাথমিক তীব্রতা ভোঁতা করে দিতে কোন্ কোন্ ব্যাটসম্যান বেশী ওস্তাদ? উইকেটে টিকে থাকবার দক্ষতা কার বেশী? কাদের ফিল্ডিং ভাল? ফাস্ট বোলিং বেশী কার্যকরী হবে না স্পিন বোলাররা বেশী উইকেট পাবেন। মাঠ জলে ভিজে গেলে ম্যাচের ফলাফল কাদের অনুকূলে যাবে? এই রকম কত গবেষণায় দেশ বিদেশের সংবাদপত্রের খেলাধুলার স্তম্ভ ভরে উঠেছে।

অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট লড়াইকে বাঘ-সিংহের লড়াই বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রচলন হলেও ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলন্ডের গোঁড়া ক্রিকেট রসিকরা আজও মনে করেন শুধু অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান

চাইনিজ অলিম্পিক টীম ও মোহনবাগানের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় চাইনিজ দলের দ্বিতীয় গোল করিবার দৃশ্য

ক্রিকেট খেলাগুলিই 'টেস্ট ম্যাচ' আখ্যা লাভের যোগ্য। এই দুই দেশের অধিবাসীরা এই খেলাকে জাতীয় ঘটনা বলেও মনে করেন। শুধু ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক দিয়েই নয়, গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যের দিক দিয়েও ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের মর্যাদা অনন্য। এই খেলা ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াবাসীর মনের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা নতুন করে বলবার নয়। ১৯৫৩ সালে যে টেস্ট খেলায় ২০ বছর পরে ইংলণ্ড 'এ্যাসেসের' পুনরুদ্ধার করে সেই টেস্ট খেলার সময় ইংলণ্ডবাসীর উত্তেজনা চরমে উঠেছিল—বলতে গেলে এই খেলার সময় কর্মমুখর ইংলণ্ডের সব কাজ-কর্মই বন্ধ ছিল। ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার সময় কোনবার মাঠের একটি দর্শক আসনও খালি থাকে না। তা ছাড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও টেলিভিশনে খেলা দেখেন হাজার হাজার দর্শক। দূরবীক্ষণ ও টেলিভিশন সংগ্রহে অক্ষম এবং মাঠে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত দর্শকদের খেলার খবর জানবার আগ্রহ মেটায় বেতার বিবরণী। এবারও বি বি সি কর্তৃক টেস্ট খেলার প্রতি ওভারের প্রতিটি বলের 'কাহিনী' প্রচারের যে আয়োজন হয়েছে তা বিশ্বের প্রায় সকল স্থান থেকেই রেডিয়ো মারফৎ শোনা যাবে। বি বি সি-র সঙ্গে আমাদের সময়ের পার্থক্য প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। ওরা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। অর্থাৎ ওদের সময়ানুযায়ী ১০টা ১৫ মিনিটের সময় খেলা আরম্ভ হলে আমাদের সময় দাঁড়াবে ৩টা ৪৫ মিনিট। ওদের সময়ানুযায়ী ১৭টা ৪৫ মিনিটে যখন খেলা শেষ হবে তখন আমাদের সময় হবে রাত ১১টা ১৫ মিনিট। পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলা ১২ই জুন মঙ্গলবার শেষ হবার কথা। রবিবার ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলা বন্ধ থাকে। বি বি সি থেকে যে যে মিটারে টেস্ট খেলার ধারা বিবরণী প্রচারিত হবে নীচে তার তালিকা দেওয়া হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য সিংগাপুর

বি বি সির চার্ট

ইংলণ্ড থেকে সরাসরি প্রচার

১০-১৫ মিঃ—১৭-৪৫ মিঃ—
২১৫৫০ কিলোসাইকেলস (১৩·৯২ মিটার)
১৭৭৯০ কিলোসাইকেলস (১৬·৯১ মিটার)

সিংগাপুর থেকে রিলে

১০-১৫ মিঃ—১২-৪৫ মিঃ—
১১৭২৫ কিলোসাইকেলস (২৫·৫৯ মিটার)
১০-১৫ মিঃ—১৭-৪৫ মিঃ—
৯৭২৫ কিলোসাইকেলস (৩০·৮৫ মিটার)
১৪-৪৫ মিঃ—১৭-৪৫ মিঃ—
৭১২০ কিলোসাইকেলস (৪২·১৩ মিটার)

থেকেও এই বিবরণী 'রিলে' করবার আয়োজন হয়েছে।

* * *

বিশ্বের ক্রিকেট পণ্ডিতদের অভিমত—এবার অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট 'রাবার' লাভের সম্ভাবনা দুই দেশেরই প্রায় সমান সমান। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। এবার অস্ট্রেলিয়ার দলও যথেষ্ট শক্তিশালী। অনন্য প্রতিভা খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের পর কোনবার এত শক্তিশালী করে অস্ট্রেলিয়া দল গঠন করা হয়নি। অপরদিকে ইংলণ্ড দল গতবারের তুলনায় বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রথমত ইংলণ্ডের দুইবারের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক ধুরন্ধর খেলোয়াড় লেন হাটন শারীরিক অসুস্থতার জন্য খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অন্যতম দিকপাল ব্যাটসম্যান কম্পটনও সুস্থ নেই। তারপর ফ্র্যাঙ্ক টাইসন গতবার ইংলণ্ডের টেস্ট জয়ের মূলে যাঁর কৃতিত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী এবং যিনি মারাত্মক গতিবেগের সঙ্গে বোলিং করে 'টাইফুন' টাইসন নামে অভিহিত হয়েছিলেন তিনি প্রথম টেস্টের মুখে পায়ে চোট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং গতবারের তুলনায় ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট টীমকে অনেক দুর্বল বলা যেতে পারে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া দলের দুই কৃতী খেলোয়াড় ম্যাকডোনাল্ড এবং আর্চারও সুস্থ নেই। এই লেখবার সময় পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে এদের প্রথম টেস্টে না খেলবারই সম্ভাবনা। যাই হক টাইসন, ম্যাকডোনাল্ড, আর্চার প্রথম টেস্টে খেলুন আর না খেলুন টেস্ট খেলায় উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব হবে না। ফলাফলের জন্য দেশ বিদেশের সহস্র সহস্র ক্রিকেট রসিকের আগ্রহেরও অন্ত থাকবে না।

* * *

প্রথম টেস্টের অনুষ্ঠান ক্ষেত্র 'ট্রেন্ট ব্রিজ' নটিংহামশায়ার কাউণ্টি ক্লাবের মনোরম ক্রীড়াভূমি। ইংলণ্ডের পাঁচটি টেস্ট কেন্দ্রের মধ্যে লর্ডসের পরই ট্রেন্ট ব্রিজের স্থান। ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ট্রেন্ট নদীর নামানুসারে হয়েছে মাঠের নামকরণ। ব্রিজের নামও অলীক নয়। নদীর উপর একটি ব্রিজ আছে নর্মান যুগ থেকে যার অস্তিত্ব, তবে ব্রিজের বর্তমান অবয়ব ১০০ বছরের পুরাতন। ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় উইলিয়াম ক্লার্ক ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠের স্রষ্টা। ১৮৩৫ সালে 'ট্রেন্ট ব্রিজ ইনের' অধিকারিণীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে 'ইনের' সংলগ্ন জমিকে ক্রিকেট মাঠে রূপান্তরিত করেন এবং ঐতিহাসিক নটিংহ্যাম ক্রিকেট ক্লাবের সূত্রপাত হয়—ক্লার্ক হন নটস দলের অধিনায়ক। ১৮৩৮ সালে 'ট্রেন্ট ব্রিজ' নটিংহামশায়ারের কাউণ্টি মাঠে পরিণত হয়। বৃক্ষরাজির পটভূমিকায় রচিত 'ট্রেন্ট ব্রিজ' বহু ঐতিহাসিক ক্রিকেট যুদ্ধের লীলাভূমি। বিশ্বের কত ধুরন্ধর খেলোয়াড় এখানে কত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ডাব্লিউ জি গ্রেস, রণজি, গানস, শ্রুসবারী, হবস, সার্টক্লিফ, ক্লেম হিল, ভিক্টর ট্রাম্পার প্রভৃতি অতীত যুগের ধুরন্ধর খেলোয়াড়েরা যে ব্যাটে খেলে ট্রেন্ট ব্রিজে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ক্লাবের 'লং রুমে' সে ব্যাট এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। লারউড, ভোস প্রভৃতি কীর্তিমান বোলারদের ব্যবহৃত বলও শোভা পাচ্ছে ট্রেন্ট ব্রিজের 'লং রুমে'। তাছাড়া দেশ-বিদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বহু চিত্র এবং ব্যঙ্গ-চিত্র ঐতিহাসিক খেলাগুলির স্কোরবোর্ড, ক্রিকেট সম্পর্কীয় তথ্যবহুল বইয়েরও অভাব নেই

ট্রেন্ট ব্রিজে। লর্ডসের প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জ পার, ইংলণ্ড ক্রিকেটে যিনি 'লায়ন অব নর্থ' নামে অভিহিত ছিলেন এবং যাঁর উঁচুতে মেরে ওভার বাউণ্ডারী করবার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, ট্রেণ্ট ব্রিজে তাঁর মর্মর-মূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় বিশ্বের যে কোন খেলোয়াড় শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। স্কোয়ার লেগের দিকে উঁচুতে বল তুলে জর্জ পার ওভার বাউণ্ডারী মারতেন। ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠের স্কোয়ার লেগের দিকে একটি সু-উচ্চ বৃক্ষ আছে। পারের বল অনেক সময় এই বৃক্ষের ৬০।৭০ ফুট উঁচুতে গিয়ে লেগে ওভার বাউণ্ডারী হয়েছে। ৯০ বছর আগে পারের বল যতটা উঁচুতে উঠেছিল গাছের সেই যায়গায় একখানি প্লেট আঁটা আছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন খেলোয়াড়ই বল মেরে এই উচ্চতা অতিক্রম করতে পারেননি। সামারসেট ও ইংলণ্ডের মারমুখী ব্যাটসম্যান আর্থার ওয়েলার্ড ও বিশ্বের সেরা চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। মিলার এবার কি সফল হবেন, এ প্রশ্নও অনেকের মনে দেখা দিয়েছে।

ট্রেণ্ট ব্রিজে ৩৫ হাজার দর্শকের বসবার যায়গা আছে। এবার দু'হাজারের মত দর্শক আসন বাড়ানো হয়েছে। কয়েক বছর আগে মাঠের উইকেট নির্জীব হয়ে পড়ায় নতুন মাটি ফেলে উইকেটকে সজীব করা হয়েছে। এখন উইকেট খুবই 'জীবন্ত'। ৫০ বছর ধরে ট্রেণ্ট ব্রিজে ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু আগামী ১০ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াকে আর 'ট্রেণ্ট ব্রিজে' খেলাতে দেখা যাবে না। নতুন ব্যবস্থানুযায়ী ইংলণ্ড সফরে বার্মিংহামের 'এজবাস্টন' মাঠ হবে প্রথম টেস্টের ক্রীড়াভূমি। অস্ট্রেলিয়া 'ট্রেণ্ট ব্রিজে' আবার প্রথম টেস্ট খেলবে ১৯৬৬ সালের সফরে। সুতরাং এদিক দিয়েও নটিংহাম-বাসীর কাছে এ টেস্ট খেলার পৃথক আকর্ষণ আছে।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[৭-৬-৫৬]

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের মাত্র পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝড়বৃষ্টি এবং চাইনিজ অলিম্পিক দলের প্রদর্শনী খেলার জন্য তিন দিন লীগের খেলা স্থগিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের খেলার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ মরসুমে আশানুরূপ খেলতে পারছিল না; কিন্তু মহমেডান দলের বিরুদ্ধে এদের খেলার মধ্যে সময়ে সময়ে অতীত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ছাপ ফুটে ওঠে এবং ইস্টবেঙ্গল আগাগোড়াই মহমেডান দলের চেয়ে ভাল খেলে ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। লীগের খেলায় মহমেডান দলের এইটিই প্রথম পরাজয়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পরাজয়ের পর প্রথম ডিভিশনের ১৪টি ক্লাবের মধ্যে এখন পর্যন্ত যারা অপরাজিতের গৌরব নিয়ে টিকে আছে তারা কলকাতা মাঠের দুই প্রধান—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল।

লীগের খেলায় এ বছর এখন পর্যন্ত কেউই হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের চ্যারিটি খেলায় ইস্টবেঙ্গলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড টি বসুর হ্যাটট্রিক করবার এক সুযোগ ঘটেছিল। টি বসু দুইটি গোল করবার পর ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি কিকের সুযোগ পায়; পেনাল্টিতে গোল করতে পারলে টি বসু হ্যাটট্রিকের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু তাকে পেনাল্টি কিক করবারই সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৭টি খেলায় ৪ পয়েণ্ট হারাবার ফলে লীগে মহমেডান দলের অবস্থা খানিকটা খারাপ হলেও চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এখনো লীগের বহু খেলা বাকী এবং অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফলও অপেক্ষা করছে লীগের জন্য। মোহনবাগান ক্লাব লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানেই অবস্থান করছে। অনেকে আশংকা করছেন চাইনিজ দলের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া মোহনবাগানের লীগের খেলার মধ্যে দেখা দিতে পারে।

জর্জ টেলিগ্রাফ সবচেয়ে কম পয়েণ্ট পেয়ে লীগের সর্বনিম্নে রয়েছে। তবে উয়াড়ী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, কালীঘাট, পুলিশ, বালী প্রতিভা কারো অবস্থাই ভাল নয়। সবারই দ্বিতীয় ডিভিসনে অবতরণের আশংকা আছে।

মোহনবাগানের কে পাল এবং রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের পি কে ব্যানার্জী গোল-দাতাদের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন। দুইজনেই গোল করেছেন ছয়টি করে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আবিদ পাঁচটি আর মোহনবাগানের এস ব্যানার্জী চারটি গোল করেছেন। আর কেউ চারটি গোল করতে পারেননি।

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিসনের ফলাফল:

৩০শে মে

পুলিশ (২) : কালীঘাট (০)
বি এন আর (১) : উয়াড়ী (০)

১লা জুন

রাজস্থান (৩) : উয়াড়ী (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (২) : খিদিরপুর (০)
বি এন আর (০) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

৫ই জুন চ্যারিটি ম্যাচ

ইস্টবেঙ্গল (৩) : মহমেডান স্পোর্টিং (০)

দেশী সংবাদ

২৯শে মে—উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে বেলিয়াঘাটা থানায় এই মর্মে এক এজাহার দেওয়া হয় যে, অদ্য সকালে শিয়ালদহে পূর্ব রেলওয়ে ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসের লোহার সিন্দুক খুলিয়া কিঞ্চিদধিক ৪২,০০০ টাকা খোয়া গিয়াছে দেখা যায়।

অদ্য জানা গিয়াছে যে, ভারত এবং পাকিস্থানের রেল কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যাত্রীদের থ্রু-বুকিং-এর বিষয়ে একমত হইয়াছেন এবং এখন তাঁহারা ইহাকে কার্যকরী করার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

৩০শে জুন—আজ লোকসভায় নিবারক নিরোধ আইনের কার্যকাল উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত বলবৎ রাখার বিষয় অনুমোদিত হইয়াছে।

মাত্র এক হাজার টাকার জন্য অদ্য সকালে পোনে এগারোটা নাগাদ ইডেন হাসপাতাল রোডের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে জনৈক নিরীহ ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের স্থলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ স্থির করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩১শে মে—গতকল্য রাত্রি প্রায় সোয়া দুই ঘটিকার সময় ইণ্টালী এলাকায় একদল সশস্ত্র লোক কনভেণ্ট রোডস্থিত এক মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর গদীতে হানা দিয়া তিনটি ক্যাশ বাক্স এবং একটি লোহার সিন্দুকসহ অনুমান ১৮ হাজার টাকা নগদ এবং ৫০ তোলা পরিমাণ সোনা লুণ্ঠন করিয়া বাহিরে অপেক্ষমান এক লরীযোগে সরিয়া পড়ে।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যাভাব লাঘব করার জন্য ভারত পাকিস্থানকে ৫ হাজার টন চাউল দান করিয়াছে।

ভাগলপুরের পিরপাঁহুটি থানা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, নওয়াদার বাল্য গোপ নামক জনৈক বৃদ্ধ ১১১ বৎসর বয়সে স্বীয় পল্লী ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১লা জুন—অদ্য সকালে ঠিক আটটার সময় প্রার্থনা করিয়া আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁহার তিন দিনব্যাপী 'আত্মশুদ্ধি' অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

অদ্য দ্বিপ্রহরে পুলিস কলিকাতার এক বস্তীতে হানা দিয়া একটি 'গুপ্ত গুদাম' হইতে বহুল পরিমাণ ঔষধ ও হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ উদ্ধার করে। কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল হইতে এগুলি চোরাই পাচার হইয়াছে বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে। উপরোক্ত ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণাদির মূল্য ৩৫ হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রে ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রবাহের ফলে কলিকাতা হইতে ৯০ মাইল দূরবর্তী গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলের কাছে কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের একটি ৪০০ টনের জাহাজ নিখোঁজ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ঐ জাহাজে ২৩জন আরোহী আছে।

২রা জুন—অদ্য বেলা ৩টার সময় 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা সিদ্ধার্থনগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সূচনা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৪ শত সদস্যের মধ্যে ২৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওজস্বিনী ভাষায় দেশে যে সমস্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী, হিংসাত্মক, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নিচাশয় শক্তি মাথা-চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তৎসমুদয়ের তীব্র নিন্দা করেন।

কংগ্রেস কমিটির অদ্যকার প্রাতঃকালীন অধিবেশনে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে রাজ্য পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষা কবচের ব্যবস্থা হয়। অপর প্রস্তাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিরাট গঠনমূলক উদ্যোগে জাতীর আহ্বানে সকল কংগ্রেসসেবীকে সমবেত হওয়ার জন্য বলা হয়।

৩রা জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, রাজ্য পুনর্গঠন বিলের বিধান অনুযায়ী বোম্বাই শহর কেন্দ্রীয় শাসনাধীন থাকিবে।

আটটি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর অদ্য অপরাহ্ন ৫-৪৫ মিনিটে এখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

অদ্য বিশ্বভারতী সংসদের সভায় প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন।

৪ঠা জুন—কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিস মধ্য কলিকাতায় গত কাল রাত্রে এবং সোমবার দিনে আরো দুইটি বাড়ি তল্লাসী করিয়া হাসপাতালের চোরাই মাল সন্দেহে পুনরায় প্রচুর পরিমাণ ঔষধপত্র উদ্ধার করে।

কাঁথি মহকুমার ৮ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় অর্ধাংশ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা, বিশেষভাবে কাঁথি মহকুমার উপর দিয়া প্রবাহিত ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে মে—অদ্যকার 'আশাহি' পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, রবিবার প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে বলিয়া এক অসমর্থিত সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর হইতে জাপানীদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

৩০শে মে—আজাদ কাশ্মীর সরকারের প্রেসিডেণ্ট কর্নেল শের আহমেদ ও তাঁহার মন্ত্রিসভার চারিজন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

ঢাকা সদর মহকুমা অফিসার অদ্য ১৪৪ ধারানুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া শহরের সর্বত্র সভা-সমিতি শোভাযাত্রা এবং পাঁচ জনের অধিক লোকের একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

৩১শে মে—পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মস্কো হইতে এক বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অদ্য করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

১লা জুন—অদ্য রাত্রে পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব পাকিস্থানে প্রেসিডেণ্টের শাসন প্রত্যাহার করেন। গত শনিবার পূর্ব পাকিস্থানে প্রেসিডেণ্টের শাসন বলবৎ করা হইয়াছিল।

সোভিয়েট তাস এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে, সুপ্রীম সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

২রা জুন—যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো অদ্য মস্কো উপনীত হইয়াছেন। তিনি রাশিয়ায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন।

অদ্য এক বেসরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে, দক্ষিণপূর্ব আলজিরিয়ায় ফরাসী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে অন্যূন ৩০০ বিদ্রোহী নিহত ও ১৫০ জন বন্দী হইয়াছে।

৩রা জুন—মে মাসে ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার মানমন্দিরে শুক্র গ্রহ হইতে প্রেরিত কয়েকটি জোরালো বেতার সংকেত ধরা পড়ে।

চীনের রাজধানী আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পিকিংয়ের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরসমূহ ভাঙিয়া ফেলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

৪ঠা জুন—নেতাজী বসুর মৃত্যু সম্পর্কে কমিটি কর্তৃক জাপানে তদন্ত কার্য শেষ হইয়াছে। কমিটি আগামী ৩০শে জুন ভারত সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু আজ রাত্রে মন্ত্রিমণ্ডলীর এক সভায় ব্রহ্ম সরকার হইতে তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার চট্টগ্রামের নিকটে সমুদ্রে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ একটি মেইল ষ্টীমার নিমজ্জিত হয়। ফলে ষ্টীমারের ১৭২ যাত্রী ৩০ জন খালাসীর অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬নং সুতার কিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

SISTA'S AML-21-BEN

টিনোপাল শুভ্র কাপড়কে শুভ্রতর করে তোলে

সাদা। উজ্জ্বল সাদা। সবচেয়ে সাদা। একমাত্র টিনোপালেই তা সম্ভব। টিনোপাল ব্যবহারের পরে আপনার কাপড়জামার শুভ্রতা এবং উজ্জ্বলতা দেখলে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। অল্প পরিমাণ টিনোপাল আপনার কাপড়জামায় এই অদ্ভুত পরিবর্তন আনতে পারে।
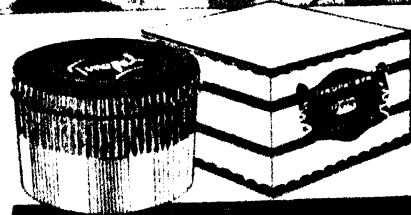
"টিনোপাল" হচ্ছে জে, আর, গেইগি, এস, এ, বাসেল, সুইজারল্যান্ড এর রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক।

এমালগামেটেড কেমিকালস্ এণ্ড ডাইষ্টাফ্‌স কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
পোঃ আঃ বক্স ৯৬৫ বোম্বাই

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY 16th JUNE 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৩৩ সংখ্যা ॥
শনিবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
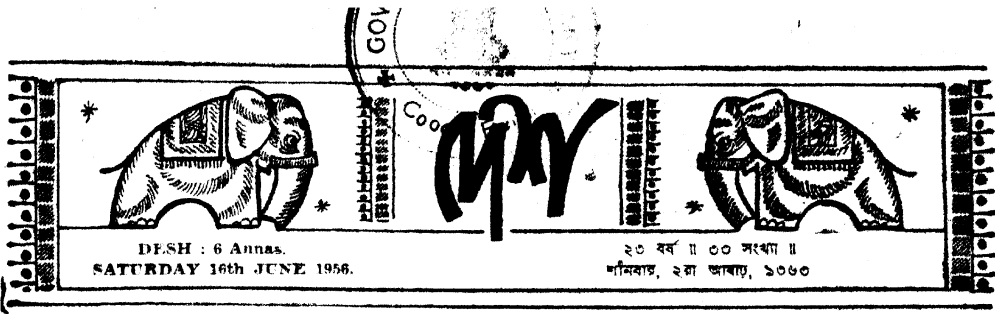
শহরের হাসপাতালসমূহের অবস্থা

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখা কলিকাতার হাসপাতাল-সমূহের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি কমিটির সাহায্যে তদন্ত করিয়া সম্প্রতি হাসপাতালগুলির পরিচালনক্ষেত্রে ত্রুটির কারণসমূহ নির্ণয় এবং তাহার প্রতিকার-স্বরূপ গভর্নমেণ্টকে একটি কমিশন নিয়োগ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। শহরের হাসপাতালসমূহের পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিযোগ নূতন নহে। দেখা যায় কমিশনের রিপোর্টে সেই-গুলি কয়েকটা নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। হাসপাতালসমূহে রোগীদের প্রতি দুর্ব্যবহার বা উপযুক্ত ব্যবহার করা হয় না, এই অভিযোগই প্রধান। দ্বিতীয় অভিযোগ সাধারণভাবে এই যে, হাসপাতালসমূহ উচ্চ বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম শ্রমিক পর্যন্ত সকলেই রোগীদের সম্বন্ধে উদাসীন অধিকন্তু অনেকে দস্তুরমত দুর্নীতিপরায়ণ। বিনা পয়সার বেডগুলি গরীবদের ভাগ্যে জোটে না। উপরওয়ালাদের সঙ্গে যাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, শুধু তাহারাই অসঙ্গত-ভাবে শুশ্রূষার এই সুবিধাক্ষেত্র জুড়িয়া বসে। অভিযোগগুলির গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না এবং অবিলম্বে এইগুলির প্রতিকার সাধিত হয়, ইহাও কামনা করিবেন। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। এসোসিয়েশন তাঁহাদের রিপোর্টে সেই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। বিষয়টি হইল এই, হাসপাতাল পরিচালনা যাহাতে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলিতে পারে, এরূপ যথেষ্ট কর্মচারীর সেগুলিতে অভাব রহিয়াছে। ইহার উপর ঔষধপত্রেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ইহার ফলে চিকিৎসকেরা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও রোগীর অদৃষ্টে তাহা কাজে আসে না। হাসপাতালের শ্রমিকদের অপরাধের উপর গুরুত্ব সকলের দৃষ্টিতে সর্বাধিকভাবে পড়ে এবং ইহাদের কাজের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাও সকল দিক হইতে উঠে। কিন্তু জীবন-ধারণের উপযোগী পর্যাপ্ত বেতন ইহারা পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদিগকে দিনে ১২ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়। ছুটির ব্যবস্থা ইহাদের কাজে নাই। এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর মেজাজ যে খিটখিটে হইয়া উঠিবে এবং বিছানার নীচে টাকাপয়সা না রাখিলে যে ইহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া যাইবে না, এমন অবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলা যায় কি? প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালগুলির এইসব অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থার জন্য গভর্নমেণ্টই দায়ী। হাস-পাতালসমূহের কাজ যাহাতে সুপরিচালিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা গভর্নমেণ্টেরই কর্তব্য। লোকের জীবন-মরণের এই প্রশ্নটি উপেক্ষার বিষয় নিশ্চয়ই নয়। কতকগুলি সীট বাড়াইয়া হাসপাতালের নামে দুর্নীতি এবং আর্ত ও পীড়িতের দুর্গতির কারণ সৃষ্টি করাতে কোন লাভ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বর্তমানে রাজনীতি অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির উপায়স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। হাসপাতালসমূহ এমন আওতায় যাহাতে না পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এ সম্বন্ধে সরকারের নিকট যে সুপারিশ করিয়াছেন, তদনুযায়ী কাজ করা হইলে হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থা উন্নততর হইবে এবং জনসাধারণও অধিকতর উপকৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উচ্চশিক্ষার বিস্তারে উদ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে আরও দুইটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। এই দুইটির একটি বর্ধমানে অপরটি দার্জিলিঙে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারত সরকারের উদ্যোগেও বিভিন্ন স্থানে সাতটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হইয়াছে, খড়্গপুরের কারিগরী শিক্ষায়তনটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদান করা হইবে। বেনারসের বর্তমান সংস্কৃত কলেজটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে। অপর চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি উজ্জয়িনী, একটি গোরখপুর, অপরটি কুরুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যুগোচিত আদর্শের সঙ্গে এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সংযোগ রক্ষা প্রয়োজন, সকলেই স্বীকার করিবেন। বৈচিত্র্যের ভিতরে সমন্বয় সাধনকে উচ্চশিক্ষার মৌলিক আদর্শ বলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতের ঐক্য এবং সংস্কৃতির উদার আদর্শকে নবগঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ যাহাতে সুদৃঢ় করিয়া তোলে এইগুলির প্রতিষ্ঠার মূলে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

রাজনীতিক জাতিভেদ

আচার্য বিনোবা ভাবে সম্প্রতি এদেশের রাজনীতিক দলসমূহের উপদলীয় মনো-বৃত্তির জন্য এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা অনেকটা হ্রাস পাইলেও এইসব দল নূতন আকারে জাতিভেদ গড়িয়া তুলিতেছে। গণতান্ত্রিক শাসন বিভিন্ন দলের ভিত্তিতেই চালিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দলের পারস্পরিক

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমাজ-জীবনে বিচ্ছেদ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং প্রশ্নটি অনেকটা জটিল; কিন্তু রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন এবং জনসেবার আদর্শ যদি বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে পরিচালিত করে, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য নীতিগত পার্থক্য সমগ্রভাবে সমাজ বা রাষ্ট্র-জীবনে সংকট সৃষ্টি করে না। গণ-তান্ত্রিকতার পথে সমাজ-জীবনের সর্বাংগীণ সংগতি সাধনের ইহাই প্রশস্ত পথ। দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশের বর্তমান রাজনীতি জনসেবার এই আদর্শের দ্বারা সর্বতোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতেছে না; পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি রাজনীতিক সাধনার ক্ষেত্রকে অভিদ্রুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর নৈতিক দিক হইতে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে না, পরন্তু দুর্নীতির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই অবস্থা অত্যন্ত আতঙ্ক-জনক। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক সাধনার ক্ষেত্রে নৈতিক চেতনা যদি জনসেবার প্রেরণায় বলিষ্ঠ হইয়া না উঠে, তাহা হইলে দেশের ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনাসমূহও কোন কাজে আসিবে না। সমগ্রের স্বার্থ সাধনের ভাবনাই দেশ এবং জাতিকে বড় করে; শুধু গঠন পরিকল্পনা প্রণয়নে মনীষার প্রভাবে কোন জাতি বড় হয় না। বর্তমানে এই সত্যটি বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবর্গের বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। অপরকে দাবাইয়া নিজেকে বড় করিবার দিকেই সকলের নজর। নেতৃত্বের অভিমান প্রকৃত নেতৃত্বের দায়িত্ব এবং গুরুত্বকে ক্ষুন্ন করিবার জন্য আজ স্পর্ধিত।

শান্তিপুরের অভিযোগ

শান্তিপুরের তন্তুব্যবসায়িগণ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, সেখানকার তন্তু-ব্যবসায় সমবায় সমিতিসমূহের প্রতি সরকার যথোচিত সুবিচার করিতেছেন না। তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, এতদিন সরকার হইতে তাঁহাদিগকে যে পরিমাণ সুতা সরবরাহ করা হইত, আজকাল সে পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। সুতার অভাবে শান্তি-পুরের অধিকাংশ তাঁত অচল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ৫ হাজারের অধিক তন্তুবায় বেকার অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। তন্তু-ব্যবসায়ীদের এই অভিযোগ সত্য হইলে সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। বর্তমানের এই দুর্দিনে এইরূপ বেকার সমস্যা সৃষ্টি করিলে সমাজে অসন্তোষের ভাবই বৃদ্ধি পাইবে। শুধু ইহাই নয়, শান্তিপুরের কাপড় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বস্তু। এই রাজ্যের এমন একটি মূল্যবান শিল্পসম্পদের সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটে, দেশের কল্যাণকামী কেহই ইহা চাহিবেন না। এই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজেদের বক্তব্য কি, দেশের লোকের নিকট প্রকাশ করা কর্তব্য।

বন্যায় বিপদ এবং বিপর্যয়

প্রবল বারিবর্ষণের ফলে মেদিনীপুর জেলার ব্যাপক অঞ্চলে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা খুবই গুরুতর। বন্যায় ৫ জন লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘরবাড়ি এবং ধনসম্পত্তির ক্ষতি কোটি টাকার উপরে বলিয়া অনুমিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিপন্ন নরনারীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে দ্রুততার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু দুর্গত এইসব নরনারীদিগকে খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান কিংবা মহামারী প্রতিষেধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই সরকারের কর্তব্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। গত দুই বৎসর হইতে মেদিনী-পুরে ফসলের অবস্থা ভাল যায় নাই, অথচ কৃষিই এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা। এরূপ অবস্থায় বন্যার ফলে যাহারা নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাদের গৃহ-নির্মাণ কার্যে এবং চাষবাসের জন্য গো-মহিষ ক্রয়ে অর্থসাহায্য প্রদান করাও সরকারের পক্ষে কর্তব্য। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যাহাতে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য পায় এজন্য কয়মাস পর্যন্ত সরকারপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে বন্যার এই বিপর্যয়ের কয়েকদিন পরেই আসাম হইতে প্রবল প্লাবন-পীড়নের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দি মহকুমা বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। করিমগঞ্জের ব্যাপক অঞ্চল বিপন্ন। মণি-পুরের অবস্থাও আতঙ্কজনক। আগরতলা পুরেই বন্যার জলে প্লাবিত হয়। সেখানে বন্যার জলে ১২ জন লোক মারা গিয়াছে। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিপন্ন নরনারীর রক্ষাকল্পে সাহায্য কার্যে অগ্রসর হইবেন। বেসরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহেরও মানব-সেবার এই মহান্ ব্রতে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

পাকিস্থানে কুগ্রহের প্রভাব

ডাঃ খান সাহেব বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রিপাবলি-কান দলের নেতা। তিনি সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূল ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভারত বিভক্ত হয়। এখন যৌথ নির্বাচন-প্রথা স্বীকার করিয়া লইলে পাকিস্থান সৃষ্টির মূলতত্ত্বের উপরই আঘাত করা হইবে। শুধু ইহাই নয়, কাশ্মীরের প্রশ্নটি বিশ্ব-রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত করা হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যৌথ নির্বাচন-নীতি পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রে পরিগৃহীত হইলে পাকিস্থানের পক্ষে দুর্বল হইয়া পড়িবে। খান সাহেবের যুক্তি সত্যই উদ্ভট এবং উৎকট। পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাগত মূল নীতিতেই গলদ রহিয়াছে, সে গলদ স্বীকারে যতই সঙ্কোচ থাকুক না কেন, রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা লাভের প্রশ্নটিই বর্তমান ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রের কল্যাণকামীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যৌথ নির্বাচন সমর্থন করিলে অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাধিকার পাকিস্থানে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত রাখিলেই কাশ্মীরের অধিবাসীরা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে আকুল হইয়া পড়িবে, এমন ধারণাও ভ্রান্ত। যদি মুসলমান সমাজের সকলেরই তাহাই কাম্য হইত, তবে মুসলমান সম্প্রদায় ভারত ছাড়িয়া পাকিস্থানের অভিমুখে ছুটিত। প্রকৃতপক্ষে ধর্মান্ধতার মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক প্রভাবিত, তাহারা মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা বোঝে না, এরূপ মনে করিলে সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবমাননাই করা হয়। ফলত উপদলীয় চক্রান্তের চাপে পড়িয়া খানসাহেব তাঁহার রাজনীতিক আদর্শের একান্তভাবেই অপচয় ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে পরাজিত করিবার দায়ে তিনি এবং তাঁহার রিপাবলিকান দল লীগের খপ্পরের মধ্যেই কার্যত গিয়া পড়িতেছেন। যুক্তফ্রণ্ট ইতঃপূর্বেই সেইদিকে ঝুঁকিয়া-ছেন। বাকী আওয়ামী লীগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন যোগাইবার দায়ে তাঁহারাও কোথায় গিয়া পড়িবেন, এখনও বলা যায় না। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতা সমর্থনের এমন মনোবৃত্তি পাকিস্থানের অগ্রনীতিকে ব্যাহত করিবে এবং তাহার বিড়ম্বনাই ক্রমাগত বাড়াইবে।

॥ কবি মোহিতলাল ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সূর্যের আলোয় সব আতশবাজিই অচল।

কিন্তু সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এ উপমা ঠিক বোধ হয় খাটে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অনতিক্রমণীয়, বিশালতায় না হোক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে দু-চারটি প্রতিভার আশ্চর্য দীপ্তি, তখনও আমরা দেখেছি।

কবি মোহিতলাল এই বিশিষ্টদের মধ্যেও বিশেষ একজন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই তাঁর অমোঘ প্রভাব—এড়িয়ে গিয়ে নয়, আত্মসাৎ করে, বাংলা কাব্যে প্রথম স্বতন্ত্র নতুন স্বাদ যদি কেউ এনে থাকেন, তাহলে তিনি কবি মোহিতলাল।

রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেই গত পাঁচ দশকে বাংলা-কাব্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্দোলনে দুলেছে। সে আন্দোলনে ঝড়ের মত অকস্মাৎ দিগ্বিদিক আলোড়িত করে যাবার দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি। কিন্তু বিদ্রোহের যে ঝটিকা আমাদের সচকিত বিস্মিত করে আমাদের দৃষ্টিকেও কিছুকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে, উৎপত্তি খুঁজতে গেলে দেখা যাবে সে ঝড় গভীরতর এক আলোড়নের প্রতিক্রিয়া মাত্র। সে আলোড়নের মূলে আছেন কবি মোহিতলাল। তাঁর সংযত সংহত শক্তি ঝটিকার আস্ফালনে কখনো দেখা দেয়নি কিন্তু বাংলা কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে তিনিই প্রথম নাড়া দিয়েছেন।

মোহিতলালের কাব্যজীবন যখন শুরু তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-জগতে পরিব্যাপ্ত। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অটল হয়ে থাকবার মত শক্তিমান কবি তখন নেই বললেই হয়। এই সময়ে প্রায় গতানুগতিকভাবেই ছন্দ ও ভাষার কিছু কুশলতা নিয়ে মোহিতলাল তাঁর প্রথম কবিতা রচনা শুরু করেন। কিন্তু স্বপন-পসারী গোড়া থেকে পড়তে আরম্ভ করলেই দেখা যাবে দুটি কি তিনটি কবিতার পরই দুর্বল একটি ক্ষীণ কাব্যধারা যেন হঠাৎ বিপুল প্লাবনের বেগ কোন অফুরন্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করেছে। এ বেগ ও বলিষ্ঠতা বাংলা কাব্যে তখন অনুপস্থিত ছিল একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি সেই সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, তার এই বিশেষ প্রেরণা ও প্রকাশভঙ্গি আগে কখনও দেখা যায় নি।

মোহিতলালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল প্রথম কবিতা বোধহয় 'অঘোর-পন্থী'। এ কবিতা প্রকাশিত হওয়ামাত্র তখনকার সাহিত্য-যুব-জন-চিত্ত যে জয় করে নিয়েছিল তার প্রধান কারণ হয়ত তার মাত্রাহীন উগ্রতা, কিন্তু এই উগ্রতাই তার সব নয়। এই উগ্রতার পেছনে আরো গভীর এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পাঠক-মন যার জন্যে তখন নিজেরাও অজ্ঞাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত চাকুরে বাঙালীর সৃষ্টি বললে খুব ভুল বলা হয় না। সেই চাকুরে বাঙালী তার সুখস্বপ্নের রাজ্যের ভাঙন সম্বন্ধে তখনই ভালো করে সচেতন হতে শুরু করেছে। আসল ও নকল অধ্যাত্মচিন্তার শৌখিন বিলাসে তেমন রুচি আর তার নেই। এই কিছুটা দিশাহারা কিছু বাস্তবতা-সন্ধানী

বাঙালী পাঠক-মন মোহিতলালের কবিতায় যেন তাদের মনের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিধ্বনি প্রথম খুঁজে পেল।

ঊর্দ্ধমুখে খেয়াইয়া রক্তোহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নিরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,—
বুভুক্ষু মানব লাগি রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব
হে কবি-বাসব?

দেহবাদ বলে এ কাব্য-প্রেরণার ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ নামকরণ যারা করলেন, এ কাব্যের বলিষ্ঠ বেগ তাঁরাও পরোক্ষভাবে স্বীকার না করে পারলেন না। এ বলিষ্ঠতা শুধু সাময়িক উত্তেজনায় পুষ্ট হলে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তার আবেদন অনেক আগেই ক্ষীণ হয়ে যেত, তখনকার অনেক কবিতারই যা হয়েছে। কিন্তু মোহিতলালের বলিষ্ঠ বেগের উৎস কোন বাহ্যিক বিপর্যয়ের মধ্যে নেই। তা আরো অনেক গভীর। আমাদের জীবন-বোধের তীব্রতা থেকেই তা উৎসারিত। যে বেগ অক্ষম হাতে শুধু উগ্রতায় অপব্যয়িত হতে পারত মোহিতলালের হাতে তা এমন একটি সুতীব্র স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে, কাব্য-রীতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যার মূল্য আজও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মৃত্যুর বরণ নীল,—শুনেছিনু কবে সে কোথায়!
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম?

উমার কপোল-শোভী সে কি নীল অলকের প্রায়?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়—
নিবিড় আয়স-নীল!—তেমনি সে আঁখির আরাম?
কিম্বা সে কি দিকপ্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম,
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল!—পরে যে অশনি গরজায়!

উপমা মনোর্মি খেলা; প্রাণ বুঝে উপমা বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর;
নীলাকাশতলে যথা সিন্ধুজল নীল নিরন্তর,—
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে!
সে নহে যমুনা-জল, নবঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য!—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

শুধু বেগের দিক দিয়ে নয়, বক্তব্য ও বলার ভঙ্গির দিক দিয়েও মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই সুপরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়-গোচর অনুভূতির বাইরে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে তিনি সহজে সম্মত নন, কিন্তু সেই মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির এমন তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ এমন সুনিপুণ হাতে কেউ বুঝি আগে পরিবেশন করেন নি।

দেহবাদ নয়, মোহিতলালের কাব্যের সত্যকার প্রেরণা হল মোহমুক্ত সবল দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে দুরন্ত জীবন-পিপাসা। একদিকে যেমন ধোঁয়াটে ভাবের অস্পষ্টতা তাঁর অসহ্য, আরেক দিকে এই জীবনের তীব্র তৃষ্ণাও উচ্ছ্বাসের তরলতা প্রকাশ করার তিনি বিরোধী। তাঁর কবিতার প্রচণ্ড আবেগও দৃঢ় অকম্পিত রেখায় রূপায়িত। তাঁর কাব্যে তাই ভাস্কর্যের কঠিন সূক্ষ্ম সুষমা। স্থাপত্যের মহান অটল গাম্ভীর্য।

বাংলা কাব্য স্বাভাবিক নিয়মেই বর্তমানে নতুন দিগন্ত সন্ধানে উৎসুক একথা সত্য, কিন্তু পরিচিত তীর থেকে পরম দুঃসাহসে প্রথম যিনি তরীর নোঙর তুলেছিলেন, দুই যোজকের মাঝখানে তাঁর বিরাট বলিষ্ঠ কাব্য-কীর্তি চিরদিন সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। *

* 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড' হইতে প্রকাশিতব্য 'মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা।

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময়ে মেয়েটা আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আবার ধ্বক ধ্বক করে উঠল হরেনের বুকের মধ্যে। তার লিকলিকে শরীরের রক্তে রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরো তোলপাড় করে উঠল। দেখল, মেয়েটাও ওর লোক-জনের সঙ্গে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা?

ছোট স্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কয়েক-জন। কিছু ক্ষেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকি-টাকি সামান্য জিনিস হাতে কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা ভেজা একটা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয়, এখনো হচ্ছে। তেমন জোরে নয়। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইলশাগুঁড়ি ছাট। এর আগের রাস্তায় জল আরো তোড়ে নেমেছে। ট্রেনের ছাদ দিয়ে জল প'ড়ে কামরাগুলি পর্যন্ত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছিল, গাড়িটাই বুঝি লাইন থেকে হড়কে পড়ে যাবে।

আষাঢ় মাস। কিন্তু যেন শ্রাবণের ধারা লেগেছে। মাঝে মাঝে থমকায়। একটু আশা দেয়। আকাশ দাঁত খিঁচোয় দূরে দূরে। ভাবখানা, যাব যা, নইলে এলুম বলে।

এসেই আছে। গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশটা অষ্টপ্রহর নামছে। মেঘ দলা পাকাচ্ছে উঁচু চড়াইয়ের মাথায়। মনে হয়, চড়াই পেরিয়ে উৎরাইয়ের ঢালু প্রান্তর দলা দলা মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও চাষ-আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। যা আছে, খুব সামান্য। সবটাই লাল কাঁকর পাথরে ভরা। মাঝে মাঝে

কাজল চোখের চকিত চাউনির মত সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক সার ভূতের মত মাথা তুলেছে সোজা বাঁকা তালগাছ। তার ঘন বেষ্টনীতে থোঁচা থোঁচা হয়ে আছে মেঘ অন্ধকার। তারপর দম আটকে চড়াই উঠেছে ঠেলে ঠেলে, হামাগুড়ি দিয়ে। এমন সময় আচমকা কয়েকটা শাল-গাছ। অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পলাশগাছ জলের ফোঁটা পড়া পাতায় পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ণ চোখে। তারপর কিছু নেই, যতদূরে চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই উঁচু-নীচু বিশাল প্রান্তর যেন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী প'ড়ে প'ড়ে প্রতি লোমকূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আষাঢ়ের ঢলে।

স্টেসনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল পরগণার সীমানা। পশ্চিমে, দূরে, মেঘের কোলে মেঘের মত জেগে রয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূরে দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতি-বিধি। যাদের সঙ্গে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো, একটা বুড়ি, একটি মাঝবয়সী মেয়ে-মানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা হুকো বোঁচকা এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে কাঁধে ঝুলছে। চাষের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল সাঁওতাল। কথা শুনে বুঝল, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগদী হবে। গাড়িতে উঠেছে ওরা নলহাটি থেকে।

মরদ নেই সঙ্গে। মনে হচ্ছে, মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়ে। যেন ঝুঁটিওয়ালী একটি কালো মেয়ে পায়রা। মদ্দা এসে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায়, বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্ বকম্। কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে। আর সঙ্গেও

কয়েকটা বুড়োবুড়ি। তবে এত হাসির ঢুলুনি ঢলানি কিসের।

গাড়িতে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। হরেন তার জীবনে অনেক মদ খাওয়া মেয়ে-মানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটার টানা টানা চোখ দুটিও যেন মদ খাওয়া চোখ। একদিকে যেমন শান দেওয়া, আর একদিকে তেমনি ঢুলুঢুলু। নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধরেও গেছে হরেনের। হেসে হেসে গাড়ির অনেকের প্রাণেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায়, হাসিতে। রং করার ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এরা?

সে ওই দলটার পেছনে পেছনে এসে দাঁড়াল স্টেশনের বাইরে। পরনে তার ফিন-ফিনে মিলের ধুতি, পপ্লিনের চকচকে সার্ট। পায়ে কালো রং-এর বুট জুতো। রংটা ফর্সা, কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চল্লিশেরও বেশী। শরীরের কয়টা জামার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। যেন বাঁশ-ব্যাকারীর কাঠামোর উপরে ঝুলছে জামাটি। শালিকের মত সরু বুক। তার উপরে আবার বোতাম খুলে দিয়েছে বুকের। গায়ে এসেন্সের গন্ধ।

বাপের আছে ভাল জমিজমা, ঘর পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুলকুনুটি বংশ কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহর শিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজের এক ক্লাশে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা সরস্বতীর পায়েই দেয়। তিনি হলেন দুষ্টু সরস্বতী। বিদ্যার প্রকৃতিটা একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, এ নেশা আট বছর ধরে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়। আর নেশার মত বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটিকে ভাল করে দেখল সে। গায়ে জামা নেই। নিভাঁজ গ্রীবার নীচে দিয়ে, রুপোর বিছে-হার বুকের টান টান কাপড়ের ঢাকায় হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা দুটি পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁদুরের আভাস দেখা গেল এবার। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকাল হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটির কাছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে কি যেন বলল ফিস্ ফিস্ করে। মাঝবয়সী মেয়েমানুষটি ফিরে তাকাল। তারপর তাকাল বুড়োবুড়ি। কেমন যেন ছেলে-মানুষের মত চাউনি বুড়োবুড়ির।

বুড়ো বলল হরেনকে, কুথাকে যাবেন গ' বাবু?

যাক, মুখ খোলা গেল। এবার জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বলল, কে আমি? যাব তো রলাটি, কিন্তু—

রলাটি? ওরা সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল তার দিকে। বলল, অলাটি যাবেন। আপুনি। আরে বাপ! গাড়ি নাই, গরু নাই, দুস্তর রাস্তা ম্যাঘ-বিষ্টি। কী করে যাবেন গ'।

সেইটেই এতক্ষণে হুঁশ্ হল হরেনের। তাইতো, চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে গরুরগাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় যাবে?

অলাটি।

রলাটি?

হুঁ। কি শহুরে যাই। মজুরি খাটতে যাই গ'। ইবারে এট্টুস আগে আগে বেরলম। দেখেন ক্যানে আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে দিবে মনে হচ্ছে।

হরেনের প্রাণে রস নামল আরো। রলাটি যাবে তা'হলে? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইল সে। বলল, কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস্? কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটির দিকে। জবাব বুড়োই দিল, ইন্দির চাটুজ্যে মশায়ের ঘরে। অলাটির কুন্ ঘর আপনাকাদের?

গদাই রায়, মানে গদাধর—

হুঁ হুঁ, বুঝেলাম গ'। তা আপুনি—

কথার মাঝেই সেই মেয়েটি কপট রোষে ফুঁসে উঠল, আ কী মন্তারা গ'। গল্প করছ, ইদিকে যে দিন যায়।

সবাই নড়েচড়ে উঠল। বুড়ো বলল হরেনকে, চলি গ' বাবু। সাত ক্রোশ রাস্তা যেতে যেতে বাতি জ্বলাবে ঘরে।

হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা বোকা মনে হতে লাগল। সে কিছু স্থির করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার উপরে জল। ফিস্ ফিস্ ক'রে পড়ছেই। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মত হা ক'রে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

চোখাচোখি হ'তে মেয়েটা আবার হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। সারা শরীরের সঙ্গে রুপোর বিছেহারটিও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পেছনে। খোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটা তুলে, মাথায় বসিয়ে দিল টোকা। বুকে কেটে কেটে বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ডহীনের মত দাঁড়িয়ে রইল হরেন। ভাবল, হুঁ! রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাট্কা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। ক্ষেপা খ্যাপা কুকুরের মত দূরে

আকাশ গর্‌গর্‌ করছে থেকে থেকে। থেকে থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে একেবারে। আবার যেন কেউ পেন্সিল টেনে বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একটিও। সামনের রাস্তাটা সরু, আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে, বীরভূমের সীমানা পার হয়ে সাঁওতাল পরগণা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ একটি বাঙালী গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইল হরেন। আবার ফিরে তাকাল দলটির দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পেছনে। তাকিয়েও বুকটা ধনরন্‌ করে উঠল। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু, পেছনটা যেন সমস্ত দলটিকে সাপটে হাঁসিনীর মত দুলে দুলে চলেছে। দেখতে দেখতে আবার কানে এসে পৌঁছল হাসির অস্ফুট নিক্কন।

আর দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল হরেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরে পশ্চিমে আকাশটা চিরে খেয়ে গেল বিদ্যুৎকষায়। মাটি যেন রক্তক মুখ হাঁ করে হেসে উঠল। বাজ হানল আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ল। সামনের ন্যাড়া তালগাছে সভয়ে কা কা করে উঠল একটা কাক। হরেন চীৎকার করে ডাক দিল, ওহে, ও বুড়া, শুনে ক্যানে।

ওরা দাঁড়াল চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝল হরেন, বুট জুতো কামড়ে কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকুনি যেতে হাঁফ ধরে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

মেয়েটি তার দিকেই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মস্‌করা, সহসা বোঝা যায় না। কালো-পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বলল হরেন, গাড়ি আসেনি, আসবে কিনা কে জানে। চ' তোদের সঙ্গেই হাঁটা দি'।

বুড়ো বলল, আরে বাপ্‌! ই হয় না। আমরা জনমজুরে মানুষ, তাতেই আসামরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।

বুড়ি সস্নেহ গলায় বলল, হুঁ। না না, ই হয় না।

মেয়েটি হঠাৎ ধারালো ছুরির মত চকিত হেসে বলল, প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে। ব'লেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠল।

বুড়ি বলল, আঃ, ই কি হাসি। বড় বেহায়া তু বউ।

মাঝবয়সী মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বলল, আকাশের গতিক ভাল না। আপুনি থাকেন গ'। অলাটি কি এখানে? আমরা যেঁছি, গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলব।

হরেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, না, যাব। এই তোরা কাজনা বইছিস। দুটো সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে চলে যাব।

আবার চিক্‌চিক্‌ বিদ্যুৎ হানল। মেয়েটাও হাসল বিদ্যুতের মত। আবার এক ঝলক বাতাস নামল হুস্‌ করে। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মত চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়াল।

বুড়োবুড়ি খানিকটা অসহায়ের মত চুপচাপ রইল। তারপর হাঁটা ধরল। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে মেঘে হারিয়ে যাবে, সেইদিকে নিশানা।

বাতাস এলে হাট বেশী আসে। নইলে মন্থর ফিস্‌ফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ে ধরে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা' হাঁটলে পাঁচ পা এগুনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিকে ঘেঁষে চলল। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে দেখতে গান মনে পড়ল। মনে পড়তেই গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গেয়ে উঠল,

সখী আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও...

ওদিকে চোখাচোখি হ'ল মাঝবয়সীর সঙ্গে মেয়েটির। আবার হাসি। বুড়োবুড়ি নির্বিকারভাবে উঠছে ঠেলে ঠেলে।

ওরা যত ওঠে, আকাশ তত ওঠে। উপরে বাতাসের জোর বেশী। বড় চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপরে উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা' টেনে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের উপর দিয়ে চলল সবাই। ঘাসে পেছলায় কম। কিন্তু ঘাসের তলে তলে পাঁক। টেনে টেনে ধরে। মস্ত না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশী জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে ধাপে হঠাৎ মাথা তুলেছে

কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতকগুলি দৈত্য মাথা নেড়ে নেড়ে কানাকানি করছে। খস্‌খস্ শব্দে হাসছে মানুষ দেখে। আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নীচু উঁচু। মেঘে বসছে চেপে চেপে।

মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিজ্ঞেস করল বুড়োকে, ওই বউ দুটো কে হয় বটে?

বুড়ো টোকার তলা থেকে বলল, বিটার বউ। দুটে বিটার বউ। বিটারা গেল্‌ছে সক্কালবেলা, আগে আগে। ইয়াদের লিয়ে এখন আমি চলছি।

সাবধানে সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে আগে। যেখানে জলের মত তর্‌তর্ ক'রে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দুখানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিট্‌কে যাচ্ছে রক্ত পংক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা। হরেনের কালো জুতো লাল হয়ে এসেছে। কাপড়ে লেগেছে চাপ চাপ রক্তের মত।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সংগে ভাব করা যাক আগে। বলাটির ছোকরা বাবুদের মন চেনে ওরা। কথার ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বলল, তবে ই বয়সে তুমার, দুটা বুড়াবুড়ির তো বড় কষ্ট হে?

বুড়ো হাসল টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মত। বলল, কস্‌ট?

কস্‌ট কি গ' বাবু। ই কি রোগ ব্যামো যে কস্‌ট হচ্ছে? সমসারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুন' কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবে, তখন মনে কস্‌ট হাবেক।

হরেনের মন বিগড়ে উঠল বুড়োর কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই সাঁই শব্দ। কোমরের গাঁটে গাঁটে কন্‌কনানি। আর ওর বুড়ো হাড়ে কোন কষ্ট নেই। ব্যাটা বজ্জাত, বেশীদূর হরেনকে এগুতে দিতে চায় না।

হরেন আবার বলল, তা' বউ বেটা সব চলেছে। নাতিনাতকুর নাই?

বুড়ো খালি বলল, নাঃ!

বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস আট্‌কে রইল। আট্‌কে রইল যেন সকলের বুকেই। বুড়ো, নাতি নাত-বহুড়ী আর...না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। খুঁটি পায়রার মত বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা।

কেবল পাঁকে পাঁকে থপ্ থপ্ চপ্ চপ্। কালো কালো কতকগুলি থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে। ডাকছে ওই সামনের চড়াইটার মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে ছিলিবিলি বিদ্যুৎ। চিক্‌চিক্ করছে তালবনের মাথায়। আর দগদগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুর গাড়ির লিক বেয়ে বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মত। তরল কিন্তু আঁটালো। অন্ধকার আরো নামছে। কে বলবে, এখন ভর দুপুর। যেন সাঁঝের শাঁখ বাজানোর সময় হল।

আস্তে আস্তে ওদের চারজনের গতি কমছে না। বাড়ছে। বাড়াতে হচ্ছে হরেনকেও।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুস্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এতক্ষণ ধরে চেপেছিল দম। আর সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে গলে পড়তে লাগল। পট্ পট্ ফুটতে লাগল ওদের তালপাতার টোকাগুলিতে।

তার মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বলল, হঁ, ছোট বিটার এট্টা ছেল্যা হয়েছিল। তা' পরে মরে গেল গ' বাবু। এই সিদিনে, ছ' মাসের ছেল্যা!......

বৃষ্টির গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, হুঁ-হু-হু, ও! এই মেয়েটারই ছ' মাসের ছেলে মারে গেছে। কিন্তু...

দূর! বিরক্ত হয়ে উঠল হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ছিঁড়ে গেল। কাপড়ের কোঁচা তিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মত ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল।

সে লাফিয়ে লাফিয়ে আগে গেল। আগে, মাঝবয়সীটিকে পার হয়ে তার আসলটির কাছে। হুঁ! গালের পাশে এখনো সেই হাসিটি লেগে রয়েছে। আড়চোখে দেখছে হরেনকে। দেখছে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছে ভ্রূদুটি। মন্দার ধনুসটি চায়।

পাশাপাশি দু' হাত ফারাকে এসে পড়ল হরেন। হাঁপিয়ে পড়ছে আসতে। বলল, কিরা বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস।

মেয়েটি চকিত চোখে একবার তাকিয়ে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। দেখে আরো হাসি পেল। পাওয়ার মত চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে, একটুখানি শরীরটি দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে দপ্ দপ্।

জ্বলছে বক্ষের মধ্যে। পথচলা আর দুর্যোগটা কাবু ক'রে দিচ্ছে। তবু, নিজের রক্তে রক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে। পশ্চিমে ছাট জলের। টোকার তলা দিয়ে জলের ছাট এক বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে ভিজে যেন আরো তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায় রেখায়। রেখার বাঁকে বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মত রূপোর বিছেহারটির শেষ দেখা যাচ্ছে। খেয়াল নেই, টানাগোছার সময়ও নেই। শুধু, টেপা ঠোঁটের কোণে কোণে, টানা চোখের আঙিনায় কী যেন খেলে বেড়াচ্ছে।

খুব খেলছে। খুব চায়। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। দু' হাত ফারাক থেকে ফারাক করল হরেন। ওই আকাশের মেঘের মত মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে দুলে যেন নেমে আসছে হরেনের চোখের সামনে। চোখের সামনে, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচুনীচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এল পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিয়ে দিল চোখ। যেন অনেক-গুলি খ্যাপা কুকুর তীব্র চীৎকারে মাতামাতি শুরু করল। চোখের নজর হারিয়ে গেল হরেনের। সামনে শুধু জলের ধারা। সেই সঙ্গে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বৃষ্টির গলা শোনা গেল, সামলে গা। সামলে চল। আবার জোর জমেছে। সামনে কিন্তুক নদী।

নদী আছে। হরেন দেখল, সে সকলের পেছনে। ছায়ার মত চারজনের দলটা তার আগে আগে। সে মনে মনে বলল, এঃ শালা, মরতে হবে নাকি? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পিছনে।

পরনের কাপড়টা সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘত ওপরে তুলে ফেলল। তার সরু পায়ে জুতো জোড়া যেমন বড়, তেমনি ভারি দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছড়ানো রাস্তা। বড় বড় চাংড়া, খোঁচা খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হরেনের চেয়েও বড় বড় পাথর। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থমকে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এরই তলে তলে পাঁক।

সামনে নদী। ছ' হাত চওড়া নদী। এখন কোমর জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর জলেই যা টান। ব্যাং হানার মত টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খলখল করে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নীচে পাথরে হোঁচট খেয়ে একেবারে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হল। বৃষ্টি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকার তলায় কলকে লাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ তখন আধ খোলা। দেখল মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় না জলের ঝাপটায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরল। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক হানছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে খুলে। কাছে যাবার জন্যে ব্যাংএর মত লাফাতে লাগল হরেন। মাঝবয়সীকে কি যেন বলছে মেয়েটি। ফিরে ফিরে দেখছে হরেনকে আর খুশিতে ঝরনার মত মরছে হেসে।

আবার, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন হবু কাছে গেল। মাঝবয়সীকে জিজ্ঞেস করল, তোরা হাসছিস যে?

মাঝবয়সী একরূপে বলল, ক্যানে? তুমাকে দেখে। ক্যামতা নাই, আসতে ক্যানে গেলে

হরেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জবাব দিল, ক্যানে, এই তো চলছি।

তার হাঁপ ধরা দেখে ওরা দুজনেই হেসে উঠল। মেয়েটা আবার কাছাকাছি। চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বলল, সামনে লিদেন আসছে যে।

লিদেন। বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল হরেনের। মরণ আসছে তার সামনে। তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিল্‌হিল্‌ ক'রে।

মেয়েটা আরো কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তার নাকে। ওর নীচে ওপরে, দিনাজ শরীরের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হরেনের। যেন রং চায় ওর প্রতি অংগ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হ'য়ে উঠছে হরেনের চোখে। পাঁক বাড়ছে। নিশিরাইয়ের কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিয়ে বলল, নিশি আই আসল গ'। আর একটু পা' চালাও। নিশিরাই। হরেনের দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎকষায় লাল তেপান্তর দগদগে ঘায়ের মত লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেত্নী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুঁজে চলেছে এবার। ওদেরও নিঃশ্বাস হয়েছে ঘন ঘন। থ্যাবড়া পায়ে মাটি থ্যাত্‌লাচ্ছে।

মেয়েটা কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পায়রা নয়, নাগিনীর মত লক্‌লক্‌ ক'রে চলেছে। আর মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নীচের থেকে অবশ হ'য়ে যাচ্ছে শরীর। অবশ, অবশ একেবারে।

আবার বাজ হানল কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেল হরেনের চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে। পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

আ হা হা...

বুড়োটা সান্দেহে সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। বুড়ো দৌড়ে ছুটে এল। তারপরে মাঝবয়সী। তার পেছনে সংশয়ান্বিত পায়ে পায়ে এল মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিল, আ-হা-হা! উই, উই গ' বাবু। বলছিলাম তখন...

ওঠে না হরেন। জলে ভিজে ভিজে, হাড় কেঁপে অচৈতন্য হয়েছে। বুড়ো বসে উঠল, হে ভগবান! ইয়ার জ্ঞান নাই যে গ'।

জ্ঞান নাই। কে টেনে তোলে। বুড়ো বুড়ি কাহিল। মাঝবয়সী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুলল। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়ার তলায়। বুড়ো অসহায়ের মত তাকাল পশ্চিমে। এখনো দেড় ক্রোশ! উই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরো সরে। তার নীচে একটি কালচে রেখা। ওইটে মল্লাটি। অর্থাৎ বল্লাটি।

হরেন কাঁপছে থরথর ক'রে। কাঁপছে তার লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ দিয়ে।

বুড়ি বলল, বউ, লোকটার কাঁপন লেগেছে যে? বাঁচবে তো? মেয়েটির চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও বাধা। বলল, তা—ই তো। আগে শুখনো কাপড় একখান দেও এখন।

বুড়ি তাই দিল বোচকা খুলে। মেয়েটি তার কোলে মাথা নিয়ে বসেছে হরেনকে। ভেজা জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড় জড়াল তাকে। নিজের টোকাটি দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝবয়সী তার টোকাটি দিল হরেনের পায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন ক'রে বলে, তেমনি সস্নেহ গলায় বলল, ইয়ার বড় বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অগাটি তো খবর দিতুমনি? তা ই লোকের বড় বাড়াবাড়ি। বলতে বলতে হেসে ফেলল মেয়েটি। স্নেহ-করুণ হয়ে উঠল চোখ। সেই চোখে সে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করল মাঝবয়সীর সঙ্গে।

বুড়ো ব'লে উঠল, হুঁ। লোকটাকে তু বাঁচা গ' বউ। ই বুড়া হাড়ে তো ক্ষামতা লাই।

মেয়েটা বলল, অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি নাকি গ'। বাপ মায়ের ছেলা তো ওটা।

হুঁ! বাপ মায়ের ছেলা!

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রুক্ষ তেপান্তরে খাড়াই উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। তালপাতার বাতাসে গুমরে গুমরে উঠল কান্না। পাগলা ঝাড় বাতাসে মাটির বুক ভরে নুয়ে নুয়ে পড়ছে কাশবন।

ছোট্ট নিটোর ছ' মাসের ছেলেটার শোক চারটি বুকে পাথর হ'য়ে জমে আছে। সে তো বাপ মায়ের ছেলে ছিল।

মেয়েটা দু' হাত দিয়ে সাপটে ধরল হরেনের অচৈতন্য মুখ। ই কি বাড়াবাড়ি বাপু তোমার, আঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস? ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি ক'রে মরণ ডাকে।

হঠাৎ আবার কেঁপে উঠল হরেন। হাত পা খিঁচিয়ে থরথরিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ।

এই, এাই দ্যাখো ক্যানে কাণ্ডো।

সভয়ে বলতে বলতে মেয়েটি বুকের কাছে আরো আঁকড়ে নিল হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যত না জলে, তার চেয়ে বেশী ভয়ে। বলল, তোরা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেয়ে গাড়ি পাঠায়ে দিই।

মেয়েটি বলে উঠল, হুঁ, তুমি যাও গ' বাবা, ই তো ভাল বুঝি না।

বুড়ো চলে গেল। মাঝবয়সী বলল মেয়েটিকে, গরম করতে হবে। শরীলে কিছু নাই।

মেয়েটি আরো বুকে চেপে ধরল। মাঝ-বয়সী বলল, আ দূরে মরণ! বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস। আরো জল লাগছে যে মুখে। কাপড় সরা। লজ্জা কিসের? বাপ মায়ের ছেলাটা। বুকের ওম্‌ পেলে গরম হবে।

মেয়েটি কাপড় সরিয়ে দিল। কক্কড় ক'রে বাজ হানল। সাপিনীর মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে নেমে এল মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব তাপ সমারোহ এখানে কোমল শান্ত ও দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। তাকে আড়াল ক'রে

মানুষ মানুষের মৃত্যুশীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনো। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে চাপে গরম করতে লাগল। একটু একটু ক'রে, অনেকক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।

এবার সাঁঝাকাশের অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনো গরাইয়ের সেই মানুষ ডোবা রক্ত পাঁক পার হতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠল। বিছের মত সুড়সুড় ক'রে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে কোমরের আশেপাশে। দেখল, চোখ চেয়েছে হরেন। যেন স্বপন দেখছে, এমনি বিস্ময়ে। যেন সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই আর একবার কেঁপে উঠল সে। বিস্ফারিত চোখে আর একবার দেখে হঠাৎ হিংস্র চোখে হেসে উঠল সে। মুহূর্তে সরু সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে দিল গায়ের থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের সেই রুগ্ন ছোট্ট মুখটার হিংস্রতা দেখে থমকে গেল। বুকের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরেন প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েটার দু' হাতের তলা দিয়ে। মুখ তুলে আনতে চেষ্টা করল ওপরে।

দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল মেয়েটার টানা চোখ। তার বাঁকানো নিটোল হাতের এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিল হরেনকে। বলল, হা মরণ! কেষ্টোর মরণ না! বলে, সেই রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠল মেয়েটা।—ইই আর বাঁচবেনি দেখছি না।

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে দিকে, উঁচুনীচু তেপান্তর যেন হাসছে বক্তার মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়ার মত পায়ে পায়ে আসছে এখানে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখা-মাখি। আবার কাদা লাগল। পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করল। চোখে তার তখনো মেয়ে-বুকের উত্তাপে চকচক করছে।

এমন সময় ওপারের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োর। বলদের গলায় ঘণ্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

গাড়ি এল, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুলল। তুলে চলল।

এতক্ষণে শরীরের যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটি নোনাধারা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনো তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে আগে চলল। মেয়েটির চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হ'য়ে উঠল। বুকের কাপড়টি কষে টেনে দিল সে। ওদের পেছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চাকা দুটো ককাচ্ছে। কাঁকিয়ে কাঁদছে।
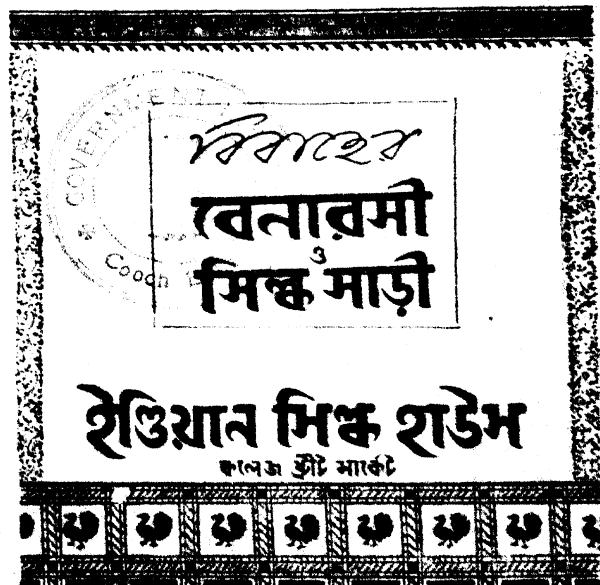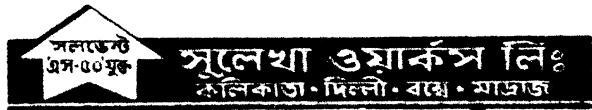
দেশ বিভাগই হইল পাকিস্থানে অনাহার ও দুঃখ দুর্দশার একমাত্র মূল কারণ—মন্তব্য করিয়াছেন বাল্টিমোরের কাগজ "সান্"। "কিন্তু করাচীর কাগজ "ডন্" তা মনে করেন না এবং বারোটা বাজবার আগে মনে করতেও পারবেন না"—মন্তব্য অবশ্য বিশুখুড়োই করেন।

* * *

একটি সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, মণিপুর অঞ্চলে খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তির জন্য ইঁদুরই একমাত্র দায়ী। শ্যামলাল বলিল—"অসম্ভব নয়, কলকাতায় আমরা দেখেছি মাছের ঘাট্‌তির জন্য দায়ী একমাত্র বেড়াল" !!

* * *

ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁর দলীয় "ঘরটি" যেভাবেই হউক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেই হইবে।

শ্যামলাল বলিল—"অবশ্য পরিষ্কার করিতে গিয়ে white wash করা হবে, কি "lime work" করা হবে তা লোহিয়াজী বলেন নি"।

প্রাচীন যুগে জনসংখ্যা কমাবার জন্য শিশু হত্যার বর্বর প্রথা বহু সমাজে প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানের যুগে সবার উচিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলো শিক্ষা ক'রে অবাঞ্ছিত সন্তানের আগমন রোধ করা। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়গুলো জানতে হলে আবুল হাসানাৎ প্রণীত 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' বইখানা পড়ুন। দাম ২., ডাকযোগে ২৸০। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ট্রামে-বাসে

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।—"ব্যক্তিগত আয়ের হিসেব সম্বন্ধে পরিসংখ্যান নীরব"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী মন্তব্য করিয়াছেন, আজকালকার দিনে কংগ্রেসীদের অবস্থা খুব সচ্ছল। তাঁহারা বর্তমানে খুব ভালো খাওয়া-দাওয়া করেন, ইচ্ছামত প্রচুর খরচ করেন এবং কাজ কিছুই করেন না।—"কিন্তু এই নিয়ে দুঃখ করে লাভ কী, কাজ না ক'রে বসে খাওয়ার সাধ হয়ে থাকলে এখনো দলে ভিড়ে যেতে পারেন, age is no bar"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

চোরাইমাল সন্দেহে কলিকাতা পুলিস প্রচুর ঔষধপত্র উদ্ধার করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বহু ডাক্তার, নার্স এবং হাসপাতালের কর্মীদের যোগসাজশে বিভিন্ন হাসপাতাল হইতে এই সব ঔষধপত্র পাচার করা হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"শিরে সর্পাঘাত হ'লে আর তাগা বাঁধবার স্থান থাকে না; সুতরাং রোগীর একমাত্র সান্ত্বনা "জয় হিন্দ্" মন্ত্র" !!!

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় নয়টি মন্ত্রিদপ্তরে প্রায় চারি হাজার উদ্বৃত্ত কর্মী রহিয়াছে।—"বারো হাত শশার তেরো হাত বিচি সম্ভব হ'লে ন'জন মন্ত্রীর চার হাজার উদ্বৃত্ত কর্মী হতে পারে না ? এ-তো অত্যন্ত সহজ মানসাঙ্ক" !

* * *

ছয় ইঞ্চির অনধিক উচ্চ একটি বন্য গুল্ম রাতের অন্ধকারে আলো বিকিরণ করিতেছে—এই মর্মে একটি সংবাদ

আসিয়াছে রাঁচী হইতে।—"রাঁচীর ঠিক্ কোন্ অঞ্চল থেকে সংবাদটি এসেছে তা না জানা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে কোনই গুরুত্ব আরোপ করিতে পারছি নে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, সুইস্ অভিযাত্রী দল নাকি এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয় করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এভারেস্ট আরোহণ এখন দেখছি প্রায় "জল ভাত" হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু সে যা-ই হোক, যারা নিত্যি তিরিশদিন ট্রামে-বাসে চড়ে, তাদের কাছে এভারেস্ট চড়াটা এমন কিছুই নয়, বিশ্বাস না হ'লে তেনজিঙ্ হিলারি একবার পরখ ক'রে দেখতে পারেন"।

* * *

মুঙ্গেরের সংবাদে শুনিলাম, সেখানেই ভারতের প্রথম নারীকে চৌকিদারীর কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।—"এ-টা নিশ্চয়ই সরকারী ব্যবস্থা; বে-সরকারী

নারী চৌকিদার প্রায় ঘরে ঘরেই রয়েছেন, কাজেই মুঙ্গেরকে এ সম্মান দিতে আমরা রাজি নই"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ধানের ধর্মগোলার অনুকরণে দিল্লীতে নাকি একটি "জ্ঞান-গোলা" স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে; সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে শস্য আহরণ করিয়া গোলাজাত করা হইবে।—"খুবই ভালো কথা; তবে জ্ঞানের গোলা করতে গিয়ে ধানটা না একেবারে গোল্লায় যায় সেদিকে নজর রাখলে ভালো হয়"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

কাশ্মীর

৪

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে. মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর পাঞ্জালের কোলে কোলে, হরমুখ আর হর-মহেশের চূড়ায় চূড়ায়, জাস্কার আর দেবশাহীর স্তবকে স্তবকে। ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর সতীসায়রে। যার আধুনিক নাম হোলো ডাল হ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গুরু গুরু ডমরুধ্বনি শোনা যাচ্ছে: দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিরকালের সর্বহারা সন্ন্যাসী নাঙ্গার রুদ্র নয়নের কচিৎ কালকটাক্ষ। অসুরনাশিনী চণ্ডী আর মহিষাসুরের রণডঙ্কা বেজে চলেছে হরমুখের কোলে কোলে। পাইন আর পপলারের অরণ্য মেঘের মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মাষ্টমী। আগস্ট ৩১, ১৯৫৩

বাগানবাড়ির তাঁবু তুলে দিলেন হিমাংশু। ওর মধ্যে আমাদের দুদিনের অনির্দিষ্ট এলোমেলো সংসারযাত্রা ছিল একটু হাস্যকর। হিমাংশু চাকরি করেন কলকাতার ইম্পীরিয়াল ব্যাংক, সুতরাং তার এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এ-বাড়িতে তিনি ভাত খেয়েছেন যত, বাজারের ফল চিবিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁবুর কারবার বন্ধ করতে হোলো। আমরা পুনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কথা চলছে, সুবিধামতো হাউসবোটের খবর পেলেই হিমাংশু ডাল হ্রদের অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন! কিন্তু আজ এ বেলা আমি হিমাংশুর অতিথি অপরাহ্নে চলে যাবো শ্রীমতী মায়ার ওখানে। ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

ভ্রাম্যমান জীবনে হিমাংশুর মতো এমন উদার প্রকৃতির সুহৃদ সচরাচর মেলে না। সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি রেল-গাড়ির কামরায় উঠে একটুখানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপর হতে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাঙ্গা সন্ন্যাসী আগেভাগে গিয়ে একটি ঘাটি-আগলানো বটবৃক্ষের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসব ক্ষুদ্র দৈন্য অনেক বরেণ্য মানুষের প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে; যথাসময়ে এসব ত্রুটি ধরা পড়ে চক্ষুর অনুবীক্ষণে। এইপ্রকার ক্ষুদ্রতা থেকে হিমাংশু অনেকটা মুক্ত। দুঃসাধ্য এবং দুস্তর পাহাড়ে তীর্থযাত্রাপথে মানুষের স্বার্থপরতা যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখেছি। হয়ত তিনি সংসার-ধর্মী হ'লে এইসব গুণপনা কমে যেত।
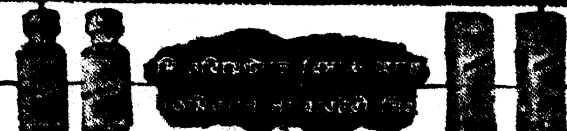
অল্প অল্প বৃষ্টি নামলো মধ্যাহ্নের আগেই। কাশ্মীরে বৃষ্টির পরিমাণ বাংলা দেশের মতো নয়। মৌসুমী বায়ু আসে বটে পশ্চিম পাকিস্তান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মরুভূমি ও শুষ্ক ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়ু যায় শুকিয়ে। সুতরাং অবশিষ্ট বায়ু পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ কোল পেরিয়ে উত্তরপথে পৌঁছয় সামান্য। সেই কারণে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝাপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠাণ্ডা হাওয়া। সে-ঠাণ্ডা আকস্মিক,—যেমন পাহাড়ে সচরাচর ঘটে,—কিন্তু তার ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার কারণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে কয়েকটি দরিদ্র ঘরকন্নাযুক্ত একটি বস্তি পল্লী চোখে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশী মহলে বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন সর্বত্রই প্রধান, এখানেও তাই। কিন্তু সর্ব-প্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনো কোনো মেয়েকে হাসতে দেখেছি, এইটি হোলো কৌতুকের বিষয়। কাশ্মীরী 'বোলি' কাশ্মীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলির' উৎপত্তি হোলো সংস্কৃত থেকে। এর সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু দুই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফার্সী। বাংলা দেশেও এই। 'মগ' বাঙলাভাষা মিলেছে চট্টগ্রামে এসে। চাটগাঁর বাঙ্গালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি পরস্পর আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাঙলাভাষা বহুবার বদলায়। দার্জিলিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে শোনা যাবে বাঙলা ভাষা বলছে হিন্দির মিশ্রণে। আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুরে আর মিথিলা, উৎকল আর মগের মুলুকে, কোচ-বিহার আর দক্ষিণ বিহার, তেজপুরে আর ভোজপুরে,—বাঙলা ভাষাই হেঁটে বেড়িয়েছে এর-ওর সঙ্গে গলা ধরাধরি করে। ভাষার স্বাস্থ্য সবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচ-জনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলংকৃত করে। সেখানেই তার প্রাণশক্তি। যে-ভাষা তার জাতিচ্যুতির ভয়ে

আলো-বাতাসের পথরুদ্ধ ক'রে নিজের গণ্ডীর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইংরেজ শুধু যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে-ঘুরে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতবর্ষীয় শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এর নমুনা আছে ভূরি ভূরি। বাঙলা ভাষার যে শতকরা প্রায় তেত্রিশ ভাগ আরবি, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট,—অন্ধ প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভুলে যাই।

কাশ্মীরী 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাব্যসাহিত্য এবং লোকসঙ্গীতের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এককালে। এর থেকে মেয়েরা সৃষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রণয়গীতি,—সেই গান অনেক সময় অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। ধানের মাঠে, দর্জির পাড়ায়, গয়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মজলিশে, ছুতোরের আড্ডায়, মজুরদের বস্তিতে,—দলবদ্ধ হয়ে লোকসঙ্গীত গায় মেয়ে আর পুরুষ। গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অন্নপ্রাশনের উৎসবে। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দোলনায়।

বিরহিনী মেয়ে তার আকণ্ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রান্ত থেকে: "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মুকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শুধু আমার সংবাদ? গিরি-উপত্যকায় তরুসমারোহে অগণ্য রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো,—তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু?"

ওপ্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক শোনা যায়: "মুক্তা এনেছি সাগর মথিয়া তোমার কণ্ঠ সাজাতে, তোমার অধরে রক্তিম আভা আমার প্রাণের শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহ্নের পর থেকে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, যেমন শিলংয়ে, যেমন দার্জিলিংয়ে। তফাৎ এই, এখানে তুষার-চূড়োরা খুব সন্নিকট, সেজন্য হু হু করে শিরশিরানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাহ্ণের দিকে ফিরে এসে হিমাংশু প্রস্তাব করলেন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত। দেরি করলে ওমরাহিগণ বিরক্ত বোধ করবেন।

বন্ধুবর মিঃ ধরের সঙ্গে বন্দোবস্ত হোলো এই যে, আগামীকাল সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বক্সী গোলাম মহম্মদের ওখানে। তাঁর বাড়িতেই আলাপচারি হবে। দু'একজন মন্ত্রী ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং অধিককাল বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলম্ব নেই। সাপটে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গুলাব সিংহের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পৌঁছলুম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বনবাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। দোতলার সামনের বারান্দায় সমস্তগুলি জানলাই কাচের শার্সি। তারই একটির সামনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়েছিলেন। উৎসুক আমাকে আসতে

সংখে নেমে এলেন। টাঙ্গার গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র নিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠাণ্ডায় হাত-পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে কথা থাক। দুটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ির নিচের পিছনদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন আরেকটি বাঙালী পরিবার, এ শিশু দুটি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠি পরিবার, তাঁদের সাড়াশব্দ কম। এ ফ্ল্যাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাজতে এই দুটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শূন্য থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপরে একটি তোষক এবং একখানা লেপ ও বালিশ।

শিশু মেয়ে দুটিকে খুব ভালো লাগছিল। তারা যেন এ ফ্ল্যাটের মরুভূমির মধ্যে এনেছে স্নেহচ্ছায়া। শিশুর মতো এমন নিঃসঙ্গতার অবলম্বন আর কিছু নেই। ওদের সঙ্গে বসে গল্প জুড়ে দিতে হলো। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, এখানে আপনার আড়ষ্ট হয়ে থাকার কিছু নেই। দাঁড়ান, বড্ড ভিজে এসেছেন আপনি, আমি চা করে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। মেঘের দল নেমে এসেছে নীচের বাগানে,—ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা। তখনও অতি সামান্য পরিমাণ দিনের আলো অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু তার চেহারাটা ধূমল,—কেমন একটা অনৈসর্গিক আভা। যেন আদি সৃষ্টির উষাকাল। ঠাণ্ডা প্রচুর পড়েছে বাইরে। জানলার শার্সিগুলি ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে —কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে কিছু দেখা যায় না। এ-বাড়ির উত্তর দিকে মাত্র একঘর বস্তি,—তার বাইরে চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘলুপ্ত পপলারের বিস্তৃত অরণ্যজটলা। সামনেই পাহাড়তলীর পা বেয়ে গেছে ঝিলম নদী বাবলাবনের নীচে দিয়ে। কোথাও জনমানব নেই।

দুরন্ত বায়ুর বেগ এবং মুষলধারা বৃষ্টি বেড়েই চললো। অন্ধ মৃত্যু দিগদিগন্ত সব একাকার। আকাশ ডাক দিচ্ছে মুহুর্মুহু তার বিদ্যুৎলতার ঝলকে। শিশু দুটির সঙ্গে গল্প জমে উঠলো।

এক পেয়ালা চা এবং টোস্ট অমলেট সহ শ্রীমতী গুপ্তা এসে ঢুকলেন। পরে ওঘর থেকে একখানা হালকা চেয়ার এনে বসলেন। বললেন, গুপ্ত সাহেব আমারই মতন সাহিত্যের খুব ভক্ত, শুনে রাখুন। তিনি থাকলে আজ ধেই-ধেই করে নাচতেন। আপনার কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন। সত্যিই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিনি। এখন দেখছি আপনি ত' আমাদেরই মতন মানুষ।

উচ্চ হাস্যে তাঁর ঘর এবার মুখরিত হলো।

বললুম, আচ্ছা, ওসব কথা এখন থাক। আপনি একা এইভাবে থাকেন, অসুবিধে হয় না?

শুনুন তবে। এই বাচ্চা দুটি আমার প্রায় সারাদিনের বন্ধু। আর ওই যে বলেছিলুম বুড়ো পণ্ডিতের কথা, ও হোলো আমার আশা-ভরসা,—অবিশ্যি কিছু কিছু দিতে হয়। তবে এখানকার পোস্টমাস্টারও মধ্যে মাঝে খবর নেন। আজকাল কোনো কোনো দিন আসে সংবতী আর মদনলাল,—ওদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসি। তবে ওরা ত' নতুন, ওরাও আজকালের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেছে।

চা বেশ ভালো লাগছিল। বললুম, এ বাচ্চাদুটির মা বাবা কোথায়?

এরা থাকে নিচে। এদেরও এই। মিঃ মুখার্জি এখানে নেই। মিলিটারির মুশকিল হোলো, তারা এক জায়গায় স্থির নয়। এখানে ত' ভালো, বাড়িঘর সুযোগ সুবিধে রয়েছে। অন্য জায়গায় ক্যাম্প ছাড়া কিছু নেই। আমাদের জীবন শুধু ভেসে বেড়ানো। স্থায়ী ঘরকন্না কাকে বলে আমরা জানি না।

ঘরের সামনে সিঁড়িতে কার যেন সাড়া পাওয়া গেল। মায়া উঠে গেলেন, তারপর ফিরে এসে মেয়েদুটিকে পাঠিয়ে দিলেন। নীচে। ওদের খাবার সময় হয়েছে। কে যেন ডেকে নিয়ে গেল।

ও'র স্বামী ফিরছেন কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মায়া বললেন, উনি আছেন মাইশোরে, ফিরতে এখনও দুমাস। সত্যি, উনি ভারি খুশী হতেন আজ এখানে থাকলে, নাচতেন ধেই ধেই ক'রে। আজও তাঁর চিঠি আমার পেয়েছি। আমাকে এভাবে থাকতে হচ্ছে, ও'র যে কী দুঃখ কি বলবো। উনি থাকলে আপনাকে নতুন জিনিস দেখাতে পারতুম।

মুখ তুললুম।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, উনি নিজেই সেই নতুন জিনিস। এমন সচ্চরিত্র ধার্মিক ছেলে আপনারা সচরাচর দেখতে পান না। আমার স্বামীর মতো লোক মিলিটারিতে বেমানান।

হাসিমুখে বললুম, বুঝতে পারা যাচ্ছে আজকাল মিলিটারিতে ভদ্রলোকেরা ঢুকছে।

নিশ্চয়। কাশ্মীরের মিলিটারি সব চেয়ে ভদ্র। এরা এদেশে এত প্রিয় কি বলবো। বসুন, আমি আসছি। —উনি বেরিয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা আমার যাচ্ছে না। ফাই-ফরমাশের লোক নেই। মহিলাকে একাই সব করতে হচ্ছে। উৎসাহ করে অতিথিকে ডেকে আনা এক জিনিস, কিন্তু তার জন্য সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা অন্য বস্তু। আমি একটু বিব্রতই বোধ করছিলুম। আজকের রাতটা অবশ্য কাটুক, কিন্তু ঠিক এইভাবে হাত পা গুটিয়ে দু'চারদিন বন্দীদশার মধ্যে আটকে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না তাই ভাবছিলুম।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। ঘড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সমগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে; পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষসীর মতো অন্ধ আক্রোশে

পাহাড় ফুল ছিঁড়ছে, তারই সেই হিংস্র কল্লোল ঝাপটে দিয়ে যাচ্ছে শার্সির বন্ধ দরজায়।

এই হোলো হিমালয়ের দানবীয় বিপ্লব। চণ্ডাল করাল দুর্ধিম ঝটিকা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারদিক থেকে,—গর্জনে, স্বননে, রণনে তার প্রলয় নাচন চরাচরের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তীর মতো পর্বতে পর্বতে অরণ্যে-অরণ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। ভয়ার্ত মানুষ আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকায়।

খরপদে মায়া আবার এলেন। —আপনাকে একলা বসিয়ে রেখেছি। বৃষ্টিতে সব মাটি হোলো। ভেবেছিলাম আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো,—ঘরকন্নার খুঁটিনাটি। আজ এই বৃষ্টি, পণ্ডিতের পাত্তাই নেই। কী যে অসুবিধে, বলতে পারিনে। কত যে কষ্ট হবে আপনার!

আপনার সমস্যাটা কি, বলুন দেখি!

না, সে আপনাকে বলতে পারবো না। শুধু বলে রাখি, আপনার যদি অসুবিধে হয়, সহ্য করে যাবেন।

বললুম, বটে, অতিথিকে ডেকে এনে অসুবিধেয় ফেলছেন, একথা জানলে আপনার স্বামীও বরদাস্ত করবেন না!

স্বামীর উল্লেখমাত্রই তিনি আনন্দ পান, তাঁর মুখে চোখে দীপ্তি ফুটে ওঠে। বললে, সে সত্যি, আমারও কোনও অসুবিধে তিনি কখনও বরদাস্ত করেননি। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে ঝড়-জল কিছুই মানতেন না,—আমার মানরক্ষার জন্যই ছুটতেন।

একটি অতি-আধুনিক সাজসজ্জা করা মেয়ের মুখে থেকে তাঁর অনুপস্থিত স্বামীর সম্বন্ধে এইপ্রকার শ্রদ্ধানুরাগ আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলুম। অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, এমন উল্লাসের অতি-চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বামীর আলোচনা ওঠামাত্রই তাঁর কণ্ঠ শান্ত ও নম্র হয়ে এসেছে, প্রসন্ন আভা এসেছে মুখে চোখে। মনে হয়েছে একটি নিরাবিল আনন্দ যেন তাঁর মনে স্নিগ্ধতা সঞ্চার করেছে। এরপর বসে-বসে শুনলুম পুস্তকসাহেবের গল্প। তিনি সদালাপী ও কষ্টসহিষ্ণু। বিবাহ অল্পদিনের, কিন্তু এ বিবাহ সার্থক। এমন উদার চরিত্র স্বামী অনেক মেয়ের ভাগ্যেই জোটে না। ক্ষমা ও ধৈর্যের তিনি প্রতিমূর্তি।

দাঁড়ান, একটি জিনিস আপনাকে না দেখিয়ে থাকতে পারছিনে। আগে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। —এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত এক তাড়া চিঠি এনে হাজির করলেন। সোৎসাহে বললেন, না না পড়ুন আপনি যেখানা খুশি। আমি একটুও লজ্জা পাবো না। এসব চিঠি সাধারণ স্বামীর লেখা নয়।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আপনার স্বামীর অনুমতি নাও থাকতে পারে!

কেমন করে জানলেন তাঁর অনুমতি নেই? এমন চিঠি কোনোদিন তিনি লেখেননি যা আপনাকে পড়ানো চলে না।

এবার আর তামাশা না করে পারলুম না। বললুম, তাহলে এক কাজ করুন। প্রথম সম্ভাষণের গোটা দুই শব্দ এবং শেষের গোটা দুই ছত্র চেপে রাখুন,—মাঝখানটা পড়ে নিই।

শ্রীমতী মায়া এবার হেসে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর একটির পর একটি চিঠি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, সেগুলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়। তারই ভিতর থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি তুলে নিয়ে বললেন, এই দেখুন, আপনার সম্বন্ধে উনি কি সুন্দর লিখেছেন!

শার্সিটা এতক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিল, এবার সহসা সেটি সশব্দে খুলে গেল। ঝড়বৃষ্টির যে উন্মাদ প্রলয় বাইরেটা তোলপাড় করছিল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মত্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা হতবুদ্ধি—পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে শ্রীমতী মায়া দুই পাল্লা এক করে চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার খাটবিছানা একদম ভিজে গেল। কাঁচের ছিটকিনিটা ভেঙে গেছে, বন্ধ থাকবে না—এটা যা হোক করে আটকে দিন। ও কি করছেন, খালি পায়ে দাঁড়াচ্ছেন কেন? ভাঙা কাঁচে কি হবে?—তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, আপনি চেপে ধরুন, আমি দেখছি।

আমি দিয়ে জানালা চেপে ধরলুম। তিনি ছুটলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনো উপায় দেখলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে বাতাসের ঝাপটায় চিঠিগুলি ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়িতে পা লেগে চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছত্রখান। অবশেষে আমার নিরুপায় অবস্থা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উনুনে জ্বালাবার কাঠের টুকরো, আম্‌কাটা ছুরি, আমার খুন্তি এবং কাগজের কুচি। শার্সি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। রাগ করে বললুম, এর পর আর কোনও মিস্ত্রিকে ডাকবেন।
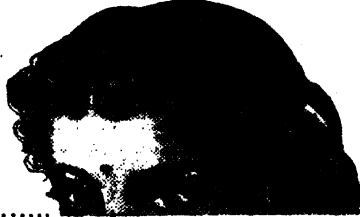
অতিথিকে ডেকে আনবার আগে ছুতোর

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা-ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলায় ওই অবসরটুকুর মধ্যে বাইরের উন্দায় অন্ধ চেহারাটা একবার দেখে নিলুম। ঝড়ের সমুদ্রে একদা ভ্রমণ করেছি বঙ্গোপসাগরের জাহাজে। সেদিন সমুদ্র ছিল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কালিঝুলি-মাখা সেই দিগন্ত দোলার বিভীষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে; অনেকে সেই রেলিং-এর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে অবশ্যম্ভাবী জাহাজডুবির প্রহর গুণেছে। আজ রাত্রে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই রুদ্রতাণ্ডব,—তিনি তাঁর এক অভিনব স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশ-জোড়া অসুরশক্তির দাপাদাপি,—যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব ডাকিনী শাঁখিনী—সবাই নাচছে উন্মত্ত বিভীষিকায়। রাক্ষসী-রূপিণী রাত্রি এসেছে রুদ্রাক্ষ মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পীর পাঞ্জাল আর হরমুখের কোলে কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলোচুলের রাশি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পিশাচী নৃত্যের উন্মাদনায় নির্কবিদিক জ্ঞানশূন্য। ছিন্নমস্তা আপন মুণ্ড নিয়ে অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলছে!

সমস্ত রাত্রি সমানে চললো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। নিদ্রার কথা ওঠে না, এই প্রবল মাতামাতির সাড়া যেন চারিদিক থেকে মাথা কোটাকুটি করতে লাগলো। ঘড়িতে এক-সময়ে দেখলুম, ভোর হতে বাকি নেই। সকাল হোলো, তখনও জলের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। অগণ্য পপলারের সারি তখনও ঝটাপটি করছে তুমুল দাপটে। বনে ও বাগানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নেমে আসছে। সেই একই দুর্যোগ।

এক সময়ে স্নান করে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী গুপ্তা। তাঁর মলিন বিমর্ষ মুখ। পণ্ডিত আসেনি, আসার সম্ভাবনাও কম। খানিকটা বাসি দুধ আছে চায়ের জন্য, সামান্য আনাজপত্র আছে ঘরে, ডিম বুঝি আছে দু'তিনটে। এ ছাড়া ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। বললেন, আপনার কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

কিন্তু একবার যখন মুখ দেখালেন তখন চা আনুন।

মিনিট পনেরো পরে অবশ্য তিনি চা এনে হাজির করলেন। প্রশ্ন করলুম, চাল আর নুন আপনার ঘরে আছে কিনা।

আছে।

ব্যস, নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত তিনি রইলেন না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিপ্লব বাঁধিয়ে তুললেন। জলযোগের ব্যবস্থা কই? দুধ, মাখন, মাংস, মাছ কই? শুধু ভাত আর সাব্জিসিদ্ধ হলেই কি সব হোলো? আমাকে জব্দ করার জন্যই যেন বৃষ্টি নেমেছে! শ্রীমতী গুপ্তার চোখে কান্না এলো। হতভাগা সেই বুড়ো পণ্ডিত নিশ্চয় মরেছে। সে মরুক, তার মরাই ভালো। এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে নীচের তলায়,—মায়া ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলো।

স্নান সেরে একসময় তাঁর রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম।—কই, দেখি আপনার কি আছে এঘরে? আমিই রেঁধে দিচ্ছি।

তিনি ত' শশব্যস্ত। ভয়ানক প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। অবশেষে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হলো। চেয়ে দেখি, কোনও অসুবিধা নেই। ডিমের অমলেট, আলুকপির ঝোল, টম্যাটোর চাটনি, মুসোসিদ্ধ, শেষ পাতে বাসি দুধ। আর চাই কি? আপনি জোগাড় দিন, আপনাকেই আমি রেঁধে খাওয়াবো।

মিথ্যা বলবো না, ঘরকন্নায় তিনি বেশ পারদর্শিনী। নুন আর মশলা থাকে কাগজে, গামলায় খাবার জল, চায়ের প্লেটে ভাত খাওয়া, দুধের কড়াইয়ে দুধভাত, মাটির ভাঁড়ে তরকারি,—সুতরাং আমোদ পাওয়া গেল প্রচুর। তাঁর স্বামীও এসব তুচ্ছ ঘরকন্নার অনুরাগী নন। তিনিই তাঁর স্ত্রীকে নাচ গান সাহিত্য শিল্প ও বাদ্যযন্ত্র চর্চায় সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং শ্রীমতীর চেহারায় যে শ্রী ও লাবণ্য, তাতে ঠিক রান্নাবান্না অথবা বাসন মাজা, কাপড় কাচা মানানসই হয় না।

আমি ঈষৎ বাস্তববাদী। সুতরাং তাঁকে কথা দিলুম, পণ্ডিত যদি না আসে তবে রাতের মধ্যে যেমন ক'রেই হোক, আমি তার জন্য কিছু-কিছু বাজার-হাট ক'রে দেবো।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ি এসে বাগানের দরজায় থামলো এবং বর্ষাতি চাপিয়ে মিঃ ধার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এলেন। গাড়িখানা সরকারি এবং আসছে 'নারপরস্থান' নামক এক পল্লী থেকে। আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সঙ্গে।

খবর পেলুম, বৃষ্টির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আজ মধ্যাহ্ন থেকে ফুলতে আরম্ভ করেছে এবং পীর পাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগ-জনক। বাজার হাট আজকে সবই বন্ধ। গতকাল সন্ধ্যায় কোনও প্লেন আসেনি দিল্লী থেকে এবং আজও এখান থেকে কোনও প্লেন ছাড়েনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাজ তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়ালো সরকারি বার্তা-বিভাগের আপিসে আমাদের পূর্বপরিচিত বন্ধু মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনি এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে এঁরা বাধ্য করালেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দাজ দেড় মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে ঢুকে বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রহরা মোতায়েন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে অবারিত। সাধারণ ভদ্রলোকের একটি উদ্যানবাটি। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘুরছে যে কোনও ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বড়বাবুর কোনও পার্থক্য নেই। গাড়িওলা, মজুর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্ত্রী—সব একাকার। আমরা বাঙ্গালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট-বেলাট আর মন্ত্রীর

...দেশ সশস্ত্র রক্ষী দেখে অভ্যস্ত। এখানে তার চিহ্নও নেই। শেখ আবদুল্লা মাত্র ক'দিন সপ্তাহ আগে গদিচ্যুত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই-কাশ্মীর। বক্সী গোলামকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'লোহমানব।' ইতিমধ্যে খবর শুনেছি, বক্সীজী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমান-ঘাঁটি পর্যন্ত। তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। এমন অকুণ্ঠ এবং ভয়হীন সত্যভাষী সংখ্যায় বড় কম। তিনি বলেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ—যেমন হায়দরাবাদ, যেমন মণিপুর, যেমন ভূপাল। জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমান ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক মুসলমান আছেন,—যেমন ন্যাশনাল কনফারেন্সে ডোগরা আর পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদর্পণে। মাঠে ঘাটে বাজারে—তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হ'লে তিনি আগেই গিয়ে হাজির, আপিসের কেরানী অসুস্থ হ'লে তিনি ওষুধ কিনে নিয়ে যান,—দোকানদারদের আড্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গল্পই ক'রে এলেন। ফষ্টিনষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে সুরসিক শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি। তিনি চিরদিন কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক ব'লেই সকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই ছুটে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাত আটটার সময় বক্সীজির ওখান থেকে হাতচিঠা বেরুলো, সমগ্র শ্রীনগর বন্যায় বিপন্ন। সাতটি অঞ্চলে বাঁধ ভেঙেছে, জল ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতার কেন্দ্র থেকে এই অশুভ সংবাদ ঘোষণা করা হলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাঞ্চল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন সবান্ধবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কাশ্মীরের লোহমানবকে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশয় স্ফীতিবিস্তারলাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ ভেঙেছে। সেই শক্তি পরীক্ষার কালে অসীম আশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পথে নেমে এলেন বক্সী গোলাম আর শ্যামলাল শরফ। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। না, মোটর নয়, জীপ নয়,—দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রাত্রের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে চললেন বক্সীজি,—পরনে তাঁর সামরিক পোশাক। আমরাই বা আশ্রয়ের মধ্যে থাকবো কেমন ক'রে? আমরাও বেরিয়ে এলুম তাঁর সঙ্গে। এর নাম উদ্দীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জনহীন, যানবাহনহীন,—দুর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ির জানলা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্ত্রী ছুটলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃষ্টিতে ভিজছেন বক্সী গোলাম, কিন্তু এরই মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, লোহমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, দেখে নিলুম কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। সুখ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদুল্লা আমাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে-রাত্রের সেই বন্যা-সংকটের নাটকীয় মুহূর্তকালে মনে হয়েছিল, এমন বলিষ্ঠচেতা, স্বাস্থ্যবান, ভয়হীন ও অক্লান্তকর্মী মুসলমান জননেতা সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে বোধ করি আর দ্বিতীয়টি নেই। লোহমানবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য আমার পক্ষে এইপ্রকার দুর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চললুম গাড়ির আড্ডায়। বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে পট্টুর কোট এবং গরম প্যান্ট ভিজে থক থক করছিল। শেষ টাঙ্গাখানা অনেক তোষা-মোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয় আমাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে। সুতরাং তিনগুণ ভাড়া কবুল করলুম। গাড়ি ছোটে না, পাছে ঘোড়ার পা পিছলায়। আমিরা-কদলের উপরে উঠে দেখি, পুলের পাশের দোকান-গুলি জলে ডুবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। নদীর ধারের পাড় ভেঙে পড়ছে। আমার গাড়ি চললো পাশের বস্তির পথ ধ'রে ময়দানের দিকে। মনে আছে, শ্রীমতী মায়ার ভাঁড়ারের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিনতে হবে। মাইলখানেক এসে গাড়ি থামলো। গাড়োয়ান নেমে

দিয়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙে একটি দোকানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল। দোকানদার দরজা খুললো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না যে, এমন 'অপার্থিব' সময়ে কারো পক্ষে চাল-ডাল-ঘি-মসলার দরকার হতে পারে। যাই হোক, এক রাশি খাদ্যসামগ্রী কিনে আবার গাড়িতে এসে উঠলুম। সর্বাঙ্গ কাদায় আর জলে জবজব করছে। দু' হাত জোড়া, সিগারেট খাবার উপায় নেই। গাড়ি আবার চললো।

সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ির দুই ধারে আতঙ্কিত জনতা ছুটেছে বিপরীত দিকে। সঙ্গে গরু বাছুর ছাগল ছেঁড়া পুঁটলী বিছানা বাক্স। শিশুর দল নিয়ে ছুটেছে মেয়ে, বালকবালিকা ছুটেছে, বোঝা নিয়ে ছুটেছে পুরুষ। শত শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘরবাঁধার সরঞ্জাম। প্রাণভয়ে ছুটেছে, ছুটেছে বন্যার তাড়নায়। ছুটেছে সবাই পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়। আরও এক মাইল এসে টাঙ্গাওয়ালা রামবাগ পুলের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি, অনেকগুলো পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে দূরে দূরে। বিপুল জলস্রোতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি সম্পূর্ণ নূতন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাঞ্চল ভেসে এসেছে। মন্ত্রী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল সর্বাগ্রে এসে পৌঁছেছেন। পূর্তবিভাগের দুইশত লোক এবং প্রায় আটশত কুলি এখানে কাজে লেগেছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। জনৈক অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা যেতো, কিন্তু মাথা ছাড়িয়েও দশ ফুট জল। আপনি চলে যান্, জল ছুটে আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলায় যে যেতেই হবে!

অসম্ভব। বড়জেলার উপর দিয়েই বন্যা এসেছে। ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চেপে অস্থির-ভাবে প্রশ্ন করলুম, সেখানকার খবর? আমার লোক আছে যে ওদিকে?

ভদ্রলোক দৌড়ে চলে যাবার আগে ব'লে গেলেন, কিছুই বলা যাবে না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন্। ডুবে গেছে সব।

ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলুম। হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময় হঠাৎ আবার জনতার ধাক্কা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়িতে তুললো এবং আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না ক'রে [illegible] আমার আপত্তি না শুনে গাড়ি ছোটালো বিপরীত দিকে। তার জানা আছে এরকম ঘটনা। নিরুপায় হয়ে খাদ্য সামগ্রীগুলি তাকেই এক সময় উপহার দিলুম। সে যেন আমার আড়ষ্ট দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে থাকসা হোটেলে উঠে হিমাংশুর ঘরের দরজা যখন ঠেললুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ঘুম চোখে দরজা খুলে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি? ফিরে এলেন যে? মাল-পত্র কই? ইস্—এত ভিজেছেন বৃষ্টিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিলুম। তিনি বললেন, বন্যা? সে কি? কোথায়? কই, কিছু খবর পাইনি ত?

হাসিমুখে বললুম, রাত্রির অন্ধকারে কত কি ঘটে, নিশ্চিন্ত লোকেরা কতটুকু জানে তার?
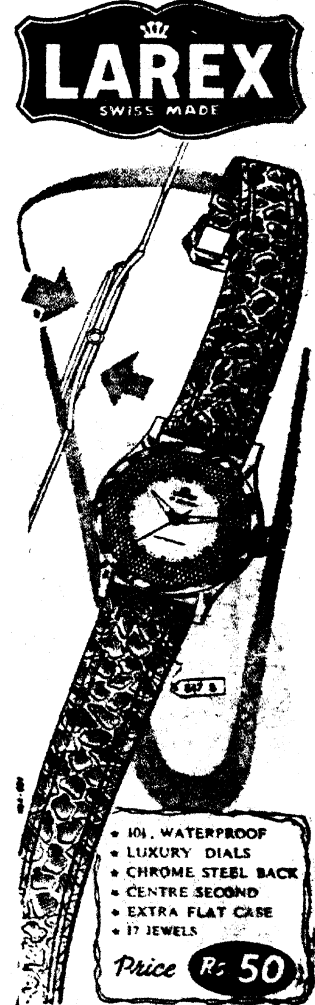
আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। ভিজে একেবারে গোবর। যত দুর্যোগ কি শুধু আপনার কপালেই ঘটে? সে-মহিলার বিপদ ঘটলো কিনা কে জানে! হয়ত ছুটোছুটি করছেন, হয়ত বা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন! কিন্তু...তাই ত'...আজ আর কোনও উপায় নেই। নিন্, আপনি সুস্থ হোন্। চা আর জলখাবার আপনাকে ঠিকই খাওয়াতে পারবো।

হিমাংশু আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, দুর্যোগ শান্ত হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আছে কিন্তু মেঘের জোট ভেঙে গেছে। সূর্যের আভা পাওয়া যাচ্ছে। হিমাংশুর প্রস্তাব ক্রমে বেলা দশটার সময় দুজনে অগ্রসর হওয়া গেল। তিনি নিলেন কিছু খাদ্য এবং এক বাল্তি পানীয় জল। বন্যা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। আজ অপরাহ্নে তিনি যাবেন হাউসবোটে,—তিন সপ্তাহ বসবাসের মতো ঘর পাওয়া গেছে। আজ রাতের পর হোটেলে তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রামবাগ পুলের কাছে এসে দেখি, বিচিত্র জগৎ। তিনদিন ধরে যে-পথ দিয়ে গাড়িতে আনাগোনা করেছি, সেই পথে নদী আর নৌকো। পুল আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অগাধ নদী বইছে সেইখানে, যেখানে কাল রাত্রে আমার টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। জলের বাল্তি নিয়ে আমরা নৌকাযোগে ওপারে গিয়ে এক বনময় পথ ধরে বড়জেলার সেই বাগান-বাড়ির ধারে এলুম। পাশের বস্তি ও গৃহস্থের চিহ্নমাত্র নেই। ঘর ভেঙেছে, লোক পালিয়েছে। আমাদের দেখেই শ্রীমতী মায়া চীৎকার ক'রে উঠলেন। তাঁর বাড়ির দোতলার সিঁড়ি অবধি বন্যা উঁচু হয়ে উঠেছিল। নীচের ঘরদোরে সেই বাঙ্গালী পরিবারটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা ঘর দোর ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিনে।

পানীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা উপরে এলুম। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্রায়, উপবাসে, আতঙ্কে শ্রীহীন। বোধ করি সারারাত কান্নাকাটি ক'রে চোখ ফুলেছে। প্রথম রাত্রে তিনি নদীর ওদিকে গিয়ে চীৎকার করেছেন আমার নাম ধ'রে, তারপর জলের তাড়নায় একপ্রকার সাঁতরে তিনি ফিরে আসেন। বন্যা এসে অতঃপর এ বাড়িকে ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে। কিন্তু তাঁর অতিথি কোনও এক সময় অবশ্যই ফিরবেন, এজন্য সবাই চ'লে গেলেও তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। প্রায় আট ফুট জল যখন নীচের থেকে উঁচু হয়ে ওঠে, তখন তিনি কেবল অন্ধকারে সারা দোতলা ছুটে বেড়িয়েছেন। ইলেক্‌ট্রিকের আলো আর জলের পাইপ সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। অতিথির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর রাত কেটেছে।

কেঁদে ফেললেন শ্রীমতী মায়া। তারপর বললেন, না, আমি আর এখানে কিছুতেই থাকবো না, এ বাড়ি আমি ছেড়ে দেবো। হয়ত আবার বৃষ্টি আসবে পাহাড়ে। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, আমি শহরে গিয়ে থাকবো।

আমার কাহিনী তাঁকে বললুম, কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। এক রাত্রির আতঙ্কময় জীবন তাঁকে যেন ভীষণ ক'রে তুলেছে।

আমরা অপেক্ষা ক'রে রইলুম, তিনি নিজের হাতে নিজের ঘরকন্না ভেঙে বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। হিমাংশু বোধ করি আড়ালে গিয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে দু' একটি কথা ব'লে থাকবেন, সুতরাং এক সময় তিনি কাছে এসে বললেন, নিজের উত্তেজনার মধ্যে আপনার কথাটা শুনিনি, কাল যে আপনি আমার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছিলেন, এ কখনও ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।

বললুম, বিলক্ষণ! আমার কষ্ট আর কতটুকু? কিন্তু আপনি যে এ বাড়ি থেকে এক পা নড়েন নি, এ যে অসমসাহসিক কাণ্ড! আপনার সাহসের তুলনা নেই!

কতকগুলো মালপত্র নিয়ে হিমাংশু আগেই অগ্রসর হলেন। তিনি গিয়ে হোটেলে ঘর ঠিক করবেন এবং জিনিসপত্র গোছাবেন। শ্রীমতী মায়াকে অনেক ছুটোছুটি করতে হোলো। মারাঠি পরিবারের হাতে এ বাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, ধোপার খোঁজ নিলেন, পাণ্ডিতকে গালি দিয়ে তার প্রাপ্য রেখে গেলেন, জমাদার বিদায় করলেন। অবশেষে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মাইলখানেক দূরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে বিদায় নিয়ে এলেম। গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার তাড়না আঘাত করেনি।

নদীর ঘাটের ওদিক থেকে জন দুই কুলি ডেকে আনলুম এবং তাঁর বাড়ি থেকে মালপত্র সমেত বেরিয়ে আসতে বেলা প্রায় তিনটে বাজলো। ভাগ্যের পরিহাস হোলো এই যে, সেদিন সন্ধ্যায় হিমাংশুকে নিয়ে যখন আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় চায়ের আসর বসলো, তখন দেখা গেল, কোমল মখমলের মতো নীল আকাশে হীরকখণ্ডের মতো জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্ররা ঝলমল করছে। কোনওকালে দুর্যোগ ছিল আকাশে, কোনওকালে বৃষ্টি ও বন্যার আতঙ্কে জনতা পালিয়ে যাচ্ছিল,—তার আভাসমাত্র নেই। মায়া উঠেছেন আমাদের পাশের ঘরে। প্রচুর লটবহরে তাঁর ঘর ভ'রে গেছে।
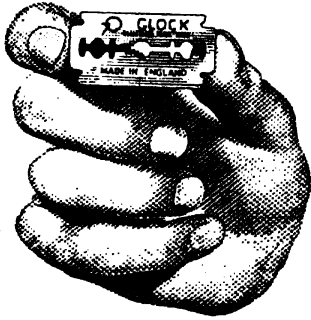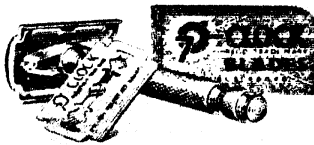
শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। পথ অতি মসৃণ এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটর-পথ পাহাড়ে ওঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা পায়ে হাঁটা। চারিদিকে পীর পাঞ্জালের পাইন বন,—মাঝখানে নিরিবিলি গুলমার্গ। এই ক্ষুদ্র জনপদটি 'গল্ফ' খেলার জন্য পৃথিবী-খ্যাত। এর সমস্ত চেহারাটা সাহেবী ধরনের এবং এই নয় হাজার ফুট উঁচুতে যারা আসে, তারা ইউরোপীয় রুচি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বস্তুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উঁচুতে ওঠো। সোনামার্গ, গঙ্গাবল, গান্ধারবল, মহাদেব-চূড়া, বিষ্ণুসায়র, গড়সায়র, বনতাল, জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহল-গাঁও—এরা হোলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গঙ্গাবল হ্রদ কাশ্মীরী হিন্দুর গঙ্গাতীর্থ,—এটি ঠিক শেষনাগের মতো। তুষারনদী নেমে আসে হিমবাহ থেকে, সরোবরের বর্ণ নীলাভ থেকে সবুজে পরিণত হয়, সূর্যের আলোয় রঙীন মেঘের টুকরো নেমে এসে ওর জল চুম্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়া-লোকে পরিণত হয়। কাশ্মীর এখানেই ভূস্বর্গ।

হরিপর্বতের দুর্গপ্রাকারের নীচে দিয়ে মোটরে যাচ্ছিলুম ক্ষীরভবানীর দিকে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী মায়া। অদূরে গান্ধারবল পর্বতের চূড়া, তার নীচে একদিকে ফতেপুর বস্তির দক্ষিণে আনছার হ্রদ—ওখান থেকে একটি প্রণালী চ'লে গেছে ডালহ্রদের দিকে। আমাদের পথের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্রগুলি ফসলে এখন পরিপূর্ণ। মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মীরে, কিন্তু পহলগাঁও ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয়নি। রৌদ্র ঝলমল করছে পথে ও প্রান্তরে। সেদিনের দুর্যোগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিগ্ধ।

বনময় একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ি এসে পৌঁছলো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকাছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগুলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশে পাশে সিন্ধু-নদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে ঢুকে সহসা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটির দৃশ্য চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দির প্রাঙ্গণের তিনদিকে ক্ষীরসায়রের জলের প্রবাহ চলেছে। কোনো কোনো স্ফীতকায় চেনার বৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণ-কালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংহের চেষ্টায় এই তীর্থস্থানটি প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্তি স্থাপিত; তার সঙ্গে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকের ধারণা, যুগল মূর্তিটি পাওয়া যায় মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডটির তল থেকে। কুণ্ডটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি-মাহাত্ম্য অনুযায়ী এই কুণ্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও শাদা, কখনও বা লাল। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে একটি যাত্রীশালা। ক্ষীর-ভবানীর উত্তরে বিরাট পর্বতপ্রাকার।

আমাদের অপরাহ্ণকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। অনেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দৃশ্য পিছনে প'ড়ে রইলো। এবার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমতী গুপ্তা জানতেন, আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্য ছিল গুহাতীর্থ অমরনাথ, গৌণ ছিল এই যা কিছু দেখে বেড়াচ্ছি। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্বল্পকালের এবং আমাদের গতি বিপরীত-মুখী। হঠাৎ তিনি তাঁর সংসার তুলে দিলেন বন্যাপীড়িত হয়ে,—সে-বন্যা এখন আর নেই। কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বালুচরে তিনি আর ফিরতে চান না, এই আমার ধারণা। তাঁর স্বামী আছেন অন্তত দু হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ দেশে,—তাঁর সঙ্গে দেখা হতেও এখনও দুই তিন মাস বাকি। সুতরাং তাঁর সঠিক কর্মসূচী আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে হিমাংশু চ'লে গেছেন হাউসবোটে, সুতরাং তাঁর ঘরটি আমার দখলে ছিল। রাত্রে খাবার টেবলে ব'সে মায়া বললেন, হোটেলের একটি ঘরে এভাবে আমাকে রেখে আপনার পক্ষে কি চ'লে যাওয়া সম্ভব? আমি যে সম্পূর্ণ একা প'ড়ে যাবো! বড়জেলার ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়াও আর চলে না।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বললুম, আপনার স্বামীর চিঠি পাবার আগে শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পক্ষে উচিত হবে?

কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন। পরে বললেন, ভয় পেয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলুম। দুর্ঘটনা না ঘটলে ওখানে একাই থাকতে পারতুম। কিন্তু আর ওখানে যাওয়া চলে না লজ্জার মাথা খেয়ে। আমার ভাসুর আছেন দিল্লীর লোদি কলোনিতে। ধরুন যদি দিল্লীতে আপনি আমাকে নামিয়ে দেন ?

চুপ করে রইলুম। আমি যে কিছুদিন অবধি হিমাচল প্রদেশে ঘুরবো, একথা তাঁকে আগে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর ঘরকন্নার এমন বৈপ্লবিক বিপর্যয় ঘটবে, তিনি ভাবেননি। সন্দেহ নেই, উনি বিপন্না। পুনরায় তিনি বললেন, আজ সকালে গুপ্ত সাহেবকে চিঠি দিয়েছি সব কথা জানিয়ে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হবেন জানি, তবে আপনি আছেন শুনে তিনি আশ্বস্ত থাকবেন।

এক সময় তিনি হেসে উঠলেন, ধন্য অতিথি আপনি। বানের জলে ঘরকন্না ভেসে গেল! লেখককে দেখবার চেষ্টা এবার সার্থক হোলো।

কথাটা সত্য। আমিও হেসে ফেললুম। বললুম, দিল্লীতে কি আপনার খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার ?

শ্রীমতী বললেন, ভাসুরঠাকুরকেও চিঠি দিয়েছি। তিনিও ভাববেন বৈকি। আপনি কি সত্যিই হিমাচল প্রদেশে যেতে চান ?

আমার প্রোগ্রাম তাই। ওদিকটা ঘুরে যাবো মনে করেছিলুম।

চলুন তবে, আমিও যাই। পথ থেকে চিঠি দেবো গুপ্তসাহেবকে।

কিন্তু আপনার মালপত্র ?

যতটা পারি বিক্রি ক'রে যাবো। কিন্তু ভাবছি, আপনার কপালে এই ছিল। হিমাংশুবাবু ঠিক বলেছেন, যত গণ্ডগোল আপনার জীবনে ঘটে। এমন আতিথ্য নিলেন যে, খাওয়া জুটলো না। তার ওপর আবার পরের ঘরকন্না কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে এ গল্প সবাইকে না বলতে পারলে আমার চলবে না। সেদিন আপনি কোন্ মুখে ভাঁড়ারে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন ? আপনি না অতিথি ? কি করলেন সেগুলো ?

হেসে বললুম, তারাও বানের জলে ভেসে গেছে !

তিনিও হেসে উঠলেন।

পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিমাংশুবাবুর নৌকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভালো। দূরে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হরিপর্বতের দুর্গ,—সব মিলিয়ে চমৎকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস ক্লান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশুবাবু প্রচুর পরিমাণে আতিথিসৎকার করলেন এবং আমরা পশকারায় ঘুরে নিলুম। হাউসবোটের বন্দিদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

একদিন সন্ধ্যায় ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কে চায়ের আমন্ত্রণ ছিল। কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু সেখানে জড়ো হয়েছেন। মিঃ শরুফ, শর্মা, ধার ইত্যাদি। সেখানে পাওয়া গেল দুজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার পুরনো আড্ডার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন হলেন দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, শ্রী এস মজুমদার, আই-সি-এস। এঁর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ পেয়েছিলুম। এরই ভগ্নী হলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। শ্রীমতী মায়ার গল্প শুনে সেদিন দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাবু সেদিন সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে এসে সুমধুর গল্পের আসর জমিয়ে তুললেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ রায় সহ চার পাঁচটির বেশি বাঙ্গালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিল না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওখানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাবু সস্ত্রীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ হোলো। চললো অনেক রাত পর্যন্ত। পরদিন আমরা বিদায় নেবো।

প্রভাতকালে এসে পৌঁছলেন হিমাংশু পূর্বব্যবস্থামতো। আমাদের দুর্যোগের বন্ধু। বন্যাত্রাণকালে জনৈক শ্রমিক হিমাংশুকে 'মহাত্মা' বলে সম্ভাষণ করেছিল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 'মহাত্মা' আমাদের উভয়ের বিপুল পরিমাণ লটবহর একটি ঠেলাগাড়ির সাহায্যে নিয়ে চললেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আপিসে। 'দিদি' বলে তিনি সম্ভাষণ করেছেন শ্রীমতী গুপ্তাকে, সুতরাং ভাইবোনে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলেন।

বিষণ্ণ হাস্যে শ্রীমতী গুপ্তা বিদায় নিলেন কাশ্মীরের কাছ থেকে। এক সপ্তাহ আগেও তিনি কল্পনা করেননি, বন্যার তাড়নায় তাঁকে ঘরকন্না তুলে দিতে হবে। আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলুম, তিনি আবার ফ্ল্যাটে ফিরে যান্। কিন্তু একটি রাত্রির আতঙ্ক তিনি ভুলতে পারেননি। একথা জানতুম কাশ্মীর ছাড়তে তাঁর আঘাত লেগেছিল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আজ রাতে পৌঁছবো জম্মুতে। শ্রীমতী গুপ্তা এবার গুছিয়ে তাঁর সীটে বসলেন।

(ক্রমশ)

রোগা অনেক রকমের আছে—ঢ্যাঙা রোগা, রোগে ভুগে রোগা, অনাহারে রোগা, জরাজীর্ণ রোগা—শ্যাম সে ধরনের নয়। শ্যাম বেঁটে, সুস্থ, অল্পপুষ্ট, অপ্রাপ্তযৌবন, অথচ রোগা। রোগা, কালো এবং অতীব সাধারণ।

কিন্তু শ্যাম বাঙালী, এবং জীবনে তার পদার্পণ যে যুগে তাকে বাঙালীরা সংক্ষেপে বলে রবীন্দ্র যুগ, অর্থাৎ অসাধারণের যুগ।

তদুপরি তার জন্ম চৌধুরী বংশে। ও-বংশে মেয়েরাও অসাধারণ ছেলেরা তো বটেই। কেউ লেখাপড়ায়, কেউ ব্যবসায়, কেউ ওকালতিতে, কেউ রাজনীতিতে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সংগীতে, কেউ খেলায়, কেউ সেবায় গোটা বংশটাই দিক্‌পালে ছেয়ে গেছে। এই তথ্যটি পাঠশিক্ষক থেকে আরম্ভ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবধি সবাই বার বার শ্যামকে শুনিয়েছেন। তাতে হাঁ না কোনো মন্তব্য না করলেও কথাটা শ্যামের কানে গেছে।

ইংরেজী ব্যাকরণে মারাত্মক ভুল হলে সহকারী প্রধানশিক্ষক কপালে ভুরু তুলে বলতেন, "উঁহু, তুমি শীতুর ভাই নয়কো।" অবশ্যই শ্যাম শীতুর সহোদর ভাই কিন্তু সে জবাব জোর গলায় দিতে গেলে শ্যামকে বোঝাতে হয় শীতু চৌধুরীর মত অসাধারণ নির্ভুল ইংরেজী লিখিয়ের ছোট ভাইয়ের কলম থেকে এরকম অসভ্য ভুল কী করে বেরোতে পারে। গণিতের ঘণ্টায় শ্যামের খাতায় 'সরল কর' শ্রেণীর অংকগুলো ধাপে ধাপে জট পাকিয়ে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলে শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামের পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় কষিয়ে নিজেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠতেন। "মোণ্ডলের মুখ হাসালে এই ছেলে! কোন্ বেটা বলে নাতি ঠাকুর্দার মত হয়! যে বলে সে শ্যাম চৌধুরীকে চাক্ষুষ করেনি।"

এ লাঞ্ছনায় সাধারণ ছেলে হয় দেশত্যাগী হত, নয় পড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে রকে গিয়ে আড্ডা গাড়ত। কিন্তু শ্যাম নিবাত-কম্প প্রদীপের মত স্থিরচিত্তে তার দৈনন্দিন কর্তব্য করে যেত।

শ্যামের মেজদিদি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন "হ্যাঁরে, তুই পড়া পারিস্‌নে কেন রে? পড়তে তোর ভালো লাগে না!"

গম্ভীর মুখে শ্যাম জবাব দিত, "ভালো লাগবে না কেন?"

"তবে?"

"আমি যা পড়তে চাই তা তো কেউ পড়ায় না।"

"তুই কী পড়তে চাস্?"

এ প্রশ্নের জবাবে শ্যাম চুপ করে যেত। সে জানত, যে-কথাগুলো সহজেই বলা যায় সেগুলো মনের কথা নয়, সেগুলো ফাঁকি। আর মনের কথা খুলে বলবার আগে গভীরভাবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে দেখা দরকার। মেজদি পাত্র হিসেবে নেহাৎ খারাপ নয়, ওকে বলা যায়, কিন্তু যথাকালে, এখনো নয়।

একদিন শ্যাম হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। গভীর রাত্রে শ্যামের ঘরে আলো দেখে মেজদি উঁকি মেরে দেখলেন শ্যাম নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছে। খুশী হয়ে তার ঘরে গিয়ে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য দুটো কথা তাকে বলতে গিয়ে মেজদি দেখলেন শ্যাম পড়ছে দুটি মোটা বই। তার একটি ইংরেজী-বাঙলা অভিধান, অন্যটি কী তা বোঝা গেল না, তবে সেটি পাঠ্যপুস্তক নয়। বইটির ভাষা কঠিন, কারণ পড়াটা এগোচ্ছে অতি ধীরে। অভিধান ঘন ঘন দেখতে হচ্ছে।

নিঃশব্দে শ্যামের পিছনে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে মেজদি দেখলেন বইখানি হচ্ছে লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ'—ইংরেজী সংস্করণ।

মেজদি সমস্যায় পড়লেন।

তিনি গুরুজন ব্যক্তি, অতএব শ্যামকে তাঁর শাসন করা উচিত—এত রাত্রে পড়াশুনো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোরতর ক্ষতিকর, বিশেষ বিষয়টা যখন পাঠ্যপুস্তক নয়। তিনি ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্রী, শিক্ষাব্রতী, অতএব তাঁর শ্যামকে বলা উচিত—একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস না করলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা যায় না। কিন্তু এর কোনোটাই তাঁর করা হলো না।

কারণ মেজদি পুরোনো পাপী। বিপ্লবের স্বপ্ন, বিপ্লবীদলের সঙ্গে পরিচয় তাঁর বহুদিনের।

তিনি শুধু বললেন, চাপা গলায়,

"শ্যামবাবু!"

শ্যাম চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইল। ভয়ে তার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল।

মেজদি বললেন, "বড্ড শক্ত, নয়রে হাবা ছেলে?"
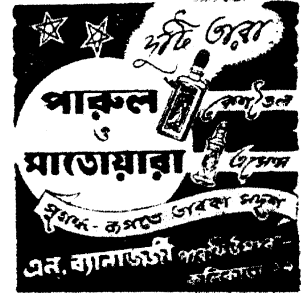
শ্যাম বললে, "হ্যাঁ।"

"অত শক্ত বই ধরলি কেন? কত তো ছেলে-বই রয়েছে।"

* * *

মেজদির অবিরাম প্রশ্ন এবং শ্যামের সংক্ষিপ্ত উত্তরমালা থেকে যে-ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা গেল তা এইঃ কয়েকমাস আগে একজন বিপ্লবী বড়দা দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে মেজদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখাটা হয়েছিল সদর বা অন্দর বৈঠকখানায় নয়—একটু আড়ালে, শ্যামেরই ঘরে। শ্যাম সেখানে উপস্থিত ছিল। তাকে সরাবার বিধিমত চেষ্টা করা হয়েছিল, সফল হয়নি। শ্যাম বুঝেছিল, গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা ওখানে হবে। হয়তো কোনো ভবিষ্যতের মহাত্মার আত্মজীবনীতে ওই আলোচনার উল্লেখ থাকবে। ভারতের, জগতের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়তো হবে ওইখানেই, তার নিজের ঘরেই—আর সে থাকবে অনুপস্থিত! কখনো নয়।

যে-আলোচনাটা হল সেটা শ্যাম বুঝল না একথা শ্যামের সামনে বলা হলে সে দৃঢ়স্বরে তার প্রতিবাদ করত। বড়দার বক্তব্যের অনেকখানিই বলা হয়েছিল দুর্বোধ্য ইংরেজীতে—সে কথা সত্যি। হয়তো তিনি ইচ্ছে ক'রেই ইংরেজী বলেছিলেন—যাতে তাঁদের আলোচনার বিষয়টা শ্যাম বুঝতে না পারে। কিংবা হয়তো বহুকাল বাংলা দৈনিক না পড়তে পেয়ে ও-ইংরেজী কথাগুলোর বাংলা প্রতিশব্দগুলো তিনি তখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। সে যাই হোক, মেজদির জবাবগুলো ছিল খাঁটি বাংলায়, যার মানে কাকদ্বীপ থেকে জলপাইগুড়ি, সিলেট থেকে মানভূম, কৃত্তিবাস থেকে সুধীন্দ্র দত্ত পর্যন্ত সবারই বোধগম্য।

বড়দা বলছিলেন অ্যাজিটেশন প্রপাগ্যান্ডার কথা; মেজদি বলছিলেন সারা দেশটাকে নাড়া দেবার, জাগিয়ে তোলবার কথা। বড়দা বলছিলেন শ্রেণীগত দাবীর ভিত্তিতে সমস্ত দেশময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক। মেজদি বলছিলেন, মুটেমজুরে, হাড়ী-মেথর সবার মধ্যে কাজ শুরু ক'রে দিতে হবে। মেজদি বলছিলেন, ভদ্রলোকদের আন্দোলনটা অতি-মাত্রায় ভদ্র হয়ে উঠছে; 'ছোটলোক'-দের পৌরুষের খানিকটা জোগান না পেলে আর তার মেরুদণ্ডটা খাড়া করা যাবে না। বড়দা বললেন, সঙ্ঘবদ্ধ প্রোলেতারিয়াতের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন এমন বলশালী হয়ে উঠবে যে নেহাৎ মডারেটও আর প্রকাশ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী তুলতে সাহস পাবে না।

'প্রোলেতারিয়াত' শব্দটা শোনবামাত্র সেটা বিদ্যুদ্‌গতিতে শ্যামের মস্তকায় ঢুকে গেল। তার মানে হল বড়দার এ কথাটা ঠিক। ডোমিনিয়ন স্টেটাস, প্রভিন্সিয়াল অটনমি প্রভৃতি বিজাতীয় ঝুটো মালগুলোর উপর বড়লোকদের পক্ষপাতিত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে; সহজ কথা 'স্বাধীনতা' আর তাদের মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। ওদের ওপর শ্যামের আর একটুও বিশ্বাস নেই। বড় বড় বিপ্লবী নেতারাও সব জেলে। আন্দোলন দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

অথচ লোকের ইচ্ছে তো মরেনি! এই সেদিন বাসে একজন ভিখিরী গাইছিল ক্ষুদিরামের গান, গাইছিল "হে ভগবান, দেখো হে মান, ভারত যেন স্বাধীন হয়।" টপ্ টপ্ ক'রে পয়সা এসে পড়ছিল পথের উপর, জানালায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছছিল। শ্যাম নিজের চক্ষে দেখেছে। তবু হয় না কেন বিপ্লব?

মেজদি-বড়দার আলোচনায় জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এসব বড়লোকের নেতাগিরিতে আর চলবে না। চাই নতুন নেতৃত্ব, ভারতের মান রাখবে তারাই, এরা নয়। চাই সঙ্ঘবদ্ধ প্রোলেতারিয়াতের নেতৃত্ব।

কিন্তু প্রশ্ন, 'প্রোলেতারিয়াত' কী? কোনো বিদেশী দল—সিন ফেনের মতো? নিশ্চয়ই নয়। বড়দা-মেজদির মত দেশাভিমানী লোকে কক্ষনো দেশ স্বাধীন করবার জন্য বাইরে থেকে লোক ডেকে আনবে না। তবে কি 'প্রোলেতারিয়াত' অনুশীলন-যুগান্তরের মত কোন নতুন বিপ্লবী দল? হতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য আহরণ করা দরকার।

মেজদিকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। যে সাবধানী মেয়ে, হয়তো শ্যাম এসব কথা বুঝতে পারে জানলে তাকে আর কখনো এরকম আলোচনার সময় কাছে থাকতে দেবে না। না, এর খবর অন্য জায়গা থেকে নিতে হবে।

দৈবাৎ অনুসন্ধানের একটি পথ খুলে

শক্তিমান প্রোলেতারিয়াত, যার সঙ্ঘবদ্ধ বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হবে, তার একখানা চারপাতার কাগজ নিয়মিত চালাবার ক্ষমতা নেই? কিন্তু সে-কথা তোলবার আগে প্রোলেতারিয়াত শব্দটার তাৎপর্য বোঝা আবশ্যক। এবং সে তত্ত্ব আহরণের সময় মূল্যবান্ এই মুহূর্ত।

সাবধানে শ্যাম প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দেখুন, এই প্রোলেতারিয়াত নেতৃত্বের কথাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

সম্পাদক বললেন, "আলবৎ দেব। কিন্তু তার আগে আমাকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবেন? বড্ডই কাবু ক'রে দিয়েছে জ্বর, পরশু রাত থেকে ধরেছে, এখনো ছাড়েনি।"

শ্যাম জল দিতে দিতে বলল, "আপনি ডাক্তার ডাকুন।"

সম্পাদক উচ্চহাসি চাপতে গিয়ে বেদম কাশতে শুরু করলেন। শ্যামের জ্যাঠা-মশাইয়ের দুর্দান্ত হাঁপানী ছিল, অতএব কাশির রোগীর সেবার প্রক্রিয়া তার জানা ছিল। সে সম্পাদককে শুইয়ে তার বুক পিঠ মালিশ ক'রে দিতে লাগল। সম্পাদক সামলে উঠে বললেন, "সাবাস ভাই! যাক, আর দরকার নেই, বেশী তোয়াজ করলে আবার রোগ খাতেরজমা হয়ে বসবে। আমাদের কি অসুখ পোষায়? এত কাজ, এই ক'টি লোক, তার ওপর যদি আবার একজন শুয়ে পড়ে তাহলেই তো চিত্তির।"

প্রোলেতারিয়াত নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সম্পাদক আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করলেন যার কিছুই শ্যাম জানে না। বড়দা যে সব খটমট কথা ব্যবহার করেছিলেন সম্পাদকও তার অনেকগুলোর পুনরুল্লেখ করলেন। শ্যাম বুঝল, ব্যাপার গভীর, তলিয়ে না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না।

সম্পাদক বললেন, "সব জিনিসই ওঠে পড়ে। কিন্তু যে-জিনিস ওঠার চেয়ে পড়েই বেশী, ওঠবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও—বুঝতে হবে তাতে ঘুণ ধরেছে। তার ধ্বসে পড়া কেউ রুখতে পারবে না। যেমন সাম্রাজ্য-বাদ। আর যে-জিনিস প'ড়ে প'ড়েও তার দ্বিগুণবেগে চাগিয়ে ওঠে, মানতে হবে ভবিষ্যৎ তারই হাতে। প্রোলেতারিয়াতের সংখ্যা বাড়ছে, সঙ্ঘশক্তি বাড়ছে, জ্ঞান বাড়ছে, প্রভাব বাড়ছে। তাদের চেতনা চাষীদেরও জাগিয়ে তুলছে। তাদের আশা হতাশ পেতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রোলে-তারিয়াতের বিস্তার। বর্ণভেদ, দেশভেদ, ভাষাভেদ, জাতিভেদ অতিক্রম ক'রে তার ঐক্য। তারই হাতে মানুষজাতির ভবিতব্য।"

শ্যাম মন দিয়ে শুনল—বুঝল না প্রায় কিছুই। শুধু তার মনে হল মেজদি-বড়দা

দ্বজনেরই কথার ভাব এ লোকটির বক্তৃতায় আছে—মেজদির মত সহজ, অথচ বড়দার মত ভারী ওজনের। বড়দার কথাগুলো যেন কেমন পড়ার বইএর মত শুকনো এ'র কথায় রসকষ আছে। শ্যামের ভারি ভালো লাগল লোকটিকে।

সম্পাদক বললেন, "আপনি কাগজগুলো চেয়েছিলেন। নিন আমার নিজের ফাইল-খানাই। আমি আর একখানা তৈরী ক'রে নেব। দাম দশদুগুণে কুড়ি, একটাকা চার আনা, পাঁচ সিকে। আর দেখুন, একটা কথা। ঘন ঘন আসবেন না এখানে, খামকা পেছনে পুলিস লাগবে। ওই তোরঙ্গটা খুলে দেখুন, খানকয়েক ভালো ভালো বই আছে। বাছাই ক'রে একখানা নিয়ে যান। ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে বুঝে পড়বেন। দাম দিতে হবে না। তবে, হারাবেন না দয়া ক'রে, পড়ে ফেরত দেবেন।"

শ্যাম বেছে নিলে লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ"। তার কারণ সে বাঙালী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হচ্ছে তার জীবনের মূল-মন্ত্র। সেই সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরেছে সম্পাদকের কাছ থেকে এই সংবাদটা পেয়ে তার বিশেষ কৌতূহল হল জানতে ঘুণটা ধরেছে কোথায়।

জ্যাঠামশায়ের ঘরে শ্যামের ডাক পড়ল।

আরাম কেদারায় শুয়ে জ্যাঠামশায়। মুখে আলবোলার নল, হাতে একখানা কাগজ। শ্যাম বুঝলে ঐ কাগজখানার দরুণই তার তলব হয়েছে। জ্যাঠামশায় জিজ্ঞেস করলেন,

"দেখেছ মার্কশীটখানা?"

শ্যাম ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ।"

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে জ্যাঠামশায় বললেন,

"হ্যাঁ! লজ্জা হচ্ছে না তোর বলতে? তোর বাপের বংশে এ মার্কশীট কেউ দেখেছে? আর তুই আমার সামনে দাঁত বার ক'রে বলছিস্ 'হ্যাঁ'।"

শ্যাম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে! বল্ তোর মতলবখানা কী! কুলীগিরি ক'রে খাবি? তাই বা তোকে কে দেবে—ঐ তো চেহারা! এই নম্বর দেখিয়ে তুই কলেজে পাবি জায়গা? কস্মিন্ কালেও নয়! কী ক'রে পাবি? তোর বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভাঙিয়ে? সে কথা মনেও স্থান দিস্‌নি।"

"আজ্ঞে না।"

"ফের্! ফের কথা কইছিস্ আমার মুখের ওপর! বেহায়া ছেলে, বল্, কলেজে তোকে নেবে?"

শ্যাম বললে, সে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে জ্যাঠামশায় বললেন, "অ্যাঁ? ভর্তি হয়েছিস্? এই মার্কশীট দেখিয়ে? কী ক'রে?"

চৌধুরীদের কলেজ প্রেসিডেন্সী। ও-বংশে কলেজে ভর্তি হওয়া মানে ভালো নম্বর পেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢোকা। শ্যাম তিনের দরজায় নম্বর দেখিয়ে শুধু পৈতৃক পাট্টার জোরে প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থান পেয়েছে এ হতেই পারে না। বহু ধরাধরি ক'রে ওকে ঢোকাতে হবে এবং সে ঘৃণ্য ধরাধরিটা তাঁকেই করতে হবে এই ভেবেই তিনি অত বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই কাজ তাঁর অজ্ঞানতেই হয়ে গেছে? কী করে হবে? অথচ শ্যামের মুখ দেখে তো মনে হয় না সে মিথ্যেকথা বলছে! তবে কি—

জ্যাঠামশায়ের মুখ হঠাৎ ফেকাশে হয়ে গেল। তবে কি ছোকরা অন্য কোনো কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে? যদি তাই হয় এখুনি তার নাম কাটাতে হবে! চোখ পাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

"কোথায় ভর্তি হয়েছিস্ তুই?"

শ্যাম বললে, "মণ্ডলস্ কলেজ।"

জ্যাঠামশায় হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলেন। মণ্ডলস্ কলেজ! ও নামের কোনো শিক্ষায়তনের কথা তো তিনি শোনেন নি! কলকাতার সব কলেজের নামই তো তিনি জানেন, মফঃস্বলের কলেজের নামও তাঁর অজানা নয়। হুঙ্কার দিয়ে তিনি বললেন,

"কী কলেজ বললি! কোথায় সে চুলোর কলেজ?"

"মণ্ডলস্ কলেজ। বৌবাজারে।"

"মিথ্যে কথা। ও-নামের কোনো কলেজ বৌবাজারে নেই। কোথাও নেই ও-নামের কলেজ! আমাকে তুই কলেজ চেনাচ্ছিস্, তোর বাপকে পড়িয়েছি আমি। বল্ কোথায় ভর্তি হয়েছিস?"

ক্রমে জানা গেল যে-কলেজে শ্যাম ভর্তি হয়েছে তার পদবী শুদ্ধ পুরো নাম হচ্ছে "মণ্ডলস্ কলেজ অভ টাইপরাইটিং"। ওর নাম কলেজ, কেননা ওখানে শুধু ম্যাট্রিকপাস ছেলেদেরই নেওয়া হয়।

রাগে আত্মহারা হয়ে জ্যাঠামশায় ডাকলেন,

"মাধুরী!"

মেজদি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। জ্যাঠা-মশায় পাড়া ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন,

"শোনো তোমার আদরের ভায়ের কীর্তি। উনি 'কলেজে' ভর্তি হয়েছেন! কলেজের নাম মণ্ডলস্ কলেজ! শেখানো হয় টাইপরাইটিং। বি.এ.-এম.এ. পাস ক'রে উনি বেকারের দল পুষ্ট করতে চান না, তাই স্থির করেছেন অর্থকরী এই বিদ্যা অর্জন করতে। ওকে বলে দাও ঐ বৌবাজারেরই ফুটপাথে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে নিতে। আস্পর্ধা দেখ ছোঁড়ার! ওর বাপ আমার কাছে মুখ খুলতে সাহস করে না—এখনও! আর ও আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যে, ও কলেজে পড়বে না, টাইপরাইটিং শিখে পয়সা রোজগার করবে! নিয়ে যাও
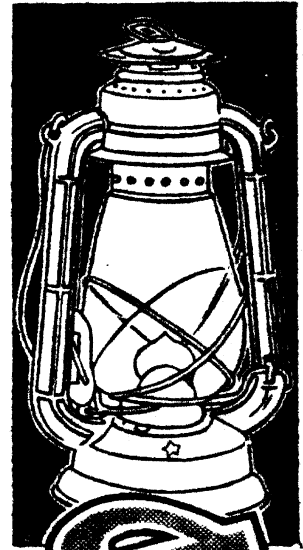
ওকে আমার সামনে থেকে—এখখুনি! নইলে ওর হাড় গ‍ুঁড়ো ক'রে ফেলব।"

মেজদি শ্যামকে নিয়ে গেল নিরালায়, তেতলায় ঘরে।

শ্যাম স্বীকার করলে, শ‍ুধ‍ু পয়সা রোজগার করবার জন্যেই সে টাইপরাইটিং শিখছে না—অন্য কারণ আছে। মেজদির সন্দেহ হল কারণটা রাজনীতিগত।

বিপ্লবীদলে টাইপরাইটিং-জানা কর্মীর বড় অভাব।

বোমার য‍ুগে বিপ্লবের প্রচার হত বেশীরভাগ ম‍ুখে ম‍ুখে। দলের বড়দারা মেজদাদের বোঝাতেন, মেজদারা ছোড়দাদের, এমনি ক্রমে বিপ্লবী প্রেরণা সারা দলে ছড়িয়ে পড়ত। কিছ‍ু পড়ারও পাট ছিল, কিন্তু তার বই ছাপার হরফেই পাওয়া যেত। দলের হ‍ুকুমও চালাচালি হত ম‍ুখে ম‍ুখে অথবা সংকেতের দ্বারা। বিস্তারিত লেখা-লেখির চল বড় একটা ছিল না।

এ য‍ুগের ব্যবস্থা অন্য রকম। হালের বিপ্লবীদের মধ্যে মৌখিক আলোচনা যে হয় না তা নয়, কিন্তু তারও ম‍ূলে থাকে দেশবিদেশের আর্থনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ—অনেক পড়া, অনেক লেখার ফল। তাছাড়া, ত্রিবাঙ্কুর থেকে কাশ্মীর, ডিব্র‍ুগড় থেকে আহমেদাবাদ, নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে আছে দলের শাখা। তন্দের সবার সংগে যোগাযোগ ম‍ুখে ম‍ুখে কী করে রাখা সম্ভব? বিশেষ পার্টি যেকালে বে-আইনী।

তাই আজকাল বিপ্লবী মহলে টাইপ-রাইটিং-জানা ছেলের সেই চাহিদা, যে-চাহিদা সেকালে ছিল বোমার ফরম‍ুলা জানা লোকের।

মেজদি জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ কি তোকে বলেছে টাইপরাইটিং স্কুলে ঢ‍ুকে দেশ উদ্ধার করতে?"

শ্যাম বললে, "না, কেউ বলেনি, আমি নিজেই ঢ‍ুকেছি।"

মেজদি রাগ করে বললেন, "বড় কাজ করেছেন ছেলে। ও'রা সব হবেন সানইয়াৎ সেন, গারিবালদি, লেনিন—আর তুমি হবে তাঁদের টাইপিস্ট!"

• • •

টাইপিস্টের পদোন্নতি হল।

জগদ্দলে মজ‍ুরবস্তীতে একটা পাঠচক্র ছিল। প্রতি সপ্তাহে সেখানে আলোচনা হত, নানাবিষয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম এমন কি ভূয়ো-দর্শনও বাদ যেত না।

বই ধরে পড়ানো কমই হত। প্রথমত হাংগামা ভাষার—মজ‍ুরেরা ইংরেজীও বোঝে না, সংস্কৃত-হিন্দীও বোঝে না। যে-ভাষায় ওরা কথা বলে সে ভাষায় কাব্যসাহিত্য থাকলেও পাঠ্যপ‍ুস্তক নেই। তাছাড়া, সারাদিন কলে খাটার পর একঘেয়ে পড়ায় জ্ঞানব‍ৃদ্ধি বড় একটা হয় না, বরং ঝিম‍ুনিই আসে।

তার চাইতে অনেক ভালো লাগত মজ‍ুরদের আজব দেশ র‍ুশের গল্প—যেখানে মজ‍ুরে তাদেরই মত কলেখাটা মজ‍ুর, ছিল গোলাম, হয়েছে ফোরম্যান, অফিসার, ম্যানেজার, মন্ত্রী। র‍ুশে যা-কিছ‍ু হয়েছে তার সবার ম‍ূলে হচ্ছে শিক্ষা। কার্ল মার্ক্সের লেখা পড়ে শিখেছেন লেনিন, লেনিনের লেখা পড়ে শিখেছে দ‍ুনিয়ার মজ‍ুর। সেই বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত এই পাঠচক্র।

কলকাতা থেকে কমরেড যেত পাঠচক্রে পড়াতে, প‍ুলিসের নজর এড়িয়ে, এপথ ওপথ ঘ‍ুরে। হাঙ্গামার কাজ। শাদা ধ‍ুতি-পাঞ্জাবী পরা কমরেডরা মজ‍ুর বস্তীতে ঢ‍ুকলেই সন্দেহ হয়। গোয়েন্দা হাপ-গোয়েন্দার তো অভাব নেই, লাগিয়ে দেয় প‍ুলিসের কানে, লাগায় প‍ুলিস তাড়া। নিত্য নতুন ফন্দি ক'রে কমরেডদের আনতে হয়, ল‍ুকিয়ে ফেলতে হয়, এ বস্তী ও বস্তী ঘ‍ুরিয়ে নিরাপদ জায়গায় পেণছে দিতে হয়। নানান্ ফ্যাসাদ, গ‍ুর‍ুদায়িত্ব।

সেদিন যে-ছেলেটির পাঠচক্রে যাওয়ার কথা তার হঠাৎ অন্তিম-সময়ে কম্প দিয়ে জ্বর হল। ছেলেটির নাম হর্ষ। শ্যাম এসেছিল তার কাছে একতাড়া টাইপ করা কাগজ পেণছে দিতে। হর্ষ ধ‍ুঁকতে ধ‍ুঁকতে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,

"কী আর হবে ও-কাগজ দিয়ে? দেখছ তো অবস্থা?"

শ্যাম ঘাড় নাড়লে। হর্ষ বললে,

"কিন্তু কী হবে? আজ-যে একজন নতুন কনট্রাক্ট আসবে স‍ুতোকল থেকে! খ‍ুব জংগী মজ‍ুর। আজ না গেলেই নয়—শ্যাম!"

হর্ষের দিকে ঝ‍ুঁকে পড়ে শ্যাম বললে "কী?"

"তুমি যাবে?"

"কোথায়?"

"জগদ্দলের পাঠচক্রে। তুমি যাবে আমার হয়ে?"

শ্যাম জিজ্ঞেস করলে, "আমি গেলে কি হবে?"

হর্ষ বললে, "খ‍ুব হবে। কেউ না গেলে ওদের ম‍ুখ ছোট হয়ে যাবে কনট্যাক্টের সামনে। তুমি গিয়ে আর কিছ‍ু যদি নাই হয় ওদের বসাতে পারবে তো? তাতেই হবে।"

শ্যাম হিসেব ক'রে দেখল তখ‍ুনি জগদ্দল রওনা হলেও বাড়ি ফিরতে তার রাত বারোটা হবে। জ্যাঠামশায় হয়তো প‍ুলিসে খবর দিয়ে একটা অনর্থ বাধাবেন। মেজদিকে একটা খবর পাঠাতে পারলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত, কিন্তু সে উপায় নেই। বাড়ি ফিরে খবর দিতে গেলে জগদ্দলের গাড়ি ফসকে যাবে; টেলিফোন করতে গেলেও ধরবেন জ্যাঠামশায় স্বয়ং! নাঃ, কোনো বাঁচোয়া নেই।

হর্ষের কাছ থেকে খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়ে খবর নিয়ে শ্যাম বেরিয়ে পড়ল। (ক্রমশ)

॥ ১৬ ॥

পশ্চিমের পাহাড়চূড়ায় বেলাশেষের বিষণ্ণ রোদ আটকে রয়েছে।
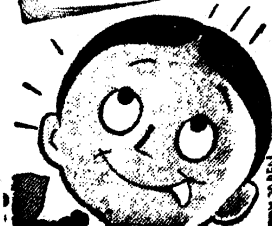
সিঁড়িটোর ঘরে এলো সারুয়ামারু। এক-পাশে বাঁশের একটা মাচান। তার ওপরে বসে রয়েছে সেঙাই। এর মধ্যে খাবারগুলো নিঃশেষ করে ফেলেছে সে।

ঘরের মধ্যে ধূসর আবছায়া। সারুয়ামারু বললো, "কী রে সেঙাই, সব গিলেছিস? আমার জন্যে রাখিস নি!"

"না, আর একটুও নেই। বড় খিদে পেয়েছিল।"

"হু—হু! আচ্ছা যাক ওসব। ফাদারের কাছ থেকে আবার চেয়ে নেবো'খন।" সারুয়ো-মারু বললো, "চল্, কোহিমা শহর তোকে ঘুরিয়ে আনি। মাধোলাল মারোয়াড়ীর দোকান, ভূষণ ফুকনের দোকান—যেখান থেকে আমরা নিমক নি, সব দেখিয়ে আনবো তোকে।"

এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো সেঙাই, "সেই যে বলেছিলি, এক রানী গাইডিলিও না কে আছে? তাকে দেখাবি না? তুই বলেছিলি, তার ছোঁয়ায় না কী সব রোগ সেরে যায়! আমুন্যুর (চিকিৎসক) চেয়েও সে বড়। সর্দার তাকে দেখে যেতে বলেছে।"

"হু, হু। নিশ্চয়ই দেখাবো। চল্ এবার।"

রেশম-সবুজ ঘাসের জমিটার কাছে আসতেই পেছন থেকে একটা ডাক ভেসে এলো। নির্ঘাৎ পাদ্রী সাহেব। পেছন ফিরে তাকালো সারুয়ামারু আর সেঙাই।

"এই সারুয়ামারু, এই সেঙাই—কোথায় যাচ্ছো তোমরা?"

ঘাসবনের ওধারে একটা বেতের চেয়ারে বসে হোলি বাইবেলের বিশেষ একটা অধ্যায়ে মনটাকে ডুবুরির মত নামিয়ে দিয়েছিল প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সারুয়ামারু। তারপর ফিস্ ফিস্ গলায় বললো, "সেঙাইকে একটু শহর দেখাবো। ঐ মাধোলালের দোকান—যেখান থেকে আমরা নিমক কিনি, সেই আস্তানাটাও দেখিয়ে দেবো। দরকার হলে বস্তী থেকে ও এসে নিমক নিয়ে যাবে।"

"আর কোথায় যাবে?" শান্ত চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী।

"আর হুই যে রানী গাইডিলিও আছে না, তাকে একবার দেখবো।"

রাণী গাইডিলিও! ময়াল সাপের ছোবল পড়লো যেন ম্যাকেঞ্জীর কানে। হাতের বাইবেলখানা সশব্দে বন্ধ করে তীরের মত উঠে দাঁড়ালো সে; "খবরদার, ঐদিকে কেউ যাবি না। ও একটা ডাইনী! সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"ডাইনী!" চমকে উঠলো সারুয়ামারু। তার মুখেচোখে একটা সন্ত্রস্ত ছায়া এসে পড়লো।

ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেঙাই। সে বললো: "ডাইনী!"

"হাঁ—হাঁ—" সোনালী চুল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, কপিশ চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুটি পাহাড়ী মানুষকে দেখতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। ডাইনী! দেখতে লাগলো, ঐ একটি শব্দ কেমন করে তাদের মুখেচোখে প্রতিক্রিয়া আঁকছে। নিপুণ শিল্পীর মত কথার তুলিতে, উচ্চারণের রঙে রঙে একটা ভয়ের ছবি আঁকতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। বার বার সেঙাই আর সারুয়ামারুর কানের কাছে মুখখানা ঘনিষ্ঠ করে পরম শুভার্থীর মত বলতে লাগলো সে: "খবরদার; গাই-ডিলিওর কাছে যেয়ো না তোমরা। একটা খারাপ আনিজা! বুকের রক্ত শুষে শুষে একেবারে সাবাড় করে ফেলবে।"

কাঁপা-কাঁপা গলায় সেঙাই বললো: "ডাইনী যখন, তখন বশীকরণ ওষুধ জানে গাইডিলিও?"

"হাঁ-হাঁ জানে। খুব সাবধান!" কণ্ঠের ওপর রাশি রাশি ভয়ের রঙ ঢালতে লাগলো প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী; "এমন বশ করবে না, একেবারে পোষা টেফঙ্ বানিয়ে ছাড়বে।"

"তবে ভালোই হ'লো। আমাদের পাশের বস্তী সালুয়ালাঙে আমার লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) আছে। তাকে আমার চাই। তার জন্য গাইডিলিও ডাইনীর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাবো। আমাদের ঐদিকে ডাইনী নাকপোলিবা রয়েছে বটে! তার কাছে যেতে বড় ভয় করে!"

একটু থতমত খেলো ম্যাকেঞ্জী। তার-পরেই বিস্রস্ত মনটাকে গোছগাছ করে নিল: "এ ডাইনী তোমাদের ঐ নাকপোলিবার চেয়েও সাংঘাতিক। এর কাছে যেয়ো না। আমি তোমাকে সেই সালুয়ালাঙ বস্তী থেকে লগোয়া লেন্যুকে (প্রেমিকা) এনে দেবো। তা হলে খুশী তো!"

"দিবি তো! দিবি তো! ও সায়েব!" একেবারে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলো সেঙাই: "তুই যদি দিস্, তবে আর গাই-ডিলিওর কাছে যাবো না।"

—বলতে বলতে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাবুনার অতল তলায় তলিয়ে গেল সেঙাই। তারপর সন্ত্রস্ত গলায় বললো; "কিন্তু সদ্দার যে তাকে দেখে যেতে বললো!"

"সদ্দার জানে না, ও কী শয়তানী! ঐ

ডাইনী [illegible] [illegible] পড়েছে।"

আচমকা বাঁশের গেটের ওপর ক্যাচ করে একটা শব্দ উঠলো। চোখ তুলে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। তারপর খুশী খুশী

[illegible] [illegible] "ফাদার এসেছে," [illegible] ফেলিয়া।"

গেটের ওপাশে অনেক মানুষের জটলা। পাহাড়ী মানুষ! দস্তুর মত সোরগোল শুরু করে দিয়েছে তারা। মাথায় মোষের শিঙ, আউ পাখির পালক। তামারঙ দেহে উল্কির শিল্পলেখা। মানুষের কঙ্কাল, মেনজোর চোখ, মেনজোর দাঁত আঁকা রয়েছে। হাতের বিশাল থাবায় মৃত্যুমুখ বর্শা। সেই বর্শার ফলায় বেলাশেষের অবসন্ন রোদ ঝিলিক দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে একখান মিছিলের মত মানুষগুলো সামনের ঘাসের জমিটায় এসে বসেছে। সেঙাই একবার তাকালো তাদের দিকে। তার দৃষ্টিটা চক্রাকারে সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে শুরু করলো। নানা জাতের পাহাড়ী নাগা। লোটা, কাও, সাঙটাম, কোনিয়াক, সেমা, রেঙমা। বিচিত্র ভাষায় তারা সব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। বিচিত্র ভাষা, বিচিত্রতর উচ্চারণ আর বিচিত্রতম মুখভঙ্গি। সহসা একটি মুখের ওপর এসে দৃষ্টিটা স্থির হয়ে উঠলো সেঙাইর। হৃৎপিণ্ডের বাজনা জলদ হলো। ঐ মানুষটা, নির্ঘাৎ সালুয়ালাঙ বস্তীর সদ্দার!

দ্রুত করে সারুয়ামারুর পেছনে এসে দাঁড়ালো সেঙাই।

সারুয়ামারু বললো, "কীরে সেঙাই? কী হলো?"

"ঐই দেখ, সালুয়ালাঙ বস্তীর সদ্দার এসেছে। তুই দাঁড়া, আমি বাবার ঘর থেকে বর্শা নিয়ে আসি।"

"কেন?" বিস্মিত চোখে তাকালো সারুয়ামারু।

"কেন আবার? যদি একটা লড়াই বেধে যায়!"

"আরে না, না! ফাদার রয়েছে না! এখানে ওসব লড়াই চলবে না। তা হলে ঐ আসান্যুরা (সমতলের মানুষ) বন্দুক দাকিয়ে মেরে ফেলবে।"

এর মধ্যে ঘাসের জমির পাহাড়ী মানুষগুলির কাছাকাছি এসে পড়েছে ম্যাকেঞ্জী। মধুর হাসিতে মুখখানা আলোময় হয়ে গিয়েছে তার। ম্যাকেঞ্জীর হাসির নেপথ্যে অনেক সাধনার ইতিহাস রয়েছে। মুখের আয়নায় যে কোন সময় যে কোন রঙের হাসি সে আঁকতে পারে। সার্প্লিসটা গোছগাছ করতে করতে ম্যাকেঞ্জী বললো; "এই যে সদ্দারেরা, তোমরা সব এসেছো; তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"হু-হু।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, মোষের শিঙের মুকুট দুলিয়ে দুলিয়ে সায় দিল পাহাড়ী সদ্দারেরা; "কী কথা বলবি ফাদার? আমরা শুনবো।"

ওপাশে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেঙাই আর সারুয়ামারু। সারুয়ামারু বললো;—

"পাহাড়ী বস্তী থেকে সর্দারেরা এসেছে। ফাদার ওদের সংগে এখন কথা বলবে। চল্, আমরা পালিয়ে যাই। শহর দেখে, মাথেলাল মারোয়াড়ীর দোকান দেখে তারপর আবার ফিরবো।"

"হু, হু, তাই চল্—"

সকলের অগোচরে লোহার গেটটা পেরিয়ে কোহিমার পথে এসে নামলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

আর প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী পাহাড়ী মানুষগুলির জটলায় মধ্যবিন্দু হয়ে বসলো। একান্ত অন্তরঙ্গতায়। নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়।

পাহাড়ী সর্দারেরা বিশৃংখল কলরব করছে: "ফাদার, আমার বস্তীতে সকলে যীশু যীশু করে আর করুশ (ক্রশ) আঁকে।"

"আমার বস্তীতেও।"

"আমার বস্তীতেও।"

অনেকগুলো গলা একই দাবীর গৌরবে সশব্দ হলো।

"গুড্, ভেরী গুড্"—প্রসন্নতার একটি চিকণ আভা ঝলমল করছে ম্যাকেঞ্জীর মুখেচোখে: "খুব খুশী হলাম।"

একটু আগে সারুয়ামারুর চোরা বলির কথা শুনে মনটা যে পরিমাণ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, এই মুহূর্তে এতগুলি গ্রামের এতগুলি পাহাড়ী সর্দারের কণ্ঠে যীশু-মেরীর উচ্চারণ শুনতে শুনতে মনের মধ্যে খানিকটা আত্মপ্রসাদ তরঙ্গিত হলো ম্যাকেঞ্জীর। তবে তার প্রীতিচর্চা একেবারেই অসফল নয়, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেনি তার মিশনারী জীবনের উজ্জ্বল শপথ। পাহাড়ী প্রাণের শিলাফলকে যীশু-মেরীর যে নাম বার বার অবিরাম প্রেরণায় লিখতে চেয়েছে ম্যাকেঞ্জী, আজ যেন তার প্রথম সুস্পষ্ট হরফ দেখতে পেলো সে। দেখে মুগ্ধ হলো। নিজের মহিমায় স্নায়ুগুলোর ওপর একটা সুখের শিহরণ বয়ে গেল প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর।

এবার আশ্চর্য শান্ত অপরূপ নিস্তরঙ্গ গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "তোমাদের নিমকের দরকার তো?"

"হু, হু, সেই জন্যেই তো এলাম ফাদার।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—এবার তোমাদের অনেক নিমক দেবো। টাকাও দেবো। একটা কাজ করতে হবে তোমাদের।"

"হো-ও-ও-ও য়া-য়া ফাদার নিমক দেবে, টাকা দেবে।"

সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে কোহিমার এই পাহাড় চূড়ায় একটা আনন্দিত সোরগোল পাহাড়ী ঝড়ের মত ভেঙে পড়লো। সে চীৎকারে আকাশের কোন নিঃসীম শূন্যে বেথলেহেমের একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ত বা চমকে উঠলো। ঘাসের জমিটার এক কিনারে কাঠের শুভ্র রূপে সে কোলাহল থেকে খানিকটা [illegible] ছিটকে গিয়ে লাগলো যেন।

ম্যাকেঞ্জী আশ্চর্য সতর্ক চোখে পাহাড়ী মানুষগুলির মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে চার্চের একটি জানালায় এনে স্থির করলো। দেখলো, দেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে দুটি নীল চোখের মণিতে কেন্দ্রিত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়ার্সন। একটা শিলামূর্তি যেন। বাঘের ঘরে ঘোগের আস্তানা! আচ্ছা, তার নামও ম্যাকেঞ্জী। পাদ্রী জীবনের পরপারে ব্রেটনব্রুকশায়ারের রাঙা মাটিতে মাটিতে তার অতীতকে রেখে এসেছে সে। সে অতীতের খবর জানা নেই পিয়ার্সনের। সে অতীত মানুষের তাজা রক্তে রক্তে ভয়ংকর। আশেপাশের পঁচিশটা শায়ারের সীমানা তার নামের দাপটে সেদিন তটস্থ থাকতো। একটা ভিলেজ রোগ: একটা ব্যান্ডিট! আশ্চর্য! ব্যান্ডিট থেকে ক্যাথিড্রালের সেণ্ট। আশ্চর্য জন্মান্তর বটে! সেই ব্রেটনব্রুকশায়ারের রাঙা মাটি ঘোড়ার খুরে খুরে বিক্ষত করে, শিকারী নেকড়ের মত একদল ভয়াল অনুচর নিয়ে ঘুরে বেড়াতো একটা মানুষ। একটা ঘৃণিত আউট ল। তার ঘোড়ার খুরে খুরে একটা আসন্ন অপঘাতের আশংকায় শিউরে উঠতো পঁচিশটা শায়ারের ধুকপুকু হৃৎপিণ্ড।

ব্যান্ডিট থেকে মিশনারী।

কী ভয়ানক সে জীবন! মানুষের নিরীহ রক্তে রক্তে নারীর ইজ্জতের শিকারে সে জীবন কী কদাকার। সেদিন কী অব্যর্থ ছিল তার রাইফেলের লক্ষ্য! রিভলভারের ট্রিগারের ওপর তর্জনীটা এতটুকু কাঁপতো না সেদিন।

আউট ল থেকে চার্চের সেণ্ট! কত যোজন ফারাক, কত পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে ম্যাকেঞ্জীকে? সে কাহিনী অন্য সময় বলা যাবে। কিন্তু ব্রেটনব্রুকশায়ারের সেই ভয়ংকর জীবন এখনও তার রক্তে রক্তে বিষাক্ত একটা দেবত কণিকার মত মিশে রয়েছে। সেই কলুষিত জীবনে ফিরে যেতে চায় না পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। কিন্তু পিয়ার্সনটা বড় একগুঁয়ে! বড় জেদী! যদি প্রয়োজন হয়? চার্চের জানালায় একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি হেনে বিড়বিড় করে কী যেন বললো ম্যাকেঞ্জী! নিশ্চয়ই বাইবেলের কোন প্যারাবল আবৃত্তি করলো না।

এবার সরাসরি চোখে পাহাড়ী মানুষগুলোর দিকে তাকালো ম্যাকেঞ্জী, "একটা কাজ করতে হবে তোমাদের, বুঝলে সর্দার! যত টাকা চাও, যত নিমক চাও, দেবো। পাইডিলিওর নাম শুনেছো তো!"

"হু-হু!" পাহাড়ী মানুষগুলো মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিল।

"ঐ পাইডিলিও একটা ডাইনী। তোমাদের বস্তীতে বস্তীতে এই কথাটা ছড়িয়ে দিতে হবে। যত টাকা চাও, দেবো।" আরো নিবিড় হয়ে বললো ম্যাকেঞ্জী।

"কে ডাইনী? হুই পাইডিলিও?" চোহুকি সর্দার সিনামস্কো হুংকার দিয়ে উঠলো; "একথা বললে একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না। আমার ছেলেটাকে অন্যায়ীরা তো সুচেনাদ্ দিয়ে কুপিয়ে

গেল। তামনুদ্ (চিকিৎসক) বললো, ও আর বাঁচবে না। ঐ গাইডিলিওর ছোঁয়ায় সে বেঁচে উঠলো। তাকে ডাইনী বলছিস!"

"হু-হু—" আও আর সাঙটাম সর্দারেরা উঠে দাঁড়ালো; "আমাদের বস্তীর অনেক লোক ভালো হয়ে গেছে। তাকে ডাইনী বলতে বলছিস! একেবারে বর্শা দিয়ে সাবাড় করবো।"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

চীৎকার করে উঠে দাঁড়ালো লোটা, কোনিয়াক আর রেঙমা সর্দারেরা: "চাই না, চাই না তোর টাকা, তোর নিমক। যে আমাদের বাঁচালো, তাকে ডাইনী বলবো না।"

"যীশুর নাম বলবো না। মেরীর নাম বলবো না।"

"আর ক্রশ আঁকবো না।"

"হো-ও-ও-য়া-য়া—"

সোরগোল উদ্দাম হয়ে উঠলো; "রাণী গাইডিলিওর সঙ্গে বেইমানী করতে বলছিস! তুই তো শয়তান আছিস!"

"তোর কাছে আর আসবো না।"

দুটোর আক্রোশে কাঁপন। চোখদুটো ধকধক জ্বলছে ম্যাকেঞ্জীর। সে কী জানতো, এই ক'দিনে পাহাড়ীগুলোর মনে যীশুমেরীর নামে যা গড়ে তুলেছিল, তা অসহায়! সহসা তার দৃষ্টিটা চার্চের জানালায় একটা মুখের ওপর এসে পড়লো। পিয়ার্সন! সক্ষ্ম মসলিনের মত সে মুখে একটি বিদ্রূপের হাসিই কী আটকে রয়েছে! সারা দেহের শিরায় শিরায় ব্রেটনব্রুকশায়ারের অতীত জীবন যেন ঝকমক করে উঠলো ম্যাকেঞ্জীর। ক্ষ্যাপা একটা নেকড়ের মত গর্জন করে উঠতে যাচ্ছিল ম্যাকেঞ্জী, তার আগেই তার চোখদুটো সামনের গেটটার ওপর এসে চমকে উঠলো।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

চীৎকার করতে করতে কোহিমার পথে নেমে গেল পাহাড়ী সর্দারেরা।

মস্ত মনটা যেন হারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ম্যাকেঞ্জীর। আগ্নেয় চোখের মণিদুটো যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিছুই শুনছে না ম্যাকেঞ্জী। একটা নিরাকার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে তার চেতনাটা। জীবনে কোনদিন এমন নিরুপায় মনে হয়নি নিজেকে।

সহসা পাথরের [illegible] থেকে [illegible] [illegible] মত ফুটে বেরুলো। তাদের মধ্যে বুড়ো সর্দার আছে, কাছাড়ী [illegible] আছে। আর রয়েছে সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার; "সাদার, আমরা তোর নিমক খেয়েছি। আমরা নিমকহারামি করবো না। গাইডিলিওকে ডাইনী বলে আমাদের বস্তীতে আমাদের চেনাশোনা বস্তীতে চাউর করে দেবো। তবে আমাদের অনেক টাকা দিতে হবে।"

"দেবো, দেবো—" একটা অবলম্বন পেয়েছে ম্যাকেঞ্জী। একটা আশ্রয়। এই আশ্রয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সে ভেল্কী দেখিয়ে ছাড়বে। "তোমরা যা চাও তাই দেবো।"

আচমকা সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার বললে: "সাদার, আমাদের বস্তীর মেয়েগুলিকে কেলুরির বস্তীর লোকেরা আটক করে রেখেছে। তাকে ফিরে পেতে হবে। তাই বস্তীর সেঙাই ওকে নিয়ে যেতে চায়। টিজিয়ে [illegible] বস্তী থেকে মেয়েদের জন্য [illegible] [illegible] দিয়ে গিয়েছে। কেলুরির বস্তীর লোকেরা আমাদের শত্রু।"

"ঠিক আছে।" [illegible] চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। [illegible] সেঙাই [illegible] [illegible] এই তো [illegible] ছিল [illegible] পাহাড়ী [illegible] [illegible] থেকে [illegible] গিয়েছে! [illegible] একটা [illegible] ম্যাকেঞ্জীর। [illegible] [illegible] সে, [illegible] মেয়েদের [illegible] বস্তীতে [illegible] [illegible] কোহিমা শহরের [illegible] [illegible] [illegible] বস্তীতে [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দারের [illegible] [illegible] লাগলো।

কোহিমা। সমতল থেকে অনেক অনেক উঁচুতে পাহাড়ী শহর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, চড়াই-উৎরাইএর ফাঁকে ফাঁকে টিনের আর [illegible] বাড়ি। পাহাড়ী ময়ালের মত এঁকে বেঁকে পথের রেখা উঠে গিয়েছে, তার পরেই সমুদ্রের একটা নিস্তব্ধ ঢেউএর মত নীচের দিকে ঢাল খেয়ে নেমে গিয়েছে।

পাঁচেক আঁকাবাঁকা পথ, পাইন আর ওক বনের আড়ালে আড়ালে কালো কালো পাথরের টিলায় মৌচাকের মত ছোট ছোট বাড়ি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে সেঙাই, আর সালুয়ামারু। সেঙাইর দু চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। তার অস্ফুট পাহাড়ী চেতনা এই কোহিমা শহরের প্রতিটি রূপ-কণাকে শোষণ করে নিচ্ছে যেন।

একসময় ডিমাপুর যাওয়ার পথটার পাশে এসে দাঁড়ালো দুজনে। জায়গাটা অনেকটা সমতল। শুধু সামনের দিকে পিঙ্গল রঙের ঘনময় পাহাড় চূড়ার দিকে এঁ পাশে টালবুনের দোকান-পসার। উঠে গিয়েছে।

ওপরে ঢেউটিনের চাল, খাটসহ কাঠের দেওয়াল, নীচে এক কাঠের পাটাতন।

সারুয়ামাব্‌ বললো, "ইস অনেক দোকান বেড়ে গেছে! আগে তো এতো ছিল না, আসানারা (সমতলের লোকেরা) সব ঝাঁক বেঁধে আসছে যে সেঙাই। কোহিমা শহর একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, দেখেছিস?"

"হু, হু—"

"আরে সারুয়ামাব্‌, ইদিকে এসো। এসো আসাহোয়া (বন্ধু)।" সামনের একটা দোকান থেকে সাদর ডাক ভেসে এলো।

"কে? ও মাধোলাল মারোয়াড়ী? চল্‌ চল্‌ সেঙাই—" সারুয়ামাব্‌ সেঙাইর একটা থাবা চেপে ধরলো। তারপর দুজনে মাধোলালের দোকানের দিকে এগুতে শুরু করলো।

ছোট্ট পাহাড়ী শহর এই কোহিমা। নাগা পাহাড়ের কেন্দ্র বিন্দু। সমতল থেকে বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে এসে বসেছে বাঙালী, আসামী, মারোয়াড়ী। এসেছে পাঞ্জাবী আর ভুটিয়া। বাকমারী সম্ভার; মনোহরণ সামগ্রীতে নানা রঙের বাহার। আশেপাশের পাহাড় থেকে শুকনো মরিচ, আনারস আর পাহাড়ী আপেল নিয়ে খোলা আকাশের নীচে অস্থায়ী বাজার বসিয়েছে কুকীরা। এসেছে মিকিরেরা। মণিপুরীরাও এই বাণিজ্য মেলা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখেনি।

কাচের বাসন, লবণ, পাউডারী চালের ভারা নিয়ে রেল স্টেশন মণিপুর রোড থেকে এই কোহিমার বাজারে আসছে একটার পর একটা লরী। বাঘের ছাল, হরিণের শিং, কস্তুরী, ওক আর পাইনের কাঠ, কমলা আর রাশি রাশি বনজ ফল— নানা পণ্যভারে বোঝাই হয়ে রেলের স্টেশনে ফিরে যাচ্ছে লরীর মিছিল।

দোকান-পসারের জটলা পেছনে রেখে মাধোলালের দোকানে এসে বসলো সেঙাই আর সারুয়ামাব্‌।

মাধোলাল বললো, "কী হে সারুয়ামাব্‌, তুমি তো আর আজকাল আসো না নিমক নিতে? কী হলো? তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরদা সব আমার খদ্দের ছিল। আজকাল এত দোকান হয়েছে। আসনারা (সমতলের লোকেরা) এসে কোহিমার বাজার ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু, আমি যখন এখানে আসি তখন আসানাদের একটা দোকান? ছিল না কী গোসা হয়েছে না কী?"

"না, না—" সারুয়ামাব্‌ মাথা ঝাঁকালো।

"তবে আসো না কেন?" অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ালো মাধোলাল।

"আজকাল ঐ ফাদার নিমক দেয়, তাই আর আনি না।"

"আরে রাম রাম! তাই না কী? তা নিমকের বদলা কী দাও?" আগ্রহে বুড়ো মাধোলালের চোখদুটি জ্বলছে।

"কিছু না, খালি ক্রশ আঁকি আর যীশু-মেরীর নাম করি।" নির্বিকার বলে গেল সারুয়ামাব্‌; দুই ফাদার বলেছে, ক্রশ আঁকলে আর যীশুমেরীর নাম করলে কিছুই দিতে হবে না।"

"হায় রাম রাম"—প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মাধোলাল; "ঐ কাম করলে তোমার আনিজা যে গোসা হবে। ঐ পাদ্রী সাহেবরা ভারী শয়তান আছে। তোমার ধরম নষ্ট করে দিচ্ছে। ঐ খাসিয়া পাহাড়ে যখন ছিলাম, তখন দেখেছি। খাসিয়াদের সব খেরেস্তান করে নিল। এবার তোমাদের ধরেছে। হায়, রাম রাম!"

আজমীড় কী মারোয়াড়ের কোন এক দেহাতী গ্রামে মাধোলালের দেশ। তা আজ আর বিশেষ মনে পড়ে না। সূর্য ওঠার আগে আকাশের চক্রেখায় যেমন এক আবছা ছায়া-ছায়া রঙ লেগে থাকে, ঠিক তেমনি একটা অস্পষ্ট স্মৃতি মনের নেপথ্যে বিবর্ণ হয়ে রয়েছে মাধোলালের। জনারের ক্ষেত, কাঁপাস-রঙ রুক্ষ মাটি, মহিষ চরাণের জমি। আর কিছু নয়। দশ বছর বয়সে বাপ ক্ষেত্রীলালের সঙ্গে এই উত্তরপূর্ব ভারতে এসেছে সে। রেলের চাকার নীচে অদৃশ্য হয়েছে বিহার, তারপর সুশ্যাম বাঙলা মুলুক। তার ওপর আসামের নিঃসীম সমতল পেরিয়ে খাসিয়া পাহাড়। নঙ পো, শিলং, চেরাপুঞ্জি। তারও পর হাফলঙে কিছুদিন থেকে এই নাগা পাহাড়। তাও আজ চল্লিশ বছর পার হতে চললো।

অনেক কিছু দেখেছে মাধোলাল। এই চল্লিশ বছরের স্মৃতিতে বন্দী হয়ে রয়েছে অনেক কথা, অনেক ঘটনা, অজস্র অভিজ্ঞতা। জীবনের এই চল্লিশটা বছরের প্রতিটি প্রহরের পাতায় পাতায় কত ইতিহাস লেখা রয়েছে মাধোলালের, তার শুকনো হাড়ে হাড়ে কত পাথরলিপি আঁকা হয়েছে, তার হিসাব নেই, তার সীমা-পরিসীমা নেই।

বাপ ক্ষেত্রীলাল কোহিমার পাহাড়ে এই তেল-লবণ-আফুর দোকান দিয়ে দিয়েছিল। বুড়ো এই বাঁশের মাচানের ওপর বসে বসে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তো। সেও আজ কতদিন পার হয়ে গেল। বাপ মরলো একদিন। তারপরের বছর কলকাত্তা শহর থেকে তাদের মুলুকের দেহাতী কিশোরী বাসুদেবীকে সাদী করে আনলো মাধোলাল। সেবার কী হুজুগ, আজীব শহর কলকাত্তায়। মিছিল, সভা, বক্তৃতা। কে এক সুরেন বানারজী না কী যেন? নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। কাঁচা-পাকা দাড়ির বহরা। বাঙালী বাবুর কলিজার জোর আছে। আগুন আছে রক্তের। তাকে নিয়ে কী মাতামাতি! একটু একটু শুনেছিল মাধোলাল, তার চেয়েও কম বুঝেছিল। বাঙালী বাবুরা নাকী সাহেবদের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সে সব ঘটনা মাধোলালের স্মৃতিতে ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

সাদী করার পরের বছর পান্ডুতে বাড়ি

তুললো মাধোলাল। সরমের কথা; তবু সত্যি বৈ কী! সাদীর প্রথম বছরেই ছানা-পোনা হলো। সেই ছেলে বুধোলাল এখন পঁচিশ বছরের তাজা জোয়ান। বুনো ঘোড়ার মত উদ্দাম। তার একটা সাদী দিতে হবে। অবশ্য সাদী একরকম ঠিকই হয়ে রয়েছে। রাঙাপায়ার মেয়ে। নাম বিরজা। আসামী মেয়ে পুত্রবধূ হবে। তাতে আপত্তি নেই মাধোলালের। এত বছর এই উত্তর-পূর্ব ভারতে রয়েছে মাধোলাল। নানা দিক থেকে আত্মীয়তার শিকড়ে-বাকড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে এই আসাম, এই খাসিয়া পাহাড়, এই নাগা মুল্লুক।

আজ দশ বছর ধরে এই কোহিমা পাহাড়ে স্থির হয়ে বসেছে মাধোলাল। মাঝে মাঝে মণিপুর রোড স্টেশন থেকে রেলে চড়ে পাণ্ডুর বাড়িতে যায়। দুচার দিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসে এই কোহিমার দোকানে। সমতল থেকে অনেক উঁচুতে এই পাহাড়ী শহর তাকে শত বাহু দিয়ে যেন বন্দী করে রেখেছে। বুধোলাল অনুযোগ দেয়। এই বুড়ো বয়সে এবার পাণ্ডুর বাড়িতে গিয়ে বসলেই হয়! যে বয়সের যে ধরম। সামনেই কামাখ্যা মন্দির! সেখানে গিয়ে পরকালের খানিকটা সুরাহা করলেও তো পারে বুড়ো মাধোলাল। আর কটা দিনই বা বাকী আছে পরমায়ুর? পরপারের সানাই বাজলো বলে! ডাক আসতে কতক্ষণ? সব বোঝে মাধোলাল। কিন্তু কোহিমা যেন পাহাড়ী ডাইনীর মত তাকে কবলিত করেছে। বিচিত্র তার ইন্দ্রজাল; তার বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্তির কণামাত্র যেন সম্ভাবনা নেই।

বুধোলালই আজকাল পণ্যভার আমদানী করে। আমিনগাঁ থেকে, কবিমগঞ্জ থেকে, তিনসুকিয়া কী হাফলঙ থেকে রেলের ওয়াগন ভরাট করে। তারপর ডিমাপুর থেকে লরীতে চাপিয়ে এই শহর কোহিমা। আর বুড়ো ক্ষেত্রীলাল যেখানে বসে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করতো, যেখান থেকে একটি ছন্দিনম্র সুরের ইন্দ্রধনুতে এই পাহাড়ী পৃথিবীকে অমৃতময় করে তুলতো, ঠিক সেই মাচানটির ওপর বসে বুড়ো মাধোলাল পাহাড়ী মানুষগুলোর সঙ্গে গল্প করে। আজমীড় কী মারোয়াড়ের সেই দেহাতী গ্রামটির আবছায়া স্মৃতি; রেলের গল্প, পাণ্ডু-আমিনগাঁ-কাটিহারের গল্প, খাসিয়া আর গারো পাহাড়ের গল্প। কলকাতার গল্প; সাহেবদের সঙ্গে সেই বাঙালীবাবু সুরেন বানারজী না কার যেন? সেই লড়াইএর ইতিহাস! শিলং-চেরায় পাদ্রী সাহেবদের কীর্তিকথা! আরো যে কত কাহিনী, তার লেখাজোখা নেই। আর ষাট বছরের প্রতিটি পলে পলে, ষাট বছরের বিরাট অতীতে আর দেহের প্রতিটি স্পন্দনে স্পন্দনে রাশি রাশি গল্প, রাশি রাশি কাহিনী ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। সেই সব গল্প বলে মাধোলাল।

সামনে উটমুখো হয়ে বসে রয়েছে সারুয়ামারু। তার পাশে সেঙাই।

আবারও সশব্দ হলো বুড়ো মাধোলাল, "হায়, রাম, রাম! এই পাদ্রীগুলো সব ধরমনাশা। নিমকের বদলা ধরম নিয়ে নেয়—"

"বলিস কী মাধোলাল? আমাদের ধরম নিচ্ছে ঐ ফাদার!"

"হাঁ-হাঁ! এ কথা আবার কাউকে বলো না। তোমার ঠাকুরদা ছিল আমার আসাহোয়া (বন্ধু)। সে আমার দোকান থেকে নিমক নিত। তারপর আসতো তোমার বাবা। তারওপর আসতে তুমি। তুমি তো এখন ঐ পাদ্রীদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছো! তোমাদের তিন পুরুষের সঙ্গে আমাদের কারবার। তাই সত্যি কথা বললুম; সাহেবদের কাছে এসব বলো না। তা হলে আমার দোকান তুলে দেবে।" পাহাড়ী ভাষা কী চমৎকার আয়ত্ত করেছে মাধোলাল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

"না, না বলবো না। আগে তো ঠিক বুঝিনি। আনিজার নামে টেফোয়া বলি দিতে ফাদার বারণ করে। একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না!" সহজ পাহাড়ী মানুষ সারুয়ামারু ফুঁসে উঠলো।

সহসা ফিস ফিস গলায় মাধোলাল বললো, "তোমাদের ঐ যে রাণী গাইডিলিও আছে না, তার কাছে জিগোস করো। হক কথা বলবে!"

"না, না উর কাছে যাবো না। ও তো ডাইনী!" একটা সন্ত্রস্ত ছায়া এসে পড়লো সেঙাইর মুখেচোখে। সারুয়ামারুও ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

"ডাইনী! কে? রাণী গাইডিলিও!" বিস্ময়ে গলাটা চৌচির হয়ে গেল মাধোলালের; "কে বললে এ কথা?"

"ফাদার বলেছে।"

"মিছে কথা। একেবারে মিছে কথা।" সহসা এক আজব কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা তুলে দিল বুড়ো মাধোলাল; "জানো সারুয়ামারু, আমাদের দেশে এক মহারাজ আছে। তার নাম হলো গান্ধীজী। এই সাহেবদের সঙ্গে তার লড়াই বেধেছে। আমার ছেলে বুধোলাল দুদিন আগে কলকাতা থেকে ফিরেছে। সে সেই লড়াই দেখেছে।"

সহসা সেঙাই বললো, "এই সাহেবরা কোথা থেকে এলো?"

"সে ভিন দেশ থেকে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে। অনেক, অনেক দূরে সে দেশ।" কোহিমা পাহাড় থেকে এক অনির্দেশ্য চক্রবেখার দিকে আঙুল বাড়িয়ে

ছিল মাধোলাল; "আমরা তো আসান্যু (সমতলের লোক)। আমাদের দেশ থেকেও অনেক, অনেক দূরে সাহেবদের দেশ।"

"সে দেশে তুই গেছিস?"

"না।"

আচমকা সারুয়ামারু বললো, "ঐ যে বলছিস লড়াই বেধেছে! তা বর্শা দিয়ে, সুচেন্যু দিয়ে, থোম কেপেম দিয়ে মানুষ ফুঁড়ছে তো! মাথা কেটে মোরাঙে ঝোলাচ্ছে তো! বেশ মজা কিন্তু, আমাদের পাহাড়ে অমন লড়াই অনেকদিন বাধছে না।"

"তেমন লড়াই নয়। গান্ধীজীর লোকেরা সায়েবদের মারে না। সায়েবরাই তাদের মারে। এ দেশ থেকে সায়েবদের ভাগতে বলেছে গান্ধীজী।"

"এ কেমন লড়াই? মার খাবে অথচ মার দেবে না। দূর! তাই কখনো হয়! সব মিছে বলছিস। আমাদের পাহাড়ে ঐ লড়াই হলে একেবারে সব ফুঁড়ে ফেলতুম না!" উত্তেজনায় ঝকমক করছে সেঙাই। থরে থরে পেশীভার ফুলে ফুলে উঠছে তার।

"এ লড়াই তোমরা বুঝবে না। এ বড় মজার লড়াই। আমার ছেলেটা বললো, "গান্ধীজীর লোকেরা মার খেয়ে খেয়ে জিতে যাচ্ছে।" একটু চুপচাপ। তারপরেই আবার বলতে শুরু করলো মাধোলাল, "ঐ দেখো, খালি কথাই বলছি। এর কথা তো বললে না সারুয়ামারু! এ কে?" সেঙাইএর দিকে তাকালো মাধোলাল।

"এ হলো সেঙাই। সিজিটোর ছেলে।"

"ও, রাম রাম! তারপর শোনো, আমাদের দেশে যেমন গান্ধীজী, তোমাদের এই পাহাড়ে তেমনি হলো রাণী গাইডিলিও। সাহেবদের সেও দেখতে পারে না। তার কথা শুনে দেখো। এই কোহিমাতেই তো আছে রাণী গাইডিলিও।" বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো বুড়ো মাধোলাল। তার দৃষ্টির আয়নায় এক বিচিত্রতর পৃথিবীর ছায়া দেখলো সেঙাই আর সারুয়ামারু। গান্ধীজীর সঙ্গে সাহেবদের লড়াই, রাণী গাইডিলিও—এই অদ্ভুত নামগুলি, মাধোলালের এই অপরূপ গল্প তাদের অস্ফুট বন্য চেতনার উপকূলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ী মনে ছলছল দোলা লেগেছে। রূপকথার মত এই রমণীয় কথার আমেজে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে দুটি পাহাড়ী চৈতন্য।

সহসা সেঙাই বললো, "তোদের দেশে সাহেবদের সঙ্গে লড়াইটা বাধলো কেন? কী হয়েছিল? ঘরের বউ ছিনিয়ে নিয়েছিল না কী?"

"ওরা বিদেশী। আমাদের দেশে এসে আমাদের মারবে, আমাদের খাবার কেড়ে
আমাদের মারবে, আমাদের খাবার কেড়ে
কতকাল সইবো? এই ধরো, তোমাদের বস্তী, সেখানে কেউ যদি এসে সর্দার হতে চায়, তোমাদের মারতে চায়, তাহলে সইবে?"

"না, না। একেবারে খতম করে ফেলবো।" গর্জে উঠলো সেঙাই।

"সাহেবরা এসেছে বিদেশ থেকে। এসেছিস থাক, তা নয় সর্দারী করতে শুরু করলো। এই দেখো না তোমাদের পাহাড়েও এসেছে।"

সারুয়ামারু বললো, "তোরাও তো এসেছিস। তোরাও তো বিদেশী! তোরা আসান্যু (সমতলের লোক)।"

"হায়, রাম রাম—" মাথা আধ হাত জিভ কাটলো মাধোলাল; "আমরা আসান্যু (সমতলের লোক), তা ঠিক কথা। কিন্তু এ দেশটা আমাদের। তোমরা আমরা একদেশী। আমরা থাকি নীচু জমিতে, তোমরা থাকো পাহাড়ে। দুইয়ে মিলিয়ে গোটা ভারতবর্ষ।"

"তবে ফাদার বলে যে, আসান্যুরা শয়তান, ওর ভিনদেশী।"

"সব মিছে। তোমাদের রাণী গাইডিলিওকে জিগ্যেস করে দেখো।"

কোহিমার আকাশে রাত্রির পদপাত হয়েছে। অস্পষ্ট রঙের কুয়াশা আচক্রবাল ছড়িয়ে পড়েছে। সামনের বনময় পাহাড়চূড়া অন্ধকারের রহস্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবার উঠে দাঁড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু। সারুয়ামারু বললো, "আমরা যাই। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। বড় শীত করছে।"

গ্যাসবাতি ধরাতে ধরাতে মাধোলাল বললো, "তোমরা আছো কোথায়?"

"ফাদারের কাছে।"

"ও।" বিড় বিড় করে অস্পষ্ট গলায় কী যে বললো মাধোলাল, বোঝা গেলো না। তারপরেই সরব হয়ে উঠলো সে, "গান্ধীজীর কথা, রাণী গাইডিলিওর কথা আমাদের ফাদারকে বলো না কিন্তু। আর নিমকের দরকার হলে আমাদের দোকান থেকে নিয়ে যেও। সব দোকান থেকে সুবিধে করে দেবো।"

"আচ্ছা।"

কোহিমার পথে পা বাড়িয়ে দিল সেঙাই আর সারুয়ামারু।

চলতে চলতে সারুয়ামারু বললো, "মজার গল্প বলে মাধোলাল। গান্ধীজীর লড়াই, রাণী গাইডিলিও! কী সুন্দর গল্প! ভারি ভালো।"

"হু, হু—" মাথা নাড়লো সেঙাই।

গান্ধীজীর যুদ্ধ! রাণী গাইডিলিও! সেঙাইর বন্য পাহাড়ী মনের ফলকে ফলকে কী পাষাণলেখা পড়লো? আঁকা হলো দুর্বোধ্য কোন শিলালিপি?

ক্রমশ

রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে

মহাশয়,—শিবনারায়ণবাবুর 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে' নিয়ে পাঠকমহলে বাদ-প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই হৈ-চৈটা আর কিছুই নয়। সংস্কারবর্জিত বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংস্কার ও সংরক্ষণশীল মনোভঙ্গির প্রতিক্রিয়া। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান যথেষ্ট; কিন্তু তাঁর সাহিত্য সাধনাতে যে কিছু ফাঁক থেকে গেছে এ কথাটা বিবেচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে শিবনারায়ণবাবু শুচিবায়ুগ্রস্ততার অভিযোগ এনেছেন। তাতে অনেকে আহত হয়েছেন; তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ভাষায় গ্রাম্যতা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির প্রশ্রয় না দিয়ে ভাষার শালীনতা রক্ষা করেছেন। ভাষাকে আমরা ভাব প্রকাশের রথ হিসাবেই ব্যবহার করি। ভাষার জন্যে ভাব প্রকাশ করি না। কাজেই আঞ্চলিক বা গ্রাম্য ভাষার মধ্যে যদি সার্বজনীন ব্যঞ্জনার প্রকাশ থাকে, তাহলে ভাষা সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামি না থাকাই ভালো। অশ্লীলতার মাঝেও একটা মাজাঘষা আর্ট ফুটিয়ে তুলতে হবে।

অবশ্য শিবনারাণবাবু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শুচিবায়ুগ্রস্ততার যে অভিযোগ এনেছেন সেটা ধোপে টেঁকে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা ছিল ভাব-জীবনের সাধন, বস্তু-জীবনের সাধনা নয়। কাজেই তাঁকে ভাবের সাথে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের কোন নায়ক-নায়িকা বলতে পারতেন না "বয়লার আছে মিস্ত্রি বলে, দেলো একটা চুমু"। অথচ এই কথাটাই যখন এক আধুনিক প্রখ্যাতনামা লেখক একটা বিশেষ পরিবেশে পরিবেশন করলেন, তখন আমরা আর অশ্লীল বলতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা বা সঙ্কোচের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইতি—শ্রীতড়িৎকুমার বসাক, মুগোলা, হুগলী।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়,—রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়ের সাম্প্রতিক রচনা বাংলা সাহিত্যপিপাসুদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

শিববাবু নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রমূল্যায়নে একটা নতুন চিন্তারীতির সূত্রপাত করেছেন। স্তাবকতার অন্ধ আবর্তে তলিয়ে শুধু বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, পূর্বসূরীর দাক্ষিণ্যের যথার্থ মর্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিতই করা হয়। শুধু নামে রত্নের সত্য মূল্য নির্ধারণ হয় না, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকসম্পাত বিচার করেই আমরা তা যাচাই করতে পারি। এদিক দিয়ে আলোচ্য রচনার জন্য রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতা শিববাবুর প্রাপ্য।

কিন্তু তবু প্রবন্ধটির রচনা সম্পর্কে,—বস্তু এবং রীতি দু দিক থেকেই কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। এতো বড়ো একটা আলোচ্য বিষয়কে অতোটুকু প্রবন্ধের পরিসরে ব্যক্ত করতে যাওয়া রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। ফলে যুক্তির পূর্ণ বিস্তার ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত-গুলি পাঠকের বিচারগ্রাহ্য হবার পথ সহজ করা হয়নি, পরন্তু সেগুলির দায়িত্ব তিনি নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপরেই টেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ যুক্তির পাকগুলিকে আরো ফেটিয়ে সিদ্ধান্তের সুতো বের করলে পাঠক-সাধারণের সুবিধে হত। প্রবন্ধটি দীর্ঘতর হলে এগুলির রূঢ়তা এতো পীড়াদায়ক হত না। রচনারীতিতেও এই একগুঁয়েমির ভঙ্গী এবং চমক লাগানোর চেষ্টা কিছু ক্লেশকর। মনে হয়, ঐ বক্তব্যকেই বুদ্ধির ধার বজায় রেখে আরেকটু মোলায়েমভাবে পরিবেশন করা কঠিন ছিল না।

এবং রেনেসাঁর উত্তরসাধনাই কি সৎসাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র অঙ্গীকার? বিশ্বসাহিত্যের উপরকোঠায় মরমিয়া সাহিত্যের কি কোনো স্থান নেই? উপরন্তু সমকালীন বাস্তব কি চিরকালীন বাস্তব? আর চিরকালীন বাস্তবের সূত্র নির্ণয়ে কতকগুলি চিরকালীন নীতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় আছে কি? পুতুল-নাচের শিল্পমূল্যকে কি প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যকর্মের নিক্তিতে খুঁটিয়ে মাপবো? নাচের মুদ্রা ব্যবহার? কিংবা আধুনিক চিত্ররীতিতে বিকৃতিকরণের যে ঝোঁক তার বাস্তব বিচার করবো কী নিরিখে? প্রতীক কি সত্য? অথচ প্রতীক কি বৃহত্তর সত্যেরই ইঙ্গিত নয়?

অবশ্য এগুলি শুধুই প্রশ্ন। এগুলির উত্তর দেবার যোগ্যতা যাঁদের তাঁরা যদি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় অগ্রসর হন, তবে তা আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর হবে।

আপনার সাপ্তাহিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে, অন্তত এক বছরের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারিত করা সম্ভব হবে কি? ইতি—পরিতোষ খাঁ, ফুলবাড়ি, মালদা।

নাটকের কথা

মহাশয়,—'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩'র ৩৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমে প্রকাশিত কয়েকটি ছত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের 'নাটকের কথা' প্রবন্ধের উক্ত অংশে বিজেতা আলেকজান্ডার ও এক ভারতীয় সাধুর (?) যে কাহিনীটি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সুপরিচিত। কিন্তু কাহিনীটি প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 'ডাইওজিনিস' ও বিজয়ী আলেকজান্ডার সম্বন্ধে নহে কি?

বিনীত—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, শংকরপুর, মেদিনীপুর।

লেখকের বক্তব্য

"দেশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,—আমি যত দূর জানি উল্লিখিত সাধুর নাম দন্দমীশ ও তিনি ভারতীয়। এ প্রসঙ্গে আপনার পাঠকদের বিচার আহ্বান করা যেতে পারে। ইতি—ভবদীয় অন্নদাশঙ্কর রায়, শান্তিনিকেতন।

॥ ২৬ ॥

হিমালয়ের পশ্চিমদিকে, দূরে, বহু দূরে, এভারেস্ট আর দার্জিলিঙ ছাড়িয়ে হাজারেরও অধিক মাইল দূরে, দাঁড়িয়ে আছে একটি পাহাড়। ভয়ংকর। বিপদ আর মৃত্যু তার সাথী। নাম নাঙ্গা পর্বত: নগ্ন পাহাড়। বছরের পর বছর ধরে বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে এই পাহাড়ে। অন্যান্য পাহাড়গুলি চড়তে যতলোক প্রাণ হারিয়েছে প্রায় তত লোকই মরেছে এই একটি পাহাড়ে উঠতে গিয়ে।

সম্প্রতি নাঙ্গা পর্বতের চূড়াতেও ওঠা হয়েছে। ১৯৫৩ সালে জার্মান আর অস্ট্রীয়ানদের এক মিলিত অভিযান মানুষের বহু বছরের প্রাণ-ঢালা সাধনার সিদ্ধি ঘটিয়েছে। ওই বছর জুলাই মাসের প্রথম দিকে, এভারেস্টে ওঠার ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে, হার্মান বুহ্‌ল্ নামে এক অস্ট্রীয়ান সাহেব এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠেন। একা। একাই তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছেন। একাই উঠেছেন উচ্চতম শিবিরটা থেকে নাঙ্গা পর্বতের চূড়ায়। কিন্তু আমি যখন ওই পাহাড়ে যাই, সেই ১৯৫০ সালে, তখনও ওটাতে কেউ উঠতে পারেনি। কেউ যে কখনও উঠতে পারবে এ ধারণাটা পর্যন্ত নষ্ট হতে বসেছিল। তখনও পর্যন্ত ছটা অভিযান ওই পাহাড়ে চালানো হয়েছিল। আর তারা তাদের পিছনে মর্মান্তিক সব দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু রেখে আসেনি।

এই পাহাড়ে প্রথম অভিযান হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এক নামকরা ইংরেজ পর্বতারোহী এই অভিযান চালিয়েছিলেন। সেই সাহেবের নাম এ এফ মামেরী। হিমালয়ে মামেরী সাহেবের সেই প্রথম পদার্পণ। আর সেটা শেষও বটে। মামেরী সাহেবের সঙ্গে ছিল দুজন ইংরেজ, তাঁর বন্ধু। আর ছিল দুজন গুর্খা আর কিছু সেই দেশীয় কুলি। সাহেব এই পাহাড়ের পাদভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর চূড়ায় ওঠবার কোন পথ পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজতে আরম্ভ করলেন। গোড়ার দিকে ভালোই কাটলো। সাহেবরা প্রায় ২২,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেলেন। তারপর মামেরী সাহেব দুজন গুর্খাকে নিয়ে খুব উঁচু একটা তুষার ঢাকা গিরিপথ পার হতে গিয়ে আর ফিরলেন না। তাঁদের যে কি হোল, সঠিক কেউ বলতে পারে না। তবে সকলের ধারণা, তাঁরা হয়তো তুষার-ধসে প্রাণ হারিয়েছেন। তারপর, তার সাঁইত্রিশ বছর পরে আর একটা অভিযান চলালো এই পাহাড়ে। সেটা ১৯৩২ সাল। এবার এলেন জার্মান আর আমেরিকানদের একটা মিশ্রিত দল। মামেরী সাহেব যে-পথে অভিযান চালিয়েছিলেন, এঁরা সে-পথে গেলেন না। অন্য আর একটা পথে এঁরা ২৩,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে

পেরেছিলেন। এঁদের তৈরী পথটা ধরেই পরবর্তীকালের অভিযানকারীরা এই পাহাড়ে অভিযান চালিয়েছেন। প্রচণ্ড ঝড় আর তীব্র তুষারবৃষ্টির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে এই দলটিকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তবে এঁদের ভাগ্যটা ভালো। প্রাণ নিয়ে সবাই ফিরতে পেরেছিলেন।

তারপর আসেন জার্মানরা। দুটো দলে। একটা দল এলো ১৯৩৪ সালে, আর একটা ১৯৩৭এ। আর এলো সব থেকে হৃদয়-বিদারক, ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সব থেকে মর্মান্তিক। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এমন শোচনীয় দুর্ঘটনা আর ঘটেনি। এমন নিদারুণ সর্বনাশ আমাদের শেরপাদের জীবনেও বেশি আসেনি। এই দুটো অভিযানেই শেরপারা ছিল। কমপক্ষে তাদের পনেরজন প্রাণ হারিয়েছে। ঝড়ের দাপটে ১৯৩৪ সালের এই শোচনীয় পরিণতিটি ঘটে। কয়েকজন সাহেব কিছু কুলির সঙ্গে পাহাড়ের উপর যখন বেশ খানিক দূরে উঠে গিয়েছেন, সেই সময় তুষার ঝড় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল তার আক্রমণ। সে আক্রমণে কোন ছেদ ছিল না, ছিল না কোন বিরাম। তুষার ঝড়ের সে প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকিয়ে সকলের পক্ষে নিচে নেমে আসা সেদিন সম্ভব হয়নি। মাত্র গুটিকয়েক লোকই পেরেছিল। এর আগে আমি শেরপা গিয়ালি ওরফে গেলে-এর কথা বলেছি। সে হয়তো নেমে আসতে পারতো। কিন্তু আসেনি। এই অভিযাত্রী দলের নেতা উইলি মেরকল্-এর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্তই সে নিয়েছিল। তাঁর সঙ্গেই সে মরেছে। চার বছর পরে তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। একেবারে অবিকৃত অবস্থায়। তারা দুজনে গভীর তুষারের মধ্যে পাশাপাশি শুয়েছিল। যেসব চিহ্ন সেখানে পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে, মেরকল্ সাহেব মরে যাবার পরও গেলে অনেকক্ষণ বেঁচেছিলো। তবুও সে সাহেবকে ছেড়ে আসেনি। আরও তিনজন জার্মান সাহেব আর জনাপাঁচেক শেরপা ঝড়ের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে করতে নেমে আসবার পথে মারা পড়ে। এই শেরপাদের একজনের দেহ ১৯৩৮ সালে খুঁজে পাওয়া যায়। তার নাম পিনজু নোরবু। তার দেহটা একটা দাঁড়িতে বাঁধা ছিল। ঝুলেছিল। মাথাটা ছিল নিচু দিকে। মনে হয়, সে একটা বরফের প্রাচীর টপ্‌কাতে গিয়ে মরেছে।

১৯৩৭ সালে আবার দুর্ঘটনা ঘটে। এবারকার দুর্ঘটনায় লোক মরে আরো বেশি। সাহেবদের সাতজন আর শেরপাদের নয়জন। তবে এবারের মৃত্যু আসে হঠাৎ। কোন কষ্টও কাউকে পেতে হয়নি। পাহাড়ের পূর্বদিকে এক গিরিশিরার নিচে একটা তুষারের গুহার মধ্যে এইবারকার অভিযাত্রীরা তাঁদের চতুর্থ শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেই শিবিরে সকলে পরম নিশ্চিন্তে এক রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ এক বিরাট তুষার ধস নেমে আসে, কবরস্থ করে দেয় সকলকে একসঙ্গে। সেই শিবিরের একটি লোকও বাঁচেনি। কেউ নড়েনি। বাঁচতে চেষ্টা করার সুযোগও কেউ পায়নি। সে বছর গ্রীষ্মকালে, তাদের খুঁজে বের করবার জন্য যে উদ্ধারকারী দলটি পাঠানো হয়েছিল, তারা গিয়ে দেখলেন, তাঁবুর মধ্যে পাশাপাশি সকলে শুয়ে আছে। যেন পরম শান্তিতে, অতি নিশ্চিন্তভাবে সবাই ঘুমিয়ে আছে। দুজন সাহেবের দেহ পাওয়া যায়নি। যে-সব সাহেবের দেহ পাওয়া গিয়েছিল, কবর দেবার জন্য সেগুলো নিচে নামিয়ে আনা হয়। শুধু নামানো হয়নি শেরপাদের দেহগুলো। নামানো হয়নি উদ্ধারকারী দলের সর্দার শেরপা নারসাঙের অনুরোধে। থাক ওরা। ওখানেই শুয়ে থাক। আছে, এখনও আমাদের সেই লোকগুলো সেখানেই ঘুমিয়ে রয়েছে। নাঙ্গা পর্বতের তুষার দিয়ে তৈরী চিরস্থায়ী সেই কবরে।*

---

* ১৯৩৭ সালের অভিযাত্রীদের মধ্যে একটি মাত্র শেরপা বেঁচেছিল। সে আমার পুরোনো বন্ধু নাওক্সা থোন্‌দুপ, দুর্ঘটনার সময় সে নিচের শিবিরে ছিল।

জার্মানরা আবার নাঙ্গা পর্বতে গিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে (সেইবার ১৯৩৪ সালের অভিযাত্রীদের দেহগুলো পাওয়া যায়)। ১৯৩৯ সালেও তাঁরা আবার যান। কিন্তু বড় বড় দুটো শোচনীয় দুর্ঘটনার পর কোনো শেরপা আর তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজী হয়নি। তাই উপযুক্ত পরিমাণ মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার অসুবিধার জন্য তাঁরা চূড়ায় পৌঁছবার সুযোগ পাননি। মৃত্যু এই দুটো দলের কোনটির উপরই তার থাবা বসাতে পারেনি। তারপরেকার দশ বছরের মধ্যেও সে আর কাউকে ঘায়েল করতে পারেনি। পারেনি তার কারণ খুব সোজা, কেননা, সেই দশ বছরে আর কোন অভিযানই হয়নি।

কিন্তু মৃত্যু যা পেয়েছে তাও কম নয়। এই নাঙ্গা পর্বত অভিযানে সে প্রাণ নিয়েছে উনত্রিশজনের। আর এখন, এই ১৯৫০ সালে আরও দুটো প্রাণ সে হয়তো নেবে।

আমি কখনও ও পাহাড়ে যাইনি। কারণ আমি যাবার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রীব ছিলাম না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার পালাও এল। কিছুদিন ধরে ক্যাপ্টেন জে ডবল্‌ থার্নলির সঙ্গে আমার চিঠিপত্র লেখালেখি চলছিল। ক্যাপ্টেন সাহেব সপ্তম গুর্খা রাইফেলের একজন পদস্থ কর্মচারী। এঁরই সঙ্গে আমি ১৯৪৬ সালে হিমবাহে গিয়েছিলাম। সেইখানেই আমি ইয়েতির পদচিহ্ন দেখি। সাহেব হিমালয়ের দূর-দূরান্তরের অঞ্চলগুলোতে একটা বড় অভিযান নিয়ে যেতে চাইছিলেন। অবশেষে তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব পাকা হয়ে গেল। তার সঙ্গে আরো দুজন সাহেব যাবেন। দুজনেই তাঁর বন্ধু; দুজনেই তরুণ। তার মধ্যে একজনের নাম ক্যাপ্টেন ডবল্‌ এইচ ক্রেস্‌। তিনি হলেন অষ্টম গুর্খাবাহিনীর এক অফিসার। আর একজন হলেন লেঃ রিচার্ড মার্স্‌। ইনিও অফিসার। বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার বাহিনীর। তাঁরা ঠিক করেছিলেন এক বছর ধরে এই অভিযান চলবে। আমরা যাব কারাকোরাম পর্বতমালায়। যাব পশ্চিম তিব্বতে। যাব রুশ-তুর্কীস্থান সীমান্ত পর্যন্ত। সারা জীবন ধরে যে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে সেই ভাগ্যবান ভবঘুরের (জানিনে আল্লাহ্‌ আমাকে এ ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবে কিনা) রক্ত এমন একটা অভিযানের আহ্বানে যে চনমন্‌ করে উঠবে, এ আর বেশি কথা কি। তাই ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে বান্দরপুঞ্চ থেকে ফিরে আসবার পরই আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। এই দলের সঙ্গে। আমি ছিলাম এই দলের সর্দার। সঙ্গে ছিল আরো তিনজন শেরপা। আঙ্‌তেম্‌পা, আজীবা, ফু তারকে।

কলকাতায় মার্স সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা হল আর তাঁর সঙ্গেই আমরা রওনা দিলাম। নানা ঝামেলা শুরু থেকেই আমাদের সঙ্গী হোল। কারণ প্রথমেই আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেটা পাকিস্থান। পাশপোর্ট আর ভিসা জোগাড় করতে আমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হোল। যাহোক, সেসব সামলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছলাম। থার্নলি আর ক্রেস্‌ সেখানে ছিলেন। আমাদের যাওয়ার জোগাড়যন্ত্র পাকা করতে তাঁরা একটু আগে আগেই ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে গেলাম পেশোয়ার। কাজেই সেই খাইবার গিরিপথ। পেশোয়ার থেকে হাওয়াই জাহাজে গিলগিট্‌ পৌঁছলাম। যদিও আমি ঘোরাঘুরি করেছি অনেক তবুও এর আগে কখনও আকাশে উড়িনি। আমার সঙ্গী শেরপাদেরও কেউ না। হাওয়াই জাহাজে ওঠা আমার এই প্রথম। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কি অদ্ভুত উত্তেজনা! কি রোমাঞ্চ! এখনও মনে পড়ে সীটের সঙ্গে আমাদের যখন বেল্ট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল তখন কেমন অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য খুব শিগ্‌গীরই তা খুলে দেওয়া হল। আর যেই না খোলা অমনি আমরা তাড়াহুড়ো করে জানলার ধারে গিয়ে বসলাম। আর উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলাম বাইরে।

কিন্তু খুব বেশী দূর যাওয়া আর ঘটলো না। শিগ্‌গীরই গিলগিট্‌ এসে গেল। সেখান থেকে আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে উত্তরদিকে এগোতে থাকলাম। এবার পায়দলে। প্রথম দলটা অন্যটার থেকে দশদিন আগে যাত্রা করলো। এই দলে ছিলেন মার্স সাহেব, ছিলাম আমি, আর ছিল দশজন ভারবাহী। ওরা সব ওই দেশের লোক। আমি ভালো চিত্রলী বলতে পারতাম। কাজেই কাজকর্মে অসুবিধা ঘটলো না। চিত্রলী বলতে না আটকালেও আটকালো আর প্রায় সবদিকেই। বাজেলা
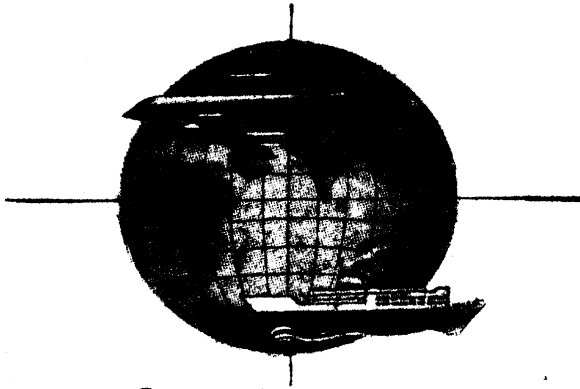
যে-কোন মুহূর্তে ধ্বস নেমে আসতে পারে

বেড়েই চললো। এর পরের যে জায়গায় আমাদের পৌঁছবার কথা ছিল তার নাম সিমসাল্। জায়গাটা রুশিয়া আর আফগানিস্থানের সীমান্তে। আমরা মান্ধাতা আমলের এক পথ ধরে নানা বন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম। তিব্বতের নির্জন সেইসব উপত্যকা থেকে এদেশ আরও নির্জন। আরও পরিত্যক্ত। আরও ন্যাড়া-খ্যাড়া। এ অঞ্চলে গাছ নেই, নদী নেই, এমন কি প্রাণেরও কোন পরিচয় নেই। এ এক অদ্ভুত মরুভূমি। পাথুরে মরুভূমি। আমার উৎসাহ অনেকটা চুপ্‌সে এল। সিমসাল্ পর্যন্ত আমরা ঠিকই গেলাম। তারপরেই পড়লাম রোগে। পেটের গোলমালে মার্স সাহেব আর আমি দুজনেই খুব কাবু হয়ে পড়লাম। আমরা একজন আর একজনকে পালা করে শুশ্রূষা করতে লাগলাম। আমাদের অবস্থা এমনই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে রোগটা সারলেও বেশ অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্বলতা কাটল না।

আমাদের এইবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্থান, আফগানিস্থান, তিব্বত আর রুশ দেশের সীমান্ত যেখানে এসে মিশেছে, সেইসব অঞ্চল সম্পর্কে জানা, তথ্য সংগ্রহ করা। এই অঞ্চলটা সম্পর্কে লোকে খুব কমই জানে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সফল হোল না। আবার গোলমাল বাধলো। না, এবার আর পেটের গোলমাল নয়। সিমসাল ছাড়বার কয়েকদিন পরেই আমরা পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফিরে আসবার হুকুম পেলাম। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন, আমাদের এই যাত্রায় আমরা যদি রুশ সীমান্তরক্ষীদের নিয়ে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তা নিয়ে হয়তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কথা উঠতে পারে। হুকুম তামিল করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমাদের জানানো হোল যে, সীমান্তের দরজা আমাদের জন্য রুদ্ধ। তাই কারাকোরাম মুখ ফিরিয়ে নিলো। অভিযান আরম্ভ না হতেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল।

কারাকোরামের এই ব্যাপারটায় আমি বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। হিমালয়ের এই অঞ্চলে আমি কখনো আসিনি। বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ গডউইন অস্টেন অথবা কে-২ এই অঞ্চলে রয়েছে। রয়েছে আরও অনেক বিখ্যাত শৃঙ্গ। অনেকদিন থেকে সতৃষ্ণ নয়নে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। ভেবেছিলাম ওগুলোতে উঠতে যদি না-ও পারি। কারণ পাহাড়ে ওঠার পক্ষে আমাদের দলটা খুবই ছোট ছিল। চোখের দেখাও অন্তত হবে। ওদের সঙ্গে চেনাজানা হবে, কিন্তু কিছুই হোল না। মার্স সাহেব আর আমি গিল্গিটে ফিরে এলাম। সেখানে বসে তিনজন সাহেব নানারকম পরামর্শ করতে লাগলেন। তারপর ঠিক করলেন নাঙ্গা পর্বতে যাবেন। পাকিস্তান আর কাশ্মীরের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাহাড়। এই কাশ্মীর নিয়ে চলেছে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ। নাঙ্গা পর্বতে ওঠবার অপেক্ষাকৃত সহজ যে রাস্তাটা, সেটা পড়েছে পাকিস্তানে। আর একবার আমরা যখন পাকিস্তানে গিয়ে পড়েছি, তখন এই পাহাড়ের তলায় পৌঁছতে আর রাজনৈতিক কোন বাধার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে না। তবে পাহাড়ে যদি উঠতে হয়, তার জন্য আমাদের অনুমতি নিতে হবে। কারণ বড় বড় শৃঙ্গে চড়বার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার দরকার হয়।

অবশ্য সে ব্যাপারে আমাদের ভাববার কিছু নেই, কেননা পাহাড়ে ওঠা তো দূরের কথা, তার চেষ্টা করার মত সাজসরঞ্জামও আমাদের কিছু ছিল না। গিল্গিট ছেড়ে আবার যখন বেরোলাম, তখনও পর্যন্ত আমার সেই ধারণাই ছিল।

সাহেবরা এখন কি করবেন, সে সম্পর্কে নানারকম পরামর্শ করতে লাগলেন। তাঁরা, বিশেষ করে থর্নলি সাহেব বলতে লাগলেন, বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন পাহাড়ে ওঠবার একটা চেষ্টা করেই দেখা যাক না কেন। অবশ্য সব কিছুই আমাদের বিপক্ষে ছিল। আমাদের পাহাড়ে ওঠার হুকুমনামা ছিল না, আমাদের দলটা ছিল ছোট, আর জানা ছিল ওই পাহাড়ের ভয়ঙ্কর ইতিহাসটা। তার উপর সব থেকে খারাপ ছিল সময়টা। সেটা নভেম্বর মাস। শীঘ্রই পুরো শীত এসে যাবে। কিন্তু সাহেবদের মাথায় একবার যখন মতলবটা ঢুকেছে, তখন সেটা হাঁসিল না করা পর্যন্ত তাঁদের স্বস্তি নেই। এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই থর্নলি সাহেব জবাব দিতেন, "হয়তো উঠে যেতেও পারি" কিংবা বলতেন, "আচ্ছা যাওয়া তো যাক। না হয় শুধু দেখেই ফিরে আসব।" ক্রমশ

॥ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কথা ॥

শওকত ওসমান

য়ুরোপ উপন্যাসের আঁতুড়-ঘর। বর্তমান বৈশ্য-সভ্যতার সূত্রপাতের সঙ্গে এই অভিনব আর্ট-ফরম বা শিল্প-রীতির আবির্ভাব। উক্ত সভ্যতার উত্থান-পতনের সমান্তরাল উপন্যাসও বিচিত্র বেশ বদলেছে। কোথাও মহাকাব্যের ঐশ্বর্য-সম্ভার-সহ মানুষের অন্তর্জগতের চিত্র-উদ্ঘাটনে নিযুক্ত; কোথাও গীতি-কবিতার রূপে। কোথাও সামাজিক পটভূমির ফ্রেমে জীবন-লীলার বৈচিত্র্য-গাথায় ভরপুর; কোথাও অবচেতন মনোরাজ্যের গহনে প্রবিষ্ট। দুই প্রত্যান্তিক চৌহদ্দির মধ্যে নানা কাঠামো আর রঙে উপন্যাসের বিকাশ। উপন্যাস শুধু কাহিনী নয়, কাহিনীর মাধ্যমে আরো ব্যাপক জীবন-ব্যঞ্জনা। গোটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দেখার এই শিল্পরীতি বণিক-সভ্যতার অন্যতম অমর অবদান। অন্তরের গুপ্ত ও সুপ্ত জগৎকে এমনভাবে প্রকাশমান করার দক্ষতা পূর্বেকার অন্য শিল্পরীতির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এডমাণ্ড উইলসন ফিল্ডিং-রচিত 'টম্ জোন্সের' ভূমিকার প্রতিধ্বনি করে তাই বলেছেন: উপন্যাস আধুনিক যুগের মহাকাব্য। মধ্যযুগের বিশিষ্ট শিল্পরীতি মহাকাব্যে সমাজ ও মানুষের প্রতিফলন অনেকখানি দেখা সম্ভব ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ব্যক্তি-স্বরূপ ঢের বেশী গভীর ও ব্যাপক।

যুগ তার গতির তাগিদেই নতুন শিল্প-সৃষ্টির দাবী জানায়। মধ্যযুগের অবসানের পর য়ুরোপে নয়া বণিক-শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সফর, ফলে বিভিন্ন দেশ ও তার নরনারীর প্রতি কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে আসে কাহিনী। ভ্রাম্যমান সওদাগর শ্রেণীই উপন্যাসের প্রথম বীজ বপন করে। উক্ত শ্রেণীর জাঁক-বৃদ্ধির সাথে সাথে এই শিল্প-রীতিরও শৈশবত্ব ঘুচতে থাকে। মহাকাব্যে সামাজিক পরিবেশের সংকলপ পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তি সেখানে অনেকখানি গৌণ। উপন্যাসের ব্যক্তি শালপ্রাংশু নায়ক। বণিকশ্রেণীর প্রথম সফল উপন্যাস-নবীশ সার্ভান্টিজ। 'ডন কুইকসোট' সমস্ত মধ্য-যুগের কেয়ামত-কাহিনী। সওদাগর শ্রেণী তখন আপন পরিবেশের নিয়ন্তা। জমি-নির্ভর সামন্ত-প্রভুরা ক্রমশ হটে যাচ্ছে। তাই মানুষ, ব্যক্তি-মানুষ উঁচু শিরোপা পায় উপন্যাসে। বণিক শ্রেণীর সম্মুখে তখন অনন্ত জগৎ ও কর্ম-চাঞ্চল্য। খ্রীষ্টোফার মার্লোর ভাষায়—

Perform what desperate
enterprise I will?
I will have them fly
to India for gold,
Ransack the oceans for
orient pearl
And search for all corner
of new-found world
For pleasant fruits and
princely delicates

অথবা—

Make men to live eternally
Or, being dead, raise
them to life again.

মার্লোর ডাঃ ফাউস্টের এই সমস্ত উক্তি বণিক শ্রেণীরই মানসিক প্রতিধ্বনি, মৃত্যুর নিকট পরাজয়-স্বীকার পর্যন্ত যার শত কুণ্ঠা। জাগ্রত শ্রেণী পরিবেশের নিপীড়ন এমনই অগ্রাহ্য করে। উপন্যাসের ব্যক্তি তাই সংগ্রামশীল প্রাণ-বীর বা হিরো। পরিবেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অভিযানই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। বণিক শ্রেণীর সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনার ইশারা। নতুন শিল্পরীতিরও আবির্ভাব ঘটে। চিত্রকলায় পারস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার একই সময়ের কাহিনী।

বণিকশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কাঠামো বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ইংলণ্ডে স্যামুয়েল পেপিস্ রিচার্ডসন থেকে হার্ডি পর্যন্ত কত না রূপান্তর!! সুদীর্ঘ চার শ' বছর। উপন্যাসের যাত্রাপথ তেমনই বৈচিত্র্যময় ও সুদীর্ঘ। বর্তমান বিদেশী শ্বেত সাম্রাজ্য-বাদীরা সেই সওদাগরজাদাদের বংশধর। কত না রূপান্তর। আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজ-মার্কিন জলদস্যুদের উপনিবেশ লুণ্ঠনের প্রয়োজন হয়। অ্যাডভেঞ্চার, ডিটেকটিভ-কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে দেখা দেয়। ইতিহাসের প্রগতিশীলতা জড়িয়ে ছিল বলে, সেদিন এই ক্ষেত্রেও কনান ডয়েলের মত সার্থক শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। আজ ফিকে হয়ে গেছে সেই কাহিনী—তার রচয়িতা ড্যান ওয়াইল্ড বা ডরোথি সেয়ার্স নেই হন। ডিটেকটিভ উপন্যাস এখনও জীবিত, কারণ সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে আছে: আফ্রিকা, মালয়, উগাণ্ডা, মরোক্কো আলজিরিয়ায় যার জ্বলন্ত নর্তন খণ্ডদৃশ্যের ধ্বংস-লীলা আজও আমাদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

বৈশ্য-সভ্যতা মানুষে মানুষে কলহ বিরোধিতার জন্মদাতা। বহু লেখকের কাছে তার সমাধান-পথ জানা থাকে না, অনেকে আবার বর্তমানকে সুনজরে দেখে নিতে পারেন নি। এমন ক্ষেত্রে রহস্যবাদী মিস্টিক কাল্পনিক ধোঁয়ায় বন্দী হয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। টমাস হার্ডি বণিক-সভ্যতার শেষ মহৎ ঔপন্যাসিক। লণ্ডন শহরের আর্তনাদ ওয়েসেক্স পল্লী-এলাকার নরনারীর সহজ সম্বন্ধ ও হৃদয়বৃত্তির উপর বিবর্ণ সুরের অনুরণন তুলেছিল। সংবেদনশীল শিল্পী তা সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু হার্ডির মতে মানুষ শেষ পর্যন্ত অমোঘ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। 'মেয়র অব ক্যাস্টারব্রিজ' রচনা-সমাপ্তির দুদিন পরে ডায়েরীতে তিনি লিখছেন,—

"The business of the poet and novelist is to show the sorriest underlying the grandest thing, and the grandeur underlying the sorriest thing."

গ্রীক্-ট্র্যাজেডিয়ানদের মত বিশ্ব-উজাড় দৃষ্টি-সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দুঃখবাদে এক মহৎ সাহিত্য-সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সার্ভান্টিজ, ফিল্ডিং, ডিফোর পাশাপাশি হার্ডির চরিত্র-কুল কত রূপে! বণিক-সভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস থেকে প্রাণ-বীর বা 'হিরো' অন্তর্হিত। তিন শ বছরে ধ্বংসোন্মুখ এই সভ্যতা পরিবেশের দাস মাত্র—আর সৃষ্টিশীল নয়। তার চাপে গোটা মানুষ দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত। উপন্যাসে তাই আর প্রাণ-বীরের প্রয়োজন কোথায়? ডাঃ
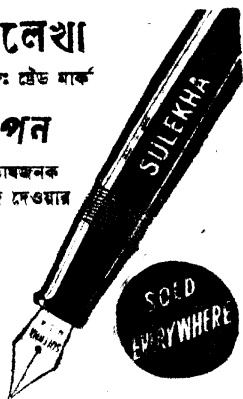
বিহারী মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে দিন-দিন হন্যে হয়ে উঠছে। সুষ্ঠু সামাজিক জ্ঞানের অভাবে বহু লেখক ঈমানদারের পক্ষেও এই ভুল স্বাভাবিক। কারণ, তাঁদের মতে যা ঘটে, তা-ই সাহিত্যের বাস্তব।

এইজন্য উপন্যাসে বাস্তবতার সমস্যা সামাজিক তত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। সমাজের সংগঠন ও কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সংঘাত; ঐ সংগঠনের দুর্বলতা ও ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ ইতিহাসে গতি যে-সমস্ত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল,—সেই সামগ্রিকতার বোধ-ই শিল্পের বাস্তবতা। জাতীয় জীবনের গভীরেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। বক্তব্য-খোলাসায় একটা উদাহরণের আশ্রয়-গ্রহণ, আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক ঠেকবে না।

সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে সবিশেষ পীড়াদায়ক সমস্যা। ঔপন্যাসিক কিভাবে ব্যাপারটা দেখতে পারেন? সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের মূল ধুয়াঃ হিন্দু মুসলমানের বা মুসলমান হিন্দুর ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিকাশের অন্তরায়। একটা-দুটো আপিস, কাছারী কি ঐ জাতীয় জায়গায়, কথাটা হয়ত সত্য। এই সত্যকে কাছারীয় সত্য নাম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গোটা দেশ ত' আর আপিস কি কাছারী দিয়ে ভর্তি নয়। এলাকা বিস্তৃতির পর, জিজ্ঞেস করা যাক, হাজার হাজার হিন্দু জেলে মালো তাঁতী নমঃশূদ্র মুসলমানকে শোষণ করছে—আবার দিনাজপুরের মুসলমান ধীবর ধাওড়া, কুষ্টিয়া খুলনার মোমিন (অবজ্ঞাত জোলা), লাখসাম চাষী, ছুতোর সুখানী-লস্কর কোন হিন্দুকে শোষণ করছে? কাছারীর সত্য তখন হাওয়া-ওয়াব, আর ধোপে টেঁকে না। বরং দেখা যায়, এক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দু-মুসলমানের জাতীয়-জীবন-বিকাশের অন্তরায়। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের গভীরে আরো ব্যাপকতার মধ্যেই সঠিক জওয়াব পাওয়া যাচ্ছে।

সমষ্টির এই বোধ, সামাজিক জীবনে প্যাটার্নের সন্ধান এবং তার মধ্যে কলা-শিল্পের মাধ্যমে সত্যের আবিষ্কার-ই উপন্যাসের বাস্তবতা। উপন্যাস তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের সন্ধান। তা-ছাড়া সত্যের তীর্থে পৌঁছানোও অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে সেই মহত্তম প্রচেষ্টার ঐতিহ্য রেখে গেছেন। তারপর আর কোন সৎ অনুশীলন হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে নিতান্ত দারিদ্র বাংলা উপন্যাস, তা অনেকেই স্বীকার করবেন। সাধনার দৈন্য বা অভাব যা-ই হোক, বাংলার জাতীয় জীবনের উপন্যাস-রূপী মহাকাব্য আজও অলিখিত। প্রচেষ্টা আর সাফল্য ত' এক কথা নয়।

খোদ উপন্যাসের বিকাশ, বিষয়বস্তু, কাঠামোর রঙ ইত্যাদি গোটা সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ছাপাখানার জন্য এই শিল্প-অবদান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা বলা বাহুল্য। তা-ছাড়া দেশে শিক্ষার হার, প্রকাশনী-প্রতিষ্ঠান, বিক্রী-ব্যবস্থা—আরো উক্ত পর্যায়ে লেখকের স্বাধীনতা কতটুকু—সব এর মধ্যে গণ্য করতে হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্থানের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতির উপর ঈষৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। গত আট বৎসরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দানের নজীর নেই এই ক্ষেত্রে—কি গুণে, কি পরিমাণে। পূর্ববঙ্গ মধ্যযুগীয় ভাব-ধারার মোহাবেশে এখনও বন্দী। ফলে, সাহিত্যের অন্যান্য দিক যা-ই হোক, উপন্যাস একদম বন্ধ্যা। নজরুল, জসিমের মত কবি পাওয়া যায়, কোন সার্থক ঔপন্যাসিকের সাক্ষাৎ মেলে না এই সমাজে। অবিশ্যি মধ্যযুগীয় ভাবধারায় বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় সদর্থক কোন আদর্শ দানা বেঁধে ওঠেনি। তাই উপন্যাস অন্তত সাহিত্যের আসরে বিরল সামগ্রী। উপন্যাসের জন্ম শুরু হয় মধ্য-যুগের তছনছ ভাঙা ভিতের উপর, পূর্বে উল্লিখিত। দু-চারখানা বই যে পূর্ব পাকিস্থানে বেরুচ্ছে না, তা নয়। তার অধিকাংশ হলিয়ুডী ঢঙের জোলো ডিটেক্‌টিভ্ কি সেক্সী কাহিনী। যেমন ভাষা, তেমন বিষয়-বস্তু। কোন কোন উপন্যাস নিছক স্বপ্ন-প্রয়াণ — জীবন-জিজ্ঞাসা স্বভাবতই অনুপস্থিত। পরিমাণে এইসব বই (খোদাকে ধন্যবাদ) বেশী নয়। কারণ, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পূর্ব পাকিস্থানে প্রকাশকরা আর কিছু ছাপা হারাম (নিষিদ্ধ) বলে মনে করেন। ছাপার দায় অগ্নি-মূল্য গত বছর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বেরিয়েছে: সূর্যদীঘল বাড়ি, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত লিরিক-মধুর দীর্ঘ কাহিনী। এই পুস্তকে পূর্ববঙ্গের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু প্রাক্-বিভাগীয়। সুতরাং উপন্যাসের ক্ষেত্র পূর্ব-বঙ্গে অন্ধকার বলা অসৌজিক কিছু নয়।

পূর্বেই উল্লেখ আছে, উপন্যাসে বাস্তবের সমস্যা একই সঙ্গে জাতীয়তার সমস্যা। পূর্ববঙ্গে এই ক্ষেত্রেও নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ফলে, উপন্যাস আর কি দিয়ে গড়ে উঠবে? বহু লেখকই এই বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি।

বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং "টম জোন্‌সে'র ভূমিকায় তাঁর দীক্ষা-গুরু হোমার ও মিল্টন সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তাঁরা দুইজনে ছিলেন নিজ-নিজ যুগের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারী; সেইজন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে সার্বিক হওয়ার ক্ষমতা তাঁরা পেয়েছিলেন। ফিল্ডিং, ঐ ভূমিকায় আরো বলছেন, যে-সব ছাপ লেখকের মানোরথে জড়ো হয়, সে-সবের পার্থক্যটা ধরার মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিও তাদের থাকা উচিত। সত্য ও নৈতিকতার প্রশ্ন আলাদা নয়। ফিল্ডিং লিখছেন, "This I think can rarely exist without the concomitancy of judgment. for how can we be said to have discovered the true essence of two things, without discovering tneir difference seen to me hard to conceive".
অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও সত্য-শিব-সুন্দরের সমাহার অবিচ্ছেদ্য ও একক।

নব নব চেতনার সন্ধান, অনুভূতির রূপায়ন, পাঠকের অনুভূতি আরো গভীরে নিয়ে যাওয়াই মহৎ ঔপন্যাসিকের সাধনা। দুরূহ সাধনা নিঃসন্দেহে।

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ্রাহাম গ্রীন-এর লেখা অত্যন্ত আঁট-সাঁট; ভাষা ও গল্পের মিলন সম্পূর্ণ; বেগে চলে পরিণতির দিকে। 'The Quiet American'ই বোধ হয় আর্টের দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ নভেল। একটি অবান্তর কথা নেই। গাঢ়বদ্ধতা বিস্ময়কর। তবু, আমেরিকান পাইল, যিনি নায়ক, যেন আবছা রকমের। বোধ হয় সেইটাই গল্পের ট্রাজেডি। তাঁর তুলনায় ইংরেজ ফাউলার নিতান্তই পরিণত, স্পষ্ট মূর্ত। ফুয়ঙ্—যিনি নায়িকা—হালকা অথচ দৃঢ় রেখা ও রঙে রচিত। উপভোগের স্তর তিনটি; (১) এশিয়ার পটভূমিতে আমেরিকার কার্যকলাপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ব্যাপারটা পলিটিকাল হয়েও পলিটিকাল নয়। এশিয়ার জটিল পরিস্থিতি পাইল বুঝতেই পারে না। কেতাবী আদর্শবাদের তাড়নায় সে Third Force তৈরী করতে যায়, আবার সেইজন্যই সে ফুয়ঙ্‌কে বিয়ে করে আমেরিকান বানাতে চায়। দুটি ক্ষেত্রেই তার অক্ষমতা প্রমাণ হলো। বেচারি খুন হলো, আর ফুয়ঙ্ ফাউলারের কাছে ফিরে এল। ফাউলার নিজেকে রিপোর্টার বলছেন, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিউট্রাল। 'এ যুদ্ধ আমার নয়।' বুদ্ধিমান, পরিণত য়ুরোপীয়ানের মনোভঙ্গী এই রকমই মনে হয়। এইখানে য়ুরোপীয়-আমেরিকানের মনোভাবের বৈষম্য পরিস্ফুট। পাইল ধার্মিক (moral) আর ফাউলার বৈজ্ঞানিক ও sophisticated। (২) ফাউলারেরও ধর্ম আছে, নিজেকে রিপোর্টার অর্থাৎ সিনিক বললে কি হবে! এই ধর্মের সমস্যা হলো involvement—অর্থাৎ জড়িয়ে পড়ব কি না। হীরের মতন এর গোটা কয়েক ফ্যাসেট্ আছে। একটা হলো দক্ষিণ এশিয়ার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের দলাদলি থেকে সরে দাঁড়ান। গ্রীন এখানে অনেকটাই সার্থক। আরেকটা হলো ফুয়ঙ্, যাকে তিনি ছাড়তে চান না, যার জন্য স্ত্রীর কাছে ডাইভোর্স চান। স্ত্রী প্রথমে সম্মতি দিলেন না, পরে যখন দিলেন তখন পাইল খুন হয়েছে এবং ফাউলারের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয়টা হলো, পাইলের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর যোগ। সেটার পুলিস কেস্ ঠিক হয় না, তবু সে ব্যাপারে ফাউলার morally involved। চতুর্থ ফ্যাসেট হলো, পাপ ও বিবেকের সেই ক্যাথলিক ধারণা। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে না বোঝার জন্য উপভোগে আমার কোনো বাধা হয় নি। (গ্রাহাম গ্রীনের ইদানীংকার নভেল পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি ক্যাথলিসিজমের বাহ্য রূপ, আচার, আড়ম্বর, বিশ্বাস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছেন, যেখানে ব্যক্তিত্বের সর্বজনীন মূল্য তাঁর সামনে জ্বলজ্বল করছে।)

(৩) তৃতীয় স্তর নিছক সাহিত্যের। রিপোর্টার এখানে সাহিত্যিক। দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের এমন অপূর্ব, সংযত বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি।

ওদেশে পাকা ক্যাথলিক হয়েও যদি পাকা নভেলিস্ট হওয়া যায়, যেমন মরিয়াক, গ্রেহাম গ্রীন—ইভলীন ওয়াফ্‌কে ধরছি না, তিনি সমান স্তরের নন,—তবে এদেশে তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সুফি নভেলিস্টই বা হবে না কেন? উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক গল্প, বৈষ্ণব ও সুফি কবিতা আছে। 'বিসর্জন'কে তান্ত্রিক নাটক বলা যায় কি? তারাশঙ্করের একটা ছোট নভেলের প্লটে তান্ত্রিক সাধনা স্থান পেয়েছে বটে তবু যেন ঠিক বসে নি। বৈষ্ণবী নভেল না লিখতে যাওয়াই ভালো, এতেই আমরা ভাববিলাসী। তান্ত্রিক নভেলের সম্ভাবনা খুব বেশী। কোনো কাপালিককে নায়ক করতে বলছি না, কিংবা কপালকুণ্ডলার অনুকরণও চাইছি না। তবে মনে হয়, শাক্তদের মধ্যে (মন্ত্রশক্তি নয়) অনেক নাটক-নভেলের বীজ রয়েছে।

২৬।৮।'৫৬

নিজের দেহ নিয়ে অনেক পরীক্ষা করছে দেখলে বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর অবিশ্বাস হয়। বিজ্ঞানের বাহাদুরী চিরটাকাল শুনে এলাম, কিন্তু বেশী দেখলাম বৈজ্ঞানিকের, বিশেষত ডাক্তারের অসার্থকতা। কেন এমন হয় ভাবছি। মনে হচ্ছে, ব্যক্তির সজ্ঞান সহযোগ না থাকলে বিজ্ঞানই বা কি করবে, বৈজ্ঞানিক-ডাক্তারেরই বা দোষ কি! কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও সহযোগ প্রয়োজন। মাত্র রোগ সারানকেই ডাক্তারী বিদ্যার চরম পরিণতি যে ভাবে সে বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান।

শুনেছি প্রতি মানুষের বিশেষত্ব আছে, সেটা তার নিজস্ব, একান্ত unique...... যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে জ্ঞানপ্রকাশ জোহরি মারা গেল। এত লোকে ভালোবাসত তাকে, সত্যই ভালোবাসত, কই কেউ তার যন্ত্রণার এক তিল ভাগ নিতে পারলে না ত! মানুষের খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি যন্ত্রণা, তার অংশীদার কেউ হতে পারে না। যীশু কাল্পনিক অংশীদার, তাও যন্ত্রণার নয়, মানসিক পাপের। ধর্মের অনেকখানি আবেদন এই অংশীদারের সন্ধান, অবতার থেকে গুরুদাস পর্যন্ত। যন্ত্রণার ভাগ-বাটোয়ারা হয় না, অথচ মানুষ চায় হোক। মিথ্যা চাহিদা—তাই ধর্মের মধ্যে অনেকখানি আত্মপ্রবঞ্চনা রয়েছে। জীবনে এই ধরনের দু একটা দামী জিনিসু সোস্যালাইজড হয় না দেখছি। অবশ্য তাদের ইতিহাস আছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রণা কমে, কিন্তু সোস্যালাইজড্ হয় না। এইখানে বিজ্ঞানেরও প্রবঞ্চনা। অসভ্য জাতির যন্ত্রণাবোধ কম, বিজ্ঞানের দৌলতে নয়, ট্রাইবালিজমের জন্যেও নয়। বাঙ্গালীর মেয়েকে প্রসবের তিন ঘণ্টা পর রান্নাঘরে ঢুকতে দেখেছি, আবার আধ মাইল দূর থেকে প্রায় সারারাত গোঙানিও কানে এসেছে। আর্থিক অবস্থার তারতম্যে এর ব্যাখ্যা হয় না। শিক্ষা, অভ্যাস, প্যাভলভ্—মানতে পারি, তবু যন্ত্রণা নিজস্ব। ভাগিস্ আত্মা আমাদের নিজস্ব নয়, হলে ভাবতাম আত্মাই যন্ত্রণা। সচ্চিদানন্দের আনন্দ কতটুকু?

* * *

খুকু (শ্রবণা) স্কুলের ষাণ্মাসিক পরীক্ষান্তে দেখা করতে এলো। বয়স দশ কি এগার, বছর দুই পরে ম্যাট্রিক দেবে। সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, পড়তে হচ্ছে পঁচিশখানি বই! একে শিক্ষা না পীড়ন
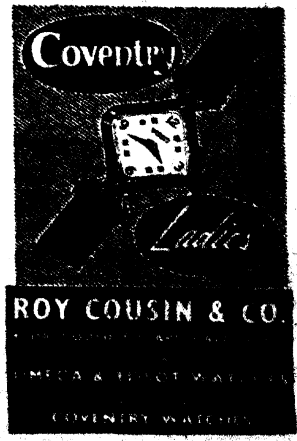
বলব! সব বাচ্চাদেরই কি এই দশা? না আমার এই পচা তিন-পুরুষে অধ্যাপক বাড়িরই কেবল? বাঙালী মেয়েদের এই ধরনের শিক্ষায় বাংলার সর্বনাশ হবে। এত পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষা দিলে একটি বাচ্চা হবার পর বন্ধ্যা না হয়ে যায় না। ছোট্ট মেয়েকে দেখলে আমার মন যত বিষণ্ণ হয় অত বিষণ্ণ কিছুতে হয় না। মেয়েদের মা'রা বলেন কি মিষ্টি মুখ আর হাসি—আমি দেখি দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, ক্ষোভ রোগ, শোক, অভিমান, অপরিণতির হতাশার চিহ্ন। বুদ্ধদেব অনেক কিছুই দেখেছিলেন—বাঙালী ছোট্ট মেয়ে ত' দেখেন নি, দেখলে সারনাথে ফিরতেন না, ঐ গয়াতেই প্রাণত্যাগ করতেন।

২৭।৪।৫৬

একটি মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে সন্দেহবাদ জন্মায় না। সেজন্য অন্তত দুটি বিরোধী মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চাই। কেবল তাই নয়, দুটি শক্তিশালী দল বিপরীত সত্যকে সমর্থন করবে। সেই থেকে সত্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠবে—এবং তারই ফলে এপিস্টেমলজী—সক্রেটিস অর ডেকার্ট। বিদেশী ইকনমিক্সের ইতিহাসে এই ধরনের প্রাথমিক তত্ত্ব-সন্ধান পেয়েছি। ভারতে মহাত্মাজীরই ছিল একমাত্র। তাই পাগলামি মনে হতো, এখনও হয়। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের মতবাদের বৈপরীত্য থেকে কি কোনোপ্রকার epistemology of Economics উঠবে না? পার্লামেন্টের এবারকার বৈঠকে দুজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মুখ থেকে প্ল্যানিং সম্পর্কের আলোচনায় philosophy কথাটি বেরিয়ে গেল। রবিনস্-এর শিষ্যরা কি বলবেন জানি না! যে যাই বলুন না কেন, শেষে মানুষকে এমন অবস্থায় আসতে হয় যেখানে প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাকেই অস্বীকার করা ছাড়া গতি থাকে না। গান্ধীজী তাই করেছিলেন—তাঁর মনে গোটাকয়েক সাংঘাতিক প্রশ্ন জেগেছিল এই ইকনমিক্স্ সম্পর্কে। উত্তর দিতে পারেন নি অবশ্য। তবু ব্যাপারটা সক্রেটিক। আমরা ছাত্রদের প্রশ্নই করি, তাইতে রোজগারও করি, কিন্তু সত্য বলতে কি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহই ওঠে না। বড়ই বিশ্বাসী জীব আমরা। হয়ত কৃষ্ণও কারুর কারুর মিলেছে, কিন্তু এ-কালাবাজার মথুরার সে-কালার প্রেমের বাজার নয়।

আমার মনে প্রাইভেট সেক্টার এবং পাবলিক সেক্টার—দুই সেক্টারের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উঠেছে। পাবলিক সেক্টারের দয়ায় কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কাঠামো খাড়া করা যায় কিন্তু সোশিয়ালিজম্ না আসতেও পারে। আর সন্দেহ হয়েছে এই যে, প্রাইভেট সেক্টারের তাগিদ মুনাফা বৃদ্ধি নয়, আশা-মরীচিকা। এখানে সব বো, বে, বা-র খেলা কালে সবই হবে, হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে, আবার হবে। কি যে হবে তা জানি না। হওয়ার নাম ক্যাপিটাল-বৃদ্ধি। চীনেরা যখন ওষুধ কিনতে পেত না, তখন প্রেসক্রিপশনটা জলে ধুয়ে সেই জলটা রোগীকে খাইয়ে দিত। ফল যে হতো না, তা নয়। আমাদেরও হচ্ছে! আমি চাই দেশের প্রত্যেক শিক্ষক আর যুবক সন্দেহশীল হোক। নতুন এপিস্টেমলজি না হলে নবজীবন জন্মে না—প্রমাণ ওদেশের সপ্তদশ শতাব্দীতে ছড়ান (মুঘল আমলের নবজীবনের পেছনে বৃন্দাবন গোঁসাইদের তত্ত্বজ্ঞান মনে হয় ছিল—কতটা ও কিভাবে জানি না। কে বলতে পারেন তাও জানি না। যাঁরা দার্শনিক তাঁরা ঐতিহাসিক নন এবং যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁরা রসতত্ত্বের ধার দিয়ে যান না, পাছে ভিজে যান।)

২৮।৪।৫৬

ডাক্তার-বদ্যি দেখছে। আরো দেখবে। খরচের কুলকিনারা নেই। সরকারী বন্দোবস্ত, নিয়ম-কানুন না হলে কিছুই হবে না। রাশিয়ায় আমাকে পাঁচজন অধ্যাপক পরীক্ষা করলেন, কত ফোটো নিলেন, কিছুই খরচ হলো না। বিদেশী ও বিদেশী অধ্যাপক বলে বিশেষ খাতিরও দেখালেন না, ওখানকার রীতিই তাই। ক্লিনিকে আমার পূর্বে ও পরে দুটি গ্রামের মেয়ে ছিল, চাষীর ঘরের। ইংলণ্ডেও ডাক্তারকে টাকা দিয়েছি, এখানকার তুলনায় অনেক কম। ওয়েলফেয়ার স্টেটের সঙ্গে সোসিয়ালিস্ট স্টেটের পার্থক্যের জলজ্যান্ত প্রমাণ ডাক্তারীতে, রোগ ও রোগীর প্রতি ব্যবহারে।

কাল বা তালের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনেক ক্ষেত্রে গায়কের "সুখ চৈনকী কল" বিকল করে দেয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা সংগীত-শিল্পী এবং যাঁদের আসরে বসার অভ্যাস আছে, তাঁরা সকলেই এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে মেনে নেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের উড়োমারা "দিলেত্তান্ত"ই হ'ল, আর দস্তুর মত তালিম নেওয়া পেশাদারই হ'ন, মৃদঙ্গ বা তবলার সঙ্গে গাইবার সময় অনেকেই অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে যান। মুখে দম্ভ প্রকাশ করে হয়ত একথা আমরা স্বীকার করব না, কিন্তু কথায় বলে মনের অগোচর পাপ নেই। অজানা কোন সঙ্গতকারের সাথে গাইবার সময় আমাদের সাঙ্গীতিক স্বাধীনতার সীমা অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবলা সংগত না থাকলে যে স্ফূর্তির সহিত আমরা গাইতে পারি, তবলা সংযোগে গাইতে হলে, আমাদের আর সে স্ফূর্তি থাকে না। আমাদের ধ্যান তখন রাগ-রাগিণীর কল্পিত রূপ ছেড়ে তবলচির 'ধা ধিন ধা'র প্রতি আকৃষ্ট, আমরা তখন শিল্পকলার সেবার বদলে গণিত শাস্ত্রের গণনা আরম্ভ করি। অর্থাৎ গান তখন হয়ে যায় নিয়মানুবর্তী, শৃংখলিত, যন্ত্রচালিত। গানের ভিতর সে দরদ, সে প্রেম, সে মর্মস্পর্শী আসক্তির অভাব অনুভূত হয়। যে সংগীত সাধনায় সত্য সত্যই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, সে সাধনায় প্রয়োজন হয় একনিষ্ঠ একাগ্রতার। এই একাগ্রতায় মন রাগরূপে তন্ময় হয়ে যায়। তখন গায়কের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাঁর মন সর্বপ্রকার কৃত্রিম বন্ধনের অনেক ঊর্ধ্বে চলে যায়। সে সময় সংগতের নীরস সংঘাত মনের সে সমাধি ভাবকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। তাই কবিগুরু গায়কের এই ভাব সমাহিত রূপের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অসংখ্য গানে। মুখর কবিকে তিনি সাধে নীরব করে দিতে চানান।

ভারতীয় সংগীতে তালের এই ঠোকাঠুকি অত্যন্ত দুরূহ। ভবিষ্যতের আশা ভরসা এমন অনেক সুকণ্ঠ গায়ককে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার উচ্চাশা পরিত্যাগ করতে হয়েছে, শুধু এই কারণেই। বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও যিনি বন্ধনহীন, তিনিই সত্যকার সঙ্গীত ধ্যানী পুরুষ। এরূপ ধ্যানমগ্ন সংগীতযোগীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আমার মনে হয়, সভ্যতার বিস্তার ও বিবর্তনের সাথে সাথে তালের এই সীমিত বন্ধনও ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানেও বন্ধন যে নেই তা নয়, তবে আপেক্ষিকভাবে কম। অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘ এক ১২ বা ১৬ মাত্রার আবর্তের বদলে ৩ বা ৪ মাত্রার হ্রস্ব এক বিভাগ বা 'বার'-এর উপর ঝোঁক দেওয়া হয়। এমন করলে তালের হিসাব অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে পড়ে।

রত্নাকর

আমাদের সঙ্গীতেও এক ঘোর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা আমাদের কৈশোর বা যৌবনের যেরূপ বিলম্বিত গান বাজনা শুনেছি, সেরূপ বিলম্বিত আর শোনাই যায় না। এখন বিলম্বিত বলতে আমরা সাধারণত একতালাকেই বুঝি। চতুর্মাত্রিক ছন্দে যে সব তাল আছে, সে সব তালের বিলম্বিত লয় এখন অপেক্ষাকৃত কম বিলম্বিত হতে আরম্ভ হয়েছে। কয়েক দশক পূর্বে, যখন টপ্পার খুব প্রচলন ছিল, তখন তো মধ্যমান ছাড়া গানই হোত না। এ ছাড়া ছিল আড়াঠেকা, তিলু আড়া, তেওট, আড়াচৌতাল, পাঞ্জাবী ঠেকা প্রভৃতি। এ যুগে মধ্যমান ও আড়াঠেকা তো প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছেই, বাকীগুলি কালে-ভদ্রে গায়কের 'টুর দ্য ফোর্স'এর কৃপায় মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। প্রখ্যাত তবলিয়া ওস্তাদ মজীদ খাঁর সাগরেদ গোপালবাবু পূর্বে প্রায়ই রাণাঘাটে যেতেন। গোপালবাবু সে সময় খুবই তৈরী হচ্ছিলেন এবং জনাব কেরামত আলির চেয়ে বোধ হয় বেশীই নাম করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে স্বর্গীয় সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায়ের সাথে এই মধ্যমান লয়ে বাজাতে তাঁকে দস্তুরমত গলদঘর্ম হোতে হোত। অনেক সময় নগেন্দ্রবাবু তাঁকে লয়ের ঝোঁক দেখিয়ে তালের ঠেকাও বলে দিতেন।

এজন্যই গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে পটু থাকা চাই, এজন্যই প্রায় প্রত্যেক উচ্চাঙ্গ সংগীত

শিল্পীর সঙ্গে একজন করে পটের সংগতকার থাকেন। বম্বাই শহরে অবস্থান কালীন যেমন পণ্ডিত রবিশংকরের পট ছিল কিষণ মহারাজের সাথে, বা ওস্তাদ আলি আকবরের ছিল জনাব আল্লা রাখা বা প্রোঃ সুদর্শন অধিকারীর সাথে। এই গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে পটের অভাবে অনেক সময় জলসার সমস্ত আবহাওয়াটা দূষিত হয়ে যায়। অবশ্য এমন অনেকে আছেন, যাঁদের নিকট এরূপ অশান্ত অবস্থা শুধু শোভন নয়, অত্যন্ত অভীপ্সিতও বটে। কিন্তু যাঁরা সত্যকার সংগীতপ্রেমী, তাঁরা আসরে আসেন মারামারি দেখতে নয়, তাঁরা আসেন একটা শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সাংসারিক প্রবৃত্তির নিরোধ করতে। এজন্যই রাগের আলাপচারীর সময় সংগতের সাহচর্য পরিহার করা হোত এবং বিলম্বিত গানের সঙ্গে কেবল ঠেকাই বাজান হোত। এখনও প্রায় তাই-ই হয়, তবে মধ্যে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। এ প্রসঙ্গে আজ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। তখনও দিল্লীর বিখ্যাত তবলাবাজের প্রতিনিধি খলিফা নথু খাঁ জীবিত আছেন। তিনি এসে কলকাতা সিমলের স্বর্গীয় সংগীতাচার্য কালী পাল মহাশয়ের বাড়িতে উঠেছেন। কয়েকদিন পরে এক জলসার আয়োজন হোল শ্রীসুধীন দত্ত মহাশয়ের গৃহে। সুধীনবাবু স্বর্গীয় সংগীতাচার্য শিবসেবক মিশ্রের সুযোগ্য শিষ্য। সাব্যস্ত হোল যে খলিফা সাহেব বাজাবেন এবং তাঁর সঙ্গে গাইবেন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তখন ভীষ্মবাবু বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক। আমার যতদূর মনে আছে, সেই সভায় অনেক গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল এবং অন্যান্য কণ্ঠসংগীত শিল্পীর মধ্যে স্বর্গীয় সংগীতাচার্য রামকিষণ মিশ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে মশায়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বলতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, আর আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে, খলিফাজী নেশা করতেন। কি নেশা করতেন, জানিনে। তবে গাঁজা বা চরস জাতীয় একটা কিছু ছিল। কলিকায় সজোরে টান দিয়ে যখন তিনি ধূমে উদ্গীরণ করতেন, তখন তিনি নিজেও যেমন দুনিয়া অন্ধকার দেখতেন, অপর যাঁরা সেখানে উপবিষ্ট থাকতেন, তাঁদেরও চোখে সর্ষে ফুল ছড়িয়ে দিতেন। কিন্তু নেশা জমে যখন তিনি বুঁদ হয়ে যেতেন, তখন তাঁর হাতে বোল যা ফুটে উঠত, সে যেমন অসাধারণ, তেমনই অলৌকিক। প্রস্তর মূর্তির মত, নিশ্চল হিমালয়ের মত অমন স্থির ধীর বাজনা আজ পর্যন্ত আমি কারো হাতে শুনিনি, আর অমন অনায়াস-লব্ধ "ধেরে ধেরে কেটে"ও অন্য কারো হাত হতে পাইনি। খলিফা আহম্মদ জান থেরকুয়া সাহেবের এক গুরু-ভাই, স্বর্গীয় ওস্তাদ মসিদ আলির শিষ্য, মুন্সী আনোয়ার আলি [illegible] বম্বেতেই থাকেন এবং অদ্ভুত প্রতিভাবান এক কবি, লেখক, গায়ক ও বাদক। আমাকে একবার বলেছিলেন যে, নথু খাঁ সাহেবই দিল্লী-বাজের একমাত্র প্রতিনিধি। মুন্সীজীও স্বীকার করেন যে, অত সুন্দরভাবে "ধেরে ধেরে কেটে"র বোল তুলতে নথু খাঁ সাহেবের জুড়ি কেউ ভারতবর্ষে ছিল না। কালীবাবু আমাকে সে সময় বলেছিলেন, "বুড়ো হয়েছেন খাঁ সাহেব, কোন্ দিন আছেন, কোন্ দিন নেই। এইবেলা কিছু শিখে নাও এঁর কাছে। এমন সুযোগ আর জীবনে পাবে না।" কালীবাবুর কৃপায় ও সুপারিশে খাঁ সাহেব আমাকে মাসিক সামান্য দশ টাকা বৃত্তিতে শেখাতে রাজী হয়েছিলেন।

যাক্ সে কথা। এখন আপাতত আসরেই নেমে আসা যাক। ভীষ্মবাবু প্রথমেই গান ধরলেন মালকোষের "পীর ন জানে", আর তাঁর সঙ্গে ঠেকা দিতে লাগলেন নথু খাঁ সাহেব। ঠিক মনে নেই, ভীষ্মবাবুর পাশে বোধ হয় কেষ্টবাবু একখানি খেয়াল গেয়েছিলেন। সে যাই হোক, ভীষ্মবাবুর গান তো বেশ জমে আসছিল। দু-একখানি ছোট তানের পর গায়ক একটি সরগম তুললেন। খাঁ সাহেব এতক্ষণ চোখ দুটি বন্ধ করে যেন ঝিমোচ্ছিলেন। যেই সরগম উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে খাঁ সাহেবও যেন জেগে উঠে ঠেকা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ লহরা ধরে বসলেন। আর সে কি লহরা! তার আদি নেই, অন্ত নেই, চলেছে তো চলেছেই। এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে, গায়ক বাদক দুজনেই যদি বিরামবিহীন বোল পরণের আশ্রয় নেন তো সমে এসে দুজনের ঠিক মিলে যাচ্ছে কিনা, কে বলে দেবে? এছাড়া, যন্ত্রে যেরূপ আঘাত ('স্ট্রোক') দিয়ে মাত্রা রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কণ্ঠে সেরূপ স্ট্রোকের সাহায্য পাওয়া যায় না। কাজেই, কণ্ঠশিল্পীর পক্ষে ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাদক অপেক্ষা গায়কের কাজ অনেক কঠিন। বাদককে যেখানে কেবল তালটুকুর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়, গায়কের সেখানে গণ্ডী অনন্ত-বিস্তৃত। গায়ককে কেবল তালটুকুরই নির্দেশ মেনে নিলে চলবে না, তাঁকে তাঁর রাগ অন্য সম-প্রাকৃতিক রাগ থেকে বাঁচিয়ে গাইতে হবে, তাঁকে নানাবিধ অলংকার ও কর্তব্যের আশ্রয় নিয়ে রাগরূপের অপরূপত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কাজেই, আসরে বাদকের সাহিত তুলনায় গায়কের কাজ অনেক বেশী, অনেক কঠিন। ভীষ্মবাবু মহামুশকিলে পড়লেন, যখন ঘন ঘন সাবধান বাণীতেও নথু খাঁ সাহেবের চৈতন্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। খাঁ সাহেব রঙের মুখে কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না দেখে, অগত্যা বাধ্য হয়ে ভীষ্মবাবুকে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হোল। তাঁর সহচর যাঁরা পাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের হাতে তাল দিতে বললেন। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ গান চলার পর অবশেষে এক

সময় সে গান বন্ধ হয়ে গেল ; কিন্তু আমাদের কান ভরল তো প্রাণ ভরল না। সঙ্গীত কলা সর্বপ্রকার চারুকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা, এ কলার অনুশীলনে সংগ্রামের কোন স্থান নেই। এজন্যই সঙ্গীত কলার সাধনায় কেবল তালের কচকচির কোন মূল্য নেই।

আলোচনা

বিষ্ণুপুর তথা বাংলার সংগীত ইতিহাসে যদুভট্ট এক অদ্ভুত ও অবিস্মরণীয় প্রতিভা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করবার কোনো উপায় নেই। তিনি ছিলেন ভবঘুরে উদাসীন প্রকৃতির ব্যক্তি।

বিষ্ণুপুরের কাদাকুলী নামক পল্লীতে দরিদ্র পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মেছিলেন। জীবিকা অর্জনের কৌলিক প্রথা অধ্যাপন ও যজন-যাজন তাঁর জন্য ছিল না। কেন না প্রতিভা কখনো সংকীর্ণতার গণ্ডীতে সীমিত হতে পারে না। যদুর লেখাপড়া সামান্যই হয়েছিল। অল্প বয়সেই সংগীত শিক্ষার জন্য তিনি দেশত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন।

যদুর সংগীত শিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তাঁর সময়ে দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত এখনকার মত সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

ভাটপাড়ার নিকটবর্তী কাঁটালপাড়া গ্রামে যদু বিবাহ করেছিলেন এবং সেখানে একটি নিজের বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সময়েই তিনি কোনো একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি। যদুর সংগীত প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। যদুভট্ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রমাণ।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মশায়ের পিতামহ জগৎচাঁদ গোস্বামী মশাই ছিলেন যদুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর প্রিয় মৃদঙ্গ সংগতকার। এই দুই ব্যক্তি একত্রে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বহুস্থানে নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রায় সত্তর বছর পূর্বে যদুভট্ট মারা গেছেন, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর নিজের দেশেও তিনি রূপকথার পর্যায়ে কিংবা কিম্বদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁর কাছে যদুভট্ট সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা যেতে পারে। যদুর জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এখনো তাঁর সম্বন্ধে দু'একটি গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি গল্প আজও তাঁর সরল স্বভাব ও দেশপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করছে। সেটি হলো তাঁর মৃত্যু-কাহিনী।

অসুস্থ হয়ে যদু মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে এসে জ্ঞাতি গৃহে আশ্রয় নেন। তাঁর মৃত্যু সময়ে দু'চারজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করেন "মরবার আর কোথাও জায়গা পেলি না রে যদু? গঙ্গাতীর ছেড়ে তুই শেষে এইখানে মরতে এলি?" উত্তরে যদু বলেছিলেন—"অন্য জায়গায় আমার আপনজন আর কে আছে বল? নিজের জন্মভূমি আর আত্মীয় স্বজন গঙ্গাতীরের চেয়ে ঢের বড় বলে মনে করি বলেই তোমাদের কাছে মরতে এসেছি। এখানে মরলে তোমরা ত' বলবে যে, তোমাদের যদু মরে গেল।" মানুষ যদুভট্টের এর চেয়ে বড় পরিচয়ের প্রমাণ আর নেই।

যদুভট্ট ফিল্ম বাংলাদেশে বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রশংসাও অর্জন করেছে। কিন্তু চিত্র পরিচালকের উচিত ছিল যদু ভট্টের প্রকৃত মৃত্যুর কাহিনীটি তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে চিত্রায়িত করা। যেটুকু সত্য বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব, তা সর্বদাই করা উচিত, তা হলে আর বিকৃত ও মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি হয় না। স্বাভাবিক সত্য ঘটনাই জনসাধারণের চিত্তে স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

উপন্যাস

সওদাগর—সমরেশ বসু, বেংগল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা আট আনা।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের যন্ত্রণার ভূমিকায় পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ী মেঘনাদ দাশের পূর্ববংগ ত্যাগ এবং ক্রমে ব্যবসায়ে তার নতুন প্রয়াস, প্রতিষ্ঠা, আঘাত ইত্যাদির সংগে সংগে স্ত্রী লীলাবতীর জীবনে নতুন পরিবেশের প্রভাব,—জটিল বর্তমানের থেই ধরে অতীত মাধুর্যের রোমন্থন, বিনয়ের সংগে লীলাবতীর ভালোবাসার সম্পর্ক,—বিকলাঙ্গ তিতির আর চাষিদের গুণে বহু বঞ্চিত মেঘনাদের নিজু-নিজু বিস্কুট-কারখানার পত্তনলাভ, এই নিয়ে 'সঞ্চা-পাইকা'—হরপে ছাপা সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার বই লিখেছেন তরুণ লেখক শ্রীসমরেশ বসু। 'ফেলে আসা দিন', 'নয়া পাড়ি' আর 'দিনকাল'—এই তিনটি পর্বে উপন্যাসের কাহিনী সাজানো হয়েছে। গল্প বস্তুর মধ্যে অভিনবত্বের প্রয়াস আছে, কিন্তু চমৎকারিত্ব একেবারে নেই। কলকাতার উপভাষা প্রভৃতির বাংলার চরিত্র কাহিনীতে অনায়াস অপূর্ব দেওয়া, দেওয়া ইত্যাদির ব্যবহার চলন নেই। এই প্রয়োগপদ্ধতি বেশ হয় তাদের ভুল। মেঘনাদের 'সওদাগর' অবতারণায় এখানেই লেখকের যদি অত্যধিক নজর থাকতো (বইয়ের নাম দেখে সে রকম আশা মনে জাগা অন্যায় নয়) তাহলে যে সব অংশের নিপুণতর শিল্পায়ন আশা করা যেতো এখানে সেসব ব্যাপার হয় নিষ্প্রভ নয়তো অনাড়ম্বর। অল্প খ্যাতিতে অধিক প্রতিষ্ঠার এই আধুনিক দুর্যোগের দিনে অধ্যবসায়ী লেখকরা তাঁদের গল্পের চমকদারিত্বে আগ্রহ না করেও গল্পের প্রাণের দিকে আরো মন দিতে সময় দেন,—এই কামনাই আশাবাদী পাঠকের কামনা। সমরেশ বসুর 'সওদাগর' বইখানি পড়ে সে কথা পুনরায় মনে পড়ার অপরাধ মার্জনীয়।

বইখানির প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ভালো, কিন্তু বেশ কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়লো।

(৬০৮।৫৫)

একই বৃন্ত—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বেংগল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

দক্ষিণ-কলকাতার 'নীর-সংঘের' নেত্রী কমিউনিস্ট অনীতা দত্ত এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে তার প্রতিপক্ষ কংগ্রেসপন্থী বিজয়েশ,—এই দুটি মানুষকে নিয়ে বাইরের সংঘাত এবং অন্তরের সান্নিধ্যের গল্প লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ। আততায়ীর হাতে নায়ক ব্যারিস্টার বিজয়েশ চৌধুরীর মৃত্যু ঘটিয়ে তরল গল্প প্রবাহের শেষ-ভাগে একদিকে যেমন করুণ অঘটন দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর অল্পকাল আগে হাসিমুখে বিজয়েশ বলেছে, "বেশ তো অনীতা,...তুমি তো জানো, আমি মনে মনে বিশ্বাস করি তোমরা আর আমরা একই বৃন্তের ফুল!" অর্থাৎ, ভারতবর্ষের কংগ্রেস-পন্থী এবং কমিউনিস্টপন্থী দলের 'একই বৃন্ত'। সেই বৃন্তের অর্থ দেশপ্রেম।

এ বইখানিরও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন সুন্দর। — ৬১৩।৫৫

আশাবরী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

খাজিতপুরের জমিদারপুত্র অশোকের সঙ্গে তিলে-শিবানীপুরের মুখুজ্জে বাড়ির দুঃস্থা বিধবা গিরিবালার মেয়ে শান্তির শুভপরিণয়ের ঘোষণা আছে 'আশাবরী'র শেষ পৃষ্ঠায়। তার আগে এই ঘটনার পূর্ব-ইতিহাস। দুই পরিবারের দূর ও নিকট সম্পর্কিত নানা উল্লেখে, বর্ণনায় গল্পের ধারা অনাবশ্যকভাবে ভারগ্রস্ত। তথাপি 'আশাবরী'র তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে। প্রচ্ছদ ও বাঁধাই রুচিসম্মত। ৬১৪।৫৫

রম্যরচনা

পরিক্রমা: তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: আর্ট য়্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা: ১২। দাম: তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৮০।

মনোরম একখানি ভ্রমণ কাহিনী। অজন্তা, ইলোরা, বাঘ—ভারতের শিল্পতীর্থ পরিক্রমাকে লেখক সরস বৈদগ্ধ্য, সুন্দর প্রকাশভঙ্গীতে ধরে রেখেছেন। মনে হয়, বিদগ্ধজনের একটি পরম রমণীয় আসর জমিয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর রূপশিল্পী গাইডের মতো টীকা-টিপ্পনী-উদ্ধৃতি সহযোগে এক উপাদেয় ও গতিময় আখ্যান বলে যাচ্ছেন। 'পরিক্রমা'তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে। মধ্যযুগের রাজা-ওমরাহ, রাজা-নামার অনেক হাসি-অশ্রুর ইতিহাস রয়েছে; কিন্তু একটি পরিহাসপ্রিয়, একটি সুকুমার 'হিউমার' বোধের রঙ আর রসের নীচে ইতিহাসের তিক্ততাগুলি হারিয়ে গিয়েছে। একটি সকৌতুক কৌতূহলের পরিচ্ছন্নতা গ্রন্থখানির সর্বত্র ঝলমল করছে। মোমসাহেব, রাজরাণী, মিস্টার ও মিসেস ওয়াদিয়া, মিস্টার জাবেরী প্রভৃতি চরিত্রগুলি 'পরিক্রমা'য় স্বল্প কয়েকটি রেখার টানে টানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে ইতিহাসের সঙ্গে রসের, বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে বক্তব্যের সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে। এ সত্ত্বেও অনেক সময় ঘটনা-গ্রন্থন ঠিক পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেনি। মোমসাহেবের চিড়িয়াখানার গল্পটি বহুশ্রুত। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচিশোভন; তবে ছাপা আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ১৫৩।৫৬

লৌহকপাট—জরাসন্ধ। (দ্বিতীয় পর্ব)। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

এক শ্রেণীর রমণীয় রচনায় বাঙলাসাহিত্য কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। Loose Sallies of mind—এই সারবাক্য স্মরণ করে অজস্র অনধিকারীর এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ হয়েছে। রম্য রচনা!—অতএব খানিকটা ভাষার চটক, এলোমেলো, শিথিলগ্রন্থি ভাবনার কিছুটা বিলাস, কিছুটা মানসিক ব্যসন—এইসব জুড়ে জুড়ে যে বস্তুটি খাড়া হয়ে ওঠে, তাতে আর যাই হোক পাঠকমন প্রসন্ন হয়ে ওঠে না। আমাদের মতে রম্য রচনা প্রচুর অনুশীলন ও নিরীক্ষা সাপেক্ষ।

জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' শুধুমাত্র সুস্বাদু রচনাই নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা স্নিগ্ধ মমতা। কারাজীবনের অন্তরালে কয়েদী জীবনের বিচিত্র নাটকের বিচিত্র অঙ্কগুলি পাঠকের অগোচরে থেকে যায়। সেখানেও যে মানবিক দুঃখ আছে, বেদনা আছে, অনুতাপ-দগ্ধ আর পাপবোধের জ্বালা আছে, স্নেহ-প্রীতির ফল্গুও যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিঃশেষ হয়ে যায়নি, জরাসন্ধ তারই একটি আবেগতপ্ত ছবি এঁকেছেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে শুধুমাত্র মূলধন না করে কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে একমুঠো জীবনের সত্যরূপকে পরম সহানুভূতিতে সাহিত্যপাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। তাই মিনু-সঞ্জয়ের প্রেমের হাহাকার, রতিকান্তের শিশুস্নেহ, মল্লিকা-মতীশের বিয়োগান্ত অশ্রু, আফজল খাঁর কন্যাপ্রেম কিংবা মংখিয়া জং-এর কাহিনী পাঠকের মানসিকতায় এমন একটি আবেষ্টনী রচনা করে, দুঃখ-অশ্রু-হাসি-কান্নার পালা-প্রবাহে কখনও তা ঝলমল, কখনও বিষাদবিধুর।

এ সত্ত্বেও লৌহকপাট ২য় পর্ব সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য রয়েছে। প্রথম পর্ব যেখানে স্বচ্ছন্দ, দুর্বার এবং স্বতস্ফূর্ত, দ্বিতীয় পর্ব বোধ হয় দ্রুত লেখনের ফাঁকে কিছুটা বাণিজ্যিক। (১২৮।৫৬)

একসঙ্গে: গোলাম কুদ্দুস: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড: কলিকাতা-১২: দু'টাকা।

রাণীগঞ্জের ফিল্যাণ্ডরী অ্যাণ্ড সেরামিক কোম্পানীর শ্রমিকদের কলকাতা অভিযান কাহিনী সংবাদপত্রসেবীদের স্মরণ থাকতে পারে। সেই অভিযানের রক্তক্ষয়ী কাহিনী আলোচ্যগ্রন্থ

বিবৃত হয়েছে। লেখকের চোখ সদা সজাগ। অনেক সময়ই চোখের চেয়ে মনে দেখেছেন বেশী। এই মনের দেখা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকের নিরপেক্ষতা থেকে সহকর্মী এবং সহমর্মীর ভাবাবেগের রাজ্যে নিয়ে গেছে। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই অকারণ এবং অশোভন কটাক্ষপাতের হাত এড়াতে পারেননি।

লেখকের বর্ণনভঙ্গী মনোরম। তবে সে বর্ণনা সাংবাদিকের নয়, রাজনৈতিক প্রচারকের।

১২৭।৫৫

শ্রেষ্ঠগল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

গল্প রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের কথা বাংলা গল্প পাঠকদের সুবিদিত। বর্তমান শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহের সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, "যাঁদের ব্যক্তিসত্তা যুগসত্তায় বিগলিত হয়ে যুগচেতনাকেই বিশেষভাবে মুক্তিদান করে" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই দলের লেখক। "মহা-যুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ।" 'দুঃশাসন', 'বীভৎস', 'টোপ' প্রভৃতি গল্পে নারায়ণবাবুর যে দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকসমাজে প্রচার লাভ করেছে তাতে সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য সমর্থিত হয়। বইখানির তৃতীয় সংস্করণ লেখকের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। ছাপা বাঁধাই ইত্যাদি চমৎকার।

৬০১।৫৫

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ৫৲ টাকা।

প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথের গল্প সংকলনটির প্রকাশ সময়োপযোগী। প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের গল্পসাহিত্যের যে ধারা একদা বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে—সম্ভবত উপেন্দ্রনাথ সেই ধারার যথার্থ শেষ সাধক। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের যে আধুনিক প্রবাহ তাহার সহিত উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনার একটি প্রভেদ স্পষ্টতই চোখে পড়ে। পাঠকের পক্ষে বিশেষত কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে বাংলা গল্পের এই বিবর্তন অবশ্যই আকর্ষণীয়। আমরা উপেন্দ্রনাথের গল্প সংগ্রহটি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। 'স্বত্বাবশেষ', 'মেমসাহেবের সুটকেস' 'বর্ষা দিনের কাব্য', 'নাস্তিক', 'সারদা মাতাল' প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজ সরল ভাষা, গল্পের সরাসরি বর্ণনা, কৌতুককর সংলাপ প্রভৃতি উপেন্দ্রনাথের রচনার বিশিষ্ট গুণ। পাঠকের পক্ষে গল্পগুলি একটানা পড়িয়া শেষ না করা পর্যন্ত নিস্তার নাই। আশা করি উপেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প জনসমাদৃত হইবে।

৩৫১।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইস্ট। চার্লস ডিকেন্স। অনুবাদ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ, ৫নং বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চৌদ্দ আনা।

ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টের নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। অলিভারের কথা কস্মিন কালে শোনে নি এমন লোক পাওয়া মুশকিল। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় এই বিখ্যাত গ্রন্থটি কিশোরদের মতন করে অতি সযত্নে এবং সুন্দর-ভাবে বাংলায় গুছিয়ে দিয়েছেন। ভাষা চমৎকার। ঝরঝরে। একটানা পড়ে যেতে কোথাও থামতে হয় না। গল্পের গতি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ছাপা, বাঁধাই উত্তম। ছবিগুলি সে অনুপাতে ভাল নয়।

৩০৫।৫

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীবচন-ভূষণ—শ্রীলোকাচার্য স্বামী প্রণীত। শ্রীবরবর মুনিকৃত ব্যাখ্যাসহ। অনুবাদক শ্রীযতীন্দ্ররামানুজ দাস। শ্রীহরপ্রীতি দাস রামানুজ দাস কর্তৃক শ্রীবিশ্বরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮৲ টাকা।

বহু দিন পরে একখানি বহুমূল্য মৌলিক গ্রন্থের মূল সহ বাংলা অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। ফলত একবার নহে দুইবার নহে গ্রন্থখানি বারংবার পাঠ করিয়াও যেন আমাদের সাধ মিটিতেছে না। আড়বার সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীলোকাচার্য স্বামীর শ্রীবচনভূষণ এমনই উপাদেয় গ্রন্থ। বাস্তবিক পক্ষে গ্রন্থখানি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার মণি-মঞ্জুষা স্বরূপ। বেদ বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত আড়বারগণের সাধন-সঞ্জাত উপলব্ধির সমুদ্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মূল সূত্রাকারে রচিত। এই সূত্রের নিগূঢ় রসতাৎপর্য ও ভাবমাধুর্য উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে কঠিন। আচার্য শ্রীবরবর মুনি কৃত ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া মূলের ভাব সরস, সরল এবং উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাখ্যাও সংস্কৃত ভাষায় এবং সুবই প্রাঞ্জল। ব্যাখ্যাতার ঋষি-সুলভ গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান, সর্বোপরি প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় অভিব্যক্ত করিবার ক্ষেত্রে অসামান্য মনীষা এবং প্রয়োগ নৈপুণ্য আমাদের অন্তরে পরম বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক ব্যাখ্যাতা লোকাচার্যের পদে অবনমিত হয়। নিরাট এই গ্রন্থ। গ্রন্থের আলোচনাও বিস্তৃত, কিন্তু বিশ্লেষণী এবং যুক্তিপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট যে এমন দার্শনিক গ্রন্থ পাঠেও আমাদের মন সহজেই অভিনিবিষ্ট হয় এবং আমরা তৃপ্তি পাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেভাবে এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে সাধন-বিজ্ঞান বলাই বিধেয়। এই আলোচনায় সার্বভৌম সত্য উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত সাধক মাত্রেরই পক্ষে গ্রন্থখানি পরম আদরের বস্তু।

এমন আকর গ্রন্থের অনুবাদ করা সহজ নয়। বস্তুত অনুবাদক যিনি, তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিশেষ-ভাবে প্রত্যক্ষানুভূতি না থাকিলে ব্যাখ্যার সাহায্যে অনুবাদ করিতে গিয়াও মূল ভাবটি সাধারণের পক্ষে সুগম করা কঠিন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে পারিভাষিক জটিলতা দেখা দেয়। শ্রীমৎ যতীন্দ্ররামানুজ দাসের অনুবাদে সেই সংকট আদৌ সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহার অনুবাদে ঘোরালো ভাব একটুও নাই, ইহাই উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এমন বহু মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ এইরূপ সার্থকভাবে অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলা দেশের চিন্তাশীল এবং সাধন-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন এবং বাংলার সাহিত্যকে স্থায়ী সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অখণ্ড ভারতের সংহতিগত আত্ম-বোধ সুদৃঢ় করিবার পক্ষে এই ধরনের অনুবাদ-সাহিত্য গড়িয়া তোলা খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থ বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত এবং সুধী সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর, কাপড়ে বাঁধাই সুদৃশ্য বং মনোরম।

চক্রদত্ত

আজকালকার দিনে বাজার থেকে জিনিস দেখে চিনে বুঝে কেনা এক বিপজ্জনক ব্যাপার। বেশ তাজা দেখে মাছ কিনে ঘরে এনে দেখা গেল সে মাছ তাজা তো নয়ই এত পচা যে, একেবারে অখাদ্য। এক্ষেত্রে ক্রেতার অজ্ঞতা ও বিক্রেতার কারসাজি থাকতে পারে কিন্তু হাঁস বা মুর্গির ডিম

প্লাস্টিকের খোলের মধ্যে ভাংগা ডিম রাখা হয়েছে

কিনতে গিয়ে যে অনেক সময় ঠকতে হয় সেটা সব সময় বিক্রেতার জানা থাকে না কারণ ওপর থেকে দেখে সব সময় বোঝা যায় না যে, কোন ডিমটি তাজা আর কোনটি খারাপ। করনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাঁচা ডিমের খোলা ফেলে দিয়ে একটি প্লাস্টিকের খোলের মধ্যে ভরে রাখা হবে তাতে ডিমটি কিছুমাত্র নষ্ট হবে না। আর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের খোলের ওপর থেকে ডিমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ঐ প্লাস্টিকের খোল শুদ্ধই ডিমটি সিদ্ধ বা পোচ তৈরী করা যাবে।

*

দুটি নতুন রকম এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বার হচ্ছে। এর মধ্যে একটির নাম ক্যাথো-মাইসিন। ক্যাথোমাইসিন একরকম মাইক্রোব থেকে তৈরী হয়। এই মাইক্রোব পুরনো ঘাসের চাপড়ার নীচের মাটির তলা থেকে পাওয়া যায়। ক্যাথোমাইসিন ফোড়া, কারবঙ্কল, অ্যাবসেস, দূষিত রক্ত জনিত রোগ ইত্যাদি স্ট্যাফাইলো কক্কাস বীজাণু জাত রোগের মহৌষধি বিশেষ। এছাড়া অস্টিও মাইলাটিস ইত্যাদি হাড়ের রোগের পক্ষেও উপকারী। অ্যালবামাইসিন নামে আর একটি ওষুধও বিশেষ উপকারী। এই ওষুধটি চর্মরোগ, হাড়ে কোনওরকম রোগ হলে কিংবা মূত্রনালীর অসুখাদির পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

*

বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সব কিছুই সংক্ষিপ্ত করতে সহায়তা করে। আজকালকার দিনে দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য কতকগুলি ফল শাকসব্জি ইত্যাদি খেয়ে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ না করে কয়েকটি ভিটামিনের বড়ি খেয়েও বেঁচে থাকা যায়। এমনকি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়াটা আজকাল আমরা খুব সুনজরে দেখতে পারি না, এটা যেন সভ্যতা বিরোধী এমনকি কতকটা গরু ছাগলের মনোবৃত্তি ঘেঁষা বলেই মনে হয়। আজকাল জানোয়ারদের বেশী বেশী খাওয়ানও বিবেচনাধীন। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গোরুকে ডাবা ভরে ভরে ঘাস খাওয়ানর বদলে খড়ের বড়ি খাওয়ানর ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ খড়কে ছোট ছোট বড়ির আকারে গড়ে তুলছেন। তারা খড়কে এক বর্গ ইঞ্চির ওপর ২০ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ চাপ দিয়ে সংকুচিত করে ফেলছেন। এইভাবে অনেকখানি খড় ছোট ছোট গোলার আকারে তৈরী করা যায়, ফলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহনের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। খড়ের বোঝা রাখার স্থান সংকুলান না হলেও খড়ের গোলা রাখার জায়গা সহজেই হয়। এইরকম কয়েকটি খড়ের গোলা এক ডাবা খড়ের বদলে গরুকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং তাতে তার পেটও ভরবে। গরুর স্বাস্থ্যের হানি হবে না স্বাভাবিক খাদ্যের মতই কাজ করবে।

*

বাতজাতীয় রোগ সাধারণত আমরা মালিশ অথবা কোনও ওষুধ, ওপর থেকে লাগিয়ে সারানর চেষ্টা করি। আরথ্রাটিস রোগটি কিন্তু অত সহজে সারান যায় না। এই গেঁটে বাত জাতীয় রোগটি বিশেষ জটিল ধরনের। প্রথমত এই রোগটি সহজে ধরা পড়ে না এবং রোগটির বিশেষ ধারনাটি ধরা আরও শক্ত হয়। ডাঃ রেনল্ড ক্লেমণ্ট এক নতুন পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করে প্রথমাবস্থা থেকেই বলে দিতে পারেন যে, এটি কী ধরনের আরথ্রাটিস। প্রথমাবস্থা থেকে রোগের বিশেষ ধরনটি জানতে পারার দরুণ ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি যথাযথ চিকিৎসা করতে পারেন এবং তাতে রোগী পংগু হয়ে পড়ার হাত থেকে অন্তত রক্ষা পায়। প্রথম থেকে ঠিকমত চিকিৎসা হওয়ার দরুণ শতকরা সত্তরটি রোগী অন্তত পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছেন।

*

টাইপরাইটিং যন্ত্র বলতে লেখার যন্ত্রই বুঝি। নতুন যন্ত্রটি কিন্তু শুধু মাত্র লেখে না আঁকেও। এই যন্ত্রে নানা রঙের ফিতে লাগিয়ে রীতিমত ছবি আঁকা হচ্ছে। মহিলাটি তাঁর একটি মাত্র আংগুল দিয়ে এই টাইপ-রাইটারের সাহায্যে ভিভনশায়ারের ডাচেসের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকেছেন।

টাইপরাইটিং যন্ত্রে ছবি আঁকা হচ্ছে

—শৌভিক—

ফিল্মস ডিভিসনের কার্য-বিবরণী

ভারতে সংবাদ-চিত্র ও ডকুমেন্টারি ছবির একচেটে কারবারী ভারত গভর্নমেন্টের বেতার ও তথ্য পরিষদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ফিল্মস ডিভিসন। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের ওসব ছবি তোলা যে বে-আইনী তা নয়, তবে, প্রথমত অন্য কেউ তুললেও তাকে দেখাতে হবে ফিল্ম ডিভিসনেরই পরিবেশন বিভাগ মারফৎ এবং তা করতে গেলে সে ছবিকে "অনুমোদিত চিত্র" তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে যে ঝঞ্ঝাট ও অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় তা দেখে কেউ ওপথ মাড়ায় না। দ্বিতীয়ত, ডকুমেন্টারি বা ছোট ছবি কেউ তুলে আলাদাভাবে সেন্সর করিয়ে সাধারণ চিত্র পরিবেশন প্রতিষ্ঠান মারফৎ মুক্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে, তাতে কোন বাধা অবশ্য নেই, কিন্তু সে ব্যবস্থায় ব্যাপক কোন প্রদর্শন ক্ষেত্র লাভ করা কার্যত সম্ভব নয়। কারণ, ভারতের প্রত্যেক প্রদর্শন গৃহকেই ভাড়া বাবদ টাকা দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবেই ফিল্মস ডিভিসন পরিবেশিত ছবি বছরের প্রতিটি সপ্তাহে দেখাতে হয়ই, তার ওপর বাইরের আর কারুর ছোট ছবি ভাড়া নেবার মতো কারুর আগ্রহও থাকে না, সময়েরও ফাঁক থাকে না, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভাড়া দেবার অবস্থাও থাকে না। ফলে এদেশে বাইরের লোকের তোলা সংবাদ-চিত্র তো হয়ই না, ডকুমেন্টারি বা অন্য কোন রকমেরই ছোট ছবিও হয় না। এইভাবে ফিল্ম ডিভিসনের একচেটে কারবার হয়ে থাকায় ডকুমেন্টারি ছবি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ ধরণের ছোট ছবি তোলার ব্যাপারে ভারত পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। ফিল্মস ডিভিসনের একার হাতে সব থাকায় একই দৃষ্টিভঙ্গীই কাজ করছে, একই ধরণের মত ও একই মনোভাব ফিল্মস ডিভিসনের ছবিগুলির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োগ ধারা, বিন্যাস কৌশল সবই একই রকমেরই থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একের হাতে বরাবর থাকলে এ রকমটাই হতে বাধ্য। বিষয়বস্তু যে নতুন নতুন পরিবেশিত হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সব ছবিরই চেহারার মধ্যেই, আকৃতি-প্রকৃতি ও পরিবেশন ধারার মধ্যে এমন একটা মিল থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে যে, এখন ফিল্মস ডিভিসনের ছবি দেখে দেখে একটা এক-ঘেয়েমীর ভাব এসে যাচ্ছে। ফিল্মস ডিভিসনের যারা কর্তা ব্যক্তি তারা হয়তো ভাবছেন নানা বিষয়ের ছবি তোলা যখন হচ্ছে তখন আর বলবার কিছু নেই, কিন্তু তারা একথা ভাবছেন না যে বিষয়বস্তুর হেরফেরই শুধু নয়, পরিবেশন ধারায় বৈচিত্র্যও সঙ্গে সঙ্গে জোগান দিয়ে যেতে না পারলে ছবির ওপর টান ধরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। এ সত্য যদিও বা উপলব্ধ হয় কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে সেই উপলব্ধিকে কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ থাকতে পারে না।

• • •

ফিল্মস ডিভিসনের প্রধান কেন্দ্র বম্বেতে। একমাত্র ভ্রমণ সংক্রান্ত চিত্রাবলী ছাড়া আর যতো ডকুমেন্টারি ছবিই তোলা হয় সবই বম্বেতে। ফলে দেখা যায় ডকুমেন্টারি ছবিগুলিতে যে সব চরিত্র রাখা হয়, যে ধরণের জীবন যাপন ধারা চিত্রিত করা হয়, সে সব সমস্যার উত্থাপন করা হয়, যে ধরণের পরিবেশ দেখানো হয় তার প্রায় সবই বম্বে অঞ্চলের। বম্বের লোক, বম্বের পোশাক-আশাক, বম্বের জীবনধারা, বম্বে অঞ্চলের পথ ঘাট, কল কারখানা, মজুর চাষী, মিল ফ্যাক্টরী, ক্ষেত খামার, বম্বের লোকের খাওয়া দাওয়ার রীতি পদ্ধতি। তা দেখিয়ে পাঞ্জাব কি মাদ্রাজের, আসামের কি ওড়িষ্যার লোকের মনকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাটি শুধু প্রয়োগ করে দিলেই হয় না, নিজেদের চেহারা ও জীবন-ধারার সঙ্গে অমিল চেহারা ও জীবনধারা সামনে দেখলে তবেই লোকের মন বসে। আর তাই দেখা যায়, জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার মত ছবি ফিল্মস ডিভিসন পরিবেশন করলেও দেশের সর্বত্র তা সমানভাবে মনে ছাপ ধরিয়ে দেওয়ায় ব্যর্থই হয়। আমাদের দেশের বৈচিত্র্যটাই হচ্ছে বড়ো কথা। মানুষের চেহারা সাজ-পোশাক, খাওয়া দাওয়া, ঘরবাড়ী, চাষবাসের রীতিনীতি, সংস্কার, ঐতিহ্য সর্ব ব্যাপারেই অঞ্চলে অঞ্চলে অগাধ পার্থক্য রয়েছে। এই বিভিন্নতা কোন প্রকারে ক্ষুন্ন হতে দেখলে লোকের মন বিক্ষুব্ধ হবেই। ফিল্মস ডিভিসন এ সত্যকে যেন নিয়ম করে উপেক্ষা করে চলেছে। জায়গা জায়গার প্রভেদ রক্ষা করে সেই মতো ছবি

তুলতে গেলে বহু অর্থের ধাক্কায় পড়তে হবে বলে হয়তো ওজর খাড়া করা হবে। কিন্তু আমাদের বিরাট দেশের সব রকমের বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখেই তো সকল রকম পরিকল্পনায় হাত দেওয়া উচিত এবং সেটা তো দেশের লোকে দাবীও করতে পারে। এসব কথা অনেকবারই তোলা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য পরিষদ প্রতিকার বিষয়ে একেবারেই উদাসীন বলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সারা বছর একটার পর একটা ডকুমেণ্টারি ছবি হয়েই চলেছে কিন্তু তার দ্বারা কতোটা কি ফল লাভ করা যাচ্ছে সে হিসেবটা আর খতিয়ে দেখার দরকার মনে হচ্ছে না।

* * *

গত মার্চ মাসে যে বারোমাস শেষ হয়েছে এই সময়ের মধ্যে ফিল্মস ডিভিসন ৫৫ খানি ডকুমেণ্টারি নিজেরা তুলেছেন যার রীল সংখ্যা হচ্ছে ১২৫ এবং বাইরের লোকের তোলা ১৪ খানি ডকুমেণ্টারি পরিবেশন করেছেন যার রীল সংখ্যা মাত্র ২০। অর্থাৎ ফিল্মস ডিভিসনের তোলা ছবিগুলির রীল সংখ্যা গড়ে যেখানে প্রায় ছবি পিছু আড়াই রীল দাঁড়ায়, বাইরে থেকে নেওয়ার গড়পড়তা হার হচ্ছে দেড় রীলের কাছাকাছি। আর এই যে চোদ্দখানি ছবি বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলি বাইরের যে-কোন লোকের তোলা নয়। গভর্নমেণ্ট নিয়োজিত কমিটির অনুমোদিত তালিকা থেকে প্রযোজক বেছে বেছে নিয়ে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে ছবি তুলিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন এমন অবস্থা যে ঐ প্যানেলে যার নাম নেই তেমন কোন প্রযোজক বা কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির কাছে ডকুমেণ্টারি ছবি তোলায় উৎসাহ বোধ করার পথই মেরে দেওয়া হয়েছে এই নতুন ব্যবস্থায়। ফিল্মস ডিভিসন সব রকম ডকুমেণ্টারি মিলিয়ে মোট ছবি তুলেছে ৬৭ খানি (১৮২ রীল) যে জায়গায় তার আগের বারো মাসের সংখ্যা ছিল ৩৯ (৪২ রীল)। এ ছাড়া ৩০ খানি ছবির চিত্র গ্রহণ চলেছে। কেন্দ্রীয় ফিল্ম এডভাইসরী বোর্ড অনুমোদন সাপেক্ষে ফিল্মস ডিভিসনের তোলা ৮৩ খানি, রাজ্য গভর্নমেণ্টের তোলা ২৪ খানি এবং বাইরের প্রযোজকদের তোলা ৩৭ খানি ছবি পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে "মিত্রতা কি যাত্রা" ও "ভারত দর্শন" এবং প্রধান মন্ত্রীর চীন সফর অবলম্বনে তোলা ডকুমেণ্টারি ছবি ভারতের বাইরেও দেখানো হয়।

* * *

সংবাদ-চিত্র প্রতি সপ্তাহেই এক প্রস্ত করে মুক্তিদান করা হয়েছে। সংবাদ-চিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো নালিশ হচ্ছে বে-সরকারী প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানাদি অবজ্ঞা করা, আর আঞ্চলিক ঘটনার যথাযথ চিত্র না থাকা। এমন যদি মনে করা যায় যে, ভারতীয় সংবাদ-চিত্র দেশের মন্ত্রিবর্গ ও পদস্থ সরকারী ব্যক্তিদের জন্যই শুধু, তাহলে নেহাৎ অসত্য বলা হবে না। দেশে অনেক রকমের সরকারী প্রচেষ্টাই হচ্ছে, দেশের লোকের মনে আশা ও ভরসা জাগিয়ে তুলতে সেই সব প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার ছবি সাধারণের সামনে খুব বেশী করেই তুলে ধরা যে অত্যাবশ্যক এ নিয়ে কোন দ্বিমত হবে না। কিন্তু তাই বলে দেশের লোকের মধ্যে

বিভিন্ন দিকে যে চেতনার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে নানা বে-সরকারী কার্জের উৎসরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলোই বা উপেক্ষিত হতে

দেওয়া হবে কেন? পশ্চিম বাঙলায়, কি আসামে, কি বিহার কি উড়িষ্যায় কতো রকমের কতো নতুন নতুন ব্যাপার ঘটছে, কিন্তু তার কটাই বা সংবাদ-চিত্রে স্থান পেতে পারছে? এটা ঠিক যে একটা সংবাদ-চিত্রের দৈর্ঘ্যে দেশের সর্বত্র যতো কিছু ঘটছে সবই সন্নিবেশিত করে দিতে গেলে তা পূর্ণ দৈর্ঘ ছবির সময় দখল করে নেবে। কিন্তু এর তো একটা প্রতিকার হওয়া দরকার যাতে কোন অঞ্চলের কোন বৃহৎ ব্যাপারই অন্তত সে অঞ্চলের লোকের কাছে প্রদর্শিত সংবাদ-চিত্রতে বাদ না পড়তে পায়। প্রতি সংবাদ-চিত্রের আঞ্চলিক সংস্করণ দ্বারা এর প্রতিকার হয় এবং এ প্রস্তাব আগেও করা হয়েছে, কিন্তু কে শুনবে সে প্রস্তাব! ফিল্মস ডিভিসনের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, সংবাদ-চিত্র ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে তোলার জন্য শ্রীনগর-জম্মু, নাগপুর, হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজে একজন করে ক্যামেরা-ম্যান রাখা হয়েছে। বম্বেতে ও দিল্লীতে দুজন করে ক্যামেরাম্যান রাখা আছে, তাছাড়া এবার থেকে কলকাতায়ও দুজন ক্যামেরা-ম্যান রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর দ্বারা নানা জায়গার ছবি তোলা বাড়বে বটে, কিন্তু তাই বলে সব জায়গার সব বড়ো ঘটনার ছবি দেখতে পাওয়ার যে অভাব ছিল তা ঘুচবে বলে মনে করা যায় না। নিজেদের অঞ্চলের একটা ঘটনা সংবাদ-চিত্রে না দেখতে পাওয়ার যে ক্ষোভ এখন রয়েছে তা চলতেই থাকবে।

* * *

ভারতের সকল চিত্রগৃহকেই বাধ্যতা-মূলকভাবে ফিল্মস ডিভিসনের ছবি দেখাতে হয় বলে ওদের তালিকায় দেখা যায় স্থায়ী অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান মিলিয়ে ভারতে চিত্র-প্রদর্শন ক্ষেত্র হচ্ছে ৩,১২৭। হিসেবে দেখা যায় গড়পড়তা বছরে ৬০ কোটি লোক ফিল্মস ডিভিসনের ছবি দেখতে বাধ্য হন। প্রতি সপ্তাহে যে নতুন ছবি মুক্তিলাভ করে তার জন্যে ১৫৭টি করে কপি তৈরী করতে হয়। ফিল্মস ডিভিসনের ছবি থাকে ভারতের প্রধান তেরটি ভাষায়। শুধু মাত্র ডকুমেণ্টারি ছবি নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী চালানো যায় কি না এ নিয়ে ফিল্মস ডিভিসন গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন শহরের চিত্রগৃহে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সাধারণত চিত্রগৃহে প্রদর্শনীর যেটা সময় ডকুমেণ্টারি প্রদর্শনীর সময়টা তার বাইরে রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট চিত্র-গৃহকে ফিল্মস ডিভিসন থেকে বিনা ভাড়ায় ছবি সরবরাহ করা হয় এবং সেই চিত্রগৃহকে দু' আনা ও চার আনা হারে টিকিট রাখতে দেওয়া হয়। টিকিট বিক্রীর দরুণ যে আয় সেটা চিত্রগৃহই পায়। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইভাবের ৪২টি ডকুমেণ্টারী প্রদর্শনী হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে এমন প্রদর্শনীর প্রতি আগ্রহও দেখা গিয়েছে। ফিল্মস ডিভিসনের এ একটি প্রশংসনীয় উদ্যম।

* * *

ফিল্মস ডিভিসনের ছবি ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকেও সরবরাহ করা হয় এবং ইন্দোচীনে প্রবাসী ভারতীয় সেনাদের জন্যও নিয়মিত পাঠান হয়। বিদেশে ভারতের ৫২টি দোত্যাবাসেও বিদেশে প্রচারকার্য সহায়তা হবার জন্য অনুমোদিত ছবি অন্যান্য বছরের মতোই পাঠানো অব্যাহত থাকে। তাছাড়া বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতেও ছবি পাঠানো হয়। বিদেশে ভারতীয় ডকুমেণ্টারীর চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ইতিপূর্বের ব্যবস্থা মতো এক ব্যবসায়ী চিত্র পরিবেশক মারফৎ যুক্তরাজ্য ও

ইওরোপের অন্যান্য দেশে ফিল্মস ডিভিসনের ছবি দেখানো অব্যাহত থাকে। আফ্রিকায় পরিবেশিত হবার জন্য এক পরিবেশকের সঙ্গে আগের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। অনুরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে সিংহল, থাইল্যান্ড ও গোল্ড কোস্টে ছবি দেখাবার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে অবাণিজ্যিকভাবে ছবি বিক্রীর। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে ব্যবসায়ীক ধারায় ছবি পরিবেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এগারো মাসে অর্থ আয় হয়েছে ৩১ লক্ষ, ৭৮ হাজার টাকা এবং বারোমাস পুরো হলে মোট আয় ৩৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৮শ টাকা হবে বলে ধরা যায়।

*　*　*

সেন্সর বোর্ডের খতিয়ান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৫ সালে বম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ মিলিয়ে বোর্ডকে মোট ৩০৭৪ খানি ছবি পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ খানি ছবি রিভাইজিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়। বোর্ড থেকে বিদেশীয় ছবি ক্ষেত্রে ১৯১০ খানি ছবিকে 'ইউ' অর্থাৎ 'সর্বসাধারণে প্রদর্শন যোগ' বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং 'এ' অর্থাৎ 'কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' বলে চিহ্নিত হয় ৩৬ খানি ছবি। দেশীয় ছবির মধ্যে 'ইউ' সার্টিফিকেট পায় ৭৬৬ খানি এবং 'এ' ৯ খানি ছবি। ৪৯ খানি বিদেশী এবং ১ খানি দেশীয় ছবি প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বাতিল করা হয়। ছবিতে যে সব কাটছাঁট হয় তার পরিমাণ ১,০৪,৬০৫ ফিট। ৪৭৭ খানি ছবিকে 'মুখ্যত শিক্ষামূলক' বলে ঘোষণা করা হয়। সেন্সর বোর্ডের নিয়মে প্রতি পাঁচ বছর পর পর ছবির সার্টিফিকেট নতুন করে নিতে হয়। এই খাতে মোট ছবি পরীক্ষা করা হয় ৪৬৯ খানি, তার মধ্যে ৬ খানিকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়; ৮ খানি ছবি বাতিল করে দেওয়া হয়, তার মধ্যে একখানি ছিল দেশীয় ছবি। গত বছর ২৮ খানি ছবির ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের কাছে আপীল আসে। এর মধ্যে ১৯ খানি ছবির ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বোর্ডের অভিমত পরিবর্তনের কোন যুক্তি না দেখে আপীল বাতিল করে দেন। দুটির ক্ষেত্রে যেখানে বোর্ড সার্টিফিকেট দিতে রাজী নয়, আপীলের ফলে ঠিক হয় আপত্তিজনক অংশ কেটে বাদ দিলে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। আর দুটির ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে ছবির যে অংশ কেটে বাদ দেবার জন্য বলা হয় গভর্নমেন্ট তা সংশোধিত করে দেয়।

"উল্কা"র চারশত রজনী

"শ্যামলী"র পর রঙমহলে "উল্কা"ই একাদিক্রমে চারশত রজনী অভিনীত হয়ে দীর্ঘ চলার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হলো। "উল্কা"র চলাটা আরো বিস্ময়কর এইজন্যে যে, যতো সব নাট্যগুণের সমাবেশ হলে কোন নাটক এতোকাল চলতে পারে "উল্কা"তে তার ঘাটতিই আছে, তবুও এই সুদীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে চলার যে কীর্তি অর্জন করলো তা এখনকার জনসাধারণের নাটক দেখার প্রবল পিপাসার কথাই ব্যক্ত করে। তবু এই অসামান্য কীর্তি স্থাপনের জন্য "উল্কা"র প্রযোজক পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতাবর্গ, কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্যভাবে সংশ্লিষ্ট সকলেরই অভিনন্দন পাওনা। গত ৪ঠা জুন রঙমহলের কর্তৃপক্ষ এই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এক উৎসবের আয়োজন করেন। ডাঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় উপস্থিত থাকেন প্রধান অতিথিরূপে। বহু বিশিষ্ট জনগণের সমাবেশে সেদিনের অনুষ্ঠানটি মনোরম হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্মীকেই মূল্যবান উপহারসমূহ প্রদান করা হয়। সুসাহিত্যিক মনোজ বসু কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

একলব্য

প্রজাতন্ত্র চীনের অলিম্পিক ফুটবল দল কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ ক'রে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দিল্লীতে নিখিল ভারত একাদশের সংগে আর একটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে চীন দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। চীনের জাতীয় ফুটবল দল কলকাতায় এসেছিল অলিম্পিকের প্রথম পর্যায়ের খেলায় ফিলিপাইনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দেশ এবং নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্মতিক্রমে 'ফিফা' অর্থাৎ ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন কলকাতা চীন-ফিলিপাইনের অলিম্পিক খেলার স্থান নির্বাচন করেন। কিন্তু ফিলিপাইন কলকাতায় এসে পৌঁছুতে না পারায় চীন 'ওয়াক ওভার' পেয়ে অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। ভারতের মত চীনকেও এখন অলিম্পিক ফুটবল খেলতে হবে মেলবোর্নের বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে।

* * *

ফিলিপাইন কলকাতায় এসে পৌঁছুতে না পারায় ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম অলিম্পিক খেলার যে আয়োজন হয়েছিল তা পণ্ড হয়ে গেছে। তবে অলিম্পিকের প্রাথমিক ফুটবল খেলা দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও ফুটবল-প্রিয় কলকাতার দর্শক সমাজ মহাচীনের অলিম্পিক টীমের খেলা দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। অবশ্য কলকাতার দর্শকদের চীনের অলিম্পিক দলের খেলা দেখবার সুযোগ এই প্রথম নয়। এর আগে চীন দল আরও দুইবার কলকাতা সফর করেছে এবং দুই-বারই সফর করেছে অলিম্পিক যাত্রার পথে। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক যাত্রার পথে কীর্তিমান খেলোয়াড় লী ওয়াই টংয়ের নেতৃত্বে চীনের যে দলটি কলকাতায় প্রথম সফর করে তারা ফুটবলের উন্নত কলা-কৌশল দেখিয়ে অশেষ প্রশংসা অর্জন করে যায়। লী ওয়াই টংয়ের দলের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি ভারতীয় ফুটবল দল কলকাতা সফর করে বটে, কিন্তু সে দলটি তেমন শক্তিশালী ছিল না এবং চারটি খেলার মধ্যে তিনটি খেলাতেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালে চীন দলের আগমনে কলকাতার ফুটবল ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে এবং চীন খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শক-মনে ছাপ রেখে যায়। সেইদিক দিয়ে লী ওয়াই টংয়ের দলকে কলকাতা ময়দানের প্রথম শক্তিশালী ফুটবল অতিথি বলে বর্ণনা করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিক যাত্রার পথে চীনের আর একটি দল কলকাতায় সফর করে। লী ওয়াই টংকে এবার দেখা যায় দলের ট্রেনাররূপে। চীনের দ্বিতীয় দলটির শক্তিও নিতান্ত কম ছিল না। তখনকার শক্তিশালী ইস্ট-বেঙ্গল ও আই এফ এ একাদশের কাছে চীন দলকে দু'টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হলেও তারা শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত ক'রে খ্যাতি অর্জন করে। মোহনবাগানের সংগে চীন দলের খেলা থাকে অমীমাংসিত। বলা বাহুল্য, ১৯৩৬ ও ১৯৪৮ সালের চাইনিজ দলের সংগে এবারের চাইনিজ দলের পার্থক্য শুধু দল হিসেবে নয়—রাজনৈতিক কারণেও। এবার যে দলটি কলকাতায় খেলে গেল এরা নয়াচীনের নতুন দল। চিয়াং কাইশেকের রাজত্বকালে চীনে যারা ফুটবল খেলায় পটু ছিল জাতীয়তাবাদী চীনে এখনো তাদের ফুটবল তৎপরতা বিদ্যমান। লী ওয়াই টং এখন হংকংয়ের ফুটবল 'কোচ'। কিছুদিন আগে দূরপ্রাচ্য সফর থেকে দেশে ফেরবার পথে মোহন-বাগান ক্লাব হংকংয়ে অল হংকংকে ৬—২ গোলে এবং হংকং বাছাই দলকে ৫—১ গোলে পরাজিত ক'রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন ক'রে এসেছে। অবশ্য হংকংয়ে মোহন-বাগানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি এমন নয়। সম্মিলিত চাইনিজ দলই দূরপ্রাচ্য সফরে সুনাম অর্জনকারী মোহন-বাগানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। যাই হোক, চীনের সংগে ভারতের ফুটবল সম্পর্ক নতুন নয়, এতদিন জাতীয়তাবাদী চীনের সংগে সম্পর্ক ছিল, এবার নয়াচীনের সংগে হ'ল নতুন সম্পর্ক। কলকাতা ত্যাগের আগে চাইনিজ টীমের দলপতি আই এফ এ-কে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন; আই এফ এ-র সভাপতিও বলেছেন, চীন ফুটবল দলের জন্য তাঁদের দ্বার সদাই উন্মুক্ত। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে দুই দলের আরও ফুটবল সফর দেখবার আশা অবাস্তব কল্পনা নয়।

* * *

কলকাতায় চাইনিজ দলের খেলার ফলা-ফল নানা কারণে অপ্রত্যাশিত। তিনটি প্রদর্শনী খেলার মধ্যে প্রথম খেলায় চীন দল ফুটবলের উন্নত কলাকৌশল দেখিয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবকে ৮—১ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও ৩—১ গোলে পরাজিত করতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তৃতীয় প্রদর্শনী খেলায় আই এফ এ-র কাছে চীন দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ৩—০ গোলে। চাইনিজ দলের কাছে শক্তিশালী মোহনবাগান ক্লাবের ৮—১ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার মোহনবাগানের তো বটেই, কলকাতার ফুটবল ইতিহাসেরই এক স্মরণীয় ঘটনা। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, বার্মা, ইংলণ্ড, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়া থেকে যেসব ফুটবল দল এখানে খেলতে এসেছে তার কোন দলই কলকাতার কোন দলের বিরুদ্ধে এত বেশী গোল করতে পারেনি। অপরদিকে আগন্তুক কোন দলের বিরুদ্ধে আই এফ এ-রও এমন কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের কোন নজির নেই, যেমন আই এফ এ সাফল্য অর্জন করেছে, প্রজাতন্ত্র চীনের জাতীয় দলের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, যারা মোহনবাগান ক্লাবকে ৮—১ গোলের ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দর্শক সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করলো, তারাই আবার আই এফ এ-র কাছে এমনভাবে হার স্বীকার করলো কেন? এর উত্তরে বলতে চাই, অপ্রত্যাশিত ফলাফল খেলায় স্বাভাবিক ঘটনা। আমি আগেই একবার বলেছি, 'Things which are equal to the same thing are equal to one another'—এই জ্যামিতিক সূত্রে খেলার ফলাফল নির্ণীত হয় না। নাম-না-জানা টীমের কাছে নাম-করা দলের পরাজয় হামেশাই চোখে পড়ে। মোহনবাগান আর আই এফ এ তো দু'টি পৃথক দল। একটি দলের দু'টি খেলাতেই কত অপ্রত্যাশিত ফলাফল সংঘটিত হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা 'জুলেস রিমেট' কাপের প্রাথমিক খেলায় যে জার্মানীকে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হাংগেরীর কাছে ৮—৩ গোলের ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল সেই জার্মানীই ফাইন্যালে দুর্ধর্ষ হাংগেরীকে ৩—২ গোলে পরাজিত ক'রে লাভ করেছে ফুটবলে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান। ক্রীড়াক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের এমন ভুরি ভুরি নজির আছে। আমার মনে হয়, মোহন-বাগান-চীন ও চীন-আই এফ এ দু'টি খেলাই এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে আই এফ এ-র বিরুদ্ধে চাইনিজ দলের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভিজে এবং আঁঠালো মাঠের প্রতিকূল অবস্থা (যে মাঠে চীন খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়), আই এফ এ-র উদ্দীপনাপূর্ণ খেলা এবং প্রাথমিক গোলের ফলে চীন খেলোয়াড়দের

মানসিক বৈকল্য প্রধান কারণ বলে মনে হয়। চীনের বিরুদ্ধে আই এফ এ-র বাছাই দল সতিাই খুব ভাল খেলেছে আর আই এফ এ-র দলও গঠন করা হয়েছিল নিরপেক্ষ-ভাবে, ইতঃপূর্বে দল গঠনের ক্ষেত্রে সে নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

যাই হোক, চীনের খেলোয়াড়রা যে উন্নত ফুটবল নৈপুণ্যের অধিকারী একথা অস্বীকার করা যায় না। একথাও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এদের খেলার পেছনে আছে শিক্ষা পদ্ধতির সুষ্ঠু পরিকল্পনা। অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও সাধনা। ইউরোপ অঞ্চলের দলগুলির মত চীনও তিন ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত। তবে ইউরোপ অঞ্চলের তিন ব্যাক প্রথার সঙ্গে এদের তিন ব্যাক প্রথার কিছু পার্থক্য আছে। চাইনিজ দলের সেণ্টার হাফ কাণ্টনেণ্টাল টীমের মত সেণ্টার ব্যাক বা 'স্টপার' হিসেবে খেলেন না। লেফ্‌ট ব্যাককে গোলের সামনে দাঁড়িয়ে সেণ্টার ব্যাক হিসেবে খেলতে দেখা যায়। প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে লেফ্‌ট হাফ ব্যাক লেফ্‌ট ব্যাকের ভূমিকা গ্রহণ করেন আবার প্রতি-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যান। চাইনিজ টীমের
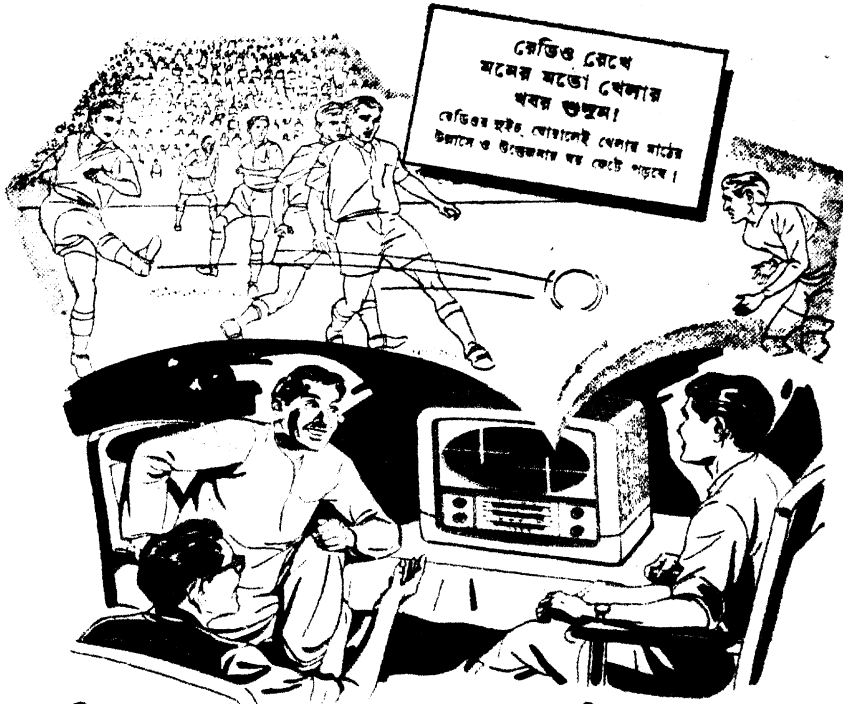
উড়ন্ত পাখি নয়—আই এফ এ ও চাইনিজ অলিম্পিক টীমের প্রদর্শনী খেলায় চাইনিজ গোলরক্ষক উড়ন্ত পাখির মত ছুটে একটি গোল রক্ষা করছেন

খেলার গতিবেগ প্রশংসনীয়। অনেকের পায়েই 'আউট সাইড' ও 'ইন্ সাইড' ডজ আছে। মাটিতে বল রেখে সর্ট পাসিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্ণ আক্রমণ রচনা করা এদের খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পায়ের সটও আছে ভাল। প্রকৃতপক্ষে চীনে বেশীদিন ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়নি। মুক্তি-সংগ্রামের পর ফুটবলকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে ৭।৮ বছরে এরা ফুটবলে যতখানি উন্নতি করেছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

কলকাতায় চীন দলের আগের এবং এবারের তিনটি খেলার ফলাফল এবং এবারের খেলায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম দেওয়া হল:—

১৯৩৬ সাল

চীন অলিম্পিক দল (১)
ভারতীয় দল (১)

চীন অলিম্পিক দল (২)
সিভিল ও মিলিটারী একাদশ (১)

১৯৪৮ সাল

চীন অলিম্পিক (৩) মহঃ স্পোর্টিং (১)

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (২)
চীন অলিম্পিক দল (০)

মোহনবাগান (০) চীন অলিম্পিক দল (০)

আই এফ এ (১) চীন অলিম্পিক দল (০)

১৯৫৬ সাল

চীন অলিম্পিক দল (৮) মোহনবাগান (১)
(চ্যাং হুং কেন, ফ্যাং তেন (সত্তার)
চিন—৩, নিয়েন ওয়েজু—২,
শী ওয়ান চুন ও ওয়াং লু)

চীন দল—চ্যাং চুন সিউ; পিয়াও ওয়ান ফু ও ওয়াং কে পিন; ওয়াং জি-ওয়ে, সুং আন-চিন ও চ্যাং চিন তিয়েন; শী ওয়ান-চু, চ্যাং হুং কেন, ফ্যাং তেন চিন, নিয়েন ওয়ে জু ও ওয়াং লু (অধিনায়ক)

মোহনবাগান—এস চ্যাটার্জি; এস গুহ ও এস মান্না; পি মজুমদার, সুভাশীষ গুহ ও নরসিয়া; এস সেন, এস ব্যানার্জি, কে পাল, সত্তার (অধিনায়ক) ও এ চ্যাটার্জি।

দ্বিতীয়ার্ধে—আর গুহ (গোল) চন্দন সিং (সেণ্টার হাফ) ও সি গোস্বামী (রাইট ইন)।

চীন অলিম্পিক দল (৩)
মহঃ স্পোর্টিং (১)
(চ্যাং হুং কেন—২ ও (আবিদ)
নিয়েন ওয়ে জু)

চাইনিজ অলিম্পিক টীম—সু ফু-সেং; সান পাও-জাংগ ও ওয়াং কে-পিন; চেন চেংগ-তা, সুং আন-চিং ও চ্যাং চিং তিয়েন; চেন চিয়াং-কিয়াং, চ্যাং হুং-কেন, সুই সেং-শী, নিয়েন ওয়েনজু ও সুন ফু-চেংগ।

দ্বিতীয়ার্ধে—ফ্যাং চেন চিউ ও চেং ও কুয়েন।

মহমেডান স্পোর্টিং—সেলিম আহমেদ; মুস্তাক হোসেন ও নবাব; লতিফ, সালাম ও হোসেন; সমির আহমেদ, আবিদ (অধিনায়ক), আজম খান, ইয়ামানি ও ফারুকী।

দ্বিতীয়ার্ধে—এফ রহমান ও ইকবাল ইমাম।

আই এফ এ (৩) চীন অলিম্পিক দল (০)
(মুসা, কিট্টু ও পি কে ব্যানার্জি)

আই এফ এ—এস সেট; এ রহমান ও জার্নেল; কিম্পায়া, এস সর্বাধিকারী ও এন নন্দী; পি কে ব্যানার্জি, আমেদ (অধিনায়ক), কে পাল, কিট্টু ও মুসা।

পরিবর্ত—চেন ও সত্তার:

চীন অলিম্পিক দল—চ্যাং চুং শিউ; পিয়াও ওয়ান-ফু ও ওয়াং কে-পিন; ওয়াং জি ওয়ে, সুং আন-চিন ও চ্যাং চুন-তিয়েন; শী ওয়াং চাং, চ্যাং হুং কেন, চ্যাং জেন-চিউ, নিয়েন ওয়ে-জু ও ওয়াং লু।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট

নটিংহ্যামশায়ারের 'ট্রেণ্ট ব্রিজ' মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই পর্যায়ের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ক্রিকেট ইতিহাসে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এটি ছিল ১৬৯তম টেস্ট। দুই দেশের টেস্ট যুদ্ধে এর আগে অস্ট্রেলিয়া ৬৯ বার এবং ইংলণ্ড ৬০ বার জয়লাভ করেছে। এই খেলাটি নিয়ে ৪০টি খেলা ড্র হ'ল।

ক্রিকেটের গাণিতিক হিসাবের অন্ত নেই। এই খেলাটি নিয়ে ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মোট ৯ বার। এর মধ্যে ইংলণ্ডে জিতেছে মাত্র একটি টেস্টে, অস্ট্রেলিয়া জিতেছে

তিনটিতে, এবার নিয়ে ৪ বার খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'ল। একবার বৃষ্টির জন্য টেস্ট খেলা একেবারেই পণ্ড হয়ে যায়।

এবারকার প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইংলণ্ডের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে খেলাতে অস্ট্রেলিয়া পটু নয়। তারপর খেলোয়াড়দের চোট। ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়াল পায়ের চোটের জন্য প্রথম ইনিংসের ১৫ ওভার ছাড়া বল করতে পারেন নি। ডেভিডসনও মাত্র ১০ ওভার বোলিং ক'রে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর পায়ের একখানি হাড় ভেংগে গেছে ব'লে আশংকা করা হচ্ছে। ডেভিডসন ব্যাট করতেও অপারগ হয়েছেন। অবশ্য ইংলণ্ডের দুই কীর্তিমান ফাস্ট বোলার ফ্রাংক টাইসন এবং স্ট্যাথামও অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেন নি। কিন্তু এদের অনুপস্থিতি ইংলণ্ডের তেমন ক্ষতির কারণ হয়নি। কারণ বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে যাদের বোলিং করবার দক্ষতা সবচেয়ে বেশী সেই টনি লক, জিম লেকার ও বন্ধু এ্যাপলইয়ার্ড টাইসন ও স্ট্যাথামের অভাব পূরণ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার আহত খেলোয়াড় লিণ্ডওয়াল ও ডেভিডসনের কাজের আংশিক ভার এসে পড়ে আর্চার মিলার ও বিনাউডের উপর। এরা তিনজনই চৌকস খেলোয়াড়। সুতরাং বোলিংয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য এদের ব্যাটিং করবার শক্তিও হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক।

বৃষ্টির জন্য পাঁচদিনের টেস্ট খেলা ৪ দিনে পরিণত হয়। ১২ ঘণ্টা ধরে অবিরাম বারিবর্ষণের ফলে দ্বিতীয় দিন একেবারেই খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম দিন মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলা সম্ভব হয় এবং টস জয়ী ইংলণ্ড দল প্রথম দিনের শেষে করে ২ উইকেটে ১৩৪ রাণ। তৃতীয় দিন চা পানের সময় ইংলণ্ডের ৮ উইকেটে ২১৭ রাণ উঠিলে অধিনায়ক পিটার মে ইনিংসের 'সমাপ্তি' ঘোষণা করেন। দুই উইকেটেই ইংলণ্ডের ১৮০ রাণ উঠেছিল, এর পর তাড়াতাড়ি রাণ সংগ্রহের চেষ্টা করায় আর ৩৪ রাণের মধ্যে ৬টি উইকেট পড়ে যায়। চা পানের পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের ফলে উইকেটের অবস্থা খুবই সংগীন হয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখে কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। তারা ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৯ রাণের মধ্যেই ২টি উইকেট হারায়। আরও উইকেট পড়বার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত এবং মাঠ অন্ধকার হওয়ায় আম্পায়ার এক ঘণ্টা আগে খেলা বন্ধ করে দেন। নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় নীল হার্ভে এবং বার্ক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসেন।

চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়াকে আঁঠালো পিচে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রে ব্যাট করতে হয়। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও তারা ১৪৮ রাণের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। এক সময়ে মাত্র ৩৬ রাণে ৪টি উইকেট পড়ে যাওয়ায় 'ফলো অন'এরই আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নীল হার্ভে ও রণ আর্চারের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া ফলো অন হাত থেকে অব্যাহতি পায়। নীল হার্ভে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দক্ষতার সংগে ব্যাটিং করেন। বিনাউড মাত্র ১৭ রাণ ক'রে আউট হলেও লেকের বলে একবার 'ওভার বাউণ্ডারী' মেরে দর্শকদের আনন্দ দেন।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬৯ রাণে অগ্রগামী থেকে ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং শুরু করে এবং আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কোন উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করে ১২৯ রাণ। পঞ্চম ও শেষদিনেও আকাশে মেঘের ঘনঘটা। খেলা আরম্ভের সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ইংলণ্ড ১৯৮ রাণে এগিয়ে আছে। সমস্ত উইকেটও অটুট রয়েছে। দ্রুত আর কিছু রাণ ক'রে ইনিংস ছেড়ে দিলে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ৭৫ মিনিট পরে খেলা আরম্ভ হ'ল। ইংলণ্ড কিন্তু হাল ছাড়ল না। ৩ উইকেটে ১৮৮ রাণ উঠলে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় করলো ইনিংসের 'সমাপ্তি' ঘোষণা।

অস্ট্রেলিয়ার এবারও কঠিন সমস্যা। জয়লাভের জন্য অন্ততঃ ২৫৮ রাণের প্রয়োজন। ২৪০ মিনিট সময় হাতে। অস্ট্রেলিয়ার আগের দিন থাকলে ২৪০ মিনিটে ২৫৮ রাণ সংগ্রহ করতে তারা থোড়াই কেয়ার করতো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কি আর সেদিন আছে? তাই তারা ক্ষত ও আঁঠালো পিচে রক্ষণমূলক খেলার নীতি গ্রহণ করলো। এখানেও বিপদ। ৪১ রাণের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া হারালো তিনটি উইকেট। তিনজন খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড, হার্ভে ও মিলার আউট হয়ে গেলেন। খেলার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। অস্ট্রেলিয়া বুঝি হেরে যায়! কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার দুই তরুণ জিম বার্ক ও পিটার বার্জ অনমনীয় দৃঢ়তার সংগে ব্যাটিং ক'রে শেষ পর্যন্ত উইকেটে টিঁকে রইলেন। ৩ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার ১২০ রাণ উঠলে প্রথম টেস্টের উপর যবনিকা পড়লো।

সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বের নজর এখন ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলার উপর। ২১শে জুন লর্ডস মাঠে আরম্ভ হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ২১৭ রাণ (রিচার্ডসন ৮১, পিটার মে ৭৩, কাউড্রে ২৫; মিলার ৬৯ রাণে ৪ উইঃ, আর্চার ৫১ রাণে ২ উইঃ, জনসন ২৬ রাণে ১ উইঃ, ডেভিডসন ২২ রাণে ১ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১৪৮ (নীল হার্ভে ৬৪, রণ আর্চার ৩৩; লেকার ৫৮ রাণে ৪ উইঃ, লক ৬১ রাণে ৩ উইঃ, এ্যাপলইয়ার্ড ১৭ রাণে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ডিক্লেঃ) ১৮৮ রাণ (কলিন কাউড্রে ৮১, পিটার রিচার্ডসন ৭৩; মিলার ৫৮ রাণে ২ উইঃ, আর্চার ৪৬ রাণে ১ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(৩ উইঃ) ১২০ (জে বার্ক নট আউট ৫৮, পি বার্জ নট আউট ৩৫; লেকার ২৯ রাণে ২ উইঃ, লক ২৩ রাণে ১ উইঃ)।

[ফলাফল অমীমাংসিত]

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিশন লীগ খেলার ফলাফলঃ—

৬ই জুন

মোহনবাগান (৪) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
রাজস্থান (০) কালীঘাট (০)
খিদিরপুর (০) বালী প্রতিভা (০)

৮ই জুন

বালী প্রতিভা (১) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
উয়াড়ী (২) কালীঘাট (০)

৯ই জুন

ইস্টবেঙ্গল (০) রাজস্থান (০)
এরিয়ান (০) রেলওয়ে স্পোর্টস (০)

১১ই জুন

মহমেডান স্পোর্টিং (৬) পুলিশ (০)
স্পোর্টিং ইউঃ (০) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

১২ই জুন

মোহনবাগান (৩) কালীঘাট (০)
ইস্টবেঙ্গল (১) উয়াড়ী (০)
রাজস্থান (০) বালী প্রতিভা (০)

দেশী সংবাদ

৬ই জুন—গতকল্য সকাল প্রায় আট ঘটিকার সময় ১৭নং বামাপুকুর লেনে একটি জীর্ণ পুরাতন বাড়ির তিনতলার বারান্দা ধসিয়া পড়ার ফলে অনুমান এক বৎসরের একটি বালক মারা যায় এবং জনৈক রিকশাওয়ালা ও একজন মহিলাসহ আরও পাঁচজন আহত হয়।

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযামিনী রায় ললিতকলা আকাদামির সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আকাদামির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

বন্যার ফলে আগরতলায় এপর্যন্ত পাঁচজনের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ মৃতের সংখ্যা ছয়। ইহাদের মধ্যে শিশুও রহিয়াছে। বন্যায় ক্ষতি হইয়াছে প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি।

৬ই জুন—অবাধে বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকার প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চিনি ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় শতকরা ৫৩.৬ জন এবং আই এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৫৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে জানা গিয়াছে।

৭ই জুন—শিলং-এর সরকারী মহলের মতে সীমাবদ্ধ অস্ত্র সরবরাহ, বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ভাঙ্গন এবং অর্থনৈতিক চাপ, একযোগে এই তিনটি ঘটনা নাগা বিদ্রোহের অবসান দ্রুততর করিতে পারে।

উত্তর প্রদেশ সরকারের সদর দপ্তরে প্রাপ্ত এক বেতার-বার্তা হইতে জানা যায় যে, ভারত-তিব্বত সীমান্তস্থিত একটি পার্বত্য গ্রাম "ভূতাত্ত্বিক কারণে" ক্রমাগত মাটির নিচে ধসিয়া যাইতেছে।

৮ই জুন—বাংলা ও বিহারের সীমানা পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ (যাহা ভারত সরকার কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে) কার্যকরী করার জন্য প্রণীত বাংলা বিহার বিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিগত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধির জন্য 'গ্রেস' নম্বর দিবার নীতি স্থির হইয়াছে। কম্পালসরী ম্যাথমেটিকসে পরীক্ষার্থী যে নম্বর পাইবে তাহাকে ভিত্তি করিয়া গ্রেস নম্বর দেওয়া হইবে।

কলিকাতার বাজারে যে সাধারণ শাক-সব্জি, দুধ, ঘি, নতুন চাউল বিক্রয় হইতেছে, সে সমুদয় দ্রব্য তেজস্ক্রিয় হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার বৈজ্ঞানিক মহল গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

৯ই জুন—চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বতো-ভাবে সরকারী শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনা হইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে।

ধলেশ্বরী ও কাটাখালি নদীতে বন্যা হইবার ফলে সমগ্র হাইলাকান্দি মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল গত সাত দিন যাবৎ জলমগ্ন হইয়াছিল। এই বন্যার জল এখন ধীরে ধীরে কমিতেছে।

১০ই জুন—অদ্য সকালে শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিচার, আইন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

ভারত সরকার রেলপথের সহিত সংযুক্ত দেশের সকল স্থানে নিয়ন্ত্রিত সর্বপ্রকার ইস্পাত এবং লৌহপিণ্ডের একই প্রকার মূল্য প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১১ই জুন—পশ্চিম বাংলায় আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। একটি বর্ধমানে এবং অপরটি দার্জিলিংয়ে স্থাপিত হইবে।

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হিসাব পাকিস্তান হইতে ভারতে স্থানান্তরিত করার জন্য দরখাস্ত করিবার শেষ তারিখ আগামী ৩০শে জুন ধার্য হইয়াছে।

মানিকতলা মেইন রোডে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এক প্রসূতি সদনের বাড়ীটিকে সম্পূর্ণ "বিপজ্জনক" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই জুন—স্বাস্থ্যের কারণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে মিঃ মহম্মদ আলীর পদত্যাগ আসন্ন এবং তাঁহার স্থলে বর্তমান অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলীর প্রধানমন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা।

রাষ্ট্রপুঞ্জ হেড কোয়ার্টার্সে একটি বোমা পাতিয়া রাখার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। টেলিফোন-যোগে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ সংবাদ পাইবার পর অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ হেড কোয়ার্টার্সে প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

অদ্য মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিন এই কথা বলিয়াছেন যে, "কোনখানেই যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া রাশিয়া তাহার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়াছে।"

৭ই জুন—সিঙ্গাপুরের গভর্নর আজ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড মার্শাল এবং তাঁহার কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেন আজ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, [illegible] প্রশান্ত মহাসাগরের [illegible] বৃটেন একটি হাইড্রোজেন অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ [illegible]।

সম্প্রতি ক্রেমলিনে [illegible] সাক্ষাৎকালে যুগোস্লাভিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির সচিব [illegible] বলেন, [illegible] সাম্রাজ্যবাদ [illegible] ইহা আমরা বিশ্বাস করি।"

৯ই জুন—[illegible] আইসেনহাওয়ারের [illegible] হইয়াছে।

১০ই জুন—আর্জেন্টিনা গভর্নমেন্ট অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পেরনের সমর্থকদের সহায়তায় সেনাবাহিনীর যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তাহা চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পর্যবেক্ষক মহলের সংবাদে প্রকাশ, আগামী [illegible] মধ্যে [illegible] দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইতে পারে।

১১ই জুন—[illegible] পাকিস্তানী দূত মিঃ বোখারী বলেন, কাশ্মীর এলাকা লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। মিঃ বোখারী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ভারত বলপ্রয়োগ করিয়া কাশ্মীর দখল করিয়া লয়—গণভোট দ্বারা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের [illegible] প্রস্তাবই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে।

১৯১৮ সালে একদল ভারতীয় মস্কোতে আসিয়া লেনিনকে চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত একটি লাঠি উপহার দিয়াছিলেন। লেনিন মিউজিয়ামের ডিরেক্টরগণ এখন সেইসব ভারতীয়দের সন্ধান লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

পর্তুগীজ পুলিশ গোয়ায় ব্যাপক ধর-পাকড় ও নির্মম প্রহার চালাইতেছে এবং ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া অদ্য গোয়া জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

আঁধার পথে আলো

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙলার এই দুইজন মহাপ্রাণ নেতার স্মৃতিবার্ষিকী উদ্যাপিত হইয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই নিবেদিতাত্মা পুরুষ; ইঁহাদের মধ্যে একজন লোক-শিক্ষক, আচার্য, জ্ঞানের সাধক-তপস্বী, অপরে ভক্ত, ভাবুক এবং প্রেমিক। একজনের জীবনে সমাজনীতি পরোক্ষ, অপরে রাজ-নীতিক সাধনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট; সেবা উভয়েরই জীবনের আদর্শ। জাতির মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া উভয়েই অমর মহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের এবং জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে; কিন্তু সনাতন ইঁহাদের আদর্শ মহামানবতার সাধনায় জাতিকে যুগে যুগে সঞ্জীবিত করিবে। অখিলাত্ম দেবতাকে ইঁহারা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। মানুষের ব্যথা এবং বেদনায় ইঁহাদের জীবন দীপ্ত হইয়া দিব্য মহিমায় উজ্জ্বল হইয়াছে। নরোত্তম ইঁহারা। ইঁহারা আমাদের সকলের পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার। ইঁহাদের জীবনব্যাপী ত্যাগ এবং তপস্যাই জাতির অভ্যুন্নতির পথে আলোকস্বরূপ। আদর্শকে ইঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সত্যকে ইঁহারা প্রাণরসে রূপ দিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহাদের নেতৃত্ব শুধু নৈতিক উপদেশের ওজনের উপর গড়িয়া উঠে নাই। সমষ্টির তাপে নিজেরা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ইঁহারা সকলের অন্তরে আত্মভাবনায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যজ্ঞার্থে ইঁহাদের কর্ম, ইঁহারা যজ্ঞপুরুষ। ইঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘোপ-চারে জাতির অধিকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া থাকে। ইঁহাদের চরণে নমস্কার আমাদের নিত্য হোক্, মনুষ্যত্ব জয়যুক্ত হোক, এই প্রার্থনা।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন
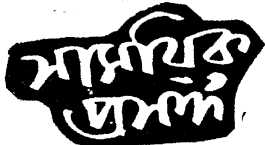
পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন সম্বন্ধে বহু-প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাব এতদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রাজ্য কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সেই সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যেটুকু জায়গা-জমি জুটিয়াছিল, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে তাহারও কতকাংশ হইতে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত হইতে হয়; সুতরাং সরকারী সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী গঠিত আইনের খসড়া পশ্চিমবঙ্গের পুরাপুরি সন্তোষবিধানে সমর্থ হইবে না, একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি ভারত সরকারের এই কাজে সমীচীনতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিহারের নেতারা এই সম্পর্কে গণভোটের যে দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন, ভারত সরকার যে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতিতে অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অন্তরে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় বিহারের দাবী মানিয়া যদি আবার তাঁহারা গণভোট গ্রহণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের একটা পক্ষ-পাতিত্বের ভাব এখানকার জনসাধারণের অন্তরে বিক্ষোভের কারণ বাড়াইয়া তুলিত। আইনের খসড়ার ব্যবস্থা-অনুযায়ী কার্যক্রমে যদি কোন অন্তরায়ের উদ্ভব না হয়, তবে আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আইনটি কার্যকর হইবে, ইহাই আশা করা যায়। ইতোমধ্যে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় এই খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ইহা সমর্থিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিহারের বিধানসভায় আইনের খসড়াটি যে সরাসরি নাকচ হইয়া যাইবে, একথা পূর্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ, বিহার সরকারের মুখপাত্রগণ জোর গলাতেই একথা পূর্ব হইতে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা বিহারের কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তর করা কিছুতেই সমর্থন করিবেন না। এরূপ মতদ্বৈধের অবস্থায় চরম সিদ্ধান্তের ভার ভারত সরকারের উপর রহিয়াছে। তাঁহারা কি করিবেন? বিহারের দাবীর অনুকূলতার দিকে তাঁহাদের গতিগতি অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়ে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা আশা করি, তাঁহারা এক্ষেত্রে নিজেদের নীতি-নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইবেন না এবং বিহারের গণভোটের দাবী যেমন তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গেই বিহার বিধানসভার অসমীচীন সিদ্ধান্তকেও উপেক্ষা করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ বিহারের এক ইঞ্চি জায়গাও নিজেদের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে না, সে তাহার ন্যায্য অধিকারই দাবী করিয়াছে। বিহারের নেতৃবর্গ যদি এই সত্য এখনও স্বীকার করিতে না চাহেন, তবে সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থই তাঁহাদের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহার ফলে দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে বিরোধ-বিদ্বেষের স্থায়ী কারণ থাকিয়াই যাইবে। এমন প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সমীচীন হইতে পারে না; সুতরাং এই সম্পর্কে সমগ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকাই দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের সামরিক সংযোগ

র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্য কমিশন এই অসুবিধা দূর করিয়া এই রাজ্যের সংহতি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া জেলার কিষেণগঞ্জ মহকুমার অংশ-টুকু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার

প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহাদের সুপারিশে এই সংযোগ সূত্রটি সুনির্দিষ্ট ছিল না। দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারের প্রস্তাবিত বিলেও এই ত্রুটি সমানভাবেই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ণিয়া জেলা অনাবিষ্কৃত অঞ্চল নিশ্চয়ই নয়। এই জেলার আধুনিকতম মানচিত্রও ভারত সরকারের দপ্তরে নিশ্চয়ই আছে, তথাপি এমন অনবধানতার কারণ কি, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রস্তাবিত আইনে বলা হইয়াছে বটে যে, পূর্ণিয়া জেলার হস্তান্তরিত অংশ দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে এতদ্দ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, এই হস্তান্তরিত অঞ্চল দার্জিলিং জেলার সহিত সংলগ্ন থাকিবে। অন্যথায় ভারত সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলে এই সংযোগ-সূত্রটি পাওয়া যায় না। প্রস্তাবিত আইনটি প্রকাশের সহিত দুইটি স্থানীয় পত্রিকায় কিষণগঞ্জ অঞ্চলের হস্তান্তরযোগ্য অংশের ম্যাপও প্রকাশিত হইয়াছে। এই ম্যাপে দুইটি অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র রক্ষিত হয় নাই। যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি উত্থাপিত হইলে কমিটি এই সংযোগ-সূত্রটি নির্ধারণ করিয়া দিবেন বলিয়া শুনিতেছি। ফলত এই কাজটি যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন না হইলে পশ্চিম-বঙ্গের সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত এক হিসাবে কাঁচা থাকিয়া যায়। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উত্তরে পূর্ণিয়া জেলার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার গণ্ডি আরও একটু বাড়াইয়া মালদহের সীমানার সঙ্গে সোজা-সুজি যুক্ত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সংযোগ-সূত্রের এই বিন্যাস সাধনের কাজটি ভারত সরকারকেই করিতে হইবে, উভয় রাজ্যের পারস্পরিক আলোচনার সূত্রে এ সম্বন্ধে আপস-মীমাংসার বরাত দেওয়া সংগত হইবে না, কারণ সেভাবে সমস্যার যে সমাধান হইবে না, ইতঃপূর্বে সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে সজাগ রাখিবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় আইনটি যখন উত্থাপিত হইবে, তখন এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

বালী ব্রিজের নূতন নামকরণ

বালী উইলিংডন ব্রীজের নাম পরিবর্তন করিয়া বিবেকানন্দ সেতু এই নামকরণ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অল্পদিনের মধ্যেই নব নামকরণের এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সেতুপথটি একদিকে দক্ষিণেশ্বর, অপরদিকে বেলুড়—এই দুইটি স্থানকে সংযুক্ত করিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত এই দুইটি স্থানই আধুনিক ভারতের পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রস্তাবিত নামকরণের দ্বারা বাঙলার ঐতিহ্যের গৌরব উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইবে, সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের নবজীবনের ক্ষেত্রে বাঙলার অবদানও এতদ্দ্বারা বর্ধিত হইবে। ফলত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মানবতার যে মহান আদর্শ বাঙলার প্রাণশক্তিকে প্রচণ্ড বীর্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার মূলে দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড়ের তীর্থ মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির মূলীভূত এই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার কর্তব্য জাতির উপর আজ ন্যস্ত রহিয়াছে। সেতুপথের এই নূতন নামকরণ সেই প্রয়োজন সাধনে সাহায্য করিবে। আমরা এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি।

অপরিচ্ছন্ন কলিকাতা

কলিকাতার খ্যাতি অনেকদিন হইতে আছে। সম্প্রতি এই শহর অপরিচ্ছন্নতার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিতে চলিয়াছে। এই গৌরব কাহার প্রাপ্য, পৌরসভার কি? সভার কমিশনার শ্রীবি কে সেন সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পৌরসভার সদস্যদের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে অনেক কৈফিয়ৎ উপস্থিত করা হইয়াছে। সে সুযোগ অবশ্যই আছে। পৌরসভার উপযুক্ত অর্থের অভাব, ইহা প্রধান কৈফিয়ৎ। এতদ্ব্যতীত ভারত বিভাগের পর কলিকাতা শহরের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ছাড়া শহরবাসীদের পৌর-দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবও শহরের অপরিচ্ছন্নতার অন্যতম কারণ। এসব সত্ত্বেও পৌরসভার এই সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। ফলত পৌরসভার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায়িত্ব প্রতিপালনে যদি আন্তরিকতাসম্পন্ন হইতেন, তবে ঐসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পরিচ্ছন্নতার দিক হইতে শহরের অনেকটা উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা এই সম্পর্কে একান্তই উদাসীন এবং নিজেদের পদ, প্রতিষ্ঠা বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহারা অধিক ব্যস্ত। পৌরসভার পরিচালন-বিভাগ অযোগ্য এবং যেসব বিভাগের দ্বারা শাসন-কার্য পরিচালিত হয়, সেগুলি দুরন্তরকমে দুর্নীতির প্রভাবে কলুষিত। ইহার ফলে অনর্থক অপব্যয়ে করদাতাদের অর্থ উড়িয়া যায়, অন্য কথায় তদ্দ্বারা অসৎ ব্যক্তিদের উদর পূর্তি সাধিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় শহরবাসীদের উপর দোষ দেওয়া নিতান্তই নিরর্থক; কারণ তাহারা যদি পৌর-দায়িত্বসম্পন্নও হইত, তথাপি শহরের অপরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। বাস্তবিকপক্ষে নেতারা ঝাঁটা হাতে বস্তির পাশে দাঁড়াইয়া নিজেদের ছবি তুলিয়া কিংবা সংবাদপত্রে সেই সব ছবি ছাপাইয়া যেমন শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে পারেন না, সেইরূপ শহরবাসীদের চেষ্টাতেও এত বড় একটা শহরের পরিচ্ছন্নতা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যাঁহাদের উপর পৌর-কর্তৃত্ব পরিচালনার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের নৈতিক বুদ্ধি কর্তব্য-পালনের ক্ষেত্রে জাগ্রত থাকাই প্রথমে প্রয়োজন।

বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা

সম্প্রতি বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নটির সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনদিনব্যাপী আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশে বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধিকে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা এই আশা পোষণ করেন যে, শীঘ্রই বাজারে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইবে। তবে মিলসমূহ যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে অধিকতর বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারে, তজ্জন্য বর্তমানের তুলনায় কিছু পরিমাণ অধিক বস্ত্র উৎপন্ন করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। মন্ত্রিসভা নাকি ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, মিলের উৎপন্ন বস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর ১০০ কোটি গজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানির জন্য মজুত রাখিতে হইবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে এই যে, বিদেশে রপ্তানির জন্য মজুত বস্ত্রের পরিমাণ যদি এইরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে মিলের উৎপাদনের পরিমাণ যদি দেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত না হয়, তবে দেশে বস্ত্রের অভাব স্বভাবতই দেখা দিবে। বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানি করিবার প্রয়োজন না আছে আমরা এমন কথা বলি না, কিন্তু দেশে যাহাতে বস্ত্রসংকট দেখা না দেয় এবং বস্ত্রের বাজারে ফাটকাবাজী চালাইবার সুবিধা না থাকে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট থাকা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে চোরাবাজারী কারবার যে দস্তুরমত চলিতেছে, এমন সন্দেহ করিবার যথেষ্টই কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষে নিত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি অবিলম্বে তাহার প্রতিকার না হয়, তবে নানারূপ করভারপ্রপীড়িত দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা দুর্বহ হইয়া উঠিবে।

॥ কবি সত্যেন্দ্রনাথ ॥

মঞ্জুলা মিত্র

বাঙলাদেশ আর কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারুক আর নাই পারুক কিন্তু কবি নিয়ে সে যথার্থ গৌরব করতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আর আধুনিককাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন এমন ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেই দেখা যায় না। প্রাচীনযুগের কথা ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র রবীন্দ্র যুগ থেকেই আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তখন বাঙলাদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির সংখ্যা যে কোনো দেশেরই ঈর্ষার বস্তু ছিল। এই যুগের কবিদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু বাঙালীজাতির বিস্মৃতির আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই হোক, অথবা রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বলতার জন্যই হোক, সত্যেন্দ্রনাথকে জানবার বা বুঝবার চেষ্টা কেউ করেননি। সম্প্রতি অবশ্য শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র এ বিষয়ে আলোকপাত করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। কিন্তু তবু বলা যায়, ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে আরও আলোচনা-সমালোচনা ও বিশ্লেষণ হওয়া উচিত ছিল। আগামী ১০ই আষাঢ় কবির মৃত্যু দিবস। সেই উপলক্ষে তাঁর ব্যক্তিগতজীবন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

কবির ব্যক্তিগতজীবনের বহুদিক তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে ছিল তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের অসাধারণ মনন-শীলতা। তাঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙলার বরেণ্য মনীষী। তাঁর মাতৃকুলের দিক থেকে তাঁর মাতা মহামায়া দেবী গ্রামের মেয়ে হলেও যথেষ্ট শিক্ষিতা, তেজস্বিনী এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। অসাধারণ সত্যানুরাগ, সংযম ও তীব্র আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি গুণ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর মাতুল শ্রীকালীচরণ মিত্র মহাশয়ের আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ি ছিল কলকাতার মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। শ্রীকালীচরণ মিত্র মহাশয় কিছুদিন পরে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর বোনের কাছে অর্থাৎ মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত বাস করেন এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও বিশ্বসাহিত্য-পর্বের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এবং একথা বলা যায় যে, সত্যেন্দ্র-নাথের কবিখ্যাতির অন্তরালে তাঁর মামার দান নিতান্ত সামান্য নয়।

বিদ্যালয়ের পড়াশুনা অর্থাৎ Academic Career বলতে যা বোঝায় সেদিকে সত্যেন্দ্র-নাথ বিশেষ কুশলতা দেখাতে পারেননি। তিনি জেনারেল এ্যাসেম্বলীতে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। বিদ্যালয়ে জীবনের গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে তিনি আনন্দ পেতেন না এবং যে বিষয় তাঁর ভালো লাগত না তা কখনই এমনকি পরীক্ষার ভয়েও পড়তেন না—এইটিই ছিল তাঁর বিফলতার কারণ।

সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীমতী কনকলতা দেবীর সঙ্গে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বিবাহিতজীবনে সুখী হতে পারেননি। তাঁর অসাধারণ আত্ম-সংযম ও সহনশীলতার বলে তিনি নীরবে আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচনাশক্তি সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্র-কুমার রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা সাময়িক পত্র-

পত্রিকায় অনেক লিখেছেন, কাজেই তার পুনরুল্লেখ করব না।

সত্যেন্দ্রনাথের পাঠতৃষ্ণা প্রবল ছিল। তাঁর পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের জন্য তাঁকে বিব্রত হতে হয়নি। তিনি প্রায় সমস্ত দিনই নিজের লাইব্রেরী ঘরে পড়াশুনা নিয়ে মগ্ন থাকতেন।.

অতিরিক্ত পড়াশুনার ফলে শীঘ্রই তাঁর গুরুতর চক্ষুরোগের সূত্রপাত হোলো। সত্যেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না, ফলে তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমশ তাঁর চোখ এত খারাপ হয়ে যায় যে, তাঁকে পড়াশুনা করা থেকে নিরস্ত হতে হল। এমনকি নিজের বইয়ের প্রুফ পর্যন্ত তিনি অন্যকে দিয়ে দেখিয়ে নিতেন। সাধারণত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতেন।

ক্রমশ তাঁর চোখের রোগ আরও বেড়ে উঠল। এই সঙ্গে এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল—তাঁর পৃষ্ঠদেশে কার্বাঙ্কল হল। তৎকালীন প্রায় সকল খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ্ কবির চিকিৎসা করেছিলেন। শারীরিক যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠলেও কবি তা নীরবে সহ্য করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর চলে যাবার দিন নিকটবর্তী হয়েছে। তাই একদিন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, "সত্যেন্দ্রবাবু, আপনার কী কষ্ট হচ্ছে?" তার উত্তরে কবি বললেন, "এই থাকাটাই।"

ক্রমশই অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হয়ে এলো। উপরে তাঁর শোবার ঘরে কবির মা মহামায়া দেবী ও আমার বাবা (কবির মামাতো ভাই) সেবাশুশ্রূষা করছেন আর নীচের ঘরে সমস্ত ডাক্তারদের পরামর্শসভা চলছে। কেউ বা বলছেন, অপারেশান করা হোক, কারুর মতে অপারেশান করলেই বিপদ ঘটবে, হোমিওপ্যাথ বলছেন, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা চলতে থাকুক।

কবির এই অবস্থায় তাঁর কাছে সকলকে আসতে দেওয়া হোতো না। কবিও সকলের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর মা আর আমার বাবা কবির কাছে থাকতেন। বন্ধুদের মধ্যে অবারিত দ্বার ছিল চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সেবাশুশ্রূষা যতই চলতে থাকুক এবং চিকিৎসকরা তাঁকে যতই আশ্বাস দিন না কেন, কবি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর যাবার দিন নিকটবর্তী হয়েছে। তাঁর একমাত্র আনন্দ ছিল জ্ঞানানুশীলনে, কিন্তু রোগের প্রাবল্যে সে আনন্দলাভ থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও, তিনি নীরবে এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কবির মন ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠেছিলো। তাঁর মনের আনন্দ-বেদনা সব তিনি তাঁরই পায়ে উৎসর্গ করে দিতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যু যখন তার করালছায়া মেলে শয্যাপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পঙ্গু কবি তখনও একান্তভাবেই পরমপিতার প্রতি অসীম নির্ভরতা রেখেছেন,

জাগিয়ে রেখো একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখ আমার 'পরে,—
চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো
দু' চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—
গহন আঁধার অকাল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা,—
জ্বালিয়ে রেখ তোমার প্রেমের শিখা।

মৃত্যুশয্যায় কবি তাঁর উপাস্যের যেন স্নেহস্পর্শ পাচ্ছেন। তাই পরম প্রশান্তির সঙ্গে বলেছেন,

এমনি যদি গো কাছে কাছে তুমি থাকো
অভয় হস্ত মস্তকে যদি রাখো
কিছু আমি ভাবিনাক।

তাঁকে পাবার জন্যে কবি তাঁর সব দিতে প্রস্তুত। তুচ্ছ দৃষ্টিশক্তি যদি যায় তো যাক্, তার বদলে তিনি যা পাচ্ছেন সে যে অনন্তকালের সম্পদ:—

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখো না বাকি
উন্মেষ চিতে ডাকি।

যদি মধ্যপথে ছলনা ঘাটে, আসে আত্মপরীক্ষা, তাতেও কবি উত্তীর্ণ হবেন বিনাবাধায়, এ বিশ্বাস তাঁর আছে:—

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু নয়ন
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন
জীবন-সাধন-ধন।

তাই তিনি এমন নির্ভরতার সঙ্গে বলতে পেরেছেন,

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

এমন আকুল আত্মনিবেদন, এমনভাবে নির্ভরতার সঙ্গে উপাস্যকে প্রার্থনা—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও কাব্যে সচরাচর দেখা যায় না।

* * *

আষাঢ়ের স্তব্ধ বাদল সন্ধ্যা। শোবার ঘরে কবি শুয়ে আছেন। এই সময়ে কবিকে একপাশে ফিরিয়ে শোয়ান হতো, যাতে পীঠের কার্বাঙ্কলে কোনরকম বেদনা না লাগে। মাথার কাছে আমার বাবা বসে আছেন। মা কিছুক্ষণের জন্য কার্যান্তরে গেছেন। কবি নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছেন।

সকলেরই মন অজানা আশঙ্কায় পূর্ণ। নিচে যথারীতি ডাক্তাররা বসে আছেন। বন্ধুরাও কেউ কেউ এসে অপেক্ষা করছেন নিচে।

অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এসেছে। ঘরের কোণে মৃদু-ক্ষীণ আলো জ্বলছে। সহসা দরজার সামনে কারা এসে পড়লেন। আচ্ছন্নের মত কবি শুয়ে, হঠাৎ চোখ পড়ল দরজার দিকে। হঠাৎ চমকে উঠে চীৎকার করে উঠলেন, "ও কে? কে? ও কে?" আগন্তুকবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে রইলেন। উত্তেজনাবশে কবি উঠে বসেছিলেন, অপরিসীম ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লেন সোজা হয়ে। কেউ ধরে ফেলবার আগেই শোওয়ায় কার্বাঙ্কলের উপরে বিছানার ঘর্ষণ লাগল। কবি হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।——কবির অসুখের সংবাদ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজায় জামাইকে দেখতে।

নিচেই ডাক্তাররা ছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ উপরে এলেন, কিন্তু তার পূর্বেই বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

সকলের সমস্ত চেষ্টা, সকল সেবাশুশ্রূষা ব্যর্থ করে দিয়ে কবি চলে গেলেন এ জগৎ ছেড়ে। ডাক্তাররা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন মা ছুটে এসে ছেলের দেহ কোলে নিলেন। আমার বাবাকে বললেন, "ডাক্তাররা জানে না, দেখছিস্ না গা এখনও গরম রয়েছে! তুই হাওয়া দে জোরে জোরে। এক্ষুণি ও আবার "মা" বলে ডাকবে।" মায়ের নাম ছিল মহামায়া, জগৎসংসারে মায়া এমনিই।

মুহূর্তে মধ্যে শোক সংবাদ শহরে ছড়িয়ে গেল। কবির বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা সকলে এসে জড়ো হলেন কবিকে শেষবারের মত দেখবার জন্যে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এসে কবিকে বিদায়-সজ্জায় সজ্জিত করলেন। মায়ের কোল থেকে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। মর্ত্যলোকের খেলা সাঙ্গ করে কবি চললেন অন্যদেশে। স্থূল দৃষ্টিশক্তির বাধা আর রইল না, আনন্দলোকের আনন্দস্রোতে কবির আত্মা বিলীন হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বন্ধুর উদ্দেশ্যে অমর শোকগাথা রচনা করলেন,

"আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ অন্ধকারে,
মৃত্যু তরঙ্গিণীধারা মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো
ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয় শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দ গানে? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে
সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।"

সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রমাধুর্য অতুলনীয় ছিল। তাঁর সুমধুর বাক্যালাপ, সুসংযত ব্যবহারের দ্বারা সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর উদারতা ছিল যথেষ্ট। তাঁর মামা তাঁর বাড়িতে দীর্ঘদিন ছিলেন কিন্তু একোনা তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। মামাতো ভাইবোনদের তিনি যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমার বাবা ও বড় পিসিমা তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। আমার বাবার সঙ্গে একত্রে বসে না খেলে তাঁর তৃপ্তি হোতো না।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি ছিল অপরিসীম। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁর অজস্র বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। মা হয়তো উপবাস করে রয়েছেন, এমন সময়ে বন্ধুরা এসে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু ফরসা কাপড় বার করবার জন্যে মাকে ব্যস্ত করতে তাঁর মন চাইত না। এই কারণে অনেক সময়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও তাঁর যাওয়া হয়ে উঠত না।

আশ্চর্য গুণগ্রাহিতার ক্ষমতা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে বাঙলাদেশের পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানান। এই সময়ে তিনি প্রায়ই বন্ধু চারুবাবুকে বলতেন, "রবিবাবু যদি এইবার নোবেল প্রাইজ পান তো বেশ হয়।" রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার অল্পদিন পরেই তিনি সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বর্ধনা জানিয়ে বাঙলাদেশের সম্মানরক্ষা করেছিলেন।

গুণগ্রাহিতার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকার দরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বিরূপ সমালোচনা করতেও পশ্চাদপদ হতেন না। যা তিনি সত্য, সুন্দর বলে জানতেন তা তিনি সসম্মানে স্বীকার করে নিতেন। অসুন্দরকে কিছুতেই তিনি মেনে নিতেন না। তাঁর এই সমালোচনার হাত থেকে তাঁর বন্ধুরাও মুক্তি পেতেন না। তাঁর এই স্পষ্টবাদিতা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে একবার চারুবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশংসা করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ও যে সত্যেন্দ্র!"

সত্যেন্দ্রনাথের পাঠস্পৃহা প্রবল ছিল। তাঁর বিরাট পাঠাগারের অজস্র পুস্তকরাশি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। কতরকম বই যে তাঁর পাঠাগারে থাকত তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত বই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর ব্যবহার কত সুমধুর, কত কবিত্বমণ্ডিত ছিল। তাঁর চরিত্রে একদিকে শান্তিপ্রিয়তা, অপরদিকে সাহস, মিষ্টভাষিতা এবং স্পষ্টবাদিতা, গাম্ভীর্য এবং পরিহাসপ্রিয়তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের দান নিতান্ত সামান্য নয়। তৎসত্ত্বেও তাঁর কবিতা সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করে বাঙলাদেশ তাঁর প্রকৃত মূল্য দেয়নি—এটি গভীর পরিতাপের বিষয়।

অফুরন্ত

গোবিন্দ চক্রবর্তী

হাজার যুদ্ধের পর
শেষ হ'লে সভ্যতার অগণিত উত্থান-পতন
ইতিহাস তবু স্তব্ধ, সুষুপ্তি-মগন
জমাট রাত্রির মত;
নিমেষের তরে
শব্দের উত্তুঙ্গ ঢেউয়ে
শুধু বুঝি উচ্চকিত হয় একবার—
ডুবে যায় আরবার স্তব্ধতার নিথর সাগরে।

হাজার বছর পর
তবু থাকে সহস্রেক আরেক বছর ঃ
আরবের উপন্যাসে
বিস্ময়ের সহস্রেক রজনী যেমন—
প্রাচীন পদ্ধতি চিরন্তন
থাকে এক—শৃঙ্খলার সুন্দর শৃঙ্খলে
ধরণী শাসন করে মুগ্ধ কুতূহলে।

বছর-বছর
বৈশাখের সূর্য আনে
সে আশ্চর্য নোতুন খবর;
চৈত্রের চিতার থেকে টকটকে লাল
লাফ দিয়ে উঠে আসে আনন্দিত একটি সকাল,

পুরানো শাখায় জাগে নোতুন পাতার কলরব ঃ
মুকুলিত, মঞ্জরিত
দিকে-দিকে স্বপ্ন-ভালবাসার উৎসব।

নোতুন অধ্যায় শুরু হয় ইতিহাসে।
ইতিহাস হাসে
মুখ টিপে বুঝি একবার
রক্ত দেখে মিছিলের পদযাত্রার;
তুলোর মতন তুলতুল
বানায় মাটির ঘর মোমের পুতুল—
আশার ময়ূরপঙ্খী নাও থরোথর
বন্দরে-বন্দরে ভিড়ে ওঠায় নোঙর।

সৃষ্টির নিটোল মৌচাক ঃ
মধু থাকে এতটুকু থাক বা না-থাক,
অন্তহীন পদধ্বনি দিকে-দিকে বাজে নিরন্তর
কত ঋতু, পাখাঝাপটা, মন্থর,
যেটুকু বদল হয়—শুধু কয় মুহূর্তের
মুমূর্ষু সে অবস্থার নাম—
কালপ্রহরীর অশ্ব উত্তাল-উদ্দাম
ছুটে চলে বাধাবন্ধ, বিরামবিহীন;
সহস্র বর্ষের শেষে তবু থাকে সহস্রেক
সূর্যঙ্করা নীল দিন, আরো নীল দিন।

পাখিপড়া

আরতি দাস

শুধু ভয়ে চুপ করে থাকি
তুমি জানো নাকি
মন নেই, মনে নেই তাই
দূরে সরে যাই।

তুমি ভাবো, সমাজ-চেতনা
এই ভয়, তা নয়ত কিছুতে যেত না
ভেঙে, সেই সুরে বাঁধা নীড়
আস্থায়ী আলাপে মগ্ন শান্তি সুনিবিড়।

নয়ত ভেবেছো তুমি—এই চিরন্তন
কালিন্দীর কালো জলে স্মৃতি রোমন্থন,

মেয়েরা এতেই খুশী থাকে
দ্বারকায় মথুরায় সেতু বেঁধে রাখে
মনে মনে, পার হয় বিরহের সেতু
করুণা অহেতু।

তুমিত জান না কী যে ভয়,
যদি সব মিথ্যে হয়,
যদি তারও পর
শূন্য মনে ঘুরি শুধু এঘর ওঘর
আর শুধু মনে মনে বলি,
'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'

মনে এলো

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমার হঠাৎ মনে হোলো এ-দেশে কোনো চালাক হাতুড়ে যদি মাত্র পেটেন্ট ওষুধের মোড়কগুলি পড়েন তা হলেই তিনি এক্সপার্ট নাম কিনে বত্রিশ টাকা ফী আদায় করতে পারেন। ক্যাপিটালিজমের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এই পেটেন্ট ওষুধের বিক্রীতে ও ব্যবহারে। ক্যাপিটালিজম বলতে আমরা ভাবি লোহা আর কাপড়ের কারখানা। কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে ক্যাপিটালিজম হাজারগুণে বেশী মারাত্মক। পেটেন্ট ওষুধ আর ইনজেকশন না দিলে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হতে পারে না, রোগীদের পছন্দ হয় না, তাঁদের দেহ ও মন এমন হয়েছে যে তা না হলে রোগও সারে না। মন পর্যন্ত দুষ্ট হয়েছে আমাদের। একেবারে বাবুনে শয়তানী।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। বরাবরই দুঃখকষ্টের সময় পড়লে, লিখলে ভুলে থাকি। আগে পড়লেই চলত, এখন কিন্তু কাগজ-কলম চাই। লিখি আর না লিখি আঁচড় কাটি। খুব কম লেখকই যথার্থ সান্ত্বনা দিতে কিংবা যন্ত্রণার উপশম করতে পারে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যখন নিজস্ব বস্তু তখন তার উপশম নিজের হাতে—প্রকৃতপক্ষে, অর্থাৎ হাতের কাজে। মোক্ষ সাধনার একটা পাকা ভিত্তি দৈহিক সক্রিয়তা। বিধবাদের রান্না করা, ঘর পোঁছা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজগুলি কেবল ফিউডাল পরিবারের কর্তার নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নয়। অকুপেশনাল থেরাপিতে কাজ হতে দেখেছি।

অন্ততঃ এই হিসেবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের শ্রমদানে আমি অবিশ্বাসী নই। একবার প্রায় বিশ্বাসী হয়েছিলাম। শ্রমদান সপ্তাহে জন বার-চোদ্দ ছাত্র সমেত কোদাল দিয়ে একটা নালা চাঁচলাম। রাজ্যপাল আর মন্ত্রী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ হল কি! নালা চাঁচার পর কোদাল হাতে ছবি তোলা, তারপর কিছু জলযোগ, তাতে বেশী খরচ হয় নি। কিন্তু যে মাটি চেঁচে খানার ধারে রেখেছিলাম, অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা রেখেছিল, সব এক পশলা বৃষ্টিতে যথাস্থানে ধুয়ে এল। আমার কপালে বিশ্বাস টেঁকে না—বিশ্বাস করেছি কি মরেছি। তাই জোর, 'মনে হয়' বলি, 'মনে এলো' লিখি।

* * *

এই প্যারাগ্রাফটি লিখে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

What are the basic categories of the Sociology of knowledge? Concepts represent interpretative responses to given situations. We are actually dealing with four variables: (1) the situation, such as a community, a nation, a revolution, or a class, which we attempt to interpret, when we respond to it; (2) the individual who is peculiarly involved in the situation and accordingly forms an image of it. Such involvements may include occupational aims, political aspirations, Kinship ties, economic rivalries and alliances, in short, a multitude of overlapping group attachments; (3) the imagery which individuals or groups adopt; (4) finally, the audience to which the image is conveyed, including its peculiar understandings, symbols to which it attaches meanings, and a vocabulary to which it responds. The four factors of ideation must be considered as inter-dependent variables.—Karl Mannheim—Essays in the Sociology of Culture. Introduction p. 2.

২৯।৪।৫৬

আজকার প্রধান খবর যদি লিখতাম, তবে ডায়েরী হোতো। অবশ্য মনের ওপর খবরের ধাক্কার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, তার সম্বন্ধে মন্তব্য সবই ডায়েরীতে চলে। আমি ঠিক ডায়েরী লিখছি না, যদিও ঐ ধরনের রচনার প্রতি আমার একটু মোহ আছে।

'দাদার ডায়েরী' দিয়েই আমার হাতে খড়ি। দেশী বিদেশী বহু ডায়েরী পড়েছি, পীপস্ থেকে জীদ্, মার্সেল পর্যন্ত। এমিয়েল্-এর জার্নাল আমি সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের কৃপায় পড়তে পাই। মান্ডালে জেলে অন্তরীন বাসের সময় ভারত সরকার তাঁকে খানকয়েক মূল্যবান বই পড়তে বাধা দেয়নি। (গোটের Poetry and Truth, Conversations with Eckerman, এবং কার্লাইলের Past and Present প্রভৃতিও তাঁর কাছে ছিল, মান্ডালে থেকে নিয়ে এসেছিলেন।) এমিএল খুব ভালো লেগেছিল মনে আছে। তার ওপর আর্নল্ড-এর Essays in Criticism-এ যখন সুখ্যাতি পড়লাম তখন থেকে এই ডায়েরী পড়বার ও লেখবার ঝোঁক এল। কেইসারলিঙ ও রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার রচনা একটু বেশী দার্শনিক। তবু চমৎকার। নিছক রিপোর্ট ও দার্শনিক ডায়েরীর মাঝামাঝি অনেকখানি স্থান রয়েছে—আমি তারই মধ্যে ঘোরাফেরা করি।

দেহ-মন ঐ টাইম-স্পেসের মতনই ব্যাপার —যমজ গোছের, ডিপথঙ বলা চলে। খানিক দূর পর্যন্ত মন শক্ত করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু দেহকে করায়ত্ত করব যে ভাবে, সে দাম্ভিক অহংকারী। তা যদি সম্ভব হোতো তবে সাধুদের কর্কট রোগ, বহুমূত্র হোতো না। শোনা যায় পরমহংস-দেবের নিদ্রাবস্থায় তাঁর গায়ে যদি কেউ টাকা পয়সা ছোঁয়াত অমনি গায়ের সে জায়গাটা কুঁচকে যেত। অথচ তাঁরও ক্যানসার হোলো, তাইতে তিনি মারা গেলেন। অত বড় যোগীর যদি ঐ অবস্থা হয় তবে চলতি দেহ ও মনোবিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞাকেই অদল-বদল করতে হয়। আমার ধারণা 'সোমা'ই ভিত্তি, সাইকী তার ওপর রঙ চড়ান। কাঁচা বুনিয়াদের ওপর স্কাইস্ক্রেপার তোলা শক্ত। শুনেছি রাইট সাহেব থল-থলে কাদার ওপর ইমারৎ খাড়া করেছিলেন টোকিওতে। সেই রকম হয়ত দু একজন যোগী ঋষি কাঁচা দেহের ওপর আত্মজ্ঞান খাড়া করতে পারেন। এটা কিন্তু আত্মজ্ঞানের বাইরের ব্যাপার। আত্মজ্ঞানে মৃত্যুভয় হয়ত গেল। আরো অনেক কিছু হোলো, কিন্তু যে যন্ত্রণায় মৃত্যু অনিবার্য তার বেলা আত্মজ্ঞান অকর্মা হিন্দু খৃষ্টান আদর্শবাদ—এ একপ্রকার আদর্শবাদ ছাড়া আর কি?—পৃথিবীর জীবনের সংসারের অনেক নিরেট সত্যকে বুঝতে দেয়নি। অবশ্য সেজন্য তাকে ত্যাগ করাও যায় না। এ যুগের হিন্দু ভারতবাসীর এই এক মানসিক দ্বন্দ্ব!

মানুষ বোধ হয় শান্তিস্থিতির জন্য একটা সিদ্ধান্ত চায়। ভূত, ভগবান, অবতার, গান্ধী, এরিস্টটল, একোয়াইনাস, পোপ, সর্দার, ডিকটেটার, আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, 'ইজম্'—একটা না একটা তৈরী সিদ্ধান্ত পেলে অনেক আরাম। উইলিয়ম জেমস লেকচার দেবার সময় আবোল-তাবোল বকে গেলেন, শ্রোতৃবৃন্দের একজন শেষে প্রশ্ন করলে, 'তা হলে স্যার, আপনার সিদ্ধান্তটি কি?' জেমস উত্তর দিলেন, 'বিশ্বের কি অন্তিমকাল এসেছে যে আমাকে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতেই হবে?' এর মোদ্দা কথাটা হোলো এই—সত্তা একটা প্রোসেস—স্নায়ু নয়, substance নয়। এই ভূত-বিজ্ঞানের আদিম প্রতিজ্ঞা। বুঝলাম—প্রোসেস মানে ত চলা? চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি—কিন্তু কতদিন মানুষে চরবে? শৃঙ্খলে বাঁধা গ্যালি স্লেভের অবস্থা মানুষের। সেও স্থির নয়, স্থানু নয়, কিন্তু কার নৌকো কে চালায়! এলেস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের ঘূরপাক খাওয়ার মতন —কাফকার গল্পের.... মতন।

৩০।৪।৫৬

খাশা বন্দোবস্ত ডাক্তারদের। কথাবার্তা বন্ধ, চা-সিগারেট বন্ধ, বিদেশ যেতে হবে অস্ত্রোপচারের জন্য। মা বলতেন দশ বার বছর পর্যন্ত নিরীহ ছিলাম—সত্যেনও (বোস) বলে ঐ বয়সে ভীষণ বাচাল ছিলাম। হয়ত ছিলাম। তাহলেও পঞ্চাশ বছর কথা কইছি, অনর্গল, দিনে দশ বার ঘণ্টা নিশ্চয়, স্বপ্নে বক্তৃতা দেওয়াটা ছেড়েই দিলাম। আর সিগারেট-চা-কফির ইয়ত্তা নেই। হিসেব এই রকম, দিনে পঁচিশটা সিগারেট চল্লিশ বছর, তিন কেৎলী চা—পেয়ালা হিসেবে যারা খায় তারা ডিলেটান্ট—প্রায় ত্রিশ বৎসর, আর কফি দু কেৎলী প্রায় পনের বছর। অতএব আফশোষ নেই। ভগবানের রাজ্যে ন্যায় বিচার নেই কে বলে! কিন্তু বেচারা লপচু কোম্পানী আর কফি হাউস কি দোষ করলো? এটা বোধ হয় চা-কফি বাগানের শ্রমিকদের অভিশাপ।

যে মানুষ ট্রাউজারসের ক্রীজ, ধুতির কোঁচা, পিরাণের রঙ, কলমের কালি, লেখবার কাগজ, বই সাজান প্রভৃতিতে ঈষৎ অদল-বদল হলে রসাতল করে সে মানুষকে সংকটের সময় পাথর হয়ে যেতে দেখেছি। আবার শক্ত সামর্থ লোক মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় কেঁদে আকুল। আমার ধারণা ছোটখাট ব্যাপারে নার্ভাস হওয়া ভালো, শক্তি সঞ্চিত থাকে বড় ব্যাপারের জন্য। যদি বড় ব্যাপার না ঘটে তবে অবশ্য সবই বরবাদ। কিন্তু সত্যই তা কি? Fussiness-এর একটা সামাজিক মূল্য আছে। নতুন বৌকে নিয়ে fuss না করলে বেচারীর অভিমান হয় না? বুড়ি ঠাকুমা মারা যাচ্ছেন, অর্থাৎ গিয়েও যাচ্ছেন না—এক্ষেত্রে নাতি নাত বৌদের fuss করা ছাড়া আর কি কর্তব্য বুঝি না। বড় গিন্নীর চাবি হারিয়েছে, ছোট গিন্নীর নেল-পালিশ পাওয়া যাচ্ছে না, ওধারে মেজ গিন্নীর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর মেজ গিন্নীর অম্বলশূল চাগাব চাগাব করছে। নাতির জন্য মাগুর মাছ আসে নি এ সব নিয়ে চেঁচামেচি না হলে সংসার কিসের? Fuss কোরো না, Worry কোরো না উপদেশ ছেড়ে আমেরিকান পত্রিকা খালাস—কিন্তু না করলে সমাজ চলে না, পরিবার রাখা যায় না, সংকীর্ণ অর্থে ত' অসম্ভব। না, না, ওয়ারি, ফাস, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক বস্তু। শ্রাদ্ধবাড়ি না করলেই হোলো—অর্থাভাবে কেউই যা করছে! তার ওপর ঘুমের ওষুধ ত রয়েইছে। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে কি fussটাই না করলেন! কিন্তু না করলে রামায়ণ ও মেঘনাদ বধ লেখা হোতো না, আর রামরাজ্য পরিষদও তৈরী হোতো না।

এই সব নানা কারণেই পার্শী থিয়েটারের পৌরাণিক ড্রামার মধ্যে একটা কমিক থাকত। ড্রামাতে আনন্দ, কিন্তু কমিকে মজা। সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডী নেই, তার কারণ তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন। রসতত্ত্ব নিয়ে অত fuss না করলে নিশ্চয় বহু অপরূপ ট্র্যাজেডী ও নাটক লিখে ফেলতেন।

আজকাল অর্থশাস্ত্রীরা দুঃস্থ ব্যাপারে fuss করছেন বলেই না উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির হার তাঁদের অলক্ষিতে অতটা বেড়ে গেল? আমার ত' মনে হয় fuss-এর জন্যই আমরা বেঁচে আছি, নচেৎ সব ক্যালভিনিস্ট হয়ে যেতাম।

সে যাই হোক, কথা বন্ধ ত' মনও বন্ধ হোক। যা নিয়ে কথা কওয়া যায় না, আড্ডা আসর জমান যায় না, তার অস্তিত্ব মন স্বীকার করে না। রহস্য আছেন কারণ তাঁকে নিয়ে মজলিস হয়—প্রমাণ উপনিষদ আর ঋষিদের সভা। আর ভগবান ত রয়েইছেন, প্রমাণ ধর্মব্যাখ্যা, কীর্তন ইত্যাদি। ডাক্তারের উপদেশগুলোকে গম্ভীরভাবে নিতে পারছি না। ইতি—ধূর্জটিপ্রসাদ

[সম্প্রতি জুরিখ্-এ শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গলায় অস্ত্রোপচার হওয়ায় সেখানকার হাসপাতালে তিনি আছেন, ক্রমশই আরোগ্য লাভ করছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত 'মনে এলো' প্রকাশ বন্ধ রাখতে হল বলে আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক—দেশ]

ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনা

মার্কিনে চারি মাস : বিপিনচন্দ্র পাল : প্রকাশক : নারায়ণচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ, ৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। দাম দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ঠিক ভ্রমণ কাহিনী পর্যায়ের নয়, স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় যান নিউইয়র্কের জাতীয় মাদক নিবারণী সভার আমন্ত্রণে। বিভিন্ন স্থানে মাদক নিবারণী বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে প্রসঙ্গত ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সম্পর্কে তিনি মার্কিনে যে আলোচনা করেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী বহন করছে বলা চলে। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় ওখানেই এবং এই আলাপের সূচনা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক, তার কাহিনীও এতে আছে।

বিপিনচন্দ্র পালের রচনা ভাবসম্পদে মূল্যবান শুধু নয়, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আজও পাঠকের কাছে সমান আগ্রহের সৃষ্টি করবে। "মার্কিনে চারি মাস" বঙ্গবাণীতে ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ধারাবাহিক সেই নিবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে প্রকাশক পাঠকসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজনই হয়েছেন। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থটির ছাপা বাঁধাইও ভালো।

৪৪২।৫৫

রত্নের কথা

রত্ন—শ্রীজগদীশ সেন। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। সচিত্র ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

প্রত্যেকটি রত্ন কত প্রকারের হতে পারে, সেগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাদের রাসায়নিক গুণ এবং ব্যবহারবিধি, রত্ন আসল কি নকল তা ধরবার কৌশল, রত্ন সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদ—এই সমস্তই পুস্তকটিতে আছে। রত্ন সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচুর কৌতূহল। তবে অন্যান্য ভাষায় এবিষয়ে প্রকাশিত পুস্তক আছে। বাঙলা ভাষায় এই ধরনের পুস্তকের অভাব আলোচ্য পুস্তকটি বহুলাংশে দূর করেছে। এতে প্রামাণিক বিশদ গবেষণা আছে, সুতরাং এটি যে রত্ন ধারণকারী, রত্ন ব্যবসায়ী এবং জ্যোতিষীগণের বিশেষ উপকারে আসবে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। সাধারণ পাঠকগণও এই পুস্তক থেকে রত্ন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা করতে পেরে আনন্দ লাভ করবেন।

৬০০।৫৫

মুদ্রাতত্ত্ব

টাকাকড়ির কথা—নরেন্দ্রনাথ রায়। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। আট আনা।

মুদ্রাতত্ত্ববিষয়ক এই ছোট্ট বইখানি পড়ে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। সমাজের কোন্ প্রয়োজনে মুদ্রাব্যবস্থার উদ্ভব হল, তারপর নানান অবস্থার মধ্য দিয়ে রূপান্তর ঘটতে ঘটতে বর্তমানে তার চেহারা কেমন দাঁড়িয়েছে, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে মুদ্রামূল্যের কী সম্পর্ক, টাকা পয়সা কীভাবে তৈরি করা হয়, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে এ-বইয়ে খুব সরল এবং সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট; তা নয়তো এত প্রাঞ্জল করে বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন না। বইখানি ছাপা হয়েছে বড় বড় অক্ষরে এবং সমগ্র বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী ভাষায়। কিন্তু শুধু সদ্যোসাক্ষর বয়স্করাই নন, মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ-বই পড়ে উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বইখানির যদি যথোচিত সমাদর ঘটে, সেটা সুখের কথা হবে।

অনুবাদ

বৈদেহী। এমিল জোলা। অনুবাদক—বিমান গঙ্গোপাধ্যায়। আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, জবাকুসুম হাউস। দাম সাড়ে তিন টাকা।

এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস La Honte-র অনুবাদ। দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর পূর্ব-প্রণয়ীর অশরীরী উপস্থিতি কিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগিয়ে বিনষ্টি ঘটালো সংসারে—তারই নাটকীয় কাহিনী উপন্যাসের উপজীব্য। 'বৈদেহী' নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেল না। অনূদিত উপন্যাসটি যদি জনপ্রিয় হয়, তাহলে মূল কাহিনীর গুণে হবে। অনুবাদকের বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই।

বিদেশী বই-এর অনুবাদে 'আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্সের' যেমন উৎসাহ, ফলশ্রুতি তেমন নয়। অনুবাদক বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন বটে, কিন্তু বাঙলা ভাষার spiritটি এখনও তাঁর বোধগম্য হয়নি। ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কেও সহজ জ্ঞান তাঁর নেই মনে হয়, থাকলেও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর চূড়ান্ত অবহেলা লক্ষণীয়। 'গভীরতর লজ্জার সম্মুখসম্মীনে' (ভাষা ও বানান দুই-ই লক্ষণীয়), 'অধরের স্পর্শ নেমে এল', 'তিনজনে এক কলঙ্ক পঙ্কিল ত্রিকোণের সৃষ্টি করেছে', ক্লান্তবেপথু দেহ' (বেপথু শব্দের বিশেষরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়), 'তার মনে তখন' এমন অবস্থা যে কোন রকম কাজকর্মই ও'র ভাল লাগতো না' —এই ধরনের ভাষা ও ব্যাকরণগত ত্রুটি অমার্জনীয়। আর একটি মুদ্রাদোষের কথা না বলে পারা গেল না। সারা বইটির প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই ছত্রে ছত্রে 'ও'র' শব্দটির প্রয়োগ। একটা বাক্য উদ্ধার করছি—কিন্তু বলতে পারলো না ও। ও'র স্পর্শকাতর সম্মানবোধ ও'র দুর্নির্ণীত অহংকারকে জাগিয়ে দিল। ও'র মনে হলো উইলিয়াম জোর করে ও'র প্রকৃত অবস্থাটা চাপা দিতে চাইছে। এবং ইচ্ছে হোল হেসে......(পৃ ৭৪)। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি 'ও'র' এ প্রয়োজনীয় ঊর্ধ্বকমার বিচিত্র সমাবেশ। ৭০, ৭১, ৭২ পৃষ্ঠায় মোট একুশ-বাইশটি 'ও'র' খচিত হয়ে আছে।

ছাপায় ভুলেরও সীমা নেই। যেখানেই একটা যুক্তাক্ষর কিংবা ই-ঈ-কার বা উ-ঊকারের প্রয়োগ আছে, সেইখানেই অঘটন। পৃথিবীর একজন

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের এমন অবহেলা কেন? কেবল উৎসাহ থাকলে লাভ কি, যদি না তার সঙ্গে নিষ্ঠা ও যোগ্যতা যুক্ত থাকে?

৪৭।৫৬

মায়াবতী। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক। অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ১২। দাম ২৷৷৹ আনা।

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহান লেখক হলেও বাঙালী পাঠক পাঠিকার কাছে সম্ভবত খুব কমই পরিচিত। শিশির সেনগুপ্ত এবং জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী বাংলা সাহিত্যের এই দুই খ্যাতনামা অনুবাদক মরিয়াকের GALIGAI নামক উপন্যাসটির অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। শিল্পী হিসাবে মরিয়াকের রচনার সবচেয়ে বড় গুণ একটি অনিন্দনীয় সৌন্দর্যে উপনীত হওয়ার এবং যথার্থ সত্য জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া। ইনি অত্যন্ত সতর্ক এবং সংযমী শিল্পী। মায়াবতীর বিষয়বস্তু অভাবনীয় এমন কথা হয়ত অনেকে বলতে চাইবেন না, কিন্তু এর শিল্পকার্য মহান শিল্পীর হাতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকল। অনুবাদ সুন্দর হয়েছে। কিন্তু লেখকদ্বয়ের উচিত ছিল এক পাতার একটি ভূমিকা না লিখে মরিয়াক সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা। একপাতার ভূমিকাটিতে একটি বিষয় শুধু জানা যায় যে, ১৯৫২ সালে মরিয়াক নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তার বেশি কিছু বাস্তবিক ওই ভূমিকা থেকে জানবার উপায় নেই। পুনর্মুদ্রণের বেলায় আশা করি লেখকদ্বয় এই ত্রুটি শুধরে নেবেন।

৬১৩।৫৫

মানিব—ম্যাকসিম গর্কী; অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত। র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। প্রকাশক: বিমল মিত্র, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা আট আনা।

'Realism' শব্দটির যথার্থ ম্যাকসিম গর্কীর কাছে যে রকম অবিকৃত সৌষ্ঠবে প্রতিভাত হয়েছিল, এমন আর খুব অধিক সংখ্যক কথাশিল্পীর কাছে লক্ষ্য করা যায় নি। কোনো একজন বিদেশী সমালোচকের এ উক্তি তাই অনস্বীকার্য, 'যখন কেউ গর্কী পাঠ করেন তাঁর কাছে গর্কীর দেশ একটি অখণ্ড চিত্রে দেখা দেয়—কোনো বিশেষ রাশিয়ান নন, অগণ্য রাশিয়াবাসীর ছবি; প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব মুখমণ্ডল আছে কিন্তু সবাই মিলে অবিভাজ্য জনগণের একটি মুখচ্ছবি রচনা করেছে।' এবং এই জনগণের প্রত্যেক তাঁর কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপবিভঙ্গ নিয়েই ফুটেছে। 'মানিবের' অনুবাদ প'ড়ে সে কথা আবার নতুন ক'রে মনে হলো। এই অনুবাদ স্বচ্ছন্দ, অনাড়ষ্ট। তবু ভাষার প্রতি অনুবাদক যদি আরো একটু যত্ননিবেশ করতেন ভালো হতো। প্রচ্ছদশিল্পী কবি পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর মুক্তকণ্ঠ-প্রশংসা না ক'রে পারছি না। (৩৮।৫৬)

বার্ষিকী

নববর্ষ। বাংলা বার্ষিকী। সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা ৯। দাম দু টাকা।

'নববর্ষ' বাংলা বার্ষিকী হিসাবে পাঠক সাধারণের কাছে সুপরিচিত। পূর্বের সংখ্যাগুলির সহিত তুলনায় বর্তমান বৎসরের বার্ষিকীটিকে উৎকৃষ্ট বলিলে অন্যায় হইবে না। আলোচ্য সংখ্যায় বাঙলাদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, নাটিকা প্রভৃতির স্থান করা হইয়াছে। অন্নদাশংকর, ডাঃ কালিদাস নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত ও অন্যান্য বহু লেখক লেখিকার রচনাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তিনরঙা ছবি ও শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোকচিত্রগুলিও নববর্ষের সম্পদ। রচনা নির্বাচন, বার্ষিকীর অংগসজ্জা ও ছাপা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদকের সুরুচি জ্ঞান ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়। 'কেদারনাথের পটটির স্থান সম্মুখে ভাগেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

উপন্যাস

রাত পোহাল: সুধীররঞ্জন গুহ। প্রকাশক: সংস্কৃতি ভবন। ১১৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম: দু'টাকা আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৫০।

মামুলী উপন্যাস। যে ধরনের কাহিনী পড়ে পড়ে পাঠকের বিতৃষ্ণা জন্মেছে, সেই বিরক্তিকর কাহিনীমালায় 'রাত পোহাল' আর একটি অঙ্ক যুক্ত করেছে। সেই চিরকালীন প্রেমের ত্রিভুজে নায়ক-নায়িকা আর উপনায়কের হৃদয়দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন। সেই কুবেরকন্যার সঙ্গে দরিদ্র আদর্শবাদী নায়কের প্রেম। আর সেই প্রেমের জন্য নায়িকার সর্বস্ব ত্যাগ করে নায়ককে জীবনে বরণ। পরিশেষে 'ভিলেন' উপনায়কের রহস্যজনক মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে নির্বিকল্প সাধুত্বপ্রাপ্তি। 'রাত পোহাল' উপন্যাসখানিতে আশিস, মহুয়া ও অমলকে নিয়ে বাঙলা উপন্যাস-ধারার গড্ডলিকাটিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র। লেখকের ভাষা সুন্দর। প্রকাশভঙ্গি মোটামুটি। কিন্তু ঘটনা-বয়ন, চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত অপরিণত। রচনার উৎকর্ষের জন্য প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। ৫১৭।৫৫

ব্যাকুল বসন্ত—সুনীল ঘোষ। ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৫১-সি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম সাড়ে চার টাকা।

একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস। ঝরঝরে ভাষা এবং ঘটনার গতি, এই দুটি প্রাথমিক গুণ রয়েছে বইখানিতে, যার জন্য পাঠকমহলে এ উপন্যাস গৃহীত হবে বলে মনে হয়। একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে, রোগী ও নার্সদের জীবন নিয়ে বইখানি রচিত হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে ভিতর থেকে এই ধরনের অন্তরঙ্গ চিত্র-রচনা সম্ভব হয় না। ডাক্তার অরুণ ও নার্স দীপার প্রণয়কাহিনী প্রত্যাশিত হলেও একেবারে মামুলী প্রেম-আখ্যান নয়, এই টুকুই বৈশিষ্ট্য। লেখকের হাত মিষ্টি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসে তিনি যেন আরও অগ্রসর হন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, এ আশা করা অসংগত হবে না। 'ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট' এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষীয় কার্যকলাপের ঘোর-প্যাঁচ লেখক ফোটাতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। তাঁর দৃষ্টি বস্তুব বিষয়মুখী এবং প্রগতিশীল। রোমাণ্টিক আখ্যানের মোহ কাটিয়ে তিনি এবার ভিন্ন পথে জীবনবোধের পরিচয় দিন। মলাটের ঘোর লাল চোখে লাগে এবং দামটাও বেশি ঠেকে। নইলে মুদ্রণ ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। ৮৬।৫৬

শ্যামলীর স্বপ্ন—প্রবোধকুমার সান্যাল, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

প্রবৃত্তির দাবী ইন্দ্রিয়ের প্রতাপ,—স্খলন, অত্যাচার, অসংযম এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের নিশ্চয়তা, এই বোধ হয় জনপ্রিয় গল্পের আদর্শ। প্রবোধকুমার সান্যাল সাধ্যানুসারে সে আদর্শ রক্ষা করেছেন এবং পথিমধ্যে প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়তাড়নার বর্ণনার ফাঁকে-ফাঁকে 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' অবধি সংস্কৃতির কথা স্মরণ করেছেন। প্রবীণ লেখকের পটুত্বের বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। বইখানির পঞ্চম সংস্করণ থেকেই পাঠক সমাজে তাঁর সমাদরের কথা বোঝা যায়।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ প্রশংসার যোগ্য।

৬১১।৫৫

জ্যোতিষতত্ত্ব

আপনার অর্থ-ভাগ্য। শ্রী ভাস্কর। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা-৭। এক টাকা বারো আনা।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি দিক গ্রন্থকার এই পুস্তকে আলোচনা করেছেন। গ্রহ-প্রভাবে মানুষের অর্থ-ভাগ্য কি রকম হতে পারে, তা সেপক্ষকে নানা চক্র সন্নিবেশিত করে বলা হয়েছে। এই পুস্তকখানি মন দিয়ে পড়ে পাঠক তাঁর নিজের জন্মকুণ্ডলীচক্র দেখে পুস্তকে বর্ণিত নিয়মগুলি প্রয়োগ করে যাতে অর্থ-ভাগ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বইখানি লিখেছেন। সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্য লেখা এই বইখানি, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত যাঁরা হতে চান, তাঁদের জন্য নয়। বাজেই বোঝবার পক্ষে যাতে অসুবিধে না হয়, সেইজন্য প্রথম অধ্যায়ে জ্যোতিষের অ আ ক খ মানে মোটা কথাগুলি সরল ভাষায় বলা হয়েছে। শাস্ত্রের জটিল অংশ যতটা সম্ভব এড়িয়ে, সহজভাবে বইখানি রচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। নিয়মগুলি হাতে কলমে প্রয়োগ করবার নির্দেশ দিয়ে, নানা উদাহরণ দিয়ে তা আরো সহজ করা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই বইখানি চিত্তাকর্ষক-ভাবে লেখা।

বইখানির মুদ্রণ পরিপাটি এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। (২৯৩।৫৬)

জীবনী

জীবনী-সংগ্রহ—শ্রীআনন্দ। প্রকাশক—কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৬। মূল্য ২৲।

ভারতবর্ষের এক শত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জীবনী সংক্ষেপে একটি গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশ করে লেখক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এমন গ্রন্থের প্রয়োজন নিঃসংশয়ে অপরিহার্য। আমরা অনেকেই বিদেশের মহাপুরুষদের নাম বা কীর্তিকলাপ কণ্ঠস্থ করি; কিন্তু স্বদেশের সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের সংবাদই রাখি না, সে হিসেবে এর উপযোগিতা অপরিসীম। লেখকের রচনা সুন্দর।

কিন্তু একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। কেন যে তিনি বাঙলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন বোঝা গেল না। যদি স্বদেশবাসী হয়ে আমরা স্বদেশের গুণী ব্যক্তিকে সম্মান না দিই, তা হলে বিদেশীদের কাছ থেকে সে সম্মান আশা করা অন্যায়। তালিকা দীর্ঘ হবার আশঙ্কা থাকলেও অন্যায়। ৫২৯।৫৫

জীবন-কথা

শোন বলি মায়ের কথা—শৈলেন ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীকমল ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ কর্তৃক বি ২।৯৪ ভাদৈনী, বেনারস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা আট আনা।

কিশোর কিশোরীদের উপযোগীভাবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী জীবন-কথা বর্ণনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। মায়ের নিজমুখে বলা গল্প কয়েকটি বড়ই মধুর এবং এইগুলি কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। লেখক মায়ের জীবনের অপ্রাকৃত ঘটনাগুলির উপর জোর না দিয়া তাঁহার দয়া, মায়া, পতিত, তাপিত ও আর্তজনের প্রতি করুণা মাতৃত্বের মাধুর্য এবং ঔদার্য এইসব কথা বলিলেই লেখা সমধিক সার্থকতা লাভ করিত। পুস্তকখানি পাঠ করিলে এইদিক হইতে একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। ২১০।৫৬

ধর্মতত্ত্ব

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্—শ্রীমৎশ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত—শ্রীআনন্দ অনূদিত—অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

সাধক কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই সংস্করণে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোকগুলি নির্ভুলভাবে এবং সুস্পষ্ট সৌন্দর্যে ছাপা হয়েছে। সঙ্গে প্রতিটি শ্লোকের গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদ রয়েছে। অবশ্য অনুবাদে এই অপূর্ব কাব্যের সম্পূর্ণ ঝঙ্কার ও মাধুর্য আনা অসম্ভব, তবু অনুবাদক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। যথা—

"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম্॥"

"সখি তোমার চরণ হতে শব্দকারী চঞ্চল নূপুর খুলে ফেল, ঐ নূপুর মোহন রতি-কেলির সময় শত্রুর মত আচরণ করে। সখি, কুঞ্জকুটীর আঁধারে ছেয়ে গেছে, নীল শাড়ী পরে এখনি কুঞ্জে গমন কর।"

"নূপুর মনোহর আজিকে কেন খুলি
বাজিলে বাধা পায় চপল রতিকেলি।
ছেয়েছে তমসায় কুঞ্জ ঘরটিরে
চঞ্চল ফেলো ত্বরা শ্যামল বাস পরে॥"

বাঙালী কবি রচিত এই অপূর্ব সংস্কৃত কাব্যের রস-মাধুর্য এই অনুবাদের সাহায্যে পান করে কাব্যামোদীরা তৃপ্ত হবেন বলেই মনে হয়।

১৪১।৫৬

রামামৃত-সাধন-বিজ্ঞান—শ্রীচিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়। মূল্য সাধারণ বাঁধাই ৩, বোর্ড বাঁধাই ৪। প্রকাশক—শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৭ বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পদাবলীর সারাংশের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার বিভিন্ন শ্লোকের ভাব ও অর্থ মিলিয়ে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের বাণী সরল হলেও গভীর অর্থ-ময়। গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ 'উপক্রম' দ্বিতীয় অংশ 'প্রবেশিকা' এবং তৃতীয় অংশ 'উপসংহার'। শুধু শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ভক্ত-সম্প্রদায়ই নয়, অন্যেরাও এ গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হবেন।

শ্রীশ্রীরাসলীলা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থের রাসপঞ্চাধ্যায় অংশের ভাবৈশ্বর্য সম্বন্ধে পণ্ডিত ও ভক্ত আলোচকগণ বহু প্রশস্তি করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে মূল, অন্বয়, অন্বয়ানুবাদ ইত্যাদি ব্যতীত শ্রীহরিদাস দাস লিখিত একটি দীর্ঘ ভূমিকাও ছাপা হইয়াছে। পদ্যানুবাদের সর্বত্র লেখকের ভক্তি-নিষ্ঠ চিত্তের প্রযত্ন বিদ্যমান। আশা করি, বই-খানি সমুচিত সমাদর লাভ করিবে। ৫৪৯।৫৫

বিবিধ

খুনী দরওয়াজা—বিক্রমাদিত্য। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দেড় টাকা।

সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রথম সংগ্রামিক অভ্যুত্থান। সুতরাং জাতীয় মানসে এই মহান বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা একটি জাতীয় কর্তব্য।

'খুনী দরওয়াজা' ইতিহাস-আশ্রিত সিপাহী-যুদ্ধের গল্পকথা। ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে এ-গ্রন্থে গল্প বলার আর্ট প্রধান হয়ে উঠেছে। বিক্রমাদিত্যের ইতিহাসের গল্প বলার ভঙ্গিটি মোটামুটি ভালই। গ্রন্থখানি কিশোর পাঠক-দের আগ্রহান্বিত করে তুলবে বলেই বিশ্বাস।

(৪৪৫।৫৫)

নেতাজী ও মহেন্দ্রজী—শ্রীসুধাংশুকুমার দাস ব্রহ্মচারী এম এ প্রণীত। শ্রীশান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩।১এ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর সেবক মহেন্দ্রজীর সহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কয়েকখানি পত্রা-লাপ পুস্তকখানিতে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৩৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে ফরিদপুরে গেলে নেতাজীর সঙ্গে মহেন্দ্রজীর প্রথম পরিচয় ঘটে। ভিয়েনা হইতে মহেন্দ্রজীর নিকট নেতাজীর লিখিত একখানি চিঠি পুস্তকখানিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। নেতাজী নিরুদ্দিষ্ট হইবার একমাস কিংবা দেড় মাস পূর্বে মহেন্দ্রজী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া লেখক নেতাজীর গোপনকক্ষে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পুস্তকখানিতে এই সাক্ষাতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণটি ইতিপূর্বে 'প্রবর্তকে' প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে সর্বসাধারণে ইহা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন।

বাংলার সুজনী প্রতিভা—শ্রীযামিনীকান্ত সোম। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

যামিনীকান্ত সোম সুলেখক এবং কিশোর-সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন আছে। বর্তমান গ্রন্থে তিনি রাজা রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবন, কর্ম ও বাণী অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। অকারণ উচ্ছ্বাস ও ভাব-বাহুল্য নেই। প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় লেখা এই মনীষী-দের কর্মকাণ্ড শুধুই মনোজ্ঞ হয়নি, বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীদের অবশ্য-পাঠ্য হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ে ও পাঠাগারগুলিতে এই গ্রন্থ রক্ষিত হওয়া উচিত। (৫২২।৫৫)

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা—শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা ১৪। দাম—২৷৷৹

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ-কেন্দ্রের অধ্যাপক এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক। সুতরাং গ্রন্থাগার-বিষয়ক পুস্তক রচনার অধিকার স্বভাবতই তাঁহার আছে; বিশেষত, তিনি সুপণ্ডিত এবং বহু তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠাবান।

কিন্তু রচনাভঙ্গি বড় বেশী নীরস, কখনও এত দুর্বল যে, পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবে, নিতান্তই ছাত্র পাঠ্য গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছাড়া লেখকের মনে আর কিছু ছিল না। বিষয়বস্তুকে পাঠকের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলা লেখকের একটি গুরু কর্তব্য, সেদিক থেকে বর্তমান লেখক পাঠকদের হতাশ করেছেন। অথচ আলোচ্য বিষয়টি যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং দেশের বহু শিক্ষিত লোকেই এ বিষয়ে কৌতূহলী।

তবে কষ্ট করে বইটি পড়ে উঠতে পারলে পাঠক দেখতে পাবেন, তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করার মত যথেষ্ট উপকরণ লেখক সংগ্রহ করে রেখেছেন এখানে। বিশেষ করে গ্রন্থাগার পরি-কল্পনায় সরকার পক্ষ থেকে কতটুকু উৎসাহ আর কার্যকরী হয়ে চলেছে, সে সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাগার জাতির জীবনে একটি অমূল্য সম্পদ, সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরো বেশী ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। বর্তমান লেখক সে দিক থেকে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছেন, সে জন্য তিনি সাধারণের কাছে ধন্যবাদার্হ। তথাপি বলবো, বহু উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহ করেও তিনি গতানুগতিক আলোচনার ধারা থেকে খুব বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারেননি।

৬১।৫৬

অবিস্মরণীয় কয়েকটি দিন: রণেন সেন, মনোরঞ্জন রায়, টি এন সিদ্ধান্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ, কলিকাতা—১২। দাম এক টাকা।

আজকাল ভারত থেকে প্রতি বৎসর বহু দল চীন ও রুশ দেশে আমন্ত্রিত হয়ে সফর করে আসেন। কেউ কেউ সেই বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। এটা প্রয়োজনীয় কাজ। ভারতের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন শুধু মুখের কথায় নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এর উদ্দেশ্য প্রচারমূলক না হয়ে সত্য কখনই হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গ্রন্থে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সোবিয়েত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের আমন্ত্রণে মে-দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একদল প্রতিনিধি গত বৎসর এপ্রিল মাসে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করেন। ভ্রমণের প্রোগ্রাম প্রতিনিধিরাই স্থির করেন, কাজেই এটা অফিশিয়াল বা 'কন্ডাকটেড ট্যুর' নয়। তাঁরা নানাভাবে রুশ দেশের মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ করেছেন। বইখানি সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক মনোভাব ও মতবাদের জন্য লিখিত হয়নি। ফ্যাক্টস ও ফিগারস্-এর সাহায্যে একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণমূখী পুস্তিকা রচিত হয়েছে। সেজন্য গ্রন্থকারেরা ধন্যবাদভাজন।

(৭১।৫৬)

জ্বালামুখী (কাংড়া)

॥ ৫ ॥

পীর পাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা উপশিরা, নানান্ শাখা-প্রশাখা। এ গিরিশ্রেণীর মৃৎপ্রকৃতি বড় কোমল,—মাটির মোহমদির গন্ধে বিবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার। ওরা তৃণশয্যার নধর কোল পেয়ে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙ্গীন প্রজাপতি আর পতঙ্গের প্রলাপগুঞ্জন ক'রে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীর পাঞ্জাল এত নরম বলেই পা পা'ড়তে গিয়েছিল অনেকের। তা'রা কেউ ইন্দো-ব্যাকট্রিয়, কেউ বা ইন্দো-পার্থিয়। তারপর মার-মার শব্দে এসেছে শক-হুন-তাতার, এসেছে খোটানি-ইয়ারকান্দি, উজবেক আর কাজাক, এসেছে তুর্কি-আফগান রক্তমাখা অস্ত্র হাতে নিয়ে,—কিন্তু এই পীর পাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে ব'সে। তা'রা কেউ নেই আজ। সর্বগ্রাসী রাহু তাদের গিলেছে। সেই রাহু হোলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহু আজও গিলছে একে একে। সাম্রাজ্য-বাদ, ঔপনিবেশবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজ-তন্ত্রবাদ—এদের ধাক্কায় ভারত-সভ্যতার একখানি ইঁটও খসেনি! মোগলরা গেছে একশো বছরও এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন,—মাথা ঠুকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউ বা পালিয়ে বাঁচলো। শক্ত ধাতু আসে বাইরের থেকে, কিন্তু এখানে এসে তা'রা গলে যায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ পৃথিবী যার ভয়ে কম্পমান,—ভারতের মাটিতে হয়ত তা'র এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে পঞ্চশিলায় মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হচ্ছে সাম্য-বাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভুলে যদি কেউ এসে পেঁছয়, তা'র আর রক্ষা নেই। পীর পাঞ্জাল তা'র সকলের বড় সাক্ষ্য।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে পীর পাঞ্জাল আর জাস্কার,—এই দুইয়ের মাঝখানে ভূস্বর্গ যেন মদালসা বিবশা দেহের বিহ্বলতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিয়েছে সবাইকে ডাকিনীর মন্ত্রে। তার ফলে পতঙ্গের দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এই মহাশ্মশান পীর পাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই অপমৃত্যু একটির পর একটি। অভিশপ্তা কাশ্মীর,—এর ওপর লোভের হাত যারা বাড়িয়েছে, তা'রা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও একদা ভয় পেয়ে একটু স'রে দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিৎ সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গুলাব সিংকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি ক'রে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

যেদিকেই তাকাই, শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসক্তি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়,—সবাই এখানে এসে আসন নিয়ে ব'সে যাও তপোবনের নিভৃত শান্তিতে,—যেখানে হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে ওঁকার ধ্বনি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলছে সকল দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। বৈদিক, বেদান্তীয়, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, জৈন, খৃষ্টীয়, জরোষ্ট্রিয়, কনফুসীয়, ইসলামীয়,—কেউ বাদ যায়নি। দিব্যজ্ঞানের মহাপরীক্ষায় ভারত হোলো পথ-প্রদর্শক। এখানে এসে শুধু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা, সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থ।

ভাবতে ভাবতে পথ পেরিয়ে এসেছি অনেকদূর। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আর অপরাহ্ন ছাড়িয়ে সন্ধ্যার পরে গাড়ি এসে পেঁছলো জম্মুতে। গাড়ি থেকে নেমে এসে জম্মুর যাত্রিশালায় আমাদের পুরনো বন্ধু মদন-লালের সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল।

শ্রীমতী মায়া কোন্ সময়ে যেন ওদেরকে আবিষ্কার করলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সহাস্য তর্ক চলতে লাগলো অনেকক্ষণ।

মদনলালের সঙ্গে রয়েছে তা'র তরুণী স্ত্রী সংবতী, এবং সেই কাঁচ শিশুকন্যাটি। ছেলেটার অধ্যবসায় অদম্য, কিন্তু তা'র অসমসাহসিকতা দেখে আমি রাগ করে-ছিলুম। ওই ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে মদনলাল গিয়েছিল অমরনাথে। তিন সপ্তাহ আগে ওদের সঙ্গে আমার আলাপ, কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে ওদের পরিচয় কয়েক মাস আগে,—ওরা পহলগাঁওয়ে ছিল সবাই একত্রে। আমি বাইরের লোক।

যাত্রিশালা অন্ধকার, সুতরাং মোম-বাতিতেই কাজ চালাতে হচ্ছে। নীচে হোটেল আছে, সুতরাং আমরা কেউ অগাধ জলে পড়িনি। বিস্ময়ের কথা এই, হোটেলের প্রায় প্রত্যেকটি লোক শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে পরিচিত। স্বামীর সঙ্গে বারংবার দিল্লী-শ্রীনগর আনাগোনার কালে জম্মুতে একদিন কাটাতেই হয়,—সেই সূত্রেই এই ঘনিষ্ঠতা। মদনলাল এবং সংবতীকে দেখে তিনি একেবারে নেচে উঠলেন। শ্রীনগর অঞ্চলে বন্যার ধাক্কায়

তাঁর সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, এবং আসবার পথে সারাদিন তাঁর মুখে চোখে বিষণ্ণতা ছিল—যেটি তিনি আমার কাছে ধরা দেননি। এবার সংবতী আর মদন-লালকে দেখে তাঁর সেই মেঘ কাটলো। ওদের দুজনকে সঙ্গে ক'রে তিনি আমার কাছে এনে হাজির করলেন।

মদনলালের পরনে সেই ময়লা পায়জামা, কিন্তু সংবতী পরেছে নতুন রেশমী শালোয়ার। মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। মদনলাল এসে একেবারে পা মুড়ে কাছে বসলো। বললে, আভি তক্ কসুর মাপ কিয়া কি নহি কাহিয়ে দাদাজি!

ওর সঙ্গে আবার সংবতী যুগিয়ে দিল, বহেনকে উপর বহুৎসা তাং কিয়া আপনে, দাদাজি!

হাসিমুখে বলতে হোলো, তোমাদের পাগলামির জন্যে রাগ করেছিলুম। ওই কচি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলে অমরনাথে। ভয় ছিল না? তুমি না ওর মা?

মায়া বললেন, সত্যি, তোরা ভারি অন্যায় করেছিলি!

ওদের গল্পগুজবের আরম্ভ হয়ে গেল বারান্দায়। রাত নটা বেজে গেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে মদনলাল ছুটে গিয়ে এক পেয়ালা চা এনে হাজির করলো। ওর মধ্যেই সে পাত্র যোগাড় ক'রে খাবার জল এনে রাখলো। জম্মুতে বড় গুমোট,—রাত্রে স্নান না ক'রে উপায় নেই।

সংবতী বললে, বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়ে এতদূর এনেছিলুম, কিন্তু জম্মুতে এসে ওর বমি আরম্ভ হোলো। এখন একটু ঘুমিয়েছে।

বাচ্চাটাকে দেখতে গেলুম ও-মহলের একটি ঘরে। ভিতরে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে রয়েছে যেমন তেমন বিছানায়।

সংবতী বললে, আমরা দুদিন আছি এখানে। কাল চ'লে যাবো।

বললুম, ভালোই হোলো। তোমরা শ্রীমতী গুপ্তাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো দিল্লীতে। কাল পাঠানকোট থেকে টিকিট কিনে দেবো। আমি যাবো কাংড়ার ওদিকে। তারপর হিমাচল প্রদেশ।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই হেসে উঠলো। বললে, তাজ্জব! আমরাও যে যাবো কাংড়া আর কুলুতে! আমরা ওই দেশের লোক, ওখানে আমাদের আদি বাড়ি।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, আপনারা দেখছি দলে ভারি হলেন। আমারই দুঃখ নেই কেন? আমিই কোন্ কম?

সংবতী বললে, তোমার স্বামী যদি এ খবর শুনে রাগ করেন? আগে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নাও?

অন্ধকারে শ্রীমতীর মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। একটু কম্পকণ্ঠেই তিনি বললেন, স্বামীকে যারা চেনে না, তারাই স্বামীকে ভয় পায়। আমার স্বামী হলেন সদাশিব।

মদনলাল ব'লে বসলো, বহুৎ ঠিককৎ! স্বামীর কথা উঠলে আর রক্ষা নেই। এখন কি করতে চাও বলো।

মায়া এবার হাসলেন। বললেন, সঙ্গে সঙ্গে যাবো, নৈলে এত লটবহর একা সামলাবো কেমন ক'রে? একা যাইনি কখনো। ঘরদোর ভাসিয়ে লেখকের সঙ্গ ধরেছি, দেখি না ওঁর দৌড় কতদূর! ভাসুরের ওখানে তুলে দিয়ে তবে ওঁর ছুটি।

স্বামী স্ত্রী একেবারে হেসে লুটোপুটি। মাঝ রাত্রি পর্যন্ত সংবতী আর শ্রীমতী গুপ্তার কলকণ্ঠ থামতে চাইলো না। তারপরে তরুণ মদনলাল গান ধ'রে দিল খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটাকে এনে শোওয়ালো কাছাকাছি। ছেলেটা যেন জন্তুর মতো পরিশ্রম করে।

কাল আবার সকলের নতুন পথে যাত্রা।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চ'লে গেছে যোগিন্দরনগরের দিকে অনেকদূর। এটি হিমালয়ের প্রশাখাপথ,—ছোট ছোট পাহাড়ের অলিগলিকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর লুপ-এর জটিলতা আরম্ভ হয়েছে।

রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্ন। আমাদের বসনে ভূষণে লেগেছে পথের ধূলিধূসরতা এবং ক্লান্তি। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হোলো পাঠানকোট স্টেশনের ক্লোকরুমে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাহ্নে গাড়ি ছাড়লো। অজস্র ভোজ্যবস্তু ও মেওয়াফল যোগাড় করেছে নিত্য উৎফুল্ল মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধূমপানের ব্যবস্থা। এদিকে সংবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাদাম-পেস্তা' নিয়ে—ওদিকে মদনলাল সকলের স্বাচ্ছন্দ্যসুবিধার জন্য ব্যস্ত। শিশুটি আছে দুই নারীর মাঝ-খানে,—আজ সে সুস্থ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক, কিন্তু গরমে কষ্ট পায়। মদনলালের পিতা হোলো লুধিয়ানার এক রেশম ব্যবসায়ী,—মস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের সর্বত্র। বাপের কাজকারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ি চলেছে ধীরগতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গুমোট দেখা দিয়েছে প্রখর রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চূড়ার বাইরে আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে প'ড়ে গেছি। মাইল পাঁচেক পেরিয়ে পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। শুধু পাহাড়তলীর খেতখামার বনীভাঙ

আস্তরণ পেতেছে এখানে ওখানে। অপরাহ্ন গড়িয়ে যাবার পর গাড়ি এসে পৌঁছালো জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। এইখানে আমরা এ যাত্রায় রেলপথকে ছেড়ে দিলুম।

এ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। কিন্তু এর ভৌগোলিক সীমা বড় জটিল। কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুলুর উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ। শিমলা অঞ্চল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও স্থির হয়নি। যেমন ধরো ডালহাউসী। সবাই জানে চাম্বার মধ্যে ডালহাউসী,—কিন্তু এটি শৈলশহর পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপসু, হিমাচল, কাংড়া, কুলু, চাম্বা—এদের পরস্পর-পৃথক মানচিত্র ছাড়া এদের সীমানা বোঝবার উপায় নেই।

স্টেশন থেকে জ্বালামুখী গ্রাম তেরো মাইল পথ। পথ নিরিবিলি। উঁচু নীচু খোয়ার রাস্তা সংকীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিন্তু জনসাধারণ পাঞ্জাবী নয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুর, পুরুষদের মাথায় লাল-পাগড়ি। এরা জাতিতে শাক্ত। কুলুতেও এই, মণ্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে পূর্বরাজপুতানা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান আর মোগল—এরা রাজপুতগণকে মাতৃভূমিতে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলে তখন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিন্তু এই শত সহস্র রাজপুত পরিবার হিমালয়ের বহু অঞ্চলে গিয়ে আপন আপন সমাজ সৃষ্টি করে এবং রাজ্যপাট বসায়। পেপসু হোলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হোলো প্রকৃত রাজপুত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে কুমায়ুনে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবঙ্গ কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শক্তিপূজা, সেই শিবের আর ভৈরবের আরাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিঁদুর আর হাতে শাখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ। কিন্তু বট আর অশ্বত্থের এমন সশ্রদ্ধ পূজা আগে দেখিনি। প্রতি বটের নীচে দেবস্থান, প্রতি অশ্বত্থের নীচে শিব। অতি যত্ন, অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানিতালের ছোট্ট একটি হাট,—তাইতেই স্থানীয় লোকরা খুশী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনের হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তবর্তী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটর বাস মাড়োয়ারি ধর্মশালার প্রাঙ্গণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্বালামুখীর পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। আশে পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দু'চার ঘর বস্তি। এদিকটা নিরিবিলি। গাড়ি থামতেই পাণ্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে,—মন্দিরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধরে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে; সকলের আগে তিনি ধুলো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এদিকে কিছু পাওয়া যায় না।

পাণ্ডা এইটিই চেয়েছিল। সে সোৎসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলির সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হোলো। মদনলাল আর সংবর্তী সামনের ধর্মশালায় নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়ের দিকে ধাবমান হোলো না। কথা রইলো, ওরাও আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। বাচ্চাটা এখানে এসে গরমে-গুমোটে আবার কান্নাকাটি লাগিয়েছে।

ঠিক সুনির্দিষ্ট একটা আশ্রয়ের দিকে দু'জনে অগ্রসর হচ্ছিলুম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশঙ্কা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কুক্ষিগত না হই। কারণ এসব স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মুশকিল এই, আমি ঠিক তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অসুবিধা, সঙ্গী হিসাবে আমি একটু বেমানান। শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিচ্ছদে কিছু অতি-আধুনিকতা বর্তমান,—চট্ করে যেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অসুবিধাজনক। পাণ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দাজ আধ মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পৌঁছলুম এক গোলকধাঁধার মধ্যে। এইটি পাণ্ডার বসতবাটী। যা ভেবেছিলুম তাই। অন্যের মুখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গতি নেই। চারিদিক শুকনো, কোথাও জল

নেই। অতি পুরনো ঘর দোর,—আগল নেই, আব্রু নেই, আয়ত্তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে ব'সে একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ির গৃহিণী,—কি যেন সেলাই করছিলেন। বাড়ির উত্তর ও পূর্বাংশটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। পিছনে শরু ছায়াচ্ছন্ন পথ।

জিনিসপত্র একটি ঘরে রেখে আমরা মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলুম। পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওখানে আছেন দেবী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের কালে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এপথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীর জিহ্বা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্বা আজও জ্বলছে জ্বালামুখীর জলের মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলুম গল্প।

সরু একটি চড়াইপড় ধ'রে মন্দিরের অঙ্গনে উঠে এলুম। সূর্যাস্ত হয়নি, রাঙা রৌদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপার্শ্বিক প্রাচীন নয়, সর্বত্রই নব-নির্মাণের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু যেটি মূল মন্দির সেটি অনেককালের,—তা'র অনেক ইতিহাস। কাছেই একটি গুহার মধ্যে ঝরনার স্বচ্ছ জল একটি কুণ্ড রচনা করেছে। রাজ-গৃহ কুণ্ডের কথাটা মনে প'ড়ে যায়। কুণ্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এটিও গুহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠস্থান। দেওয়ালে ছোট ছোট গর্ত—এক একটিতে অগ্নিশিখা জ্বলছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানে ওখানে এবং আরেকটি সুড়ঙ্গে কয়েকটি শিখা জ্বলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিত্র, এবং সন্দেহ নেই—একটি রহস্য অনুভূতি আনে। দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র পাহাড়টি অন্তরে-অন্তরে ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ। গন্ধক, খড়িপাথর, ফসফোরাস,—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথর আর মাটির ভিতরে-ভিতরে। আমাদের দেশে আগ্নেয়-গিরি নেই। কিন্তু অনেক পাহাড়ে তা'র উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গৌরীকুণ্ডে, রাজগৃহে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তপ্ত ঝরনা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধক্ ধক্ ক'রে আগুন জ্বলছে পাথরের গভীর অভ্যন্তরে,—কেউ তা'র খোঁজ রাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলুম। কিন্তু ভিতরে যখন দাহ্যবস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জ্বলবে। বাইরের দিকে এক পাশে আরেকটা জলকুণ্ডের মধ্যে পাণ্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ্ ক'রে জলের মধ্যে একটি শিখা জ্বলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রলে যেমন আগুন লাগে, এও তেমনি। ওটার মধ্যে শ্রীমতী গুপ্তা ছেলেমানুষের মতন একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলেন। তিনি বারংবার শিখাটা জ্বালিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চ'লে গেছে দূর-দুরান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অস্পষ্ট সমতল, তারপরে বিপাশা নদী চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। ভালো লাগছে এই অপরিচিত পৃথিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিম্ন-স্তর। এরা হোলো তোরণদ্বার, এখান থেকে যাত্রা করো। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিঙ্গ অর্থাৎ শূলেশৃঙ্গ গিরিমালা। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে বন্য বিপাশা। তা'র উত্তর ভূভাগ হোলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি সুবিশাল পার্বত্য মণ্ডিরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে শূলেশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাসপুর রাজ্যকে নানাদিকে বেষ্টন করেছে।

মন্দিরের অঙ্গনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধুনিক। এক পাশে পাণ্ডাদের গদি, সেখানে পুণ্যকামীরা শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটায় রস পাইনে। লোভ এবং শোষণের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নই। সমগ্র মন্দির অঞ্চল তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে সময় গেল। সন্ধ্যা আসন্ন।

কিছু দুশ্চিন্তা এসেছিল, ফুটেছিল শ্রীমতী গুপ্তার চোখে মুখে। এতক্ষণ তিনিই সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলেন, তাঁর হাতেই হাল ধরা ছিল। এবার বললেন, চলুন, ধর্মশালাতেই ফিরে যাই, পাণ্ডার ওখানে থেকে কাজ নেই। ওর হাতের মধ্যে থাকতে চাইনে। তাছাড়া, নানা অসুবিধেও রয়েছে দেখছি।

কিছু পুজো দিতে হোলো বৈকি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো। পাণ্ডার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে, তবে অল্প মুক্তি পাওয়া যেতো না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র পুনরায় নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন স্বস্তি পাওয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা আবার এসে উঠলুম ধর্ম-শালায়। অধ্যবসায়ী মদনলাল সেখানে সংবতীকে নিয়ে দিব্য অস্থায়ী ঘরকন্না পেতে বসেছে। বাচ্চাটাকে সঙ্গে ক'রে শুইয়েছে দোতলার বারান্দায়। ওরা আগামীকাল প্রাতে যাবে মন্দিরে। আমাদের দেখে সংবতী একেবারে নেচে উঠলো।

মস্ত বাড়ি। নীচে ওপরে দরদালান। ঘরের পর ঘর। অনেক যাত্রী এসেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের। নীচের তলায় তাদের কলরব চলছে। স্নানের জল পেয়ে আমরা বাঁচলুম। পথের পাশেই দু'একটি

ভোজনাগার, সেখানে যেমন-তেমন আহারাদির ব্যবস্থা। ক্ষুধার উগ্রতা থাকলে যে কোনও খাদ্যই উপাদেয় লাগে। ভোজ্য ব্যবস্থার দারিদ্র্য দেখে শ্রীমতী গুপ্তা হেসেই খুন। এক সময় তিনি বললেন, ভয়ে-ভয়ে বলি, শ্রীনগরে আপনি যে আলুকপির তরকারি রান্না করেছিলেন, সেটি খুব ভালো হয়নি!

মেজাজটা বোধ করি ভালো ছিল না। ফস্ ক'রে ব'লে ফেললুম, এখানকার আধসিদ্ধ আলুর ঘাটের তুলনায় সেটা কি এতই মন্দ ছিল?

তিনি হেসে উঠলেন। সংবতী এসে যোগ দিল, এলো মদনলাল। ওরা গোগ্রাসে খেলো সবাই। মদনলাল ওর মধ্যে জোগাড় ক'রে এনেছে দুধ আর আপেল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাচ্চাকে একা শুইয়ে এসেছে দোতলার একটি ঘরে। হারিকেন জ্বেলে রেখে এসেছে। এবার ফিরতে হবে।

স্নানাহার সেরে উপরে যেতে রাত দশটা বেজে গেল।

মদনলালের উৎসাহ অপরিসীম। কথায় কথায় ধমক খাচ্ছে স্ত্রীর কাছে, ওকে নিয়ে কৌতুক করছি আমরা সবাই, কিন্তু মদন-লাল, [illegible]। কাজ কেড়ে নিচ্ছে সকলের হাত থেকে,—নিজে করবে সব। আরও বিপদ, ওর মধ্যেই গান গাইবে। কবে শ্রীরাধা যমুনায় কলস নিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন, তার জন্য মদনলালের মাথায় কী যন্ত্রণা! সংবতী রাগে একেবারে আগুন, মায়াদেবী হেসে লুটোপুটি। এক সময় যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন সংবতীর ধৈর্য হারালো। চেঁচিয়ে বললে, ভাণ্ডাসে তোঁর বাধেকো গাগরা ম্যায়নে তোড় দুংগা!

মদন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, দেখিয়ে দাদাজি, মেরা বিবিভি নাস্তিক বন্ গই!—আমাদের উচ্চকণ্ঠ হাসি আর বাধা মানলো না।

মদনলাল বিছানা পেতে দিচ্ছে সকলের। জল এনে দিচ্ছে সকলের হাতে। এমন কি সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য সে আমার বিছানার পাশে একটি 'কটোরা'ও এনে রেখেছে। বাচ্চা কেঁদে উঠলো ওরই মধ্যে বার দুই, মদনলাল তাকে শান্ত ক'রে আবার শোওয়ালো।

বারান্দা আর ঘর মিলিয়ে বিছানা পড়েছে সকলের। এটা যাত্রিশালা, পদে পদে সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটে। তবু এর আভিজাত্য কম নয়। দোতলা পাকা বাড়ি পাহাড়ী দেশে, সুযোগ সুবিধা প্রচুর। অনেককালে অনেকবার কেটেছে পার্বত্য চটির ধারে, অনেক অযত্নে, অনেক ধুলিধূসর আনাচে কানাচে। এখানে চমৎকার। সামনে বারান্দার বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার বিশালকায় দানবীর মতো জ্বালামুখীর অচল আয়তন, তার উপরে জ্বলছে একটি জ্যোতিষ্ক। চুপ ক'রে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। সহ-যাত্রীদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ করি, ঘুমিয়েছে সবাই।

অরণ্যসমাকীর্ণ কাংড়া উপত্যকার একটি অংশ হোলো জ্বালামুখী অঞ্চল। অতি ক্ষুদ্র এই জনপদটি গ'ড়ে উঠেছে তীর্থমন্দিরটিকে কেন্দ্র ক'রে। এর বাইরে বনময় চাষী-বসতি। এই অরণ্যলোকের কোনও নির্দিষ্ট সীমানা এদিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশূন্যতায় এই অরণ্য প্রসিদ্ধ। হিংস্র শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চ'লে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে-নীচে বিপাশার তীরে-তীরে,—মণ্ডি আর বিলাসপুরের রাজ্যে। পশ্চিমে শুলেশৃঙ্গ গিরিশ্রেণীর অরণ্যলোক, দক্ষিণে চ'লে গেছে হামির-পুরের পথ, সেখান থেকে 'আম্বার' এবং অতঃপর সুন্দরনগর রাজ্যের শেষ সীমানা,—যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্রু শুলে-শৃঙ্গের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হোলো

অখণ্ড অবিভক্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দুই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অঞ্চল,—হিন্দুকুশের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসাম সীমান্তের পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মদেশ ও চীন-সীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গ বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অম্বিকা,—যিনি দুর্গা,—মহাচণ্ডী, যিনি অস্ত্রধারণ ক'রে রয়েছেন অসুর-নাশনের,—শত্রুহননে যাঁর দয়া নেই, ক্ষমা নেই, কৃপা নেই, মোহকজ্জল নেই। ওই অন্ধকার পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে তিনি ডাক দিচ্ছেন মহা-ভারতকে যুগ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার যজ্ঞ যারা পণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জ্ঞানসংস্কারকে কলুষিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব-সাধনাকে যারা ইতিহাসের পর্বে-পর্বে হিংস্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে যারা আক্রমণ করেছে বারংবার—মহাচণ্ডী ডাক দিচ্ছেন যেন এখান থেকে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো! দৈব-অহিংসাবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করো। সেই হবে তোমার সভ্যতার রাজসূয় যজ্ঞ, সেই হবে কল্যাণব্রতের শেষ বাণী। সংহার-সাধিকা সেই দেবী অম্বিকার রক্তপিপাসা নিয়ে যিনি এই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের চূড়ায়-চূড়ায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন, সর্বমঙ্গলার কল্যাণের প্রতীক নন,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব, তিনি দেবাদিদেব নন, মহারুদ্র; তিনি রুদ্রাণীর অমাকৃষ্ণকেশরাশির সঙ্গে মিলিয়েছেন আপন মহাজটা এই অরণ্যে-অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাজড়ানো একপ্রকার দুর্যোগে জাগিয়ে-সময় আকাশের ওই জ্বলজ্বলে বড় তারাটার দিকে সম্মুখের কাশ্মীর পাহাড়ের চূড়ায় যেটা জ্বলছে। সত্যিকার আমি জীবিত নই, চোখ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ, আমার অজানা অম্লান পিপাসা নিয়ে নীলপদ্মের ভিক্ষাকাড়া অন্বেষণে ভ্রমর যেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। অনন্তের থেকে অন্ধকারে, সাগরে, প্রান্তরে, সুমেরু-লোকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সংসারের সীমানায়, মহাব্যোমে, রহস্যচেতনায়। ক্ষুধার্ত ভ্রমর ফিরছে একা একা আপন রহস্য পিপাসায়। বন্ধনহীন, কিন্তু মুক্তিহীন,—অস্তিত্বের আর চৈতন্যের কল্প-কল্প তার নীলপদ্মের অন্বেষণ চলেছে।

পরদিন প্রভাতে মোটরবাসে বেরিয়ে পড়েছি। মদনলালরা সঙ্গে এলো না।

বাণগঙ্গার তীরে-তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জাঁতা নেমেছে নীচের নদীতে। শরৎপ্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে-বনে। রাঙ্গারৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়। নীচের দিকে এখনও ছমছমে ছায়াবরণ। আলো এসে পৌঁছয়নি।

আমাদের গাড়ি চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক-অজানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকে। পৃথিবীকে নতুন করে পাই নতুন পাহাড়ে এসে। নতুনের দিকে যাবার আগে

দিগন্তের দ্বার খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে—যেদিকে ধওলাধার।

পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরম্ভ হয়েছে শিবালিক পর্বতমালা,—এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পূর্বহিমালয়ে। ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ হোলো এই শিবালিক শ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হোলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, হিমাচল, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল—সমস্ত ভূভাগই এই পর্বতশ্রেণীর দ্বারা অবরুদ্ধ। সেই শিবালিক পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হোলো ধওলাধার গিরিশ্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দরনগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় অতি নিকটে এই ধওলাধার,—স্বয়ংচারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন লোকালয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়েছে। দেখলে ভয় করে—ওর সর্বাঙ্গে কোনও স্নেহ নেই, ছায়া-মায়া কিছু নেই,—[illegible] যেন সর্বহারা! সবুজের [illegible] নেই যেন ওর সর্বাঙ্গে, বর্ষায়-বসন্তে ওর [illegible] ঘটে না, ওর গোপনতা কিছু নেই, অরণ্যের কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন বক্ষ জটার ভিতর থেকে এখনো চক্ষু মেলে [illegible] মতো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালের প্রহর গুনছে,—রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করছে বসে [illegible] কালান্ত, কাল প্রলয়, বারে আবির্ভূত হবে নতুন [illegible] হবে সৃষ্টি। ধওলাধারের বিরাট নগ্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেড়ে এলুম, পিছনে রেখে এলুম বাণগঙ্গার অতলস্পর্শী খদ, আর অশান্ত স্রোতোধারা, রেখে এলুম দুর্ভেদ্য বনভূমির নৈঃশব্দ্য,—রেখে এলুম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের জয়বার্তা।

পূর্বাহ্নে এসে পৌঁছলুম কাংড়ার বড় শহরে।

এটি একটু বড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত। কোর্ট-কাছারি, ডাক ও তারঘর, আপিস-ইস্কুল, দোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য,—নগর সভ্যতার প্রত্যেকটি উপকরণ বর্তমান। তবে সকলেরই আকার ছোট। আমরা শহর-সভ্যতায় মানুষ, এসব আমাদের চোখে পড়লো। বরং হিমালয়-ভ্রমণকালে যদি সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণের অভাবে অসুবিধায় পড়ি সে সহ্য হয়; উপযুক্ত আহার এবং আশ্রয় না জুটলে দুঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পৌঁছলে আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে আমরা সব চাই,—এবং না পেলে ক্ষুণ্ণ হই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পাণ্ডা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জানলাম, যাঁর পাণ্ডার নাম ছিল মোতিলাল। তার প্রতি খুব খুশী ছিলুম না। কিন্তু এই ভদ্রলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেলুম। শ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়িতেই চলুন, স্নান না ক'রে আর থাকা যাচ্ছে না। বড্ড রোদ।

বললুম, কিন্তু মদনলালরা যদি পরের গাড়িতে এসে মোটর স্ট্যান্ডে আমাদেরকে দেখতে না পায়?

নাই বা পেলো!—তিনি বললেন, সাড়ে তিনটের আগে যখন বৈজনাথের বাস ছাড়ছে না, তখন তারা মোটর স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে বাধ্য। আমরা ঠিক সময় এখানে এসে দাঁড়াবো। চলুন—

কথাটা যুক্তিসংগত। কিন্তু সংবতীর বাচ্চাটা যদি এই পথের কষ্টে আবার অসুস্থ হয় তবেই মুশকিল। ওরা সন্তানের জনক-জননী বটে, কিন্তু এখনও মা-বাপ হয়ে ওঠেনি। শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য এখনও বুঝতে শেখেনি।

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। তবু শ্রীমতী মায়ার নির্দেশ মানতে হোলো। আমরা অলিগলি আর আনাচ কানাচ পেরিয়ে একটি বস্তির মধ্যে মোতিরামের বাড়ীতে এসে উঠলুম। পাণ্ডাজি সযত্নে পানীয় জল ও মিষ্টান্ন নিয়ে এলেন।

সামান্যই একতলার ঘর। প্রখর রৌদ্র থেকে এসে ভারি শান্তি পেলুম। কিন্তু এ-কদিন একটি বিশেষ বিষয়ে আমি অন্যমনস্ক ছিলুম, সেটি আমারই ত্রুটি। ঘরে ঢুকেই শ্রীমতী মায়া প্রথমেই তাঁর চামড়ার ব্যাগ খুলে কাগজ কলম নিয়ে স্বামীর নিকট দ্রুতহস্তে চিঠি লিখতে বসে গেলেন। যে-ভাবেই হোক, একটি কথা সত্য। শ্রীনগরের বন্যায় তাঁর সুখস্বপ্ন ঘর-কন্না ভেঙে গেছে। হয়ত অতখানি শঙ্কিত মনে অত দ্রুতগতিতে একটি সংসার তচনচ ক'রে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে যুক্তিসংগত হয়নি; হয়ত সেই সময়ের দুর্যোগে, আরও কিছু ধৈর্যরক্ষার দরকার ছিল। কিন্তু তাঁর তরুণ মন ওই আকস্মিক প্রবল বন্যার তাড়না দেখে আতঙ্কিত ও নিরুপায় বোধ করেছিল সন্দেহ নেই। তবে একথা তিনি জানতেন, মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁর স্বামী কাশ্মীরে ফিরবেন, এবং দিল্লীতে তাঁর অবিলম্বে বদলী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁকে যেতেই হোতো কিছুদিন পরে, কিন্তু মাঝখানে বন্যা এসে আগেই তাঁর যাওয়াটা দ্রুত ঘটিয়ে দিল। আমার বিশ্বাস, তাঁর মনে কিছু বিহ্বলতা ছিল।

চিঠি শেষ ক'রে ঠিকানা লিখে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার স্বামীকে দেখলে আপনি কিন্তু খুব খুশী হতেন বলে রাখছি।

হাসিমুখে বললুম, কথাটা যেন তিরস্কারের মতন শোনালো। আমি কিন্তু মনে-মনে আপনার স্বামীর অনুরক্ত হয়ে উঠেছি।

কাগজপত্র গুছিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে তিনি

উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। মনে নেই, বড়জেলায় থাকতে আপনাকে তাঁর চিঠি পড়ালুম? চিঠিখানায় সবই আপনার কথা।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর নেই, প্রণামী পাবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে প্রস্তুত নন্। আমরা তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি এক স্থলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে একদা এই পাণ্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলুম।

পাণ্ডাজি অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে চললেন মন্দির দর্শনে। পথ একটুখানি চড়াই। এঁকে বেঁকে এদিক ওদিক ঘুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরের চত্বরে উঠে এসে দাঁড়ালুম।

বাণগঙ্গা পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাঙলা দেশের আত্মিক বন্ধু ব'লে মনে হচ্ছে। পূজার্চনার রীতি পশ্চিমী নয়; ব্যবহারে, আলাপে, সামাজিকতায়—বাঙলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পাঞ্জাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক; অন্যটি শৈবশাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটা নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবদ্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায়, বাইরের লোকের প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়,—শিখধর্মেও তেমনি, প্রবেশপথটি সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনিই বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-ষড়দর্শন-পুরাণ পাঠ করেন, যিনিই ডুবে যান যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়,—তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পুস্তিকা প্রচার ক'রে হিন্দুরা তাদের স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,—যেই হও, হিন্দুদর্শনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু ব'লে অনেকেই মনে করে। গোতম বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুদর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ—একথা কে অস্বীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় এসে দেখছি বাঙালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি পথে পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই সুরে বাঁধা। সুতরাং বাজারে, হাটে, আদালতের পাড়ায়, বস্তিপল্লীর আশে পাশে, খেলার মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘুরে একথা মনে হয়নি বিদেশে এসেছি। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতর গিয়ে দাঁড়াও,—ঠিক বাঙলার গ্রাম। কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি ঝুলছে। মাচানের ওপর লাউ,—তলায় তার কাঁচালঙ্কার চারা। রোদ্দুরে ব'সে কাঁথা-শেলাই,—একেবারে বাংলাদেশ। উনুন-পাড়ে মেনি বিড়াল, খামারে ছাগল, গরুর সামনে খুদসিদ্ধর পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির ঝাড়, সরোবরে শালুক, ছেঁচা বাঁশের বেড়ায় গোবরের চাপড়া,—অবিকল বাঙলা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা কুয়ার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেয়ারা গাছে চড়ছে ছেলেমেয়ে, ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, মুদির দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মানুষের চেহারায় কোনও উগ্রতা নেই,—সমস্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যত্র যাও,—যাও অমৃতশহরে, গুরুদাসপুরে, জলন্ধর কিংবা লুধিয়ানায়, ফিরোজপুর কিংবা ভাতিন্দায়,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ায় এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মানুষের স্বভাবে এসে পৌঁছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপুতানার রসবোধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রুক্ষতা পায়নি। সভ্যতার থেকে যতদূরে সরেছে মানুষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যান্ত্রিক সভ্যতা যে-পোশাক পরিয়েছে মানুষকে, সেই পোশাকটি মানানসই হয়নি তার প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সকলের বড় ষড়যন্ত্র হোলো, একই ছাঁচে পৃথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাত্রা, এক পোশাক, এক খাদ্য, এক শিক্ষা, এক আশা-আকাঙ্ক্ষা। দাঁড় করাও আমেরিকানের পাশে অস্ট্রেলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রুশীয়কে, জার্মানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থক্য রাখেনি কিছু। এসো ভারতবর্ষে,—অনন্ত বৈচিত্র্য আজও দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানুষ আপন স্বভাবধর্মে বিদ্যমান। এই দেওদার আর ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আশ্চর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে,—মানুষের স্বভাব সৌন্দর্য দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্শ এদের মনে আজও লাগেনি ব'লেই প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোশাকে, ব্যবহারে, সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।

একটি টিলা পাহাড়ের উপরে বজ্রেশ্বরী মন্দির। কয়েক রশি চড়াই পথ। সামনের মন্দির দ্বার একটু উঁচুতে। আমরা এসেছি গঙ্গার দেশ থেকে। ফুল আর চন্দনের সুগন্ধ যদি পাই, ত্র্যম্বকের বীজমন্ত্র যদি পূজার্থীর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'তে শুনি—আমাদের মনে প'ড়ে যায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার কূলপ্লাবিনী তটসীমান্ত—যার তীর থেকে উঠে গেল গৈরিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে; ব্রাহ্মণে যার তীরে ব'সে মন্ত্রপাঠ করছে নিত্য, যেখানে ভারতসভ্যতা যুগযুগান্ত অবগাহন ক'রে পুণ্যময় হয়েছে।

পাণ্ডাজির পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। শ্রীমতী মায়া এতক্ষণে যেন স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করলেন। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি হলেন দেবী বজ্রেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জ্বালামুখীর পরে বজ্রেশ্বরীই হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে খরস্রোতা বাণগঙ্গা যেমন এই বজ্রেশ্বরীর পর্বতপাদ চুম্বন করছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারমৌলী ধবলা-

ধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই চারিদিক থেকে হিমালয়ের মধুর বাতাস সর্বাঙ্গে তার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা বুলিয়ে দিয়ে গেল।

জ্বালামুখীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অম্বিকা, তিনি শক্তির প্রতীক্। তাঁর উজ্জ্বলন্ত লোলাগ্নি রসনা সমস্ত ধাতব পাহাড়ের ফাটলের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই। অগণ্য অগ্নি-জিহ্বা যাঁর,—তাঁর বিগ্রহকে কল্পনা করো, চিত্রাঙ্কন করো মনে-মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাঁকে চূড়ায়-চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্বতী। এখানে শান্ত শিব, শক্তি তাঁর বামে। এখানে ওখানে সেখানে, —সর্বত্র দেবস্থান। যেমন কাশীর অন্নপূর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উজ্জয়িনীর মহাকাল। একবার একটু নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিদ্বারে, পুরীতে কিংবা দ্বারকায়, মাদুরায় কিংবা শিবসাগরে, অযোধ্যায় কিংবা গঙ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইকে ধরে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যায়নি। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা,—যারা ছিল সনাতন ব্রাহ্মণ সভ্যতার যুগে, যারা ছিল বৌদ্ধ আর জৈন আমলে, তা'রা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গুহা-গর্ভে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মৌর্য-বৌদ্ধ আমলে, গুপ্ত যুগে, হর্ষবর্ধনে, শক-হূন-গ্রীকদের কালে, পাঠানে-মোগলে, ওলন্দাজ - পর্তুগীজ - ফরাসী - ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসঙ্গ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা'র চিত্রকলায়,—যার নাম 'কাংড়া স্কুল অফ আর্ট।' স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তা'রা সুন্দর করেছে, ললিতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণ্য, যার স্বাতন্ত্র্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অনন্ত বৈচিত্র্য, এখানেও তা'র অভিনবত্ব। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ; দ্বারকা থেকে ব্রহ্ম আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রা; ব্রহ্মপুত্র থেকে সিংহল,—এর নাম ভূ-ভারত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, অব্যয় ভূভাগকে আপন ক্রোড়ভূমিতে ধারণ ক'রে আছেন দেবতাত্মা হিমালয়, যাঁকে কাব্যে ও পুরাণে বলা হয়েছে কুলপর্বত, বলা হয়েছে মেরু-মন্দারমাল্য শোভিত হিমবান।

একা বসেছিলুম একটি নিরিবিলি পাথরের আসনে। শ্রীমতী মায়া ঘুরছেন এখানে ওখানে। পুজো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন ব্রাহ্মণকে। মোতিরাম আছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হ'লেন সৌম্যকান্ত এক ব্যক্তি,—পরনে তাঁর কোটপ্যান্ট। আমাকে দেখেই তিনি কোলাহল ক'রে উঠলেন সবান্ধবে। ইনি আমাদের বন্ধু এবং প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই হোলো, আমি সর্বত্রগামী। আসুন, আসুন, এ মন্দিরের পাথরের কাজগুলি একবার দেখে যান, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

উঠবো, এমন সময় মায়াদেবী এলেন। উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলুম। হরিচরণ-বাবু বাক্‌রসিক ব্যক্তি, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে সব বোঝাতে লাগলেন। এ অঞ্চলে বারংবার তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর কাজের জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে তাঁকে প্রায়ই রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বেতনাদি তিনি ভালোই পান।

বললুম, আশুতোষ কলেজের প্রফেসারি ছাড়লেন কবে?

হরিচরণ বললেন, সে অনেকদিন, বছর কয়েক হোলো। দিল্লী থেকে চাকরি নিয়ে-ছিলুম। ধরুন না, সেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বের আমলে। তখন চারদিকে খুব হৈ-চৈ।

জন দুই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সঙ্গে। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হরিচরণবাবু নিজে পণ্ডিত এবং সুরসিক। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন। শ্রীমতী মায়ার সঙ্গে তিনি খুব গল্প আরম্ভ করে দিলেন। আবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির-চৌহদ্দির মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘোষ মশায় বললেন, থাক্, আর নয়। দেখেছেন, বেলা হয়েছে কত? চলুন, একেবারে খাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক্।

ভোজনরসিকের কথা অমান্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং যেতেই হোলো পথঘাট মুখর করতে করতে। হঠাৎ এক সময় তিনি বললেন, এ কি, উল্টো জামা গায়ে চড়িয়ে-ছেন, সেদিকে লক্ষ্য আছে কি? কই, পকেট খুঁজে বা'র করুন ত?

সহসা আমার প্রতি লক্ষ্য ক'রে মায়াদেবী এবং অন্য সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। অত্যন্ত কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলুম। হরিচরণবাবু তা'র উপরে আবার যোগ করে দিলেন, কাংড়ার সমস্ত ধুলোময়লা নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন? ক্ষৌরকার্যটি হয়নি কতকাল? স্নান করেননি কদ্দিন?

বললুম, ঘণ্টা তিনেক আগে স্নান করেছি!

ও, স্নান করেছেন! আচ্ছা, মিসেস

গুপ্তা, আপনার কাছে এক কুচি সাবানও ছিল না?

হাসিমুখে শ্রীমতী গুপ্তা একেবারে শর-সন্ধান করলেন,—উনি অন্য কা'রো জিনিস ছোঁন্ না।

প্রতিবাদ জানাতে হোলো,—এবার যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

না, হয়নি!—ঘোষ মশায় বললেন, আমরাও একটু আধটু ভ্রমণাদি ক'রে থাকি, কিন্তু এমন সর্বহারা হইনে। এর চেয়ে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে ব'সে পড়ুন পথের ধারে, বামুনের ছেলের ভিক্ষে জুটবে!

এবম্প্রকার লাঞ্ছনা কপালে জুটলো অনেকক্ষণ অবধি। তারপর আমরা বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটি হোটেলে এসে উঠলুম। আমাদের ক্ষুধা ছিল প্রচুর, কিন্তু হুঁশ ছিল না। এখানে তার অকৃপণ পরিচয় পাওয়া গেল। আহারাদির মধ্যে এক সময় হরিচরণবাবু সহসা জানতে চাইলেন, আমার আর কোনও বইয়ের সিনেমাচিত্র হচ্ছে কিনা। আলোচনাটা উঠতেই মায়াদেবী একটু আকৃষ্টবোধ করলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পারিপাট্যে হয়ত এমন কিছু ছিল, যা লক্ষ্য ক'রে সম্ভবত হরিচরণবাবু একথা পেড়েছেন। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে হোলো। হয়ত সুশ্রী চেহারা, নীল চশমা, রেশমী শাড়ি এবং নেইল্-পলিশ ইত্যাদি দেখলে আজকাল মানুষের একটু কৌতূহল হয়।

যাই হোক, বিদেশ বিভুঁয়ে একটি চেনা মানুষকে হঠাৎ পেয়ে আলাপে হাস্যে তামাশায় বেশ কাটলো ঘণ্টা দুই। আহারাদির পর হরিচরণ বিদায় নিলেন এবং আমরাও পাণ্ডাজির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। পথের পাশে এতক্ষণে একটি ডাকবাক্স পাওয়া গেল। শ্রীমতী মায়া তাড়াতাড়ি তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে স্বামীর চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোলো, তাঁর স্বামীই যেন বাক্সের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন।

পাণ্ডার মিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘরটিকেও যেন পুরনো বন্ধুর মতো মনে হোলো। ঘরে এসে শ্রীমতী গুপ্তা কিছু-ক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল প্রচুর। কাশ্মীর থেকে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, এর আগে লেখক কেমন, আমি দেখিনি। লেখককে কাছে থেকে দেখবার এমন সুযোগ আমি ছাড়বো না!

আমি আড়ষ্ট। কী তিনি লক্ষ্য করছেন আমার জানা নেই। যে-ভ্রমণে আমার আনন্দ, তাতে তিনি উপভোগের ক্ষেত্র পাচ্ছেন কিনা, তাও আমার অজ্ঞাত। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্নানাদির অসুবিধা, নিভৃত বিশ্রামের সুবিধা তাঁর জুটছে না, আহার-নিদ্রা-প্রসাধনের প্রশস্ত স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে না,—সুতরাং আমার বিশ্বাস, তাঁর কষ্টের সীমা নেই। সমস্ত পথ আমি সঙ্গে থাকলেও তিনি একা, এবং বুঝতে পারি তিনি তলিয়ে আছেন নিজের মধ্যে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তিনি উঠে এলেন। আমি একটু অস্বস্তিবোধ করেই বললুম, একটি কথা নিবেদন করি। চলুন, আর এগিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই দিল্লী রওনা হই। আমি না হয় আর একবার আসবো এদিকে।

কেন?

ধরুন, সেখানে সকলেই ভাবছেন আপনার জন্য। জিনিসপত্র নিয়ে অবিলম্বে আপনার ভাসুরের কাছে পৌঁছানো দরকার।

একটু ক্ষুণ্ণ হলেন মিসেস গুপ্তা,—আমি তবে চিঠি দিলুম কি জন্যে? জম্মু থেকে লিখেছি ভাসুরকে। আপনি আছেন সঙ্গে,—তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কি, জানেন? আমাকে নিয়ে আপনিই অসুবিধে বোধ করছেন।

খুব হাসলুম। বললুম, যদি বলি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়?

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে তিনি কঠোর অভিমত ব্যক্ত করলেন, সত্যি হলেও নড়বো না, জেনে রাখুন লেখক মশাই! ভ্রমণের এমন সুবিধে আর পাবো না। যত টাকাই লাগুক, এইভাবেই খরচ করবো। কাঁঠাল যদি ভাঙতেই হয়, ব্রাহ্মণ সন্তানের মাথাটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের হাসির তরঙ্গে মোতিরামও যোগ দিলেন। কিন্তু আর দেরি নয়, সাড়ে চারটের আগেই মোটর বাস ছাড়বে,—আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মোতিরামের হাতে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। একটু আগেই যাই, হয়ত সংবতী ও মদনলাল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণে বাস স্ট্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে। ওদের কুশলবার্তা পাবার জন্য আমরা উভয়েই অস্বস্তিবোধ করছিলুম।

পাণ্ডাজি মালপত্রের হেপাজত ক'রে সমস্ত পথ এসে আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। সমুদ্রসমতা থেকে কাংড়ার উচ্চতা প্রায় দেড় হাজার ফুট মাত্র, কিন্তু শীতকালে এখানে প্রবল ঠাণ্ডা। অবরোধ কোথাও নেই, সুতরাং উত্তরের বাতাস এখানে অবারিত। শীতকালের শীত হোলো বাতাসের জন্য, বাতাস বন্ধ হলে তুষার-রাজ্যও সহনীয়। কাংড়ায় এখন শরৎকাল, উত্তরের বাতাস ওঠেনি,—অতএব গরম। রৌদ্রে দাঁড়ানো চলে না,—আমরা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও মদনলাল অথবা সংবতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একবার এগিয়ে গিয়ে প্রায় সেই কচারিপাড়ার ধার পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে এলুম।

মায়াদেবী বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ছেলেটা আপনাকে ভয় করে, তাই হয়ত দল ছেড়ে পালাচ্ছে! এমন হতভাগা আমি দেখিনি। সংবতীও দুঃখ পাচ্ছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে।

বললুম, অনেক লক্ষ্মীছাড়ার হাতে অনেকেই দুঃখ পায়!

হঠাৎ সন্দেহক্রমে বাঁকাচোখে তাকালেন মিসেস গুপ্তা। বললেন, [illegible] সঙ্গে থাকলে আপনাকে এ কথার জবাব দিয়ে দিতুম। আপনি দেখছি আমাকে ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচেন। ওটি কিন্তু হচ্ছে না! আপনার যত সাধ আছে, পাহাড়ে ঘুরে নিন্। দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছে তবে আপনার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়বে!

ঠিক ভূত নয় অবশ্য!

ভূত না হয় পেত্নীই হোলো! চলুন, গাড়ি ছাড়ছে!

হাসিমুখে আবার উঠলুম গাড়িতে। বৈদ্যনাথের দিকে চললুম। (ক্রমশ)

॥ সতেরো ॥
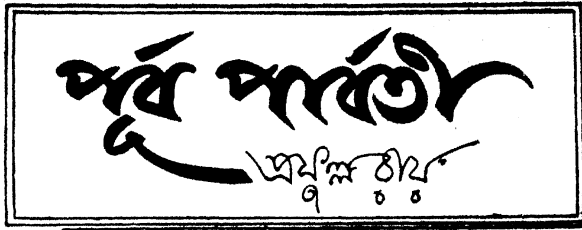
পাহাড়ী মনের উত্তেজনা! বনঘাসের ফলকে শিশিরকণার পরমায়ু! রাত্রিবেলা সিজিটোর ঘরে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছে সেঙাই। পাশের মাচানে একটা বুনো সেণ্ট্সুছের মত ভোঁস্ ভোঁস্ করেছে সারুয়ামারু। একটি মসৃণ ঘুমে রাত্রিটা উজিয়ে এসেছে সে।

কিন্তু অনেকটা সময় পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি সেঙাই। রাত্রি যখন গহন হয়েছিল, নিবিড় হয়েছিল, ঠিক সেই সময় ঢেউটিনের চালের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সেঙাই। সেণ্ট্সুছের পিঠের মত ঘন কালো আকাশ। সে আকাশে নক্ষত্রের বাসর রচনা হয়ে রয়েছে। অনিপুণ হাতের একটি আঁচড়ের মত ফুটে বেরিয়েছে বিবর্ণ বাঁকের ছায়াপথ।

সন্ধ্যার সময় মাধোলাল কার সঙ্গে যেন সাহেবদের লড়াইর কথা বলেছিল, রাণী গাইডিলিওর কথা বলছিল। গাইডিলিও না কী ডাইনী নয়! অথচ সাহেব বলেছে, সে ডাইনী। গ্রাম থেকে আসার সময় বুড়ো খাপেগা বার বার বলে দিয়েছিল, রাণী গাইডিলিওর সঙ্গে দেখা করতে। রাণী গাইডিলিও আর ডাইনী গাইডিলিও—এই দুটি নামের মধ্যবিন্দুতে সেঙাইর পাহাড়ী মনটা অনেকক্ষণ দোল খেয়েছে! একটা স্থির সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে সে উপস্থিত হতে পারেনি। তাকে দেখবে কী দেখবে না। চকিত ছায়াপাত! একটার পর একটা ভাবনার ঢেউ চেতনার ওপর দিয়ে সরে সরে গিয়েছে। কার যেন লড়াইর কথা বললো মাধোলাল! বর্শা দিয়ে ফুঁড়ছে না, সুচেন্যু দিয়ে কোপাচ্ছে না। মার খাচ্ছে অথচ মারছে না। আজব দেশ; সব যেন রূপ-কথা! কোথায় সেই দেশ! কোথায় সেই বিচিত্র মানুষেরা। সব যেন মিথ্যে মনে হয়! একটা অপরূপ বিভ্রান্তির মত লাগে। তাদের এই পাহাড়ী পৃথিবীর বাইরে আর কোথায়ও কোন সমতলের দেশ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, সেখানে সাহেবদের সঙ্গে লড়াই চলছে, ভাবতেও কেমন লাগে পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর। নাঃ, এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই মালভূমি, এই বন-প্রস্রবণ-জলপ্রপাত আর এই কোহিমা শহরের বাইরে কোথায়ও কোন দেশ আছে, তা তার ধারণার অতীত। প্রবল প্রতিবাদে বন্য মনটা অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সেঙাইর।

এক সময় ভাবনাকে দুটি বাহুর তলোয়ার দিয়ে কেটে কেটে একটি মুখ চেতনার ওপর উঁকি দিয়েছে। অনেকদিন আগে একটি শব্দহীন ঝরনার পাশে মেহেলীকে দেখেছিল সেঙাই। পোকরি বংশের এক রমণীয় যৌবন, কোহিমার এই নিঃসঙ্গ শয্যাকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত উত্তেজিত করে রেখেছে। তাকে যেমন করে হোক, বাহুর বন্ধে নিয়ে আসতে হবে।

কোহিমার পাহাড় তার জন্য এত বিচিত্র ভাবনার পসরা সাজিয়ে রেখেছিল, তা কী জানতো সেঙাই?

আকাশের দেহে রাত্রির খানিকটা কালো আভাস লেগে রয়েছে তখনও। একটা উদাত্ত সুর ভেসে এলো চার্চের চ্যাপেল থেকে। অপূর্ব এক সঙ্গীতের মত সে সুরের মূর্ছনা সমস্ত চেতনাটাকে প্লাবিত করে দিয়েছিল সেঙাইর।

পাশের মাচান থেকে সারুয়ামারু বলেছিল: "ছোট ফাদার যীশুমেরীর গান করছে।"

"কী গান করছে? কী কথা বলছে রে?" সেঙাই বলেছিল।

"ওদের কথা বুঝি না।"

ছোট পাদ্রী অর্থাৎ পিয়ার্সন! পরম পিতার কাছে নতপ্রভাতের প্রার্থনা জানাচ্ছে। একটি অর্থও তার বোঝে না সেঙাই, পরমার্থও তার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবু পিয়ার্সনের সুললিত কণ্ঠে এমন একটা ইন্দ্রজাল রয়েছে, যাতে তার রোমকূপে রোমকূপে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। একটু আগে মেহেলীর নগ্ন বরতনুর কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। এখন এই গানের দোলায় দোলায় বিচিত্র অনুভূতিতে সেঙাইর অস্ফুট মনটা ভরে গিয়েছে। মেহেলীর ভাবনা থেকে পিয়ার্সনের এই উদাত্ত সঙ্গীত কত তফাৎ, কত যোজন ফারাক! এই সঙ্গীতের সঙ্গে মাধোলালের গল্পের একটা আশ্চর্য সঙ্গতি রয়েছে যেন। ঠিক ধরতে পারেনি সেঙাই।

এক সময় পুবের আকাশে কনকপদ্মের মত ফুটে উঠলো প্রথম প্রভাতের সূর্য! কোহিমার পাহাড় রোদের প্রপাতে স্নান করে ঝলমল করছে।

সিজিটোর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সেঙাই আর সারুয়ামারু। বাইরে বেরিয়ে এই মোহন সকালে যেন আনিজা দর্শন হলো সেঙাইর।

রেশম-সবুজ ঘাসজমির ওপারে বসে রয়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। তার পায়ের কাছে একদল পোষা টেফঙের মত ছত্রখান হয়ে বসেছে জনকয়েক পাহাড়ী সর্দার। তাদের সারাদেহে বিচিত্র ধরনের পোশাক আর অলংকারের বাহার। মাঝখানে মধ্যমণির মত সভা আলো করে রেখেছে সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার।

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী মুঠো মুঠো রুপালী টাকা পাহাড়ী সর্দারদের থাবায় গুঁজে দিচ্ছে। আর ফিস্ ফিস্ করে কী এক আলোকদান করে চলেছে! হয়ত বা যীশু-মেরীর কোন বন্দনা-মন্ত্র। গুঢ়তম। আর পাহাড়ী সর্দারদের নির্লোম মুখে কখনো ক্রুর হাসি, কখনো কপিশ নিষ্ঠুরতা ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

সহসা বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর দৃষ্টি সাঁ করে হাউইর মত এদিকে এসে পড়লো: "আরে সেঙাই, এই যে সারুয়ামারু—তোমরা এসো।"

গুটি গুটি পায়ে ঘাসের জমি পেরিয়ে ম্যাকেঞ্জীর কাছে এসে দাঁড়ালো দুজনে। সেঙাইর কঠোর থাবায় অতিকায় বর্শার ফলায় মৃত্যু চমকে উঠলো। দুটি চোখ তার অজগরের ফণা হয়ে নির্ণিমেষ সালুয়ালাঙের সর্দারের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে।

সেঙাই! চমকে উঠেছিল সালুয়ালাঙের সর্দার। কোনদিন সে সেঙাইকে দেখেনি। সালুনারুর কথায় সেদিন খাসেম গাছের মগডালে মেহেলীর ছোট্ট ঘরখানায় তাকে পুড়িয়ে এসেছিল। পরে অবশ্য জেনেছিল সেঙাই মরেনি। কোহিমার পাহাড়ে তার জন্য এমন একটা সন্ত্রস্ত বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল, তা কী জানতো সে। চোখদুটো মমতাহীন হলো তার। প্রখর মুঠিটা সামনের বর্শার ওপর চেপে বসলো।

সেঙাই আর সালুয়ালাঙের সর্দার। দুই প্রতিপক্ষ। তিন পুরুষ ধরে পরস্পরের শত্রু। কোহিমার পাহাড়ে মুখোমুখি হলো কেলুরি আর সালুয়ালাঙ। আর এক বিচিত্র হাসিতে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর মুখখানা প্লাবিত হয়ে গেল।

ম্যাকেঞ্জী বললো: "রাত্তিরে কেমন ঘুমালে তোমরা?"

"গয়া (ভালো), গয়া (ভালো)।" রীতিমত সশব্দ হয়ে উঠলো সারুয়ামারু।

তির্যক দৃষ্টিতে সেঙাইর দিকে তাকালো ম্যাকেঞ্জী; "কী হে সেঙাই, মেহেলীকে বিয়ে করতে চাও? কী ব্যাপার?"

"হু-হু। চাই তো। মেহেলীকে আমি ছিনিয়ে আনবো হুই সালুয়ালাঙ বস্তী থেকে।"

"কী বললি?" ফুঁসে উঠলো সালুয়ালাঙের সর্দার।

ততক্ষণে বর্শাটাকে বাগিয়ে তাক করেছে সেঙাই। তার দুটি পিঙ্গল চোখে নিশ্চিত ঘাতনের সংকেত: "একেবারে শেষ করে ফেলবো না তোকে! ইজাহান্ট্সা সালো!"

"এই, এই এটা কী হচ্ছে! এটা চার্চ!" হাঁ-হাঁ করে লাফিয়ে উঠলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

চার্চের পবিত্র বেদীমূলে পাহাড়ী রক্তের কলঙ্ক লাগবে! যেশাসের পুণ্যনাম কলুষিত হবে—সারপ্লিসের আড়ালে ম্যাকেঞ্জীর দেহটা কেঁপে উঠলো। ব্রেটনব্রুক শায়ার গ্রামের সেই আউট ল রক্ত নিয়ে হোরি খেলায় প্রেরণা দিতে পারতো! কিন্তু সারপ্লিসের খোলস যখন থেকে দেহে মেখেছে, তখন

থেকেই অনেকটা নিরুত্তেজ হয়ে পড়েছে ম্যাকেঞ্জী।

সাঁ করে সেঙাইর একটি মণিবন্ধ চেপে টানতে টানতে তাকে সিজিটোর ঘরে রেখে এলো ম্যাকেঞ্জী। আসার সময় বললো; "কোন ভয় নেই। মেহেলীকে তোমার সঙ্গে বিয়ে আমি দেবো। তবে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে?"

"কী কাজ?"

"পরে বলবো।" বাইরে বেরিয়ে সালুয়ালাঙের সর্দারের কাছে চলে এলো ম্যাকেঞ্জী। তারপর তাকে নিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলো।

ম্যাকেঞ্জী বললো; "কোন চিন্তা নেই সর্দার। আমি যখন আছি, তখন মেহেলীকে তোমরা পাবেই। আরো অনেক টাকা দেবো। যে কাজের কথা বললাম, মনে আছে তো।"

"হু, হু। নিমকহারামী আমরা করি না। আমরা পাহাড়ী মানুষ। টাকা নিয়েছি, তার বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।"

"এই তো চাই। বস্তীতে গিয়ে যে কথা বলেছি, তা চাউর করে দাও।"

"হু-হু। আমরা এবার যাই। কিন্তু তুই দেখিস ফাদার, ঐ শয়তানের বাচ্চা সেঙাইটাকে একেবারে খতম করবো।" বলতে বলতে বাইরের ঘাসবনে নামলো সালুয়ালাঙের সর্দার। সেখান থেকে কোহিমার আঁকা-বাঁকা পথে।

পরের দিনও রক্তপদ্ম সকাল থেকে ধূসর বেলাশেষ পর্যন্ত কোহিমার পথে পথে ঘুরে বেড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু। চড়াই-উৎরাইএ ছন্দিত পথ। দোকান-পসার। সমতলের বাসিন্দাদের নানিজামেলা। ইম্ফল আর ডিমাপুরের দিকে প্রসারিত পথরেখা। বিচিত্র সব মানুষ। বিচিত্রের ভাষার কলশব্দ।

কেলুরি গ্রামের এক পাহাড়ী যৌবন প্রথম শহরে এসে একটার পর একটা বিস্ময়ের মেলায় মুগ্ধ হয়ে গেল। সারুয়ামারু এই শহরে অনেকবার এসেছে। এই অভিজ্ঞতার গৌরবে সেঙাইকে উদয়াস্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো সে।

সন্ধ্যার একটু আগেই ঘটনাটা ঘটলো।

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী সেঙাই আর সারুয়ামারুকে ডাকিয়ে পাঠালো।

কোহিমার আকাশে এখনও খানিকটা বিবর্ণ আলো লেগে রয়েছে। রেশম-সবুজ ঘাসের জমিটায় একটা বেতের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছে ম্যাকেঞ্জী। দু পাশে দু'টি মণিপুরী পুলিশ। হাতের মুঠিতে রাইফেলের বেয়নেট উদ্ধত হয়ে রয়েছে। বিদেশী চার্চের শান্তি এদেশী মানুষের পাহারায় নির্বিঘ্ন। বেথলেহেমের ধ্রুবতারাটি কোহিমার পাহাড়ে সুরক্ষিত হয়েছে রাইফেলের চকচকে হিংস্রতায়। যেশাস্! মানবপুত্রের স্বপ্ন কী চরিতার্থ হলো এই পাহাড়ী টিলার দেশে, এই বনময় শৈলশিরে! এই রাইফেলের, এই বেয়নেটের পাহারায়! কে জানে?

ইতিমধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেঙাই আর সারুয়ামারু। সারাদিন কোহিমার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে সেঙাই একটু আগে সিজিটোর ঘরে ফিরে এসেছিল।

ম্যাকেঞ্জীর সারামুখে মোহিনী হাসি; "এসো, এসো। এই যে সেঙাই! এই যে সারুয়ামারু! তারপর শহর কেমন দেখলে সেঙাই?"

"গয়া (ভালো), গয়া (ভালো)।"

একটু থামলো ম্যাকেঞ্জী। এক মুহূর্ত ভাবনার অতলতলায় তলিয়ে গেল সে; তারপর বললো, "কী চাই তোমার বলো দিকি সেঙাই? কাটা কাপড়? কত টাকা?"

আসেপাশে কোথায়ও থাবা পেতে বসেছিল পিয়ার্সন। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো সে, "হোয়াটস্ দিস্ ফাদার!"

"কী হলো পিয়ার্সন!" তির্যক চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী, "এত উত্তেজিত কেন?"

"এ ভারী অন্যায়! এরকমভাবে লোভ দেখিয়ে ক্রিশ্চিয়ানিটি স্প্রেড্ করে কী লাভ? সেণ্ট ম্যাথুর সারমন্ আছে, লোভ-রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" সারা দেহ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে পিয়ার্সনের।

প্রায় গর্জন করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "ডোণ্ট ইণ্টারফেয়ার! কীসে লাভ হবে বা না হবে, আমি তোমার কাছে জানতে যাবো না। লিভ্ দিস্ প্লেস এ্যাট্ ওয়ান্স—আই বিড্—"

"থ্যাংকস!" উদ্ধত পদক্ষেপে সামনের রাস্তায় গিয়ে নামলো পিয়ার্সন।

পিয়ার্সনের গমনপথের দিকে আগুনের চোখে তাকিয়েছিল ম্যাকেঞ্জী। যখন একটা উৎরাই পথের বাঁকে পিয়ার্সনের দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠিক সেই সময় দৃষ্টিটাকে সেঙাইর মুখের ওপর এনে ফেললো ম্যাকেঞ্জী। নাঃ, মেজাজটাকে একেবারে বিস্বাদ করে দিয়ে গেল লোকটা। একটা ডেভিল! স্কাউণ্ড্রেল!

কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিল বরফ-সাদা মানুষ দুটি; এক বিন্দুও বুঝতে পারছিল না সেঙাই কী সারুয়ামারু। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তারা।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "যে কথা বলছিলাম। বুঝলে সেঙাই, যা চাইবে তাই তোমাকে দেবো। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ!" ভীরু ভীরু চোখে তাকালো সেঙাই।

"কিছু নয়! ঐ আসানুদের (সমতলের লোক) সঙ্গে মিশবে না। ওরা লোক বড় খারাপ। এই সারুয়ামারুকে বলে দিয়েছি, তোমার বাবা সিজিটোকে বলে দিয়েছি। কী, সারুয়ামারু, বলে দিই নি?"

"হু হু"—নির্বিরাম মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সারুয়ামারু। "এ কথাটা ঠিক। ঐ আসানুরা ভারী শয়তান। ঐ যারা ধুতি পরে, তারা একেবারে টেফঙের বাচ্চা।"

"ঠিক, ঠিক। যা বলে দিয়েছি, তোমার

সব মনে রয়েছে দেখছি।" আত্মপ্রসাদের আলো ফুটলো ম্যাকেঞ্জীর মুখে, "যাক্ ও কথা। গাইডিলিওর কাছে যাও নি তো!

"না, না।"

"ভালো করেছো। ও ডাইনী! একেবারে জানে খতম করে ফেলবে।" বিচিত্র কৌশলে মুখেচোখে আতঙ্কের সব কটি রেখা ফুটিয়ে তুললো ম্যাকেঞ্জী; "খবরদার, ওর কাছাকাছি ঘেঁষবে না তোমরা।"

"ডাইনী! কে বললে ডাইনী? তুই মিথ্যে বলেছিস। হুই যে মাধোলাল বললে, ও হলো রাণী। খুব গয়া (ভালো)! গাইডিলিও রাণী ডাইনী তো নয়!" এবার সরাসরি চোখে তাকালো সেঙাই, "তুই সব মিথ্যে বলিস্। তুই বড় শয়তান! মাধোলাল কত কী বললে?"

"মাধোলাল!" চমকে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। কানের ওপর গরম সীসা যেন ঝলকে ঝলকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, "মাধোলাল কে?"

সারুয়ামারু বললো, হুই যে দোকান আছে ডিমাপুর যাবার পথে। সেই দোকানের মালিক মাধোলাল। কত কথা বললে মাধোলাল। ও তো আসানু (সমতলের লোক), ধুতি পরে। অথচ কত ভাল। আমার বন্ধু হুই, মাধোলাল। আমার বাবা—"

মধ্যপথে সারুয়ামারুকে থামিয়ে দিল ম্যাকেঞ্জী, "থামো থামো। আর কী বললে মাধোলাল?" উত্তেজনায় চোখের কপিশ মণি দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে ম্যাকেঞ্জীর।

এবার সেঙাই বললো, "হু হু, সায়েবদের সঙ্গে কোথায় যেন আসানুদের লড়াই হচ্ছে। কার যেন নাম বললো মাধোলাল। কী রে সারুয়ামারু বল্ না ঐ আসানুদের সর্দারটার নাম। আমার মনে পড়লে না।"

সারুয়ামারু বললো, "আসানুদের সর্দারটার নাম গান্ধীজী। মাধোলাল বললে, ওদের মহারাজ যেমন গান্ধীজী, আমাদের তেমনি রাণী গাইডিলিও।"

গান্ধীজী! কী ভয়ঙ্কর একটি শব্দ! সমতলের দেশ থেকে সব বাধা, সব ব্যবধান পেরিয়ে এই বনময় গিরিচূড়ায় এসে পৌঁছেছে। এই পাহাড়ের টিলায় টিলায়, এই গুহা আর কন্দরে ঐ নামটা কী এক ইন্দ্রজালে বাতাসের সওয়ার হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। গান্ধীজী! নাম নয়, একটা বিচিত্র ভোজবাজী। একটা দুর্বোধ্য ভেল্কী। এ ভোজবাজীর রহস্য অন্তত পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর অজানা। নাম নয়, ম্যাকেঞ্জীর মনে হোল, বিচিত্র এক বিস্ফোরণ। কলকাতা, সবরমতী, মহারাষ্ট্র—হিমালয়ের পাদপীঠ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড ঐ একটি নামের মধ্যে বিদীর্ণ হয়েছে। ঐ একটি নাম যোজন যোজন পথ অতিক্রম করে এই বুনো মানুষগুলির অস্ফুট চেতনায় কী অক্ষয় শিলালিপির মত আঁকা হলো। যেমন করে হোক্, এই পাহাড়ী পৃথিবী থেকে ঐ নামটিকে, বন্য মানুষের চেতনা থেকে ঐ শব্দটিকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। নইলে উপায় নেই, রেহাই নেই। একটা দুর্বল রন্ধ্র পেলে ঐ নামটা দু-কূল ভাসিয়ে হু হু প্লাবন নিয়ে আসবে কোন অতল তলায় তলিয়ে যাবে এই উত্তুঙ্গ নাগাপাহাড়। অন্তত খবরের কাগজে সেই ভয়াবহ সংবাদই দেশের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। ম্যাকেঞ্জী ভাবলো, আজই একবার পুলিস সুপার মিস্টার বসওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সেঙাই বলতে শুরু করলো, 'তোরা সায়েব। মাধোলাল বললে, তোদের সব ওদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দেবে। আমাদের রাণী গাইডিলিও না কী তোদের সঙ্গে লড়াই বাধাবে!"

বিষপাত্র এবার ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। রানী গাইডিলিও। লড়াই! বলে কী সেঙাই! এতক্ষণ কানে গরম সীসা পড়ছিল, এবার উল্কাপাত হতে শুরু করেছে ম্যাকেঞ্জীর।

রেটনরুকশায়ারের সেই দুর্দান্ত আউট ল আর আজকের পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী জীবনে যেন প্রথমে ভয় পেয়েছে। পাণ্ডুর গলায় সে বললো, "সব মিথ্যে! আমাদের সঙ্গে লড়াই নয় তো! আমরা তোমাদের বন্ধু, ওরা বিদেশী। ওরা আসানু (সমতলের লোক)!"

সেঙাই বললো, "মাধোলাল যে বললো, তোরা অন্য দেশ থেকে এসেছিস, তোরা বিদেশী! তোরা এখানে কী করতে এসেছিস?"

মাধোলাল! নামটাকে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কড়মড় চিবোতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। আচ্ছা, ঐ হাফনেকেড গান্ধীর চেলার সঙ্গে পরে দেখা হবে। স্বগতের মত কথাগুলো বলে একটা অখৃষ্টানসুলভ গালাগালি আবৃত্তি করলো ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাই তখনও বলছে, "কী করতে এখানে এসেছিস তোরা?"

এ জিজ্ঞাসার উত্তর জানা আছে ম্যাকেঞ্জীর। কিন্তু সে উত্তরমালা অন্তত এদের কাছে সাজানো চলবে না। একটি অর্ধনগ্ন পাহাড়ী মানুষের প্রশ্ন যে এত মারাত্মক, তা কী আগে জানতো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

সহসা এক মোহিনী হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুললো ম্যাকেঞ্জী। অদ্ভুত উৎসাহ, অখণ্ড প্রেরণা। ম্যাকেঞ্জী বললো, "আচ্ছা সেঙাই, সালুয়ালাঙ বস্তীর সঙ্গে তোমাদের খুব ঝগড়া, না?" আর একটি প্রসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাই মাথা নাড়লো, "হু, হু, ওরা আমাদের শত্রু।"

আচমকা চীৎকার করে উঠলো সারুয়ামারু, "কী রে সেঙাই, মাধোলাল না গান্ধীজীর লড়াই আর রাণী গাইডিলিওর কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিল।"

"হু হু—" প্রবলবেগে মাথা দোলাতে লাগলো সেঙাই। তারপরেই রক্তচোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জীর দিকে, "হুই শয়তানটা সব জেনে নিল। ওর জান একেবারে খতম করে দেবো। হুই শয়তানটা আমাদের বেইমান করলো।"

"আমরা বিশ্বাসঘাতী হলাম! বেইমানী করলাম! কী রে সেঙাই?"

"হু, হু! ইজাহান্ট্সা সালো! আমরা পাহাড়ী মানুষ; আমাদের কেউ অন্তত বিশ্বাসঘাতক বলতে পারে না! হু-হু, আনিজার গোসা এসে পড়বে। সব ওই শয়তান সাহেবটার জন্যে।" আচমকা পাশ থেকে অতিকায় বর্শাটা তুলে নিল সেঙাই। অব্যর্থ লক্ষ্য। উল্কার মত সাঁ করে বর্শার ফলাটা মণিবন্ধে গেঁথে গেল পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর। এক ঝলক তাজা রক্ত ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে এলো। চার্চের শুভ্র প্রাঙ্গণে মানবপুত্রের পবিত্র নামের ওপর এই পাহাড়ী পৃথিবী খানিকটা রক্তের কলঙ্ক মেখে দিল।

"মার্ডার! মার্ডার! অ্যারেস্ট! অ্যারেস্ট—সন্ অব্ বীচ্"—আর্তনাদ ক'রে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। সেই আর্তনাদের মধ্য দিয়ে মহাপ্রাণটাও যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে তার।
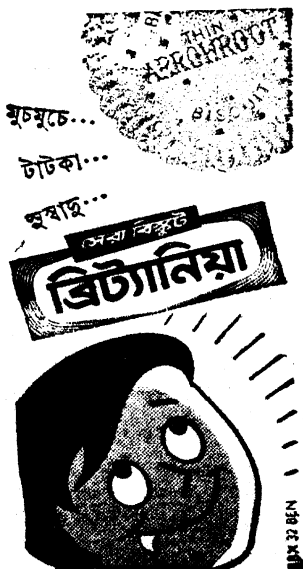
বুনো সেণ্টসুরের মত সেঙাইর ওপর মণিপুরী পুলিস দুটো ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজনের বেয়নেটের আধাআধি ফলা কোমরে গেঁথে গিয়েছে সেঙাইর। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত বসিয়ে দিল আর একটি মণিপুরী পুলিস।

"আউ-উ-উ—" চীৎকার করে রেশম সবুজ ঘাসবনে আছড়ে পড়লো সেঙাই।

চার্চের খান দুই বাড়ি ফারাকে আউট পোস্ট্।

ম্যাকেঞ্জী আগ্নেয় দৃষ্টিতে মণিপুরী পুলিস দুটির দিকে তাকালো: "শয়তানটাকে আউট পোস্টে নিয়ে যাও। পাহাড়ী তেজ সব কমে যাবে ঠিকমত আসানুরে (সমতলের লোক) ওষুধ পড়লে।"

মুখখানা আশ্চর্য বিকৃত দেখাচ্ছে ম্যাকেঞ্জীর। মণিবন্ধের ক্ষতের ওপর আঙুল টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। আর এক পাশে নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে আছে সারুয়ামারু। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারেই পাথর হয়ে গিয়েছে সে।

আবারও গর্জন করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী: "নিয়ে যাও, হারি-ই আপ্—"

প্রায় নিশ্চেতন দেহ। সেঙাইর দুটি হাত ধরে ঘাসবনের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে চললো মণিপুরী পুলিস দুটি।

আচমকা সব নিষ্ক্রিয়তা কেটে গেল সারুয়ামারুর। মণিপুরী পুলিস দুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেঙাইকে ছিনিয়ে নিল সে: "টেফঙ্গা রামখো। সেঙাইকে নিয়ে যাবে! একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না!"

সেঙাইকে ঘাসবনে ফেলে রেখে ফোঁস ফোঁস্ গর্জাতে লাগলো সারুয়ামারু।

"মার্ডার! মার্ডার! পুলিস, পুলিস!" চার্চ থেকে ম্যাকেঞ্জীর আর্তনাদ আউট পোস্টের দিকে ধেয়ে গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত। কোহিমার পথে ভারি বুটের উদ্ধত গর্জন উঠলো। পাহাড়ী ঝড়ের মত বাঙালী, বিহারী আর আসামী পুলিসরা চার্চের নিরাপত্তায় ছুটে এলো।

সেঙাইকে কাঁধের ওপর তুলে পাহাড়ী পথের উৎরাইতে পলাতক হয়নি সারুয়ামারু। এতক্ষণ তার চোখে শুধু পিঙ্গল আগুন ধক্ ধক্ জ্বলেছে। আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এক বিচিত্র সঙ্গীতের মত খিস্তি করে গিয়েছে সে: "আহে ভু টেলো! ইজা হুৎসা সালো! সেঙাইকে একবার ধরলে সাবাড় করে ফেলবো! ফাদার হয়েছে! ক্রুশ আঁকবো না। চাই না পী (কাপড়)! মাধোলাল ঠিক বলেছে, তোদের মত শয়তানের সঙ্গে লড়াই বাধাতে হবে। আমাদের পাহাড়ে এসে আবার আমাদেরই মারবে?"

পরশুদিন বিকেলে সেঙাইকে খানকয়েক নয়নলোভন রঙের কাপড় দিয়েছিল পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। সা করে সিজিটোর ঘর থেকে সেগুলো নিয়ে এসে ম্যাকেঞ্জীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারলো সারুয়ামারু। প্রবল ঘৃণায় মুখখানা কুঁকড়ে গিয়েছে তার। একদলা থুথু নিয়ে ম্যাকেঞ্জীর মুখে ছিটিয়ে দিল সারুয়ামারু: "থুঃ, থুঃ, এই নে তোর কাপড়। সেঙাইকে মারবে! আমাদের বস্তীতে একবার পেলে তোকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবো, থুঃ, থুঃ—"

মুখের ওপর একপিণ্ড বিজাতীয় তরল। গর্জে উঠলো ম্যাকেঞ্জী: "ওহ্! সন্স্ অব্ ডেভিল। ব্যাস্টার্ড। হিলি হিদেনস্! প্যাগনস্! আই এ্যাম্ এ ফাদার। আই মাস্ট সী—"

এতকাল গালাগালিগুলো স্বগত মহিমার নীচে গুণ্ঠিত থাকতো। আজ প্রথম সারপ্লিসের ছদ্মবেশ ফালা ফালা করে রেটনব্রুকশায়ারের সেই আউট্‌ ল আত্মপ্রকাশ করলো যেন। একটা উত্তেজিত ঘুঁষি বাগিয়ে তীরের মত সারুয়ামারুর দিকে ছুটে এলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। তার আগেই বর্শাটা থাবার মধ্যে ধরে দাঁড়ালো সারুয়ামারু। তার দুটি পিঙ্গল চোখের মণিতে এক বিচিত্র শিকারের ছায়া ফেলেছে। দুটো শিশু পাখির পালকের মত ধবধবে এক মানুষ। চোখের মণি কপিশ-রঙ্।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ম্যাকেঞ্জী! পাহাড়ী মানুষের থাবায় বর্শার ফলা বড় বন্য, বড় আদিম।

ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার আগেই চারদিক থেকে বিহারী, আসামী আর বাঙালী পুলিসরা বৃত্তের মত ঘিরে ধরেছে সারুয়ামারুকে। ঝকঝকে বেয়নেটের ফলাগুলো বুক, পিঠ—সারাদেহের দিকে হিংস্রভাবে উদ্যত হয়ে রয়েছে। অসহায় চোখে চনমন করে তাকালো সারুয়ামারু। পায়ের কাছে সেঙাই পড়ে রয়েছে। প্রায় নিশ্চেতন! সবুজ ঘাসের ওপর থকথকে থকথকে পাহাড়ী রক্ত জমে রয়েছে। রাশি রাশি টোঘুটুঘোটাঙ্ ফুলের মত।

গর্জে উঠলো ম্যাকেঞ্জী: "শয়তানটাকে নিয়ে যাও আউট পোস্টে। ঐ ডেভিলের বাচ্চাটাকেও তুলে নিয়ে যাও। সেঙাইর দিকে আঙুল প্রসারিত করে দিল ম্যাকেঞ্জী: আমি একটু পরেই যাচ্ছি। শয়তানটাকে আচ্ছা করে দাওয়াইর ব্যবস্থা করো। পাহাড়ী তেজ আমি উপড়ে দিয়ে যাবো, তবে আমার নাম ম্যাকেঞ্জী!"

অদ্ভুত নৈপুণ্য! বিচিত্র কারিৎকর্মা! পলকপাতের মধ্যে সেঙাই আর সারুয়ামারুর দেহ দুটি টেনে টেনে, কোহিমার বন্ধুর পাথুরে পথের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে আউট পোস্টের দিকে নিয়ে গেল পুলিসেরা।

খানিকটা পরেই আউট পোস্টে এলো ম্যাকেঞ্জী। মণিবন্ধের ওপর অতিকায় ব্যাণ্ডেজ।

"আসুন, আসুন ফাদার—" পুলিস সুপার বসওয়েল এখনও তার কোয়ার্টারে ফিরে যায়নি। ম্যাকেঞ্জীকে দেখে অভ্যর্থনায় সশব্দ হলো সে: "কী ব্যাপার, পুলিসরা সব রিপোর্ট দিয়েছে। ব্লাডশেড্ ইন্ চার্চ! এ তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! এই হিদেনগুলো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি।"

মণিবন্ধটা সামনে তুলে ধরলো ম্যাকেঞ্জী, তারপর বিবর্ণ হাসি হাসলো: "এই দেখুন, বর্শা দিয়ে আমাকে ফুঁড়েছে।"

"চার্চে গিয়ে মিশনারীর গায়ে হাত দেওয়া! এ আমি বরদাস্ত করবো না। দরকার হলে নাগা হিলস্ থেকে পাহাড়ী শয়তানদের চিহ্ন আমি মুছে দেবো। হাউ ডেঞ্জারাস্!" অব্যক্ত একটা আর্তনাদ করলো বসওয়েল।

"ডেঞ্জারাস! সত্যি ডেঞ্জারাস! তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। বাছা বাছা সব জাঁদরেল লোককে গভর্নমেণ্ট পাঠিয়েছে এই নাগা পাহাড়ে। এই দেখুন, আপনি ফার্স্ট গ্রেট্ ওয়ারের লোক, আমার অতীত জীবনটা নিশ্চয়ই বাঁড্স্ কাউণ্ট করে কাটে নি। তবু দেখুন এই প্যাগানগুলোকে বাগে আনতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছি!"

"দ্যাট্স্ রাইট্। কোন সন্দেহ নেই।" সরবে সমর্থন জানালো বসওয়েল।

"এই দেখুন না, পেলনস্মেনদের সঙ্গে এদের মিশতে বারণ করেছি। কত সতর্ক হয়ে এদের ওয়াচ্ করেছি কিন্তু যা হবার তা হয়েছে।" চোখে মুখে অবসন্ন হতাশা ফুটে বেরুলো ম্যাকেঞ্জীর।

"কী হলো? কী ব্যাপার?" চেয়ারটাকে টেনে ম্যাকেঞ্জীর কাছাকাছি অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো বসওয়েল।

"ডিমাপুরের পথের ওপর যে বাজারটা আছে, সেখানে গান্ধীর এক চেলার দোকান আছে। লোকটার নাম মাধোলাল।"

"কী সর্বনাশ! ওহ্ ক্রাইস্ট!" চীৎকার করে উঠলো বসওয়েল; "তারপর?"

"দ্যাট্ ডেভিল্স্ সন পাহাড়ীদের মধ্যে গান্ধীর নন্-কো-অপারেশনের কথা প্রচার করছে। গাইডিলিওকে রাণী বলে সকলকে মন্ত্র দিচ্ছে। যে পাহাড়ী দুটোকে একটু আগে এই আউট পোস্টে নিয়ে এসেছে পুলিসরা, সেই শয়তান দুটো ঐসব শুনে এসেছিল। এই নিয়ে কথা হতে আমাকে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছে ঐ সেঙাইটা।"

"ইজ্ ইট! মাধোলাল! গান্ধী! গাই-ডিলিও!" নামগুলিকে কড়মড় করে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো পুলিস সুপার বসওয়েল; "আচ্ছা; আমি জানি কেমন করে গান্ধী আর গাইডিলিওকে পাহাড়ীদের মন থেকে উপড়ে দিতে হয়।" তারপরেই গলার স্বরটা চড়ায় উঠলো বসওয়েলের; "চ্যাটার্জি, চ্যাটার্জি—"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ সাঁ করে ঘরের মধ্যে চলে এলো। তারপর বুটে বুটে প্রচণ্ড শব্দ করে একটা সন্ত্রস্ত সেলাম ঠুকলো: "ইয়েস্ স্যার—"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি! নাকের নীচে একজোড়া কাঁচাপাকা গোঁফ সগৌরবে বিরাজ করছে। প্রান্ত দুটি সূঁচের মত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্মমুখ। ডেমোক্লেসের তলোয়ারের মত অতিকায় নাকটা সামনের দিকে ঝুলে রয়েছে। বুকের আর পেটের মধ্যবিন্দুতে চামড়ার চওড়া বেল্ট। পিতলের প্লেটটা ঝকমক করছে। তার ওপর উদ্ধত মহিমায় কোহিমা পুলিসের নাম খোদিত হয়ে রয়েছে। বেখাপ্পা চেহারা। মুক্তকোষ কৃপাণ ঘুরিয়ে সেই যে চরিত্রটি উইন্ডমিলের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করতো! কী যেন নাম? ডন কুইকসোট্! অনেকটা সেইরকম।

পুলিস সুপার বসওয়েল বললো; "চার্চ থেকে যে পাহাড়ী দুটোকে ধরে এনেছে পুলিসরা, তাদের একটু দলাই-মলাইর ব্যবস্থা করতে হবে।"

"দলাই-মলাই!"

"ইয়েস্। ওদের সারা গায়ে বড় ব্যথা! আই মীন্, সেই বেদনার জন্যে একটু ম্যাসেজ! বুঝলে তো!" অর্থপূর্ণ একটা ভ্রূকুটি হানলো বসওয়েল।

একটু ইতস্তত করলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি! অনেক আমতা-আমতার বেড়া ডিঙিয়ে সে বললো; "কিন্তু স্যার, এই পাহাড়ীরা তো বোঝে না! আপনাদের হুকুম আমরা তামিল করি। ওরা মনে করে, আমরা মারি, আমরাই দোষী। ওরা স্যর আমাদের দু' চক্ষে দেখতে পারে না। আমরা এই ইণ্ডিয়ার প্লেন্স্ম্যানরা ওদের দু' চোখের বিষ।"

ধক্ করে বসওয়েলের কপিশ চোখদুটি জ্বলে উঠলো। মাত্র একটি মুহূর্ত! তারপরেই একটি বাৎসল্যের হাসি আলোময় করে তুললো তার বিশাল মুখখানাকে: "আইসোর! পাহাড়ীরা তোমাদের প্লেন্স্-ম্যানদের দেখতে পারে না! বোঝই তো, এরা হলো ওয়াইল্ড্ বিস্টস্। যাক্, সেদিন তুমি পাণ্ডুতে ট্রান্সফারড্ হবার দরখাস্ত দিয়েছিলে না?"

"ইয়েস্ স্যর: তবে বড় ভালো হয়! বড় ভালো হয়!" একেবারে বিগলিত হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। সঙ্গে সঙ্গে হাত কচলাতে শুরু করলো।

"তোমাকে মাস কয়েক পরে ট্রান্সফার করবো। আর ছোট দারোগা নয়, এবারে ও সি হয়ে যাবে তুমি।" কৌণিক দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জিকে দেখতে লাগলো পুলিস সুপার বসওয়েল। দেখতে লাগলো কেমন করে তার কথাগুলি ঐ নিগার্ডটার গোঁফময় মুখখানায় একটি লোলুপ প্রতিক্রিয়া আঁকছে।

ও সি! হৃৎপিণ্ডটাকে তরঙ্গিত করে একরাশ উল্লাস উঠে এলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জির; "প্রমোশন স্যর?"

"ইয়াস্, প্রমোশন! তার আগে ঐ পাহাড়ীগুলোকে একটু শায়েস্তা করতে হবে। বেশ ভালো করে; বোঝই তো! দলাই-মলাইর ব্যাপারে তুমি তো পাকা আর্টিস্ট! যাও, যাও—" আলোকদান করতে লাগলো পুলিস সুপার বসওয়েল; "তোমার স্কিল দেখতে চাই!"

রীতিমত প্রেরণা পেয়েছে বৈকুণ্ঠ। প্রচণ্ড উৎসাহে ভারি বুটে খট্ খট্ ঝড় তুলে পাশের ঘরে চলে গেল সে! পাকা আর্টিস্ট! নাঃ, অনেকদিন পর, অনেক, অনেক বছরের শীত-বসন্ত পেরিয়ে, সজারুর কাঁটার মত কালো কালো গোঁফের প্রায় অর্ধেক পাকিয়ে ফেলেছে বৈকুণ্ঠ! কিন্তু বরাতটা এমনই বিশ্বাসঘাতক; ছোট দারোগার চরে বিশ বছর কাটিয়ে ফেললো সে! অথচ প্রমোশনের জাহাজ এতদিন তার উদ্ধারে আসে নি। পাণ্ডু থানার ও সি! ধমনীতে ধমনীতে রক্তের কণিকাগুলি জলদ বাজনার মত উত্তাল হয়ে উঠলো। কোহিমা পাহাড়ের নিঃসঙ্গ বিছানায় দিনের পর দিন কাটিয়ে জীবনটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে বৈকুণ্ঠের। বউ রয়েছে গৌহাটী। বছরে একবার তার সোহাগ, তার বুকের কবোষ্ণ উত্তাপ পায় কী না পায়; ছুটিই মেলে না। পাঁজরের হাড়ে হাড়ে যক্ষ বিরহীর প্রাণকে বন্দী করে এক আঁজলা ছুটির তৃষ্ণায় পল-প্রহর গুণে যায় বৈকুণ্ঠ। ছট্ফট্ করে। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সঙ্গীন চেতনাটাকে ফালা ফালা করে ফেলে যেন। এই কোহিমা শহর! সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে এই পাহাড়চূড়া! চারপাশে চড়াই-উৎরাই, টিলা-গুহা, কন্দর আর নিবিড় অরণ্য! উপত্যকা আর মালভূমি। ঋতুতে ঋতুতে এর রঙ বদলের পালা; এর বেশ বদল, আর নানা সাজসজ্জার প্রসাধন। বৈকুণ্ঠের মনে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে সে এই পাহাড়চূড়ায় নির্বাসিত হয়ে রয়েছে। এক এক সময় সন্দেহ জাগে বৈকুণ্ঠের; সে আর রক্তমাংসের দেহময় মানুষ নয়; একটা বৈদেহী প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে কোহিমার পাহাড়ে পাহাড়ে।

শুধু নাগা আর নাগা! একটি মানুষ নেই কথা বলবার, একটি মানুষ নেই কথা শুনবার। পাহাড়ী, বন্য মানুষ। তিন বছর এখানে এসেছে, তাদের ভাষাই বোঝে না বৈকুণ্ঠ। এরা ছাড়া আর আছে সমতলের বাণিয়ারা। তাদের সঙ্গে আসর জমাতেও ছোট দারোগার সূক্ষ্ম মর্যাদায় কোথায় যেন আঘাত লাগে! এক এক সময় এই কোহিমা পাহাড় থেকে ফেরারী হয়ে যেতে ইচ্ছা করে বৈকুণ্ঠের!

আপাতত অন্য এক প্রেরণায় ফুসফুসটা বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠছে। পাণ্ডু থানার ও সি! এতদিনের লালিত স্বপ্নটা তবে হাতের থাবায় একটি পাহাড়ী আপেলের মত নেমে এসেছে! তার আগে একটি কর্তব্য বাকী রয়েছে বৈকুণ্ঠের। একটি অপরূপ নৈপুণ্যে অভিভূত করে ফেলতে হবে পুলিস সুপারকে। সে নৈপুণ্য একটি আদিম শিল্পলেখার মত সে এঁকে দেবে পাহাড়ী দুটির পিঠে। প্রাক্-সন্ধ্যায় যাদের চার্চ থেকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছে পুলিসরা। অন্তর্নিহিত বীররসের প্রেরণায় ভারি বুটজোড়া পাথুরে মেঝের ওপর ঠুকতে লাগলো বৈকুণ্ঠ। খট্ খট্।

(ক্রমশ)

চেনা আকাশ

দেবদাস পাঠক

প্রতিভাবান সুরকার ভাস্কর রায়ের অকালমৃত্যুর কথা অনেকেই হয়তো ভুলে যাননি। তাঁর সুরে গাওয়া বিভিন্ন গানের জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে গ্রামোফোন কম্পানীর মোটা রয়্যালটিতে। বৎসরান্তে একটি দিন ভাস্কর স্মৃতিদিবস জাঁকজমকের সঙ্গেই প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর অজস্র ছাত্র-ছাত্রী আর বন্ধুবান্ধব তাঁর রচিত সুরে গানের অঞ্জলি নিবেদন করেন।

ভাস্কর রায়ের অকালমৃত্যু যেমন সংগীত-প্রিয় জনসাধারণকে শোকার্ত করেছিল তেমনি অবাক করেছিল মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 'মধুকণ্ঠী' গায়িকা স্ত্রী ললিতা রায়ের সংগীতজগৎ থেকে আকস্মিক অপসরণ। ললিতা রায়ের জনপ্রিয়তা তখন শিখরস্পর্শী। একদিকে গ্রামোফোন কম্পানীগুলি তাঁর একখানা রেকর্ডের জন্য মোটা টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি করত, অন্যদিকে ততোধিক মোটা টাকার চেক নিয়ে নেপথ্য সংগীতের জন্য হামলা করত ফিল্ম কম্পানীর লোকজন। শুধুমাত্র ললিতা রায়ের গান অনেক মারখাওয়া বইকেও ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। 'এহেন ললিতা রায় স্বামীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এমনকি সর্বব্যাপী ফিল্ম কম্পানীর কর্ণধাররাও তার কোন হদিশ পেলেন না। হয়তো মনে আছে ললিতা রায়ের অন্তর্ধান নিয়ে সারা কলকাতা কেমন গুজব ছড়িয়েছিল। গুজবের একটি ভাষ্য ছিল স্বামীর শোকে সন্ন্যাসিনী হয়ে কোন আশ্রমে চলে গেছে ললিতা রায়। অপর মতে, এই মতটিই বহুল প্রচারিত, ভাস্করের কোন তরুণ ছাত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল ললিতা। ভাস্কর রায়ের অকালমৃত্যুর এই নাকি কারণ। মৃত্যুর পর তারই সঙ্গে চলে গেছে ললিতা। কিন্তু গান ছেড়ে দিল কেন? নাকি লজ্জা। এই সব গুজবের অনেকগুলি আমার কানেও এসেছিল। ভাস্কর রায় যখন মারা গেল আমি তখন সরকারী কাজে উড়িষ্যার এক মফস্বল শহরে।। ভাস্কর রায়ের মৃত্যুর খবর কাগজে দেখে ললিতাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। মামুলি সান্ত্বনা। মনে হয় শতসহস্র চিঠির ভিড়ে সে-চিঠি অপঠিতই থেকে গেছে। নাহলে নিশ্চয়ই একটা জবাব পেতাম। কলকাতা ফিরতে মাস তিনেক দেরী হয়ে গেল। ফিরে এসে ললিতার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তার আগেই ললিতার অন্তর্ধানের খবরে বাজার সরগরম।

তারপর তো কবছর কাটল। জনগণ এরই মধ্যেই তাদের নতুন 'মধুকণ্ঠী'কে খুঁজে পেয়েছে। গানের জলসায় আর ললিতা রায়কে তাঁদের মনে পড়ে কিনা কে জানে। তবে ভাস্কর রায়ের স্মৃতিবার্ষিকীতে অনিবার্যভাবেই ললিতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বন্ধুবান্ধবরা বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে হাহুতাশ প্রকাশ করেন। এমনি একটি সভাতে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম।

যদি বিহারের এক অখ্যাত মহকুমা শহরে ললিতার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে আমার দেখা না হতো তবে এ কাহিনী লিখতে বসতাম না। এ প্রসঙ্গে ললিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা বলে নিলে আর নতুন জল্পনার অবকাশ থাকবে না। ললিতা আমার বন্ধু। নিতান্তই সাদা-মাঠা সম্পর্ক। বাঙলা দেশের মফস্বল শহরে পাশাপাশি বাড়িতে আমরা শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। আমার কাকা আর ললিতার মামা স্বল্পবেতনের সরকারী কর্মচারী। মাবাপমরা মেয়ে ললিতা মামার গলগ্রহ। কাকার বাড়িতে আমিও ফুলের বিছানায় শুইনি। এছাড়া আরও একটি মিল ছিল আমাদের। দুঃখের ঢেউএ ভেসে একই সুরের ভেলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা। আমরা দুজনই গান ভালোবাসতাম। না, গাইতে আমি কোনদিনই পারতাম না। গলা আমার এমনি বেয়াড়া আর বেসুরো যে স্কুলের প্রার্থনা ক্লাশেও গলা মেলাতে ভরসা পাইনি কোনদিন। ললিতা তার উল্টো। আশ্চর্য সুরেলা গলা ছিল ওর। অবশ্য এ খবর আজ আর আপনাদের অজানা নয়। কেবল যেটুকু আপনাদের জানা নেই এখানে তারই কিছুটা বলব।

একবার শুনেই যে-কোন গান চট করে তুলে নিতে পারত ললিতা। দোকানে অথবা কারও বাড়ীতে হয়তো গ্রামোফোনে নতুন গান বাজছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত ললিতা। ঘাড় কাত করে শুনত, আর একবার শুনেই সুরটা তৈরী হয়ে যেত। মুশকিল হতো গানের কথা নিয়ে। কথাগুলো সব সময় ভালো বোঝা যেতনা, গেলেও একবার শুনে সব কথা মনে রাখা সম্ভব হত না। তখন হত আমার বিপদ। সে-গান দোকানের গ্রামোফোনেই হোক আর কারও বাড়ির গ্রামোফোনেই হোক আমাকে গিয়ে একাধিক-বার আস্তে বাজিয়ে কথাগুলো টুকে আনতে

হতো। কথা দেখে দেখে গোটা গানটা আবার গাইত ললিতা। একবার, দুবার, বারবার। যতক্ষণ না নিজের কাছে ঠিক বলে মনে হতো ছাড়ত না। হয়তো কোথাও কোন গানের একটি মাত্র কলি শুনেছে, কদিন তাই গুনগুন করত। এমনি কথা ছাড়া কোন গানের সুর ললিতার গলায় শুনলেই আমি ভয় পেতাম। কারণ তারপরই আমাকে ছুটতে হবে শহরের তাবত গ্রামোফোনওয়ালা লোকের বাড়ি। কার কাছে সেই রেকর্ড আছে। এক লাইনের সুরেই গোটা গানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইত ললিতা। বাকী সুরতো জানা নেই। তবে সে গানের একমাত্র শ্রোতা ছিলাম আমি। আর ললিতার গলায় সব গানই আমার ভালো লাগত। এমনি তখনকার দিনের অনেক বিখ্যাত গানের গোটাটা আমি ললিতার মুখে প্রথম লাইনের অথবা মাঝখানের কোন লাইনের সুরে শুনেছি। পরের যুগে ললিতা যখন বিখ্যাত হয়েছে, ওর অনেক গানই শুনেছেন আপনারা, আমিও। সে-গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে জনসাধারণ, তারজন্য মোটা অংকের চেক দিয়েছে গ্রামোফোন কম্পানী-গুলি। কিন্তু আমার প্রথম জীবনে ললিতার গান শোনার সেই আনন্দরোমাঞ্চ তেমন করে আর অনুভব করিনি কখনও।

আমাদের সাহচর্যে প্রথম ছেদ পড়ল ললিতার মামা হঠাৎ একটা প্রমোশন পেয়ে কলকাতা বদলী হলেন বলে। আমরা সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। এরপর আমি যখন মফস্বল কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে চাকরি খুঁজতে কলকাতা এলাম, ললিতা তখন ভাস্কর রায়ের স্ত্রী। নিজেও খ্যাতির সিঁড়ি জোরপায়ে ভাঙছে। ললিতা কলকাতা আসবার পরেও কিছুদিন পত্রালাপ নিয়মিত ছিল। ওর চিঠির সবটা জুড়েই থাকত নতুন নতুন গান শেখার কথা। আর এবার সবটাই ঠিক সুরে শেখা সে-সব গান আমাকে শোনাতে পারছে না বলে ওর আফসোসের অন্ত ছিল না।

পাড়ার জলসায় গান শুনিয়ে যেদিন উচ্ছ্বসিত হাততালি পেয়েছিল, সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরেই চিঠি লিখেছিল আমাকে। সেই জলসাতেই ভাস্কর রায়ের সংগে প্রথম আলাপ হয় ললিতার। ওর গান শুনে নিজেই এসে আলাপ করেছিলেন ভাস্কর রায়। কেবল তাই নয়, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর কাছে গান শিখতে আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি! ললিতা তখন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আনন্দে জ্বলে উঠে পরমুহূর্তেই নিভে গিয়েছিল। গান তো শিখবে, কিন্তু টাকা! টাকা সে পাবে কোথায়? মাথা নীচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে কেবল মাটি খুঁড়েছিল ললিতা। বেশবাস আর নিরাভরণ দেহ থেকেই হয়তো খানিকটা আঁচ করে-ছিলেন ভাস্কর রায়। বলেছিলেন, আমি এমনিতেই শেখাব।

ললিতা বলেছিল, একবার মামার কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

আচ্ছা আমি নিজেই দেখা করব তাঁর সংগে।

ভাস্কর রায়ের আগ্রহ দেখে পাড়ার লোকেরা একটু অবাক হয়েছিল। মোটা টাকা না পেলে কখনও গান শেখাত না ভাস্কর রায়। আর অনেকটা এই কারণেই ভাস্কর রায়ের কাছে গান শেখা সামাজিক ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছিল।

জলসার শেষে ললিতার মামার সংগে দেখা করেছিলেন ভাস্কর রায়, সংগে পাড়ার দুজন লোক।

ভাস্কর রায়ের প্রস্তাব শুনে প্রথমে একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন মামা। কিন্তু ওর মুখে ললিতার গলার সম্ভাবনার কথা শুনে আর পাড়ার লোকের কাছে ভাস্কর রায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে খুশী মনেই রাজী হলেন।

যাবার আগে মামাকে বলেছিলেন ভাস্কর রায়, দেখবেন আপনার ভাগ্নী একদিন বাঙলা দেশের সেরা গাইয়ে হবে।

ভাস্কর রায়ের সে-কথা যে মিথ্যা হয়নি ললিতার কৃতিত্ব তার প্রমাণ।

আগেই বলেছি রাত্রে আমাকে চিঠি লিখেছিল ললিতা। দীর্ঘ চিঠি। সব রকম খুঁটিনাটি কথায় বোঝাই। আর ছিল খুশি, অজস্র, অফুরন্ত। সারা রাত ললিতা ঘুমুতে পারেনি। অস্বস্তি আর উত্তেজনায় রাত ভোর হয়েছে। ভাস্কর রায়ের একটা কথা, আড়াল থেকে শোনা, বারবার তার কানে বেজেছে—আপনার ভাগ্নী একদিন বাঙলা দেশের সেরা গাইয়ে হবে।

এর পর থেকে ললিতার নতুন জীবনের শুরু। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ললিতার আর পড়া হয়নি। প্রথমত মামার আর্থিক অবস্থা, দ্বিতীয়ত গান তখন ওকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। ভাস্কর রায়ের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করবার মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রথম রেকর্ড বেরল ললিতার। আমাকে একখানা পাঠিয়েছিল। রেকর্ড হাতে করে দোকানে গিয়ে সে-গান বাজিয়ে শুনে এলাম। ললিতার সেই প্রথম গানেই বেশ নাম হয়েছিল।

এরপর থেকে ললিতার চিঠিপত্র কমে আসতে লাগল। যাও আসত তার সবটুকু জুড়ে থাকত ভাস্কর রায়। কী তার প্রতিভা, কী তার নিষ্ঠা। ললিতার নিতান্তই ভাগ্য ভালো না হলে ভাস্করদের মত লোক তাঁকে ডেকে এনে গান শিখবার সুযোগ দেবেন কেন। কত বড় বড় লোকের মেয়েরা রাশি রাশি টাকা দিয়েও তাঁর কাছ থেকে গান শিখবার সুযোগ পায় না ইত্যাকার সব কথায় ভর্তি থাকত সে-চিঠি। সে-চিঠির মধ্যে ভাস্কর রায়ের আড়ালে ললিতার ছায়াটুকুও আমি খুঁজে পাইনি। অথবা কেবল ছায়াটুকুই ছিল।

এমনি করে গোটা তিনেক বছর আরও কাটল। ললিতা ততদিনে পসার জমিয়ে নিয়েছে। রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমার প্লেব্যাক সবেতেই তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি। সবার উপর সে তখন ভাস্কর রায়ের স্ত্রী।

ললিতার সঙ্গে আবার দেখা হলো বি-এ পাশ করে কলকাতা চাকরি খুঁজতে এসে। ইছাপুরে এক পিসীর বাড়ি উঠেছিলাম। একদিন চাকরির উমেদারি শেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় বড় রাস্তার ধারে ভাস্কর রায়ের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করলাম ললিতার সঙ্গে।

ভাস্কর রায় বাড়ি ছিলেন না। আমাকে দেখতে পেয়েই ললিতা ছুটে এলো। হাত ধরে নিয়ে দামী কাপড়ে মোড়া সোফায় বসল। কিন্তু কেবল এক মুহূর্তের জন্য আমার সেই বাল্যসখী ললিতাকে চিনতে পেরেছিলাম। পরমুহূর্তেই সে কোথায় হারিয়ে গেল। অবশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব খবর জিজ্ঞাসা করল। তবে সবই কেমন যেন যান্ত্রিক মনে হলো। চা খাবার পরে একটা অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে মন খারাপ হয়ে গেল। এই কি আমার বন্ধু ললিতা। খ্যাতি আর অর্থে ললিতাও যে বদলে যাবে, কখনও ভাবতে পারি নি। ললিতা আবার যেতে বলেছিল, আমিও মামুলি সম্মতি জানিয়েছিলাম। কিন্তু আর যে কোনদিন যাব না এ সিদ্ধান্তে তার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। ললিতার মুখ দেখে মনে হলো আমার মনের কথা ও-ও বুঝতে পেরেছিল।

অনেক দরখাস্ত আর অনেক ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলাম এই সময়। বিস্তর ঘোরাঘুরির কাজ। বাঙলা থেকে বিহার, উড়িষ্যা তিন রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হবে। চাঁদনী বাজার থেকে নতুন হোলড অল আর সুটকেস কিনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিন চার মাস বাইরে থাকি আবার কিছুদিনের জন্য ফিরে আসি কলকাতা। আবার বাইরে। মফস্বল শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চেনাগলার গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়ি, ললিতার নতুন রেকর্ড। শো শুরু হবার আগে সিনেমায় গান হচ্ছে, ললিতার গলা। এই সময় একটি হিন্দী ফিল্মের নেপথ্য-সঙ্গীতের জন্য ললিতার নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

একবার কলকাতা ফিরে ভেবেছিলাম ললিতার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু কাগজে দেখলাম ভাস্কর রায় সস্ত্রীক বম্বে গেছে কোন ফিল্মের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে। সুর দেবে ভাস্কর রায় আর নায়িকার গানগুলো গাইবে ললিতা।

তারও কিছুদিন পরে কাগজেই দেখলাম ভাস্কর রায়ের অকালমৃত্যুর খবর। আমি তখন উড়িষ্যায়। সেই দিনই ললিতাকে চিঠি লিখেছিলাম। সেকথা আগেই বলেছি।

আবার হঠাৎ এমনি করে বিহারের এই অখ্যাত শহরে ললিতার সঙ্গে দেখা হতে পারে কল্পনা করিনি। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে মিল রেখে পা ফেলতে হবে ঘটনার এমন কোন দায় নেই। সে নিজের ইচ্ছেয় ঘটে।

আমি তখন সরকারী কাজে বিহারের ছোট এক শহরে আস্তানা গেড়েছি। অফিসের পর বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সময়টা বোধ হয় মাঘের শেষ কি ফাল্গুনের প্রথম। বিকেলের হাওয়ায় শীতের আমেজ শেষ হয়ে এসেছে। শহর পাশে রেখে লাল-মাটির রাস্তা যেখানে রেলের গুমটি ছেড়ে মাঠের দিকে মোড় নিয়েছে সেখানেই হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কালোপাড় শাদা খোলের শাড়ি পরনে, হাতে দু-গাছা বালা। মাথার এলো খোঁপা ছাতার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। বিস্ময়ের ধাক্কা আমরা কেউই হঠাৎ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম, থাকতামও হয়তো যদি না আচমকা আমার পিছন দিক থেকে সাইকেল রিক্‌শ ঘণ্টি বাজাত। পশ্চিম আকাশে সূর্য সবে লাল ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়েছে। রোদ না থাকলেও বেশ মেলায়নি। দৃষ্টিভ্রম হবার কোন কারণ ছিল না।

ললিতা প্রথম আত্মস্থ হলো। বলল, সরে দাঁড়িয়ে রিক্‌শটাকে যেতে দে।

এক মুখ বিরক্তি নিয়ে অস্ফুটস্বরে কী একটা স্বগতোক্তি করে রিক্‌শওয়ালা চলে গেল।

বললাম, তাহলে লোকে যা বলে তা সত্যি নয়? তুই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাসনি দেখছি।

ললিতা বলল, লোকে তাই বলে বুঝি? আর কী বলে?

বললাম, বলে হয়তো অনেক কিছুই, তবে লোকালয়ের বাইরে থাকি বলে তার সব কথা কানে পৌঁছায় না।

ললিতার মুখ কেমন গম্ভীর দেখাল। পরমুহূর্তেই হাসি টেনে বলল, থাক আমার কথা তো লোকের মুখে অনেকই শুনেছিস, আরও শুনবি। এবার তোর কথা বল। এখানে কী করে এলি? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয়।

বললাম, না, নির্বাসনে আসবার পক্ষে জায়গাটি আদর্শ হতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু বেড়াবার পক্ষে খুব মনোরম নয়। এসেছি সরকারী কাজে। তাও মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। কাল রাত্রের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি।

ললিতার চোখ দুটো যেন একটু ম্লান হলো। বলল, কালই?

বললাম, হ্যাঁ, পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রোগ্রাম আগে থেকেই তৈরী আছে। আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করি।

কোথায় আছিস?

বললাম, ডাক-বাঙলোয়। তুই এখানে কী করছিস?

ললিতা বলল, মাস্টারী।

মাস্টারী! গানের! আমার গলায় বিস্ময়ের সুরটা বোধ হয় একটু প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত গায়িকা, ভাস্কর রায়ের স্ত্রী ললিতা রায় বিহারের এক মহকুমা শহরে গানের মাস্টারী করছে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। কিন্তু না, বিস্ময়ের আরও কিছু বাকী ছিল।

আমার কথা শুনে ললিতা একটু থমকে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, না, গান নয়, বাঙালী মেয়েদের এম ই স্কুলে সেকেণ্ড টিচার।

খবরটা অবাক হবার মত সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় তো ললিতা রায়ের এই স্বেচ্ছানির্বাসন।

আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। যেতে যেতে দু-চার জোড়া কৌতূহলী চোখ আমাদের ছুঁয়ে গেল।

ললিতা বলল, চল আমার বাড়িতে চল। ও, কতদিন পর যে তোর সঙ্গে দেখা হলো।

বললাম, হ্যাঁ, তা অনেকদিন হলো বই কি।

মাঠের রাস্তা ছেড়ে আবার আমরা শহরের ভেতর ঢুকলাম। আঁকাবাঁকা ধুলো-রাঙা পথ ভেঙে মিনিট পনের পরই পৌঁছে গেলাম ললিতার বাড়িতে। পাকা দেয়াল, খোলার চাল। এই ধরনের বাড়িই এদিকে বেশী। ভেতরের দিকে এক ফালি বারান্দা। তারপর উঠোন আর উঠোনের এক কোণে পাড়ঘেরা ইঁদারা।

ঝি এসে দরজা খুলে দিল। নতুন লোক দেখে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ললিতা বলল, আমার ভাই। সরকারী কাজে এসেছে এখানে।

ভাই শুনে ললিতার মুখের দিকে তাকালাম। ঝিটি ততক্ষণে চলে গিয়েছে।

ললিতা বলল, মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে নিতান্তই আত্মীয় ছাড়া অন্য পুরুষের আসাটা শোভন নয়। বুঝলি তো। এবার তুই বারান্দায় মাদুরে একটু বস, আমি চট করে চানটা সেরে আসি।

ঝি বারান্দায় মাদুর পেতে দিল। আর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গেল। লণ্ঠন দেখে মনে হলো সন্ধ্যা হয়েছে। এরই মধ্যে বাইরের আম গাছের পাতার ফাঁকে থোকা থোকা অন্ধকার জমেছে।

ইঁদারার ধার থেকে ঝপ্-ঝপ্ জলের শব্দ আসছিল, আর মাঝে মাঝে গুন-গুন করে টুকরো সুর। চান করতে করতে গুন-গুন করছে ললিতা। জলের শব্দ ছাপিয়ে এক-আধ টুকরো সুর ধরা পড়ছিল কানে। হঠাৎ মনে হলো, এ সুর তো আমার চেনা। খুবই চেনা। ও, কতদিন পর আবার শুনলাম। এ গান এখনও মনে আছে ললিতার! আমাদের ছেলেবেলায় শোনা গানের কলি। বোসেদের বাড়ি সার্কল অফিসার বেড়াতে এসেছিল সপরিবারে। তাদেরই একটি মেয়ে গেয়েছিল গানটি। সেই একবার ললিতা আমাকে গানের কথা জোগাড় করে দিতে বলেনি। বললেও সাহস হতো না। সার্কল অফিসরের মেয়ে তো আমাদের কাছে দেবকন্যা। তাঁদের ধারে-কাছে যাবার দুঃসাহসের কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না। ফলে দুটো লাইন আর গোটাকতক টুকরো কথা সুরের সুতোয় পরিয়ে মালা গাঁথবার চেষ্টা করত ললিতা। মনে আছে গানটা আমাদের দুজনকেই খুব মুগ্ধ করেছিল। আশ্চর্য সেই গান এখনও মনে আছে ললিতার। শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি ছোট হয়ে গেছি। পায়ের দিকে ছেঁড়া একটা ঢোলা ফ্রক পরে পুকুরধারে বকুলতলায় বসে ললিতা আমাকে গান শোনাচ্ছে আর আমি হাফ প্যাণ্ট পরে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের ওপর থুতনি রেখে তার গান শুনছি।

হঠাৎ শুনলাম ললিতা বলছে, কী ভাবছিস অমন করে? তাকিয়ে দেখলাম আমার সামনে সেই খেলার সাথী ললিতা নয়, বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড টিচার ললিতা রায়। তবু কোথায় যেন একটু সাদৃশ্য এখনও খুঁজলে পাওয়া যায়।

বললাম, সে-গানটা তোর এখনও মনে আছে?

ললিতা চমকে উঠল। বলল, গান! গান শুনলি কোথায়?

কেন? এই যে চান করবার সময় গুন-গুন করছিলি। সেই যে বোসেদের বাড়ি সার্কল অফিসরের মেয়ে গেয়েছিল, সেই গান। ছেলেবেলার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

ললিতাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাল। বলল, কে জানে, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গান তো আমি আর গাই না। আচ্ছা দেখছি চায়ের কী করল। ললিতা উঠে গেল।

বুঝলাম ও প্রসঙ্গ এড়াতে চায়। একটু পরে ঝির হাতে খাবার আর নিজের হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে এলো।

মাদুরে বসে বলল, এবার তোর কথা বল শুনি। বিয়ে করেছিস?

বললাম, না, সুযোগ হয়নি।

করলে খবর দিস। খেটে দিয়ে আসব।

বললাম, আচ্ছা মনে রাখব।

এমনি সব অবান্তর কথায় এলো পথে অনিচ্ছুক পায়চারি করে এক সময় রাত হয়েছে বলে উঠে পড়লাম।

ললিতা বলল, তাহলে কালই* যাবি? তোর কলকাতার ঠিকানাটা রেখে যাস। চিঠি লিখব। উত্তর দিস কিন্তু।

উঠে আসছিলাম, ললিতা ডাকল। শোন, একটা কথা——ললিতা থামল।

বললাম, বল, থামলি কেন?

আমি যে এখানে আছি কাউকে বলিস না। মামাকেও না। কাউকে না জানিয়েই এখানে এসেছি।

বললাম, আচ্ছা।

পরদিন সে শহর ছেড়ে এলাম। এদিক ওদিকে কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরতে আরও একমাস হলো। মেসে ফিরে দেখলাম আমার টেবিলের ওপর চার পাঁচখানা চিঠি জমে আছে। একখানা পুরু খাম। হাতের লেখাটা মনে হলো ললিতার। দীর্ঘ চিঠি। কিন্তু এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। পড়ে চুপ করে বসে রইলাম। ললিতার ব্যবহারে আমি সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু চিঠি পড়ে সেকথা আর মনে রইল না। বরং আমিও ওর প্রতি যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করিনি বলে লজ্জিত বোধ করলাম।

ললিতার চিঠিটা মোটামুটি এখানে তুলে দিচ্ছি। যেটুকু অপ্রয়োজনীয় সেটুকু কেবল বাদ দিচ্ছি।

নীপু, এমনি করে তোর সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবিনি। কোনদিন যে আর হবে তাও ভাবিনি। হয়তো বুঝতে পেরেছিস আমার এ নতুন জীবনে পুরনো পরিচিত কেউ বাঞ্ছিত নয়। কারণ আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু তোর কথা আলাদা। তুই তো আমার পরিচিতদের একজন নয়। তুই নীপু।

বহুদিন পরে হঠাৎ তোকে দেখে মনে হলো আমি একদিন আমার জগতে নিজের মত করে বেঁচেছিলাম। সে যে কতদিন আগে তা ভুলতে বসেছি। তোর সঙ্গে দেখা তো আমার সেই নিজের সঙ্গে এই নিজের দেখা। কিন্তু তুই বোধ হয় আমার সম্পর্কে অন্য ধারণা নিয়েই গিয়েছিস। আমার মনের খুশি হয়তো মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। তার কারণ খুশী হওয়া, নিজের কাছে নিজের মত হওয়াই আমি ভুলে গেছি। তুই যদি আর কটা দিন এখানে থাকতিস, হয়তো স্বাভাবিক হবার সুযোগ পেতেম আমি। কিন্তু তার আগেই তুই চলে গেলি।

নিজের ব্যবহারের জন্য তোর কাছে ক্ষমা চাইতে এ-চিঠি লিখতে বসিনি। বসেছি অনেক দিনের জমান কথা তোকে বলে কিছুটা হাল্কা হব বলে। এ শুধু তোকে বলা নয়, নিজের কাছেই বলা। এতদিন বলতে পারিনি, কারণ সেই ললিতাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তুই এসে তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিস। সেই যে গানটার কথা সেদিন সন্ধ্যাবেলা জিজ্ঞাসা করছিলি, ছেলেবেলায় যে-গান আমি গাইতাম, তাকে সত্যিই খুঁজে পেয়েছি, আর সেই সঙ্গে খুঁজে পেয়েছি নিজেকে। তুই যেদিন চলে গেলি, সারা সন্ধ্যা গুন-গুন করে নিজের মনে গাইলাম গানটা। কতদিন আগে শুনেছিলাম, সুর অনেকটাই তার ভুল, কিন্তু মূল্য সবটুকুই তার খাঁটি। তুই না এলে হয়তো এমনটি হতো না।

তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দুঃখের অন্ধকার থেকে তুই আমাকে মুক্তি দিয়েছিস। কী করে—বলছি। এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের যে-অধ্যায়টার সঠিক খবর তুই আরও অনেকের মত জানিস না, তার কিছুটা তোকে বলব। কথা অল্প, ঘটনা সামান্য, কাজেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না। তাছাড়া আমার বিষয়ে তোর ধৈর্যের তো অভাব নেই।

আমার নতুন জীবন শুরু হয়েছিল বহুজনের ঈর্ষাকণ্টকিত পথে। আমার মত অজ্ঞাত, অখ্যাত, দেখতে নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে ভাস্কর রায়ের বিয়ে কলকাতার গানের জগতে বিশেষ একটা হৈচৈ তুলেছিল। বিশেষত যখন একাধিক সুন্দরী, শিক্ষিতা ধনীর দুহিতা ভাস্কর রায়ের স্ত্রী হতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করত। এ ছাড়া ছিল দু-চারজন ছাত্রী। গানের জগতে তাদের প্রতিষ্ঠা কিছু কম নয়। তাদের নাম করলে চিনে ফেলবি। আমার স্বামীই সংগীত জগতে তাঁদের জায়গা করে দিয়েছিল। আর জায়গা কেবল গানের জগতেই করে দেয়নি, তাদের অন্তত একজন ভাস্কর রায়ের এক অদৃশ্য জগতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। একথা জেনেছি পরে। যদি অসময়ে আমি উড়ে এসে জুড়ে না বসতাম, তাহলে সেই এক-জনই আমার মত বহুজনের ঈর্ষাকণ্টকিত পথে ভাস্কর রায়ের ঘরে ঢুকত। কিন্তু সেই হতো ভালো। দশজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে জয়ের আনন্দ ওরা উপভোগ করতে পারে। আমি ও-দলে নই। আমার অপরাধ ওরা কেউ ক্ষমা করেনি। বিশেষত সেই একজন। কিন্তু এসব প্রথমে নজরেই পড়েনি। আমি তখন গান-পাগল। আর গানের প্রতি আমার ভালোবাসা গানের জন্যই আর একজনকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার স্বামী তখন আমার কাছে গানের শারীর রূপ। দুটিকে আলাদা করে দেখিনি কখনও। কিন্তু আমার স্বামী আমার মধ্যে দেখেছিল শুধু আমার কণ্ঠ। গলা আমার ভালো, একথা নিজে বললে নিশ্চয়ই দম্ভোক্তি হবে না। সেদিন পাড়ার জলসায় সেই গলাই, তখনও কাঁচা, চিনতে পেরেছিল গলার জহুরী ভাস্কর রায়। ভাস্কর রায় অসাধারণ প্রতিভাশালী সুরকার। কিন্তু স্বকণ্ঠে সেই সুরের রূপারোপের ক্ষমতা
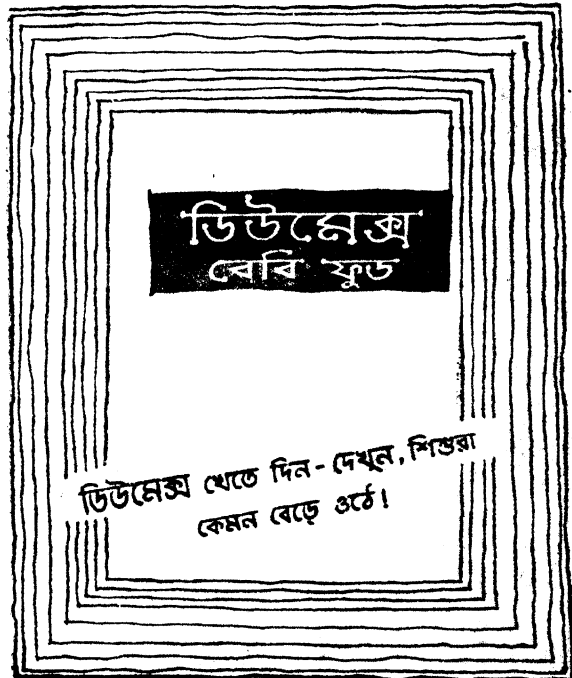
তাঁর সীমাবদ্ধ। গলা ভালো নয়। তাই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আর স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন ছিল তেমনি সুরেলা কণ্ঠের। হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আমার মধ্যে সেই সম্ভাবনা সেদিন তাঁর চোখে পড়েছিল।

তারপর কী থেকে কী হলো। হঠাৎ দেখলাম আমি ভাস্কর রায়ের স্ত্রী। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর ঘরকন্না শুরু হলো না, আমাদের শুরু হলো গুরু-শিষ্যার সুরবিহার। আমি পড়ে থাকতাম গান নিয়ে। গলা তৈরী করতে হবে। আরও, আরও ভালো করে। আরও দশজনের মত আমিও স্বামীর ছাত্রী। হয়তো বিশেষ কেউ। অন্য কিছু ভেবে দেখবার মত তখন মনই নয় আমার। এগিয়েও গেলাম খুব তাড়াতাড়ি। স্বামীর সুরে প্রথম রেকর্ড করলাম আমি। সে-রেকর্ড তোকে পাঠিয়েছিলাম। হয়তো বাজিয়ে শুনেছিস। এরপর একের পর এক নতুন গান রেকর্ড করিয়েছি। অর্থ আর যশ দুহাত উপছে পড়েছে। আমি তখন জন-সাধারণের মন কেড়েছি। লোকে বলেছে আমাদের নাকি রাজযোটক। ভাস্কর রায়ের প্রতিভার বিকাশ নাকি আমার মত স্ত্রী না হলে কোনদিনই সম্ভব ছিল না। কোন-দিকে চাইবার অবকাশ পাইনি। স্বামী প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতেন। আমিও তো ঘরে একা নই। আমার ছিল গান। নতুন নতুন স্বরলিপি থেকে গান তোলা। স্বামী ঘরে থাকলে তাঁকে শোনাতাম। কোন জায়গা ভালো না লাগলে সুর পাল্টাতেন। এমন কি যে সব গান অন্যে গাইবে তার সুরটাও আমি গেয়ে তুলে না দিলে হতো না।

কিন্তু এমনি করে আর চলল না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম আমি কেবল ছাত্রী নই, স্বামীর স্ত্রীও বটে। আমি কেবল গায়িকা নই, মেয়েও। কিন্তু সেদিন নিজের চারদিকে আর কোন অবলম্বন পেলাম না। যেদিন প্রথম বুঝলাম ভাস্কর রায় আমার সুরকার স্বামী আর আমি তাঁর গায়িকা স্ত্রী মাত্র, এ ছাড়া আর কোন সম্পর্কই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি, সেদিনের হতাশার কথা লিখে বোঝাতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। মনে হলো সব মিথ্যা। আমার গান মিথ্যা, মিথ্যা আমার নাম-যশ। কী হবে এসব দিয়ে যদি আমি স্ত্রীর অধিকার না পেলাম। আমি যখন গান নিয়ে ডুবে ছিলাম, আমার স্বামীকে তখন সেই ছাত্রী পুরোপুরি গ্রাস করেছে। আগে যদিও বা আড়াল আবডাল ছিল, এখন খোলা-মেলা, নিঃসংকোচ, অনাবরণ তাদের সম্পর্ক।

দেরি হলেও আমি ভাঙা ঘর গড়তে মন দিলাম। মাথায় উঠল গান।

কিছুদিন ধরে নানারকম কানাঘুষো আমার কানে আসছিল। আমার স্বামী আর তার সেই ছাত্রীটি সম্পর্কে। ওদের নাকি যত্রতত্র একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। কেউ কেউ আভাসে ইঙ্গিতে সাবধানও করে দিয়েছিল আমাকে।

স্বামী প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরতেন। আমি কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। গানের মাস্টারী যাঁরা করেন, তাঁদের এরকম হয়। স্বামী যে মদ খেতেন, এ খবরটা বিয়ের পরই জেনেছিলাম। কিন্তু ওটা সয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরে যে সমাজে আমি ঢুকেছিলাম, সেখানে ওটা নিতান্তই সাধারণ অভ্যাস। আমি যদি ওদের মধ্যে জন্মাতাম, তাহলে প্রথম জানার সেই শংকা আর অস্বস্তিটুকু নিশ্চয়ই অনুভব করতাম না। কিন্তু ইদানীং মাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছিল। বেশী রাতে বাড়ি ফিরলে ভালো হুঁশ থাকত না। রাত হলে আমার চিন্তা হতো। অনেক সময় সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেদিন প্রায় রাত একটার সময় বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামল। ভিতর থেকে স্বামীর হাত ধরে নামিয়ে দিল সেই মেয়েটি। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে স্বামীও ওর হাত ধরে টানতে লাগলেন। অনেকটা দূরে বলে স্বামীর জড়ান কথা ছাড়া আর কোন কথাই বিশেষ শুনতে পেলাম না। জড়িত স্বরে আমার নামটা দু-একবার শুনলাম। মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। স্বামী টলতে টলতে উঠে এলেন। রাতে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লেন। আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

কখন যে বিয়ের পর তিনটে বছর গড়িয়ে গিয়েছে, খেয়াল নেই। খেয়াল হলো বাড়ির সামনে বড় রাস্তায় ফুলে ভরা জারুল গাছটার দিকে তাকিয়ে। বিয়ের পর যখন এ বাড়িতে আসি, তখনও জারুল গাছটা ফুলে ভরা ছিল। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পরের সপ্তাহে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। মন অনুকূলে নয়, তবু ভাবলাম বার্ষিকীটা পালন করতেই হবে। এ যেন যে অধিকার আমি পাইনি, তারই মিথ্যে ঘোষণা। আমার সামাজিক অধিকার-টুকু সকলের চোখে আঙুলে দিয়ে দেখাতেই হবে। বিশেষ করে সেই মেয়েটিকে। কিন্তু নিমন্ত্রিতের লিস্টে কিছুতেই ওর নামটা ঢোকাতে পারলাম না। মন বেঁকে বসল। না, আমার বাড়িতে ওকে ডেকে আনতে পারব না। ভেবেছিলাম স্বামী ও প্রসংগ এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু দেখলাম—না। লিস্ট দেখে স্বামী বললেন, ওর নামটা বোধ হয় ভুল হয়েছে। ঢুকিয়ে দাও। আমি এক মুহূর্তে কাঠ হয়ে রইলাম। পরে বললাম, কী করে বলেছিলাম জানি না, না, মনে ছিল বলেই বাদ দিয়েছি।

স্বামী বললেন, তার মানে?

বলে ফেললাম, মানে যে কী তা তুমি আমার থেকে ভালো জান। আমার মনে হচ্ছে কটিমাত্র কথার মধ্যেই আমার মনের সব বিষ, সব জ্বালা ঢেলে দিয়েছিলাম। স্বামী একবার চমকে উঠলেন। মনে হলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপল। এই বুঝি ফেটে পড়ে। সমস্ত আক্রোশ জড় করে কেবল বললেন, ললিতা।

আমি বললাম, এই তো বুঝতে পেরেছ। এখন আর চেঁচামেচি করো না। ঠাকুর-চাকররা সব ছুটে আসবে।

ওরও তখন রাগ চড়েছে। সংকোচ কেটেছে। বলল, তা আসুক। আমি একটা হেস্তনেস্ত চাই।

বললাম, কী চাও তুমি?

বলল, ওর সম্পর্কে একথা বলবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?

বললাম, অধিকার কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না। ওটা অর্জন করতে হয়। তোমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা যে কত অশোভন তা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।

ও বলল, ও! আজকাল বুঝি গান ছেড়ে অধিকার অর্জনে মন দিয়েছ?

বললাম, হ্যাঁ, তবে একটু দেরি হয়ে গেছে।

বলল, দেরি যখন হয়েইছে একেবারেই বাদ দাও। তোমার যা কাজ তাই কর।

বললাম, কী আমার কাজ, তোমার সুরে গান গেয়ে তোমার জন্য অর্থ আর যশ অর্জন করা?

ও বলল, বাঃ, তুমিও তো বুঝতে শিখেছ।

বললাম, হ্যাঁ, শিখেছি বলেই আর গাইব না। এখন থেকে আমি আর তোমার যশ অর্জনের মেশিন নই, স্ত্রী।

ও বলল, সেজন্য তোমাকে বিয়ে করে রাস্তা থেকে ঘরে ডেকে এনে গান শেখাইনি। কথাটা যখন উঠল স্পষ্ট করেই বলি। স্ত্রীর কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। গানের প্রয়োজনেই তোমাকে বিয়ে করেছি।

আমি বললাম, ও, স্ত্রীর প্রয়োজন বুঝি ছাত্রীদের দিয়েই মেটাতে? এখনও অবশ্য তাই-ই মেটাচ্ছ।

স্বামী তখন রাগে ফুলছে। কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিল।

আমার তখন কী যে হয়েছে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছিলাম বলেই বোধ হয়। বললাম, উহুঁ, গলা টিপে ধরো না। চাপ লাগলে গলা নষ্ট হয়ে যাবে। অত সুন্দর সুরে দেওয়া দুখানা গান পরশুদিন রেকর্ড করবার কথা। তা আর হবে না। আর আমি যদি না পারি, তোমার ছাত্রীকে দিয়ে যে তেমনটি হবে না, সে তো তুমিই ভালো জান।

হঠাৎ কী হলো, কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বুঝতেই পারছিস, বিবাহবার্ষিকীর এখানেই সমাধি হলো। অসহ্য তিক্ততায় মন ভরে গেল। পাঁক ঘুলিয়ে তুলেছি বলে নিজের ওপরই আক্রোশ জন্মে গেল। কিন্তু আর ফেরা যায় না।

যেদিন গান রেকর্ড করবার কথা, বললাম, পারব না, গলা খারাপ লাগছে।

ও বলল, আজ নয়, নাকি কোনদিনই নয়।

চট্ করে, কিছু না ভেবেই, বলে ফেললাম, না, কোনদিনই নয়।

বলল, আচ্ছা। অর্গানের ওপর থেকে স্বরলিপি তুলে নিয়ে চলে গেল। বলল, তাহলে ওকে দিয়েই রেকর্ড করাতে হবে।

বললাম, বেশ তো।

সে-গান শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিই রেকর্ড করিয়েছিল। কিন্তু আমি জানি কিছুই হয়নি। মুখস্থ করে কি গান হয়! গান দাগা বুলোবার জিনিস নয়। অথচ সে-গান দুটির সুরে ওর দেওয়া অনেক সুরকেই ছাপিয়ে দিয়েছিল। জানি আমি গাইলে সারা বাজারে হৈচৈ পড়ে যেত। এটা অতিশয়োক্তি নয়। শুনেছি আমি গাইব না শুনে কম্পানীর কর্তৃপক্ষ মোটেই খুশী হয়নি। কিন্তু ওর প্রভাব অসাধারণ, মেনে নিতেই হয়েছে।

অজস্র অশান্তিকর ঘটনার থেকে আর একটিমাত্র তোকে শোনাব। সেটা আমাদের বিবাহবার্ষিকীর রাত। স্বামী বাড়ি ফিরল রাত তখন দুটো। অজস্র অপমানের পরেও কেন যে একটু আশা পুষে রেখেছিলাম জানি না। ঘুম আসছিল না। আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে খুঁটিনাটি অনেক ঘটনাই মনে আসছিল। তার কোনটাতেই এতটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ কড়া নড়ল। স্বামী ঘরে ঢুকল। মাতাল। কিন্তু পুরো যে নয় একটু পরেই তা বুঝতে পারলাম। জামা খুলতে গিয়ে বলল, এই যা রমা (ছাত্রীটির আসল নাম গোপন রাখলাম) ঘড়িটা তো নিতে ভুলে গেছে।

বুঝলাম এ ভুল ইচ্ছাকৃত। আমাকে অপমান করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

বললাম, তা হলে যাও দিয়ে এসো। আর এসেই বা কী করবে। রাত তো প্রায় শেষ করেই ফিরেছ। বাকীটাও এই অজুহাতে কাটিয়ে এসো।

উত্তরে বলল, তোমার কি ধারণা রমার সংগে রাত কাটাতে আমার অজুহাত লাগে?

বললাম, রাত দুপুরে এ নিয়ে তোমার সংগে কথা কাটাকাটি করতে আমার ঘৃণা হয়। যাবে তো চলে যাও, নয়তো শুয়ে পড়ো। আমার ঘুম পেয়েছে।

আমার বিছানা আলাদা ছিল। আমি শুয়ে পড়লাম। টলতে টলতে নিজেও বিছানায় গিয়ে শুলো।

এইতো আমার বিবাহিত জীবন। এরই জন্য লোকের হিংসার পাত্রী হয়েছি। এর-পর এই রকম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ওর তখন মদ খাওয়া অসম্ভব রকম বেড়েছে। আমি আত্মাধিক্কারে গান ছেড়ে দিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা অশান্তি। নিঃশ্বাস নিতে কণ্ট হতো। হাওয়ায় যেন বিষ ছড়ান।

কেবল গলার জন্যই আমাকে বিয়ে করেছিল ভাস্কর রায়। আমার গলা পুরোপুরি দখলে রাখবার জন্য। আর মেয়ের সম্পত্তি দখলে আনবার জন্য বিয়ের সিল-মোহরের মত এমন জিনিস আর নেই। সেই গলা যখন দখলছাড়া হলো আমার প্রয়োজনও ফুরোল। কিন্তু আমি কেন দখল ছাড়ব। হেরে যাব অন্য একটি মেয়ের কাছে। শুরু হলো দখলের লড়াই। স্বামীকে ভালোবাসি বলে নয়, স্বামী আমার স্বামী বলে। আমি যে কত নীচে নামতে পারি, ইতর স্ত্রীলোকের মত স্বামীর প্রণয়িনীর সংগে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারি সে তুই কল্পনাই করতে পারবি না। অথচ কেন? আমি স্বামীকে ঘৃণা করি, স্বামী আমাকে ভালোবাসে না। কিন্তু ভালোবাসা না থাকলেও অধিকার ছাড়তে চায় না মেয়েরা। আমি যা পাইনি অন্যকে কেন তা পেতে দেব। এখন ভাবলে অবাক লাগে এত ইতর আমি কী করে হতে পেরেছিলাম।

এমনি করে আরও কতদিন চলত জানি না। কিন্তু মুক্তি এলো অন্য দিক থেকে। অসম্ভব অত্যাচারের জন্য দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল ওর শরীরে। তার পরিণামের কথাও তুই জানিস।

স্বামীর মৃত্যুর সংগে সংগেই আমার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন শেষ হলো। তবু যাকে ঘৃণা করেছি, যার কাছ থেকে ভালোবাসা পাইনি মৃত্যুর পর তার প্রতিভার কথা স্মরণ করে কান্না পেয়েছিল। সে-প্রতিভা যদিও আমার জীবনে দুঃস্বপ্নের মেঘ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তুইতো গান বুঝিস, ভালোমন্দ চিনতে পারিস। বলতো ভাস্কর রায়ের মত প্রতিভা এখন কি আর একটি আছে?

স্বামীর মৃত্যুর সংগে সংগেই আমার সংগীত জীবনের পূর্ণচ্ছেদ। লোকে জানে সংগীতে আমার সাফল্যের তুলনা নেই। কিন্তু সংগীত যে আমার গোটা জীবনটাকেই ব্যর্থ করেছে এখবর কেউ রাখে না।

রেকর্ডে আমার গান শুনলেই বুকের ক্ষত জায়গাটা জ্বলে ওঠে। চেনা মুখ কেবল সেই ব্যর্থতার কথাটাই মনে করিয়ে দেয়। সিনেমা আর প্রোমোফোনওয়ালারা সান্ত্বনা দিতে এসেও পরের কণ্ট্র্যাক্টের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার স্বামীর সংগে কোন তফাত নেই। সবারই নজর আমার গলার দিকে। স্বামী চেয়েছিল যশ, এরা চায় অর্থ। গলার নীচে যে একটা বুক আছে, সে বুকে যে হৃদয় বলে কিছু আছে, থাকতে পারে, সে খবর এরা কেউ রাখে না।

বলতে পারিস, না পালালে আমি বাঁচতাম কী করে? মামা এসেছিলেন নিয়ে যেতে। কিন্তু সেখানে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। তাছাড়া সান্ত্বনা আমি সইতে পারতাম না।

এমনি সময় চোখে পড়ল এই স্কুলের বিজ্ঞাপন। বিহারের এই অখ্যাত শহরে বাংগালী মেয়েদের এম ই স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রী চাই। ভেবে দেখলাম এই সুযোগ। দরখাস্ত করে দিলাম। চাকরি পেতে অসুবিধে হলো না। এখানে আর কে আসতে চাইবে।

এখানে কেউ আমাকে চেনে না। কুমারী অথবা সধবার যেসব অসুবিধে আমার তাও নেই। স্বামী নেই জেনেই তারা নিশ্চিন্ত। বেশী কৌতূহল বড় কারও হয় না।

আমি যে কোনদিন গান গাইতাম সেকথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হয়তো একেবারেই যেতাম। কিন্তু তুই এসে আবার মনে করিয়ে দিলি। সেই সংগেই আবার মনে হলো আমার ব্যর্থতা, আমার গ্লানির কথা। আমার ব্যবহারে যা কিছু অসংগতি দেখেছিস তা এইজন্যই।

কিন্তু তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তুই-ই আবার মনে করিয়ে দিয়েছিস যে ভাস্কর রায়ের স্ত্রী হবার আগেও আমার আর একটা অস্তিত্ব ছিল। আমার সব লজ্জা, সব গ্লানির মেঘের ফাঁক দিয়ে আবার আকাশ দেখতে পেয়েছি। আবার যদি আসিস, আসিস অবশ্য, তাহলে আমার মধ্যে সেই ললিতাকে হয়তো খুঁজে পাবি। সেই গানটা, যে গানে ভাস্কর রায়ের সুর নেই, ছাপ নেই, তোকে আবার শোনাব।'

[শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের "সাহিত্যচিন্তা" পুস্তক সম্পর্কে শ্রীরাজশেখর বসুর পত্র]

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৫শে বৈশাখের চিঠি যথাকালে পেয়েছি। আপনার পত্নী ক্রমশ সেরে উঠছেন জেনে সুখী হলাম। "সাহিত্যচিন্তা" পড়ে যা মনে হল লিখছি।

তুবড়ি পটকা বা রেডিও তৈরী করতে পারলেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না, গীতার ব্যাখ্যা বা অবতারতত্ত্ব লিখলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। তেমনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা সমালোচনা লেখেন শুধু এই কারণেই কাকেও সাহিত্যিক বলা চলে না। ইতিহাসের তুল্য সাহিত্য একটি বিশাল ও দুরূহ সাধনার বিষয়। যাঁর দেশ-বিদেশের সাহিত্যের জ্ঞান আছে তিনিই প্রকৃষ্ট অর্থে সাহিত্যিক, অন্য লেখকরা সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যস্রষ্টা হতে পারেন। আপনি নিঃসন্দেহ সাহিত্যিক; কিন্তু আমি নই। যেসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন তার প্রায় সবই আমার গণ্ডির বাইরে। বিদ্যা খাটিয়ে বিচার করা আমার সাধ্য নয়, অতএব শুধু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান অবলম্বন করে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে কিছু লিখছি। নিজের ধারণা সম্বন্ধে আমার জেদ নেই। মত বদলাতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি।

১২ পৃঃ। 'মহাকাব্যের এইসব চরিত্রবিচিত্র ব্যক্তি মানুষের স্বাদে সরস......কোনও ঔচিত্যের ছাঁচে তাদের গড়া হয়নি।' আপনার এই উক্তি অতি সত্য। মহাভারতের দ্রৌপদীর তুলনা নেই। যুধিষ্ঠির আর বঙ্কিমচন্দ্র যতই নিন্দা করুন, ভীম লোকপ্রিয় নরশার্দুল। রাবণ আর দুর্যোধন এক একটি চিরন্তন জাতিরূপ বা টাইপ।

২৪ পৃঃ। দক্ষিণেশ্বর পণ্ডিচেরি আর সেবাগ্রাম সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত, কিন্তু গুরুর চাইতে ভক্তদের দোষ বেশী মনে করি। মানুষমাত্রেরই যে ভ্রান্তি বা ত্রুটি থাকতে পারে ভক্তরা তা বোঝেন না; মহাপুরুষ যা বলেন তাতে সার বা অসার যাই থাকুক সবই ভক্তের কাছে তুল্যমূল্য বচনামৃত। প্রখ্যাত জড়বিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর উক্তি লোকে যেমন নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সেইভাবে গুরুবাক্যের বিচার করতে পারলে এদেশের মহাপুরুষদের কাছ থেকে আমরা বেশী উপকার পেতাম।

২৬ পৃঃ। 'জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সম্ভোগ এবং বিকাশের মধ্যে নিহিত'—এই ধরনের কথা আপনি নানা স্থানে বলেছেন। একথাও বলেছেন—(৩৮ পৃঃ) 'সম্ভোগের দ্বারা প্রতিটি মূল বৃত্তিকে তৃপ্ত করতে হবে......যাতে একটির পুষ্টি অন্যগুলির শীর্ণতার কারণ না হয়।' যেমন অন্যান্য জন্তুর তেমনি মানুষেরও লক্ষ্য সম্ভোগ আর বিকাশ (সমস্ত বৃত্তি বা function-এর উৎকর্ষ)—এ আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতর জন্তুর পক্ষে সম্ভোগ শুধু দেহের ব্যাপার, মানুষ দেহ আর মন দিয়ে সম্ভোগ করে। শুধু সম্ভোগ বললে সাধারণ লোকে দৈহিক সুখভোগই বোঝে। আমি মনে করি ইন্দ্রিয়ভোগে সংযম না থাকলে মানসিক অর্থাৎ aesthetic ও intellectual ভোগে বাধা হয়। অত্যন্ত বিলাসী বাসনাসক্ত লোকেরও চারিত্রিক পূর্ণতা লাভ হয় এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষে মধ্যমপন্থাই হিতকর। দুঃস্থ দরিদ্র আর বিলাসী ধনীর তুলনায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা বেশী মনে করি।

৩২ পৃঃ। 'আমরা এদেশের (এদেশে?) মুক্তি বললে বুঝি জীবন্মুক্তি।......এদেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে পারলেই আমাদের মোক্ষ।' জীবন্মুক্তির অর্থ কিন্তু এ নয়। যিনি জীবিত অবস্থাতেই সাংসারিক বন্ধন বা আসক্তি থেকে মুক্ত তিনিই জীবন্মুক্ত (প্রাচীন উদাহরণ—জনকরাজা)। 'যে দেশে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন সুখ নেই, সম্ভোগ নেই,......এ ধরনের বিকৃত বুদ্ধি তত্ত্বকথায় কারো তেমন অবাক ঠেকে না।' এরকম তত্ত্বকথা কেউ কেউ বলেন বটে, বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ পন্থা এমন মতও শোনা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ এ নয়, সাধারণ লোকের জন্য বিহিত হয়েছে—চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম (সামাজিক কর্তব্য পালন), অর্থ (উপার্জন), কাম (সর্বপ্রকার সম্ভোগ) এবং মোক্ষ (অনাসক্তির চেষ্টা)।

৫৪ পৃঃ। 'জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ত ক্ষয়-সৃষ্টিশীল দেহই ব্যক্তির অস্তিত্বগত ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন'। কয়েক বৎসর আগে লেখা 'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে আমিও অনুরূপ মত অন্যভাবে প্রকাশ করেছি। আমার যথার্থ সত্তা আমার সমগ্র জীবন। শুধু দেশে কালে ব্যাপ্ত শরীর নয়, আমার চিত্ত ও কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। জীবিতকালে আমার শারীরিক মানসিক যত পরিবর্তন হয়েছে, সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ যা ভোগ করেছি, সুকর্ম দুষ্কর্ম যা করেছি, সব সুদ্ধ নিয়ে আমার সত্তা। আমি একটি ঘটনাপ্রবাহ। এ ভিন্ন যদি আমার অন্যবিধ সত্তা মানা হয় তবে তা ক্ষণিক, অসম্পূর্ণ বা অপ্রমাণিত।

৬১ পৃঃ। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনবিমুখতা'।—যেমন বিজ্ঞানে তেমনি সাহিত্যে কোনও শব্দ বা বিবৃতি নিষিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু প্রভেদ আছে। বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য তথ্যজ্ঞাপন। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—লেখকের নিজের অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চার করে রসোৎপাদন। বিভিন্নকালে, বিভিন্ন সমাজে অনেক বিষয় taboo গণ্য হয়। প্রতিভাবান লেখক টাবু ভঙ্গ করে সমাজের রুচি বদলাতে পারেন, কিন্তু সকলের তা সাধ্য নয়। ভোজের বিবরণ আর স্থূল আদিরস সেকেলে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অঙ্গ ছিল, কিন্তু এখন নেই। ভিক্টোরীয় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক রুচি বদলে গেছে। আধুনিক ইংরেজী বইএ অশ্লীলতা প্রচুর দেখতে পাই, কিন্তু এদেশের রুচি আর পুলিসের শাসন ততটা সইতে পারে না, সেজন্য বাঙালী লেখককে সংযত হতে হয়।

ফরাসী জার্মান সাহিত্যের জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নেই, ইংরাজীরও খুব কম। ফরাসী সাহিত্যে inhibition নেই, ইংরেজীতে আছে, সেজন্য ইংরেজী সাহিত্য পূর্ণতা পায়নি এই অভিমত বিচার করার শক্তি আমার নেই। সাহিত্যের উপজীব্য অসংখ্য, ভোজন রমণ আর রেচনের বর্ণনা পরিহার করলেই সাহিত্য খর্ব হবে কেন তা বুঝতে পারি না। আপনি বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে যা উদ্ধার করেছেন তার হাস্যরস বীভৎসতার জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর চাইতে ভাল উদাহরণ মহাভারতে আছে। অগস্ত্য ঋষি মেষরূপী বাতাপি অসুরের রান্না মাংস খেয়ে ফেললেন। 'ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদধস্তস্য মহাত্মনঃ, শব্দেন মহতা তাত গর্জন্নিব যথা ঘনঃ।' বাতাপির দাদা ইল্বল ডাকতে লাগল—বাতাপি, বেরিয়ে এস। অগস্ত্য হেসে বললেন—সেতো হজম হয়ে গেছে। এই বর্ণনায় কৌতুক আছে, বীভৎসতা নেই।

৬৪ পৃঃ। 'নায়ক-নায়িকারাও যে হাঁচে কাশে, খায়দায়, মলমূত্র ত্যাগ করে...।' এই সবই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নিশ্চয়ই, দরকার হলে সাহিত্যে উল্লেখও করতে হবে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় তার নির্ণায়ক সামাজিক রুচি দেশভেদে কালভেদে বিভিন্ন, সুতরাং সাহিত্যেও ভিন্নতা থাকবে। বৈঠকখানা আর পায়খানা দুই-ই আমাদের দরকার, কিন্তু দুইএর মধ্যে ব্যবধান লোপ করাই উদার রুচির লক্ষণ নয়। বিলাতীর তুলনায় আমাদের রান্নায় মসলা বেশী থাকে। কিন্তু এমন মানদণ্ড নেই যাতে বলা যায় বিলাতী রুচি ভাল, দেশী রুচি মন্দ। আমরা বাদামী খাকী কালো প্রভৃতি রঙের প্যাণ্ট পরি, কিন্তু রঙিন ধুতি টাবু। যেমন খাদ্যে আর পরিচ্ছদে তেমনি সাহিত্যেও দুর্লঙ্ঘ ফ্যাশন বা রুচি আছে।

৬৬ পৃঃ। '...খিস্তির ভাষা বাংলা সাহিত্যে আজও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।'

খিস্তির সাধারণ অর্থ—অশ্লীল ভাষা বা গালি। গোপাল ভাঁড়ের গল্পে, বকাটে ছোকরাদের আলাপে, অনেক সেকেলে বুড়োর রসিকতায় খিস্তি আছে। খিস্তি-সাহিত্য অলিখিত হলেও দুর্লভ নয়। কিন্তু অনেকের উপভোগ্য হলেও লিখিত সাহিত্যে খিস্তি প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। সাহিত্যের ভদ্রজনোচিত পোশাক দরকার, নিতান্ত আটপৌরে অসংবৃত হলে চলে না। ভেপসা গরমে নগ্ন থাকাই স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বর্তমান রুচিতে তা বাধে। রুচি বদলালে আমরা nudist হতে পারব, অন্তত গ্রীষ্মকালে। কিন্তু যাদের গড়ন বিশ্রী তারা কি করবে বলা যায় না।

হয়তো আপনি খিস্তির মানে ধরেছেন আড্ডায় কথিত স্ল্যাং, যা সাধারণত অশিষ্ট গণ্য হয়। এই ভাষাকে আমি সাহিত্যে অপাংক্তেয় মনে করি না। হুতোম পেঁচার নকসায় স্ল্যাংএর সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়, প্রাচীন কলকাতার এমন জীবন্ত vivid বিবরণ আর নেই। রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষের কতকগুলি স্ল্যাং-বহুল রচনা (যেমন রূপহরী হস্তিনীর জাপান যাত্রা, সানাইওয়ালার আত্মকথা) ইত্যাদি বাংলা কথা চিত্রে নূতনত্ব এনেছে।

৮০ পৃঃ।—'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে আপনি তাঁর অদ্ভুত পদ্ধতির যে হেতু দেখিয়েছেন তা খুব কৌতূহলজনক। যাঁরা চিত্রকল্পনার ভিত্তি আর আধুনিক অন্তর্জ্ঞানীয় (subconscious) মনোবিদ্যা বোঝেন তাঁরাই আপনার মত বিচার করতে পারবেন।

৯৮ পৃঃ।—'রবীন্দ্রনাথ ও গায়টে।' আমি গ্যয়টে সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ, নামের উচ্চারণও জানি না। রবীন্দ্রকাব্যের জ্ঞানও আমার অতি অল্প। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কাব্য আর সংগীতের বোদ্ধা নই। আপনার অভিমত বিচারের যোগ্যতা আমার নেই। শুনেছি আপনার লেখা পড়ে অনেকে অত্যন্ত চটেছেন। তার কারণ দেখি না, আপনার আলোচনায় শ্রদ্ধার অভাব নেই। যাঁরা আপনার সমকক্ষ সাহিত্যরথী তাঁরা আপনার সঙ্গে লড়তে পারেন। আপনার সিদ্ধান্ত যদি খণ্ডিত হয় তবে আমি খুশী হব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি আপনারই জয় হয় তাতেও ক্ষুব্ধ হব না। অসংখ্য বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্তাদেশের পিছনে পড়ে আছি, যদি জগৎকবি সভায় বাঙালীর গর্ব খর্বই হয় তাতে সর্বনাশ হবে না, রবীন্দ্র কীর্তির যা অবশিষ্ট থাকবে তাও পর্বত প্রমাণ।

ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি শারীরিক ব্যাধির মতন আমরা একটি দেশব্যাপী মানসিক ব্যাধিতে অভিভূত হয়ে আছি—ঘোলাটে বুদ্ধি বা obscurantism বা হিংটিংছট। আপনার সংস্কারমুক্ত, ভাবাবেগবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যান পড়ে আনন্দিত হয়েছি—অনেক বিষয়ে মতান্তর থাকলেও।

শুভার্থী

১৩।৫।৫৬ রাজশেখর বসু

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা

॥ ২৭ ॥

অতএব আমাদের যাত্রা শরু হোল। আমরা নাঙ্গা পর্বতের দিকে রওনা দিলাম। এই পাহাড়ের উপর একটা প্রান্তর আছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা। তাকে বলে, 'পরীর বন'। আমরা সেখানে গিয়ে পেৌঁছলাম। সমস্ত জার্মান অভিযাত্রী দলগুলোই এখান থেকে সরাসরি নাঙ্গা পর্বতে ওঠবার চেষ্টা করেছে। আমরাও সেখানে গিয়ে পেৌঁছলাম। আমাদের সামনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে নাঙ্গা পর্বত। নাঙ্গা পর্বত। মানে নগ্ন পাহাড়। এই নামটাই দেশে-বিদেশে চালু হয়েছে। কিন্তু কেন যে এই পাহাড়টাকে নগ্ন বলা হয় আমি তা ভালো বুঝতে পারি না। পাহাড়টা কোথায় নগ্ন। ওই তো ওর গায়ে তুষারের প্রলেপ, বরফের আস্তরণ। অজস্র হিমবাহ আর বরফের কার্নিস, তাকে এমন শ্লীলভাবে ঢেকে রেখেছে যে, কোথাও, কোনো ফাঁক দিয়েও পাথর দেখা যায় না। এই পাহাড়ের পাথুরে আকৃতিটা যে কি, তা তুষার আর বরফ আর হিমবাহ আর কার্নিসের আচ্ছাদনের ভারে ঠিকমত বোঝার উপায় নেই। না, নগ্ন নামটা ঠিক জুৎসই হয়নি। বরং এই পাহাড়টাকে যদি দৈত্য বলা হোত, তা হলেই মানাতো। দৈত্য পর্বত।

আমার মনে হয় এইটেই বড় ভালো নাম হোত। আমি তো এভারেস্টেও গিয়েছি। তা সত্ত্বেও বলছি আমার কাছেও এই পর্বতের আকৃতিটা দৈত্যের মত ঠেকেছে। উচ্চতায়

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

২৬,৬৬০ ফুট। পৃথিবীর উচ্চতম পাহাড়গুলোর মধ্যে এ সপ্তম। কিন্তু যদি সিন্ধুনদের দিক থেকে দেখা যায়, এই পাহাড়ের যে মুখটা সিন্ধুর দিকে ফেরানো, তার গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত যে উচ্চতা, সে রকম একটানা খাড়াই পৃথিবীর আর কোন পাহাড়েরই বোধ হয় নেই। আর আমাদের দিকেও কি কম? এক জায়গায় সে সরাসরি ১২,০০০ হাজার ফুট খাড়া। আমি তো অনেক পাহাড়েই চড়েছি। কিন্তু এমন খাড়া, এমন বিভীষণ আকৃতির পাহাড়ের পাল্লায় এর আগে আর পড়িনি।

কিন্তু শুধু আকারে ভীষণ বলেই যে নাঙ্গা পর্বত এতো ভয়াবহ তা নয়। যেসব দুর্ঘটনা অতীতে এখানে ঘটে গেছে, ভয়টা তারই জন্য। আমরা যেখানে আমাদের 'বেস্ ক্যাম্প' স্থাপন করেছিলাম, তার খুব কাছেই ছিল পাথর দিয়ে তৈরী একটা লম্বা স্তম্ভ। আর সেই স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা ছিল কতকগুলো নাম। ১৯৩৪ আর '৩৭ সালে যেসব জার্মান সাহেব আর শেরপা

ওর গায়ে তুষারের আস্তরণ

এই পাহাড়ে অভিযানে এসে মারা পড়েছে, ও নামগুলো তাদেরই। পাহাড়ের উপরে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আমার মনে হচ্ছিল শুধু ওই তুষারই নয়, শুধু ওই বরফই নয়, ওইসব সাহসী বীরদের প্রেতাত্মাগুলোও যেন এই পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে। এমন কি পরিষ্কার ঝকঝকে দিনটিতেও, সূর্য যখন উজ্জ্বল আর আকাশ যখন গভীর নীল, সেই তখনও আমার মনে হোল যেন এক খণ্ড কালো মেঘ পাহাড়ের ওই উঁচু চূড়া থেকে ছোঁ মেরে নীচের দিকে নেমে আসছে। অসহ্য এক শীতলতা নিয়ে নেমে আসছে আমাদের কাছে। তার সেই শীতলতার স্পর্শ যেন আমাদের হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। এ মেঘ চোখ দিয়ে দেখা যায় না, শরীর দিয়ে বোঝা যায় না, অনুভব করা যায় শুধু মন দিয়ে। এ মেঘ শুধু ভয়ের। এ মৃত্যুর মেঘ।

নবেম্বরের শেষাশেষি। শীতকাল। শীত আর আমরা মাত্র সাতজন। তিনজন সাহেব আর চারজন শেরপা। স্থানীয় যেসব কুলী আমাদের সঙ্গে ছিল, তারা অনেক আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এগিয়ে যাওয়া শুধু পাগলামো। এ আমি জানতাম। তবুও এগিয়েই গেলাম। উঠতে লাগলাম পাহাড়ের উপরে। পাহাড়টা তুষার আর বরফে কি চমৎকার এক ওড়না জড়িয়ে বসে আছে। সেই ওড়না উঠিয়ে তার মুখ দেখবো তাই আমরা চলেছি। আমরা লোক বড় কম। আমাদের বোঝা বড় বেশি। এক একজন লোককে তাই আশি থেকে নব্বই পাউণ্ড পর্যন্ত মাল বইতে হচ্ছিল। এ বিষয়ে শেরপা আর সাহেবে কোন প্রভেদ ছিল না। সাহেবরাও আমাদের সমানই মাল বইছিলেন। আমাদের মতন করেই। আমরা যেমন বোঝাটা পিঠে ফেলে, বোঝার ফিতেটা মাথায় আটকে দিই, সাহেবরাও ঠিক তেমনি করে তাই দিয়েছিলেন।

বড় পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা সাহেবদের কারুরই ছিল না। কিন্তু তাঁরা তরুণ। তাঁরা শক্তিমান। আর আশ্চর্য তাঁদের মনোবল। আমাদের সব কষ্ট, সব শোক (শেষের দিকে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল) সত্ত্বেও এই অভিযানের এইটেই ছিল মহৎ দিক। অভিযাত্রীদের মনোবলের যে পরিচয় এখানে পেয়েছি, তা মহৎ। অতীব মহৎ। সাহেব আর শেরপায় কোন পার্থক্য এখানে ছিল না। আমরা সবাই একই ধরনের কাজ করেছি, একই পরিমাণ বোঝা বয়েছি, একে অন্যকে সাহায্য করেছি, যখনই দরকার হয়েছে সে সাহায্যের। এখানে কেউ মনিব ছিল না। কেউ নফর ছিলাম না। সবাই ভাই-ভাই। তবুও সাহেবরা কখনও স্পষ্ট করে বলেননি যে, তাঁরা চূড়ায় উঠবার একটা চেষ্টা করবেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উত্তাপের ওঠানামার হিসাব রাখছিলেন, তুষার আর বরফে অবস্থা ভেদ লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। আর একটু একটু করে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলেন। আরও একটু উপরে চলো, আর একটু উঠি। এই ছিল তাদের ভাবখানা। এমনি করে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করতে করতে সেই বরফের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে আমরা বেশ অনেকটা উঠে গিয়েছিলাম। আর সেখানে আমাদের প্রথম শিবিরটাও স্থাপন করেছিলাম। ইতিমধ্যে শীত তীব্রতর হোল। তুষার ঝড় হিংস্রভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগলো। হা হা করে তেড়ে এলো উন্মত্ত বাতাস। আমি ভেবেছিলাম, এবারের মত এই পর্যন্তই বোধ হয় আমাদের শেষ ওঠা। কিন্তু না, ওটুকু উঠেই সাহেবরা ক্ষান্ত থাকলেন না। আরও উপরে উঠতে চাইলেন। বিশেষ করে থর্নলি সাহেব। তিনি বড় দৃঢ়চেতা লোক। বড় একরোখা। পরিশ্রম যতো বাড়ে, কষ্ট যতো বেশি হয়, সাহেবের শক্তিও ততো বাড়ে। আর আমি যখন আমার পিছনকার জীবনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, বিভিন্ন পাহাড়ে ওঠবার সঙ্গী-সাথীদের কথা যখন আমার মনে পড়ে, কালের ব্যবধান কাটিয়ে তাদের চেহারাগুলো যখন স্পষ্ট হয়েছে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তাদের মধ্যে উজ্জ্বল যে কটা মূর্তি দেখি, তাদের ভিতর এই থর্নলি সাহেবও একজন। আমার মনে হয়, যত অভিযাত্রী আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে বোধ হয় এই সাহেবের ক্ষমতাই ছিল সবথেকে বেশি। অবস্থা অনুকূল হলে, উপযুক্ত পরিমাণ সাজসরঞ্জাম আর সঙ্গী থাকলে থর্নলি সাহেব নিশ্চয়ই নাঙ্গা পর্বতে উঠতে পারতেন। হয়তো এভারেস্টেও।

কিন্তু আমরা সেখানে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম, 'অনুকূল' কথাটা তার একশো মাইলের মধ্যেও আসে না। আর একটা বড় পাহাড় জয় করা, শুধুমাত্র শারীরিক শক্তি থাকলেই সম্ভব হয় না। থর্নলি সাহেব যাচ্ছিলেন, "আমরা তো আরও একটু উপরে উঠতে পারি।" আর মার্স আর ক্রেস সাহেব তাঁকে কেবল সমর্থন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের শেরপাদের অতো আস্থা ছিল না। আমি হয়তো ওঠবার জন্য শেরপাদের অনুরোধ করতে পারতাম। কিছুকাল তাই করেও ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, পিছিয়ে আসাকে আমি ঘৃণা করি। আর তাছাড়া আমি সর্দার, আমার কর্তব্য আমাকে সাহেবদের সঙ্গেই থাকতে নির্দেশ দিচ্ছিল। কিন্তু আঙ তেমপা, আজীবা আর ফু তারকে বেঁকে বসলো। তারা আর এক পা'ও এগুবে না। এই শীত, এই ঝড় তাদের কাবু করেছে। এই পাহাড়ে যে সব মানুষের

পাহাড়ের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম

মৃত্যু ঘটেছে, তাদের কথা এদের নির্জীব করেছে। তারা বলতে লাগলো হয়তো আমরাও মারা পড়ব। বলতে লাগলো, যদি ফিরতে না পারি তখন আমাদের বউ, বাল-বাচ্চাদের কি অবস্থা হবে?

তারা আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। কাঁদতে লাগলো। সে বড় কঠিন সমস্যা। এ বড় কঠিন সংঘাত। আমার ইচ্ছা একদিকে, আমার কর্তব্য একদিকে, আর অন্যদিকে আমার দায়িত্ব। এর মধ্যে আমাকে এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদিও আমি মনে মনে জানতাম এই শেরপারা যে কথা বলছে, তা উচিত কথাই। তাই আমি সাহেবদের কাছে গিয়ে বললাম, "না সাহেব, আমরা আর যেতে পারবো না। শীত ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এ বড় মারাত্মক।" কিন্তু সাহেবরা উঠবেনই। তাঁদের প্রতিজ্ঞা খুবই দৃঢ়। আর শেরপারাও নেমে যাবেই। তারাও নাছোড়। আর তাই সেই প্রথম শিবিরটাতেই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলো। সাহেবরা লিখে দিলেন, তাদের যদি অহিত কিছু ঘটে, তবে তার জন্য আমরা দায়ী থাকবো না। আর সাহেবরা খরচ-খরচা মেটাবার জন্য যে টাকা জমা রেখে গেছেন, তার থেকে আমাদের পুরো মাইনে যেন মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর আমাদের পক্ষ থেকে কথা দিলাম, আমরা সেই 'বেস-ক্যাম্পে' সাহেবদের জন্য দু'সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

আমরা নেমে গেলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। দু'দিন পরে দেখি, পাহাড়ের উপর দিয়ে কে যেন একজন নেমে আসছে। প্রথমে আমরা খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, সাহেবরা বুঝি ফিরে এলেন। সত্যিই এলেন, তবে মার্স সাহেব একা। তিনি বললেন, তাঁর পা এমনভাবে জমে গেছে যে, তিনি আর যেতে পারেন নি। তারপর আবার অপেক্ষা। সাহেব দুজনের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা সমানে মার্স সাহেবের পা মালিশ করে যেতে লাগলাম। তাঁর পায়ে রক্ত-চলাচল আবার যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি সেইজন্য। দিনের পর দিন আমাদের চোখগুলো পড়ে রইলো ওই বিরাট পাহাড়ের শ্বেতশুভ্র বরফ-ঢাকা ঢালু গায়ের উপর। যদি থর্নালিকে দেখতে পাই। যদি ক্রেস্‌কে দেখতে পাই। তাদের চেহারা বার-কয়েক আমাদের দূরবীনে ধরাও পড়েছিল। জার্মানরা যে পথ ধরে বড় বড় হিমবাহ আর তুষারের ঢাল পেরিয়ে নাঙ্গা পর্বতের পশ্চিম গিরিশিরার দিকে এগিয়ে গিয়ে-ছিলেন, দেখেছিলাম আমাদের সাহেব দুজনও সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দুটো শিবিরও স্থাপন করতে পেরে-ছিলেন। সবচেয়ে উঁচু শিবিরটা ছিল ১৮,০০০ হাজার ফুট উপরে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সাহেবদের দেখলাম। মনে হোল তাঁদের তাঁবুর দড়ি শক্ত করে আঁটছেন। তারপর দেখলাম তাঁরা যেন খাবারদাবার তৈরী করছেন, তারপর অন্ধকার নেমে এল। আর কিছু দেখতে পেলাম না। মনে আছে সেই রাতে এক স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম, থর্নালি আর ক্রেস সাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের পরনে চকচকে নূতন পোশাক। তাঁদের সঙ্গে অনেক লোক। কিন্তু তাঁদের কারোরই মাথা নেই। আমার কোন কুসংস্কার নেই, তা আপনারা জানেন। কিন্তু আমার লোকেদের কাছে এই স্বপ্নের যে মানে, তা খুব খারাপ। তাছাড়া এই নাঙ্গা পর্বতে কোন খারাপ কিছু যে ঘটতে পারে, তা মেনে নেওয়ার জন্য কোন কুসংস্কারের দরকার করে না। সারারাত আমার দুশ্চিন্তায় কাটলো। ঘুমোতে পারলাম না। বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করলাম। সকাল হতে না হতে দূরবীনটি চোখে দিয়ে পাহাড়ময় সাহেবদের খুঁজে বেড়ালাম। আমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। আগের দিন যে তাঁবুটি দেখেছিলাম, আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই।

-(ক্রমশ)

॥ কাঁসা-পিতলের কথা ॥

নাগরিক

বাঙলার বাঘকেও বেকায়দায় পড়তে হলো শেষটায়। আমি স্যর আশুতোষের কথা বলছি। তাঁকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হলো।

নাম করব না। পোর্ট্রেটের কাজে বিশেষ গুণী এক শিল্পীর বালীগঞ্জের বাড়িতে বসে আছি। গল্প করছি তাঁর সংগে। কথা প্রসংগে আশুতোষের কথা উঠল। বললেন, তাঁর কথা আর বলবেন না। একদিন ভবানীপুরের বাড়িতে গেছি। ইচ্ছে, যদি সুবিধা হয় একটা স্কেচ করে আনব। বেলা তখন বারোটা কি তার কিছু কম। উনি তেল মাখতে বসেছেন। প্রণাম করে ছবি আঁকবার কথাটি নিবেদন করলাম। অম্লানবদনে বললেন, ছবি আঁকবে। তা' আঁকো না। বললাম, কখন আসবো? আসবে আবার কি! এখুনি আঁকো না। জিজ্ঞাসা করলাম, এই অবস্থায়? ক্ষতি কি, তিনি উত্তর দিলেন। বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! তেল মাখছেন সেই অবস্থাতেই ছবি আঁকতে হবে। এমনি যে মানুষ তিনিও একবার ভারি বিপদে পড়ে গেলেন। অথচ কি সামান্য ব্যাপারের জন্য, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আপনিও।

খুলেই বলি তাহলে ব্যাপারটা। আজকাল যেমন শনিবার অর্ধেকদিন আর রবিবার পুরো দোকান-পত্তর বন্ধ থাকে, আগে তেমনটি ছিল না। আমি কাঁসা-পিতলের দোকানের কথা বলছি। তখন দোকান বন্ধ থাকতো সংক্রান্তির দিন। প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন। হিসেব-পত্তর সব চলতো। অ্যাসোসিয়েশন ছিল দোকানদারদের। সবাই তা' মানতোও। কাঁসা-পিতল ছাড়া আর সব দোকানের কি হোত তা' ঠিক বলতে পারছি না।

সংক্রান্তির দিনই একবার কি কাজে যেন কিছু বাসনপত্রের দরকার পড়ল স্যর আশুতোষের। বাড়িতে শ্রদ্ধাদি কোন কাজ ছিল বলেই মনে হচ্ছে, বললেন প্রভাপদবাবু। আশুবাবু বোধ হয় নানা কাজে ভুলে গিয়ে থাকবেন সংক্রান্তির দিন দোকান বন্ধ থাকার কথা। বাসন কিনতে বেরিয়ে দেখেন, কেউ বাসন বেচতে চায় না। সবারই মুখে এক কথা, অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনওরকমেই কোনকিছু বেচা সম্ভব নয় আজ।

আশুবাবুকে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির কাছে আসতে হোল। অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হোল এবং তবেই পাওয়া গেল দরকারী বাসনপত্র। অবশ্য অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত বন্দোবস্ত করেও দিলেন তাঁকে।

দোকানে থরে থরে সাজান রকমারী কাঁসা-পিতলের বাসন

প্রভাপদবাবু বলছিলেম, এই তো সব সেকালের গল্প। বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতে বিয়ে। তিলকে বাটি চাই। কমপক্ষে পাঁচসেরি ওজন হতে হবে। তিলকে বাটি কি জানেন?

বললাম, না।

ওই বাটি ভর্তি করে টাকা দিতে হয় নাকি! হয়তো বা মোহরই দিতে হয় দানে! কে জানে। যাই হোক, অত বড় বাটি পাওয়াই যায় না। শেষকালে একটা তৈরী করেই দিতে হোল।

যুদ্ধের সময় বেচতে এলো বাসন। দলে দলে, কাতারে কাতারে। গাঁ ছেড়ে শহরে এলো খাবার পাবে বলে, আশ্রয় পাবে বলে তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে। শহরের মানুষের সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা নেই। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই। হাতে থালা, ঘটি আর গেলাস। শেষ অবধি তাই বিক্রি করে সাময়িক সংগ্রহ হোল অন্নের। ক্ষুধা মিটলো ক্ষণিকের। জীবনের বর্তিকা নিভলো শহরের ফুটপাথে। সেই দেখেছি বাসন বিক্রির হিড়িক, বলছিলেন প্রভাপদবাবু, আবার বাসন কেনার হিড়িকও দেখেছি।

কেনার হিড়িক?

তাই ছাড়া আর কি! ১৩৩৬ সালে আইন পাশ হলো সর্দা আইন। সংগে সংগে শুরু হল বিয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, অত বিয়ে একসংগে হতে আর দেখিনি জীবনে। সেই একবার বাসনপত্র বিক্রি হতে দেখলাম বটে।

কাঁসা আর পিতল তৈরী হয় তামা, দস্তা, টিন দিয়ে। আর কখনো লাগে একটু সীসে। খুব কম পরিমাণে। নরম করার প্রয়োজনে।

কাঁচা মাল বেশীর ভাগই আসে বিদেশ থেকে। কপার কর্পোরেশন খোলার পর, তামা কিছু এদেশেও হচ্ছে বটে, তবে দস্তা আর টিন প্রায় সবটাই আসে বিদেশ থেকে। সীসেও তাই। পুরোনো, ভাঙ্গা বাসন বিক্রি হয় কম দামে। তাই কিনে নিয়ে গালিয়ে হয় নতুন বাসন। গালাবার সময় শতকরা দু' ভাগ থেকে পাঁচ ভাগ ফেলা যায়। নতুন বাসন অনেক সময় সত্যি সত্যি নতুন করেই তৈরী হয়। মানে, তামা, দস্তা টিন পরিমাণ মত মিশিয়ে।

কুটিরশিল্প বিভাগের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আছে। ডেপুটি ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ (কটেজ) শ্রীযুক্ত সেন কথা প্রসংগে বলছিলেন সেদিন, আপনারা এসব করছেন দেখে আমরাও উৎসাহ পাচ্ছি। তবে ব্যাপার কি জানেন, কাঁসা-পেতল আর চলবে না। অ্যালুমিনিয়াম আর স্টেনলেস স্টীল
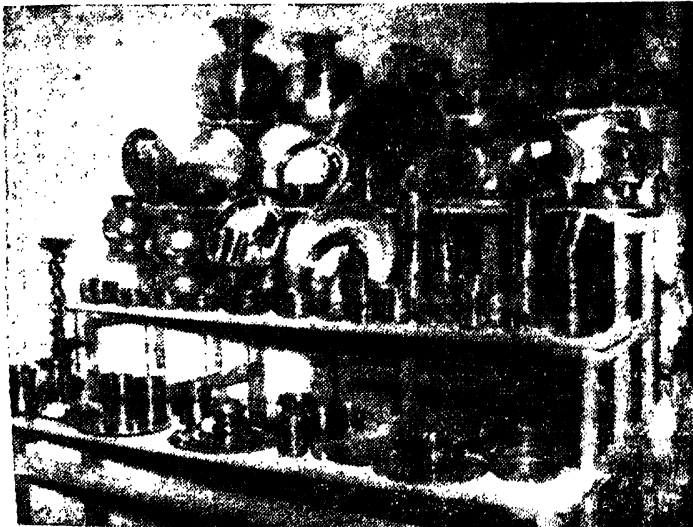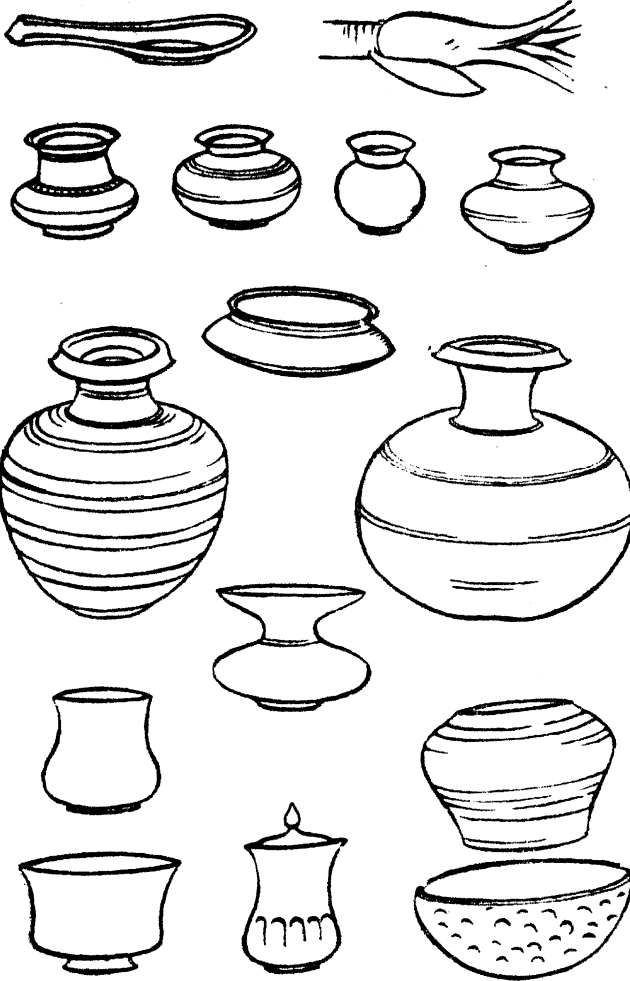
প্রথম সারিতে তামার কোশাকুশি। কাঠেরও। তা' ছাড়া দ্বিতীয় সারি থেকে পঞ্চম সারি অবধি রয়েছে পিতলের নানা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য। ঘড়া, ঘটি, ডেকচি, বাটি, গ্লাস আরও অনেক কিছু। বাঙলার এই কুটিরশিল্পটির কয়েকটি নিদর্শন

যেভাবে ছেয়ে যাচ্ছে দেশে তাঁতে করে কাঁসা-পিতলের অন্ন গেল। তবু চেষ্টা করছি আমরা।

চেষ্টাও তাঁরা করছেন সত্যি। বাঁকুড়ায় তাঁরা একটা রোলিং প্লাণ্ট খুলেছেন খুচরো ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য। কতকগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি চালাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই একটা ল্যাবরেটারী খোলার পরিকল্পনাও রয়েছে এ'দের নানা পরীক্ষার জন্য।

বাঙলাদেশের যেসব জায়গা থেকে মাল আমদানী হয় কলকাতার বাজারে ব্যবসায়ী মহলের ভাষায় তাকে বলে মোকাম। পশ্চিম-বাঙলার প্রায় সব জেলাতেই কিছু কিছু কংসবণিকের বাস আছে। প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোক লেগে আছে এ ব্যবসায়ে। কিছু কমবেশী এক কোটি টাকা খাটছে।

মোকামগুলোর নাম করি প্রথমে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, মেদিনীপুরের ঘাটাল, মনোহরপুর, আজুড়, খড়ার, মহিষাদল, বর্ধমানের বনপাশ, দাঁইহাট, বেগুনেখোলা, হুগলীর বাঁশবেড়িয়া, আরামবাগ (বালী), নদীয়ার মুড়োগাছা, মতিহারী, নবদ্বীপ থেকে আসে বাসনপত্র কলকাতার বাজারে। বড়বাজারের গদিতে তার দাম ওঠে, নামে।

কলকাতার আছে কাঁসারীপাড়া। তবে সেখানে চাদরের বাসনই হয় বেশী। গিয়ে দেখেছি।

কোন্ জেলায় কত লোক এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত রয়েছে তাও মোটামুটিভাবে জানাচ্ছি। বাঁকুড়া—১৩,০০০, মেদিনীপুর—২,৫০০, বর্ধমান—১,৫০০, হুগলী—১,০০০, বীরভূম—১,৫০০, নদীয়া—৩,০০০, মুর্শিদাবাদ—২,০০০; এমনি সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক। কলকাতাতেও প্রায় এক হাজারের মত লোক এ কারবারে আছে।

এইসব লোকের মধ্যে ভাল ভাল কারিগরের অভাব নেই। উপযুক্ত শিক্ষা, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবের ফলে তাদের নাম কেউ জানে না। কোনও গবেষণা কস্মিনকালেও হয়নি এদের নিয়ে। লোকচক্ষুর সামনে ধরবার হয়নি কোনও চেষ্টা। তাই অধিকাংশের নাম সংগ্রহ করাই আজ রীতিমত শক্ত। তবু এ ব্যবসায়ের সঙ্গে বহুদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের কাছে ঘুরে জীবিত ও মৃত কয়েকজন সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর নাম জোগাড় করতে পেরেছি। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, বিরাট এই বাঙলা দেশের বিশিষ্ট এই কুটিরশিল্পটির মধ্যে প্রতিভার এত অভাব আছে। নিশ্চয়ই নেই।

নামের তালিকা দিই। সামান্যই যা জোগাড় হয়েছে। কালীপদ দাস (গ্লাস), নিরঞ্জন দাস (বাটি), রাযেন্দ্র দাস (হাঁড়ি), তিনুপদ দাস (কাঁসার জলখাবারের ডিস, রেকাবি প্রভৃতি), সাধন শোল ও শশী শোল (ঘড়া), পঞ্চুরাম কর্মকার (ঘটি), উপেন্দ্রনাথ জানা (বদনা), ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডলান (ঘটি), বালকরাম মণ্ডল (হাঁড়ি), ভোলানাথ হাউই (তামার হাঁড়ি), ফকিরচন্দ্র ঘোষ (থালা), বলাইচাঁদ পাল (হাঁড়ি), চন্দ্রভূষণ দাস (ডিস), বানেশ্বর দাস (হাতা), রামধন কংসবণিক (চাদরের ঘটি আর কলসী) এমনি সব। এদের মধ্যে কয়েকজন এখনো বেঁচে আছেন। তাঁদের হাতের কাজের তুলনা হয় না।

কাঁসা-পিতলের ব্যবসা বাঙলা দেশে বহুদিনের। কত দিনের তার কোনও সঠিক সাল-তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কলকাতার বাজারেই একশো-দেড়শো বছরের পুরোনো কারবারী রয়েছেন। চন্দ্রকুমার গোঁসাইদাস কুণ্ডু, জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু, জয়দেব নিত্যানন্দ প্রামাণিক, শশিভূষণ প্রভাপদ দে প্রভৃতি বহুদিনের ব্যবসায়ী। এ'দের

অ্যাসোসিয়েশনটির বয়সই প্রায় একশো বছর হোল।

কাঁসা-পিতলের সবচেয়ে বড় বাজার ছিল পূর্ববঙ্গে। অবশ্য পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি জায়গারও বাসনের নাম ছিল প্রচুর। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় বাসনও বিক্রি হতো খুব। সে বাজার চলে গিয়ে আর সব ব্যবসার মতো এ ব্যবসারও ক্ষতি হয়ে গেছে খুব। এখন বাজার বলতে আছে বিহারে প্রায় সবটাই, উড়িষ্যার কিছুটা, আসাম আর ইউ পি'র সামান্য অংশ। ভারতবর্ষের বাইরেও মাল যে একেবারে যায় না তা' নয়। তবে তা' মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

বংশানুক্রমিক ব্যবসা হিসেবে এ ব্যবসা থেকে লোক ক্রমেই চলে যাচ্ছে অন্য ব্যবসায়। ফলে জিনিসের গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে প্রতিদিন। স্বাভাবিক নিয়মেই তা' হচ্ছে। ধনী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাঁচের এবং চীনেমাটির বাসনের ব্যবহার বাড়ছে খুব তাড়াতাড়ি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও চাষী-মজুর পরিবারের মধ্যে ব্যবহার বাড়ছে অ্যালুমিনিয়মের বাসনের। তা' দামে কম, সাফ করায় পরিশ্রম কম এবং পুরাতন জিনিসও বিক্রি হয়। আগে চাষী-মজুর পরিবারে কাঁসা-পিতলের বাসনকে অস্থায়ী সম্পত্তির মতো মনে করা হোত। কারণ যে কোনও সময়েই তার একটা বিক্রয়-মূল্য ছিল। বিপদে পড়লে তা' বেচে বিপদ থেকে সাময়িকভাবে উদ্ধার পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের যা আয় তার চেয়ে ব্যয় বেশী তাই সম্পত্তি করার সাধ তার গেছে।

তবে প্রচার হওয়া দরকার। বিদেশে আমাদের কুটিরশিল্প-জাত জিনিসের মার্কেট করতে হবে। হ্যামিলটন্, বসেক্ যদি সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে এসে আমাদের কাঁটা-চামচ ধরা শেখাতে পেরে থাকে তো কাঁসা-পেতলের ব্যবহার আমরাই বা তাদের শেখাতে পারবো না কেন?

[গত ২রা জুনের পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙলার অলংকার শিল্পের নিদর্শনগুলি শ্রীতুলসীচরণ আঢ্য মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চক্রদত্ত

পৃথিবীতে যতরকমের অস্ত্রোপচার আছে তার মধ্যে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার খুবই শক্ত। এ ধরনের অস্ত্রোপচার আজ পর্যন্ত খুবই কম হয়েছে। সম্প্রতি চিকাগো ওয়েসলী মেমোরিয়াল হাসপাতালের অস্ত্র-চিকিৎসকগণ একটি ছয় বৎসরের বালিকার মস্তিষ্কের অর্ধেক কেটে বাদ দিয়েছেন। এর পরও বালিকাটি স্বাভাবিক অবস্থায় চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। রোগের প্রথম অবস্থায় বালিকাটি 'নিদ্রারোগে' ভুগতো। পরে আংশিক পক্ষাঘাতের ফলে বালিকাটির বাঁ হাত এবং বাঁ পা অবশ হয়ে পড়ে। ক্রমশ তার বাঁ দিকের দৃষ্টিশক্তিও লোপ পায়। এর পর তার স্নায়বিক অবনতি দেখা দেয়। তখন ডাক্তাররা আর কোন উপায় না দেখে বালিকার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের ডান দিকের অংশটি বাদ দেন। সমস্ত অস্ত্রোপচার চারজন ডাক্তার প্রায় চার ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ধরে করেছেন। অবশ্য বালিকাটি সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও সে ক্রমশ আরোগ্য লাভ করছে।

•

জীবে সেবা পরমধর্ম। সেবাব্রতে ব্রতী নার্সদের কাছে অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে যে, এই পরম ধর্মটি পালন করা কত শক্ত। এক ঘেঁয়ে রোগীর ঘরে বসে বসে রোগীর যন্ত্রণা কাতর কান্না শোনা কিংবা অনবরত রোগীর সঙ্গে একই রকম রুটীন বাঁধা কাজ করা যে, কী বিরক্তিকর তা ভুক্তভোগীই বোঝে। টেলিভিশনের সাহায্যে একরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে নার্সদের আর সারাক্ষণ রোগীর ঘরে থাকতে হয় না। নার্স তার নিজের ঘরে বসেই একটি বোতাম টিপে দিলেই তার সামনের টেলিভিশন যন্ত্রের পর্দায় রোগীর চেহারা প্রতিভাত হবে,
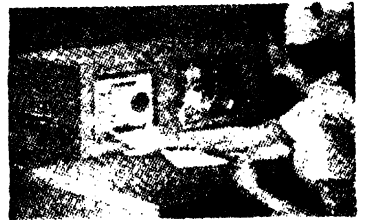
টেলিভিসন পর্দায় রোগীর ছবি প্রতিভাত হচ্ছে

সেই সঙ্গে রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার খবর নিতে পারবে। প্রতিটি রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রতিটি রোগীর জন্য নির্দিষ্ট এক একটি বোতাম আছে। যদি কোনও কারণে রোগী যদি তার পর্দানশীনতা বজায় রাখতে চায় তাহলে সে টেলিভিসন যন্ত্রের যোগাযোগটা তার তরফ থেকে বন্ধ করে দিলে নার্সের সামনের টেলিভিসনের পর্দায় আর তার চেহারা দেখা যাবেনা। নার্স তার চেহারা দেখতে না পেলেও তার সঙ্গে নার্স কথাবার্তা বলতে পারে। সেটুকু যোগাযোগ তখনও বজায় রাখা যাবে।

বড় বড় ক্ষেত খামারে আজকাল ট্র্যাক্টার দিয়ে জমি চাষ করা হয়। যদিও এই ট্র্যাক্টারে জমি তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায়, কিন্তু চালককে এর জন্য বেশ কষ্টস্বীকার করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরো আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য চায়। চালক চায় যে, চেয়ারে বসে বসে সে

চালক-বিহীন ট্র্যাক্টর বেতারের সাহায্যে চলছে

তার ট্র্যাক্টার চালাবে। এটা সত্যিই সম্ভব হয়েছে। আজকাল চালক ছাড়া ট্র্যাক্টার চালান হচ্ছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে বেতারের সাহায্যে। ক্ষেতের বাইরে একটা চেয়ারে বেতারের যন্ত্র হাতে করে চালক বসে আছে। আর এই যন্ত্র টিপে সে তার প্রয়োজন মত সামনে-পেছনে ট্র্যাক্টার চালাচ্ছে। এছাড়াও ট্র্যাক্টারের পেছনে লাগান লাঙ্গলটি বেতারের সাহায্যে ওঠান নামান যায়।

॥ ২ ॥

জগদ্দলে গান্ধী ময়দানের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন নিঃশব্দে বিড়ি ফুঁকছে। শ্যাম তার কাছে গিয়ে দেশলাই চাইল।

ধূমপায়ী বললে, "দেশলাই নেই, বিড়ি থেকে ধরিয়ে নাও, কোথা থেকে আসছ?"

শ্যাম বললে "এঃ, আমার বিড়িটা ভিজে গেছে, হর্দে কমরেডের অসুখ করেছে, আমাকে পাঠিয়েছে।"

ধূমপায়ী বললে, "পেছু পেছু এস— একটু তফাতে।"

অন্ধকূপের মত খোলার ঘরের সারি। তারই মধ্য দিয়ে শ্যাম চলল বিড়ির আগুনে অনুসরণ ক'রে। পথে কাদা, থেকে থেকে আবর্জনার স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোট-বড় ডোবা। এরকম পথে শ্যাম জীবনে কখনো পা দেয়নি, কিন্তু সে একজন "পেশাদার বিপ্লবী"—লেনিনের লেখায় আছে, শখের বিপ্লবী দিয়ে বিপ্লব হয় না, চাই এমন মানুষ বিপ্লবই যাদের পেশা—তার তো পা হড়কালে চলবে না।

বিড়ির আগুন একখানা খোলার ঘরের সামনে এসে থামল। ঘরখানার দরজার মাথা শ্যামের কাঁধ অবধি পৌঁছয় না, একেবারে কুর্নিশ করবার মত নুয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘুঁটে আর কেরোসিনের ডিবের ধোঁয়ায় ঘরখানি এত অন্ধকার যে শ্যাম প্রথম পদক্ষেপ বুঝতে পারেনি ঘরের মেঝেটা রাস্তা থেকে পাক্কা আধ হাত নিচু। হোঁচট খেতে খেতে সে সামলে নিলে।

ঘরে বসে হিন্দুস্থানী একটি মেয়ে, রান্নায় ব্যস্ত। গুটি দুই তিন ছেলেমেয়েও ঘরে আছে, একটি কাঁদছে, একটি তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে আর একটি তারস্বরে 'অ আ' মুখস্থ পড়ছে। আগন্তুক দুটিকে দেখে মেয়েটি একহাতে মাথার ঘোমটা টেনে আর এক হাত দিয়ে কী একটা ইশারা করল। শ্যাম তার তাৎপর্য বুঝলে না, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কালবিলম্ব না করে শ্যামের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। মৃদু-স্বরে সে বললে, "উ বস্তীতে যেতে হবে, এখানে আজ গোলমাল।"

'গোলমালের' খবর পাঠচক্রের সমস্ত সভ্যের কাছে পৌঁছে দিতে হল, নতুন কনট্র্যাক্ট সুতোকলের জংগীমজুরকেও— যাতে সবাই উ বস্তীতে যায়। শ্যামও পিছু পিছু গেল। উ বস্তীতে পৌঁছতে রাত আটটা হয়ে গেল। সেখানে যার ঘরে পাঠচক্র বসবে তার কাছে বোধ হয় তখনও এত্তেলা এসে পৌঁছয়নি, সে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে ব্যাপারটা শুনে সে বেরিয়ে গেল তেল-ভর্তি একখানা লণ্ঠন জোগাড়ের চেষ্টায়। অন্ধকারে শ্যাম এবং তার সহচর একখানা খাটিয়ার উপর বসে পড়ল।

লোকটি বললে, "এখানে তোমার নাম হবে মুজীব, বুঝলে?"

শ্যাম বললে, "বেশ।"

লোকটি হেসে বললে, "এক একজন নতুন কমরেড আসে, তারা মুসলমান নাম নিতে চায় না। মজুরদের মধ্যেও আছে অমন লোক। নাগপুর হরতালের সময় একজন মহারাষ্ট্রী মজুরকে আমরা এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটা মুসলমান বস্তী; এখানে যদি কেউ তাকে 'পাণ্ডুরং' ব'লে ডাকে, তবে পাঁচ মিনিটে সে গেরেফতার হয়ে যাবে। তাই আমরা তার কোমরে রঙীন লুঙ্গি জড়ালাম, চোখে সুরমা দিলাম, পাঠ পড়িয়ে নাম দিলাম 'হমীদ'; কিন্তু লোকটা কেমন শিঁটিয়ে রইল, কিছুতেই ভোলটা ঠিক নিতে চাইলে না। যেমন চারপাশটা সেই রকম হতে হবে, নইলে চট্ করে ধরা পড়ে যাবে, এইটুকুই তো কথা! ভোল বদলালেই ভেতরটা তো আর বদলে যাচ্ছে না।"

শ্যাম বললে, "না।"

লোকটি বললে, "তুমিও এক কাজ কর, চট করে এই অন্ধকারে কাপড়টা বদলে নাও। আমার ঘর এই বস্তীতেই, এখুনি তোমাকে অন্য কাপড় এনে দিচ্ছি। তোমার কাপড়চোপড় পুঁটলি বেঁধে রাখ, যাবার পথে কোথাও আবার বদলে নিও। কী বলো?"

শ্যাম বললে, "বেশ।"

সম্পূর্ণ প্রোলেতারীয় পরিবেশে, নিষ্কলুষ প্রোলেতারীয় পরিচ্ছদে দেহ আবৃত ক'রে শ্যাম পাঠচক্রে বসল।

প্রথম দর্শনেই জংগীমজুর বিসমুভরের শ্যামকে ভালো লেগে গেল। সে বললে,

"এই ব্যক্তি বাইরের কমরেড? বলো কি? এ তো বিলকুল মজুরের মত দেখতে। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে তো আমার মালুমই হত না এ জগদ্দলের মজুর নয়।"

শ্যামের পথপ্রদর্শক ইয়াসিন সগর্বে বললে,

"আরে, বলিনি তোমাকে? আমার পার্টি আর দশটা পার্টির মতো নয়, মুখে সোশ্যালিজম্ কাজে বুরজোয়া। আমাদের পার্টি প্রোলেতারিয়াতের আসল চীজ।"

বিসমুভর একটু হুঁশিয়ার হয়ে বললে, "দেখা যাবে। আগে আমার কতগুলো কথার জবাব দাও।"

ইয়াসিন বললে, "রোসো বাপু, আমাদের কাজ বা-কায়দা হয়ে থাকে। আগে আমাদের সভাপতি ঠিক করা হোক, তারপর তার হুকুমমত কাজ-কারবার চলবে। আমি প্রস্তাব করছি সভাপতি হোক বংশীধর।"

বংশীধর চটকলের মজুর, কম কথার মানুষ। মজলিসে মিছিলে তার সাধারণ দায়িত্ব হচ্ছে শান্তিরক্ষার; কালো পাথরের মূর্তির মত বিরাট দেহখানা তার শান্তি-

রক্ষার উপযোগাই বটে। পাঠচক্রে সভাপতির আসনখান্য তার বরাবরের। সভায় কেউ কখনো তাকে কোন প্রশ্ন তুলতে দেখেনি, তর্কাতর্কিতে যোগ দেওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। জিজ্ঞাসাবাদ করেও তার কাছ থেকে কোন মতামত আদায় করা যায় না। তবু যে কেন সে নিয়মিত পাঠচক্রে হাজিরা দিত সেকথার সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি।
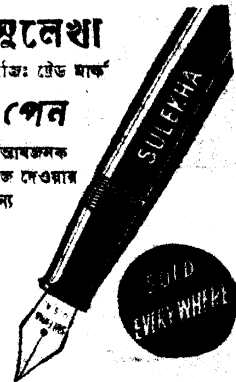
শ্যামের মনে হল, কোথায় যেন বংশীধরের সঙ্গে তার আদল আছে।

সভা আরম্ভ হল। বিসম্ভর অনেক কথা তুলল, তার বেশীর ভাগের জবাব দিতে শুরু করল শ্যাম, দিল ইয়াসিন। অন্য মজুরেরাও খানিক খানিক জবাব দিলে। শুধু একটি প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করল শ্যাম, কেননা সেটার উল্লেখ ছিল লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদে"। ঐ একখানি বই শ্যামের কণ্ঠস্থ ছিল। বিসম্ভর খুব মনোযোগ দিয়ে শ্যামের ব্যাখ্যাটা শুনল।

ঘণ্টা দুই ধরে আলোচনা চলল। কিছু কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেল, কিছুর হল না। যেগুলো হল না তার পরের বারে আবার সেগুলো তোলা হবে, শ্যাম প'ড়ে তৈরী হয়ে আসবে, এই সিদ্ধান্তের পর সভা ভঙ্গ হল।

বিসম্ভর বললে, "চলো কমরেড তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ইয়াসিন বললে, "আরে না, না, আমি পৌঁছে দেব।"

বংশীধর বললে, "আমার সঙ্গে এস।"

জেলখানার চেয়ে উঁচু চটকলের দেওয়াল। পাশ দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় সে দেওয়ালে শেষ নেই। মাঝে মাঝে ল্যাম্প-পোস্ট, তার তলা দিয়ে যাবার সময় শ্যামের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুঝি অন্ধকারে লুকোনো গোয়েন্দারা তাকে দেখে ফেললে। আবার আসে অন্ধকার, প্রাণ পায় ভরসা—পরক্ষণেই দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে আর একখানা ল্যাম্পপোস্ট। আবার আলোর নির্দয় অত্যাচার।

পিছনে চেয়ে দেখবার অদম্য ইচ্ছা শ্যামের, কিন্তু বংশীর বারণ। বংশী পিছনে আছে, বলেছে বিপদ দেখলে শ্যামকে হুঁশিয়ার করে দেবে। তবু চোখ দুটো বশ মানতে চায় না; জোর করে তাদের সাম্‌নেমুখো করে রাখতে হয়।

পথে লোক দেখলেই মনে হয় গোয়েন্দা। কোট-ধুতি-পরা ভদ্রলোক দেখলে তো শ্যাম একরকম ধরেই নেয় তারা গুপ্ত পুলিসের লোক, মজুরবেশী লোক দেখলেও মনে হয় ওটা ওদের ছদ্মবেশ। বরং জলজ্যান্ত উর্দিপরা পুলিস দেখলে প্রাণে আশ্বাস হয়।

অনেকটা পথ চলবার পর বংশী এগিয়ে এসে বললে, এবার রাস্তা সাফ। একটু আগেই মধ্যবিত্ত বাঙালীপাড়া, সেখান থেকে গাড়ি ধরলে শ্যামকে কেউ বড় একটা সন্দেহ করবে না। একটু সাবধানে থাকতে হবে অবশ্যই, কিন্তু অতি-সাবধানে আবার উল্টো ফল হতে পারে।

সে রাত্রে বাড়ি পৌঁছনোর পর জ্যাঠা-মশায়ের তর্জন, মেজদির বকুনি এবং আর কী হল না হল শ্যামের একটুও মনে নেই। শুধু বিছানায় শুয়ে তার মনে হল, যা ঘটেছে তার সবটাই কল্পনা। রাত্রে তার ঘুম হল না।

*　　*　　*

সংস্কৃত শ্লোকে বলে, সুখ-দুঃখের গতি চক্রবৎ। শ্যামের বই-এ বলে, ইতিহাসের ধারা বক্রপথ। শ্রেণীদ্বন্দ্বের মল্লযুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কখনো কখনো জয়ী হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আসে প্রগতির পাল্টা জবাব।

বঙ্গভঙ্গের পরে এল স্বদেশী আন্দোলন। রোলাট অ্যাক্টের পরে হল অসহযোগ। '৩১ সালের জোয়ারের পর এল '৩৩ সালের ভাঁটা—জগৎজুড়ে। জার্মানিতে হিটলারী রাজ কায়েম হল, জাপান মাঞ্চুরিয়া ঘায়েল ক'রে খাস চীনের টুঁটি চেপে ধরবার জন্য হাত বাড়াল। মুসোলিনীর বক্তৃতার সুর চড়তে আরম্ভ করল।

কিন্তু '৩৪ সালে ফাঁসের গেরো আবার ফস্‌কে গেল। ফ্রান্সের লোকসাধারণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়াল। স্পেনও গেল ঐ পথে—সারা ইউরোপে তার সাড়া পড়ে গেল।

দেশেও ধরপাকড়ের ঢেউ চরমে উঠে ঝিমিয়ে গেল। শ্যামের বই-এ লেখে: বিপ্লবের ঢেউ পুরোনো মাটিতে ধস্ ধরিয়ে তার উপর নতুন সমাজের পলিমাটি ফেলে। সে এক জিনিস। আর প্রতিক্রিয়া দেয় জ্যান্ত নদীর মুখে বালির বাঁধ। সে আরেক জিনিস—দুদিন না যেতেই স্রোতের তোড় তাতে ফাটল ধরায়।

'৩৩ সালে গোটা দেশটা ছিল জেলখানা। '৩৪ সাল থেকে তার দেওয়ালে ছোটবড় ফাটল দেখা দিতে লাগল। আজ বোম্বাই বন্দরে ধর্মঘট, কাল যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলন, তার পরদিন কলকাতায় ধর্মঘট—নিত্য এমনি হাঙ্গামায় জেল জুজুর অষ্ট-বন্ধন ক্রমেই আলগা হতে আরম্ভ করল। যে এলাকায় দুদিন আগে পাঁচজন জমা হলে বন্দুকধারী সেপাই তেড়ে আসত, সেখানে বিনা হুকুমে হাজার লোকের জমায়েত হতে লাগল। যে সব বই ছিল অসূর্যম্পশ্যা, মলাট ঢাকা থাকত চার ফেরতা খবরের কাগজে, তারা প্রথমে বেরোলো ফুটপাথে, তারপর দোকানে দোকানে এবং অবশেষে একেবারে বে-পরদা হয়ে লম্বাচুল বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘোরাফেরা করতে লাগল—প্রকাশ্য দিবালোকে। বে-আইনী রাজনীতিক দল-গুলির আবরণও স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

যে-শ্যাম সান্ধ্যের অন্ধকারে বজবজ থেকে হাজিনগর, বাউড়িয়া থেকে ভদ্রেশ্বর ঘুরে ঘুরে কুল্লে পাঁচশো কপি ইস্তাহার ছড়াতে পারলে ধন্য হয়ে যেত, সেই শ্যাম দশ দশ হাজার ইস্তাহার বিলি করতে লাগল এক এক এলাকায়—'৩৬এর নির্বাচনের হিড়িকে। আগে যে কথা হাতে লেখা পত্রিকায় লিখে বার করতেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত আজ সেই কথা বেরোচ্ছে ছাপার হরফে, পার্টির নামে, আর সে জিনিস ছড়াচ্ছে শ্যামনগর, জগদ্দল ব্যারাক-পুরের বস্তীতে বস্তীতে, মিল গেটে, থানার চৌহদ্দির চারপাশে।

এবং শুধু শ্যামই নয়। সেদিন আর নেই যখন হর্ষের অসুখ হলে পাঠচক্র বিপন্ন হয়ে পড়ে—শ্যামকে গিয়ে কার্যোদ্ধার করে দিতে হয়। এখন পার্টির চারপাশে কাতারে কাতারে লোক—কত স্বনামধন্য বিপ্লবী, এক যুগ জেলে কাটিয়ে এসেছেন, কত শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, যাঁদের এক ডাকে হাজার মজুর দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে জড়ো হয়, কত নিখিল ভারতের

ছাত্র-নেতা, কত দেশ-বিদেশে শিক্ষা পাওয়া কর্মী।

লোক বহু, কিন্তু কাজও অনেক। শ্যাম আগেও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেত না, এখনও পায় না। কত কাজ! গজ গজ শালু, বস্তা বস্তা তুলো আনতে হয়, ঝাণ্ডা তৈরী করতে হয়। কাগজ কিনতে হয় রীম রীম, লাখ ইস্তাহার ছাপাতে হয়। সে ইস্তাহার বিলি করাও এক ব্যাপার। বড় বড় সভা হয়, তার মাইকের বন্দোবস্ত, অল্প টাকায় পান্ডাল তৈরী, এও আছে। আর সবচাইতে বড় কাজ, টাকার জোগাড় করা। আগে অল্প-সল্প যা লাগতো মেজদির কাছে হাত পেতে পাওয়া যেত। এখন রসীদ বই কেটে হপ্তার দিন মিল গেটে গেটে লোক লাগিয়ে দুশো পাঁচশো পয়সা আনা সিকি আধুলি জড়ো করতে হয়। তার হিসেব রাখা, সেও প্রায় নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপা! মণ্ডলদের কলেজে হিসেব রাখা শেখানো হত, কী ভেবে শ্যাম ওটা শিখে নিয়েছিল এখন তা প্রতি হাত কাজে লেগে যাচ্ছে। পার্টিতে লোক অনেক কিন্তু হিসেব রাখতে জানে এমন লোক মুষ্টিমেয়।

মেজদির তবু রাগ পড়ে না। বলে, "হ্যাঁ রে শ্যাম, কত লোকের নাম বেরোচ্ছে কাগজে, কই তোর নাম তো দেখতে পাইনে। অথচ তুই তো দেখি সারাদিন গাধার মত খেটে বেড়াস!"

শ্যাম জিভ কেটে বলে, "ওরেব্বাবা, আমার নাম কাগজে বেরোলে কি জ্যাঠামশায় আমাকে আস্ত রাখবে?"

ইউরোপে যুদ্ধ বাধল।

যাদের নাম খবরের কাগজে বেরোতো, তাঁরা কেউ ডুবো-জাহাজের মত হঠাৎ তলিয়ে গেল, কেউ যণ্ডাবিষের মত গ্রেপ্তার হল। সভাসমিতি-আদি আইনসংগত কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ হল না বটে, কিন্তু সবাই বুঝলে, চাকা আবার ঘুরল।

নব বাস পরিত্যাগ ক'রে শ্যাম আবার তার জীর্ণ বাস পরিগ্রহ করল। আবার সেই জগদ্দলের পাঠচক্র, আবার সেই সাইক্লো-স্টাইলে ছাপা 'স্ফুলিঙ্গ', 'চিৎকারে', 'ইন-ক্লাব' বিলির বন্দোবস্ত। কিন্তু শ্যামের মনে হল আর শুধু ওতেই হবে না অন্য কিছুও চাই। এবারে যেন বিপ্লবটা আরো এগিয়ে এসেছে। নরওয়ে গেল, হল্যান্ড গেল, বেলজিয়ম আবার জর্মন দখলে এল। ফ্রান্সের বিরাট মাজিনো দেওয়াল—অক্ষয় কবচ, তাও প্রায় ফুঁয়ে উড়ে গেল। শ্যাম ভাবল, এত প্রচণ্ড একটা শক্তিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাতে পারবে না। একে হারাতে হলে চাই একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবী —[illegible] আক্রমণ। ভারতবর্ষের মত

একটা সুপ্ত সিংহকে যদি জাগানো যায়—খুব তাড়াতাড়ি—তবে ফ্যাসিবাদকে একবার একহাত দেখে নেওয়া যায়।

হর্ষ বললে, আর চীনকেও। চীনে তো বিপ্লবের জমি তৈরীই আছে। মাও সে তুং, জু দে, এরা শুধু ইস্তাহার নয়, হাতিয়ার হাতে যুদ্ধ করছে। চীনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে।

হর্ষের কথাটা শ্যামের খুবই মনে ধরল। কিন্তু চীন যাওয়া যায় কী প্রকারে?

পুলিসের দৃষ্টি ক্রমেই প্রখর হতে আরম্ভ করল। শ্যামেদের কাজও সেই আন্দাজে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। আর একটা নতুন কাজও গজিয়ে উঠল—যারা ধরা পড়ছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। বাঘ শিকারের চাইতেও বিপজ্জনক কাজ! বাঘ শিকারে গুলী ফসকে গেলে শুধু শিকারীদের বিপদ, কিন্তু জেলের চিঠি-পত্রের একখানা ফসকে গেলে সারা পার্টির সংগঠন নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। বিপ্লব পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়!

আরও শক্ত কাজ ক্যাম্পে-আটক কমরেডদের সঙ্গে বই-চিঠি চালাচালি। কলকাতার ভিড়ে এক-আধ টুকরো কাগজ এ-হাত ও-হাত করা আর হিজলী ক্যাম্পে দুখানা থান ইঁটের মত ভারি মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পৌঁছে দেওয়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ।

প্রথমবারে তো শ্যাম ভেবেই পায়নি, ক্যাম্পের কাজটা কী করে ওতরানো সম্ভব। হাতেখড়ি হল তার গদর দলের এক বুড়ো শিখের কাছে। বুড়ো বললে, "যাও, একদিন শুধু হাতে জায়গাটা ঘুরে এস। চোখ-কান খুলে রেখ, দেখো ও-গাড়ীতে যারা যাতায়াত করে তারা কী ধরনের লোক, কলকাতায় কী জিনিসের সওদা করে, কী বলে, কীভাবে চলাফেরা করে। তারপর ওদেরই একজন হয়ে চলে যেও। শেষ কাজটুকু আমি সেরে দেব—ক্যাম্পের রক্ষী দলে খাস আমার গাঁয়ের লোক আছে।"

যেদিন সত্যি জিনিস নিয়ে ক্যাম্পে রওনা হতে হল, সেদিন হাওড়া স্টেশনে গাড়ি চড়া থেকে শ্যামের বুকে শুরু হল জয়-ঢাকের গৎতোড়া। হাওড়ায় আবার ফিরে না আসা ইস্তক সে বাদ্যি বন্ধ হল না।

বড়বাজারে যে-লোকটি তার পিছু নিয়েছিল সে গাড়ীতে উঠে বসল ঠিক তার পাশে। সামনে বসল একটি লোক, নাদুস-নুদুস, জ্বলজ্বলে চোখ—অবিকল ঝানু গোয়েন্দা রাধানাথ পাড়ুইএর মত দেখতে; ও লোক পুলিস না হয়ে যায় না। সময় হলে খপ করে দুজনে দুদিক থেকে শ্যামকে চেপে ধরবে। একজন পাঁজরায় রিভলবার ঠেকাবে, অন্যজন হাতকড়া পরাবে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে শ্যামের ঘাড়ে হাত দিল। ব্যস্—এইবারে তিনদিক থেকে! আর নিস্তার নেই!—কিন্তু তবু, ঘাবড়ালে চলবে না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখলে পিছনে বুড়ো হর্মিন্দর সিং।

রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বুড়োটা পাগল না কি? না অথর্ব হয়ে পড়ছে? সামনে পাশে গোয়েন্দা, চুরবাড়িতে মাল, এই অবস্থায় সে শ্যামকে চিনে ফেললে! এই গদর দলের সুদীর্ঘ বৈপ্লবিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল? এর চেয়ে তো বাঙলা দেশের শিশুও বেশী জানে।

হর্মিন্দর সিং বললে, "বাউজী, টাইম কী হ্যায়?"

শ্যাম বিরক্তমুখে বললে, "আমার কাছে ঘড়ি নেই, বাইরে স্টেশনের ঘড়ি দেখ না।"

হর্মিন্দর হেসে বললে, "চোখ ঠিক নেই, ঘড়ি দেখতে পারি না, বুড়ো মানুষ—"

পাশের লোকটি বললে, "বত্রিশ হয়েছে, এখনও তিন মিনিট দেরি গাড়ি ছাড়তে।"

হর্মিন্দর জিজ্ঞেস করলে, "খড়্গপুর কখন পৌঁছাবে?"

শ্যাম বললে, "নটা চুয়াল্লিশ।"

"আচ্ছা!" বলে হর্মিন্দর আয়েস ক'রে পা মুড়ে বসল।

পাশের লোকটি শ্যামকে জিজ্ঞেস করলে, "কদ্দূর যাওয়া হবে?"

শ্যামের গলা শুকিয়ে গেল। পাঠ তার মুখস্থই ছিল। হর্মিন্দর সিংটা যদি তার পিটিয়ে জানিয়ে না দিত যে তারও গন্তব্য-স্থল খড়্গপুরে তাহলে শ্যাম নির্ভয়ে বলত সে খড়্গপুরে যাচ্ছে। কিন্তু এখন কি তা বলা ঠিক হবে? একবার তার ইচ্ছে হলো বলে সে যাবে চেঙাইল- চেঙাইলের পথ তো
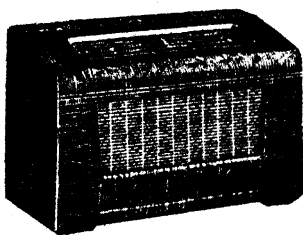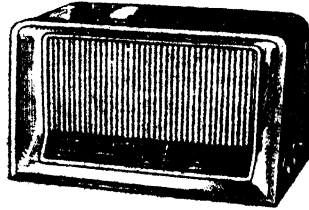
তার অজানা নয়—কিন্তু তাই বা বলে কি ক'রে? চেঙাইলে যে ধর্মঘট হচ্ছে চটকল মজুরদের। সে বললে, "আজ্ঞে খড়গপুরে।"

হরমিন্দর পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলে, "আপ্ ভী খড়গপুর যা রহে হে'?"

শ্যাম বললে, হ্যাঁ।

আবার প্রশ্ন, "খড়গপুরে কোথায় যাবে বাউজী?"

মনে মনে শ্যাম বললে, চুলোয়! মুখে বললে, "রেলওয়ে কলোনিতে।"

হরমিন্দর বললে, "সে কোথায়? গুরুদোয়ারার কাছাকাছি কোথাও? আমি গুরুদোয়ারায় যাব। আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল এক সরদার, কিন্তু সে তো এল না। গাড়ি ভি ছেড়ে দিচ্ছে বুড়ো মানুষ, পথঘাট ভালো দেখতে পাই না—"

শ্যাম বললে, "গুরুদোয়ারা অন্য রাস্তায়। সাইক্ল রিকশাকে বললেই পৌঁছে দেবে। আমি ব'লে দেব'খন"

হরমিন্দর বললে, "মেহেরবানী আপকী।"

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটি শিখ চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠল। গাড়ির লোকেরা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল—যারা এক সেকেণ্ড আগে নিজেরাই চলন্ত গাড়িতে উঠেছে তারাও। হরমিন্দর শণের মত শাদা ভুরু জোড়া কুঁচকে আগন্তুকের দিকে চাইল। আগন্তুক বললে, "সৎশ্রী অকাল বাবাজী।"

হরমিন্দর আশ্বস্ত হয়ে বললে, "সৎশ্রী অকাল, সরদারা। এত দেরি করলে? আমি এই এখনি এই বাবুকে বলছিলাম, আমাকে একাই খড়গপুরের পথে পথে গুরুদোয়ারা খুঁজে বেড়াতে হবে।"

সরদার বললে, "হেডকোয়ার্টারে দেরি হয়ে গেল।"

আর হরমিন্দর শ্যামকে জ্বালালে না, নবাগতের সঙ্গে পাঞ্জাবে রোপড়ের আশ-পাশের নানা গ্রামীণ সমস্যার আলোচনায় পথটুকু কাটিয়ে দিলে। কিন্তু তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শ্যামের বিপত্তি কিছু-মাত্র কমল না। উৎসুক সহযাত্রীদের অনর্গল জেরায় তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। খড়গপুরের রেলওয়ে কলোনির কোন্ বাড়িটিতে সে যাবে, গৃহস্বামী তার কী রকম মামা, শ্যামের কী কাজ, ছুটি কদিনের এসব নানা বৃত্তান্ত তাকে অন্তত দশবার এগুরাতে হল। পাড়ুই-প্রাপ্ত মশাইটি চেঙাইলে নেমে গেলেন, কিন্তু তাঁর জায়গা নিলেন যিনি তাঁর কৌতূহল অদম্য। তিনি গেলেন হাওড়ে নেমে, এলেন আর একটি।

পাশের লোকটি অনড় অচল হয়ে শ্যামের গা ঘেঁষে বসে রইল এবং দশবার মন দিয়ে তার শেখা বুলি শুনল। শ্যামের দৃঢ় ধারণা হল লোকটি মিলিয়ে দেখছে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে বলা তার গল্পগুলো অভিন্ন কি না। গরমিল বেরোলেই বোধ হয় হাতকড়াও বেরিয়ে পড়বে।

খড়গপুর যতই এগিয়ে আসতে লাগল শ্যামের ভীতিও ততই বাড়তে লাগল। এইবার সব খড়গপুরের বাসিন্দেরা গাড়িতে উঠছে, এইবার স্থানীয় লোকেরা তার পড়ায় ভুল ধরবে। কোনো না কোনো ত্রুটি বেরিয়ে পড়বেই এবার। অতএব যখন সে বিনা বাধায় খড়গপুরে এসে নামল, রিকশা ধরল, রিকশায় বসে হুকুম দিল "রেলওয়ে কলোনি চল" এবং পাশের সেই লোকটি তার হুকুম শুনে তখনি তার পিছু না নিয়ে চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল, তখনও তার মনে হল লোকটি থানায় খবর দিতে গেল।

পরদিন সন্ধ্যে বেলায় হরমিন্দর ক্যাম্পে বন্দী কমরেডদের চিঠি এনে শ্যামের হাতে পৌঁছে দিল। বলল, "রাস্তায় তুমি ছোটো-খাটো দু'একটা ভুল করেছ, কিন্তু সে কেউ ধরতে পারেনি। কলকাতায় দেখা ক'রো, সব বুঝিয়ে বলব।"

শ্যাম শুনল তার যেটুকু ভুল হয়েছে তা অভিনয়গত। কোনো একটা ভোল নিতে হলে সেটাকে ঠিক সেইভাবে তৈরী করতে হবে যেভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা নিজেদের পার্ট তৈরী করেন। মামুলী অভিনেতারা শুধু কথাগুলো মুখস্থ করে; শ্রেষ্ঠ অভি-নেতারা তাঁদের পার্টের চোখ, মুখ, চলার ধরণ, হাত নাড়া, উচ্চারণ সবকিছু এমন নিখুঁতভাবে তৈরী করেন যে মুহূর্তের মধ্যে দর্শক ভুলে যায় সে অভিনয় দেখছে। শ্যামের ছদ্মরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে অভি-নয়ের এই সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য তাকে আয়ত্ত করতে হবে।

রাতারাতি শ্যাম থীয়েটারভক্ত হয়ে উঠল। প্রথম কেনা হল অভিনয়কৌশল সম্বন্ধে স্টানিস্লাভস্কির একখানা বই। তারপর সে বুঝল এ-বিদ্যা শুধু প'ড়ে আয়ত্ত করা যাবে না, এর প্রয়োগটাও দেখতে হবে। প্রয়োগ দেখবার একটা সুযোগও মিলে গেল।

শনিবার জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমা থিয়েটার যাবেন ঠিক হয়েছিল। টিকিট পর্যন্ত কেনা ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই হঠাৎ শেষ মুহূর্তে জরুরী কাজে বেরিয়ে গিয়ে সব পণ্ড ক'রে দিলেন। পালা 'প্রফুল্ল'। শিশির ভাদুড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, আরও সব নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রী নামবেন, কলকাতা ভেঙে লোক আসবে, এই সময়ে পড়লো ও'র কাজ—এই কথাটা জ্যাঠাইমা আতস্বরে সবাইকে জানাচ্ছিলেন। হঠাৎ শ্যাম উদ্যোগী হয়ে বললে, সে নিয়ে যাবে জ্যাঠাইমাকে।

জ্যাঠাইমা হাতে স্বর্গ পেলেন, কেন না এর আগে শত উপরোধ সত্ত্বেও শ্যামকে কখনো থীয়েটারে হাজির করা যায়নি। হঠাৎ এই বিষমসময়ে শ্যামের এমন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। মেজদিও আশ্চর্য হলেন। দেশ স্বাধীন না ক'রে শ্যাম কখনও থিয়েটার দেখবে না এমনি একটা ধারণা মেজদির মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ধারণা ভেঙে যাওয়ায় তিনি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন, জগতে শাশ্বত কিছুই নেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অন্যান্য দেশের সরকারী ট্যাক্স আদায়ের রীতিনীতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের দেশের সরকার নাকি বিদেশে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন। —"কিন্তু আমরা শুনেছি ঠিক উল্টো খবর, বিদেশী সরকারই নাকি ট্যাক্স সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

লক্ষ্ণৌর এক সংবাদে শুনিলাম, প্রজা-সোস্যালিস্ট দলে নাকি নেতার অভাব ঘটিয়াছে। —"পাটহাতী ছাড়ার চল্ নেই বলে তার বদলে খবরের কাগজে

কর্মখালি কলামে নেতা আবশ্যক বিজ্ঞাপনের কথাই বলব, একদিনে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সবাই জানেন, আমাদের যত অভাবই থাক্, নেতার ব্যাপারে আমরা উদ্বৃত্ত অঞ্চলে বাস করি"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শুনিলাম কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্যের উপর নাকি তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে। —"তেজস্ক্রিয়তার কথা জানিনে এবং বুঝিওনে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের বাজার যে খুব তেজি চলছে, তা জানি। অবশ্য একথাও স্বীকার করব, আমাদের পক্ষে তেজস্ক্রিয়তা আর তেজি বাজার দুই-ই পরমায়ু-ক্ষয়কারী"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রসংগত অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতার নাকি কম ওজনের বাটখারা অনেক দোকানীরাই ব্যবহার করিতেছেন। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উধৃত করিয়া বলিল—"দোকানীরা বলছেন তাঁরা ঠিক ওজনের বাটখারাই কিনেছিলেন; কিন্তু খুব সম্ভব তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সেই বাটখারা ক্ষয়ে যাচ্ছে—সুতরাং ব্যাপারটা পুলিসের হাত থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবার আগে কোন মীমাংসার আশা নেই"।

* * *

এক সংবাদে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, যে-যোগ্যতার অনুবলে কাহারও নামে রাস্তাঘাটের নামকরণ হইতে পারে, সেই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকের নামে রাস্তাঘাটের নামকরণ হইতেছে এবং যে হারে এই নাম পাল্টাইবার হিড়িক চলিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ বড়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। —"কিন্তু উপায় নেই, কলিতে নামৈব কেবলম্"!!

* * *

নূতন দশমিক মুদ্রা চালুর প্রসংগে আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিপদই হবে সবচেয়ে বেশি, পয়সা সংগ্রহের

ঝামেলা তো যেমন আছে তেমনি থাকবে, মাঝখানে দশমিকের হিসেব রাখতে দশম দশা"!!

* * *

কাঁচরাপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের খবরে শুনিলাম, একদিন রোগীরা নাকি হাসপাতালের ডাক্তার এবং কর্মীদের আক্রমণ করিয়াছে এবং পরে একদিন কোন এক রোগী ধর্মঘটে যোগদান করে নাই বলিয়া তাহাকেও মারধর করিয়াছে। —"ধরা পড়লে এবং একটু সতর্ক হয়ে চিকিৎসা করালে ক্ষয়রোগ সারে বলেই শুনেছি, কিন্তু সেটা বোধ হয় বুকের; মনের এবং মাথার ক্ষয়রোগ কী ক'রে সারে তাই ভাবছি"।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃষি বিভাগের ট্র্যাক্টর ডিভিশনের ৭০ জন কর্মীর উপর নাকি ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন— "সাম্প্রতিক সংবাদে একটি সৎ-পরামর্শের কথা পড়েছিলাম অর্থাৎ সরকারী বড় মাইনের চাকুরেরা দিনে অন্ততঃ এক ঘণ্টা নাকি কোন জমিতে কাজ করবেন। এই অনুমান করেই ট্র্যাক্টর বাতিল করা হচ্ছে কিনা বোঝা গেল না। তবে আমরা বলি গাছে কাঁটাল রেখে গোঁফে তেল না মাখাই বুদ্ধিমানের কাজ"।

* * *

সুদূর প্রাচ্যে বৃটেনের সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার চার্লস লাওয়েন বলিয়াছেন যে, "সীয়াটো" হইল স্বাধীনতার ঢাল।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তিনি নিশ্চয়ই জানেন, এ যুগের যুদ্ধে ঢাল একেবারেই অচল। তাই আমরা বলি সেনাপতি মহাশয় সীয়াটো ছেড়ে বরং পঞ্চশীলের কথাই ভাবুন"।

* * *

আই এফ এ একাদশের সংগে চীনা-দলের খেলা প্রসংগে আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"আই এফ এ-রে বাহাদুরী দিমু; কিন্তু মনে রাইখ্খেন পয়লা গোলটা দিছে কিন্তু ইস্টবেংগলের খেউড়াল"। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"তা দিয়েছে বটে, কিন্তু চীনা-দলকে দেয় নি। চীনাদল আগেই দিল্লী চলে গেছেন, কিন্তু আই-এফ-এ খেলা হবে ব'লে ঘোষণা করেছিলেন—তাই শেষ পর্যন্ত ব্যাণ্টিং স্ট্রীট থেকে এগারোজন চীনা এনে খেলিয়েছেন"!!—সহযাত্রীর সংবাদটা সত্য নয়; কিন্তু জবাবটা জুৎসই হয়েছে, যেমন মন্তব্য, তেমনি তার উত্তর।

এ কোন্ "আরোগ্য নিকেতন"

আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত হবার আগেই কলকাতার নব-নামাঙ্কিত নাট্যালয় বিশ্বরূপা তাদের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(?) "আরোগ্য নিকেতন" দেখাতে আরম্ভ করেন গত ৭ই জুন থেকে। প্রথম অভিনয়ের পরই নাটকখানি সম্পর্কে রঙ্গজগত-এর পাঠকদের অবহিত করা উচিত ছিল; কিন্তু সেটা করা হয়নি এই কারণে যে, বিশ্বরূপা নতুন গঠিত দল, নিজেদের মধ্যে টিমওয়ার্ক গড়ে তুলতে সময় লাগবারই কথা; দ্বিতীয়ত, নাট্যগৃহটির প্রস্তুতি যে সম্পূর্ণ নয়, এটা কর্তৃপক্ষ নাটকখানির উদ্বোধন থেকেই বিজ্ঞাপিত করে আসছেন। তাই এমন অ-প্রস্তুত অবস্থায় পরিবেশিত নাটক সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য প্রকাশ করা অসমীচীন মনে হয়েছে। তাছাড়া প্রথম অভিনয় দর্শকদের কাছে কেমন ফল দর্শায়, তাই দেখে নাটককে পুনর্গঠিত করে নেবার সুযোগ নাট্যে আছে এবং প্রায়শই এই সুযোগ কাজে লাগাবার দরকারও হয়ে পড়ে। এখনও আমাদের দেশে এমন সম্পূর্ণ-প্রস্তুত হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হয় না যে, প্রথম অভিনয়ের পর তার আর পরিবর্তন করতে হয় না। তাই কোন নাটকের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথম কয়েকটি অভিনয় বাদ দিয়ে তার পরের অভিনয় ধরে আলোচনা করা উচিত, কারণ এটা আশা করা যায় যে, দোষ-ত্রুটি বা অপছন্দ যা প্রথম অভিনয়ে পাওয়া সম্ভব, পরের কটি অভিনয়ের মধ্যে তা শুধরে নেওয়া হয়ে যাবে। এখানে "আরোগ্য নিকেতন" সম্পর্কে যে আলোচনা করা হচ্ছে, তা ষষ্ঠ অভিনয়ের ওপর ভিত্তি করে এবং এই ধরে নিয়ে যে, প্রথম অভিনয়ে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ধরা পড়েছিল তা অনেকটা শুধরে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত প্রথম অভিনয়ের পর যে যথেষ্ট অদলবদল হয়েছে, তা বুঝতে পারা যায় এই সূত্রে যে, প্রথমে যার জন্যে লাগতো প্রায় চার ঘণ্টা সময়, তা এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন ঘণ্টাতে।

* * *

"আরোগ্য নিকেতন" যা বিশ্বরূপা পরিবেশন করছেন, তা দেখা শেষ হবার পর প্রথম যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হচ্ছে, এটা কোন্ "আরোগ্য নিকেতন"? অবশ্য রচয়িতার নাম একই, সেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই, কিন্তু তার লেখা রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাসখানির কোথায় কি এ নাটকে! চরিত্রগুলির নামগুলি ছাড়া আর যে কি উপন্যাস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে গভীরে যাবার মোটেই দরকার করে না,

—শৌভিক—

গোনিতেই তা ধরতে পারা যায়। উপন্যাসের মূল ভাবও নেই, ভাষাও নেই, এমন কি আখ্যানবস্তুও নেই। এ এক সম্পূর্ণ আলাদা এবং অনেক নিরেস জিনিস, যার সঙ্গে তারাশঙ্কর কি করে যে নিজের নাম রাখতে দিয়েছেন, সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়ের। কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করতে তাঁরা জানান যে, নাটকখানি মূলত তারাশঙ্করই গ্রন্থন করে দেন, পরে অভিনয়ের সুযোগ

পরলোকে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

'রঙ্গজগত' লেখার শেষ মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, রঙ্গজগতের সুপরিচিতা অভিনয়শিল্পী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় বুধবার সকাল ১২-১৫টায় চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। বাঙলার চিত্রজগতের গর্ব করার মতো যে ক'জন শিল্পীর নাম করা যায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, ভদ্রতায়, সাহিত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়, মানবিকতায় এবং শিল্পকৃতিত্বে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় সেই স্বল্প ক'জনের একজন ছিলেন। ভারতের সীমানা পার হয়ে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্তও পৌঁছেছিল।

সুবিধা অনুসারে আর পাঁচজনে মিলে দরকারমতো পরিবর্তন করে নিয়েছেন। জানি না, তারাশঙ্কর যে নাটকখানি গড়ে দিয়েছিলেন তা কি ছিল এবং পরিবর্তনই বা কি সাধিত হয়েছে, কিন্তু এটা কিছুতেই দেখানো যায় না যে, মূল উপন্যাস আর এই নাটক একই লোকের লেখা, একই সংস্করের একই জিনিস। কে যে দায়ী জানা নেই, কিন্তু একটা কথা বাজারে বেশ চাউর করে দেওয়া হয়েছে যে, উপন্যাস

"আরোগ্য নিকেতন" এমনিই যে, তা নিয়ে নাটক গঠন করা যায় না, অথবা নাটক গড়ে তোলা অতীব কঠিন ব্যাপার। প্রথম কথা হচ্ছে, বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষও যদি জেনেই ছিলেন যে, এ উপন্যাস নিয়ে নাটক গড়া যায় না, তাহলে তাঁরা হাত দিতে গেলেন কেন? আর দ্বিতীয়ত, যদি কঠিনই মনে হয়েছিল, তাহলে আর কি কোন কৃতী লোক ছিলেন না, যাঁকে দিয়ে নাট্যরূপ দিইয়ে নেওয়া যেতে পারতো? এর মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্য রয়েছে। তা নয়তো উপন্যাসের মধ্যে যে অগাধ সমৃদ্ধ উপাদান রয়েছে, তা যে আজকালকার দিনের বেশ একটা চাঞ্চল্য নাটক গড়ে তোলার পক্ষে প্রচুর, সে-সত্য কি করে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে? সুবৃহৎ উপন্যাস এবং বহু ঘটনা, কিন্তু তার মধ্যে থেকে মূল ঘটনা, ভাব, পরিবেশ ও বক্তব্যটা যে ছেঁকে বের করা যেতনা তেমন কোন অসম্ভব্যতা নেই একটুও। জানি না, তাহলে কার এবং কিসের সুবিধের জন্যে যা-নয়-তাই করে এই নাটকখানি পরিবেশন করা হয়েছে। ঠিক-ভাবে নাটক হলে বাঙলা নাট্যালয়কে উদ্বুদ্ধ করে তোলার একটা যে মস্ত সুযোগ ছিল, সেটা হেলায় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

* * *

অতি মহাশয় ব্যক্তি জীবন দত্ত। দু-পুরুষ ধরে সবাই তাঁদের শ্রদ্ধায় মশাই বলে ডাকে। জীবন মশাই। পিতার কাছে কবরেজী শেখেন, তারপর এলোপ্যাথী বিদ্যেও আয়ত্ত করেন; তবে পাশ করে নয়, গ্রামেরই বিচক্ষণ ডাক্তারের কাছে শিখে। ক্রমে নতুন সব অষুধ, নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত পাশ করা নবীন ডাক্তারদের আমদানী হলো। বৃদ্ধ বয়সে জীবন ডাক্তার পরিগণিত হয়ে উঠলেন হাতুড়ে ডাক্তার বলে। কিন্তু তার নাড়ীজ্ঞানের কাছে দাঁড়াতে পারে কে? নিদেন যাকে দেন, তাকে বাঁচায় কার সাধ্য। কিন্তু জীবন মশাইয়ের নিদান পাওয়া রোগীও নতুন ডাক্তারদের নতুন অষুধে বাঁচতে লাগলো। জীবনের পসার নেই। পরনে জীর্ণ বেশ, ডাক্তারখানায় ভাঙা আলমারিতে খালি শিশি, তাকে স্তূপাকার ছেঁড়া রোকরের খাতা, যাতে চিকিৎসা বাবদ নানা লোকের কাছে হাজার হাজার টাকা পাওনার হিসেব। চিকিৎসা বিদ্যার নতুন যুগের ওপর তার আক্রোশ নেই, কিন্তু পরাভবকে মেনে নিতে মানুষের যে সংকোচ ও দ্বিধা তারই প্রতিমূর্তি সত্তর বছরের এই জীবন মশাই। অতীত গৌরব নিয়েই মশগুল। তরুণ বয়সে বর্ধমানে পড়তে গিয়ে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন, তাকে বিবাহ করতে পারেন নি। বিবাহ করে আনেন আরেক মেয়েকে। কিন্তু প্রথম জীবনের প্রেমের সেই ব্যর্থতা তাকে খোঁচা দিয়ে এসেচে, তারই তিনি কিছুটা প্রশমিত করেন তরুণ বয়সের সেই প্রেমিকার দৌহিত্রীর সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিয়ে। পাশকরা ডাক্তার না হতে পারার আফসোস তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন ছেলেকে কলকাতা থেকে ডাক্তারী পাশ করিয়ে নিয়ে। কিন্তু ছেলে ছোট বয়েস থেকেই মদাপ, তার ওপর হলো প্রমেহ, শরীরটা এমনিই ব্যাধি-আকুল করে রেখেছিল যে, কালাজ্বর হতে তাকে আর বাঁচানো গেল না। গাঁয়ের পুরনো লোক জীবন মশাইয়ের শরণাপন্ন হয়, তিনি ওদের নিদান দেন। তাই নিয়ে আধুনিক ডাক্তারদের মধ্যে চাঞ্চল্য, তারা ঠিক করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে জীবনের হাতুড়ে বদ্যিগিরি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু এমনি মানুষ এই মশাই, এমন অনেকগুলো অসাধারণ গুণ তার মধ্যে যে, শেষ পর্যন্ত বিরোধী ডাক্তারদলকেও তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে হয়। তারপর একদিন নিজের নিদান নিজেই দিয়ে নাড়ী টিপতে টিপতে মৃত্যুকে যেন অনুভব করতে করতে মশাই মারা গেলেন। আর তাঁর স্ত্রী আতরবউ 'আমাকে সঙ্গে নাও', বলে শান্ত

আত্মসমর্পণের মতো স্বামীর বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। এই হলো মূল গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

* * *

নাটকের গল্পও যেমন আলাদা, তেমনি ভাব এবং জীবন মশাইয়ের আচরণ ও প্রকৃতিও। এ এক সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া বৈদ্য এবং বৈদ্য বলেই পদবী তার সেন। এ জীবন মশাই আধুনিক এলোপ্যাথী চিকিৎসার প্রতি রুষ্ট। বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক। রোগের চিকিৎসার বদলে কেবল নিদান দেয় বলেই সবাই ওর ওপরে ক্ষেপে যায়। মূল কাহিনীতে ছেলের নাম ছিল বনবিহারী এবং জীবন মশাই নিজেই ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু নাটকে ছেলের নাম সত্যসিন্ধু; সে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে গিয়ে এক খৃশ্চান নার্সের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে। জীবন তা জানতে পারলেন গ্রামের অভয়া মার কাছ থেকে। এই অভয়া মার পরিচয় নাটকে দুর্বোধ্য। শুনেই জীবন মশাই ছেলের সৌজন্য ও বিবাহিতা স্ত্রী ও বিবাহ-জনিত পুত্রকে স্বীকার করতে, গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন। দেখা গেল হাসপাতালের তরুণ ডাক্তার প্রদ্যোৎই জীবন মশাইয়ের সেই পৌত্র। অথচ মূল গল্পে প্রদ্যোৎ বিবাহিত, তার স্ত্রীকে নিয়েই সে হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এসেছে এবং জীবন মশাইয়ের সঙ্গে কোন আত্মীয়তাই তার নেই। জীবন মশাই গ্রামের জমিদার ভুবনেশ্বর রায়কে নিদান দেওয়ায় সে বেচারা আতঙ্কে প্রদ্যোতের শরণাপন্ন হয়, প্রদ্যোৎ তাকে আশ্বাস ও চিকিৎসার সাহায্যে ভালো করে তোলে। সেই সূত্রে ভুবনেশ্বরের নাতনী মঞ্জুর সঙ্গে প্রদ্যোতের প্রেম জমে ওঠে। ওদের বিবাহও প্রায় ঠিক, কিন্তু প্রকাশ পেল প্রদ্যোৎ খৃশ্চান। ভুবনেশ্বর রুখে দাঁড়ালেন। এরপর ঘটনা জটিল হতে প্রদ্যোৎ পড়লো অসুখে। মঞ্জু পিতৃগৃহ ত্যাগ করে প্রদ্যোতের ঘরে আশ্রয় নিলে। মাথার অসুখ, যাতে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। প্রদ্যোৎ তার নিজের ধারার চিকিৎসার ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে জীবন মশাইকে ডাকলে। জীবন মশাই খলে ওষুধ পিষ্ট করে জানালে রোগটা যদি প্রদ্যোতের বংশগত হয়, তাহলেই সুফল পাওয়া যাবে, নচেৎ বিপরীত ফল। প্রদ্যোৎ জানালে, এ তার বংশগত রোগ, নাটকের এখানে ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, প্রদ্যোতের পিতা অর্থাৎ জীবন মশাইয়ের পুত্র সত্যসিন্ধুও এই রোগেই মারা যায়। প্রদ্যোৎ যখন ওষুধ সেবন করছে, তখন ওদিকে আতরবউয়ের কাছে খবর গেল যে, মশাই বংশ নির্বংশ নয়, তার পুত্র সত্যিই গোপনে বিবাহ করেছিল এবং সে বিবাহের স্ত্রী ও পুত্র বর্তমান—তার সেই পৌত্র প্রদ্যোৎ এবং পুত্রবধূ প্রদ্যোতের মা। আতরবউ তখন সাবিত্রীব্রতের পারণ করছিল, খবর শুনেই ছুটলো পাগলিনীর মতো এবং একেবারে প্রদ্যোতের রোগ-বিছানায় আছড়ে পড়লো। নাটকের এই গল্প আর উপন্যাসে আকাশ-পাতাল তফাত।

* * *

নাটকের গল্প আলাদা, চরিত্রের মতি-গতিও আলাদা। উপন্যাসে যেখানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতির ওপরে দৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে আধুনিক চিকিৎসাধারার প্রবর্তনে দেশের রোগ-মুক্তির পথ প্রশস্ত করে তোলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তার বদলে নাটকখানির বক্তব্য ধরে রাখা হয়েছে ডাক্তার আর নার্সের প্রেম করা অন্যায় কি ন্যায়, আর যে পুত্র অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করে, তাকে ত্যাগ করবার যুক্তি দেখানো নিয়ে অতি সংকীর্ণ মনোভাবের ওপরে। এদিকে আবার সস্তা ভাবালুতা সৃষ্টির জন্য প্রদ্যোতের খৃশ্চান মাকে দিয়ে পরিচয় গোপন রাখিয়ে জন্মাষ্টমীর পুজো দিতে পাঠানোর মতোও অসংগত দৃশ্য উপস্থিত করা হয়েছে। এ আখ্যানবস্তুতে না আছে কোন আদর্শ, না কোন তত্ত্ব। মূল উপন্যাসের তুলনায় অতি সস্তাদরের জিনিস দিয়ে ভর্তি এই নাটকখানি, যার সঙ্গে তারাশঙ্করের নামটা জড়িয়ে থাকাই অত্যন্ত আশ্চর্যের মনে হয়। জীবন মশাইকে তিনি যা তৈরী করেছেন, নাটকে সে এক ভিন্ন ব্যক্তি। বইয়ে মরি বৈষ্ণবী বলে একটি চরিত্রের সামান্য উল্লেখ আছে, কিন্তু নাটকে ছ'খানি গান জোগান দেওয়ার জন্যে মোট তিন অঙ্কের বারোটি দৃশ্যে তার ছবার আবির্ভাব, যদিও তা নেহাতই অযথা; বইয়ে মৃত্যু, জন্ম এবং জীবনের পিছনে তার নিয়ত ধাওয়া করে চলার এক ভাবোক্তি আছে, এই সুযোগ আঁকড়েই নাটকে প্রায় আধ ঘণ্টা দীর্ঘ বিবিধ রোগ সহযোগে মরণের কামড়-দেওয়া এক নাচ। যা নাচের দিক থেকে মন্দ না লাগলেও অতি অবান্তর এবং নাটকের গতিপথে বাধাস্বরূপ। এমনি-ভাবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জিনিস সামনে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করতে অদলবদল দরকার হতে পারে এবং তা স্বাভাবিকও; কিন্তু অদল-বদল মানে একেবারে যে ভিন্ন সব কিছু, এ দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপা যা দেখালেন, তার আর তুলনা নেই।

* * *

সেদিনের অভিনয় শেষ হবার পর স্বত্বাধিকারী অনুরোধ করেন সেদিনের অভিনয়ের ওপর যেন আলোচনা প্রকাশ করা না হয়; তিনি জানান যে, আগামী ১ই জুলাই তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেক্ষা-গৃহের উদ্বোধন করবেন এবং তন্মধ্যে নাটকের দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব শুধরে নেবেন। তা হয়তো তাঁরা নেবেন—হয়তো তাঁরা নাটকে যেখানে স্পীকারের সাহায্যে অফ-ভয়েসে কথা হয় তা তুলে দেবেন, হয়তো গ্রাম্য-বৈষ্ণবী মরিকে ড্রয়িং-রুমে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার দৃশ্যটি

অগ্রগামীর আগামী ছবি "শিল্পী"তে গীতা রায়, কালি বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

শুধরে নেবেন, হয়তো মৃত্যুর নাচ দৃশ্যটি কারুর স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সংযুক্ত করে নাট্য-কাহিনীর আরও অন্তর্গত করে তুলবেন; হয়তো যে জয়শ্রী একবার নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁকে চেনা-না-যায় এমন কোন রূপসজ্জা না দিয়েই মৃত্যুর ভূমিকায় অন্যত্র নাচতে দেখার যে অসংগতিবোধ জাগে তা কাটাবার জন্য দুটি চরিত্রে দুজন শিল্পী রাখবেন, ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি সংশোধন হয়তো হবে। কিন্তু তবুও তা তারাশঙ্করের মূল কাহিনীর উপযুক্ত নাট্য-সংস্করণ থেকে বহুদূরেই থেকে যাবে। এই সূত্রে একটা কথা কিন্তু বলতে হচ্ছেঃ নাটকের ক্ষেত্রে বদল করার সুযোগ রয়েছে বলেই তা কেবলই প্রয়োগ করে যেতে হবে, এটাও ঠিক নয়। কারণ প্রথম রজনীর যে দর্শক পয়সা দিয়ে দেখে গেছে, পরে যদি অন্য কিছু অন্তর্ভুক্ত হয় বা কিছু অদলবদল হয়, তাহলে প্রথম রজনীর সেই দর্শককে এই নতুন রূপ দেখায় বঞ্চিত হতে হয়, নিজের বিনা দোষে দর্শককে কেনই বা বঞ্চিত হতে হবে! তাছাড়া ভালোভাবে প্রস্তুত না হয়েই বা নাটকের উদ্বোধন কেন?—আর, প্রেক্ষাগৃহটির নির্মাণকার্যও সম্পূর্ণ না হতেই বা দ্বারোদ্ঘাটন হলো কেন?—এখনো ভালো আসন বসেনি, ঠিকমতো হাওয়ার ব্যবস্থা নেই, অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা দর্শকদের জন্য করা হবে বলে ঘোষিত হয়, তারও অনেক কিছু বাকি থাকতে কেনই বা খোলা হলো!—এমনি আধাখেচড়া অবস্থার মধ্যে যাঁরা অভিনয় দেখে গিয়েছেন, তাঁরা যদি বলেন যে, প্রতিশ্রুতি মতো সব কিছু তৈরী না হতেই এবং সততই পরিবর্তন সম্ভাবনাযুক্ত অবস্থায় যে নাটক পরিবেশন করা হয়েছে, তার জন্যে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল প্রবেশ-মূল্যে অর্ধেক রাখা, পুরো টাকা নেওয়া উচিত হয়নি—তাহলে কি দর্শকদের সে উক্তি অন্যায় বলে ধরতে হবে? নাট্যালয়টি নির্মাণ হাতে নিয়ে কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ডেকে তাঁদের যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তাতে নানা আশায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারা যায় নি। কিন্তু আরম্ভটাই এত শত খামতি বোঝাই যে, আগের সে উচ্ছ্বাস দমে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবুও ৯ই জুলাইয়ের আশায় থাকতেই হয় এবং নতুন করে এই আশা পোষণ করে যে, সেই সময়ের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ যেমন ঘোষণা করে যাচ্ছেন, তেমনিই বিশ্বরূপাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়রূপেই হাজির করে দিতে পারবেন।

* * *

কর্তৃপক্ষ যে চেষ্টা করছেন, তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল আলোর বহু সমাবেশ দেখে। আলোকসম্পাত-শিল্পী তাপস সেন জানালেন যে, ভারতের কোন মঞ্চেই আলোর এমন সমাবেশ নেই এবং আলোক-পাতের এতো রকমের ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাবার মতো কল্পনাপ্রবণ প্রয়োগশিল্পীই যদি না থাকে, তাহলে কি কাজে আসবে এই সমারোহ? "আরোগ্য নিকেতন"এর ক্ষেত্রেই তো তা দেখা গেল। স্টেজের মাচায় চড়ে অসংখ্য সুইচ দেখে তবে বুঝতে পারা যায় আলোর কি বিপুল সমাবেশ, মঞ্চে অভিনীত নাটকের গায়ে তার কোন পরিচয়ই ফোটেনি, ফোটেনি ফোটাবার মতো করে দৃশ্য পরিকল্পিত হয়নি বলেই। সে দোষ আলোরও নয় আলোকসম্পাত-শিল্পীরও নয়, সে দোষ প্রয়োগশিল্পীর, সে দোষ শিল্প-অজ্ঞতার। আর এই শিল্প-জ্ঞানের অভাবের দরুণ,

সরঞ্জামের কোন অভাব না থাকলেও উল্লেখ করার মতো দৃশ্যপটও দেখা গেল না, যা ভাবসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করে দর্শকমনে চমক ধরিয়ে দিতে পারে। আখ্যানবস্তুটির কি পরিবেশ, তা উপন্যাসে এমনভাবে বর্ণিত রয়েছে, যার সাহায্যে চমৎকার শিল্পসৃষ্টির কৃতিত্ব প্রকাশ করা যায়—'ভাঙাগড়ায় বিচিত্র সমাবেশ গ্রামখানিতে পুরাতন নূতনের সমাবেশ'—এই বিবৃতি থেকে কেমন সুন্দর নাটকীয় পরিবেশই না গড়ে নেওয়া যেতো। তাছাড়া আরও বিশদ করেও দৃশ্য বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সেদিকে নজর পড়েনি,—অবশ্য সে কাহিনীই তো নেই এ নাটকে। এমনিভাবে নাটকখানির গঠনে যেমন, তেমনি মঞ্চে তার উপস্থাপনে আর তেমনি প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণ ব্যাপারে, সর্বতোভাবেই গোলেমালে কাজ সারবার চেষ্টাটা বড়ো বেশীরকম প্রকট। এতোটা আশা করা যায়নি। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে সর্বাদিকের সব ঘাটতি শুধরে নেওয়া যদি সম্ভব না হয় তো তাঁরা আরো দিন নিন; কিন্তু স্বাধীন ভারতে নতুন তৈরী প্রথম নাট্যালয়টিকে যেন যা তা চেহারায়, যা তা ভাবে পরিবেশিত নাটক নিয়ে চালাতে প্রবৃত্ত না হন।

* * *

"আরোগ্য নিকেতন" নাম নিয়ে যে নাটক পরিবেশিত হচ্ছে তার মধ্যে গল্পের যা কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তা কাজনের অভিনয়ের মধ্যেই, আর সেই টানেই শেষপর্যন্ত বসেও থাকতে হয়। এক কম্পাউন্ডারের চরিত্র আছে—শশী কম্পাউন্ডার। মূল বইয়ে বর্ণিত চেহারা ও প্রকৃতির সঙ্গে সামান্য মিল ছাড়া এটা একেবারেই নতুন সৃষ্ট একটি চরিত্র। এখানে সে প্রদ্যোতের হাসপাতালের কম্পাউন্ডার, নার্সদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির মধ্যে দিয়ে কড়া সত্যও বলে ফেলে। এলোমেলো মাতাল কিন্তু এই মর্মান্তিক আবেদনভরা বিচিত্র চরিত্রটির সৃষ্টিতে কালি বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যসাধারণ এক নাট্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বহুদিন পর মঞ্চে একটি অতি মৌলিক টাইপ-চরিত্র দেখার আনন্দ পাওয়া গেল। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কৃতিত্ব বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং এই নাটকখানির ঐটেই প্রধান আকর্ষণ বলে মনে লাগবে। বইয়ের সঙ্গে এই নাটকের জীবন মশাইয়ের চরিত্র মেলে না, তবুও নিতীশ মুখোপাধ্যায় তার সাধ্যমত অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শকের আবেগকে স্পর্শ করার মতো একটা চরিত্র দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; অভিনয়ে তিনি তার অংশটি দিয়ে বেশ একটি ভাবগম্ভীর আবহাওয়া এনে দেন। নাটকের জীবন মশাইয়ের ধর্মত্যাগী পুত্রের সন্তান প্রদ্যোৎ ডাক্তারের চরিত্রাভিনয়ে বসন্ত চৌধুরীর মঞ্চে এই প্রথম অবতরণ। এইটেই নাটকের নায়কচরিত্র, এবং চেহারা ও কণ্ঠের দিক থেকে বসন্ত চৌধুরী বাঙলা মঞ্চের যে শোভা বাড়াবেন সে পরিচয় পাওয়া গেল, তবে ভঙ্গীর একটু আড়ষ্টতা আছে এবং আশা করা যায় সেটা তিনি কাটিয়ে উঠে ভঙ্গীতে সাবলিলতা আনতে পারবেন। এই সম্ভাবনার কথা মনে করে বসন্ত চৌধুরীর মঞ্চাবতরণকে সুস্বাগতম জানাতে আপত্তি করবেন না কেউ। আর মঞ্চে এই নতুন শিল্পীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশ্বরূপও ধন্যবাদার্হ। থাই থাই বাতিক দাঁতুর কমিক চরিত্রে নবদ্বীপ হালদার অভিনয়ের দিক থেকে নাটকের আর একটি উপভোগ্য অংশ। ওর রাগে ক্ষেপে যাওয়া হাসির মধ্যেও নাটকীয় তেজ ফুটিয়ে তোলে। আর একটি চরিত্র মনে ছাপ রাখে,—জীবন মশাইয়ের পুরাতন ভৃত্য ইন্দিরের ভূমিকায় মনি শ্রীমানির অভিনয় বেশ খানিকটা নাটকীয়তার সঞ্চার করে দেয়। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে আতরবউয়ের ভূমিকায় শান্তি গুপ্তাকে বহুদিন পর মঞ্চে দেখে পুরণো আমলের নাট্যরসিকরা তার আগেকার নাট্য কৃতিত্বের কথা স্মরণ করতে থাকবেন। ভূমিকার অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হচ্ছে সন্তোষ সিংহ, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, মেনকা দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল, পূর্ণিমা দেবী প্রভৃতি। তিনজন সাহিত্যিক নাটকখানি পরিচালনা করবেন বলে বিজ্ঞাপিত হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত কেবলমাত্র শৈলজানন্দের ওপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। শৈলজানন্দ নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হয়ে মূলে 'আরোগ্য নিকেতন'কে জবাই করে অন্য একটা জিনিস হাজির করে দিয়েছেন সেটা বিশ্বাস করতে যেন মন চায় না। কেন যে নাটক এমন হলো সেইটেই তো কেমন যেন রহস্যজনক লাগে। তাছাড়া

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় প্রথম বাঙলা চিত্র প্রচেষ্টা—ইণ্ডো বার্মা ফিল্মসের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের 'ছবি'র জন্য নির্বাচিত নায়ক ও নায়িকা চরিত্রে আশীষকুমার ও মালা সিংহ। ছবিখানি পরিচালনা করবেন নির্মল দে

নাট্যবিন্যাসের দিকেও পরিচালন কৃতিত্বের কোন জোরালো পরিচয়ও নেই। সংগীতের দিকটা সমৃদ্ধ করার জন্য কমল দাশগুপ্তের ওপর ভার দেওয়া হয়। আবহ সংগীতে কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নেই। গানের জন্য সুখ্যাতা গায়িকা কমলা ঝরিয়াকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেখানে একখানি গান থাকলেই চলতো সেখানে অনর্থক ছ'খানি গান। ৯ই জুলাইয়ের অভিনয় দেখা পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখার অনুরোধ রক্ষা করার কোন দরকার আছে মনে হলো না, তবে যদি সত্যিই তেমন তেমন পরিবর্তন সাধিত হয় তাহলে অবশ্যই সে বিবরণ দিয়ে নতুন করে আলোচনার অবতারণা করতে আপত্তি হবে না।

একখানি কৃতিত্বে উজ্জ্বল ভালো ছবি

বেশ ভালো ছবিই বলে অভিহিত করা যায় কল্পনা মুভীজ কৃত নিরুপমা দেবীর জনপ্রিয় রচনা 'শ্যামলী'র চিত্ররূপায়ণকে; বেশ চৌকস ভালো ছবিই বলা যায়। স্টার মঞ্চে দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত রজনী ধরে অভিনীত হওয়ার যে অভূতপূর্ব ইতিহাস 'শ্যামলী' রচনা করে দিয়েছে তার ফলে এই বোবা-কালা মেয়েটির জন্য বাঙলার আপামর জনসাধারণের মনে যে টান তা নতুন করে জাগিয়ে তুলবে এই ছবিখানি এবং যে আবেদন কেবল কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে আরও সহস্র সহস্রজনের মনকে সহানুভূতিতে আপ্লুত করে তুলবে। অমন সফল নাটক আগেই মঞ্চস্থ হয়ে যাওয়ায় তার সংগে ছবিখানির তুলনা স্বতঃই এসে পড়ে। দেখা যায়, নাটকখানির চেয়ে চিত্রনাট্যটি হয়েছে ঢের বেশী জমাটি। নিতাই ভট্টাচার্য গল্পটিকে বেঁধেছেন ভালো, আর পরিচালনায় এবং আলোকচিত্রগ্রহণে অজয় করও বেশ প্রাণবন্ত করে গল্পটি হাজিরও করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ভালো বাঁধুনীর জোরালো গল্প হলে যে ছবির সকল বিভাগের মধ্যেই বেশ একটা উদ্দীপনাময় কৃতিত্ব ফুটে উঠেই 'শ্যামলী' তার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

* * *

কাহিনীটি এতো পরিচিত যে এখানে তা বিবৃত করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এর চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ গুণ আছে। 'শ্যামলী'র যা মূল পরিবেশ তা এমন আমলের যা এখনকার লোকের কাছে পুরণো ঠেকবে, অথচ কাহিনীর যে আবেদন তার মধ্যে একটা শাশ্বতের ধ্বনি রয়েছে। চিত্রনাট্যকার আবেদনটি ঠিক রেখে দিয়ে এমন উপাদান সংযোগে কাহিনীটি সাজিয়েছেন যা এখনকার যে কোন মনকেই ভাবাকুল করে তুলবেই। তার জন্য নতুন কথাবার্তা এবং দৃশ্য অবশ্য যুক্ত হয়েছে, কিন্তু মূল কাহিনীর পথ থেকে সরে গিয়ে নয়। পরিচালনায়ও একটা নিবিড় আন্তরিকতা সুস্পষ্ট। খানিক খামিক আতিশয্য, যেমন শ্যামলীকে বিবাহ করার পর তাকে পিত্রালয়ে তুলে দিয়ে মনমরা স্বামী অনিলের মাকে নিয়ে তীর্থ দর্শনের স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার সুদীর্ঘ চলমান দৃশ্য। দৃশ্যগুলি অবশ্য ভালো, ঝকঝকে এবং বহির্দৃশ্যের সংগে স্টুডিওয় তৈরী সেটের এমন চমৎকার মিল, বা ব্যাক-প্রজেকসনে তোলা দৃশ্যগুলি, যা সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের খুবই কৃতিত্বের নিদর্শন; বাঙলা ছবিতে এমন মিল দেখা যায় না। তবুও মনে হয় এসব দৃশ্য যেন অনেকখানি বেশী। হৃষিকেশ থেকে আগত অনিলদের আশ্রিতা রেবা যখন শেষ জানলো যে, অনিলকে সে আপনার করে পেতে পারবে না, সেই শুনে তার মুখে গান, কাহিনীটি যে ধরণে নিবদ্ধ তাতে যেন বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়ায়। সবে শেষে শ্যামলীর মার মৃত্যুর পর বুনো শ্যামলীর খবর শুনে মাকে সম্মত করে এবং শ্যামলী যতোদিন না ঠিক মতো গড়ে ওঠে ততোদিন রেবা তার পরিচর্যায় থেকে যাবার প্রতিশ্রুতি দেবার পর যখন অনিল গিয়ে শ্যামলীর সংগে মিলিত হলো, গল্পের তো সেইখানেই সমাপ্তি। তারপরও অনিলদের বাড়ি থেকে রেবার বিদায় গ্রহণের করুণ দৃশ্যের অবতারণার কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং তা সংযোজিত হওয়ায় শেষকালে দেখা গেল গল্পটা 'শ্যামলী'র স্থলে বদলে দাঁড়িয়ে গেছে 'রেবা' হয়ে। চিত্রনাট্য বা পরিচালনার এইটাই হয়েছে বড়োগোছের অসংগত ব্যাপার। অনিল হৃষিকেশ থেকে অসুস্থ হয়ে আসার পর তার রোগবৃদ্ধি ও আরোগ্য নিয়ে একবার রোগীর মুখ, একবার তার সেবিকার মুখ, একবার ওষুধের শিশি, একবার ঘড়ী, একবার ক্যালেণ্ডার ইত্যাদির ফেরাফের দ্বারা যে মণ্টাজ দৃশ্য তৈরী হয়েছে, এমনিতে অবশ্য তা ভালোই হয়েছে তবে ওটা বড়ো একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। অজয় কর মৌলিকভাবে কিছু পরিবেশন করেন বলেই তার কাছ থেকে অন্যরকমের কিছু আশা করা গিয়েছিল।

প্রগতি চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক প্রচেষ্টা 'রাত্রিশেষ'এ রেণুকা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী ও রাণী গাঙ্গুলী

যাই হোক, এগুলোকে ঠিক ত্রুটি বলা যায় না; নতুনত্ব না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ মাত্র।

* * *

পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি বিন্যাসের সংগে চমৎকার সংগতি রক্ষা করে গিয়েছে অভিনয়ের দিকটা। নাম ভূমিকায় মঞ্চে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রতিভার পরিচয় যারা পেয়েছেন তাদের পক্ষে ছবিতে এই ভূমিকায় অবতীর্ণা কাবেরী বসুর অভিনয়ের তুলনা চেপে রাখা সম্ভব নয়। ছবিতে কাবেরী বসু মানিয়ে গিয়েছেন এবং পরিচালক চরিত্রটিকে এমনিভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে শ্যামলী মঞ্চে যে পরিমাণ আবেগ উচ্ছ্বসিত করে তোলে এখানে তার কিছু কমতি হয় না, কিন্তু সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের যে ব্যক্তিগত অভিনয়দীপ্তি ছিল এখানে তা নেই। তবে অভিনয় করেছেন অনিলের চরিত্রে উত্তমকুমার যা এই ভূমিকাতেই তার মঞ্চাভিনয়ের চাইতে বেশী জোরালো এবং বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অনিলের ছোট ভাই সুনীলের চরিত্রে অনুপকুমার সকলকে ছাড়িয়ে তার সরল হাল্কা ভংগীর অভিনয়ে দর্শক মাত্রেরই মন জয় করে নেন। রেবার চরিত্রে অনুভার অভিনয় ভাবগত, তবে চরিত্রটির ওপর একটু বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনিলের মায়ের চরিত্রে মলিনা দেবীর অভিনয় নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তোলে। বেশ স্বচ্ছ আবেগময় শ্যামলীর মায়ের চরিত্রে অপর্ণাও প্রশংসিত হবেন। শ্যামলীর পিতার ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী সমাজের চাপে নিগৃহীত অসহায় বৃদ্ধের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনয়ে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, অমর বিশ্বাস, খগেন পাঠক, আশীষ মুখোপাধ্যায়, মনিকা গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী, আশা দেবী, লীলাবতী, বেলা দেবী, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের সুষ্ঠু কাজে ছবিখানি রূপবান। প্রতিটি বিভাগের কাজই ঝকঝকে। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেনের আবহসংগীতে বিলিতী বাজনার চাকচিক্য থাকলেও বেশ মনোজ্ঞ হয়েছে এবং কাহিনীর নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করে তুলতে ও অনুকূল আবহাওয়া গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। অনিলের সংগে বরযাত্রীদলের একজন হয়ে এসে একখানি গান শুনিয়েও কালীপদ সেন মাতিয়ে দেন—কিন্তু গানখানি গাওয়া কার? যারই হোক, বেশ মনভরে উপভোগ করার মতো গান। গানগুলি লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুনীল সরকারের শিল্পনির্দেশনার কাজও বেশ ছিমছাম। অন্যান্য কাজে আছেন শব্দগ্রহণে জে ডি ইরানী, সংগীত রেকর্ডিংয়ে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

একলব্য

কলকাতা ফুটবল ক্ষেত্রের দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোহনবাগান ক্লাব ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করেছে। লীগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই খেলায় মোহনবাগানের প্রথম গোলের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। মাঠে, ঘাটে, পার্কে—ট্রামে, বাসে, রকের গুলতানিতে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, হোটেল রেস্তোরাঁ, এমন কি অন্দর মহলেও এই গোল নিয়ে আরম্ভ হয়েছে তুমুল বিতর্ক। কারো মতে গোলটি আইনসিদ্ধ, কারো মতে রেফারীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক—বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেনি।

প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই গোলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সমস্ত সাংবাদিকই স্বীকার করেছেন তাঁদের বসবার যায়গা থেকে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেছে কি না তা বোঝা শক্ত। আমারও স্বীকার করতে বাধা নেই, 'প্রেস বক্স' থেকে আমি বুঝতে পারিনি বলটি সত্য-সত্যই গোল লাইন অতিক্রম করেছিল কি না। বলটি গোল লাইন অতিক্রম করতেও পারে, না-ও করতে পারে। যদিও বলের গতি, শটের দূরত্ব, গোল-কিপারের বল ধরার প্রক্রিয়া এবং লাইন্স-ম্যানের তুকীম্ভাবের বিবেচনায় মনে হয় বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেনি, তবুও আমি নিশ্চিত নই বলে বলছি বলটি গোল লাইন অতিক্রমও করতে পারে। বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে, কি করেনি এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল বোঝবার সুযোগ ছিল লাইন্সম্যানের আর গোল লাইন বরাবর উপবিষ্ট দর্শক সাধারণের। বহু দূরে দণ্ডায়মান রেফারীর কোনই সুযোগ ছিল না। খেলা আরম্ভের সময় সেণ্টার হাফ ব্যাক যে যায়গায় সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকেন, —রেফারী আর বাগচীও দাঁড়িয়েছিলেন সেই যায়গায়। গোলের বিপরীত দিকে অত দূরে দাঁড়িয়ে রেফারী কি করে বুঝলেন বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে তা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। রেফারীর চেয়ে ব্যাপারটা

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চ্যারিটি খেলায় বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে উপস্থিত মোহনবাগানের ১৯১১ সালের শীল্ডবিজয়ী তিনজন খেলোয়াড়। বাঁ দিক থেকে—সুধীর চ্যাটার্জি, জে এন রায় ও হাবুল সরকার

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় মোহন-বাগান গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জিকে একটি বল ফিস্ট করতে দেখা যাচ্ছে

সাংবাদিকদের বুঝবার সুবিধা ছিল অনেক বেশী। কারণ তাঁরা ছিলেন গ্যালারীর সব চেয়ে উপরে। কিন্তু কোন সাংবাদিকই জোর করে বলতে পারছেন না বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেছে কি না। লাইন্সম্যানও গোলের নির্দেশ দেননি। আমার মনে হয় অভিজ্ঞ রেফারী রমেন বাগচী লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভাল করতেন। লাইন্স-ম্যানের নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে গোলের নির্দেশ দেওয়া হঠকারিতা হয়েছে। কারণ বল খেলার মধ্যে রয়েছে, না গোল লাইন কি টাচ লাইন অতিক্রম করে বাইরে গেছে এটা দেখার প্রধান দায়িত্ব লাইন্সম্যানের। অবশ্য সব সময়ই লাইন্সম্যানের নির্দেশ রেফারীর অনুমোদন সাপেক্ষ। তা ছাড়া আইনেই বলা হয়েছে :

...."It is the duty of the referees to act upon the information of neutral Linesmen with regard to incidents that do not come under the personal notice of Referees". [official decision—Law—5]

এ ছাড়া লাইন্সম্যান সম্পর্কেও ৬ নম্বর আইনে বলা হয়েছে :

"Linesmen where neutral may be asked by the referee to give an opinion on the ball crossing the goal-line between the posts". [official decision]

অবশ্য May be asked থাকাতে জিজ্ঞাসা করা না করা রেফারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর-শীল। কিন্তু ঘটনা অনুযায়ী তিনি জিজ্ঞাসা করলে সন্দেহের কারণ থাকতো না।

আর রেফারী রমেন বাগচী অতীতে লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করেননি, এমন

নয়, গতবার লীগের খেলায় মোহন-বাগানের বিরুদ্ধে রাজস্থান ক্লাবের কানাইয়ান গোল করবার পর যে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়, সেই খেলাতেই রেফারী রমেন বাগচীকে মোহনবাগান অধিনায়ক এস মান্নার দাবীতে লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা গেছে। ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়ের দাবীতে এবারও তাঁর লাইন্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল বলেই মনে হয়। যিনি বিচারক তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ সন্দেহ না করতে পারে এমনভাবেই বিচার করা উচিত। লাইন্স-ম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কোন কথাই হয়তো উঠতো না।

• • •

এই খেলার সূচনাতে মোহনবাগান ক্লাব আরও একটি গোল করেছিল। কিন্তু লাইন্স-ম্যানের অবসাইডের নির্দেশে রেফারী গোলটি নাকচ করে দেন। গোল করেছিলেন মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল। অবসাইডে ছিলেন রাইট আউট এস সেন। আইনের দিক দিয়ে গোলটি অবসাইডের জন্য বাতিল হতে পারে, কিন্তু আইনেই রয়েছে অবসাইডে থাকা অপরাধ নয় যদি তিনি খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেন। এই গোল সম্পর্কে আমার অভিমত রেফারী যদি লাইন্সম্যানের নির্দেশ অমান্য করতেন, তবে বিশেষ কিছুই বলবার থাকত না। কারণ এস সেন অবসাইডে খানিকটা দৌড়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু গোল-কিপারের দৃষ্টিতে কোন বাধা সৃষ্টি করেন নি, ইস্ট-বেঙ্গলের অপর কোন খেলোয়াড়েরও উদ্বেগ সৃষ্টির কোন কারণ ঘটেনি,—কে পাল বেশ একটু দূর থেকে সরাসরি শট করেই গোল করেন।

রেফারীর পরিচালনার অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু ভুলচুক না ছিল, এমন নয়। প্রথম
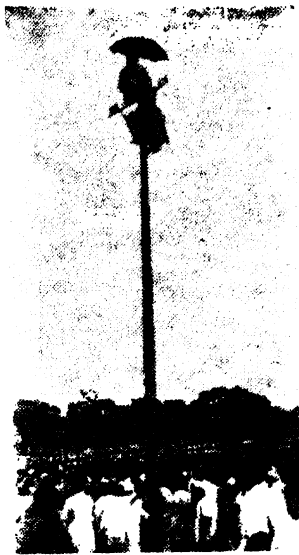
বেপরোয়া ফুটবল দর্শক—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা দেখবার জন্য এরা টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর বসে আছেন

গোলের পর মোহনবাগানের রাইট হাফ ব্যাক সুভাশীষ গুহ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে মুসাকে একবার ফাউল করেন, অনেকের মতে এখানে রেফারীর পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। একটু পরে আবার অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ব্যাক রৌঙ্ক মোহনবাগান সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পালকে হাত দিয়ে ঠেলে দেন—এ ঘটনাও ঘটে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে। এখানেও রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি পেনাল্টি দেন নি এবং দুই দিকের অপরাধে অপরাধে কাটাকাটি হয়ে গেছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। দুই দলের সমর্থকমনে এখনও কিছু কিছু ঝড় বইছে। ময়দানের খোলা হাওয়ায় মনের এ ঝড়ও শীঘ্র কেটে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[২০—৬—৫৬]

লীগের দৌড়ে মোহনবাগান অনেকখানি এগিয়ে গেছে। যদিও লীগের মোট ২৬টি খেলার মধ্যে মোহনবাগানের শেষ হয়েছে অর্ধেক অর্থাৎ ১৩টি খেলা তবুও নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে মোহনবাগান অনেক এগিয়ে আছে। মহ-মেডান স্পোর্টিং যেখানে ৬ পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গল ৭ পয়েন্ট নষ্ট করেছে সেখানে মোহনবাগান নষ্ট করেছে মাত্র ১ পয়েন্ট: এবং ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের পর ১৪টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই অপরাজিতের গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধেক খেলা বাকী থাকলেও নিতান্ত অঘটন কিছু না ঘটলে মোহনবাগানের লীগজয় একরূপ নিশ্চিত বলা যায়।

'রেলিগেশন' বা অবনমনের প্রশ্নে এবার নীচের দিকে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না বলে টানাহ্যাঁচড়া বলাই সংগত। নীচের দিকে একটি পয়েণ্টেরও মূল্য যথেষ্ট। কালীঘাট এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত কোন খেলায় জিততে পারেনি। জর্জ টেলীগ্রাফ একটি খেলায় জিতলেও সবচেয়ে কম পয়েণ্ট পেয়ে আছে লীগের সর্বনিম্নে।

দিল্লীতে চাইনিজ অলিম্পিক টীম ও নিখিল ভারত ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলার আগে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে উভয় দলের খেলোয়াড়গণ। চাইনিজ টীম ১—০ গোলে খেলাটিতে জয়লাভ করে
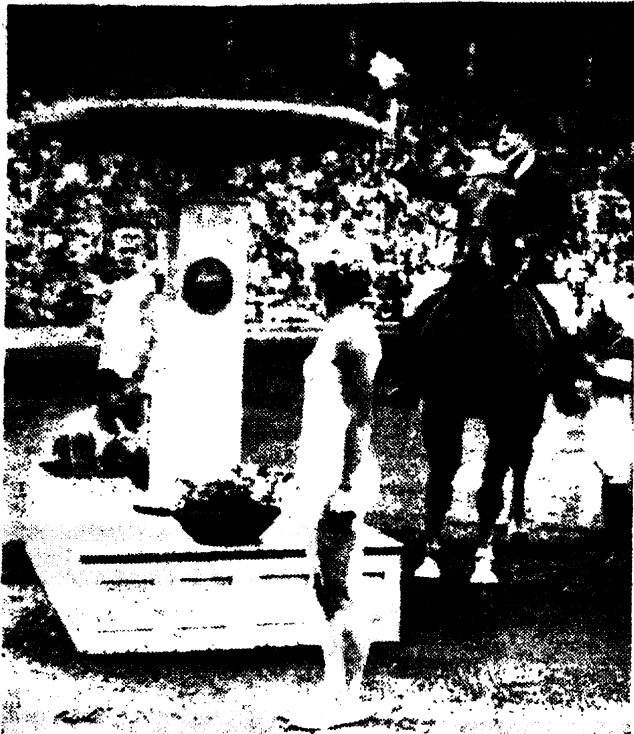
স্টকহলমে অলিম্পিক অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সুইডেনের রাইডিং মাস্টার হ্যানস উইকনে পুত্তাশিন দ্বারা অলিম্পিক মশাল প্রজ্বলিত করছেন। অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে বৃটেন, গ্রাণ্ড প্রিক্সে সুইডেন ও গ্রাণ্ড প্রিক্স্ নাকে জার্মানী বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে

আলোচ্য সপ্তাহে তিনটি ছোট ক্লাবের শক্তিশালী মোহনবাগান ও ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করবার কৃতিত্ব উল্লেখ-যোগ্য। কালীঘাট ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করেও একটি পয়েণ্ট লাভ করতে পারেনি। পুলিস ও বালী প্রতিভা মোহন-বাগানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করেও শেষ-পর্যন্ত হয়েছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। রেফারীর পরিচালনার বিরুদ্ধে বালী প্রতিভা শেষ সময়ের খেলায় অবস্থান ধর্মঘট করে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিশনের ফলাফল :—

১৩ই জুন

মোহনবাগান (৩)	: কালীঘাট	(৩)
ইস্টবেংগল (১)	: উয়াড়ী	(০)
রাজস্থান (০)	: বালী প্রতিভা	(০)

১৪ই জুন

মহঃ স্পোর্টিং (০)	: এরিয়ান	(০)
পুলিস (২)	: রেলওয়ে স্পোর্টস	(০)

১৫ই জুন

মোহনবাগান (৪)	: বালী প্রতিভা	(১)
ইস্টবেংগল (১)	: খিদিরপুর	(১)
জর্জ টেলীঃ (০)	: বি এন আর	(০)

১৬ই জুন

মহঃ স্পোর্টিং (২)	: রাজস্থান	(০)
এরিয়ান (০)	: পুলিস	(০)
উয়াড়ী (০)	: স্পোর্টিং ইউনিয়ন	(০)

১৭ই জুন—চ্যারিটি ম্যাচ

মোহনবাগান (২)	: ইস্টবেংগল	(০)

১৯শে জুন

মহঃ স্পোর্টিং (০)	: স্পোর্টিং ইউনিয়ন	(০)
উয়াড়ী (১)	: খিদিরপুর	(০)

২০শে জুন

মোহনবাগান (৬)	: পুলিশ	(২)
ইস্টবেংগল (২)	: কালীঘাট	(১)
বালী প্রতিভা (০)	: বি এন আর	(০)

লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট

নটিংহ্যামশায়ারের ট্রেণ্টব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর লর্ডস মাঠে একুশ তারিখ থেকে আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। হিসেবমত দুই দেশের এটা ১৭০তম টেস্ট যুদ্ধ। বহু ঐতিহাসিক ক্রিকেট যুদ্ধের রণভূমি লর্ডসে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার শেষবারের টেস্ট খেলা হয়েছে ১৯৫৩ সালে। ইংলণ্ডের ক্রিকেটপ্রিয় জনসাধারণের মন থেকে এই খেলার স্মৃতি আজও মুছে যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার ৩৪৬ রাণের (হ্যাসেট ১০৪) প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড করলো ৩৭২ রাণ (হাটন ১৪৫ ও গ্রেভনি ৭৮)। ৩৬৮ রাণে শেষ হলো অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস (মিলার ১০৯)। কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষে ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ে দেখা দিল শোচনীয় বিপর্যয়। মাত্র ১২ রাণে তারা হারালো ৩টি উইকেট। পঞ্চম দিন মধ্যাহ্ন ভোজের আগে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান কম্পটনও প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন; কিন্তু ওয়াটসন (১০৯) ও বেলী (৭১) ৪ ঘণ্টা ধরে অপূর্ব দৃঢ়তার সংগে ব্যাটিং করলেন—উত্তেজনার মধ্যে খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। সেই উত্তেজনার পর দুই বছর পরে দুই দেশের খেলায় লর্ডস মাঠ আবার চাঞ্চল্যে ভরে উঠেছে ফলাফলের আশায়।

ইংলণ্ডের পাঁচটি টেস্ট মাঠের মধ্যে লর্ডস মাঠ আকারে সব চেয়ে ছোট। কিন্তু আভিজাত্যে ও মর্যাদায় লর্ডস্ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ। যে কোন ইংলিশ ক্রিকেটার লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ লাভকে জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করেন। লর্ডসে ৩২ হাজার দর্শক আসন আছে। তবে লর্ডসে খেলা দেখার আকুল আগ্রহ মেটাবার জন্য সময় সময় দর্শক আসন বাড়ান হয়। গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ড ও প্যাভিলিয়নের মাঝখানে প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা সহ আধুনিক প্রথায় অতিরিক্ত সভ্য-আসন বাড়াবার এক পরিকল্পনা চলছে কিন্তু যে পরিকল্পনাই হক, লর্ডস মাঠের মালিক এম সি সি কর্তৃপক্ষ বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের আভিজাত্য এবং মনোরম পরিবেশ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

লর্ডস প্যাভিলিয়নের একতলায় দুই চূড়ার মধ্যবর্তী লং রুমের পরিবেশ সত্যই মনোরম। লং রুম লম্বায় প্রায় ১০০ ফুট। এখানে আরামে বসে সভ্যরা প্রশস্থ

গবাক্ষপথে খেলা দেখে থাকেন। দেওয়ালে দেওয়ালে টানানো আছে অতীত দিনের দিকপাল সব ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ছবি আর ক্রিকেট বিষয়ে অঙ্কিত নিপুণ শিল্পীর ল্যান্ডস্কেপ। শো-কেসে আছে দিকপাল খেলোয়াড়দের ব্যাট বল, ঐতিহাসিক স্কোর বোর্ড ও স্মরণীয় ঘটনার স্মারক পুরস্কার।

ইয়র্কশায়ারের অধিবাসী টমাস লর্ড 'লর্ডস মাঠের' সৃষ্টিকর্তা এবং তারই নামানুসারে মাঠের নামকরণ। টমাস লর্ড ইয়র্কশায়ার থেকে নরফোক এবং নরফোক থেকে লণ্ডনে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। টমাস লর্ড ছিলেন একজন বোলার। এম সি সি-র পৃষ্ঠপোষক 'হোয়াইট কণ্ডুইট ক্লাবে' তিনি একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন। কণ্ডুইট ক্লাব সভ্যদের অর্থানুকূল্যে তাঁর প্রচেষ্টায় ডরসেট স্কোয়ারে এক ক্রিকেট মাঠ তৈরী হয়। কিন্তু এই মাঠের 'লীজ' উত্তীর্ণ হবার পর লর্ড সেণ্ট জনস উডে দুইটি মাঠ ভাড়া নেন। ১৮১১ সালে এখানে 'লর্ডস' মাঠের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এখানে 'লর্ডস' বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এখান-দিয়ে রিজেন্টস খাল কাটবার প্রস্তাব পার্লা-মেণ্টে গৃহীত হয়। টমাস লর্ড আবার নতুন মাঠের সন্ধান করেন এবং যে স্থানে বর্তমানে মাঠটি আছে এখানেই ১৮১৪ সালে 'লর্ডস মাঠের' সৃষ্টি হয়। লর্ডসের পারিবেশ তখন খুবই গ্রাম্য ছিল। এবং এখানে ছিল দুইটি এলো পুকুর আর একটি পান্থনিবাস। ধীরে ধীরে 'লর্ডসের' উন্নতি হতে থাকে। ১৮২৫ সালে লর্ডসের কাঠের প্যাভেলিয়ন ভস্মীভূত হবার সংগে ক্রিকেট খেলায় অনেক ঐতিহাসিক রেকর্ডও ভস্মীভূত হয়ে যায়। এর পর তৈরী হয় এক ছোট্ট পাকা প্যাভেলিয়ান। বর্তমান প্রাসাদোপম প্যাভিলিয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৮৯ সালে। তারপর ধীরে ধীরে লর্ডসকে মনোরম করে তোলা হয়েছে। আজ 'লর্ডস' বিশ্বের সবচেয়ে মনোরম ও আভিজাত্যপূর্ণ ক্রিকেট মাঠ।

উইম্বলডন টেনিস

জুন মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে উইম্বলডনে আরম্ভ হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা। উইম্বলডনকে কেন্দ্র করে সারা টেনিস বিশ্বে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। উইম্বলডন যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা, তেমন উইম্বলডন বিজয়ীর সম্মানও অনন্য।

এবারকার খেলার বাছাই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার দুই কৃতী খেলোয়াড় লুই হোডকে প্রথম এবং কেন রোজওয়ালকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস পটিয়সী মিস লুই ব্রাউ পেয়েছেন মহিলা বিভাগের প্রথম

মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লীগ খেলার এক দৃশ্য

স্থান। নীচে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের বাছাই তালিকা দেওয়া হল :—

পুরুষ বিভাগ

(১) লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া)
(২) কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া)
(৩) স্বেন ডেভিডসন (সুইডেন)
(৪) বাজ পেটি (যুক্তরাষ্ট্র)
(৫) জে ড্রবনি (মিশর)
(৬) হ্যামিল্টন রিচার্ডসন (যুক্তরাষ্ট্র)
(৭) কার্ট নীলসেন (ডেনমার্ক)
(৮) ভিক সেক্সাস (যুক্তরাষ্ট্র)

মহিলা বিভাগ

(১) মিস লুই ব্রাউ (যুক্তরাষ্ট্র)
(২) মিস কে ফ্রিক (যুক্তরাষ্ট্র)
(৩) মিস মার্টিমার (বৃটেন)
(৪) মিস গিবসন (যুক্তরাষ্ট্র)
(৫) মিস ফ্রাই (যুক্তরাষ্ট্র)
(৬) মিস এঞ্জেলিকা বাক্সটন (বৃটেন)
(৭) মিসেস নুড (যুক্তরাষ্ট্র)
(৮) মিস ব্লুমার (বৃটেন)

দেশী সংবাদ

১২ই জুন—গতকাল কোহিমার নিকটে নাগা-বিদ্রোহীরা এক মোটর কনভয়ের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি ট্রাক হস্তগত, দুইজনকে নিহত ও পাঁচজনকে আহত করে বলিয়া আজ জানা গেল। আহতদের মধ্যে আছেন মণিপুর সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা শ্রীশ্বিজমণি শর্মা।

অর্থ মন্ত্রণালয় আশা করেন, আগামী বৎসর ১লা এপ্রিল বর্তমান মুদ্রাসমূহের স্থলে নূতন দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইবে।

এক সংবাদে প্রকাশ, মালদহের নিকটে চাষ করিবার সময় কয়েকজন কৃষকের লাঙগলের ফলায় মাটিতে পুতিয়া রাখা অনুমান ২৮০ তোলা পরিমাণ মোহর এবং সোনার বাট উঠিয়া আসে। কৃষকগণ নিকটবর্তী থানায় ঐ সোনা জমা দেয়।

১৩ই জুন—কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে শ্রী ঢেবরের কার্যকালের মেয়াদ এক বৎসর বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। আগামী জানুয়ারী মাসে উহা শেষ হওয়ার কথা ছিল।

আসাম অয়েল কোম্পানী মোরানে পরীক্ষামূলকভাবে যে নূতন তৈলকূপ খনন করিয়াছে সেই কূপে দুই মাইলেরও অধিক নীচে অদ্য তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৪ই জুন—এলাহাবাদের পৌরপাল আজ একটি নিম গাছের মূলোচ্ছেদ বন্ধ করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নাকি এই নিম গাছে লটকাইয়া ফাঁসি দেওয়া হইত।

বহু প্রতীক্ষিত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (ভূখণ্ড হস্তান্তর) বিলটি অদ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে পৌঁছিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক বিমানে উহা কলিকাতায় প্রেরিত হয় এবং অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা নাগাদ বিলটি রাজ্য সরকারের হস্তগত হয়।

জানা গিয়াছে যে, কয়লা শিল্পকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার শীঘ্রই কয়লার মূল্য বর্ধিত করিবেন।

১৫ই জুন—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুর নামক একটি গ্রামে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ডায়মণ্ডহারবার হইতে দশ মাইল দূরে কুলপী থানা ভবনের সন্নিকটে পুরাতন এক বটবৃক্ষ মূলে মাটির নিচ হইতে এক অতি মনোরম বিষ্ণুমূর্তি অর্ধেক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৭ই জুন—অদ্য এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১৩ই জুন মধ্য রাত্রে নাগা পাহাড় জেলার সদর শহর কোহিমায় নাগা বিদ্রোহীরা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া ছয়জন

অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। অবশ্য সরকারীভাবে এই সংবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ বলেন যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ও দেশের দৈনন্দিন শাসন কার্য পরিচালন এই দুয়ের ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ একদিকে গ্রেট-বৃটেন আর অপরদিকে রাশিয়া ও চীনে অনসৃত পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

১৮ই জুন—এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে।

সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গতকল্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক এক তদন্তে প্রকাশ, সরকারের পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল হইতে বছরে দশ লক্ষ টাকার ঔষধ চুরি যায়। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে সরকারী হাসপাতালগুলিতে প্রতি বৎসর মোট এক কোটি টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১২ই জুন—করাচীর একখানা সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কতিপয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতির সহায়তায় পাকিস্থানের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের একাংশ গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ক্ষমতা দখলের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তজ্জন্য পুঁজিপতিরা কয়েক কোটি টাকা দিয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

মিশরে বৃটেনের ৭৪ বৎসরব্যাপী আধিপত্যের অবসান আজ আসন্ন—গতকল্য বৃটিশ বাহিনীর শেষ দলটি সৈন্যবাহী জাহাজ "ইভানস গিপে" আরোহণ করিয়াছে। জাহাজখানা অদ্য সাইপ্রাস অভিমুখে যাত্রা করিবে।

১৩ই জুন—প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটেলেওয়ালা সরকারের বিরুদ্ধে সিংহলের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়ক আজ এই অভিযোগ আনিয়াছে যে, তাঁহারা আভ্যন্তরীণ জননিরাপত্তা দপ্তরের এবং সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

গোয়ার নির্ভরযোগ্য খবরে প্রকাশ, গত সোমবার ৫ জন গোয়ানী জাতীয়তাবাদী গোয়ার গভর্নর জেনারেল জেঃ পাওলো বার্নার্ড গুয়েডিস ও অপর দুই ব্যক্তিকে স্টেনগান হইতে গুলী চালাইয়া আহত করে।

আজ জানা গেল ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এই প্রথমবার সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট রেলওয়ে সাজসরঞ্জাম সরবাহের একটি অর্ডার পেশ করিয়াছেন।

ব্রুসেলস্-এ এক সাংবাদিক বৈঠকে ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ হ্যারি ট্রুম্যান বলেন, স্যার উইনস্টন চার্চিল ও স্ট্যালিন সরকারীভাবে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলা উচিত।

মার্কিন আদমসুমারী সংস্থা হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৫৩ সালের মধ্য ভাগে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৫৮ কোটি ২৬ লক্ষ—ইহা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

১৫ই জুন—রুহ্মের সংবাদপত্রসমূহে আজ এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীরা "যে কোন মুহূর্তে অস্ত্র সংবরণে প্রস্তুত" এবং সরকারের সহিত তাহারা আপস-আলোচনা চালাইতে চায়।

রুহ্ম গভর্নমেণ্ট পাকিস্থান ও রুহ্মদেশের মধ্যে মণিঅর্ডারযোগে অর্থ প্রেরণ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সংপ্রতি উহা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

১৭ই জুন—লালকোর্তা দলের নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানকে গত রাত্রিতে উৎমনজাইস্থিত তাঁহার স্বগ্রাম হইতে ৮ মাইল দূরে শাহীবাগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য এখানে কাবুল বেতারে প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, এক সপ্তাহ পূর্বে আফগানিস্থানে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে ২৭০ জন নিহত ও ১১০ জন আহত হইয়াছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মঁ রেনে কোটি অদ্য ফরাসী জাতিকে আলজিরিয়ায় ফরাসী কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংগ্রামে আহ্বান জানান। আলজিরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে তিনি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দেন।

১৮ই জুন—সাইপ্রাসের সামরিক কর্তৃপক্ষ অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম সাইপ্রাসে দাবাগ্নি নির্বাপিত করিতে গিয়া ১৯ জন বৃটিশ সেনা নিহত ও ১৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

জার্মানীর সর্প বিশেষজ্ঞ আর্নেস্ট বেণ্ডার (৬১) গত সপ্তাহের শেষে তাঁহারই সরীসৃপশালার একটি গোক্ষুর সর্পের দংশনে মারা গিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০্, ষাণ্মাসিক—১০্

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

Kusum
Kusum
VANASPATI
5lbs.

7 O'CLOCK
MADE IN ENGLAND

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY 30th JUNE 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥
শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বিশ্বশান্তি ও পঞ্চশীল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল মাসাধিক কালের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা এবং মিশর রাজ্যে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী সফর করিবেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রচারই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। পণ্ডিত জওহরলালের নির্দেশিত পঞ্চশীলের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহাবস্থিতির নীতি বর্তমানে বিশ্ববাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক সফরে সেই নীতির পথে বিশ্বশান্তি সুদৃঢ় করিবার দিকে নেহরুজীর লক্ষ্য থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বস্তুত বর্তমানে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ এবং সংশয়ের ভাব বিশ্বজগতের শান্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন শক্তিবর্গের ভিতরকার এই বিদ্বেষের ভাব যদি অনতিবিলম্বে প্রশমিত না হয়, তবে বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রলয়ংকর বিপর্যয় আসন্ন হইয়া পড়িবে। পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তি-সামর্থ্যের জন্য শক্তিবর্গ যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, যুদ্ধ যদি না ঘটে, তাহা হইলে সেই পরীক্ষায় মানব-সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদেরও ইহাই অভিমত। একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু প্রতিদ্বন্দ্বীয়মান শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের এবং বিশ্বাসের পাত্র। এক বৎসর পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের পঞ্চশীলের নীতি সমর্থন করেন। অপর কয়েকটি শক্তিও এই নীতি মানিয়া লইয়াছে। ইউরোপের কয়েকটি শক্তি বিশেষভাবে আমেরিকা এই নীতিতে সন্দিহান। নেহরুজীর বর্তমান পরিভ্রমণের ফলে শক্তিগোষ্ঠীর ভিতরকার পারস্পরিক এই সন্দেহ এবং সংশয়জনিত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এমন আশা অবশ্য করা যায় না। কারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংস্কার এবং তজ্জনিত দুর্বলতা দূর করা সহজে সম্ভব নয়, তবে ধীরে ধীরে শক্তিগোষ্ঠীর মনের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যুত ভারতের আন্তর্জাতিক নীতি এই কয়েক বৎসরে এই দিক হইতে কিছুটা যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সফরে ভারতের এই নীতি বিশ্বশান্তির অনুকূলে প্রতিবেশ প্রশস্ততর করিবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতা, জাতি এবং বর্ণবৈষম্যের বিভীষিকায় অভিভূত মানবসমাজের দুর্গতি অপনোদনে বিশ্বের প্রাণবীর্যকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে, আমরা এই আশা করি।

দুর্গত রক্ষায় দায়িত্ব

বর্ষা পুরাপুরি রকমে শুরু না হইতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যাজনিত বিপর্যয় আরম্ভ হইয়াছে। এই বিপর্যয় আরও কতদূর গিয়া দাঁড়াইবে, এখনও বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া ঘূর্ণিবাত্যা ও জলপ্লাবনে যে ধ্বংস কার্য সাধিত হইয়াছে বর্তমানে তাহার অনেকটা সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার লক্ষ লক্ষ লোক আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। লোকের ঘরবাড়ী বিধ্বংস হইয়াছে, খাদ্যাভাবে গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায় সরকার হইতে নানাভাবে দুর্গত এলাকায় সাহায্য দান করা হইতেছে। তবে যথাসময়ে উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার জন্য অভিযোগ যে একেবারে উত্থাপিত না হইতেছে এমন নয়। এই দিকে সরকারকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এতই অধিক এবং সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা এতই বিপুল ও ব্যাপক যে দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত এক সরকারের পক্ষে জনগণের এই দুর্গতি দূর করা সম্ভব নয়। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে দুর্গত দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙলার উদ্যম অতীতে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। দামোদরের এবং উত্তরবঙ্গের বন্যায় বাঙালীর প্রাণধর্মের সেই বৈপ্লবিক প্রেরণা এ দেশের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় সাধনায় বলিষ্ঠতা বিধান করে। বর্তমান বিপর্যয়েও আমরা সেই প্রাণধর্মেরই এখানে আলোড়ন দেখিতে চাই। বস্তুত যাহারা আজ বিপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাদেরই নিজেদের জন। সরকার তাঁহাদের কর্তব্য করুন, কিন্তু সে জন্য আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। বিপন্ন মানুষের বেদনায় যদি আমরা সাড়া না দেই, তাহা হইলে মানুষ হিসাবে আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব, অধিকন্তু মানুষের মর্যাদা দাবী করিবার অধিকারও আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবে।

বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমে বন্যা নিরোধের জন্য সমধিক ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারত সরকারের সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী নন্দ প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ডিব্রুগড় শহর এই চেষ্টার ফলে রক্ষা পাইয়াছে। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং আসামে যে সব বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও বন্যার গতিবেগ নিরোধে সমর্থ হইয়াছে। সেচ-বিভাগের মন্ত্রীর এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। এ বৎসরের বন্যার ধাক্কাতে ডিব্রুগড়ে রক্ষাবেষ্টনী এখনও অটুট

রহিয়াছে, তবে বন্যার বেগ সবে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আশঙ্কার কারণ এখনও সম্পূর্ণই রহিয়াছে। বস্তুত বন্যা-নিরোধের এই সব প্রচেষ্টা দেশের সামান্য অংশ মাত্রেই সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এইগুলির দ্বারা বন্যাজনিত ব্যাপক বিপর্যয় অদ্যাপি নিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। এই পরিচয় আমরা এ বৎসরের বর্ষার প্রথম পর্যায়েই পাইতেছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্যা নিরোধের কাজের জন্য ১৬॥ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল কিন্তু এই বরাদ্দের টাকার অর্ধেকও কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা কর্তৃপক্ষের, বিশেষভাবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহের কর্মদক্ষতার অভাবেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাঁহারা অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্যা নিরোধের জন্য ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই টাকা যাহাতে সার্থকভাবে বন্যা নিরোধ কার্যে প্রযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বস্তুত বন্যা নিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত না হয়, তবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মনীতিও বিশেষ কোন কাজে আসিবে না। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা না আছে, এমন নহে এবং সেদিকে গুরুত্ব প্রদান করাও দরকার; কিন্তু সেই প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য বন্যা নিরোধের ব্যাপক পরিকল্পনারও সার্থকতা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়া সমভাবেই কর্তব্য।

মর্মান্তিক ঘটনা

কলিকাতার রাজপথ সব সময়ই বিপজ্জনক। বস্তুত দুর্ঘটনা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ হাতে করিয়া এই শহরের পথে বাহির হইতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি টালার পুলের উপর যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তেমন মর্মন্তুদ ব্যাপার এখানেও ইতঃপূর্বেই কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। ঐ সেতুপথ অতিক্রম করিবার সময় সরকারী একখানা দোতলা মোটর বাস বেড়া ভাঙিয়া ২০ ফুট নীচে পড়িয়া যায়। ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে দুইজন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পড়েন এবং দুইজন ব্যতীত অপর সকল যাত্রীই আহত হন। টালার এই পুলটি বিশেষ মজবুত নহে। এত উঁচু সাঁকো শুধু করগেট টিনের বেড়া দিয়া ঘেরা সুতরাং গুরুতর ঝাঁকুনী সহ্য করিবার মত শক্তি এই পুলের কতটা থাকিতে পারে, এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনেও সন্দেহ হইবার কথা। সরকার এবং পৌর-কর্তৃপক্ষও যে এ সত্য অবগত না ছিলেন, এমন নয়। বস্তুত তাঁহারাও এই পুলটির সংস্কার প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ অবস্থায় এই পুলের উপর দিয়া অতিকায় ডবল ডেকার বাস চালাইবার ঝুঁকি তাঁহারা কেন লইতে গেলেন, এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠিয়াছে। দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা এই সেতুপথের উপর দিয়া দোতলা বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইতঃপূর্বেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল। জানি, এই সম্বন্ধে তদন্ত হইবে এবং সেই তদন্তের রিপোর্টও যথারীতি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইবে, কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলে যাহারা প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদিগকে আর ফিরিয়া পাইবেন না। যাহারা আহত হইয়াছেন, তাহাদের সকলের দুঃখ দূর হইবে না। অবিলম্বে এই পুলটি ভাঙিয়া ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং দৃঢ়তর সেতুপথ নির্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্যই আমরা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিব।

কলিকাতা বস্তি অঞ্চলের সংস্কার

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন শহরের বস্তী অঞ্চলের দুর্গত নরনারীর প্রতি সুগভীর সমবেদনাসম্পন্ন। কখনো কখনো তাঁহার এই সহানুভূতি মানবতার উদ্দীপনায় বস্তী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তেজনার আকারে মাঝেই মাঝেই দেখা দেয়। তিনি এইগুলি আগুনে লাগাইয়া পোড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিভিন্ন শহরের বস্তী অঞ্চল সমভাবেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন দেখা যায়। বিদেশ পরিভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে পণ্ডিত নেহরুরই উদ্যোগে এই প্রসঙ্গে রীতি-কর্তব্যতা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে শাসন-বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতার পৌরসভা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে জানা যায় নাই। আমরা আশা করি, এতৎসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে কলিকাতার বস্তী অঞ্চলসমূহের সংস্কার সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইবেন। এখানকার বস্তী অঞ্চলের সমস্যা ব্যাপক। এই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত আর্থিক সম্বল পৌর-সভার নাই, রাজ্য সরকারের চেষ্টাতেও ইহার সমাধান সাধিত হওয়া কঠিন। সুতরাং এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কলিকাতা শহরের ১০ লক্ষ নরনারী বস্তী অঞ্চলের অন্ধকার গর্ভে পড়িয়া একদিকে পশুর অধম জীবনযাপন করিবে, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস তাহারা পাইবে না, পরিষ্কৃত জলটুকু পর্যন্ত তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না, স্বাস্থ্যবিধানের অভাবে তাহারা নানারূপ মহামারীর প্রকোপে পোকা-মাকড়ের মত মারা যাইবে এবং শহরের সর্বত্র ব্যাধির বীজ ছড়াইবে, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের বুক জুড়িয়া আকাশস্পর্শী বড় বড় প্রাসাদের পত্তন হইতে থাকিবে, এই দৃশ্য মানবতার দিক হইতে একান্তই অশোভন; বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে যাহারা ব্রতী হইয়াছেন বলিতে চাহেন, তাঁহাদের আদর্শ-নিষ্ঠার পক্ষে ইহা হানিকর, গ্লানিকর; অধিকন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে বিরক্তিকর।

রাষ্ট্রসাধনায় আদর্শনিষ্ঠা

ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের এক সম্মেলনে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাদেশিকতা তাঁহাদের অন্তর হইতে দূর করা উচিত এবং ভাষা-সম্পর্কিত প্রশ্ন লইয়া ভারতের সংহতির আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ কিছু করা তাঁহাদের কর্তব্য নহে। এই দেশ যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ হয়, সেইদিকেই কংগ্রেসকর্মীদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতির অন্তরে যে ভাবাদর্শ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসকর্মীদিগকে তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব অনুরোধ করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র-সচিবের উক্তির যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ সাধনে এদেশের রাজনীতিক সাধনায় কংগ্রেসের আদর্শ যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, বর্তমানে তাহা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এজন্য কংগ্রেসকর্মীদের দায়িত্ব অবশ্যই আছে; কিন্তু কংগ্রেস-পরিচালিত সরকারও সেই দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের বলিষ্ঠ নীতির অভাব রাষ্ট্রীয় আদর্শে জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহার ফলে প্রাদেশিকতার ভাব, সেই সঙ্গে ভাষা-সম্পর্কিত সংকীর্ণতা কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে প্রভাবিত হইবার সুযোগও পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্য সাধনে মনোবল লইয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলত অব্যবস্থিতচিত্ততা আদর্শে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও নয়।

চার সপ্তাহ "বৈদেশিকী"র লেখা বন্ধ ছিল। তার মধ্যে ২৩।২৪ দিন লেখকের দক্ষিণ ভারতে কেটেছে—অবিরাম ভ্রমণে। কাঞ্চিপুরমে "সর্বোদয়" সম্মেলন। তারপর চলার পথে মহাবলীপুরম্, চিদম্বরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম্, ত্রিচিনোপল্লী, ধনুষ্কোটী, রামেশ্বরম্, মাদুরা, তিরুচেন্দুর, কন্যাকুমারী, ত্রিভেন্দ্রাম, কুইলন, কোচিন, কোয়েম্বাটোর, উটকামণ্ড, মহীশুর, ব্যাংগালোর, মাদ্রাজ ছুঁয়ে কলকাতায় ফেরা। পুরো তিন সপ্তাহ খবরের কাগজের সঙ্গে একেবারে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বলা বাহুল্য সর্বত্রই কাগজ পাওয়া যেতো এবং পড়া যেত যদি ইচ্ছা থাকত। ইচ্ছা করেই কাগজ দেখি নি, আত্মসংযম করছি, এরকম বোধও হয়নি।

সাংবাদিক এবং বোধ হয় রাজনীতিকদের পক্ষেও মাঝে মাঝে এরকম অজ্ঞাতবাস অথবা অজ্ঞানবাস ভালো। দিনের পর দিন যাঁরা সংবাদের উপর টিপ্পনী কাটতে অভ্যস্ত তাঁদের বোধশক্তি সম্বন্ধে নিজেদের এবং অপরের মনেও একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। অনবরত মত প্রকাশের সুযোগের আড়ালে অনবরত মত পরিবর্তন চলে কিন্তু সেটা টীকাকার এবং পাঠক উভয়ের নিকটেই অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট থেকে যায় কারণ পরিবর্তনটা একটু একটু করে হয়। আজ যে-ঘটনার যে-তাৎপর্য ব্যাখ্যা হোল আবার কালই তার উল্টো ব্যাখ্যা হয় না, হয়ত সামান্য একটু আলাদা ভাবের দু একটা কথা বলা হয়। এমনি করে চলতে চলতে তিন মাস, ছ' মাস অথবা এক বছর পরে দেখা যায় যে পূর্বের ব্যাখ্যার একেবারে উল্টো সংস্করণ চালু হয়েছে। পূর্বে যে ঘটনার যে-পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলে ঘোষিত হয়েছিল বাস্তবে তার উল্টোটি ঘটেছে কিন্তু টীকাকারের আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ আছে কারণ তিনিও তাঁর ব্যাখ্যায় আস্তে আস্তে নূতন নূতন রং লাগাতে লাগাতে তার চেহারা বদলিয়ে ফেলেছেন। পাঠকগণের মনও এই ধারায় "কন্‌ডিশন্‌ড্‌" হয়ে যায়, ছ'মাস পূর্বের "হাঁ"এর জায়গায় "না" বা "না"এর জায়গায় "হাঁ" শুনে তাঁরা আশ্চর্যবোধ করেন না।

রাজনীতিকদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধেও প্রায়শই এইরকম ঘটে থাকে। যদি এইরকম নিয়ম থাকেত যে কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির পরিণাম সম্বন্ধে টীকাকার জোরের সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে কোনো অভিমত প্রকাশ করলে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাঁকে ঐ বিষয়ে নীরব থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট কালের পরে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁর উক্তি মিলিয়ে দেখা হবে তাহলে কার বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের কত দৌড় বুঝা যেত।

বোধ হয় মহাভারতে কোথাও পড়েছিলাম—পুরাকালে একরাজ্যে দৈবজ্ঞদের সম্বন্ধে একটি নিয়মের কথা। বিষয়টি ছিল এই—প্রতি বৎসরারম্ভে দৈবজ্ঞদের রাজসভায় ডেকে এনে সেই বৎসরের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হোত। দৈবজ্ঞরা যে যা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন সেগুলি তার তার নামে টুকে রাখা হোত। বৎসরান্তে মিলিয়ে দেখা হোত কার কথা কী রকম ফলেছে। যাঁদের কথা ফলেনি তাঁদের দৈবজ্ঞ হিসাবে প্রাক্‌টিস্ করা রাজ আজ্ঞায় চিরতরে নিষিদ্ধ হোত।

নিয়মটা ভালোই ছিল বলতে হবে। যে রাজা এই নিয়মটি আবিষ্কার ও চালু করেছিলেন তিনি প্রজার কল্যাণকামী ছিলেন সন্দেহ নেই। লোকটির প্রাকটিক্যাল বুদ্ধি ও "বৈজ্ঞানিক" মনোভাবেরও প্রশংসা করতে হয়। নিয়মটিকে বর্তমান কালোপযোগী আকারে পুনঃপ্রবর্তনের বিষয় দেশনায়কগণ চিন্তা করতে পারেন। অবশ্য সংবাদ-টীকাকার এবং রাজনীতিকদের এরকম আইনের আমলে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করি না কারণ কাকের মাংস কাকে খাবে না। তবে দৈবজ্ঞদের সম্বন্ধে কিছু করা দরকার। এঁদের পসার, বিশেষ করে ভারত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তরুণ কথাসাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস **"নীড় ও আকাশ"** আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

স্বাধীন হবার পরে যেন আরো বেশি করে জমে উঠেছে এবং ক্রমশই বাড়ছে। এ'দের বাড়টা কিঞ্চিৎ কমাতে পারলে মন্দ হয় না। তবে এ'রাও ভোটার এবং এ'দের অসংখ্য সমর্থকরাও ভোটার। তাছাড়া শুনো যায়, রাজনীতিক কর্তাদের মধ্যেও এ'দের পৃষ্ঠ-পোষকের সংখ্যা কম নয়।

দৈবজ্ঞের খাতির করেন বলে কাউকে লজ্জা দেওয়ারও উপায় নেই। সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে দুর্নীতির কথা তুল্লে জবাব শুনি, "দুর্নীতি কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তাই নিয়ে এতো কথা কেন? অমুক অমুক সভ্য দেশের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও দুর্নীতি আছে।" কর্তাদের মধ্যে দৈবজ্ঞ-প্রীতির কথা তুল্লেও তাঁরা বল্‌তে পারেন, "কেন? পাশ্চাত্ত্য দেশেও কি এ জিনিস নেই? কানাডার বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং কী করতেন?" এই বলে তাঁরা জন্‌ গান্থারএর "Inside Africa" নামক গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যটির উল্লেখ করতে পারেন: "Nkrumah (Gold Coast-এর—নূতন নাম Ghana—প্রধানমন্ত্রী) was brought up as a Roman Catholic, but now calls himself a 'non-denominational Christian.' Some people say he still occasionally consults a 'juju' or medicine man, and this is quite possible...As to 'juju,' why should he not if he wants, visit a mitch doctor? Similar phenomena are not unknown in the West. Mackenzie King, who was Prime Minister of Canada for twenty years, had crystal balls all over his office, indulged steadily in the fanciest kind of 'spiritual' hocus-pocus, and never moved an inch without consulting an astrologer."

ম্যাকেঞ্জি কিংএর মতো লোক যিনি কানাডার মতো আধুনিক রাষ্ট্রের বিশ বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন তিনি যদি জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া এক ইঞ্চি নড়তেন না তবে আমাদের রাজনীতিকদের কী বলে ঠেকানো যাবে? বরঞ্চ ম্যাকেঞ্জি কিংএর খবরটা জানলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে জ্যোতিষীর পরামর্শ শুনে চলেই ম্যাকেঞ্জি কিং বিশ বছর মন্ত্রিত্ব করতে পেরে-ছিলেন। মহাভারতীয় যুগের কোনো রাজা আধুনিক ম্যাকেঞ্জি কিংএর চেয়ে বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন এবং কুসংস্কারবিহীন হতে পারেন, একথা এ'দের কে বুঝাবে?

তাহলেও, কর্তাদের মধ্যে যাঁরা জ্যোতিষীতে বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষেও নিজেদের স্বার্থেই এবিষয়ে কিছু করা উচিত। সমাজ চিকিৎসা বিদ্যায় বিশ্বাস করে, তাই বলে যাকে তাকে চিকিৎসা ব্যবসা করতে দেয় না, অন্তত না দেবার চেষ্টা করে। কাউকে ডাক্তারী করতে হলে তার আগে তাকে নির্দিষ্ট শিক্ষালাভ করে লাইসেন্স নেওয়ার রীতি আছে। কেউ যদি ডাক্তারী করতে চায় তাহলে তাকে ডাক্তারী পড়তে হয় এবং পরীক্ষা পাশ করতে হয়। আমরা যেমন জানি, মহাভারতে বর্ণিত রাজাও তেমনি জানতেন যে, জ্যোতিষ (Astrology অর্থে) যে-ধরনের বিদ্যা তাতে জ্যোতিষি-নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসক-নিয়ন্ত্রণের কায়দায় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি এমন একটা প্রাকটিক্যাল উপায় বার করেছিলেন যাতে জ্যোতিষ বিদ্যারও মান থাকে অথচ জ্যোতিষীর উৎপাত সীমিত হয়। যে নিয়ম তিনি করেছিলেন সেটা যদি তিনি কিছুকাল চালাতে পেরে থাকেন তবে কয়েক বৎসর পরে তাঁর রাজ্যে গণৎকারের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব কমে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরাতন কূট-নীতির একটা উপদেশ মনে পড়ল। খুব যে সদুপদেশ তা অবশ্য নয়। বিজিগীষু রাজা শত্রু রাজাকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কী কী উপায়ে তাঁকে দুর্বল করবেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে শত্রুরাজ্যে গণৎকার এবং ধর্ম-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে চর পাঠিয়ে তাদের দিয়ে রাজার মনে দৈবের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করানো যাতে রাজা পুরুষকারের চেয়ে দৈবের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, দেশরক্ষার জন্য সৈন্যসামন্তের সুব্যবস্থার দিকে নজর না দিয়ে যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকেন।

এই নীতি সংস্কৃত আকারে আধুনিক কালেও যে কোথাও কোথাও প্রযুক্ত হয়নি তা বলা যায় না। তবে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে দৈবজ্ঞ-প্রীতির প্রসার দেখা যাচ্ছে তার পিছনে বিদেশীর হাত আছে, এরূপ আমরা সন্দেহ করি না। অন্তত পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, আমরা জানি যে, পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যেও দৈবজ্ঞে বিশ্বাসীর সংখ্যা কম নয়। সুরাবর্দী সাহেবের কথাই ধরুন না কেন। এবিষয়ে তাঁর মতো বিশ্বাসের জোর ভারতেও আমরা কম দেখেছি। তাঁর গণৎকারগণ তাঁকে অনেকবার অনেক কিছু বলেছেন, বারম্বার তাঁর আশা ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু আমরা যতদূর শুনেছি সুরাবর্দী সাহেবের দৈবজ্ঞে বিশ্বাস এখনো অটল রয়েছে। যদি কোনো দিন দেখি যে তিনি পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আশা ত্যাগ করেছেন সেদিন বুঝব যে তিনি গণৎকারের কথায় বিশ্বাস হারিয়েছেন। গণৎকারের কথায় বিশ্বাস করে তিনি করেন নি কী? শুনা যায় একবার কোন্ মন্ত্রতন্ত্রের শক্তির দ্বারা কী এক ফললাভের আশায় তিনি কালীঘাটে "আদি গঙ্গায়" ডুব পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

পাঠকগণ নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন যে, অতঃপর আজ আর কোনো গুরুগম্ভীর আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনা চলতে পারে না।

অ্যাঁ! সার্জেণ্টমেজর মারা গেল? কিসে ম'ল? এইতো পরশু না তরশুও যে দেখলাম রবার্টসনের মেয়ের পাশে মোটর-গাড়িতে বসে? দিনকয়েক থেকেই লক্ষ্য করছিলাম যে, তার বরাত ফিরেছে—তার স্ত্রী আবার তাকে পাশে বসিয়ে অষ্টপ্রহর খুব গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি......!

...একটি রুগ্ন পাণ্ডুর মুখ......বালিশের উপর ছড়ান কাঁচা পাকা মেশানো চুলগুলি ......বেদনা ও অনুরাগে ভরা দুটি নীল চোখ।

মিসিজ পেরী মারা যাবার পর আজ প্রথম তার কথা মনে পড়ল।

সার্জেণ্টমেজরের মৃত্যুসংবাদ শুনে মিসিজ পেরীর চোখদুটির কথা মনে পড়াটা খুব স্বাভাবিক জিনিস হয়তো নয়। মনের গভীরে এই দুটো জিনিসের মধ্যে কোন একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে। নইলে এমনভাবে এমন সময় ছবিটা চোখের সম্মুখে ভেসে উঠবে কেন? হঠাৎ মনে পড়াতো আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

এখানকার কারও কাছে সেসব কথা বলার সাহস আমার নেই; আপনাদের কাছে ব'লেই বলছি। এক নাটকীয় মুহূর্তে তিনজোড়া চোখের আগুন। আমি যা দেখে-ছিলাম, তা যদি আপনারা দেখতেন, তাহলে আপনারাও নিশ্চয় সার্জেণ্টমেজরের মৃত্যু-সংবাদ শুনেই প্রশ্ন করতেন—'কিসে ম'ল?' আমারই মত, আপনাদের মনেও মুহূর্তের জন্য একটা সন্দেহের ঝিলিক খেলে যেত—'তবে কি......

না; সন্দেহ শব্দটা বোধহয় ঠিক হ'ল না। ওর মধ্যে যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরবার একটা ভাব আছে। সংশয় কথাটার মধ্যেও যেন মনের উপর একটা কড়া বুরুশের ঘষটানি লাগবার ভাব মেশানো। তার তুলনায়, মনের উপর আমার 'তবে কি'র পরশ অনেক হাল্কা—অনিশ্চয়তা অনেক বেশী—ভিত অনেক পলকা। সংশয়ের আভাস মাত্র লেগেছিল আমার মনে।

তিনটি চাউনির ক্ষীণদীপিকায় দেখা তিনটি মনের জগৎ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে, তাদের আগেকার কথা খানিকটা জানা দরকার।

যদিও আমাদের কথা আরম্ভ হয়েছে,

সার্জেণ্টমেজর ও মিসিজ পেরী, এই দুজন পরলোকগত ব্যক্তিকে দিয়ে; কিন্তু আমাদের আসল কাহিনী দুজন জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে। পেরী সাহেব আর রবার্টসনের মেয়ে। এখানকার দুটি বনেদী নীলকর পরিবারের বংশধর এরা।

পেরী সাহেবরা ছিল এ-জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক। শোনা যেত, বর্ষাকালে ছাতাপড়া নোটের বাণ্ডিল ওরা রোদ্রে শুকোতে দেয়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার আস্তাবল তাদের ছিল কলকাতায়। ঘোড়ার ঘাস পর্যন্ত নাকি তারা আনাত অস্ট্রেলিয়া থেকে। আমার একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল পেরী সাহেবের কাছারির খাজাণ্ডী। তাঁর কাছ থেকে আমরা ছোট-বেলায় পেরীদের, রূপকথার মত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতাম।

পেরী—ছ' ফুটের উপর লম্বা—বিরাট চেহারা—বিশাল চওড়া বুক—হাত, পা, আঙুল, কান, সবই যেন প্রমাণ সাইজের চেয়েও একটু বেশী বড়। ছোট শুধু স্লেটের রঙের চোখ দুটো আর বোঁচা নাকটা। লাল টকটকে রং, চাঁদের মত গোল মুখ, ফোলা ফোলা গাল,—মোটকথা মুখশ্রী মোটেই সুন্দর নয়। আর এত চুল লোকটার সর্বাঙ্গে—কাঁধে, গলায়, হাতের পিঠে, কানের উপর, নাকের গোড়ায়—সব জায়গায় সমান ঘন। একটু বনমানুষ বনমানুষ ভাব। এই কারণেই অনেকে ওর মুখখানাতে একটা বন্য হিংস্রভাব সন্ধান পায়। এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে বহুদিন। আমার শুধু মনে হত চেহারাটা হাবা হাবা গোছের। অত বড় চেহারার যেন একটা ছোট ছেলে। তাই সে অমন জেদী, একগুঁয়ে, উদ্ধত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন। যখনই যে খেলনাটার কথা মনে হবে তখনই সেটাকে চাই, নইলে রেগে আগুন হয়ে উঠবে। ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময়, তাকে পাশ কাটিয়ে কেউ এগিয়ে যাকতো। দপ করে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠবে। তখন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নিজের সামর্থ্য অধিকার, ঔচিত্য, কোন প্রশ্নই তখন তার মনে আসে না। লোকটা তার শত্রু—আর কিছু মনে রাখবার দরকার নেই। চোখের সম্মুখের জিনিস ছাড়া আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই তার কাছে—ঠিক জন্তু জানোয়ারের মত।

ছেলেমানুষ ব'লে ছেলেমানুষ! আমার সেই আত্মীয়ের কাছে শোনা যে, কুঠি থেকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বার হবার আগে, সাহেব এসে ঢুকত কাছারিবাড়িতে; যেখানে খাজাণ্ডীবাবু টাকা পয়সা আর দুয়ানিগুলো থাকে থাকে সাজিয়ে বসতেন, সেখানে গিয়ে ওই বুড়োখোকা পা দিয়ে সেগুলোকে প্রত্যহ একবার চতুর্দিকে ছিটিয়ে ফেলে দিত। কাতলা মাছের মত মুখের হাসিতে ফুটে বার হ'ত সফল রসিকতা করবার বাহাদুরি।

তার ছেলেমানুষী আচরণগুলোর মধ্যে একটা বন্যভাব ছিল ঠিকই। সকলেই জানে যে, সে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিকারী; কিন্তু তাই বলে বাবুর্চির হাতের চায়ের পেয়ালায় রিভলবারের নিশানা পরখ করা, বেশ একটু মাত্রাধিক্য নয় কি? মাচার উপর থেকে, সে বাঘ মারেনি কোনদিন। বলত যে অমনভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঘ শিকার করবে মেয়েমানুষে!

যেমন ছিল তার বুকের পাটা, তেমনি ছিল তার হাতের অব্যর্থ নিশানা। ঘোড়া-পাগল সাহেবটা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, তার পিঠের থেকে বুনো হাঁস মারত।

এইসব কারণে লাটসাহেবের শিকার-পার্টিতে তার স্থান বাঁধা ছিল।

এই গেল পেরী সাহেবের পরিচয়।

বিচিত্ররূপিণী রবার্টসনের-মেয়ের ভাব-ভঙ্গী অন্য রকমের। উড়ে বেড়ায়, নিজের খেয়ালখুশীতে, নাচুনী মেয়েটা। কথা বলবার সময়, কটা কটা চোখ দুটি থেকে হাসির দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। নতুন নতুন কাণ্ড করে, এখানকার লোকদের রসের খোরাক জোগায় নিঃসন্দেহে। তার মধ্যে একটা বললেই সে মেয়ের স্বভাবের ধরন খানিকটা বুঝতে পারবেন। ওদের জমিদারীর কুশোর জঙ্গলে বন্দোবস্ত নিয়েছিল একজন লোক, লাক্ষার জন্য। সেই লোকটা এক রাত্রিতে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটা চিতাবাঘ মেরে-ছিল। মরা বাঘটার উপর বসে, লাঠিহাতে সেই লোকটাকে পিছনে দাঁড় করিয়ে রবার্ট-সনের মেয়ে পরের দিন ফটো তোলায়। তাকে নিয়ে এসে কুঠিতে রাখে। দিনকতক খুব মাখামাখি সে লোকটার সঙ্গে। তারপর একদিন তার সঙ্গে উধাও।

তখনও তামাকখোর বুড়ো রবার্টসন বেঁচে। কিছুকাল পর কোথা থেকে যেন বাপ ধরে এনেছিল মেয়েটাকে। দিনকয়েক একটু চুপচাপ; তারপর আবার যে কে সে-ই।

একবার এইরকমই একটা ভাবোন্মত্ততার ঝোঁকে পড়ে সে নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলেছিল পেরীর সঙ্গে। পেরী গিয়েছিল, কমিশনার সাহেবের সঙ্গে, নেপালের রিজার্ভ ফরেস্টে গণ্ডার শিকার করতে। গণ্ডারদের প্রেম নাকি একনাগাড়ে অনেকদিন চলে। সেই সময় গণ্ডার মারা নাকি শিকারীদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ। কমিশনার সাহেবের হাতে মাত্র দুইদিনের সময়, তিনি গণ্ডারের উপর গুলী চালিয়েছিলেন। আর যাবে কোথায়! বাঘের মত কমিশনার সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পেরী তাঁর টুঁটি চেপে ধরে। দলের অন্য লোকেরা মাঝে পড়ে কমিশনার সাহেবকে ছাড়িয়ে না নিলে, বোধহয় সেদিন তাঁর প্রাণটাই যেত। সরকারী মহল চাপা দেবার চেষ্টা করলেও, ঘটনাটার পল্লবিত বিবরণ দ্বিতীয় দিনেই আমাদের শহরে পৌঁছে যায়। নেপাল থেকে রাইফেল বন্দুকের বোঝা নিয়ে ফিরবার সময় পেরী দেখে যে রবার্টসনের মেয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কমিশনার-সাহেবঘটিত কাণ্ডটার সঠিক বিবরণ শুনবার অছিলায় সে এসেছে জগতের সেরা বীরকে প্রশংসাঞ্জলি দিতে।

অপ্রত্যাশিত! স্লেটের রঙের খুদে খুদে চোখ দুটোয় ফুটে উঠল বিস্ময়। সমাজের সবচেয়ে বাঞ্ছিতা সুন্দরী—যে এতদিন তাকে এড়িয়ে চলত, কাছে ঘেঁষতে দিত না—সে আজ নিজে যেচে তার কাছে ধরা দিতে এসেছে—হাতে ফাঁসের গোছা নিয়ে!

......তিনদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, অমার্জিত কথা-বার্তা, ষাঁড়ের মত চেহারা, উস্কখুস্ক চুল, ময়লা পোশাক, তামাক, হুইস্কি আর প্যাঘামের উৎকট দুর্গন্ধ—সব একাকার হয়ে মিশিয়ে একটা পৌরুষের জ্যোতি-র্মণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে পেরীর চারিদিকে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মন মাতিয়ে দেয়, সারা শরীর ঝিমিয়ে পড়ে। নিজেকে বিলিয়ে দেবার নেশা লাগে। ওই পুরুষ অনায়াসে বুটশুদ্ধ পায়ে তার দেহকে মাড়িয়ে চলে যাক, হাতে চাবুক নিয়ে শপাং শপাং করে তাকে মারুক, ওই বনমানুষের মত হাতের দশ আঙুলের মধ্যে তার পাঁজরার হাড় কখানা পাটকাঠির মত মট মট করে ভেঙে যাক!......

এই ভাবটা সাড়া জাগিয়েছিল রবার্ট-সনের মেয়ের দেহ-মনে। তাই ছোঁয়াচ লেগেছিল মেয়েটার কটা চোখের চাউনিতে। এত সূক্ষ্ম জিনিস পেরী সাহেবের মত জড়বুদ্ধি ও রসকষহীন লোকের নজরে পড়বার কথা নয়। তবু পড়ে গেল কি করে যেন; পুরো স্বীকৃতি পেলে জড়বুদ্ধির পর্দাও বোধ একটু ফাঁক হয়। কটা চোখের দ্যুতিটুকু একেবারে নতুন নতুন লাগল পেরী সাহেবের। দেশে-বিদেশে কত মেয়েই তো সে দেখেছে। লোক-ভোলানোর জন্য ছুঁড়েমারা চোখের বিদ্যুৎ তো এ নয়। এ যে অন্যরকম। চোখের দীপ্তি-টুকু যে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে! শুধু মুখে কেন—আকাঙ্ক্ষতার সারা দেহে! চোখ ফিরনো যায় না সেদিক থেকে!......

শিশুর আনন্দ-উদ্ভাসের কয়েকটি রেখা নাকের নীচ আর চোখের কোণ থেকে বেরিয়ে ফোলা ফোলা গালের মেদের মধ্যে এসে হারিয়ে গেল। পেরীর মান চলে সিধে সড়কে—গলিঘুঁজির ধার ধারে না। সোজা হিসাবে একটা মানে করে নিয়ে, নিজের গাড়ি ফিরিয়ে দেয়। গিয়ে চড়ে বসে রবার্টসনের মেয়ের গাড়িতে।

"চলো মেমসাহেবকা কোঠি!"

কমিশনার-প্রহারের চাঞ্চল্যকর খবর চাপা পড়ে গেল পেরী সাহেবের আধুনিকতম কৃতিত্বে। দিনকয়েকের মধ্যে রবার্টসনের

মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল খুব জাঁকজমক করে। বিয়ের পর তারা চলে গেল হনিমুন করতে বিদেশে।

রবার্টসনের মেয়ে পেরীর স্ত্রী হবার পরও আমাদের কাছে কিন্তু রবার্টসনের মেয়েই থেকে গিয়েছিল।

বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পরই সকলে লক্ষ্য করে একটা বেসুরো ভাব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কত কানাঘুষো এ নিয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজে। বয়স্থা কুমারীরা মুখ টিপে হাসল।

যে লোকটা জীবনে কখনও দ্বিধা-কুণ্ঠার ধার ধারে না, স্ত্রীর কাছে তার কেন এমন কুণ্ঠাজড়িত ভাব? দাড়ি-না-কামানো অবস্থায়, ঘামের গন্ধওলা জামাটার কথা ভুলে গিয়ে রবার্টসনের মেয়ের সম্মুখে বার হবার সাহস তার আর নেই। পৃথিবীকে, পরিবেশকে বেপরোয়া তাচ্ছিল্য করবার সহজ দ্বিধাহীনতা তার গেল কোথায়? নিজের বেশভূষার উপর নজর পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা দোষী-দোষী ভাব মেশানো।

বীরভোগ্যা রবার্টসনের মেয়ে চেয়েছিল পুরুষের মত পুরুষের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে। কিন্তু বীরপুরুষের ছিবড়েও যে নেই এর মধ্যে! বীরপুরুষে না ছাই! ও জোরগলায় হুকুম করে না কেন? পান থেকে চুন খসলে চাবকে লাল করে দেবো এই ভাষায় স্বামী কথা বলে না কেন তার সঙ্গে? সবচেয়ে অসহ্য পেরীর আজকালকার মিনমিনে ভাবটা।

রবার্টসনের মেয়ে কিছুদিন চেষ্টা করে বাইরের সামাজিক সৌষ্ঠব বাঁচিয়ে চলতে। কিন্তু সে চেষ্টা বেশীদিন বজায় রাখা তার পক্ষে শক্ত। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া সে। মনের বাসনার সঙ্গে আপসে মিটমাট করতে শেখেনি কোনদিন রবার্টসনের মেয়ে। আশাভঙ্গের স্থান নিল বিতৃষ্ণা; উদাসীনতার স্থানে এল তাচ্ছিল্য।

তারপর পড়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত। দরখাস্তে দেওয়া কারণটা এখানে বলবার মত নয়। পেরী সাহেব কোর্টে হাজির হল না লজ্জায়। রবার্টসনের মেয়ের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল।

বেশ কিছুকাল পেরী সাহেবকে আর দেখা গেল না এখানে। সকলে বলল, লজ্জায় গা-ঢাকা দিয়েছে। পেরী-সাহেবদের এস্টেটের বড় মেলা বসে এখানে প্রতি বছর। সেখানকার ঘোড়দৌড় আর হাতীর রেস দেখবার জন্য, আমরা ছোট-বেলায় সারাবছর অপেক্ষা করে থাকতাম। সেবার প্রথম ঘোড়দৌড় আর হাতীর রেস বন্ধ থাকল। পেরী সাহেবের বিহনে শহর একেবারে কানা সে বছর।

সরস গল্পের অভাবে, সাঁঝের আড্ডার সিগারেট বেবে বিস্বাদ লাগতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ শোনা গেল রবার্টসনের মেয়ের নূতনতম প্রণয় নিবেদনের কথা। ঝিমিয়ে-পড়া শহর আবার জেগে ওঠে, পানসে গল্প আবার মিষ্টি হয়ে আসে। এবারকারটা 'পুলিস-লাইনস্'এর সার্জেণ্ট-মেজরের সঙ্গে। শুধু প্রণয় নিবেদন নয়, শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল দুজনের। তখন নতুন এসেছে সার্জেণ্টমেজর মিলিটারী ফেরত লোক। নাম ওরাণ্ডেন। সব সময় মদে চুর হয়ে থাকে। হাতে ছড়ি, মুখে সিগারেট, কোমরে রিভলবার, সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। যুদ্ধে কি করে সে মেডেল পেয়েছিল, একবার সে মিশর-সুদানে কেমন করে এক সঙ্গে দুটো সিংহ মেরেছিল, এই ধরনের গল্প সে সব সময় করে বেড়াত লোকের কাছে। একদিন মাতাল অবস্থায় আমার কাছে তার গায়ের কোট বিক্রি করতেও এসেছিল। এসব সত্ত্বেও আমরা তাকে অপছন্দ করতাম না; কারণ সে সাধারণ দেশী লোকদের সঙ্গেও প্রাণখোলাভাবে মিশত। এ জিনিস সে যুগে বিরল ছিল। আমরা বলতাম আইরিশম্যান কিনা—সেইজন্য। তাই এর সঙ্গে রবার্টসনের মেয়ের বিয়ে হওয়ায়, আমরা একরকম খুশীই হয়েছিলাম। যাক, এতদিনে একটা খাস বিলিতী লোক ধরেছে

রবার্টসনের মেয়েটা—এই হল সাধারণ নাগরিকের মন্তব্য।

ওয়ারেন সাহেব সার্জেণ্টমেজরের কাজ ছেড়ে দিল বিয়ের দিনই। আমাদের কাছে কিন্তু সে সার্জেণ্টমেজরই থেকে গেল, চিরকাল। রবার্টসনের মেয়ের নামও আমরা বদলালাম না, এ বিয়ের পরও। ও মেয়ের নাম একবার বদলালে আরও কতবার বদলাতে হবে, তার ঠিক কি!

বিয়ের পর দিনকতক সার্জেণ্টমেজরের সাইকেল চড়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা বন্ধ হ'ল। ঘুরত গাড়িতে, স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে। চেহারায়, পোশাকে একটু চাকচিক্য দেখা গেল। শনিবারে শনিবারে দার্জিলিঙ যায়। যাবেই তো—অত বড়লোক ওর স্ত্রী। দেখ, ক'দিন টেকে ওর বরাতে। রবার্টসনের মেয়ে তো! চিতাবাঘ মারলে টেকে একমাস; কমিশনার মারলে টেকে এক' বছর: জোড়া সিংহ মারলে কতদিন টিকবে? এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই অংকটা আসবে নির্ঘাত, বুঝেলি!......

দিনকতকের মধ্যেই লোকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবার লক্ষণ প্রকাশ পেল। আবার দেখা যায় সার্জেণ্টমেজরকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু পুরনো সাইকেলখানাতে নতুন রঙ পড়েছে। পকেট-খরচ নিশ্চয়ই কিছু কিছু দেয় মেমসাহেব। আহা, বেচারা চাকরিটা হট করে ছেড়ে দিল! হাজার হলেও আইরিশম্যান।

সার্জেণ্টমেজরের ভবিষ্যৎ ভেবে শহরের লোকের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। রবার্টসনের মেয়ে কবে বিয়ে-বাতিলের দরখাস্ত দেবে আদালতে, লোকে তারই দিন গোনে। কিন্তু দেখা গেল, এ দিন-গোনার শেষ নেই। আমরা হতাশ হলাম। বিজ্ঞরা চোখ টিপে মুচকি হেসে রায় দিলেন—"আছে। আছে। এর মধ্যেও তথ্য আছে। সেসব তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝবে না।" সে তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলাম না আমরা। কেননা সেই সময় পেরীসাহেব ফিরে এল। একা নয়। নতুন মিসিজ পেরীকে সঙ্গে নিয়ে। নতুন স্ত্রী দেখতে সত্যিকারের সুন্দরী। টানা-টানা নীল চোখ। না হেসে কথা বলতে পারে না। গভীর আত্মবিশ্বাসের ছাপ মুখের উপর। পেরী সাহেবের চেয়ে বয়সে অনেক বড়; তবে সেটা বেমানান লাগে না, দেখতে অত ভাল বলে।

নতুন স্ত্রীকে সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সে এসেই এমন রাজকীয় ঠাটে পার্টি দিল, যা এ মুলুককে এর আগে কেউ কোনদিন দেখেনি। আমার সেই আত্মীয়ের মুখে শোনা যে, দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেছিল সাহেব ওই একদিনের পার্টিতে। উদ্দেশ্য—রবার্টসনের মেয়েকে ছোট করা; তার সঙ্গে বিয়ের সময়ের চেয়েও বেশী খরচ করা; লোকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, এ স্ত্রী আগের স্ত্রীর চেয়ে কত বেশী সুন্দরী। তার মত মেয়ের আমি কেয়ারও করি না।......

এর পর থেকে পেরীসাহেব টাকা ওড়াতে আরম্ভ করে খোলামকুচির মত। নিত্য নূতন ঘোড়া কেনার বাতিক জাগে। ব্যাঙ্গালোর, পুনা, বোম্বাই, লাহোর, সব জায়গায় ঘোড়া রাখে। স্ত্রীর বেশবিন্যাস দেখাশোনা করবার জন্য বিলাত থেকে একজন মেমসাহেবকে আনাল হাজার টাকা মাইনে দিয়ে। আর এই অনুপাতে অন্য সব খরচ। পেরী সাহেবের ঝোঁকতো! মিসিজ পেরীর কিন্তু কেউ কোনদিন নিন্দা করেনি। খুব ভাল লোক। স্বামীর স্বভাব যে একটা ছোট ছেলের মত, তা সে জানে। পেরী যখন স্বভাব অনুযায়ী, সামান্য কারণে রেগে আগুন হয়ে ওঠে, তখন সে মৃদু হেসে তার পিঠ চাপড়ে দেয়। মিসিজ পেরী বোকা নয়; কিন্তু স্বামী যে পরিমাণে খরচ করে, সেই পরিমাণে বড়লোক কি না, সেকথা সে ধরতে পারে নি।

আমরাও পারি নি। কি করে কি হ'ল কে জানে। বোম্বাই-কলকাতার বহু পাওনাদার আস্তে আস্তে এখানে এসে জোটে ডিক্রি জারী করানর জন্য। তার মধ্যে একটা বিলাতী ব্যাংকই সবচেয়ে বড় পাওনাদার। উকিল-ব্যারিস্টারের মরসুম পড়ে গেল। বহু রকমের মোকদ্দমা, বহু রকমের পাল্টা মামলা। পেরী সাহেব একেবারে ফেরবার হয়ে গেল। এরই শেষের দিকের কথা। পেরী তখন হুডহীন, গদিহীন 'টি' মডেলের ফোর্ড গাড়িখানায় চ'ড়ে প্রত্যহ কোর্টে আসে, স্ত্রীর আদেশানুযায়ী মোকদ্দমার তদ্বির করতে। সার্জেণ্ট-মেজর তখন ভিড়ে গিয়েছে পাওনাদার ব্যাঙ্কের দিকে, টাকার লোভে। সে তাদের পক্ষ থেকে মোকদ্দমার তদ্বির করে, ব্যারিস্টারের কাছে পেরীর বেনামী করা সম্পত্তির অন্ধিসন্ধি বাতলে দেয়, পাইপ-মুখে কোর্ট কম্পাউণ্ডে অযথা ব্যস্ততার ভান দেখায়, কলকাতার ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে ডাকবাঙলায় মদ খায়। বটতলায় খোলা গাড়িখানার মধ্যে বসে পেরী সব দেখে। এই অবস্থাতেও একটা নির্লিপ্ত বোকা বোকা ভাব; এত অভাবের মধ্যেও তার দুর্দিনের কথাটা পুরো বুঝতে পারছে কিনা সন্দেহ। মামলার নথিপত্র, আর উকিল-ব্যারিস্টারের অর্থহীন কথার ঝুড়ির নীচে, তার দুর্দৈবের স্বরূপটা কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছে। লেখাপড়া সে শেখেনি, আইনের মোটা মোটা বইগুলো দেখলে ভয় করে। অপরপক্ষের ব্যারিস্টার তো তার শত্রু; তার সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার জন্য এসেছে; সার্জেণ্টমেজর সেই ব্যারিস্টারেরই গুপ্তচর; দেখলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। বাড়ি থেকে বার হবার সময় স্ত্রী, দুগালে দুটি নরম হাতের পরশ দিয়ে বলে দেয়—"দুষ্টু ছেলে! দেখো, কোর্টের মধ্যে কোন হইচই করে বস না যেন। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা মনে রেখ!" এই অনুরোধ মনে রেখেই সে পারতপক্ষে আদালতঘরে বা বার-লাইব্রেরীতে বসে না। বসে থাকে ওই দূরের বটতলায়। দেখে, আর কত কি ভাবে।

একদিন একটা ফেঁকড়া মোকদ্দমায় তার স্ত্রী সাক্ষ্য দেবে। পেরী আর সেদিন বটতলায় বসে থাকতে পারল না। আদালত-ঘর লোকে লোকারণ্য। মিসিজ পেরী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবে; কলকাতার সাহেব-ব্যারিস্টার জেরায় তাকে নাজেহাল করবে; বহু আংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে-পুরুষও মজা দেখতে এসেছে। রবার্টসনের মেয়ে পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। মিসিজ পেরী সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। বড় রোগা রোগা দেখাচ্ছে। রঙ আগের চেয়ে ফ্যাকাশে হয়েছে। চোখ দুটো সেইরকমই নীল। গলায় স্বর দৃঢ়। সাক্ষী বলল যে, মোকদ্দমার বহু পূর্বে, বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে সে এই মীরপুরের জোতটা পায়।

বেশ বলছে, গুছিয়ে বলছে। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।—পেরী সাহেব বিজয়ীর দৃষ্টি হানে উপস্থিত লোকদের দিকে—দৃষ্টি গিয়ে থামে শত্রুপক্ষের ব্যারিস্টারের মুখের উপর। এ কি! শত্রু-পক্ষের দালাল, শয়তান সার্জেণ্টমেজরটা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল ব্যারিস্টার সাহেবকে কি যেন বলবার জন্য। বেশ জোরে জোরেই বলছে। "পেরী' পেরী করেছে বিয়ে! হুঃ! আমি রেকর্ড দেখাব। মিথ্যে কথা। এই মেয়েমানুষটা আদপেই পেরীর স্ত্রী নয়,—চালিয়েছে বিবাহিতা স্ত্রী বলে। এ ছিল কলকাতার একটা বাজারের মেয়েমানুষ। আমি রেকর্ড দেখাব আপনাকে ব্যারিস্টার সাহেব। বিয়েই হয়নি, তার আবার বিয়ের সময় সম্পত্তি পাবে কি করে?"

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। সারা পৃথিবী মুছে গিয়েছে তার চোখের সম্মুখ থেকে, শুধু ওই দুশমনটার মুখ ছাড়া। কুত্তীর বাচ্চা! পেরী ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শত্রুর উপর। পিষে, থেঁতলে, কুটে সে ওই মুখখানাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। চেয়ার-বেঞ্চ ছিটকে পড়ছে চারিদিকে। গাউনপরা উকিল-ব্যারিস্টারের দল যে যেদিকে পারছে দূরে পালাবার চেষ্টা করছে। হাকিম গাম্ভীর্য ভুলে উঠে দাঁড়িয়ে—"আরদালী, আরদালী!" বলে চীৎকার করছেন; কিন্তু ঘরের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে তাঁর কথায়

কান দেবার মত লোক কোথায়? এই ঘটনাটার তীব্র আকস্মিকতায় অধিকাংশ দর্শক হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। এজলাস-ঘরের শান-বাঁধানো মেঝের ওপর পেরী সার্জেন্ট-মেজরের মাথাটা ঠুকছে ঠক্ ঠক্ করে। কাছে যায় কার সাধ্য। মিসিজ পেরী সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে ছুটে গেল সেদিকে।

"ছি! বোকার মত অমন করে নাকি!"

ফণাতোলা সাপের মাথায় মন্ত্রৌষধি পড়েছে। মিসিজ পেরী স্বামীর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লোকে পথ ছেড়ে দিল। বটতলার মোটরগাড়িখান ঝর ঝর শব্দ করে চলে যাবার পর মন্ত্রমুগ্ধা রবার্টসনের মেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেল; হাকিম গলা খাঁকার দিয়ে কোর্টের অস্তিত্ব জাহির করলেন; ব্যারিস্টার সাহেবের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল; উকিলবাবু অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে হাকিমকে মনে করিয়ে দিলেন যে, এই কান্ডটির জন্য পেরীর উপর কোর্টকে অসম্মান প্রদর্শন করবার মোকদ্দমা আনা উচিত।

এর ফলে পেরীকে মোটা টাকা জরিমানা দিতে হয় সেবার; কিন্তু যে লোকটা মার খেল, তার শাস্তি হল আরও বেশী। রবার্টসনের মেয়ে স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া বন্ধ করে দিল, সেই দিন থেকে। কাপুরুষেরও অধম। মিলিটারী মেডেল দেখাতে আসে!

এর পর থেকে সে বছরের মধ্যে আটমাস থাকতে আরম্ভ করে দার্জিলিঙএ।

মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে পেরী সাহেব পৈতৃক বসতবাটী ছেড়ে চলে যায়। এখানকার পরের রেলস্টেশনের কাছে, স্ত্রীর নামে রাখা একটা জমিতে ছোট্ট একটা খড়ের বাঙলা তয়ের করে সেইখানেই থাকত। সত্যি করেই সর্বস্বান্ত। নেবার মধ্যে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল তার বড় আদরের একদাঁতওলা বুড়ো হাতীটা, সবচেয়ে প্রিয় সাদা ঘোড়াটা, আর একরাশ দামী দামী বন্দুক-রাইফেল। স্ত্রী নিয়ে গিয়েছিল তার ম্নিক্সি নামের কুকুরটাকে।

পাওনাদাররা তবু ছাড়ে না। খুচরো মামলা-মোকদ্দমা তবু লেগে থাকে। পেরীর উকিল, মোক্তার বিনাপয়সার মক্কেলের মোকদ্দমায় যে রকম মনোযোগ দেওয়া স্বাভাবিক, ততটুকুই দেন। এত দুরবস্থার মধ্যেও পেরী সাহেব নির্বিকার। তালি দেওয়া প্যান্ট প'রে ঘোড়াটাকে ডলাইমলাই করে; বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারে বার হয়; নিজের পুরনো প্রজাদের ভয় দেখিয়ে, ঘোড়ার খাওয়ার দানা ও হাতীর জন্য কলাগাছ নিয়মিত আদায় করে। ভাবনা-চিন্তার বালাই সব স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। স্ত্রী কি করে সংসার চালাচ্ছে, তার কাছে আগেকার জমানো কিছু টাকা আছে কি না, এসব কথা জানবার কৌতূহল কখনও তার মনেও আসে না। মিসিজ পেরীও সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের কথা তাকে বলে না।...ওকে ব'লে কি হবে। ও যে অসহায় ছোট-ছেলের মত। ওর অবস্থা কি ছিল, আর আজ কি হয়েছে। তাকান যায় না ওর দিকে। মায়া হয়। দুঃখ হয়। তবু ভাল যে, এই অবস্থা পরিবর্তনের কষ্টটা ভালভাবে বুঝবার মত বুদ্ধি ভগবান পেরীকে দেননি!...

তবু কখন কখন স্বামীকে বলতে হয়। কত সময় কত কাজে তাকে পাঠাতে হয়। অধিকাংশ সময়েই তাকে পাঠালে কোন কাজ হয় না; তবু পাঠাতে হয়। পেরী শুনেই 'সিরিয়াস' হয়ে ওঠে; গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয়—যেন সংসার চালানর গুরুদায়িত্ব তারই উপরে; তখনই কুকুর বন্দুক ফেলে ছোটে, সেই কাজটা করবার জন্য। বার হবার সময় তার গালের ওপর দুটি হাতের মৃদু চাপ দিয়ে স্ত্রী বলে—"দুষ্টু ছেলে! বাইরে কোন হইচই বাধিয়ে ব'স না যেন।" এই বরাদ্দ আদরটুকু থেকে কোনদিন বঞ্চিত হলে কেমন যেন খারাপ খারাপ লাগে পেরীর।

আমার সঙ্গে পেরীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের সেই দুরবস্থার সময়। আমি তখন জনসেবার কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম। সেই সময় আমার কাছে একদিন একটা নালিশ এল এক জলাশয়ের মালিকের কাছ থেকে। তার মাখনার ফসল পেরী-সাহেব হাতীকে স্নান করানর সময় প্রত্যহ নষ্ট করে দেয়—বারণ করলে বন্দুক দিয়ে গুলী করে দেবার ভয় দেখায়। মাখনা একরকম দামী জলজ ফসল—অতি সুখাদ্য। এই গোলমাল নিয়ে আমি পেরী সাহেবকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে নিজে এসে হাজির। স্বামীর হয়ে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে গেল। দেখলাম যে, আমাকে বেশ একটা কেষ্টবিষ্টু ঠাউরেছে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা এর পর থেকে আমার কাছে আনাগোনা আরম্ভ করে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মিসিজ পেরী খুলেই বলল একদিন। পেরী সাহেব সেদিন একবস্তা নথীপত্র সঙ্গে করে এনেছে, তার মামলা মোকদ্দমার। আমাকে সেগুলো পড়তে হবে—পড়লেই বুঝতে পারব তাদের উপর কি রকম অত্যাচার অবিচার হয়ে চলেছে—আরও কত হবে—এখনও অনেক মোকদ্দমা আদালতে ঝুলছে—আমি যদি এ সম্বন্ধে একবার মিনিস্টার সাহেবকে বলে দিই তাহলেই কাজ হয়ে যাবে—মিনিস্টার হুকুম দিলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট কি তার বিরুদ্ধে যেতে পারে—একবার শুধু মন্ত্রী-মশাই নিজে সরেজমিনে তদারক করুন

ব্যাপারটা—তাহ'লেই তিনি তাদের বিরুদ্ধের সব মোকদ্দমা তুলে নেবার হুকুম দিয়ে দেবেন আদালতকে।......

তাদের এই ছেলেমানুষী অনুরোধ শুনে হাসি আসে। কিছুতেই বুঝবে না যে, এ জিনিস হয় না। সেদিনকার মত চলে যায়, কিন্তু আশা ছাড়ে না। আবার আসে। কতবার এসেছে। একবার পেরী সাহেব তার শিকার-করা বাঘের একটা বাঁধানো মাথা, আমাকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে আসে। বুঝি যে মিসিজ পেরী পাঠিয়েছে, আমাকে খুশী করবার জন্য। আমি না নেওয়ায় খুব দুঃখিত হ'ল। পরে মিসিজ পেরীর কথা থেকে আঁচ করেছিলাম যে তার ধারণা যে তারা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ব'লেই নাকি আমি তাদের অনুরোধ রাখছি না।

তাদের কথা রাখতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু বহুবার দেখাশোনা হবার ফলে, তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল আমার। তাই মিসিজ পেরীর কঠিন অসুখের খবর শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। ডাক্তার বলেছিল ক্যান্সার—এখানে চিকিৎসা হয় না। পয়সা নেই—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো এদের পক্ষে অসম্ভব। সিভিল সার্জন ভাল লোক। তাঁকে অনুরোধ করে, হাসপাতালের আউট হাউসের একটা ঘরে মিসিজ পেরীর থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। সেখানে থাকলে পয়সা খরচ নেই, হাসপাতালের অসুবিধাগুলো নেই, অথচ সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। আসল রোগের চিকিৎসা হবে না বটে, কিন্তু সাময়িক উপসর্গগুলো দেখে রোগিণীর শারীরিক কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা সব সময়ই করা যাবে। এ তো দু'চার দিনের ব্যাপার নয়।

পেরী প্রত্যহ বিকালের ট্রেনে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে হাসপাতালে। আমিও মাঝে মাঝে যাই কর্তব্যের খাতিরে। মিসিজ পেরী দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যায়; দিন দিন চোখের কোলের কালি গাঢ় হয়; কিন্তু চোখের নীল ঠিক একইরকম আছে। পেরীর পরিবর্তনের মধ্যে, তার জুতোর তালি বেড়েছে, আর সে সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরেছে; বোধহয় স্ত্রীর অসুখের গুরুত্ব ঠিক বুঝতেও পারে না। আমি মাঝে মাঝে দু'দশ টাকা চাঁদা তুলেও তাকে দিয়েছি; সে নিতে ইতস্তত করেনি। দেখলে মায়া হয়। আমার সহকর্মীরা পেরীদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করত। তাদেরই একজন একদিন আমায় খবর দিল যে আমার বন্ধু পাগলা পেরী, আবার এক নতুন কাণ্ড করে বসেছে আজ।

একজন পাওনাদার কোর্টের আরদালি, সেপাই নিয়ে, গিয়েছিল পেরীর হাতী, ঘোড়া আর বন্দুক রাইফেলগুলো ক্রোক করাতে। নাজিরবাবুর সঙ্গে সার্জেণ্ট মেজরও গিয়েছিল, সম্পত্তি চিনিয়ে দেবার জন্য। খবর পেয়েই পেরী পাগলের মত হয়ে যায়।...শত্রুরা দল বেঁধে আসছে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোকে ছিনিয়ে নিতে! এদের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই! সব কেড়ে নিয়েছে, শুধু এই কয়টিকে কোনরকমে আগলে আগলে রেখেছে এতদিন। এগুলোর উপরও নজর! অন্য লোকে চালাবে তার বন্দুক রাইফেলগুলো! সার্জেণ্টমেজর চড়বে তার সাদা ঘোড়াটাতে! না! মরে গেলেও না! পৃথিবী উল্টে গেলেও না! শত্রুর দল এসে পড়ল ব'লে! সময় নেই; নইলে হাতীটাকে সে একবার শেষবারের মত নিজ হাতে অশথপাতা খাইয়ে দিত। বুড়ো হয়েছে তার আদরের একদাঁতওলা হাতীটা; পিঠে প্রকাণ্ড ঘা; ফিনাইল ভেজানো ন্যাকড়া প্রত্যহ তার গভীর ক্ষতটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়; তবু তোকে ওরা ছাড়বে না রে! বন্ধুকে কাছে যেতে দেখে হাতীটা শুঁড় তুলে জোরে নিশ্বাস নিল—শুঁড় দোলাচ্ছে—একটু আদর চায়—কিন্তু সে সময় কই! এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিকারীর হাত কাঁপছে—ঠক ঠক করে কাঁপছে। হাতীর মত অত বড় একটা জানোয়ার মাত্র পনর হাত দূরে—তবু মনে হচ্ছে গায়ে না লাগতেও পারে।......দড়াম! দড়াম! চমকে উঠেছে শত্রুর দল রাইফেলের শব্দ শুনে। মনে মনে গুনছে—একটা, দুটো ......তিনটে, চারটে......পাঁচ, ছয়......সাত আট! ব্যস থাক—আর দরকার হবে না হাতীটার জন্য! দড়ি বাঁধা সাদা ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সম্মুখের পা দুটো উঁচুতে তুলে দিচ্ছে—চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে ভয়ে,—না না, সে তাকাবে না ওদিকে —তাকে শক্ত হ'তে হবে—ভয় পাস না—আর যে কোন উপায় নেই—কুত্তীর বাচ্চাগুলো যে এসে পড়ল ব'লে!......নিজের বুকের উত্তাল ধুকধুকুনির শব্দটা সে শুনতে পাচ্ছে।

কিন্তু আধমাইল দূরে শত্রুদের বুকের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছে। আট গুনবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে আবার গুনেস...নয়, দশ!......এগারো, বারো!......

গ্রামের একটা ছেলে একটা কলাগাছ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল সাহেবের বাংলোতে। "সাহেব পাগল হয়ে গিয়েছে। সাহেব পাগল হয়ে গিয়েছে!" চীৎকার করে গাঁয়ের লোককে খবর দিতে দিতে সে ছুটে পালাচ্ছে। রেল স্টেশনের কর্মচারীরা ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করছে ভয়ে। সাহেব নিজের বাংলা থেকে বার হ'ল। কাঁধে দামী দামী বন্দুক রাইফেলের বোঝা। এগিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে। ব্যাপার দেখে নাজিরবাবুর দল গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে; ফিরে যাচ্ছে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে। পেরী সাহেবের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। বড় রাস্তার উপর একটা লোহার রেলিং দেওয়া পুল আছে; সেইখানে গিয়ে সে থামে। কার্তুজগুলোকে খরচ করে ফেলা দরকার, এইবার; সে আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি গুলী ছোঁড়ে। নাজিরবাবুর দলের গতি দ্রুত হয়। শেষ কার্তুজটা খরচ হবার পর, পেরী একটা একটা করে বন্দুক তুলে নিয়ে লোহার রেলিং-এর উপর প্রাণপণ শক্তিতে আছাড় মারে। সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে না ভাঙা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। তারপর-সেগুলোকে পুলের নীচের জলের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে।......"নে! এই নে! বেজম্মার দল!"

আর তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই। নিজের বাংলায় ফিরে এসে দেশলাই জ্বালানর সময় আর তার হাত কাঁপল না। দাউ দাউ জ্বলে ওঠে খড়ের বাড়ি।...... "নিক! শয়তানগুলো এসে নিয়ে যাক এ বাড়ির ছাই আঁজলা ভরে ভরে!"......

আগুনের হলকার জন্য এত কাছে আর দাঁড়ান যায় না। সে গিয়ে বসে একটু দূরে, হাতীটার কাছে।......হাতীটার দেহ যখন পচে গলে শেষ হয়ে যাবে, তখনও বোধহয় শত্রুর দল ছাড়বে না—আসবে ওর হাড় আর দাঁতের লোভে!......ঘোড়াটার দিকে সে কিছুতেই তাকাবে না। এখনও বোধহয়

ওর দেহটা গরম আছে। ইচ্ছা করে সেই গরমটুকু আঙুলের ডগায় একবার নিতে। ইচ্ছাকরে জড়িয়ে ধরে তার দেহের উত্তাপ নিজের সারা দেহে একবার মাখিয়ে নিতে। ......প্রাণপণ চেষ্টায় সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। এ সংযম বুঝি আর টেকে না!...... কিন্তু যদি বেঁচে থাকে এখনও!......ভয় ভয় করে।......

কতটুকুই বা দূরে। আমাদের শহরে পেরীর আধুনিকতম পাগলামির খবর পৌঁছতে দেরি হয়নি। মিসিজ পেরীর শারীরিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সেদিন হাসপাতালে গেলাম তাকে দেখতে। ফুল পেয়ে খুব খুশী। দু একটা কথা বলেই বুঝতে পারি যে স্বামীর কীর্তির খবর সে তখনও পায়নি। রোগিণীর অবস্থা বুঝেই বোধহয় হাস-পাতালের লোকেরা তাকে কিছু বলে নি।

বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ হল!...... এখন তো ডাক্তার আসবার সময় নয়!......কে আবার এল!......মেয়েমানুষের গলা! বাইরে কাকে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে।......

হাতে ফুলের তোড়া—ভিতরে ঢুকবার অনুমতি না নিয়েই এসে ঢুকল রবার্ট-সনের মেয়ে। আমার চেয়েও অনেক বেশী অবাক হয়েছে মিসিজ পেরী—কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। এর আগে জীবনে কখনও মিসিজ ওয়াটসনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি ওর। প্রথম ভর দিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করতেই রবার্টসনের মেয়ে ছুটে এল। "না না, ও কাজ করবেন না, আপনার যে অসুখ।" মিসিজ পেরীকে ধরে সে বালিশে শুইয়ে দিল।

"কেমন আছেন? এখন কেমন লাগছে? কিছু ভাববেন না। ভাল হয়ে যাবেন। খুব ভাল ডাক্তার এখানকার সিভিল সার্জন। আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"......

কোন উত্তরের আশা না রেখে অনর্গল কথা বলে চলেছে রবার্টসনের মেয়ে। যে রোগিণী এক বছরের উপর এখানে রয়েছে, তার জন্য হঠাৎ আজ দরদ উথলে উঠল কেন?......একটা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে! কি যেন একটা বলবে বলবে করছে। আমার মনে হল যে আমি থাকায় হয়তো বলতে দ্বিধা হচ্ছে। আমি চলে যাবার জন্য উঠতেই, মিসিজ পেরী আমায় বারণ করে—সে চায় না যে, আমি এখন এখান থেকে চলে যাই।

তারপর রবার্টসনের মেয়ের এখানে আসবার উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল। সে এসেছে একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে, পেরী-দের দেবার জন্য। পেরীর কাছে যেতে পারেনি, এসেছে এখানেই। আমার ধারণা হল যে, আজকের কাণ্ডটির কথা শুনেই মনে পড়েছে তার পেরীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। জানিতো ওর খেয়ালের ধরন।

রবার্টসনের মেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে মিসিজ পেরী মৃদু আপত্তি জানাচ্ছে। হ্যাঁ, অতি মৃদু। আমার মনে হচ্ছে যে, এটা শুধু শিষ্টাচার। প্রাথমিক সঙ্কোচটা কাটিয়ে নিচ্ছে। টাকাটা ও নেবে। চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, টাকাটার উপর ওর লোভ পুরোমাত্রায়; আর রবার্টসনের মেয়ের কাছে সে কৃতজ্ঞ। অবস্থা বিপর্যয়ে ও আত্মসম্মানজ্ঞান হারিয়েছে। তাই রবার্টসনের মেয়ের হাত থেকে ভিক্ষা নিতেও ওর আজ লজ্জা নেই। আর বেশী-দিন সে বাঁচবে না, এ কথা জানে মিসিজ পেরী। এ কথা সে দেখা হলেই আমাকে বলে। তার দুশ্চিন্তা শুধু পেরীর জন্য। তার জন্যই টাকার দরকার।......

অনুরোধ উপরোধ আপত্তির পালা মাঝ-পথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে এসে ঢুকল পেরী সাহেব। থমকে দাঁড়িয়েছে। মেঝের উপর সূচ পড়বার শব্দটাও বুঝি শোনা যায় এখন! পেরী তাকিয়ে রবার্টসনের মেয়ের মুখের দিকে। রবার্টসনের মেয়ে তাকিয়ে পেরীর দিকে।

মিসিজ পেরী লক্ষ্য করছে স্বামীর মুখ-খানা। যেন অন্যরকম অন্যরকম লাগছে! ঘরে ঢুকবার মুহূর্তেতো এরকম ছিল না। ......মিসিজ ওয়াটসনকে দেখে নাকি?......

আমি আশা করেছিলাম যে পেরী আজ ওই কাণ্ডের পর, পাগলের মত চেঁচিয়ে বাধিয়ে দেবে এখানে; কিন্তু তার মুখের ভাব আমার সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে। তার ফোলা ফোলা মুখখানাতে রাগ আর এক-গুঁয়েমির লেশও নেই এখন। তার স্লেটের রঙের ছোট ছোট দুটো চোখ কি যেন জিনিস আবিষ্কার করেছে রবার্টসনের মেয়ের কটা চোখের মণিতে—হারিয়ে যাওয়া

জিনিস খ‍ুঁজে পাচ্ছে সেখানে—ভুলে যাওয়া জিনিস যেন মনে পড়ছে—বহুকাল আগে সে নেপাল থেকে শিকার করে ফিরে আসবার দিন, মেয়েটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল ফুলের গোছা হাতে নিয়ে—নিজেকে নিঃশেষ করে লুটিয়ে দেবার চাউনি—বীরের পায়ে মাথা কুটবার চাউনি—যে প্রশংসাভরা চাউনিটুকু সে ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ের পরই হারিয়েছিল—সেইটা ফিরে এসেছে আবার ওর চোখে। একেবারে নতুন নতুন লাগছে। পুরনো, অথচ নতুন।......

পেরীর দৃষ্টির অনুসরণে আমার নজরও গিয়ে পড়ল এতক্ষণে রবার্টসনের মেয়ের দিকে।...যেন একটা আবেশে রয়েছে এখন। উচ্ছ্বাসের দীপ্তি মুখচোখে। প্রশংসাঞ্জলি দিচ্ছে পুরুষ সিংহকে একটি বীরভোগ্যা মেয়ে। উস্কখুস্ক চুল, ছাইমাথা ময়লা পোশাক, ঘাম আর বিড়ির গন্ধ, চলবার সময়ের দুর্বিনীত বলদৃপ্ত ভঙ্গী, দ্রূরেখার কঠোরতা, চোখের স্লেটে লেখা পৃথিবীকে রণে আহ্বান করবার বিজ্ঞাপন,—অবহেলায় ছিটিয়ে-ফেলা পেরীর অনায়াস শৌর্যের এইসব প্রমাণগুলোকে সে নিজের অণু-পরমাণুর মধ্যে টেনে শুষে নিতে চায়। তার নেশার অঞ্জন লাগানো চোখে রবার্টসনের মেয়ে, সে-ই প্রথমবারের বিয়ের আগের অতি আকাঙ্ক্ষিত পৌরুষের ব্যঞ্জনাগুলোকে দেখতে পাচ্ছে। পেরী চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে না থাকলেও সে মনে মনে দেখতে পেত এখন। আজকের কাণ্ডের খবর শুনে, সে মনের চোখে ঠিক এমনি পেরীকেই দেখতে পেয়েছিল। বিয়ের পরের সেই মিন-মিনে, চোখপচানো পেরী এতদিনে আবার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। একা লড়াই করেছে এত বড় গভর্নমেন্টের সঙ্গে! চোরের মত পালিয়ে এসেছে ওরায়েন আর সরকারী সেপাই ফৌজ, তার ভয়ে! পুরনো অতি-কথার বিস্মৃত বীর আজ আবার নবীন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই রবার্ট-সনের মেয়ে ছুটে এসেছে, সব লজ্জা সংকোচ ভুলে। ইচ্ছা হয় যে, ওই বন-মানুষের মত হাতের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে তার পাঁজরার হাড়গুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক। কিন্তু সে তো আর হবার নয়! পেরীর যে বিবাহিতা স্ত্রী আছে—সে যত রুগ্নাই হোক। তার নিজেরও যে স্বামী আছে—সে যত অপদার্থই হোক! কত বাধা! তাই সে নোটের বাণ্ডিল নিয়ে ছুটে এসেছিল—মিসিজ পেরীর চিকিৎসার খরচের জন্য নয়—ওই টাকা পেরীর কাজে লাগলে তবু খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়—শুধু সেইজন্য। এর চেয়ে বেশী সে কী প্রত্যাশা করতে পারে আজ?

মিসিজ পেরী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে স্বামীর মুখের দিকে। লক্ষ্য করছে। খ‍ুঁটিয়ে দেখছে। বুঝবার চেষ্টা করছে। ভুল হচ্ছে না তো বুঝতে? একটা সরল শিশুর মনের ভাব কখনও কি তার মুখ-চোখে ছাপ না রেখে পারে!......নীল চোখ-দুটো বেদনায় ভরে এল। বেদনার সঙ্গে মিশে রয়েছে একটা মৃদু অনুযোগ।......আর ক'টা দিনই বা সে বাঁচবে!......কিন্তু যার চুলে পাক ধরেছে, যে দুবছর থেকে রোগশয্যায়, তার কি অনুযোগ করবার অধিকার আছে!......

হঠাৎ পেরী সাহেবের নজর পড়ল স্ত্রীর মুখের দিকে।......গভীর বেদনাভরা নীল চোখের চাউনী মাথা কুটছে স্লেট পাথরের উপর।.....পাথরেও সাড়া জাগে। স্লেট-চোখের লেখায় স্পষ্ট দেখা গেল একটু অপ্রস্তুতের ভাব।

এসব এক মুহূর্তের ব্যাপার।

.....তালিমারা জুতো.....সুতো বার হওয়া ট্রাউজার.....জরাজীর্ণ জ্যাকেট.....

.....এ মুহূর্তেও সেগুলো নীলচোখের নজর এড়ায় না।......তবু,.....

"ডিয়ার শুনেছ। —মিসিজ ওরায়েন তোমাকে অর্থসাহায্য করতে এসেছেন। এই যে নোটের বাণ্ডিল। আমি হ্যাঁ না কিছু বলিনি। নিতে ইচ্ছা হয় নাও, না নিতে ইচ্ছা হয় ফেরত দাও। বুঝেছেন মিসিজ ওরায়েন, আমি একে বুড়োমানুষ, তায় বিছানায় শুয়ে, আমার কথার মূল্য কি? আর আমার কি এখন বিচার বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে? এসব বিষয়ে আমার স্বামী—হ্যাঁ আমার স্বামী—যা বলবেন, তাই হবে।"

আবহ থমথমে হয়ে উঠেছে। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না।

দুটি আয়ত নীল চোখ; দুটো খুদে খুদে স্লেটের রঙের চোখ; একজোড়া কটা কটা বিড়ালের মত চোখ।

"না।"

অন্যদিকে তাকিয়ে পেরী রবার্টসনের মেয়ের হাতে নোটের বাণ্ডিল ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু চলে যাবার আগে সে মেয়ে যে দৃষ্টি হেনে গেল, তাতে পরাজয়ের লাঞ্ছন নেই। নীল চোখ দুটি তখন জলে ভরে উঠেছে।

* * *

সার্জেণ্ট মেজর এমন হঠাৎ মারা গেলেন! তবে কি......!

শিবনাথ শাস্ত্রীর ডায়েরি

শ্রীঅবন্তী দেবী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ড প্রবাসকালীন একখানি সুবৃহৎ ডায়েরি আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় "ইংলণ্ডের ডায়েরি" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

আটষট্টি বৎসর যাবৎ এই ডায়েরি বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়িয়া ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্রবধূ শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী এই অপ্রকাশিত মূল্যবান ডায়েরি উদ্ধার করিয়া প্রকাশার্থ দিয়াছেন, ইহার জন্য 'দেশ' পত্রিকা ও দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক 'দেশ'

আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরদেব স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ইংলণ্ডের ডায়েরি"খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ধারাবাহিকভাবে এই ডায়েরি "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করি বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া ইহার মূল্য অনুধাবন করিতে পারিবেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল "মৃজাপুরে" ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে শিবনাথের বিলাত যাত্রা আরম্ভ হয় এবং ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ডায়েরিতে ১৫ই এপ্রিল হইতে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত দৈনন্দিন লিপি লিখিত আছে।

পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন, কিরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত তিনি সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং কিরূপ সহজ স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষায় এই চিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে হয়তো জানেন না, শিবনাথ কে এবং কি ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিবনাথ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্বন্ধে দেশীয় বিদেশীয় বিবিধ ইংরাজী ও বাঙলা সংবাদপত্রে যে সমস্ত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

> মত ও বিশ্বাসে যাঁহারা শিবনাথের সমভাবাপন্ন ছিলেন না—প্রথমত তাঁহাদের উক্তি হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "বাঙ্গালী" লিখিয়াছিলেন—

* * * "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গলার এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একটি বড় নাম, শ্রদ্ধার এবং গৌরবের নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একটি উচ্চবড় নাম; * * * সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর ময়ূর-পাখায় প্রদীপ্ত অক্ষরে লিখিত, এ পক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের মত শক্তিধর নাম; * * * মেধাবী, মনীষী, প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন; স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশ-সেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকার ছেলেরা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাহ্ম সমাজের জন্য জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়ার অবস্থার এম এ এবং শাস্ত্রী। তিনি যদি শিক্ষা বিভাগেই থাকিতেন, তাহা হইলে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। হাইকোর্টের উকীল হইলে হাইকোর্টের জজীয়তি তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য পদ হইত না। * * * তিনি সামাজিক ও সাংবাদিক পদমর্যাদার সকল লোভ ছাড়িয়া * * * ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। * * * যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের স্রষ্টা, যাঁহারা ছিল বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজ এত বড় হইয়াছিল, যাঁহাদের মহিমার জ্যোতিতে সমগ্র বাঙ্গলার ধর্মক্ষেত্র সমালোকিত ছিল, একে একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। * * *

"আমরা হিন্দু, চিরদিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি; পরন্তু তাঁহার মনীষা, তেজস্বিতা, একনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা দেখিয়া এবং সে সকলের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

অবনত হইত। আজ ব্রাহ্ম সমাজের যাহা গেল, তাহা আর মিলিবে না, * * * বাঙ্গালী জাতি অমূল্য নিধি হারাইল।"

(২) "হিন্দুস্থান" লিখিয়াছিলেন :—

* * * "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। * * * ব্রাহ্ম সমাজ যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে এই তিনজন প্রতিভাশালী পুরুষেরই নাম করিতে হয়।

শুধু ব্রাহ্ম সমাজের নহে, বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি একজন দিকপালবিশেষ ছিলেন। তবে কবিতা লিখিয়া তাঁহার যশ হইলেও তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীই তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। * * * তাঁহার "মেজ বউ", "যুগান্তর" ও "নয়নতারা" বাংলার উপন্যাস সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া তিনি "আত্মচরিত" এবং "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক দুই খানি মূল্যবান জীবনী-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন, তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।"

বিদেশীয় সংবাদপত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

* * * "Preacher, poet, thinker, religious and social reformer,—Sivanath Sastri was a man of real distinction. His wide culture, his saintly character, combined with great simplicity and strength of purpose marked him out for leadership. In his youth he was attracted by Keshub Chunder Sen; and cutting himself adrift from family and friends, he joined the Brahmo Samaj in 1869, on the same day as the late Mr. A. M. Bose. Nine years later, he and his friend parted company with Keshub and founded the Sadharan Brahmo Samaj—the most enlightened and progressive Theistic movement in India. Pandit Sastri became its chief missionary minister, an office which he held until his death." * * *

"Inquirer".

* * * Sivnath Sastri * * * abandoned a career in the educational service in which he gave every promise of rising to the very highest rung of the ladder to serve his God and his country in those fields of work for which nature but which offered few opportunities had pre-eminently marked him out, of earning renown and none whatever of earning money, and to the end of his days he remained true to the inspirations of his youth and guidence of his conscience. Such a man is at all times, and in all countries a rare asset of national life * * *"

"Christian Life."

সমবিশ্বাসিগণের দৃষ্টিতে শিবনাথ কি ছিলেন, অতঃপর তাহাও কিঞ্চিৎ নিবেদন করা যাইতেছে :—

(১) "প্রবাসী" পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—"তিনি বিদ্বান, বাগ্মী, কাব্য-উপন্যাস-জীবনচরিত-সন্দর্ভাদির সুলেখক, সুকবি, অতি সামাজিক ও হাস্যরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনায় কঠিন প্রাণও বিগলিত এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। তিনি

যৌবনকালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহযোগে দেশের রাজনৈতিক দুর্দশা দূরে করিবার জন্য "ভারত সভা" স্থাপন করেন এবং তজ্জন্য পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। * * * ছেলেমেয়েদের কাগজ "মুকুলের" প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি, বালকবালিকাদের জন্য লিখিত তাঁহার অনেক রচনা "সখায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠন জন্য তিনি কখনও স্বয়ং একাকী, কখনও বন্ধুদের সহযোগে সিটি স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, রামমোহন সেমিনারী প্রভৃতি স্থাপন করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান কর্মী, প্রধান আচার্য ও প্রধান প্রচারক তিনি ছিলেন। ইঁহার বাংলা ও ইংরেজী মুখপত্র দুটি তিনি স্থাপন ও বহু বৎসর সম্পাদনা করেন। তৎপূর্বে "সমদর্শী" ও "সমালোচক" স্থাপন করিয়া তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মিশন প্রেস স্থাপন করিয়া তিনি উহা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে দান করেন। ধর্মসম্প্রদায়ের কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তন, আধুনিক ভারতে নূতন জিনিস। শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর ইহা একটি কীর্তি। এই প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইলে বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল নিয়মে যেমন বিশ্বাস চাই, মানব প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি আবশ্যক। সাহসেরও একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সমুদয়ই ছিল। তাঁহার গৃহে অনেক অনাথ ও বিধবা আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল। * * * এই ভগবদ্ভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, দ্বেষ-অসূয়াশূন্য, পরচর্চা-পরনিন্দাবিমুখ, মানবপ্রেমিক দেশভক্ত, অক্লান্ত কর্মী, নির্লোভ ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষের কীর্তি অনেক। মানুষত্বে তিনি তাঁহার সমুদয় কীর্তিরও বহু ঊর্ধ্বে। তথাপি তিনি নিজেকে অতি অধম মনে করিতেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, তিনি তাহার তুলনায় আপনাকে হীন মনে করিতেন।"

(২) শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ "ভারতী"র জন্য প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়া শিবনাথকে ১৩০৫ সালে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—* * * "এক্ষণে অবসরমত ভারতীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না—কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।"

১৩২৬ সনে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ শিবনাথ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ:—"প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে, শুধু জন্মগত বিশ্বাসের বেষ্টন নহে। মানুষের সবচেয়ে প্রবল অভিমান যে ক্ষমতাভিমান, সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ষাদ্বেষ, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়াও, তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। "তমসো মা জ্যোতির্গময়"—এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাঁহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্রনিহিত ছিল; এই জন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা। * * * শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানব-বাৎসল্য। * * * অথচ এই তাঁর মানব-বাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াইছেন, তাহার পরে ব্রাহ্ম সমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও বার বার তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা

সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শান্তিপ্রবাহে সমীরিত।"

কেবল "ভারত সভা" সংগঠনের মধ্যেই তাঁহার দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে বিবিধ কবিতা, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাদির দ্বারা তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের কথা বর্তমানকালে অনেকেই বোধ হয় জানেন না। "বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলনের ফলে এতদ্দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়, বিদেশী শাসক তাহাতে শঙ্কান্বিত হইয়া কঠোর হস্তে উহার দমনে প্রয়াসী হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয়জন বিশিষ্ট নেতা কারারুদ্ধ হইলে কলিকাতায় যে বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীই তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। আলিপুরে বোমার মামলার অন্যতম আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যখন ফাঁসির আদেশ হয়, তখন উক্ত আসামীর শেষ ইচ্ছা জানিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কারাগারে গিয়া তাঁহাকে লইয়া উপাসনা করেন।

বিলাত গমনের সংকল্প বহুদিন হইতে তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল এবং তাহারও মূলে তাঁহার দেশপ্রেম এবং সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তাঁর ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন :—"ভারতের নবজীবন লাভের জন্য পাশ্চাত্ত্য, উদ্যোগশীলতা, কার্যতৎপরতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এদেশে লোকের মনে স্থানপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্ম সমাজ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এদেশীয় ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যান পরায়ণতা রক্ষা করিবেন।" ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বিলাত যাত্রাকালে স্টীমারে বসিয়া ডায়েরিতে লিখিয়াছেন :—"ইংলণ্ডে আমি Linguist বা Scholar বা Philosopher হইতে যাইতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম মিশনারী ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে আরও সমর্থ হইব বলিয়া যাইতেছি।" এ সম্বন্ধে পাঠক, পাঠিকাগণ তাঁহার ডায়েরি হইতেই আরও সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

যাঁহারা শিবনাথের "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কোনো আদর্শই ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা এবং উপদেশাদির মধ্যে তিনি বহুবার মনুষ্যত্বের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এই—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম এবং ভগবানে ভক্তি।" এই আদর্শ স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতে জীবনের ঊষাকাল হইতে তিনি ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অনেকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, সে-সফলতায় তিনি কখনও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। এই কারণে ডায়েরির মধ্যে অনেক স্থলে পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, তিনি কত আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রায় ৩৭ বৎসর হইল শ্বশুরদেব চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে জানিতেন, এরূপ লোকের সংখ্যাও এখন অধিক নাই।

আমার শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা ননন্দা স্বর্গীয়া হেমলতা সরকার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেবের যে জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কয়েক স্থানে এই ডায়েরিগুলির কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন ও মন্তব্য করিয়াছেন, "শিবনাথের ডায়েরি এক অপূর্ব জিনিস, আশা আছে তাহা একদিন সকলে দেখিবে।" এই কথাতে ডায়েরি প্রকাশিত হইবে, এই আশার বাণী তিনি শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্বশুরদেবের সন্তানতুল্য, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য এবং তাঁহার পরবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, পরলোকগত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও এ বিষয়ে হেমলতা সরকারের সহিত একমত ছিলেন; ডায়েরিগুলিও তিনি কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন। তিনিও আজ ১২ বৎসর হইল পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্বশুরদেবের দেহত্যাগের পর আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "বৌদিদি, আপনি ধন্য হইয়া গিয়াছেন।" তাঁহার এই উক্তির সার্থকতা আমি সত্যসত্যই অনুভব করি। নিজ জীবনের অক্ষমতা, অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া যাই; এই রোগভগ্ন দেহের অবসন্নতা ও নিজের মানসিক আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ও অনুপযুক্ততার কথা বিস্মৃত হইয়া প্রাণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। আমিও জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি। (আমার বয়স এখন ৭৬ বৎসর চলিতেছে) আমার শক্তি সাধ্যও অতি সামান্য। তথাপি এই বৃদ্ধ বয়সে গুরুজনের আশীর্বাদ ও বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া এই অপ্রকাশিত মূল্যবান ডায়েরি প্রকাশে ব্রতী হইলাম। এই ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিয়া তুলিতে পারি এবং পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে সমাজসেবার উৎসর্গীকৃত শিবনাথের মহান চরিত্রের কিয়দংশ ফুটাইয়া তুলিতে পারি, তবে আমার শ্রম সার্থক এবং নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

বৈজনাথ (কাংড়া)

॥ ৭ ॥

বর্ষাশেষের বাদল ছেয়ে রয়েছে কাপিশ-কান্ত ধবলাধারের তুষার-চূড়ায়,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিস্ময় হিমালয়ের কোথাও নেই। মোটরপথের অদূরে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্চতা কম-বেশী ষোল হাজার ফুট। ওই শৈল-মালার ঠিক নীচে অন্তহীন ফসলের ক্ষেত সমগ্র কাংড়ায় যেন সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী এঁকেবেঁকে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকন্না আর দেবস্থান। পৃথিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাঠান আর দেওদারের বনরেখা যেন হৃৎপিণ্ডকে টেনে নিয়ে যায় বহুদূরে—যেদিকে উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিম—তিনদিকে জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচূড়াদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র এঁকে রেখেছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফুরন্ত ফলের বাগান, অন্যদিকে প্রান্তর আর শস্যক্ষেত্র। কোথাও ছায়া নেমেছে অরণ্যের, কোথাও স্রোতস্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝুরি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন মুনি আপন মনে যেন গণ্ডূষ ভরে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাহুলের পাখী,—যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজু পথ বনবীথিকার মতো দূরে থেকে দূরান্তরে চলে গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী রোড এবং যোগিন্দর-নগর হয়ে নাগরোটা পর্যন্ত। নাগরোটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এপারের বৈজনাথের পথ থেকে তার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াবৃত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গুপ্তা স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

অপরাহ্ন ম্লান হয়ে আসছিল। জন-সমাগম এত কম যে, বিস্ময় লাগে। মাঝে মাঝে পুরুষ দেখা যাচ্ছে,—মাথায় তাদের লাল পাগড়ি; স্কুল-বালকের দল গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাদের, যাদের নাম 'গাদ্দি।' তারা এখানকার মাটির সন্তান নয়। আপেলের রক্তিমাভা 'গাদ্দি' মেয়ের গালে আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বন্য অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর পেলব কণ্ঠে প্রবালের মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, কিন্তু সর্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় রাঙা ওড়না। কেউ বলে এরা মোগল রক্তের ধারা, কেউ বলে আদিম আর্যের অবশেষ। ছেলে-ছোকরা-পুরুষেও তাই। রঙীন টুপি মাথায়, শাদা কম্বলের জোব্বা সর্বাঙ্গে, পশুলোমের ফেটি বাঁধা তাদের কোমরে। একটু সাবান মাখিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন করে দেখো, প্রত্যেকে রূপবান। অরণ্য থেকে ওরা পেয়েছে স্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য, পার্বতী নদীর ঝনক ঝঙ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লাস এবং সভ্যতা-চিহ্ন লেশহীন পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ওরা পেয়েছে চিত্তের সরলতা। পশু, ছাগল, মেষ ও মহিষ—এদের চরানো হলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিল্পের কাজ নেয়, রূপার অলঙ্কার নির্মাণ করে, পশুর লোম থেকে পশমের গুটি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরি ক'রে যায় এদিকের নানা অঞ্চলে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র। ওরা যায় জাস্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর দিয়ে লাহুল উপত্যকায়, কিংবা লাদাখ অথবা তিব্বত সীমানার পার্বত্যালোকে। ওরা ঠিক 'গুজর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছু নেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ছাড়পত্রের তোয়াক্কা রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকে চেনে না। কোন্ দেশ থেকে কাদের শাসনদণ্ড খসে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন্ সীমানা, কোন্ রাজ-শক্তির কি পরিচয়,—ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দুস্তর পথের সন্ধান,—যেখানে সভ্যতার আনাগোনা কম। সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুঁটি উপড়ে নেয়, তল্পিতল্পা বেঁধে তুষারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য করে ওরা দল বেঁধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যুগ-যুগান্তরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ পাহাড় অঞ্চলে জরিপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তুত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখা-প্রশাখার মধ্যে শত-সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল ঊর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত করে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধরে অভিযাত্রীরা চলে। মুনিঋষি গিয়েছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আর রাজভিখারীর দল,—গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পায়ের দাগ দেখে দেখে এসেছে তাতার আর মোগল, এসেছে তুর্কী, ইরাণী আর পাঠান, এসেছে শক আর হূন,—এসেছে উত্তর তিব্বতের মরুলোক তাকলা-মাকানের অগণ্য বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রান্ত থেকে কত অচিহ্নিত জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে বের ক'রে এসেছে ইয়ারখন্দ আর সমরখন্দের

দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্ঝার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখের অন্ন আর কোলের শিশু চাপা পড়ে, পশুর লোমের অভাবে ওদের হাড়-চামড়া বেরিয়ে আসে, তুষার-ক্ষত দেখা দেয় সর্বাঙ্গে,—কিন্তু তবু ওরা চন্দ্রভাগা আর বিপাশার নীচে নীচে ভারতের সুশ্যাম সমতলে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার মধ্যে নামতে চায় না,—পাছে নিম্নলোকের বাতাবরণের চাপে ওরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে। কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুলোকে যখন নব-বসন্তের সংবাদ আসে, কোনও অচেনা রঙীন পাখী যখন হঠাৎ ডাক দিয়ে যায় নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে, দেবতাত্মার জটা শিথিল হয়ে নির্ঝরিণীরা দল বেঁধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কুঁড়ি বুকফাটা যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দেয়, তখন আসে ওদের জীবনে মিথুন লগ্ন। সুনীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার কানে তুলে নেয় ধাতব অলঙ্কার, রাশিকৃত কম্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায় এবং পুরুষকে ডাক দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণ-বক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গুপ্তা স্তব্ধচক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। বানগঙ্গা পেরিয়েছি একাধিকবার। দূরে কাংড়ার দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদূর মনে পড়ছে, বেলা পড়ে এলো নাগরোটায় পৌঁছতে। ছায়াবৃত নাগরোটা, তার ছায়ায় আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছ্বসিত। এখান থেকে অরণ্যের শুরু,—এ অরণ্য চলে গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধরমশালা পেরিয়ে। চেয়ে দেখছি স্বপ্নের মতো,—এ পথ সৌন্দর্যপিপাসুর পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি, যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু। কেউ জানবে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ,—মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা। ওই অপরিচিত পৃথিবীর ওক্ আর পাইনবনের তলায়—যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আলপনা আঁকা হচ্ছে বনকুসুমের রঙে রঙ মিলিয়ে—পতঙ্গ প্রজাপতির দৌত্যগিরির পথে পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়ত নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহ-প্রলাপ, ঝাউ-পাইনের শাখায়-শাখায় উচ্ছ্বসিত হবে তাদেরই পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা! কেউ শুনবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিন্তু তুষার-তীর্থের আর শৈলপারাবতের কণ্ঠে-কণ্ঠে সেই বার্তা ধ্বনিত হবে; ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশ্রুধারা নেমে আসবে ওই বাণগঙ্গায়! আমি ওদেরই অনাত্মীয়। ওই যেখানে অবেলার করুণ ছায়া নেমেছে কান্নার মতো, যেখানে ঘুরে ঘুরে গেল ঘূর্ণি হাওয়ারা, নীল পাখী উড়ে গেল অরণ্য সচকিত করে, ডাহুক যেখানে ওই শিশমের নিভৃত শাখায় বসে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শ্লেটপাথরের ছাদের নীচে 'গদ্দি'রা ওদের অস্থায়ী গৃহস্থালী বসিয়েছে, ওদের সকলের মধ্যে আমি! আমার মধ্যে ওরা বাসা বেঁধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরা-উপশিরায়, অস্থি-মজ্জায়, শোণিতে-ধ্বনিতে, আমার অলিন্দে আর সত্তায়,—ওদের চৈতন্য কাজ করে গেছে কাল-কালান্ত।

পালামপুরের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের আনা-গোনা, দোকানপাট আর কাজ কারবার। এক একটি মানুষ, যাদেরকে দেখছি দুজনে একান্ত আনন্দের চক্ষে, তারা যেন অনাদি-অনন্ত কৌতূহলের প্রতীক। ওরা যেন বহন করছে ধবলাধারের অনন্ত রহস্য, সমস্ত কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই, কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে মুখর। অদূরে একটি ছায়ানিভৃত জলাশয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে শ্বেত ও রক্তপদ্ম। একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লজ্জাবরণ-গুলি রেখে অবগাহন করে উঠে এলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি উৎফুল্ল। মাথা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি ক'রে স্নানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, গাড়োয়ালে, নেপালে,—যেখানেই শ্রমিক নারী, সেখানেই এই। একটিমাত্র মোটা পোশাক ওদের সম্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনমতেই ওদের চলে না।

বহুদূর পর্যন্ত সমতল, তারপর পথ উঠছে ধীরে ধীরে। সবুজ প্রান্তরকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। চোখ ছাড়া পেয়েছে। এবার দেখতে পাচ্ছি বহুদূরে,

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—তুষারবাসী পার্বত্য চিতা, পিঙ্গল-কৃষ্ণ ভল্লুকের পাল এবং দাঁতাল হরিণ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস, পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে, আর আসে শৈলপারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। আমাদের গাড়ি ঘুরে চলেছে অনেক দূর।

বন্যা এসেছিল কিছুদিন আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাঙন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধসেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের বন্যা বিশ্বসংহারিণী। আগে থেকে নোটিশ নেই; হয়ত আকাশ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, তারকাখচিত। হয়ত বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্য হাসছে—এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা। এর কারণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই। [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] গ্রাম ও শহর। [illegible] কোথাও বন্যা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] থেকে [illegible], [illegible] থেকে সমস্ত, তিব্বত থেকে ব্রহ্মপুত্র। এই সকল ভূভাগের ঠিক নীচে যারা থাকে, তারা চিরদিন আতঙ্কে। শুধু যে পর্বতপ্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছুটে আসে তাই নয়, ওর সঙ্গে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম, বিরাটাকার পাথরের চাংড়া, হাজার-হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধস, উপড়োনো বড় বড় বৃক্ষ। ধসের আর নুড়ির সেই ভয়াবহ বজ্র-গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নিরুপায় গণ্ডার আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভাল্লুকের কান্না, অজগর সাপের ঝাপট এবং তাদেরই সঙ্গে ভাসমান মানুষের বুক-ফাটা চীৎকার। কেউ বাঁচে না সেই বিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন জন্তু সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়—তবে সে ক্ষিপ্তোন্মত্ত হয়ে নিকটবর্তী গ্রাম ও বস্তিকে আক্রমণ করে এবং নিরীহ গ্রামবাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চলে যায় এবং পার্বত্য-প্রপাত যখন শান্ত হয়ে আসে, দেখা যায় শত শত বনজন্তুর গলিত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী, গণ্ডার, বাঘ, ভল্লুক, হরিণ—কেউ বাদ যায় নি। তাদের সঙ্গে মেশানো আছে মানুষের আর অজগর মহাকায়ের শবদেহ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভুটানের জঙ্গলে প্রায় দুই হাজার বড় বড় জন্তু, মানুষ এবং সংখ্যাতীত সরীসৃপ বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পৌঁছলুম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দু-চারটি ব্যবসায়ীর গদি। শহরটি ছোট এবং রাজপথটির বাইরে গেলে কয়েক ঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদূরে বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা বনবাসা ও সরকারী খোঁজখবর করতে করতে বাসপাটনের ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছলুম। ডাকবাংলোটি ছোট পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এখান থেকে দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। বাংলোর ঠিক নীচে [illegible] উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়-পাথরে মাথা কোটে, কিন্তু কে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী ভয়ানক ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটি একেবারে পাহাড়ের চূড়ার মাঝখানে। [illegible] হয়েছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্চ শিখর এবং দূর পারে গিরিশ্রেণীর ও দিকে চড়াই পার হয়ে গেছে মণ্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানেই প্রায় শেষ। এ অঞ্চল পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের সংযোগস্থল।

বাস থেকে নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য করে দেখা গেল এই ডাকবাংলোরই উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে একখানা প্রাইভেট গাড়ী দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোনও রাজ-কর্মচারী হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠুকে। যেমন সর্বত্র, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার প্রান্ত হোটেলের মতো। এই নির্জনতা এবং নিস্তব্ধতাকে যারা এমন সুন্দর আবাস-গৃহে পরিণত করেছে, তাদের সুরুচি এবং সুবিবেচনার প্রশংসা করি। ঘরগুলির কোলে সুন্দর বারান্দা।

শ্রীমতী মায়া দেখে-শুনে খুশী হলেন এবং চৌকিদার যখন টিফিনের টেবিল ও চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল, তিনি বসে পড়লেন। কাশ্মীরের চেয়ে কাংড়া কোন অংশে কম নয়। সত্যি, চোখ দেখলে এ জায়গাটা অবিকল পহলগাঁও মতন। কিন্তু লোকজন একেবারে নেই। বাবুজি, চৌকিদার থাকবে ত?—হুকুম রহেগা রাতমে, ক্যা?

জি, হাঁ।—চৌকিদার জবাব দিল।

মায়াদেবী চা ও জলযোগের অর্ডার দিলেন। লোকটা যাবার পর তিনি একবার উঠে ভিতরের মহলে বসবাসের তদ্বির-তদারক করতে গেলেন।

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো পাহাড়ের উপরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে। অদূরে এই মালভূমিরই প্রান্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তারা মাঠ ছেড়ে ঘরের দিকে রওনা হোলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বাস্তবিক পাহাড় ও নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ডাকবাঙলা খুব কমই দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রান্তভাগে একটি সরুপথ এঁকেবেঁকে বৈজনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছেছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসছে না।

কিছুক্ষণ পরে মায়াদেবী ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন। উঠে ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখে-শুনে আমি অবাক। মস্তবড় হলঘর, সমস্ত মেঝে কার্পেট-মোড়া। ঝকঝকে কয়েকখানা খাট এবং পরিচ্ছন্ন বিছানা। প্রত্যেকটি বড় বড় জানলায় মূল্যবান পর্দা উপর থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। হল'এর ভিতর দিয়ে সাহেবী-সজ্জার বাথরুম, ড্রেসিং রুম, এপাশে পার্টিশনের গায়ে মস্ত ডিনার-টেবল, অনেকগুলি দামী চেয়ার, ওপাশে একটি আলমারিতে বিবিধপ্রকার কাচের বাসন ও চায়ের সরঞ্জাম, এধারে ওয়ার্ড-রোব, ওখানে মস্ত আয়না, এদিকে আলনা, ম্যাণ্টলপীসের উপর সাজানো কয়েকটি পুতুল ও রঙীন কাচের ফুলদানি,—তার ঠিক নীচে ফায়ার-প্লেস। এমন পরিচ্ছন্ন নূতন ও সুসজ্জিত হলঘর দেখে মায়া দেবী একেবারে উৎফুল্ল। বললেন, এখান থেকে কিছুদিন নড়বার ইচ্ছে রইলো না। আপনি এক কাজ করুন না? গুপ্তসাহেবকে জরুরী টেলিগ্রাম করে দিন, উনি প্লেনে করে চলে আসুন।

হেসে বললুম, না, তামাশা নয়। যদি অনুমতি করেন, এখনই তার পাঠিয়ে দিই! পরশু দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন।

মায়া দেবী বললেন, বটে। তিনি যদি এ বছর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা না দেন, তবে সে ক্ষতি আমাকেই সইতে হবে। তার চেয়ে আশীর্বাদ করুন, তিনি যেন পরীক্ষায় পাস হন। ওইতেই তাঁর ভবিষ্যতের উন্নতি। ওই দিকেই আমি চেয়ে আছি।

প্রশ্ন করলুম, আপনাদের বিবাহ হয়েছে কতদিন?

বিয়ে' তা ধরুন, বছর পাঁচেক হতে চললো।

চৌকিদার চা ও টিফিন নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। খেতে বসবার আগে তাকে আলোর ব্যবস্থা করতে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে অল্প-বয়সের একটি যুবক ও একটি বিবি এসেছে কি না। চৌকিদার জানতে চাইলো, তাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা আছে কি?

মায়া দেবী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ হাঁ, আছে। তারা কোথায় বলতে পারো?

চৌকিদার তার পার্বত্য হিন্দিভাষায় জানালো, তারা এই ডাকবাংলাতেই বিকেলে এসে উঠেছে আমাদের ঘণ্টা তিনেক আগে। তারা আছে ও-মহলে।

যাও, শিগগির ডেকে আনো'

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ চা তৈরি করুন।

ও-মহলের শেষ প্রান্তের ঘরে এসে উঠেছে মদনলাল আর সংবতী। আমাকে দেখেই মদনলাল ছুটে এসে ওদের কায়দা-মতো হাঁটু ছুঁয়ে আদর জানালো। সংবতী খাটের উপর পড়ে রয়েছে চোখ বুজে, বাচ্চা মেয়েটা নরম বিছানার আরাম পেয়ে হাত-পা নেড়ে মায়ের পাশে শুয়ে খেলা করছে। এ ঘরটিও চমৎকার' বললুম, কি হয়েছে সংবতীর?

কুছ নেহি দাদাজি। চক্কর লাগা। পেট্রলকা বু বরদাস্ত নেহি কর্ শকতা!

কাংড়ায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন এ-কথার উত্তরে মদনলাল জানালো, পাঁচ মিনিটের বেশী ওরা কাংড়ায় ছিল না, কারণ ওই মোটরবাস স্ট্যাণ্ডে একটু পরেই ওরা বৈজনাথের মোটর বাস পেয়ে গেল। ওরা জ্বালামুখীর মন্দিরের মধ্যেও ঢোকেনি। শুনে অবাক হলুম। কিন্তু মদনলাল আমাকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিল, অত মন্দির-টন্দির দেখতে গেলে ভ্রমণ হয় না।

সংবতী শুয়ে রইলো, মদনলালকে নিয়ে আমি এলুম শ্রীমতী গুপ্তার কাছে। ওকে দেখামাত্রেই তিনি রাগে উত্তেজিত হলেন। উপযুক্ত ভাষায় সম্ভাষণ করে বললেন, তোর পেছনে আমাদের মাথা [illegible] উঠেছে, মনে রাখিস মদনলাল!

উত্তরেই সমস্তক্ষণ, সুতরাং মাস তিন চারের ঘনিষ্ঠতার পর নিকট-সম্ভাষণটা সহজেই আসে। মদনলাল বহিনজীর কাছে একেবারে কাঁচুমাচু। কিন্তু বহিনজীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তার চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নিজের জন্যে। ছেলেটা এত লোকলজ্জা-মানসম্ভ্রমের ধার ধারে না। মায়া দেবী হাসলেন।

প্রশ্ন করলুম, যদি পথঘাট আর মন্দির-দেউল না দেখবে তবে ওই ছেলেমানুষ বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এত এদেশ ওদেশ করছ কেন?

মদনলাল বললে, দাদাজি, ঘোরাঘুরি তো হচ্ছে! 'এক আসলি বাত হ্যায়, শুনিয়ে।'

কি বলো।

সে বললে, হাজার ছয়েক টাকা বাবাকে ঠকিয়ে পেয়েছিলুম—!

বাবাকে ঠকিয়ে! মানে? বাক্স ভেঙেছিলে?

নেহি সাব,—মদনলাল বললে, বাবাকে লুকিয়ে রেশম স্টক করেছিলাম অনেক টাকার। বড়া এক শেঠসে কুছ প্রাইভেট্ খবর মিলা। পিতাজিকো মালুম নেহি থা। —বাস, ঝটসে তেরা হাজার রূপ্যা বিলাক মার্কেটসে নাফা মিল গিয়া! —তখন বাবাকে জানালুম। তিনি হাজার টাকা বকশিস দিতে চাইলেন, আমি বেঁকে বসলুম,—আরো পাঁচ হাজার চাই! উনকো সমঝা দিয়া কি আট হাজার রূপ্যা আপকো ফোকটসে আ গিয়া।

মায়া দেবী হেসেই খুন। শুধু একসময় মন্তব্য করলেন, পাজির পা ঝাড়া! শ্রীনগর

অমরাবতী থেকে সিন্ধু, অরুণ থেকে সপ্ত-কোশী, নীলধারা থেকে নীলগঙ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগঙ্গা, আমার অণুপরমাণু ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যারা তীর্থপথিক, যারা অভিযাত্রী, যারা মুমুক্ষু, যারা আত্মার অভিব্যক্তি লাভের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে চলে এসেছে, যাদের দৃষ্টি চিরবিরহবেদনায় বিষণ্ণ, পরম পিপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেত্রে যারা মানানসই হয়নি,—তাদের জন্য রইলো আমার এই অণুপরমাণু। তারা পদদলিত করে যাবে, এই আমার আনন্দ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ডাক-বাংলার খেলাঘর ফেলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোখ ছিল। ভয় ছিল মনে, পাছে আমার তিলমাত্র বিরক্তি প্রকাশ পায়। ঘরকন্নাটা অস্থায়ী বটে, এবং ওটার আয়ু বড় জোর ছত্রিশ ঘণ্টামাত্র, কিন্তু ওটা বেমানান বলেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলুম বুনো পাথরের গন্ধ, যে-গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগুল্মে আর চীড়-দেওদারের বনে, যেটা মিলিয়ে থাকে গিরি-নদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—সে-গন্ধ ডাকবাংলার ঘরের অজস্র তৈজসপত্রে আর বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে নেই।

ডাক-বাংলাটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সুরুচির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটি ত্রিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীরগঙ্গা এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেল-পথ। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষীরগঙ্গা এবং বাণগঙ্গায়,—তারই জলের ধাক্কায় ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে, লাইন ঝুলেছে উঁচুতে সংকটজনকভাবে,—গাড়ি চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর তার জল-বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য একপ্রকার পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ ধরে এই জল প্রায় আট হাজার ফুট সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজ চলছে সর্বক্ষণ। 'উহল' নামক একটি ভিন্ন-পথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। এক শতদ্রু ভিন্ন হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাড়-পর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যন্ত। কিন্তু এখানেই তার শেষ। মোটর-পথ বরাবর এসেছে [illegible] [illegible] এখানে চারিদিক থেকে ধবলাধারের বিশাল [illegible] [illegible] আমাদের অভ্যস্ত চক্ষু শহর-নগরের স্বাচ্ছন্দ্য পথ, বড় জোর বন-বাগান, নদী-প্রান্তর। কিন্তু এরই মধ্যে একবার বিন্ধ্যাচল, অথবা একবারটি শিলং-দার্জিলিঙ। এখানে সে-রাস্তা নয়, এরা পৃথিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়,—তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই পৌঁছেছে। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুষ জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে,—অসাধ্য এবং দুস্তর বলে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পৌঁছেছে সমুদ্রসমতা থেকে আট

হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটরপথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অবধি,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় সেই সীমানা থেকে আরম্ভ। দার্জিলিঙের ঘুম, হিমাচলের সিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসংকট,—রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়নি।

শীলভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের চেহারা নতুন, নতুন ধরনের সাজ-সজ্জা, নরনারী অতিশয় সুশ্রী,—কিন্তু মুখের কাঠামোতে আসে মঙ্গোলীয় ধরনের ছাপ; এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংসার-যাত্রার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উৎরাই পথে নেমে কুলু উপত্যকায় পৌঁছনো যায়।

বস্তি-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বসতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির — একটি শিব স্থাপনা করে, তারপর পাথরের ঢেলা সরিয়ে নরম মাটি বের করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালকবালিকা সকলের স্বার্থ সমান, সুতরাং কেউ বসে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি খোঁড়ায়; ঝরনা কাছাকাছি পেলে সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে, তারপর ফসল ফলায়। পাহাড়ী ছাগল ওদের মাল বয়; ভেড়ার পাল পোষে—তার লোম কেটে বানায় কম্বলের পোশাক। কিন্তু একটিমাত্র ভয় ওদের মনে জেগে থাকে, সেটি হলো বন্যার ভয়। সমতল ক্ষেত্রে বন্যা প্লাবিত করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলো ঘরকন্না ক্ষেতখামার সব ফেলে ওরা উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন জীবনের শুরু। অদম্য উৎসাহে নরনারী আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যায়।

আজ সন্ধ্যার পরে শীত পড়েছে বেশী। মদনলালের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন মিসেস গুপ্তা,—সারাদিনে উনি নাকি হেঁটেছেন অনেক। সংবতী বুঝি কোন্ রাস্তার ঢালু পথ বেয়ে ক্ষীরগঙ্গায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এসেছে তার ওই পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও। মদনলাল নাকি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে খানসামার হাত থেকে মুরগীর ডিমের অমলেট নিয়ে খেয়েছে। ব্রাহ্মণকন্যা সংবতীর এবার জাত গেল! স্বামী একেবারে নাস্তিক। ও যেন আর কাছে না আসে।

সংবতীর জন্য আমি সংগ্রহ করে আনলুম কলা, রুটি আর মালাই। তাই দেখে কী হাসাহাসি সকলের। ওরা কেউ বিশ্বাস করে না, আমি গার্হস্থ্যধর্মী। তাড়া করে এলেন মিসেস গুপ্তা,—এবার বুঝি কোমর বেঁধে প্রমাণ করবেন যে, আপনারও দয়াধর্ম আছে? কী সৌভাগ্য সংবতীর!

সংবতীও তেমনি। তার হঠাৎ ধারণা হয়ে গেল, আমি একজন অতি শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। সুতরাং সকলের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে এসে আমার সামনেই খেতে বসে গেল। মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে পরিহাসের ঝড় বইতে লাগলো। মদনলাল গিয়েছিল যোগিন্দরনগরের ওদিকে, সেখান থেকে আমার জন্য অতি মূল্যবান এক টিন সিগারেট এনেছিল, এবার সেটি উপহার দিল। সিগারেট নিয়ে সহাস্যে শুধু বললুম, সাবধান করে দিচ্ছি, বৌকে আর জ্বালিয়ো না!

বৈজনাথের আশপাশ ঘুরে এসেছিলুম, কিন্তু রাত্রের দিকে শয়নারতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মদনলাল আর সংবতী ঘরে রইলো ওদের শিশু-কন্যা রতনকে নিয়ে। মিসেস গুপ্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চললো।

মোটর রোড পর্যন্ত যেতে হয় না মাঠের ও-প্রান্তে মন্দির। রাত এখনও নটা বাজেনি, কিন্তু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝুম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সঙ্গেই নিঃসাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলো।

মন্দির দেখে এমন সম্ভ্রমবোধ জাগেনি অনেকদিন। আমি যা খুঁজে বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বজ্রেশ্বরী দেখে এসেছি, কিন্তু তার গাঁথুনির চেহারা অনেকটা আধুনিক, তার সাজসজ্জায় হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেল পাথরের কাজ, এখানে ওখানে রংবাহার,—তাতে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারির। এখানে কিছু পৌঁছয়নি, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহসা চোখে পড়ে না; প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ী,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথরের। রংটা যেন ঘষা পয়সা। পাথরের সঙ্গে পাথরের জোড় আলগা,—ফাটল বেরিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধূপ-ধূনো-চন্দনের গন্ধ নয়, গন্ধটা যেন প্রাগৈতিহাসিক,—যে-গন্ধটা পাথরে-পাথরে, বট-অশ্বত্থের শিকড়ে, আনগ্ন দারিদ্র্যভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনি-জ্বালনে, মুনি-ঋষি-বৈদিকের তপোবনে, চীরবাস ভৈরবের মহিষমর্দিনীর গুহাদেউলে,—যে-গন্ধ বারম্বার পেয়ে এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছু ভালো দেখা যায় না। কিছু অস্পষ্ট, কিছু ছায়াচ্ছন্ন, কিছু বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল উঁচু তার খিলান,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো সজ্জা নেই, অন্নবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনার্থীর সংখ্যা অতি কম। দু-চারজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক, এক আধজন শ্রমিক, দু-একটি ভক্ত। পূজারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভ-মন্দিরে বসে।

স্থানীয় লোক বলে, দু হাজার বছর আগে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মন্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হলো বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক। পূজারী যিনি আরতির আয়োজন করছেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা নাকি তিন শো বছর আগে বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছিলেন।

শ্রীমতী গুপ্তা গিয়ে বসলেন গর্ভ-মন্দিরের দরজার কোণে। তিনি পরেছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ি, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তারা এই পূজারিণীর চেহারাটি দেখলে একটু অবাক হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি শ্রদ্ধায়

এবং অনুরাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শঙ্খ, ধূনার পাত্র, কিছু ফুল এবং প্রদীপ —এই নিয়ে পূজারী আরতি করলেন। ধীরে ধীরে গুরু-গুরু ডম্বরুধ্বনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনার্থী শান্ত, স্তব্ধমুখ। সেই ধ্বনিমহিমা গুরু-গুরু রবে চলে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালয় পেরিয়ে যেন মানব সংসারের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বন্তরীর আশীর্বাদে। ধিকৃত বিকলচিত্ত হিংসাশ্রয়ী বৃহত্তর যে-মানব-সভ্যতা পালব প্রকৃতিকে আজ খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমন্ত্র ডম্বরুধ্বনির সংগে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঙ্গলবার্তা নিয়ে। মানুষের চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্মল হবে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আরতি শেষ হলো, কিংবা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। এমন আত্ম-বিস্মৃতি সচরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহু দূরে কোনও অজ্ঞাতলোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গুপ্তা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট পূজারীটি প্রদীপের পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের মাথায় অগ্নির তাপ বিতরণ করছেন। নত-মস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই তাপ। শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর আঁচলের গেরো খুলে যা কিছু সংগে এনেছিলেন, সবই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর চোখে মুখে যেন দীপ্তি ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মানুষ। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেড়াতে হয়। চলতিকাল নিত্যই তার পাওনা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সংগে চলতে হচ্ছে, নিত্য নতুনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানান-সই করছি। হাসিমুখে কথা বলছি তার সংগে, যাকে একেবারেই পছন্দ করিনে; দুঃখ জানাচ্ছি তার কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। জয়গান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে-অপদার্থ; তোষামোদ করছি তার, যাকে কুচক্রী বলে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সংগে, যার লোভ এবং আসক্তি সর্বিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,— উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। কুরুচি এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ঢাকা। অহংকার এবং আত্মাভিমানে জরো-জরো,—উপরে মিষ্ট মুখের পালিশ। যথার্থ পরিচয়কে লুকিয়ে রেখেছে সংগোপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারি-পার্শ্বিককে। একটু স্নেহ, একটু অনুরাগ, একটু রঙগীন কটাক্ষ,—এই সব ছোট ছোট উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহ-প্রার্থীদেরকে, চাতুরীর দ্বারা কার্য হাসিল করছে; কিন্তু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে-যত আত্মগোপনশীল, সে নাকি ততই সামাজিক; যার প্রতারণা যত নিখুঁত, সে নাকি ততই বুদ্ধিমতী। তথা-কথিত সভাসমাজে সরলতা, সাধুতা, আড়ম্বরহীনতা, নিস্পৃহতা,—এরা পরি-হাসের বস্তু। শ্রদ্ধা, অনুরাগ, স্নেহ, ভাল-বাসা,—এদের বাজার-দর নেই। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য,—এরা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে, তাকে আমরা বলি বাতুল। সে আমাদের হাসি এবং উপেক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে!

ফিরবার পথে শ্রীমতী গুপ্তা অভিভূতের মতো চলছিলেন। চৌকিদার যথারীতি আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে। তিনি এক সময়ে বললেন, এমনভাবে কোনও মন্দির কোনও দিন দেখিনি। ওঁর কাছে আজ রাত্রেই আমি চিঠি দেবো।

জবাব দিলুম না। সাড়া না পেয়ে মায়াদেবী আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কেমন লাগলো?

এবার আর চুপ করে থাকা চলে না। বললুম, আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন, আপনার ভালো লেগেছে, এই আমার আনন্দ!

আমরা ডাক-বাংলার বারান্দায় এসে উঠলুম। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি আমাদের মুখে-চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা।

মদনলাল এবং সংবতী ওদের বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশ-বিভুঁয়ে দরজাটা বন্ধ করে শোয়নি। মদনলালের পাশেই আমার খাটিয়া পড়েছে। ক্লান্তি ছিল অনেক, সেজন্য আর কোনোদিকে না তাকিয়ে খাটিয়ায় উঠে কম্বল মুড়ি দিলুম। আলোটা হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে মায়া চলে গেলেন পার্টিশনের ওদিকে, সংবতীর খাটিয়ার পাশে। বুঝতে পারা গেল তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। বৈজনাথ দর্শন করে তাঁর উদ্দীপনা বেড়ে গেছে।

কখন বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারায়, বুঝতে পারিনি। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মায়া প্রস্তুত হচ্ছেন এবং আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝতে পারা যাচ্ছে মদনলাল এবং সংবতী এখানে দু-চার দিন থেকে যেতে চায়। মুখ তুলে এক সময়ে মদনলাল মায়া দেবীকে উদ্দেশ করে বললে, যাগেগা ত যায়েগা, ক্যা হ্যায়? আরে, পাঁড়েজী চা পিয়ো ত সহি! এৎনা বারিষমে ক্যা,—মরনে কো জিনে যাতা হ্যায়?

চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া—বকবক করিসনে! —মায়া দেবী তাকে ধমক দিলেন।

জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। চৌকিদারের কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জুটে গেল। এখানে মদনলাল তার বউকে নিয়ে রইলো। আগামীকাল ওরা যাবে মণ্ডী, সেখান থেকে কুলু। যদি ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। এর পর পা ছোঁওয়া, প্রণাম, কটূক্তি বিনি-ময়ের দ্বারা মায়া দেবীর সংগে ওদের সহাস্য বিদায়-সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলুম। সংবতী তার স্বভাব-মধুর আলাপের দ্বারা বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একটু, কিন্তু পড়ছে। ছাতা-বর্ষাতি কোনোটাই আমাদের নেই। ঠাণ্ডা পড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকাল সাড়ে ছ'টা, সাতটায় মোটর বাস ছাড়বে। সুতরাং মদনলালের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হলো। চৌকিদার এবং কুলি দুজন সংগে চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাপড়ার পাশ কাটিয়ে যখন বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলুম, তখন গাড়ি ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকি। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম।

(ক্রমশ)

॥ আঠারো ॥

ঘরের মধ্যে একটা মণিপুরী পুলিস গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। গ্যাসজ্বলা তীব্র দুর্গন্ধ সারা ঘরখানায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

বসওয়েল তাকালো ম্যাকেঞ্জীর দিকে; "কী মনে হয় ফাদার?"

"কীসের কী?" ম্যাকেঞ্জীর দুচোখে রীতিমত কৌতূহল।

"এই যে ব্যাপারটা! দেখলেন তো, প্লেনসম্যানদের পাহাড়ীরা দেখতে পারে না; ঐ যে স্ট্যাটাজি বলে গেল।" একটু থামলো বসওয়েল। তারপর অতিকায় মুখখানাকে ম্যাকেঞ্জীর কানের ওপর ঝুলিয়ে দিল, "খবরদার, ভুল করেও পাহাড়ীদের গায়ে আমাদের ব্রিটিশারদের হাত তোলা চলবে না। যদি ঠেঙাতে হয়, তবে এই প্লেনসম্যানদের দিয়েই ঐ অপ্রিয় কাজটি করতে হবে।"

নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ম্যাকেঞ্জী। একেবারেই নিরুত্তর সে।

বসওয়েলের ভয়াল মুখখানা নানা রঙের কৌতুক নেচে গেল; "এটা ডিপ্লোম্যাসি! পোলিটিকস্! প্লেনম্যানদের সংগে ঐ হিলি হিদেনগুলোর য়ুনিয়ন হলেই মুশকিল। রাজ্যপাট মাথায় উঠে যাবে। সময়মত প্লেনস্ আর হিলসের মধ্যে একটা ফিউড বাধিয়ে রাখতে হবে।"

"ব্রিলিয়্যান্ট! সত্যি, এটা আমার মনে স্ট্রাইক্ করে নি তো!" ম্যাকেঞ্জীর দুচোখ থেকে বিন্দু বিন্দু শ্রদ্ধা ঝরতে লাগলো।

আর আইভরি পাইপের মধ্যে সুরভিত তামাক পুরতে লাগলো বসওয়েল। নির্বাক মনোযোগে। নির্বিকার গাম্ভীর্যে। শুধু একটি আত্মপ্রসাদের হাসি তার সারা মুখে তির্যক রেখায় ফুটে বেরুলো।

সহসা ম্যাকেঞ্জী বললো, "একটা বড় মুশকিল হয়েছে পিয়ার্সনকে নিয়ে। তলে তলে ও এই পাহাড়ীদের সিমপ্যাথাইজ করে। প্রীচিংএর বিরুদ্ধে কথা বলে।"

"তাই না কী? আচ্ছা; সব দেখা যাবে।" তির্যক রেখায় যে হাসিটা ফুটে বেরিয়েছিল বসওয়েলের মুখে, সেটা প্লেটের লেখার মত মুছে গেল; "একটু ওয়াচ—"

আরও কিছু বলতো বসওয়েল; তার আগেই কনতিনেক নাগা সর্দার ঘরের মধ্যে চলে এলো। হাতের থাবায় বর্শা, মাথায় সেন্টসঙের শিঙের মুকুট; সারা গায়ে দড়ির কেপ জড়ানো; গলায় সাপের মুণ্ডমালা।

বসওয়েল গদগদ গলায় অভ্যর্থনা জানালো, "এসো সর্দারেরা। তারপর খবর কী!"

তিনজনেই একসংগে বিদীর্ণ হলো, "না, না, আমরা পারবো না। এই দেখ্, গাইডিলিওকে ডাইনী বলতে গিয়েছিলাম সিকুয়ামাক বস্তীতে। আমাদের বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে দিয়েছে।"

একজন পিঠ দেখালো। একজন বাহুসন্ধি। আর একজন কণ্ঠাস্থি। বর্শার ফলায় তিনজনের দেহে রক্তলেখা ফুটে বেরিয়েছে। স্তবকে স্তবকে। টৌমুটু-ঘোটাঙ্ ফুলের মত।

"এই নে তোর টাকা। গাইডিলিওকে ডাইনী বলতে গিয়ে শেষে জান দেবো না কী? বস্তীর লোকেরা সব ক্ষেপে রয়েছে।" তিনজনেই কোমরের তক্মার গ্রন্থি থেকে একরাশ রুপোলী টাকা ঝনঝন করে ওক্ কাঠের পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিল।

নীচের অসমান দাঁতের পাটিটার ওপর ওপরের পাটিটা নেমে এলো বসওয়েলের। উদ্ধত চোয়ালে চোয়ালে নির্মম প্রতিজ্ঞা ফুঁড়ে বেরুলো। চোখ দুটো দাবাগ্নির মতো ধক্ ধক্ করছে তার।

আচমকা পাশের ঘরে পাহাড়-ফাটানো আর্তনাদ উঠলো, "আউ—উ—উ—।"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জির দলনমলন শুরু হয়েছে। এই হলো আদিপর্ব। চমকে উঠলো তিনজন পাহাড়ী সর্দার: "কী হলো রে সাহেব? কাকে মারছে?"

সহসা বসওয়েলের দুচোখের পিঙ্গল মণিতে কুটিল একটা ছায়া খেলে গেল। কপালের ওপর কয়েকটা জটিল রেখার হিজিবিজি ভেসে উঠলো। পাকা অভিনেতার মত মুখখানা তিনটি সর্দারের মধ্যে নামিয়ে আনলো সে। তারপর ফিস্ ফিস্ গলায় বললো; "আসানুরা (সমতলের লোক) পাহাড়ীদের মারছে।"

"কেন?" গর্জে উঠলো পাহাড়ী সর্দারেরা; "একেবারে সাবাড় করে ফেলবো না।"

"আরে চুপ চুপ! বেশী চেঁচামেচি করিস না। আসানুরা (সমতলের লোক) ভারী শয়তান। বন্দুক আছে ওদের; এক গুলীতে একেবারে খতম করে ফেলবে।" কণ্ঠে আতংকের শেষ বিন্দু রঙ ঢেলে দিল বসওয়েল।

বন্দুকের মহিমা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এই পাহাড়ী সর্দারেরা। কয়েক-

দিন আগেই তারা দেখেছে, কেমন করে একটা মণিপুরী পুলিস অতিকায় দুটো ময়াল সাপকে গুলী মেরে খতম করেছে। অতএব, অতএব একেবারেই নিভে গেল তিনজন বন্য সর্দার। রুদ্ধ গলায় তারা বললে; "তুই ওই আসানুদের (সমতলের লোক) ভাগিয়ে দে। ওরা ভারী শয়তান। এই যে বন্দুক দিয়ে আমাদের মারবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাগিয়ে দেবো। তা হলে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"যা বলেছি। ঐ গাইডিলিওর নামে বস্তীতে বস্তীতে ডাইনী বলে আসবে।" বসওয়েলের কথা শেষ হবার আগেই পাশের ঘরের আর্তনাদটা তুমুল হয়ে উঠলো। কীল, চড় আর ঘুষির সংগে তাল লয় মিলিয়ে মিলিয়ে ব্যাটনের আঘাত অবিশ্রাম হয়ে উঠেছে। মাঝখানে প্ল্যাস্টারের দেওয়াল। সেটা যেন আঘাতের আওয়াজে আর আর্তনাদে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

এ-ঘরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তিনটি পাহাড়ী সর্দার; "আসানুরা (সমতলের লোক) মারছে কেন?"

"গাইডিলিওকে ওই পাহাড়ীরা ডাইনী বলেনি, তাই মারছে। শিগগীর টাকা নিয়ে বস্তীতে বস্তীতে গাইডিলিওর নামে ডাইনী বলে এসো। নইলে আসানুরা রেহাই রাখবে না। ওরা কিন্তু আনিজার মত শয়তান।" এবার বেতের কেদারা থেকে পাহাড়ী সর্দারদের মধ্যে নেমে এলো বসওয়েল। নিবিড় অন্তরঙ্গতায় বললো; "আরো টাকা দেবো।"

ক্রিয়া হলো। কাঠের পাটাতন থেকে টাকাগুলো তুলে আবার কোমরের গোপন গ্রন্থিতে চালান করে দিল সর্দারেরা। তারপর উঠতে উঠতে বললো, "আমরা এবার যাই। তুই কিন্তু হই বন্দুকওলা আসানুদের আমাদের পাহাড় থেকে ভাগিয়ে দিবি। নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।"

নিজের গৌরবে এবার লাফিয়ে উঠলো বসওয়েল; "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ব্রাদার-ইন-ল'দের সব ভাগিয়ে দেবো পাহাড় থেকে। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।"

বাইরে অজগরের দেহের মত কোহিমার আঁকাবাঁকা পথ। সেই পথে রাত্রির অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল তিনটি পাহাড়ী সর্দার। শয়তানের তিনটি শিকার।

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। কোহিমার পাহাড়ে রাত্রি এখন গভীর হয়েছে, নিবিড় হয়ে এসেছে অন্ধকার।

গ্যাসের আলোটা জ্বলছে শিখাময় হয়ে। কটুঘ্রাণ দুর্গন্ধটা উগ্র হয়ে উঠছে, প্রখর হচ্ছে।

তিনটি পাহাড়ী সর্দার অনেকক্ষণ আগে নেমে গিয়েছে কোহিমার পথে। পাদ্রী ম্যাকাঞ্জীও বিদায় জানিয়ে চার্চের চ্যাপেলে চলে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে একটি মানুষও আর নেই। সামনের প্রসারিত চেয়ারটার ওপর মাথা রেখে বসে রয়েছে বসওয়েল। একেবারেই নিশ্চল, একেবারেই নিথর। সমাধিস্থ। এতক্ষণ পাশের ঘরে পাহাড়ী কণ্ঠের আর্তনাদ আর আঘাতের শব্দ মিলিয়ে আবহ বাজনার মত মনে হচ্ছিল বসওয়েলের। নেশার মত মনোরম এক আনন্দে সেই আবহ বাজনা তার সারাটা চেতনায় ঘনিয়ে এসেছিল।

এখন আর পাশের ঘর থেকে প্ল্যাস্টারের দেওয়াল বিদীর্ণ করে একটি শব্দও আসছে না এদিকে। শুধু গ্যাসের আলোর

"ঠিক।" রাণী গাইডিলিওর দু'চোখে ...খণ্ড নীলা জ্বলছে। কিন্তু কণ্ঠ কী ...াশ্চর্য শান্ত, কী মধুবর্ষী: "আমি অনেক ...ভবে দেখেছি, আমাদের এই পাহাড় থেকে ...াহেবদের হটিয়ে দিতে হবে। ওরা এসে ...ার করে খৃষ্টান করছে, আমাদের ধর্ম ...ট করছে। আসামীদের সংগে আমাদের ...গড়া বাধিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ে এসব ...সবে না।"

"ঠিক, ঠিক কথা।" অনেকগুলো কণ্ঠে ...পথ বাজলো; "আমাদের নাগা পাহাড়ে ...ন্তত একটি সাহেবকেও থাকতে ...দবো না।"

গাইডিলিও বললেন, "একা একা এ কাজ ...রা সম্ভব নয়। তাছাড়া মারামারি করে ওদের আমরা তাড়াবো না। আমাদের পথ হবে গান্ধীজীর মত অহিংস। এর জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরে সব মানুষকে বোঝাতে হবে। এক করতে হবে।"

"ঠিক, ঠিক।"

"আপনারাও তো শিলং-গোহাটির ছাত্র। সেখানকার খবর কী?" বাঁ পাশের যুবক-দের দিকে তাকালেন গাইডিলিও।

"গোপীনাথ বড়দলৈ, রোহিনী চৌধুরীর লিডারশিপে আসামীরাও নন-কো-অপারেশন শুরু করেছে।" একটি যুবক বললো।

"দেখুন, আমাদেরও পাহাড়ী মানুষদের সংগঠন করতে হবে। সাহেবরা, পাদ্রীরা অনেককে টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করে ফেলেছে। সে যা হোক; আমাদের অনেক অসুবিধা। অনেক দূরের পাহাড়ীরা, যারা কোনদিন শহর দেখেনি, যেখানে এখনও মাথা-কাটারা রয়েছে, তাদেরও বোঝাতে হবে। তার জন্য আপনাদেরও প্রচুর ভার নিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

লিকোক্যুঙবা বললো, "আমি লোহটা নাগা। আমাদের বস্তীতে ফিরে গিয়ে সাহেবদের মতলবের কথা বলবো। গান্ধীজীর কথা বলবো। বস্তীর লোকেরা বড় সরল, ওদের বুঝিয়ে দিলে ঠিকই বুঝবে।"

আর একজন বললো, "আমি অংগামী নাগা, আমাদের বস্তীতেও একথা বলবো।"

ডান দিক থেকে আর একটি কণ্ঠ ফুটে বেরুলো: "আমি সাঙটাম, আমাদের পাহাড়ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না। কালই আমি রওনা হবো।"

"আমরাও, আমরাও—" অনেকগুলো গলার স্বর বেজে উঠলো।

আও, সাঙটাম, কোনিয়াক, অংগা রেঙমা, লোহটা সেমা। নাগা পাহাড়ের দিগদিগন্ত থেকে প্রদীপ্ত তারুণ্য এই টৌঘটুঘোটাঙ পাতার ঘরে এসে সমবেত হয়েছে। কেউ কলকাতা থেকে, কেউ শিলং-গোহাটি থেকে এক অপূর্ব প্রতিজ্ঞার অগ্নিকণা বুকে বুকে ধরে নিয়ে এসেছে, ধরে এনেছে এক বীর্যবান শপথ। সেই শপথের নাম গান্ধীজী। সেই প্রতিজ্ঞার নাম অসহযোগ। সেই শপথকে নাগা পাহাড়ের গুহায়-কন্দরে, মালভূমি আর উপত্যকায় দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে দেবে তারা।

আচমকা টৌঘুটুঘোটাঙ পাতার ঘর-খানায় এসে ঢুকলো জনকয়েক কিম্ভূত মূর্তি। কার্পাস দড়ির লেপে সারা দেহ জড়ানো। মাথার সামনে ঘোমটার মত ঢাকনা। সব পাহাড়ী গ্রামের সর্দার। হাতের অতিকায় বর্শার ফলকে মশালের আলো ঝলক দিয়ে উঠলো।

কলশব্দ হয়ে উঠলো পাহাড়ী সর্দারেরা; "বুঝলি রাণী, ঐ শয়তান ফাদারেরা আর পুলিসেরা আমাদের টাকা দিতে চায়। বস্তীতে বস্তীতে তোর নামে ডাইনী বলতে বলে। তা আমরা কেন বেইমানী করবো। আমার ছেলে তোর ছোঁয়ায় ভালো হলো। কী ব্যারাম যে হয়েছিল, তামুন্যু (চিকিৎসক) তো বললে, আনিজাতে পেয়েছে।"

আর একটি গলা ফুটলো, "তোকে ডাইনী বলতে বলে। মনে হলো, বর্শা দিয়ে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলি।"

"না, না।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন গাইডিলিও, "খবরদার মারামারি করবে না। ওরা মারলেও মারবে না।"

"কী বলছিস তুই? মারলে তার শোধ নেবো না! এ কেমন তাজ্জবের কথা।" অসহায় গলায় একটি সর্দার বললো।

"না।" সুকুমার একটি মুখ। সেই মুখের চারপাশে অপরূপ এক জ্যোতি-লেখা। সুঠাম মুখখানার নেপথ্যে কোথায় যেন একটা বজ্র লুকিয়ে রয়েছে, লুকিয়ে আছে একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি, মণিপুরী আবরণের আড়ালে ছোট্ট একটি প্রাণকণা টগবগ করে ফুটছে যেন গাইডি-লিওর, "আমি সব বুঝি, সব জানি। তবুও ওদের গায়ে আমরা হাত তুলবো না। আর শোনো, বস্তীর লোকদের বলে দেবে ফাদারেরা ক্রশ আঁকতে বললে যেন না আঁকে। তা হলে আমাদের আনিজা গোসা হবে। আর ঐ সাহেবদের কাছ থেকে কোন কিছু যেন মাগনা না নেয়।"

"কেন?"

"ওরা ভিক্ষে দেয়। তারপর আমাদের মনটাকে কিনে ফেলে। আমাদের ভিখিরী বানায় তারপর একটু একটু করে খৃষ্টান করে ওদের রাজ্য বড় করে।" শাণিত বল্লমের মত গলাটা ঝকমক করে উঠলো গাইডিলিওর, "খাসিয়াদের করেছে, মিকির-দের করেছে, গারোদের করেছে, তারপর এসেছে নাগাপাহাড়ে।"

পেন্যু কাঠের মশাল থেকে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে আঁখিপক্ষ্মের ওপর। সমস্ত মুখখানায় কানায় কানায় পাহাড়ী নদীর মত দুর্বার কৌমার্য উদ্বেল হয়ে রয়েছে। বছর ষোল বয়স; এখনও গাইডিলিওর দেহমন থেকে কিশোরী কালের আভাষ একেবারেই মুছে যায় নি। উদ্ভিন্ন কোরক যৌবন। তবু তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের মণিতে দুটি জ্বলন্ত পরকলায় দৃষ্টি যেন ধাঁধিয়ে যায়। বার বার তাঁর দিকে তাকিয়ে তরুণ ছেলেরা দৃষ্টিকে ঘুরপাক দিয়ে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নির্বোধ চোখে পাহাড়ী সর্দারেরা তাকিয়ে রয়েছে রাণী গাইডিলিওর দিকে।

তার একটু আগের কথাগুলি তারা ঠিকমত ধরতে পারছে না। চেতনার ওপর একটা বিচিত্র ছায়া ফেলেই তারা পলাতক হচ্ছে।

গাইডিলিও বললেন, "বুঝতে পারছো না। আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ফাদারদের কাছ থেকে নিমক নাও। তার বদলে টেশঙের ছাল, মেনজোর দাঁত, সেণ্টসঙের শিঙ দাও?"

"না, না। তার বদলে কিছু নেয় না ফাদারেরা।"

"মাগনা নাও কেন নিমক?"

"মাগনা কোথায়? ওরা যা বলে তাই করি। ক্রুশ আঁকি, যীশু-মেরীর নাম করি।"

"ওসব করবে না। ওসব ওদের ধর্ম, ওদের গেন্না। তাতে আমাদের আনিজারা রাগ করবে। বুঝলে?"

"ওদের গেন্না আমাদের দিয়ে করাচ্ছে? একেবারে ফুঁড়ে ফেলবো না! এবার আমাদের বস্তীতে ঢুকলে একেবারে সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে—" উত্তেজনায় কপিশ রঙের চোখ দুটো যেন ছিটকে পড়বে পাহাড়ী সর্দারের। এমন মনে হলো।

"না, খবরদার মারবে না। বস্তীতে গিয়ে বলবে কেউ যেন ঐ ক্রুশ আঁকা আর যীশুমেরীর নামের বদলে নিমক, পী (কাপড়) কী টাকা না নেয়। ওরা অনেক, অনেকদূর থেকে আমাদের দেশে এসেছে। এসেই একেবারে সর্দার হতে চায়।"

"না, না। ওসব হবে না।"

"ঠিক বলেছ। এমনি থাকতে চাও থাকো। নইলে সর্দারি করতে গেলে ভাগাতে হবে। এখন যেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, তাতে ভাগাতেই হবে।" এক মুহূর্তে কী যেন ভাবলেন গাইডিলিও, তারপর বললেন, "শোনো সর্দারেরা, দরকার হলে তোমাদের বস্তীতে যাবো। থাকবার বন্দোবস্ত করবে তো?"

"তুই যাবি! তুই গেলে নতুন ঘর করে দেবো। নাচ দেখাবো, গান শোনাবো। আর বস্তীর যত ব্যারামী মানুষ আছে, তাদের একবার খালি ছুঁয়ে দিবি। সব রোগ চলে যাবে। তুই যাবি তো?" পাহাড়ী সর্দারেরা কলরব করে উঠলো।

"যাবো, যাবো।" মধুর হাসিতে মুখখানা আভাসিত হয়ে উঠলো গাইডিলিওর।

সহসা সামনের মাচান থেকে লিকোক্যাঙবা বললো, "কী ব্যাপার? ওদের বস্তীতে যাবেন না কি?"

"কখন কাদের বস্তীতে যেতে হয়, তার কী ঠিকঠিকানা আছে? ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য আন্দোলন হবে। তারা কী সহজে ছেড়ে দেবে। আটক করবে, আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।"

"তা ঠিক।"

"পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে দেশের মানুষদের যদি খানিকটা বুঝিয়ে যেতে পারি, তবুও কাজ হবে। ধরুন, আমি, আপনি আরো পাঁচজন হয়ত ধরা পড়লাম। তার সঙ্গে সঙ্গে কী স্বাধীনতার আন্দোলন মরে যাবে। তা হয় না। আমরাও সমস্ত ভারতেরই একটা অংশ। স্বাধীনতার জন্যে সবাই যখন অহিংসা দিয়ে লড়াই করছে, তখন আমাদের এই নাগা পাহাড় পিছিয়ে থাকবে কেন?"

"ঠিক, ঠিক।" সকলে মাথা নাড়লো।

টঘুটুঘোটাঙ পাতায় ছাওয়া ছোট্ট এই ঘরের আয়তনে এখনও গাইডিলিওর কথাগুলি রিমঝিম রেশের মত বেজে চলেছে। বৈদেহী কয়েকটি শব্দ। অথচ কী শরীরময়। যেন বাঁশের দেওয়ালে দেওয়ালে, পাটাতনের ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলি ধনুকের মত টঙ্কার দিয়ে চলেছে।

কেউ কিছু বলার আগেই ঘটলো ঘটনাটা।

পাঁচ-ছজন পাহাড়ী মানুষ দুটি নিশ্চেতন নরদেহকে পাটাতনের ওপর এনে শুইয়ে দিল।

বাইরের উপত্যকায় আর অরণ্যে, মাওএর দিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পথে নুস্‌ কেহেঙ মাসের রাত্রি নিবিড় হয়ে ঝরছে। থরে বিথরে। আকাশে বিবর্ণ নক্ষত্রের সভায় একটা কদর্য আঁচড়ের মত ফুটে বেরিয়েছে সপ্তর্ষি। ফুটে বেরিয়েছে আনিজা উইঁথু।

গাইডিলিও তাকালেন পাহাড়ী মানুষ কজনের দিকে, "কী ব্যাপার জদোনাঙ আটসা (দাদা)! এরা কারা?"

জদোনাঙ বললো, "জানি না, কোহিমার পথে পড়েছিল। মানুষ দুটো ঠাণ্ডায় একেবারে হিম হয়ে গেছে। আর জ্ঞানও নেই।"

বাঁশের মাচান থেকে তীরের মত নেমে এলেন গাইডিলিও, "পাটাতনে কেন? মাচানে বিছানা করে শুইয়ে দাও। আমি স্যাক দেবার ব্যবস্থা করি।"

পেন্যু কাঠের মশালের আলো এসে পড়েছে নরদেহ দুটির ওপর। স্তবকে স্তবকে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে সে দেহে। আর আঁকা রয়েছে নানা আকৃতির সব নির্মম ক্ষতরেখা। নারকীয় উল্লাসে দুটি শরীরে বীভৎস শিল্পকলা ফুটিয়ে তুলতে এতটুকু কসুর হয় নি।

অপলক তাকিয়ে আছেন গাইডিলিও। এতক্ষণ যে চোখ দুটি তার জ্বলছিল, এখন সে চোখ দুটি প্লাবিত করে একটি করুণ বন্যা নেমে এসেছে। আবছায়া গলায় তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এদের কেউ মেরেছে।"

জদোনাঙ মাথা দোলালো, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। মানুষ দুটো ঐ কোহিমার থানার কাছেই পড়েছিল। পায়ে ঠেকতে তুলে নিয়ে এলাম।" (ক্রমশ)

॥ ৩ ॥

যুদ্ধে যোগ দেবার ইচ্ছা শ্যামের রাবরের। বিপ্লব সম্বন্ধে তার ছেলেবেলাকার রোমান্টিক ধারণা আর নেই। জোর করে বিপ্লব তৈরী করা যায় না, বোমা ছুঁড়ে সমাজের পুরোনো ভিত্ ভেঙে নতুন ভিত্ গড়া যায় না; লোক জাগলে, অবস্থা অনুকূলে না হলে সমাজে বিপ্লব ঘটে না, এসব কথা ঠিক। কিন্তু যখন অবস্থা অনুকূলে হবে, তখন কী হবে এই দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট হয়ে শ্যাম প্রায়ই ভাবত, যুদ্ধ যখন একটা হচ্ছে তখন এই সুযোগে যুদ্ধবিদ্যাটা শিখে নেওয়া উচিত।

তাছাড়া, যুদ্ধে যাওয়া মানেই বিদেশে যাওয়া। একবার দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়তো চীনে যাওয়ারও একটা রাস্তা মিলে যাবে। এও একটা কথা।

বহুদিন শ্যামের এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথে প্রধান বাধা ছিল পার্টির বারণ। '৪১ সালের শেষভাগে জাপান যেন তার দিগ্বিজয় শুরু করল, তখন অনুমতি পাওয়া গেল।

শ্যামের চরিত্রে রাজনীতির স্পর্শ ছিল, অতএব সদর দরজা দিয়ে সৈন্যদলে ঢোকা শক্ত হত। কিন্তু শ্যাম চৌধুরীবংশের ছেলে। অতএব একটু তদ্বিরেই নিচের তলকার পুলিসের আপত্তি উপরওয়ালাদের হস্তক্ষেপে চাপা পড়ে গেল।

আর দিনকালও ছিল যাকে খুলোদের ভাষায় বলে 'বেকায়দার'। ব্রিটেনের দুখানা সেরা জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আর 'রিপালস্'—যে জাহাজ নাকি ডোবানো অসম্ভব, নামজাদা অভিজ্ঞদের মতে—সিঙ্গাপুরে জাপানী বিমান অবলীলাক্রমে সেই দুখানা জাহাজ ডুবিয়ে দিলে। তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যত ক্ষতি হল সিঙ্গাপুরে, তার চার ডবল মর্যাদাহানি হলে ডালহৌসী স্কোয়ারে। সরকারী দপ্তরে দপ্তরে কেরানীরা গোল্ড হয়ে খবরের কাগজের ম্যাপে ফুট ইঁচি মেপে হিসেব করতে লাগল শেষের আর কত বাকী। আজ গেল হংকং কাল সিঙ্গাপুর। থাইল্যাণ্ড ওলটালো, যায় বুঝি বর্মা। কেরানীরা উচ্চৈঃস্বরে বলাবলি করতে লাগল, "ও জানা পালাবে তো দিয়াছে, এখন দেখ যাতে সাইনেটা ঢুকিয়ে দিয়ে পালায়, এইবার শ্যাল কুকুরের মত না খেয়ে মরতে হবে যদ্দিন জাপানীরা না আসে।"

অতএব, এমন অবস্থাতেও যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিতে চায়, সামান্য চরিত্র-দোষের জন্য তাদের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার পথে বাধা দেওয়া সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। শ্যাম ঢুকে গেল।

শ্যামের রণবেশ দেখে মেজদি হেসে আকুল। বললেন, "ওদের বাড়ীতে আয়না নেই বুঝি? যা তুমার ঘরে গিয়ে বড় আয়নায় দেখে আয় কী সঙ সেজেছিস। একেবারে তালপাতার সেপাই। তোকে দেখলে কাঠের মত দুখানা পায়ে জাহাজের মত দুখানা বুট—হাসতে হাসতে জাপানীদের পেটে খিল ধরে যাবে!"

মেজদির হাসিতে একটুও না দমে শ্যাম গট গট করে ট্রেনিং ক্যাম্পে চলে গেল।

প্রথম দফা ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে শ্যাম তার অফিসারকে বললে, সে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চায়। অফিসারটি ছিল শ্যামের মনের মত মানুষ—যারা শিখতে চায় তাদের জী-জান দিয়ে শেখায়। শ্যামের আগ্রহ দেখে অফিসার তাকে শুধু রাইফেল চালানো, সঙ্গীন-যুদ্ধ, গ্রেনেড ছোঁড়া নয়, এমন অনেক বস্তু শিখিয়ে দিয়েছিল যেগুলো কেবল বাছা বাছা এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী সৈন্যদেরই শেখানো হয়—যেমন বিনা-অস্ত্রে যুদ্ধ।

শ্যামের কথা শুনে অফিসার বললে, "উঁ? যুদ্ধক্ষেত্রে? আমার ইচ্ছে ছিল আরও একটা জিনিস তোমাকে শেখাবার বন্দোবস্ত করে দিই। সেটা না শিখেই যাবে?"

শ্যাম জিজ্ঞেস করল, সে জিনিস কী।

অফিসার বললে, "প্যারা-ট্রেনিং, উড়োজাহাজ থেকে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়বার কলাকৌশল। জিনিসটা খুব চলছে আজকাল। প্রথমে ওটা চালু হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে। এখন জার্মানরাও ওটা ঘন ঘন ব্যবহার করছে। আমরাও আরম্ভ করেছি সম্প্রতি। তুমি রাজী আছ ও ট্রেনিং নিতে?"

শ্যাম বললে, "রাজি।"

আরম্ভ হয়ে গেল শ্যামের প্যারাশুট ট্রেনিং। এর অফিসারটি ছিল ছিটগ্রস্ত। অনিশ্চিত [illegible] কোনটা কাজের কথা আর কোনটা বাজে, তা কেউ চট্ করে বুঝতে পারত না। ট্রেনিংটা ছিল বেশ একটু গোপন, কিন্তু অফিসারের প্রকৃতি ছিল এমন বাচাল যে, সে ফিস্ ফিস্ করে কথা বললেও দশ গজ দূরে থেকে তার কথা স্পষ্ট শোনা যেত।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি লোকদের [illegible]। [illegible] নাম চার্লি। আপনাদের ট্রেনিং শুরু হল। প্যারাশুট কিছুই নয় খুবই সহজ, শুধু [illegible] জিনিস সড়গড় করে নিতে হবে। আমি এই যুদ্ধে বাইশবার লাফিয়েছি—এই অধম চার্লি। তা হলেই বুঝেছেন এ কাজে বুদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই।

"লোকে বলে আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই আমি বেপরোয়া। বাজে কথা। আর বউএরই বা কী দোষ বলুন? যেদিন আমার বিয়ে হল, লাগল যুদ্ধ তার পরদিনই। লণ্ডনে যেদিন বোমা পড়ল, বোমা পড়লো তো পড়লো আমারই বাড়ীতে। যাবতীয় আসবাবপত্র, বউএর কাপড়, আমার বেসামরিক পোশাক, মায় আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট শুদ্ধ জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল। বউ গিয়েছিল কারখানায় কাজ করতে, তাই প্রাণে বেঁচে গেল। গেল সে আমার পিসীর বাড়ি, সাতদিনের মধ্যে সে-বাড়িও উড়ে গেল। বলুন সে করে কী?

"থাক সে কথা। আমি বলছিলাম, বিষয়টি খুবই সহজ। একখানা খাসা [illegible] আমি আপনাদের শিখিয়ে দেব—তারই হালে তাবৎ কাজ করবেন। লাফিয়ে পড়বার সময় পদ্য আওড়াতে শুরু করবেন, যেমনি প্রথম লাইনটি শেষ হবে, অমনি রামদড়িখানা টেনে দেবেন—সব কলকাঠি ওই দড়ির মধ্যে। এক লহমার মধ্যে প্যারাশুটটি খুলে গিয়ে আপনার মাথার উপর সাক্ষাৎ [illegible] মত বিরাজ করবে—অবতরণে কোন কষ্ট হবে না। অবশ্য যদি প্যারাশুটটার তৈরীতে কোন খুঁত থাকে, তাহলে—

"তারপর একখানা গড়াগড়ি, মা ধরিত্রীর বুকে। এইটুকুই তো কথা, আবার কী?"

শ্যাম লাফাল, একবার, দুবার, তিনবার। তারিফ পেল, পিঠচাপড়ানি খেল, কিন্তু মনে হল সত্যি প্রশংসা তার প্রাপ্য নয়। হাত-পা তার প্রতিবারই কলের মত কাজ করে গেল, কিন্তু বিষয়টি যে সহজ, এ অনুভূতি তার কোনবারই হল না। একদিন সে খুলে বললে একথা তার অফিসারকে।

চার্লি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "তাও কি হয়? মুখে বলি কথা, কিন্তু মন কি অত সহজে মানে? আমি বাইশবার লাফিয়েছি, বাইশটিবার আমার মনে হয়েছে, 'এবারে আর নিস্তার নেই!' নিস্তার যে পেয়েছি, তার কারণ আমার মন নয়, হাত-পা কলের মত কাজ করে গেছে তাই বেঁচেছি। আমি দেখেছি লক্ষ্য করে—তোমারও হাত-পা ভাবে না, যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। তোমার কোন ভয় নেই।"

প্রায়ই চার্লি শ্যামকে তার জীবনের কাহিনী শোনাতো। সাদাসিদে মানুষ চার্লি, চৌত্রিশ বছরের বারো বছর কাটিয়েছে সৈনিক হয়ে, তার গল্পে কীই বা থাকবে? কখনো শোনাত সে তার এক পোষা কাঠ-বেরালীর গল্প, কখনো বলত তার ভ্রমণ কাহিনী, আর প্রায়ই দিত তার বাইশবারের প্যারাশুট লাফানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

হাঁ করে শ্যাম শুনত। প্রত্যেকটি কথা তার মনে গেঁথে যেত।

একদিন চার্লি তাকে ডেকে বললে, "ওহে, তোমাকে একজন মেজর খুঁজছেন।"

শ্যাম গিয়ে দেখল অপরিচিত লোক, বোধ হয় ইংরেজ, কিন্তু চেহারায় কোথায় যেন একটু মোঙ্গোলীয় ছাপ। সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘ সুপুষ্ট চেহারা। প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না লোকটিকে।

মেজরটি বললেন, "তোমার অফিসারেরা তোমার খুব সুখ্যাতি করেন।"

শ্যাম বললে, ধন্যবাদ।

মেজর বললেন, "কিন্তু পুলিস তোমার ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়।"

শ্যাম জিজ্ঞেস করলে, "মিলিটারী পুলিস?"

মেজর বললেন, "না, বেসামরিক পুলিস, তোমার থানার পুলিস।"

শ্যাম বললে, "ও!" সে আন্দাজ করল তার সামরিক জীবনের অবসানের আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

মেজর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ একগাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন,

"এই রকম লোকই আমরা খুঁজছি।"

শ্যাম অবাক হয়ে ভাবলে, বলে কী লোকটি?

মেজর বললেন, "এই আমার বাড়ির ঠিকানা। আজ সন্ধ্যেবেলায় সেখানে এস, কথাবার্তা হবে।"

মেজর বললেন, তিনি সম্প্রতি চুংকিং ঘুরে এসেছেন। চুংকিং গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল সামান্যই, আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাও-সে-তুং-এর দলের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। চুংকিং গভর্নমেণ্ট চায়নি বিদেশীদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ হোক, কিন্তু মেজর কাজ সেরে এসেছেন অতি গোপনে।

সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও শ্যাম উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না। অতিমানুষ তো সে নয়। মেজর বলতে লাগলেন,

"ওদের যুদ্ধকৌশল একেবারে আলাদা। ওরা শত্রুর সঙ্গে লড়ে চারপাশ থেকে। জাপানীরা এত যুদ্ধ পটু, কিন্তু জুদের সৈন্যদের ফাঁদ কিছুতেই এড়াতে পারে না। যেখানেই যায় জাপানীরা, দেখে জুদের লোক চারপাশে!"

শ্যাম মনে মনে বলল, তোমাদের-কাছে ও খবরটা নতুন, কিন্তু আমরা বহুদিন আগে ওসব আমাদের বই-এ পড়েছি। তোমাদের এখানে লড়ে শুধু মাইনেকরা সৈন্য, জনসাধারণ নির্লিপ্ত দর্শকমাত্র। উত্তর-পশ্চিম চীনে সবাই জনসাধারণ, সবাই সৈন্য। কিন্তু, এসব তো গৌরচন্দ্রিকা, আসল বক্তব্যটা কী হুজুরের? এ কথা নিয়ে শ্যামের সঙ্গে আলোচনা কেন?

মেজর বললেন, "উ আউঙ সানের নাম শুনেছ?"

"না।"

"উ আউঙ সান বর্মার জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি। লোকে জানে তিনি জাপানীদের দিকে। কিন্তু আমরা জানি তিনি কারো দিকে নন। তিনি চান বর্মার স্বাধীনতা।"

শ্যাম ফস করে বলে ফেললে, "হয়তো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিও শুধু চায় ভারতের স্বাধীনতাই, অন্য কিছু নয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে রটে কেন যে, তারা ভারতে জাপানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়?"

কথাটা বলেই শ্যামের অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল। ছি, ছি, হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় সে এ কী করে ফেলল। বাবা হরমিন্দর সিং এতবার বলেছিল তাকে—মুখটি বুজে কাজটি শিখে নিতে, মনের কথা কাউকে প্রকাশ না করে। সব ভেস্তে গেল নিমেষের ভুলে।

কিন্তু কোনো বিপর্যয় ঘটল না। মেজর শান্তমুখে বললেন, "আউঙ সানের খবরটা আমরা পাকাপাকি জানি, তাই জোর গলায় বলতে পারি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির খবর আমি জানি না। হয়তো তোমার কথা ঠিক।"

তারপর, আবার সকাল বেলার মত একগাল হেসে শ্যামের বুকে মাঝারি ওজনের এক তর্জনীর ঠোকা মেরে মেজর বললেন, "ইচ্ছে হয়, সঠিক খবরটা নাও না গিয়ে!"

অন্য ব্যক্তি হলে ভাবতো মেজর একটা রসিকতা করলেন। কিন্তু শ্যামের মাথায় তখন ঘুরছে মাও-সে-তুং-এর গেরিলা সৈন্যদলের কথা—যারা জাপানী বেড়াজালের মধ্য দিয়ে মাছের পোনার মত একবার ঢোকে আবার বেরোয়। তার দুকান ভর্তি চার্লির গল্প—বাইশবার লাফ, কখনো নরওয়েতে, কখনো ফ্রান্সে, জার্মানদের চোখ এড়িয়ে; আবার উধাও হওয়া, অন্ধকারে নৌকো বেয়ে, জলে-ভাসা উড়োজাহাজে অথবা ডুবোজাহাজে। তার মনে হল, মেজরের কথাটা ঠাট্টা নয়, সত্যি। হয়তো মাও-সে-তুং-এর কাছ থেকে উনি কোনো খবর এনেছেন, যার বলে সত্যিই শ্যামকে নিরাপদে সিঙাপুরে হাজির করা যেতে পারে।

মেজর বললেন, "আমি বর্মার লোক, বর্মী মনোভাব জানি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মনোভাব আমার চেয়ে তুমি ভালো বুঝবে। তাই বলছিলাম, তুমি যদি চাও বর্মায় গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।"

এর উত্তরে বলবার কোনো কথা শ্যাম খুঁজে পেল না। তার উদ্দেশ্য চীনের সঙ্গে যোগাযোগ; আই এন এ-র কথা সে কখনো ভাবেনি। বিশেষত এমন অভিনব উপায়ে যোগাযোগের কথা। তাছাড়া, ধরেই যদি নেওয়া যায় আই এন এ-র সঙ্গে কথা

"তারপর একখানা গড়াগড়ি, মা ধরিত্রীর বুকে। এইটুকুই তো কথা, আবার কী?"

শ্যাম লাফাল, একবার, দুবার, তিনবার। তারিফ পেল, পিঠচাপড়ানি খেল, কিন্তু মনে হল সত্যি প্রশংসা তার প্রাপ্য নয়। হাত-পা তার প্রতিবারই কলের মত কাজ করে গেল, কিন্তু বিষয়টি যে সহজ, এ অনুভূতি তার কোনবারই হল না। একদিন সে খুলে বললে একথা তার অফিসারকে।

চার্লি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "তাও কি হয়? মুখে বলি কথা, কিন্তু মন কি অত সহজে মানে? আমি বাইশবার লাফিয়েছি, বাইশটিবার আমার মনে হয়েছে, 'এবারে আর নিস্তার নেই!' নিস্তার যে পেয়েছি, তার কারণ আমার মন নয়, হাত-পা কলের মত কাজ করে গেছে তাই বেঁচেছি। আমি দেখেছি লক্ষ্য ক'রে—তোমারও হাত পা ভাবে না, যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যায়। তোমার কোন ভয় নেই।"

প্রায়ই চার্লি শ্যামকে তার জীবনের কাহিনী শোনাতো। সাদাসিধে মানুষ চার্লি, তেত্রিশ বছরের বারো বছর কাটিয়েছে সৈনিক হয়ে, তার গল্পে কী-ই বা থাকবে? কখনো শোনাত সে তার এক পোষা কাঠ-বেরালীর গল্প, কখনো বলত তার ভ্রমণ কাহিনী, আর প্রায়ই দিত তার বাইশবারের প্যারাশুটে লাফানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। হাঁ করে শ্যাম শুনত। প্রত্যেকটি কথা তার মনে গেঁথে যেত।

একদিন চার্লি তাকে ডেকে বললে, "ওহে, তোমাকে একজন মেজর খুঁজছেন।"

শ্যাম গিয়ে দেখল অপরিচিত লোক, বোধ হয় ইংরেজ, কিন্তু চেহারায় কোথায় যেন একটু মোঙ্গোলীয় ছাপ। সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘ সুপুষ্ট চেহারা। প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না লোকটিকে।

মেজরটি বললেন, "তোমার অফিসারেরা তোমার খুব সুখ্যাতি করেন।"

শ্যাম বললে, ধন্যবাদ।

মেজর বললেন, "কিন্তু পুলিস তোমার ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়।"

শ্যাম জিজ্ঞেস করলে, "মিলিটারী পুলিস?"

মেজর বললেন, "না, বেসামরিক পুলিস, তোমার থানার পুলিস।"

শ্যাম বললে, "ও!" সে আন্দাজ করল তার সামরিক জীবনের অবসানের আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

মেজর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ একগাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন,

"এই রকম লোকই আমরা খুঁজছি।"

শ্যাম অবাক হয়ে ভাবলে, বলে কী লোকটি?

মেজর বললেন, "এই আমার বাড়ির ঠিকানা। আজ সন্ধ্যেবেলায় সেখানে এস, কথাবার্তা হবে।"

মেজর বললেন, তিনি সম্প্রতি চুংকিং ঘুরে এসেছেন। চুংকিং গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল সামান্যই, আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাও-সে-তুং-এর দলের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। চুংকিং গভর্নমেন্ট চায়নি বিদেশীদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ হোক, কিন্তু মেজর কাজ সেরে এসেছেন অতি গোপনে।

সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও শ্যাম উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না। অতিমানুষ তো সে নয়। মেজর বলতে লাগলেন,

"ওদের যুদ্ধকৌশল একেবারে আলাদা। ওরা শত্রুর সঙ্গে লড়ে চারপাশ থেকে। জাপানীরা এত যুদ্ধ পটু, কিন্তু জুদে'র সৈন্যদের যদি কিছুতেই এড়াতে পারে না! যেখানেই যায় জাপানীরা, দেখে জুদে'র লোক চারপাশে!"

শ্যাম মনে মনে বলল, তোমাদের কাছে ও খবরটা নতুন, কিন্তু আমরা বহুদিন আগে ওসব আমাদের বই-এ পড়েছি। তোমাদের এখানে লড়ে শুধু মাইনেকরা সৈন্য, জন-সাধারণ নির্লিপ্ত দর্শকমাত্র। উত্তর-পশ্চিম চীনে সবাই জনসাধারণ, সবাই সৈন্য। কিন্তু, এসব তো গৌরচন্দ্রিকা, আসল বক্তব্যটা কী হুজুরের? এ কথা নিয়ে শ্যামের সঙ্গে আলোচনা কেন?

মেজর বললেন, "উ আউঙ সানের নাম শুনেছ?"

"না।"

"উ আউঙ সান বর্মার জাতীয় সৈন্য-দলের সেনাপতি। লোকে জানে তিনি জাপানীদের দিকে। কিন্তু আমরা জানি তিনি কারো দিকে নন। তিনি চান বর্মার স্বাধীনতা।"

শ্যাম ফস করে বলে ফেললে, "হয়তো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিও শুধু চায় ভারতের স্বাধীনতাই, অন্য কিছু নয়। তার তাদের বিরুদ্ধে বটে কেন যে, তারা ভারতে জাপানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়?"

কথাটা ব'লেই শ্যামের অত্যন্ত অনুতাপ হতে লাগল। ছি, ছি, হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় সে এ কী করে ফেলল। বাবা হরমিন্দর সিং এতবার বলেছিল তাকে—মুখটি বুজে কাজটি শিখে নিতে, মনের কথা কাউকে প্রকাশ না করে। সব ভেস্তে গেল নিমেষের ভুলে।

কিন্তু কোনো বিপর্যয় ঘটল না। মেজর শান্তমুখে বললেন, "আউঙ সানের খবরটা আমরা পাকাপাকি জানি, তাই জোর গলায় বলতে পারি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির খবর আমি জানি না। হয়তো তোমার কথা ঠিক।"

তারপর, আবার সকাল বেলার মত একগাল হেসে শ্যামের বুকে মাঝারি ওজনের এক তর্জনীর ঠোকা মেরে মেজর বললেন, "ইচ্ছে হয়, সঠিক খবরটা নাও না গিয়ে!"

অন্য ব্যক্তি হলে ভাবতো মেজর একটা রসিকতা করলেন। কিন্তু শ্যামের মাথায় তখন ঘুরছে মাও-সে-তুং-এর গেরিলা সৈন্যদলের কথা—যারা জাপানী বেড়াজালের মধ্য দিয়ে মাছের পোনার মত একবার ঢোকে আবার বেরোয়। তার দু'কান ভর্তি চার্লির গল্প—বাইশবার লাফ, কখনো নরওয়েতে, কখনো ফ্রান্সে, জার্মানদের চোখ এড়িয়ে; আবার উধাও হওয়া, অন্ধকারে নৌকো বেয়ে, জলে-ভাসা উড়ো-জাহাজে অথবা ডুবোজাহাজে। তার মনে হল, মেজরের কথাটা ঠাট্টা নয়, সত্যি। হয়তো মাও-সে-তুং-এর কাছ থেকে উনি কোনো খবর এনেছেন, যার বলে সত্যিই শ্যামকে নিরাপদে সিঙাপুরে হাজির করা যেতে পারে।

মেজর বললেন, "আমি বর্মার লোক, বর্মী মনোভাব জানি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মনোভাব আমার চেয়ে তুমি ভালো বুঝবে। তাই বলছিলাম, তুমি যদি চাও বর্মায় গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।"

এর উত্তরে বলবার কোনো কথা শ্যাম খুঁজে পেল না। তার উদ্দেশ্য চীনের সঙ্গে যোগাযোগ; আই এন এ-র কথা সে কখনো ভাবেনি। বিশেষত এমন অভিনব উপায়ে যোগাযোগের কথা। তাছাড়া, ধরেই যদি নেওয়া যায় আই এন এ-র সঙ্গে কথা

বার সুযোগ তার হল, তারপর? সে
যে, তার কথা তারা শুনবে বা গ্রাহ্য
বে?

এ-আলোচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার সবচেয়ে
জ পন্থা হল মেজরকে বলা যে, অমন
সাহসের কাজ তার দ্বারা হয়ে উঠবে না।
তু তাও বলা নিজের অপমান। শ্যাম
র করলো কথা খোলাখুলি বলে ফেলাই
লা। সে বললে, "তুমি জানো বোধ হয়,
টশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমার মোটেই
বনা নেই। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের
গও নেই। আমি চাই আমার দেশের
ীনতা। আমি যদি বর্মায় যাই, যাব
; ঐ জন্যেই। ব্রিটিশ বা জাপানী কোনো
জোর খাতিরেই আমি এক পাও
ব না।"

জর বললেন, "আমি বললাম তো
াকে, আমি শুধু বর্মা বুঝি: ইণ্ডিয়ার
া কিচ্ছু জানি না। আমি জানি, তোমার
া বর্মার কোনো ক্ষতি হতে পারে না,
তোমাকে বর্মায় পাঠাতে আমার
ুকুও ভয় নেই, তুমি সেখানে গিয়ে
করো। আর পারোও তুমি সেখানে
খুশী তাই করতে, ব্রিটিশ রাজত্ব তো
ওখানে নেই। কে তোমাকে আটকাবে?
া শুধু একটি জিনিস চাই, ভারতীয়-
সঙ্গে যেন আউঙ্ সানের দলের কোনো
র্ষ না হয়। জাপানী শাসনে বর্মীরা
-বিরক্ত হয়ে উঠেছে—দুহাত তুলে যারা
নীদের অভ্যর্থনা করেছিল, তারাও।
ঙ সানের সৈন্য সুবিধে পেলেই জাপানী-
উৎখাত করবে। সে সময় যখন আসবে,
যেন একটা বর্মী-ভারতীয় যুদ্ধ না
জাপানী প্ররোচনায়। এইটুকুই
চাই।"

জরের কাছ থেকে শ্যাম সোজা গেল
'কমিউন' বা বিপ্লবী মেসে।

মউনে সবাই 'পেশাদারী বিপ্লবী':
সাত বছর জেল খেটেছে, কেউ চোদ্দ
আটক থেকেছে, কেউ বছরের পর বছর
সের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার থেকে
ত আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে
ভ করেছে। বাসিন্দেরা বিপ্লবী হলেও
ী, অতএব অবিপ্লবী মেসেরই মত
নও আড্ডা জমে। তবে গুলতুনি হয়
শত রাজনীতি নিয়ে।

িন একটা আড্ডা বসেছিল হর্ষের
রে। আলোচনা হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী
এবং গণযুদ্ধ নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-
া দ্বারা গণযুদ্ধ যে কখনও হতে পারে
ইটাই নানা বক্তা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে
চ্ছিলেন। কিছুদিন আগে একযোগে
জন বিপ্লবী বিমানবাহিনীতে ঢুকে
ছিল; সম্প্রতি পুলিসের আপত্তিতে
বরখাস্ত হয়েছে—এই ঘটনাটা
াচনায় পুনঃপুনঃ ইন্ধন জোগাচ্ছিল,
এবং সবাই সম্পূর্ণ একমত হওয়া সত্ত্বেও
আলোচনার উষ্মা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হল উর্দি-
পরিহিত শ্যাম। সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল।
একটি গাইয়ে ছেলে বিখ্যাত একটি ঠুংরি
বিকৃত ক'রে গেয়ে উঠল "আয়ে র—ণশ্যাম"।

শ্যামের মনে হল তার সমস্যার এই
সমাধান। একা বর্মায় গিয়ে সে কী করবে?
অচেনা জায়গা, অজানা ভাষা, না সে
কাউকে চেনে, না আছে তার ডেরা। হঠাৎ
যদি এমন লোক ভুঁইফোঁড়ের মত আই এন
এ দপ্তরে গিয়ে উদয় হয় তবে কেউ তার
সঙ্গে কথা বলা দূরস্থান তাতে তো
ঢুকতেই দেবে না!

কিন্তু এরা—এই দলটা—যদি গিয়ে
সেখানে গেড়ে বসে তবে হবে কাজ। ঐ
নিকুঞ্জ, হর্ষ, সত্যেন—অসম্ভব পড়া
সত্যেনের—ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি,
বিপ্লবী বিদ্যের একটি জাহাজ; ওকে নিয়ে
যাওয়া মানে লেনিনের পুরো এক সেট বই
সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এরা সবাই যদি সঙ্গে
থাকে তবেই পারবে শ্যাম কিছু ক'রে
উঠতে, নচেৎ নয়। হর্ষের সঙ্গে বসে
পরামর্শ করতে হবে।

খানিকক্ষণ আড্ডায় বসে শ্যাম হর্ষকে
তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বিষয়টা গোপনে
আলোচনা করতে।

হর্ষ আনুপূর্বিক শুনে বললে, "ঠিক
বলেছিস তুই। আমরা পুরো এক দঙ্গল
যাব। এখানে থেকে গণযুদ্ধের কাজ এগোবে
না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লম্ফঝম্ফই সার;
ওদের তোড়জোড় শেষ না হতেই জাপানী
সাম্রাজ্যবাদ খতম হয়ে যাবে। ওদিকে গেলে
হয়তো গেরিলাবাহিনীতে যোগ দেওয়া যাবে,
হয়তো চীনের সঙ্গে যোগাযোগের একটা
রাস্তাও খুলে যেতে পারে।"

উল্লসিত হয়ে শ্যাম গিয়ে মেজরকে কথা
দিয়ে এল।

আবার আরম্ভ হল ট্রেনিং। অফিসারদের
দস্তুরমতো তাক্ খাইয়ে দিল শ্যাম। ছ'
হপ্তায় তার বর্মীভাষায় কথাবার্তা রপ্ত
হয়ে গেল। বর্মার ম্যাপ, রেঙ্গুনের পথঘাট
তার নখদর্পণে এসে গেল। জাপানীদের
হালচাল, দুটো একটা বুলি এও সে শিখে
নিল।

দঙ্গলের অন্য ছেলেদেরও ট্রেনিং হয়ে
গেল। তাদের কে কোথায় যাবে, কেমন করে
পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে তার
বিস্তারিত প্ল্যান তৈরী হল। কিন্তু কী
তাদের কার্যকলাপ হবে সে সম্বন্ধে কোনো
কথাই হল না। মেজর তার আগের কথারই
পুনরাবৃত্তি করলে,

"আমি বার্মান। বর্মার কোনো ক্ষতি
তোমাদের দ্বারা হতে পারে না—কারণ
তোমরা মনে-প্রাণে খাঁটি লোক, এবং
ভারতীয়—এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।
বাকী তোমাদের হাত; প্ল্যান ক'রে কী
হবে?"

* * *

অমাবস্যা। বোমারু উড়োজাহাজ চলেছে
বর্মার পথে। সাতখানা জাহাজ, সারি বেঁধে
চলেছে বকের পাঁতির মত। মেঘের উপর
দিয়ে চলেছে, কনকনে ঠাণ্ডায়।

ছখানি জাহাজে শুধু বৈমানিক—চালক,
নাবিক, কামানদাগ। কেবল একখানি জাহাজে
দুটি অতিরিক্ত যাত্রী শ্যাম এবং মেজর।
যুদ্ধের রসদের মধ্যে সে-জাহাজে আছে মাত্র
দুটি হালকা বোমা।

নাবিক এসে মেজরকে খবর দিলে, সময়
হয়েছে। আর পাঁচ মিনিট বাদেই তাদের
জাহাজখানা সারি থেকে সরে গিয়ে প্রোম-
রেঙ্গুন পথের উপর দিয়ে উড়ে যাবে। তার
পরেই—

মেজর শ্যামকে বর্মী ভাষায় জিজ্ঞেস
করলে,

"কিছু বলবে?"

শ্যাম বললে, "একটা কথা। এর আগে
কাউকে এভাবে ফেলা হয়েছে?"

মেজর বললে, "হয়েছে, ইউরোপে, চীনে।
কিন্তু এ-অঞ্চলে তুমিই প্রথম।"

আর কোনো কথা বলবার সময় হল না।

শ্যাম এসে দাঁড়াল তার নির্দিষ্ট স্থানে।
বোমা ফেলবার জানলা খুলে গেল। রক্ত-
মাংসের দেহটা তার মুহূর্তে হয়ে গেল জড়-
পদার্থ। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তার দেহ ত্যাগ
করে গেল, তার স্থান নিল কতকগুলো
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এখন আসবে কানে
আদেশ,

"অ্যাকশন স্টেশন—ওয়ান—টু—"

পরক্ষণেই হতজ্যোতি উল্কাপিণ্ডের মত
একটা জড়দেহ নিক্ষিপ্ত হবে শূন্যে।
অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন, অসহায় সেই
ক্ষুদ্র দেহটাকে বিরাট পৃথিবী সহস্র অদৃশ্য
বাহু দিয়ে টেনে নেবে তার বুকে, ক্ষিপ্র-
বেগে, আরও বাড়া আরও ক্ষিপ্রবেগে। মহা-
শূন্যের কোটি নক্ষত্রের উদ্‌ভ্রান্ত আকর্ষণ
থেকে রক্ষা করে মুগ্ধা পৃথিবী উন্মত্ত
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে তার দেহটাকে—
প্রাণহীন, অচেতন দেহটাকে। ঈশ্বরে প্রাণ-
চৈতন্য স্পন্দন বিশ্বের; অক্ষর দেহবস্তুতে
অধিকার পৃথিবীর, একা পৃথিবীর।

কার দেহ শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল? যন্ত্র-
চালিতের মত কে প্রলাপের ছন্দে বাঁধা
অর্থহীন একটা কবিতার অস্ফুট আবৃত্তি
আরম্ভ করল? সে কবিতার প্রথম চরণ
শেষ হতেই কার অচেতন হাত প্যারাশুটের
একটা দড়ি ধরে টানল? শ্যাম জানে না।

প্যারাশুট খুলতে লাগল। রাজছত্র?
কোথায় রাজছত্র? ঘাতকের পরিচ্ছদে রাজ-
ছত্র? অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে প্যারাশুটের
কালোবরণের রূপ কেউ দেখলে না, শ্যামও
নয়। কারণ, চৈতন্যস্বরূপ শ্যাম তখনও

দো-মনা—ত্রিশঙ্কুর মত দাঁড়িয়ে—তার দোদ্‌ল্যমান জড়দেহ, আর অনন্তনির্বাণের ঠিক মধ্যপথে।

শ্যামের পড়ার বেগ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও ফিরে এল একটু একটু ক'রে। প্রথমে অতীতের স্মৃতি ফিরল—মেজদির কথা মনে হল, দু চোখ জলে ভরে উঠল। তারপর এল ভবিষ্যতের অনুভূতি।

অন্ধকার। অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অমাবস্যার এ রাতের চেয়ে, পায়ের নিচেকার পৃথিবীটার চেয়েও। কেন এল শ্যাম? নির্বোধ একটা আবেগে। এখন শেষ, সব শেষ। এই মুহূর্তে হয়তো একশো জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, শিকারী বেড়ালের মত, আর একটু নামলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চোখধাঁধানো সার্চ-লাইটের আলো কবন্ধের হাতের নখের মত তার দেহটাকে বিঁধবে, শ্মশানে প্রেতাত্মার মত অট্ট হেসে উঠবে মেশিনগান—

হঠাৎ দূর থেকে বোমা ফাটার আওয়াজ শোনা গেল। শ্যাম বুঝল তাকে আড়াল দেবার জন্য বোমা পড়ল দূরে। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে জাপানী স্থলসেনার পাল্টা জবাব শোনবার জন্য। অনেক দূরে একটা মেশিন-গানের আওয়াজ হল, একবার, তারপর সব চুপ।

এইবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাটি। একটা জঙ্গল, তারপর একটা ডোবা—ডোবা বাঁচিয়ে পড়তে হবে তাকে—একটু সমান জমিতে—ধানক্ষেতের নয়, দাগ পড়বে—চাই অ-চাষা রুক্ষ জমি—

ধপ্ ক'রে শ্যাম মাটিতে লাফিয়ে পড়েই গড়াতে শুরু করল। আবার তার দেহযন্ত্র চালাবার ভার নিলে চার্জি,

"গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামবে একটা গর্তে—লুকানো একখানা গর্তে। আশেপাশে ঝোপ থাকে তো খুবই ভালো। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে, আর ছড়া কাটবে মনে মনে। যদি দেখ সব চুপ, ঝপ ক'রে কাপড় বদলে নেবে—নিঃশব্দে, হৈ চৈ কোরো না। প্যারা-শুট, সরকারী উর্দি সব গর্তে পুঁতে ফেলবে, টুঁ শব্দ না ক'রে, ঝোপের আড়ালে। তারপর অতি সন্তর্পণে চারদিক একবার দেখে নিয়ে বাবুটি হাওয়া খেতে বেরুবে।"

শ্যাম বেরোল বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়ের বেশে। খানিকক্ষণ খানা-খন্দ ডিঙিয়ে চলবার পর চষা জমি নজরে পড়ল। লোকালয় কাছেই, সাবধান শ্যাম! আল বেয়ে চলল সে পথের খোঁজে।

গর্তে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার খিদেটা চেগে উঠেছিল। পকেটে ছিল চকোলেট, একটু ভেঙে মুখে দিয়েছিল—দিয়েই থুথু ক'রে ফেলে দিতে হল। চিরকালের প্রিয় খাদ্য তার চকোলেট, এখন বিষের মত বিস্বাদ লাগল। অতীতের পোশাক পুঁতে ফেলবার সময় সে তার সঙ্গে-নেওয়া খাবার-টুকুও পুঁতে ফেলে ভবিষ্যতের হাতে তার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের দায়িত্ব ছেড়ে দিল।

সে কে? সে শ্যাম নয়, করালী—করালী-চরণ—শ্যামাচরণ নয়, কালীচরণ—রেঙ্গুনে স্টীল ব্রাদার্সে কেরানীর কাজ করত। তার বাবা মারা যাবার পর করালী বর্মায় তার কাকার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কাকা তাকে একটা পিওনের কাজ জুটিয়ে দিয়ে-ছিলেন স্টীল ব্রাদার্সেরই একটা চালের আড়তে। রেঙ্গুনে বোমা পড়ল, করালী কাকার খবর নিতে এল, এসে শুনল কাকা নেই। তিনি নাকি ডকে ছিলেন বোমা ফাটবার সময়, আর ফেরেননি।

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও করালী তার কাকার সন্ধান পেল না। তার এক বন্ধু রমেশ (হর্স এলে এই নামেই তার পুনর্জন্ম হবে) তাকে বললে, সবাই পালাচ্ছে তাদেরও পালানো উচিত। হয়তো তার কাকা জাহাজে ক'রে দেশে চলে গেছেন, নয় তিনি আর নেই; বৃথা খুঁজে আর থেকে লাভ নেই।

তখন তারা দুই বন্ধু রেঙ্গুন ছেড়ে প্রোম রোড ধরে বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ তারা একসঙ্গেই চলেছিল, কিন্তু থেয়োকের কাছাকাছি একদিন জোর বোমা পড়ল, ভয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন জ্ঞান হল দেখল রমেশ কোথাও নেই, সে শুয়ে আছে এক হুপাঙ্গচাউং অর্থাৎ বর্মা ভিক্ষুনিবাসে। ভিক্ষু তাকে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ ক'রে পাঠিয়ে দিল পাউংদের এক বর্মী ব্যবসায়ীর কাছে। করালীর শরীরের অবস্থা দেখে ভিক্ষু বুঝেছিল হাঁটাপথে দেশে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। শক্ত সমর্থ লোক তখন পথে মরছে বেড়াল কুকুরের মত, অন্নাভাবে জলাভাবে, রোগে, শ্রান্তিতে। শ্যাম যেন তার আশ্রয়দাতা ব্যবসায়ীর কাছেই থাকে কিছুদিন, তারপর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে ফিরে যায় ইয়াঙ্গুনে।

তাই শ্যাম এখন ফিরছে রেঙ্গুনে। একটা চাকরি জোগাড় করা দরকার, যাহোক একটা কিছু, বেয়ারা খানসামা কুলীর কাজ। দুটি খাওয়া জুটলেই তার চলে যাবে।

দূরে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। লোকজনের গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। সাবধানে পথ চলতে হবে, কুকুর না খেঁপিয়ে। পথ প্রোম রোড নয়, শহরতলীর কাঁচাপাকা পথ। দু-তিনজন লোক যাচ্ছে বোঁচকা মাথায়। স্টেশনে যাচ্ছে বোধ হয়—বিমানহানার দরুণ ট্রেন রাতেই চলাফেরা করে। হন্ হন্ ক'রে শ্যাম এগিয়ে গেল তাদের দিকে। তাদের সঙ্গ ধরে সে জিজ্ঞাসা করল,

"থাম্‌ইয়ারো বেগো-থ্‌ওয়ানিরে—এ? কোথায় যাচ্ছ তোমরা?" বর্মায় বর্মীভাষায় এই তার প্রথম পরীক্ষা!

লোকদুটি চলতে চলতে তার, কথার জবাব দিল।

ব্যস, করালী! চুপ ক'রে যাও। হর্‌-মিন্দরের কথা মনে আছে তো? অপর লোককে প্রথম কথা কইবার সুযোগ দিও না, তাহলে কথা গোড়া থেকেই বেয়াড়া চালে চলবে। প্রথম প্রশ্ন যেন তোমার তরফ থেকেই হয়। তারপর ভোম্‌ মেরে যাও, যেচে কথা কয়ো না— শুধু চোখকান খুলে অন্যদের নজরে রাখো।

ওঃ, কী ওস্তাদ বাবা হর্‌মিন্দর। তারিফ করি গদরের। শ্যাম ভেবেছিল সে চলেছে লে'পাডান থেকে থারাওয়াডির দিকে, রেঙ্গুনের পথে। লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে সে বুঝল সে ধরেছে ঠিক উলটো পথ।

সে-যাত্রা শ্যাম বেঁচে গেল।

পেঁছিল শ্যাম রেঙ্গুনে। এক বিড়ি-ওয়ালার সঙ্গে তার দোস্তী হয়ে গেল। বিড়িওয়ালা তাকে বিড়িবাঁধার কাজ শিখিয়ে দিয়ে তার দোকানেই তার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিল। শ্যাম হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

নানা রকমের লোক আসত বিড়িওয়ালার দোকানে, তামিল মজুর, জেরাবাদী, হিন্দু-স্থানী। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে ব'লে শ্যামের জ্ঞান চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে লাগল। হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই সে রেঙ্গুনের বাসিন্দে বনে গেল। পরের অমাবস্যায় নিকুঞ্জ, শ্রীপতি, হর্ষ—তিনজনকে তিন জায়গায় নামিয়ে দেবার কথা। একে একে তারা সব রেঙ্গুনে আসবে। কোথায় কখন তাদের কার সঙ্গে শ্যামের দেখা হবে তা ঠিক করাই ছিল, কিন্তু কারো সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ হল না। পর পর তিন অমাবস্যা, তিনটে মাস কেটে গেল, কেউ এল না। শ্যাম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

নিজের জন্য তার বিশেষ চিন্তা ছিল না। রেঙ্গুনে তার দিব্যি সড়গড় হয়ে গেছে। বর্মী ভাষা সে রেঙ্গুনের পুরোনো ভারতীয় বাসিন্দাদের চেয়ে নেহাৎ খারাপ বলে না। জাপানী মুরুব্বি, তাদের সেপাইদের সেলাম করার কায়দা এসবও আস্তে আস্তে এসে গেছে। কিন্তু কাজ? আসল কাজ? শুধু বিড়ি বাঁধতেই তো সে আর রেঙ্গুনে আসেনি!

চীনাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব। এক তো জাপানী বর্মী উভয়েই চীনাদের উপর খাপ্পা। তারপরে যেসব চীনাদের পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায় তারাও অতি নিকৃষ্ট মাল—চণ্ডুখোর, বদমাইশ। জাপানী-দের সঙ্গে চোরাগোপ্তা কোনো কারবারও বোধ হয় তাদের আছে, নইলে তাদের জাপানী সামরিক পুলিস আটক ক'রে রাখত। কিছু কিছু চীনা একদম বর্মী হয়ে গেছে, চীনা ভাষাই প্রায় ভুলে গেছে।

তারপর আই এন এ। সেখানে ঘেঁষতে গিয়ে তো শ্যাম একেবারে সাক্ষাৎ শমনের মুখে পড়েছিল।

অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে শ্যাম কখনও চারদিক একবার না দেখে নিয়ে অজানা কোনো জায়গায় ঢুকত না। আই এন এ আপিসে ঢোকবার আগেও সে একবার চারপাশটা দেখে নিচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল একটি ভারতীয়ের মুখ। একটা বাড়ীর জানলা থেকে অলক্ষিতে লোকটি চেয়ে আছে আই এন এ আপিসের গেটের দিকে। শ্যামের মনে হল লোকটার কাজ গোয়েন্দাগিরি।

ব্যাপার কী? আই এন এ'র ওপর নজর! কাদের? জাপানীদের, না ব্রিটিশের? শ্যামের বড় কৌতূহল হল। সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বাড়িটা চোখে চোখে রাখতে লাগল।

সন্ধ্যে আর একটু ঘনিয়ে আসতেই লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আই এন এ আপিসের গেট সাবধানে এড়িয়ে লোকটা চট ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল। শ্যাম আর কালবিলম্ব না ক'রে তার অনুসরণ করল।

লোকটার চলন দেখে শ্যামের মনে হল সে কোথায় তাকে দেখেছে—রেঙ্গুনে নয়, বর্মায় নয়, বোধ হয় দেশে।

লোকটা ঢুকল কেম্‌পেই আপিসে। 'কেম্‌পেই' জাপানী সৈন্যবাহিনীর পুলিস, যাদের নেকনজরকে ভয় পায় না এমন লোক জাপানী সাম্রাজ্যে বিরল। তাহলে কেম্‌পেই আই এন এ'কে নজরে রাখে কেন? ব্রিটিশদের সঙ্গে তো আই এন এ-র যোগসাজসের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবে? তবে কি জাপানীদের ভয় বর্মী জাতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে আই এন এ-র যোগাযোগকে?

এই সমস্যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলতে চলতে শ্যাম হঠাৎ দেখল সেই লোকটা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এবারে আর সন্দেহ রইল না লোকটা কে! কলকাতায় তার বাড়ি, শ্যামেদেরই পাড়ায়। অতিশয় দুশ্চরিত্র লোক, কোকেনখোর, নাম পরিতোষ। টাকার বিনিময়ে সে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিত এমনি একটা খ্যাতি তার বরাবরই ছিল, তাই শ্যামেরা কখনও ওর সঙ্গে মিশত না। লোকটা বছর দুতিন আগে তহবিল তছরূপ গোছের কী একটা ক'রে হঠাৎ কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়, কোথায় কেউ জানতে পারেনি। এখন বোঝা গেল এই জ্যান্ত গোখরোটি কোথায় এসে বাসা করেছে।

ত্বরিৎগতিতে শ্যাম অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

শ্যামের গুণে বিড়িওয়ালার দোকানটায় একটা পাঠচক্র গড়ে উঠল। সবাই যে-কথাগুলো এলোমেলোভাবে বুঝত এবং বলত, শ্যাম সেগুলো ঝেড়েমুছে গুছিয়ে দিত। জ্বালাময়ী বক্তৃতার সম্মোহনে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা শ্যামের ছিল না। তার অস্ত্র ছিল দুটি, অকপট আন্তরিকতা এবং স্পষ্ট ধারণা। কমিউনের আড্ডায় শ্যাম প্রায়ই চুপ ক'রে বসে শুনত; কিন্তু আবছায়া-আবছায়া কথা শুরু হলেই শ্যামের মুখ থেকে অনর্গল প্রশ্ন বেরোতো—'কেন?' 'তার মানে?' 'কী করে?' বিষয়টা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠা পর্যন্ত শ্যামের জিজ্ঞাসার বিরাম হত না।

হর্ষ-নিকুঞ্জের জন্য নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থানে সে গিয়ে হাজির হত। কিন্তু তারা যে এসে পেঁছিবে এ ভরসা তার ক্রমেই কমে আসতে লাগল। সে স্থির করল, এই বিড়িওয়ালার চক্রটাকেই কেন্দ্র ক'রে সে "কাজ" চালাবে। তারপর সুযোগমত অন্য অন্য দলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা যাবে।

নানা দিক থেকে খবর এসে জড়ো হত দোকানে। একজন বর্মী ভদ্রলোক লুকিয়ে লুকিয়ে রেডিওতে খবর শুনতেন, তিনি এসে সেগুলো সঙ্গোপনে শ্যামকে শোনাতেন। একটি রেলমজুর লুকিয়ে উড়োজাহাজে ছড়ানো ইস্তাহার কুড়োতো—জাপানীদের কড়া হুকুম অমান্য ক'রে। সেগুলোর মর্মও সে শ্যামকে শোনাতো। আরও টুকরো টুকরো ছোট ছেঁড়া খবর আসত নানা দিক থেকে, নানান্‌ জনের মুখে।

খবরগুলোর কতখানি খাঁটি আর কতটা নিছক প্রপাগাণ্ডা তা শ্যাম বুঝিয়ে দিত সওয়াল জবাবের প্যাঁচে। আর থেকে থেকে বলত,

"বর্মা জাপানীদের নয়, ব্রিটিশদেরও নয়। বর্মার লোককে তৈরী হতে হবে যাতে বর্মা আসে বর্মাবাসীদের হাতে। আমি এই বুঝি।"

বিশেষ ক'রে সে তৈরী করতে লাগল রেলমজুরটিকে—যাতে শ্যামের অবর্তমানেও সে চক্রটাকে চালাতে পারে।

একদিন অঘটন ঘটে গেল। বিড়ির দোকানে অকস্মাৎ পরিতোষ এসে উদয় হল। বিড়িওয়ালা অনুপস্থিত ছিল, শ্যামই দোকানের খবরদারী করছিল, অতএব পরিতোষের দৃষ্টি এড়ানো গেল না।

কটমট ক'রে তার দিকে চেয়ে পরিতোষ বললে, পরিষ্কার বাংলায়,

"তোমার বাড়ি কলকাতায় নয়?"

শ্যাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে বললে, "আইগ্যা না। আমাগো দ্যাশ মৈমনসিং জেলায়।"

পরিতোষ বললে, "তোমার দ্যাশ কোথায়

জিজ্ঞেস করিনি। কলকাতায় কোথায় থাকতে তাই বলো।"

শ্যাম বললে, "আইগ্যা কৈলকাতায় বাসা আছিল নাইরকলডাঙ্গায়।"

পরিতোষ বললে, "উঁহু। নারকেলডাঙ্গায় তো আমার যাতায়াত ছিল না। তোমাকে দেখেছি আমি কলকাতায়। এস আমার সঙ্গে।"

* * *

তিন মাস কাটল শ্যামের কেম্পেই জেলে। তিন মাস ধরে চলল নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার — দৈহিক, মানসিক। আর অবিশ্রান্ত জেরা।

কতরকম কতরকম ভাবে তাকে জানানো হল যে ব্রিটিশ [illegible]। একবার বলা হল তাকে [illegible] [illegible] উপলক্ষে [illegible] [illegible] একবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"অনুমানে [illegible] [illegible] আপনার কাছে [illegible] [illegible]"

একদিন [illegible] এক অফিসারের ঘরে। [illegible] [illegible] শ্যাম সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

অফিসার [illegible] [illegible] শ্যামকে বললে,

"[illegible] তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। সম্রাটের সৈন্যদলের সামরিক পুলিস [illegible] দোষ [illegible] [illegible] তিন মাস শুধু সন্দেহের উপর [illegible] [illegible] আটক করে রেখেছি, তার জন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

কয়েদী [illegible] [illegible] সম্রাটের শতবর্ষ আয়ু কামনা করতে করতে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। শ্যাম ভাবল, এ একটা নতুন ফন্দি।

কিন্তু সত্যিই শ্যামকে ছেড়ে দেওয়া হল। রেঙ্গমক্কার শ্যামকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। জেনারেল উ আউঙ্ সানের সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ রাখার একটা পাকা বন্দোবস্ত তৈরী হয়েছে। কটা দিন কাটলেই সে শ্যামের সঙ্গে একজন বর্মী অফিসারের আলাপ করিয়ে দেবে।

বিড়িওয়ালার দোকানের মত আরও তিনটে চক্র হয়েছে, আরও হবে। রেল-মজুরদের একটা গোপন ইউনিয়ন হয়েছে — বাছা বাছা লোককে নিয়ে।

জোর গুজব, জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবে। শীগ্গিরই কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে।

কাণ্ডটা ঘটল অপ্রত্যাশিত রকম তাড়াতাড়ি। জেনারেল আউঙ্ সানের সেনাদলের সঙ্গে জাপানী সৈন্যের বিরোধ আর চেপে রাখা গেল না; নানা জায়গায় খোলাখুলি ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। গেরিলারা সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বোমারু বিমানের ছায়া বড় ঘন ঘন হতে লাগল।

জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেল।

শ্যাম দেশে ফিরল।

নিকুঞ্জ একটা দল নিয়ে আরাকানে গিয়েছিল, সে আগেই ফিরেছিল। মাস-খানেক বাদে হর্ষও ফিরল। তারও কিছু কম নিগ্রহ হয়নি পরিতোষেরই মত একটা উঁচু দরের ইংরেজ আমলাকে যোগাযোগের কথাটা [illegible] [illegible] কেম্পেই-এর হাতে লাঞ্ছনা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু প্রমাণ অথবা স্বীকারোক্তির অভাবে হর্ষেরও প্রাণ বেঁচে গেল।

কলকাতায় কয়েকদিন খুব হৈ চৈ হল। [illegible] বললেন সোজা হাসপাতালে যেতে। মেজদি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। কমিটিতে 'অমুক বললাম' পাওয়া হল।

ইস্তিসন, বংশীধর, বিসম্ভর দেখা করতে এল। তার অভিজ্ঞতার গল্প বারবার বলতে হল।

কিন্তু ইতিহাস বারবার এক গল্প শুনতে চায় না। সে চায় নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাস্রোত নিত্যনূতন কাহিনী। যুদ্ধের পর আসে শান্তি, শান্তির পর অশান্তি, আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব। আবার লাগে দেশে দেশে আলোড়ন। আসে প্রতিক্রিয়া, প্রভুত্বের মর্যাদায় দাসের উপর হিংস্র নিপীড়ন, আসে প্রতিবাদ, ভাঙে দাসের শৃঙ্খল। আসে ঢেউএর পর ঢেউ, ভেসে যায়, ডুবে যায়, চাপা পড়ে যায় পুরোনো গল্প।

ক্রমে ক্রমে শ্যামের বর্মী রূপ ঝরে গিয়ে তার সাবেকী চেহারা ফিরে আসতে লাগল। অনভ্যাসে আঙুলগুলো একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দিনকতক রেয়াজ করতেই টাইপ-রাইটিং আবার রপ্ত হয়ে গেল। এদিক ওদিক থেকে টাকার তাগাদা আসতে লাগল। তারপর একদিন জোর তলব এল চটকল এলাকা থেকে। নতুন একটি কমরেড ট্রেড ইউনিয়নের হিসেব একদম গুলিয়ে দিয়ে বসে আছে, শ্যাম যেন অবিলম্বে আপিসে হাজির হয়ে হিসাব পরীক্ষা করে গলদটা শুধরে দেয়, কারণ বার্ষিক সাবমিট করতে আর মাত্র দুদিন বাকী আছে।

কাপড়চোপড় [illegible] কাঁধে করে শ্যাম যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

মেজদি বললে, "আবার কোথায় দিগ্বিজয়ে যাচ্ছ শ্যামবাবু?"

শ্যাম বললে, "জগদ্দল।"

॥ সমাপ্ত ॥

॥ ২৮ ॥

ঘত সাহেবরা তাঁবুটা সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সকালেও রাত্রিতে নিশ্চয়ই। তাহলে কখন? পাহাড়ের দিকে খ রেখে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাহেবদের তাঁবুটা নজরে পড়ে, যদি হেবদের কাউকে দেখতে পাই। কিন্তু থায় তাঁবু? কোথায় সাহেব? কিছুই মাদের নজরে এল না। সারাদিন আমরা হাড়ের ধারে বসে রইলাম। আমাদের ণ্ট ক্লান্ত হয়ে এল, ব্যর্থ হল। ব্যর্থ, র্থ, ব্যর্থ। সন্ধ্যা পর্যন্তও যখন কারো থা পেলাম না, কোন কিছুর হদিস লাম না, তখন আশংকা হল, আশংকাই কেন, প্রায় নিশ্চিতই হলাম যে, একটা ঙ্গল কিছু ঘটেছে। তাই রাত্রি গভীর ল আমরা সবাই পরামর্শে বসলাম। সময়ে আমরা ওদের কোনরকম সাহায্যে তে পারি কি? সে বিষয়ে যে আমাদের দহ আছে তা আমরা জানতাম। কিন্তু মরা এখানে চুপচাপ বসে থাকব, হাত পা টয়ে একেবারে চুপটি করে, তাতো হতে র না। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

যে, মার্স সাহেব, আজীবা আর আমি এই তিনজন পাহাড়ের উপরে উঠে যাব। আর আঙ্ তেম্পা আর ফু তারকে আমাদের জন্য এই 'বেস ক্যাম্প' অপেক্ষা করবে। ওদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা যদি ফিরে না আসি, তাহলে তারা ও জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। মনে পড়ল, ধর্নালি সাহেবরাও আমাদের সঙ্গে এই চুক্তিই করেছিলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই আমরা যাত্রা করলাম। মার্স সাহেবের বরফে জমে জখম হওয়া পায়ের অবস্থা তখনও বেশ খারাপ। কিন্তু সাহেব বাঘের বাচ্চা। সাহেব নিজের থেকেই আমাদের সঙ্গে আসবার জন্য গোঁ ধরেছিলেন, আর সারাটা পথ মুখ বুজে নিজের কর্তব্য করে গেছেন। সারাদিন ধরে আমরা উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। এ এক অসম্ভব কঠিন কাজ। আমরা নেমে যাওয়ার পর নতুন করে এই পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছে। প্রচুর তুষার পড়েছে। আমাদের সেই আগের রাস্তা ঘাট সব তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে। কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। নরম তুষারের আস্তরণ এত পুরু যে, আমাদের শরীর তার মধ্যে দেবে যাচ্ছে। আমাদের বুক পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। সেই এক বুক বরফ ঠেলতে ঠেলতে আমরা অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছি। যে বোঝা আমরা বয়ে চলেছি তাও বড় ভারী। তা একটানা বইবার সাধ্য আমাদের মধ্যে কারো ছিল না। তাই মাঝে মাঝে পিঠ থেকে তা ফেলে দিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে তুষারের উপর শুয়ে পড়ে আমরা খানিকটা করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। অসম্ভব। এ অসম্ভব। ভাবতে লাগলাম, এভাবে কি এগিয়ে যাওয়া যায়? কতটুকু আর যাব? বেশিদূর বোধ হয় এভাবে আমরা যেতে পারব না। অনেকবার সেকথা ভাবলাম। কিন্তু এগিয়েও গেলাম। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার মুখোমুখি আমরা যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে আমাদের আগেরবারের প্রথম শিবিরটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই পুরানো জায়গায় আমরা নতুন করে আর একটি শিবির স্থাপন করলাম।

কিন্তু তাঁবুও আর খাটাতে পারি না। কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। শীতকালে হিমবাহের উপর তাঁবু খাটানো যে কত ক্লান্তিকর সেকথা সেদিন টের পেলাম। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে

যে বোঝা বয়ে চলেছি তা বড় ভারী

আর যেন কখনও না হয়। কি নিদারুণ শীত! যদিও আমরা নাঙ্গা পর্বতের পাদদেশ ছেড়ে খুব বেশি একটা উঠিনি, তবুও আবার এরকম অপরিসীম ঠাণ্ডা আমি আর কখনও, আর কোন পাহাড়ে পাইনি। মার্স সাহেব পরে আমাকে বলেছিলেন, উত্তাপ শূন্যে ডিগ্রী ছাড়িয়ে নীচের দিকে চল্লিশ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। তাঁবুর ক্যাম্বিস, তাঁবুর দাঁড়দড়া সব জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শক্ত হয়ে গেছে। ওগুলো সব যেন লোহার। আমাদের দস্তানাগুলো এমন শক্ত হয়ে গেছে যে, আমরা হাত দিয়ে কোন কাজকর্ম ভালভাবে করতে পারছি না। আবার এও জানি, যদি মুহূর্তের জন্যও হাত থেকে দস্তানাগুলো খুলে ফেলি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হাত আমাদের জমে শক্ত পাথর হয়ে যাবে। অতি কষ্টে সেদিন শেষ পর্যন্ত তাঁবুটা টাঙাতে পেরেছিলাম। অতি কষ্টে আমরা কজন শেষ পর্যন্ত হামা দিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ঢুকতে পেরেছিলাম। অতি কষ্টে একটা প্যান বের করলাম। বের করলাম প্যাক করা স্টোভটাও। স্টোভ জ্বালিয়েও কিছু করতে পারছিলাম না। তুষার গলিয়ে জল বানানো, তারপর সেই জল দিয়ে চা তৈরী। কিন্তু তুষার তো গলে না। স্টোভের আঁচে তুষার একটুখানি গলেছে বটে, কিন্তু গলবার সঙ্গে সঙ্গেই প্যানের মধ্যে আবার জমে যাচ্ছে সেই। জমা বরফের চাড় খেয়ে আমাদের প্যানটাতে চিড় ধরে গেল। আবার একটা প্যান নিলাম। এবার প্যানের মধ্যে তুষার চাপিয়ে স্টোভের উপর বসিয়ে প্যানটা বেশ করে নাড়তে লাগলাম। এমনি করে আমরা চা বানাতে পেলাম। তারপর ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম কি আসে? ঘুমোবার ব্যাগের মধ্যে শরীরটা তো ঢুকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। আমরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের গরম রাখবার জন্য তিনজনে জড়িয়ে-মড়িয়ে শুয়ে থাকলাম। অন্ধকার নেমে এল। বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। তার ক্রুদ্ধ গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তাঁবুটা প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। ফাঁক ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে তুষার। আমরা চোখ বুজে পড়ে আছি। কিন্তু বিপদের এই শেষ নয়। এখানেই চরম নয়। আমাদের নীচে যে হিমবাহ, তাতে বড় বড় ফাট ধরছে। বরফে চিড় খাওয়ার সেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ অনবরত আমাদের কানে এসে লাগছে। শীতকালে বরফ খুব শক্তভাবে জমে। জমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি করে জায়গা সংকুচিত হয়ে আসে। হিমবাহের উপরে বড় বড় ফাটল দেখা যায়। এক বিরাট রাক্ষস প্রচণ্ড আক্রোশে যেন হাঁ করে থাকে। মনোমত শিকার পেলেই গিলে ফেলবে। কে জানে আমরাই সেই শিকার কিনা? আমাদের তাঁবুর নীচে যে বরফ, যে কোন মুহূর্তেই তো তাতে ফাট ধরতে পারে। আর যদি তাতে ফাট ধরে, তাহলেই আমরা খতম।

আমাদের নিজেদের অবস্থাই এই। কিন্তু সে মুহূর্তে নিজেদের বিপদের কথা আমাদের মনে একটুও পড়েনি। আমরা ভাবছিলাম, থর্নলি আর ক্রেস সাহেবের কথা। তাঁরা আমাদের আরও উপরে উঠে গেছেন। ভাবতে লাগলাম, যে প্রচণ্ড সংগ্রাম তাদের করতে হচ্ছে তা যে কোন মানুষের পক্ষেই সহ্যের অতীত। কিন্তু তাঁরা কি এখনও সংগ্রাম করছেন? তাঁরা কি এখনও বেঁচে আছেন?......যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাহলে......মার্স সাহেব মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তার জমে যাওয়া পা দুটোকে গরম করবার জন্য একটু একটু নড়াচ্ছেন। সাহেব হঠাৎ অতি ধীর, অতি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকে কি দিন তা কি জান, তেনজিং?" একটু চমকে উঠেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "না—কোনদিন?" সাহেব বললেন, "খ্রীস্টমাস!" বড়দিন।

আবার সকাল হল। ঠাণ্ডা। বড় ঠাণ্ডা। এ ছাড়া আর কোন অনুভূতি আমাদের বোধ হয় ছিল না। চা বানাতে, খাবারের কয়েকটা টিন খুলতে, আমাদের বুটের ফিতে বাঁধতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নাক ছেড়ে বেরোবার পরই জমে যাচ্ছিল। আমাদের নাক, আমাদের থুতনি বেয়ে লম্বা লম্বা কাঠির মত বরফ ঝুলতে লাগলো। অতি কষ্টে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আবার উঠতে লাগলাম, নীচের থেকে উপরে তুষারের আস্তরণ আরও পুরু। আরো গভীর। আমরা পাহাড়ে উঠছিলাম একথা বলা ভুল। সত্যি বলতে কি, ঘন তুষারের উঁচু এক সমুদ্রে আমরা সাঁতার কাটছিলাম। সেই অবর্ণনীয় অবস্থা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। সাহেবরা কেমন করে যে এই পথে এগিয়ে চলেছেন তা ভাবতেও পারি না। তাঁরা এই জায়গা ছেড়ে যাবার পর এসব জায়গায় আরও তুষার পড়েছে। পুরো এক ঘণ্টা লড়াই করে আমরা মাত্র ১৫০ ফুট উঠতে পারলাম। পরের এক ঘণ্টায় উঠলাম আরও কম। এর মধ্যে মার্স সাহেবের জখমি পায়ের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠল। সাহেব কিছুতেই তা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু আমি দেখলাম, তার পায়ের দফা প্রায় শেষ। আমার আর তাকীবার শক্তিও প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও আরো এক ঘণ্টা আমরা কোনরকমে

একেবারে আগাগোড়া সাদা, বরফে ঢাকা—

পথের দিকে এগোলাম। কিন্তু বৃথা। পণ্ডশ্রম। সেইখানেই থেমে পড়লাম। আমাদের সামনে নাঙ্গা পর্বত দাঁড়িয়ে আছে একেবারে আগাগোড়া সাদা। বরফে ঢাকা। পাগলের মত একবার ভাবলাম, সে কি এখান থেকে চেঁচাবো। কিন্তু চেঁচিয়ে কি হবে, এই তুষারের ভারি পাঁচিল ডিঙিয়ে সে আওয়াজ তো পৌঁছাবেও যাবে না। আর তা ছাড়া চেঁচাব ! আমার সে জোরই বা কই ? ধীরে ধীরে আমরা ফিরতে লাগলাম। নীচে নামতে লাগলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা 'বেস্ ক্যাম্পে' পৌঁছে গেলাম। আঙ্ তেম্পা আর ফু তারকে আমাদের যত্ন করে ধরে নিয়ে এল। খাবার খেলাম। গরম পেলাম। একটু পরেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

পরদিন খুব ভোরে আমি আর আঙ্ তেম্পা কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটলাম, ঘটনাটা বলতে। প্রায় মাঝ রাতে গিলগিটে পৌঁছলাম। এই সমস্তটা রাস্তা আমি আর আঙ্ তেম্পা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে এসেছি। সেনাবিভাগের স্কাউটরা দয়া করে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হল। আর সাহেবদের খুঁজে বের করবার জন্য একটা দলও পাঠালো। সেই দলে ছিলেন সেনাবিভাগের একজন লেফট্ন্যাণ্ট আর ছিল এগারজন সৈন্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা পাহাড়ের কোলে ফিরে এলাম। খানিকটা পথ জীপে করেও এসেছিলাম। কিন্তু এত তোড়-জোড়ও কোন কাজে এল না। আমরা পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর এই যে স্বল্প সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, এরই মধ্যে প্রচুর তুষারপাত হয়েছে পাহাড়ে। আর তাই এবারে লোকজন অনেক থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রথম শিবির পর্যন্তও পৌঁছুতে পারলাম না। কয়েকদিন পরে আমরা নাঙ্গা পর্বত ছেড়ে চললাম। ছেড়ে চললাম জীবনের মত। আর রেখে এলাম আমাদের দুজন বন্ধুকে সেই বরফের বিরাট কবরে। একা নয়, আরও অনেকের সঙ্গেই।

আবার আমরা গিলগিটে ফিরে এলাম। সেনাবিভাগের একখানা হাওয়াই জাহাজ আমাদের দেওয়া হল। হাওয়াই জাহাজখানা পাহাড়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা? কোন চিহ্নই আমরা দেখতে পাইনি। সাধারণভাবে সকলের ধারণা, ১৯৩৭ সালের জার্মান অভিযাত্রীরা যেভাবে তুষার-ধ্বসে প্রাণ হারিয়েছে, এই সাহেবদেরও ভাগ্যে বোধ হয় সেই দশা ঘটেছে। কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হয়, সেই বড়দিনের ভয়ংকর রাতটায় প্রথম শিবিরে শুয়ে থাকার কথাটা। ফট্ ফট্ করে বরফ ফেটে যাচ্ছে। হাঁ করে তেড়ে আসছে হিমবাহের সেই রাক্ষস। গড়ে গড়ে সড়ে সড়ে কানে আসছে বরফ ফাটার আওয়াজ। আমাদের তাঁবুর নীচে ফাটল ধরলে যে অবস্থা হোত, সাহেবদেরও হয়তো তাই-ই হয়েছে। তাদের তাঁবুর নীচে হয়তো বিরাট এক ফাটল দেখা দিয়েছিল আর তাঁবু শুদ্ধ সাহেবরা তলিয়ে গেছেন সেই ফাটলে।

মার্স সাহেবের পায়ের অবস্থা বেশ খারাপই হয়েছিল। কিছুদিন চলতে ফিরতেও তাঁর বড় কষ্ট হোত। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর অন্তরে যে ব্যথা তিনি বয়ে বেড়াচ্ছিলেন তার তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। আমাদের এবারকার অভিযান সম্পর্কে তিনি অনেক আশা রেখেছিলেন। কত নতুন নতুন জায়গায় যাবেন, কত উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করবেন, আরও কত কি ভেবেছিলেন। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। যে কাজই করতে গেছেন, এবারে তাতেই গোলমাল বেধেছে। একটা কিছুতেই সফল হতে পারেন নি। আর শেষকালে সব থেকে প্রিয় তাঁর যে দুজন বন্ধু, তাদের দিয়ে এসেছিলেন মৃত্যুর হাতে সঁপে। দুঃখের বোঝা মনে চাপিয়ে আমরা গিলগিট ছাড়লাম হাওয়াই পথে। তারপর পাঞ্জাবের অমৃতসর। এখানে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখন কি করবে, তেনজিং?"

সাহেবকে একটু চাঙ্গা করবার জন্য আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। তারপর চাইলাম আঙ্ তেম্পার দিকে। ও বড় বেঁটে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা। আর দুলে দুলে অদ্ভুত ধরনে হাঁটে। অভিযানে বেরিয়ে আমরা প্রথম প্রথম ওকে নিয়ে খুব মস্করা করতাম। ওকে বলতাম, হিমালয়ের ভল্লুক। বললাম "সাহেব, আমি আঙ্ তেম্পার নাকে একটা দড়ি পরিয়ে দেব। তারপর ওকে হাটে বাজারে নাচিয়ে নাচিয়ে পয়সা রোজগার করব।"

মার্স সাহেব মৃদু হাসলেন। তারপর বিদায়। বিদায় সাহেব, বিদায়।

(ক্রমশ)

দণ্ডকারণ্য • সলিল ঘোষ
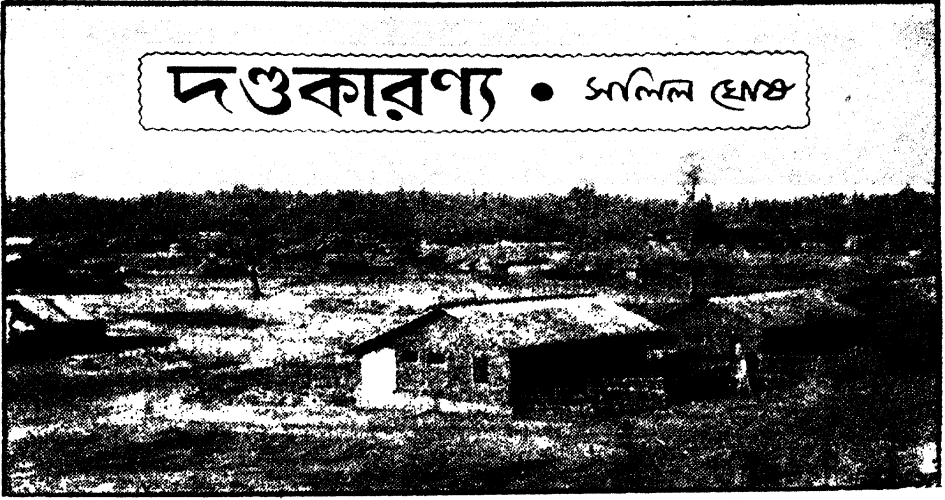
প্রথর গ্রীষ্মের দিবপ্রহর। দন্ডকারণ্যের গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি একলা। সংগী সাথী কেউ নেই। জঙ্গলের গাছপালা পোড়াকাঠে পরিণত হয়েছে। ধূলোতে পিংগল আকাশ গেছে ঢেকে। তপনতাপে দগ্ধ পাতাবিহীন সেগুন ও বাঁশের গভীর জঙ্গলের দৃশ্যটি অতি করুণ অথচ ভয়ংকর। রৌদ্রদগ্ধ এই পার্বত্য অরণ্যের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে চলেছি অদূরবর্তী একটি আদিবাসী গ্রামের উদ্দেশ্যে। নিঃশব্দ অরণ্যের শান্তি-ভংগ শুধু করছে, পায়ের তলায় শুকনো সেগুন ও বাঁশপাতার খস্ খস্ আওয়াজ। জীবজন্তুর কোন সাড়া নেই। কোথাও কোন শীতল স্থান খুঁজে তারা হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছে রাত্রির অপেক্ষায়, উত্তপ্ত ধরনীকে এড়িয়ে। গ্রাম থেকে কানে ভেসে আসছে মাদলের ধ্বনি। হোলির উৎসব শেষ হয়ে গেছে আজ প্রায় দশদিন, কিন্তু এই আদিবাসীদের জীবনে হোলি এখনও শেষ হয়নি, প্রখর গ্রীষ্মও সে উৎসবানন্দ ব্যাহত করতে পারেনি। ভাবছিলাম, শবরীর কথা। রামায়ণে বর্ণিত অনার্যসুন্দরী শবরী, এই অরণ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের দেখা পাবে বলে তপস্যা করেছিল। আশা করে আজীবন প্রতীক্ষা করেছিল, একদিন না একদিন আরাধ্য দেবতা দেখা নিশ্চয় দেবেন।

রামায়ণে বর্ণিত দন্ডকারণ্য বোম্বাই রাজ্যের নাসিক থেকে উত্তরে ডাংগ জিলা পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। নাসিকের সে অরণ্যের এখন আর তেমন কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু বোম্বাই শহর থেকে প্রায় দু'শো মাইল এবং নাসিক থেকে একশো মাইল উত্তরে ডাংগ জিলার পার্বত্য অঞ্চলের দণ্ডকারণ্য এখনও বর্তমান। এই জিলায় "সুবীর" নামে একটি আদিবাসী গ্রাম আছে। নামটির উৎপত্তি রামায়ণের শবরীর উপাখ্যান থেকে এবং শবরী ছিলেন একজন ডাংগ আদিবাসী নৃপ-দুহিতা। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ডাংগ জিলা বা তার আদিবাসীদের বিষয় সাধারণে কোনই খবর রাখত না। এখনও যে এদের বিষয় জনসাধারণ বিশেষ কিছু জানে, তা নয়। দুর্গম পর্বতমালা, সেগুন ও বাঁশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী ডাংগদের বাসভূমি। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও পার্বত্য এলাকার এ রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, এখানকার আদিবাসীরা দিনযাপন করত। তথাকথিত

উৎসব পোশাকে 'ডাংগী' তরুণী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কত রকমের গহনার প্রাচুর্য

অনার্য সুন্দরী শবরীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল পিছনের মেয়েটি, দুঃখভরা গভীর দৃষ্টি ছিল তার চোখে

সভ্যজগতের ছোঁয়াচ এদের একেবারেই স্পর্শ করেনি। অরণ্যসম্পদ দ্বারা সরকার ও অনেক কাষ্ঠ ব্যবসায়ী প্রচুর লাভবান হলেও এই আদিবাসীরা ছিল নিতান্ত গরীব ও অবহেলিত। এদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কোনপ্রকার প্রচেষ্টা সরকার বা সাধারণের তরফ থেকে হয়নি। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সীমারেখায় অবস্থিত ৬৫০ বর্গমাইল আয়তনের এই ডাংগ জিলাকে দাবী করে এখন যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে এই জিলার আদিবাসীরা কিছুই জানে না এবং সে বিষয় চিন্তাও করে না। এই জিলাকে দাবী করে দুই তরফের বিবাদ এখন অবশ্য রাজনীতিকদের এই আদিবাসীদের সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য করেছে। দুতরফই যে এই জিলাকে চাইবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এ অঞ্চলের বনসম্পদ যে কোন রাজ্যেরই লাভের বস্তু। ডাংগ অরণ্যের সেগুন কাঠ ও বাঁশ বিখ্যাত, যার জন্য বাৎসরিক ৬০ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা সরকারের আয় হয়। কয়েকটি মারাঠী সম্প্রদায়ের সহিত ডাংগ আদিবাসীদের আচারে ব্যবহারে কিছুটা মিল আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডাংগ জিলা গুজরাটের সহিত অধিক জড়িত। সেগুন কাঠের ঠিকাদার বেশীভাগ গুজরাটী এবং সব চাইতে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনও ৪২ মাইল দূরে গুজরাটের বিলিমোরা। গুজরাট থেকে ডাংগ জিলাতে আসার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের আমূল পরিবর্তন চোখে পড়ে। গুজরাটের সমতলভূমিতে পাহাড় দেখা যায় না। বিলিমোরা স্টেশন থেকে প্রায় ৫০ মাইল বাসে আসার সময় চোখে পড়বে পাহাড়, আল দিয়ে বাঁধা টুকরো জমি, যা গুজরাটে দেখা যায় না। সেগুন ও বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে বাবুলো গাছের জঙ্গলও টেক্কা দেবার চেষ্টা করছে, ওরই মধ্যে দুচারটা মহুয়া গাছ।

ব্রিটিশ আমলে ডাংগ এলাকা কোন প্রাদেশিক রাজ্যের সহিত সংযুক্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এই অঞ্চল একজন ইংরাজ কমিশনারের অধীনে ছিল। অরণ্যসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারক করার ভার ছিল বনবিভাগের উপর। বিশেষ অনুমতি ব্যতীত এই অঞ্চলে সাধারণের প্রবেশ ছিল নিষেধ। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালে ডাংগ জিলা বম্বে রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়। এই জিলার ৩০৮টি গ্রামের জনসংখ্যা ৪৭,২৮২, এর মধ্যে পুরুষ ২৫,১৯৬ ও স্ত্রী ২২,০৮৬। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার মিশ্রণ ও সমন্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে এই আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন এই ডাংগ জিলাকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত করার জন্য সুপারিশ করলেও গুজরাটীরা এর বিরোধী এবং তাদের মতে ডাংগ চিরকালই গুজরাটের অংশ এবং এখনও থাকা উচিত। সরকারী তরফ থেকে ডাংগ জিলার ভবিষ্যৎ ডাংগ আদিবাসীদের দ্বারাই নির্ধারিত হবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কয়েক বছর বাদে আদিবাসীদের ভোটগ্রহণ করা হবে, কোন রাজ্যের সহিত তারা সংযুক্ত হতে চায় তা জানবার জন্য। এই কারণেই বিগত কয়েক বছরে গুজরাটীরা এই জিলায় গুজরাটী ভাষার প্রচারে উঠে পড়ে লেগেছে, অনেক গ্রামে গুজরাটী স্কুল স্থাপনা করে। অপরদিকে মারাঠীরাও ইদানীং আসরে নেমেছে মারাঠী ভাষার প্রচারে। সহজ, সরল, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ এই আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ভাষাভিত্তিক বিরোধের টানাপোড়েনে এরা যে লাভবান হয়েছে তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

বম্বে রাজ্যের সর্বত্র অনেক বিভিন্ন জাতের আদিবাসীর বাস। অন্যান্য আদিবাসীদের সহিত স্বাভাবিক অনেক মিল থাকলেও ডাংগ আদিবাসীদের মত অমন 'কলারফুল', প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল আদবাসী আমার চোখে পড়েনি, বিশেষ করে এদের মেয়েদের মত। সুন্দর এদের চেহারা, তেমনি বাহারে এদের পোশাক। শাড়ি, উড়নী ও চোলীর বিভিন্ন বিপরীত চড়া রঙের সে কি সুরুচিপূর্ণ সম্মিলন। লাল রঙই এদের সবচাইতে প্রিয়; কিন্তু গভীর সবুজ, হলদে বেগুনী, কালো নীল প্রভৃতি রঙও এদের পছন্দ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কত রকমের গহনার প্রাচুর্য। গলায় রাণী ভিক্টোরিয়া ও পঞ্চম জর্জের টাকার তৈরী ভারী মালার সহিত, গোছা গোছা রঙ-বেরঙের কাঁচের পুঁতির মালা। কানে ঝুমকো, নাকে নোলক, বাহুতে রুপোর ভারী বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে চুড়ির গোছা,

আঙুলে হরেক রকমের আংটি, পায়েও রূপোর মিহি নূপুর। লাল উড়নি পরিবৃত কেশদামও ভূষিত করছে কত রকমের নাজুক গহনা। মুখমণ্ডলে উল্কি করা ছোট ছোট "মোতিফ্"। উৎসবের দিনে বিদেশী 'লিপস্টিক'-এর বদলে মেয়েরা রঞ্জিত করে তাদের অধর, দাঁত, মাড়ি, জিভ্ একপ্রকার গাছের পাতার রসে। অদ্ভুত তার রঙ, অনেকটা 'পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট্' মিশ্রিত জলের রঙের মত। নাকের নীচ থেকে প্রায় চিবুক পর্যন্ত ধ্যাবড়া করে লাগায় এই রঙ অনেক সময়। কাছা দিয়ে শাড়ি পরে, কটিদেশে নাভীর নীচে থাকে। একটু বয়স্ক ডাংগা মহিলাদের দেখলাম, ম্যালেরিয়ার প্লীহা রোগীর মত বড় পেট। কোনপ্রকার ব্যাধি বলে মনে হত, কিন্তু তা নয়। হয়ত আকৃতিক বিশেষত্ব এটা। কারণ যাই হোক, সরকারী চিকিৎসক এরকম যাতে না হয় তার চেষ্টা করছেন। মেয়েদের তুলনায় পুরুষেরা অনেক সাদাসিধে। পরনে সামান্য ছোট সাদা ধুতি, সাধারণ লম্বা, মাথায় [illegible]

[illegible] গাছের শাড়িতে কিম্বা [illegible] এরা খোদাই করে মূর্তি [illegible] জানে, লাল সিঁদুর লেপে দেয় তাতে। [illegible] এরা পূজা করে, পালন করে, হয়ত ডাংগা জংগলের বাঘের ভয়ে। অনেকসময় বহু গ্রামে একটি লোককেও দেখা যাবে না দিনের পর দিন। [illegible] গভীর জংগলে গিয়ে জড়ো হবে কয়েকদিনের জন্যে। পুজো দেবে জংগল দেবতাকে। মুরগী বলি দেবে, নাচগান করবে, মাদল সিংগা বাজাবে। এরা ভূতকেও বিশ্বাস করে। অনেক সময় গ্রামের কোন বৃদ্ধাকে এরা ভূত বা ডাইনী বলে ধরে নেয়। হয়তো কারো অসুখ হল, ওরা মনে করে ডাইনী বুড়ী নজর দিয়েছে এবং তার জন্য বৃদ্ধাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। মদ্যপান নিবারণ আইন এ অঞ্চলে খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এরা পূর্বে মদ্যপান করলেও নিজেরা চোলাই

উৎসবে নাচগান ও ঝাঁড় বোনার কাজ একসংগেই চলছে

করত না। চোরা মদ চোলাইয়ের খবর ডাংগা অঞ্চল থেকে কখনও শোনা যায়নি।

কখনও ভবিষ্যতের চিন্তা করে না এরা। অল্প কয়েক টাকা হাতে জমলেই কয়েকদিন কাজ বন্ধ করে দিন কাটাবে, আমোদে আহ্লাদে হেসে খেলে, নেচে গেয়ে। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার কাজে যোগ দেবে। উৎসব বা নাচগানের আয়োজন হলে ত কথাই নেই। দিনের পর দিন কাজকর্ম খাওয়া দাওয়া ভুলে নেচেই কাটাবে। উৎসব পোশাকে মেয়েরা গিয়ে হাজির হবে বাজারে। [illegible] করে তুলবে [illegible] আবহাওয়াকে, [illegible] ধূলিধূসর [illegible] জংগলে [illegible] রঙের মেলা। উৎসবের কোন বাঁধাধরা দিন নেই। অনেক সময় আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে

অম্বিকা নদীতে স্নান ক'রে খুশিতে হাসছে ডাংগী ছেলেমেয়ে

ছেলেরাও রঙবেরঙের কিম্ভূতকিমাকার মুখোশ পরে নাচে, পাঁচমাথার রাবণ, গণেশ প্রভৃতির সাজে সজ্জিত হয়ে

ৎসব উদ্‌যাপন। প্রধান উৎসব হোলির দনে হাতে পয়সা নেই? ঠিক আছে, এক-াস বাদে কিছু টাকা হাতে এলে তখন হালির উৎসব করা যাবে। উৎসবের প্রধান ঙ্গ হল নাচগান। সারাদিন সারারাত লবে এই নাচ এবং ওরই মধ্যে সেরে ফেলবে দনন্দিন কাজকর্ম। দুপুর বেলা, প্রচণ্ড রম ও প্রখর রোদের মধ্যেও দেখেছিলাম কটি গ্রামের সব আদিবাসীদের জমায়েত তে বৃক্ষছায়ার নীচে। একদল যুবক-বতী নেচে চলেছে, অন্যেরা নাচগান দখতে দেখতে কাজ করে যাচ্ছে। বাঁশের ুড়ি ও টুকরি বানাচ্ছে একপাশে বসে। ানন্দের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের এ কাজে কান একঘেয়েমি নেই। দুটি ছোট্ট মেয়ে লা জড়িয়ে ধরে বড়দের দেখে দেখে খুব াচছে। আরেকধারে একটি ক্ষুদে মেয়ে কালে বাচ্চা ভাইটিকে নিয়ে পায়ে তাল দচ্ছে। আসরে বৃদ্ধাদেরও সাজসজ্জার ক বহর। বয়সের তারতম্য এরা বোঝে না, তাই আবালবৃদ্ধবনিতা একসঙ্গে যোগ দিতে পারে উৎসব আনন্দে। এদের অনেকরকম নাচ আছে, অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী নাচের সঙ্গেও বহু মিল পাওয়া যায়। সাঁওতালী ধরনেও এদের নাচ আছে কিন্তু বৈচিত্র্য অনেক বেশী, হাতধরার কায়দাও অন্যরকম। নাচের দলে দুই একটি বিদূষক অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে মুখোশ পরে, মাদলের তালে তালে নাচে। হাস্যকর এদের পোশাক। নাচের সময় মেয়েদের লাইনের গতির বৈচিত্র্য অনেক জটিল, সর্পিল ও প্রাণবন্ত। দ্রুত লয়ে খুবই চমকপ্রদ। মেয়েদের মত ছেলেরাও অনেক সময় হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে নাচে। আবার ছেলে ও মেয়েদের মিলিত নাচও আছে, তবে সে নাচ অন্যরকম। শুধু ছেলেরাও রঙবেরঙের কিম্ভূত-কিমাকার মুখোশ পরে লাইন করে অনেক সময় নাচে, পাঁচমাথার রাবণ, গণেশ ইত্যাদি আরও কতরকম সাজ নেয়।

ডাংগ আদিবাসীদের মধ্যে কোনও বিবাহ-প্রথা নেই। কোন ছেলের যদি কোন মেয়েকে পছন্দ হয়, তবে সে সোজাসুজি মেয়েকে তার ইচ্ছা নিবেদন করে দুতরফের সম্মতি-ক্রমে একসঙ্গে বসবাস শুরু করতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে যখন খুশী আলাদা হয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারে দুজনেই। এই উপলক্ষ্যে কোন কোন সময় বিশেষ উৎসবের আয়োজনও যে হয় না, তা নয়। কিন্তু তা নির্ভর করে আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। ছেলের দিক থেকে মেয়েকে দেবার জন্য আর্থিক সামর্থ্য হলেই, সে ইচ্ছামত পিতামাতার কাছ থেকে পৃথক হয়ে ঘর-সংসার পাততে পারে। অনেক সময় সন্তান জন্মের পর হয়ত বা বিবাহ উৎসব করা হল। "পেন্" বলে এদের একটি সামাজিক প্রথা আছে। একটি বিশেষ দিনে অনেকে একসঙ্গে 'বিবাহ' করে। এ-উৎসবকে সাথী পছন্দ করে নেওয়ার উৎসব বলা চলতে পারে। অনেক সময় পিতাপুত্র হয়ত একই সঙ্গে একই দিনে 'বিবাহ' করল, এমনও হয়। ডাংগ জিলার সমাজ-সেবকদের মুখে শুনেছি, ডাঙ্গী মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতার কথা। সেই জন্যই সরকারের তরফ থেকে এদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলন করার চেষ্টা হয়েছে। কয়েক বছর আগে উপ-মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীহীরে একবার ডাংগ জিলাতে এক-সঙ্গে সামাজিকভাবে বহু যুবকযুবতীর বিবাহের উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। ইদানীং এই আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই যৌনব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ডাংগ জিলার প্রধান গ্রাম বা তালুকা শহর "আহোয়া"র আধুনিক হাসপাতালের সরকারী চিকিৎসকের মতে বাইরের লোকের দ্বারাই এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে এদের মধ্যে। সেই জন্যই ডাংগ মেয়েদের চরিত্রের দুর্বলতার জন্য দোষী করা ভুল। প্রকৃতির সন্তান এই সরল মেয়েদের জীবন দূষিত করেছে বাইরের লোক।

ডাংগদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে দিন-মজুরী, সেগুন গাছ কাটা ও সামান্য কিছু কৃষিকর্ম। ডাংগ জিলায় মাত্র সাত হাজার একর কৃষি ভূমি, বাকী অরণ্য সম্পদের জন্য রক্ষিত। সরকারের ইচ্ছা ছিল কৃষিক্ষেত্র আরও বাড়ান, কিন্তু বনবিভাগের এতে আপত্তি আছে। কারণ এ অঞ্চলের সেগুন ও বাঁশ জংগল থেকে সরকারের যখন এত আয় হয়, তখন কৃষিক্ষেত্র না বাড়িয়ে বন-সম্পদের জন্যই সমস্ত বনভূমি নিয়োজিত করা উচিত। এ অঞ্চলের সেগুন কাঠ গৃহ-নির্মাণের উপকরণরূপে খুবই প্রসিদ্ধ; অবশ্য এই কাঠের আসবাবপত্র তেমন ভাল হয় না। কয়েকজন বৃক্ষ বিশেষজ্ঞের মতে এখানকার সেগুনকাঠ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। বনবিভাগ এই সেগুন গাছ রক্ষণাবেক্ষণ, বপন ও প্রতিপালন করেন। যে পরিমাণ সেগুনগাছ প্রতিবছর কাটা হয়, আবার সেই পরিমাণ রোপণ করা হয়। এর জন্য এলাকা বা 'Coupe' ভাগ করা থাকে। এইপ্রকার বিভিন্ন 'Coupe'এতে ১০, ১৫, ২০, ৫০ থেকে ৩০০ বছরের পুরানো সেগুনগাছ কাটা হয়। গাছ কাটার পর বর্ষার সময় মাটি যাতে ধুয়ে না যায়, তারজন্য ফাঁকে ফাঁকে কৃষিকার্যের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক এলাকায় এমন কি বিভিন্ন বৃক্ষে নিশানা দেওয়া আছে, কোন সালে রোপিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে দাবানল যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য জংগলের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ও রাস্তার দুপাশের শুকনো পাতা জ্বালিয়ে দিয়ে "নিরাপদ অঞ্চল" স্থাপনা করা হয়, আগুন যাতে এগোতে না পারে।

পূর্বে, এই অরণ্যের আসল মালিক ছিল বিভিন্ন "ডাংগী রাজারা"। ব্রিটিশ আমলে এই রাজারা সরকারের নিকট থেকে ভাতা পেত বনসম্পদের কর হিসাবে। এখনও বম্বে সরকার এইরকম বিভিন্ন [illegible] জন রাজাকে সবশুদ্ধ বাৎসরিক মোট তিন লক্ষ টাকা ভাতা দেন, একটি চুক্তি অনুযায়ী। সেই অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের দাবানল থেকে বনসম্পদ রক্ষা করার ভারও এই রাজাদের উপর, যাদের ডাংগ অধিবাসীদের "প্রধান" বলা চলে। একজন ডাংগীরাজার মতে স্বয়ং শ্রীরাম তাঁর পূর্ব-পুরুষকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে এই অরণ্যভূমি দান করেছিলেন। সেই জন্যই তাঁর অধিকারে সরকারের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। সম্প্রতি একটি ডাংগী রাজার সহিত দেখা হয়েছিল, আমার প্রচুর অনু-যোগ করেছিল। ইংরাজ সরকার তার রাজত্ব কেড়ে নিয়ে ভাতা দিয়েছে, স্বাধীনতার পর, কোন প্রকারে [illegible] সরকার তাকে কোন ভাতা দিচ্ছেন না। কর্তৃপক্ষের নিকট এখনও দরবার করে চলেছেন। [illegible] আমরা [illegible] এদের রাজপ্রাসাদও নেই [illegible] বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না [illegible] সম্ভাবনা। এই রকম একজন রাজার সহিত দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম এবং [illegible] রাজাকে [illegible] রেখেছিল। [illegible] হয়েছিল। রাজকুটীরের অভ্যন্তরে গিয়ে রাণীর দেখা পেয়েছিলাম, [illegible] সহ একই ছাদের নীচে, একই ঘরে। রাজারা তাদের "কারবারী" বা [illegible] মাধ্যমে কথাবার্তা বলেন, [illegible] আত্মীয়-স্বজন। পারিষদবর্গ হয়ে থাকেন। এই পরি-বেষ্টন ভেদ করে বাইরের লোকের পক্ষে রাজদর্শন করা প্রায় অসম্ভব। সরকারের কাছে বিভিন্ন কিস্তিতে প্রচুর ভাতা পেলেও এই রাজাদের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। ভাতার বেশীরভাগই বিভিন্ন উপায়ে আত্মসাৎ করে "কারবারী" ও "ভাও-বন্দা"রা বা বাইরের ব্যবসায়ীরা। এই জন্যই রাজাদের আর রাজার হালে থাকা হয় না। অন্যান্য গ্রামবাসীদের কুটীরের চাইতে তার কুটীরটি আয়তনে হয়ত কিছু বড়। কুটীরে দুটি মাত্র ঘর। একটিতে রাজা ও রাণী, অন্যটিতে তার গৃহপালিত পশু। গৃহ-পালিত পশুকে এরা রীতিমত সম্পদ বলে গণ্য করে এবং মানুষের সহিত পশুদের এরা পৃথক বলে মনে করে না। "তোমার সম্পত্তির পরিমাণ কি?" জিজ্ঞাসা করলে একজন ডাংগী হয়ত উত্তর দেবে, "একটা মহিষ।" আত্মীয়স্বজন, 'কারবারী' রাজার পাছেই থাকে। বিভিন্ন কিস্তিতে সরকারের কাছ থেকে ভাতা নিয়ে ফিরবার সময় সংগে সংগেই রাজারা বাইরের ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে। এরা বিভিন্ন উপায়ে সরল প্রকৃতি এই ডাংগী রাজাদের অর্থ আত্মসাৎ করে; হয়ত ধারের টাকার সুদ হিসাবে

নাচগানের আসরে ডাংগী তরুণ-তরুণী

কিম্বা চড়া দামে রাণীর জন্য শাড়ি বা গহনা বিক্রী করে।

স্বাধীন ভারতে ডাংগ অধিবাসীরা এখন আর অবহেলিত নেই, বরঞ্চ অন্যদের তুলনায় এদের জন্য অনেক কিছুই করা হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে শ্রী বি [illegible] ও শ্রীমোরারজী দেশাইকে নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য। এদের কল্যাণের জন্য বোম্বাই সরকার বিগত কয়েক বছরে যে সব উন্নয়ন পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছেন, কার্যক্ষেত্রে তা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ডাংগ জিলা থেকে সরকারের যা আয় হয়, তা অন্যত্র ব্যয় না করে, এই জিলার উন্নতির জন্যই সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন বলে বোম্বাই সরকার স্থির করেছেন। এক কোটি টাকারও বেশী জমেছে এই তহবিলে। বালকবালিকা ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, উন্নত কৃষিকার্য, বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি, আধুনিক চিকিৎসা, সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি ইত্যাদি আরও কত রকম পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করেছে তা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সর্ব-ব্যাপী এই পরিকল্পনাগুলি আদিবাসীদের জীবনে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যে। স্বাধীনতার পূর্বে এই জিলাতে ছয়টি প্রাথমিক স্কুল ছিল, ছাত্রসংখ্যা মাত্র ২৪৮ জন। পূর্বে ডাংগ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করা মোটেই পছন্দ করত না, স্কুল পলায়নই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু এখন ৯১টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। এর মধ্যে সরকারী স্কুল ৮৮টি, বাকী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে ২৫০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করছে। এদেরই অনেকে ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে শিক্ষকরূপে কাজ করবে। মেয়েদের জন্যও আলাদা হস্টেল আছে "স্বরাজ আশ্রম" পরিচালিত। এই স্বরাজ আশ্রমে, গভীর রাত্রে জংগল ও পর্বত পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রাংগণে বসে, ছাত্রছাত্রীদের প্রার্থনা সভায় রবীন্দ্রনাথের "অন্ধজনে দেহ আলো"র গুজরাটী অনু-বাদে গান শুনেছিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশে তারা মিটমিট করছে। ওই পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অত্যন্ত সংগীত ওই গানটি বহুকাল আমার মনে থাকবে। সর্বত্রই শিক্ষা, থাকা, খাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না। লেখা-পড়া ছাড়াও বিভিন্ন কারুশিল্প, কৃষিকর্ম, মুরগী পালন ও অন্যান্য হাতের কাজও এই সব বিদ্যালয়ে শেখান হয়। "সমবায়

হাসি-কান্না, হীরা-পান্না

গৃহনির্মাণ সমিতি" ডাংগীদের বাসস্থানের অনেক পরিবর্তন এনেছে। এতকাল এদের কুটীর ছিল বসবাসের অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর। গোবরলেপা বাঁশের বেড়ার দেয়াল, ছাদে শুকনো পাতা, বিচালী, অনেক সময় খোপড়া টালি। জমির লেবেলেই মেঝে, উঁচু ভিত নেই। এইরকম কুটীরে ডাংগীরা গৃহপালিত পশুপক্ষী, শিশু-সন্তান সহ একত্র থাকত। এখন বিভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীদের জন্য বহু গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এক একটি গৃহের খরচ প্রায় ১৫০০ টাকা। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই বসতিগুলি। দু' ফুট উঁচু মেঝে, টালির ছাদ, বাঁশের বেড়া দিয়ে দেয়াল, গোবর লেপাও শক্ত। গৃহপালিত পশুদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা। গৃহনির্মাণের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা গৃহ অধিকারীকে শোধ দিতে হবে ১৫ বছর ধরে, বাৎসরিক ৭২, টাকার কিস্তিতে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম, ডাংগীদের এখনকার উপার্জনে এই বাৎসরিক কিস্তি দিতেও তারা অক্ষম। সেইজন্য আরও কম খরচে, অন্য প্রকার বাসস্থান নির্মাণে সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। বিভিন্ন উন্নয়নকার্যে সবচাইতে আমাকে আশ্চর্য করেছিল "আহোয়া"র মত গণ্ড-গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে আধুনিক ও সুবৃহৎ হাসপাতালটি। পাথর দিয়ে তৈরি দোতালা হাসপাতাল আধুনিক চিকিৎসার আয়োজন সম্বলিত অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপাতত ৫৬জন রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে এই হাসপাতালে। ভারতবর্ষের মফঃস্বল শহরেও এরকম আয়োজন সর্বত্র নেই। পূর্বেকার নামেমাত্র হাসপাতালটি ছিল এমন একটি গৃহে যাকে আস্তাবল বলা চলে। এই হাসপাতালের বিছানাতে আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষদের দেখে খুবই ভাল লেগেছিল, কিছুটা খাপছাড়াও মনে হয়েছিল, কেন জানি না। পূর্বে উল্লিখিত ডাংগীদের উৎসবপ্রিয়তা যে কতদূর তা বোঝা যায় এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের কথায়। কয়েকটি খালি বিছানা দেখিয়ে আক্ষেপ করে বললেন,—"এমন দিনে এসেছেন যে আজ অনেক বিছানা খালি। কারণ ডাংগীদের হোলি উৎসব চলছে। রোগীর আত্মীয়স্বজনরা এখানে এসে রোগীদের নিয়ে গেছে গ্রামে। ওরা চায় না যে, রোগীরা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রায় জোর করে নিয়ে গেছে, পরশু আবার ফেরৎ দিয়ে যাবে। এ ধরণের চিকিৎসাতে এখনও এরা অভ্যস্ত হয়নি। রোগীকে হাসপাতালে রাখতে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়। এখনও এদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক ভৌতিক চিকিৎসা বর্তমান। গ্রামের "ভগত" সে তার আদিম কালের চিকিৎসা এখনও চালায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তা কমে আসছে আমাদের চিকিৎসা সহজ-লভ্য হবার পর থেকে।" একটি ডাংগী বাচ্চা মেয়েকে দেখেছিলাম অত্যন্ত রুগ্ন। সারা শরীরে, পেটে কপালে পোড়া দাগ। আদিবাসী চিকিৎসা করেছিল গ্রামের "ভগত", তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে ওই শিশুর অঙ্গে। সরকারী "মোবাইল ডিসপেনসারী"ও আজকাল যায় গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার জন্য এবং স্বাস্থ্যবিধিরও প্রচার করে।

সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন কার্যের বিষয় লিখতে গেলে এই প্রবন্ধ অনেক বড় হবে। সমবায় কৃষিকার্য ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আদিবাসীদের আধুনিক প্রথায় চাষবাসের শিক্ষা দিচ্ছে। এ ছাড়া 'ন্যাশনাল এক্সটেন-শন সার্ভিসে'র বিভিন্ন কার্যকলাপ, গুজরাটী 'স্বরাজ আশ্রমে'র কাজ, মারাঠী 'ডাংগী সেবামণ্ডলে'র বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি, কিম্বা সরকারের মদ্যপান নিবারণ বিভাগের সংস্কার কেন্দ্রে অবসর-বিনোদনের আয়োজন, এই আদিবাসীদের জীবনে নতুন দিনের সূচনা করেছে। এই কল্যাণকর্মযজ্ঞে কোন বিকট বাধা পড়েনি। সেগুন কাঠের জঙ্গলে এতদিন ঠিকাদাররাই শ্রমিকদের উপার্জনের সারাংশ আত্মসাৎ করত। সরকারের উদ্যোগে সমবায় শ্রমিক সমিতিগুলি এখন আর ঠিকাদারদের উপর নির্ভর করে না। গাছ কাটার কাজ এই শ্রমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করে এবং ঠিকাদাররা আর এদের শোষণ করতে পারে না।

ডাংগ দেশটা ঘুরে আসার পর কেন জানি না, যে দেশটার জন্য মনের মধ্যে এমন একটা "সফট্ কর্নার" হয়ে গেছে যে, অন্যান্য কোন দেশ দেখে অমনটি হয়নি। শহরে থেকে এখনও মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে ডাংগের এক একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। দেখতে পাই, প্রখর গ্রীষ্মে ক্ষীণতোয়া ডাংগের পাহাড়ী নদী কল্যাণময়ী "অম্বিকা"র জলে ডাংগী ছেলেমেয়েদের দাপাদাপি, গভীর অরণ্য থেকে বিরাট সেগুন গাছ কেটে ডাংগীরা নিয়ে আসছে "ওয়াঘাই"-এর সেগুনে কাঠের ডিপোতে, দুপুর রোদে ডাংগীদের উৎসবের নাচ। আর মনে পড়ছে ডাংগী মেয়ে "গংগা"র হাসিতে উজ্জ্বল মুখটি। সখীসখা পরি-বেষ্টিতা হয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওদের গ্রামে নাচ দেখাতে। অসম্ভব ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও ভোর হবার আগে ফিরে আসতে পারিনি নাচের আসর ছেড়ে। অনুরোধ করেছিল, আবার আসতে হবে ওদের গ্রামে, এত যে ফটো নিলাম, দেখাতে হবে ওকে। নিজেকে কখনো ফটোতে সে দেখেনি। সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করার সাধ্য আমার নেই। আর মনে পড়ে অনার্য সুন্দরী শবরীকে......

(প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

আমাদেরই কাগজ 'আনন্দবাজারের' স্টাফ রিপোর্টার 'বেগুনের সের এক টাকা' শীর্ষক সংবাদে মাণিকতলা বাজারের পণ্যদ্রব্যের সাম্প্রতিক দর জানাইয়াছেন। ঝিঙ্গা-চিচিংগা হইতে আলু, পটল এবং মাছ ডিম আম কাঁঠালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ দিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"লক্ষ্য করিয়া

দেখিবেন, বাজারে যে যায়, সে পাগল হইয়া আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে বাড়ি ফেরে।" বিশুখুড়ো বলিলেন—"স্টাফ রিপোর্টার এইখানটায় ভুল করেছেন, কিম্বা ভালো শুনতে পাননি। তিনি যে কথাটাকে পাগলের আবোল-তাবোল বলে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা আসলে জয়-হিন্দ, শুষ্ক কণ্ঠে কথাটা আবোল-তাবোলের মতো শুনিয়েছে মাত্র!!"

* * *

বাদেশ যাত্রার প্রাক্কালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীযুক্ত জওহরলাল তাঁহার শ্রোতাদের বলিয়াছেন—তাঁহারা জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই ভারত মাতার সন্তান এই কথাটা যেন মনে রাখেন। শ্যামলাল বলিল—"তা হয়ত সবাই মনে রাখবেন, কিন্তু ভাবনা হলো ভারত-মাতার নিজের, কারণ তিনি শুনেছেন কিনা—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।"

* * *

জহরলালজী তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে কংগ্রেসীদের Middle path ধরিয়া চলিতে বলিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু আমরা বলি, দুর্ঘটনার হাত এড়াতে হলে ফুটপাথ ধরে চলাই বাঞ্ছনীয়।"

* * *

এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের এক সংবাদে জানা গেল, খিদিরপুর অঞ্চলে কোন কোন ডিস্পেন্সারীতে নাকি বিনা লাইসেন্সে ঔষধপত্র রাখা হইতেছে এবং বিক্রয়ও চলিতেছে। প্রসংগত বলা হইয়াছে যে, এইসব ডিস্পেন্সারীতে যেসব ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিতেছেন, তাঁদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কোন ডিগ্রী নাই।—

"কিন্তু তাঁরা Honoris causa ডাক্তার কিনা সে সংবাদ কি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ নিয়েছেন"—প্রশ্ন করেন বিশুখুড়ো।

* * *

পাক সরকার শতদ্রু ও ইরাবতী অববাহিকার জন্য একটি সেচ পরিকল্পনা করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাংকের নিকট দাখিল করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা রূপায়নে ৩০।৪০ বৎসর লাগিবে এবং খরচ পড়িবে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। এই টাকা ভারত সরকারের নিকট দাবী করা হইয়াছে: খালের জল সরবরাহ ব্যাপারে যে-সব চুক্তিশর্ত হইয়াছে, এই দাবী শুনিলাম সেই সূত্রে ধরিয়া করা হইয়াছে।—"কিন্তু চুক্তি-শর্ত না থাকলেই বা কী আসে যায়, ভাঙ্গা খায় ভবানন্দ আর কড়ি গোণে নিধি—এই নীতিতো আর নূতন নয়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আমাদের জনৈক সহযাত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বস্ত্রনীতির কথাটা পাড়িলেন। শ্যামলাল বলিল—"সরকারী

বস্ত্রনীতি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল আছি, সেটা হলো চুড়িদার পাজামা আর গলাবন্ধ কোট, আর কোন কোন ক্ষেত্রে কণ্ঠলেংগটি!!"

* * *

আসন্ন কমনওয়েলথ সচিব সম্মেলনে পাকিস্থান নাকি আবার কাশ্মীর প্রসংগ উত্থাপন করিবেন।—"প্রসংগটা কাশ্মীরী শাল, জাফরান, না হাউস-বোট সম্বন্ধে আলোচনা হবে, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি" বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম ভারত সরকার পাকিস্থানকে "সার" সরবরাহ করিবেন।—"ভারতের অন্য নীতিকথা

পাকিস্থান গ্রহণ না করলেও একটি কথা গ্রহণ করেছেন, সেটি হলো—সারম্ ততঃ গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু!"

* * *

মস্কোতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের এক অভ্যর্থনা সভার সংবাদে শুনিলাম, কোন একটি ভারতীয় শিশুকে মার্শাল বুলগানিন কোলে নিয়া আদর করিতেছিলেন, কিন্তু মঃ ক্রুশ্চেভ তাহাকে কোলে নিতে গেলে শিশুটি প্রথম আপত্তি করে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত সে ক্রুশ্চেভের কোলে গেলে তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, এ একেবারেই ছোট বাচ্চা কিনা তাই সব কথা ঠিকমত বুঝিতে পারে না।—"অনেক ভারতীয় শিশুদের আমরা দেখেছি সব কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরেও মস্কোর কোলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেয়ালা করছে!!"

* * *

হলিউড নাকি স্তালিনের Secret crime সম্বন্ধে একটি ফিল্ম তোলার পরিকল্পনা করিয়াছেন।—"হলিউডের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে, তাই মনে হয় ছবিটি মুক্তিলাভ করলে শুধু House-full নয়, world fool চলতে থাকবে অনেক সগৌরব সপ্তাহ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চক্রদত্ত

জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষকে নানা-রকম কাজ করতে হয়। এমন অনেক রকম কাজ আছে সেগুলো করার সময় নিত্য-ব্যবহার্য পোশাকগুলি অপরিচ্ছন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটা "ওভার অল" বা "কভার অল" ব্যবহার করতে হয়। নৌবহরে যে সব কর্মচারী কাজ করেন তাঁদের জন্য একরকম রবারের "ওভার অল" ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই "ওভার অল"

পাখাযুক্ত "ওভার অল"

ব্যবহারে সুবিধা প্রচুর, কিন্তু অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। ঐ রকম একটি ওভার অল পরলে গরমে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। রবারের জামা পরার জন্য ভিতরে ভিতরে সমস্ত শরীর ঘেমে ওঠে। এখন এই ভিতরের আর্দ্রতা দূর করার জন্য পোশাকটির পেছনে ভিতর দিক থেকে একটি ছোট্ট ফ্যান লাগান থাকে। পাখাটি যখন চলতে থাকে তখন তিন মিনিটের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ আর্দ্রতা কমিয়ে দিতে পারে। পাখাটি ১·৩ ভোল্টের ব্যাটারীতে চলে এবং এইভাবে এটা প্রায় ২৪ ঘণ্টা চলতে পারে।

*
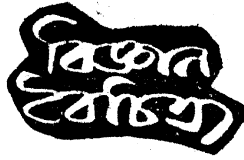
বাঁশির সুরে সাপকে সম্মোহিত করা যায় এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে। শিশুকাল থেকেই শুনে আসছি রাতে বাঁশি বাজাতে নেই, সাপ আসে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, এ বিশ্বাস নিছক ভুল। তাঁদের মতে সাপের শোনার কোনও ক্ষমতাই নেই। অবশ্য সাধারণ সাপুড়েরা যখন সাপের খেলা দেখায় তখন বাঁশি বাজিয়েই সাপকে ভোলাতে দেখি। আসলে কিন্তু এরা সাপকে ভোলায় না, দর্শককে সম্মোহিত করে। সাপ সর্বতোভাবে বধির। এরা শুধুমাত্র মাটির স্পন্দন অনুভব করতে পারে। সাপুড়ের বাঁশির তালে তালে সাপকে মাথা দোলাতে দেখলে এরা যে বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে এ ধারণা আমাদের দৃঢ় হয়। বাস্তবিকপক্ষে এরা বাঁশির আওয়াজে মাথা নাড়ে না, সাপুড়ের মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে মাথা দোলাতে থাকে।

*

দূরবীন দিয়ে আমরা অনেক দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই কারণে শত্রুপক্ষের খবরাখবর রাখতে হলে দূরবীন ব্যবহার করতে হয়। বিশেষত বিমানবহরে দূরবীনের খুব বেশী প্রয়োজন হয়, তবে দূরবীনের সাহায্যে শত্রুপক্ষকে দেখার পর সতর্কতা অবলম্বনের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। আরও কিছু

টুপি সংলগ্ন ছোট্ট রাডার

আগে কোনও উপায়ে শত্রুদের অস্তিত্বের সন্ধান পেলে বিশেষ সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে শব্দ সংকেত হিসাবে রাডার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বড় বড় রাডার এক একটি ঘাঁটিতে রাখা থাকে এবং ঘাঁটি ছাড়ার পর আর শব্দ-সংকেতে কিছু জানার উপায় থাকে না। এইজন্য ছোট ছোট আকারের রাডার অথবা ঐ জাতীয় কিছু যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হলেও উপকার পাওয়া যায়। আজকাল কুড়ি আউন্স ওজনের যে যন্ত্রটি বার হয়েছে সেটি খুবই উপকারী। এই ছোট্ট যন্ত্রটি টুপির সঙ্গে লাগান থাকে আর পরিদর্শক তার কোট সংলগ্ন একটি বোতামের সাহায্যে যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরস্থিত শত্রু-পক্ষের বিমান সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হওয়া যায়। এ ছাড়া রাত্রের ঘন অন্ধকারে অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশেও শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থিতি জানা যায়।

*

চক্ষু পরম ধন। চক্ষুরত্ন নষ্ট হয়ে গেলে জীবনের অর্ধেক মজাই নষ্ট হয়ে যায়। হারানো দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য আজকাল নানারকম বৈজ্ঞানিক উপায় বার হয়েছে। আজকালকার দিনে অনেক মৃত মানুষের চক্ষু নিয়ে অন্যের মৃত চক্ষু পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব চোখ অনেক ক্ষেত্রে চক্ষু-ব্যাংকে রেখে দেওয়া যায়। তবে এখনও অনেক দেশ আছে যারা আজও কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই সব দেশ মৃত মানুষের চক্ষু জমিয়ে রাখার বিরোধী। জাপান এই সব দেশের মধ্যে অন্যতম। জাপানের ডাক্তার কুয়াবারা সম্প্রতি একটি ১৪ বছরের অন্ধ বালিকার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। একটি মুরগীর চোখের মণি দৃষ্টিহীনা বালিকাটির চোখের মণির বদলে বসিয়ে দেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই অস্ত্রোপচার করা হয় এবং তার-পর থেকেই বালিকাটি অল্প অল্প করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে থাকে। এ স্থানের কয়েকজন চক্ষুবিশারদ বালিকাটির চক্ষু ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেই বুঝেছেন যে, বাস্তবিকই বালিকাটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। ডাঃ কুয়াবারা বলেন যে, এইভাবে মানুষে ব্যতিরেকে অন্য প্রাণীর চোখ ব্যবহার করে যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত।

ছোটগল্প

প্রান্তিক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, কমলা প্রকাশ ভবন, ৪১।বি, রসা রোড (সাউথ), কলিকাতা-৩৩। মূল্য—দু' টাকা চার আনা।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় বাংলা কথা-সাহিত্যের পরিসর বর্ধন করেছেন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট, এই যে, কল্পনা সামর্থ্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে তা সহজেই প্রকাশ করতে পারে। ছোট গল্প অপেক্ষা উপন্যাসেই এই গুণটি অধিকতর সুব্যবহৃত হতে পারে—প্রান্তিকের অধিকাংশ গল্প পড়ে এই কথা মনে হলো। এর মধ্যে কোনো-কোনো গল্প উপন্যাসের বীজ বহন করছে। বিন্যাস নৈপুণ্যের দিক দিয়ে হরিনারায়ণ বৈশিষ্ট এক 'সুর' গল্পটিতে তার অপূর্ব উন্মোচন ঘটেছে কেননা এর বিষয় বস্তুও সেই উন্মোচনের সহায়ক হয়েছে। 'পুনর্ভব' গল্পটির সম্ভাবনা উপসংহারের অস্পষ্টতা উপস্থাপনার জন্য ব্যাহত। কিন্তু সমস্ত গল্পই লেখকের খ্যাতির আনুকূল্য করেছে—'প্রান্তিক' সম্পর্কেই এটা উল্লেখযোগ্য। ২০৫।৫৬

দেবীকিশোরী (তৃতীয় সংস্করণ)—মনোজ বসু। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২।০।

'দেবীকিশোরী' মনোজবাবুর পাকা হাতে লেখা ছয়টি ছোট গল্পের সংকলন। লেখকের যেমন পরিচয় দরকার নাই, গল্পগুলিরও তেমন পরিচয় দরকার নাই। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ভাল জিনিস না থাকিলে রসিকজন নিশ্চয় ইহার এত সমাদর করিতেন না। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পূর্ব পূর্ব সংস্করণের মতই শোভন ও সুন্দর হইয়াছে। ১২৬।৫৬

অলংকারশাস্ত্র

বাগ্মানা ও কাব্য—প্রথম খণ্ড : হরিহর মিশ্র। রসসাগর গ্রন্থমালা। প্রকাশক—দেবকুমার বসু, ৫৩জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। ৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য—দুই টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যে বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকের অভাব ছিল না, বরং ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলে তবেই ছাত্রো ভাষার রস গ্রহণের অধিকারী বলে গণ্য হতো। দেবভাষারই কন্যা বাঙলাভাষায় কিন্তু ব্যাকরণ থাকলেও অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক দুর্লভ। কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের 'সাহিত্য রীতি বিচার' এ এদিকে একটা আংশিক চেষ্টা হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য লেখক আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাগ্মানা ও কাব্য-গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। অধ্যাপক শ্রীহরিহর মিশ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান কৃতী ছাত্র, সুধী ও সুবিদ্বান। তাঁর এই আশ্বাসে আমরা পুলকিত হচ্ছি। আমাদের প্রাচীন রসবিচারের নিয়মগুলির বাঙলায় আলোচনা এবং তাদের নিকষশিলায় বাঙলা সাহিত্যের যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকে তিনি যে-সব বিষয় আলোচনা করেছেন, তা' হচ্ছে—শব্দ ও তাহার শক্তি, অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণা, শাব্দী ব্যঞ্জনা, আর্থী ব্যঞ্জনা, অলংকারবাদ ও রীতিবাদের স্বরূপ বিচার। লেখক পাঠক ও বিদ্যার্থী সকলেরই পুস্তকটি কাজে লাগবে। ১/৫৬

ভ্রমণকাহিনী

উত্তরাপথে—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত। স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, ৭৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩্।

লেখক হিমালয় পর্যটনে গিয়ে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও গোমুখী তীর্থ দর্শন করে সেই ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি গিয়াছিলাম জ্বালা জুড়াইতে, তীর্থ করিতে নহে। তীর্থ থাকেন মনে। আমার মনে তখন ছিল শ্মশানের অগ্নি-স্মৃতি। সে-স্মৃতির জ্বালা জুড়াইল বটে, কিন্তু বেদনা গেল না।

জীবন-সায়াহ্নেও দেখিতেছি উহা আছে এবং শেষদিন পর্যন্ত থাকিবেও।"

এদিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থটি সুপাঠ্য। এক সবল দর্শকমন গ্রন্থটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এক স্নেহ-করুণ সৌরভ মনকে আপ্লুত করে। কোথাও সাহিত্য-রচনার ভান নেই। প্রথমেই নিজের পরলোকগতা কন্যার ত্রিবর্ণ ফোটো-চিত্র। ভেতরেও অনেকগুলো দৃশ্য-চিত্রের প্রতিলিপি আছে। আরো আনন্দ হলো—এই গ্রন্থ-প্রকাশে কোনও ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যের ক্ষীণতম চিহ্নও পাওয়া গেল না।

চীন দেখে এলাম—মনোজ বসু—১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ সংস্করণ—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২, ১৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

দেড় বছরে ছয়টি সংস্করণ থেকেই বোঝা যায় সুসাহিত্যিক মনোজবাবু চীন-ভ্রমণের এই সরস ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীটি কিরূপ জনপ্রিয় হয়েছে। তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলেছে বেঙ্গল পাব্লিশার্সের পুস্তকটির অঙ্গ-শোভায় কারু-ব্যঞ্জনা। বাঙলা ভাষায় গল্প উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য পুস্তকের এইরূপ বহুল প্রচার দেখতে উৎসাহিত বোধ করা যায়। ১৩১।৫৬

কাহিনী

কানাগলির কাহিনী—অচ্যুত গোস্বামী। প্রকাশক—বিমল মিত্র, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা আট আনা।

'এ-কাহিনীতে অনেক চরিত্র আছে আর অনেক ঘটনার ভিড়। কিন্তু এমন কোন চরিত্রকে পাচ্ছিনা যাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে পারি ইনি এ নাটকের নায়ক।' কয়েকটি আদর্শ নেতৃবোধ পবিত্র বা ব্যক্তিত্বের চিত্র বইটিতে আছে। উদ্বাস্তু-জীবনের অস্থির ক্ষেত্র থেকে সেই ব্যক্তিত্বগুণ শক্তিসংগ্রহ করেছে। কল্যাণবাবুর চিত্রায়ণ অত্যন্ত স্মরণীয়। কিন্তু বইটির আস্বাদনে সবচেয়ে বড়ো বিপত্তির হেতু তার অসমঞ্জস ভাষা। লেখকের ভাষা-বোধ অপরিণত। বানান-ভুলের প্রাদুর্ভাবেও গ্রন্থটি কণ্টকিত।

'কানাগলির কাহিনী' নিরীক্ষণের পর্যায়ভুক্ত এবং সেটি সিদ্ধিমণ্ডিত নয়। এই বই তবু তাঁর পরবর্তী এবং সম্ভবত সার্থকতর উপন্যাসের বস্তু-সঞ্চয় হয়ে রইলো। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। (৩১।৫৬)

কবিতা

বাউল—চিত্ত সিংহ। প্রকাশক—মুকুন্দলাল মিত্র, সুজনী, ৬৭-এ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থে একজন সম্ভাবনাময় কবিকে পাওয়া গেল। বিশেষ করে 'চিল', 'উত্তর-ভাষণ', 'প্রার্থী', 'চতুর্দশপদী ও বাড়তি পাঁচ', 'তুমি আর আমি', এবং অংশত 'সৃষ্টি' ও 'পরিক্রমা'—এই কয়েকটি কবিতায় সেই সম্ভাবনা প্রতিবিম্বিত। বইটিতে বানান ভুল অত্যন্ত প্রকট। প্রচ্ছদের ছবিটিই তো যথেষ্ট ছিলো, ভিক্টর হ্যুগোর ইংরিজী উদ্ধৃতিটির কি প্রয়োজন ছিলো? বরং ওটিকে অনুবাদ করে দিলেই ভালো হতো। 'বাউলে'র কবির উজ্জ্বল সিদ্ধি আমাদের কাম্য। (১৭।৫৬)

মেঘলা মন—শ্রীবাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যালোক, ১৬১এ, রাসবিহারী এভিনু, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রণব গুহ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চার আনা।

এই গ্রন্থে কোনো স্বকীয় রীতির পরিচয় নেই। অন্যান্য কবিকণ্ঠের অনুসরণে এর কবি ব্যাপৃত। বইটি পড়তে পড়তে কখনো যে সুপাঠ্য লাইনের সন্ধান মেলেনা তা নয়। যেমন—

'উজাড় দেওয়া এক সন্ধ্যার বুকে
বেদের মন্ত্র পড়া,
রঙিন চেলিতে সাজাবে বসুন্ধরা...'

(দুর্মুখের কবিতা)

যে-দৃষ্টান্ত দাখিল করলাম, 'মেঘলা মনে'র পাঠক এরকম আরো খুঁজে পাবেন।

(১৮৭।৫৫)

রুশ সাহিত্য

১। Chapayev-Dmitry Furmanov রুশ থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেছেন George Kittel ও Jearjette Kittel. প্রকাশক—Foreign Languages Publishing House, Moscow. মূল্য— দু' টাকা ন' আনা।

২। Loiking Ahead—Vera Panova, রুশ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন—David Skvirsky. প্রকাশক—Foreign Languages Publishing House, Moscow. মূল্য—এক টাকা চৌদ্দ আনা।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেডের সৌজন্যে এই দুটি রুশ উপন্যাস সমালোচনার্থে এসেছে।

ম্যাক্সিম গর্কি আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের এলাকায় নতুন পৃথিবীর উপযোগী এক নবীন নায়কের সন্ধান করেছিলেন। এই নায়ক দৈনন্দিন জগতের বেষ্টনী থেকে পরিচ্ছিন্ন হবে না, রূপকথার কল্পভুবন থেকে তাঁর উদাহরণ মিলবে না—গর্কির এই কাম্য ছিলো। শুধু যে নায়ক-প্রসঙ্গেই তাঁর এই অভীপ্সা চঞ্চল হয়েছিল তা নয়, যে-কোনো চরিত্র সম্পর্কেই তিনি নিজে এ-অভিপ্রায়ের আনুকূল্য করে গেছেন।

আলোচ্য দুটি উপন্যাসে এই পথ-পরিচয় অস্বীকৃত হয়নি—বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। প্রথম বইটিতে ভাসিলি আইভানোভিচ চাপায়েভ নামক পরিচিত জননেতার জীবন-বিবৃতি—যিনি জনতাকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে লোক-পুরাণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। লেখক ফার্মানভের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এই নেতাকে কোনো দূরস্থ আদর্শের অনধিগম্য পরিমণ্ডলে নিয়ে যাননি—বরং তাঁর এগিয়ে-যাওয়া ও পিছিয়ে-পড়া, তার ভালো ও মন্দ সব নিয়ে যে নিছক সাধারণ মানুষেরই অন্তরবর্তী। অবশ্য এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার প্রাণোচ্ছল প্রবাহবেগ, সারল্য, সুরধর্মিতা

এবং এরকম আরো কয়েকটি অসাধারণ লক্ষণ। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, 'Chavayev' তাঁর পরিকল্পিত মহাকাব্য গুণেরই সম্ভাবনায় আশ্লিষ্ট—কিন্তু যখন এল্ পোল্যাক এই সম্ভাবনার সূত্রে বলেন, 'Chapayev has become a heroic epic of the socialist revolution' সে-উক্তি এই কারণেই মনে হয় যে এপিক নামাঙ্কের অঙ্গীভূত হতে গেলে তার রচনাকাল ও চিরকাল দুয়ের মধ্যে এক বন্ধুত্বের বন্ধন অপরিহার্য। এই কারণেই হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' এপিক পদবী পেতে পারে—যার জীবন সমতল থেকে সঞ্জাত হয়েও এক উন্নীত মহিম মর্যাদায় শিল্পজন্ম লাভ করেছে। 'Chapayev' সেই প্রত্যাশিত মহাকাব্যের অস্থির বস্তুভূমিকা হয়ে রইলো—মহাকাব্য হবার অবকাশ পেলো না।

'Looking Ahead'এর লেখিকা তাঁর সচিত্র পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব-প্রদর্শিত পূর্বোক্ত নীতি অনুসরণ করেছেন—তারা সকলেই মিলিত হয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা রচনা করেছে, আবার তাদের নিজস্ব সুখ-সংযোগও সমান স্বাতন্ত্র্যে স্বীকৃত। [illegible] তাঁর অভিজ্ঞতার মানদণ্ড [illegible] পরিত্যাগ করেননি—তিনি যা দেখেছেন [illegible] দেখিয়েছেন এ বই সে সবের প্রাণবন্ত প্রকাশ। ক্রুজিলিখার কারখানা তার [illegible] ও জনসমাবেশে সুন্দর ফুটেছে। বইটির উপসংহারে সব অতিক্রম করে একটি অপূর্ব [illegible] শোনা যায়—

'At last vague lights appeared through the snow-storm, vague noises rose above the hum of the engine, my place on earth, my drop of blood Kruzilikha! What made me love you, Kruzilikha? You did not nurse me, you did not rear me, and yet I am yours!'

(পৃষ্ঠা ২৯১)

ম্যাক্সিম গোর্কি [illegible] ও আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। [illegible] কিন্তু 'Chapayev' ও 'Looking Ahead' পড়ে সে সম্পর্কে আমরা আশাবাদী হতে পেরেছি।

(২৬৮।৫৬ ও ২৬৮।৫৬)

অনুবাদ সাহিত্য

ধম্মপদ পালি মূল, অন্বয় ও অনুবাদ—শ্রীধর্মজ্যোতি স্থবির ও শ্রীনীলাম্বর বড়ুয়া। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ [illegible] বি এ, [illegible] লিমিটেড, ১, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য [illegible] আনা।

সূত্রপিটক বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের পক্ষে একটি অপরিহার্য অংশ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধম্মপদ নিকায়ের প্রধান গ্রন্থ—ধম্মপদ পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই অনস্বীকার্য। তাছাড়া সাম্প্রতিক পালি-পঠনের ব্যাপারে এই বইটি তালিকাভুক্ত হওয়ায় ছাত্র-সমাজের হিতার্থে এ-বইটির একটি ব্যাখ্যাযুক্ত নির্ভরযোগ্য সম্পাদিত অনুবাদ প্রকাশিত হোক—সংশ্লিষ্ট অনেকেই এই কামনা করেছিলেন। আলোচ্য দুজন অনুবাদক এই কামনা চরিতার্থ করে শুধু তাদেরই নন্, সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ধম্মপদ-পাঠের রূপকধর্মী কাহিনীগুলির সম্যক পরিচয় উদ্ধার করেই তাঁরা বিরত হননি, প্রত্যেকটি শব্দার্থের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখে এঁরা অনুবাদ কর্মটিকে সুপরিচ্ছন্ন করে তুলেছেন। এভাবে যদি তাঁরা বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের বঙ্গানুবাদ করেন তবে পাঠক-সমাজের প্রভূত উপকার হয়। শ্রীধর্মজ্যোতি স্থবির এবং নীলাম্বর বড়ুয়া আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

১৫৭।৫৬

ধর্মতত্ত্ব

গৌর কথা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাকথা। গ্রন্থকারের ভাষা অতীব মধুর। এমন সংক্ষেপের মধ্যে মধুময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার ঔদার্য, মাধুর্য এবং ভাববত্তার ছাপ মনে দেওয়া খুবই কঠিন। সুলেখক ব্রহ্মচারী সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিবেন।

কাকলিধ্বনির মত

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কাকলি ধ্বনির মত শোনা যায়, শুনি—
আমার ঘুমের নম্র শাখায় বসে কোন ফাল্গুনী
পাখি গান গায়, মুগ্ধ আবেশে, শুনি।

অদ্ভুত যুগের পর
কে যেন শোনায় কানে কানে এক অতি পরিচিত স্বর,
মৃদু সৌরভে ভরে ওঠে সারা ঘর।

কার বাহু ঘিরে আমার কণ্ঠদেশে
স্বপ্ন-নিবিড় উষ্ণ-কোমল বিচিত্র আশ্লেষে
বুকে মুখ রাখে—সুগভীর ভালোবেসে।

ঘুম ভেঙে যায়। মুখোমুখি হই দুরন্ত লজ্জায়,
দুঃখও হয়: বুকে তুলে নিই তবু আগ্রহে তায়ঃ
কাঁচা হাতে-লেখা আমারই কবিতা কে রেখেছে বিছানায়!

ভালোবাসা শেষ হয়

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

ভালোবাসা শেষ হয়। স্তব্ধ মধ্যরাতের জ্যোৎস্নায়
ঘুম-পাওয়া বাড়িগুলি পড়ে থাকে অসহ্য মূর্ছায়
যেমন।—রাতের ঘুমে বাধা দিয়ে দূরে ফেউ ডাকে।
কেন শেষ হয়, কেউ বলবে কি?—কেন ব্যথা থাকে?

বিকেলে-জড়িয়ে-নেওয়া ব্যর্থ শাড়িটার ভাঁজে ভাঁজে
পরিশ্রান্ত ভালোবাসা ঘুমায়। যে আশ্চর্য জাহাজে
ভাবনারা ভেসে যায়,—একটি রঙিন পাখি আর
তার সাথে উড়বে না।—ডানা বুঝি ভেঙে গেছে তার।

এই তো আশ্চর্য দীপ জ্বলেছিলো। যা ছিলো যেখানে
সবি যেন পেয়েছিলো দেখার অতীত কোনো মানে।
সেই দীপ নিবে গেলে সব কিছু একাকার, কালো।
ভালোবাসা শেষ হয়।—কখনো কি জ্বলেছিল আলো?

তটভূমি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গ্রাম থেকে এসেছে সোজা যে-ছেলেটি নিমাই-সন্ন্যাসে
নিমাই সেজেছে পরশু, বৌকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রথম
কলকাতায় এলো, কিন্তু বধূটির রকম সকম
গাঁয়েরই মেয়ের মতো—এই দে'খে ময়দানের ঘাসে
অবিকল ঘাস হ'য়ে গেছে সেই নকল নিমাই।
সামনে এসে বিচলিত ছেলেটির মুখ পানে চাই,
আবার নেহাৎ যেন ভুল ক'রে ফেলেছি ভুলোমনে
এইভাবে স'রে এসে যাই ঠিক পিছনে পিছনে:
সন্ত্রস্ত অর্থাৎ সেই সপ্রতিভ ছেলেটি এদিকে
চৌরাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সামলে নিলো সাটিনের শার্ট,
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবে যাত্রায় নেবেনা আর পার্ট।
ট্রাফিকের ঢেউয়ে ঘূর্ণী থমকানো গাঁয়ের মেয়েটিকে
সচেতন ক'রে গেলো দোতলা বাড়ির মতো গাড়ি,
ওধারে পৌঁছেই তা'র মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো হাসি,
আর পিছু-পিছু নয়, এইবার প্রায় পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে শুনেছি স্পষ্ট বলে সেই নারীঃ
'শুনছো! তুমি যা-ই বলো, আমাদের গাঁ অনেক ভালো
এ যেন কেমনতরো, কেন জানি ভয় ভয় করে,
ও যেন কেমন'তরো সারি-সারি ভয়-ভয় আলো,
পায়ে পড়ি ফিরে চলো আমাদের গাঁয়ের শহরে—
এই ব'লে নিঅনের সহস্র মশাল দে'খে ডরে
পটের ছবির মতো মেয়েটি হঠাৎ সংগোছালো
বেণীর সুষমা ভেঙে বিদেশী বোঝাই কালীঘাটে
ঝড়ের সাহস নিয়ে হাঁটে!

'দেবতাত্মা হিমালয়'

মহাশয়,

১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের লেখা "দেবতাত্মা হিমালয় (২য় খণ্ড)"-এর 'কাশ্মীর' শীর্ষক অংশটি পাঠ করিয়া কয়েকটি বিষয়ে ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিলাম। লেখক চেঙ্গিস খাঁ প্রসঙ্গে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

লেখক ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়াছেন, "রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়ে মোঙ্গল দস্যুরাজ চেঙ্গিস খাঁ ছুটে আসছে ভারতের দিকে।" —আমি জানি না লেখক কোন যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া চেঙ্গিস খাঁকে "দস্যুরাজ" বলিলেন। চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন সম্রাট। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুবিশাল মোঙ্গল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল নাম তেমুজিন এবং সম্রাট হইয়া "চেঙ্গিস" অর্থাৎ "পৃথিবী শাসনকারী" উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট হইয়া উপাধি [illegible] ছিল। [illegible] চেঙ্গিস খাঁকে আমরা "দস্যুরাজ" বলিয়া [illegible] সমর্থন করিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন "......লক্ষ লক্ষ হিন্দু, [illegible]" আমরা জানি [illegible] বলিয়া [illegible] চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible]

[illegible] চেঙ্গিস [illegible] মনে হয় লেখকের [illegible] একমাত্র কারণ। চেঙ্গিস খাঁ [illegible] ভারত আক্রমণ করেন [illegible] ইতিহাসকে মিথ্যা [illegible] হইবে।

সর্বশেষে অপর একটি ভুলের কথা উল্লেখ করিতে চাই। [illegible] লিখিয়াছেন, "অতঃপর [illegible] ঐ চেঙ্গিসের বংশধর তৈমুরলঙ্গ।" এই মন্তব্যে সকলেই বিস্মিত হইবেন। চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন মোঙ্গলীয় বৌদ্ধ এবং তৈমুরলঙ্গ ছিলেন তুর্কী মুসলমান। চেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্য ছিল মধ্য এশিয়ায় এবং তৈমুরলঙ্গের রাজ্য ছিল সমরখন্দে। জানি না কোন প্রমাণের সাহায্যে লেখক সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যকে উড়াইয়া দিয়াছেন। নমস্কারান্তে। ৬-৮-৫৬ ইং তাং। বিনীত—বিবেকরঞ্জন দাস, চুঁচুড়া।

লেখকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত 'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,—

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'দেবতাত্মা হিমালয়' রচনায় চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। সাতশো বছর আগে ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানা কোথায় এবং কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল, আজ তার সঠিক হিসাব নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাসবিদ্ বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও পামীর, কারাকোরামের অপর পার এবং আফগানিস্তানে ভারতের সীমানা প্রসারিত ছিল। এই সীমানার বাইরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় চেঙ্গিস খাঁ আপন সাম্রাজ্য-মধ্য এশিয়ায়—সুদূর মঙ্গোলিয়া, উত্তর তিব্বত, পামীরের পরপারবর্তী দক্ষিণ রাশিয়া, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলে সুশৃঙ্খল গভর্নমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকায় প্রত্যেকটি ভূভাগ চেঙ্গিসের আক্রমণের নিকট বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। তিনি ছিলেন মঙ্গোলীয় তাতার, পররাজ্যগ্রাসী এবং পরস্বাপহারী। ধর্মে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু দস্যুজনোচিত বর্বরতা ভিন্ন তাঁর আর কোনও ধর্ম ছিল না। সেই কারণে তাঁর 'নিজ' বিবৃতি থেকেই কয়েক ছত্র আমার রচনায় উদ্ধৃত করেছি। চেঙ্গিস ছিলেন কুতুবুদ্দিন এবং ইলতুৎমিসের সমসাময়িক। ইলতুৎমিসের কালে 'খাওয়ারিজমের' রাজা চেঙ্গিসের ভয়ে পালিয়ে আসেন ভারতবর্ষে, সেই সংবাদে চেঙ্গিস খাঁ 'রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়ে ভারতের দিকে ছুটে এসেছিলেন।' ইলতুৎমিস তখন আতঙ্কিত হয়ে উক্ত 'খাওয়ারিজম-রাজকে' ভারত থেকে সরিয়ে দেন এবং ভারতকে এক নিদারুণ বিপদের থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বর্বরের হাতে সেদিন ভারত সম্পূর্ণ রক্ষা পায়নি। চেঙ্গিস ভারত আক্রমণ করেন এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ উপঢৌকন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। চেঙ্গিসের সৈন্যসামন্ত লুঠতরাজ, নরহত্যা, অগ্নিদাহন, নারীনিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিল বলেই চেঙ্গিসকে 'দস্যুরাজ' বলেছি।

ইতিহাস হোলো গবেষণাসাপেক্ষ, সেইজন্য নতুন নতুন ঐতিহাসিক এসে নতুনভাবে সম্মুখ বিস্তার করেছিলেন। তৎকালে উক্ত একই ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ফলে, যাঁরা ঐতিহাসিক 'চরিত্র'—তাঁদেরও বর্ণবৈচিত্র্য ঘটে। একটি উদাহরণ দিই। সম্প্রতি ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপার নিয়ে পত্রান্তরে আলোচনা করেছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, নানাসাহেব এবং বাহাদুর শাহ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে গৌরববোধ একশো বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি বলেছেন, এ গৌরবের অধিকাংশই অলীক এবং মিথ্যা লোকশ্রুতির ওপরে দাঁড়িয়ে। জাতীয়তাবাদের গৌরব সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তিনি এর নানা প্রমাণপত্র তুলে ধরেছেন।

চেঙ্গিস খাঁর বহু বছর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী চীন সম্রাট কুবলাই খাঁ তাঁর রাজসভায় খৃষ্টান ধর্মযাজক এবং তিব্বতের লামাদলকে আমন্ত্রণ করেন। সম্রাট জানান, যিনি তাঁর ধর্মের 'যোগবিভূতি' দেখাতে পারবেন, তাঁর ধর্মই সম্রাট শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করবেন। খৃষ্টানরা অপারগ হয়, কিন্তু তিব্বতের লামারা মন্ত্রশক্তির দ্বারা সুরাপাত্রকে সম্রাটের অধর স্পর্শ করান এবং সম্রাট সেই সুরা পান করেন। নানা সদ্গুণসম্পন্ন সম্রাট কুবলাই খাঁ তখন সানন্দে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। চেঙ্গিস এবং কুবলাই খাঁর সেই "তাতার মোঙ্গোলিয়ার বংশেরই সন্তান হলেন কুখ্যাত তৈমুরলঙ্গ—ভাবী মোগল সম্রাটদেরই পূর্বপুরুষ।" তৈমুরের রাজ্য ছিল সমরখন্দে,—সমরখন্দ মধ্য এশিয়ারই অন্তর্গত। চেঙ্গিসের অর্থ 'পৃথিবীশাসনকারী'—একথা সত্য। চেঙ্গিস খাঁ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শননীতির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শত্রু ছিলেন।

চেঙ্গিসের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে যিনি তর্ক তুলেছেন, তাঁর দোষ দিইনে। খানকয়েক সুলভ স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের বাইরে আমাদের ইতিহাসের জ্ঞান বেশিদূর পৌঁছয়

।। আমার রচনায় কোনও 'ভুলভ্রান্তি' আবিষ্কার করার আগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের রচনা ও বিবরণ কিছু কিছু আলোচনা করে নিলে ভালো হোতোঃ ডাঃ কালিদাস নাগ, স্বামী অভেদানন্দ, তামিল-সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ, সোয়েন হেডিন, ইয়ংহাসব্যান্ড, স্পার, ডিজি ইত্যাদি। এ'রা বহু বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ইতি—প্রবোধকুমার সান্যাল।

॥ ২ ॥

'দেশ' সম্পাদক মহাশয়েষু,

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠের 'দেশে' শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কাশ্মীর' শীর্ষক লেখাটি পড়লুম। এক জায়গায় এসে আমার খটকা লাগল। তাই দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে কিছু বলার অনুমতি চাইছি। (১) ২৬শে জ্যৈষ্ঠের 'দেশে'র ৪৫৭ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমেই তিনি লিখেছেন 'কাশ্মীরের বিমান বিভাগে বাঙ্গালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাহজনক।' কাশ্মীরের বিমান বিভাগ বলতে কি তিনি কাশ্মীর সরকারের অধীন বিমান বিভাগ না ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাশ্মীরস্থ শাখাটির কথা বলেছেন? যদি কাশ্মীরের নিজস্ব কোন বিমান বিভাগের কথা বলে থাকেন (মনে হয় আমার এ অনুমান ভুল) তাহলে সবিনয়ে একথা বলতে পারি যে কাশ্মীর সরকারের নিজস্ব কোন বিমান বিভাগ নেই। ভারতীয় বিমান বাহিনীরই একটি শাখা কাশ্মীরের জম্মু এবং শ্রীনগরে পর্যায়ক্রমে থাকে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যেত কিন্তু নিরাপত্তারক্ষার জন্য বলা সম্ভব হোল না। যদি তিনি কাশ্মীরের বিমান বিভাগে বাঙ্গালী থাকা নিয়ে গৌরববোধ করে থাকেন, তাহলে এটুকু বলতে পারি তাঁর পরিচিত শ্রীযুক্ত গুপ্ত একা সেখানে নেই—আরো বহু বাঙালী সেখানের স্থল এবং বিমান বাহিনীতে রয়েছেন। বিমান বিভাগের শাখাগুলি সারা ভারতবর্ষে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কাজেই যাঁরা এই বিভাগের চাকুরে, ট্রান্সফারেবল চাকরি হওয়ার দরুণ ভারতময় তাঁদের ঘুরতে হয় এবং বলাবাহুল্য কাশ্মীরেও যেতে হয়। শ্রীগুপ্ত নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন।

বিমান বিভাগে বাঙ্গালী থাকার ব্যাপারে উৎসাহজনক যদি কিছু থাকে তাহলে জানাই যে, সমস্ত বিমান বাহিনীতে বিস্তর বাঙ্গালী আছেন। এ'দের মধ্যে এমন বৈমানিকও আছেন যাঁরা গত কাশ্মীর যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছেন। বিগত মহাযুদ্ধে এবং কাশ্মীর অপারেশনে বীরত্ব দেখিয়ে মিলিটারী পুরস্কার ও বর্তমানে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত সম্মানসূচক পদকলাভ করেছেন এমন দু'চারজন বাঙ্গালীও যে নেই তা নয়।

(২) আমার দ্বিতীয় বক্তব্যটি হোল পরবর্তী কয়েকটি পংক্তির বিষয় সম্বন্ধে—'সত্যি বলতে কি ....বছর হতে চললো।' এ সম্বন্ধেও কয়েকটি বলবার কথা আছে। ত্রিশ বছর আগে বাঙ্গালীর হাতে তৈরী যে বিমান বিভাগটি প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে সেটি নিশ্চয়ই কোন অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা হবে। আজকাল ভারতের প্রায় সব বড়ো বড়ো শহরেই শৌখীন ফ্লাইং ক্লাব আছে। হয়তো ত্রিশ বছর আগে বাঙলা দেশেই এর গোড়াপত্তন হয়। এ ক্লাবগুলির সঙ্গে কিন্তু ভারতীয় বিমান বাহিনীর কোন যোগাযোগ নেই। বরঞ্চ এগুলির সঙ্গে ডাইরেকটার জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। ভারতীয় বিমান বাহিনী ত্রিশ বছরের পুরনোও নয় এবং বাঙ্গালীর হাতে এর সৃষ্টিও নয়। বিমান বাহিনীর বয়স গত ১লা এপ্রিল, ১৯৫৬তে ২৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই বিভাগটি সৃষ্টির ইতিহাস আছে—সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সৈন্যবাহিনীতে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগের জন্য তদানীন্তন সরকারকে চাপ দেওয়া হতে থাকে। উদ্যোক্তাদের ভাবনা ছিল, স্বাধীন হবার পর ইংরেজ চলে গেলে সেনা বাহিনীকে চালাবে কে? ভবিষ্যতের ভাবনাই তাঁদের চাপ দিতে বাধ্য করে। ফলে ১৯২৯ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ ছয় জন ভারতীয় নেতাকে নিয়ে একটি 'স্কেলিটন কমিটি' গঠিত হয়। এ'দের সুপারিশক্রমে জনকয়েক ভারতীয় ক্যাডেটকে নির্বাচিত করে ইংলন্ডের ক্রনওয়াল কলেজে পাঠানো হয় বিমানচালনা বিদ্যা শিক্ষার জন্য। বিমান বাহিনীর বর্তমান সর্বাধিনায়ক সুব্রত মুখার্জিও এ'দের মধ্যে একজন ছিলেন। এ'দের শিক্ষা সমাপ্ত হলে আরো নতুন একদল শিক্ষার্থীকে পাঠানো হয়। এইভাবে কিছু ক্যাডেটের উপযুক্ত শিক্ষার পর ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর পত্তন হয়। প্রথমে এর কাজ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আফ্রিদি গ্রামগুলির উপর টহল দিয়ে বেড়ানো। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে এ'দের কাজ শুরু হয় এবং বিমান বাহিনীর কয়েকটি 'স্কোয়াড্রন' বহু-রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়। সেখানে তাঁরা প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তদবধি এই বিভাগটির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিমান বিভাগটি গড়ে তোলার ব্যাপারে একা বাঙ্গালী নয়, সকলেরই সমবেত প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে এবিষয়ে বাঙ্গালীর অবদান অন্য কারো চেয়ে কম তো নয়ই, বরং কয়েক ক্ষেত্রে অন্যান্যকে ডিঙিয়ে গেছে। যেমন ধরুন স্বর্গীয় উইং কমান্ডার করুণকৃষ্ণ মজুমদারের কথা। ১৯৪৫ সালে লাহোরে 'এয়ার ডিসপ্লে'র সময় এক বিমান দুর্ঘটনায় ইনি মারা যান। জীবিতকালে এ'র তুল্য সুদক্ষ বৈমানিক সারা পৃথিবীতে খুব কম ছিল। তাছাড়া ভারতীয় বিমানসেনাদের সুযোগ-সুবিধা বৃটিশ সেনাদের তুল্য মূল্যে করার ব্যাপারে ইনি তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যথাসাধ্য লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভও করেন। বস্তুত এ'র অবর্তমানে বিমান বিভাগের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এ'র ব্যক্তিগত অবদান ছাড়াও আরো অনেক বাঙালী আছেন যাঁরা নানাভাবে বিমান বাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ'দের নামধাম বিবরণ দিতে গেলে কেউ কেউ বাদ পড়ে যেতে পারেন, এই ভয়ে আর দিতে সাহস করলুম না। মোটকথা বিমান বিভাগ সৃষ্টির মোটামুটি ইতিহাস এই। নমস্কারান্তে ইতি—কশ্চিৎ প্রাক্তন সৈনিক, কলকাতা।

—শৌভিক—

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

ছাপার অক্ষরের মধ্যে দিয়ে যারা চেনেন তাদের কাছে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের সবায়েরই মিলিদি। বুধবার ২০শে জুন বেলা ১২-১০এ দ্বিতীয়বার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগে থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে বাঙলার চিত্রজগতের সবায়েরই এবং তারও আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যে থেকে দেশের কাজ করার সময়েও দেশকর্মীদের সকলেরই তিনি ছিলেন মিলিদি। আশপাশের সকলকে একটা সহজ স্নেহে আকর্ষিত করে নেওয়ার এমন ক্ষমতা কজনের মধ্যেই বা পাওয়া যায়! পাটনার স্বর্গত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা; নিকট আত্মীয় পরিজনের অনেকেই দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন। ডিগ্রী পাশ পর্যন্ত পড়া মেয়ে যখন সুলভ ছিল না সুপ্রভা তখন গ্রাজুয়েট হবার জন্য পড়তে থাকেন। আবার দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান যখন মেয়েদের মধ্যে ততোটা সরগর হয়নি সে সময়েই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেই পড়া শেষ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই যে এগিয়ে চলার অভ্যস্ত উৎসাহ এটা তাঁর শিল্পী জীবনেও প্রণোদিত হয়ে ওঠে। থিয়েটার সিনেমার অভিনয়ে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের যোগদান যখনো লজ্জা ও আতঙ্কের বিষয় ছিল ঠিক তেমনি দিনেই তিনি ১৯২৭ সালে, মধু বসুর পরিচালনায় ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের "আলিবাবা" নাটকে ফাতিমার চরিত্রে অভিনয় করে গোঁড়াদের সে আতঙ্ক দূরে করে দিতে এগিয়ে আসেন। গোঁড়ামী তখন কি রকম ছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যায়! "আলিবাবা"তে মর্জিনার মুখে 'মিনসে' কথাটায় সে সময়ে ঘোরতর আপত্তি ওঠে। মর্জিনার মুখে 'মিনসে' বলে ধরা হলোনা, ধরা হলো অভিজাতবংশীয়া অভিনেত্রী কথাটা বলবেন কি করে! সেই লজ্জায় যেন কলকাতার সারা অভিজাত সম্প্রদায়ের মাথা কাটা যাবার উপক্রম। কথাটা শেষ পর্যন্ত বদলে দেওয়াই হয় এবং তা নিয়ে সে সময়ে কাগজে মন্তব্যও বেরিয়েছিল। তবুও সুপ্রভাদের মঞ্চাভিনয়ে সেই অবতরণ ভদ্র পরিবারের মেয়েদের অভিনয় করতে নামার আতঙ্ক অপনোদনের সহায়ক হয়। তারও প্রায় বছর দশেক পরে সুপ্রভা ঐ একই চরিত্রে "আলিবাবা"র চিত্রসংস্করণে অবতরণ করেন। অবশ্য ছবিতে তার আগে তিনি অভিনয় করেন "চোখের বালি"তে বিনোদিনীর ভূমিকায়। সেই থেকে তিনি শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং একটি বড়োগোছের কৃতিত্ব হচ্ছে জাঁ রেনোয়ার আন্তর্জাতিক চিত্র "দি রিভার"এ ধাইমার চরিত্র, কোন ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে যে সুযোগলাভ একটা অভূতপূর্ব ব্যাপারই বলা যায়।

• • •

শতাধিক ছবির যে ভূমিকায় যতটুকু ক্ষণের জন্যেই তাঁর অবতরণ হোক না কেন এমন একটা নিবিড় ব্যক্তিত্ব তিনি হাজির করে দিতেন যা দর্শকমাত্রেরই মনের ওপরে গভীর রেখাপাত না করে পারেনি। শতাধিক চরিত্রে অবতরণ করে একটিবারও তিনি কি দর্শক, আর কি সমালোচক, কোন পক্ষ থেকেই কখনো অভিনয়ের জন্য প্রশংসা ছাড়া বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখে পড়েননি। একটানা প্রশংসা পেয়ে যাওয়ার এমন রেকর্ড আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে পড়ে না। মন্দিরা-নিক্কণ এমন একটা দরদী কণ্ঠস্বর তাঁর ছিল যা দর্শকমাত্রেরই মর্মস্থলে আবেগ ঝঙ্কৃত করে তুলতো। সাধারণত তিনি মমতাময়ী মা, দিদিমা, ঠাকুমা, পিসিমার চরিত্রেই অভিনয় করতেন এবং প্রধানত কণ্ঠের জন্য তাঁকে মানাতও বড়ো ভালো। তবে রুষ্টা অভিমানক্ষুব্ধা তেজস্বিনী; দৃঢ়সংকল্পা নারীর চরিত্রেও তিনি কৃতিত্ব রেখে গিয়েছেন। চট্ করে প্রভাব বিস্তার করার অদ্ভুত নাটকীয় স্বর ও ভঙ্গীই ছিল তাঁর। তাই কোন চরিত্রে তাঁকে গ্রহণ করতে কখনো কোন পরিচালককে সংশয়ে পড়তে হয়নি। শেষ জীবনে সুপ্রভা সাধারণ মঞ্চে কিছুদিনের জন্য যোগদান করেন। রঙমহলের "উল্কা" আরম্ভ হবার গোড়ার কিছুদিন তাঁকে দেখা গিয়েছিল এবং মঞ্চে সেই তাঁর শেষ অবতরণ।

ছবিতে তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে "শুভরাত্রি"তে।

* * *

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি বাঙলা দেশের বাইরেও ছিল। "দি রিভার"এ অভিনয় করে তো তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতিই লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর গুণের জন্য সরকারী মহলেও খাতির ছিল। বেতার ও তথ্য পরিষদের উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম চলচ্চিত্র চক্রপাঠিতে প্রবন্ধ পাঠে যোগদানকারীদের তিনি অন্যতমা ছিলেন। কলকাতার অভিনেতৃ সংঘের তিনি সহ-সভানেত্রী ছিলেন এবং আরও কয়েকটি নাট্য ও অন্যাবিধ সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্টা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও একমাত্র পুত্র রেখে গিয়েছেন।

কথক নৃত্যের অনুপম প্রয়োগ

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে দিকে দিকে যে নতুন দিনের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে তার আভাস কিছু কিছু ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এই উদ্দীপনার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে পাশ্চাত্যের প্রভাবকে গা থেকে নামিয়ে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের শাল-দোশালা চাপিয়ে নেবার চেষ্টা। বর্তমানে ক্লাসিকাল সঙ্গীতাদির দিকে যে বিপুল ঝোঁক দেখা দিয়েছে তার মূলে ঐ কথাই রয়েছে। ক্লাসিক জিনিসকে পুনঃপরিবেশনের দিকেও যেমন ঝোঁক, যেমন ঝোঁক ক্লাসিকের চর্চায়, তেমনি বর্তমানকালের মতো করে সাজিয়ে ক্লাসিক ধারার প্রয়োগেও ঝোঁক ঝুঁকেছে। তার অনেকগুলি উদাহরণ তুলে ধরা যায়, তবে গত শনিবার ইণ্টালির ক্যাথি হাই স্কুল হলে নীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় পরিকল্পিত ও রূপায়িত কথক নৃত্যের মাধ্যমে বুদ্ধ জীবন-চরিত "মার-বিজয়"এ যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল তার মধ্যে অনবদ্যতার এমন সব উপকরণ রয়েছে যে স্বতস্ফূর্তভাবেই বাহবা বেরিয়ে আসে। একটা পুরো পালা কেবলমাত্র কথক-নৃত্যের সাহায্যেই মঞ্চস্থ হতে আগে দেখা গিয়েছে বলে মনে পড়ে না। এ অভিনবত্ব তো আছেই, তাছাড়া এতো রকমের প্রচলিত ও দুর্লভ তাল মাত্রা নাচের ছন্দে ব্যবহার করা হয়েছে যা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ওস্তাদ-দেরও বিস্মিত না করে পারে না।

* * *

ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পক্ষ থেকে নৃত্য নাট্যটি পরিবেশন করেন অমূল্য চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা করেন সুশীল গুহ। পাঁচটি অঙ্কে প্রায় আড়াই ঘণ্টার নৃত্যনাট্য। প্রথম অঙ্কে গৌতমের জন্ম; দ্বিতীয় অঙ্কে বিবাহ, তৃতীয় অঙ্কে নগর ভ্রমণ ও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দর্শন লাভ থেকে গৃহত্যাগ; চতুর্থ অঙ্কে ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান-পিপাসা এবং পঞ্চম অঙ্কে ইন্দ্রিয়বিজয়

ইণ্টালি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোগে পরিবেশিত নলিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় পরিকল্পিত ও রূপায়িত কথক-নৃত্যের মাধ্যমে বুদ্ধ-জীবনী অবলম্বনে নৃত্য-নাট্য 'মার-বিজয়'এর একটি দৃশ্য

ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। মোট তেরজন শিল্পী এই নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করেন। বাজনার মধ্যে ছিল প্রধানত তবলা এবং তার সংগে পাখোয়াজ, সরোদ ও সেতার। নাচের মধ্যে আগাগোড়াই ছন্দ-বৈচিত্র্য। এক একটি দৃশ্যে এক একটি চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন তালমাত্রার নাচে দর্শকমনে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে সারাক্ষণ। চরিত্রের ভাব ও ক্রিয়া এবং ঘটনা অনুযায়ী তাল ও মাত্রা তার মাঝে মাঝে মুখে মুখে কথকের বোল বলে যাওয়ার এমন একটা প্রভাব এনে দেয় যে দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাবার আর অবকাশই পাওয়া যায় না। কোন আবহ বিবৃতি নেই কিন্তু এমনি ভঙ্গী যে কাহিনী বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রায় বিশ রকমের তাল এবং ৪ থেকে ১৬ মাত্রা পর্যন্ত প্রয়োগে এমনভাবে নাচের ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে যাওয়া হয়েছে যে মন অলস হবার একটু মাত্রও ফাঁক পায় না কোনখানে। পোষাক ও আলোকপাতে যথেষ্ট খামতি পরিলক্ষিত অবশ্য হলো, কিন্তু নৃত্য-ছন্দের এমনি প্রস্রবণ যে ওসব খামতির জন্য মনে খুঁৎ ধরিয়ে রাখার অবকাশ পাওয়া যায় না। পোষাক ও আলোকপাত, শ্লোক গান ইত্যাদি ঠিক করে আর সঙ্গীতের দিকটা আরো সাজিয়ে উপস্থিত করতে পারলে এ নৃত্য-নাট্য নিয়ে বাজার মাৎ করে দেওয়া যায়। একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে ইদানীং যতোগুলি নাটক বা নৃত্য-নাট্য কলকাতায় পরিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে আঙ্গিকত্বে, মৌলিকত্বে এবং নৃত্য-সম্পদে নলিন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মার-বিজয়' মনোজ্ঞ সৃষ্টি। বছর দশেক থেকে বছর পনের-ষোলোর মেয়ে এবং জন তিনেক তরুণকে নলিন গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে তৈরী করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এদের মধ্যে মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় গতবার বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে এককভাবে কথক নাচ দেখিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন, তাছাড়া আছেন চন্দ্রা, ছন্দা, রত্না, শুক্লা, দীপালী, চন্দ্রা, উমা, ছবি, সীতা, শম্ভু ও কুণাল।

একলব্য

কলকাতা ফুটবল লীগের চারটি বিশিষ্ট দল ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান ও এরিয়ান ক্লাব রেফারীদের খামখেয়ালী ও মর্জিমাফিক খেলা পরিচালনার বিরুদ্ধে আই এফ এর কাছে অভিযোগ করে এক চরম পত্র প্রেরণ করায় লীগ খেলায় এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির মীমাংসা না করলে লীগে ১৯৩৯ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবারও সম্ভাবনা আছে। স্মরণ থাকতে পারে, ক্লাব বিশেষের প্রতি রেফারীর পক্ষপাত-মূলক আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৩৯ সালে মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান ও কালীঘাট ক্লাব আই এফ এর কাছে 'প্রতিবাদ' জানায়। এরিয়ান ক্লাব শেষ পর্যন্ত তাদের 'প্রতিবাদ পত্র' প্রত্যাহার করে। মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাট ক্লাবের উদ্যোগে বি এফ এর (বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন) সৃষ্টি হয়। পরলোকগত নলিনীরঞ্জন সরকার হন বি এফ এর সভাপতি। আই এফ এর কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী বি এফ এ পৃথক-ভাবে লীগ ও লর্ড ব্রাবোর্ন কাপের খেলার ব্যবস্থা করে। পরে অনেক আলাপ আলোচনার পর আই এফ এ ও বি এফ এর মধ্যে গণ্ডগোলের অবসান হয়।

যদিও আমরা বিশ্বাস করি, আই এফ এ, রেফারী এসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন ক্লাব-কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা এবারও বিষয়টি মীমাংসা করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়, তবুও সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আই এফ এর পরিচালনা ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও গলদ আছে এবং রেফারীদের খেলা পরি-চালনার মধ্যে বহুদিন আগে যে 'ঘুণ' ধরেছিল, সেই ঘুণ আজ দেখা দিয়েছে দুষ্ট-ক্ষতের আকারে। কলকাতা রেফারী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত যিনি আজ বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে কিভাবে খেলা পরিচালনায় উন্নতি করা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য যেকোন ব্যক্তির পরামর্শ আহ্বান করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ১৯৩৪ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলা পণ্ড হয়েছিল কেন? কে আর আর ও ডারহামস লাইট ইনফ্যাণ্ট্রির মধ্যে সেই ফাইন্যাল খেলার তিনিই কি বহু নিন্দিত পরিচালক নন? কেনই বা ১৯৩৯ সালে বি এফ এর সৃষ্টি হয়েছিল? ১৯৫২ সালে মোহনবাগান এবং রাজস্থানের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত থাকবারই বা কারণ কি? প্রতি ক্ষেত্রেই রেফারীদের উদ্দেশ্যমূলক এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ নয় কি? তাই ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান ও এরিয়ানের আজকের অভিযোগ কোন নতুন ঘটনা নয়। রেফারীদের খেলা পরিচালনার ব্যাপারে এ অভিযোগ বহুদিনের। রেফারীদের পরি-চালনার ভুলে বহু ক্লাবকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে। আই এফ এর দরবারে তারা অভিযোগও করেছে। প্রতিকার কিছু হয়নি, রেফারীর বিরুদ্ধেও গ্রহণ করা হয়নি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। আবহ-মান কাল ফুটবল খেলায় যেখানে এই নীতি সেখানে উন্নতি আশা করা যায় কি-ভাবে? সেখানে কোন সৎ পরামর্শ গৃহীত হবে কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

* * *

কলকাতার ফুটবলের আজকের এই অবস্থার জন্য রেফারীই শুধু দায়ী নন। নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ, বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং দর্শক সাধারণও এর জন্য সমভাবে দায়ী। প্রথমে আই এফ এর কথা ধরা যাক।

রেফারীদের বিরুদ্ধে খাম-খেয়ালী ও মর্জিমাফিক পরিচালনার অভিযোগ এনে চারটি ক্লাবের পক্ষ থেকে যে চরম পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: ২১শে জুন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে আই এফ এর পক্ষ থেকে খেলা পরি-চালনার উন্নতির প্রতিশ্রুতি না দিলে স্বাক্ষরকারী চারটি ক্লাব লীগের পরবর্তী খেলায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

এই পত্র পাবার পর আই এফ এর লীগ কমিটির যে সভা হয়, তাতে রেফারীদের খেলা পরিচালনা ভাল হচ্ছে না বলে স্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু চরম পত্রের কোন কোন অংশকে সভা আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে এই পত্রে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে—রেফারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অস্পষ্ট, অপর্যাপ্ত এবং এলোমেলো। রেফারীদের খেলা পরিচালনা ভাল হচ্ছে না, একথা স্বীকার করেও লীগ কমিটি যে-ভাবে অভিযোগপত্র আলোচনা করেছেন, তা কিছুটা পরস্পরবিরোধী। লীগ কমিটির মন্তব্যকে চারটি ক্লাবের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগও বলা যায়। নিয়ামক সংস্থা যদি উপলব্ধি করে থাকেন, খেলা পরিচালনা ভাল হচ্ছে না তবে সেইটাই যথেষ্ট। ক্লাবের অভিযোগ অমূলক হলেও এ সম্বন্ধে তাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে। বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবার অর্থ প্রকারান্তরে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। রেফারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি এটা বড় কথা নয়; রেফারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে কিনা সেইটাই বড় কথা। প্রমাণাভাবে খুনের আসামীও খালাস পায়, কিন্তু আসামী খালাস পেয়েছে বলে কোন খুন হয়নি, একথা প্রমাণ হয় না। তাই আই এফ এ-র পরিচালকবর্গ সত্যই যদি উপলব্ধি করে থাকেন, খেলা পরিচালনা ভাল হচ্ছে না, তবে অভিযোগের অপেক্ষা না রেখে নিজেদেরই এর প্রতিবিধানের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এ পর্যন্ত তারা কোন ব্যবস্থা করেছেন কি?

এক্ষেত্রে ক্লাব কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও কম নয়। বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিকে নিয়েই আই এফ এ। শুধু রেফারীদের বিরুদ্ধেই নয়, তাদের বিরুদ্ধেও জনসাধারণের বহু অভিযোগ। জনসাধারণের অর্থ নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত স্টেডিয়াম রচনা সম্পর্কে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। এমেচার খেলোয়াড়দের গায়ের রক্তে অর্থ উপার্জন হচ্ছে, অথচ সেই অর্থ তাদের কোন প্রয়োজনে আসছে না। চ্যারিটি খেলা থেকে বছরে আই এফ এ দেড় দুই লাখ টাকা সংগ্রহ করে থাকেন কিন্তু দেড় দুই টাকা দিয়েও খেলাধুলোর প্রয়োজনে একখানা বই কেনবার প্রয়োজন বোধ করেন না। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন, আই এফ এ অফিস একেবারেই ফাঁকা, ফুটবল সম্পর্কীয় কোন বইপত্রের বালাই সেখানে নেই। এই সপ্তাহেরই একটি খবরে প্রকাশ, ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠের প্যাভেলিয়নে শুধু ক্রিকেট সম্পর্কেই বই আছে ৬ হাজার। ওদের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কত তফাৎ! আমার মনে হয়, আই এফ এ ও বিভিন্ন ক্লাবের তরফ থেকে জনসাধারণকে ফুটবল আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবার চেষ্টা করলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এ সম্পর্কে মাঠে মাঠে এবং ক্লাবে ক্লাবে প্রচারপত্র বিলি করলেও ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ আইনের অজ্ঞতা ফুটবল মাঠে কম গোলযোগের সৃষ্টি করে না।

অবশ্য সবাই আইন জানলেই মাঠ থেকে গোলমাল চলে যাবে, একথা বলছি না। কারণ ফুটবল আইনের অজ্ঞতাই দর্শকদের একমাত্র দোষ নয়—তারা নানা অতিরঞ্জিত খবরে জর্জরিত। আঁধি তাদের রঙীন মনে, ব্যাধি তাদের চোখে। এক একজন দর্শক এক এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। কেউ দেখেন বল হাতে লেগেছে—হ্যাণ্ডবল; কেউ দেখেন বল হাতে লাগেনি। কেউ দেখেন বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে, কেউ দেখেন—করেনি। এ রোগের ওষুধ কি? চোখের দেখার মধ্যে যেখানে এত পার্থক্য সেখানে আইন কি করবে? বেচারী রেফারীরই বা কর্তব্য কি? তাই দোষ শুধু রেফারীর নয়—দর্শকসাধারণেরও।

রেফারীদের সম্বন্ধে বলবার অনেক কিছুই আছে। মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে। রেফারীরাও মানুষ, সুতরাং তাদের পক্ষেও ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্তু ক্লাব বিশেষের খেলার পরিচালনার ভার যদি রেফারী বিশেষের উপর প্রতিনিয়ত পড়তে থাকে তবে এসোসিয়েশনের কার্যকলাপে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ঘটে। তাছাড়া, যেভাবে খেলা পরিচালনা করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, রেফারীদের মধ্যেও প্রীতির সম্পর্ক বজায় নেই। রেফারী ও লাইন্সম্যানের বোঝা-পড়ার অভাবে এ বছরের খেলায় কয়েকটি বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। সব ক্ষেত্রেই যে ভুলচুক তা নয়—বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা গেছে পারস্পরিক অসহযোগিতার মনোভাব। তাই মনে হয়, রেফারী এসোসিয়েশনের মধ্যেও কোথায় ঘুণ ধরেছে! রেফারী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী পি গুপ্ত বলেছেন, বিদেশ থেকে রেফারী আনা সমস্যার সমাধান নয়। এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত। পরিচালনার উন্নতি সম্পর্কে তিনি সবারই পরামর্শ আহ্বান করেছেন—পরামর্শ তিনি নিশ্চয়ই পাবেন; পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হলে সমস্যারও অনেক সমাধান হবে; কিন্তু পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হবে কিনা সেইটাই প্রশ্ন?

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[২৭-৬-৫৬]

বি এন রেল দলের কাছে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম পরাজয় স্বীকার গত সপ্তাহের লীগ খেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুই প্রধানের খেলায় মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের পর প্রথম ডিভিসন লীগের ১৯টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই অপরাজিতের গৌরব নিয়ে টিঁকে ছিল। মোহনবাগানের পরাজয়ের পর লীগে আর কোন দলই অপরাজিত নেই। এটা অবশ্য প্রথম ডিভিশনের কথা। দ্বিতীয় ডিভিশনে ইন্টারন্যাশনাল ও হাওড়া ইউনিয়ন, তৃতীয় ডিভিশনে সিটি এ সি এবং চতুর্থ ডিভিশনে বাড়িষা স্পোর্টিং এখনো অপরাজিতের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হক, বি এন আর গত সপ্তাহে শুধু লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকেই পরাজিত করেনি, তাদের সহধর্মী অপর রেল টীম রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী রাজস্থান ক্লাবকেও পরাজিত করেছে। মোহনবাগানের পরাজয়ের পর লীগের উপরের দিকে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দেখা দিয়াছে সন্দেহ নেই। কষ্টসাধ্য হলেও এখন মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে মোহনবাগানের অর্জিত পয়েন্টের নাগাল পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। বর্তমানে মোহনবাগান তিনটি, মহমেডান স্পোর্টিং ছয়টি ও ইস্টবেঙ্গল সাতটি পয়েন্ট নষ্ট করেছে। সুতরাং হিসেব মত মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে মোহনবাগানের পয়েন্টের পার্থক্য ৩ আর মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ৪। এই সপ্তাহে মহমেডান স্পোর্টিং ও

গত সপ্তাহে দুই দলের দুইজন সেণ্টার ফরোয়ার্ড 'হ্যাট্‌ট্রিক' লাভে সমর্থ হয়েছেন এবং হ্যাট্‌ট্রিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন। মহমেডান দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আবিদ বাঙ্গী প্রতিভা ও উয়ারীর বিরুদ্ধে পর পর দুইবার হ্যাট্‌ট্রিক করেছেন আর মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল লীগ কোঠার শীর্ষস্থান অধিকারী মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

প্রথম ডিভিশন লীগে এ পর্যন্ত জয়লাভে যে দুইটি টীম বঞ্চিত ছিল তার মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন রেলওয়ে স্পোর্টসকে হারিয়ে প্রথম জয়লাভে সমর্থ হয়েছে—কালীঘাট ক্লাব এখনো রয়েছে অবিজয়ী। আলোচ্য সপ্তাহে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের উপর্যুপরি তিনটি খেলায় পরাজয়ের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আগের সপ্তাহের একটি নিয়ে এদের পর পর চারটি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে।

একমাত্র মোহনবাগানের খেলা ছাড়া এবার সব টীমের খেলায় গোলের বড় অভাব ছিল, সঙ্গে 'হ্যাট্‌ট্রিকের'ও। কিন্তু হ্যাট্‌ট্রিক করেছেন জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে।

গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আবিদ। তিনি করেছেন ১৫টি গোল। এর পর মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল ১৪টি গোল করেছেন। মোহনবাগানের এস ব্যানার্জি করেছেন ১১টি গোল। আর কেউই দশের কোঠা পার হননি। ইস্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ড টি বসুর গোলের সংখ্যা সাত।

দ্বিতীয় ডিভিশন

আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ডিভিশনে ইণ্টারন্যাশনাল ও হাওড়া ইউনিয়ন অপরাজিত আছে। ৮টি ক'রে খেলায় দুই দলই সংগ্রহ করেছে ১৬টি ক'রে পয়েণ্ট এবং এরাই আছে লীগ কোঠার উপরের দিকে। এর পরের স্থান পোর্ট কমিশনার্স ও সাল্কিয়া ফ্রেন্ডস দলের। এরা ৯টি ক'রে খেলায় ১২টি ক'রে পয়েণ্ট পেয়েছে। সুতরাং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই হাওড়ার দুই টীম ইণ্টারন্যাশনাল ও হাওড়া ইউনিয়নের মধ্যে। নীচের দিকে কাস্টমস্, ডালহৌসী, সুবার্বন, ক্যালকাটা জিমখানা কারো অবস্থাই ভাল নয়। কাস্টমস ৮টি খেলায় এখন পর্যন্ত একটি পয়েণ্টও অর্জন করতে পারেনি। নবম খেলায় রবার্ট হাডসনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে খেলা শেষ হবার ১৩ মিনিট আগে রেফারীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগের এ এক প্রধান ঘটনা।

তৃতীয় ডিভিশন

তৃতীয় ডিভিশনে কোন টীমই অপরাজিত নেই। এখানে টাউন ক্লাবের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। ৭টি খেলায় টাউন অর্জন করেছে ১১ পয়েণ্ট। সিটি এ সি ৯টি খেলায় ১১ এবং উত্তরপাড়া ৯টি খেলায় ১০ পয়েণ্ট পেয়ে টাউনের পিছু তাড়া করছে। নীচের দিকে বাণী নিকেতন, ক্যালকাটা পুলিশ, শ্যামবাজার, মিলন

সমিতি সবাই বিপদের সম্মুখীন,—সবারই আছে ডিভিশনচ্যুত হবার আশঙ্কা। ক্যালকাটা পুলিশ এখনো কোন খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি।

চতুর্থ ডিভিশন

লীগ কোঠার শীর্ষস্থানাধিকারী বড়িষা স্পোর্টিং চতুর্থ ডিভিশনের একমাত্র অপরাজিত দল। বড়িষা ৯টি খেলায় ১৬ এবং রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ৮টি খেলায় ১২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করায় এই দুই দলের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রশ্নে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভাবনা। পরের দলগুলি বেশ পিছিয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত জয়লাভে অসমর্থ বেংগল স্পোর্টিং মাত্র ১ পয়েণ্ট পেয়ে আছে সবার নীচে। আলীপুর, মেসারার্স, ওয়াই এম সি এ, ইউনাইটেড স্টুডেণ্ট, কারো অবস্থাই ভাল নয়।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট

'ট্রেন্ট ব্রিজ' মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৮৫ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। যদিও এখনো তিনটি টেস্ট বাকী, তবুও অস্ট্রেলিয়ার এই জয় তাদের 'এ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের সহায়ক সন্দেহ নেই।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এটি ছিল ১৭০তম টেস্ট লড়াই। এই খেলাটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৭০টি খেলায় জয়লাভ করেছে। ইংলণ্ড ইতিপূর্বে জয়লাভ করেছে ৬০টি খেলায়। ৪০ বার দুই দেশের টেস্ট যুদ্ধে জয়পরাজয় মীমাংসিত হয়নি। ইংলণ্ডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া শেষবার জয়লাভ করেছে ১৯৪৮ সালে ওভাল মাঠে। তারপর ইংলণ্ডের কোন খেলায় অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হতে পারেনি।

অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার গিল ল্যাংলের উইকেট কিপিংয়ে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় টেস্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই টেস্টের দুই ইনিংসে ল্যাংলে ক্যাচ লুফে ও স্ট্যাম্প করে ৯ জন ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করেছেন। এর আগে ১৯০১-১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার জে কেলী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৩৩ সালে ইংলণ্ডের উইকেট কিপার লেসলী এমস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি ক'রে খেলায় ৮ জন ক'রে ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করেছিলেন। ল্যাংলে এবারের দুইটি টেস্টে ইতিমধ্যেই ১৫ জন ব্যাটস্‌ম্যানের উইকেট হারাবার কারণ হয়েছেন। এই পর্যায়ের পাঁচটি টেস্ট খেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী খেলোয়াড়কে আউট করবার কৃতিত্বে রেকর্ড অধিকার ক'রে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জন ওয়েট নিউজিল্যাণ্ডের ২৩ জন খেলোয়াড়কে আউট করে। এবার ল্যাংলের জন ওয়েটের রেকর্ড ভাঙবারও সম্ভাবনা আছে।

খ্যাতনামা ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়াল ও ডেভিডসনকে ব্যতিরেকে অস্ট্রেলিয়ার এই টেস্ট জয় খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। তাদের তরুণ ফাস্ট বোলার ক্রফোর্ড দলভুক্ত হলেও পায়ের মাংসপেশীতে 'টান' ধরায় প্রথম ইনিংসের পাঁচ ওভার মাত্র বোলিং করতে সমর্থ হন। অস্ট্রেলিয়ার এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের মূলে দলের সহ-অধিনায়ক বিশ্বের চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। মারাত্মকভাবে বোলিং ক'রে দুই ইনিংসে তিনি ১৫২ রাণে ১০টি উইকেট পান। মিলার ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার তরুণ খেলোয়াড়েরা বার্ক, বার্জ ও ম্যাকে ভাল খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এটা আশার কথা। লর্ডস মাঠে ব্যাটস্‌ম্যানরাই চিরদিন সুবিধা পেয়ে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ব্যাটস্‌ম্যানরা এই সুবিধা গ্রহণ করতে কসুর করেননি।

লীডস মাঠে ১২ জুলাই থেকে আরম্ভ হচ্ছে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট খেলা। সারা ক্রিকেট বিশ্বে এখন চলবে এই খেলা নিয়েই গবেষণা। তৃতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড ঃ—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—২৮৫ (ম্যাকডোনাল্ড ৭৮, জিম বার্ক ৬৫, ম্যাকে ৩৮, আর্চার ২৮, বার্জ ২১; লেকার ৪৭ রাণে ৩, স্ট্যাথাম ৭০ রাণে ২, ট্রুম্যান ৫৪ রাণে ২ ও বেলী ৭২ রাণে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৭১ (পিটার মে ৬৩, বেলী ৩২, কাউড্রে ২৩; মিলার ৭২ রাণে ৫, বিনাউড ১৯ রাণে ২, আর্চার ৪৭ রাণে ২ ও ম্যাকে ১৫ রাণে ১ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—২৫৭ (বিনাউড ৯৭, মিলার ৩০, ম্যাকে ৩১, ম্যাকডোনাল্ড ২৬; ট্রুম্যান ৯০ রাণে ৫ ও বেলী ৬৪ রাণে ৪টি উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৬ (পিটার মে ৫৩, কাউড্রে ২৭, রিচার্ডসন ২১, ইভান্স ২০; মিলার ৮০ রাণে ৫, আর্চার ৭১ রাণে ৪ উইকেট)

(অস্ট্রেলিয়া ১৮৫ রাণে বিজয়ী)

দেশী সংবাদ

১৯শে জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ২০শে জুন বিকালে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। ইহার রেডিও রিপোর্ট ঐদিন রাত্রি ১০টায় আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় উক্ত মেডিসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিয়মাবলী অনুমোদিত হয়।

ভারত সরকারের ভাবী শিল্পমন্ত্রী শ্রী এম সি শাহ বলিয়াছেন যে, ভারত চলতি বৎসরে বিভিন্ন দেশ হইতে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টন ইস্পাত আমদানী করিবে।

২০শে জুন—অদ্য অপরাহ্নে একখানি বিরাটকায় দোতলা স্টেট বাস উত্তর কলিকাতায় টালা পুলের পাশ দিয়া প্রায় ২০ ফুট নীচুতে রেল লাইনে গড়াইয়া পড়ার ফলে ঐ বাসের যাত্রী ও কর্মচারী মিলাইয়া মোট ৩৬ জন আহত হন। তন্মধ্যে দুইজন যাত্রী হাসপাতালে নীত হইবার অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যান।

বাংলা চিত্রজগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি অদ্য দুপুরে, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৎসরের আই এ এবং আই এস্‌সি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রামাণ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, হাতোয়া রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ খুঁড়িয়া এপর্যন্ত ৫২টি পিতল ও তামার কলসীতে ৯,২৩,১৭৯ তোলা ওজনের খাঁটি রূপার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি শাহ আলম ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের।

২১শে জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য প্রাতঃকালে ভাইকাউণ্ট বিমানযোগে নয়াদিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি ৩৩ দিনব্যাপী ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিবেন। শ্রী নেহরুর সঙ্গে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, দুইটি দৌহিত্র এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রী এম ও মাথাই আছেন।

অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ অদ্য বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে আমার পদত্যাগে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়াছেন। কিন্তু আমি পার্লামেণ্টের সদস্য থাকিব।

গতকল্য রাত্রে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিস মানিকতলা অঞ্চলে একস্থানে হানা দিয়া জাল গ্লুকোস-ডি'র একটি ছোটখাট কারখানা আবিষ্কার করে বলিয়া প্রকাশ।

২২শে জুন—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসাবে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বসুর নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি ১০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের ১৯টি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গতকল্য কেন্দ্রীয় সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চম অধিবেশনে অনুমোদিত হইয়াছে।

২৩শে জুন—১৯৫৮ সালের প্রথমভাগে ভারতে মেট্রিক প্রথায় ওজন বলবৎ হইলে কিরূপ বাটখারাসমূহ প্রচলিত হইবে তাহা এই উদ্দেশ্যে গঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক ২৫শে জুন বিবেচিত হইবে।

সম্প্রতি কালিম্পং শহরের এক বস্তীর জনৈক কৃষকের নয় মাস বয়স্ক সন্তানকে চারি ফিট দীর্ঘ একটি গোক্ষুর সর্পের সহিত খেলা করিতে দেখা যায়। আতঙ্কগ্রস্ত মাতার চীৎকার শুনিয়া সাপটি চলিয়া যায়। শিশুটি কিন্তু অক্ষত আছে।

২৪শে জুন—আজ সকালে মাও-এর নিকট আসাম রাইফেলস-এর এক সেনাদল ও বিদ্রোহী নাগাদের মধ্যে তিন ঘণ্টারও বেশীকাল যাবত তীব্র যুদ্ধ ও গুলী বিনিময় চলিতেছে বলিয়া সরকারীভাবে জানা গিয়াছে।

ভারত সরকার 'অশোক চক্র'কে কোন আকারেই ট্রেডমার্ক করার জন্য নিষেধ করিয়াছেন। অশোক-চক্র, ধর্মচক্র বা অশোকচক্রের কোন আকার রেজেস্ট্রী করা হইবে না।

২৫শে জুন—কিষণগঞ্জের অঞ্চল বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের প্রতিবাদে দল কোলহাতে স্থানীয় জনসাধারণ সত্যাগ্রহ করায় অদ্য সকাল হইতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে মেইন লাইনে কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে।

অদ্য এনফোর্সমেণ্ট পুলিস আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে তল্লাসী চালাইয়া প্রচুর পরিমাণ ভেজাল গ্লুকোজ এবং অন্যান্য ভেজাল ঔষধ বাজেয়াপ্ত করে। এ সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী শ্রীমতী পত্রলেখা ভট্টাচার্য মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে জুন—পাক প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী আজ করাচীতে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের বিষয় শীঘ্রই মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সহিত তিনি আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা করেন।

কাবুল বেতারে প্রচারিত এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া অদ্য "পাকিস্থান টাইমস" সংবাদ দিয়াছে যে, আফগানিস্থানের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে আরও দুই সহস্রাধিক লোক হতাহত হইয়াছে।

বৃটেন অদ্য মণ্টিবেলো দ্বীপে তাহার বর্তমান পর্যায়ের সর্বশেষ আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

২০শে জুন—টোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ কুওয়াচারা অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৪ বৎসর বয়স্ক একটি অন্ধ বালিকার চক্ষুতে একটি মোরগ-শাবকের অক্ষি-গোলকের স্বচ্ছ আবরণ জুড়িয়া দিয়া তিনি বালিকাটির দৃষ্টি-শক্তি আংশিকভাবে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন বর্তমান বৎসরের শীতকালে ভারত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

২১শে জুন—মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা মিঃ ডি জানুক "জোসেফ স্টালিনের গোপন অপরাধ" নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২২শে জুন—জনৈক বৈজ্ঞানিক জানাইয়াছেন, জাপানের আকাশে ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় বায়ুর একখণ্ড কালমেঘ নামিয়া আসিয়া অদ্য বহু অঞ্চলে প্রবল উষ্ণ বারিপাত ঘটাইয়াছে।

বুধবার কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রী নেহরু অদ্য রাত্রে লণ্ডনে উপনীত হন।

২৩শে জুন—অদ্য ঢাকাতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন নদীপথ দিয়া প্রচণ্ড জলস্রোত হিমালয় হইতে ভারতের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

গতকল্য ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে আটজন রাজনৈতিক আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে জুন—গতকল্য মিশরে যে গণ[illegible] গৃহীত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় ৯৯ জন [illegible] ল্‌তা প্রধানমন্ত্রী নাসেরের রাষ্ট্র পরিষদে নি[illegible] এবং নূতন মিশরীয় সংবিধানের সমর্থনে ভোট দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আসন্ন বন্যার কব[illegible] হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুমিল্লা শহর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে গোমতী নদীর ১[illegible] ফুট ভাঙ্গন বন্ধ করিতে ৫০০ লো[illegible] দিনরা[illegible] চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ২০০ লো[illegible] সেনাবাহিনী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৫শে জুন—আগামী ৭ই হইতে জুলাই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত আলোচনার যে কথা ছিল, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য তাহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীইন্দ্র দুগার

LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের *ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
ভারতে প্রস্তুত

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 7TH JULY, 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৩৬ সংখ্যা ॥
শনিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৩
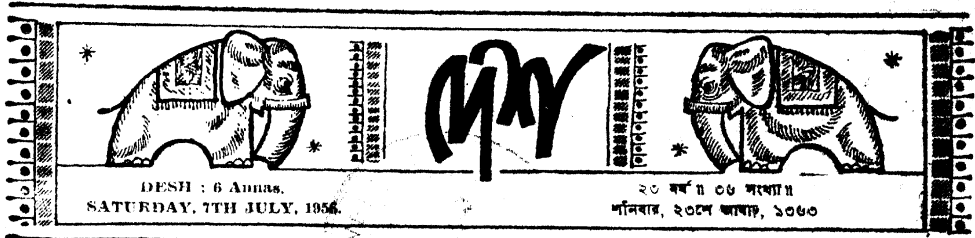
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বিধানচন্দ্র রায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ১লা জুলাই ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব-শক্তি অর্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, সকলের পায়ে মাথা নোয়াইবার মত যোগ্যতা থাকিলে তবে নেতা হওয়া যায়। বস্তুত সমষ্টির জন্য আত্মীয়তাবোধের বিস্তারে এবং নিঃস্বার্থ সেবা-প্রবৃত্তি পরিস্ফূর্ত করিয়া নেতৃত্বকে মহিমান্বিত করে। সুতরাং নেতৃত্ব শুধু বিচারের দ্বারা লভ্য পদার্থ নয়, প্রত্যুত নেতার জীবনে উদারভাবে একটি অবিতর্ক প্রভাব থাকাও প্রয়োজন। ডাঃ রায় অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার মনীষাও বহুমুখী। কিন্তু বুদ্ধির এই প্রাখর্য বা মনীষার তীক্ষ্ণতা তাঁহার নেতৃত্বমূলে অপেক্ষাকৃত গৌণ, ফলত সকলের জন্য উদার মনোভাবই তাঁহার নেতৃত্বের বীর্যস্বরূপে কাজ করে। সেই ভাব বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম করিবার বল তাঁহার মনে শক্তি ও তাঁহার বিচারে মেধার সঞ্চার করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে সমগ্র ভারতের মধ্যে সঙ্কটময় রাজ্য এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ভারত-বিভাগজনিত বহু গ্লানিভারে বাঙালীর সমাজ-জীবন আজ অভিভূত এবং তাহার আর্থিক সংস্থিতি বিপর্যস্ত। ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু-সমাগমে আর্তি এবং তজ্জনিত দুর্গতি আমাদের জীবনে উদ্বেগের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ডাঃ রায়ের নেতৃত্ব দুর্দৈবের এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে জাতীয় জীবনে আলোক-রেখার সম্পাত করিতেছে। নেতৃহীন বাঙালী জাতিকে তিনি যত্নাগ্রহে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। ডাঃ রায় অটুট স্বাস্থ্য এবং অধিকতর সুদীর্ঘ জীবনে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া মানব-সেবার মহান্ আদর্শে আমাদিগকে উদ্দীপিত রাখুন। তাঁহার নেতৃত্বে বাঙালী জাতি আত্মশক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক্, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
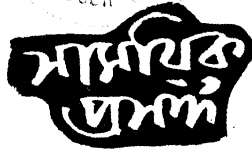
শাসনক্ষেত্রে সদাদর্শ

পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনে আসিয়া সম্প্রতি একটি বিশেষ সদাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-জনিত পূর্ববঙ্গের সংকটজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সেখানকার রাজ্যপালস্বরূপে মিঃ ফজলুল হক তাঁহাকে পূর্ববঙ্গে আসিতে অনুরোধ করেন। মীর্জা সাহেব বিমান-বন্দরে অবতরণ করিয়াই সোজা সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের নিকট চলিয়া যান এবং তাঁহাদের নিকট চাউলের বাজার দর সম্বন্ধে খোঁজখবর সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি এইভাবে জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সরকারী দপ্তরে রাশিকৃত নথিপত্রের পরিসংখ্যান হইতে তাহা অর্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সরকারী কর্মচারীদের সাজানো কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যেও তিনি তাহা পাইতেন না। বেসরকারী প্রতিনিধিবর্গ তাঁহার সঙ্গে দরবার করিয়া জনসাধারণের দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করিতে কতটা সুযোগ পাইতেন এই বিষয়েও সন্দেহ আছে। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রবর্তন হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্থান দূরের কথা, এই ভারতে পর্যন্ত শাসকদের দৃষ্টি এবং তাঁহাদের প্রতিবেশে বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সাবেকী আমেজ আজও অনেকটা জড়াইয়া মাখাইয়া রহিয়াছে। আন্তরিক সম্বন্ধের সূত্র শিথিল। পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতির এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনাধিকারীদের আদর্শস্থানীয়। শাসন-বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মেলামিশার এইরূপ যদি সুযোগ গ্রহণ করেন তাহা হইলে শাসন-বিভাগের নীতি-নির্দেশের পক্ষে যেমন তাহা অনুকূল সেইরূপ দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যব্যবস্থায় দ্রুততা বিধানেও তাহা সমভাবে সহায়ক হইবে।

অগ্রগতির পক্ষে আদর্শ

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ডেবর সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর আদর্শের প্রতি জাতিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বৃহত্তর সেই আদর্শের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে বর্তমানে নানা মতবাদ আমাদের মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই এক সমস্যা। কংগ্রেস-সভাপতি আদর্শের সেই স্বরূপ ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিরূপিত পঞ্চশীল, এই দুইটি নীতি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের স্বরূপকে পরিস্ফূর্ত করিতেছে। মানব-কল্যাণের ব্রতে এই দুইটি নীতির গতি এবং পরিণতি ভারতের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতি বলেন, এই দুইটি নীতি রাশিয়ার জনগণের মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। শুধু রাশিয়া নহে, আমেরিকাও তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতির এই উক্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফলত পরমাণবিক অস্ত্রের প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, মানুষকে বাঁচিতে হইলে মানবতার মৌলিক ভিত্তি যে মৈত্রী এবং পারস্পরিক প্রীতির নৈতিক বল তাহার উপর জোর দিতে হইবে। সম্প্রতি জগতের ৫১জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী আন্তর্জাতিক বৈঠকে সমবেত হইয়া পারমাণিক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং পরীক্ষা ও সমীক্ষায় বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন শক্তিকে এই মারাত্মক পথ পরিবর্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি এবং মৈত্রীই বর্তমান অবস্থায়

ন্ত্রের আদর্শের স্বরূপ সেই সত্যের অনু-ত্র উপর নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক-ক সেই অনুভূতি যদি উজ্জ্বল না হয়, । আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনা এবং জ-চেতনা অন্য কোনভাবে সার্থক হইতে র না।

মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা

রিষার তেলের মূল্য বৃদ্ধির সংগে ণ কলিকাতার বাজারে তেলে ভেজালের মাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে সাধারণের শুধু যে জীবন-সংস্থানের র সঙ্কট হইয়াছে ইহাই নয়, তাহাদের ন বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা সৃষ্টি য়াছে। কলিকাতার পৌরসভার বণাগারে সরিষার তেলের কয়েক মাসের হীত নমুনা পরীক্ষা করার ফলে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত মার্চ মাসে হীত নমুনার শতকরা ৬টি, মে মাসে টি এবং জুন মাসে ২৩টিতে ভেজাল । লাভখোর এবং মুনাফাশিকারীদের রাজ্য দিন দিন আমাদের সমাজ-জীবনে ভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে, ইহাতেই া বোঝা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ব্যবসায়ী জের পক্ষ হইতে যেমন চড়া গলায় ওয়াজ উঠে, এইসব সমাজদ্রোহী দুষ্কৃত-ীদের বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ানের জন্য তাঁহাদিগের তেমন আগ্রহ রলক্ষিত হয় না; এই সম্পর্কে এ াটা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সম্প্রতি চমবঙ্গ সরকার রেশনকার্ডের সাহায্যে • আনা সের দরে নির্দিষ্ট কতকগুলি কান হইতে সরিষার তেল সরবরাহের স্থা করিয়াছেন। নির্ধারিত মূল্যের ও কম নয়। এস্থলে লক্ষ্য করিবার র এই যে, স্থানীয় তেল উৎপাদনকারী তষ্ঠানসমূহকে এজন্য সরকারপক্ষ হইতে করা ৬৲ টাকা হিসাবে অর্থসাহায্য করা বে। তেলের দামের বর্তমান হার ত্যধিক বৃদ্ধির মূলে যথেষ্ট কারণ আছে না দেশের লোকের মনে কিন্তু এই নেই জাগিতেছে, তাহাদের বিশ্বাস ই যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শুল্ক দ্ধ সত্ত্বেও দাম এতটা বাড়িতে পারে না। ূপ ক্ষেত্রে তেলের কলগুলিকে সরকারী র্থসাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা অনেকের কট দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তর্কতার ইংগিত

পূর্ববঙ্গে নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা য়াছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল স্কান্দার মীর্জা সম্প্রতি ঢাকায় এক কৃতায় এই সংকটজনক অবস্থাতেও সেখানে াজনীতিক দলাদলি এবং মতভেদজনিত নর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই অনর্থ পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের দযত্নবর্ধিত সন্তান। বর্তমান যুগে বিশেষ কোন ধর্মকে এবং তৎসম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রের আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিতে গেলে এই সমস্যার সৃষ্টি হইবে এবং জনকল্যাণের পথে রাষ্ট্রের সর্বাংগীণ স্বার্থ ব্যাহত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব-বংগের এই খাদ্যসমস্যার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম-বংগে দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবংগ হইতে পূর্ববংগে চাউলের চোরাই চালান অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবংগ সরকার কলিকাতা এলাকায় ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে ১৭॥০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সে চাউলও সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে না। অধিকন্তু সরকার এইভাবে কলিকাতায় চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার ফলে শহরের উপকন্ঠবর্তী অঞ্চলে চাউলের দর হ্রাস পাইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু সে আশা যে সফল হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সম্প্রতি কলিকাতার এক বক্তৃতায় মজুতদারদের কারচুপির কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ করেন। পশ্চিমবংগ সরকার এইসব মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করিবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে। সরকারপক্ষ হইতে এই ধরনের কথা আমরা পূর্বেও শুনিয়াছি। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা বিপদ কাটিয়া যায় নাই। সরকারের সব হুঁশিয়ারী এড়াইয়া লাভখোর এবং মজুতদারের দল স্বচ্ছন্দে শোষণকার্য চালাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সমাজ-দ্রোহী হিংস্রতা দলন করিতে হইলে সরকার হইতে সোজাসুজি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মানুষের রক্ত শুষিয়া খাইয়া যেসব নরপিশাচের লালসা বাড়িয়া গিয়াছে তাহারা সহজে নিরস্ত হইবার নয়; পরন্তু সূক্ষ্মভাবে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাহারা নিজেদের কাজ হাসিল করিতে ফিকির বাহির করিবে। তাহাদের নিত্য নূতন নবাবিষ্কারক্ষম প্রতিভার পরিচয়ই আমরা পাইব। কার্যত তাহাই ঘটিতেছে। সুতরাং পৈশাচিক এই প্রবৃত্তি সমাজদেহ হইতে উৎখাত করিবার জন্য সরকারের পক্ষে আন্তরিকতার সংগে অবিলম্বে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া দরকার।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত রবিবার বালীগঞ্জ স্টেশনের রেলপথের উপরকার সেতু ভাঙিয়া গিয়া অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। টালার পুলের দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই এই ব্যাপার। এই দুর্ঘটনার ফলে ১৭ জন লোক আহত হইয়াছেন। ক্যানিংগামী ট্রেনটি এই সময় স্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, ট্রেনের গতি যদি যথাসময়ে রুদ্ধ না হইত, তবে দুর্ঘটনার মর্মান্তিকতা আরও বৃদ্ধি পাইত। প্রকাশ, বহুদিন হইতেই এই সেতুটি বিনা মেরামতের অবস্থায় ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ ইহার সংস্কারের জন্য রেলকর্তৃপক্ষের নিকট বারংবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কাজ হয় নাই। অভিযোগটি সত্য হইলে এই সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষের এইরূপ উদাসীনতাকে নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। মানুষের জীবনের মূল্যে যদি এদেশের কর্তৃপক্ষকে প্রতি পদে সচেতন করিতে হয়, তবে আমাদের মনুষ্যত্বের মূল্য কি?

ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা

সেদিন হায়দরাবাদে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা এবং অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আজকাল কাহারো কাহারো এইরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংস্কৃত মৃত ভাষা, সুতরাং তাহার প্রচার বা প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় বা সমাজ-জীবনের অভ্যুন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। দেখা যাইতেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজে এমন মতের পরিপোষক নহেন। তাঁহার মতে শুধু অতীত ঐতিহ্যের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার গৌরব নিহিত নয়; প্রত্যুত, আমাদের বর্তমান বাস্তব অবস্থাতেও সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের উপযোগিতা রহিয়াছে এবং তাহার কার্যকারিতাও আছে। আমরাও রাষ্ট্রপতির এই মতের সমর্থন করি। ভারত বহু ভাষাভাষী জনগণের বাসভূমি। এই ভেদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মূলে শক্তির উৎস স্বরূপে কাজ করিয়াছে এবং এদেশের অখণ্ড আত্মসত্তাকে তিন হাজার বৎসরের অধিককাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। বহুর মধ্যে একত্বের সেই ব্রহ্মসূত্রের আজ নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক, মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আজ সেই তপস্যায় ব্রতী হইতে হইবে। ভারতের শাশ্বত সত্তার ভাবটিকে বিভিন্নভাবে এবং বিচিত্র ছন্দে উদ্বুদ্ধ করিবার ভার তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতি-পালনে সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে। সেই ভাবে ভারতের আত্মার সুর বিস্তার করিয়া তাঁহারা প্রাদেশিকতার ব্যবধান বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবেন। এইস্থলে বিদেশী ভাব বা রীতিকে উপেক্ষা করিতে হইবে, আমরা এমন কথা বলি না, জাতির সাংস্কৃতিক বিশিষ্ট ধরনটি ধরিয়া সাহিত্য সাধনাকে ব্যাপ্তি এবং দীপ্তি দিতে হইবে আমাদের ইহাই বক্তব্য। অতি আধুনিকতার এই যুগে এইদিক হইতে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না।

পূর্বে স্থির ছিল যে, লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের কনফারেন্স সেরে পণ্ডিত নেহরু আমেরিকায় যাবেন। কিন্তু নেহরুজীর লণ্ডনযাত্রার পূর্বেই প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। ৯ই জুন তাঁর তল-পেটে অস্ত্রোপচার হয়। যদিও তিনি ভালো হয়েছেন এবং হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সবল হতে সময় লাগবে, এ অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শ্রী নেহরু নিজেই প্রস্তাব করে পাঠান যে, আপাতত তাঁর আমেরিকাগমন স্থগিত থাক। কারণ এ সময়ে নেহরুজীর সংগে গুরুতর আলোচনার ভার মিঃ আইজেনহাওয়ারের শরীরে সইবে না। আর মিঃ আইজেনহাওয়ারের সংগে আলোচনাই যদি সম্ভব না হয় তবে শ্রী নেহরুর এখন আমেরিকা গমন নিরর্থক হবে। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারও এই যুক্তি মেনে নিয়েছেন।

হয়ত উভয়পক্ষের মনে আর একটা কথাও আছে সেটা শালীনতার দিক থেকে কারোই মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়। সেটা হচ্ছে মিঃ আইজেনহাওয়ারের নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার গত সেপ্টেম্বর মাসে 'করোনারি থ্রম্বোসিস' দ্বারা আক্রান্ত হবার পূর্বে ঘোষণা করে-ছিলেন যে তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচন-প্রার্থী হতে প্রস্তুত আছেন। যখন অসুখ হল তখন অবস্থাটা অনিশ্চিত হয়ে গেল। যদিও মিঃ আইজেনহাওয়ার সেরে উঠলেন কিন্তু একবার 'করোনারি থ্রম্বোসিস' হবার পরে তাঁর পক্ষে আর একবার প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগল। শেষপর্যন্ত মিঃ আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন যে ডাক্তাররা তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে মত দিয়েছেন এবং তিনি নিজে যেরকম বোধ করেন তাতে আর এক টার্ম প্রেসিডেণ্ট পদের দায়িত্ব গ্রহণ করার শক্তি তাঁর আছে বলে তিনি মনে করেন, অতএব আবার নির্বাচনপ্রার্থী হতে তাঁর আপত্তি নেই। এবিষয়ে আমেরিকায় রাজনৈতিক মহলে মতদ্বৈধ ছিল। তারপর মিঃ আইজেন-হাওয়ার আবার এই নূতন অসুখে পড়লেন। এ অসুখ থেকেও তিনি সৌভাগ্য-ক্রমে সেরে উঠছেন এবং তাঁর ডাক্তাররা যে ধরনের বিবৃতি দিচ্ছেন তা থেকে মনে হয় যে তাঁর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হবার সংকল্প পরিত্যক্ত হয় নি। কারণ তিনি রিপাবলিকান পার্টির একমাত্র ভরসা।

মিঃ আইজেনহাওয়ার যদি নির্বাচন-প্রার্থী না হন তবে রিপাবলিকান পার্টির জয়ের আশা অতি অল্প। ক্রমাগত বিশ বছর ডেমোক্রাটিক পার্টির [illegible]

আইজেনহাওয়ারের অধীনে ওয়াশিংটনে কর্তৃত্ব রিপাবলিকান পার্টির হাতে আসে। মিঃ আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত লোক-প্রিয়তার জোরেই গত নির্বাচনে রিপাব-লিকান পার্টির জয় সম্ভব হয়েছিল। অন্য কোনো ব্যক্তি রিপাবলিকান পার্টির পক্ষে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হলে তিনি জিততে পারতেন না। গত কয়েক নির্বাচনের ভোট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ভোটারদের মধ্যে ডেমো-ক্রাটিক পার্টির অনুগামীর সংখ্যাই বেশি, বস্তুত মোটের উপর আমেরিকায় ভোট-দাতাদের মধ্যে ডেমোক্রাটিক পার্টির 'পারমা-নেণ্ট মেজরিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীর পক্ষে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে জিততে হলে তাঁকে বহুসংখ্যক ডেমোক্রেটিক ভোটারের সমর্থন লাভ করা চাই। মিঃ আইজেনহাওয়ার সেই সমর্থন লাভ করেছিলেন। রিপাবলিকান পার্টির চাঁইদের মধ্যে অন্য এমন কেউ ছিলেন না বা এখনো নেই যাঁর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল। সেইজন্য মিঃ আইজেন-হাওয়ারকে আবার দাঁড় করাবার জন্য রিপাবলিকান পার্টির এতো বেশি আগ্রহ যদিও রিপাবলিকান পার্টির একটা গোঁড়া অংশ মিঃ আইজেনহাওয়ারকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তাঁদের চেয়ে অনেক ডেমোক্রাটিক পার্টির লোক মিঃ আইজেন-হাওয়ারকে বেশি পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে মিঃ আইজেনহাওয়ারের অনেক নীতি ডেমোক্রাটদের সমর্থন ছাড়া চালানো যেতো না। কংগ্রেসে রিপাবলিকান পার্টির এক

২০ [illegible]

অংশের বিরুদ্ধতা ডেমোক্রাটিক পার্টির এক অংশের সমর্থন দ্বারা না কাটাতে পারলে মিঃ আইজেনহাওয়ারের অনেক প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারত না। তাছাড়া কংগ্রেসে—সেনেট বা হাউস্ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এ—কোথাও রিপাবলিকান পার্টির মেজরিটি নেই। সুতরাং রিপাবলিকান পার্টির গোঁড়ার দল মিঃ আইজেনহাওয়ারকে বিশেষ পছন্দ না করলেও তাঁকে ছাড়তে পারে না।

অরপক্ষে, ব্যক্তিগতভাবে মিঃ আইজেনহাওয়ারকে অনেক ডেমোক্রাট ভোটার পছন্দ করেন এবং মিঃ আইজেনহাওয়ার আবার দাঁড়ালে তিনি অনেক ডেমোক্রাট ভোট পাবেন, এই জন্যই ডেমোক্রাটিক পার্টি আদৌ চায় না যে মিঃ আইজেনহাওয়ার আবার দাঁড়ান। মিঃ আইজেনহাওয়ার যদি না দাঁড়ান তবে আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক পার্টির জয় এবং কর্তৃত্বে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং মিঃ আইজেনহাওয়ারের শারীরিক অবস্থায় তাঁর পক্ষে পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কিনা, এইটাই এখন মার্কিন রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মার্কিন কনস্টিটিউশনে প্রেসিডেণ্ট যদি মারা যান তবে পরবর্তী চতুর্বার্ষিক নির্বাচন পর্যন্ত ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তাঁর স্থান গ্রহণ করেন, যেমন প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টের তৃতীয় টার্মের অভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়ায় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর জায়গায় প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট যদি মারা না গিয়ে অসুখে বা অন্য কোনো কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে কিন্তু ভাইস-প্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন না। সে অবস্থায় প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব কীভাবে পালিত হবে তার কোনো নির্দেশ কনস্টিটিউশনে নেই। অথচ আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিপুল, যাকে 'পলিসি' বলে সেটা তাঁকেই স্থির করতে হয় এবং চালাতে হয়। তাঁর পদ ইংলণ্ডের 'কনস্টিটিউশন্যাল' রাজার মতো নয়। প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য পালনের জন্য তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, এবাবে কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তি বা কমিটির দ্বারা তাঁর প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। অথচ চার বছরের টার্মের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট না মরে যদি স্থায়ীভাবে অশক্ত হয়ে পড়েন তাহলে কী হবে তার ব্যবস্থা কনস্টিটিউশনে নেই। এই কারণেই মিঃ আইজেনহাওয়ারের স্বাস্থ্যের প্রশ্নটা এরূপ গুরুতর বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। মিঃ আইজেনহাওয়ার আরো পাঁচ বছর বাঁচতে পারবেন কিনা এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে—তাঁর যেরকম গুরুতর অসুখ হয়ে গেল তাতে আরো পাঁচ বছর প্রেসিডেণ্টের যোগ্য আনা দায়িত্ব পালনের ভার তাঁর স্বাস্থ্যে সইবে কিনা।

এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এরূপ সন্দেহস্থলে মিঃ আইজেনহাওয়ার যদি পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হন তবে তিনি আমেরিকার স্বার্থের চেয়ে রিপাবলিকান পার্টির স্বার্থ বড়ো করে দেখবেন, এই অভিযোগ উঠবে। মিঃ আইজেনহাওয়ার শেষপর্যন্ত কী স্থির করবেন তা এখনো নিশ্চিত নেই।

নেহরুজী প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করেন এবং জুলাই মাসে আমেরিকায় যাবার দিন ধার্য হয় তখন পর্যন্ত জানা ছিল যে, মিঃ আইজেনহাওয়ার পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হবেন এবং পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হলে তাঁর জয়ও অনেকটা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁর নূতন অসুখের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত মিঃ আইজেনহাওয়ার না দাঁড়ানো স্থির করেন, তবে আগামী বছর তিনি প্রেসিডেণ্ট থাকবেন না। অন্য কেউ এবং খুব সম্ভবত ডেমোক্রাটিক পার্টির কেউ প্রেসিডেণ্ট হবেন। তাহলে এখন গিয়ে তাঁর সঙ্গে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা থাকে না। অবশ্য ডেমক্রাটিক পার্টির কেউ, ধরুন মিঃ স্টিভেনসন প্রেসিডেণ্ট হলেই যে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে সে সম্ভাবনা নেই। তবে ভাবভঙ্গীটা বদলাতে পারে। বিশেষ করে, মিঃ ডালেস যদি পররাষ্ট্র সচিব না থাকেন তাহলে কথা এক থাকলেও সুর ও তাল বদলে গিয়ে মনে হতে পারে নূতন গান শুনছি।

নেহরুজীর আমেরিকা-গমন স্থগিত হওয়াতে তাঁর বিদেশভ্রমণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যতটুকু ঔৎসুক্য ও কৌতূহল ছিল তাও চলে গিয়েছে। কারণ কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের কনফারেন্সের মূল্য সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষে নয়, অন্যত্রও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কোনো বিষয়েই এমন কোনো নীতি বা মত নেই যাকে কমনওয়েলথের নীতি বা মত বলা যেতে পারে অর্থাৎ যা কমনওয়েলথের সকল দেশ সম্বন্ধেই খাটে। কোনো কোনো বিষয়ে দুই বা ততোধিক দেশের নীতির মধ্যে মিল বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু এমন কোনো বিষয় নেই, যাতে সকলে একমত বা যাতে সকলের মধ্যে সহযোগিতার সমভূমি বর্তমান। আলাপ-আলোচনার দ্বারা কোনো বিষয়ে যে মতের অমিল হ্রাস পাচ্ছে তারও কোনো প্রমাণ নেই।

মতের মিল না হলেও দেখাশুনার দ্বারা পরস্পরকে বুঝার সুবিধা হয় এই গতানুগতিক যুক্তিরও কোনো মূল্য নেই। পরস্পরকে বুঝার জন্য যথেষ্ট কূটনৈতিক ব্যবস্থা আছে। তার জন্য এই ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই। কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে-সব ঝগড়া আছে সেগুলির উল্লেখ কনফারেন্সে করা চলবে না। গোয়া সম্বন্ধে বৃটেন তথা কমনওয়েলথের অন্য দেশগুলির কী ভাব সে প্রশ্ন ভারতবর্ষ তুলতে পারবে না। কাশ্মীরের কথা পাকিস্থান তুলতে পারবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের নীতির সম্বন্ধে কারো কথা তোলা বারণ। এ-সব বিষয়ে কেউ যদি অপর কাউকে কিছু বলতে চায়, তবে সেটা "informally" কনফারেন্সের বাইরে করতে হবে। অর্থাৎ খোলাখুলি সকলের সামনে আলোচনা হতে পারবে না, কনফারেন্সের বাইরে একে অপরের অসাক্ষাতে canvassing এবং ঘোঁট পাকাতে পারবে। কনফারেন্সের যতো কথা সব হচ্ছে কমনওয়েলথের বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে, রাশিয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে—মিঃ ইডেন অথবা শ্রী নেহরু কি মনে করেন; চীন সম্বন্ধে কার কী মত; মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা কী ইত্যাদি। অথচ এই সব বিষয়েও যে কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাব পোষণ করেন এবং বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন এবং করতে থাকবেন সেটাও ধরা কথা।

আসলে অনেকের পক্ষেই "কমনওয়েলথের বন্ধন" একটা ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। যে-সব বন্ধনে আছে সেগুলির পক্ষে কমনওয়েলথের সদস্যতা অবান্তর। প্রধানমন্ত্রীদের এই বার্ষিক সম্মেলনের একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে এই ফাঁকিটা ঢাকা দেওয়া।

এটা প্রধানমন্ত্রীরাও বোধহয় অনুভব করেন। কিছুদিন পূর্বে শ্রী নেহরু বর্মার ইউ নুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "এই সময়ে বাইরে যেতে আমি যে রকম অনিচ্ছা বোধ করছি এমন পূর্বে কখনো করিনি।" যদি তিনি বোধ করতেন যে লণ্ডন কনফারেন্সে গিয়ে কোনো কাজ হবে তাহলে নেহরুজী কখনো এমন কথা লিখতেন না। তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করছিলেন যে, তাকে একটা বাজে কাজে দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে যখন দেশের অভ্যন্তরে একাধিক সমস্যা জটিল হয়ে রয়েছে। রাজ্য পুনর্গঠন সমস্যা, নাগাবিদ্রোহ ইত্যাদির দুশ্চিন্তার ভার মনে বহন করে পণ্ডিতজীকে বাইরে যেতে হয়েছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও দুঃশাসনের ফলে পড়ে পূর্ববঙ্গের যে অবস্থা হয়েছে তাতে পাকিস্থানের জন্য প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলীর যদি কোনো দরদ থাকে তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত মন নিয়ে লণ্ডনে যেতে পারেননি। সিংহলে তামিলভাষীদের প্রতি সরকারী নীতিরু অবিচারের ফলে যে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য শ্রী বন্দরনায়কেরও নিশ্চয়ই কিছু উদ্বেগবোধ আছে, যদিও এই অশান্তি সৃষ্টির জন্য তিনিও দায়ী। এঁদের প্রত্যেকের এই সময়ে লণ্ডনের চেয়ে স্বদেশে থাকার বেশী প্রয়োজন ছিল।

৩।৭।৫৬

(১)

বাড়িটা কেমন হয়ে গেছে আজ। কেমন একটি বিষণ্ণতা, চাপা অস্বস্তি ঘিরে রয়েছে সারা বাড়ি। শুধু এই বাড়িটি।

আর সব অস্বস্তিটুকু এসে যেন জমেছে সুমিতার মনে। ওরই পায়ে পায়ে অস্বস্তির ছায়া ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পড়ার ঘর থেকে শোবার ঘরে। খাবার ঘর থেকে বড়দা'র ঘরে। বড়দা'র ঘর থেকে ওর আর ওর মেজদি'র ঘরে। সেখান থেকে পড়ার ঘরে। তারপর বাইরের ঘরে। বাইরের ঘর থেকে, উত্তরের বারান্দা পার হ'য়ে খাবার ঘর, পাশে রান্না ঘর। সবখানে কিসের একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যায় সুমিতা, সেখানেই। যেন ওরই পায়ে পায়ে ফিরছে।

শুধু অস্বস্তি নয়, অশান্তিও। তার সঙ্গে কেমন একটু বুক চাপা ব্যথা। ভার হ'য়ে চেপে আছে সর্বত্র।

রান্না ঘরের পাশ দিয়ে ছোট সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানের মধ্যে। ছোট বাগান। সামান্য কিছু ফুলগাছ। একটি কিশোরী স্বর্ণচাঁপা গাছ আছে এক কোণ ঘেঁষে। আর নিতান্ত শখ ক'রে লাগানো কিছু শীতের আনাজ। সযত্ন হাতের ছোঁয়ায় এ সামান্যই কেমন অসামান্য হ'য়ে উঠেছে সবুজের সমারোহে। আজ সেখানেও সেই বিষণ্ণতা। এই শেষ শীতের দিনেও গুটি কয়েক মাঘের ফুলকপি, হাতে গোনা দুটি বাঁধাকপি। রূপ আছে যদিও, গন্ধহীন কিছু মরসুমী ফুলের গাছ। স্ফুটোন্মুখ দুটি ডালিয়া আর কেমন একরকমের গাঢ় লালে হঠাৎ কালোর ছোঁয়ায় চাপা ব্যথার রং লেগেছে কিছু ফোটা কারনেসনে। কিছু আছে ক্রিসানথিমাম। স্বর্ণচাঁপার সুদীর্ঘ কাঁচা-সবুজ রং পাতার ঝাড়। পুবে-পশ্চিমে ছড়ানো এ ফালি বাগানের অসংখ্য উন্মুক্ত চোখের মত পাতাগুলি। সবখানেই তার বিন্দু বিন্দু শিশিরে অশ্রু বিষণ্ণতা, জমাট হয়ে আছে নিঃশব্দ কান্না। ফাঁকে ফাঁকে, মাকড়সার জালগুলিতে আলোর ছোঁয়ায় রং লাগেনি এখনো।

যেখানে যায় সুমিতা, সবখানেই সেই অশান্তির ছায়া। অদৃশ্যে ফিরছে পিছনে পিছনে। সব মিলিয়ে, সারা বাড়িটা ঢাকা পড়ে গেছে সেই ছায়ায়।

সামনের পুবদিকের তেতলা বাড়িটার ছাদ ডিঙিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁচা রোদের ইশারা। দক্ষিণের যাত্রা শেষ ক'রে, উত্তরায়ণে বাঁক নিয়েছে সবে সূর্য। উত্তরে বাঁকা রেখা রোদ কাঁপছে তেতলার আলসের কার্নিশে। নতুন উত্তাপে তার কিরণে। সাগরপারের নতুন বাতাস আসবে মহা-আলোকের ঘূর্ণনে। সোনার মত মাঘের রোদে তারই আভাস ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। এখানে দিগন্ত ব্যাপে রোদ ছড়াবার জায়গা নেই। জ্যামিতিক ভঙ্গিতে হঠাৎ সামনের বাস্তটির কোথাও রোদ পড়েছে ত্রিভুজাকারে। কোনও বাড়ির দক্ষিণ দেয়াল বাঁচিয়ে, পেছনের বাড়ির পুবদিকে চকিতে দিয়েছে ছুঁড়ে এক কণা রোদ। দেয়াল থেকে দেয়ালে, আলসেয়, জানালায়, হঠাৎ

াদ্ ঝলমল করছে ঋজুরেখায়। ফাঁকে
ার কোথাও হঠাৎ এক কৃষ্ণচূড়া রাস্তার
ীমানায়, কিংবা বাড়ির সীমানায় মাথা
লেছে নারকেল নয় তো কলমের আমগাছ।
নেক দেয়াল ছাতের পরে আচমকা এক
ঃমারে দৃষ্টি বদলের স্পর্শ। তবে, শহরের
দক্ষিণ সীমায় সবুজের দাক্ষিণ্য কিছু
শী।

কেমন একটি সচকিত খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে এই সকালের রোদে। দূরে থেকে ভেসে আসছে ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি। কখনো সখনো তীব্র হর্নের ক্ষীণ রেশ শোনা যাচ্ছে। কেউ শেষ অবধি ঘুরিয়ে দিয়েছে রেডিওটার ভল্যুম রেগুলেটার। হঠাৎ খুশির মত ছড়িয়ে পড়ছে গানের সুর। সামনের রাস্তায় স্বল্পজনের রকমারি পদশব্দ। পথ চলতি কিছু কথাবার্তা, হঠাৎ একটি ডাক দিল হয়তো কেউ কাউকে। সব মিলিয়ে একটি কর্মচঞ্চল খুশি খুশি ভাব দিকে দিকে।

শুধু এখানে এই বাড়িটি স্তব্ধ ক্ষার। একতলা বাড়িটার হলদে মাথায় পড়েছে রোদ। স্বর্ণচাঁপার আগডালে সোনার ঝিকিমিকি। তবু যেন কী এক থম্ ধরা অন্ধকার গ্রাস করেছে সারাবাড়ি। যেখানে যায় সুমিতা সেখানেই।

যেন কিছু হয়নি, যেন প্রত্যহের মতই, সকালের রোদের আশায়, ভাল-লাগা মনটি নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে সুমিতা। ও বেড়াচ্ছে আর ও'রা, অর্থাৎ বাবা, বড়দি, মেজদি যেন প্রত্যহের মতই ঘরে কিংবা বাগানে লাগিয়েছে তর্ক। অদ্ভুত সব কথা। কোন কোন কথা শুনতে সত্যি বড় লজ্জা করে সুমিতার। মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। বোঝা-না-বোঝা ভাবে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায় সকলের মুখের দিকে। ও বোঝে, সব কথা ওর শুনতে নেই, বোধহয় বুঝতেও নেই। তখন ও সরে পড়ে, ঘুরে ফিরে বেড়ায় এখানে সেখানে।

যেন তেমনিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুমিতা। বারবার বোঝাতে চাইছে মনকে, কিছু হয়নি, কিছুই হয়নি। কিছু হয়নি, ও যেন শুধু ঘুরে ফিরে বাগানে নেমে আদরের ডালিমগাছে হাত বাড়াতে গেল ফুলগাছের দিকে। সতেজ ডগে সবুজ পাতার পাশে শুকনো মরা পাতা [illegible]।

হাত বাড়াল, কিন্তু কাছে গিয়ে স্পর্শ করল না। আবার ফিরে [illegible] ঘরের দিকে। এখানে ওর মন নেই, মন পড়ে আছে অন্যত্র। বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে উঠছে। মুচড়ে মুচড়ে উঠে কান্না পাচ্ছে কেবলি। শুধু তো অশান্তি নয়, অস্বস্তিও নয়। একটি অদৃশ্য কাঁটা বিঁধে আছে এ বাড়িটার হৃৎপিণ্ডে। আর সেই কাঁটাটি যেন আমূল বিঁধেছে ওরই বুকে। সব খোঁচাখুঁচির রক্তঝরা যন্ত্রণা যেন ওরই। সারা বাড়িটার সমস্ত দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ওকেই ঘিরে আছে।

বাগান থেকে দেখা যায়, প্রত্যেকটি ঘরের প্রতিটি জানালা বন্ধ। কাচের শার্সির আড়ালে পর্দাগুলি কোনটা গুটানো, কোনটা স্প্রিংয়ের গায়ে টান টান করে মেলা। কিছু দেখা যায় না ঘরের মধ্যে। সাড়া শব্দ নেই কারুর। এক অস্বস্তিকর স্তব্ধতা বিরাজ করছে সবখানে। কেবল, রান্নাঘরে বিলাসের কাজের সামান্য শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু আগেই সসপেনে মাখনের ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ শুনে সুমিতা বুঝতে পেরেছে, বাবার জন্যে পোচ্ তৈরী করছে বিলাস। জন্ম থেকে দেখে আসছে সুমিতা, সকালবেলার চায়ের সংগে ওইটি তার বাবার চিরকালের খাবার। আর তাদের তিন বোনের জন্য হয়তো রুটি সেঁকবে এবার কিংবা সেঁকা

হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আরো কিছু। আরো কিছুর পর চায়ের জল চাপবে। তারপর, খাবার ঘরে ডাক পড়বে সকলের।

তখন কী হবে! একই টেবিলের এপাশে ওপাশে যখন বসবে সবাই, তখন এই নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা হঠাৎ কেমন ক'রে ভাঙবে। কে ভাঙবে! সেকথা ভেবে, এখনই ওর বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছে। এটুকু ওর ভয় নয়, আনন্দও নয়, এক অপার বিস্ময়ের আলো আঁধার। কিছুক্ষণ পরের সেই ভবিষ্যতের বুকে উৎকণ্ঠিত কান পেতে আছেও।

পরমুহূর্তেই ধক্‌ধকানিটুকু কেটে গিয়ে আবার সেই যন্ত্রণাকর অস্থিরতা ফিরে এল ওর মনে। অসল ছায়াটা যে অনড়। এ স্তব্ধতা ভাঙবার পালা শেষেও এ ছায়া সরবে না। এ ছায়ার প্রথম পদক্ষেপ হয়েছে অনেকদিন। দিনে দিনে, মাসে মাসে, সে ছায়া বেড়েছে, বড় হয়েছে। আর এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছে পূর্ণগ্রাস হবে বলে।

এ ছায়া পায়ে পায়ে এসেছে, তবু গতকাল পর্যন্তও এবাড়ির আবহাওয়া অনেকখানি স্বচ্ছ ছিল। মানুষগুলির চলায় ফেরায়, কাজে কর্মে কথায় চাউনিতে বারে বারে এ দিনটির ছায়া উঁকি দিলেও, প্রত্যহের জীবনে কোথাও ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। তবু এ দিনটির মুখোমুখি যাতে দাঁড়াতে না হয়, সে চেষ্টা অনেক করা হয়েছে। তলে তলে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এ দিনটিকে প্রতিরোধ করার জন্যে। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত এই দিন এসেছে।

এসেছে, তবু এখনো একটি ক্ষীণ আশা রয়েছে। তাই সুমিতা উৎকর্ণ হয়ে আছে, কখন বাড়ির সামনের লোহার গেটটা বিলম্বিত সুরে উঠবে কাঁকিয়ে। শব্দটা বেশ জোরে হয়। কোন কোন অন্ধকার বাতাস হুতাশন রাত্রে, উত্তরের ডেপুটির বাড়ির সোহাগী বেড়ালটা যেমন অদ্ভুত স্বরে তাদের বাগানে এসে ডাকে টেনে টেনে, ঠিক তেমনি শব্দ হয় গেটে। প্রতিদিনের শোনা সেই শব্দ, আজকে শোনবার জন্যে কান পেতে আছে সমস্ত হৃদয়। কখন শব্দ হবে, কখন দেখা যাবে রবিদা' আসছেন ঠিক তেমনি মাথাটি একটু হেলিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশান্ত মুখে তার সেই সহৃদয় স্বাভাবিক হাসিটুকু নিশ্চয় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে শেষ মুহূর্তের কৃতকার্যতায়। মুহূর্তে সমস্ত স্তব্ধতার অন্ধকার পালাবে মুখ ঢেকে। রবিদাকে প্রথম ছুটে গিয়ে অভিনন্দিত করবে সুমিতা। যেন তারই জীবনের এক জীবন-মরণ রুদ্ধশ্বাস সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবেন রবিদা।

কিন্তু, সে এ বাড়ির সকলের ছোট। এখনো পর্যন্ত কোন বিষয়ে তার মতামতের দাম নেই। কোন গুরুত্ব নেই তার কথার। কোন গুরুতর বিষয়ে কেউ আলোচনা করে না তার সঙ্গে। বাবা তাকে আদর ক'রে রুমুনি ব'লে ডাকেন। বড়দি' মেজদি'কে বলেন উমুনি আর ঝুমুনি। সে ডাকেও আদর আছে। কিন্তু আরো কিছু আছে, যা দিয়ে সুমিতার মনে হয় ওরা বড়দি আর মেজদি। ওরা সুজাতা আর সুগতা। সুমিতা শুধুই রুমনি। এ বাড়ির ছোট মেয়েটি। যাকে আদর করা যায়, ধমকানো যায়, কাজে কর্মে ফাই ফরমায়েস করা যায়। বিশেষ কোন কথার সময়ে বলা যায়, 'রুমনি তুমি একটু ওঘরে যাও তো এখন।' হঠাৎ বাইরের কোন নতুন লোক এলে, কয়েক মুহূর্ত সুমিতা কিছু প্রাধান্য পায়। তারপর যখনই পরিচয় হ'য়ে যায়, ও হচ্ছে এ বাড়ির রুমনি, সেই মুহূর্তেই ওর সমস্ত প্রাধান্য যেন যায় শেষ হয়ে। আর মানুষ কী বিচিত্র! তবুও সকলের চোখ থেকে থেকে পড়ে ওর দিকে। পড়তে হয় বলেই বোধ হয় পড়ে। রাস্তায় ঘাটে, ট্রামে বাসে, সবাই এখন তাকায় ওর দিকে। তার কারণ আর কিছুই নয়, ওর চেহারাটার জন্যে সবাই তাকায়। হয়তো আরো কিছু মনে করে, যেমন প্রথম দর্শনে মনে করে তাদের বাড়িতে আসা নতুন লোকগুলি। যদি জানতে পারত, সে শুধুমাত্র রুমনি, তাহলে সকলের চোখের চাউনি যেত বদলে।

এ বাড়ির কোন দুঃখের ব্যাপারে ওর

দুঃখিত হ'তে নেই। পারিবারিক কোন জটিল বিষয়ে ওর কিছু নেই চিন্তা করার। এমন কী, বড়োদের অনেক হাসির কথায় হাসাও ওর উচিত নয়।

এ সীমারেখাটি যত না টেনে দিয়েছে বাড়ির লোকেরা, তার চেয়ে হয়তো কিছু বেশী টেনেছে সুমিতা নিজে। ও যে বুমনি, সে কথাটি ও নিজে ভুলতে পারে না কখনো।

কিন্তু ওর জীবনের কোন্ ফাঁক দিয়ে, কবে কখন ওর মনটি আড়ালে আড়ালে টপ্‌কে গেছে সেই সীমারেখা, সে খবর রাখেনি ও নিজেই। গৃহস্থের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে যেমন ক'রে ঢোকে বনলতা, ঠিক তেমনি। যখন সে ঢোকে, তখন কারুর নজরে পড়ে না। যে ঢুকেছে, সে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে। প্রত্যহের কাজের মাঝে গৃহস্থের নজরে পড়ে না তা'। তারপর আরো ঢোকে, আরো আরো। অনেকখানি ছড়িয়ে, লকলকিয়ে এপাশে ওপাশে বাড়তে থাকে। তখন নজরে পড়ে। তখন আর অন্ত থাকে না বিস্ময়ের।

ওর মনটিও তেমনি অদৃশ্যে টপ্‌কে এসেছে সেই সীমারেখা। কিন্তু সেটা নজরে পড়েনি কারুর। তাই বাড়ির আজকের অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে, ওর কথা কারুর মনেও পড়ে না। ভাবেও নি কেউ।

কিন্তু যে দুর্ভাবনার অধিকার ওকে কেউ দেয়নি, যেটুকু আপনি এসেছে ওর মনে, সেটুকু লুকিয়ে রাখতে হ'চ্ছে ওকে। যত না ভয়ে, তত লজ্জায়। আজকের ঘটনা ওকেই বিচলিত করেছে সবচেয়ে বেশী। ওর বেদনা, ওর কান্না, অস্বস্তি অশান্তি ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে। যে বাতাসের ঘায়ে অকম্পিত অবিচল থাকে বড় শক্ত পোক্ত গাছগুলি, সবচেয়ে কচি লতাটি সেই বাতাসেই যেন পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

যখন সকলের মুখ থমথম্ করছে, স্তব্ধ হ'য়ে আছে সব, অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে এসে গ্রাস করছে একেবারে, তখন ছটফট ক'রে মরছে ও। ও সারা হচ্ছে ভেবে। কী হবে! কী হবে এর পরে!

শুধু অস্বস্তি অশান্তি বেদনা নয়। ওর বুকের মধ্যে যেমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, তেমনি ভয়ও করছে। সারা বাড়িটা শুধু ছায়া ছায়া নয়, থমথমিয়ে আছে। সেজন্যে ওর ভয় করছে। ভয়ে ও কান্নায়, সারা বাড়িটা ঘুরেছে পায়ে পায়ে। আর ওর বড় বড় দুটি ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত চোখে তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। এতক্ষণ সময়ের মধ্যে মাত্র তিনবার লোহার গেটটা উঠেছে কাঁকিয়ে। বিলাস একবার বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরেছে। আর ঝি এসেছে। সেই শেষবার শব্দ হয়েছে। তারপর যেন বরফের মত জমে গেছে গেটটা। আর কোনদিন বুঝি শব্দ হবে না।

কিন্তু কখন আসবেন রবিদা। আজকের এই মাঘী সকালে, সে-ই যে ওর সত্যিকারের উত্তরায়ণের বাঁকে ফেরা সূর্য। ওই লোহার গেটের দিক্‌চক্রবালে কখন উদয় হবেন তিনি। ও'র সেই গম্ভীর কিন্তু অমায়িক হাসি দিয়ে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন সব ভয়। ওর ভীত ব্যাকুল চোখে পলক নেই। ওর দুটি টানা টানা আয়ত চোখ। যেন ওর চোখ দুটি এমনি ভীত ব্যাকুল সব সময়েই। ভীত না হোক্, ওর চোখের তারায় ত্রস্ত ব্যাকুলতা নিয়ত বেড়ায় খেলা ক'রে। যদি হাসে, তখনো সেই হাসির ধারে ও যেন কিসের ভাবে থাকে ব্যাকুল হ'য়ে।

কিন্তু ওর নিষ্পলক চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেল, তবু না, রবিদা'র চিহ্নও নেই কোথাও। রাস্তায় বাড়ছে লোক চলাচল। এত লোকের আনাগোনা। কিন্তু যাকে চাই, সে আসে না। এমনটিই হয়।

তবু রবিদা'র আসার সময় তো অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে।

রান্নাঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে আবার বারান্দায় উঠে এল ও। এমনি ক'রে অনেকবার করেছে ঘর বার। আবার মন টানছে ঘরের দিকে। বড়দি'র ঘরের দিকে। যাকে নিয়ে আজ সার বাড়ির চেহারা গেছে বদলে। যার জীবনের একটি অধ্যায় হয়তো একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে আজ। যদি না হয়, তবে হয়তো ঝুলে থাকবে ত্রিশংকুর মত। আজ বিচারক রায় দেবেন ওর জীবনের। সত্যি সত্যি বিচারক, সত্যি সত্যি কোর্ট, কাচারি, মামলা। ভাবতে ভাবতে সুস্মিতার বুকের মধ্যে কনকনিয়ে উঠল ভয়ে ও ব্যথায়।

আজকে বড়দি'র বিয়ের তিন বছর পূর্ণ হবে। পূর্ণ হবে সন্ধ্যারাত্রি আটটার কাঁটায় কাঁটায়। তার আগেই, বেলা এগারোটা থেকে চারটের মধ্যে কোনও এক সময় হয়তো বড়দি'র সঙ্গে গিরীনদা'র বিচ্ছেদের রায় হ'য়ে যাবে। ভীষণ রাশভারী অথচ ভারী অমায়িক মানুষ গিরীনদা। মস্ত বড় প্রেসের মালিক। সুস্মিতাদের তুলনায় মস্ত বড়লোক। বিয়ের বছরখানেক আগে ওদের পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়েছিল। আর বিয়ের এক বছর পর প্রথম শোনা গিয়েছিল ওদের বিবাদের কথা। কত কথা শোনা গেছে তখন, কত ঘটনা ঘটে গেছে এতদিনে। গত বছর এমন দিনেই বড়দি' চলে এল গিরীনদা'র বাড়ি থেকে। স্বভাবতই বাবা নিয়েছেন বড়দি'র পক্ষ। মেজদি'ও তাই। বরং কিছু বেশী। চেষ্টা চলতে লাগল বোঝাপড়ার। সেই ফাঁকেই যেন বিবাদের চেহারাটা হ'য়ে উঠতে লাগল ভয়াবহ। কথা উঠল, আলাদা হওয়া যাক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে। সেই প্রথম ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছিল সুস্মিতা। সেই প্রথম নিজেরই অজান্তে যৌবনের মন সংকল্পের অলক্ষ্যে টপকালো তার সীমারেখা। সে সীমারেখা হ'ল ওর ব্যথা পাওয়ার অনধিকার চর্চা। আলাদা হওয়ার কথাটা কোনো সুরাহা করল না। যে দুজনকে নিয়ে ঘটনা, তলে তলে বাড়ল তাদের রেষারেষি। আগুনে জ্বলল ভাল ক'রে। ব্যাপারটা উঠল গিয়ে কোর্টে। ঘরের কথা বাইরে যেতে না যেতে, হাটের আসর উঠল জমে। উভয়পক্ষেই ইন্ধন জোগাবার লোকের অভাব হল না একটুও। উপকারীর দল এলেন জুটে। একটি কথাই বারবার শুনতে পেয়েছে সুস্মিতা। জুডি-সিয়াল সেপারেশন। হিন্দু বিবাহ না হ'লে ডাইভোর্স্ হ'ত।

জুডিসিয়াল সেপারেশন। আজ তার রায় পাওয়া যাবে। কী রায় পাওয়া যাবে না যাবে, সেকথা একবারও মনে হয়নি সুস্মিতার। এবার কী হবে, সেই কথা ভেবে বুকে ওর নেমেছে পাষাণভার। মানুষের জীবন মনের জটিল গ্রন্থ খোলা না ও। বড়দি'কে ও ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। যেকথা মুখ ফুটে ওর কোনদিন বলার সাহস হবে না, সেকথা হল, ওর হৃদয় মাঝের অনেক মনের একটি অস্পষ্ট মন গিরীনদা'কেও ভালবাসে। সে-ই যে ও কত বেশে কতদিন দেখেছে বড়দি আর

নিদা'কে, কত বিচিত্র পরিবেশে, সেই গুলি আঁকা হয়ে গেছে ওর তখনকার নারী বুকে। সে ছবি একটুও ম্লান ন ওর এই সবে বাড়ন্ত যৌবনের ন্তে। সেই ছবিটি যেন একটি ঝক- নীল আকাশ, রসসিক্ত উর্বর মাটি, টি মসৃণ পাঁচিল, কিছু মৃদু মন্দ বাতাস। যার মাঝখান দিয়ে ওর মনের কচি লতাটি, আড়ালে আড়ালে ছড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে তর্‌তর্‌ ক'রে। ওদের চাউনি, ওদের হাসি, ওদের ভালোবাসাবাসি, সে সবই শেষ হয়ে যাবে।

জজের বিচার কী হবে কে জানে। কিন্তু তারপরে কী করবে গিরীনদা' আর বড়দি। তারপরে কী হবে ওদের দুটির, সেই কথা ভেবে ও অস্থির হয়ে উঠেছে ভয়ে ও ব্যথায়। সেই কথা ভেবেই ওর যত বুকের কাঁপন, যত যন্ত্রণা। সেকথা বড়দি' কেমন ক'রে ভাবছে ও জানে না। মেজদি'র বিক্ষুব্ধ মুখে, সেকথার ছায়াও দেখা যায় না। কেবল, বাবাকে যখন ও একলা বসে থাকতে দেখে, তখন ও'র বিশাল মুখ-খানিতে যেন কিসের একটি করুণ ছায়া দেখতে পায়। সে ছায়া যে কেন, কিসের জন্যে, ও তা ভেবে কূল পায় না। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে, সবাই যেন এক। কেবল একই বাড়িতে, একই পরিবেশে ওর মনটি আলাদা হয়ে গেছে ওদের কাছ থেকে।

সত্যিই আলাদা। বাবার সঙ্গে দুই দিদির যেমন সম্পর্ক, ওর সঙ্গে তেমন নয়। বাবা ওকেও ভালবাসেন, অনেক কথা বলেন। কিন্তু বড়দি' মেজদি' আগে জন্মেছে বলে, ওদের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে অন্যরকম। সুমিতা যখন চোখ মেলে বাবাকে দেখতে শিখেছে, তখন বাবা কিছু ক্লান্ত, সৌম্য, একটু যেন করুণ। সন্তানের প্রতি একটু বেশীমাত্রায় স্নেহপরায়ণ বিপত্নীক এক ভদ্রলোক। চলায় ফেরায় কোথায় যেন ফুটে ওঠে একটু অসহায়তার আভাস। সেই মানুষটির সঙ্গেই ওর ভাব, ওর চেনাশোনা।

কিন্তু বড়দি' মেজদি' আর বাবা তিন-জনে মিলে আর একরকম। যাদের ও সবটুকু চেনে না, বোঝে না। আর ও জানে, তা বুঝতেও নেই।

কিন্তু সময় তো চলে যায়। বাইরের ঘরের পর্দায় হাত দিতে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। আবার তাকাল গেটের দিকে। না, রবিদার ছায়াও দেখা যায় না। শুধুই অচেনা মানুষের যাওয়া আসা।

শেষ আশা রবিদা'। উনি এ বাড়ির যেমন একনিষ্ঠ বন্ধু, তেমনি অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীনদা'র। গিরীনদা'দের পরিবারেরও এ ব্যাপারের একমাত্র বাইরের মানুষ, প্রকৃত বন্ধুর মত এ দুইয়ের ভিতরে ছুটোছুটি করছেন শেষরক্ষার জন্যে। গতকাল রাত্রেও বাবার সঙ্গে আড়ালে কথা বলে গেছেন উনি। বলে গেছেন, 'আজ রাত্রে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব গিরীনের সঙ্গে কথা ব'লে। ওর পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কিছু করা যায়।' শুনে সুমিতার ভীরু অস্থির অন্তরে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল মহারব ভেরী। ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে রবিদা'কে।

সেই ধরার ব্যাকুল-খুশি-আশায় মনে মনে হাত বাড়িয়ে আছে ও। কখন আসবেন রবিদা'! যেন ও'র হাতেই আছে সেই **প্রসন্নময়ের ঘুম ভাঙ্গানো সোনার কাঠি।**

(ক্রমশ)

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসী মনোনয়ন-প্রার্থীদিগকে টিকিটের জন্য আবেদন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—"বিনা টিকিটে ভ্রমণ নীতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অবশ্য এই নির্দেশে কর্ণপাত করবেন না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসীদের সম্প্রতি এক গোপন বৈঠক হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, বৈঠকে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের ছাটাই-বাছাইর প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। "প্রার্থীদের ক'জন ধোপে টিকলেন সে সম্বন্ধে অবশ্য এখনো কিছু জানা যায়নি। বাছাবাছি নিশ্চয়ই ভালো কিন্তু সব জিনিসের বাছাবাছি চলে না, যথা কম্বলের রোঁয়া"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির ফলে কলিকাতার নগরবাসীদের জীবন নাকি বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। শুনিলাম, ইহার প্রতিক্রিয়ায় ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি"।

* * *

বিলাতে বর্তমানে কমনওয়েলথ মন্ত্রি-সম্মেলন চলিতেছে। "মন্ত্রীরা ছাই বা Ashes সংগ্রহের জন্যে সমাগত হয়েছেন এমন ধারণা করা হয়ত আপনার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু সেটা ভুল, "ছাই"-টা ক্রিকেটাররাই সংগ্রহ করছেন"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

প্রেস প্রতিনিধিদের কোন এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত জওহরলাল বলিয়াছেন, তিনি যে সব সময় শুধু শিখেন বা

শেখান তা নয়, অনেক সময় খেলিয়াও থাকেন।—"প্রেস প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই জানেন, সেটা বেলেখেলা ছাড়া কিছু নয়"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সাধারণত দেখা যায়, ছাত্ররা অঙ্ক এবং ইংরেজীতেই বেশি ফেল করে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য উত্তর প্রদেশ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বোর্ড পাশ নম্বরের হার কমাইয়া দিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"ছাত্ররা এই ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই খুশী হবেন কিন্তু তাঁরা একথাও মনে মনে ভাববেন যে, "ভালো হতো আরো ভালো হলে"—অর্থাৎ পরীক্ষাটি উঠিয়ে দিলেই হতো উত্তম"!!

* * *

কলিকাতার কোন এক অফিসার ১৫ জন কর্মীর জন্য বিজ্ঞাপনের উত্তরে ৪০০ মহিলা প্রার্থী নাকি আবেদন পেশ করিয়াছেন।—"অথচ আমার এক বন্ধুর "পাত্র চাই" বিজ্ঞাপনের একটি উত্তরও আজ পর্যন্ত আসেনি"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতার পথে-ঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা নাকি অসম্ভবরকম বৃদ্ধি পাইয়াছে।—"বাড়ির

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান এখনো প্রকাশিত হয়নি বলেই আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নেহরুজীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্য একটি তারিখ স্থির করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উত্তরে জওহরলালজী নাকি জানাইয়াছেন যে, সাক্ষাৎ-এর সুযোগ অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হইবে।—"দু'জনের মধ্যে "Dating" চলছে, আমরা কী-ইবা বলতে পারি"!!

* * *

কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ছাত্র-সম্মেলনের বিদেশী প্রতিনিধিরা নাকি বলিয়াছেন যে, ভারতের শান্তিবাণীর আকর্ষণেই তাঁহারা সেখানে একত্রিত হইয়াছেন।—"কথাটা হয়ত আংশিক সত্য, সম্মেলনটা বারুইপুরে বা বজবজ হলে অন্যরকম ভাবা যেতো"—শ্যামলালের কথার ছিরি-ই এইরকম।

* * *

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কর্মিটি রেলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে রেলের যোগাযোগের অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বিশুখুড়ো বলিলেন—"সেদিকে কদ্দুর কী হবে বলতে পারছিনে, তবে রেলওয়ে অন্যদিকে অনেক উন্নতি করেছে,—প্রথমে মোহনবাগান এবং পরে রাজস্থান দুই-ই রেলওয়ের কাছে কাৎ"!!!

* * *

বালীর কোন এক বাড়ির সম্মুখে একটি বোর্ডে নাকি লেখা ছিল—"আজাদ রেন্ ফোরকাস্ট স্কুল"। অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুলিস আবিষ্কার করিলেন যে, আদপে সেটা কোন স্কুলই নয়, জুয়াখেলার একটি আড্ডা মাত্র। এই ব্যাপারে ৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ফোরকাস্ট স্কুলে গোড়াতেই ছাত্রের যা ভীড় দেখছি, তা'তে মনে হয় ভবিষ্যতে ভর্তি হতে এখানেও অন্যান্য স্কুলের মতোই অসুবিধে হবে"।

* * *

আমাদের কাগজ আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় আলোচনীতে "মৎস্য কথা" প্রবন্ধ পাঠ করিলাম।—"কিন্তু বাজারে মাছের আমদানী এবং দর দেখে মনে হলো, এটা নিতান্তই মৎস্য পুরাণ, শুধু নব আবিষ্কার"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পাওয়া যাচ্ছে...

সর্ব্বজনের ও সর্ব্বস্থানের উপযোগী রেডিও

সবাই কিনতে পারে ফিলিপ্‌স্‌এর এরকম একটা রেডিও এখন পাওয়া যাচ্ছে। ফিলিপ্‌স্‌এর 'সুপার এম' রেডিও গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে তৈরি, শর্ট ও মিডিয়াম ওয়েভ সমেত এই সেটটা সর্ব্বজনের ও সর্ব্বস্থানের উপযোগী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একে একবার দেখলেই নিজের করে নিতে ইচ্ছা হয়।
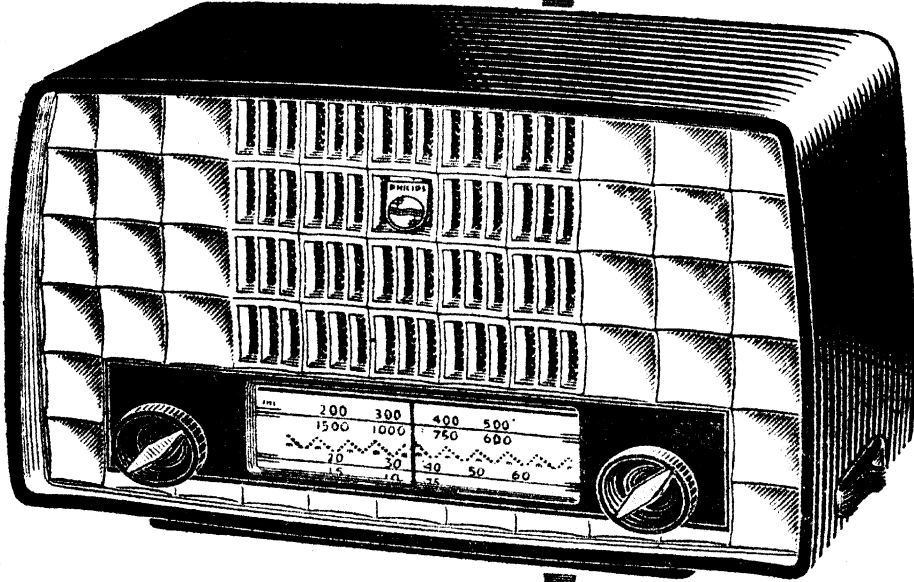
বিশেষ গুণাবলী:

- ✓ শর্ট মিডিয়াম ওয়েভ
- ✓ মজবুত গড়ন
- ✓ উৎকৃষ্ট ধ্বনি বিশিষ্ট
- ✓ ব্যাটারী খরচে সাশ্রয়

(তদুপরি স্থানীয় ট্যাক্স)
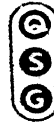
অনুমোদিত ফিলিপ্‌স্‌ ডিলারগণ আপনাদের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত বিশেষ করে রেডিও কেনার পর।

ফিলিপ্‌স্‌ ২৩৬

ড্রাই ব্যাটারী অথবা এসি/ডিসি রেডিও

আজই আপনার নিকটবর্ত্তী **ফিলিপ্‌স্‌** রেডিও ডিলারের নিকট গিয়ে সেটটী বাজিয়ে শুনে আসুন, আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ, ১৫ই এপ্রিল, রবিবার

অদ্য ইংলন্ড যাত্রা করিবার দিন। অতি প্রত্যুষ হইতেই বাড়িতে গোলমাল লাগিয়াছে। আমারও ভাল নিদ্রা হয় নাই। দুর্ভাবনায় ও দুঃখে হেমের মারও(১) নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে একটি দুইটি করিয়া পাড়ার লোক বাড়িতে জমিতে আরম্ভ হইল। আমার কাজের জিদ্ কিন্তু মরে নাই। সর্বাগ্রে সকলে একত্র হইয়া পারিবারিক উপাসনা হইল; তৎপরে অবশিষ্ট যে দুই একখানা পত্র লিখিতে বাকি ছিল তাহা লিখিলাম। ঠাকুরদাসী(২) বেচারি এত কষ্ট করিয়া দেশ হইতে আমাকে দেখিবার জন্য আসিল; তাহার সঙ্গে যে নির্জনে দুইটা কথা কহিব, তাহার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। চিঠি লিখিতেছি আর দুই একটা কথা বলিতেছি। তাহার মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইতেছে। নড়িতেছি, চড়িতেছি, আর হেমের মা এক একবার নিকটে আসিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার মুখে এমন কাতরতার চিহ্ন অতি অল্পই দেখিয়াছি। বিরাজ(৩) বেচারির সঙ্গে ত আমার মেশামিশি কম, তিনি অত করে নিকটে আসিতে পারিতেছেন না; কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহারও মুখ নিতান্ত বিষণ্ণ ও মলিন দেখিতেছি। ক্রমে যাত্রা করিবার বেলা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ভয়ানক ত্বরা পড়িয়া গেল, কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কি দেখিতেছি, কি শুনিতেছি, যেন বুঝিতেও পারিতেছি না। বাড়ি লোকে লোকারণ্য। আহা, আমার প্রতি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কি সদ্ভাব! আমি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া, কত আত্মীয় পাইয়াছি। ইঁহারাই ত প্রকৃত আত্মীয়। আধ্যাত্মিক রক্তের পরিবার। জগদীশ্বর দেখাইতেছেন, যে তাঁহার সেবার জন্য রতিপ্রমাণ আপনাকে ব্যয় করে, তিনি ভরি ভরি তোলা তোলা পরিমাণে, লোকের প্রেম দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। এই দুঃখ যে, আমি এই সদ্ভাবের অনুরূপ আপনার দেহ মন প্রাণ, তাঁহার চরণে আজিও অর্পণ করিতে পারি নাই। আর কবেই বা করিব! বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর হইল, জরার লক্ষণ সকল এখনই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার কাজে যাহাতে আরও প্রাণ দিতে পারি, সেই জন্যই ইংলণ্ডে যাইতেছি। দেখি এবার কি হয়।

ঘোর ত্বরার মধ্যে, এর সঙ্গে দুই একটি

১৮৮৮ সালে ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে লেখক

কথা, ওর প্রতি দুই একটি প্রশ্ন, ইহাকে একটি নমস্কার উঁহাকে একটু সাদর সম্ভাষণ—এইরূপ করিতে করিতে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পূর্বদিন রাত্রি হইতে হেম(৪) এই বলিয়া দুঃখ করিতেছে যে, বাহিরের লোকেরা সর্বদা আমাকে ঘিরিয়া থাকিতেছে, বাড়ির লোকে দুইটা কথা বলিবার সময় পাইতেছে না; বলিতেছে—আমরা বাহিরের লোক হইলে ভাল হইত, বাবার সঙ্গে দুইটা কথা কহিতে পারিতাম। আমি বলিতেছি—"That is the penalty we pay for being public men." আর এইরূপই ত হইবে। আমি ত আর নিরবচ্ছিন্ন আমার পরিবার পরিজনের নহি। আমার প্রতি পরিবার পরিজনের যেরূপ অধিকার, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরও সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব হেমের দুঃখ করাই অন্যায়।

যাহা হউক, যথাসময়ে গাড়ি গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিল। আমার গাড়িতে হেম, রাজু(৫), সরলা (৬) প্রভৃতি; আর এক গাড়িতে বৌঠাকুরানী(৭) প্রভৃতি; আর এক গাড়িতে ভুবনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি এইরূপ গাড়ির মালা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। স্টীমার ঘাটে ৮নং জেটিতে উপস্থিত হইয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা উপস্থিত; স্টীমারের লোক বোধহয় এত বাঙ্গালীকে কখনও স্টীমার ঘাটে একত্র হইতে দেখে নাই। হা ভগবান, আমি এই সদ্ভাবের উপযুক্ত কি করিতে পারি! হেমের মুখচুম্বন করিয়া যখন বিদায় লইলাম, তখন সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এত লোক আমি সকলের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলাম না; প্রত্যেকের নিকট বিশেষভাবে বিদায় লইতে পারিলাম না। গড়ের উপরে সকলকে নমস্কার করিয়া 'মির্জাপুর' নামক স্টীমারে আসিয়া উঠিলাম।

স্টীমার যতক্ষণ চক্ষের অগোচর না হইল, ততক্ষণ তাঁহারা ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরাও রৌদ্রে ডেকের উপর দাঁড়াইলাম। তৎপরে নামিয়া ক্যাবিনে আসিলাম।

ক্যাবিনে আসিয়া দেখি, বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে জাহাজের কি উন্নতিই করিয়াছে! ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন এই P and O কোম্পানীর জাহাজে মাদ্রাজে যাই, তখন জাহাজের অবস্থা যাহা দেখিয়াছিলাম, এবং এখন যাহা দেখিতেছি—এ উভয়ে অনেক প্রভেদ। ক্যাবিনগুলির অনেক উন্নতি করিয়াছে। প্রত্যেক ক্যাবিনে ইলেকট্রিক লাইট—তড়িতালোক, তড়িত-ঘণ্টা, মুখ হাত ধুইবার জলধারা, আয়না প্রভৃতি সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীর

---

(১) প্রথমা পত্নী—প্রসন্নময়ী দেবী। (২) শিবনাথের প্রথমা ভগিনী। (৩) শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী—বিরাজমোহিনী দেবী। (৪) শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা সরকার।

(৫) এবং (৬) শিবনাথের পালিতা কন্যাদ্বয়।

(৭) পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মাতা।

য়ি স্থানটি কি বিস্তৃত ও পরিষ্কার, র্শ ও সুন্দর রূপে সুসজ্জিত। । ছটি টেবিল, এক এক টেবিলে করিয়া ৪০ জনের উপযুক্ত স্থান প্রত্যেক টেবিলে এক একজন " আর মহিলাগণ যে টেবিলে বসেন, । একজন, স্টুয়ার্ডেস্।

াজের কর্মচারিগণ আরোহীদিগের অতিশয় সৌজন্যের সহিত ব্যবহার আমাদিগকেও সৌজন্যের সহিত । করিতে হয়। তাহারা ভৃত্য বটে, কিন্তু আদেশ করিবার সময় "অনু- গ্রিয়া এটা কর" কি "ঐ জিনিসটা । দেও" বলিতে হয়। এইখানেই ত্র মহত্ত্বের ভিত্তি দেখিতেছি। ইহারা চাকর, রাঁধে পরিবেশন করে, বিছানা া দেয়, জুতা ব্রাশ করে, তথাপি র আত্মমর্যাদাজ্ঞান এরূপ স্বাভাবিক জনল যে, আমরা সমুচিত সৌজন্য ; ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে পারি তুলনায় আমাদের সঙ্গে কি আশ্চর্য । বিবিধপ্রকার পরাধীনতার মধ্যে ল বাস করিয়া আমাদের দেশের র আত্মমর্যাদাজ্ঞান লুপ্তপ্রায় ছে। এই খানেই আমাদের সকল ত্র মূল। প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ের এক বিষয়ে মহা প্রভেদ দেখিতেছি। ীতে ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব ফুট, প্রাচীতে ইহা বিলীন। এইজন্যই তে রাজকীয় যথেচ্ছাচার বদ্ধমূল পারিয়াছে।

ন্তু এই প্রাচ্য আত্মমর্যাদাজ্ঞানের পের মূল কোথায়? আমার বোধহয়, প্রথা ও জাতিভেদ-প্রথার ন্যায় সামাজিক সকল প্রচলিত হওয়াতে প্রাচীতে াঙ্গীকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি অতিরিক্ত াগে সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজশক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত শক্তি পরাস্ত কৃত হইয়াছে। প্রতীচীতে ইহার ীত কারণে, ব্যক্তিগত শক্তি সুরক্ষিত াছে। Feudal System ব্যক্তিগত র পরিপোষক হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। এখন ভারতবর্ষকে তুলিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে এই আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রস্ফুটিত করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, আমরা জাহাজে পদার্পণ করিতে না করিতে প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজিল। আমি কিন্তু আজ প্রাতরাশে গেলাম না। আমার জন্য নিরামিষের কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা জানিবার অগ্রে গিয়া কি হাস্যভাজন হইব?

ক্যাবিনে আসিয়া একটু সুস্থির হইয়াই Higgins সাহেবের পত্র লইয়া Purser-এর সঙ্গে ও chief steward-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিরামিষের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলা গেল। তৎপরে উঠিয়া দুর্গামোহনবাবু (৮) ও পার্বতীবাবুকে (৯) কোন ক্যাবিন দিয়াছে তাহা দেখিয়া আসা গেল। জাহাজ দেখিতে দেখিতে মুচিখোলা, বজবজ প্রভৃতি ছাড়াইয়া অপরাহ্ণে ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিধানে আসিয়া পৌঁছিল এবং রাত্রের মত সেখানে নঙ্গর করিল।

কে বলিবে জাহাজে আছি। সন্ধ্যার সময় আহারের হলে পিয়ানো বাজিতেছে, নাচ ও গান চলিতেছে। কতকগুলি বিবি সঙ্গে রহিয়াছেন; ছোট ছেলেও আছে যেন ঘর ঘর বোধ হইতেছে। এখানেই অদ্য রাত্রি যাপন করা গেল। সন্ধ্যাকালে ডেকে বসিয়া সায়ং সন্ধ্যা (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা) হইল।

১৬ই এপ্রিল ১৮৮৮, সোমবার

অদ্য বেলা প্রায় ৮।৯টা পর্যন্ত জাহাজ ছাড়িল না। আমাদের আহারাদি নিয়মিত চলিতেছে। ক্রমে জাহাজ ছাড়িয়া সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে আর উভয় কূল পারদৃষ্ট হয় না। কিছু কিছু দূর অন্তর একটি একটি বয়া, অনেক পরে একটি রাঙ্গা বয়া দেখা গেল। আমাদের ওদিকের লোকে গল্প করে—এই বয়ার দক্ষিণে যদি নৌকা আসিয়া পড়ে, তবে আর বাঁচে না।

যাহা হউক, আর একটু অগ্রসর হইয়া দুইখানি জাহাজ দৃষ্ট হইল। একখানির নাম Upper Gasper আর একখানির নাম Lower Gasper। মধ্যে জাহাজের সঙ্গীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল যে, জাহাজের Pilot পথে জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে আমাদের পত্র লইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি হেমকে ও রামব্রহ্মবাবুকে (১১) দুই পত্র লিখিলাম।

ক্রমে যতই সাগরে আসিয়া পড়িলাম, ততই জলের বিক্রম ও বাতাসের বেগ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তরঙ্গের এত জোর যে, জাহাজের উপরের ছাদে জল উঠিতে লাগিল, Second class-এর সমুদায় ক্যাবিনের জানালা বন্ধ করিতে হইল।

ক্রমে অপরাহ্ণ ৫টা কি ৫॥টার সময় Pilot Brigg নামক জাহাজের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল। ইহা একখানি জাহাজ, সর্বদা সমুদ্রের জলে ভাসিতেছে; ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে। Pilot ইহাতেই থাকেন, যে জাহাজ নদীতে প্রবেশ করে তাঁহাকে তাহাতে উঠিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হয়; আবার কোন স্টীমার আসিবার সময় তাহাতে উঠিয়া নদী পার করিয়া দিতে হয়। নদীর মধ্যে কোন বিপদ ঘটিলে সে দায়িত্ব তাঁর, সেজন্য কাপ্তেনকে দায়ী করা হয় না।

অনুমান ৬টার সময় Pilot কাপ্তেনের হাতে জাহাজ দিয়া আমাদের জাহাজ পরিত্যাগ করিলেন। সেই জোর বাতাসের মধ্যে Pilot Brigg হইতে একখানি Life Boat আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম। বাপরে, সমুদ্র-তরঙ্গের কি অপূর্ব নৃত্য! জাহাজ-খানি একবার তরঙ্গপৃষ্ঠে উঠিতেছে আবার তরঙ্গগর্ভে নামিতেছে। অনেক সাহেব-বিবির মাথা ঘুরিয়া বমন আরম্ভ হইল। পার্বতীবাবুরও মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনিও তাঁহার ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ডেকের উপরেই সায়ং সন্ধ্যা হইল।

১৭।১৮ই এপ্রিল ১৮৮৮। মঙ্গলবার, বুধবার

এই দুই দিনের বিশেষ বিবরণ কিছু নাই, সেই নীল জলরাশি, সেই জাহাজের লোক, সেই নিয়মিত আহার। সবই সেই অধিকের মধ্যে এই দুইদিনে আমি অনেক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। রঘুবংশের শেষ ৫০টি কবিতার নোট লিখিলাম ও একটি ভূমিকা লিখিলাম। ১০খানি পত্র লিখিলাম। সঞ্জীবনীর (১১) জন্য একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলাম ও মেসেঞ্জারের (১২) জন্য একটি আর্টিকেল লিখিলাম। সঙ্গের ইংরাজেরা দেখিয়া একটু আশ্চর্য; ভাবিতেছেন যে লোকটি এত লিখিতেও পারে। একজন কানাডার লোক আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন; তিনি বলিলেন, তুমি দুদিন বড় লিখিয়াছ। আমি বলিলাম, পরিশ্রম করা আমার অভ্যাস, না করিলে আমার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

---

(৮) লেডি অবলা বসুর পিতা দুর্গামোহন দাস। (৯) তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পার্বতীচরণ রায়।

(১০) রামব্রহ্ম সান্যাল—তৎকালীন আলিপুর চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ।

(১১) কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(১২) "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার"—শিবনাথ-সম্পাদিত, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ইংরেজি মুখপত্র।

২৪ এপ্রেল [illegible handwriting]

[illegible handwriting] Calcutta Review-তে Then and Now [illegible handwriting] Review of Robert Cust [illegible handwriting] Liquor Traffic in India [illegible handwriting] Cust [illegible handwriting] Canon Farrar [illegible handwriting]

শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংলণ্ডের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি

জাহাজের একজন ইংরাজের সহিত ইংলণ্ডের মেষ ও গরুর সম্বন্ধে কথা হইল। জাহাজে যে ভেড়াগুলি যাইতেছে সেগুলি লম্বে আড়াই হাত, উচ্চে পৌনে দুই হাত হইবে। আমাকে একজন বলিলেন, একশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের মেষ এত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল না। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে কেবল কৃষকদিগের যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের গৃহপালিত পশু-বংশের উন্নতির কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন না করিলে তাহাদের দৈনন্দিন দুর্গতি অপরিহার্য।

১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অদ্য প্রাতে মাদ্রাজ উপকূলে সূর্যোদয় হইল। শীঘ্র শীঘ্র কূলে নামিয়া যাইব বলিয়া অতি প্রত্যূষে স্নানাদি সারিলাম ও চা খাইয়া লইলাম। একটু বেলা না হইতে হইতে পিণাকপাণি মুদালিয়ারের পুত্র বোট লইয়া আমাকে লইতে আসিলেন। রামস্বামী আইয়ার ও দুর্গামোহনবাবুর জন্য পালকি লইয়া উপস্থিত। ক্রমে আমরা নামিয়া গেলাম। নামিয়া গিয়া দেখি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি সভ্য অপেক্ষা করিতেছেন। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া সমাজে যাওয়া গেল। সেখানে তাঁহাদের নূতন ছাপাখানা ও Ragged School দেখা গেল। তৎপরে বাজারে গিয়া অনেক জিনিস কেনা গেল; কিনিতে প্রায় ১২টা বাজিল। তৎপরে Ponno Swamy Pillay-র বাড়িতে গিয়া আহার করিয়া সুন্দরম্ পিলে ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া গেল। বেচারা সুন্দরম্ পিলে আমাকে অনেক দিনের পর দেখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাঁর স্ত্রীটি বড় লক্ষ্মী; ইচ্ছা হইল তাঁহার সহিত আলাপ করি; কিন্তু তামিল জানি না কি করি! সুন্দরম্ পিলে ইণ্টারপ্রিটারের কাজ করিতে লাগিলেন। সুন্দরম্ পিলে বেচারা আমাকে জিনিসপত্র কিনিতে দশ টাকা দিলেন। চিঠিগুলো ডাকে পাঠান গেল। পরে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ৪টার সময় জাহাজে আসা গেল। জাহাজে আসিয়া আর একবার স্নান করিয়া দিনের শ্রম নিবারণ করা গেল। আবার সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িল।

আজ একটি দৃশ্য দেখিলাম। যাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইল। জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে ধরিলে এখানকার মুটে ও বোটম্যানগণ জাহাজে উঠিল। ও দেশের এই সব লোকের কাপড় পরিবার রীতি নাই; একটু একটু নেংটি পরিয়া আছে। দেখিলাম, জাহাজের ইংরাজ কর্মচারী ও অফিসারগণ যে যেখানে পাইতেছে তাহাদের পশ্চাদ্দেশে লাথি ও ছড়ি মারিতেছে। বেচারারা মারের জ্বালায় অস্থির, লোক জুটাইবে কি! তাহাদের এমনি অবস্থা যে, এই প্রহারকে তাহারা আপনাদের উপযুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে!

আজ মান্দ্রাজ হইতে অনেকগুলি ইংরাজ ও বিবি প্যাসেঞ্জার নামিলেন। আহারের স্থানের চারিটি টেবিল আজ পরিপূর্ণ, রীতিমত স্থানাভাব। যুগলে নৃত্য, গীত, বাক্য চলিতেছে। সকলে বেশ সুখী। বিবিদের এক আধজন বেশ সুন্দরী। ইঁহাদের অনেকে লঙ্কাদ্বীপে নামিয়া যাইবেন। আমার ক্যাবিনে একজন সঙ্গী জুটিয়াছেন। ইনিও অস্ট্রেলিয়াতে যাইবেন।

(ক্রমশ)

হিমাচল খণ্ড

॥ ৭ ॥

…মাচল প্রদেশে আবার এসে প্রবেশ করলুম। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। হিমাচল আরম্ভ হোলো যোগিন্দর নগরের …ায়। একটি শিখর পেরিয়ে তার …ড়া পথ ধরে নতুন রাজ্যের দিকে ধীরে এগিয়ে চললুম। বর্ষামেঘের ফাঁকে এবার আকাশের নীলাভা …।

…য় আর শরতে মেলানো পার্বত্য-…। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির ঝালর, রামধনুর …ন ঝিকিমিকি। উত্তর থেকে দক্ষিণে …দের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো …ারের তুষারশুভ্র চূড়া, মহাকালের …ু প্রহরীর মতো। কালোমেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মুখেচোখে, এলায়িতকুন্তলা রমণীর ঝুরু ঝুরু ভিজা চুলের রাশি যেন বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে-চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখী সমাজ, তারা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ডাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরৎবন্দনা সভায়।
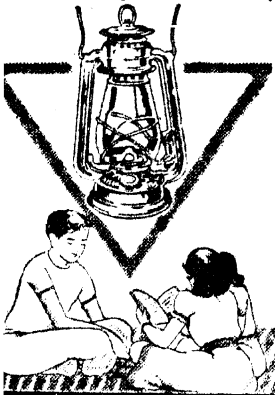
বনচ্ছায়ার পাশ দিয়ে নির্ঝরিণীরা নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলির দিকে, যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদারের বনে বনে; যেখানকার সংসারযাত্রা এখনও তন্দ্রা-জড়ানো। আমাদের গাড়ী চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খর রৌদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি স্নিগ্ধতা। কাংড়ার বনকান্তারের নিভৃত নিকুঞ্জে যেন কুসুমশয্যা রচনা করেছিলুম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবরুদ্ধ, সেজন্য ওখানকার বিহ্বল প্রকৃতির বাসক-শয্যায় দরদর ঘাম ঝরেছিল কপাল বেয়ে, নিবিড় তৃপ্তির মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠাণ্ডা হওয়ায় প্রভাত কালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা, গত রজনীর ক্লান্তি শেষের মধুর অবসাদের মতো।

হিমালয় তার অন্তঃপুরের দ্বার খুলে দিচ্ছে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিপথে। সেখানে তার প্রাণের ভাষা আছে গোপনে, পরমাত্মীয় এসে না দাঁড়ালে সেই ভাষা অপর কারো কানে কানে বলা চলে না। আমরা সেই পথে চললুম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদীর তীরে নিভৃত শিলাসনে বসে চিরবৈরাগী ভারত আপন জপের মালায় বীজমন্ত্র পাঠ করছে। জরা, জন্ম ও জাতকের অতীতে যে-ভারত যার আবহমান কালের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব প্রতি রুদ্রাক্ষদানার জপের সঙ্গে ফিরে ফিরে চলেছে! এবারে আকাশ তার নির্মল নীল শোভা বিস্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রঙ্গীন পাখীরা, যাদেরকে সচরাচর চোখে পড়ে না সমতল ভারতে।

ভারতের মানচিত্রে সর্বাপেক্ষা জটিলতা দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এলোমেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কাটেনি। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাব; এবং এর সীমা নির্দেশ করতে গেলে পাঞ্জাবের মধ্যে ভ্রমণ করে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চল আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিটমহল আরেকটির কোলে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে ভৌমিক সংলগ্নতা নেই। কুলু উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত, কিন্তু হিমাচলের এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুলু পৌঁছানো যায় না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হোলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী আজও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ত সম্প্রতি একটা পাওয়া গেছে। গল্পটা অবশ্য সেই পুরোনো আমলের। পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপুতেরা কোনোদিন পুরোপুরি হাত মেলাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না, কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্য-বত্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপুতনার ইতিহাস যেমন গৌরব দীপ্ত — অনৈক্য, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং আত্মঘাতী অদূরদর্শিতায়ও সেই ইতিহাস কলঙ্কমসীলিপ্ত। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নির্বিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন, তারা তাদের ধনরত্নসম্ভার, আত্মীয় পরিবারবর্গ এবং লোকলস্কর নিয়ে একে একে চলে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা পার্বত্য আদিম অধি-বাসিগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক পাঠান এবং মোগল রাজশক্তি ওদের নিয়ে তেমন আর ঘাটাঘাটি করেনি, কারণ ততদিনে মুসল-মান শক্তি সমতল ভূভাগে যতখানি আধিপত্য পেয়েছিল, ততখানিকেই তাদের বিনা মূল্যের লাভ বলে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপুতেরা হিমালয়ে গিয়ে বসে ক্রমে কুড়ি পঁচিশটি রাজ্য সৃষ্টি করে এবং পাঞ্জাবী রাজাগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। বিশাল এক একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সমুদয় পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজপুতনার উত্তর, উত্তরপূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম, এই বিরাট ভূভাগ এই সেদিন অবধি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারত-স্বাধীনতার সঙ্গে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যত চারভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্থানে এবং ভারতের অধীনে

আসে বাকি তিনভাগ। একটি পূর্বপাঞ্জাব, একটি হোলো পেপসু এবং তৃতীয়টি হোলো হিমাচল প্রদেশ। পূর্ব পাঞ্জাব এবং পেপসু হোলো হিন্দু-শিখ প্রধান, হিমাচল প্রদেশ হোলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় রাজপুত প্রধান। এছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্য সম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতল ভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে। এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত—শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতী। উত্তরে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্রু, মধ্য ভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা। আমরা বিপাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। বন্য শতদ্রুকে ছেড়ে এসেছি একদা কিন্নর ও বুশাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বস্তি পার হয়ে যাচ্ছি। কোনোটা উঁচুতে, কোনোটা বা অনেক নীচে। আনাচে কানাচে পড়িয়ে আছে ওদের সুখ-দুঃখ, ওদের ঘরকন্নার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পাবে, নৈলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র, জীবনদর্শন ঘটে না। যারা বিমানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাদের প্রশ্ন করো, কিছু জানা যাবে না। পৃথিবী তাদের জন্য, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গুনেছে। মানুষের কাছে গিয়ে তারা বসেছে, আতিথ্য নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকান্নার এবং বেদনার অংশ গ্রহণ করেছে। দরিদ্রকে নারায়ণ বলেছি তখন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, চোখের জল মুছে দিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃস্বার্থ সে নিরপেক্ষ। পর্যটক হয় তীর্থপথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যে-ব্যক্তি তীর্থের পর তীর্থ পায়ে হেঁটে পর্যটন করে তাকে আমরা বলি, পুণ্যাত্মা। তার পায়ে যে শুধু তীর্থ ধূলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধূলির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মানুষের ইতিহাস,—দুঃখের, ঝড়ের, সংকটের, দারুণের ইতিবৃত্ত; সেই ধূলির মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর হৃদয়ানুরাগ, আত্মোপলব্ধি এবং দিব্যজ্ঞানের ছোট ছোট বিস্ময়াবিষ্কার। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যে-পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়, সে হোলো মৃত্তিকার অঞ্জলি, উপড়ে করলেই তার শেষ হয়। কিন্তু অন্তরে দিয়ে যা দেখেছি, পায়ে হাঁটা পথের দুই প্রান্তে, সেইত পরম দর্শন; দরিদ্র দিনশ্রমিকের ঘরে বিদুরের অন্ন গ্রহণ কালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেইত পরম জ্ঞান। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নরের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মার্থের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির কথা। বস্তুকে সত্য বলে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে পৌঁছতে চাই। মাটির পুতুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে জ্ঞান ও বিদ্যার উপলব্ধি। ঐশ্বর্যকে লাভ করি, লক্ষ্মী থাকেন আমাদের কল্পনায়। ঋষিকে দর্শন করি, অনুভব করি দর্শনতত্ত্বকে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় আনি। বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে, তার ভিতর দিয়ে পৌঁছতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকে জ্ঞান বলে না, উপলব্ধ সত্যই হোলো জ্ঞান।

মানুষকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বঞ্চিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিন্তু মানুষকে জানা হচ্ছে না। ওই চীড়বনের তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জাম্ববনের ওপাশে যেখানে প্রস্তর-জটলার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত, ওখানে আসন বিছিয়ে পড়ে থাকো বাকি জীবন, দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশু-বালক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠুরিয়া চলেছে মাথায় তার বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণ্যের আশ্চর্য রহস্য। একটি আধ-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবন সম্রাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, ওর মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যসম্ভার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আপেলের বনের উচ্ছ্বসিত রক্তিম প্রগল্‌ভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীবায় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে। কতটুকু সীমা, কতটুকু বা প্রয়োজনের জগৎ। পাথরখণ্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, স্লেট পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সজ্জা,

আগাছায় নীড়-পাকানো চালাই, দু' একটি টুকরির মধ্যে ধানের দানা, পুঁটুলির মধ্যে জোয়ার, ভাঁড়ের মধ্যে নুন, লোহার গামলায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চির-দরিদ্রা রাজকন্যার গৃহস্থালী, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশুর জন্ম। এক টুকরো ক্ষেত, দু তিনটি গরু মহিষ, পাঁচ সাতটি ভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই চার মুরগী, দু একটি পোষা তিতির, এরাও মিলে রয়েছে ওদের সঙ্গে। সুখী সেই পরিবার, মালভূমির উপরে যাদের ক্ষেত-খামার, যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বনাশের আশঙ্কা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে, নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এখানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোট্ট একটি দোকান, যারা ওরই মধ্যে একটু সম্পন্ন গৃহস্থ। তোলার বরণির একটি পাত্র, তার উপর বসেছে অসংখ্য রঙীন বোলতা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শুকনো প্যাড়া, যার রস টেনে শুষে নিয়েছে পতঙ্গের দল। কড়াইতে মহিষের দুধ জ্বাল দিচ্ছে ঘরের মধ্যে বসে কাজল মাখা গৃহস্থ বধূ, কাঠের তাকু ঘোরাচ্ছে কাঁটের পাকে-পাকে—ওর থেকে প্রস্তুত হবে কাজাকাদ। গৃহপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে বধূর চরণপদ্মে আপন গা ছুঁইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদি পাতার রসে রঙীন। সংসার এখানে মন্থরগতি, কর্মচক্রের ঘর্ঘরতা কোথাও নেই। শান্ত নিরিবিলি নিষ্কম্প পাহাড়ী জীবন, উন্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। লোভের পিছনে মদমত্ত মানুষ ছোটে না, দ্রুতগতির দ্বারা কেউ ঊর্ধ্বশ্বাস নয়। ধান, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের টুকরো, কোথাও বা আলু ও আখের চাষ। একদিকে খদ, অন্যদিকে মালভূমি। দূরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার, আর কোলের কাছে শিশু পাহাড় সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণ্যের ছায়া পড়ছে সেই গিরিসংকটে। যেখানে ছায়া, সেখানেই শীতল বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জঙ্গল-জটলার মধ্যে ঝিল্লীর ডাক ছেড়ে ওঠে। ওরা তারস্বরে ডাকছে রাত্রিকে, ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা জামির আর কমলার গন্ধ পেয়ে ছুটেছে পতঙ্গের পাল। প্রজাপতিরা কিছু বিমর্ষ, ফুল ঝরে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে, ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর তুষারচিতা, অজগর আসে কাংড়ার অরণ্য পেরিয়ে, কুলুর ওপার থেকে আসে তিব্বতী পীতাভ ভালুক, আলুর ক্ষেতে ঘুরে যায় বন্য শূকর।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে অনেক দূর। এই গাড়ী সারাদিন দুবার আনাগোনা করে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হোলো আধুনিক সভ্যতার সংবাদ। বিচিত্র সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পৌঁছয়, সেইসব মনোহারী সামগ্রীসম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিস্ময় আনে। এই একটিমাত্র পথ, এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যান-বাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় না, যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ওদের কাছে পৌঁছয় না। হাট বসে ওদের পার্বত্য কোনো কোনো গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দূরের মহাজন, সেই ফল সমতলে চালান যায়। ওই হাটেই বিক্রি হয় জন্তুর আর সরীসৃপের ছাল, পিতল অথবা রূপোর অলংকার, বিভিন্ন ঔষধ শিকড়, হাড়ের অথবা রঙীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অস্ত্র, ভেড়ার লোমের টুপি কিংবা মখমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চিরুণী, আর হয়ত নায়দা। আশ্চর্য, মোটা সিঁদুর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাঙা রুলি আর আলতা। ওরা শিবের পাশে শক্তিকে বসায়, রামের পাশে সীতা, বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী। সর্বাপেক্ষা পূজ্য সংহাররূপিণী মহাকালী। জন্তু আর পাখীর মাংসে ওদের অরুচি নেই। ওরা সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দুর্গাপূজার দশমীর দিনে সেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা'। সেদিন সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ মাণ্ডি, চাম্বা, মাহাসু, শিরমুর ও নবসংযুক্ত বিলাসপুর, এরা আনন্দে উদ্দীপনায় কর্মতৎপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

হঠাৎ চমক ভাঙালো, মিসেস গুপ্তা মাথা তুললেন। পেট্রোলের গন্ধ এবং চড়াই-উৎরাই পথের বাঁক—এতে তাঁর মাথা ঘোরে এবং অসুস্থ বোধ করেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে চোখ বুজে ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আর কত দেরি?

গাড়ী তখন উৎরাই পথে নামছে। বললুম, প্রায় এসে গেছি।

তাঁর চোখে ঘুমের ভাব ছিল,—গত কয়েক দিনের পথের ক্লান্তি ত' ছিলই। বললুম, আকাট শুকনো মানুষের পাল্লায় পড়ে আপনাকে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে। মাণ্ডিতে পৌঁছে কি খাবেন বলুন? খাওয়ার গল্প এখন ভালো লাগছে।

হাসিমুখে তিনি বললেন, অর্থাৎ খিদে পেয়েছে আপনার। চলুন, আমিই আপনাকে আজ খাওয়াবো। একটা সুবিধে এই, আপনার খাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

তাই বলে এই ঠান্ডা দেশে ভাঁটা চচ্চড়ির খোঁজ করতে আমি রাজি নই।

তিনি খুব হাসলেন।

বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। ওপারের পাহাড়ের কোলে-কোলে পাকা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট বাসা, ছোট ছোট স্বর্গ। এখানে ওখানে পায়ে-চলা পথ চ'লে গেছে, কোথায় গেছে, কোনো দিন তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎসুক চোখে। কোনও অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে, বোধ হয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগৎ জুড়ে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। চন্দ্রলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দশ হাজার মাইল দূরের মানুষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আণবিক এবং অন্তরযান বোমা পৃথিবীর বায়ু, বৃষ্টি, আবহ-স্বভাব ও শীতাতপকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে—এসকল খবর এদিকে কেউ জানে না। কিন্তু আমাদেরই ভুল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ গৌরী-শৃঙ্গের চূড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিহার করেছে, সুমেরু প্রদেশে সভ্যতার স্বাদ পৌঁছে দিয়েছে,—সুতরাং এখানে সেই জগৎজোড়া আধুনিকের ছিটেফোঁটা ঠিকরে আসবে বৈকি। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিলুম, শহর আসছে।

গাড়ী নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাস তুলে আবর্ত রচনা করে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ী সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডিজাইনের সাঁকো, ক্যানটিলিভার ব্রীজ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল নিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিরাপদ ওই কাছিগুলির জন্য। নীচের দিকে এর ভিত্তি থাকে না, কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধাক্কা ভিত্তিকে চূর্ণ করে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখ্য। তিস্তায়, রংগীতে, লছমনঝুলায়, বিষ্ণু-গঙ্গায়, ইরাবতীতে, আরও নানান অঞ্চলে।

নদী পার হয়ে আমাদের মোটর বাস মাণ্ডির মস্ত শহরে এসে প্রবেশ করলো, শহর একটু দূরে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মানুষের সমস্ত কীর্তিকে অতি ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পট-ভূমিতে মাণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পৌঁছলুম।

সামনেই চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্লক-টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে ঘড়ি। সাড়ে নটা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কান-জোড়া ওই চতুষ্কোণ গম্বুজটি প্রথম প্রবেশপথে মাণ্ডির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রান্তে, যেখানে তিব্বতী স্থাপত্যের ছোঁওয়া স্পর্শ করেছে। পশ্চিম তিব্বতের প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে। যেমন উত্তর কুমায়ুনে, সিকিম-ভুটানে, দার্জিলিং-কালিম্পঙে, পূর্ব ও উত্তর কাশ্মীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালেও এই স্থাপত্যের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গঙ্গার কূলে সেই ছোট্ট পশুপতিনাথের মন্দিরটিও এই গঠনতন্ত্রকে ধারণ করে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিব্বতী ও মঙ্গোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রবল।

শহর-বাজার জনবহুল। সমতল পথ ঘাট

রৌদ্র ঝলোমলো। নানা পথ চলে গেছে নানান দিকে। ডাক বাংলা এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে, সুতরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেল পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লটবহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া করলুম। সহসা শ্রীমতী গুপ্তা কলরব করে উঠলেন, কই, আপনি যে বলেছিলেন, আমাকে শশা খাওয়াবেন? এই দেখুন, একেবারে এক ঝুড়ি শশা নিয়ে বসেছে। কিনুন, কিনুন—

শশা কেনা হোলো সোৎসাহে। তিনি সহাস্যে বললেন, এটির দিকে তাকাবেন না। যদি আপনার আর্থিক সঙ্গতি থাকে, আরেকটি কিনতে পারেন।

তিনি না হাসিয়ে আর ছাড়লেন না। দু আনায় দুটি মস্ত শশা কেনা হোলো। কিন্তু খোসা ছাড়াবার মতো সময় শ্রীমতী গুপ্তার হাতে ছিল না!

টাঙ্গা চললো দোকান বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। তিনি কথায়-কথায় মদনলাল এবং সংবতীর মুণ্ডপাত করছিলেন। কাছেই একটি প্রান্তর ও খেলার মাঠ। পথের এ দিকটায় মহাজনদের পাইকারী বাজার এবং নগর সভ্যতার সেই বিবিধ পণ্যাবিপণি। আমরা ছিটকে এসে পড়লুম বাস্তব জগতে।

এক সময় টাঙ্গা থামিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুললেন, এবং গত রাত্রে লেখা একখানি চিঠি নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে পুনরায় গুছিয়ে বসে তিনি বলেন, রাত জেগে আপনার কথাই লিখলুম দুপাতা। আসল প্রশ্নটা করা হোলো না যে, উনি দিল্লী আসছেন ঠিক কবে। একটি বিষয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবতী, এমন স্বামী অনেক মেয়েই পায় না।

এবারে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললুম, অনেক মেয়ে স্বাধীনতা পেলে স্বামীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়। আপনি কি তাদেরই একজন?

একেবারেই না! শ্রীমতী গুপ্তা বলে উঠলেন, আমাদের বাড়ীতে উনি যেদিন আপনাকে নিয়ে আসবেন সেদিন দেখবেন, আমাদের ঘরকন্না! আমার সমস্ত ব্যবস্থা আর ইচ্ছা-অভিরুচির সঙ্গে উনি মিলিয়ে থাকেন। উনি আলাদা মানুষ নন।

স্বামীর প্রসঙ্গে উনি এত গৌরব বোধ করলেন যে, পুরুষমাত্রই আনন্দলাভ করবে। ওঁর একাগ্র তন্ময়তা দেখে একথা সহজেই বিশ্বাস করলুম, এই হিমালয় ভ্রমণ এবং চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য ওঁর কাছে কত সামান্য! সত্যি বলতে কি, মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এই ভ্রমণের ঠিক এক বছর পরে দিল্লীতে যেদিন তাঁর তরুণ স্বামী মিঃ গুপ্তর সঙ্গে প্রথম আলাপ হোলো, সেদিন অনুভব করেছিলুম শ্রীমতী গুপ্তার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। মিঃ গুপ্ত আমাকে তাঁর বাড়ীতে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার আমার হিমালয় যাত্রাকালে তিনি যে-বিস্ময় সৃষ্টি করলেন, তার কথা যথাসময়ে বলবো।

হঠাৎ সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছুঁয়েছে মণ্ডিকে। শুধু ওই চীন-তিব্বত স্থাপত্যের প্রতীক ঘড়িঘরটি নয়, ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছুঁয়েছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের মূর্তি, সেই তীক্ষ্ণ দাঁত আর মুখব্যাদান, দুদিকে দুই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংষ্ট্রা, কুমীরের লেজ, গরুড়ের ডানা এবং মানুষের ভঙ্গি। শিরা উপশিরায় প্রচণ্ড তীব্রতা। সমগ্র গঠন, সমস্ত আয়তন—সমস্তটা যেন বহি-ভারতীয়। কাঠের উপরে আশ্চর্য কারু-কার্য, তার আঙ্গিক ও সুষমা, তার সুসঙ্গতি ও ছন্দ, সারাদিন ধরে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি বহু হিন্দু-মন্দির। উখীমঠ, ত্রিযুগী-নারায়ণ, তুঙ্গনাথ, যোশীমঠ, বদরিনাথ—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমস্ত নেপালে এছাড়া কিছু নেই। সিকিমে ভুটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অঞ্চলও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বিচিত্র পোষাকে পরিহিত এক আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে। সৌম্য দর্শন আমাকে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভূখণ্ডে মিলে গেছে। অনেক লামা পুরুষানুক্রমে বাস করে ভারতে, যেমন অনেক চীনা। নৈনীতাল অঞ্চলের কোনো কোনো পার্বত্য ভূখণ্ডে একদল চীনার প্রচুর জায়গা জমি ছিল এই সেদিন অবধি,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কারো কারো জমি-দারী,—আজ তারা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হুণ, আরব, তাতার, এমন কি চেঙ্গিস খাঁর প্রপৌত্র বংশের ছিটে ফোঁটা,—এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজস্থানের মরু-ভূমিতে। পৃথিবীর আর কোনও ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈচিত্র্য নেই,—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা—কোথাও না।

অবশেষে যেমন-তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অমনি কিছু। হোটেলের নীচেই বড় রাস্তা, এইটিই প্রধান রাজপথ,—শহরকে বেষ্টন করেছে। পূর্বদিকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে সরকারী দপ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভি পার্স-ও তিনি পান। কিন্তু এখন তাঁর দখলে সৈন্যসামন্ত অথবা অস্ত্রসজ্জা কিছু থাকার হুকুম নেই। বোধ হয় জন দুই চার বডিগার্ড তাঁর আছে, হয়ত বা এক আধটা পাখী-মারা গাদা বন্দুক,—ওটা সঠিক জানিনে।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে আমরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। দুধ,

মিষ্টি আর শিঙ্গাড়ার দোকান পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়ত স্বয়ং দোকানদারও আড়চোখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে থাকবে। ভোজনান্তে পানের দোকান দেখে খুশী হলুম। মায়া-দেবী পান খান না, কিন্তু নতুন দেশের সঙ্গে সুর না মেলালে চলবে কেন? এর পর আমাদের সময় ছিল কম। ওখানে মস্ত বড় কলেজ আর ইস্কুল—সমস্তই একে একে দেখা দরকার। তিনি ফলপাকড়ের ভক্ত, সুতরাং পাহাড়ী মেওয়া ফল কিনে বসলেন এক ঝুড়ি। ঘুরে-ঘুরে দেখা গেল এ পাড়া আর ও পাড়া। সরু সরু ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপুত বংশের মেয়ে আর পুরুষ। মেয়েরা সুশ্রী, পুরুষ শ্যামবর্ণ, মাথায় রাঙা পাগড়ি, পরনে চুড়িদার। মেয়েদের পরনে সাধারণত শাড়ি নয়,—পায়জামা, পাঞ্জাবী আর উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মস্ত হাট বসেছিল, আজও সেই ভাঙা হাটের রাশি রাশি সামগ্রী-সম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলুম অনেক দূর। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দুটি নদীর সংগম-স্থল দেখা যায়। যারা দেখেছে গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ আর রুদ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকা-নন্দা মিলেছে এসে নীলধারায়, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তারা এ ছবি সহজে কল্পনা করবে। একটি নদী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। শেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে,—ওরই পথ ধ'রে দক্ষিণে গেলে সুন্দরনগরের বিশাল উপত্যকা। তারপর সেই পথটি আবার গিয়েছে দক্ষিণে—শতদ্রু নদী অতিক্রম ক'রে বিলাসপুর রাজ্যে। অধুনা বিলাসপুর হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি, অনেক ছায়া-বীথিকা রইলো অনাবিষ্কৃত, অনেক নিভৃত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, কিন্তু তারা দূরবর্তী। বাইরের পৃথিবী চোখে পড়ে না, কিন্তু এই হিমালয়ের প্রাকার ঘেরা অবরোধের মধ্যেও এখানকার নিজস্ব জগৎটি সুপ্রসারিত।

বনময় পাহাড়তলীর পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির; ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শক্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার তরঙ্গরণরঙ্গে। এদিকে ত্রিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিখ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবস্থান, আছে মূর্তি, আছে বিচিত্র স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পাচ্ছিনে। এরা এই তিব্বতী-চৈনিক-মঙ্গোলীয় নয়, এরা যেন আবার আগাগোড়া ভিন্নগোত্রীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভুটানে নেই, গাড়োয়ালে-নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়ুনে-কিন্নরদেশে এ ধরন নয়,—এরা নতুন। এরা আভাস দেয় অতি প্রাচীনের—যখন নদীতীরে ব'সে মানুষ প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যখন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়ত বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, যে-ব্যাখ্যা তারা ক'রে যেতো, পরবর্তীকালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে গেছে। অজন্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পদ্মাশিথান-শয়ান বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণ মূর্তি, বোম্বাই সমুদ্রগর্ভে হস্তীগুহায় ত্রিমূর্তি, নেপালের স্বয়ম্ভু, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পুরীলোকে কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যায়নি আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপত্য আপন অর্থ হারিয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়ের মতো। মণ্ডিতে এসে চমক লাগে, এ একেবারে নতুন, এর জাতিগোত্র সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। পৃথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আত্মনিবেদন নেই; আনন্দ এবং সৌন্দর্য-বোধের দিকে বৃহত্তর মানবতাকে অনু-প্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই; মহাজনতার আনন্দ আর উদ্দীপনার জন্য তারা উৎসর্গিত।

পাহাড়ী দেশে সর্বত্র যেটি লক্ষ্য করেছি, এখানেও তাই। বিরোধ কোথাও নেই। সংসারযাত্রা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিন্যকে দাঁড়াতে দেয় না।

অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে ঘণ্টাকয়েক আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম। ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটি ধোপার দোকান, অর্থাৎ ডাইয়িং ক্লিনিং,—সেখানে মাত্র তিন ঘণ্টার চুক্তিতে কতগুলি জামা-কাপড় কাচতে দেওয়া হোলো। দোকানদার আমাদের সেই চুক্তি যথাযথ পালন করেছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম। সর্বাগ্রে স্নানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উপরতলায় এসে সচকিত হয়ে দেখি ঘরটি খোলা। আমরা ভয়ে চমকে উঠলুম। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুলুপ লাগানো হয়নি। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখ পড়লো টিপাইয়ের ওপর রুমালে বাঁধা শ্রীমতী গুপ্তার সংরক্ষিত টাকার তোড়াটা, ওটা তিনি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আরও কিছু

কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিল এখানে ওখানে ছড়ানো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো হোটেলওয়ালা, এবং জানালো, আমরা ঘর বন্ধ ক'রে যাইনি, সেজন্য দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই,—সে এতক্ষণ এই ঘরের পাহারাতেই ছিল। তবে ব্যাপারটা এই, এ তল্লাটে কারো কিছু সহজে খোয়া যায় না!

এমন শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে সেই যুবকটি কথাগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

রৌদ্র ছিল প্রখর, তাই সাবানসহযোগে স্নিগ্ধ শীতল জলে স্নান ক'রে সেদিন বড় আনন্দ পাওয়া গেল। কাংড়ায় হঠাৎ-আবির্ভূত অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় আমার অপরিচ্ছন্ন চেহারা ও পোশাকপত্র দেখে অত্যন্ত লাঞ্ছনা করেছিলেন, আজ তার সম্পূর্ণ প্রতিকার করতে বসলুম। দেখে শুনে শ্রীমতী গুপ্তা অত্যন্ত আপত্তি-জনক পরিহাস ক'রে বসলেন,—করলেন কি? রাস্তাঘাটে সকাল থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, তা'রা যে এবার চিনতে পারবে না? এমন দুর্মতি কেন হোলো আপনার?

আমার উচ্চহাস্যে তিনি জবাব পেয়ে গেলেন।

আহারাদি অল্পবিস্তর বাঙালী ধরনের। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করায় যুবকটি জানালো, এখানকার খাদ্যরীতি মোটামুটি এই, তবে বনস্পতির তৈরী খাদ্য এখানকার ভদ্রসমাজ ছোঁয় না। বনস্পতি খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। ওটা খেলে নাকি পরিণামে অন্ত্রনালী এবং যকৃতের সর্বনাশ ঘটে!

যুবকটির মুখে চোখে উত্তেজনার আভাস দেখে আমরা হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলুম।

বেলা প'ড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। ধোপার বাড়ি থেকে কাপড় চোপড় যথাসময়ে আনিয়ে নেওয়া হোলো। আমাদের গাড়ি ছাড়বে অপরাহ্ণে।

মণ্ডি অবধি যাত্রীর ভিড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয়ত বা শিমলার পরে দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই শহরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপত্যকায়। পূর্বদিকে বিপাশা নদীর তীর ধ'রে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপত্যকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথটি আগে ছিল না। এটি শুধু অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল। একদিকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাথরের পাহাড়,—এবং সেই মৃন্ময়তাহীন পাথুরে পাহাড় অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ঝুঁকে থাকতো বিপাশার স্রোতের উপর। সে-দৃশ্য আশ্চর্য এবং প্রকৃতির এই অদ্ভুত চেহারার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করতে সাহস পেতো না। সেদিন লারজির এই বিপাশা-পথ ধ'রে পায়ে হেঁটে কুলু উপত্যকায় যাওয়াটাও ছিল অতীব কষ্টকর। সেই কারণে কুলু যেতে গেলে যোগিন্দরনগর থেকে বেরিয়ে গুমা ও ঘাটাসানি হয়ে যাওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। হিমালয় এখানে যেন তার আদিম অভি-ব্যক্তির দিকে পর্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। আমরা অবাক হয়ে ছিলুম।

আমাদের গাড়ি ছাড়লো অপরাহ্ণে যথাসময়ে। কুলুর খ্যাতি ইদানীং কম নয়। অনেকে বলে, কাশ্মীরের পরেই কুলু। এর বৈচিত্র্যও আছে। ভূস্বর্গের সঙ্গে শোভা সৌন্দর্যের তুলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছু,—যেটি পথিকের পক্ষে পরম বিস্ময়। আসামের উত্তরপূর্ব কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে যেখানে বিরাট নামচা-বারোয়ার সীমানা, চমলহারির নীচের দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে ভুটানের অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্নহীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্রু যেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরি-সংকট রংচুং এলাকায় যে-পথ গিয়েছে কিন্নরলোক পেরিয়ে 'ধবলগিরির' শিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগৎপ্রসিদ্ধ অরুণ নদ যে-পথ দিয়ে বিশ হাজার ফুট উঁচু পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুলুর পথে সেই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

বোধ হয় স্থান-কালের প্রভাব পড়েছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস ক'রে এসেছি এতদিন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়া পড়েনি। অতি প্রাচীনের সংকেত রয়েছে এই সর্বকাল এবং সর্বলোক-বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের অন্তঃপুরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শুনেছে? অগণ্য শতাব্দীর যোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দৃষ্টি,—চোখে মুখে অনাদি-অনন্তকালের ক্ষমাস্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্নতা। মাথা নত হয়ে আসে ওর দিকে

তাকালে। একালের রুচি এনেছি সঙ্গে, এনেছি এ যুগের বিজ্ঞানের অহঙ্কার, এনেছি আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবর্জনাকুণ্ড থেকে অধঃপতিত প্রকৃতি-বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিন্যের ধিক্কার,—কিন্তু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঋষির ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না! পুরুষপরম্পরায় এসেছে অনেক মানুষ ওর স্নেহচ্ছায়ায়, একটির পর একটি শতাব্দী ধ'রে দলে দলে তা'রা চলে গেছে, কত আধুনিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষ্যৎ কতবার ঘুরেছে ওর চক্রতীর্থপথে, কিন্তু নির্বিকার সুপ্রাচীন চেয়ে রয়েছে অপলক-চক্ষু মহা-কালের মতো, ভ্রূক্ষেপ তার কিছুমাত্র নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্দিরের সোপানে, দেওদারের অরণ্যে, অমিতকায় পাষাণপৃষ্ঠের ভাস্কর্যে, প্রাক্‌বৈদিক ভারতের ছায়া-সুনিবিড় অতীন্দ্রিয় চেতনায় —দেখে গেলুম ওই মহাযোগীর চকিত পদসঞ্চার; নিয়ে গেলুম আমার মর্মের রোমাঞ্চ শিহরণে তাঁর নিত্যকালের বাণী: শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্!

ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইলখানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি-পাহারা, অর্থাৎ চেক্-পোস্ট পড়ে। এখানে একটি পুরাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিস ঝুলিয়ে গাড়ির আগে-আগে হেঁটে চলে, অর্থাৎ স্পীড একেবারেই দেওয়া চলবে না। যদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকে চাপা দিয়ে চলে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা, গৈরিক তরঙ্গ তা'র চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে পাথরে-পাথরে। এটি হোলো দুই নদীর সঙ্গম। সম্ভবত যে-বৃষ্টি হয়ে গেছে গত দু'দিন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দুরন্ত স্রোত সংহার-মূর্তিতে নামছে দুই ধারায়। ওদের আঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, ছিন্নস্রোতায় এবং বিপ্লব-বিক্ষোভে উৎক্ষিপ্ত শীকরকণায় মুহুর্মুহু ধূম্রজাল সৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ওই আত্মঘাতী প্রাণযন্ত্রণার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আরোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ি ঘুরলো ডানদিকে এবং ওই ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সঙ্কীর্ণ পথে লারজির দিকে। কুলু উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোটরপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সরু এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। মোটর বাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ হয় তা'র চেয়ে বেশি। পথটি একতরফা, অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ি আসবে না। বিপাশা এখানে ঘুরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূর্বে, তারপর পুনরায় গেছে উত্তরে। আমাদের গতি স্রোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ির মধ্যে উঠেছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি যুবক। নিঃসন্দেহ, মাতা ও পুত্র। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো ক'রে না তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ, কিন্তু তাঁর আর্যজনোচিত দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, শরীরের ধবধবে রং, মিহি বেগুনী মখমলের গাত্রাবরণ, তাঁর আগুলফলম্বিত শুভ্রবর্ণের গাউন, মাথায় রেশমী ওড়না এবং পায়ের দিকে শাদা মোজা ও ক্যাম্বিশের জুতো, এদের সঙ্গে তাঁর স্থির শান্ত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগুলি মিলিয়ে এমন একটি সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, যেটি এমন ক'রে আগে দেখিনি। পাশের যুবকটির বয়স অল্প, সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে গাড়ির মধ্যে বসেছি, কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলের মাথা ছাড়িয়ে। সকলেই আমরা তাঁর কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত স্কন্ধ-দেশ, চওড়া মুখের চোয়াল, মাথায় উচ্চতা, ছড়ানো দুই পা,—আর কেউ না হোক, আমি নিজে অবাক। আরেকটি বস্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁর সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদে লাল, সবুজ, পীত, কৃষ্ণনীলাভ, গৈরিক, ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে সমগ্র গাড়িখানা যেন অভিনব গৌরব লাভ করছিল।

তাঁকে কেউ দেখছে না, কেবল আমি লক্ষ্য করছি, এটি শ্রীমতী গুপ্তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এক সময় গলা নামিয়ে বললেন, দেখছেন কি? উনি পণ্ডিতানী!

কে?

পণ্ডিতানী! কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের মহিলা! ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেখছেন না,—তীর্থে যাচ্ছেন?

বললুম, আপনি চিনলেন কেমন করে?

বাঃ—শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, তিন বছর হয়ে গেল আমি আছি কাশ্মীরে; ওদের নিয়ে ঘর করেছি,—আমি জানিনে? আপনি যা হুড়োহুড়ি করলেন, কাশ্মীরে আপনার কিছুই দেখা হোলো না। তাছাড়া এমন লোকের কাছে আতিথ্য নিলেন, যা'র ঘর-কন্না বানের জলে ভেসে গেল! সব লেখকেরই কি আপনার মতন কপাল মন্দ?

হেসে উঠলুম। এবার চড়াইপথে গাড়ি উঠছে, সুতরাং শ্রীমতী গুপ্তার বাক্যালাপ থেমে গেল। তাঁর ঘূর্ণি লেগেছে। তাঁর কথাটা কিন্তু সত্য, কাশ্মীরের একটি বিশেষ শ্রেণীকে দেখা হয়নি,—যাঁরা বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে সুখ্যাত। তাঁরা বিশেষ শুদ্ধাচারী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাঁদের মহিলারা প্রায়শই থাকেন লোকলোচনের বাইরে,

শ্রমজগতে এবং জনতার হট্টগোলে তাঁদেরকে দেখা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অভিজাত এবং সম্পদশালী। এই মহিলাটি সেই সমাজেরই। মাতা ও পুত্রের মুখে-চোখে এমন সুশিক্ষার দীপ্তি এবং প্রসন্ন নম্রতা অভিব্যক্ত যে, আমি অভিভূত হয়ে ছিলুম। কেউ যদি বলতো, পায়ের ধুলো নাও,—আমি রাজি হতুম।

পথ ক্রমশ সংকটাপন্ন হচ্ছে। একখানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি সংকীর্ণ পথ। একদিকে গভীর খাদ—আমাদের পায়ের নীচে। বিপাশার প্রচণ্ড রণরঙ্গ-স্রোত বয়ে চলেছে সেই খাদের তলায়। একটি অসতর্ক মুহূর্তে, বাস—আমাদের গাড়ি ছিটকে পড়বে দেশলাইর বাক্সের মতো পাঁচশো কিংবা হাজার ফুট নীচে,—অবধারিত মৃত্যু! পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় সর্পের ফণার মতো মাথার উপরে ঝুলেছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলন্ত গাড়ি সেই ধাক্কা কোনোমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিটকে যাবে বিপাশায় তলিয়ে। মাইলের পর মাইল এই বিপজ্জনক পথ ধ'রে গাড়িখানা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললো, এবং আমরা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শংকা, অস্বস্তি এবং আতংক নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ হয়ে রইলুম।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য উদ্বেগ ও ভয়ের কথা ভুলে যেতে পারলে এমন একটি রূপ-জগৎ তা'র রহস্য আবরণ উন্মোচন করতে থাকে যে, আপন অস্তিত্বকে অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বত্য গুহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজস্র বিচিত্র পুষ্পলতা ও গুল্মে আকীর্ণ সেই সব গুহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে পূজার্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের স্তবক অবিকল ঋষির আকার লাভ করেছে এবং আকাশের মেঘস্তূপের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিরাট দেব ও দানবের ছবি চিনে-চিনে বা'র করি,—এখানেও তাই, স্পষ্ট চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি ঋষি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেয়ে দেখছে নতুন কালের মানুষকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নির্ঝরিণী নামছে ওদেরই জটা থেকে, ওদেরই বুকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথের তীর্থপথে মহাগুণাস গিরিসংকটে—যেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগীশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর শরীর হিমতুষারে আচ্ছন্ন হয় এবং কালক্রমে সেটি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজস্র ফুলের বিবিধ বর্ণে ও গুল্মলতায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখেছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমস্তটাই যেন জীবন্ত, প্রাণময়। বুঝতে পাচ্ছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের এই নিঃশব্দ সমাজকে। চিরকালো ধরতে পারছিনে আমার অস্তিত্বটা সত্য, কিংবা ওদের এই নিঃশব্দ অলৌকিক জগৎটা বাস্তব। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ, আমার এই মনোভাব দেখে হাসবে সবাই—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তাদের মনেও হাসি কি? যেটা আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধির অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য? যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অশ্রদ্ধেয়? এ অহংকার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়ায়, পরমাণুতে, চৈতন্যবিন্দুতে—এই হোলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোকসম্পাৎ। সেই বিন্দুর বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিস্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও আণবিক আর উদ্জান বোমা,—নৈলে সৃষ্টি রসাতলে যায়! যে-অণুর দ্বারা মানুষের সৃষ্টি, সেই অণুতেই পাথর তৈরী। প্রথমটায় পেয়েছি সৃষ্টির পরম বিস্ময়, দ্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ভাষা শুনবো,—এরই জন্য আজ প্রস্তুত হচ্ছি। একশো বছর আগে কেউ ভেবেছিল মানুষ উড়বে, বেতারে গান গাইবে, পর্দায় মানুষের চেহারা নড়বে এবং তা'র প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনবো? যাদেরকে এতকাল ধ'রে বলা হয়েছে, জড়—তারা কি জড়তা ঘোচায়নি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে অভিধানে?

বন্য গোলাপের ঝাড়, আপেল ডালিমের বন, স্লেট পাথরের পাহাড়, কর্কশ শিলা-সম্ভার, রহস্যগর্ভ গুহাপথ এবং আতংক-সংকুল বিপাশার খাদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ি চললো। (ক্রমশ)

রত্নাকর

১৯শে মে, শনিবার, সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায়ের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। স্থান ছিল শ্রীমানিবাবুদের ৪৮।১, রামতনু বসু লেনস্থ ভবনে। এ অনুষ্ঠানে কলকাতা সংগীত জগতের অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। পৌরোহিত্য করেছিলেন, আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। বিশেষ কোন কারণে চপলাবাবুর আসতে দেরি হওয়ার ফলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় প্রায় আটটায়, যদিও সময় ধার্য ছিল সন্ধ্যা ৬টায়। অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (যষ্ঠীবাবু), শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র, শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রহ্লাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি কল্পনা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইকুমার বসু, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীললিত পাল, শ্রীঅনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি খ্যাতনামা সংগীতবিদ্‌গণ। সংগীতাচার্য অমরনাথ ভট্টাচার্য ও সংগীতাচার্য যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিল্পিবৃন্দের মধ্যে অনুপস্থিত দেখে একটু আশ্চর্য বোধ করছি। ওস্তাদ দবীর খাঁ ও ওস্তাদ আতা হোসেন খাঁ সাহেব বিশেষ কারণবশতঃ উপস্থিত না থাকতে পারায় এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথাক্রমে শ্রীললিত পাল ও শ্রীহেমন্ত আলি খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। লালাবাবুও (শ্রীদামোদরদাস খান্না) না আসতে পারায়, পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ খান্নাকে পাঠিয়েছিলেন নিমন্ত্রণরক্ষার্থে।

অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছিলেন ধীরেনবাবুর শিষ্যবৃন্দ। সুরুচির পরিচায়ক সুন্দর এক পরিবেশের মধ্যে এমন একটি অনুষ্ঠানের কথা বহুদিন আমার স্মরণে থাকবে। জন্মবার্ষিকী হলেও সাধারণ সভাসমিতির মতই এর কার্যবিবরণী নির্ধারিত হয়েছিল। সভাপতি নির্বাচন, মাল্যদান, সম্পাদকীয় ভাষণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় উদ্যোক্তা সমিতির বিষয়-সূচীর অন্তর্গত ছিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং এঁদের দুজনের মধ্যস্থলে সংগীতাচার্য ধীরেনবাবু আসন পরিগ্রহ করার পর সমিতির পক্ষ হতে এঁদের মাল্যভূষিত করা হয়। কি জানি কেন, বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও এই সম্মানজনক উপহার হতে বঞ্চিত হননি। এই চারিজনের মাল্যদান পর্বের পর সমিতির সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ দে, যিনি এই অনুষ্ঠানের প্রধান হোতা ছিলেন, নাতিদীর্ঘ সুন্দর একটি ভাষণে সংগীতাচার্যের প্রতি সমিতির শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বাংলার যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেছেন, তাঁদের পূজ্যপাদ গুরুদেব সেই সংগীতনায়কদের অন্যতম। তাঁরা প্রার্থনা করেন, যেন তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে ধ্রুপদ সংগীতের উত্তরোত্তর প্রসার করে বাংলায় পুনরায় এই সংগীতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। প্রত্যুত্তরে ধীরেনবাবু তাঁর শিষ্যগণকে প্রাণখোলা আশীর্বাদ করে সমাগত অতিথিবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর গায়কোচিত মধুর কণ্ঠে বলেন, "জীবনে প্রত্যেকেরই বৎসরে একবার করে জন্মবার্ষিকী আসে। আমারও আজ এসেছে। জীবনের অনেক বিপরীতধর্মী ঘটনার সহিত তুলনায় জন্মবার্ষিকী একটি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা যে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে সম্মানিত করবার জন্য আজ উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আমি অসীম কৃতজ্ঞ। আমি আজীবন সংগীতকলার অনুশীলন করে আসছি। আপনাদের সদিচ্ছায়, আশা করি, যতদিন জীবিত থাকব, সেই কলার সেবাতেই আত্মনিয়োগ করব।"

এঁর পরে, প্রধান অতিথি হীরেনবাবু চমৎকার একটি বক্তৃতায় বলেন, "ধীরেনবাবু আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায়, ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার যেন রক্তসম্বন্ধ। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আকাশে ইনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবন লাভ করে ইনি এই সংস্কৃতির মশালকে জ্বালিয়ে রেখে মৃতপ্রায় ধ্রুপদ সংগীতের প্রাণ সঞ্চার করুন। সংগীতকলাকে একদিন আমরা সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখতুম। তার কারণ ছিল এই যে, অতীতের সে-দিনের কলাকার সম্প্রদায় সাধারণত ভদ্রসমাজভুক্ত ছিল না। কিন্তু পঙ্কের ভিতর কমল আহরণের মত ধীরেনবাবু সেই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্য হতে সংগীতকমলকে উদ্ধার করায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাঙলার ললিতকলার ইতিহাসে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন উৎসাহী শিল্পীর অমর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, ধীরেনবাবুর নামও তাঁদের মধ্যে পরিগণিত হবে। সংগীত সাধনায় মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, সংগীতের ভিতরও দলাদলি, সংগীতের মধ্যেও রাজনীতির স্বার্থপরতা। সংগীতে ঈর্ষা বিদ্বেষের কোন স্থান নেই, শুধু আছে প্রেমের স্থান। তাই আপনাদিগকে অনুরোধ যে, আপনারা সকলে গুণগ্রাহী

সংগীতের এই মহৎ দিকটাই গ্রহণ
া। ভারতীয় সংস্কৃতি একদিন সমস্ত
র আদর্শ ছিল, আজ আমরা সে
ভ্রষ্ট হয়েছি। আমাদের সকলেরই
কর্তব্য, সে লুপ্ত গৌরবের পুনঃ
ঠা করা। আমাদের প্রাচীন সংগীতের
ধ্রুপদ সংগীতই প্রধান। ধ্রুপদে
র্শিতা লাভ করলে অন্যান্য উচ্চাংগ
ত অপেক্ষাকৃত সহজগম্য হয়। সুতরাং
নারা সকলে ধ্রুপদের পৃষ্ঠপোষকতা
তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি আশা
করি যে, ধীরেনবাবুর শিষ্যগণ তাঁদের
পূজনীয় গুরুদেবের সংগীতধারার অনু-
করণ ও অনুসরণ করে গুরুর ঐতিহ্য
কায়েম রাখুন। গীতায় বলেছে, "নাহং
তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে......" শ্লোকটি যেন
আপনারা সর্বদাই খেয়ালে রাখবেন।
পরিশেষে আমি বলি যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয়
এই যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব,
সেটাকে দূর করবার জন্য সংযুক্ত রাষ্ট্রের
নিরাপত্তা পরিষদ প্রাণপণ চেষ্টা করছেন,
সে হিংসা শেষ যেতে পারে একমাত্র
সংগীতকলার দ্বারা। সংযুক্ত রাষ্ট্রের উচিত,
এক আন্তর্জাতিক সংগীত সৈন্য গঠন করে,
দেশে দেশে সেই সৈন্য প্রেরণ করা। তবেই
জগৎময় শান্তি স্থাপিত হবে।

এ'র পরে, সমিতির তরফ হতে ফ্রেমে
বাঁধান এক মানপত্র দেওয়া হোল ধীরেন-
বাবুকে। মানপত্র পাঠের পর সমিতি
কর্তৃক উপস্থিত অতিথিসমূহের মধ্যে
বিশিষ্ট চারিজনকে পুনরায় মাল্যদান করা
হয়। এই চারিজন যথাক্রমে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ
গুহ, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীবাণেশ্বর পাল

ও শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। জগৎবিখ্যাত কুস্তিগীর যতীনবাবু (ওরফে গোবরবাবু) সংগীতকলার এক অন্ধ-উপাসক। উত্তর কলকাতার প্রায় প্রত্যেক সংগীত মজলিসে তাঁকে হাজির দেখা যায়। শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল হচ্ছেন স্বর্গীয় সংগীতাচার্য গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ধ্রুপদ গায়কের শিষ্য। বাকী দুজনেই খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক। সমিতির পক্ষ হতে কলকাতার বিশিষ্ট গুণিজনের সমাদরের যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। রাশিকৃত সুবাসযুক্ত গোড়ের মালা সঞ্চিত ছিল সে আসরে, কিন্তু মালাদানের পূর্বেই দু' একজন (যেমন শ্রীজ্ঞান ঘোষ) চলে গিয়েছিলেন, অথবা মালাদানের সময় পর্যন্ত অনেকে (যেমন ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ) এসে পৌঁছতে পারেন নি। এতদ্ব্যতীত, পান তামাক, চা সরবৎ ও প্রচুর জলযোগেরও বন্দোবস্ত সমিতি করেছিলেন। আমি এই প্রবন্ধে ধীরেনবাবুর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণের তরফ হতে সমিতির সভ্যগণকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত এঁরা এই অনুষ্ঠানটির উদ্‌যাপন করেছিলেন, সেরূপ শৃঙ্খলা কদাচিৎ দেখা যায়। গুণিজনের সমাদরের পর উপস্থিত ছাত্রছাত্রীগণের মধ্য হতে কয়েকজন এই আসরে ধীরেনবাবুকে মাল্যভূষিত করেন।

কার্যক্রমে প্রারম্ভিক বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পরে সভাপতি চপলাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে ভাষণে বললেন, "আজ আমরা এখানে এক বিশিষ্ট গুণীর সম্বর্ধনার জন্য উপস্থিত হয়েছি। সকলেই আমরা আজ তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে মাল্যবিভূষিত করছি, কিন্তু মালা যে দেয় সে তো দিয়েই খালাস, মালা যে নেয় তাকে সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হয়, যেন সে সেই মালার যোগ্য হয়। আমরা যেন সর্বদা স্মরণে রাখি যে, কতখানি সাধনা থাকলে তবে বিশিষ্ট গুণীর সম্মান পাওয়া যায় এবং এই মালার উপযোগী হওয়া যায়। মালার পশ্চাতে যে অতীতের কতখানি সাধনা, কতখানি আত্মোৎসর্গ গোপনে অবস্থান করছে, আমরা যেন সেটুকু ভুলে না যাই। শিষ্য বলে গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে যাঁরা গুরুর গলায় মালা চড়ালেন আজ, তাঁদের এই মালাই ভবিষ্যতে একদিন নিতে হবে। সমাবর্তনের পর যখন শিষ্য গুরুর আশ্রম ত্যাগ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে যেতেন, তখন সঙ্গে নিয়ে যেতেন গুরুর চিরন্তন আশীর্বাণী—আমার কাছে যদি ভাল কিছু থাকে তবে সেইটাই নিও, খারাপ যেটা আছে সেটা ফেলে দিও। ধীরেনবাবুর শিষ্যদেরও আমি সেই আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা যেন শিক্ষা সমাপ্ত করে, ধীরেনবাবুর সাধনার ধারাটিকে বজায় রাখবার জন্য একটি সাধকদলের সৃষ্টি করেন, আমরা যেন সেই সম্প্রদায়ের কাছ হতে School of Dhiren Babu's Dhrupad Music জাতীয় এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘরানা পাই। ধ্রুপদ সংগীত কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। প্রচুর দম চাই। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মনের সহিত শরীরের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে, তবেই ধ্রুপদ গাইবার অধিকারী হওয়া যেতে পারে। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, দেশের গৌরব বাড়ে গুণীর দ্বারা, রাজনীতিবিদের দ্বারা নয়। দেশের গৌরব বাড়ে নিভৃত সাধনায়, গুণীর কৃতিত্বে। ইতিহাস ভবিষ্যতে একদিন রাজনীতির কথা ভুলে যাবে, কিন্তু গুণিজনের কথা কখনও ভুলবে না। গুণিজন অমর হয়ে থাকবেন, যেমন থাকবেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ যুগ যুগ ধরে। আজ আড়াই হাজার বৎসর পরেও আমরা বুদ্ধদেবের বাণী ভুলে যাইনি, তাই আমরা বুদ্ধজয়ন্তীর উৎসব আজ সমস্ত ভারতবর্ষময় পালন করছি। পাশ্চাত্য দেশ বুদ্ধদেবকে Light of Asia বলেছেন, জ্ঞানের প্রদীপ। গুণী বলেই তানসেনের নাম এখনও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ললিতকলার অপূর্ব নিদর্শন বলে আজ অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতে বিদেশ হতে দলে দলে টুরিস্ট আসেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞান যদি না থাকত তো ইংরেজ আমাদের অসভ্য জাত বলে প্রমাণ করে দিত, প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিল। ভারতবর্ষে অনেক গুণিজনের জন্ম হয়েছিল বলেই সমস্ত জগতে ভারতের এত নাম, এত আদর। পরিশেষে, প্রার্থনা করি, ধীরেনবাবু যেন দীর্ঘজীবী হন এবং তাঁর আওতায় যেন অনেক গুণীর সৃষ্টি হয়।

চপলাবাবুর ভাষণের পর আসল সংগীতানুষ্ঠানের শুরু হয়। তখন প্রায় রাত্রি ৯টা। প্রায় ৭ ঘণ্টার প্রোগ্রামে প্রথম গাইলেন কুমারী অর্চনা সরকার। ইনি গাইলেন মাড়োয়াঠাটের বসন্ত রাগের ধ্রুপদ ও ধামার। 'ধ্রুপদ' অর্থে চৌতাল তালে ধ্রুপদ সংগীত বোঝায়। এ রাগে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার হয়, যেমন হয় ব্যবহার কোমল ধৈবতের পূর্বীঠাটের বসন্তে, অর্থাৎ পরজ বসন্তে। অর্চনা দেবী এবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে মৃদঙ্গ সঙ্গত করলেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইনি স্বর্গীয় মুরারিমোহন গুপ্তের প্রশিষ্য, মৃদঙ্গাচার্য প্রবোধ ঘোষ মশায়ের শিষ্য।

গানের পর সেতার বাজালেন ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব। প্রাচীন কালে কণ্ঠসংগীতের পর যন্ত্রসংগীতের স্থান ছিল অর্থাৎ আসরে যতক্ষণ না কণ্ঠসংগীত শেষ হোত, ততক্ষণ কোন যন্ত্রীরই যন্ত্রে হাত দেবার অধিকার ছিল না। আধুনিক যুগে যন্ত্রসংগীতের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বাড়ছে, কাজেই আর পূর্বকালের নিয়ম-

না হয় না। খাঁ সাহেবের অন্য
ানে প্রোগ্রাম ছিল, তাই তাঁকে
় ছেড়ে দেবার জন্য বিষয়সূচীতে
স্থান দেওয়া হয়। খাঁ সাহেব
কেদারা—আলাপ, বিলম্বিত ও
দেশরাগের ঠুংরি সাধারণত ইনি
ঢং-এর পক্ষপাতী, তবে আজ
ীতমানি ও রেজামানি দুই ঢঙেই
। এ'র সঙ্গে সঙ্গত করলেন
নন্দী। ইনি আসলে বিষ্ণুপুরের
সঙ্গীত-নাট্য-অ্যাকাদেমির একজন
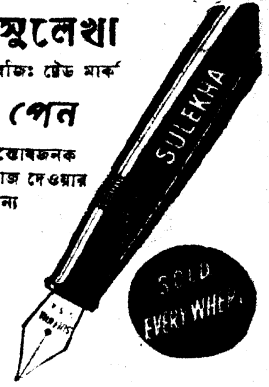
হেবের পরে আসরে এলেন কুমারী
া। ইনি গাইলেন আড়ানার ধ্রুপদ
জর ধামার। গীতা দেবী M Sc
াত্রী। সঙ্গত করলেন শ্রীজগদীশ
জগদীশবাবু স্বর্গীয় অরুণপ্রকাশ
র (ওরফে কেবলবাবু) শিষ্য।
ছিলেন স্বর্গীয় দীননাথ
শিষ্য। গীতাদেবীর পরে গাইলেন
মজুমদার মিঞা মল্লারের ধ্রুপদ
াটের বসন্তের ধামার। সঙ্গত
শ্রীবিঠলদাস গুজরাতী। ইনি
বিখ্যাত মুন্নাজী মিশ্রের শিষ্য।
গাইলেন কুমারী মণিকা দে, বয়স
গাইলেন আড়ানার ভজন, কাফী
াড়ানা রাগে ভজন গান কমই
য়। সঙ্গত করলেন ধীরেনবাবুর
ীবীরেন ভট্টাচার্য। ইনি শ্রীজ্ঞান
শিষ্য।

আসরে এলেন কুমারী উমা
চট্টোপাধ্যায়। ইনি আই এ পাশ করে ট্রেনিং নেওয়া শিক্ষয়িত্রী। উপস্থিত বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গাইলেন বেহাগের খেয়াল, বিলম্বিত ও দ্রুত। এযুগে 'বিলম্বিত' অর্থে শুধু বিলম্বিত একতালাকেই বোঝায় এবং 'দ্রুত' মানে দ্রুত ত্রিতাল। বীরেনবাবু সংগত করলেন। উমাদেবীকে বেশ 'প্রমিসিং' বলে মনে হল। উমাদেবীর পরে শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য গাইলেন বাগেশ্রীর ধ্রুপদ ও ধামার। ইনি ভূপেন্দ্র সংগীত বিদ্যালয় হতে 'সংগীত গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত এবং একজন বেতারশিল্পী। সংগত করলেন জগদীশ-বাবু।

পশুপতিবাবুর পর গাইলেন শ্রীসুজয় সরকার। ইনি গাইলেন জয়জয়ন্তীর খেয়াল, বিলম্বিত ও দ্রুত। সংগত করলেন বীরেন-বাবু। সুজয়বাবু একদিকে 'সংগীত বিশারদ', অন্যদিকে বার্ন কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনীয়ার। শিবপুর কলেজ থেকে ইনি বি ই-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরূপ বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। ইনি ধীরেনবাবুর নিকট বছর ২।৩ তালিম নিচ্ছেন। বাস্তবিক পক্ষে ধীরেনবাবুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে সংগীত সম্মেলন হয়েছিল, সে সম্মেলনে কেবল ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ ও জনাব ইসমত আলি খাঁ ছাড়া যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সকলেই ছিলেন ধীরেনবাবুর ছাত্রছাত্রী। ধীরেনবাবুর ন্যায় যথার্থ সদ্গুরু ও গুণীর সংস্পর্শে এ'দেরও কৃতিত্ব একদিন ফুটে উঠবে, এটা আশা করা যেতে পারে।

সুজয়বাবুর পরে গাইলেন কুমারী অঞ্জলি সুর শ্যামকোশ রাগের খেয়াল—বিলম্বিত ও দ্রুত। ইনিও বি এ ক্লাশের ছাত্রী, আই এ (মিউজিক) পাশ করেছেন। ইনি ধ্রুপদ শেখেন ধীরেনবাবুর কাছে এবং খেয়াল শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছে। শ্যাম-কোশ রাগ চিন্ময়বাবুর সৃষ্ট, চন্দ্রকোশ রাগকে সম্পূর্ণ করে গাইলে এ-রাগের উৎপত্তি হয়। এ'র সংগে সংগত করলেন শ্রীদিলীপকুমার দাস। জ্ঞানবাবুর নিকট তালিম নিয়ে যে কয়েকজন তরুণ বেশ নাম করেছেন, দিলীপবাবু তাঁদের অন্যতম। বাকি যে দুচার জনের নাম সংগীত সমাজে পরিচিত, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকানাই দত্ত, বীরেন বাবু, শঙ্করবাবু, শ্যামলবাবু (ইনি হচ্ছেন সংগীতাচার্য অনাথবাবুর পুত্র) ইত্যাদি।

অঞ্জলি দেবীর পরে গাইলেন কুমারী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও বি এ পড়েন। ইনি গাইলেন 'প্রভুজী, অবগুণ চিত্ত না ধরো' সেই বিখ্যাত ভজন, যা একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে শুনিয়েছিলেন এক বাইজী এবং শুনিয়ে অভিভূত করেছিলেন। ইনি সংগীত-নাট্য অ্যাকাদেমীরও ছাত্রী। সংগত করলেন বীরেনবাবু। এর পরে সংগীতাচার্য স্বয়ং বিহঙ্গড়ার এক ধ্রুপদ ও পরজের ধামার গাইলেন। সংগত করলেন জগদীশবাবু। বেহাগে দুই নিখাদ লাগালে এ-রাগের উৎপত্তি হয়। সর্বশেষে আসরে নামলেন জনাব ইসমত আলি খাঁ। ইনি সেতারে বাজালেন এক চৈতী ঠুংরি। এ ঠুংরিতে ঝিঁঝোটি ও পাহাড়ীর ছায়া আছে। সংগত করলেন দিলীপবাবু। খাঁ সাহেব স্বর্গীয় কেরামত খাঁ সাহেবের ভাগিনেয়। কেরামত ও শরাফত হোসেন খাঁ সাহেবদের অনুজ। চমৎকার বাজালেন। বাজনা যখন শেষ হোলো, তখন ভোর ৪টা।

নিখিল বংগ সংগীত প্রতিযোগিতা

তানসেন সংগীত সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক নিখিল বংগ সংগীত প্রতিযোগিতা গত ১০ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ বিচারকের কাজ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের (ধ্রুপদ, খেয়াল, ভজন, ঠুংরি, রবীন্দ্রসংগীত, রাগ-প্রধান সংগীত) ফলাফল বিচারের পরি-প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বালকবালিকাগণ নিম্নরূপ স্থান অধিকার করেছেন:—

বালক বিভাগ—১ম দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ২য় ফণীলাল নাথ, ৩য় রাম সুকুল, ৪র্থ আশুতোষ মুখার্জি ও ৫ম মণিলাল ঘোষ।

বালিকা বিভাগ—১ম কল্যাণী দাস, ২য় শিপ্রা মিত্র, ৩য় পূরবী চ্যাটার্জি, ৪র্থ শুচিস্মিতা মিত্র ও ৫ম কৃষ্ণা ভট্টাচার্য।

॥ উনিশ ॥

নসু কেহেঙ্ মাসের প্রথম দিকে সিঁড়ি-ক্ষেতে জোয়ার বুনে এসেছিল জোয়ান ছেলেমেয়েরা। পাঁতাভ অঙ্কুরে অঙ্কুরে ভরে গিয়েছিল পাহাড়ী উপত্যকা। সেই অঙ্কুর এখন ডাগর হয়েছে। শ্যামল লাবণ্যে ঝলমল করে উঠেছে পাহাড়িয়া সিঁড়িক্ষেত। তার মধ্যে তীক্ষ্ণচূড়া ফসল-ঘরগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে। সিঁড়িক্ষেতে জোয়ার চারাগুলো ঋতুমতী হবে, তারপর সারাদেহে শিশুশস্যের ভ্রূণ জন্মাবে। তার অনেক আগেই পাহাড়ী মানুষেরা অরণ্য সংহার করতে যাবে। সেই অরণ্যের শবদেহ পুড়িয়ে তৈরী হবে পাথুরে মাটির সার। তার ওপর বীজধান বোনা হবে। কেলুরী গ্রামে জঙ্গলবধের তোড়জোড় চলেছে। চলেছে শান দেবার প্রাথমিক প্রস্তুতি। কয়েকদিন পর থেকেই একরাশ 'গেন্না' শুরু হবে। ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন। মেথি লিন্‌ডা কেই কেন্যা গেন্না। টুসি চি কেত্‌সান্যা গেন্না। টৈ নুগা গেন্না। এমনি অনেক। অজস্র।

বুড়ী বেঙ্‌সানু সিঁড়িক্ষেত পেরিয়ে ঘনবন মালভূমিতে গিয়েছিল সেই প্রথম সকালে। বড় একটা মৌচাক কেটে এইমাত্র গ্রামে ফিরলো সে। একেবারে সরাসরি কেসুঙে এসে মোটা দুই বর্শা নিয়ে আবার বেরুলো।

সহসা জোরি কেসুঙ থেকে সাঁ সাঁ পাহাড়ী ঝড় ছুটে এলো। ফাসাও আর নজলি। দুজনে দুদিক থেকে আক্রমণ করলো বুড়ী বেঙসানুকে: "আপি (ঠাকুমা) বড় খিদে পেয়েছে। খেতে দে।"

"খিদে পেয়েছে! তার আমি কী করবো? তোদের বাবা আছে, মা আছে, দাদা আছে, তাদের কাছে যা।" দাঁত খিঁচিয়ে একটা কদাকার মুখভঙ্গি করলো বুড়ী বেঙসানু: "হুই শয়তানের বাচ্চা সেঙাইটা হুই যে কোহিমা গেল, আর ফিরবার নাম নাই! হুই সিজিটোটা গিয়ে আর ফেরেনি। হুই টেফঙ্‌টাও ফিরলো না। জোয়ার বোনে নি। খাবি কী?"

"তা আমরা কী জানি? খিদে পেয়েছে!" বায়না শুরু করে দিল ফাসাও আর নজলি।

"গায়ে কী জোয়ান কালের তাগদ আছে? তা থাকলে নয় শিকার-টিকার করে নিয়ে আসতাম! খাবি কী? আমার হাত-পা চলে না!"

"কেমন লাগবে তোর মাংস?" ফাসাও আর নজলির মুখেচোখে সবিস্ময় কৌতূহল।

"আরে শয়তানের বাচ্চারা, আমার মাংস খেতে চাইছিস!" বুড়ী বেঙসানুর পাণ্ডুর চোখ দুটোর ওপর একটা বিমর্ষ শঙ্কা ঘনিয়ে এলো। একসময় আবার ফোকলা গলায় বলতে শুরু করলো সে: "তোরা আরেলাকাঙে (বাইরের ঘর) গিয়ে বোস, আমি খাপেগা সদ্দারের বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসি। আর যদি পাই একটু মাংস।"

"তাড়াতাড়ি আসবি। খিদেতে পেট জ্বলছে।"

ফাসাও আর নজলি জোহেরি কেসুঙের দিকে চলে গেল। আর বুড়ী বেঙসানু তিনটে তীক্ষ্ণচূড়া টিলা ডিঙিয়ে এলো বুড়ো খাপেগার কেসুঙে।

একখানা বাদামী রঙের অমসৃণ পাথরের ওপর বসে রয়েছে বুড়ো খাপেগা। বাঁশের সরু চোঙায় একরাশ তামাকের চিতা সাজানো। ভুরিবং করে সেই চোঙার রন্ধ্রে মুখ রেখে দীর্ঘ ছন্দে টেনে চলেছে খাপেগা। তামাকের মৌতাতে চোখদুটি বেশ ঢুলুঢুলু হয়ে উঠেছে।

বুড়ো খাপেগা এবার সরব হয়ে উঠলো: "আয় বেঙ্‌সানু, তারপর খবর কী?"

"খবর আবার কী! ঘরে এককণা খাবার নেই। আমি বুড়ী, আমি কোথা থেকে কী জোগাড় করি! হুই সিজিটো আর সেঙাইর মা মাগী তো কোহিমা গেল। তারপর আজ কদিন হোল সেঙাইও গিয়েছে। ইদিকে টেফঙের বাচ্চাদের একটারও ফিরবার নাম নেই। ফাসাও রয়েছে, নজলি রয়েছে। ওদের তো কিছু দিতে হবে খেতে?"

"হু, হু—" সংক্ষিপ্ত উত্তর। মৌজ করে সমানে তামাক টেনে চললো বুড়ো খাপেগা।

"তোর কাছে এলাম।" এবার সরাসরি দৃষ্টিতে বুড়ো খাপেগার দিকে তাকালো বেঙসানু।

"আমার কাছে? কেন!" আশ্চর্য বিস্ময়ে কণ্ঠটা বেঁকে গেল বুড়ো খাপেগার।

"কেন আবার? আমাকে খানিকটা মাংস আর চাল দে। নইলে কী না খেয়ে মরবো!"

"চাল! মাংস! কোথায় পাবো? আমার নেই ওসব। তা ছাড়া চাল মাংস তুই নিবি কী? আমাকে বরং দিয়ে যাবি।" ভক্ ভক্ করে একরাশ তামাকের ধোঁয়া ছাড়লো বুড়ো খাপেগা। সমস্ত কেসুঙটা সেই ধোঁয়ার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

"আমি দেব? কেন?" তির্যক চোখে তাকালো বুড়ী বেঙসানু।

"তোর নাতির বউকে খাওয়াচ্ছি। সেই খাওয়া দেবে কে?"

"আমার নাতির বউ! সে আবার কে?" বিস্ময়ে শতফালা হলো বুড়ী বেঙসানুর কণ্ঠ: "সেঙাইর আবার বিয়ে হলো কবে?"

"হু, হু—সেঙাইর বউ। হুই পোকরি বংশের মেয়ে। নাম হলো মেহেলী। বিয়ে এখনো হয় নি। কোহিমা থেকে সেঙাই ফিরলে হবে। সেই বউর খোরাক দিয়ে যাবি এবার থেকে।"

"ইজা রামখো!" কদর্য একটা খিস্তি দিয়ে উঠলো বুড়ী বেঙসানু; "আমার

। আমাদেরও টাকা দিতে চেয়েছিল
দারটা। তুই লড়াই বাঁধিয়ে দে
আমরা বস্তী থেকে মাঁ (বর্শা)
াসবো: জোয়ান ছেলেদের ডেকে
পাহাড় থেকে শয়তানের বাচ্চা-
ড়ে ফ‍ুঁড়ে খাদে ফেলে দেবো।
রা আমাদের পাহাড়ে এসে
ই মারে। এই দেখ।"
গতিতে কোমরটা অনাবৃত করে
সেঙাই। দেহের ঠিক মধ্যসন্ধিতে
বিশাল ক্ষতচিহ্ন। দিনদ‍ুয়েক
নই মণিপ‍ুরী প‍ুলিসটা বেয়োনেটের
ত ফলা বসিয়ে দিয়েছিল। সেই
র্ত সগৌরবে বিরাজ করছে। সেঙাই
থামে নি: "হ‍ুই মণিপ‍ুরী আর
(সমতলের লোক), দ‍ু দলকেই
দিবি। ওরাই মেরেছে আমাদের।"
হয়ে উঠলেন গাইডিলিও: "সব
সাহেবদের। ওরা বলেছে তাই
রা (সমতলের লোকেরা) তোমাদের
। ঐ সাহেবরাই হোল শয়তান।
সঙ্গেই আমাদের লড়াই হবে।"
? কবে" রীতিমত উৎসাহিত
লো সেঙাই: "কবে লড়াই বাধবে?"

"বেধে গিয়েছে। গান্ধীজী বাধিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পাহাড়েও বোধহয় বেধেছে কাল থেকে।"

"লড়াই বেধেছে! ক'টা মরেছে?"

"একজনও নয়। এ লড়াইতে মারামারি হয় না। আমরা মারি না, মারবোও না। কিন্তু সাহেবরা আমাদের ধরে নিয়ে আটক করে রাখবে। রাখছে।" রাণী গাইডিলিওর দেহ ঘিরে এক দৈবী জ্যোতির্বলয় বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে যেন। দ‍ু' চোখ থেকে এক অপ‍ূর্ব আলোকলেখা বিচ্ছ‍ুরিত হচ্ছে: "এই লড়াইতে তোমাদেরও আসতে হবে সেঙাই।"

"মাধোলাল বলছিল, গান্ধীজীর লোকেরা নাকী মার খাচ্ছে কিন্তু মার দিচ্ছে না। এ কেমন লড়াই! তুইও একথা বলছিস্? আমরা পাহাড়ী মান‍ুষ। লড়াই হবে, অথচ মান‍ুষ মরবে না। এমন কথা তো সদ্দার বলে নি কোনদিন। তবে কী তুই গান্ধীজীর লোক?"

"আমরা সবাই গান্ধীজীর লোক।" একট‍ু থামলেন গাইডিলিও। দেখতে লাগলেন তাঁর কথাগ‍ুলি দ‍ুটি সহজ পাহাড়ী ম‍ুখের ওপর কী রঙের প্রতিক্রিয়া এ‍ঁকে চলেছে। তারপর বললেন:

"গান্ধীজীই বলেছেন, এ লড়াইতে সাহেবদের আমরা মারবো না। মার যদি খাই, মার খেয়ে খেয়ে আমরা জিতে যাবো।"

"এই কথা মাধোলালও বলেছিল।"

বিচিত্র এই সংগ্রাম! বর্শা নেই, তীর-ধন‍ুক নেই। নিরীহ দেহটিকে সাহেবদের হাতিয়ারের সীমানায় অসহায়ভাবে তুলে ধরতে হবে। বন্য মন ঠিক সায় দেয় না। পাহাড়ী চেতনা ঠিক প্রেরণা পাচ্ছে না। অথচ গাইডিলিও বলছেন। তাঁর ম‍ুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি সবাক্ প্রতিবাদ জানাবার মত দ‍ুঃসাহস নেই সেঙাইর। মাধোলালের কাছে গান্ধীজীর আজব লড়াইর গল্প শ‍ুনে মনটা অবিশ্বাসে ভরে গিয়েছিল। এই ম‍ুহ‍ূর্তে রাণী গাইডিলিওর কথা শ‍ুনতে শ‍ুনতে একটা কিনারাহীন অথৈ সম‍ুদ্রে হাব‍ুড‍ুব‍ু খেতে লাগলো পাহাড়ী জোয়ান সেঙাই। গাই-ডিলিওর এই য‍ুদ্ধকে অবিশ্বাস করার মত ভরসা পর্যন্ত নেই সেঙাইর।

সহসা গাইডিলিও বললেন: "আমাদের এই লড়াইতে তোমরাও আসবে তো সেঙাই?"

সার‍ুয়ামার‍ু কুণ্ঠিত গলায় বললো; "একবার সদ্দারকে জিগেস করে নি।"

"সদ্দারকে জিগ্যেস করে নি; ইক্রো রামখো!" আচমকা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলো সেঙাই: "সদ্দার তোকে কোহিমার পথ থেকে বাঁচিয়েছিল?"

"না, না।"

"ও আমাদের বাঁচিয়েছে। ও আমাদের যা বলবে তাই করবো। বেহ‍ুঁশ যখন ছিলাম, তখন আমাকে আনিজাতে ধরেছিল। বস্তীতে থাকলে খোনাকের মত নির্ঘাৎ আমাকে খাদে ফেলে দিত তাম‍ুন‍ু (চিকিৎসক)।" দ‍ৃষ্টিটা ঘ‍ুরিয়ে গাই-ডিলিওর ম‍ুখের ওপর এনে ফেললো সেঙাই: একট‍ু আগের উত্তেজনা তার দেহমন থেকে কুয়াশার আল‍্পনার মত ম‍ুছে গিয়েছে। সেঙাই বললো: "তুই আমাদের বাঁচিয়েছিস। তুই যা বলবি, তাই করবো। মরতে বললে তাই করবো।"

স্নিগ্ধ মমতায় ম‍ুখখানা পেলব দেখালো গাইডিলিওর: "এই দেখো, এত কথা বললাম, এটাই জানা হয়নি। তোমরা কোন্ বস্তীর লোক?"

"কেল‍ুরী বস্তীর।"

"দরকার হলে তোমাদের বস্তীতে যাবো। থাকতে দেবে তো!" সরল পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর মধ্যে একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তি খ‍ুঁজে পেয়েছেন, যেন গাইডিলিও।

"হ‍ু, হ‍ু—" প্রচণ্ড উৎসাহে মাচানটা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলো সেঙাই: "তোর জন্যে নত‍ুন ঘর বানিয়ে দেবো।"

"না, না। একথা বেশী চাউর করো না।"

"হ্যঁ, হ্যঁ। তুই যখন বলছিস!"

বাইরের আকাশ থেকে ধূপছায়া প্রাক্-সন্ধ্যা পলাতক হয়েছে। টঘুটুঘোটাঙ্ পাতায় ছাওয়া এই ঘরখানার চার পাশ থেকে রাশি রাশি রোমশ থাবার মত নেমে আসছে অন্ধকার। ভয়াল সন্ধ্যা। ভয়ালতর পাহাড়ী রাত্রি। চারদিকে গহন বন। খাসেম আর ভেরাপাঙ্। আত্তামারী লতার বাঁধনে বাঁধনে জটিল হয়ে বন কখনও উঠেছে তুঙ্গ টিলায়। ঘনতম হয়ে কখনও একটা সামুদ্রিক ঢেউএর মত দোল খেয়ে নেমেছে উপত্যকার দিকে। প্রেতকণ্ঠে চীৎকার করে উঠছে আউ পাখীর ঝাঁক; ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁপিয়ে উড়ছে খারিমা পতঙ্গের দল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর্ সর্ করে চলেছে পাহাড়ী অজগর। খাটসঙ্ গাছের শাখায় শাখায় লাফিয়ে চলেছে রাশি রাশি বানরেরা। গর্জন উঠছে মেনজোর, চীৎকার জাগছে মেনাডোর। পাখী-পতঙ্গ-সরীসৃপ—সবাই এখন নীড়মুখী। বিশাল এই পাহাড়ী অরণ্যের সংসারের সবাই নিয়মের রেখা দিয়ে বন্দী। সে নিয়মে গুহায় কী নীড়ে, গাছের কোঁকরে কী শাখায় একটি নিভৃত আশ্রয়ের উত্তাপে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে।

ঘরের মধ্যে একটা পেন্যু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন গাইডিলিও। সামনের প্রবেশ পথের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন বাঁশের বাঁখা ফাঁস-লাগানো একটা নিশ্ছেদ ঝাঁপ।

নাগা পাহাড় এখন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গিয়েছে। সামনে মাওগামী পথের সরীসৃপ রেখা। চারপাশে আদিম জিঘাংসা। অরণ্যের বিভীষিকা। তার মাঝে টঘুটুঘোটাঙ্ পাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি ঘরে পেন্যু কাঠের মশালে একবিন্দু আলো। একবিন্দু আলো! আলো নয়, ও যেন নাগাপাহাড়ের হৃৎপিণ্ড। সব অন্ধকার থেকে সে আলোকে দুটি পক্ষপুটে মেলে পাহারা দিয়ে রাখছে একটি প্রাণ। সে প্রাণের নাম গাইডিলিও। এই মশালের শিখাটিকে নাগা পাহাড়ের উপত্যকা আর মালভূমিতে দাবানলের মত ছড়িয়ে দিতে হবে। টঘু-টুঘোটাঙ্ পাতায়-ছাওয়া ঘরখানায় তারই নিভৃত দীক্ষা।

ঝাঁপের ওপর একটা ক্ষ্যাপা ঝড় এসে আছড়ে পড়লো সহসা। মাচানের ওপরে চমকে উঠলেন গাইডিলিও। তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "কে?"

"আমি লিকোক্যাঙ্বা। শিগ্গীর ঝাঁপ খুলুন।"

সাঁ করে মাচান থেকে পাটাতনে নামলেন গাইডিলিও। ঝাঁপটা খুলতে খুলতে বললেন, "আসুন, আসুন।"

ঘরের মধ্যে এসে দ্রুতলয় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফুসফুস ভরে টেনে তুললো লিকোক্যাঙ্বা: "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, আপনি এখানে রয়েছেন।"

গাইডিলিও চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন লিকোক্যাঙবার দিকে। সমস্ত মুখখানা রক্তে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। সাদা জামাটা রক্তজবার মত টকটক করছে। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে এখনও তাজা রক্ত থোকায় থোকায় ঢলের মত নেমে আসছে। আর্তনাদ করে উঠলেন গাইডিলিও: "এ কী? এ কী হয়েছে? একেবারে খুন করে ফেলেছে, দেখছি?"

লিকোক্যাঙবা হাসলো; দু পাটি ঝকঝকে দাঁত পেন্যু কাঠের স্নিগ্ধ আলোতে আত্মপ্রকাশ করলো: "কোহিমা থানার সামনে আজ জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছিল। পুলিশ বেয়োনেট চালিয়েছে। তারই চিহ্ন। থাক্ ও সব। এখনই এ ঘর ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে। অঙ্গামীদের গ্রামে লুকিয়ে থাকার একটা ব্যবস্থা করেছি।"

"কিন্তু আপনার মাথায় এত বড় আঘাত!" একটু ইতস্তত করলেন গাইডিলিও।

"অঙ্গামীদের গ্রামে গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হবে। থানার সামনে অনেককে অ্যারেস্ট করেছে। পুলিশ এদিকে আসছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না।"

"এ আস্তানার খবর পুলিশ পেলো কী করে?"

"যে সব সর্দারেরা এখানে আসে, তাদের মধ্যে কেউ পুলিশের চর রয়েছে। সে-ই আমাদের এই উপকারটুকু করেছে। সে যা হোক, এক্ষুণি আমাদের এ আস্তানা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনার অ্যারেস্ট হলে কিছুতেই চলবে না। তা হলে নাগা পাহাড়ের স্বাধীনতা আন্দোলন একেবারে নিভে যাবে। সমস্ত ভারতবর্ষ স্বরাজের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমাদের এই নাগা পাহাড়কে পিছিয়ে থাকলে কিছুতেই চলবে না।" আশ্চর্য এক কাঠিন্য নেমে এসেছে লিকোক্যাঙ্বার কণ্ঠে। চোখমুখ ঋজু, তলোয়ারের মত ঝকমক করছে তার: "সমতলের দেশের জন্য রয়েছে গান্ধীজীর নেতৃত্ব। আমাদের পাহাড়ী মানুষেরা আপনাকে দেবীর মত মানে। আপনি জীবিত থাকতে দেশের লোক শয়তানের শিকার হবে

একটু একটু করে আমাদের ধর্ম
রল মানুষগুলো শঠ হবে? টাকা
: বিশ্বাসঘাতক হবে? বেইমান
', না, এতবড় অন্যায় সহ্য করা

বাবুদের ওপর মশালের শিখা
লা। দপ্ করে দাবাগ্নির মত
লেন গাইডিলিও; "ঠিক কথা।

রক্ত দেখে আমার যেন কেমন লাগছিল। রক্তের পথ তো আমাদের পথ নয়, মনটা তাই ধক্ করে উঠেছিল। সে যাক্, আমি যাবো।"

লিকোক্যুঙবা হাসলো। বিচিত্র হাসি। সে হাসির সিংদরজা দিয়ে একটি দাউ দাউ জ্বলা প্রাণের প্রতিচ্ছায়া পড়লো; "রক্তের পথ আমাদের নয়। পিকেটিংএ একটি পাহাড়ী মানুষও সাহেবদের গায়ে হাত তোলে নি। আমরা হাত তুলবো বলে তো ওরা ছাড়বে না। ওরা এ আন্দোলনকে মেরে-ধরে যেমন করে হোক্ দাবাবার চেষ্টা করবে।" একটু থামলো লিকোক্যুঙবা। কী যেন ভাবলো একবার। রক্তাক্ত মুখখানার ওপর একটা ভাবনার বক্র ছায়া এসে পড়লো; "আজ শুনলাম গান্ধীজীকে নাকি অ্যারেস্ট করবে।"

"কী বললেন? গান্ধীজীকে আটক করবে!" প্রায় চীৎকার করে উঠলেন গাইডিলিও।

"হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম। এবার চলুন। পেছনের খাদে অগ্রগামী সর্দার তার লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" লিকোক্যুঙবা অধীর হয়ে উঠলো; "এবার আমাদের কাজ শুরু হলো। অনেক দায়িত্ব, অনেক সমস্যা, অনেক, অনেক কাজ।"

বিস্মিত চোখে সেঙাইরা তাকিয়েছিল গাইডিলিও আর লিকোক্যুঙবার দিকে। পাহাড়ী ভাষায় কথা বলছে দুজনে। সব ক'টি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছে সেঙাই। চেতনায় পরিচ্ছন্ন ধরা পড়ছে। কিন্তু সেই কথা চোলাই করে একটি উত্তেজনা ছাড়া বিশেষ কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারে নি। যত দুর্বোধ্যই হোক আর একটি অর্থ সে আবিষ্কার করেছে। সে অর্থ রক্তের অক্ষরে রাজটীকার মত আঁকা রয়েছে লিকোক্যুঙবার কপালে।

সেঙাই বললো; "কাদের সঙ্গে লড়াই বেধেছে রে? অমন করে ওকে মারলো?"

"সায়েবদের সঙ্গে।" গাইডিলিও তাকালেন সেঙাইর দিকে; "সেঙাই আমাদের চলে যেতে হবে এক্ষুণি। সাহেবদের সঙ্গে লড়াই বেধেছে। তারা, ঐ দেখ ও'কে মেরেছে; আমাদের ধরতে আসছে।"

"পালাতে হবে! কেন? আমরা পাহাড়ী মরদ না!" ঝলসে উঠলো সেঙাই; "আসুক সাহেবরা! আমাকে মেরেছে, তোর লোককে মেরেছে। তিনটে মাথা রেখে দেবো।"

"না, না। পাগলামি করো না। ওদের বন্দুকে আছে, গুলী করে মারবে।"

পাশের মাচান থেকে সারুয়ামারু আলোকদান করলো। বন্দুকের মহিমা সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন; "না রে, দূরে থেকে তাক করে বন্দুক দিয়ে আমাদের সাবাড় করবে। অতদূরে বর্শা (বর্শা) ছুঁড়লেও লাগবে না। তার চেয়ে পালাই চল। তারপর আমাদের বস্তীতে কী আচেলায় জুতমত একবার পেলে ফুঁড়ে খাসেম গাছের মগডালে ঝুলিয়ে রাখবো সায়েবদের।"

শিউরে উঠলেন গাইডিলিও; "খবরদার কেউ সাহেবদের মারবে না। ওরা মারুক। মারতে মারতে ওরাই একদিন কাহিল হয়ে পড়বে। কত মারবে? সে যাক্, আমরা তো যাচ্ছি। তোমরা বস্তীতে যেতে পারবে? শরীর তো তোমাদের খারাপ! কিন্তু এ ঘর না ছাড়লে সাহেবরা ধরে ফেলবে।"

"পারবো, খুব পারবো। খাদে একবার পড়ে গিয়েছিলাম না। হাড়গোড় চুর চুর হয়ে ভেঙে গিয়েছিল; তারপর দিন সালুয়ালাঙু বস্তী থেকে আমি ভেগে এলাম না?" সগৌরবে নিজের কৃতিত্ব ঘোষণা করলো সেঙাই।

কেন খাদে পড়ে গিয়েছিল? সালুয়ালাঙু বস্তী কোনটা? এসব কৌতূহল প্রকাশের কণামাত্র সময় নেই গাইডিলিওর। বেয়োনেট বাগিয়ে মাতলা হাতীর ঝাঁকের মত ছুটে আসছে পুলিশ। তাদের থাবা থেকে আপাতত ফেরারী হতে হবে। নাগা পাহাড়ের একটি নিভৃত প্রাণকোষে স্বাধীনতার প্রখর আকাঙ্ক্ষার যে নবাঙ্কুরটি জন্ম নিয়েছে, তাকে কোনমতেই দলিত হতে দেওয়া যাবে না। সযত্নে লালন করে নাগা পাহাড়ের দিকে দিকে তার শাখা-প্রশাখাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সে প্রাণাঙ্কুরকে অগ্নি-বীজের মত অজস্র প্রাণের প্রান্তরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

গাইডিলিও বললেন; "তবে চলো। আর দেরী করার সময় নেই।" বলতে বলতে পেনুয়া কাঠের মশালটি পাটাতন থেকে তুলে নিলেন তিনি।

একসময় চারজনে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

গাইডিলিও আবারও বললেন; "তোমাদের বস্তীর নাম তো কেলুরী; দরকার হলে যাবো। এবার তোমরা সামনের পথে যাও। আমরা পেছনের খাদে নামবো।"

"হু, হু। আমাদের বস্তীতে যাবি। সর্দার খুব খুশী হবে। আমরা গান-বাজনা শোনাবো, নাচ দেখাবো। তুই আমাদের জান বাঁচিয়েছিস, তোকে সেণ্টসুঙের মাংস খাওয়াবো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।" মধুর হাসিতে মুখখানা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো গাইডিলিওর।

একটু পরেই সেঙাই আর সারুয়ামারু মাও-গামী পথের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। আর একটি পেনুয়া কাঠের মশাল আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের উৎরাই বেয়ে নীচের খাদে নামতে লাগলো। কবে, কবে নাগা পাহাড়ের হৃৎপিণ্ডের মত ঐ ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দুটি দিকে দিকে বনবহ্নির মত ছড়িয়ে পড়বে? প্রাণে প্রাণে একটি আগ্নেয় আকাঙ্ক্ষার দাবানল ছড়াবে? কবে, কত পল প্রহর পেরিয়ে সেই পরম শুভময় মুহূর্তে?

(ক্রমশ)

২৯।

কুড়ি পেরোলেই মেয়েদের জীবনে একটা সন্ধিকাল ঘনিয়ে আসে। সেটা ছেলেদের জীবনে আসে তিরিশ পেরোলে। এই সময় হয় তাদের খুব ভাল হয়, নয় তাদের খুব খারাপ হয়। শেরপাদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস খুব জোর চালু আছে। আমার বয়সের সেই সন্ধিকাল এখন উপস্থিত। আমি যখন নাঙ্গা পর্বতে যাই, তখন আমি ছত্রিশে পড়েছি। সূচনাটা আদৌ ভালো হ'ল না। এই নঙ্গা পাহাড় অভিযানেই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গীদের মৃত্যু হ'ল। আর এর পরের বছর যে দুটো অভিযানে আমি গেলাম সে দুটোতেও দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পর পর তিনটে অভিযানে দুর্ভাগ্য আমাকে তাড়া করে ফিরল। যদিও এদের কবল থেকে আমি অক্ষত ফিরে এসেছি তবুও লক্ষণগুলো আমার পক্ষে মোটেই শুভ নয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আমার ভাগ্য নিয়ে এই রকম খেলাই চলেছে। তারপর হঠাৎ একদিন তার পরিবর্তন হ'ল, বিরাট পরিবর্তন। কিন্তু সে এক আলাদা কাহিনী।

আমি ইংরেজদের একটা কথা প্রায়ই বলতে শুনেছি—'হয় ভোজ, না হয় দুর্ভিক্ষ'। হিমালয়ের অভিযান সম্পর্কে এই কথাটা বেশ খাটে। যুদ্ধ যতদিন চলেছে, ততদিন অভিযাত্রী দল বড় বিশেষ

একটা আসেনি। কাজকর্ম জোটাতে জান-প্রাণ প্রায় শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু ১৯৫০ সাল শুরু হবার সংগে সংগে পিল পিল করে দলের পর দল আসতে থাকলো। প্রত্যেকটা মরসুমে। আর এক একবারে বেশ কয়েকটা করে। আর মজাটা হ'ল এই

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা
শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ
জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

যেই একটা দলে আমরা ভিড়ে পড়তাম অমনি মনে হ'ত আহা ভাল ভাল দল-গুলোই বোধ হয় ফস্কে গেল। ১৯৫০-এ আমি গেলাম বান্দরপুঞ্ছে। সেবারে অন্নপূর্ণায় উঠল ফরাসীরা। তখন পর্যন্ত অন্নপূর্ণার চূড়াতে ওঠাই ছিল পৃথিবীর উচ্চতম চূড়ায় ওঠার রেকর্ড। অনেক শেরপা ঐ অভিযানে গিয়েছিল, ওদের সর্দার ছিল আমারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আঙতারকে। তারা তাদের সাহেবদের পাহাড় থেকে জ্যান্ত নামিয়ে আনতে সাংঘাতিক পরিশ্রম করেছিল। তাদের গল্প শুনে মনে মনে আমি হায় হায় করতে লাগলাম। আহা, আমিও যদি এই বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হতে পারতাম! আবার আমি যে সময় নাঙ্গা পর্বতের দিকে চলছি সে সময় টিলম্যান সাহেব আর আমেরিকান পর্বতারোহী ডাঃ চার্লস হোস্টন একটা ছোটখাটো দল নিয়ে দক্ষিণ থেকে নেপালের মধ্য দিয়ে এভারেস্টে রওনা দিলেন। এ-পথে তাঁরাই প্রথম অভিযান চালালেন। তাঁদের দলটার উপরে ওঠার মত সাজসরঞ্জাম কিছু ছিল
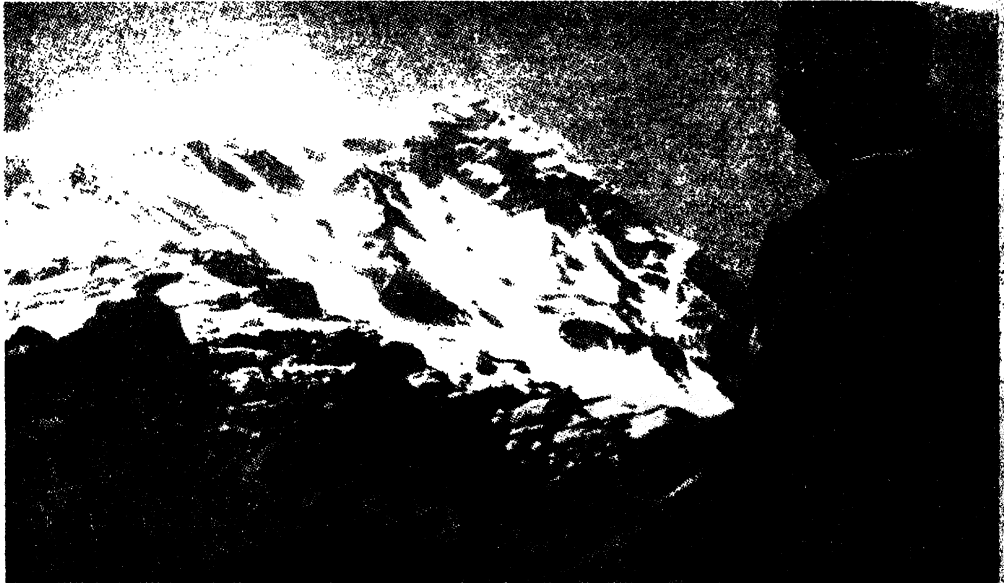
নন্দা দেবীর দিকে চেয়ে আছি

শোলোখুম্বু জেলার মধ্য দিয়ে এভারেস্টের পাদদেশে গিয়ে ন। এধার দিয়ে অভিযান নেক নতুন তথ্য তাঁরা সরবরাহ এবারও আমার মনে হ'ল, কেন এদের সংগে গেলাম না! সালে এভারেস্টে আর একবার ল। এবারকার দলটি পরি- লেন এরিক শিপটন্। চূড়োয় া তাঁরা খুব একটা করেননি, উঠতে পারেন তা তাঁরা উঠে ছিল পরিকল্পনা। দক্ষিণ পথটা তাঁরা ভালোভাবে তৈরী ন। আমি একবার এভারেস্টে আমার মনে হ'ত এই এভারেস্ট পাহাড়। কাজেই এবারকার স্কে যাওয়াতে আমার নিজের হ'ল। কিন্তু আমি তার লয়ান ক্লাবের মারফতে আর ধানে যাওয়ার চুক্তিপত্রে সই করে আর একই লোক, একই বিভিন্ন জায়গায় তো আর না। আমার এবারে নন্দা দেবী। সী দলের সংগে। ১৯৩৬ নন্দা দেবী দেখে এসেছি, উপর চড়িনি।

আমি সর্দার। বসন্তকালের মি দলবল নিয়ে একদিন য় হাজির হলাম। অভিযাত্রী ংগে আমাদের এখানেই দেখা মরা কালবিলম্ব না করে যাত্রা করলাম। ১৯৪৭ সালে ুইসদের সংগে অভিযানে কিন্তু খাটী ফরাসীদের সংগে ার কখনও মিশিনি। দেখলাম যেমন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় তেমনই া করে যেন ফুটছে। গত পূর্ণা বিজয় তামাম ফরাসী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সী অভিযাত্রীরা তারপর থেকে য়ের কথাই ভাবতে লাগলেন। ল, এই নতুন দলের হিমালয়ে এঁরা এসেছেন আরও উঁচু ত। এর জন্যে যে রাজনৈতিক গ্রহ করা দরকার, তা অবশ্য গাড় করতে পারেনি। তাই দলটি নন্দা দেবীর জন্য যে রচনা করল তা যেমন মনই মৌলিক। আমি আগেই টিলম্যান আর ওডেল্ সাহেব র চূড়ায় ১৯৩৬ সালেই এই মূল চূড়ার কাছাকাছি চূড়া আছে সেটা একটু নীচু। পূর্বনন্দা দেবী। একটা । ১৯৩৯ সালে তাতে চড়ে-

ছিল কিন্তু কোন দলই একসংগে দুটো চূড়ায় উঠতে পারেনি। এই ফরাসীরা মতলব আঁটলো যে, তাঁরা একসংগে দুটো চূড়াতেই উঠবেন। আর তাও কিভাবে? একটা চূড়ায় উঠে নীচে না নেমে যে আকাশ ছোঁয়া গিরিশিরা দুটো চূড়োকে একসংগে যোগ করেছে, তাঁরা সেইটে পেরিয়ে আর একটি চূড়ায় গিয়ে হাজির হবেন। হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত কান্ড আর কখনও ঘটেনি। এ-কাজ যেমন সুকঠিন, তেমনি মারাত্মক।

দলে আমরা ছিলাম আঠারোজন। আট- জন ফরাসী। বেশির ভাগই তাঁরা এসেছেন লিঁয় শহর থেকে। রজার দুপ্লাত্ তাঁদের নেতা। আর আমরা, আমাকে নিয়ে শেরপা ছিলাম নয়জন। আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধিও এই দলে ছিলেন। তাঁর নাম 'নন্দু' জয়াল (বর্তমানে ইনি ক্যাপ্টেন)। এঁর সংগে ১৯৪৬ সালে আমি বান্দরপুঞ্চে গিয়ে ছিলাম। আর ছিল স্থানীয় কুলিদের এক বিরাট দল। দুঃখের বিষয় পাওনাগন্ডা নিয়ে এদের সংগে অনেক খেচাখেচি করতে হয়েছিল। তর্কাতর্কি সত্ত্বেও আমরা দলটাকেও সামলে সুমলে এগিয়ে চলে ছিলাম। ঋষিগঙ্গার গভীর খাদ ধরে ধরে আমরা শেষ পর্যন্ত নন্দা দেবীর পায়ের কাছে ফুলে ঘেরা এক অপূর্ব উপবনে এসে পৌঁছলাম। এ-বন সংরক্ষিত।

এই সেই পবিত্র পর্বত। এই সেই দেবী, মহিমা যার অপার......

এর আগের বারে আমরা এই পাহাড়ে চড়তে পারিনি। আমি এর সৌন্দর্য দেখেই গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এবারকার অবস্থাটা অন্য। এবারে আমরা চূড়ায় পৌঁছতে এসেছি। একটায় নয়, দু দুটো চূড়ায়। দেখলাম পাহাড়টা তেমনই সুন্দর আছে। তবে এবার শুধু সৌন্দর্যই দেখলাম না, দেখলাম পাহাড়টা আকারেও বেশ বড় আর ভীষণ। সব থেকে ভয়ানক হচ্ছে সেই আকাশছোঁয়া তুষার ঢাকা গিরিশিরার পথটি। দুটো চূড়াকে যে পথ একটি বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। ওই পথটিই ছিল আমাদের এবারকার অভিযানের চাবিকাঠি। ওইটে পার হওয়াই ছিল ফরাসীদের মতলব। নন্দা দেবীর মূল চূড়াটি ২৫,৬৬০ ফুট উঁচু। আর পূব চূড়াটি উঁচু হোল ২৪,৪০০ ফুট। এই দুই চূড়ার মাঝখানে ওই যে সাদা করাতের ধারের মত গিরিশিরা, তার উচ্চতা কোনখানেই ২৩,০০০ ফুটের কম নয়। আর সেটা লম্বায় দু মাইলেরও ওপর। আমরা যে এক সাংঘাতিক কাজের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সন্দেহ ছিল আমরা এ-কাজটায় সফল হতে পারব কিনা।

কিন্তু ফরাসীরা খুব আশাবাদী। আর তাদের দলপতি দুপ্লাত্, তিনি যেমন সহজে উত্তেজিত হন তেমনি সহজে অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা ছিল, কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁরা তা হাসিল করে ফেলবেন। তিনি যেমন ভেবেছিলেন, আমরা তত দ্রুত অবশ্য চলতে পারিনি, তবুও এই অভিযানে যত তাড়াতাড়ি আমরা এগোচ্ছিলাম, তত তাড়াতাড়ি আমি আর কোন অভিযানে এগিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। আবহাওয়াটা ছিল বড় ভাল। তাই আমরা বেশ কম সময়ের মধ্যেই বেস ক্যাম্প একসার শিবির স্থাপনা করতে পারলাম। এই শিবিরগুলো মূল চূড়ার গায়েই স্থাপিত হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, আগে এই চূড়াটায় ওঠা হবে, তারপর এটা থেকে নেমে যাওয়া হবে ওই নীচু পূব চূড়াটায়। তারপর তার গা বেয়ে একে- বারে নীচে শিবিরে পৌঁছানো হবে। শুধু দুজন লোকই এ চূড়া থেকে ও চূড়ায় পাড়ি মারবেন। একজন হলেন দুপ্লাত্ নিজে, আর অন্য জন হলেন গিলবার্ট ভিগনেস। সাহেব দুজনই ভালো, বিশেষ করে ভিগনেস্। তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। এর মধ্যেই তিনি আল্পস পর্বতের সাংঘাতিক সাংঘাতিক জায়গায় উঠেছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠবার মত লোক আমি যত দেখেছি তাদের মধ্যে এই সাহেবই সব থেকে ভালো বলে আমার ধারণা। কিন্তু নন্দা দেবীতে পাথর প্রায় নেই বললেই হয়। খালি তুষার। আর এই দুটো চূড়ার দূরত্বও অনেকখানি। তাদের এই কাজটা যে গোঁয়ার্তুমিরই নামান্তর তা আমি না ভেবে পারলাম না।

তৃতীয় শিবিরে বেশির ভাগ অভিযাত্রীরা এসে জড়ো হলেন। দুপ্লাত্ আর ভিগনেস্ কয়েকজন শেরপাকে সংগে নিয়ে সেখান থেকে আরও উপরে উঠে প্রায় ২৩,৬০০ ফুট উঁচুতে গিয়ে সেখানে চতুর্থ শিবির খাড়া করলেন। তারপর শেরপারা নেমে এলো, আর সাহেবরা সেই রাত্রিটা সেই শিবিরে কাটিয়েই পরদিন ২৯শে জুন সকালে উপরে উঠতে লাগলেন। পাহাড়ে উঠবার সব কিছু সরঞ্জাম ছিল আর সংগে ছিল একটা হালকা তাঁবু আর পর্যাপ্ত খাদ্য। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন ওই আকাশছোঁয়া গিরিশিরার কোন এক জায়গায় হয়ত একটা রাত্রি কাটাতে হতে পারে।

আমরা এদিকে তোড়জোড় শুরু করলাম, নন্দা দেবীর পূব চূড়াটায় গিয়ে সাহেবদের জন্যে অপেক্ষা করবার। দুই দাদু বো

পাহাড়ের খাদ ধরে ধরে এগিয়ে চললাম

নামে এক অভিযাত্রী সাহেব, দলের চিকিৎসক ডাঃ পেঁশু আর আমার উপর এই কাজের দায়িত্ব পড়লো। চূড়ায় অভিযানের কয়েক দিন আগেই আমরা অন্যান্য সঙ্গী-দের ছেড়ে পাহাড়ের নীচ দিয়ে দিয়ে একটা উঁচু গিরিপথে গিয়ে পৌঁছলাম। এই জায়গাটার নাম 'লংস্টাফ কল'*। আমরা এখানেই আমাদের শিবির স্থাপন করে সাহেবদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ২৯শে জুন সকালে আমরা সেখান থেকে আমাদের দূরবীন দিয়ে দেখতে পেলাম, কয়েক মাইল দূরে দুটো ছোট ছোট বিন্দু মূল চূড়াটির গা বেয়ে বেয়ে উঠে চলেছে। সাদা তুষারের পটভূমিকায় এই কালো দুটো বিন্দুকে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত উঠতে দেখলাম, প্রায় চূড়া পর্যন্ত। কিন্তু তারপর তাঁরা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তারপর আর তাঁদের দেখতে পেলাম না। অবশ্য সেদিন যে আর তাঁদের দেখা পাব তা ভাবিনি, কারণ তাঁরা ঠিক করেছিলেন সেই আকাশছোঁয়া গিরিশিরার উপর তাঁরা রাতটা কাটাবেন। আমরা পর-দিন সকালে 'কল' থেকে পূব চূড়োটার খানিকটা উঠে সাহেবদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বসে থাকলাম। কিন্তু সকাল কেটে গেল, তাঁদের দেখা নেই। বিকেল কেটে গেল, তাঁদের দেখা নেই। আমাদের দূরবীন চোখে লাগিয়ে পাহাড়ের উপর আঁতিপাঁতি করে তাঁদের খুঁজলাম, তাঁদের কোন চিহ্ন নেই। আমরা চেঁচিয়ে তাঁদের ডাকতে লাগলাম। তাঁদের কোন সাড়া নেই। তারপর অন্ধকার, রাতের অন্ধকার বড় বড় দুটো ডানা মেলে নেমে এল। আমাদের শিবিরে আমরা নেমে আসতে বাধ্য হলাম।

আমাদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হয়ে-ছিল, দুপ্লাত্ আর ভিগনেস্কে যদি কোন কারণে নীচে নেমে আসতে হয় তবে তাঁরা আমাদের উদ্দেশে সাংকেতিক বার্তা পাঠাবেন। তাহলে আমরা নেমে যাব। কিন্তু সেদিন কোন সাংকেতিক বার্তা পেলাম না। তার পরদিনও না। একটা কোন দুর্ঘটনা যে ঘটেছে এবার আমরা তা বুঝতে পারলাম। আর দুজনে, ডাঃ পেঁশু আর আমি ভাবতে লাগলাম এবার কি করা যায়। সেই কলে চুপচাপ বসে সময় কাটানোর কোন মানে হয় না। মনটাও মুষড়ে পড়ে। হয় উপরে ওঠ আর না হয় নীচে নেমে যাও।

সুতরাং আর আমি উপরেই উঠলাম।

ডাঃ পেঁশু (উঁচু পাহাড়ে চড়া তাঁর অভ্যাস ছিল না) উপর শিবিরের ভার নিলে আমরা দুজন নন্দা দেবীর পূব চূড়োর সেই খাড়া গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। উঁচুর থেকে উঁচুতে, আরও উঁচুতে। আমাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ছিল, সঙ্গের বোঝাও ছিল বেশ ভারী। একটা তাঁবুও আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। কারণ আমরা ঠিক করে-ছিলাম, মানুষের পক্ষে যত দূর যাওয়া সম্ভব, তত দূর আমরা যাব। সারাদিন ধরে আমরা শুধু উঠলামই, দিনের শেষে একটা শিবির স্থাপন করলাম। পরদিনও শুধু উঠেই গেলাম। এই দিনও তাঁবু পাতলাম দিনের শেষে। 'কলের' উপর আমরা মোট তিনটি শিবির স্থাপন করে-ছিলাম। তা না হলে আমরা এগোতে পারতাম না। কারণ আমাদের গতি ছিল ভয়ানক ধীর। বেশীর ভাগ সময় আমরা গিরিশিরার উপরেই ছিলাম। যে গিরিশিরা ধরে দুপ্লাত্ আর ভিগনেসের এগিয়ে আসবার কথা, আমরা ছিলাম তার বিপরীত দিকে। আমরা যতই উঠছি, পথও তত খাড়া হয়ে উঠছে। আর কি সরু। সমস্ত পথ বরফ আর আলগা তুষারে ছেয়ে আছে। আমরাই প্রথম এ-পথের যাত্রী নই। বারো বছর আগে এই পথ ধরেই পোলিশ অভি-

* ডাঃ টমাস লংস্টাফের নাম অনুসারে এই নামটি হয়েছে। এই বৃটিশ সাহেবই সর্বপ্রথম এই অঞ্চল পর্যটন করেন।

ভার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পর তাদের দড়িদড়া তখনও ধা ছিল। কিন্তু এগুলো এত এতো জীর্ণ যে, আমাদের তা ল না। আমরা নতুন করে পথ তৈরী করে নিতে লাগলাম। হাড় কোথাও কুঁজো হয়ে আছে, কোথাও পাক খেয়ে খেয়ে আছে। দুই মাইল লম্বা সেই সংকীর্ণ তুঙ্গ পথে চলতে চলতে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমাদের পা হড়কে যাবে, এই বুঝি আছাড় খেয়ে পড়বো নীচে। বর্তমানে প্রায়ই লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ পাহাড়ে চড়তে তোমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছে? কোন্ পাহাড়ে চড়তে তোমাকে মারাত্মক অবস্থায় পড়তে হয়েছে?" তারা হয়ত আশা করেন, আমি জবাব দোব, এভারেস্ট। কিন্তু তা এভারেস্ট নয়। তা নন্দা দেবীর এই পূব চূড়া।

[ক্রমশ]

চক্রদত্ত

শৌখীন লোকের বাড়িতেই গাছ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ফুল সহজে চোখে পড়ে না। বছরে একবার করে অর্কিডের। এমন অনেক ধরনের অর্কিড আছে যেগুলিতে বেশ কয়েক বছর অন্তর ফুল ফুটতে দেখা যায়। অর্কিড সাধারণত ঘরের শোভাবর্ধনকারী বলেই আমরা জানি। অর্কিডের ফুল ভালবাসে না এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায়। অর্কিডের ফুল মেয়েরা তাদের সজ্জাভরণ হিসাবে ব্যবহার করে। এইরকম শখ ও শৌখীনত্ব বজায় রাখা ছাড়া অর্কিডের আর কোনও উপকারিতার খবর আমরা জানি না। বিশেষত অর্কিডের ফুলের যে কোনও গন্ধ আছে একথা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। বস্তুতপক্ষে কয়েক ধরনের অর্কিড ফুলে বেশ মিষ্টি মৃদু গন্ধ আছে। কোনও কোনও অর্কিডে খুব উগ্র সুগন্ধ পাওয়া যায়। আবার কোন কোন অর্কিডে খারাপ গন্ধও পাওয়া যায়।

[illegible] নামের অর্কিড ফুল

আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিস হিসাবে যে 'এসেন্স অব ভ্যানিলা' ব্যবহার করি সেটি একরকম অর্কিডের ফুল থেকেই পাওয়া যায়। এই অর্কিডগুলি ফ্লোরিডা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে জন্মায়। আমাদের ধারণা, অর্কিড শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মায়, কিন্তু এখন জানা গেছে যে, মেরু-প্রদেশও অর্কিডের জন্মস্থান। অর্কিড সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। অর্কিড বলতে আমরা ঝুলন্ত গাছ বুঝি। বিশেষত এটি পরগাছা বলে গাছ থেকেই ঝুলতে দেখি। কিন্তু অর্কিড মাটির ওপরেও জন্মায়। অস্ট্রেলিয়ায় দুটি প্রজাতির অর্কিড আছে, সেগুলি মাটির নীচে জন্মায়, মাটির নীচে ফুলও ফোটে। আজ পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার প্রজাতির অর্কিডের খোঁজ পাওয়া গেছে। যারা শখ করে অথবা ব্যবসায় করার জন্য নানারকম অর্কিডের চাষ করেন তাঁরা দুরকম অর্কিডের সংমিশ্রণে নতুন রকম অর্কিডের জন্ম দেবার চেষ্টা করেন। এইভাবে আজকাল অনেক নতুন অর্কিড দেখা যায় এবং নতুন নতুন অর্কিডের ফুলও দেখা যায়। ছবিতে যে অর্কিডের ফুল দেখা যাচ্ছে এগুলি এইরকমই বর্ণ-সংকর অর্কিড ফুল

[illegible] চার্চিল

*

সাধারণত সমুদ্রের জলের পরিমাণকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কোনও কিছুর আধিক্য বোঝাতে হলে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি। সেক্ষেত্রে হয়, সমুদ্রের জলরাশি কিংবা উত্তাল ঢেউগুলি উপমান হিসাবে ব্যবহার করি। সমুদ্রের জলে লবণের অস্তিত্ব আমরা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করি। সমুদ্রের লবণের পরিমাণ নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। পৃথিবীতে যত সমুদ্র আছে সেগুলির জল থেকে সমস্ত লবণ বার করে এনে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলে সমগ্র পৃথিবী ১১০ ফুট পরিমাণ উঁচু লবণের আস্তরণে ঢেকে যাবে।

পরক্ষণেই কান্নায় সে ভেঙে পড়েছিল। ...র কি বাঁচতে ইচ্ছে যায় না গো—
...জল চোখে শ্যামল তাকিয়েছিল, আমার ...তে ইচ্ছে যায় না? বিয়ের আগে তোমায় সব কথা দিয়েছিলুম, শহরে রাখবো, ...বো, গীটার শেখাবো, তুমি কি মনে —মৃদু ম্লান হাসল—সে সব শুধু ...র কথা? তুমি তো জানো বাবার অমতে ...করেছি আমি। অত বড় ঘরে কাজ ...র ইচ্ছে তাঁর ছিল না, শুধু কাকীমার ...রোধে একবার মেয়ে দেখতে গিয়ে— ...মীমা—কাকীমাই তো এই সর্বনাশটি ...য়েছে। আর সেই খোরো ঘটকটা, যে ...আমায় বলেছিল, এক বাটি দুধে ঠিক ...ফোঁটা আলতা ফেললে যে রঙ হয়— ...সেন্স, ইডিয়ট, সুন্দরী মেয়ের রূপ ...া করতে শেখেনি ধরনী ঘটক। তোমার ...করেছে ওরা। তুমি বিশ্বাস কর ধীরা, ...য় তোমার সর্বনাশ করতে চাইনি— ...ন—কখনো না।

...রপর কদিন কেটে গেল। সেই অনুরা... ...শ প্রতিবাদ চড়া থেকে খাদে নেমে এল। ...ন যেন হতাশা আর আশাভঙ্গের নিষ্ক... ...লোকে, ধীরে ধীরে তাও পালটে গেল, ...র তো সে মৃত্যুর মন্ত্রপ্রার্থনা শুনতে ...ছ। এই কি তবে নৈরাশ্যের নিম্নতম ...শ? কি জানি, কেমন যেন ভয় করে ...রার, ভয়ে ভয়ে সে এগোয়।

...রে ঢুকতেই তার দিকে একবার তাকাল ...ল তারপর যথাসাধ্য কোমল করুণ কণ্ঠে ...ন, সারাদিনে কি করলে বলো, ছবি ...কছো? গান? ওঃ এখানে তো অর্গ্যান ...। একে পাড়াগাঁ তার ওপর শ্বশুর- ...র। এখানে তো গলা খোলা যাবে না, ...তু—কিন্তু এমনি করে চললে সব ভুলে ...যে, আর আমি—আমিও ভুলে যাব ...জেনে তোমার ঘরে এনেছিলুম— ...প করে দাঁড়িয়ে রইল অধীরা। যদি চীৎকার করে বলতে পারত, ঘুমিয়েছি, সারা দুপুর পড়ে পড়ে মোষের মত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছি, তোমাদের বাড়িতে দুপুরে শুধু ঘুমোনোই যায় আর কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু না, মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়েই রইল।

—আমি কেন ও কথা বলছি জানো? এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল শ্যামল-সুন্দর। এভাবে বাঁচতে চাইনি বলে— না—না—এভাবে বাঁচা উচিত নয়, কিছুতেই না, এ আমি চাইনে, চাইনে। কিন্তু—কি করব আমি, কি করতে পারি। আমি নিরুপায়, আমি অসহায়, আমি আমারি কাছে অসহায়। সারাদিন ধরে ছুটোছুটি, কলে কারখানায়, লোহালক্কড়ের বাজারে, কি করি, কি না করি, কিছুই যে জানি না। চাকরি কে দেবে? চাকরি কি সহজ? ব্যবসাপত্তি তো কিছু হবে না। তাহলে উপায়! পুরোনো এক বন্ধুর কাছে ছুটলুম। সে বললে, এই তো, নতুন মেশিনটা হয়ে গেলেই। জানো অধীরা, আমি যখন আর কূল দেখতে পাইনে তখন তার কারখানায় গিয়ে চুপটি করে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকি। দুমাস হয়ে গেছে, চাকা আর ঘোরে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিলিং মেশিনের ওই মস্ত চাকাটা আমি যদি আমার দুহাতের জোরে ঘোরাতে পারতুম—

—আঃ কি হচ্ছে, এ সব শুনলে কে কি ভাববে বলো তো? নীচুকণ্ঠে অধীরা ফিস ফিস করে উঠল, বললে, তোমরা দেখছি দিনরাত শুধু গল্প আর গল্প—

সারাদিনের পরিশ্রমে মুখটা তেল চিক চিক করছে সুন্দরের। কি বিষম মলিন আর পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। ধীরার কথা শুনে একবার পাশের দিকে চাইলে সে, তারপর দূর আকাশের দিকে চেয়ে বললে, গল্প? তাও যদি মনের মত করে করতে পারতুম! নতুন বিয়ে করে লোকে কিসের গল্প করে জানো? স্বপ্নের গল্প করে। তারা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের কথা বলে। আর আমি? আমি তো আমার স্বপ্নকে উপহাস করি। তুমি তো শুধু ঘুমোও—না-না, ভুল বললুম, তোমাকে আমিই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। আমার সোনার কাঠি আমি হারিয়ে ফেলেছি, সাধ্য কি তোমাকে জাগাই। তোমার তো দোষ নেই, আমিই তোমায় জাগাতে পারিনি। তবু তোমাকেই দোষ দিতে দাও, হ্যাঁ-হ্যাঁ এইখানে আমি প্রবঞ্চনা করি, বঞ্চনা করি, নইলে যে নিজেকে বড় অক্ষম লাগে—

গলার স্বর রুক্ষতা থেকে নেমে এসেছে কোমলতায়। আশ্চর্য গম্ভীর মনে হচ্ছে সুন্দরকে। ধীরকণ্ঠে ও বললে, ধীরার হাতখানা নিজের মুঠোয় ধরে বললে, তাই ভাবি, অমলেশের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হত তাহলে এ দুর্ভাগ্য তো তোমার হত না, তুমি তার হাতে রাণী হয়ে থাকতে।

—ছি-ছি—ওর নাম করতে নেই।

প্রতিবাদ করতে গেল ধীরা কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই বললে, তোমায় সব বলেছি বলে তুমি আমায় এমন করে অপমান করবে? অমলেশ আমারও নয়, তোমারও শত্রু ছিল।

—ছিল নাকি? তার মানে? চমকে উঠল শ্যামলসুন্দর, কোথায় শুনলে সেকথা?

সেকথাকে অস্বীকার তোমার উপায় হারিয়েছে। কিন্তু পুরোনো চিঠি থেকে তার বক্তব্য জানলুম। এরপরেও লোকটা সম্বন্ধে অধিকারের তো অভাব নেই।

ভারি চিন্তিত দেখাল শ্যামলসুন্দরকে, আস্তে আস্তে বললে, অমলেশের কথাটা কেন তুললুম জানো? আমার আজকাল মাঝে মাঝে বিকল্প সম্বন্ধে কথা মনে হয়। মনে হয়, ভুল-ভুল—সারাজীবন আমি শুধু ভুল করে এসেছি। এমনটা না হয়ে অমনটা যদি হোত, এইটে না হয়ে ওইটে—

ের উন্দাম কামনা-বাসনাময় মূর্তি, চোখে যেন আজও না-পাওয়া, পেয়ে নো আর যাচিত অর্থের আলেয়ার না বার বার ধাঁধা লাগায়। আত্ম-র্শের ফিরে ফিরে আসা উপহাসকে ভুললে বাঁচে—কিন্তু না, দুজনেই এক য় অনুভব করে, অতীতের কোনো ভাব নেই তাদের মনে, অতীত ঘটনার টুকু বায় নেই স্মৃতিতে। তাদের য় সমস্ত অক্ষয়—অব্যয়—অন্তহীন ারে অবারিত উৎস।

াঝে মাঝে এ বাড়িতে হাওয়া দেয়। ন্তর ঝিরঝিরে হাওয়া দেয় এঘরে ওঘরে ছাতে, চৈত্রের রাত রমণীয় মনে হয়। কেবল মুহূর্তের মতো। পুনরায় ফিরে হাওয়া। শেষ বসন্তের হাওয়া। সুখ । হয়ে ওঠে।

ধীরার জন্যে কতক্ষণ প্রতীক্ষা করলে লসুন্দর। সেই সন্ধ্যের পর থেকেই ১ পায়চারি করছে। সংসারের কাজে বারে তলিয়ে গিয়েছে ধীরা, তার দিকে নজর নেই। কলকাতায় থাকতে পায় বলে অনুযোগ করবে আর শ্যামল দেশে ই পালিয়ে বেড়াবে। এ ভাবগতির সে খুঁজে পায় না, সব কিছু তার হ প্রহেলিকাময়। এইটুকু সে বুঝেছে, সংসার তার ভাল লাগে না।

এখনো তো বিয়ের প্রথম বছর কাটেনি। সময় হলে শ্যামল সান্ত্বনা দিত, এই থা না, একটা ব্যবস্থা করে ফেলছি। কাতায় ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, দিব্যি আরামে খন তার এসব কিছুই মনে এল না, মনে হল, সে বঞ্চিত। অধীরা তাকে প্রাপ্য দেয়নি, তার বিপদের দিনে নি সান্ত্বনা, দেয়নি সাহচর্য, কিসের স্ত্রী তবে! মনে মনে ভাবলে শ্যামলসুন্দর, জ সে দাবী আদায় করবে।

অনেকক্ষণ পরে এল অধীরা। আস্তে আস্তে কাছে এল শ্যামল। অন্ধকারে যে মুখ আবছা দেখা যায় সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কখন সেই সন্ধ্যে থেকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আর তোমার এই আসবার সময় হল?

—কি হবে এসে, নিরুত্তাপ নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললে অধীরা।

—তার মানে? কি জন্যে আমি দৌড়ে আসি শহর থেকে? কার জন্যে? নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব হল না শ্যামলসুন্দরের পক্ষে। আর তুমি আমাকে বললে এই কথা! কই, শাড়িটা পাল্টাওনি কেন! এ কি পরেছো—ময়লা আর ছেঁড়া—

—কি হবে পরে, আমার সাজতে গুজতে ভালো লাগে না। উদাসীন অধীরার কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু আমারও তো একটা ইচ্ছে যায়, যথাসম্ভব মৃদু মোলায়েমভাবে বলতে চেষ্টা করলে শ্যামল, তবু বুঝি অনুযোগটা চাপা গেল না, আজ পর্যন্ত একটা কথাও তুমি আমার রাখনি, কি হয়েছে তোমার বল তো? এমনি করে আর কতদিন কথা ঠেলবে? আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ, সেদিন আমার আগ্রহ মিটে যাবে, সেদিন আমার উৎসাহ নিভে যাবে—

—সেদিন তোমার জয়াবতীকে মনে পড়বে, ব্যঙ্গের হাসি হাসল অধীরা।

চমকে উঠল শ্যামলসুন্দর, মিথ্যে—মিথ্যে—এর একটা প্রতিবাদ চাই, তীব্রতম তীক্ষ্ণতম প্রতিবাদ। আর প্রতিবাদ করতে গিয়েই সে সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারে আবার করে বসল, আর তোমার মনে পড়বে নিতাই সামন্তের ছেলেকে, কাতিলাক-কাইসলার—বাড়ি আর গাড়ি।

মিথ্যে—এও মিথ্যে—অসতর্ক মুহূর্তে প্রতিবাদ করে বসল অধীরা, শহরের মেয়ে এনে তোমার বিপদ বেড়েছে, সেই কথাই বল না কেন।

—তার চেয়ে বল না, গাঁয়ের ছেলে বিয়ে করা তোমার ভুল হয়েছে।

দুজনেই চুপ করে গেল। দুজনেরই মনে হল প্রতিবাদ নিরর্থক, অর্থহীন। যা মিথ্যে, যা তুচ্ছ, যা এতই সামান্য যে, তা নিয়ে প্রতিবাদ শুধু অর্থহীন নয়, একেবারে ছেলেমানুষী। একজনের মনে পড়ল তমালকৃষ্ণের কথা, আর একজনের মনে পড়ল লাখো টাকার ঔজ্জ্বল্য। আর দুজনেই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে, মাঝে মাঝে বিরোধ আর অন্তঃক্ষোভ যখন চরমে পৌঁছয় তখন ওরা ঘুরে ফিরে দুজনের নামই বলে, জয়াবতী আর নিতাই সামন্ত, আর দুজনেই চমকে আবিষ্কার করে, দুজনের মনে সম্পূর্ণ অন্য দুই নাম। একজনের মনে পড়ে অপর চোখের সেই কামনার আগুন আর একজন মনে করে রূপোর ঔজ্জ্বল্য। একজন ভাবে নিতাই সামন্তের ছেলেকে সে দেখেনি পর্যন্ত, তবে তাকে নিয়ে এই পরিহাস কেন, আর একজন ভাবে, জয়াবতীর নামটুকুই শুধু চেনা, তবে এই নামোচ্চারণে এত ব্যঙ্গ-উপহাস কেন—কেউই জানলো না দুজনের অগোচরে অলক্ষ্যে দুই ভুল প্রতিচ্ছবি দুজনের হৃদয়ে মুদ্রিত—অক্ষয়, অব্যয়ভাবে।

কতক্ষণ পরে দুজনে মুখ খুললে। শ্যামলসুন্দর বললে, সংসারে যদি শান্তিই না পাওয়া গেল তবে কি হবে বাড়ি এসে, আমি বাসাতেই পড়ে থাকব।

একটু থেমে আরো সে বললে, একদিন তোমায় বলতেই হবে, আমার চেয়ে আপন তোমার কেউ নেই, আমি সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

অধীরা শুধু বললে, এ সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে, বাবাকে লিখে দেবো, আমায় যেন নিয়ে যান।

বাপের বাড়িতে পা দিয়েই মনে হল মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে। প্রথমটায় ঠিক মনে করতে পারল না অধীরা, তারপর সবকিছু স্মরণে এল, গত অঘ্রাণ মাসে, বড়দির শ্বশুরবাড়িতে মদনমোহনের রাস-মেলায়, ওদের বাড়িতে বিরাট উৎসব হয়। সেই সময় এসেছিল ওর ননদের মেয়ে। ঠিক আগের মতই আছে। ঢ্যাঙা আর রোগা, কালো আর শ্রীহীনা। কিন্তু ও এখানে কেন?

তারপর এক এক করে সমস্তই কানে গেল ওর। প্রথমটায় সে দারুণ চমকে উঠেছিল, বিশ্বাস করতে চায়নি। এ কী সত্যি! এ কী সম্ভব! তাহলে সেই যে কানে কানে কথা, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কখনো আমি এ জীবনে—না-না সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে, ওই কালো কুশ্রী মেয়েকে তমালের মত রূপবান—আর তাছাড়া সে তো বোনকে পার করে দেশের ভিটেমাটি বিক্রী করে শহরে এসে উঠেছে।

ভালো চাকরিও পেয়েছে। সে তো এখন সমাজের চোখে সুপাত্র, তার জন্যে কতো ভালো পাত্রী থাকতে একে কেন—আসলে তার মন বলতে লাগল, এ বাড়িতে কেন, আমার চোখের ওপর কি না করলেই নয়!

শ্বশুরবাড়িতে খাতির কুড়োতে চায় বড়দি, উঠে পড়ে লেগেছে, সে-ই বাবা মাকে বলে ব্যবস্থা করেছে। আর মেজদা? সে চটাতে চায় না তমালকে। কেবলি ভয়, এই বুঝি বিষাক্ত করে দেবে তার বিবাহিত জীবনকে। সে তাকে এড়িয়ে চলে। আর তমাল? সে বোধহয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই এই ফাঁদ রচনা করেছে।

সবই শুনল সে বড়দির কাছে। দুজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে, আলাপ পরিচয়ের প্রাথমিকতা পার হয়েছে দুজনেই। এখন নাকি এসেছে প্রগাঢ়তা, আনন্দে উৎসাহে অতৃপ্ত বড়দি একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, জানিস ধীরা, এখন মাঝে মাঝে না এলে নাকি মরে যায়। আমায় তাড়া দিচ্ছে, পাঁজিপুঁথিতে দেখতে বলেছে। দেখবি'খন পরশু তরশু করে অফিস টাইমের পর ঠিক ভর সন্ধ্যায় সুযোগটি বুঝে বাবু হাজির হবেন'খন।

শুনতে কষ্ট হচ্ছিল অধীরার। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মন নিষ্পেষিত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে সবকিছু অর্থহীন মনে হল তার কাছে। মাথার ভেতরটায় কেমন যেন শূন্যতা। আরো খানিক পরে তার মনে হল, নিজেকে সে আর সংবরণ করতে পারবে না। একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসবে, একটা চিঠি লিখবে, সরাসরি লিখবে তমালকৃষ্ণকে। বলবে, কি কথা তুমি আমায় দিয়েছিলে আর আজ কি শুনছি—কিংবা—হ্যাঁ, তার চেয়ে দেখা করাটাই ভালো। শিগ্‌গিরই আসবে নাকি, ছাতের আলসেয় ভর দিয়ে গল্প করবে, অতৃপ্ত বড়দির খেয়ালী কামনার পূর্ণ সুযোগ নেবে। হ্যাঁ, সেই সময়েই প্রতীক্ষায় থাকবে অধীরা, সিঁড়ি বেয়ে সোজা ছাতে উঠে যাবে, মেয়েটাকে আড়াল করে দাঁড়াবে, বলবে, নির্লজ্জ বেহায়া মিথ্যেবাদী। না-না বলবে, করুণ অনুনয়ে বলবে, এই তো আমি এসেছি, সেই যে তুমি বলেছিলে, পালিয়ে যাবে, আজ পারবে না সেই কথা রাখতে? আমি প্রস্তুত, সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কয়েকটা দিন দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যা এল। সন্ধ্যার আধো ছায়া আধো আলো অন্ধকারে সে এল। কিছুক্ষণের মত নীচে কুশল প্রশ্ন, জলযোগ। তারপর সে ছাতে উঠে গেল।

অধীরা সর্বক্ষণ রইল লুকিয়ে লুকিয়ে, আড়ালে আবডালে। নজর রাখল তীক্ষ্ণ। তারপর এক সময়ে সত্যিই সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

বুকটা কাঁপছে তার, অজানিত আশঙ্কায়

হেমন শিউরে উঠছে। কে যেন বলছে, । ভাল হচ্ছে না, এর পরিণাম শুভ নয়। কউ দেখে ফেললে, কিংবা তমালই যদি ীৎকার করে ওঠে, তার সদ্য বলা পরি-ল্পনা যদি ফাঁস করে দেয়, কিংবা সেই স্ত্রী মেয়েটা যদি ঈর্ষাবশত......

আর ভাবতে চায় না আর ভাবতে পারে না। সে যাবে, সে নিজে যাবে তমালের কাছে। বলবে, কী প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে? সবাই তাকে ভুল বুঝুক, তার কোন দুঃখ নেই, শুধু একজন যেন তাকে না অন্য ভাবে। সে যাবে, সে বলবে, আমি ময়লা আর পুরোনো শাড়ি পরে আছি, আমি প্রসাধন করিনি, আমি তোমায় ভোলাতে আসিনি, আমি মনে করিয়ে দিতে এসেছি যা আমি ভুলতে পারিনি।

একটি একটি করে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল অধীরা। নীরবে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে অধীরা। না, আর তার কোনো শংকা নেই সংকোচ নেই, ছাতে পা দেবে এইবার, সোজা দাঁড়াবে তমালকৃষ্ণের মুখোমুখী।

কিন্তু না, ও কি, স্পষ্ট গলা শুনতে পাচ্ছে তমালকৃষ্ণের, কি যেন বলছে সেই মেয়েটার কাছে। হাস্যকর অভিনয় থমকে দাঁড়িয়ে গেল অধীরা।

আর তারপরই মাথাটা ঘুরে উঠল। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল চোখের সামনে। মনে হল, এ তমালকৃষ্ণ নয়, এ অন্য কেউ। অন্য কেউ কথা বলছে শুধু তাকে কষ্ট দেবার জন্যে। সমস্তই তার কানে ঢুকতে লাগল আর সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা পরিচিত পুরুষ-কণ্ঠস্বর শেষ চৈত্রের বিদায়ী বসন্তের উষ্ণ বাতাসে অনুরণন তুলতে লাগল: জানো, অধীরার সঙ্গে আগে আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল, অধীরা মিথ্যেবাদী, অধীরা বেইমান, আমার টাকা ছিল না বলে—

—সত্যি নয়, একথা সত্যি নয়। অস্ফুটাস্ফুট আর্তনাদে কেঁদে উঠল অধীরা, তারপর নিজের কথা আর কান্নার শব্দে নিজেই চমকে উঠল। ত্রস্তভাবে নিজের মুখে হাতচাপা দিলে, তারপর কেমন করে সে যে নীচে নেমে এল, রেলিং ধরে টাল সামলাতে সামলাতে একটার পর একটা সিঁড়ি ভাঙলে তা আর সে নিজে জানে না।

প্রথম ঘোর কাটল ঘরে পা দিয়েই। চৌকাঠ পেরিয়েই দেখে সামনে শ্যামল-সুন্দর। তেমনি জানলার দিকে ফিরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ফোটা দেখছে। মুহূর্তের জন্যে যেন চেতনা ফিরে এল অধীরার। দরজার ভারি পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিলে, তারপর প্রায় দৌড়ে গেল শ্যামলের কাছে। কাঁধে হাত দিল, কাঁধ দুটো ফিরিয়ে দিল। বিপুল আবেগে বাহুর বেষ্টনী রচনা করল, বুকে মুখ লুকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, শুনেছো, সে আমায় বেইমান বলেছে, আমি বেইমান, আমি মিথ্যেবাদী......

—আজ আমার প্রত্যাশা ফুরিয়ে গেল অধীরা, শ্যামলের কণ্ঠে হতাশার সুর।

তার মানে? কি বলতে চায় ও? অধীরা অবাক চোখে শ্যামলের দিকে তাকাল।

তেমনি নিরাশ সুরে বললে শ্যামল, তুমি তো ডাক দিলে না, আমি নিজেই তাই এলুম, থাকতে পারলুম না। এসে বুঝলুম, নিতাই সামন্তর অর্থ তুমি চাওনি, ওটা আমার বোঝার ভুল, একটা গোটা মানুষকে তুমি মনে করে রেখেছ।

—না-না, মনে রাখিনি, আমি ভুলতে চেয়েছিলুম, ভুলতে পারিনি। করুণ অনুনয়ে লুটিয়ে পড়ল অধীরা, বল না গো, কি করলে ভোলা যায়।

—ভোলা কি যায়, সাধ্য কি মানুষের সব ভুলে যায়। ও ঘটে, আপনিই ঘটে, বিস্মরণ ঘটে। হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল শ্যামলসুন্দর, জয়াবতীকে আমি ভুলেছি, অনেকদিন। এক লাখ টাকাকে ভুলতে পারিনি, পারবো না। ওদিকে আমার আদর্শ আমায় বলে বেইমান, মিথ্যেবাদী, হাঃ হাঃ হাঃ।

একটা দমকা হাওয়ার মতো দরজা খুলেই বেরিয়ে গেল শ্যামলসুন্দর। অধীরা বাধা দিলে না, দেবার চেষ্টাও করলে না। একদিকে এক প্রত্যাশাশূন্য মন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, আর একদিকে ভুলুণ্ঠিত কান্না। ওদিকে জুতোর আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছে আর এদিকে কেঁদেই চলেছে অধীরা, আমায় ভুলতে দাও, আমায় তুমি এসে ভুলিয়ে দাও......আমায় সব ভুলিয়ে দাও...... ....

পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। উচ্চবর্ণ নীচবর্ণ, অভিজাত ভদ্রেতর শ্রেণীর পার্থক্য আজও আমাদের দেশে প্রবল। কিন্তু তার মূলে টান পড়েছে, সে-টান আরও শক্ত হবে। তার লক্ষণও দেখা দিচ্ছে ধীরে ধীরে। তবু সাত্তাকারের অশ্রেণিক সমাজ গঠনের পক্ষে প্রাথমিকভাবে যে কয়টি বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন তার দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। প্রবন্ধের শেষে তার একটি খসড়া তৈরী করে দিয়েছেন লেখক।

'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' এবং 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি প্রবন্ধ। প্রথম রচনাটিতে লেখক সামাজিক মানুষের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন রসিকতা করলেও জাতিগতভাবে আমাদের অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যে পরিচয় দিয়েছেন তা সত্য। মুখে প্রগতির বুলি আওড়ানো অথচ যুক্তিহীন বুজরুকিতেও বিশ্বাস রাখলে তা কখনও চলতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, কিন্তু বিজ্ঞান কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে অমঙ্গলের অগ্রদূত সে-কথাও প্রমাণ করেছেন লেখক তাঁর 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা' প্রবন্ধে। এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ উক্তি: 'মোট কথা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।'

'ইহকাল পরকাল', 'বিবর্তবাদ', [illegible] 'ভারতীয় হিন্দু' এবং [illegible] প্রবন্ধ [illegible] মূলত দর্শন এবং ধর্মকে আশ্রয় করে লেখা। শুধু সে-জন্যেই নয়, এ কয়টি রচনা লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্যের বিশেষ নিদর্শন বলেও পাঠকের একাধিকবার পড়তে হবে। অথচ আশ্চর্য, [illegible] সহজ করে বলা যায়।'

'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার' এবং 'বাংলা ভাষার গতি' আধুনিক বাঙালী লেখক মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখা কঠিন নয়, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে [illegible] সে কী পরিমাণ আয়াসসাধ্য ব্যাপার এ-রচনা দুটো পড়লেই স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এর আগে, যতদূর মনে পড়ে, পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহুকাল আগে একবার এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর একটি প্রবন্ধ [illegible] কথা পড়ায়। তখনও ভাষার প্রতি আজকের মতো অনাচার দেখা দেয় নি, তথাপি তাঁকে সে-প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিলো। এখন এ ধরনের রচনার আবশ্যকতা একান্তভাবেই অনুভব করছেন কোনো কোনো লেখক, রাজশেখর বসুর এ দুটো প্রবন্ধই তার নিদর্শন। 'সাহিত্যিকের ব্রত' রচনাটিও প্রচলিত কয়েকটি দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে। সমাজ সম্পর্কে সচেতন রচনার পক্ষে এরকম ওকালতী করতে আর কাউকে এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু সমাজ-চেতনা মানেই রাজনীতি নয় এ সতর্ক বাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন—বলেছেন: 'রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকেরা সামাজিক [illegible] কার্যকর করার চেষ্টা করুন।'

'বাঙালীর হিন্দীচর্চা' সম্বন্ধে একটি চিন্তিত এবং চিন্তনীয় প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে বলে বাঙালীমাত্রকেই হিন্দী শিক্ষা করতে হবে, সেটা নতুন কথা নয়। তাতে আপত্তি জানানোটাও দোষ হয় বোকামি, কারণ রাষ্ট্রের বিধানকে প্রত্যেক প্রজারই মেনে চলা উচিত। এ-প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্য সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতের সঙ্গে অধিকাংশ বাঙালী লেখকই একমত হবেন না বলে আশঙ্কা করি। তাঁর মত স্বীকার করে এই পর্যন্ত বলতে পারি 'হিন্দীর আধিপত্যে আমাদের মাতৃভাষার ক্ষতি হবে এই ভয় একেবারে ভিত্তিহীন।' কিন্তু যুক্তির প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে তিনি

যখন ইংরেজী ভাষা এবং হিন্দী ভাষায় ভেদ রাখতে চান না, ভয় হয় তখনই। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে, তার কারণ ইংরেজী ছিল সমৃদ্ধতর ভাষা। হিন্দী তা নয়। সুতরাং হিন্দী কখনও বাংলা ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, এ সান্ত্বনাতেই কি আমরা সুখী হতে পারবো? চীনা-জাপানী ভাষা থেকেও যখন দুটো একটা শব্দ ছিটকে এসে আমাদের ভাষায় ঢুকেছে তখন অঢেল হিন্দী শব্দ যে ঢুকবে তাতে আর বিচিত্র কি? তারপর ঢুকবে বাক্যরীতি বা ইডিয়ম—যা ইংরেজী ভাষার প্রভাবেও হয়েছিল। লেখক কি সত্যিই বিশ্বাস করেন সে প্রভাব খুব সুন্দর হবে বাংলা ভাষার পক্ষে? অন্যদিকে তিনি লোভ দেখিয়েছেন হিন্দী শিখে বহু বাঙালী সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেন, যেমন ইতিপূর্বে কয়েকজন হয়েছেন। সাহিত্যিক মাত্রেই যশস্বী হতে চান, কিন্তু নিজ মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য কোনো ভাষায় নিতান্ত স্বেচ্ছায় কি কেউ সাহিত্য রচনা করতে রাজী হবেন যশস্বী হওয়ার লোভে? সমৃদ্ধতর মাতৃভাষা থাকতে সে-চেষ্টা কেউ করবেন বলে আমার তো মনে হয় না। বহু ভাষাবিদ এবং সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে-লোভ ত্যাগ করতে হয়েছিলো স্বয়ং মাইকেলকে। আর যদি বলি, তুলনায় অনেক বেশী বাঙালী সাহিত্যিকদের উচিত হিন্দী ভাষায় সাহিত্য রচনা করা তা হলে হিন্দী সাহিত্যিকেরাও সম্মান বোধ করবেন না। তা ছাড়া বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের জনকতককে হিন্দী লেখায় মন দিতে বললে তা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ লেখকের সংখ্যা বাহুল্যকমুক ভাবে সাহিত্যের কিছু এসে যায় না।

প্রবন্ধ নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্যই তো হলো লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা-ধারণাকে প্রকাশ করা, সুতরাং তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে সকল পাঠকেরই মত মিলবে এমনটা আশা করা যায় না। বিচিন্তার কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কেউ কেউ হয়তো ভিন্ন রায় দেবেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আশা করি সকল পাঠকই একমত হবেন। সে লেখকের রচনাশৈলী। কোনো প্রবন্ধেই তিনি সহজ কথা বলেন নি, কিন্তু বলেছেন অত্যন্ত সহজ করে। 'জনশাসন ও প্রজাপালন' প্রবন্ধটিই এ উক্তির প্রমাণ। এমন বিষয়বস্তুকেও যে এমন রসালো এবং আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করা যায়, তা প্রবন্ধটি না পড়লে বোঝা যাবে না।

স্বল্পায়তন ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, 'বিচিন্তা' সাধারণের ভালো লাগবে কিনা তিনি তা জানেন না, তবে অন্তত জনকয়েকের চিন্তার খোরাক যোগাবে এই আশায় প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। সরস উপন্যাস-পাঠে তৃপ্ত বাঙালী সাধারণের কাছে ভালো লাগবে কিনা তা আমরাও জানি না, তবে যে সামান্য কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি দেশ ও দেশবাসীর জন্য ভাবেন, এ-গ্রন্থ যে তাঁদের চিন্তার খোরাক যথেষ্ট পরিমাণেই যোগাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২২২।৫৬

—শৌভিক—

অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল কাহিনী

এক ঝাঁক মৌলিকত্ব ও একরাশ রস-সমৃদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ে অতি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচায়ক সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা' যার চিত্ররূপ দান করেছেন এম পি প্রডাকসন্স। অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব ঘটনাবলীর পরিকল্পনায়ও যেমন তেমনি চরিত্রগুলিরও পরিকল্পনায়। এ দিক থেকে এমন সমৃদ্ধ উপাদান পর্দায় কচিৎই এসেছে। একটা নতুন আস্বাদ ধরিয়ে দেবার মতো রসসমন্বিত কাহিনী। এমন একটি নতুন দিনের সাহিত্য সম্পদকে চিত্রে রূপায়িত করায় ব্রতী হওয়ার জন্য পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠীর অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু যেভাবে এরা উপাদানটি সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন তাতে মনে হলো এ যেন পড়েছে এমন ভুল লোকেদের হাতে যাদের কাছে অভিনবত্ব একটা বোঝা স্বরূপ আর সে বোঝা বইবার সাধ্য তাদের সীমাবদ্ধ। এটা স্পষ্ট যে অগ্রদূত দলের রুচি আছে, নিষ্ঠাও আছে, নতুন কিছু হাতে নেবার আগ্রহেরও আছে, কিন্তু চমকে দেবার মতো নতুনত্ব পরিস্ফুট করে তোলায় যে মেধার এবং যতোটা দরকার তা যথাযথ নেই তাদের কর্মক্ষমতায়। তাই অনন্য-সাধারণ চিত্রসৃষ্টির উপযোগী জোরালো কাহিনী তারা হাতে নিয়েও তারা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছেন, আর সেই অক্ষমতাটাই বেশী করে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ছবিখানি অনবদ্যতা ও অক্ষমতার সমন্বয়ে প্রোজ্জ্বল।

* * *

মানুষের অজানা অবাস্তব জগতের কাহিনী নয়, চরিত্রগুলিও চেনা জগতের বাইরের নয়। কাহিনীকার সুবোধ ঘোষ তাদের নিয়ে অতি বৈচিত্র্যময় বাস্তবের মধ্যে দিয়ে জীবনের বহুবিধ প্রকৃতির সন্ধান এনে দিয়েছেন। এক একটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে জীবনকে তিনি নানাভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। যেমন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার বিজয়বাবু। পরিণত বয়সে সকল উদ্যম, সকল আগ্রহ স্তব্ধ করে দিয়ে গীতা পাঠ নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। ব্যাঙ্কে তার লাখ আড়াই টাকা জমা রয়েছে, জীবনে আর রোজগারের কোন প্রয়োজন নেই তার কাছে; বাড়ির জন্য জমি কেনা আছে কিন্তু নতুন বাড়ি তৈরীর স্পৃহা নেই, নতুন গাড়ীও তার দরকার করে না। এমনিই নিস্পৃহ, নিস্পন্দ স্থির মানুষ যে, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সব টাকা চলে গেলেও যে পরম প্রশান্তির মধ্যে তিনি বিচরণ করছিলেন সেখানে এতটুকুও চিড় খেল না। তার কাছে বিশ্বাসই জীবন। তার একমাত্র সন্তান কুশল। ইতিহাসে এম-এ, কৃতিত্বে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রথম হয়ে প্রায় ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে।' 'ডিগ্রী ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে কুশলের মনুষ্যত্ব, বড়রকম চাকরি লাভের পূর্ণ যোগ্যতা।' 'কুশল ভয় পায় দুঃখকে, ঘৃণা করে নিঃস্বতাকে।' জীবনে সুখী হতে চায় সে। সুখী হবার সন্ধানও সে পেয়েছে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মৃগেনবাবুর মেয়ে

রহমৎ ও মিনি—যে কটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বাঙলার স্টুডিওতে নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম চারুচিত্র প্রযোজিত তপন সিংহ পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "কাবুলীওয়ালা"র চিত্ররূপায়ন। আগামী আগষ্টে বহির্দৃশ্য তোলার জন্য এরা আফগানিস্থান যাত্রা করবেন। ছবিতে রয়েছেন নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও মিনির ভূমিকায় টিঙ্কু ঠাকুর

নবলার সাহচর্যলাভে। হররভবন মিউজিয়ামের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে বহাল হলেই নবলাকে সে বিয়ে করবে, কিন্তু পিতার নিস্পন্দ ও কঠিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে কুশলের মন ক্ষোভে ও আক্ষেপে অস্বচ্ছ হয়েই থাকে।' হঠাৎ ব্যাংক ফেল হয়ে গেল; নবলার মা নন্দা দেবী কুশলকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। যে-বড়ো চাকরিটা পেলে নবলাকে লাভ করার আশা ছিল তাও হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, হঠাৎ বিজয়বাবুও মারা গেলেন। যে সম্মানিত পদে কুশল একদিন প্রার্থী ছিল সংসারে অভাবের তাড়নায় মানসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে সেই পদেরই অধীনে অনেক কম মাইনের নীচু পদে চাকরি নিতে হলো তাকে। কুশলের তাই মনের প্রশ্ন, 'জীবন কি এক পরম আকস্মিকের কতগুলি অনিয়মের খেলা?' কুশলের বাবার ব্যাঙ্কে লাখ আড়াই টাকা আছে, কুশল নামকরা স্কলার, বড়ো সরকারী চাকরি তার বাঁধা, এ-সব হিসেব করেই মাধবনবাবুর স্ত্রী নন্দাদেবী তাদের একমাত্র সন্তান নবলাকে কুশলের সঙ্গে মেলবার অধিকার দিয়েছেন। হয়তো নবলা কুশলকে সত্যিই ভালোবেসেছিলো। একদিন নবলার বিশ্বাস করতে ভালোই লেগেছিল যে, 'কুশলের চোখের মত দৃষ্টিটাও নবলার মুখের দিকে অপলকভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে।' কিন্তু কুশল সর্বস্বান্ত হবার পর আকাঙ্ক্ষিত চাকরি না পাবার পর নবলার মন কুশলের উপর থেকে সরে গিয়ে পড়লো মিউজিয়ামের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট দেবী রায়ের ওপরে। দেবী রায়ের দুবৃত্তপনায় নবলার সৌন্দর্য ধরা দিতে চাইলো, কুশল সেখানে হলো অনভিপ্রেত। 'নবলার ধারণা, জীবন যেন রঙীন সুখের ছুটন্ত স্বপ্ন।' এই স্বপ্ন নিয়েই নবলা দেবী রায়ের পিছনে ধাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু একদিন দেবী রায়ের নকল আবরণ খসে গেল। মিউজিয়ামে রক্ষিত মূর্তিগুলি বিদেশে চালান করার ষড়যন্ত্র তার ধরা পড়ে গেল কুশলের কাছে। দেবী রায় অপমানিত ও পদচ্যুত হবার পর আবার নবলা এলো তার প্রথম ভালোবাসার কাছে। কিন্তু কুশলের তখন অভিজ্ঞান লাভ হয়েছে; দীর্ঘ দশ বছর ধরে যাকে এক সাবানওয়ালার মেয়ে মাত্র বলেই জেনে এসেছে, সেই স্বরূপার মধ্যে কুশল তার মনের সান্ত্বনা ও জীবনের আদর্শ খুঁজে পেয়েছে। নবলাকে ফিরে যেতে হলো।

* * * *

সাবানওয়ালা রাধেশবাবুর মেয়ে স্বরূপা। ইঞ্জিনীয়ার বিজয়বাবুর ইউবাবু ছিলেন রাধেশবাবু। কারবার তুলে দেবার পর রাধেশ সাবান তৈরীর ব্যবসা আরম্ভ করে। লোকে বলে কাজের দৈত্য রাধেশ। সৎ, কর্মঠ লোক বলে বিজয়বাবুর কাছে তার বিশেষ স্থান ছিল, বিজয়বাবুকেও রাধেশ বড়ো সম্মান করতেন। বিজয়বাবুর বাড়িতে স্বরূপার অবারিত দ্বার। বিজয়বাবু ও স্ত্রী মিত্রা দেবী গীতা পাঠ নিয়ে থাকেন, স্বরূপাই কুশলের ফাইফরমাস খেটে দেয়। দশ বছর ধরে এই সম্পর্ক এতো নিবিড় হয়ে ওঠে যে, স্বরূপা ও-বাড়িরই যেন মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কুশলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বরূপাকে যে আটকে রাখতে পারবেনই, সে বিষয়ে মিত্রাদেবীর কোন সংশয় ছিল না। আর স্বরূপাও জানতো, ও বাড়িতে তার আসন পাতা আছেই। কিন্তু সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গেল কুশল নবলাকে বিয়ে করতে চাওয়ায়। স্বরূপা মিত্রাদেবীর কাছ থেকে নিষ্ঠুর নির্দেশ পেলো যে, না ডাকলে সে যেন ও-বাড়িতে আর না যায়। তারপর চলেছে স্বরূপার জীবনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। তার ধারণা, 'এই জীবন বোধহয় একটা অফুরান প্রতীক্ষা।' ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে যাওয়ায় কাজের দৈত্য রাধেশবাবু ভেঙে পড়েছেন। স্বরূপার বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছিলেন ব্যাঙ্কে, সবই গেল। উপায় না দেখে পাওনাদার বাড়ি-ওয়ালা শ্রীধর উপকার করতে এলো স্বরূপাকে বিয়ে করে রাধেশবাবুর চিন্তার বোঝা হাল্কা করে দিতে। স্বরূপা জানালো বিয়ে সে করবে না। রাধেশবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে তাকে সে জানালে, যেমন করেই হোক শ্রীধরের কাছে দেনা সে শোধ করবেই। প্রতিবেশী বৈষ্ণবী শান্তির সহায়তায় বাজারের জন্য জামা সেলাই করে স্বরূপা সংসার চালায়। কুশলের জন্য তার মনের আকুতি সে প্রকাশ করে শান্তির কাছে; শান্তি তাকে পদাবলীর বুলি শুনিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। কুশল তখন জুয়ার মধ্যে ভাগ্য সন্ধানের চেষ্টা করছে। একদিন সে শুনলে রাতবিরেতে স্বরূপাদের বাড়িতে অচেনা লোক যাতায়াত করে। কুশল ভাবলে, পাঁচু মুখুজ্যের ক্লাবের তাস, আর মাঝরাতের স্বরূপা, মন্দ কি? কিন্তু স্বরূপার কাছে এসে যখন জানলে বাড়ি-ওয়ালা শ্রীধর বেনামী চিঠি লিখে স্বরূপার
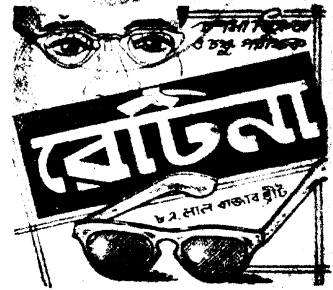
মিথ্যা কলংক রটাচ্ছে, আর তাদের র সংসার কোনরকমে চলছে বাজারের য়ের কাজ করে, তখন যেন কুশলের ছুটে যায়। কুশল যেন নতুনভাবে য়ালা রাধেশবাবুর মেয়ে স্বরূপাকে থাকে; ভয় করে স্বরূপার মুখের তাকাতে। কিন্তু স্বরূপার প্রতীক্ষা র সুফল নিয়ে এল। মূর্তি চালান ব্যাপারে দেবী রায়কে বাধা দিতে কুশল যেদিন আহত হলো আততায়ীর সেদিন মিত্রাদেবী স্বরূপার কাছেই এলেন কুশলকে বাঁচিয়ে তোলার ভার করতে।

* * *

ী রায় প্রথম দিন এসেই জানালে, সে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে আয়োজন করলে এক সাংস্কৃতিক নের যেখানে আলাপ হলো তার সঙ্গে। দেবী রাঁয় সেই ধরনের চরিত্র যাদের কাছে 'এই জীবন একটা স্পোর্টস।' মহা-ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারি বলে সে নিজের পরিচয় দিয়ে নবলাকে মোহিত করে দিলে। নবলার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হতে দেরী হলো না। কিন্তু মূর্তি চালান দেওয়া ব্যাপারে ধরা পড়ে গেল: একটা ভণ্ড জোচ্চোর সে। নন্দা দেবীর কিন্তু তবুও বিশ্বাস হয় না, তাই তিনি স্বামী মৃগেনবাবুর কাছে দরবার করতে যান, যাতে দেবীকে জেলে যেতে না হয়। নবলার মা নন্দা দেবী হচ্ছেন সেই জাতের মেয়ে যাদের কাছে 'জীবন হলো সোনার গয়না, ডিজাইন বদলানোই সুখ।' মৃগেন-বাবু ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর পদে যা পান, তাতে স্ত্রী ও মেয়ের আবদার পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য নন্দা দেবীর গঞ্জনা কম নয়। একদিন মৃগেনবাবু তার পথ ঠিক করে নিলেন। তার কাছে 'জীবন হলো টাকা, আরও টাকা।' তাই ব্যাঙ্ক ফেল হতে দেখা গেল তারা আরও দামী বাড়ি কিনেছেন। কুশল ভেবেছিল, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে মৃগেনবাবুর চাকরিও গেল, তাই সমবেদনা জানাতে এসেছিল সে। কিন্তু শুনলে মৃগেনবাবু চাকরিতে বিরক্ত হয়ে আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। কুশল আর রাধেশবাবুদের মতো সহস্রজনের গচ্ছিত টাকায় গড়ে উঠলো বেনামায় নন্দা দেবীর নামে কেনা হ্যাপি-নুকের বিলাস আলয়।

* * *

এছাড়া জীবনের আরও নানা ধরনের চরিত্র পাওয়া গেল। এর মধ্যে রামজী-ভক্ত মিউজিয়মের দরওয়ান পাঠকজী একজন। তার কাছে 'জীবন হলো সন্তোষ।' অদ্ভুত মনের শান্তি তার। কুশল তার অশান্ত মনের শান্তি পেলে পাঠকজীর কাছে। সৎ নিষ্ঠাবান চরিত্র। দেবী রায়ের মূর্তি চালান বাধা দেওয়ার ব্যাপারে পাঠকজীই হয় কুশলের সহায়ক। আর এক আছে

মিউজিয়মের কেরাণী বিশ্বনাথ, যে বলে 'জীবনটাই হলো টু পাইস।' আর টু পাইস পাবার আশাতেই দেবী রায়ের কুকীর্তির সহকর্মী হয়েছিল।

* * *

উপন্যাসের সঙ্গে চিত্রকাহিনীটির মিলের চেয়ে অমিলই বেশী, তবে আলোচ্য হচ্ছে চিত্রকাহিনীতে যা পাওয়া গিয়েছে, তাই নিয়েই। চিত্রকাহিনীতে পাওয়া যায় একটা নিটোল প্রণয়-কাহিনী—একজন যুবকের জীবনে দুটি মেয়ের ভালোবাসার টানা-পোড়েন। তার সঙ্গে সহজ ও সাবলীলভাবে মিশে রয়েছে চিন্তাকে পুষ্ট করে তোলার মতো কতক উপাদান। যেমন এদেশের প্রাচীন শিল্পনিদর্শনকে নির্বোধদের দ্বারা বিদেশে চালান করে দেওয়ার চেষ্টার কথা। এখনকার দিনে স্বরূপাদের মতো মেয়েদের জীবনধারণ করার সমস্যার কথাও রয়েছে। তবে আদর্শ চরিত্র এই স্বরূপা; দুঃখে ভেঙে পড়ে না সে; প্রতীক্ষা করার মতো তার ধৈর্য আছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো মনের জোর তার আছে। আর আছে মনকে উদ্বুদ্ধ ও সমাহিত করে তোলার মতো চমৎকার সংলাপ। সহজ ভাষা অথচ ভাবের সম্ভারে উদ্দীপনাময়। এ দিকে ছবিখানি অভিনয়কৃতিত্বে সম্পদময়। কিন্তু সংলাপই হয়েছে এর যা কিছু সার ও সহায় যেমন, তেমনি আর এক দিক থেকে কাহিনীর গতিশীলতার পথে বিঘ্ন। চিত্রনাট্যের ধাঁচটা দৃশ্য দেখাবার চেয়ে বেশী ঝুঁকেছে সাজানো কথা শোনাবার দিকে। একেবারে প্রায় নাটকের ধরনেই সাজানো দৃশ্য। বিন্যাস ব্যাপারে অগ্রদূতও ছকবাঁধা পথ ধরেই চলেছেন। এক একটা দৃশ্য দাঁড় করিয়ে করিয়ে কথা শুনিয়ে যাওয়ার মতো করেই ঘটনার বিন্যাস। আর এমনভাবে গতিহীনতার মধ্যে দাঁড় করানো, যাতে কাহিনীর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের সাড়া প্রায়ই থমকে থমকে গিয়েছে; চমৎকারিত্ব চোখের সামনে একটু ঘুরঘুর করেই যেন সরে পড়ে। নতুন জিনিসকে নতুনভাবে পরিবেশন করতে যে নতুন চিন্তা ও কল্পনা শক্তির প্রয়োজন ছিল, তার অভাবটা অনুভব করা যায়। আর সে অভাবটা বেশী করে মনে লাগে এই কারণে যে, উপাদান পর্যায়েতেই যা পাওয়া যায় তাতেই দেখা যায় যে, তার মধ্যে সর্বগুণসমন্বিত গুণ ও শক্তি প্রভৃতিই ছিল আর তা ছিল বলেই চলচ্চিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গঠন-প্রকৃতির ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও ঘটনার সংঘাতের ক্ষণে দর্শকমনে আবেগের সঞ্চার হয়ই। অবশ্য সেটাও হচ্ছে প্রধানত সংলাপ ও অভিনয় গুণেই। তবে এটা বলতে পারা যায় যে, ভাবের গভীরে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি যাদের চলে, তারা অবশ্য গঠনধারার বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই মনকে আটকে রেখে দেবে না, রস তারা ঠিক আহরণ করে নেবেনই, সে ধর্তাটা আছেও।

* * *

সংলাপ ছাড়া আর যে গুণটা বেশী চোখে পড়বে, সেটা হচ্ছে এর পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাভাবিক ও সুস্থ প্রকৃতি। খেলো না হলেও এ-কাহিনীর অঙ্গে অসম লাগে এমন কিছু কিছু অংশ এসে পড়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় দেবী রায়ের প্রথম অফিসে আসার দৃশ্য। কেরানী বিশ্বনাথকে ডেকে জানালে, সে কাজ আরম্ভ করতে চায় উইথ-এ-ব্যাঙ্গ, ব্যাং নয়, বি এ এন জি ব্যাঙ্গ। এই নিয়ে কেরানীদের প্রত্যুক্তি বা তার পরে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এমনভাবে করা, যেখানে নবলার গানই হয় সূচীর একমাত্র অংশ, বড়ো মামুলি ধাঁচের অসার জিনিস। তেমনি নবলাকে নিয়ে দেবীর ভ্রমণ মানে গাছের নিচ থেকে চাঁদ দেখে নবলার গান, এ-দৃশ্যও যেন এ-কাহিনীর পরিবেশে খাপ খেল না, অবশ্য সেটা বিন্যাসে মৌলিকত্ব না থাকার দোষেই। তেমনি হয়েছে স্বরূপার সঙ্গে শান্তি বৈষ্ণবীর আবির্ভাব। শান্তির উপস্থিতিটা দৃশ্য সাজানোর প্রয়োজনে অনভিপ্রেত নয়, তা কারুর মনেও হবে না; বরং স্বরূপার দুঃখের দিনের সহায়রূপে তাকে প্রয়োজনও। কিন্তু তাই বলে তাকে দিয়ে বার বার গোঁসাইয়ের পদাবলীর কলি শোনানোটা একটু যেতে না যেতেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তার ওপর করা হয়েছে শান্তিকে এক কচি বৈষ্ণবী, যার মুখ দিয়ে তত্ত্বকথা শোনাতে যাওয়াটাই হাস্যাস্পদ। স্বরূপা যে ধরনের শান্ত চরিত্র তার মুখে গান শোভা পায় না, কিন্তু নায়িকার মুখে গান না থাকাটা বোধহয় বিসদৃশ ঠেকে থাকবে।

গেভা কলারে রঞ্জিত প্রথম ভারতীয় শিশুচিত্র 'স্বপন পুরী' কথাচিত্রে
বিশু, অলো ক ও অঞ্জলি

শক দেবী রায়ের লোকের লাঠিতে হবার পর সুস্থ হয়ে যখন স্বরূপার মগন, তখন স্বরূপার মনেরও সম-চ প্রকাশের জন্য তার মুখে একখানা টা নাটকীয়তা সৃষ্টির অতি মামুলি এখানে মানায় না মোটে। ঘটনা-এমনই চিন্তার দীনতা দেখা গেল বুর মৃত্যুর পূর্বে কুশলের মুখের নানাভাবে ঘণ্টার ধ্বনি ও অশান্ত দৃশ্য প্রতিফলিত করে দিয়ে। দৃশ্য অবশ্যই, কিন্তু নাটক কে এড়িয়ে যাবার বড়ো সহজ

কৌশল ওটা। আরও একটা জিনিস কায়দা করে গড়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বহির্দৃশ্যাংশ। বাইরে বেরিয়ে ছবি তুলে প্রাকৃতিক শোভা যোগ করার সুযোগ ছিল এতে, কিন্তু তা স্টুডিওতে সম্পন্ন করে নেওয়ায় কৃত্রিমতার প্রলেপটা প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরাতন শিল্প ঐশ্বর্য মাটির থেকে খুঁড়ে বের করা আর তার মিউজিয়ম নিয়ে একটা নতুন পরিবেশ বাঙলা ছবিতে এনে দেওয়ার সুন্দর সুযোগ ছিল। দেখবার মতো অনেক কিছুই তোলাও যেত, কিন্তু সেদিক যথাসম্ভব পরিহার করেই যাওয়া হয়েছে, কারণ এর গড়নই যে নাটক অনুগ।

আলি আকবরের সরোদ বাজনাকে মুখ্য রেখে টাইটেল দিয়ে ছবির আরম্ভটি ভালো। নাটকের মতো লাগলেও ছবির ওপরে মন বেশ নিবদ্ধ থাকে বিজয়বাবুর মৃত্যুদৃশ্য পর্যন্ত। তারপর খানিকক্ষণের জন্য সাড়া স্তিমিত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মন যেন আর চলতেই চায় না। শেষের দিকে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত কিছুক্ষণ জমে এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় যেখানে কুশল, নবলা ও স্বরূপার মধ্যে শেষ বোঝাপড়ার মুহূর্ত এসে দাঁড়ায়। চমৎকার একটা সিচুয়েশন এখানে তৈরী হয়, কিন্তু একইভাবে দাঁড়িয়ে তিনজনের দীর্ঘক্ষণের সংলাপ শেষ পর্যন্ত আবেগকে ধৈর্যহারা করে তোলে। বিজয়বাবুর মৃত্যুদৃশ্যটি বড়ো অভিনব, এমনটি কখনও দেখা যায়নি। 'আমি যাই' এইমাত্র বলেই চলে যাওয়ার দৃশ্যটি যেভাবে পরিকল্পনা ও পরিবেশন করা হয়েছে, তা কুশলের সঙ্গে দর্শক-মনেও এক মহাপুরুষ হারানোর হাহাকার জাগিয়ে তোলে। স্বরূপার কাছে রাতে লোক যাতায়াত করে শোনবার পর কুশলের স্বরূপার কাছে আবির্ভাব এবং নিজের প্রতি ঘৃণা নিয়ে প্রত্যাবর্তন দৃশ্যটিতে নাটকীয় কৃতিত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ভালো লাগবে মিউজিয়মের দরওয়ান পাঠকজীর সঙ্গে কুশলের প্রসঙ্গ। দেশের সম্পদকে দস্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পাঠকজীর আকুলতা ওর ওপরে লোকের শ্রদ্ধা এনে দেবে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় ব্যাঙ্কের সামনের দৃশ্যটি কিন্তু তেমন পটু হাতের তোলা নয়। খুঁচখাচ কিছু কিছু ত্রুটি দৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়, যা অগ্রদূতের মতো নামী কলাকুশলীদের হাত থেকে আশা করা যায় না। যেমন মূর্তি নিয়ে লরী মিউজিয়মের বাইরে পাঠাবার আগে পাঠকজীকে তাড়িয়ে তার মুখের ওপর গেট বন্ধ করে দিতে লোহার গেটের কাপড় কেঁপে ওঠা, যা বাড়ি

"কবি গোবিন্দদাস"এ সুনন্দা ও গুরুদাস

ইমারতের চেহারায় সেটের থামগুলি ভাব, আঁকা চাঁদ বোঝা যায় এমন সব ইত্যাদি। এগুলো ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।

*　　　*　　　*

ছবিখানির প্রচারে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে সুচিত্রা ও উত্তমের ওপরে। সেই আকর্ষণেই যাঁরা ছবি দেখতে যান, তাঁদের কাছে এ ছবি মনঃপূত না ও হতে পারে। কারণ ওরা দুজনে এখানে অন্যভাবে আছেন। ইদানীং ওদের চটুল নাকামির অভিনয় দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের এবার ওরা মন রাখতে পারবেন না। কিন্তু সুস্থ ও সহজ মানুষের কাছে ওদের দুজনেরই অভিনয় ভালো লাগবে। যদিও একথাটা ঠিক যে, সুনন্দা ও স্বরূপা যে ধরনের চরিত্র তাদের রূপায়ণে ওদের এই চলতি অভিনয় পর্যায়ের চেয়ে আরও উঁচুতে ওঠার দরকার ছিল। সবচেয়ে ভালো লাগবে বিজয়বাবুর চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়। অদ্ভুত চরিত্র, মনের ওপরে একটা গভীর প্রভাব এনে দেয়; একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে। বলতে কি, প্রবীণ শিল্পীদের ক'জনের অভিনয়ই এতে বেশী খুলেছে। চন্দ্রাবতীকে ভালো লাগবে মিত্রা দেবীর চরিত্রে, ছায়া দেবীও নন্দা-দেবীর চরিত্রে একটা টাইপ সৃষ্টি করেছেন।

রাধেশের চরিত্রে তরুণ গাঙ্গুলীর আকৃতি সঠিক হয়ে চলা যায় দিলে অভিনয় ভালো। কমল মিত্র ব্যাংক ম্যানেজার মুগেনের চরিত্রে সত্যিকার আছেন চরিত্রানুগই। নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণে পাঠকজী মনে রাখার মতো একটি চরিত্র হয়েছে। দীপক মুখার্জির দেবী রায়ের মধ্যে কাঠিন্যই বেশী, নবলার প্রেমিকরূপে মানায় না। কেরানী বিশ্বনাথের চরিত্রে গৌর সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-প্রভুর অনুগত পয়সালোভী চরিত্রটিকে দৃষ্টিতে এনে তোলেন। নটেদের গতিপথে এসে পড়া আর কয়েকটি চরিত্রে আছেন জীবেন বসু, শ্যামেন্দু মুখোপাধ্যায়, হরিধন, চন্দ্রশেখর, ডাঃ হরেন, শোভা সেন প্রভৃতি। ক্ষণিকের জন্য হলেও অভিনয়টা মন্দ করেননি এঁরা।

*　　　*　　　*

অগ্রদূত কলাকুশলী গোষ্ঠী। পূর্বপাঠ দুটি আগে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাদে বেশ ঝকঝকে ছবি এবং আর পাঁচটা ছবির চেয়ে তাদের কাজ উন্নত ধরনেরই। ক্যামেরায় বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, শব্দগ্রহণে সতীন দত্ত, শিল্পনির্দেশে সত্যেন রায় চৌধুরীর কাজ একটা স্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষা করে গিয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ টাইটেল সঙ্গীত পরিকল্পনায় আলি আকবরের সরোদ সহযোগে আবহ-সঙ্গীতের সাহায্যে আরম্ভেই ছবিতে একটা মর্যাদা আরোপ করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে দৃশ্যাবলীর ক্ষেত্রে সর্বত্র সে মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি, অনেক ক্ষেত্রে মামুলিই হয়েছে। নবলার মুখে যে গান, তাকে বাজনার সঙ্গে জোড়া সুরেলা কথার পিংপং বলেই অভিহিত করতে হয়। আরও একটা বিষয় কেন যে চালিয়ে দেওয়া হয় বোঝা ভার। নবলার মুখে যে-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ দেওয়া হলো, স্বরূপার মুখেও সেই একই কণ্ঠ কেন?

না গোলযোগ এবং নানা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কলকাতার ফুটবল খেলা এগিয়ে চলেছে। হয়তো বাধা-ত্তর মধ্য দিয়ে এইভাবেই একদিন ল মরসুমের উপর যবনিকা পড়বে। ফুটবলের পংকিলতাকে কেন্দ্র করে জীবনে যে তিক্ততা দানা বেঁধে হ তা কি ফুটবলের সংগে সংগেই হয়ে যাবে? সমাজের কল্যাণকামী-একথা ভাববার আজ সময় এসেছে।

লকাতার ফুটবল খেলা নিয়ে গবেষণা দেখা যায়; ফুটবল খেলার প্রথম ায় ছিল সাদায় সাদায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপীয়ান সিভিল টীমের সংগে পীয়ান মিলিটারী টীমের খেলার র্ণ ছিল সবচেয়ে বেশী। পরে দ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় সাদা কালার খেলায়। একদিকে ইউরোপীয়ান

একলব্য

সিভিল কিম্বা মিলিটারী টীম, অপর-দিকে ন্যাশনাল, শোভাবাজার, মোহনবাগান বা কুমারটুলী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের পর বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ক্রীড়ামোদি মাত্রেই মোহনবাগানকে জাতীয় দল বলে কল্পনা করে নেয় এবং ইউরোপীয় যে কোন দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের সাফল্যকে করে জাতীয় সাফল্যের অন্তর্ভুক্ত। এই অবস্থার মধ্যে ইউরোপীয়ান রেফারীদের পক্ষপাতিত্বের জন্য যখনই মোহনবাগানকে হার স্বীকার করতে হয়েছে তখনই ভারতের জাতীয় চেতনায় লেগেছে দারুণ আঘাত—ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষ পোষণ করেছে ভারতের ফুটবলপ্রিয় দর্শক সমাজ। ইউরোপীয় দলের কাছে পরাজয়ে মোহনবাগানের জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠা খর্ব হয়নি, বরং ধীরে ধীরে মোহনবাগান দর্শকমনে লাভ করেছে স্থায়ী আসন—ফুটবল ক্ষেত্রে মোহনবাগান হয়ে পড়েছে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানের জনপ্রিয়তার অংশীদার হিসাবে কলকাতার মাঠে আত্মপ্রকাশ করলেও ফুটবলক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু তৃতীয় দশকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অভ্যুত্থানের সংগে সংগে কলকাতার ফুটবল আকাশে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ। মহমেডান দলের প্রতিষ্ঠা হানি এবং রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে সে কালো মেঘও কেটে যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় চেতনার প্রতীক মহমেডান দলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে ফুটবল খেলার পরিস্থিতি সমাজ জীবনকে কতখানি কলুষিত করে তুলেছিল আজ সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের রেষারেষিকে কেন্দ্র করে আজ সমাজজীবনে যে বিদ্বেষের ভাব দেখা দিয়েছে সে প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করবার কিছু আছে বৈ কি! অবশ্য শুধু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানকে নিয়েই কলকাতার ফুটবলের সব গোলমাল নয়। আরও কারণ আছে, নানা সমস্যা আছে, অন্যান্য ক্লাব নিয়েও নানা গোলযোগ আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানকে নিয়েই রেষারেষি বেশী। এদের মধ্যে সম্পর্কও মোটেই মধুর নয়—ফলে দুই প্রধানের সমর্থকদের মধ্যেও সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অম্ল-মধুর। অনেক সময় আবার শুধু অম্লেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—মধু কিছুই থাকে না।

যদিও শুধু পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড় নিয়ে মোহনবাগান দল নয় এবং ইস্ট-বেঙ্গল দলেও পূর্ববঙ্গের খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কষ্টকর তবুও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক বলতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ অধিবাসীদের বুঝায় এবং কারো উপরে কোন অবিচার হলে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়া। অবশ্য এইসব দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে শুধু খেলা দেখে আনন্দ পেতে চান দুই বঙ্গের অধিবাসী এমন দর্শকের অভাব নেই। তবুও শুধু নামের মোহে সমাজ-জীবনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে তা কি সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী নয়? এ কথা আজ গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে। রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছিল দেশ ব্যবচ্ছেদের সংগে সংগে সে ব্যবধান ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বঙ্গের ক্ষীয়মান অধিবাসীর মধ্যে ব্যবধান জীইয়ে রাখার আজও যদি কোন কারণ থাকে তবে দ্রুত হাতেই সে কারণ অপসারণ করতে হবে। তাতে যদি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা বন্ধ করতে হয় তবে তাও করা উচিত।

* * *

সত্যিই ময়দানের পরিবেশ আজ মোটেই সুস্থ নয়। অন্যায়, অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্ষমতালোভীদের চক্রান্তের বেড়াজাল ময়দানকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। ছোটবড় সবার মুখেই ময়দানপাড়ার কারবারীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। কি খেলোয়াড়, কি দর্শক, কি পরিচালক সমিতি, কি খেলার রেফারী কেউই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। স্বীকার করতে বাধা নেই এই পরি-স্থিতির জন্য সাংবাদিকদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে বহুগুণে। নানা ঘটনা-সংঘাতে ময়দানের আবহাওয়া আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এখানে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে আর বিশেষ পার্থক্য নেই। তুমি যেটাকে ন্যায় বলবে, আমি সেটাকে বলবো অন্যায়। আমি যাকে অন্যায় বলবো তুমি হয়তো তাকে বলবে ন্যায়। দৃষ্টিভঙ্গির যেখানে এত পার্থক্য সেখানে সাংবাদিকদের দায়িত্ব কত দুরূহ তা সহজেই অনুমেয়। সত্য পরিবেশন এবং গঠনমূলক সমালোচনা সাংবাদিকের প্রধান কর্তব্য একথা স্মরণ

রেখে এবং বিশেষ বিবেচনা করে কিছু লিখতে গেলেও মনে দ্বিধা আসে—ঠিক লিখছি তো? কারো পরে তো অন্যায় করছি না বা কারো সম্বন্ধে তো বেশী লিখছি না? এমনই অবস্থা যে নিজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। তবুও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী 'দেশের' পাতায় নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে কসুর করিনি, কোনদিন করবও না পাঠকদের এ আশ্বাস দিতে পারি।

* * *

রেফারীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এবং চারটি বিশিষ্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে আই এফ এ-র কাছে রেফারীদের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দাবী করা সত্ত্বেও গত সপ্তাহে লীগের তিনটি উল্লেখযোগ্য খেলার পরিচালনায় এমন কিছু ঘটে গেছে যা সমালোচনার যথেষ্ট দাবী রাখে। তিনটি ক্ষেত্রেই রেফারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেনাল্টি সম্পর্কে। দুটি ক্ষেত্রে পেনাল্টি দেবার জন্য; একটি ক্ষেত্রে পেনাল্টি না-দেবার জন্য। এক একটি করে খেলা তিনটির আলোচনা করা যাক। অবশ্য প্রথম আলোচনা তিনটি অবস্থার সঙ্গেই সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গতবারের দুই লীগ রানার্স এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। খেলাটি পুরো সময় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে রেফারী এক বিতর্কমূলক পেনাল্টির নির্দেশ দিলে মাঠে গোলযোগ আরম্ভ হয়। অবশ্য রেফারীর কয়েকটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাঠে গোলমাল আগেই আরম্ভ হয়েছিল, তবে সে গোলমাল খেলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু পেনাল্টির নির্দেশের পর চরম আকারে দর্শকদের রোষ প্রকাশ পায়। পেনাল্টি থেকে এরিয়ান ক্লাব গোল করতে ভুলচুক করে না। গোলের পর খেলাটিও পুনরায় আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে মাঠে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং একদল উগ্র দর্শক মাঠে প্রবেশ করায় রেফারী খেলাটি বন্ধ করে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হন। খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৮ মিনিট আগে এই ঘটনা ঘটে। খেলার পরিচালক ছিলেন বর্ষীয়ান রেফারী বিজলী মুখার্জি।

এক শ্রেণীর উগ্র দর্শকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং খেলা পণ্ড করে দেবার মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করে বলছি, রেফারী যেভাবে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি বিতর্কিত নির্দেশ দিয়েছেন তা যুক্তিসংগত হয়নি। যেখানে উত্তেজনার ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে সেখানে কারো বিরুদ্ধে চরম দণ্ড দিতে হলে তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকা প্রয়োজন। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, রেফারী লঘুভাবে আইনের প্রয়োগ করবেন—বরং উত্তেজনার কারণ থাকলে কারো প্রতি কোন করুণা না দেখিয়ে যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ করাই উচিত। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে তুচ্ছ কারণে বা বিনা কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রেফারী বিজলী মুখার্জি ইস্টবেঙ্গলের লেফট হাফ কেম্পিয়ার হ্যান্ড-বলের জন্য যেভাবে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছেন কোন দর্শক এবং সংবাদপত্র তা সমর্থন করতে পারেননি। কোন সংবাদপত্র বলেছেন, অনিচ্ছাকৃত হ্যান্ড-বলের জন্য পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া ঠিক হয়নি, কেউ বলেছেন, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হয়েছে' কথাটি ফুটবল আইনের ক্ষেত্রে একটু পরস্পরবিরোধী। ফুটবল

ইনে পাপ করলেই তাকে দণ্ড পেতে ব। আর সেই পাপ যদি পেনাল্টি মানার মধ্যে হয়ে থাকে, তবে পেনাল্টির দেশ দেওয়া অসঙ্গত নয়। যে অপরাধের ন মাঠের অন্যান্য ক্ষেত্রে দোষী লোয়াড়ের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক য কিকে সরাসরি গোল হয়) দেওয়া যায়, নাল্টি সীমানার মধ্যে রক্ষণদলের কোন লোয়াড় সেই অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে নাল্টি দিতেও আইনে আটকায় না। নাল্টি ও ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের আইনে পাতদৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই, শুধু কটি কথা দ্বারা দুই আইনের মধ্যে কিন্তু ষ্টি করা হয়েছে বিরাট ব্যবধান। সে থাটি হচ্ছে 'ইচ্ছাপূর্বক'। অর্থাৎ যে টি অপরাধের জন্য পেনাল্টি দেবার বিধি ছে ইচ্ছা করে কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি মানায় মধ্যে সেই অপরাধ করলে তবেই বে পেনাল্টি। এখন অপরাধ 'ইচ্ছাপূর্বক' ক 'অনিচ্ছাপূর্বক', এই উদ্দেশ্যের বিচারক ফারী এবং যেহেতু পেনাল্টি কোন দলের

...কৃত (ইণ্টেনশনাল) হ্যাণ্ডবল

বিরুদ্ধে চরম দণ্ড সেহেতু অপরাধী খেলোয়াড়ের এই 'ইচ্ছা' সম্পর্কে রেফারীকে নিশ্চিত হয়ে দণ্ড দিতে হবে। খেলোয়াড়ের অপরাধ 'ইচ্ছাকৃত' কি অনিচ্ছাকৃত, এই প্রশ্নের একমাত্র বিচারক রেফারী হলেও অপরাধের প্রকৃতি থেকে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য বোঝা দর্শকদের পক্ষেও কষ্টসাধ্য নয়। যদি বলটি গোলে ঢোকবার কোন সম্ভাবনা না থাকে বা কোন খেলোয়াড় নিশ্চিত গোল করবার জন্য অগ্রসর না হন, তবে রক্ষণদলের খেলোয়াড় কেন অযথা হ্যাণ্ডবল বা ফাউল করে পেনাল্টির ঝুঁকি নেবেন,—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। অবশ্য এমন যে হয় না, তা নয়। তবে খুবই কম। বিশেষ করে হ্যাণ্ডবলের ক্ষেত্রে পেনাল্টির নির্দেশ দিতে হলে রেফারীর যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পেনাল্টি সম্পর্কে আইনে বলা হয়েছে—

The penalty-kick can only be awarded for the following nine offences, intentionally committed

ইচ্ছাকৃত (ইণ্টেনশনাল) হ্যাণ্ডবল

by a player of the defending side within the penalty—area:

(a) Kicking or attempting to kick an opponent
(b) Tripping an opponent
(c) Jumping at an opponent
(d) Charging an opponent in a violent or dangerous manner
(e) Charging an opponent from behind unless the latter be obstructing
(f) Striking or attempting to strike an opponent
(g) Holding an opponent
(h) Pushing an opponent
(i) Handling the ball

লক্ষ্য করবার বিষয়, শেষ অপরাধ হ্যাণ্ডবল সম্পর্কে ১২ নম্বর আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে:

Handles the ball, i.e., carries, strikes or propels the ball with his or arm.

Law—12 (i)

এর অর্থ হাতে বল লাগলেই হ্যাণ্ডবল হয় না। হাত বা বাহু দিয়ে বলটিকে বয়ে নিয়ে গেলে বা হাতের দ্বারা বলকে আঘাত করলে কিম্বা হাত দিয়ে বলটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলে তবেই হ্যাণ্ডবল হয়। ছোট কথায় বাংলায় এই আইনের ভাষ্য করা হয়েছে—'হাতে বল লাগলে হ্যাণ্ডবল হয় না, হাত দিয়ে লাগালে হ্যাণ্ডবল হয়।' লাগলে এবং লাগালে কথা দুটির পার্থক্যে অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সোজা কথায়, ইচ্ছা করে কোন খেলোয়াড় হাত দিয়ে যদি বল খেলেন, তবেই হবে হ্যাণ্ডবল।

অনিচ্ছাকৃত (নন-ইণ্টেনশনাল) হ্যাণ্ডবল

পেনাল্টির ক্ষেত্রে এই ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে:—

......It is clear that there are only nine offences for which a penalty-kick can be awarded and, even then, only if the offences was INTENTIONAL.

Law—14, advice to Referees.

'ইণ্টেনশনাল' কথাটির অক্ষর লক্ষ্যনীয়। আইন বইয়ে যেভাবে 'ইণ্টেনশনাল' কথাটি লেখা আছে—এখানেও কথাটি লেখা হয়েছে সেইভাবে। এর থেকে বোঝা যায়, আইন-প্রণেতারা 'ইণ্টেনশন' কথাটির উপর কতখানি জোর দিয়েছেন।

এখন কথা আসে বুটের ডগায় লেগে বলটি লাফিয়ে উঠে যেভাবে কেম্পিয়ার হাতে লেগেছিল, তাতে পেনাল্টি দেওয়া যায় কি? কেম্পিয়া কি হাত দিয়ে বল খেলেছিলেন না, বল তাঁর হাতে লেগেছিল। তাছাড়া হাত দিয়ে কেম্পিয়ার বল খেলবার কোন কারণও ছিল না। কারণ বলের কাছে না ছিল প্রতি-পক্ষের কোন খেলোয়াড়, না ছিল বলটির গোলে যাবার সম্ভাবনা। সুতরাং বিনা কারণে তিনি হাত দিয়ে বল খেলবেনই বা কেন? তাই আমার ধারণা, রেফারী বিজলী মুখার্জি কেম্পিয়ার বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়ে যুক্তিসঙ্গত কাজ করেন নি।

এই পেনাল্টি কিকের সময় আবার বলটি বসানো নিয়ে দেখা যায় এক বিপত্তি। শুধু এই পেনাল্টি কেন, আজকাল পেনাল্টি হলেই বল বসানো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। গোলরক্ষক চান বলের 'লেস' নীচে রেখে 'পেনাল্টি-কিক-মার্কের' উপর বলটি বসাতে। যিনি কিক করবেন, তিনি চান বলের 'লেস' উপরে রাখতে। অনেকের ধারণা আছে, 'পেনাল্টি-কিক-মার্কে' বল বসানোর পদ্ধতি গোলকিপারের ইচ্ছাধীন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। লেস বলেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যিনি কিক করবেন, তিনিই ইচ্ছামত বল বসিয়ে নেবেন—এতে কারোই আপত্তির কিছু নেই। তবে বলের লেস বেরিয়ে থাকলে গোলকিপার আপত্তি করতে পারেন বৈকি! তবে এ আপত্তি সব সময়ই করা যায় এবং যে কোন খেলোয়াড়েরই এ আপত্তির অধিকার আছে। কারণ লেস বেরিয়ে থাকা বিপজ্জনক।

* * *

পেনাল্টি না দেবার জন্য রেফারী পি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয় মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলায়। অনেকের মতে মহমেডান দলের এই খেলায় একটি পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। কারণ তাদের নবাগত সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওমর যখন গোল করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মোহনবাগান ব্যাক এস গুহ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ওমরকে ফেলে

দিয়েছিল ল্যেংগি মেরে। যে কারণে ইস্ট-বেংগলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দেওয়া আমি সমর্থন করতে পারছি না; ঠিক সেই কারণে এখানেও আমি সমর্থন করতে পারছি না পেনাল্টি দেবার যৌক্তিকতা। আমার অভিমত রেফারী পি চক্রবর্তী পেনাল্টি না দিয়ে যুক্তিসংগত কাজ করেছেন। কারণ ওমর ও এস গুহ এত গায়ে গায়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে, দুইজনে একসংগে বলের দিকে ঘুরতে গেলে একজনের পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এইদিন মাঠ ছিল অত্যন্ত পিছল। সত্যিই এস গুহর ফাউল করবার উদ্দেশ্য বুঝা যায়নি। আর বলটিও ওমরের পায়ে ছিল না—তবে বল পাবার তাঁর সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। বল পেলে তিনি হয়তো গোলও করতে পারতেন। কিন্তু পেনাল্টির ক্ষেত্রে বলের অবস্থান বিচার্য নয়। মাঠের অপর পাশে খেলা চলছে, এমন সময় কোন খেলোয়াড় নিজ সীমানার মধ্যে পেনাল্টিজনিত অপরাধ করলেই

ইচ্ছাকৃত ল্যেংগিমারা (ইন্টেনশনাল ট্রিপিং)

রেফারী পেনাল্টি দিতে পারেন। পেনাল্টির ক্ষেত্রে অপরাধী খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যই একমাত্র বিচার্য, তবে তার উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য বলের অবস্থানের প্রশ্ন এসে পড়ে। তবে হ্যাঁ, ওমর পায়ে বল নিয়ে গোল করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় এস গুহ যদি তাঁকে ফাউল করতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা যেত। কিন্তু এমন অবস্থার মধ্যে ওমর পড়ে গেছেন, যেখানে অপরাধী খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য বোঝা যায়নি। এক্ষেত্রে রক্ষণকারী দলের বিপক্ষে চরম দণ্ড না দিয়ে রেফারী যুক্তিসংগত কাজ করেছেন।

* * *

সমস্যাসঙ্কুল পেনাল্টির তৃতীয় ঘটনা ঘটে ইস্ট বেংগল ও বি এন রেল দলের খেলায়। খেলাটির পরিচালক ছিলেন উদীয়মান রেফারী পি এ সোম। অত্যন্ত যোগ্যতার সংগেই তিনি খেলাটি পরিচালনা করছিলেন। বি এন আর ও ইস্ট বেংগলের মধ্যে একটা স্বাভাবিক রেষারেষির ভাব আছে। এটি ছিল দুই দলের ফিরতি লীগের খেলা। প্রথমবারের খেলাতেও রেষারেষির ভাব

অনিচ্ছাকৃত ল্যেংগিমারা
(আন-ইন্টেনশনাল ট্রিপিং)

প্রত্যক্ষ করা যায় এবং রেফারী দুই দলের দুইজন খেলোয়াড়কে শেষ সময়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। ফিরতি খেলায় ইস্ট বেংগলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় আমেদ ও রেল দলের লেফট-হাফ আর দে'র মধ্যে খোটাখুটি আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে আমেদ রেল দলের ওয়াই এন রাওকে বিশ্রীভাবে ফাউল করলে রেফারী আমেদকে 'মার্চিং অর্ডার' দেন। আমেদকে অবশ্য বিনা দ্বিধায় ভদ্রভাবেই মাঠ পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। কিন্তু যশস্বী ও জনপ্রিয় খেলোয়াড় আমেদকে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্যই হক অথবা অন্য কোন কারণেই হক রেফারীর পরিচালনায় কিছুটা দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং শেষ সময়ে ইস্ট বেংগলের স্বপক্ষে তিনি এক 'বিস্ময়জনক' পেনাল্টির নির্দেশ দিলে সেই পেনাল্টির সুযোগে ইস্ট বেংগল বিজয়সূচক গোল করে। রেল দলের কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছেন, তার কারণ অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অন্তত আমার চোখে কোন খেলোয়াড়ের অপরাধ ধরা পড়েনি। রেল দলের গোলের মুখে ইস্ট বেংগলের দুইজন খেলোয়াড়কে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সংঘর্ষ ঘটেছিল নিজেদেরই মধ্যে, প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়ের সংগে সংঘর্ষ ঘটেনি। আমার মনে হয়, জামার রং-বিভ্রাটই এই পেনাল্টির অন্যতম কারণ। বি এন আর ও ইস্ট বেংগল খেলোয়াড়দের জামার রং প্রধানত ছিল হলুদ। রেল দলের খেলোয়াড়রা হলুদ ও লাল রংয়ের জামা পরে খেলছিলেন আর ইস্ট বেংগলের খেলোয়াড়রা খেলছিলেন লাল বর্ডার দেওয়া হলুদ রংয়ের জামা পরে। ফলে একই দলের দুইজন খেলোয়াড়ের সংঘর্ষের মধ্যে জামার রং-বিভ্রাট হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এবং রেফারী এক দলের দুইজন খেলোয়াড়কে দুই দলের দুইজন খেলোয়াড় মনে করে থাকবেন। যদিও এঁর মধ্যে পেনাল্টিজনিত কোন অপরাধ লক্ষ্য করা যায়নি, তবুও রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দিয়েছেন—এইজন্যই এই পেনাল্টিকে আমি 'বিস্ময়জনক' পেনাল্টি বলে অভিহিত করেছি।

শী সংবাদ

২৬শে জুন—কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের উপ-
ী বাঙ্গালোরে এক ঘোষণায় বলেন যে
সময়ের জন্য মজুত করিয়া রাখা চাউল
তে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের চাউল জুলাই
দ হইতে বাজারে ছাড়ার এক পরিকল্পনা
কারের রহিয়াছে। কারণ এই সময়ে দেশে
চলের ঘাটতি দেখা দিয়া থাকে।

২৭শে জুন—হিন্দ মজদুর সভার পশ্চিমবঙ্গ
খার সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবেন সেন এবং
ন্যান্য ৮৪জনকে গতকল্য আসানসোলের নিকট
ণপুর কলিয়ারীর নিকটে ফৌজদারী কার্য-
ধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা অমান্য
রয়া কলিয়ারীর কর্মীদের সমাবেশ করার
ভযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকারীভাবে সমর্থিত একটি সংবাদে বলা
হয়াছে যে, গতকল্য রাত্রে সাঁওতাল পরগণা
লার পাকুড় মহকুমার মহেশপুর থানার
ন্তর্গত কিতা গ্রামে একটি বিরাট সশস্ত্র
ওতাল দলের উপর পুলিসের গুলী চালনার
ল ১০জন সাঁওতাল নিহত এবং ১৪জন
হত হইয়াছে।

২৮শে জুন—অদ্য প্রাতে কলিকাতায় কিং
র্জস ডকে বিদ্যুৎ-চালিত ২০০ টনের একটি
নর্টিলিভার ক্রেন স্থাপনের কাজ শুরু হয়।
ই ক্রেনটি প্রাচ্যের বৃহত্তম ক্রেন হইবে বলিয়া
বী করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ-এর সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার
পরাহ্নে উনাও-এর প্রায় দশ মাইল দূরে
সাত গ্রামের বাজারে একটি কাঁচা বাড়ি ধসিয়া
ড়ায় ৪০জনেরও অধিক লোক নিহত
য়াছে।

২৯শে জুন—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত
গবিন্দবল্লভ পন্থ অদ্য সন্ধ্যাকালে উপদ্রুত
গা পাহাড় এলাকার অবস্থা সম্পর্কে আসামের
খ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এবং উচ্চপদস্থ
মরিক ও অসামরিক অফিসারগণের সহিত
চ পর্যায়ের সম্মেলন আরম্ভ করেন।

অদ্য অপরাহ্নে ৩৯, ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি
দামে ১০ ফুট লম্বা এবং প্রায় এক মণ
জনের একটি ময়াল সাপ দেখিতে পাওয়া
য়।

অদ্য পৌর সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে
লিকাতার আবর্জনা অপসারণ সম্পর্কে কমি-
নারের বিবরণী আলোচনা কালে স্ট্যাণ্ডিং
রার্কস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅমর ঘোষ
লিকাতার আবর্জনা অপসারণ সংক্রান্ত
সন্তোষজনক ব্যবস্থার জন্য কোন নাম না
রিয়া "বিভাগ" "পরিচালকমণ্ডলী" ও
মিশনার শ্রী বি কে সেনকে সর্বতোভাবে দায়ী
রেন।
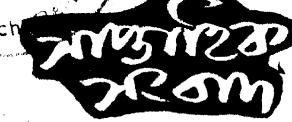
৩০শে জুন—ভারত সরকার রপ্তানী শুল্ক
নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পাউণ্ডপ্রতি চায়ের মূল্য
দুই টাকা তেরো আনা এগার পাই স্থির করিয়া
দিয়া অদ্য এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

বিদরের সংবাদে প্রকাশ, মাউলু নামক ৭০
বৎসর বয়স্ক একজন মুচী অদ্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ
রাজেন্দ্র প্রসাদের সম্মুখে অনধিক তিন তোলা
ওজনের একজোড়া জুতা হাজির করে।
রাষ্ট্রপতি মুচীর দক্ষতার প্রশংসা করিয়া
মুচীকে একশত টাকা উপহার দিয়া জুতাজোড়া
ক্রয় করেন।

গতকল্য সকালে বেলেঘাটা মেন রোডের
পূর্বপ্রান্ত সীমায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ
হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এগারটি চার তলা
ভবনে বিভক্ত ৫৫৬টি ফ্ল্যাটের একটি শ্রমিক
পল্লীর উদ্বোধন করেন।

১লা জুলাই—দেশবরেণ্য জননায়ক ডাঃ
বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ
উপলক্ষে কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে
তাঁহাকে দেশবাসীর পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ
অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় এবং দেশবাসীর পক্ষ
হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার একখানি চেক
প্রদান করা হয়।

অদ্য বিকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বালিগঞ্জ
রেলওয়ে স্টেশনের ওভারব্রীজ ভাঙ্গিয়া এক
মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় ৩জন স্ত্রীলোক সহ ১৭জন
আহত হন।

গতকল্য রাত্রি আট ঘটিকার সময় এক
সাঁওতাল জনতা কর্তৃক চাকদহ থানার অন্তর্গত
দালিয়া গ্রামের হাট লুণ্ঠিত এবং চারিজন
পুলিস কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়। লুণ্ঠন-
কারীদের উপর পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে
একজন সাঁওতাল ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে
পতিত হয়।

২রা জুলাই—প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্বে লাল-
বাজার পুলিস দপ্তরের নীচের তলায় অবস্থিত
গোয়েন্দা বিভাগের সি আই ডি সেকশন হইতে
তিনটি টাইপরাইটার মেশিন চুরি যাওয়ায়
পুলিস কর্তৃপক্ষ মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার
হইয়াছে।

কলিকাতার পুলিস কমিশনার সম্প্রতি
নগরীর বিভিন্ন গৃহে নিযুক্ত ভৃত্যদের নাম
রেজেষ্ট্রি করাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার
ঐ আদেশ বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিস অফিসার-
গণকে বাড়ি বাড়ি গিয়া ভৃত্যদের যাহাতে নাম
রেজেষ্ট্রি করা হয় তাহার নির্দেশ দেওয়া
হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় সাংবাদিকগণের সঙ্গে এক
সাক্ষাৎকালে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার
শ্রীসুকুমার সেন বলেন যে, পয়লা নবেম্বরের
মধ্যে রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত হইলে ১৯৫৭
সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধের মধ্যেই
যাহাতে সাধারণ নির্বাচন হইতে পারে তাহার
ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে
করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জুন—নয়টি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের
প্রধান মন্ত্রিগণ অদ্য হাইড্রোজেন বোমার যুগে
পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক এবং অ-কম্যুনিস্ট
জগতের প্রতি সোভিয়েট নীতির পরিবর্তনের
তাৎপর্য আলোচনার উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রধান
মন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে এক বৈঠকে
মিলিত হন।

অদ্য অপরাহ্নে করাচীতে রুশিয়া ও পাকি-
স্থানের মধ্যে এক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত
হইয়াছে। অদ্য রাত্রিতে মস্কো ও করাচীতে
এই চুক্তির বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত এক
ইস্তাহার যুগপৎ প্রকাশিত হইবে।

সিংহল হইতে বৃটিশ নৌ ও বিমান ঘাটি
অপসারণের জন্য যে দাবী জানান হইতেছে
সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বন্দরনায়ক অদ্য সে
সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিবর্গের সহিত আলোচন
করেন।

২৮শে জুন—পাকিস্থানের যে সকল
সাংবাদিক বর্তমানে চীন পরিভ্রমণ করিতেছেন
চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই তাঁহাদের
নিকট বলেন যে, চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরের
ব্যাপারের উল্লেখ পছন্দ করেন না।

কম্যুনিস্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন
লাই আজ বলেন যে, "শান্তিপূর্ণভাবে
ফরমোজার মুক্তিকল্পে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও
শর্ত সম্পর্কে" তাঁহার গবর্নমেণ্ট জাতীয়তা-
বাদী চীনাদের সহিত আপোস আলোচনা
করিতে ইচ্ছুক।

নবনিযুক্ত পাক হাইকমিশনার মিঃ এ
জিয়াউদ্দিন অদ্য প্রাতে দিল্লী পৌঁছিয়াছেন।
তাঁহাকে দিল্লী মেন স্টেশনে অভ্যর্থনা করা হয়।

বৃটেনে হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার
জন্য অদ্য রাত্রে কমন্স সভায় ১৫২—১৩৩ ভোটে
একটি বিল গৃহীত হয়।

২৯শে জুন—পোলিশ সংবাদ সরবরাহ
প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ, গতকাল পশ্চিম
পোল্যাণ্ডের পোজনান শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার
ফলে মোট ৩৮জন নিহত ও ২৭০জন আহত
হইয়াছে।

৩০শে জুন—পূর্ব পাকিস্থানের দুর্ভিক্ষ-
গ্রস্ত এলাকাগুলিতে খাদ্য বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ও
তৎসম্পর্কিত সর্বাত্মক পরিকল্পনা রচনার ভার
সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতেছেন।

লেনিনের যে উইলে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট
পার্টির সেক্রেটারীর পদ হইতে স্টালিনকে
অপসারণের নির্দেশ ছিল, অদ্য ৩৩ বৎসর পরে
তাহা প্রকাশ করা হয়।

১লা জুলাই—আগামীকাল বৃটেন কমন-
ওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে ইন্দোচীন,
মালয় ও সিঙ্গাপুরের উপর বিশেষ জোর দিয়া
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ
করিবে।

আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের অবলম্বন
ইস্পাত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা অদ্য মধ্যরাত্রি
হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছে।

২রা জুলাই—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বন্দর-
নায়ক আজ জানান যে, বৃটেন সিংহল হইতে
তাহার ঘাটি অপসারণে নীতিগতভাবে সম্মত
হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—l৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 14th JULY, 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৩৭ সংখ্যা ॥
শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বঙ্গ-বিহার সীমানা সমস্যা

কেন্দ্রীয় সরকার নিরূপিত বঙ্গ-বিহারের সীমানা পনুর্গঠন সম্পর্কিত আইনের খসড়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অনুমোদিত হইয়াছে। বিধানসভা এই খসড়ার সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া পূর্ণিয়া জেলার মেচী নদীর পূর্বপার হইতে মহানন্দা নদীর মালদহ জেলার সীমারেখা পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটুকু পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করিতেছেন। বস্তু বস্তুত রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা বিধানের জন্য এই অঞ্চলটুকু পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। এই ভুলটি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থিগণ এই বিল সম্পর্কিত বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্রভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিতর্কে সম্পর্কে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি দেখা দিয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধতার যুক্তি সে সম্বন্ধে আদৌ বিচারসহ নহে। ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের দাবী মিটিয়াছে, এমন কথা কেহই বলিবে না। সে দাবী অবশ্যই রহিয়াই গিয়াছে। কিন্তু বিলে পশ্চিমবঙ্গকে যেটুকু জায়গা-জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ তাহা চাহে না, ইহা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বিলটি সরাসরি অগ্রাহ্য করার অর্থ কতকটা তাহাই গিয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, বিলটি পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার কেহই চাহে না, ইহা বুঝিয়া লইয়া ভারত সরকার যদি এই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলে ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গেরই ঘটিবে, বিহারের কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যুত বিহার বিধানসভা বিলটি নাকচ করিয়াই দিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলের বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কাজ করা উচিত ছিল। বস্তুত বিরোধী দলের রণনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতার ভাব ব্যক্ত হয় নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধতার সর্ববিধ যুক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফল পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের পক্ষে কিরূপ হানিকর হইতে পারে, উপদলীয় স্বার্থের দায়ে এখানকার বামপন্থীরা সে বিচার উপেক্ষা করিয়াছেন। যে কোনভাবে দল হিসাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য বিরুদ্ধতা করা এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই ব্যাপারে সংবাদপত্রসমূহের উপরও কটোক্তি করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা নিতান্তই নিরর্থক এবং অযৌক্তিক। সংবাদপত্রসমূহ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকেই এই সম্পর্কে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা অপরাধ নিশ্চয়ই নয়। বিহার বিলটিকে নাকচ করিয়া দিবার জন্য প্রাদেশিকতাবোধে যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যদি পশ্চিমবঙ্গও উপদলীয় স্বার্থের দায়ে অন্য পথে বিলটি সেইভাবে নাকচ করিয়া দেয়, তবে ফল কি দাঁড়াইবে ইহা বুঝিতে অবশ্যই রাজনীতিক সূক্ষ্ম প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমবঙ্গের জন-স্বার্থ ও প্রকৃত সমস্যার কথা স্মরণ রাখিয়া উপদলীয় মনোবৃত্তি এক্ষেত্রে সংযত করাই সকল দলের উচিত এবং আত্মবিরোধের পথ পরিত্যাগ করিয়া এক সুরে কথা বলা দরকার। নির্বাচনে জিতিবার ফন্দি পাকা করিবার তালে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ যদি আমরা উপেক্ষা করি, ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদের বিড়ম্বনাই বাড়িবে।

বিহারে কংগ্রেসের আদর্শ

বিহারের বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ বিহার ভূখণ্ড হস্তান্তর বিল সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। কারণ নিতান্ত সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ব্যতীত সেই আলোচনায় যুক্তি-বুদ্ধি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বিহারের কোন কোন নেতার মতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক দেহে এক উপদ্রবস্বরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং এই জঞ্জাল একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। এই যুক্তি অনুসারে একজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গের কতটা অঞ্চল বিহারে খানিকটা আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং কলিকাতা শহরটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে লইয়া এই সমস্যা সমাধানের সোজা পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আর একজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমীচীনতা প্রদর্শনের জন্য অভিনব যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পশ্চিমবঙ্গকে কমিউনিস্টদের কবল হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এই রাজ্যটি বিলুপ্তির ব্যবস্থা করাই একমাত্র উপায়। সদস্যদের কাহারো কাহারো মস্তিষ্ক শক্তি সর্বাধিক সূক্ষ্ম স্তরে খেলিয়াছে। তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের মূলে গূঢ় অভিসন্ধির পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে কমিউনিস্টদের কব্জা হইতে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীকে হাতে রাখিবার উদ্দেশ্যেই বিহারের ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে একজন সদস্য তাঁহাকে কাপুরুষ বলিতেও ইতস্তত করেন নাই। ফলত উক্ত সংযুক্তি প্রস্তাবের মূলে বিহারের কংগ্রেসী দলের মনোভাব কিরূপ ছিল এবং তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল কোনদিকে, এই আলোচনাতেই তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু বিরোধী দলই নয়, বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, মুখ্যমন্ত্রী হইতে উপমন্ত্রী সকলে এবং কংগ্রেসী সদস্যগণ জোট বাঁধিয়া এইরূপ প্রাদেশিক মনোবৃত্তিমূলক উৎকট মানসিক ব্যাধির

ক্ষোভে নিতান্ত অসংযত ভাষায় অসম্বন্ধ লাপোক্তি করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের, মকি দেখাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার হার বিধানসভার এমন অনিষ্টকর নোভাবের প্রশ্রয় দিবেন না, ইহাই আমাদের ঢ় বিশ্বাস।

গতি স্বরূপে

বর্তমান যুগ প্রগতির যুগ বলিয়া ভিহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-সাধনার য়যাত্রা চলিতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নমেষের মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস করা ইতে পারে এমন কি সমগ্র জগৎ স্মস্তূপে পরিণত করিবার মত শক্তির ন্ধানও বিজ্ঞান বলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কন্তু বৈজ্ঞানিক বর্তমান জগতের এই যে ববর্তন ইহা সত্যই প্রগতি কি না ারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স বিষয়ে সেদিন সন্দেহ প্রকাশ রিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রগতি রীক্ষার কষ্টিপাথর হইতেছে, ইহা আমাদগকে অধিকতর উদার করিবে না, অধিকতর মানুষ করিবে। বস্তুত বৈজ্ঞানিক শক্তির পপ্রয়োগের আশংকা মানব সমাজকে ৎপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্ভবত বজ্ঞানিক বলের অপপ্রয়োগে নিজেদের তিষ্ঠা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জগতের বত্তিম শক্তি যেভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে, ারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরাল লণ্ডনে সাংবাদিকদের নিকট নিজকে প্যাগান' অর্থাৎ পৌত্তলিক বলিয়া ভিহিত করিয়া সেই মনোবৃত্তির উপরই আঘাত করিয়াছেন। বিদেশী বিশ্বদ্যালয়ে আবাল্য শিক্ষিত যুক্তিবাদী পণ্ডিত জওহরলালের মুখে এমন কথা শুনিয়া বিলাতের সাংবাদিকেরা কিরূপ বিস্ময় বোধ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু পণ্ডিতজী ইহার কারণও ভাঙিয়া বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যাগানদের প্রধান গুণ এই যে, তাহারা পরমতসহিষ্ণু। একদিকে খৃস্টধর্মের ধ্বজাধারী পর্তুগাল এবং তাহার সমর্থক মার্কিন মন্ত্রী ডালেসের দলবল অন্যদিকে বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ—একদিকে আমেরিকা, অপরদিকে সোভিয়েট, একদিকে দণ্ডধর ঈশ্বর, অপরদিকে নিরীশ্বর জড়বাদ, এই দোটানার পাক হইতে দূরে থাকিতে হইলে ভারতের পক্ষে পৌত্তলিক হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ইহার ফলে পরমতসহিষ্ণুতার দোষে ভারতের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টি কাহারো কাহারো পড়িতে পারে; কিন্তু ভারত কোন শক্তিগোষ্ঠীর চাপে নিজের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। প্রগতির পথে সে মানবতার উদার লক্ষ্যেই অভিনিবিষ্ট থাকিবে এবং ভারতের সংস্কৃতিতে মৈত্রীই প্রগতির স্বরূপ।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষা

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্প্রতি হায়দরাবাদে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রবর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার মতে যতদিন পর্যন্ত বিদেশী ভাষার উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে, ততদিন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে না। এই সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীন এবং আধুনিক চিন্তাজগতে আমাদের বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম হইবার যোগ্যতা ভারতের অনেক ভাষারই রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতির উক্তির যৌক্তিকতা আমরাও উপলব্ধি করি। প্রকৃত পক্ষে কোন বিদেশী ভাষাকে ভিত্তি করিয়া কোন জাতি সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে পারে না। ফলত সেই পথে বিদেশী ভাষায় অভিজ্ঞ শ্রেণী বিশেষের আভিজাত্য জাতির গণতান্ত্রিকতার পথে অভ্যুন্নতিকে ব্যাহত করে। ইংরেজী ভাষার সম্পদ—প্রাচুর্য—সে ভাষার বীর্য এবং মাধুর্য কেহই অস্বীকার করিবেন না, আন্তর্জাতিক দিক হইতেও তাহার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রতি একান্ত মর্যাদা বুদ্ধি মোহ স্বরূপে আমাদের অনেকের মনে দীর্ঘদিনের দুরপনেয় একটা গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীন জাতির সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমুন্নতির জন্য এই গ্রন্থি শিথিল করা বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ইংরেজী ভাষা হইতে আমরা যে সব সুবিধা পাইতেছি দেশীয় ভাষাগুলিকে তাহা পূরণ করিবার জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতীয় অনেক ভাষার মধ্যেই আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্যতা সম্পূর্ট স্বরূপে আছে ইহা সত্য। কিন্তু সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে পরিস্ফূর্ত করিবার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। জাতির মনীষী এবং চিন্তাশীল যাঁহারা, তাঁহাদিগকে বর্তমানে এই সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। আমাদের স্বাদেশিকতা এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ যদি সেই সাধনায় আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোলে তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

ভারতে ব্রিটিশ বিমানঘাঁটি

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও এদেশের ভূখণ্ডে ইংরেজের বিমানঘাঁটি বিদ্যমান ছিল, এই তথ্য অবগত হইয়া অনেকে বিস্ময়বোধ করিবেন। কিন্তু নিকোবর দ্বীপের নিকট এই বিমানঘাঁটি ছিল। সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্বর্তী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি তদারক করা ব্রিটিশ বিমানবহরের পক্ষে সুবিধা হইত। ফলত ভারত সরকারের সম্মতি লইয়াই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করেন। তথাপি এইরূপ ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের মর্যাদার অনুকূল ছিল না, এই কথা বলিতেই হয়। সম্প্রতি সিংহলের নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডল সিংহল হইতে ব্রিটিশের বিমানঘাঁটি অপসারণে উদ্যোগী হইয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারও নিকোবর দ্বীপের বিমানের ঘাঁটি নিজেদের অধিকারে লইয়াছেন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সকলেই সমর্থন করিবেন। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্বর্তী অঞ্চলের সহিত ভারতের সংযোগসূত্র উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় নিকোবর দ্বীপে বিমানঘাঁটি তাঁহাদের কর্তৃত্বে আনয়ন করা একান্তই প্রয়োজন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষকতা করা ভারতের রাজনীতিক আদর্শের অনুকূল নয়, মালয় সম্পর্কে একথা বিশেষভাবেই বলা চলে, এরূপ অবস্থায় নিকোবরদ্বীপ হইতে ব্রিটিশের বিমানঘাঁটি অপসারণের ব্যবস্থা পূর্বেই অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

ভারত সরকার মালদহে একটি বিমান ঘাটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১৬০ একর জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মালদহ আম এবং রেশমের কারবারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ভারত বিভক্ত হইবার পরে মালদহের এই দুইটি ব্যবসায়ই ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মালদহের আমের ব্যবসা একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় আমের বাজার আছে, কিন্তু মালদহ হইতে কলিকাতায় আম চালান দেওয়ার সুবিধা নাই। যে ঘোরা পথে মালদহ হইতে কলিকাতায় মাল আসে, তাহাতে আমের মত দ্রব্যের ব্যবসা চলে না। পথের বিলম্বে মাল নষ্ট হইয়া যায় এবং ব্যবসায়ীদের লোকসানের কারণ ঘটে। মালদহে বিমান ঘাটি নির্মিত হইলে এই অসুবিধা অনেকটা দূর হইবে। আমের ব্যবসা মালদহ অঞ্চলের অনেক লোকের প্রধান উপজীবিকা স্বরূপ। এই ব্যবস্থায় তাহারা উপকৃত হইবে এবং কলিকাতার অধিবাসীদেরও আমের অভাব অনেকটা দূর হইবে। প্রত্যুত মালদহের ন্যায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রের দিক হইতেও রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ভারতের দেহে যে অস্ত্রোপচার হয়েছে তার ব্যথা রাজনৈতিক নেতারা বোধ হয় সহজে ভুলে যেতে বা ভুলে থাকতে পারেন কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার আনন্দ এবং উন্মাদনায় তাঁদের মন ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের সে সুবিধা নেই। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে অভূতপূর্ব মৈত্রীভাবের কথা দুপক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের মুখে লেগেই আছে। দুশো বছরের বৃটিশ শাসনের স্মৃতিতে যা কিছু তিক্ততা ছিল সব নাকি ধুয়ে মুছে গেছে। ভারতবর্ষ ও বৃটেনের রাজনৈতিক নেতারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলে ঘোষণা করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত নয় তারা যখন শুনে যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ইংলণ্ডবাসীরা তাদের আত্মীয় এবং সেই সঙ্গে দেখে যে দশ বছর আগেও যাদের এক ঘরে বাস ছিল তারা আজ পরস্পরকে কেবল পর নয় অনেক সময় শত্রু বলে ভাবতে শিখছে, তখন তাদের কাছে জগৎটাকে বিশেষ করে রাজনৈতিক জগৎটাকে একটু অদ্ভুত লাগে।

এর মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ফাঁকি আছে। কারণ যদি সত্যকারের কোন নৈতিক জোরেই দূরবর্তী বৃটেনকে (গত দুশো বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও) আমরা বন্ধু বলতে এবং বন্ধু ভাবতে পেরে থাকি, তবে সে জোর আমাদের কাছের লোকের সম্বন্ধে খাটে না কেন? বরঞ্চ এখানে দেখছি যারা নিকটই ছিল, একই দেহের অংশ ছিল তারা দূরে চলে যাচ্ছে, পৃথক হয়ে যাচ্ছে।

লণ্ডনের পৌরসভা পণ্ডিত নেহরুকে লণ্ডনের নাগরিক আখ্যা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এ সংবাদ আমাদের দেশের খবরের কাগজে পাঁচ কলম ব্যাপী শিরোনামা দিয়ে ছাপা হয়েছে এ যেন একটা জগৎ-নাড়ানো ব্যাপার, অথচ ইংলণ্ডবাসীদের কাছে ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে দিন দু'একটা ছাড়া ইংলণ্ডের অন্যান্য কাগজগুলিতে খবরটার উল্লেখ মাত্রও ছিল না। অথচ পূর্ব বাংলার প্রায় পাঁচ কোটি লোক যারা রাষ্ট্রীয় বিভাগের কথা বাদ দিলে এই দেশেরই মানুষ তাদের উপর আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়া সত্ত্বেও এ দেশের খবরের কাগজে তার আভাস অতি সামান্যই পাওয়া যায়। দোষ অবশ্য কেবল খবরের কাগজের নয়। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ, পাকিস্তান "বিদেশ"। পূর্ববঙ্গের ঘটনা "বিদেশের" ঘটনা—এই ধারণা যতো বেশি বদ্ধমূল হচ্ছে খবরের কাগজেও সেটা তত বেশী প্রতিফলিত হচ্ছে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবধানবোধ বেশি। অনেকের কাছেই বিশেষ

করে রাজনীতিকদের কাছে হয়ত কিছু মাত্র অস্বাভাবিক লাগে না, কিন্তু মানবতা এবং সুব্যবস্থার এর চেয়ে নিষ্ঠুর সংকোচন আর কী হতে পারে? পূর্ববঙ্গে যে অন্নাভাব-সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান করা পাকিস্তানী সরকারের ক্ষমতার বাইরে বলে মনে হয়। অথচ এই সমস্যা যদি শীঘ্র আয়ত্তাধীন না করা যায় তবে যে কত লোক মারা যাবে তা বলা যায় না। কারো কারো ধারণা পূর্ববঙ্গ যে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন

হয়েছে তাতে শতকরা দশজনের মৃত্যু হতে পারে অর্থাৎ ৪০।৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে।

দশ বছর আগে হলে এটা সমগ্র বাঙালী জাতির বিপদ বলে গণ্য হোত। আজ কলকাতায় বাঙালীরাও এটাকে "বিদেশী" ঘটনা বলে ভাবতে পারছে। পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে অতি লোভী চোরা-কারবারীরা এদিক থেকে চাল পাচার করবে—এইটাই হচ্ছে অনেকের সব চেয়ে দুর্ভাবনার বিষয়। এর জন্য কাকে দোষ দেয়া যায়? রাষ্ট্রীয় সীমানা যা একান্তই আর্টিফিশিয়াল এমনকি অনেক সময়ে জাতির ইতিহাস এবং মানুষের হৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার করে যা টানা হয়, তার প্রভাব দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তা না হলে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী আজ পূর্ববঙ্গের বাঙালীকে "বিদেশী" বলে ভাবতে পারছে বা ভাবতে শিখছে অথচ কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য ব্যগ্র। আজ যদি ভারত সরকার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার জন্য পাঁচ দশ কোটি টাকার সাহায্য দিতে অগ্রসর হন, তাহলে হয়ত অনেক পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীও বলবে, "প্যাকিস্তানের ঘর প্যাকিস্তান যেমন করে পারে সামলাক, তার জন্য ভারতের মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কী? অথচ কাশ্মীরের জন্য ভারত সরকারের শত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে আপত্তি নেই। শুধু যে সৈন্য রাখার খরচ তা নয়, সস্তা চাল থেকে আরম্ভ করে অবৈতনিক শিক্ষা পর্যন্ত কাশ্মীরে ভারত সরকারের প্রদত্ত সাহায্যে চলে, যে-সুবিধা ভারতের অন্য কোন অংশের লোকের ভাগ্যে এখনো ঘটে নি, কোনদিন ঘটবে কিনা ঈশ্বর জানেন।

এর উপর আছে কাশ্মীর সরকারের স্বাতন্ত্র্য যা ভারতের অন্য কোন রাজ্য সরকারের নেই। সম্প্রতি লণ্ডনে পণ্ডিত নেহরুর একটি প্রেস কনফারেন্সে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কথা উঠে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বন্দী শেখ আবদুল্লা যাতে মুক্তি পেতে পারেন, তার জন্য পণ্ডিতজী চেষ্টা করবেন কিনা। উত্তরে শ্রী নেহরু বলেন শেখ আবদুল্লা যে বন্দী রয়েছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং তিনি আশা করেন যে, শেখ আবদুল্লাকে আর বেশি দিন বন্দী থাকতে হবে না, তবে এ ব্যাপারে শ্রীনেহরুর পক্ষে কিছু করা মুশকিল, কারণ—

"the Kashmir Government was a fully autonomous Government and the responsibility in the matter of Shaik Abdullah lay with that Government."

কাশ্মীর সরকারকে পণ্ডিত নেহরু "a fully autonomous Government" বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য এরূপ কথা ভারতের অন্য কোন রাজ্য সরকারের সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য হতে পারে না।

ধরুন, বিহারের হাবভাব দেখে কেন্দ্রীয় সরকার ভড়কে গিয়ে বঙ্গ-বিহার সীমানা পুনর্নির্দেশ বিলটিকে ধামা চাপা দিলেন। এতে বিরক্ত হয়ে বিধানবাবু স্থির করলেন যে পশ্চিম বাঙলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র না করতে পারলে বাঙালীর পূর্ণ আত্মস্ফুরণ সম্ভব নয় এবং এজন্য তিনি আমেরিকা, বৃটেন অথবা রাশিয়ার "নৈতিক" সমর্থন লাভের আশায় তলে তলে একটু খোঁজ-খবর করতে লাগলেন। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদটা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কানে গেল। তিনি তখন অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যেমন করে হোক বিধানবাবুকে গ্রেপ্তার করে ফেললেন এবং নিজে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা হাতে নিলেন এবং যথারীতি আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন লাভ করলেন। তারপর বছর দুই কেটে গেল। বিধানবাবু বন্দীই আছেন। এই সময়ে পণ্ডিত নেহরু এবারে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের বৈঠক উপলক্ষ্যে লণ্ডনে গেলেন। সেখানে এক প্রেস কনফারেন্সে নেহরুজীকে একজন জিজ্ঞাসা করল তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু বিধানবাবুর মুক্তি সম্পর্কে কিছু করতে পারেন কিনা।......

এই নিতান্ত আষাঢ়ে গল্পটা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যেটুকু বলা হয়েছে, তা থেকেই বুঝা যাবে যে আইন ও রাজনীতি উভয় দিক থেকেই কাশ্মীর এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকারের মধ্যে পার্থক্যটা কতখানি এবং কী রকমের। কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট যদি "a fully autonomous Government" হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তথা ভারত সরকার যদি "a fully autonomous Government"কে নিয়মিতভাবে শত শত কোটি টাকার সাহায্য দিয়ে যেতে পারেন, তবে ভারতের অন্য প্রান্তেও কোন সরকারের সঙ্গে অনুরূপ সম্বন্ধ স্থাপন অচিন্তনীয় বলা যায় না। তবে ইতিহাসের চাকা কখন আস্তে এবং কখন তাড়াতাড়ি ঘুরে কেউ বলতে পারে না।

* * *

অপরকে উপদেশ দেয় অথচ নিজে তার উল্টা কাজ করে, এমন লোকের কথা কেউ গ্রাহ্য করতে চায় না। এক ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম দেখা যায়, সে হচ্ছে ডাক্তারদের বেলায়। এমন মদ্যপ ডাক্তার যার নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা এরূপ যে স্পষ্টই তাঁর পক্ষে মদ খাওয়া অনুচিত, তিনিও আশা করেন যে, কোন রোগীকে মদ খেতে বারণ করলে সে তাঁর কথা শুনবে। নিজেদের আচরণের দ্বারা সদৃষ্টান্ত স্থাপনের আবশ্যকতা স্বীকার করার রেওয়াজ ডাক্তারদের মধ্যে নেই। সম্প্রতি বিলাতে একটি ঘটনায় এ বিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে একটা নূতন চেতনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটে বৃটিশ মেডিক্যাল এসো-সিয়েশনের বাৎসরিক সভায়। সভার কাজ চলার সময়ে ধূমপান চলবে কিনা তাই নিয়ে ভোট হয়। এসোসিয়েশনের নিয়ম হচ্ছে যে, যদি সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ধূমপানের পক্ষে ভোট দেন তবে সভায় ধূমপান চলতে পারবে। ধূমপান চলবে কিনা এই নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। ধূমপানের বিরুদ্ধে অনেকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় মত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে, ডাক্তাররা অনবরত ধূমপান করে সাধারণের সামনে একটা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কেউ কেউ ধূমপান ও রোগের সম্বন্ধের কথা বলেন। কোন কোন ডাক্তার এ কথার প্রতিবাদও করেন। তবে অনেকে জোর গলায় বলেন যে, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ধূমপানের সঙ্গে রোগের সম্বন্ধ আছে তাঁদের উচিত ধূমপান ত্যাগ করে তাঁদের বিশ্বাসের প্রমাণ দেওয়া এবং সাধারণের সামনে সৎ-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সভায় ধূমপান করা চলবে কিনা এই প্রশ্নের উপর ভোট হলে ১৭৩ জন ডাক্তার পক্ষে এবং ১৫৪ জন বিপক্ষে ভোট দেন। মেজরিটি হলেও তিন-চতুর্থাংশ ভোট না পাওয়ায় সভায় ধূমপান বন্ধ থাকে।

অতিমাত্রায় সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসে ক্যানসার রোগ হওয়ার সম্বন্ধ আছে বলে এক দল বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে সকলে একমত নন, এখনো তথ্যানুসন্ধান চলছে। তবে গবেষকগণ যে-সব Statistics প্রকাশ করেছেন তাতে অতি মাত্রায় সিগারেট খাওয়ার ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার হয় এরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন বলে মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিছুকাল পূর্বে এই সম্পর্কে গবেষকদের সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি পুস্তিকা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কখনো এরূপ পুস্তিকা প্রকাশ করতেন না। সিগারেটের উপর শুল্ক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের একটা সবচেয়ে বড়ো আয়ের পথ। সিগারেট খাওয়া কমলে সে আয়ও কমে যাবে। তা সত্ত্বেও যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এরূপ পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে তাঁরা বিষয়টিকে কিরূপ গুরুতর বলে মনে করেন।

১০।৭।৫৬

(২)

আবার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গেল ও। আবার দাঁড়াল থমকে। ছদ্মবেশ নিতে হবে এবার ওকে। ওর মুখের সবটুকু ব্যথা দুশ্চিন্তা উদ্বেগের ছায়া মুছে ফেলে ঢুকতে হবে। ও উৎকণ্ঠিত ও ভয় পেয়েছে, সেই অনধিকার চর্চা দেখে আর কেউ অবাক হবে, সে-ই যে ওর সবচেয়ে বড় সমস্যা, বড় লজ্জা।

যেন ওর কিছু হয়নি, কোথায় কি ঘটছে, জানে না কিছুই, ঠিক এমনি অবিকৃত নিঃশব্দে তড়িদগতি রুমনিটির মত ঘরে ঢুকল ও।

ওর বাবা মহীতোষ টেরও পেলেন না। প্রত্যহের মতই, এ মাঘের সকালে, লংক্লথের পাঞ্জাবীটি পরনে। বুকের বোতামগুলি খোলা তেমনি, পাশ থেকে চওড়া কাঁধে, পাঞ্জাবীর গলা সরে যাওয়া পরিসরে দেখা যায় স্যাণ্ডো গেঞ্জিটি। পায়জামা ঢাকা পা দুটি মাটিতে রেখে দোলাচ্ছেন একটু একটু। চশমা চোখে দিয়ে ঝুঁকে আছেন খবরের কাগজের উপর।

আজ এইটি বাবার সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। কোনদিন এ সময়ে বাইরের ঘরে বসেন না কাগজ পড়তে। তেমন শান্ত মানুষটি উনি কোনকালেই নন। এতক্ষণে কত হাঁকডাক করেন। খুরপোটি নিয়ে নেমে যান বাগানে। তাতেই রেহাই নেই। ডাক পড়বে সকলের। অদ্ভুত এবং বিচিত্র সব তত্ত্ব তথ্য আবিষ্কার করবেন গাছের পাতায়, চারায়, অঙ্কুরে, ফুলে। শুধু আবিষ্কার করলেই তো হবে না, ব্যাখ্যা করতে হবে কাউকে। সুতরাং সুজাতা, সুগতা অর্থাৎ উমুনি-ঝুমনির ডাক পড়বেই। দিদিরা হাসাহাসি করে। তার মধ্যে মেজদি তর্ক জুড়ে দেবেই। বড়দি শাসনের ভঙ্গিতে খুরপোটি কেড়ে নিয়ে সকাল বেলার খাবার টেবিলে নিয়ে যাবে ধরে।

এ সময়ে রেডিওটা বাজে হয়তো নীচু সুরে। বাবা বিষয় থেকে যান বিষয়ান্তরে। হয়তো রবিদা কিংবা বড়দি-মেজদির বন্ধুরা আসেন কোন-কোনদিন। সকাল বেলাটি জমজমাট থাকে।

আজ কিছুদিন থেকেই সেই জমাটি সকালের তলে তলে ধরেছে ভাঙন। পায়ে পায়ে এসেছে এই কালো-মুখ দিনটি।

হয়তো আজকের দিনের এই ছায়া আসত না ঘিরে, যদি তেমনি জমে উঠত সকালটি। তবে হয়তো এত ভয়, এত অস্থিরতা পেয়ে বসত না সুমিতাকে।

বাবাকে এমনি করে বসে থাকতে দেখে ওর বুকের ভয় ও ব্যথা আরো বাড়ছে। ও এই দেখতে না চাওয়ার জন্যেই বাইরে যাচ্ছে ছুটে ছুটে। বাইরে গিয়ে মনে হচ্ছে, না জানি কী ঘটে যাচ্ছে ভিতরে। তাই ছুটে ছুটে আসছে ঘরে।

ছুটে ছুটে আসছে, আর এই শুধু দেখছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে এ-বাড়ির মনের অন্ধকার আছে চেপে। বইয়ের ওই আলমারি দুটিতে, নির্বাক রেডিওতে, ঢাকনা ঢাকা, মুণ্ডহীন গাধার মত অর্গ্যানটায়, শোফায়, চেয়ারে, টেবিলে আর লাল টকটকে মেঝেয়। তার মাঝে মুখ-ফেরানো বাবার সর্বাঙ্গ ঘিরে ও যেন দেখছে শুধু ব্যথা আড়ষ্টতা। ওর মনে হল, বাবাও যেন ওর মত ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় কান পেতে আছেন লোহার গেটের উপর।

ভিতর দরজার পর্দা সরিয়ে, অন্দরের বারান্দা দিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। সেখানে টেবিলে মুখ দিয়ে এখনো তেমনি বসে আছে মেজদি। যেন কী ভাবছিল একদৃষ্টে চেয়ে, একমনে। সুমিতাকে দেখেই চকিতে চোখ ফিরিয়ে নিল বইয়ের উপর। যেন সে কিছুই ভাবছে না এসব, ব্যস্ত শুধু পরীক্ষার পড়া নিয়ে। এ মুহূর্তে সুমিতা না হয়ে বড়দি কিংবা বাবা হলে মেজদি এ ছলনাটুকু করত না কখনো। কিন্তু সে যে রুমনি। সে শোনে কিছু, কিছু জানে, তবু থাকে আপন মনে, কলেজের পড়া পড়ে, বেড়ায় এদিক সেদিকে। তার কাছে তো ধরা দেওয়া যায় না।

না দিক। মেজদিকে দেখেও যে ওর বুকের পাষাণভার আরো ভার হচ্ছে, সেকথা ওরা বোঝে না কেন। ও ঢুকল তড়িৎ পায়ে, যেমন চলাফেরা করে তেমনি। আড়চোখে

চেয়ে ওর আর মেজদির খাটের মাঝখান দিয়ে চলে গেল দেয়াল-ঘেঁষা আলমারিটার কাছে। কেন যে গেল, তাও নিজেই জানে না। যেন কিছু খুঁজছে, এমনি উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল আলমারির কাঁচের ঢাকায়। ভয় হল, এ-ছলনাটুকুও ধরে ফেলবে মেজদি। কিংবা এখুনি বলে উঠবে বিরক্ত গলায়, 'ছোড়দির পরীক্ষা কী পেছিয়ে গেল নাকি?' মেজদি যখন রাগ করে, তখন রুমনির বদলে বিদ্রূপ করে বলে 'ছোড়দি'। ওর শাসনের মধ্যে একটি বিদ্রূপের হুল থাকে সব সময়ে। সেই হুলের মধ্যে জ্বালা আছে, মধুও আছে। কিন্তু তিক্ততা নেই। ও মানুষটিই এমনি। যা মনে আসে, মুখে তা-ই বলে। কখনো সেকথা সোজা স্পষ্ট, কখনো বাঁকা ও তীব্র। হঠাৎ অচেনা মানুষের মনে হতে পারে, বিষ আছে ওর অন্তরে। সেজন্যে অনেকে ওর সংগে কথা বলে ভেবে, একটু বা ভয়ে ভয়েই। কিন্তু ওকে যে চেনে, সে ওর অন্ধকার মুখের সামনেও হাসতে পারে নির্ভয়ে। শাসন ও স্নেহের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে ও মান-অভিমানের যে মেঘটুকু সঞ্চার করে সুমিতার মনে, সে মেঘটুকু শরৎকালের মেঘের মত এখন আসে, তখন যায়। তার মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষ নেই, নেই শ্রাবণ মেঘের আবর্তন।

তবু ওর মেজদিকেই ভয় সবচেয়ে বেশি। ও যে সবার চোখে ওর অবুঝ মনের কান্না নিয়ে, ওর উৎকণ্ঠা অস্থিরতা নিয়ে, সেটুকু মেজদির সামনে ধরা পড়লে লজ্জার সীমা থাকবে না ওর। সেই মুহূর্তে যেন ধরা পড়ে যাবে ওর কোন গোপন অপরাধ। এ সেই কাঁচা লতাটির সকলের অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠার অপরাধ। যে অধিকার ওকে কেউ দেয়নি, কিন্তু ওর ভিতর দুয়ারের আগল খুলে গেছে আপনি। আর যদি কারুর কাছে ও ধরা পড়ে, সে মেজদি। এ-বাড়িতে খুব বেশি কাছাকাছি ওর আর কেউ নেই।

রুমনিকে এই হঠাৎ আবিষ্কারে হয়তো ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ভরে উঠবে মেজদির মুখ। ওর ওই রক্তরেখায়িত তীব্র পাতলা ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে হয়তো বলবে, কী হলো হঠাৎ তোর?

ভাবতেও কাঁপছে বুকের মধ্যে। সে যে ওর কী লজ্জা! কী ভয়! শুধু কি তাই। ওর মনের ছোট বেড়াটিকে পাশ কাটিয়ে যার মধ্যে দেখা দিয়েছে মহা বিস্তৃতির লক্ষণ, ওর সেই প্রাণে যে অপমান হয়ে বাজবে এবার সেটুকু! সেকি ওর দোষ! ওর সেই অপমানটুকু হয়তো বুঝবে না কেউ, কিন্তু প্রাণের দিগন্তকে তো ও টেনে ছোট করে আনতে পারবে না।

একদিকে এই সারা বাড়ির পাষাণভার কালো ছায়া ওর বুকে জুড়ে। আর একদিকে ধরা পড়ার ভয়। এ দুয়ের আলো-আঁধারিতে ফিরছে ও পা ঢাকা দিয়ে। ফিরছে সর্বত্র, ঘরে-বাইরে, সকলের মুখের দিকে লুকিয়ে তাকিয়ে। খুঁজে মরছে একটু নিভৃতি, একটু সান্নিধ্য, একটু প্রসন্নতা।

মেজদির কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার ও ভয়ে ভয়ে তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে। মেজদি তেমনি রয়েছে বইয়ের মুখোমুখি। এক বেণী এলিয়ে পড়েছে পিঠে, কিনুরীর ভাঁজে ভাঁজে বাসি চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে। কাঁধের পাশ থেকে আঁচল গেছে সরে। নীল সার্জের ব্লাউজ ওর গায়ে। ছোট গলা ব্লাউজ কিন্তু পিছন থেকে যেন জামাটি কেউ হ্যাঁচকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। নিজেই হয়তো উঠতে বসতে অজান্তে বিস্রস্ত করেছে নিজেকে। মাঘের এই সকালে ঘরের মধ্যেও কম শীত নেই। মেজদির যেন শীত করছে না। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে ওর শক্ত চওড়া কাঁধ। নীল জামার পাশে, হঠাৎ ওই খোলা কাঁধ যেন এক ঝলক রোদ। বসেছে ও সারা চেয়ারখানি ছড়িয়ে। সুদীর্ঘ পুষ্ট ফর্সা হাত দুখানি দেখলে এত গম্ভীর আর সুন্দর মনে হয় মেজদিকে, যেন ও এক দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী। তেমনি ওর চলাফেরা। দোহারা গড়ন ওর। এক সময়ে বাঙলা দেশের বাইরে থাকতে খেলাধুলো করেছে প্রচুর। ওর হাতে, পায়ে, বুকে, সারা শরীর জুড়ে উদ্ধত বলিষ্ঠতা। মেজদির এ দীপ্ত স্বাস্থ্যের জন্য ওকে যত সুন্দর লাগে, সুমিতার ভয়ও করে তত। আর আশ্চর্য! মেজদির শরীরটিকে প্রতিটি রেখাকে যখন বড় বেশি তীব্র মনে হয়, তখন কেন যেন ওর লজ্জা করে। মেজদি চলাফেরা করে স্বচ্ছন্দে, কিন্তু সুমিতার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ও আশে-পাশের লোকের দিকে দেখে তাকিয়ে,

কেমন করে দেখছে সবাই মেজদিকে। সেই ফাঁকে নিজেকেও বারেক দেখে নেয় লুকিয়ে। তুলনায় ও অনেক অপুষ্ট আর কাঁচা। তবু মনে হয়, ওরও শরীর যেন মেজদির মত, বাঁধভাঙা দিগন্তের ঢেউ হয়ে দুলেছে। ওর এই সেদিনে নিয়মিত কাপড় পরতে শেখা শরীরে, তাড়াতাড়ি ওর নিজেরও শাড়ি টানে, জামা ঠিক করে।

কিন্তু মেজদি তেমনি। বেচারী রুমনির এই সঙ্কোচে, অদ্ভুত সংকটে ওর কিছুই যায় আসে না। ও এত সাবলীল, সপ্রতিভ, দৃপ্ত, অথচ উদাসিনী যে, লজ্জার অবকাশ ওর নেই। মেজদির এই শরীরটির সঙ্গে ওর মনেরও একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ওর সোজা কিংবা বাঁকা কথা শুনেই যে শুধু লোকে ওকে ভুল করতে পারে, তা নয়। ও যখন সোজা চোখে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দ-গতিতে হাঁটে, তখন ওকে মনে হয় অহঙ্কারী মেয়ে। কিন্তু যারা ওকে চেনে, তারা জানে, অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই ওর মনে।

চওড়া ফরশা মুখখানিতে ওর এই স্বাস্থ্যের দীপ্তি একটু যেন রুক্ষতাই দিয়েছে এনে। সৌন্দর্যের বাহন যে কোমলতা, তা থেকে ওর মুখখানি কিছু বঞ্চিত। কিন্তু সেইটুকুই মানানসই করেছে ওকে সর্বাঙ্গে। রূপসী নয়, তবু রূপ দেখলে ওর সবাই যেন অবাক হয়ে চায় ফিরে।

কেবল চোখ দুটি ওর এসব কিছু থেকে আলাদা। সেখানে কেমন এক অতল গভীরতা, স্নিগ্ধতা, অতল দৃষ্টি। ওই চোখে যখন রাগ করে তাকায়, তখন মনে হয়, সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে ওর কাছে।

ও বসে আছে তেমনি, সুমিতার দিক থেকে পিছন ফিরে। মুখোমুখি রয়েছে বই। পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে মুখের একটুখানি। চোখ স্থির। পড়ছে না, বোঝাই যাচ্ছে। পাতলা তীক্ষ্ণ রেখায়িত ঠোঁট যেন খুলবে না কিছুতেই, এমনি কঠিনভাবে রয়েছে এঁটে। যতবার এসেছে সুমিতা এ ঘরে, দেখেছে, অমনি করেই বসে রয়েছে ও সারাক্ষণ। সেই যে ছোটবেলায় সিমলায় থাকতে বরফ জমে থাকতে দেখেছে, সেই যে শিশু চোখের বড় ভয়ের ওর দেখা সেই থমথমে নির্বাক কিম্ভূত আকার পাহাড়ের পাথুরে ভূত, সবাই ঠিক তেমনি হয়ে গেছে। কী ওরা চায় কী ওরা ভাবছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। তাতে যেন সুমিতার আরো অন্ধকার লাগছে, বুকের ভার বাড়ছে আরো, নিঃশব্দে কাঁদিয়ে মারছে ওকে। সুমিতাকে ওরা বলবে না কিছু, কিন্তু ওরা নিজেরা কেন নীরব। ওরা যদি একটু কথা বলত, একসঙ্গে হত, তবু যেন হাল্কা হওয়া যেত একটু।

সুমিতা আরো ঝুঁকে, আরো বেঁকে দেখল মেজদিকে। কে জানে মেজদি কেঁদেছে কি না। মেজদিকে ও কোনদিন কাঁদতে দেখেনি। কিন্তু এমন স্তব্ধ হয়ে থাকতেও দেখেনি কোনদিন। মেজদির সর্বাঙ্গ ঘিরেও সেই আড়ষ্টতা, ঠিক বাবার মত। যেন ও নড়তে চড়তে পারছে না, ঘিরে রয়েছে ওকে নির্বাক বিষণ্ণতা। অথচ আজকের এই ব্যাপারে ওর শৈথিল্য ছিল না। গিরীনদা'র প্রতি ও বড় নিষ্ঠুর। যেন ও-ই সবচেয়ে বেশি মর্মাহত গিরীনদা'র ব্যাপারে। বড়দি যদিও বা গিরীনদাকে কোনদিন

মা করতে পারে, মেজদি পারবে না। ইটিই ওর চরিত্রের বিশেষত্ব। ও জে যাকে ফাঁকি বলে জেনেছে, নেছে পাপ বলে, সেখানে ওর কান আপস নেই। কিন্তু যেখানে ওর শ্বাস আছে, ভালোবাসা আছে, সেখানে টল ধরানো সহজ নয়। সুমিতা ওদের াছে যতখানি ছোট হয়ে গেছে, বড়দি-জদি পরস্পরের কাছে তত নয়। ওদের ম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ, বন্ধুর মত। গত ছর এমন দিনেই যখন বড়দি চলে এল খানে, তখন মেজদির এম -এ পরীক্ষা শুরু ওয়ার কয়েকদিন বাকি। কিন্তু ও কিছুতেই রীক্ষা দিতে পারলে না। বাবা বলেছিলেন, ড়দিও বলেছিল, শুধু শুধু একটা বছর ট করবি ঝুমনো?

ও বলেছিল, তোমরা বলছ 'শুধু শুধু'। কন্তু আমি যে পারব না কিছুতেই। াইতেই বোঝা গিয়েছিল, বড়দির জন্যে ওর াঘাত বেজেছে কতখানি। পরীক্ষায় ও কানদিন ফেল করেনি, এ ব্যাপারে ওর বহেলা, অমনোযোগ দেখেনি কেউ কানদিন। ওর পরীক্ষা না দেওয়াটা সেই-জন্যে বড় বিস্মিত ব্যথার মত ঠেকেছিল সকলের কাছে, ঘরের এবং বাইরের। সুমিতারও। মেজদির পরীক্ষা না দিতে পারাটাই যেন ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকখানি।

বড়দি আর গিরীনদার বোঝাপড়ার ব্যাপারে, একদিকে গিরীনদা যতই জেদ করেছেন, ততই নির্দয় হয়েছে মেজদি। ওর নির্দয়তা দেখে বড় কান্না পেয়েছে সুমিতার। কেবলি ভেবেছে, মেজদি ইচ্ছে করলেই বুঝি সব মিটিয়ে দিতে পারে। ও মেজদির উত্তেজনা দেখেছে, থমথমানি দেখেছে। মেজদির ওই চোখ দুটির মত হৃদয়ের অতলে আর কিছু আছে কিনা, তাতো ও জানে না। ও তাই কেবলি ভেবেছে, মেজদি যদি ওর সমস্ত ব্যক্তিত্ব দিয়ে সব অন্ধকার দূর করে দিত, তবেই যেন চারদিকের সব বিবাদ-বিসম্বাদ যেত কেটে।

কিন্তু আজ সব বোঝাপড়ার, সব ভাবা-ভাবি, সব কথাবার্তার শেষ দিন। আজ কেন ও অমন স্তব্ধ হয়ে আছে বসে। যেন ওরও সমস্ত উত্তেজনার, সমস্ত যুক্তি-তর্কের শেষ দিন আজ।

আজ শেষ দিন। কোথাও একটু আশা পাচ্ছে না সুমিতা। আজ এই শেষ দিন, আর আজ এই স্তব্ধতা। এতদিন, প্রতিদিন ধরে, প্রতিদিনের একটু একটু ফিরে-আসা অন্ধকারে হঠাৎ দিগন্ত ব্যাপ্ত চকিত আলোর স্বপ্ন দেখেছে ও। ওর নিজের মত ওর কিছু সুখ-দুঃখ আছে। ও যেভাবে বেড়েছে, বড় হয়েছে, দিদি, বাবা, স্কুল-কলেজের বন্ধু, পরিবারের বন্ধুবান্ধব, ওর পাঠ্য আর অপাঠ্য বইয়ের অতি ছোট্ট একটুখানি রাজ্যে, এ সবকিছু মিলিয়ে ওর সুখ-দুঃখ আলাদা একলা একলা এক কোণে গড়ে উঠেছে। ওর সেই সুখ-দুঃখের দিকে এ-বাড়ির কারুর নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আজকের মত এত বড় দুঃখের মুখোমুখি ও আর কোনদিন হয়নি। এত ভয় ও আর কোনদিন পায়নি।

কিন্তু কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে ও ওর অবুঝ, অনস্বীকৃত কান্নার গহ্বরে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে না।

রাত পোহানো থেকে ও যেমন করে বার বার এমনি ঘরবার করেছে, গেছে প্রত্যেকের কাছে কাছে, তেমনি এ-ঘর থেকে পা বাড়াল বড়দির ঘরে। যে ঘরে গেলে ওর বুকের ভয় সশব্দে চীৎকার দিয়ে উঠতে চায়। উদ্বেল হয়ে ওঠে কান্না। তবু না গিয়ে পারে না ও। ওর ছোট বুকে যে আশা বাসা বেঁধেছে, তার মধ্যে তো ওর কোন ছলনা নেই।

ছলনা যেটুকু, সেটুকু তো ওর ভাবের বহিরাঙ্গনের ছদ্মবেশ। বড়দির ঘরে পা বাড়াবার আগে, আরেকবার তাই ও ওর ছদ্মবেশ ফিরিয়ে আনল। ওর সেই কিছু-না-জানা, কিছু-না-বোঝা বুমনির ছদ্মবেশ। ও জানে না, যদি ওকে তেমন করে কেউ লক্ষ্য করত দেখতে পেত, ও যতই ছদ্মবেশ ধারনের চেষ্টা করছে, ততই প্রকাশ করে ফেলছে নিজেকে। আগুন-লাগা আঁচলে ঝাপটা দিলে তো সে নেভে না, আরো বাড়ে।

ঘরের ভেতর দিয়ে ঘরে যাওয়ার দরজা রয়েছে। মাঝখানে রয়েছে পর্দা। খাটের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল বড়দির সঙ্গে। মেজদি যেমন চকিতে নিয়েছিল চোখ ফিরিয়ে, বড়দি তা নিতে পারল না। ও যেমন তাকিয়েছিল, তাকিয়ে রইল তেমনি। কেবল একবার চোখাচোখি হল সুমিতার সঙ্গে। চোখে ওর শূন্য দৃষ্টি। যেন কী এক ভাবের ঘোরে ও মগ্ন রয়েছে। মনের পায়ে পায়ে চলে গেছে অন্য জগতে। সেখানেই নিবদ্ধ রয়েছে চোখ। তার মাঝখান দিয়ে কে চলে গেছে, কার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে এক মুহূর্তের, তা ওর মনে গিয়ে ছোঁয়নি। তার ওপারে যে গেছে, সে বুমনি। সে অনেকবার গেছে, এসেছে আবার। (ক্রমশ)

শোলার কাজ, ডাকের সাজ

নাগরিক

যীশুখৃষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গীর্জেতে' বলে একদা যে আন্টুনি সাহেবকে ব্যংগ করেছিলেন বাঙালী কবিয়াল সেই আন্টুনি সাহেব ছাড়াও আর এক আন্টুনি সাহেবের খবর পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সে আন্টুনি সাহেব ছিলেন কবি, মুখে মুখে কবিতা করে, ছড়া বেঁধে কবির লড়াইয়ে জেতাই ছিল তাঁর কাজ কিন্তু এই নতুন আন্টুনি সাহেব ছিলেন পটুয়া। আপার চিৎপুর রোডের কোনও এক জায়গায় তার বাস ছিল। অদ্ভুত নাকি ছিল তার প্রতিমা গড়ার কাজ! সবচেয়ে বিস্ময়কর যা ছিল তা' নাকি তার হাতের শোলার সাজ আর ডাক সাজ।

এই আন্টুনি সাহেবের সম্পর্কে ইতিহাস কি বলবে জানি না, কিন্তু কুমোরটুলীর পাড়ায় দেখেছি এর নাম অনেকেই জানেন। অনেকেই বললেন, তিনি প্রথম জীবনে বাঙালীই ছিলেন। মানে, বাঙালী হিন্দুই। পরে নাকি অভাবের চাপে পড়ে নিজধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। খুব অবাক হয়ে দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, হিন্দুর বিগ্রহ একজন অন্যধর্মের লোকের হাতে তৈরী করা সত্ত্বেও বাজারে বিক্রি হোত কি করে? কোনও আপত্তি উঠতো না? কেউ তার কোনও উত্তর আমাকে দিতে পারেন নি।

আন্টুনি সাহেব সম্পর্কে নানা গল্প আমি শুনেছি। সত্য-মিথ্যার কথা বলতে পারি না। একবার চিৎপুর অঞ্চলের এক রাজ-বাড়িতে ডাক পড়ল আন্টুনি সাহেবের। তখন প্রতিমা গড়া নিয়ে কলকাতার বড় বড় বাড়িতে খুব প্রতিযোগিতা চলতো। একে অন্যের ওপর টেক্কা দেবার চেষ্টা করতেন নানাভাবে। প্রত্যেক বাড়িরই নিজস্ব বাধা পটুয়া থাকতো। প্রতি বছর নানাভাবে প্রতিমা গড়তেন এ'রা। এখন যেখানে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কল্যাণে বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের চওড়া রাস্তা বেরিয়েছে ওরই কাছাকাছি নদীর তীর বরাবর প্রতিমার পর প্রতিমা এসে হাজির হতো বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যায়। রঙমশাল জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে বিচার হতো সে বছরের সেরা প্রতিমা কোনখানি। যে বাড়ির প্রতিমা বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে স্থির হোত সেই বাড়ির পটুয়ার কপালে জুটতো পুরস্কার।

আন্টুনি সাহেবের ডাক পড়লো। রাজা-বাবু এসে বললেন, এবারের ফার্স্ট প্রাইজ এনে দিতে হবে আমাকে। যত টাকা লাগে খরচা করব।

শোলার সাজের ওপর জার্মানী থেকে আনানো পেতলের কাজ করা সব ফুল, লতাপাতা দিয়ে প্রতিমা সাজালেন আন্টুনি সাহেব। প্রাণ দিয়ে প্রতিমা গড়লেন। ডাকের সাজ দিয়ে আশেপাশের জায়গা ভরিয়ে দিলেন। প্রথম হয়ে বাজি জিতে এলেন সেবার।

নিজের গলার হার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন রাজাসাহেব। মুক্তোবসানো সোনার হার।

পুরোনো দিনের অনেক কথাই হচ্ছিল শিল্পী নিতাইচরণ পালের সঙ্গে। প্রসংগ-ক্রমে তিনি বললেন, পটুয়া আন্টুনি সাহেবের কথা আমিও পড়েছি। কাজের সুখ্যাতিও শুনেছি। মূর্তিগড়া, শোলার আর ডাকের সাজ খুব ভাল করতেন বলে জানি। তবে বিস্তারিতভাবে আমিও কিছু বলতে পারবো না।

শোলার কি ডাকের সাজ তৈরী করতে লাগে শোলার কাপ, জরির আন্টি, বুলিয়ান, চুমকি, জামিরা, বশমা কাগজ, পেটা চুমকি, মুক্তোর মালা, তবক আর নানারকমের রঙীন কাগজ। শোলার সাজে ভুরোও লাগে। আগে ঢাকাই কারিগরেরা রাঙের কাজও করতেন শোলার কাজের সঙ্গে।

নিতাইবাবু বলছিলেন, বাংলা প্রতিমার রেওয়াজ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আগে এক একটা সাজ তৈরী হতো হাজার, এগারোশো টাকা দিয়ে। কখনো কখনো দেড়, দু' হাজার টাকার সাজ বানানো হোত শুনেছি। আর এখন পাঁচ কি ছ'শো টাকার মধ্যে গোটা ঠাকুরটাই গড়ে দিতে হয় আমাদের। ভাল জিনিস কি করে হবে বলুন?

একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন, আপনার সামনেই একজন মালাকরকে ডাকছি। তার সঙ্গে নিজেই আপনি কথা বলুন।

কথা বলে দেখলাম, বছরের মধ্যে আজ
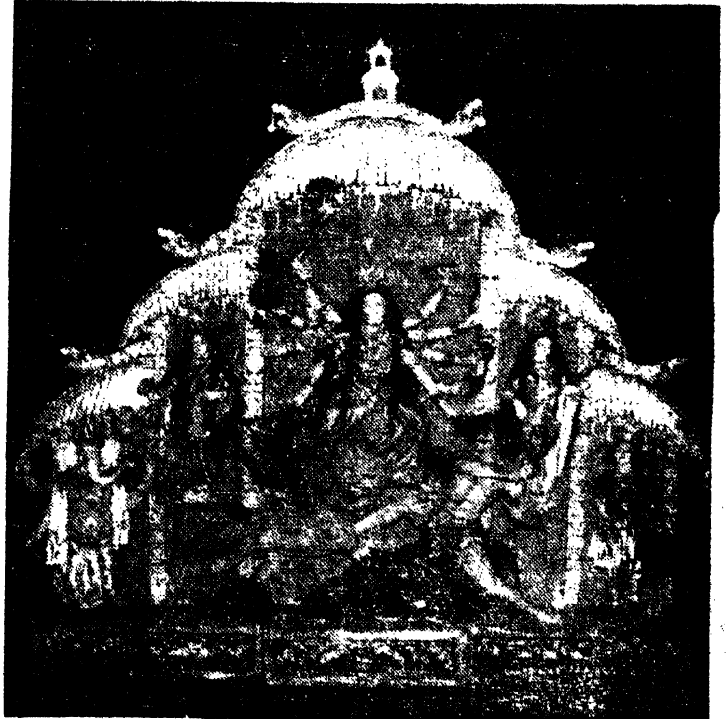
শোলার সাজ। আধুনিক পদ্ধতির

বাঙলা প্রতিমার গায়ের পুরাতন পদ্ধতির শোলার সাজ

কি চারমাস কাজ হয় তার। বাকী
া কাঠের কাজ করে পেট চালাতে হয়।
। ছেড়ে দিয়ে নতুন করে অন্য কোনও
শুরু করার মতো বয়স আর নেই।
ছেলেরা এ-ব্যবসা থেকে প্রায়ই অন্য
সরে যাচ্ছে।

ালা জলে জন্মায় এবং তা' জন্মায়
পরিশ্রমেই। এর জন্য আলাদা করে
ও চাষ করার দরকার হয় না। একমাত্র
া জেলার বাওরবিলেই যা শোলা
য় তাতেই বাঙলার এই শিল্পটির
চাহিদা মিটে যেতে পারে। তবে
াদেশের প্রায় সব জায়গায়ই কিছু
শোলা হয়।

ালা থেকে শুধু যে শোলার সাজই
ী হয় তাই নয়। তা' থেকে আরও নানা
্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন শোলা-হ্যাট,
প ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে। শোলার
পর না হলে বিয়েই সাংগ হয় না
ালী-ঘরে। নানারকম শোলার তৈরী
মালা, কদমফুল, পদ্ম প্রভৃতিও উৎসব-
ুষ্ঠানে লাগে। শোলার তন্তুজালোয়ার
র জাল দিয়ে তৈরী 'ইন্দ্রজাল' রাসলীলার
অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

বালী-বারাকপুর। হাওড়া স্টেশন থেকে একান্ন, চুয়ান্ন কি ছাপ্পান্ন নম্বর বাসে আপনি
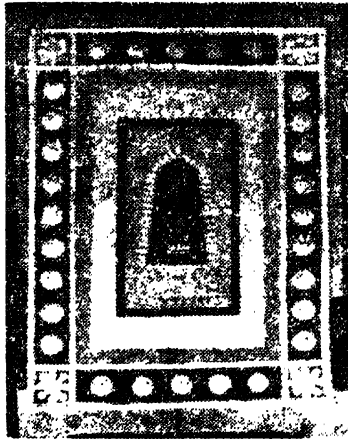
সবচেয়ে আধুনিক শোলার সাজের এ এক নমুনা। প্রতিমাসজ্জায় শোলার কাজের মধ্যেও রকমারী নক্সা করার রেওয়াজ এদেশে ক্রমেই আসছে

বালী-বারাকপুরে গিয়ে হাজির হতে পারেন। অক্টোবর-নভেম্বরের কোনও এক সময়ে এখানে যে রাসের মেলা বসে সেখানে শোলার কাজের সবচেয়ে ভালো নিদর্শন-গুলি আপনি দেখতে পাবেন।

বালী-বারাকপুরের এরকম অদ্ভুত নামের যে কারণটি লোকমুখে প্রচারিত তা' কতখানি সত্য জানিনে। আসল বারাকপুরে (২৪ পরগণায়) ইংরেজের সেনানিবাসের পত্তন হবার আগে নাকি হাওড়া জেলার বালীতেই সেনানিবাসটি করার কথা হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা গোরাদের সংগে একত্র থাকায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানান। ফলে অপেক্ষাকৃত বিরলবসতিসম্পন্ন ২৪ পরগণার বারাক-পুর অঞ্চলটিই সরকারী সেনানিবাসে পরিণত হয়। সেই স্থানটিই বালী-বারাক-পুর নামে আজও পরিচিত হয়ে আছে।

বালী-বারাকপুরে এখনও কয়েক ঘর মালাকরের বাস রয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসছে। হাতের কাজের উৎকর্ষ সাধনেও আসছে শিথিলতা। এবং তা' আসছে দারিদ্র্য থেকেই। আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত বালী-বারাকপুরের কোনও মালাকরের তৈরী একটি হনুমানের মূর্তি আজও সেদিনের সেই উন্নত আর্টের পরিচয় দিচ্ছে।

২৪ পরগণার খড়দহের মেলায়ও শোলার কাজের দেখা মিলবে।

নিতাইবাবু বলছিলেন, প্রতিমার সাজের বড় বাহার ছিল জানবাজারের রানী রাস-মণির বাড়িতে। শোভাবাজার রাজবাটী, খারিকবাড়ি প্রভৃতি কলকাতার কয়েকটি পুরাতনকালের অভিজাতগৃহের প্রতিমা-সজ্জাও দেখবার মতো। তবে এখন বাঙলায় প্রতিমা গড়ার রেওয়াজ প্রায় সব জায়গাতেই কমে যাচ্ছে। এই সব রাজবাড়িতেই এখনো এ-শিল্প যা কোনোমতে বেঁচে আছে।

মালাকর দু'শ্রেণীর। এক যারা বাগানে কাজ করে, ফুল তোলে, মালাগাঁথে। আর এক যারা শোলার কাজ করে। প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করার মতো বিশেষ কিছু নেই তাই এ আলোচনা দ্বিতীয় শ্রেণীর মালাকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

মালাকর অর্থাৎ যারা শোলার কাজ করে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সব জড়িয়ে দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার পরিবার আছে এ ব্যবসায়ে। তার মধ্যে নদীয়া জেলাতেই প্রায় আটশো পরিবার লেগে আছেন এই কারবারে। শ'চারেক লোকের এটাই মুখ্যব্যবসা। বাকী সকলে চাষবাসের কাজ করার সাথে সাথে অবসর সময়ে এ কাজ করে থাকেন। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ, মাতিয়ারী এবং কৃষ্ণনগর সদরেই এদের বেশী দেখা যায়।
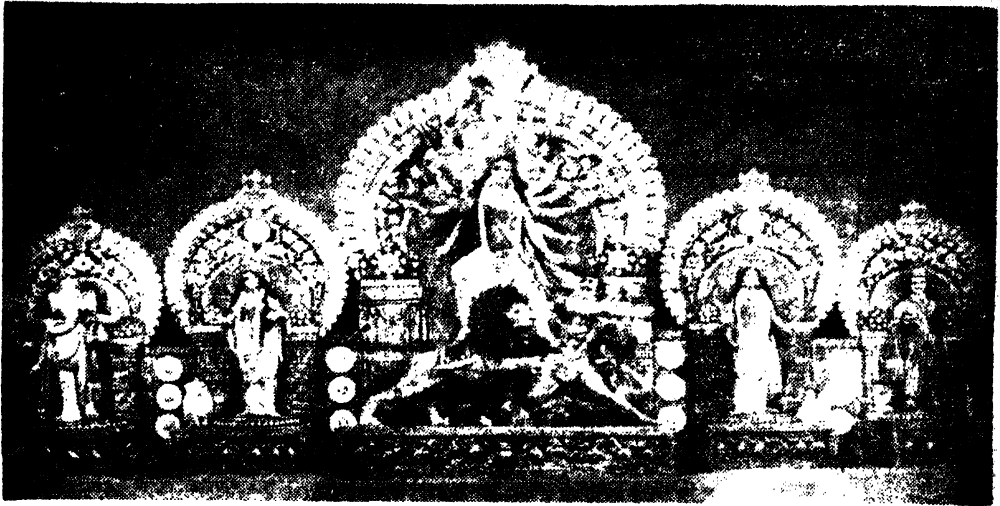
শোলার সাজের আর এক বাহার

হাওড়া জেলার বালী-বারাকপুরে, আমতা, হুগলীর ডানকুনি, উত্তরপাড়া, শিয়াখালা, ২৪ পরগণার খড়দহ, মেদিনীপুরের তমলুকে, গড়বেতা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে, সোনামুখী, বর্ধমানের কাটোয়া, দোমোহানী, জামুরিয়া, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে, বেলডাঙ্গা, বীরভূমের ময়রাশোল, দুবরাজপুরে, ময়ূরেশ্বর প্রভৃতি জায়গায় বাঙলার মালাকরেরা কয়েকঘর কয়েকঘর করে ছড়িয়ে আছে।

পূর্ব বাঙলার বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানের শোলার কাজেরও কম খ্যাতি ছিল না।

কলকাতাতেও মালাকরদের ঘর আছে। নতুনবাজার, কুমোরটুলী, বাগবাজারে। পাকিস্থান থেকে কিছু উদ্বাস্তু মালাকর-পরিবারও এসে কাজ করছেন মাণিকতলা অঞ্চলে।

অ্যাসিস্টাণ্ট ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রীজ বলছিলেন, যুদ্ধের সময়ে নদীয়ার মালাকরদের হাল ফিরে গিয়েছিল। শোলার টুপীর ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো বানিয়ে তাদের চালান আসতো কলকাতায়। এখানে হালসীবাগানে, চেতলায় লাইনিং দিয়ে, মানে জামাকাপড় পরিয়ে শোলার হ্যাটের চেহারা দেওয়া হতো পালটিয়ে। যুদ্ধের বাজারে তা' কাটতোও ভালো। তবে এখন খুব বাজার মন্দা। নতুন যুগের হাওয়ায় টুপী পরার ফ্যাশন গেছে কমে। বাজারও গেছে পড়ে।

সরকারী প্রচেণ্টার বিষয় উল্লেখ করাতে তিনি বলেন, নদীয়ার কালীগঞ্জেই সরকার একটা ট্রেনিং কাম্ প্রোডাকশন সেণ্টার তৈরী করবেন ঠিক করছেন। তাতে এ বিষয়ে কারিগরদের একদিকে যেমন শিক্ষা দেওয়া চলবে তেমনি অন্যদিকে এই ব্যবসাটির বিদেশে প্রসার চেষ্টা থাকবে। বিশেষ করে শোলা-হ্যাটের ফরেন্ মার্কেট—এই যেমন উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি জায়গায় ভালই পাওয়া যাবে।

এই কুটিরশিল্পটিতে ঠিক কত টাকা খাটছে তা সঠিক বলা শক্ত। কারণ এ ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। শোলা খুব হালকা বলে তা' প্রায়ই ওজন দরে বিক্রি না হয়ে বাণ্ডিল হিসাবে বিক্রি হয়। পাঁচ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এক বাণ্ডিল শোলা তিন-চার টাকার মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। লম্বায় সাধারণত এগুলি পাঁচ, ছয় ফুট থেকে ন' দশ ফুট অবধি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, জলা নীচু জমিতে এগুলো আপনিই হয়। শোলা-হ্যাট যারা বানায় তাদের আয় গড়ে মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশী কোনোদিনই হয় না।

তাই এ ব্যবসা থেকে আর্ট ক্রমেই সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছেন আর্টিস্টরাও। কয়েকজন নামকরা প্রতিমার সাজের কারিগরের নামের একটি তালিকা দিচ্ছি। এর মধ্যে শোলার সাজ আর ডাকের সাজ উভয় শ্রেণীর কারিগরই আছেন।

ত্রৈলোক্য মালাকর, চণ্ডী মালাকর, পরমেশ্বর মালাকর, কালীপদ সরকার, কালীপদ দাস, ভুলু সাজওয়ালা, বেহারী দাস, বিষ্ণুচরণ অধিকারী, নগেন্দ্রচরণ দাস, আশু মালাকর, রাধাবল্লভ মালাকর, ভজহরি মালাকর, গৌরীরাম দাস, শৈলেনচরণ দাস, বলাই দাস, কার্তিকচরণ দাস প্রভৃতির নাম পেয়েছি। এ তালিকার কয়েকজন এখনও বেঁচে আছেন।

ফ্লুরেসেণ্ট বাতি, মাইকে হিন্দী ছবির বহুল প্রচারিত গান আর আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোর নানা কেরামতিভরা প্যাণ্ডেলের নীচে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আজও কিছু পরিমাণ বাঙালী দর্শকের মনে সেদিনের সেই কাঁসর-ঘণ্টা, ধূপধুনো, আরতি, ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে মায়ের গায়ের বাঙলা সাজের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। সেদিন ভক্তি, শ্রদ্ধা আর প্রীতির বন্যা ছুটতো উৎসবমণ্ডপে আর আজ ক্ষমতার, অর্থের কিংবা দম্ভের। পুরোনো দিন ফ্লুরেসেণ্ট বাতির রোশনাইয়ে ঢাকা পড়ে গেছে।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শ্রীনিতাইচরণ পালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আনন্দ, এবং আনন্দ

মণীন্দ্র রায়

মা, আমি হাওয়ার হাতে টিনের মোরগ যে আনন্দে
ঘুরে ঘুরে নাচে মানমন্দিরের চূড়ায়, কখনো
চাইনি তা। গলুই-লাফানো এই স্রোতে আদি-অন্তে
ভাঙে সংঘর্ষের ঢেউ, ক্লান্তি, নামে অশ্রুর লবণও।
তবু কুমোরের মতো শিল্পস্নাত চেতনা আমার
কাঠামোয় খড় বাঁধে, তাল তাল বোবা মাটি ছেনে
মূর্তি গড়ে। কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার,
বিশাল কয়লার খাদে হীরা রেখে যে বলে : বেছে নে।

যা-কিছু হয়েছে, হবে, সে কি জল পড়ে পাতা নড়ে
এত সোজা! বীজের খোলস ভাঙতে চারা কেন তবে
বাঁকায় পিঠের ধনু? নদী ছুটে যায় না সাগরে
টর্চের আলোর মতো ঋজু পথে? আনন্দের স্তবে
মুগ্ধ তুমি। তবু বৃন্দাবনে জেনো থাকে তারই নাম
যে কৃষ্ণ, যে সয় জ্বালা। বাকী সবই দাম-বসুদাম॥

মৃত্যুর পরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দু দণ্ড দাঁড়াই ঘাটে। এই স্থির শান্ত জলে তার
আয়ত দৃষ্টির মৌন রহস্য বিম্বিত হয় যদি;
দু দণ্ড দাঁড়াই এই আদি অন্ধকারে। বলি, "নদী,
কে তার ব্যর্থতাগুলি ক্ষিপ্র হাতে নিয়েছে কুড়িয়ে
সন্ধ্যার আকাশ, অস্ত-সূর্য আর নিঃসঙ্গ হাওয়ার
বিষণ্ণ মর্মর থেকে, শীতের সন্ন্যাসী-বনভূমি
থেকে? তুমি নাকি? তার আকাঙ্ক্ষার ক্লান্ত পথ দিয়ে
কে ফিরে এসেছে এই অপরূপ অন্ধকারে,—তুমি?"

দু দণ্ড দাঁড়াই ঘাটে। তরঙ্গের অস্ফুট কল্লোলে
কান পাতি। যদি তার কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়।
যদি এই মধ্যরাত্রে শীত-শীত সুন্দর হাওয়ায়
নদীর গভীরে তার কান্না জেগে ওঠে। হাত রাখি
জলের শরীরে। বলি, 'নদী, তোর নয়নের কোলে
এত অন্ধকার কেন, তুই তার অশ্রুজল নাকি?"

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

২০শে এপ্রিল, শুক্রবার

আজ আমরা সিংহলের অভিমুখে চলিয়াছি। পাছে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে হয়, এই জন্য আমাদের স্টীমারের বেগ কমাইয়া দিয়াছে। স্টীমার ধীরে ধীরে চলিয়াছে। গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে পড়িয়া, সাগরের যে অবস্থা দেখা গিয়াছিল, এদিকে সে অবস্থা নাই। নির্বাত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শোভা অতি অপূর্ব্ব। স্টীমারের লোকের আমোদ, প্রমোদ, আহার বিষয়ে এক প্রকারই চলিয়াছে। বিশেষ নূতন কিছু নাই।

মান্দ্রাজ হইতে কতকগুলি নূতন লোক আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইটি বিবি সন্তান-সন্ততি লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভাবটি ভাল। আমি তাঁহাদের ছেলেদিগকে কিছু পিণ্ডী খেজুর ও লেবু প্রভৃতি খাওয়াইতেছি।

২১শে এপ্রিল, শনিবার

আজ প্রাতঃকাল হইতে একটু একটু জমি দেখা যাইতেছে। আমরা সিংহল বেষ্টন করিয়া চলিয়াছি। ইংরাজেরা বাইনোকুলার গ্লাস চক্ষে লাগাইয়া দেখিতেছেন। আমিও পার্ব্বতীবাবুর গ্লাসখানা আনিয়া একবার দেখিলাম। সিংহলের পাহাড় সকল দৃষ্ট হইতেছে। অদ্যকার দিনও একভাবেই গেল।

২২শে এপ্রিল, রবিবার

আজ প্রাতে আমরা কলম্বো বন্দরে পৌঁছিলাম। সত্বর স্নান আহার সারিয়া, ৯টার সময় দুর্গামোহনবাবু, পার্ব্বতীবাবু ও আমি জাহাজ হইতে নৌকাযোগে কূলে গমন করিলাম। সেখানে একখানি ভাড়াটে গাড়ি করিয়া শহর দেখিবার জন্য বাহির হওয়া গেল।

সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়া, দুর্গামোহনবাবু ও পার্ব্বতীবাবু টেলিগ্রাম করিলেন। তৎপরে পোস্টাফিসে গিয়া বিপিনের (১) পত্র, কাশীর মহেন্দ্রনাথ সরকারের পত্র, হেম-এর পত্র ও দ্বারিকাবাবুর (২) পত্র, এই কয়খানি পত্র ডাকে ফেলিয়া দিলাম। তৎপরে গাড়িতে চড়িয়া শহর ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে গবর্নরের কাউন্সিলের মেম্বার ও ব্যারিস্টার অনারেবল রামনাথন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া গেল। ইনি মৃত স্যার মুথু কুমারস্বামীর ভাগিনেয়। ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা মিঃ অরুণাচলম সি এস্ একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সহিত আলাপ হয় নাই। দুর্গামোহনবাবু পূর্ব্বে যখন সিংহলে আসিয়া একমাস ছিলেন তখন ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। দুইটি ভাই ইংরাজী ধরনে থাকেন। বাংলো দুইটি বাগানের মধ্যে; অতি সুন্দর বাড়িগুলি, ইংরাজের বাড়ির ন্যায় অতি সুন্দররূপে সাজান। দুজনেই অতি ভদ্র। ইঁহাদের সদ্ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ যাপন করিয়া এখানকার বিদ্যোদয় কলেজ নামক বৌদ্ধ কলেজ সন্দর্শন করিতে গেলাম। এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পুরোহিত সমঙ্গলাম নামক পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, এখানে যে সকল ছাত্র আছে, তাহারা বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করে। রবিবার হওয়াতে, ছাত্রগণকে কলেজে দেখিতে পাওয়া গেল না। কতগুলি ছাত্র রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবিবাহিত, গৈরিকধারী, মুণ্ডিতশির, বৌদ্ধ চিহ্নের মধ্যে এইমাত্র। আমি ইঁহাদের উপাসনা স্থান দেখিতে চাহিলাম; ইঁহারা লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে হাতের লেখা সুন্দর সুন্দর অনেক পুঁথি দেখা গেল। তৎপরে আমাদিগকে একটি ঘরে লইয়া গেলেন; সেখানে একটি শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত শয়ান মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বৌদ্ধ ছাত্র বলিলেন যে, তাহা বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ ভক্ত পুষ্পাদি দ্বারা তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। একথা কতদূর বিশ্বাস্য জানি না; কিন্তু ঐ মূর্ত্তির সমীপে কতকগুলি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিলাম। তৎপরে আমরা চলিয়া আসিলাম।

সিংহলের অধিবাসিগণ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। তামিল সিংহলী ও বর্গার। বর্গারগণ আদিম পর্তুগীজ; ঔপনিবেশিকদিগের সন্তান। ইহারা পূর্ব্বে গভর্নমেণ্টের বিশেষ অনুগৃহীত ছিল। কিন্তু এখন ততদূর নহে। তামিলগণ উৎসাহী, কর্ম্মঠ ও এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্য অধিকাংশ তাঁহাদেরই হস্তে। ইহাদের তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি এখানকার গভর্নরের কাউন্সিলে আছে।

মিঃ রামানাথন উদ্যোগী হইয়া এখানে Ceylon Examiner নামে একখানি দৈনিক ইংরাজী কাগজ চালাইতেছেন। জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা এই কাগজ পরিচালিত। বেতন দিয়া একজন বর্গারকে সম্পাদক রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে কোনও ক্লাব প্রভৃতি নাই। রামানাথন

(১) বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। (২) "অবলা-বান্ধব"-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নন, একটা ক্লাবের মত ছিল, লোকে ন বড় মদ খায় বলিয়া তুলিয়া দেওয়া ছে।

হলীদিগের মধ্যে বালিকাদিগের বাল্য-বিবাহ দিবার রীতি নাই। ১৮।১৯ র পূর্বে বালিকাদের বিবাহ হয় না। দিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে কাদের ১২।১৩ বৎসরের সময় বিবাহ কিন্তু তাহাও বিরল।

দোদয় কলেজ হইতে আমরা Gatte- নামক হোটেলের সম্মুখবর্তী সমুদ্র-স্থিত রাস্তায় বেড়াইতে গেলাম। এইটি ধার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বোধ অনেকক্ষণ বেড়াইয়া আবার আহারের রামানাথনের বাড়িতে যাওয়া গেল।

াহারের পর প্রায় রাত্রি নয়টায় আমরা ারে আসিলাম; আসিয়া শুনিলাম যে, র (৩) নিকট হইতে টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে। দুর্গামোহনবাবুর বাড়ির সব ভাল।

২৩শে এপ্রিল, সোমবার

আজও আমরা কলম্বোর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। শুনিতেছি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ ছাড়িবে। অস্ট্রেলিয়াগামী আরোহিগণ প্রায় ১৮।২০ জন কল্য নামিয়া গিয়াছে; আমাদের দিকটা যেন সেজন্য নিস্তব্ধ।

আহারান্তে মিউজিয়ম দেখিবার জন্য তিনজনে আবার কূলে যাওয়া গেল। সর্ব-প্রথমে এখানকার এক ইংরাজের দোকানে গিয়া আমার জন্য একটি প্যাণ্টালুন ও ছয়টা সাদা শার্ট ক্রয় করা গেল। সাদা শার্ট কয়টিতে ২০ টাকা ও প্যাণ্টালুনটি ৪ টাকা, এই ২৪ টাকা লাগিল। দুইটি পাউণ্ড দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ৪ টাকা ফিরিয়া পাইলাম। আমার ৫টি পাউণ্ডের মধ্যে দুইটি তো গেল; আর তিনটি পাউণ্ড হাতে আছে। বইগুলি আনিয়া ৭ শিলিং ৬ পেন্স ডিউটি দিতে হইয়াছে। আমাকে অতিশয় মিতব্যয়িতার সহিত চলিতে হইবে।

মিউজিয়ম দেখিয়া আসিবার সময় রামানাথন্ মহাশয়ের নিকট গিয়া বিদায় লইয়া আসা গেল।

স্টীমারে আসিয়া আহারাদি করিয়া সায়ং সন্ধ্যার জন্য ডেকের উপরে বসা গেল। আগে ভাবিয়াছিলাম, জাহাজে অনেক সময় পাইব, মনের সাধে চিন্তা ও লেখাপড়া করিতে পারিব; কিন্তু এখন দেখিতেছি, জাহাজে ঠিক কাজের সুবিধা হয় না। বড় ভিড়, কোন একটি নির্জন স্থান পাওয়া যায় না, সকল স্থানেই লোকের গতায়াত। আমি জাহাজে আশানুরূপ কাজ করিতে পারিতেছি না; প্রাণ জুড়াইয়া প্রভুর পূজা করিতে পারিতেছি না; আমার Inspiration হইতেছে না। এত বড় মহাসমুদ্র যাহা দেখিয়া ভাবোদয় হওয়া নিতান্ত উচিত, কই তদনুরূপ ত হইতেছে না। আমার ভাল লাগিতেছে না।

দুইটা দিন কিছু হইল না, কেবল ছুটাছুটিতে গেল। অদ্য রাত্রি ১২টার সময় স্টীমার ছাড়িল। আমি ১১টার পর প্রভুকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিলাম। চীন ও জাপান হইতে অনেক লোক আসিয়াছেন।

আমি যে-সকল লক্ষ্য লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি, তাহার অনুরূপ পাঠ ও আত্ম-চিন্তা দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না।

২৪শে এপ্রিল, মঙ্গলবার

অদ্য জাহাজ ভারত মহাসাগরে ভাসিতেছে। আজ সমস্ত দিনের মধ্যে অনেক কাজ করিতে পারা গিয়াছে। প্রাতে আহারের পর Calcutta Review-তে 'Then and Now' নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া ফেলিলাম ও নোট লইলাম। মধ্যাহ্নে আহারের পরে ঐ Review-তে Robert Cust-এর লিখিত Liquor Traffic in India নামক প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিলাম। এই প্রবন্ধে রবার্ট কাস্ট Canon farrar-

এই প্রবন্ধে রবার্ট কাস্ট Canon farrar-

দেখাইয়াছেন যে, সুরাপান প্রথা ইংরাজেরা এদেশে আনেন নাই। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজস্বের জন্য আবগারি বিভাগ রাখা হয় না; কিন্তু পানাসক্তিকে নিয়মিত করিবার জন্যই ঐরূপ করা হয়।

অদ্য সায়ংকালে অনেকক্ষণ একলা বসিয়া উপাসনা করা গেল। প্রাণে অনেকটা শান্তি পাওয়া গেল। স্টীমারে লোকারণ্য, ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া প্রাণটা তেমন হইয়া খুলিতেছে না।

আজ রাত্রে হাত-পা কামড়াইতে লাগিল; এই জন্য সত্বর আসিয়া ক্যাবিনের মধ্যে শয়ন করিলাম; আজ আর বাহিরে শয়ন করা গেল না।

(৩) দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র, ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাস।

২৫শে এপ্রিল, বুধবার

আজ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভুকে স্মরণ করিলাম। তদনন্তর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চা খাইয়া দুর্গামোহন-বাবুর ঘরে গেলাম। তৎপরে আসিয়া কাপড় পড়িয়া ডেকের উপর উপাসনা করিতে গেলাম।

অদ্য হইতে এইরূপ স্থির করিতেছি যে, প্রাতে উঠিয়া ৭৷৷টার মধ্যে চা খাওয়া, স্নান করা ও পোশাক পরা সারিব। ৭৷৷টা হইতে ৮৷৷টা পর্যন্ত উপাসনা করিব। ৮৷৷টা হইতে ৯টা প্রাতঃরাশ। ৯টা হইতে ৯৷৷টা ডেকে বায়ু সেবন। ৯৷৷টা হইতে ১টা নবেল লেখা। ১টা হইতে ২টা মাধ্যাহ্নিক আহার। ২টা হইতে ৬টা পাঠ ও নোট লওয়া। ৬৷৷টায় Tea তৎপরে ৭টা হইতে ৯টা সায়ংসন্ধ্যা।

আজ প্রাতের উপাসনায় প্রাণে অনেক বল পাওয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য প্রভু আমাকে আনিয়াছেন—এই বিশ্বাস হৃদয়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন যে, আমার দ্বারা তাঁহার কাজ করাইবেন। অমনি আমার নিজের দুর্বলতা স্মরণ হইয়া মন লজ্জাতে অধোবদন হইতে লাগিল। আমি কী দুর্বল। আমি আজও সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিতে পারি নাই। ব্রহ্মশক্তিতে মানবের আত্মশক্তির পরাজয় হয়। সেই ব্রহ্মশক্তি এখনও ভক্তি করিয়া আমাতে অবতীর্ণ হইতেছে না, আমি আপনাকে কায়-মন-প্রাণে তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিতে পারিতেছি না বলিয়া। এই যে ইংলণ্ডে চলিয়াছি আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে, আমি যদি দৃঢ়রূপে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা হইলেই সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাঁহার কৃপা ও নিজের দুই পা, ইহার উপরেই ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমি তো এ জীবনে কোন মানুষ, কোন বন্ধুর উপর নির্ভর করি নাই। যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহার কৃপা ভরসা করিয়া পড়িয়া থাকিয়াছি। সকল প্রকার নিরাশাজনক অবস্থা হইতেই তিনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এখন তিনি এই করুন, আমি যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি।

আজ প্রাতে একজন চীন দেশ হইতে সমাগত মিশনারীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। ইঁহারা Faith Principle-এ কাজ করেন। ইঁহাদের মিশনে প্রায় ২৯৮জন লোক খাটিতেছেন। ইঁহারা সকলেই Faith Principle-এ কাজ করিয়া থাকেন। আগামী ২৭শে মে লণ্ডনে ইঁহাদের মিশনের Annual meeting হইবে। তখন সেই সভায় আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমি ইঁহাকে বলিলাম,—আপনারা এতগুলি ধর্মানুরাগী লোক যখন আসিয়াছেন, তখন রবিবার-রবিবার আপনাদের উপাসনা কেন করেন না? তিনি বলিলেন পূর্বাবধিই তাঁহারা তাহার যোগাড় করিতেছেন। অদ্য প্রাতে Second Class-এর আহারের স্থানে ১০।১৫ মিনিট সময় ইঁহাদের একটু উপাসনা হইল। আমি উপস্থিত ছিলাম। একটি চমৎকার hymn গাওয়া হইল ও একটি প্রার্থনা করা হইল। তৎপর সকলে স্ব স্ব কার্যে গমন করিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতদিন কেবল খাওয়া-দাওয়া লইয়া সকলে রহিয়াছি; ইহার মধ্যে একটু ভগবানের নাম হয় এটা ভাল। মান্দ্রাজের বিশপ এই জাহাজে যাইতেছেন, তিনি ইঁহাদের উপাসনাতে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি কথা হইল।

২৬।২৭।২৮।২৯ এপ্রিল ॥ বৃহস্পতি শুক্র, শনি ও রবিবার

এই কয়দিন আমার জ্বর হওয়াতে শরীর ও মন দুইই অসুস্থ ছিল, লেখা-পড়া কিছুই করিতে পারি নাই। কোনো কাজ ভাল লাগে নাই। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন সায়ংকালে Inland Chinese Mission-এর Missionaryদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে। তাহাতে প্রাণ ভরিয়া রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র বলিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সমাজের কার্যকলাপ তাঁহাদিগকে বলিয়াছি।

এই কয়দিন ষ্টীমারস্থিত খ্রীষ্টানদিগের উপাসনা উপদেশাদি শুনিতেছি। দেখিয়া মনে গভীর বেদনা পাইতেছি, যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরকে আবরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। Voyseyর খ্রীষ্টের প্রতি ক্রোধের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিতেছি।

৩০শে এপ্রিল, সোমবার

অদ্য প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে উপাসনাদি সারিলাম। সারিয়া আহারের পূর্বে আর দুইখানা কার্ড লিখিয়া ফেলিলাম। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আগামী জন্মোৎসবে পড়িবার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে মনে হইল,—আমি একজন লোক, অতি অপদার্থ, আমি কোথায় যাইতেছি সে কথা তাহাদিগকে মনে করাইবার জন্য লেখা ধৃষ্টতার কর্ম। আমি কিসের অহঙ্কার করি? আমাকে তাহারা ভুলুক, আমি অধিক গোলমাল না করিয়া বিনয়ের সহিত চুপে চুপে প্রভুর কাজের জন্য একটু প্রস্তুত হই। এই ভাব মনে উদয় হওয়াতে আবার তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। এ ভাব ঈশ্বর স্বয়ং আনিয়া দিলেন এবং এইভাবে আমাকে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে ও থাকিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা এডেন নগরের সমীপে পৌঁছিলাম। এই আরবের উপকূল। কত কথাই স্মরণ হইল। আরব কখনও চক্ষে দেখিব—ইহা কি স্বপ্নেও জানিতাম! মনে হইল, এখানে যাযাবর জাতিসমূহ উষ্ট্রারোহণে ভ্রমণ করিত এবং নানা জাতীয় আরবদিগের বিবাদে এক সময় পূর্ণ ছিল। এডেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—উদ্ভিদ-বিহীন, প্রাণিবিহীন, বারিবিহীন পর্বত-

ণী; দেখিতে চক্ষুর তৃপ্তি নাই; ক্ষণেক া দেখিলে যেন তৃষ্ণার্তের ছাতি শুকাইয়া ই। এখানে মানুষই বা থাকে কিরূপে? দরই বা হলো কিরূপে? দুর্গামোহন-বুকে বলিলাম, "এমন দেশেও মহম্মদ প্রচার করিয়াছেন!" পার্বতীবাবু লেন, "এইজনাই তাঁহার ধর্ম এত া"। ক্রমে বোটসকল আসিয়া জাহাজে গিল, আমরাও লম্ফ দিয়া বোটে ড়িলাম। তাহারা আমাদের ইংরাজী বোঝে , আমরা তাহাদের ভাঙ্গা ইংরাজী বুঝি , এও এক জন্বালা! বোটম্যানগুলিরই শ্রী কি? কাফ্রি রাজ্যের কি এই আরম্ভ এরা বুঝি আবিসিনিয়ার লোক! আরব-গের চেহারা তো এমন নয়। দূরে হোক ছাই, জিজ্ঞাসাই বা করি কাহাকে? যেখানকার লোক হউক, তাই থাকুক। বোট লইয়া টেলিগ্রাফ আফিসের নিকট লাগাইল। টেলিগ্রাফ আফিসটি ছোট। দুটি একটি শ্বেতকান্তি যুবা পুরুষ কাজ করিতেছে। দুর্গামোহনবাবুর একটা টেলিগ্রাফ পাঠাই-বার ইচ্ছা ছিল; জিজ্ঞাসা করিলেন এক এক শব্দে কত খরচ। তাহারা উত্তর করিল, দু টাকা। অমনি দুর্গামোহনবাবুর উৎসাহটা খর্ব হইয়া গেল। এত দরকার নাই, কথাপিছু দু টাকা দিয়া টেলিগ্রাম পাঠাই। তারপর আমরা এক গাড়ি ভাড়া করিয়া পোস্টাফিসে গেলাম। আমি ত ছয় পয়সা দামের ছয়খানি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়া লইয়া গিয়াছি। পথে দুর্গা-মোহনবাবু বলিতেছেন, "তুমি যেমন বোকা, এ যে বোম্বাই গভর্নমেণ্টের এলাকা, এখানে এক পয়সা দামের পোস্টকার্ডে চিঠি যাইবে।" আমি মূর্খ মানুষ, মুখটি চুন হইয়া গেল। ভাবিলাম হায় হায়, ছয় পয়সার জায়গায় নয় আনা খরচ করিলাম! আবার একটু ফিলজফার হইয়া ভাবিলাম, তা হোক, লোকে অজ্ঞতার জন্য জরিমানা না দিলে শিখিবে কেন। কিন্তু পোস্ট আফিসে গিয়া দেখি, আমারই জিত, দুর্গা-মোহনবাবুর হার। তাঁহার চিঠি পাঠাইতে তিন আনা করিয়া মাশুল লাগিল। তিনি তাঁহার এক পয়সাওয়ালা কার্ড কয়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি ড্যাং ড্যাং করিয়া আমার কার্ডগুলি চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিলাম।

ভাল কথা, আমরা যখন নৌকাতে উঠি, তখন কলিকাতার কয়েকখানি পত্র পাইলাম। পরেশনাথ সেনের (৪) এক কার্ড, হেমের এক পত্র ও রাজবালার এক কার্ড। হেমের পত্র পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার ঐ একটা বড় দোষ, একটু কেহ ভালবাসার কথা লিখিলে এই পোড়া চক্ষু দুইটায় জল রাখিতে পারি না। লোকজন থাকিলে মুশকিলে পড়ি। সেদিন লাবণ্যর (৫) পত্র পড়িয়া কাঁদিয়াছি। দুর্গামোহনবাবু কয়েক-খানি পত্র পাইলেন। পার্বতীবাবু বেচারা একখানাও পাইলেন না, মুখটি কেমন করিয়া রহিলেন। সরলা (৬) দুর্গামোহনবাবুকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছে, তাহাও পড়িতে দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আনন্দমোহন-বাবু (৭) আমাদের তিনজনকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর; তাহা পড়িতেও চক্ষে জল পড়িল।

আমরা জাহাজে আসিয়া কিছু আহার করিয়া ডেকের উপরে আসিলাম। জাহাজে কয়লা উঠিতেছে। আর এক আশ্চর্য দেখিলাম, কতকগুলি বালক ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া জাহাজের নিকট আসিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সমুদ্রের জলে সাঁতার দিতেছে, ২০।৩০ হাত জাহাজের উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িতেছে। আরোহিগণ সিকি, দুয়ানি ফেলিয়া দিতেছেন, উহারা ডুব দিয়া তুলিতেছে। ঠিক মাছের মত, কোন প্রভেদ নাই। একটা ছেলে জাহাজের তলা দিয়া ওপর পারে গেল এবং আসিল। এক অপূর্ব দৃশ্য।

তৎপর তিনটার পর জাহাজ ছাড়িল। কিছুদূর আসিয়া একপ্রকার নূতন মাছ কি শামুক দেখিলাম। যেন ছোট ছোট ঝুনো

(৪) ইনি বহু বৎসর বেথুন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। (৫) স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী। (৬) দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা—মিসেস্ পি. কে. রায়। (৭) স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসু।

নারিকেলের মালার মুখের দিক কাটিয়া তুলা পুরিয়া দিয়াছে। সে যে কি, কেহ বলিতে পারিল না। কেহ বলিল, Jelly fish, কেহ বলিল Shell fish। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সায়ং সন্ধ্যার পর সন্ধ্যার আহারান্তে দুর্গামোহনবাবু আসিলেন। দুইজনে পরস্পরের জীবন বিষয়ে অনেক কথা হইল। দুর্গামোহনবাবু কিরূপে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন তাহা খুব চিন্তা করিতেছেন। Lord Shaftesburyর জীবনচরিত, যাহা আমি Chinese Missionaryদিগের নিকট হইতে লইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছি, তাহা পড়িয়া তাঁহার অনেক উপকার দর্শিয়াছে। আমার পত্নীবিয়োগ-ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষয় আমি তাঁহাকে অনেক কথা বলিলাম; এ সকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল। তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।

১লা মে, মঙ্গলবার

আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করিয়া চা খাইলাম। তৎপরে স্নানান্তে উপরে গেলাম। বড় মুশকিল, ষ্টীমারে এমন ভিড় যে, একটু নির্জনে বসিবার জায়গা নাই। মান্দ্রাজে পৌঁছিবার পূর্বে যে-জায়গায় বসিয়া লিখিতাম ও পড়িতাম, তাহা আর নির্জন থাকিল না। মান্দ্রাজে ও কলম্বোতে এত লোক আসিল—ছেলেপিলে ও স্ত্রীলোকে ষ্টীমার পূর্ণ হইয়া গেল। আর কোন স্থানই নির্জন নাই। একটু বসিয়া ভাবিবার বা লিখিবার সুবিধা নাই। Hatchwayর উপরে একটা জায়গায় বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছি, দুর্গামোহনবাবু আসিলেন। তিনি বলিলেন, ষ্টীমারের লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

ষ্টীমারে লাইব্রেরী আছে। মাসে দুই টাকা করিয়া দিলে নানাপ্রকার ভাল ভাল বই পাওয়া যায়। দুর্গামোহনবাবু বলেন যে, নভেলই বেশী।

আজিকার দিনটা হেথায়-হোথায় বসিয়া গড়াইয়া বেড়াইতেছি, কোন কাজই হইতেছে না।

গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় আমরা বাবেলমাণ্ডব প্রণালী দিয়া লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়াছি। দুর্গামোহনবাবু জাগিয়া ছিলেন, আমি অথবা পার্বতীবাবু জাগিয়াছিলাম না। আজ সমস্ত দিন বড় গরম বোধ হইতেছে; কিন্তু জাহাজের লোকে বলিতেছে, এ গরম কিছুই নয়। লোহিত সাগরে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক গরম হয়।

আজ বেলা ২।৩টার সময় সাগরের মধ্যে অনেকগুলি পাহাড় দেখা গেল। লোকে এই ১২টি পাহাড়ের নাম Twelve Apostles দিয়াছে।

জাহাজে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস-এ সুরতি খেলা চলিয়াছে। আমাকে সুরতি খেলিবার জন্য একজন ডাকিলেন। আমি বলিলাম, "মাপ করুন, আমার সুরতি খেলিবার ইচ্ছা নাই।" তাহাতে লোকটি যেন একটু বিরক্ত হইলেন। লোকে কি করিয়াই বা দিন কাটায়! কাজেই কোন না কোনপ্রকার খেলার সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে বিনোদন করে। ফার্স্ট ক্লাস-এর আরোহিগণ এক একদিন এক এক প্রকার খেলা খেলিতেছেন। Concert, Fancy Dress, Ball, নৃত্যগীত প্রভৃতি চলিয়াছে।

সেদিন শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহারা Mirzapore Gazette নামে সংবাদপত্র করিয়াছেন এবং তাহার একজন সম্পাদক স্থির করিয়াছেন। এ-ও এক খেলা। সম্পাদক সংবাদসকল লিখিয়া পড়িয়া থাকেন। গতকল্য নাকি দুইজন Correspondent-এর দুই পত্র পড়া হইয়াছে। তাহার একখানিতে একজন নামবিহীন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি ছেলেদের উৎপাতে আর কাজ করিতে পারেন না। মায়েরা যদি ছেলেদের ধরিয়া না রাখেন, তবে তাহাদিগকে দশ সের ভারি এক একটি চেন গলায় বাঁধিয়া ধরিয়া রাখা হইবে। শুনিলাম সেজন্য ফার্স্ট ক্লাস ডেক্-এ ছেলেদের উৎপাত কিছু কম হইয়াছে। হনুমানগুলি সন্ধ্যার পূর্বেই আমাদের ডেকে আসিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় প্রথম শ্রেণীর বাহাদুরদিগের অনেকে জিমনাস্টিক ক্রীড়া দেখাইতেছেন। দেখাইতে দেখাইতে নাক-গাছি ভাঙিয়া গেল।

সন্ধ্যার আহারের পর বন্ধুবন্ধুতে একত্র হওয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম ভাল করিয়া প্রচার হইতেছে না কেন, এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা হইল।

যতই চিন্তা করিতেছি, এতদিন যেভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছি, তাহার জন্য মনে বড় লজ্জা হইতেছে। আমার ত কোন বন্ধন নাই; আমি অর্থ চাই না, পদ চাই না, কেবল ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং সেজন্য বৃদ্ধা জননী ও বৃদ্ধ পিতাকে মৃতপ্রায় করিয়াছি। কিন্তু আমি বন্ধনবিহীন হইয়াই বা কি করিলাম! কই প্রচারকার্যে কত দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলাম! এইজন্যই ত প্রকৃত ধর্মজীবন পাইলাম না। প্রেমাগ্নি সমুদয় হৃদয়-মনকে ব্যাপ্ত না করিলে আমাদের প্রাণের পাপ প্রবৃত্তিসকল দগ্ধ হয় না।

(ক্রমশ)

দেবতাত্মা হিমালয়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৮ ॥

কুলু উপত্যকা

প্রাচীন ঋষিকুলের মধ্যে প্রধানত আমরা দুজনকে পাই যাঁরা প্রচুর পরিমাণে হিমালয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; অন্যজন সূর্যবংশের রাজগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য খুঁজে ফিরতেন এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচূড়া নির্বাচন করে নিতেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ ত্রেতাযুগের মানুষ ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, পুষ্পাঙ্গন, এবং একখানি কুটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, সুতরাং তিনি যেখানেই গেছেন, একটি ক'রে আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। আসামের হিমালয় থেকে কাশ্মীরের হিমালয় এবং মানসসরোবর ও কৈলাস অবধি রাজগুরু বশিষ্ঠ অনেকগুলি আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন। নবতন একটি আশ্রম সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অন্তঃপুরে, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এখানকার হিমালয়ের অতিপ্রাকৃত এবং অত্যাশ্চর্য নিসর্গ শোভা দেখে তিনি ভাবস্থিত হয়ে যান এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগ-স্থবির হন। সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে তিনি উত্তর কুলুর একটি অতি মনোরম নিভৃত অঞ্চলে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কুলুর অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দু মাইল দূরে রাজগুরু বশিষ্ঠের কুণ্ড ও আশ্রম আজও বিদ্যমান।

ত্রেতা এবং দ্বাপরের মধ্যে কালের ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাক, অন্তত হাজার দশেক বছর হবে সন্দেহ কি! দ্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু 'মহাভারতীয়' গিরিশ্রেণীর এখানে-ওখানে ছাড়া মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। বদ্রীপুরীর ভূখণ্ডে ব্যাসদেব সর্বত্র নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের স্মরণাতীতকালে হয়ত মহর্ষি বেদব্যাসের মনে এ-কৌতূহল এসে থাকতে পারে যে, রাজগুরু বশিষ্ঠ কোন্ স্থলে গিয়ে হিমালয়ের দেবতাত্মাকে এমন-ভাবে আবিষ্কার করলেন। হয়ত পুরাকালের মনস্তত্ব ছিল ভিন্ন রকমের। সেকালে হয়ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ যোগ্যতা প্রমাণিত হোতো অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিদ্ধিলাভ, এই ছিল হয়ত নেতৃত্বের প্রকৃত কষ্টিপাথর। মহর্ষি বেদব্যাস সম্ভবত তাঁর পূর্বাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এই হিমালয়ের পরমাশ্চর্য এবং অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালী থেকে দু' মাইল দূরে যেখানে বশিষ্ঠের নামে একটি গন্ধক-মিশ্রিত উত্তপ্ত জলের প্রস্রবন বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু মহর্ষি থেমে যাননি। হিমালয়ের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ তাঁকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় আরও দূরে উত্তরের ভূস্বর্গলোকে। সেই লতাগুল্মহীন প্রাণীচিহ্নবিহীন তুষারশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে তিনি দেব-লোকের এবং ব্রহ্মলোকের সন্ধিদ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তিকালে সেই তুষার চূড়ার নাম রাখা হয় ব্যাসঋষিশৃঙ্গ!

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুশহর বোধ করি আটাত্রিশ মাইল পথ। পথ শুধু নতুন নয়, পৃথিবী নতুন, মানুষও নতুন। এদেরকে কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্নরদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তারা নয়। এমন শিরো-ভূষণ দেখিনি আগে—তিব্বতকে যেন কোমল ক'রে এনেছে! রংয়ের বৈচিত্র্য মাথায় ধ'রে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রক্তগোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তীবর্ণ শৈলউপত্যকার বসন্ত-বাহার থেকে, মেয়েদের চোখ থেকে পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করেছে রক্তবরণ। মাথার টুপি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

তিব্বতী গুম্ফার চতুষ্কোণ গম্বুজে চারটি কোণ যেমন একটু উপর দিকে মোড়া—এই সুন্দর টুপিগুলির দুই 'কোণ' উপর দিকে ঠিক তেমনি করে একটু মোচড় দেওয়া। তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-সমন্বয় ও সুষমা ছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারো মাথায় কালো, কারো বা লাল কাপড়ের টুকরো কপাল ঘিরে ফেট্টি বাঁধা। পোশাক প্রায়ই শাদা কম্বলের, একটু শীত পড়লে সুতি-বস্ত্র ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

মাসাদেবী কুলুর টুপি দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমিও ঘুরেছি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এ ধরনের টুপি দেখলুম এই প্রথম। গোটা দুই কিনে নিয়ে যাবো।

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পথহারা রঙ্গীন প্রজাপতিরা এখনও বাসা খুঁজে পায়নি। ডালিম আর আনারের বনে তারা এখনও ঘুরছে।

পথ সংকটসংকুল। গাড়ি চলছে অতি সতর্ক হয়ে। পাহাড়ের অতিকায় পাথর এক এক স্থলে এমন করে ঝুলছে যে, দেখলে ভয় করে—পাছে গাড়ির চালে তাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত পাথরে পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে
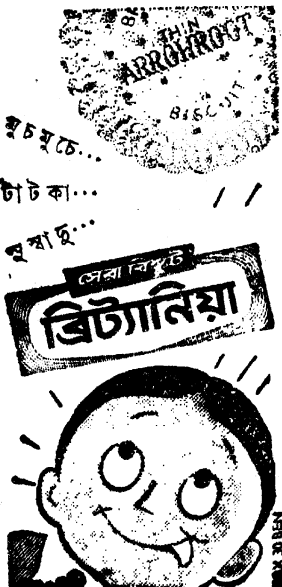
চলেছে। কাশ্মীরের সেই পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্র বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রয়েছেন। গাড়ি চলেছে এ'কেবে'কে। আমাদের গন্তব্য এখনও অনেক দূর।

শুধু বিপাশা নয়। আরও দুটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই পার্বত্য ভূখণ্ডে। একটি ইরাবতী, অন্যটি চন্দ্রভাগা। কুলু উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিয়ে বন্য শতদ্রু উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুন্দর-নগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাই যাবার পথে শতদ্রু পেরিয়ে যেতে হয়। কুমারসাই থেকে কোটগড় হয়ে নারকাণ্ডা পৌঁছতে পারলে হিন্দুস্থান-টিবেট রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপুর ওয়াংটো ও চিনি-কিন্নর হয়ে বুশাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপকির গিরিসঙ্কটে পৌঁছনো চলে। শিপকি থেকে রংচুং উপত্যকার প্রধান ক্যারাভান পথ গারটকের দিকে চলে গেছে। গারটক থেকে কৈলাস পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ সোজা দক্ষিণে পৌঁছেছে মানস সরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি আর পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে চলে গেছে। এ-পথ অতি প্রাচীন। একশো বছরেরও আগে কাশ্মীর মহারাজার প্রসিদ্ধ সেনাপতি জোরাবার সিং এই অঞ্চলে সংগ্রাম করে লাডাখ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন এবং এই অঞ্চলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিব্বতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহাড়ী গ্রামে এসে আমাদের মোটর বাস থামলো। এ-গ্রামটি মণ্ডি আর সুলতানপুরের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্তাটা একতরফা বলে বিপরীত দিকের একখানা গাড়ি 'ব্যারিয়ারের' ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ির জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। এ দুখানা ছাড়া আর কোনও গাড়ি আজ চলবে না।

কয়েকটি দোকান এবং পুলিসের ফাঁড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগুলি অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ। পাহাড়ী দেশের বাড়িমাত্রই কাষ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি এবং কাঠের সিলিং। কিন্তু ছাদগুলি অধিকাংশই স্লেটপাথরের। এ-পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বস্তির মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অঞ্চলে অল্পস্বল্প খেত-খামার এবং চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ মনে হতে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অঞ্চলে এসে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ যেন আমারই উদ্বিগ্নচিত্তের ক্ষুধার বার্তা নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এ'কেবে'কে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দুর্গমে গিয়েছে, তার খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিয়েছে লারজি উপত্যকায়, সেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে,—গুহায়, গহ্বরে, জলধারার শিরা-উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিবাসীর আনাচে-কানাচে, অনাবিষ্কৃত ওষধি-পর্বতের লতা-শিকড়ের বিচিত্র বন্য-গন্ধ পেরিয়ে এই পথ উঠেছে এক সময় বিশাল পর্বতের চূড়ায়—যেখানে 'বানজার' নামক জনপদের প্রান্তে 'বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসংকট পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। অবশেষে এই পথ সুদূর দক্ষিণে গিয়ে শতদ্রু অতিক্রম করে কুমারসাইতে গিয়ে মিলেছে। বুশাহর রাজ্য থেকে বণিকের দল এই পথ দিয়ে কুলুতে এসে প্রবেশ করে। এই পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সর্প, হিংস্র চিতা এবং পীতাভ ভল্লুক অসতর্ক পথিককে অতর্কিতে আক্রমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অশ্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এপথে আগে চলতো অশ্বারোহী পর্যটক, এখন পথ কতকটা সুগম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ি অতিক্রম করে যায়। শীতের দিনে এপথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল—সুতরাং আমরা আড়ষ্ট হয়ে এতক্ষণ বসেছিলুম। 'আউট'এ এসে গাড়ি থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনের একটি দোকানে বেশ রুচিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোৎসাহে মরজগতে ফিরে এলুম। ওপাশ থেকে সেই বর্ষীয়সী পণ্ডিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদেরকে এক একবার লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর চাহনির নির্বিকার স্নেহশীলতা যেন আনন্দদায়ক।

আহারের আয়োজন করা গেল। মায়া-দেবী সহাস্যে বললেন, আমাদের মুখের কাজ কিন্তু কোথাও বন্ধ হয়নি, দেখেছেন?

বললুম, হজমেরও ব্যতিক্রম ঘটেনি দেখছি।

তিনি প্রচুর হাসলেন এবং অতঃপর মাতাপুত্র পুরি ও জিলাবীর সদ্ব্যবহার চলতে লাগলো বহুক্ষণ অবধি।

ঠিক এই কারণেই গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্ব অনুসারে শোক তাপ দুঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন নানাবিধ ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আতঙ্কের থেকে আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যতন্ত্র ও

স্নায়ুমণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবলপরাক্রমে আপন-আপন কাজ করেছে, সন্দেহ নেই।

গাড়ি ছাড়লো এক সময়ে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাচ্ছে আকাশে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এর পর থেকে পথ কিছু প্রশস্ত হবে। কুলু-টুপি মাথায় দিয়ে চলেছে কত লোক, হাসিমুখীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে লাঙগলের ব্যবসায়ী। বস্তুত, কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায়, তা হোলো বিপাশা নদীর দুই পার মাত্র। সেটি কখনও সংকীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘ। শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেৎ —চড়াই এবং উৎড়াই। কোনো কোনো স্থলে এই দুই পার প্রশস্ত হয়ে দুদিকে এক মাইল থেকে দু মাইল আন্দাজ প্রায়-সমতল ভূভাগে পরিণত হয়েছে—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাঝে মাঝে এক একটি ক্যান্টিলিভার অর্থাৎ ঝুলা পুলের দ্বারা বিপাশার এপার-ওপারের উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আবার বলি, পৃথিবী এখানে আশ্চর্য। একথা বলে যাবো চেঁচিয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে-সেখানে স্বর্গের পারিজাত কাননের যবনিকা যেন উত্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীত স্বর্গ-লোকে বিচরণ করে চলেছি—বলে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। সমগ্র সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরছে অমরাবতীর দ্বার! দেখে নাও প্রাণ-ভরে—যা স্বপ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে কোথাও বসে যাও—কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়—ওক্, জুনিপার, চীড় কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে বসো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের বুকফাটা কান্না কেঁদে বেড়াও ওই গুল্মলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে-কানাচে—শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে, তা নয়—ঈশ্বরকেও হয়ত বা পেয়ে যাবে সহজে!

ঈশ্বর! মুখ ফিরিয়ে চুপ করে গেলুম। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে পড়ে যায় নানা দৃশ্য। তপোবনে তপস্যায় বসেছেন ঋষি, শাক্য-সিংহ অধ্যাত্ম ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াচ্ছেন আর্যাবর্তের পথে পথে, মৌর্যসম্রাট অশোক অসীম পিপাসা নিয়ে পরিভ্রমণ করছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনন্ত প্রশ্ন নিয়ে—এ'রা ভিড় করে আসে মনে। এর পরে আবার পট-পরিবর্তন ঘটে। চেয়ে দেখি, মানুষ রুদ্ধশ্বাস হচ্ছে অপমানে, সলজ্জ মালিন্যে তার জীবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনে একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দম্ভে সভ্যতার কদর্য স্বরূপ! ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নোংরায় মুখ থুবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তনাদ শুনেছি নিরন্নের, নিরুপায় শরণার্থীর বীভৎস অপমৃত্যু ঘটছে চোখের সামনে—ঈশ্বর যেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যন্ত্রণায়, দুঃখে, সংকটে, বেদনায়, অপমানে, ঈর্ষায়, ঘৃণায়, পাশবতায়, ধিক্কারে—পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে!

পৃথিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ—দেবতা যেখানে নিত্য জাগ্রত—সেটি হোলো মানুষের প্রাণ। ওই প্রাণের মূলে দণ্ডের থেকে কতবার আমার বাসাছাড়া পাখি রাত্রির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দুর্লভ নীলপদ্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশূন্য পথে, তার বিদীর্ণ কণ্ঠে রক্ত ঝরেছে অনেক—ঝড়ের হাওয়ায় অশ্রু উড়ে গেছে অনেক-বার। কিন্তু আজ বিপাশার তটভূমি পথে যেতে যেতে তার হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তবু এখানে এই অভিনব পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অমরাবতীর সেই আশ্চর্য ছায়া। যদি বলো, এই স্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দস্বরূপ—প্রতিবাদ করবো না। উনি অনেকবার আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যরাত্রের ভয়াবহ অরণ্যালোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন; ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রির সমুদ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুস্বরূপ; সমগ্র ভারতের পথে-পথে রৌদ্রে ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলা-সহচর। —তারপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো প্রতি পাথর শুঁকে শুঁকে অর্থহীন অন্বেষণে পরিভ্রমণ করে ফিরেছি। কাঁদিয়েছেন উনি অনেক, মুখে অন্ন তুলতে দেননি, দুর্যোগের দ্বারা আশ্রয় ভেঙে দিয়েছেন, সঙ্গীকে নিয়ে গেছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছেন পদে পদে।

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো বিপাশার দুই তটে। নতুন করে আমার চোখের সামনে স্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিচ্ছে অমর্ত্য-লোকে; এঁকে যাচ্ছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিপ্ত শিকরকণার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুদ্ধ সুরভিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে বনে-বনে। প্রতি বৃক্ষচ্ছায়ায় তপোবনের শান্তশ্রী, প্রতি প্রস্তরের গুল্মজড়িত গাত্রে অলক্ষ্য মুনির অবয়ব, প্রতি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝনকে বেদমন্ত্রধ্বনি, প্রতি রঙগীন পাখির

কলাস্বনে ঋষিকন্যার কলকাকলি। ও'রা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না!

উপত্যকা ঈষৎ প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কুলু উপত্যকার ভিন্ন নাম হোলো, 'দেবভূম'—Valley of Gods. চেতনার উপরে এসে পৌঁছয় শান্ত গভীর একটি প্রসন্ন আনন্দের অনুভূতি—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাবতে থাকে দেবতার কথা, সুতরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস এসে পৌঁছলো 'বাজোরা'র একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময় বাজোরার প্রাচীন মন্দির—এখানে শৈব ও শাক্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্ণ হোলো গৈরিক এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমতুল্য। এককালে চান্দেল্লা রাজপুত গোষ্ঠী যে-কালজয়ী প্রতিভা ও সৌন্দর্য-বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধ্যপ্রদেশে 'খাজুরাহোর' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল, এ-মন্দিরে যেন তাদেরই ছায়া পড়েছে। 'বাজোরার' প্রাচীন মন্দির সমগ্র 'দেবভূমকে' যেন পরমার্ঘ দান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল। সেটি হোলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালী থেকে পার্বতী উপত্যকার দিকে অগ্রসর হওয়াই সুবিধা, কেননা, এখান থেকে বাহনের ব্যবস্থা করা যায়। 'ভুন্তারগাঁও' থেকে পার্বতী পৌঁছতে দুদিনের কম লাগে। এই অঞ্চল কুলুরই অন্তর্গত, কিন্তু কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এর বনাতাই হোলো শোভা; সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুপ্রাচীন স্বভাবকৌমার্য আমরা কল্পনা করি—সম্ভবত সেই বস্তুর চিহ্ন এখানে মেলে। চারিদিকের গগনচুম্বী বিরাট গিরি-চূড়াদলবেষ্টিত এই বহুবর্ণা নন্দন সুশোভিতা উপত্যকাকে যারা নাম দিয়েছে 'পার্বতী', তাদেরকে নমস্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসংকটসংঘর্ষ অতিক্রম করে যে দুরন্ত নদী নেমে এসেছে, তার দুই পারে জনশূন্য অরণ্যালোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত স্বপ্নপুরি চোখে পড়ে। নদী এসে মিশেছে বন্য বিপাশায়।

বাজোরা থেকে কয়েক রশি পথ দক্ষিণে এগিয়ে গেলে একটি পথ উত্তর-পূর্বে 'মণিকরণের' দিকে চলে গেছে। কিছুদূরে গিয়ে নদীতীরে-তীরে দুই পারে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরলোক। কোথাও কোথাও শস্য-ক্ষেত্র এবং তারই পাশে পাশে চড়াই-উতরাই। —এমনি করে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বত প্রাকারের কোলে 'মণিকরণে' পৌঁছনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট্ট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথিবৎসল। মানুষের তঞ্চকতা, দুষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধোগতির সঙ্গে এখানকার স্বল্পতুষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে-ওখানে। অধিবাসীরা সুশ্রী ও ভদ্র। এখান-কার প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিশেষ-ভাবে স্বাস্থ্যকর। বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পার্বতী উপত্যকাটি 'মণিকরণের' জন্যই সুবিখ্যাত। কুলু থেকে প্রথম যাত্রারম্ভে পথের ধারেই পড়ে একটি 'শক্তি' মন্দির। উপত্যকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দুর নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দুরশোভিত নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাঙালী মেয়ের স্বভাব ছুঁয়ে রয়েছে ওদের সর্বাঙ্গে।

সায়াহ্নকালে এসে পৌঁছলাম 'সুলতান-পুরে।' এইটি আমাদের গন্তব্য। এরই আধুনিক নাম কুলু শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ সুপ্রশস্ত—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে স্থান সংকুলান হয়ে যায়। এই শহর প্রধান সরকারী কেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপুর এবং যোগিন্দর নগরের পরেই সুলতানপুর, ওরফে কুলু। গাড়ি থামলো এসে একটি সুন্দর নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, মাঠের পশ্চিম সীমানায় ডাকবাংলো। আমাদের সঙ্গেই গাড়ি থেকে নামলেন কাশ্মীরের পণ্ডিতানি এবং তাঁর যুবক পুত্রটি।

এবার একটি স্থূল বিষয় আলোচনা করি। বাইরে গিয়ে কুলু উপত্যকার সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হয় এবং সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কুলুকে যেভাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পাশেই বসানো হয়, সেটি একেবারেই প্রতারণা। নিরীহ পর্যটক এবং অভ্যাগতরা এই তঞ্চক প্রচারকার্যের ফাঁদে পা দেয়; ফলে ওখানে গিয়ে তারা নানা অসুবিধায় পড়ে। হোটেল নেই বললেই চলে —কারণ অনেক চেষ্টাতেও খোঁজ পাইনি; খাদ্যাদি একেবারেই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য নয়। সারাদিনে দুখানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহনাদি নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দুদিন আগে থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে লোক পাঠাতে হয়। ভিনদেশী ব্যক্তিগণকে দোহন এবং শোষণ করার জন্য একটি শহরব্যাপী চক্রান্ত চলতে থাকে। ফলে কুলু উপত্যকায় সমগ্র বসবাস-কালটিতে অসংখ্য কাঁটা পদে-পদে বিঁধতে থাকে। পাঞ্জাব সরকারের প্রচার বিভাগ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ থেকে কয়েকটি অপদার্থ ব্যক্তিকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এ ধরনের অসুবিধা চলতেই থাকবে।

ডাক বাংলায় জায়গা পাওয়া গেল না। যাত্রীশালাও বহু দূরবর্তী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অনুমতিপত্র আনালে

ফরেস্ট রেস্ট হাউসে' আশ্রয় মিলতে পারে। তাই করা হোলো। কিন্তু 'রেস্ট হাউস' অন্ধকার। না আছে ইলেকট্রিক, না কেরোসিন, না বা কোনো আহার্য লাভের সুবিধা। 'রেস্ট হাউসটি' আবার ওরই মধ্যে একটু টিলা পাহাড়ী পথের বনময় অঞ্চলে। অনেক চেষ্টার পর হ্যারিকেন লণ্ঠন জোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছুকাল আগে থেকে পণ্ডিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিলুম, দেখা গেল সেটি সত্যে পরিণত হোলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকার জায়গা পাননি। অতএব আমি সেই যুবকটিকে এবার আমন্ত্রণ করলুম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কাশ্মীরী 'বোলিতে' আলাপ করলেন। ও'রা তীর্থে বেরিয়েছেন এবং মানালীর বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে যাবেন। আগামীকাল অপরাহ্নে ফিরবেন মণ্ডিতে। সেখানে ও'দের লোক আছে। মহিলা মায়াদেবীর কাছে যখন শুনলেন, আমি ব্রাহ্মণ, তখন তিনি 'রেস্ট হাউসে' এসে রাত্রিবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খুশি হলুম, কেননা, এই নির্জন বনছায়াময় বাংলোটিতে আরও দুজন সংগী পাওয়া গেল। দুটি ঘরে আলো জবালা হোলো।

আমার স্বর্গতা জননীর মুখের সঙ্গে পণ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটা সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেকথা মায়াদেবীকে জানাবার সময় পাইনি। সন্ধ্যার পরে একটু বাহাদুরীর লোভে যখন পণ্ডিতানীর পুজার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাত্র ভরে জল এনে দিলুম—আমার সেই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে মায়াদেবী একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন। তারপর ওই যুবকটিকে এখানে পাহারা মোতায়েন রেখে আমি যখন চৌকিদারের অলক্ষ্যে অন্ধকার বন-বাগান থেকে মহিলার পুজার জন্য কতগুলি ফুল তুলে আনলুম, তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বললেন, যাক্, বুড়ো হলে মেয়েদের একটা সুবিধে—পথে-ঘাটে ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া যায়!

কী যেন জবাব দিয়েছিলুম, আজ আর মনে নেই। ফুলগুলি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর পুজার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন-হাস্যে উঠে এসে ফুল নিলেন। ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বললেন, বেটা, জিন্দা রহো!

তিনি আরও জানালেন, তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের কিছু বিলম্ব ঘটে গেছে। একটু দূরের থেকে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম। তাঁর প্রশস্ত উন্নত এবং দীর্ঘদেহ যেন প্রণাম লাভেরই যোগ্য। তাঁর শরীরের প্রাচুর্য ও বিশালতা আর্যজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

চৌকিদারের সাহায্যে সেই রাত্রে যেমন-তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল এবং আমরা ওই স্বল্পভাষী লাজুক এবং নম্রস্বভাব যুবকটিকে আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জোর করেই এনে বসালুম। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য বলেই অবশেষে সে রাজী হল। রাত্রের দিকে মায়াদেবী পণ্ডিতানীর ঘরে জায়গা পেয়ে গেলেন। যুবকটি রইলো আমার কাছে।

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো। গত রজনীর অন্তিম প্রহরে অরণ্যশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার দাগ লেগেছিল—পাখিরা ভুল করে ভেবেছিল, ওইটেই বুঝি প্রভাত। ভুল ধরা পড়েছে পরে। কিন্তু ডাক দিচ্ছে সেই থেকে। পাখির দেশে পেশছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। 'রেস্ট হাউসটি' এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোনও শব্দ এসে পেশছয় না। ঝিল্লীরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর আওয়াজের সঙ্গে সেই রব মিলে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, ও দুটোর সাড়া আর কানে পেশছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশের ঘরটি শূন্য। সকালের দিকে মানালীর গাড়িতে পণ্ডিতানী এবং তাঁর সেই স্বল্পবাক ছেলেটি চলে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে নিতে হোলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আয়োজন করা সম্ভব হোলো না, কারণ কিছুই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একটু দূরে। অতএব যেমন-তেমনভাবে প্রস্তুত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

গতকাল সন্ধ্যায় দেখে গেছি মাঠের পূর্ব প্রান্তে বিপাশা। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাট নিরিবিলি, লোকজন তেমন চোখে পড়ে না। আমরা রাজপথ ধরে কতকটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে এক-আধটি দোকান পেলুম। থমকে দাঁড়ালেই বুঝতে পারা যায়, স্থানীয় অধিবাসীদের দরিদ্র জীবনযাত্রা। এর পরে অরণ্যজটলার

ভিতর দিয়ে বিপাশা চলে গেছে অদৃশ্য হয়ে। উপত্যকা এখানে অনেকটা সমতল প্রান্তরে প্রসারিত। এটি হিমালয়ের উত্তর ভূভাগ, সুতরাং উপত্যকার উচ্চতা অল্প হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই শরৎকালে এখন এখানে পাখী শিকারের আয়োজন চলছে। অরণ্যমোরগ, প্রস্তর ও তুষার-পারাবত—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালয় থেকে। সময় থাকতে এবার কুলুর অধিবাসীরা শাকসব্জি শুকিয়ে নিয়ে ঘরে উঠবে। কাঠ আনবে অরণ্য থেকে। এখন থেকে ভেড়ার লোম নিয়ে শীতবস্ত্র বোনা চলছে। ছেলে বুড়ো সকলের হাতেই তকলি ফিরছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এলুম। কিন্তু আঙ্গুলে গুণে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী কয়-জন। কাজ কারবার কিছু নেই, শহর গড়বে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিয়ে কল-কারখানা বসাবে—কার এমন বুকের পাটা? শুধু মাল আমদানি করবে, টাকা পয়সা কই? শুধু রপ্তানি করবে, ভাঁড়ার কই? সুতরাং গ্রামের দারিদ্র্য নিয়ে গ্রাম পড়ে আছে চোখের আড়ালে। পর্যটকদের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দু'দশ টাকা যদি ওদের হাতে আসে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন যাত্রী গিয়ে যদি গাড়ি থেকে নামে তবে পঁচিশ জন কুলি ছুটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তারা হোলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায়। চাষ-বাস করে, ঘর বানায়, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চায়ের দোকান আছে দু-একটি। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় বলে রাখলে ওবেলায় মিলতে পারে। গোটা দুই ডিম হঠাৎ পেয়ে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক এক সঙ্গে চাইলে গ্রামে-গ্রামে খবর দিতে হবে। 'ডবল রোটি' অর্থাৎ পাউরুটি পেতে গেলে পালাম-পুরে যাও—কমবেশী একশো মাইল। মাংস পেতে গেলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার। সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট'—যেমন কাশ্মীরে, কিন্তু খাবারের প্লেটে সেই 'ট্রাউট' পৌঁছবার আগে মৎস্য শিকারী হতে হবে। এ আর তোমার দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজার আলো করে মৎস্যগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে।

প্রাতরাশ সারা হোলো পূর্বাহ্নে। তারপর চা-ওয়ালার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের চুক্তি করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মানালীর গাড়ি যাচ্ছে। এখান থেকে মানালী দূরে নয়, মাত্র চব্বিশ মাইল। পথটি পাকা এবং এই প্রায়-সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে উত্তরে উঠে গিয়েছে বনময় পর্বতের অন্তর্লোকে। যেমন সর্বত্র—এখানেও পাহাড় যত দু'দিকে উঁচু হয়েছে, নদীর গহ্বর ততই [illegible] নীচে। প্রকৃতি যতই তার রহস্য-যবনিকা উত্তোলন করেছে, মানুষের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুলু থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আষ্টেক গেলে 'রায়সন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবির পর ছবি। আমাদের চোখে সমস্তটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদেরকে অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে পাইনে। দিল্লী-কলকাতা-বোম্ব্যাই, এদের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ, চোখ আমাদের তৈরি হয়েছে ওদেরই মাঝখানে। বড় শহরের নক্সায় ইদানীং আর কোনও বৈচিত্র্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরি হচ্ছে নতুন দিল্লীর ছাঁচে—চণ্ডীগড়ও তাই। পুরনো দিল্লীর সঙ্গে আগ্রা-মথুরার তফাৎ কম। বোম্বাই-কলকাতার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে, তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ একই। গয়া-কাশীতে সামান্যই তফাৎ। লণ্ডনের লোক নিউ ইয়র্কে কোনও বৈচিত্র্য পায় না; প্যারিস আর বার্লিনের নক্সায় কত-টুকুই বা পার্থক্য! কিন্তু এখানে এই দূরে হিমালয়ের গহনলোকে অনন্ত বৈচিত্র্য। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রক্তকরবী সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষার-চূড়ায় যখন পঞ্চমীর শীর্ণ শশী-কলা এসে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায়নি কোনদিন। একটি বাড়ির সুন্দর কাঠের কারুকার্য—সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলির ছোট একটি বাঁক, একটি গাছের একান্ত ছায়া, এক টুকরো বনান্তরাল, একটি নির্ঝরিণীর মৃদু ঝঙ্কার, এরা যেন সমস্ত জীবনের নিরুদ্ধ পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে।

পর্বতপ্রাচীর এবং অল্পস্বল্প সমতল সংযুক্ত নিঃঝুম বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন' এবং পূর্বপারে 'নাগর'। কাটরাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পৌঁছতে হয়। এপথে আসে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা। পূর্বদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেলে স্পিতি-উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত-আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুগম পথ হোলো মানালীর পথ। 'নাগরের' জনপদটি আপন শোভা আর সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপরপারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাব কৌমার্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দূরে।

এই 'নাগরে' একটি দম্পতির কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবকালে একটি ধনী পরিবার তাঁদের ধনসম্পদসহ ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এঁরা বোধকরি সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান। এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখ। তাঁরা এই কুলু উপত্যকায় আসেন এবং নাগরে জায়গাজমি কিনে ঘরদোর তৈরি করেন। এঁরই পুত্র জুনিয়র মিস্টার রোয়েরিখ একজন প্রকৃত পণ্ডিত, গুণী এবং চিত্রশিল্পী। এঁ'র

চরিত্রবত্তা, স্বভাবমাধুর্য এবং নম্রসৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে পরলোকগত চিত্রনির্মাতা হিমাংশু রায় মহাশয়ের পত্নী ভারত প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণী দ্বিতীয় পক্ষে মিঃ রোয়েরিখকে বিবাহ করেন। বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হতে চললো। একদা শ্রীমতীর আমন্ত্রণক্রমে তাঁর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি এবং সৌম্যদর্শন রোয়েরিখের শান্ত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে দেবিকারাণীকে প্রশ্ন করেছিলুম, এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে?

দেবিকারাণী মুগ্ধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনোদিন মাথা ধরে চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকি, উনি সেদিন অন্নজল মুখে তোলেন না! উনি সতর্ক থাকেন, সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে! শান্তিই আমার কামনা ছিল!

'দেবভূম' কুলু উপত্যকার অপার্থিব সৌন্দর্য এবং দেবতাত্মা হিমালয়ের আলোচনা করে যেদিন ফিরে আসি, তারপরের দিন বোম্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারাণীর একখানি চিঠি পাই:

"........It was an honour and privilege—such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way........"

দেবিকারাণীর অভিনয় দু'চারবার দেখেছি বৈকি, কিন্তু মানুষটি ভিন্ন প্রকারের। স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহজাত অধ্যাত্ম পিপাসা আমাকে বারম্বার বিস্মিত করেছিল।

'নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্বত্রই শোনা যায়। বস্তুত, সমগ্র কুলুর সঙ্গেই সেই নামটি অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। এই নামটি হোলো 'বেনন' পরিবার। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মিঃ বেনন প্রথম আসেন কুলুর পথে দুর্গম ও দুস্তর হিমালয় পেরিয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আরেক বন্ধু ক্যাপ্টেন লী। এই ভূস্বর্গের আকর্ষণ তাঁরা সামলাতে পারেননি এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এসে মানালীতে বাসা বাঁধলেন এবং সমগ্র অঞ্চলে ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। সেইসব বাগান আজও সুপ্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে 'লী' এবং 'বেনন' পরিবার এখানে সমৃদ্ধ। বড়গাঁও এবং মানালীতে তাঁদের হোটেলগুলি বহুজন পরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে ও'রা 'চিনিসাহেব' নামে প্রসিদ্ধ, প্রত্যেক গ্রামে ও'রা সুখ্যাত। পার্বত্য নারীকে ও'রা বিবাহ করেছেন এবং বহুলাংশে শিক্ষা-বিস্তারেও সহায় হয়েছেন। অত্যন্ত বিস্ময় লাগে, হিমালয়ের গহনলোকে গিয়ে যখন এই সাহেবগোষ্ঠীটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এ'দের বাগানের 'সেও' এবং নাশপাতি সদৃশ্য 'বাগুগোসা' অতি মধুর।

মন্দির-প্রধান হোলো সমগ্র কুলু উপত্যকা। বিভিন্ন পাল-পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালী, নাগর, কাটরাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিবাসীরা নেমে এসে উৎসবে মাতে। এ ছাড়া আসে লাহুল, তিব্বত, লাডাখ, ইয়ারখন্দ, খোটান, স্পিতি, পার্বতী ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুলুতে এসে পৌঁছয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচ-গানের আসর। আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি পুজো আসন্ন।

বিজয়াদশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হোলো 'দশহরা'। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পৌঁছবে এবং সর্বপ্রধান পূজা পাবেন রঘুনাথজী। কুলু উপত্যকায় সেদিন বিপাশার কূলে-কূলে কূলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জীবন-তরী কূল ছেড়ে চলে যাবে। অকূলের দিকে!

উচ্চ মালভূমির উপর মানালী গ্রাম। পাইন এবং দেওদারের শোভায় চিত্রিত মানালী। উত্তুংগ গিরিমালা স্তরে স্তরে চলে গেছে একদিক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চূড়া অতি সন্নিকট বলে মনে হয়, কিন্তু সেটি দৃষ্টিবিভ্রম।

কিছুদূর এগিয়ে পথ চলে গেছে উত্তরে বিপাশার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চলে গেছে দূর দূরান্তরের চড়াইয়ের দিকে যেদিকে 'রেহলা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিসংকট। দশ হাজার ফুট ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গদলের শান্ত গম্ভীর প্রকাশটি অনন্ত বিস্ময় বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিসংকটের উত্তরে সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসঋষিশৃংগ। এই শৃংগেরই তল থেকে রোহটাং গিরি-সংকটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি বিপাশা, অন্যটি চন্দ্রা। চন্দ্রা নদী আরো দুটি নামে পরিচিত। একটি চন্দ্রভাগা, আরেকটি চেনাব। বিপাশাকে অনেকে বলে বিয়াস; হিমাচল প্রদেশীরা বলে, 'বিয়াসা'। ব্যাস-ঋষির নামটিই হয়ত তারা ধরে রাখতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরিশিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। দশ এগারো হাজার ফুটের পরে ঋতু বলে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত্র। শীতের কালে অগম্য, আর কিছু নয়। তুষার ঝঞ্ঝা বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস যদি না থাকে এবং পরিস্কার আকাশে থাকে রৌদ্র, তবে হোক না কেন পাহাড় তুষার-মণ্ডিত! কর্নেল হাণ্ট-এর বইতে পাই, গৌরীশৃঙ্গবিজয়কালে মে মাসের শেষের রৌদ্রে 'এভারেস্ট' অঞ্চলে তাঁরা এক এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন। রোহটাং গিরিসংকট অতিক্রম করে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তর পথে গেলে পাওয়া যায় উত্তুংগ শিখরলোকে 'বড়ালাচা' গিরিসংকট। এপথ গিয়েছে লাহুলের ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হানলে' এবং 'রূপসু' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণাক্ত বিরাট 'মুরারি' হ্রদ। লাহুল উপত্যকার উত্তরাঞ্চল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্ব সীমায় পীর-পাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযুক্ত। সুতরাং রোহটাং গিরিসংকট এখানে ত্রিমার্গ সংগমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অমীমাংসিত।

মানালী হোলো এই সকল দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয় পথের প্রথম তোরণদ্বার। এখানকার বাতায়নে মুখ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তারা নামহারা, পরিচয় হারা—তারা শুধু পার্বত্য সন্তান। চিরকাল ধরে তারা নিশ্চিন্ত, চিরদিন নিস্পৃহ; এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চলে গেছে, কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করেনি। সভ্য জগতে তারা পৌঁছয়নি কোনওকালে, সভ্যতার স্বাদ কেমন জানেনি, পরখ করেনি, চোখে দেখেনি। ওদের দুর্গপ্রাকারের বাইরে নীচের তলায় ভারত ইতিহাসে শত শত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গৌতম বুদ্ধের পরে আর কোনও মহাপুরুষের সংবাদ ওদের কানে পৌঁছয়নি!

যেমন 'বাজোরায়' তেমনি মানালীতে—মন্দির অতি প্রাচীন। কিন্তু বাজোরার হিন্দু স্থাপত্য এইটুকু দূরে মানালীতে এসে মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন—দক্ষিণের সংগে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দু বটে, কিন্তু সাজপোশাক বদল করেছে। মানালীর একটি মন্দিরের সন্ধান দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হচ্ছে হিড়িম্বার মন্দির। মানালীর গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহন বনবেষ্টিত পাহাড়ের প্রাচীন বনস্পতির শাখা-প্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দারু-শিল্পের প্রতীক। জনশূন্য বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো। ছায়াচ্ছন্ন বনে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা! চমকে উঠলে চলবে না, ভয় পেলেই পরাজয়। অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে, একটি সুন্দরী রমণী আসছে এগিয়ে, মাথায় তার কাঠের বোঝা। অধরে তার মধুর হাসির রঙিমা, তার চেয়েও রঙীন তার বেশভূষা। বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে সেই সুন্দরী সহাস্যে তাকালো! এ মন্দিরের পূজারী কই—এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানাবে, সেই পূজারিনী! তারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গুপ্ত-দ্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢুকবে এবং সম্মুখের দ্বার খুলে দেবে। প্রদীপ জেলে নম্রহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে! প্রদীপের আলোয় আর আবছায়ায় দুরুদুরু বুকে এদিক ওদিক অন্বেষণ করে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ-বর্ণের শিলা। উনিই দেবী, ওঁরই উদ্দেশে পশুবলি দেওয়া হয়! দরজার বাইরে তাজা রক্তে এখনও হয়ত তার হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ জড়ানো।

রহস্যময়ী পরমাসুন্দরীর হাসি দেখে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না; ওই হাসিতে হয়ত বা রক্ত অপেক্ষাও বিপদের সংকেত নিহিত, সেই কারণে রহস্য আরও নিবিড় হয়েছে। নম্র নতমুখে অর্ঘ্য দান করে শান্ত-ভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণ্যভূমি পেরিয়ে আবার নেমে যাও মানালীর দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটবে তোমার পিছনে পিছনে, কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশ্ন তোমার মধ্যরাত্রির তন্দ্রার মধ্যে হয়ত দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলবে, হয়ত বা সেই প্রশ্নরা ওই আদি অন্তহীন হিমালয়ের শত সহস্র মাইলব্যাপী গুহায় গহ্বরে মঠে মন্দিরে অরণ্যে তপোবনে, উপত্যকায় তুষারশৃংগ-মালায়—সর্বত্র একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকারে ক্ষুধাতুরা ডাকিনীর মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে।

এ যাত্রায় আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছিলুম। মায়াদেবীর মুখে চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছে। আমি নিজে অস্থির ক্ষুধা নিয়ে ঘুরেছি নানাস্থানে, তিনি চুপ করে দেখেছেন হিমালয়কে। মন্দির দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশব্দে। তামাসা করেছি অনেকবার—তিনি আধুনিককালের প্রসাধন-পটিয়সী তরুণী। তিনি হাসিমুখে বরদাস্ত করেছেন আমার পরিহাস এবং বার বার মুগ্ধমনে হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য অঞ্চলে গিয়ে একান্ত আনন্দলাভ করেছেন। অনেকবার মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীতে তাঁর ভাসুরের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি নিরাপদে আছেন এবং অমুক দিন সকালে তাঁর ভাসুর মহাশয় যেন দিল্লী স্টেশনে উপস্থিত থাকেন। পাঠানকোট থেকে তিনি ট্রেনে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন। কুলু থেকে তিনি পুনরায় চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে দক্ষিণ ভারতে। যাবার সময় আমরা নুরপুরের পথ দিয়ে যাবো।

স্থানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হয়েছিল। মায়াদেবী তাকে গত দুদিন ধরে নানাবিধ ফাই-ফরমাস করছিলেন। উদ্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছু উপার্জন করে! কথায় কথায় তাকে বকশিশ দেবার জন্য মায়াদেবী বিশেষ ব্যস্ত। ছেলেটির নাম সুখনলাল। তার মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুগ্ন বোন। সামান্য চাষ-বাস, যেমন-তেমন ঘরকন্না, সারা বছরের অন্নবস্ত্র চলে না। মায়াদেবী একবার সুখনকে একটি টাকা ভাঙাতে দিলেন এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ছেলেটা ফিরে এলো। এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙানোর জন্য! এদিকে কারো এত পয়সা নেই যে, ভাঙিয়ে দেয়! মায়াদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙানো চাইনে। টাকাটা তুই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দু'আনা পেলেই সে মহাখুশী; এক টাকা তার পক্ষে অনেক। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে টাকাটা তার পকেটে দিলুম। কিন্তু তখন থেকেই আমাদের একটা কাজ জুটলো। ছেলেটার কাপড়-চোপড় নেই, হয়ত ওর বোনের অসুখে ওষুধ জোটে না, হয়ত খাওয়াও জুটছে না, হয়ত বা রাত্রে গায়ে দেবার কম্বলও নেই! সুতরাং একটা মস্ত কাজ আমরা পেয়ে গেলুম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল সে গন্ধ তেল আর সাবান, খাদ্যসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শীতবস্ত্র এবং মোটা-মুটি কিছু অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, রং ফর্সা, মুখের ভাবে অকিঞ্চন এবং অল্পে তুষ্ট।

যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট, তাকে কিছু বেশি দিতে পারলে আমরা সুখী হই। ভিখারীকে কিছু দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজন করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছু, সেই সহজে পায়। যে ভোগী নয়, তার চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে বসি। অর্থের প্রতি যার কিছুমাত্র আসক্তি নেই, তার চার-দিকে টাকা জড়ো হয়। চাইনে বললেই কাছে আসে, কামনা করলেই দূরে পালায়। সুখন-লাল কিছু চায়নি আমাদের কাছে, তাই সে পেয়ে গেল তার আশাতীত। যতটুকু সে গ্রহণ করেছে, ততটুকুই যেন আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দুদিন ধরে সে আমাদের কাছে-কাছে ছিল এবং একজন অপরিচিতা ও ভিন-দেশিনী নারীর করুণ স্নেহচ্ছায়ায় তার জীবনের ওই দুটি দিন নিত্য স্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহ্ণের আলো সুদীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশে পাশে ছোট ছোট বস্তির জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সঙ্গে রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছু ভাষা, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো করুণ আনন্দের সুরে কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরে ভিতরে ঝিল্লির ঝনকে-ঝনকে রেখে গেলুম—যা কিছু আমার অপ্রকাশিত!

মালপত্র একে একে উঠলো গাড়ির চালে। গাড়ি ছাড়বে, এমন সময় সুখনলাল এসে দাঁড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সামনে। কিশোর বালকের মনে কি সেই বেদনাটুকু জন্মেছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধুর বর্ণটুকু জড়ানো? আত্মার অনন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি নক্সা জগদ্ধাত্রীর?

আমি ঈষৎ হাসলুম উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে। আরো দুটি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে সুখনলাল। নির্বোধ মূঢ় চায়নি অকিঞ্চনের আর অর্বাচীনের—অন্যদিকে চিরকালের সেই অনাদি-অনন্ত আবেদনের সকরুণ চাহনি, 'মনে রাখিস, সুখনলাল!'

গাড়ি ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষু মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ির ভিতরের দুটো চোখ বাষ্প থরো থরো। রবীন্দ্রনাথের দুটো ছত্র মনে পড়ে গেল: "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়, হে বন্ধু বিদায়।"

—ক্রমশ

সীমান্তের এই রুক্ষ পটভূমিকায় যে বিরাট বাঁধটা গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন চাকরি নিয়ে দীপক সেখানে পৌঁছে গেল একদিন। নতুন চাকরি, অনেক আশা, উদ্যম আর উৎসাহ। ওর কাজ হলো মাটি সরবরাহের তদারকি।

মাটি কেটে চলে দৈত্যাকৃতি এক্সক্যাভেটর। এক এক হিংস্র কামড়ে প্রায় সত্তর কিউবিক ফুট কঠিন মাটি রুদ্ধ আক্রোশে ছিঁড়ে তুলছে ধরিত্রীর কর্কশ মুখখানিকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপরে উন্মত্ত শব্দের ঝড় তুলে বুম্ ঘুরিয়ে নিয়ে রাখছে ডাম্পারের উপরে। বাকেটের ডালা খুলে দিতেই সে মাটি গিয়ে পড়ছে ডাম্পারের গর্ভে। বার-পাঁচেক এরকমভাবে মাটি দিতেই ডাম্পারের বিরাট উদর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ডাম্পারের ইঞ্জিন বন্ধ করা হয় না। ডাম্পারের বাকেট ভরে যেতেই অপারেটর লাফ দিয়ে উঠে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দেয়। অকস্মাৎ গতি পেয়ে ডাম্পারটি লাফ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণে আর একটা শূন্য ডাম্পার তার জায়গা নিয়ে নিয়েছে। অপেক্ষা করছে আরো মাটির জন্যে। মাটি কাটার এই কাজ অব্যাহত রাখাই হলো দীপকের দায়িত্ব।

মাটি গিয়ে পড়ছে ড্যামে আর ডাইকে। নদী বন্দী হচ্ছে। নদীর বুকের উপর মাটি পাথর আর কংক্রিটের পাহাড় গড়ে উঠছে। তিন শিফ্‌টে কাজ হয়ঃ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বিরামবিহীন গর্জন তুলে কাজ করে চলে এক্সক্যাভেটর, ডাম্পার, বুল ডোজার আর ট্রাকটার। ক্রাশার আর ব্যাচিং প্ল্যান্টের গম্ভীর আওয়াজের ছন্দে শোনা যায় দৃঢ় সংকল্প আর কঠোর পরিশ্রমের ইঙ্গিত। মধ্যে মধ্যে অজস্র পাথরের অন্তর্ভেদী হাহাকার তুলে ব্লাস্টিংয়ের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-শব্দে কেঁপে ওঠে সমস্ত পটভূমি। অসংখ্য মানুষের অজস্র পরিশ্রমে বাঁধটার ক্রমবর্ধিত অবয়ব ধীরে ধীরে দিগন্তে মাথা তোলে।

শিফ্‌টের শুরুতে জিপ পৌঁছে দিয়ে আসতো কর্মস্থলে—কলোনী থেকে মাইল তিনেক দূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে। একটা উঁচু টিলার ওপরে দীপকের তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে একটা টেবিল, দুটি চেয়ার আর একটা ছোট আলমারি। আলমারির মধ্যে কয়েকটা ফাইল আর কিছু কাগজপত্র। তাঁবুটার এক কোণে বালির বিছানার উপরে একটা জলের কলসী। আর এক অদ্ভুত রকমের নির্বোধ দারোয়ান। শুরু হোলো আট ঘণ্টার নির্বাসনদণ্ড।

তাঁবুর মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি যায় বালু-গর্ভ নদী পেরিয়ে ওপারে। পাহাড়ের সারি—শৃঙ্খলের মতো একটার সঙ্গে আর একটার সংযোগ। এপারে বৃক্ষহীন নিশ্ছায়া প্রান্তর—হলুদ রঙের মিহি ধুলো আর পাংশু কাঁকর-ভরা প্রান্তর। তাঁবুর পিছনে অনেক দূরে দেখা যায় কয়েকটা গ্রামের ইশারা। বাঁধ হয়ে গেলে এসব গ্রাম চলে যাবে জলের অতলে।

অপারেটরের দল কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপকও বেরিয়ে পড়ত। অক্লান্তভাবে ছোটাছুটি করত এক শোভেল থেকে আর একটাতে। শুরু করত তোয়াজ আর শাসানি। মিষ্টিকথা আর কটুকথা। ডাম্পারের স্রোত যেন অব্যাহত থাকে, শোভেলের গর্জন যেন অবিরত শোনা যায়।

আপাদমস্তক পিঙ্গল ধুলোয় ধূসর, এমনকি, চোখের ভ্রূ পর্যন্ত সাদা হয়ে যাওয়া অপারেটরের দল বাঁকাভাবে তাকাত ওর দিকে। নীরব প্রতিবাদ ওদের চাহনিতে। তবু, মাথার ক্যাপ আরো টেনে দিয়ে আবার ছুটে যেতো ড্যামের দিকে।

সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা পর একে একে তাঁবুতে ফিরে আসতো, নিহাল সিং, ইরফান আমেদ, ঘোষ, রামনাগিনা, আরো অনেকে। ট্রিপের সংখ্যা নিয়ে প্রত্যহ ওদের বিবাদ হতো সুপারভাইজারের সঙ্গে। সে বিবাদে মধ্যস্থতা করাও দীপকের দৈনন্দিন কাজের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিল—

নিহাল সিং একদিন তাঁবুতে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। দীপক বুঝলে, ও কোন কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে চায়। হামেশা সেলাম দিতে ও অভ্যস্ত নয়। লোকটি একটু দুর্বিনীত উদ্ধত প্রকৃতির। তবে চেহারা চমৎকার, দীর্ঘ, সোজা, শক্তিমান। এককালের গৌরবর্ণ ঝলসে বর্তমানে তামাটে হয়ে গিয়েছে।

লোকটা কথা বলে আস্তে আস্তে—সাব, শুনা থা কী আরো ডাম্পার আসছে। আমার জান্‌পহেচান্ একটি লোক আছে। গাড়ির কাজে ও পাক্কা ওস্তাদ। সাব যদি মেহের-বানি করে ওকে কাজে নেন্ তো—

— দীপক প্রশ্ন করলে—ডাম্পার চালানো

মেহনতি কাজ। পারবে কী তোমার লাক?

হালসিং মৃদু হাসলে—সাব আপনি একবার দেখলে আর একথা বলতেন না। ফ্রণ্টিয়ারে ওর ডেরা ছিল। আমার এক হাত উঁচু আর তেমনি চওড়া। তের কাজে ওর জুড়িদার পাওয়া ভার। শ, ওকে খবর দিও যেন পরশু আমার দেখা করে। পরশু আরো চারটে র আসবে। যদি ট্রায়াল ভালো দিতে তবে চাকরি হয়ে যাবে।

ী সাব। আর একবার সেলাম দিলে ল সিং।

দিন পরে নতুন ডাম্পারগুলিকে দীপক পরীক্ষা করছিল এমন সময়ে দুই জী এসে হাজির হলো। নিহাল সিং ওর বর্ণিত উজাগর সিং।

ীপক ঘুরে দাঁড়াতে ওরা দুজনেই এক । সেলাম দিল। কী খবর নিহাল?

নহাল বললে—সাব, এরি কথা আপনাকে ছিলাম।

নিহাল সিং বিশেষ অতিরঞ্জন করেনি। লম্বায় উজাগর সিং ছ' ফুটের উপর আরো কয়েক ইঞ্চি। চওড়া পেশীময় ছাতি। পরিশ্রমের পরিচয় ওর শিরাবহুল হাত-গুলিতে। প্রকাণ্ড মাথার উপর প্রকাণ্ডতর একটা পাগড়ি। পরনে কুর্তা। পাজামা। সীমান্ত প্রদেশের লোক ব'লে বোঝা যায় সহজেই।

দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে এল উজাগরের। সবিনীত হাসির অভ্যর্থনা।

নিহাল সিংয়ের অনুরোধের কথা চিন্তা করলে দীপক। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর অফিসার সেন সাহেবের সতর্কবাণী। কোনো ব্যাড্ এলিমেণ্ট যাতে না ঢুকে যায়। ভালো করে পরীক্ষা করে তবে লোক নিও।

উজাগর সিংকে বিপজ্জনক বলে মনে করার কোনো কারণ খুঁজে পেল না দীপক। বরং একটু শান্ত প্রকৃতির বলেই মনে হলো।

ডাম্পার চালাতে পারবে? দীপক প্রশ্ন করে।

কে'ও নহী সাব। উতো কোই আজায়ব চীজ্ নহী হ্যায়। আজ পন্দ্র বরষ হেভী গাড়ি চালায়া। লোকটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে জবাব দিলে।

ট্রায়াল ভালোই দিলে উজাগর সিং। দীপক বললে, তোমার কাজ হয়ে যাবে। সেন সাহেব এলে তোমার চিঠি সই করিয়ে নেবো। আর কাল থেকে কাজে লাগতে পারবে?

উজাগর সিং আকর্ণবিস্তৃত হাসলে—হাম তো হরবখত্ তৈয়ার সাব।

ঠিক হ্যায়। অন্যমনস্ক সুরে জবাব দিলে দীপক। দূরে সেনসাহেবের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আবার ছোটাছুটি শুরু করা উচিত।

উজাগর সিং দীপকের শিফ্টে সবায়ের বিস্ময় হ'য়ে উঠলো। কাজে যোগ দেওয়ার তিন দিন পরেই ও রেকর্ড করলে। পুরো সাড়ে সাত ঘণ্টা অবিশ্রাম গাড়ি চালাল

নিপুণ হাতে, উদ্দাম গতিতে। নিহাল সিং গর্বিত সুরে বললে, কেয়া সাব বোলা থা না, মেহনতের কাজে ওর জুড়ি নেই। শিফটের শেষে উজাগর দেখা করলে দীপকের সঙ্গে —"হামারা কাম্ আপ্‌কো পসন্দ্ আয়া সাব্?" উৎসাহের সুরে দীপক বললে, এই ক'দিনে তুমি সবচেয়ে ওস্তাদ অপারেটার বনে গেছ। এরকম কাজ করলে তোমার তলব জরুর বাড়বে।

উজাগর সিং হাসলে। সে হাসি কৃতজ্ঞের হাসি।

— দুই —

আর একটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হলো দীপকের অকস্মাৎ। তাঁবুতে বসে সকাল বেলায় ও কাগজপত্র দেখছিল, এমন সময়ে এসে দাঁড়ালে একটি মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী। সহসা চোখে পড়ে না। গোলাপী সিল্কের কামিজ আর নীল শাটিনের শালোয়ার পরনে। শালোয়ারের নীচের দিকটা ধুলোয় ধুসর হয়ে গেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে আসার চিহ্ন। হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। সরু গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'উজাগর সিং কিধে? উন্‌কা লিয়ে নাস্তা ল্যায়ী।'

দীপক একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সামলিয়ে নিয়ে বললে, 'উজাগর সিং কাজে আছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি ওকে খবর পাঠাচ্ছি।'

মেয়েটি হেসে ওকে নিরস্ত করলে—না, আমি দাঁড়াব না। খানা পকানে হোগা। ও এলে পরে ওকে এই নাস্তা দিয়ে দেবেন। বলবেন, রমাবাঈ দিয়ে গেছে। 'আচ্ছা নমস্তে!' সঙ্গের নেপালী বাচ্চা চাকরটাকে নিয়ে চলে গেল কলোনীর দিকে। তাঁবুর পিছন থেকে ইরফান আমেদের গলা শোনা গেল—আসমান কা হুরো জমিনপর আগ্যায়। সাবাস্ উজাগর সিং।

দীপকের মনে হলো, রমাবাঈয়ের সৌন্দর্যের দীপ্তিটুকু যেন এরই মধ্যে নিভতে শুরু করেছে। যেন একটা শংকার ভাব ঘিরে রয়েছে, কেমন এক নিরানন্দ শ্রান্তি। হয়তো উজাগর সিং ওকে সুখে রাখতে পারেনি। রমাবাঈ আর উজাগরের চেহারা পাশপাশি ভেসে উঠলো। বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট।

ইরফান এসে ঘরে ঢুকলো—স্যার, উজাগর সিংকে বলে দেবেন ওর আওরাৎ যেন এখানে না আসে। হরেক রকমের আদমী এখানে কাজ করে। যদি কোনো কেস হয়ে যায়—

দীপক ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু ও মেয়েটা কে?

এই অঞ্চলের কোন তথ্যই বোধহয় ইরফানের অজানা নেই। লোকটা দালাল ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—সাব, রমাবাঈ হচ্ছে এক কাশ্মীরী পন্ডিতের মেয়ে। ওরা আগে থাকতো রাওয়াল-পিন্ডিতে। দাংগাতে ওর পরিবারের সকলে নিখোঁজ হয়ে যায়। উজাগর সিং ওকে নিয়ে এক ফাঁকে পালিয়ে আসে হিন্দুস্থানে। এখানে এসে রমাবাঈকে উজাগর বিয়ে করেছে। অবশ্য যথেষ্ট জবরদস্তি করাতে রমাবাঈ বিয়েতে রাজী হয়। এখন রমাবাঈ হচ্ছে ওর জেনানা।

দীপককে নীরব দেখে ইরফান উৎসাহ বোধ করলে। পুনরায় নতুন কাহিনী শুরু করলে—কিন্তু রমাবাঈকে নিয়ে উজাগর সিংয়ের স্বস্তি নেই। রমাবাঈয়ের অতো রূপই হয়েছে যত অশান্তির মূল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। সেখান হতে আবার নতুন এক জায়গা। এইভাবেই উজাগর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও সুস্থির হতে পারছে না। প্রথমে ওরা গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ। সেখানে এক 'রইস' আদমীর গাড়ি চালাত উজাগর। সে রইসের নজর পড়ল রমাবাঈয়ের উপর। উজাগর সে ব্যাপার জানতে পেরে তাকে আধমরা করে দিয়ে পালিয়ে এলো পাটনায়। ওখানে কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে গেল দিল্লী। সেখান থেকে ধানবাদ। এই করেই বেড়াচ্ছে। লেকিন হাঁ, রমাবাঈকে যতোদূর সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করে উজাগর। প্রচুর বেশভূষা আর গহনা দিয়েছে ওকে। কোনো অভাবই রাখেনি। কিন্তু এতো করেও রমাবাঈয়ের মন পেল না উজাগর। কেবল ভয়ের দরুণই ও এতদিন উজাগরের সঙ্গে রয়েছে। ভয়ও করে যমের মতো। যতক্ষণ উজাগর বাড়িতে থাকে, রমাবাঈয়ের গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পায় না।

দীপকের মন্দ লাগছিল না এই ইতিবৃত্ত শুনতে। অন্য দিন হলে হয়তো নিজের এই দুর্বলতাকে ও প্রশ্রয় দিত না। কিন্তু রমাবাঈকে দেখার পর ওর সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে দীপক। জিজ্ঞাসা করলে ইরফানকে—ওরা এখন আছে কোথায়?

ইরফান জবাব দিলে—থাকবে আর কোথায়? আছে নিহাল সিংয়ের সঙ্গে। নিহালের তো একখানা ঘরের কোয়ার্টার। সেই ঘরখানা দখল করে রয়েছে ওরা। নিহাল পড়ে আছে বারান্দায়। তারপরে গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললে, নিহালের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। বেচারা শাদী করেনি। নওজোয়ান। অথচ ওরই ঘরে রয়েছে অমন এক খুবসুরত আওরাত। তাও উজাগরের পাল্লায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে।

দীপক এইবার বিব্রত বোধ করলে। লোকটার এই এক দোষ। গল্প শুরু করলে আর থামতে চায় না। ইরফানকে টিফিনের বাক্সটা দেখিয়ে বললে, তুমি এক কাজ করো তো, এই বাক্সটি উজাগরকে দিও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি উজাগরকে বলে দেব, ওর আওরাত যেন ফিল্ডে না আসে।

ন টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যেতে বললে, দেখবেন সাব, আমি বলে আমি তো সব খবর রাখি। একটা গোলমাল হবে এই রমাবাঈকে নিয়ে। উজাগরের চাচেরা ভাই হয়। কিন্তু র মাথা খারাপ করে দিয়েছে এই । আর, মেরা খেয়ালমে নিহালকে একটু নজরবন্দি দিচ্ছে। জাগরও কম হুঁশিয়ার নয়। সে ধ্যে নিহালকে সন্দেহের চক্ষে দেখছে। অসহিষ্ণু হয়ে কাশল কয়েকবার। এইবার ইঙ্গিত বুঝলে। বাক্সটা ও বেরিয়ে গেল।

চর্য রকম কাজের নমুনা দেখাল এই র সিং। পাহাড়ী অঞ্চলের দুঃসহ তাপমাত্রা একশো আঠারো ডিগ্রি র আরো ঊর্ধ্বগামী হতে শুরু। নদী গর্ভের শুষ্ক বালির প্রান্তর অস্তিত্বকেই নির্মমতম পরিহাস করে ওপারের পাহাড়গুলি মনে হয় অসীম রুদ্ধ আক্রোশে কেঁপে চলেছে। তাঁবুর বাইরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কষ্টকর। তখনো উজাগর সিং গাড়ি চালিয়ে যায় ঝড়ের বেগে উদ্দামভাবে। ওর পরিশ্রম একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার এই অসাধারণ পরিশ্রম অন্যান্য অপারেটারেরা ভালো চোখে দেখছিল না। উজাগরের বিরুদ্ধে ওদের অসন্তুষ্ট আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চললো। আর আন্দোলনে সবচেয়ে ইন্ধন যোগাচ্ছিল নিহাল সিং। দীপকের নজরেও এটা বড়ো স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য উজাগরের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করছিল ও।

ব্যাপারটা চরমে উঠলো একদিন। সেন সাহেবের কাছে উজাগরের মাইনে বাড়ানোর জন্য জোর সুপারিশ করেছিল দীপক। সেই মতো উনি ওকে একসঙ্গে দুটো ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে দিলেন। এবারে বিস্ফোরণ হলো। সবাই ঘিরে ধরলো দীপককে। কেন এরকম হবে?

দীপক ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলে অনেক। যুক্তি দেখালো উজাগরের পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। হিসাব কষে দেখিয়ে দিলো, সবচেয়ে আগে যে অপারেটর এসেছে, তার চেয়েও উজাগরের প্রডাকসন বেশি হয়ে গেছে। যদিও সে উজাগরের মাস-তিনেক আগে ভর্তি হয়েছে।

কিন্তু যুক্তি শুনতে ওরা আসেনি। নানা রকমের অপমানকর মন্তব্য ছুঁড়লো চারিদিক থেকে। ওরা দাবী তুললো, উজাগরের মতো ডাবল ইনক্রিমেণ্ট না দিলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

দীপক বুঝতে পারছিল না, কীভাবে ওদের শান্ত করা যায়। এমন সময়ে ভিড় ঠেলে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো নিহাল সিং। দুর্বিনীত, উত্তেজিত ও উদ্ধত। চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে—কেন? কিস্‌লিয়ে? কেন এরকম হবে?

দীপকের পৌরুষে আঘাত লাগল—চড়া গলায় বললে,—সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব না।

নিহাল সিংয়ের গলা আরো চড়ায় উঠলো—কাহে নেহী দিজিয়েগা? জবাব আপকো দেনেই হোগা। নহীতো—

দীপক ভ্রূক্ষেপ না করে দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করলে—নহী তো কেয়া?

নিহাল সিং বললে—নহী তো আপকো সবক্ শিখলাউঙ্গা। বলে এগিয়ে এল উত্তেজিতভাবে।

তাকে ধরে ফেললে উজাগর সিং। তাঁবুর সামনে ভিড় দেখে ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে কখন ওখানে পৌঁছে গিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে একহাত উঁচু হয়ে দাঁড়াল ও। আপাদ মস্তক ধুলোয় সাদা। চোখ টকটকে লাল—ধুলোয় আর গরমে। নিহালের হাত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরে প্রশ্ন করলে—কেয়াবাত নিহাল? বড়ে পাহেলওয়ান বন্ গিয়া তু।

নিহাল সিং ওর দিকে ফিরে তাকাল। খোলাখুলি শত্রুতার দৃষ্টি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, বোধহয় নীরবে পরস্পরের শক্তির পরিমাপ নিলে কিছুক্ষণ। আবার উজাগরের ভারি গলা শোনা গেল—আপ যাইয়ে সাব। ম্যায় ইনসবোকো দেখতা হুঁ।

দীপক এতক্ষণ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে তার হারানো সম্বিৎ ফিরে পেল। কর্তৃত্বের সুর গলায় ফুটিয়ে বললে—যাও, সবাই নিজের কাজে ফিরে যাও। সেন সাহাবকে বলে এর ফয়সালা আমি করবো। লেকিন কাম চালু রাখো।

আশ্চর্য! লোকগুলো এবারে আস্তে আস্তে সরে যেতে আরম্ভ করলে। ভিড় পাতলা হয়ে উঠল ক্রমশ। আবার কিছুক্ষণ পরে ডাম্পার আর শোভেলের গর্জন শোনা যেতে লাগলো। কাজ আবার চালু হলো।

দীপক বুঝলে, এ-আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার সবটুকু কৃতিত্বই উজাগর সিংয়ের। ও সময় মতো না পেঁছালে হয়তো আজ একটা অপমানকর ঘটনা ঘটে যেতো।

—তিন—

সমস্যার মীমাংসা হল। অন্য সবায়ের সংগে উজাগর সিংয়ের মাইনে বৃদ্ধির পার্থক্যটা কমিয়ে দিয়ে। তবু উজাগরের বেতন সবচেয়ে বেশি দাঁড়াল। নিহাল সিংকে সতর্ক করে দেওয়া হলো অবাধ্যতার দরুণ। দীপক আর ওদের মধ্যে তিক্ততা যদিও অতটা প্রকাশ্য রইলো না, তবু তিক্ততার পরিমাণ বিশেষ না কমে প্রচ্ছন্ন সুর নিলে।

পরিবর্তন দেখা যায় না কেবল উজাগর সিংয়ের। প্রতিদিন সে অবিশ্রাম সাড়ে সাত ঘণ্টা গাড়ি চালায়। কাজ শেষ করে ট্রিপ লিখিয়ে গম্ভীরভাবে বাড়ি চলে যায়। কারো সংগে ওর কথাবার্তা বিশেষ হয় না।

রাত্রির শিফটেও ওর একইভাবে কাটে। বিনিদ্র রজনী কাজ করে চলে উজাগর সিং। মাঝরাতে একবার গাড়ি থেকে নেমে আসে। পকেট থেকে বার করে একটা মোটা শিশি। এক চুমুকে সবটুকু নির্জলা মদ শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত দেয়।

একটা অস্বাভাবিক ঘটনা লক্ষ্য করছিল দীপক। রাত্রির শিফট পড়লে মাঝরাতের পর নিহাল সিংকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় যেন চলে যায়। পথের মাঝখানের কোনো সংযোগস্থলে গাড়িটাকে একটু আড়ালে দাঁড় করিয়ে চলে যায় নৈশ ভ্রমণে। ভোরবেলার দিকে আবার ফিরে আসে। এই ব্যাপার নিয়ে অপারেটরের দল হাসাহাসি করে। দীপক এই ঘটনাটাকে লঘু বলে মানতে পারছিল না।

উজাগর সিং এক মধ্যরাত্রিতে ঢুকলো তাঁবুতে। দীপক তখন সিগারেট টেনে চলেছে।

তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায় সাব—উজাগর সিং কৈফিয়তের সুরে বললে। দীপক জবাব দিল, কোই বাত নেহী। ঘর চলা যাও। উঁহা যাকে আরাম করো।

উজাগর সিং রাজী হলো না। ওর অভিমত, অল্প একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পরে উজাগর সিং জিজ্ঞাসা করলে, আউর কেতনা মিট্টি গিরানে পড়েগা সাব? দীপক এবার উৎসাহ বোধ করল। এই লোকগুলোর উপর ওর সহানুভূতির অভাব নেই। কিন্তু কোথায় যেন কোনো বিঘ্ন আছে, যার জন্য ওদের সংগে পূর্বেকার সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে।

ওর প্রশ্নের জবাবে দীপক বোঝাতে শুরু করলে, এই বাঁধের ভাবী আয়তন, এখানে বাঁধ দেওয়ার উদ্দেশ্য ও এর ভাবী ফলাফল। উজাগর চেষ্টা করে দীপককে অনুসরণ করার। মধ্যে মধ্যে সমর্থন জানায়, 'আহ্জী, আহ্জী।

হঠাৎ তাঁবুতে ইরফানের প্রবেশ। উজাগরকে লক্ষ্য করে ব্যংগ করে বললে, ড্যাম পিছে বনাওগে উজাগর। পহেলে আপনে ঘর সামলাও।

চমকে উঠলো উজাগর। কে'ও, কেয়াবাত? ইরফান ঘাড় নাড়লে,—ওহি তো কহ্ দিয়া। আব যাকে ঘর সামলাও।

উজাগর উঠে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলে। তারপর ঝড়ের গতিতে বাইরে চলে গেল। দীপক গোটা ব্যাপারটার কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি। বিস্মিত সুরে বললে,—কী হয়েছে ইরফান?

এই প্রশ্নটারই যেন অপেক্ষা করছিল ও। সংগে সংগে উত্তর দিল—নিহাল সিংয়ের খবর রাখেন? রাতের পর রাত সে যায় কোথায়? উজাগর যখন এখানে গিধড়ের মতো খাটে, ও তখন আস্তে আস্তে সরে পড়ে চলে যায় রমাবাঈয়ের কাছে। আবার ভোরের দিকে ফিরে আসে। উজাগর এখনো কিছুই জানে না।

দীপক এবারে উদ্বেগ বোধ করলে—উজাগরকে বলে তুমি কী ভালো করলে? শেষ পর্যন্ত একটা খুন-খারাবী না হয়ে যায়।

ইরফান প্রতিবাদ করে। না সাব, রাতের পর রাত এই কান্ড কী চুপ করে দেখবো নাকি? আমি নিহালকে বহুবার সাবধান করেছি। কিন্তু ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে। বলে, রমাবাঈকে নিয়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে। অকস্মাৎ অত্যন্ত হৃদ্যতার সংগে বললে—আমিও তো চাই, সাব, ওদের মধ্যে লড়াই লাগুক। একটা হোক খতম। আর একটা যাক জেলে। রমাবাঈয়ের মতো মেয়ের নতুন খদ্দের জুটতে দেরি হবে না।

দীপক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিলে। লোকটার এই অন্তরংগ হবার প্রচেষ্টা ওর অসহ্য লাগে।

অকস্মাৎ এই বিস্ফোরণের অর্থ না করতে পেরে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইরফান।

দীপক কিন্তু বড়ো উদ্বিগ্ন হলো পরিণতির কথা চিন্তা করে। উজাগরের ভয়াবহ রূপ তার অজানা নয়। এসব ধরনের লোক সহজে উত্তেজিত হয় না। কিন্তু একবার উত্তপ্ত হলে একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হতে দ্বিধা করে না। দীপক ভাবলে, জীপটা নিয়ে ওখানে গেলে কীরকম হয়? পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলে। এই নোংরা ব্যাপারের সংগে নিজেকে জড়াতে আগ্রহবোধ করলে না। সবচেয়ে ভালো নির্লিপ্ত থাকা। ইরফানের শেষ কথাটা আবার ওর মনে পড়লো। রমাবাঈয়ের মতো মেয়ের নতুন খদ্দের জুটতে দেরি হবে না। রমাবাঈয়ের আশ্চর্য রূপ। সে রূপের নতুন ক্রেতা কে হবে? ইরফান কী সেই চেষ্টাই করছে নাকি?

দীপক মনে-মনে যে আশংকা করছিল। পরের দিন ইরফান এসে খবর দিলে আগের রাত্রে জোর কান্ড হয়ে গেছে। উজাগর একটা দা দিয়ে এক প্রচন্ড কোপ দিয়েছিল নিহালের ঘাড়ে। সেটা ঠিকমতো পড়লে নিহাল সিংকে এতক্ষণ শ্বাস ফেলতে হতো না। কিন্তু এক প্রচন্ড লাফ মেরে ঘর থেকে পালিয়ে যায় নিহাল। তবু আঘাত এড়াতে পারেনি। পিঠের দিকের কিছুটা মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। দিন-কতক ওকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

আর রমাবাঈ? দীপক প্রশ্ন করলে।

রমাবাঈ! ওকে গত রাত্রে সাংঘাতিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

সেদিন কাজে ওরা কেউই এলো না। পরদিন উজাগর কাজে এলো। গম্ভীর ভাবগতিকেই অন্য কেউ ওর সংগে কথাবার্তা বলতে সাহসী হলো না। উজাগর এসে

র অনুরোধ করলে একটা রের ব্যবস্থা করে দিতে। ও সিংয়ের সঙ্গে আর একমুহূর্ত চায় না।

ঢ্যক্রমে একটা কোয়ার্টার খালি ছিল। দিন আগে একটা লোক ছাটাই তার কোয়ার্টারটা উজাগর সিংয়ের বস্থা করে দিলো দীপক।

দিন পরে নিহাল সিং পুনরায় যাগ দিলে। ওকে দেখে উজাগর নে বিড় বিড় করে কী বললে। একবার ওকে লক্ষ্য করে চলে গেল ডাম্পারের দিকে। ওর মুখের রেখা-ঠোর হয়ে উঠলো।

কথাবার্তা রইল না ওদের মধ্যে। র প্রতি প্রচণ্ডতম আক্রোশ বহন া নীরবে কাজ করে চলে। দীপকের টা ভালোই হলো। নিহাল সিংয়ের র অন্যান্যেরাও নিঃশব্দে কাজ করে চললো। তবু একটা অনাগত আশংকার ভাব ছড়িয়ে পড়ল এই শিফটের লোকদের মধ্যে।

—চার—

সে রাত্রির ভয়াবহতা দীপকের মনে থাকবে বহুদিন। সে বছর শীত পড়ল অসম্ভব রকমের। আর সেরাত্রির শীত যেন আরো চরম হয়ে উঠলো।

তাঁবুতে এসে ঢুকলো দীপক। হিমেল হাওয়া সবায়ের সমস্ত আবরণ ভেদ করে বুকের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। তাপমাত্রা দেখলে দীপক। উনচাল্লিশ ডিগ্রী।

রাত্রের শিফটের অপারেটরের দল ঢুকলো। নিহাল, উজাগর, ইরফান, ঘোষ, আরো অনেকে। ওদের সহসা চেনবার উপায় নেই। গরম ভারি পোশাকে সারা শরীর আবৃত। এই কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ় লোকগুলিও যেন এই প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়েছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো নিহাল সিং। গম্ভীরভাবে সেলাম ঠুকলে দীপককে। এই দাম্ভিক লোকটা সহসা সেলাম করে না। দীপক বিস্ময় বোধ করলে।

—সাব, আমার আর উজাগরের মধ্যে এক বাজী ধরা হয়েছে। আজ রাতে কার মাটির ট্রিপ বেশী হবে। যে হেরে যাবে, তাকে এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্যখানে।

এই অদ্ভুত বাজীর গূঢ় অর্থ বুঝলে না দীপক। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, ওদের মনোমালিন্য চরমে উঠেছে। নিজেদের মধ্যে শত্রুতার সমাধানের দরুণই বোধহয় এই আশ্চর্য বাজী। ইরফান এগিয়ে এসে বললে—সাব, এহি আচ্ছা হোগা। এরা দুজন একসঙ্গে থাকলে আবার লড়াই লেগে যাবে। হাজার হলেও ওরা দুজনে চাচেরা ভাই। সেজন্য আবার লড়াই করার চেয়ে এ প্রস্তাব ভালো নয় কী?

দীপক হেসে বললে—দেখ, ওসব তোমাদের নিজেদের ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করো।

উজাগর সিং গম্ভীর গলায় বললে, ঠিক বাত। সাহাবকো এর মধ্যে টেনো না। সুপারভাইজার গুণে বলবে, কে কত ট্রিপ দিয়েছে? ওর কথাই আমি মেনে নেবো।

নিহাল সিং একটু চিন্তা করে বললে—ঠিক বাত। মঞ্জুর। চলো আভি কামমে।

মেশিন-কার্ড নিয়ে ওরা চলে গেল কাজে। দীপকের শরীরটা ভালো ছিল না। নিজের টেবিলে মাথা রাখলে।

অতো শীতে ঘুম আসা এক আশ্চর্য ব্যাপার বৈকি। বোধহয়, নিদারুণ ক্লান্তির জন্যই নিদ্রা এসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ল দীপক। রাত তখন সাড়ে বারোটা। শোভেলের কাছে যেতে সুপারভাইজার বললে, ওরা আজ খুব কাজ করছে সাব। উজাগর এর মধ্যেই তেরো ট্রিপ দিয়েছে।

আর নিহাল সিং! নিহাল সিং দিয়েছে এগারো। স্বাভাবিক। উজাগরই বোধহয় বাজী জিতলো। উজাগর জিতলেই দীপক খুশি হবে সত্যি। কিন্তু নিহালের জন্য দুঃখও কিছুটা হবে। নিহালের উপর ওর একটা আকর্ষণ ছিল।

আবার তাঁবুতে এসে ঢুকলো। প্রচণ্ড শীতে বাইরে দাঁড়ানো, অন্তত আজ রাত্রে দীপকের সহ্য হলো না। একটু দূরে কয়েকটা লোক বড়ো একটা আগুনের কুণ্ডের সৃষ্টি করে আগুন পোয়াচ্ছিল। দীপকের প্রবল ইচ্ছা হলো সেখানে যায়। কিন্তু আবার টেবিলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে শুরু করলে। এবারে ঘুম আসতে দেরি হলো না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল দীপক, অকস্মাৎ পিঠে কার স্পর্শ অনুভব করে উঠে পড়ল। ইরফান আমেদ সামনে দাঁড়িয়ে। সাব

জলদী চলিয়ে। অ্যাকসিডেণ্ট হো গিয়া?

দীপক একটা প্রবল শিহরণ অনুভব করলে। অসংলগ্নভাবে ওর হতভম্ব কতকগুলি কথা বেরিয়ে এল। অ্যাকসিডেণ্ট। কেয়া হুয়া—কিস্‌কা।

উজাগর আর নিহাল দোনো ফাঁস গিয়া। চলিয়ে সাব জলদী। জীপ তৈয়ার হ্যায়।

এতক্ষণে আত্মস্থ হলো দীপক। ইরফানকে সংগে নিয়ে পরক্ষণেই এগিয়ে চললে।

উত্তেজিত, আতংকগ্রস্ত মানুষগুলির ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল দীপক। দুটো ডাম্পার সোজাসুজি ধাক্কা মেরে নীচের দিকে চলে গিয়েছে। একটি আসছিল পুরো লোড নিয়ে উপরের দিকে বাঁধে, অপরটি নামছিল নীচে বরো এরিয়া থেকে মাটি আনবার জন্য। উর্ধ্বগামী গাড়িটার চালক উজাগর সিং। আর খালি গাড়িটা চালাচ্ছিল নিহাল সিং। রাস্তাটা বিপজ্জনক বলে এখানে লোক থাকে একজন। দীপক এসে তার খোঁজ করলে। লোকটি বললেন, সাব, পুরো কসুর নিহাল সিংকা।

দীপক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অসংলগ্নভাবে সে যা বললে, তার মর্মার্থ হলো—উজাগর সিং ঠিকমতো রাস্তার ধার দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। নিহাল সিং উন্মাদগতিতে ঐ লোকটার বিপদসংকেত অগ্রাহ্য করে সোজাসুজিভাবে ধাক্কা মারে উজাগরের গাড়িতে। ওর ফলে উজাগর গাড়িসুদ্ধ নীচে গিয়ে পড়ে। আর ধাক্কা মারবার ঠিক আগেই নিহাল সিং নীচে লাফিয়ে পড়েছিল। একটা পাথরের সংগে চোট লেগেছে তার।

আর উজাগর সিং? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে দীপক। —সমঝ লিজিয়ে কী ও খতমই হোচুকা। ইরফান জবাব দিল। অধৈর্য দীপক প্রশ্ন করলে—জিন্দা হ্যায় কেয়া আভিতক?

জী সাব—সমবেত জবাব এলো।

উঠাও দোনোকো গাড়িমে। দীপক হুকুম দিল। উজাগরের বীভৎসভাবে আহত দেহটি দেখে দীপক শিউরে উঠলো। অসম্ভব। একে আর বাঁচানো যাবে না। লোকটার জন্য বড়ো দুঃখ বোধ করলে দীপক।

নিহাল সিং জ্ঞান হারায় নি। কেয়া হুয়া থা নিহাল? দীপক প্রশ্ন করলে? নিহাল উত্তর দিলে—ব্রেক ফেল কিয়া থা।

স্টিয়ারিংভী ফেল কিয়া থা কেয়া? দীপক প্রশ্ন করলে ব্যঙ্গ করে। সে-প্রশ্নের উত্তর দিলে না নিহাল। দুর্বিনীত উদ্ধত এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরব হয়ে রইলো। কিজন্য কে জানে, এসব অনুভূতিকে ছাপিয়ে দীপকের মনে কার মুখ ভেসে উঠল। সে-মুখ হলো রমাবাঈয়ের।

হাসপাতালের পাশাপাশি দুটি বেডে ওদের রাখা হোলো। উজাগরের অবস্থা দেখে ডাক্তার বল্লেন, একে আর কষ্ট করে নিয়ে এলেন কেন মশাই? ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই টেঁসে যাবে।

তবু ডাক্তারকে অনুরোধ জানিয়ে এল দীপক, উজাগরের জ্ঞান ফিরলেই ওকে যেন খবর দেওয়া হয়। ব্যাপারটা পুলিসের হাতে তুলে দিতে চায় ও। মৃত্যুকালীন জবানবন্দী যদি কিছু পাওয়া যায়।

ডাক্তার মৃদু হাসলেন। নিহাল সিং দীপকের বহু প্রশ্নের একটারও উত্তর দিলে না। একটা রহস্যময় আতংকিত দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল পার্শ্বশায়ী উজাগরের দিকে।

আশ্চর্য উজাগর সিংয়ের জীবনীশক্তি। ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ও বেঁচে রইল পরের দিন সন্ধ্যে অবধি।

সকালবেলায় দীপকের ঘুম ভাঙিয়ে দিল হাসপাতালের এক জমাদার। সাব, ডাক্তারবাবু আপনাকে খবর দিয়েছেন এখনি হাসপাতালে যেতে।

সবিস্ময়ে দীপক প্রশ্ন করলে—সে কী? উজাগরের জ্ঞান ফিরেছে নাকি?

জমাদার বল্লে—জী, কয়েক মিনিট আগে ওর জ্ঞান ফিরেছে দেখে ডাক্তারবাবু আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।

নিস্পন্দ উজাগরের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দীপক মৃদুস্বরে ডাকলে—উজাগর সিং।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালে উজাগর। চোখ মেলতেও কষ্ট হচ্ছিল ওর। প্রায় শোনা যায় না, অবশকণ্ঠে ও জিজ্ঞাসা করলে—নিহাল সিং কোথায়?

দীপক বল্লে—পাশের বিছানাতে।

আবার তেমনি আস্তে আস্তে কতকগুলো কথা। দীপক শুনতে পেলে ও বলছে, নিহাল সিংকে বলবেন, রমাবাঈকে আমি ওর হাতে দিয়ে গেলাম। ও যেন ওর দেখভাল করে ঠিক মতো। রমাবাঈয়ের কোনরকম তকলিফ্‌ যেন না হয়।

দীপকের মনে যে সন্দেহটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার দিকে ইংগিত করে বল্লে—অ্যাকসিডেন্টের সম্বন্ধে কিছু বলবে? নিহাল সিংয়ের সম্বন্ধে অভিযোগ করবে? বলো তো পুলিসে খবর দি। দীপকের মনে হোলো পুলিসের নাম শুনে নিহাল সিং চমকে উঠল।

উজাগরের মুখে এক ক্লিষ্ট হাসির ছায়া ফুটে উঠল। পুলিস! পুলিস কেয়া করেগা বাবুজী। নিহালকো পুলিস মে দেনেসে রমাবাঈ কিধার যায়েগী?

দীপকের আশ্চর্য লাগলো উজাগরের শেষ কথাগুলি। কোনো অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধে। সারাজীবন যাকে যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করে সাবধানে রেখেছিল বহু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে, সেই রমাবাঈকেই শেষ সময়ে নিহাল সিংয়ের হাতেই দিয়ে গেল। কী আশ্চর্য!

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্‌ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

বো আর আমি ইতিমধ্যে বুঝে ফেললাম, ওই হারানো মানুষদুটোর আমরা আর পাবো না। যদিও দেখা জীবিত তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তবুও আমাদের খোঁজায় ছেদ দিলাম না। ত্তুংগ খাড়াই বেয়ে উঠতে অপরিসীম ছিল। আশঙ্কা ছিল প্রতি পদে কে পড়ে যাওয়ার। সেই সবরকম ল অবস্থার মধ্যে আমাদের পক্ষে শুধু চমৎকার আবহাওয়াটা। ৬ই দুপ্লাত্‌ আর ভিগ্‌নেকে শেষ ঠিক এক সপ্তাহ পরে, আমরা র তৃতীয় শিবির ছেড়ে চূড়ার দিকে চেষ্টা করতে লাগলাম। বুঝতে া, এই আমাদের শেষ চেষ্টা কারণ র খাবার ক্রমশই শেষ হয়ে আসছে। রার প্রকৃতি সেই আগের মতই, না কেও খারাপ। আরও খাড়া। আছাড় খেতে, ধুঁকতে ধুঁকতে আমরা দিকে উঠতে থাকলাম। বহুবার ফলার মত সরুপথে টাল সামলে চলতে হয়েছে। সামলাতে না পেরে র তো প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। পড়তে আবার টাল সামলে নিয়েছি। থেকে যাতে পড়ে না যাই তার জন্য

া কিছু করা দরকার তা করেছি। কেন যে সেবার পড়ে যাইনি তা আজও বুঝতে পারিনি। আবার আমরা নীল আকাশের দেখা পেলাম। এবার আর শুধু আশেপাশে

নয় একেবারে আমাদের সামনে। গিরি-শিরার উপরে। তারপর একসময় গিরিশিরার সীমাও শেষ হয়ে এল। তার দৌড় ফুরিয়েছে। আমরা চড়ে গিয়েছি চূড়ার একেবারে মাথায়। সেই পাহাড়টার শীর্ষে। এই দ্বিতীয়বার নন্দাদেবীর চূড়াটায় ওঠা হ'ল। আর আমার কাছে এর স্থান এভারেস্টের পরেই। এভারেস্টের পরে এত উঁচু চূড়ায় আমি আর উঠিনি।

এই জয় বড় কষ্টসাধ্য জয়। তবে বড় ভাল। সেই পরিস্কার দিনটিতে আমাদের দৃষ্টি বড় বড় পাহাড়গুলো পার হয়ে তিব্বতের সমভূমিতে গিয়ে পড়ছিল। এত ভালো দৃশ্য আমি খুব কমই দেখেছি। কিন্তু আমরা আমাদের জয়ের কথা ভাবছিলাম না, যেসব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেছিলাম তার কথাও ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম অন্য কথা। দেখছিলাম অন্য জিনিস। চেয়েছিলাম দুই মাইল প্রসারিত আকাশ ছোঁয়া সেই সংকীর্ণ যোজকটিকে,

সেই উত্তুঙ্গ খাড়াই বেয়ে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল

যা নন্দাদেবীর দুইটি চূড়াকে তুষার আর বরফের কুটীল গাটছড়ায় বেঁধে রেখেছে। যে চূড়াটায় আমরা উঠেছি সেখান থেকে বেরিয়ে কখন উঁচু হয়ে, কখন নীচু হয়ে ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে এই যোজকটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে মিশে গেছে নন্দা দেবীর মূল চূড়াটার গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে আমরা সেই যোজকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। দূরবীন চোখে লাগিয়ে গোটা অঞ্চলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। সেই দুইমাইল জায়গার প্রতিটি গজ, প্রতিটি ফুট জায়গায় আমাদের দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। কিছু না। শুধু তুষার, শুধু বরফ দুইদিকেই শুধু ভয়ংকর খাড়াই। আর খাড়াইয়ের ওপারে দুটো সুনীল শূন্যের মহাসাগর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভয়াবহ জায়গার উপর দিয়ে হাঁটা তো চিন্তার বাইরে, কেউ যে ওখানে, ওই গিরি-শিরার উপরে, কয়েক মিনিটের জন্যও উঠতে পেরেছিল একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

আর আমাদের করবার কিছু ছিল না। আমরা নেমে আসতে লাগলাম। নামবার সময় পা হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় আরও বেশি থাকে। আমরা খুবই ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম। অবশেষে 'কল'-এ এসে পৌঁছলাম। ডাঃ পেং সেখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। পরদিন তাঁকে সঙ্গে করে আমরা নীচে আমাদের 'বেস ক্যাম্পে' ফিরে এলাম। সেখানে আমাদের যেসব সঙ্গীসাথী ছিল তাদেরও কেউ দুপ্লাত্ আর ভিগনের দেখা পায়নি। যেদিন থেকে তাঁরা নন্দা দেবীর মূল চূড়াটির কাছে অদৃশ্য হয়ে যান, তারপর থেকে তাঁদের দেখা আর কেউই পায়নি। সাহেব দুজনের জন্য আমরা যত আগে থেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি, এরা তা হয়নি। কারণ এরা ভেবেছিল, অন্তত আশা করেছিল, যে সাহেবরা হয়ত ওই জায়গাটা পাড়ি মেরে এসে আমাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু আমাদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ওদের কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিল যে, হয়ত একটা বিপদ আপদ কিছু হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের গায়ের জোর কিছু বেশি তারা ওই সাহেব দুজনের পথ ধরে মূল চূড়াটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা বেশিদূর এগোতে পারেনি। আর তারপর তারা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। তবুও দুবোয়া আর আমার একটা সান্ত্বনা এই যে, আমরা নন্দা-দেবীর পূর্ব চূড়াটায় উঠতে পেরেছি। এই অভিযান নিতান্ত ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু ক্ষতির তুলনায়, আমাদের সঙ্গী দুজনের বিচ্ছেদের তুলনায়, এ কাজ কিছুই না।

তাহলে দুপ্লাত্ আর ভিগ্‌নের হ'ল কি? থর্নলি আর চেস্ সাহেবের নাঙ্গা পর্বতে যা হয়েছিল, পাহাড়ে এসে যে সব লোক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় তাদের বেলায় যা ঘটে এদেরও তাই ঘটেছে। শুধু আন্দাজ ছাড়া আর কেউ কিছু করতেও পারে না। আমার নিজের ধারণা যে তাঁরা নন্দাদেবীর মূল চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। কারণ আমরা যখন তাঁদের দেখি তখন তাঁরা চূড়াটার খুবই কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন। আর বাকি পথটায় খুব প্রকাণ্ড বাধাও বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু চূড়াটি ডিঙিয়ে তাঁরা যখন ঐ দুইমাইল লম্বা গিরিশিরাটি ধরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তখনই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাদের কাছে খুব ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার ধারণা হঠাৎ পা হড়কে গিয়ে তাঁরা পড়ে যান। পড়েন পাহাড়ের ওই উল্টোদিকে। সেদিকটা আরও খাড়া। একেবারে খুব নীচেকার ওই হিমবাহটির উপরে গিয়ে পড়েন।

একককভাবে দেখলে পাহাড়টা শ্রদ্ধাই জাগায়
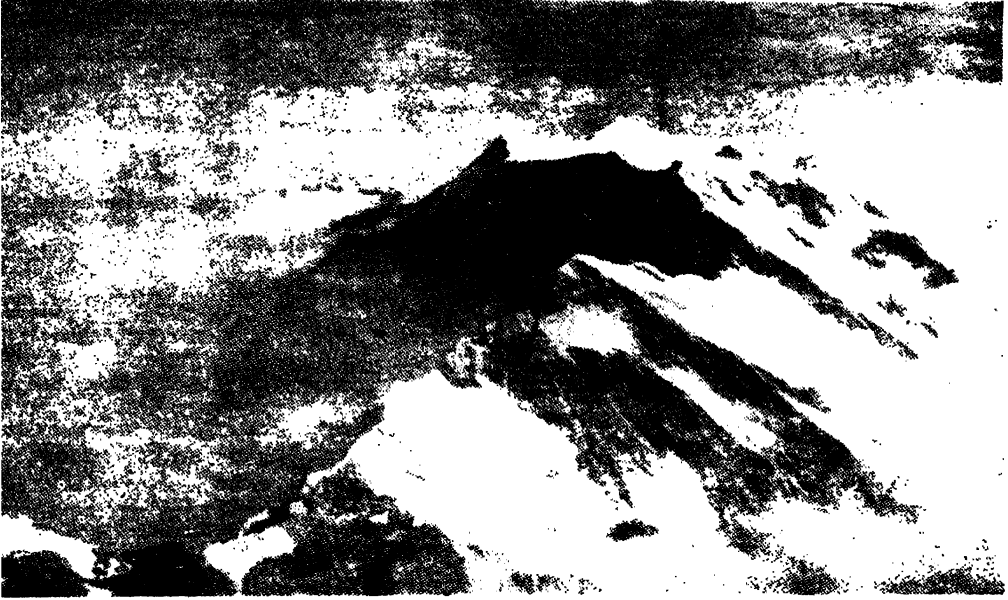
াক, তাঁরা এজগৎ ছেড়ে চলে তাঁদের সাহস ছিল। পাহাড় হলেন ওস্তাদ। কিন্তু থর্নলি আর ও কিছু লোকের মত তারাও এই াড়টার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। করতে গিয়েছিলেন। আর তার দামও দিয়েছেন।

অভিযানে চারটে মৃত্যু। যথেষ্ট, া হয় এই যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্য ামাকে ছেড়ে যায়নি। সেই বছরই একটা অভিযান। নিলো আর প্রাণ বলি।

নময়টা শরৎকাল। বর্ষা কেটে ার। আর স্থানটা কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জিলিঙের উত্তরে। আগের ুলোর মতই এটারও লক্ষ্য কোন শেষ পাহাড় ছিল না। তথ্য জন্য সাধারণত যে ধরনের দলকে ঞ্চলে পাঠানো হয়, এ দলটাও সেই আর এ দলটা ছিল খুবই ছোট। দের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। এই হেব ছিলেন একজন। মিঃ জর্জ জন সুইস। তিনি ছিলেন ভারত, । আর ব্রহ্মদেশের সুইস সরকারের বাণিজ্য কমিশনার। দলের সর্দার ামি। আর ছিল মুষ্টিমেয় কয়েক- পা। ফ্রে সাহেব পাহাড়ে ওঠার জানতেন চমৎকার। কোনরকম বড় আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। আর এ এক এমন ধরনের অভিযান, যার সঙ্গে দুর্ঘটনার কথা ভাবাই যায় না।

সুন্দরভাবে যাত্রাটা শুরু হ'ল। আবহাওয়া ছিল অতি চমৎকার। আমরা উঁচু উঁচু অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। এ চূড়া, সে চূড়ার মধ্যে অনেক খেপ্ মারলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে ইয়ানুঙ হিমবাহের নানা অনাবিষ্কৃত জায়গায় গিয়ে আমরা হাজির হলাম। নেপাল আর সিকিমের মধ্যে একটা সংকটময় গিরিপথ আছে। রাটঙ্ গিরিপথ। আমরা সেটা পেরিয়ে গেলাম। আমাদের আগে আর একটিমাত্র দল এই পথ পার হয়েছে। কয়েকবছর আগে একটা সুইস-পেরনা অভিযাত্রীদল আর একজন তরুণ আমেরিকান কৃষিব্যবসায়ী কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অঞ্চলে এসে বিফল হ'য়ে অদৃশ্য হয়ে যান, আমরা সেসব জায়গাতেও ঘুরেছি। খুঁজেছি, যদি তাদের কোন চিহ্ন দেখতে পাই। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পাইনি। তারপর আমরা ধারেকাছে কয়েকটা পাহাড়ে অভিযান চালাই। এইসব অভিযানে খুবই সফল হয়েছিলাম। বেশিরভাগ পাহাড়ের চূড়াতেই উঠতে পেরেছিলাম। আর টিনের কৌটার মধ্যে আমাদের নামগুলো লিখে সেসব জায়গায় রেখে এসেছিলাম, এইজন্য যে পরে আমাদের যদি কেউ অনুসরণ করে তবে এগুলো তাদের উপকারে লাগবে। এমনি করে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এলো।

ফেরবার পথে কি করলাম এবার একটা বড়সড় পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। কাঙ্ বলে একটা চূড়া ছিল, মোটামুটি মন্দ উঁচু নয়, আমরা সেইটাকেই বেছে নিলাম।

হিমালয়ের কাছে এই চূড়োটা এমন কিছু গণ্যমান্য নয়। এটা মাত্র ১৯,০০০ ফিট উঁচু। বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশে এই চূড়াটাকে দেখায় ঠিক যেন বেঁটে বামন। কিন্তু শুধু এই পাহাড়টিকে দেখলে মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। আর এটার চূড়ায় এর আগে কেউ ওঠেওনি। তাই আমাদের মনে হ'ল, আমাদের মত ছোটখাটো একটা দলের পক্ষে এটাকে জয় করা মন্দ পুরস্কার নয়। তাই আমরা এই পাহাড়টার পাদদেশের দিকে এগিয়ে গেলাম, ওপরে ওঠার একটা পথও খুঁজে পেলাম। আর তারপর শিবির স্থাপন করলাম। এ পর্যন্ত বেশ ভালই কাটল। কোথাও কোন গোলমাল ঠেকল না। সত্যি বলতে কি, আমার মনে কেন যে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে আমি তার কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সেই রাত্রে আমি একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমি জানি, আমি আমার স্বপ্ন দেখার কথা এর আগেও কয়েকবার বলেছি। পাঠক পাঠিকারা হয়ত আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছেন। কিন্তু যা সত্য তা আমি বলব। স্বপ্ন আমি দেখলাম। খুবই দুঃস্বপ্ন। আর ঠিক তার পরদিনেই দুর্ঘটনা ঘটলো। আগের বছর আমার দুঃস্বপ্ন দেখার পরে

নাঙ্গা পর্বতে যেরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল, এবারেও ঠিক তেমনটিই ঘটলো। তবে এবারে স্বপ্নে আমি এমন কাউকে দেখলাম না যাদের আমি চিনি। এবার আমার স্বপ্নে ছিলাম আমি আর অপরিচিত এক স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি খাবার বিতরণ করছিল। আমার খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই খাবার দিল না। স্বপ্ন মাত্র এইটুকু। কিন্তু শেরপাদের বিশ্বাস অনুসারে এ এক খুবই অমঙ্গলের চিহ্ন। আমি তাই ভাবিত হলাম। সকালে উঠে এই স্বপ্নের কথা আমি আমার সঙ্গীদের বললাম। তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'ল। কিন্তু ফ্রে সাহেব ব্যাপারটা শুনে হো হো করে হাসলেন। এ নিয়ে রঙ্গ-রসিকতাও করলেন। তারপর বললেন, "চল যাই, যাত্রার সময় হয়েছে।"

আমি হয়ত গররাজি হতে পারতাম। কিন্তু একথা বলা খুব শক্ত। কয়েকজন শেরপা বেঁকে বসল। যেতে চাইলো না। কিন্তু আমি তা করিনি। শেষ পর্যন্ত আমরা তিনজন—ফ্রে সাহেব, শেরপা আঙদাওয়া ও আমি পাহাড় চড়তে শুরু করলাম। প্রথমদিকে কাজটা ছিল খুবই সোজা। এক লম্বা তুষার মোড়া খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা উঠতে লাগলাম। আর সে খাড়াইও এমন কিছু বুকভাঙ্গা নয়। দড়িদড়ার সাহায্যের দরকার আমাদের হচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের খাঁজগুলোর কোণ ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল। তুষার হল কঠিনতর। আমি একটুখানি থেমে আমার জুতোর নীচে ইস্পাতের কাঁটাওয়ালা "ক্র্যাম্পন্" লাগিয়ে নিলাম। এইবারে আমার পায়ে বেশ জোর পেলাম। ফ্রে সাহেব আগে আগে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে বললাম, "আপনার জুতোয় ক্র্যাম্পন্ লাগিয়ে নিলেন না?" সাহেব জবাব দিলেন, "না, আমার কোন দরকার নেই।" তারপর আবার আমরা উঠতে লাগলাম। কখন কখন ভাবি, আমার কি তখন আরও জোর করা উচিত ছিল না? সাহেবের জুতোয় কাঁটা লাগাবার জন্য তাঁকে কি আরো পীড়াপীড়ি করা উচিত ছিল না? কিন্তু ফ্রে সাহেব তো ওস্তাদ পাহাড় চড়িয়ে। আল্পস্ পাহাড়ে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আর এই জায়গা থেকে অনেক বেশি দুরূহ জায়গাতেও তিনি গিয়েছেন। কই তাতে তো কোন আপদ-বিপদ তার ঘটেনি। আমরা খুব সহজেই উঠতে লাগলাম। আগে আগে সাহেব, আমি মাঝখানে আর আঙদাওয়া আমার পিছনে। এ সময় পর্যন্তও আমরা কেউ কারো পায়ে দড়ি বাঁধিনি। ফুট পনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা চলছিলাম। চারিদিক চেয়ে আমার ধারণা হল, আমরা হাজার সতের ফিট উঠেছি। কাঙ্ চুনার শীর্ষে পৌঁছতে আর বড়জোর হাজার দুয়েক ফিট বাকি।

তারপর হঠাৎ ফ্রে সাহেব পা পিছলে পড়ে গেলেন কেমন করে, কেন, তা বলতে পারি না। আমার সামনেই ধীর স্থিরভাবে এইতো একটু আগেই তিনি উঠে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে কি হয়ে গেল। দেখলাম সাহেব গড়াতে গড়াতে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, সাহেব বোধহয় আমার ঘাড়েই এসে পড়বেন। তারপর আমাকে শুদ্ধ নিয়ে তিনি গড়িয়ে যাবেন। কিন্তু না। আমার একটু পাশ দিয়েই তিনি গড়াতে লাগলেন। কাছাকাছি আসতেই আমি লাফ দিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল কিছু হল না। একে সাহেবের ভারি ওজন, তারপর ঐ প্রচণ্ড গতিবেগ। তাঁকে রোখা গেল না। আমি হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে
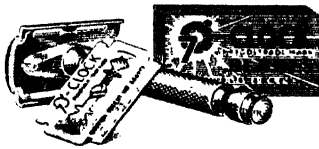
লাম। তাঁকে ধরেও ছিলাম। আমার মচকে গেল নিমেষের মধ্যে। প্রচণ্ড টর পেলাম। ততক্ষণে সাহেব আমাকে গড়িয়ে নিচে গেছে। আমাকে ন, আঙদাওয়াকে ছাড়ালেন। ধাক্কা খেতে সেই ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত গড়িয়ে গেল তাঁর দেহ। গড়িয়ে গেল প্রায় হাজার ফিট নীচে। তারপর সেইখানে একটা সমতল জায়গায় এসে তাঁর দেহটা শান্ত হয়ে থেমে পড়ল।

আমার পাহাড় চড়ার জীবনে, এই প্রথম আমি কাউকে আমার চোখের উপর দিয়ে পড়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু যারা দেখেছে, এ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা আমাকে বলেছে—এ সময় কেমন লাগে। কয়েক মিনিটের মত হতভম্ব হতে যেতে হয়। সমস্ত শরীরটা পাথরের মত স্থানু হয়ে পড়ে। তোমার চেতনায়, তোমার ভাবনায় একটিমাত্র ভয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সে ভয়, পড়ে যাবার ভয়। মনে হয়, পর-মুহূর্তেই এই বুঝি তুমিও পড়ে গেলে। আমার আর আঙদাওয়ার এই অবস্থাই হয়েছিল। প্রথম প্রথম আমরা যেন নিশ্চল হয়ে গেলাম, জমে গেলাম। আমরা যেন এই পাহাড়েরই একটা অংশ। কিন্তু এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল যে, আমার চোখকে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, সাহেব আমার আগে আগে উঠে যাচ্ছেন। উপরের দিকে চাইলেই তাঁকে দেখতে পাবো। কিন্তু নেই, সাহেব সেখানে নেই। এই যে নিচে, ওই যে শ্বেতশুভ্র একখণ্ড সমতল চত্বর তার উপরে ওই যে একটা কালো বিন্দু স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, ওই হচ্ছেন সাহেব। কিছুক্ষণ পরে আমি আঙদাওয়ার কাছে নেমে যেতে সমর্থ হলাম। সে বেজায় ভড়কে গেছে। প্রথম কথাই সে বললে, নীচে নামার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

সে নীচে নামতে পারবে না। একটু অপেক্ষা করার পর তার অবস্থা কিছু ভাল হল। আমরা ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম। আমরা খুবই সাবধানে পা ফেলতে লাগলাম। আমরা যে পরিমাণ ভড়কে গিয়েছিলাম, তাতে জানতাম, যে কোন মুহূর্তেই আমাদের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অর্ধেক পথ নেমে আসার পর একটা ছোট কালো জিনিসের দিকে আমার নজর পড়ল। কুড়িয়ে নিয়ে দেখি, সেটা ফ্রে সাহেবের ক্যামেরা। এবার আমরা সাহেবের কাছে নেমে গেলাম। বলাই বাহুল্য, তিনি মারা গেছেন। এত উঁচু থেকে পড়ে বাঁচা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাকি পথটুকু তাঁকে আমরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললাম। শিবিরের কাছাকাছি যেতে, যেসব শেরপা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা এগিয়ে এল; এসে সাহেবের দেহটা বয়ে নিতে আমাদের সাহায্য করল। পরদিন তাঁকে আমরা কবর দিলাম। বরফের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে যে হিমবাহের উপর তিনি পড়েছিলেন, সেখানে নয়। আমরা তাঁকে কবর দিলাম একটা পাথুরে পাহাড়ের নীচে, অজস্র নুড়িপাথর যেখানে তাঁর জন্য বিছানা পেতে রেখেছিল, সেইখানে। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে সেখানে আমরা একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে রাখলাম। তারপর ভারাক্রান্ত মনে ফিরে চললাম দার্জিলিঙে। কিছুদূর আসবার পর আমি টের পেলাম, ফ্রে সাহেবকে ধরতে যে আঙুলটায় আমি ব্যথা পেয়েছিলাম, সেটা ভেঙে গেছে। দু-একটা ছোটখাটো আছাড় খাওয়া কি সামান্য একটু ছাল চটা-ওঠা ছাড়া আমি আমার সমগ্র পাহাড়ে চড়ার জীবনে অন্য আঘাত পাইনি। দেহে চোট পেলাম এইবারই প্রথম।

তাহলে, আমি ভাবতে লাগলাম, এই আমার তিরিশের কোঠার শেষের দিকে পা দেওয়া। এই বুঝি আমার সেই সংকটকাল। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে অক্ষতই আছি, তবুও পর পর যে তিনটে অভিযানের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, সেই তিনটেতেই প্রাণহানি ঘটেছে......নাঙ্গা পর্বত, নন্দা দেবী, কাঙ্ চূড়া......"তারপর এখন কি?" আমার ভাবনা হল। কিছু ভয়ও হল। তিরিশের কোঠা পেরোতে আমার এখনও যে দু-বছর বাকি। (ক্রমশ)

॥ কুড়ি ॥

বুড়ো খাপেগার কেসুঙে কেলুরী গ্রামের সব মানুষগুলো বৃত্তের মত ঘন হয়ে বসেছে। নানা বংশের প্রাচীন মানুষেরা এসেছে, এসেছে অপরূপ সাজে সেজে তুগাকবরী পাহাড়ী কন্যাকুমারী। কোমরের সন্ধি থেকে নিটোল জঙ্ঘা পর্যন্ত খামেরু সু কাপড়। ফেকু দিয়ে নিবিড় করে বাঁধা চুলের দুপাশে আউ পাখির পালক। আতামারী ফুলের বাহারে পাহাড়ী কানা। গলায় হাতীর দাঁতের আরুখা। মণিবন্ধে বাদামি হাড়ের বলয়। এসেছে পাহাড়ী তরুণ। মাথায় সেটসুঙের শিঙের মুকুট। কোমরে জঙ্গুপি। আর এসেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা; লালঝুঁটি মুর্গীর মত কেসুঙের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

খাপেগার কেসুঙের ঠিক পেছনেই বন-বনের ফাঁকে একটা জলপ্রপাত। ভয়ানক। অবিরাম গর্জে চলেছে। উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে প্রবল উচ্ছ্বাসে অতল খাদে সেই ভয়াল জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সমস্ত বন-ভূমি সেই প্রপাতের গর্জনে আর প্রতি-ধ্বনিতে ভরে গিয়েছে। দুপুরের রোদ মাছের আঁশের মত ঝকঝকে। সেই রোদেই প্রপাতের দেহে মাখামাখি হয়ে একটি রূপালি তরঙ্গরেখা সৃষ্টি হয়েছে। গম্ গম্ প্রপাতের গর্জন। সেই গর্জনকে ছাপিয়ে বুড়ো খাপেগার কেসুঙে খুশি খুশি কোলাহল ভেসে উঠছে।

"ও সন্দার, সেণ্ট্সুঙের মাংস খাবো।"
"ও সন্দার, রোহি মধু দে।"

বুড়ো খাপেগার কেসুঙে রমণীয় এক উৎসবের আয়োজন। বুড়ো খাপেগা কপট বিরক্তিতে ধমক দিল, "রোহি মধু খাবে! সেণ্ট্সুঙের মাংস খাবে শয়তানের বাচ্চারা! এখন পর্যন্ত বুড়ি বেঙসানটা এলো না টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) নিয়ে! আমি এখন কী করি? শয়তানির গলাটা টিপে নিয়ে আসবো না কী?"

কয়েকটা গলা বুদ্বুদের মত ফিস ফিস ফুটে উঠেই ফেটে চৌচির হলো; "একটা সাসুমেচু (ভয়ানক লোভী মানুষ)! আস্ত সাসুমেচু!"

"হু, হু, শত্রুদের মেয়েটাকে নিজের ধর্মমেয়ে বানিয়ে শয়তানটা টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) বাগাচ্ছে।"

"হু, হু। আজ যদি সেঙাইটা থাকতো। মজাটা জমতো ভালো। ছোঁড়াটা আজও ফিরলো না কোহিমা থেকে!"

আচমকা অনেকগুলো গলায় উল্লাস ভেঙে পড়লো; "হুই তো, হুই তো সেঙাইর আপি (ঠাকুমা) আসছে।"

"কই? কই?" সকলকে ধাক্কা মেরে, গুঁতো দিয়ে ওলট-পালট করে সামনে এগিয়ে এলো বুড়ো সর্দার খাপেগা। লোলুপ চোখদুটো তার ঝকমক জ্বলছে। অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর পার হয়েছে তার।

সামনের টিলাটার ফাঁক দিয়ে খাপেগার কেসুঙে চলে এলো বুড়ি বেঙসানু। তার কাঁধের একরাশ খারে ন্যু বর্শা। বেঙু-সানুর পেছনে ফাসাও আর নজলি। তাদেরও পেছনে পেছনে এলো ওঙলে। তার কাঁধে খানকয়েক আধুনিক গড়নের বর্শা। বুড়ি বেঙসানু একলা একলা বর্শার বোঝা নিয়ে আসতে পারে নি। তাই ওঙলে তার সাহায্যে গিয়েছিল প্রথম সকালে।

বিগলিত অভ্যর্থনা জানালো বুড়ো খাপেগা; "আয়, আয় বেঙসানু। কী খাবি বল? রোহি মধু, না টেবোয়ার কাবাব? না ঝলসানো আশুমি?"

"না, না, অত খাতিরের দরকার নেই। টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) এনেছি। তুই তো একটা সাসুমেচু! পরের মেয়ের রূপ আর যৌবন কয়েকদিন পুষে দাম হেঁকেছিস দশটা খারে ন্যু বর্শা। কী আর করি, মেয়েটাকে দেখে চোখ মজেছে, মেয়েটার গুণ দেখে মন নরম হয়েছে! কী আর করি?"

"হু, হু।" দুটি মাত্র শব্দ করে নিরুত্তর হয়ে গেল বুড়ো খাপেগা। শুধু ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলো সে।

"তা ছাড়া সেঙাই ওকে পিরীত করে। দুজনে দুজনের লগো। তাই, এই খারে ন্যু দিয়ে টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) দিলুম। এই খারে ন্যু আমার বাবা আমার বিয়ের সময় পেয়েছিল হুই সেঙাইর ঠাকুদ্দার কাছ থেকে। সেঙাইর ঠাকুদ্দা পেয়েছিল—" অনেক প্রাচীন ইতিহাস টেনে আনলো বুড়ি বেঙসানু।

"হু, হু—" সমানে মাথা দুলিয়ে চলেছে বুড়ো খাপেগা; "সে আমি জানি।"

খুশি খুশি কলরব কেসুঙের চারদিক থেকে উঠে আসছে; "ভোজ দে, রোহি মধু দে—"

"ও সন্দার, কুকুরের কাবাব দে—"

"থাম টেফঙের বাচ্চারা!" গর্জে উঠতে গিয়ে হেসে ফেললো বুড়ো খাপেগা; "আজ যদি সেঙাইটা থাকতো! ওর বিয়ে, অথচ ছেলেটা জানতেই পারলো না।"

বুড়ি বেঙসানুর কুঞ্চিত মুখখানাতে একটি রহস্যময় হাসির লহর ফিনিক দিয়ে ফুটে উঠলো; "শয়তানটা এসে একেবারে তাজ্জব হয়ে যাবে। মেহেলী আর

—শয়তানটা আনন্দে না আবার য় যায়। সে যাক্, তেলেঙ্গা সু য়টা দেবো টেবোয়ার বাচ্চা দুটোর।" হঃ—হিঃ—" ফিক ফিক করে গলায় হেসে ফেললো বুড়ো

—" অনেক বেলা হয়েছে পার হতে চললো। এবার তো

টেনেন্যু মিঙ্গেলু হিসেব করে গুণে নে।"

"হু—হু—" শিথিল পেশীগুলিকে তরঙ্গিত করে একটি লোভার্ত পুলকের ঢেউ উঠেছে বুড়ো খাপেগার। কোনদিনই কী সে ভেবেছিল, সালুয়ালাঙ্ গ্রামের শত্রুপক্ষের মেয়েটা তার কেসুঙকে খারে নাদু বর্শার গৌরবে ভরে দেবে। ভরে দেবে টেনেন্যু মিঙ্গেলুর ঐশ্বর্য।

রূপকথার মত অপরূপ! কী তার চেয়েও আশ্চর্যতর বিস্ময়ের! বুড়ো খাপেগার কেসুঙের ঠিক পেছনেই বিশাল একখণ্ড কপিশ পাথর। তার ওপরে জটিলবন্ধ কয়েকটি খাসেম গাছ, আতামারী লতার কুটিল বাঁধনে নীরন্ধ্র হয়ে রয়েছে। সেই দুর্গম জঙ্গল ফুঁড়ে দুটি মানুষ বেরিয়ে এলো। সেঙাই আর সারুয়ামারু। একেবারে সরাসরি এসে দাঁড়ালো বুড়ো খাপেগার কেসুঙের সামনে অতিকায় পাথুরে চত্বরে।

প্রচণ্ড বিস্ময়ের প্রহারে প্রথমটা হতবাক হয়ে গিয়েছিল পাহাড়ী মানুষগুলো। তারপরেই বিস্ময়ের মৌতাত কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দিত হল্লা আকাশের দিকে উঠে গেল। সে চিৎকারে পেছনের ঘন পত্রিকুঞ্জের প্রপাতটা চমকে উঠলো যেন।

"সেঙাই এসেছে। সেঙাই এসেছে।"

"সারুয়ামারু এসেছে। সারুয়ামারু এসেছে।"

বুড়ী বেঙসানুর চোখ দুটো উল্লাসে চিক চিক করছে। ভাঁড়বেগে কালো পাথরের রাজাসন থেকে উঠে এলো সে। তারপর দুটি কঙ্কালবাহু দিয়ে সেঙাইর গলায় ফাঁস পরালো, "এতদিন কোহিমাতে কী করলি রে সেঙাই? এই দেখ্ না, তোর জন্যে টেনেন্যু মিঙ্গেলু (কন্যাপণ) দিতে এসেছি তা তোর বাবা সেই সিজিটো শয়তানটা কই? তোর মা মাগী মরেছে না কী?"

প্রথম যখন বুঝবুদ্ধির কলি ফুটলো সিজিটোর, যখন মোরাঙের নারীহীন বিছানায় প্রথম শুতে গেল, সেদিন থেকে তার সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছে বুড়ী বেঙসানুর। সিজিটো যেন কেমন এক বিচিত্র মানুষ। এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই বনময় মালভূমির মানুষগুলি থেকে পালিয়ে পালিয়ে নিভৃত নিরালায় বসে বসে কী যেন ভাবতো। দৃষ্টি তার দূরান্বেষী। তারও পর যেদিন সে কোহিমা গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে এলো, সেদিন থেকে ব্যবধান আরো বাড়লো। কিন্তু একদিন যখন ারুয়ামারুর বউ জামাতসুর বিছানায় উঠে নিজের পাহাড়ী রক্তের প্রমাণ দিলে সিজিটো, সেদিন বুড়ী বেঙসানু তার ইজ্জতের দাম দিতে দিতে ভেবেছিল ছেলের সঙ্গে বুঝি নতুন করে সেতুবন্ধ হলো। কিন্তু নাঃ, সিজিটো সুদূরেই রয়ে গেল। আবারও সে কোহিমা না কোথায় পলাতক হয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে বউকে। প্রবল বিতৃষ্ণায় মাত্র একটি জিজ্ঞাসার সীমান্তে এসে সিজিটোর প্রসঙ্গকে সে বরবাদ করে দিল। বুড়ী বেঙসানু বললো, "তোর টেনেন্যু মিঙ্গেলু (কন্যাপণ) দিতে এসেছি।"

"টেনেগনু মিঙেগলু (কন্যাপণ)? আমি মেহেলী ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবো না। সে হলো আমার পিরীতের মাগী। খবরদার!" দাউ দাউ জ্বলে উঠলো সেঙাই।"

"বিয়ে করবি না? তোকে করতেই হবে।" মিটি মিটি গলায় রঙ্গ করতে শুরু করলো বুড়ী বেঙসানু।

"আমি করবো না। বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করবি না ঠাকুমা। একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো কিন্তু।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সেঙাই।

সারুয়ামারুও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এবারে সে বললো "এটা কেমন কথা। মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর পিরীত। এই পাহাড়ের সবাই জানে সে খবর। সেঙাই হুই কোহিমাতে গিয়ে ফাদারকেও বলে এসেছে। অন্য মাগীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া চলবে না।"

"চলবে তো!" বুড়ী বেঙসানুর গলায় নির্বিকার দৃঢ়তা।

"খবরদার!" আবারও গর্জন করে উঠলো সেঙাই।

কিছু একটা ঘটে যেতো। ভয়ঙ্কর একটা কিছু। খানিকটা তাজা পাহাড়ী রক্ত বুড়ো খাপেগার কেসুঙটাকে রাঙিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তার আগেই কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো আকাশ ফাটিয়ে কলরব করে উঠলো। এতক্ষণ যেন একটা গর্জমান জলপ্রপাত একেবারে স্তব্ধ হয়েছিল। স্তব্ধ হয়ে বুড়ী বেঙসানু আর সেঙাইর রঙ্গরস উপভোগ করছিল।

কেসুঙ তোলপাড় কোলাহল। কেলুরী গ্রামের কন্যাকুমারীদের সঙ্গে তরুণ ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠলো, "মেহেলীর সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে রে সেঙাই। তোর ঠাকুমা মস্করা করছে।"

"মেহেলীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!" নিজের কণ্ঠটা নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা শোনালো সেঙাইর। কেমন যেন অবিশ্বাসী।

"হু, হু—" সকল গলায় একই খুশীর সমর্থন, "তার জন্যেই টেনেগনু মিঙেগলু (কন্যাপণ) নিচ্ছে সর্দার।"

এক খণ্ড কুটিল সন্দেহ সেঙাইর চেতনার ওপর ছায়া ফেললো, "মেহেলী তো সালুয়ালাঙ বস্তীর মেয়ে। তার জন্যে টেনেনু মিঙেগলু নেবে কেন আমাদের সর্দার? টেনেনু মিঙেগলু নেবে তো মেহেলীর বাবা।"

"তুই তো জানিস না। তুই যেদিন কোহিমা চলে গেলি, সেদিন মেহেলী এ বস্তীতে চলে এসেছে।" কনুই দিয়ে পথ কেটে কেটে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো ওঙলে। কেমন করে মেহেলী এ গ্রামে এলো, কেমন করে বুড়ো খাপেগার সঙ্গে ধর্মবাপের সম্পর্ক রচনা করলো, তারপর সেঙাইর জন্যে একটির পর একটি প্রতীক্ষার প্রহর দিয়ে মালা গেঁথে চলেছে, তার আদিশেষ রূপকথা বললো ওঙলে।

এবার বিস্ময়ে আর আনন্দে চোখের মণি দুটো ঝিকমিক করে উঠলো সেঙাইর। এই মুহূর্তে তার অর্ধস্ফুট চেতনায় সমস্ত পাহাড়ী পৃথিবীটা যেন মধুময় হয়ে উঠেছে। বড় ভালো লাগছে দুপুরশেষের এই গৈরিক রোদ। ফুলতনু পাহাড়ী রূপ-কন্যারা অপরূপ হয়ে উঠেছে। ভালো লাগছে ওঙলেকে, এমন কী বুড়ী বেঙসানু কী বুড়ো খাপেগার আশ্চর্য ভয়ংকর মুখ দুটোও কী রমণীয় হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তের ইন্দ্রজালে দূরের ঐ জলপ্রপাতের গর্জনকে মধুর সংগীতের মত কমনীয় মনে হচ্ছে সেঙাইর। সারা দেহের পেশী-গুলিকে আলোড়িত করে একটি সুখের শিহরণ খেলে খেলে যাচ্ছে তার।

আবিষ্ট গলায় সেঙাই বললো, "বাকিস কী? মেহেলী কোথায়?"

এবার জবাবটা ওঙলের ঠোঁট থেকে বেরুলো না। সামনে এগিয়ে এলো বুড়ো খাপেগা, "কী রে টেরোর বাচ্চা টেফোয়া। ইজা রামখো! এবার বুঝি আনন্দ আর ধরে না। পছন্দের মাগীকে বিছানায় পাবি। বিয়ের কথা শুনে একেবারে ফোঁস করে উঠেছিলি তো!"

একবিন্দু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সেঙাইর সব মনোযোগ স্থির হয়ে রয়েছে; "মেহেলী কোথায়? তাকে দেখবো।"

"তার ব্যারাম হয়েছে। আজোলার ভিতরের ঘরে মাচানে শুয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

"কেন? আমার বউর সঙ্গে দেখা করবো তো।"

"তোর বউ তো এখনও হয়নি। ও এখন আমার ধরম মেয়ে। তা ছাড়া তামুন্যু (চিকিৎসক) ওর সঙ্গে কারো কথা বলতে বারণ করেছে।"

"হু-হু।" একটি অসহ্য হৃদয়াবেগকে দুটি শব্দের মধ্যে মুক্তি দিল সেঙাই; "আচ্ছা।"

কেসুঙের বাইরে এই ঘাসময় পাহাড়ী ভূমিটা থেকে একটি বিশেষ কণ্ঠ ভেসে আসছে। সে কণ্ঠের স্বরে পৃথিবীর সব সুস্বাদ যেন মেশানো, সব রোমাঞ্চ জড়ানো।

আজোলার বাঁশের মাচানে রোগবন্দী হয়ে শুয়ে রয়েছে মেহেলী। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দুটি কানের মধ্যে কেন্দ্রিত হয়ে সেঙাইর কণ্ঠকে চুমুক দিয়ে শুষে নিচ্ছে। অবশেষে সেঙাই এসেছে। অনেক প্রতীক্ষার জল-প্রপাত ডিঙিয়ে, অজস্র পল-বিপলের পাহাড় রেখা উজিয়ে এই মনোরম মুহূর্তের শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে মেহেলী। সেঙাই! এই একটি নাম বুকের ধুকধুক হয়ে অহরহ বাজতে শুরু করলো যেন তার। বাঁশের এই নীরস মাচানের আলিঙ্গন থেকে একটা রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে সেঙইর দুটি প্রখর বাহুর মধ্যে এই কুমারী দেহটিকে ঢেলে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নিরুপায় মেহেলী। তামুন্যুর নিষেধ: এই মাচান থেকে তার কোনমতেই ওঠা চলবে না। কী এক বিচিত্র রোগ: চামড়ার ওপর অসহ্য উত্তাপ। তামুন্যুর নির্দেশে খাওয়া বন্ধ হয়েছে।

সমস্ত দেহমন প্রবল আবেগে ছটফট করছে। শরাহত একটা আউ পাখীর মত। পাহাড়ী রক্ত ধমনীতে ধমনীতে উচ্ছ্বসিত

ঠেছে। অসহায় আক্রোশে মাচানের ফাঁস ফোঁস করতে লাগলো মেহেলী। আজেলো, তারপর আয়েহাকাঙা। র একটু সমতলের আভাস। সেখানে য়েছে সেঙাই। কত সামনে, অথচ দূরে সেঙাই। আপাতত দূরতম ার সন্ধ্যা তারাটির মত অধরাই সেঙাই।

সময় টেনেন্যু মিঙেগসু (কন্যাপণ) নেওয়ার পর্ব শেষ হলো। বাঁশের ত্র রোহিমধু আর কাঠের পাত্রে ার কাবাব সকলের সামনে সাজিয়ে ড়ো খাপেগা। একমাত্র ভাইপো ওঙলে সংসারে আর কেউ নেই তার। তাই র্ভোগ। সারা সকাল বসে বসে নিজের কাবাব বানাতে হয়েছে। অবশ্য মারুর বউ জামাতসু, আর গ্রামের টি কুমারী মেয়ে সাহায্য করতে ল।

য়ে তারিয়ে রোহিমধু খেতে খেতে ন বললো, "পছন্দের মাগী তো বউ তোর, কী রে সেঙাই? একটা মাথা গেল না, খানিকটা রক্ত দেখলাম না। যেন স্বোয়াদ পাচ্ছি না। কেমন নিমকছাড়া!"

হু-হু।" মাথা ঝাঁকালো বুড়ো সর্দার া: "একেবারে ঢিলে দিলে চলবে না। যে সালুয়ালাঙের শত্রুরা বর্শা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার কী ঠিক আছে? তো পাহাড়ী, ওদের মেয়েকে এ র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি আমরা; কী ছাড়বে? লড়াই একটা বাধবে মনে হচ্ছে।"

হু-হু। আমাদের তৈরী থাকতে হবে। গুলো গলায় একই ঘোষণা বাজলো। ড়ো খাপেগা বললো, "তারপর কোহি- কী হলো সেঙাই? তার গল্প বল্?" ঙাইর মনটা কল্পনার একটি মনোহর র চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। সে-মুখ লীর। কোন গল্প, কোন কাহিনীর র্ণ নেই। তার সব মনোযোগ, সব হ ত একটি মুখকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ঐ একটি মুখে কত সুখ! কত সম্মোহন। বিস্বাদ গলায় সেঙাই বললো, "কোহিমার কথা অনেক, মোরাঙে বসে রাত্তিরে বলবো।"

নানকোয়া গ্রাম থেকে রাঙসুঙ্ সরাসরি এসে উঠলো পোকরি কেসুঙে। এসে সাঙ্গাম খাবার আয়েহাকাঙে জাঁকিয়ে বসলো। রাঙসুঙের সঙ্গে এসেছে জনকয়েক পাহাড়ী জোয়ান। হাতের থাবায় মৃত্যুমুখ বর্শার ফলাগুলো ঝলকাচ্ছে। রাঙসুঙ মেজি- চিজুঙের বাপ।

সমস্ত কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে একটা হুঙ্কার ছাড়লো রাঙসুঙ "নসু কেহেঙ মাসে টেনেন্যু মিঙেগলু (কন্যাপণ) পাঠালুম, এখনও তোর মেয়ের বিয়ে দিলি নি। খারে নু বর্শাগুলো মেরে দেবার মতলব না কি? এদিকে আমার ছেলেটা পাহাড়ে পাহাড়ে বাঘ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"বিয়ে তো দেবো। কিন্তু আমার মেয়েটা যে উধাও হয়েছে।"

"তোর মেয়ে!"

"হু-হু, হুই মেহেলীটা কেলুরী বস্তীতে পালিয়ে গিয়েছে। হুই বস্তীর সেঙাইকে বিয়ে করতে চায়।"

"সেঙাইকে বিয়ে করতে চাইলেই হলো! আমরা আগে মেয়ের বায়না দিয়ে গিয়েছি।" রক্তচোখে তাকালো রাঙসুঙ।

অপরাধী গলায় সাঙ্গাবখাবা বললো, "হু, হু—সে কথা তো একশ' বার মানি। মেহেলীটা এই বস্তীতে থাকলে এই মাসেই বিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন কী করি, তোরাই বল?"

হুঙ্কারটা এবার তীব্রতর হলো। প্রখর শেলের গলাটা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো রাঙসুঙের, "তোরা একেবারে মাগীরও অধম। ঘর থেকে মেয়ে কী করে পালায়? ঘরে বর্শা ছিল না? হাতের কাছা- কাছি একটা সুচেন্যু অন্ততঃ?"

"ছিল! বর্শা হাঁকড়েই তো রাখতে চেয়েছিলাম মেহেলীকে, কিন্তু তার আগেই যে জঙ্গলে ভাগলো শয়তানের বাচ্চাটা।"

"হু।" বিকট একটি শব্দ করলো রাঙ্- সুঙ: "তারপর?"

"তারপর সেদিন সন্ধ্যের সময় পলিঙা এসে খবর দিলে মেহেলী হুই কেলুরী বস্তীতে ভেগেছে। আমরা কী করি বল্?" চোখমুখ ম্রিয়মান দেখালো সাঙ্গামখাবার।

"হুঃ—"হুস্ করে একটা বিলম্বিত আওয়াজ করলো রাঙ্সুঙ্। তারপর খর- ধার বর্শার বাজুটা প্রখর থাবায় বাগিয়ে ধরলো সে: "একেবারে ছাগী হয়ে গেছিস তোরা! কত বড় বংশ তোদের? তোদের বস্তীর মেয়ে ছিনিয়ে নিতে এসে কেলুরি বস্তীর জেভেখাঙ্ মরেছিল। মেয়ে নিতে এসে তোদের বংশের কাছে মাথা রেখে গিয়েছিল কত মানুষ। এমন বনেদী বংশ তোদের? সেই বংশের নামডাক শুনে একটা মেয়ে নিয়ে ছেলের বউ করবো, ভেবেছিলুম!"

"হু-হু—বংশটা আমাদের বনেদী! লোটারা, সাংটামরা, আওরা, কোনিয়াকরা— এই নাগা পাহাড়ের সব বস্তীর মানুষ আমাদের বংশকে খাতির করে চলে। কথাটা ঠিকই বলেছিস মেজিচিজুঙের বাপ।" এবার রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলো সাঙ্গামখাবা।

"থাম্, থাম্, বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করতে হবে না।" দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একটা পাশবিক গর্জন করে উঠলো রাঙ্সুঙ্: "হুই মুখে মুখেই তোদের বংশের যত কেরামতি। না হলে ঘরের মেয়ে পিরীতের ঠেলায় শত্তুরদের বস্তীতে গিয়ে উঠতে পারে! একেবারে মাগীটাকে আর ওর পিরীতের ছোঁড়াটাকে সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে মুণ্ডু কেটে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখতে পারলি না?"

"হু-হু—কী আর করি বল্? কেলুরি বস্তীতে তাগড়া তাগড়া সব জোয়ান ছোক্‌রা রয়েছে। বর্শা কী হাঁকড়ায়! থেমি কেপেমের একটা কোপ ঝাড়লে কোন আনিজার বাপের সাধ্যি নেই যে, এসে বাঁচায়।" কণ্ঠটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে এলো সাঙ্গামখাবার।

"কী বললি? জানের ভয়ে বস্তীর ইজ্জৎ, বংশের ইজ্জৎ সব জবাই করতে হবে! ইজাহাণ্ট্সা সালো!" সমস্ত কেসুঙ্‌টাকে কাঁপিয়ে, ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ সালুয়া- লাঙের হৃৎপিণ্ডটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে একটা বীভৎস গর্জন ছাড়লো রাঙ্সুঙ্: "ওরে টেফঙের বাচ্চা মেয়েটার জন্যে যখন বায়নাই দিয়েছি; তখন ও মেয়ে আমার ছেলের বউ হয়েই গিয়েছে। আমাদের বস্তী তো সামনেই। তিনটে চড়াই আর দুটো খাড়াই

বাঁক পেরুলেই যাওয়া যায়। একটা লোক পাঠিয়ে দিতে পারলি না! পাঁচ শ' জোয়ান এনে মাগীটাকে তো ছিনিয়ে আনতামই তার ওপর ঐ ছোকরা সেঙাইটাকে এনে ওর মাংস দিয়ে কাবাব করে খেতাম।"

"হু-হু। ঠিক বলেছিস। তখন বুদ্ধিটা ঠিক জোগায় নি; নইলে খবর দিতাম। যাক্, মেজাজটা তোর বেয়াড়া হয়ে রয়েছে। একটু রোহি মধু গিলে খেয়ালটাকে খুশী করে নে।" করুণ আবেদনের মত শোনালো সাঞ্চামখাবার কথাগুলো।

"হু-হু; তাই নিয়ে আয়। ইজা রামখো!" কদর্য একটা গালাগালি নির্বিকার গলায় আবৃত্তি ক'রে আগ্নেয় চোখে তাকালো রাঙসুঙ্; "খবরটা শুনে বুদ্ধিটা একেবারে খিঁচড়ে গিয়েছে। মনে হ'চ্ছে, তোর মুণ্ডুটাই বর্শার মাথায় গিঁথে বস্তীতে নিয়ে যাই।"

"আহে ভু টেলো!" কুৎসিত একটা খেউড় গেয়ে উঠলো সাঞ্চামখাবা; তার গলা থেকে সরাসরি যেন একটা বজ্র নেমে এলো ছোট্ট এই ঘরখানায়। সহসা, একান্তই আচমকা; "ওরে টেঙফের বাচ্চা, আমার মুণ্ডু নিয়ে যেতে এসেছিস?"

"এসেছি তো!" বাদামী পাথরের রাজাসন থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাঙসুঙ্। তার অতিকায় মাথাটা ঘন ঘন নড়ছে। সেই দোলানিতে আউ পাখির পালকের বিচিত্র মুকুটটা দুলছে। পরণে একটা আরি পী কাপড়। নরমুণ্ড, বাঘের মাথা, চিতাবাঘের রাশি রাশি চক্র, বুনো মোষ—পাহাড়ী পৃথিবীর ভয়াল ভীষণতা সেই কাপড়ের ওপর চিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে। ছোট ছোট দু'টি চোখে পিঙ্গল রঙের দুটি মণি আগ্নেয় হ'য়ে জ্বলছে। সর্পিল দু'টি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লাল লাল অসমান ক'টি দাঁত ক্রূর ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে রয়েছে। বর্শার বাজুতে থাবাটা প্রখর, আরো প্রখর হ'য়ে বসছে রাঙসুঙের। জীমবো পাতার মত হিংস্র ফলাটার ওপর মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা যেন লোলিহ হ'য়ে উঠেছে। নানকোয়া বস্তী থেকে আসার আগে সে কী ভাবতে পেরেছিল, তার থাবার এই বর্শাটার জন্য এমন একটা রক্তের উৎসব এই সালুয়ালাঙ্ পাহাড়ে অপেক্ষা করছে? প্রচণ্ড একটা শব্দ রাঙসুঙের কণ্ঠটাকে বিদীর্ণ করে যেন বেরিয়ে এলো; "আজ তোর রক্ত নিয়ে গিয়ে মোরাঙ চিত্তির করবো। আর মুণ্ডু গিঁথে রাখবো টেট্‌সে আনিজার চত্বরে!"

সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোঁচা খাওয়া একটা বুনো মোষের মত ফুলছিল সাঞ্চামখাবা। উত্তেজনায় কোমর থেকে জঙগুপি কাপড়ের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে খুলে পড়েছে। অনাবৃত দেহের পেশীতে পেশীতে একটা আদিম ক্রোধ তরঙ্গিত হ'য়ে যাচ্ছে তার। চক্ষের পলকে বাঁশের দেওয়াল থেকে সেও একটা বিশাল সুচেন্যু টেনে নিয়েছে।

মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ। দুই পাহাড়ী হিংস্রতা। দুই আরণ্যক ভীষণতা। সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙ্। সালুয়ালাঙ্ আর নানকোয়া বস্তী। একটু আগে তাদের দুজনের কামনায় একটা মধুর সম্পর্ক রচনার বাসনা ছিল। নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় রাঙসুঙ্ আর সাঞ্চামখাবা পরস্পরের কাছে সন্নিহিত হয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সাঞ্চাবখাবা আর রাঙসুঙ্ দু'টি প্রবল প্রতিপক্ষ। পরস্পরের পক্ষে সাংঘাতিক দুই শত্রু।

কেসুঙের বাইরে বেলাশেষের রোদ নাগা পাহাড়ের ওপর পিঙ্গল হ'য়ে এসেছে। পাহাড়ী চক্ররেখায় বনময় উপত্যকাগুলি আবছায়া হয়ে আসছে। একটা ধূসর ঘেরাটোপের নীচে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে এই ছোট্ট পাহাড়ী উপনিবেশ সালুয়ালাঙ্, দূরের নীলাভ টিজু নদী, আরো দূরের কেলুরি গ্রাম। তারও পর ছয় পাহাড় আর ছয় আকাশ এই প্রাক্‌সন্ধ্যায় দৃষ্টির সীমানা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে বেলা শেষের খানিকটা পিঙ্গল রোদ এসে এই আয়েহাকাঙে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই রোদের আলোতে চারটি প্রবালের মত দপ্ দপ্ জ্বলছে সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙের দুজোড়া চোখের মণি। সে চোখে অনিবার্য মৃত্যুর শপথ; নিশ্চিত ঘাতনের ইঙ্গিত। আর জ্বলছে একটি সুচেন্যু আর একটি বর্শার খরধার ফলা।

মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারতো। রক্তে মাখামাখি হ'য়ে এই পোকরি কেসুঙটা একটা টেঘুটুঘোটাঙ্ ফুলের মত লাল টকটকে হ'য়ে উঠতো। কিন্তু তার আগেই একটা তীব্রগামী উল্কার মত সাঁ করে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো সালুয়ালাঙ্ গ্রামের বুড়ো সর্দার। সুচেন্যু আর বর্শার শাণিত ফলায় ফলায় একটি অনিবার্য ঘাতনের প্রতিজ্ঞা আচমকা বিচলিত হয়ে গেল। ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো রাঙসুঙ্ আর সাঞ্চামাখাবা।

পাথরকাটা অমসৃণ মেঝের ওপর জাঁকিয়ে বসে হুস্ হুস্ করে কয়েকটা বিলম্বিত নিঃশ্বাস ছাড়লো বুড়ো সর্দার। তারপর দুজনের ওপর ধূসর চোখ দুটিকে ঘুরপাক খাইয়ে হা-হা করে উঠলো; "ইজা রামখো! এই বিকেল বেলায় খুনখারাপি কেন আবার? কী রে রাঙসুঙ্, এই সাঞ্চামখাবা? বর্শা আর সুচেন্যু নামা রে মরদেরা। ওসব দেখলে মেজাজ বিগড়ে যায়!"

"ইজা হান্ট্‌সা সালো!" প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলো সাঞ্চামখাবা; "তুই এসেছিস, ভালই হয়েছে সর্দার। এই দেখ্ না, দুই শয়তানের বাচ্চা রাঙসুঙ্ আমার মুণ্ডু নিয়ে যেতে চায়!"

রাঙসুঙ্ও তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো; "কদ্দিন হলো মেয়ে বায়না নিয়েছি; এখনও বিয়ে দেবার নাম নেই। মেয়ে না পেলে ওর মুণ্ডু নেবো না! কী রে সর্দার, কি বলিস্ তুই?"

"হু-হু—সে তো ঠিক কথাই। মুণ্ডু না নিলে মরদের ইজ্জৎ থাকে!" ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে রীতিমত সমর্থন জানালো বুড়ো সর্দার।

ক্রূর চোখে তাকালো রাঙসুঙ্; "তবে বর্শা হাঁকড়াই সর্দার?"

হুংকার দিল সাঞ্চামখাবা; "তুই যখন বলছিস্ সর্দার, তখন ঐ শয়তানের বাচ্চার ঘাড়ে একটা সুচেন্যুর কোপ ঝাড়ি! নানকোয়া বস্তী থেকে এখানে এসেছে ফুটানি দেখাতে!"

বিশাল দু'খানা বাহু দু'দিকে প্রসারিত করে দিল বুড়ো সর্দার; "থাম শয়তানের বাচ্চারা। নানকোয়া আর সালুয়ালাঙ্—এই দুই বস্তীতে কতকালের খাতির; কতকালের দোস্ত আমরা! নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করলে চলবে কী করে?" বুড়ো সর্দারের কণ্ঠটা রীতিমত দার্শনিক হয়ে উঠলো। সারা মুখে অজস্র উল্কির রেখা। পাহাড়ী পৃথিবীর বীভৎস শিল্পলেখা। সেই বীভৎস মুখখানায় প্রজ্ঞাবানের ছায়া পড়েছে বুড়ো সর্দারের; "বোস্ তোরা, আর কারো মুণ্ডু নিতে হবে না। অনেক হয়েছে। আমার কথা শোন্, মজাদার সব খবর আছে।"

"কী খবর? কী খবর?" কলরব করে দু'দিক থেকে নিবিড় হয়ে এলো সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙ্। তার আগে দুজনের থাবা থেকেই সুচেন্যু আর ভয়াল বর্শা ঝরে গিয়েছে। বুড়ো সর্দারের গলায় মনোরম গল্পকথার সম্ভাবনা রয়েছে। গল্প! গল্প! গল্প! পাহাড়ী মানুষেরা এই গল্পের নামে বিচিত্র এক মৌতাতের সৌরভ পায়।

"হু-হু"—হুণ্ট্‌সিঙ্ পাখির পালকের মুকুটটা মৃদু মৃদু দুলিয়ে বুড়ো সর্দার বললো; "সে সব অনেক খবর! তার আগে একটু রোহি মধু নিয়ে আয়, গলাটা ভিজিয়ে নিই। আর সেই সঙ্গে গোটা কয়েক আউ পাখি ঝলসে আনিস। বড় খিদে পেয়েছে। মেজাজটাকে একটু চাঙ্গা করে নি। কি বলিস্ রাঙসুঙ্?"

"হু-হু—" সারা দেহ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে স্বীকৃতি জানালো রাঙসুঙ্; "আমারও বড় খিদে পেয়েছে। সেই নানকোয়া বস্তী থেকে কত চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে তোদের সালুয়ালাঙ্ বস্তীতে।"

ততক্ষণে ভিতরের আজেলোর অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে সাঞ্চামখাবা। (ক্রমশ)

্র বলে স্বভাব যায় না ম'লে। কথাটা মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সমস্ত জগতেই বোধ হয় এই একই নীতি । সম্প্রতি দুজন শৌখীন মৎস্য ী নিউইয়র্কের 'নামো' হ্রদে মাছ ধরতে একটি ১৬ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ছটফট করতে করতে জলের ওপরে উঠতে দেখেন এবং তৎক্ষণাৎ মাছটি য়। দেখে শুনে বোঝা গেল যে, ঐ আর একটি মাছ খেতে গিয়ে গিলতে র দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। মাছেরা যে য় এ খবর আমাদের অনেকেরই জানা শাল শোল ল্যাঠা, বোয়াল চাঁই জাতীয় কয়েক রকম রাক্ষুসে মাছ সুবিধা পেলেই অন্যান্য মাছ খেয়ে মাছেদের এই স্বভাব বোধ হয় যুগ রেই চলে আসছে আর এইভাবে মাছ আটকে হয়তো অনেক মাছ মারাও । তবু স্বভাব যায় না। ডেভিড ম একদিন কোনও স্থানে তৈলখনির টি খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি জীবাশ্ম দল পান। অবশ্য মাত্র একটি মাছ া। একটি বড় মাছের মুখে একটি মাছ লেগে ছিল। প্রথমে মনে ল; বুঝিবা ছোট মাছটির অর্ধেকটা ছের তলায় চাপা অবস্থায় প্রস্তরী-তে আরম্ভ করে, সেই জন্য মনে বড় মাছটি ছোট মাছকে খাচ্ছে। হ্যাডেনাম তখন পরীক্ষার জন্য এই মটি একজন বিশিষ্ট জীবাশ্ম তত্ত্ব-কাছে পাঠিয়ে দেন। ফসিল তত্ত্ববিদ ক এটি ভাল করে পরীক্ষা করে পারেন যে, ঐ বড় মাছটি ছোট কে খেতে খেতে মারা যায়। এবং ধারণা হয় যে, এটিও ঐ রকম মাছ আটকে মারা গেছে। আরও পরীক্ষা জানা গেছে যে, এই ফসিলটি ৬০,০০০,০০০ বছর আগের জীব। বর্তমানে নাসো লেকের মাছের ছবি ও এই ফসিলটির ছবি একটি প্রিন্সটন জিওলজি মিউজিয়মে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখা হয়েছে—দুটি ছবি প্রমাণ করছে যে, স্বভাবেই করায় কর্ম।

চক্রদত্ত

*

অনেক সময় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালার আগেই অনেক-বার আসবাবপত্রের সঙ্গে ধাক্কা খেতে হতে পারে। আজকাল একরকম সুইচ বার হয়েছে তাতে আর এত অসুবিধা হয় না। সুইচটির সঙ্গে একটি ছোট্ট ১/২৫ ওয়াটের নিয়ন বাল্‌ব লাগান থাকবে। সুইচটা নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বালবটা জ্বলতে থাকবে আবার যেই সুইচটা জ্বালা হবে সঙ্গে সঙ্গে বালবটা নিভে যাবে। এই ধরনের আলোর দুটি সুবিধা। প্রথমত অন্ধকারের মধ্যে সহজেই সুইচটি চোখে পড়বে তাছাড়া রাতে শোবার সময় অন্ধকার ঘরে মৃদু আলোর কাজ করবে। এই রকম বালবের দামটা খুবই কম আর এতে ইলেকট্রিসিটির খরচও খুবই সামান্য।

*

প্রকৃতির নিয়মের কোথাও কোথাও বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবজগতে দেখা যায় যে, বংশ পরম্পরায় যে সকল চারিত্রিক গুণাবলী স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে হঠাৎ একটি নতুন বংশধরের মধ্যে নতুন কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। উদ্ভিদ জগতেও এই রকম বৈচিত্র লক্ষ্য করা গেছে। বহুদিনের পরিচিত লাল ফুলের গাছে হঠাৎ সাদা ফুল ফুটতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের ব্যতিক্রমকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'মিউটেশন' বা পরিব্যাপ্তি বলা হয়। একথাও সত্যি যে, বিজ্ঞান আজকাল প্রকৃতির রাজ্যেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ধরনের পরিব্যাপ্তিও বিজ্ঞানের বলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। একটি লাল কারনেশন ফুলের ওপর "কোবল্ট ৬০" থেকে গামা-রশ্মি বিচ্ছুরিত করে দেখা যায় যে, লাল ফুলটি সাদা হয়ে গেছে। এরপর থেকে ঐ ফুলটি পর পর তিনটি বংশানুক্রমে সাদাই হতে থাকে। এর থেকে বৈজ্ঞানিকদের ধারনা হয়েছে যে, এইভাবে গামারশ্মির সাহায্যে মানুষ ইচ্ছেমত যে কোনও গাছে যে কোনও রঙের ফুল ফোটাতে পারে।

*

সকালবেলার কাগজে খুললে প্রায়ই একটা না একটা বিমান দুর্ঘটনার কাহিনী আমাদের চোখে পড়ে। তাতে দেখা যায় যে, বিমানটির দুর্ঘটনা ঘটার আগে কিংবা পরে বিমানে আগুন লেগে গেছে। বিমানের ব্রেক, বিমান ওঠানামার যন্ত্র, ডানা নড়াচড়া করার জন্য হাইড্রোলিক ফ্লুইড নামক একটি বিশেষ দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়, সর্বোপরি বিমান চালনার জন্য পেট্রল ব্যবহার করতে হয়। এইসব দাহ্য পদার্থের জন্য বিমানে সহজে আগুন লাগা সম্ভব হয়। এটা ঠিক যে, সহজ-দাহ্য নয় এমন পেট্রল খুঁজে বার করার চেষ্টা বৃথা। সামরিক ও বেসামরিক গবেষণাকারীরা সহজ-দাহ্য নয় এমন একটি হাইড্রোলিক ফ্লুইড খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ ঐরূপ তিনটি পদার্থ পাওয়া গেছে। তিনটির নাম যথাক্রমে "হাইড্রোলোব ইউ ফোর", "আর পি এম" ও "স্কাইড্রোল"। স্কাইড্রোল আবিষ্কার হওয়ার আগে গবেষণাকারীরা প্রায় ৭৮ রকম রাসায়নিক বস্তু নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন। রাসায়নিকদের প্রচেষ্টার সঙ্গে বিমান ইঞ্জিনীয়াররাও যোগদান করেন। এইসব রাসায়নিক বস্তুগুলি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, ফাটিয়ে এবং জ্বলন্ত আগুনে ফেলে পরীক্ষা করে দেখাই কাজ ছিল। ৭৮টি রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে যেটিকে শেষ পর্যন্ত হাইড্রোলিক ফ্লুইডের জন্য নির্বাচন করা হলো তারই নাম দেওয়া হলো—স্কাইড্রোল। স্কাইড্রোলে খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রগুলি তৈলাক্ত করা যায়, শীতাতপের তারতম্যে এর সান্দ্রতা (viscosity) বদল হয় না, ধাতু নির্মিত যন্ত্রপাতির ক্ষতি করে না, কোনও রকম ধোঁয়া উৎপাদন করে না। এটি সহজে জ্বলে না আর জ্বলন্ত আগুনকে জ্বলতে সাহায্য করে না।
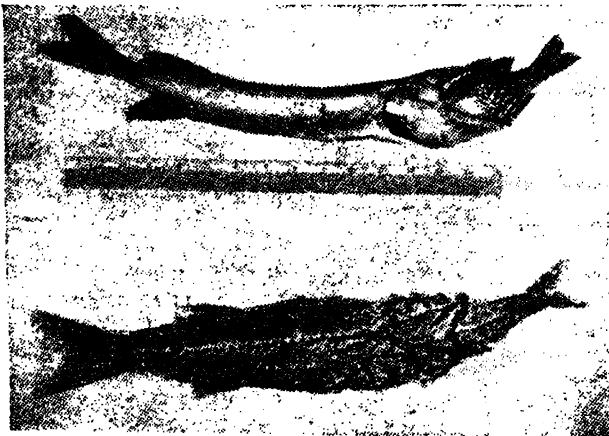
নাসো লেকের পিকরেল মাছ   ৬০,০০০,০০০ বছরের মাছের জীবাশ্ম

কবিতা

অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া স্বরূপেই যতীন্দ্রনাথের প্রীতিকর আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলা কাব্য সাহিত্যে। সকল প্রকারের ভাবালুতা ও অমর্ত্য-প্রীতির বৈপরীত্য হিসেবেই যতীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের রুদ্রতার বর্ণনা খানিক দূর করেই বলেছেন, 'হে বৈরাগি কর শান্তি পাঠ'। এই কবিতাকে স্মরণ করেই যেন যতীন্দ্রনাথ বললেন—"করে তব একটি ফুৎকারে এই ঘন ধূমপুঞ্জ ভেদি, লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদী!" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শরৎ, যতীন্দ্রনাথের শরৎ; রবীন্দ্রনাথের 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' আর যতীন্দ্রনাথের 'পিছু হট্ পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই' স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' যতীন্দ্রনাথের হাতে হলো 'চির ক্রন্দনময়ী গঙ্গে'।

কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াতেই যতীন্দ্রনাথের সব পরিচয় নয়। কারণ নিছক প্রতিক্রিয়ারূপে কোন কবিত্বই বেশিদিন টেঁকে না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের বেলায় টিকলো, তার কারণ আছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রমে প্রতিক্রিয়ার তিক্ততা ও চমক ঝরে গেল। ঐ ধরনের উল্টো করে কথা বলাটাই তাঁর স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেল। যেটা ছিল দর্শনের আবরণ, সেটাই হোল জীবন দর্শন। এতকাল আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মূর্চ্ছা গেছি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বললেন—

'দিনান্তে যবে বার্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যুশয়ন রক্তবমন করে।

প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য আমরা নারীর সঙ্গেই তার তুলনা দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের চোখে প্রকৃতির আর একরূপে উদ্ঘাটিত হোল। জীবনে যেমন আমরা কোথাও অকারণ কার্পণ্য, কোথাও বা অযাচিত দানের শ্রাবণ ধারা দেখি, তেমনি প্রকৃতিতেও আছে। তাই কবি বললেন—

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার
বুকে?

অথচ এর কাব্যত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন? জীবনের বস্তুরসকে তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চার করেছেন। এইখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র এবং কল্লোল যুগের কবিদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পেরেছেন। 'মানুষে', 'রূপে কোথা আছে?' ইত্যাদি কবিতা পড়তে পড়তে প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনানন্দের কথা মনে হবেই।

কবি জীবনের আদিযুগে যে প্রতিক্রিয়া চেতনার তিনি বশবর্তী হয়েছিলেন, তাই ক্রমশ কবিধর্মে পরিণত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের প্রকাশে ঋজুতা, বর্ণনায় স্পষ্টতা, রচনায় বলিষ্ঠতা আর উপমায় নতুনত্ব এল। একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজেই তিনি আয়ত্ত করে ফেললেন। আবেগ প্রবণতাকে রুক্ষ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা বন্ধুর ও অনতিললিত। তাঁর ভাষার গঠন রীতি গদ্যাভিমুখী। যেমন,

অভাবের সাথে ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে।
মামুলি প্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য অভেদ্য ইত্যাদি,

এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও গদ্যাভিমুখী ভাষার সাহায্যে তিনি যে যথার্থ কাব্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন, তাতে তাঁর প্রকৃত কবিকৃতির পরিচয়। উপকরণও ছিল অকাব্যিক। 'ভাড়াটিয়া বাড়ী' 'ছাতা', 'হাটে' ইত্যাদি কবিতা তার প্রমাণ দেবে। 'হাটে' কবিতাটিতে শ্রেষ্ঠ রসিকের দৃষ্টি উদ্ভিন্ন হয়েছে। হাটের চতুর কয়াল, লাউ-ডগা, পালম আঁটি ছাঁচি কুমড়ো, আঙুর, আপেল আর আম, মেছোহাটার কাতলা আর ইলিশ—সবই কবির কলমের জাদুতে রসতীর্থে পৌঁছেচে। মেছোহাটায় মাছ দেখে কবির মনে হোল—

এখনো যে দেহ রূপোর পাতরে
হীরের টুকরো আঁখি—
মরণের শীত করে নিবারণ
ধরণের কাঁথা ঢাকি।
মেছোহাটে গিয়ে জলকল্লোলে
জলকল্লোলই শুনি,—
নির্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু গায় ঢেউগুনি।

এখনও কি কবিকে শুধু বস্তুবাদী বলবো? তিনি রসিক। তিনি অতি সাধারণ বস্তু থেকেও রস নিষ্কাশন করতে পারেন।

'অনুপূর্বা'র আনুপূর্বিক এই রসিকতারই পরিচয়। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্, ত্রিযামা, নিশান্তিকা এই ছখানি কাব্য-গ্রন্থ থেকে কবি নিজেই কিছু কিছু কবিতা সংকলন করে সংকলনখানিকে সার্থক করেছেন। কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝবার পক্ষে কাব্য সংকলনখানি যথেষ্ট। কাব্য পাঠক 'অনুপূর্বা'য় যে মর্জির পরিচয় পাবেন, তা সমসাময়িক কবিদের কাছেও দুর্লভ বস্তু।

(৩০৬।৫৬)

কথিকা—শ্রীমুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রকান্ত নাথ কর্তৃক শ্রীগোপালধাম, ২৬।৩৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৵০ আনা।

কবিতার বই 'চিতার তীর' "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" 'চির মিলন', 'সুবিরলক্ষ্মী', 'সফল প্রতীক্ষা' এই চারিটি কবিতা পুস্তকখানিতে আছে। কবিতা কয়েকটিতে বাংলার কোমল এবং মধুর অন্তরের সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। সেই সুর মনের মূলে প্রাণময় স্পর্শ দিয়া রূপকে জাগাইয়া তোলে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখার এই প্রাণময় আবেদনটি বিশেষভাবে উপভোগ্য হইয়াছে।

উপন্যাস

কাঞ্চনমূল্য—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। দাম—৪্।

স্বরূপ মণ্ডল এখন বুড়ো হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বহু সুখ দুঃখের স্মৃতি তাকে উত্থিত করে তোলে ক্ষণে ক্ষণে। অথচ দিনকাল অনেক বদলে গেছে, একটু অবসরমতো কেউ যে তার সে স্মৃতিকাহিনী শুনবে তারও সম্ভাবনা কম। তাই, যদি কখনও কোনো শ্রোতা মেলে তা হলেই মুখ চলে তার স্রোতের মতো। তেমনি একটি স্রোতোধারায় গড়ে উঠেছে এ-কাহিনী 'কাঞ্চনমূল্য'।

স্বরূপ যখন নিতান্তই ছোট, মাত্র দশ বৎসরের, তখনকার চোখে দেখার একটা গ্রামীণ সমাজচিত্রকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে সে আমাদের চোখের সামনে। আশ্চর্য বলার ভঙ্গি তার, গ্রাম্যকথার টানে টানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক একটি চিত্র, উজ্জ্বলতর হয় চরিত্রগুলো। কেন্দ্রচরিত্র তার দিদিমণি—গরীব ভোলানাথ-স্বভাবের এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। প্রখর বুদ্ধিমতী, হাসির দমকে উছলে-পড়া মেয়ে সে। কিন্তু করুণ কান্নায় ভরা জীবন তার। অসহায় অবস্থায় বারবার সে হোঁচট খায়, নিতান্তই নাবালক স্বরূপ তাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। তাতে অনেক সময়ই আরো বেশী ঘোরালো আর হাস্যকর হয়ে ওঠে অবস্থা। তবু স্বরূপই তার একমাত্র ভরসা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কূলে এনে নৌকো ভেড়ান দিদিমণির মাসী। এ একটি অনবদ্য সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যে। ভিতর বাহিরে কোথাও মিল নেই তার। আচারে ব্যবহারে তিনি সর্বক্ষণই রণ-রঙ্গিণী, কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায় তিনি চিরন্তনী মা। বাইরের চেহারা দেখেই সকলে আতঙ্কে দিশাহারা। ভিতরটা প্রকাশ করলেন যখন তিনি বোনঝিকে উদ্ধার করে তখনও তার মুখ ছুটেছে বিদ্যুৎ-এর মতো।

বহুকালের পুরাতন একটি গ্রামের কাহিনী। রচনার কলা-কৌশলে লেখক সে-কালটাকে নিয়ে এসেছেন আমাদের চোখের সামনে। হাসি-অশ্রু-মেশানো এ-কাহিনী নিতান্ত বাঙালী ঘরের জীবনচরিত্র। অথচ লেখক এখানে অবান্তর, আসল কথক তো স্বরূপ মণ্ডল, বয়সের ভারে যে নুয়ে পড়েছে আজ। লেখক শুধু একটা বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করছেন আমাদের সামনে। সব দিক থেকেই 'কাঞ্চনমূল্য' আজকের দিনের উপন্যাসপ্লাবিত বাংলাদেশে একটি বিদ্যুৎচমক। ২২১।৫৬

Nectar In a Sieve by Kamala Markandaya, Jaico Publishing House. Price Rs. 2/-.

লেখিকা ভারতীয় মহিলা। তাঁর এই প্রথম ইংরেজি উপন্যাস আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে এবং গত বছর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস Some Inner Fury প্রকাশিত হয়ে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজী ভাষায় কথা-সাহিত্য রচনা করে যে সব ভারতীয় লেখক ইদানীং নাম করেছে, শ্রীমতী কমলা তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। অন্তত প্রতিশ্রুতি দেখে তাই মনে হয়। ছোট উপন্যাস; কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আর বক্তব্যের সংক্ষেপে লেখিকা একটি গণ্ডি এঁকে নিয়েছেন। এখানে অতি-কথন ও বিস্তারের শৈথিল্য আসতে পারেনি। দৃষ্টি বিষয়মুখী, পরিণতি অন্তর্নিষ্ঠ। প্রথম রচনার পক্ষে আশ্চর্য সংযম বলতে হবে। যা চোখে দেখেছেন, যে জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাকে নিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন এবং যে সব চরিত্র এঁকেছেন, তারা মাটির সঙ্গে যুক্ত, সংবদ্ধ। এই কারণেই তাঁর লেখায় স্থানীয় বর্ণ ও পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে একটি পাড়াগ্রামে এক কৃষক পরিবারের দিনানুদৈনিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবন। তাদের ক্ষুদ্র আশা ভরসা, নগণ্য চাহিদা আর ভয়াবহ দারিদ্র্যের কাহিনী যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে মনে হয় অন্তরঙ্গ জ্ঞানের সঙ্গে সংযত সমবেদনার সুমিত মিশ্রণেই শিল্পকর্ম সত্য হয়ে ওঠে। স্বত্বহীন কৃষক নাথন, স্ত্রী রুক্মিনী, কন্যা ইরা আরও কয়েকটি সন্তান নিয়ে দুঃখী এক পরিবার। নিঃস্ব ভূমিদাসের অনিশ্চিত জীবন যাপনের পরম গ্লানি যেভাবে পরি-স্ফুটিত হয়েছে, তাতে স্বদেশী ও বিদেশী পাঠকের চোখে মিথ্যা মোহ জাগে না। যে সব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এগিয়ে চলেছে, সন্তানদের বড় করেছে, পারিবারিক ও সামাজিক সংকটেও জীবনের প্রতি আস্থা হারায়নি, তাদের ভিতর একটা 'এপিক' বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই সহজ অথচ বলিষ্ঠ জীবনবোধ কৃত্রিম রোমান্টিকতায় আপনাকে রঞ্জিত করেনি। বাঁচবার ইচ্ছা এবং প্রবল চেষ্টাকে ন্যায্য মর্যাদা দিতে পেরেছে। বইখানি শেষ করে মনে হল, গ্রাম ভারতের একখানি অকৃত্রিম চিত্র পাওয়া গেল। এতে ইঙ্গ-ভারতীয়-পনা নেই, স্মার্ট হবার চেষ্টা নেই। অথচ বিদেশী ভাষার অনায়াস দখলে ও তার সাবলীল ব্যবহারে জার্নালিজমের পালিশ ছাড়িয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে। (২১৭।৫৬)

সংরাগ—অ-কু-ব। গ্রন্থ সমাবেশ, বাঁড়শা। মূল্য আড়াই টাকা।

'সংরাগ' অসুস্থ কলকাতা নগরীর কয়েক ঘন্টার ঘটনা নিয়ে রচিত উপন্যাস। পরিমিত কালের ঘটনা বর্ণনায় জয়েস-চাতুর্য এবং চারিদিকের অনিশ্চয়তার মধ্যেও ছেঁদো কথায় প্রেমালাপ বোমাকেন প্রসঙ্গ নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির (যেমন শান্তির স্বামী হিসেবে সোমেশের পরিচয় লাভে উষার অন্তর্ধান) চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোন রেখাপাত করে না মনে। রচনায় না আছে প্রতিশ্রুতি না আছে দক্ষতার পরিচয়। বক্তব্যেও নতুনত্ব নেই। লেখক যে জাঁ পল সার্ত্রের উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, উপন্যাসখানি প'ড়ে সেই উদ্ধৃতিরই পুনরুদ্ধার ক'রে মনোগত অভিপ্রায়টিকে ব্যক্ত করতে ইচ্ছে করে 'The scenery changes, people come in and goant, that's all.' এই ধরনের পরিমিত কালের বর্ণনায় আর কিছু না হোক পাঠককে বিমূঢ় ক'রে রাখা চাই। সে ক্ষমতা লেখকের নেই। বাঙলা সাহিত্যে এই ধরনের রচনা আরও কেউ কেউ লিখেছেন। সেগুলি সবই যে সার্থক হয়েছে তা বলি না। তবে তাঁদের চেয়ে সংরাগের লেখক যে অধিক কিছু দিতে পেরেছেন, তাও নয়। কেবল কতকগুলি বর্ণহীন ঘটনার সঙ্গে ঘটনার গ্রন্থন, —তার ওপর স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু প্রয়োগে ভাষার শ্রী নষ্ট হয়েছে। (৪৪।৫৬)

বঙ্গবিজেতা—রমেশচন্দ্র দত্ত। মিত্র বিহার লিমিটেড। ৫, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম ২৷৷০

বঙ্কিমচন্দ্রের মতন রমেশচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস যে ইতিহাস ও সমাজ-জীবনকে আশ্রয় করে রচিত, তা বাঙালী পাঠক মাত্রেই জানেন। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' পরিচিতির প্রতীক্ষা করে না। তাই প্রকাশক বইখানির সুলভ সংস্করণ বার করে পাঠক সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হলেন। রমেশচন্দ্রের প্রতিকৃতি আর অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান ভূমিকাটি এই সংস্করণের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। (১২১।৫৬)

অনুবাদ সাহিত্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রথম খণ্ড। অনুবাদক অনিলেন্দু চক্রবর্তী। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম চার টাকা।

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প' এই পর্যায়ে প্রথম খণ্ডে কেবল রাশিয়ান গল্পকারদের সংকলিত গল্পগুলি অনুবাদ করা হয়েছে। পুশকিন, টুর্গেনিফ, টলস্টয়, চেখভ, সোলোগাব, কুপ্রিন, গর্কি—এই সাতজন শ্রেষ্ঠ গল্পকারের গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। পুশকিন, টুর্গেনিফ, চেখভ আর গর্কি এ'দের গল্প নির্বাচন ভালোই হয়েছে। টলস্টয়ের যে গল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক ভালো গল্প আছে। সোলোগাব আর কুপ্রিনের গল্পগুলি মন্দ নয়, তবে তেমন ভালো লাগলো না। যাই হোক নির্বাচন ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

গল্পগুলির অনুবাদে লেখক মোটামুটি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আজকালকার বহু অনুবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, অনুবাদক বাঙলা ভাষার নিজস্ব ধর্ম (genius) রক্ষা করতে পারেন না। এই বইএর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্য স্মরণীয়—'সাহিত্যকে সে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না, অন্য ভাষায় নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে হয়, সেই জ্ঞান বিস্তৃত হওয়া দরকার।' সেই দিক থেকে বর্তমান অনুবাদক অনুবাদে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্পের ভাষাই স্বচ্ছন্দ ও ঋজু। সামান্য দু একটি ত্রুটি থাকলেও তা দেখে এত সুখ লাগল—পৃঃ ১৩৬। অনুবাদকে লেখক যে একটি বিশিষ্ট 'কারুশিল্প' মনে করেন তা বেশ বোঝা যায়। (৩১২।৫৬)

বিমানে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি—অনুবাদ—অ-কু-র। হসন্তিকা প্রকাশিকা ৩১বি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালিঘাট। ২৬। দাম আট আনা।

ত্রিশ বছর আগে বৈমানিক লিণ্ডবার্গ প্রথম নিউইয়র্ক থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে প্যারিসে পৌঁছেছিলেন। এভারেস্ট বিজয়ের মতো সেও এক দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভিযান। এ যেন মৃত্যুকে ডিঙিয়ে যাওয়া। বিপদ অনেক। সৌভাগ্যও কম নয়। কিন্তু চাই অটল বিশ্বাস ও অবিচলিত ধৈর্য। যোজন যোজন মেঘমালা আর নক্ষত্র-নীহারিকাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যাত্রা। কিন্তু শরীরে মৃত্যুর রোমাঞ্চ: বিভীষিকার সঙ্গে সুন্দরের পদে পদে মিলন! লিণ্ডবার্গ সেই মিলন কাহিনীই লিখেছেন তাঁর স্পিরিট অব সেণ্ট লুইতে। বইখানি তারই অনুবাদ।

অনুবাদে লেখকের কৃতিত্ব আছে। স্বচ্ছন্দ বাধাহীন ভাষা। মূল লেখকের 'মুড'কে ভালো ভাবে আত্মসাৎ করেছেন। পাঠকদের সুবিধার জন্য গ্রন্থ শেষে বিমানের বিভিন্ন অংশের পরিচয় সহ চিত্র দেওয়া হয়েছে। পরিভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে চিত্রটি বিশেষ কাজে দেবে। (২৩৫।৫৬)

গ্র্যান্ড ব্যাবিলন হোটেল: আর্নল্ড বেনেট: অনুবাদক—শ্রীইন্দুভূষণ দাস: ডি এম লাইব্রেরী: ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট: কলিকাতা-৬: তিন টাকা।

ইংরেজী সাহিত্যে বেনেটের স্থান একটু স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ প্রকাশ তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ গ্র্যান্ড ব্যাবিলন হোটেল-এ। বাঙলা দেশে অনুবাদের মাধ্যমে যেসব ইংরেজ লেখকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় কী জানি কেন বেনেট তাঁদের মধ্যে ছিলেন না। সম্ভবত এইটিই তাঁর বই-এর প্রথম বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদক তাঁর কর্তব্য সাধ্যানুযায়ী সম্পন্ন করেছেন। তবে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী কথা এবং সেকথাও অতি সাধারণ, রেখে দেওয়ার সার্থকতা বুঝলাম না। যেমন 'ফরাসী কায়দায় অভিবাদন করলো' (Bowed) 'অভিবাদন'ই তো যথেষ্ট। অন্যত্র 'প্রসাধন কক্ষে' (Dressing room)। সম্ভবত এগুলো রসাস্বাদনের অন্তরায়। ২২৫।৫৬

পরমাকাঙ্খা: চার্লস ডিকেন্স: অনুবাদক—শ্রীসনৎকুমার ভট্টাচার্য: এস কে পালিত এণ্ড কোং: ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট: কলিকাতা-১২। এক টাকা আট আনা।

ডিকেন্সে-এর গ্রেট এক্সপেক্টেশন বহু পঠিত উপন্যাস। মূল গ্রন্থের রসাস্বাদ যাঁরা করেছেন অনুবাদে তাঁরা হতাশ হবেন। মূলের স্বাদ থেকে যাঁরা বঞ্চিত আলোচ্য অনুবাদ

কে তাঁরা ঘোলের তৃষ্ণাটুকুও মেটাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অনুবাদের আড়ষ্টতার জন্য গল্পের গতি ব্যাহত। সংলাপ কষ্টকর।

বাঙলা অনুবাদ সাহিত্য এখন কৈশোর অতিক্রান্ত। অনুবাদকের দায়িত্ব সেই কারণে অনেক বেশী। আলোচ্য অনুবাদে অনুবাদক লেখক অথবা পাঠক কারও প্রতিই সুবিচার করতে পারেননি। ৬১।৫৬

এব্রাহাম লিঙ্কন: এমিল লুডউইগ: মিত্র ও ঘোষ: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট: কলিকাতা-১২: আড়াই টাকা।

জীবনী লেখক হিসেবে এমিল লুডউইগ অতুলনীয়। তিনি কেবল ঘটনার অনুলেখক নন বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খুঁটিনাটি এবং আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ঘটনার সাহায্যে ব্যক্তি-জীবনের সঠিক এবং বিশেষ করে মানবীয় দিকটি উদঘাটনে তাঁর জুড়ি খুব বেশী নেই। কেবলমাত্র বিবরণে নয় বিশ্লেষণে মানুষের পূর্ণ চিত্রটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মহামানব লিঙ্কনের জীবনেও তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর সমভাবে উপস্থিত। বিংশ শতকের মধ্যভাগ পেরিয়ে এসেও যে-আমেরিকায় নিগ্রো নির্যাতনের শেষ হয়নি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সেখানে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন দাসত্রাতার ভূমিকায়। প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে এই আপোস-বিরোধী যোদ্ধা কালা আদমিদের মুক্তি দিয়ে ঘাতকের হাতে জয়মাল্য পরলেন। ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু ক্রুশে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর সঙ্গেই তুলনীয়। বইটি শেষ করে পাঠকের মনে এই কথাই জাগে।

অনুবাদ অনাড়ষ্ট স্বচ্ছন্দ। তবে পরিবেশনে প্রকাশকের কর্তব্য আরও সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়া উচিত ছিল। ৩০৮।৫৬

টনির স্বপ্ন—অনুবাদ—শ্রীপ্রসূন বসু। সাহিত্যায়ন, ২৩-ডি কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'Tonny and the wonderful Door' বইটি থেকে 'টনির স্বপন' প্রস্ফুটিত। হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রধানত সমাজ প্রবুদ্ধ অথচ শিল্পসমৃদ্ধ রচনা-ধারার অন্যতম পুরোধা লেখক। তিনি যেসব সমস্যা উত্থাপন করেন তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যে সচেতন বয়স্কতার প্রয়োজন তা কিশোর পাঠকের কাছে আশা করা অনুচিত। তবু সেই একই হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর এই বইটিতে একটি কিশোর-মানসের স্বপ্নমণ্ডল যেভাবে রচনা করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। প্রসূন বসু বইটিকে বাংলার পাঠক সমাজে পরিচিত করিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। তাঁর অনুবাদ অনাড়ষ্টতার জন্য সাবলীল, বিষয়োপযোগী সহজ শব্দ চয়নের জন্য সুন্দর। তাঁর কাছে ছোট এবং বড় উভয়স্তরের অনেক আকাঙ্ক্ষা রইলো। প্রচ্ছদ-পট ও অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়। ১৫২।৫৬

পেট্রিয়ট পার্ল বাক। অনুবাদ—পুষ্পময়ী বসু। নবভারতী, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা আট আনা।

পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যত বাড়ছে, অনুবাদ সাহিত্যের সীমানাও তত বেড়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্যের অতি-সাম্প্রতিক অনুবাদ বিভাগের ক্রমোন্নয়ন থেকে এ সম্পর্কে আশাবাদী না হওয়ার উপায় থাকে না এবং একথা মানতেই হয় যে শ্রীযুক্তা পুষ্পময়ী বসু এই ধারার অন্যতমা একজন। তিনি অনুবাদের উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচন ক্ষেত্রে ক্লাসিক-কল্প রচনার দিকেই প্রাধান্য দেন এবং তাঁর এই মহান উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদকর্মের সর্বাঙ্গীণ সাবলীলতা এবং সৌষ্ঠবের গুণে সুসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাস 'পেট্রিয়ট' সম্পর্কেও একই বক্তব্য। পার্ল-বাক চীনের মানবিক আন্তরিক পরিচয় শিল্পানুগ রীতিতে উপস্থাপিত করে কৃতী হয়েছেন এবং The Patriot বইটিতে তাঁর যে কৃতিত্ব দেখা গেল তা শুধুই পূর্ব প্রখ্যাতির উপরে নির্ভর করেই গড়ে ওঠেনি, নব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়েছে। চীন-জাপানের সেতুবন্ধনের কাহিনীসূত্রে যে পাত্র-পাত্রী এখানে ভিড় করেছে তারা যন্ত্র হয়ে নেই, বিবিধ রূপময় মানব-স্বভাবের উপাদান রচনা করেছে। মূল বইটির জন্য পার্ল বাক এবং তার মূলানুগ অনবদ্য অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্তা পুষ্পময়ী বসু, দুজনকেই আমাদের অভিনন্দন জানাই। প্রচ্ছদশিল্পী মণীন্দ্র মিত্রের চিত্র কাজ নিঃসন্দেহে মনোরম। ১৭০।৫৬

নাটিকা

মন্দার ও মালঞ্চ। কালীকিংকর সেনগুপ্ত প্রণীত। শ্রীকিংকরমাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক ৪৫।১ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

পুস্তকখানি একটি নাটিকা। শিল্প এবং শিল্পী ইহার বিষয়বস্তু। শিল্পের সহিত শিল্পীমনের রসসম্বন্ধ এবং তাহার বিস্তার ও বিলাসের বিভব-বৈচিত্র্যকে রূপ দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য। যিনি চিরসুন্দর তাঁহার সঙ্গে শিল্পীমনের নিবিড় রসসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের আনন্দের সান্দ্রচ্ছন্দে আত্ম-নিবেদিত শিল্পী-জীবন সাধনায় রসানুভাবনার রহস্য নাটিকাখানির আলেখ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রূপরসের সংযোগসূত্রে শিল্পীর মন সুন্দরের সহিত একীভূত হয় এবং তাঁহার সমগ্র জীবন সুন্দরের সেবায় অনিরুদ্ধ সঞ্জীবন সংস্পর্শে উদ্দীপনা লাভ করে। এই অবস্থায় সুন্দরের সেবা ছাড়িয়া তিনি বাঁচিতে পারেন না। জীবন সেখানে দান এবং সেই দানেই প্রাণ। ভাবযোগ্য দেহ লইয়া এই ভজন এবং কামগন্ধের উপরে এখানে মনের ক্রিয়া। লেখক নারীর পূজারী। নারীর ভিতর দিয়াই সুন্দরের মাধুর্য সঞ্চারী ধর্ম পায় এবং রসোপচয়ে প্রাণময় এবং মনোময় হইয়া লীলায় ফোটে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। কিন্তু সম্যক্ রসোত্তীর্ণ সার্থক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধকের পক্ষে সংযম স্বাভাবিক কি, না শতর্ক? অবিতর্ক লিঙ্গেই রসরঙ্গ জীবিত হয়, সুতরাং অসিধারা-ব্রত পালনের ন্যায় ব্যাপারটি খাটে কিনা এই প্রশ্ন জাগিবে।

অবন্তীরাজ অবন্তী বর্মার ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা অবলম্বনে নাটিকাখানি লিখিত। মালাকর এবং নট মালবক ও তাহার পত্নী ও নটী মঞ্জুলিকা, কবি চারুদত্ত এবং দেবদাসী অঞ্জলি, চিত্রকর পুরন্দর, ইঁহাদের চরিত্র চিত্রণে লেখক সূক্ষ্ম রসনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। নাটিকাখানিতে নাট্যরস ছন্দোময় রূপ পাইয়াছে এবং বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ৪৭২।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

দুরন্ত নদী—আনা লুই স্ট্রং অনুবাদক—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।

নবজন্ম—ধীরেন্দ্রনাথ দাস।

লুপ্ত গৌরব—মণীন্দ্র দত্ত।

পয়গম্বর প্রিয়া—এম আবদুর রহমান।

মহাপ্রকাশ লীলা সন্দেশ—শ্রীপরিমলবন্ধু দাস।

অশোক চরিত—বিশুদ্ধাচার স্থবির।

পুষ্পধনু—প্রবোধকুমার সান্যাল।

পরিবার পরিকল্পনা—ডাঃ মদন রাণা।

লালু—শ্রীসুখেন্দুলেখর সরকার।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী এম ভি কৃষ্ণাপ্পা এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলি পরিদর্শন করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এইসব জেলা হইতেই ভারতের চাউল পাকিস্তানে পাচার হইয়া থাকে, সরেজমিনে এ সম্বন্ধে তদন্ত করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। বিশু খুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন — "ফলং — শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা" !!

*   *   *

কলিকাতা কর্পোরেশন একটি "যান্ত্রিক ঝাড়ুর" প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। ঝাড়ুটির মূল্য শুনিলাম—মবলক ৬৪ হাজার টাকা। আমাদের শ্যামলাল বলিল —"তার চেয়ে নাটকীয় ঝাড়ু হাতে নিয়ে কর্পোরেশন ছি ছি এত্তা জঞ্জাল করুন, আসর জমবে ভালো"।

*   *   *

Corporation to run life business"—একটি সংবাদ শিরোনামা—"কিন্তু সংবাদ নূতন নয়; "life" নিয়ে ব্যবসা কর্পোরেশনে বহুদিন থেকেই চলছে, অবশ্য একথা দুষ্ট লোকেরাই বলে থাকে—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *

কৃষিমন্ত্রীরা নাকি একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে তাঁরা Agriculture-এর উন্নতি সাধন করিবেন।—"আমরা ভেবেছিলাম তাঁরা নিজেদের লাইন অর্থাৎ culture ছেড়ে Agriculture নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, বিশেষ করে এই Cultural delegation-এর হিড়িকের যুগে"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

*   *   *

ইন্দোচীন মৈত্রী পক্ষের পঞ্চশীল বার্ষিকী অনুষ্ঠান ব্যাপারে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া শ্রীযুক্ত নেহরু প্রসংগত

বলিয়াছেন যে পঞ্চশীল এখন একটি International Coin হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে Coin-এর মেকিও চলছে বহু" !!

*   *   *

একটি সংবাদে প্রকাশ বর্মাতে নাকি সম্প্রতি দুইটি শ্বেতহস্তী দেখা গিয়াছে।—"ভারতের শ্বেতহস্তী যদিও
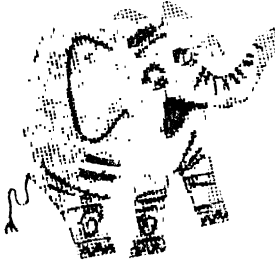
রুইট্ করে গেছে, অনেকে বলেন বর্তমানে পাশুটে হাতী যা আছে তা-ও নাকি শ্বেতহস্তীর চেয়ে বড় কম যায় না"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

*   *   *

কমনওয়েলথ মন্ত্রিসম্মেলনে কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাশিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলিকে যেভাবে সাহায্য করিয়া তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করিতেছে তাহাতে তাদের সংগে প্রতিযোগিতা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—"অতঃপর তাঁরা বন্ধুত্বের বদলে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবেন কিনা সে কথা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

*   *   *

একটি সংবাদে প্রকাশ করাচীর নাপিতেরা নাকি আলজিরিয়ার অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।—"আমরা দেখছি করাচীর নাপিতরাই আসর জমিয়ে রেখেছেন। পাক প্রদর্শনীতে ভারতীয় স্টলের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন এই নাপিতরা। নাকের বদলে নরুন নিয়ে তাকডুমাডুম দেখছি তাঁরাই করছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *

১৫ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীকে "বিশুষ্ক" এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।—"এখন বুঝতে পারছি বোম্বাইকে দিল্লী কেন্দ্রের অধীনে রাখার অর্থ। দিল্লী জানে কী করে লাঠি না ভেঙে সাপ মারতে হয়, বোকামি নয় একদিন হলো, সারা বছর তো আর তা চলে না"—ভিড়ের মধ্য হইতে কে মন্তব্য করিলেন।

*   *   *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ বৃটেন নাকি বছরে দুই ইঞ্চি করিয়া উত্তর মেরুর দিকে সরিয়া যাইতেছে।—"ভারত, সুয়েজ অঞ্চল, সিংহল বন্দর প্রভৃতি ছাড়ার পর আবার নূতন কার কোন্ দাবীতে উত্তর মেরুর দিকে চলে যেতে হচ্ছে তা অবশ্য বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *

একটি ভয়াবহ সংবাদে শুনিলাম অচিরেই নাকি মেয়েদের মাথায় টাক পড়িবে।—"ঘোমটা মাথায় ছিল নাকো মোটে,

মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে—না হয় না-ই দেখলাম কিন্তু ছায়াছবির পর্দায় একটি টেকো তারকা—ভাবা যায় না মশাই, ভাবা যায় না" !!

—শৌভিক—

সঙ্গীতের জন্য মান রক্ষা

রিৎচন্দ্রের রচনা অবলম্বনে ছবি তুলে তুলে শ্রীমতী পিকচার্স তথা প্রযোজিকা কানন ভট্টাচার্য একটা শুধু আভি-জাত্যই দেখিয়ে যাচ্ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছবির জন্য ভালো গল্পের প্রয়োজনীয়তাবোধ এবং সুগঠিত গল্পের প্রতি মমত্ববোধেরও সুন্দর দৃষ্টান্ত রক্ষা করে চলছিলেন। ওঁদের নবতম ছবি "আশা" শরৎচন্দ্রের লেখা নয় জেনেও এটা তাই আশা করা অন্যায় হয়নি যে, ওরা আর যা-ই করুন, গল্পটা যাতে জোরালো হয় সেদিকে দৃষ্টি বিশেষভাবেই রেখেছেন। কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার বিপরীত। "আশা"তে সবই খাসা সরেস জিনিস, নিরেস কেবল গল্পটি, যাকে ধরে আর সব জিনিসের অস্তিত্বের যুক্তি নয়ে পড়েছে। সঙ্গীতের ছবি হবে একথা ওরা গোড়া থেকেই ঘোষণা করে এসেছেন এবং কথাও ওরা রক্ষা করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। বরং যতো পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী, পরিমাণই শুধু নয়, গুণেও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু গান-বাজনাই তো ছবির সব নয়, সুপরিকল্পিত ঘটনার সূত্রে তাদের নাটকীয় ভাবে ও ভঙ্গীতে সাজিয়ে পরিবেশন করতে না পারলে কোন মূল্যই থাকে না। এখানে গল্পের কাঠামোটা যে একেবারেই অচল তা নয়, খুব কিছু অভিনবত্ব না থাকলেও ঐ কাঠামোর ওপরেই বেশ মনোজ্ঞ ঘটনার উদ্ভাবন করে বেশ জমিয়ে তোলা যেত। কিন্তু ঘটনাবলীর পরিকল্পনা ও বিন্যাস যেমন নিস্তেজ তেমনি এক গাদা অতি নিষ্প্রভ সংলাপ, এই দুইয়ে মিলে কাহিনীর দফারফা ঘটিয়ে দিয়েছে। আবার ঘটনাবলী যাও বা সহনীয় তাকে প্রায় অপাংক্তেয় করে দিয়েছে মাত্রা-ছাড়া সংলাপের রাশি। ছবিতে যা প্রত্যক্ষ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাকে আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে নানাব রাশে বর্ণনা করে দেবার এমন

প্রমাণ-পত্র গ্রহণে অপু—"পথের পাঁচালী"র সুবীর গত বছরের শ্রেষ্ঠ বালক অভিনেতা নির্বাচিত হওয়ায় শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বি এফ জে এ প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করছে। গত ৯ই জুলাই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৫৫ সালের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের প্রমাণ-পত্র অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅশোককুমার সরকার

একটা ঝোঁক দেখা গেল আগাগোড়া যে, তাতে ছবির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে দর্শকের বিরক্তির মাত্রাও বাড়িয়ে গিয়েছে। আর তাও শোনবার মত সংলাপ হলে একটু হয়তো সান্ত্বনা থাকতো, কিন্তু সে দিক থেকেও তো শুধুই নিরাশা। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন হরিদাস ভট্টাচার্য এবং সংলাপ রচনা করেছেন সজনীকান্ত দাস।

* * *

সত্যিকারের প্রতিভাকে ঠেলেঠুলে লোকের সামনে হাজির করে দিতে না পারলে সে-প্রতিভা চাপা পড়ে যায় এই হলো "আশা"র বক্তব্য। গানে প্রতিভাধর শিল্পী অরূপ গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে কলকাতায় আসে তার গুরুভাই পনের বছর আগে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ওস্তাদ রত্নেশ্বরের কাছে। এই পনের বছরের মধ্যে রত্নেশ্বরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গুরুদেবের পত্র নিয়ে এলেও অরূপকে রত্নেশ্বর চেনে বলে মনে করতেও পারলে না। রত্নেশ্বর এখন মস্ত বড়ো গাইয়ে, প্রচুর তার উপার্জন। অবশ্য তার মূলে তার স্ত্রী পূরবী। পূরবী এককালে নিজে অতি জনপ্রিয়া গায়িকা ছিলেন। রত্নেশ্বরের মধ্যে বিরাট প্রতিভা দেখে তিনিই রত্নেশ্বরকে লোকের দৃষ্টিতে এনে দেন। তারপর তাদের বিয়ে হয়। রত্নেশ্বর আরো নাম করেন এবং আরো পয়সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চামার হয়ে দাঁড়ান, একেবারে অর্থপিশাচ। রত্নেশ্বরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অরূপ চলে আসে ট্রেনে-আলাপ কলা-সমালোচক প্রভাতের সঙ্গে। প্রভাত তাকে এক টিউশনি জুটিয়ে দেয় এবং এক জায়গায় মিথ্যে করে অরূপকে সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক বলে পরিচয় করিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করিয়ে দেয়। তারই পাশের বাড়িতে থাকেন পূরবীর মাসিমা আর মাসতুতো বোন সন্ধ্যা। হঠাৎ পূরবী এলেন মাসিমার কাছে কদিন থেকে যেতে এবং পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তার মনে পড়ে গেল সেই ছেলেটির কথা, যার গানের প্রতি তার স্বামী অবহেলা দেখিয়ে তাকে একরকম তাড়িয়েই দেন। অরূপ গান গায় আর এ-বাড়ির দু বোন, পূরবী ও সন্ধ্যা তন্ময় হয়ে তা শোনে, শ্রদ্ধায় ওদের মন ভরে ওঠে। যাওয়া আসার পথে সন্ধ্যার সঙ্গে অরূপের চোখাচোখি হয়ে যায়, আর অরূপ নিভৃতে ঘরে বসে গান রচনা করে চলে। সন্ধ্যাকে বাজনা শেখাতে আসে নরেন। নরেন আবার একখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত। সে কোম্পানীর মালিক নরেনের দেওয়া সুর শুনে হতাশ হয়ে পড়েছেন, নরেনের কাজ হাতছাড়া হয় হয়। এই সময়ে নরেনও শুনতে লাগলো অরূপের গাওয়া গান। আর অলক্ষ্যে বসে তাই টুকে টুকে নিয়ে গিয়ে স্টুডিওতে ছবির গানে প্রয়োগ করতে লাগলো। নরেনের সেই চুরি করে নেওয়া সুরের গানগুলি ছবির মারফৎ অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, দিকে দিকে ওর নাম ছড়িয়ে পড়লো। সেই গানের রেকর্ড শুনে পূরবী ও সন্ধ্যা বিস্মিতা হলো, নরেনের চুরি ওরা বুঝতে পারলো। পূরবী অরূপকে তার পাওনা প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু কোথায় অরূপ? অরূপের খোঁজ নিতে গিয়ে ওঁরা শুনলেন ভাড়া বাকি পড়ে যাওয়ায় বাড়িওয়ালা জিনিসপত্তর আটকে অরূপকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। প্রভাতও তখন কাজ নিয়ে বাইরে চলে গেছে। কোথাও অরূপের খোঁজ পাওয়া গেল না। অথচ পূরবী তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক সম্মেলনের উদ্যোগ করে বসেছেন। হার্টের অসুখ বলে পূরবীর গাইতে বারণ আছে, তবুও তিনি সম্মেলনে গাইবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং দীর্ঘদিন পর আবার রেওয়াজে বসেন। রত্নেশ্বর তাই নিয়ে খিটখিট করেন। প্রথমে পূরবী সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিষেধ করেন তাঁর নাম আগে থেকে ঘোষণা করতে। দুদিন আগে নাম বের হতেই রত্নেশ্বর ক্ষিপ্ত হলেন পূরবীর ওপর। এই নিয়ে স্বামী

স্ত্রীর মধ্যে কেন একটা কলহও বাধলো, এবং হঠাৎ পড়ে গিয়ে পূরবী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার জানালেন পূরবীর কোন-ক্রমেই সম্মেলনে যোগদান করা চলবে না। ওদিকে সন্ধ্যা রাস্তায় রাস্তায় খুঁজতে খুঁজতে অতি দীন অবস্থায় অরূপকে আবিষ্কার করে বাড়ি নিয়ে এলো। অরূপ এই কুমারী দেহটিকে ফেলে দিতে ইচ্ছা জানায় সে গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যা এবং প্রভাত ওকে রাজী করাতে চেষ্টা করতে থাকে। সম্মেলনের দিন রত্নেশ্বর হাজির হলেন সন্ধ্যাদের বাড়িতে এবং সন্ধ্যাকে তার দিদির সেবায় জোর করে পাঠিয়ে দিয়ে অরূপ ও প্রভাসকে নিয়ে সম্মেলনে হাজির হলেন। রেডিওতে রিলে মারফত পূরবী বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলেন রত্নেশ্বরের কণ্ঠ। রত্নেশ্বর পূরবীর অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে বললেন পূরবী দেবী যে-শিল্পীকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য এই সম্মেলনের উদ্যোগ করেছেন, তিনিই সেই শিল্পীকে সবার সমক্ষে উপস্থিত করে দিচ্ছেন। এর পর অরূপ বসলো গাইতে। ওর গান শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী পুলকে ফেটে পড়লো। স্বীকৃতি লাভের যে আশা নিয়ে অরূপ কলকাতায় এসেছিল তা পূরণ হলো।

* * *

গল্পে প্রণয়ের দিকটাকে কিনার দিয়ে কিনার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অরূপকে সন্ধ্যা ভালবেসে ফেলে ওর গান শুনে, তারপর দুজনে মাঝে মাঝে দৃষ্টি বদল ছাড়া সাক্ষাৎ পরিচয় কোনদিন হয়নি অরূপকে রাস্তা থেকে খুঁজে বের করার আগে পর্যন্ত। তবে অরূপকে নিয়ে দু' বোনের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই। ঘটনার বিন্যাস এতো কাঁচা যে, গল্পের চেহারায় বানিয়ে নেওয়ার ভাবটা খটখটে হয়েই ফুটে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একটা ঘটনা ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিয়ে পরে তাকে আবার মুখের কথায় যুক্তিতে টেনে ধরা। যেমন নরেনের লুকিয়ে লুকিয়ে অরূপের গান শুনে টুকে টুকে নেওয়া। নরেন সন্ধ্যার মাস্টার, সে নিচে এসে বসে রয়েছে আর সন্ধ্যা রয়েছে তার দিদির সঙ্গে ওপরে, এটা যেন কেমন কেমন দেখায়। তাই ওটা মানিয়ে নেওয়ার জন্যে পরে কথার অবতারণা হলো এই বোঝাতে যে, নরেনই চাকরকে নিষেধ করে দিয়েছে তার উপস্থিতি ওদের জানাতে। আশ্চর্য দেখা গেল, অরূপ যখনই গান গায়, পূরবী ঠিক হাজির আছেন তাঁর মাসীর বাড়িতে, অন্তত পাঁচখানি গানের বেলায় তাই। বা, এটাও মনে হতে পারে যে, পূরবী যখনই হাজির থাকেন, অরূপ তখনই শুধু গায়। নরেন যে সুর চুরি করে ছবির গানে জুড়ে দিয়েছে তা দেখতে ও বুঝতে দর্শকের বাকি ছিল না, পরে তাই নিয়ে একখানির পর একখানি করে ছখানি রেকর্ড বাজিয়ে আবার মুখে মুখে গেয়ে আসল ও চুরি ধরিয়ে দেওয়া নিয়ে কথার পর কথায় দীর্ঘ গবেষণা ব্যাপারটার গুরুত্ব না বাড়িয়ে দর্শকের বোধ-শক্তিকে উত্যক্ত করে তোলে। যেমন বিরক্তিকর লাগে অরূপের এক একখানি গান শেষ হবার পর সংগীত নিয়ে পূরবী ও সন্ধ্যার মধ্যে পাণ্ডিত্যী মন্তব্য। তথাকথিত সংগীতজ্ঞ ও সংগীত-রসিকদের নিয়ে কিছু কিছু বিদ্রূপ করার চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু বড়ো কাঁচা পরিকল্পনা। যেমন একজন কমিক ধনীকে দেখানো হয়েছে যিনি নিজেকে মহান কলারসিক বলে গর্ব করেন, বলেন সংগীত তাঁদের বংশের রক্তে রক্তে আছে অথচ তাঁর ছেলের মুখে সিনেমার সস্তা গান, আর মেয়েটি অরূপের কাছে গান শিখতে বসে সিনেমার প্রেমের কথা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। একজন ফিল্ম প্রডিউসার আছেন, মারোয়াড়ীর কমিক চরিত্র, নাম পাপিরমল, গান আর ন্যাকা ন্যাকা প্রেম হলেই যে ছবি হিট তা তিনি বুঝে নিয়েছেন। অদ্ভুত লাগবে অরূপকে নিয়ে পূরবীদেব আচরণও। দুবোনে পাশের বাড়িতে থেকে অরূপের গান শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু একদিনও আলাপ করলেন না, যেন অপেক্ষা করতে লাগলো সেই দিনটির জন্য যেদিন বাড়িওয়ালা অরূপকে তাড়িয়ে দেবে আর ওরা গিয়ে দেখবে শূন্য কক্ষ। গোড়াতেই তো পূরবী যেন ইচ্ছে করেই অরূপকে তার বাড়ি থেকে চলে যেতে দিলে। কারণ যে পূরবী শেষে সম্মেলনে গান গাইতে যাবার জন্যে স্বামীর অবাধ্য পর্যন্ত হতে গেলো, সেই রকম একটি চরিত্রের হয়েও গোড়ায় অরূপ তার স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হবার পর, তার পরিচয় জেনেও পরে মাসীর বাড়িতে গিয়ে সেই অরূপকে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপও করলে না, এ সব হচ্ছে জবরদস্তী মেলানো ব্যাপার। এই জবরদস্তী বা যকে আনেকবার ছেলে-মানুষী বলে মনে হয়েছে তার পরিচয় বিস্তর। সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার দুদিন আগে পূরবী তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হতে দিলেন, কিন্তু কেন? যদি আদপেই নাম না

এ সপ্তাহের বাঙলা চিত্রমুক্তি "মামলার ফল"এ জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবী

ব্যবহার করতে দিতেন-অনুষ্ঠানে যোগদান করার আগে পর্যন্ত, তাহলে বোঝা যেত যে স্বামী রত্নেশ্বরকে গোপন করে তিনি একাজ করতে চান এবং তার একটা মানে এই হতো যে, রত্নেশ্বর একদা অরূপকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কাজেই সেই বিতাড়িত বালককে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে পাছে রত্নেশ্বর চটে যান, এই ভেবেই হয়তো গোপনীয়তার প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল, দুদিন আগে রত্নেশ্বর জানতেই পারলেন আর তাই নিয়ে বাধলো কলহ। সেই যদি রত্নেশ্বর জানবেনই এবং তাই নিয়ে পূরবীর সঙ্গে কলহও দেখাতে হবেই, তাহলে সেটা আগেই হলে কি হতো? অরূপকে নিঃসঙ্গ বিপদে ফেলাতে হবে বলেই যেন তার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভাতকে ঠিক তিন মাস হিসেব করে বাইরে চাকরি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কম নয়, বেশী নয়, ঠিক তিন মাস, যাতে তিন মাস ভাড়া না দেওয়ার অরূপকে বাড়িওয়ালার তাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে হিসেবে মেলে। অরূপকে খুঁজতে পথে পথে একা সন্ধ্যার ঘুরে বেড়ানোও বড়ো বিসদৃশ, বা অরূপকে পোস্টার-গাড়ি ঠেলা অবস্থায় আবিষ্কার, যে গাড়িতে তারই সুর চুরি করা গানওয়ালা ছবির বিজ্ঞাপন—বড়ো সস্তা ধরনের যোগাযোগ। সম্মেলনের দিন রত্নেশ্বর এলো সন্ধ্যার বাড়ীতে আর তাকে পূরবীর অসুখের কথা জানিয়েই জবরদস্তী পাঠিয়ে দিলে পূরবীর কাছে; এমন কাণ্ড যে সন্ধ্যা তার মার কাছে কন্যাপ্রতীম পূরবীর অসুখের খবরটাও দিতে দেওয়া হলো না। এও কম বিসদৃশ নয়। বড়ো চিন্তাহীন বিন্যাস।

* * *

প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী কথা এবং তার বেশীর ভাগই অতি নিরেস ভাবা। আরম্ভতেই অরূপের কলকাতায় আসার সময় ট্রেনে প্রভাতের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ। প্রভাতকে দেখে কলা-সমালোচকের এক ব্যঙ্গ-চরিত্র বলে মনে হয়। ওখানে দীর্ঘকাল তার বকবকানির জের চললো খানিকটা অরূপ রত্নেশ্বরের বাড়ি থেকে চলে এসে প্রভাতের বাড়িতে ওঠবার পর এবং সেখান থেকে অরূপের একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে রেস্তোরাঁতে গিয়ে। কলা-সমালোচকের অবস্থার কথা তো আছেই, সেই সঙ্গে রত্নেশ্বর কে ও কি এবং পূরবীই বা কি ছিল, সব একটানা দীর্ঘ সংলাপে বলে যাওয়া হয়েছে। সংগীত বিষয়ে পূরবীর কথাও কম নয়। কথা ছবিখানিতে একটা দুঃসহ বোঝার মতো চেপে বসেছে। আর সে সংলাপে না আছে তেমন রস, আর না আছে, ঘটনার নাটাদীপ্তি যোগ করার ক্ষমতা। নেহাৎই ব্যাজর ব্যাজর।

• • •

সংগীতই ছবিখানির যা কিছু জান-প্রাণ। সুরে ও বাজনায় এতো রকমারিতা বড়ো একটা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সংগীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বৈচিত্র্যের সঙ্গে নতুনত্বও যথেষ্ট পরিবেশন করেছেন। একটা অপূর্ব আকর্ষণ হচ্ছে পনেরজন তবলিয়া সহযোগে তবলা তরঙ্গ। বেশ চমক লাগার মতো দেখবার ও শোনবার জিনিস। ভারতীয় বাজনা নিয়ে যে কতো রকমের কি করা যেতে পারে, এই সম্মিলিত তবলা তরঙ্গ তার একটি মনোরম দৃষ্টান্ত। খুব বেশিক্ষণের বাজনা নয়, কিন্তু তার মধ্যেই দর্শক চমৎকৃত হবার সুযোগ পান। এই তবলা তরঙ্গের দৃশ্যটি আলাদাভাবে ছবি থেকে বের করে নিয়েও দেখবার মতো জিনিস। অরূপের মুখে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানগুলি মনকে মাতিয়ে রাখবে। বিশেষ করে শেষের ঠুংরী গান একখানি যার মতো সুগীত উচ্চাঙ্গ

নির্মীয়মান বাঙলা ছবি "পুত্রবধূ"তে উত্তমকুমার ও মালা সিনহা

চ ছাবতে এতো ভালো মনে হয় আর যায়নি, দর্শক এবং তাদের মধ্যে বিশেষ সংগীতরসিক যারা তাদের উচ্ছ্বসিত পাবে এই গানখানি। অনেক রকমেরই বাজনা আবহসংগীতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এবিষয়ে সংগীত পরিচালক কিছু কিছু এক্সপেরিমেণ্ট যে করেছেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতার আবহাওয়ায় তিনি ভাটিয়ালী বাঁশী এনে চৈতির সুর বেঁধেছেন। ভজনের সঙ্গে এমন মিষ্টি একটা বাজনা জুড়ে দিয়েছেন যা ভজনকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার পরম আনন্দ পাইয়ে দেয়। প্রত্যেকখানি গান আর তাদের আবহ সঙ্গীত, বারবার শুধু তাই শুনতে গিয়ে প্রতিবারই মন ভরে নিয়ে আসা যায়। কানন দেবীও এতে কয়েকখানি গান গেয়েছেন এবং তার অতুলনীয় মিষ্টি কণ্ঠ আবার পাওয়া গেল দীর্ঘদিন পর। ছবির এই গান কখানিও বড়ো আকর্ষণ। অন্যান্য গায়িকাদের মধ্যে আছেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী কোনার ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়।

* * *

শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে জবরদস্তীর পরিচয় বেশ প্রকট। কমল মিত্রের যে আঙ্গিক গঠন ও অভিনয়ভঙ্গী তাতে তাকে আর যে কোন চরিত্রেই মানাক না কেন, একজন দেশজোড়া নামী ওস্তাদ গাইয়ের চরিত্রে নিশ্চয়ই কেউ কল্পনাও করতে পারেন না; বোধহয় কমল মিত্রের নিজের স্বপ্নেও কোনদিন তা ঠাঁই পায়নি। আর কি বিপরীত চরিত্র এই রত্নেশ্বর! গান শুনলেই তার ঘুম পায় এমনিই গাইয়ে তিনি; তার কথাবার্তা, চালচলন, আচরণ এমন রাখা হয়েছে যার মধ্যে সবটুকুই অ-সুরজ্ঞনোচিত। তবে পরিচালক একটা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এহেন রত্নেশ্বর-রূপী কমল মিত্রের মুখে শেষ পর্যন্তও কোন গান জুড়ে না দিয়ে। তেমনি বিপরীত চরিত্র প্রভাতের এবং সেই চরিত্রের জন্য জহর গাঙ্গুলিকে নির্বাচন। একজন সাহিত্যিক কি সাংবাদিক, কি সমালোচকের কথাবার্তা আচরণের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার কোন লক্ষণই না আছে প্রভাত চরিত্রটিতে আর না জহর গাঙ্গুলীতে। সন্ধ্যা চরিত্রটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির নায়িকা পরিকল্পনা। গায়কের সাক্ষাতে থেকে নয়, দূর থেকে তার প্রতি প্রণয়াশক্তি। মণিকা গাঙ্গুলীর সাধ্যতে কুলায়নি অভিনয়ে চরিত্রটি দাঁড় করিয়ে দিতে। এটা মস্ত দুর্বল দিক হয়েছে ছবিখানির। পূরবীর চরিত্রটিতে বড়ো বেশী বক্তৃতা। কানন দেবীকে চরিত্রটিতে ভালো লাগবে প্রধানত তার গানগুলির জন্য; মুগ্ধ হতে হয় শুনে। ছিসেব মতো ক্লোজ-আপ ব্যবহার না করায় নাটক জমানোর চেয়ে অনেকবার দৃষ্টিতে আঘাতই সৃষ্টি করেছে। পূরবী ছাড়া অন্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। প্রভাতের স্ত্রীর চরিত্রে মাত্র মিনিটখানেকের জন্য তৃপ্তি মিত্রের মতো অভিনয়প্রতিভাকে অবতরণ করানোর কোন কারণ দেখা গেল না। শ্যাম লাহা এতে পাঁপরমল্ল মারোয়াড়ী, ইদানীং ভাঙা ভাঙা বাঙলাভাষী মারোয়াড়ী চরিত্রে অভিনয় করে তিনি লোক হাসাচ্ছেন

বেশ, এখানেও তাতে তিনি সফল হয়েছেন। ধনী কলারসিকের কমিক চরিত্রে তুলসী লাহিড়ীও হাসবার সুযোগ দেন। সুর-চোর নরেনের চরিত্রে প্রশান্তকুমার অভিনয় করেছেন ভালো। সত্যিকারের অভিনয় দেখাবার জোরটা স্বভাবতই বেশী ন্যস্ত হয়েছে নায়ক অরূপের চরিত্রে আশীষ-কুমারের ওপর। বড়ো চরিত্রে এই তার প্রথম অবতরণ এবং তার অভিনয়ের মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা পাওয়া গেল প্রচুর। বেশ একটা অভিব্যক্তিব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব আছে ওর যা দর্শকমনকে আকৃষ্ট করেই। গানের সঙ্গে অভিব্যক্তি ভালো মিলিয়েছেন তিনি যাতে সত্যিকারের একজন গায়ককেই সামনে পাওয়া যায়।

* * *

শব্দগ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কাজ খুবই প্রশংসনীয়। গান ও আবহসংগীত রেকর্ডিং বিশেষ করে পনেরো জোড়া তবলার বাজনা, আর তাছাড়া সংগীত সম্মেলন ক্ষেত্রে রত্নেশ্বরের বক্তৃতায় স্পীকারের স্বাভাবিক রেশ ইত্যাদি এফেক্টগুলির সৃষ্টিতে কৃতিত্ব পাওয়া যায়। ক্যামেরার কাজেও প্রবীন আলোকচিত্রশিল্পী জি কে মেহতা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষা করে গিয়েছেন।

বিদেশগামী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল

স্বাধীনতার পর ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিনিময় ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের একটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান আজকের দিনে প্রয়োজনও আছে। ক' বছরের মধ্যে চীনে, পূর্ব এশিয়ায়, মধ্য এশিয়ায়, আমেরিকায় এবং রাশিয়া সহ ইউরোপের নানা দেশে ভারত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে। কোন কোন দল খুবই নাম করে এসেছেন, আবার কোন কোন দল বিদেশী-দের সৌজন্যের খাতিরটুকু নিয়েই ফিরে এসেছেন। তার কারণ, কোন কোন দলে যেমন সত্যিই দেশের সেরা শিল্পীদের নেওয়া হয়েছে, তেমনি আবার কোন কোন দলের সঙ্গে এমন শিল্পীদের পাঠানো হয়েছে যারা নিজের দেশেই গুণী বলে পরিচিত নন। ঠিক এমনি শিল্পীদের নিয়ে দল ভারী করে গত ১০ই জুলাই শ্রীঅনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে ত্রিশ জনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল মস্কো যাত্রা করেছেন। এদলে বড়ো গুণী বলতে কয়েকজন মাত্রই আছেন, আর বাকী যারা তাদের অনেককে পাড়ার আসরেও ঠাঁই পেতে দেখা যায় না। জানিনা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শিল্পী নির্বাচনের রীতি কি, কিন্তু এটা বুঝি যে বিদেশে ভারতের শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যদি কাউকে পাঠাতে হয় তো দেশের সেরা শিল্পীদেরই পাঠানো উচিত। যাকে তাকে পাঠালে বিদেশে ভারতের শিল্পগৌরব রক্ষা করা যাবে না। শিল্পীর যে এদেশে অভাব আছে তা নয়, কিন্তু তবুও গুণী থাকতে আধা-গুণী বা নির্গুণদের বেছে বেছে পাঠাবার পিছনে যে কি রহস্য আছে বোঝা ভার।

একলব্য

...ল ইংলণ্ড ক্লাব-লনে উইম্বলডন টেনিসের ৭০তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সব-জাঁকজমকপূর্ণ টেনিস প্রতিযোগিতার ...হা উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা টেনিস উৎসাহ উদ্দীপনার যে সাড়া জেগে-

...ধোত্তর টেনিসে কনিষ্ঠতম উইম্বলডন ...ম্পিয়ান লুই হোড

সমস্ত বিষয়ের ফাইন্যাল খেলার পর ...াবিকভাবেই তা মন্থর হয়ে গেছে। উইম্বলডনের স্মৃতি মন থেকে সহজে ...ার নয়। টেনিস রসপিপাসু ক্রীড়া...ক মনে উইম্বলডনের স্মৃতি সারা ...ই জেগে থাকে। কারণ উইম্বলডন হচ্ছে ... টেনিসের পীঠস্থান। তাই উইম্বল... ...বিজয়ীর সম্মানও অনন্য।

...র্ঘ ৭৯ বছর আগে ১৮৭৭ সালে ...ালবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব এবং অল ইংলণ্ড ...ট ক্লাবের যুগ্ম চেষ্টায় উইম্বলডন ...স প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মেরিলি... ...' ক্রিকেট ক্লাব উত্তরকালে টেনিসের ...া সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে ক্রিকেটের ...ায় আত্মনিয়োগ করে। আজ বিশ্ব ...কটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থারূপে এম সি সি ...মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের প্রসিদ্ধি ...জনবিদিত। মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব ...নস থেকে সরে যাবার পর অল ইংলণ্ড ...বের পরিচালনায় তাদের ঐতিহাসিক ...ন' উইম্বলডন প্রতিযোগিতা পরিচালি... ...া আসছে। ১৮৭৭ সালে প্রতিযোগিতা ...রম্ভ হলে এবার প্রতিযোগিতার ৭৯ ...র পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু প্রথম মহা-যুদ্ধের জন্য ৪ বছর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ৫ বছর উইম্বলডন বন্ধ থাকায় এবারকার অনুষ্ঠান ৭০তম অনুষ্ঠানে পরিগণিত হয়েছে।

টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হিসেবেই একদিন উইম্বলডনের পরিচয় ছিল। ১৯২৪ সালে উইম্বলডন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রূপান্তর ঘটলেও

দুইবারের কনিষ্ঠতম উইম্বলডন রানার্স কেন রোজওয়াল

টেনিসের আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পৃথক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ফলে উইম্বলডনের আভিজাত্য, মর্যাদা এবং সুনামও ক্ষুণ্ণ হয়নি। টেনিস মহলে উইম্বলডন চিরদিনই বে-সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে। সেই জন্যই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত টেনিস বীর হিসেবে পরিগণিত, বিশ্ব টেনিসের অজেয় যোদ্ধা হিসেবেই উইম্বলডন বিজয়ীর খ্যাতি ও মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত। টেনিসের বল র‍্যাকেট, আইন-কানুন এবং নানা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উইম্বলডনেরও বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথম বছর যেখানে মাত্র ২২ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যে প্রতিযোগিতা শুধু সীমাবদ্ধ ছিল, ইংলণ্ডের ধনাঢ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতা এখন বিশ্বের টেনিস দিকপালদের জন্যই উন্মুক্ত এবং প্রতিযোগীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু সিঙ্গলসের খেলাই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ১২৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে।

উইম্বলডনের প্রথম অবস্থায় বৃটিশ খেলোয়াড়রা আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হলেও পরবর্তী কালে এক এক সময়ে এক এক দেশের খেলোয়াড়দের আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে। কোন সময় আমেরিকা, কোন সময় অস্ট্রেলিয়া এবং কোন সময় ফ্রান্সের কীর্তিমান খেলোয়াড়েরা উইম্বলডনের আসর জমিয়ে তুলেছেন। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত উইম্বলডনে বৃটিশ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ১৯০৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার নর্মান ব্রুকস উইম্বলডন জয় করে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এণ্টনী উইল্ডিং উপর্যুপরি ৪ বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জন করবার পর আবার ব্রুকস বিজয়ী হন ১৯১৪ সালে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং উইম্বলডন বন্ধ থাকে ৪ বছর। যুদ্ধোত্তর কালে যুক্তরাষ্ট্রের বিল টিলডেনের আবির্ভাবে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। উইম্বলডন তথা আন্তর্জাতিক টেনিস জগতে টিলডেন একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে পরিগণিত হন, যদিও টিলডেনের সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে ফ্রান্সের বিখ্যাত 'ফোর মাস্কেটিয়ার্সের' অন্যতম রেনে লাকোস্ট, হেনরী কোসে, ও জিন বরোট্রার সম্মান কম ছিল না এবং এঁরাও উইম্বলডন জয় করে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন। টিলডেন কোসে বরোট্রার পর অস্ট্রেলিয়ার হার্বার্ট ক্রফোর্ড ও আমেরিকার ডাইন্স

এবং তারপর ব্রিটেনের ফ্রেড পেরীর উইম্বলডনে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার ডোনাল্ড বাজের আরও পরবর্তী কালে। ইংলণ্ডের খেলোয়াড় ফ্রেড পেরীর ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার উইম্বলডন জয়ের পর আর কোন বৃটিশ খেলোয়াড়ই উইম্বলডনে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইডন পেট্রা, জ্যাক ক্র্যামার, বাজ পেটী, ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান, জারোস্লাভ ড্রবনী, টোনি ট্রাবার্ট প্রমুখেরা উইম্বলডনে বিজয়ী হলেও এই যুগের একমাত্র চ্যাম্পিয়ন ক্র্যামারকে টেনিস বিশেষজ্ঞরা প্রতিভাসম্পন্ন ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

উইম্বলডনের মনোরম টেনিস লন, মাঠের পরিবেশ, দর্শক গ্যালারী, আলোর ব্যবস্থা, প্রতিযোগিতার নিখুঁত ব্যবস্থাপনা—সবকিছুতেই পাওয়া যায় উদ্যোক্তাদের পরিচ্ছন্ন শিল্পী-মনের সম্যক পরিচয়। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ১৬টি কোর্টে ১২ দিন ধরে চলে দেশ বিদেশের টেনিস বীরদের অবিরাম সংগ্রাম। নানা দেশের প্রায় আড়াই লাখ টেনিস রসপিপাসু প্রতি বছর দর্শক হিসেবে উইম্বলডনে উপস্থিত থাকেন। এদের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এবছরও অল ইংলণ্ড ক্লাবের সভানেত্রী ডাসেস অব কেণ্ট রাজকুমারী মার্গারেটসহ উপস্থিত ছিলেন। ফাইন্যালে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়কেও এঁদের পাশে উপবিষ্ট দেখা যায়। উইম্বলডনে প্রতি বছর কম করে দুই হাজার নতুন বলের প্রয়োজন হয়। এর থেকে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়।

• • •

আগেই বলা হয়েছে উইম্বলডনের এবার ছিল ৭০তম অনুষ্ঠান। এবারকার অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছে। ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অস্ট্রেলিয়ারই দুই কীর্তিমান খেলোয়াড়—লুই হোড ও কেন রোজওয়াল। এর মধ্যে হোড রোজওয়ালকে হারিয়ে হয়েছেন উইম্বলডনের নতুন চ্যাম্পিয়ন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধের পর হোডের মত এত কম বয়সে কেউই উইম্বলডন জয় করতে পারেননি। হোডের বর্তমান বয়স মাত্র ২১ বছর। হোডের প্রতিদ্বন্দ্বী রোজওয়ালের বয়সও একুশ পার হয়নি এবং অস্ট্রেলিয়ার এই দুই ধুরন্ধর খেলোয়াড় অতি অল্প বয়স থেকেই উইম্বলডন অভিযান আরম্ভ করেছেন। ১৯৫৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে এরা উইম্বলডনের ডাবলস বিজয়ী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সিংগলসে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এ বছরও এঁদের কাছ

মহিলাদের ডাবলস চ্যাম্পিয়নের অন্যতমা মিস এঞ্জেলিকা বাক্সটন

থেকে কেউ ডাবলসের পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সিংগলসের বিজয়ী ও বিজিতের পুরস্কারসহ হোড রোজওয়াল ডাবলসের পুরস্কার নিয়ে দেশে ফিরেছেন। মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যালের চারজন টেনিস পটিয়সীর মধ্যে দুইজন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিনী। কিন্তু মিস মুলার ও মিস সিনেকে আমেরিকার ও ইংলণ্ড জুটির কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। ফলে বিজিতের পুরস্কার নিয়ে মিস সিনে ও মিস মুলার হয়েছেন হোড-রোজওয়ালের অনুগামী।

উইম্বলডন রানার্স কেন রোজওয়ালের পক্ষে ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ এই প্রথম নয়। ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে মিশরের খেলোয়াড় জারোস্লাভ ড্রবনীর কাছে তিনি ফাইন্যালে পরাজিত হন। সুতরাং মাত্র ৩ বছরের মধ্যে রোজওয়াল উইম্বলডনে হলেন দুইবার রানার্স। প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকায় রোজওয়ালকে দ্বিতীয় স্থান দান করা হয়েছিল। প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন লুই হোড। হোড এই বছরই অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় প্রতিযোগিতার পরিচালকবর্গ তাকেই সম্ভাবিত বিজয়ী বলে কল্পনা করে নেন। হোড জয়লাভ করায় তাদের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। উইম্বলডন জয়ের পর হোড যদি আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেন, তবে বিশ্বের চারটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা জয় করে ডোনাল্ড বাজ যে কীর্তি স্থাপন করে রেখেছেন, তার সমতুল মর্যাদা লাভ করবেন।

বাছাই তালিকার অন্যান্য খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী সুইডেনের খেলোয়াড় স্বেন ডেভিডসনকে তৃতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় এ্যাসলে কুপারের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। চতুর্থ স্থানের অধিকারী প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন বাজ পেটী তৃতীয় রাউণ্ডে হেরেছেন ব্রিটেনের তরুণ খেলোয়াড় ববি উইলসনের কাছে। ১৯৫৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ড্রবনীকে দেওয়া হয়েছিল বাছাই তালিকার পঞ্চম স্থান। তিনি প্রথম রাউণ্ডেই ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণণের কাছে পরাজিত হন। গতবারের রানার্স ডেনমার্কের কার্ট নীলসেন তৃতীয় রাউণ্ডে হার স্বীকার করেন চিলির উদীয়মান খেলোয়াড় লুই আয়লার কাছে।

উইম্বলডনে পুরস্কার প্রাপ্তা প্রথম নিগ্রো টেনিস পটিয়সী মিস এ্যালাথিয়া গিবসন

ভারতের উদীয়মান খেলোয়াড় আর কৃষ্ণণের পক্ষে ড্রবনীকে পরাজিত করবার গৌরব এই প্রথম নয়। গতবার ইংলণ্ডের কুইন্স টুর্নামেন্টেও কৃষ্ণণ পরাজিত করেছিলেন ড্রবনীকে। যাই হোক, কৃষ্ণণ প্রথম রাউণ্ডে ড্রবনী এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার ডন ক্যান্ডিকে হারাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার অপর খেলোয়াড় মল এণ্ডারসনের কাছে হার স্বীকার করেন। ভারতের অপর প্রতিযোগী নরেশকুমার দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হন ইটালীর অরল্যাণ্ডের কাছে। ডাবলসের খেলায় কুমার ও কৃষ্ণণকে তৃতীয় রাউণ্ডে আমেরিকান জুটি ভিক্ সেসাস ও হ্যাম রিচার্ডসনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার টেনিস পটিয়সী মিস শার্লি ফ্রাই। ইনি বাছাই তালিকায় পঞ্চম

মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী জুটির অন্যতম ভিক সেসাস

স্থানের অধিকারিণী ছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পরে ইংলণ্ডের একজন মহিলা উইম্বলডন ফাইন্যালে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা অর্জন করলেও বিজয়িনী হতে পারেন নি। মিস অ্যাঞ্জেলিকা বাক্সটনকে স্ট্রেট সেটেই হার স্বীকার করতে হয়েছে মিস শার্লি ফ্রাইয়ের কাছে। দেশের খেলোয়াড় ভিক সেসাসের সঙ্গে খেলে মিস ফ্রাই মিক্সড ডাবলসেও বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করেছেন।

উইম্বলডনের মহিলা বিভাগে আমেরিকার প্রাধান্য গত ১২ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মিস ফ্রাই এবারও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় উপর্যুপরি ২৩ বছর বিজয়িনীর পুরস্কার আমেরিকার ঘরে উঠেছে। আমেরিকার নিগ্রো টেনিস-পটিয়সী মিস অ্যালথিয় গিবসন ব্রিটেনের অ্যাঞ্জেলিকা বাক্সটনের সঙ্গে খেলে লাভ করেছেন ডাবলসের পুরস্কার। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উইম্বলডনের ইতিহাসে কোন নিগ্রো খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভের এটা প্রথম ঘটনা। মিস গিবসন উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের অধিকারিণী। বাছাই তালিকায় ইনি চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। গিবসনকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে মিস ফ্রাইয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৪—৬, ৭—৫ ও ৬—৪ সেটে কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

লুই হোড ও কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৭—৫, ৬—২ ও ৬—১ সেটে নিকোলা পেট্রাঞ্জেলী ও সিরজা অরল্যাণ্ডোকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস শার্লি ফ্রাই (আমেরিকা) ৬—৩ ও ৬—১ সেটে অ্যাঞ্জেলা বাক্সটনকে (ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ও মিস অ্যাঞ্জেলা বাক্সটন (ব্রিটেন)—৬—১ ও ৮—৬ সেটে মিস কে মুলার ও মিস ড্যাফনে সিলেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

ভিক্ সেসাস ও মিস ফ্রাই (আমেরিকা) ২—৬, ৬—২ ও ৭—৫ সেটে গার্ডনার মুলোয় ও মিস গিবসনকে পরাজিত করেন।

ফুটবল লীগের পর্যালোচনা

[১০—৭—৫৬]

রেফারীদের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য লীগ খেলায় যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা সহজতর হলেও রেফারীদের খেলা পরিচালনায় উন্নতির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। গত সপ্তাহের তিনটি উল্লেখযোগ্য খেলার মধ্যে রাজস্থান ক্লাব উয়াড়ীর বিরুদ্ধে এবং এরিয়ান ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে একটি করে পেনাল্টি কিকের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মোহনবাগানের খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের একটি আইনসংগত গোল অগ্রাহ্য হয়েছে একরূপ বিনা কারণে। এই খেলার শেষদিকে মোহনবাগানেরও একটি পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দেননি। রেফারীদের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার এমন ছোট খাটো এবং বড়সড় ঘটনা আরও প্রত্যক্ষ করা না গেছে, এমন নয়। ময়দানের আবহাওয়াকে সজীব করবার জন্য যে সময় রেফারীর ত্রুটিহীন পরিচালনার সর্ববিধ প্রয়োজন সে সময়ও যদি ভুলচুক হতে থাকে তবে ফুটবলকে ক্লেদমুক্ত করবার উপায় কি? আই এফ এ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের এটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা উচিত।

মোহনবাগান ক্লাব এখনো রয়েছে লীগ কোঠার শীর্ষস্থানে। তবে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গলের সাম্প্রতিক উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলে লীগে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের পয়েণ্টের যে ব্যবধান ছিল তা অনেক কমে এসেছে। ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ানের অসমাপ্ত খেলাটির উপর এই অবস্থা নির্ভর করছে অনেকখানি। যদি খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় তবে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গলের অসমাপ্ত খেলার ফলাফল বহাল থাকলে মোহনবাগানকে সম্ভাবিত লীগ চ্যাম্পিয়ন বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এখনো লীগের জন্য অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফল অপেক্ষা করছে। তবুও শেষদিকে ৩।৪ পয়েণ্ট এগিয়ে থাকার মূল্য অনেকখানি। এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গলের

রেলওয়ে স্পোর্টস ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলায় রেল গোলরক্ষক এ চৌধুরী আবিদের মাথার উপর দিয়ে একটি বল 'ফিস্ট' করছেন

খেলা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন—নির্দিষ্ট সময়ের ৭।৮ মিনিট আগে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়, এই সময় এরিয়ান [illegible] পেনাল্টি গোলে এগিয়েছিল।

রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজয় এবং এরিয়ান ক্লাবের কাছে একটি পয়েন্ট নষ্ট করিবার ফলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের দৌড় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। লীগ কোঠা থেকে এদের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল ও লীগ টেবল নীচে দেওয়া হল।

১লা জুলাই

বি এন আর (১) : খিদিরপুর (০)

২রা জুলাই

মহঃ স্পোর্টিং (১) : কালীঘাট (০)
রাজস্থান (৩) : পুলিস (৩)
রেলওয়ে স্পোর্টস (০) : জর্জ টেলীগ্রাফ (০)

৩রা জুলাই

ইস্টবেঙ্গল (২) : বি এন আর (১)
মোহনবাগান (০) : উয়াড়ী (০)
এরিয়ান (০) : খিদিরপুর (০)

৪ঠা জুলাই

জর্জ টেলীগ্রাফ (১) : মহঃ স্পোর্টিং (১)
পুলিস (২) : স্পোর্টিং ইউঃ (১)

৫ই জুলাই

মোহনবাগান (০) : রাজস্থান (০)
এরিয়ান (১) : বি এম আর (০)
ইস্টবেঙ্গল (৪) : বাঙ্গালী প্রতিভা (০)

৬ই জুলাই

রেলওয়ে স্পোর্টস (৩) : মহঃ স্পোর্টিং (২)
খিদিরপুর (২) : কালীঘাট (০)

৯ই জুলাই

ইস্টবেঙ্গল (১) : পুলিস (০)
রাজস্থান (১) : উয়াড়ী (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (১) : খিদিরপুর (০)

১০ই জুলাই

মোহনবাগান (১) : স্পোর্টিং ইউঃ (০)
এরিয়ান (১) : মহঃ স্পোর্টিং (১)
জর্জ টেলীগ্রাফ (৩) : বি এন আর (২)

প্রথম ডিভিসন লীগ টেবল

[১০—৭—৫৬]

মোহনবাগান	১৯	১৪	৪	১	৪১	৫	৩২
ইস্টবেঙ্গল	১৭	১১	৫	১	২২	৬	২৭
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১০	৭	২	৩০	৯	২৭
বি এন আর	১৮	৮	৪	৬	১৫	১৫	২০
রেলওয়ে স্পোর্টস	১৭	৭	৫	৫	১৩	১০	১৯
রাজস্থান	১৮	৫	৮	৫	১৫	১০	১৮
এরিয়ান	১৪	৫	৭	২	১২	৭	১৭
উয়াড়ী	১৬	৫	৩	৮	১৫	২১	১৩
খিদিরপুর	১৬	২	৮	৬	৪	১০	১২
পুলিস	১৮	৩	৬	৯	১১	৩০	১২
বাঙ্গালী প্রতিভা	১৬	২	৮	৬	৬	২১	১২
জর্জ টেলীঃ	১৫	২	৬	৭	৮	১৭	১০
স্পোর্টিং ইউঃ	১৫	১	৭	৭	৪	১৫	৯
কালীঘাট	১৬	০	৬	১০	৪	২১	৬

স্টেডিয়াম নেই তাতে কি হয়েছে? গাছের ডাল থাকতে খেলা দেখা ঠেকায় কে?

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা জুলাই—ভারতে রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন সমগ্র দেশে ১৬০টি সাব ব্র্যাঞ্চ অফিস লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। শীঘ্রই ঐ অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৩৫০টি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪ঠা জুলাই—ভারত সরকার কয়লা ও পোড়া কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলা এবং বিহারের কয়লাখনিসমূহে উৎপন্ন কয়লার মূল্য টনপ্রতি ৩ টাকা ও অন্যান্য কয়লা খনিতে উৎপন্ন কয়লার মূল্য টনপ্রতি ২, হইতে ৬৷৷৹ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ৫ই জুলাই হইতে এই মূল্যবৃদ্ধি বলবৎ হইবে।

অদ্য চোরাই আমদানী স্বর্ণ ও জহরতাদির সন্ধানে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এক বৃহত্তম তল্লাসীর অভিযানকালে জল ও স্থল শুল্ক বিভাগ ও কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা কয়েকজন ক্রোড়পতি শিল্প ব্যবসায়ীর ৯টি বাসভবনে হানা দিয়া ব্যাপক তল্লাসী চালায়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূখণ্ড হস্তান্তর বিল সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অভিমত সম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

আগামী ১৬ই জুলাই লোকসভার আগামী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রত্যাশানুযায়ী জয়েন্ট কমিটি যদি ঐ তারিখে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন, তবে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লোকসভা রাজ্য পুনর্গঠন বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

শিলং হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী খণ্ড-জাতি অধ্যুষিত গ্রাম 'মসীনরাম'এ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে। এতদিন এ প্রসিদ্ধি ছিল চেরাপুঞ্জীর।

৫ই জুলাই—আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রচারিত এক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, মোট ১৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার একযোগে তিন শ্রেণীর নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সম্প্রতি টালীগঞ্জ-রসা ডাকঘরের তহবিলে অনুমান ৭৫ হাজার টাকা গরমিলের এক অভিযোগ সম্পর্কে বর্তমানে টালীগঞ্জ পুলিস তদন্ত চালাইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই অভিযোগ সম্পর্কে উক্ত ডাকঘরের সংশ্লিষ্ট পোস্ট মাস্টারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৬ই জুলাই—কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূখণ্ড হস্তান্তর বিলটি তিন দিনব্যাপী বিতর্কের অবসানে অদ্য সায়াহ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

অদ্য বৈকালে কলিকাতা পৌরসভার শ্রমিক ও কর্মচারী যুক্ত কমিটির উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আহূত একটি সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ও শ্রমিকদের দাবীদাওয়া সম্যকরূপে না মানায় আগামী ২০শে আগস্ট মধ্যরাত্রি হইতে সমস্ত ইউনিয়নের কর্মচারীরা ধর্মঘট আরম্ভ করিবে।

৭ই জুলাই—রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলার ন্যূনতম দাবীর প্রতি উপেক্ষা ও অবিচারের প্রতিবাদে শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্যন্ত কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়।

বিহার বিধানসভায় আজ ১৯৫৬ সালের বিহার-পশ্চিমবঙ্গ (এলাকা হস্তান্তর) বিলটি উত্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে ভারত সরকারকে আবেদন জানান হয়। এবং রাষ্ট্রপতিকে সংসদে উহা উত্থাপনের সুপারিশ করিতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

৮ই জুলাই—কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ বলেন যে, দ্রব্যমূল্য বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে তিনি 'অহেতুক উদ্বিগ্ন' হইবার কোন কারণ দেখেন না। মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে রোধ করা যাইতে পারে।

এনফোর্সমেণ্ট বিভাগীয় পুলিস কলিকাতা পৌরসভার কর্মচারীদের সহযোগিতায় রবিবার সকালে কলিকাতার ৬টি বাজারে হানা দিয়া প্রায় ৬ মণ পচা মাছ, ফল ও তরিতরকারি নষ্ট করে। একই সঙ্গে ৯৯টি কম ওজনের বাটখারা ও দাঁড়িপাল্লা নষ্ট করা হয়।

৯ই জুলাই—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে এক লক্ষ একর জমি দখল ও উন্নয়নের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশনে এই রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং উক্ত আলোচনা কালে মন্ত্রিসভা এবিষয়ে একমত হন বলিয়া প্রকাশ যে প্রয়োজন দেখা দিলে রাজ্য সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধকল্পে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইবেন।

বিদেশী সংবাদ

৩রা জুলাই—অদ্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিল্ড হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে 'ফ্রিডম অব দি সিটি অব লণ্ডনে'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

কলিকাতায় নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে পূর্ববঙ্গের ৪ কোটি জনসংখ্যার শতকরা ৭৫জন লোকই দুর্ভিক্ষের মত আতঙ্কজনক চরম খাদ্যসঙ্কটের কবলে পড়িয়াছে।

৪ঠা জুলাই—লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে আহূত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সহনশীলতার মধ্য দিয়াই ভারত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধান করিতে চায়। ইহাই ভারতের মূল নীতি। ইচ্ছা করিলে আপনারা ইহাকে সহাবস্থানের নীতি বলিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী আগামী কাল লণ্ডনে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইতে পারেন বলিয়া পাকিস্থান মহলের নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

ব্রহ্ম দেশীয় জনৈক ইঞ্জিনীয়ার মার্টিন পাদাউ টাঙ্গাপ রোডের নিকট [illegible] হস্তী দেখিতে পান [illegible]

থানার কর্তৃপক্ষকে তা জানান।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, সিংহল প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিলে সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন বলিয়া আজ কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রিগণ সিংহলকে জানাইয়াছেন।

৫ই জুলাই—অদ্য লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং পাক প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর মধ্যে পাক-ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

নিকোবর দ্বীপে ব্রিটিশ সরকারকে একটি বিমানঘাটি ব্যবহার করার যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য ঊর্ধ্বতন সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, সময়মত ষড়যন্ত্রের অন্তরালবর্তী ১২ ব্যক্তির গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নেপালে রাজা মহেন্দ্রের গবর্নমেণ্টের পতন ঘটাইবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। পুলিস রাত্রে কয়েকজন প্রাক্তন সেনা বিভাগীয় অফিসারসহ উক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে।

৬ই জুলাই—এখানে প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, গত ১লা জুলাই ভারতীয় বিমান বাহিনী বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালার মধ্যে অবস্থিত কর নিকোবর দ্বীপের বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

অদ্য কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। দশ দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীরা অদ্য এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

৭ই জুলাই—পশ্চিম পাকিস্থান সরকার আজ লালকোর্তা দলকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। লালকোর্তা নেতা মিঃ আবদুল গফফর খাঁ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ হইতে পাঁচ দিনব্যাপী আয়ারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি আজ আইরিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ জন কস্টেলোর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৮ই জুলাই—গতকল্য জাপানের জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় হইতে বলা হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধের শেষভাগে মাঞ্চুরিয়ায় প্রায় ১৬ হাজার জাপানী আশ্রয়প্রার্থী অনশনে, ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা সোভিয়েট ও চীনা সৈন্য দলের অত্যাচারে মারা গিয়াছে।

৯ই জুলাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সন আজ এখানে বলেন যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যায় আপাতত হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অভিমতও পোষণ করে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সরাসরি আলাপ-আলোচনা দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত।

পূর্ব পাকিস্থানের প্রাদেশিক গবর্নর আজ রাত্রে যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্থানে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধের জন্য দশ ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। দণ্ডস্বরূপ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডের বিধানও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৷৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 21st JULY, 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৩৮ সংখ্যা ॥
শনিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ভূমি-হস্তান্তর বিল বর্তমানে শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এই বিলটির সম্পর্কে পুরো-পুরি মতভেদ দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী সিদ্ধান্তের কিছু সংশোধন দাবী করিয়া বিলটি অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু বিহার বিধানসভা সরকারী বিলটির সম্বন্ধে কোন বিবেচনাকে আমল দেন নাই। তাঁহারা বিহারের সংযোগ ভূমিও ছাড়িবেন না, এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু মন্ত্রি-মণ্ডল সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হইলে দলবলে তন্মুহূর্তেই পদত্যাগ করিবার প্রস্তুতির বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছেন। বিহার বিধানসভা একজোটে বিলটি নাকচ করিলে ভারত সরকার বিলটি কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইবেন না এইরূপ একটা মনোভাব এতৎ-সম্পর্কে বিহারের নেতৃবর্গের অসংগত জিদকে প্রশ্রয় দিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের কর্তব্য কি? মতভেদ এই সম্পর্কে ঘটিবে ইহা পূর্ব হইতেই বোঝা গিয়াছিল। সেই-রূপ মত বিরোধের ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং সমগ্র রাষ্ট্রের সংহতির আদর্শ অনুযায়ী কর্মনীতি অবলম্বনে বলিষ্ঠ সংকল্পশীলতা অবলম্বন করাই সুস্পষ্ট-রূপে ভারত সরকারের পক্ষে কর্তব্য। বস্তুত রাজ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের অব্যবস্থিতচিত্ততা এই সমস্যাকে অনেকাংশে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং এখন এই সম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করা ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ফলত এক ভোটে ভোটকে মূল্য দিলেই গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা রক্ষিত হইবে, এই বিচার এই সম্পর্কে বিপজ্জনক, কারণ গণতান্ত্রিকতার পটভূমি এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার মধ্যে নিশ্চয়ই নিবদ্ধ নয়। পরন্তু সমগ্র ভারতের স্বার্থের সম্বন্ধে অবহিত হইয়াই ভারত সরকারকে এই ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গ বাংলো, রাজ্য কমিশন সেই দিক হইতে সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছেন এবং ভারত সরকারও কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে সেই দিক হইতে নিজেদের মত মিলাইয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমিশন কিংবা ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কিত বিচার এবং সিদ্ধান্ত সংগত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইয়া এমন কথা বলিবার মত জোর অবশ্য আমাদের নাই। অভিযোগের কারণ আমাদের নিশ্চয়ই আছে; আমাদের সম্বন্ধে অবিচার হইয়াছে, এমন কথা আমরা বলিবই। তথাপি এই সম্পর্কে নিছক প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়াতে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে বিপদ আছে, ইহা আমরা বুঝি এবং সেই আশঙ্কা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া কাজ করিবার মত বুদ্ধির স্থৈর্যও আমরা হারাই নাই। বিহারের নেতাদের বুদ্ধির স্পষ্টতঃ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। প্রাদেশিকতার মোহে তাঁহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন। এই মনোবিকারের চূড়ান্ত রকমে প্রতিকার করাই বর্তমানে প্রয়োজন। ভারত সর-কারকে তাঁহাদের মনের কোণের গোপন হইতে সকল দ্বিধা দূর করিয়া এই কাজ করিতে হইবে।

জীবন না মৃত্যু

সভ্যতা ও অসভ্যতার নিরিখ কি? বিশ্ব-রাষ্ট্র পরিষদে ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপে শ্রী ভি কে মেনন সম্প্রতি ইহার একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে সভ্য যাহারা তাহারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া কাজ করে। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞার যৌক্তিকতা আমরাও স্বীকার করি। নির্দিষ্ট এই অগ্রগতির সাধনাই সংস্কৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃহতের স্বার্থের এই সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হইয়া জগতের সমুন্নতিসাধন করিয়া থাকে। পরমাণু শক্তির উদ্ভাবন এবং তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি বর্তমান বৈজ্ঞানিক সাধনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। কিন্তু এই আবিষ্কৃতি কোন লক্ষ্যে জগতের শক্তিনিচয়কে লইয়া চলিয়াছে এবং তাহা জগৎ সভ্যতার অনুকূল কি প্রতিকূল এই প্রশ্ন বর্তমান মানব-সমাজের নিকট বড় হইয়া জাগিয়াছে। শ্রী মেনন পরমাণবিক অস্ত্রের বিশ্ববিধ্বংসী বিভীষিকা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাক্ষাৎ সম্পর্কে যুদ্ধে প্রযুক্ত না হইলেও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাই বিশ্বকে তামসিক-ভাবে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে এবং ইতোমধ্যে সেই ধ্বংসলীলার কাজ শুরু হইয়াছে। পরীক্ষা জলে হোক, কিংবা স্থলে হোক, বায়ুর গতি সর্বত্র। বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া সর্বত্র সংক্রমিত হইতেছে। জাপানে ইহার অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। আমরাও এই বিপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহি। শ্রী মেনন সে কথাও বলিয়াছেন। কলিকাতার খাদ্যদ্রব্য এবং সবজিতে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া সংক্রমিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উদ্ঘাটিত এই সত্য তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। জগতের সভ্যতাভিমানী শক্তিসমূহের পক্ষে এই তথ্য অবিজ্ঞাত নহে। কিন্তু পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকট মোহে বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রম-বর্ধমান আগ্রহের আমরা পরিচয় পাইতেছি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও বসিয়া নাই, তাঁহারাও আগামী বৎসরে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-সাধনে প্রস্তুত হইতেছেন। সোভি-য়েট সরকারের মনোভাব সম্বন্ধে ইঁহারা সকলেই সন্দিহান। এই সন্দেহ পার-মাণবিক অস্ত্রসাধনার পাকচক্রই জটিল

করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভারতই বিশ্ব-শান্তির এক লক্ষ্যে তাহার নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান স্বীকৃত হওয়ার উপরই জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয়কে এই দিক হইতে যুগান্তকারী ব্যাপার বলা যায়।

মানবতার আবেদন

কয়েকদিন পূর্বে শহরের নীলরতন সরকার হাসপাতাল হইতে একটি রোগী নিরুদ্দিষ্ট হন। ৪৮ ঘণ্টা পরে হাসপাতাল সংলগ্ন পুকুরে তাঁহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জলে ডুবিয়া লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া করোনার রায় দিয়াছেন। জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মানুষ মরে, সুতরাং ব্যাপারটিতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই; কিন্তু কতকগুলি কারণে এই রোগীর মৃত্যু জনসাধারণের মনে যুগপৎ বেদনা এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। জানা যায়, রোগীটি যে শয্যা ত্যাগ করিয়া যায় এবং সে ফিরিয়া আসে নাই, নার্সকে এ কথা অন্যান্য রোগীরা জানাইয়াছিল এবং নার্সও টেলিফোন যোগে এই তথ্য ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে জানায়। চিকিৎসক আসিয়া নার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু দুই-জনের একজনও পুলিসকে এই সংবাদ জানান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পরদিন সকালে রোগীর স্ত্রী হাসপাতালে ছুটিয়া আসেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি সমবেদনা বা সহানুভূতি দেখাইতে কেহই আগাইয়া যায় নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার আবেদন-নিবেদন নিতান্ত রূঢ়তার সহিত এবং নির্মমভাবে উপেক্ষিত হয়। নীলরতন সরকার হাসপাতালে পুকুরে ডুবিয়া রোগীর মৃত্যু ইতোপূর্বেও ঘটিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিকারের কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এমন কি, এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা যাহাতে না ঘটে, সেজন্য সামান্যরূপ সতর্কতার ব্যবস্থাও করা হয় নাই। শুনা যাইতেছে, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক এই ঘটনার পর পুকুরটি ভরাট করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু পুকুরটি ভরাট করিলে এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। প্রকৃতপক্ষে রোগীদের সম্বন্ধে হাসপাতালসমূহের কর্তৃপক্ষের তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার মনোভাব যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, হাসপাতালসমূহের কক্ষ হইতে বিপন্ন মানবের বেদনা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করিয়া বাহিরে প্রবাহিত হইবে এবং আমাদের মনুষ্যত্বকে ধিক্কৃত করিবে।

সিমেণ্টের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ বিলটির সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইবে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে সিমেণ্টের কারখানা প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু যে সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, আপাতত তাহার সমাধানের কোন আশা রাজ্য সরকার আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিমেণ্ট ক্রয়ের পারমিট কাহার ভাগ্যে জুটিবে, এই সম্বন্ধে সরকারের বণ্টন ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট নয়। চোরাবাজারে বেশী দাম দিলে সিমেণ্ট যোগাড় করা আদৌ কঠিন নয়। সিমেণ্টের বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে দুর্নীতির এই যে প্রভাব চলিতেছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিকার করা রাজ্য সরকারের পক্ষে কর্তব্য এবং যাহারা একান্ত অভাবগ্রস্ত শুধু তাহারাই যাহাতে পারমিট পায় এই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

গতি কোন দিকে

জাতীয়তাবাদ আদর্শস্বরূপে বর্তমানে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহা ভাল, কি মন্দ গভীরভাবে বিবেচনার বিষয়। বস্তুত ইউরোপের জাতীয়তাবাদ পররাজ্য গ্রাসের পথে পরপীড়ন এবং শোষণের প্রচণ্ড লালসায় একদিন বিশ্ব-জগৎ উত্তপ্ত করিয়া তোলে। বৈজ্ঞানিক সাধনার অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক আপেক্ষিকতা একান্ত হইয়া পড়াতে ইউরোপীয় জাতীয়তবাদের সে মূর্তি আজ পরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার স্বরূপ-ধর্ম ঠিকই আছে। শক্তিগোষ্ঠীর মতবাদের ভিতর দিয়া জাতীয়তাবাদের সেই পাশবিক প্রকৃতি বর্তমানে গতি খুঁজিতেছে। যে জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর দলে না ভিড়িবে, আজ সে দুর্বল দুর্নীতি প্রভাবিত ইত্যাদি যত কিছু। কিন্তু যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে, পরের ইচ্ছায় চলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মশক্তি হারাইলে কোন জাতি বাঁচে না। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী সম্প্রতি এই দিকে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। মুন্সীজী লিখিয়াছেন, আমরা কি গীতা অধ্যয়ন করি এবং জীবনকে গীতার আদর্শে গড়িতে চেষ্টা করি? যদি আপনারা তাহা না করিয়া থাকেন, তবে আপনারা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন, ভাল ব্যবহারজীব হইতে পারেন, বড় রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক হওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু মানুষ হিসাবে আপনার জীবন বিফল হইবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ গীতোক্ত মানবধর্মেই বিধৃত রহিয়াছে। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ বিশ্বকে পর করিয়া দেখিয়াছে। ভারতের জাতীয়তাবাদ মৈত্রীর মধ্যে জীবনের সার্থকতার সন্ধান পাইয়াছে। বৈদেশিক মতবাদের ভ্রান্ত মোহে পড়িয়া ভারতীয় সংস্কৃতির এই আদর্শ সম্বন্ধে আমরা যদি শ্রদ্ধাবুদ্ধি হারাই, তবে আমাদের জীবনের মূলে সমষ্টি চেতনার প্রেরণা খেলিবে না—ইহার ফলে স্রোতের শেওলার মত আমাদিগকে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

উৎকট মতিগতি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বিধানসভায় লাভখোর এবং মজুতদারদের দমন করিবার পক্ষে রাজ্য সরকারের দিক হইতে অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের উক্তি অনুসারে ইহাই বোঝা যায় যে, রাজ্য সরকার মজুতদার এবং চোরাকারবারীদের মাল আটক এবং বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট বিধিসঙ্গত ক্ষমতা লাভের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই কার্যের যৌক্তিকতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাহারা সমাজদ্রোহী আচরণে দেশের অশেষবিধ দুর্দশার কারণ ঘটাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে শাসকদের মনের কোণে কোন প্রকারে দরদের ভাব থাকিবে, ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ মতিগতির কারণ কি দেশের লোককে তাহা তাঁহাদের জানাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু চোরাকারবারী এবং মজুতদারদের দলনের জন্য রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা রহিয়াছে, সেগুলিই তাঁহারা যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করিতেছেন কি না এই প্রশ্ন উঠিবে। সমাজবিরোধী অপরাধ দমনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে বিধি বলবৎ আছে, তাহাতে অবশ্য মজুত মাল আটক করিবার অধিকার কর্তৃপক্ষের নাই। কিন্তু তাঁহারা অপরাধীকে গ্রেপ্তার এবং আটক করিতে পারেন। রাজ্য সরকার চোরাকারবারী এবং মজুতদারী দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন আমরা এই কথা উপদেষ্টাদের মুখে হামেশাই শুনিতে পাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চোরাবাজারী এবং মজুতদারী ব্যবসা সমাজজীবন হইতে দূর হইতেছে না, উহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্সের পরে শ্রী নেহরু কয়েকদিন আয়ারল্যাণ্ডে কাটিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে গিয়েছিলেন। অতঃপর যুগোশ্লাভিয়া। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়াতে এসে গেছেন। সেখানে মার্শাল টিটো, প্রেসিডেণ্ট নাসের ও শ্রী নেহরুর মধ্যে সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনা হবে। সম্প্রতি মার্শাল টিটো সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। পণ্ডিত নেহরুর আমেরিকাযাত্রা স্থগিত না হলে টিটো-নাসের-নেহরু কনফারেন্সটা আরো 'ইণ্টারেস্টিং' হতো কারণ তাহলে যেমন মার্শাল টিটো সোভিয়েট মুলুকে তাঁর সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেতন তেমনি নেহরুজী মার্কিন মুলুকের বর্তমান আবহাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত আস্বাদনের কথা বলতে পারতেন। যাই হোক আমেরিকা যাওয়া স্থগিত হওয়াতে নেহরুজী আয়ারল্যাণ্ডে তিনচারদিন 'ছুটি' উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন।

যুগোশ্লাভিয়াতে টিটো-নাসের-নেহরু মিলনের 'আন্তর্জাতিক গুরুত্ব' সম্বন্ধে অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেহরুজীর এবারকার বিদেশ ভ্রমণের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে (অথবা হওয়া উচিত) জার্মানী পরিদর্শন। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরভ্যুদয় জগতে একটা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধে জার্মানরা কেবল হারে নি, জার্মানী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের ফলে এমন ধ্বংসলীলা কচিৎ কোনো দেশের ভাগ্যে ঘটেছে, পরাজয়ের এমন শাস্তি কচিৎ কোনো দেশকে পেতে হয়েছে। জার্মানীর শহরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কলকারখানার ভগ্নাবশেষ যা ছিল তারও বেশির ভাগ বিজেতারা ক্ষতিপূরণের নামে খুলে নিয়ে গেল। বাড়িঘরদোরের বোধহয় শতকরা ৮০ ভাগ সম্পূর্ণ অথবা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। Oder এবং Neisse নদীর পূর্বে এবং দক্ষিণে জার্মান বলে আর কিছু থাকল না, লক্ষ লক্ষ জার্মানকে ভিটে-মাটি ছাড়া করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তার উপর সঙ্কুচিত জার্মানী হলো দ্বিধাবিভক্ত। জার্মানীর বুকের উপর একদিকে বিজয়ী রাশিয়ার সৈন্য এবং অন্যদিকে বিজয়ী ইংগ-মার্কিন-ফরাসী সৈন্য চেপে বসে থাকল, তার খরচাও জার্মানদের বইতে হলো।

এই জার্মানরাই আবার যুদ্ধ শেষ হবার দশ বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রবলতম জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রা 'মার্কের' সম্মান আর পৃথিবীর বাজারে মার্কিন 'ডলারের' সমান হয়ে উঠেছে, তার কাছে আজ বৃটিশ 'স্টার্লিং' হীনপ্রভ। জার্মানদের রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেবল বিস্মিত নয়, দস্তুরমতো ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। জার্মানরা তথাকথিত 'under developed' দেশগুলিতে বড়ো বড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কণ্ট্রাক্ট পাচ্ছে। ভারতে রৌরকেলার ইস্পাত কারখানা জার্মানরা তৈরী করে দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক বড়ো বড়ো ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের কণ্ট্রাক্ট জার্মানরা পেয়েছে এবং পাচ্ছে। রাশিয়ানরা যেমন ভারতে একটা টেকনিক্যাল শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান খুলেছে তেমনি পশ্চিম জার্মানী থেকেও ভারতে একটা টেকনিক্যাল শিক্ষায়তন খোলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তাছাড়া ভারতীয় শিক্ষার্থীদের পশ্চিম জার্মানীতে টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

তবুও এখনো জার্মানদের নিজেদের অনেক বেদনাকর জাতীয় সমস্যা অমীমাংসিত। আগেকার জার্মানীর এক তৃতীয়াংশ তো বাইরে চলে গেছেই, বাকী জার্মানীও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং এই বিভাগ কবে কীভাবে দূর হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার উপর জার্মানীর উভয় অংশেই বিদেশী সৈন্য এখনো চেপে বসে আছে। এসব সত্ত্বেও জার্মানরা নিজেদের অবস্থার যে আশ্চর্যকর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তাতে যেমন জার্মান জাতির অন্তর্নিহিত অদম্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় তাদের অদ্ভুত কর্মনিষ্ঠার পরিচয়। চরমতম দুর্ভাগ্যের আঘাতও জার্মান জাতির আত্মশক্তিকে নষ্ট করতে পারে নি।

জার্মানদের এই পুনরভ্যুদয় ভস্মীভূতের পুনরাগমনের মতো মনে হয়। এটা কেবল

'টেকনিক্যাল' জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তার পিছনে আরো বেশি দরকারী কিছু ছিল—অসীম ধৈর্য, দাঁতে দাঁত চেপে অশেষ দুর্গতির মধ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার শক্তি এবং কোনো কাজকে হীন-কাজ মনে না করার নৈতিক বল। তাই জার্মানীতে দেখা গেছে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিদেশে আরামের চাকরির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশের পুনরুত্থানের জন্য আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে দরজাজানালাবিহীন ভাঙ্গাবাড়িতে দিবারাত্র খেটে আবার শুরু থেকে ল্যাবরেটরী গড়ে তুলেছেন। নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত মনীষী গবেষণার কাজের ফাঁকে ঘর ঝাঁট দিয়েছেন। কেরানী, কারিগর, মজুর অফিস কারখানার কাজ করে এসে দিনান্তে নিজের বাড়ি তৈরী করতে লেগেছেন বা অপরের বাড়ি তৈরী করতে খেটেছেন। আগে বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরী হোক, বিদেশ থেকে দামী দামী যন্ত্রপাতি এনে ল্যাবরেটরী সাজানো হোক, তারপর বিজ্ঞানের কাজ আরম্ভ হবে—এরকম হয়নি। শিল্পের উৎপাদন ও বড়ো বাড়ি এবং ঝকঝকে আসবাবপত্রের জন্য অপেক্ষা করে নি। এসবও ক্রমশ হয়েছে কিন্তু সে কেমনভাবে হয়েছে যেমন গাছের মধ্যে যদি প্রাণের সঞ্চার থাকে তাহলে যেমন তার দেহ পত্রে পল্লবে আপনি সুশোভিত হয়ে ওঠে তেমনিভাবে হয়েছে। এর উল্টোটি আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। সেটা হয় যেমন কাগজ বা আর কিছু দিয়ে কৃত্রিম গাছ তৈরী করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। খৃষ্টান গোরস্থানে ঢুকলে যেমন চারিদিকে কবরের উপর ক্রশ চিহ্ন চোখে পড়ে তেমনি ভারতের 'পাবলিক সার্ভিস' অসংখ্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, আণ্ডার-সেক্রেটারী, ডেপুটি-সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, এডিশনাল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, ডিরেক্টর জেনারেলে ছাওয়া। এঁদের তলায় খুঁড়লে—মানুষের হাড় পাওয়া যাবে বল্লে বড়ো কঠিন শোনাবে সেইজন্য একটু মোলায়েম করে বলছি—কেবল ফাইল পাওয়া যাবে। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে কিছু হবার নয়। পণ্ডিত নেহরু জার্মানী থেকে 'টেকনিক্যাল এইডের' উপহার কী নিয়ে আসেন বা না নিয়ে আসেন তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এহ বাহ্য। 'অনগ্রসর' দেশগুলিকে ঐ জিনিসটা দেবার জন্য চারদিকে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি বাইরে থেকে কেউ দিতে পারে না। তবে সেটি কী তা জার্মানীকে দেখলে কিছুটা বুঝা যায়। সেইজন্য জার্মানীকে দেখার একটা সার্থকতা আছে। জার্মানী অনেক ভুল করেছে, ভুলের ফসল উপড়াতে একাধিকবার জাতির বুকের এক এক পাল্লা চামড়া তুলে ফেলতে হয়েছে, তবুও তার প্রাণ পরাজয় মানে নি।

স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী জার্মানীতে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আর এক-জনের কথাও মনে পড়ছে, যিনি পনেরো বছর আগে পরাধীনতার বেদনায় অস্থির হয়ে অসীম বিপদ মৃত্যুভয় সমস্ত তুচ্ছ করে জার্মানীতে গিয়েছিলেন। হিটলারের গভর্নমেণ্ট নিজের স্বার্থেই সুভাষবাবুকে সহায়তা দিয়েছিল সন্দেহ নাই। ১৯১৭ সালে লেনিন যে ট্রেনে করে রাশিয়ায় ঢুকেছিলেন সেই বিখ্যাত 'Sealed train'ও কাইজারের সেনাপতিরাই জুগিয়ে-ছিলেন। বর্মার অংসানের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়ের পাতাগুলি টোকিওর সহযোগিতার দ্বারা গ্রথিত ছিল। থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বিপুলসংগ্রাম যিনি কিছুদিন পরেই ভারত সরকারের সম্মানিত অতিথি হয়ে ভারত ভ্রমণে আসছেন তিনি গত যুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে 'কোলাবরেট' করেছিলেন। পিকিং সরকার গোয়া সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের দাবী সমর্থন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আবার বর্তমান পিকিং-এর শত্রু চিয়াং কাইশেক যখন চীনের কর্তা ছিলেন তখন তিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য তাগিদ দিয়ে দিয়ে চার্চিল সাহেবের বিরক্তি-ভাজন হয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম মহাসাধক হিসাবে সুভাষবাবুর স্থান আজ ভারতের অভ্যন্তরে স্বীকৃত। ভারত সরকারও এবিষয়ে জনচিত্তের প্রত্যয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু ভারতের বাইরে গেলে আমাদের কর্তারা সুভাষবাবু সম্বন্ধে নীরব হয়ে যান অথবা আমতা আমতা করেন। এই দৌর্বল্য—আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে—এই কাপুরুষতা কেন? হিটলারের উদ্দেশ্য যাই থাক সুভাষবাবু যে জার্মানীর কাছে থেকে সহায়তা পেয়েছিলেন তার জন্য ভারতবর্ষের কি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধের কারণ নেই? হিটলার সরকারের কথা বাদ দিলাম। সুভাষবাবু জার্মানীতে অনেক বে-সরকারী জার্মানের শ্রদ্ধা ও সহায়তা লাভ করে-ছিলেন যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বন্ধু ছিলেন, যাঁরা চাইতেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। বহু জার্মান নিঃস্বার্থভাবে সুভাষ-বাবুর কর্মের সহায়ক ছিলেন। হিটলার-নীতির সঙ্গে না জড়িয়েও সেই সমস্ত ভারতহিতৈষী জার্মানদের প্রতি ভারতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব ছিল না, অশোভনও হতো না। বরঞ্চ সেটা তাঁর কর্তব্য ছিল। হয়ত জার্মানীতে সুভাষ-বাবুকে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সহায়তাদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অল্প লোকই এখন জীবিত আছেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকুন বা না থাকুন তাঁদের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধার ঋণ অনস্বীকার্য।

এইসব কথা লিখতে লিখতে মনে একটা চিন্তা এলো। ভারত সরকারের মুখপাত্র-গণ পৃথিবীময় 'co-existence'-এর মহিমা কীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরে রাজনীতিতে যদি বড়ো-গোছের 'co-existence'-এর একটা বড়ো গোছের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এঁরা কী করবেন কে জানে! ধরুন সত্যই যদি সুভাষ-বাবু বেঁচে থেকে ভারতবর্ষে আজ উপস্থিত হতেন তাহলে দেশের আভ্যন্তর রাজ-নীতিতে কর্তারা 'co-existence' নীতির সম্মান রাখতে কতটা উৎসাহী হতেন সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগে। ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে 'co-exist' করতে ব্যগ্র কিন্তু ভারতের ভিতরে অদ্যকারদিনে সুভাষবাবু ও নেহরুজী কি 'co-exist' করতে পারতেন।

১৭।৭।৫৬

তিলকের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২০ সালের ২৩শে জুলাই তিলকের ৬৪ বছর পূর্ণ হয়। ভারতের নানা প্রদেশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। লোকমান্য তখন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। সহসা তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং ১লা আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে এই শেষ কথা বলে গিয়েছিলেন যে, "স্বাধীনতা ব্যতীত ভারতের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের অস্তিত্বের জন্য, প্রাণধারণের জন্য স্বাধীনতা চাইই।" তাঁর পিছনে পড়ে রইল তাঁর দেশবাসীকে "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার দীর্ঘ চল্লিশ বছরব্যাপী একাগ্র তপস্যা ও ধ্যান।

ঐ ১লা আগস্ট গান্ধী ভারতজোড়া অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন ঠিক ছিল কিন্তু তিলকের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি বম্বেতে চলে যান। তিলকের বাসভবনে তাঁর প্রাণহীন দেহের প্রতি শেষ-দৃষ্টিপাত করার জন্য গান্ধী রাতে সর্দার গৃহে গিয়েছিলেন, তারপর অগণিত জনসাধারণের সংগে মিশে তাঁর শবদেহ নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। যখন গান্ধী শবাধারের একটি দিক তুলতে যাচ্ছিলেন তখন একজন সনাতনী হিন্দু তাঁকে বাধা দিয়েছিল কারণ গান্ধী অব্রাহ্মণ। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে "জাতীয় নেতার কোন জাত নেই" বলে গান্ধী শবাধারটি তুলে ধরেন; ততক্ষণে অপর প্রান্তে সৌকত আলি কাঁধ দিয়ে চলেছিলেন।

১৮৯৬ সালে তিলকের সংগে গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুরবস্থার সুবিচার কামনা করে গান্ধী তখন বহু নেতার শরণ নিয়েছিলেন। তিলক গান্ধীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা আমার কাছে নিঃসংকোচে এসো, আমি যতটা পারি সাহায্য করব।" তাঁর হৃদয়ের এই সাগরোপম বিশালতা গান্ধীকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিলকের প্রাণ দেশবাসীর দুঃখে এত কাতর বলেই যে তিনি "লোকমান্য" হয়েছিলেন তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর ১৯০১ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী তিলকের সংগে রিপন কলেজের এক অংশে আশ্রয় পেয়েছিলেন। গান্ধী বলেছিলেন যে, "আমি ভাল চিত্রকর হলে তাঁর উচ্চহাস্যমুখর সদালাপী চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতুম। তিনি যেন সব সময় দরবার করছেন, নিজে বিছানায় বসে থাকতেন আর তাঁর চারপাশে অগণিত মানুষ তাঁকে ঘিরে পরামর্শ নিত, আলাপ করত। সরকারের জুলুমের কথা নিয়ে তিনি ঠাট্টাও করতেন।"

তিলকের আকস্মিক মৃত্যুতে গান্ধী বড় অসহায় বোধ করেছিলেন, একটি ক্লান্তিকর

বালগংগাধর তিলক

শূন্যতা তাঁর মনকে ছেয়ে থাকত। বলতেন, "আমার শ্রেষ্ঠ দুর্গ আজ ভেঙে পড়েছে। লোকমান্যের মতো এমন দৃঢ়তা সহকারে আর একাগ্র নিষ্ঠায় কেউ স্বরাজের মন্ত্র প্রচার করেন নি। তাঁর সাহস ছিল অবিচল। গণতন্ত্রের এই সহজ ভক্তটি আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচারের পরম শত্রু ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে তিনি সরকারকে রেয়াৎ করেন নি। অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররা তিলককে নবভারত রচনার পুরোধা বলেই জানবে। আমাদের জীবনের সংগে তাঁর বীর্য, তাঁর অনাড়ম্বর জীবনধারা, তাঁর অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ও দেশপ্রেম মিশিয়ে দিতে পারলেই আমরা ভারতের একমেবাদ্বিতীয় লোকমান্যের অক্ষয় স্মৃতি গড়ে তুলতে পারব।"

গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ। তাঁর অন্য বহু সহকর্মীর মৃত্যুতেই তিনি তাদের গুণকীর্তন করে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন কিন্তু তিলকের জন্য তাঁর অন্তরের আকুতি প্রকাশ করে তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন।

অথচ তিলকের সংগে তাঁর মতের পার্থক্য ছিল। রাজভক্তি দেখালে যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হবে এই আশায় তাঁরা দুজনেই ১৯১৪ সালের যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীর ছিল অকুণ্ঠ সহযোগ আর তিলকের শর্ত ছিল যদি সরকার ভারতীয় সৈন্যদলের সনন্দওলা কর্মচারীর পদ দেওয়া হয় তো মহারাষ্ট্র থেকেই ৫০০০ লোক জোগাড় করে দেবেন। তারপর যে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার প্রচলনের কথা উঠে তিলক তার বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্রিপস্‌ সাহেবের আনা প্রস্তাবের মতোই এটা যে ফাঁকা বুলি, সত্যি স্বায়ত্তশাসনের

অধিকার মঞ্জুর করা সনদ নয় তা তিলক বুঝেছিলেন। তিনি আইনসভায় ঢুকে এ-সব কুব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন আর গান্ধী চেয়েছিলেন যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে। খিলাফৎ আন্দোলনেও তিলক সরাসরি যোগ দিতে চান নি; মুসলমানেরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর তাতে সায় দিতে রাজী ছিলেন। তখন খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের বিহিত দাবী করাই গান্ধীর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। গান্ধী এক পত্রে তিলককে লিখেছিলেন, "আমি যে ধারায় লড়তে চাই আপনি তা পছন্দ করেন না তা আমি জানি। সত্যাগ্রহকেও আপনি দুর্বলের অস্ত্র বলে মনে করেন।"

এ সব আপাতবিরোধ সত্ত্বেও তিলকের সঙ্গে তাঁর যে একটি নিবিড় স্নেহ সম্পর্ক আছে এটা কেন গান্ধীর মনে হ'তো? কেন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, "আমরা ভিন্ন মত পোষণ করলেও; একে অন্যকে কখনও ভুল বুঝব না, আমাদের মধ্যে কলহের তিক্ততা দেখা দেবে না।" তিলক গান্ধীকে যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনই ভালবাসতেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিলক গান্ধীকে প্রশ্রয় দিয়ে, তাঁর প্রতি আবদার অভিমান জানিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার অসহযোগ আন্দোলনে কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করব না। লোকে তোমার পথে চলতে পারবে কি না সন্দেহ—যদি তারা তোমার অনুসরণ করে তো আমিও তোমারই এটা নিশ্চয় জেনো"; "গান্ধী যাতে সই দেবে আমিও তাতে সায় দেব", "কতকগুলো ব্যাপারে তার আমার চেয়ে বেশী জ্ঞান আছে মনে করি"; "আমি যখন ইংলণ্ডে (১৯১৯এ) তখন গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল বলে আমি বড় চটে গেছি। আমি তখন বম্বেতে থাকলে তার দুঃখজ্বালায় ভাগ নিতে পারতুম।"

তিলকের মৃত্যুর দু'বছর পরে গান্ধীর ভাগ্যে ভারতে প্রথম জেলভোগের পরোয়ানা আসে। তিনিও তিলকের মতো বক্তৃতা দিয়ে আর নিজের চালানো কাগজে প্রবন্ধ লিখে দেশের মানুষদের স্বাবলম্বী স্বরাট স্বাধীন হতে বলতেন। ঠিক এই একই অপরাধে ১৮৯৬ সালে তিলককে প্রথম কারাবরণ করতে হয়েছিল। মহাত্মার মতো মাননীয় মানুষকে আইনত রাজদ্রোহীরূপে সাজা দিতে বাধ্য হলেও মানুষ হিসেবে জজ সাহেবের বিবেকে বাধছিল তাই তিনি সাফাই গেয়ে গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে অন্য এক দেশপ্রেমীর ক্ষেত্রেও এমনই ছ বছর কয়েদ খাটার বিধান দিয়েছিল রাজার আইন। গান্ধীও সোৎসাহে সায় দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তিলকের অনুরূপ রাজদ্রোহী রূপে, আমার সঙ্গে তিলকের নাম জড়িয়ে রায় দেওয়া হয়েছে বলে আমি বড় গর্ব বোধ করছি। এ যে আমার মহাসম্মান।"

মুক্তি পাওয়ার পর গান্ধী দেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে লম্বা সফর করেছিলেন। সকলকে নিজ শ্রমে নিজের অন্ন জোগাড় করতে পরামর্শ দিতেন আর চরকা কাটাই যে তার সুষ্ঠু সর্বজনসাধ্য সাধন এইটি বোঝাতে চাইতেন। তিলকের জন্মস্থান রত্নাগিরিতে বক্তৃতায় বলেছিলেন, "তিলকের জন্মস্থান শুধু আমার কেন সকল ভারতবাসীর কাছেই পুণ্যতীর্থ বিশেষ। আমি বিশ্বাস করি স্বরাজ যে কেবল আমাদের জন্মগত অধিকার তা নয়, সে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে। যে স্বরাজ লোকমান্যের স্বপ্ন ছিল তা কেবল রত্নাগিরিবাসীদের স্বতন্ত্ররাজ নয়, তা হচ্ছে সারা ভারতের স্বাধীনতা, দেশের ধনী দরিদ্র সবার মুক্তি। গরীবরা যদি পেট ভরে খেতে পায় তো স্বরাজ তাদের কাছে মরীচিকা মাত্র। আমি লোকমান্যের বাণী অনুধাবন করেছি, তার সঙ্গে আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতা যোগ করে এটা বুঝেছি যে খাদির প্রচারও তাঁর বাণীর অঙ্গস্বরূপ। সবাইকে ডাক দিয়ে বলছি যে, যদি তোমরা তাঁর চিত্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর নির্দিষ্ট কর্মধারা, আর দীনদুঃখীর জন্য তাঁর প্রাণের উপচে-পড়া ভালোবাসার কণামাত্রও আয়ত্ত করতে পারো তবেই তাঁর নাম নিয়ে লোকমান্য কী জয় বলার অধিকারী হবে, নচেৎ তাঁর নাম না করাই বিধেয়।"

বর্মাতেও তিনি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল খাদি কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। তিলকের মৃত্যুর পর তিন সপ্তাহের মেয়াদে অন্য নেতাদের সাহায্যে গান্ধী তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা চাঁদা তুলেছিলেন। সে টাকারও অধিকাংশ খাদি প্রচার ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য ব্যয় করেছিলেন। বর্মার মান্ডালে ত্যাগ করার সময় তাঁর মনে পড়েছিল "এই সেই মান্ডালে যেখানে ভারতের সুসন্তান তিলক নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে ব্রিটিশ রাজ ভারতকেও কবর দিয়ে রেখেছিল। তিনিই ভারতকে স্বরাজের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। মান্ডালে আমাদের কাছে পূত স্থান, মান্ডালের মধ্য দিয়েই স্বরাজের পথ চলে গিয়েছে।"

গান্ধী তিলককে নিজের রাজনৈতিক শিক্ষার গুরু বলে মানতেন না অথচ বলতেন, "আমি লোকমান্যের উত্তরাধিকারী। তিনি যে পৈত্রিক ধনে আমাকে ধনী করে গেছেন আমি যদি তাতে কিছু যোগ না দিই তো যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হতে পারব না। তিনি বুঝিয়ে গেছেন যে, আমরা ভক্ত, জ্ঞানী যাই হই না কেন, কর্মই আমাদের একমাত্র পথ; আত্মসুখের জন্য কর্ম নয়, সর্বহিতায় কর্ম। তিনি শিখিয়েছেন স্বাধীনতা যদি জন্মগত অধিকার হয় তো পরের সেবা করাই হচ্ছে সে অধিকার অর্জন করার চাবিকাঠি। আমি তাঁকে তাঁর অজেয় মনোবল, প্রগাঢ় জ্ঞানবিদ্যা, দেশপ্রেম এবং সর্বোপরি নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য শ্রদ্ধা করি। আমার তাঁর মতো বিদ্যা, সঙ্ঘগড়ার শক্তি বা ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই তবু আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে, আমি তাঁর অতি নিষ্ঠাবান অনুগত ভক্তের মতোই যথাযথভাবে তাঁর বাণী তাঁর দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। স্বরাজ লাভ ব্যতীত আর কোনও যোগ্য উপায়েই যিনি স্বরাজের সারসত্যে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা সম্ভব নয়।"

॥ কমনওয়েলথ ও নেহরু ॥

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

লণ্ডনে নেহরু আসছেন কমনওয়েলথ কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করতে। গত বছরও তিনি এই সময়ে এসেছিলেন। রাশিয়া এবং পূর্ব ইয়োরোপ ঘুরে দেশে ফেরার পথে লণ্ডনে পা দেন, বিলেতের প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনি ইডেনের আমন্ত্রণে। রাশিয়ায় নেহরু যে শ্রদ্ধা ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ আন্তরিকতা পেয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। ইংরেজরা তা ভালো চোখে দেখেনি। আসলে গাত্রদাহ হয়েছিল, একজন কালা আদমির এত সম্মান দেখে। অধিকাংশ সংবাদপত্র সেই সুরে সুর মিলিয়ে শুরু করেছিল কটূক্তি। পাতা ভর্তি করেছিল নেহরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আর ভারতের বদনামে। সেদিন ভালো লাগেনি নিন্দাবাদ। আজ মনে হচ্ছে, এমন নীরবতার চেয়ে সেও ভালো ছিল।

নেহরুর মত বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বিলেতে পদার্পণ করলেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। লোকে জানতেই পেলো না। সে খবর প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে বেরোন ত দূরের কথা, অনেকে তার উল্লেখই করল না। কোন কোন কাগজে ভেতরের পাতায় বেরোল ছোট্ট দু লাইন। ভাবছিলাম এরা হঠাৎ এমন নির্বিকার হয়ে গেল কেন।

একে একে অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরাও আসতে লাগলেন। অবশ্য নেহরুর আগে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেন্‌জিস। উদ্দেশ্য, এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা দেখবেন। অবসর সময়ে আলোচনা চালাবেন, ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কি না।

এবার দুজন নবাগত আসছেন। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্ট্রিডম। বিলেতের হ্যারোতেই বন্দরনায়কের উচ্চশিক্ষার হাতেখড়ি। স্যার এণ্টনি ইডেন তাঁর সহপাঠী। ইডেন তখন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ও একদিন সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হবে। আর বন্দরনায়ক বলেছিলেন ইডেনটা হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ায়। আনন্দ দেয় বটে, তার চেয়ে বেশী ব্যাঘাত সৃষ্টি করে পড়াশোনায়।

এখনও সে রাগ আছে কিনা জানা যায়নি তবে বৃটেনের প্রতি যে বেশী অনুরাগ নেই সেকথা সর্বজনবিদিত। তিনি সিংহলকে গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করবেন, কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতেও পারেন। সে দুটো বড় কথা নয়। যেদিন ইচ্ছে করা যায়। সবার বড় কথা ত্রিকোণমালী ও কার্টুনায়েকে ইংরেজরা যে সামরিক ঘাঁটি গেড়েছে, সেখান থেকে ওদের লোটাকম্বল গোটাতে বাধ্য করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিডমও তেমনি আত্মসচেতন। সাদার প্রভুত্বে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। রঙ সাদা, সেই গর্বে বুক ফুলিয়েই তিনি ক্ষান্ত নন, নিজেকে ইয়োরোপীয়ানদের অন্যতম ভাবেন। সম্মেলন শুরু হবার আগেই সাউথ আফ্রিকা ক্লাবে বক্তৃতা দিলেন। সুরে বেশ খানিকটা ঝাঁঝ। এমনকি আফ্রিকা থেকে নিগ্রোরা বিলেতে এসে সমানাধিকার পাচ্ছে, তাতেও তাঁর গাত্রদাহ। তাঁর মতে এ নাকি 'racial suicide'। শেষে ভয় দেখালেন এমনিভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে সাদার প্রভুত্ব না বিলুপ্ত হয়।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়েই কমনওয়েলথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। সবাই যদি বর্ণ-বৈষম্য দূর করার পক্ষে রায় দেয়, তিনি কমনওয়েলথ ছেড়ে আসবেন, এমন হুমকিও দিয়েছেন।

সাউথ আফ্রিকাকে আঁকড়ে ধরাই হয়ত উদ্দেশ্য। একটু প্রাধান্য দিয়ে যদি সন্তুষ্ট করা যায়। তাই মিঃ স্ট্রিডমের সেই ডিনার পার্টিতে দেওয়া বক্তৃতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদের মর্যাদা পেল মর্যাদাসম্পন্ন টাইমস পত্রিকায়। বিবিসিও বিশেষ প্রাধান্য দেয় ওই বক্তৃতার। ভারতকে খোঁচা দেবার সুযোগ সন্ধানে অনেক সময় এদেশে পাকিস্তানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাও সেদিন ধামাচাপা পড়ল। ভারতের ত কথাই ওঠে না।

একটু আশ্চর্য লাগছিল। লর্ড বিভার-ব্রুকের কাগজ 'ডেলি এক্সপ্রেস'-এর কি হল? যারা প্রতি কথায় জিগির তোলে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন বলে। সোসালিস্টরা ভারত সাম্রাজ্য হাতছাড়া করে দেশকে সর্বহারা করার পথে সোপান গড়ে দিয়েছে। ভারতে দুটো পটকা ফুটলে 'Nehru Riot in India' এই শিরোনামায় সংবাদ ছাপায়। ভারত রাজার মুকুট ছাপ দেওয়া টাকা বাতিল করে দেবে—এদের সংবাদ পড়ে মনে হল, ভারত বুঝিবা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

লণ্ডন বিমান ঘাঁটিতে শ্রী নেহরু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

ঘোষণা করল। তারাও কি ভাষাহারা হয়ে পড়ল?

না। এক্সপ্রেস এখনও জীবিত। একটু দেরী করেছে, তবে ভোলেনি। প্রবন্ধ ছাপাল 'Man with a Tiger in his baggage'। মানুষটি হলেন নেহরু, বাঘ হল জাতীয়তাবোধ অন্য কথায় দেশের ঐক্য। তারা লেখে, যে কয়জন প্রধানমন্ত্রী এসেছে তাদের মধ্যে কার দেশ সবচেয়ে সমস্যাসংকুল, কে চিন্তার ভারে জর্জরিত? পণ্ডিত নেহরু! কারণ (১) বোম্বাই, কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে; (২) দেশের প্রতি অঞ্চল ভারত থেকে বেরিয়ে আসার দাবী তুলেছে: (৩) নেহরুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে আফগানিস্থান কমিউনিস্ট করতলগত, ফলে রাশিয়া এবং চীনের কমিউনিস্ট ভীতি ভারতে প্রকট হয়ে উঠেছে; (৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

আরও লিখল, যে জাতীয়তার ধুয়ো দিয়ে ভারতের নেতারা সাধারণকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে, হিন্দী দিয়ে ইংরাজী ভাষাকে স্থানান্তরিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, সে এখন বাঘের রূপ গ্রহণ করেছে এবং আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সহানুভূতিও জানিয়েছে। অসহায় নেহরু কি করতে পারে! অহিংসার দূত গান্ধীর অগণিত স্মৃতিসৌধের যে-কোনো একটা পাদপীঠে গিয়ে বসতে পারে। শান্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে।

এবার 'ডেলি টেলিগ্রাফে'র পালা। আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হল তার পাতায়। হায়, স্বর্ণলংকার এ কি দশা! যে বৃটিশ সাম্রাজ্য সূর্য অস্ত যেত না, সে আজি শতধা!

Far called, our navies melt away,
On dune and deadland sinks the fire.

Lo, all our pomp of yesterday,
Is one with Nineveh and Tyre.

নিনেভে এবং টাইরে, এক যুগে শুধু মেসোপোটেমিয়ার শ্রেষ্ঠ শহর ছিল না, বিশ্বের ঈর্ষার ক্ষেত্র ছিল। সেও কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনেরও আজ অবসান হয়েছে!

প্রবন্ধে আরও লিখল, 'সেলফ্ ডিটারমিনেশন' আসলে সর্বনাশীর ডাক। ১৯১৮ সালে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রু উইলসন এই পদযুগল প্রবর্তন করেন। তাঁর সেক্রেটারী অফ স্টেট তখন সখেদে মন্তব্য করেছিলেন, এ পৃথিবীতে অকথা দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই দান করতে পারবে না। 'টেলিগ্রাফে'র মতে এই মন্তব্যই বুঝি পরম সত্য।

এ আক্ষেপ প্রতি ইংরেজের প্রাণে। তারা ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলে 'ইউনাইটেড কিংডম' কেটে 'কুইনডম' করা হোক। কলোনিয়েল অফিসকে বলে লস্ট প্রপার্টি অফিস। তারা ভুলেও কমনওয়েলথ অফ নেশনস বলে না, বলে বৃটিশ কমনওয়েলথ। বাস্তবে যাই হোক, মুখে এম্পায়ার কথাটা জুড়ে দিতে পারলে বুঝিবা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

অবশ্য অন্য তরফও আছে। 'টাইমস' লিখল, 'দি চেঞ্জিং কমনওয়েলথ'। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' কমনওয়েলথ সম্বন্ধে মিঃ কে এম পানিকরের লেখা চিন্তাশীল প্রবন্ধ ছাপায়। তিনি বলেন, পরিসর যত বিস্তৃত হবে, পুরোনো বাঁধন আল্গা করে দিতে হবে। প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে সত্যের বন্ধন বা ডিক্লারেশন অফ ফেইথ্।

দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাবের বিরুদ্ধেও গার্ডিয়ান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিবাদ জানায়। ডাক্তার মালানের রাজত্বকালে তিনি হুমকি দিতেন অসভ্য গোল্ড কোস্টকে সভ্য করলে সভা তাঁকে হারাবে। স্ট্রিডম অবশ্য সে জেদটা ছেড়েছেন। গার্ডিয়ান যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, গোল্ড কোস্টের মিঃ ঘানা কেন। নাইজিরিয়া, রোডেশিয়ান ফেডারেশন, মালয় এদের প্রতিনিধিদেরও যোগদান করবার অধিকার দেওয়া হোক। বাৎসরিক সম্মেলন বসুক দিল্লীতে ওটায়ায়।

কমনওয়েলথ কনফারেন্স হচ্ছে লণ্ডনে। ভারতের কাগজে প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে খবর বেরোচ্ছে। অথচ এখানকার কাগজে এক লাইনও বিবরণ নেই।

একটা মজার ব্যাপার নজরে পড়ল। নেহরু এবং নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হল্যাণ্ডকে 'ফ্রিডম অফ দি সিটি অফ লণ্ডন' সম্মানে ভূষিত করা হল। লণ্ডনের মেয়র স্বর্ণখচিত ধর্মযাজকের মত পোশাক পরে রূপোর বাক্সে ভরা মানপত্র দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তারপরই তাঁরা লণ্ডন শহর ভ্রমণে বেরোলেন। বৈকালীন পত্রিকা 'ইভনিং নিউজ' অনিচ্ছাসত্ত্বেও, যেন না হলে নয় হিসেবে, নেহরুর নাম উল্লেখ করল। অথচ সস্ত্রীক হল্যাণ্ড পথচারীদের অভিবাদন গ্রহণ করছে, তার সচিত্র বিবরণ ছাপা হল। মিঃ হল্যাণ্ড ইংরেজের দোসর। তাই তাদের কাছে খাতির বেশী। সুতরাং আমরা যতই না কেন পক্ষপাতিত্বের কথা বলি, শুনবে কেন। তবে আমাদের পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ইংরেজের রাজত্বে যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো জেলে কাটিয়েছেন, আজ লণ্ডনের বুকে সেই ইংরেজের কাছে পাচ্ছেন ফ্রিডম অফ দি সিটি-র সম্মান। এই অনুষ্ঠানে নেহরু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। শেষে বলেন, সংগ্রাম হলেও তার রূপ ছিল সুসভ্য।

মিঃ হল্যাণ্ড সে অনুষ্ঠানে আরও একটি উপাধি পান—'বুচার অফ লণ্ডন'। পাবেন না কেন, ইংলণ্ডের বাজার ভর্তি নিউজিল্যাণ্ডের মাংস। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন—কয়েক শতাব্দী আগে আমার পূর্বপুরুষেরা এই টেমস নদীর ওপর দিয়ে যাত্রা করেছিল নিউজিল্যাণ্ডে—নিতান্ত ছোট জাহাজে একটুখানি ঠাঁই। আর আজ সেই নিউজিল্যাণ্ড থেকে বড় বড় জাহাজভর্তি ল্যাম্ব আর বিফ আসছে। নবতন বুচার এইটুকু বলতে পারে সে খাদ্য কুলীন এবং সম্ভ্রান্ত।

ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নেহরুকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে এক সভার আয়োজন করে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড, বিরোধীপক্ষের নেতা গেটস্কেল, লেবার পার্টির নেতা এবং কৃষ্ণ মেননও উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় পরিবেশে নেহরু হাল্কা কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। ক্রমে গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর [illegible]। তিনি এক

বলেন, সহকারীরা আমার হাতে অনেক লেখা তুলে দেয়, যেমন 'নেহরু কে?', 'নেহরুর উত্তরাধিকারী কে?', 'নিগূঢ় রহস্যাবৃত নেহরু' ইত্যাদি। সবগুলোই আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি কিন্তু বুঝি না আমার মধ্যে রহস্য কোথায়?

সেলুইন লয়েড বলেন, নেহরু কমনওয়েলথকে ব্যাখ্যা করেছেন 'ইর্নাভজিবল্ এসোসিয়েশন' আখ্যা দিয়ে। এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা আমার জানা নেই।

গেটস্কেল উল্লেখ করেন, সোস্যালিস্টদের মন্ত্রীত্বকালে ভারত স্বাধীন হয়। সেটা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু তা এত ভালো নাও হতে পারত। নেহরুর নেতৃত্বগুণে আজ বৃটেনের সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ভারতের স্বাধীনতা পরম ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত। আরও বলেন, ভারতের কংগ্রেস পার্টিকে সোস্যালিস্ট বললে মহা অপরাধ করা হবে। তবে নেহরু ভারতের উন্নতিকল্পে যা করেছেন তা সমাজতান্ত্রিকের কর্মসূচী।

এবার আসল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি। নাম 'কমনওয়েলথ' কিন্তু এদের মধ্যে 'কমন' খুঁজে পাওয়া ভার। আর 'ওয়েলথ'? —প্রায় সবাই সর্বহারা। অভাব অনটনই বোধহয় একমাত্র মিলনগ্রন্থী।

ইংরেজদের প্রথম কথা, ক্রাউনকে যারা শ্রদ্ধা করতে পারে না তাদের সঙ্গে প্রাণের টান অসম্ভব। তারপরই আসে দুই মহাদেশের কথা—এশিয়া এবং ইয়োরোপ। একদলের আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আর এক দলের কোন মিল নেই। এক দলের সমস্যার সঙ্গে অন্য জাতের সম্ভাবনার আকাশ পাতাল তফাৎ। একপক্ষ 'নেটো' 'সিয়াটো' গড়তে ব্যস্ত। আর একদল শান্তিপ্রিয়। তাদের ধারণা সবসময় বিষে বিষক্ষয় হয় না, অমৃতই মৃতসঞ্জীবনী। প্রীতিই শান্তির বাহন, যুদ্ধ নয়।

ব্যক্তিগতভাবে দেখা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকার স্ট্রিডমের কাছে সাদা-কালোর তফাৎটা জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যবধান। সাদার শ্রেষ্ঠত্বে তথা প্রভুত্বে তিনি বিশ্বাসী। নেহরু স্বতন্ত্রীকরণের পরম বিরোধী। ইডেন চাইছেন, সামরিক ঘাঁটিগুলো যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়। ওদিকে বন্দরনায়ক বদ্ধপরিকর, ওটা দিতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেন্‌জিস চাইছেন স্টারলিং এলাকায় ব্যবসার আসন বিছোতে। অপরদিকে কানাডার বাসনা কি উপায়ে আরও বেশী ডলার অর্জন করা যায়।

এই বিভেদের কথা একা আমার নয়। কাগজে কাগজে সেই সুর তুলেছে। ডেলি টেলিগ্রাফ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে 'এ ডিফিকাল্ট কন্‌ফারেন্স'। বলে কমনওয়েলথ কিসে একসূত্রে গাঁথা, রাজমুকুট, প্রণিধানযোগ্য রাজকীয় (ইম্পিরিয়েল) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, স্টারলিং এলাকা, এক বৈদেশিক নীতি—কোনটায় নয়। এরা পরম বিচ্ছিন্ন—ভাষা, সংস্কৃতি, ভূভাগ এবং ধর্ম—সব বিষয়ে। সুতরাং 'বৃটিশ কমনওয়েলথ' নামে যদি কিছু বিরাজ করে তা কল্পনায় বা অতীতের স্মৃতিতে।

অন্য পত্রিকা লেখে—

Look what a strange assembly of nation the Commonwealth really is: what an odd assortment of races and religions and traditions are in it: what a mixture of personalities and men.

উদারপন্থী 'নিউজ ক্রনিকল' প্রবন্ধের নাম দিল—'হোয়াট্ ডু দীজ্ নাইন মেন হ্যাভ ইন কমন?' তাতে লিখল, ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে (বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি) এক সঙ্ঘের আলোচনা বসবে। তাতে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার Inflexible apostle of white baaskap (boss-ship) অর্থাৎ, শ্বেত-কর্তৃত্বের অনমনীয় পবিত্র দূত করমর্দন করবে মার্জিত এবং হৃদয়াবেগে ভরা নেহরুর সঙ্গে। পাকিস্তানের......

এবার হিসাব নিকাশ করা যাক। দীর্ঘ দশদিন ধরে ঘন ঘন বৈঠক বসল। পার্মুটেশন কম্বিনেশন করে নেতারা ছোট ছোট দলে প্রীতিভোজনে মিলিত হলেন। এ বিরাট আয়োজনের ফলাফল কি দাঁড়াল? লাভ হল, ফুলস্কেপ কাগজের চারপৃষ্ঠাব্যাপী সংযুক্ত বিবৃতি। কমনওয়েল্‌থ্ কন্‌ফারেন্সকে আখ্যা দেওয়া হয় একঘেঁয়ে এবং পানসে সম্মেলন। এই যুক্ত বিবৃতি আরও স্বাদহীন। তবে অপূর্ব নাকি এই বিবৃতির সম্পাদনা। কারও মনে সামান্যতম আঁচড় লাগতে পারে এমন কথা নেই। তাই আস্বাদও নেই। উদাহরণ ধরা যাক। বিবৃতিতে আছে রাষ্ট্রসংঘের পরিধি আরও বিস্তৃত করা সংগত। আসলে প্রশ্ন ছিল চীনকে রাষ্ট্রসংঘভুক্ত করার। এই প্রসঙ্গে প্রভূত আলাপ আলোচনা হয়, তাতে নতুন আলোর সন্ধানও আছে। আমেরিকার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এমনি গজকচ্ছপ অবস্থায় থাকুক। তারপর জাপানকে, রাষ্ট্রসংঘের সভ্য করে নিতে রাজি থাকলে, আমেরিকা হয়ত চীনের অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দেবে না। তবে আত্মমর্যাদার খাতিরে ফরমোসার জন্যে রাখতে হবে একটা স্বতন্ত্র আসন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, নবীন চীনকে আন্ত পরিষদে গ্রহণ করতে আমেরিকা রাজি থাকবে কি না। বা চীন ফরমোজাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করবে কিনা। তবু এ নিয়ে আলোচনা চালান যেতে পারে।

আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল রাশিয়ার সহৃদয়তায় আস্থা রাখা যায় কিনা?—নেহরু এবং বন্দরনায়ক তাদের আন্তরিকতায় আস্থাবান। কানাডা জানায় নেহরুর সঙ্গে তাদের মনান্তর নেই তবে অত জোর দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অক্ষম। অস্ট্রেলিয়া সে সন্দেহ সমর্থন করল। স্যার এন্টনিও সন্দেহসংকুল। স্ট্রিডমের উত্তর নেতিবাচক। তিনি জানালেন রাশিয়াকে বিশ্বাস করা চলে না। শেষপর্যন্ত স্থির হল, বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখে সাবধানে এগোতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে নেহরু এবং মহম্মদ আলী দুজনেই নাকি সমান দক্ষতার সঙ্গে বক্তৃতা দেন। যদিও একজন বাগদাদ প্যাক্টের নিন্দাবাদ করলেন আর একজন প্রশংসা। তবে উভয়েই সংযত, হাতাহাতি হবার মত বিষয় এড়িয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত ঠিক হল কমনওয়েলথ নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে না, রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায় সমাধানের চেষ্টা করবে। আর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব, সৈন্যবাহিনীর আংশিক ছাঁটাই নীতি, সকলে সানন্দে সমর্থন করেছেন। উপযুক্ত পরিস্থিতি এলে সবাই এ নীতি কার্যকরী করবেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য বোধহয় সিংহলের সঙ্গে বৃটেনের চুক্তি। ইংরেজরা সিংহলের সামরিক ঘাঁটি হস্তান্তরিত করতে রাজি হয়েছে। সিংহলও সে বিষয়ে সুযোগ সুবিধে দিতে সম্মত।

ঘরের খবরের মধ্যে সিংহল গণতন্ত্র বাষ্ট্র

ব, তা সবাই মেনে নিয়েছে। লর্ড মেল-র্ন বরাবর কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ য়েছেন মেলস্তান' হিসেবে। ভবিষ্যতে সবেন রোডেশিয়ান ফেডারেশনের প্রতি-ধি হিসেবে। অর্থাৎ রোডেশিয়ান ডারেশনের যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁরই সবার অধিকার থাকবে। তবে কমন-য়েলথে গোল্ড কোস্টের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে খনও পাকাপাকি কিছু হয়নি। দক্ষিণ ফ্রিকার সাদা প্রভু যদি মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়। তাই বোধহয় এই মূলতুবী।

এই কমনওয়েলথ কনফারেন্সকে বিলেতের প্রায় সমস্ত কাগজে অপ্রয়োজনীয় বলে রায় দিয়েছে। তবে 'নিউজ ক্রনিকল' আগেই বলেছিল, এ সম্মেলনে নাটকীয় কিছু আশা করা সঙ্গত হবে না। তবে যে সময় ক্রেমলিন 'ট্র্যাক্টর-বিফোর-ট্যাঙ্ক' নীতি গ্রহণ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছে, এ মিলনের প্রয়োজন আছে। আরও বলেছে, সবার বড় মিল, কমনওয়েলথের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ তাদের শাসনকর্তাকে ক্ষমতার আসনে যেমন বসাতে পারে, হটাতেও পারে। পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসি সবার মিলনের স্বর্ণসূত্র।

নেহরু বলেছেন, বৎসরান্তে এই মিলন ইতিহাসে কি রূপ নেবে জানি না, তবে গত কয়েক বছরের কাজ বিচার করে বলতে পারি, এ সম্মেলন পরস্পরকে কাছে টেনে এনেছে; আমার ধারণা এ আমাদের আরও নিকটতর করবে।

"বিদেশগামী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল"

সম্পাদক মহাশয়,—

৩৫ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় কালচারাল ডেলিগেশন সম্বন্ধে শৌভিকের মন্তব্য পড়লাম। মস্কো যাবার প্রাক্কালে দিল্লীতে তাঁরা যে অনুষ্ঠান করেছিলেন, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতাটুকু আপনাকে জানাই।

ডেপুটি মিনিস্টার শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দর নেতৃত্বে কালচারাল ডেলিগেশন পাঠাচ্ছেন ভারত সরকার রাশিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে।

ত্রিশজন শিল্পী নিয়ে এই ডেলিগেশন; এঁরা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি পরিবেশন করবেন বিদেশীদের কাছে। দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই একটি শিল্পী ছাড়া বাকি সকলেই অপরিচিত, অজানা। শিল্পীদের বাছাই কে বা কারা করেছেন তা জানিনা, কিন্তু যাঁরাই করে থাকুন, তাঁরা ইংরেজিতে যাকে বলে originality and without understanding প্রচুর পরিমাণে দেখিয়েছেন।

এই জুলাই সন্ধ্যা ৬টার সময় অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে কালচারাল ডেলিগেশন দিল্লীর গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতদের সামনে তাঁদের কৃতিত্ব দেখালেন।

সর্বাগ্রে সমবেত বেদগান গাইলেন শ্রীবীরেন পালিত ও তাঁর দল। বেদগানটি যে ভালভাবে আয়ত্ত করা হয়নি তা শুনেই বোঝা গেল। দুটি [illegible] গলা ছাড়া পুরুষদের গলার আওয়াজ মাইক্রোফোন থাকা সত্ত্বেও কিছুমাত্র শোনা যায়নি। [illegible] শ্রীবীরেন পালিত বিশ্বভারতীতে 'একক' রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে [illegible] এই সমবেত সংগীত সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। কিংবা দল [illegible] মধ্যে তিনি [illegible] সামঞ্জস্য তাঁর দলকে শিখিয়ে দিতে পারেননি।

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর নামকরা ছাত্রী শ্রীমতী সারদা নাচলেন ভরতনাট্যম 'অলারিপু'। শ্রীমতী সারদার ভরতনাট্যম নাচ দিল্লীবাসী এর পূর্বে দুই একবার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সেদিনকার 'অলারিপু' তেমন জমেনি মনে হলো। [illegible] কারণ ছিল। তবে, অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় দলের মধ্যে শ্রীমতী সারদা এবং কথাকলি নৃত্যের তিনজন নাচিয়ে বিদেশে যে প্রশংসা অর্জন করতে পারবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সরোদ বাজালেন শ্রীবাহাদুর খাঁ। স্বীকার করি অল্প সময়ের মধ্যে কোনো ক্লাসিকাল বাজিয়ে বা গাইয়ের পক্ষে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে কতকগুলো কারুকার্য ও ছন্দের তাল নিয়ে কসরত করলেই যে বাজনা বাজানো হয় না। মনে হলো, শ্রীবাহাদুর খাঁ ধরে নিয়েছেন যে বিদেশীরা সংগীত সম্বন্ধে অসমঝদার, তাই বোধহয় অত বেপরোয়া হয়ে বাজালেন। ঠিক এই মনোভাব নিয়েই সেতার বাজালেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। সমস্ত রাগরাগিণী বাদ দিয়ে তিনি ভাটিয়ালী সুর ধরলেন কেন তা বোঝা গেল না। তাঁকে কি রাগরাগিণী সম্বন্ধেও ডেপুটি মিনিস্টার সুপরামর্শ দিয়েছিলেন?

শ্রীদ্বিজেন মুখার্জি'র গান শুনে কেউ নাকি গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলেছিলেন 'এমন গলা যে শুনলে মন কোথায় যেন হু হু করে যায়।' অমন দরদী গলা শোনার আগ্রহে ছিলাম, গান শুনে ভাবলাম এ কী পরিহাস! রবীন্দ্র সংগীত বিদেশীদের শোনাবার জন্যে সারা বাংলা দেশ ঘেঁটে জোগাড় হলো শ্রীদ্বিজেন মুখার্জি! আর তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ হলো রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত সংগীতের ভাণ্ডার থেকে যে গানটি বেছে গায়ক গাইলেন 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।' গায়কের

আলোচনা

মুখভঙ্গী ও ডান হাতে ভাও বাতলাবার ভঙ্গী দেখে মনে হলো হয়তো আজকাল আধুনিক গায়করা রবীন্দ্র সংগীত গান যখন করেন তখন ভাবেন ঐসব ভঙ্গিমা না করলে রবীন্দ্র সংগীতের রস বিতরণ করা সম্পূর্ণ হয় না। শুনেছি ইনি বিদেশে মীরাবাঈয়ের ভজনও শোনাবেন রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে।

শান্তিনিকেতনের নাম দিয়ে চারজন মেয়ে "ওরা অকারণে চঞ্চল" গানটির সঙ্গে সমবেত নৃত্য করলেন মণিপুরী স্টাইলে। সমবেত নৃত্যের প্রধান সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব হলো প্রত্যেকের ভঙ্গী মিলে একটি ভঙ্গীকে প্রকাশ করা। গোড়ার থেকে শেষ অবধি এঁরা নাচলেন চারজনে চার রকমে। মণিপুরী নৃত্যের কমনীয় ভঙ্গী, সে নৃত্যের যে মাধুর্য, তার কোথাও চিহ্নমাত্র ছিল না। খাঁটি মণিপুরী নাচের নমুনা কিছুদিন পূর্বে দিল্লীবাসী দেখেছিলেন যখন সাউথ ইস্ট এশিয়ায় কালচারাল ডেলিগেশন গিয়েছিল। সেই দলের মণিপুরী নাচিয়েরা গত বছর রাশিয়াতেও গিয়েছিলেন, কাজেই মস্কোর দর্শকরা এবার মণিপুরী নাচের নমুনা দেখে কিঞ্চিৎ অবাক হবেন বৈকি।

শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ কেমন করে প্রতিষ্ঠানের নাম রসাতলে যেতে দিলেন তাই ভাবছি। বিশ্বভারতীর অনুমতি বিনা নিশ্চয়ই শিক্ষক ও ছাত্রীরা তিন মাসের জন্য এই ডেলিগেশন-এ যোগ দিতে পারতেন না। তবে, কর্তৃপক্ষ হয়তো ভেবে দেখেননি যে দিল্লীর প্রোগ্রামে ছাপানো হবে Santiniketan Party। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যদি রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত সম্মান দিতে না পারেন তবে যেন তাঁকে নিয়ে খামখেয়ালীভাবে ছেলেমানুষীও না করেন। তাঁর নাম নিয়ে, দেশের ভিতর নানান জনে নানা ভাবে অপব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু বিদেশে তাঁকে আজো লোকে পূজো করে। রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। তাঁর নামের সঙ্গে যা কিছু জড়িত তাকে ছোট করার অধিকার কারোর নেই।

পাঁচমিশালী প্রোগ্রামের মধ্যে, সীতারা দেবীর নাচ বাদ পড়েছিল। তিনি বোধহয় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর কথক নাচ অনেকেই দেখে থাকতে পারেন। ক্লাসিকাল গান—বিদেশীরা সহজে তার রসগ্রহণ করতে পারেন না। খুব উঁচু দরের ওস্তাদ গাইলে তাঁরা অনায়াসে তা অনুমান করতে পারেন। একজন সুন্দরী মহিলা 'খেয়াল' গাইতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়লেন। ভীতি-জনিত জড়তায় মাঝে মাঝে তিনি থেমে যাচ্ছিলেন। সবচেয়ের বিপদ ঘটেছিল নামকরা তবলচি শ্রীশান্তা প্রসাদের। তিনি বহুবার চেষ্টা করলেন গায়িকাকে তালে গাওয়াতে, শেষে হাল ছেড়ে মৃদু হাসা হাসলেন বাকি সময়টুকু।

কথাকলি নাচটি নেহাৎ মন্দ হয়নি, তবে দলের গায়কের গলাটি যদি একটু সুমধুর হতো বাঁচা যেতো। সবশেষে জাতীয় সংগীত

শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর: "উপযুক্ত লোকের কোনো আত্মীয়ই যদি গুণী না হন, আমরা তার কী করতে পারি?"

-গণ-মন" গাইলেন। দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে পড়লো, শ্রীজওহরলাল নেহরু যখন মস্কো গিয়েছিলেন সেখানে আমাদের জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন রাশিয়ানরা—সেই ছবিটি সিনেমা সে দেখেছিলাম, সেই দৃশ্যটি। নিজেদের জাতীয় সংগীত নিজেরাই গলা মিলিয়ে গাইতে পারিনা। কত বড় লজ্জার কথা। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসে আমার সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম প্রধানমন্ত্রী কী ভাগ্যিস দেশে নেই, এই নাচ গানের অনুষ্ঠান দেখলে তিনি কি বিদেশে যেতেন?" "না বোধহয়।" ইতি—নন্দিতা ...লনী, নিউ দিল্লী।

॥ নাটকের কথা ॥

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,—"নাটকের কথা" সম্পর্কে ...জুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের চিঠি (দেশ, ২রা আষাঢ়, ১৩৬৩) পড়লাম। দার্শনিক ডায়োজিনস সম্পর্কে লেমপ্রায়ারের ক্লাসিকাল ...চধানে যা বলা হয়েছে, তার একাংশের ...থ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Alexander the Great condescended to visit the philosopher in ...tub. He asked Diogenes if ...re was anything in which he ...ld gratify or oblige him. 'Get ...of my sunshine', was the only ...swer which the philosopher ...ve."

অবশ্য, এটি একটি গৌণ বিষয় মাত্র এবং ...মীশ-ডায়োজিনিস বিতণ্ডার সিদ্ধান্ত শেষ ...ন্ত যা-ই হক না কেন, অন্নদাশঙ্করের মূল ...ন্ধের তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ইতি—...ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কলকাতা।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,—

দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩তে 'নাটকের কথা' প্রবন্ধের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় লিখেছেন, "বিজেতা আলেকজাণ্ডার এক ভারতীয় সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি? সাধু উত্তর দিয়েছিলেন, দয়া করে আপনার ছায়াটা সরিয়ে নন।"

২রা আষাঢ় ১৩৬৩ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন, "...কাহিনীটি প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 'ডাইওজিনিস' ও বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধে নহে কি?"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে আপনার পাঠকদের বিচার আহ্বান করায় বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে কাহিনীটি ভারতীয় সাধু দন্দমীশের নামে যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি আবার আলেকজাণ্ডারের (খৃষ্টপূর্ব ৩৫৬—৩২৩) সমসাময়িক 'সিনিজিজম'-এর প্রবর্তক ডাইওজিনিস'এর নামেও চলে। যদিও খুব সম্ভব শেষোক্ত ব্যক্তির নামের গল্পটি সত্য নয়। নজির হিসাবে উদ্ধৃত করছি,

"....there is no likelihood that he (Diogenes) bade Alexander the Great stand out of his light....."—Chambers's Encyclopaedia, New Edition, Vol. IV, Page 533.

ইতি—ভবদীয় তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগের বাজার, দমদম।

বিদেশীর ধারণায় ভারতীয়

সবিনয় নিবেদন,—

'দেশ' পত্রিকায় বৈদেশিক চিত্রে নীলকণ্ঠ ...আলোচনার জন্য সাধুবাদ জানাই। এই ...সংকট ইংরেজপ্রীতির যুগে সত্যের এমন ...স্পষ্ট প্রকাশের প্রয়োজন। জাতীয়ের বৃহত্তম জাতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশ ও জাতির স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার গুরুভার দায়িত্ব আপনাদের উপর অনেকখানি বর্তেছে। তাই আপনাদের সমীপে "রেড-ইণ্ডিয়ান" প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার আছে।

মার্কিন মুলুক থেকে আমদানী "রেড-ইণ্ডিয়ান" সংক্রান্ত অজস্র ছবি ইংল্যাণ্ডের প্রায় প্রতিটি চিত্রগৃহে নিয়মিত প্রদর্শিত হয়, কারণ মাথায় পালকের টুপী পরা বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত অরণ্যচারী "রেড-ইণ্ডিয়ান"দের সরল বনাজীবনের বিকৃত রূপ চিড়িয়াখানার পশুপাখীর মতই ইংরেজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দের খোরাক জুগিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ছবিগুলিতে তাদের অসভ্য, বর্বর ও হেয় দেখিয়ে শ্বেত-সভ্যতার মহিমা প্রচারের প্রয়াস পাওয়া যায়। শব্দের সংকোচনে "রেড" কথাটি বিলুপ্ত; আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাই "ইণ্ডিয়ান" নামে অভিহিত হয়ে বিদেশীর চক্ষে আমাদের স্বগোত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ডের দৈনিক সংবাদপত্রগুলির কৃপায় ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যতীত অন্য দেশ এবং অন্য জাতির বিষয়ে জনসাধারণের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, ধারণা হেয়! সুতরাং আশ্চর্য কি, যখন কোনও ইংরেজের মুখে শুনি, আমারই স্বজাতিকে "ডেভী ক্রকেট" ছবিতে সে দেখে এসেছে; ঘোড়া ছোটাতে আর তীর ছুঁড়তে আমরা নাকি খুবই পটু। এটা Compliments, বলা বাহুল্য। কৃত্রিম পিস্তল হাতে নিয়ে কল্পিত ইণ্ডিয়ানের সাথে যুদ্ধ ও নিধন ইদানীং ইংরেজ শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। মাথায় পালকের টুপী নেই দেখে অনেক শিশু গভীর বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তারপর প্রশ্ন করেছে "Don't you wear feathers?"

এদের এই ভুল ধারণার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে Hollywoodএর মুরুব্বীদের কাছে করুণ, কাতর অনুনয় জানিয়ে লাভ আছে কি? শব্দের সংকোচন হবেই, চিত্রে তারা যতই কেন "রেড ইণ্ডিয়ান" নামে অভিহিত হ'ক। আমার মনে হয়—আমরাই আমাদের গভর্নমেণ্টের সহযোগিতা এবং প্রতিকার করতে পারি। India শব্দটি ইংরেজের সৃষ্টি। সুবিধানুসারে অনেক কিছুই সে তৈরী করে নিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তার অনেক কিছুই ভাঙতে হয়েছে জাতির স্বার্থের খাতিরে। বিদেশী পতাকা যখন অপসারিত হয়েছে, বিদেশী নামটি রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাইনা। আমরা কি বিদেশে 'ইণ্ডিয়া'কে ভারত এবং নিজেদের ভারতীয় বলতে পারিনা? ভারত সরকার যদি India শব্দটিকে তাঁর সকল দপ্তর হতে সমূলে উচ্ছেদ করেন—বিদেশের মাটিতে বিদেশীকে আমাদের 'ভারতীয়' নামে অভিহিত করতে বাধ্য করতে পারব।

সব শেষে অনুরোধ—Father Trevor Huddleston রচিত "Naught for your comfort"এর সমালোচনা প্রকাশ করে আমার মত অশ্বেতকায়দের কৃতজ্ঞ করুন। নমস্কারান্তে বিনীত—অসীমদেব গোস্বামী। মিডিলসেক্স, ইংলণ্ড।

॥ ৯ ॥

পার্বত্য আসাম

মানসখণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনটি তরুণ ব্রাহ্মণ একদা কৈলাসপতির প্রসন্ন আশীর্বাদ লাভ করেছিল,—তোমাদের ভারত বিজয়যাত্রা সার্থক হোক, তোমরা দেবভূমির উদার নীল নভোতলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা বহন করে নিয়ে যাও। কালপ্রহরীর মতো ভারতকে তোমরা আবহমানকাল বেষ্টন করে থাকো!

তরুণী ভৈরবী এসে দাঁড়ালো হাসি-মুখে তার এলোচুল ফিরিয়ে। বললে, প্রভু 'অনবতপ্তা' মানসের নীলপদ্ম পাত্র থেকে আমিও অঞ্জলি ভরেছি! আদেশ করুন দেবাদিদেব, আমিও যাত্রা করতে চাই।

কৈলাসপতির নির্দেশক্রমে তিনটি ব্রাহ্মণ গেল তিনদিকে—উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে। হাস্যোজ্জ্বলা যোগিনী যুবতী চললো দক্ষিণে। যাত্রারম্ভের পূর্বে ওরা চারজনে মন্ত্রপাঠ করতে করতে সাতবার কৈলাস-মানস প্রদক্ষিণ করেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার এই কাহিনী। কিন্তু ওই চারজন আপন আপন পথে কোথাও বাধা মানেনি। ওরা তুষার কেতনকে অতিক্রম করেছে, ঝঞ্ঝাগতি হিম-বাহকে পরাজিত করেছে,—তারপর বিজন ভীষণ অরণ্যানী, গগনচুম্বী গিরিশৃঙ্গমালা, ভয়াল প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব,—ওরা সব তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। অপরের মুখাপেক্ষী হয়নি, ভিক্ষা করেনি পিপাসার জল, স্থির হয়ে থাকেনি কোথাও,—আপন শক্তিতে আপন আপন পথ সৃষ্টি করেছে। ঐশ্বর্য আহরণ করেছে পথে পথে, ফলবান করে গেছে ওরা যাত্রাপথের দুই পার এবং প্রাণের প্রাচুর্যের দ্বারা অস্থির অশ্রান্ত গতি লাভ করেছে। সার্থক হয়েছে কৈলাসপতির আশীর্বাদ।

ওই তিনটি ব্রাহ্মণের নাম হোলো—সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও শতদ্রু। আর প্রমত্তা ভৈরবী যিনি, তিনি হলেন কর্ণালী। এরা চারজন বিচিত্র ঐশ্বর্য বহন করেছে চিরকাল। শতদ্রু তার ধারাপথে নিয়ে গেছে স্বর্ণ-রেণুসম্ভার, রূপের সঙ্গে রৌপ্যচূর্ণ ঝলমলিয়ে উঠেছে কর্ণালীতে, অজস্র হীরক-চূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সিন্ধু, এবং ব্রহ্মপুত্র তার পূর্বধারাপথে নিয়ে চলেছে স্ফটিকরত্নসম্ভার। শতদ্রুর জলপান করলে হস্তীর মত বলবান হয়, কর্ণালীর জল-পানে ময়ূরের মতো সৌন্দর্যশোভাবর্ধন ঘটে, সিন্ধুর জলপানে সিংহের মতো বিক্রম লাভ হয়,—ব্রহ্মপুত্রের জলে আছে বলশালী অশ্বের কঠিন গতি ও অধ্যবসায়!

কর্ণালীর গতি বড় বিচিত্র। কুমায়ুনের কালীনদী আর সরযূ মিলে হয়েছে শরদা, এবং নেপালে প্রবেশ করে কর্ণালী ছদ্মনাম নিয়েছে ঘাগরা,—যার অপভ্রংশ হোলো ঘর্ঘরা,—এই দুই আলুলায়িতা নদী গলা-গলি করেছে চৌকাঘাটে, তারপর ওরা ছাপরা থেকে নেমে গিয়ে গঙ্গায় মিলেছে। সরযূই হোক আর ঘর্ঘরাই হোক—পরিণতি ঘটলো গঙ্গায়। ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গিনী গঙ্গা! ভীমা, ভয়ঙ্করী, রুদ্রাণী কর্ণালী জাহ্নবীধারায় মিলে হয়েছেন শান্ত এবং আত্মসমাহিত।

পূর্বপথে ব্রহ্মপুত্র জপ করে চলেছে বীজমন্ত্র, তার ধ্যানভঙ্গ হয়নি। চলেছে সে হাজার মাইল পূর্বপথে,—ভারতের ঈশান কোনে 'নাম্‌চাবারোয়ার' পর্বতশিখর প্রদক্ষিণ করে আসামে গিয়ে সে প্রবেশ করেছে। হিমালয়ের অপর পার দিয়ে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমির সমতল পেরিয়ে সুদীর্ঘবিস্তৃত এক সহস্র মাইল ধারাপথে ব্রহ্মপুত্র চলে এসেছে, এর উদাহরণ দু'একটির বেশি নেই। ব্রহ্মপুত্রের আভি-জাত্য হোলো সে কৈলাসমেরুর মানসপুত্র। কিন্তু এই নদ প্রথম বাধা পেলো সেইখানে, যেখানে দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর জটারাশির গ্রন্থি খুলে দিয়েছেন উত্তর আসাম থেকে দক্ষিণ আরাকানের দিকে। ওই উত্তর-পূর্ব আসামের উত্তুঙ্গ গিরিশিখর 'নাম্‌চা-বারোয়ার' পার্বত্য অঞ্চলে সভ্য মানুষ হয়ত আজও পদার্পণ করেনি, ইতিহাসের যুগেও ওই অঞ্চল অকথিত থেকে গেছে। সমতল আসামকে আমরা পাই ইতিহাসে, কিন্তু পার্বত্য বন্য আসামকে পাঠান-মোগল অথবা ইংরেজ আমলে অপেক্ষাকৃত সামান্যই পাই। কেবলমাত্র বর্তমান শতাব্দীর মধ্যকালে এসে আমরা দেখি, প্রাণস্পন্দন শোনা যাচ্ছে পার্বত্য আসামে। প্রাণ স্ফুরিত হচ্ছে পটকাই গিরিশ্রেণীর এখানে ওখানে, নাগা-পাহাড়ের কোলে-কোলে, মিস্‌মি আর মিকিরদের পাড়ায় পাড়ায়। দেখা যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির গলিত অগ্নিস্রাব নেমে আসছে নাগাদের পায়ে পায়ে। ভৈরবের ভয়াল রক্তচক্ষে সভ্যতার বিরুদ্ধে ওরা অস্ত্র-ধারণ করেছে এই শতাব্দীতে। ওখানে এতকাল ধরে সভ্যতার পায়ের চিহ্ন পড়েনি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ওদের কোনওদিন ডাক দেওয়া হয়নি। জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ-পক্ষী-সরীসৃপের সঙ্গে পার্বত্য আসাম এতকাল ধরে আপন জীবনকে মিলিয়ে একপাশে পড়েছিল।

ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণপথে ঘুরে এসেছে পাংসিং থেকে 'কানি' উপত্যকায়। এই কানি উপত্যকায় এসে ব্রহ্মপুত্রের মূল-ধারার স্থানীয় নাম হয়েছে ডিহং। হিমালয়ে কোনও নদী একা আসেনি। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, শতদ্রু, অরুণ, সূর্যকোশী, সপ্ত-কোশী, জলঢাকা, মানস,—কেউ একা নয়। ভারতে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের নানা নদীর সাহায্য নিয়েছে। এই কানি উপত্যকার দুই পারে যে বিশাল পার্বত্য-ভূভাগ,—এর রাষ্ট্রীয় সীমানা আজও নির্দিষ্ট হয়নি। কেউ জানে না, হিমালয়ের অন্তর্গত মিস্‌মি পাহাড়দলের শেষ সীমানা কোথায়! কোথায় গিয়ে ভারতবর্ষের সীমা পাবো,—কেউ জবাব দেয় না। সভ্য মানুষকে দেখে এখানকার পার্বত্য জাতির লোক এবং আরণ্যক মানুষ হয় ভয়ার্ত চক্ষে দূর দূরান্তরে পালায় আর নয়ত দলবদ্ধ

র এসে সহসা আক্রমণ করে। নিতান্ত
গারজন ছাড়া কেউ কোনওদিন এদের
রা বোঝেনি, এদের বন্য জীবনকে চেনেনি,
র মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি।
নে নাম-পরিচয়-গোত্রহীন বন্য মানুষের
বাস করে; ঘর বাঁধে তারা বিচিত্র
ম,—সেসব ঘর লতাপাতা ও গাছের
ল ছাওয়া। এদের এক শ্রেণী হোলো
বর, তারা ভারত-ব্রহ্ম-চীন-তিব্বত—
র কিছু বোঝে না। তারা সন্ধান করে
র ক্ষুধার খাদ্য আর তৃষ্ণার জল। বর্শা,
র তীর ধনুক—এইসব নিয়ে তারা ছোটে
বজন্তুর পিছনে পিছনে। যেসব
নোয়ারকে দেখে সভ্য মানুষ পালায়,
বা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা সংহার করে,—
রে দেখলে সেই সব জানোয়ার প্রাণভয়ে
লাতে থাকে। তিরিশ হাত লম্বা পার্বত্য
ল সাপ এদের পক্ষে লোভনীয় খাদ্য।
কুকুরের কাঁচা মাংস এদের কাছে
দের। এদের কোনও জাতি-পরিচয়
নেই,—পাহাড়ের নামে এরা পরিচিত।
অরণ্যে পর্বতে জলাভূমিতে তুষারে বন্যায়
ভূমিকম্পে—এরা থাকে জড়িয়ে। পিতা-
মাতা পুত্র কন্যা,—সবাই উলঙ্গ, লজ্জার
কোনও সংস্কার কোথাও দেখা যায় না।
বর্ষায় বসন্তে ঝড়ে রৌদ্রে শীতাতপে—এদের
কাজ হোলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে
অভিযান করা এবং খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে
বেড়ানো। এরা কোনওকালে কোনও শাসন
মানেনি, কোনও সভ্যতাকে চোখে দেখেনি,
এবং কোনও সমাজকে কল্পনা করেনি।
এইসব কারণে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত
আমাদের চোখে চিরকাল রহস্যাবৃত। বোধ
করি হিমালয়ের আর কোনও অঞ্চল এত
অন্ধকার নয়।

হিমালয়ের যে-প্রধান শাখা আসামের
শেষ প্রান্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে
এসেছে, তার নাম পাটকাই গিরিমালা। এই
গিরিমালা ভারত ও ব্রহ্মের মাঝখানে উত্তর
দক্ষিণে প্রসারিত প্রাচীর। এই পার্বত্য
ভূভাগের উপত্যকার প্রান্তে ঝুমকি জনপদ
থেকে চৌকন্ গিরিসংকট পেঁৗছে বোধকরি
ভারত সীমান্তেরও শেষ হয়। আরেকটি
সীমান্ত অঞ্চল বাকি থেকে যায়—সেটি
আসাম, ব্রহ্ম, চীন এবং তিব্বতের সন্ধি-
স্থল; সেখানে পার্বত্য বন্যানদী শালবনীর
তীরে পেঁৗছে ভারত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু
শেষ হলেও কিছু কথা বাকি থাকে বৈ কি।
ভারতের সীমানা তথা আসামের প্রশাসনের
সীমানার গায়ে-গায়ে আছে নানা পার্বত্য
অঞ্চল,—তারা কি আজও উত্তর-পূর্ব-
সীমান্ত এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
একদা চীন ব্রহ্ম তিব্বত ভারত—প্রত্যেকের
উপর ইংরেজের দখল ছিল। সেই কারণে
এই চতুঃশক্তি সীমানারেখা নিয়ে কখনও
কথা ওঠেনি। আজ চাকা ঘুরেছে। কিন্তু
দুঃসাধ্য দুস্তর এবং অগম্য সেই সব সীমানা
অঞ্চলে ভারতের অধিকার কি সুপ্রতিষ্ঠিত
হয়েছে? প্রত্যেকটি সীমারেখার কি নির্দিষ্ট
চেহারা পাওয়া গেছে? পাহাড়ে-পাহাড়ে
এ প্রশ্ন আজ উঠেছে বৈ কি।

হিমালয় থেকে প্রথম প্রথম যখন ব্রহ্ম-
পুত্র পাংসিং উপত্যকা পেরিয়ে ভারতে এসে
প্রবেশ করলো, তখন তার ছদ্মনাম হোলো
ডিহং। মিস্‌মি গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্বত্য
উপত্যকার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সকল-
প্রকার হিংস্র জানোয়ার ও সরীসৃপের
আবাসভূমি পেরিয়ে ডিহং নদ যখন পাসি-
ঘাট ও 'কোবো' অঞ্চলে সদিয়ার কাছাকাছি
এলো, তখন দেখি আর একটি সুবিস্তৃত
নদ বয়ে এসেছে ওই সদিয়া নগরের গায়ে-
গায়ে,—তার নাম হোলো ডিবং। ডিহং
আর ডিবং যখন একাকার হোলো, তখন
পূর্বদিক থেকে এসে পেঁৗছলো লোহিত
নদী। এরা তিনজনেই হিমালয়ের সন্তান,
কিন্তু তিনজনেই মিস্‌মির বিরাট পার্বত্য
ভূভাগ ও অগণ্য উপত্যকাকে নানাভাগে
বিভক্ত করেছে। মানুষের কোনও সভ্যতা
এখনও এই সুদূর বিস্তৃত পার্বত্য এলাকায়
কোথাও আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।
এই মিস্‌মির ভিতর দিয়ে তেরো হাজার
থেকে প্রায় উনিশ হাজার ফুট চড়াই পথে
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হলে যে-গিরি-
সংকট পাওয়া যায়, সেটি ভারতের অন্যতম
তোরণ দ্বার। কিন্তু এর পর থেকে কত
দূর অবধি অগ্রসর হ'লে ভারতের সীমা-
রেখা পাওয়া যাবে, এটি আলোচনার বস্তু।
আমার বিশ্বাস, এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে
যে-প্রকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেতনা
দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রসীমা নিয়ে যেসব নতুন
সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে,—এরা আগে ছিল না।
কেউ খবর রাখেনি, ভারতের পার্বত্য অঞ্চল
কোথায় এবং কতদূরে বিস্তৃত, হিমালয়ের
প্রকৃত ভারতীয় সীমারেখা কোন্ স্থলে
পেঁৗছলে পাওয়া যায়। সমতল আসাম
উপত্যকাকে সবাই জেনে এসেছে এতকাল,
কিন্তু পার্বত্য আসামের প্রকৃত স্বরূপকে

জানবার চেষ্টা না করায় তারা ধীরে ধীরে যুগে যুগে অনাত্মীয় হয়ে উঠেছে। মিকির, ডাফলা, মিরি, আবর, বোরি, মিস্মি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি বাসা বেঁধে আছে মূল হিমালয়ের নীচে আসাম উপত্যকার উত্তরাংশে। ওই সব জাতির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই, তখন দেখি তামাশা, তখন দেখি প্রদর্শনী। ওরা নাচে অর্ধনগ্ন হয়ে, মেয়েরা গায়ে কাপড় দেয় না—ওরা তীর-ধনুক নিয়ে থাকে, অদ্ভুত ওদের জীবন-যাত্রা,—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ওদের ছবি তুলে আনি, কাগজে ছাপি,—এবং নগ্ন নৃত্যের শিল্পবিচার নিয়ে রসিক সমাজের সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু একথা কখনও মনে করিনে, ওরা আমাদেরই লোক, ওদের সমাজ এবং জীবনধারা আমাদেরই একটা অংশ মাত্র, ওদের অন্নবস্ত্র আশ্রয় জোটে না—সে আমাদেরই অপরাধ। ওরা যে-দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, সে আমাদেরই প্রাণের টানের অভাবে। ইংরেজ একথা জানে, আমেরিকানরাও একথা বোঝে,—সেজন্য তারা মিশনারী পাঠিয়ে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমিয়াকে খৃষ্টান বানিয়ে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে তাদের গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি অন্যদিকে অনুচর পাঠিয়ে সমগ্র আসামের পার্বত্য অঞ্চলকে উস্কিয়ে তারা জাতীয়তাবাদী ভারতের সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধাতে চেয়েছে। আজ আসামে গিয়ে কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে চেনবার জো নেই, এরা প্রকৃত ভারতীয় কিনা। এদের সমাজ, এদের আচার-আচরণ এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি,—প্রায় সমস্তই ভারতবিরোধী। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কথা কেউ ভোলেনি—যখন ইংরেজের ক্যাবিনেট্ মিশন ভারতে এসে সমগ্র আসামকে 'সি' স্টেটে পরিণত করতে চেয়েছিল মুসলিম সংখ্যাপ্রধান বাঙলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে। পরবর্তীকালে আসাম কংগ্রেসের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যের ফলে শ্রীহট্ট ভূভাগ হস্তান্তরিত হয়ে এই চক্রান্তের আংশিক সাফল্যলাভ ঘটে।

সমতল ভারতের স্নেহমমতা পায়নি বলে পার্বত্য আসাম কেঁদেছে অনেকদিন। তাদের মিনতি কেউ শোনে নি, তাদের প্রার্থনায় কেউ কান দেয়নি, এবং তাদের অনেকে যখন সভ্য সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন কেউ বিশেষ আমলও দেয়নি। সেই একই দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় রক্ত,—যার থেকে উৎপত্তি বাঙালীর,—সেই রক্তে অসমিয়ারও সৃষ্টি, সেই রক্তে ভূটান আর সিকিম—সেই রক্তই গেছে ত্রিপুরায়, মণিপুরে, আর ব্রহ্মদেশে। অনেকে বলে দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় রক্তে বঙ্গোপসাগরের উত্তরপূর্ব ভূভাগ সৃষ্টি হয়। আর্যজাতি এদিকে এসেছে তাদের শেষ অভিযানের পর্বে। কিন্তু তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতখানি প্রভাব হিমালয়ের এই ভূভাগে রেখে গেছে বলা কঠিন। আমাদের আচমনী মন্ত্রে ব্রহ্মপুত্র নেই, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে আসামের উল্লেখও কম। মহাকাব্যের যুগে এসে দেখি, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। বর্তমান ডিমাপুর সেই প্রাচীন হিড়িম্বাপুর কিনা কে জানে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগারাজকন্যা উলূপীকে আবিষ্কার করেন এবং মণিপুররাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা এবং উলূপী-দুইজনের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। এর পরে পার্বত্য আসামের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যে-সকল যোগাযোগ, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে গল্পের আকারে কানে আসে। কিন্তু ইতিহাসের যুগে এসে দেখি, পার্বত্য আসাম অনেক দূরে সরে গেছে উপত্যকাময় আসাম থেকে। ওরা কেউ খোঁজ রাখে না তাদের ইতিহাস। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে প্রচুর।

যারা এতকাল ধরে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, যারা কোনোদিন ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য সমাজে আমল পায়নি, সেই নাগা গিরি-শ্রেণী আজ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। ভারতকে তারা চেনেনি কোনও-কালে, ভারতও তাদেরকে সময়মতো আবিষ্কার করেনি। তাদেরকে শুধু পার্বত্য 'অ-সভ্য' জাতি বলা হয়েছে, কিন্তু মানুষ বলা হয়নি। তারা চিরকাল স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দচারী; বশ্যতা স্বীকার করেনি তারা কোনওকালে। তাদের কাছাকাছি যারা ছিল তারা হোলো ইংরেজ মিশনারী, চা-বাগানের সাহেব-মেম। তারা চেনে বন্য জীবন এবং নিজস্ব জগতের স্বাধীনতা। পাটকাই পর্বতমালার এপারে তারা পেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীন মণিপুর এবং ওপারে পেয়েছিল ব্রহ্ম উপত্যকার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। তারা বর্মা-মণিপুরকে চেনে, ভারতকে চেনে না। ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও নাড়ীর যোগ থাকার সুযোগ ছিল

। আজ যখন তারা মিশনারী এবং ...হৃষ-গুপ্তচরের উস্কানীতে উৎসাহিত ...র সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাধীনতা চেয়ে ...লো, তখন তাদেরকে ভালোবাসার দ্বারা ... করা দরকার। তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের ...শে দাঁড়িয়ে তাদের সুখদুঃখে নিজেদেরকে ...পূর্ণ মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন। বর্তমান কালে নাগা পাহাড় ব্যতীত সমগ্র হিমালয়ের আর কোনও অঞ্চলে এমন ব্যাপক ভারত-বিদ্বেষ আর কোথাও দেখা যায়নি। ঠিক এই একই কারণে পূর্ব কাশ্মীরের লাদাখ প্রদেশটি সেদিন হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করায় বেঁচে গিয়েছে। নাগাজাতির সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃত্ব আজ কঠিন এবং সঙ্কটসঙ্কুল পরীক্ষায় উপস্থিত, এতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

শিলচর থেকে পথ চলে গেছে পূর্ব-দিকে। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি। বরাক নদী পার হয়ে এসেছি। দিন পনেরো আগে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, এবং পাকিস্তানের জন্মলাভ ঘটেছে। নবচেতনার একটা চমক রয়েছে চারিদিকে। সেই চমকে হতচকিত ছিল পূর্ববঙ্গ। আনন্দ-উল্লাস কোথাও দেখিনি মুসলমান মহলে, শুধু দেখে এসেছি রুদ্ধকণ্ঠ অনিশ্চয়তা। তাদের দেশের নতুন নামকরণের ফলে দুঃখ দারিদ্র্য এবং অভাব অভিযোগ ঘুচবে কিনা— এই ছিল তাদের মুখেচোখে প্রশ্ন। সেদিন কুমিল্লায় কয়েকটি সভা-সমিতি উপলক্ষে বহু শত বাঙগালী মুসলমানকে কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম। তাদের স্বভাবসারল্যে ও আত্মীয়প্রীতিতে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

বরাক নদী পেরিয়ে প্রভাতকালে চলেছি শিলচর থেকে মণিপুরের পথে। বর্ষার কারুণ্য লেগে রয়েছে দুই পাশের সজলতায়। গ্রামের পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে দিশা-হারার মতো। এ পাশে উপত্যকাপথ চলে গেছে পাহাড়তলীর দিকে। এমন শান্ত এবং আত্মসমাহিত বনময় পথ অনেকদিন চোখে পড়েনি। দূরে দূরে যে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল চোখে পড়ছে তারা সম্ভবত বরাইল গিরিশ্রেণীরই অন্তর্গত,—কিন্তু সঠিক আমার জানা নেই। আমরা ছিলুম জন-চারেক। 'যুগান্তর'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকা-নন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী। আমাদের গন্তব্য-স্থল ছিল একটি ক্ষুদ্র বনময় পাহাড়ের শিখরদেশ। নাম তার 'অরুণবন্ধ।' পরেশ-বাবু তাঁর পাহাড়ী চা-বাগানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন উদারপন্থী এবং ধৈর্যশীল অতিথিসেবক সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমরা চারটি ব্রাহ্মণ মিলে সেবার যাত্রা করেছিলুম। অর্থাৎ, অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আগের দিন অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সঙ্গ-ত্যাগ করে গেছেন। সে যাই হোক, পরেশ-চন্দ্রের অতিথিসেবার তালিকায় হিন্দু-মুসলমান এবং খৃষ্টানের উদার এবং অবাধ মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল।

আসামের রোমাঞ্চ-কৌতুক ছিল আমার মনে। কতকাল আগে থেকে শুনে এসেছি চিত্রবাহন আসামের কথা। এখানে এক-দিকে যেমন আছে রহস্যলোকের মায়াজাল, তেমনি অন্যদিকে পথে-পথে মৃত্যু ছড়ানো। অরণ্যে জাত দুরারোগ্য ব্যাধি, বিষাক্ত জল, কালাজ্বর, নরখাদক ব্যাঘ্র, উন্মত্ত হস্তী, অপরাজেয় গণ্ডার, অজগর সাপ এবং নর-মুণ্ডশিকারী পার্বত্য জাতি,—এরা নাকি

আসামকে চিরদিন আতঙ্কের ক্ষেত্র করে রেখেছে। বস্তুত, হিমালয়ের শাখাপ্রশাখায় এক আরণ্যী অঞ্চল ছাড়া অপর কোথাও এমন গা ছমছম করে না। সমতল ভারতে বহুলোকের বিশ্বাস, আসামে পাওয়া যায় মায়াবিনীর দলকে,—যারা চাহনির দ্বারা মানুষকে শুধু বশীভূতই করে না, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তিও ঘটায়। ছয়শো বছর আগে মহম্মদ শাহর আমলে পাঠান যোদ্ধার প্রকান্ড দল গিয়েছিল হিমালয়ের এই অঞ্চলে আসাম জয় করতে, কিন্তু পর্বত-প্রাচীরের অন্তরালে এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা নাকি কোনও রহস্যজনক কারণে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়,—তাদের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি।

অরুণবন্ধের নীচে দিয়ে একটি নিরিবিলি পাকা পথ চলে গেছে মণিপুরের দিকে। বিগত যুদ্ধের কালে এই পথে ইংগ-আমেরিকান যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিপুল পরিমাণ তোড়জোড় ছিল। এখান থেকে বিমানে গেলে মণিপুর পৌঁছতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগে। আশে পাশে পাহাড়তলীর ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত চা-বাগানে কাজ চলছে। আসামের সমগ্র পরিচয়টাই যেন তাই। জন-সংখ্যার স্বল্পতা। মেঘ বৃষ্টি ও কুয়াশার এত প্রাচুর্য ভারতে আর কোথাও নেই, আসামের উদ্ভিদ্ জীবন তাই বিচিত্র। ভীষণ গহন অরণ্যানী আসামের প্রধান পরিচয়। নীলপাড়া বালিপাড়া, কাজি-রঙ্গা—ইত্যাদি পার্বত্য জলাভূমি গণ্ডার, হরিণ, হস্তী বাইসন প্রভৃতি বহুবিধ জানো-য়ারের আবাসস্থল এবং এরা 'সংরক্ষিত অরণ্য' হিসাবে পরিচালিত। এ সব অঞ্চলের গণ্ডার এবং বাইসন্ পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। আমাদের অরুণবন্ধ পাহাড়ের উপর বসবাসকালে একদিন রাত্রে সাহেব ম্যানে-জারের ওখানে নৈশভোজ সেরে বাইরে এসেছি, এমন সময় বনের মধ্যে শোরগোল শোনা গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই কয়েকটি লোক মস্ত একগাছা দড়ি বেঁধে যে জীবটিকে অন্ধকারে টানতে টানতে নিয়ে এলো, তাকে দেখামাত্র আমরা সবাই হতবাক। ফুট পঁচিশেক লম্বা একটি স্ফীতকায় বহু-বিচিত্র বর্ণের অজগর সাপ। ওরা সাপটিকে মেরে এনেছে, তবে এখনও সম্পূর্ণ মরেনি। এরা নাকি হরিণ খরগোস প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ারকে মোহিনী দৃষ্টির দ্বারা বশ ক'রে কাছে এনে তাকে সহসা আলিঙ্গন করে। যে-আসামকে জানিনে, কোনওদিন চিনিনে, যার আশ্চর্য ও আরণ্য-পার্বত্য সম্পদ চিরদিন আমার নিকট অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল, সেই অজানা অচেনা আসাম যেন এই রাত্রির অন্ধকারে ওই-ভয়াল বিশাল অজগরের সর্বাঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করলো। ওর ঐ বর্ণাঢ্যতার মধ্যেই এখানকার হিমা-লয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির পরি-চয়কে জানতে পারা যায়। যাদের নাম শেরদুক্‌পেন, আবর, মিস্‌মি, তিরাপ, মিকির, নাগা ও সুবনশিরি। এরা প্রধান, কিন্তু নাগারা আজ সর্বপ্রধান। স্বাধীন এবং শাসন-বিহীন জীবনের জন্য এরা পাগল। এদের সঙ্গে অরণ্যচারী পশুপক্ষীর প্রকৃতি বরং মিলবে, কিন্তু সভ্য মানুষের সঙ্গে মিলন এদের পক্ষে কঠিন। এরা জন্তু হত্যা ক'রে খায়, এবং এরাও জন্তুর ভোজ্য। উভয়ে থাকে বড় কাছাকাছি, উভয় উভয়কে চেনে, একজন অপরজনের ভাষা বোঝে। এ চেহারা দেখেছি দক্ষিণ কুমায়ুনে, দেখেছি ধওলাধার পর্বতমালার কোলে কাংড়ায়,—দেখেছি ভুটানের নীচে। ক্ষুধিত জানোয়ার ওদেরকে ডাকে, ওরা গিয়ে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা ক'ষে আসে। ক্ষুধিত উপজাতীয় লোক জানোয়ারসুলভ কণ্ঠস্বরে জন্তুকে ডাকে, এবং জন্তুরা এসে ওদের ফাঁদে পড়ে। পাশাপাশি ওদের জীবনযাত্রা, একজনের সঙ্গে অপরের নিবিড় প্রাকৃতিক পরিচয়। জন্তুর চামড়া ওরা গায়ে চড়ায়, পাখীর পালক ওরা মাথায় চড়ায়, হাড়ের মালা ওদের ভূষণ, ভালুকের লোম ওদের পোশাক, বাঘের দাঁত আর নখ ওদের কাছে অলঙ্কার। নরমুণ্ড না দেখাতে পারলে মেয়েদের কাছে ওদের সমাদর নেই। প্রকাণ্ড পাহাড়ী পাখীর মতো নাচতে না পারলে ওদের আনন্দ হয় না। মন, লাডা, গারো, খাসি-জৈনতিয়া, ডাফলা, আবর, নাগা মিস্‌মি—যেখানে যাও, এই চেহারা। লোহিত নদীর তীর ধরে যাও পরশুরামকুণ্ডে, ব্রহ্মকুণ্ডে, বশিষ্ঠাশ্রমে, মিস্‌মির এখানে ওখানে—সর্বত্র একই কথা। একই পরিচয়, কিন্তু বিভিন্ন নাম। পদম, মিনিয়ং, গালং, মিজু, দিগারু, তরাওন, চুলিকাটা, হ্রুসো বুগুন দিফামাই,—যা খুশি বলে ওদেরকে ডাকো। এতগুলির মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে বেছে নিয়ে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা চলে, এমনই বিস্ময়-কর ওদের পরিচয়। সম্পূর্ণ আসাম আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

শিলচর থেকে বরাক এবং সোনাই নদী ছাড়লে দক্ষিণে চ'লে গেছে আইজলের পথ লুসাই পর্বতমালার ভিতর দিয়ে। ধলে-শ্বরীর প্রবল প্রবাহ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত, এরই তীরে দাঁড়িয়ে আইজল জনপদ। লুসাই গিরিশ্রেণীর পশ্চিমে নদী পার হ'লে পার্বত্য চট্টগ্রাম,—যেখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনেককাল থেকে বাসা বেঁধেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে উঠে এলে একদিকে আসাম এবং পশ্চিমে সমগ্র ত্রিপুরা। ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমানায় ফেণী নদী প্রবাহিত।

মণিপুর রাজ্য রয়ে গেল বরাক নদীর ওপারে পূর্বপ্রান্তে—বর্মার পশ্চিম সীমানায়, চিন্দুইনের উপত্যকায়, নাগাপাহাড়ের কোলে-কোলে। ওরা বভ্রুবাহনের বংশ—যারা ওখানকার রাজবংশীয়। আসামের বহু অংশে যেমন—ওখানেও তাই, ওরা ছোটো নারী-

প্রধান সমাজ। ঐরাবত বংশীয় নাগরাজ উলুপীর গর্ভে জন্মেছিল ইরাবত,—যেমন জন্মেছিল বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে। ইরাবতী নদী আজও সেই পৌরাণিক কাহিনীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমগ্র মণিপুর এবং রাজধানী ইম্ফল নাচে গানে কীর্তনে বৈষ্ণবপ্রেমে অতিথিপরায়ণতায় হিমালয়ের কোলে ব'সে আপন মহৎ প্রকৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ নাগাপাহাড় প্রদেশ এবং মণিপুর—ইরাবত এবং বভ্রুবাহনের সেই দুই প্রাচীন রাজ্য—প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরা মণিপুরের অভাব সম্পদ্। এদেরই প্রভাবে নাগা পার্বত্য জাতির একটি বৃহৎ শ্রেণী আজ সর্বপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিলাভ করেছে। মণিপুরের সর্বত্র মহারাজা চন্দ্রকীর্তি এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের নামে শ্রদ্ধা ও সম্মানে মুখর। টিকেন্দ্রজিতের গৌরব ও বীরত্ব গাথায় উদ্ভাসিত মণিপুর। ইংরেজ কলঙ্কের কদর্য ইতিহাস যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসির ভিতর দিয়ে যেন নূতনভাবে পুনরায় জন্মলাভ করেছে। মণিপুরের সর্বাধুনিক ইতিহাসে রাজা প্রিয়ব্রত সিংহের উদ্দীপনা ও অধ্যবসায়ক্রমে তাঁর রাজ্যে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা এবং নৃত্যগীতাদির অভিনব উন্নতি ঘটেছে।

লুসাই আর মণিপুর পেরিয়ে হিমালয়ের জটাজটিলতা নেমে চ'লে গেল দক্ষিণে অনেক দূরে। চিন্দুইনে, আরাকানে, ব্রহ্মদেশে, ইন্দোচীনে, শিয়ামে, কম্বোজে। এখানে ডিমাপুর, কোহিমা, ইম্ফল, পালেল, আর টামু, সেখান থেকে চলেছে পার্বত্য পথ দূর দূরান্তরে কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে। নিয়ে চলে গেল প্রাণের অনন্ত পিপাসা, নিয়ে গেল ক্ষুধা, নিয়ে গেল পূজার বীজমন্ত্র। মীকং আর মেনামের তীরে তীরে, ইরাবতী আর শালবনীর অগণ্য বালুবেলায়, চিন্দুইনের শাখা-বিশাখায়, মণিপুর নদী আর লগটগ হ্রদের পারে পারে,—বুদ্ধ-সন্ন্যাসী হিমালয় যেন যাবার আগে তার আশীর্বাদ রেখে গেল। ভারতের আবহমানকালের বাণী বহন ক'রে নিয়ে গেল ওই হিমালয়ের শাখা প্রশাখা,—যেমন একদা গিয়েছিল মহেন্দ্র আর সংঘমিত্রা, যেমন গিয়েছিল শান্ত রক্ষিত আর কমলা, যেমন গিয়েছিল শ্রীজ্ঞান দীপংকর। ওরা যেন সেই দুর্বিষহ ক্ষুধা রেখে গেল আমার মর্মে মর্মে,—আর আমি যেন জন্মজন্মান্তব্যাপী জপ করে চলেছি ওই লোহিত নদী আর ব্রহ্মপুত্রের জনহীন বালুবেলায়, নীলপদ্ম আর স্বর্ণরক্তিম উপলখণ্ড খুঁজে ফিরেছি ডিবং আর সুবর্ণশ্রীর তটে তটে; দেখতে চেয়েছি ওই ব্রহ্মকুণ্ডে—যা কোনোদিন দেখা যায় না। রেখে গেলুম আমার পরম প্রণাম এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির প্রতি পরমাণুতে; ছড়িয়ে রেখে গেলুম আমারই প্রাণ লক্ষ লক্ষ বিন্দুতে এখানকার বনে-অরণ্যে, গুহাগহ্বরের মুখে মুখে, এখানকার উদার দীর্ঘ পাইন বীথিতে, শত শত অর্কিডের চারায়, সহস্র ঝরোকায়, নীলনয়না অলকায়। এখানে পৃথিবী চিরকাল আশ্চর্য হয়ে থাক্ অরণ্যে, পর্বতে, উপত্যকায়, নদ ও নদীতে, উপবনে আর তপোবনে, ভালোবাসায় আর সৌন্দর্যপিপাসায়। লক্ষ লক্ষ অসমীয়া থাকুক আনন্দে,—আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

অরুণবন্ধ থেকে নেমে এসেছি দামচড়ায় 'জটিঙ্গা' নদীর তীরে। বালুপাথরের ডাঙ্গা পেরিয়ে অজগরের বন ছাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছি নদীতটে, যার তিনদিকে পাহাড়ের অবরোধ। পাখী ডাকছে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে। ওপারের ছায়াঢাকা রহস্যলোকের পথ ধরে চলেছে আমার মন দামচড়া থেকে লামডিং, ডিমাপুর থেকে মার্গেরিটা, শিলঘাট থেকে শিবসাগর। বিজন ভীষণ অরণ্যে রেখে যাচ্ছি আত্মার আত্মীয়তা, রেখে যাচ্ছি বিভীষিকার আরাধনা উত্তর লখিমপুরে আর কাজিরঙ্গে, রেখে যাচ্ছি উত্তর-পূর্ব সীমান্তে হিমালয়ের শেষ আশীর্বাদ।

আসামের পৌরাণিক নাম ছিল কামরূপ। রাজা নরকাসুর ছিলেন কামরূপের অধিপতি গৌহাটির কাছে ছিল তাঁর রাজধানী। দক্ষযজ্ঞের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্ত শিব যখন ভূ-ভারতের পথে যাত্রা করলেন, শ্রীবিষ্ণু দেখলেন—সৃষ্টিস্থিতির ওপর বুঝি প্রলয়কালের কল্পান্ত ঘনিয়ে এলো। তিনি তাঁর সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করে বৃহত্তর মানবতাকে রক্ষা করতে চাইলেন। সেই সুদর্শন চক্রের আঘাতে খণ্ডিত সতীর মহামুদ্রা এই কামরূপের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-তটপ্রান্তবর্তী নীলাচল পাহাড়ে পতিত হয়। একদা এই পরম রমণীয় পাহাড়ের শিখরলোক যখন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত, যখন চন্দ্রহাসিত ব্রহ্মপুত্র নীলাচলের চরণ ধৌত করে চলেছে,—সেই সময় হিমালয়ের মায়াকানন থেকে দেবলোকবাসিনী একটি যুবতী মুগ্ধ হৃদয় নিয়ে নেমে আসে এই নীলাচলে। সেদিনকার মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নালোক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, সেই যুবতীটি তার লজ্জাবরণ পরিধান করে আসতে একেবারেই ভুলে যায়। এদিকে রাজা নরকাসুর সেই জ্যোৎস্নালোকে নীলাচল শিখরে পরি-

ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সহসা তিনি দেখতে পান সেই নগ্না সুন্দরীকে। মুগ্ধচক্ষে চেয়ে নরকাসুর প্রশ্ন করেন, কে তুমি, সুন্দরী?

সুন্দরী জবাব দেয়, আমি কামদেবী, প্রণয়ের প্রতীক্ আমি! এই নীলাচলের পবিত্র শিখরে আমার নামে একটি মন্দির নির্মাণ হতে পারে কিনা, তারই উদ্দেশ্যে এখানে নেমে এসেছি!

নরকাসুর বললেন, যদি অনুমতি হয়, সে-মন্দির আমি নির্মাণ করে দেবো, সুন্দরি—আমার প্রাণ দিয়ে, আমার যথা-সর্বস্ব দিয়ে।

বাঁকানয়নের কটাক্ষ হেনে কামাক্ষী বললেন, তোমার স্বার্থ কি?

নরকাসুর বললেন, তোমার ওই তনু-লতার সঙ্গে আমার মরণের ফাঁস জড়িয়ে গেছে, দেবি,—তুমি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করো, নৈলে এই রাজমুকুট ফেলে দেবো এই ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গে।

কামদেবী এই প্রস্তাবে রাজি হলেন একটি শর্তে: আজই রাতে এই মন্দির নির্মাণ এবং সমতলের সঙ্গে নীলাচলের একটি যোগাযোগ পথ—যদি এ দুটি প্রভাতের পূর্বে শেষ হয়, তবেই আমি তোমার অঙ্কশায়িনী হবো।

নরকাসুর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে ছুটো-ছুটি আরম্ভ করে দিলেন। মূর্ছিত জ্যোৎস্না স্থির হয়ে রইলো মায়াবিনী কাম-দেবীর তনুলাবণ্যে, তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে নরকাসুরের অতিমানবিক ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

প্রভাতকালের পূর্বেই নরকাসুর তাঁর কাজ প্রায় শেষ করে আনলেন, আর একটু-খানি পাকাপথ তৈরীর কাজ বাকি। কিন্তু সর্বনাশিনীর ভিন্নপ্রকার অভিপ্রায় ছিল। কামদেবী আনালেন একটি মোরগ, এবং সেই মোরগ যখন প্রভাতকালের সাংকেতিক ডাক ডেকে [illegible], তখন কামাক্ষা বেঁকে বসলেন। [illegible], ওই দ্যাখো, প্রভাত হয়েছে! [illegible] তোমাকে আমি আর বরণ করতে পারিনে।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। রাগে দুঃখে নরকাসুর খড়্গের দ্বারা মোরগটিকে হত্যা করলেন।

সেই অসমাপ্ত পথের শেষাংশ আজও তেমনি রয়েছে। গোহাটি যাবার পথ থেকে প্রায় মাইলখানেক চড়াই ভেঙে উঠে এলে নীলাচল। নীলাচলের চূড়ায় আছে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। কামাক্ষার মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে উমানন্দ ভৈরবের আর একটি মন্দির। অনেকের ধারণা, কামাক্ষার পীঠ-স্থানটি নির্মিত হয় প্রায় তেইশ শো বছর আগে। মন্দিরের মধ্যে নরনারায়ণ ও চিলা-রায়ের প্রস্তরমূর্তি দেখা যায়। এখানে চারশো বছর পূর্বেকার শিলালিপিও খোদিত।

একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে নীচের দিকে নামতে হয় কয়েক পা। কামরূপের প্রধান তীর্থ এটি। নীচে গিয়ে চোখে পড়ে একটি শিলাতল, কতকটা প্রস্তরখোদিত,—সেইটি হলো দেবীর যোনিপীঠ। সেখানে আলতা, সিঁদুর এবং রাঙাপাড় শাড়ির মস্ত সমারোহ চোখে পড়ে। এখানকার অতি ভদ্র সাধু ও মিষ্ট প্রকৃতির পূজারী-পাণ্ডারা তাঁদের গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে যাত্রীদেরকে নিয়ে গিয়ে সানন্দে তাদের পরিচর্যা করেন। ভারতের আর কোনও তীর্থস্থানে এমন উদারচরিত্র পাণ্ডা দেখা যায় না। সকলেই মধুর বাঙলা ভাষায় আলাপ করেন। পাহাড়ের মালভূমিতে কামাক্ষা হলো একটি গ্রাম। গ্রামে জলাশয়, পথঘাট, দোকান-বাজার, সাধারণ বাড়িঘর সবই রয়েছে। একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ছিলুম কয়েকদিন, কিন্তু একটিবারও নিজেকে অনাত্মীয় কিংবা প্রবাসী মনে হয়নি। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় সংসারযাত্রা চলতো নিজের নিয়মে, কিন্তু রাত্রের দিকে এই গ্রামের কোন কোনও অঞ্চলে কিছু রহস্যের ছায়া নেমে আসতো। আমার মন স্বভাবতই কৌতূহলী। এখানকার নানাবিধ ক্রিয়া-করণের কথা অনেককাল ধরে শুনে এসেছি। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির রহস্যভেদ করার জন্য কখনও কখনও নৈশ অভিযান করেছি বটে, কিন্তু প্রভাতের পূর্বেই ফিরে আসতে হয়েছে। সেই সব আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

নীলাচলের নীচের দিকে পাণ্ডু থেকে গোহাটির পথ চলে গেছে। আজকের মতো সুবিস্তৃত শহর তখন গোহাটিতে ছিল না এত জনতা, এত কর্মচাঞ্চল্য, এত প্রকার যানবাহন সেদিন কেউ ভাবেনি। প্রধান রাজধানী ছিল শিলঙে। গোহাটি পড়ে থাকতো পিছনে, সবাই মোটরে চলে যেতে বনময় পার্বত্য সুন্দর পথে শিলঙের দিকে। পথের পরিমাণ যতদূর মনে পড়ে, প্রায় পঁয়ষট্টি মাইল। তখন একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এই পথে মোটর বাসের একচেটিয়া কারবার করতো। তারা এখন আছে কি না খবর রাখিনি। কিন্তু গোহাটি শিলঙের প্রশস্ত রাজপথটি সেদিন বড় ভালো লেগে-ছিল। মনে পড়ে যায় কালকা-শিমলার কথা, শিলিগুড়ি-দার্জিলিং, কাঠগোদাম-আলমোড়া, রাওয়ালপিণ্ডি-কোহালা! এরা চিরকাল স্মৃতির পটে রয়ে গেল শ্রেষ্ঠ কবিতার মতো। বিবাগী মনের অনর্থক ভাবনা আনে হিমালয়ের এই সব পথঘাট, হঠাৎ আনে অশান্তি, হঠাৎ বেজে ওঠে সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী। এই পথ দিয়ে ছুটলে প্রাণ উড়ে যায় খাসি-জৈন্তিয়া ডিঙিয়ে কোথাও কোনো পথ-হারানো সুরে হিমালয়ের পর্বে পর্বে, শাখায়-প্রশাখায়। ভুবনেশ্বরী শিখর থেকে ব্রহ্মপুত্রের শোভা অপরূপ।

গোহাটি ছাড়ালে প্রান্তর এবং অরণ্য। পথে পাওয়া যায় শস্যক্ষেত্রের আনাচে-কানাচে শিকারের কেন্দ্র, শস্যের ক্ষেত থেকে জন্তু তাড়াবার মাচান। অনেক ক্ষেত্রে দিনমানেও

একা পথিকের পক্ষে এ পথ সেদিন নিরাপদ ছিল না। গোহাটি-শিলঙের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে পার্বত্য জনপদ নাংপো। ছবির মতো শহর,—কাঠ বিক্রির কেন্দ্র।

বছরের প্রায় অর্ধিকাংশ সময় আসামে বৃষ্টি-বাদল থাকে। আমাদের চোখে যেটা অতিবৃষ্টি, এখানে সেই বৃষ্টিই হলো সাধারণ। আসাম উর্বর, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে। মাটি ভিজে, সমগ্র প্রদেশ ভিজে। নীচের তলায় যারা থাকে তাদের বড় কষ্ট। জন্তু-জানোয়ার জল-জলা-জঙ্গল—এদের গায়ে গায়ে জীবন জড়ানো। কিন্তু পাহাড়ে ওঠো, পাইন বনের হাওয়া লাগবে গায়ে। এমন ফুলের গন্ধ পাবে, যা আগে জানতে না! এমন লতাপাতা, যা আগে দেখোনি। এমন নরনারী চোখে পড়বে—যাদের খুঁজে পাওনি ভূভারতে।

শিলঙে এসে উঠলুম,—সমুদ্রসমতা থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। চেয়ে দেখছি মস্ত শহর,—কিন্তু প্রায় সমতল। স্বাস্থ্যের গুণে শহর হাসছে। দার্জিলিঙের মতো নয়, এখানে বড় বড় রাজপথ গেছে নানাদিকে। এমন প্রশস্ত মালভূমি,—হঠাৎ মনে হয় বুঝি কাশ্মীরের শ্রীনগর। এমন বড় বড় সমতল বাগানবাড়ি,—সহসা কোনও পার্বত্য শহরে চোখে পড়ে না। চারিদিকে প্রচুর জনতা, প্রচুর মেয়ে-পুরুষ,—অনবদ্য যৌবন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে! ধনী অসমিয়া, সম্ভ্রান্ত বাঙালী, বিশেষ করে লাবান অঞ্চলে,—এরা রয়েছে পুরুষানুক্রমে। সাহেবসুবোর বাংলো কথায় কথায়। সভ্য অসভ্য, নগ্ন অর্ধনগ্ন, ইতর ভদ্র—প্রায় রয়েছে গায়ে গায়ে। অসমিয়া, মণিপুরী, নাগা, সিলেটী, খাসিয়া, —এদের দেখে আমি মুগ্ধ। অসমিয়াদের আপন ভাষা হলো 'অহোম',—শুনতে ভারি চমৎকার,—কিন্তু কানে যেন লাগে বাঙলার অপভ্রংশ। দু-চারটি অক্ষরের এদিক ওদিক, কিন্তু আসলে এক। আমার হোটেলে সবাই অসমিয়া,—কিন্তু তারা যে ঠিক বাঙালী নয়, এটি জানতে সময় লেগেছিল। ওদের কথার ভঙ্গিটি আয়ত্ত করার জন্য কান পেতে থাকতুম।

সমগ্র শিলঙ যেন একটি পুষ্পপাত্র। বৃক্ষলতায়, গাছের ডগায়, বোঁটায়-বোঁটায় অজস্র ফুলের আশ্চর্য শোভা। ফুল আর ফলের বাগানের কারুকার্য রুচির পরিচয় দেয়। ডালিম আখরোট আর কমলার বাগান বহু ক্ষেত্রকে বর্ণাঢ্য করে রেখেছে। বাজারে গিয়ে দাঁড়ালে বিচিত্র দৃশ্য। যেন মেলা বসেছে আনন্দের হাটে। কেউ নেচে নিল, কেউ ঘুঙুর বাজিয়ে দিল। বাজারে বেচতে এসেছে চাল ডালের সঙ্গে তীর-ধনুক, শাকসব্জির সঙ্গে পাখির পালক, তেল-নুন-লকড়ির সঙ্গে রুপোর গহনা আর হাড়ের মালা। বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখো, খৃষ্টানের সংখ্যা অনেক বেশী। ইস্কুল-পাঠশালায় যাও,—অগণ্য খৃষ্টান। মিশনারী মেয়ে-নেত্রীর সঙ্গে শত শত মেয়ে চলেছে,—তারা নানা সম্প্রদায়ের নানা উপজাতির মিশ্রণ,—কিন্তু তারা খৃষ্টান। আমাদের হোটেলের নীচের তলায় ছিল একটি পরিবার,—বাপ মুসলমান, মা হিন্দু, মেয়ে খৃষ্টান, ছেলে তথৈবচ। খৃষ্টান হতে পারলে ওদের অনেক বিষয়ে আর ভাবনা থাকে না। মিশনারীরা ওদের অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথায় কথায় এগিয়ে এসেছি অনেক দূরে। দক্ষিণ আসামের অসংখ্য গিরিশ্রেণী হিমালয়ের মূলে মেরুদণ্ড নয়,—কিন্তু এরা সবাই হিমালয়ের শিরা-উপশিরা। গারো, খাসি, জৈন্তিয়া, কাছাড়, লুসাই, মিকির, নাগা, পাটকাই, আবর, মিস্‌মি,—এরা সকলেই সেই শিরা-উপশিরার ভগ্নাংশ। অনেক সময় পরস্পরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে না,—কিন্তু শিকড় রয়েছে মাটির তলায় কিংবা উপত্যকায়, নদীগর্ভে কিংবা অরণ্যলোকে। হিমালয় এক, আদি ও অনন্য,—হাজার হাজার মাইলের মধ্যে তার দূরদূরান্তরপ্রসারী অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন গিরিশ্রেণীর নামে প্রকাশ। আমি ভারতীয়, এই আমার একমাত্র পরিচয়। হতে পারি আমি রাজস্থানী, মারাঠি, বাঙালী, মাদ্রাজী কিংবা অসমিয়া,—কিন্তু আমি ভারতীয়,—অভিন্ন অচ্ছেদ্য অখণ্ড অক্ষুণ্ণ। আমার অন্য পরিচয় হোলো আঞ্চলিক,—সেটি একেবারেই প্রধান নয়। আগে আমি ভারতীয়, পরে বাঙালী! আমার জন্মভূমি বড়, বাসস্থান বড় নয়। আমার সমস্ত সত্তা ছড়ানো কাশ্মীর থেকে কুমারিকায়, কবরীর অববাহিকায়, গঙ্গায় আর তুঙ্গভদ্রায়। আমি স্বীকার করিনে কোনও শিক্ষা আর সংস্কৃতির আঞ্চলিক শাসন। আমি সর্বভারতীয়, আমি ভারত-পথিক! আসামের সঙ্গে সেদিন আমি একাকার হয়ে ছিলুম।

চেরাপুঞ্জীর দিকে যাচ্ছিলুম। খড়ি-পাথরের পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি। এ পাশ দিয়ে ভিন্ন পথ চলে গেল সুন্দর সুরমা উপত্যকার দিকে—শ্রীহট্টের পথে। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টি আসে কথায় কথায়। কয়েক মাইল গিয়ে পাওয়া যায় হস্তী প্রপাত। নিভৃত অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা জলধারা নামছে পাহাড় থেকে। এখানকার কুঞ্জবনের নিরিবিলি অঞ্চলে গদগদ কণ্ঠের কাকলী শোনা যায় যখন তখন।

শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জী প্রায় চৌত্রিশ মাইল পথ। পথ কখনো প্রশস্ত, কখনো সংকীর্ণ। কোথাও সমতল, কোথাও বা গভীর খাদ। কোথাও আরক্তিম গিরিগাত্র, কোথাও বা অরণ্যের উদার গাম্ভীর্য। মাঝে মাঝে দুস্তর ও দুঃসাধ্য। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হয় এই অঞ্চলে,—বাদলের সজল হাওয়ায় সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এখানে যেন কিছু বিমর্ষ ও ধূসর।

এসে পৌঁছলুম চেরাপুঞ্জী শহরে। শৈবালাচ্ছন্ন সংসারযাত্রাটা সহজেই চোখে পড়ে। দু-চারটে সরকারী আর বেসরকারী ঘর-দোর। কিছু দূরে পাওয়া গেল একটি জলপ্রপাত,—মুসৌরীর ওদিকে যেমন কেম্পটি প্রপাত। জনহীন প্রাণীচিহ্নহীন পর্বতশিখর এখানে নিশ্চুপ। নীচের দিকে নামছে অসংখ্য ঝরনার ধারা। দূরদিগন্তে ছায়াঢাকা সুরমা উপত্যকা! পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে লোহরজ্জুপথ চলে গেছে ভোলাগঞ্জের দিকে।

চেরাপুঞ্জীর উপরে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। —ক্রমশ

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

২রা মে, বুধবার

আমরা আজও লোহিতসাগরে চলিয়াছি। প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত উপাসনা ও ডেভিডের সাম (Psalm) পাঠ করিলাম। ৮৷৷টার সময় প্রাতরাশ আরম্ভ হইল। আহারের পর একটু ডেকে বেড়াইয়া তৎপরে নিম্নে আসিয়া এক্‌সাইজ কমিশন-এর রিপোর্ট পাঠ করিলাম ও লিখিলাম। ইতিমধ্যে খৃষ্টানদিগের Relegious meeting হইল। তাহাতে উপস্থিত থাকিলাম। ইঁহাদের দৈনিক উপাসনাদি কি প্রকারে চলে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিগত রবিবার মিঃ বেলার নামক একজন চীনদেশীয় মিশনরীর সারমন শুনিয়াছি। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে"—কেবল যীশু, কেবল যীশু, যীশুর ওলট—যীশুর পালট! প্রভু পরমেশ্বর কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন! মুক্তির জন্য তাঁহার সঙ্গে প্রয়োজন নাই। সকল সম্প্রদায়ের উপাসনাদি লক্ষ্য করাই আমার কার্য; নতুবা ঈশ্বরের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিতাম না।

বিলাতে পেঁাছিবার পূর্বে রামমোহন রায়ের "Three appeals to the Christian public" পড়িয়া ফেলিতে হইতেছে। সেখানে আমাকে চারিদিক দিয়া ধরিতে ছাড়িবে না। আমার হস্তে যথাসাধ্য অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে হইবে।

অদ্য প্রাতে রেভাঃ মিঃ কুক্ এখানে মুঙ্গাপুরে মিশনারী, বঙ্গদেশীয় মিশনারী-দিগের একখানি মাসিক পত্রিকা আনিয়া পড়াইতেছেন; তাহাতে আমার 'চাইল্ড ম্যারেজ' সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রশংসা আছে। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, এক এক দিন এক একজন কিছু কিছু বলিলে হয়। মিঃ ক্লার্ক 'ট্রাভেলস্ ইন চায়না' বিষয়ে কিছু বলিতে রাজি হইলেন; মিঃ বেলার যে বিষয়ে বলিবেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না। আমার বিষয় "The effect of English Education on Native Society in Bengal," দুর্গামোহনবাবু বলিতেছেন, এ বিষয়ে এমন অনেক কথা বলিতে হইতে পারে, যাহা ইংরেজ-দিগের ভাল লাগিবে না। ইহা অপেক্ষা ভাল হয়—"The History of the rise and Progress of the Brahmo Samaj।" কুককে এই কথাটা বলিতে হইবে। কুক্ আর এক কান্ড করিয়া বসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, লেকচার-টেকচার যদি হয়, সেকেন্ড ক্লাস সেলুন-এ হইলেই ভাল; কিন্তু এই প্রস্তাবটি তিনি ফার্স্ট ক্লাস-এর কমিটির হাতে দিয়াছেন। নৃত্য, গীত, বলনাচ প্রভৃতির উপর তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি; তাঁহারা কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন? অত বড়লোক অডিয়েন্স-এর নিকট কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না। কুক্-এর সঙ্গে আজ এ বিষয়ে কথা কহিতে হইবে।

স্টীমারের গোলমালে আমার নভেল লেখাটি বন্ধ হইয়া গেল। এত গোলে কি তাহা হয়? অন্যান্য কাজও ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। ভজন, সাধনও যে খুব প্রাণ জুড়াইয়া করিব, তাহাও হইয়া উঠিতেছে না। গড়ের উপরে স্টীমারে যতটা উপকার লাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা হইয়া উঠিতেছে না। এই ইংলণ্ড গমনের দ্বারা আমার জীবনের একটি বিশেষ পরিবর্তন আনীত হওয়া উচিত: তাহার চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণভাবে দেখিতেছি না। তবে আমার জীবনের উপরে যে প্রভুর হস্ত রহিয়াছে, সে বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি করুন, তাঁহার প্রতি আমার নির্ভর বাড়িয়া আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হই।

Programme of work during my stay in England :—

1. To ascertain what are the prospects of **liberal religion** in the West.

(a) Its adversaries say it is not thriving in the West.

(b) If so, what are the causes of its weakness.

(c) What are the obstacles in the way of its general acceptance.

This is to be done by private and semi-formal conferences with (1) advanced unitarian thinkers, (2) professed agnostics and secularists, and (3) with Christian workers.

(d) They say liberal religion does not produce many fruits in the shape of practical philanthropy;—if true, to ascertain its causes.

2. To try to impress on the theists and advanced unitarians of England, something like an idea of the aims and aspirations of the Brahmo Samaj, and its charactristics, as contra-distinguished from those of Western Theism..... .. ..

3. To take notes of the various measures adopted by the English philanthropists to fight the three great evils—Poverty, Intemperance and Impurity.

4. To obtain general information as far as possible, about the internal spiritual life and religious activity of the leading Christian sects.

5. To study, particularly, the educational systems of the country, with their results.

6. To try to influence public opinion on the subjects of Coolie Emigration and the Liquor Traffic.

7. The last, but most important with me, is to try to improve my own mind by study and observation, by cultivating the art of public speaking, so that I may return to my country better-fitted, to carry on the mission to which God has called me.

As preparatory to the successful carrying out of the above programme, I must finish the undermentioned studies before I leave England :—

(1) To finish the study of the Excise Commission's Report—taking notes of important facts.
(2) To finish, if possible, the study of the reports of the Director of Public Instruction and of the Education Commission.
(3) To frame a number of questions on each of the above heads.
(4) To finish reading Ram Mohan Roy's Three Appeals.

Leading questions for directing my enquiries :

(1) What is the number of liberal Churches.
(2) What the number of new accession during the last ten Years.
(3) What their work and influence among the younger generation.
(4) Liberalism—how far affecting the theology of orthodox Churches.
(5) What is the proportion of annual detections from the liberal Churches.
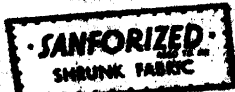
৩রা মে, বৃহস্পতিবার

আজও আমরা লোহিতসাগরে চলিয়াছি। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া ও চা খাইয়া প্রাতের উপাসনা সারিলাম। তৎপরে প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' হইতে জন বানিয়ান-এর জীবনচরিত পাঠ করিলাম। তৎপরে আহারের পর পূর্বদিনের দৈনিক লিপি লিখিলাম এবং 'সঞ্জীবনী' হইতে আউট-স্টীল সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলাম। দুপুরবেলা ও বৈকালে জন বানিয়ানের জীবনচরিত পড়িয়াছি। রাত্রে আমার ইংলণ্ডের কাজের একটি প্রোগ্রাম নোটবুকে লিখিয়া ফেলিয়াছি। একটি লক্ষ্য স্থির না হইলে কোন কাজই অগ্রসর হয় না।

আমরা জাহাজে উঠিয়া যে পাঁচটি পশ্চিমা গরু দেখিয়াছিলাম, তাহার চতুর্থটি অদ্য বলিদান হইল। তৃতীয়টি পূর্বদিন হইয়াছে। অতগুলি ভেড়া প্রায় সবই গিয়াছে। কয়েকটি মাত্র আছে। মানব দুর্বল প্রাণীদের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হয়, ইহা মানবের পক্ষে অতি হীন কার্য; কিন্তু মাছ-মাংস খাওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকাতে এই হীনতা হইতেছে।

অতাঃ কুক্‌ যে লোকাচারের হুজুকে থাকা

করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাকে ফার্স্ট ক্লাস ডেকে একদিন "Effects of English Education on Native Society in Bengal"—এই বিষয়ে লেকচার দিতে বলিতেছেন। লেকচার যেরূপ পাকিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ইঁহাদের হাত এড়াইতে পারিব এরূপ বোধ হয় না।

আজ রাত্রে ফার্স্ট ক্লাস-এ অভিনয় হইল।

৪ঠা মে, শুক্রবার

আজ প্রাতে আমরা গালফ অব সুয়েজে প্রবেশ করিয়াছি। প্রাতে উঠিয়াই দেখি—উত্তরদিকে পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। এখানে সাগরের বিস্তৃতি পদ্মার বিস্তার অপেক্ষাও অল্প। খৃষ্টীয় মিশনারীগণ বলিতেছেন, আর একটু উপরে গেলে সেই স্থানে যাইব, যেখানে ইস্রেলাইটগণ মুসার (মোসেস) আদেশানুসারে লোহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং সমুদ্র তাহাদিগকে পথ দিয়াছিল। এসব গল্প রামচন্দ্রের সাগর বন্ধনের ন্যায়। আজ স্নান ও উপাসনা সারিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। হেমকে এক পত্র লিখিলাম, তার মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের এক পত্র ও বিরাজের এক পত্র দিলাম। মিঃ এ এম বসুকে আর এক পত্র লিখিলাম। আজ স্টীমারে এক নোটিস দিয়াছে যে, তিনটার মধ্যে ডাক বন্ধ হইবে; স্টীমারেই ডাক টিকিট পাওয়া যাইবে। দুইখানি তিন আনা দামের টিকিট কিনিলাম। ইহা ইজিপশিয়ান গভর্নমেণ্টের টিকিট। ইহা কলিকাতায় যাইবে।

দুর্গামোহনবাবু আমার লিখিত মিঃ বসুর পত্রে দুই কথা লিখিয়া দিলেন। মিসেস বসুকেও আমি এক পত্র লিখিয়া মিঃ বসুর পত্রে দিলাম।

পত্রগুলি লেখা হইলে আমাদের সেলুন-এর বারম্যানের নিকট দেওয়া গেল।

পত্রলেখার পর রসিকের প্রদত্ত অবশিষ্ট 'সঞ্জীবনী'গুলি পড়িয়া ফেলিলাম। এই কাগজগুলি পড়িয়া আউটস্টিল সিস্টেম কিরূপ কাজ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আবশ্যকমত নোট লইয়া সঞ্জীবনীতে মুদ্রিত গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার ডেসপ্যাচটি আমার নিউজপেপার স্ক্র্যাপ-বুক-এ আঠা দিয়া জুড়িয়া দিলাম। এই সকল কাজ করিতে প্রায় দিবা অবসান হইয়া আসিল। এদিকে জাহাজ সুয়েজ নগরের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইবামাত্র একখানি স্টীমলঞ্চে করিয়া কয়েকজন কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—জাহাজ কোথা হইতে আসিতেছে? উত্তর—কলিকাতা। তোমরা কি মান্দ্রাজে লাগাইয়াছিলে? উত্তর—হ্যাঁ। আদেশ হইল—তবে কোয়ারেনটাইন আইন অনুসারে ২৪ ঘণ্টা এখান হইতে নড়িতে পারিবে না এবং হলদে পতাকা তুলিয়া দেও। তদনুসারে হলদে পতাকা তুলিয়া দেওয়া হইল। ইহার অর্থ এই, এই জাহাজ কোয়ারাণ্টাইন শাসনে শাসিত হইয়া রহিয়াছে।

এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ হইতে কেহ নামিতে পারিবে না বা কেহ জাহাজে আসিবে না।

আজ অবশিষ্ট গরুটিকে হত্যা করিল।

এখানে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। ডেকে বসিয়া কোন-প্রকারে সায়ং সন্ধ্যা করা গেল।

আজ দুর্গামোহনবাবু একটা কথা বলিয়াছেন। আনন্দমোহনবাবুকে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছি—

I am only sorry that the fire of self-sacrifice has not burnt all the impurities of my nature."

দুর্গামোহনবাবু পড়িয়া বলিলেন—"Why do you take such gloomy views, my dear fellow? God never created us for impurities; there are no impurities in you."

বেশ কথা, আমিও অনেকবার মন্দিরে উপাসনাদির সময় বলিয়াছি—ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার আনন্দের অংশী হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় প্রাণী আনন্দে বিহার করিবে, আর মানব, যে তাঁহাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেই মানব কেবল তাঁহার চরণতলে পড়িয়া সর্প-মুখগ্রস্ত ভেকের ন্যায় চিরদিন কাঁদিবে! ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে? এরূপ কখনই বোধ হয় না। আমাদিগকে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। এই ভাবটা দুই মাস পূর্বে বড় প্রবল ছিল। কিন্তু বিগত দুই-আড়াই মাস ভাল উপাসনা হয় নাই। প্রথম এগজামিনেশন পেপার-এর তাড়াতে, দ্বিতীয় স্টীমার যাত্রার গোলমালে। তাহাতেই বা এই ভাবটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, দুর্গামোহনবাবু কথার মাত্রায় কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু কথাটা আমার মনে রহিয়া গেল।

হারিকেন ডেকে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত বেড়াইয়া ও জাহাজীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে রাত্রি ১০টার সময় আসিয়া শয়ন করিলাম। (ক্রমশ)

॥ একুশ ॥

খানিকটা পরে বাঁশের পানপাত্র ভরাট করে রোহি মধু আর কাঠের বাসনে ঝলসানো আউ পাখির স্তূপ সাজিয়ে মাথোয়াকোঙে চলে এলো সাঙ্গামখাবা। ঝলসানো মাংসের পিন্ড। জ্বলন্ত, রক্তলাল। সেই মাংসের ওপর থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা উড়ে যাচ্ছে। রোহি মধুর সৌরভে সমস্ত পোকরি কেসুঙটা সুরভিত হয়ে গিয়েছে। তিনজোড়া চোখ লুব্ধ উত্তেজনায় ঝকমক করে উঠলো।

একসময় তিনজনে তারিয়ে তারিয়ে রোহি মধু খেতে শুরু করলো; আর থাবা ভরে আউ পাখির ঝলসানো মাংস অতিকায় গ্রাসের মধ্যে পুরতে লাগলো।

ধারালো নখ দিয়ে একপিন্ড মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বুড়ো সর্দার বললো, "মেহেলীকে এবার ছিনিয়ে আনতে পারবো রে সাঙ্গামখাবা।"

"কেমন করে?" উত্তেজনায় হাতের মুঠিতে বাঁশের পানপাত্রটা থেকে এক ঝলক রোহি মধু চলকে পড়লো সাঙ্গামখাবার।

"হু-হু—কোহিমা শহর থেকে ফাদার আসবে, ফাদারের লোক আসবে, বন্দুক আসবে। হু-হু—হুই কেলুরি বস্তীর ফুটানি একেবারে খতম করে দেবো না! আমাদের বস্তীর মেয়ে নিয়ে আটক করে রাখে। নখ দিয়ে কলিজা একেবারে ফেঁড়ে ফেলবো না?" ধূসর চোখদুটো দু'টি অঙ্গারপিন্ডের মত ধক্ করে উঠলো বুড়ো সর্দারের।

"ফাদার কে রে?" রাঙসুঙের দু'চোখে অপার বিস্ময়; "বন্দুক আবার কী?" ফাদার, বন্দুক—বিচিত্র দু'টি শব্দ, অপরূপ রহস্যময় দু'টি নাম। নিতান্তই অপরিচিত, একান্তই অজানা এই অপূর্ব শব্দ দু'টি রাঙসুঙের অর্ধস্ফুট পাহাড়ী চেতনাকে এই মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে দিল।

"হু-হু। সব বুঝতে পারবি। আগে তো আমাদের বস্তীতে ফাদারকে নিয়ে আসি, তারপর মেহেলীটাকে কেড়ে আনি কেলুরি বস্তী থেকে। আমার মেয়েটা তো বেপাত্তাই হয়ে গেল। বাঘের পেটে গেলো, না বুনো সেন্টসুঙের গুঁতোয় সাবাড় হলো, কিছুই বুঝতে পারলাম না।" কণ্ঠটা সহসা আশ্চর্য মন্থর হয়ে এলো বুড়ো সর্দারের; "থাক, জিজ্ঞোমুরে কথা থাক। জিজ্ঞোমু যখন নেই, মেহেলীই আমার মেয়ে, ওকে এনে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে হয়!" একটা কবোষ্ণ নিঃশ্বাস বিলম্বিত লয়ে সমস্ত বুকটাকে দলিত করে বেরিয়ে এলো বুড়ো সর্দারের।

এবার দস্তুরমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে রাঙসুঙ। অমসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে গুরুভার দেহটাকে টানতে টানতে একেবারে বুড়ো সর্দারের স্পর্শের সীমানায় চলে এলো সে; "হু-হু—খুব ভালো। এই তো সেদিন আমার ছেলের বউ করার জন্যে সাঙ্গামখাবাকে টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) পাঠিয়ে দিলুম। খাবেনামু বর্শা, এরি কাপড়, আরুখা, কড়ি আর শঙ্খের সব গয়না দিলুম। তুই হুই ফাদার না কী তাকে এনে মেহেলীকে ছিনিয়ে আন কেলুরি বস্তী থেকে। কেলুরি বস্তীর সঙ্গে লড়াই বাধলে আমরা তোদের দলে থাকবো।"

"হু-হু—" পরম প্রাজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকালো বুড়ো সর্দার; "গয়া, গয়া, খুব ভালো কথা বলেছিস। তোরা আমাদের দলে থাকবি, আমরা হলাম আসাহোয়া (বন্ধু)।"

"হু-হু—আসাহোয়া (বন্ধু)। এক শ' বার আসাহোয়া!" তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো রাঙসুঙ; "তোদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হতে যাচ্ছে।"

"ভালো কথা বলেছিস রাঙসুঙ। মেহেলীকে তোর ছেলের সঙ্গে নির্ঘাৎ বিয়ে দেবো। টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) যখন নিয়েছে সাঙ্গামখাবা, তখন কথার খেলাপ করা কিছুতেই চলবে না। তবে আমার একটা কথা তোদের রাখতে হবে রাঙসুঙ!" সরীসৃপের মত চোখদুটো ক্রূর হয়ে উঠলো বুড়ো সর্দারের।

"কী কথা?"

"ফাদারকে তোদের বস্তীতে যেতে দিবি তো?"

"নির্ঘাৎ দেবো। ফাদার আমার ছেলের বউকে কেলুরি বস্তী থেকে এনে দেবে; আর

তাকে যেতে দেবো না? তেমন নিমকহারাম আমরা পাহাড়ীরা নই রে সন্দার!"

"গয়া, গয়া। ভালো কথা বলেছিস। তোদের বস্তীর কেউ আবার ফাদারকে বর্শা হাঁকড়াবে না তো!"

"কে হাঁকড়াবে? একেবারে জানে খেয়ে ফেলবো না তাকে? আমি হলাম নান্‌কোরা বস্তীর সন্দার। আমার ছেলে মেজিচিজ্‌ঙ হলো টেমি খামকোয়ান্যু (বাঘামানুষ)। আমরা যা বলবো, তাই হবে। কেউ ওস্তাদি করতে গেলে মোষের মত ছাল উপড়ে ফেলবো একেবারে।"। ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে উঠলো রাঙসুঙু।

"ভালো বলেছিস। আর একটা কথা আছে। সে কথাটাও তোকে রাখতে হবে। তা হলে মেহেলীকে ঠিক ছেলের বউ করে ফিরতে পারবি।"

"আবার কী কথা?" মুখচোখের ভঙ্গী এবার রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলো রাঙসুঙের।

"তোদের আসেপাশে তো অনেক বস্তী আছে। তাদের সঙ্গে খাতির আছে?"

"হু-হু—অনেক বস্তীর সঙ্গে আমাদের খাতির আছে। ভুরুকামচা বস্তী, পেরুমা বস্তী, ইটিসাক বস্তী। আরও কত আছে—কিন্তু কেন রে সন্দার?"

"শোন্ তবে।" যেমন করে গোপন মন্ত্র-গুপ্তির সন্ধান দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি সতর্ক ভঙ্গিতে রাঙসুঙের কানের ওপর মুখটাকে নামিয়ে আনলো বুড়ো সর্দার: "কোহিমা পাহাড়ে এক ডাইনী আছে, তার নাম হলো গাইডিলিও। খবরদার, তার কাছে কেউ যেন না যায়—এই কথাটা আসা-হোয়াদের (বন্ধুদের) বস্তীতে বস্তীতে রটিয়ে দিবি! তারাও যেন তাদের আসা-হোয়াদের (বন্ধুদের) বস্তীতে আবার রটিয়ে দেয়। তা হলে অনেক মজা আছে তোদের বরাতে। ফাদারের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবি। মেহেলীকে ছেলের বউ করে পাবি।"

"ডাইনী—গাইডিলিও!" স্বগতোক্তির মত শব্দ দুটি উচ্চারণ করলো রাঙসুঙু। তারপর সশব্দে ঘোষণা করলো; "তাই করবো, বস্তীতে বস্তীতে দুই কোহিমা পাহাড়ের গাইডিলিও ডাইনীর নাম রটিয়ে দেবো।"

"গয়া, গয়া, ভালো বলেছিস।" পরম পুলকে, অপরূপ আবেশে গলাটা জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে বুড়ো সর্দারের।

বাইরের আকাশে ছয় পাহাড়ের উপত্যকা আর বনময় মালভূমি জুড়ে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নামছে। ঘনতম হয়ে ঝরছে পার্বত্য রাত্রি। পোকরি কেসুঙের এই ছোট্ট ঘরখানা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তিনটি ছায়া-দেহ আশ্চর্য সান্নিহিত হয়ে বসেছে। আর বুড়ো সর্দারের শিকারী চোখদুটো একটা পাহাড়ী ময়ালের মত দপ্ দপ্ জ্বলছে। এইমাত্র রাঙসুঙু নামে এক পাহাড়ী সারল্যকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন বেষ্টনে বন্দী করে ফেলেছে সে।

উপত্যকা আর মালভূমি। চড়াই আর উৎরাইতে তরঙ্গিত এই নাগা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপর কয়েকদিনের মধ্যেই নেমে এলো লো শী মাস। এলো ফসল বোনার ঋতু। এই শিলাময় পৃথিবীর কঠিন আবরণের নীচে কোথায় একটি অমৃতের ধারা রয়েছে, সে খবর জানা আছে নাগা কৃষাণী-দের। তারা জানে সেই প্রাণরস লক্ষ শিকড়ের জিভ দিয়ে শুষে শুষে বীজফসলেরা শ্যামাভ অঙ্কুরের মহিমায় সিঁড়িক্ষেত প্লাবিত করে দেবে। লো শী মাস। বীজ রোপণের মরশুম। পরিশ্রমের মরশুম। লো শী মাসের এই বীজকণা লো ফু মাসে বিশাল এই নাগা পৃথিবীকে সোনালী লাবণ্যে ভরে দেবে—সেই প্রত্যাশায়, সেই খুশীর সৌরভে পাহাড়ী মানুষগুলো আমোদিত হয়ে রয়েছে।

ছোট্ট জনপদ সালুয়ালাঙেও বীজ বোনা শুরু হয়েছে। শিলাময় উপত্যকার দেহে দেহে আনন্দিত কলরব। জোয়ান ছেলেরা, যুবতী মেয়েরা ধাপে ধাপে সাজানো সিঁড়ি-ক্ষেতে 'বিউলা' ধানের বীজ বুনছে। লো শী মাসের রোদ আশ্চর্য উজ্জ্বল। ছুরির ফলার মত শাণিত। খরদীপ্ত। সেই রোদই ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

একসময় ঝুনো (সিঁড়িক্ষেত) থেকে অজস্র কণ্ঠে একটি পুলকিত গানের সুর ঝংকার দিয়ে উঠলো। একই সুরে সকলে সুর মিলিয়েছে। পাহাড়ী সুর, পাহাড়ী লয়, পাহাড়ী গমক। গানের সুরটা দোল খেতে খেতে দক্ষিণ পাহাড় পেরিয়ে দূরতম আকাশের কোন নিরুদ্দেশে উধাও হয়ে যাচ্ছে:

> ম্যাফে রোনি নুখেশে লে হো,
> সুলে ফাচুনুগি।
> এলু হো নায়েঙকোহানুগি লে হো,
> আমুহু রেমিন্যু।

কয়েকটি মেয়ে পরস্পরের বাহু ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছন্দিত পদক্ষেপে আলপথের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। অপরূপ সুরেলা গলায় তাদের গানের ধরতাই:

> সুলে ফাচুনুগি।
> সুলে ফাচুনুগি

একপাশে বিশাল একখানা পাথরের রাজাসনে জাঁকিয়ে বসেছে বুড়ো সর্দার। সারা মুখের রাশি রাশি কুঞ্চনে একটি পরম খুশীর হিল্লোল বয়ে চলেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের থাবায় মুঠোমুখ বর্শাটা দুলিয়ে দুলিয়ে গানটার তারিফ করতে লাগলো সে।

এদিক সেদিক কয়েকটা পোষা শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চরে বেড়াচ্ছে। ঠোঁটের

আঘাতে পাহাড়ী মাটি চিরে চিরে ার সন্ধান করছে লালঝ‍্‌টি মোরগের কিছ্‌ খাদ্যের প্রত্যাশায় পাথরের চাঁজে হন্যে হয়ে ঘ‍্‌রছে পোষা কুকুরের ঝাঁক।

আ-আ—হ্‌রে, ও কে? কে রে?" রাজাসন থেকে চীৎকার করে উঠলো দর্দার। আর সংগে সংগে মিলিত মনোরম পাহাড়ী গানটা ফালা ফালা ঁড়ে গেল। সকলেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

ট জোয়ান ছেলে বললোঃ "এটোঙা তো মনে হচ্ছে রে সন্দার!"

টাঙা!" তড়াক করে বাদামী পাথর- থকে লাফিয়ে উঠলো ব‍্‌ড়ো সর্দার। ক্ষণ দক্ষিণ পাহাড়ের চ‍্‌ড়ায় একটা বিন্দ‍্‌র মত দেখাচ্ছিল। একট‍্‌ করে সেই বিন্দ‍্‌টা স্পষ্ট থেকে র হলো। তারপর সিঁড়িক্ষেতে এসে মান‍্‌ষের র‍্‌প নিল। এটোঙা!

সমস্ত এটোঙার চারপাশে চক্রাকারে য়ে দাঁড়ালো সালুয়ালাঙ গ্রামের । ছেলেমেয়েরা। সকলের পিংগল চোখে বিচিত্র একটি বিস্ময় স্তব্ধ গয়েছে। এটোঙার সারা দেহে বিচিত্র জ্জা ঝলমল করছে। পরণে নীল‍্‌চে প্যান্ট, মাথায় সাহেবী ট‍্‌পি, সব‍্‌জ কাঁধ থেকে কোমরের সীমানা প‍্‌র্যন্ত নো একটা মণিপ‍্‌রী ঝোলা। পায়ে রঙের ব‍্‌ট জ‍্‌তো। প্যান্ট, ট‍্‌পি, শার্ট, জ‍্‌তো—এই শব্দগ‍্‌লি, এই রহস্যময় বস্তুগ‍্‌লি পাহাড়ী জ্ঞানের অভিধানে একান্তই অন‍্‌পস্থিত। এই পাহাড়, এই বন, এই ঝরনা ছাড়া তারা এইসব বিচিত্র জিনিস কোনদিনই দেখে নি। কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার অনেকেই একটা সসম্ভ্রম ব্যবধান বজায় রেখে অপলক চোখে এটোঙাকে দেখছে।

ব‍্‌ড়ো সর্দার কন‍্‌ইর বর্শা দিয়ে জোয়ান ছেলেমেয়েদের জটলাটাকে ছত্রখান করে একেবারে সামনে এগিয়ে এলো। সাল‍্‌য়ালাঙ গ্রামের সে-ই প্রাচীনতম মান‍্‌ষ। প্রাজ্ঞতম। পাহাড়ী জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতার সে সাক্ষী। অনেক দেখেছে সে। অজস্র ভূয়ো-দর্শন হয়েছে তার। কোহিমা শহরে, জ‍্‌নো-বটো, মোকক‍্‌চঙ্‌ আর আংখ‍্‌নোটিতে এমন পোশাকের বাহার, এমন সাজসজ্জার আশনাই সে অসংখ্য দেখেছে।

ব‍্‌ড়ো সর্দার এটোঙার ব‍্‌কের ওপর একটা জীর্ণ হাতের পাতা বিছিয়ে বললো; "হ‍্‌-হ‍্‌, তা এতদিন তুই কোথায় ছিলি রে এটোঙা?"

ম‍্‌দ‍্‌ একট‍্‌ হাসলো এটোঙা; "তা অনেক বছর হলো বস্তী থেকে ভেগেছিল‍্‌ম, কী বলিস সন্দার! কতদিন হবে বল্‌ দিকি?"

"বছর চারেক। তা ছিলি কোথায়? যে অংগামী মাগীটাকে নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে সাতমাস কাটিয়েছিস সেটা গেল কোথায়?"

"চার বছর ইম্ফলের জেলখানায় কাটালাম। সে অনেক কেচ্ছা। তা আমার বাপ-মা কোথায়? আমাদের কেস‍্‌ঙটা কোনদিকে? সব ভুলে গিয়েছি একেবারে।" একট‍্‌ থামলো এটোঙা; তার-পর বলতে শ‍্‌র‍্‌ করলো; "মেয়েটাকে তার বাপ নিয়ে গিয়েছে তাদের বস্তীতে। যাক্‌ ওসব। কেস‍্‌ঙের খবর বল্‌। বাপ-মা'র খবর দে তো শ‍্‌নি।"

একটা ক্লিষ্ট নিশ্বাস সমস্ত পাঁজরটাকে আলোড়িত করে বেরিয়ে এলো ব‍্‌ড়ো সর্দারের; "তোদের কেস‍্‌ঙ‍্‌ কী আর আছে? সেবার পাহাড়ে স‍্‌ঙ‍্‌কেনি (ভূমিকম্প) হলো। পাথর চাপা পড়ে তোদের কেস‍্‌ঙটা গ‍্‌ড়ো গ‍্‌ড়ো হয়ে গেল; আর একটা বড় আতামারী গাছের তলায় পড়ে তোর বাপ-মা একেবারে চেপ্টা হলো। সবই বরাত। তোদের অতবড় ন‍্‌গ‍্‌সোরি বংশটা একেবারে লোপাট হয়ে গেল। আর তোরও কোন পাত্তা নেই।"

"হ‍্‌? হ‍্‌—ভালোই হলো। দ‍্‌নিয়ার সব লোপাট হয়ে যাওয়াই ভালো। বল্‌ দিকি বাপ্‌-মা কেমন করে চেপ্টা হয়েছিল; ছবিটা এ‍ঁকে নি।" ক্ষিপ্র হাত চালিয়ে মণিপ‍্‌রী ঝোলার মধ্য থেকে খানকয়েক সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল বের করলো এটোঙা।

"ছবি! ছবি কী করে?" কৌত‍্‌হলে আর আগ্রহে দ‍্‌ চোখে চকমকি জ্বললো ব‍্‌ড়ো সর্দারের।

"হ‍্‌—হ‍্‌—সব দেখবি!" রীতিমত প্রজ্ঞাবানের মত দেখাচ্ছে এটোঙাকে।

চারপাশ থেকে জোয়ান ছেলেমেয়েরা নিবিড় হয়ে এসেছে আরো। সকলের গলায় সমান আগ্রহ, সমান অন‍্‌সন্ধান; "তোর হাতে ওগ‍্‌লো কী রে এটোঙা?"

"এটার নাম হলো কাগজ আর এটার নাম হলো পেন্সিল। এইবার দেখ কী করি? আমার বাপ্‌-মা আতামারী গাছ চাপা পড়ে মরেছিল তো! দেখ, দেখ—" সাদা কাগজের ব‍্‌কে কালো পেন্সিলের নিপ‍্‌ণ কয়েকটি রেখায় একটি বিধ্বস্ত প‍্‌র‍্‌ষ আর একটি নারীর ছবি ফ‍্‌টিয়ে তুললো এটোঙা। তারপর সামনের দিকে প্রসারিত করে বললো, "কী রে সন্দার, অনেকটা এই রকম না?"

"হ‍্‌—হ‍্‌—" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, সারা দেহ দ‍্‌লিয়ে দ‍্‌লিয়ে ছবিটার তারিফ করলো ব‍্‌ড়ো সর্দার। সাদা কাগজ আর পেন্সিলের কয়েকটি নগণ্য টানেটোনে এমন একটা ক‍্‌হক, এমন একটা ইন্দ্রজাল যে ল‍্‌কিয়েছিল, তা কী ব‍্‌ড়ো সর্দার জানতো! সাল‍্‌য়ালাঙ গ্রামের প্রাচীনতম মান‍্‌ষ সে। প্রথমে সম্ভ্রমে আর মধ‍্‌র শ্রদ্ধায় মনটা আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার পরেই তীক্ষ্ণ সন্দেহে দ‍্‌ষ্টিটা কুঞ্চিত হলো। সন্ধানী দ‍্‌ষ্টিটা এটোঙার ম‍্‌খের ওপর দোলাতে দোলাতে ভাবতে লাগলো—এই চারটে বছরে এটোঙা কোন ডাইনী কী কোন

টেটসে আনিজার কাছ থেকে এই ভোজবাজি শিখে এলো। চারপাশের জোয়ান ছেলে-মেয়েরাও বিস্ময়ে একেবারেই গতবাক হয়ে গিয়েছে। লো শী মাসের এই উজ্জ্বল রোদের দিন এমন একটা মজাকে যে তাদের সালুয়ালাঙ বস্তীতে আমন্ত্রণ করে আনবে, তা কী তারা জানতো?

"হু—হু—হুই ইম্ফলের জেলখানায় বসে বসে একটা মণিপুরীর কাছ থেকে এই ছবি আঁকা ভালো করে শিখেছি রে সন্দার।" অপরূপ রূপময় এক কাহিনীর পটক্ষেপ উঠলো। শুরু হলো এক রমণীয় ইতিহাসের। গল্প আরম্ভ করলো এটোঙা।

অপরূপ এক কাহিনী। বিচিত্র এক আখ্যান। সে আখ্যান এটোঙার চার বছরের অজ্ঞাত আর রহস্যময় জীবনের নেপথ্যে স্থির হয়ে রয়েছে। চার চারটে বছরের ধূসর পর্দার অন্তরালে আর একটা নিপুণ অতীত যে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে এটোঙার সেই অতীত এই পাহাড়ের উপত্যকায় আর প্রস্রবনে, উতরাই আর চড়াইতে, বনময় টিলায় টিলায়, গুহা আর কন্দরে যে বিকীর্ণ —সে ইতিহাস সালুয়ালাঙ গ্রামের প্রত্যেকটি নারী, প্রত্যেকটি পুরুষ জানে।

এখন যেখানে খোখিকেসারি কেসুঙ : ঠিক তার পাশ থেকেই পাটল রঙের পাথরের দেওয়াল ঋজু রেখায় আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। আর সেই দেওয়ালটা একটা সমতলের আকার নিয়ে যেখানে ওক বনের নিভৃত ছায়ায় নিঃঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে, ঠিক সেখানেই ছিল নগাসোরি কেসুঙ। ওপরে সোনালি খড়ের চাল, চারপাশে পাহাড়ী বাঁশের দেওয়াল, অমসৃণ পাথরের ভীত। সেই কেসুঙে বুনো মায়ের কামনা আর পাহাড়ী বাপের পৌরুষে রক্তে রক্তে ধারণ করে ছোট্ট একটি আরেলা ফুলের মত জন্ম নিয়েছিল এটোঙা। কবে, কোনদিন এই পাহাড়ী পৃথিবীর মাটি সে স্পর্শ করেছিল, আজ আর তা মনে নেই। সেদিন তারায় তারায় আকীর্ণ বিশাল আকাশটায় হয়ত অনিপুণ একটি আঁচড়ের মত ফুটে উঠেছিল আনিজ উইখু। সে সংবাদ এই গ্রামের প্রাচীন মানুষগুলি জানলে জানতেও পারে।

মায়ের কোল থেকে একদিন মাটিতে নামলো এটোঙা। একটু একটু করে তার বিচরণের সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হতে লাগলো। সবল দুটি বাহুতে, পেশীময় দেহে এই পাহাড় থেকে, এই অরণ্য থেকে কণায় কণায় স্বাস্থ্য আহরণ করলো সে।

শিশু এটোঙা থেকে কিশোর এটোঙা। তারপর যৌবনের রঙেরসে পাহাড়ী ছেলে এটোঙার দেহে, মর্মের কোষে কোষে জন্ম নিল অপরূপ রূপময় এক জোয়ান পুরুষ। কিন্তু আশ্চর্য! সালুয়ালাঙ গ্রামের অন্য জোয়ানদের থেকে সে আলাদা। একেবারেই স্বতন্ত্র। মোরাঙের বাঁশের মাচানে সকলের সঙ্গে সে-ও পাশাপাশি শুলো। অবিবাহিত ছেলেদের চরিত্রের জন্য এ-এক পাহাড়ী প্রথা। দেহমনকে পাপের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য, নারীর লালসা আর রিপু থেকে রক্ষা করার জন্য মোরাঙ হলো একটি নিরাপদ দুর্গ। একেবারে স্পর্শের সীমানায় শুতো অন্য ছেলেরা; তাদের কবোষ্ণ নিঃশ্বাস এসে পড়তো দেহের ওপর। তবু তাদের সঙ্গে একটিও রঙ্গরসের প্রসঙ্গ তুলতো না এটোঙা। একটি কথাও বলতো না পারতপক্ষে। মোট কথা, নিজের চারপাশে একটা ধূসর রঙের অন্তরাল রচনা করে নিয়েছিল এটোঙা।

এই পাহাড়ী জীবনের আশা-বেদনা, এই পাহাড়ী পৃথিবীর ভয়াল ভীষণতা সম্পর্কে কোন মোহই নেই এটোঙার মনে। চেতনায় নেই কণামাত্র কৌতূহল। অতিকায় বর্শা নিয়ে গহন অরণ্যে সে শিকারে যেতো না, পাহাড় চূড়ায় অগ্নিকুণ্ড রচনা করে বুনো মোষ ঝলসে মাংসের যে উৎসব হতো, শত্রুর মুণ্ড উপড়ে এনে মোরাঙের সামনে যে আদিম উল্লাসের পার্বণ চলতো, সিঁড়ি-ক্ষেতে ফসল বোনা আর ফসল কাটার দিনে নাচ-গানের যে আনন্দিত হল্লা শুরু হতো সেসব জায়গায়, সব সময় এটোঙা অনুপস্থিত।

এটোঙার বাপ রিজিমাথঙ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠতো : "এই কী হয়েছিস বল দিকি; শিকারে যাবি না, খানোতে (সিঁড়িক্ষেতে) বীজদানা বুনতে যাবি না, আবাদ করবি না; তো কী করে কী হবে? আমাদের এত বড় নগাসোরি বংশ। দু-চারটে শত্রুর মুণ্ড না আনলে ইজ্জৎ থাকবে না। একটা খারিমা শিকার করতে পারিস না কি আমার শত্রুর মুণ্ডু! সব ইজ্জৎ তুই ডোবাবি।

"আমি তার কী জানি!" চক্ষের পলকে কেসুঙ থেকে সামনের উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে যেতো এটোঙা।

"আস্ত একটা টেফঙের বাচ্চা। ইজাহান্টসা সালো!" ঘোলাটে চোখ দুটো দপ দপ অগ্নিলেখা হয়ে জ্বলে উঠতো রিজি-মাথুঙের। "শয়তানের ছানাটাকে সুচেনু দিয়ে কুপিয়ে একেবারে সাবাড় করে ফেলবো। হু—হু—" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আজেলোর দিকে উধাও হতো রিজিমাথুঙ।

তিনটে ভরাঙ্গতে চড়াই আর দুটো বনময় উপত্যকা পাড়ি দিয়ে প্রথম সকালে দক্ষিণের পাহাড় চূড়ায় চলে যেতো এটোঙা। একটা বাদামি পাথরের ওপর বসে বসে দুটি মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে এই পাহাড়ের ভয়ংকর অথচ হিংস্র রূপটি শুষে নিত। নীচে, অনেক নীচে পাহাড়ী ময়ালের মত ঘনগর্জিত চিক্কু নদীর খরনীল দেহ। আকাশে আকাশে মেঘদলের মিছিল। আজামারী বনের ফাঁকে ফাঁকে সম্বরের মুগ্ধ দৃষ্টি। কোথাও কল্লোলিত প্রস্রবন। কোথাও নিঃশব্দ ঝর্ণা। সব মিলিয়ে এই পাহাড়, এই নদী, এই ঝর্ণা, এই বন, এই উপত্যকা পাহাড়ী ছেলে এটোঙার অর্ধস্ফুট বন্য চেতনায় একটি দুর্বার আবেগের রিমঝিম ছন্দে চমকিত হতো। আশ্চর্য! দক্ষিণের এই পাহাড় চূড়া প্রতিদিন সকালে কী এক কুহকে, কী এক বিচিত্র সম্মোহনে এটোঙাকে আকর্ষণ করে আনতো। এক সময় পাহাড়ী সকাল থেকে সোনালি আভাস মুছে অভ্ররোদ দুপুরে আসতো। তারও পর মোহন বেলাশেষ। প্রাক্ সন্ধ্যার ধূসর আবছায়ায় আবার গ্রামে ফিরতো এটোঙা। এ একেবারে নিয়মিত।

খাড়া খাড়া বাদামি পাথরের দেওয়াল। আশ্চর্য! একদিন নিজের অজান্তে সেই পাথরের দেওয়ালে একটুকরো নুড়ি দিয়ে অনিপুণ রেখায় চিক্কু নদী আঁকলো; আঁকলো সম্বরের মাথা, আঁকলো আজামারী বন। তারপর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো এটোঙা। অস্ফুট পাহাড়ী মনের কোথায় কোন আবেগের আড়ালে শিল্পের পরাগ ছড়িয়েছিল তার সৌরভে একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেল এটোঙা। একেবারে আমোদিত হলো।

মনেরাম এক নেশায় পেয়ে গিয়েছিল এটোঙাকে। এ নেশার কোন পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা নেই তার অস্ফুট পাহাড়ী মনে। তবু খাড়া খাড়া পাহাড়ের নরম নুড়ি দিয়ে এই পাহাড়ের, এই নদী-প্রস্রবনের রূপকে চিত্রিত করতে ভালো লাগে। একটু একটু করে দক্ষিণের পাহাড় চূড়ায় রাশি রাশি ছবির অক্ষরে নিজের পার্বত্য আবেগকে মুক্তি দিতে লাগলো এটোঙা।

আশ্চর্য! বিচিত্র এক বিস্ময়। সেই মোহন বেলাশেষটা এটোঙার চেতনার মধ্যে এখনও একটা অবাস্তব স্বপ্নের মত দোল খেয়ে ওঠে। (ক্রমশ)
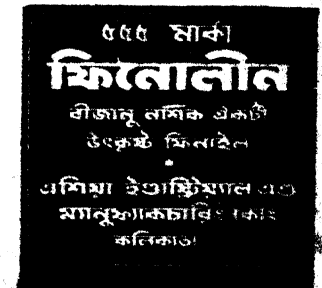
-া-া-া—ঃ একটা তৃপ্তির অব্যয় বেরিয়ে এলো লালমোহনের মুখ থেকে। আত্মতৃপ্তির সরব প্রকাশ। অধরোষ্ঠে লেগে রইল—মাঝরাতে ওঠা চাঁদের র মতন। লেগে রইল অনেকক্ষণ। তার কথা প্রতিধ্বনি তোলার আগেই দের মতো হারিয়ে গেল কারখানার সমুদ্রে। পাশের মেশিন থেকে মুখ তাকালো পঞ্চানন। হাতের কোপটা টেনে মেশিন বন্ধ করে পাশে এসে লা ওস্তাদের। পঞ্চাননের ওস্তাদ মাহন।

ঞানন ডাকলোঃ ওস্তাদ—! পঞ্চাননের দরদ, হয়তো বা করুণাও।

লমোহন আরক্ত চোখে তাকালো শুধু, দিল না। মুখে চোখে বিরক্তির র সুস্পষ্ট, চোখে হয়তো জিজ্ঞাসা—কি বলতে চাস?

ঞ্চানন আবার ডাকলো, ওস্তাদ। একটু বললো, বেকার—বেকার হায় ওস্তাদ—রাস্তা ছোড়ো—বিলকুল নেহি া—'

ফিনিশ কোপ শেষ করে বাটালি খুলেছিল লমোহন। টুলপোস্ট থেকে বাটালিটা ল নিয়ে পঞ্চাননকে তেড়েই এলো [illegible]। দেবো মাথা ফাটিয়ে। বেরো, [illegible] এখান থেকে।

পঞ্চানন আশ্চর্য হল না, ক্ষুণ্ণ হল মাত্র। সরে এলো, স্টার্টিং গীয়ার টেনে নিজের মেশিন চালু করে কাজে মন দিল আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বুকটাকে ফুলিয়ে খানিক পর চুপসে দিয়ে গেল শুধু।

পৃথিবী তার গতিবেগ বন্ধ তো করলোই না, মেশিনগুলোও বন্ধ হল না পর্যন্ত—। বেয়াদাপ হাসি হাসতে লাগল উপেক্ষার মিলিং মেশিন, মনে হল, হাসতে লাগল ঘ্যাস ঘ্যাস, ড্রিলিং ক্যাচ কোচ ক্যাচ কোচ, শেপিং চলতে লাগল ঘটাং ঘট, আর প্লেনিং কিট-কট-কট-র‍্র‍্র‍্। সবচেয়ে বেশী হেসে উঠলো অন্য লেদগুলো যেন—

পঞ্চাননের চলে যাওয়ার পথে তাকাতে গিয়েই ওপাশের খালি জায়গাটায় নজর পড়ল লালমোহনের। বাঁ-হাতি টুলের আলমারির ওপাশটা খালিই। না, দাঁড়িয়ে নেই ভাইসরয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে না সি ইন সি। অন্ধকারের মতো অদৃশ্য একটা প্রেত দাঁড়িয়ে আছে হয়তো—সমস্ত কারখানাটার সহানুভূতি করুণা আর উপেক্ষার না-দেখা শরীর নিয়ে। তাকে সবাই আজ আর সম্মান করে না, করুণা করে—

বার বার শেষবার। শেষবারের মতো 'টাইল' জব কেটে দেখছিল লালমোহন। এবার কিন্তু নিশ্চয় ঠিক হয়েছে কাজটা। এ বিষয়ে তার সন্দেহের বাষ্প পর্যন্ত নেই। নারকোল তেল দিয়ে বাটালির ডগাটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মেজে দিয়েছে মাত্র। ষোলো-গুণো 'থ্রেডে'র 'কোরে' আর পিচে ঝকমক করছে দু' সেট চুড়ি হিন্দুস্থানীতে বলে চুড়ি, বাঙলায় গুনো আর ইংরাজিতে থ্রেড। চুড়ি তো সত্যিই চুড়ি, রুপোর চুড়ি। ঝলমল করছে, ঝকঝক করছে, চকমক করছে। ঠিকরে আসছে নর্থ-লাইট চুঁয়ে-আসা দিনের আলো, চুড়ির ঢেউয়ের মাথায় আর বুকে—।

যন্তরের আলমারি থেকে লালমোহন মাইক্রোমিটার বের করে নিল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কুয়াশায়, ভরে ভরে আসছে জলে। বাহান্ন শীতের জমানো কুয়াশা একসাথে ভিড় করেছে আজ। ভর করেছে সাতসাগরের নোনাজল। কোমরের গোঁজা থেকে উল্টোন কোঁচার খুঁট খুলে নিয়ে যতোবার চোখ মুছছে লালমোহন, ততোবার ভরে আসছে জল।

ডান কান থেকে ডাঁটি আর বাঁ কান থেকে সুতোর বাঁধন মুক্ত করে চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে নিল লালমোহন। মুছে নিল ভালো করে কাঁচ দুটো। ফতুয়ার পকেটের তলার অংশটা দিয়ে, সেই সঙ্গে মুছে ফেলতে চাইল সন্দেহের কুজ্ঝটিকাও। কি জানি, এবারেও না হয়ে থাকে যদি!

যদি না হয়ে থাকে—! ভাবাও যায় না, তা হলে কি হবে। আজই মেশিন উপড়ে নিয়ে যাবার কথা। এই লেদ [illegible]

কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে—উঃ—ওরা মানবে না, মেশিন উপড়ে নিয়ে যাবেই।

না, না, কিছুতেই মেশিন ছেড়ে দেবে না লালমোহন। চালাকি নাকি! সারাজীবন কাজ করেছে সে এই লেদে। এই লেদের গর্ভে জন্মেছে হাজার হাজার দিগ্বিজয়ী স্ক্রু-গেজ। এই লেদে স্ক্রু-গেজ জন্মেছে ইণ্ডিয়ায় প্রথম, জন্মেছে তারি হাতে। হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে এই মেশিন। ভাগাড়ে নিয়ে গেলেই হোলো!

অপরাধ কি! এ্যাকিউরেসি নষ্ট হয়েছে মেশিনের, জরায়ুতে ভর করছে জরা। তা থেকে যা জন্মায় বিকলাঙ্গ তারা। বিফল তারা স্ক্রু-গেজের বাজারে। গোদা বোল্টু কাটা চলে আজ, স্ক্রু-গেজ নয়। সবচেয়ে বড়ো ব্যারাম—'টেপার' যাওয়া, আগায় গোড়ায় সমান মাপ হয় না আর—

গ্রাইণ্ড করে ঠিক সাইজ করে নিয়েছে লাইনিং। টুলপোস্টের তলায় আর টেল-স্টকের পাশে স্লিপ গেজ গলিয়ে গলিয়ে মেপে নিয়েছে লালমোহন—কোন্‌খানে কতো 'থিকনেস' খাবে। আর তারি মাপে গ্রাইণ্ড করেছে লাইনিং। হোক দিকি মাপে ভুল, ইনঅ্যাকিউরেট, যাক দিকি টেপার—! গেলেই হোলো। মেশিন মেরামত করেছে না ছাই—দরকার নেই পাশকরা ছোকরা ডাক্তারের, সে নিজেই টোটকা চালাবে। মেরামত করতে এলো, দিন কতো নাড়াচাড়া করল, তা-না-না-না করল, রায় দিয়ে দিল—চলবে না, ফেলে দাও মেশিন।

আর সাহেবরাও হয়েছে তেমনি। ইন্সপেক্‌টাররা রায় দিয়েছে তো বাস—আর কি! নাও উপড়ে। এতোকালের এতো বিশ্বস্ততা, এতো উপার্জন! রেসের ঘোড়াকে বাতে ধরেছে আজ—।

এইসব ভাবতে ভাবতে মাপ নেয়া হয়েছে বার তিনেক। মগজে বাজে চিন্তা, হাতে মাপ হয় নাকি? চোখ দুটো হয়েছে এপার ওপার। বিশ্বাস হয়নি চোখকে। চশমা তো ছিলই—তার ওপর চেপেছে এবার আই গ্লাস। আতস কাচ আরো জোর গলায় বলছে এখন—না না হয়নি। কিছু হয়নি। আরো টেপার গেছে। আগায় সরু, গোড়ায় মোটা।

বড়ো বড়ো চোখ বিস্ময়ে উপড়ে আসছে। বিস্ফারিত হচ্ছে অবিশ্বাসে। কি, হয়নি! এবারও হয়নি! তবে? তবে কি হবে!

বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজের চোখকে লালমোহনের। যখন সন্দেহের কিছু নেই আর, পঞ্চাননকে ডাকলে লালমোহন; 'পঞ্চা, মাপটা দেখে দে না ভাই—'

নিজের মেশিন বন্ধ করে এলো পঞ্চানন। মেপে দেখল—একবার, দুবার, তিনবার। তারও চোখে মুখে যখন হতাশা ফুটে উঠল লালমোহন বললো, 'তোর মাইকটা দিয়ে দ্যাখ না। আমারটা যদি ভুল থাকে।'

তার উত্তর দিল না পঞ্চানন, শুধু বললো: ওস্তাদ—!

এবার আর বাটালি তুললো না, হাঁটু মুড়ে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে মেঝেতে বসে পড়লো লালমোহন। বসবার টুল আছে তার, অন্য সকলের মতো হাত কাটা শার্ট আর ঠ্যাং কাটা প্যাণ্টও পরতে হয় না তাকে। টুলে বসতে সাহস হোলো না তার, মনে হলো পড়ে যাবে সে। মাথাটা বেজায় ঘুরছে। মাথার ওপরে পুলী সুদর্শন চক্রের মতো ঘুরছে। তার চেয়েও জোরে ঘুরছে তার মাথাটা। লেদটাকে নির্ভর করে, তার গায়ে ভর রেখে বসে পড়লো মেঝেয়।

অন্যান্য মিস্ত্রিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সুপারভাইজার চার্জম্যানরা পাশ দিয়ে কতবার এলো, গেল। সকলেই শ্রদ্ধা করে তাকে। যার হাতের তৈরী স্ক্রু-গেজ রাখা আছে ব্রিটেনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে, সে কি বড়ো মিস্ত্রি, না যাদুকর। একটা কোপ বসিয়ে বাবরিটা এক নজর দেখে বলে দিত যে, আট লাখ মোটা, সে কি যাদুকর নয়! ইঞ্চিতে সাড়ে পনেরো থ্রেড কাটতে পারত যে, তার আজ এ কি দুর্গতি! কে তাকে ঘাঁটাবে? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবে অমন একটা লোককে! আজই না হয় খানায় পড়েছে—হাতী তো বটেই!

কিন্তু একটা কথা কেউই বোঝে না, পঞ্চাননও নয়। সাহেবরা আরো ভালো, আরো সূক্ষ্ম, কাজের প্রিসিশান লেদ আনতে দিয়েছেন, তাতে কাজ করবে না লালমোহন। ঐ হোলরুকই চাই—ঐ মেশিনখানাই তার চিন্তা, ভাবনা, বুকের পাঁজর—। কেন? ফোরম্যান সিমসন কি কম বোঝাচ্ছে! ফুরনের কাজে উপার্জন লালমোহনের কমতে কমতে সামান্যয় এসে দাঁড়িয়েছে, যা প্রফিট হয়, লস যায় তার চেয়ে ঢের বেশী, মাইনের কৌটোয় যা ভরে দেয় সিমসন, দয়ার দান সেটা, যেটাকে ওল্ড-এজ পেনসানও বলা চলে, সবাই জানে লালমোহনও জানে—ঐ মেশিনে ফাইন কাজ জন্মায় না আর,—তবু ঐ মেশিন-প্রীতি—! কেন?

তারা কি করে জানবে? কি করে বুঝবে তারা? ঐ কথাই তো চিন্তা করছিল লালমোহন। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঐ কথাই ভাবছিল লালমোহন। পরদার ছবির মতন তার গৌরবে উজ্জ্বল অতীত, স্মৃতির এলোমেলো হাওয়ায় ভেসে আসছিল চোখের সামনে। গত বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের অতল থেকে।

এ ঘরের ফোরম্যান তখন সিনক্লেয়ার। মজা করেছিল একটা বেশ—

গল্প করতে [illegible] নিয়ে এসেছিল, এই এখানে, যেখানে [illegible] বসে পড়ে সে আজ কাঁদছে। সবুজ বনাতের ঢাকাটা তুলে ধরেছিল একটা লেদের বাচ্চা দেখতে। এই সেই হোলরুক। বলেছিল: পছন্দ হয়?

পছন্দ! সেই পছন্দের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে সে আজও। সবুজ বনাতের আচ্ছাদনের তলায় এই বাচ্চা লেদের সঙ্গে সেই মুহূর্তেই শুভদৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার। আর আজ বুড়ী হয়ে গেছে এই মেশিন, এই অপরাধে আর অপবাদে

কিনা বলছেঃ আনতে দিয়েছি
।মার্কেন্স আরো প্রিসিশান লেদ?
' ফেলে দাও এটাকে—মেশিনের
ালে—
াহন বলেছেঃ তোমাদের ফিরিঙ্গি
ডাইভোর্স আছে। আমাদের
—মুসলমানও নই যে, তালাক
মার এই বয়েসে ছাড়বো একে—
র একসাথে ঘর করে? পাগল
াম বেইমানি। ছি—
াহনের মিহি হাত, মিহি মাপ।
মিলে মিহি মাপের স্ক্রু গেজ।
প্রথম, আর পাইওনীয়ার তার
ব। একে অন্যের পরিপূরক।
মানুষের জীবনই সম্পূর্ণ নয়
স একা, গাণিতিক সাংসারিক কোন
নয়। একের জীবন তো একার
অর্ধপূর্ণ।

ফ্লানেলের বিছানায় তাদের যৌথ প্রয়াসের সেই ফলগুলি। ফিনিশের রূপে অপরূপ, মেজারমেণ্টের নিখুঁৎ নির্ভুলতায় অতুলনীয়। ছোট কাঠের বাক্সেভরা আঙুর যেন।

দেয়ালের গায়ে পঞ্চাশগুণ বড় ড্রয়িংএ, পঞ্চাশগুণ বড় ছায়া পড়বে স্ক্রু-গেজের। 'জব'এর কনটুরের ছায়া, ড্রয়িংএর পেন্সিলের দাগে এক হয়ে মিশে যাবে।

সেই শ্যাডোগ্রাফে যাওয়া দরকারই মনে করত না লালমোহন। যান না, দেখে নিন, খুঁত না থাকে, খুঁতখুঁতি না থাকে আপনার মনে। আমি আর কি করতে যাবো, বুড়োমানুষ—

মার্কিনী তরুণীর সাথে প্রথম শুভ-দৃষ্টির সুফল এই তার হাতে তৈরী স্ক্রু-গেজগুলি।

শুভদৃষ্টি!

হ্যাঁ, শুভদৃষ্টি আর একবার হয়েছিল তার, সুহাসিনীকে বিয়ে করেছিল যখন। সেই বিয়েটা তার আগেই হয়েছিল, সেই প্রথমা। কারখানায় এই মেশিন আসবার আগেই ছোট্ট তার ঘরখানায় এসেছিল সুহাসিনী। হাসিখুশী কালো-কোলো ডাগর-ডোগর মেয়েটি—সত্যিই সুহাসিনী। কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ত, অকারণে। অকারণে, কখনও কখনও কম কারণেও—বোকার মতো লাগত তখন। তাই নিয়ে সুহাসিনীকে কালামুখ পর্যন্ত করত লালমোহন।

সুহাসিনী গেছে অনেকদিন আগে। আর আজ? মেশিনও ছেড়ে চলল নাকি।

একটা পর্বত-ভারি দীর্ঘনিশ্বাস লাল-মোহনের বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো।

অসুখ হলো হোলবুকের, সেই প্রথম অসুস্থতা গীয়ারের বুকে কফের ঘড়-ঘড়ি। অবক্ষয়ের প্রথম সূত্রপাত। গীয়ারের দাঁত ফাঁক হয়ে গিয়েছে। আর সেই ব্যারামই কাল হল তার। হায়রে—ডাক্তার-বদ্যিতে থৈ থৈ। হাউজ ফিজিসিয়ান নার্স কতো কী!

সেই সময়টা রাত্রিদিন কারখানায় কাটিয়েছে লালমোহন। প্রত্যেক হপ্তায় পাঁচ রাত্রি ছ'দিন একনাগাড়। বেয়ারিংএর টেম্পারেচার কতো, গীয়ারবক্সে তেল দরকার কিনা ঠাণ্ডা হতে, এমনি কতো অবজার-ভেশান। খাওয়া জুটত না লালমোহনের ঠিকমতো। আর ঘুম! সেকথা থাক—ঠিক টাইফয়েডের কেস আর কি! টেম্পারেচার নাও, বরফ চাপাও—সেই রকমই সব। সেই কঠিন ব্যারামের রুগীকে ছেড়ে আসা যায় না কি? লালমোহনও পারে নি, আর তাই তো অভিমান হলো সুহাসিনীর।

আর এমনি এক সপ্তাহান্তে শ্রান্ত মনে ক্লান্ত শরীরে ঘুম চোখে বাড়ি ফিরে লাল-মোহন দেখে সুহাসিনী নেই। হাসতে হাসতে চলে গেছে। তার আগের দিন চাকরি-যাওয়া জোয়ান একটা ছোকরাও উধাও—ঐ একই সঙ্গে।

সদ্য-ফোটা পদ্মকুঁড়ির যৌবন নিয়ে সুহাসিনী প্রতীক্ষা করেছে রাতের পর রাত। আর লালমোহন রাত জেগেছে সুহাসিনীর সতীনের রোগশয্যায়। কতখানি অপমান তার হাতে হয়েছে সুহাসিনীর—যাবে না, যাবে না তাকে ছেড়ে! সে কি সুহাসিনীর অপরাধ!

ছুটির দিনগুলো ছটফট করত, রবিবারের ছুটি মুক্তি শৃঙ্খল শনিবারের বিকেল আর সোমবার সকালের পিঞ্জরের বেড়া ভেঙে। শুয়ে-বসে গড়িয়ে জিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘামিয়ে......ঠেলে দিলেও যেতে চাইত না চাকা-ভাঙা সময়ের ঠেলাগাড়ি। কেবল চিন্তা—কখন আসবে সোমবারের সকাল,
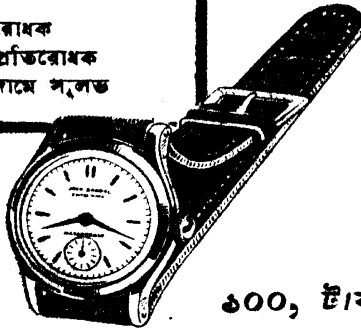
হাজিরীর বাঁশী বাজিয়ে। হোলব্রুকের পাশে হাজির হওয়া যাবে। সুহাসিনীকে ভালবাসত না লালমোহন, তা তো নয়। তবে সুহাসিনীর অনুযোগ ছিল—উল্টো। দুজনেই তার সন্তান ধারণ করেছে, সুহাসিনীর সন্তান অন্য পাঁচজনের মতোই—সাধারণ। আর হোলব্রুকের গর্ভের সন্তান লণ্ডন জয় করেছে, লালমোহনকে এনে দিয়েছে জয়মালা। তার যশের সৌরভ টেনে এনেছে কতো ভাইসরয় কতো সি ইন সি কে, এই তার লেদের এই পাশটায়। বিলিতি লোকেরা নাকি বলাবলি করত—তাই নাকি, ন্যাপিট নেটিভ তারা করেছে এই স্ক্রু-গেজ—সত্যি? এই গৌরব তাকে এনে দিয়েছে হোলব্রুকেই। সুহাসিনী চেষ্টা করলেও পারত কি?

সন্তানের কথা মনে হতেই একটা কথা মনে প'ড়ে গেল লালমোহনের। যার জন্যে সারাজীবন খোঁটা শুনতে হয়েছে তাকে। পাঁচজনের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে! ছি ছি, কাজটা সে আদৌ ভাল করে নি, হোলব্রুককে ভালবাসার নেশায়—

গা-ভারি তখন সুহাসিনীর, মাস পাঁচেক। শেষরাত্রের দিকে পা পিছলে পড়ে গেল সুহাসিনী কলতলায়। সর্বজনীন সেই কলতলা থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল পড়শীরা—অজ্ঞান, অচৈতন্য। রক্তারক্তি কাণ্ড একেবারে—

ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরবার পথ কারখানার সামনে দিয়ে। ডাক্তার বলেছিল—তুমি এগোও, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসছি আমি। ফেরবার সময় লালমোহনের নজরে পড়ল—লোক ঢুকছে কারখানায়। মনে পড়ল—ইঞ্চিতে সাড়ে পনেরো গুনোর পঞ্চাশগুণ বড় ছবি ড্রয়িং-অফিস থেকে পাওয়া যাবে আজই। যে কাজ কাল ফিনিস করে রেখেছে সে—

যেই না মনে পড়া—বিলকুল সব বিস্মরণ হয়ে গেছে তার। নিজের অজানতে অভ্যস্ত পা দুটো চলে গেছে কারখানায়। সেই ছোট্ট কাচঘরে রেখে যাওয়া ফ্লানেলের টুকরোয় শোয়ানো, কালকের তৈরী, ইঞ্চিতে সাড়ে পনেরো গুনোর চমক। শ্যাডোগ্রাফে পরখ হবে আজ ট্রায়াল সমেত দুটো। জোড়া ছেলে তার, লব আর কুশ দিগ্বিজয়ে বেরোবে তারাও একদিন—

শ্যাডোরুম থেকে বেরিয়ে ওতকার্যতার আনন্দে উত্তেজনায় মনে পড়ে গিয়েছিল সুহাসিনীর কথা। আঁ, তাইতো—ডাক্তার, গেছে তো! সুহাসিনী! সুহাসিনী কেমন আছে!

তার ঘণ্টাখানেক আগে ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছিলেন, সুহাসিনীর শয্যাপাশে উপস্থিত পড়শীদের—জোড়া ছেলে ছিল পেটে, লব আর কুশ, প্রসূতির ভয় নেই আর, এই যা ভরসা।

সুহাসিনীর মন বিকল ছিলই, শরীর বিকল হোলো এবার। একটার ওপর অন্যটার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল ধরল সহজেই। ফল—ঐ গৃহত্যাগ!

সুহাসিনীর ঘর ছাড়ায় লালমোহনের কষ্ট হয়েছিল খুবই, সন্দেহ নেই। কিন্তু কে একজন ফিল্ড মার্শাল কারখানায় ঢুকেই জিজ্ঞেস করেছিল, হয়ার ইজ ল্যাল-মোহন? সেটাও ভুলতে পারে না সে—

খট-খট সোঁ-সোঁ কট-কট-কটাং ঠং-ঠং—কারখানা তার নানা রকমের শব্দ নিয়ে লালমোহনের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল সে—। আজ সত্যিই সে বিরহী—কেউ নেই, কিছু রইল না তার দুনিয়ায়—সুহাসিনী থাকত যদি আজ, হয়তো এতোদিনে ছেলেপুলেতে পূর্ণ থাকত তার ঘর, ভরতি থাকত সংসার...

হঠাৎ কঠিন আওয়াজে দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল লালমোহনের।

মেশিনের ফাউণ্ডেশন বোল্টের তলায় চারটে ষণ্ডামার্কা লোক সবলে শাবল চালাচ্ছে। সিমেণ্ট কংক্রীটের সঙ্গে শাবলের সংঘর্ষে ঠিকরে বেরোচ্ছে আগুনের ফুলকি। তার হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পাথরের মেঝে। মেঝেটাও বলছে, উপড়ে নিও না, উপড়ে নিয়ে গেলে সি ই ন সিরা আসবে না আর এখানে।

ছেনি হাতুড়ি বোল্টগুলোর চারপাশে মেঝের ওপর অত্যাচার করেই চলেছে। চোখ বুজে অনুভব করছে সে সবই। কে যেন পিঠে হাত রাখল তার! হাতে মাখানো স্নেহ আর সান্ত্বনা—

সিমসন। টুল শপের ফোরম্যান: ডোণ্ট ফিল সরি ল্যালমোহান, আ' হ্যাভ অর্ডারড এ নিউ লেদ ফর য়ু, টমাস ওয়ার্ড' দিস টাইম। ফাইনার লেদ ফর ফাইনার জবস, মোর প্রিসিশান, ডোণ্ট ওরি—ডিয়ার ওল্ড চ্যাম—

আস্তে আস্তে চাপড়াচ্ছে লালমোহনের পিঠ, সান্ত্বনা দিচ্ছে প্রবোধ দিচ্ছে সিমসন। খেলনা ভেঙে যাওয়া ছোট্ট শিশুকে নতুন খেলনার আশ্বাস দিচ্ছে:

শী হ্যাজ গ্রোন ওল্ড। ইটস টাইম শী রিটায়ার্ড। লেট হার রেস্ট নাউ। গিভন য়ু লট অব ফাইন প্রোডাক্টস। থ্রু আউট হার ইভেণ্টফুল লাইফ অব ফেম। লেট হার রেস্ট ইন পীস নাউ—

তার মানে তো নিয়ে গিয়ে ফেলবে মেশিনের ভাগাড়ে। নীলেম ডাকতে আসবে ভুঁড়িওলা মারোয়াড়ী, টুপী মাথায় সিন্ধী, সরু সরু পাকানো হলদে কাপড়ের পাগড়ি বাঁধা ভাটিয়া। লোহার ওজন দরে কিনে নিয়ে যাবে, বেচে দেবে লোহা গালাইয়ের কারখানায়—এই তো রেস্ট ইন পীস—!

উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেশিন, মেঝে থেকে মূলে উন্মূলিত করে উপড়ে নিচ্ছে লাল-মোহনের হৃদপিণ্ড শরীরের স্নায়ুশিরার মর্মমূল থেকে।—শেষ হয়ে যাচ্ছে ত্রিশ বছরের গৌরবের ইতিহাস একটা।

মেশিনের তলায় নয়, শাবলের বাড়ি-গুলো পড়ছিল লালমোহন হাজরার মাথায়। পড়ছিল মাথায়, মগজে, চৈতন্যে চেতনায় বুকের মধ্যে আর আত্মসম্মানে। তার মনে হচ্ছিল তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তারই চোখের সামনে কেউ তার স্ত্রীকে চূড়ান্ত অপমান করছে যেন। মাথার ওপরকার গোটা শাফট লাইনটা সমস্ত পুলীর সুদর্শন চক্রের চক্রান্ত সমেত নেমে এলো লালমোহনের মাথায়। সমস্ত বেল্টগুলো ছিঁড়ে ছিটকে যাচ্ছে—তার মাথার স্নায়ু-শিরা যেন। অসহ্য যন্ত্রণা মাথার মধ্যে।

মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে, অতলস্পর্শ গহ্বর সেখানে। মাথাটা ফাঁকা নিরবয়ব, পালক হাল্কা শূন্যতায় ভরা। মাথার অস্তিত্ব নেই, ওজন নেই শরীরের। ঝড়ে ওড়া একটা ঝরা পাতার মতো ঘুরতে ঘুরতে আর পাক খেতে খেতে সেই তল-হীন গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল লালমোহন। গহ্বরটার না আছে তল, না আছে পার, তার ওপর তেমনি অন্ধকার। শাবল হাতে, চারটে যমদূত লালমোহনকে মাথায় বাড়ি মারতে মারতে নিয়ে যেতে লাগল। আর তাদের কাজের তদবির করছে ফুটফুটে ফরসা একটা লোক, টুলশপের ফোরম্যান সিমসনের মতো দেখতে অনেকটা—

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে মনে হতে লাগল শরীরটা অত্যন্ত দুর্বল, গুরুতর প্রহার করেছে কে যেন সর্বাঙ্গে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এ সে কোথায়? এই তো তার পরিচিত বিছানা। লালমোহনের মনে হতে লাগল, দরজার বাইরেই অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু। হোক হোক, মৃত্যু হোক তার বেঁচে থেকে আর লাভ কি? পরিজনরা ছেড়ে যাচ্ছে সব এক এক করে—

আচ্ছা, সে তো তার তক্তাপোশটায় শুয়ে তবে সেই তল না থাকা গহ্বরটা, কোথায় সেটা? ঐ যে সেই, কি যেন, কি যেন, সিমসন কি বলছিল যেন? খুব সুখ্যাতি

। তার কাজের। বলছিল মারডেলাস হয়েছে এই ভাঙ্গা লেদে। আর তাই াগ হয়ে গেল লালমোহনের, তার ুককে ভাঙ্গা বললো কেন? আর । করলো যেন? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, নাকে তুলে মাথায় মারল সিমসনের। ন রাগ করলো না—সিমসনের মাথার টা ফাঁক হয়ে গেল, তবুও হাসতে সাহেব। আর তার খুলির ভেতর বেরোতে লাগল শক্ত শক্ত ঘিলু, । এসে লাগল লালমোহনের বাহুতে। ুলো কী শক্ত, সিমেণ্ট কংক্রীটের া যেন। লালমোহনের ভয় হয়ে গেল, নাকে নিয়েই দৌড়তে লাগল সে। হোলরুকের জন্য সব ছেড়েছে সে, ুককে ছাড়বে না সে আজ, তাই কধে নিয়ে পালিয়ে এসেছে—কেন হ না?—

। ছেড়েছে সে—না! হ্যাঁ, সব ছেড়েছে। তারও ছিল, তার বৌ ছিল। তার ছিল সু-সুহাসিনী। ভরাদেহ যৌবন মাথায় আধ ঘোমটা টানা একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে ঘুর ঘুর করে বেড়াত, নানাভাবে ফন্দি আঁটতো, কি করে মাহনকে বেশীক্ষণ কাছে আটকে রাখা আজো যেন তার দেহের সুবাস ভারি আছে এই ঘরে। তা মেয়েটার চোখে ছিল বটে, মাঝে মাঝে সেও আবেশ-ল হয়ে পড়ত বৈকি! আজো মাঝে-যখন এক একদিন ঘুম ভেঙ্গে যায়, হয় ছায়া ছায়া কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ! মধ্যে—

ই তো ... তো মেঝেতে শুয়ে সিনী। আগে আগে যেমন তার সাথে মান করে মেঝেতে শুতো, আজও তাই আছে। এই তো হাত বাড়ালেই া যাবে—

রিচর্যা করতে এসে লালমোহন ঘুমিয়ে ল পর পঞ্চাননও মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল। লালমোহন হাত বাড়িয়ে সিনীকে ধরতে গিয়ে পড়ে গেল ননের গায়ের ওপর। গায়ের ওপর ছিল ভাগ্যিস, নইলে চোট লাগতে ত হবে—

াস তিনেক পর—

দিকে নীল শিখার জিভ দিয়ে চেটে । মাডগার্ডের ফাটল জুড়ে দিচ্ছে ল্ডিং, ওদিকে নিউমাটিক হ্যামার ছে খটখট খটখট—রিভেট করে দিচ্ছে ইরের ঝাঁপা বডি। লোহার কুচিতে, স, রডে, তারের জালে পোক্ত-করা সিজেন আর এ্যাসিটিলিনের রবার নলে, নর ঝালাইতে, ভিজে সুতোর একো-লা অবস্থানের অত্যাচারে ধরমতলার টপাথ জোড়া। দোকান ছোট্ট আয়তনে—কাজের পরিসর বড়ো। ছোট্ট ঘরে ঠাঁই হয়নি, নেমে এসেছে ফুটপাথে, পায়দল-ওলাকে ফুটপাথ থেকে হটিয়ে, নামিয়ে দিয়েছে ট্রাম রাস্তায়। জবর দখল করে নিয়েছে ফুটপাত বিনা ভাড়ায়, মৌলালি থেকে প্রায় ওয়েলিংটন। এ দোকানের প্রোপ্রাইটার নিখিল দাস একা নয়, পাশা-পাশি সব দোকান—ধরমতলার এপার ওপার—

মাঝখানে ট্রাম চলে ঠং ঠং, রিকশা চলে টুন টুন, বাস আর ট্রাক ভোঁ ভোঁ—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। জনে আর যানে কর্মচাঞ্চল্যে আর কোলাহলে ধরমতলা উদয়াস্ত সরগরম।

দাঁতের ফাঁকে নিভে যাওয়া পোড়া বিড়ি চেপে ধরে ওয়েল্ডিং করছিল নিখিল দাস। নিখিলের চোখে নীল ঠুলি-ওয়েল্ডিং গগলস্‌ ঘানির বলদের চোখেও ঠুলি থাকে, যাতে ঘানি ছাড়া অন্য দিকে নজর তার না যায়। ওয়েল্ডিংএর নীল শিখার দিকে খালি চোখে তাকালে দেখতে হবে না আর! সত্যি দেখতে হবে না আর, অন্ধ হয়ে যাবে চোখ।

ছোকরা একটা জোগানদার—হুকুম মাত্র টুকিটাকি এগিয়ে দিচ্ছে, সরিয়ে নিচ্ছে, তুলে ধরছে—

দোরগোড়ায় বসে আর এক ছোকরা, জোগানদার ছোকরার চেয়ে বয়সে বড়োই হবে। মোটরের ডাইনামো ওয়াইণ্ডিং করছে—জামা-পরা চুল-সরু তার পরাচ্ছে লোহার খাঁজে খাঁজে—

লালমোহন হাজরার লেদখানা চলছিল নিখিল দাসের দোকানে—সখেদে, পরম অযত্নে আর চরম অবহেলায় এই অনভি-জাত পরিবেশে—। ইচ্ছা ছিল না তার—তাঁবা পিতলের রিভেট কেটে অন্নসংস্থান জীবনযাপন করতে, কিন্তু উপায়ও তো ছিল না। নিজের ইচ্ছার চলে না সে, পরের ইচ্ছায় চলতে হয়, চালায় তাকে বিজলীর চাবুক—সার্কাসের রিং মাস্টারের হাতের ইলেকট্রিক হুইপের মতো—

সর্বাঙ্গে জরা, গীয়ারের দাঁত নড়ে নড়ে ফাঁক হয়ে গেছে। টেলস্টক আর টুলপোস্ট নড়বড়ে হয়ে গেছে। লীড স্ক্রু গ'জে গেছে, বেয়ারিং থেকে আওয়াজ আসছে ঘটঘট। গায় জায়গায় জায়গায় চাকলা উঠে গেছে, রঙের জলুস তো কবেই গেছে, খানিকটা করে মেদও। টার্নার ছোকরাটা বেয়ারিং-এর মাথায় মাঝে মাঝে লাথি মারছিল, নইলে নাকি চলে না—

পাংশুবর্ণ রক্তশূন্য পাণ্ডুর চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল একটা লোক, টার্নার ছোকরার ঐ লাথি মারা। তার মুখের অভিব্যক্তিতে মনে হচ্ছিল লাথিগুলো পড়ছে বেয়ারিংএর নয়, তারই মাথায়। মাথায় সবে চুল গজিয়েছে লোকটার। সর্বাঙ্গে কঠিন আর দীর্ঘ রোগভোগের স্বাক্ষর। দাড়ি কাটা হয়নি মাসাবধি, দাড়ির চুল আর মাথার চুল সমান লম্বা আর সমান পাকা। চোয়ালের ফাঁকে ঢুকে গেছে গালের চামড়া। গায়ে ছেঁড়া একটা আধময়লা ফতুয়া, বেশে বাসে চেহারায় লোকটা বৃদ্ধ-বীভৎস— সহানুভূতির উদ্রেক না হয়ে, হয় ঘৃণার—।

ওয়েল্ডিংএর গরম লোহার ছালে নিভে যাওয়া বিড়িটা ধরিয়ে নিল, চোখে ঠুলি নিখিল দাস। দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল, ভ্যালা জ্বালায় পড়লুমরে বাবা। লোক আমার দরকার নেই, তবু নিতে হবে! মামাবাড়ির আব্দার নাকি—। টার্নার দরকার নেই আমার, তা ভালো আর মন্দ। রিভেটটা-আসটা কাটা, সেলফের ডায়নামোর কমিউ-টেটারটা ছুঁয়ে দেয়া একটু—কাজ তো এই!

লোকটা কিন্তু মিনতি করেই চলেছে।

'না হয় মাইনে নাই দেবেন, বার চারেক চা হলেই চলবে। দুটি পায় পড়ি আপনার, দয়া করে আমাকে আপনার এখানে কাজ করতে দিন—

হাতের কাজ বন্ধ করে সোজা তাকালে নিখিল দাস।

'বলি, ব্যাপারখানা কি! দোকানের কিছু জিনিস নিয়ে সরে পড়বার তাল, না? ওসব চালাকি চলবে না, সরে পড়ো এখান থেকে! ওরে ও গণশা—পাঁচ জ' রডখানা নে'আয় দিকি—দিই ব্যাটার চালাকি বের করে—ব্যাটা চোর!—বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে—অভ্যেস যায়নি আজো, ফাটক থেকে বেরিয়েছো ক'দিন বাছাধন?'

লেদখানাকে নজরবন্দী রেখে, ধুঁকতে ধুঁকতে ওপাশের ফুটপাতে গিয়ে বসেছে লালমোহন।

ঝাঁপ টেনে দোকান বন্ধ করার সময়, তালাগুলো বার বার টেনে দেখেছে আজ নিখিল দাস। আর ততোবারই ওফুটে বসে থাকা লালমোহনকেও আড়চোখে দেখেছে—

চোখে ঠুলি নিখিল দাস, সব কিছু নীল দেখে—

ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ ট্রাম গুডনাইট জানিয়ে গেছে। জনবিরল ধরমতলা—

লালমোহন চোরের মতো উঠে এসেছে এ-ফুটে-নিখিল দাসের দোকানের সামনে। এইখানটা ছেড়ে যেতে পারছেন না সে। কালও তো দোকানের ঝাঁপ খুলবে, দেখা যাবে লেদখানা, চোখের দেখায় ট্যাক্সো নেই।

এবছর বাতাসে এখনও শীত আসেনি, শিহর এসেছে মাত্র—

খুঁজে খুঁজে গরম জায়গা বের করে নিয়ে শোবার উদ্যোগ করল লালমোহন। ঐ আতপ্ত ফুটপাতের উপরই।

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

॥ ৩১ ॥

নাংগা পর্বত, নন্দা দেবী আর কাঞ্চ চূড়া। কাশ্মীর, গাড়োয়াল, নেপাল আর এমন কি তিব্বতও। মানচিত্রে দাগ দেওয়া এই সব কটা জায়গাতেই আমার পায়ের ছোঁয়া লেগেছে। অনেক পাহাড়ে চড়েছি। অনেক দেশ চাক্ষুস করেছি। বহু অভিজ্ঞতার উজানস্রোত ঠেলে এগিয়ে গেছি। কিন্তু সেখানে যাওয়া এখনও বাকী। সেখানে—সেই চোমোলাঙমায়। সেই মহিমময় বিরাট পাহাড়টিতে। ডেনম্যান্ সাহেবের সংগে সেই যে এক ঝটিতি অভিযান চালিয়েছিলাম তারপর থেকে পাঁচবছর পার হয়ে গেছে। তার উঁচু পিঠে চড়ে সেই যে টাইগার উপাধি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে চৌদ্দবছর কেটে গেছে। ওদিকে আর যাইনি। ওকে দেখিনি। মাঝে মাঝে ভাবি, অবাক হয়ে ভাবি সত্যিই কি কোনদিন এভারেস্টে আবার ফিরে যেতে পারবো। ভাবি, আমার যা প্রাণের ধন, তার সংস্পর্শ থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখাই কি দেবতাদের ইচ্ছা?

কিন্তু দেবতারা আরও অনেক বেশি করুণাময়। তাই আবার আমার সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটলো। আবার, আবার, আর একবার। আর এ সুযোগ এলো আমার বয়স যখন তিরিশের এলাকা পেরোবো পেরোবো করছে তখন, ঠিক ঊনচল্লিশ বছর বয়সে! তবে আমি যে এভারেস্ট থেকে ফিরে ফিরে এসেছি এ সে এভারেস্ট নয়, এক নতুন এভারেস্ট। কারণ যুদ্ধের পর সেখানে যে সমস্ত অভিযান শুরু হোল তাদের কেউ আর উত্তরদিক ধরে এগোয়নি। গিয়েছিল দক্ষিণের পথে। আর একই পাহাড়ে এক একবার এক একদিক থেকে ওঠা 'নতুন পাহাড়ে ওঠারই সামিল। তাই এবারের এভারেস্ট অভিযানে যাওয়ার পথটা একদিক থেকে যেমন নতুন, আমার কাছে আবার একদিক থেকে তা পুরোনোও বটে। হ্যাঁ, তিব্বত থেকে রঙবুকের উপর দিয়ে যে পথ ধরে আমরা এভারেস্টে অভিযান চালিয়েছিলাম তার চেয়ে এবারকার অভিযানের পথটা আমার কাছে পুরানো তো বটেই। এভারেস্টে যাওয়ার দক্ষিণদিকের এই পথটা শোলো-খুম্বুর মধ্য দিয়ে গিয়েছে। শোলোখুম্বু, আমার সেই ছেলেবেলার আশ্রয়। আর যদিও এই পথ দিয়ে আমি কখনও এভারেস্ট ওঠবার চেষ্টা করিনি, তবুও এই অঞ্চলটার নাড়িনক্ষত্র তো আমার জানা। এ যে আমার স্মৃতিতে, আমার স্বপ্নে মিশে রয়েছে। এবার, দীর্ঘ আঠার বছর পর, আমার মা'র সংগে আমার দেখা হবে' আবার আমি থামি'র পিছনে যে পশুচারণ মাঠ, সেখানে আমার মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। দেখবো সেই উত্তুংগ মহিমময়ের সুউচ্চ শীর্ষ চূড়া, যার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা পাখীরও নেই। আমি আবার আমার 'বাড়িতে' ফিরে যাচ্ছি। দুদিক দিয়েই একথাটা সত্যি।

রাজনীতির চক্করে পড়েই এই পথ পরিবর্তন করতে হল। তিব্বতে তখন কম্যুনিস্ট রাজ কায়েম হয়েছে। পশ্চিমী দেশ—ইউরোপের পশ্চিম দেশ—থেকে আসা কোনো অভিযানের সাধ্য নেই সেখানে ঢোকে। নেপালে এদিকে শান্তভাবে বিপ্লব হয়ে গেছে। বাইরের জগতের কাছে সে ধীরে ধীরে তার দরজা খুলে দিচ্ছে। ১৯৫০ সালে এইচ ডবল্যু টিলম্যান আর আমেরিকান ডাঃ চার্লস হোস্টন কাঠমাণ্ডু থেকে শোলোখুম্বু দিয়ে এভারেস্টের দক্ষিণ পাদদেশে ভ্রমণ করে গেছেন। সেকথা আগেই বলেছি। তার পরের বছর এসেছিলেন, এরিক শিপটন, একেবারে পুরো একটা অভিযান নিয়ে। ওই অঞ্চল দিয়ে এভারেস্টে ওঠা যায় কি না, সেটা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কোনো দলটি কিন্তু খুব বেশিদূর উঠতে পারেনি। টিলম্যান আর হোস্টন সাহেবের তো সাজসরঞ্জাম বলতে কিছুই ছিল না। পুরো ওঠা সে দূরের কথা, খানিকটা যে উঠবেন তারও ক্ষমতা ছিল না। শিপটন সাহেবের দলবল ছিল কিন্তু তিনি খুম্বু হিমবাহ পর্যন্ত গিয়ে এমন একটা বড় রকমের খাদের সামনে পড়লেন, যে সেটা পার হওয়া তাঁর দলবলের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। প্রথম দলটা ম্যালোরি সাহেবের মতেই মত দিলেন। অনেক বছর আগে ম্যালোরী সাহেব এই পথে এভারেস্টে

সর্দারের কাজে ঝকমারি কম নয়। তেনজিং কুলীদের ঝামেলা মেটাতে ব্যস্ত।

লো লা'র কাছ থেকে খুম্বু চূড়াকে দেখা যাচ্ছে
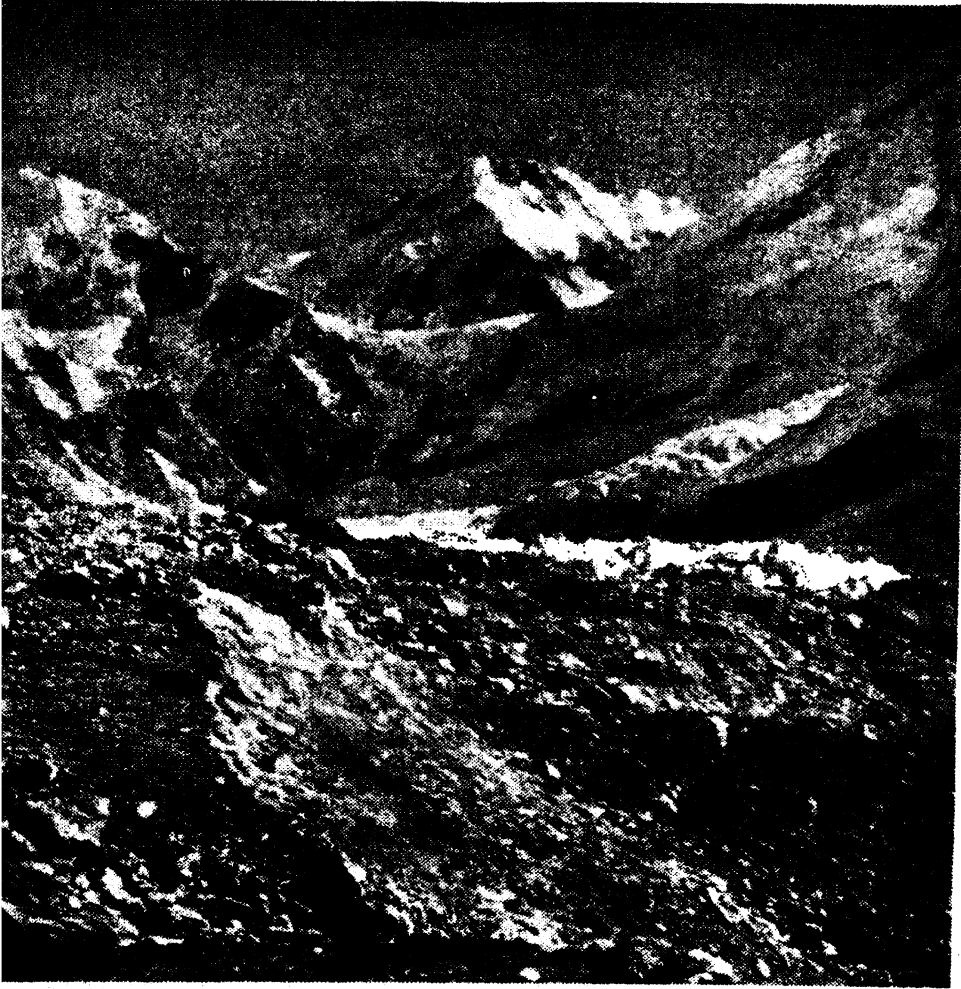
করেছিলেন। তিনি লো লা'র গেছিলেন। সাহেব বলেছিলেন, ওটা উত্তরদিকের পথ থেকে। এ পথে এভারেস্টে ওঠা হবে না।

তবুও তিব্বতের দরজা যখন রুদ্ধই হল তখন এই পথটি ছাড়া দ্বিতীয় পথ তো আর রইল না। অকম্যুনিস্ট দুনিয়ার পক্ষে হয় এই দক্ষিণের পথ ধরেই এভারেস্টে এগিয়ে যেতে হবে আর না হয় এভারেস্টের আশা ছাড়তে হবে। সেই ১৯৫২ সালে এই নতুন পথটা ছাড়া এভারেস্টের পক্ষে আরও একটা নতুন জিনিস দেখা দিল। এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসের সেই গোড়া থেকে শুরু করে এপর্যন্ত এভারেস্ট ছিল 'বৃটিশদের পাহাড়।' বৃটিশরা ছাড়া আর মাত্র দুটো জাতের লোকই এর কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। একজন আমেরিকান, সেই হৌস্টন সাহেব আর অন্য জন হলেন একজন দিনেমার। নাম, লার্সেন। ১৯৫১ সালে তিনি খুম্বু থেকে রঙবুক পর্যন্ত একটা চক্কর দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আর কেউই এই পাহাড়ের গায়ে তাঁদের পা ঠেকাতে পারেন নি। এইবার তার পরিবর্তন হল। বিরাট পরিবর্তন। আগে, সেই পুরানো দিনে তিব্বত, ইংরেজ ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিতো না। কিন্তু নেপাল সমস্ত দেশের পর্বতারোহীদের কাছেই তার নতুন দরজা খুলে

দিলো। আর নবাগতদের মধ্যে সবার আগে দেখা দিলেন সুইসরা।

খবরটা যেদিন দার্জিলিঙে পেণছালো, সেই দিনটি আমার কাছে সোনা হয়ে আছে। দুটো চিঠি এসেছিল। একটা সিধে আমার কাছে। আর একটা 'হিমালয়ান ক্লাবের সেক্রেটারী মিসেস হেন্ডারসনের কাছে। ওরা আমাকে তাদের দলের সর্দার করে নিতে চাইলো। আমি যে শুধু এভারেস্টেই ফিরে যেতে পারছি তা নয়, যাচ্ছি এমন একটা দলের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে খুব মৌজ করে এককালে পাহাড়ে পড়েছি। এই অভিযানের সব সাহেবগুলোকে আমি চিনতাম না। কিন্তু ওদের দলের নেতা ডাঃ উইস-ডুনাণ্টকে কয়েক বছর আগে দার্জিলিঙে দেখেছি। আর ওদের দলের দুজনের—রেনে ডিটার্ট আর আন্দ্রে রচ—সঙ্গে তো রীতিমত দোস্তিই আছে। খাতির জমেছিল ১৯৪৭ সালে গাড়োয়ালের সেই অভিযানে। অন্য সাহেবগুলোও যে এদের মতই হবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। চিঠিতে ও'রা জানতে চেয়েছেন, "আমি যাব কিনা?" আমি খেতে পারি কিনা, আমি নিশ্বাস নিতে পারি কিনা, একথাও তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন? ক'দিন ধরে বাড়িতে যে কাণ্ডকারখানা শুরু করলাম তাতে আঙ-লাহমু আর আমার মেয়েরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, আমাকে ভূতে পেয়েছে।

টাকাপয়সার দিকটা সামলাবার দায়িত্ব নিলেন হিমালয়ান ক্লাব। আমার উপর ভার পড়লো শেরপাদের নিয়োগ করবার। সুইসরা দার্জিলিঙ থেকে তেরোজন শেরপা নিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল যে শোলোখুম্বু থেকে তাঁরা আরও দশজন শেরপা নেবেন। শেরপা জোগাড় করতে গিয়ে দেখি এভারেস্টে যাবার ইচ্ছে ওদের খুব বেশি একটা নেই। কেননা আগের বছর শিপটন সাহেবের অভিযানে কিছু গোলযোগ হয়েছিল। যে সমস্ত নেপালী কুলি সেই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন তারা নালিশ জানালে যে, তাদের পুরো মাইনে তারা পায়নি। গোলমাল বেধেছিল একটা ক্যামেরা নিয়ে। ক্যামেরাটা হারিয়ে গিয়েছিল। হয়ত চুরিও হতে পারে। তাই অভিযানের শেষে বক্শিশ টর্কশিস কাউকে দেওয়া হয়নি। আমি তাদের বোঝালাম, "হয়তো তাই-ই, কিন্তু তার সঙ্গে এই সুইসদের সম্পর্ক কি?" কিন্তু ওরা অতশত বোঝে না। পাহাড়ে চড়তে গিয়েই না ওদের এইসব গোলমালে পড়তে হয়েছে। কাজেই তারা আর পাহাড়ে চড়তে যাবে না। তাছাড়া এভারেস্ট অনেক বড়, অনেক বেশি বিপজ্জনক। দক্ষিণের এই পথ দিয়ে তাতে ওঠাও প্রায় অসম্ভব। অন্যের কথা ছেড়েই দিলাম। অমন

যে বাঘা সর্দার 'টাইগার' আঙ্‌তারকে, ১৯৫১ সালের অভিযানে যে ছিল সর্দার, সেও আর এবার গেল না। সে আমার সঙ্গে কুড়ি টাকা বাজী ধরল যে, সুইসরাও শিপটনের দলের মত খুম্বু হিমবাহের সেই

বিরাট তুষারের খাদটা পার হতে পারবে
যাই হোক আমি শেষপর্যন্ত তেরজন
ভাল শেরপাকে নিয়োগ করতে পারলা
তারপর বসন্ত শুরু হতে না হতেই আ
কাঠমাণ্ডু উপস্থিত হলে সাহেবদের

।। এই বসন্তকালই শেরপাদের র মরসুম। আমি যাঁদের টাঁরা ছাড়া আরো ছ'জন ই অভিযাত্রীদলে ছিলেন লেন দু'জন বিজ্ঞানী। শুনে মনে হ'ল দলটা শক্ত- ; নয়, দলের লোকগুলোও বড় আর রুচ্ ১৯৪৭ সালের সেই অভিযানের (যাতে আমিও ছিলাম) পর থেকে হিমালয়ের আরও নানা পাহাড়ে চড়েছেন। তাঁরা এখন বেশ হিমালয়ের ঘাঘু পাহাড়-চড়িয়ে হয়ে গেছেন। অন্য যাঁরা এসেছেন তাঁরাও মশহুর। জেনেভা অঞ্চলে ফরাসী-সুইস্ পাহাড় চড়িয়েদের মধ্যে এ'রা সব খাশ খাশ আদমী। এ'দের মধ্যে সব থেকে ওস্তাদ বোধহয় রেমোঁ ল্যাম্বেয়ার। তাঁর সংগে এই আমার প্রথম আলাপ। আলাপের সংগে সংগেই দোস্তি খুব গাঢ় হয়ে উঠল। আমি ছিলাম ও'র সব থেকে উ'চু উ'চু জায়গায় চড়ার সংগী। ছিলাম সব থেকে প্রিয়, সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর সংগে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় ডিটার্ট বললেন, "দেখ, এবার আমাদের সংগে আমরা এই ভল্লুকটাকেও এনেছি।"

আর ল্যাম্বেয়ার আমাদের দিকে একটা মস্ত হাসি এগিয়ে দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। সেই মুহূর্ত থেকেই আমরা সবাই তাঁকে ভালবেসে ফেললাম। আর সেই মুহূর্তেই আমার নজর পড়ল তাঁর জুতোর দিকে। ভারি অদ্ভুত জুতোজোড়া। কি অসম্ভব ছোট। শীঘ্রই জানলাম, কারণটা কি? বেশ কয়েক বছর আগে আল্পস পাহাড়ে উঠে তাঁকে ঝড়ের কবলে পড়তে হয়েছিল। সেই সময় তাঁর পায়ে 'বরফের কামড়' লেগে জমে যায়। দুটো পায়ের পাতাই কেটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু ল্যাম্বেয়ারকে তা দমাতে পারেনি। তা সত্ত্বেও সুইস্ গাইডদের মধ্যে সে হয়েছে শীর্ষস্থানীয়। এবং এভারেস্টের চূড়ার প্রায় নাগালের মধ্যে পৌঁছতেও তাঁর বাধেনি।

কাঠমাণ্ডুতে আমরা টন টন খাদ্য আর সাজসরঞ্জাম গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শহরের কাছেই হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি। নতুন হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ড থেকে মাল এনে সেখানে নামানো হয়েছে। আমরা সেই সব মাল বাছাই করে বিভিন্ন নেপালী কুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। তারা এগুলো শোলোখুম্বুতে বয়ে নিয়ে যাবে। সচরাচর যা হয়ে থাকে, মাইনে পত্তর নিয়ে কুলিদের সঙ্গে খচাখচি বাঁধল। এবার আর ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি, অল্পেই মিটে গেল। আর এতে যে আমারও কিছুটা হাত আছে তা ভেবে বড় খুশী হলাম। সর্দাররা কুলিদের মাইনে থেকে সচরাচর যে ভাগটা বসান, আমি তা নিইনি। কাজেই ওরা ওদের মাইনে পুরোপুরিই পেলো আর এর জন্য এই অভিযানের ব্যয়ও কিছু-মাত্র বাড়লো না। যাই হোক ২৯শে মার্চ আমরা আমাদের যাত্রা করার দিনটা ধার্য করেছিলাম। আর সেই দিনই আমরা রওনা দিতে পারলাম। সর্দার হিসাবে আমার একটা কাজ ছিল, কার ঘাড়ে কোন বোঝা চাপাতে হবে সেটা ঠিক করা, অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় সে পদ্ধতিটি আমার সবথেকে ভাল বলে মনে হয়েছিল আমি সেই অনুসারে আমার কাজ করে গেলাম। আমি করতাম কি, প্রত্যেকদিন যেসব কুলি সবার আগে যাত্রা করতো তাদের ঘাড়ে রান্নাবান্নার সরঞ্জাম আর রসদ তুলে দিতাম। তার ফলে সারাদিন পথ চলার পর আমাদের রাতের খাবার চটপট তৈরী করে নিতে আমাদের আটকাতো না। তারপরে যারা যেতো, তারা বইতো তাঁবু আর এমন সমস্ত জিনিসপত্র যা রাত্রে আমাদের কাজে লাগে। আর সব শেষের লোকগুলো বইতো পাহাড়ে ওঠবার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। পাহাড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ওগুলোর কোন কাজ নেই বলে ওসব আমি পিছনের দিকেই রাখতাম। রাস্তায় কোন কারণে দেরির জন্য ওগুলো যদি ঠিক ঠিক সময়ে পৌঁছতে নাও পারতো তাতেও কোন ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু সারাদিন পথ চলে পরিশ্রান্ত দলটার যেখানে বিশ্রাম নেবার কথা, সেখানে পৌঁছে যদি খাবার আর আশ্রয়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তবে তা বড় খারাপ।

কাঠমাণ্ডু থেকে নামচে বাজার প্রায় একশ' আশি মাইল রাস্তা। পৌঁছতে আমাদের লাগল ষোলোদিন। বেশিরভাগ পথই আমরা শুধু পূর্বদিকে এগিয়ে গেছি। শুধু শেষের দুদিন চলেছি উত্তরে। কিন্তু গোটা পথটাই আমাদের চড়াই আর উৎরাই ভাঙতে হয়েছে। গোটা নেপালই গভীর গভীর উপত্যকা আর গিরিশিরা দিয়ে ঘেরা। সেসবও আমাদের পার হতে হয়েছে। পুরানো সেই তিব্বতী পথটা ধরে, এভারেস্টে আমরা যখন যেতাম তখন তার প্রায় পাদদেশ পর্যন্ত মালপত্র বয়ে নিতাম ভারবাহী পশুর পিঠে পিঠে। কিন্তু এ পথে তা অসম্ভব। পাহাড়ী পথের জন্য নয়। নেপাল আর তিব্বতের মধ্যে এই পথটা একটা প্রধান পথ। ঘোড়া কি খচ্চর এ পথে চলতে পারে। তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। অসুবিধা হয় অন্য জায়গায়। প্রত্যেক উপত্যকার নীচে দিয়েই এখানে খরস্রোতা নদী বইছে। সেই নদী পারাপারের জন্য যেসব ঝোলানো পুল তৈরী হয়েছে তার উপর দিয়ে মানুষ নানা কায়দা কসরত করে যেতে পারে বটে, কিন্তু ঘোড়া বা খচ্চরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই কারণের জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নেপালীরা মালপত্র সব নিজেদের পিঠেই বয়ে এসেছে। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

(ক্রমশ)

ায়ে এসে স্মিতা চলে গেল,
র খাটের পাশতলার দিকে,
লের কাছে। এলোমেলো ড্রেসিং
াজ কিছুদিন থেকেই এমনটি
। জায়গা বদলে সব শিশি
ছড়িয়ে রয়েছে অজায়গায়।
কজন যেন বুক-চিতিয়ে হয়ে
মুখ। অর্ধেক বুক জুড়ে তার
শুধু হাতের কব্জিবয়স। হঠাৎ
দেখলে মনে হয়, মাথাটি গিয়ে
কি কড়িকাঠে। প্রতির ঝালর
নার জাল পর্দাটি অসম্বৃত
চ একপাশে রয়েছে ঝুলে।
াত্রে বড়দি'র আর ঢাকমাটিও
ইচ্ছে হয়নি। বারে বারে, ঘুরতে
জর ছায়াটি চোখে পড়েছে বলে,
হয়ে আয়নাটিকে ঠেলে দিয়েছে
রে। পাশে একটি ছোট লেখবার
টেবিল। এগুলি বড়দির ব্যবহারের। হয়তো
কালে রাত্রে কিছু লিখেছে বড়দি। ফাউণ্টেন-
পেনটি পড়ে রয়েছে খোলা অবস্থাতেই।
কাগজপত্রও ছড়ানো। ছেঁড়া কাগজের
ঝুড়িতে পড়ে রয়েছে অনেকদিনের পুরনো
একটি বিলাতী ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি
এ বাড়ির নয়, গিরীনদা হাতে করে এনে-
ছিলেন। সেই থেকে ঘর আর জায়গা বদলে
বদলে পত্রিকাটি ওইখানে গিয়ে ঠেকেছে।
দেখে সুমিতার বুকের মধ্যে আর একটি
কাঁটার খোঁচা লাগল। হয়তো, ইচ্ছে করেই
বড়দি ম্যাগাজিনটাকে কখন ফেলে দিয়েছে
ওখানে। ছোট টেবিলের পাশে দুটি চেয়ার।
ঘরের মাঝখানে টি-পয়। একপাশে পাশা-
পাশি জামাকাপড় আর অন্যান্য জিনিসের
দুটি আলমারি। খাটের শিয়রের কাছে
আর একটি ছোট টেবিল, পাশে একটি ছোট
বইয়ের শেলফ। সেখানেও এলোমেলো
অবস্থা। দেয়ালে আছে দেশী ও বিলাতী
ছবি, মা বাবার ফটো। আর ফটো ছিল
বড়দি-গিরীনদার। কিন্তু ওদের সমস্ত
ব্যাপার যেদিন চাপা থাকতে থাকতে শেষ-
পর্যন্ত ভেরী বাজিয়ে ছড়িয়ে পড়ল
বাইরে, সেদিন সুমিতা দেখল, দেয়ালে
ছবিটি নেই। কে সরিয়ে নিয়েছে, কোথায়
রেখেছে ও কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

ভিতর-বাড়িতে এ ঘরটি সবচেয়ে বেশী
সাজানো। কেমন একটি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে
থাকে ঘরটির মধ্যে। আগে অবশ্য
এতখানি ছিল না। বড়দির বিয়ের পরেই,
এ ঘরটিরও যেন বিয়ে হয়েছিল। এ ঘরের
ফুলদানী থেকে দেয়ালের ছবি, সবকিছুর
মধ্যেই একটি বিয়ে বিয়ে ছাপ পড়েছিল।
সুমিতা ঠিক নিজের মনের মতনটি করে
বোঝাতে পারে না সঠিক অবস্থাটা। সেটাকে
ঠিক বিলাসিতা বলা চলে না। মেয়েরা বড়
হলে যেমন তার ভাবে ও কথার মধ্যে ওঠে
ফুটে কেমন একটি নতুন ভাব, বিয়ে হলেও
বোধহয় তাদের মনের মুকুরে কী এত নতুন
রূপের আবির্ভাব হয়। যে রূপ সুমিতা
সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু
ভাবতে গেলে ও একলাই বিচিত্র লজ্জায়
লাল হয়ে ওঠে। সেই নতুন রূপেরই ছাপ
সারাটি ঘরে।

তখন গিরীনদা আসতেন প্রায়ই।
থাকতেনও এখানে। যখনই বড়দি আসত,
তখনই। এ ঘরে গিরীনদার ছোটখাটো অনেক
চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যাবে এখনো।
মলিয়েরের ওই ন্যূড-ইন্-কুশ্যানটি যেদিন
টাঙানো হ'ল দেয়ালে, সেদিন শঙ্কিত লজ্জায়
লাল হয়ে উঠেছিল মেজদি। নিজের নামটি
শুনে, সুমিতা থমকে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে
শুনেছিল ওদের কথা। মেজদি বলেছিল,
রুমনিটা এখনো বড্ডো ছোট। না জানি
কী মনে করবে। জবাব দিয়েছিলেন
গিরীনদা। উনি ঠাট্টা করে মেজদিকে কখনো
মিস্ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মচারিণী, কিংবা
মেজদির রাজনীতি করার দিকে একটা
খোঁচা দিয়ে বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
দলনী নয়তো সোজাসুজি মেজদিও
বলতেন। বলেছিলেন, দেখ মেজদি, এটা
তোমরা বড় ভুল কর। দেখতে না দিলে
মানুষ দেখতে শেখে না। তখন লুকিয়ে
দেখাতে হয়। নইলে ওদের দেশের এত বড়
বড় শিল্পীদের ছবিগুলি যখন ভারতবর্ষে
পাঠায়, তখন নীচে লিখে দিতে হয়, ফর
এ্যাডাল্টস্ ওন্লি।

কথা শুনে হেসে উঠেছিল ওরা তিন-
জনেই। বড়দি মেজদি গিরীনদা। হাসি
শুনে বাবাও এসে হাজির হয়েছিলেন।
ছবিটি দেখে বলেছিলেন, বাঃ, চমৎকার!
বাবার আবির্ভাবে ও কথায় এরা তিনজনেই
কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। কোন কোন
সময় বাবার কথার মধ্যে কেমন একটু
শ্লেষের স্পর্শ থাকত। সেটুকু সহসা বোঝা
যেত না। বাবার ওই ভাবটুকু কিছু বড়দি,
আর অনেকখানি পেয়েছিল মেজদি। বাবা
শ্লেষ করছেন কি না সেটুকুও ওরা যেমন
ঠিক ধরতে পারছিল না, তেমনি বাবার
সামনে ছবিটি দেখতে বড়দি মেজদি কেমন
একটু ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য! দু' বছরেরও আগের
কথা। সুমিতার সঙ্গে বাবার যে সম্পর্ক
ছিল, তার ভিতর দিয়েই, গলার স্বর শুনে
অনুমান করেছিল ও, বাবা শ্লেষ বিদ্রূপ
কিছুই করেননি। মেজদিই কেমন একটু
অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আর
আপত্তি তোলেনি।

ফটোশিল্পী নবীন হালদারের ওই প্রাইব-
েের দুটি ফটোও তখনি টাঙানো হয়েছিল।
তখনো প্রশ্ন উঠেছিল, সেই একই। একটি
বিবস্ত্র মেয়ে-পুরুষদের নাচের ফটো,
অন্যটিতে, গাছপালা পাহাড় পর্বত নদ-
নদীর মতই উন্মুক্ত দেহ একটি যুবতী
দু' পা ছড়িয়ে রং দিয়ে অলংকৃত করছে
তার নাভিমূল।

এ সবই বড়দি'র বিয়ের পর। বাবার
ঘরে তো শুধু মায়ের ফটোটি আছে। এর
আর মেজদির ঘরে আছে আয়ারল্যাণ্ডের
দু'জন বিপ্লবীর ছবি, মহাত্মা গান্ধীর

সমুদ্রযাত্রা আর গতবছর যে মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেই যুদ্ধে মুক্ত লেনিনগ্রাডের উপর একজন বিজয়ী সৈনিকের ছবি। আর শুধু বই। ও ঘরে প্রসাধন সামগ্রীও কিছু নেই। সেসবও বড়দির ঘরেই। এ ঘরেরই এক কোণে, ওই ছোট্ট কুঠরী। ওরা তিন বোন ওখানেই কাপড় পরে। এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই ঠিক করে নেয় বেশবাস।

এ বাড়িতে প্রসাধন সামগ্রী সাজানো থেকেছে, বড়দির বিয়ের পর সেসবের আমদানীও হয়েছে সুপ্রচুর। কিন্তু এ বাড়িতে প্রসাধনের বাড়াবাড়ি হয়নি কোন-দিনই। একটু স্নো, পাউডার, শীতের ক্রীম, চুলের শ্যাম্পু, এমন এ বাড়ির প্রথানুযায়ী কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বড়দি'র বিয়ের পরেই নতুন নতুন জিনিসে উঠেছে ভরে ড্রেসিং টেবিল। নতুন সাজে সেজেছে এ-ঘর।

কিন্তু সব সজ্জা-ই আজ এ বাড়ির সংগে পাল্লা দিয়ে মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে। কেমন বিবর্ণ, শ্রীহীন, রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তিতে ভরে আছে সারাটি ঘর। এ-ঘরের অগোছালো জিনিস প্রতিদিন ঝি অচলা দিয়ে যায় গুছিয়ে। তবু যেন সবই অগোছালো, তবু যেন সবই এলো-মেলো, বিশৃংখল, বিষণ্ণ আর একটি অস্পষ্ট অপমানের ক্ষুব্ধ বাথায় গুমরোচ্ছে।

বড়দিকে সকাল থেকে সেই একইভাবে এলিয়ে এলোমেলো শুয়ে থাকতে দেখে আরো বেশী করে মনে হচ্ছে সেকথা। ওরই মুখের ছায়া নিয়ে সারাটি ঘরের মধ্যে ওই ভাঙা সাজের রুদ্ধ যন্ত্রণা মূর্ত্তি ধরছে। স্মৃতি দংশন করছে প্রতি কোণে কো… বিছানায়, টেবিল-চেয়ারে, সর্বত্র… সবখানে। সবখানে, অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা, অনেক রাতের অলি-দংশিত-স্মৃতি… অলক্ষিত ফোটা-ফুলগুলি বাসি আর বিব… হয়ে পড়ছে ঝরে ঝরে। অনেক মিষ্টি-হাসি… আবেশ-দৃষ্টি, এখন বিদ্রূপ আর… কষায়, জ্বালা ছড়াচ্ছে ব্যথা ও অপমানে…

বিনুনির বাঁধন খুলতে খুলতে, বড়দি… দিকে লুকিয়ে দেখতে দেখতে হাত কাঁপ… সুমিতার। ও যত খুলছে, জট পাকাচ্ছে… তত। কিন্তু এই ঘরে, এখন এইটুকুই… ছদ্মবেশের একমাত্র বেশ। এই আয়না… সামনে দাঁড়িয়ে ও রোজ এ সময়ে চুল খোলে… তেল মাখে। ও যতবার আজ এসেছে এ ঘ… ততবারই এসেছে চুল খুলতে। এবার…

সেই ছলনা নিয়েই। কিন্তু তবু হচ্ছে, তবু বড়দির দিকে তাকিয়ে ও কান্নায় ভরে উঠেছে ওর বুক। ঠিক তেমনি এলিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে ...র লাল আভাসিত রং-শাড়িটি দলিত ...কমন করে শুয়ে আছে, সে খেয়াল- নেই এখন। ওর বাঁ পায়ের উপর ...াড়িটি উঠে গেছে খানিকটা। আঁচলটি

চাপা পড়ে গেছে শরীরের তলায়, একটুখানি টেনে দেওয়া রয়েছে বুকের উপর দিয়ে। বিলাতী লিননের জাম-রং-ছাপা ব্লাউজ কুঁচকে কোমরের কাছ থেকে সরে উঁচুতে উঠে গেছে। বড়দির জামার কাঁধও বড়। কাঁধ, গলা, সবই যেন নিজের দিগন্তকে বাড়িয়ে, পোশাকের বিস্তৃতিটুকু দিয়েছে সংক্ষিপ্ত করে। একমাত্র ওরই জামার ছাঁট-

কাট্ একটু এই রকমের। আগেও প্রায় এমনিই ছিল। বিয়ের পরে আরো বদলেছে। বিশেষ, গরমের দিনের জামাগুলি তো কাঁধের প্রান্তে ডানা ছুঁয়ে বিস্তৃত বাঁকে দিশেহারা গতিতে নেমে যায় বুকের দিকে। যেন সেই দুর্জয় গতি থামবেনা। তারপরে হঠাৎ একসময়ে থামে, যখন সুমিতা, রুদ্ধ-শ্বাস হয়ে উঠেছে মনে মনে। পরে নিশ্বাস যদিও বা পড়ে, তবু এক সংশয় ও বিস্ময় মন বিলুলিত হতে থাকে। যেখানে এসে থেমেছে, সেখানেও কেমন এক বাঁধভাঙা অস্পষ্টতা। সুমিতা-ই লাল হয়ে ওঠে মুগ্ধ-লজ্জায়। মুগ্ধ হয় ও, ওই সময়ে বড়দিকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। কিন্তু ওর এই নতুন বয়সের লজ্জা ছাপিয়ে ওঠে সেই মুগ্ধতাকে। বড়দি যত চলাফেরা ওঠাবসা করে, ততই ধুকধুক করে ওর বুকের মধ্যে। তাকায় সকলের চোখের দিকে, যদি কেউ থাকে আশেপাশে, বিশেষ পুরুষদের। কিন্তু সবাই হাসে, কথা বলে, বড়দিও সমান তালে চলে সকলের সঙ্গে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। ও-ই শুধু মরে ভেবে ভেবে।

কিন্তু বড়দি এমনি চিরদিনই। ওর বড় হওয়ার সব কালটুকুই কেটেছে বাংলার বাইরে। লেখাপড়া শিখেছে কনভেন্টে। বি এ পাশ করেছিল লাহোরে। বাংলার কোনো সমাজের সঙ্গেই পরিচয় ঘটেনি ওর সে-পর্যন্ত। মেজদি কনভেন্টে ছিল কয়েক বছর। কিন্তু পুরোপুরি নয়। ওর কলেজ জীবনের সবটাই কেটেছে প্রায় কলকাতায়। কলকাতার ছাত্রী জীবনের রুচি বোধটাই রপ্ত হয়েছে ওর। তবু ওর সচকিত বলিষ্ঠতা একটু চোখে পড়ে বেশী। সেদিক থেকে সুমিতা একেবারেই কলকাতার মেয়ে। ঘরে-বাইরে, মনে, শিক্ষায় দীক্ষায়, চলাফেরায়, সবকিছুতে। কলকাতার এই পাশ্চিমশেলী আধুনিক ঝঙ্কার ও শোনে, ভালোও লাগে মাঝে মাঝে। কিন্তু বড়দির মত জামা পরার কথা আজো ভাবতে পারেনা।

মেজদি কখনো সখনো প্রায় ওই-রকমের জামা পরে। বড়দির বিয়ের সময় পরেছিল। বড়দি-গিরীনদা'র সঙ্গে কোন কোনদিন বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়তো পরেছে। গিরীনদা বলতেন, তুমি তোমার ওই স্বদেশী পোশাকগুলো দয়া করে ছেড়ে নিও মিস্ ঝুমনো। লোকে ভাববে, আমি দুই বাড়ির দুই মেয়েকে নিয়ে চলেছি।

মেজদি বলত, যাচ্ছি বেড়াতে। তোমার জন্যে তো যাচ্ছিনে।

গিরীনদা' বলতেন, তা বললে তো হবে না। যতক্ষণ আমার সঙ্গে আছো, ততক্ষণ আমারই।

মেজদি ওর পাতলা ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে বলত, ইস্।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেজদিকে মনে হত,

বড়দির মতই রহস্যপ্রিয় তরল।

এখন বড়দির ওই বড় গলা জামা আরো অনেকখানি নেমে এসেছে সব সংশয় পার হয়ে। সেদিকেও ওর খেয়াল নেই। অন্য সময় হলে এতক্ষণে লজ্জায় মরে যেত সুস্মিতা। কিন্তু নিয়ত ফিটফাট বড়দিকে এমন বিস্রস্ত অবস্থায় দেখে সমস্ত ব্যাপারটি ওকে আরো শঙ্কিত করে তুলেছে।

গলায় সোনার চেন্ হার গলা থেকে পিল্‌পিল্ করে নেমে এসেছে ডানদিকের বুকে। হাতে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। কানে দুটি বড় বড় লাল পাথর সোনার সরু আংটায় আটকানো।

কিন্তু সব মিলিয়ে ও যেন কেমন দলিত মথিত হয়ে পড়ে রয়েছে। ওর পাশের লাল টকটকে কম্বল, ওর লাল আভাসিত-রং-শাড়ি, জাম রং-ছাপা ব্লাউজ, তার ফাঁকে ফাঁকে ওর উন্মুক্ত ফর্সা ধবধবে নিটোল পায়ের গোছা, কোমরের উপরিভাগ, কাঁধ আর বুকের একটি অংশ যেন রং-বেরংএর নিক্ষেপিত ফুলের মত রয়েছে ছড়িয়ে। চুলের খোঁপাটি পড়েছে শিথিল হয়ে। চোখের চারপাশে ভিড় করেছে ছায়া। মাঝখানে অকম্পিত দীপশিখার মত চোখ জ্বলছে। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। আর ওর রক্তের মত লাল টকটকে ঠোঁট হঠাৎ নড়ে উঠছে। কী যেন ভাবছে ও। যেন সারা রাত ধরেই ভেবেছে। ওকে এই বেশে, প্রায় এমনিভাবেই, অনেককাল থেকে দেখছে সুস্মিতা।

বড়দি, মেজদির মত দোহারা নয়, কিন্তু ঠিক একহারা বলতে যেমন ছিপছিপে বোঝায়, ও তাও নয়। ওর হাতে পায়ে, চোখে মুখে এক অপূর্ব রূপের দীপ্তি। কিন্তু সেই রূপ যেন মেজদির মত গম্ভীর হয়ে ওঠেনি। বরং বড় হয়েও বড়দি সদা-সচকিত তরল স্রোতের মত তরতর করে চলেছে। ঠোঁটের কোণে নিয়তই একটু হাসি আছে লেগে। যখন ও অভিমান করে, দুঃখ পায়, রাগ করে, তখনো লেগে থাকে ওই হাসি-টুকু। কেবল মুখখানি লাল হয়ে ওঠে। যখন সেটুকুও থাকেনা, বুঝতে হবে, তখন ওর দুঃখ বড় গভীরভাবে বেজেছে। এমনিতে ওর চোখে মুখে চলায় ফেরায় গাম্ভীর্যের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ দেখে মনে হয়, ব্যক্তিত্ব বুঝি নেই ওর। কিন্তু যখন রাগ করে, তখন অনর্থ ঘটে যায়। অনাথায়, ওর এই অপরূপ রূপের মাঝে একটি সহজ মানুষ, কথায় কথায় গুণগুণ্ করে ফেরে অনুক্ষণ। মনের কোথায় যেন ওর একটু শৈথিল্যও আছে। এ-কাজে সে-কাজে কেবলি মেজদিকে জিজ্ঞেস করবে, 'আচ্ছা এটা কি করব বলতো ঝুমনো?' কিংবা, 'এটা ঠিক হয়েছে ঝুমনি?'

তখন গম্ভীর চিন্তাশীল মেজদি'র সামনে বড়দি'কে রূপসী আদুরে মেয়েটি মনে হয়।

মেজদি যদি বলে এইটি কর, নিশ্চিন্ত খুশিতে ও তাই করে। আবার ঝগড়া হ'লে কথা বন্ধ হ'তে দেরী হবে না। ওরা দুজনে যখন পথ চলে, তখন মেজদি চলে সামনের দিকে তাকিয়ে। বড়দি যায় চারদিকে চোখ বুলিয়ে। মেজদি যদি বলে, এটি খারাপ, এ চলবে না। বড়দি বলবে, একটু দেখলে কেমন হয়?

ওদের মিলের চেয়ে অমিল বেশী। কিন্তু ওদের ভাবও বেশী, যে ভাবের মধ্যে ছোট রুমনির জায়গা নেই।

বাবা বলেন, রুমনিটাও দেখছি উমনির মত হয়ে উঠছে। অর্থাৎ বড়দির মত। কিন্তু কোথায়, কোন্‌খানে, সঠিক বুঝতে পারে না সুস্মিতা। এমন কী, বড়দি ওর কাছে কেমন যেন অচেনা দূরে দূরে রয়ে গেছে। শুধু যে বয়সের অনেক তফাৎ, তা' নয়। আরো কোনো কোনো জায়গায় বড়দিকে ও সবটুকু চিনে উঠতে পারেনি।

এক জায়গায় বড়দি ওর বড় চেনা। সেখানে এক স্নেহময়ী বড়দি, যে রুমনিকে মাঝে মাঝে সাজায়, আদর ক'রে কিনে দেয় এটা সেটা। খেতে দেরী হলে বাবাকে ধমকায়, রবিদাকে ক্ষেপায়, বিলাসকে তাড়া দেয়, রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই নতুন নতুন খাবার তৈরী করে। মুখ গোমড়া ক'রে থাকতে জানে না ও। 'মেজদি যদি বলে রুমনি, চুল বেঁধে নাওগে।' বড়দি সেখানে বলবে, 'এ কি? চুল বাঁধিস্‌নি?' ব'লে নিজেই চিরুণী নিয়ে, ওর ছোটকালে শেখা মেমসাহেবদের মত অদ্ভুত ভঙ্গিতে চুল বেঁধে দেবে।

তারপরে এমন ভুলে যাবে যে, তিনদিন হয়তো রুমনির সঙ্গে কোন কথাই হবে না। চোখেই পড়বে না। যেন রুমনি এ বাড়িতে নেই, কিংবা বড়দি এখানে থেকেও ঘোরা-ফেরা করছে আর এক জগতে।

তখন বড় কষ্ট হয় সুস্মিতার মনে। অবাকও হয় আর দূর থেকে দেখে বড়দিকে। তখন আর বড়দিকে ও কিছুতেই চিনে উঠতে পারে না।

সেই বড়দি কেমন এক স্বপ্নময়ী। নিজের ভাবেই বিভোর। আড়ালে আঁচল ঠিক করছে, ব্লাউজটি টেনে দিচ্ছে, সারা মুখে একটি রহস্যের ঝিকিমিকি। যেন ও কী এক গোপন রসের হিন্দোলে, বিজয়িনীর মত ফিরছে নিঃশব্দ হাসির রেশ ঠোঁটে নিয়ে। বিয়ের অনেক আগের থেকে, সুস্মিতার চোখে যখন সবেমাত্র এ সংসারের বৈচিত্রে ফুটেছে কৌতূহল, তখন থেকেই দেখছে এমনি। যেন বড়দি কী একটি বস্তু পেয়েছে, কী নিয়ে কী যেন রচনা করছে মনে মনে।

ওদের বাড়িতে চিরকালই অনেক ছেলের আনাগোনা। তখন বড়দি সব সময়েই কারণে অকারণে বাইরের ঘরে যেত। ছেলেরা যখন আসত, তখন ওকে আরো বেশী ভাবে

চার রহস্যময়ী মনে হত। পাশে দাঁড়িয়ে লেও চিনতে পারত না রুমনিকে। কাছে বসে থেকেও পড়ে থাকতেন বহু- । সবাই ওর সংগে কথা বলতে ব্যস্ত। যন মহারানী, ওকে ঘিরেই সবাই। বাও রুমনির মতই, কাছে থেকেও দূর ক দেখতেন উঁকি মেরে মেরে। ও'রও বুকের মধ্যে রুমনির মত একটি অস্পষ্ট । বাবার জন্যে ক রিকম কষ্ট হত মনে। কিন্তু বাবা ঠিক কথা বলতেন, তেন, তবু ওই রকম মনে হত।

তারপরে রবিদার সংগে প্রথম এলেন নদা। তখন থেকে বড়দিকে ওর আরো রূপ আচ্ছন্ন মনে হত। কী এক আবেশে হাসছে, কথা বলছে, চলছে, ফিরছে, ই বোধহয় জানত না। অথচ চোখের । তেমনি সচকিত, স্রোতস্বিনীর মত কে ওদিকে প্রবাহিত।

তখন প্রায় মাসখানেকের মধ্যে একটি ও বড়দি বলেনি সুমিতার সংগে। কিন্তু চর্য! এতবড় একটি বিচিত্র ঘটনা রে যেন চোখেই পড়েনি এ বাড়ির। সুমিতাই এক অবাক ও অবুঝ ব্যথা সব লক্ষ্য করেছে।

তারপরে, বছর ঘুরতেই ও দেখল, বড়দির গ গিরীনদার বিয়ে। ওকে কেউ কিছুই নি। যে বলতে পারত, সে মেজদি। তু মেজদি কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। রে তো সময়ই ছিল না। বিয়ের পূর্ব-র্তে রহস্যমিশ্রিত দূরাগত বাজনার মত টি শব্দ পাচ্ছিল সুমিতা। বিয়ের তেই ওর এতদিনের সব সংশয়, তূহল, ব্যথা এক চকিত খুশির কল্লোলে ভেসে। হঠাৎ যেন ও বড়দিকে বিষ্কার করল নতুন করে। এত ভাল লাগ ওর বড়দিকে! কেন, ও তা' নিজেই ন না। বড়দি যে এত সুন্দরী, এমন সী, তা ওর চোখে এমন ক'রে ধরা ড়েনি।

হঠাৎ বাড়িতে কী ঘটে গেল। সারা বাড়ির ণে কোণে কেমন এক নিঃশব্দ উল্লাসের । ডেকে উঠল। ওর ভাব হয়ে গেল রীনদা'র সংগে। গিরীনদা এমন ক'রে দির দিকে চায়, এমন কাছে কাছে থাকে, খে শুনে, ওর প্রাণের প্রথম নির্ঝরের নস্তগ্ন হ'য়ে গেল। ওর সেই প্রথম র্ঝর হল, ওর সেই সময়ের কৈশোরের ন্তিম মুহূর্তে, দুটি আপন জনের মিলন খা। সেই সময়টা ও আর কাউকে দেখেনি, ড়দি আর গিরীনদাকে ছাড়া। দেখে দেখে, ী যে ভালবেসেছিল দুটিকে। যেন ছোট্ট য়েটির দুটি প্রাণের পুতুল।

যে অস্পষ্ট ব্যথা ও কৌতূহল নিয়ে ও াগে বড়দিকে দেখত, তখন ওই অস্পষ্ট ্যথাটুকু চাপা-খুশি-কৌতূহল হয়ে উঠল। ও দেখল, বড়দির সেই ভাববিহ্বলতা আরো গভীর হয়েছে। ওর লাল ঠোঁট দুটি আরো রাঙা হয়ে থাকে সব সময়। ওর ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু কী কারণে বন্দী হয়েছিল, সেটুকু মুক্তি পেয়ে অনাবিল হয়ে উঠল।

সুমিতা তখনো তেমনি বড়দির কাছ থেকে দূরে দূরেই। ওই দুজনকে মিলিয়ে ভালবেসেছে ও দূরে থেকেই।

ওর এই খুশির আসরে মেজদির ভূমিকা কম। তবু মেজদিও ওদের কাছে গেলে অন্য রকম হ'য়ে যায়। বড়দির মত মেজদিও সশব্দে হেসে ওঠে খিল্ খিল্ করে। বাবাকে মনে হ'ত যেন, পুতুল খেলার আসরে এসে-ছেন বয়স্ক মানুষটি। দেখেশুনে মজা পাচ্ছেন খুবই, তবে কিছুই করার নেই, বড় একলা।

সুমিতার এই খুশির কথাটুকু জানতেন সবচেয়ে বেশী রবিদা। বারে বারে জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে তুমি খুবই খুশি হয়েছ রুমনি?

—খু—উ—ব।

—কেন বলতো!

সুমিতা অবাক হ'য়ে বলত, বা রে! আপনি যেন কী।'

রবিদাকে সুমিতাই বলত, কেমন ক'রে বড়দির ঘর সাজানো হয়েছে। গিরীনদা কী বলেছেন। বড়দিকে নিয়ে কোথায় গেছেন। রবিদা বলতেন, তাই নাকি? ও, আচ্ছা? কখনো কখনো মনে হ'ত রবিদা যেন বড় বেশী গম্ভীর হ'য়ে উঠছেন শুনতে শুনতে। কিংবা শুনছেন না, দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন কিছু। বড়দি যখন গিরীনদাদের বাড়ি যেত, তখন রবিদার সংগে সুমিতা বেড়াতে যেত ও-বাড়িতে। সে-বাড়িও যত বড়, সাজানো গোছানো ততই সুন্দর।

তারপরে, বছর ঘুরতেই ও একদিন দেখল, বড়দি লুকিয়ে কাঁদছে ওর ঘরে। বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন সামনে। সেদিনটি ছিল আজকের এই দিনের প্রস্তাবনা। তারপরেও বড়দি এক বছর যাতায়াত করেছে গিরীনদাদের বাড়িতে। গিরীনদাও এসেছেন। গত বছর থেকে সবই বন্ধ হয়েছে।

বাকী আছে শুধু এই দিনটি। সুমিতা চেয়েও দেখল না ওর চুলের দিকে। দুটি বিনুনি যেমন ছিল, তেমনি আছে। ও দেখছে শুধু বড়দিকে। আজো বড়দি নিজের ভাবে বিভোর। কিন্তু এমন বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ সেদিন ছিল না। কোথায় গেল ওর সেই সদা-সচকিত হাসিটি। ও ওর সেই তরল স্রোতের সব প্রবাহটুকু যেন রেখে এসেছে গিরীনদাদের বাড়িতে।

এইখানে গিরীনদা বসতেন, ওইখানে শুতেন, এইটি, ওইটি, সেটি গিরীনদা এনেছিলেন এ ঘরে। তার মাঝে ওইভাবে শুয়ে আছে বড়দি। সারা ঘরের মধ্যে একটি তীব্র ব্যথা আবর্তিত হ'য়ে উঠছে। আজ সব শেষ, আজ এই শেষ দিনেই যেন সবচেয়ে বড় ঝড়ের প্রাক্ মুহূর্তের নিস্তব্ধতা এসেছে নেমে। চারদিকে এখন মেঘের সমারোহ। তারে বিলুলিত শুধু এ বাড়ির অলক্ষিত লতাটি।

মাতৃহীন ছোট্ট মেয়ে রুমনির অনেক সুখ দুঃখে, এ বাড়ির মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল ওকে বড়দি আর গিরীনদা। ওর সেই দিগন্তই আজ নিদারুণ বিদ্রূপ করে ফিরে এসেছে ভয়াল কুটিল বেশে।

সুজাতা ডাকল, রুমনি!

ধক্ ক'রে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। চোখাচোখি হ'ল বড়দির সংগে। বলল, অ্যাঁ? ওর চমকানি দেখে বোধ হয় চকিতে একবার সুজাতার ভ্রূ কেঁপে উঠল। বলল, রবি এসেছে?

তখনো সুমিতার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটি লাফাচ্ছে। বলল, না তো!

বলতে বলতে ও প্রায় টেনে ছিঁড়তে লাগল বিনুনি। কিন্তু বড়দি আর কিছুই বললে না। তবু মুহূর্তের মধ্যে যেন কী ঘটে গেল। সুমিতার হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি থামল না। ও যেন কিসের এক আলোকময় ইশারা পেল দেখতে। আজকের ছায়া অন্ধ-কারে, এক ঝলক বিদ্যুতের মত বড়দির প্রশ্নটি ওকে দেখিয়ে দিল নতুন পথ।

বড়দিও তবে রবিদার পথ চেয়ে আছে। জানতে চায়, কী সংবাদ আনবেন রবিদা। ও যেন স্পষ্টই দেখতে পেল, ব্যথায় বুক চেপে বড়দিও উৎকর্ণ হ'য়ে আছে ওই লোহার গেটের দিকে। এই শেষ মুহূর্তে তবে বড়দি শেষ কথাটি জানতে চায়! এখনো তবে সব বিবাদ বিসম্বাদ মিটতে পারে।

ও যেমন ত্বরিত পায়ে এসেছিল, তেমনি ত্বরিত পায়ে সামনের দরজা দিয়ে চলে গেল বাইরে। মনটা নিঃশব্দে গুন গুন করছে, যেন বাইরের ঘরে গিয়ে দেখতে পায় রবিদা কথা বলছেন বাবার সংগে। যেন দেখতে পায়, যেন দেখতে পায়...... (ক্রমশ)

রাণাঘাট যে এককালে সংগীতকলা অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, তার অনেক প্রমাণ পূর্ব-পূর্বকার প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। অদ্যকার প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করব। লোকমুখে যতদূর শুনেছি, ঘটনাটি একটি সত্যকার কাহিনীকেই আশ্রয় করে এখনও রাণাঘাটের বয়োবৃদ্ধদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আজ আমি এখানে সেই কাহিনীরই বর্ণনা করব। কাহিনী যে নিছক গল্পকথা নয়, কাহিনী যে কেবল কল্পনাকে অবলম্বন করে রচিত নয়, এর প্রমাণ রাণাঘাটের জমিদার পাল-চৌধুরী বংশ, এর প্রমাণ আমাদের গুরুজনেরা, এর প্রমাণ আমরা নিজে। আমরাও এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শুনেছি। শৈশবে এঁকে রাণাঘাট স্টেশনের আশে পাশে বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষা করতেও দেখেছি। ভৈরবের মত এঁর ছিল রূপ। সর্বদাই একদল কুকুর পরিবৃত হয়ে ইনি ঘুরে বেড়াতেন। ভিক্ষালব্ধ অর্থে খাবার কিনে, সে খাবার আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুচরগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। অদ্ভুত লোক ছিলেন ইনি, যেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের এক অংশ গ্রহণ করে ধরাধামে জন্ম নিয়েছিলেন।

এই মহাপুরুষের নাম ছিল যদুনাথ, কি যদুগোপাল। উপাধি কি ছিল, তাও ঠিক মনে করতে পারছিনে, সম্ভব চক্রবর্তী কি ভট্টাচার্য ছিলেন। মোদ্দা, ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। লোকে এঁকে যদু পাগলা বা যেদো পাগলা বলেই জানত এবং সত্যই বিশ্বাস করত যে, ইনি পাগল ছিলেন। আমরাও ছেলেবেলায় তাই জানতুম। কিন্তু কিসের পাগল ছিলেন, সেটাও এখানে জেনে রাখা দরকার। তিনি ছিলেন গানের পাগল, বিশেষ করে সুরের পাগল। যে বয়সে তাঁর গান শুনেছি, সে বয়সে সংগীত সম্বন্ধে কিছু না বুঝলেও এটুকু মনে আছে যে, রাণাঘাটের অতি দুরন্ত ছেলেরাও, যারা পাগল তাড়িয়ে বেড়াত, তারাও তাঁর সংগীতের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে হাতের ইট-পাটকেল হাতেই রেখে দিত, ছুঁড়ে মারা আর তাদের হতো না। রাণাঘাটের যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, পাগলামির পিছনে এক একাগ্র সাধনার ছায়া বিরাজ করছে,- ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ আশ্রয় করে গোপনে অধিষ্ঠান করছেন এক সিদ্ধ পুরুষ।

যে সময়ের আখ্যান বর্ণনা করছি, তখন রাণাঘাট ছিল রেলের এক বিখ্যাত জংশন স্টেশন। তখনও সম্ভবত দিল্লীতে ভারতের রাজধানী উঠে যায়নি। শেয়ালদা থেকে

রত্নাকর

রাণাঘাট হয়ে দার্জিলিং ছুটে যেত বড়লাট ও ছোটলাটদের স্পেশাল ট্রেন। রাণাঘাটে তখন ছিলেন এক ইংরেজ স্টেশন মাস্টার—নাম ছিল তাঁর গলস্টোন সাহেব। তিনি যদু পাগলাকে খুবই ভালবাসতেন। এত ভালবাসতেন যে, তাঁকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষা করবার অনুমতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, কোন মেল ট্রেন বা ডাক গাড়ি এলেই যদু পাগলা স্টেশনে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর আমরণ সহচর বেহালাখানি বাজাতে বাজাতে গান করে ভিক্ষা করতেন। দার্জিলিং মেলে যে সাহেব-মেমরা ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই যদু পাগলাকে চিনতেন। রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ি থামতেই তাঁরা যদু পাগলের সন্ধান করতেন এবং তাঁকে ডেকে টাকাটা-সিকিটা দিতেন। দার্জিলিং মেলে যদু পাগলের রোজগার বেশ ভালই হত। কিন্তু ঐ পূর্বে যা বলে এসেছি, তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ কাজেই কামিনী-কাঞ্চনের মোহের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। টাকা-পয়সা ছিল তাঁর কাছে হাতের ময়লা। ভিক্ষালব্ধ অর্থে, হয় খাবার কিনে সহচর ও অন্যান্য ইতরজনের মধ্যে বিলি করে দিতেন, না-হয় রাস্তায় ছড়িয়ে দিতেন।

এটুকু পরিচয় দেবার পর এবারে আসল ঘটনার অবতারণা করছি। এই ঘটনার সহিত পালচৌধুরী বংশের জীবন-চরিতের এক অধ্যায় নিবিড়ভাবে জড়িত হলেও সেই সম্মানীয় বংশের প্রতি কোনরূপ অসম্মান-জনক ইঙ্গিত করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এজন্য আমি পূর্ব হতেই তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। যে কাহিনী লোকমুখে শুনেছি, সেই কাহিনীই আমাকে বিষয়সূচী নির্বাচনে প্রোৎসাহিত করেছে। তখনও সংগীতকলার পরিপোষকরূপে সমগ্র ভারতময় পাল-চৌধুরী বংশের যথেষ্ট সুনাম। পশ্চিম থেকে দুজন, হিন্দু কি মুসলমান মনে নেই, কলাবিদ্ এসেছেন রাণাঘাটে, পাল-চৌধুরী বংশের বড়বাবুকে গান শুনিয়ে খুশি করে মোটা ইনামের লোভে। ওস্তাদদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হল গেস্ট হাউসে, যে অতিথিশালা অতীতে অনেক গুণী-জনকে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়েছে। বড়বাবুর নিকট ওস্তাদ দুজনের নাম সুবিদিত ছিল। কিন্তু কোষাগার তখন শূন্য, যথারীতি সে বৎসর খাজনা আদায় হয়নি, কবে কোষাগার খাজনা উশুলের দ্বারা পূর্ণ হবে, সে বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা নেই। বড়বাবু প্রমাদ গণলেন। সামনা-

সামনি আর্থিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে গান না শুনেই ওস্তাদদের বিনা পারিশ্রমিকে বিদায় দিতেও ইজ্জতে বাধে, আবার ইনাম দেবার মত অর্থসাচ্ছল্যও কোষাগারের নেই। বড়বাবু পড়লেন মহা মুশকিলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বড়বাবু তাঁর খাস বৈঠকখানায় আলবোলায় টান দিতে দিতে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালমেঘে অন্ধকার। উপায় কি? ঠিক এই অবসরে তাঁর এক আবাল্য সুহৃদ সেই কামরায় প্রবেশ করলেন। বড়বাবুর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, ব্যাপরা কি? এই ভর দুপুরে এমন মুখ ঝুড়ি করে বসে আছ যে?" বড়বাবু তখন সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটি প্রকাশ করে বললেন, "ভাই, মহা বিপদ গণছি! একদিকে এই ওস্তাদদের এমনি এমনি বিদায় দিতে আত্মসম্মানে ঘা লাগছে, অন্য দিকে এঁদের সসম্মানে অতিথি সংকার করবার অর্থসামর্থ্যও ঠিক এই মুহূর্তে আমার নেই। এখন এই উভয় সমস্যার সমাধান কি করে করা যায়, তুমিই বল।" বন্ধুবর হেসেই জবাব দিলেন, "এই কথা, এরই জন্য এত মাথাব্যথা? তা তুমি ভেবো না, আমি সবই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যাতে সাপও মরে, অথচ তোমার লাঠিও না ভাঙে।" বড়বাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে?" বন্ধু উত্তর দিলেন, "বলছি।" তারপরে, দুজনে মিলে অনেক গোপন পরামর্শের পর বন্ধুটি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

পরদিন পূর্বাহ্নেই গানের আসর বসবে। সব অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রাতঃকাল হতেই আমাদের গল্পের এই বন্ধুটি অতিথিশালায় পদার্পণ করলেন। ওস্তাদ দুজন তখন সুর ভাঁজছিলেন। বন্ধু তাঁদের আপ্যায়িত করে বললেন, "আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা করবার জন্য আমাদের সকল বন্দোবস্তই সারা হয়ে গেছে। বড়বাবু আমাকে এ খবর জানাবার জন্য এবং আপনাদের তদ্বির করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সামনেই চূর্ণী নদী। এমন নদী আর কোথাও পাবেন না। চলুন, ততক্ষণ আমরা স্নানটি সেরে আসি। তারপরে জলযোগ সেরে আসরে যাওয়া যাবে।" ওস্তাদ দুজন খুশি হয়ে কাপড়-জামা ছেড়ে তেল মাখতে বসে গেলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করে সুরের হাওয়া গগন বেয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। প্রাসাদের পশ্চিম ফটকের এক চত্বরের উপর বসে যদু পাগল গাইছিলেন এক ভৈরবী ঠুংরি। অপূর্ব সে রাগের বিস্তার, অপূর্ব তান-বার্তব, অপূর্ব কলাকৌশল। ওস্তাদদের তেলমাখা হাত দুটি আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেল, অভিভূতের মত তাঁরা সে দৈব-সংগীত উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

বন্ধু বুঝতে পারলেন যে, ওষুধ ঠিক ধরেছে। বললেন, "কৈ, নিন তাড়াতাড়ি। চলুন, ঘাটে যাই।" মন্ত্রচালিতের মত তাঁরা উঠলেন এবং চূর্ণী নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁদের পথ ছিল সেই ফটকের মধ্য দিয়ে, যাকে আগলে বসে ছিলেন যদু পাগল। সম্মোহনকারী সেই সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে ওস্তাদ দুজন যদু পাগলের পাশেই সেই চত্বরের উপর বসে পড়লেন। যদু পাগল তখন ধ্যানস্থ, বাস্তব জ্ঞানহীন। কেবল হাতের যন্ত্র তাঁর অবিরাম মীড়-গমকের কাজ করে চলেছে এবং কণ্ঠ হতে অমৃতের ধারা ক্ষরে ক্ষরে সুরলোকের সৃষ্টি করছে। শোনা যায় যে, যদু পাগল ভৈরবী সিদ্ধ ছিলেন। সে ভৈরবীর রূপায়ণ সত্যকার উপলব্ধিকার সাধকের কণ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন কণ্ঠে প্রকাশিত হয় না। কত দীর্ঘকাল ধরে এই অলকনন্দার ঝরনাধারা ঝরেছিল, কারো খেয়াল ছিল না। কিন্তু সুরের রেশ, যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। যদু পাগল চোখ তাকিয়ে সকলকে একবার দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মুখে তখন তাঁর স্বর্গীয় শোভা। বন্ধু তাচ্ছিল্য সহকারে একটি আধুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "এই বেদো, খুব গেয়েছিস, এখন যা। আমাদের কাজ আছে। আর ঐ নে, ওটা উঠিয়ে নিয়ে যা।" যদু আধুলিটা উঠিয়ে নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন।

যদুর চলে যাওয়ার পরমুহূর্তেই ওস্তাদ দুজনের বড়ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?" বন্ধু নার্কাস্‌টিকে জবাব দিলেন, "কে আবার? এক ভিখিরী। কেন, আপনাদের এর গান বুঝি বড় ভাল লেগেছে?" পরে খানিকটে হো হো করে হেসে বলে উঠলেন, "আরে, এর গানেই আপনারা এত মোহিত হলেন? আমাদের রাণাঘাটে এরকম গাইয়ে আরো আছে; এর চেয়ে ভালও আছে। আসর হোক, শোনাব'খন। আপনারা হচ্ছেন সম্মানীয় অতিথি আগে আপনাদের গান হোক, পরে গ্রামের গাইয়েরা গাইবে'খন।" বন্ধুর এই এক চালেই কিস্তিমাত। শোনা যায় যে, স্নান সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর আর তাঁদের চুলের টিকি কেউ দেখেনি। তাঁরা পালিয়ে বেঁচেছিলেন, গান শুনিয়ে ইনাম দাবী করা তো দূরের কথা।

জনশ্রুতি যে, যদু পাগল তাঁর দেহত্যাগের তিথি-নক্ষত্র পূর্ব হতেই ধার্য করে রেখেছিলেন। কথিত দিনে, তিনি গোর নগরের সন্নিকটে প্রবাহিত গঙ্গার জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তারা নাম জপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশনে মন্ত্রীরা একমত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রয়োজন দেখা দিলে রাজ্য সরকার দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইবেন।—"অথচ এদিকে দ্রব্যমূল্য অসম্ভবরকম বেড়ে গেছে বলে আমরা চেঁচামেচি করছি; মন্ত্রী আর সাধারণ লোকের মধ্যে এইখানেই তো তফাং। ভাগ্যিস তাঁরা বলে দিলেন, নইলে বোকার মতো অযথা ভেবে ভেবে অনিদ্রা ডেকে আনতুম"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে শিশুদের নাকি বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে —"ইঁচড়ে পাকাদের

সংখ্যাধিক্য দেখে মনে হয় কথাটি সত্যি" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী খাদ্যপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ভীত হওয়ার কিছু নাই।—"সত্যিই তো কালেব-বসন্তে-স্ট্রীট অ্যাকসিডেন্টে মরছি, নয় এবারে অনাহারে মরব, ভয়ের এতে কী-ই বা আছে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জওহরলালজীর আমার পরিভ্রমণ উপলক্ষে সেখানকার একটি কাগজ মন্তব্য করিয়াছে—ভারত বিশ্ব রংগমঞ্চে তৃতীয়

গোষ্ঠীর নেতারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। —"দুঃখের বিষয় এটাকে অনেকে স্রেফ রংগমঞ্চের ব্যাপার বলে মনে করেন বলেই এতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।" সহযোগীর মন্তব্য শেষ না হইতেই অন্য একজন বলিলেন—"তারা নিশ্চয়ই পর্দার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন!!!"

* * *

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সংগে লড়িবার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অন্য যে-কোন পার্টির সংগে সংযুক্ত হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। —"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ঝড়ের মুখে যে-কোন বন্দরই নিরাপদ" মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

শুনিলাম পাকিস্তানে খাদ্য অপরাধীদের দশ ঘা বেত মারিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। —"খুব ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু বেতের ভেতর যদি চোরাকারবারী লুকিয়ে থাকে তাহলে কী ব্যবস্থা হবে? হিন্দুস্থানে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াতে এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে কিনা তাই কথাটা জিজ্ঞেস করছি"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ফরাসী দেশের কয়েকটি যুবক প্রাগৈতিহাসিক কালের মতো নাকি একটি গুহায় বাস করিতেছেন। —"গুহায় বাস

না করেও অনেক দেশের অনেকেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো চলা-ফেরা করছেন, শুধু পোশাকের আড়ালে তাঁদের চেনা যায় না"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

প্রসম্প্রতি পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন জনসাধারণ আঙুরের কথা না ভাবিয়া রোজ কিছু কলা, পেঁপে আর বেল খাওয়ার অভ্যাস করুন, এইসব ফল 'সস্তা' এবং খাওয়াও ভালো। —"মন্ত্রী মহাশয় জেনে রাখুন যে আঙুর টক বলে তার কথা আর ভাবিনে; বেল-কলা-পেঁপে সস্তা কিনা জানিনে তবে আমরা এসবও Sour বলে ছেড়ে দিয়েছি" —মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

দক্ষিণ ভারতের এক গ্রাম অঞ্চলে গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচনে আটজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। —"আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু এতে না গেলেই পারতেন, বাড়ীতে মোড়লী আর পঞ্চায়তী এক নয়। তাছাড়া নির্বাচনের নেশা একবার পেয়ে বসলে"......শ্যামলালকে বাধ্য হইয়া থামাইতে হইল।

* *

যে-সব ছাত্রীরা এবারে আই. এস্-সি পাস করিয়াছেন, শুনিলাম তাঁরা নাকি বি. এস্-সিতে ভর্তি হওয়ার কলেজ পাইতেছেন না। —"অগত্যা 'বিয়ে' কোর্স নিয়ে ফেলাই তো ভালো"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আর্থার লিউইস্ নামক জনৈক অধ্যাপক নাকি হিসাব কষিয়া দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে-অনুপাতে বাড়িতেছে সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকিলে ন'শত বৎসর পর মানুষের শুধু দাঁড়াইবার স্থান এই পৃথিবীতে থাকিবে। শ্যামলাল বলিল—"শুধু দাঁড়াবার স্থান নিয়ে ট্রামে-বাসে চলা আমাদের যেমন সড়গড় হচ্ছে তাতে ভয়ের কোন হেতুই আমাদের নেই, অধ্যাপক মশাই নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন।"

ব্ভা

ৎসের দিকে। অরুণ মিত্র। দীপংকর
শনী, ১।১ ঘোষাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৯।
বেষক—সিগনেট বুক শপ। দাম: আড়াই
।

উৎসের দিকে' অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্য-
লন। 'স্মরণকাল' নাম দিয়ে পূর্বেকার রচিত

যে সমস্ত কবিতা ছিল তারও একটি সংকলন এই কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে সংলগ্ন করা হয়েছে। পৃথক করে প্রকাশ না করার কারণ—'প্রতিকূল অবস্থার জন্যে তা সম্ভব হয়নি।'

'স্মরণকাল' অংশের কবিতাগুলি পূর্বরচিত বলে সেগুলির কথাই আগে বলছি। এ কবিতাগুলি বিশেষ একটি যুগের আবেদনে ('৪৮—'৫৩) মণ্ডিত। কবির দেশকালে একটা প্রচণ্ড ভাঙাগড়া চলেছে। মনুষ্যত্ব অবদমিত। পাশবিকতার জয়ধ্বজা উঠেছে। একটা রক্তাক্ত সত্যের জন্ম হবে বোধহয়। 'স্মরণকালের' কাব্যগুচ্ছ থর থর কাঁপছে এই আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে। কাব্যের ভাষায়, ছন্দে, উপকথায় অস্বাভাবিক দীপ্তি, যন্ত্রণার রক্তিমা।

মানবিবৃক্ষের ছায়া হটে গেল—
তেপান্তরের নৃশংস তেজ নীল বিদ্যুৎ—
স্পর্শের মার দিয়েছে শরীরে,
মরযাত্রায় সিংহমূপিঠ হয়ধনু ভাঙা
ললাটপটের লেখা, চৌচির ভারতবর্ষ।।

এইসঙ্গে জেগেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সাম্যবাদী সহানুভূতি। এ সহানুভূতি প্রধানত হলেও কবির আন্তরিকতায় ত্রুটি নেই।

কে বাঁচে?
ঘানিঘোরার টানে
লাঙলের ফালে
লোহা গলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে? কে?

এই টলোমলো হৃদয়ে প্রেমেরও স্নিগ্ধতা নেই। আছে দহন জ্বালা, জ্বলন্ত পিপাসা।

এর চেয়ে ভালো তুমি
নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার,
তোমার অমৃত চোখ খুঁজে পাক দিশা
অঙ্গার জ্বলন্ত রোদে,
জ্বলুক নিখুঁত মিলে আমাদের সহমর ক্ষুধা!

চল্লিশের দশকের এই যন্ত্রণার আর্তি, প্রতিবাদ-অভিযোগ আর দহন-জ্বালা এখনও সম্পূর্ণ ঝরে যায়নি আমাদের হৃদয় থেকে। মহফিল-শেষের জানপুরার রেশের মতো এখনও সেই ব্যথা বুকে বাজে। তাই এর আবেদন এখনও সমান আন্দোলন জাগায় পাঠকের মনে। এখনও সেই 'দশ আঙুলের ডগা অগ্নিবিন্দু' আমাদের হৃদয় জ্বালিয়ে দেয়।

কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুচ্ছে ঐ টলোমলো হৃদয়ের থর থর ভাষা আর নেই, উচ্ছ্বাসের কলরোল নেই। তীরের জনতাও কমে এসেছে। চারিদিকে যেন নির্জনতার একটা অবকাশ রচিত হয়েছে। উজানী দৃষ্টি উৎসের দিকে বইতে শুরু করেছে, স্রোত শান্ত থেকে শান্ততর হয়ে চলেছে। কাব্যপ্রসঙ্গে, এমনকি অভিধাতেই তা স্পষ্ট। 'একাগ্র দুঃখের তাপে'র পর 'যেখানে উত্তাপ নেই', 'এক একটা শান্ত দিন'। 'হৈমন্তী', 'ফসলের সুরে' আর ছয় ঋতুর সঞ্চিত সৌন্দর্যে কবি আত্মলীন হলেন। ভাষার উপমায় অপূর্ব আত্মস্থতা, চেতনার ধীর পদক্ষেপ। দৃষ্টি সূক্ষ্ম হয়ে অধ্যাত্ম রাজ্যে উত্তীর্ণ। উদ্ধৃতির সাহায্যে তা দেখানো যেতে পারে, বিচার-বিশ্লেষণ করলে তা কাব্যের পক্ষে অপমানকর হবে।

(১) খোয়ামাটির উপর আসন্ন বন্যা
ঘনশ্যাম বৃক্ষ
নয়তো অফুরন্ত ফসল বৈশাখের সামনে
তারা তোমাকে ছবির মতো ঘিরে নিক
পাতা-ছলছল শীত
নয়তো গ্রীষ্মের ধ্যান
তোমার বুকের মধ্যে রাখুক।
প্রতীক্ষার দীপে দীপে তুমি জেগে থাকো।

(২) শত সহস্র সন্ধ্যার ভিতরে এক নিবন্ত শিখা
তার চারিপাশে আদিকালের গল্প
যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ আস্তে
আস্তে গ'লে গ'লে ঘুম হয়ে যায়।

(৩) গহীন চোখের মধ্যে ডুবে
আমরা ফসলের মতো নতুন হতে চাই
কখনো সন্ধ্যা তারার নীচে
কখনো পাখী জাগার লগ্নে.....
তুমি মঞ্জরীর মতো জাগো
বলি মানশীষ হও সমুদ্রের ঢেউ
বলি গভীর কল্লোল দিয়ে আমাকে জড়াও।

সমস্ত কবিতাই যেন নির্জন কথন! কবি যেন পাঠককে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেন বিস্ময়ের উৎসমুখে, আদিরাজ্যে, যেখানে প্রথম উপলব্ধির বিস্ময়, প্রথম আশ্চর্যের অপার কৌতূহল চোখে মুখে। চারিদিকে পুঞ্জিত নীরবতা, আর তারি উপযুক্ত ভাষা। 'উৎসের দিকে' বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে একটি সার্থক সংযোজনা।

ও.চ.ন.।৩ড

বিষকন্যা—আশ্রাফ সিদ্দিকী। প্রকাশিকা—মাঈদা সিদ্দিকী বি এ, ৩৭ দেওয়ান বাজার, ঢাকা। মূল্য—এক টাকা।

সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গে কবিতা এবং কথাশিল্প দুয়েরই ধারা প্রাণময়। আশ্রাফ সিদ্দিকী দুই দিকেই পাঠককে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু মূলত তিনি কবি এবং যথার্থই রোমান্টিক কবি। স্বপ্ন এবং সংবেগ তাঁরও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কাছে পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ঐতিহ্যগুণ নিঃশেষিত নয়। তিনি ব্যালাডধর্মী সাহিত্যের কাছে তাঁর কাব্যের উপাদান এবং রূপদৃষ্টি গ্রহণ করে বিক্ষুব্ধ কালের দিকে সেই সম্ভাবনা চালিত করেছেন। দ্বিতীয়ত জীবনানন্দ এবং অজিত দত্ত থেকে আরম্ভ করে জসিম উদ্দীনের ভাব-সাধনাকে স্থানিক লো আনবার জন্য তিনি যে পরীক্ষণ করে চলেছেন তাতে তাঁর জয় অপ্রত্যাশিত নয়। যেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ক্ষমতার ক্ষেত্র সম্বন্ধে উদাসীন নন সেসব স্থলে তাঁর কবিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্যতা লাভ করেছে। এই ছোট্ট বইটিতেও 'স্টাডি', কোনো একটি কবিতা লেখার মুহূর্তে 'গোধূলি নদীর তীরে' ও 'বিষকন্যা'র মতো একাধিক কবিতায় সেই পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। আশ্রাফ সিদ্দিকীর যাত্রাপথে আমাদের আস্থা এবং অভিনন্দন রইলো। (৩৬১।৫৫)

মাইনরীর হার : আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ। দীপ্তি প্রকাশনী : ৬৮ নবদ্বীপ বসাক লেন, ঢাকা : দু টাকা।

রাজনৈতিক ব্যবধান মানুষকে মানুষের থেকে কত দূরে সরিয়ে নিতে পারে পূর্ব আর পশ্চিমবঙ্গের দূরত্ব তার প্রমাণ। এই দূরত্বের বেদনা সবচেয়ে বেশী করে বাজে বোধ হয় শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। পশ্চিম বাঙলার কোন লেখক, পাঠকদের কথা ছেড়েই দিলাম, তার সমসাময়িক পূর্ববঙ্গের ক'জন লেখকের সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচিত? নতুন লেখকদের অধিকাংশ লেখাই সাময়িক পত্রে সীমাবদ্ধ। তবু, এদেরই কারও কারও দু একখানা বই মাঝে মাঝে ছিটকে এসে যদি পড়ে তাহলেই কেবল পরিচয়ের সেতুবন্ধন সম্ভব হয়। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি হাতে করে সেই কথাই মনে হলো।

কবির ঝোঁক ছড়ার ছন্দের দিকে। অধিকাংশ কবিতাই ছড়ার ছন্দে হেকা তালে বাঁচত। কয়েকটি কবিতা বিদেশীর অনুবাদ। ছড়ার ছাঁচে আশ্চর্য সুন্দর প্রবহমানতাই অধিকাংশ কবিতার প্রাণ। নাড়ি ভেঙ্গে যেন ঝোরা নামছে। এই ছন্দেই ফুটিয়ে তুলেছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর দুঃখের ছবি। 'কোন এক মাকে' কবিতায় কেবল এর ব্যতিক্রম। কবি এখানে অমিল ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সম্ভবত কারণেই।

একটি ছোট কবিতা এখানে তুলে দিচ্ছি। এ থেকে কবিকর্মের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে :

'কুঁচবরণ-কন্যা তোমার
মেঘবরণ চুল,
চুলগুলো সব ঝরেই গেল
গুঁজবো কোথা ফুল!
একটা ছেঁড়া গামছা ছিল,
তাই সে দিলে ফাঁস,
মরেও মেয়ে দায় ঠেকালে
ঢাকবো কী সে লাশ!'

(৩৬৯/৫৫)

ধানি মাটি সোনা—ফণিভূষণ আচার্য। প্রকাশক—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ২বি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা-৩। মূল্য দেড় টাকা।

এই তরুণ কবির নাম পূর্বশ্রুত। পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা আমরা লক্ষ্য করেছি। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় লিরিক-রচনার যে-ধারা বয়ে চলেছে, তার প্রকরণগত দিকটিকে তিনি তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এই পরিগ্রহণের সঙ্গে পন্থ-সন্ধানের যে-ঔৎসুক্য তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান, সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ এবং এই সঙ্গে উপমা-গ্রন্থনেও তাঁর চাতুর্য আছে—
'তোমার উপমা খুঁজে বৈশাখের বয়ঃসন্ধি মেঘ
সহসা স্তম্ভিত হলো, কী জানি কী

আকুল আবেগ
তোমাকে সাজালো স্বর্ণে, মৃত্তিকার

রোমাঞ্চিত ঘ্রাণ
শরীরে ও মনে আনে অফুরান যৌবনের গান।'

(রূপকল্প)

প্রসঙ্গত ফণিভূষণ আচার্যের শব্দচয়ন প্রশংসিত হবার দাবী রাখে। ছন্দানুপাতিক পরিচিন্তন থাকলে ভালো হতো। অথবা তাঁর কাছে সম্ভবত মনে হয়েছে, শেষোক্ত লক্ষণটি বিশুদ্ধ লিরিকের লালিত্যকে ব্যাহত করে। এমনও হতে পারে, আমাদের উক্তিটিই ছিদ্র-অন্বেষীর দৃষ্টি থেকে জাত। যাই হোক, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে 'ধানি মাটি সোনা' বইটি সুখপাঠ্য এবং এর কবি প্রতিশ্রুতিময়। এই প্রতিশ্রুতি যাতে সম্বর্ধিত হতে পারে, সেজন্য তাঁকে আমরা সমসাময়িক অপরাপর কবিকণ্ঠের প্রভাবমুক্ত হতে অনুরোধ করি। (৩২।৫৬)

মাটির বেহালা। তরুণ সান্যাল। দীপংকর প্রকাশনী, ১।১ ঘোষাল স্ট্রীট, কলিকাতা ১৯॥ দাম দু টাকা।

'মাটির বেহালা' তরুণ সান্যালের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। কিন্তু এই প্রথম গ্রন্থেই তাঁর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। জীবনের আনন্দতীর্থের চেয়ে যন্ত্রণার আত্মক্ষয়ের উপলব্ধিতেই কবিমন সাড়া দেয় বেশী। সৃষ্টির মাধুরীকে আকাশের মাঠে ছড়িয়ে থাকতে খুব কমই দেখেছেন কবি ('তুমি—সেই তুমি')। 'জীবনের জ্বালা বাথার অনুপ্রাস' ('তবু') বুকে বয়ে বয়ে বেড়াতেই যেন তাঁর ভালো লাগে। রক্ততীর্থেই রসতীর্থের পারানি কুড়িয়ে নেন তিনি। 'স্বপ্নপ্রয়াসী' শৈশবে ফিরবার কখনও কখনও সাধ জাগে বটে, কিন্তু 'তবু আমি ভালোবাসি হৃদয়ের বাথার বৃত্তিকে', 'আহা—তবু ভালোবাসি, দুঃখের চোখের জলে মানুষের এক ফোঁটা হাসি।' প্রেয়সী হলো তাঁর কাছে যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি ('তুমি নির্মম যন্ত্রণা, তুমি আকণ্ঠ জ্বালা')। সমুদ্র হলো অতৃপ্ত সাধ-তৃষ্ণার ব্যাকুল সমাহার। আর 'প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন'—এই চেতনাতেই কবিসত্তা যেন অন্তর্লীন।

এমন ছত্রে ছত্রে যন্ত্রণার রক্তচ্ছটা দেখেছি জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'কারার প্রার্থনায়'। তরুণ সান্যালের সমগ্র কাব্যও যেন সেই কারার প্রার্থনারই অভিজ্ঞান।

ফুল ফুটেও ফোটে না। তবু দ্বার
খুলেও খোলে না। রুদ্ধ এ জীবন বন্দীর গরাদ
দু হাতে নাড়ায়; তবু ভেঙেও ভাঙে না।
দিন কাটে॥

কবির কল্পপৃথিবীতে কবি তাঁর মাটির বেহালার ক্লান্ত ছন্দে এই করুণ আর্তির সংলাপ তুলে তুলে চলেছেন। 'রুক্ষ চুলে ক্লান্ত মেয়েরালীর মতো'।

—'মিথ্যার মিছিলে হেঁটে পায়ে পায়ে মিথ্যা হয়ে যাই।'

লক্ষ্যণীয় এই যে, প্রেরণার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি শব্দসম্ভার। প্রত্যেকটি শব্দ যেন কবির চেতনার রঙে রঙিন। কোমল এবং করুণ। যন্ত্রণার যথার্থ মন্ত্রণা কানে কানে দিয়ে যায় যেন।

ভোরের দীঘিতে আমি পা ডুবিয়ে,
মেঘের সিঁড়িতে
একা একা বসে থেকে কতদিন আলোর ফেনিল
আবাধা বিনুনি ভাঙা কোঁকড়া মেঘে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নীল
সকালে সাম্পান বেয়ে যেতে চাই
দিগন্তের ঘাটে
এ শুধু মেঘের হাতে এ জীবন
বৃথা ছেড়ে দিতে......

অথবা

কান্না দিয়ে কখনো যদি পান্নামোতি চোখে
জ্বালাতে পারি দীপ্রদাহে মনের কালো রাত
বুকের তাপে ঘোচাতে পারি,
আমি কি তবে তোকে
পাবই পাব বাড়িয়ে দিলে
ছাড়িয়ে নেওয়া হাত......

ইত্যাদি উজ্জ্বল, কোমল, করুণ পংক্তির দেখা মেলে পাতায় পাতায়।

দু-একটি ছোটখাটো মুদ্রাদোষ কাটিয়ে উঠতে পারলে কবির ভবিষ্যৎ আশাতীত সাফল্যে ভরে উঠবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অথচ আশ্চর্য লাগে যখন কবির ভূমিকাটি পাঠ করি। এমন সহজ আর্তি যাঁর কাব্যে, গদ্যে ঠিক তারই বিপরীত প্রকাশ কেন? ঘোরালো বিন্যাস, উৎকট শব্দমোহ কবিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কাব্যে যিনি খাঁচা ছাড়া, গদ্যে তিনি খাঁচায় বন্দী। আর সে খাঁচায় তালা দিয়েছেন বিষ্ণু দে আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁদের হাতে যেটা পরীক্ষা, অপরের হাতে তা অবাঞ্ছনীয় অনুকরণ। ৩৪৪।৫৬

সাহিত্য-সংবাদ

দেশে দেশে। বিক্রমাদিত্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। দাম তিন টাকা।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে লেখক কতকগুলো রাজনৈতিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। লেখক নিজে সাংবাদিক। কাজেই দেশ-নেতাদের তৎকালীন আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, পলিসি ও ফাঁস-হয়ে-যাওয়া কিছু

ব্যক্তিগত কথা সরস করে সাজিয়েছেন। কর্মসূত্রে স্বাধীনতার সময়কার রাজনীতিকদের আলাপ-আলোচনা তাঁকে শুনতে হয়েছে। নানা মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, বহু দুর্লভ দর্শন মানুষের দেখা মিলেছে। নানা বিস্ময়, বিপদ, ঝড়ঝঞ্ঝা, প্রতিবাদ চোখের সামনে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্, হোরেস আলেকজান্ডার, মাউণ্টব্যাটেন, রুজভেল্ট, লুই ফিশার, গান্ধী, জিন্না, প্যাটেল, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুরাবর্দী ভিড় করেছেন। গান্ধীর কথাই বেশী আছে। প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য দেশ-নেতার কথা এসেছে। রুজ-লিপ্স্টিক-লাঞ্ছিতা বিলাস-বাসিনীদের ভ্রুভঙ্গ সহযোগে দেশসেবার হুলো আলোচনার চিত্রটি ফুটেছে ভালো। তবে অজয় ও অলকানন্দার প্রেমকাহিনী এই সমস্ত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ঘটনার সঙ্গে খাপ খায়নি। এই episodeটিকে লেখক রিপোর্টিং-এর এক-ঘেয়েমি দূর করবার জন্য রিলিফ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক কাহিনী শুনতে শুনতে নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা ভালো লাগে না। লেখক অলকানন্দাকে নায়িকা বলেছেন কাহিনীর। কাহিনীর নায়িকা অলকানন্দা নয়। বইতে একটি অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। আছে বিশেষ একটি সময়ের টুকরো টুকরো খবর। অজয়-অলকানন্দার ব্যাপারটিও টুকরো খবর। নিতান্ত ব্যক্তিগত বলেই এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। নায়িকার কথা উঠতেই পারে না।

মোটামুটি বইখানি সরস সাংবাদিকতা। ভাষণক্ষমতা লেখকের আছে। ভূমিকায় চাণক্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। প্রচ্ছদপট সুন্দর। মুদ্রণ নিখুঁত।

১৩০।৫৬

ছোট গল্প

পথ ও প্রান্তর: অতুল চক্রবর্তী: পুঁথিঘর: ২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা: আড়াই টাকা।

দুটি ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি বিদেশী পটভূমিকায় লেখা। চরিত্রগুলিও বিদেশী। বাংলা সাহিত্যের একটা দুর্বলতা পুরোপুরি-ভাবে আজও দূর হয়নি। সে হলো তার ভৌগোলিক সীমার সংকীর্ণতা। সেদিক থেকে লেখকের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। তবে লেখার আড়ষ্টতার জন্য কেমন যেন অস্বচ্ছ অনুবাদের মত মনে হয়। অথচ গল্পগুলি অনুবাদ নয় সেকথা ভূমিকায় লেখক বলেছেন। 'আবু পাহাড়' গল্পের ঘটনা সংস্থাপন বেশ নাটকীয়। ক্ষতি গল্পের শেষ বহু পুরনো। প্রায় অধিকাংশ গল্পের আয়তনই অকারণে বড়। ছাটকাট করলে পরিচ্ছন্ন হতে পারত।

৫৫০।৫৫

গল্পের মতো॥ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলকাতা ৬॥ দাম দেড় টাকা।

আটটি ছোট গল্পের সংকলন। 'জীবছন্দ', 'স্বর্ণমৃগ', 'ভুল' ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। 'অনুরাধা' গল্পে একটি বিশেষ ধরনের নারী-চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'বাস্তব', 'স্মৃতি', 'চলমানা'—এ তিনটি গল্পে জীবনটা যে ব্যর্থ প্রহসন, এইটেই প্রমাণিত হয়েছে। শেষ গল্পটি বিদেশী গল্পের ভাবানুবাদ। অনুবাদ মন্দ হয়নি। গল্পটিও ভালো লাগলো। একটি আহত চোখ-বাঁধা সৈনিক হাসপাতালে শয্যাশায়ী। একটি কুরূপা নার্স সৈনিকটির মনে এক তরুণী রূপসীর ভালবাসার বিশ্বাস জন্মিয়ে তাকে নীরোগ করে তুললে। কিন্তু পাছে সৈনিকটির আন্তরিক বিশ্বাস ভেঙে যায় এই ভয়ে সৈনিকটির চোখ খোলায় আগেই

অভিজ্ঞতা ব্যাপক না হলেও গল্প বলার একটি ক্ষমতা আছে। স্থানে স্থানে ভাষার মনো-যোগের অভাব ('সাথে সাথে' ইত্যাদির বারংবার ব্যবহার) চোখে পড়লো। মুদ্রণ প্রমাদও দুর্লভ নয়।

২৭৩।৫৬

জ্যোতিষশাস্ত্র

পারাশরী হোরা—পূর্ব খণ্ড—মূল, অনুবাদ এবং উদাহরণ সহ—জ্যোতিঃশাস্ত্রী শ্রীবিমলা-কান্ত লাহিড়ী এম-এ, বি-এল। সূর্য জ্যোতিষালয়, ১৫৬, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড, বেহালা, কলিকাতা। ৬৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ টাকা।

ফলিত জ্যোতিষের প্রবর্তক মহর্ষি পরাশর। ভগবান পরাশরের হোরা-শাস্ত্রের কতকাংশ মহর্ষি জৈমিনী সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১২৮৭ সালে রসিকমোহন চট্টো-পাধ্যায়ের চেষ্টায় 'বৃহৎপরাসর' নামে যে গ্রন্থ বাংলা অক্ষরে প্রচারিত হয়েছিল তাতে অনুবাদ বা উদাহরণ ছিল না এবং তার পুনর্মুদ্রণ হয়নি। বোম্বাই থেকে ১৮৪৫ ও ১৮৭৩ শকাব্দে দেবনাগরী অক্ষরে দুই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে পূর্ব খণ্ডের কোনও অনুবাদ ছিল না এবং উদাহরণ অতি অল্পই ছিল। কাশী থেকে ৭।৮ বছর পূর্বে যে হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বহু প্রয়োজনীয় শ্লোক ও অধ্যায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। অথচ এদেশে যাবতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুস্তক, গবেষণা ও আলোচনা প্রধানত পরাশরী মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মহর্ষির পূর্ণাঙ্গ পুস্তক না থাকায় বহু স্থানে তাঁর মতের অপপ্রয়োগ হয়েছে, লঘু প্রয়োগ হয়েছে। উদাহরণ সমেত সম্পূর্ণ নির্ভুল সানুবাদ পারাশরী হোরার এই পূর্ব খণ্ডটি পুনর্বাসন উপসমাহর্তা মহাশয় তাঁর কর্মবহুল জীবনের মধ্যে থেকেও প্রকাশিত করে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্রবিদদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। অবশ্য সমস্ত শ্লোকের অনুবাদ সম্ভব হয়নি এই কারণে যে, তা প্রকাশ করতে পুস্তকের কলেবর অতিশয় স্ফীতি লাভ করত। অবশ্য উত্তর খণ্ড থেকে বহু প্রয়োজনীয় অধ্যায়ও এই খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। অধুনা ভাগ্যগণনার দিকে বহু ব্যক্তি আগ্রহশীল, গণকেরও অভাব নেই। লেখকের পঁয়ত্রিশ বছর জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলনের ফলস্বরূপ পুস্তকটি যে বহু সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

১২০।৫৬

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

কাউণ্ট অব মণ্টেক্রীস্টো—আলেকজান্দার দুমা অনুবাদক—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী।

মেঘমল্লার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুচ্ছ—প্রবোধকুমার সান্যাল।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য—বাসুদেব মাইতি।

ঘুঁই—কুমুদকান্ত চক্রবর্তী।

বাংলা সাহিত্য পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্মনিয়ম—স্বামী অসীমানন্দ।

সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র ও বিশ্ব রাজনীতি—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

শ্যাওলা—শ্রীবাসব।

উত্তরকাল—প্রবোধকুমার সান্যাল।

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল।

দুটি—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

পথহারা—অনুরূপা দেবী।

প্রাচীন ফিলাডেল ফিয়ার বেন ফ্রাঙ্কলিন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বশীকরণ—অবধূত।

মরুতীর্থ হিংলাজ—অবধূত।

রুণুঝুণু—কৃষ্ণদয়াল বসু।

ভাগফল—অজিত দাস।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

শর-সন্ধান—ধনঞ্জয় দাস।

গান্ধী স্মারকনিধি—শক্তিরঞ্জন বসু।

আংশিক—আশাপূর্ণা দেবী।

আনন্দ প্রতিষ্ঠা—শ্রীচিত্তরঞ্জন।

আলাদিন—শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ।

—শৌভিক—

ঝাঁঝালো সুগন্ধীর ঝাঁকুনি এক

বেশ ভালো সুগন্ধও অতিরিক্ত তীব্র হলে তার ঝাঁঝে অনুভূতিটা ঝাঁকুনি খাওয়ার যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, এস এন প্রডাকসন্স কৃত শরৎচন্দ্রের 'মামলার ফল' দেখতে গোড়া থেকে ঠিক তেমনিই ঝাঁকুনি খেতে খেতেই ছবির শেষে এসে পৌঁছতে হয়। শরৎচন্দ্র কয়েকটিমাত্র পাতার যে ছোট্ট গল্পটি লিখেছিলেন, তার বিষয়কেন্দ্রটি খুবই স্বল্প পরিসরে অল্প ঘটনায় সীমাবদ্ধ। তবে তাই নিয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি হওয়া যে সম্ভব নয়, তা নয়। কিন্তু যে ধরণের পরিবিন্যাস মূল কাহিনী রেখেও ছবির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারতো বেশী মনোজ্ঞ করে এখানে সে পথ ধরে যাওয়া হয়নি। কাহিনীর পরিবর্ধন ও চিত্রনাট্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দের কল্পনাপ্রসূত। মূল চরিত্রগুলির ধাঁচটা ধরতে তিনি ভুলও করেননি, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক আর কেবলই কথা কাটাকাটি জুড়ে জুড়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে যাওয়া এমনিই তার ঘটনা সৃষ্টি যে বেশ নাটকীয় করে গুছিয়ে মনোজ্ঞভাবে পরিবেশনে পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় অনেক রকমে নৈপুণ্য প্রকাশ করেও এবং তার সঙ্গে অভিনয়ের দিক, ক্যামেরার কাজ ও সঙ্গীত পরিচালনা অতি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও ছবিখানির গা থেকে মনোময়তা যেন ধমক খেয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে গিয়েছে। কথাবার্তা ও আচরণে যতোসব মারমুখী উগ্র চরিত্রই কেবল। পায়ে পা দিয়ে সবায়েরই কেবল এমনি ঝগড়া আর ঝগড়া যে, মনে হলো কমনীয়তা আর মাধুর্যকে বর্জন করে আবেগকে উত্তাপিত করে ছবি তৈরীর এটা যেন এক্সপেরিমেন্ট একটা।

* * *

বেশ একটা চমক সৃষ্টি-করা আরম্ভ। তবলা-তরঙ্গের মুখ নিয়ে প্রাণোন্মাদনায় ভরাট সুরের এবং বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহ সঙ্গীত যুক্ত টাইটেল সমাপনান্তে গ্রামের বিস্তৃত প্রাকৃতিক শোভা। নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হতে হতে একটি পুকুরঘাটে এক গৃহকর্ত্রীর কাপড় কাচার দৃশ্য। তারপর সেই গৃহকর্ত্রীকে অনুসরণ করে তার গৃহাঙ্গনে দৃষ্টি টেনে নিয়ে যাওয়া। উঠানে তিনি কাপড় শুকতে দিচ্ছেন; হঠাৎ বাসন পড়ে যাওয়ার একটা শব্দে স্তব্ধতা ভাঙলো। গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টি ঘুরলো শব্দের দিকে, ভাঙ্গা বাটি হাতে এক বালিকাকে অপরাধিনীর ভঙ্গিতে দাওয়ায় দেখা গেল। গৃহকর্ত্রীর তিরস্কার ও ভৎর্সনা ফেটে পড়লো। মেয়েটিও আরম্ভ করলে মুখে মুখে জবাব দিতে। এই হলো সুবি আর তার মামী। বাপ-মা মরা মেয়ে সুবি মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে; অল্প অল্প লেখাপড়া শিখেছে। মারমুখী মামীর সঙ্গে সুবির বাকবিতণ্ডা যখন বেশ পাকিয়ে উঠেছে, সেই মুখেই তার মামার আবির্ভাব। সুবি তার মামার আদুরে ভাগ্নী; মামা এসে পড়ায় সুবি মামীর গঞ্জনার মুখ থেকে সরে পড়ার সুযোগ পেলে। স্বামীর কাছে স্ত্রী অভিযোগ করলে সুবির নামে, সুবির বড়ো হয়ে ওঠা নিয়ে কথা উঠলো, কথা প্রসঙ্গে সুবির বিয়ের কথাও উঠলো। সম্বন্ধ একটা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু পাত্র দোজবরে এবং তার একটি পুত্র সন্তানও আছে। স্বামী-স্ত্রী ঠিক করলে ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, পাত্রের সন্তান থাকার কথাটা সুবির কাছে গোপন রাখলেই হবে। বেশ এলো, এপর্যন্ত দৃশ্যগুলি। দৃশ্যগুলি উপস্থাপন ও কলাকৌশল কৃতিত্বে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়ে মনকে নিবদ্ধ করে তোলে। এর পরই বিয়ের দৃশ্য; বাজনাদারদের দৃশ্যটির গোছালিতে একটু বৈচিত্র্য এনে দেওয়া হয়েছে। এর পরই বাসর ঘরের দৃশ্য। বৈচিত্র্য এইখানেই হলো প্রথম ছন্দপাত। বাসর দৃশ্যটির প্রয়োজন অবশ্য ছিল, কারণ এই সময়েই পাত্র শম্ভুর যে প্রথম পক্ষের ছেলে আছে, সুবি তা জানতে পারবে।

কিন্তু প্রথমত বাসরদৃশ্য বলেই সেই সুযোগে একখানি গান এবং গানখানি সুরে ও গাওয়ায় ভালো লাগবার মতো হওয়া সত্ত্বেও গানের সময় পার করার জন্য অগত্যা ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাসরে উপস্থিত একই কতকগুলি মেয়ের মুখ বারবার করে দেখানোয় অতি মামুলীয়ানার একটা ভাব মনে জুটিয়ে দিয়ে যায়। গান শোনাবার জন্যই যেন গান; ঘটনায় যার কোন প্রয়োজনই নেই। আর দ্বিতীয়ত শম্ভুর ছেলে গয়ারামকে কনে বৌ সুবির কোলে বসিয়ে দিয়ে মা না হয়েও সৎ মায়ের আসনে এসে বসার অদ্ভুত ব্যাপারটা ওকে যেভাবে বাঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো, তাতে এটা যে সুবির জীবনের তথা এই কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতো একটা অত্যন্ত নাটকীয় ঘটনা সে জোরটা ফুটলো না। তবে গয়ারামের জেঠাইমা অর্থাৎ শম্ভুর দাদা শিবুর স্ত্রী গঙ্গামণি যে কতোটা গয়ারাম-অন্ত প্রাণ সেটা বেশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর গয়ারামের কাছেও জেঠাইমাই তার মা। এর পরের দৃশ্যটি ফুলশয্যার রাত শেষে ভোরের সময় বলেই মনে হয়। এই সময়টাই শম্ভুর [illegible] কথা গোপন রেখে সুবিকে যে প্রতারণা করা হয়েছে এবং সুবির মনেও যে সেইভাব, সেটা সুবি তাকে [illegible] তার মামার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলাতেই জানা গেল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে স্বামী শম্ভুর সঙ্গে তার যেভাবে কথা কাটাকাটি দেখানো হয়েছে, তা [illegible] প্রদর্শিত হলেও কোন আনকোরা কনের পক্ষে যেন মাত্রাধিক উগ্র অশোভনীয়তা। আচরণে এই উগ্রতা ও চড়া মেজাজ শুধু সুবির ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত কটি চরিত্রেই যেন সংক্রামক ব্যাধির মতো পরিব্যাপ্ত এবং ছবি যত এগিয়ে যেতে থাকে সবায়ের মেজাজও ততই চড়তে চড়তে এমন ধাপে পৌঁছয় যে নেহাৎ সাধনকাম ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কারুরই পক্ষে সেখানে গিয়ে পৌঁছনো অসহনীয়।

* * *

সুবির আদমপুরে ফিরে যেতে চাওয়া থেকে একটা নির্মম রুক্ষতার মেজাজ নিয়েই গল্প চলতে থাকে। সুবি কাউকে ভালো ভাবে দেখে না, সদাই একটা খিটখিটে ভাব এমনটা হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর পর যখন ওর মামাতো ভাই এলো দেখা করতে এবং সুবি জানলে যে শম্ভুর যে ছেলে আছে সেটা মামারা জেনেই এবং সুবির কাছে তা গোপন রেখে তাকে এ-বাড়ির বউ করে পাঠিয়েছে, তখন সারা দুনিয়াটার ওপরেই সুবির মন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। সুবির এ আচরণ অতি সঙ্গতই এবং পরিচালন কৃতিত্বে তা ফুটেওছে। এর-পর গয়ারামকে উপলক্ষ্য করে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দুই জায়ে নিয়তই ঝগড়া। সে দৃশ্যগুলির মধ্যেও নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে।

কিন্তু তেমন কোন গুরুতর ঘটনা পাকিয়ে না তুলেও ভায়ে ভায়ে আলাদা হয়ে যাওয়া যেভাবে সাব্যস্ত করে তোলা হলো, তার মধ্যে যুক্তিরও বলিষ্ঠতা নেই। শিবু ও শম্ভুর মধ্যে গোড়া থেকেই অতি সদ্ভাব। শম্ভুও বৌঠান বলতে অজ্ঞান। বৌয়ে বৌয়ে কলহ, কিন্তু দুভায়ের পরস্পরের আচরণে তার কোন আঁচ মাত্রও নেই, অথচ ধড়াস করে একটা দৃশ্য এনে ফেলে জমিদারকে দিয়ে সম্পত্তি একেবারে ভাগাভাগি করিয়ে দিতে বসিয়ে দেওয়া হলো। এমন গুরুত্বের অবস্থাটা ভালোভাবে পাকিয়েই উঠলো না। বড়ো আকস্মিক। সবই সমান দুভাগ হলো, হলো না কেবল একটা বাঁশ ঝাড়, একটাই ছিল বলে জমিদার সেটা এজমালিতে রাখলেন। এই বাঁশ ঝাড়ই হলো কাল, আর ছবির এক তৃতীয়াংশই অর্থাৎ মাঝের প্রায় সম্পূর্ণ ঘটনাবলীরই উপলক্ষ্য হয়ে রইলো এই বাঁশঝাড়। আলাদা হবার পর গয়ারামকে তার বাবার কাছে ঘুমন্ত অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে আসতে গঙ্গামণির মনের নিদারুণ অবস্থা, এবং সারা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোরে তারই দরজার গোড়ায় গয়ারামের কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা দেখে প্রায় আর্তনাদে তার ফেটে পড়া, সারা ছবিখানির মধ্যে সবচেয়ে ছল-ছল দৃশ্য। চোখের জল ধরে রাখা যায় না এমনভাবে পরিচালক ঘটনাটা

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

আপনার প্রকাণ্ড বই পড়ে ফেলেছি, ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়েছে। কারখানা আর শ্রমিক নিয়ে আরও উপন্যাস আছে জানি, কিন্তু আমার পড়া নেই, সেজন্য সেসব বইএর সঙ্গে আপনার বইএর তুলনা আমার সাধ্য নয়। তবে এ কথা বলতে পারি — এমন চমৎকার রচনা বহু কাল পড়ি নি।

কারখানা, ধর্মঘট, লেবার-ইউনিয়ন, তাদের দলাদলি, ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। আপনার লেখা পড়ে মনে হয়, আপনি কারখানায় কাজ করেছেন কিংবা কর্মীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন। আপনার বর্ণনা যথাযথ, কোথাও ভুল নেই। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনেক, মনে রাখা শক্ত, কিন্তু তাদের স্বভাবের বৈচিত্র্য মুগ্ধ করে, প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁত ও জীবন্ত। আপনার এই বই খুব সমাদর পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আপনার
রাজশেখর বসু

বিশেষ দ্রষ্টব্য : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সদ্য প্রকাশিত **ইস্পাতের স্বাক্ষর** পাঠ করে রাজশেখর বসু মহাশয় এই পত্র লিখেছেন।
॥ ৯৮০ পৃষ্ঠা : দাম : দশ টাকা ॥
এই লেখকের গল্পগ্রন্থ **রথচক্র ২৷৷৹**

ছেন। ভোর রাতে বিছানায় উঠে র কথা ভাবতে আরম্ভ করতেই ার মনের ভাব প্রকাশ করতে নেপথ্যে াছের একজনের একখানি গান চমৎকার যা কমই শোনা যায় এবং ণর কথা ধরলেও বেমানানও নয়, চব্ও ও যেন কোন একটা উপায় বের কখানি গান প্রয়োগ করা। নয়তো পাপে মোর এমন হলো, বল দয়াময়' লেও গঙ্গামণির অভিব্যক্তি দেখে তার অবস্থা উপলব্ধি করার কোন ছিল না দর্শকের সামনে।

*   *   *

াড় নিয়ে গণ্ডগোল বাধলো একদিন শম্ভু তার বাড়ি তৈরীর জন্য মজুর পাঠিয়ে বাঁশ কাটিয়ে আনাতেই শিবু যখন তেড়ে এসে আটকে দিলে মাঝপথে। শুনে শম্ভুও ছুটে এসে তম্বী দেখালে। তবে বিবাদটা আপোষে মিটলো সে সময় গয়ারাম সেজে-গুজে বইশ্লেট বগলে নিয়ে প্রথম পাঠ-শালায় যাবার আগে বাবা জেঠার আশীর্বাদ নিতে এসে পড়ায়। বিন্যাসগুণে অন্তর-স্পর্শী দৃশ্য। বাঁশ কাটা নিয়ে দুভায়ের কলহের দৃশ্যটির সাজানোর পরিকল্পনায় ও চিত্রগ্রহণে অভিনবত্ব আছে। বেশ জমে ওঠে। এরপর জেঠাইমার বাড়ির উঠোনে ফেলে যাওয়া বইশ্লেটের সঙ্গে মাপে বড়ো জামা দেখিয়ে অতি সাবলিলভাবে গয়ারামের বয়োবৃদ্ধি জানিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাটির মধ্যেও বেশ একটু নতুনত্ব পাওয়া যায়। এর পর আবার কাঁচা চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় গয়ারামের জন্য গঙ্গামণির ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে 'অতি চঞ্চল গোপাল আমার' বলে একখানি গানের অবতারণায়। যদিও গানখানির মধ্যে দিয়ে কৌশলে যাত্রার আসর উপস্থিত করার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে। যাত্রার পালায় গানের সাহায্যে গোপালের জন্য যশো-মতীর ব্যাকুলতা প্রকাশের এই গান। যাত্রা শুনতে এসেছে গঙ্গামণি, আর একপাশে সুবিও এসে বসেছে। ক্ষুধার্ত গয়ারাম বাড়িতে ফিরে দেখলে তার বাবা দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। রান্নাঘরে খাবার কিছু নেই। বাবার কাছে খিদের কথা জানাতে দুটো পয়সা পেলে, তাই নিয়ে যাত্রার আসরের একধারে এসে পাঁপর কিনে খেতে লাগলো। গঙ্গামণি ওদিকে গয়ারামের খোঁজে ব্যস্ত। খুঁজে পেয়ে তাকে নিয়ে বাড়িতে গেল এবং খেতে দিলে পেটপুরে। রোজই গঙ্গামণি গয়ারামের জন্য রান্না করে রাখে, যদি হঠাৎ এসে খেতে চায়, আর না এলে পরদিন সব ফেলে দেয়। গঙ্গামণির এই মমতা দর্শকমনে গভীরভাবে স্পর্শ করবেই। গয়ারাম ছেলেটি কিন্তু বড় চোয়াড়ে এবং যতো-হলে-চলতো তার চেয়ে বেশী অভব্য প্রকৃতির। গ্রামের চাষীঘরের ছেলের ভাষা কিছুটা অপরিমার্জিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাই বলে তার সংমাকে সে আবাগী রাক্কুসী ইত্যাদি বলেই শুধু অভিহীত করবে এবং রাগলে মাতৃসমা জেঠাইমাকেও তাই বলবে, এটা একটু কটু হয়ে গিয়েছে। ছবিখানির রূঢ় নির্মম প্রকৃতি এবং ছেলেটির এবম্বিধ অশিষ্ট আচরণ একে ছোটদেরও দেখাবার উপযোগী বলে ধরা যায় কি না, সেটা সেন্সরের আর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

*   *   *

মামলা বাঁধবার ঘটনাটা হলো সেই বাঁশ ঝাড় নিয়েই। ষষ্ঠিপুজোর দিন। গঙ্গামণি অনেক বুঝিয়ে গয়ারামকে সেদিন সকালে উপোস রেখে পাঠশালায় পাঠিয়েছে, ফিরে এলে পুজোর চন্নামৃত খাইয়ে ভালো করে খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গঙ্গামণি নৈবেদ্যের থালা নিয়ে সকালে পুজো দিতে চললো, দরকার শুধু দুটি বাঁশপাতার। গঙ্গামণি তার চাকরকে বললে পেড়ে দিতে। ঘাট থেকে সুবি তাই দেখে পাঠালে তার স্বামীকে। শম্ভু চড়াও হয়ে এলো বৌঠানের ওপর, তাকে চোর বলে হাতের পুজোর থালা ফেলে দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। বাড়িতে ঢুকেই শিবু সে খবর শুনে চাকরকে সঙ্গে নিয়ে দা হাতে হাজির হলো বাঁশঝাড় কেটে

উজাড় করে ফেলতে। শম্ভুও এলো দা হাতে দাদার ওপর চড়াও হয়ে, তবে কাটা-কাটি শেষপর্যন্ত হলো না। শম্ভু দা পুকুরে ফেলে দিয়ে চলে গেল, শিবুও দা ফেলে দিলে কিন্তু অপমানের শোধ নিতে চললো তার শ্যালক পাঁচুর খোঁজে, মামলার তদারক যার পেশা। ইতিমধ্যে গয়ারাম পাঠশালা থেকে উপস্থিত হয়ে জেঠিমার কাছে খেতে চাইলে। গঙ্গামণির মাথায় বজ্রাঘাত, গণ্ডগোলে গয়ারামের খাবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। রাগে গয়ারাম জেঠিকে যা নয় তাই বললে। ষষ্ঠিতলায় বামুনের মেয়েরা সেদিন চিড়েমুড়কী বিলোয়। স্নান সেরে শম্ভু গেল সেখানে, কিন্তু জেঠাইমার চাঁপাকলা ও নলেনগুড়ের সন্দেশের প্রতি-শ্রুতির কথা মনে করে ফিরে এসেই ঠাঁই পেতে বসে পড়লো। গঙ্গামণির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। শম্ভুকে বসতে বলে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেল কলা সন্দেশ যদি পাওয়া যায়, কিন্তু মিললো না। অগত্যা ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে ঘরে যা ছিল চিঁড়ে দই মুড়কী এনে ধরে দিলে গয়ারামের সামনে। কলা সন্দেশ না দেখে ক্ষেপে উঠলো গয়া-রাম; লাথি মেরে সব ফেলে দিয়ে দৌড়ে এক চেলা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ারে ঢুকে হাঁড়িকুঁড়ি সব ভেঙে তচনচ করে ফেললে। গঙ্গামণি তাকে বাধা দিতে যাওয়ায় চেলা-কাঠের একটা ঘা এসে তারও হাতে লাগলো। যন্ত্রণায় কাঁকিয়ে উঠলো গঙ্গামণি, গয়ারাম পালালো সেখান থেকে। গঙ্গামণি কাতর হয়ে বসে পড়লো দাওয়ায়, আর পাঁচুরামকে নিয়ে শিবুরও প্রবেশ। আর কোন কথা নয়, থানায় সোজা নালিশ। দারোগা এলেন তদারকে। গয়ারামকে পাকড়াও করে আনা হলো। পাঁচু আর তার দাদা চরণ প্রমাণ করতে চাইলে গয়ারাম তাদের দিদি গঙ্গা-মণিকে মেরেছে। দারোগা জানতে চান, লেগে গেছে, না সত্যিই মেরেছে। গয়ারামের কাতর আবেদন তার জেঠিমার কাছে, কিন্তু গয়ারামের দিকে চেয়ে কান্নার আবেগে গঙ্গামণির তখন বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। দারোগা কোন কিনারা না পেয়ে চলে গেলেন। পাঁচুর উস্কানিতে শিবু মামলা রুজু করলে। ওদিকে শিবু সুবির পরা-মর্শে গয়ারামকে লুকোবার জন্যে দিয়ে এলো পাঁচলায় বাঁধের কাজে ভর্তি করে। গঙ্গামণির বুক ফেটে যায়। একটা একরত্তি ছেলেকে শায়েস্তা করার জন্য ঘরের বউকেও আদালতে হাজির করতে চায় এরা। আর সইতে পারে না গঙ্গা-মণি। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে হলো কলহ। রাগে শিবু গঙ্গামণিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। পরদিন সকালে গঙ্গামণিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শিবু কৃতকার্যের জন্য মুষড়ে পড়লেও দারোগাকে নিয়ে পাঁচলা থেকে গয়ারামকে গ্রেপ্তার করে আনবার জন্য তাকেও যেতে হলো। ওদিকে সুবিও হঠাৎ বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে পুজোর সময় গয়ারাম কাছে না থাকার মমতায়। নিজেই সে চললো পাঁচলায়। শিবু সদ্ভিব্যাহারে দারোগা গিয়ে দয়ারামকে ধরেও ফেললে ঠিকই। গয়ারাম চিৎকার করে উঠলো জেঠাইমা বলে। কুঁড়ের ভিতর থেকে সবাইকে বিস্মিত করে বেরিয়ে এলো এতোদিন নিখোঁজ গঙ্গা-মণি। গয়ারামকে পুলিসের হাত থেকে

নিয়ে যেভাবে আগন্সে দাঁড়ালো ...াধিা কার এগিয়ে যায় তার ... আর অপর দিক থেকে এসে উপস্থিত এবারে সতি-মায়ের আবেদন নিয়ে। মামলার

"আদর্শ হিন্দু হোটেল"এর পদ্মঝি—সন্ধ্যারাণী

ফলে মাতৃত্বে বঞ্চিতা দুই বন্ধ্যা নারীর দুজনেই পেলো গয়ারামকে তাদের সন্তানরূপে।

* * *

কাহিনীটি বিন্যাসে পরিচালক বাস্তবকে একেবারে চষে ফেলেছেন। এতে বাস্তবানুগ নয় এমন কিছু খুঁজে বের করা মুশকিল এবং এটাও প্রনিধানযোগ্য যে, কোন ঘটনা পাকিয়ে তুলতে যুক্তিকেও কোনরূপ অবজ্ঞা করা হয়নি, তাই সহজ মানবিক আবেদনটা ফুটেছে আবেগময় হয়ে। অনেক ভালো এবং বড়ো বড়ো গুণও আছে ছবিখানির। নাটকীয় গতিও এমন বেগবান যে দীর্ঘায়িত পথ অতিক্রম করিয়ে দেয়। কিন্তু সবই ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে প্রথমত বাঁকার তোড়ে, দ্বিতীয়ত আগাগোড়া ছবিখানির নির্মমরূপে চেহারার জন্য, আর তৃতীয়ত লালিত্য ও কমনীয়তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে যাওয়ার জন্য। অল্পকথার মানুষ কেউ নয়, সবারেরই একটা রোষায়িত চোয়াড়ে ভঙ্গি, রাগ উঁচিয়েই আছে সকলে, এমন কি বালক গয়ারামও। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলা মানেই ঝগড়া, তা সে শম্ভু আর সুবিই হোক, শিবু আর গঙ্গামণিই হোক, গয়ারাম আর সুবিই হোক, কি সুবি আর গঙ্গামণিই হোক, এমন কি সুবির সামনে তার ভাসুর শিবুই বা পড়ুক না কেন। একটানা কেবল ঝগড়াই, কোন ফাঁক নেই। এতো ঝগড়ার মধ্যে মন আর তাই তিষ্ঠতে চায় না। তার ওপর বিশেষ করে বহির্দৃশ্যাংশে কথার রেকর্ডিং ঠিকমতো সামলে উঠতে না পারায় চিত্রগুলির অতিমাত্রায় চেঁচানি উগ্রতার একটা নারকীয়তা ঘটিয়ে দেয়। কোথাও নরম মেজাজের একটা কিছুতে যে মনকে একটু স্বস্তি পাইয়ে দেওয়া যাবে তার জোটি নেই। অথচ সমগ্র ছবিখানির মধ্যে স্মরণ করে রাখার মতো কৃতিত্বপূর্ণ দৃশ্য বড়ো কম চোখে পড়বে না। গোড়াতেই সুবি আর তার মামীর ঝগড়া, তারপরেও বাঁশ কাটা নিয়ে দু ভায়ের মধ্যে, পুকুরের এপারে সুবি আর ওপারে গঙ্গামণির মধ্যে ঝগড়ার দৃশ্য, সংসার আলাদা হবার পর গয়ারামকে শিবুর কাছে দিয়ে আসতে গঙ্গামণির মর্মান্তিক অবস্থা, প্রতিশ্রুতি মতো গয়ারামকে কলা সন্দেশ দিতে না পারায় ভয়ে আশঙ্কায় কাঁচুমাচু হয়ে গঙ্গামণির অবস্থা ইত্যাদি দৃশ্যগুলি ভোলবার নয়। তবে কাহিনীটি গোড়া থেকে যেভাবে বিস্তার খেলিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সে তুলনায় পরিসমাপ্তিটা অনেক তাড়াহুড়োর মধ্যে শেষ করা হয়েছে।

* * *

এতে গঙ্গামণির চরিত্রে মলিনা দেবী আর একবার একটি অবিস্মরণীয় অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গঙ্গামণি আর সুবি, দুই বন্ধ্যা নারী একটি মাতৃহীন

বালককে নিজের সন্তান করে নিতে চায়। এই নিয়েই তাদের সংঘর্ষ। গয়ারামকে দখলে রাখার দুজনের দুরকম পথ। গঙ্গামণি ভালোবাসা দিয়ে গয়ারামকে পেতে চায়, আর সুবিও চায় তার প্রতি গয়ারামের ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করে তাকে নিজের করে রাখতে। গয়ারাম অশান্ত, রাগী ছেলে। কিন্তু তার যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকটা দেখবার ভারে যেমনি, তেমনি গয়ারাম সুবির দখলে চলে যাওয়ায় তার জন্য আকুলতা, গয়ারাম রেগে অনর্থ বাধালে তার জন্যে আশঙ্কা ও মমতা জড়ানো ভয়, আবার সুবির দাপটের সামনে নিজের মাথা উঁচু করে রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবাভিব্যক্তিতে মলিনা দেবী গঙ্গামণিকে বাঙলা পর্দার একটি স্মরণীয় চরিত্রে রূপায়িত করে দিয়েছেন। গঙ্গামণিকে বেশী বকতে হয়েছে, চেঁচাতে হয়েছে সেটা সংযত না করার জন্য দায়ী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা। সুবির চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অল্প লেখাপড়া জানা গাঁয়ের মেয়ে, এবং জীবনের পরম বিষয়ে প্রবঞ্চিতা নারীর সংসারের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ চরিত্রটি ফুটিয়েছেন চমৎকার। ছবিখানির এটিও একটি অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। গয়ারামের প্রতি সুবির মমতা ও অপত্যস্নেহ জাগরূক হয়ে ওঠাটা কিন্তু যথোপযুক্ত বিন্যাস না হওয়ার ফলে অতি আকস্মিক মনে হয়। শিবু ও শম্ভুর চরিত্র দুটিতে যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও অসিতবরণ বেশ দুটি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। শম্ভুর বিয়ের ঘটক এবং গঙ্গামণির অন্যতম ভাই চরণের চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শম্ভুর ছেলে থাকা নিয়ে নতুন বউয়ের সংগে ঝগড়া করার দৃশ্যটি যা সারা-ছবির একমাত্র হাল্কা দৃশ্য। অপর ভাই মামলাবাজ পাঁচুর চরিত্রে প্রেমাংশু বসুর অভিনয়েও একটা চরিত্র ফুটেছে। আর অভিনয়ে আছেন রেণুকা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, তুলসী লাহিড়ী, সুখেন, বিভু, অসিতকুমার, সুদীপ্তা প্রভৃতি।

* * *

দৃশ্যগুলির রচনায় এবং দৃশ্যের মধ্যে ঘটনানুগ সচলতা রক্ষা করে যাওয়ায় বিশু চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজে বিশেষভাবে দৃষ্টিতে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বহির্দৃশ্যগুলির রচনার মধ্যে এবং চরিত্র ও ঘটনার মেজাজ ও গতি ধরে ক্যামেরার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করে রাখার কাজে যথেষ্ট অসাধারণত্বও দেখিয়েছেন তিনি। এই প্রসংগে বলে নেওয়া যায় যে, ছবিখানির অন্যতম গুণের মধ্যে রয়েছে এর খাঁটি দিশী চেহারাটা। চরিত্র ও ঘটনার পরিকল্পনাতেও যেমন, তেমনি দৃশ্য পরিবেশ রচনার মধ্যেও সবটুকুই নিখাদ দিশী। ছবিখানির অসাধারণত্ব নিয়ে আসার পক্ষে এও একটা সহায় ছিল। শুধু কথা আর চেঁচানি ব্যাপারে কিছু

"চলাচল" চিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

মিতব্যয়িতা রক্ষা করতে পারলে এ-ছবির অনন্যসাধারণত্ব মারা যেতে পারতো না। বহির্দৃশ্যে সংলাপের রেকর্ডিংটা বেশী উচ্চগ্রামে তোলা, তাতে কথার মধ্যে আবেগ ফুটতে পারেনি। অজস্র নাটকীয় অংশ জায়গায় জায়গায় গ্রহণ করেছে, যেমন দুভায়ের পুকুরের এপার ওপার থেকে ঝগড়া, বাঁশকাটা নিয়ে দুভায়ের ঝগড়া ইত্যাদি দৃশ্যের ক্ষেত্রে। তবে গান ও আবহ সংগীতের রেকর্ডিং নিছক ভালো। সংলাপের শব্দ গ্রহণ করেছেন নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ ও ভূপেন ঘোষ এবং সঙ্গীতাংশ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সংগীতাংশ ও কার্তিক বসুর শিল্প-নির্দেশ ছবির সাজ শোভা ও নাটকীয় পরিবেশ মনোজ্ঞ করে গড়ে তুলতে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। অনেকদিন পর মনকে মাতিয়ে দেবার মতো টাইটেল সঙ্গীত। গান পরিবেশন করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগত মনকে ভরিয়ে দেবার মতো গানগুলির গাওয়া ও তার সংগে বাজনা গানগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে খুঁৎ ধরা গেলো গানগুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

' মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার
স্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও
অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছে:
গায়ার মাঠের প্রথম টেস্ট খেলা
াতভাবে শেষ হওয়ায় এবং লর্ডস
তীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১৮৫ রানে
পরাজিত করায় এখন 'রাবার'
প্রশ্নে দুই দেশেরই সুযোগ রইল
ান। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে
খেলা বাকী। ২৬শে জুলাই ম্যান-
ঠে আরম্ভ হচ্ছে দুই দলের চতুর্থ
া।

ও অস্ট্রেলিয়ায় এটি ছিল ১৭১তম
ই। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে
লায়। এটি নিয়ে ইংলণ্ড জিতলো
লায়। দুই দেশের টেস্ট যুদ্ধ ৪০
মাংসিত থেকে গেছে।

বাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার
লণ্ডের লীডস মাঠের এই সাফল্যকে
ক ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ
াঠের এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট
লণ্ড কোনদিনই জয়লাভ করতে
লীডস মাঠের টেস্ট ইতিহাস
ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনীতে
অপরদিকে লীডস মাঠে অস্ট্রে-
জলা ঔজ্জ্বল্যে চিহ্নিত হয়ে আছে।
দুই দেশের ১০টি টেস্ট খেলার
স্ট্রেলিয়া জিতেছে পাঁচটি খেলায়।
লাভই নয়, অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান
ব্যাটসম্যানের কাছে ছিল এই মাঠ
মৃগয়াভূমি। কারণ স্যার ব্র্যাডম্যান
ণ্ড পরিক্রমায় এসে প্রতিবারই
ঠের টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন,
দুইবার তিনি এক এক ইনিংসে
তিনশ'রও বেশী রান। লীডস
টি টেস্ট খেলায় স্যার ডোনাল্ড ব্যাট
পাঁচবার এবং পাঁচ ইনিংসে তাঁর
হয়েছে ১১১২ রান। হিসেব
নংস পিছু গড় দাঁড়ায় ২২৬ রান।
ঠের আরও একটু ইতিহাস আছে।
অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে একবারই মাত্র
বোলার 'হ্যাটট্রিক' লাভের অধিকারী
এবং সে অধিকার অর্জিত হয়েছে
স মাঠে। ১৮৯৯ সালে মিডল-
লোয়াড় জে টি হার্নি অস্ট্রেলিয়ার
গ্রগরী ও হিলকে পর পর তিন বলে
র এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

ার টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের খ্যাতনামা
লার জিম লেকারের কৃতিত্বও কম
ধানত লেকার ও লকের মারাত্মক
র ফলেই ইংলণ্ডের এই কৃতিত্ব-
ফল্য সম্ভব হয়েছে বললে ভুল হয়
রণ দুই ইনিংসের হিসেবে লেকার
ানে ১১টি উইকেট এবং লক ৮৭
টি উইকেট পেয়েছেন। তবে এদের

একলব্য

কৃতিত্বের সঙ্গে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে এবং বর্ষীয়ান খেলোয়াড় ও ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সভ্য সিরিল ওয়াশব্রুকের কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয়। ব্যাটিং শক্তিশালী করবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে অবসরপ্রাপ্ত ওয়াশব্রুকের ডাক পড়ে। ওয়াশব্রুকের নির্বাচনে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় বিরুদ্ধ সমালোচনা যথেষ্ট হয়; কিন্তু ওয়াশব্রুক যে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে নিজ দলের শোচনীয় বিপর্যয়

ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মে

রোধ করেছেন তা ক্রিকেট ইতিহাসের এক দৃষ্টান্ত হিসেবেই পরিগণিত হবে। খেলা আরম্ভের পর মাত্র ১৭ রানের মাথায় যে ইংলণ্ড দল প্রথম তিনজন খেলোয়াড়কে হারিয়েছিল সেই ইংলণ্ডই অধিনায়ক মে ও ওয়াশব্রুকের সহযোগিতায় প্রথম দিনের শেষে সংগ্রহ করলো ৩ উইকেটে ২০৪ রান। ২০৪ রানের মাথায়ই অধিনায়ক মে ১০১ রান করে আউট হলেন। ওয়াশব্রুক ৯০ রান করে রইলেন নট আউট। সত্যিই নৈরাশ্যজনক সূচনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি।

পিটার মের সেঞ্চুরী সম্পর্কে বলা যেতে পারে এবারকার টেস্ট পর্যায়ে মে-ই প্রথম এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। দুই দেশের আর কোন খেলোয়াড়ই এবারকার কোন টেস্টে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ওয়াশব্রুক সেঞ্চুরীর মুখে পৌঁছেও দুর্ভাগ্যবশত ৯৮ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। এখানে অস্ট্রেলিয়ার বিনাউডের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ওয়াশব্রুকের দুর্ভাগ্যের তুলনা করা যেতে পারে। লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনাউড মাত্র ৩ রানের জন্য শত রান লাভ করতে পারেননি।

যাই হোক দ্বিতীয় দিন চা পানের কিছু আগে ৩২৫ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে আরম্ভ করে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে দেখা যায় শোচনীয় বিপর্যয়। ৬ উইকেট হারিয়ে দিনের শেষে তারা সংগ্রহ করে মাত্র ৮১ রান। মিলার ও বিনাউড নট আউট থাকেন। পরের দিন বৃষ্টির জন্য খেলা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে থাকে অস্ট্রেলিয়াবাসীর মন। পার্জন্য দেব যদি তাদের সহায়ক হয় তবে রক্ষা। নতুবা উইকেট আরও খারাপ হবার সম্ভাবনা এবং অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় অনিবার্য। পরের দিন রবিবারও খেলা বন্ধ। সুতরাং সোমবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় খেলা আরম্ভ হয়। মিলার ও বিনাউডের উইকেট অক্ষত রাখার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৪৩ রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস। ফলে 'ফলো অন' করে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং আরম্ভ করতে হয়। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য প্রথম ইনিংসের সপ্তম উইকেটে বিনাউড আউট হবার পর বাকী তিনটি উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার যোগ হয় মাত্র ১ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও ভাল হয় না। দিনের শেষে ২ উইকেটে ৯৩ রান ওঠে। হার্ভে ও মিলার যথাক্রমে ৪০ ও ২৪ রান করে নটআউট থাকেন। শেষ দিন ৫০ মিনিট পর্যন্ত মিলার ও হার্ভেকে অনমনীয় দৃঢ়তার

সংগে ব্যাট চালনা করতে দেখা যায়; কিন্তু 'হার্ভে' মিলার' জুটি ভাঙবার পর অস্ট্রেলিয়ার বাকী ৭টি উইকেটে সংগৃহীত হয় মাত্র ১২ রান। সত্যিই শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়। মধ্যাহ্ন ভোজের ১০ মিনিট পরে খেলাটির উপর যবনিকা পড়ে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ আনন্দে ফেটে পড়ে লীডস মাঠের প্রথম বিজয় সাফল্যে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩২৫। পিটার মে ১০১, ওয়াশব্রুক ৯৮, গডফ্রে ইভান্স ৪০, টি বেলী ৩৩; লিণ্ডওয়াল ৬৭ রানে ৩ উই, আর্চার ৬৮ রানে ৩ উই, বিনাউড ৮৯ রানে ৩ উইকেট।।

ইংলণ্ডের কীর্তিমান স্পিন বোলার জিম লেকার। লীডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে লেকারের টেস্ট খেলায় সাত উইকেট পূর্ণ হয়েছে

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—১৪৩। জিম বার্ক ৪১, মিলার ৪১, বিনাউড ৩০; লেকার ৫৮ রানে ৫ উই, লক ৪১ রানে ৪ উইকেট।।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—১৪০। নীল হার্ভে ৬৯, মিলার ২৬; লেকার ৫৫ রানে ৬ উই, লক ৪০ রানে ৩ উইকেট।।

। ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৪২ রানে বিজয়ী।

* * *

সপ্তাহ দুই আগে ফুটবল আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। অধিকাংশ আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল 'হ্যাণ্ডবল' ও 'পেনাল্টি'। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে হ্যাণ্ডবল এবং পেনাল্টি দেওয়া উচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত নয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে লীগের খেলায় রেফারীদের পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে যা সমালোচনার দাবী রাখে। অবশ্য রেফারীদের ভুলচুক নিয়ে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার প্রধান উদ্দেশ্য আইনঘটিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা দর্শক ও পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা। এই সংগে ফুটবল আইনের কিছু কিছু জটিল প্রশ্ন নিয়েও আলোচনার ইচ্ছে আছে। এতে আইন সম্বন্ধে যারা যথাযথ ওয়াকিবহাল নন, তাদের কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফুটবল আকারেও যেমন গোল, এ-খেলা নিয়েও তেমন গণ্ডগোল, তারপর রেফারীর পরিচালনা নিয়ে যে গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে, তাতে এ আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে না আশা করি।

কিছুদিন আগের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে, ইস্টবেংগল ও খিদিরপুর ক্লাবের প্রথমবারের লীগের খেলায় খিদিরপুর গোলরক্ষক এস ঘোষকে রেফারী সুনীল ব্যানার্জি মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এস ঘোষ অবশ্য পরে আই এফ এর কাছে তার দোষ স্বীকার করায় আই এফ এ তাকে খেলবার অনুমতি দিয়েছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, কোন খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ থেকে বের করে দিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। বিচারে খালাস পেলে অবশ্য খেলবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু যতদিন বিচার না হচ্ছে, ততদিন তিনি 'সাসপেণ্ড' খেলোয়াড় হিসাবেই গণ্য।

যাই হোক খিদিরপুর গোলরক্ষক এস ঘোষের অপরাধ ছিল খেলার মধ্যে অভদ্রোচিত আচরণ। যার শাস্তি হচ্ছে দোষী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ। রেফারী ইচ্ছে করলে তাকে 'সতর্ক'ও করে দিতে পারেন। কিন্তু গোলকিপার এস ঘোষের অভদ্রোচিত আচরণের জন্য রেফারী সুনীল ব্যানার্জি'র অবলম্বিত পন্থা এবং শেষ পর্যন্ত এস ঘোষকে মাঠ থেকে বের করে দেবার ঘটনাকে অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। অনেক সংবাদপত্রে সুনীল ব্যানার্জি'র কার্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলবো, এই খেলায় রেফারীর অন্য ভুলচুক যাই থাক গোলকিপারকে মাঠ থেকে বের করে দেবার ব্যাপারে সুনীল ব্যানার্জি একটুও অন্যায় করেননি। বরং প্রথমদিকে অনেক লঘুভাবেই তিনি বিষয়টির বিচার করেছেন।

অনেক দিনের পুরনো ঘটনার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কারের জন্যই উল্লেখ করতে হচ্ছে। সেই খেলায় অনেক দর্শকই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন গোলকিপার এস ঘোষ দুইবার বল ধরে ইস্টবেংগলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড টি বসুর মুখের উপর দিয়ে বল নাচাচ্ছিলেন। নাচাচ্ছিলেন অর্থে একবার মুখের উপর বল নিয়ে যাচ্ছিলেন আবার টেনে আনছিলেন। শুধু এস ঘোষ কেন, অনেক গোলকিপারেরই প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের মুখের উপর এমনভাবে বল নাচাবার বদ অভ্যাস আছে। কিন্তু গোলকিপারের পক্ষে এটা অন্যায় আচরণ এবং এর জন্য রেফারী তাকে সতর্ক করে তার বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে পারেন। সুনীল ব্যানার্জি অবশ্য এতদূর না এগিয়ে বলটি মৃত বা 'ডেড' হবার পর এস ঘোষকে বলেছিলেন—'এমন আচরণ অন্যায়, আর করো না।' কিন্তু এতেই এস ঘোষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন, তখন রেফারীর

ইংলণ্ডের বর্ষীয়ান খেলোয়াড় সিরিল ওয়াশব্রুক

পক্ষে তাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ফুটবল আইন খেলার মাঠে রেফারীকে অবাধ অধিকার দিয়েছে, যার ফলে রেফারী অন্যায় এবং অভদ্র আচরণের জন্য যে কোন খেলোয়াড়কে যে কোন সময় মাঠ থেকে

করে দিতে পারেন। আইনে বলা
—
layer shall be **SENT OFF** the
of play :—
If he is guilty of violent
t. i.e., using foul or abusive
ge, or if, in the opinion of the
e, he is guilty of serious foul

if he persists in misconduct
having received a caution.
[Law—12]

ৎ খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে
হবে ঃ—

যদি তিনি মারাত্মক আচরণে অভি-
ব, অর্থাৎ অশ্লীল বা গালিযুক্ত
য়োগ করেন কিংবা তিনি রেফারীর
পদসংকুল বে-আইনী খেলার জন্য
ী হন,

যদি তিনি 'সতর্ক' করবার পরও
াচরণে পুনঃপ্রবৃত্ত হন।

ায়াড়কে 'সতর্ক' করবার আইনে
য়েছে—
layer shall be **CAUTIONED** if :—

(a) He joins his team after the game has commenced, returns to the field while the game is in progress without waiting for a stoppage of the game. If the game has been stopped (to adminster the caution) it shall be restarted by the Referee dropping the ball at the place where the infringement occurred, but if the player has committed a more important offence he shall be penalised according to that section of the Law infringed;

(b) he persistently infringes the Laws of the game;

(c) he shows by word or action, dissent from any decision given by the Referee;

(d) he is guilty of ungentlemanly conduct.

For any of these three last offences, in addition to the caution, an INDIRECT FREE-KICK shall also be awarded to the opposing side from the place where the offence occurred.

অর্থাৎ খেলা আরম্ভ হবার পর খেলা চলতে থাকাকালে রেফারীর কাছ থেকে মাঠে প্রবেশ করবার সমর্থনসূচক সংকেত না পেয়ে কোন খেলোয়াড় যদি মাঠে প্রবেশ বা পুন-প্রবেশ করেন। কিম্বা তিনি বার বার খেলার নিয়ম ভাঙেন, অথবা কথায় এবং ব্যবহারে রেফারীর সিদ্ধান্তে অমত প্রকাশ করেন, অথবা অভদ্র ব্যবহারের জন্য দোষী হন, তবে তাঁকে 'সতর্ক' করা চলবে।

খেলোয়াড়ের অভদ্র ব্যবহার সম্পর্কে আইন বিশারদরা যে ভাষ্য করেছেন তার মধ্যে ইচ্ছে করে বল মাঠের বাইরে শট করা এবং আহত হবার ভান করাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেফারী এবং দর্শকদের করুণা উদ্রেকের জন্য খেলার মধ্যে যেটা সচরাচরই ঘটে থাকে। তাছাড়া গোলকিপারের পক্ষে বল আটকে রেখে অপরকে খেলবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টাও অভদ্রোচিত আচরণের আওতায় পড়ে। এই সপ্তাহেরই একটি ঘটনা ঃ

রাজস্থান ও খিদিরপুরের লীগের খেলায় খিদিরপুর গোলকিপার এস ঘোষ, যার

সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে তাকে একটি বল ধরে অহেতুক কালক্ষেপ করতে দেখা যায়। অর্থাৎ রাজস্থান ফরোয়ার্ড তাকে চার্জ করতে চেষ্টা করলে তিনি বলটি মাঝে মাঝে মাটিতে ঠেকিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকেন, কখনো উল্টো দিকে মুখ করে কখনো বা পাশ কাটিয়ে। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই রেফারী পি চক্রবর্তী তাঁর বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেন। ফলে মাঠের বহু দর্শকই পি চক্রবর্তীর ফ্রি কিকের নির্দেশের যৌক্তিকতায় হয়ে ওঠেন সন্দিহান। অনেকে মন্তব্য করেন—'গোলকিপার তো আইন মতই বল খেলছেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ফ্রি কিক কেন?' কিন্তু তাঁরা ভুলে যান এভাবে বল আটকে রেখে অহেতুক কালক্ষেপ করা অভদ্র আচরণের আওতায় পড়ে। তা ছাড়া অবস্ট্রাকশনের অপরাধেও খেলোয়াড়কে দোষী বলা যায়। অনেকের ভুল ধারণা আছে, যেহেতু গোলকিপার নিজ সীমানায় হাত দিয়ে বল খেলতে অধিকারী সেহেতু সে যদি হাত দিয়ে বল ধরে থাকে তাতে ক্ষতি কি? হাতে ধরে ৪ পায়ের বেশী না গেলেই হল। কিন্তু ১২ নম্বর আইনে রেফারীর উপদেশ শীর্ষক অংশে পরিষ্কার লেখা আছে।

When playing as goalkeeper, bear in mind that directly you leave the goal-area, any opponent may charge you. As long as you are within your goal-area, provided you do not hold the ball or obstruct an opponent, you are protected under the Laws. The best advice possible to a goalkeeper is to get rid of ball at once.

এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোলকিপারের বলমুক্ত হওয়া উচিত। কারণ বল ধরে থাকলে বা প্রতিপক্ষের খেলার বাধা সৃষ্টি করলে যে কোন সময় এবং যে কোন জায়গায় গোলকিপারকে চার্জ করবার অধিকার আছে। তবে চার্জ অবশ্যই আইন সংগত হওয়া চাই। কিন্তু অধিকাংশ গোলরক্ষকই এ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন এবং তাঁরা বেশী সময় বল ধরে রেখে অহেতুক বিপদ ডেকে আনেন।

ফুটবল লীগের পর্যালোচনা

লীগের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মোহনবাগানের পয়েণ্ট নাগাল পাবার যে সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল উয়াড়ীর কাছে পরাজয় স্বীকার এবং কালীঘাট ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে পর পর দুইটি পয়েণ্ট নষ্ট করার ফলে সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে শীর্ষস্থানীয় তিনটি ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান ৮টি, ইস্টবেঙ্গল ১১টি এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১২টি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান ক্লাবের অসমাপ্ত খেলা সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বর্তমানে মোহনবাগান ক্লাব যে অবস্থায় আছে তাতে কোন অঘটন না ঘটলে তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ একরকম নিশ্চিত বলা যায়। লীগের নীচের দিকে কালীঘাটের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

তবে নীচেকার দলগুলির খেলার ফলাফল খেলার আগেই 'গড়াপেটা' করবার যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত কোন দলকে দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণ করতে হবে, বলা শক্ত।

লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিতের আলয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সংগে ভারতের দুই কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড় নরেশ কুমার (বাঁ দিকে) ও আর কৃষ্ণন

শী সংবাদ

১০ই জ্বলাই—অদ্য বিবেকানন্দ রোডের কটি বাড়িতে এক ব্যক্তি সর্পদষ্ট হইয়া ডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত । ইহা ব্যতীত শহরতলীর আরও পাঁচ জায়গা তে ৫ ব্যক্তিকে সর্পদষ্ট অবস্থায় উপরোক্ত সপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য সন্ধ্যাবেলা দরাবাদ হইতে নয়াদিল্লী প্রত্যাবর্তন রয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্ন ৩টার সময় রাজভবনের দক্ষিণ কের ফটকের নিকট লরেন্স রোডে ১৪৪ ধারা ণ করার অভিযোগে একদল উদ্বাস্তুর উপর লিস লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ র।

১২ই জ্বলাই—সরকারী সংস্থা, নীলরতন কার হাসপাতাল হইতে গত রবিবার রাত্রে হরি পাল নামে যে রোগী নিখোঁজ হইয়া-লেন, অদ্য প্রাতে উক্ত হাসপাতাল সীমানার স্থিত পুকুরে তাহার মৃতদেহ ভাসমান স্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

লকাতার নাগরিকগণের সুবিধার্থে এসপ্ল্যানেড লে আবহাওয়ার দৈনন্দিন তালিকা র্শনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পে কলিকাতা কর্পোরেশন বিবেচনা করিয়া খতেছেন বলিয়া জানা যায়।

১৩ই জ্বলাই—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল এবং ীয় অর্থ (বিক্রয় কর) সংশোধনী বিল নামে টি বিল গৃহীত হয়। উভয় বিলই মুখ্য-ী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভায় উত্থাপন করেন।

আর জি কর হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়ন ঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করায় হাসপাতাল পক্ষ অদ্য হইতে সমুদয় ইনডোর বিভাগে ী ভর্তি পুনরায় শুরু করিবেন।

১৯৫৬ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ত্তীর্ণ কোন পরীক্ষার্থী (ক) প্রাইভেট ীক্ষার্থী হিসাবে অথবা (খ) কোন অনু-দিত হাই স্কুলের যথার্থ ছাত্র হিসাবে ১৯৫৭ ল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারিবে।

অম্বর চরকা কমিটির সুপারিশ অনুসারে রত সরকার অম্বর চরকা সংক্রান্ত পরিকল্পনা র্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান র্থিক বৎসরের জন্য ৩,২৬,৭০,০০০ টাকার ণী অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি ত্নী দুর্গাবাঈ দেশমুখ গতকল্য পুণাতে লন যে, দেশের পতিতা নারীদিগকে সমাজে নঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ৪৩০টি পুন-সন ভবন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা য়াছে।

১৪ই জ্বলাই—সংবাদপত্র শিল্পে পৃষ্ঠানু-তিক মূল্য প্রবর্তনের জন্য লোকসভার গামী অধিবেশনে একটি বিল পেশ করা বে। প্রেস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ই বিল রচিত হইবে।

আজ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই শাইয়ের সভাপতিত্বে কর্মীদের রাষ্ট্রীয় বীমা পোরেশনের সভা হয়। উহাতে সিদ্ধান্ত করা ইয়াছে যে, কাজ করিবার সময়ে আঘাত াওয়ার ফলে অঙ্গহানি ঘটিলে কর্মীদিগকে াষ্ট্রীয় বীমা পরিকল্পনা অনুযায়ী অতিরিক্ত ুবিধা হিসাবে কৃত্রিম অঙ্গ দেওয়া হইবে।

১৫ই জ্বলাই—আগামী কাল লোকসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং প্রশ্নোত্তরের পরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ রাজ্য পুনর্গঠন বিলের উপর যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করিবেন। ২৪শে জ্বলাই রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় এইবারেও ভারত সরকার শিল্প সংস্থাসমূহে তাঁহাদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবেতন ছুটি ঘোষণা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

১৬ই জ্বলাই—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ অদ্য লোকসভায় বিহার-পশ্চিমবঙ্গ বিল পেশ করিয়া বলেন যে, তিনি সংসদের সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলটিকে প্রেরণের প্রস্তাব করিবেন।

১৯৫৬ সালের স্কুল ফাইন্যাল সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা হইবে না। অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরামর্শদাতামণ্ডলীর সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নেতাজী তদন্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভারত সরকার তিনজন সদস্য লইয়া উক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

কলিকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে ফিল্ম সেন্সর সংক্রান্ত নিয়মাবলী যথারীতি পালন করা হয় কিনা, তৎসম্পর্কে নগরীর পুলিস কর্তৃপক্ষ এক তদন্ত শুরু করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জ্বলাই—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহরু অদ্য আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন।

কারেন বিদ্রোহীরা কিছুকাল যাবৎ নিষ্ক্রিয় থাকার পর গত রবিবার মৌলমেন হইতে তিশ মাইল দূরবর্তী কিয়াইন নামক একটা ক্ষুদ্র শহরে হানা দেয় এবং স্থানীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক ও ৩০জন সৈন্যকে হত্যা করে বলিয়া অদ্য সংবাদ আসিয়াছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী ও শ্রীমনোরঞ্জন সিকদারকে পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

১১ই জ্বলাই—পাঁচ দিনব্যাপী আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের পর অদ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহরু লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের মুসলিম লীগ পরিচালিত 'যুগভেরী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, কমলগঞ্জ থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামে ওয়াকিদুল্লা নামক এক ব্যক্তি এবং তার কন্যা সুরজান বিবি না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে।

"আজাদ কাশ্মীর" এলাকা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হওয়ার সময় পাকিস্থান সরকার নাকি কাশ্মীর উপত্যকায় হাঙ্গামা বাধাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

১২ই জ্বলাই—ভবিষ্যতে আণবিক অস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষাকার্য নিষিদ্ধ করিবার জন্য ভারত অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ লণ্ডনে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া বলেন যে, তিনি ভারতীয় বিপ্লবের জনক ছিলেন।

আজ কমন্সসভায় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার অ্যাণ্টনী ইডেন বলেন যে, গবর্নমেণ্ট সাইপ্রাসে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে উৎসুক। এই উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ লর্ড র‍্যাডক্লিফ কাল বিলম্ব না করিয়া সাইপ্রাসের সংবিধান রচনার জন্য শাসনতান্ত্রিক কমিশনাররূপে কাজ আরম্ভ করিবেন।

১৩ই জ্বলাই—অদ্য লণ্ডন ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর কল্পনা সর্বতো-ভাবে পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্থানের গবর্নর মিঃ এ কে ফজলুল হক যোগাযোগ, পূর্ত ও সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ আবদুস সালাম খান ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ হাসিমুদ্দীন আহমেদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

আজ বন-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহরু এবং পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ আডেনাওয়ারের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়।

১৪ই জ্বলাই—ভারত-জার্মান সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসাবে 'বনের' একটি রাস্তার নামকরণ মহাত্মা গান্ধীর নামানুসারে করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একটি সৈন্যও কমাইতে পারে না, একথা জানাইয়াছেন সেনা বাহিনীর সেক্রেটারী মিঃ উইলসন ব্রাকার।

অদ্য বেলগ্রাদে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটোর সহিত আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বুধবার এখানে পৌঁছিবেন।

১৫ই জ্বলাই—টিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ হবিব বোরগুইবা গতকল্য ফ্রান্সকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি টিউনি-সিয়া হইতে সৈন্য অপসারণে সম্মত না হয়, তবে টিউনিসিয়া "পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিবে।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গতকল্য রাত্রিতে জার্মান ফরেন পলিসি এসো-সিয়েশনের এক সভায় বলেন যে, কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

বেলগাঁওয়ে গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের অফিসে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যাহাদিগকে জাতীয়তাবাদী-দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া সন্দেহ করিতেছে, তাহাদিগকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া চলিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাষিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমি তেনজিং—অনুলেখক জে আর উলম্যান		৯২৮
পুস্তক পরিচয়—		৯৩১
রংগজগৎ—শৌভিক		৯৩৫
খেলার মাঠে—একলব্য		৯৩৯
সাপ্তাহিক সংবাদ		৯৪২
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র		৯৪৩

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 28th JULY, 1956

দেশ

২৩ বর্ষ ॥ ৩৯ সংখ্যা ॥ ।৵০
শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

লোকমান্য তিলক

গত ২৩শে জুলাই ভারতের সর্বত্র লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। লোকমান্য তিলক নিঃসন্দেহে ভারতের মুক্তি-সাধনার মন্ত্রগুরু। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত তাঁহার নিকট হইতেই বিপ্লবের বহ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করে। এই হিসাবে তিলক জাতির মন্ত্রদাতা, প্রাণপ্রদ পিতা। সিপাহী-বিদ্রোহের ভিতর দিয়া জাতির মুক্তি সাধনার যে বহ্নিবীর্য একদিন উদ্দীপ্ত হয়, বৈদেশিক প্রভুশক্তির পীড়নে এবং পেষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেই বিদ্রোহে নানা সাহেবের বীর্য ও শৌর্য এবং রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের গৌরবময় ঐতিহ্য গূঢ়ভাবে বিদেশী প্রভু-শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বীজ মারাঠা জাতির অন্তরে উপ্ত রাখে। লোকমান্য তিলকের জীবনদর্শনে এবং রাজনীতিক সাধনার মূলে আমরা তাহারই বিকাশ ও বিলাস দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী যুগ ভারতের পক্ষে অন্ধকারময়। এই যুগে শোষণ-পর শাসক সম্প্রদায়ের কূটনীতির প্রয়োগ-কৌশলে জাতি উত্তরোত্তর প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া দাসমনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। এদেশের রাজনীতিক সাধনা সেই দাসমনোবৃত্তির জটিল গ্রন্থিতে জড়াইয়া যায়। আত্মপ্রত্যয়হীন, একান্ত অসহায়, পরপ্রত্যাশাপর জাতি পরম দুর্গতির পঙ্কে পতিত হয়। জাতির অধোগতির এই দুর্দিনে তিলক মহারাজের জীবনাদর্শ এবং তাঁহার সাধনা আগ্নেয়বীর্য সঞ্চার করে এবং দীর্ঘদিনের পরমুখাপেক্ষিতার ঘৃণ্য দৈন্য এবং কার্পণ্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া তাহাকে আত্ম-চৈতন্যে উজ্জীবিত করে। স্বরাজ লাভে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার, মানবমুক্তিই কাম্য—লোকমান্য তিলকের দৃপ্তকণ্ঠে এই বাণী ধ্বনিত হয়। ভিক্ষার পথে মুক্তি মিলে না, সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে লভ্য, হৃদয়ের রক্ত দিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়—লোকমান্য তিলক জাতিকে এই শিক্ষা প্রদান করেন। ভারতের মুক্তিসাধনার দুর্গমের পথে তিলকের অভিসার। দুর্নিবার দুর্যোগ-ঝঞ্ঝাকে দুর্দম প্রাণবলে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার জীবনের গতি এবং বিদ্যুৎ-বক্ত্রালোকে সে-পথের দীপ্তি-দ্যুতি। দুর্দৈবে তাঁহার বিলাস। দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগেই তাঁহার তুষ্টি। বলিষ্ঠ এই আত্মনিষ্ঠা, মুক্তি সাধনায় তীক্ষ্ণ মনীষাদীপ্ত তাঁহার অধ্যাত্মনিষ্ঠ এমন সংবেগময় সমারম্ভ, তিলক মহারাজকে সমগ্র ভারতের অন্তরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। লোকমান্য এই খ্যাতি বালগঙ্গাধর তিলকে সর্বাংশে সার্থকতা পায়। তাঁহার এই মর্যাদা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির মুক্তিসংগ্রামে আত্মদাতা অনুগামিবৃন্দের শোণিতসিক্ত গৌরবধ্বজা তিলক গান্ধীজীর সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান এবং তাঁহার প্রদত্ত বহ্নিমন্ত্রের সাধনাতেই জাতি মুক্তিলাভ করে। লোক-মান্য তিলকের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির মন্ত্রদাতা গুরুস্বরূপে আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। সর্ববিধ ইতর আসক্তি হইতে তিনি আমাদিগকে মুক্ত করুন। অমৃতলোক হইতে তিনি আমা-দিগকে শক্তি দিন, ভক্তি দান করুন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের মানসিক বিবর্তন

মানুষের চিন্তাধারাকে দীর্ঘদিন লৌহ-জালে নিবদ্ধ রাখা যায় না। সকল বাঁধন ভাঙিয়া উদার অনন্তের অভিমুখে তাহার স্বাভাবিক গতি একদিন সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল পরে বন্ধনমুক্ত হইয়া মানুষের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্র-নাথের ঋষিদৃষ্টিতে এই সত্য অনেকদিন পূর্বেই উন্মুক্ত হয়। কবি সোভিয়েট রাষ্ট্র পরিদর্শনে গিয়া বলিয়াছিলেন—অশ্বত্থ গাছের চারাকে টবে বাঁধিয়া রাখা চলিবে না। আজ সেই কবির সেই বাণী সার্থক হইতে চলিয়াছে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সোভিয়েট রাষ্ট্র পরিদর্শন করিতে গিয়া সেখানে বর্তমানে স্বাধীন চিন্তার এমন জাগরণের পরিচয় পাইয়াছেন। স্তালিনবাদের বিরুদ্ধতাকে কেন্দ্র করিয়া সর্বতোময় ব্যক্তিপ্রভুত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কিছুদিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। উপরাষ্ট্রপতির মতে বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বত্র বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর ভাব সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার মতে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা, মানুষের সহিত মানুষের ভেদ এবং বৈষম্যবাদ এইগুলির বিরুদ্ধতাই রাশিয়ার কমিউনিস্টদের মত-বাদের মূলে কাজ করিতেছে। বলা বাহুল্য, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং ভেদ-বিদ্বেষ, এগুলির বিরুদ্ধতা মানবতারই মূলে রহিয়াছে। ইহা নিরীশ্বরবাদ নয়, অধর্ম তো নহেই। কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদের মূলে সর্বগ্রাসী আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং তদুদ্দেশ্য সাধনে অভিসন্ধি-পূর্ণ হিংসা এবং বিদ্বেষের উগ্রতাই এতদিন বিশ্বের সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে; কমিউনিস্ট মতবাদপুষ্ট সোভিয়েটের সর্বময় প্রভুত্ব নির্বিবেকভাবে বিশ্বমানবের স্বাধীন চিন্তাকে পিষ্ট করিয়া আত্মপুষ্টি খুঁজিয়াছে। বর্তমানে ভেদ-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদসাধন করিয়া মৈত্রীর অনুকূলে সোভিয়েট চিন্তা সত্যই যদি উন্মুখ হইয়া থাকে, তবে সোভিয়েট মানসিকতার এই আধুনিক বিবর্তন আশার লক্ষণ বলিতে হইবে।

অবাধে চোরাকারবার

বনগাঁও মহকুমার ৬০ মাইলব্যাপী ভারত-পাক সীমান্তে দীর্ঘদিন হইতে অবাধে চোরাকারবার চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে কলিকাতা হইতে চাউল, তৈল, কাপড় পূর্ব পাকিস্থানে চালান হইতেছে। এই ব্যাপার আজ নতুন নয়। দেশ-বিভাগের পর হইতেই এই চোরা-চালানের জোর কারবার শুরু হইয়াছে। বস্তুত এই অঞ্চলটি চোরাকারবারীদের একচ্ছত্র রাজত্বে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এই কারবারে নরনারী লিপ্ত রহিয়াছে। অনেকের পক্ষে এই সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মই একমাত্র জীবিকায় পরিণত হইয়াছে। এই কারবারীদের কলাকৌশল এবং মেধাও সামান্য নয়। ইহাদের দলে নিজেদের গোয়েন্দা আছে। পুলিসের তৎপরতার সম্বন্ধে ইহারা দলের কর্তাব্যক্তিদিগকে সংবাদ দেয় এবং পুলিসের লোক বলিয়া যদি কাহাকেও সন্দেহ করে, তবে তাহার উপর নজর রাখে। ইহা ছাড়া দলের কতকগুলি গুপ্ত ঘাটি আছে। সেইসব স্থানে মাল লইয়া মজুত রাখা হয় এবং সুযোগমত সরাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। পুলিস ও শুল্ক বিভাগের কর্মচারী এবং রেল-কর্মচারীদের সহিত এইসব চোরাকারবারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। ধারণা যে একেবারে ভ্রান্ত, ইহা বলা যায় না, কারণ যদি সেইরূপ যোগাযোগ না থাকিত, তবে এত দীর্ঘদিন অবাধে এমন চোরাকারবার চলা কিছুতেই সম্ভব হইত না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সীমান্তের এপারে ওপারে যোগাযোগসূত্রে এই কারবার চলে। পুলিসের সাড়া পাইলে ইহারা পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লয়। সুতরাং চোরাকারবারীদের চক্রান্তজাল কিরূপ ব্যাপক, ইহা হইতেই বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গে খাদ্যসংকট নিদারুণভাবে দেখা দিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর সমাজদ্রোহীদিগকে কঠোরহস্তে দণ্ডিত করিবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, আশানুরূপ ফল তাহাতে হয় নাই; কিন্তু বর্তমানে সমস্যা যেভাবে জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য নহে; প্রত্যুত অপরাধীর দমন এবং সমাজে নৈতিক চেতনা জাগরণ উভয় দিক হইতেই এই শ্রেণীর চোরাকারবারীদের কঠোরহস্তে দণ্ড বিধানের শাসন-নীতি প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ইউরোপে হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবকে ভারতীয় নবজাগরণের যুগ বলা যাইতে পারে। বেদান্তশাস্ত্র ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সংস্কৃতির প্রাণশক্তিস্বরূপ। এদেশের প্রাচীন ঋষিগণ বেদান্তের বাণীতে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে সেই বেদান্তের বাণী উদ্গীত হইয়া ভারতের সনাতন এবং সার্বভৌম আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর অনুগামিস্বরূপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেই আদর্শ প্রচারে ব্রতী আছেন। এই আদর্শের প্রচার এবং প্রসার উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। ইহার ফলে লণ্ডনস্থ রামকৃষ্ণ বেদান্ত প্রচারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ সেখানে একটি হিন্দু মন্দির এবং ভজনালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। উক্ত কেন্দ্রের সভাপতি স্বামী ঘনানন্দ এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আবেদনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটি মসজিদ আছে, বৌদ্ধগণের একটি বিহারও প্রতিষ্ঠিত আছে, শিখ সমাজের একটি গুরুদ্বারও সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দু সমাজের কোন মন্দির বা ভজনালয় নাই। লণ্ডনস্থ রামকৃষ্ণ বেদান্ত প্রচারকেন্দ্র সংলগ্ন মন্দির এবং ভজনাগারটিতে স্থান সঙ্কীর্ণ। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বহু নরনারীর সমাবেশের স্থান সেখানে হয় না। অন্তত ৫ শত নরনারীর সমাবেশের উপযোগী আয়তনবিশিষ্ট একটি মন্দির এবং ভজনাগার প্রতিষ্ঠা করা একন্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই মহদুদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে হইলে অন্যূন ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আবশ্যক। প্রস্তাবানুযায়ী মন্দির এবং ভজনাগারটি নির্মিত হইলে শুধু ইংলণ্ডে নহে, সমগ্র ইউরোপে একমাত্র উল্লেখযোগ্য হিন্দুমন্দির এবং ভজনাগারস্বরূপে গণ্য হইবে। সৎকার্যে দাতার অভাব এদেশে নাই। আমরা আশা করি, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সংস্কৃতির প্রচাররূপে এই মহদুদ্দেশ্য উদ্যাপনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী দেশবাসী প্রত্যেকে উদারহস্তে অর্থসাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইবেন। (১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ হাওড়া, (২) লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, ২৯, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা, (৩) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ বেদান্ত প্রচারকেন্দ্র, ৬৮, ডিউক এভিনিউ, মুসোয়েল হিল, লণ্ডন এন্ ১০, ইংলণ্ড, যে কোন একটি ঠিকানায় অর্থসাহায্য প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

রেল ভ্রমণের ঝুঁকি

ভারতে বর্তমানে কেহ বিলাসিতার জন্য রেল ভ্রমণ করে না, ভারতের রেল-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত [illegible] এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার অভিমত সকলেই সমর্থন করিবেন। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে, এই কারণে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোককে গতিবিধির জন্য রেলপথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই হিসাবেই এদেশের লোক এখন অধিক পরিমাণে রেল ভ্রমণে অভ্যস্ত হইয়াছে বলা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া কার্যে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রেলপথসমূহের উপর চাপ আরো বাড়িবে, রেলসচিব এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই চাপ হ্রাস করিবার জন্য রেলপথ সম্প্রসারণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক নরনারী যাহাতে নিজের নিজের প্রয়োজনে রেলে চলাফেরা করিতে পারে, এই দিকে দৃষ্টি রাখাই সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। লোকে দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণ এবং ভিড়ের চাপ কমাইবার জন্য কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ নগরীর সহিত শহরতলীর সংযোগসূত্র রক্ষার জন্য বিদ্যুৎচালিত ট্রেনের অবিলম্বে ব্যবস্থা করা দরকার। ফলত অত্যধিক ভিড়ের জন্য যাত্রীদিগকে বর্তমানে যে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ করিতে হয়, সেই সমস্যাই এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রেলযাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন ব্যবস্থাই কাজে আসিবে না বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কচ্ছ রাজ্যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প

বিগত ২২শে জুলাই কচ্ছ রাজ্যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প ঘটিয়াছে। নিদারুণ মর্মন্তুদ অত্যন্ত আকস্মিক এই সংবাদে সমগ্র দেশে বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় শতাধিক নরনারীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং বহু সহস্র লোক আশ্রয়হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। বস্তুত ১৮১৯ সালের ভূমিকম্পের পর কচ্ছ রাজ্যে এত বড় লোকক্ষয়কারী দৈববিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ দৈবদুর্যোগের উপর মানুষের কোন হাত নাই। কিন্তু বিপন্ন এবং আর্ত নরনারীকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশবাসীরও কর্তব্য আছে। যাহারা এই প্রলয়ংকর দৈবদুর্যোগের ভিতর পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমাদেরই দেশবাসী, আমাদেরই ভাই বোন, একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাহাদের অশ্রু আমাদের মুছাইতে হইবে, আহতদের শোকে আমাদের সান্ত্বনা দিতে হইবে। সর্বতোভাবে তাহাদের আশ্রয় বিধান এবং তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে করিতে হইবে।

নীলনদের পরিকল্পিত অসোয়ান বাঁধ তৈরীর জন্য আমেরিকা এবং বৃটেন যে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল তা এখন দেয়া সম্ভব নয় বলে মার্কিন ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। অসোয়ান বাঁধের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির জন্য মোট ব্যয় হবার কথা ছিল ১৩০ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য মার্কিন গভর্নমেণ্ট সাড়ে পাঁচ কোটি ও বৃটেন দেড় কোটি ডলার এবং ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ২০ কোটি ডলার ঋণ দেবে—ঠিক হয়েছিল। পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হলে মিশরের ২০ লক্ষ একর নূতন আবাদী জমি লাভ হতে পারে। তাছাড়া প্রভূত পরিমাণ হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। অসোয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটা কেন প্রত্যাহার করা হোল, এই প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকা ও বৃটেন দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন: (১) ইংগ-মার্কিন প্রতিশ্রুতি দানের সময়ে মিশরের যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তার পরিবর্তন ঘটেছে; অসোয়ান বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে মিশরের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সে দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং (২) নীলনদের জলের ভাগাভাগির বিষয়ে অন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করাতে কায়রো সরকার সক্ষম হননি।

দ্বিতীয় কারণটির সারবত্তা কতখানি সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। নীলনদের জলের সঙ্গে অন্য যে-সব রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত—সুদান, ট্যাংগানিকা, ইথিওপিয়া প্রভৃতি—তাদের সঙ্গে একটা আপস ব্যবস্থা কঠিন হোত না যদি আমেরিকা এবং বৃটেন সত্যই গরজ করত। কারণ এই সব রাষ্ট্রের উপর ইংগ-মার্কিনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট আছে। আমেরিকা ও বৃটেন অকপটভাবে চেষ্টা করলে জলের ভাগাভাগি নিয়ে এদের সঙ্গে মিশরের একটা বন্দোবস্ত হওয়া কঠিন ছিল না।

প্রথমোক্ত—অর্থনৈতিক কারণটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা টেঁকসই মনে হতে পারে, কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক নয়, তার সঙ্গে রাজনীতিও গভীরভাবে জড়ানো আছে। কারণ মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের যে-কথা বলা হচ্ছে তার মূলে হচ্ছে কম্যুনিস্টশাসিত দেশগুলির সঙ্গে মিশরের নূতন লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন। মিশর চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে যে অস্ত্রপাতি ক্রয় করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মিশরের বহির্বাণিজ্যের ধারায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেইটাই হচ্ছে মূল কথা। মিশর কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে যে অস্ত্রপাতি আমদানি করেছে, সেগুলো মাগ্না পায়নি, তার জন্য দাম দিতে হয়েছে। সে টাকা এসেছে মিশরের সর্বপ্রধান রপ্তানিযোগ্য মাল—তুলো থেকে। কম্যুনিস্ট ব্লক খুব ভালো দরে মিশরের তুলো কিনেছে এবং কিনছে। যতদিন এই অবস্থা থাকবে ততদিন পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশরের তুলোর কারবার অতি সামান্যই থাকবে। এতদিন মিশর তুলো বেচার জন্য সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা দেশগুলির মুখাপেক্ষী ছিল, এখন সেটা একেবারে উল্টো হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। তুলো বেচার টাকা যদি স্টার্লিং এবং ডলারে জমে উঠতো তবেই মিশরের পক্ষে ইংগ-মার্কিন সাহায্যের ঋণ পরিশোধ সম্ভব আর তুলো বেচার টাকা যদি কেবল রুবেল—এই জমে, তবে মিশরকে কম্যুনিস্ট ব্লক থেকেই মালপত্র আমদানি করতে হবে। উল্লিখিত অর্থনৈতিক কারণের এইটাই হচ্ছে মূলকথা যার সঙ্গে কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে অস্ত্রপাতি আমদানি করার ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে জড়িত রয়েছে।

মিশর কম্যুনিস্ট ব্লকের কাছ থেকে অস্ত্রপাতি আমদানি করাতে পশ্চিমা শক্তিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তার জবাবে সঙ্গে সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেনি। এখনও অন্যভাবে মিশরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে, একথা বৃটেন ও আমেরিকা বলছে। চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার সঙ্গে সঙ্গে "মিশরকে আর কোনো সাহায্য করব না" বলে জবাবটা অত্যন্ত রাজনৈতিকগন্ধযুক্ত হোত এবং তার ফলে মিশর আরো বেশি কম্যুনিস্ট ব্লকের দিকে ঝুঁকত।

জবাবটাকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক রূপে আনতে হয়েছে, অবশ্য মিশরের তুলোর ব্যবসায়ের কম্যুনিস্ট-ব্লকমুখী গতি ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তিকে কিছুটা অর্থনৈতিক সার-বত্তা দান করেছে। এর পিছনে অন্যান্য শক্তির ক্রিয়াও অল্পাধিক আছে সন্দেহ নেই, তবে কোন্‌টার কতখানি বোঝা মুশকিল। শোনা যাচ্ছে যে পাকিস্তান, ইরাক, ইরান এবং তুর্কীর এতে কিছু হাত আছে। এরা চায়নি যে, বাগদাদ প্যাক্টবিরোধীদের নেতা মিশরকে এতো বড়ো রকমের একটা সাহায্য দেওয়া হয়। অবশ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একথা অস্বীকার করা হয়েছে যে, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি এ-বিষয়ে কোনো চাপ দিয়েছে। তবে মিশরের এই আশাভঙ্গে যে এইসব দেশের কর্তারা অখুশী হননি অন্তত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ইজরেলকে শায়েস্তা করার জন্যই মিশর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে, একথা মিশরীয় প্রচারকগণ এতো বেশি এবং বেপরোয়াভাবে বলেছে যে এ-ব্যাপারে ইজ্‌রেলের নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। ইজরেল নিঃসন্দেহে যতটা পেরেছে চেষ্টা করেছে যাতে মিশর ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্য বেশি না পায়। আলাদাভাবে ক্ষুদ্র ইজরেলের কথায় কিছু হোত না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজরেল-দরদী ইহুদি সম্প্রদায়ের চাপ মার্কিন গভর্নমেণ্টের উপর নগণ্য নয়। বিশেষত এটা ইলেকশনের বছর, কোনো দলই ইহুদি ভোটারদের অবহেলা করতে পারে না।

অসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়া মিশরে কিরূপ হবে তাই নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা চলছে। বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট নাসের প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। অনেকেই হয়ত ভাবছে যে মিশর গভর্নমেণ্ট পশ্চিমা দেশগুলির প্রতি ক্রোধে ফেটে পড়বেন এবং সেই সুযোগে সোভিয়েট প্রভাব মিশরে তথা সারা মধ্যপ্রাচ্যে আরো বিস্তারলাভ করবে। কিন্তু মিশর গভর্নমেণ্ট যতটা বিগড়বেন বলে অনেকে ভাবছে ততটা নাও বিগড়তে পারেন। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পক্ষে এটা বেশ একটা বড়ো রকমের ধাক্কা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিশরে আবাদী জমির ভীষণ টানাটানি, অসোয়ান বাঁধ হলে অনেক পরিমাণ নূতন জমি পাওয়া যাবে, কৃষকদের এই আশা দেওয়া হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা নেই. এটা দেখা গেলে নাসের-গভর্নমেণ্ট আভ্যন্তর রাজ-নীতিতে একটু বেকায়দায় পড়বেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রেস্টিজও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। বৃটেন আমেরিকা যদি সাহায্য না করে, তবে রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে বাঁধ তৈরী হোক—এই ধ্বনি উঠতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাতে বাঁধ তৈরী হবার সম্ভাবনা নিকটতর হবে কিনা সন্দেহ। যদিও যতদূর মনে পড়ে রাশিয়া একসময়ে অসোয়ান বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু একা এতো বড়ো একটা কাজের সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে রাশিয়া প্রস্তুত কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। রাশিয়ার পক্ষে এ-কাজ করে দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু মিশরের মতো একটি দেশেই এতোখানি সাহায্য খরচ করা বোধহয় রাশিয়া সমীচীন মনে করবে না। রাশিয়া বোধহয় যত খুশী টেকনিশিয়ান পাঠাতে পারে, কিন্তু মাল-পত্রের দিক দিয়ে এতবেশি পরিমাণ কোনো একটি দেশের জন্য সরবরাহ করা বোধহয় তার পক্ষে সম্ভব নয়। রাশিয়ার সাহায্য-দান নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার পরিমাণ (টেকনিশিয়ানদের বাদ দিলে) কোথাও খুব বেশি নয়। তাছাড়া, নীল-নদের জলের ভাগাভাগি নিয়ে মিশর ও অন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে-সমস্যা রয়েছে, সেটা না মিটলে বাঁধ তৈরী হতে পারে না। এটা অবশ্য আশা করা যায় না যে, রাশিয়ার বাঁধ তৈরী করার পথ পরিষ্কার করে দেবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা উক্ত সমস্যা মিটিয়ে দেবার জন্য চেষ্টিত হবেন। অবশ্য প্রোপাগাণ্ডার জন্য রাশিয়া এই রকম ভাব দেখাতে পারে যে, সে একাই অথবা কম্যুনিস্ট ব্লকের সকলে মিলে বাঁধ তৈরী করে দিতে পারে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পিছনে থেকে জল ভাগাভাগির সমস্যা মেটাতে দিচ্ছে না। এর দ্বারা মিশরে পশ্চিমা-বিরোধী মনোভাব তীব্রতর করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের কোনো দিকে বেশি বাড়া-বাড়ি করতে ইতস্তত করবেন বলে মনে হয় না। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর পলিসি হচ্ছে নন্‌-এলাইনমেণ্ট—কোনো ব্লকে ভিড়ে না গিয়ে উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা (এবং সাহায্য আদায় করা)। দেশের জনমত অথবা বাইরের কোনো চাপ মিশরকে এক ব্লকের মধ্যে ঠেলে না নিয়ে ফেলে সে দিকে তিনি সতর্ক হবেন। কোনো এক ব্লকের খপ্পরে মিশর পড়ে না যায়, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি আছে। পশ্চিমা শক্তি বা সোভিয়েট প্রভাব একান্তভাবে কোনটারই আওতায় তিনি আসতে রাজী নন।

নাসের-গভর্নমেণ্ট কম্যুনিজম্‌-এর প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন নন। বরঞ্চ উল্টো। পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলিতে কখনো কখনো পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি কম্যুনিস্টশাসিত দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলেও দেশের মধ্যে তিনি কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে খুবই কড়া—"tough with the communists inside India।" অনেক সময়ে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে নাসের প্রভৃতির তুলনাও করা হয়। কিন্তু তুলনাটা ঠিক নয়। পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় কম্যুনিস্টদের নির্বোধ বলে উপহাস করেন, ভ্রান্ত বলে তিরস্কার করেন এবং বলা বাহুল্য ইলেকশনে কম্যুনিস্টরা যাতে পাত্তা না পায় তার জন্য কংগ্রেস দলপতি হিসাবে যা করার দরকার সবই করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি অবৈধ নয়। মিশরে অবশ্য বর্তমানে পার্টি সিসটেমের বালাই নেই, কম্যুনিস্ট নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাদের গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। কারণ কম্যুনিস্টের অস্তিত্ব এবং কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার উভয়ই মিশরে অবৈধ। মিশর যদি কোনো দিন কম্যুনিস্ট-প্রভাবাধীন হয়, তবে সেটা নিশ্চয়ই নাসের গভর্নমেণ্টের ইচ্ছায় হবে না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হবে। পশ্চিমা শক্তিরা নাসেরকে একটু নোয়াতে চায়, ভাঙতে চায় না।

অসোয়ান বাঁধ সম্বন্ধে যেরকম আশার উদ্রেক করা হয়েছিল, তাতে পরিকল্পনাটি স্থগিত হলে নাসের গভর্নমেণ্ট দেশের লোকের সামনে একটু খেলো হবেন, কিন্তু বাধ্য হয়ে আবার সর্বদিক ভেবে দেখতে হচ্ছে—এতে হয়ত ভালোই হবে। বাঁধের উপরে এতো জোর দেওয়া ঠিক হচ্ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষেও আমরা "river valley projects" বলতে অজ্ঞান হতাম। কিছুকাল পণ্ডিত নেহরুর মুখে ঐ একটি মাত্র বুলি ছিল। মনে হোত "river valley projects"-গুলো শেষ হতে যা দেরী, তারপর আর দেখতে হবে না—ভারতবর্ষ স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এখন কিন্তু আর কর্তাদের মুখে "river valley projects"-এর মহিমার কথা তেমন শোনা যাচ্ছে না। বোধ হয় কিঞ্চিৎ আশাভঙ্গ হয়েছে। শত শত কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, projectগুলির কোনোটার প্রথম, কোনোটার দ্বিতীয়, কোনোটার বা তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত কাজ শেষ হোল, কিন্তু দেশের অবস্থাতো যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই রয়ে গেছে দেখছি। মন্ত্রীরা আবার আশঙ্কা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন যে, অনির্দিষ্টকালের মতো খাদ্যশস্যে ভারত-বর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা নেই! আপাতত আমরা ইস্পাত নিয়ে পড়েছি—স্বর্গের সিঁড়ি নাকি একমাত্র ওতেই তৈরী হবে। হোক—যতদিন পর্যন্ত না global expert এবং global contractorগণ আর একটা নতুন পথ বাতলায়। পণ্ডিত নেহরু নাসেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারেন,—"ভাই, মন খারাপ কোরো না, আমি দেখেছি, ড্যাম্‌ফ্যাম্‌-এ কিছু হয় না। পারতো গোটা দু-তিন ইস্পাতের কারখানার অর্ডার দাও।"

২৪।৭।৫৬

এস বি সোম। লোকে বলে শুয়োরের বাচ্চা সোম। পুরো নামটা কিন্তু সুধীবন্ধু সোম। সোম নিজে এবং তার স্ত্রী অতসী ছাড়া এই নামটা আর কেউ জানে বলে মনে হয় না।

অথচ জানা উচিত ছিল। সোনাপুরে অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনে চারটে বছর সোমের কেটে গেল। তার আগে ছিল পুলিসে। এফিসিয়ান্সি যেভাবে দেখাচ্ছিল তাতে উন্নতি হচ্ছিল, ভবিষ্যতে আরও উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু সোমের ওই আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঁচুতে ওঠার ধৈর্য ছিল না। তা ছাড়া অল্প দিনেই যে রকম সুনাম করেছিল সোম তা সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের খোদ কর্তাদের পর্যন্ত কানে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে একটা ব্যবস্থা হল। সোম এল সোনাপুরে। প্রথম বছরটা অ্যাসিসট্যান্ট: তার পরেই একেবারে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডবলু অ্যান্ড ডবলু—। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা। বারোশোর গ্রেড। অফিসার্স বাংলো, ইলেকট্রিসিটি, মালি আর জমাদার ফ্রি। কম্পানির গাড়ি আর পেট্রল। চল্লিশেই সোম এতোটা এগিয়ে এল। ভবিষ্যৎ তো পড়ে আছে সামনে। সোমের স্বপ্ন বারশোকে সে হাজার দুইয়ে অন্তত তুলবে। সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের সোয়াশো ওয়াচম্যান, তিরিশজন আর্মড্ গুর্খা আর জনাচারেক জুনিয়ার যে কম্পানি ফালতু পুষছে না—এই কাজের কথাটা ডিরেক্টার বোর্ডকে আরও একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সোনাপুরে আসার পর থেকেই সোম অবশ্য সব সময় এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কথায় নয় কাজে। আর তার ফলেই সুধীবন্ধু সোম—এস বি সোম সোনাপুরের লোকের কাছে শুয়োরের বাচ্চা সোমে দাঁড়িয়েছে।

সোনাপুরের যারা লেবারারস্—মজুর, মিস্ত্রি, ফিটার, ফোরম্যান-টোরম্যান মায় কেরানী বাবুটাবু, তাদের চোখ নেই। থাকলে সোমকে অন্য নামেও ডাকতে পারত। সোমকে দেখতে সত্যিই আর শুয়োরের বাচ্চার মতন নয়। বরং উল্টো। বেশ সুপুরুষ চেহারা। তা ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা, পেটানো শরীর, গায়ের হাড়গুলো যেমন চওড়া তেমনি কঠিন, রঙ আধ-ফরসা, চুল সামান্যই কিন্তু লালচে রঙ-ধরা। ঘাড়ের বাঁক দুটো বেশ চেটালো, গলা ছোট অথচ পুরু। আর মুখ—মুখটাই বা মন্দ কি দেখতে, নাক লম্বা হলেও আগায় একটু চাপা, দেখলে মনে হয় ভেতরের হাড় ভাঙা। গালে খুব একটা মাংস নেই, ভারি চোয়াল; সুন্দর করে কামানো একটু গোঁফ। ছোট কপাল, মাঝে একটা শিরা ফুলে থাকে রক্তের চাপে নীলচে হয়ে। চোখ দুটো টানাটানা হলেও কালো ভুরুর নীচে একটু ধুসর রঙের তীক্ষ্ণ মণি দুটো সোমের ভীষণ ব্যক্তিত্বটা আরও ভীষণতর করে প্রকাশ করে। তা করুক। তা ব'লে এই চেহারা যার, তাকে শুয়োরের বাচ্চা বলা কেন?

সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের বাবুটাবুদের জিজ্ঞেস করলে বলবে, চেহারার জন্যে কি বলি মশাই, বলি গুণের জন্যে। এমন খচ্চড় লোক আমাদের এখানে আর দুটি পাবেন না। বেশ ছিল পুলিসে—হারামজাদা কেন যে মরতে এখানে এল—! জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে সকলকে। তবে এখানেও বেশিদিন করে খেতে হবে না। একদিন শালা ঠিক গায়েব হয়ে যাবে—নুনিয়ার জলে পুঁতে দিয়ে আসবো।

আর মজুর-মিস্ত্রিদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, উ শালা হারামি হ্যায়' পয়লা নম্বরকা হারামি। ডাঁট উতার যাগা একরোজ।

সালেকো ব্যাস—উঠা লেগা আউর বয়লারকো আন্দার ঘ্সা দে গা।

সোমের এই দুর্নাম দিনে দিনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। আগে যাও-বা সোমকে উল্লেখ করতে হলে কেউ কেউ বলত সোম-সাহেব, ইদানীং তাও আর কেউ বলত না। শুয়োরের বাচ্চা নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল।

অফিসার্সদের মধ্যেও সোমের সুখ্যাতি ছিল না। মুখার্জি, রায়, সেন, কিংহাম, গ্রীসলে—সবাইকেই কোনো না কোনো ছোট-খাটো ব্যাপারে একবার অন্তত বিব্রত এবং বিরক্ত না করেছে এমন নয়। একবার কারখানার মুখার্জি সাহেবের জন্যে একটা চাটু তৈরি হয়ে বাংলোয় যাচ্ছিল—চাপরাসী নিয়ে যাচ্ছিল, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোক তাকে ধরে সোজা সোমের কাছে এনে হাজির করলে। সোম তলব করলে মুখার্জি সাহেবকে। মুখার্জি সাহেব ইঞ্জিনিয়ার মানুষ—ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সোমের অফিসে তিনি যাবেন না। সোমও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত চিঠি। সোম ইংরিজীতে দু লাইন খসখস করে লিখে পাঠিয়ে দিল—যার বাংলা অর্থ—কারখানা মিঃ মুখার্জির চাটু তৈরি করার জন্যে নয়। তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

মুখার্জি সাহেব সেই দিন থেকেই সোমের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা।

গ্রীসলের সঙ্গে একদিন তো খুনোখুনি হবার যোগাড় হয়েছিল। গ্রীসলের শালা এসেছিল ফ্যাক্টরীর মধ্যে দেখা করতে। মোটর সাইক চেপে। গেটে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের শান্ত্রীরা আটকে দিল তাকে। পাস আছে? নেই? ভেতরে ঢোকা চলবে না। গ্রীসলের শালা চটেমটে ফিরে গেল। কথাটা সন্ধ্যেবেলায় জানতে পারল গ্রীসলে। পরের দিন সকালেই সোমের অফিসে গ্রীসলের পদার্পণ। গ্রীসলের তিনপুরুষ আগেকার স্কচ্ রক্ত ফুটছিল। সোমের দাঁতগুলো খসিয়ে দেয় আর কি! আমার লোককে গেটে আটকে দেওয়ার মানে আমাকে, অপমান করা। তোমার এ-অধিকার নেই।

তোমার শালার জন্যে কি ফ্যাক্টরীর আলাদা নিয়ম? সোম নিজের চেয়ারে বসে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে।

এ-সব বাজে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি তো তুমি করেছো—আগে ছিল না। গ্রীসলে ঝাঁঝালো স্বরে জবাব।

ইয়েস, আমি করেছি। বছরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার কম্পানির মাল তোমরা চুরি করছিলে। বাইরের লোক ঢুকে দুবার স্ট্রাইক করিয়েছে কারখানায়।

গ্রীসলে লাফিয়ে পড়ে সোমের কলার চেপে ধরল, আমি চোর, আমরা থিভস্? যু রাস্কেল! আমার লোক আনডিজায়ারেবল্ এলিমেণ্ট!

সোম গ্রীসলের হাত পলকে সরিয়ে দিল। চোখ দুটো তার আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতন জ্বলছে। আর একটা কথা বলেছো কি তোমার প্যাণ্ট শার্ট খুলে নিয়ে চাবকাবো। বাগার কোথাকার!

ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সেপাই শান্ত্রী না থাকলে সেদিন সোম-গ্রীসলের দ্বন্দ্বটা কোথায় যে গড়াত কে জানে।

গ্রীসলে সেইদিন থেকে সোমের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছে। সোমকে পথে দেখলে মনে মনে সপ্তপুরুষ উদ্ধার করে—নাম শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। রায়, সেন, ভাদুড়ী—সকলেই তাই। এ'রা নিজেদের মধ্যে দলাবাজি করেন, সোম একটা স্কাউণ্ড্রেল। টু মাচ্ আনপপুলার। এমন আর কেউ নয়। ও লাইফ রিস্ক্ নিচ্ছে। কেলেংকারী একদিন একটা হবেই। ঐই তো সেদিন স্টোর শেডের কুলিরা ঘিরে ধরেছিল। ওদের হাতেই মরবে একদিন।

কথাটা মিথ্যে নয়। সোম নিজেও বুঝতে পেরেছিল তার নাম সুধীবন্ধু হলেও আসলে সে সুধীজনের বন্ধু মোটেই নয়। বরং ঠিক উল্টো, সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের সবায়ের সে শত্রু। সবাই তার শত্রু। ডিরেক্টার বোর্ডের দু একজনই যা একটু সুনজরে দেখে তাকে। সোম বোকা নয়, মূর্খ নয়; জীবনের ওপর মমতা যে নেই তাও নয়—আবার সহজে ভয় পাবার ছেলেও সে নয়। ভয় করলেই পিছিয়ে পড়তে হবে। বারোশো দেড় হাজারের গ্রেড কোনো দিন দু হাজারে ঠেলে তোলা যাবে না। কাজেই নির্ভয় তাকে থাকতেই হবে—তবে প্রাণটাও বাঁচাতে হবে। আর সাবধানে, সতর্ক হয়ে থাকলে প্রাণ সহজে যাবে না।

ভেবে-চিন্তে এবং খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সোম ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড থেকে বাহাদুরকে নিজের জন্যে নিয়ে নিল। কারখানার মধ্যে কিংবা খাস অফিসে পার্সোনাল গার্ডের দরকার ছিল না সোমের। নিরাপত্তার অভাব ঘটবে না সেখানে। তাছাড়া কারখানার মধ্যে অতোটা সাহস কারুর হবে না দুশ্চিন্তা বাংলো নিয়ে। বাংলোটা অফিসার্স বাংলোর একেবারে শেষে—নুনিয়া নদীর কাছে। চারপাশ ফাঁকা। ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি। কাছাকাছি মানুষ বলতে ওখানে ভাদুড়ী সাহেবের বাংলো—তাও অন্তত পঞ্চাশ গজের বাইরে। আপদবিপদে ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে না। অবশ্য সোমের দৃঢ় ধারণা, ডাক শুনতে পেলেও ভাদুড়ী সাড়া দেবে না। ইচ্ছে করেই।

তা বলে সোম কি এই ভয়ের কৈফিয়ৎ দিয়ে বাংলো বদলাতে চাইবে? কখনোই না। সোম সাহেব ভয় পেয়েছে—এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করলে সোমের সিংহাসনে ফাটল ধরে যাবে।

সোম বাংলো বদলাতে চাইল না। শুধু একবার দেখা করলে জি এম-এর সঙ্গে। আমার বাংলোয় একটা গার্ড রাখতে চাই। ফর সেফ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর। সিওর, অনেক আগেই গার্ড রাখা তোমার উচিত ছিল সোম। কেন রাখোনি? ইয়োরস ইজ্ এ রিস্কি জব।

বাহাদুরকে পরের দিন থেকেই নিজের বাংলোয় রেখে দিল সোম। পার্সোনাল গার্ড।

সোমের তীক্ষ্ন চোখ দিয়ে বাছাই হয়েছে বাহাদুর। বোঝাই যায় মানুষটা ভয়ংকর হবে। এমন মানুষ যার ওপর সোম অনায়াসে আস্থা রাখতে পারে; হ্যাঁ—তেই নির্জন নুনিয়া নদীর বাংলোর শীত কি বর্ষা বিজন

গ্রীষ্ম অথবা হেমন্তের ছমছমে রাত্রিতেও যার ওপর আস্থা রেখে, ভরসা করে সোম ঘুমুতে পারে।

সোমের নির্বাচন নিখুঁত। বাহাদুর তেমনি মানুষ যাকে দেখলে ভয়ংকরই মনে হয়। তার শরীরের মধ্যে একটা ভয় যেন জমে রয়েছে। মানুষটাকে চোখ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রুচি হয় না। কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল ছোট ছোট, কোঁকড়ানো। মুখটা গোল। নাক ছোট আর বসা। চোয়ালের হাড় উঁচু উঁচু। চোখ দুটো ছোট ছোট। ভুরু যেন নেই। দৃষ্টিটা ওপর ওপর বোকাটে কিন্তু একটু নজর করলেই মনে হয়, বোকামির নীচে ভীষণ হিংস্র আর বেপরোয়া একটা পশুরে চোখ লুকিয়ে আছে। বেঁটে কোঁদানো চেহারা। ঘাড়ে পিঠে স্ফীতকায় মাংসপেশী। পায়ে হাতের গুলীতে লোকটার শক্তি যেন চমকে উঠছে।

নাম বাহাদুর হলেও লোকটা নেপালী নয়। সোমের ধারণা, মা-বাপের কেউ একজন নেপালী ছিল; অন্যজন এ-পাশের কোনো ডোম, মেথর কি সাঁওতালটাঁওতাল হবে। ট্রিডিংটা জুতসই হয়েছে। শক্তির সঙ্গে বাধ্যতা, ভয়ের সঙ্গে ভয়ংকরতা মিশ খেয়েছে।

সোমের বাংলোয় বাহাদুর অদ্ভুত মিশ খেয়ে গেল। মেহেদী আর কাঁটা তারের ফেন্সিংয়ের আড়ালে হাফ প্যান্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি গায় একটা ভয়ংকর পশু যেন সকাল থেকে রাত সারাবার সোমের বাড়ি আগলে রাখছে। না ভুল হল পশু নয়—পশুপালক কেননা সোম শুধু বাহাদুরকে রেখেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেনি—দুটো সাঙ্ঘাতিক কুকুর পর্যন্ত আমদানি করে ফেলল। একটু বাড়ন্ত ছানাই এনেছিল—বিশুদ্ধ বিলিতী রক্তের ছ' মাসেই তারা গায়ে গতরে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। আর বাহাদুর সেই দুটো অ্যালসেশিয়ানের গলায় বাঁধা শক্ত চামড়ার বকলস দু হাতে ধরে সোমের বাংলোর কম্পাউন্ড আর গেট আটকে দাঁড়িয়ে গেল। দুশাটা ভয়ংকর, ভীতিকর। চোখে পড়লে বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। মনে হয় একটা শয়তান তার অনুগত দুই দুর্ধর্ষ অনুচরের ঝুঁটি ধরে এই বাংলোটার একাকীত্ব রক্ষা করছে। কারও সাধ্য নেই গেট খুলে একটা পা বাড়াবে। একটা ডাক পর্যন্ত দিতে ভয় হয়, শিসের একটু শব্দ পর্যন্ত কানে গিয়েছে কি বাংলোর ভেতর থেকে মূর্তিমান দুই যমদূতের গর্জন ভেসে উঠবে।

সোম হুকুম করে দিয়েছিল, 'বাহাদুর, ওহি দোনোকো রোজ গোস খিলানা। হলদি আর থোড়া চাউল ডালনা গোসমে।'

জী, হুজুর।

ডগ্ সোপ্-সে দু দিন বাদ বাদ নাহা দেনা।

জী, হুজুর।

দেখো, ওহি দোনোকো শিকারী বানাও। বল্ খেলাও, আউর চিঁড়িয়া মারকে তফাৎমে ফেঁকো। সামঝা?

জী, হুজুর।

সোম যা যা বলেছিল বাহাদুর নিখুঁত-ভাবে সব করেছে—করছে এখনও। নিজের হাতে সামান্য হলুদ আর নুন দিয়ে অল্প চালের সঙ্গে মাংসের হাড় সেদ্ধ করে কুকুর-দের খাওয়ায় রোজ। দু দিন অন্তর ডগ সোপ দিয়ে চান করিয়ে দেয়। শিকারী করে তোলার জন্যে বল্ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত দূরে নিয়ে আসার জন্যে, আজকাল প্রায়ই শিশু কী নিমগাছে সকাল বিকেল চড়ুই শালিক কাক এসে বসলে ছররা দিয়ে বন্দুক ছোড়ে—পাখিগুলো টুপটাপ মাটিতে পড়লে কুকুর দুটো হাওয়ার বেগে ছুটে গিয়ে দাঁতে বিঁধে নিয়ে আসে। না, বাহাদুর এই শিকার কুকুরদের খেতে দেয় না। সাহেবের নিষেধ, তাতে কুকুরের রক্ত খারাপ হয়ে যাবে।

কুকুর দুটোকে পাকা শিকারী তৈরি করতে করতে বাহাদুর একদিন থামল। গাছগুলো থেকে মরা পাখি কুড়িয়ে আনার খেলা বাহাদুরের আর পছন্দ হচ্ছিল না, কুকুর দুটোরও বোধ হয় ভাল লাগছিল না।

সেদিন সোম যখন পিছন দিকের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে, বেতের টেবিলটার একদিকে সোম আর একদিকে অতসী, চায়ের ট্রের ওপর পরিপাটি করে বিছানো নকশা তোলা কাপড়টার ওপর একটা টকটকে লাল সুতোর প্রজাপতি নিশ্চল হয়ে আছে, বাহাদুর সামনের বাগান থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এল। বারান্দার নীচে প্রথম সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল।

'কিয়া বাত বাহাদুর?' সোম বেতের টেবিলে খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

'হুজুর!' একটু থামল বাহাদুর, মুখ তুলল, অতসীকে দেখল এক পলক, চোখ ফিরিয়ে সোমের দিকে চাইল, 'দুসরা কোই গেম্ শিখলানে হোগা।'

সোম বাহাদুরের মুখের দিকে অল্প একটু চেয়ে থাকল। যেন বাহাদুরের কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। পরক্ষণেই বুঝে ফেলল। কুকুর দুটোকে অন্য কোনো শিকারের খেলা শেখাতে চায় বাহাদুর। মনে মনে খুশী হল সোম। বললে,—'ঠিক হ্যায়, শিখলাও।'

'জী হুজুর।' বাহাদুর মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল।

সোম ডাকল। বললে, 'মাগর দেখো বাহাদুর—বাহার মাত ছোড় দো। আউর হারবাখত আপনা হাতমে রাখনা,—কনট্রোল মে। সামঝা?'

'জী, হুজুর।' বাহাদুর সম্মতি জানাতে গিয়ে আর একবার চোখ তুলল। মেম সাহেব তার দিকে চেয়ে রয়েছে। একটুক্ষণ, তারপরেই বাহাদুর বাগানের ঘাস মাড়িয়ে তার কোয়ার্টারে চলে গেল। সারভেন্টস কোয়ার্টার। সামনেই।
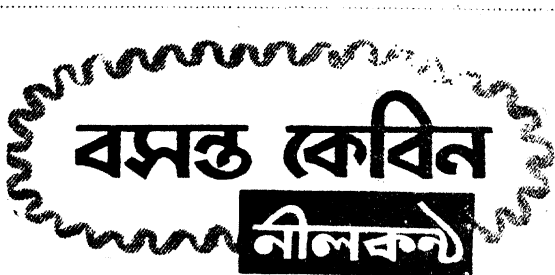
অতসী বাহাদুরের দিকে খানিক চেয়ে

থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সোমের দিকে চাইল। ভীষণ একটা বিরক্তি আর বিস্বাদ তার মুখে কালো হয়ে নেমেছে। 'তোমরা শুরু করলে কি?' অতসীর গলায় খুব ঝাঁঝ।

সোম সিগারেটটা ফেলে দিয়ে স্ত্রীর দিকে চাইল। কোনো কথা বললে না।

অতসী অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'ক্রমেই তোমরা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছ আমায় আর থাকতে দেবে না।'

'কেন, কি হল?' সোম খুব হাল্কা গলায় যেন স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস করলে।

চেয়ার ঠেলে অতসী একটু পিছিয়ে গেল। হয়ত রাগে, বিতৃষ্ণায়। বললে, 'এ-বাড়িটায় মানুষ থাকে না পশু থাকে সেটা আমি বুঝতে পারি না। কি শুরু করেছো তোমরা?'

সোম একটু হাসল, 'মানুষের চেয়ে পশুরা ভাল সার্ভিস দেয়। কিন্তু বাড়াবাড়িটা তুমি দেখলে কোথায়—কুকুর দুটো সারাদিন বসে বসে খেলে আর ঘুমুলে ওয়ার্থলেস হয়ে যাবে। বাহাদুর ওদের তাজা রাখতে চায়।'

অতসী কোনো কথা বললে না। অসহ্য রাগ আর ঘৃণায় তার সারাটা মুখ বিশ্রী হয়ে গেছে।

সোম কি ভেবে, খুব খুশী খুশী মুখে, তারিফ করা গলায় বললে, 'যাই বলো তুমি, বাহাদুর যখন দু হাতে দুটো কুকুরের বকলস টেনে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ দেখায়। ফেরোসাস। কাছে এগুবার সাহস হয় না।'

অতসী চেয়ার ছেড়ে আচমকা উঠে পড়ল। হঠাৎ বললে, 'তা এবার তোমাদের কোন্ খেলা শুরু হবে?'

'আমি জানি না। বাহাদুর নিশ্চয় কিছু একটা মতলব ঠাওরেছে।' সোম কথা বলতে বলতে এবার কি ভেবে যেন বেশ জোরেই হেসে উঠল, 'জানোয়ারটার কথা শুনলে—মগজ পরিষ্কার হচ্ছে বোধ হয়,—বলে 'গেম্'—!'

অতসী স্বামীর মুখের হাসি নিবিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে নিজেও একটু হাসল ঠোঁটের গোড়ায়, 'জানোয়ারের মতলব মতন খেলা—সাংঘাতিক একটা কিছু হবে বোধ হয়।'

'না, না—সাংঘাতিক আর কি হবে! দেখলে না, আমি তো বারণই করে দিলাম—সবসময় নিজের কনট্রোলে—হাতের মুঠোয় কুকুর দুটোকে রাখতে বলে দিলাম। আফটার অল পশু তো! কখন কি করে বসবে—'

'বসতে পারে—বলা যায় না।' অতসী যেন সোমের বাকি কথাটা শেষ করে ছেদ টেনে দিল। আর দাঁড়াল না। বারান্দা থেকে সোজা ঘরে চলে গেল।

সোম আর একটা সিগারেট ধরাল।

অতসীর কাছে সত্যিই এ-বাড়ি অসহ্য—অসহ্য। আর ভাল লাগে না। ভাল লাগার মতন কিছু নেই। অতসী ভেবে পায় না, এতো মানুষ থাকতে সোমের সঙ্গে তার বিয়ে হলো কেন! তার বাবা এমন কিছু গরীব ছিলেন না, নিজেও সে দেখতে তেমন কিছু খারাপ নয়—তবু সোমের সঙ্গে বিয়ে হবার কি দরকার ছিল।

সোম যখন সোনাপুরে সবে এসেছে—তখনই তার বিয়ে হল। বাবা বুদ্ধিমান মানুষ। সোমের ভবিষ্যৎ যেন তাঁর দেখা ছিল। দেড় দু হাজারী জামাই যে মেয়ের কপালে সুখে সৌভাগ্যে ছাতা ধরিয়ে দেবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অতসীরও সন্দেহ করার কারণ থাকেনি।

বিয়ের পর অতসী বুঝতে পারল একটা ভুল কোথাও হয়ে গেছে। সোম তেমন মানুষ যার কাছে দাম্পত্য জীবন কি স্ত্রী কিংবা সংসার বিশেষ একটা আকর্ষণ নয়। সকালের চা, দুপুরের ভাত, রাত্রের ঘুমের মতন স্ত্রী, সংসার সবই একটা স্বাভাবিক অভ্যাস। তার বেশি কিছু নয়।

আস্তে আস্তে অতসী সেটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। বাড়িতে মন বসত না বলে প্রথম প্রথম অতসী চেষ্টা করলে বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার। মুখার্জি, রায়, সেন সাহেবদের স্ত্রী, কন্যা, ভাইঝিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, যাতায়াত, বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করলে—। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাইরের পাঁচটি মেয়েও তার কাছে ধরা দিল না। প্রথম প্রথম মুখার্জি সাহেবের স্ত্রী কিংবা রায় সাহেবের বোনের সঙ্গে গল্প গুজব করতে গেলে তাঁরা ড্রয়িং রুমে এনে বসাতেন, নিজেরাও বসতেন। অল্প সল্প কথা বলতেন। চা দিতেন খেতে। ধীরে ধীরে সে-সব বন্ধ হয়ে গেল। বাংলোয় গেলে কেউ বলত, ও আপনি! আসুন, বসুন। আমার শরীরটা বড় খারাপ। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি। এখুনি এসে পড়বেন। কেউ বলত, এমন অসময়ে এলেন মিসেস সোম, আমাদের এখুনি গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে স্টেশনে—কলকাতা থেকে বড়দি আসছেন। একদিন মিসেস ভাদুড়ী তো অতসীকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে গেলেন মাথা ঘোরা আর গা গুলোনোর ছুতো দেখিয়ে, তারপর ঠায় একটি ঘণ্টা কেউ আর সে-পথ মাড়াল না।

প্রথম প্রথম যাও বা একটু চক্ষুলজ্জা, সামাজিকতার বোধ ছিল আস্তে আস্তে তাও ঘুচল। অতসীকে কেউ আর বসতে, চা খেতেও বলে না। বরং তাকে দেখলেই ওরা অস্বস্তি বোধ করে, আতংক পায় যেন। হ্যাঁ—অতসী বুঝতে পারল, তাকে সবাই এড়িয়ে যেতে চায়, দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে।

সোমকে বললে অতসী; এতটুকু দ্বিধা না করে, 'তোমার এমন সুনাম এখানে যে আমাকেও মিসেস মুখার্জিরা হয়ত তোমার স্পাই কিংবা ইনফরমার ভাবেন।'

সোম শিস দিয়ে দিয়ে গালে সাবান ঘষছিল। বললে, 'ওই হামবাগটাকে একদিন শায়েস্তা করব। পাকা চোর একটা।'

অতসীর সারা গা ঘেন্নায় রি রি করে উঠল, 'তোমার কি লজ্জা ভদ্রতা কিছু নেই? মিঃ মুখার্জি বয়স্ক লোক, মানী মানুষ।'

'রাস্কেল!' সোম শিসের সুর থামিয়ে তার মত ব্যক্ত করলে।

অতসী স্তম্ভিত। একটু চুপ করে থেকে তেতো রুক্ষ গলায় বললে, 'তোমার জন্যে আমি কারুর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি না, মিশতে পর্যন্ত না। সকলে আমায় দূর দূর করে।'

'করে নাকি?' সোম রেজার তুলে গালের কাছে ধরল। 'কেন যাও ওদের সঙ্গে কথা বলতে!'

'যাব না তো করব কি! আমি মানুষ না পশু! লোকজনের সঙ্গে মিশবো না, কথা বলব না—শুধু তোমার এই ভূতের মতন বাড়িতে সারা দিন-রাত একলা মুখ বুজে থাকব!'

সোম হো' হো করে হেসে উঠল। হাসি থামতে বলল, 'তুমি যে ক্ষেপে গেছ দেখছি। কতকগুলো মেয়েলি গল্প না করলে তোমার কি খিদে হচ্ছে না নাকি? কে বলেছে তোমায় চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকতে! রেডিও বাজাও, রেকর্ড শোনো, ছুঁচের কাজটাজ করো, নাচো গান গাও, নভেল পড়ো। ডু অ্যাজ ইউ লাইক। সময় কাটানোর অভাব কি? বাগান রয়েছে, বাহাদুর রয়েছে।'

'বাহাদুর!' অতসীর গলার কাছে সাংঘাতিক একটা চমক এসে বিঁধে গেল।

'হ্যাঁ, বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শেখ না কেন? ও তোমায় শ্যুটিং শেখাতে পারে!'

অতসী চুপ। মুখটায় যেন অনেকখানি রক্ত এসে জমে নীল হয়ে গেছে। চোখের মণি দুটো পাথর। গলার বাতাস-নলীর কাছে একটা বাতাসের কাঁকর যেন থর থর করে কাঁপছে।

সত্যিই সোমকে ঘৃণা করতে লাগল অতসী। বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল। সোমকে আর সহ্য হয় না। তার কাছে পর্যন্ত যেতে অতসীর আজকাল অদ্ভুত একটা ঘৃণা হয়। সোম মানুষ নয়—স্বামী তো কিছুতেই নয়—পশু, পশুর চেয়েও অধম একটা জীব। যদি অতসীর সাধ্য থাকত এই লোকটাকে সে বুঝিয়ে দিত সারা সোনাপুর শুধু নয়—তার ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত তাকে অত্যন্ত জঘন্য একটা মানুষ বলে ভাবে—ঘৃণা করে—ভীষণ ঘৃণা। কিন্তু মজা এই সোম এমন মানুষ যে ঘৃণা বোঝে না। বোঝে না তার স্ত্রী তাকে কতোটা ইতর, কুৎসিত ভাবে, কী পরিমাণ ঘৃণা করে। কিংবা বুঝলেও সেটা সে গ্রাহ্যই করে না। যেন স্ত্রীর ভালবাসা আর ঘৃণা দুইই সমান—কিছুতেই কিছু আসে যায় না সোমের।

আশ্চর্য, অতসীর দিন দিন এই ইচ্ছেটাই তীব্র হতে লাগল যে, সোমকে—তার স্বামীকে, সে সত্যিই যে সাংঘাতিক ঘৃণা করে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যেমন করেই হোক। যেন সেটা বোঝানোর ওপর অতসীর অস্তিত্ব, অতসীর স্বাতন্ত্র্য, তার নারীত্ব নির্ভর করছে। কিন্তু কি করে এই অমানুষিক ঘৃণাটা বোঝায় অতসী!

বাহাদুর নতুন খেলা শেখাতে শুরু করেছে অ্যালসেসিয়ান দুটোকে। শিকার ধরার খেলা। সোমের নুনিয়া নদীর বাংলোয় দুটো পশুর পাশবিকতা ভীষণ হয়ে উঠেছে। বাহাদুর তার কোয়ার্টারের একটা ঘরে খরগোশ পুষেছে। ধবধবে রঙ, লোমশ, চঞ্চল ক'টা জীব। সামনের মাঠে কাঠ-তক্তা জাল নেটের বেড়া দিয়ে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা করেছে। তার মধ্যে খরগোশ ছেড়ে দেয়। আর অ্যালসেসিয়ান দুটোকে। খরগোশ ছোটে—অ্যালসেসিয়ান দুটো ধাওয়া করে। সারা বাংলোটা কুকুরের ভয়ানক, ক্রুদ্ধ ডাকে চমকে চমকে ওঠে।

অতসী একদিন এই নতুন খেলা পা বাড়িয়ে দেখতে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। পরে সোমকে বললে, 'তোমার বাহাদুরের নতুন খেলাটা দেখেছো?'

'হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি খেলিয়েছে জানোয়ারটা। এত বুদ্ধি ওর মগজে এল কি করে?'

'আমি সামান্য শুনিয়েছি।'

'তাই তো বলি। এ কিন্তু দিব্যি হয়েছে। একটা খরগোশ নাকি কাল মরেছে।'

'নাকি! তা মরতে পারে, আশ্চর্য কি! মুখের খাবার রোজ রোজ ফস্কে যেতে কেউ দেয় না!' অতসী পাশ থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

হ্যাঁ, বাহাদুরের নতুন খেলায় নরম খরগোশ মরেছে। প্রথমে একটা। তারপর দুটো। শেষে তিনটে খরগোশও গেল।

এই খেলা শুরু হয়েছিল এক শীতের সকালে। মিঠে রোদে। হিমভেজা ঘাসে। দেখতে দেখতে শীত পেরিয়ে বসন্ত এল। নুনিয়া নদীর বাঙলোর আশেপাশের পলাশ-ঝোপ লাল হয়ে গেল—আগুনে ধরল। টকটকে আগুন। অতসী যেন তার আঁচ গায়ে মেখে নিল।

'বাহাদুর!'

'জী, মেমসাব!'

'বাহার চলো।'

'নুনিয়া মেমসাব?'

'হ্যাঁ।'

'কুত্তা?'

'লে লেও!'

'গান—?'

'জরুর।'

নুনিয়ার উঁচু-নীচু চরে—আগুনে ধরা পলাশ বনে একটা পারপেল-রেড সিফনের শাড়ি ছুটে বেড়ায় পাগল হয়ে। যেন অদ্ভুত এক আগুনের শিখা ছুটে বেড়াচ্ছে। পাথর থেকে পাথরে, বালিতে, জলে—পলাশ আর কাঁটা ঝোপে ঝোপে। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ায়। দূরে কটা হাঁস নেমেছে, ঝোপের মাথায় বুঝি এক ঝাঁক পাখি বসেছে—অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'বাহাদুর!'

'জী, মেমসাব।'

'গান্ দেও।'

বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে ছররা ভর্তি বন্দুকটা এগিয়ে দেয়। অতসীর হাত আর চোখ এতোদিনে ঠিক হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নুনিয়ার বুকে একটা শব্দ অট্টহাসি হেসে ওঠে। বাহাদুর কুকুর দুটো ছেড়ে দেয়। বিশ্রী একটা ডাক বাতাসে ছুড়ে কুকুর দুটো মরা পাখি কুড়িয়ে আনতে ছুটে যায়।

পলাশের আগুন লাগা বনে পারপেল-রেড সিফনের শাড়ি দুলে দুলে হাসতে থাকে। সে তৈরি হয়ে উঠেছে। ওয়ান্ডার-ফুল। সোম শুনলে নিশ্চয় বলবে, ওয়াণ্ডারফুল।

বসন্ত বুঝি আরও উগ্র, আরও তীব্র হল। ক'দিন থেকেই হাওয়া বইছে। কেমন এক হাওয়া যেন। অতসীর ভেতর ভেতর একটা চাপা আগুন এবার সব কিছু চৌচির করে তার মধ্য থেকে জ্বলে উঠেছে। নুনিয়ার চরে হঠাৎ একদিন বালির মধ্যে শুয়ে পড়ল অতসী। একটা অন্ধকার পা পা করে এগিয়ে আসছে। বালির মধ্যে লুটোপুটি খেতে গিয়েও হঠাৎ শান্ত, স্থির হয়ে গেল অতসী।

'বাহাদুর!'

'জী মেমসাব।'

'কুত্তা হাটাও।'

'জী।'

'ছোড় দেও দোনোকো।'

হ্যাঁ, বাহাদুর কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিল। দুই পশুকে।

বসন্তও শেষ হল। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা।

বৃষ্টি নেমেছে সোমের বাংলোয়। অ্যালসেসিয়ান দুটোর খেলা থেমেছে। বাহাদুরের কোয়ার্টারের সামনে বাঁধা থাকে। মাঝে মাঝে হুংকার দিয়ে ওঠে।

অতসী বিছানায়। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

'বাহাদুর।'

'জী মেমসাব।'

'গরম পানি বানাও।'

'জী।'

অতসী ফুটবাথ নেয়। বাহাদুর দুটি সুন্দর সুডৌল পায়ের কাছে বোবা পশুর মতন বসে থাকে। নধর হাঁটুর আবছা হাড় থেকে পায়ের গোড়ালি আর আঙুল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেন দেখে।

'বাহাদুর!'

'মেমসাব।'

'তোমারা দেশ কাঁহা?'

'মালুম নেহি।'

অতসী আচমকা খিল খিল করে হেসে ওঠে। বাহাদুর সেই হাসির ফোয়ারার দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। অতসী বলে, 'তোমারা দেশ জংগলমে। তোমারা আর তোমারা সাহাবকা। মালুম—?'

'জী, মেমসাব।' বাহাদুর হাসে না। যেন কথাটা সত্যি। তার অস্বীকার করার কিছু নেই।

বর্ষাও ফুরিয়ে গেল। তারপর শরতের এক দুপুর কাটতে না কাটতে হঠাৎ ভীষণ বর্ষা নামল। সোমের বাঙলোর গাছপালায় ঝড় তুলে, পাতা উড়িয়ে, ডাল ভেঙে ঝড় আর বৃষ্টি। দুরন্ত সে জলধারা। আকাশ কালো—নিকষ কালো। বাতাসে সে কালো যেন মিশে মিশে গেছে। বিকেলের মাঝা-মাঝি যেন রাত নেমে এল। বৃষ্টিও ঝরে চলেছে। অবিশ্রান্ত।

সোমের বাঙলোয় বাতি জ্বলে উঠল। সব বাতি নয়। একটি দুটি। অন্ধকারে আর জলের মধ্যে গাছপালা ঘেরা বাঙলোটা যেন সেই অল্প কটি মৃদু আলো নিয়ে নির্জন দ্বীপের মত পড়ে থাকল।

সন্ধ্যের একটু পরেই সোম ফিরল। গেটের কাছে আসতেই দাঁড়াল। গেট বন্ধ। গেটের বাতিটাও জ্বলছে না। হর্ন দিল সোম। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে দুটো বিকট হুংকার অন্ধকার থেকে তীরের মত তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। কুকুর দুটো গেট টপকে এলো বলে। তাড়াতাড়ি সোম গাড়ির কাঁচ দুটো তুলে দিল। ডিমার নিভিয়ে হেডলাইট জ্বেলে দিল গাড়ির। গেটের মাথার ওপর গলা তুলে ভয়ংকর দুই পশু পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। রোখা মূর্তি। চোখ জ্বলছে। ভৌতিকর গর্জনটার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে আর একটা গর্জন লাফিয়ে উঠছে। সোম এই যেন প্রথম দেখল, কুকুর দুটো অত্যন্ত বীভৎস। যে কোন মুহূর্তে লাফিয়ে গলার টুঁটি ছিঁড়ে খেতে পারে। হাউ ফেরোসাস!

অধৈর্য হয়ে সোম আর একবার হর্ন দিল। না, বাহাদুর আসছে না। বৃষ্টির শব্দে কি জানোয়ারটার কানে তালা ধরে গেল, না ঘুম দিচ্ছে! রাস্কেল, ইডিয়েট কোথাকার। এই লোকটা তার গার্ড! এর হাতে সোম তার সেফটি তুলে দিয়েছে!

ক্ষেপে গিয়ে সোম ইলেকট্রিক হর্নটা আর থামাল না। বরং হাতের সবটুকু জোর দিয়ে টিপে থাকল। বিশ্রী কর্কশ একটা একঘেয়ে শব্দ বৃষ্টিঝরা বাঙলোর অন্ধকারে কুকুরডাকের শব্দ উপচে বাজতে লাগল।

হঠাৎ একটা শব্দ। জলের মধ্যে দিয়ে কেউ যেন ছুটে আসছে। বাহাদুর। দৌড়তে দৌড়তে এসে বাহাদুর কুকুর দুটোকে বাগিয়ে ধরে নিল। হেড লাইটের আলোয় সেই তিন জানোয়ারের মূর্তি গেটের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

গেটটা খুলে দিল বাহাদুর। গাড়ির মুখ গেটের মধ্যে বাড়িয়ে একবার ব্রেক কষল সোম। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল শয়তানটাকে। ধমকে উঠল, 'কিয়া করতা থা তুম! উল্লু কাঁহাকাব। কুত্তা ছোড় দিয়া কাহে বাস্তে?'

'ছুট গিয়া হুজুর।'

'ছুট গিয়া—! পাঠ্ঠা বুড়বাক কাঁহাকাব! ইয়ে তোমারা কাম হায়? গার্ড কো কাম?'

বাহাদুর চুপ। কুকুর দুটোকে টেনে এক-পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। সোম চলে গেল গ্যারেজে।

বারান্দা পেরিয়ে বিরক্ত, অপ্রসন্ন মনে সোম ঘরে ঢুকল। ড্রয়িংরুমে। অতসী নেই। শোবার ঘরে এল সোম। বিছানায় শুয়ে রয়েছে অতসী। কোমরের ওপর পর্যন্ত সুতীর চাদর টেনে। চুল এলোমেলো। মুখের মধ্যে লালচে ভাব একটা। সামান্য যেন ঘাম কপালে। বালিশের পাশে এমব্রয়ডারির ফ্রেমে কী যেন একটা পরানো। সামান্য পিঠ উঁচিয়ে সেটা টেনে নিল অতসী। লাল রঙের সুতো পরানো ছুঁচটা আঙুলে তুলে নিল।

'বাড়িসুদ্ধ সবাই কী [illegible] মরে গিয়েছিলে?' সোম খেঁকিয়ে উঠল।

'কই, দিব্যি তো বেঁচে আছি।' অতসী আরও একটু পিঠ সোজা করে নিল।

'লক্ষণ তো দেখছি না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা ধরে হর্ন দিচ্ছি—কারও কানে ঢুকছে না?'

'যা বৃষ্টি!'

'বৃষ্টি! মালি কোথায়?'

'তাকে বাজারে পাঠিয়েছি বিকেলে। এই বৃষ্টিতেই। মুরগী জোগাড় করে আনতে। এই ওয়েদারে তোমার হয়ত মুরগী ভাল লাগবে ভেবে।' অতসী বলল, পরিহাস করছে না যেন এমন সুরে টেনে।

'আর বনমালী? সে কোথায়?'

'তাকে পাঠিয়েছি ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে। শরীরটা দুপুর থেকে খুব খারাপ হয়েছিল। মাথা ধরা আর বমি-বমি!'

সোম স্ত্রীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল। বেশ কিছুদিন ধরে অতসী শরীর খারাপের বাতিক ধরেছে। মাথা ধরা আর বমি-বমি—প্রায়ই শুনছে সোম।

'ওটা কি?' সোম অতসীর হাতের দিকে তাকিয়ে বলল।

'বাহাদুরের গেঞ্জি। একটা ফুল তুলে দিচ্ছি বুকে। ক'দিন ধরে পাগলা করে মারছে আমাকে।' অতসী হাতের ছুঁচ কাপড়ের মধ্যে ফুটিয়ে দিল।

সোম দু-পা এগিয়ে এল। অতসীর প্রায় গায়ের ওপরই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীকে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মুখটা লালচে। কপালে ঘাম। বুকের কাছটা খোলা। হৃদ্‌পিণ্ড যেন ভীষণ শ্রান্ত হয়ে খুব আস্তে আস্তে ধুকধুক করছে।

'কি হয়েছে তোমার দেখি!' সোম ছোঁ মেরে অতসীর গা থেকে চাদরটা তুলে ছুঁড়ে দিল বিছানার একপাশে। অতসী চমকে উঠে চুপ করে গেল। তারপরই ভীষণ—ভীষণ একটু রূঢ়তা ও দৃঢ়তায় শান্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকল।

অতসীর শাড়ি বড় এলোমেলো হয়েছিল। সোম পট পট করে তার ব্লাউজের শেষ বোতাম দুটো পর্যন্ত খুলে দিল এবং তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অতসীর আধ-ঢাকা শরীরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন ভীষণভাবে চমকে উঠল।

'পেটে একটা বাচ্চা ধরেছ তুমি!' সোম বিশ্রী বিশ্রীভাবে ইতরের মতন চেঁচিয়ে উঠল। পশুর মতন।

অতসী একটুও চমকাল না। কাঁপল না। সোমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে খুব নিশ্চিন্ত গলায় বললে, 'হ্যাঁ।'

সোম ছটফট করে বিছানার সামনে একটু পায়চারি করল। তারপর হঠাৎ অতসীর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাপের মতন দুই হিংস্র চোখ রেখে বললে, 'আমাকে বাজে কথা বলো না। এ হতে পারে না। তোমার। তুমি নিশ্চয় একটা জানোয়ার পেটে ধরেছ।'

অতসী গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিতে নিতে সামান্য উঠে বসল। সোমের দিকে চাইল, 'জানোয়ারের বাচ্চা কি মানুষ হয় নাকি!' গলায় অতসীর চোখ, মুখ কুঁচকে উঠল।

সোম হাত বাড়িয়ে অতসীকে, অতসীর গলাটা খপ করে ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। বেডরুমের কাচ-আঁটা দরজার বাইরে বাহাদুর দুটো ভয়ংকর জানোয়ারের গলার বকলেস ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সোম পাগলের মতন ছুটে এসে দরজাটায় প্রচণ্ড একটা লাথি মারল। ঝনঝন করে একটা কাচ বোধহয় ভেঙে পড়ল মেঝেতে। দরজাটা খুলে গেল। হাঠ হয়ে।

'হিঁয়া খাড়া হোকা কিয়া দেখতা হ্যায়, সোয়াইন।'

কুকুর দুটোকে সোমের আর নিজের মধ্যে রেখে বাহাদুর বলল, 'জী হুজুর। গার্ড্‌মে হ্যায়।'

সোম বাহাদুরের ভয়ংকর দুই চোখের দিকে তাকাল একবার। আর একবার কুকুর দুটোর ভীতিকর ভঙ্গির দিকে, চোখের দিকে। তিনটে জানোয়ারকে একসংগে দেখে নিয়ে সোম আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে অতসীর দিকে চাইল।

'হাটো—হিঁয়া সে। যাও!' সোম বিরাট জোরে এক ধমক দিতে গেল। কিন্তু গলায় শব্দ উঠল না।

বাহাদুর অন্ধকারে সরে গেল।

অতসী বিছানায় উঠে বসেছিল। সোম আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। পা দুটো কাঁপছে।

'বাহাদুর বুঝি আজকাল তোমায় গার্ড দিচ্ছে!'

'আমাকে একা নয়। আমাদের।' অতসী খুব ঠাণ্ডা গলায় বললে। আর সোমকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে মনে হল, সোম নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে ভীরু একটা জন্তুর মতন গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জ্বলেপুড়ে মরছে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ভাঙা অবশ গলায় সোম বললে, বিদ্রূপটা ভাল ফুটল না যদিও, 'খুব একটা পুণ্য কাজ করলে তা হলে!'

অতসী ছুরির মত স্বচ্ছ দুই চোখ সোমের চোখে রেখে তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, 'জানোয়ারদের আবার পাপ পুণ্য—!'

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দর যাহাতে দ্রুত নামিয়া আসে তাহার জন্য সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন,—এই প্রশ্ন করিয়া-র শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী। উত্তরে সরকার ক হইতে বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা য়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"বিশ্ব-দ্যালয় বা লোকসভা কোনটার বিচারেই ই উত্তর to the point হয়নি; প্রশ্নটা দ্রুত নাবানোর, ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে উঁচু রর চাল কেনার নয়। আমরা বলি, দ্রুত । নাবাতে দরের নীচে গোটা দুই "চক্র" ড়ে দিলেই গড়গড় করে দর নেমে াসবে" !!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয় সরিষার তৈলের মূল্য দ্ধি প্রসঙ্গে জনসাধারণকে এই তৈল ম্বন্ধে রুচি পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। "সেন মশাইর উপদেশ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত য়েছে, কেননা সর্ষের তৈল উপকারী হয় র্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ। কিন্তু অনেকেই লছেন, এই তেলের বদলে জনসাধারণ কি বহার করবেন সে কথাটা বলে দিলে ভালো করতেন। কিন্তু বিকল্পটাও কি বলে দিতে হবে, শুধু জল আছড়া মশাই, জল আছড়া" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় খাদ্যউপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাপ্পা নাকি বলিয়াছেন যে, ভারত কোন-কালে খাদ্যে স্বাবলম্বী বা প্রায়স্বাবলম্বী ছিল কিনা তা বলা কঠিন।—"এক্ষেত্রে একটি সরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলে বছর পাঁচের গবেষণার পর এ সম্বন্ধে অন্তত কিছুটা তত্ত্ব এবং তথ্য পাওয়া যেতে পারে, খাদ্য পাওয়া না গেলেও"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এশিয়ার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য পাকিস্থান নাকি একটি স্থায়ী "খাদ্যব্যাঙ্ক" গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। —"কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে overdraft নেওয়া চলবে কিনা সে সম্বন্ধে প্রস্তাবকারীরা কিছুই বলেন নি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, বর্তমানে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট অস্থায়ী, স্পীকার অস্থায়ী, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী সবাই নাকি অস্থায়ী।—"দর্শনের বিচারে পাকিস্থান অনেক উচ্চ মার্গে আরোহণ করেছেন কিন্তু অস্থায়িত্বের বান প্রতিরোধ না করলে শেষ পর্যন্ত — — —" ট্রামের জনৈক আরোহীর ধাক্কা খাইয়া শ্যামলাল কথার খেই হারাইয়া ফেলিল।

* * *

কর্পোরেশনের এক সাম্প্রতিক সভায় পৌরপিতাদের মধ্যে নাকি হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল।—"আর ঠিক সেই সময় বাপকা বেটা অর্থাৎ পৌরপুত্রদের সর্ষপ-তৈল-সিক্ত নাসিকা গর্জনে দিঙমণ্ডল প্রকম্পিত হচ্ছিল"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলালজীর Bonn-এ গমন প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। আমাদের এক সহযাত্রী প্রসঙ্গটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন—"আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনে যাবার রীতি ছিল, দেরিতে হলেও ষাটের ঊর্ধ্বে যে পণ্ডিতজী বনে গেলেন এখানেই তাঁর পাণ্ডিত্য" !!

* * *

অ[illegible] মেয়েরা উড়িবেন অর্থাৎ সদাশয় সরকার মহিলা বৈমানিকদের নাকি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।—"ওড়াটা অবশ্য নূতন নয়, দেমাকে কারু কারু পা যে

মাটিতে পড়ে না তা শুনেছি এবং দেখেছিও। তারপর অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওড়ার কথা জানি, কিন্তু বলব না"—বলিল শ্যামলাল।

* * *

রাজকোটের এক সংবাদে শুনিলাম, মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হইয়া গির-বন হইতে সিংহরা নাকি পালাইয়া যাইতেছে।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী চৌপদী ছাড়িলেন—"ওরে মূর্খ ইহা দেখি শিক্ষ, মশকেও দিতে পারে দুঃখ"!

* * *

চীন পাকিস্থানকে বিনামূল্যে চার হাজার টন চাউল দিয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতও পাকিস্থানকে চাউল দিয়াছিল। পাকিস্থান শুনিতেছি, কিছু কিছু চাউল গোয়ায় পর্তুগীজদের জন্য পাঠাইতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"একেই বলে মেগে এনে বিলিয়ে খায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়। পাকিস্থানের বেহেস্ত তো বাঁধা"।

* * *

ক্যালিফোর্নিয়া হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে নাকি শব্দতরঙ্গগ্রাসী একটি কক্ষ নির্মিত হইয়াছে অর্থাৎ যে কক্ষে চীৎকার করিলেও তাহা কক্ষবাসীর কর্ণগোচর হয় না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বোধ হয় অনেকটা আমাদের দেশের মন্ত্রীদের কক্ষের মতো, এখানেও চীৎকার-আর্তনাদ কারু কর্ণগোচর হয় না" !!

* * *

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

৫ই মে, শনিবার

আজও আমরা সুয়েজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। ২৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে সুয়েজ কেনালে প্রবেশ করিতে পারিব না। ৫॥টায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, চা খাইয়া ক্যাবিনে গিয়া শয্যার বসিয়া উপাসনা করা গেল। অদ্যকার উপাসনা বেশ লাগিতেছে। দুর্গামোহন-বাবুর পূর্বদিনের কথাটার বিষয় অনেক ভাবিয়াছি। আজ ঈশ্বরের নাম মিষ্ট লাগিতেছে।

প্রায় ৭॥টার সময় কাপড় চোপড় পরিয়া উপরে গিয়া দেখি যে, এখানকার লোকেরা নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। আমি এক শিলিং দিয়া একটা টার্কিশ ক্যাপ কিনিলাম; এক শিলিং দিয়া এক রকম পিণ্ডি খেজুর কিনিলাম এবং এক শিলিং দিয়া একটা গলাবন্ধ কিনিলাম। তিনটা শিলিং গেল। গলাবন্ধটি দুর্গামোহনবাবুকে দেখাইতে তিনি বলিলেন, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। পরে ভাবিলাম, পয়সাগুলি কি বৃথা গেল? জিনিস দেখিলে কিনিতে ইচ্ছা হয়, এ ভাবটা বোধ হয় এখনও দূর হয় নাই। যেরূপ স্থানে যাইতেছি—এরূপ ছেলেমানুষি থাকিলে রক্ষা নাই। আমাকে মিতব্যয়িতার অতি সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে; তবে রক্ষা পাইতে পারিব। প্রাতঃকালের আহারের পর একটু পড়িব ও লিখিব ভাবিয়াছিলাম। এক্সাইজ কমিশনের রিপোর্টখানি আনিয়া খানিক পাঠ না করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। ক্যাবিনে আসিয়া একটু ঘুমান গেল।

ডেকের উপরে গিয়া দেখি, আমাদের ক্যাবিনের ছাতে ইলেকট্রিক আলোর মস্ত এক এপারেটস সাজান হইতেছে। শুনিলাম, জাহাজ অদ্যই কেনালে প্রবিষ্ট হইবে। সেখানে যাইতে হইলে উজ্জ্বল আলোকের প্রয়োজন, এই জন্য এই ইলেকট্রিক আলোর বন্দোবস্ত হইতেছে।

বৈকালে প্রায় পাঁচটার সময় জাহাজ ছাড়িল ও কেনাল অভিমুখে অগ্রসর হইল। আমরা ক্রমে ক্রমে সুয়েজ বন্দরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

ইংরেজেরা থাকিতে জানে। অল্প পরি-শ্রমে ও অল্প ব্যয়ে, নিতান্ত প্রাণী-বিহীন মরুময় স্থানকে কিরূপ করিয়া রাখিতে পারা যায়, এই সুয়েজে ইংরেজেরা তাহা দেখাইয়াছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড ডক আছে; তাহাতে অনেকগুলি জাহাজ মেরা-মত হইতেছে। একটি সুন্দর এ্যাভিনিউ, ইহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ বসাইয়াছে। মরু মধ্যে বৃক্ষগুলির সচরাচর যেরূপ দুর্দশা হয়, এগুলিরও সেইরূপ দুর্দশা দেখা গেল।

ক্রমে আমরা কেনালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে সাইডিং ও স্টেশন আছে।

একটি ইউরোপীয় বাচ্চা খেলা করিতেছে। দুই একটি শ্বেতাঙ্গীর মুখ দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ স্টেশনের জেটির উপর আসিতেছেন। এই দুই এক প্রাণীতে ঐ সকল স্থানের জন-শূন্যতা, মরুময়তা ও নিস্তব্ধতা আরও বাড়াইতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত। সন্ধ্যা হইতে না হইতে স্টীমারের মাথাতে তড়িত-আলোক জ্বলিয়া উঠিল। স্টীমারখানা যেন কি এক দুরন্ত জানোয়ারের মত চলিয়াছে, তাহার মস্তকে এক অপূর্ব মণি জ্বলিতেছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। পার্বতীবাবু শয়ন করিতে গেলেন। দুর্গামোহনবাবু ও আমি আরও অনেকক্ষণ ডেকের উপর রহি-লাম। তৎপরে শয়নার্থ ক্যাবিনে আসা গেল।

৬ই মে, রবিবার

অদ্য প্রাতে জাগিয়া দেখি খুব বাতাস বহিতেছে। স্টীমার সৈয়দ বন্দরের ২০ মাইলের মধ্যে আসিয়াছে। প্রাতঃকৃত্য সমা-পনান্তে ক্যাবিনে বসিয়া উপাসনা করা গেল। তৎপরে প্রাতঃরাশের সময় উপস্থিত হইল। প্রাতরাশ সমাপনান্তে, গরম কাপড়-চোপড় বাহির করিতে ও পাতলা কাপড় প্রভৃতি তুলিতে প্রায় বেলা দশটা বাজিয়া গেল। ওদিকে জাহাজ সৈয়দ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত।

অনুমান বেলা সাড়ে দশটার সময় পার্বতীবাবু ও আমি সৈয়দ বন্দর দেখিবার জন্য তীরে নামিয়া গেলাম। তীরে নামিয়া দেখি নানা জাতীয় ইউরোপীয় লোক এখানে আছে। তন্মধ্যে গ্রীক ও ফরাসী অনেক। এত মদের দোকান আর কোথাও কখনও দেখি নাই। ইহারা পূর্ব দেশীয় লোকদিগকে এই দেখাইতেছে যে, সুরা-পান পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। হোটেল, বার রুম, বীয়ার-রুম, কফি-হাউস, সর্বত্রই মদ-মদ-মদ! সুরাদেবীর এমন পূজা জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দ্বারে রুদ্রমূর্তি দুই
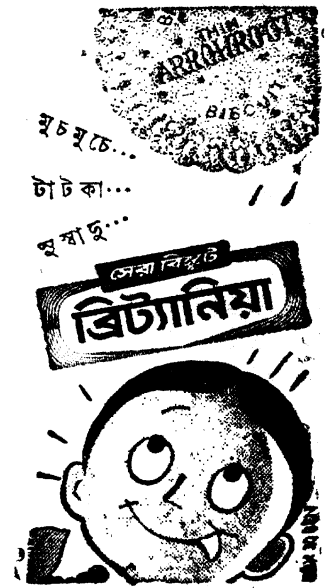
মদে দণ্ডায়মান—মদ ও মাংস। নম্র প্রকৃতি হিন্দুগণ ইহাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাজারে ঘুরিয়া আসিলাম—শহরটি ক্রমে বাড়িতেছে। কিন্তু সর্বত্রই জার্মান ও ইতালীয় বারবণিতাগণকে দেখিতে পাইলাম। যেখানেই মদিরা সেখানেই ইহারা। সভ্যতার চিরসাঙ্গণী। আমরা কয়েকটি রাস্তায় বেড়াইয়া স্টীমারে আসিলাম।

স্টীমারে কয়লা তোলাটা কি ভয়ানক বিরক্তিকর ব্যাপার! সমুদায় স্টীমার কয়লার ধুলাতে পরিপূর্ণ।

স্টীমার আড়াইটার সময় ছাড়িল। আমরা গভীর ভূমধ্য সাগরে আসিয়া পড়িলাম। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাসে ডেকে থাকা যায় না, নীচে সমুদয় সময় থাকিতে হইল।

সায়ংসন্ধ্যাটি ডেকে হইল। প্রাণটা একটু একটু করিয়া প্রভুর সঙ্গ অধিক অনুভব করিতেছে। প্রভু এস, প্রভু এস তোমার দাসের প্রাণে এস; আমাকে যে জন্য লইয়া যাইতেছ, তাহা যেন পূর্ণ হয়! ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য এইবার ফিরিয়া একেবারে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে আমি ভাষাতাত্ত্বিক বা পণ্ডিত বা দার্শনিক হইতে যাইতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম মিশনারী ও মিশনের কার্য সমুচিত-রূপে করিতে আরও সমর্থ হইব বলিয়া যাইতেছি। প্রভু, তোমার দাসকে উপযুক্ত কর।

৭ই মে, সোমবার

অদ্য আমরা ভূমধ্য সাগর-এ রহিয়াছি। প্রভাত কালে সমুদ্রের অবস্থা মন্দ বোধ হইল না। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান সারিয়া উপাসনা করা গেল। তৎপরে প্রাত আহারের সময় হইল।

অদ্য প্রাতে খৃস্টানদিগের Religious Meeting-এ কুক ও বিশপ সাহেব আসিলেন। সকলে বসিয়া স্থির হইল যে Mr. Baller অদ্য তিনটার সময় চীন দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কল্য অর্থাৎ মঙ্গলবার বিশপ দক্ষিণ ভারতের বিষয় কিছু বলিবেন। বুধবার আমি English Education in Bengal. এই বিষয়ে কিছু বলিব। বৃহস্পতিবার মিঃ ক্লার্ক চীন-এর বিষয়ে কিছু বলিবেন। অদ্য দুপুর বেলা দুর্গামোহনবাবু লর্ড শ্যাফটস্‌বেরীর জীবন-চরিত ফিরাইয়া দিলেন; পাইয়াই আহারান্তে উহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

আজ পলমল গেজেট-এ পড়িলাম যে ম্যাথু আর্নল্ড-এর (১) মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে একজন একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন, পার্বতীবাবু তাহা কাটিয়া রাখিলেন।

আমি পলমল গেজেট-এ Overland Mail পড়িয়া, আমার নিউজ পেপার স্ক্র্যাপ-বুক-এ কিছু কিছু সংবাদ কাটিয়া রাখিলাম।

আজ আহারের পর সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত লর্ড শ্যাফটস্‌বেরীর জীবন চরিত অনেকটা পড়িয়াছি।

প্রাতে শুনিলাম, আজ রাত্রে নাকি নিদ্রার মধ্যে চীৎকার করিয়াছি।

আজ সায়ংসন্ধ্যাটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। 'সত্যং-শিবং সুন্দরম্‌' এই নাম ১০৮ বার আঙ্গুলে জপিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

৮ই মে, মঙ্গলবার

বিগত রাত্রিতে বাতাস বাড়িয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ খুব প্রবল হইয়াছে। প্রাতে উঠিয়া দেখি শয্যাতে বসিলে দুলাইয়া ফেলে। গড়িমসি করিয়া উঠি-উঠি করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আজ আর চা খাইবার পূর্বে স্নান করিতে পারা গেল না। চা খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে স্নান করা গেল। স্নানান্তে ক্যাবিনে গিয়া উপাসনা করিতে বসিলাম; মনটা চঞ্চল হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতে লাগিল, ভাল করিয়া উপাসনাতে বসিল না। একবার মনটাকে ধরিয়া আনি, আবার এটা ওটা ভাবিতে ভাবিতে কোথায় গিয়া পড়ে। এইরূপে কোন প্রকারে উপাসনা করিলাম। ক্রমে প্রাতঃকালীন আহারের সময় হইল। বেশ রুচি পূর্বক আহার করা গেল। আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, জাহাজ দুলিতেছে, তরঙ্গ ছুটিতেছে; জাহাজের কর্মচারিগণ সেলুন ও ক্যাবিনের দরজা সব বন্ধ করিতেছে।

আহারের পর ডেকের উপরে গিয়া একটু বসিয়া রহিলাম, তৎপরে নীচে আসিয়া পর্বাদনের বক্তৃতার নোটগুলি শেষ করিয়া রাখিলাম। সেজন্য এডুকেশন কমিশন-এর রিপোর্ট ও ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন-স্ট্রাকশন-এর রিপোর্ট পাঠ করিলাম। নোট লওয়া হইলে ডায়েরি লিখিয়া শ্যাফটস্‌-বেরীর জীবনচরিত পড়িব স্থির করিয়া, উপরে গেলাম। পার্বতীবাবুর সী-সিকনেস হইবার উপক্রম; তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তর্ক ও গল্প গাছায় তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে দুর্গামোহনবাবু আসিয়া জুটিলেন। পার্বতীবাবুর সহিত ইংরেজী পোষাক লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। আমি বলিলাম, আমার মত এই যে, পোষাকে ন্যাশনালিটি থাকে না, ইউরোপের সকল জাতির এক পোষাক। আমি ভদ্র ও কার্যের উপযোগী পোষাক গ্রহণ করিতে সম্মত; কিন্তু ইংরেজের পোশাকের অনুকরণ করিতে প্রস্তুত নই।

আরও অনেক বিষয়ে কথা হইল। দুর্গা-মোহানবাবু বলিলেন, যাহারা উপাসনার সময় হাউ হাউ করিয়া কাঁদে, তাহারা বোধ হয় গোপনে কোন পাপ করে; উপাসনার সময় তাহা মনে পড়ে তাই কাঁদে। আমি ইহার প্রতিবাদ করিলাম। তৎপরে নিজের প্রতি ঘৃণার কথা হইল। দুর্গামোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজের প্রতি এত ঘৃণা কেন? তোমাকে ত বদমায়েস

(১) বিখ্যাত ইংরেজ কবি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্য-সমালোচক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক।

বলিয়া জানি না।" আমি বলিলাম, "কে জানে, আমার একটু আধ্যাত্মিক শুচিবাই আছে; এ বোধ হয় পীড়া বিশেষ।" তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, মনে করুন, আমাদিগকে ঈশ্বরের গৃহে এক প্রকাণ্ড হলে লইয়া গিয়া এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ গুণ অনুসারে বস; তাহা হইলে আপনারা কি করেন? দেখিলেন প্রথম বেঞ্চে বুদ্ধ যীশু, প্রভৃতি বসিয়া আছেন।" ... ... তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "আমার বেঞ্চ বাছিয়া বসা মুস্কিল হয়; বোধ হয় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকি; না হয়, শেষ বেঞ্চে বসি।" ইহাতে দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, "ইহা তোমার মনের রোগ। এটা শুধরান উচিত।" এইরূপ নানা কথার পর নীচে নামিয়া আসিলাম।

আমি সায়ংকালের আহারান্তে, সায়ং-সন্ধ্যার জন্য ডেকে গিয়া বসিলাম। লোকের ভিড়, তবু তাহার মধ্যে মনকে একটু নির্জন করিয়া "সত্যং, শিবং, সুন্দরম্" প্রিয় মন্ত্রটি জপ করিবার চেষ্টা করিলাম এবং কলিকাতার পরিবার পরিজন ও ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য তাঁহার নিকট একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করিলাম।

তৎপরে নামিয়া আসিয়া Abide in Christ নামক পুস্তক, রেভাঃ মিঃ ক্লার্ক যাহা পড়িতে দিয়াছেন, তাহার খানিকটা পড়িলাম। ৯টা না বাজিতে বাজিতে নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল; অতএব শয়ন করিতে গেলাম।

৯ই মে, বুধবার

আজ প্রাতে আকাশ পরিষ্কার, একটু মেঘের কুচিও নাই, বায়ু প্রবল নাই, সমুদ্রও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। জাহাজের সকলেই প্রফুল্ল, সকলের মুখেই "nice weather" শুনা যাইতেছে। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে চা খাইয়া কেবিন-এ আসিয়া উপাসনান্তে বসা গেল; মনটা যেন স্থির হয় না। ভাবিলাম, ডেকে গিয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপাসনা করিব। প্রাতরাশের পর ডেকে গিয়া অনেকক্ষণ উপাসনার ভাবে চিন্তাকে রাখিবার চেষ্টা করিলাম। আমার জীবনের সকল ভার তাঁহার হস্তে,—দিন দিন এই চিন্তা উজ্জ্বল হইতেছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার হস্তে মন প্রাণ দেহ সমুদায় সর্বতোভাবে অর্পণ করিতে পারি না কেন? এইখানেই আমার হীনতা।

আজ একটু বেলা না হইতে হইতে ইটালীর পর্বতমালা ও সিসিলি দ্বীপের পর্বতমালা দেখা যাইতেছে। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির দেশ দেখিব এই উৎসাহে মনে কেমন এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। দৃষ্টি এক একবার ইটালী হইতে ভারত-বর্ষের দিকে গিয়া পড়িতেছে। ইটালীর কি দশা ছিল, আর কি দশা হইয়াছে। আগে 'ইউনাইটেড্ ইটালী' হইয়াছে তৎপরে 'ফ্রী ইটালী' হইয়াছে। ভারতবর্ষও অগ্রে 'ইউনাইটেড' ভারতবর্ষ হওয়া চাই, তৎপরে 'ফ্রী' ভারতবর্ষ হইবে।

ক্রমে আমরা ইটালীর সন্নিকটে আসিয়া পড়িলাম, পর্বত পৃষ্ঠে গ্রাম ও জনপদসকল দূর হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। রেলগাড়ি শুকের পালের মত চলিয়াছে; গিরিনদী সকল শুষ্কে বালুকাময় বোধ হইতেছে; তদুপরি রেলওয়ে সেতুসকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; সুন্দর নগর, সুরম্য হর্ম্যমালা, বিচিত্র উদ্যান, দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল। এই সকল স্থানে বুঝি সুখ ও স্বাস্থ্য চিরবিরাজিত। ক্রমে মেসিনা নগরের সন্নিধানে জাহাজ উপস্থিত। মেসিনা সিসিলির রাজধানী। নগরটি অনুমান ৬।৭ মাইল বিস্তৃত, দূর হইতে ত বড়ই মনোহর মনে হয়; দেখিলে সুখ সৌভাগ্যের আলয় বলিয়া মনে হয়। সমুদ্রের একটি শাখা বাঁকিয়া মেসিনার ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়াছে; সেইটির জন্য শহরটি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। দূর হইতে আর অধিক কিছু দেখিবার সুবিধা নাই। তবে বাইনো-কুলার গ্লাসের সাহায্যে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে শহরটি অতি মনোহর বোধ হইল।

দেখিতে দেখিতে Scylla and Charibdis-এর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এতদিন Scylla and Charibdis কথা ব্যবহারই করা যাইত; কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি তাহা জানিতাম না। এখন দেখিলাম Scylla একটি পাহাড়ের অংশের নাম, ইহা ইতালীর অন্তর্গত এবং Charibdis একটি অন্তরীপের নাম, ইহা সিসিলির অন্তর্গত। Scylla—Charibdis অতিক্রম করিয়া আমরা আবার বিস্তীর্ণ সিন্ধু জলে পড়িলাম; মার্সেলিসের অভিমুখে চলিয়াছি। অনুমান শুক্রবার সেখানে পৌঁছিব।

অদ্য তিনটার সময় সি এম সোসাইটি-র বিশপের বক্তৃতা হইল। তিনি দক্ষিণ ভারতের বিষয়ে কিছু গল্পগাছা করিলেন ও ডেভিল ডান্সিং ও শতাবধানীদের বিষয়ে কিছু বলিলেন। বড় ভাল লাগিল না।

সন্ধ্যার সময় সায়ংসন্ধ্যা করিয়া একটু বেড়ান গেল। চাইনিজ মিশনরী ক্লার্ক সাহেব আসিয়া জুটিলেন। Millenium বিষয়ে কথা হইল। তিনি বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন পৃথিবীতে পাপ থাকিবে না; কারণ খ্রীষ্ট শয়তানকে ধরিয়া বাঁধিবেন এবং তাহাকে এক অন্ধকার গর্তে পূরিয়া রাখিবেন; সুতরাং লোকের পাপ প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। জগতে যে চিন্তার এত আন্দোলন চলিয়াছে, ইঁহারা তাহার সংবাদ কিছু রাখেন না; কেমন সুখে আছেন! এইরূপ নিদ্রাগত বিশ্বাস অধিক দিন টিকিবে না। সন্দেহ ও অজ্ঞেয়তা-বাদের আঘাতে ইহা এক সময় ভগ্ন হইবে। পাশ্চাত্য দেশে একেশ্বরবাদ যে ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ বোধ হয় এই। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়সকল সুদৃঢ় বিশ্বাসের বাঁধ দিয়া আধুনিক চিন্তাকে আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া নিজেদের কার্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের ভিত্তি বর্তমান চিন্তার তরঙ্গের আঘাতে আলো-ড়িত হইতেছে না। একেশ্বরবাদিগণ সেই বাঁধের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং চিন্তাসাগরের তরঙ্গ তাঁহাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিতেছে; তাঁহাদিগকে সেই তরঙ্গের মধ্যে আপনাদের জীবন ও কর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইতেছে; সুতরাং হঠাৎ ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে না। এই তরঙ্গের মধ্যে breakwater নির্মাণের উপায় কি? সে ইঞ্জিনীয়র কোথায়? সে ক্ষমতাশালী মনস্বী পুরুষ কোন দেশে জন্মিবেন?

কিন্তু এটাও হওয়া নিতান্ত আবশ্যক

যে, যে-টুকু সত্যাভাবে বিশ্বাস করি, প্রাণমনের সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে; তাহাকে সত্য বলি, সত্যের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্ক সাহেব Life for the Last Days নামক এক প্রকাণ্ড পুস্তক আনিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তার গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যীশুর পুনরাগমনের দিন সন্নিকট। কি আশ্চর্য, এই বিষয় লইয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইয়াছে! যেমন বুদ্ধের নানা জন্মের বর্ণনা করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে। মানুষ ধর্মভাবের দ্বারা অন্ধ হইয়া অনেক শক্তি কেবল ভ্রমের মধ্যে ক্ষয় করিয়াছে; প্রকৃত ধর্মসাধনে, মানবের উপকারে, সেই শক্তির অর্ধেক ব্যয় হইলে, জগতের অবস্থা আর এক প্রকার হইত। অদ্য এই ভাবিয়া সকাল সকাল শয়ন করিতে যাওয়া গেল যে, রাত্রি শেষে উঠিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে। (ক্রমশ)

॥ ১০ ॥

নৈনীতাল

দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি দেবতা অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের দিকে টান ছিল তাঁর বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতুক পরিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি মানুষের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ভয়হীন অধ্যবসায়কে পরীক্ষা করতেন।

সৃষ্টিলোকে প্রতিপালকের আসনে বসে আছেন শ্রীবিষ্ণু। আনন্দ বেদনা জরা জয়োল্লাস ভালোবাসা ও স্নেহমমতা—এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলোকের মধ্যে থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও আইনে বাঁধেননি। তিনি জানেন, মানুষ হোলো স্বেচ্ছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্রীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ পেতেন রাজ্যপাল বিষ্ণুর এই প্রশাসন পদ্ধতিতে। সেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মর্ত্যে নেমে আসতেন প্রায়ই ছদ্মবেশে। তিনি হতেন বহুরূপী। মানুষের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্রবেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি স্বর্গলোকবাসী বটে, কিন্তু স্বর্গলোকে বৈচিত্র্য কোথা? নিত্য আনন্দময় স্বর্গ,—কিন্তু তার মধ্যে দুঃখ-বেদনার স্পর্শে মধুর কাব্যের আস্বাদ নেই। দেবতামাত্রই পুণ্যময়, কিন্তু পাপের মনোহর রঙ্গীন রূপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পারিজাত কাননের কোনও কুসুমে কীট নেই, সিংহ-শার্দুলেরা সম্পূর্ণ অহিংস, সর্পের দল সর্বদা নৃত্যশীল, নন্দনকান্তি চিরযৌবনা অপ্সরাদের লীলায়িত তনুলতার সঙ্কেতে আসঙ্গলিপ্সা নেই। শোকে, অনুরাগে, দুঃখে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দ্রের স্বর্গ উদ্বেলিত নয়। শ্রীবিষ্ণু তাই শত-সহস্র-অযুত-নিযুত ভূস্বর্গ রচনা করেছেন এই পৃথিবীতে। ঈর্ষান্বিত দেবরাজ একদা স্থির করলেন যে, স্বর্গ এবং মর্ত্যের কোনও এক সন্ধিস্থলে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছদ্মবেশে তিনি পৃথিবীতে নেমে ভ্রমণে বাহির হলেন।

শিবালিক গিরিমালার মধ্যকেন্দ্র যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্ত, সেই অঞ্চলে আলুলায়িতকেশা যোগভ্রষ্টা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তার উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে পাথর লুটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিত্রাহী আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁর ঝাপটের কাছে। তার রাশি রাশি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনস্পতির অবলুণ্ঠিত ঘটেছে। শারদার উন্মত্ত নাচনে সৃষ্টি রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলশ্রেণীর প্রান্তে টনকপুরের কাছে এসে শান্ত হয়েছে শারদা। তখন শোনা যায় ঝনক-ঝনক নূপুর-নৃত্য—সেই নাচনে তরাই অঞ্চলে ব'সে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষণাবতীর উত্তর প্রান্তে পৌঁছে শান্ত হয়েছে।

টনকপুর হোলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অঞ্চলের পূর্বে নেপালরাজ্যের সীমানা, এবং পশ্চিমে হোলো দক্ষিণ কুমায়ন—অর্থাৎ নৈনীতাল। এই দুইয়ের মাঝখানে সীমানারেখা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। সুদূর উত্তরের হিমালয়লোকে ধবলীগঙ্গা ও কালী,—উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকিয়ে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়ুনের এক প্রান্তে। না, এ দৃশ্য তাঁর সুখের স্বর্গে নেই। সৃষ্টি এখানে পরমাশ্চর্য, এই হোলো অমরাবতীর সন্ধিস্থল। এখানকার নিভৃত মায়াকাননে গোপনে নেমে আসে অলকাবাসিনী অপ্সরার দল: এই উদার অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালার নীচে বিচিত্র আরণ্যক পুষ্পশোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে বসে যায় তাদের নৃত্যসভা। না, এমন জ্যোৎস্না নেই স্বর্গে —সেখানে কেবল আছে নিত্য জ্যোতির্ময়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধুরভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতীণীর বুকফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সঙ্গে মায়ালোকের জ্যোৎস্নার যে-রঙ্গ-রহস্য,—এ যে নিখিল বিশ্বেরই বিস্ময়। এর তুলনা স্বর্গে কোথাও নেই। সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র স্থির করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগুহালোক শৈবালাচ্ছন্ন শিলানির্ঝর ব্যাঘ্রভল্লুকাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অগণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলেন এক নীলনয়না সরোবরের

ন্তে। সরোবরের সলিলগহ্বরে বহুকাল র বাস করছিলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই তাল গহ্বর থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্না-সত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্র সহাস্যমুখে নালেন, এই ভূস্বর্গেই তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। ইন্দ্রপ্রস্থের বিলুপ্তির পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান। সেইজন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবধি পাষাণদেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। তিনি শক্তিরূপিণী, সেই কারণে তিনি সিন্দুর-শোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

'তাল' শব্দের অর্থ হোলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হোলো মাল্লিতাল, যেদিকে নন্দাদেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির; অন্যটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো নৈনী হ্রদটি। নৈনীতাল জেলা ভিন্ন দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগুলি জলাশয় সহসা চোখে পড়ে না। সেজন্য এগুলি হিমালয়ের উপগিরি অঞ্চলে প্রচুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এই হ্রদগুলির মধ্যে প্রধান হোলো ভীমতাল, খুরপাতাল, গরুড়তাল, নল-দময়ন্তী তাল, সুখতাল, রামতাল, লক্ষ্মণ-তাল, নওকুচিয়াতাল ইত্যাদি। সুন্দর শত-দলের শোভা এবং শালুকের গলাগলি 'নওকুচিয়াতালের' একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্রু এবং অন্যদিকে কালী-গঙ্গা, এই দুই নদীর মধ্যভূভাগ নিয়ে সমগ্র কুমায়ুন। কুমায়ুনকে যদি তিনভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশ হোলো আলমোড়া, উত্তরাংশ গাড়োয়াল। তবে গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার উত্তর-পূর্ব সীমানা তিব্বতের সঙ্গে মিলেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমগ্র ভারতে কোথাও গিয়ে তার এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিহরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়ুনে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এত-গুলি তুষারাবৃত চূড়া আর কোথাও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও অংশকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্ম চিন্তায় এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গেও ঠাঁই দেয়নি। পশ্চিমে যমুনাপর্বত—যেটিকে বলা হয় 'বন্দরপাঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতগিরিশিখরগুলিকে জনৈক জার্মান পণ্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন'। যমুনা পর্বতের পর শ্রীকণ্ঠ, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিখরগুলি জগৎপ্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, ত্রিশূল, বদরিনাথ—এগুলি সর্বোচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসংকট এবং ক্যারাভান পথ—যাদের ভিতর দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান করা চলে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ গিরিসংকট ঠাংগা, মানা, নিতি, কাংড়াবিংড়ি, দরমা, লিপুলেক ইত্যাদি পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা-

গ্রাম হয়ে শতোপন্থ ও কাম্যেতের তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসংকটের পথ, সেই পথ গেছে শতদ্রু নদের দিকে। শতদ্রুর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের নিজস্ব কোন পথ নেই, সেইজন্য তাকে আলমোড়ার মুখ চেয়ে থাকতে হয়। নৈনীতালের পশ্চিম সীমানা হোলো কালীগংগা ওরফে শারদা এবং পূর্ব সীমানা হোলো কোশী নদী। এই কোশী নদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা এবং যতদূর আমার জানা আছে এটি নেপাল-বিহারের অন্তর্গত সূর্যকোশী, সপ্তকোশী অথবা অরুণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওয়া যায়। পশ্চিম অংশে হোলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রাণীক্ষেতের পথ। এটি চলে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্য পথটি সর্বাপেক্ষা সহজ, বেরিলী থেকে কাঠ-গোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ সেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হোলো টনকপুর থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গহন অরণ্য, অসাধী পার্বত্যালোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার অভিযানকারী পর্যটককে নিত্য অভ্যর্থনা জানায়। টনকপুর থেকে মোটরবাসের পথ গেছে সোজা উত্তরে—চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড় পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগৎপ্রসিদ্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট' বহুকাল ধরে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। তাঁর নামে সমগ্র কুমায়ূন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বৎসর তাঁরই নামে রুদ্রপ্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে।

নৈনী হ্রদটিকে কেন্দ্র করে আধুনিক নৈনীতাল শহরটি গড়ে উঠেছে। উত্তপ্ত ভারতের সমতলে দাঁড়িয়ে সাহেবরা খুঁজে বেড়াতো ঠাণ্ডা অঞ্চল। বস্তুত, ইংরেজের আনুকূল্যেই ভারতে একটির পর একটি সুন্দর পার্বত্য শহর গড়ে উঠেছে। ডাল-হাউসী, লান্সডাউন, শিমলা, মুসৌরী, শিলং, এমন কি দার্জিলিঙেরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যারন নামক এক সাহেব সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার জন্য এসে পৌঁছন নৈনীতালে—সেটি ১৮৪১ খৃস্টাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন কর্তৃপক্ষ মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি আঞ্চলিক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের যে শহরটিকে আমরা দেখি, সেটি হোলো অনেকটা নীচের তলা। এখানে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাজার, বাসস্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ কাজ-কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। উপরতলায় রাজধানী এবং সরকারী দপ্তর। আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন না ঘটলে প্রাদেশিক সরকার গ্রীষ্মকালে আর লক্ষ্ণৌ থেকে স্থানান্তরিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা প্রচুর। উত্তর-পূর্বের একটি অংশ অনেকটা অবারিত থাকার জন্য শীতের দিনে ঠাণ্ডা নেমে আসে এবং তখন নগরের কাজকারবার বন্ধ করে স্থানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশ নীচের দিকে চলে যায়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাড়ের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়ারেরা হ্রদের চৌহদ্দির বনময় অঞ্চলে নেমে আসে। এই জলাশয়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের ছোটো চৌবাচ্চার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপরূপ। কিন্তু হিমালয়ের সুদূর ব্যাপকতায় স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গংগাবল, উলার হ্রদ, ডাল হ্রদ, এদের চারিদিকে অনন্তের পরিব্যাপ্তি। প্রণবানন্দ বলেন, মানস সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের পথহারা কল্পনা কৈলাস-শৃঙ্গের চারিদিকে সমস্ত আকাশে আর তিব্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানে, এই হ্রদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা নিকাশ করে দেবার জন্য একটি নালীপথ বানানো আছে, কিন্তু নালীর দক্ষিণে যে প্রবাহপথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বস্তির জটলা। পুরনো বাড়িঘর, গলি-ঘুঁজি, নোংরা আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অঞ্চল কোথাও সুশ্রী নয়। যেখানে যাও—দার্জিলিঙে, মুসৌরীতে,

শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামুটি ছয় মাস হোলো 'সীজন্', বাকি ছয়মাস তারা দারিদ্র্যে ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সম্বন্ধে যে কথা তুলছি, তাদের প্রত্যেকটি হোলো এক একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনোটির নাম 'আয়ার পট্ট', কোনোটি 'দেওপট্ট'। উত্তর অঞ্চলে হোলো 'চায়না পীক্', এদিকে আলমা, লারিয়াকান্তা, শের-কি-ডান্ডা,—এরা চারিদিক থেকে ওই হ্রদটিকে যেন ঘিরে রয়েছে। কিন্তু হাজারখানেক ফুট উপরে উঠলেই পৃথিবী অনেক বড়। যতদূরে তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিখরশ্রেণী—পূর্বেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দুস্থানের ধূসর অস্পষ্ট সমতল। পূর্ব পর্বতের 'টিপেন্ টপের' উপর উঠে সমস্ত দিনমান ধরে কেবলমাত্র হিমালয়ের পরমাশ্চর্য মহাশ্বেতশোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যারা নৈনীতালে আসে তারা জলের ধারে তলিয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করবে, সন্দেহ কি!

ছোট্ট গল্পটি মনে পড়ছে। নৈনীহ্রদে নৌকাবিহারকালে মাঝি বলেছিলঃ বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধু এখানে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে এক হৈ চৈ বাধিয়েছিলেন। সে নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয় যে, এখানে হ্রদের ধারে নয়নাদেবী মন্দির নির্মাণ না করলে তার নিস্তার নেই। সাধু এই দাবি করে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছুতেই চলবে না। তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর বাহাদুর সাধুর কান ধরে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা পান, এবং সাধুর পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেন। সাধু ভয় পায়নি। সে বিনামেঘে এমন এক বজ্রাঘাত ঘটায় যে, সমগ্র নৈনীতাল থরথরিয়ে ওঠে। চোখ রাঙিয়ে সে বলে, এমন ভূমিকম্প সে আনবে যে, লাটপ্রাসাদ ধূলিসাৎ করে দেবে। বোধকরি সেই সাধুর কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল, সেইজন্য ইংরেজ তার দাবি স্বীকার করে এবং নয়না দেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরেও আবার নানা কারণে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধুকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য গভর্নর স্বয়ং যখন পুলিস ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন্ তখন অকাল বর্ষণের ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধস নেমে আসে নীচের দিকে,—চারিদিক ছত্রখান হয়ে যায়। সাধু সেই সময় অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু যাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায়, চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ রাজত্ব পৃথিবী থেকে রসাতলে যাবে!

নৌকার মাঝি সগৌরব উদ্দীপনার সংগে মোটামুটি গল্পটা শোনালো। ওখানে আজও একটি সাধু দেখছি বৈ কি। তবে সে এক ভক্ত শিষ্যসহ হ্রদের তটের নীচে জলের কোলে একটি গুহার মধ্যে থাকে। জলের ওপারেই তার বাসা এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গুহাটি ঢাকা,—গাঁদাফুলে ভরা সেই গুহামুখ। ওরা নিজের সংসারটি বানায় ঠিক সেইখানে, যে-স্থলটি সর্বপরিত্যক্ত। গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়ের গুহা, মন্দিরের পাশ, পথের ধার,—যেখানে কারো প্রয়োজন নেই, যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্ষে করে না, কিন্তু আকর্ষণ করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘনিয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার নিগূঢ় জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। চুপ
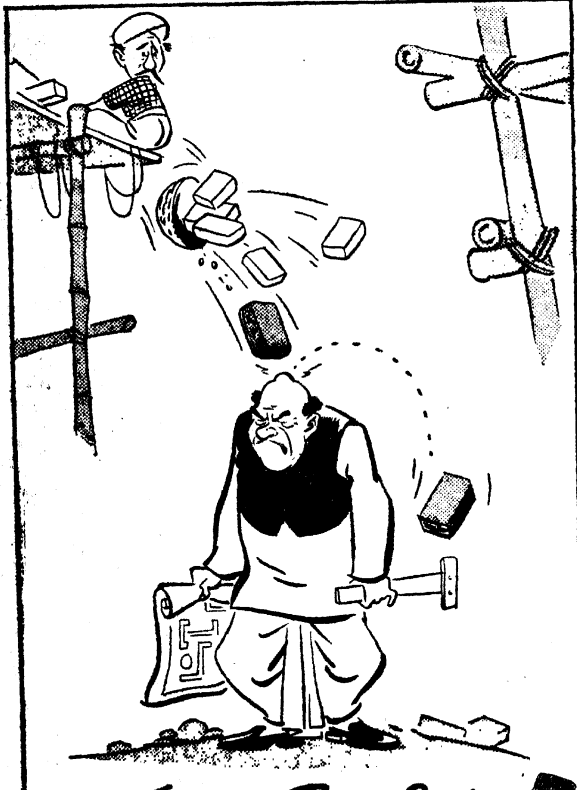
করে থাকে,—সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তটা বুঝে নাও। চরসের কল্‌কেটায় দম ভরে টান দিল,—ওই সঙ্গে ফুঁকে দিল জীবনটা। এক সময় হঠাৎ ধ্বনির থেকে ভস্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—বাস, আর চাই কি, 'ভাগোয়ানকো' মিল্‌ গিয়া। নমস্কার জানিয়ে চলে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধ্যা-সকাল করছি শুধু এঘাট ওঘাট।' সমস্ত দিনমান সুন্দর রৌদ্রে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি পাহাড় ছায়া ফেলেছে হ্রদের জলে—যেমন ওর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকান্ত আকাশ। ছবি আসেনা ওদের, কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে নিবিড় অতৃপ্তি যেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শান্ত! জলে আকাশে পাহাড়ে বাতাসে যেন সমস্ত দিন ধরে একটা প্রশ্নোত্তর মীমাংসা চলছে,—আমরা যেন তার নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দর্শক। জ্যোৎস্না-লোকে জলাশয়ের তীরে আড়ালে-আবডালে বসে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের আসর বসে যাবে। আমাদের স্তব্ধ নিমেষনিহত দৃষ্টির পিছনে নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠা!

গির্জায়, 'গুরুদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরে, কিছু যেন খুঁজে ফিরছি। কিছু দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে,—— কিন্তু তার সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌতূহল আছে, কিন্তু সংশয় আছে অনেক বেশি। সমস্ত জীবন ঘষেছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে,—অরণিকাষ্ঠ যেমন ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্য। ছমছমিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অরণ্যতলের ছায়া রাহুর মতো মুখব্যাদান করে, শুষ্ক পত্রদলের সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ,—বুঝিনি অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উত্তেজনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন করে থরথরিয়ে ওঠে! তখন দ্রুতপদে চলে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে-বস্তু খুঁজতে গিয়েছিলুম, তাই পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই বিকার এবং বৈলক্ষণ্য বুঝিনি কোনোদিন।

জলে স্থলে পাহাড়ের কোলে-কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছ্বসিত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘের আকারে এসে দাঁড়িয়েছে শ্বেত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে শিখরে। চাঞ্চল্যের বেগ আসছে ক্ষণে ক্ষণে।
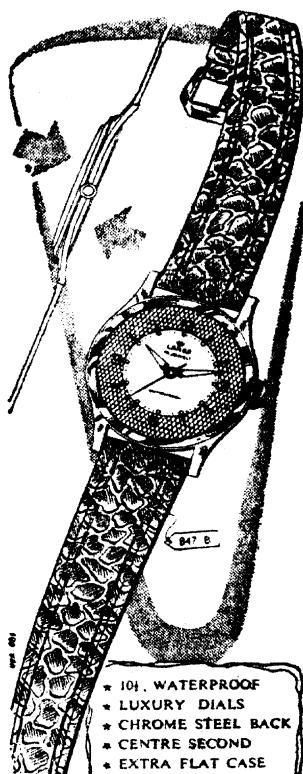
বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছে বায়ুবিলাসী ঘোড়সওয়ার। মোটরও যাচ্ছে এক আধখানা। পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছত্রিশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে সহসা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখানকার স্বল্প পরিধির মধ্যে তারা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আর মধুরে রৌদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পৌঁছেছে মারাঠী আর মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী আর রাজস্থানী, গুজরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লক্ষ্ণৌ থেকে তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে,—তারা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'এক্‌স্‌কারশনে।' এদের পাশে বাঙালী ছেলেমেয়েকে কল্পনা করে লজ্জা পাই। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষমতায় বাঙালী আজ ভারতের কোথাও বিশেষ নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাহিরে—যখন দুরন্ত জীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তার-স্বরে, তখন বাঙালী বাৎসল্যের আঁচলের নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র বাড়াচ্ছে। বদ্ধ-জলায় বাঙালীর পা পুঁতে বসে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওদের জীবনে যক্ষ্মা, দারিদ্র্য এনেছে ওদের জীবনে দৈন্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব এনেছে ওদের সমাজ-সংসারে পাণ্ডুর-প্রকৃতি। বাহিরের সবল, বৃহৎ, উদার ও সর্বপ্লাবী প্রাণশক্তির দিকে বাঙালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাকরি, পরে চায় ধর্মঘট। স্বাধীনতালাভের পর বাঙালী চাইছে অপমৃত্যু!

সুশ্রী বালক-বালিকাদলের আনন্দোজ্জ্বল কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকলে ঈর্ষাকাতর চক্ষু একসময় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। ওরা আমাদেরই সন্তান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যৎ—এ সান্ত্বনা মন যেন মানতে চায় না!

ভদ্রসমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতুম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যারা নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তারা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে পড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলে চাকরি নেয়, ড্রাইভারী করে, কিংবা বায়ুসেবীদের কাছে দাসখত লেখে। কুমায়ুনীরা ঘরে কম্বল বোনে, দর্জিগিরি করে, ফল আর সব্জি বেচে, আর নয়ত খাবারের দোকান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহস্থের জীবন-যাত্রা, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীত-কালের তিন চার মাস ওরা কুঁকড়ে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। শাকসব্জি শুকিয়ে রাখে ঘরে, খেত-খামারে কাজ থাকে না, রোগ-ভোগে ওষুধ জোটে না, বাইরের বাড়ি-ওয়ালারা ওদের কাছে জুলুম করে ঘরভাড়া

য়। চৈত্রমাস পড়লে, তবে ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—‘ট্রেক্কার’দের প্রতীক্ষায় দিন গোণে। যারা খোঁজ রাখে তারা জানে, পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্র্যে পঙ্গু। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, শ্রীনগরে—সর্বত্র প্রায় একই ইতিহাস। গভর্নমেণ্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চূড়ায় গঙ্গা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হ্রদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে এলে ‘ভাওয়ালীর’ ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিলুম, এ পাশ দিয়ে নেমেছি। এটি সেই প্রধান রাজ-পথ—যেটি রামনগর থেকে এসে আল-মোড়ার দিকে চলে গেছে। পথটি অতি চমৎকার এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলের আলোছায়ায় অপরূপ। এ আমার পরিচিত পথ। তবু আবার এসেছি অনেক দিন পরে। পুরাতন বন্ধুদের প্রাচীন স্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক্, আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীরা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। একালের নতুন পাখীরা এসে বাসা বেঁধেছে নির্ঝরের আশে পাশে, গিরিনদীর প্রাণধারা শুকিয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝরে গেছে,—নিশ্বাস ফেলছে যেন সর্বগ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি,—আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছে সব। প্রতি গ্রানাইট্ পাথর, প্রতি অর্কিডের চারা, প্রতি পুষ্পের স্তবক, প্রতি নিকুঞ্জের কুসুমলতা,—ওরা থাকে এ-পাড়ায় আমার অতি পরিচিত মহলে। কিন্তু সমস্ত পরি-চয়ের বাইরেও ওরা আমার চোখে চিরকালের অচেনা। ভালোবাসার পাত্রকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের সমস্ত অনাবিষ্কৃত পরিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। আলিঙ্গনের মধ্যে পাই যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে থাকে বাইরে। সেই কারণে বড় প্রেম হলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের এক কূলে ওকূলে যাকে ধরে না,—সেই অনাস্বাদিত দুর্লভ অমৃতলাভের আশায় প্রেমের চক্ষে অশ্রু গড়িয়ে আসে। ওদেরকে বুকের মধ্যে নিয়েছি একদিন, কোলে নিয়ে কেঁদেছি কতদিন। জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে দেখেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহা-কালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশিরাদলের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শতসহস্র গিরি-নির্ঝরিণীরা, আমার অস্থি-পঞ্জরের স্তরে স্তরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন মুনিঋষির যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি ধারণ করে রয়েছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের শত শত শৃঙ্গমালা। জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অখণ্ড চৈতন্য সেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্তরে, যুগান্তরে বিবর্তিত। পুরাণে ইতিহাসে অতীতে আধুনিকে ভবিষ্যতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অব্যয় ভারতাত্মার নিত্য প্রতীক্। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহঙ্কার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝ-খানে বসিয়েছে বারম্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার মুখে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীথরাত্রির তারায় পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরভি-শ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।
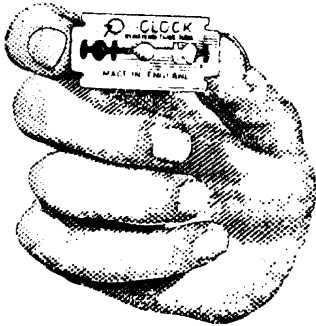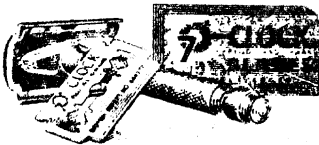
ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভৃত বনচ্ছায়াময় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ভারত-

প্রসিদ্ধ যক্ষ্মারোগী নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগীনিবাসটির জন্য শহরটি সর্বত্র সুপরিচিত। অসুস্থ না হ'লে এমন একটি মধুর কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না,—এ যেন জীবনের একটি ট্রাজেডি। কলকণ্ঠী পাখী আর সরীসৃপের ডাক ছাড়া সমগ্র অঞ্চল যেন প্রাণীচিহ্নহীন। রোগীনিবাস থেকে সামান্য উতরাই পথে আন্দাজ আধ মাইল নেমে এসে ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে পথের চৌমাথা,—সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করছে। অদূরে মোটরবাস স্ট্যান্ডের অঙ্গনটি কতকটা প্রশস্ত। গিরিশ্রেণীর সন্নিবদ্ধ জটলার বাইরে দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছয় না। পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ঝিরঝিরে ঝরনা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল'। পথ পার্বত্য, কিন্তু অনেকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়ের নীচে গা বেয়ে বেয়ে পথ চলে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদটিতে আবার যথাসময়ে ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মসৃণ নয়, কিছু কর্কশ। এখানকার উঁচু কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়ুনের তরাইয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেকটা ওই কাশীপুর অঞ্চলের ন্যায় ধূসর একটি ছায়ার মতো। এ পথটি ভীমতাল হয়ে একেবেঁকে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ি যখন এসে পৌঁছলো তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে।

ভীমতালের হ্রদটির সর্ব পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একটু বড়, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দু হাজার ফুট নীচু হওয়ার জন্য এখানে রৌদ্রের উত্তাপ বেশী। উঁচুতেই হোক আর নীচুতেই হোক, পাহাড় অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। হেমন্তকালে হরিদ্বার বাতাসের জন্য ঠান্ডা হয়ে যায়, কিন্তু হৃষিকেশ লছমনঝোলা অঞ্চলে গরম। মাত্র পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শুধু এখানে নয়, তুষার রাজ্যেও এই। 'পঞ্চচুলীর' শৃঙ্গবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি-এন-নিকোর বলেন, "সাড়ে বাইশ হাজার ফুটের উপরে উঠে প্রখর উত্তপ্ত সূর্যরশ্মি তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ করছিল কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী এবং অতঃপর তুষার ঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলস্পর্শ গভীরতার জন প্রসিদ্ধ। এখানে এসে দেখি হ্রদটি বড় নির্জন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচূড়া এবং ওটির নাম 'হিড়িম্বা' পাহাড়। এ অঞ্চলে কেবল এই হ্রদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সাতাট 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের নাম আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। নাম, ভীমেশ্বর মহাদেব। দ্বিতীয় পান্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিড়িম্বাপুরে (ডিমাপুরে), কো-হিমা অর্থাৎ হিড়িম্বা পাহাড়, নেপালে ভীমপেড়ী, হরিদ্বারে ভীমগোড়া,—এর পরেও পাঞ্জাবে আর কাশ্মীরে কি-কি চিহ্ন যেন পাওয়া যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নামে উৎসর্গীকৃত একটি দেবস্থানও বড় একটা চোখে পড়েনি। শ্রীকৃষ্ণ ছড়িয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত্র তেমনি হিমালয়েরও সর্বত্র। শ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধুনদী অতিক্রম করে গিলগিটে ঢোকবার তোরণদ্বারটি তো আজো রামকোট। পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপুর। পশ্চিম পাকিস্থানের একটি বড় শহরের নাম রামনগর,—সেটি শিয়ালকোটের দক্ষিণে, চন্দ্রভাগার তীরে। সুতরাং 'রামকোট' থেকে সেতুবন্ধ 'রামেশ্বরম' পর্যন্ত ভারতবর্ষ একসূত্রে গাঁথা।

ভীমতাল হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রয়েছে চোখের সামনে,—কলকাতার লেকেও যেমন দেখা যায়। গিরিলোকে নদীর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু জলাশয়ের সংখ্যা বড় কম। সেই দীঘি, হ্রদ, সরোবর—এদের আকর্ষণ বেশি। এই হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ে আদিবাসী পাহাড়ীর মেয়ে ছিলেন পরমাসুন্দরী শ্রীমতী হিড়িম্বা। তিনি বোধ করি ভীমের অসমশক্তির কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে দ্বিতীয় পান্ডবকে এখানে আমন্ত্রণ করেন। পাহাড়ী মেয়ের কঠিন যৌবন হয়ত খুঁজেছিল শক্তিমান পুরুষ। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন দ্বীপ-কাননে তাঁরা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। ঘটনাটি মহাভারতে ঠিক এইভাবে আছে কিনা মনে পড়ছে না।

একটি প্রাচীরের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চত্বরে উত্তীর্ণ হলুম। বৃক্ষচ্ছায়াময় মন্দিরের অঙ্গন,—অদূরে বস্তি। ঝুরু ঝুরু বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পান্ডা-পরিবার এখানে থাকে। শিবের কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই,—এবং সিন্দুরমাখা মহাবীর অবশ্যম্ভাবী। হনুমান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক। বেদী বাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে ব'সে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের

ন মধুর অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র াও নেই। গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় হাওয়ায় নিভৃত মন্দিরের এক খ বুজে শুয়ে থাকা—তার সংগে আকাশপথে পথিক পাখীর চূর্ণ আর যদি থাকে নিকটবর্তী নালা- াবর সলিলের কুলুকুলু ধ্বনি,—

তাহ'লে সেই সৌন্দর্যচেতনার শিহরণে আকাশের অনন্ত নীলিমাও শিউরে ওঠে বৈকি। বিশ্বাস করবে না অনেকে,—স্বর্গ লাভ করি আমি কথায় কথায়!

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিলুম ভীমতালের সংগে নালীপথ সংযুক্ত ক'রে 'স্লুইস গেট্' বানিয়ে জলনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এরপর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চললুম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল, কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। নাম, 'নেহরু রোড'। দক্ষিণ-পূর্বদিক পেরিয়ে গাড়ি চলেছে উপর দিকে। এ অঞ্চলে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসের প্রথম যুগে মালিক এবং চালকের যে-স্বেচ্ছাচার ছিল—যেমন ছিল কলকাতায়,—এখন আর সেরূপ সহসা চোখে পড়ে না।

ডালিমের বন ঘেঁষে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাছে গাছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভুলে গেলুম। শুষ্ককণ্ঠে এখনই কিছু ফলের রস সঞ্চারিত না হতে পারলে জীবনটাই ব্যর্থ! দার্জিলিংয়ের ভূটিয়া মেয়ের দুটি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের, ছাপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন ভীমেশ্বর! কিন্তু ফলের বাগান নাগালের বাইরে,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোনো লাভ নেই। ওই সব রাঙা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাতুর মহাজনের দল। তাদের সংগে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্রান্ত। ফল তারা পচিয়ে দেবে সে ভালো, কিন্তু অল্প দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ফাঁদ ওরা পেতে রেখেছে নগরে নগরে। কায়েমী স্বার্থের সাফল্যটা ফলের রসে সরস। আমাদের গাড়ি চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে-নীচে দেখে যাচ্ছি, নতুন ধরনের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও ফলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন পদ্ধতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড়, ওরই মধ্যে চলছে আলুর চাষ।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম বুঝি 'বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে মুক্তেশ্বরে চৌদ্দ মাইল চড়াই আর উতরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বোধ হয় ভুলতে বসেছে যে, মুক্তেশ্বর হোলো একটি তীর্থস্থান। কেননা, প্রায় ষাট বছর পূর্বে ভারত গভর্নমেণ্ট মুক্তেশ্বর পর্বতের শিখরে একটি পশুচিকিৎসা ও গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কর্মী ও ছাত্ররা এখানে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। মুক্তেশ্বরের চারিদিকে কুমায়ুনের মনোরম উপত্যকাগুলি বিস্তারিতভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই মুক্তেশ্বরে দাঁড়ালে হিমালয়ের চূড়া-দলের শত শত মাইল জোড়া সমগ্র দিগন্ত
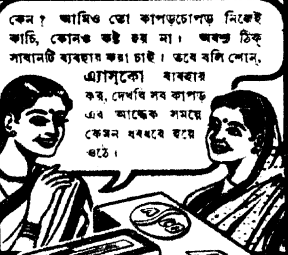
জড়ে দৃষ্টিগোচর হয়। 'বিনায়ক' অথবা 'রামগড়' থেকে মুক্তেশ্বরের পথে এখনও গাড়ি চলে না। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার পিঠে বারো চৌদ্দ মাইল পথ যাওয়াই সুবিধা।

আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো 'রামগড়ে'। এখানে একটি ডাকবাংলা রয়েছে অদূরে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড় একটি মস্ত বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা পাকা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। রামগড়ের শিখরলোকে একটি উপত্যকায় মোটরবাস এসে দাঁড়ালো, এর পরে আর যাবে না। পাহাড়ের অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড় নদী। বেশি দিনের কথা নয়, বোধ হয় শ' দেড়েক বছর আগে এ অঞ্চলে কয়েকজন চীনার দখলে ছিল কয়েকটি সম্পত্তি। তারা এখানে চায়ের চাষ করেছিল। আজও 'চায়না-পীক' তাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ অঞ্চলটি যাঁর দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকারই 'চরখোল' স্টেটের রাজা রুদ্রপাল সিং। আজও রামগড়ের নীচে তাঁর নানাবিধ রাজকীর্তির স্থাপত্য চিহ্ন পড়ে রয়েছে। এরপর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ সাদারল্যাণ্ড এবং মিঃ যালেন। দেখতে দেখতেই এসে পৌঁছে যান অজয়-গড়ের রাজা, ধনপতি বিরলা এবং যুগী-লাল কমলাপতি। ক্ষুদ্র রামগড়ের আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, এত পাহাড় থাকতে এই অপরিচিত অজানা ও অখ্যাত রামগড় অঞ্চলে এঁরা এলেন কেন? একটি উপমার লোভ সামলাতে পারছিনে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে! রামগড়ের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সমগ্র উত্তর ভারতে 'নৈনীতালের আলু' বলে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চল হোলো তার প্রধান জন্মভূমি। এ ছাড়া কাশ্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং প্রতি বৎসর এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার রপ্তানির খেলা চলছে। প্রত্যেকটি পাহাড়ের সানুদেশ বিরাট ও বৃহৎ এক একটি ফলনক্ষেত্র। আলু আর আপেল হোলো প্রধান। তার সঙ্গে আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, টমাটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ফল ও সব্জি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি মস্ত কার-খানা। মনে প'ড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোল্ড্ স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচক্রান্ত। কলকাতায় সম্প্রতি এর উৎপাত চলছে। সময়কালের ফল ও সব্জি অসময়ে বেচতে পারলে দু'পয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগুলো মানুষের খাদ্যের উপযোগী থাক্ আর নাই থাক্। শীতকালে আম, বসন্ত-কালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেবু, বর্ষাকালে বাঁধাকপি, শরৎকালে লীচু ইত্যাদি কিনে হাসিখুশী মুখে কেরানীবাবু যখন বাড়ি ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে পাঁচুর মা গদগদ কণ্ঠে এগিয়ে এসে 'নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন্! সেদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব। পরদিন পাঁচুর জন্য ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি!

তুষারের চূড়াগুলি অনেক দূরে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চূড়াগুলি মেঘ-ময় না থাকলে এখান থেকে তাদের ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে মুগ্ধচক্ষে চেয়ে যখন একান্তে দাঁড়িয়েছিলুম তখন এক অকিঞ্চন ব্যক্তি এসে জানালো, অদূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছেন, ওরই একটি বাগানবাড়িতে কিছু-কাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

আমার মুখের চেহারা দেখে সে ব্যক্তি একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেননি?—জিনকো 'ভারত-কবি' বোলা যাতা হ্যায়! দুনিয়াভর ইনসানকো প্যারে হে'!

সামান্য ব্যক্তির চোখে-মুখে সেদিন ভারত-কবির সম্বন্ধে যে-গৌরববোধ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয়। রামগড় পাহাড়ের চূড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। এখানে বসে তাঁর সুদূর দৃষ্টির সম্মুখে তুষার-চূড়াগুলিকে রেখে অনেকগুলি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়ুন পর্বতমালার মধ্যে মহাকবি বারম্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দবোধ করেছিলুম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থান-কাহিনীকে অতি যত্নে লালন করে চলেছে। কবি যে-বাড়িটিতে বসবাস করে-ছিলেন, সেটি তাঁর নিজের কিনা আমার জানা নেই। অনেকে এখন বলে, সেটি বিড়লার বাড়ি।

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মোটরপথ প'চাশী মাইলেরও বেশী পড়ে, এবং বাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যাবা যায়,—অর্থাৎ কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড়, এবং 'ফিউড়া' হয়ে যে-পথটি গেছে আলমোড়ায়, সেটি মাত্র এক-চল্লিশ মাইল পথ। অসুবিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পৌঁছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেঁটে, কিংবা উচ্চমূল্যে 'ডাণ্ডিতে' অথবা পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাঙালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকা-নন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু একা যাননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন

ধর্মপত্নী বাসন্তী দেবী, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল', কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি'। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধু ভাগলপুর থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন, এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধরে আলমোড়া পৌঁছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিন্নপথে অভিযান করেন। তাঁরা তখন গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডাণ্ডি ইত্যাদির সাহায্যে, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধুর সেই 'মায়াবতী আশ্রম' যাত্রার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবতী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও 'মায়াবতী' পর্যন্ত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্যন্ত এবং এদিকে রামগড় অবধি গাড়ী রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী পঁয়তাল্লিশ মাইলেরও বেশি। ইদানিং শোনা যাচ্ছে টনকপুর থেকে পিথোরাগড় পর্যন্ত মোটর বাস চলছে। তা যদি হয় তবে পথেই পড়ে 'চম্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক জনপদ। 'মায়াবতী বেদান্ত আশ্রম' লোহাঘাট থেকে আন্দাজ চার মাইল পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বত্য ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরনার নয়নাভিরাম দৃশ্যের মাঝখানে 'মায়াবতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত।

কাশ্মীরে পাঞ্জাবে হিমাচলে নেপালে,—যে-বিষয়টি কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না,—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়ুনের তিনটি জেলার পর্বতশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে; ব্রহ্মপুরী গাড়োয়ালে, কুর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমন ভগবৎ ভাবনা, এমন বিবাগী মনের বেদনা কুমায়ুন পর্বতমালার মতো আর কোথাও নেই। যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, তপস্বী, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী, বেদাধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধহয় হিমালয়ের অপর কোনও অঞ্চলে এমন অগণিত দেখা যায় না। বোধহয় হিমালয়ের আর কোনও ভূভাগ থেকে এক-চাহনিতে এতগুলি তুষারশৃঙ্গও পাশাপাশি চোখে পড়ে না। এমন করে হিমালয় আর কোথাও ডাকে না, এমন করে আর কোথাও সে কাছে টানে না। সমগ্র কুমায়ুনে অসংখ্য গঙ্গার আঁকাবাঁকা বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গৌরীগঙ্গা, কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, দুগ্ধগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, ভাগীরথী গঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কেদারগঙ্গা, গরুড় গঙ্গা, পিন্দার গঙ্গা,—আরও অনেক গঙ্গা। কিন্তু সব গঙ্গার জল মিলেছে গিয়ে আর্যাবর্তের মূল গঙ্গায়। ওই একেকটি গঙ্গাপথে সাধুসন্তেরা বেঁধেছে আশ্রম লোকচলাচলের অন্তরালে; ফেলেছে অনেক তৃপ্তিহীন মন, কাটিয়েছে অনেক জীবন অকারণে।

জনৈক আমেরিকান মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে একদা মায়াবতীর অরণ্যপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তুষার পর্বতরাজির শোভা এখানে অপরূপ। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও গৈরিক, কখনও বা তারা হীরকজ্যোতিষ্মান। ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের মধ্যে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় যে-বর্ণবৈচিত্র্যের অশ্রান্তলীলা দেখা যায়, তারই অপরূপ ইন্দ্রজাল মেরু-মন্দার হিমালয়কে বোধকরি সেদিন মায়াচ্ছন্ন লোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভৃত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দুজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুসুমকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রান্তে ব'সে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করবেন। পরবর্তীকালে যখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যান। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি সেই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হন, এবং সম্ভবত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী প্রথম মায়াবতীতে যান। অনেকেরই কাছে শুনেছি, বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও একসময়ে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া সর্বত্রই প্রায় সংযুক্ত হয়ে রয়েছে এক একটি সেতুবন্ধে —কোন্‌টি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা

থামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেকদূর। সন্ধ্যার আকাশে কখনও জ্বলে উঠেছে লক্ষ প্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক স্রাব, প্রভাতকালে তাদের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহ্নে বিগলিত স্বর্ণস্রোত। জেনেছি চোখের ভ্রম, জেনে এসেছি বায়ুস্তরভেদের মায়া,- কিন্তু তারা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এনেছে সৌরবিশ্বের আহ্বান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অপার আনন্দ। সমস্ত আকাশকে পেয়েছি আলিঙ্গনের মধ্যে।, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপন বক্ষে। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য রূপ দেখেছি পথে পথে,—জলে, আকাশে, রৌদ্রে, নিঝরে, দেওদারের বনে বনে, বায়ুর মধুর স্বননে, সেই অনন্ত বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে বর্ণের সুষমায়। 'রিচি' গ্রামের সেই সংকটসংকুল অবরোহণ, রাম গঙ্গার অদূরে সেই 'ধাটি' গ্রামের প্রজাপতি পতঙ্গভরা গ্রাম, তারপর সেই 'টোডমেহ' পাহাড়ধসা কার্নিশপথ, সেই আনন্দ আর আতঙ্কের চেতনা আজও বুকের মধ্যে ধকধক করে। 'সোয়াল' পেরিয়ে গেছি, —যেখানে লোমহারা গিরিনির্ঝরিণী বনবালিকার মতো গান গেয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা পাথরের আড়ালে আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ করেছি নির্জন ভীষণ 'কুমারিয়ার' অরণ্যে। ওখানে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহনা সেতুর' উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'নাকাসের' দিকে, আমার নিজের পথটি নদীর তীরে তীরে চলে গেল রামনগরের দিকে।

'গর্জিয়ার' গহন অরণ্যলোকের কথা অনেকেই জানে। শুনেছি কোন না কোনও সময় একটি-দুটি নরখাদক ব্যাঘ্রের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য তটস্থ। বাঘ হোলো শাসনকর্তা, তার একনায়কত্বের কাছে বশ্যতাস্বীকার করে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তারা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়, এবং তাদের আক্রমণ ঘটলে তারা কপালের লিখন বলে বুক চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চলে যেতে হয়েছে অনেকদূর।

বিরাট পাহাড়ের মেরুদণ্ড নেমে এসেছে কোশী নদীর পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বরষায় তার পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপুল ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায়, তাতেও বিমূঢ় হতে হয়। এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বোধ করি জুলাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভয়াবহ। সেই ধসগুলির সঙ্গে অনেকগুলি বাড়িঘর চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং কয়েকটির সমাধিলাভ ঘটে। নরনারী ও শিশু কতগুলির মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎ-প্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস করা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণ্য সমাকীর্ণ রামনগরের পথে যাচ্ছি। বাঁদিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝখানে পাওয়া গেল মাটি আর পাথর মেলানো একটি মস্ত,—না, মন্দির নয়, কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীর 'মন্দির'। ওর মধ্যে আছেন উপাট্টা দেবী। ওই আয়তনটির ভিতরে রয়েছে একটি মস্ত গুহা—নদীর বুকের উপর। এই গুহায় অনেককাল ধরে থাকতো এক সাধু, নাম—'বালক বাবা'। সে ছিল মস্ত তপস্বী। কিন্তু যত বড় তপস্বীই হও, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষকে প্রকৃতির শাসন, জৈবিক তাড়না এবং পার্থিব দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক বাবাও' মানুষ। একদা বর্ষারম্ভে এই কোশীতে ছুটে এলো পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু জল। পশুপক্ষী মানুষ গ্রাম, খেত-খামার সমস্তই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগলো। মাঝনদীতে রয়ে গেল ওই 'ভগবতীর গুহা' এবং ওই 'বালক বাবা'। ওকে বাঁচাবার জন্য কারো মাথা ব্যথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো ওই ভগবতী খণ্ড,—গুহা এবং বালক বাবা নিশ্চিহ্ন হলো জলের তলায়।

এখানকার লোক বলে, 'বালক বাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যতক্ষণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল, উঁচু জায়গায় গলা বাড়িয়ে সে প্রবল কণ্ঠে চীৎকার করে বলেছে, বিশ্বাস করিনে। বিশ্বাসবাদীরা চিরকাল ধরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছে, তপস্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথ্যে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।—'বালক বাবা' চীৎকার করে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে!

প্রাণীচিহ্নহীন বিপুল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত্র বালক বাবার নিমজ্জিত দেহের উপর শুধুমাত্র তার মুণ্ডটি জলের উপরে বেরিয়েছিল। জল যত উঁচু হয়, মুণ্ডটিও তত উঁচুতে ওঠে। জল উঁচু হয় পর্বত প্রমাণ, মুণ্ডটি ওঠে তারও উপরে।

'বালক বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চলে গেল, বালক বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে! ওটা হোলো, ভগবতীর গুহা!

দেখতে দেখতে রামগঙ্গার তীরে এসে গাড়ি থামলো। সামনেই রামনগর।

(ক্রমশ)

॥ বাইশ ॥

দক্ষিণ পাহাড়ের ওপারেই অঙ্গামীদের বিরাট জনপদ সাংখুবটো। কী এক য়ালে সাংখুবটোর বুড়ো সর্দারের মেয়ে ই শৈলশিরে এসেছিল। দুটি মুগ্ধ চোখের মস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত আনন্দ দিয়ে খাড়াই াথরের দেহে দেহে শিল্পলিপি দেখছিল। াংখুবটোর বুড়ো সর্দারের মেয়ে। হ্যাজাও। মেটা, একটি রমণীয় যুবতীর মুখ রক্তে ক্ত, স্নায়ুতে স্নায়ুতে এখনও তরঙ্গিত য়ে যায়।

বিশাল উপত্যকাটা বেয়ে ওপরের দিকে ঠতে উঠতে এটোঙার দুটি পিঙ্গল চোখ াহিত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ পাহাড়ের ড়ায় বেলা শেষের মোহন আলোতে জ্জ্বল তামাভ এক তরুণীর পাহাড়ী তনু শখায়িত হয়ে রয়েছে। সেদিনের সেই সানালী বিকেল এমন একটা যৌবনের বস্ময় নিয়ে তারই জন্য যে অপেক্ষা করছিল, া কী সে জানতো? নির্বাক নিষ্পলক—কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলো এটোঙা। তারপর একটু একটু করে পাহাড়ের দেহ বেয়ে সেই তরুণী তনুর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো।

"কে তুই?" আবিষ্ট গলায় জিজ্ঞাসাটা ফুটে উঠলো এটোঙার।

চমকে একটা চকিত বিদ্যুতের মত সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে ফেলে এটোঙার সমস্ত দেহ, দেহ ফুঁড়ে হাড়-মজ্জা, স্নায়ুর সকল তন্ত্রী এমন কী তার ভাবনা আর চেতনাগুলিকেও যেন তন্ন তন্ন করে দেখে নিল। তামাভ কপালের ওপর গভীর সন্দেহের অজস্র হিজিবিজি ফুটে বেরিয়েছিল। এক সময় দৃষ্টি থেকে সকল ক্রুর সন্দেহ, কপালের ওপর থেকে নানা বক্র রেখার আঁকিবুকি মুছে গেল মেয়েটির। দুটি পিঙ্গল চোখের মণিতে প্রশ্রয়ের হাসি ঝিকমিক করে জ্বলে উঠলো। আউ পাখির মত সুডৌল ঘাড়খানা বাঁকিয়ে, কানের লতায় পিতলের নীয়েঙু গয়নায় দোলন দিয়ে, সুঠাম তনুদেহটিকে বঙ্কিম ছাঁদে ঘুরিয়ে মেয়েটি বললো: "আমি হ্যাজাও, অঙ্গামী সর্দারের মেয়ে। হুই সাংখুবটো বস্তীটা আমাদের।"

এটোঙা বলেছিল, "আমাদের হলো সালুয়ালাঙ্ বস্তী; আমরা রেঙমা। নগুসোরি বংশ। আমার নাম এটোঙা।"

এপারে সালুয়ালাঙ্, ওপারের উংরাই উপত্যকায় অঙ্গামীদের গ্রাম সাংখুবটো। মাঝখান দিয়ে বিশাল একখানা বর্শামুখের মত উঠে গিয়েছে দক্ষিণের পাহাড়চূড়া। দুই গ্রামের, দুই সম্প্রদায়ের দুটি মুগ্ধ যৌবন মুখোমুখি হয়েছিল দুই জনপদের মধ্যবিন্দুতে।

হ্যাজাও বলেছিল; "রোজ তোকে দেখি এই পাহাড়ে। আমি হুই আখুশি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোকে দেখি। নুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে কী সব দাগ কাটিস্। খালি ভাবি, এসে দেখবো, কী করিস তুই! কিন্তু সাহস পাই না।"

"কেন রে হ্যাজাও? সাহস পাস্ না কেন?"

"ভয় হয়, হয়ত তোর কাছে বর্শা রয়েছে। যদি হাঁকড়ে দিস্, একেবারে জানে সাবাড় হয়ে যাবো। সেই জন্যেই তো আসি না।"

"আরে না, না। হুই সব বর্শা আর সুচেন্যু আমার ভালো লাগে না। খুন-খারাপি, রক্তারক্তি, শিকার—হুই সবে মেজাজও পাই না ঠিক। একা একা এই দক্ষিণের পাহাড়ে এসে নুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে বন, পাহাড়, নদী আঁকতে বড় ভালো লাগে।"

"বড় ভালো। আমারও হুই সব খুনখারাপি ভালো লাগে না। পাথরে গায়ে তোর এই দাগগুলো কী সুন্দর? এটা ঠিক মেন্‌জোর মতই হয়েছে। আরে, এটা ঠিক সম্বর হরিণের মত। আর এটা কী রে? ময়াল নাকী? না আশুমি?" হ্যাজাওএর দৃষ্টটা সারি সারি পাথরের দেওয়ালের গায়ে নানা শিল্পলেখার ওপর দিয়ে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলল।

"আরে না, না।" একেবারে চাঁচা করে উঠলো এটোঙা; ত্রস্ত গলায় হ্যাজাওএর ভুলটা সংশোধন করে দিল; "এটা ময়ালও নয় আশুমিও নয়। এটা হলো টিজু নদী।"

"হু-হু।" পাথরের ওপর এটোঙার চিত্রকলা দেখতে দেখতে পিঙ্গল চোখদুটো একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অঙ্গামী সর্দারের মেয়ে হ্যাজাওএর। তার আবিষ্ট কণ্ঠে, সসম্ভ্রম ভঙ্গিতে পুলকিত অভিনন্দন গলগল করছে, "তুই কী ভালো দাগ কাটিস! একেবারে হুবহু মেনজো একেবারে হুবহু মেনজা। কী ভালো তুই! আমি রোজ এখানে তোর কাছে আসবো।"

"হু-হু—খুব ভালো। রোজ আসবি তুই। তোকে আমার মনে ধরেছে। তুইও খুন-খারাপি ভালোবাসিস না। আমিও না। তোতে আমাতে খুব মিল; কী বলিস?" অপরূপ চোখে হ্যাজাওএর দিকে তাকিয়ে রইলো এটোঙা। তাকিয়েই থাকলো।

"হু-হু"—হ্যাজাওএর কণ্ঠে তন্ময় স্বীকৃতি ফুটলো; "খুব মিল।"

তারপর দক্ষিণ পাহাড়ের ওপর দিয়ে মিছিলের মত ঝরে গেল কত পল-প্রহর। সোনালী প্রপাতের মত পার হলো রোদের ঋতু সেনাঙ্ড, বৃষ্টি ঝর-ঝর মৌসুমী বাতাসের দিন, তুষারঝরা সাঙসুর মাসগুলি।

অনেক ঘনিষ্ঠ হলো এটোঙা আর হ্যাজাও। অঙ্গামী আর রেঙমা গ্রামের দুই মুগ্ধ পাহাড়ী যৌবন। বাদামী পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র সব শিলাচিত্র আঁকা হলো। আরো মোহিত হলো হ্যাজাও, আরো আবিষ্ট হলো এটোঙা। দক্ষিণ পাহাড়ের বনময় চূড়াটা দুটি পাহাড়ী মানবমানবীর প্রেমে আর ভালো-বাসার উত্তাপে মধুর হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের খাড়া দেওয়ালে বিচিত্র খেয়ালের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন যে হ্যাজাওএর মনের পর্দায় অদৃশ্য আবেগের গভীর

রেখায় কতকগুলি অক্ষয় ছাব এ'কেছিল এটোঙা, তা কী তারা জানতো?

সাঙস্ ঋতুর এক হিমাক্ত দুপুরে ওক বনের ছায়ায় বসেছিল শিল্পী এটোঙা। আর বিশাল উপত্যকাটা বেয়ে বেয়ে উল্কার মত ছুটে এসেছিল হ্যাজাও। চকিত হয়ে তাকিয়েছিল এটোঙা: "কী রে হ্যাজাও, কী ব্যাপার?"

"সর্বনাশ হয়েছে!" বিলম্বিত নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে হাঁপাতে লাগলো হ্যাজাও। তুঙ্গ বুকটা থরতালে দুলছে। শরীরের রাশি রাশি পেশী নাচছে। ধপ করে এটোঙার পাশে বসে পড়লো হ্যাজাও।

"কী সর্বনাশ হলো!" সংশয়ের দৃষ্টিতে হ্যাজাওএর দিকে তাকালো এটোঙা।

"ওরা সব জানতে পেরেছে। আমাদের বস্তীর দুই শয়তানের বাচ্চা হালুংটা আমাদের দেখে বস্তীতে সব বলে দিয়েছে। আমার বাবা বস্তীর সর্দার, আমাকে পেলে সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়বে। আমাকে সব খুজছে, তাই তোর কাছে পালিয়ে এসেছি।"

"ঠিক করেছিস। আমাদের বস্তীর সদ্দারও জানতে পেরেছে। তোর সঙ্গে আমার এই পিরীত তার দু চোখের বিষ। তোরা আমরা তো ভিন্ন জাত। তোরা অগামী, আমরা রেঙমা—তাই সদ্দার মোরাঙ থেকে আমাকে একেবারে ভাগিয়ে দিয়েছে। আমি শিকার করি না, বস্তীর জোয়ান ছোকরাদের সঙ্গে মিশি না, খুনোতে আবাদ করতে যাই না, তাই সবাই আমার ওপর গোসা হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক করেছি, এখান থেকে যাবো না।"

"আমিও যাবো না। তোর কাছে থাকবো। তুই শিকার করতে পারিস না, আমি কিন্তু পারি। তুই পাথরের গায়ে গায়ে নুড়ি ঘষে মজার মজার দাগ কাটবি। আমি বন থেকে মেনজো মেরে আনবো, সম্বর নিয়ে আসবো। ফলপাকুড় নিয়ে আসবো। দুজনে ভাগ করে খাবো। কেমন?" সুডৌল ঘাড়-খানা বাঁকিয়ে তনুদেহটিকে বাঁকিয়ে অপরূপ চোখে তাকিয়ে ছিল হ্যাজাও। তখন তার কপিশ চোখে একটি অনুগত প্রেমিকের ছবি টলমল দুলছে।

"খুব ভালো, খুব ভালো।" হ্যাজাওএর কাছাকাছি আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বসেছিল এটোঙা: "কিন্তু এই খোলা পাহাড়ের গায়ে এই শীতের দিনে কোথায় থাকবো আমরা?"

উদ্দাম একটা জলপ্রপাতের মত খিলখিল করে হেসে উঠেছিল হ্যাজাও: "পাহাড়ী জোয়ান না, একটা টেফঙের বাচ্চারে তুই!"

"কেন?" পাহাড়ী পৃথিবীর শিল্পী এটোঙার চোখদুটো দু টুকরো অঙ্গার হয়ে জ্বলে উঠেছিল: "সাবধান হ্যাজাও। খিস্তি খেউড় করবি না। একেবারে আছাড় মেরে খাদে ফেলে দেবো।"

"খিস্তি করবো না তো কী করবো! বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করবি না। তোরা রেঙমারা বড় বোকা; একটু যদি মগজ থাকতো তোদের! এই পাহাড়ে কত সুড়ঙ্গ রয়েছে। তার ভেতর ঢুকে আতামারী পাতা বিছিয়ে আমরা থাকবো।"

"ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস। হু-হু— তোর বুদ্ধিটা তো বড় খাসা।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হ্যাজাওএর মনোরম বুদ্ধিটার তারিফ করলো এটোঙা: "বুঝলি কিনা, দুই পাথরের গায়ে নুড়ির আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছুই আমার বুদ্ধিতে আসে না—হু-হু"— মাথার ঝাঁকানি একটু একটু করে প্রচণ্ড হয়ে উঠতে লাগলো এটোঙার।

তারও পর দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় দুটি আদিম মানব-মানবীর সংসার রচিত হলো। বিশাল একটি সুড়ঙ্গের গর্ভে একটি আদিম গৃহস্থালি। ওপরে নিশ্ছেদ পাথরের ছাদ, দুদিকে নীরেট পাথরের দেওয়াল, নীচে অমসৃণ শিলার মেঝে আর সামনের দিকে সুড়ঙ্গমুখ। সেই গুহাগৃহে মগি কাঠ এলো, এলো পেন্যু কাঠের মশাল। জমানো হলো সাঙসু ঋতুর খাবার। বুনো মোষের মাংস, সম্বরের মাংস। পাহাড়ী আপেল, বনজ কলা। রাশি রাশি তেরুঙা ফল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, অমসৃণ মেঝের ওপর বাঘছাল, হরিণের ছাল, বুনো মোষের মাথা স্তূপাকার করে রাখা হলো। তুষার-ঝরা রাত্রির অন্ধকারে অগামীদের গ্রাম থেকে কিছু সোনালী খড় হাতিয়ে এনেছিল হ্যাজাও। তাই বিছিয়ে অসহ্য শীতের শয্যাকে উত্তপ্ত করা হলো। রেঙমা সমাজ কী অগামী সমাজ—কেউ এটোঙা-হ্যাজাওএর সংসারকে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতি দেয়নি সাঙসু ঋতুর এই কবোষ্ণ

কে। তবু সমস্ত পাহাড়ী পৃথিবীর টি আর উদাত্ত বর্শামুখকে অগ্রাহ্য করে বিমুগ্ধ পাহাড়ী যৌবন দক্ষিণের ড়চূড়ায় এই গুহাগৃহে একটি নিবিড় রঙ্গ জগৎ রচনা করেছিল।

াঙুসু ঋতুর শেষে আকাশ থেকে তুষার-র সমস্ত কারসাজিকে মুছে দিয়ে এলো দল রোদের দিন। এটোঙার পিঙ্গল র বুকের ওপর মুখটাকে ঘষতে ঘষতে টি সুন্দর সকালে একটি রমণীয় কথা লো হ্যাজাও—"আমার বাচ্চা হবে রে টাঙা। তুই বাপ হবি, আমি মা হবো।" "গয়া, গয়া—ভালো বলেছিস। কিন্তু করে বুঝলি তোর ছানা হবে?" আশ্চর্য বোধ দৃষ্টিতে হ্যাজাওএর মুখের দিকে কিয়ে রইলো এটোঙা।

"শুধু-শুধু তোকে খিস্তি করি! তুই একটা টেশঙের বাচ্চা! দেখছিস না, আমার পেটটা কী ফুলেছে!"

"হু-হু" নির্বোধ দৃষ্টিটাকে এবার হ্যাজাওএর সারা দেহের ওপর দিয়ে ঘুর-পাক খাওয়ালো এটোঙা। স্ফীত মধ্যদেশ, গুরুভার নিতম্ব, টসটসে স্তনচূড়া। তামাভ দেহ ছাপাছাপি করে ভরে উঠেছে। উজ্জ্বল চেকনাই ঝলমল করছে মসৃণ চামড়ায়। চলচল মুখ, পিঙ্গল দৃষ্টি থেকে পাহাড়ী বিদ্যুৎ মুছে গিয়েছে। মধুর আলস্যের ভারে ভারী হয়ে গিয়েছে আঁখি-পক্ষ্ম। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো এটোঙা। তাকিয়েই থাকলো। একেবারেই নির্নিমেষ।

হ্যাজাও বললো, "আমার মেয়ে হবে।"

"কী করে বুঝলি?" আরো খানিকটা অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো এটোঙা।

"কাল রাত্তিরে স্বপন দেখেছি। একটা ময়াল একটা সম্বরের মাথা গিলছে হাঁ করে—"

"হু-হু।" মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এটোঙা বললো, "সবই তো বুঝলুম; তাতে হলো কী?"

"আমার মা বলেছে; স্বপ্নে যদি পোয়াতি একটা ময়ালকে সম্বরের মাথা গিলতে দেখে, তবে তার মেয়ে হয়। কী মজা বল দিকি? টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) তুই অনেক পাবি।" খুশী-খুশী গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে আচমকা কণ্ঠটা মেদুর হয়ে গেল হ্যাজাওএর, উজ্জ্বল মুখখানার ওপর একটা কালো মেঘের ছায়া নেমে এলো। আর একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল হ্যাজাও।

"কী রে, কথা বলতে বলতে থামলি কেন? কী হলো তোর?" সংশয়ের চোখে তাকালো এটোঙা।

"মেয়ে হবে ঠিকই। কিন্তু বিয়ে হবে কী করে? আমরা এই পাহাড়ের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রয়েছি। তোদের বস্তীতে যাবার তো উপায় নেই, আমাদের বস্তীতে গেলেও একেবারে টুকরো টুকরো করে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখবে। মেয়ের বিয়েতে আর টেনেন্যু মিঙেলু (কন্যাপণ) পাবি কী করে?"

"দরকার নেই টেনেন্যু মিঙেলুতে (কন্যাপণে)। বস্তীতে আমরা যাবো না। পিরীত করেছি বলে যখন সর্দারেরা আমাদের কোপাতে চায়, তখন হুই সব শয়তানদের বস্তীতে গিয়ে কী লাভ? আমাদের মেয়েটা এই সুড়ঙ্গেই বড় হবে। কেউ যদি পিরীত করে ওকে বিয়ে করে, তাকেই দিয়ে দেবো মেয়েটাকে। একটা খারে নু বর্শাও তার বদলে নেবো না।" হুস্ হুস্ করে জিভের ডগা থেকে কথা-গুলোকে মুক্তি দিল এটোঙা। তারপর দ্রুততালে ফুসফুস ভরাট করে রাশি রাশি বাতাস টেনে নিল। চোখ দুটো তার অগ্নিগোলকের মত দপ্ দপ্ জ্বলছে।

কিছু সময়ের বিরতি। এক সময় আবার এটোঙা বলতে শুরু করলো, "তুই মা হবি, আমি বাপ হবো। এবার আমরা একটা ঘর বানিয়ে নিই আয়। খাদে বাঁশ আছে, সাঙুলিয়া লতা আছে। রাত্তির বেলায় আমাদের হুই সালুয়ালাঙ্ বস্তী থেকে খড় হাতিয়ে আনবো। খাসা একখানা ঘর হয়ে যাবে। সুড়ঙ্গের মধ্যে সাতটা মাস লুকিয়ে রয়েছি। আর ভালো লাগছে না। মেয়েটা জন্মাবে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে জানেই হয়ত লোপাট হয়ে যাবে।"

"ইজাহান্টসা সালো!" প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো হ্যাজাও: "এমনি এমনি তোকে বলি, তুই একটা টেফঙের বাচ্চা। সাত মাস এই সুড়ঙ্গের মধ্যে

লুকিয়ে না থাকলে বে'চে থাকতে পারাত? কতবার দুই বস্তীর লোকেরা আমাদের খোঁজে এসেছিল : মনে নেই? এই সুড়ঙ্গটা তারা খু'জে বের করতে পারেনি। নইলে—"

"হু-হু—ঠিক বলেছিস।" একটু শিউরে উঠলো এটোঙা। তার সন্ত্রস্ত দুটি চোখের ওপর ভয়াল কতকগুলি ছায়াচিত্র ভেসে গেল। যেদিন থেকে হ্যাজাওকে নিয়ে সে এই গুহাগৃহের অন্ধকারে একটি উষ্ণ প্রেমের নীড় রচনা করেছে, ঠিক সেই দিনটি থেকে সালুয়োলাঙু আর ওপারের অংগামী গ্রাম সাংখুবেটো থেকে দলে দলে জোয়ান পুরুষেরা এসেছে। হাতের মুঠিতে তাদের জীমুলো পাতার মত ভয়ংকর বর্শা। শাণিত, ঝকঝকে, হিংস্র সব ফলা। সেই নিষ্ঠুর ফলায় নিশ্চিত মৃত্যুর শপথ ঝলসাতো। একটি পাহাড়ী যুবতী আর একটি বন্য শিল্পী যুবক—এই দুটি মুগ্ধ প্রেমিকের হৃৎপিন্ডকে উপড়ে নেবার জন্যে, এই দুটি অনাচারী প্রেমের প্রাণকে শিকার করে নিয়ে যাবার জন্যে বুনো বাঘের মত দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় এসে বার বার তারা হানা দিয়েছে। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে পরস্পরকে পাহারা দিত হ্যাজাও আর এটোঙা। দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দু চোখের সন্ধানী আলো ফেলে ফেলে তারা খাবারের সন্ধানে নামতো উপত্যকায়, বাঁশের পাত্র ভরে জল আনতে যেতো দূরের টিজু নদী থেকে। এই সাতটা মাস ইন্দ্রিয়-গুলোকে ধনুকের ছিলার মত প্রখর করে দুটি পাহাড়ী জীবন পরস্পরকে নিরাপদ রেখেছে। দুটি বিদ্রোহী প্রেম পরস্পরকে নির্বিপদ করেছে। দুই গ্রামের বর্শাগুলোর ফলা চেতনার মধ্যে এখনও শিউরে ওঠে এটোঙার। প্রচণ্ড আতঙ্কে শরীরটা ছমছম করে।

"অনেক দিন পাথরের গায়ে দাগ কাটিস না তুই? তোর দাগগুলো কী সুন্দর?" মধুর গলায় বললো হ্যাজাও।

"দাগ কী করে কাটবো। তুই তো আমাকে এখান থেকে বেরুতে দিস্ না।"

"হু—বেরুতে দিলে কেউ যদি সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে যায়। থাক এখন ওসব। আমার মেয়েটা হলে তার দাগ কাটিস দেওয়ালে।"

"হু-হু—রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলো এটোঙা; "দেখ্ হ্যাজাও, আমার একটা বুদ্ধি খুলে গিয়েছে। পাহাড় খুদে খুদে আমাদের ছানাটাকে অবিকল ফুটিয়ে দেবো। আমার একটা চৌখা লোহার টুকরো রয়েছে। সেটা দিয়েই খুদবো।"

"হু-হু—খুব ভালো হবে—" এটোঙার বুকের কাছে আরো নিবিড় হয়ে বসলো হ্যাজাও।

"ভালো হবে! ইজাহান্টসা সালো!" সুড়ঙ্গমুখের কাছে একটা বিস্ফোরণ ঘটলো যেন। কিংবা একটা আচমকা উল্কাপাত!

গুহাগর্ভে শিউরে উঠলো হ্যাজাও। চমকে উঠলো এটোঙা। দুটি বিদ্রোহী পাহাড়ী প্রেমের হৃৎপিন্ড ধড়াস করে উঠলো। সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো হ্যাজাও; এটোঙার চাপা চাপা চোখের দুটি কপিশ মণিতেও থরথর করে আতংক কাঁপছে। ধমনীর রক্ত জলদ বাজনার মত গুরু গুরু করে উঠলো।

ফিস্‌ফিস্ গলায় এটোঙা বললো, "কী রে হ্যাজাও, ব্যাপারটা কী? আনিজার গলা নাকি?"

"বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করিস না। চুপ মেরে থাক। ভাব গতিক দেখতে দে।" ইন্দ্রিয়গুলোকে বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ করে উৎকর্ণ হয়ে বসলো হ্যাজাও।

সুড়ঙ্গমুখে এবার অজস্র গলার শোর-গোল ফুটে বেরিয়েছে। প্রচণ্ড শোরগোল! উদ্দাম। বিশৃংখল। ভয়ংকর। সামনের দিকে বিশাল একখণ্ড পাথরের অবরোধ; গুহার মধ্যে পেন্যু কাঠের মশাল জ্বলছে। ভৌতিক আলোটা পাথরের ভাঁজে ভাঁজে ভয়াল রহস্যের মত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। আর সেই আলোতে দুটি পাহাড়ী যৌবনের ছায়া গুহাঘরের দেওয়ালে একেবারেই নিষ্পন্দ হয়ে গিয়েছে।

এই পাহাড়ী পৃথিবীর কোথায়ও কী ধস নামছে? এবার শোরগোলটা আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। কী হিংস্র শোনাচ্ছে কণ্ঠগুলো!

"হু-হু—সদ্দার, এই সুড়ঙ্গটার মধ্যেই রয়েছে দুটোতে। একটু আগেই কথা শুনেছিলুম।"

"ইজা রামখো!" একটা প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল এবার। গুহার মধ্যে প্রবল একটা আতঙ্কের আঘাতে রক্তকণাগুলো যেন ছমছম করে উঠলো হ্যাজাওএর। এ কণ্ঠ নির্ঘাৎ অংগামী সর্দারের। তার বাপের। সহসা হ্যাজাওএর চেতনার ওপর একটি মানুষের প্রতিচ্ছায়া এসে পড়লো। অতিকায় থাবায় একটি মৃত্যুমুখ বর্শা। মোষের সিংএর মুকুটে আউ পাখির রাশি রাশি পালক গোঁজা। ঊর্ধ্বদেহ অনাবরণ। দেহসন্ধি থেকে জংঘা পর্যন্ত মানুষের মুণ্ডুআঁকা আরি পী কাপড়। লাল লাল অসমান দাঁতের সারি। গলায় বুনো বাঘের গর্জন। কোমরে সুচেন্যু ঝুলছে। দুটি ঘোলাটে চোখে সব সময় রক্ত-লালের আভাস। তার বাপ। না,না—একটা প্রেত-দেহ। একটা সাংঘাতিক আনিজা। সেই আনিজার কণ্ঠই আবার গম্‌গম্ শব্দে গর্জিত হলো। গুহাঘরের মধ্য থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অংগামী সর্দার একটা ভয়াল নির্দেশ দিচ্ছে: "সুড়ঙের মধ্যে থাকলে টেনে বার কর। না, না, টেনে নয়। বর্শা দিয়ে শয়তান দুটোকে ফুঁড়ে বের কর। সাত মাস ধরে টেফঙের বাচ্চা দুটোকে আমি খু'জছি। এই পাপ আর সইবো না।"

পণ্ডটা লাফিয়ে প্রায় ঠোঁটের কাছে লো হ্যাজাও আর এটোঙার। সুড়ঙ্গ-থকে বিশাল পাথরের অবরোধখানা দিয়েছে মানুষগুলো। বাইরের া থেকে খানিকটা পাণ্ডুর রঙের এসে পড়েছিল গুহার ভেতর। আর ল অজস্র কণ্ঠের হিংস্র উল্লাস। তিটা মাস পরে একেবারে মৃত্যুমুখ সীমানায় আশ্চর্য নিরীহ দুটি কে তারা পেয়েছে। অতএব—অতএব উদ্দাম আনন্দের কারণ আছে ?

ই-হুই যে শয়তান দুটো জড়াজড়ি সে রয়েছে।"

-হু—রামখোর বাচ্চাদুটোকে ফুঁড়ে তোরা।" অগ্রগামী সর্দারের গলায় চ হলো যেন।

াগর্ভের সেই ছায়ালোকে একটি হরিণীর মত সমস্ত দেহটিকে র বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল া। আশ্রয় খুঁজেছিল। একটি দ প্রতিশ্রুতি খুঁজেছিল। আর দুটি বেষ্টনে হ্যাজাওএর দেহটাকে বর্শার া থেকে আড়াল করে নিজের বিশাল মধ্যে এতটুকু করে মিশিয়ে নিয়ে-এটোঙা।

াঙার বুকের মধ্যে নিজের দেহটাকে র চীৎকার করে উঠেছিল হ্যাজাও;

"আমাদের মারিস না বাবা। আমাদের মারিস না।"

রাক্ষসের মত অতিকায় মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিকট অট্টহাসি হেসে উঠলো অগ্রগামী সর্দার। বাইরে উজ্জ্বল রোদের দিন। সে হাসিতে মনে হয়, আশ্চর্য নীল আকাশটা খণ্ড খণ্ড নীহারিকায় ছত্রখান হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। একটু একটু করে সমস্ত মুখখানার ওপর একটা দানবের প্রতিচ্ছায়া এসে পড়লো। মোটা মোটা লেপে ঠোঁট দুটিকে দুফালা করে লাল লাল অমসৃণ দুপাটি দাঁত আত্মপ্রকাশ করলো তার: "টেফঙের বাচ্চারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? দে, আমার কাছে ধারে বর্শাটা দে। কেমন করে ফুঁড়তে হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সামনের একটা জোয়ান ছেলের মুঠি থেকে ধারে বর্শাটা নিজের থাবায় ছিনিয়ে নিল অগ্রগামী সর্দার। চোখদুটো তার ক্রূরতম হয়ে উঠলো; নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো মুখের প্রতিটি কুঞ্চন। পলকপাতের মধ্যে সর্দারের থাবা থেকে বর্শাটা সাঁ করে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানবিক আর্তনাদ উঠলো। সে আর্তনাদে গুহাঘরটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যাবে চারদিকে। "আ-উ-উ-উ—"

অমসৃণ পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে-

ছিল এটোঙা। তার কণ্ঠাস্থি ফুঁড়ে ধারে আশ্চর্য! এতটুকু চীৎকার করে উঠলো না বর্শাটা বঁড়শির মত আটকে গিয়েছে। হ্যাজাও। তার দেহ থেকে এটোঙার বাহু-বেষ্টনী শিথিল হয়ে গিয়েছে। সেদিকে একবিন্দু ভ্রূপাত নেই তার। চোখদুটো সহসা ধক করে জ্বলে উঠলো তার। চকিতে পাশ থেকে একটা বিশাল সুচেনার ফলা তুলে নিল সে। সে ফলায় এতটুকু ক্ষমা নেই। এতটুকু করুণা নেই। তার দেহের মধ্যমান কোষে কোষে যে প্রাণকণা আলোড়ন তুলেছে, সেই প্রাণকে যে উপহার দিয়েছে, তার যৌবনকে যে মাতৃত্ব দিয়েছে, সেই এটোঙাকে তার বাপ বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে। না, এতটুকু মমতা নেই তার সুচেনার ফলায়। হোক তার বাপ। তবু প্রতিশোধ চাই। একটি নিশ্চিত প্রতিশোধ। একটি অনিবার্য প্রতিশোধ। একটা আহত বাঘিনীর মত ফুঁসে উঠলো হ্যাজাও।

সুচেনার ফলা হাতের থাবাতেই ধরা রইল। তার আগেই আর একটা ধারে বর্শা সাঁ করে গুহার মধ্যে ছুটে এলো। এবার আর্তনাদ করে এটোঙার বুকের ওপর আছড়ে পড়লো হ্যাজাও।

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—" অগ্রগামী সর্দারের অট্টহাসি এবার আরো ভয়ংকর হয়ে উঠলো। সে হাসি উপত্যকায় আর মালভূমির চড়াই-উতরাইতে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে দিকে দিকে মিলিয়ে গেল; "আমি হলাম অগ্রগামী সর্দার। লোহুটাদের সঙ্গে, সাহুটামদের সঙ্গে, ডাকুলাদের সঙ্গে কত লড়াই করেছি আমি। আর আমার মেয়ে দুই শয়তানের বাচ্চাটা সুচেনা দিয়ে আমাকেই কোপাতে চায়! হাঃ হাঃ-হাঃ—"

বর্শার ফলাদুটি সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়েছিল। সে দুটো ধরে অগ্রগামী জোয়ানেরা হিঁচড়ে হিঁচড়ে হ্যাজাও আর এটোঙাকে গুহার মধ্য থেকে বাইরে বের করে এনেছিল। এটোঙার কণ্ঠাস্থিতে আর হ্যাজাওএর পাঁজরায় বাঁকা বঁড়শির মত ফলাদুটো বিঁধে রয়েছে। রক্তের বন্যায় দেহ দুটি মাখামাখি। দুজনের চেতনাই দেহ থেকে জলের খেলার মত মুছে যেতে শুরু করেছে। আবছায়া একটা পর্দা নেমে আসছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর।

অগ্রগামী সর্দার আবার অট্টরোলে হেসে উঠলো। একটি সফল উল্লাসে তার অর্ধ-স্ফুট পাহাড়ী বোধটা একেবারে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সাত-সাতটা মাস ধরে যে শিকার দুটির সন্ধানে তারা হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে, এইমাত্র অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ফুঁড়তে পেরেছে তাদের। অগ্রগামী সর্দার বললো, "শয়তানের বাচ্চা রেঙমা হয়ে অগ্রগামী মাগীর দিকে নজর দেয়। একেবারে সাবাড় করে ফেলবো।"

"না-না। জানে মারিস না রে সদ্দার। সায়েবরা বারণ করে দিয়েছে। শয়তানকে ধরে সায়েবদের হাতে তুলে দেবো। ওরাই ওটাকে জবাই করবে।" পাশ থেকে একটি জোয়ান ছেলের কণ্ঠ ফুটে বেরুলো।

এতক্ষণ নিষ্পলক চোখে হ্যাজাওএর সারা দেহটাকে ফুঁড়ছিল অংগামী সর্দার। এবারে সে হুংকার দিয়ে উঠলো, "দেখ্, দেখ হুই রেঙমা শয়তানটা আমার মেয়েটার পেটে বাচ্চা বানিয়েছে। একেবারে জান কাবার করে দেবো। হু-হু—" প্রচণ্ড উত্তেজনায় একটা লোহার মেরিকেতসু সাঁ করে আকাশের দিকে তুলে ধরলো অংগামী সর্দার। আর সংগে সংগে পাশের জোয়ান ছেলেটি দুটি বাহুর বেষ্টনে বন্দী করে ফেললো তাকে।

জোয়ান ছেলেটি বললো, "কী করছিস সদ্দার, মানুষ খুন করার জন্যে সায়েবরা সেদিন ইমপাঙ বস্তী থেকে দশটা পাহাড়ীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। খবরদার, ওকে মারিস না। তার চেয়ে ওকে হিঁচড়ে বস্তীতে নিয়ে চল।"

রক্তাক্ত চোখে জোয়ান ছেলেটির দিকে তাকালো অংগামী সর্দার। তার অসমান দাঁতগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রক্তপাত হলো যেন; "ইজাহাণ্টস্ সাকো। নে, শয়তানটাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে বস্তীতে নিয়ে চল্।" বলতে বলতে উদ্যত মেরিকেতসু থেকে একান্ত অনিচ্ছার সংগে নিশ্চিত মৃত্যুকে মুছে দিল অংগামী সর্দার।

কণ্ঠাস্থির ফাঁকে বাঁকা বড়শির মত খাঁজে বর্শার ফলা। বাজুটা ধরে টানতে টানতে খাড়াই উপত্যকার দিকে দৌড়তে শুরু করলো অংগামী জোয়ানেরা। দুটি দেহ, দুটি পাহাড়ী প্রেম—হ্যাজাও আর এটোঙা, বর্শার ফলায় বিদ্ধ হয়ে বন্দী পাখীর পথের ওপর দিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে নীচের দিকে নামতে লাগলো। সামনে বিশাল একখানা বল্লম খাড়ায় বন্দী করে সদর্প পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে অংগামী সর্দার।

পাহাড়ী প্রেম। এই পার্বত্য পৃথিবীর মতই আরণ্যক। ভয়ংকর আর দুর্বার। এ প্রেম সমাজের শাসন মানে না। এ প্রেম বর্শার ফলাকে, প্রতিকূল পৃথিবীকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। রেঙমা আর অংগামী—এটোঙা আর হ্যাজাও দুটি বন্য প্রেমিক-প্রেমিকা সমাজের সকল অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ পাহাড়ের গুহাগর্ভে একটি কবোষ্ণ নির্ভরতার নীড় রচনা করেছিল। দুটি আদিম মানব-মানবীর হৃদয়ের উত্তাপে সে নীড় মধুময়। কিন্তু পাহাড়ী পৃথিবী বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। সেখানে এতটুকু ক্ষমা নেই, এতটুকু করুণা নেই। এইমাত্র একটি অসামাজিক প্রেমকে হত্যা করে, সুড়ংগ-গর্ভের একটি সুখী দম্পতির নীড়কে ফালা-ফালা করে হিংস্র উল্লাসে মাতাল হয়ে উঠলো এই পাহাড়; এই পাহাড়ের জ্যোৎস্না।

"তারপরে কী হলো? অংগামীরা তোকে পাকড়ে ধরে ফেললো!" রুদ্ধশ্বাস গলায় অনেকগুলো প্রশ্ন একসংগে ফুটে বেরুলো। সিঁড়িক্ষেতের দিক্‌দিগন্ত থেকে সবাই [illegible] ঘিরে ধরেছে এটোঙাকে। এমন কি শিকারী কুকুর আর [illegible] আদেশ [illegible] মধ্যে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হো-হো করে সিঁড়িক্ষেত ফাটিয়ে হেসে উঠলো এটোঙা; "তোরা সব এক-একটা [illegible] বাচ্চা। সত্যি যদি তোদের একটুও [illegible] থাকতো! আমাকে মেরে ফেললে এখানে কী করে এলুম?"

"হো-হো [illegible] তোর খাসা। তারপর কী হলো বল দিকি?" [illegible] সর্দার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো; "[illegible] বড় [illegible] এটোঙা। অংগামীরা যে [illegible] এমন করে [illegible], তা তো [illegible] বর্শা দিয়ে [illegible] অংগামী মাগীটাকে নিয়ে [illegible]। তুই আমাদের বস্তির ছেলে, তোকে আমরা যা খুশি [illegible] সমস্ত [illegible] দুটি [illegible] অস্থির [illegible]।

"[illegible] তো অংগামীদের [illegible] চিনতে [illegible] চাই।" [illegible] গুলো [illegible]।

"[illegible]" [illegible] শুরু করলো; "[illegible] জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি আমি কোহিমায়। চারপাশে সাদা সাদা সব মানুষ। পরে জেনেছিলাম, ওরা সব সায়েব। সারা গা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছিল। তার কয়েকদিন পর আমাকে ইম্ফল চালান করে দিল। সেখানে চার বছর কাটিয়ে আজ বস্তীতে ফিরছি।"

"ইম্ফলে কোথায় ছিলি?" সমস্বর গলায় সকলে জিজ্ঞাসা করলো।

"জেলখানায়। [illegible] সব ঘর। সেখানে একটা মণিপুরী চোর ছিল; তার কাছে ছুরি [illegible] ভালো করে শিখে এসেছি।"

বুড়ো সর্দার বললো, "জেলখানাটা কী রে? সেখানে মানুষ থাকে কেন?"

"হুই সায়েবরা জেলখানা বানিয়েছে। চুরি করলে, খুন করলে, মেয়েমানুষের ইজ্জত নিলে হুইখানে আটক করে রাখে সায়েবরা। ভারী মজার জায়গা; সে গল্প আর একদিন বলবো।" চারদিক একবার চনমনে চোখে তাকালো এটোঙা; তারপর বললো, "কী রে সদ্দার, আমার বাপ-মা তো মরেছে। কেসুঙটাও সাবাড় হয়েছে। তাই না?"

"হু-হু—"

"আমি তবে যাই।"

"কোথায় যাবি?"

"হুই দক্ষিণ পাহাড়ের ডগায়। দেখি যদি হ্যাজাওটাকে পাই। কতকগুলো বছর ওর সংগে দেখা নেই। ওর পেটে বাচ্চা ছিল। নিশ্চয়ই এ্যাদ্দিনে সে বাচ্চাটা বড়-সড় হয়েছে।" বলতে বলতে দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে পা বাড়িয়ে দিল এটোঙা। সকলের দৃষ্টিতে সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ছায়া এঁকে টুপি, প্যাণ্ট, জুতো-পরা রহস্যময় জগতের এই বিচিত্র মানুষটা সামনের উপত্যকায় একটু একটু করে হ্রস্ব, হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। চার বছর আগের সেই জানাশোনা পাহাড়ী ছেলে আজ এই মুহূর্তে কী আশ্চর্য অপরিচিতই না হয়ে গেছে! হয়েছে কী অপরূপ রহস্যময়!

(ক্রমশ)

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

১৯

দেশ স্বাধীন হওয়ার মুখেই কলকাতা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। পুলিস সে দাঙ্গা বন্ধ করতে পারল না। অবশেষে মিলিটারীদের হাতে শহর ছেড়ে দেওয়া হল। কারফিউ অর্ডার জারি হল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কারফিউ। মাঝে শুধু ঘণ্টা দুয়েক বাজার করবার জন্য খোলা।

এ পাড়ায় নতুন এসেছি। রুগী পত্তর এমনিতেই বিশেষ কিছু নেই। তার ওপর এই হাঙ্গামায় আর কে আসবে?

চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকি আর গুজব শুনি। শত্রুপক্ষের নৃশংসতার গুজব যেন হাওয়ায় ভেসে আসে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক জানালা খুলে ডেকে গুজব শোনান।

মাঝে মাঝে হঠাৎ এক বাড়িতে শংখধ্বনি হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে। দেখতে দেখতে সব বাড়িতেই ঐ ধ্বনি গর্জে ওঠে। বুঝি শত্রুপক্ষের আক্রমণের সংকেত। ছেলেরা ইঁটের থান আর লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সিঁড়ির দরজায় দাঁড়ায়। তবু যুদ্ধু কিন্তু হয় না। রাস্তার ট্যাঙ্কের ঘড় ঘড় আর মেশিন গানের ফট্ ফট্ আওয়াজে সব গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মিলিটারীর গুলি খেয়ে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেল। দোকান পাট খুলল। ট্রাম বাস আবার চলা শুরু হল। গুজব কিন্তু গেল না। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছুটকো ছাটকা ছোরা ছুরি চালানোর খবর আসতে লাগল। রাত ন'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত কারফিউ চলতে লাগল।

বড় বড় ডাক্তার, যাঁদের বেশী প্র্যাকটিস, তাঁরা ঐ কারফিউর মধ্যেই বেরুবার পারমিট করিয়ে নিলেন। নিজের গাড়ি গ্যারেজে রেখে রুগীদের গাড়িতে করে, ঐ পারমিট নিয়ে নেহাত দরকার হ'লে রাত বিরেতে বেরুতে লাগলেন। আমাদের দিনের বেলাতেই কেউ ডাকে না, রাতে আর ডাকবে কে? তাই ঐ পারমিটের ঝামেলায় আর গেলাম না।

এমনি সময় একদিন হঠাৎ এক টাইফয়েডের কেস হাতে এসে গেল। টাইফয়েডের অষুধ ক্লোরোমাইসেটিন তখনও বাজারে বেরোয় নি। তখনকার দিনে টাইফয়েডের রুগী হাতে আসা মানেই ডাক্তারের ঘরে লক্ষ্মী আসা। কমসে কম মাসখানেকের জন্য একটি রুগী হাতে থাকা, রোজ দু'বেলা করে দেখতে যাওয়া, গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দেওয়া। পয়সাওয়ালা রুগী হলে ডাক্তার নার্স সকলেরই বেশ কিছু প্রাপ্তির আশা। রোগের যখন কোন অষুধ নেই তখনই চিকিৎসকের যা কিছু কেরামত। রুগী যদি ভাল হয় চিকিৎসকের হাত যশ। যদি মৃত্যু হয় তার ভাগ্যদোষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, রুগীর একটি জিনিস শুধু ধ্রুব। সেটি হল অর্থনাশ।

শুধুই কি অর্থনাশ? রোগ থেকে বেঁচে উঠলেও কমসে কম ছটি মাসের জন্য দেহের শক্তিনাশ। মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা নাশ। দৃষ্টি, স্মৃতি, শ্রবণশক্তি অথবা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে কারু হয়ত বা সর্বনাশ।

এমন যে কঠিন রোগ তারও কিন্তু প্রতিষেধক ছিল। এখনও আছে। টি, এ, বি ইন্‌জেকশান। বৎসরে একদিন অর্ধ সি সি, সাতদিন পর আবার এক সি সি। কর্পোরেশনের টিকা দেওয়ার আপিস থেকে নিলে কারুর একটি পয়সাও খরচ নেই। তবু লোকে নিত না। এখনও যেমন নেয় না।

যে ছেলেটির অসুখ হয়েছে তার দাদা এসে একদিন বলল,—ভাইটার আজ ৭।৮ দিন থেকে খুব জ্বর। রোজই বাড়ছে। একবার চলুন দেখে আসবেন।

এই দাদাটির বয়স ২৫।২৬। আমারই জানাশোনা একটা আপিসে টাইপিস্টের কাজ করে। গঙ্গার ধারে পুরোনো একটা গলির ভেতর ভাঙাচোরা একখানা ঘর নিয়ে থাকে। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে বিধবা মা আর বিশ বছরের ছোট ভাইটি এসেছে। তারই আজ ৭।৮ দিন থেকে জ্বর।

জিজ্ঞাসা করলাম,—এই সাত আট দিনে জ্বর একবারও ছাড়েনি?

নবীন বলল—আজ্ঞে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—জ্বর কতটা উঠছে?

নবীন বলল—প্রথম প্রথম ১০২° পর্যন্ত উঠত। ১০০° পর্যন্ত নাবত। আজ দু'দিন হল ১০৪° পর্যন্ত উঠছে। ১০২° ডিগ্রির নিচে আর নাবছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—জ্বর যখন বাড়ে তখন শীত করে?

নবীন বলল—না। শীতের কথা কখনও বলেনি। গায়ে কাপড় দিলে সরিয়ে দেয়। শুধু বলে, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল, মেনিনজাইটিস্ নয় ত? জিজ্ঞাসা করলাম—জ্ঞান আছে? মাথা ঘাড় নাড়তে পারে?

নবীন বলল—তা পারে। এপাশ ওপাশ ফেরে। ছটফট্ করে। পরশু থেকে এটা বেড়েছে। মনে হয়, একটু একটু ভুলও বকছে।

বললাম—চল যাই দেখে আসি।

রাস্তায় বেরিয়ে নবীন একটা রিকশা ডেকে দরদস্তুর করে বিনীত কণ্ঠে বলল—দয়া করে উঠে পড়ুন। আমি হেঁটে হেঁটে সঙ্গে যাই।

ওর আপিসের 'বসে'র আমি গৃহ-চিকিৎসক। 'বসে'র গাড়ি করে 'বসে'র বাড়ি গিয়ে রুগী দেখি। সেই আমাকে ও রিকশা করে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পাশে এসে বসে কি করে?

ওর এই সংকোচ কাটাবার জন্য একটু হেসে বললাম—তুমি নিচে থাকলে চলবে কি করে? রুগীর কথা আরও জানতে হবে যে। উঠে এস। যেতে যেতে শুনে নিই।

একটু আপত্তি করে একটু অপ্রস্তুত মুখে নবীন সসংকোচে উঠে এল। আমার ব্যাগটা কোলে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রিকশা ডাইনে চালাতে বলল।

জিজ্ঞাসা করলাম এবার কলেরা টাই-ফয়েডের ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছে?

লজ্জিত মুখে নবীন বলল—আজ্ঞে না।

শুনে মোটেই অবাক হলাম না। ইন্‌জেকশন যে নেয়নি আগেই যেন জানা ছিল।

বললাম—কেন?

নবীন বলল—ইন্‌জেকশন দিলে হাতে ব্যথা হয়। জ্বর হয়। তাছাড়া নিলেও নাকি এ অসুখ হতে পারে?

একথার কি জবাব দেব? চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিশ্চিত ধ্রুব বলে কিছু আছে কি? গ্যারাণ্টি তো বিজ্ঞান কখনও দেয় না। দিতে পারেও না। কিন্তু লোকে যে তাই চায়! না পেলে অর্থব্যয় অপব্যয় মনে হয়। সেই ফাঁকে অবিজ্ঞানী ধূর্ত ব্যবসায়ী নিশ্চিত আরোগ্যের লোভ দেখিয়ে জাল ফেলে। সেই জালে বুদ্ধিমান বিত্তবান

গরীব মূর্খ সকলেই দেখি এক এক সময় ঘায়েল হয়।

বললাম—এক বাড়িতে একটি আট বছরের ছেলের টাইফয়েড হয়। তিরিশ দিন অজ্ঞান থেকে শেষে বেঁচে ওঠে। সেই বাড়িতে ছেলে বুড়ো সবাইকেই টি, এ, বি দেওয়া হল। বাদ গেল শুধু একটি বাচ্চা। ছ' মাস তার বয়েস। যেদিন টাইফয়েডের রুগীটির জ্ঞান হল, জ্বর ছাড়ল, তার তিন দিনের মধ্যেই ছোট বাচ্চাটির এ রোগ হল। তিন সপ্তাহ ভুগে বাচ্চাটি মারা গেল।

শুনে নবীন একটু যেন লজ্জিত হল। বলল—আজ্ঞে সেজন্য নয়। প্রতি বছরই তো ইনজেকশন নিই। এবারও নেব। কিন্তু নিই নিচ্ছি করে দেরি হয়ে গেল। এ নিলে আমার আবার খুব জ্বর হয়।

তা অবশ্য হয়। কারু কারু আবার খুব বেশীই হয়। জ্বর ওঠে ১০৩ । কিন্তু একদিনের বেশী কেউ বড় একটা ভোগে না।

সেই ভয়ে ডাক্তাররাও অনেকে সহজে এ ইনজেকশন নিতে চায় না। বলে—আমাদের এসব রোগে ধরে না। খুব সাবধানে থাকি। বাজারের কোন খাবার খাই না। জল ফুটিয়ে খাই এ অসুখ হবে কি করে?

তবু কিন্তু রোগ ধরে। ডাক্তার বলে রেহাই না। এ রোগে ডাক্তারেরও মৃত্যু হয়। [illegible] আগে হত।

নবী বলল তাহলে যে শুনি ইনজেকশন নিলেও অসুখ হতে পারে, সেটা কি ঠিক নয়?

ঠিক যে নয় তাই বা বলি কি করে? যুদ্ধের সময় দেখেছি তো ইনজেকশন নেবার তিন মাসের মধ্যেই টাইফয়েডে মৃত্যু হয়েছে। অবস্থাপন্ন ঘরের লোক। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। নাম-করা বড় ডাক্তার অনেক এসেছেন। কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয়নি। পনের দিনের মধ্যেই রুগীর মৃত্যু হয়েছে।

যুদ্ধের সময় সব জিনিসেই ভেজাল চলেছে। সব দেশে। কিন্তু খাদ্য অথবা ওষুধে আমাদের মত ভেজাল দিতে আর কেউ বোধ হয় পারেনি। তখন দেখেছি, কুইনিনে জ্বর ছাড়ে না। এমিটিনে আমাশা বন্ধ হয় না।

টাইফয়েডের যে ভ্যাকসিন বাজার থেকে কিনে এই ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছিল সেটা যে খাঁটি ছিল তাই বা কে বলবে?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওষুধে ভেজাল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভ্যাকসিন যাতে ঠিকমত রক্ষা করা যায় সেজন্য ওষুধের দোকানে রেফ্রিজারেটার রাখার আইন হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বভাব কিছু বদলেছে কি?

শিশুর খাদ্য যে দুধ তাতেও ভেজাল মেশাতে আমাদের কোনদিন বাধেনি। এখনও বাধে না। যুদ্ধের আগেও শুনেছি, কলকাতায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। এখনও তাই শুনি।

নবীনকে এসব বলে আর লাভ কি? তাই গম্ভীর হয়ে বললাম—ওষুধ ঠিক থাকলে এ ইনজেকশনে রোগ না হবারই কথা।

রিকশা বড় রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। এক গলি থেকে আর এক গলি। এ গলি ও গলি পেরিয়ে অবশেষে নবীনদের স্যাঁতসেঁতে গলির ভিতর ঢুকলাম। আঁকা বাঁকা সরু গলি। খানিকটা গিয়ে রিকশা পাশ্চিম আর এগুতে পারল না।

নবীন আমার ব্যাগটি তুলে নেবে পড়ল। লজ্জিত বিনীত কণ্ঠে বলল—এইবারে একটু হাঁটতে হবে।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে চললাম। এ বাড়ি পার হয়ে ও বাড়ির আঙিনা ডিঙিয়ে, অবশেষে ওদের ঘরে গিয়ে পৌঁছুলাম।

পুরনো দোতলা বাড়ি চুনবালি খসা। তারই একতলার একখানা ঘর। মেঝেতে বিছানা পাতা। ঘর দোর নোংরা। ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল।

শুনেছি বড় বড় চিকিৎসক রুগীর ঘরে ঢুকেই বলে দিতে পারতেন, কি রোগ এবং পরমায়ু কতদিন। চিকিৎসক জ্যোতিষী নন। তবু বলতেন। অনেক ক্ষেত্রে মিলেও যেত।

আমরা তা পারি না। রোগীর চেহারা দেখে এবং ঘরের গন্ধ থেকে এ অনুমান করা নাকি সম্ভব হত। চূড়ান্তভাবে বোঝা যেত নাড়ী দেখে। রোগীর নাড়ী নিজের আঙুলে অনুভব করে রোগের প্রকোপ চিকিৎসক উপলব্ধি করতেন। এই নাড়ী জ্ঞানটি বড় সহজ বস্তু ছিল না। নাড়ী ধরে চিকিৎসক মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিতেন। নিজের দু' চোখ বন্ধ করে সোজা হয়ে বসতেন। মনে হত যেন ধ্যানে বসেছেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। একমনে শুধু রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছেন। এক এক সময় আধ ঘণ্টারও উপর কেটে যেত। তবু নাড়ী দেখা শেষ হত না। এমনি করে ধ্যানস্থ হলে তবে চিকিৎসক মৃত্যুর পদ-ধ্বনি শুনতে পেতেন। কখনও শুনতেন ধীর মন্থর নিশ্চিত গতিতে মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। অন্ধ বধিরা পিঙ্গল-কেশী। কখনও দেখতেন, এগিয়ে এসেও মৃত্যু ফিরে গেল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত লজ্জিত পায়ে।

আমরা তা পারি না। আগেকার চিকিৎসকের মত আমাদের এ নাড়ীজ্ঞান নেই। তার জন্য আপসোস করি না। লজ্জাও বোধ হয় না। কারণ শুধু নাড়ী দেখে এখন আর চলে না। স্টেথোস্কোপ বসাতে হয়। ব্লাড প্রেশারের যন্ত্র লাগাতে হয়। হৃদযন্ত্র বিকল হলে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম পর্যন্ত করাতে হয়।

একই রোগে এক এক ঘরে এক এক রকম গন্ধ। হাসপাতালে এক। নার্সিং হোমে অন্য। পরিষ্কার ঘরে এক। নোংরা ঘরে অন্য।

রোগীর চেহারা দেখে কিন্তু অনেক কিছুই ধরা যায়। এইখানেই চিকিৎসকের বাহাদুরী। অনেক দেখে অনেক শিখে এ বিদ্যা লাভ হয়।

আমাদের প্রফেসর বলতেন, চোখ দুটোকে তৈরি কর। দেখতে শেখ। তোমার হাত তোমাকে ঠকাতে পারে। কান তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে পারে। কিন্তু দেখতে শিখলে চোখ কখনও ঠকাবে না। ভুল করবে না। চোখের পিছনে নিজের মগজটাকে খাটাও। দেখতে শেখ।

রুগীর ঘরে ঢুকে সেই প্রফেসরের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম চোখদুটো ঠিক তৈরি

দেখতে শিখেছি। এর যা চেহারা
় রোগ এবং পরমায়ু বলে দিতে
থবারও আর কোন প্রয়োজন নেই।

একপাশে বিছানায় ২০।২১
একটি ছেলে শুয়ে। মাথায় এক
় চুল। মুখ দাড়ি গোঁফে ভর্তি।
াল গর্তে। সরু লিকলিকে রোগা
হাত। গলার হাড় ফুটে উঠেছে।
০ দিনে গায়ে মাথায় এক ফোঁটাও
ঢ়নি। জামা কাপড় বিছানা সব
সমস্ত মিলিয়ে ভ্যাপসা একটা

। ঢুকতেই নবীনের বিধবা মা
আসন পেতে দিলেন।

ন, কাল অমাবস্যা গেছে। জ্বরটাও
ড়েছে। কিন্তু আজও তো কৈ
?

নিম্ন মধ্যবিত্ত। অল্পশিক্ষিত।
ায়ণ। ধর্মনিষ্ঠ। অতি আধুনিকা,
, শিক্ষিতা, এমন কি মার্কসপন্থী
র মুখেও শুনি অমাবস্যা
। জ্বর বাড়ে। ব্যথা বেশী হয়।
ন। দেহ রসস্থ হয়।
অহিন্দুদের তো কৈ এসব কিছু

দ বড় কঠিন জিনিস। যুক্তির
ঠাঁই নেই। তাই নবীনের মার
উত্তরে শুধু বললাম, দেখি আগে
করে। বসতে গিয়ে দেখি আসনটি
ংরা। তবু তারই ওপর বসতে
ভাবলাম, বাড়ি গিয়েই এই নতুন

পোশাকটি ছাড়তে হবে। আর টি এ বি ইনজেকশন একটি নিতে হবে।

দেখলাম, রুগীর পেট বেশ ফাঁপা। কোটরাগত চক্ষু দুটি ঘোলাটে। জিভের ওপর সাদা পর্দা। জ্বর ১০৪ ডিগ্রী। বিকার চলছে। কিন্তু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়নি।

বললাম, টাইফয়েডের তো কোন অষুধ নেই। শুশ্রূষাটাই আসল। বাড়িতে কি তার সুবিধে হবে? হাসপাতালে দিন না?

নবীনের মা বললেন, আমরা গরীব লোক। হাসপাতাল কি আমাদের কেউ দেখে? যত্ন নেয়?

এই একই কথা শুনে আসছি আজ তিরিশ বৎসর। আগে হাসপাতালে বেড খালি থাকত। রুগী সহজে ভর্তি হতে চাইত না। ভাবত, হাসপাতাল একটি জেলখানা। ডাক্তার একটি জল্লাদ।

আজকাল বেড পাওয়া যায় না। যত রুগী তত বেড নেই। তাই তদ্বিরের চল হয়েছে। এই কার্যটি গরীবের কর্ম নয়। আমরা যারা মধ্যবিত্ত তাদেরই একচেটিয়া। ওকে ধরে তাকে ধরে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোক ছাড়া আর কেউ পারে কি? এজন্য আমরা অনুরোধ করি, খোশামোদ করি, অবশেষে ভয় দেখাই। খবরের কাগজে কেচ্ছা বার করি।

কিন্তু হাসপাতালে রোজ আমরা কি দেখি?

এইত গত হরতালের দিন আমাদের হাসপাতালে দুপুর বেলা হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। উঃরে বাবারে মরে গেলাম। সেই সাংঘাতিক চীৎকার শুনে রুগীরা চমকে উঠল। আমরা অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলাম। সার্জন আর এস এবং আমি।

দেখলাম একটি ১৫।১৬ বছরের জোয়ান ছেলেকে দুই ভদ্রলোক কোলে করে নিয়ে আসছেন। ছেলেটা চ্যাঁচাচ্ছে।

কি ব্যাপার?

টেবিলে শুইয়ে দেখা গেল ছেলেটার একটা হাতের কব্জি শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। নিচ থেকে সবটা হাত ফুলে উঠেছে। নীল হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকটি বললেন, উঠোনের এক পাশে অনেকদিন থেকে কতকগুলি ইঁট পড়েছিল। ছেলেটাকে আজ বলেছিলাম সরিয়ে ফেলতে। খান দুই সরাবার পরই হঠাৎ আঙুলে কি একটা কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি কব্জিটা বেঁধে ফেলে একটা ডিসপেন্সারীতে নিয়ে যাই। ওরা বলে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে। হরতালের দিন বাস ট্যাক্সী সব বন্ধ। তাই কাছাকাছি এইখানে এনেছি।

ছেলেটা সমানে চীৎকার করে চলেছে। ছটফট করছে।

আমাদের সার্জন ছেলেটার হাত দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কিসে কামড়েছে?

ছেলেটা বলল, কাঁকড়া বিছে।

সার্জন জিজ্ঞাসা করলেন, কতক্ষণ বাঁধা হয়েছে?

ভদ্রলোকটি বললেন, তা ঘণ্টাখানেক হবে।

সার্জন আর এসকে বললেন, তাড়াতাড়ি বাঁধটা কেটে দাও। রক্ত চলাচল হোক। তারপর যেখানে কেটেছে, সেখানে লিভোকেন ইনজেকশন দাও। ব্যথা কমে যাবে।

ভদ্রলোকটি ফস করে বললেন, বাঁধ তো খুলবেন, কিন্তু তার দায়িত্ব নেবে কে? সাপে যদি কেটে থাকে?

আমরা তো স্তম্ভিত! দিন দুপুরে কলকাতা শহরে সাপে কাটবে অথচ কেউ দেখবে না? জানবে না? কাটার দাগও থাকবে না? রক্তও বেরুবে না? ভদ্রলোক বলে কি?

এদিকে বাঁধটি না খুললে ছেলেটার হাতটি যাবে। শেষকালে কব্জি থেকে কেটে ফেলে হয়ত বাদ দিতে হবে।

কিন্তু ভদ্রলোক তো বুঝবেন না।

বললেন, আপনাদের তো ভুলও হতে পারে। কাগজে দেখেছি আপনাদের ভুলে অনেক রুগী আজকাল মারা যাচ্ছে। এখন যে ভুল হচ্ছে না, তারই বা গ্যারান্টি কি?

সার্জন বিরক্ত হলেন। বললেন, তাহলে আপনি বরং মেডিক্যাল কলেজেই নিয়ে যান। বলেন তো আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিই।

ভদ্রলোক তাতেও রাজি নন।

ছেলেটা এদিকে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে। ওদিকে অপারেশন থিয়েটারে আমাদের কাজ আছে। কে ভদ্রলোককে বোঝাবে? আর এস এর ওপর ভার দিয়ে আমরা ও টিতে চলে এলাম।

অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করে করে এক সময় ছেলেটা হঠাৎ চুপ করে গেল। আর এস এসে খবর দিল ভদ্রলোক অবশেষে রাজি হয়েছেন। বাঁধ কাটা হয়েছে। ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ব্যথা কমে গেছে।

অপারেশনের পর বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোক বসে আছেন। বিনীত লজ্জিত মুখে সার্জনকে বললেন, কিছু মনে করবেন না। খুব নার্ভাস ছিলাম। খবরের কাগজ পড়ে আরও বেশী ভয় হয়েছিল। যা বলেছি ঘাবড়ে গিয়ে বলেছি। কিছু মিন করে বলিনি।

শুনে আমরা একটু হাসলাম। ভাবলাম ব্যথা কমে গেছে, তাই এখন ভাল ভাল কথা সব বেরুচ্ছে। না কমলে ইনিই অন্য কথা বলতেন। খবরের কাগজে ডাক্তারের হৃদয়হীনতা ও ঔদাসীন্যের আর একটি কাহিনী ফলাও করে ছাপা হত।

সেদিন নবীনের মা যেই বললেন, হাসপাতালে কি গরীবের চিকিৎসা হয়, তখনই বুঝলাম, এই নোংরা পরিবেশে রেখেই ছেলেটির চিকিৎসা করতে হবে। এখান থেকে সরানো একে যাবে না।

তাই বললাম, রোজ গা গরম জলে মুছিয়ে দিতে হবে। মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা। ১০৩° ডিগ্রীর ওপর জ্বর থাকলে বরফ। জামা কাপড় রোজ বদলাতে হবে। গায়ে দিতে হবে পাউডার। চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর দেখে লিখে রাখতে হবে। জল খাওয়াতে হবে ৪।৫ সের। তাছাড়া গ্লুকোজ ইনজেকশন দেব রোজ দু বেলা। ১০০ সি.সি।

নবীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

এইবার বলল, আপনি যা বলবেন তাই হবে। ওষুধ পত্র যা লাগবে লিখে দিন।

লিখে দিলাম।

বাইরে বেরিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নবীন বলল, সন্ধ্যার সময় চিনে আসতে পারবেন তো? না আমি গিয়ে নিয়ে আসব?

বললাম, একবার যখন দেখে গেলাম, চিনে আসব ঠিক।

সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি রুগীর বিছানা জামা কাপড় সব বদলানো হয়েছে। স্পঞ্জ করিয়ে পাউডার দেওয়া হয়েছে। মাথায় আইস ব্যাগ। ঘরে ধূপে ফিনাইল এবং পাউডারের গন্ধ মিশে নতুন এক গন্ধ উঠছে। আমার বসবার জন্যও এসেছে একখানা জল চৌকি।

রুগীর বুকে পরীক্ষা করে নাড়ী দেখে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিয়ে চলে এলাম।

রোজ দুবেলা ইনজেকশন দিই। রুগীর কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি নেই। দিন দুই পর যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাও চলে গেল। ডাকলে আর সাড়া দেয় না। মুখে জল দিলে কখনও খায় কখনও ফেলে দেয়। জ্বর সেই ১০৪° ডিগ্রী। দু ডিগ্রীর নিচে আর নামে না। আট দশ দিন এমনি করে কেটে গেল। একদিন সকালে গিয়ে দেখি বুকে ঘড় ঘড় শব্দ। নাড়ীর গতি ভাল নয়।

বললাম, একটু অক্সিজেন দেওয়া দরকার।

নবীন তক্ষুণি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে এল। নাকে নল ঢুকিয়ে অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল।

পরদিন রুগীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুখে চামচে করে দিলেও গেলে না। বাইরে গড়িয়ে আসে।

দেখে বললাম, খাওয়া বন্ধ হলে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই। এমনি না পারলে টিউব ঢুকিয়ে খাওয়াতে হয়।

অক্সিজেন দেওয়া দেখেই নবীনের মা বুঝেছিলেন, ছেলে বাঁচবে না। টিউব ঢোকাবার কথায় কেঁদে ফেললেন।

বললেন, আর না। অনেক তো হল। আর কষ্ট ওকে দেবেন না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা অবস্থা দেখে মনে হল আজ রাত আর কাটবে না। সমস্ত বুকে জল জমে গেছে। ঘড় ঘড় শব্দ বেড়েছে। মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। হার্ট ফেইলিওর শুরু হয়েছে। জ্বর বেড়ে ১০৫° ডিগ্রী উঠেছে। অতি কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত। সঙ্কুচিত গলার মাংসপেশী।

এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন ইনজেকশন দিয়েও কোন পরিবর্তন আনা গেল না। উপকার হল না। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল।

সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন রাত্রি হয়েছে। আটটা বেজে গেছে। নটা থেকে কারফিউ। ভোর ছটা পর্যন্ত।

নবীন মিনতি করে বলল, আজ রাতটা এইখানেই থেকে যান। রোগের সঙ্গে লড়াই করে করে রুগী এখন হার মেনেছে। মৃত্যু শুধু আর শিয়রে দাঁড়িয়ে নেই। রোগীর দেহে এসে প্রবেশ করেছে। প্রাণের যেটুকু ক্ষীণ স্পন্দন এখনও বর্তমান, মনে হল, রাত বারোটার মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। কোন ওষুধ, কোন ইনজেকশনেই আর তাকে জিইয়ে রাখা যাবে না।

এ অবস্থায় আমি থেকে আর কি করব? এদিকে রাত নটা থেকে আবার কারফিউ। আমার কোন পারমিট নেই। দু তিন ঘণ্টা পর মৃত্যু হলেও যে বাড়ি চলে আসব তারও কোন উপায় নেই। এদের এই একটি মাত্র ঘর। বাকি রাত থাকব কোথায়?

পয়সাওয়ালা ঘর হলে কিন্তু এত কথা ভাবতাম না। থেকে যেতাম। জানতাম যত কষ্টই হোক বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পাব। উপার্জন হবে। কিন্তু নবীনকে সে কথা বলা চলবে না। ও যদি বোঝে টাকা দিলেই আমাকে রাখা যায়, তাহলে ধার করে ভিক্ষা করে যেমন করেই হোক টাকা ও দেবেই। এমনিতেই বেচারা এই অসুখে দেনায় ডুবে গেছে। তার ওপর অনর্থক এই বাড়তি বোঝা ওর ঘাড়ে চাপাতে পারব না।

নবীন আবার বলল, আপনার খুব কষ্ট হবে। তবু থাকুন দয়া করে।

বললাম, আমি থাকলে রোগীর জীবনী শক্তি বাড়াবার এতটুকু আশাও যদি থাকত, নিশ্চয় আমি থেকে যেতাম। নিজের কষ্টের কথা কখনও ভাবতাম না। কিন্তু আমার তো ভাই করবার কিছু নেই। ইনজেকশন যা দেবার ছিল, সবই তো দিয়ে ফেলেছি। রাতে আরও ইনজেকশন দেওয়া চলবে না। দিলে ক্ষতি হবে।

নিতান্ত অসহায়ভাবে শুকনো মুখে নবীন বলল, তাহলে?

মনে হল কিছু একটা ভরসা ও চাই। একটা কোন ওষুধ ওর হাতে দিতে হয়। তাহলেও একটু আশা থাকবে। জোর পাবে।

রুগী এদিকে ওষুধ পথ্য কিছুই গেলে না। কি দেব?

হঠাৎ মনে পড়ল ব্যাগে তো ইথার আছে। উগ্র তার গন্ধ। দু আউন্সের একটা শিশিতে ঐ ইথার ভর্তি করে দিলাম। তুলোয় একটু ঢেলে রুগীর নাকের কাছে ধরলাম।

বললাম, আধ ঘণ্টা পরপর এমনি করে তুলোয় ঢেলে এই ওষুধটা নাকের কাছে ধরে রেখ। কাজ যদি হয় এতেই হবে।

ন রাত প্রায় নটা। কারফিউ-এর আর নেই। তাড়াতাড়ি রিক্‌শা করে বাড়ি এলাম।

ীনকে বলে এলাম ভোর ছটায় উ শেষ হলেই যেন আমার কাছে । খবরটা দেয়।

গীর চিকিৎসা শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজ এখনও মেটেনি ডেথ সার্টি- দিতে হবে। ভোরবেলা এটি র হাতে দিলে তবে আমার ছুটি। র ভেতর উদ্বেগ থাকলে রাতে ঘুম য় না। আজও হল না। বার বার ল কে যেন ডাকছে। কড়া নাড়ছে। নিতেই একটু দেরি করে উঠি। আজ ছটার আগেই উঠে পড়লাম। চাকরটাকে তুলে চা তৈরি করতে বললাম।

বাজল। কারফিউ শেষ হল। ট্রাম লা শুরু হল। রাস্তায় লোকজন । নবীনের কিন্তু দেখা নেই।

বাজতে না বাজতেই নবীন আসবে। সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে। এ যেন ধ্রুব ছিল। ওর এই দেরিতে সব যেন ভেস্তে গেল। মনে হল ভাইএর নিশ্চয় খুব মুষড়ে পড়েছে। কিংবা আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে বেরিয়েছে। সার্টিফিকেট নেওয়াটাও যে একটা কর্তব্য সে খেয়াল হয়নি।

টার সময় একটা কাজ ছিল। এক অপারেশন হবে। সার্জন আসবেন। আসবে। ঠিক আটটায় গিয়ে পৌছতে

র সেরে পোশাক পরে তৈরি হলাম। নবীনের কোন পাত্তা নেই। আমিই কি করব? কতক্ষণ ওর জন্য বসে কিন্তু একবার বেরুলে কখন যে পারব, তার কোন ঠিক নেই।

এদিকে ডেথ সার্টিফিকেট না পেলে নবীন বেচারা মহা মুশকিলে পড়বে। শবদাহ করতে পারবে না।

কি করি? একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে রেখে যাব? চাকরকে বলব, নবীন এলে ওর হাতে দিতে? কিন্তু তাই বা করব কি করে? সে যে সাংঘাতিক বে-আইনী?

এইবার ওর ওপর রাগ হল। ভয়ানক বিরক্ত হলাম। ওর যদি এতটুকুও কাণ্ড-জ্ঞান না থাকে, আমি তার কি করব? ও যদি ভোগে নিজের দোষেই ভুগবে। যে বাড়িতে যাচ্ছি, সেই ঠিকানা চাকরের কাছে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেবে দেখি নবীন আসছে।

কিন্তু এ কি? ওর চলনে ওর মুখে সদ্য শোকের সেই বিষাদাক্রান্ত করুণ চিহ্ন কোথায়? এ যে হাসি হাসি জ্বল জ্বলে চোখ মুখ।

মাথা নিচু করে হাঁটছিল। মুখ তুলে আমাকে দেখেই খুশীতে কৃতজ্ঞতায় এক-গাল হেসে ফেলল। দু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, কী চমৎকার ওষুধই যে কাল শোঁকাতে দিয়েছিলেন। বার দুয়েক শোঁকাবার পরই নিঃশ্বাসটা সহজ হতে শুরু হল। কষ্টটা যেন কমে গেল। জ্বরটাও কমছে। ভোরের দিকে চোখ মেলে খেতে চাইল। বেশ জ্ঞান হয়েছে। হরলিকস খেয়েছে।

দেখুন দেখি কি কাণ্ড! এদিকে আমি ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য সকাল থেকে ছটফট করছি। ভাগ্যিস কথাটা নবীন জানে না। জানলে কি রক্ষাটাই না পেতাম। ওর কাছে প্রেসটিজ বলে কিছু আর থাকত না।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, খুব ভাল খবর।

জ্ঞান যখন একবার ফিরেছে, তখন আর ভয় নেই। ওষুধেরও আর এখন দরকার নেই। দুপুরে যাব। তখন দেখে যা হয় ব্যবস্থা দেব।

নবীন তখনও আমার সেই শোঁকাবার ওষুধের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ।

বলল, এত ভাল ওষুধ! লাগাতে না লাগাতেই ফল। ওটার নাম কি ডাক্তারবাবু?

এতক্ষণে আমি সামলে গেছি। চোখে-মুখে বিজ্ঞজনোচিত ভারিক্কিভাব আনতে সমর্থ হয়েছি।

ডাক্তারী চালে গম্ভীর হয়ে বললাম, ওটা একটা স্টিমুল্যাণ্ট।

খুশী খুশী মুখে নবীন বলল, আশ্চর্য কাজ করেছে কিন্তু। ইনজেকশনের চেয়েও বেশী জোরালো। কি কড়া গন্ধ!

দুপুরে গিয়ে দেখি রুগীর অবস্থা সত্যি খুব ভাল। নিঃশ্বাসের কোন কষ্ট নেই। বুক পিঠ সব পরিষ্কার। ঘড়ঘড়ানি নেই। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক। পেট ফাঁপা কম। বেশ জ্ঞান হয়েছে। কথা বলছে। হাসছে।

দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। সেই যে রুগী ভাল হতে শুরু করল সাতদিনের মধ্যেই উঠে বসল। ভাত খেল।

প্রফেসরের কথা মনে পড়ল।

বলেছিলেন, চোখদুটোকে তৈরি কর। দেখতে শেখ।

প্রথম যেদিন এই রুগী দেখি, ভেবে-ছিলাম চোখদুটি খুব তৈরি হয়েছে। দেখতে শিখেছি।

আজ বুঝলাম মোটেই চোখ তৈরি হয়নি। দেখতে কিছুই শিখিনি। এখনও কিছু বুঝি না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

উঠেছে আরো বিশাল রক্তাভ। যেন কী কথা রয়েছে মনের মাঝে। তারই বোবা অভিব্যক্তি উঠেছে ফুটে, ফুলে ফুলে উঠছে ভিতর থেকে। সহসা সুমিতার দৃষ্টি পড়ল, ওদের দুজনের কাপ-ই শূন্যে হয়ে গেছে। তবু আছে বসে। ওর বসে থাকাটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠল হঠাৎ নিজের কাছেই। গরম চা-ই চোখ কান বুজে গিলে ও উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে, কোনদিকেই যাওয়ার পথ খুঁজে পেল না যেন ও। পিছন দিকে বাগানে যাওয়ার ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়েও নেমে যেতে পারল না। একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার উপর। কে যেন ওর পায়ে এঁটে দিল শক্ত। কান পেতে রইল ও ঘরের গহন হৃদয়ে।

কিন্তু ও'রা দু'টিতে তেমনি নীরব, মুখোমুখি। কতক্ষণ থাকবে! থাকতে তো পারবে না। সুমিতা ওর এই বয়সের মন দিয়ে অনুভব করেছে, ও'দের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব কত গভীর। ও'রা তো শুধু বাপ আর মেয়ে নয়, আরো কিছু। কথায়-গল্পে কাজে, সুখে-দুঃখে, ও'রা পরস্পরের সঙ্গী। সেই সঙ্গে মেজদিও অবশ্য আছে। ও'দের কত অতীত দিনের গল্প ও কাহিনী, পুরনো দিনের কত কথা, কত জায়গা, কত বন্ধু জুড়ে আছে মনে। সুমিতার কাছে সেগুলি সবই অচেনা বিস্ময়কর গল্প। শেষের দিকের দু' একটি অস্পষ্ট ছায়া হয় তো ভেসে ওঠে ওর চোখে। বাবার চাকরির শেষ কয়েকটি বছরের দিল্লী, তার আগে সিমলা প্রবাসের অস্পষ্ট ছবি সে-সব। বড়দি মেজদি বাবার কাছে সে-সব জীবন্ত। যেন সেদিনের কথা।

সেই সব দিনগুলিই ও'দের পরস্পরকে অনেকখানি কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে। ও'দের এই বন্ধুত্বে সুমিতার ঠাঁই যেমন নেই, তেমনি মনে মনে বড়দি মেজদির প্রতি ওর হিংসেও একটু আছে। ওর এই হিংসে তখনি কোথায় উৎসুক হয়ে ওঠে, যখন ও'রা মায়ের কথা বলেন। কত হাসি, কত খেলা, কত ঝগড়া, কত খুঁটিনাটি ছোট-খাটো বিচিত্র সব ঘটনায় পরিপূর্ণ ও'দের জীবন।

বাবা যদি বলেন, সেবারে মনে আছে তো উমানি, সেবারে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মোস্ট ক্রেজী হয়ে এলেন মিঃ ওয়েবস্টার—

বড়দি চোখ বড় বড় করে বলবে, ওয়েবস্টার?

বাবা: হ্যাঁ রে, সেই যে সিমলায়—

মেজদি একটু গম্ভীরভাবে হেসে বলবে, আর সেই যে মিঃ ওয়াইল্ডউডের কথা বলছ?

বাবা যেন দুই দিদিরই সমবয়সী, এমনিভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ......অমনি ও'রা সবাই হেসে উঠবে। বড়দি বলবে, তুমি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছ বাবা। বাবা সেটা স্বীকার না করে বলবেন, তোর মনে আছে, ওয়াইল্ডউডটা কী পরিমাণ পাগলা ছিল!

মেজদি তেমনি গম্ভীর স্বরেই হেসে বলবে, নইলে আর মাকে চেয়েছিল নাচ শেখাতে? তখন চকিতে একবার বড়দির দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, তোর মাকে না পেরে শেষটায় উমনিকে নিয়ে পড়ল।

বড়দির মুখে একটু হালকা লাল রং-এর ছোঁয়া লাগবে। বলবে, ওয়াইল্ডউড মানুষটি কিন্তু খুব খাঁটি ছিল। নেটিভ বলে কোনদিন নাক সিঁটকোয়নি আমাদের।

বাবা—হ্যাঁ, তোকে বেশ নাচ শিখিয়ে তুলেছিল। তোর মা খালি আমাকে বলত, কী বিপদ! মেয়েকে তো নাচ শেখাচ্ছে,

ওদিকে সাহেব যে তোমার মেয়েকে ছেড়ে থাকতেই চায় না।

আর একবার বড়দির মুখটি একটু লাল হবে। মেজদি ওয়াইলডেভের সেই গানটি সুর না করে বলে উঠবে, আই লভ্ড মাই হার্ট অ্যান্ড গু ... দি কী!......ওই ছোট্ট গানের কলিটি বলার মধ্য দিয়ে কী যে ঘটে যাবে! সুমিতা কিছু বোঝবার আগেই, ওঁরা তিনটিতে খুন হয়ে যাবে হেসে। মেজদিরও মুখটি কিছু লাল থাকবে তখন। ও আবার বলবে, বেচারী ওয়াইল-ডেভ!

হাসিটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে আবার [illegible]।

তারপর [illegible] বলেই সুমিতার দিকে তাকিয়ে বাবা বলবেন, রুমুনো [illegible] হাঁ করে ... [illegible] দেখছে ... [illegible] দিয়ে [illegible] ওর মাথে।

কিন্তু ওই [illegible] একবার [illegible] বাবা আর [illegible] কিন্তু কথা [illegible] হয়েছিল [illegible]।

কিন্তু [illegible] ... চেয়েছেন। চেয়েছেন, কিন্তু সব সময়ে পারেননি। বড়দির বিয়ের পর সেই সায়াহ্নের ছায়ায় সন্ধ্যার আভাস দেখা দিয়েছিল। হয়তো বড়দির বিরহিনীদের বাড়ি চলে যেত। মেজদি চলে যেত কলেজে কিংবা ওদের ছাত্র আন্দোলনের কাজে। তখন বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হত সুমিতা। এ সেই বড়দি মেজদির বাবা নন, রমুমণির বাবা। সকাল বেলার দেখা সন্ধ্যার সঙ্গে। দুজনের মাঝে কেমন একটি স্বল্প কথার প্রসন্নতা বিরাজ করে তখন। একজনের পিছে পড়ে আছে আনন্দে সারা বেলার সুখ-দুঃখের বিচিত্র জীবন। আরেকজনের সামনে আগতপ্রায় রাত্রির নিস্তব্ধতা। একজন ফিরে তাকান শুধু পিছনের দিকে, আমনের দিকে আরেক-জন। কেবল পার্থক্য ঘটে গেছে একটি বিষয়ে। সুমিতা ওর বাবার এই রূপের সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছে নিজেকে। সর্বদিক দিয়ে সেজন্যে ও একটু চাপা হয়ে গেছে বেশী। আর ঠিক সেই কারণেই ওর অনুভূতির তীব্রতাও বেশী।

কিন্তু সেদিনের সায়াহ্নের বেদনার মধ্যে মহীতোষের এই জীবনের একটি স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। সেটুকুর চিহ্নও আজ নেই। আজ সেই মানুষে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। একদিন বড়দির ব্যাপারে সংশয়ে নিঃসংশয়ে অনেক কথা বকেছেন। আজো অনেক কথা আবর্তিত হয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। কিন্তু বলতে পারছেন না। হয়তো আজ নতুন কথা কিছু বলতে চান। তাই সবচেয়ে যেখানে কম সংকোচ, সেখানেই এখন ঠেকছে বাধো বাধো।

সুজাতার দিকে তেমনি করেই দেখছেন মহীতোষ। ওঁর বাথা-আড়ষ্ট মুখে একটি অস্পষ্ট অপরাধের ছায়া পড়েছে যেন। খানিকক্ষণ পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, উমনো, ঘুমোসনি মনে হচ্ছে সারা রাত।

মহীতোষের গলায় কেমন একটু সংকোচ আভাসও রয়েছে। সুজাতা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, ঘুমিয়েছি তো!

বাইরের জীবনের রীতি-নীতি যা-ই থাক, বাপে-মেয়েতে কোনদিন একাড়িতে মন নিয়ে লুকোচুরি হয়নি। রাত্রি জাগরণ চিহ্নিত যে মুখ সুজাতা কিছুতেই কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না, সেই মুখ নিয়ে আজ সবচেয়ে কাছের মানুষকে ও সত্যি কথা বলতে পারছে না। সেইটি তো সবচেয়ে বড় শংকা মহীতোষের। বললেন, দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না।

বলে এক নিমেষ জবাবের অপেক্ষা করে আবার বললেন, উমনো, তুই যদি বলিস, তবে আমি নিজেই একবার পিরীনের কাছে না হয় যেতুম।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল সুজাতা। সোজা হয়ে বসতে গিয়ে ওর আঁচল লুটিয়ে পড়ল টেবিলের উপর। বুকের উপর চিক-চিক করে উঠল সোনার হারটি। সারা মুখে ওর রক্ত ছুটে এল। বলল, কেন? পেছনের খোলা দরজার পাশে, বাগানের বারান্দায় ঠিক বড়দির মতই চমকে উঠল সুমিতাও। এ যে ওর কাছে আশাতীত। এ যেন ওর সেই সায়াহ্নের বাবার কথা। বিষম করুণ অসহায়।

মহীতোষ বললেন, হয়তো বড় দেরি করে ফেলেছি, তবু মনে হচ্ছে, আমি আমার কর্তব্য বোধ হয় ঠিক করে উঠতে পারিনি।

এবার আর তেমন করে চমকে উঠল না সুজাতা। বলল, কেন তোমার মনে হচ্ছে একথা?

কেন তা জানিনে। কেবলি ভাবছি, তোর মা থাকলে কি করত। আমি তো তার কিছুই বুঝিনে। আমি শুধু তোর অপমান অভি-মানের মুখ চেয়েই এতদিন চলে...... জীবনের আর একটি দিক তো আমি ভেবে দেখিনি উমনো।

সুজাতা বিস্মিত অনুসন্ধিৎসু চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, জীবনের সেই দিকটা কি অপমান মেনে অভিমান পুষে বজায় রাখতে হবে বাবা?

সহসা কোন কথা জোগাল না মহীতোষের মুখে। মেয়ের মুখ থেকে ওঁর নিজেরই, সংশয়ান্বিত প্রশ্নটি যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। উনি নিজে ছিলেন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের দরিদ্র কেরানীর ছেলে। ওই জীবনটি পার হয়েছিলেন এক অভাবিত অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে। সে অধ্যায়ের হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষয়ের কথা ওঁর সন্তানেরা কেউ জানে না। এখনো উত্তর কলকাতায় ওঁর বিধবা বড় বউদি আছেন, আরো আছেন কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। সেখানে ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, সব মিলিয়ে এক জীর্ণ দেয়াল-ঘেরা নিশ্চুপ আশাহীন জীবনের ছায়ার সমারোহ দেখেছেন। মহীতোষ যে দিগন্তে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেখানকার সঙ্গে উত্তর কলকাতার বাড়ির কোন মিলই নেই। সেই

‍ওঁর পরিণতি ওঁর এই জীবন, এই বোধ, এই স্বাধীন সত্তা। একদিন যখন ভেবেছিলেন, সুজাতা রবিকে বিয়ে চায়, তখন সেখানে হস্তক্ষেপের কোন জন বোধ করেননি। কিন্তু নিজের কাছে তো নেই কোন ফাঁকি। রবি সমাজের ছেলে, কিন্তু প্রাইভেট জের গরীব অধ্যাপক। তা ছাড়া রাজ-ও করে। তারপর সুজাতা যখন বেছে বড়লোক গিরীনকে, তখন মনে মনে ক করেছিলেন। এই তারিফের মধ্যে খানি সমাজ-মন, কতখানি স্নেহের মন ভেবে দেখেননি। কিন্তু এ জীবনে নের সঙ্গে আপোস না করার যে , তাকেও তো অস্বীকার করতে ননি।

জাতার কথায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বললেন, কিন্তু উমনো, অপমানতো াল থাকে না।

জাতা ... চিরকাল থাকবে কিনা সে তো আমি পাইনি বাবা।

ীতোষ জানেন, সে ভরসা দেওয়ার ক একমাত্র গিরীন। বললেন, উমনো, নে ক্ষমা জিনসটি কিন্তু ছোট নয়।

য়েক নিমেষ সুজাতার রক্তাভ ঠোঁট দুটি শক্ত হয়ে রইল। বাবার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। ওর ক্লিন্ন চোখের পরিখার ওপারে বিষাদ কিন্তু কেমন একটি শ্লেষের ঝিলিক হানছে। বলল, 'ক্ষমা তো আমার কাছে কেউ চায়নি।'

সে কথা এত সহজে বলা যায় না উমনো। এখানে ক্ষমা কেউ ঘটা করে, দশজনের সামনে চাইতে পারে না। কিংবা এক কথায় ছুটে এসে হাত ধরে ক্ষমা চাওয়াও যায় না, করাও যায় না। সেটা ভাঁড়ামি হয়ে যায়। তোদের দুজনের ঘর করার মধ্য দিয়ে ক্ষমা চাওয়া, ক্ষমা করা কখন হয়ে যেত, তা হয়তো তোরাও জানতে পারতিসনে।

সুজাতার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই ঘটনার পরেও এক বছরতো আমি সেখানেই ছিলুম। কই, তখনতো তেমন কিছু ঘটেনি। তারপরেও কেটেছে অনেক দিন। তখনকার চিঠিপত্রগুলির কথা তো ভুলে যাওনি। তোমার এ কথার আভাসও তাতে একবিন্দু পাইনি আমি।

তখন তোদের দুজনেরই মন বিদ্বেষে ভরা।

আজ-ই বা মিতালী কোথায় দেখলে তুমি?

মহীতোষ দেখলেন, সুজাতার নাসারন্ধ্র উঠছে ফুলে ফুলে। কঠিন রেখায় বেঁকে উঠেছে ঠোঁট। চোখ দুটি দপ দপ করছে। আবার বলল সুজাতা, বাবা, সবটাই শেষ পর্যন্ত ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন অন্যায় তো আমি করিনি। তবে আমি কেন যেচে মান, কেঁদে সোহাগ করতে যাব?

মহীতোষের এক চোখ করুণ, আরেক চোখে দ্যুতি। মেয়ের এই দৃপ্ত তেজস্বিনী মূর্তি ওঁর স্নেহান্ধ হৃদয়কে গর্বিত করে তোলে। সবকিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর স্নেহ ও ভালোবাসা। এত কথা বলেছেন, ওরই দুঃখের ভয়ে, ওরই সুখের আশায়। ওরই রক্তমাংসের আত্মজন এই মেয়েদের সুখ, সান্নিধ্যের আশাতেই ওঁর নিজের জীবনের এই শেষ প্রহরের হেঁকে ডেকে ছুটে বাঁচবার বাসনাটুকু নিহিত রয়েছে। সুজাতার চোখে মুখে বিতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশটা দেখে, উনি সহসা আর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারলেন না।

এমন সময় সুগতা এল সময়ের তাড়া দিতে। এসে কিছু বলতে পারল না। মহীতোষ তখন স্নেহ-শঙ্কিত গলায় বলছেন, কিন্তু তুই কাল সারা রাত ঘুমোসনি উমনো। তোকে দেখে যে আমি শান্তি পাচ্ছিনে।

সুজাতা ওর বাবার দিকে ফিরে তাকাল না। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, ঘরে বাইরে এ অপমান তো একটুখানি নয়। তাকে আমি সহ্য করে উঠতে পারছিনে।

কথাটি শুনে মহীতোষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সহ্য করতে না পারায় কষ্ট যদি এমনি করে ফুটে ওঠে সুজাতার মধ্যে, তাহলে আগামী দিনের অবস্থা কী হবে।

কিন্তু সুজাতার কণ্ঠের মধ্যে বিক্ষোভের সুরটুকু ওঁর কানে ঢোকেনি। কথার মধ্যে-কার জ্বলুনিটুকু পারেননি ধরতে। আজকে যাকে ও ওর জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ধরে নিয়েছে, তার মধ্যে ও যেন নিজের মনের তীব্র ধিক্কারকে প্রতি-ফলিত হতে দেখেনি।

সুজাতা আবার বলল, তাছাড়া আমি এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, জজ শেষ পর্যন্ত কী রায় দেবেন। যদি আমার বিপক্ষে যায়—

মহীতোষ দ্রুত ঘাড় নেড়ে উঠলেন। বললেন, অনিলবাবু আমাকে সে ভরসা খুব জোরের সঙ্গেই দিয়েছেন। রায় যে তোর পক্ষে আসবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জজ মিঃ ব্যানার্জির মরালিটির বিষয়ে সবাই সশ্রদ্ধ।

অনিলবাবু সুজাতার পক্ষের উকিল।

সুজাতা বলল, কিন্তু ধরো, যদি অন্য রকমই ঘটে।

তার জন্যে অন্যরকম ব্যবস্থাও আছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই ... আঁচলটি ঘাড়ের উপর ফেলে সুজাতা দ্রুত রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, কিন্তু তুমি রবিকে কেন পাঠিয়েছ ওর কাছে?

চকিতে পাংশু হয়ে উঠল মহীতোষের মুখ। তারপর ফ্যাকাশে করুণ অসহায় হয়ে উঠল ওঁর বিশাল মুখটি। কী বলবার জন্যে মুখ তুলতেই সুজাতা আবার বলে উঠল, কেন তুমি এমন করে আমাকে হীন করে দিলে? বলতে বলতে ওর বড় বড় কালো চোখের কোণে জল জমে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ গলায় ফিসফিস করে বলতে লাগল না থেমে, হয়তো রবি ভেবেছে, আমার সম্মতি নিয়েই তুমি ওকে যেতে বলেছ।

মহীতোষ অসহায়ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বললেন, না উমনো, রবি সেকথা ভাববে না।

রবি না ভাবুক, যার কাছে পাঠিয়েছে, সে তা-ই ভাববে। হাসবে মনে মনে, বিদ্রূপ করবে। রবির কথার মধ্য দিয়ে সে দেখবে, 'আমিই কেঁদে কাঙাল হয়ে পাঠিয়েছি, আমিই ভেঙে পড়তে চেয়েছি তার অন্যায় অহংকারের কাছে।

মহীতোষকে যেন কেউ গলা টিপে ধরেছে। ওঁর গলায় মুখে পেশী ও শিরা স্ফীত ... হচ্ছে। চোয়াল কাঁপছে, কিন্তু ... বলতে পারছেন না।

স্বল্পালোক গম্ভীর সুগতা কারুর পক্ষেই কোন কথা বলতে পারছে না। স্নান করতে

যাওয়ার আগে ওর বাঁধনখোলা বিনুনি-এলো-চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে পিঠে। ও সুজাতার অপমান অনুভব করছে তীব্রভাবে। দাদার অসহায় করুণ অবস্থাটাও পীড়িত করছে ওকে। এই তিনের অন্যতম বন্ধু ও. ওর বাকরুদ্ধ বুকের কোণে অদৃশ্য অশ্রুহীন একটি কান্নার রেশ নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল দাঁড়িয়ে। আর বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমিতা কাঁপছে থরো থরো। ওর মনের আকাশ জুড়ে মেঘের পরে মেঘ এল ধেয়ে। অলক্ষ্যের এই লতাটি নিঃশব্দ কান্নায় উঠল চমকে চমকে। এ কী হল! যে বাতাসটুকু আঁচ করেছিল ও কিছুক্ষণ আগে, সে শুধু নতুন মেঘের আমন্ত্রণের জন্যে! যে আশাটুকু ছিল ওর, তাতো হলই না, এবাড়ির এই তাসের কোণে কোণে দেখল নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছে আর এক ছায়া। ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাবার অসহায় মূর্তিটি। দেখতে পাচ্ছে, অপমানহত বড়দির চোখে জল। মেজদি দাঁড়িয়ে আছে সহস্র ব্যথা নিয়ে। ওই তিনজনের মধ্যে ওর ঠাঁই নেই। কিন্তু ও যেন বিভীষিকার মত দেখল, ওদের ত্রিপদী ছন্দ অবিনাশী হয়েছে।

বুকের শঙ্কা ও ভার নিয়ে পালাবার জন্যে পা তুলল ও। আবার শুনতে পেল, বড়দি বলছে, তুমি হয়তো তোমার কর্তব্য ভেবে পাঠিয়েছ। কিন্তু তা কর্তব্য হবে না। তুমি আমাকে বড় করেছ, মানুষ করেছ, সেইটুকু তো তোমার কর্তব্য করেছ। তুমি তো আমাকে কারুর গলগ্রহ তৈরি করোনি। তবে তোমার ভাবনা কি?

বাবা যেন চাপা গলায় প্রায় কেঁদে উঠলেন, কি বলছিস তুই উমনো। আমি তোকে কারো গলগ্রহ ভাবব।

যারই হোক, আমি কারুরই গলগ্রহ হবো না বাবা।

উমনো, তুই আমার গলগ্রহ হবি ভেবে আমি রবিকে পাঠিয়েছি? তুই একথা বিশ্বাস করিস?

জবাবে শুধু অস্ফুট একটু কান্নার শব্দ শোনা গেল। বড়দির গলার শব্দ। আবার কান্নাভাঙা গলা শোনা গেল, না, তা ভাবিনি।

তারপর শান্ত স্তব্ধতা। সুমিতার মনে হল, এখুনি ওর রুমনি জীবনের সমস্ত বেড়াটি ভেঙে ওঁদের কাছে গিয়ে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।

মেজদি বলল, তোমরা ওঠ, বিলাস আসছে।

সুমিতা দ্রুত কম্পিত পায়ে নেমে গেল বাগানের মধ্যে। ঘুরে, বাইরের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়াল থমকে। দেখল, লোহার গেট খোলা হয়েছে নিঃশব্দে। তাকে আড়াল করে রবিদা দাঁড়িয়ে আছেন ওর দিকে চেয়েই। নিমেষে কী ঘটে গেল ওর বুকে। দারুণ ভয়ের মাঝে নির্ভয়ের দেখা পেয়ে, দুই বেণী দুলিয়ে ও ছুটে গেল রবিদার দিকে।

রবিদাও পা দিয়েছিলেন বাগানের দিকেই। মাঝপথে ও দু হাতে সাপটে জড়িয়ে ধরল রবিদাকে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দোহারা পুরুষ রবিদা। গায়ে চিকেন-হাতা খদ্দরের পাঞ্জাবি। বুদ্ধিদীপ্ত কমনীয়তা সারা মুখে। কিন্তু বড় শান্ত, সময়ে সময়ে কেমন যেন ওঁর সুন্দর হাসির মাঝে একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ থাকে লেগে।

রবিদার কাছে ওর মনের কোন সংকোচ নেই। লজ্জা নেই কোন ওর এই সবে-বাড়ন্ত দেহের। ও দু হাত দিয়ে রবিদাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠাভরে, কী বলেছেন গিরীনদা?

রবিদা চমকে উঠলেন যেন একটু। তারপর ওঁর মুখখানিও ভরে উঠল নিরাশায়। সুমিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, ভালো কিছু বলেননি রুমনি।

সুমিতার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। বলল, তবে কী হবে রবিদা?

রবিদার বিস্ময়ের চমক কাটল না। এমন করে কোনদিন সুমিতাকে কথা বলতে শোনেননি। না শুনুন, কিন্তু এমন করে অলক্ষ্যের বেদনা চেপে রাখা যায় না আর। একমাত্র রবিদা ছাড়া তার আর কেউ যে নেই।

রবিদা বললেন, সে তো এখন কিছু বলা যাবে না। দেখি কি হয়।

ও বলল, রবিদা আমার একটু গিরীনদাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

রবিদা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, বেশ তো, যেয়ো।

তারপর ও রবিদার পিছন পিছন ঘরে গিয়ে ঢুকল। নিজে ছুটে গিয়ে খবর দিল, রবিদা এসেছেন।

মেজদি বললেন, ডেকে নিয়ে এস।

রবিদা এসে দেখলেন, বড়দি মেজদি বাবা তিনজনেই দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ।

বাবা বললেন, কী খবর রবি?

রবিদা কী ভেবে বললেন, গিরীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কাকাবাবু।

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বড়দি ছাড়া। সকলের আগে বেরিয়ে গেল বড়দিই। তৈরি হওয়ার পালা এবার সবারই।

সকলের পরে স্নান সেরে সুমিতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই মেজদি প্রথমে বলল, রুমনি, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমাদের সঙ্গে যাবে।

মেজদির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। কাপড় পরতে পালাল বড়দির ঘরের দিকে।

(ক্রমশ)

॥ ৩২ ॥

উঠছি আর নামছি। উঠছি আর নামছি। রোজই মনে হচ্ছে যেন, এক একটা করে ছোট খাটো পর্বতশ্রেণী ডিঙিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে আমাদের সামনে। তারপর সেটাও ডিঙিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শুধু পাহাড় ডিঙিয়ে আর মালপত্র নিয়েই আমরা ক্ষান্ত থাকিনি। চলতে চলতেই এভারেস্টে ওঠার পরিকল্পনাটা ঠিক করে নিচ্ছিলাম। জানাশোনা হচ্ছিল নিজেদের সঙ্গে। আমার মত অন্য শেরপারাও সুইসদের খুব ভক্ত হয়ে পড়ল। ডিটার্ট্ সাহেবের উপর ভার ছিল পাহাড়ের উঁচু অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করার। সাহেব খুব ফুর্তিবাজ লোক। জীবনী-শক্তির প্রাচুর্যে যেন টগবগ টগবগ ফুটছে। সাহেব কাছাকাছি থাকলে মন খারাপ করে কেউ বসে থাকবে তার উপায় নেই। সাহেব চারদিকে যেমন করে দাবড়ে দাবড়ে বেড়াতেন তাতে আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'খিসিগ্পা'। মানে, বড় মাছি। ল্যাম্বেয়ার সাহেবকে ভালুক বলে তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ও নামটা টিলম্যান সাহেবেরও ছিল। এবার ল্যাম্বেয়ার সাহেবও বালু সাহেব বনে গেলেন। তিনি এদেশী ভাষা কিছু জানতেন না। ইংরেজী, তাও একটা কি দুটো শব্দ। কাজেই ইশারা ইঙ্গিতেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতো। কিছু-দিনের মধ্যেই আমরা চমৎকারভাবে একে অন্যের মনোভাব বুঝে ফেলতে পারতাম।

যতই আমরা এগিয়ে চলেছি, দেশটার চেহারা ততই বদলে যাচ্ছে। এখনও আমরা চড়াই আর উতরাই সেই একইভাবে ভেঙেগ চলেছি বটে, কিন্তু ক্রমশই চড়াই বেড়ে চলেছে। ধান-ক্ষেতগুলো আমাদের পেছনে পড়ে থাকলো। এবার আমরা যবের ক্ষেত, আলুর ক্ষেত আর বন পার হয়ে হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এদিককার লোকজনও অন্যরকম। এরা হিন্দু নয়, বৌদ্ধ। নেপালী নয়,

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

মঙ্গোলীয়। দশদিনের দিন আমরা শেরপা-দের দেশে এসে পৌঁছলাম। এগিয়ে যেতে লাগলাম উত্তরে। প্রথমেই পড়লো শোলো'র নিচু অঞ্চল। তারপরে ক্রমশ উপরে, খরস্রোতা দুধকোশী, খুম্বু আর নামচে বাজার। এই দিনগুলো আমার কাছে যে কি রোমাঞ্চ বয়ে এনেছিল তা প্রকাশ করা যায় না। শুধু যে চোমোলাঙ্মার দিকে এগিয়ে চলেছি তাও তো নয়, আমি আমার বাড়িতেও ফিরে চলেছি। চার পাশে নানা পরিচিত জিনিস। একটা একটা দেখি, আর পুরানো কথা মনে পড়ে। কখনো কখনো স্ফূর্তিতে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কখন মনে হচ্ছিল, এই বুঝি কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম। অবশেষে নামচে। নামচেতে এসে পৌঁছলাম। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার সঙ্গে মিলন হ'ল আবার। শুধু আমার একার নয়, অন্যান্য শেরপাদেরও। ভাবসাব দেখে আশঙ্কা হ'ল যে, কিছুকালের মত অভিযান হয়তো মাথায় উঠলো। আমাদের যাবার খবর আমাদের আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল। শেরপারা যে যেখানে ছিল সবাই এসে জড়ো হয়েছে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। রীতিমত একটা উৎসব পড়ে গেল। এমন কি, আমার মা'ও এসেছে। আমার মা, এই থুথুড়ি বুড়ি হেঁটে এসেছে সেই থামি থেকে। মা'

নেপালী মালবাহকরা বিশ্রাম নিচ্ছে

দু' হাতে জড়িয়ে ধরলাম। মা'র স্পর্শ আবার পেলাম আঠারো বছর পরে। বললাম, "মা, মা, এই দেখ আমি এসেছি।" আঠারো বছর পরে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম।

কিন্তু যত না কান্না, হাসি তার থেকে ঢের ঢের বেশি। একে ওকে দেখছি, এর তার কথা শুনছি, এর ওর খবর পাচ্ছি, আমার খবর সবাইকে দিচ্ছি। আমার মা'র কোলে তাঁর এক নাতিকে দেখলাম। মা'র সঙ্গে আমার তিন বোন এসেছে। ভগ্নী-পতিরা এসেছে। এসেছে খুড়তুতো মাসতুতো বোনেরা, ভাইপো ভাইঝিরা। এদের মধ্যে অনেককে আমি চিনিও না। আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পরে তাদের অনেকে জন্মেছে। আবার অনেকের সঙ্গে কত-কতকাল পরে দেখা। নানা উপহার সামগ্রী এনেছে। খাবার এনেছে আর এনেছে 'চ্যাঙ্'। খুম্বুর তাবৎ লোক কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কাজেই উৎসবটা যে জোর জমবে তাতে সন্দেহ ছিল না বা তার জন্য কোন কারণ অকারণের দরকার ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয়, আমরা যেদিন পৌঁছলাম তার পরের দিনটাই ছিল নেপালী নববর্ষ আর সাহেব-দের 'ঈস্টারের সোমবার'। আর যাবে কোথায়। ভেদাভেদ দূর হয়ে গেল। এবার শুধু নাচো, শুধু গাও আর প্রাণ ভরে পান করো 'চ্যাঙ্'। পরে আমি নামচের চারদিকটা দেখবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। যতদূর আমার মনে পড়ে, তাতে দেখলাম নামচের বেশিরভাগ জিনিসই সেই আগের মতই আছে। পরিবর্তনও অবশ্য কিছু কিছু হয়েছে। তার মধ্যে যেটা আমার বিশেষভাবে নজরে পড়ল সেটা হচ্ছে একটা ইস্কুল। নামচেতে একটা ইস্কুল হয়েছে। ছোট ইস্কুল। শিক্ষকও মাত্র একজন। কিন্তু তার কার্যটি বেশ কঠিন। কারণ শেরপা ভাষায় লেখবার কোন বন্দোবস্ত নেই। শিক্ষাটাও নেপালী ভাষায় দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ইস্কুল যে একটা হয়েছে আমি তাতেই খুশী। মনে মনে ভাবলাম, আর এটা আমাদের লোকেদের ভবিষ্যতের পক্ষে এ এক খুবই শুভ লক্ষণ।

একটা মাত্র দিন আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের মিলন উৎসবে, ফুর্তিফার্তিতে, আর ঘুরতে ফিরতেই সেটা কাবার হয়ে গেল। আমরা ফিরে গেলাম আমাদের কাজে। যেসব নেপালী কুলি কাঠমাণ্ডু থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছিল, পয়সাকড়ি চুকিয়ে তাদের বিদায় দেওয়া হল। তারাও ফিরে গেল। আমাদের পরিকল্পনা মত আমরা দশজন বাছাই করা খুম্বুর শেরপা আমাদের দলে নিলাম। অনেক উঁচুতে চলাফেরা করতে এরা খুবই পোক্ত। আর নেওয়া হ'ল তার বইবার জন্য কিছু লোক।

থায়াংবকের লামা

আমাদের এই ভারি ভারি মাল 'বেসক্যাম্প' পর্যন্ত বয়ে নেওয়ার জন্য নামচের প্রায় অর্ধেক লোক এগিয়ে এল। পুরুষরাই শুধু নয়, মেয়েরাও এলো। এই শেরপানী-দের মধ্যে আমার সব থেকে ছোট বোন সোনাডোমা আর আমার ভাইঝি ফু লাহ্‌মুও ছিল। ফু লাহ্‌মু আমার যে ভাইয়ের মেয়ে, সে অনেকদিন হ'ল গতাসু হয়েছে। দার্জিলিঙ থেকে যে সমস্ত শেরপা এসেছিল তাদের আত্মীয়স্বজনরাও এই কাজে ভিড়ে গিয়েছিল। ধরতে গেলে এক বিরাট পারিবারিক দল নিয়েই আমরা থায়াঙবক্ মঠ আর তার ওধারের পার্বত্য রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলাম।

থায়াঙ্বকের লামারা এসে আমাদের স্বাগত করলেন। জানি না, সাহেবরা এটাকে কিভাবে উপভোগ করলেন। কারণ এখানে আমাদের তিব্বতী চা প্রচুর পরিমাণে পান করতে দেওয়া হয়েছিল। নুন আর চমরীর মাখন দিয়ে এই চা তৈরী করা হয়। আজ পর্যন্ত আমি কোন সাহেবকে এই চা খুশী মনে গলাধঃকরণ করতে দেখিনি। কিন্তু ল্যাম্বেয়ার এদিন কামাল করলেন। আমার মনে হয়, তাঁর পেটে হয়ত এক 'তিব্বতী পাকস্থলী' ছিল। কারণ যখন অন্যান্য সাহেবরা এই চা একটুখানি জিভে ঠেকিয়েই মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলছিলেন। পাছে লামারা মনে দুঃখ পান সেই ভয়ে যখন সাহেবরা অতি কষ্টে তাঁদের মুখ-গুলো হাসি হাসি করে রেখেছিলেন, সেই সময় ল্যাম্বেয়ার সাহেব খুশি মনে তাঁর নিজের কাপের চা সাবাড় তো করলেনই অন্যান্য সঙ্গীদের কাপগুলোও খালি করে ফেললেন। সবাই অপেক্ষা করছিলেন ল্যাম্বেয়ার কখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তা দেখতে। কিন্তু তিনি অসুস্থতার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। অন্যান্য সাহেবরা ল্যাম্বেয়ারের বাহাদুরি দেখে অবাক হলেন। অবাকই শুধু নয়, প্রশংসাও করলেন।

সেই মঠটা ছিল ১২,০০০ ফিটেরও উপরে। কিন্তু সত্যিকার পাহাড় আরম্ভ হয়েছে এই মঠটা ছাড়িয়ে। টিলম্যান আর হোস্টন্ সাহেব যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, যে পথ ধরে ১৯৫১ সালে শিপটন সাহেব এগিয়েছিলেন, আমরাও সেই পথ ধরে দুধকোশী থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলাম। টাওয়েচে আর আমা দাব্‌লাম্ নামে ভারি সুন্দর দুটো চূড়ার মধ্যে যে এক খাড়া উপত্যকা আছে আমরা সেটা পার হয়ে খুম্বু হিমবাহের নাকের ডগায় গিয়ে হাজির হলাম। এই হিমবাহ এভারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু গিরিসংকট থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। ওই তল্লাট থেকে এভারেস্টের অল্পই দেখা যায়। এভারেস্টের দক্ষিণ দিকে লোৎসে পাহাড়।

যার পশ্চিমদিকে নাপ্‌ৎসে। তাই ল্হোৎসে যেমন এভারেস্টকে একদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে তেমনি নাপ্‌ৎসে ঘিরেছে আর এক দিক দিয়ে। এদের ফাঁক দিয়ে এভারেস্টের চুড়োটাই মাত্র দেখা যায়। শীতল, সুনীল আকাশের পটভূমিকায় সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সাদা তুষারের মেঘ এসে তার মাথায় যেন ছাতা ধরে। আমি যখন সেই ছোট্টটি ছিলাম, চমরী গাইয়ের পাল রাখতাম, তখন এই হিমবাহের গোড়া পর্যন্ত উঠে আসতাম। এই পাহাড়ের অনেক দূরের যে একটা পিঠ সেটা বেয়ে আমি অবশ্য আরও কিছুটা উপরে উঠেছিলাম। কিন্তু এবারে, এখন, আমরা যে পথ ধরে চলেছি তার সবটাই আমার কাছে নতুন।

একদিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল। যে দুজন সুইস বিজ্ঞানী আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা সারাদিন ধরে নানা তত্ত্ব সংগ্রহের কাজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসে তাঁরা বললেন, তাঁরা বরফের উপর রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখেছেন। পরদিন আমরা আরও কয়েকজন সেই জায়গায় গেলাম। হিমবাহের উপর, ১৮,০০০ ফিট উঁচুতে নরম তুষারের মধ্যে আমরা সে পায়ের ছাপ দেখলাম। হ্যাঁ, এ ছাপ ইয়েতিরই। আমার মনে পড়লো ১৯৪৬ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে জেমু হিমবাহে আমি এরকম ছাপ দেখেছিলাম। ছাপগুলো পরিষ্কার। তখনও মিলিয়ে যায়নি। এমন কি, সাহেবরাও স্বীকার করলেন, এ ছাপ তাদের জানা শোনা কোনো প্রাণীর নয়। এ সাহেবরাও, ইয়োরোপের অন্যান্য সাহেবদের মতই, কোন জিনিস ভালো করে বুঝতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকতে পায় না। বিজ্ঞানী দুজন ছাপগুলো মাপ জোক করতে বসে গেলেন। লম্বায় সাড়ে এগার ইঞ্চি, চওড়ায় পোনে পাঁচ ইঞ্চি আর একটা ছাপ থেকে আর একটা ছাপের ব্যবধান কুড়ি ইঞ্চি। পায়ের ছাপ ছিল মাত্র এক সারি। যেমন হঠাৎ এক জায়গায় ছাপগুলো তুষারের উপরে জেগে উঠেছে তেমনি হঠাৎই এক জায়গায় আবার তা মিলিয়ে গেছে। যতদূর অনুসন্ধান করা তাঁদের সাধ্যে কুলোয়, বিজ্ঞানীরা তা করলেন। কিন্তু তাঁরা না পেলেন ইয়েতির কোনো খোঁজ, না পেলেন আর কোন পদচিহ্ন। এ বিষয়ে আমি অনেক কিছু জানি। অনেক কিছু বলতেও পারি। বলতে ইচ্ছাও করছিল। কিন্তু কিছুই বললাম না।

বাইশে এপ্রিল আমরা খুম্বু হিমবাহে ১৬,৫৭০ ফিট উপরে, আমাদের 'বেস-ক্যাম্প' স্থাপন করলাম। এখান থেকে বেশির ভাগ স্থানীয় শেরপাই নামচেতে ফিরে গেল। কিন্তু সুইসরা, উঁচু অঞ্চলে ওঠবার জন্য যে দশজন শেরপাকে নিয়োগ করেছিলেন, তাদের ছাড়া আরও তিরিশজন শেরপাকে রেখে দিলেন। এরা আমাদের পরের শিবিরে জ্বালানি কাঠ আর খাবার পৌঁছে দেবে। আমাদের সামনে সিধে উত্তরে এই হিমবাহ তুষার আর বরফে গড়া বিরাট এক প্রাচীরের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর সেই প্রাচীরের উপর দিয়েই চলে গেছে বিখ্যাত গিরিসংকট লো-লা। এই গিরিপথটিই তিব্বত থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই গিরিপথের উপর থেকেই ১৯৩৮ সালে আমি এই দিককার পাহাড়গুলোর উপর নজর দিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে আর লো-লা'র দিকে আমরা নজর দিলাম না। আমাদের দৃষ্টি পড়লো তার ডাইনে, পশ্চিমে, যেখানে একটা তুষার প্রপাত রয়েছে, সেই অঞ্চলটার উপর। এক বিরাট বরফের স্তূপ গড়িয়ে গড়িয়ে এসে সে জায়গায় জমা হচ্ছে, তারপর এভারেস্ট আর নাপ্‌ৎসে এই দু'টো পাহাড়ের এক সংকীর্ণ খাঁজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিচেকার হিমবাহের উপর গড়িয়ে পড়ছে। এই সেই জায়গা, টিলম্যান আর হোস্টন সাহেবের মাথা যেখানে এসে হেঁট হয়ে গিয়েছিল। এই সেই জায়গা, শিপটন সাহেব আর তাঁর লোকজন অনেক চেষ্টা করেও যা পার হতে পারেন নি, বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। এই সেই জায়গা, যা পার হবার জন্য আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে। শুধু চেষ্টাই নয়, যদি আমরা 'পশ্চিম কম'-এ প্রবেশ করতে চাই, যদি আমরা তার পিছনের উত্তুঙ্গ পাহাড়গুলোর দিকে এগিয়ে যেতে চাই, তাহ'লে আমাদের খাঁজটা পারও হতে হবে।'

(ক্রমশ)

মার্ক্সীয় দর্শন

ভাববাদ খণ্ডন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য-জগৎ, ২০৩।৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—আড়াই টাকা।

আলোচ্য আলোচনার নামটির সঙ্গে 'মার্ক্সীয় দর্শনের পটভূমি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ফলে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ভাববাদ ও বস্তুবাদ, এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা কি গুণগত, না পরিমাণগত? অথবা একই বিষয়ের প্রতি দুই পরস্পর বিপ্রতীপ বীক্ষণ কোণ? নাকি কোনোটাই প্রথম ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া প্রসূত? কার্ল মার্কস বলেছিলেন: 'My own dialectical method is not only fundamentally different from the Hegelian dialectical method but its direct opposite.' (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, জার্মান সংস্করণের ভূমিকা) এর কারণ ideal ও material এর সম্বন্ধ বিশ্লেষণে উভয়ের দৃষ্টি এক ছেলেমানুষী ছিলো না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক দিক থেকে ভবিষ্যতে যে দৃষ্টি দ্বারা [illegible] তার দিকে লেখক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এবং সন্দেহ নেই, বাস্তব দৃষ্টান্তে [illegible] বিবৃত করেছেন। কোনো কোনো স্থলে [illegible] ফল ভালো হয়নি। [illegible] দিয়ে যখন তিনি এর শিল্প-কল্পনার [illegible] তার মধ্যে [illegible] সেই বিশুদ্ধ ইতিহাস [illegible]। এই over-stress এর [illegible]। [illegible] দৃষ্টিকোণ অনিবার্যভাবে [illegible] বোঝা গেলেও এর প্রকৃত কোনো অর্থ নেই, কেননা দৃষ্টিকোণ আছে [illegible] সিদ্ধান্ত। কিন্তু সমালোচকের এই ছিদ্র সন্ধান লেখকের কৃতিত্ব উৎসাহ এবং প্রশংসা [illegible] কাছে পরাভূত হয়েছে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ দুরূহ শাখাকে জন-কল্যাণের অভিমুখী করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই কাজে এ-বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। (২০২।৫৬)

প্রবন্ধ-সাহিত্য

১। **ভবানী-মন্দির**—শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য চার আনা।

২। **বিবিধ রচনা**—শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য এক টাকা।

প্রথম পুস্তকটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই যুগের বিপ্লবের আহ্বান যা অগ্নিযুগ বলে পরিচিত। এই আহ্বানে মাতৃমন্দিরে সাধকের কাছে সমবেত হওয়ার আমন্ত্রণ সন্নিহিত। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভারতযাত্রী শ্রীঅরবিন্দ আত্মশক্তির অমল মহিমায় ভারতবাসীকে ডাক দিয়েছেন। পরিতৃপ্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, অতীত ভারতের দিকে তিনি যে-দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-বঙ্কিমেরও সাদৃশ্য আছে। পূর্ণতা-পথিক শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় সহজসাধ্য নয় এবং সে-কাজে আমরা অগ্রসর না হয়ে আমাদেরই একটি পূর্বোক্তি পুনর্বার উদ্ধৃত করে বলবো, তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা হয়না, অর্চনা হতে পারে। আশ্রম-প্রকাশনী 'বিবিধ রচনায় শ্রীঅরবিন্দের অনেকগুলি বাংলা রচনা সংকলিত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন বলে ধন্যবাদার্হ'। (২১।৩৬ ও ৪০।৫৬)

ধর্ম-সাহিত্য

উত্তম রহস্য—শ্রীমা। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য এক টাকা।

পূর্ণতা সাধনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই একাঙ্ক নাটক লিখিত হয়েছে। ঘটনা-প্রবাহ অপেক্ষা বর্ণনা-গুণ বেশি—এবং সাধারণ নাট্য-রীতি এর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। অধ্যাত্ম উদ্দেশ্যে বইটির পরিণাম; পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শক সেই মুক্তিবোধের সামগ্রিক বিস্তার অনুভব করবেন। সমীরকান্ত গুপ্তের অনুবাদ সুপাঠ্য। (৩১২।৫৩)

রঙ ও রূপ—শ্রীসচ্চিদানন্দ কুমার। রত্নসাগর গ্রন্থমালা থেকে প্রকাশক দেবকুমার বসু। ৫ কে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য দুই টাকা।

বর্ণ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বাংলা দেশে এমন একটি গ্রন্থের অভাব ছিল। আমরা অধিকাংশই বর্ণান্ধ—এ-বইটি যত্ন নিয়ে পাঠ করলে সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ সংশোধিত হতে পারে। বিষয়টিকে লেখক তাঁর অন্তর্লোকে লাভ করেছেন এবং আমরা যারা গ্রন্থস্বীকার না করেও বেটি সংক্ষেপে জানতে চাই তারাও এ-বই পড়লে লাভবান হতে বাধ্য। 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'কে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমরা অভিনন্দিত করছি। (৬০২।৫৫)

উপন্যাস

রাজমোহনের বৌ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ২২।৫বি শ্যামাপুকুর লেন, দেবসাহিত্য কুটীর॥ কলকাতা। দাম দু টাকা।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmohan's wife নামে ইংরেজী উপন্যাস প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিম এই উপন্যাসটির প্রথম সাত অধ্যায় নিজেই অনুবাদ করেন। শচীন চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'বারিবাহিনী'র প্রথম ন'টি অধ্যায় ঐ বইটিরই বঙ্কিমকৃত অনুবাদ। আর ইতি-পূর্বেই 'রাজমোহনের স্ত্রী' নামে পূর্ণাঙ্গ বাঙলা অনুবাদ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে বইটির সম্পাদনার কোন প্রয়োজন দেখি না। বইটি বঙ্কিমের প্রথম ও অপরিণত রচনা। সাহিত্যিক মূল্যও খুব বেশী নয়। শুধু বঙ্কিমের প্রথম রচনা বলেই সুপরিচিত। সম্পাদক কোন ভূমিকা লেখেননি, এটাও আশ্চর্য ঠেকলো। কেন, কি উদ্দেশ্যে বইটি আত্মপ্রকাশ করলো তার হদিস পাওয়া যায় না। প্রচ্ছদপটে অধিকতর শালীনতা ও রুচির পরিচয় পেলে খুশী হওয়া যেত। ১৩৫।৫৬

অনুবাদ সাহিত্য

সাকেনে বসন্ত : জর্জি গুলিয়া : অনুবাদক— সুবোধ রায় : দি বুক হাউস : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ তিন টাকা আট আনা।

উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় পরিচয় স্টালিন প্রাইজ লাভ। কাজেই বিষয়বস্তুও মোটামুটি বোঝা যায়। সেই অধিক ফসল ফলাও আর কলকারখানা বাড়ু। বলাই বাহুল্য এসব জিনিস উপন্যাসের অঙ্গীকৃত হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস যখন এ সবের অঙ্গীভূত হয় তখন কী হয় জানতে হলে এ বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে। মানুষগুলি সব বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে। যারা আছে তারাও যেন যন্ত্র। কাহিনী যদি কিছু থাকে, রিপোর্ট বলে ভুল হয়। এ যেন মানুষের গল্প নয়, প্রয়োজনের ভারবাহী মানুষের রিপোর্ট। অনুবাদও আড়ষ্ট। বিশেষ করে সংলাপ। ২১২।৫৬

স্নেহনীড় : অ্যানা পেরট বোজ : অনুবাদক— শ্রীগৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় : সর্বমঙ্গলা লাইব্রেরী : ১৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১ : আড়াই টাকা।

যুদ্ধশিবির থেকে উদ্ধার করা একটি বালকের কাহিনী—আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যুদ্ধ-শিবিরের বীভৎস পরিবেশের ভয়ঙ্কর স্মৃতি শিশু মনের ওপর কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া করে-ছিল এবং স্নেহশীলা মাতৃহৃদয়ের সাহচর্যে আর মনোব্যাধির আধুনিকতম চিকিৎসার সাহায্যে কী করে সেই শিশুমনকে সম্পূর্ণ সুস্থ আর স্বাভাবিক করে তোলা হলো তার চিত্র আছে বইটিতে। আর সবার শেষে আছে গৃহহীন পোর্টোরিয়ার ছেলের মুখে 'আমেরিকা কত বিরাট, কত নিরাপদ, কত সুন্দর' ইত্যাকার উক্তি। গোটা বইটি পড়ে শেষ করে শেষের দিকে এসে সরল পাঠক একটু অসঙ্গতিজনক দ্বিধায় দুলবেন। আমাদের দেশে বিশেষ শ্রেণীর যাজক-দের কথা স্মরণ হতে পারে।

অনুবাদ এমনিতে একরকম, তবে সংলাপাংশে নিতান্তই দুর্বল। 'তোমার কৌতুকাবহ মনে হবে' অথবা 'তুমি কৌতুক পাবে' এবম্বিধ কথা আমরা বলি কি? ৫৫।৫৬

বিবিধ

সমবায় সমিতির সংগঠন ও ব্যবস্থাপন: শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার, এম এ: সমবায় প্রকাশনী: ১৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। এক টাকা॥

লেখক কোন্নগরে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ। আলোচ্য গ্রন্থে খুব সাধারণভাবে সমবায় সংস্থা সংগঠন এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা সুন্দর-রূপে আলোচিত হয়েছে। সমবায় সংস্থার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। অথচ সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত লোকের এ বিষয়ে কোন ধারণাই নেই। সেদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি বাঙলা দেশের গ্রামবাসীর অশেষ উপকার সাধন করবে। ৪৩৩।৫৫

স্মরণীয় যাঁরা: অলককুমার ঘোষ: প্রকাশক—শ্রীঅমরনাথ ঘোষ: অনুপালয়, কোন্নগর: হুগলী: আট আনা।

ছোটদের জন্য লেখা মহাপুরুষদের জীবন-কথা। জীবনকথা বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না। কারণ জীবনের কথা এতে নিতান্ত সামান্যই আছে। দু'টি একটি ঘটনা আর কিছু নীরস [illegible]। [illegible] কৌতূহল [illegible] এই ধরনের বইতে মেটে না। বরং বিরক্তি [illegible] অপেক্ষা [illegible]। ২৭৬।৫৬

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে:

যখন নায়ক ছিলাম—[illegible] চট্টোপাধ্যায়।
পথের কথা—[illegible] রায়চৌধুরী।
বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের [illegible]—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী[illegible] দাস।
রোশন চৌকি—[illegible]।
মনোবিজ্ঞান—[illegible] মজুমদার।
আমার জীবন—শ্রীমতী রাসসুন্দরী।
পরমাণু, জগৎ—শ্রীস[illegible] চট্টোপাধ্যায়।
সাধনা—[illegible] সেন ও [illegible] বসু।
জাগ্রত ভারত—শ্রীচারুবিকাশ দত্ত।
রাজকুমারী কৃষ্ণ কমলিনী—শ্রীসু[illegible]কুমার মিত্র।
স্পার্টাকাস—হাওয়ার্ড ফাস্ট।
যাযাবরকার বিপ্লব—অনুবাদক শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাংলার ডাকাত—শ্রী[illegible]নাথ [illegible]।
বাসর কন্যা—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীগুরুগীতা—শ্রী[illegible] ভারত ব্রহ্মচারীরাজ।
বিশ্বসভ্যতার ধারা—[illegible] ঘোষাল।
বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ)—শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী।
দাও ত্রিশরণ—[illegible]মোহন বড়ুয়া।
অন্তর্গতি—[illegible] ভট্টাচার্য।
পঞ্চাশ বছর পরে—শ্রীহৃষীকেশ [illegible]।
বাঙালীর গৌরব—শ্রী[illegible]কুমার চক্রবর্তী।
ভাগবতামৃত কণা—শ্রী[illegible]নাথ চক্রবর্তী।
ফিটফোটা—শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়।
ঘুমিয়ে ছিল যে—শ্রীআলোকনাথ চক্রবর্তী।
ফুড়ুকে পাখী—আলেকজাণ্ডার ডুমা অনুবাদক শ্রী[illegible]নাথ মিত্র।
মুক্তের গল্প—শ্রী[illegible]লাল ধর।
কাব্যজগতে মাইকেল মধুসূদন ও মহেন্দ্রনাথ—শ্রীঅশ্বিভূষণ রায়।
The National Minorities in New China—S. A. Masud.
The Living Thoughts of Gotama the Buddha—Ananda K. Coomaraswamy and I. B. Horner.
The Wisdom of India—Ling Yutang.
Somadeva's Vetalapanchavimsati—C. H. Tawney.
Indian Astrology and Diseases—Parimal Purkayastha.
শুধু তো নিসর্গ নয়—শান্তিকুমার ঘোষ।
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের স্ব-নির্বাচিত গল্প (ছোটদের জন্য)।
ছোটদের কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহাগোত্তিরষ্ট—মৈত্রেয়ী দেবী।
মস্কো থেকে [illegible]—রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
আজ চোখ মেলে—সুকুমার রায়।
সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান—নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিংশতি কংগ্রেস ও স্টালিন—মণি গুহ।

জেনে রাখুন!
নারায়ন কোম্পানীর
হিন্দি চিত্র অর্ঘ্য……
রূপালী পর্দায়
শ্রেষ্ঠ সাফল্য……
মানবিক অবদানে পূর্ণ
এক নারীর গৌরবদীপ্ত জীবনগাথা
জাকজমক ও আড়ম্বর পূর্ণ দৃশ্যাবলীতে
সমৃদ্ধ
গেভাকলারে রঞ্জিত
দেবতা
আপনাদের প্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে
সুরসৃষ্টি :-
সি. রামচন্দ্র
পরিচালনা :-
পট্টান্না
জেমিনি
পরিবেশিত

বাঃ!!!

হঠাৎ কোন চমৎকার নতুনত্ব দৃষ্টিকে বিমোহিত করে তুললে উচ্ছ্বাসভরা পুলকে একটিই শব্দ উৎসারিত হয়ে পড়ে, বাঃ! একটা বিস্ময়কর অসাধারণত্বের আকস্মিক দর্শন আলোচনার ভাষাকেও যে কিভাবে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, এভারেস্ট সিনে কর্পোরেশনের "চলাচল" ছবিখানি যেন তারই একটি সাড়া-জাগানো দৃষ্টান্ত। ছবিখানি আরম্ভ মাত্রই মানুষের অবাকটাকে সেই যে ধরে নেয়, ছবি শেষে তেমনিই নির্বাক চমক নিয়ে চলে আসতে আসতে এইটেই শুধু মনের ভাঁজে ভাঁজে খেলে যেতে থাকে যে, ছবি তোলায় কখনো হাত দেয়নি যে ব্যক্তি তেমনি একজন এর পরিচালক অসিতকুমার সেন, তিনি এমন পরিণত কৃতিত্ব আয়ত্ত করলেন কোথা থেকে! প্রতি পদেই, প্রতিটি ঘটনা ও দৃশ্যের উপস্থাপন এবং রচনায়, প্রতিটি চরিত্রে এবং সমগ্রভাবে ছবিখানির অঙ্গে অঙ্গে এতো মৌলিকতা, এমন উদ্দীপনাময় একটা আনকোরা দৃষ্টিভঙ্গী একজন নতুনের মধ্যে কিসের প্রেরণায় যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে তার হদিশ খুঁজতে ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। ছিলেন তো একজন স্থির চিত্রশিল্পী মাত্র, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ঐ সূত্রেই যা সামান্য একটু যোগাযোগ। ঐ থেকে ছবির পরিচালনায় হাত দেওয়াই কারুর নজরে পড়ার মতো কিছু নয়। তাছাড়া গল্পও যা, তাও ধরে একটা জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে নেওয়া নয় আর তার লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও অতিপ্রিয় সাহিত্যিকদেরও কেউ নন। ছবির প্রযোজকও একেবারে নতুন লোক। কলাকুশলীদের মধ্যে অবশ্য কাজের লোক কেউ কেউ আছেন এবং কৃতিও, যেমন আলোকচিত্রগ্রহণে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে গৌর দাস ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি; আবার অভিনয়ে প্রধান প্রধান চরিত্রে নির্মলকুমার, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, চন্দ্রাবতী প্রমুখ এমন শিল্পিবৃন্দ রয়েছেন, যাঁদের গুণ প্রশ্নাতীত হলেও, ঝাঁকে ঝাঁকে যাঁরা দর্শক আকর্ষণ করেন তাদের দলের কেউ এঁরা নন। উপরন্তু নতুন অভিনয়-শিল্পীও দু-একজন। সংগীত একটা বড়ো আকর্ষণ হয়, কিন্তু সে-কাজেও রয়েছেন কে এক নির্মল ভট্টাচার্য! অর্থাৎ নামগুলি দেখে আগে থেকে বিশেষভাবে উৎসাহিত হবার কোন চাপ পাওয়া যায়নি। তাই ছবিখানি দেখতে দেখতে প্রতিটি ফুটের মধ্যে শিল্প ও নাট্যরস সমৃদ্ধ বিপুল অভিনবত্বের অভাবনীয় সম্ভারে বিস্ময়ে পুলকে অভিভূত মন থেকে ঐ একটি শব্দই বেরিয়ে আসে, বাঃ!

—শৌভিক—

এমন একটা অদ্ভুত শিল্পপরিণত বোধশক্তির পরিচয় ছবিখানির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত যা আমাদের দেশের চিত্রপরিচালকদের মধ্যে বিরলই শুধু নয়, "পথের পাঁচালী"র কথা বাদ দিলে তা একান্ত দুর্লভ বলেই অভিহীত করতে হয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশের ভাল ছবির স্ট্যান্ডার্ডে পরিগণিত হবার মতো অতি পরিপাটি এক কৃতিত্ব এমনি অকস্মাৎ সামনে এসে পড়েছে যে বিচারপ্রবণ মন দস্তুরমতো থতমত খেয়ে যায়। অভিনবত্ব একেবারে ছবি আরম্ভের মুখেতেই। বিরাট লম্বা এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত টানা একটা বারান্দা। একেবারে ওপ্রান্তের শেষাশেষি থেকে কজন ডাক্তার আসছেন খটখট করে। মাঝে একজন মহিলা ডাক্তার। তাঁরা যতো এগিয়ে আসতে থাকেন, আপেক্ষিক দূরত্ব অনুযায়ী তাঁদের চেহারা ও জুতোর শব্দও ততো বেড়ে বেড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকমনে একটা কৌতূহল জমাট বাঁধিয়ে দেয়। মহিলা ডাক্তার এক জায়গায় এসে এক্স-রে প্লেট দেখে দেখে রুগী পরীক্ষা করছেন। একটা টেলিফোনের খবর এলো। ডাক পড়েছে একটা বড়ো অপারেশন করবার। মহিলা গিয়ে দেখা করলেন বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে। ডাঃ চন্দ্র। মহিলা ডাঃ সরমা ব্যানার্জি। ডাঃ চন্দ্র চান যে, সরমাই অপারেশন করে। চললো তোড়জোড়। অপারেশন আরম্ভ হলো। সরমার হাত চলতে লাগলো ক্ষিপ্রগতিতে। কিন্তু সামান্যের জন্য রোগিণীর

মৃত্যু ঘটে গেল। দারুণ মুষড়ে পড়ে সরমা এসে বসলো তার ঘরে। ডাঃ চন্দ্র এসে সান্ত্বনা দিলেন, মনের বল দৃঢ় রাখতে বললেন। হঠাৎ আর্তনাদ করতে করতে এক তরুণ ঘরে ঢুকলো—কেন তার মায়ের অপারেশন এক মহিলা ডাক্তারকে দিয়ে করতে দেওয়া হয়েছে—খুনী সে ডাক্তার—সরমার দিকে আঙুল তুলে চীৎকার করে উঠলো সে—খুনী, খুনী। সংগে সংগে সরমার মাথার মধ্যে যেন কটা কথা ঝনঝন করে উঠলো—মার্ডারার, মার্ডার ইটস এ ডেলিবারেট প্রিপসটরাস মার্ডার! মর্মান্তিক আঘাতে নিজেকে সামলাতে না পেরে সরমা দাঁড়ালো জানলা ধারে। নীচের লোক চলাচলের ওপর তার দৃষ্টি। হাসপাতাল থেকে আসছে যাচ্ছে রোগীর দল। ক্লাস বসার ঘণ্টা। আর সেই শব্দ ধরে একটা বিচিত্র পরিবেশ এনে ঝট করে ফ্ল্যাস-ব্যাকে অতীতে প্রবেশ করার এমন একটা অদ্ভুত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন অভিনবত্ব এনে দেয় যা সংগে সংগেই মনের চমকটাকে প্রদীপ্ত করে তোলে—নতুনের সাড়ায় কৌতূহলকে অনায়াস উদ্‌গ্রীবতায় নির্নিমেষ করে সরমার অতীতের কাহিনী অবতারণা করে দেয়।

* * *

ডাক্তারী শিক্ষার ক্লাস। ছাত্রদের মধ্যে বাজি হলো, কে বসতে পারে সরমার পাশে; অবিনাশ রাজী। সরমা এসে বসতেই অবিনাশ গিয়ে বসলো তার পাশে। এতেই যথেষ্ট স্পষ্ট হলো সরমা এক ভারিক্কী চালের গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, আর অবিনাশ প্রাণখোলা এক দুষ্টু ছেলে। পরে দেখা গেল এরা দুজনে পরস্পরের পরিচিত। সরমা গরীবের মেয়ে, প্রতি বছর স্কলারশিপ পেয়ে পড়া চালায়। অবিনাশের অনেকটা ভ্রূক্ষেপ-হীন জীবন। ভালো ও বুদ্ধিমতী ছাত্রী বলে সরমা ডাঃ চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। সরমার সংসারে শুধু তার দাদা মণিময় আর বৌদি। মণিময়ের চাকরি করা পোষাল না, নাটক লিখতে বসলো। বন্ধু অবিনাশের তাই নিয়ে ঠাট্টা, আর বোন সরমার তার জন্যে আশংকা—দাদা চাকরি না করলে সংসারই বা চলবে কি করে, আর তার পড়াই বা কি করে চলবে। ক'দিন কলেজে কামাই দেখে ডাঃ চন্দ্র একদিন সরমাকে ডেকে বললেন, তাদের সাংসারিক অবস্থা তিনি জানেন। সরমা যদি তাঁর জানাশোনা এক বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়ানোর ভার নেয়। তাহলে তিনি সে চাকরিটা পাইয়ে দেবেন এবং সরমাকে অনুরোধ করলেন চাকরিটা নিতে। এই সূত্রে সরমা জানলো, ডাঃ চন্দ্র চাকরিটা ঠিক করেছিলেন অবিনাশের জন্যে, কিন্তু অবিনাশ তাকে চিঠিতে জানিয়েছে যে, তার চেয়ে সরমার প্রয়োজন বেশি এবং চাকরিটা যেন সরমাকেই দেওয়া হয়। ডাঃ চন্দ্রের উপরোধে সরমা চাকরিটা অবশ্য নিতে রাজি হলো, কিন্তু ফাজিল অবিনাশের এই চালটার মধ্যে একটা বিদ্রূপের আভাস যেন পেল সরমা। বাড়ি খুঁজে অবিনাশকে রোষায়িত ধন্যবাদ জানিয়ে এলো সরমা, কিন্তু বুঝতে পারলে না যে অবিনাশ রোগ-শয্যায় শায়িত। বুঝলে ক'দিন পর, আর তার জন্যে সরমার অনুশোচনার অন্ত রইল না। তার প্রায়শ্চিত্ত সে করলে দিনরাত সেবা করে অবিনাশকে সুস্থ করে তুলে। এতোদিনে ওদের দুটি হৃদয় পরস্পরের অতি সান্নিধ্যে এলো। অবিনাশ পড়া ছেড়ে কমার্শিয়াল আর্ট বেচে কোন রকমে নিজের একলার দিন চালায়। সরমা পড়ায় তার ছাত্র মণ্টুকে, কিন্তু মণ্টুর ব্যবসায়ী দাদা বিপিনের নজর পড়লো সরমার ওপর। বিপিনের মা সেটা বুঝলেন এবং একদিন একটা ছুতো ধরে সরমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। বিপিন এতদিনে বুঝেছে যে, সরমাকে না হলে তার চলেব না। কথাটা সে তুললে ডাঃ চন্দ্রের কাছে। ডাঃ চন্দ্র জানালেন সরমার কাছে এ-প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে একমাত্র অবিনাশ। সরমার দাদা মণিময়ের কাছেও বিপিন শুনলে যে, অবিনাশই পারে সরমাকে রাজি করাতে বা না করাতে। অগত্যা বিপিন অবিনাশেরই শরণাপন্ন হলো। অবিনাশ সরমাকে যে ভালোবাসতো, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সরমাকে সে পেতে চায়নি, কারণ বংশ-পরম্পরায় যক্ষ্মার বীজাণু তার রক্তে। তা সে জানতো এবং জানতো বলেই নিজেকে সরমার কাছে ধরা দিতে চায়নি। এবার সে সরমার কাছে গেল বিপিনের হয়ে প্রস্তাব জানাতে। প্রাণের প্রিয়াকে অপরের হাতে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবার জন্য সে কি আকুতি-ভরা বিষাদ। নিজের জীবনের ওপরে যার কোন আশা নেই, সে কেন সরমার আশায়-ভরা জীবনকে জীবনসাথী করে বরবাদ করে দেবে!

* * *

বিপিনের সংগেই সরমার বিয়ে হলো। অবিনাশ গেল না ওদের আশীর্বাদ করতে। বিপিন প্রথম থেকেই বুঝতে পারলে, বিয়ে সে করেছে বটে, কিন্তু সরমার মন সে পায়নি। এটা যেন যাচাই করার জন্যেই একদিন সরমাকে নিয়ে হাজির হলো অবিনাশের বাসায়। সেই থেকে সরমা প্রায়ই হাসপাতাল ফিরৎ যায় অবিনাশের সংগে দেখা করতে। সন্দেহে সন্দেহে বিপিনের মন বিষিয়ে উঠতে লাগলো। কারবারে তার মন নেই, লোকসানের পর লোকসান। সংসারে অশান্তি, কিন্তু বিপিন সরমার কাছে এসব খবর গোপন করে যায়। মণ্টুকে

বিপিন সরমার গতায়াত লক্ষ্য করার জন্যে নিয়োজিত করে রাখে; একদিন মণ্টুর কাছে তা অসহ্য হতে সরমার কাছে সেকথা সে ফাঁস করে দিলে। বিপিনের সংগে সরমার এই নিয়ে সংঘাত আরো ঘনীভূত হলো। অবিনাশের কাছে সরমার যাওয়াটা বিপিনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ব্যাপার চরমে উঠলো। এটা বুঝে অবিনাশ অজানার মধ্যে আত্মগোপন করলে, আর সেইদিনই বিপিন করলে আত্মহত্যা। সরমা ডাক্তার, তার পক্ষে গৃহে নানাবিধ রাসায়নিক এনে রাখা স্বাভাবিক, তার মধ্যে পটাসিয়াম সাইনাইডও থাকতে পারে এবং বিপিনের প্রতি সরমার যখন কোন টান ছিল না, তখন তার পক্ষে নিজের হাতে বিপিনকে ঐ বিষ তুলে দেওয়াও অসম্ভব নয়,—এই অজুহাতে খুনের দায়ে সরমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। কিন্তু মুক্তি পেলে বিপিনের মার সাক্ষীতে। তিনি বললেন, সরমা নিজের হাতে বিষ দেবার মতো মেয়ে নয়। সেই থেকে সরমা এসে আছে ডাঃ চন্দ্রের কাছে, হাসপাতালে রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। দীর্ঘদিন পার হয়ে গেল। একদিন মণ্টু খবর এনে দিলে অবিনাশ ফিরেছে, কিন্তু বড়ো অসুস্থ। ডাঃ চন্দ্র এসে জানালেন অবিনাশের অবস্থা খারাপ, তাকে এই হাসপাতালেই এনে রাখা হয়েছে। সরমার এতোদিনের প্রতীক্ষা, কিন্তু কর্তব্যের ডাকে তাকে যেতে হলো আর এক মরণাপন্নের পরিচর্যায়। ওদিকে কার খোঁজে যেন অবিনাশের দৃষ্টিটা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দপ্ করে নিভে গেল। ছুটতে ছুটতে এসে মণ্টু জানিয়ে গেল সরমাকে, অবিনাশ মারা গিয়েছে আর তার মৃত্যুর জন্য দায়ী সরমা। বাতাসে বাতাসে ঝনঝন করে উঠলো মার্ডারার, মার্ডারার। ভেঙে পড়লো সরমা। কোন রকমে দেহটাকে বয়ে নিয়ে দাঁড়ালো জানলার ধারে। নীচে রোগীদের চলাচল। পিছন থেকে পিতৃসম ডাঃ চন্দ্র এসে সরমাকে সান্ত্বনা দেন। সামনের ঐ রোগীদের প্রতি সরমার কর্তব্যের দিকে মন টেনে নিয়ে যেতে চান। গল্প ফিরে আসে অতীত থেকে বর্তমানে। মণ্টু ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছে। চিঠি শেষ হলো। আবার সেই হাসপাতালের লম্বা টানা বারান্দা। দূরে থেকে ডাক্তার সরমা সদলে এগিয়ে আসছে তার কর্তব্য সম্পাদনে।

* * *

সহজ সোজা এবং একেবারে এখনকার দিনের নতুন ধারার বাস্তব নিয়ে আদর্শবাদী গল্প। ঘটনার জংগল আর চরিত্রের দঙ্গল নিয়ে বস্তাভরা উপাদান নয়। অতি স্পষ্ট এবং পরিমিত উপাদান। এবং তাকে নতুন চোখের দৃষ্টিকোণ দিয়ে নতুন ভঙ্গীর দৃশ্যের সাহায্যে এমন আবেগনিবিড় করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শকমনকে অভিভূত করে তো তোলেই, সেই সংগে এযুগের ক'টা বাস্তব বক্তব্যের প্রভাবও মনে-মনে সঞ্চারিত করে দেয়। বক্তব্যের মধ্যে দুটি, একটি হচ্ছে মেয়েদের কাছে ছেলেদের লেখাপড়া করা ও তাদের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া নিয়ে যে শংকা ও সংস্কার রয়েছে, তাই নিয়ে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আর্ত ও রুগ্নের সেবায় ডাক্তারের কর্তব্যের প্রতি চেতনা জাগানো নিয়ে। তবে নিগূঢ় সমস্যার চেহারায় বক্তব্যের উত্থাপন করা নয়, ক'টি ট্র্যাজিক জীবনের অন্তর্গত হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সাবলীল গতিপথে কথাগুলি এসে পড়েছে। সংলাপ বড়ো বেশি নয়। যেখানে না হলে নয়, তার চেয়ে বেশি নয়। পরিচালক ছিলেন চিত্রশিল্পী, আর তাঁর সেই প্রতিভার পরিচয় কাহিনী বিন্যাসের প্রতিপদক্ষেপে ফুটিয়ে তুলেছেন দৃশ্য-সংযোজনার অভিনবত্বে। শব্দকেও যেন তিনি আলোছায়ার তরংগে দৃশ্যায়িত করে উপস্থিত করে দিয়েছেন। শব্দ এ-ছবিতে আওয়াজ নয়, এখানে তা দৃশ্যের পর্দাবিশেষ। এবং শব্দ ও আলোছায়ার প্রয়োগে এমন চমৎকার একটা পরিমিতি জ্ঞান পাওয়া যায়, যা ভারতীয় ছবিতে একান্তই দুর্লভ। গভীর অন্তস্পর্শী নাট্যসমৃদ্ধ দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে কাহিনীকে আয়াসের কোন ছাপ না ফুটিয়ে দর্শকের অন্তরঙ্গ করে তোলার যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব পাওয়া যায়, তা অতি মৌলিক কল্পনাশক্তি ও নিবিড় শিল্পনিষ্ঠ রসজ্ঞানসম্পন্ন সুপরিণত চিন্তাধারার পরিচয় দেয়। তরুণ পরিচালক অসিত সেনের এ এক বিস্ময়কর প্রতিভা এবং এইটেই তাঁর প্রথম ছবি বলে আরো বিস্ময়কর। গত বছর প্রায় এমনি দিনেই চমকপ্রদ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় "পথের পাঁচালী"তে। আজ সে প্রতিভা অভিনন্দিত হচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে। এ বছর অসিত সেনের "চলাচল"-এর মধ্যে আবার পাওয়া গেল আর একটি ঝকঝকে মৌলিক প্রতিভা। দুজনে দুদিকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভংগী নিয়ে হাজির হয়েছেন; দুজনের ধারা ভিন্ন, তা নিয়ে তুলনা চলে না। "পথের পাঁচালী"তে ছিল গ্রাম ভারতের অপরূপ জীবন-প্রকৃতি; আর "চলাচল"-এ রয়েছে নগর-ভারতের আজকের দিনের জীবনের এক বিশেষ প্রকৃতি। তবে একটা অদ্ভুত মিল কিন্তু এদের দুজনের; এদের দুজনেরই ডাকনাম মানিক।

* * *

কোন্ দৃশ্যটিইবা ঘটনার ভাবানুগ পরিকল্পনার নতুনত্বে অনবদ্য নয়! ছবিখানির বেশ কতকাংশ তোলা কুমুদশঙ্কর হাসপাতালে, তাতে বাস্তব রূপ ফুটেছে চমৎকার। বহুকাল মনে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে এমন দৃশ্য বহু। আরম্ভে সেই লম্বা টানা বারান্দা ধরে ডাক্তারদের আসা; হাসপাতালে রুগী দেখার সময় বাতি জ্বলে জ্বলে-ওঠা এক্স-রে প্লেটের সারি; অপারেশন প্রভৃতি মিলে অদ্ভুত একটা পরিবেশ মনকে আবিষ্ট করে তোলে। কোথাও অতিশয্যতা নেই, ঠিক যেটুকু দরকার, ততোটুকুই। যা সচরাচর ঘটে, অন্য কেউ হলে অমন সব সরঞ্জাম পেয়ে ঐ নিয়েই কতো কাণ্ড বাঁধিয়ে গল্প থেকে সরে যেতোই। কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে কেবল পরিবেশ সৃষ্টি ও কৌতূহলকে নিবিষ্ট করে তুলতে যতোটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশি নয়। ভোলবার নয় সে দৃশ্য, যেখানে অপারেশনে মৃতার পুত্র এসে সরমাকে মার্ডারার বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

থাকবে, সরমার সেই প্রথম অবিনাশের ত এসে চাকরি পাইয়ে দেবার মুন্টে ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া। সরমার ঠ তার দাদা-বৌদির খুনসুটি, আর য়র নাটক লেখা নিয়ে এবং মণিময়কে করার জন্য অবিনাশের কৌতুক-াস; বিপিনের আফসে তার পার্টনার মের ব্যবসা রসাতলে যাওয়ার জন্য । ও আক্ষেপ প্রকাশের মার্জিত হাল্কা ও থেকে থেকে মনে এসে যাবে। রাতে ঘরে বসে অবিনাশের চলতি অপসৃয়মান আলোর ফালিতে সরমার দিকে সেই চেয়ে থাকা! য় মনে থাকবে রোগমুক্ত হবার পর াশ ও সরমার গঙ্গার তীরে এসে দর গান শোনা, বিয়ের পর বিপিনও সরমাকে নিয়ে ঐ একই স্থানে; নমান্তরালতার মধ্যে একটা করুণ বগ এনে দেওয়া। আর সেই অবিনাশ সরমার দৃশ্য, যেখানে অবিনাশ নিজের গতা জানিয়ে সরমাকে আবেদন-াধ করে বিপিনকে বিয়ে করার জন্য—র 'দেবদাস'-এ চন্দ্রমুখীকে দেবদাসের খ্যান করার সেই দৃশ্যের পর এমন শী বিষাদঘন প্রণয় দৃশ্য আর দেখা । অবিনাশের নিজের অক্ষমতা নর সে দৃশ্যে মনের ভেতরটা দারুণ গ্রে ককিয়ে ওঠে। তারপর বিপিনের চভাবে আত্মহত্যার দৃশ্য অবিনাশের সরমার নিবিড়তার অলীক সম্পর্ক স্বপ্নে তার পরিণাম ঠিক করে বিকট চীৎকার করে ওঠা, পটাসিয়াম ইড মেশানো ওষুধ চতুরভাবে সরমার দিয়েই গ্ল্যাসে ঢালিয়ে নেওয়া, কথা বলতে সেই ওষুধ খেয়ে একটা আর্ত-নাদ তুলে লুটিয়ে পড়া; সরমার য় পড়ে বিপিন বলে তীক্ষ্ন আর্তনাদ ওঠা, কিংবা তার পরে সংক্ষিপ্ত আদা-দৃশ্য— আসামীর কাঠগড়ায় সরমা, আর র কাঠগড়ায় বিপিনের মা, ফরিয়াদী । উকিলের ক'টি কথায় জেরা আর এ ডেলিবরেট প্রিপসটরস্ মার্ডার' উক্তি; অথবা তারপরে অবিনাশের াতালে এসে ভর্তি হওয়ার খবর ও কর্তব্যের টানে সরমাকে অন্য এক র পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়া; াশের মৃত্যু, আর সেই খবর জানাবার মণ্টুর হাসপাতালের অঙ্গন, তিন-লা সিঁড়ি, লম্বা টানা বারান্দা, সারা রাস্তা ছুটে এসে সরমার সামনে না—এসব দৃশ্য সেরা পরিচালকদের স্তর সঙ্গে তুলনীয়। আর বিশেষ করে াশের মৃত্যু দৃশ্য—অবিনাশ বিছানায় তার দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে কাকে যেন ছে, মাথার ওপরে ঝুঁকে রয়েছেন ডাঃ চন্দ্র, মণ্টু, অন্যান্য ডাক্তার, নার্স। অবিনাশের দৃষ্টি পড়ছে একে একে এদের এক একজনের মুখের ওপরে। ডাঃ চন্দ্র বলছেন, অবিনাশ কিছু বলবে কি না; মণ্টু ডাকছে অবিনাশদা। অবিনাশের দৃষ্টিতে মুখ-গুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকে, ডাঃ চন্দ্র ও মণ্টুর ডাক ক্ষীণতর শোনাতে থাকে। মুখগুলো আরো ঝাপসা, আর ডাক আরও ক্ষীণ হতে হতে হঠাৎ দপ্ করে নির্বাপিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা হাহাকার যেন প্রেক্ষাগৃহে আর্তনাদ করে ওঠে। রোমে রোমে শিহরণ জাগিয়ে হৃদয়াবেগকে আকুলিবিকুলি করে তোলার এ এক অনবদ্য মৃত্যু দৃশ্য। এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা, যা দর্শকমনে দীর্ঘকাল ভর করে থাকবে, আর যার কোন তুলনা পাওয়া যায় না আজ পর্যন্ত কোন ছবিতে। খুঁটিনাটির দিকেও নিবিষ্ট নজর রেখে দেওয়া হয়েছে আগাগোড়া। কোথাও শব্দ এবং কোথাও আলোর সূত্র ধরে দৃশ্যান্তর ঘটানোর মধ্যেও বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের সুর রক্ষা করে যাওয়া হয়েছে। কোন ঘটনার যুক্তি ও কার্যকারণে কোন ছুট রাখা নেই, কোন গোঁজামিল নেই। স্পষ্ট, সহজ ও সোজাসুজি-ভাবে সব সামনে তুলে ধরা। একটু ছন্দপতন লাগে দুখানি গানের সময়, যার একখানি হচ্ছে অবিনাশ রোগমুক্ত হবার পর সরমাকে নিয়ে গঙ্গার তীরে বেড়াতে আসা। দৃশ্যটি অবশ্য চমৎকার এবং সিলহুটে হওয়ায় বেশ ভাবোদ্দীপকও হয়েছে, কিন্তু মাঝিদের গানে যে ধরনের সুর, তা গাওয়া চমৎকার, শোনায়ও খুবই ভালো কিন্তু অমন গান কলকাতার গঙ্গা-মাঝির নয় বলে বাস্তবতার তাল কেটে যায়। আর একখানি গান, বিপিনকে বিয়ে করার জন্য সরমাকে বলে অবিনাশ চলে আসার পর রেডিওর গান, এটার উপস্থাপনে একটু যেন মামুলি ধাঁচ। আর হচ্ছে মণ্টুর বয়েস। প্রথম যখন সরমা ওকে পড়াতে যায়, তখন ওর যা বয়েস, পাঁচ বছর পর অবিনাশ মারা যাবার সময়ে দেখতে ঠিক একই, চোখে লাগে। আর টিউশনির জন্যে দেড়শ টাকা মাইনে ওটাও কানে লাগে। ত্রুটি বলতে এই-ই যা, তবে ঘটনার গতিবেগে আর অভিনবত্বের চমকে এসব ত্রুটি তলিয়ে যায়। কনডেনসন ভেঙে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক অনেক ক্ষেত্রেই। সেইটেই চোখে পড়বে সকলের।

* * *

পরিচালনাকৃতিত্বকে আরো প্রতিভা-মণ্ডিত করে তোলায় সহায়ক হয়েছেন কলাকুশলী ও অভিনয়শিল্পিবৃন্দ। ক্যামেরার কাজে অজয় মিত্র ও কিয়দংশে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন। কলকাতার স্টুডিওর অপ্রতুল সরঞ্জাম সহযোগে প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি শটের প্রতিটি দৃশ্যকোণের যে পরিকল্পনার বৈচিত্র্য তারা এনে দিয়েছেন, তার তুলনা সুলভ নয়। সংলাপ ও সঙ্গীতের রেকর্ডিংয়েও যথাক্রমে গৌর দাস ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের বিকাশ পাওয়া যায়। কলাকৌশলের সামান্য একটু আধটু ভুলচুক চোখে পড়লেও উপেক্ষা করা যায়। সংগীত পরিচালনায় নির্মল ভট্টাচার্যের কাজের মধ্যেও নতুনত্বের সাড়া পাওয়া যায়, যা ছবিখানির সামগ্রিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গিয়েছে। ছবিখানিতে চরিত্র-বাহুল্য নেই, কিন্তু যে ক'টি চরিত্র তার প্রত্যেকটিই অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে দীপ্ত। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র পর অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তেমন স্মরণীয় কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু এ ছবিতে সরমার ভাবগম্ভীর এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন এক অতি কৃতি শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ অভিনয়কে পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের কৃতিত্বের পাশে ফেলা যায়। অভিব্যক্তির মধ্যে সারাক্ষণ তিনি এমন একটা রাগিনী লালিত করে গিয়েছেন যা তাঁর প্রতিটি দৃশ্যকে অনিন্দ্য নাটকীয় করে তুলেছে। অবিনাশের চরিত্রে নির্মলকুমার এতোদিনে তাঁর অভিনয় প্রতিভার প্রাণ-স্পর্শী পরিচয় দিয়েছেন; মনে গেঁথে থাকবে চরিত্রটি। তেমনি নতুন করে পাওয়া গেল বিপিনের চরিত্রে অসিতবরণকে; ওর শিল্পী জীবনের নতুনই নয়, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বও। ডাঃ চন্দের চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল এক স্নেহময়, কর্তব্যনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ চরিত্রে তাঁর কৃতিত্বেরও একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের ছোট্ট সামান্য ক্ষণের চরিত্রে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এক অতি শক্তিমান অভিনয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তি এনে দিয়েছেন। ওর সেই 'ইটস এ ডেলিবারেট প্রিপসটরাস মার্ডার' কথাটির স্বর ও বলার ভঙ্গীর জন্য এখনও মাথায় অনুরণিত হয়ে রয়েছে। মণিময়ের গম্ভীর ধরনের হাল্কা চরিত্রে খগেন রায়ের অভিনয় একটি নতুন প্রকৃতির চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। মণিময়ের স্ত্রীর ভূমিকায় তপতী ঘোষকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সরলা মিশুকে বৌদির চরিত্রে বেশ লাগবে। বিপিনের ব্যবসায়ের পার্টনার ঘনশ্যামের চরিত্রে জহর রায় ক'টা অভিব্যক্তিতেই মাৎ করে দেন। আই-এ ছাত্রের পক্ষে মণ্টুকে একটু বেশি ছেলেমানুষ লাগবে কিন্তু বয়েসের ঐ গোলমালটা বাদ দিলে মণ্টুর চরিত্রে সমরকুমারের অভিনয় বিশেষভাবে ভালো লাগবে। বিপিনের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী।

একলব্য

ইংলণ্ডের কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় লেন হাটন রাণী এলিজাবেথের জন্মদিনে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছেন। এখন থেকে হাটন স্যার লিওনার্ড হাটন নামে অভিহিত হবেন। এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধে হাটন উপর্যুপরি দুবারের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক। ১৯৫৩ সালে তাঁরই অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'রাবার' লাভ করে দীর্ঘ ২০ বছর পরে কাল্পনিক 'অ্যাসেসের' পুনরুদ্ধার করে। হাটনের অধিনায়কত্বে গতবারও ইংলণ্ড টেস্ট যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'অ্যাসেস' অধিকারে রাখে। সুতরাং ক্রিকেটের বীর যোদ্ধা হিসাবে হাটন 'স্যার' খেতাব লাভ করবেন এতে আর বিচিত্র কি? হাটন 'স্যার' খেতাব পাবেন বলে অনেকদিন আগেই কথা উঠেছিল। কিন্তু নববর্ষের উপাধিপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের নামের তালিকার মধ্যে হাটনের নাম না দেখে ইংলণ্ডের ক্রিকেটপ্রিয় জনসাধারণ দুঃখিত হন। দেরীতে হলেও এখন হাটন নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এতে ইংলণ্ডের সকলেই সুখী সন্দেহ নেই। হাটন শুধু ইংলণ্ডের রাবার বিজয়ী অধিনায়কই নন। তিনি বিশ্বের অন্যতম কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর মতে খেলোয়াড় বিশ্বে খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেনি। এখন পর্যন্ত হাটনই টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশী রান করার কৃতিত্বের অধিকারী। তাছাড়া কয়েকটি রেকর্ড এবং খেলার মাঠে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনায় তাঁর ক্রিকেট জীবন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।

রয়টারের সংবাদদাতা হাটনের 'নাইট' উপাধি লাভের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বের পঞ্চম ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে হাটন 'নাইট' উপাধি লাভ করলেন। এর আগে আর যে ৪জন ক্রিকেট খেলোয়াড় নাইট খেতাব লাভ করেছেন, তারা হচ্ছেন বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড় ডি জি ব্র্যাডম্যান, জ্যাক হবস, পেলহাম ওয়ার্নার ও স্ট্যানলী জ্যাকসন। কিন্তু ক্রিকেট খেলার জন্য এবং ক্রিকেটকে সেবা করবার জন্য আর যাঁরা নাইট উপাধি লাভ করেছেন, রয়টারের সংবাদদাতা তাঁদের নাম প্রকাশ করেননি। এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করা হল।

ক্রিকেটকে সেবা করবার জন্য সর্বপ্রথম নাইট খেতাব লাভ করেন ফ্রেডারিক টুন। ইনি ছিলেন ইয়র্কসায়ারে ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক। তাছাড়া তিনবার তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলণ্ড দলের ম্যানেজার হিসাবে নির্বাচিত হন। ফ্রেডারিক টুন নাইট খেতাব লাভ করেন ১৯৩০ সালে। ফ্রেডারিক টুনের পর নাইট খেতাব পান ফ্রান্সিস লেসি। ইনি ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর এম সি সির সম্পাদক ছিলেন। নাইট উপাধিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে লেভসন গাওয়ারের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গাওয়ার শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না, খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সদস্য এবং অন্যতম ক্রিকেট পরিচালক হিসাবে এঁর নাম সুবিদিত।

অনেকেই হয়তো জানেন না ভারতের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ও ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নাইট উপাধি লাভ করেছেন। ইনি হচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার, ক্রিকেট মহলে যিনি 'ভিজি' নামে পরিচিত। ১৯৩৬ সালে ভারতের অধিনায়করূপে 'ভিজি' ইংলণ্ড সফর করেন এবং এই বছরই নাইট খেতাবে ভূষিত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্রিকেটকে সেবা করবার জন্য এবং খেলোয়াড় হিসাবে যারা নাইট খেতাব লাভ করেছেন, তাদের সংখ্যা ৯। ফ্রেডারিক টুন, ফ্রান্সিস লেসি, পেলহাম ওয়ার্নার, লেভসন গাওয়ার, বিজয়নগরের মহারাজকুমার, ডি জি ব্র্যাডম্যান, জ্যাক হবস, স্ট্যানলী জ্যাকসন ও লেন হাটন।

রয়টারের সংবাদদাতা বলতে পারেন তাঁরা শুধু খেলোয়াড় হিসাবে যাঁরা খ্যাতি

ন করেছেন, তাদেরই নাম প্রকাশ
ছেন। কিন্তু লেডসম গাওয়ারও তো
লোয়াড় ছিলেন। বিজয়নগরের মহারাজ-
রও খেলোয়াড় হিসাবে নাইট খেতাব
করেন। বাঙলার প্রাক্তন গবর্নর
নলী জ্যাকসনের স্যার খেতাব লাভের
ণ যদি ক্রিকেটই একমাত্র কারণ হয়, তবে
য়নগরের মহারাজকুমারের খেতাব লাভের
ণই বা ক্রিকেট থাকবে না কেন?

ফুটবল লীগের পর্যালোচনা

[২৫-৭-৫৬]

লীগ প্রতিযোগিতা শেষ মুখে এসে পৌঁছেছে। গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানও উপনীত হয়েছে লীগ জয়ের মুখে। আগেই বলা হয়েছে কোন অঘটন না ঘটলে মোহনবাগানের লীগ জয় একরকম নিশ্চিত। গত সপ্তাহে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের 'চ্যারিটি' খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় এবং মোহনবাগান আর একটি খেলায় তাদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী এরিয়ানকে ৪—৩ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করায় মোহনবাগানের উপর্যুপরি তিনবার লীগ জয়ের সম্ভাবনা আরও প্রশস্থ হয়েছে। অবশ্য লীগ জয়ের ক্ষেত্রে এখনো বাধা নেই, একথা বলা যায় না। মোহনবাগানের বাকি তিনটি খেলার মধ্যে সবচেয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। এই খেলার ফলাফলের উপরও চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন কিছুটা নির্ভর করছে। অবশ্য মহমেডান দলের কাছে হার স্বীকার করলেও মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপ না পাবার কোন আশংকা নেই, যদি তারা আর কোন পয়েণ্ট নষ্ট না করে। অর্থাৎ বাকি তিনটি খেলার মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আর ৪ পয়েণ্টের প্রয়োজন। মোহনবাগানের নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দল পয়েণ্ট হারালে মোহনবাগান ক্লাব আরও কম পয়েণ্ট সংগ্রহ করেও লীগ বিজয়ী হতে পারে। মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখন সমান সংখ্যক খেলায় সমান সংখ্যক পয়েণ্ট সংগ্রহ করে লীগ কোঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের ক্ষীণ আশা এখনো দু দলের মনে দানা বেঁধে থাকলেও শেষ মুখে অগ্রগামী দল থেকে ৩ পয়েণ্ট পিছিয়ে থাকা অভীষ্ট লাভের পথে যে কত বড় অন্তরায়, ভুক্তভোগী মাত্রেরই তা জানা আছে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে 'রানার্স আপের' সম্মানের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে বলে মনে হয়। রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের এবার চতুর্থ স্থান লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা। অবশ্য এরিয়ান ক্লাবের খেলার সংখ্যা কম থাকায় তারা আছে আরও সুবিধাজনক অবস্থায়। কিন্তু এরিয়ানতো চিরদিনই শক্তিশালী ক্লাবের সঙ্গে ভাল খেলে, ছোট ক্লাবের কাছে পয়েণ্ট হারায়। সেই বিচারে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের চতুর্থ স্থান লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। দ্বিতীয়ার্ধ লীগে এক সময় রেল দল উপর্যুপরি ছয়টি খেলায় বিজয়ী হয়ে ক্রীড়ামোদীদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে।

লীগ কোঠার নীচের দিকে এবার কালীঘাট ক্লাবের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। লীগ প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন পর্যন্ত কালীঘাট একটি খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি। কুড়িটি খেলার মধ্যে ১০টি খেলায় ১০ পয়েণ্ট পেয়ে আছে লীগ কোঠায় সবার নীচে। অবশ্য স্পোর্টিং ইউনিয়নের অবস্থাও ভাল নয়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১৯টি খেলায় ১১ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে আছে কালীঘাটেরই কেবল উপরে। তবে নীচের দিকে বিশেষ লীগ শেষ হবার মুখে দলের শক্তি অনুযায়ী খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয় না। খেলার আগেই খেলার ফলাফল গড়াপেটা হয়ে যাবার অনেক খবর কানে আসে। তারপর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রধান মুরুব্বি হচ্ছেন আই এফ এর সম্পাদক শ্রী এন দত্ত রায়। তাঁর অস্তিত্ব থাকতে প্রথম ডিভিশনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকবে না, একথা কে মনে স্থান দেবে? আর একবার স্পোর্টিং ইউনিয়নের দ্বিতীয় ডিভিশনে নামবার আশংকা দেখা দিলে 'রেলিগেশনের' প্রশ্নটি ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য নীচের দিকে যে অবস্থা তাতে কালীঘাটেরই ডিভিশনচ্যুত হবার আশংকা সবচেয়ে বেশী। বি এন রেল দলের সঙ্গে এদের অসমাপ্ত খেলাটি আবার গোলের উপর বিষ ফোটের সৃষ্টি করেছে।

এক আইনঘটিত প্রশ্নে গোলের যৌক্তিকতা নিয়ে দর্শকমনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তারই পরিণতিরূপে দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটের সময় বি এন আর ও কালীঘাট ক্লাবের খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। রেল দল এই সময়ে ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। এখন খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে কি ফলাফল বহাল থাকবে, সে প্রশ্ন লীগ কমিটির হাতে।

সমস্যা দেখা দেয় রেল দলের গোল নিয়ে। গোলটি হয়েছিল প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটের সময়। রেল দলের রাইট আউট রজ্জাক একটি বল নিয়ে প্রতিপক্ষের গোলের দিকে এগুতে থাকেন, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকও বিপদ দেখে এগিয়ে আসেন, এই সময় রজ্জাক গোলে শট করলে বলটি গোলরক্ষকের গায়ে লেগে পিছনদিকে রাইট ইন বি চক্রবর্তীর আয়ত্তে আসে, কিন্তু রজ্জাক দৌড়ের ঝোঁকে গোলের নেটের মধ্যে ঢুকে যান, বি চক্রবর্তী গোল করতে

কোনই ভুলচুক করেন না। এখন কথা হচ্ছে গোলটি কি আইনসিদ্ধ না, অবসাইডদুষ্ট। রক্ষক ছিলেন নেটের মধ্যে গোল লাইনের ওপারে। আইনমত তাকে মাঠের বাইরে বলেও ধরা যায়। কিন্তু আইনের ভাষ্যকারেরা যে ভাষ্য করেছেন, তাতে খেলার সময় মাঠের লাইন ছেড়ে কোন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে গেলে তাকে মাঠের মধ্যে বলেই ধরতে হবে। কারণ রেফারীর আদেশ ছাড়া খেলার সময় কোন খেলোয়াড়ের মাঠের বাইরে যাবার অধিকার নেই। এখন দেখা যাক, গোলের নেটের মধ্যে বিপক্ষের কোন খেলোয়াড় থাকলে তাতে অবসাইড হতে পারে কিনা। যদিও অবসাইডে থাকা অপরাধ নয় এবং অবসাইডে থেকে খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলে গোলের ক্ষেত্রেও কোন বাধা নেই। কিন্তু আইনের ভাষ্যকারেরা বলেছেন, খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেও যদি প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় গোলের নেটের মধ্যে অবস্থান করেন, তবে তার উপস্থিতিই গোলরক্ষকের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সহায়ক। সুতরাং এক্ষেত্রে গোল হলে গোলটি অবসাইডের জন্য বাতিল হওয়া উচিত। এসম্বন্ধে ফুটবল আইনের ভাষ্যকারেরা প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যে সমাধান করেছেন, তা হচ্ছে—

(Q) Finding the ball behind a player of the attacking side went into the net outside the goalline and stood there behind the goal-keeper, when another player of the attacking side ran up and scored a goal. State if is there any law by which you can put the former player as offside.

It gives the following answer:

Yes; he will be penalised for offside; he is interfering with the attention of the goalie by his position.

রেফারী দিবপেন সেন বি এন আর ও কালীঘাট ক্লাবের খেলায় এই ধরনের গোল অগ্রাহ্য না করায় খেলায় এক গোলযোগের সূত্রপাত হয়, যার ফলে ২০ মিনিট আগে খেলার উপর পড়ে যবনিকা।

গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল ও লীগ টেবল।

১৬ই জুলাই

উয়াড়ী (১) — ইস্টবেঙ্গল (০)
মহঃ স্পোর্টিং (৩) — বি এন আর (১)
রেলওয়ে স্পোর্টস (২) — বালী প্রতিভা (০)

১৭ই জুলাই

মোহনবাগান (৩) — জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
এরিয়ান (০) — রাজস্থান (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) — খিদিরপুর (০)

১৮ই জুলাই

রেলওয়ে স্পোর্টস (২) — বি এন আর (০)
পুলিস (১) — কালীঘাট (১)

১৯শে জুলাই

এরিয়ান (০) — বালী প্রতিভা (০)
জর্জ টেলিগ্রাফ (১) — খিদিরপুর (০)

২০শে জুলাই

রাজস্থান (২) — স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (১) — কালীঘাট (১)
পুলিস (২) — উয়াড়ী (১)

২১শে জুলাই—চ্যারিটি ম্যাচ

মোহনবাগান (০) — ইস্টবেঙ্গল (০)

২৩শে জুলাই

মহঃ স্পোর্টিং (২) — রাজস্থান (১)
উয়াড়ী (৩) — রেলওয়ে স্পোর্টস (২)
জর্জ টেলিগ্রাফ (৩) — পুলিস (২)

২৪শে জুলাই

মোহনবাগান (৪) — এরিয়ান (০)
ইস্টবেঙ্গল (২) — স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)
বি এন আর (১) — কালীঘাট (০)

লীগ টেবল

[২৫-৭-৫৬]

মোহনবাগান	২৩	১৬	৫	২	৪৮	৯	৩৭
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১২	৮	২	৩৬	১১	৩২
ইস্টবেঙ্গল	২২	১২	৮	২	২৪	৯	৩২
রেল স্পোর্টস	২৩	১১	৬	৬	২৩	১৭	২৮
রাজস্থান	২৩	৬	১০	৭	১৯	১৪	২২
এরিয়ান	১৮	৬	৯	৩	১৬	১১	২১
বি এন আর	২১	৮	৪	৯	১৬	২২	২০
উয়াড়ী	২০	৮	৩	৯	২২	২৫	১৯
পুলিস	২২	৫	৭	১০	১৮	৩৬	১৭
বালী প্রতিভা	২১	৩	৯	৯	৮	২৫	১৫
জর্জ টেলিঃ	২০	৪	৬	৯	১২	১২	১৪
খিদিরপুর	১৯	২	১০	৭	৫	১২	১৪
স্পোর্টিং ইউ	১৯	১	৯	৯	৭	২০	১১
কালীঘাট	২০	০	১০	১০	৮	২৫	১০

[বি এন আর ও কালীঘাট ক্লাবের অসমাপ্ত খেলাটি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি]

ী সংবাদ

ই জুলাই—গতকল্য রাত্রিতে নাগা
ৌরা শিবসাগর জেলার সিমলুগুড়ি
নর নিকটবর্তী নাগিনা মোরা রেল স্টেশন
ণ করে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে
গিয়াছে।

বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক
পূজা" সম্প্রতি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত
ছ। বিশ্বকবির রচনা এই প্রথম তিব্বতী
অনূদিত হইল।

কল্য হইতে বোম্বাইয়ের জেনারেল পোস্ট
ন সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে চেকের সাহায্যে
তুলিবার প্রথা চালু হইয়াছে।

ী জুলাই—সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
সুরজিত সিং মাজিথিয়া অদ্য লোকসভায়
যে, লন্ডনে জীপ ক্রয়ের মামলায় আদালত
পরোয়ানা লইয়া তাহা বিবাদীদের উপর
করা হইয়াছে।

য় নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে
এক সপ্তাহ পূর্বে একদল চীনা সৈন্য
। ভারত-তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া
(হিমাচল প্রদেশ) নিকটে ভারতবর্ষের
। প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা তিব্বত
য় ফিরিয়া গিয়াছে।

। পাহাড়ের সীমানা সংলগ্ন আসামের
জেলাগুলিতে বিদ্রোহী নাগাদের উপদ্রব
করিবার জন্য আসাম সরকার সৈন্য
র সাহায্য লইবেন।

চমবঙ্গ সরকার কলিকাতা শহর এবং
রাণাঘাট ও চুঁচুড়া হইতে দক্ষিণে বজবজ
বেড়িয়া পর্যন্ত গঙ্গানদীর উভয়তীরস্থ
৩০টি শহর ও মিউনিসিপ্যাল এলাকায়
সম্বন্ধ পরিকল্পনায় পানীয় জল সরবরাহ
। দায়িত্ব দিয়া "মেট্রোপলিটান ওয়াটার
নামে একটিমাত্র উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা
এক প্রস্তাব করিয়াছেন।

তের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণণ
ট ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ
র্ব আফ্রিকায় ৭ সপ্তাহব্যাপী সফরান্তে
য়াদিল্লীতে পৌঁছেন।

শে জুলাই—বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ব-
য়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্যেকের জন্য
টি করিয়া টাকা বিশেষ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা
ছেন।

ারী অর্থ মন্ত্রী শ্রী বি আর ভগত
। লোকসভায় বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,
টেন এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই তিনটি
তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যে
করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে ঋণ
প্রস্তাব করিয়াছেন।

ী সীমান্ত দিয়া উদ্বাস্তু সমাগম গত
অপেক্ষা এই বৎসর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি
ছ। বর্তমানে পেট্রাপোল ও হরিদাসপুরে
ন উদ্বাস্তুর সমাবেশ হইতেছে।

দীর এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত থানার
ড়িয়া গ্রামের ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি
ন মহিলার সাত বৎসর বয়স্ক এক
র সহিত নিকাহ পড়ান হইয়াছে। উক্ত
অবৈধ বলিয়া গ্রামের মুসলমান সমাজে
সমালোচনা চলিতেছে।

২০শে জুলাই—রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ নয়াদিল্লীতে বলেন যে, বর্তমান আর্থিক বৎসরে ব্রড গেজে ২০টি এবং মিটার গেজে ২০টি অতিরিক্ত ট্রেন চলাচল করিবে। ইহা ছাড়া প্রায় ২০০ শত ট্রেনে আরও বেশী কামরা যুক্ত করা হইবে।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভার কার্য নির্ধারিত সময়ের প্রায় কুড়ি মিনিট পূর্বে মুলতুবী রাখা হয়। ঐ দিনের সভায় বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল ইত্যাদিতে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়টি লইয়া কাউন্সিলারদের মধ্যে তীব্র মতান্তরের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে সভাকক্ষে গন্ডগোল আরম্ভ হইলে মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ সভাটি মুলতুবী রাখার নির্দেশ দেন।

ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, এই বৎসরের প্রথম হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে প্রায় দুই লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছে।

২১শে জুলাই—অদ্য লোকসভায় এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রম দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীআবিদ আলী বলেন যে, সংবাদপত্রে নিযুক্ত প্রুফরিডারগণকে বার্তাজীবীদের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবাদপত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানে নিযুক্ত প্রুফরিডারগণ সম্বন্ধে ফ্যাক্টরী আইন প্রযুক্ত হইবে।

অদ্য সকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের একাধিক দলনেতা রাজ্যের পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়কে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ব্যর্থতার জন্য তীক্ষ্ণ ভাষায় পদত্যাগ করিতে বলেন।

সুদীর্ঘ ১৯ বৎসর পূর্বে নিমতলা মহাশ্মশানের যে স্থানটিতে অবিনশ্বর কীর্তি রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে রবীন্দ্র ভারতী একটি স্মারকবেদী প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আগামী ২৩শে জুলাই সোমবার হইতে কেবলমাত্র পারিবারিক রেশনকার্ড মারফৎ ন্যায্য মূল্যের দোকানে ১৷৵০ আনা সের দরে সরিষার তৈল কিনিতে পারা যাইবে। একজন কার্ডধারী সপ্তাহে এক সের করিয়া তৈল যে দোকানে কার্ড লেখান হইয়াছে, সেই দোকানে কিনিতে পারিবেন।

২২শে জুলাই—গত রাত্রে কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্গত আঞ্জার নামক শহরে ও উহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ১১৭ জন লোক হত ও ২৫০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সরকারী সংবাদে প্রকাশ। আরও ৪০০ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু চার সপ্তাহকাল ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ইয়োরোপ পরিভ্রমণের পর আজ সন্ধ্যায় জামনগরে পৌঁছিয়াছেন।

জয়পুরে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, যশল্মীর হইতে প্রায় ৯০ মাইল দূরে কুখ্যাত দস্যু বিজয় সিং ও তাহার দলের সহিত সংঘর্ষে যশল্মীর পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীজগন্নাথ শর্মা নিহত এবং একজন কনস্টেবল আহত হইয়াছে।

গতকল্য বোম্বাইয়ের শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারিগণ সান্তাক্রুজ বিমান ঘাটিতে করাচী হইতে বিমানযোগে আগত একটি যাত্রীর নিকট হইতে ১,৫০,০০০ টাকা মূল্যের ১৯১টি সোনার তাল হস্তগত করিয়াছেন।

২৩শে জুলাই—আগামী ৩০শে জুলাই হইতে রাজ্যসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রাণদণ্ডাদেশ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব এই অধিবেশনেই আলোচিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গতকল্য সোমবার কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন মনোরম অনুষ্ঠানে ভারতীয় আধ্যাত্মশক্তির অম্লান শিখা লোকমান্য তিলকের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয়।

১৬ই জুলাই—ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণণ নাইরোবীতে এক বক্তৃতায় বলেন, বিজ্ঞান যে সকল সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দিয়াছে, মানবকল্যাণে তাহা কতদূর নিয়োজিত হইতে পারে, আধুনিক যুগের সম্মুখে তাহাই এক বৃহৎ প্রশ্নরূপে দেখা দিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১২ই জুলাই—গতকল্য রাত্রিতে উত্তর ব্রহ্মে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে অন্যূন ২৯ জন নিহত ও অট্টালিকাসমূহের ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত প্রাথমিক সংবাদে জানা গিয়াছে।

১৮ই জুলাই—আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বিমানযোগে ফ্রান্স হইতে যুগোস্লাভিয়ায় পৌঁছিয়াছেন।

বর্তমানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানে সেনাবাহিনী খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে জনসাধারণ এ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত এক-চল্লিশটি ভুয়া রেশন কার্ড সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১৯শে জুলাই—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ব্রিয়নী দ্বীপে অবস্থিত মার্শাল টিটোর 'শ্বেতাবাসে' বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া যে আলোচনা করিতেছিলেন তাহা আজ শেষ হইয়াছে।

২০শে জুলাই—অদ্য নেপাল সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, নেপাল এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন পরস্পরের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ঘোষণায় চুক্তি স্বাক্ষরের দিন উল্লেখ করা হয় নাই।

অদ্য বেলগ্রেড, কায়রো ও নয়াদিল্লী হইতে যুগপৎ যে ত্রিপক্ষীয় ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দিল্লীর পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০্, ষান্মাষিক—১০্
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ

১০ ই আগষ্ট
শুভারম্ভ
উচ্চ আদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন
দেবতা
নারায়ণন্ কোম্পানীর চিত্র
শ্রেষ্ঠাংশে
অঞ্জলী দেবী · গনেশ
বিপিন গুপ্ত · আগা
কুমারী কমলা · রূপকুমার
ও
বৈজয়ন্তীমালা
সঙ্গীত · সি. রামচন্দ্র · পরিচালক · পট্টান্না
জেমিনী রিলিজ
কলিকাতার
বসুশ্রী ও বীণা
চিত্রগৃহে এবং বঙ্গ, বিহার ও
উড়িষ্যার অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে
A.K. GOPAL

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 4th AUGUST, 1956

২৩ বর্ষ ॥ ৪০ সংখ্যা ॥ ।৶০
শনিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

২২শে শ্রাবণ

২২শে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস। এই দিন আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি। আমাদের জীবনে কবির মর্ত্যলীলার অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই? কালের বিচারে তাহাই দাঁড়ায়, কিন্তু আমাদের সমগ্র অন্তর ইহা স্বীকার করিয়া লইতে চায় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের জীবন কালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সে জীবন দিব্য। মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে দেবতা আকাশে বাতাসে, যিনি ওষধি, বনস্পতিতে অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই আমাদের অন্তরে বিরাজমান আছেন। যিনি এই দেবতাকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, অনন্ত-রসসম্পর্কে তিনি উজ্জীবিত হইয়া থাকেন। পূর্ণকে লাভ করিয়া তিনি পূর্ণ, পূর্ণের দানে পূর্ণ তাঁহার গরিমা। তিনি নিত্য ও শাশ্বত ধর্মে উজ্জ্বল। ব্যাপ্তিশীল জীবনের এমন দীপ্তিময় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জীবনে আত্মসম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছে, প্রবল এবং উদ্বেল প্রাণরসের এমন উদার বৈভব তাঁহার মর্ত্যলীলায় বিচিত্রভাবে বিলসিত হইয়াছে। কবি শান্ত, শিব, সুন্দর এবং অদ্বয় যে তত্ত্ববস্তু তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেই অনুভূতির অব্যয় উৎস হইতে আনন্দধারা বিশ্ব-প্রকৃতিতে রূপে রসে স্বচ্ছন্দভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মুঠি মুঠি ছড়ান সেই রত্নমণির ঝলকে তাঁহার দিব্য জীবনের প্রভাব আমাদের দৃষ্টিতে আজও নিত্য নূতনভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিশ্বকবি তাঁহার অবদানের ভিতর দিয়া আমাদের জীবনে অপরিম্লান মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাই নাই, একান্ত সত্য ইহাই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-নাথ আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যে, তাঁহাকে হারাইলে আমাদের কোন আশ্রয়ই থাকে না। বস্তুত সে ক্ষেত্রে একান্ত অসহায়ত্বে আমাদিগকে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, এমন কি আমাদের সমাজ-জীবনের সংস্থিতি পর্যন্ত টলিয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের মর্মমূলে লীলায়িত রসময় সত্তার দ্রষ্টা এবং বর্তমান যুগের তিনি স্রষ্টা।

কবির অবদান দেশ বা কালের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে; এই হিসাবে রবীন্দ্র-নাথ আমাদের নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের, বিশ্বকবি তিনি। তথাপি তিনি একান্তভাবে আমাদের আপন, একথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবের আবির্ভাব আমাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল। আমাদের সুখ দুঃখে আমরা তাঁহাকে আপনার করিয়া পাইয়াছিলাম। আমাদের বেদনা, আমাদের লাঞ্ছনা নিবিড় নিজ সম্বন্ধ মননের উদার-বীর্য রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। আমরা যখন মহাভয়ে আর্ত হইয়াছি, রবীন্দ্র-নাথ আমাদিগকে অভয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্নোজ্জ্বল মুখের মধুর হাসি আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে। তিনি আমাদের মনে শক্তি দিয়াছেন, জীবনে দুর্গমের অভিসারে জয়যাত্রার পথে তিনি
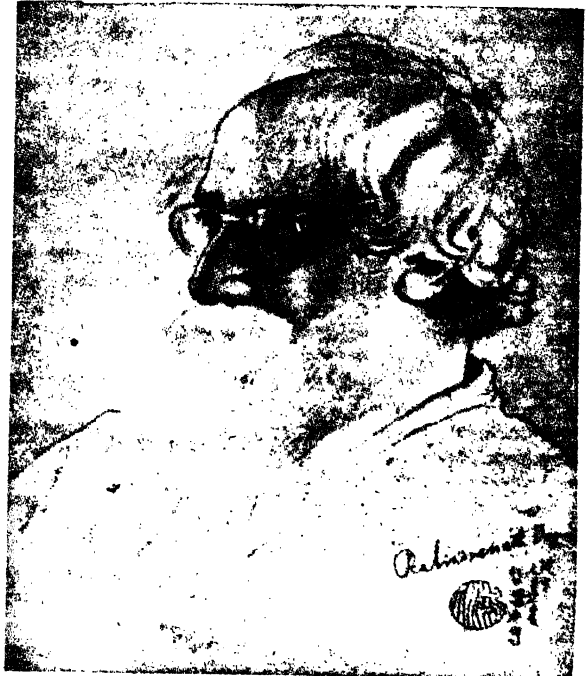
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আমাদের অন্তরের অকুতোভয় বলবিক্রমের সঞ্চার করিয়াছেন।

এতই নিবিড় যেখানে আত্মসম্বন্ধ, সেখানে ছন্দের পতন ঘটিতে পারে কি? ফলত ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-সাধনায় সকল ছন্দের তারে তারে আমাদের অন্তরকে একান্তভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন; গানে গানে আমাদের প্রাণ ভরিয়া দিয়া তিনি আমাদিগকে কোলে-বুকে টানিয়া লইয়াছেন। সেই ছন্দের সম্বন্ধ আমাদের মনের মূলে আজও রূপে, রসে খেলিতেছে। সেই গান আমাদিগের প্রাণবলকে আজও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। শ্রাবণের বারিধারার বর্ষণগীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাক্ষানুভূতি আমরা অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি। কবির গান আমাদের কানে বাজিতেছে। মেঘের উপর মেঘ জমিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়া কবির প্রীতির গভীর স্নেহ-সংস্পর্শ আমাদের স্মৃতিকে নিত্য নৈকট্যের সম্বন্ধবোধে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। কবিকে আমরা আমাদের কাছে পাইতেছি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইয়াছি, একথা কেমন করিয়া বলিব? সুতরাং 'যা ঘটে তা' সব সত্য নয়, এক্ষেত্রে বিশ্বকবির এই উক্তিকেই আমাদের মর্যাদা দিতে হয়। ফলত রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। প্রত্যুত তিনি তাঁহার মনোময় মহিমায় আমাদের অন্তরে বাহিরে, তিনি আমাদের ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের সর্বত্র জাগ্রত রহিয়াছেন।

মনীষী যোগেশচন্দ্র

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির পরলোকগমনে বর্তমান ভারতের প্রবীণতম জ্ঞানসাধকের তিরোধান ঘটিল। তাঁহার জীবন এক অসাধারণ মনীষায় উদ্ভাসিত জীবন। বিজ্ঞান দর্শন ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য বহু বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতি বিরলসংখ্যক প্রতিভাধর কৃতীদিগের জীবনে সম্ভব হইতে দেখা গিয়াছে। বাঙলা ও ইংরাজী, উভয় ভাষাতেই তিনি তাঁহার গবেষণালব্ধ তত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিশেষভাবে বাঙলা সাহিত্য তাঁহার কাছে চিরকালীন ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে এবং বাঙলার সাংস্কৃতিক গবেষণার ইতিহাসে তাঁহার কৃতিত্বের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমাদিগের পক্ষে সান্ত্বনার কথা এই যে, আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার প্রতি দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র সাড়ে তিন মাস আগে আচার্যের বাসস্থান বাঁকুড়াতে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া পণ্ডিত যোগেশচন্দ্রকে 'অনারারী ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। পুরীর পণ্ডিতসভা পূর্বেই তাঁহাকে বিদ্যানিধি উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সকল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অতিরিক্ত আর এক স্বীকৃতি আরও আগেই তাঁহার প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার মহিমাকে গৌরব দান করিয়াছিল, তাহা হইল বাঙলা ও ভারতের সাধারণ বিদ্বজ্জন সমাজের শ্রদ্ধান্বিত চিত্তের স্বীকৃতি। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া তিনি বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাঁহার দানের পরিমাণ হিসাব করা যায় না। কত শত ছাত্রের জীবনে তিনি প্রেরণার আস্পদে পরিণত হইয়াছিলেন। কত শত গবেষকের সন্ধিৎসা তিনি উৎসাহিত করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানধারণার ও বিদ্যানুশীলনের শক্তি অটুট ছিল। ইহাও এক অসাধারণ বিস্ময়ের বিষয়। বস্তুত তাঁহার সারাজীবনের বিদ্যাসাধনার আগ্রহ রীতি ও উৎসাহের মধ্যে তপস্বীসুলভ নিষ্ঠা, সংকল্প এবং শক্তির প্রকাশ লক্ষিত হইয়াছে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণায় আচার্য যোগেশচন্দ্রের প্রতিভার দান আগামীকালের বহু গবেষকের চিন্তার পাথেয় সম্পদরূপে মর্যাদা লাভ করিবে। বিশেষভাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাকে বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। বাঙলা গদ্যের গঠন এবং শব্দের সরলীকরণ সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলা ভাষার সংস্কার ও উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁহার বৈয়াকরণিক গবেষণা বাঙলার সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষে মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হইবে।

জ্ঞানসাধক যোগেশচন্দ্রের সন্ধিৎসা ও চিন্তাশীলতা জীবনের এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন মুহূর্তেও স্তিমিত হয় নাই; জীবনের শেষদিনেও নহে। অধ্যয়ন এবং গবেষণা, উভয়ই বস্তুত তাঁহার জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তপস্যার মতই অনুশীলিত হইয়াছে। শুধু বিদ্যাবত্তার এক কীর্তিকর ঐতিহ্য রাখিয়া নহে, বিদ্যানুশীলনের এক অসাধারণ আগ্রহের উদাহরণ রাখিয়া তিনি নরজীবনের বন্ধন ক্ষয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

অসোয়ান বাঁধ তৈরীর জন্য সাহায্যদানের ইংগ-মার্কিন প্রতিশ্রুতির প্রত্যাহারের উত্তরে নাসের গভর্নমেণ্ট সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীকে "ন্যাশানালাইজ" করে নিয়েছেন অর্থাৎ সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। ২৬এ জুলাই রাত্রে (গত সপ্তাহের "বৈদেশিকী"র প্রবন্ধ লেখার দুদিন পরে) প্রেসিডেণ্ট নাসের এই চমকপ্রদ সংবাদ ঘোষণা করেন এবং সেই অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে মিশর গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বোর্ড সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম ইংগ-মার্কিন সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ "প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পক্ষে একটা বড়ো রকমের ধাক্কা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিশরে আবাদি জমির ভীষণ টানাটানি, অসোয়ান বাঁধ হলে অনেক পরিমাণ নূতন জমি পাওয়া যাবে, কৃষকদের এই আশা দেওয়া হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা নেই, এটা দেখা গেলে নাসের গভর্নমেণ্ট আভ্যন্তর রাজনীতিতে একটু বে-কায়দায় পড়বেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রেস্টিজও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে।" এই ধাক্কা সামলাবার জন্য অর্থাৎ যাতে জনসাধারণের মনে হতাশার সৃষ্টি না হয় এবং তাদের কাছে সরকার খেলো প্রতিপন্ন না হন তার জন্য নাসের গভর্নমেণ্ট একটা কিছু করবেন এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে আমরা একথাও লিখেছিলাম যে, প্রেসিডেণ্ট নাসের চটে গিয়ে এমন কিছু করবেন যাতে তাঁকে "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতি বিসর্জন দিয়ে সোভিয়েট ব্লকের ভিতরে গিয়ে পড়তে হয়। এ সম্ভাবনা অল্প, কারণ প্রেসিডেণ্ট নাসের আসলে সাবধানী লোক। নাসেরের প্রতি পশ্চিমা শক্তিদের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা লিখেছিলাম, "পশ্চিমা শক্তিরা নাসেরকে একটু নোয়াতে চায়, ভাঙাতে চায় না"।

সুয়েজ খালের খবর এ কদিন যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে সাধারণ সংবাদপত্র পাঠকের কাছে উপরোক্ত বিশ্লেষণ ভ্রান্ত বলে মনে হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের গর্ব দ্বারা একটা ভীষণ আন্তর্জাতিক সংকটের সূচনা হয়েছে, এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এটা অনেকাংশে আহত ইংগ-ফরাসী স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত প্রচার এবং বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মিশরের বিরুদ্ধে সদ্য প্রযুক্ত ব্যবস্থাদির ফল। বৃটেন ও ফ্রান্সের চেঁচামিচিতে প্রেসিডেণ্ট নাসের আপাতত বোধ হয় খুশিই আছেন কারণ মিশর গভর্নমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে আঘাত করতে ভয় করেন না, এটা মিশরবাসীদের কাছে প্রতিপন্ন করাই তাঁদের এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। ২৬এ জুলাই কায়রোতে প্রেসিডেণ্ট নাসের যে বক্তৃতা করেন, তার মূল সুর ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের উপর

আক্রমণ। বাঁধ তৈরী করতে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করার সময়ে আমেরিকা ও বৃটেন একটা অর্থনৈতিক যুক্তি উল্লেখ করেছিল, কিন্তু সেটা অজুহাত মাত্র—আসল কারণ ছিল রাজনৈতিক। তেমনি সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব হস্তগত করারও একটা অর্থনৈতিক কারণ দেওয়া হয়েছে—সুয়েজ খালের আয় দিয়ে অসোয়ান বাঁধ তৈরী হবে—কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা একটা গৌণ কথা, আসলে উপস্থিত লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। সেটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই। সুয়েজ খালের আয়-ব্যয় হিসাব করে দেখার কথা মিশরে কেউ এখন ভাবছে না, ভাবতে পারে না,—সুয়েজ খালের উপর বিদেশী কর্তৃত্ব খতম হয়েছে, এই আনন্দের ঢেউয়ে সমস্ত দেশের মন দোল খাচ্ছে।

রাজনৈতিক "dividend" আদায় করার দিক থেকে সুয়েজ খাল ন্যাশনালাইজ করার যে-সুযোগ প্রেসিডেণ্ট নাসের নিয়েছেন—হয়ত বাধ্য হয়েই নিয়েছেন—এমনটি আর হ'তো না। আর তেরো বছর পরে ইজারার মেয়াদ আপনি ফুরতো এবং খালের কর্তৃত্ব সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর হাত থেকে মিশর

গভর্নমেণ্টের হাতে আসত। তার আগেও সুযোগ-বুঝে চাপ দিয়ে "নিগোশিয়েসনের" দ্বারা খালের কর্তৃত্ব আদায় করা হয়ত সম্ভব হতো। কিন্তু তাতে মন ভরত না যেমন মন ভরেছে এমনি করে কেড়ে নিয়ে, এমনি করে দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিয়ে। পরাধীনতার অপমানের পূর্ব ইতিহাস ধীরে ধীরে সরিয়ে রাখার চেয়ে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলার একটা আনন্দ আছে, যার মূল্য টাকা আনা পাইয়ের হিসাব করে স্থির করা যায় না।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নসের সত্যই কি খুব একটা বড়ো দুঃসাহসিকতার কাজ করেছেন, খুব একটা সাংঘাতিক "risk" নিয়েছেন? বৃটেন ও ফ্রান্সের কথাবার্তা শুনলে ও ধরন-ধারন দেখলে আপাততঃ তাই মনে হতে পারে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, প্রেসিডেণ্ট নসের বিশেষ বে-হিসাবী বা অসাবধানীর মতো কাজ করেন নি। প্রথমত, তিনি চটে গিয়ে এমন কিছু করেন নি, যাতে মনে হতে পারে যে, মিশর সোভিয়েট ব্লকের ভিতর গিয়ে পড়ল। এতে পশ্চিমা ব্লকের মধ্যেও অনেকে আশ্বস্ত বোধ করবে এবং সুয়েজের ব্যাপারটাকে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বিচার করবে, আহত বৃটিশ-ফরাসী স্বার্থের চিৎকারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হবে না।

আইনের দিক থেকে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীকে "nationalize" করার অধিকার মিশর গভর্নমেণ্টের আছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুয়েজ খাল মিশর রাজ্যের অন্তর্গত এবং সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীও মিশরে রেজেস্ট্রীকৃত কোম্পানী। ন্যায়ের দিক দিয়ে তো কোনো কথাই নেই। কোম্পানীর মূলধনের বহুগুণ টাকা অংশীদারগণ লভ্য হিসাবে উসুল করে নিয়েছে। যেখানে অর্থের অভাবে দরিদ্র মিশরবাসীদের বৈষয়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ রয়েছে, সেখানে সুয়েজ ক্যানালের লাভের অল্পাংশ মাত্র মিশর গভর্নমেণ্ট পাবেন এবং মোটা ভাগটা বিদেশীরা নিয়ে যাবে—এ ব্যবস্থা কোন্ ন্যায়ের বিচারে টেঁকে? বিদেশী অংশীদারগণ যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে, কেবল তারা ছাড়া আর কারো ধর্মবুদ্ধি মিশরের কাজে অন্যায় খুঁজে পাবে না।

বরঞ্চ মিশর গভর্নমেণ্ট যে-শর্ত ঘোষণা করেছেন, সেটা উদারতার (এবং প্রেসিডেণ্ট নসেরের সাবধানী মনের) পরিচায়ক। মিশর গভর্নমেণ্ট বলেছেন, nationalization-এর দিনের কোম্পানীর শেয়ারের বাজার দর যা ছিল, অংশীদারদের তাই ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে। যাকে expropriation বলে এতে তার গন্ধমাত্র নেই। খাল পরিচালনায় নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীরা যে যে বেতনে কাজ করছেন, সে-সমস্ত অটুট রাখা হবে, এ প্রতিশ্রুতিও মিশর গভর্নমেণ্ট দিয়েছেন। খালের আয় থেকে যত টাকা মিশর পাবে ভাবছে অথবা সেই টাকায় অসোয়ান বাঁধ তৈরী করা যাবে কি না, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে। মিশর গভর্নমেণ্ট দেশের লোককে বৃথা আশা দিচ্ছেন এও হতে পারে, কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তার সঙ্গে nationalization-এর বৈধতা বা ন্যায্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। যদি আয় বেশি নাও হয়, এমন কি যদি আয় কমেও যায়, তাহলেও খালের কর্তৃত্ব নেওয়ার অধিকার মিশর সরকারের আছে।

অবশ্য ক্যানাল কোম্পানীর অংশীদারদের পাওনা ও মিশর সরকারের অধিকার ছাড়াও এ ব্যাপারে আর একটা বড়ো কথা আছে। সুয়েজ খাল একটি আন্তর্জাতিক নৌ-পথ হিসাবে স্বীকৃত। শান্তির সময়ে সব দেশের জলযানের (উপযুক্ত শুল্ক দিয়ে) এই পথ ব্যবহার করার অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এই অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি মিশর গভর্নমেণ্টও দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করার নূতন কোনো কারণ নেই। হতে পারে মিশর ইজরেলি জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে যেতে দেবে না। সে রকম তো হয়েছে এবং সুয়েজ খাল কোম্পানীর আমলে এবং Canal Zone-এ বৃটিশ সামরিক ঘাটি থাকা সত্ত্বেও হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তো তা ঠেকাতে পারেন নি! ক্ষুদ্র ইজরেলের খাতিরে মিশরকে এবং অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তখন চটাতে চান নি। বৃটিশ স্বার্থের কাছে ইজরেলি স্বার্থ নগণ্য বোধ হয়েছে। অবশ্য যদি কোনো বড়ো শক্তির স্বার্থে আঘাত লাগত, তবে অন্য রকম ব্যবস্থা হতো। সে যাই হউক, মোটের উপর, ক্যানাল কোম্পানীর হাতে কর্তৃত্ব থাকার সময়ে সর্বজাতির খাল ব্যবহারের অধিকার যেরূপ রক্ষিত হতো, মিশর গভর্নমেণ্টের হাতে যাওয়াতে তার চেয়ে কম হবে এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। যুদ্ধের সময়ের কথা আলোচনা করে কোনো লাভ নেই, তখন জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতি অতীতেও অনুসৃত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। মধ্য প্রাচ্যে পশ্চিমা শক্তিদের তৈল-স্বার্থের সঙ্গে সুয়েজ খালের সম্পর্ক আছে, কিন্তু বর্তমানে সেটা "নিরাপত্তা"মূলক নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক। মিশর গভর্নমেণ্ট তৈলবাহী জাহাজের শুল্ক বাড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে তৈল-ব্যবসায়ীদের খরচ কিছু বাড়বে এবং লাভ কিছু কমবে। ইরাক, ইরান, আরবের মতো মিশরের তেলের খনি নেই। যাদের তেলের খনি নেই, তারা তাদের রাজ্যের ভিতর দিয়ে তেল চালানের সুবিধা যদি দেয় (তা সে পাইপ দিয়েই হোক বা খাল দিয়েই হোক) তবে তার জন্য কিছু আদায় করবে না? লাভের অংশ থেকে এক ফোঁটা কমার দূরতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই বে-সামাল হতে হবে? এই যে সর্বজাতির অধিকার বিপন্ন হয়েছে বলে একটা রব তোলা হয়েছে, এটা বাজে কথা। ক্যানাল কোম্পানীর অংশীদার এবং তেলের কারবারীদের স্বার্থের নগ্ন রূপটা ঢাকা দেবার জন্য এই ধোঁয়া ছাড়া হয়েছে।

যে-সব তথাকথিত "under-developed" দেশগুলি বিদেশী মূলধনের সাহায্য-প্রত্যাশী তাদের মন মিশরের প্রতি অপ্রসন্ন করার জন্য আর একটা রব তোলা হয়েছে যে, মিশর যে-কাণ্ড করল তাতে "আণ্ডার-ডেভেলপড্" দেশগুলিতে মূলধন খাটাতে পশ্চিমা শক্তির ভয় পাবে; কারণ যে-কোনো সময়ে বাজেয়াপ্তের ভয় থাকবে। এটাও একটা অত্যন্ত বাজে কথা। "আণ্ডার-ডেভেলপড্" দেশগুলিতে অধুনা যে-ধরনের শর্তে বিদেশী মূলধনের প্রয়োগ কাঙ্ক্ষিত ও স্বীকৃত হয়, তার সঙ্গে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর ৯৯-বছরী ইজারার কোনো সাদৃশ্যই নেই।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট স্ব স্ব এলাকায় ক্যানাল কোম্পানী, মিশর গভর্নমেণ্ট ও মিশরীয়দের সমস্ত টাকা আটক করেছেন এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মিশরে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করেছেন। মিশর গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধাস্ত্র পাঠানো বন্ধ করেছেন, তাতে আমরা দুঃখিত নই। কিন্তু সেটা নিজের স্বার্থে ঘা লাগাতে করেছেন, শুভবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে করেন নি। যখন ইজরেল কান্নাকাটি করেছে, "মিশরকে অস্ত্র দিও না, আর যদি দাও তবে আমাকেও সমানভাবে দাও।" তখন বৃটেন তাতে কর্ণপাত করে নি। তখন আরবদের খুশী রাখার জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইজরেলের কান্নাকাটিতে কর্ণপাত করেন নি আর এখন নিজের স্বার্থে আঘাত লাগাতেই অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেল।

তা যাক। কিন্তু মিশরের টাকা আটকানো কি সঙ্গত হয়েছে? অথবা মিশরকে আরো উত্তেজিত করার জন্য করা হয়েছে? আশা ছিল কি যে, বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট মিশরের টাকা আটকালে কায়রো সরকার হুকুম দেবেন যে, লণ্ডন বা প্যারিসের উপর চেকে কোনো জাহাজের শুল্ক নেয়া হবে না? এই রকম আদেশ দেওয়া হলে সম্ভবত অনেক জাহাজ আটকে যেতো এবং প্রচার করা হতো যে, মিশর গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বে এসে সুয়েজ খালে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট মিশরের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে মিশর সরকার যদি লণ্ডন এবং প্যারিসের উপর চেকে খালের শুল্ক নিতে অস্বীকার করতেন, তবে সেটা অন্যায় হতো না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নসের সে ফাঁদে পা দেন নি, তিনি যে চেকের টাকা আপাতত পাবেন না জানেন, সেই চেকেরও খাতির করে সুয়েজ দিয়ে জাহাজ চলাচল হতে দিচ্ছেন। তাই নসেরকে সাবধানী লোক বল্লে ভুল করা হবে না।

॥ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে অঁদ্রে জিদ্ ॥

শুভময় ঘোষ
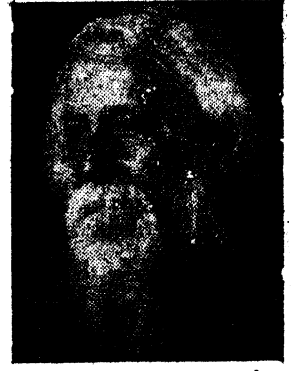
গীতাঞ্জলির ফরাসী তর্জমার নাম "লোফ্র'দ লিরীক্"। অনুবাদক স্বয়ং অঁদ্রে জিদ্। তর্জমাটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। জিদ্ তখন সাহিত্যজগতে

অঁদ্রে জিদ্

আগন্তুক না হলেও এখনকার মত সুপরিচিত নন্। তাঁর সমস্ত হৃদয় এই কাব্যের অমৃতে কিরকম অভিষিক্ত হয়েছিল তা জানা যায় তাঁর লিখিত ভূমিকা এবং উৎসর্গপত্রটি পড়লে। গীতাঞ্জলির অনু-বাদের কাজকে তিনি একটি বিশেষ ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন এবং তার কবিকে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিবেদন করেছিলেন, একথা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।

ইংরিজী গীতাঞ্জলির সঙ্গে জিদের যখন পরিচয় ঘটে, তখনও অধিকাংশ শিক্ষিত ইংরেজের কাছে এই কাব্য অপরিচিত। এই পরিচয়ের সূত্রে ছিলেন স্যাঁলেজার লেজার। তিনি ইংরিজী গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণের, সেই বড় আকারের চৌক সাদা মলাটের বইটি, জিদ্‌কে পড়তে দেন এবং শেষ পর্যন্ত অনুবাদে উৎসাহ দেবার জন্য উপহারও দেন। জিদের তর্জমা এঁকেই উৎসর্গীকৃত।

আমরা যখন মূল গীতাঞ্জলি পড়তে সক্ষম, তখন জিদের তর্জমা হয়ত না পড়লেও চলে, কিন্তু জিদের ভূমিকাটি সব রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিকদেরই পড়া কর্তব্য। গীতাঞ্জলি নিয়ে ইয়েটস্, এজরা পাউন্ড, টমসন, এর্নস্ট রীজ্ প্রভৃতি অনেক সুধী-ব্যক্তিই সুন্দর আলোচনা করেছেন। কিন্তু জিদের আলোচনায় যে সমালোচকের সহৃদয় আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, তার দাম আরও বেশি। "লোফ্র'দ্ লিরীক্" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সবুজপত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) এর ভূমিকাটি অনুবাদ করেন। তার বহু বছর পর ১৯৫৫'র চতুর্থ সংখ্যা বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টার্লিতে শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য জিদের ভূমিকার একটি ইংরিজী তর্জমা করেন। কিন্তু দুটি তর্জমাই যে পরিমাণ চর্চা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

জিদ্ তাঁর ভূমিকায় প্রথমেই বলেছেন গীতাঞ্জলি তাঁর ভাল লাগার একটি কারণ

রবীন্দ্রনাথ

হ'ল বইটি বেশ ছোট্ট। "প্রাচীন ভারতের মোটা মোটা বইগুলির পর, মাত্র ১০৩টি ছোট কবিতায় ভরা এই ছোট্ট বইটি পেয়ে বাঁচলাম। দৈর্ঘ্যের বদলে গুণ, বিপুল সংগ্রহের ভারের বদলে পরিমাণের ঘনত্ব ও গভীরতার জন্য" জিদ্ আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

"এই বইয়ের প্রশংসার কথা এখন মূলতুবী রেখে প্রথমে এর একটি বড় ত্রুটির কথা বলে নিই। বইটি মোটেই সুগ্রথিত নয়।" জিদের মতে গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত বলে ভাবের ঐক্য বজায় থাকেনি, প্রায়ই সেই সূত্র ছিন্ন হয়েছে।

এর কিছু পরে বলছেন, "এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ক্রমশ সরিয়ে ফেলে এর অন্তরের, এর অপূর্ব সুন্দর হৃদয়ের কথা বলার আগে রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনা সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা দরকার।" এর পর 'ক্রিসেণ্ট মুন' এবং 'গার্ডনার' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "গার্ডনারের কবিতাগুলি ঠিক যৌবনে না হলেও গীতাঞ্জলির অনেক আগে রচিত। এই বইয়ের সব কবিতা সমান দরের নয়; কিন্তু কিছুসংখ্যক অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কবিতার মধ্যে কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে—সে প্রেম গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ভগবৎ প্রেম নয়, মানুষের প্রেম এবং অত্যন্ত মাংসল। কিন্তু তবুও তাতে আধা-মিস্টিক সৌরভ রয়েছে, সে সৌরভ এত বিশিষ্ট এবং একক যে, একটি কবিতা কিছুতেই আপনাদের না শুনিয়ে থাকতে পারছি না—

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি,—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাংগ ঢাকিয়া।
নাই, নাই,—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?"

'গার্ডনারে'র কয়েকটি বড় কবিতা জিদের ভাল লাগেনি। তার কারণ "আবেগের সোজাসুজি প্রকাশের বদলে তাদের পৃথক করে নিয়ে যেন আলাদা মঞ্চে অভিনয় করান হয়েছে, এমনকি, নীতিউপাখ্যানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আবার সংলাপিষ্ট। গীতাঞ্জলির কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল কবিতা এদের সমগোত্র। এই কবিতাগুলি আমার বেশি উপভোগ্য মনে হয়নি। 'তখন রাত্রি আঁধার হ'ল', 'বন্দী তোরে কে বেঁধেছে' এবং আর একটি রহস্যময় কবিতা—সেই যোদ্ধা, বর্ম, তীর-ধনুক রয়েছে এর উদাহরণ।* এদের কেন যে এই গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে জানি না, বোধহয় পাতা-ভরানের জন্য। এদের বাদ দিতে আমি অন্তত এতটুকুও দুঃখ বোধ করতাম না। কিন্তু তার বদলে এই দুটি কবিতা—এদের মূলেও আছে নৈতিক উপদেশ—আমি কখনই স্বেচ্ছায় ছাড়তে পারব না—

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
  সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
  নীল আকাশের মাঝে;
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
  সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেবতা সবাই
  বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা, 'কী আনন্দ।
  একী পূর্ণ ছবি।
এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ
  গ্রহ চন্দ্র রবি।'
হেনকালে সভায় কে গো
  হঠাৎ বলি উঠে—
'জ্যোতির মালায় একটি তারা
  কোথায় গেছে টুটে।'
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
  থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
  পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে, 'সেই তারাতেই
  স্বর্গ হতো আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
  সবার চেয়ে ভালো'।
সেদিন হতে জগৎ আছে
  সেই তারাটির খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাতে
  চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, 'সকল চেয়ে
  তারেই পাওয়া চাই।'
সবাই বলে, 'সে গিয়েছে
  ভুবন কানা তাই।'
শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
  স্তব্ধ তারার দলে—
'মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে'
  নীরব হেসে বলে।

"এই কবিতার অপ্রত্যাশিত বহুঈশ্বরতা গীতাঞ্জলিতে অনন্য। এই বহুঈশ্বরতা অন্তরের সত্য নয়, এ বাইরের, কিন্তু তবুও একটু অদ্ভুত মনে হয়—অবশ্য ঋগ্বেদের এই চমৎকার মন্ত্রটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে আর বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকবে না—

'কে এদের জানে? কে এদের বিষয় বলতে পারে? কোথা থেকে এল প্রাণীসমূহ? এই সৃষ্টিই বা কী? তিনি দেবতাদের জন্মদাতা। কিন্তু তিনি,—কে জানে তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ?'

দ্বিতীয়টি হ'ল—

'ভিক্ষা করে ফিরতে ছিলেম গ্রামের পথে পথে
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে।'†

এই কবিতাটি, অপরপক্ষে আরও কয়েকটি কবিতার সঙ্গে একটি দীর্ঘধারার অন্তর্গত। এই ধারার নাম দেওয়া যেতে পারে 'ঈশ্বরে আশা', 'ঈশ্বরের প্রতীক্ষায়' বল্লে বোধ হয় আরও ভাল হয়। হাইনের নুখ্ডার লাইডার থেকে হদীমুখের ধারার কবিতাগুলি বা সিরীশ্ ইণ্টার্মেৎজো যেমন সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায়, গীতাঞ্জলি থেকে এই ধারার কবিতাগুলিও তেমনি সহজেই বেছে নেওয়া চলে।"

এই সব কবিতায় জিদের মতে চিত্রাঙ্গদা এবং ডাকঘরের অংশবিশেষ নতুন সাজে সেজেছে। ডাকঘর সম্বন্ধে জিদ্ বলেছেন, "পূর্বোক্ত ধারার কবিতাগুলি আর এই নাটকটি একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত। এই নাটকটির পরিবেশ আধুনিক। গীতাঞ্জলির—আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ—গানটি কল্পনা করতে ইচ্ছে করে এই বিচিত্র নাটকটিরই এক ধারে লেখা রয়েছে।

"এই কবিতাটি যে-ধারার অন্তর্গত তার সব কবিতায়—'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্

* প্রভু গৃহ হতে আসিলে যেদিন বীরের দল—অনুবাদক

† কৃপণ। খেয়া

নি তার পায়ের ধ্বনি', 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', 'পথ চেয়ে তো কাটল নিশি', 'দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি' প্রতীক্ষার যতরকম অবস্থা, ভাব ও অনুভূতি আছে সব প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো কবিতা এক গহনলীন সংগীতের উৎসরণে কম্পিত। এই কম্পন মনে পড়িয়ে দেয় শুমান্-এর কোনো রাগিনী বা বাখ্-এর কান্টাটা-র একই ভাবের এ্যারিআ। কখনও কখনও এই প্রতীক্ষা কামনামদির; তার পর মুহূর্তেই আবার পুরোপুরি অতীন্দ্রিয়।

"কয়েকটি কবিতায় হঠাৎ স্ত্রীবাচক সর্বনামের ব্যবহারে বোঝা যায় কবিতায় একটি মেয়ে কথা বলছে। কিন্তু সেই ধারা কখন শুরু হল, কোথায় থামল তা বোঝার উপায় নেই। কারণ ইংরিজী ভাষায়, বিশেষ করে উত্তমপুরুষে, বক্তা ছেলে কি মেয়ে একথা অনেকক্ষণ গোপন রাখা যায়। ফরাসীতে তা সম্ভব নয়। তাই অনুবাদককে মুশকিলে পড়তে হয়। কিন্তু আসল সত্য হ'ল এই গান হৃদয়ের গান, মানব আত্মা গাইছে, এর আর নারী পুরুষ কোন ভেদ নেই:

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিনী শুনবে নীরব হেসে।

আজো সময় হয়নি কি তার, কাজ কি
আছে বাকি?
ওগো ঐযে সন্ধ্যা নামে সাগর তীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন কুলায়মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে?
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে॥

এই যাত্রা আত্মার যাত্রা, কিম্বা বদ্‌ল্যারের--ওগো মৃত্যু, প্রবীণ নাবিক, সময় এসেছে। এবার নোঙর তোল! সেই যাত্রা। এই অনুভূতি অন্য কোন দিক দিয়েই বদ্‌ল্যারের মত নয়। এর থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিচিত্রতম এবং সুন্দরতম কবিতার জন্ম।

"এইবার আমরা বইটির অন্তরে এসে পৌঁছেছি। পরিপার্শ্বের কবিতাগুলো সরিয়ে রেখে, এখন কেবল এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কবিতা কয়টি এবং কয়েকটি আধ্যাত্মিক কবিতা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই।

"কিন্তু এদেরও আগে আলোর গান-গুলির কথা বলতে হবে। এই গানগুলি এত সুন্দর, কিছুতেই ভোলা যায় না। যদিও গানগুলি বইটির নানা জায়গায় ছড়ান, তবুও তাদের এক সঙ্গে গেঁথে দেওয়াই স্বাভাবিক:

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তা'রে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিলরে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে জ্বালোরে তা'রে জ্বালো।...

* কুপণ: খেয়া।

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড়নিশা নিকষ-ঘন কালো
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥

আর

আলো আমার, আলো ওগো, আলো-ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা॥
নাচে আলো নাচে ওভাই, আমার
প্রাণের কাছে;
বাজে আলো বাজে ওভাই, হৃদয়বীণার
মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস,
হাসে সকল ধরা॥

এ দুটি একটি অন্যের সংগী। যদিও আগে বলেছি এদের একসংগে রাখাই স্বাভাবিক—কিন্তু তার দরকার নেই, যা আছে এই ভাল। প্রথম গানটি ব্যথায় পূর্ণ, কিন্তু তবু তার স্থান আত্মার চঞ্চলতা যে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তাদের সংগে। সেই আত্মা সতর্ক, জাগরিত, আবেগময়। জীবনের এই পারেই সে ভগবানকে খুঁজছে আর সেই কারণেই তাঁর সংগে প্রকৃত যোগাযোগ ঘটছে না। দ্বিতীয় গানটি ভগবানের দ্বারা পূর্ণ, উন্নীত, উদ্বেল আত্মার জয়ের আনন্দগান।

"এই যে উদ্বেল আনন্দ, যা ঝর্নার মত প্রবাহিত, জলের মত উচ্ছল, দিনের আলোর মত উজ্জ্বল উত্তপ্ত, এর গোপন সত্যটি কী? এই সত্য যা আত্মাকে একই সংগে উজ্জীবিত এবং শোধিত করছে, এর স্বরূপ কী? একি ব্রাহ্মণ্য দর্শনের ফল? নাকি বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম? না, এ প্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ দর্শনের প্রেম, ঐ ধর্মের প্রেম। তাঁর উপদেশের সংকলন গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

'পশ্চিমের পণ্ডিতদের কাছে ভারতের মহান ধর্মগ্রন্থগুলি শুধু তাঁদের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের কৌতূহল মিটিয়েছে; আমাদের কাছে তাদের প্রেরণা অত্যন্ত সজীব।'

—সাধনা

"এই কাব্যের যা আমার ভাল লেগেছে, যা আমায় হাসি কান্নায় ভরে দিয়েছে, তা হ'ল এর বেদনাময় সজীবতা। এর ফলেই যে ব্রাহ্মণ্য দর্শন এতদিন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ এবং নির্বস্তুক বলে জেনে এসেছি, তা আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠেছে, পাস্কালের পিনসেতেয়ার দা জেস্যুর মত। তবে এখানে আবেগটা আনন্দের।

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিনী পূরে—
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

বিশ্বে যে প্রাণ প্রবাহিত তার চেতনা এবং তাতে অংশ গ্রহণের উপলব্ধি থেকেই এই আনন্দ স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়েছে।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্‌বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,

প্রথম দর্শনে এতে প্যানথীস্টিক আবেগের বেশি কিছু চোখে পড়ে না—যে আবেগ ফাউস্টের দ্বিতীয় কাণ্ডের গোড়ায় জাগরণের স্বগতোক্তিতে খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। ফাউস্টবর্ণিত রঙীন চিত্র আর হিন্দু দর্শনের মায়া অনেকটা এক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দ বিকীরণ করেছেন, সে আনন্দ তিনি মায়ার ঊর্ধ্বে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি যতক্ষণ রঙীন চিত্রের এই পারে, শুধু ঘটনার জগতের বিচিত্র চলচ্ছবির এই ধারেই ভগবানকে খুঁজছেন, ততক্ষণ তাঁর আত্মা তৃষিত থেকেছে ঃ

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্য মনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে।
ওগো সেই সুগন্ধ ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

"রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ব্যাখ্যা আমি কখনই করব না, যদি কোনদিন এ কাজের উপযুক্ততা অর্জন করি, তবুও না। আরও করব না এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, উপনিষদের দর্শনের তিনি কোনও বদল ঘটাননি, কোনও নতুন কিছু তিনি দেননি। সত্যি বলতে কি, উপনিষদ চির-নূতন। তাছাড়া, দর্শনের জন্যই গীতাঞ্জলি যে আমার ভাল লেগেছে তা মোটেই নয়। আমার ভাল লেগেছে এর বেদনা যা একে প্রাণ দিয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব-সুন্দর শিল্পকলা, যা একে প্রকাশ দিয়েছে।

"রবীন্দ্রনাথ একথা মানেন যে, ভগবান তাঁকে চান। তাঁকে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। ভগবানের হাতের বাঁশির উপমায় নিজের উপমা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সেই বাঁশি প্রাণ পায় যখন ভগবান, বিশ্বকবি, তাকে বাজান। ভগবানকে তিনি 'কবি' বলেছেন, 'মহাকবি' বলেছেন। তিনি নিজে এবং মানবজাতি সেই মহাকবির জীবন্ত কবিতা। তিনি বলছেন ঃ

জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি সকল ছিদ্র তার॥

"তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই, তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের অন্তরেই, ভগবান নিজেকে পান। রবীন্দ্রনাথ যে ভগবানকে জেনেছেন, এবং ভগবানও নিজেকে তাঁর মধ্যেই জেনেছেন এই চিন্তা 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর', 'হে মোর দেবতা'র মত নিটোল নিখুঁত কবিতাকে প্রাণ দিয়েছে।

"যে কবিতায় মায়া নিজের পরিচয় উদ্ঘাটন করছে, ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তার পর্দা একটু সরিয়ে ফেলে সত্যের হৃদয় প্রকাশ করছে সেই কবিতাগুলিও নিখুঁৎ সুন্দর।

"'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের সাধনার বাণী সংকলিত হয়েছে। তার একটি লেখা এই কবিতাগুচ্ছের টীকার কাজ করতে পারে। 'প্রেমে উপলব্ধি' নামের পরিচ্ছেদটির শেষে আছে ঃ

'প্রকৃতির একই সঙ্গে যে দুটি বিরোধী দিক রয়েছে—একটি বন্ধনের, আরেকটি মুক্তির, একথা জানলে বিস্মিত হতে হয়। প্রকৃতির একদিকে নিরলস পরিশ্রম, অন্যদিকে অগাধ অবসর। প্রকৃতি তার বাইরের দিকে অত্যন্ত ব্যস্ত, চঞ্চল। কিন্তু তার অন্তরে গভীর নৈঃশব্দ্য আর শান্তি।' সাধনা ১০৩ পৃঃ।

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়......

এই অদ্ভুত সুন্দর কবিতাটিতে কি সেই কথাই ফুটে ওঠেনি ?

"যে কবিতাগুচ্ছের কথা বলছি তাদের প্রত্যেকটিই এই দ্বৈতরূপে অনুপ্রাণিত। সাধনার এই রমণীয় অনুচ্ছেদে এই দ্বৈত-সত্তার কথাই স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে ঃ

'গাছের ফুলেই হল এর উদাহরণ। সে ফুল যতই সুন্দর এবং পেলব হোক, তার উপর এক মস্ত বড় কাজের ভার রয়েছে, তার রং তার রূপ সেই কাজের প্রয়োজনেই তৈরি। তাকে ফল ধরাতেই হবে, নইলে গাছের প্রাণপ্রবাহ ছিন্ন হবে, পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই ফুলের রং, গন্ধ এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করে চলেছে; মৌমাছির সংস্পর্শে যে-মুহূর্তে

সে সৃজনক্ষম হল, তার মধ্যে ফল ধরার মুহূর্ত এল, অমনি সে তার সুন্দর পত্রদল ঝরিয়ে দিল। এক নিষ্ঠুর প্রয়োজনবোধ তার সুগন্ধের অবসান ঘটাল। এখন আর তার প্রসাধনের সময় নেই, কারণ এখন সে অত্যন্ত ব্যস্ত। বাইরে দেখলে মনে হবে, প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে সবই প্রয়োজনের তাগিদে-ঘটছে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটেছে, ফুল থেকে ফল ধরছে, ফল আবার দিচ্ছে বীজ, বীজ জন্ম দিচ্ছে নতুন গাছের। এই ভাবেই কাজের ধারা অব্যাহত চলেছে। কিন্তু যখন সেই একই ফুল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন ব্যবহারিক প্রয়োজনের ব্যস্ততা আর থাকে না, সে তখন শান্তি আর অবসরের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাইরে যা নিরলস পরিশ্রমের মূর্তরূপ, অন্তরে তাই সৌন্দর্য আর শান্তির নিখুঁৎ প্রকাশ।'

সাধনা, ৯৯—১০০ পৃঃ

"শ্যাপেনহাউয়র মোটিভ্ আর কোয়া-য়েটিভ্-এর যে পার্থক্য দেখিয়েছেন সেই বিভেদের কথাই এখানে পেলাম। এই পৃথকীকরণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

"এই নিত্যদ্বৈততাকে জানার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তিনি মায়ার ঊর্ধ্বে গিয়ে মহত্তর আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। সাধনায় তিনি আবার বলেছেনঃ

'আমাদের সত্তার যে অংশ অনন্তের দিকে ধাবিত তা ধনদৌলত চায় না, চায় মুক্তি আর আনন্দ। সেখানে প্রয়োজনের বাঁধন থাকে না, সেখানে পাওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, হওয়াটাই উদ্দেশ্য। কী হওয়া? ব্রহ্মের সঙ্গে এক হওয়া। অনন্তলোক হচ্ছে ঐক্যলোক। তাই উপনিষদ বলেছেন: মানুষ ভগবানকে পেলেই সত্য হয়ে ওঠে। এখানে হওয়ার কথাই রয়েছে, আরও পাওয়ার কথা নয়। মানে জানলেই কথা বড় হয়ে ওঠে না: তা সত্য হয়ে ওঠে ভাবের সংযোগে। যদিও পশ্চিম তার গুরু বলে তাকে গ্রহণ করেছে, যিনি সাহসের সঙ্গে তাঁর পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য প্রচার করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদের ঈশ্বরের মত নির্দোষ হয়ে উঠতে উপদেশ দিয়েছেন, তবুও সে আমাদের অনন্ত সত্তায় একাত্ম হয়ে যাবার ধারণা গ্রহণ করতে পারেনি, বুঝতে পারেনি। মানুষ ভগবান হয়ে উঠতে পারে, এরকম কোনো চিন্তা পশ্চিমের চোখে পাপ, ঈশ্বরবিরুদ্ধ। এই একেবারে সম্পূর্ণ লোকোত্তরণ যীশুখৃষ্ট কখনই প্রচার করেননি, বোধ হয় খৃষ্টীয় মরমিয়াবাদেও তা নেই, কিন্তু খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত পশ্চিমে এই ধারণাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।'

সাধনা, ১৫৪ পৃঃ।

"অপরপক্ষে হিন্দুদের মধ্যে ভগবান হয়ে ওঠার ধারণা অত্যন্ত প্রবল। আমার আলোচনার প্রথমে ঋগ্বেদের একটি মোহন মন্ত্রের উল্লেখ করেছি। মন্ত্রের রচয়িতা ঋষি এই কারণেই প্রজাপতি নাম নিয়ে ভগবানের নামই গ্রহণ করেছেন, যে ভগবানকে তিনি 'প্রজাপতি' অর্থাৎ 'প্রাণী সকলের অধিপতি' বলে আরাধনা করে থাকেন। সাধনার অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

'যখন এই পূর্ণ ঐক্যের ধারণা শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে না, আমাদের সমস্ত সত্তাকে আলো করে এই চৈতন্য জেগে ওঠে, তখনই দেখা দেয় জ্যোতির্ময় আনন্দ, প্রেমের প্লাবন।'

"ব্রহ্মের মধ্যে এই পূর্ণলীন হবার কথাই গীতাঞ্জলির এই কবিতায় রয়েছে—

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
    তোমার গগন কোণে
সদাই ফিরি অকারণে,
তুমি আমার চিরদিনের
    দিনমণি গো......
ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
    সাঙ্গ করো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রি বেলা।
    অশ্রুধারে ঝরে যাব অন্ধকারে গো
    প্রভাতকালে রবে কেবল
    নির্মলতা শুভ্র শীতল,
    রেখা বিহীন মুক্ত আকাশ হাসবে চারিধার
    মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
        জ্যোতিঃসাগরপার।]

এই 'জ্যোতিসাগর' এই তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে তাঁর সব দুঃখ বেদনা উৎকণ্ঠা কামনা বিলীন হয়ে গেছে।

"গীতাঞ্জলির শেষের সবকটি গানেই রয়েছে মৃত্যুকামনা। অন্য কোনও সাহিত্যে এর চেয়ে গভীর, এর চেয়ে সুন্দর সুর শুনেছি বলে মনে পড়ে না।"

এই দীর্ঘ আলোচনার পর উৎসর্গপত্র। তার শেষে জিদ্ স্যাঁলেজার লেজার-এর উদ্দেশে বলছেন, "আপনার সৌজন্যেই আমি অনুবাদের অনুমতি পেয়েছি। অনেকদিন পর্যন্ত এর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত বলেই ধারণা ছিল। কিন্তু একদিন দেখলাম, একটি পত্রিকায় এক উৎসাহী লেখক আলোচনা প্রসঙ্গে এই বইয়ের অর্ধেক কবিতাই অনুবাদ করে ফেলেছেন।

"আপনি জানেন, তাড়াহুড়ো করে করা কাটাছাঁটা অনুবাদ আমার কী খারাপই লাগে। এও জানেন, আমি এ কাজ রবীন্দ্র-নাথের বন্ধুদের উৎসাহে নিইনি। আমি এ কাজ ছেড়েই দিয়েছিলাম আমার চেয়ে বুদ্ধিমান অনুবাদকের অপেক্ষায়। কারণ আমি জানতাম যে, আমার পক্ষে তাড়াতাড়ি এ কাজ করা অসম্ভব, আমার অনেক সময় লাগবে। আমার বিশ্বাস এর কোনো কোনো কবিতা অনুবাদ করতে আমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছি এবং সময় নিয়েছি রবীন্দ্র-নাথও তাদের রচনায় তা করেননি। একথাও স্বীকার করব, আর কোনও লেখাই আমাকে এরকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেয়নি। স্বতস্ফূর্ত রচনার চেয়ে অবশ্য সবসময়েই তার অনুবাদে অনেক বেশি ঘসা-মাজা অদলবদলের প্রয়োজন হয়। নিজের ভাবকে নিয়ে স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করা যায়, কিন্তু যাঁর সেবা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি তাঁর বেলা এই স্বাধীনতা সম্ভব নয়। আমার মনে হয়েছে আমাদের কালের কোনও চিন্তা, কোনও বাণী রবীন্দ্রনাথের বাণীর চেয়ে শ্রদ্ধেয়, ভক্তির যোগ্যই বলব, নয়। আমি নিজেকে আনন্দের সঙ্গে তাঁর কাছে বিনত করেছি, যেমন তিনি তাঁর ভগবানের কাছে গান গাইতে নিজেকে বিনত করেছেন।"*

---

* মূলবই ১০৭ পৃঃ ভূমিকা ৩৩ পৃঃ। এদিস্যঁ দ্য লা নুভেল্ রেভ্যু ফ্রঁসেজ। ১৯১৪। ৫০ কপির একটি বিশেষ সংস্করণের চতুর্থ কপি রবীন্দ্রসদনে আছে, তাতে জিদের স্বহস্তে লেখা আছে—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সশ্রদ্ধ উপহার, অঁদ্রে জিদ্'। মূল-ভূমিকাতে জিদ্ উদাহরণের জন্য প্রত্যেকটি কবিতার স্বকৃত ফরাসী তর্জমা ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব কবিতার পুরো উদ্ধৃতি রয়েছে। স্থানাভাববশতঃ এখানে আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল, কবিতাগুলির সঙ্গে বাঙালী পাঠক সুপরিচিত, তাই পুরো উদ্ধৃতির প্রয়োজনও নেই।

রবীন্দ্রপরিচয়গ্রন্থপঞ্জী

পূর্বানুবৃত্তি

১৩৬২ সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' পত্রে (২৩ বৈশাখ ১৩৬২) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থের একটি সূচী প্রকাশ করি। তদবধি এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দু-একখানি পুস্তিকা পূর্বতালিকায় অনুল্লিখিত ছিল। এই সকল পুস্তক-পুস্তিকার একটি তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

অমল হোম। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। এম্ সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড। বাইশে শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ৭৮। **মূল্য দুই টাকা।**

সূচী॥ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ; কেরানী রবীন্দ্রনাথ; সংযোজনী: জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, সংযোজনী: অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের চিঠি; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিঠি।

তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জন-পত্র ও তাহার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন বিবিধ চিঠিপত্রের সাহায্যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার একটি বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম সাংবাৎসরিক সভায় প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের বাণীও এই সূত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সংযোজনীতে ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি উদ্ধৃত আছে। চতুর্থ প্রবন্ধে, অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথকে এই পত্র উপলক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য লেখকের চেষ্টা কিভাবে নিষ্ফল হয়, তাহার বিবরণ আছে। শরৎচন্দ্রের চিঠিখানিতেও রবীন্দ্রনাথের এই পত্র আলোচিত—"দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।"

কেরানী রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র উল্লিখিত অভিভাষণের পুনর্মুদ্রণ।

অজিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। শান্তি লাইব্রেরি। আশ্বিন ১৩৬২। পৃ ১১২। মূল্য দুই টাকা।

সূচী॥ প্রথম অধ্যায়—অহং ঃ আত্মা; দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রকৃতি ঃ প্রেম; তৃতীয় অধ্যায়—প্রেম ঃ মানব; চতুর্থ অধ্যায়—মৃত্যু ঃ জীবন; পঞ্চম অধ্যায়—শিল্প ঃ ছন্দ।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। নৌকাডুবির প্লট। ডিসেম্বর ১৯৫৪। পৃ ৫।

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ প্রবাসীতে মুদ্রিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মত উদ্ধৃত হইয়াছে—"নৌকাডুবির মর্ম তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার সমালোচনা আমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করলাম।"

গুণময় মান্না। রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চৈত্র ১৩৬২। **পৃ** ২০২। **মূল্য সাড়ে চার টাকা।**

সূচী॥ অবতরণিকা: প্রথম অধ্যায় ঃ ব্যক্তিতন্ত্র; দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জাতিতন্ত্র; তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিশ্বমানবতা; চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাম্রাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র; পঞ্চম অধ্যায় ঃ ফ্যাসিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র; ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ পরিণতি।

গোপালচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস। ডি এম লাইব্রেরি। ভাদ্র ১৩৬২, **আগস্ট** ১৯৫৫। **পৃ** ১০০। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকারের নিবেদনে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে—"গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা পড়িয়া তাঁহাকে অনেক জানা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না। যিনি তাঁহার সহিত আলাপসালাপের সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ না করিয়াছেন, তাঁহার অনেকই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। তিনি যে কত কৌতুকপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন না।" এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পরিহাস কৌতুক-প্রিয়তার ৯১টি নিদর্শন সংকলিত হইয়াছে।

তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়। মডার্ন বুক এজেন্সি। ২৩ জুন ১৯৫৬। পৃ ৫৯। মূল্য দেড় **টাকা।**

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। শান্তি লাইব্রেরি, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা। শ্রাবণ ১৩৬২। **পৃ** ১০৪। **মূল্য দুই টাকা চার আনা।**

সূচী॥ প্রথম অধ্যায়—সোনার তরী ঃ জীবন-ধ্যান; দ্বিতীয় অধ্যায়—চিত্রা ঃ জীবন-দেবতা; তৃতীয় অধ্যায়—রূপলোক ও ভাবজীবন; চতুর্থ অধ্যায়—খেয়া ঃ সাধন-জীবন; পঞ্চম অধ্যায়—গীতাঞ্জলি-গীতি-মাল্য-গীতালি ঃ সহজ-জীবন।

• **প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৩। পৃ ১৫৬। মূল্য আড়াই টাকা।**

সূচী ঃ মুখবন্ধ; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা; সৌন্দর্য-দর্শনের মূল-তত্ত্ব—সৌন্দর্য-তত্ত্ব, আনন্দ-তত্ত্ব; সত্য, মঙ্গল, সাহিত্য, প্রকাশ-তত্ত্ব; মূলতত্ত্বের পরস্পর-যোগ; সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ও তাহার আধার; ভাব-বিনিময়; সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব; কবির সৌন্দর্য-দর্শন, তাঁহার জীবন ও কাব্য; পরিশিষ্ট।

বাসুদেব মাইতি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য। বাণীনিকেতন। রবীন্দ্র-জন্ম-পক্ষ, ১৩৬৩। পৃ ৮৭। **মূল্য দুই টাকা।**

সূচী॥ 'জীবন-স্মৃতি'তে কবির জীবন; 'পঞ্চভূত'এর রচনাশৈলী; 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর বৈশিষ্ট্য; রম্য-রচনা ও রবীন্দ্রনাথ; আমাদের শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ; 'চিত্রপত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-কাব্যে 'মরণ'; রেনেসাঁ ও রবীন্দ্রনাথ; ছোট গল্প।

বীরেন নাথ। রবীন্দ্র-বাণী। সমাজবাদী সাহিত্য পরিষৎ। মাঘ ১৩৬১। **পৃ ২২। মূল্য চার আনা।**

সূচী॥ রবীন্দ্রমানস; **বিশ্বভারতীর** বাণী; সাহিত্যে 'বাদ' **ও রবীন্দ্রনাথ;** আমাদের নকলনিপুণ মন; বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ; বাংলা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি-প্রধান আলোচনা।

বিজয়াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-কথা। প্রকাশক দেবকুমার বসু, ৭ জে পাণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা। ৩১ শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ৩৬। মূল্য এক টাকা।

সূচী॥ রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবন; রবীন্দ্র-কাব্যের দৃশ্যপট; জাতীয়তা ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত; রবীন্দ্রনাথের ছন্দ।

বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথ: কথা-সাহিত্য। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। বৈশাখ ১৩৬২। পৃ ২০৪। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

সূচী॥ অবতরণিকা; কাহিনী ও রচনা; 'গল্পগুচ্ছ'; 'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি; 'গোরা': 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'; 'শেষের কবিতা'; 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'; 'চার অধ্যায়'। পরিশিষ্ট॥ 'চোখের বালি', রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ সহ;· 'শেষের কবিতা' ও লাবণ্য, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী লিখিত; 'শেষের কবিতা' ও অমিত রায়।

"রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সঙ্গতি ঘটাতে পারেন নি—এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অন্যায় হয়।...সেই সঙ্গে এও দেখি যে, তাঁর কথা-সাহিত্যের একটি বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণই তার কবিত্বগুণ; 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', এসব বই বীজের মতো কাজ করেছে বাঙলা সাহিত্যে, তা থেকে অন্য বই জন্ম নিয়েছে। এই অবস্থায় কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে, কোনটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া যায় না। সেরকম বই 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', কিন্তু এই সঙ্গতি সাধনের দৃষ্টান্তরূপে যার নাম করতে হয়, সে বই 'গল্পগুচ্ছ'।

"কবিতায় তিনি যত বড়ো, ছোট গল্পে তার কাছাকাছি, কিন্তু 'গোরা' সত্ত্বেও 'যোগাযোগে'র সূচনা সত্ত্বেও উপন্যাসে তাঁর আসন ভিন্ন।...কিন্তু বাঙলা উপন্যাসের যে সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে বঙ্কিম বাস্তুদেবতা হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান স্থপতি।..." —লেখকের 'অবতরণিকা'

মনোরঞ্জন জানা। রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কাব্য)। এন জি ব্যানার্জী। প্রথম খণ্ড। পৃ ৩০১। মূল্য সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ২৯৮। মূল্য সাত টাকা।

প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ ও উৎসর্গ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতি-মাল্য, গীতালি, বলাকা, পূরবী, বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ, বিচিত্রিতা, পুনশ্চ, শেষ-সন্ধ্যা, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে, রোগশয্যায়, আরোগ্য ও শেষ লেখা কাব্যগ্রন্থ ব্যাখ্যাত। প্রথম খণ্ডে ভূমিকা, 'বেসুর হইবে সুরে'।

রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। অরবিন্দ-রবীন্দ্র। প্রবর্তক পাবলিশার্স। লক্ষ্মী-পূর্ণিমা ১৩৬২। পৃ ১২৩। মূল্য চার টাকা।

অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতের ঐক্য ও সামঞ্জস্য নির্ণয়।

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ

সাধনা কর। ৭ই পৌষের ইতিহাস প্রকাশক সুধীরচন্দ্র কর, শান্তিনিকেতন পৃ ৮। মূল্য দুই আনা।

কবিতা

অর্ঘ। রবীন্দ্র-সংসদ, উলুবেড়িয়া। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ ১৬।

হরিপদ ঘোষাল, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষাল (দুইটি), রণজিৎকুমার দাশগুপ্ত, সরোজ ঘোষাল ও কানাই ঘোষাল লিখিত কবিতার সমষ্টি।

রবীন্দ্র-বাণী-সংকলন

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। শিক্ষা। বিশ্বভারতী। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬২। পৃ ২৫। বিতরণার্থ।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশটি উক্তির সংকলন।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য। বিশ্বভারতী। [বৈশাখ ১৩৬৩]। পৃ ৩০। বিতরণার্থ

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে সাতটি গদ্য-রচনাংশ ও পাঁচটি কবিতার সংকলন।

তারাপদ চক্রবর্তী প্রকাশিত। কবির বাণী। ...পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদ। ফাল্গুন ১৩৬২। পৃ ১৩। বিতরণার্থ।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব উপলক্ষে "যে ধরনের প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠেছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত"এর সংকলন।

ভবানী লাহা অঙ্কিত ও সংকলিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকণায় অলংকৃত। শোভা। [বসুমতী সাহিত্য মন্দির]। ভূমিকার তারিখ 'বড়দিন ১৯২৬'। প্লেট ৫৯।

"বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতক-গুলি ফটো... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা-পারিজাত-মাধুরী সমাবেশে ইহা সুশোভিত করিয়াছি।" এই গ্রন্থে এই-রূপ ১১২খানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি ছাপা হইয়াছে, প্রত্যেকটির নীচে ছবির নাম বা বর্ণনাস্বরূপ কবিতার ছত্র মুদ্রিত, ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্র-রচনা হইতে গৃহীত।

"শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব......কবিতাগুলি নির্বাচিত করিয়া ছবির সহিত সুসংগত করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন।"

॥ পিকনিক ॥

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈরাগীঠাকুর একেবারে নাছোড়বান্দা। কাঁথির বন্যায় ঘরদোর ভেসে গিয়েছে, কিছু পয়সা দিতেই হবে। আহা—আগে গান হোক তবে তো পয়সা। বৈরাগী ঠাকুর গান ধরেন—

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি,—
ত্রিভুবন অতিশীতল কিরণ শুভদায়ি।
চারিদিকে তারাগণ,
উজলি গগনাঙ্গন—
ধারণ করে তোমারি,
শোভা মনোহারি।

বৈরাগীর গলাটি চমৎকার। গানের সঙ্গে তাল দিতে দিতে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে বোলপুরের দিকে। ছোট্ট একটি কামরা, যাত্রী মাত্র চারজন,—শ্রদ্ধেয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস মহাশয় চলেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সঙ্গে ফণী বাগচি ও আমি। কিছুদিন আগে একবার বিজ্ঞানাচার্যের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম; কথায় কথায় উঠেছিল শান্তিনিকেতনের কথা। আচার্যদেব বললেন 'চ' শান্তিনিকেতনে গিয়ে একদিন পিকনিক করে আসি।' তাঁরই সময়ের অভাবে এতদিন যাওয়া হয়নি, তাই আজ সেই পিকনিক করতেই আমি আর ফণীদা চলেছি বোলপুরের পথে। ১লা জুলাই অধ্যাপক বোস বিশ্বভারতীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন—তিন দিন শান্তিনিকেতনে থাকার পর আবার ৪ঠা জুলাই তাঁকে কোলকাতায় ফিরতে হবে, আমরাও সেই দিনই পিকনিক সমাপ্ত করে তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসবো। বিশ্বভারতীর কর্মপরিষদের সদস্য শ্রীপ্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত মহাশয় এই কামরার চতুর্থ যাত্রী। গল্প করতে করতে চলেছিলাম, মাঝপথে বৈরাগী ঠাকুর উঠলেন সাহায্য চাইতে। ঠাকুরের গলা জোরাল আর বেশ মিষ্টি।

"তোমার নাম কিগো ঠাকুর?"—অধ্যাপক বোস প্রশ্ন করলেন।

নাম মুরারিমোহন মিশ্র—নিবাস কুন্তী নদীর তীরে। দেশ যদিও কাঁথি মহকুমায়, ঠাকুরের বর্তমান বিচরণভূমি এই অঞ্চলেই। এখানে তিনি ভগবানের নাম সংকীর্তন করে সামান্য যা রোজগার করেন, তাতেই কায়ক্লেশে দিন চলে যায়।

"গানটির ভাষা তো চমৎকার—কার লেখা?" বিজ্ঞানাচার্যের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বৈরাগী ঠাকুর বলেন—"মিত্তির মহাশয়ের।"

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

"এরকম আর গান শোনাতে পার ঠাকুর?"

বৈরাগী জবাব না দিয়ে আবার গান ধরে—
তিনি হে সর্ব অন্তরে,
যারে তুমি ভাব দূরে—
বুদ্ধির গুহাতে স্থিতবাক্য মন অগোচরে।
আঁখি দেখে পথ চলে,
তাঁহারি দৃষ্টির বলে,
তিনি জানেন সকলে—
কেহ নাহি জানে তাঁরে।

গানের এই হোল শুরু,—অধ্যাপক বোস কামরার এক ধারে গদীতে ঠেসান দিয়ে গান উপভোগ করছেন আর সমজদার শ্রোতা পেয়ে বৈরাগী ঠাকুর পরম আনন্দে চলেছেন গেয়ে। শেষ হলে এবার প্রদ্যোৎদা প্রশ্ন করেন,—"এটা কার গান ঠাকুর?"

"রজনী সেনের"—ঠাকুর মশাই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন। "আর একটা রজনী সেনের গান শুনবেন বাবু মশায়?"

সানন্দে তার প্রস্তাব মেনে নিলেন—সময় কাটানোর জন্য এই অবস্থাতে এর চেয়ে মধুরতর পরিবেশ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। বৈরাগী ঠাকুর একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে।

—এই কি রজনী সেনের গান নাকি? এতো কবিগুরুর রচনা—এই সংগীত রচনা করেই তো তিনি মহর্ষির কাছে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বুঝলাম, ঠাকুর মশাই সব গান আর গানের লেখককে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন।

গান শেষ হলো, এবার বৈরাগীর বিদায়ের পালা। আচার্য বোস বললেন—"বোলপুর তো এখনও অনেক দূরে—আমাদের আরও কয়েকটা গান শোনাও না?"

বৈরাগী ঠাকুর এবার তাঁর দাম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। গান শোনাতে আর আপত্তির কি আছে, কিন্তু দক্ষিণা ভালরকম চাই। বিজ্ঞানাচার্যের সঙ্গীতে অতিরিক্ত আসক্তি আছে, একথা আগে শুনেছিলাম—আজ দেখলাম নিজের চোখে। প্রার্থনা পূরণে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই দেখে ঠাকুর এবার শুরু করলেন ঝুলনের গান। আগেই বলে নিলেন, যার তার লেখা গান নয়,—এ এক "বি-এ—এ-মে'র লেখা। কার লেখা জানি না, তবে গানগুলি খুবই ভালো, তাতে সন্দেহ নেই। বৈরাগী ঠাকুরের ঝুলনের গানের নমুনা হিসাবে সামান্য কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি।

আবার শ্রাবণ এলো ফিরে
তেমনি মধুর ডাকে,—
দোলনা কেন বাঁধলি নাক
এবার কদম শাখে।
সঙ্গে লয়ে গোপ গোপীরে—
ব্রজের কিশোর যাবে ফিরে;
লীলা কিশোর শ্যাম যে লীলা সাথীর
সাথে থাকে।

পর পর চলে ঠাকুরের গান। অধ্যাপক বোস তারিফ করেন আর আমাকে বলেন,

লুকুল্যো টুকে নিতে। ইতিমধ্যে প্রদ্যোৎদাও কাগজ-পেন্সিল বার করে ফেলেছেন। পিকনিক যাত্রার শুরুতেই এই ধরুর পরিবেশন, সুতরাং আশা করা যায়, শেষ অধ্যায় মধুরতর হবে। সারা পথ কতারে কেটে গেল, তা অনুভবই করতে পারলাম না।

বোলপুর স্টেশনে থামলো এসে গাড়ি, প্ল্যাটফর্ম স্টেশনে এসেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীধীরানন্দ রায়। অধ্যাপক বোসকে অভ্যর্থনা জানাতে আর এসেছিলেন বাংলার বশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণ সিংহ, তিনি বিশেষ কাজে তখন শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। বেশ বেলা হয়েছে, আর দেরি করা যায় না—তাই কোন রকমে মালপত্র গাড়িতে তুলে নিয়ে যাত্রা করলাম উপাচার্যের বাসভবনের দিকে।

উপাচার্যের বাসভবনটি চমৎকার। চারিদিকের খোলামেলার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বাড়িখানি—অফুরন্ত আলো আর বাতাসে ঝলমল করছে। দু'পাশে দু'খানি বড় ঘর আর সামনে বারান্দা, এমন পরিবেশ রচনা করেছে, যা মনের মধ্যে সহজেই হাত-পা ছড়িয়ে বাস করার চমৎকার একটি অনুভূতি এনে দেয়। পরম প্রশান্তির প্রীতিপ্রদ এই চিন্তার উপলব্ধি কোলকাতার বসে করা অসম্ভব। সামনে পেছনে ছড়িয়ে আছে অঢেল জমি—সাজানো বাগান তৈরী করতে কোনই অসুবিধা নেই। গল্প শুনেছি ঢাকায় থাকতে, অধ্যাপক বোসের বাগান তৈরী ছিল এক প্রিয় খেয়াল; প্রকৃতির সুন্দর সাজানো পরিবেশে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানী আপনমনে পরমানন্দে নিজেকে ফেলতেন হারিয়ে। বুঝলাম সুন্দর সাজানো একটি বাগানের সম্ভাবনা তাঁর মন প্রফুল্ল করে তুলেছে।

বারান্দার পিছনে মাঝের বড় ঘরটাতে আমরা গিয়ে বসলাম। বিজ্ঞানাচার্য নানা-ভাবে আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নের অবতারণা করে বিশ্বভারতীর বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিলেন। কবিগুরুর আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য, তাঁর সাধনা ও চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞানাচার্যকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন তার বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। উপাচার্য বাসভবনে প্রবেশ করেছেন মাত্র দশ মিনিট, এর মধ্যেই শুরু হলো কাজের কথা। অবিলম্বে তাঁর একটি শান্তিনিকেতনের, একটি বীরভূম জেলার মানচিত্র চাই। বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি ছোট নক্সা তাঁকে করে দিতে হবে, যাতে তিনি একনজরেই পরিবেশের একটু সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পারেন, আর চাই বিশ্বভারতীর আগামী উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ। নানাভাবে তিনি তথ্যাবলী সংগ্রহ করছিলেন—সংবাদ পরিবেশন করছিলেন শৈলেশবাবু, ধীরানন্দবাবু এবং প্রদ্যোৎদা আর নির্বাক শ্রোতারূপে পরিবেশকে বিশ্লেষণ করছিলেন মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণ সিংহ মহাশয়।

আমাদের সেদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা ডাঃ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতেই হয়েছিল। অধ্যাপক বোস সকালে বিশেষ কিছু খান না—সামান্য ফল আর মিষ্টি বাড়িতেই খেয়ে নেবেন আর আমাদের যেতে হবে পূর্ব পল্লীতে ডাঃ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে। অগত্যা স্নান করতে যাবার জন্য সভা ত্যাগ করতে হোল। ফণীদা কোলকাতা থেকে কিছু লজেন্স আর ভালো ডালমুট এনেছিলেন, উপস্থিত সকলে তারই রসাস্বাদন করতে করতে সভা ভঙ্গ করলেন।

ডাঃ সিংহ সম্বন্ধে ফণীদার মামা, সুতরাং মামার বাড়ির আদরযত্নের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হয়ে গেলাম। কোলকাতার লোক, রেশনের চাল খেতেই অভ্যস্থ। সুতরাং পরিবেশনের সময় অফুরন্ত পদের আক্রমণে আত্মরক্ষায় অনভ্যস্থ আমরা হয়ে গেলাম বিপর্যস্ত। রাত্রে রইলো আবার নিমন্ত্রণ—সেই আসরে অধ্যাপক বোস হবেন মধ্যমণি।

উপাচার্যের বাসভবনে যখন ফিরে এলাম, তখন প্রায় বেলা ৩টা। ঠিক ৪টার সময় যাবার কথা উত্তরায়ণে। সেখানে অধ্যাপক বোস বিশ্বভারতীর প্রধানদের সঙ্গে এক আলোচনাচক্রে পরিচিত হবেন।

"আমাদের যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে?" প্রশ্ন করতেই আচার্যদেব বলে উঠলেন, "চ-চ, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে নেই, তাছাড়া তোদেরও তো চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।" গেলাম—কিন্তু উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণের বিকেলের সেই অপরূপ পরিবেশকে পরিত্যাগ করে কিছুতেই ঘরের ভেতরে যেতে মন চাইল না। তাই আমি আর ফণীদা বাইরে রয়ে গেলাম আর আচার্য বোসের সঙ্গে প্রদ্যোৎদা ঢুকলেন সভাক্ষেত্রে। কথা রইলো আলোচনার শেষে চায়ের আসরে আমরা ঠিক উপস্থিত হব। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম আশ্রমের মধ্যে, কো-অপারেটিভ স্টলে গিয়ে চা খেলাম—ফণীদাকে দেখালাম আশ্রমের বিভিন্ন অঙ্গন। ফণীদা প্রায় ১৬।১৭ বছর পরে শান্তিনিকেতনে আসছেন—সেই আগে একবার এখানকার কলেজে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে ঘুরে গিয়েছিলেন। পথে বন্ধু-বান্ধবদের অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, অধ্যাপক বোস তাঁদের মধ্যে এসেছেন, তাই সকলেই আনন্দে অধীর—অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন বিজ্ঞান কলেজ পরিত্যাগ করে হয়তো তিনি শেষ পর্যন্ত আসবেন না। অধ্যাপককে নিজেদের মধ্যে

আপন করে পেয়ে সকলেই অসাধারণ খুশি—এই স্বতঃস্ফূর্ত অনাবিল পরম খুশির জোয়ারের পরিচয় কাগজে কলমে আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। উত্তরায়ণে যখন ফিরে এলাম, তখন সভা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, প্রথম পরিচয়ে অধ্যাপক বোস একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানদের সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এইবার শুরু হলো আমাদের বৈকালিক ভ্রমণ। আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে অধ্যাপক বোস সর্বপ্রথম দেখা করতে গেলেন প্রাক্তন উপাচার্য বিবিদি, অর্থাৎ শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে অনেক কথাই হলো—আমরা প্রায় নির্বাক শ্রোতা। এই আলোচনার এক প্রধান অংশ অধিকার করেছিল শ্রীধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। আচার্যদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—বাংলার এই চিন্তাশীল অধ্যাপক বর্তমানে চিকিৎসার জন্য বিদেশে আছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার অবতারণা হওয়ায় আচার্যদেবকে একটু চিন্তান্বিত মনে হলো। বিবিদি অধ্যাপক বোসকে বললেন—"বহুদিন থেকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে তোমার পরিচয়, এবার শক্ত হাতে একে টেনে নিয়ে চলো। ডাঃ বাগচীর মৃত্যুর পর যে স্তব্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাপ্তি অবিলম্বে দরকার। নেতার অভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।"

বৃষ্টি এসে গেল—অগত্যা সেদিনের আলোচনা সেখানেই হলো শেষ। বিবিদিকে প্রণাম করে আমরা গাড়িতে এসে উঠলাম। এর পরে ঢাকার সহকর্মী অধ্যাপক রাজেন্দ্রলাল দে মহাশয়ের বাড়ি যাবার ইচ্ছা অধ্যাপক বোসের ছিল, কিন্তু বৃষ্টি আর অন্ধকারের জন্য তিনি অধ্যাপক রবি রায়ের বাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরাতে আদেশ দিলেন, সেখানে মালবিকা রায়ের গান শুনবেন। বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় গানের একটি জমজমাট আসর কল্পনা করতেই আমাদের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মালবিকা রায়—অধ্যাপক রবি রায়ের কন্যা—শিল্পী হিসাবে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার অধিকারী। অধ্যাপক রায়ের বাড়িতে আমরা যখন পৌঁছলাম—মালবিকা দেবী তখন বাড়ি ছিলেন না, তাই এই দুই পূর্ব-আলাপীর মধ্যে খুব হলো গল্প। এখানেও আমি আর ফণীদা অসহায় শ্রোতা, ব্যক্তিগত বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই; আমাদের মধ্যে থেকে কেবল প্রদ্যোৎদা মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে মালবিকা দেবী এসে আচার্য বোসকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "আমরা এসেছি তোমার গান শুনতে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো গান। বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, গান সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতামত প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, লাগলো কেমন? —বলবো, "চমৎকার।" বিজ্ঞানাচার্য নিজে এককালে যন্ত্রসংগীত চর্চা করেছেন, সংগীত জগতের প্রতি অনুরাগ তাঁর গভীর, তাই পরম সমাদরের সঙ্গে কণ্ঠসংগীত উপভোগ করলেন। অধ্যাপক রায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম ডাঃ সিংহের বাড়ির দিকে—সেখানে বহুবিধ খাদ্যসম্ভারের প্রচণ্ড আক্রমণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুন্দরভাবে কাটলো পিকনিকের প্রথম দিনটি।

বড় চমৎকার জায়গা এই শান্তিনিকেতন। ফণীদা বললেন, প্রিন্সটনের সঙ্গে এই স্থানের অনেক সাদৃশ্য আছে। উঁচু-নীচু জমি, চারিদিকের ছড়ান বসতি প্রিন্সটনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানী আইন-স্টাইনের পরিণত বয়সের কর্মভূমি ছিল প্রিন্সটন—বিজ্ঞানী বোসের বর্তমান কর্মক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সম্মানের আসন আছে; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে এবং সংগীত ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় সেই গৌরবের অধিকারী, তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে পেছিয়ে থাকবে কেন? আচার্য বোসকে কেন্দ্র করেই প্রিন্সটনের মতো গড়ে উঠতে পারে নবভারতের এক বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার তো গুরুদেবের আদর্শের পরিপূরক—গুরুদেব চেয়েছিলেন পূর্ণ মানব সৃষ্টি করতে। কেবলমাত্র জ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানের সাধনায় পূর্ণতা আসে না, পূর্ণতার সৃষ্টি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে।

রাত্রে কেবল এই কথাই আমার মনে হতে লাগলো। বিশ্বভারতী এবং একসঙ্গে দেশের স্বার্থে আশ্রম থেকে বেশ কিছুদূরে এক বিজ্ঞান সাধনার পরিবেশ স্থাপন করা প্রয়োজন। সত্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের সাধনা, প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোধনরা আশ্রম-জীবনে চিরকাল সেই বিশেষ জ্ঞানের চর্চাই করতেন—সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আজকের দিনে বিজ্ঞানকে অবহেলা আমরা করতে পারি না। গুরুদেব প্রয়োগ বিজ্ঞানের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সৃষ্টি হয়েছে শ্রীনিকেতন। ভারতীয় আদর্শের

সম্পূর্ণ পরিবেশে বিজ্ঞানী কনাদ, নাগার্জুনের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা, মনে হয়, একমাত্র শান্তিনিকেতনেই সম্ভব।

পরদিন ভোরবেলা আচার্য দেবকে আমার মনের কথা বললাম। একটু হেসে তিনি বললেন,—"কোথায় করবি বিজ্ঞান ভবন?"

বললাম—"কেন? খালের ধারে তো অনেক জমি পড়ে আছে, তাছাড়া শ্রীনিকেতন আর শান্তিনিকেতনের মাঝেও তো জমির অভাব নেই। গবেষণাগার করবার জন্য প্রয়োজন জল আর বিদ্যুতের, সে অভাব তো বাঁধের জল আর বিদ্যুৎশক্তিই পূরণ করতে পারে?"

সস্নেহে আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে তিনি বললেন, "ভেবে চিন্তে যা হোক কিছু একটা স্থির করা যাবে,—বা এখন জামা-কাপড় পরে নে শ্রীনিকেতনে যাবি না?"

প্রাতরাশ শেষ করে বিজ্ঞানাচার্য আমাদের নিয়ে যাত্রা করলেন শ্রীনিকেতনের পথে। সেখানে প্রধানত আলোচনা হলো শ্রীনিকেতনের বর্তমান কর্মধারার উপর। অধ্যক্ষ শ্রীধীরানন্দ রায় উপাচার্যকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে পল্লী-উন্নয়নের কাজে সমবায় কর্মধারার মাধ্যমে শ্রীনিকেতনের কর্মিবৃন্দ বীরভূম জেলার এই অংশকে সহায়তা করেছেন। যে কয়টি অঞ্চল বর্তমানে তাঁদের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আছে, সেখানে রোগের আক্রমণ গিয়েছে কমে, শিক্ষার হয়েছে বিস্তার, আর্থিক অবস্থার ঘটেছে অনেক উন্নতি। অধ্যাপক বোস বিস্তারিতভাবে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জেনে নিলেন। এঁরা কয়েকটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। একটি অঞ্চলের কথাই বলা যাক। সেখানে ছিল প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, তাই সকলে শ্রীনিকেতনের সমবায় সমিতি সভ্য হলো। সমবায় সমিতির কর্মী ও চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েক বছরের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ গেল খুবেই কমে, কিন্তু তখন আর লোকে সমবায় সমিতির সভ্য থাকতে চায় না! রোগ যখন নেই, তখন আর মিছামিছি সভ্য থাকার কি প্রয়োজন আছে?

শ্রীনিকেতনের কর্মীরা শিক্ষার প্রসারের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। ধীরানন্দবাবু আক্ষেপ করে বললেন, সামান্য শিক্ষিত লোকেদের জন্য ভাল বই তাঁরা পান না। ফলে যাঁরা লেখাপড়া শিখছেন, তাঁরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই যাচ্ছেন তা ভুলে। এই পরিস্থিতির একটা প্রতিকার অবিলম্বে না করলে তাঁদের সব পরিশ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

২রা জুলাই বিকেল বেলা ভ্রমণকালে আচার্য বোসকে আমাদের মধ্যে পেলাম না। নতুন উপাচার্যের সংগে অনেকেই আসলেন দেখা করতে, বাড়ি একেবারে জমজমাট, তাই আমি ফণীদা আর প্রদ্যোৎদা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাত আটটার সময় যেতে হবে রতন কুটীরে, সেখানে আজ রাত্রে ইংলিশ খানার ব্যবস্থা হয়েছে। গতকাল দু'বেলার এবং আজ সকালের রাজসিক ভারতীয় খানার পরে মুরগীর রোস্ট সহযোগে সাহেবী পরিবেশন আমরা বেশ তারিফ করেই উপভোগ করলাম।

এবার পিকনিকের তৃতীয় দিন। সকালে উঠেই প্রদ্যোৎদা তাড়া দিয়েছেন, আজ উপাচার্যের কলা ভবন এবং বিনয় ভবন পরিদর্শনের কথা আছে। সকালে কয়েকজন দর্শনপ্রার্থীর সংগে সাক্ষাৎ করে আচার্য বোস আটটার আগেই বেরিয়ে পড়লেন কলা-ভবনের উদ্দেশ্যে। কর্তৃপক্ষের সকলেই অপেক্ষা করছিলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এক এক করে তাঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হল কলাভবনের সমস্ত মূল্যবান সংগ্রহ ও নমুনা। সম্প্রতি ভগবান অমিতাভের পরিনির্বাণ জয়ন্তীর মহাউৎসবের সময় কলাভবনের সংগ্রহশালা থেকে তিনটি ধাতুর বুদ্ধমূর্তির অমূল্য সংগ্রহ চুরি গেছে। এই ধরনের সংগ্রহ একবার খোয়া গেলে আবার জোগাড় করা অসম্ভব, তাই জানলায় লোহা লাগিয়ে ও অন্যান্যভাবে কলাভবনকে সুরক্ষিত করবার জন্য কর্মি-বৃন্দ অধ্যাপক বোসকে অনুরোধ জানালেন। কলাভবন থেকে গাড়ি করে সোজা বিনয় ভবন, সেখানে অতি অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তিনি এক সভায় সমস্ত কর্মীদের সংগে মিলিত হলেন। বিনয় ভবন [illegible] শিক্ষকেরা মাত্র নয়-দশ মাস শিক্ষার [illegible] শিক্ষকতায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। আচার্য বোস এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। মাত্র নয়-দশ মাসে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব, তাই তিনি বললেন, শিক্ষকতার এই শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকেরা কেবলমাত্র একটা ছাপই পাচ্ছেন, কিন্তু শিক্ষাধারার পরিবর্তন হচ্ছে না। প্রশংসাপত্র বা উপাধি পাওয়ার আগেও তাঁরা যা পড়াতেন,—পরেও পড়াচ্ছেন ঠিকই তাই। শিক্ষকতায় যদি শিক্ষা দিতেই হয়, তাহলে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চার বছরে দেওয়া উচিত। প্রবেশিকা অথবা হাইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করে ছেলেরা যাবে সোজা বি টি পড়তে; বি এ এবং তৎপরে আবার বি টি পাশ-করা কেবলমাত্র সময়ের অপব্যবহার। যাঁরা শিক্ষক হবেন, তাঁদের জন্য এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা উচিত, যাতে তাঁরা পরিপূর্ণ শিক্ষক হবার শিক্ষা পান।

দু'একজন এই শিক্ষাধারার কয়েকটি সমস্যার দিকে আচার্য দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন, প্রথম দিকে হয়তো বেশি ছাত্র পাওয়া যাবে না।

আচার্যদেব হেসে উত্তর দিলেন,—"ব্যবস্থা
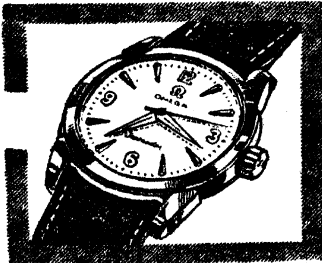
হবে অবস্থা বুঝে, দুটোই চলবে প্রথমে, তারপরে একটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে দিলেই হবে।"

বিনয় ভবনের ইতিহাসের অধ্যাপককে আচার্য বোস প্রশ্ন করলেন, "হিউয়েন সাং কতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন।"

হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্নে অবাক হয়ে অধ্যাপক উত্তর দিলেন এই তের-চৌদ্দ বছর হবে।

"তবেই?" —অধ্যাপক বোস বলেন, "হিউয়েন সাং ভারতবর্ষে তের-চৌদ্দ বছর ধরে বিনয় শিক্ষা করেছিলেন, আর আপনারা মাত্র নয়-দশ মাসে বিনয় ভবনে বিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন!"

বিনয় ভবন থেকে সোজা ফিরে এলাম উপাচার্যের বাসভবনে, আজ বিকেল বেলা বিবিদির বাড়িতে দলবলসমেত অধ্যাপক বোসের চায়ের নিমন্ত্রণ। একটা কথা,—এখানে অধ্যাপক বোসকে অনেকেই শিব-তুল্য দেবতা বলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে—তাহলে আমরা কি? দেবাদিদেবের অনুচরদের সংগে আমাদের কোন সাদৃশ্য তারা খুঁজে পেয়েই আচার্যদেবের প্রতি ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বিবিদির বাড়ির চায়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন সংগীত ভবনের শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। নানা কথার ফাঁকে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানাচার্যকে নানারকম আলোচনামূলক চক্রের মাধ্যমে কিভাবে এখানে ইতিহাস পাঠ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয় তা উল্লেখ করলেন।

আচার্যদেব সংগে সংগে প্রশ্ন করলেন—"ঐ আলোচনা চক্র কোন ভাষায় হয়?"

"ইংরেজিতে।"—ডক্টর চট্টোপাধ্যায় উত্তর দেন।

"বাঙলায় পড়ান চলে না?"

আচার্য বোসের প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় জানান যে, ইতিহাসেও অনেক বিশেষ অর্থ-প্রকাশক টেক্‌নিক্যাল শব্দ আছে যা বাঙলায় প্রকাশ করা শক্ত। সেগুলির প্রকাশের অসুবিধার জন্যই ইংরেজিতে আলোচনা হয়।

আচার্যদেব এইবার তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেন, তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার মাধ্যমে সবকিছু পড়াতে চান। টেক্‌নিক্যাল যে সব শব্দ অনুবাদের অসুবিধা ঘটাবে তাকে ভাষায় গ্রহণ করে নিলেই হয়, জোর করে অনুবাদ করার কি প্রয়োজন আছে? ইংরেজির বিশেষ অর্থ-প্রকাশক টেক্‌নিক্যাল শব্দাবলী গ্রহণ করে বাঙলার মাধ্যমে পড়ান সম্ভব হলে মাতৃ-ভাষায় পরিবেশিত বিষয়বস্তু অনেক সহজে ছাত্রেরা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। তাহলে অবাঙালী ছাত্রদের হবে কি?—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঙালী ছাত্রদের বাঙলা ভাষা শিক্ষা করা হবে অবশ্য কর্তব্য।

এই প্রসংগে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। গত পরশু সকালবেলা কয়েকজন অবাঙালী ছাত্র অধ্যাপক বোসের সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যেই অনেকেই বাঙলা জানেন না। তাঁদের সংগে পরিচিত হয়ে অধ্যাপক বোস অবাক হয়ে বলেছিলেন—"বাঙলা যদি না শিখলো তবে এই ছেলেরা বিশ্বভারতীর চিন্তাধারা আর আদর্শের সংগে পরিচিত হবে কিসের মাধ্যমে? বিশ্বভারতীতে তারা এসেছে কেবলমাত্র উপাধির ছাপ নেবার জন্য নয়, এক বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি এবং শিক্ষাধারার সংগে পরিচিত হবার জন্য। সেই শিক্ষা-ধারার চিন্তা এবং প্রেরণার সংগে বাঙলা ভাষা এক হয়ে মিশে আছে, তাই এ সাধনার উপলব্ধি ভাষান্তরের মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেবল উপাধি এবং প্রতিষ্ঠাই কোন লোকের যদি একমাত্র কাম্য হয় তাহলে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যেতে পারে; বিশ্বভারতীতে আসার কোন প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা নেওয়া এবং উপাধি দেওয়াই শুধু বিশ্বভারতীর কাজ নয়, প্রতিটি ছাত্রকে গুরুদেবের আদর্শধারায় অভিসিক্ত করে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরীই এর প্রধান কর্তব্য। নিজস্ব শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদেশী এবং ভারতের অন্য প্রদেশের ছাত্ররা দেশে ফিরে গিয়ে ব্যবহারে এবং কাজে বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষা ও মহিমা কীর্তন করবে, তবেই এর প্রচেষ্টা হবে সার্থক।

চায়ের আসরে ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও উপস্থিত হয়েছেন, তিনি আচার্য বোসের একজন পুরাতন বন্ধু। বিবিদির বাড়ির আসরের সংগে সংগেই আমাদের পিকনিকের শেষ পালা হলো সাংগ। এবার তল্পী গোটাও—কাল ভোরের ট্রেনেই বিজ্ঞানাচার্যের সংগে আমরা কোলকাতায় রওনা হবো।

পাঠকেরা যদি প্রশ্ন করেন এই উপ-ভোগ্য পিক্‌নিকের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কোনটি, তাহলে আমি বলব, দেশের দুই পরম শ্রদ্ধেয় দিক্‌পালের সাক্ষাৎকারের ছবিটি আমার মানসপটে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। ২রা জুলাই সকালবেলা অধ্যাপক বোস শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সংগে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানা-চার্যকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শিল্পাচার্য স্বয়ং অসুস্থ দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর বসবার ঘরে এসে নিজের আসনে বসলেন। মুখোমুখি দুই প্রতিভাধর বসে আছেন;—একজনের দেহ দুর্বল মুখে অভ্যর্থনার আনন্দময় হাসি আর অপরজনের চোখে আন্তরিক সহানুভূতির রেখা, মনে প্রাণে তিনি শিল্পাচার্যের সত্বর আরোগ্য কামনা করছেন। বিজ্ঞানাচার্য কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন, শিল্পাচার্য খুব আস্তে কম কথায় দিলেন জবাব। বড়ই আপশোস, ক্যামেরা ছিল না বলে এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারকে ছবির মাধ্যমে ধরে রাখতে পারলাম না।

॥ রবীন্দ্রপ্রবন্ধের আদিযুগ ॥

স্মরণ আচার্য

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিবার সংগে সংগেই তাঁহার 'কবি' পরিচয়টি পথরোধ করে। কবি ও প্রাবন্ধিকের মধ্যে কোথাও হয়ত একটু বিরোধ আছে। বুদ্ধি ও হৃদয় এ দুইয়ের বিরোধ সর্বজন কথিত। বুদ্ধির তুলাদণ্ডে বিশ্লেষণী কৌশল প্রয়োগই প্রাবন্ধিকের সার্থকতার মাপকাঠি। কিন্তু অনুভূতির খামখেয়ালী রাজত্বে কাব্যের বসবাস। বিদেশী সাহিত্যে অবশ্য কবি, প্রাবন্ধিক সব্যসাচীর সংখ্যা বিরল নয়। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের পর হইতে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে এই দুই বিপরীত গুণের মিলন চোখে পড়ে না। এই কারণেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি সমালোচকের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়াছে। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্য তাহার অন্যান্য পরিপুষ্ট শাখাগুলির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সমকালীন কাব্য, নাটক, ছোট গল্প প্রভৃতির সহিত সেগুলির ভাবগত ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতর পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য সৃষ্টির ইতিহাস—কবিযশলোভী বালকের 'কবিতার নীল খাতার' সরসতম বর্ণনা জীবনস্মৃতি পাঠকের কাছে অজ্ঞাত নয়। জ্যোতিদাদা হঠাৎ খেয়ালে যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, তাহার কি বিপুল, বিশাল পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ রচনার পিছনেও এমনি একটি কৌতুক কাহিনী আছে। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একখানি মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' একখানি কাব্যগ্রন্থ। এখানি কোন মহিলার রচনা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে মহিলার নামাঙ্কিত পত্রও দেখাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে মহিলার রচনা বলিয়া মানিতে পারেন নাই। তিনি কঠোর লেখনীতে ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম, খণ্ড-কাব্যেরই বা লক্ষণ কি, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত।"

প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১২৮৩ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ, পনের বৎসরের কৈশোর সীমায়। প্রবন্ধটিতে বয়সোচিত প্রগল্ভতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বক্তব্যে কিংবা ভাষায় যতই বালকোচিত ধর্ম থাকুক না কেন, কাব্য বিচারের সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিটি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই লাভ করিয়াছেন। কাব্যে কবির অসংযম লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রবন্ধটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। তবে রবীন্দ্র লিখিত প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে এটির মূল্য স্বীকার্য।

বাল্যে ও কৈশোরে কবি বা প্রাবন্ধিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অধিকাংশই পরবর্তীকালের উন্নততর বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে টেকে নাই। নির্বাচন ব্যাপারে কাব্য সম্বন্ধে যেমন প্রবন্ধ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টির অভাব ছিল না। বাল্য কৈশোরের প্রগল্ভতা পরবর্তীকালে কবিকে লজ্জিত করিয়াছে বহুক্ষেত্রে। কাব্য নির্বাচনকালে রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে 'কালাতিক্রমণ দোষে' দুষ্ট বলিয়া কঠোর আত্মসমালোচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্র রচনাবলী সম্পাদনকালে কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রবিবর্জিত অংশটুকুকে 'অচলিত সংগ্রহ' নামাকরণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য—"সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক, যার সংগে আমার সাহিত্য ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে, কিন্তু চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে।"

আলোচনার সুবিধার জন্য যে সকল প্রবন্ধ কোন গ্রন্থ মধ্যে স্থান পায় নাই এবং যে সমস্ত প্রবন্ধ 'অচলিত সংগ্রহে' সন্নিবেশিত হইয়াছে, এইগুলিকে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিযুগ বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। ইহার পরিধি প্রায় পনেরো বৎসর। ১২৮২ সালে জ্ঞানাঙ্কুর প্রকাশিত প্রবন্ধটি হইতে ১২৯৭ সালের 'মন্ত্রী অভিষেক' পর্যন্ত লিখিত প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটিভাবে আদিযুগের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম দিকের অনেকগুলি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আর কোন গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশাধিকার দেন নাই।

এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা চার। গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১২৯০), আলোচনা (১২৯১), সমালোচনা (১২৯৪) এবং মন্ত্রী অভিষেক (১২৯৭)। গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। রবীন্দ্র রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহে' গ্রন্থ চারখানি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারখানি গ্রন্থের প্রবন্ধ-সংখ্যা ষাটের অধিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১২৯৭ সাল যেমন মন্ত্রী অভিষেকের প্রকাশ কাল, তেমনি কাব্যগ্রন্থ মানসীরও প্রকাশ কাল। মানসীর যুগে আসিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা আত্মস্থ হইয়াছে। সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাত সংগীত, প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভার স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। মানসীতে তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানসীর যুগ পর্যন্ত লিখিত একটি প্রবন্ধও পরবর্তীকালের বিচারে সার্থকতার টিকা লাভ করে নাই। এই দীর্ঘ পনেরো বৎসরের প্রবন্ধ সাহিত্য 'অচলিত সংগ্রহে' স্থান লাভ করিয়াছে। স্থানান্তরে ইহার কারণ আলোচনা করা যাইবে।

সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়াই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চার সুযোগ ঘটিয়াছে। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য সমালোচনা প্রবন্ধটির পর 'ভারতী' পত্রিকা তাঁহার সহায় হইল। রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার (১২৮৪) একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাহা ছাড়া, আপন অধিকারে একখানি পত্রিকা থাকায় তাঁহার রচনা প্রকাশের আর কোন বাধাই রহিল না। এই সময় ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কঠোর সমালোচনা করিলেন। এই প্রবন্ধে বালক সমালোচক তীব্র ভাষায় সর্বজন-প্রশংসিত কাব্যখানিকে আক্রমণ করিলেন।

পূর্বের সমালোচনা প্রবন্ধটি হইতেও এই প্রবন্ধটিতে উগ্রতা ও প্রগলভতা আরও প্রবল মাত্রায় ছিল। এই গদ্য রচনাটিকে পরবর্তীকালে তিনি আর কোন গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রিত হইতে দেন নাই। ইহার পর ১২ সালে তিনি 'মেঘনাদ বধের' দ্বিতীয় সমালোচনাটি লেখেন। এইটি 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'মেঘনাদ বধে'র ন্যায় এইরূপ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনার কারণ হিসাবে, বাল্যের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে কাব্যখানির নির্বাচনকে অনেকে দায়ী করিয়া থাকেন। স্বয়ং কবিও জীবনস্মৃতিতে এই কারণই দেখাইয়াছেন। এ কারণটিকে স্বীকার করিয়াও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের সহিত 'মেঘনাদ বধের' যে বিরোধ, তাহা উভয়ের কবিধর্মে। অতি অল্প বয়সে এদিকে কবির সহিত লিরিক কবি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় তাহার ভাষা ও ভাব কিছু পরিমাণে অসংযত হইয়াছে। এই লজ্জায় পরবর্তীকালে তাঁহার আসল মনোভাবটি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মনে হয়, পরিণতবয়সে যদি তিনি প্রথম 'মেঘনাদ বধের' সমালোচনা লিখিতেন, তাহা হইলে তাহার ভাষা যেমনই হোক, ভাবের খুব ভিন্নতা ঘটিত না। প্রবন্ধটি বাল্য লেখনীর উগ্রতাপ্রসূত হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা চলে না। আধুনিক কালের জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন—'ঐ প্রবন্ধের চিন্তাবিন্যাসে অপরিণত মনের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্য কথাই যে বলা হয়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই।' (সাহিত্যচর্চা'—বুদ্ধদেব বসু)

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনার সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইতঃপূর্বে এমন নির্ভীক বিস্তারিত সমালোচনা বাংলা সাহিত্যের কোন গ্রন্থ সম্বন্ধেই হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটিয়াছে সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ দিয়া। প্রারম্ভিক রবীন্দ্রনাথ অন্য সকল সাধারণ বিষয় ছাড়িয়া সাহিত্য সমালোচনা দিয়া তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্বোধন করিলেন কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই সমালোচনা প্রবন্ধ দুইটি লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার কাব্য সাধনাও চলিতেছে। 'জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁহার বনফুল' প্রকাশিত হইতেছে। স্বাভাবিক কাব্য প্রেরণায় তিনি কাব্য রচনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে কাব্যের প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করিয়াছেন সচেতনভাবে। ইতঃপূর্বে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' কিছু কিছু সাহিত্য সমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে আপন সৃষ্টির মাপকাঠিতে অন্য কাব্যগুলিকে বিচার করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর অধ্যয়নও করিতেছেন। ইহারই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ এই সমালোচনা প্রবন্ধগুলির উৎপত্তি। এই দুইটি প্রবন্ধ ছাড়াও রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিযুগে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা সুপ্রচুর। আদিযুগের এই সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সহিত পরবর্তীকালের সাহিত্য প্রবন্ধের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় সাহিত্যধর্ম ও সাহিত্যতত্ত্ব যাহা পরবর্তীকালের প্রবন্ধে পরিস্ফুট এই রচনাগুলিতে তাহার অভাব। অধ্যয়নপ্রসূত জ্ঞানের মাপকাঠিতে এবং কবি দৃষ্টির স্বাভাবিক সংস্কার হইতেই এই প্রবন্ধগুলির উদ্ভব। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ একাধারে কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার সমালোচনার মানদণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহার পর বিলাত যাইবার পূর্বে ১২৮৫ এবং ১২৮৬ সালে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি তাঁহার তৎকালীন বিচিত্র অধ্যয়নের ফলস্বরূপ। বিলাত যাইবার পূর্বে বিলাতি সাহিত্য ও আদবকায়দা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া তিনি 'ইংরেজদিগের আদব-কায়দা' এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিযুগের প্রবন্ধগুলির একটি পর্যায়ের সীমা এখানেই টানিতে হয়। ১২৮৫ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এই সময় লিখিত তাঁহার পত্রধারা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে পরিচিত। এগুলি পত্রসাহিত্যের অন্তর্গত—এ প্রবন্ধের সীমার বাহিরে।

১২৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিলেন। এই এক বৎসর কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন নাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া দেশ-বিদেশী সংগীতের পরীক্ষায় তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা' লিখিতে আরম্ভ করেন। সংগীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (ভারতী ১২৮৮) এই সময়ের রচনা। ইহার পরে 'সন্ধ্যাসংগীতের' যুগ। 'সন্ধ্যাসংগীত'কে কবি নিজস্ব কাব্যসম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সময় লিখিত প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নাম দিয়া গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়াছে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"যখন 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখিতেছিলাম, তখন 'খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। ...সেও কোন বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা।..... মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা

। তাহাই লিখিব—কী লিখিব, সে
াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব এই
। একটা উত্তেজনা।'

বিবিধ প্রসঙ্গ' নামটিতেই বিষয়বস্তুর ক্যর অভাব নির্দেশ করে। এই সময় রতী পত্রিকা তাঁহার সহায়। এই পত্রিকায় ২৮৮ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত ত্যক মাসেই ক্ষুদ্রাকার প্রবন্ধ প্রকাশিত তে থাকে। ১২৯০ সালে প্রবন্ধগুলি লিত করিয়া 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানি কাশিত হয়। ইহাতে প্রবন্ধ-সংখ্যা প্রায় শ।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে নানা ভাবের প্রবন্ধ াছে। 'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও ন্ধ্যাকাল' প্রভৃতি ভাবপ্রধান প্রবন্ধ, শূন্য, ণ, জমাখরচ' প্রভৃতি লঘু, হাস্যরসের চনা, 'দয়ালু মাংসাশী' জাতীয় অর্ধ-জনৈতিক প্রবন্ধ পাশাপাশি স্থান াইয়াছে। প্রবন্ধগুলির সাহিত্য মূল্য যে থেষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন। াই নির্মম হস্তে তিনি এগুলিকে সার্থক ৃষ্টির সীমানা হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। নখন্ত সাহিত্যিক মূল্য বিচারে এগুলির ল্যে যাহাই হোক না কেন, রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে এগুলির ূল্যে যথেষ্ট।

কল্পনাপ্রবণতা, ভাবাতিশয্য, দার্শনিকতা রবীন্দ্র-প্রবন্ধের যাহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাহার সূত্রপাত 'বিবিধ প্রসঙ্গের' ভাবাত্মক প্রবন্ধগুলিতেই ঘটিয়াছে। যদিও এই সময়ের প্রবন্ধগুলির সহিত উত্তরকালের প্রবন্ধগুলির ভাব, কল্পনা ও রচনাশৈলীর প্রভেদ দুস্তর, তথাপি পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-প্রবন্ধের নিজস্বতার অঙ্কুর এই প্রবন্ধগুলিতেই সুপ্ত ছিল।

'বিবিধ প্রসঙ্গের' ভাবাত্মক প্রবন্ধ 'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রভৃতির সহিত উত্তরকালের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও লিপিকার প্রবন্ধগুলির একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য সহজেই চোখে পড়িবে। আকার ও বিষয়বস্তুতে এগুলি সমধর্মী। 'বিবিধ প্রসঙ্গের' প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল এবং লিপিকার 'সন্ধ্যা-প্রভাত' প্রবন্ধ দুইটি আলোচনা করিলে প্রথমটি দ্বিতীয়টির খসড়া বলিয়া মনে হইবে। প্রথম যুগের এই জাতীয় প্রবন্ধের সহিত পরবর্তী-কালের প্রবন্ধগুলির মৌলিক প্রভেদ প্রথম যুগের প্রবন্ধে রবীন্দ্র জীবনদর্শনের প্রতি-ফলনের অভাব। এই অভাবটির জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথ পূর্ব প্রবন্ধগুলিকে বর্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধ দুইটি গভীর ভাবাত্মক। ইহার সম-জাতীয় প্রবন্ধ পরবর্তীকালে বিরল নয়। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে দার্শনিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া একাধিক প্রবন্ধ পরবর্তী-কালে রচনা করিয়াছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধের' সুরটিও এই।

কিছু কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধও 'বিবিধ প্রসঙ্গে' আছে। এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্র-নাথের স্বচ্ছ চিন্তা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও কৌতুক-প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরবর্তী-কালের রাজনৈতিক প্রবন্ধে যে মৌলিক সত্য ও মানবতার ভিত্তিটি আছে, এগুলিতে তাহার অভাব। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের লেখনী তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে কমলাকান্তের সগোত্র বলিয়া মনে হয়। 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধটি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইতঃপূর্বে এজাতীয় প্রবন্ধের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে হয় নাই। আপন খেয়ালে রচনা করিয়া এগুলি প্রকাশ করিবার সময় কবিকে সঙ্কোচে পড়িতে হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি জাতছাড়া তাই এগুলি লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, একথাও লেখকের মেন হইয়াছিল। এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে 'সমাপন' নাম দিয়া তিনি বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন—"আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। ......এ বইখানি সেভাবে লেখাই হয় নাই। ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল, এই মাত্র।"

'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যে সূত্র পাওয়া যায়, তাহা পরবর্তীকালের প্রবন্ধ বিচারের দিগ্‌দর্শনী। এই সময় রবীন্দ্র কবি-মানস অশান্ত, অব্যবস্থ। সন্ধ্যাসঙ্গীতের হৃদয়ারণ্যে পথ সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কাব্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা না ঘটায় সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব। এযুগে রবীন্দ্রনাথের কবিমন ও বিশ্লেষণীমন একমুখী হয় নাই। সেইজনাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সুরের সহিত তৎকালীন প্রবন্ধের সুরের মিল নাই। একদিকে বেদনার পথে আত্মানুসন্ধান, অন্যদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টিতে বিশ্ব বিচার। প্রকৃত কথা, এই যুগে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও হৃদয় ভিন্ন আসনেই বসিয়া আছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের যুগের গদ্যের মূল্য বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"দার্শনিক সমা-লোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে নিজ জীবনের বিশেষ পর্ব ও সৃষ্টিকে কঠোর বিশ্লেষণ দ্বারা যেভাবে রবীন্দ্রনাথ উহাকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সাময়িক গদ্য রচনার দ্বারা সমর্থিত হয় না। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগকে যদি আমরা বলি যে, কবি কেবলই আপনার হৃদয়াগ্নিতে হাপর টানিতেছেন, তাহা হইলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।"

ইহা একান্ত সত্য কথা যে, সন্ধ্যাসঙ্গীত যুগের বেদনার অনুভূতি রবীন্দ্র কবি-মানসের একটি দিক মাত্র। হয়ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, ইহা সাময়িক কালের বিচ্ছিন্ন অনুভূতি মাত্র। সাহিত্য জীবনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের বিভিন্ন প্রান্তে পথ-সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"জীবনের প্রতি মুহূর্তে মনের গঠনকার্য চলিতেছে...এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্যশীল পরিবর্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই

ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণও এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য, সমতা ও ছাঁচেঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ।"

রবীন্দ্র কবি-মানসের ইহা পরীক্ষার যুগ। বহু পথ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আপন অন্তর পরিচয়টি লাভ করিয়াছেন যেদিন, সেইদিনই তাঁহার কবি-সত্তার বিকাশ। তৎপূর্বের রচনাগুলি এই কারণেই অবহেলিত।

'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থ দুই-খানির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১২৯১ ও ১২৯৪। ইহাদের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিও এই সমসাময়িক কালে লিখিত।

'আলোচনা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি গভীর ভাবাত্মক। এই সময় কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্য নাট্যখানি রচনা করিতেছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্য-নাট্যে রবীন্দ্র জীবনদর্শনের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। সীমা কিংবা অসীম উভয় কোটিতে বদ্ধ মানবজীবন ব্যর্থ। জীবনের এই দুই বন্ধনের দুই প্রান্তে জ্যা যোজনা না করিতে পারিলে মানুষের মুক্তি নাই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাথ এই পরম সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার পর সমগ্র জীবনব্যাপী কবি ইহারই পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সমকালে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে এই কথাই আছে। 'জীবন-স্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, তাহার গোড়ার দিকেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব-ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

কবির মনোজগতে তখন সীমা-অসীমের মিলন সাধনের পালা চলিতেছে। অবশ্যম্ভাবী কারণেই তৎকালীন প্রবন্ধে তাহারই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা আসিয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ দিয়াই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' গ্রন্থ দুইখানির প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই সাহিত্য-তত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা ও কবি-সমালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগিতায় বঙ্গদর্শনে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত হয়। এই প্রবন্ধগুলিই রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত করায়। কোন একটি প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ 'বাঙালি কবি নয়' এবং 'বাঙালি কবি নয় কেন'? (ভারতী ১২৮৭) প্রবন্ধ দুইটি রচনা করেন।

প্রবন্ধ দুইটিতে কবিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা। বাঙালী কবিসত্তাকে ধিক্কার দিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। তরুণ সমালোচক লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীব ভাব সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহাই বাঙালীকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্ধেক চক্ষু দিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প।" এই সমালোচনা কঠোর হইলেও সেদিনের মত আজও পরম সত্য।

আর একটি সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।' পূর্বেই বলিয়াছি, এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ একদিকে কবি ও অন্যদিকে প্রাবন্ধিক। 'সন্ধ্যাসংগীতের' কবিতাগুলি প্রাচীন বস্তুগত কবিতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। উক্ত প্রবন্ধে লেখক যেন আপন কাব্যেরই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রবন্ধটিতে তিনি আরও গভীর ভাবে তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সময়ের প্রবন্ধগুলি তাঁহার কাব্যধারার সমর্থনের প্রচেষ্টা।

সাহিত্যের লক্ষণ ও গুণাগুণ বিচার ছাড়াও প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি আজও বিস্ময়ের কারণ। তাঁহার 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটিতে দুই কবির কবিসত্তার অপূর্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতঃপূর্বে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতির' তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠ মনের ছাপ আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি আবেগপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া অনুভূতির দ্বারে আঘাত করে।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে 'বসন্তরায়' প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধগুলির রসবিচারের সূক্ষ্মতা দেখিয়া রবীন্দ্র জীবনীকার মন্তব্য করিয়াছেন—"আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্র-নাথের এই রস বিশ্লেষণ য়ুরোপীয় সাহিত্য বিচারের মানসূচী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।"

সমালোচনা গ্রন্থের প্রবন্ধ সংখ্যা স্বল্প নয়। স্থানাভাবে এখানে প্রবন্ধগুলি লইয়া পৃথক পৃথক আলোচনা সম্ভব নয়। 'সমালোচনা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পূর্বের দুইখানি গ্রন্থ 'বিবিধ প্রসংগ' ও 'আলো-চনা'র প্রবন্ধগুলি যুক্তিনিষ্ঠ। 'প্রভাত সংগীতে'র পূর্বে পর্যন্ত রবীন্দ্র কবিমন উচ্ছ্বাস ভারাক্রান্ত। তৎকালীন প্রবন্ধেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। বিষয়বস্তু, ভাষা এবং আকার বিচার করিলে এগুলিতে গীতি কবিতার লক্ষণ দেখা যাইবে। 'সমা-লোচনা'র প্রবন্ধগুলিতে প্রথম হইতেই

মণ্ঠ মনের ছাপ—এখান হইতেই
। প্রবন্ধের যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচার-
চার সূচনা।
ন্ত্রী অভিষেক' রবীন্দ্রনাথের প্রথম দীর্ঘ
নতিক প্রবন্ধ। ১২৯৭ সালে এমারেল্ড
টারে ইহা পঠিত হয়। ইতঃপূর্বে
ধ প্রসংগ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি
ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু
টিকে পুরাপুরি রাজনৈতিক প্রবন্ধ
য়া রাজনীতিগন্ধী প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' গ্রন্থখানির প্রকাশ লইয়া ব্যস্ত। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে হঠাৎ কাল-বৈশাখী দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের মনও অশান্ত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন 'মন্ত্রী অভিষেক'। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করিয়া তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড ক্রসের মন্তব্যের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। পূর্বের রচনার মত এই রচনাটিতেও ব্যংগ বিদ্রূপের অভাব ছিল না। কিন্তু তৎকালীন মনোভাব অনুসারে ইংরাজ শাসকের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসও প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মন্তব্য করিয়াছেন—"যখন মন্ত্রী অভিষেক লিখেছিলুম তারপরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপের সংগে মিলবেনা।" (পত্র ১৯৪০ জানুয়ারী ৫)

সাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে এটির ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। সাময়িক কালের প্রয়োজনে ইহার সৃষ্টি এবং তাহার পরেই ইহার বিলুপ্তি। রবীন্দ্রনাথ তাহার পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে এ দুর্বলতা কিছু পরিমাণে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তরকালের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি কোন একটি সাময়িক ঘটনা আশ্রিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি কতকগুলি মৌলিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই প্রাণশক্তির অভাবেই 'মন্ত্রী অভিষেকে'র স্থান 'অচলিত সংগ্রহে'। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক প্রবন্ধের সহিত তুলনামূলক বিচারের জন্য এ প্রবন্ধটির মূল্য কম নয়।

বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ মডেল সচেতন শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন বাংলা গদ্য সাহিত্য তখনও পরীক্ষার যুগে। বাল্যকালে বিহারীলালের কাব্যের রূপ ও ভাবের সহিত রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হইয়াছিলেন। হয়ত কিছু পরিমাণে প্রভাবিতও হইয়াছিলেন। তবে এই প্রভাব সন্ধ্যাসংগীতের যুগেই শেষ হইয়াছে। ইহার পর হইতে কবি স্বকীয় প্রতিভার নির্দেশ অনুসারে কাব্যের মডেলটি গড়িয়া লইয়াছেন। কাব্যের স্বকীয় মডেল সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের বিলম্ব ঘটে নাই। কিন্তু গদ্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। প্রয়োজন ও বুদ্ধির নির্দেশেই গদ্য রচনার সূত্রপাত। সুতরাং গদ্যের মডেল তাঁহাকে বাহিরে সন্ধান করিতে হইয়াছে।

বঙ্কিম পূর্ববর্তী কালের গদ্য সাহিত্য পরীক্ষার সীমায় আবদ্ধ। রামমোহন হইতে বিদ্যাসাগর কিংবা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী বাংলা গদ্যের যত উন্নতিই করুন না কেন ইহা তর, তমের প্রভেদ মাত্র। বাংলা গদ্যের সরল, নমনীয় রূপটি তখনই আবিষ্কৃত হয় নাই।

বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকল্প নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দান অসাধারণ। তাঁহার সম্পাদিত 'বংগদর্শনে' প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সাহিত্যের পথ প্রদর্শন করে। সাহিত্য সমালোচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, দার্শনিক প্রবন্ধ সকল বিষয়ের প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। লিখন-ভংগীর কারুকর্মে প্রবন্ধকে তিনি রস সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়' ইহার প্রমাণ।

ইহার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্র প্রবন্ধের জন্মকাল। একান্ত অবশ্যম্ভাবী কারণেই পূর্বসূরীর প্রভাব তাহার উপর পড়িয়াছে। কেবল প্রবন্ধ সাহিত্য কেন গদ্যরচনার বিভিন্ন শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আছে। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের প্রথম যুগ বঙ্কিম প্রভাবিত। রাজর্ষি, বৌ-ঠাকুরানীর হাট বঙ্কিম উপন্যাসের মডেলে রচিত। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যত সহজে বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, গদ্যে বঙ্কিম প্রভাব তত সহজে কাটান সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ কবিসত্তাই রবীন্দ্র প্রতিভার মূল উপাদান। প্রবন্ধ রচনার আদি যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবে, ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'উত্তর চরিত শকুন্তলা' প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনায় সহায় হইয়াছে। সমসাময়িক সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ বঙ্কিম রচনা করেন। পরবর্তীকালে মডেল গঠনে এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। আদি যুগের প্রবন্ধগুলি ভাষা-রীতি ও বাক্যগঠনে অনেকাংশে বঙ্কিমী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধের কয়েকটি প্রবন্ধের সহিত এই যুগে লিখিত কতক প্রবন্ধের মিল সহজেই চোখে পড়ে।

আদি যুগের রবীন্দ্র প্রবন্ধের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করিয়াও বলা চলে, সাহিত্যের অন্য সব শাখার মতই প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ। প্রচলিত প্রবন্ধের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নূতন পথের পথিক। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশ্লেষণী দৃষ্টিভংগী তৎকালীন মনীষিগণকে প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ চিন্তা এই প্রবন্ধগুলি রচনার পিছনে সক্রিয় কাজ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের প্রবন্ধে জাতি ও সমাজের কল্যাণমূলক প্রবন্ধ কিছু সংখ্যক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবাত্মক ও মনন-শীল প্রবন্ধগুলি একান্তই তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি। এগুলিতে যাহার সূচনা পরবর্তীকালে তাহাই রবীন্দ্র প্রবন্ধে সার্থকতম স্বরূপ।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥২০॥

ডাক্তারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। আর লিখব না। কারণটা বলি।

প্রথম যখন লিখি, ভয় ছিল পাঠকদের হয়ত এটা ভাল লাগবে না। এখন সে ভয় নেই। এখন যা ভয় সে অন্য। আমার যারা মক্কেল, যাদের ঘরে চিকিৎসা করে আমি সংসার চালাই, তারাই দেখছি ভয় পেয়েছে। আমার ওপর ভরসা পাচ্ছে না। মনে সংশয় ঢুকেছে কখন না জানি তাদেরই কোন্ গোপন কথা ফাঁস করে দিই, ডায়েরীতে লিখে ফেলি।

এই এক বছরে, যেদিন থেকে এই ডায়েরী বেরুচ্ছে, অনেক নতুন রোগী অনেক জায়গা থেকে বহু ক্লেশ স্বীকার করে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি দিয়েছেন, দেখা করেছেন। দেখেছি সকলেরই ঐ এক ভয়। কবে না জানি তাঁদের কথাও লিখে ফেলি। কথা দিয়েছি, লিখব না।

ভদ্রলোকের কথা, খেলাপ করা চলবে না। তাই এঁদের কথাও লেখা যাবে না। ভাবছি যদি ভদ্র না থাকি, কথা না রাখি তাহলে কি হয়? মজার মজার কত কথাই না বলা যায়। চমকদার কত কাহিনীই না শোনানো যায়। কিন্তু তার উপায় কৈ? ডাক্তারী করেই যখন খেতে হবে তখন ঐ সব গোপন কথা লিখব কোন সাহসে?

পারা যায়, যদি ডাক্তারী ছেড়ে কলম ধরি, লেখাকেই পেশা করি। কিন্তু সে ক্ষমতাই বা কোথায়, আর সে হিম্মতই বা কৈ?

বিলেতের কয়েকজন নামজাদা ডাক্তার চিকিৎসা ছেড়ে লিখিয়ে হয়েছেন। লেখাই জীবনের পেশা করেছেন। তাঁদের ভাগ্য ভাল। প্র্যাকটিস করে কখনও যা পান নি, লিখে তা পেয়েছেন। যশ, মান এবং অর্থ।

আমার ভাগ্য অন্য। লিখতে শুরু করে দেখছি পুরোনো রোগী হাতছাড়া হয়ে যায়, আত্মীয় বন্ধুরা চটে যায়, আর বিনা পয়সার রুগী বাড়ে। লিখে যা পাই তা দিয়ে সংসার চলে না। অতএব বলুন দেখি কি করি?

তাই ঠিক করেছি, এখন থেকে ডাক্তারীই শুধু করব। আর লিখব না।

ডাক্তারী যখন পড়ি, মনে হত, ডাক্তার হলেই বুঝি সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে। হাতে পয়সা আসবে। বাপ মার কাছে টাকার জন্য হাত পাততে হবে না।

এখন বাবা-মার কাছে হাত পাতি না ঠিক কিন্তু রুগীদের কাছে পাতি। কেউ কিছু দেয়, কেউ দেয় না।

পাশ করেই দেখলাম, টাকা ঘরে আসে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে স্যুট-বুট করাতে হয়, যন্ত্রপাতি সব কিনতে হয়। ঘরের পয়সায় কুলোয় না। ধার হয়।

তখন ধার করতে সংকোচ হত। লজ্জা হত। এখন সে সব হয় না। রোজগার যত বাড়ছে, ধারও ততই বাড়ছে, লজ্জাও ততই কমছে।

রুগীর পকেটের পয়সা নিজের হাতের মুঠোয় আনা, এরই নাম প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্। এই কাজে যে যত বেশী ওস্তাদ, তার প্র্যাক্টিস্ তত বেশী ভাল।

এই কাজটি আবার নিতান্ত সহজ কর্ম নয়। চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় এ বিদ্যাটি শেখায় নি। কাজে কাজেই এই কায়দাটি আগে কিছুই জানতাম না। এখন বেশ শিখেছি। তবু মাঝে মাঝে ঠকে যাই। বোকা বনি। রুগীর বুদ্ধির কাছে হার মানি। পকেটে পয়সা আছে জানি, তবু তা কৌশলে বার করে নিজের পকেটে আনতে পারি না।

এই বিদ্যাটি শিখতে পাশ করার পরেও অনেকদিন লাগে, অনেক বুদ্ধি খরচ হয়। পাশ করার পর সকালে যখন হাসপাতালে কাজ করি তখন বিকেলে এক বন্ধুর ডিস্পেন্সারীতে আড্ডা দিতে যেতাম। তাস খেলা হত।

একদিন গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক দশ বারো বছরের একটি ছেলেকে দেখাতে এনেছেন। ভদ্রলোক বিজ্ঞানের প্রফেসর। তাঁরই ছোট ভাই। আমাশা হয়েছে আজ তিন চার দিন।

বন্ধুটি সব শুনে ছেলেটাকে টেবিলে শুইয়ে পেট টিপে, জিভ দেখে, স্টেথোস্কোপ বার করে বুক দেখল। চোখের পাতা টেনে টর্চ ফেলে চোখ দেখল, কানের ফুটো আর গলা দেখল। অবশেষে ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্রটি ঐ ছেলের বাহুতে বেঁধে প্রেসার দেখল।

দেখা শেষ হলে বলল—আমাশাই হয়েছে আর কোন দোষ নেই। এই ওষুধটা নিয়ে যান। কাল সকালে একবার খবর দেবেন।

এই বলে খস্ খস্ করে একটা মিক্শ্চার লিখে দিল।

ভদ্রলোক ওষুধ নিয়ে বিদায় হলে বন্ধুটিকে বললাম—অতটুকু রোগী; তার ব্লাডপ্রেশার? প্যাঁচটা কি ভাই?

বন্ধুটি বছরখানেক আগে এই দোকান খুলেছে। এমন একটা ভাব দেখাল যেন আমার চেয়ে কত বেশী পণ্ডিত! কত বেশী সিনিয়র!

ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল—তোরা হাসপাতালে কাজ করিস, ওসব বুঝবি না।

বললাম—কেন?

বন্ধু বলল—ঐ প্রেশারটি দেখলাম বলেই ঐ রুগীটি এখানে আটকে গেল। আর কোন ডাক্তারের কাছে যাবে না। গেলেও এইখানেই ঠিক ফিরে আসবে। এইখানেই বাঁধা থাকবে।

বিস্মিত হয়ে বললাম—কি রকম?

বন্ধু বলল—আর কোন ডাক্তার তো অত বাচ্চা রোগীর ব্লাডপ্রেশার দেখবে না। কাজেই ও ভাববে এখানেই বেশী যত্ন নেওয়া হয়। ভাল করে পরীক্ষা করা হয়। অতএব এখানেই আসবে। এসব না করে যদি শুধু এম বি ট্যাবলেট আর এণ্টেরো-ভায়োফর্ম লিখে দিতাম তাহলে আমার কি লাভ হত?

তক্ষুনি বললাম—রোগীর রোগ সারত। আর ডাক্তারের সুনাম হত।

বিজ্ঞের মত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বন্ধু বলল—'রুগীর রোগও সারত না, আমারও বদনাম হত।'

আশ্চর্য হয়ে, তর্ক তুলে বললাম—কেন?

বন্ধু বলল—যতদিন ধরে ওষুধ খেলে অথবা ইন্‌জেক্‌শন নিলে আমাশা সারে ততদিন ওষুধ খায় কে? ইন্‌জেক্‌শন কে নয়? যেই পেট একটু ভাল হল, অমনি ওষুধ বন্ধ। ইন্‌জেক্‌শন বন্ধ।

বললাম—তাতে তোর কি? এডভাইস তো তুই ঠিক দিলি। যদি না মানে সে রোগীর দোষ।

বন্ধু বলল—আরে ভাই, আমার এডভাইস শুনবে কে? প্রথমদিনই যদি ফল দেখাতে না পারি রুগী অন্য ডাক্তারের কাছে যাবে। আর যদি প্রথমেই ঐ এম বি ট্যাবলেট আর এন্‌টেরোভায়ফর্ম লিখে দি, ফল ঠিক পাবে কিন্তু আর ডাক্তার দেখাবে না। যখনি অসুখ বাড়বে দোকান থেকে আমার প্রেস্‌-ক্রিপ্‌সন দেখিয়ে ঐ অষুধ কিনে খাবে। নিজেরও রোগ সারবে না, ডাক্তারকেও কিছু দেবে না। মাঝখান থেকে বদনাম হবে আমার অষুধে রোগ সারে না।

বললাম—কিন্তু স্টুলটা দেখা উচিত ছিল না কি?

বন্ধু বলল—নিশ্চয় ছিল। এবং দেখা হবেও। কিন্তু ধীরে। সইয়ে সইয়ে। পয়লা দিনই অত খরচের ধাক্কায় ফেললে রুগী ভড়কে যায়। ভেগে পড়ে। সস্তার চিকিৎসা খোঁজে। কাজেই সইয়ে সইয়ে এসব করতে হয়।

অনেক ডাক্তার আবার এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে পারেন না। প্র্যাক্‌টিসের এই কায়দাটি রপ্ত করতে পারেন না। কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এক এক সময় ক্ষেপে যান। 'দূর ছাই' বলে প্র্যাক্‌টিস ফেলে চাকরী খোঁজেন। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বিশ বছর প্র্যাক্‌টিস্‌ করে এখন চাকরী নিয়েছেন।

বললেন—মশাই, বেশ আছি। প্র্যাক্‌টিস্‌ ছেড়েছি না বেঁচেছি। দু তিনটে ফার্মের ডাক্তার। চাকরী করি। কোনটায় দু' ঘণ্টা, কোনটায় বা তিন ঘণ্টা। সব মিলিয়ে যা পাই, সংসারের খরচা বেশ চলে যায়। কখন রুগী আসবে আর কী প্যাঁচ কসে তার পকেট থেকে পয়সা বার করব, নিত্য অত ভাবতে হয় না। এ বেশ আছি। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। রোজ সকালে উঠে প্রার্থনা করি—হে ভগবান, আর যেন রুগী দেখে পয়সা নিতে না হয়, প্র্যাক্‌টিস্‌ না করতে হয়।

এই পাড়ায় যখন প্রথম আসি, এখানকার এক প্রবীণ চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হল। প্রাচীন লোক। খুব আমুদে। অনেক সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। খুব ভাল প্র্যাক্‌টিস্‌। সকাল বিকেল সব সময় রুগীরা এ'র বসবার ঘরে ভিড় করে থাকে।

বললেন—প্র্যাক্‌টিস বজায় রাখা ভাই বড় কঠিন। দিনকে দিন আরও কঠিন হচ্ছে। সাংঘাতিক কম্পিটিশন। বাজ পাখীর মত চোখ সর্বদা সতর্ক রাখবে। একটু ঢিল দিয়েছ, একটু অন্যমনস্ক হয়েছ, কি আর একজন এসে তোমার রুগী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। এই দেখ না, এ পাড়ায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করছি আজ ত্রিশ বচ্ছর। কত ডাক্তার এল, আর কত উঠে গেল। কিন্তু আমি ঠিক টিঁকে আছি।

শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিগলিত হয়ে বললাম—কি করে স্যার? কি সেই সিক্‌রেট?

ভদ্রলোক বললেন—বাজারের কাছে যে পুরনো তেতলা বাড়িটা দেখছ, ওরা আমার পঁচিশ বছরের মক্কেল। যখন যা হয় আমাকেই ডাকে। সেই বাড়িতে ১০।১২ বছরের একটি ছেলের একবার টাইফয়েড হল। আমি কিন্তু জানি না। আমাকে না ডেকে বাজারের ওপর নতুন ডিস্‌পেন্সারীর নতুন ডাক্তারকে ডেকে দেখাচ্ছে। সে আবার এক বড় ডাক্তারকে কন্‌সালটেশনে এনেছে।

একদিন ঐ পথ দিয়ে রুগী দেখে ফিরছি, দেখলাম, ঐ বাড়ির সামনে বড় ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে। এই বাড়ির অসুখ, বড় ডাক্তার এসেছে, আমায় কোন খবর দেয়নি, ভারী আশ্চর্য বোধ হল। কেমন একটা খটকা লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করলেন? বাড়িতে ঢুকে পড়লেন? ভদ্রলোক চটে গেলেন। বললেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে? তোমার কিছু হবে না।

বললাম—তাহলে?

ভদ্রলোক বললেন—আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। কম্পাউণ্ডারকে পাঠালাম খবর আনতে। নীচের দোকান থেকে কম্পাউণ্ডার সব খবর নিয়ে এল। ছেলেটার সত্যি টাইফয়েড। দিন পনেরো হল। নতুন ডাক্তার দেখছে। আমাকে নাকি আর ডাকবে না।

বিস্মিত হয়ে বললাম—কেন? আপনার ওপর হঠাৎ এত চটল যে?

ভদ্রলোক বললেন—ওসব চটা ফটা ভাই কিছু না। সব বোগাস্‌। নতুন নতুন ডাক্তার প্র্যাক্‌টিসের জন্য অনেক ভুজুং ভাজুং দেয়। বলে বুড়োরা সব ওল্ড ফসিল। নতুন চিকিৎসা জানে না। এই আর কি? রুগীরাও ফাঁদে পড়ে। কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে কী ভেল্কি যে খেলে ঐ ছোকরা ডাক্তার তা জানবে কি করে? দিলাম এক খেল্‌ দেখিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কি দেখালেন?

ভদ্রলোক বললেন—পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। এক হাতে এক ঘটি জল। আর এক হাতে এক মুঠো কাদা।

অবাক হয়ে বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—আমাকে ভেজা কাপড়ে ঐ অবস্থায় দেখে ছেলের বাবা মা তো হতভম্ব। ছেলের বাবা হাত কচলাতে কচলাতে অপ্রস্তুত মুখে বলল—এই যে ডাক্তারবাবু! আসুন, আসুন।

নির্লিপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললাম—কাল রাত্রে শুনলাম ছেলেটার টাইফয়েড। দিন পনেরো থেকে ভুগছে। বড় ডাক্তার দেখছে। শুনে মনে ভারী উদ্বেগ হল। আহা, অমন ফুটফুটে ছেলেটা! আমারই হাতে তো ওর জন্ম হয়েছে।

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। স্বপ্ন দেখলাম মা কালী এসে যেন বলছেন—এইজন্য কেন মিছে ভয় পাচ্ছিস? কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে একঘটি গঙ্গাজল নিয়ে এসে ফুটিয়ে ওকে খেতে দে। আর ঘাটের পাশের গাছ-তলা থেকে গঙ্গামৃত্তিকা এনে পেটের ওপর প্রলেপ লাগা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই বাবা এই একঘটি গঙ্গাজল আর এই এক মুঠো গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে এসেছি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—তারপর আর কি? নতুন ডাক্তার বিদেয় হল। আমার চাকরী পাকা হল। রুগী সেরে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? কি করে?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন—গঙ্গাজল খেতে দিয়েছি বয়েল করে। আর পেট ফাঁপার জন্য গঙ্গামৃত্তিকার কোল্ড কম্প্রেস্‌। টাইফয়েডের আর কি চিকিৎসা আছে হে?

এত বুদ্ধি খাটিয়ে, এত হাঙ্গামা করে যে প্র্যাক্‌টিস বজায় রাখতে হয়, এতটুকু অসতর্ক হলে যা তাসের ঘরের মত ভেঙে যায়, খামোখা এই ডায়েরী লিখে তা নষ্ট করি কি করে? এর পরে আরও লেখা চলে কি?

— সমাপ্ত —

চক্রদত্ত

মানুষের দেহাভ্যন্তর একটি কারখানা বিশেষ। এখানে নানারকম যন্ত্রে নানারকম কাজ হতে থাকে। মানুষের শরীরে বিভিন্ন যন্ত্র সচল রাখার জন্য সব সময় রক্ত চলাচল প্রয়োজন। করনারী ধমনী হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। যদি কোনও কারণে এই ধমনী দিয়ে রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে না আসে, তাহলে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ দেখা দেয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগে মানুষ মারা পড়ে। একজন হৃদ্‌যন্ত্রবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতে বর্তমানে চল্লিশ বছর অথবা তার চেয়ে বেশী বয়সের ত্রিশজন পুরুষের মধ্যে অন্তত একটি এবং নব্বইটি মেয়ের মধ্যে একটি অন্তত কঠিন ধরনের হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ভুগতে দেখা যায়। ১৯৩০ সালের পর থেকে এই রোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ হিসাবে ডাক্তারটি বলেন যে, এ রোগ হয়তো আগেও হতো, কিন্তু আজকাল ডাক্তাররা এ সম্বন্ধে বেশী সজাগ বলে রোগটা বেশী ধরা যাচ্ছে। তা ছাড়া আজ-কাল খুব বেশী পরিমাণ মদ্যপায়ী ও ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই রোগও বেড়ে চলেছে।

*

আমাদের প্রতিদিনের আহার্যের তালিকায় মাখন অন্যতম। রোজই আমরা মাখন খাই, কিন্তু মাখন সম্বন্ধে কতকগুলো জিনিস আমরা খুব লক্ষ্য করি না। সাধারণত শীতকালে মাখনের রং একটু ফিকে হলদে হতে দেখা যায় আর গরমকালে বেশ হলদে রং হয়। শুধু রং কেন, এর গুণেরও তারতম্য ঘটে। রংএর সঙ্গে ভিটামিনের পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে। গরমকালে গরুরা যে সব লতাপাতা খায়, তাতে ভিটামিন ও ক্যারটিন খুব বেশী পরিমাণে থাকে এবং গরুর গ্রন্থিতে এমন ব্যবস্থা আছে যে, ঐ দুটি পদার্থ গরুর দুধে মিশে যায়। জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে গরুর দুধে ভিটামিন এবং ক্যারটিন খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায়, কারণ তখন আর গরুরা কাঁচা ঘাস পাতা খেতে পায় না, শুকনো খড়, গম, ভূষি জাতীয় জিনিস খেতে থাকে।

*

সকাল থেকেই খোকার কান্না শুরু হয়েছে—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—দাঁতের যন্ত্রণায় খোকা কেঁদে আকুল। দাঁতে পোকা ধরেছে, দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে। অ্যাসিড প্রস্তুতকারী এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা এই ক্ষয় সাধন হয়। এইভাবে পোকা লেগে দাঁত নষ্ট হওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। দেখা গেছে যে, শিশুর দাঁতে যদি বছরে দুবার করে সোডিয়াম ফ্লোরাইডের শতকরা দু' ভাগ তরল সলিউশন লাগান যায়, তাহলে এই ধরনের দাঁতের রোগ শতকরা ৪০ ভাগ রোধ করা সম্ভব হয়। কীভাবে আর কেমন করে এই ওষুধ কাজ করে তা সঠিক বলা যায় না। খুব সম্ভবত দাঁতের ওপরের এনামেলের ওপর ফ্লোরাইডের একটি আস্তরণ পড়ায় অ্যাসিড প্রস্তুতকারী ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে পারে না। অবশ্য এই চিকিৎসা শুধু ছোট ছেলেদের দাঁতেই কার্যকরী হতে দেখা যাচ্ছে, বড়দের দাঁতে কোনও কাজই করে না।

*

শোনা যায়, ক্যানুট নাকি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তার আধিপত্য প্রচারের জন্য সমুদ্রের ঢেউকে থামতে নির্দেশ দেন। সম্রাটের এ ঔদ্ধত্য সাধারণত আমাদের হাসির উদ্রেক করে। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে কতকগুলি ক্ষয়ক্ষতি যুগ যুগ ধরেই মানুষ মাথা পেতে নিচ্ছে। এ নিরোধ করার ক্ষমতা বুঝি মানুষের নেই! আজকের বিজ্ঞান শুধু খবর দিতে পারেন অচির ভবিষ্যতে প্রকৃতির বুকে কী লীলা ঘটবে। ঝড় তুফানের খবর আমরা কাগজে আগে থেকেই পেয়ে যাই, তারপর প্রকৃতির বুকে তাণ্ডবলীলা ঘটে যাবার পর তার ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবও আমরা খবরের কাগজে পাই। কিন্তু আবহাওয়া তত্ত্ববিদ্‌রা আজ পর্যন্ত বলতে পারেন না যে, কী করে এটা রোধ করা যায়। ডাঃ জোওরিকিন বলেন যে, সমুদ্রের ওপর যদি তেল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তুফান বন্ধ হতে পারে। আগুন লাগার ফলে হাওয়ার গতি বদলে যাবে এবং বাতাস হাল্কা হয়ে যত ওপর দিকে উঠতে থাকবে, তুফানের গতিও তত বদলে যাবে। এ ছাড়া সমুদ্রের ওপর যে সমস্ত জায়গা থেকে তুফানের উৎপত্তি, সেই সমস্ত জায়গায় যদি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন কোনও রং মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সমুদ্রের ওপরের স্তরে সূর্যের তাপের তারতম্য ঘটায় বায়ু-তরঙ্গের গতিও বদলে যাবে, ফলে তুফান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

১০ই মে, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৮

অদ্য প্রাতে ৪॥টার সময় উঠিলাম। উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ক্যাবিনে গিয়া শয্যাতে বসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত দশ বৎসরের কার্য ও উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ধ্যানে করি, বেশ স্থিরচিত্তে ভাবি। মনটা কিন্তু আবল তাবল ভাবিতে যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে হুঁশ হয়, আবার ব্রাহ্মসমাজের ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিতে যাই, আবার মনটি বক্তৃতার বিষয় ভাবিতে যায়। এইরূপ অনেকক্ষণ চিন্তাধস্তির পর উপাসনা করা গেল।

উপাসনা সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতে প্রায় প্রাতঃকালের আহারের সময় হইল। আমার ক্যাবিনের Norweagian বন্ধু, আমার পোশাক দেখিয়া বলিলেন, 'তোমার ঐ চোগা চাপকান আমি বড় ভালবাসি, তুমি ইংলণ্ডে এই পোশাক ছাড়িয়ো না"। আমি বলিলাম, 'সত্যি নাকি, তোমার ভাল লাগিতেছে?' উনি বলিলেন, 'হাঁ'। আমার কোন জন্মে কেহ কি বিলাতী শার্ট পরিয়াছে, কপে বোতাম পরাইয়াছে? ভট্টাচার্য্যগিরি করিতেছি আর ভাবিতেছি,—বাপ রে, শার্ট পরা এত মুশকিল! এমন সময় নরওয়ের বন্ধু বলিলেন, "তুমি এসব পরিতে জান না; এস এস, আমি পরাইয়া দি"। বলিয়া চক্ষের নিমেষে পরাইয়া দিলেন। যখন তিনি পরাইলেন, ভাবিলাম, বাঃ এ তো বেশ সহজ।

প্রাতঃকালে আহারের পর ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাকশন-এর রিপোর্ট পড়িলাম। তৎপরে কর্সিকা ও সারডিনিয়া দেখিতে বাহিরে গেলাম।

দূরে কর্সিকার তুষারমণ্ডিত পর্বত দেখা যাইতেছে। সমুদ্রের এই অঞ্চলটি পর্বতাকীর্ণ, ইহারই সন্নিকটে "টাসমানিয়া" জাহাজ সাগরস্থ গিরিশৃঙ্গে ঠেকিয়া ভগ্ন ও জলমগ্ন হয়। বামদিকে তাহার নিকট আর একখানি জলমগ্ন জাহাজের মাস্তুল দেখা যাইতেছে। এই সংকট স্থানে দিনে দিনে আসা গিয়াছে;—এ একটা সৌভাগ্য।

তিনটার সময় আবার বক্তৃতা, English Education in Bengal বিষয়ে। বক্তৃতার প্রস্তাব হওয়াতে আমি রাজি হইয়াছিলাম। কি করি, কোন রকমে বক্তৃতাও হইয়া গেল। যেটুকু ইংরাজী জানি, যদি নার্ভাস না হই, তাহা হইলে বেশ একপ্রকার বলিতে পারি। কিন্তু নার্ভাসনেস্ আর যাইতেছে না। অদ্যকার বক্তৃতা আমার সন্তোষজনক হইল না। কিন্তু অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। দুর্গামোহনবাবুও বলিলেন, অনেক জায়গায় Repetition হইয়াছে। বিচিত্র নয়। পার্বতীবাবু বলিলেন, figurative language যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

সন্ধ্যার সময় ব্যারাকপুরের Zenana Mission-এর Ladyটির সহিত কিছু কথা-বার্তা হইল। আমি ব্রাহ্মসমাজেরই উন্নতির আশাতে ইংলণ্ডে যাইতেছি, এটা তাঁহার ভাল লাগিল না। আমাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, আপনি প্রভু যীশুখৃষ্টকে না ধরিলে শান্তি পাইবেন না। আমি উত্তর করিলাম, যিনি আমাকে এতদূরে আনিয়াছেন, আমার কল্যাণের জন্য যেখানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক, তিনিই লইয়া যাইবেন।

দেখিতেছি, মিশনারি ভাবাপন্ন লোকের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা করা ভারি মুশকিল। সকল চিন্তার অগ্রে ইঁহাদের এই চিন্তার উদয় হয়, ইহাকে শিকার পাকড়ান যায় কিনা। এই ভাবের উপরে যে আলাপাদি হয়, তাহা কখনই প্রীতিজনক হইতে পারে না। আমিও ত মিশনারি, আমি কি এইভাবে লোকের সহিত মিশি? প্রচার সম্বন্ধে দেখিয়াছি—প্রচার করিব বলিয়া প্রচার করিয়া যত উপকার না হয়, চরিত্রের অদৃশ্য প্রভাবে ততোধিক কার্য হয়। ধর্ম-ভাবকে জীবনে পরিণত করিতে হইবে। তাহা ত এখনও করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের সেবক সেই, যাহাকে দেখিলে ঈশ্বরকে স্মরণ হয়। রাত্রে স্টপফোর্ড ব্রুক(১)-এর ইটারন্যাল পানিশমেণ্ট সম্বন্ধীয় সারমনটি পড়িব মনে করিলাম, কিন্তু খানিকটা না পড়িতে পড়িতে নিদ্রাকর্ষণ হইল; শয়ন করিতে গেলাম।

১১ই মে, শুক্রবার

অদ্য প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পোশাক পরিয়া ডেকে গিয়া দেখি, দূরে হইতে ফ্রান্সের পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে এবং দূরে মার্সেলিস নগর ধু ধু করিতেছে। চক্ষে দূরবীণ লাগাইলে উক্ত শহরের হর্ম্য-শ্রেণী, গিরিশৃঙ্গবর্তী রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং বহুসংখ্যক কলের চোঙ দৃষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে জাহাজ মার্সেলিস বন্দরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বন্দর জাহাজে জাহাজে ছয়লাপ। কত বোট, কত জাহাজ, কত স্টীমার!

আমরা সত্বর প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া শহর দেখিবার জন্য নামিয়া গেলাম। কুকের ইণ্টারপ্রিটারদিগের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। সে ব্যক্তি আমাদিগকে সমুদয় দেখাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা তিনজন ও আর একজন ইংরেজ—এই চারিজন একত্র যাওয়া গেল। প্রথমেই দেখি, ঘোড়াতে মালের গাড়ি টানে। ক্রমে শহরে গিয়া প্রবিষ্ট হইলাম। রাস্তাগুলি যেমন বিস্তীর্ণ তেমনি পরিষ্কার। দুই পাশে ৩।৪ তলা বাড়ি, বাড়িগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোকানগুলি ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সাজান। প্রত্যেকটিই যেন কলিকাতার উইলসেন হোটেলের ন্যায়। রাস্তা দিয়া পুরুষ স্ত্রীলোক দলে দলে চলিয়াছে, সকলেরই বেশভূষা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ফরাসী জাতির সৌন্দর্যপ্রিয়তার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গেল। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমুদয় বস্তু, সমুদয় ব্যাপার সুন্দর। প্রথমেই ব্যাংকে যাওয়া গেল। স্থানটি পরিষ্কার, সুন্দর। সেখান হইতে জুলোজিক্যাল গার্ডেন-এ যাওয়া গেল। সেখানে একটি জলপ্রপাত আছে। তাহাতেই বা কি কারি-গরি করিয়াছে! কি সব মূর্তি পাথরে খুদিয়াছে! এই স্থানটি মার্সেলিস নগরে একটি প্রধান ও সুরম্য দৃশ্য। এখানে যে চিত্রশালা আছে, তাহার ন্যায় চিত্রশালা ইতিপূর্বে দেখি নাই। কি সুন্দর-সুন্দর ছবি! র‍্যাফেল প্রভৃতি অনেক জগদ্বিখ্যাত চিত্রকরের ছবি এখানে বিদ্যমান আছে। M. Thiers(২)-এর প্রস্তর খোদিত এক মূর্তি এখানে দেখিলাম। তৎপরে Zoo-তে ভ্রমণ করা গেল। এখানে আমাদের দেশের অনেক পাখী ও জন্তু দেখা গেল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া মিউজিয়মে যাওয়া গেল। সেখানে বিস্ময়জনক বস্তুর

---

(১) বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান পাদরি।

(২) বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাজ-নৈতিক নেতা।

মধ্যে Egyptian Mummy কতকগুলি দেখিলাম। তৎপরে একটি হোটেলে গিয়া টিফিন খাওয়া গেল। সর্বনেশে খরচ! সেখান হইতে Palais Crystal দেখিতে যাওয়া গেল। এটি রংগালয়, চতুর্দিকে আয়না মণ্ডিত। ভিতরটি চমৎকাররূপে সুসজ্জিত। শুনিলাম, অদ্য রাত্রেই সেখানে অভিনয় হইবে।

তৎপরে একটি স্থানে অনেকক্ষণ বেড়ান গেল। সে স্থানটি শহরের লোকের বেড়াইবার জন্যই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানটির দুধার দিয়া রাস্তা, তাহাতে নিরন্তর ট্রাম, ওমনিবাস, ঘোড়ার ছক্কড় চলিয়াছে, মধ্যস্থানটি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ছায়া-যুক্ত, মধ্যে মধ্যে বসিবার বেঞ্চ ও চেয়ার প্রভৃতি আছে। তাহাতে দলে দলে লোক বসিয়া রহিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় লোকেরা গল্পগাছা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার লোকের বিশেষত্ব একটি দেখিতেছি, সকলেরই মুখ গোল ও চেপ্টা। Ejaelic race-এর এটাই বোধ হয় বিশেষ লক্ষণ। রমণীদিগের মধ্যে অনেকে বেশ সুন্দরী, এবং একজন নিখুঁত। তৎপরে আমরা রেলওয়ে স্টেশনে কাগজ কিনিতে গেলাম। স্টেশন ও গাড়ি দেখিয়া গরীবের পাড়া দেখিতে গেলাম। স্ত্রীলোকেরা কাপড় কাচিতেছে। কাপড়গুলো কাদা ধুলা মাখা; গলিতে দুর্গন্ধ দাঁড়াইবার যো নাই; শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে হইল। সে স্থান অতিক্রম করিয়া একটা Basket কিনিয়া ৬টার সময় জাহাজে আসা গেল। আজ দুর্গামোহনবাবুর ঠাকুর শ্রাদ্ধ হইল।

স্টীমারে আসিয়া দেখি, কয়লা তোলা হইতেছে। এই কয়লা তোলা একটি বড় জঞ্জাল। কয়লার ধুলাতে স্টীমার ধুলাময় হইয়া যায়, নড়া চড়া কষ্টকর, ক্যাবিনে যাতায়াত করা কঠিন, ক্যাবিনের দরজা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেয়। আজিকার কয়লা তোলা শেষ করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি আমার ক্যাবিন-এর মাথাতে খট্ খট্ ধুপ ধাপ, ভাল করিয়া ঘুম হইল না।

১২ই মে, শনিবার

আমরা অদ্য প্রাতে আমার দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অদ্যকার দিনের বিশেষ ঘটনার মধ্যে প্রথমে চীন সম্বন্ধে রেভাঃ মিঃ ক্লার্ক-এর বক্তৃতা; চীন-এর বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া গেল। যাহা শুনা গেল, তাহাতে বোধ হইল যে, হিন্দুদিগের ন্যায় চীনাদিগেরও ভূতকালের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি এবং সেই জন্যই তাহাদের উন্নতি হয় না। তাহাদের সাহিত্য প্রাচীনকালের সাহিত্য; তাহাদের আইন প্রাচীনকালের আইন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাহারা পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করে। হিন্দুদিগের ন্যায় পুত্রের উপরে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। পিতৃপুরুষের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি ও বিদেশীয়দিগের প্রতি অতিরিক্ত ঘৃণা, এই দুইটি জাতীয় ভাব বিদ্যমান থাকাতে চীনবাসিগণ বর্তমান উন্নতির অংশী হইতে পারিতেছে না। সভ্য জগতের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বসকল, তাহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও উক্ত উভয় কারণ বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ও ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হইয়া উক্ত উভয় ভাবকে ক্রমে শিথিল করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ উক্ত উভয় ভাব ভগ্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে।

অদ্যকার আর একটি প্রধান ঘটনা এই, মার্সেলিস হইতে ডব্লিউ এফ হার্স্ট নামে একজন ইংরেজ সস্ত্রীক আসিয়াছেন। পরি[illegible] গেল, ইনি একজন Theist;
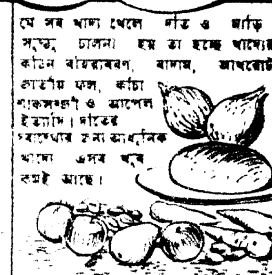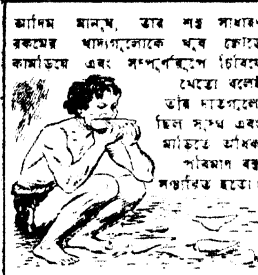
v. Voysey-র Church (৩)-এর ন বহুদিনের সভ্য। ইঁহার ও ইঁহার র সহিত ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে অনেক কথা। ও ভয়সীর কাব্যের বিষয়েও অনেক বার্তা হইল। কথাবার্তাতে বোধ হইল, ণ্ডে Theistic movement-এর নীশক্তি নাই, Organisation নাই, র কাজে উদ্যোগ নাই। আমার বোধ তেছে, ইংলণ্ডের থীইস্টগণ কেবল ষ্টধর্মের ভ্রম প্রদর্শন লইয়া ব্যস্ত ছেন; থীইজম্-এর সৌন্দর্য লোকের য়ে মুদ্রিত করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। জন্য ইঁহাদের দলে লোক দাঁড়ায় না। নাইটি নাই, ধর্ম শিক্ষার উপায় নাই, ডে স্কুল নাই। একদিকে থীইজম-এর শা শুনিয়া যেমন দুঃখ হইল, অপর-ক Spurgeon-এর (৪) কাব্যের বিবরণ নয়া প্রাণ খুবই আনন্দিত হইল। আমি টকে বলিলাম, যদি থীইজম্ সত্য হয়, । অর্গানাইজ করিব না, কেন ইহা দুর্বল কবে? বোধ হইল, আমার কথাগুলি ট-এর প্রাণে লাগিল। তিনি আমাকে লেন, 'আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া টা কিছু করিব। আমার কন্যা দুইটিকে য়া তুমি কার্য আরম্ভ করিতে পার।' কটি বুদ্ধিমান এবং কার্যক্ষম; উদ্ভাবনী ও আছে। যেই আমার কথাগুলি মনে গল, অমনি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন, রূপে থীইজমকে অর্গানাইজ করা যায়। est End of London-এ একটি চাপেল ভাড়া করিয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। ভাড়া ধরা হইল—বছরে ১০০ পাউন্ড, অর্থাৎ আমাদের ১৪০০ টাকা। বাবাঃ, এসব দেশে সকল বিষয়েই কি ব্যয়বাহুল্য!

১৩ই মে রবিবার

আজ বিশেষ ঘটনা কিছু নাই। সারাদিন মিঃ হাণ্টের সঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্তাতে যাপন করা গেল।

১৪ই মে সোমবার

আজ প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর উপাসনা করিলাম। আজ রজনী প্রভাত না হইতেই স্পেনের উপকূলভাগ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে সাড়ে নয়টার সময় আসিয়া জিব্রাল্টারে পৌঁছিলাম। জিব্রাল্টার দুর্গ অতি সুরক্ষিত, অত্যুচ্চ পাহাড় ও সুরম্য নগরী—উভয়ে এই স্থানের আশ্চর্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমাদের তীরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না। মিঃ হাণ্ট ও তাঁহার পত্নী এখানে নামিয়া গেলেন।

আজিকার দিনে মনটা বড় উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাতঃকাল হইতে ডিম-পাড়া মুরগীর ন্যায় যেখানে সেখানে বসিতে চাহিতেছে, কিন্তু স্টীমারে গোলমাল। "তুমি হে ভরসা মম" গানটি মনে ঘুরিতেছে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভরের মিষ্টতা মনে বড়ই লাগিতেছে। আজ কি ২রা জ্যৈষ্ঠ? জানি না। যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব করিব।

এদিকে আর বড় কাজ হইতেছে না। পড়াশুনা বা লেখাপড়া করিতে পারিতেছি না। যেন আমার মানসিক শক্তি খেলিতেছে না। ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই বুঝি মনটা খুলিতেছে না।

আজ বৈকালে আবার ক্লার্ক সাহেবের বক্তৃতা হইল। চীনের বিষয় আরও অনেক কথা বলিলেন।

১৫ই মে, মঙ্গলবার

আজ প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পার্বতীবাবুর ক্যাবিনে যাওয়া গেল। ক্রমে দুর্গামোহনবাবু আসিয়া জুটিলেন। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করা গেল। ব্রহ্মসঙ্গীত করিবার শক্তি নাই; তাল, মান, জ্ঞান নাই; তবু "কর তাঁর নাম গান", "এবে জাগ সকলে", "দয়ার সাগর পিতা", "তুমি নাহি দিলে দেখা", "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "তুমি একজন হৃদয়ের ধন"—এই গানগুলি করা গেল ও একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করা গেল। এই আমাদের উপাসনা। প্রার্থনাটি দুর্গামোহনবাবুর অনুরোধে হইল, আমার কেবল ব্রহ্মসঙ্গীতে উপাসনা করিবার ইচ্ছা ছিল। আহা, ব্রহ্মসঙ্গীত কি মিষ্ট লাগিল! হরিমোহন (৫), রজবাবু (৬), মহলানবীশ মহাশয় (৭) উপাসকমণ্ডলীর সকলকে স্মরণ হইতে লাগিল। এই পাষাণ চক্ষে অনেক জল পড়িল। অনেক দিনের পর প্রাণটা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। তাঁহার কৃপা ধন্য!

অদ্য বৈকালেও পার্বতীবাবুর ঘরে একটু সঙ্গীত করা গেল। তৎপূর্বে আমি একলা উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছি। রাত্রির উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত দশ বৎসরের কার্যবিবরণ যাহা লিখিয়া-ছিলাম, তাহা দুর্গামোহনবাবুকে পড়িয়া শুনাইলাম। শেষভাগে যেখানে বলিয়াছি—আমার মনে সম্ভ্রমের স্পৃহা নাই, সেখানে দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, "Humbug! মান-সম্ভ্রমের স্পৃহা কি মন্দ? কেন তাহা দমন করিব?"

পার্বতীবাবু বলিলেন, "যদিই দমন কর, বলিয়ো না,—মানুষে বিশ্বাস করিবে না।" পার্বতীবাবুর কথাগুলি বেশ লাগিল। আমি কিন্তু আপনার কথা বলিয়া ফেলি। আমার vanity ইহার কারণ। এই vanityটা আমার মন হইতে যাইতেছে না।

১৬ই মে, বুধবার

আমরা অদ্য প্রাতে Bay of Biscayতে আসিয়া পড়িয়াছি। এই বিস্কে উপসাগর উম্মত্ততার জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা তার কিছু পরিচয় পাইতেছি। এখন জাহাজ দুলিতেছে। অনেকের মাথা ঘুরিতেছে। পার্বতীবাবু শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাতে বেশ রৌদ্র ছিল। দুপুর বেলা হইতে মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া মহা অসুবিধা উপস্থিত করিয়াছে। ডেকে যাইবার যো নাই। আজ কোন বিশেষ কাজ করিতে পারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে লগেজ গুছাইতেছি।

১৭ই মে, বৃহস্পতিবার

অদ্য সমস্ত দিন দুর্যোগ; সর্বদা বৃষ্টি, তাহাতে আবার জাহাজ বিস্কে উপসাগরের মধ্যে। সমস্ত দিনটা কোন কাজ হইল না। আজ সন্ধ্যার সময় প্লিমাউথ-এ পৌঁছিবার কথা; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই কুয়াশা হওয়াতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। জাহাজ পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে নঙ্গর করিয়া পথের মধ্যেই রহিল।

(ক্রমশ)

---

(৩) একেশ্বরবাদী (Theist)-দিগের ভজনালয়।

(৪) C. H. Spurgeon—তৎকালীন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় সুবক্তা ও উদার মতাবলম্বী খৃষ্টীয় পাদরি।

(৫) পরলোকগত ব্রাহ্ম সুগায়ক হরিমোহন ঘোষাল।

(৬) ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায়—তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট গায়ক।

(৭) গুরুচরণ মহলানবীশ—বিশিষ্ট ব্রাহ্ম এবং অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের পিতামহ।

শিল্পের আবেগে

শ্রীবিষ্ণু দে

মনে হল প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগে
অমাবস্যা মধ্যরাতে একা জেগে জেগে
এবারে ভেঙেছি বুঝি মানুষের অসম্পূর্ণ সীমা,
আজ বুঝি পরিপূর্ণ গড়ে দেব তোমার প্রতিমা
এঁকে নেব পরম ভঙ্গিমা—
প্রশ্নের প্রতীক মাত্র সূর্যোদয়ে লেগে।

এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,
একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বওয়া যায়
অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার।

অসহ্য তাপের শীর্ষে বৃষ্টি দাও যে নটভৈরবে
তারই অন্তে দাও ইন্দ্রধনু,
ভাবি স্বর্গমর্ত্য বাঁধো এইবার মানববৈভবে,
রৌদ্রে সেই মুহূর্তে অতনু।

বাহুতে মেলে না তাকে, চোখের মণিতে
থেকে থেকে পড়ে শুধু ছায়া,
ভাবি তাকে বাঁধি কোন্ শিল্পের গণিতে
অধরাকে দিই নিজ কায়া!

এ আলাপ ঢোলকে পেটে না,
কথা তার অনির্বচনীয়,
এই কথা বলি গানে গানে।
মূর্তি তার কোনোই স্থানীয়
রঙে বেঁধে সাধ তো মেটে না
রূপের উদ্বৃত্ত কাঁদে প্রাণে।

সকল জনম ভরে কাঁদো কি? কাঁদাও মোরে
হায় ওরে দরদিয়া!
একি ঘোর আনন্দ আমার জীবনমৃত্যুতে একাকার—
কে যে কার দরদিয়া!

মনে হল কোজাগরী শশী পাশে আজ আমার প্রেয়সী,
কানাড়ার মূর্ছনার সুখে মুখ খুঁজি প্রেয়সীর মুখে,
রামকেলির বিলম্বিত লয়ে বাহু বাঁধি বাহুর আশ্রয়ে—
মুহূর্তেই আকাশে প্রেয়সী চিরন্তন প্রস্তরিত শশী॥

আলোচনা

"কবি সত্যেন্দ্রনাথ"

...শ' পত্রিকার ৯ই আষাঢ়ের সংখ্যায় ...ঞ্জুলা মিত্র লিখিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' ...ধ এমন কয়েকটি মন্তব্য লক্ষ্য ...ম যেগুলি কবির পত্নী শ্রীকনকলতা দেবীর ...ধে অতি অশোভন ব্যক্তিগত আক্রমণ মাত্র।—...মি কবিপত্নী শ্রীকনকলতা দেবীর সঙ্গে ...নিষ্ঠভাবে পরিচিত। কবিপত্নী বর্তমানে ...পুরে 'শমধাম' ভবনের নিভৃতে স্বামীর ...পূজা করে জীবনযাপন করছেন। প্রতি ...[illegible] আষাঢ় সেখানে কবির স্মৃতিপূজা ...ষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কপিল মঠের উদ্যোগে ..., গান ও পাঠ হয় এবং দরিদ্রনারায়ণের ...ও হয়। কবির ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী সেখানে ...রক্ষিত আছে। কবির স্বহস্তে রোপিত ...ন বৃক্ষের তলায় কবিপত্নী আজও প্রত্যহ ...্যাদীপ জ্বালেন। কবিপত্নীকে ভক্তিভরে ...ৃষ্টি করতে শুনেছি—"তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম অনির্বচনীয়; প্রণাম কবি হে পূজা কল্যাণ।"

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে শ্রীমঞ্জুলা মিত্র লিখেছেন—"সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীমতী কনকলতা দেবীর সঙ্গে পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেননি। তার প্রধান কারণ আত্মসংযম ও সহনশীলতার বলে তিনি নীরবে আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন।"

লেখিকা শ্রীমঞ্জুলা মিত্রের মন্তব্য শুধু অশিষ্ট নয়, সত্যের অপলাপও বটে। শ্রীমঞ্জুলা মিত্র হলেন কবির মামাতো ভাই এর কন্যা। আমি সন্ধান করে জেনেছি যে, কবি যখন মারা যান তখন কবির মামাতো ভাই এর বয়স বোধ হয় ১৬।১৭ বছরের বেশী ছিল না। কবির মৃত্যুর অনেক পরে লেখিকা শ্রীমঞ্জুলা মিত্র জন্মলাভ করেছেন। তাঁর পক্ষে বৃদ্ধা জেঠিমাতার বিবাহিত জীবনের দেহগত সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা ও মন্তব্য করা কত অশোভন অনধিকারচর্চা, তাই বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছি। তা ছাড়া, কথাগুলি যে আদৌ সত্য নয়। আজও বাংলা দেশে এমন অনেকে আছেন যাঁরা কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সেই তথ্যও জানেন যে, কেন কবি ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ হিসাবে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছিলেন। [illegible] নয়। এবং কবির সঙ্গে তাঁর পত্নীর প্রীতি-সম্পর্কের অভাব কোনদিন ঘটেনি। ১৩৩৫ সনে নববর্ষে কবিপত্নীর প্রতি কবির লেখা একটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করছি। কবি লিখছেন—

"নব বৎসর আমাদের নতুন শক্তি প্রদান করুক। আমরা যেন সকল রকম দুর্বলতা পরিহার করিতে পারি। নূতন বৎসর আমাদের নতুন পথে লইয়া যাক। ......আমরা সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতে চাই। কারণ আমাদের দুর্নীতি, স্নায়ু দুর্বল, আমাদের ভিতর উন্মত্ততা, মূর্খতা, স্বেচ্ছাচার রুগ্নতা প্রভৃতি দোষের বীজ বর্তমান। সুতরাং আমাদের সন্তানাদি না হওয়াই মঙ্গল। ......পূজার ফুল শুকাইলেও নির্মাল্যে পরিণত হয়। বিলাসীর উপভোগের ফুল রাত্রিশেষে পথের পঙ্কে পচিয়া থাকে। আমরা যেন শারীরিক সুখকেই চরম সুখ মনে না করি। আমরা যেন আত্মাকে মলিন না করি। ......এই নূতন বৎসরে পুনর্বার না ভুলিয়া যাই, [illegible] অন্তরের বাহিরের লোক [illegible] সকল সংসার [illegible] কেমন করিয়া, [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারের দ্বারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] সামান্য [illegible] পারি। [illegible] যেন আত্মবিস্মৃত না হই। ......"

[illegible] অনেক আত্মীয়ের বাড়ীতে [illegible] হয়েছেন, এখন কবি এই ভাষাতেই [illegible] দিয়েছেন।

শ্রীমঞ্জুলা মিত্র লিখেছেন যে, কবির জীবনের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার সময় "আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর মা আর আমার বাবা কবির কাছে থাকতেন। বন্ধুদের মধ্যে [illegible] ছিল চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অর্থাৎ কবির রোগশয্যায় এবং তাঁর অন্তিম-কালে কবিপত্নী কবির কাছে ছিলেন না, এই কথাই বলতে চেয়েছেন শ্রীমঞ্জুলা মিত্র। লেখিকার উক্তিতে [illegible] অবমাননা ঘটানো হয়েছে। কবির বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, [illegible] দেখতে যেতেন, তাঁরই লেখা থেকে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। কবির মৃত্যুর বছরে, সেই ১৩২৯ সালেরই প্রবাসী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা যখন তাঁকে ঔষধ পথ্য খাওয়াতে পারেনি, আমি তাঁকে অনুরোধ করাতেই হাসিমুখে বৃক্ষকরে আমার প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি নির্ভর ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার অনুরোধ পালন করেছেন। তাঁর অকাল [illegible] ও পতি-ব্রতা পত্নীর যে ক্ষতি তার যে তুলনা নেই।"

কবির রোগশয্যায় পতিব্রতা কবিপত্নী যে কবির কাছেই ছিলেন, তার প্রমাণ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য। কবির সবচেয়ে বড় সুহৃদ এবং প্রত্যক্ষদর্শী চারুচন্দ্রের কথা-গুলি কি মঞ্জুলা মিত্রের উক্তির ভয়ংকর অসত্যতা প্রমাণিত করছে না?

কবির শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে দেখে কবির আতঙ্ক ও রোগবৃদ্ধির যে গল্পটি লেখিকা লিখেছেন, সেটিও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অনুমান করছি, লেখিকা কতগুলি শোনা কথা লিখেছেন এবং সম্ভবতঃ কবিপত্নীর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করেন, এমন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেই এ-সব গল্প শুনে থাকবেন। ইতি

শ্রীঅমিতা ঘোষাল
কলিকাতা

॥ ১১ ॥

নিষিদ্ধ তিব্বত

সন্ন্যাসী বললেন, জ্বলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তার পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন, সেই আসনের আশেপাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।

প্রশ্ন করলুম, সে আচ্ছন্ন ভাবটি কেমন, মহারাজ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহচূর্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

পুরাকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কম্বোজ আর যবদ্বীপ, যেমন সুমাত্রা আর শ্রীলংকা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণদ্বীপ। তিব্বতকে সেই পুরাকালে বলা হোতো কিম্পুরুষখণ্ড, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি তো বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পুঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখণ্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পুরুষ-পর্বত। প্রতি তুষারচূড়ায় পুরুষোত্তম নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। পুরাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি একে একে ভারতের সীমানা-ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অঞ্চল থেকে,—বনস্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের আঘাতে যেমন ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলংকা, কম্বোজ, সিয়াম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ,—একে একে সবাই চ'লে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে ব্রহ্মদেশ,—এখনও পঁচিশ বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষতস্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। এমনি ক'রে যুগযুগান্তর ধ'রে ভারত ছোট হচ্ছে, সীমানা তার সংকুচিত হয়ে চলেছে। শুধু আনন্দের কথা এই,—ধর্মবোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের সঙ্গে ভারতের সমগোত্রিয়তা বর্তমান।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। তবে কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌদ্ধদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পারেনি? তবে কি আর্যজাতিদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্র ঘটেনি কোনওকালে? কে কাকে ত্যাগ করেছে?

হিমালয়ের উচ্চ প্রশ্নগুলির মধ্যে এর কোনো কোনওদিন মেলেনি। সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এত বড় রণক্ষেত্রও পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু সেই রণক্ষেত্র যোদ্ধা মর্ত্যবাদের, দর্শন-মন্ত্রের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপস্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খুঁজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দুর্গমে আর দারুণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে বলবীর আর কে আছে সংসারে? তারা নিঃশব্দে জয় করেছে মনুষ্যের শ্রদ্ধা, নিভৃতে নির্ণয় করেছে মানব সভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশ্নগুলির মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে ঊর্ধ্ব জ্ঞানের জগতে। বুদ্ধিকে নির্মল করেছে, সভ্যতাকে সুন্দর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন সহজ হয়নি। পথ দুঃসাধ্য বা'লে নয়, কিন্তু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থযাত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও সমাদৃত নয়। মৌর্যসাম্রাজ্যকালে, সিথিয়ান যুগে, বাকট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমুদ্রগুপ্ত-স্কন্দগুপ্তের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমান্তে 'জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে-পঞ্চধাতুনির্মিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটি পবিত্রতম ব'লে পূজিত হয়, সেই মূর্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালেই মগধে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং মুসলমান আক্রমণকালে চীন সম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃত[illegible] উপহার [illegible] কন্যার সহিত [illegible] হয়, সেই সময়ে বধূ[illegible] এই মূর্তিটি তিব্বতে আনেন। সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা ক[illegible] এই মূর্তিটি স্থাপিত করেন।

বুঝতে পারা যায় ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুসলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ - ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভুত্ব লাভ করেছিল,—কিন্তু এদের থেকে গোঁড়া বৌদ্ধ-তিব্বত একান্তে স'রে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এতকাল ধ'রে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সঙ্গে পর্যটককেও সরিয়ে রেখেছে যুগের পর যুগ। তিব্বত হয়ে গেল নিষিদ্ধ।

ওরা নাকি পৃথিবীর একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ওদের দেশব্যাপী গ্রন্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ পুঁথি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জানে পৃথিবীর পরিণাম, সভ্যতার আদি অন্ত ইতিহাস। হিমালয়ের ওপারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ষোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়।

পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার বছরে শত শত রাজ্যের ‍া এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রূক্ষেপ । চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কি-এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় বিপ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তাদেরকে গ্রাহ্য করেনি। ওরা চিরকাল পুঁথি পড়েছে আর মন্ত্র জপেছে; 'মণিচক্র' ঘুরিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির দ্বারা টুকরো টুকরো ক'রে কাটে, এবং শৃগাল-শকুনি আর কুকুর যখন সেগুলি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে।

চীন ওদের উপর গায়ের জোরে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢুকে তম্বি করেছে, তাই ওদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় কষাকষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেও চায়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের দেশে, সাহেব না ঢোকে, মুসলমান-ছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধুনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। তিব্বতের ঘৃণা বয়ে বেড়ালো সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহ্রদ। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশূন্য। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মাত্র সাতজনের বেশি মানুষ নেই। খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না,—ক্ষুধার্ত তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র সৃজন করেছে অরণ্য, শস্যক্ষেত্র আর নিম্নভূমি। বালুপাথরে, কাঁকরে, লবণে, সোডায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালিবনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম, এবং হিংস্রতা। পূর্ব তিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের স্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার পোটালা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘুরেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজও ঘুরছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ির চাকা কখনও ঘোরেনি তিব্বতে। আজ সভ্যতার ধাক্কা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তারা গাড়ি চালাতে চায় তিব্বতে, তারা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মানবতার দাবিকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাবার জন্য তারা সৈন্য-সামন্ত এনে ফেলেছে এই দুস্তর ভূখণ্ডে। এবার হয়ত কলের এবং কালের চাকা ঘুরবে!

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা বৃথা। সেখানে আছে নুন, দামী পাথর, ভূগর্ভের স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবসতির এখানে ওখানে আদিমকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুম্ফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রখর সূর্যে, নির্মল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমজ্জী প্রাকৃতিক চটুলতায়, আকাশের অত্যুগ্র নীলিমায়,—তিব্বত অপার্থিব রহস্যে আচ্ছন্ন। উত্তরে তার আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মরুভূমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচূড়া,—ধবলগিরি, মুক্তিনাথ, মানসলু, গোসাঁইথান,

গৌরীশঙ্কর, এভারেস্ট, মাঁকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুনরি, চলমহরি—এমনি আরো অনেক। এই সব চূড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী—এরা তিব্বতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে বলশালী ক'রে তুলেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে পৃথক ক'রে রেখেছে কারাকোরাম, লাডাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাস পর্বতশ্রেণী নেপাল সীমানা অবধি চ'লে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজ-দূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাংলা দেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণ-মালা তিনি নিয়ে যান তিব্বতে। সংরক্ষণ-শীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটু আধটু চেহারার অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাংলার সঙ্গে তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চ'লে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শান্তরক্ষিত' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা-লাভ ক'রে তিব্বতে যান, এবং তৎকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতী মঠের মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গৌরব আজও আছে তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকে আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়ে গৌতম বুদ্ধের মতোই তাঁকে পূজা করে। অতঃপর বাংলা দেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধ পণ্ডিত যান তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাই নয়, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ছিল ব'লেই সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দু দর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌদ্ধ দর্শন—একথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। গৌতম বুদ্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দু ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপুরুষের কথা ওঠে, তিনিও বাঙালী। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ব-বঙ্গ,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আচার্য শঙ্করের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দীপঙ্করও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তৎকালে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান এবং বৌদ্ধদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশুদ্ধ 'মহাজান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তান্ত্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে 'কদম্‌পা' নামক একটি নূতন লামা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাবধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপঙ্কর তেরো বৎসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রদ্ধেয় এবং পূজ্য। বুদ্ধের পরেই তিনি বোধি-সত্ত্বস্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মূর্তিপূজা করে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধি মন্দির। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাস্ত্র, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যেকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে তিব্বতীদের কিছু কিছু যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক-ভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজশক্তির সহায়তার

এবং ভারতে বিধর্মীর প্রভুত্ব—
কে হারাবার মূলে এই কারণ দুটি
দূরে স'রে গেল, তা'রা অদৃশ্য-
মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সংগে
তা ঘুচে গেল।

দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র
তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ
পেয়েছিলেন। তাঁর নাম টমাস
। অতি অল্পকালের জন্য তিনি
থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু
কানও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তার
তেত্রিশ বছর পরে দু'জন ফরাসী
রী লাসায় স্বল্পকালের জন্য প্রবেশ
সমর্থ হয়েছিলেন, তারাও কোনো
রেখে যাননি। আত্মাভিমানী
দের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন
অবধি ধূমায়িত হতে থাকে। এদিকে
ভারতের উপরে ইংরেজদের প্রভুত্ব তিব্বতের
চক্ষুশূল ছিল, এবং যাদের সাহায্যে ইংরেজ
ভারত সাম্রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা চালাচ্ছিল,—
সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের
প্রবল বিরাগ ছিল। কিন্তু তিব্বতের সংগে
ভারতের এমন কোনও বিষয়ে যোগা-
যোগ ছিল না, যার জন্য বৃটিশ ভারত
গভর্নমেণ্টের সংগে তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া
চলতে পারে। এ ছাড়া, আরেকটি কারণ
ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে
গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খা-
দের সংগে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ
সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট
পরাজিত হয়। পুনরায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে
নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে,
এবং বহুলোকের ধারণা, এর মধ্যে ইংরেজের
উস্কানি ছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং
নিয়মিত 'ক্ষতিপূরণ' অর্থাৎ নমস্কারী
পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত
ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু
ভিতরে ভিতরে জ্বালা করে তা'র মন।

শোনা যায়, উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা
রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করে-
ছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার
জানা নেই। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯
খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসম-
সাহসিক শিক্ষক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর
এক 'লামা বন্ধুর' সহায়তায় তিব্বত
প্রবেশের অধিকার পান। শরৎচন্দ্রের এই
অভিযানের পিছনে ভারত গভর্নমেণ্টের
সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপথের
পরিমাপ করবেন, এবং খোঁজখবর আনবেন—
এই ছিল শর্ত। তাঁর সংগে ছিলেন আরও

দুজন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবাল্ড উইলিয়ামস্ বলছেন,

"These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expedition of Kishen Singh .. who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West....and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey in considered to be very accurate."

বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই ছদ্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিব্বত ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এনেছিলেন তিব্বতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয় মাস কাল তিব্বতের অন্যতম 'তাশিলহুনপো'তে সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং নানাজাতীয় গ্রন্থের তাঁর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর সঙ্গে পানচেন্ লামার প্রধান মন্ত্রী-পুরোহিতের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি আবার তিব্বতে যান। এবার তিনি লাসায় উপস্থিত হন। শুধু লাসা নয় [illegible] বছরের মধ্যে তিনি বিভিন্ন তিব্বতীয় শহর ভ্রমণ করে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিব্বতের কর্তৃপক্ষ দুর্ভাগ্যক্রমেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য একটুও জানতে পারেননি। রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক এবং ব্যবসায়িক, সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ঝুলিতে ভ'রে এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁকে এক বিশেষ উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি' নিকট থেকে তিনি অর্থসাহায্যও পান। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে, 'তাশিলহুনপো' থেকে ভারত প্রবেশের পথে, সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা 'পানচেন্ লামার' প্রধান মন্ত্রী-পুরোহিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'সিনচেন্ লামাকে' গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান। এই কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তবু এখানে সংক্ষেপে সেটুকু বললে বেমানান হবে না। 'সিনচেন্' লামাকে গ্রেপ্তার করে কুমারগড়োয় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাবুক মারতে-মারতে হাত দুখানা পিঠের দিকে বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের তুষার গলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিনচেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি আরও বীভৎস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি করে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হননি, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষুও উপড়ে ফেলা হয়েছিল। এখানে থাকে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'সিনচেন'ও জানতেন না! শুধু এরা নয়, আরও অনেকে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর 'শাস্তিভোগ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে যান—"Narrative of a journey to Lhasa."

এই ঘটনার পনেরো বছর পরে সুইডেনের জগৎপ্রসিদ্ধ অভিযানকারী ডাঃ সোয়েন হেডিন্ মধ্যএশিয়ার তাকলামাকান মরুভূমি পেরিয়ে তিব্বতে ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তৎকালীন দলাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সসম্মানে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খৃঃ) এবং লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অল্পকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়।

তিব্বত এককালে নামেমাত্র চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতা স্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারটুকু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবধি হিংসার আশ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত পাছে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন-সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অবরোধ করে। এর কারণ ছিল। কম্যুনিস্ট চীন নেহরু-গভর্নমেণ্টকে প্রথমদিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদন করে নেহরু-গভর্নমেণ্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গত (Tibet region of China) বলে

ক'রে নিলেন, সেইদিন থেকেই ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় ত্রিশ বছর পরে চীন পুনরায় র উপর তার দখল ফিরে পেলো। কার আলোচনাটুকু শেষ করি।

শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে পুঙ্খ বিবরণগুলি তৎকালীন ভারতের অধিনায়ক লর্ড কার্জন জাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র-বর্ণিত পথঘাট দিয়েই তিব্বত অভিযান করেন, এবং তিব্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদু আক্রমণের নিকট পরাজিত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কাইচুর তীর ধ'রে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত, তীর্থ-কেন্দ্রিক ব'লেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গ-প্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ ব'লে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নয়, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর বাসস্থান,—যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি মোগল শব্দ,—উৎপত্তি বোধ করি মঙ্গোলীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। যেমন হলেন রোমের পোপ, যেমন জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি, ভারতের শঙ্করাচার্য ইত্যাদি। কিন্তু এ'দের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনোটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্ত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু অঞ্চল এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালু আছে। ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিত সম্মতি দান করেননি ব'লে অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে বিবাহ করতে হয়েছিল; গির্জার সম্মতি না থাকার জন্য এই সেদিন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হোলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধ্যযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের স্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশ শো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব ছিল। সেই রাজার কুমার হেলিয়োডোরাস মালোয়া রাজ্যে আসেন হস্তী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ার বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধবিকা সখীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন। তরুণ সুদর্শন হেলিয়োডোরাস মাধবিকাকে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হন, এবং রাজকুমারকে দেখে মাধবিকাও অভিভূত হন। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভয়ের বৈবাহিক মিলন ঘটেছিল।

একশো বছর ধ'রে গির্জাতন্ত্রী ইংরেজ সমস্ত পৃথিবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হোলো যোগী ফকির, মারণ-উচাটন, যাদু-ভোজবাজি, বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতকিমাকার রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতী মেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয় ন্যাংটা সন্ন্যাসী, লতাপাতার সঙ্গে গোবর খায় দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপুড়ে, এবং নাগা ফকিররা 'শিরাসন' ক'রে ঠ্যাং দুখানা শূন্যে তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তা'রা বলেনি,—উল্কির ছাপ সর্বাঙ্গে মুদ্রিত ক'রে ইংরেজ নরনারী অর্ধনগ্ন চেহারায় নর্মাণ্ডির তীরে-তীরে নৌকা নিয়ে যখন 'বোম্বেটে' হয়ে ঘুরে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানবাত্মার অবারিত মুক্তি-

সাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বসিনি, কিন্তু এ কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় পাই, একটি বৌদ্ধমঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্ত্রিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেষ্টা প্রধান। সোয়েন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভ্য' হতে চাইনে, কারণ 'সভ্য' জগতকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইনে। দয়া ক'রে একা থাকতে দাও।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথার এখানে পুনরুক্তি করি। "তিব্বতের পথে ঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বুদ্ধমূর্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়—এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠাণ্ডা গুহাগহ্বরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষু লুক্কায়িত।"

'জো-খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরৎচন্দ্র বলছেন, আড়াই হাজার বছর হ'তে চললো মন্দির। পুরাতন কালের মোহাচ্ছন্নকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তার ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগুলি অদ্ভুতভাবে চিত্রাঙ্কিত। পূজার স্বর্ণপাত্রগুলি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধূমোজ্জ শিখার আভায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একদা কোনও এক অপরাহ্নে ইয়ংহাসব্যাণ্ড এই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান। এখানে বলে রাখি, ইয়ংহাসব্যাণ্ড যদিও সমর-অধিনায়ক ছিলেন, তবু তিনি ছিলেন ভগবৎভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধুনিককালের যোগীশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ রক্ষা ক'রে যোগনিমীলিত হন, সেই সংবাদের পর সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি-সমিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সার ফ্রান্সিস মাত্র কিছুকাল আগে বৃদ্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন।

সার ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেদীপ্যমান। মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে আমি উদার উদাত্ত গম্ভীর ডম্বরুর গুরু-গুরুধ্বনি শুনলাম,—তারই সঙ্গে পূজারী-গণের করুণ মধুর এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দূরদূরান্তরের শঙ্খঘণ্টারব! দেখলাম, ভক্তিনম্র অনুরাগের ভাবাবিষ্ট বিহ্বলতা! সহসা আমারও সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করি, এই অপরূপ দৈবপ্রেরণার উৎস।......তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারবিহীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মানুষ কোথাও স্বীকৃত নয়। এমন কোনও মানুষ তিব্বতে শ্রদ্ধালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মগত নয়। বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে একবার দেখে নিতুম সেই দেশকে, যেখানে মানুষ অবিশ্রান্ত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে বুদ্ধ-ভগবানকে,—কিন্তু মানুষের নারায়ণ যেখানে শ্রদ্ধালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহুল্য, অস্থির ক্ষুধায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানায় গিরিসঙ্কটে, কুলুতে, কিন্নরে, জোজিলায়,—কতবার ঘাড় উঁচু ক'রে তাকে দেখবার চেষ্টা ক'রেছি। সিকিমে, ভূটানে, কুমায়ুনে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজস্র। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগৎ—যেখানে পিশাচ-লোকের দেবতাও পূজ্য,—কিন্তু গণদেবতা আরাধ্য নয়!

মনে প'ড়ে গেল একশো বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। মহারাজা গুলাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে-আক্রমণ নৃশংস—তার মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গুম্ফা মন্দির জনপদ—কোনও কিছুকে ক্ষমা করেননি। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাস প্রখ্যাত জোরোয়ার সিং। ধ্বংসের পর ধ্বংস,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল

পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। জোরোয়ারের নির্মম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত ওরফে 'লাডাখ' এলো ভারতের মধ্যে। কিন্তু জোরোয়ারের উপরে ভাগ্যের বিদ্রূপ সঞ্চিত ছিল। পরের বছর বিজয়ী জোরোয়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তীর্থাপুরী' থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকোটে'। সেখানে তাঁর ক্যাপ্টেনের জিম্মায় সৈন্যদলকে রেখে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাখতে গেলেন 'গারটকে'। ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জোরোয়ারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। জোরোয়ারের অতিমানবিক শক্তি ও যুদ্ধপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক্ এবং তিব্বতীদের ধারণা—জোরোয়ার একজন তান্ত্রিক যাদুকর,—পিশাচসিদ্ধ! ওরা সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গুলীবিদ্ধ করে মারে। সে-গুলীটি সিসার নয়, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে টুকরো টুকরো ক'রে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসখণ্ড নিয়ে তারই স্মৃতিফলক ও সমাধিমন্দির নির্মাণ করে। আজও 'শিপ্‌চিলিং' ও 'শাকা গুম্ফায়' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ টুকরো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অসুর' ব'লেই তিব্বতে শ্রদ্ধেয়।

এই ঘটনার তেষট্টি বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যাণ্ড পূর্ব তিব্বত আক্রমণ করেন—একটু আগে যেকথা বলেছি। সেই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা 'পোটালা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান। অতঃপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দখল' (suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। পঁয়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। চীন পুনরায় এসে তিব্বতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুক্তি নাকচ ক'রে নেহরু গভর্নমেণ্ট ইয়াটুং, গেয়ানৎসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলিসহ সৈন্যরক্ষা ব্যবস্থাও প্রত্যাহার ক'রে নেন।

মাত্র পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল,—১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গত 'কারগিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দস্যু চৈনিক তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস-সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রসিদ্ধ মঠ তাদের হাতে লুণ্ঠিত হয় এবং তীর্থাপারী গুম্ফা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভারতীয় অধ্যপ্রদেশী সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশব্যাপী লুটতরাজের পরে দস্যুদল যখন লাডাখে পৌঁছয় তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লাখেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার ঝব্বু, দুহাজার ঘোড়া ও অশ্বতর, পাঁচশত রাইফেল ও বন্দুক; হাজার হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ, অলংকারাদি, মণিরত্নাদি এবং সোনা রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা।" তারা লাডাখের সীমানায় এসে পৌঁছলে কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট তাদেরকে নিরস্ত্র করে ভারতে প্রবেশে অনুমতি দেন। তৎকালে বৃটিশ-রুশ মৈত্রী চুক্তি বলবৎ থাকায় বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট সীমান্তের 'হাজারা' জেলা তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ করেন, এমন কি তাদের জন্য খরচপত্রেরও দায়িত্ব নেন। কিন্তু তৎকালে দুটি 'ঘরের শত্রু' ছিল ভারতে—তারা হায়দরাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তাঁরা উক্ত দস্যুদলকে আপন আপন অঞ্চলে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান ব'লে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাডাখ। বৌদ্ধ-হিন্দু সম্রাট ললিতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য-এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাখসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। সেটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত মুসলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মাত্র লাডাখ ভারতের সীমানাভুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমি প্রদেশ হলো লাডাখ। এর উচ্চতা অনেকস্থলেই পনেরো ষোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতী। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মসংস্কারে তিব্বতের সঙ্গে লাডাখের পার্থক্য কম।

লাডাখ হলো উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্য ভূভাগ—যেটি মূলে হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবর্তী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লাডাখের দক্ষিণ সীমানা অনির্দিষ্ট। শিপকির গিরিসংকটে রংচুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়ত বা তিব্বতের এলাকা—যেটি কারাকোরাম পাস গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্তু রুম্পল, হানলে, দোমেজ ও রংচুং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্নেল ক্যানিংহাম ভারতের প্রথম জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমাপটির অদ্যাবধি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা এবং ভারত গভর্নমেণ্টের এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ তথা উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের দ্বারা অবরুদ্ধ। এর মধ্যে পড়েছে স্কার্দু, বাল্তিস্তান, রাকাপোশি, হুনজা, গিলগিট, দারেল, টাংগির, সোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিরাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদী-প্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি; অসংখ্য হিমাঙ্গ এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট-বড় পার্বত্য জনপদ এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌদ্ধ ও হিন্দু-কীর্তির অগণিত ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। উত্তর লাডাখের বাল্তিস্তান উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল আবহমানকাল থেকে হিমবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। পৃথিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশৃঙ্গের দক্ষিণ বাহিনী নদীগুলি তুষারস্তূপে পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্য-এশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসের অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলশ্রেণীর ক্রোড়-ভূভাগে শত শত মাইল অবধি বিপুল পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাটুরা, চোগো ইত্যাদি বিশালকায় দেশ-জোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে ভিতরে একেকটি তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বিত শিখর-লোক এবং তাদের প্রত্যেকটি কারা-কোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুষিত মনুষ্যপদচিহ্নহীন হিম-প্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অধ্যাপক 'দেশিয়োর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অস্টিনের' শিখরে (২৮,২৫০ ফিট) আরোহণ করতে সমর্থ হন। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান-অবরুদ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্ধুনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। 'স্কার্দু' অঞ্চল থেকে তার আরম্ভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে 'অর্ণব' অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তার শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার সুনির্দিষ্ট জরীপ আজও অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হলো একটি অতিপ্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাখ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধুর সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্-হিন্দুস্থান-পথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্কির ভিতর দিয়ে। পূর্বপথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সোনার খনি 'থোক্ জালুং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগুলি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে ষোল হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চলে গেছে। একথাগুলি হিমাচল শিমলা ও কিন্নরের আলোচনায় পূর্বে বলে এসেছি।

মানস সরোবর। সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবতপ্তা'—আবার কোথাও এর নাম 'পদ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া। পরমাশ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণকমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল করে উঠেছে তীর্থযাত্রীর অশ্রুসজল দৃষ্টিতে। কৈলাসের চূড়ায় আদিঅন্তহীন কাল বসে রয়েছেন 'বজ্র-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাকলাকোটের পথ ধরে গেলে কুড়ি মাইল দূরে থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় আলোক-বৈচিত্র্যবর্ণা মানস ও রাবণ সরোবরের ঊর্মিতরঙ্গায়িত জল ঝলমল করে ওঠে,—তার প্রখর স্বচ্ছতার মধ্যে বজ্র-বরাহী কৈলাসের ধবল-মুকুট প্রতিবিম্বিত। ভূ-পৃষ্ঠের ইতিহাস কত লক্ষ বছরের জানিনে কিন্তু তারও আগে প্রথম আবিষ্কৃত হ্রদ হোলো মানস—যেখান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণপক্ষ বিস্তার করে অনন্ত নীলিমায় বলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মানুষের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রথম মানববংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রাক্তন কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হ্রদ হলো মানসসরোবর। হিন্দুপুরাণে মানস প্রসিদ্ধ। বস্তুত সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হ্রদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানস সরোবর মানবজাতির নিকট যশোলাভ করে। ইতিহাসের ঊষাকালেরও পূর্বে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এইভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বৎসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তর-পূর্বে দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শারদা, কালী ও ধওলীগঙ্গার তীরে তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধারচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে 'গার্বিয়াং' নামক উপত্যকায় পৌঁছতে হয়। এখান থেকে তুষার সীমানা ও দুঃসাধ্য চড়াই আরম্ভ। গার্বিয়াং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট ত্রিশ মাইল। প্রায় আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে (সমুদ্রসমতা থেকে) লিপুলেক গিরিসংকটে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনন্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ এবং উত্তরে 'রৌপ্যমণ্ডিত' শুভ্রতুষারাবৃত তিব্বতের গিরিশৃঙ্গদল উজ্জ্বলনন্ত নীলিমার নীচে প্রখর সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস-সরোবরের দূরত্ব হোলো দুশো চল্লিশ মাইল এবং লাসা নগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিনপোচে'। মানসসরোবর সমুদ্র-সমতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়ান্ন মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল'। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত এবং নরকপাল-ভূষিত। এক হাতে তাঁর ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। যিনি শক্তি, তিনি 'বজ্রবরাহী'—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মধ্যে 'যৌনসংযোগে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে রয়েছেন।' কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে থাকলে শোনা যায় অপার্থিব শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও ঝঞ্ঝনী করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সংগীত ঝংকার।

যিনি মানস-রসিক সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে বুদ্ধিহীন সংস্কার থেকে বর্জিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবাবিলতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত—তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমালয়ে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলো কৈলাস ও মানস। চতুর্দিকব্যাপী সমগ্র অঞ্চল পরমাশ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি যে কোনো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশয়াচ্ছন্ন অবিশ্বাসী হও, হও আস্তিক কিংবা নাস্তিক—এক সময়ে হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতন্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে কখন্ যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলেছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রানুগ মহৎ কামনা।"

সন্ন্যাসী বলছেন, "আজন্ম যার ঘ্রাণশক্তি পঙ্গু,—গোলাপের গন্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারযন্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দূর দেশের কোনও সংগীত-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াও! পঙ্গুনাসা মানুষ প্রথম গোলাপের গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তার সত্তার মধ্যে একটি নিগূঢ়

অধ্যাত্ম বাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।"

বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে চলেছে সিন্ধু উত্তর কৈলাসের পথে। সিন্ধুর আদি অন্ত দিশাহারা। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধু। সিন্ধু অপরিণামদর্শী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সিন্ধুনদ। সিন্ধুর উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধু চ'লে গেছে লাডাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চ মালভূমির উপরে লে শহর। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুম্ফা সমগ্র লাডাখে বর্তমান। তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গুম্ফা লে শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে ও লোকশূন্য পার্বত্যপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই গুম্ফার মধ্যেই মহামানব যীশুখৃষ্টের ভারত ভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলী সমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-রুশ যুদ্ধের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হন। তাঁকে হেমিস গুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শুশ্রূষা করা হয়। সুস্থ হবার পর তিনি একখানি দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান এবং দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যায়, কিশোর বয়সে যীশুখৃষ্ট বিবাহ বন্ধনে ধরা না দিয়ে মধ্যএশিয়ার বণিকদলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতম বুদ্ধের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় ষোল বছর কাটে। তিনি পুরী, কাশী, কপিলাবস্তু, কুমায়ুন এবং কাশ্মীর ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা—জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সঙ্গে যীশুর বিরোধ বাধে। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে যীশুখৃষ্ট যেরুশালেমে ফিরে যান। অতঃপর ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুকে তাঁর ভক্তরা ক্রুশ থেকে নামিয়ে গুল্মলতাশিকড়ের রসের সাহায্যে তাঁর ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করেন এবং পুনরুজ্জীবিত যীশু পুনরায় চ'লে আসেন তাঁর স্বপ্নভূমি ভারতে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'খানা-ইয়ারী' নামক স্থানে যীশুখৃষ্টের নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে। এই পুঁথিবর্ণিত আনুপূর্বিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তা'র নাম—"The unknown life of Jesus Christ." দুইজন মাত্র বাঙ্গালী এই পুঁথিখানি হেমিস গুম্ফায় দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দজীরই নিত্যসেবক ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য।

হেমিস গুম্ফার প্রধান পুরোহিত বলেন, যীশুখৃষ্ট পালিভাষা শিখে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শেষদিকে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌদ্ধনীতিকে ভিত্তি ক'রে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশুখৃষ্টের "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথনটি অবিকল এবং হুবহু বৌদ্ধ তথা হিন্দু-নীতিবাদের একটি নকলমাত্র।

সিন্ধুর জন্ম কৈলাসে, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম ব্রহ্মাসৃষ্ট মানসসরোবরে। এই নদের দক্ষিণে হিমালয়, উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেন-টাংলা।' গগনের অনন্ত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ ক'রে সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মলোক থেকে ছুটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে সমগ্র নদ তুষারকঠিন। ওর দুই পাশের পার্বত্যগুহাগহ্বরে থাকে শ্বেতপীতাভ ভল্লুক; নামহারা অতিকায় জন্তুরা ধূসরবর্ণ রাত্রির ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শুঁকে চ'লে যায়। মাঝে মাঝে আছে ভয়াবহ তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে লুকোয়। কখনও কখনও খুঁজে পাওয়া যায় তীর্থযাত্রী ও বণিকদলের কঙ্কাল,—পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তা'রা স্থির হয়ে আছে চিরকালের মতো। কখনও আসে ভয়াল পার্বত্য মহানাগ, কখনও পথভ্রান্ত ঈগল। ওরা আসে জলের পিপাসায়। কিন্তু জল না পেয়ে রক্তের খোঁজে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চল অগম্য। ভীষণাকৃতি পাতালপথ, শূন্য অন্ধকার গহ্বরলোক, বালুপাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা আচ্ছন্ন করেছে শত শত বর্গমাইল। পৃথিবী এখানে মৃদুগতি, মহাকালের জপের মালা ঘোরে অতি ধীরে, কর্মচাঞ্চল্য কোথাও নেই, মানববসতি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে মঙ্গোলীয় কিংবা তিব্বতী ঘোড়সওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের ক্যারাভান, —রেখে যায় ওই লবণাক্ত বালু-কাঁকর-পাথরের মরুভূমিতে রক্তের করুণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেন-টাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে—তুষারের ঝঞ্জা, আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বজ্রে, অন্ধকারে ইয়ারখন্দে আর খোটানে, তাকলামাকানে আর তুর্কিস্তানে, কৈলাসে আর মানসে।

রৌদ্রের প্রচণ্ড জ্বলজ্বালার মধ্যে হঠাৎ প্রবল তুষারপাত ঘটতে থাকে তিব্বতে। হঠাৎ নেমে আসে করোকা প্রবল বর্ষণের সঙ্গে। দিনান্তের তমসায় হঠাৎ ভলকে ভলকে লালাভ অগ্নিপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,—সেই অগ্নিপ্লাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ণ ধূম্রপুঞ্জ। একটি দিনমানের মধ্যে অগ্নিক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়নৃত্যরূপিণী বর্ষা, নির্মল নীলিমা শরতের, প্রচণ্ড শীতের সাংঘাতিক তুষার,—এবং তার সঙ্গে বসন্ত সমীরণের মধুর স্বগত প্রলাপ উদ্বেলিত মানসহৃদয়ের রক্তকমলদলকে টলোমলো ক'রে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষের অসহ্য প্রখর চন্দ্রচ্ছটা। সেই জ্যোতির্বিকিরণের নীচে কৈলাস-শিখরস্থিত দেবাদিদেবের ক্রোড়বন্ধা বজ্রবরাহীর নিবিড়-নিমীলিত মৈথুনযন্ত্রণা তীর্থবাসিগণের প্রাণসত্তাকে আবেগ-উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তা'রা কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করে নবাবিশ্বসুজনের!

(ক্রমশ)

'দেশ'-এর গত সংখ্যায় (১২ই শ্রাবণ '৬৩) 'নৈনীতাল' আলোচনায় আমার একটি মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, "নৈনীতালের নিজস্ব কোন পথ নেই, সেইজন্য তাকে আলমোড়ার মুখ চেয়ে থাকতে হয়।" এটি সঠিক সত্য নয়। পার্বত্য জেলার ভিতরে-ভিতরে সীমানা পথগুলি কোথাও নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত নয়। সরকারী দলিলগুলির মধ্যে ওদের পরিচয় লুকিয়ে থাকে। পশ্চিমে রামনগর এবং দক্ষিণে হলদুয়ানি-কাঠগোদাম,—এই দুটি পথই নৈনীতাল জেলার নিজস্ব, এই আমার ধারণা। ভারতীয় জরীপ বিভাগের অস্পষ্ট মানচিত্র আমার এই বিভ্রান্তিটি ঘটিয়েছিল।—প্রবোধকুমার সান্যাল।

॥ তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে— ॥

নাগরিক

মহাভারতের কথা অমৃতসমান, কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান। সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। শুধু বাঙালীর নয় সমগ্র ভারত-বাসীর জীবন একই সুরে বাঁধা। সে সুর রামায়ণ-মহাভারতের সাপখেলানো সুর। রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ জনশিক্ষার এমন সহজ অস্ত্র পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানিনে। কিন্তু কি মোহ যে আছে এই সাপখেলানো সুরের জালে! দুরন্ত শিশু সে সুর অবাক হয়ে শোনে, চঞ্চলমতী বালিকা আভূমি নত হয়ে সে সুরকে প্রণাম করে। শোকার্ত সান্ত্বনা পায়, বৃদ্ধের আশ্রয় মেলে সে মহীরূহতলে।

সেদিন হারাপঞ্চমী। জগন্নাথদেব মাসি বাড়ি গেছেন বেড়াতে। রথযাত্রা হয়ে গেছে। এতদিনে জগন্নাথদেবের অনুপস্থিতি নজরে পড়ল সকলের। কোথায় গেলেন মহাপ্রভু? সমস্ত বাড়ি যে অন্ধকার। ভগবানের বিরহে সকলেই শোকাতুর। তাই এদিনটি পুণ্যাহ। হারাপঞ্চমীর দিন তাই সকলেই গঙ্গাস্নান করে, পট্টবস্ত্র পরিধান করে, মন্দিরে পুজো দেয়।

হারাপঞ্চমীর বিকেলেই আমি বাগবাজার স্ট্রীটের শঙ্খকারদের পাড়ায় যাই। শ্যাম-বাজারের মোড়ে নেমে বাগবাজার স্ট্রীট ধরে গঙ্গার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট পুরোনো বাড়ি ভেঙে যেখানে নতুন চওড়া অ্যাসফাল্টের রাস্তা বানাচ্ছে তার পাশেই এক শাঁখার দোকানে গিয়ে বসলাম।

এক অতিবৃদ্ধ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে সাপখেলানো সুরে সেই দোকানের এক পাশে বসে রামায়ণ পড়-ছিলেন। আমাকে দেখে পড়া থামিয়ে এসে বসলেন পাশে। খবরের কাগজে শাঁখার বিষয় কিছু লিখবো শুনে কি যে আনন্দ হোল বৃদ্ধের! বললেন, ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে এ ব্যবসার জন্ম।

জিজ্ঞাসা করলাম, মানে?

সত্যিই তাই। শ্রীভগবান একবার শাঁখারীর বেশ ধরে এসে দেখা দেন।

খুলেই বলুন ব্যাপারটা। আমি অনু-রোধ করলাম।

দুর্গা বাপের বাড়ি যাবেন বায়না ধরেছেন। শিবকে বোঝাচ্ছেন এবার বাড়ি না গেলে মা ভীষণ অভিমান করবেন। আরও কত কি! শেষে শিবের মন পাওয়া গেল। তিনি মত দিলেন। অনুমতি দিলেন গমনের।

অনুমতি পেয়ে দুর্গা ভারী খুশী। কিন্তু বাপের বাড়ি যাওয়ার কথাতে মনে পড়ে গেল গত বছরের স্মৃতি। পিতা তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, তোর স্বামীর কি এমন ক্ষমতাও নেই যে একগাছা শাঁখাও কিনে দেয় তোকে?

কিন্তু শিব যে সর্বকিছু পরিত্যাগ করে-ছেন। মহাদেব যে পরমসন্ন্যাসী। শাঁখা কেনবার মত অর্থ তার কোথায়?

দুর্গা সব জানেন, তবু বললেন, এবারে এক জোড়া শাঁখা চাই আমার।

শিব শ্মশানবাসী। ছাই আর নরমুণ্ডের মালা তাঁর ভূষণ। কাঞ্চনের তো স্থান নেই তাঁর কাছে। তাহলে?

শিব অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি অপারগ।

দুর্গা ক্ষুণ্ণমনে পিত্রালয়ে এলেন।

পিত্রালয়ে সুখেই দিন কাটে সর্ববিবাহি-তার। কিন্তু তার মনের কোথায় যেন একটা অভাব।

হঠাৎ একদিন মহারাজ দক্ষের অন্তঃপুরে এক শঙ্খকারের আগমন হল।

দুর্গা ভাবলেন, বাবাই হয়তো পাঠিয়ে দিয়েছেন শঙ্খকারকে। শাঁখা পছন্দ করতে বসলেন তিনি।

পছন্দও হল। কিন্তু যতবারই তিনি শাঁখা পরতে যান ততবারই তা ভেঙে যায়। নতুন উৎসাহ নিয়ে আবার শাঁখা পছন্দ করতে বসেন। আবারও ভেঙে যায় তা। অতিসতর্কভাবে শাঁখা পরবার চেষ্টা করেন। তবু যেন তা মন্ত্রবলে ভাঙে। অদ্ভুত ব্যাপার!

শাঁখার কারবারী শেষে বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হল, আপনার হাতে শাঁখা থাকতে চাইছে না। আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীকে যথেষ্ট ভক্তি করেন না। পতি-ব্রতা নন নিঃসন্দেহে।

দুর্গার ক্রোধের সীমা নেই। তিনি পতি-ব্রতা নন! তিনি যদি পতিব্রতা না হন তো পতিব্রতা কে? স্বামীর জন্য তিনি কী পরিত্যাগ করেন নি? সমাজ, সংসার, পিতামাতা, ধনদৌলত কী তিনি ছাড়েন

শঙ্খের নয়, অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী থেকে তৈরী ফুলের সাজি, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি

শঙ্খের তৈরী নানা শৌখীন বস্তু—চরকা, পাউডার কেস ইত্যাদি

নি স্বামীর জন্য। শাঁখারীকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন তিনি।

ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করলেন মহাদেব। দেবাদিদেব মহাদেব সামনে শঙ্খকারের বেশ পরিত্যাগ করলেন। দেখা দিলেন গৌরীকে। সহাস্যে জানালেন, পরীক্ষায় জয়যুক্ত হয়েছেন তিনি।

এমনিই হয়। যুগে যুগে ছদ্মবেশে ভগবান আসেন ভক্তের কাছে। ভক্তের পরীক্ষা হয়। অহঙ্কারের পতনে প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

উপাখ্যান শেষে শঙ্করকে প্রণাম জানালেন বৃদ্ধ শঙ্খকার। বললেন, তাই বাঙলাদেশে শাঁখাকে বলে সাবিত্রী-শাঁখা। নববিবাহিতাকে আশীর্বাদ করেন গুরুজনেরা, হাতের শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক মা।

বাইরের রাস্তার দিকে এগিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ভাগীরথীতে জনতার ভিড়। গঙ্গাস্নান করে ফিরছে কেউ। নতুন শাঁখা কিনছেন একজন পল্লীবধূ। সিঁথির সিঁদুর ঠেকিয়ে নিলেন শাঁখায়।

শঙ্খের ব্যবহার হয় বাঙলায়, আসামে, বিহারে আর উড়িষ্যায়। কিন্তু শঙ্খের জন্ম হয় মাদ্রাজে আর সিংহলে।

শঙ্খ জন্মায় সমুদ্রে। সমুদ্রের বুকেই তা' বড় হয়। পরে ডুবরীদের সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে তা' তুলে আনতে হয়। মাদ্রাজ ও সিংহলের সমুদ্র থেকে বছরে বারো-তেরো লাখ শঙ্খ ওঠে। কোন কোনও বছরে কিছু কমবেশী যে হয় না এমন নয়।

মাদ্রাজ থেকে শঙ্খের চালান আসে কলকাতায়। সিংহল থেকে মাল আসা এখন বন্ধ। সেই শঙ্খের কারখানা আছে বাগবাজারে, কেশব সেন স্ট্রীটে, জোড়াসাঁকোয়। কলকাতার বাইরের অনেক জায়গাতেও। বাঁকুড়ায়, মুর্শিদাবাদে, নদীয়ায়, হুগলীতে।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাতগ্রাম। মুর্শিদাবাদের ডোমকল। হুগলীর ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, ধনেখালি। বীরভূমের সিউড়ি, রামপুরহাট। বর্ধমানের পাটুলি, কাটোয়া। নদীয়ার রাণাঘাট, নবদ্বীপ। এই সব শাঁখার মোকাম। অর্থাৎ শাঁখা এই সব জায়গা থেকে আমদানী হয় কলকাতার বাজারে। কলকাতাতে শাঁখা যে তৈরী হয় না তা' নয়। বাগবাজার, কেশব সেন স্ট্রীট কি জোড়াসাঁকোর কথা আগেই বলেছি।

বাগবাজার স্ট্রীটের বড় এক কারবারী তাদের কারখানা দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন আমাকে। কারখানা বলতেই আমাদের চোখের সামনে যে ছবিখানা ভেসে ওঠে তা' হল উর্দিপরা বেয়ারা, বিশেষ পোশাকপরা দরোয়ান, কোলাপসিবল্ গেট, অফিস, ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারের ধক্ ধক্ আওয়াজ,

নানা ধরনের শাঁখ, হুঁকা, শঙ্খের মালা

স্টীম, কুলীদের চিৎকার, ব্যস্তভাবে লোক-জনের আনাগোনা, মেশিনপত্রের ঘটাঘট শব্দ, লরীর যাতায়াত, অফিসারের প্রাপ্য কুর্নিশ। সেসব কিছুই এখানে নেই। বাগবাজার স্ট্রীট থেকে নির্গত একটা ব্লাইন্ড লেন। লম্বায় ষাট সত্তর ফুট, চওড়ায় তিন থেকে সাড়ে তিন। তারই দু' পাশে কয়েকটি টিনের চালা। করোগেটের ছাদ ফেটে জল পড়ছে অবিশ্রান্ত। রাস্তার একপাশে শংখ-চূর্ণের পাহাড়। পদে পদে পা পিছলাবার

করাত দিয়ে কাটার পর শাঁখার প্রথম অবস্থা

সম্ভাবনা আছে কর্দমাক্ত পথে। তারই এক পাশে কর্মীদের বাসা। নোংরা কাঁথা রোদে দেওয়া হয়েছিল তারে। তোলা হয়নি বৃষ্টিতে। টিনের ঘরে আলোর প্রবেশ প্রায় নিষেধ। তাতেই ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে শুকিয়ে নেবার প্রয়াস রয়েছে। উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে পাশেই কোথাও। তার ধোঁয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার। বিকেল ছ'টাতেই রাত নেমে এসেছে বলে ভ্রম হয়।

কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শংখ কাটা হচ্ছে একটা ঘরে। শাঁখের করাত দিয়ে। কথায়ই বলে, শাঁখের করাত। মানে, যা যেতেও কাটে আসতেও কাটে। দেখলাম, কথাটা যথার্থ বটে।

তার পাশেই আর একটা ঘরে শাঁখকে ফাইল (উকা) দিয়ে ঘষে সমান করার বন্দোবস্ত রয়েছে। আর এক ঘরে বন্দোবস্ত আছে শাঁখা পালিশ করার আর নক্সা কাটার। এই কারখানা।

শাঁখা তৈরী করতে লাগে করাত, কুড়া, বিনুনী আর একধাড়া। কুড়া দু'রকমের হয়। শাঁখের করাত দেখতে অনেকটা চাঁদের আধখানার মতো। দু পাশে দু'টি হাতল দেওয়া আছে। দু' হাতে ধরে এ করাত চালাতে হয়।

পশ্চিম বাঙলায় বর্তমানে প্রায় চার হাজার লোক এ কারবারে লেগে আছে। মুর্শিদা-

নক্সা কাটার পর শাঁখা

বাদে ন'শ, বাঁকুড়ায় ছ'শ, নদীয়ায় ছ'শ, হুগলীতে তিনশ'। আর বাকী এক-দেড়-হাজার লোক ছড়িয়ে আছে কলকাতায়, বারাকপুরের শাঁখারী কলোনীতে আরও এধারে ওধারে স্থানে স্থানে।

প্রায় ত্রিশ লক্ষ শাঁখা তৈরী হয় বছরে। কমবেশী সত্তর-আশী লক্ষ টাকার কারবার হয়।

একটি প্রমাণ সাইজের শংখ থেকে পাঁচ কি কখনো কখনো ছ'টি শাঁখাও পাওয়া যায়। এক একটি শংখের দাম পাঁচ টাকার মত। একজোড়া শাঁখার দামও দুই, আড়াই কি কখনো কখনো তিন টাকার কাছাকাছি পড়ে।

আগেই বলেছি শংখ ওঠে সমুদ্র থেকে। বড় আর ছোট সব সাইজেরই। বড়গুলি থেকে হয় শাঁখ, ছোটগুলি থেকে শাঁখা। খুব ছোটগুলি থেকে কখনো কখনো কাগজ-চাপা (পেপার ওয়েট) ইত্যাদিও হতে দেখেছি।

শংখের ব্যবসা বহু পুরাতন। কতদিন আগের তা' বলা অসম্ভব। পূর্ববাঙলার ঢাকার শাঁখার নাম ছিল সারা বাংলাদেশে। তাদের কয়েকজন কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছেন। কারবারও করছেন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের শাঁখারও খ্যাতি আছে।

শাঁখার দাম এত বেশী কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করলাম এ ব্যবসায়ের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রীসাগরচন্দ্র সুরকে।

তিনি অভিযোগ করলেন, সরকার সিংহল থেকে মাল কেনা বন্ধ করার ফলেই শংখের দাম বেড়ে গেছে তিন-চারগুণ। শুধুমাত্র মাদ্রাজের মাল দিয়ে বাজার চালাতে গেলে দাম বাড়বেই।

বললাম, সরকার হয়ত বিদেশে টাকা যাওয়া পছন্দ করেন না।

হতে পারে, তিনিও স্বীকার করলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথাটাও ভেবে দেখতে হবে তো।

নিরুত্তর থাকলাম।

কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম করি। যাদের কাজকারবার কিছু বেশী। ত্রৈলোক্যনাথ ধর, সাগরচন্দ্র সুর, নিগূঢ়চন্দ্র সুর, কালীপদ দত্ত, নীলকান্ত নন্দী, বীরেন্দ্রচন্দ্র ধর, রজগিরি নাগ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র সুর, উদয়নাথ নন্দী, উমেশচন্দ্র ধর, নিশিকান্ত সেন, লক্ষ্মীচাঁদ সুর, সুরেশচন্দ্র সুর সরলরাম সুর প্রভৃতি কারবারী ছড়িয়ে আছেন কলকাতার বাগবাজারে, শক্ স্ট্রীটে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে, রাসবিহারী অ্যাভিনুতে।

কিছু কারিগরের নামও সংগ্রহ করেছি। যাদের হাতের কাজের সুখ্যাতি ছিল একদা অর্থাৎ যারা মৃত। যারা জীবিত আছেন এমন কয়েকজনের নামও দিই। একত্রেই। প্রেমচন্দ্র সুর, ভারতচন্দ্র সুর, রামগোপাল ধর, হেমচন্দ্র ধর, দ্বারিকানাথ নাথ, সুরেশচন্দ্র সুর, নরেশচন্দ্র সুর, আবেশরাম সুর, অশ্বিনী নন্দী, হরিপদ কুণ্ডু প্রভৃতি। এদের কয়েকজন এখনো বেঁচে আছেন।

আগেই বলেছি ধর্মের নিগড়ে বন্ধনই বাঙালী সমাজকে এতদিন ধরে রেখেছে। রামায়ণ-মহাভারতের সাপখেলানো সুরে তা' প্রচার করেছে অবিরত। কিন্তু আজকের বুইক, ন্যাস, প্যাকার্ড কি সানবিম্ ট্যালবট গাড়ি থেকে সুইডোর খুলে রাস্তায় নেমে দাঁড়াচ্ছেন যে বঙ্গললনা, মহার্ঘ্য শিফন যার পরিধানে, অতিআধুনিক মেক-আপ যার সর্বাঙ্গে, ফ্যাশনেবল লেডিজ রিস্টওয়াচ যার হস্তে, চার-গাছা জলতরঙ্গ চুড়ি কি সাবিত্রী-শাঁখার স্থান তার কাছে কোথায়?

॥ তেইশ ॥

মোরাঙের মধ্যে একখানা ত্রিকোণ পাথরের রাজাসনে বসে গল্প বলছে সেঙাই। মজাদার গল্প। কোহিমা শহরের গল্প। মাধোলালের গল্প। পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী আর পিয়ার্সনের গল্প। রানী গাইডিলিওর কাহিনী। অস্ফুট পাহাড়ী চৈতন্যের বোধ আর বুদ্ধির সবটুকু রস মিশিয়ে মিশিয়ে সে গল্পকে রীতিমত রসালো করে তুলেছে সেঙাই। বিভীষিকার শেষ বিন্দু রক্তটুকুতে রঙীন হয়ে সে-সব কাহিনী ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

বুড়ো খাপেগা এখনও তার কেসুঙ্ থেকে মোরাঙে আসেনি। পাহাড়ী তরুণেরা গল্পের মৌতাতে বুঁদ হয়ে সেঙাইর চারপাশে চক্রাকারে বসেছে। নেশার আবেশে রসালো সব গল্প। অপূর্ব। অশ্রুত। পাথুরে মুখগুলোর ওপর দিয়ে ছায়াছবির মত ভেসে চলেছে কখনও বিস্ময়, কখনও ক্রোধ। পিঙ্গল চোখ কখনও বর্শার মত ঝকমক করে উঠছে। কখনও কুঁপিত পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে; হাতের থাবাগুলো বজ্রের মত প্রখর হচ্ছে। আবার কখনও সুন্দর আনন্দে সমস্ত দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে যাচ্ছে।

দুদিকে পেন্যু কাঠের মশাল জ্বলছে। বাইরের উপত্যকায় পাহাড়ী রাত্রি ঝরছে থরে থরে। বাতাসে এখনও শীতের দাপট মিশে রয়েছে। মেন্ডার দাঁতের মত সেই পার্বত্য বাতাস চড়াই-উৎরাই-এর ওপর দিয়ে হু-হু উল্লাসে ছুটে চলেছে। ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দূরের মালভূমিতে। আছড়ে পড়ছে গহন বনদেহে। সাঙসু-শেষের বাতাস। এলোমেলো। খেয়ালখুশীর সওয়ার হয়ে দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যাবার বাতাস। এর কিছুদিন পরেই আসবে ঝুমের ঋতু। আসবে মরশুমী দিন।

সেঙাইর একপাশে একটি গলা বুদ্বুদের মত ফুটে বেরুলো। ওঙলে। সে বললো: "তুই যে গাইডিলিওর কথা বললি। বেশ খাসা মেয়ে, না?"

"হু-হু—" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল সেঙাই।

"পিরীত-টিরীত জমিয়ে এসেছিস নাকি? কী রে? কোহিমায় গিয়ে আর একটা ভালোবাসার মাগী জুটিয়ে ফেললি?" লোভার্ত ছোট ছোট দুটি চোখে আদিম কামনার ছায়া পড়লো ওঙলের।

"ইজাহান্টসা সালো!" গর্জন করে উঠলো সেঙাই: "একেবারে জানে লোপাট করে ফেলবো না তোকে! গাইডিলিওকে পিরীতের মাগী বলছিস! জানিস, সে হলো এই পাহাড়ের রানী। শয়তানের বাচ্চা—" পাশ থেকে সাঁ করে একটা ভয়াল খেমি কেপেম থাবায় তুলে নিল সেঙাই; "গাইডিলিওর ইজ্জৎ তুলে কথা বলছিস—"

একটা খন্ডযুদ্ধের পূর্বাভাস। ওপাশ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে ওঙলে। রক্তারক্তির উৎসাহে তার শিরা-স্নায়ুগুলোও চনচন করে উঠেছে। আর একটি মুহূর্তের মধ্যে গল্পের মৌতাতটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় চারপাশের পাহাড়ী জোয়ানেরা প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চকিতে তাদের দেহমন থেকে সব নিস্ক্রিয়তা মুছে গেল। মোরাঙ ফাটিয়ে অজস্র গলার চীৎকার উঠলো; "হো-ও-ও-য়া-আ-আ—"

পাহাড়ী মনের উত্তেজনা! যে কোন মুহূর্তে, যে কোন ঘটনায়, যে কোন একটি কথায় মশাল লেগে তা দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে। কেলুরি গ্রামের এই মোরাঙে এই মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারতো; তাজা পাহাড়ী রক্তের বন্যায় পাথুরে জনপদটা স্নান করতে পারতো; কিন্তু তার আগেই মোরাঙে এসে ঢুকলো বুড়ো খাপেগা। কেলুরি গ্রামের দলনায়ক সে।

বুড়ো খাপেগা গর্জে উঠলো: "এই শয়তানের বাচ্চারা, মোরাঙের মধ্যে চিল্লা-চিল্লি বাধিয়েছিস কেন?" দুটি ধূসর চোখ দুলিয়ে দুলিয়ে জোয়ানগুলির দেহের ওপর ফেলতে লাগলো খাপেগা; "কী হয়েছে, ব্যাপার কী?"

"ইজা রামখো!" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সেঙাই; "হবে আবার কী? ওঙলেটাকে আমি খুন করবো।"

ওপাশে ওঙলের গলায় একই ঘোষণা শোনা গেল; "সেঙাইটাকে জানে লোপাট করে দেবো।"

"জানিস, এটা হলো মোরাঙ্। এখানে হুই সব খুনেখারাপির কথা হলে আনিজার গোঁসা এসে পড়ে। বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করলে দুটোকেই একেবারে সাবাড় করে ফেলবো।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগা।

কনুইর বর্শা দিয়ে চারপাশের জোয়ান-দের ছত্রখান করে বুড়ো খাপেগার কাছা-কাছি এসে দাঁড়ালো সেঙাই; "হুই টেফঙের বাচ্চা ওঙলেটা রানী গাই-ডিলিওকে আমার পিরীতের মাগী বললো। ওকে বর্শা হাঁকড়াবো না! তুই একবার বল সন্দার!"

বিধ্বস্ত কয়েকটি দাঁত কড়মড় বেজে উঠলো। রক্তচোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা; "হু-হু, কী হলো? কীরে সেঙাই? গাই-

ডিলিওকে পিরীতের মাগী বলতে অমন রুখে উঠলি কেন?"
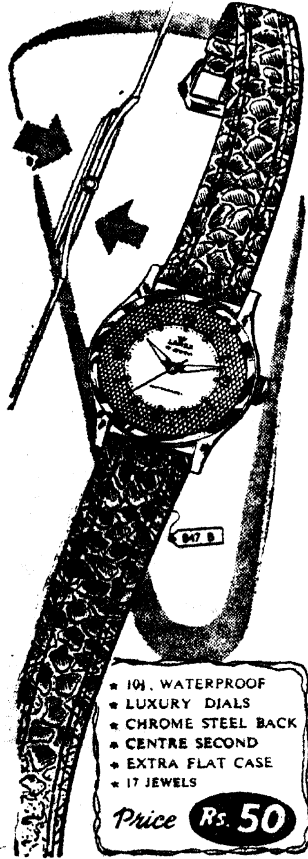
"জানিস সর্দার, হুই গাইডিলিও হলো রানী। ওর দিকে তাকালে পিরীতের কথা মনে আসে না। কোহিমায় যখন আসানুরা (সমতলের বাসিন্দা) আমাকে মারলে তখন হুই রানী গাই-ডিলিও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। যে আমাকে বাঁচালো, তার ইজ্জত নিয়ে কথা বলবো এমন বেইমান আমি না।" একটু একটু করে আবার সম্ভ্রমের রঙে রঙে অস্ফুট চৈতন্যের সবটুকু শ্রদ্ধা মিশিয়ে মিশিয়ে কোহিমা পাহাড়ের, রানী গাই-ডিলিওর, মাধোলালের গল্প নতুন করে বলতে শুরু করলো সেঙাই; "হুই সাহেবরা একটুও ভালো না।"

"কেন? কী করে বুঝলি?" তীক্ষ্ম চোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা।

"ওদের জন্যেই তো আমাকে আর সাবুয়ামারুকে মারলো আসানুরা। তা ছাড়া মাধোলাল বললে, রানী গাইডিলিও বললে, হুই সাহেবরা অনেক দূর দেশ থেকে এসে আমাদের এখানে সর্দারী করতে চায়।"

একটু আগের প্রবল উত্তেজনা মোরাঙের মধ্য থেকে শিশিরের লেখার মত মুছে গিয়েছে। নতুন গল্পের বিচিত্র মৌতাতের আস্বাদে জোয়ান পুরুষগুলির মনে আবার আবেশ ঘনীভূত হয়েছে। সকলেই পাথরের আসনে আবার জাঁকিয়ে বসেছে।

বুড়ো খাপেগার গলায় বাজ চমকালো: "হুই তোর বাপ সিজিটোটাকে আমি আগেই বলেছিলাম। সাহেবরা লোক ভালো না। রামখোর বাচ্চারা এখানে এসে সর্দারী ফলাতে চায়! হুই সব এই পাহাড়ে চলবে না। সিধে কথা। একেবারে পাথরের চাঁই মেরে মেরে খাদে ফেলে দেবো শয়তানদের। ইজাহান্টসা সালো! "তোকে মেরেছে, না রে সেঙাই?"

"হু-হু—এমন মেরেছে যে, জ্ঞান ছিল না। হুই গাইডিলিও আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ও না থাকলে আর কেলুরি বস্তীতে ফিরে আসতে হতো না।"

আবারও হুংকার দিল বুড়ো খাপেগা: "তোকে মেরেছে শয়তানের বাচ্চারা! হুই সাহেবদের দশটা মাথা চাই তার বদলা। অনেক দিন বড় রকমের লড়াই বাধছে না। হাতটা বড় নিস্পিস্ করছে। শয়তানদের মুণ্ডু এনে মোরাঙের সামনে বর্শার মাথায় গেঁথে রাখবো আর রক্ত দিয়ে দেয়াল চিত্তির করবো। বুড়ো বয়সে রক্তটা কেমন ঝিমিয়ে আসছিল। নাঃ, মনে মনে আবার তাগদ পাচ্ছি।" একটু থামলো বুড়ো খাপেগা। তারপর দৃষ্টিটাকে দরজার মধ্য দিয়ে অস্বচ্ছ চক্র-রেখার দিকে ছড়িয়ে দিল। তার ধূসর চোখের সামনে যেন এই পাহাড় নেই, এই জনপদ নেই। এই বনময় উপত্যকা, এই চড়াই-উৎরাইএ তরঙ্গগত পাহাড়ী পৃথিবীর পরপারে এক অতীতের চক্রবালে তার শ্রুতি-স্মৃতি ফিরে গিয়েছে। কেলুরি গ্রামের অতীতকাল সে। তার কণ্ঠে প্রাচীন দিনের আবেগ এসে মিশলো: "এই পাহাড় থেকে সে সব দিন একেবারে চলে গেল। লড়াই বাধতো অংগামীদের সংগে, কোনিয়াকদের সংগে, সাঙটামদের সংগে। পাহাড়ের মাথা, টিজু নদী রক্তে লাল হয়ে যেতো। সে সব দিনকালই নেই, সে সব রেওয়াজই উধাও হয়ে যাচ্ছে। তিনটে মাথা না আনতে পারলে জোয়ান ছেলে বিয়ের জন্যে মেয়ে পেতো না। সেবার তো অংগামীদের সংগে লড়াই বাধলো। শোন্ তবে সে গল্প।"

একটু একটু করে ফেলে-আসা দিন-গুলির ওপর থেকে যবনিকা তুলে দিল বুড়ো খাপেগা। শুরু হলো অপরূপ এক আখ্যানের। সে আখ্যানের রঙ পাহাড়ী পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড-ছেঁড়া তাজা রক্তে রক্তাক্ত। আবিষ্ট গলায় খাপেগা বলতে লাগলো: "দক্ষিণ পাহাড়ের হুই উঁদিকে অংগামীদের বস্তী সাংখুবেটো একবার হলো কী, ওদের একপাল গরু এসে আমাদের সিঁড়িক্ষেত থেকে পাকা ধান খেয়ে গেল। মোরাঙে বসে জটলা শুরু হলো। আমাদের সর্দার বলেছিল, আমাদের ধান খেয়েছে ওদের গরুতে, তার বদলে ওদের দুটো মাথা চাই। আমার ওপর সেই মাথা আনার ভার পড়লো। রাত্তির বেলায় অন্ধকারে অন্ধকারে সাংখুবেটো বস্তীতে গিয়ে দুটোর বদলে চারটে মাথা নিয়ে এলুম। অংগামীদের বস্তীতে গিয়ে দেখি, একটা কেসুঙে শয়তানের বাচ্চারা মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। একটুও শব্দ করিনি। শুধু সুচেনু দিয়ে কুপিয়ে চারটে মাথা চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে এলুম। সর্দার আমাকে খুব সাবাস দিলে, যোহি মধু দিলে, কুকুরের কাবাব দিলে গরম গরম। আর সেই সংগে তার সুন্দর মেয়েটাকে আমার সংগে বিয়ে দিলে। আমার বিয়ে তো হলো। তার ক'দিন বাদেই নড্রিলোদের কেসুঙ থেকে মড়া কান্না উঠলো। রাত্তির বেলায় অংগামীরা তাদের সাতটা মাথা নিয়ে গেছে। সে শোধ তুললুম দু বছর বাদে: অংগামীদের কুড়িটা মাথা এনে। এক কুড়ি মাথার শোধ এখনো ওরা তুলতে পারেনি। সে আজ কত বছরের ব্যাপার, অত হিসেব মনে নেই। তখন কাঁচা জোয়ান ছিলুম; এখন বুড়ো হয়েছি। যাক্ সে কথা, অংগামী শয়তানেরা তাকে তাকে আছে। একবার বাগে পেলেই হয় আমাদের।"

সেঙাই বললো; "সে সব ওরা হয়ত ভুলে গেছে।"

"আরে না, না। পাহাড়ী নাগা অত সহজে মাথার কথা ভোলে না। এক জন্মে না হোক্ আর এক জন্মে; বাপ না পারুক ছেলে, ছেলে না পারুক নাতি তার শোধ তুলবেই। যাক্ সে কথা, আবার তাহলে লড়াই বাধবে হুই সায়েবদের সঙ্গে!" আদিম উল্লাসে বুড়ো খাপেগার ধূসর চোখ দুটো দপ্ দপ্ জ্বলতে লাগলো।"

সেঙাই বললো; "হু-হু—আসান্যুরা সায়েবদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে।"

"কে বললে?" বাদামী পাথরের রাজাসনে একটি তির্যক রেখায় উঠে বসলো বুড়ো খাপেগা।

"কোহিমা পাহাড়ের মাধোলাল বলেছিল। আসান্যুদের সন্দারটার নাম হলো গান্ধা—না কী জানি? আমি ঠিক জানি না। সারুয়ামারু জানে। সে বলতে পারবে নামটা।"

"সারুয়ামারু, এই সারুয়ামারু—" তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো বুড়ো খাপেগা; "আসান্যুদের সন্দারের নামটা জানা দরকার।"

ওপাশ থেকে ওঙলে বললো: "সারুয়ামারু তো মোরাঙে নেই। সে তার কেসুঙে রয়েছে।"

"আচ্ছা কাল সকালেই নামটা জেনে নেবো তার কাছে।"

সহসা চীৎকার করে উঠলো সেঙাই: "নামটা মনে পড়েছে রে সন্দার; হুই আসান্যুদের সন্দারটার নাম হলো গান্ধীজী। সে-ই লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে সায়েবদের সঙ্গে।"

"সাবাস দিতে হয় লোকটাকে। আমরা পাহাড়ী মানুষগুলো হুই সায়েবদের সঙ্গে এখনও লড়াই বাধাইনি। আর আসান্যুরা বাধিয়ে দিলে! এ তো বড় আপশোষের কথা।" বিচিত্র আক্ষেপে মুখ-চোখ করুণ হয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগার।

"আমরাও বাধিয়েছি। হু-হু—" প্রজ্ঞাবানের মত মাথা ঝাঁকালো সেঙাই।

"আমরা আবার কবে বাধালুম!" বিস্ময়ে কণ্ঠটা চৌচির হয়ে গেল বুড়ো খাপেগার।

"হু-হু—রানী গাইডিলিও বাধিয়ে দিয়েছে। আমাদের বস্তীতে সে আসবে বলেছে।" একটি মিটি-মিটি উজ্জ্বল হাসির আলো ঝিকমিক করতে লাগলো সেঙাইর মুখেচোখে: "আমাদের বস্তীতে আসতে বলে দিয়েছি রানীকে। ভালো করিনি! তুই আমাকে মারবি না তো এর জন্যে!"

"আরে না, না। তোর মগজটা এই কদিন শহরে গিয়ে একেবারে খুলে গিয়েছে রে সেঙাই। যাক্, এ্যাদ্দিনে মেয়েটাকে দেখা যাবে। সারুয়ামারু বলেছিল, ওর ছোঁয়ায় নাকি শক্ত শক্ত সব রোগ সেরে যায়!"

"হু-হু—এই দ্যাখ না, আমাকে আর সারুয়ামারুকে কী মার দিলে সায়েবের লোকেরা। রানী গাইডিলিওর ছোঁয়াতেই তো ভালো হয়ে গেলুম। সারা গা ফেটে ফেটে রক্তে মাখামাখি হয়েছিল। হুঁশ ছিল না একেবারে। গাইডিলিওই তো আমাদের বাঁচিয়ে দিলে। হু-হু—" অপরূপ কৃতজ্ঞতায় পাহাড়ী ছেলে সেঙাইর অস্ফুট মনটা টইটম্বুর হয়ে গিয়েছে।

বুড়ো খাপেগা বললো; "রানী গাইডিলিও যখন সায়েবদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে, তখন আমরা তার দলে। তোদের দুজনকে যখন সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তখন তার হয়েই আমরা লড়বো। তা ছাড়া হুই সায়েবরা পাহাড়ী ছেলেদের ফুসলে পর করে দিচ্ছে। আমাদের সিজিটোটাকে একেবারে কেমন করে দিয়েছে শয়তানেরা। বহু সাহেবরা হলো এক-একটা আনিজা। এক-একটা ডাইনী।" একটু থামলো খাপেগা। তারপর একদলা থুথু সামনের অগ্নিকুণ্ডটার ওপর ছুঁড়ে বললো: "আমাদের বস্তীতে গাইডিলিও আসবে। কাল থেকে আরো বর্শা, অনেক সুচেনু আর থেমি কেপেম বানাতে শুরু করে দে তোরা।"

"হো-ও-ও-য়া-আ-আ—" পাহাড়ী জোয়ানদের গলায় ঝড় বাজলো। আসন্ন একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। নাগা পাহাড়ের শিখরে শিখরে মন্দ্রিত হতে হতে এই গর্জন দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়লো। চক্রবালের ওপরে যে করাল রাত্রি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে রাত্রির হৃৎপিণ্ড শিউরে উঠলো। চমকে উঠলো।

ডাইনী নাকপোলিবার গুহাঘর।

এখান থেকে দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়াটা সমতল হয়ে অনেক, অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। ওদিকে টিজু নদীর বাঁকা রেখাটা একটা নীল খতের মত দেখায়। খানিকটা লঘুভার কুয়াশা চক্রবেখার ওপর ঝুলছে। চারপাশে ভৌতিক গলায় চীৎকার করে উঠছে আউ পাখির ঝাঁক। খাসেম বনে তীক্ষ্ণধার ঠোঁট দিয়ে ঠক ঠক শব্দ করছে খারিমা পতঙ্গের দল। এই গুহাঘর থেকে যতদূর নজর ছড়ানো যায়, শুধু একটানা অরণ্য। ছেদহীন। রন্ধ্রহীন। উদ্দাম। ভয়ংকর পৃথিবীর আদিম শ্যামায়িত প্রকাশ। এখান থেকে অনেক, অনেকটা নিরাপদ ব্যবধান রেখে পাহাড়ী জনপদগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

পাহাড়ী পৃথিবীর ওপর থেকে রাত্রির পরমায়ু একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে আসছে। অস্বচ্ছ রঙের ছায়া-ছায়া আলো লেগেছে সামনের বনদেহে। আর সুড়ঙ্গের মধ্যে এই গুহায় নিশ্চুপ বসে রয়েছে দুটি নারীর শরীর। অনাবৃত। দু জোড়া চোখ নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে। ডাইনী নাকপোলিবা আর সালুনারু।

পাথরের ভাঁজে ভাঁজে রক্তাভ আগুনের আভাস। এক পাশে খাটসঙ্ কাঠের একটা অগ্নিকুণ্ড। সেই কুণ্ড থেকে রহস্যময় আলো প্রেতদৃষ্টির মত বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

ডাইনী নাকাপোলিবা জীর্ণ শরীরটাকে ঘষতে ঘষতে সালুনারুর কাছাকাছি টেনে আনলো; এর মধ্যে সালুনারুর সারা দেহে, গ্রীবায়, স্তনে, উদরদেশে, জঙ্ঘায় আরেলা পাতা দিয়ে রাশি রাশি উল্কি আঁকা হয়েছে। পৃথিবীর আদিম শিল্পলেখা। কঙ্কালের ছবি, মোষের মাথা, বাঘের হাড়, বানরের চোখ।

সালুনারুর বুকের ওপর একটি কঙ্কাল-বাহু বিছিয়ে দিল ডাইনী নাকপোলিবা। কিছুদিন আগে হলেও আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক স্তব্ধ হয়ে যেতো তার। কিন্তু এর মধ্যে মর্মের প্রতিটি কোষে কোষে, ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি কণায় কণায় অজস্র দুঃসাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে সালুনারু।

নিদাঁত দুটি মাড়ি খিঁচিয়ে নাকপোলিবা বললো; "এই ক'দিনে তুই তো সব মন্ত্রতন্ত্র শিখে নিলি। মাগী-পুরুষ বশ করার মন্ত্র। বুকের রক্ত জল করার মন্ত্র। আনিজা ডাকার মন্ত্র। সুঙকেনি থামানোর মন্ত্র। ঝড়তুফান ডাকার মন্ত্র। বাঘ আর বুনো মোষ পোষ মানাবার মন্ত্র। বৃষ্টি থামাবার, বৃষ্টি নামাবার মন্ত্র। পাহাড়ের ধস্ থামাবার মন্ত্র। রক্তবমি করাবারে মন্ত্র।"

"হু-হু--" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল সালুনারু। তারপর আগ্নেয় চোখে অপলক সে তাকিয়ে রইলো ডাইনী নাকপোলিবার দিকে। তার দৃষ্টিটা যেন অপক্ষ্ম।

নাকপোলিবা আবারও বললো: "তুই তো এখন রীতিমত ডাইনী হয়ে গেলি। কত বছর ধরে এই সুড়ঙ্গে বসে রয়েছি। তার কী হিসেব আছে! সেবার সুঙকেনির (ভূমিকম্পের) দাপটে টিজু নদীর মুখ ঘুরে গেল; আগে কী এখানে বন ছিল? ছিল না। সেই বন গজাতে দেখলুম। দক্ষিণ পাহাড়ের মাথায় অঙ্গামীদের বস্তী ঘেঁষে লাল রঙের একটা পাহাড় উঠলো। তাও দেখলুম। সে বসব ব্যাপার তিরিশ কী পঞ্চাশ বছর আগের। আগে তো বেরতুম। দক্ষিণ পাহাড়ের ডগায় দাঁড়িয়ে দেখতুম অঙ্গামীদের বস্তীতে সাদা ধবধবে সব মানুষ আসতে লাগলো। হেন্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে সব রঙ্। তাদের নাম নাকি সায়েব। কত দেখলুম রে সালুনারু। কত বছর ধরে এই পাহাড়ে বেঁচে রয়েছি!" কঙ্কাল দেহটিকে আলোড়িত করে নাকপোলিবার একটা মন্থর দীর্ঘশ্বাস গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

কিছু সময়ের বিরতি। তারপরেই আবার বলতে শুরু করলো ডাইনী নাকপোলিবা; "এতদিন তো এই পাহাড়ে রইলুম। এত মন্ত্র শিখলুম, এত গুণতুক শিখলুম, এত ওষুধ করা শিখলুম। সারাদিন এই সুড়ঙ্গে বসে থেকে থেকে ভাবতুম, কাকে এই মন্ত্র, এই ওষুধ দিয়ে যাই। তোকে এ সব দিয়ে এবার ভাবনা দূর হলো। সময় তো হলো, এবার নির্ঘাৎ লোপাট হয়ে যাবো।"

এই ক'টি ঋতুর প্রতিটি পলপ্রহর ধরে পরম মনোযোগে, অখণ্ড একাগ্রতায় ডাইনী নাকপোলিবার কাছে পৃথিবীর আদিম মন্ত্রগুপ্তির সন্ধান নিয়েছে সালুনারু। একনিষ্ঠ, একব্রত হয়ে সে পাঠ নিয়েছে ভয়ঙ্করের, ভীষণের। মন্ত্রের, তন্ত্রের, ওষুধের। এই পাহাড়ী জগতের কোন অন্ধিসন্ধিতে, কোন গুহায়-কন্দরে, কোন উপত্যকায় বনদেহের আড়ালে আবডালে রয়েছে গুণু পাতা, রয়েছে সাঙুলিক লতা, রয়েছে খুঙ্গা গাছ; কোন জলপ্রপাতের নীচে রয়েছে কমলা রঙের পাথর, কোথায় রয়েছে সাদা পিঁপড়ের ঢিবি, রয়েছে তিন শ' বছর আগের মানুষের করোটি, রয়েছে মন্ত্রসিদ্ধির অজস্র উপকরণ—টেফঙের মেটলী, টেশঙের হৃৎপিণ্ড, তাজা ছেলের হলদে মগজ, যুবতী মেয়ের কলিজা—সব, সবই জেনে নিয়েছে সালুনারু।

সালুনারু বললো: "সবই তো শিখলুম। এইবার এই মন্ত্র আর ওষুধ কেলুরি আর সালুয়ালাঙ বস্তীর সব শয়তানগুলোর ওপর চাপাবো। সব ক'টার রক্ত জল করে খতম করবো। হু-হু—তবে আমি পাহাড়ী ডাইনী!" দৃষ্টিটা রক্তলাল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো সালুনারুর। এই মুহূর্তে তাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে। মারাত্মক একটা নাগিনীর মত, দেখাচ্ছে একটা ভয়াল প্রেতিনীর মত; "কেলুরি বস্তীর সর্দার আমাকে তাগিয়ে দিলে। সালুয়ালাঙ বস্তীর উপকার করতে গেলুম। সেখানেও আমাকে ওরা ফুঁড়তে চায়। আমার মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে বস্তীতে ভোজ দিতে চায়। দুই বস্তীর একটাকেও আমি জ্যান্ত রাখবো না। হু-হু—" উল্কি-আঁকা কুপিত বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো সালুনারুর। উত্তেজনায় দাঁতে দাঁতে কড়মড় বাজনা উঠলো; "একটা বস্তীতেও আমাকে টিঁকতে দিলে না শয়তানের বাচ্চারা।"

কোটরের মধ্যে দু টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারপিণ্ড। নাকপোলিবার চোখ।

একটু একটু করে সেই চোখ দুটি স্তিমিত হয়ে এলো ডাইনী নাকপোলিবার; "হু-হু—আমাকেও একদিন টিঁকতে দেয়নি—"

"কেন, তোর আবার কী হলো? জন্মেই তো তুই ডাইনী হয়েছিস। লোকে বলে, তুই এখানেই থেকেছিস সারা জনম।" সালুনারুর গলাটা বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো।

"ইজাহান্টসা সালো!" দাঁতহীন আকর্ণ মাড়ি বিস্তার করে হুংকার ছাড়লো ডাইনী নাকপোলিবা: "জন্মেই কী কেউ ডাইনী হয় নাকি? আমি যখন জন্মেছিলাম, তখন কেলুরি বস্তীও ছিল না, সালুয়ালাঙ বস্তীও নয়। দুটো মিলিয়ে একটা বস্তী ছিল। তার নাম কুরগুলাঙ। সেই কুরগুলাঙ বস্তীতে আমার জন্ম। আমার সময়কার একটা মানুষও আজ আর বেঁচে নেই।"

"থাক, ওসব কথা!" অসহিষ্ণু গলায় সালুনারু বললো: "তুই কেমন করে ডাইনী হলি, সে গল্প বল দিকি। বড় মজা লাগছে সে কথা শুনতে।"

"শোন্ তবে। আমিও এককালে তোদের মতো জোয়ান মাগী ছিলুম। মনে সোয়ামী-পুত্তুর আর ঘরের জন্যে সাধ-আহ্লাদ ছিল।" আশ্চর্য! ডাইনী নাকপোলিবার দু চোখ থেকে আগুনের ভাণ্ডার একেবারেই মুছে গিয়েছে। কী এক কোমল আবেশে সমস্ত দেহখানা মাখামাখি হয়ে গিয়েছে তার। একটি কংকালদেহ। নিখাদ হাড়ের কাঠামো। মাংসের এতটুকু ভেজাল নেই নাকপোলিবার শরীরে। একটা ভয়ংকর ডাইনী, একটা জীবন্ত প্রেতিনী! কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে একেবারে মন্দ দেখাচ্ছে না। জীর্ণ বুকের নীচে ধুক-ধুক হৃৎপিণ্ডে একদিন কুমারী মেয়ের রমণীয় বাসনা জন্মল বাজনায় বেজে উঠতো, তা যেন মিথ্যে নয়। ডাইনী নয়; এই মুহূর্তের ইন্দ্রজালে নাকপোলিবার মধ্য থেকে চিরকালের এক নারীমনের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। যে নারীর বরতনুতে রূপ ছিল, মনের পরতে পরতে ইন্দ্রধনুর রঙ ছিল। আশা ছিল ভোগের। বাসনা ছিল উপভোগের। কামনা ছিল একটি বলিষ্ঠ পুরুষের। একটি প্রেমিক স্বামীর। তার নির্দয় পেষণের; নির্মম সোহাগের।

আশ্চর্য ভাঙা-ভাঙা গলায় নাকপোলিবা বলে চললো: "বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু তখনও কী আমি জানি, আমি বাঁজা। এক বছর গেল, দু বছর গেল, তিন বছর সোয়ামীর সোহাগ ভোগ করেও একটা বাচ্চার জন্ম দিতে পারলুম না। বর্শা উঁচিয়ে সোয়ামী আমাকে তাগালে। বাঁজা বউ ঘরে পুষলে নাকি আনিজার গোসা এসে পড়ে। চলে এলুম বাপের কাছে। বাপ সুচেন্যু বাগিয়ে ধরলে। তিন বছর সোয়ামীর ঘর করে যে মাগী বাচ্চা বিয়োতে পারে না নির্ঘাৎ তার ওপর আনিজার খারাপ নজর আছে। তাকে ঘরে জায়গা দিলে সব জানে লোপাট হয়ে যাবে। ভয়ে পালিয়ে গেলুম আচেলায় (বাইরের পাহাড়ে)। তিন দিন তিন রাত বনে কাটিয়ে দিলুম। তারপর দেখা হলো ডাইনী রসিলটাকের সঙ্গে।"

"রসিলটাক আবার কে?" কৌতূহলে, আগ্রহে, গল্প শোনার আনন্দিত মৌতাতে একেবারে নিবিড় হয়ে এসেছে সালুনারু।

"এই সুড়ঙ্গে সে থাকতো। সে-ও ডাইনী ছিল। আমাকে মন্তরতন্তর সব শেখালো সে; ওষুধ শেখালো, গুণতুক শেখালো। বশীকরণ শেখালো। পোয়াতি মাগীর গর্ভ নষ্ট করার কায়দা শেখালো। সব শিখে সোয়ামীকে মারলুম আগে, তারপর বাপকে।" একবার থামলো ডাইনী নাকপোলিবা, নিশ্ছেদ কথার বন্যায় বুকটা ওঠানামা করছে তার। ঘন ঘন, দ্রুততালে ফুসফুস ভরাট করে কয়েকটা নিঃশ্বাস তুলে নিল সে। তারপর বললো: "একদিন রসিলটাক মরলো। তার জায়গায় আমি রয়েছি। বাঁজা বলে সোয়ামী-বাপ ঘরে থাকতে দিলে না। নইলে কী আর ডাইনী হতুম! যাক্ সে সব কথা। আমি মরলে আমার জায়গায় তুই থাকবি। তারপর তোর মরার সময় আবার নতুন ডাইনী বানিয়ে যাবি। যারা আমাদের বস্তীতে থাকতে দেয় না, তাদের শায়েস্তা করতে হবে। নিজেদের দোষ নেই; এই ধর, আমি বাঁজা, তুই আনিজার নামে রুখে উঠেছিলি, অমনি আমাদের বস্তী থেকে তাড়িয়ে দিল। ওরাই তো আমাদের ডাইনী করে। ডাইনী যেমন আমাদের বানায়, তেমনি তার ঠ্যালা সামলাক।"

"হু-হু-ঠিক বলেছিস।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নাকপোলিবার কথায় সায় দিল সালুনারু: "হুই রামখোর বাচ্চারাই তো আমাদের ডাইনী বানায়। একটু একটু করে তার শোধ তুলবো। তোর কাছে ওষুধ শিখলাম, মন্তর শিখলুম। এবার সালুয়ালাঙ আর কেলুরি বস্তীর সব শয়তানগুলোর ওপর সেই মন্তর আর ওষুধে ঝাড়বো। হু-হু"—

"হু-হু—সব লোপাট করে দে। এই পাহাড়ে একটা মানুষও জ্যান্ত রাখবি না। সবগুলোকে মেরে তাদের হাড়ের ওপর, মাংসের ওপর বসে বসে মজা করে খুলি বাজাবি। এই পাহাড়ী মানুষগুলো আমাদের ঘর দেয় নি, একটু থাকবার জায়গা দেয় নি, একটু ভালবাসা দেয় নি। তাদের সঙ্গে কোন খাতির নেই। সব সাবাড় করে তুই আর আমি এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবো। কী বলিস্। হাঃ—হাঃ—হাঃ"—

বীভৎস একটা প্রেতের গলায় অট্টহাসি হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। সে হাসির উৎক্ষেপে জীর্ণ বুকটা থেকে ধনুকের ছিলার মত হাড়গুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেন খানখান হয়ে যাবে তার। অবিরাম হাসি। অবিশ্রাম হাসি। খরধার হাসি। সে হাসি গুহার ছমছম আলোছায়ার রহস্যে একটি বৈদেহী প্রেতের মত ওত পেতে রইলো।

একটু আগে ডাইনী নাকপোলিবার হিসাবহীন বয়সের অতলান্ত থেকে যে কোমল কুমারী কামনাটি, যে মানবিক আকাঙ্ক্ষার সৌরভটি উঁকি মেরেছিল, এই হাসির হুঙ্কারে বুকের কোন নিভৃত কন্দরে তারা আবার পলাতক হয়েছে। আবার ফেরারী হয়েছে।

আগে হ'লে সমস্ত স্নায়ুগুলো, দেহমনের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো শিউরে উঠতো সালুনারুর। কিন্তু এতদিন ধরে একেবারে স্পর্শের সীমানায় বসে বসে আদিম পৃথিবীর মন্ত্রগুপ্তির সন্ধান নিতে নিতে শরীরের প্রাণী চেতনার সমস্ত কোষ থেকে সব ভয়, সব আতঙ্ক মুছে গিয়েছে তার। নির্বিকার, পাথরের আসনে বসেই রইলো সালুনারু। অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, কেমন করে ডাইনী নাকপোলিবার কোটরচোখে দুটি ধক্ ধক্ আগ্নেয় গোলক জ্বলে জ্বলে উঠছে।

একসময় ডাইনী নাকপোলিবার সারা দেহ থেকে হাসির উত্তেজনা মুছে গেল। আশ্চর্য সহজ গলায় সে বললো; "আচ্ছা সালুনারু, আমার সব বিদ্যে তোকে তো দিলুম। একেবারে প্রথমে কার ওপরে এই বিদ্যে হাঁকড়াবি? কী রে?" নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো নাকপোলিবা। একেবারে সালুনারুর আলিঙ্গনের সীমানায়।

"কার ওপর হাঁকড়াবো!" আশ্চর্য ক্রুর চোখে তাকালো সালুনারু। তার সেই ভয়াল দৃষ্টিতে কোন আদিম অরণ্যের ছায়া এসে পড়লো। মসৃণ মুখের ওপর রাশি রাশি রেখার আঁকিবুকি ফুটে বেরুলো। রেখার আঁকিবুকি নয়, যেন রাশি রাশি সরীসৃপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। একটু একটু করে সালুনারুর দেহটা শিলামূর্তির মত কঠিন হয়ে উঠছে। চোখের পিঙ্গল মণি দুটো ধাতব দেখাচ্ছে। নিষ্ঠুর গলায় সালুনারু বললো; "সবচেয়ে আগে হাঁকড়াবো তোর ওপর। তুই আমার সোয়ামীকে আচেলা থেকে ফেলে মেরেছিস।—তোকে—"

"ইজাহান্ট্সা সালো"—সাঁ করে একটা উল্কার মত একপাশে সরে গেল ডাইনী নাকপোলিবা; "আমাকে মারবার জন্যে এখানে এসে ডাইনী হয়েছিস!" বিধ্বস্ত কয়েকটি দাঁতে কড়মড় শব্দ উঠলো নাকপোলিবার। তারপরেই পাশ থেকে একটা বুনো মোষের হাড় বের করে নিয়ে এলো। হাড়টার দু পাশ পাথরে ঘষে ঘষে রীতিমত ধারালো করা হয়েছে। প্রচণ্ড একটা গর্জন করে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা;" আমাকে সাবাড় করতে এসেছিস? এই গুহার মধ্য থেকে জান নিয়ে আর ফিরতে হবে না। একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটবো তোকে!" অতিকায় কৃপাণের মত সেই ধারালো মোষের হাড় মাথার ওপর তুলে ধরলো ডাইনী নাকপোলিবা।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেত। কিন্তু তার আগেই প্রবল উৎক্ষেপে এই গুহাঘর দুলে উঠলো। বাইরে বিশাল বিশাল পাথর নামার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। গম্ গম্।

আর্তনাদ করে উঠলো নাকপোলিবা; "সুঙ্কেনি (ভূমিকম্প); সুঙ্কেনি শুরু হয়েছে।"

চমকে উঠলো সালুনারু। একটি মাত্র মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্রগামী বল্লমের মত গুহাঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। ছিটকে বেরিয়ে গেল একটি উলঙ্গ যুবতীদেহ। উপত্যকার নিবিড় বনের শরীরে সালুনারু নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল পলকপাতের মধ্যে।

গুহাঘরের মধ্যে একটি করুণ কণ্ঠ শোনা গেল। শোনা গেল একটি বীভৎস আর্তি। ডাইনী নাকপোলিবা কঁকিয়ে উঠেছে; "তুই একা যাস নি সালুনারু। আমাকে বাঁচা; পাহাড়টা নেমে আসছে। আমি যে বেরুতে পারছি না।"

সামনের পাহাড়ী উপত্যকাটা আশ্চর্য নিরুত্তর। একটি মানবিক কণ্ঠের আশ্বাস সেখান থেকে এই গুহাঘরের মধ্যে ভেসে এলো না। একটি খরযৌবনা নারীর গলা থেকে জীবনের একটি প্রতিশ্রুতিও শোনা গেল না। শুধু গুম গুম গর্জনে বিশাল বিশাল পাথর নামার শব্দ আসছে। বিকট আওয়াজে পাহাড়ী অরণ্য ধরাশায়ী হচ্ছে। তার সঙ্গে কলোল্লাসে নামছে জলপ্রপাত। সব গর্জন মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর প্রলয়ের সূচনা এই পাহাড়ী পৃথিবীকে আলোড়িত করে তুলেছে।

সুঙ্কেনি। পাহাড়ী ভূমিকম্প। ভয়াল আর ভয়ঙ্কর। নির্মম। নিষ্ঠুর। নাকপোলিবার গুহাঘরের ছাদ একটু একটু করে নেমে আসছে। ভাঁজে ভাঁজে পাথর ফেটে ফেটে প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। পেন্যু কাঠের মশালগুলো নিভে গিয়েছে। নিশ্ছেদ অন্ধকার। আর সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এই গুহাঘরের একটি আদিম প্রাণকে চিরকালের জন্য মুছে দেবার উল্লাসে পাহাড়টা নামছে। নেমে আসছে অমসৃণ পাথরের ছাদটা।

বিকট আর্তনাদ করে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। কিন্তু সেই আর্তনাদ ধস্ নামার গর্জনের মধ্যে একটা নগণ্য বুদ্বুদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; "আমি তোকে মারবো না সালুনারু। তুই আমাকে বাঁচা। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। সব অন্ধকার। ছাদটা যে নেমে আসছে। আ—উ—উ—উ—"

মাতলা মোষের শিঙের মত অমসৃণ ছাদটা নেমে আসছে। জীর্ণ থাবা থেকে ধারালো হাড়খানা ঝরে গেল ডাইনী নাকপোলিবার। কয়েকটি মাত্র নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত। তারপরেই করাতের মত বন্ধুর পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগুতে লাগলো ডাইনী নাকপোলিবা।

বাইরে প্রচণ্ড শব্দ করে পাথরের চাঙাড় নামছে। সংহার হচ্ছে আতামারী বন। লক্ষ শিকড়ের বাহু বিস্তার করে যে পাহাড়ী অরণ্য উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, ভূমিকম্পের একটি মাত্র উৎক্ষেপে তারা লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

বুক হিঁচড়ে এগুতে এগুতে আচমকা স্নায়ুগুলো টঙ্কার দিয়ে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবার। জীর্ণ বুকের মধ্যে যে নিথর ধমনীটা তির তির করে শব্দিত হ'ত, সেই ধমনীটাকে উচ্ছ্বসিত করে রক্তের বন্যা নামলো। জলদ বাজনার মত ডাইনী নাকপোলিবার হিসাবহীন বয়সের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এগিয়ে আসতে আসতে থমকে গেল ডাইনী নাকপোলিবা। [illegible]পে তার মাথাটা গুহাঘরের মধ্য থেকে

বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দেহটা সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে।

একটু আগে সে ভয় পেয়েছে। পাহাড়ী সঙ্কোনি তাকে মৃত্যুর আতঙ্কে জর্জর করে তুলেছিল। ভয়! আতঙ্ক! বিভীষিকা! ডাইনী জীবনের ইতিহাসে, ডাইনীর চেতনায় কী ভাবনায় এই শব্দগুলি একান্তই অনুপস্থিত। ভয় নামে কোন অনুভূতি নেই, আতঙ্ক নামে শিহরণ নেই, মৃত্যু নামে কোন বিভীষিকা ডাইনীর মনে থাকতে নেই।

ডাইনী নাকপোলিবা! এই পাহাড়ী পৃথিবীর সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র, সমস্ত আদিম ভয়ঙ্করকে শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, ভাবনায়, ধারণায় ধারণ করে এই গুহাঘরে নির্বাসিত হয়েছে। সে নিজেই এক বিভীষিকা, সে নিজেই আতঙ্কের প্রতিচ্ছায়া। এই পাহাড়ী পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যু তো তারই একটি নির্দেশের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকে। সে ডাইনী নাকপোলিবা! সে ভয় পেয়েছে। তার ব্রত, তার দীক্ষা থেকে বিকেন্দ্রিত হয়ে ছিটকে পড়েছে। বিচিত্র এক অপরাধবোধ, মারাত্মক এক পাপাচরণের ইঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পরমাণু শিহরিত হয়ে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবার। ডাইনী হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। রসিলটাকের মন্ত্রশিষ্যা হবার বিন্দুমাত্র সামর্থ তার নেই। স্মৃতি থেকে জলের লেখার মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে রসিলটাকের শিক্ষা। মুছে যাচ্ছে সব সব মন্ত্র। সব তন্ত্র।

ধূসর পর্দার ওপারে একটা অস্পষ্ট ছায়াচিত্র দেখা যায়। এক যৌবনবতী নারীর নরতনু, বন্ধ্যা হওয়ার অপরাধে এই পাহাড় তাকে আশ্রয় দেয় নি। স্বীকৃতি দেয় নি স্ত্রীর, অধিকার দেয় নি কন্যা হওয়ার। সেদিন থেকে এই গুহাগর্ভে, জনপদ থেকে অনেক, অনেকদূরে এই নির্জন পাহাড়ী উপত্যকায় সে ডাইনী রসিলটাকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। রসিলটাকের উত্তরকাল সে। সেই যৌবনবতী নারীর ছবি এই মুহূর্তে বড় অসত্য মনে হয়। মনে হয়, একটা অবাস্তব, একটা অলস মনোবিলাস। তার চেয়ে আরেক বড় সত্য আছে। রসিলটাকের উত্তরকাল সে। সে বরাঙ্গী তরুণী নয়, সে ডাইনী নাকপোলিবা।

ডাইনী নাকপোলিবা ভয় পেয়েছে। তবে কী, অজস্র পাহাড়ী গ্রীষ্ম-বর্ষা উজিয়ে, জীবনের এই জীর্ণ অধ্যায়ে আনিজার কুপিত দৃষ্টি এসে পড়লো তার ওপর! বুকের মধ্যেটা কী ছমছম করে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবার।

না! ভয় পেলে তাকে চলবে না। রসিলটাকের শিক্ষাকে, এই পাহাড়ী পৃথিবীর আদিমতাকে সে ব্যর্থ হতে দেবে না। রসিলটাক তাকে ভূমিকম্প শাসনের মন্ত্র শিখিয়েছিল। সেই মন্ত্র আবৃত্তি করে এই পাহাড়ী সঙ্কোনিকে উপত্যকা থেকে, মালভূমি থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করে দেবে নাকপোলিবা। গুহা-ঘর থেকে সে কিছুতেই বাইরে যাবে না। কিছুতেই এখান থেকে সে পলাতক হবে না। মৃত্যুর আতঙ্কে ফেরারী হবে না।

ওপর থেকে অমসৃণ ছাদ নেমে আসছে। না, আর কিছুতেই এই ছাদকে নামতে দেওয়া যায় না। ডাইনী রসিলটাকের এই গুহাঘরকে কিছুতেই বিধ্বস্ত হতে দেওয়া হবে না। সুড়ঙ্গের বাইরে মাথাটা বেরিয়ে গিয়েছে ডাইনী নাকপোলিবার। কিন্তু সমস্ত দেহটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় ডাইনী নাকপোলিবা মন্ত্র উচ্চারণ করে চললো। দ্রুত লয়ে। নিশ্ছেদ ছন্দে।

ওহ্ ই-য়ি—এ—হে—এ—এ
ওহ্ ই-ইয়ি—সঙ্কোনি—ই—ই—ই
আমাহ্ সেখস্—সঙ্কোনি—ই—ই—ই
অমুকেরঙ্ সঙ্—সঙ্কোনি—ই—ই—ই
ওহ্ ই-ইইয়ি—এ—হে—এ—এ—
সঙ্—সঙ্কোনি—ই—ই—ই—

ছাদটা আরও নেমে আসছে। ডাইনী নাকপোলিবার শীর্ণ দেহে তার হিমাক্ত স্পর্শ এসে লেগেছে। বাইরে ধস্ নামার গর্জন। অরণ্য ধ্বংসের আর্তনাদ। জল-প্রপাতের তর্জন। সব মিলিয়ে এক বিকট মহাপ্রলয়। সব কিছুকে ছাপিয়ে ডাইনী নাকপোলিবার কণ্ঠটা প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। অনেক, অনেকদিন পর সে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। তার ব্রত থেকে একটু আগে সে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, তার দীক্ষা থেকে সে বিকেন্দ্রিত হয়েছিল। এই মুহূর্তে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আরো, আরো জোরে দেহের সমস্ত উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়-গুলির সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংহত করে চীৎকার করতে লাগলো ডাইনী। নাক-পোলিবা। না, রসিলটাকের শিক্ষাকে, এই পাহাড়ী পৃথিবীর গুহায়-কন্দরে, মালভূমি আর উপত্যকায় আদিম জীবনের যে মন্ত্রগুম্ফিত ছড়ানো রয়েছে, তাকে বিফল হতে দেওয়া যাবে না। কিছুতেই নয়। এই ভূমিকম্পকে সে শাসন করবে।

পাথুরে ছাদটা আরো, আরো নেমে আসছে। আচমকা, একান্তই আচমকা ডাইনী নাকপোলিবার হিংস্র কণ্ঠটা স্তব্ধ হয়ে গেল। দপ করে একটি ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা নিভে গেল যেন।

(ক্রমশ)

॥ বঙ্কিমপ্রতিভা ॥

অমূল্যরতন গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনরূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ হয়। আধুনিক বাংগালীপ্রধানগণের মধ্যে এইরূপ বহুমুখী প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে দেখা গিয়াছে রাজা রামমোহনে এবং পরবর্তীকালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী, বিশ্বতোমুখী—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় encyclopaedic.

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ পরিচয় এই যে, তিনি ঔপন্যাসিক; কিন্তু ইহা তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট বা সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, প্রবন্ধকার, সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক ও জাতীয়তার উদ্গাতা। ঔপন্যাসিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন তাহা সকলেরই বিদিত। ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম সন তারিখ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী ২।১ জন ঔপন্যাসিকের নাম হয়ত করা যাইতে পারে; অথবা বাঙলার প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ববর্তী ২।১ খানা উপন্যাসও হয়ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে প্রথম সার্থক উপন্যাস-স্রষ্টা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি; আজ হয়ত এই উপন্যাসখানির রোমান্সবাহুল্য আমাদিগকে তত মুগ্ধ করিবে না; কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বাঙলার পাঠক সমাজ আকাশে নবাবিষ্কৃত তারকার ন্যায় ইহাকে মুগ্ধ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। ইহার পর কিঞ্চিদধিক বিংশ বৎসরকাল পর্যায়ক্রমে 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার বিদগ্ধ পাঠকসমাজকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিলেন এবং বাঙলা সাহিত্যে প্রকৃত উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার উপন্যাসের মধ্য দিয়া তিনি পাঠককে কখনও বা রোমান্সের কল্প-লোকে লইয়া গেলেন,—আবার কখনও বা বাঙলার অতি-পরিচিত জীবনের মধ্যেও যে কত সুখদুঃখ, বিরহমিলন, প্রেম, সেবা ও আত্মত্যাগের চিত্র ফুটিয়া উঠিতে পারে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। অতি সহজেই তিনি বাংগালী পাঠকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন; কিরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত তখনকার পাঠক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার উপন্যাসের জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিত রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতি সহজেই বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ-ঔপন্যাসিকের আসন লাভ করিলেন; তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সত্ত্বেও আজিও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

বঙ্কিমচন্দ্র কবি; কবি শব্দের মূলগত অর্থ দ্রষ্টা; 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে বঙ্কিমচন্দ্র কবি। শুধু তাহাই নহে; বর্তমানে কবি বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেই কবিজনোচিত কল্পনাশক্তি এবং ভাবের প্রাচুর্য ও বঙ্কিমচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা বহু স্থলে কাব্যগুণসম্পন্ন; পাঠকালে মনে হয় যেন আমরা গদ্যে রচিত কবিতা পড়িতেছি; উদাহরণস্বরূপ কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব', 'কে গায় ঐ' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কবিতা রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন; 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার গানগুলি আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। এই গানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার প্রকৃত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বলিয়া জানা না থাকিলে সহজেই এইগুলিকে বৈষ্ণব কবিদের রচিত গান বলিয়া ভুল হইবে। 'মথুরা-বাসিনী মধুর হাসিনী, শ্যামবিলাসিনী রে' শীর্ষক গানটির নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটি—

"বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে
বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী,
না মিটিল আশারে॥"

যেন কোন্ অনর্মদ কাল হইতে প্রেমের অতৃপ্ত ঘোষণা করিয়া আমাদের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ করিয়া দিতেছে!

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকার; 'কমলাকান্ত' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' আমরা প্রবন্ধকার বঙ্কিমের পরিচয় পাই। প্রবন্ধ দুই রকমের হইতে পারে; প্রথম, যাহাতে প্রবন্ধকার নানা তথ্যের অবতারণা করিয়া পাঠককে জ্ঞান দান করেন; আর দ্বিতীয়, যাহাতে প্রবন্ধকার নিজের হৃদয় পাঠকের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া পাঠকের মনোহরণ করেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি প্রথম শ্রেণীর; ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে; এইগুলি পাঠ করিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করি। 'কমলাকান্তে'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর; ইহাতে কমলাকান্ত ছদ্মনামের অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় হৃদয় পাঠকের নিকট মেলিয়া ধরিয়াছেন; নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সংসারের বিবিধ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া হাস্যকৌতুক করিতেছেন এবং আপনার মনের কথা বলিয়া পাঠককে একেবারে আপন করিয়া লইতেছেন। ইংরেজ সমালোচক De Quincey-র ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিতে literature of knowledge এবং literature of power এই দুইয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচক। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বহু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা করিয়াছেন। কতকগুলি প্রবন্ধে, যেমন 'গীতিকাব্যে', সাহিত্যের মূলে ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; আবার কতকগুলি প্রবন্ধে—যেমন 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা'—বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বা কবি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী, কিন্তু স্থানে স্থানে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়; বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলায় সমালোচনা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। সমালোচনাও যে সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগ এবং সমালোচনা সাহিত্য হইতেও যে আমরা প্রকৃত সাহিত্যের রস আহরণ করিতে পারি, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্রে যাহা আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথে আমরা তাহার পরিপূর্ণতা দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিক। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিকতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় মেলে তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে। তাঁহার মতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল বৃত্তির বিহিত অনুশীলনই ধর্ম; তাঁহার প্রতিপাদিত ধর্মকে অনুশীলন ধর্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। গীতার নিষ্কাম ধর্ম, ম্যাথু আর্নল্ড-এর থিওরী অব কালচার এবং অগস্ট কোম্‌ৎ-এর ধ্রুববাদ (পজিটিভিসম)—তিনটি মিলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন ধর্ম প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বৃত্তিগুলিকে প্রথমত দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—শারীরিক ও

মানসিক; তাহার পরে মানসিক বৃত্তিগুলিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন—জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করি; কার্যকারিনী বৃত্তি আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত করে; এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি দ্বারা আমরা আনন্দ অনুভব করি। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তির ফল জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আমাদের বৃত্তিগুলি পরস্পর-সাপেক্ষ; এ কটির যথার্থ অনুশীলন অন্যগুলির অনুশীলন-সাপেক্ষ; তাই একদিকে যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বৃত্তিগুলির অনুশীলন এমনভাবে করিতে হইবে যেন তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়—কোনও একটি বৃত্তি যেন অযথা বৃদ্ধি পাইয়া অপর বৃত্তিগুলিকে ক্ষুণ্ণ না করে।' তাই তিনি বলেন,—"অনুশীলন-নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসংগত বৃদ্ধি পাইবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন ও তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন অতি কঠিন ব্যাপার; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই ইহা সম্ভব হইয়াছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব।

সকল বৃত্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, ইহাই দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের মূল কথা। বাঙগলার জাতীয় জীবনের বর্তমান দুর্দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। জাতি হিসাবে আমরা বড় বেশী Emotional বা ভাবপ্রবণ; ইহার ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই আছে; অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িলে সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সর্দার প্যাটেল সেদিন বাঙগালী জাতিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙগালী শুধু কাঁদিতেই জানে। বঙ্কিমের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানুষ ও জাতি হিসাবে আমাদিগকে সুসমঞ্জস জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার উদ্গাতা। তিনি "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি কবি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির পূর্বেই তিনি ভারতকে এই মন্ত্রদীক্ষা দেন। দেশমাতৃকার পূজা, মাতৃসমা মাতৃভাষার সেবা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সময়ে শিক্ষিত বাঙগালী ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া গর্ব অনুভব করিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহার প্রথম উপন্যাস ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন এবং মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শুধু নিজে বাংলা ভাষায় লিখিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, সকল শিক্ষিত বাঙগালীকে বাংলা ভাষায় রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার "বঙ্গদর্শন"কে কেন্দ্র করিয়া এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইংরেজী শিক্ষিত বাঙগালী উভয়ের সমান অবজ্ঞার পাত্র ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষায় স্বীয় সকল বক্তব্য প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেন; ইহার মূলে ছিল তাঁহার জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতি। কিন্তু বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি ইউরোপীয় patriotism নহে; স্বদেশকে ভালবাস, কিন্তু অপর দেশকে ঘৃণা করিয়াও না, স্বদেশকে বড় কর, কিন্তু তজ্জন্য অপর দেশকে লুণ্ঠন করিও না—ইহাই বঙ্কিমের উপদেশ। তিনি বলেন, "ইউরোপীয় patriotism একটি ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরের সমাজে কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।...জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীদের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন।" পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি তাহারই পূর্বাভাস।

বঙ্কিমের প্রতিভা বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া ইহাকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্য শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলিত; বঙ্কিম-প্রতিভার যাদু স্পর্শে তাহা সহসা যৌবনের শক্তি ও শ্রী লাভ করিল। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে আজ আমরা যে শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। বহু বিষয়ে তিনিই পরবর্তী সাহিত্যিকগণের পথপ্রদর্শক। আজকাল এক শ্রেণীর সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে খাটো করিবার চেষ্টা করিতেছেন; শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, বাঙগলার যাঁহারা বরণীয় মনীষী তাঁহাদের সকলকেই ইহারা খাটো প্রতিপন্ন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। আজকাল ইউরোপে যেমন সাহিত্যের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তেমনি এ দেশেও এক শ্রেণীর সমালোচক মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে ইহাদের অভিযোগ এই যে, তাঁহার সাহিত্যে যথেষ্ট সমাজ-চেতনা বা গণ-চেতনা নাই। গণ-চেতনাই সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড কি না, সে সম্বন্ধে কোন তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াও আমরা বলিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় গণ-চেতনার অভাব নাই। সর্বহারা, প্রোলিটারিয়েট, বুর্জোয়া প্রভৃতি আধুনিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিয়া থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট গণসচেতন ছিলেন। জনগণের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্বদাই কাঁদিত, কিসে বাঙগলার জনগণের—বাঙগলার কৃষকের উন্নতি হইবে সে কথা তিনি সর্বদাই চিন্তা করিতেন। তাই তাঁহার 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে আমরা দেখি যে, তিনি অনশনক্লিষ্ট রোগজীর্ণ বাঙগলার কৃষক হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের কথা ভাবিতেছেন। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে যে, দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কি? যদি তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই জয়ধ্বনিতে যোগ দিবেন না। কৃষকের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র কি এখানে গণ-চেতনার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছান নাই? উপরোক্ত সমালোচকদের কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ক্ষীণকণ্ঠে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহার প্রতিভার অমর অবদান স্মরণ করিতেছি।

(৪)

রবিদা ট্যাক্সি নিয়ে এল ডেকে। সবাই তৈরী হয়েছে বেরুবার জন্যে। বিলাসের রান্না করাই সার হয়েছে। খাবার টেবিলে কোনরকমে সবাই বসেছিল একবার। কিন্তু খাওয়া কারুরই ঠিক হয়নি। যার কোনদিকে না তাকিয়ে, খাবার কথাছিল মন দিয়ে, সেই সুমিতাও পারেনি খেতে।

ওর মন জুড়ে যে এত উৎকণ্ঠা, এত অস্বস্তি ছিল, রবিদাকে পেয়ে, কয়েক মুহূর্তের কান্নার আবেগে সেই বন্ধ হৃদয়ের দরজাটি গেল খুলে। তাতে অভয় পায়নি। উৎকণ্ঠা যায়নি মন থেকে। বুক ভরা ব্যথা হঠাৎ আলোড়নে উপচে পড়েছে। যা উপচে পড়েছে, তাকে লুকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন নেই। লুকিয়ে রাখতেও পারেনি। ওই উপচে পড়া ধারায় আপনি ভেসে চলেছিল সুমিতা।

কিন্তু ওর স্নান করতে যাওয়ার ফাঁকে যেন কী একটা ঘটে গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই মেজদি'র চাউনি ও কথা শুনেই বিস্মিত লজ্জায় হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পালাতে হয়েছিল। কিন্তু পালাবার উপায় ছিল না। সকলেই ওর দিকে ফিরে ফিরে দেখেছে কয়েকবার। বড়দি', মেজদি', বাবাও। কী যে ছিল সেই দেখার মধ্যে! এত ভয় ও ব্যথা ছাপিয়ে ওঠা লজ্জায় ও আর বাঁচেনি। তখন মনে হচ্ছিল, রবিদা'র পিঠে গুপ্ করে একটি কিল মেরে, ও'রই বুকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'কী বলেছেন আপনি ওদের।' যেন সেই অলক্ষিত সত্যটির সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা। তাতে সবাই খুশি হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। অবাক যে হয়েছে, সেটুকু চাপা থাকেনি।

সুমিতা যেটুকু জানে না, সেটুকু হল, ওর অনুপস্থিতিতে রবিদা' বলেছিলেন সুগতাকে, তোমরা সবাই চলে গেলে, সুমিতা একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে না।

কথাটি শুধু সুগতাকে বললেও সুজাতা আর মহীতোষের কানেও গিয়েছিল। সুগতা বলেছিল, কোর্ট কাচারির ওই সব পরিবেশে ওকে নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে রবিদা'?

রবিদা' এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে-ছিলেন, ও ছোট বলে মনের দিক থেকে যে ক্ষতির কথা ভাবছ, সেটা বোধহয় আসলে কিছু নয়। কিন্তু বাড়িতে একলা রেখে গেলে, বেচারী ছটফটিয়ে মরবে। সেটা বড় অবিচার হবে।

রবিদা'র কথার মধ্যে কী ছিল, সহসা আর প্রতিবাদ করতে পারেনি সুগতা। মহীতোষ বলে উঠেছিলেন, ঠিকই বলেছ রবি। ঝুমনো তো মাঝপথে নেমে যাবে। ওদের কি জরুরী সভা আছে উনিভা-র্সিটিতে। ঝুমনোটা ওর বড়দি'র সঙ্গে থাকতে পারবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ে রবিদা' দাঁড়িয়ে রইলেন। সুমিতা ততক্ষণে বড়দি' মেজদি'র মাঝখানে গিয়ে বসেছে জড়োসড়ো হ'য়ে। মহীতোষ উঠতে গিয়েও দাঁড়ালেন থমকে। বললেন, কই রবি, তুমি সামনের দিকে ওঠ!

সুমিতা লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, রবিদা' অনেকক্ষণ থেকেই কেমন বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছেন। বাবার কথা শুনে, ও'র বুদ্ধিদীপ্ত বিষণ্ণ চোখ চকিতে একবার দেখে নিল বড়দি'কে। কুণ্ঠিত হেসে বললেন, আমার যাওয়ার কি দরকার আছে কাকাবাবু? রবিদা'র কথা শুনে বাবাও একবার বড়দি'র মুখের দিকে দেখলেন। বললেন, তোমার নিজের দিক থেকে যদি কোন বাধা থাকে, তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

বড় অসহায় মনে হল বাবাকে। বড়দি'র ব্যাপারে, এতদিন বাবাকে ঠিক এতখানি আত্মনির্ভরহীন মনে হয়নি। আজ ওঁর মনের কোথায় কী যেন ঘটে গেছে। দুশ্চিন্তার ভার একলা বহন করবার সাহস নেই মনে হচ্ছে। তাই আজ রবিদা'র মত একটি ছেলে দরকার ওঁর। নিজের অত বড় একটি ছেলে থাকলে, তাকেও বোধহয় এমনি করেই ডেকে নিতেন।

কিন্তু এই কথার মধ্যখানে, বড়দি' একটি কথাও বললেন না। ও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, স্থির চোখে। বাবার সঙ্গে কথা বলার পর, সে-ই যে নীরব হয়েছে, তারপর থেকে মুখ খোলেনি একবারও। অন্যান্যদিন রবিদা'র সঙ্গে এতক্ষণে কত কথা হ'য়ে যায়। কত কথা যে ওরা বলে। চিরদিন ভেবে ভেবে অবাক হয়েছে সুমিতা, ওদের দুজনকে কথা বলতে দেখে। যেন দুজনের কথা বলা কোনদিন শেষ হবে না।

কিন্তু, এ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আজো রবিদা' থাবার বলেই বসেছিলেন সকলের সঙ্গে। দাদা আর মেজদি'র সঙ্গে কয়েকটি কথা হয়েছে। সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে লুকিয়ে অনেকবার রবিদা' বড়দি'র দিকে তাকিয়েছেন। সুমিতার মনে হয়েছে, বড়দি'র আনত চোখও যেন লক্ষ্য করছিল সেটুকু। এমনকি, রবিদা'র ভাব-ভঙ্গি দেখে, দু' একবার ওকে তাকাতেও হয়েছে। তবু ওর গলা থেকে একটি কথা বেরোয়নি। যেন বড়দি' নিজেকে ক্রমেই শক্ত করেছে। ওদিকে মাঝে পড়েছিল বাকী তিনজনের কথায়। আর রবিদা'র অপ্রস্তুত মুখে একটি বিমর্ষতা এসেছে ফিরে।

বাবার পরেই মেজদি' বলে উঠল, তুমি চল রবিদা'। বলছিলে, সাড়ে বারোটায় তোমার ক্লাশ আছে। ওখান থেকে চলে যেও কলেজে।

মেজদি'র দিকে তাকাতে গিয়ে আর একবার চোখ পড়ল সুজাতার দিকে। ওর দিকে তখন সকলেরই চোখ পড়েছে গিয়ে। বোঝা গেল, বড়দি'রও অস্বস্তি হচ্ছে। ওর স্থির চোখের পাতা নড়েচড়ে উঠল কয়েক-

যায়। বাঁ হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটি ডান হাতে নিয়ে, রবিদা'র দিকে তাকিয়ে কোন রকমে বলল খুব নীচু গলায়, চল না!

লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়েছিল বিলাস। আরো দূরে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, বাইরের ঘরের জানালার পর্দা'র আড়ালে ঝি অবলার মুখখানি। বিকৃত মুখে তার একটি অশ্রুধার ভাব। বিলাসের কাছে শুনেছে যে, বড় মেয়ে তার স্বামীর সংগে ছাড়াছাড়ির জন্যে কোর্ট কাচারি করছে। ভাবছিল, হবে না! এত বাইরের ছেলে ছোকরার ভিড় যে বাড়িতে, সে বাড়ির মেয়েরা ছাড়াছাড়ি না করবে কেন?

ওপাশে, ডেপুটি বাড়ির দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়াছিল, প্রৌঢ়া গিন্নী আর ছোট মেয়ে। মেয়েটি সুমিতারই সহপাঠিনী। বয়সে দু' এক বছরের বড়। নাম ওর তাপসী। তাকিয়ে যেন মজা দেখছে।

রবিদা' উঠে গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সুমিতা জানত, বড়দি'র ওই বলাটুকুর জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন রবিদা'। ওদের দুজনের মধ্যে ওটা ভদ্রতা কিংবা সামাজিকতার ব্যাপার নয়, সম্পর্কের সংকোচ ও আড়ষ্টতা। বাইরে মস্তবড় মানুষ রবিদা'। অধ্যাপনা আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক সম্মান ওঁর। যখন বড়দি'র সামনে এসে দাঁড়ান, তখন আর বাইরের সেই মানুষটিকে চেনা যায় না। মনে হয়, বড়দি'র একটি অংগুলি সংকেতের জন্য সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন উনি। এর মধ্যে সুখ ও আনন্দ আছে কতখানি, তা' জানে না সুমিতা। কিন্তু, দুজনের মাঝখানে, কোথায় কোন্ অদৃশ্যে একটি ব্যথার ছোট কাঁটা যেন আছে লুকিয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। তাকে অনুভব করা যায় না বড়দি'র দিকে তাকিয়ে। রবিদা'র সান্নিধ্যে এলে খচখচানিটুকু টের পাওয়া যায়।

রবিদা'র এই গাড়িতে ওঠার মধ্যে আর কে কী দেখতে পেল ও জানে না। কিন্তু রবিদা'র মধ্যেও বাবার মতই একটি অসহায় বেদনার আভাস পেয়ে, সুমিতার বুকের মধ্যে উঠল টনটনিয়ে।

গাড়ি এসে পড়েছে ট্রাম রাস্তার উপরে। রোদে স্নান করে উঠেছে সারা শহরটি। ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের চীৎকার, প্রাইভেট গাড়ির হর্ন, রিকশার ঠুন্‌ঠুন, মানুষের কলরবে কেমন এক সচকিত উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে রাস্তাঘাট। যুদ্ধের পর দাংগার অবরোধ সবে কাটিয়ে উঠেছে শহর। তার ছাপ লেগে আছে এখনো এখানে সেখানে। দেয়ালে দেয়ালে, দাংগা আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পোস্টারে গেছে ছেয়ে। কোনটিতে গান্ধীজীর শান্তির বাণী, কোনটিতে সাম্প্রদায়িক রণহুংকার, ক্রিপট মিশনের বিরুদ্ধে জেহাদ কোনটিতে। এ-আর-পি ওয়ার্ডেন্ পোস্টগুলির সামনে সেই বালি কুড়ো মানুষগুলির জটলা নেই আর। শুধু সরিয়ে নেওয়ার অবসর পাওয়া যায়নি এখনো সাইনবোর্ডগুলি। এখানে সেখানে এখনো জরুরী শেল্‌টারের প্রাচীরগুলি রয়েছে দাঁড়িয়ে।

গাড়িতে সবাই চুপচাপ। সবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সুমিতা আড়চোখে দেখল একবার বড়দি'কে। বড়দি' স্নান করেনি। আঁচড়ে নিয়েছে সামনের চুলগুলি। সাবান ধোয়া মুখে একটু হিমানীর প্রলেপ মাত্র। শাদা রংএর কাশ্মীরি সার্জের ব্লাউজের সংগে পরে এসেছে আঁসপাড় শাদা তাঁতের শাড়ি।

বিয়ের এক বছর আগে এমনি শাদা জামা-কাপড় খুব পরত বড়দি'। সে সব খদ্দরের জামাকাপড়। তখন সুমিতা সবদিক থেকেই অনেক ছোট। ওর স্কুলের বইয়ের আশে-পাশে আর যে সমস্ত ভগবতী আর দেশ-নেত্রীদের বহু বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনীগুলি থাকত, সেইসব নায়িকাদের সংগে হুবহু মিশিয়ে ফেলত বড়দি'কে। বড়দি' মেজদি' আর রবিদা'র মুখে নানান কথা শুনে শুনে, ওরও বুকের মধ্যে এক অস্পষ্ট আগুনের আঁচ লেগেছিল। কেমন একটি অস্পষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষে ফুঁসত মনে মনে। কে যে শত্রু, কার বিরুদ্ধে এত রাগ, তা-ই ভাল করে জানতনা সুমিতা। এই উত্তাপের পিছনে বড়দি'র সেই মূর্তিখানি আসল! বড়দি' তখন ধ্যানের নায়িকা।

তখন রবিদা'র সংগে রোজ বাইরে যেত বড়দি'। রবিদা'র সংগেই সারাক্ষণ। সেই স্রোতে মেজদি'ও ভেসে গিয়েছিল। কত ছেলে আসত বাড়িতে। সকলের মধ্যে বড়দি'কে দেখাত রানীর মতন। সেদিনের রবিদা' আর বড়দি', আর আজকের এই দুই বন্ধুতে কত তফাৎ।

সবচেয়ে চরম হয়েছিল, বড়দি'র জেল যাওয়া। সারা কলকাতাটাই যেন বড়দি'র জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। বাড়িতে পুলিস তল্লাস করেছে। মেজদি' গেছে পালিয়ে। কী ভাগ্যি, বাবা তখন অবসর নিয়েছেন চাকরী থেকে। জেল হয়েছিল রবিদা'রও।

পনর দিন পরেই জেল থেকে বেরিয়ে এল বড়দি'। ছ' মাস পরে রবিদা'। গিরীনদা'র সংগে আলাপ হয়েছিল বড়দি'র, জেলে যাওয়ার আগেই। রবিদা' এসে দেখলেন, গিরীনদা' এ বাড়ির প্রত্যহ আসরের একজন। রবিদা' আসার পরেই তো পাকাপাকি হল বিয়ের কথা।

তখনো সুমিতা রবিদা'র হাসির দিগন্তে বিষণ্ণতার অস্তাভা দেখেছে। যেটুকু ও আজো জানে না, সেটুকু সেদিনও জানত না যে, রবিদা'র দীপ্ত চোখের কোণ থেকে, কোন্ শিখাটি নিভে গেছে একেবারে। সে শিখাটি নিভে গেলে বাইরেটাকে তো অন্ধকার

করে না। যেখানটাতে ঘনীভূত হয় অন্ধকার, সে জায়গাটি থাকে সকলের অগোচরে। যেখানে বেদনা যত, তত জমে নিজের ধিক্কার। রবিদা'র মত মানুষেরা সেইখানটি ঢেকে রেখে হেসে বেড়ান দশজনের সামনে। ওঁদের পথটি এমনি কঠিন।

সুমিতা জানত না, বিয়ের আগে যেদিন বড়দি রবিদাকে বলেছিল, রবি, আমি তোমার ওপর অন্যায় করছি না তো?

তীব্রবেগে রক্তপ্রবাহ ছুটে এসেছিল রবিদার মুখে। কী ভয়ংকর দীপ্ত হাসি ফুটেছিল ও'র ঠোঁটে। যেন আগুন জ্বলছিল দপ্ দপ্ করে। বলেছিলেন, আমার ওপর? না, না, তেমন দুরাশা তো আমি কোনদিন করিনি উমনো। তা হলে তো স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে পারতুম কোনদিন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওরা দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দুজনের কাছ থেকে। সেই দুরাশা থাকলে স্পষ্ট করে বলতে পারতেন রবিদা। এত বড় মিথ্যে কথাটা কেউ-ই বোধ হয় চোখে চোখে তাকিয়ে বলতে পারেনি, শুনতেও পারেনি।

এর বেশী ওরা বলতে পারেনি কেউ কিছু। রবিদা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে-ছিলেন, রাতের নির্জন রাস্তায়, একটি গাড়ির ছায়ায় যেন ঘাপটি মেরে পড়ে আছে গিরীনের মস্তবড় গাড়িটি।

বড় রাস্তায় এসে আর একবার হেসে-ছিলেন রবিদা। ভুল, সবটাই একেবারে ভুল। চোখে আগুন, ঠোঁটে আগুন যে

রুদ্রানীর হাতের পতাকা নিয়ে সবার আগে রবিদা মৃত্যু-উল্লাসে যাবেন ছুটে, সেই রুদ্রানী ধরেছে রানীর বেশ। সত্যি, একটুও বিশেষ হয়নি রবিদার। ভেবেছিলেন, এছাড়া কী উপায় আছে সুজাতার। ও যেভাবে মানুষ হয়েছে, যে মন নিয়ে বেড়েছে, ঠিক সেই পথই নিয়েছে বেছে। ওইদিকেই সুজাতার সীমান্ত। তার ওপারে রবির আগুনের শিখায় কাঁপা অস্পষ্ট দিগন্তে কী আছে, কে জানে। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল রবিদার। কী এক সর্বনাশের হাত থেকেই না সুজাতা বাঁচিয়ে দিয়েছে রবিদাকে, বেঁচেছে নিজে। হয়তো, পরে না পেতেন ও'র রুদ্রাণীকে, না পারতেন রাণীর মত সমাদর করতে। তখন ধুলো মাথামাখি করে দাঁড়াতে হ'ত দুজনকে দশ-জনের সামনে। কী অপমান!

আজ তো সুজাতা ধুলো মেখে দাঁড়ায়নি। দাঁড়িয়েছে রাণীর মতই। রবিকে ও ধরেওনি, ছাড়েওনি। নিজের মনকে চোখ টিপে, ছলনার মধ্য দিয়ে ও স্বীকার করেনি গিরীনকে। ও যেন চিরকাল ধরেই প্রতীক্ষা করছিল গিরীনের। যেদিন এসে গিরীন চাইল, দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাণী বলেই, রাণীর মত ও বেরিয়ে এসেছে আজ।

এলোমেলো হয়ে উঠেছিল সুমিতার অস্পষ্ট মন। কোন বেশটি যে বড়দির সত্যি, সেটা বুঝে উঠতে পারেনি। ওই জেলে যাওয়ার বেশ, না গিরীনদার সামনের বেশ। যদিও কোনটাই ওকে ক্ষুণ্ণ করেনি। মনে হয়েছিল, বড়দি যেন একটি স্বাধীন সুন্দর পুতুল। কখনো এই বেশে, কখনো ওই বেশে বেড়ায় সেজে।

কিন্তু কোথা থেকে কী ঘটে গেল। সুমিতার মনে পড়ল সেই বিশ্রী সংবাদটির কথা। গিরীনদার চেহারাটির সংগে কোন-দিন ও ঘটনাটির মিল খুঁজে পায়নি। স্পষ্ট মনে পড়ছে, বড়দিকে লেখা, সুমিতার লুকিয়ে দেখা গিরীনদার সেই পত্রটি। —"তোমাকে প্রতারণা আমি কোনদিন করতে চাইনি। যার বিষয় নিয়ে তুমি এতটা ক্ষিপ্ত হয়েছ, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়।" তখন আর সামনাসামনি নয়, দূরে থেকে ওরা পত্রে পত্রে আয়ুধ নিক্ষেপ করছে পরস্পরের প্রতি।

আর একটি গিরীনদার পত্র—"তার সংগে তো আমি কোন সম্পর্কই রাখিনি। তোমার হিতৈষী সংবাদদাতারা আমার নামে মিথ্যে কথা বলেছেন তোমাকে।

"স্ত্রীর অধিকারে যেসব গালাগাল আমাকে দিয়েছ, আমার অতিবড় শত্রুও কোনদিন তা দেয়নি। সেই জন্যই বলছি, ছোট মুখে বড় কথায় আমার বড় ঘৃণা।"

পড়তে পড়তে মনে হত, সুমিতার বুকের তন্ত্রী ছিঁড়ে পড়বে। একে তো লুকিয়ে দেখার কাঁপুনি, তার ওপরে সেই ভয়ংকর কথাগুলি। এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে সেই সব পত্রের কথা—"হ্যাঁ, তোমার সংগে দেখা হওয়ার আগে তার সংগে আমার কোন সম্পর্কেরই কোনরকম শৈথিল্য ছিল না। সেকথা আগেও বলেছি, এখনো বলছি। তাতে তোমার যত ঘৃণা এবং রাগই হোক, এ সত্য স্বীকার না করে পারছিনে। কিন্তু সে সুন্দরী এবং বিদুষী কিনা, অনর্থক এ প্রশ্ন করে আমাকে খোঁচা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি লিখেছ, আমার মত নীচ সবই করতে পারে। তা ঠিক, সুতরাং তার রূপ ও বিদ্যার কথা থাক। তোমাকে যে পেয়েছিলুম, সেটা তো অস্বীকার করতে পারবে না। একটি কথা, পত্র লেখালেখি পরস্পরের প্রতি ঘৃণাটাই বাড়াচ্ছে। সুতরাং তার থাক। তবে আমার বিশ্বাস, তোমার অধিকারে আমি কোনরকমেই হস্তক্ষেপ করিনি। তোমার ফিরে আসার পথ পরিষ্কার। আর তা না চাইলে সেটাকেও অপরিষ্কার করে রাখতে রাজী নই আমি।"

আবার—

"তার কাছে আর যাবো কি না যাবো, সেটা তোমার ওই ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ প্রশ্নের মুখে আমি কোন জবাবদিহি করতে পারব না। হ্যাঁ, যতদিন প্রয়োজন বুঝব, ততদিন তাকে আর্থিক সাহায্য না করে পারব না। তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে, আর একজন একে-বারেই ভেসে যাবে, তার মধ্যে আমি কোন গৌরব দেখিনে। সে যে কারণেই হোক। তবে এতদিনে তোমার সংগে আমার ব্যাপারটা পারিবারিক অপমানের শেষ সীমায় এসে পড়েছে। তুমি ফিরে না এলে আমাদের বংশে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতে হবে আমাকে। আমি কোন কিছুকেই আর ঝুলিয়ে রাখতে পারব না।

কত কথা সেই পত্রাবলীর। তারই পরিণতির সর্পিল পথ বেয়ে এখনো চলতে হচ্ছে।

হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়াল। চমকে তাকাল সুমিতা। মেজদি নেমে যাচ্ছে। ব্যস্ত ছুটন্ত চৌরংগী। ইংরেজি ছবিঘরের ভিড়। ভিড় চারদিকে শাদা, কালো মেয়ে-পুরুষের। মাথার উপরে গম্বুজের কপালে ঘুরেছে সময়ের কাঁটা। কাঁচের গায়ে গায়ে ঝুলছে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র রকমারি জামা।

মেজদির নেমে যাওয়া দেখে সুমিতার মনটা খারাপ হয়ে উঠল আরো। কিন্তু বড়দির ব্যাপারের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে আছে ও যে, ওর কোর্টে না যাওয়ার মধ্যে কোন অভিযোগের অবকাশ নেই। পারলে মেজদি'কে আটকাতে পারত না কেউ। নেমে দাঁড়াল মেজদি। বেশে ওর বৈরাগ্য, ভঙ্গিতে রাজেন্দ্রাণী। নেমে দাঁড়াতেই দেখা গেল,

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটি ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে মৃণাল। মেজদির বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছে। গত বছর পাশ করেছে মৃণাল। মেজদি পরীক্ষা দিতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্র ওদের ছাড়াছাড়ি হতে দেয়নি।

সে এসে আগে রবিদার দিকে চেয়ে হাসল একটু। তারপরে হঠাৎ মুখখানি করুণ করে তাকাল বড়দির দিকে। যেন শবযাত্রার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়দিও হাসল একটু। মেজদি বলল বড়দিকে, দিদি, আমি তা হলে যাচ্ছি।

বড়দিকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছিল। ঘাড় কাৎ করে বলল, আচ্ছা। মহীতোষ ফিরে তাকিয়ে বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস ঝুমনো।

মৃণালের পাশ ঘেঁষে ফিরতে গিয়ে মেজদি বলল, চেষ্টা করব বাবা।

বাবা ওদের দুজনকেই দেখছিলেন। মৃণাল আর মেজদিকে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সমস্তটাই যেন সুমিতার স্বপ্নের ঘোরে ঘটে গেল। বাবা, বড়দি, মেজদি, রবিদা, সবাইকেই ভালবেসেছিল সুমিতা। তার জন্যে ওর জীবনে নিরঙ্কুশ সুখ ছিল না। কীভাবে, কোনদিক দিয়ে কতগুলি বিচিত্র সুখ-দুঃখ গড়ে উঠেছিল ওর মনে। সেই মন, মানুষের এমন বৈচিত্র্য দেখে সভয়ে কেঁদে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে। আজ মৃণালকে মেজদির পাশে দেখে, অন্যদিনের মত খুশিতে ও উপচে উঠতে পারল না। এখনো বিত্ত ও অবস্থা দিয়ে সুখ-দুঃখ রচনা করার পথে পা বাড়াতে পারেনি সুমিতা। ওর খালি ভয় আজ, মানুষ তার নিজের হাসি নিজেই দেয় ধুয়ে শেষ করে। মানুষের জীবনধারণের মধ্যে কোথায় কতগুলি মহা-সর্বনাশ আছে লুকিয়ে। আর মানুষ তাকে কেমন করে যেন নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। কী করে বলবে ও, মৃণালকে দেখলে মেজদির গম্ভীর পাতলা ধারালো ঠোঁটের কোণে একটি বিচিত্র হাসির রেখা দেখতে পায় ও। একদিন পেয়েছিল, গিরীনদার সামনে বড়দিরও। তারপর ওই পত্রগুলি। যার প্রতিটি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য রয়ে গেছে আসল কথাগুলি। ফুটে উঠেছে শুধু ক্ষিপ্ত, অবুঝ, অপমানকর কতগুলি মিথ্যেকথার সারি।

রাস্তাঘাট, গাড়ির গতি, ভেতরে বাবা, বড়দি, রবিদা, সব মিলিয়ে ঘোর কাটল না ওর স্বপ্নের। কেবল একটি মর্মভেদী কান্না ঠেলে উঠতে লাগল বুক থেকে।

ওর গল্প-সাহিত্য, হাসি-খেলা-গানের সহজ পথ দলে দুমড়ে ভাঙছে চোখেরই সামনে। সবটাই এতবড় মিথ্যে এই সংসারে।

ওর এই ঘোরের মধ্যে দিয়েই গাড়ি কোর্টে এল। কখন উঠে গেল বারলাইব্রেরীতে। উকীল অনিলবাবু বক্ বক্ করে গেলেন। কালো গাউনপরা শকুনের মত উড়ে উড়ে যেন চলেছে কতগুলি মানুষ। আশেপাশে ডাইনে বাঁয়ে, সর্বত্র তাদের ছায়া। জোড়া জোড়া চোখ এসে গিলছে বড়দিকে, ওকে, ওদের সবাইকে। আলমারীতে, বইয়ে, আলোছায়াতে সর্বত্রই যুদ্ধমান তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। চারদিকে এক মহাসমারোহ এখানে যেন ঘিরে আসছে এক বিশালকায় খড়্গ নিয়ে। বড়দি আর গিরীদার মাঝখানের সমস্ত তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

ওর ভয় নিয়ে, কান্না চেপে, কখন রবিদার সঙ্গে এসে দাঁড়াল সুমিতা নীচের গাড়ি ভিড়করা লনের একপাশে, সে খেয়ালটুকুও নেই। তারপর হঠাৎ ও চমকে দেখল, একটি গাড়ির দরজা খুলে নামছেন গিরীনদা। ও অস্ফুট গলায় বলে উঠল, গিরীনদা।'

রবিদা বললেন, কই?

তারপর দুজনেই নিঃশব্দে চেয়ে দেখল, গিরীনদা নেমেছেন গাড়ি থেকে। সেই গিরীনদা! দেখে কাঁপছে সুমিতার বুকের মধ্যে। হয়তো ডাক দিয়ে বসবে। ঠিক তেমনি, টাই আঁটা, কোট পরা, ফিটফাট গিরীনদা। তবু যেন সব মিলিয়ে কিছু অবিন্যস্ত। চোখ থেকে গগলস নামিয়ে, ড্রাইভারকে কি বলে চলে গেলেন ওপরে। দেখতেও পেলেন না ও'র রুমনো সাহেবাকে, বন্ধু রবিকে।

হঠাৎ রবিদার গলার স্বরটি কেমন গাঢ় হয়ে উঠল। সুমিতার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, আমরা এখানেই দাঁড়াই রুমনি, কেমন।

—হ্যাঁ।

আবার বললেন কি ভাবছো রুমনি?

কি ভাবছে সুমিতা? বড় ভয় পেল, চোখ ফেটে জল আসবে এখুনি। তবুও হাসল। হেসে রুদ্ধ গলায় বলল, বলব রবিদা?

অবাক হয়ে বললেন রবিদা, বল না।

সুমিতা সেই অসহজ পথের নির্মমতার যন্ত্রণা নিয়ে, সহজ পথের কথাটাই বলে ফেলল নির্ভয়ে। ঢোক গিলে, হেসে বলল, আচ্ছা রবিদা, যদি গিরীনদা এখুনি গিয়ে বড়দির কাছে গিয়ে দাঁড়ান হেসে?

রবিদা চমকে উঠে বললেন, আঁ?

কিন্তু সুমিতা তখন ফিস্‌ফিস্‌ করে যেন স্বপ্নের ঘোরে বলেই চলেছে, যদি গিরীনদা গিয়ে বড়দির হাত ধরে টেনে নিয়ে যান। যদি বড়দিটা কেঁদে ফেলে সত্যি সত্যি গিরীনদার সঙ্গে চলে যায়। ওরা সব ঝগড়া ভুলে যদি সেই আগের মত হয়ে যায়। সেই আগের মত হাসতে হাসতে, ঠিক আগেরই মত ওই গাড়িটাতে চলে যায়।......

সমস্ত গলাটি ভরে উঠল সুমিতার ওর হাসি [illegible] সুধায়। রবিদা কয়েক মুহূর্ত [illegible] বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ নীরবত[illegible], সুমিতাকে কাছে টেনে, মাথায় হা[illegible] বুলিয়ে, চাপা স্বরে বললেন, ঠিক বলেছ রুমনি, ঠিক। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না।

(ক্রমশ)

এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ জেমস্ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

॥ ৩৩ ॥

হিমবাহে ওঠবার পর আবহাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য খারাপ হয়ে পড়লো। কিন্তু তা খুব অল্পকালের জন্য। আমরা এগিয়ে চললাম। 'বেসক্যাম্প' থেকে উপরে উঠলাম, আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে তুষার প্রপাতটার কাছাকাছি আমরা আমাদের প্রথম শিবিরটা স্থাপন করলাম। এখানে যে বিরাট বরফের স্তূপ জট পাকিয়ে রয়েছে, সেটা পার হয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটা ভালমত রাস্তা খুঁজে বার করবার জন্য সুইসরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলেন। এক দলে দিত্তের, ল্যাম্বের, অবের, আর ডাঃ সিভ্যালী। আর অন্য দলে রচ, ফ্লোরী, গ্যাসপার আর হফস্টেটার। এই দুটো দল পালা করে করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পথ খুঁজতে লাগলো। বরফের ওপরে ধাপ কেটে কেটে, দড়ি পুঁতে পুঁতে পথ বানাতে চেষ্টা করল। ডাঃ উইস ডুনাণ্ট, ওদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়, তিনিই 'বেস ক্যাম্পে' আর প্রথম শিবিরটায় থাকলেন। ঠিক হ'ল এই অভিযানের দায়িত্ব তিনি সেখান থেকেই গ্রহণ করবেন। কিন্তু উঁচু অঞ্চলে পাহাড়ে চড়ার নেতৃত্ব নেবেন দিত্তের সাহেব। আর আমার কাজ ছিল, যেখানে যেখানে শিবির স্থাপিত হবে, সেখানে সেখানে শেরপারা যাতে মালপত্র-গুলো ঠিকমত এবং নিরাপদে পৌঁছে দেয় সে বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখা, অভিযাত্রী দলটি ধীরে ধীরে তুষার প্রপাতের মধ্যে নেমে গেল। এ যেন গভীর এক সাদা অরণ্য। আর তার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে পেলাম। আর এ বেজায় বিপজ্জনকও। কারণ এখানে ওখানে গম্বুজের মত সব বরফ জড়ো হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ের উপর তা ভেঙে পড়তে পারে। পাতলা বরফের চাদরে মোড়া নানা ফাটল লুকিয়ে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সেগুলোর মধ্যে তলিয়ে যেতে পারো। আগের বছর শিপটন সাহেবের সংগে যেসব শেরপা এসেছিল, দেখা গেল তারা পথ-ঘাট কিছুই চিনতে পারছে না। অথবা তুষার প্রপাতের যেমন ঘন ঘন পরিবর্তন হয়, তাতে বোধহয় পথঘাটের বালাই থাকে না। কাজেই তাদের মনে আর কি পড়বে। সাহেবরা একবার এদিক দিয়ে চেষ্টা করেন, একবার ওদিক দিয়ে চেষ্টা করেন। কখনও তাঁরা এমন বড় বড় সব বরফের পাঁচিলের সামনে এসে উপস্থিত হন, যেগুলো ডিঙানো যায় না। এমন সব ফাটল তাঁদের সামনে পড়ে, যেগুলো পার হওয়া যায় না। তাঁরা ফিরে আসেন। চেষ্টা করেন তৃতীয় এক পথে। এগোতে থাকেন। বরফের উপর ধাপ কাটেন। বরফের গায়ে দড়িদড়া লটকাতে থাকেন। আর আমরা শেরপারা মালের বোঝা বয়ে বয়ে তাঁদেরও অনুসরণ করতে থাকি। এমনি করে তুষার প্রপাতের উপর আধাআধি উঠে যেতে সমর্থ হই। সেখানে আশ্রয় নেবার মত একটা স্থান খুঁজে বের করে আমরা আমাদের দ্বিতীয় শিবিরটা স্থাপন করি। এর উপরে ওঠা আরও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা থেকে বিরত হইনি। কোনও দুর্ঘটনাতেও আমাদের পড়তে হয়নি। অবশেষে আমরা 'পশ্চিম কুম'এর কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। সাহেবরা আশান্বিত হয়ে বলেন, "আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি।" আর ল্যাম্বেয়ার, যাকে শুধু ভাল্লুকের মত দেখতেই নয়, যে শুধু কাজই করেছে দশটা ভাল্লুকের মত, সে একথা শুনে একবার ফিরে দাঁড়ায়, একগাল হাসে, তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্যটা করে, "বা ভা বিয়েন (বহুত আচ্ছা)।"

তারপর আরও উঠে, সেই চড়াইটার মাথায় মাথায় পৌঁছে আমরা সেই জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছলাম, যার কথা আমরা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। জানতাম, সেই জায়গাটার মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। কুম-এ ঢোকবার পথের ঠিক নীচ দিয়ে যে দিগন্ত-বিস্তৃত ফাটলটি রয়েছে, শিপটনের দল আগের বছর যেখানে থেকে ফিরে গেছে, অবশেষে আমরা তার মুখোমুখি হলাম। আর ব্যাপার দেখে আমরা খুব ঘাবড়ে গেলাম। বস্তুটি যে ভয় পাবার মত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ফাটল এমনই চওড়া যে, লাফ দিয়ে কারুর পার হবার উপায় নেই। এমনই গভীর যে তল দেখা যায় না। আর তুষার প্রপাতের ওধারে এভারেস্টের যে প্রাচীর, সেখান থেকে এটা নাপৎসের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন উপায়! এখন কি করা যায়! সুইস সাহেবরা ফাটলের কিনার ধরে ধরে, এগিয়ে পেছিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রত্যেকটা গজ তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা ফাটলটা পেরিয়ে যাবার কোন পথ পাওয়া যায় কি না, তা খুঁজতে লাগলো।

খুঁজতে খুঁজতে বেলা পড়ে এল। কিন্তু তারা সফল হ'ল না। বাধ্য হয়ে তারা দ্বিতীয় শিবিরে ফিরে এল। পরদিন আবার গেল। আবার চললো খোঁজাখুঁজি। তারা আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'ল, দড়ি ধরে ঝুলে খেয়ে ওপারে পার হওয়া যায় কি না, তা দেখতে। দলের মধ্যে অ্যাসপার সাহেবের বয়স সব থেকে কম। চেষ্টাটা তিনিই করলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। ফাটলের এপাশ থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে, সেই দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে অ্যাসপার সাহেব ওপার পর্যন্ত পৌঁছতে পারছিলেন বটে, কিন্তু ওদিকে গিয়ে কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে পারছিলেন না। ওধারের মসৃণ বরফে তাঁর হাত পিছলে যাচ্ছিল। বরফকাটা গাঁইতিটাও সেখানে দাঁত ফোটাতে পারছিল না। সাহেব একবার করে দোল খেয়ে ওপারে যাচ্ছিলেন, তারপর আবার এধারে এসে ফাটলের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি এ চেষ্টা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সুইসরা তাদের চেষ্টা ছাড়লো না। কারণ তারা জানতো, শিপটন সাহেবের মত এইখানেই যদি থেমে পড়ে, তবে তাদের আশা আর স্বপ্নের জলাঞ্জলি ঘটে যাবে। আর তাদের এই অনুসন্ধান ব্যর্থ হল না। একটা পথ তাঁরা পেলেন। এই ফাটলের একটা জায়গায় গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, সেখানে প্রায় ষাট ফুট নীচে একটা প্ল্যাটফর্মের মত জায়গা আছে। একটা লোক কষ্টেসৃষ্টে সেটার উপর দিয়ে গিয়ে ফাটলের ওদিকের প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে পারে। আর সে প্রাচীরটার গা বেয়ে উপরে ওঠা, অন্য জায়গাগুলোর তুলনায় তত কষ্টসাধ্য বলে মনে হল না। এবারও অ্যাসপার সাহেবই এগিয়ে এলেন। তাঁর সাথীরা তাঁকে খুব সাবধানে সে প্ল্যাটফর্মটার উপর দড়ি ধরে নামিয়ে দিল। তিনি ফাটলটা পার হয়ে ওধারে পাঁচিলের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বরফের গায়ে খাঁজ কাটতে কাটতে, ঝুলতে ঝুলতে, উঠতে উঠতে এক

সময়ে পাঁচিলের উপরে পেঁৗছে গেলেন। এই কাজটা করতে তাঁর এত অমানুষিক পরিশ্রম হয়েছিল যে, তিনি উপরে উঠবার পর সেই বরফের উপরেই বেশ কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন। ক্রমে তিনি তাঁর জীবন ফিরে পেলেন। দম ফিরে পেলেন। সাহেব চাংগা হয়ে উঠলেন। আর তিনি চাংগা হয়ে ওঠা মানেই পথ খোলসা হয়ে যাওয়া। কারণ যোগেযাগে একজনকে পার করে দিতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকে না। তার সংগে যে দড়িটা থাকে, সেই দড়িটাই দুদিকে যোগাযোগ রক্ষা করল। এপার থেকে আরও দড়ি ওপারে ছুঁড়ে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে এই সব দড়িদড়া দিয়ে একটা সম্পূর্ণ সেতু বানিয়ে ফেলা হল। আর সংগে সংগে দেখা গেল, যে কাজটাকে এতক্ষণ ধরে প্রায় অসাধ্য বলে মনে হচ্ছিল, তা এখন বড় সহজ হয়ে গেছে। লোক আর মাল এপার থেকে ওপারে এখন কত অনায়াসে পার হয়ে গেল।

এ এক বড় রকমের সাফল্য। আমরা এত খুশী হলাম, যেন আমরা এভারেস্টের চূড়াতেই পৌঁছে গেছি। কেননা, এখন আমরা যতদূরই যাই না কেন, আমাদের আগে আর কেউ সেমন [illegible] যেতে পারবে না। পশ্চিম কম-এ আমরাই সকলের আগে প্রবেশ করলাম। [illegible] বাজির কথাটা আমার মনে পড়ল। আহা, বেচারা! বিশ-ত্রিশটা টাকা আমি এখন তোমার কাছে পাব। তবে দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, সে টাকা এখনও পর্যন্ত আদায় করতে পারিনি।

সাহেবরা তৃতীয় শিবির স্থাপন করতে চললেন। মালের বোঝা সংগে সংগে তাঁদের অনুসরণ করল। এর মধ্যেই 'বেস ক্যাম্প' থেকে কম-এ প্রায় আড়াই টন মাল পৌঁছে গেছে। আর যে উচ্চতায় আমরা পৌঁছেছি, সেখানে একটা লোক নিরাপদে পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড পর্যন্ত মাল বইতে পারে। তার মানে, একশ' পঁচিশজন শেরপা যে পরিমাণ মাল বইতে পারে, আমরা কজনে তা এনে ফেললাম। এখন আমিই সেই 'বড় মাছি' বনে গেলাম। দিতের সাহেব নন। বন্ বন্ করে চক্কর খেতে লাগলাম। খালি উপরে উঠছি, আর নীচে নামছি। উঠানামা করতে করতে পথ আর মালের খবরদারী করছি।

পথটা যাতে ঠিক থাকে, তা দেখছি। আর দেখছি, ঠিক সময়মত মালগুলো যেন যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয়। আঙজ্জ শেরপা শারকী, আজীবা আর আমার পুরানো বন্ধু দাওয়া থোনদাপ আমাকে অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছে। এমনকি দলের একদম নতুন ছোকরাটি পর্যন্ত, তার যা কাজ তা সে নিপুণভাবে করে গেছে। আমাদের কাজ কি পরিমাণ কঠিন ছিল, কত জটিল ছিল, তা বোঝাবার জন্যে আমি দিতের সাহেবের নোটবই থেকে কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি:

১লা মে।

বারজন শেরপাকে দ্বিতীয় শিবিরে যেতে হবে। আয়লা আর পাসাং আগে থেকেই সেখানে আছে। ছজন শেরপা সেখানে তাদের সংগে রাত কাটাবে। কাজেই আজকে রাতে দ্বিতীয় শিবিরে শেরপার সংখ্যা দাঁড়াল আট। বাকী ছজনকে প্রথম শিবিরে নেমে যেতে হবে। শারকী আর আজীবার, সেখানে আজকের মত বিশ্রাম।

২রা মে।

দুজন শেরপাকে দ্বিতীয় শিবিরে উঠে যেতে হবে। শারকী আর আজীবাকেও। দ্বিতীয় শিবিরের দুজন শেরপাকে মালের প্রথম চালান পৌঁছাতে হবে তৃতীয় শিবিরে।

৩রা মে।

চারজন শেরপাকে ২নং-এ উঠে যেতে হবে। দশজন শেরপাকে ২নং থেকে ৩নং-এ উঠে যেতে হবে।

আর এইভাবে দিনের পর দিন।

আমরা প্রায় ২০,০০০ ফিট উপরে উঠেছি। বাতাস পাতলা হয়ে এসেছে। সুইসরা সেটা অনুভব করতে শুরু করল। বিশেষ করে অ্যাসপার আর রচ্ সাহেব। ফাটলটা পার হবার জন্য এদেরকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমার মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওঁরা সবাই বসে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল। কে একজন বললে যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই আবহাওয়া সহ্য না হওয়া পর্যন্ত সকলের অসুবিধা হচ্ছিল। তারপর এই পরিবেশে সকলেই খাপ খেয়ে গেলেন। এমনকি, শেরপারাও।

"শুধু এর কোন কষ্ট হয়নি" সাহেবদের একজন আমাকে দেখিয়ে বললেন।

"আরে ওর তো তিনটে ফুসফুস আছে।"

"ও যত উপরে উঠবে, ও তত ভাল বোধ করবে।"

তাঁরা হাসতে লাগলেন। আমিও খুব হাসলাম। সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই যে, সাহেবদের জোকের কথাটা একেবারে সত্যি কথা। পাহাড়ে ওঠার সময় আমি দেখেছি যে, আমি যত উঁচু দিকে উঠতে থাকি,

লো লার কাছে পাহাড়ের ওপর থেকে নুপৎসে ও বরফ-প্রবাহ

ততই আমার তাকত বাড়তে থাকে। আমার পা, আমার ফুসফুস, আমার মন তত তাজা থাকে। এটা যে কেমন করে হয়, কিসের থেকে হয় আমি জানি না। কিন্তু সত্যিই এরকম হয়। ওই পাহাড়-গুলোর অস্তিত্ব যেমন সত্যি, এটাও ঠিক তেমনই। আর এই যে শক্তিটা আমার মধ্যে আছে, আমার মনে হয়, তার জনাই আমি যা কিছু করতে পেরেছি। শুধু আমার ক্ষমতা নয়, এগিয়ে যাবার যে ইচ্ছা, সেটাও আমি ও'র কাছ থেকেই পেয়েছি। শুধু আমার কর্মে নয়, সংগ্রামে নয়, ভাল-বাসাতেও ও আমার জীবনকে উ'চুতে পে'ৗছে দিয়েছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় যে অন্ধকার, ঠান্ডা কনকনে আবহাওয়ায় বসে আমি আমার মধ্যে এক শক্তির, এক উত্তাপের এক সুখকর অনুভূতির তরঙ্গের স্পর্শ পেয়েছিলাম। আর মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমি ভালই বোধ করি। আর ভালই চলবে.....ল্যাম্বেয়ারের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম। তারপর একটু হেসে বললাম, "কা ভা বিয়েন" ...... হয়ত এবারে—অবশেষে এইবার—আমরা এগিয়ে যাব, এগোতে থাকব, যতক্ষণ না আমাদের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত।

আমরা উপস্থিত হয়েছি কম-এ, যেখানে কোন মানুষ—এক যাযাবর পাখি ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণী—আজ পর্যন্ত পদার্পণ করেনি। তুষারে ভরা এ এক গভীর উপত্যকা। সাড়ে চার মাইল লম্বা আর দু' মাইল চওড়া। এর বাঁ দিকে এভারেস্ট ডানদিকে নাপৎসে আর 'লোৎসে'র সমুন্নত সাদা বরফের দেওয়ালগুলো আমাদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। পাহাড়ের সান্নিধ্যে পে'ৗছে গেলে একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাকে দেখা যায় না। এভারেস্টের কাছে এসেও ঠিক তাই ঘটলো। আমাদের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার উপরের অংশ আমাদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে আকাশের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এটা আমরা জানতাম, কোন্ পথে গেলে তাকে ধরতে পারবো। কারণ পথ ছিল একটাই। সমগ্র কম-টা অতিক্রম করে লোৎসের গোড়ায় গিয়ে পে'ৗছানো, তারপর সেখান থেকে তার বাঁ দিক ধরে বরফের এক খাড়া চড়াই ভেঙে দক্ষিণ কল-এ গিয়ে হাজির হলাম। লোৎসে আর এভারেস্টের চূড়া দুটোর মধ্যে এই কল এক যোজক রচনা করেছে। আর তারপর......কিন্তু তার-পরের কথা ধারণা করতেও আমরা সাহস পাচ্ছিলাম না। আমাদের প্রথম কাজ ছিল কল্'-এ গিয়ে পে'ৗছানো।

তিন সপ্তাহ ধরে আমরা পশ্চিম 'কল'-এ পড়ে রইলাম। কিন্তু সুইসরা এটাকে ওই নামে ডাকতো না। তারা এর আরো ভালো নাম দিয়েছিল—'মৌন উপত্যকা'। কখনও কখনও অবশ্য ঝড় হা-হা করে গর্জন করে উঠতো। কখন সখন উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ভীম গর্জনে নেমে আসতো তুষারের ধস। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এক তুষার-শীতল স্তব্ধতার অসাড় হয়ে সেখানে বিরাজ করতো। শব্দও যা কিছু ছিল, তা

আমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বরের, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের, আমাদের বুটের মসমসানির। আর বোঝা-ঝোলানো আমাদের পিঠের বেল্টগুলোর করুণ আর্তনাদে। 'কম'-এর প্রায় মাঝামাঝি আমরা চতুর্থ শিবির স্থাপন করলাম। এইটেই আমাদের অগ্রগামী 'বেস ক্যাম্প'। আর পঞ্চম শিবিরটা স্থাপিত হল লোৎসের প্রায় গোড়ায় গিয়ে। কয়েকদিন পর পরই ঝড় উঠত। আর ঝড় উঠলেই আমরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আমরা আমাদের হিসেব অনুযায়ী এগিয়ে গিয়েছি, সেইটেই হল আসল কথা। এভারেস্টের সব বাসন্তী অভিযানের মত আমরাও বর্ষার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিলাম। বর্ষার আক্রমণ শুরু হবার আগেই আমাদের শুধু যে উঠতে হবে তা নয়, পাহাড় থেকে নেমে আমাদের এ অঞ্চল ছেড়ে চলেও যেতে হবে।

পঞ্চম শিবিরটা স্থাপিত হয়েছিল ২২,৬৪০ ফুট উপরে। দক্ষিণ 'কল' আরও ৩০০০ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখানে পৌঁছবার জন্য যে পথটা নির্বাচিত হল, সেটা 'কল' থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে একটা গভীর বরফের নালা অনুসরণ করে উঠে চলে গেছে।

তারপর হঠাৎ একটা বড় শিলা-পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। সাহেবরা এই পাহাড়টার নাম দিয়েছিল অ্যাপরন ডেস জেনেভাইস অর্থাৎ 'জেনেভার শৈলবাহু'। তুষার প্রপাত পেরোবার সময় আমাদের যা-যা করতে হয়েছিল, এখানেও আমরা তাই তাই করলাম। ঠিক সেই রকমই অনুসন্ধান শুরু হল পথের জন্য, সেই রকমই জোড়জোড় করে এক একবার চেষ্টা চললো, বিফলতা এল, দীর্ঘদিন ধরে বরফের উপর ধাপ কাটা বরফের গায়ে দড়িদড়া খাটানো চলতে লাগলো। সাহেব আর শেরপা সবাই এ-কাজে সামিল হল। এইবার বেশির ভাগ সময়ই আমি ল্যাম্বেয়ারের সঙ্গে কাজ করলাম। এর মধ্যে কোন সরকারী নির্দেশ ছিল না বা এর জন্য কেউ আমাকে হুকুমও করেনি। হঠাৎ একদিন দেখি, আমরা দুজনে এক সুন্দর জুড়ি বেঁধে গেছি। আর এতে আমি খুশীই হয়েছিলাম। মে মাসের শেষ সপ্তাহ শুরু হতে না হতেই আমরা আমাদের সমস্ত যোগাড়যন্ত্র ঠিক করে ফেললাম। 'কল'-এ যাওয়ার মাঝপথে আমরা আমাদের রসদ আর সরঞ্জাম জড়ো করে রেখে এলাম। কয়েকজন অভিযাত্রী আরও কিছু উপরে উঠেছিলেন। 'জেনেভার শৈলবাহু'র চূড়া পর্যন্ত। এখন আমরা 'কল' আক্রমণের জন্য তৈরী হলাম। প্রথম দলটা তৈরী হল ল্যাম্বেয়ার, অ্যাবেয়ার, ফ্লোরী আর আমাকে নিয়ে। আর শেরপাদের মধ্যে বাছা হল পাসাং ফুটার, ফুতারকে আজীবা, মিঙ্মা দোরজে, দা নামগিল আর আঙ নোরবুকে। আমার উপর এবার পড়ল ডবল কাজের ভার। শুরু থেকেই আমি ছিলাম আমার দলের শেরপাদের সর্দার, এখনও তাই থাকলাম। পাহাড়ের উপরে সাজ-সরঞ্জাম ঠিকমত পৌঁছে দেবার যে দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছিল, সেটাও থাকলো। উপরন্তু আমি একজন অভিযাত্রীও বনে গেলাম। অভিযানকারী দলের পুরো-দস্তুর একজন সদস্য। এ যেন এক সম্মান, সে সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমার জীবনে এর থেকে বড় সম্মান আর আমাকে কেউ দেয়নি। আমি মনে মনে শপথ করলাম এর মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে।

২৪শে মে তারিখে আমরা আক্রমণ শুরু করলাম। আবহাওয়া ভাল ছিল না, তাই ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। পরদিন আবার যাত্রা শুরু করলাম। আর সেবার এগোতেই থাকলাম। এপথে আগেই ধাপ কেটে রাখা হয়েছিল, সেই সব ধাপ বেয়ে আমরা উঠতে শুরু করলাম। আর মালপত্রও আমাদের তেমন ভারি ছিল না। তাই কিছুদূর পর্যন্ত বেশ ভালই গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে দুর্ভাগ্য আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ আজীবার জ্বর এসে গেল। কাজেই তাকে ফিরে আসতে হল। এই আমাদের প্রথম দুর্ভাগ্য। ভাগ্যিস আমরা খুব একটা বেশিদূর গিয়ে পড়িনি, তাই আজীবা একাই ফিরে যেতে পারলো। আমরা ওর মালপত্র ভাগাভাগি করে নিলাম। ও নেমে গেল আর আমরা এগিয়েই যেতে থাকলাম। দুপুরের কাছাকাছি আমরা সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে মালপত্র জড়ো করে রেখে গিয়েছিলাম। আর এখান থেকেই সেসব জিনিস আমাদের কাঁধে কাঁধে ভাগ করে তুলে নিলাম। তাঁবু, খাবার, জ্বালানি আর অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। এই হল আমাদের মাল। যদিও আমরা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার বইছিলাম, কিন্তু সে অক্সিজেন আমরা তখনও ব্যবহার

আমাদের শেষ তিনটি গ্রন্থ সম্বন্ধে

ডাঃ কালিদাস নাগ :

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্সকে তাঁদের সাম্প্রতিক তিনখানি বইয়ের উৎকৃষ্ট প্রকাশনা ও রুচির বিভিন্নতার জন্য অভিনন্দন জানাই। বিশ্ববিশ্রুত কিরোর Secrets of the hands -এর রমণীয় বাংলা অনুবাদ 'হাতের গোপন কথা' আগ্রহশীল পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করবে। সরল রেখাঙ্কনগুলিও বইটির বিষয়বস্তু অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর সঙ্গে ভারতীয় সামুদ্রিক বিদ্যার রেখাঙ্কনের তুলনামূলক বিচারের মূল্যায়ন সম্ভব।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী গ্রন্থ জোলার La Honte এর স্বচ্ছ-সুন্দর অনুবাদ 'বৈদেহী'। সম্প্রতি ফ্রান্স রোমাণ্টিসিজম্-এর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলো Musset এর কবিতা আবৃত্তি ও ভিক্টর হুগোর নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জোলার আবির্ভাবের পর—বাস্তববাদ রোমাণ্টিসিজমকে সাময়িকভাবে কক্ষচ্যুত করেছিলো, জোলার অন্তর্দৃষ্টি সমাজ-ব্যবস্থার ভাগ্যবিড়ম্বিত নরনারীর বীভৎস চরিত্রচিত্রণের মধ্যরূপে। তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকাগণ 'বাংলা-বৈদেহী' গ্রন্থের উইলিয়ম এবং মাদালিনের ন্যায়। এরা বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের যূপকাষ্ঠে ভাগ্যাহত অবোধ বলি। আধুনিক সমাজব্যবস্থা মানুষকে জীবন-মর্যাদার অশুচি সংস্পর্শ হতে রক্ষা করতে অপারগ—সুতরাং তাদের মর্মান্তিক পরিণতির দায়িত্ব সমাজেরই। তাদের মূল্য নিরূপিত হওয়া উচিৎ বিচারের কঠোরতায় নয়—সহানুভূতির মাধ্যমে। আধুনিক ফরাসী সাহিত্য সামাজিক চরিত্রঅঙ্কণে ও সমস্যাসৃজনে জোলার উৎকর্ষকে ছাড়িয়ে গেছে আনাতোল্ ফ্রাঁস ও রোমা রোলাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যে। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মাণ যুদ্ধের যুগসন্ধিক্ষণে জোলার অবদান চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে বিশ্ব-সাহিত্যে। বলা বাহুল্য, ফরাসী জীবনবোধ ভারতীয় জীবনায়ন থেকে বহুলাংশে পৃথক, কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য জীবনবেত্তাদের কাছে তাঁদের অনুষ্টানুগ অস্তিত্বের নির্ভীক প্রকাশের জন্য ঋণী। ফরাসী সাহিত্য অস্তিত্ববাদ-মূলক বিভিন্ন বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনদর্শনের পরিবর্তনশীলতার এক নতুন রূপ উদ্ঘাটিত করেছে।

শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পরিক্রমা' একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থ। নিজেকে সাধারণ ভ্রমণকারীরূপে পরিচায়িত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চারুকলা, তক্ষণশিল্প, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসে তাঁর প্রশংসনীয় বৈদগ্ধ্য গ্রন্থটিতে প্রকাশ লাভ করেছে। অজন্তা এবং ইলোরার পূর্বতন পরবর্তীকালীন শিল্পকলা থেকে সুরু করে তিনি অবগাহন করেছেন মধ্যযুগের ভারতেতিহাসের বহু বিচিত্র কাহিনীর স্রোতে। রূপায়িত করেছেন তার আলোক ও প্রচ্ছায়ার তীব্র বৈপরীত্য, তার ঐতিহাসিক নরনারীর কাহাহীন অস্তিত্ব। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের ভয়াবহ নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যার বহু অতিরঞ্জন করেছেন—গ্রন্থকার তার অন্তর্নিহিত মানব-ঐক্যের একটি বিশদ বিবরণী সুদক্ষভাবে দিয়েছেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি ঘটনা ও চরিত্রের সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ রূপায়ণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং এটি ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান চিত্রশালার সঙ্গে দ্রুত পরিচিতিলাভের জন্য পাঠকমনকে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করে। আমরা এইরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকের মুদ্রণ ও মনোরম প্রচ্ছদ পট প্রকাশকের আভিজাত্যের পরিচায়ক এবং তজ্জন্য উদ্যোগী ও সুশিক্ষিত সত্ত্বাধিকারী শ্রীরণজিৎ সেন আমাদের ধন্যবাদার্হ। কালিদাস নাগ।

(আচার্য কালিদাস নাগ কর্তৃক লিখিত ইংরাজী সমালোচনার বঙ্গানুবাদ)

করিনি। আমাদের সঙ্গে তা প্রচুর ছিল। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার পর সেখানে হয়ত অক্সিজেন ছাড়া আমাদের চলবে না। তখন এগুলো আমাদের ব্যবহারে লাগবে।

আমরা আরও চার ঘণ্টা চললাম। 'কল' থেকে যাত্রা করার পর আধ ঘণ্টা ধরে শুধু চলছিই। আমাদের পিছনে নাপৎসের যে চূড়া, ২৫,৬৮০ ফুট উঁচু, তা আমাদের থেকে আর উঁচুতে নেই। 'জেনেভার' শৈল-বাহুর কাছাকাছি যেসব শিলা-পাহাড়, আমরা সেগুলো এর মধ্যেই ডিঙিয়ে গেছি। 'কল'-ও আর খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে লাগলো। কি অসহ্য ঠাণ্ডা। আরও কিছুদূর কঠিন পরিশ্রম করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আঙনোরবু আর মিঙমা দোরাজে থেমে গেল। তারা তাদের বোঝা নামিয়ে ফেললো। বললো, তারা এবার ফিরে যাবে। গুরুতর পরিশ্রমে তারা কাতর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তারা আশঙ্কা করছে যে, তাদের পায়ে হয়তো বরফের কামড় পড়েছে। আমি তাদের বোঝাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সাহেবরা বললেন, "না, ওদের যা করবার, তা ওরা সুন্দরভাবে করেছে। এখন ওদের যেতে দাও।" তাঁরা ন্যায্য কথাই বললেন। কোন লোক যখন জান দিয়ে তার কাজ করে—আর সে যদি, আমরা এখন যে অবস্থায় পড়েছি, সেই অবস্থায় পড়ে—তখন তাকে তার নিজের ওজন বুঝে চলতে দেওয়াই ভাল। না হলে তার কোন হানি ঘটতে পারে। হয়তো মৃত্যুও। কাজেই এরা দুজন নীচে নেমে গেল। আবার আমাদের ওদের বোঝাগুলো ভাগ করে নিজেদের কাঁধে তুলতে হল। তবে এবারে ওদের মাল অল্পই নিতে পারলাম। বেশির ভাগই সেখানে ফেলে রেখে গেলাম। পরে হয়ত ওগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে। হঠাৎ আমার গালে এক চড় মেরে কি যেন চলে গেল। সেটা হচ্ছে অবেবের ঘুমানোর ব্যাগ। মালপত্র বাঁধাছাঁদা করবার সময় হয়তো একটু আল্গা হয়ে গিয়েছিল, বাতাসের তোড়ে ডানা ঝাপটানো বড় একটা পাখির মত সেটা উড়তে উড়তে দূরে মিলিয়ে গেল।

আমরা আরও এক ঘণ্টা এগিয়ে চললাম। আর তারপর আরও এক ঘণ্টা। তারপর অন্ধকার নেমে এল। যদিও আমরা দক্ষিণ 'কল'-এর খুব কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, তবু বুঝতে পারলাম সেদিন আর সেখানে ঢুকতে পারবো না। সেখানেই আমরা থামলাম। সেই ঢালু তুষার আর বরফের গায়ে গাঁইতি মেরে মেরে আমরা একটা সমতল চত্বর বানিয়ে নিলাম আর তার উপর দুটো তাঁবু খাটালাম। একটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে সাহেব তিনজন ঢুকে পড়লেন, আর অন্যটায় আমরা চারজন—পাসাঙ ফুটার, ফুতারকে, দা নামগিল আর আমি বাতাসের বেগ বেড়ে উঠলো। অনেকবার মনে হল, আমাদের যেন উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে। কিন্তু আমরা কোনক্রমে সেখানে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখলাম। আর অনেক চেষ্টার পর আমি খানিকটা গরম সুপ তৈরী করতে পারলাম। তারপর ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা। সেই ছোট্ট তাঁবুটায় গুটিসুটি মেরে আমরা প্রায় একে অন্যের ঘাড়ের উপর শুয়ে নিজেদের দেহগুলোকে গরম রাখবার চেষ্টা করলাম। মনে হল এ-রাত যেন আর কখনও ফুরোবে না। কিন্তু আবার সকাল হল। পরিষ্কার ঝকঝকে এক নতুন সকাল। উপরের দিকে চাইলাম। ওই তো 'কল'। একেবারে খুব কাছে। আজকেই আমরা ওখানে পৌঁছে যাব।

(ক্রমশ)

সংবাদে পড়িলাম, শ্রীযুক্ত চিন্তামন দেশমুখ যখন লোকসভায় তাঁহার ত্যাগের কারণের বর্ণনা দিতেছিলেন, তখন "বিরোধী" দল হর্ষধ্বনি করিতে-

ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস সম্পূর্ণ মৌন থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আবার নূতন করে সেই পুরনো কথাটারই প্রমাণ পাওয়া গেল অর্থাৎ কিসের যেন কি বধে আনন্দ"!!

* * *

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার বিভিন্ন রুটের বাসে পকেটমারের দৌরাত্ম্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। —"কিন্তু পকেটমারদের মজুরি পোষায় কি? আমরাতো জানি অনেকের পকেটই গড়ের মাঠ"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার ভিখারীদের একটি পরিসংখ্যান গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দপ্তরের দরজার ভিখিরী এবং ভোটারের দরজার ভিখিরীদের নিশ্চয়ই এই পরিসংখ্যানে ধরা হবে না"!!

* * *

ভারত হইতে চীনে একটি Agricultural Delegation যাইতেছে বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। ফসল ফলাইবার উন্নত পদ্ধতি শিক্ষাই নাকি এই সফরের উদ্দেশ্য। আরো শুনিলাম দলীয় সভ্যগণ নাকি ভারত হইতে কোন কোন ফসলের বীজও সেখানে নিয়া গিয়াছেন।—"আশা করি ভারতের যে জাতীয় ধান গাছে কাঁকর ফলে বা যে জাতীয় সর্ষেতে শেয়ালকাঁটা ফলে সে-সব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত বীজ তাঁরা নিশ্চয়ই বিদেশে নিয়ে যান নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ আগামী নির্বাচনে তাঁহার চেলাদিগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

—আমাদের শ্যামলাল বলিল—"এইটি জয়প্রকাশজীর 'জীবন দানের' বীজমন্ত্র কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না"।

* * *

ভারত হইতে বেগার খাটার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য নাকি লোকসভার সভ্যগণ সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। —"কিন্তু তাতে যখন সমাজসেবীরা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়বে, সরকার তাঁদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন"—প্রশ্ন করেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

অন্যান্য রাজ্যে কর্তা এবং কর্মীদের মধ্যে সম্বন্ধের উন্নতি হইলেও শুনিলাম পশ্চিমবঙ্গে নাকি অবস্থার অনেকখানি অবনতি ঘটিয়াছে। —"আমরা একথা স্বীকার করিনে; ভাই-এর চাইতে বড়কুটুম সম্বন্ধকেই আমরা মধুর বলে মনে করি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আবহাওয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারত হইতে কয়েকজনকে রাশ্যাতে পাঠান হইতেছে। —"কিন্তু আমরা তো শুনেছি রাশ্যাতেই নাকি আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ভুল হচ্ছে, Comrade-দেরও নাকি Personality Cult-এর ঝড় ছাড়া কিছু নয়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম খুনী ধরিবার জন্য কলিকাতা পুলিস মাদ্রাজ পুলিসের নিকট হইতে কয়েকটি শিক্ষিত কুকুর ক্রয় করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন

—"খুবই ভালো কথা, কিন্তু খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে যারা তিলে তিলে খুন করে তাঁরা কুকুরকেও ফাঁকি দিতে জানে, কলিকাতা মাদ্রাজ নয় বলেই আজব শহর"!!

* * *

পাকিস্তান হইতে আগত মুসলমানেরা নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁরা বরং হিন্দুস্থানের জেল পছন্দ করেন কেননা এখানে থাকিয়া অন্তত খাইতে পরিতে পারিবেন, পাকিস্তানে নুন ভাতও জোটে না। শ্যামলাল বলিল—"কি আর করবে চাচা, এই রাতের এই কথা"!!

* * *

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার কথা হইতেছিল। অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য বিপর্যয়ে আমরা সবাই তাজ্জব বনিয়া গিয়াছি। আমাদের জনৈক ক্রীড়ারসিক এবং "হে মা কালীতে" বিশ্বাসী সহযাত্রী বলিলেন—"হবে না কেন, অধিনায়ক হলেন পিটার আর খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন ডেভিড নামক পাদ্রী; খেলা শুধু খেলা দিয়ে জেতা যায় না, সাধে কি আর আমরা হে মা কালী করি"!!!

কবিতা

অহল্যা : দিনেশ দাস। পরিবেশক : সিগনেট বুক সপ, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

শ্রীদিনেশ দাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধানতম শক্তিমান কবি। তাঁর রচনার পরিমাণ স্বল্প, কিন্তু অংসামান্য যা তিনি লেখেন তারই ভিতর তাঁর বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। দিনেশবাবুর কবিতায় সবচেয়ে যা আমাদের ভাল লাগে তা হচ্ছে, দুর্বোধ্যতার ঢঙ একেবারেই নেই, অথচ তাদের ভিতর ভাবনার অনুভূতির সম্পদ কিছু কম নয়। বরং দিনেশবাবুর কাব্য-জীবনের যত বয়স হচ্ছে ততই পুলকিত হয়ে লক্ষ্য করছি, তাঁর রচনা ক্রমশ ব্যঞ্জনা গুণে অধিক সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। যেন কী একটা গভীর আলো-অন্ধকারময় ভাবের জগতে তিনি পথ হাঁটছেন, যা খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না—এমনি একটা আকূতি ও অস্পষ্ট ব্যাকুলতা তাঁর সমস্ত কাব্যদেহের প্রাঞ্জলতার স্বচ্ছ আবরণ ছিঁড়ে বাইরে প্রকাশমান হতে চাইছে। ছন্দের প্রাণময়তায়, ধ্বনির সৌকুমার্যে ও শব্দ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে দিনেশবাবুর প্রতিটি কবিতা মনের ভিতর কাব্য পাঠের একটা বিশেষ স্বাদগ্রহণ আনে।

'অহল্যা' দিনেশবাবুর আধুনিকতম কাব্যগ্রন্থ। উপরে কবির যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল তা বিশেষ করে এই কাব্যগ্রন্থটির দিকে চোখ রেখেই বলা হয়েছে, যদিও সেগুলিকে দিনেশবাবুর কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপেও নির্দেশ করা যেতে পারে। কিছু আরবী কবিতার সফল অনুবাদ বইটিতে আছে, সেগুলির প্রসঙ্গ বাদ দিলে যতগুলি মৌলিক কবিতা এতে আছে তাদের সব কটির ভিতরেই একটা মধুর বিষাদ ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থের 'অহল্যা' নামকরণের মধ্যে কবিতাগুলির মূল সংকেত খুঁজে পাওয়া যাবে। নিঃসঙ্গতার কবি হলেও তিনি সার্থক কবি এ কারণে যে, তাঁর মনে এক গঠনমূলক আশাবাদ রয়েছে, আজকের দিনের নৈরাশ্যকর অবস্থাকে তিনি মানুষের চরম পরিণাম কোনক্রমেই ভাবতে পারেন নি।

দিনেশ দাস সবিশেষ সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন কবি। তাঁর এই বিবিধ সচেতনতার পরিচয় পাই "তৃতীয় পৃথিবী", "মে-দিন", বঙ্গ বিভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্পর্কিত কবিতা "ভাঙা গাছ" ও "পদ্মানদীর চর" এবং শিক্ষক ধর্মঘটসম্পর্কিত কবিতাগুলিতে। "তৃতীয় পৃথিবী" কবিতায় তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুই যুধ্যমান শিবিরের জীবন দর্শনের গণ্ডীর বাইরে নূতন এক সুস্থ জীবন দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ জীবন দর্শনের ভিতর হানাহানি দলাদলির কোন কথা নেই, এতে আছে আশা, শান্তি ও মৈত্রীর গভীর আশ্বাস।

তা বলে কবির মন সাময়িকতাতেই নিবদ্ধ নয়, জীবনের চিরন্তন মাধুরী আর সৌন্দর্যলীলার আবেদনেও তিনি উপযুক্তভাবে সাড়া দিতে জানেন। "ছায়া" একটি আশ্চর্য-সুন্দর প্রেমের কবিতা। "ঘুঘু ডাকে" একটি চমৎকার আবহ-চিত্র। তেমনি "বৃষ্টি পড়ে" কবিতাটির প্রকৃতি পরিবেশ-বর্ণনা মনোগ্রাহী।

দু' একটি জায়গায় ছন্দের কথঞ্চিৎ অসংগতি চোখে পড়ল। যেমন,

"দিন-রাত্রি বর্ষ-যুগ নক্ষত্র-শতাব্দী ধরে
অহল্যার কান্না শুনি জীবন্ত পাথরে"

এখানে 'নক্ষত্র' এবং 'শতাব্দী' শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটিকে চারমাত্রার মর্যাদা দিলেও (যদিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সেটি রীতি নয়) ছন্দের সুষ্ঠুতায় কোথায় যেন বাধে। কিম্বা,

"রাত্রি ভেঙে গুঁড়ো হয়, আকাশে জয়ের সংকেত" 'আকাশে'র তিনমাত্রা সুস্পষ্ট ছন্দ পতন। খুব সম্ভব এটি ছাপার ভুল।

উপন্যাস

নীল সিন্ধু—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—ইস্ট লাইট বুক হাউস। ২০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা ১। দাম—তিন টাকা চার আনা।

মানসিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য গুণবাচক স্তর বিন্যাস শ্রেণীহীন সমাজেও (যদি তেমন সমাজ কোথাও থাকে) আছে। গুণের তারতম্য হিসেবে গুণীর স্তর বিন্যাস নিশ্চয় অন্যায়ও নয় অশোভনও নয়।

ব্যক্তির বেলায় যেমন সাহিত্যিকের বেলায়ও তেমনি তা প্রযোজ্য। আর সে প্রয়োগ তাঁর সাহিত্য-কর্মের গুণ বিচারের ওপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং লেখকের সাহিত্য কর্মের গুণ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাঁর জাতি-নির্ধারণ করি তো বিশেষ অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক-জাতি বিচারে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক না হলেও মাত্র ব্রাহ্মণ বলতে দ্বিধা নেই। শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণের যে বর্ণনা পাই তার সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের রচনার কারু ও চারুকর্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ব্রাহ্মণের যে সব গুণাবলীর তালিকা আছে তার সঙ্গেও শচীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষ গুণ-সান্নিধ্য আছে। শচীন্দ্রনাথের রচনার মুখোমুখি দাঁড়ালে এক অনির্বচনীয় কান্তি, সৌম্য, উদার, স্থিতধী, আজানুলম্বিত-বাহু পুরুষ-স্বভাবের পরিচয় পাই। তাঁর উপন্যাসের নায়ক হয়তো ব্রাহ্মণ নয়, উপন্যাসের পার্শ্ব নায়কও হয়ত তা নয়। হয়ত অশিক্ষিত গ্রাম্য চরিত্র সব। নিতান্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীব। দারিদ্র দুঃখ লাঞ্ছিত পীড়িত মানব আর

কোর জন্য। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব ধারণা আর সমাজ-জীবনের অনগ্রসর রীতি-পদ্ধতির দ্বারা শাসিত, কিন্তু গল্পের সেই লেখার অন্তরে যে রসরূপ মহৎ চিন্তা অনুপ্রাণিত তা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব।

নীল সিন্ধুর গল্প অত্যন্ত সমবেদনা ও অনুভূতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একজন ধীবর ... র লোকের জীবন-যাপনকে কেন্দ্র করে ... হাতে-টানা, কাঠের-তৈরী, পাল তোলা জাহাজের সঙ্গে যান্ত্রিক জাহাজের প্রতিযোগিতার কাহিনী। একদিন সে প্রতিযোগিতা সমুদ্র অতিক্রম করে ডাঙার জীবনকেও বিপর্যস্ত করে ছিল। জলপথ তাদের জীবিকা হলেও স্থলে তাদের গৃহ। সেই গৃহতেও আছে অন্যান্য নানা সমস্যা। স্থলের মানুষকে একমাত্র স্থলের সমস্যাই সমাধান করতে হয়—কিন্তু জলের মানুষদের কথা স্বতন্ত্র। এই দুর্ভাগা মানুষদের দুই হাতে দুই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টায় বিব্রত হতে হয় বার বার। বিব্রত মানুষের আশা-আকাঙ্খা বার বার ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু বার বার তারা আশায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বহুদিন আগে ইতিহাসের রাজা অনন্ত-বর্মা যে ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন তা গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার এই আদিবাসীরা একদিন সেই আদিম কলিঙ্গ পত্তনের অধিবাসী ছিল। তারপর যান্ত্রিক যুগের আবির্ভাবে এক একটা নন্দন জনপদে রূপান্তরিত হয়েছে আর ওরা হয়েছে নির্বাসিত। বঙ্গোপসাগরের এক তীর থেকে আর এক তীরে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। এমনি চলেছে যুগের পর যুগ। এবার নীল সিন্ধুর এক অখ্যাত তীর থেকেও উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে এদের আবাসস্থল। এবার এখানেও পেট্রল কোম্পানী তার নতুন যন্ত্রপাতি নতুন জনপদ স্থাপন করবে। কিন্তু এরা—এই আদিবাসীরা—কোথায় আশ্রয় নেবে? কোন্ অনাবিষ্কৃত চরে? কোথায়, পৃথিবীর কোন কোণে সভ্যতার নান্দীপাঠ এখনও শুরু হয়নি! তারই সন্ধানে এরা বেরিয়ে পড়ে!

বাঙালী লেখকের ভাবনা-চিন্তা ইতিহাস-ভূগোলের কোন্ দুর্গম গহনে অভিযান শুরু করেছে তার প্রমাণ নীল সিন্ধু। নীল সিন্ধু একাধারে উদার আকাশের নীল-বিস্তার, আবার যান্ত্রিক-সভ্যতারও নীল বিষ। শচীন্দ্রনাথ সিন্ধু মন্থন করে অমৃত পরিবেশন করেছেন এবং বিষ গলধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এত অভিজ্ঞতা যাঁর, এত সুদূরদর্শী যিনি, তাঁর কাছে আমরা আরো মহৎ এবং আরো সুদীর্ঘ উপন্যাস আশা করবো ভবিষ্যতে।

৩৫১।৫৯

কিশোর সাহিত্য

ছোটদের কাহিনী। রবীন্দ্রকুমার বসু। এস চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ১৲।

বৌদ্ধ সাহিত্য, লোক সাহিত্য পুরাণ থেকে কয়েকটি আখ্যায়িকা বাছাই করে ছোটদের জন্যে কতকগুলি কাহিনী প্রকাশ করেছেন লেখক। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শিশু অথবা কিশোর সাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ আজকাল হামেশাই অনেকে করে থাকেন, তাঁদের দায়িত্ব না বুঝেই। বর্তমান গ্রন্থের লেখক, সুখের বিষয়, সে-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরিবর্তন, নকলযুদ্ধ, দেবীর দয়া, অজয় নদীর তীরে প্রভৃতি কাহিনীগুলি ভালই লাগবে ছোটদের। লেখকের ভাষা ব্যবহার সহজবোধ্য হলেও স্থানে স্থানে জটিল বাক্য গঠনের প্রশংসা করা যায় না। ছাপা বাঁধাই ভাল।

৩৭৯।৫৬

তপুর নিষ্কৃতি : শ্রীনরেশচন্দ্র রায় : সাহিত্য সঙ্গ : কলিকাতা। দেড় টাকা।

একটি ছেলে তার কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে কীভাবে ধীরে ধীরে প্রতিবেশীর সেবার ভিতর দিয়ে একটি জনকল্যাণ সমিতি গড়ে তুলল তারই কাহিনী আছে আলোচ্য গ্রন্থে। তবে নিতান্ত মামুলি কতকগুলি ঘটনার অনিপুণ সংস্থাপনের জন্য বইটি তেমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে নি। কেবল বিবরণ বলেই মনে হয়।

২৪৮।৫৬

সত্যিকারের রবিন হুড্—প্রকাশ পাল। সাহিত্যায়ন, ২৩-ডি কুমারটুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে সুনীলকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

জিওফ্রে ট্রীজ-এর 'Bows Against The Barons' অবলম্বনে এই বইটি রচিত। মূল বইটি উদ্দেশ্যমূলক ছিলো, তৎসত্ত্বেও লেখকের রচনাশক্তি সেই উদ্দেশ্যকে সাহিত্যশ্রেণীস্থ করতে পেরেছিলো। 'সত্যিকারের রবিন হুডের' লেখক শ্রীযুক্ত প্রকাশ পাল সম্পর্কেও একই উক্তি পুনর্বার প্রযুক্ত হতে পারে। বইটি তাঁর প্রাণোচ্ছল বর্ণনা-সামর্থ্যের গুণে এবং মূলানুগ মহিমা-রক্ষণের কর্তব্য-পালনে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পাঠকের আগ্রহ কোথাও বাধা পায়না—বরং অত্যন্ত ত্বরায় এগিয়ে চলে। এর লেখকের জন্য আমাদের অভিনন্দন রইলো। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছদসজ্জা সুন্দর।

(১৩।৫৬)

ছোটদের গৌতম বুদ্ধ—মণি বাগচী। প্রকাশক—শ্রীঅরুণকান্তি পাল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

যুগ-পুরুষ এবং যুগ-মহীয়সী একাধিক জনের জীবনী প্রণয়নে আলোচ্য গ্রন্থকারের প্রখ্যাতি আছে। ছোটদের জন্য একটি সহজ অথচ মূলানুগত বুদ্ধ জীবনী লিখে তিনি ছোট-দের এবং বড়দের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। বুদ্ধদেবের পুণ্যজীবনের মূল ঘটনাবলী এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত তাঁর ধর্মপ্রসঙ্গ দুই দিকের সঙ্গেই লেখক নতুন করে আমাদের পরিচয়সাধন করিয়ে দিলেন। এছাড়া তাঁর বইটিতে এমন কয়েকটি উপাখ্যানও তিনি উপস্থাপনা করেছেন যেগুলি এখনো আমাদের অনেকেরই অনতি-পরিচিত। তাঁর লিখনভঙ্গি প্রোজ্জ্বল। 'ছোটদের গৌতম বুদ্ধ' নিঃসন্দেহে পাঠক মহলের সাদর স্বীকৃতি পাবে। বইটির প্রথমে সন্নিবিষ্ট কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বুদ্ধবন্দনা এ-বইয়ের মর্যাদা বর্ধন করেছে। বইটির অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলিও সুন্দর।

১৭১।৫৬

প্রবন্ধ-সাহিত্য

শিশুমন—রমেশ দাশ। প্রকাশক—সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ১০৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা১। দাম—৩.

মানব চরিত্র বহু বিচিত্র ধারায় সদা প্রকাশমান এবং এই বৈচিত্র্যকে স্পষ্টভাবে জানবার জন্য মানুষের কৌতূহলেরও শেষ নাই। তাই মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার মানুষের বিস্ময়কে বারবার নতুন নতুন রূপে প্রতিভাত করে তুলছে। শিশুর মন মানব জাতির কাছে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়। তাই সে মনের সন্ধান নিতেও কৌতূহলীর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই।

রমেশ দাশের শিশুমন সেই কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে খানিকটা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। শিশুরা কেমন করে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তাদের পরিপার্শ্বকে অবলম্বন করে, তাদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কেমন করে, তাদের অবচেতন মনকে গড়ে তুলতে সমাজ এবং সামাজিক জীবদের দায়িত্ব কতখানি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি সহজভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাই

এ গ্রন্থটি বিশেষ উপকারী হবে বলে আশা করা যায়।

তিন বৎসরের মধ্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাঠক সাধারণের জ্ঞানের তৃষ্ণার পরিচয় বহন করছে। ৫৬২।৫৫

গোয়েন্দা কাহিনী

শিখার অগ্নি-পরীক্ষা : শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী: দেব সাহিত্য কুটীর: ২২।৫।বি ঝামাপুকুর লেন: কলিকাতা-৯। বারো আনা।

উপরে লেখা 'কলেজ গার্লসের জন্য'। হয়তো সেই কারণেই গোয়েন্দা একটি মেয়ে। বই লিখবার প্রয়োজন এখানেই শেষ। এরপর কাহিনীর জটিলতা অথবা ডিটেকশনের নিপুণতা থাকলেও চলে। 'কলেজ গার্লস'রা হয়তো পড়বে। ১০৭।৫৬

সাংঘাতিক হাঁশপত—দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক: বাসন্তী বুক স্টল, ১৫৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২৷৷০।

আলোচ্য রহস্য-উপন্যাসটি বহুদিন পূর্বে কোন মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রথম ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। সাহিত্যের আসরে এই ধরনের গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ কোন স্থান নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পাঠকের সংখ্যা কম নয়। এই ধরনের পুঁথি মনে ক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে বলিয়াই ইহার এত চাহিদা। যাহা হউক বর্তমান গ্রন্থটিও যে এক শ্রেণীর পাঠকের আনন্দের খোরাক যোগাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৩।৫৬

মাসিক পত্রিকা

কথাশিল্প। ২ বর্ষ ৫ সংখ্যা। সম্পাদনা : শ্রীবীণা চক্রবর্তী। ৩৩।১ দক্ষিণের সার্কুলার রোড, কলকাতা ১৯। দাম—প্রতি সংখ্যা ১, টাকা।

নতুন বাংলা মাসিক পত্রিকার আসরে 'কথাশিল্প' ইতিমধ্যেই একটি আসন করে নিয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, বাঙালী পাঠক সমাজ এই পত্রিকাটির প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, বাংলা মাসিক পত্রিকার পক্ষে তো শ্লাঘার বিষয়। 'কথাশিল্পে'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলছে এবং তুলবে। রচনা নির্বাচনে এঁদের সম্পাদনার কাজ প্রায় ত্রুটিহীন। লেখক সংগ্রহও উত্তম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ছাড়াও সাহিত্য নিরীক্ষা, আলোচনা, পাঠকের ডায়েরী, বিদেশের চিঠি প্রভৃতি বিভাগগুলি সাহিত্য নিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বর্তমান সংখ্যাটিতে শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর উপন্যাস, বীণা চক্রবর্তীর আলোচনা, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিরীক্ষা এবং কস্তুরচাঁদ লালওয়ানীর অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি পত্রিকাটির মান নির্ধারণ করছে। বাণী রায়, অমিয়েন্দু ঠাকুর, গণেশ লালওয়ানী, এঁদের রচনাও রয়েছে। রয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ—সুনির্মল বসু।
মাইকেল মধুসূদন—সুনির্মল বসু।
চিত্রগুপ্তের ফাইল—সতীনাথ ভাদুড়ী।
রাতভোর—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পাতুল নাচের ইতিকথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভাঙ্গা—গোপাল হালদার।
সৈনিক—মনোজ বসু।
আমার দেখা ডেনমার্ক—মন্মথনাথ রায়।
দুয়ার হতে অদূরে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
অবিশ্বাস্য—সৈয়দ মুজতবা আলী।
মাস্টারের মেয়ে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সর্বহারার ইতি—শ্রীঅরিন্দম মুখোপাধ্যায়
গান্ধী ও মার্কস—কিশোরীলাল মশরুওয়ালা
The Outlook For a Socialist Constitution—Debabrata Chaudhuri.
Thus Spake The Buddha—Swami Suddhasatwananda.
ভিন্ন আকাশ—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, রামপদ পাইক ও রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ।
ভাগ্য পরিবর্তন—১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত।
য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলার পরিচয়—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ণ—শ্রীজ্যোতিষ্কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিখা ও রাজকন্যা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।
পূজার ফুল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
বেন হুর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
ছোটদের বড় কাজ—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিমির বলয়—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী।

র দল। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব রূপ। অর সমাজ-জীবনের অনগ্রসর রীতি-পদ্ধতির দ্বারা শাসিত, কিন্তু গল্পের সেই গর অন্তরে যে রসরূপ মহৎ চিন্তা অনুপ্রাণিত তা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব।

ল সিন্ধুর গল্প অত্যন্ত সমবেদনা ও দৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একজন ধীবর লোকের জীবন-যাপনকে কেন্দ্র করে হাতে-টানা, কাঠের-তৈরী, পাল তোলা জাহাজের সঙ্গে যান্ত্রিক জাহাজের প্রতিযোগিতার কাহিনী। একদিন সে প্রতিযোগিতা সমুদ্র অতিক্রম করে ডাঙার জীবনকেও বিপর্যস্ত করে ছিল। জলপথ তাদের জীবিকা হলেও স্থলে তাদের গৃহ। সেই গৃহতেও আছে অন্যান্য নানা সমস্যা। স্থলের মানুষকে একমাত্র স্থলের সমস্যাই সমাধান করতে হয়—কিন্তু জলের মানুষদের কথা স্বতন্ত্র। এই দুর্ভাগা মানুষদের দুই হাতে দুই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টায় বিব্রত হতে হয় বার বার। বিব্রত মানুষের আশা-আকাঙ্খা বার বার ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু বার বার তারা আশায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বহুদিন আগে ইতিহাসের রাজা অনন্ত-বর্মা যে ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন তা গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার এই আদিবাসীরা একদিন সেই আদিম কলিঙ্গ পত্তনের অধিবাসী ছিল। তারপর যান্ত্রিক যুগের আবির্ভাবে এক একটা বন্দর জনপদে রূপান্তরিত হয়েছে আর ওরা হয়েছে নির্বাসিত। বঙ্গোপসাগরের এক তীর থেকে আর এক তীরে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। এমনি চলেছে যুগের পর যুগ। এবার নীল সিন্ধুর এক অখ্যাত তীর থেকেও উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে এদের আবাসগৃহ। এবার এখানেও পেট্রল কোম্পানী তার নতুন যন্ত্রপাতি নতুন জনপদ স্থাপন করবে। কিন্তু এরা—এই আদিবাসীরা—কোথায় আশ্রয় নেবে? কোন্ অনাবিষ্কৃত চরে? কোথায়, পৃথিবীর কোন কোণে সভ্যতার নান্দীপাঠ এখনও শুরু হয়নি! তারই সন্ধানে এরা বেরিয়ে পড়ে!

বাঙালী লেখকের ভাবনা-চিন্তা ইতিহাস-ভূগোলের কোন্ দুর্গম গহনে অভিযান শুরু করেছে তার প্রমাণ নীল সিন্ধু। নীল সিন্ধু একাধারে উদার আকাশের নীল-বিস্তার, আবার যান্ত্রিক-সভ্যতারও নীল বিষ। শচীন্দ্রনাথ সিন্ধু মন্থন করে অমৃত পরিবেশন করেছেন এবং বিষ গলধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়!

এত অভিজ্ঞতা যাঁর, এত সুদূরদর্শী যিনি, তাঁর কাছে আমরা আরো মহৎ এবং আরো সুদীর্ঘ উপন্যাস আশা করবো ভবিষ্যতে।

৩৫১।৫৯

কিশোর সাহিত্য

ছোটদের কাহিনী। রবীন্দ্রকুমার বসু। এস চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ১।০।

বৌদ্ধ সাহিত্য, লোক সাহিত্য পুরাণ থেকে কয়েকটি আখ্যায়িকা বাছাই করে ছোটদের জন্যে কতকগুলি কাহিনী প্রকাশ করেছেন লেখক। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শিশু অথবা কিশোর সাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ আজকাল হামেশাই অনেকে করে থাকেন, তাঁদের দায়িত্ব না বুঝেই। বর্তমান গ্রন্থের লেখক, সুখের বিষয়, সে-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরিবর্তন, নকলযুদ্ধ, দেবীর দয়া, অজয় নদীর তীরে প্রভৃতি কাহিনীগুলি ভালই লাগবে ছোটদের। লেখকের ভাষা ব্যবহার সহজবোধ্য হলেও স্থানে স্থানে জটিল বাক্য গঠনের প্রশংসা করা যায় না। ছাপা বাঁধাই ভাল।

৩২৯।৫৬

তপুর নিষ্কৃতি : শ্রীনরেশচন্দ্র রায় : সাহিত্য সংগ : কলিকাতা। দেড় টাকা।

একটি ছেলে তার কয়েকটি সংগী নিয়ে কীভাবে ধীরে ধীরে প্রতিবেশীর সেবার ভিতর দিয়ে একটি জনকল্যাণ সমিতি গড়ে তুলল তারই কাহিনী আছে আলোচ্য গ্রন্থে। তবে নিতান্ত মামুলি কতকগুলি ঘটনার অনিপুণ সংস্থাপনের জন্য বইটি তেমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে নি। কেবল বিবরণ বলেই মনে হয়।

২৪৮।৫৬

সত্যিকারের রবিন হুড্—প্রকাশ পাল। সাহিত্যায়ন, ২৩-ডি কুমারটুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে সুনীলকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

জিওফ্রে ট্রীজ্-এর 'Bows Against The Barons' অবলম্বনে এই বইটি রচিত। মূল বইটি উদ্দেশ্যমূলক ছিলো, তৎসত্ত্বেও লেখকের রচনাশক্তি সেই উদ্দেশ্যকে সাহিত্যশ্রেণীস্থ করতে পেরেছিলো। 'সত্যিকারের রবিন হুডের' লেখক শ্রীযুক্ত প্রকাশ পাল সম্পর্কেও একই উক্তি পুনর্বার প্রযুক্ত হতে পারে। বইটি তাঁর প্রাণোজ্জ্বল বর্ণন-সামর্থ্যের গুণে এবং মূলানুগ মহিমা-রক্ষণের কর্তব্য-পালনে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পাঠকের আগ্রহ কোথাও বাধা পায়না—বরং অত্যন্ত ত্বরায় এগিয়ে চলে। এর লেখকের জন্য আমাদের অভিনন্দন রইলো। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছদসজ্জা সুন্দর।

(২৩।৫৬)

ছোটদের গৌতম বুদ্ধ—মণি বাগচী। প্রকাশক—শ্রীঅরুণকান্তি পাল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

যুগ-পুরুষ এবং যুগ-মহীয়সী একাধিক জনের জীবনী প্রণয়নে আলোচ্য গ্রন্থকারের প্রখ্যাতি আছে। ছোটদের জন্য একটি সহজ অথচ মূল্যানুগত বুদ্ধ জীবনী লিখে তিনি ছোট-দের এবং বড়দের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। বুদ্ধদেবের পুণ্যজীবনের মূল ঘটনাবলী এবং তার সংগে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত তাঁর ধর্মপ্রসংগ দুই দিকের সংগেই লেখক নতুন করে আমাদের পরিচয়সাধন করিয়ে দিলেন। এছাড়া তাঁর বইটিতে এমন কয়েকটি তথ্যের দিক তিনি উপস্থাপনা করেছেন যেগুলি এখনো আমাদের অনেকেরই অনতি-পরিচিত। তাঁর লিখনভঙ্গি প্রোজ্জ্বল। 'ছোটদের গৌতম বুদ্ধ' নিঃসন্দেহে পাঠক মহলের সাদর স্বীকৃতি পাবে। বইটির প্রথমে সন্নিবিষ্ট কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বুদ্ধবন্দনা এ-বইয়ের মর্যাদা বর্ধন করেছে। বইটির অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলিও সুন্দর।

১৭১।৫৬

প্রবন্ধ-সাহিত্য

শিশুমন—রমেশ দাশ। প্রকাশক—সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ১০৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা১। দাম—৩,

মানব চরিত্র বহু বিচিত্র ধারায় সদা প্রকাশমান এবং এই বৈচিত্র্যকে স্পষ্টভাবে জানবার জন্য মানুষের কৌতূহলেরও শেষ নাই। তাই মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার মানুষের বিস্ময়কে বারবার নতুন নতুন রূপে প্রতিভাত করে তুলছে। শিশুর মন মানব জাতির কাছে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়। তাই সে মনের সন্ধান নিতেও কৌতূহলীর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই।

রমেশ দাশের শিশুমন সেই কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে খানিকটা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। শিশুরা কেমন করে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তাদের পরিপার্শ্বকে অবলম্বন করে, তাদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কেমন করে, তাদের অবচেতন মনকে গড়ে তুলতে সমাজ এবং সামাজিক জীবনের দায়িত্ব কতখানি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি সহজভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাই

এ গ্রন্থটি বিশেষ উপকারী হবে বলে আশা করা যায়।

তিন বৎসরের মধ্যে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাঠক সাধারণের জ্ঞানের তৃষ্ণার পরিচয় বহন করছে। ৫৬৮।৫৫

গোয়েন্দা কাহিনী

শিখার অগ্নি-পরীক্ষা : শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী : দেব সাহিত্য কুটীর : ২২।৫।বি ঝামাপুকুর লেন : কলিকাতা-৯। বারো আনা।

উপরে লেখা 'কলেজ গার্লসের জন্য'। হয়তো সেই কারণেই গোয়েন্দা একটি মেয়ে। বই লিখবার প্রয়োজন এখানেই শেষ। এরপর কাহিনীর জটিলতা অথবা ডিটেকশনের নিপুণতা থাকলেও চলে। 'কলেজ গার্লস'রা হয়তো পড়বে। ১০৭।৫৬

সাংঘাতিক ইঙ্গিত—দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক : বাসন্তী বুক স্টল, ১৫৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২॥০।

আলোচ্য রহস্য-উপন্যাসটি বহুদিন পূর্বে কোন মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রথম উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। সাহিত্যের আসরে এই ধরনের গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ কোন স্থান নাই কিন্তু তা বলিয়া ইহার পাঠকের সংখ্যা কম নয়। এই ধরনের পুঁথি মনে ক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে বলিয়াই ইহার এত চাহিদা। যাহা হউক বর্তমান গ্রন্থটিও যে এক শ্রেণীর পাঠকের আনন্দের খোরাক যোগাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৩।৫৬

মাসিক পত্রিকা

কথাশিল্প। ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা। সম্পাদনা : শ্রীবীণা চক্রবর্তী। ৫৩।১ দক্ষিণপাড়া সার্কুলার রোড, কলকাতা ১৯। দাম—প্রতি সংখ্যা ১, টাকা।

নতুন বাংলা মাসিক পত্রিকার আসরে 'কথা-শিল্প' ইতিমধ্যেই একটি আসন করে নিয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, বাঙালী পাঠক সমাজ এই পত্রিকাটির প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, বাংলা মাসিক পত্রিকার পক্ষে তো গৌরবের বিষয়। 'কথাশিল্পী'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলছে এবং তুলবে। রচনা নির্বাচনে এঁদের সম্পাদনার কাজ প্রায় ত্রুটিহীন। লেখক সংগ্রহও উত্তম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ছাড়াও সাহিত্য নিরীক্ষা, আলোচনা, পাঠকের ডায়েরী, বিদেশের চিঠি প্রভৃতি বিভাগগুলি সাহিত্য নিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বর্তমান সংখ্যাটিতে শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর উপন্যাস, বীণা চক্রবর্তীর আলোচনা, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিরীক্ষা এবং কস্তুরচাঁদ লালওয়ানীর অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি পত্রিকাটির মান নির্ধারণ করছে। বাণী রায়, অমিতেন্দ্র ঠাকুর, গণেশ লালওয়ানী, এঁদের রচনাও রয়েছে। রয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ—সুনির্মল বসু।
মাইকেল মধুসূদন—সুনির্মল বসু।
চিত্রগুপ্তের ফাইল—সতীনাথ ভাদুড়ী।
বারকোশ—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
পদ্মা নদীর মাঝির ইতিকথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
আত্মা—গোপাল হালদার।
গৈরিক—মনোজ বসু।
আমার দেখা জেমমার্ক—মন্মথনাথ রায়।
দুয়ার হতে অদূরে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
অবিশ্বাসী—সৈয়দ মুজতবা আলী।
মাস্টারের মেয়ে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সর্বদলের ঊর্মি—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
গান্ধী ও মার্কস—কিশোরীলাল মশরুওয়ালা
The Outlook For a Socialist Constitution—Debabrata Chaudhuri.
Thus Spake The Buddha—Swami Suddhasatwananda.
তিন আকাশ—[illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়।
বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ।
ভাগ্য পরিবর্তন—১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীসরল-[illegible] দাশগুপ্ত।
[illegible] আধুনিক চিত্রকলার পদ্ধতি—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বর্গ—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিল্প ও বারুকলা—শ্রী[illegible] সরস্বতী।
পুজার ফুল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
বেস সুর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
ছোটদের বড় কাজ—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিমির বলয়—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী।

পাপের রূপ এমনি সর্বগ্রাসী কিন্তু তাকে দেখা যায় কি !
অশোক চিত্রের
পাপ ও পাপী
অঞ্জন ফিল্মস রিলিজ
কাহিনী
মুরারি সেন
পরিচালনা
বিজন সেন
সংগীত
গোপেন মল্লিক
শ্রেষ্ঠাংশে : মঞ্জু দে • অনুভা • সবিতা • শ্যামলী • জয়শ্রী • মণিকা
পাহাড়ী • অসিত • বিকাশ • অজিত • নীতীশ • নির্মল বসাক
রাধা ০ পূর্ণ ০ প্রাচী
অজন্তা — জয়শ্রী — নেত্র — মায়াপুরী — যোগমায়া — পারিজাত
উদয়ন — জ্যোতি — রূপালী — গৌরী

আসামের চলচ্চিত্র শিল্প

কথাটা একটু ভুল হয়, কারণ অসমীয়াতে ছবি তৈরী হলেও নিজের চিত্রশিল্প বলতে আসামে কিছুর অস্তিত্ব নেই। মাত্র নব্বই লক্ষ অধিবাসীর আসামে ভারতের প্রধান রাজ্যাগুলির মধ্যে চিত্রগৃহের সংখ্যা সবচেয়ে কম; প্রাকৃতিক অবস্থাও এমন যে ভ্রাম্যমান চিত্রপ্রদর্শন ইউনিটেরও বিশেষ প্রচলন সম্ভব নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র মানচিত্রে আসাম পড়ে পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গত যার প্রধান কেন্দ্র কলকাতা। কলকাতা থেকেই যদিও, ছবি যায়, তবু ইদানীং ওখানে কয়েকটি চিত্র-পরিবেশন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি ওখানকার চিত্রব্যবসায়ীদের দাবীতে গৌহাটিতে বেংগল মোসন পিকচার এসোসিয়েশনের একটি শাখা অফিসও খোলা হয়েছে। আসামে ছবি পরিবেশন ও দেখানোর ব্যবসা যাওবা আছে, কিন্তু ওখানে ছবি তোলার কোন ব্যবস্থাই নেই। এ বিষয়ে ওখানকার লোকের কিন্তু উৎসাহের অভাব নেই। নিজেদের মাতৃভাষার ছবি দেখার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক এবং লোকের, সেই আগ্রহ পরিতুষ্ট করার চেষ্টাও হয়ে আসছে ১৯৩৩ সাল থেকে। কিন্তু বহুগুলি এমন বাধা রয়েছে, যে জন্যে আসামে চিত্রশিল্প গঠিত হয়ে ওঠা একরকম অসম্ভবই। প্রথমত, চিত্রগৃহের সংখ্যা এতো অল্প যে, কোন ছবির খরচ তোলাই দুঃসাধ্য—চিত্রগৃহ যে সংখ্যায় আরো অনেক বাড়ানো যেতে পারে, সে সম্ভাবনাও বিশেষ নেই। বাড়তে পারে আর কয়েকটি মাত্রই, কারণ অধিবাসীর যা সংখ্যায় তার অনুপাতে পঞ্চাশটি চিত্রগৃহই যথেষ্ট, তার বেশী হলে চিত্রগৃহের অর্থকরী ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় বাধা হচ্ছেঃ মাতৃভাষা যাদের অসমীয়া এমন লোকের সংখ্যা পুরো পঞ্চাশ লক্ষও নয়; এর সংগে আরো পনের-ষোল লক্ষ ধরা যায়, যারা অসমীয়া বুঝতে পারে। তৎসত্ত্বেও মাত্র পঁয়ষট্টি-সত্তর লক্ষ লোক যার মধ্যে সম্ভাব্য অসমীয়া চিত্রদর্শক একুনে হয়তো দশ লক্ষ দাঁড়ায় কি সন্দেহ, শুধু তাদের সহায়তায় অসমীয়া ভাষায় ছবি তোলার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। অসমীয়া ছবি লাভের হওয়ার নিশ্চয়তা তাই অত্যান্ত কম, নেই বললেই চলে। তবুও প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন একদল লোককে টাকাপত্তর যোগাড় করে কলকাতায় এসে অসমীয়াতে ছবি তুলে নিয়ে যেতে দেখা যায়ই!

* * *

অসমীয়া ছবি তোলার পথিকৃৎ হলেন জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালা। ১৯৩৩ সালে তিনি "জয়মতী" নামে একখানি ছবি তোলেন। সে সময় তিনি চিত্রলেখা মুভীটোন নামে তেজপুরের কাছে একটি

—শৌভিক—

স্টুডিও নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন। পরের বছর ছবিখানি মুক্তিলাভ করে, কিন্তু টাকার দিক থেকে সাফল্য অর্জন করা যায় নি। শ্রী আগরওয়ালার প্রচেষ্টা ক'বছর বন্ধ থাকে, তারপর ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতার অরোরা স্টুডিওতে তোলেন "ইন্দ্রমালতী"। এ ছবিখানিও অর্থকরিতার দিক থেকে ব্যর্থ হওয়ার পর শ্রী আগরওয়ালা চিত্রনির্মাণে নিরস্ত হন। এর পরের ছবি হয় ১৯৪০ সালে "মনোমতী" যার প্রযোজক ছিলেন ডিব্রুগড়ের ব্যবসায়ী রোহিণীকুমার বড়ুয়া। শ্রী বড়ুয়া তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে অরোরা স্টুডিওতে ছবিখানি তোলেন, নিজেই ছিলেন তার পরিচালক। আগের দুখানির চেয়ে "মনোমতী" সমাদৃত হয়। প্রায় ঐ একই সময়েই জোড়হাটের পার্বতী বড়ুয়াও একটি দল নিয়ে কলকাতার শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে "রূপহী" নামক একখানি ছবি তোলেন। এর পর যুদ্ধজনিত প্রতিবন্ধক হেতু বছর কতক আর কোন ছবি তোলা হয়নি। তবে এ সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী বিভিন্ন গুণীসমন্বিত একদল যুবক ইস্টার্ন মুভীজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দীর্ঘ ছ'বছর পর এরা এদের প্রথম ছবি 'বদন বরফুকন' তোলায় হাত দিতে সক্ষম হন। ছবিখানি তোলা হয় তৎকালিন কালী ফিল্মস স্টুডিওতে। কমল চৌধুরী ছবিখানি পরিচালনা করেন এবং এতে আসামের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীপুরুষ বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে অবতরণ করেন। বিখ্যাত শিল্প-উদ্যোক্তা হরেন ঘোষের পরিচালনায় একটি বলীনৃত্য এতে সংযোজিত হয়। ঐ সময়েই তেজপুরেও চিত্রাবলী পিকচার্স লিমিটেড নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান 'সিরাজ' নামে একখানি ছবি তোলায় হাত দেয়। পরে এরা কলকাতায় এসে কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে কাজ করেন। আসামের দুজন বিখ্যাত গুণী, সংগীত-শিল্পী বিষ্ণু রাভা ও অভিনেতা বলীন শর্মা এই ছবিখানির

যুক্ত ছিলেন। 'বদন বরফুকন'-এর তরুণ পরিচালক কমল চৌধুরী টির প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলাচিত্রের পক্ষ তোলেন 'পারঘাট' কলকাতার ইন্দ্র-পুরী স্টুডিওতে; ছবিখানি মুক্তিলাভ করে ১৯৪৯ সালের শেষদিকে। এরপর নওগাঁর কালীনাথ বিহানী তোলেন 'বিপ্লবী'। তারপর তেজপুরের এক প্রযোজক তোলেন 'রূপমণী'। ১৯৫৩ সালে হয় 'সতী বেউলা', এর প্রযোজক ছিলেন কলকাতার এক চিত্রব্যবসায়ী এবং আসামের বাইরের কোন প্রজোযকের তোলা এইটিই প্রথম অসমীয়া ছবি। এর একটি বাঙলা সংস্করণও হয়। এরপর তোলা হয় 'নিমিল অংক', 'পিয়ালী ফুকন' 'সরাপাত'। 'পিয়ালী ফুকন' পরিচালনা করেন আসামের জনপ্রিয় অভিনেতা ফণী শর্মা। বর্তমানে নির্মীয়মান রয়েছে 'স্মৃতির পরশ', 'লখিমী' ও 'এরা বাটর সুর'। অর্থাৎ এ পর্যন্ত এই তেইশ বছরের ইতিহাসে অসমীয়া ছবি তৈরী হয়েছে ষোলখানি। 'লখিমী'র পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ভবেন দাস। এর প্রযোজক গৌহাটির 'রূপায়ন' সিনেমার স্বত্বাধিকারী শ্রী বড়ুয়া। পরিচালক দাসই একমাত্র অসমীয়া কলা-কুশলী যিনি দীর্ঘ ষোল বৎসর যাবৎ কলকাতায় থেকে বিভিন্ন ছবির নির্মাণে পরিচালনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা বিভাগে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসছেন। 'লখিমী'র তরুণ আলোকচিত্রগ্রাহী নলিনী দুয়ারাকে একমাত্র অসমীয়া ক্যামেরাম্যান বলা যায়। বম্বেতে তিনি সহকারীর কাজ করেন এবং এর আগে 'নিমিল অংক' তোলেন। 'লখিমী'র সংগীত পরিচালক ব্রজেন বড়ুয়াও ওখানকার একজন নামকরা শিল্পী। 'এরাও বাটর সুর'-এর পরিচালক ডাঃ ভুপেন হাজারিকাও আসামের নামকরা কণ্ঠশিল্পী। সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অডিও-ভিসুয়াল চিত্রবিষয়ে শিক্ষালাভ করে আসেন। এর আগে তিনি 'পিয়লি ফুকন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পরে বাঙলা ছবিতেও তিনি সংগীত পরিচালকের কাজ করেন। 'এরাও বাটর সুর' ছবিখানির গান বম্বের নামকরা গায়িকাদের দিয়ে গাওয়ানো হয়েছে এবং ছবিখানি যেভাবে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সাধারণত অসমীয়া ছবি যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করা হচ্ছে এবং খরচও হবে প্রায় সাধারণ ছবির দু'তিনগুণ বেশী। এ একটা ঝুঁকির ব্যাপার এবং আসামের চিত্রনির্মাণে উৎ-সাহীরা এর ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

• • •

অসমীয়া ভাষায় নির্মিত ষোলখানি ছবির মধ্যে তিনখানি মুক্তিলাভ করতে বাকি, অন্যগুলির বিষয়ে শোনা যায়, খরচের টাকা তুলতে পেরেছে এমন ছবি খান দুইয়ের বেশী নয়। এখানে জানানো দরকার যে, অসমীয়া ছবির খরচ গড়পড়তা বাঙলা ছবির খরচের চেয়ে অনেক কমই করা হয়। তবুও খরচ তোলা দুঃসাধ্য। তাই দেখা যায় যে, একবার ছবি তুলতে নেমে আবার দ্বিতীয়বার বড় একটা কেউ এগিয়ে আসেন না। অসমীয়া ছবির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠার এমন সম্ভাবনাও হয়নি যা বড়ো ব্যবসায়ীদের এর পিছনে লেগে যেতে প্রলুব্ধ করতে পারে। এ পর্যন্ত
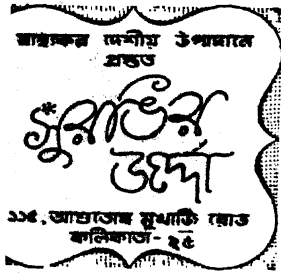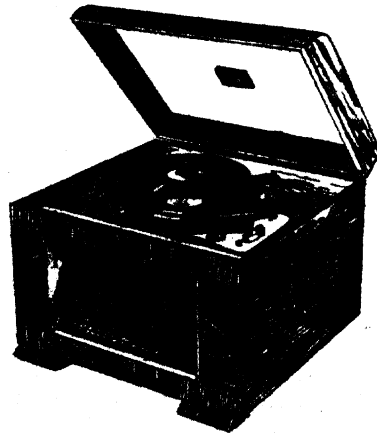
যা ছবি হয়েছে বা হচ্ছে তা সবই আঞ্চলিক ভাষা ও শিল্প সংস্কৃতির প্রকাশ ও প্রসারে উৎসাহী কতকজন গুণী অসমীয়ার উৎসাহে ও আগ্রহে। খরচ যতোরকমভাবে কম করা যায় সেবিষয়ে আসামের চিত্র-নির্মাণে ব্রতীদের বিশেষভাবেই মাথা ঘামাতে হয়। আসামে পেশাদার শিল্পী-গোষ্ঠি গড়ে নেই বলে যখন যেমন ছবির পরিকল্পনা হয় সেই অনুযায়ী সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে অভিনয় করবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ বেছে নেওয়া হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রী ঠিক করে সকলকে নিয়ে কলকাতায় এসে ছবি তোলা হয়। কলকাতায় থাকা-খাওয়ার খরচ বড়ো কম যায় না। 'লাখিমী'র প্রযোজক শ্রী বড়ুয়া সেদিন বলছিলেন যে, শিল্পী-দের পারিশ্রমিক বাবদ যা না খরচ তাদের সবাইকে কলকাতায় এনে রেখে দেওয়ার খরচ তার চেয়ে বেশী পড়ে। এর ওপর যদি কোন কারণে দলের থাকাটা খুব বেশী দিনের জন্য গড়ায় তাহলে ফ্যাসাদ বেড়ে যায়। তাই ওরা কলকাতায় এসেই ঝপ ঝপ করে বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যেই কাজ শেষ করে শিল্পীদলকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এই তাড়াহুড়ো এবং অতি অল্প খরচের মধ্যে ছবি সম্পূর্ণ করা, তার ফলে ছবির উৎকর্ষ বিঘ্নিত হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ও তাইই। আর এইজন্যেই অসমীয়া ছবির একান্ত ভক্ত দর্শক সংখ্যায় বেশী হয় না। আর তাই আসামে পুরোদস্তুর চিত্রশিল্প গড়ে উঠতে পারছে না। এ অবস্থায় উপায় তাহলে কি?

* * *

অসমীয়া ছবি তুলতে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গুণীলোক অনেক দেখা গিয়েছে। বিষ্ণু রাভা, বলীন শর্মা, কমল চৌধুরী, ফণী শর্মা, ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, ভবেন দাস, নলিনী দুয়ারা, ব্রজেন বড়ুয়া প্রভৃতির মতো গুণী ব্যক্তিদের দেখে মনে হয় এদেশের চিত্র-শিল্পে আসন করে নেওয়ার মতো যোগ্যতা-সম্পন্ন গুণী আসামে যথেষ্টই পাওয়া যেতে পারবে। এদের আশা আকাঙ্ক্ষাও আছে, কিন্তু তা স্ফুরিত হওয়ার সুযোগ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পাণ্ডুতে বড়ো বন্দর গড়ে উঠলে, আরো তৈলখনি প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় আসামের শিল্প ব্যবসা উন্নত-তর হলে হয়তো তখন কিছু চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়বে, তাতে হয়তো অসমীয়া ছবির বাজারও একটু ভালো হবে, কিন্তু যতোই ভালো হোক, শুধু অসমীয়া ছবি তুলে চিত্রশিল্প গড়ে তোলার অবস্থা অতি সুদূরপরাহত। এক্ষেত্রে আসামের শিল্প-প্রতিভাগুলিকে কাজে লাগাবার বিকল্প ব্যবস্থা কি করা যায় সেদিক দিয়ে চিন্তা করা দরকার।

* * *

কতকগুলি উপায় আছে যা কার্যকরী করা সম্ভব। অসমীয়া চলচ্চিত্রে উৎসাহীরা এদিকগুলো ভেবে দেখতে পারেন। প্রথমেই দরকার এমন কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা

াতে অসমীয়া ছবির প্রতি জনসাধারণের গ্রাহ বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। অসমীয়া চাষায় যেসব ছবি তোলা হচ্ছে তা দিয়ে স-আগ্রহ গঠিত করে দেওয়া সম্ভব নয়। এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হয়, ভালো বাঙলা বা হিন্দী ছবিকে অসমীয়া ভাষায় ডাব করে দেখানো। আসামের সংগে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সৌসাদৃশ্য বাঙলারই বেশী বলে অসমীয়াতে ডাব করা বাঙলা ছবির প্রচলন সম্ভাবনা বোধ-হয় বেশীই হবে। আর এক ব্যবস্থা হয়, কলকাতায় অল্প খরচে যারা বাঙলা ছবি তোলায় হাত দেন তাদের মধ্যে থেকে ভালো কৃতি লোকের সংগে একজোট হয়ে বাঙলার সংগে একটি অসমীয়া সংস্করণও তৈরী করে নেওয়া। অসমীয়া ছবি তুলতে যে ব্যয় হয় তাতে এখানকার প্রথম শ্রেণীর কলাকুশলীদের নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না, এবং কলাকৌশলের নিকৃষ্ট কাজ এপর্যন্ত অসমীয়া ছবির জনপ্রিয়তা অর্জনে একটি প্রধান বিঘ্ন হয়ে আসছে। বাঙলা ছবির সংগে মিলিতভাবে ছবি তুললে সেদিকটা উন্নততর হবেই। বাঙলার নামকরা শিল্পী-দের সংগে অসমীয়া শিল্পীদের অভিনয়ে নামানোও যেতে পারে, অথবা অসমীয়া সংস্করণের জন্য শুধুমাত্র অসমীয়া শিল্পী-দেরও রাখা যায়, যখন যেটা ভালো হয়। এতে বিশেষ সুবিধে হয় প্রচার ব্যাপারেও। শুধু অসমীয়া ছবি থাকলে প্রচারের জন্য কোন রকম খরচই সামলানো দায়। কিন্তু বাঙলা ও হিন্দী ছবি অসমীয়াতে ডাব করা হলে বা, বাঙলার সংগে একটি স্বতন্ত্র অসমীয়া সংস্করণ তুললে মূল ছবির প্রচারের সংগে অসমীয়া সংস্করণেরও প্রচার অনেকখানিই হয়ে যায়। আর সুবিধে হয় বাঙলা ছবি তৈরীর সংগে লেগে থেকে অসমীয়া কলাকুশলী তৈরী হবার। অপর উপায়, গভর্নমেন্টকে দিয়ে একটি সাউণ্ড ফ্লোর করিয়ে নেওয়া। একটি শব্দগ্রহণ যন্ত্র, একটি সাউণ্ড ক্যামেরা, একটি টেপ-রেকর্ডার ও একটি সাইলেণ্ট-ক্যামেরা এবং কিছু আলোর ব্যবস্থা হলেই হয়। এটা আসামের সংগীত-নাটক আকাদেমীর অন্তর্ভুক্ত করে রেখে দেওয়া যায়। অসমীয়া প্রযোজকরা যতোটা পারলেন তাদের ছবি এখানেই তুললেন এবং নেহাৎ যা হলোনা তা কলকাতায় এসে তোলাও শেষ করলেন এবং সেই সংগে পরিস্ফুটনেরও কাজ করে নিয়ে গেলেন। এতে খরচ আরো কমাতে পারবে। আসামের প্রাকৃতিক শোভা এতো রমণীয় যে, সেই পটভূমিকায় মোহনীয় ছবি অগাধ তোলা যায়। স্টুডিও থাকলে এ সুযোগটা আসামের প্রযোজকরা বেশী করে কাজে লাগাতে পারেন। আর আসামে ক্যামেরা, সাউণ্ড-ট্রাক ইত্যাদি আছে জানা থাকলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্র-নির্মাতারাও ওখানে গিয়ে ছবি তুলে আনার কথা ভাবতে পারবেন। আসামের বিপুল শিল্প সম্পদকে ছবিতে তুলে রাখা বিষয়েও ঐরকম একটা স্টুডিওর সহায়তা থাকলে আসামের সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদমীও বিশেষ লাভবান হবেন।

একলব্য

অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধের চতুর্থ রণাঙ্গনে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ১৭০ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে এবারও 'অ্যাসেস' দখলে রাখবার পথ পরিষ্কার করেছে। অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। অনুষ্ঠিত চারটি টেস্ট খেলার মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১৮৫ রানে পরাজিত করে ইংলণ্ডকে। তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড পর পর জয়লাভ করায় ২—১ টেস্টে এগিয়ে আছে। সুতরাং পঞ্চম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে পরাজিত করলেও 'রাবার' লাভ করতে পারবে না। তবে রাবার লাভের কৃতিত্ব থেকে প্রতিপক্ষ ইংলণ্ডকে বঞ্চিত করতে পারবে। আর পঞ্চম টেস্ট অমীমাংসিত থাকলে বা অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় ঘটলে ইংলণ্ডের 'রাবার' লাভ সুনিশ্চিত। আগামী ১৩শে আগষ্ট ওভাল মাঠে আরম্ভ হচ্ছে দুই দেশের পঞ্চম টেস্ট খেলা।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এটি ছিল ১৭২তম টেস্ট যুদ্ধ। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে ৭০ বার ইংলণ্ড এটি নিয়ে ৬২ বার জয়লাভ করলো, ৪০ বার দুই দেশের টেস্ট খেলায় জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

ম্যানচেস্টার মাঠের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ডের কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের মূলে সারের অফ ব্রেক বোলার জিম লেকারের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা সব চেয়ে আগে উল্লেখ করা কর্তব্য। এই টেস্টে লেকারের অপূর্ব বোলিং দক্ষতা টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৩৭ রানে ৯টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রানে ১০টি উইকেট দখল করায় দুই ইনিংসে লেকার মাত্র ৯০ রানে ১৯টি উইকেট পেয়েছেন। ইতিপূর্বে কোন খেলোয়াড়ই টেস্ট খেলায় এ কৃতিত্ব লাভ করতে পারেন নি। অদূর ভবিষ্যতে কেউ পারবেন কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লেকারের ৩৭ রানে ৯ উইকেট, ৫৩ রানে ১০ উইকেট এবং ৯০ রানে ১৯ উইকেট লাভ—তিনটি ঘটনাকেই তিনটি পৃথক রেকর্ড বলে অভিহিত করা যায়। কারণ ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের কেউই অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পাননি। ১৯২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার আর্থার মেলী ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন বটে কিন্তু রান দিয়েছিলেন ১২১টি। সুতরাং ৩৭ রানে ৯ উইকেট লাভ নতুন রেকর্ড বৈ কি! আর এক ইনিংসে সব ক'টি (১০টি) উইকেট দখল তো টেস্ট ক্রিকেটের সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। দুই ইনিংসের বোলিংয়ে যিনি টেস্টে রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন তিনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের অতীত দিনের কীর্তিমান খেলোয়াড় সিড বার্নেস। দীর্ঘ ৪২ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলায় তিনি ১৫৯ রানে ১৭টি উইকেট পান। লেকার তাঁর রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন।

লেকারের নিজের দল সারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলাতেও লেকার ইনিংসের সব ক'টি উইকেট দখল করেছিলেন। কিন্তু

বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ইংলণ্ডের কীর্তিমান বোলার জিম লেকারের বোলিং করবার ভঙ্গী

কাউণ্টি ম্যাচে ১০টি উইকেট লাভ করা আর টেস্ট ম্যাচে ১০টি উইকেট দখল করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ম্যানচেস্টার টেস্টে প্রথম থেকেই লেকার অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বোলিং করতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের পর এক সময় তাঁর বোলিংয়ের হিসাব দাঁড়ায় ওভার ৩·৮—মেডেন ১—রান ৮—উইকেট ৭। সত্যই অত্যাশ্চর্য বোলিং।

লেকার ছাড়া এই টেস্টে ইংলণ্ডের ব্যাটস-ম্যানরাও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ইংলণ্ডের দুইজন খেলোয়াড় রিচার্ডসন ও ডেভিড শেফার্ড এই টেস্টে সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। টেস্ট খেলায় রিচার্ডসনের এটি প্রথম সেঞ্চুরী আর ধর্ম-যাজক শেফার্ডের দ্বিতীয়। সুনিপুণ ব্যাটসম্যান শেফার্ড ১৯৫২ সালে ওভাল মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে ১০৪ রান করে টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী করেন।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে কি বোলিং, কি ব্যাটিং, সব দিক দিয়েই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এক-মাত্র ম্যাকডোনাল্ড ছাড়া আর কেউই দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করতে পারেননি। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের 'পিচ' সম্বন্ধে নানা আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। দ্বিতীয় দিন থেকেই উইকেট ভাঙ্গতে আরম্ভ করে, যার ফলে ব্যাটসম্যানদেরও উইকেটে টিকে থাকা হয়ে পড়ে অসম্ভব।

ক্রিকেট সমালোচকরা ইংলণ্ডের 'পিচ' তৈরী সম্পর্কে কটাক্ষ করতে কসুর করেননি। কেউ কেউ এ সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান কমিটি স্থাপনেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। মাঠ খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ না বেরোয়, এই আশংকা।

পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্য প্রায় তিন দিনে পরিণত হয়। কারণ বৃষ্টির জন্য ১০ ঘণ্টা খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই অসুবিধা সত্ত্বেও ইংলণ্ড বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। দীর্ঘ ৫১ বছর আগে ইংলণ্ড এই মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল, আর পরাজিত করতে পারে নি ট্রাফোর্ড ইংলণ্ড বিজয় গৌরবের সঙ্গে এক টেস্ট ইতিহাস সৃষ্টি করলো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৪৫৯ (পি রিচার্ডসন ১০৪, ডেভিড শেফার্ড ১১৩, কলিন কাউড্রে ৮০, টি ইভান্স ৪৭, পিটার মে ৪৩; জনসন ১৫১ রানে ৪ উইঃ, লিণ্ড-ওয়াল ৬৩ রানে ২ উইঃ, বিনাউড ১২০ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৮৪ (ম্যাক-ডোনাল্ড ৩২, জে বার্ক ২২; জিম লেকার ৩৭ রানে ৯ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—২০৫ (ম্যাক-

ডোনাল্ড ৮৯, বার্ক ৬৩, ক্রেগ ৩৮; জিম লেকার ৫৩ রাণে ১০ উইকেট)

(ইংলেণ্ড এক ইনিংস ও ১৭০ রানে বিজয়ী)

*   *   *

গত দুবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব এ বছরও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ক'রে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ফুটবল ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছে। মোহনবাগানের পক্ষে অবশ্য লীগ-বিজয় কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে তারা আরও ৬ বার লীগ বিজয়ী হয়েছে। তবে উপর্যুপরি তিনবার লীগ-জয় ইতিপূর্বে মোহনবাগানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু মোহনবাগান কেন, কলকাতা ফুটবল লীগের ৬৯ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র দুটি ক্লাবের পক্ষেই এ কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ রেজিমেণ্টাল ফুটবল টীম ডারহামস লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল উপর্যুপরি লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। তারপর লীগ জয় করে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর পাঁচ বছর। সুতরাং কলকাতার ফুটবল লীগের ইতিহাসে মোহনবাগান ক্লাব তৃতীয় দল হিসাবে উপর্যুপরি তিনবার লীগ-জয়ের গৌরব অর্জন করলো। মোহনবাগানের এ কৃতিত্ব সত্যই যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। কলকাতার ফুটবলে ইউরোপীয় দলগুলির প্রাধান্য বজায় থাকতে কোন ভারতীয় দলের পক্ষেই লীগ জয় সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় টীমের প্রাধান্য খর্ব হবার পরও মাত্র তিনটি ক্লাবের পক্ষে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এরা হচ্ছে কলকাতার ফুটবল ক্ষেত্রের তিন প্রধান—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এর মধ্যে মোহনবাগান ক্লাব—এবার নিয়ে ৭ বার লীগ জয় করলো। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও লীগ-বিজয়ী ৭ বার। আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের পুরস্কার ঘরে তুলেছে ৬ বার।

চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নের মীমাংসা হলেও এখন পর্যন্ত লীগের রানার্সের প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'রানার্সের' জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। রেলিগেশন বা অবনমনের ক্ষেত্রেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে অবস্থা দেখে মনে হয় শেষ পর্যন্ত কালীঘাট ক্লাবকেই দ্বিতীয় ডিভিশনে নামতে হবে।

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগেও চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে গেছে এবং হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব অপরাজিত থেকেই লাভ করেছে দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়নশিপ। সুতরাং দীর্ঘ ২০ বছর পরে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবকে আবার প্রথম ডিভিশনে খেলতে দেখা যাবে। ১৯৩৫ সালে ডিভিশনচ্যুত হবার পর হাওড়া ইউনিয়ন প্রতি বছরই প্রথম ডিভিশনে উঠবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। এতদিনে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল। লীগের অন্যান্য ডিভিশন ও প্রথম ডিভিশনের বাকী খেলাগুলি শেষ হতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না। লীগের সমস্ত খেলা শেষ হবার পর লীগ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করার ইচ্ছে রইলো। এখন কলকাতার ফুটবল লীগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

*   *   *

ভারতে ফুটবল খেলার আয়ুষ্কাল ও কলকাতার ফুটবল লীগের বয়সের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান নেই। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন সৃষ্টির পাঁচ বছর পরে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের জন্ম হয়। সুতরাং কলকাতার ফুটবল লীগ খেলার জন্ম সন ১৮৯৮। লীগের জন্মের আগে ট্রেডস কাপ, আই এফ এ শীল্ড, ইলিয়ট শীল্ড প্রভৃতি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের প্রধান হাতিয়ার ছিল। অবশ্য ট্রেডস কাপের জন্ম আই এফ এ সৃষ্টিরও আগে।

একদিকে ক্লাবগুলিকে বেশীবার প্রতিযোগিতামূলক খেলার সুযোগ দান, অন্যদিকে খেলাধুলার উন্নতিবিধান—দুদিকে দৃষ্টি রেখেই তৎকালের খেলাধুলার পরিচালকরা লীগ খেলার প্রবর্তন করেন। তাছাড়া বেশী ম্যাচ খেলবার জন্য ক্লাবগুলোর ক্রমবর্ধিত চাহিদাও ছিল লীগ প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দেশ শাসনের মত ফুটবল শাসনেও সাহেবদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। যাদের দৌলতে এদেশে ফুটবল খেলার সৃষ্টি তারা সহজে কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবেন কেন? অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে প্রথম দিকে কলকাতার ফুটবল খেলায় ভারতীয় দলের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। এদেশে ফুটবলকে জনপ্রিয় করতেও সময় লাগে। কালের রথচক্র, খেলার প্রসার ও ঘটনার গতিপথে ফুটবলের পরিচালনাভার ধাপে ধাপে সাহেবদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে এসেছে।

লীগ খেলার সূচনায় লীগে ভারতীয় দলের প্রবেশাধিকার ছিল না। ডালহৌসী, ক্যালকাটা, রেঞ্জার্স, হাওড়া ইউনাইটেড (হাওড়ার সাহেবদের একটি দল) ও ওয়াই এম সি এ—এই পাঁচটি সাহেবী দল, আর গ্লস্টারস, ৪৮ নম্বর কোম্পানী এফ বি আর ও রয়্যাল ওয়েস্ট কেণ্ট—এ তিনটি পল্টনী দল, মোট ৮টি দল নিয়ে লীগ খেলা আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য পাঁচটি সাহেবী দলের কর্মকর্তারাই ছিলেন লীগের প্রবর্তক। মেসার্স ওয়াল্টার লক এণ্ড কোম্পানী লীগ বিজয়ীর জন্য একটি কাপ উপহার দেন। সেই কাপটি এখনো লীগ বিজয়ীর পুরস্কার। ক্লাবের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন, ১৯২৮ সালে তৃতীয় ডিভিশন ও ১৯৩২ সালে চতুর্থ ডিভিশন লীগের খেলা আরম্ভ হয়।

আই এফ এ-র পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে এখন যেভাবে লীগ খেলা পরিচালিত হয় পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিল না। তখন লীগ খেলা পৃথকভাবে পরিচালিত হত এবং প্রতি ক্লাবের একজন করে প্রতিনিধি এবং সর্বোপরি একজন সম্পাদক নিয়ে গঠিত কমিটির উপর লীগ খেলা পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। সাধারণত প্রতি ক্লাবের সম্পাদক হতেন ক্যালকাটা ফুটবল লীগ কমিটির সদস্য।

লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভের সময়ই প্রতি ক্লাবের সঙ্গে প্রতি ক্লাবের দুবার খেলার ব্যবস্থা হয়। ১৯৪২ সাল পর্যন্তও দ্বিতীয় ডিভিশনে পাল্টা খেলার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে পাল্টা বা ফিরতি খেলার উঠে যায়।

যাই হক, ৬ বছর ধরে প্রথম ডিভিশন লীগ খেলা পরিচালনার পর ১৯০৪ সালে আর ৭টি সাহেবী ও পল্টনী দলের সমন্বয়ে দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ খেলা

আরম্ভ হলেও লীগে ভারতীয় দলের যোগদানের বাধা অপসারিত হল না। শোভাবাজার, ন্যাশন্যাল, মোহনবাগান, কুমারটুলী প্রভৃতি কয়েকটি ক্লাব নক আউট ফুটবলে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও ফুটবল শাসকরা লীগে সাদা আর কালোর মধ্যে পার্থক্য জীইয়ে রাখতে চাইলেন।

১৯১১ সালে লীগ বহির্ভূত ভারতীয় ক্লাব—মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ডে বিজয়ী হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করলো। মোহনবাগানের ক্রীড়ানৈপুণ্যের নানা কথা এখানকার সাহেবদের কান ছাপিয়ে সাগরপারের সাহেবদের কানে গিয়ে পৌঁছল। সাহেবরা বুঝলেন ভারতীয় দলকে আর দাবিয়ে রাখা চলবে না। ধীরে ধীরে এরিয়ান, শোভাবাজার, কুমারটুলী, টাউন, গ্রীয়ার স্পোর্টিং, জোড়াবাগান, তাজহাট প্রভৃতি ক্লাব ফুটবল খেলায় সুনাম অর্জন করতে আরম্ভ করলো। ফলে ১৯১৪ সালে মোহনবাগানের জন্য এবং ১৯১৫ সালে এরিয়ান ক্লাবের জন্য দ্বিতীয় ডিভিশনের দ্বার উন্মুক্ত হলো। ১৯১৪ সালেই মোহনবাগান ক্লাব সোমারসেট ক্লাবের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট অর্জন করে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ৯১ হাইল্যাণ্ডার্স-এর 'বি' টীম লাভ করে চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু হাইল্যাণ্ডার্সের 'এ' টীম প্রথম ডিভিশনে থাকায় 'বি' টীম আইনঘটিত কারণে প্রথম ডিভিশনে উঠতে পারে না। ফলে প্রমোশনের জন্য মোহনবাগান ও সোমারসেট ক্লাবের মধ্যে আবার খেলার ব্যবস্থা হয়। একদিন অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিন তখনকার শক্তিশালী সোমারসেট ক্লাব ২—১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে প্রথম ডিভিশনে উঠবার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু মোহনবাগানও দ্বিতীয় ডিভিশনে পড়ে থাকে না। ৬২ নম্বর আর জি এ কোম্পানী প্রথম ডিভিসন থেকে সরে যাওয়ায় লীগ কমিটি মোহনবাগানকেও প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ নিয়ম করতে কসুর করেন না যে, প্রথম ডিভিশনে মাত্র দুটি ভারতীয় দলের খেলবার অধিকার থাকবে, তার বেশী নয়। এ নিয়মে সবচেয়ে যারা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হল তারা হচ্ছে কুমারটুলী ক্লাব। ১৯১৭, ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে তারা পর পর তিন বছর প্রথম ডিভিশনে উঠবার অধিকার অর্জন করেও আইনের বিধানে দ্বিতীয় ডিভিশনে পড়ে রইলেন। ১৯২৭ সালেই কুমারটুলী দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবার সুযোগ পেয়েছিল। এই বছর টাউন এবং গ্রীয়ার ক্লাবও দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবার সুযোগ পায়। শোভাবাজার লীগে খেলছিল আরও দু'বছর আগে থেকে। ১৯২১ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন লীগের তাজহাট ক্লাবের শূন্যস্থান পূর্ণ করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডিভিশনে আবির্ভাব ঘটে এবং লীগ পরিচালনায় দেখা যায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ১৯২৪ সালে ইস্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে লাভ করে তৃতীয় স্থান। চ্যাম্পিয়ন পুলিশ দল নিজেদের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে প্রথম ডিভিশনে উঠতে অস্বীকার করে। রানার্স আপ ক্যামেরন 'বি' টীমেরও প্রথম ডিভিশনে উঠবার আইনঘটিত বাধা। সুতরাং তৃতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিশনে উঠবার আবেদন জানায়। কিন্তু এখানেও আইনের বাধা। মাত্র দুইটি ভারতীয় দলই প্রথম ডিভিশনে থাকবার অধিকারী। প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। আন্দোলনের ফলে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিশনে খেলবার অধিকার পেল, সঙ্গে সঙ্গে মাত্র দুটি টীম প্রথম ডিভিশনে খেলবার অধিকারী এ আইনও উঠে গেল। আইনের এই রদবদলের প্রতিবাদে তখনকার লীগ কমিটির সম্পাদক ক্লাদরেল সাহেব এইচ ই মেডলীকট লীগ কমিটির সম্পাদকের কার্যভার ত্যাগ করলেন।

সাহেবী দলগুলির অস্তগামী প্রতিভার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় দলগুলি প্রথম ডিভিশনে খেলবার সুযোগ পায়। ১৯২৯ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ১৯৩১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন, ১৯৩৩ সালে কালীঘাট, ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ও ১৯৩৭ সালে ভবানীপুর ক্লাব প্রথম ডিভিশনে উঠবার পর যুদ্ধের জন্য কয়েক বছর 'উঠানামা বন্ধ থাকে। যুদ্ধোত্তর ফুটবলে জর্জ টেলীগ্রাফ, রাজস্থান, বি এন আর, উয়াড়ী, খিদিরপুর, অরোরা ও বালী প্রতিভা প্রথম ডিভিশনে উঠেছে। অরোরা অবশ্য এক বরষকা সুলতানের মত এক বছর খেলেই দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গেছে। শুধু অরোরাই নয়, আরও কত দলকে দু-এক বছর সিনিয়র লীগে খেলে দ্বিতীয় লীগে নেমে যেতে হয়েছে। তাই উঠা নামা এবং দল ভাঙাগড়ার খেলায় কলকাতার ফুটবল লীগের ইতিহাস সত্যিই বিচিত্র।

দেশী সংবাদ

২৪শে জুলাই—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য শ্রী সি ডি দেশমুখের নিকট হইতে অর্থদপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শ্রী দেশমুখের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্থানী হানার যে বিবরণ উপস্থাপিত করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর সীমান্ত অঞ্চলে মোট ৬৪টি হানার ঘটনা ঘটে। ঐ সকল ঘটনায় ২ জন নিহত ৩০ জন আহত এবং ৯ জন অপহৃত হয়।

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ডাঃ জন মাথাই সমাবর্তন ভাষণ দান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর ঐ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হইবে।

২৫শে জুলাই—বুধবার লোকসভা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ (এলাকা হস্তান্তর) বিল একটি যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিয়াছেন।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের রোগী শ্রীব্রজহরি পালের মৃত্যু সম্পর্কে এবং শ্রী পালের পত্নীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে যে সব সংবাদ ও মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহাতে রুষ্ট হইয়া উপরোক্ত হাসপাতালের হাউস-ষ্টাফের ডাক্তারগণ ও নার্সগণ আগামী সোমবার, ৩০শে জুলাই একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করিবার নোটিশ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

২৬শে জুলাই—গণতন্ত্র পরিষদের সভাপতি এবং উড়িষ্যা বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র অদ্য সকাল ৮-৩০টায় সি বি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং হোমে পরলোকগমন করিয়াছেন।

আজ লোকসভায় রাজ্য পুনর্গঠন বিল সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষার নবরূপায়ণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেন যে, বর্তমান দশ-শ্রেণী সমন্বিত বিদ্যালয়গুলিকে এগারো-শ্রেণী সমন্বিত বিদ্যালয়ে উন্নীত করিলে শিক্ষাব্যয় নিঃসন্দেহে বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। তবে সরকার আংশিক ব্যয়ভার বহন করিবেন।

২৭শে জুলাই—বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির দাবীতে অদ্য সংসদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য পুলিস প্রায় ১,৮০০ জন মহারাষ্ট্রীয়কে গ্রেপ্তার করে, তন্মধ্যে ২০০ জন মহিলা ছিলেন। তিন ঘণ্টাকাল আটক রাখার পর ধৃত ব্যক্তিদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বীমা কোম্পানীসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পর বীমা কোম্পানীসমূহের তত্ত্বাবধায়কগণ দেখিতে পান যে, পাঁচটি ক্ষেত্রে পাঁচটি বীমা কোম্পানী অন্যায়ভাবে মোট ৭০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

বর্তমান সপ্তাহে পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু ক্যাম্প-গুলিতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার উদ্বাস্তু রহিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই সরকারের খয়রাতি দানের উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতেছেন।

২৮শে জুলাই—জানা গেল, ১৯৫৬ সালের বিহার পশ্চিমবঙ্গ (ভূমি হস্তান্তর) খসড়া বিল সম্পর্কে নিজেদের অভিমত জানাইতে গিয়া বিহার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিহারের যেসব অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে, জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেই সব অঞ্চলে গণভোটের ব্যবস্থা করা হউক।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্রাজুয়েট দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দিয়াও চাকরি যোগাড় করিতে না পারিয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া হকারী বৃত্তি গ্রহণ করেন। অদ্য ফিরিওয়ালা-দের বিরুদ্ধে এক অভিযানকালে উক্ত গ্রাজুয়েট পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হন।

২৯শে জুলাই—কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের পক্ষ হইতে নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে তিন বৎসরের (নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) কোর্সের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পঠনীয় বিষয়সমূহের একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

সরকারী চাকুরিতে কর্মচারী সংগ্রহের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রয়োজন আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেন—প্রকাশ, কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং কেরানীগিরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চপদের চাকুরিতে এবং প্রশাসনিক পদে ডিগ্রির প্রয়োজন আছে।

৩০শে জুলাই—আজ প্রত্যূষে সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও সুপরিচিত শিক্ষাবিদ্ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি থ্রম্বোসিস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইয়াছিল।

মন্ত্রিসভার সহিত কোনরূপে পরামর্শ না করিয়াই বোম্বাই শহর সম্পর্কে দুইটি গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ যে অভিযোগ করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য লোকসভায় তাহা অস্বীকার করেন।

৩১শে জুলাই—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বাতিল করিয়া সরকারী তত্ত্বাবধানে আনার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইতেছে। রাজ্য সরকার ঐ মেয়াদ আরও তিন মাসের জন্য বাড়াইয়া দিতেছেন। নূতন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে জুলাই—আজ তেহরান রেডিও ঘোষণা করে যে, ইরানের সাম্প্রতিক বন্যায় তিনশত লোক হত হইয়াছে।

২৪শে জুলাই—আজ কায়রো বেতার হইতে জানান হইয়াছে যে, আশোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য মিশর যদি রাশিয়ার নিকট অর্থ সাহায্য চাহে, তবে রাশিয়া তাহা দিতে প্রস্তুত আছে!

২৫শে জুলাই—মার্কিন সেনেট প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া গতকল্য যুগোশ্লাভিয়াকে আর কোন সামরিক সাহায্য না দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে জুলাই—প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের অদ্য রাত্রিতে আলেকজান্দ্রিয়ার লিবারেশন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া মিশরকে যথার্থ স্বাধীন রাখিবার জন্য মিশর সংগ্রাম করিবে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে সাত শতাধিক ভারতীয় ধাতুবিদ্যাবিশারদ সোভিয়েট ইউনিয়নে ট্রেনিং গ্রহণ করিবে।

প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের অদ্য রাত্রে মিশর সরকারের সুয়েজ খাল কোম্পানি রাষ্ট্রীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

২৭শে জুলাই—বৃটিশ মন্ত্রিসভা কমন্স সভার রক্ষণশীল সদস্যগণের সমর্থনে অদ্য সর্বপ্রথম মিশর কর্তৃক সুয়েজ খালের রাষ্ট্রীকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনা রচনা করেন।

২৮শে জুলাই—মিশরের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী-দের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আজ এখানে প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আমরা বলপ্রয়োগ করিব।

২৯শে জুলাই—মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল কোম্পানি রাষ্ট্রীকরণের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কি করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আজ বৃটিশ ও মার্কিন কূটনৈতিকদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি সংবাদপত্র "প্রাভদা" অদ্য লিখিয়াছেন, মিশর অর্থনৈতিক সাহায্যলাভের জন্য "কার্যোপযোগী" কোন অনুরোধ জানাইলে রাশিয়া তাহা পূরণ করিতে সম্মত রহিয়াছে।

৩০শে জুলাই—কুমিল্লায় দুইজন খাদ্য-অপরাধীর বেত্রদণ্ড দেখিবার জন্য শত শত লোক টাউন হলে সমবেত হয়। উহাদের ১০ ঘা করিয়া বেত্রদণ্ড ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৫ ঘা বেত্রদণ্ডের পর উহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ায় সিভিল সার্জেনের নির্দেশে বেত্রমারা বন্ধ করা হয়। বেত্রদণ্ড দেখিয়া ৪ জন লোক অচেতন হইয়া পড়ে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন অদ্য ঘোষণা করেন যে, মিশরে সমস্ত সমরোপকরণ রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর তথায় জাহাজ চলাচল ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই রহিয়াছে। কর্মচারীরা যথারীতি নিজ নিজ কার্য করিয়া যাইতেছেন। খাল-কর আদায় ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন হয় নাই।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২৷৷০, ষাণ্মাসিক—১৷০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরাজপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু
নিয়া এক বিরাট চিত্র
দেবতা
দেখুন—
হিন্দ বসুশ্রী বীণায়
(কলিকাতা)
এবং ভারতের সর্বত্র অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানসমূহে।
সঙ্গীত
সি. রামচন্দ্র
পরিচালনা
পট্টন্না
জেমিনী রিলিজ
নারায়ণন কোম্পানীর চিত্র

দেশ

DESH : 6 Annas.
SATURDAY, 11th AUG, 1956.

২৩ বর্ষ ॥ ৪১ সংখ্যা ॥ ৶০
শনিবার ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৬৩
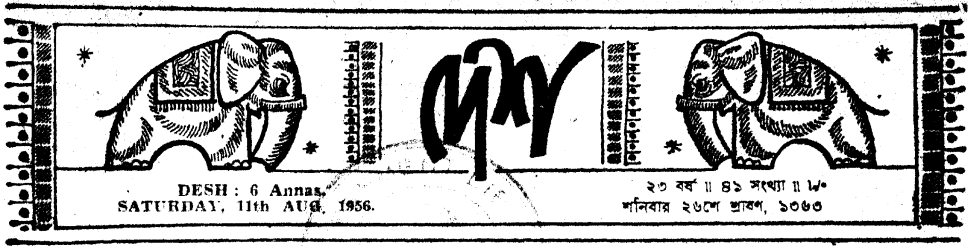
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার

গত ৭ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। নিতান্ত আকস্মিক এই সংবাদে সমগ্র দেশে গভীর বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। বর্তমান কার্যকাল শেষ হইলে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কথা শোনা যাইতেছিল, কিন্তু এইরূপ আকস্মিকভাবে যে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হরেন্দ্রকুমার মনীষী পুরুষ ছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁহার অবদান বহু দিক হইতে রহিয়াছে। বস্তুত কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের পরিমাপে হরেন্দ্রকুমারের জীবনের বিচার করা চলে না; কারণ একই আদর্শে তাঁহার সমগ্র জীবন উজ্জ্বল মহিমায় এবং মাধুর্যে অখণ্ডভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। সেবাতেই তিনি জীবনের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কর্মময় তাঁহার জীবনের ইহাই ছিল ধর্ম। শিক্ষকস্বরূপে তিনি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানোপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও হরেন্দ্রকুমার বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ভাষায় গৌরববর্জিত ছিলেন। তিনি মান চাহেন নাই, প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রতিপত্তির জন্য কোনদিন লালায়িত হন নাই। ফলত যজ্ঞার্থে সকল কর্ম, গীতার এই যে আদর্শ হরেন্দ্রকুমারের জীবনে তাহা সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার সকল সাধনা, সব অবদানের মূলে ছিল সুগভীর মানব-প্রীতি, এই একই শক্তি। প্রেমের দৃষ্টিতে জাগ্রত এই অনপেক্ষ আত্মসংস্থিতি হইতেই তাঁহার প্রাণের বীর্য পরিস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ত্যাগ ধর্মে উজ্জ্বল প্রাণবলে অকিঞ্চন সাধকের ভাস্বর প্রভায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বৈরাগীর পবিত্রতার দীপ্তিতে তাঁহার প্রতিবেশে আমরা শুভময় প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছি এবং অনাবিল আত্মীয়তার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙ্গালীর জীবনে বহু দুর্বিপাক দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও মুক্তির প্রাণময় তরঙ্গের স্পর্শ আমরা তাঁহার সঙ্গলাভে পাইয়াছি। রাজভবনের সঙ্গে জনচিত্তের সংযোগ তিনি একান্ত নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমারের জীবনই ছিল দান, এই নিঃশেষে দানের প্রাণের মহিমাই জাতির অন্তরে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করে। রাজভবনে রাজ্যপাল আরো হইবেন; কিন্তু বাঙ্গালী হরেন্দ্রকুমারকে আর পাইবে না। রাজভবনের দিকে চাহিয়া হরেন্দ্রকুমারের স্মৃতি আমাদের মনে জাগিবে এবং একান্ত নিজ জনের বিয়োগ-ব্যথায় আমাদের চোখে অশ্রু উদ্গত হইবে। শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের শোক আজ সারা দেশের। বেদনা যেখানে এমনভাবে বৃহত্তের চেতনাকে প্রদীপ্ত করে সেখানে আত্মভাবনা পাওয়া যায়, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের আত্মার উদ্দেশে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ভারতে আণবিক শক্তির উদ্বোধন

গত ৪ঠা আগস্ট বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বে নামক স্থানে ভারতে সর্বপ্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার ফলে আগামী পাঁচ-সাত কিংবা বড় জোর দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে আণবিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। এই সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শক্তি উৎপাদনের এই আণবিক চুল্লী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরাই নির্মাণ করিয়াছেন। বাহির হইতে এজন্য কোন বৈজ্ঞানিকের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় নাই এবং মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় আণবিক কমিশনের সভাপতি ডাঃ ভাবার নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫০ জন বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনীয়ার এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই সাফল্য সমগ্র এশিয়ায় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে; কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, কানাডা, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স এই কয়েকটি শক্তি অপর কোন শক্তির সাহায্য না লইয়া এবং হল্যান্ড ও নরওয়ে অপর দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে এপর্যন্ত আণবিক শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাপান নানাদিক হইতে বৈজ্ঞানিক সাধনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে এবং দিতেছে ইহা সত্য; কিন্তু জাপানও এ পর্যন্ত আণবিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই। চীন অল্প দিনের মধ্যে এই শক্তি উৎপাদন করিতে পারিবে, অনেকে এই আশা করিতেছেন; কিন্তু চীন এজন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই সাফল্যে আমরা সকলেই গৌরব বোধ করিতেছি। এতদ্দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, আণবিক শক্তি সাধন-ক্ষেত্রে ভারতকে অপর কোন শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। বর্তমান যুগ আণবিক শক্তির যুগ। প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তিই নিন্দনীয় নহে। প্রত্যুত শক্তি কিভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহার উপর মানব-সমাজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ নির্ভর করে। ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধ প্রবৃত্তিই আণবিক শক্তিকে আতঙ্ককর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সাধনার এই সাফল্য আতঙ্ককর এই প্রতিবেশের ঊর্ধ্বে মানব-সংস্কৃতিকে লোকহিতের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আসুরিক হিংস্রতার অক্টোপাশের বন্ধন কাটাইয়া বিশ্বকল্যাণের পথে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভের মর্যাদা-বোধে সক্রিয় হইয়া উঠিবে। আমরা ইহাই আশা করি। আমরা এই কামনা করি যে, আণবিক শক্তির সাধনা বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের বিভীষিকা সৃষ্টি না করিয়া মানুষের সংস্কৃতিকে অভ্যুদয়ের পথে লইয়া যাইবে। এই দিক হইতে স্বাধীন ভারতের উপর আজ গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সে দায়িত্ব উদ্‌যাপনের পথে জাতির অন্তরে নবীন উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন।

জন্ম: ৩ অক্টোবর, ১৮৭৭ ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৯৫৬

সুয়েজ খালের ব্যাপার নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সলাপরামর্শের পর লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়েছে। ১৬ই আগস্ট সম্মেলনের দিন ধার্য হয়েছে এবং তাতে ২৪টি দেশের গভর্নমেণ্ট আমন্ত্রিত হয়েছেন। আমন্ত্রিত দেশগুলি হচ্ছে : মিশর, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড, স্পেন, তুরস্ক, বৃটেন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পাকিস্থান, পর্তুগাল, সুইডেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সম্মেলনের আহ্বায়ক বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। আহূত গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে কেউ কেউ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, অনেকে করেননি. সকলে করবেন কি না, বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত (৭ই আগস্ট) অনিশ্চিত। মিশর কী করে তার উপর অনেকটা নির্ভর করছে। যদিও মিশরের অভিমত হচ্ছে এরূপ কনফারেন্স আহ্বান করার অধিকারই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নেই, তাহলেও শেষ পর্যন্ত মিশর কি সিদ্ধান্ত করে তা এখনো নিশ্চিত বলা যায় না। সেটা নির্ভর করছে কনফারেন্সের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যার উপর। বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রধান-মন্ত্রী স্যর এ্যাণ্টনী ইডেন বলেছেন যে, সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব কোনো একটিমাত্র দেশের উপর, বিশেষ করে মিশরের বর্তমান গভর্নমেণ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না, সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা চাই. তার কমে কিছুতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। ফ্রান্স ও আমেরিকাও তাই চায়, কিন্তু লণ্ডনে পশ্চিমী ত্রিশক্তির মধ্যে আলোচনার পরে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার ভাষা ততটা উগ্র নয়। আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের যদি এমন একটা পরিকল্পনা পশ্চিমী ত্রিশক্তি করে থাকে যেটা মিশরের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে খাপ খাবে না, তবে মিশর গভর্নমেণ্ট নিশ্চয় সম্মেলনে যোগ দেবেন না আর মিশর গভর্নমেণ্ট যোগ না দিলে অন্য অনেকেও সম্মেলনে যোগ দেবে না, কারণ তাহলে সম্মেলন নিরর্থক হবে। পশ্চিমী ত্রিশক্তির পূর্ব পরিকল্পিত একটা প্ল্যান ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেওয়া যদি সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র তাতে যোগ দিতে পারে না। সুয়েজ সম্পর্কে ভারত সরকারের অভিমত এবং প্রস্তাবিত কনফারেন্সে ভারত গভর্নমেণ্ট যোগ দেবেন কি না, সেটা আগামীকাল (বুধবার) পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় ব্যক্ত করবেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি এবং আলোচনার পরিধি কি হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চিন্তা ও তথ্যের আদান-প্রদান করছেন। সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একটা সম্মেলন আবশ্যক এটা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু মিশরকে একটা Ultimatum দেওয়াই যদি সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়, তবে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিক থেকে সেটা কেবল নিরর্থক হবে না, বিপজ্জনক হবে। কোনো এক পক্ষের পূর্বকল্পিত একটা প্ল্যানের বাইরে যদি আলোচনার অবসর না থাকে, তবে কনফারেন্স করে কোনো লাভ নেই। আমাদের ধারণা যে, ভারত গভর্নমেণ্ট কনফারেন্স চান এবং যদি বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পান যে, কনফারেন্সের কাজ কোনো পূর্বকল্পিত আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের প্ল্যানের আলোচনা এবং তার উপর ভোটাভুটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তবে ভারত গভর্নমেণ্ট কনফারেন্সে যোগ দিতে স্বীকৃত হবেন এবং মিশরকেও যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করবেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমস্যার সমাধান ভোটের জোরে পাশ-করা কোনো প্ল্যানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। যে-সব দেশ কনফারেন্সে আহূত হয়েছে তাদের মেজরিটি পশ্চিমী ত্রিশক্তির দিকে হতে পারে. কিন্তু আহূত দেশগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি শক্তিও আছে যারা মিশরের স্বার্থ এবং সম্মেলনের ক্ষতিকর কোনো অসংগত প্রস্তাবে সম্মত হবে না। উপরন্তু যাদের মতের বিরুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক প্ল্যান শান্তিপূর্ণভাবে কার্যকরী করাও সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয়, মিশর কর্তৃক ক্যানাল কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণে ক্ষিপ্ত হয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এমন কতকগুলি কাজ করেছেন

যাতে আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসার আবহাওয়া অনেকটা নষ্ট হয়েছে। মিশরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক "sanctions" প্রয়োগ করেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষান্ত হননি; যুদ্ধের ভয়ও দেখিয়েছেন। এ অবস্থায় যাকে ভয় দেখানো হয় তার পক্ষে মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনায় আগ্রহ দেখানো কঠিন, কারণ সেটা "ভয় পেয়েছি"র স্বীকারোক্তি বলে মনে হবে, যা রাজনৈতিক কারণে মিশর গভর্নমেণ্টের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইংরেজের সামরিক তোড়জোরের উত্তরে মিশরকেও সামরিক পাঁয়তাড়া করতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক "sanctions"-এর উত্তরে কিন্তু মিশর মাথা গরম করে কিছু করেনি, বরঞ্চ প্রেসিডেণ্ট নাসের মাথা ঠাণ্ডা রেখে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। যে-সব জাহাজ কোম্পানী লণ্ডনে বা প্যারিসে মাশুল জমা দিয়েছে তাদের জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে যদিও লণ্ডন ও প্যারিস মিশরের পাওনা টাকা এবং ক্যানাল কোম্পানীর হিসাবের টাকা আটকে দিয়েছে। সুয়েজ খাল দিয়ে অবাধ যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটেছে, এই রব যাতে না উঠে তার জন্য মিশর গভর্নমেণ্ট স্বীয় আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা না করে এরূপ উদারনীতি অবলম্বন করেছেন। এটা বুদ্ধির কাজই হয়েছে, কারণ মিশর এর দ্বারা যারা নিরপেক্ষ তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছে। অবশ্য সব বিষয়েই যে মিশর গভর্নমেণ্ট সাবধানতার পরিচয় দিতে পেরেছেন তা নয়। ক্যানাল কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণের ঘোষণা যে বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট নাসের করেন, তাতে অসংযত অতিশয়োক্তি কিছু কিছু ছিল। সেগুলো না থাকলেই ভালো হতো, তবে হয়ত আভ্যন্তর রাজনৈতিক অবস্থার খাতিরে সেগুলো না করে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের উপায় ছিল না এবং তার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা অনেকাংশে দায়ী। অকস্মাৎ ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্য-দানের প্রতিশ্রুতির প্রত্যাহারের ফলে মিশরের আভ্যন্তর রাজনীতির দিক থেকে নাসের যে-অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে কিছু অত্যুগ্র দেশাভিমানের বুলি আওড়ানো তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

একটা আশার কথা এই যে, আমেরিকা বৃটেনের "যুদ্ধং দেহি" ভাবটাকে কিঞ্চিৎ সংযত করার চেষ্টা করছে। অনেকে এতে আশ্চর্যবোধ করবে। মিঃ ডালেস লণ্ডনে আসছেন শুনে অনেকে প্রমাদ গনেছিল, ভেবেছিল মিঃ ডালেস নিশ্চয়ই বলপ্রয়োগের উস্কানি দিতে আসছেন। কারণ একটা ধারণা জন্মে গেছে, যে, আমেরিকার বিশেষ করে মিঃ ডালেসের ঝোঁকই হচ্ছে বলপ্রয়োগের দিকে, কিন্তু বৃটেন ধীর স্থির। এই ধারণা অনেকাংশে বৃটিশ প্রোপোগাণ্ডার ফল। ইংরেজ অনেক ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরামর্শ দেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা দেয় নিজেদের স্বার্থের কথা আগে চিন্তা করে এবং নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে স্থান ও কাল বিবেচনা করে। যেখানে নিজেদের স্বার্থে সরাসরি আঘাত লাগে সেখানে ইংরেজের মারমুখো হয়ে উঠতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে যেখানে বৃটেনের সাক্ষাৎ স্বার্থ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে ইংরেজরা অনেক সাবধানতার কথা, অনেক ধৈর্যের কথা বলে, কিন্তু ইংরেজের স্বার্থ যেখানে বেশী, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ায় অথবা আফ্রিকায়, সেখানে ইংরেজ ঢিলের বদলে পাটকেল ছুঁড়তে সর্বদাই উদ্যত। সেখানে আমেরিকা, যার স্বার্থ তত বেশী বা প্রাচীন নয়, সে বরঞ্চ কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণের নীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। মোসাদেক কর্তৃক এ্যাংলো-পারশিয়ান তেল কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণের সময়েও ইংরেজ উগ্রনীতি চালাতে উদ্যত হয়েছিল, আমেরিকাই তার হাত ধরে রেখেছিল। আমেরিকা নিরস্ত না করলে তখন বোধহয় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইরাণের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। এ্যাংলো-পারশিয়ান কোম্পানীর তেলের খনিগুলি দক্ষিণ ইরাণে। তেহেরাণের উপর চাপ দিবার জন্য এ্যাংলো-পারশিয়ান কোম্পানী দক্ষিণ ইরাণে উপজাতীয় বিদ্রোহ সৃষ্টির অপকৌশল পূর্বে অধিকবার করেছে। আমেরিকার সমর্থন পেলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দক্ষিণ ইরাণে একটা উপজাতীয় সরকার খাড়া করে তেহেরাণ সরকারের হাত থেকে দক্ষিণ ইরাণ ছুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। তাহলে অবশ্য উত্তর ইরাণ সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট প্রভাবাধীন হয়ে যেতো। অর্ধেক ইরাণ সম্পূর্ণভাবে করতলগত করতে পারলে ইংরেজের তাতে আপত্তি ছিল না, কারণ পূর্বে বরাবরই বৃটিশ ও রাশিয়ার মধ্যে এই রকম "sphere of influence"-এর একটা ভাগাভাগি ছিল। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা আমেরিকার পছন্দ হয়নি। কারণ রুশ ও বৃটিশ প্রভাবের জায়গায় মার্কিন প্রভাব বিস্তার আমেরিকার লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্যের দিকে চেয়েই আমেরিকা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বলপ্রয়োগের নীতি সমর্থন করেনি। তবে আমেরিকার উদ্দেশ্য যাই থাক, একথা ঠিক যে, আমেরিকার জন্যই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তখন ইরাণের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি। উত্তর আফ্রিকায়ও গোড়াতে আমেরিকা ফ্রান্সের সামরিক উগ্রতা সংযত করার পরামর্শ দিয়েছিল. অবশ্য হিসেব করে মার্কিন স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। আমেরিকা জানত যে উত্তর আফ্রিকায় যে-সমস্ত মার্কিন বিমানঘাঁটি তৈরী হয়েছে সেগুলি অকেজো হয়ে যাবে যদি স্থানীয় অধিবাসীরা শত্রুভাবাপন্ন থাকে। সেইজন্য উত্তর আফ্রিকায় দমননীতি না চালিয়ে স্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোস করার জন্য আমেরিকা গোড়ায় গোড়ায় ফ্রান্সের উপর কিছুটা চাপ দিয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক স্বার্থগোষ্ঠীর উল্টা চাপে মার্কিন পরামর্শ কার্যকরী হয়নি এবং আমেরিকাকেও NATOর খাতিরে ফ্রান্সের সামরিক নীতির পরোক্ষ সমর্থক হতে হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৃটিশ এবং ফ্রান্সের ধৈর্য আছে, তারা তত উগ্র নয়, আমেরিকার ধৈর্য নেই, আমেরিকার ঝোঁকই হচ্ছে বলপ্রয়োগের দিকে—একথা ঠিক নয়। আসলে যেখানে নিজের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে কোনো বৃহৎ শক্তিরই ধৈর্য নেই, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি ত্যাগ করতে চায় না। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেন যে জিনিস হারাবে বলে ভয় করছে তা বলপ্রয়োগ ছাড়া রাখা যাবে না—ইংরেজের এই ধারণা হয়েছে, সুতরাং ইংরেজ বলপ্রয়োগের জন্য প্রস্তুত। আবার মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার যা কাম্য সেটা বলপ্রয়োগের দ্বারা লাভ করা বা রক্ষা করা যাবে না—আমেরিকা এটা বুঝছে, সেইজন্য আমেরিকা বৃটেনকে সংযত করার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর এক অংশে আমেরিকা কামান-বন্দুক নিয়ে এগুতে চায়, ইংরেজ রাশ টানে; অন্য অংশে ইংরেজ এগুতে চায়, আমেরিকা রাশ টানে—কোথায় কে কী রকম ব্যবহার করে সেটা যার যার স্বার্থ অনুসারে হয়। ইরাণের ব্যাপারে যেমন হয়েছিল তেমনি বর্তমান ক্ষেত্রেও আমেরিকা বৃটেনের উগ্রতাকে সংযত করার দিকেই চেষ্টা করবে বলে মনে হয়, তবে ইরাণের ব্যাপারে যেমন শেষ পর্যন্ত মার্কিন নীতি (মার্কিন স্বার্থের দিক থেকে) সফল হয়েছিল মিশরের ক্ষেত্রেও সেই রকম হবে, এমন কথা বলা যায় না। সুয়েজ খালের সঙ্গে বহু জাতির স্বার্থ জড়িত, এতে মিশরের দিক থেকে একটা সুবিধাই বলতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী কর্তারা অন্য দেশগুলির মতামত অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। অবশ্য আমেরিকাকে ফ্রান্স ও বৃটেনের দিক একটু বেশী করে টানতেই হবে, বিশেষ করে এইজন্য যে, আমেরিকার কৃতকর্মের ফলেই ফ্রান্স ও বৃটেনের এমন অকস্মাৎ বিপদ ঘটল। আমেরিকা ও ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক যদি এমন করে নাসেরকে গাছে তুলে মই কেড়ে না নিত, তবে নাসেরও এমন করে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়তেন না। নাসের যা করেছেন তাতে আমেরিকার এখন পর্যন্ত বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি, বাড়ি পড়েছে বৃটেন ও ফ্রান্সের মাথায়। সুতরাং ফ্রান্স ও বৃটেনের চেয়ে আমেরিকার মাথা যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

৭।৮।৫৬

টিপলার সাহেবের গল্পটা মহারাজগঞ্জে গিয়ে শুনেছিলাম। কিন্তু আজো যখন চলতে চলতে কোথাও থামি, ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসি দু'দণ্ড, আড্ডা দিতে দিতে কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাই, তখনই টিপলার সাহেব আর শনিচরিয়ার গল্পটা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠি। মনে হয় টিপলার সাহেবের মত আমিও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে বুঝি 'হোলি ওয়াটার' খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম। শনিচরিয়ার মত একদিনের চাকরি করতে এসে মন-প্রাণ বিকিয়ে দিয়ে ফেললাম, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। মনে হয় টিপলার সাহেবের মতই বুঝি সোজা রাস্তায় চলতে চলতে পথ ভুলে আমিও মহারাজগঞ্জে এসে তলিয়ে গেলাম।

কিন্তু তখনকার মহারাজগঞ্জ এমন ছিল না। এখন তো একত্রিশটা সাইকেল রিক্‌শা, পাঁচখানা ট্যাক্সি, তিপ্পান্নটা দোতলাবাড়ি, হাসপাতাল, বিড়ি-ফ্যাক্টরি কত কি হয়েছে। রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট, পানের দোকানে রেডিও বাজে। সিনেমা আর সার্কাস কোম্পানী তাঁবু ফেলে কয়েকদিন মাতিয়ে দিয়ে যায়। দোকানে গিয়ে দাড়ি কামাবার ব্লেড, টর্চের ব্যাটারি,—কী পাবেন না? হোটেলও হয়েছে একটা। আগে থেকে খবর দিলে গাধার দুধ পর্যন্ত জোগাড় করে দেয় হোটেলওয়ালা।

ম্যানেজার বটুক চাটুজ্জে বলেছিলেন—আপনি শুধু মুখের কথাটি খসান্ না মশাই দেখবেন মাল একেবারে আপনার ঘরের ভেতর এসে হাজির,—

অথচ যেদিন প্রথম মহারাজগঞ্জে গেলাম, হোটেলের খাতায় নাম লেখালাম, সেদিন তেমন আমলই দেননি। খদ্দের না খদ্দের! বোর্ডার না বোর্ডার! অমন বোর্ডার হামেশা আসছে মশাই এখানে। সবে-ধন-নীলমণি এই হোটেল—এখানে না উঠে যাবে কোথায়। আসতেই হবে এখানে। খাতায় নাম লেখাতে হবে সবিস্তারে। শুধু নাম নয়, ধাম নিবাস, পিতার নাম, উদ্দেশ্য, পেশা—

ওই পেশাতে এসেই আটকে গেলেন বটুক চাটুজ্জে।

বললেন—মশাই-এর কী করা হয়?

বললাম—কিছু না।

বটুক চাটুজ্জে অবাক হয়ে একক্ষণে আমার দিকে চাইলেন।

বললেন—বলেন কি মশাই, কিছুই করেন না? চলে কী করে?

এবার চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্জে নিজে থেকেই বললেন—কিছু করেন না অথচ বেড়াতে এসেছেন... পৈতৃক জমিদারী আছে বুঝি?

বললাম—না—

আমার উত্তরে শুনে আরো অবাক হয়ে গেলেন বটুক চাটুজ্জে। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। একবার আমার চেহারার দিকে চেয়ে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে পেশাটা অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন। তারপর আমার মালপত্রগুলোর দিকে চেয়েও কিছু বুঝতে পারলেন না। শেষে কী জানি খাতায় কি লিখলেন! তা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাতে হয়নি।

কিন্তু ক'দিন পরে হাওয়া একেবারে উল্টে গেল।

একদিন সকালবেলা লিখতে বসেছি নিজের ঘরে। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায় চারিদিকে বই ছড়ানো। হঠাৎ দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন বটুক চাটুজ্জে।

বললেন—আসতে পারি স্যার?

বললুম—আসুন,—

বটুক চাটুজ্জে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু এ-চেহারা যেন অন্য রকম। চলা বলায় হাব-ভাবে যেন হর্ষ-বিনয়-কৌতূহল।

বললেন—আপনি যে গপ্পো লেখেন তা তো আগে বলেন নি মশাই—

বললাম—বলবার মত সেটা নয় তেমন বলেই বলিনি—

বটুক চাটুজ্জের মুখ বিনয়ের হাসিতে ভরে উঠলো।

বললেন—অবিশ্যি এই আপনার বই-এর গাদা দেখেই তা আন্দাজ করেছিলাম...... আর তা ছাড়া লেখকদের কখনও তো চোখে দেখিনি কি না—

তারপর বললেন—তা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম...করবো?... আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

বললাম—মনে করবো কেন—বলুন না—

বটুক চাটুজ্জে বললেন—মানে, চোখে লেখকদের না দেখলেও, আপনাদের হালের লেখা গপ্পোর বই তো কিছু কিছু পড়েছি মশাই—তা একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি..

আবার অভয় দিলাম।

বললাম—বলুন না আপনি—

বটুক চাটুজ্জে বললেন—আচ্ছা, মানে, আপনারা এই যে গপ্পো লেখেন সব—এ-সব কি বই দেখে দেখে লেখেন?

এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না। তবু বললাম—এ ধারণা আপনার হলো কেমন করে?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—হালের গপ্পোর বইগুলো পড়ে আমার তাই তো মনে হয় মশাই—বই দেখে দেখে না লিখলে গপ্পো-গুলো এমন হবে কেন? সংসারে যা দেখি, সংসারে যা ঘটে, তার সঙ্গে কোথাও মেলে না কেন তাব—

সত্যিই, কথাটা ভাববার মত!

তারপর একটু থেমে বললেন—এই দেখুন না, আজ ছ'বচ্ছর ম্যানেজারি করছি এই হোটেলে, কত রকম ঘটনা ঘটতে দেখলুম, কত ঘটনা ঘটতে শুনলুম, বয়েসও কম হলো না মশাই, কিন্তু তেমন ঘটনা তো বই-এর গপ্পোতে ঘটে না। গোড়াটা আরম্ভ হয় ঠিকই—কিন্তু......এই মহারাজ-গঞ্জের টিপলার সাহেবের গপ্পোর মত গপ্পোও তো কই পড়িনি—তেমন ঘটনা নিয়েও তো আপনারা কেউ লেখেন না—

বললাম—টিপলার! টিপলার সাহেব কে?

বটুক চাটুজ্জে এবার জুত করে নড়ে বসলেন চেয়ারে। বললেন—আহা, সাহেবের মত সাহেব ছিল বটে মশাই টিপলার সাহেব! টিপলার সাহেব বলতো—চাটুজ্জে, ও লণ্ডনই বলো আর প্যারিসই বলো, মিউনিক, বার্লিন, আর তোমাদের কাশ্মীরই বলো, এই মহারাজগঞ্জের তুল্য দেশ কোথাও নেই—এ একেবারে প্যারাডাইস যাকে বলে—(প্যারাডাইস মানে স্বর্গ—বুঝলেন তো!)—

তা টিপলার সাহেবের গল্পটা গোড়া থেকে সবটা বলি, শুনুন। তখন তো আর মহারাজ-গঞ্জ এইরকম ছিল না। মাছি ভন্ ভন্ করতো চারদিকে। রাস্তার দু'পাশে এদোপড়া নর্দমা। মোষের আর গরুর গাড়ি চলে চলে রাস্তার দফা একেবারে রফা। হাঁটে কার সাধ্যি! সাইকেল চালাই আর মাঝে মাঝে সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে হাঁটতে হয়। বাজারে তখন মাত্র দু'খানা টিনের চালা। একটা আবগারির দোকান আর একটা দিশী ভাটিখানা। তা এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন টিপলার সাহেব এই মহারাজ-গঞ্জে এসে হাজির।

তখন সন্ধ্যে হবো হবো। আমরা তিন বন্ধু—আমি, কেদার আর তারক আবগারির দোকানের পৈঠেতে বসে জটলা করছি। রোববার দিন কোথায় মাছ ধরতে যাওয়া যায় তাই ভাবছি। সময় তো কাটাতে হবে মশাই। আমাদের তখন হাতে তো অফুরন্ত সময়।

তারক বললে—ভুলুবাবুর বাগানে চল্—ইয়া বড় বড় মাছ পুকুরে দেখেছি ঘাই দেয়—

ভুলুবাবু জনকপুরের জমিদার। নীল-কুঠির প্ল্যান্টার বুড়ো সাহেব যখন সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বেচে বিলেত চলে গেল তখন ভুলুবাবু সস্তা দরে বাগানটা কিনে নিয়েছিলেন। সেই থেকে পড়েই আছে। তারকের কাছে চাবি থাকে বাগানের। পেয়ারা পাকলে পেড়ে খাই। মাছ ধরবার ইচ্ছে হলে ধরি। আর অন্য কোনও দরকার হলেও তারক চাবি খুলে দেয়।

কথাটা বলেই তারক বললে—দে, তবে আর একটা বিড়ি দে—

কেদার বললে—তা হলে শনিচরিকে বলতে হবে চার বানাতে—

দেহাতী মেয়ে শনিচরি ছিল বড় চালাক চতুর মেয়ে। ভুলুবাবুর বাগানের আশ-পাশ থেকে তাস, বেল, পেয়ারা কুড়িয়ে এনে আবার আমাদেরই বেচতো। বলতো—চার আনা পয়সা দিতে হবে কিন্তু বাবু—

পয়সার যম ছিল মাগী। পয়সা ছাড়া কথা নেই মুখে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—বেরিলীগঞ্জের রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারিস ছোকরি?

শনিচরি বলতো—আগে পয়সা দে, তবে বলবো—

তা পয়সাও আমরা দেব না শনিচরিকে, অথচ মাছ ধরবার চারও পাওয়া চাই—কী করলে তা সম্ভব তাই আমরা আবগারির দোকানের পৈঠেতে বসে ভাবছিলাম। হঠাৎ ফট্ ফট্ শব্দ করতে করতে সেই ভর্ সন্ধ্যাবেলা মশাই একটা মটর সাইকেল চড়ে টিপলার সাহেব এই মহারাজগঞ্জে এসে হাজির।

আমরা তো সাহেব দেখে অবাক।

সাহেবটা তড়াক করে সাইকেল থেকে

নমে আমাদের কাছে এসে বললে—এখানে রেস্ট্‌হাউস্‌টা কোন্‌ দিকে বাবু?

রেস্টহাউস্‌! বলে কী সাহেবটা! একটা আড্ডা দেবার মত চায়ের দোকান নেই এখানে, তায় আবার রেস্টহাউস্‌! তখন আমাদের আস্তানার অভাবে মাঠে ঘাটে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে হয়। গাছতলাই আমাদের আড্ডাস্থল। এ হোটেল তখন কোথায়! আর বেহারীরা তখন চা-ই খেতে শেখেনি। গোবিন্দপুরের ভূষণ ঠাকুর একটা চায়ের দোকান করবার চেষ্টা করেছিল বাজারের মধ্যে। স্টার্টও করে দিয়েছিল। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই উঠে গেল আমাদের আড্ডা। সব বাকির খদ্দের কি না!

তা তারক একটু ইংরিজী জানতো। সে-ই এগিয়ে গেল সাহেবের সামনে।

বললে—এখানে মহারাজগঞ্জে রেস্টহাউস্‌ কোথায় পাবে সাহেব রেস্টহাউস্‌ আছে বোরিলীগঞ্জে—

বোরিলীগঞ্জ! মোটা মোটা বুট পায়ে, গায়ে মোটা গেঞ্জী, পরনে হাফ্‌ প্যান্ট—মাথায় টুপি, চোখে গগলস্‌! আর কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। সাহেব ব্যাগ থেকে ম্যাপ্‌ বার করে দেখতে লাগলো কোথায় বোরিলী-গঞ্জ! এখান থেকে কতদূরে!

কেদার সাহস পেয়ে এতক্ষণে সামনে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম।

তারক বললে বোরিলীগঞ্জ এখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে—রাস্তা খারাপ, সেখানে পৌঁছোতে তোমার রাত তিনটে বাজবে সাহেব—

টিপলার সাহেব কী যেন ভাবতে লাগলো।

তারক আবার বললে—আর পথে বুনো শুয়োর আছে—ফট্‌ফটিয়ার আওয়াজ পেলে তোমার পেট দু'ফালা করে ছেড়ে দেবে সাহেব—

শুনে আরো চিন্তিত হলো সাহেব।

তারক বললে—কোত্থেকে তুমি আসছো সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—ডেনমার্ক—

ডেনমার্ক! সে আবার কোথায়! আমি তারকের মুখের দিকে তাকালাম। তারক ইংরিজী জানে।

জিজ্ঞেস করলাম—সে কোথায় রে তারক?

তারক বললে—চুপ কর্‌ না, শুনেছিস বিলেত থেকে আসছে।—

কেদার বললে—তারক, একটু তোয়াজ-টোয়াজ কর মাইরি, খাঁটি সাহেব-বাচ্চা, চাকরি করে দিতে পারে আমাদের—

টিপলার সাহেব আবার বললে—আমি ওয়ার্লড্‌ টুরিস্ট্‌—পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছি—

তারক জিজ্ঞেস করলে—কোথায় কোথায় ঘুরেছ?

সাহেব বললে—চার বছর আগে ডেনমার্ক থেকে বেরিয়েছি, ইয়োরোপ ঘুরে, আফ্রিকায় গিয়েছিলাম—তারপর ডাবলিন থেকে জাহাজে চড়ে ওখাপোর্টে নেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, নর্থ ইণ্ডিয়া, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ঘুরে এবার সাউথে যাবো—

তারকের মুখে-চোখে গদ-গদ ভাব।

তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে পৈঁঠেটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—এখানে একটু বোসো সাহেব—

টিপলার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমাদের দিলে। নিজেও একটা ধরালে।

তারক বললে—তা পৃথিবী ঘুরতে

বেরিয়েছ সাহেব, কিন্তু মহারাজগঞ্জে এসে পড়লে কী করে, মহারাজগঞ্জ তো পৃথিবীর বাইরে—

টিপলার সাহেবও হাসলে।

বললে—পথ ভুলে এসে পড়েছি বাবু—স্রেফ পথ ভুলে—পথে খুব ঝড় বৃষ্টি হলো—ধুলোর ঝড় উঠলো আর কিচ্ছু দেখতে পেলুম না চোখে—

কেদার বললে—তারক, এইবার চাকরির কথাটা বল্ মাইরি—

টিপলার সাহেব বললে—তা এখানে কোনও য়ুরোপীয়ান নেই? কোনও প্ল্যান্টার—শুনেছিলাম বেহারে অনেক প্ল্যান্টার্স থাকে—আমাদের স্বজাতি—

তারক বললে—ছিল এখানে একজন সাহেব, তা সে বুচার সাহেব তো জমি-জমা বাগানবাড়ি বিক্রী করে দিয়ে কবে পাততাড়ি গুটিয়েছে—তার নীলের কুঠি ছিল, সে-ও ভুলুবাবু কিনে নিয়েছে—এখন সেখানে দুব্বো ঘাস গজায় কেবল—

টিপলার সাহেব বললেন—তা যে কোনও একটা ঘর হলেই চলবে—একটা রাত শুধু থাকবো—তারপর কাল চলে যাবো পাটনায়—

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর পাটনা থেকে বেঙ্গল আসাম দেখে চলে যাবো স্ট্রেট্ সাউথে—

কেদার বললে—তারক, আর দেরি করিসনি মাইরি, চাকরির কথাটা বল্, অন্তত একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট্—সাহেবদের সার্টিফিকেটের দাম আছে ভাই—

তারক বললে—দিতে পারি ঘর তোমাকে সাহেব—কিন্তু পাঁচটাকা ভাড়া লাগবে এক দিনের জন্যে—

টিপলার সাহেব বললে—ভেরি গুড্—

ভুলুবাবুর বাগানবাড়িটা তো পড়েই আছে এমনিতে। শুধু দুব্বো ঘাস গজাচ্ছে। কোনও কাজে লাগে না। না হোমে না যজ্ঞে। ভুলুবাবুও টাকার ক্রোকোডাইল।

তারক আমাদের বললে—পাঁচটা টাকাই তো আমাদের লাভ—অনেকদিন তো ও-সব হয়ে খাইনি—

কেদার বললে—কেন মাইরি তারক তুই টাকা চাইতে গেলি, শেষকালে হয়ত ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিতে চাইবে না—

তারক বললে—তুই থামতো, ভ্যাজর ভ্যাজর করিসনি, সাহেব দেখলেই তোর জিব দিয়ে নাল পড়ে—দেখ্ না কী করি—

টিপলার সাহেব বললে—আর একটা সারভেন্ট্ জোগাড় করে দিতে পারো—টাকা দেব, আমার মোজা-গেঞ্জি-রুমাল সব ময়লা হয়ে গিয়েছে—একটু সাবান দিয়ে কেচে দেবে—খানা বানিয়ে দেবে—

তারক বললে—কত টাকা দেবে?

টিপলার সাহেব বললে—যা চায়—

তারক বললে—মেড্-সারভেন্ট হলে চলবে? মানে ঝি—

টিপলার সাহেব বললে—যা হয় তাই সই—

তা তাই হলো। থাকবার ব্যবস্থা হলো ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে। একটা রাত শুধু থাকবে সাহেব। বুচার সাহেবের খাট-বিছানা চেয়ার টেবিল আয়না সবই আছে। শুধু ধুলো জমে খারাপ হয়ে আছে। আমরা গিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলাম। একটা রাত তো শুধু থাকা। কাল সকালবেলাটা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে রওনা দেবে সাহেব। আর দেখা পাওয়া যাবে না তার জীবনে।

সাহেব বললে—ইণ্ডিয়া দেখে চলে যাবো চায়না, চায়না থেকে জাপান, তারপর জাপান থেকে আমেরিকা—তারপর নিজের বাড়ি—

কেদার বললে—তা হলে সার্টিফিকেটটা আজই নিয়ে নে তারক—

তারক বললে—তুই থাম তো—বড় তাড়া-হুড়ো করিস—এসব কাজে তাড়াহুড়ো করলে চলে না—

সাহেব বললে—একটা দিন শুধু মিছি মিছি এই মহারাজগঞ্জে পথ ভুলে এসে নষ্ট হয়ে গেল—

যে টিপলার সাহেব একদিন একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল বলে হা-হুতাশ করেছিল, আশ্চর্য, সেই টিপলার সাহেবই শেষকালে—

তা সে কথা এখন থাক মশাই। ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে সাহেবের তো থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। খাবার সাহেবের সঙ্গেই ছিল। পাউরুটি আর শুকনো মাংস। সেই খেয়েই কাটালো।

কিন্তু কথাটা শনিচরিকে বলতেই শনিচরি বললে—টাকা আমার আগাম চাই কিন্তু—

তারক বললে—তা সাহেব কি তোকে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছুঁড়ি—?

সাহেব শুনে বললে—টাকাটা আগামই দিয়ে দাও না—এই নাও টাকা—

বলে একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিলে শনিচরির হাতে।

শনিচরি তবুও খুশী নয়। বললে—কিন্তু ওই সাবানকাচা আর ঘর ঝাঁট দেওয়া, আর সকালবেলার রান্না ছাড়া আর কিচ্ছু করবো না—তা বলে রাখছি—

কেদার বললে—খাঁটি বিলিতি সাহেব, তাকে চটাচ্ছিস, তুই কি ভাবছিস তোর ভালো হবে এতে?

শনিচরি বললে—আমার ভালো আমি বুঝবো—তোদের কী!

তারক বললে—টাকাটাই তোর কাছে সব হলো রে, আর একটা অতিথি এখেনে এসে যে অনাথ হয়ে পড়লো, তার জন্যে তোর একটু মায়া-দয়াও নেই—এমন পিশাচ তুই শনিচরি।

শনিচরি বললে—গতর আছে বলেই তো আমার এত খাতির, যখন গতর থাকবে না, তখন তোরা খেতে দিবি—?

তারপর শনিচরি বললে—কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি—সাহেবের এঁটো আমি ছোঁব না—

তারক বললে—সে কি রে, তা হলে সাহেবের বাটি থালা গেলাস কে মাজবে?

শনিচরি বললে—যে মাজে সে মাজবে—আমি পারবো না—

—তা হলে কে মাজবে বল? ও তো আর কাঁসার থালা নয়, চিনেমাটির ডিস্—সাবান ঘষে শুধু পরিষ্কার করে দিবি—

শনিচরি বললে—না বাবু, জাত আমি দিতে পারবো না টাকার জন্যে। টাকার জন্যে আর সব দিতে পারি, জাত দিতে পারবো না—হাজার টাকা দিলেও না—

তাই এখনও ভাবি মশাই। কোথায় থাকে জাতের বড়াই, কোথায় থাকে টাকার গরম আর কোথায় থাকে গতরের ঠ্যাকার! শনিচরিকে এখনও বাজারের দিন দেখতে পাই কিনা। কাঁঠাল গাছের তলায় করলা উচ্ছে শিম নিয়ে বেচে। বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে। মাথায় পাকা চুলে তেলও পড়ে না আজকাল। দেহাতী মাগীদের সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়াও করে, আবার এখানকার সুগার মিলের সাহেবদের সঙ্গে গড়-গড় করে ইংরিজিও বলে......

তা সে-কথা পরে বলবো অখন।

আমরা তো টিপলার সাহেবের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে যে-যার বাড়ি ফিরে এলাম। আসবার সময় টিপলার সাহেব অনেক থ্যাঙ্কস দিলে। ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দিলে।

বললে—বাবুরা, কালকে এখানে তোমাদের লাঞ্চের নেমন্তন্ন রইল সব—ঠিক বারোটার সময় আসবে সবাই—ঠিক আসবে—ভুলো না যেন—

কেদার বললে—তারক তুই দেখছি সব গুবলেট্ করে দিবি—কালকে কি আর সময় হবে অত—খেয়ে উঠেই তো চলে যাবে সাহেব—

তারক বললে—কাল তোর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট্ পেলেই তো হলো?

কেদার বললে—ওই সার্টিফিকেটটার জন্যেই আমার সুগার-মিলের চাকরিটা আটকে যাচ্ছে ভাই—

ভগবানের পৃথিবীতে মশাই কার ক্যারেক্টারের সার্টিফিকেট কে দেয় কে জানে! দিন-দুনিয়ার মালিক ছাড়া কিছু দেনেওয়ালা তো কাউকে দেখলাম না। তবে আপনারা লেখক মানুষ আমার চেয়ে বেশি জানেন। তা তখন আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা এসে গেছে।

তারক পাঁচটা টাকা বাজাতে বাজাতে বললে—মুফত্ পাঁচটা টাকা তো রোজগার হলো—চল্ বাজারে—

বাজারে মানে...। তবে আপনাকে খুলেই বলি মশাই সেই বয়সেই আমরা একটু বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তুম মাঝে মাঝে। সোমলতা চেনেন? সোমলতার নাম শুনেছেন?

যার থেকে সোমরস হয়? আমরা ছোট-বেলায় বাঙলা দেশে ছিলুম। আমার কাকা ছিল মস্ত কবিরাজ। সংস্কৃত জ্ঞান ছিল খুব। কাকার কাছে শুনেছি—সোমকে নাকি ওষধিপতি বলা হয় শাস্ত্রে। শাস্ত্র টাস্ত্র তো জীবনে পড়িনি মশাই। শুধু শুনেই এসেছি কাকার মুখে। দেবতারা নাকি সোম-রস পান করতেন। সোম খেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের গায়ে এমন জোর হলো যে তিনি নাকি বৃত্রকে শুধু হারিয়ে দিয়েছিলেন তা-ই নয়—বধও করেছিলেন। ঋষিরাও সোম খেতেন। বেদে নাকি লেখা আছে সোমরস খেলে অমর হওয়া যায়। অমরতা দিতে পারে বলেই সোমযজ্ঞের এত মাহাত্ম্য। তাই সোমেরই আর এক নাম অমৃত। ঋষি কাশ্যপ এই সোমকেই উদ্দেশ করে স্তোত্র লিখেছিলেন—যত্রানুকামং চরনং...সব মনে নেই মশাই—অর্থাৎ মোদ্দা কথা এই যে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে যেখানে যথাকাম মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোক-সকল জ্যোতিষ্মান, সেইখানে হে সোম, তুমি আমাকে অমৃতপদ দাও—

তা আমিও মশাই ও-সব সোমলতা-টতা বলে কিছু দেখিনি, সোমরসও খাইনি,—আমাদের এখানে এই মহারাজগঞ্জে মহুয়া বলে একরকম জিনিস পাওয়া যায় তা থেকে একরকম মদ হয় আমরা তা খেতাম মশাই। খেলে অমর হওয়া যায় বলে কখনও শুনিনি। তবে খেতে ভালো লাগে বলেই খাই। আমরা দেবতাও নই ঋষিও নই—শুধু বেকার বখাটে ছেলে তখন। চাকরি-বাকরি নেই, কাজ পেলুম তো বেঁচে গেলুম। এমনি অবস্থা।

সেদিন তো আমাদের তিনজনের সেই পাঁচটাকাতে মন্দ কাটলো না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় ভুসবাবুর বাগানে গেলাম তিনজনে। টিপলার সাহেব দাড়ি কামিয়ে মুখে চুনকাম করে ফরসা কোট-প্যান্ট পরে তো আমাদের অভ্যর্থনা করলে।

সাহেব বললে—আজ শনিচরিকে তোমা-দের ইণ্ডিয়ান খানা তৈরি করতে বলেছি—কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে—

দেখলাম, টিপলার সাহেবকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস। সুন্দর স্বাস্থ্য, টক্ টক্ করছে ফরসা রঙ।

শনিচরি তখন রাঁধছিল। মাংস রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে। পোলাও রান্না হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন, মশলার গন্ধ।

শনিচরি বললে—আমি রান্না-টান্না করে দিলাম, কিন্তু বাসন-কোসন ধোবার জন্যে যেন আমায় বোলসনি তোরা—

বললাম—কেন, তুইও তো মাংস পোলাও খাবি শনিচরি—

শনিচরি রেগে গেল। বললে—আমি ও-সব খাই?

—খাসনি তো আজ খা। খেলে আর ভুলতে পারবি না জীবনে—

শনিচরি আবার মনে করিয়ে দিলে আমাদের—আমি কিন্তু বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবো—তা বলে রাখছি এইবেলা—

সবাই খেতে বসলাম। সাহেব বললে—তোমরা আমার অতিথি—কিন্তু তোমাদের আমি ভালো করে অতিথি-সৎকার করতে পারলুম না বাবু—আমি দুঃখিত—আমার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু ড্রিঙ্ক্ বাদ দিয়ে তো লাঞ্চ হয় না—কি আর করা যাবে।

টিপলার সাহেব আবার কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা, তোমাদের এখানে ও-সব কিছু পাওয়া যায় না?

তারক না-বোঝবার ভান করলে।

বললে—কী?

টিপলার সাহেব বললে—ড্রিংকস্।

তারক মুচকি হেসে আমার দিকে চাইলে।

কেদার বললে—এইবার সেই ক্যারেকটার...

তারক বললে—তুই থাম, ড্রিঙ্ক্ খেয়ে যদি ক্যারেকটার ঠিক থাকে তো তখন দেখা যাবে—

তারপর টিপলার সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—ড্রিঙ্ক আছে সাহেব, কিন্তু সে-সব দিশী মাল, তোমার কি চলবে?

টিপলার সাহেব বললে—আমার না-চলে না চলবে—তোমরা আমার অতিথি, তোমাদের চললেই হলো—জিনিসটা কী? কান্ট্রি?

তারক বললে—হ্যাঁ সাহেব, একেবারে খাঁটি কান্ট্রি, মহুয়া। মহুয়ার থেকে তৈরি—

অগত্যা যেন উপায় না পেয়েই টিপলার সাহেব বললে—তা তাই আনো—

শনিচরিকে টাকা দিলে টিপলার সাহেব। এসে গেল মহুয়া।

তারক বললে—তুমি এ খাবে না সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—আমার কান্ট্রি-টা সহ্য হয় না বাবু—তবে একটু ছোঁব সামান্য—নইলে তোমরা হয়ত কী মনে করবে—

আমরা সবাই নিলাম। কালকে রাত্তিরেও বেশ হয়েছে। আজকেও হলো। পর-পর দু'দিনই ফোকোটে। পরের পয়সায়।

টিপলার সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে?

তারকের মুখ দিয়ে শুধু একটা আওয়াজ বেরোল—আঃ—

তারক বললে—তোমাকে একটু দেব সাহেব? একটু চেখে দেখবে?

টিপলার সাহেব বললে—না না আমাকে দিও না, তোমরাই খাও—তোমাদের জন্যেই এনেছি বাবু—শেষকালে আমি এক ফোঁটা নেব অখন—

টিপলার সাহেব মাংস খেতে খেতে বললে—ড্রিংক আমি বেশি করি না বাবু, আমা বাবা মদ খেয়ে খেয়ে মরে গেছে, এত ম খেত যে, লিভার পচে গিয়েছিল, তাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল যেন বেশি না খাই—

তারপর বললে—আফ্রিকায় গিয়ে অনে জায়গায় ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির অভাবে দিশ খেতে হয়েছে কিন্তু ও-খেলেই আমার বা মাথা ধরে, ও আমার পেটে সহ্য হয় না—

তারক বললে—তবু একটুখানি না সাহেব, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কেন হ আর—বলে টিপলার সাহেবের গেলাসে ঢে দিতে যাচ্ছিল।

টিপলার সাহেব হাঁ হাঁ করে উঠলো—অতো না, অতো না—সামান্য দাও বাবু—এক ফোঁটা—

তা এক ফোঁটা কি আর সত্যি স দেওয়া যায়।

টিপলার সাহেব বললে—বড় বেশি দি

ফেললে—নষ্ট হবে, আমার মাথা ধরবে—

তারপর অত্যন্ত সঙ্কোচে টিপলার সাহেব গেলাসে একটু চুমুক দিলে। যেন নাক-মুখ বুজে তেতো ওষুধ খাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম মশাই, আস্তে আস্তে মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল। মুখে হাসি বেরোল যেন। আবার চুমুক দিলে। আবার। আবার!

টিপলার সাহেব বললে—আরে, এ যে হোলি ওয়াটার—আর একটু দাও বাবু—বলে টিপলার সাহেব হেসে উঠলো।

তারক আরো ঢেলে দিলে। বললে—আর দেব?

টিপলার সাহেব বললে—দাও—গেলাস ভর্তি করে দাও—

তারপর টিপলার সাহেব আরো এক গ্লাস খেলে।

বললে—আরো দাও বাবু, একেবারে পিওর হোলি ওয়াটার—আমি ব্র্যাণ্ডি খেয়েছি, জিন্ খেয়েছি, হুইস্কি খেয়েছি, শেরি শ্যাম্পেন ভড্‌কা খেয়েছি—কিন্তু তোমাদের এই হোলি ওয়াটারের আর তুলনা নেই—একেবারে তুলনাহীন! আরো দাও বাবু—

খেতে খেতে কী যে হলো মশাই সাহেবের। শেষকালে টিপলার সাহেবকে নিয়ে প্রাণান্ত! বন্ধ করা দায়। যত খায়, তত চায়।

তারক বলে—সাহেব অত খেলে মটর সাইকেল চালাতে পারবে না আজ—

শেষে মহুয়া ফুরিয়ে গেল। শনিচরিকে আবার বাজারে পাঠাতে হলো। গজ্ গজ্ করতে করতে গেল সে আনতে। দশ টাকায় তাকে অনেক খাটানো হয়েছে। আর খাটতে চাইছে না শনিচরি।

যাবার সময় শনিচরি বললে—বিকেল হলে আর এক দণ্ডও থাকবো না কিন্তু বাবু—তোঁদের কথার খেলাপ যেন না হয়—

এবার সাহেবের আরো উৎসাহ। আরো খাওয়া চলতে লাগলো। আরো উত্তেজনা। আরো আনন্দ। বলে—পিওর হোলি ওয়াটার বাবু, পিওর হোলি ওয়াটার—আর একবার দাও—

শেষকালে সেবারও ফুরিয়ে গেল মহুয়া।

টিপলার সাহেব তখন প্রায় অজ্ঞান। বেসামাল। বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

বললাম—চারটে যে বাজে—আজ পাটনায় যাবে না সাহেব?

টিপলার সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—কাল যাবো বাবু, আজকে বড় টায়ার্ড—কাল যাবো ঠিক—

কিন্তু শনিচরিকে নিয়েই হলো বিপদ। আর এক মিনিটও থাকতে চায় না।

বলে—অন্য লোক দেখ তোরা—আমি পারবো না—

তারক বুঝিয়ে বললে—দেখছিস তো সাহেবের অবস্থা, এ-সময়ে কি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত—ভিন্‌দেশি মানুষ, তুই যদি এ-রকম অবুঝ হোস তো কাকে বোঝাবো—কী করে চলবে—কে দেখবে সাহেবকে?

শনিচরি বললে—সাহেবকে কে দেখবে তার আমি কী জানি! সাহেব আমার কে? সাহেব মোলো কি বাঁচলো তা আমার দেখার কী দরকার? টাকা নিয়ে আমার ফুরিয়ে গেল কাজ—আর টাকা দেবে আমায় কে?

তারক বললে—দেবে, দেবে, দেখছিস না সাহেব কত ভালো লোক, কত খরচ করলে সকাল থেকে! সাহেবকে যদি সেবা করে খুশী করতে পারিস তো তোরও ট্যাঁক ভর্তি হয়ে যাবে—

শনিচরি যেন রেগে গেল—তা তোরাই তো মহুয়া খাইয়ে সাহেবকে মজালি—

তারক বললে—তুই তো বুঝিস শনিচরি, যে মজে সে এমনিই মজে—মজবার জিনিস না পেলেও মজে—আমরা যে এতদিন খাচ্ছি, মজেছি? না তুই মজেছিস?

শনিচরি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমি মজবার লোকই বটে!

তা পরদিন সকালবেলা আবার আমরা টিপলার সাহেবকে দেখতে গেলাম। বেশ খাসা দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছে আবার। দাড়ি টাড়ি কামিয়ে আবার স্বাভাবিক মানুষ।

আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালে।

বললে—মেনি থ্যাংক্স তোমাদের বাবু—তোমরা কাল খুব কষ্ট পেয়েছে—

তারক জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে কেমন ছিলে সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—খুব ভালো—খুব ভালো—তোমাদের মেড-সারভেন্টটা আমার খুব সেবা করেছে—

তারক বললে—আজ যাচ্ছ তো সাহেব?

টিপলার সাহেব বললে—হাঁ আজই যাবো—

কেদার বললে—তারক, এইবার ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের কথাটা বল্ না—

টিপলার সাহেব বললে—আজকে শেষবারের মত তোমাদের হোলি-ওয়াটার খেয়ে নেওয়া যাক—কী বলো—আনবো?

তা আমাদের আবার কীসের আপত্তি! আবার মহুয়া এল। সেদিনও সাহেব পেট ভরে খেলে। তারপর যখন সেদিনও একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা—সাহেব বললে—আজ আর যাব না বাবু, কাল বিকেলে যাবো—

বললাম—তারপর?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—তারপর মশাই সেই টিপলার সাহেবের 'কাল যাবো' 'কাল যাবো' করে আর তার যাওয়া হলো না। একদিন পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল জোয়ান বয়েসে, কত দেশ, কত জনপদ পেরিয়ে, পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি অতিক্রম করে শেষকালে পথ ভুলে সেই যে মহারাজগঞ্জে এসে আটকে গেল সে আর নড়লো না। ভুলো-বাবুর বাগানবাড়িটা তো এমনিতে পড়েই ছিল, সেটা ভাড়া নিয়ে নিলে সাহেব। কুকুর পুষলে, পায়রা পুষলে, বেড়াল পুষলে—

বললে—তারক, তোমাদের মহারাজগঞ্জ প্যারাডাইস্, একেবারে প্যারাডাইস্ অন্‌-আর্থ—

ওদিকে মটর সাইকেলটা পড়ে পড়ে মরচে ধরতে লাগলো। তাতে আর চড়ে না সাহেব। বিক্রি-করে দিলেও চলতো। নতুন অবস্থায় বেচলে কিছু অন্তত দামও আসতো। শেষে একদিন সেই টিপলার সাহেব আমাদের ধুতি পায়জামা পরতে শিখলে। চুলে সরষের তেল মাখতে শিখলে, খিস্তি করতে শিখলে, বাঙলা গান শিখলে, তবলা বাজাতে শিখলে, দুগ্গা ঠাকুর দেখলে পেন্নাম করতো, সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতো, আর একেবারে, বলবো কি মশাই, আমাদের জাত-ভাই হয়ে গেল মশাই।

—আর শনিচরি?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—আর শনিচরির গায়েও তখন ফরসা সেমিজ, ফরসা শাড়ি পায়ে আলতা পরে, ইংরিজি বলে—সাহেবের কাছে থেকে থেকে ইংরিজি শিখে গেছে তখন।—

জিজ্ঞেস করলাম—শনিচরি জাত দিলে শেষ পর্যন্ত?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—জাত দেবার কথা কী বলছেন মশাই! আমরা যখন দেখলাম সাহেব পটকে গেছে তখন ভাবলাম শনিচরিকে যদি ভাগিয়ে দিই তো টিপলার সাহেব বোধহয় আবার ভালো হয়ে যেতে পারে—

শনিচরিকে গিয়ে তারক বললে—তুই বেরো এখান থেকে শনিচরি—তোর জন্যেই তো সাহেবের এই দুর্গতি—

শনিচরির তখন ঠেকার কত। বললে—আমার জন্যে না তোদের জন্যে? তোরাই তো সাহেবকে আমার মহুয়া খেতে শেখালি—আমার সাহেবকে তোরাই তো খারাপ করলি—

দেখতাম টিপলার সাহেবের যখন অসুখ-টসুখ হতো শনিচরি মাথায় বরফ লাগিয়ে দিচ্ছে। স্নান করিয়ে দিচ্ছে, খাইয়ে দিচ্ছে। সাহেবের কী খেতে ভালো লাগে, কী পরতে ভালো লাগে, কী চায় সাহেব—সব দিকে নজর শনিচরির।

কতদিন টিপলার সাহেবের জন্যে বাজারের ভাঁটিখানা থেকে মহুয়ার মদ নিয়ে এসে দিয়েছে। রান্না করে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অনেক রাতে সাহেবের এঁটো বাসন মেজেছে পুকুরঘাটে বসে বসে।

স্বজাতিরা কেউ কেউ বলেছে—হ্যাঁরে, তা বলে টাকার জন্যে তুই জাত-ধম্ম দিলি?

শনিচরি পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে—শতেকখোয়ারীরা আমাকে জাত দেখাচ্ছে—তোদের জাতের মাথায় আমি......

এর পর তার মুখের ভাষা আর শোনা

যেত না মশাই। কানে আঙুল দিতে হতো। কিন্তু টিপলার সাহেবের ব্যাপার দেখে আমরাও অবাক হয়ে গেলাম মশাই। ও-সাহেব যে কেন বাড়ি-ঘর ছেড়ে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল কে জানে। পথ ভুলে গেলেই বা, তা'বলে মানুষ অমন করে সব ভুলে যায়! প্রথম প্রথম দেড়শো মাইল দূরের এক গির্জায় যেত রবিবার দিনগুলো। শেষে তাও গেল। গির্জা-টির্জা মাথায় উঠলো সাহেবের। কেবল ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনতো আর মহুয়া খেত।

যেদিন রাস্তাতেই নর্দমার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো সাহেব, খবর পেয়ে শনিচরি সেই দশাসই মানুষটাকে ধরে তুলে নিয়ে আসতো। আপাদ-মস্তকে বালতি বালতি জল ঢেলে ধুয়ে দিত সর্বাঙ্গ। জামা-কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। তারপর যখন আস্তে আস্তে হাতে টাকা ফুরিয়ে এল সাহেবের, শনিচরি ঘুঁটে দিয়ে পাড়ায় বিক্রি করতো, গরু ছিল গরুর দুধ বিক্রি করতো, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম বিক্রি করতো।

বলতো—পাড়ার বখাটে ছোঁড়ারাই আমার সাহেবকে খারাপ করে দিলে—

বলতো—যারা আমার সর্বনাশ করেছে—তাদের ভালো হবে না—তাদের তিনকুলে বাতি দেবার কেউ থাকবে না—তাদেরও সর্বনাশ হবে—মরলে মুর্দফরাসেও তাদের ছোঁবে না—এই বলে রাখলুম—

শনিচরি আপন মনে কেবল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাল দিত আর বাসন মাজতো।

কিন্তু একদিন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে এল টিপলার সাহেবের। শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠলো। রাস্তায় টিপলার সাহেবকে দেখলে আমরাই ভয়ে পালাতুম মশাই।

সাহেব আমাদের দেখলেই বলতো—এই তারক হোলি ওয়াটার খাওয়া দোস্ত—

আমাকে একলা দেখতে পেলে বলতো—চাটুজ্জে, হোলি-ওয়াটার খাওয়াবি একটু?

কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে দেখতে পেলেই শনিচরি রেগে চীৎকার করে বলতো—ওই বদমাইশদের সঙ্গে আবার মিশছো তুমি? আবার ওদের কাছে মদ চাইছো—?

টিপলার সাহেব বলতো—আমার হাতে যে আর পয়সা নেই—

শনিচরি বলতো—তোমার পয়সা নেই কি হয়েছে—আমার পয়সা আছে। আমি কিনে দেব—আমি মদ খাওয়াবো তোমাকে—

শেষকালে আস্তে আস্তে যখন সবাই ত্যাগ করলো টিপলার সাহেবকে, দোকান-দার সিগারেট দেয় না, মুদি তেল নুন বেচে না, রুটিওয়ালা রুটি দেয় না, তখন শনিচরিই রইলো টিপলার সাহেবের সঙ্গে। সেবা করতে লাগলো সাহেবের। যেমন করে হিন্দু ঘরের বউএরা সোয়ামীর সেবা করে তেমনি করে সেবা করতে লাগলো—।

সেই টিপলার সাহেবকে নিয়ে আমরা কত মজা করেছি মশাই। আমাদের সঙ্গে হোলির দিন আবীর মেখে হুল্লোড় করেছে। শাল-পাতা চেটে চেটে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়েছে। সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছে। একদিন টিপলার সাহেবের পয়সায় আমরা কত ফূর্তি করেছি, আর পরে সাহেবের অবস্থা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরে এসেছি। কিন্তু সাহেবের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করেছে, সাহেবের ময়লা সাফ করেছে সে ওই শনিচরি। টাকা না ফেললে যে কুটোটি সরাতো না সেই শনিচরি নিজে পরের বাড়ি গতর খেটে সাহেবকে খাইয়েছে পরিয়েছে।

আমরা মজা করবার জন্যে যখন বলতাম—এই টিপলার, সাংহাই যাবি না? টোকিও যাবি না? বার্লিন যাবি না?

কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত টিপলার সাহেব। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে উঠে চলে যেত নিজের বাড়ি।

বলতো—মাথা ধরেছে বড্ড—বাড়ি যাই—

কিংবা কখনও গল্প করতে করতে যখন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত—জানিস্, যখন ডেনমার্কে ছিলাম—

বলতে গিয়েই যেন কথা আটকে যেত তার মুখে। চোখ দুটোর দৃষ্টি কোথায় উধাও হয়ে যেত। বরফ ঢাকা সেই দেশের মাটির মত টিপলার সাহেবের চোখেও বুঝি বরফ জমে আসতো। খোলা চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখতো কোন্ দেশের কোন্ সাটিনের গাউন পরা ষোড়শীকে। তারা বুঝি তাকে ডাকতো হাতছানি দিয়ে। অনেক দূরের পপ্লার আর পাইন গাছের মর্মর শব্দ যেন কান পেতে শুনতে পেত টিপলার সাহেব। তারপর আড্ডার মাঝপথেই উঠে চলে যেত বাড়ি। গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে না-খেয়ে না-দেয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো কতদিন—। তারপর শনিচরির পীড়া-পীড়িতে উঠতো একদিন। আবার তারপর ফাঁক পেলেই দৌড়ে আসতো আড্ডায়। এসে

হাঁফাতে হাঁফাতে বলতো—দে ভাই একটু হোলি ওয়াটার দে—অনেকদিন খাইনি—

আমরা দিতাম।

কিন্তু শনিচরি টের পেলেই আমাদের গালাগালি দিতে দিতে সাহেবের গলা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যেত।......

টিপলার সাহেবের অবস্থা দেখে আমাদের কান্না পেত মশাই। কাকার কাছে শুনেছি—এক এক রাজা এক-একদিকের অধিপতি। কে জানে মশাই—শাস্ত্র-টাস্ত্র তো পড়িনি। রাজা ইন্দ্র হলো পূর্বদিকের, রাজা যম হলো দক্ষিণদিকের, আর রাজা বরুণ হলো পশ্চিমদিকের। সোমদেবতা ভূলোকেও থাকে না, গোলোকেও থাকে না—থাকে দ্যুলোকে। তা শেষকালে আমাদের টিপলার সাহেবও পুরোপুরি সেই দ্যুলোকের বাসিন্দেই হয়ে গেল। লাজ-লজ্জা-ভয়-সংকোচ-ঘেন্না আর কিছু রইল না। এক-একবার মনে হতো কেন এমন হলো! আমরাও তো খাই। খেয়ে তো এমন পরিণতি হয়নি আমাদের। যে টিপলার সাহেবের কাছে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পাবার জন্যে কেদার অত লাফিয়েছিল সেই সাহেবের ক্যারেকটার দেখে কেদার বলেছিল—মাইরি, টিপলার সাহেব ক্যারেকটারটা নষ্ট করলে শেষকালে—

কিন্তু আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন কেন এমন হলো! আমরাও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি—কেন এমন হলো! সে কি মহুয়া! সে কি তুচ্ছ মহুয়ার মদ! সে তো আমরাও খাই! তবে কি শনিচরিয়া! সেই ময়লা নোংরা কাপড়পরা চুলে তেল না দেওয়া কালো দেহাতী মেয়ে!

বললাম—তারপর?

বটুক চাটুজ্জে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। আবার বসলেন।

তারপর কী করলুম জানেন মশাই—

বটুক চাটুজ্জে একটু থেমে আবার বললেন—তারপর কি করলুম জানেন মশাই—একদিন তিনজনে মিলে পরামর্শ করলুম টিপলার সাহেবকে বাঁচাতে হবে—টিপলার সাহেবকে একদিন বললাম—চলো সাহেব, বেরিলীগঞ্জে বেড়িয়ে আসি—

টিপলার সাহেব বললে—কেন?

তারক বললে—তোমাকে হোলি ওয়াটার খাওয়াবো—চলো—

টিপলার সাহেবের মহা ফুর্তি। সাহেবকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তো টাঙ্গায় তুললাম। অনেকদিন পরে আবার খেতে পাবে!

ভোরবেলা বেরিয়েছি। বেরিলীগঞ্জে পৌঁছলুম যখন, তখন পরের দিন ভোর হয়ে আসছে।

বেরিলীগঞ্জে তখনও কয়েকটা প্ল্যাণ্টার সাহেব আছে। জমি-জমা ক্ষেত খামার করে দু'একটা সাহেব তখনও রয়েছে। দেশে ফিরে যাবো যাবো করছে।

টিপলার সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তুললাম তাদের বাড়ি।

টিপলার সাহেবকে দেখে ডি'সুজা সাহেব সামনে এগিয়ে এল। ডি'সুজা সাহেবের মেমও এগিয়ে এল। পেছনে-পেছনে ছেলে-মেয়েরাও এগিয়ে এল। আমাদের সঙ্গে টিপলার সাহেবকে দেখে তারাও অবাক হয়ে গেছে।

ডি'সুজা সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলে টিপলার সাহেবের দিকে। টিপলার সাহেবের মুখেও হাসি ফুটলো যেন। গুড মর্নিং হলো। হ্যাণ্ড্ শেক্ হলো। কোথা থেকে আসছো! কী নাম, ধাম, কোথায় নিবাস, কোন্ গোত্র—কুলপঞ্জী, সবই আদান-প্রদান হলো। কত বছর পরে আবার স্বদেশের লোক পেয়েছে—একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমাদের দিকে আর কেউ ফিরে চায় না। শেষে যে-ই ওরা চা খেতে ঘরে ঢুকলো আমরাও টুপ করে সরে পড়লাম সেখান থেকে।

ভাবলাম এবার যাহোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে সাহেবের। ফিরতি টাঙ্গাতে সোজা চলে এলুম একেবারে মহারাজগঞ্জে।

শনিচরি আমাদের এসে ধরে। —বলে—সাহেবের কী হলো? সাহেব কোথায় গেল?

তারক বললে—আমরা কী জানি—

কিন্তু ও মশাই, ভবি ভোলবার নয়। একদিন পরেই দেখি দৌড়তে দৌড়তে টিপলার সাহেব এসে হাজির। আমরাও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে? ফিরে এলি যে?

টিপলার সাহেব বললে—দূর, ওখানে কখনও মন টেঁকে—! ভারি মন কেমন করতে লাগলো ভাই তোদের জন্যে—চলে এলাম—

বললাম—আর তারপর?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—তারপর আর কি! এমনি করে চোদ্দ বছর এইভাবে কাটিয়ে টিপলার সাহেবের একদিন শরীর ভেঙে পড়লো। হঠাৎ পাটনা থেকে একদিন জোনাথান সাহেব এখানে কাজে এসেছিল—ম্যাজিস্ট্রেট, নতুন বিলেত থেকে এসেছে। এসে সব শুনে দিল্লীর কন্‌সাল অফিসে একটা চিঠি লিখে দিলে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। টিপলার সাহেব তখন অজ্ঞান অচৈতন্য—আর শনিচরি দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাশে বসে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে এক নাগাড়ে সেবা করে যাচ্ছে।

আমরা ভাবলাম এবার এ-যাত্রায় বুঝি টিপলার সাহেব বেঁচে গেল।

একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ কয়েকটা মটরগাড়িও মহারাজগঞ্জে এসে হাজির। নতুন নতুন মুখে সব। দিল্লীর কনসাল অফিসের পরোয়ানা এসে গেছে এতদিনে। এবার বিনা খরচে টিপলার সাহেবকে জাহাজে করে সরকার নিজের দেশে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু হলে কি হবে মশাই—বলে বটুক চাটুজ্জে এবার নতুন ধরনের হাসি হেসে উঠলেন।

বললেন—টিপলার সাহেব তার আগের দিনই মারা গেছে.....

বললাম—মারা গেছে?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—হ্যাঁ,—মারা গেছে—মরে একেবারে সত্যিকারের দ্যুলোক-বাসী হয়ে গেছে—

বললাম—আর শনিচরি?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—শনিচরি আর যাবে কোথায়। এখানেই আছে। আরো বুড়ি থুথ্থুড়ি হয়ে গেছে। বাজারে গেলে দেখতে পাবেন কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে এখন কবলা উচ্ছে শিম বেগুন বিক্রি করে। কিন্তু এখনও বড় তেল মশাই—ইংরিজি পেটে গিয়েছে কি না—আমাদের দেখলে জ্বলে যায়—যেন টিপলার সাহেবের আমরাই সর্বনাশ করেছি—তা আমাদের কী দোষ বলুন—সাহেব ওয়ার্ল্ড টুর করতে বেরিয়ে পথ না ভুললে তো আর এমন হতো না—আর পথ ভুলে আসবি তো আয় একেবারে এই মহারাজগঞ্জে—

আমি চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্জে বললেন—তাই তো আপনাকে বলছিলাম মশাই, হালের গপ্পো-গুলো তো সব পড়ি, কিন্তু মনে হয় যেন সব বই দেখে দেখে লেখা—আপনি টিপলার সাহেবের গপ্পো শুনলেন তো, আরম্ভটা ঠিক বই-এ লেখা গপ্পোর মত—কিন্তু শেষকালটাই গোলমাল হয়ে যায়—শেষটাই কারো হয় না—শেষে গিয়েই আপনাদের গপ্পো একেবারে গুলিয়ে যায়—জীবনের সঙ্গে কিছুছু মেলে না তার—

বটুক চাটুজ্জে আরো সব কী যেন বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি তখনও টিপলার সাহেবের কথাই ভাবছি। মনে হলো—আমরা সবাই-ই যেন এক-একজন টিপলার সাহেব। একদিন ওয়ার্ল্ড টুর করতেই বেরিয়েছিলাম সবাই—তারপর ছোট-ছোট মহারাজগঞ্জে এসে সব আটকে গিয়েছি চিরকালের মত। আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের। আর যাওয়া হবেও না।

॥ শ'স কর্নার ॥

অমিয়কুমার সেন

কিছুকাল আগে কাগজে দেখেছিলাম, বার্নার্ড শ-এর বিখ্যাত বাড়ি শ'স কর্নার দর্শকদের জন্য আর খোলা থাকবে না। ব্রিটেনের ন্যাশনাল ট্রাস্টের হাতে গচ্ছিত এই বাড়ির থেকে নাকি যথাযোগ্য দর্শনী আদায় হচ্ছিল না। কিছু আশ্চর্য হইনি। জীবিত অবস্থায়ও এই বিচিত্র অদ্ভুত মানুষটির চারিদিকে তেমন ভিড় হয়নি। তাছাড়া নিজের চারদিকে ভিড় জমতে দিতে বার্নার্ড শ'র ঘোরতর আপত্তিও ছিল। ও'র বাড়ির দরজা সাধারণের কাছে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তবু দুঃখ হয়েছিল। চার বছর আগে (আগস্ট ১৯৫২) একদিন শ্রান্ত পা দুটোকে টেনে শ'স কর্নারের সদর দরজার ঘণ্টাটি বাজিয়ে দু শিলিং দর্শনী দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম, সেদিনের কথা মনে পড়ছিল।

বোধ হয় লোকের ভিড় থেকে বাঁচবার জন্যই লোকসমাগমের রাস্তা থেকে আরো দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে বার্নার্ড শ তাঁর 'শেষ বেলাকার ঘর' বেঁধেছিলেন। লণ্ডন থেকে বাসে উঠে এ্যাওট সেণ্ট লরেন্স যাব শুনে কণ্ডাক্টর আশ্চর্য হয়ে জানালেন ও জায়গার তিন মাইল দূর দিয়ে বাসের যাতায়াতের পথ। শুধু বৃহস্পতিবারে একটা বাস আছে, সেটা ও জায়গার মাইল দেড়েক দূরের একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যায়। সেদিন বৃহস্পতিবার নয়, তাই সম্মতির অপেক্ষায় সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। ইংলণ্ডের মতো দেশে বাস রাস্তা থেকে তিন মাইল দূরে কোনো জায়গা আছে জেনে আমার মতোই ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন মহিলা, আমাকে নিয়ে আড়াই জন পুরুষ। মিসেস ভড়ের বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়েই ভয়। তিন মাইল তিন মাইল ছ মাইল ওকে হাঁটতে হবে। মেয়েরাও কেউ স্বস্তি বোধ করছিলেন না। মিসেস ভড় ধনী গৃহের পুরাঙ্গণা, হাঁটাচলার অভ্যেস তেমন নেই। লীলাকে যদিও সুখথংকর পদবীতে মারাঠী বলে চেনা যায়, তবু পৈতৃক আমল থেকে বাংলা দেশে বাস করেও শুধু ভাষায় নয় চেহারায়ও সে ক্ষীণকায়া বাঙালী তরুণীদের মতোই। আর পত্নী নীলিমা হাই হীল পরে এতটা চলবার আশংকায় ম্রিয়মানা। অবশেষে রণজিৎমামা বললেন, 'ঠিক আছে, চেষ্টাতো করা যাক। কেউ যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে পথের ধারে কোনো জায়গায় আমি

প্রেস রিপোর্টারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে তাদের তাড়া করার সময় একজন রিপোর্টার এই ছবি তোলেন। পরে এই ছবি দেখে খুশি হয়ে শ নিজেই এর নাম দেন 'The chucker out ?'

তাকে নিয়ে অপেক্ষা করব। অন্যেরা দেখে আসবে।' আমরা ইংলণ্ডে অল্প কদিনের যাত্রী। রণজিৎমামা থাকবেন আরও এক বছর। ওখানে যাবার সুযোগ তাঁর আরও মিলবে। সুতরাং যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে বাসের টিকিট কেনা হল।

যে-গ্রামটাতে বাস থেকে নামতে হল তার নাম মনে নেই। নানা দিক থেকে অনেকগুলো রাস্তা এসে সেখানে মিলেছে। এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের রাস্তা বেছে নিয়ে চলতে শুরু করা গেল। আমি শেষবারের মতো সাবধানবাণী উচ্চারণ করলাম, 'যার ইচ্ছে হয় এখানে বসেও অপেক্ষা করতে পারেন। আমরা দু তিন ঘণ্টা পরে ফিরে আসব।' কথাটা শেষ করলাম মিসেস ভড়ের দিকে তাকিয়ে। অপেক্ষা করতে তাঁর যে বিশেষ আপত্তি ছিল তা নয়। কিন্তু তাঁর পুত্রটি ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ছাত্র, যাকে পিছপা দেখতে রাজি নয়। কাজেই সকলে একসঙ্গেই রওনা হলাম। তখন বেলা বারোটা হবে।

নির্জন রাস্তা। ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামকে এত কাছাকাছি থেকে এর আগে আর দেখিনি। ওদিকটায় জনবসতি যেন খুব কম। রাস্তায় কদাচিৎ দু একটি লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। পিছন থেকে কখনও বা দু একটা মোটরগাড়ি আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। হয়তো বা এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের তীর্থযাত্রী। দুধারে পাকা শস্যক্ষেত। গমের ক্ষেতগুলো আমাদের চেনা। পথশ্রম লাঘবের জন্য আমি গল্প ফাঁদলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে রাস্তার মোড়ে এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের নাম লেখা দেখে সকলেই আনন্দে মৃদু চীৎকার করে উঠলাম। গ্রামে ঢুকে রাস্তার দুটো বাঁক পেরতেই শ'স কর্নারের গেট চোখে পড়ল। তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে ঢুকলাম এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর শেষ জীবনের গৃহে, বার্নার্ড শ'র উত্তরায়ণে।

পরিচ্ছন্ন একটি ছোটো বাড়ি। চারিদিকে বিস্তৃত জমিতে গ্রীষ্মের মরসুমি ফুল। বাড়ির পিছনের দিকে জমিটা ঢালু হয়ে আবার অনেকটা দূরে গিয়ে ঢেউখেলানো ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে উঠেছে।

১৯০৬ সনে পঞ্চাশ বছর বয়সে বার্নার্ড শ এই নির্জন বাড়িটি কিনে এখানে বাস করতে আসেন। সে বছরেই ও'র বিখ্যাত নাটক Doctor's Dilemma অভিনীত হয়। এ-বাড়িতে বসেই লেখা হল, তাঁর Pygmalion, Man and Superman, Heart break House, Back to methuslah আর Saint Joan. গাইডের মুখে এসব কথা শুনে মনে হতে লাগল একটি অতিমানবিক চিন্তার অশ্রুত গুঞ্জনে এখনও যেন সমস্ত বাড়িটা ভরে আছে। কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, আমাদের অতি সাধারণ কৌতূহল প্রকাশিত হলে যেন একটি শাণিত ব্যঙ্গের হাসি ঘরময় বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে একটি হল ঘর। একপাশে ঝোলানো আছে বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত টুপিগুলি—তার দীর্ঘ দিনের সঙ্গীরা। তার নিচে লাঠিগুলি আর দস্তানার বাক্স। টুপিগুলির ইতিহাস শুনলাম। বড়ো আকারের একটি fawn felt তিনি ষাট বছর ধরে ব্যবহার করেছিলেন। আর একটা টুপির সঙ্গে লাগানো আছে মৌমাছি-পালকদের মুখাবরণ। বিচিত্র জ্ঞানের সঙ্গে এরকম বিচিত্র শখ-ওয়ালা লোক পৃথিবীতে বেশি জন্মায় না।

হাঁকাতে হাঁকাতে বলতো—দে আর একটু হোলি ওয়াটার দে—অনেকদিন খাইনি—

আমরা দিতাম।

কিন্তু শনিচরি টের পেলেই আমাদের গালাগালি দিতে দিতে সাহেবের গলা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যেত।......

টিপলার সাহেবের অবস্থা দেখে আমাদের কান্না পেত মশাই। কাকার কাছে শুনেছি—এক এক রাজা এক-একদিকের অধিপতি। কে জানে মশাই—শাস্ত্র-টাস্ত্র তো পড়িনি। রাজা ইন্দ্র হলো পূর্বদিকের, রাজা যম হলো দক্ষিণদিকের, আর রাজা বরুণ হলো পশ্চিমদিকের। সোমদেবতা ভূলোকেও থাকে না, গোলোকেও থাকে না—থাকে দ্যুলোকে। তা শেষকালে আমাদের টিপলার সাহেবও পুরোপুরি সেই দ্যুলোকের বাসিন্দেই হয়ে গেল। লাজ-লজ্জা-ভয়-সঙ্কোচ-ঘেন্না আর কিছু রইল না। এক-একবার মনে হতো কেন এমন হলো! আমরাও তো খাই। খেয়ে তো এমন পরিণতি হয়নি আমাদের। যে টিপলার সাহেবের কাছে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পাবার জন্যে কেদার অত লাফিয়েছিল সেই সাহেবের ক্যারেকটার দেখে কেদার বলেছিল—মাইরি, টিপলার সাহেব ক্যারেকটারটা নষ্ট করলে শেষকালে—

কিন্তু আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন কেন এমন হলো! আমরাও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি—কেন এমন হলো! সে কি মহুয়া! সে কি তুচ্ছ মহুয়ার মদ! সে তো আমরাও খাই! তবে কি শনিচরিয়া! সেই ময়লা নোংরা কাপড়পরা চুলে তেল না দেওয়া কালো দেহাতী মেয়ে!

বললাম—তারপর?

বটুক চাটুজ্জে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। আবার বসলেন।

তারপর কী করলুম জানেন মশাই—

বটুক চাটুজ্জে একটু থেমে আবার বললেন—তারপর কি করলুম জানেন মশাই—একদিন তিনজনে মিলে পরামর্শ করলুম টিপলার সাহেবকে বাঁচাতে হবে—টিপলার সাহেবকে একদিন বললাম—চলো সাহেব, বেরিলীগঞ্জে বেড়িয়ে আসি—

টিপলার সাহেব বললে—কেন?

তারক বললে—তোমাকে হোলি ওয়াটার খাওয়াবো—চলো—

টিপলার সাহেবের মহা ফুর্তি। সাহেবকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তো টাঙ্গায় তুললাম। অনেকদিন পরে আবার খেতে পাবে!

ভোরবেলা বেরিয়েছি। বেরিলীগঞ্জে পৌঁছলুম যখন, তখন পরের দিন ভোর হয়ে আসছে।

বেরিলীগঞ্জে তখনও কয়েকটা প্ল্যান্টার সাহেব আছে। জমি-জমা ক্ষেত খামার করে দু'একটা সাহেব তখনও রয়েছে। দেশে ফিরে যাবো যাবো করছে।

টিপলার সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তুললাম তাদের বাড়ি।

টিপলার সাহেবকে দেখে ডি'সুজা সাহেব সামনে এগিয়ে এল। ডি'সুজা সাহেবের মেমও এগিয়ে এল। পেছনে-পেছনে ছেলে-মেয়েরাও এগিয়ে এল। আমাদের সঙ্গে টিপলার সাহেবকে দেখে তারাও অবাক হয়ে গেছে।

ডি'সুজা সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলে টিপলার সাহেবের দিকে। টিপলার সাহেবের মুখেও হাসি ফুটলো যেন। গুড মর্নিং হলো। হ্যান্ড্ শেক্ হলো। কোথা থেকে আসছো! কী নাম, ধাম, কোথায় নিবাস, কোন্ গোত্র—কুলপঞ্জী, সবই আদান-প্রদান হলো। কত বছর পরে আবার স্বদেশের লোক পেয়েছে—একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমাদের দিকে আর কেউ ফিরে চায় না। শেষে যে-ই ওরা চা খেতে ঘরে ঢুকলো আমরাও টুপ করে সরে পড়লাম সেখান থেকে।

ভাবলাম এবার যাহোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে সাহেবের। ফিরতি টাঙ্গাতে সোজা চলে এলুম একেবারে মহারাজগঞ্জে।

শনিচরি আমাদের এসে ধরে। —বলে—সাহেবের কী হলো? সাহেব কোথায় গেল?

তারক বললে—আমরা কী জানি—

কিন্তু ও মশাই, ভবি ভোলবার নয়। একদিন পরেই দেখি দৌড়তে দৌড়তে টিপলার সাহেব এসে হাজির। আমরাও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে? ফিরে এলি যে?

টিপলার সাহেব বললে—দূর, ওখানে কখনও মন টেঁকে—! ভারি মন কেমন করতে লাগলো ভাই তোদের জন্যে—চলে এলাম—

বললাম—আর তারপর?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—তারপর আর কি! এমনি করে চৌদ্দ বছর এইভাবে কাটিয়ে টিপলার সাহেবের একদিন শরীর ভেঙে পড়লো। হঠাৎ পাটনা থেকে একদিন জোনাথান সাহেব এখানে কাজে এসেছিল—ম্যাজিস্ট্রেট, নতুন বিলেত থেকে এসেছে। এসে সব শুনে দিল্লীর কন্‌সাল অফিসে একটা চিঠি লিখে দিলে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। টিপলার সাহেব তখন অজ্ঞান অচৈতন্য—আর শনিচরি দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাশে বসে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে এক নাগাড়ে সেবা করে যাচ্ছে।

আমরা ভাবলাম এবার এ-যাত্রায় বুঝি টিপলার সাহেব বেঁচে গেল।

একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ কয়েকটা মটরগাড়িও মহারাজগঞ্জে এসে হাজির। নতুন নতুন মুখ সব। দিল্লীর কনসাল অফিসের পরোয়ানা এসে গেছে এতদিনে। এবার বিনা খরচে টিপলার সাহেবকে জাহাজে করে সরকার নিজের দেশে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু হলে কি হবে মশাই—বলে বটুক চাটুজ্জে এবার নতুন ধরনের হাসি হেসে উঠলেন।

বললেন—টিপলার সাহেব তার আগের দিনই মারা গেছে......

বললাম—মারা গেছে?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—হ্যাঁ,—মারা গেছে—মরে একেবারে সত্যিকারের দ্যুলোক-বাসী হয়ে গেছে—

বললাম—আর শনিচরি?

বটুক চাটুজ্জে বললেন—শনিচরি আর যাবে কোথায়। এখানেই আছে। আরো বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে। বাজারে গেলে দেখতে পাবেন কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে এখন কয়লা উচ্ছে শিম বেগুন বিক্রি করে। কিন্তু এখনও বড় তেজ মশাই—ইংরিজি পেটে গিয়েছে কি না—আমাদের দেখলে জ্বলে যায়—যেন টিপলার সাহেবের আমরাই সর্বনাশ করেছি—তা আমাদের কী দোষ বলুন—সাহেব ওয়ার্ল্ড টুর করতে বেরিয়ে পথ না ভুললে তো আর এমন হতো না—আর পথ ভুলে আসবি তো আয় একেবারে এই মহারাজগঞ্জে—

আমি চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্জে বললেন—তাই তো আপনাকে বলছিলাম মশাই, হালের গপ্পো-গুলো তো সব পড়ি, কিন্তু মনে হয় যেন সব বই দেখে দেখে লেখা—আপনি টিপলার সাহেবের গপ্পো শুনলেন তো, আরম্ভটা ঠিক বই-এ লেখা গপ্পোর মত—কিন্তু শেষকালটাই গোলমাল হয়ে যায়—শেষটাই কারো হয় না—শেষে গিয়েই আপনাদের গপ্পো একেবারে গুলিয়ে যায়—জীবনের সঙ্গে কিছুছু মেলে না তার—

বটুক চাটুজ্জে আরো সব কী যেন বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি তখনও টিপলার সাহেবের কথাই ভাবছি। মনে হলো—আমরা সবাই-ই যেন এক-একজন টিপলার সাহেব। একদিন ওয়ার্ল্ড টুর করতেই বেরিয়েছিলাম সবাই—তারপর ছোট-ছোট মহারাজগঞ্জে এসে সব আটকে গিয়েছি চিরকালের মত। আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের। আর যাওয়া হবেও না।

॥ শ'স কর্নার ॥

অমিয়কুমার সেন

কিছুকাল আগে কাগজে দেখেছিলাম, বার্নার্ড শ-এর বিখ্যাত বাড়ি শ'স কর্নার দর্শকদের জন্য আর খোলা থাকবে না। ব্রিটেনের ন্যাশনাল ট্রাস্টের হাতে গচ্ছিত এই বাড়ির থেকে নাকি যথাযোগ্য দর্শনী আদায় হচ্ছিল না। কিছু আশ্চর্য হইনি। জীবিত অবস্থায়ও এই বিচিত্র অদ্ভুত মানুষটির চারিদিকে তেমন ভিড় হয়নি। তাছাড়া নিজের চারদিকে ভিড় জমতে দিতে বার্নার্ড শ'র ঘোরতর আপত্তিও ছিল। ও'র বাড়ির দরজা সাধারণের কাছে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তবু দুঃখ হয়েছিল। চার বছর আগে (আগস্ট ১৯৫২) একদিন শ্রান্ত পা দুটোকে টেনে শ'স কর্নারের সদর দরজার ঘণ্টাটি বাজিয়ে দু শিলিং দর্শনী দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম, সেদিনের কথা মনে পড়ছিল।

বোধ হয় লোকের ভিড় থেকে বাঁচবার জন্যই লোকসমাগমের রাস্তা থেকে আরো দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে বার্নার্ড শ তাঁর 'শেষ বেলাকার ঘর' বেঁধেছিলেন। লন্ডন থেকে বাসে উঠে এ্যাওট সেণ্ট লরেন্স যাব শুনে কণ্ডাক্টর আশ্চর্য হয়ে জানালেন ও জায়গার তিন মাইল দূর দিয়ে বাসের যাতায়াতের পথ। শুধু বৃহস্পতিবারে একটা বাস আছে, সেটা ও জায়গার মাইল দেড়েক দূরের একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে যায়। সেদিন বৃহস্পতিবার নয়, তাই সম্মতির অপেক্ষায় সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। ইংলণ্ডের মতো দেশে বাস রাস্তা থেকে তিন মাইল দূরে কোনো জায়গা আছে জেনে আমার মতোই ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন মহিলা, আমাকে নিয়ে আড়াই জন পুরুষ। মিসেস ভড়ের বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়েই ভয়। তিন মাইল তিন মাইল ছ মাইল ওকে হাঁটতে হবে। মেয়েরাও কেউ স্বস্তি বোধ করছিলেন না। মিসেস ভড় ধনী গৃহের পুরাঙ্গণা, হাঁটাচলার অভ্যেস তেমন নেই। লীলাকে যদিও সুখঁতাংকর পদবীতে মারাঠী বলে চেনা যায়, তবু পৈতৃক আমল থেকে বাংলা দেশে বাস করেও শুধু ভাষায় নয় চেহারায়ও সে ক্ষীণকায়া বাঙ্গালী তরুণীদের মতোই। আর পত্নী নীলিমা হাই হীল পরে এতটা চলবার আশঙ্কায় ম্রিয়মানা। অবশেষে রণজিৎমামা বললেন, 'ঠিক আছে, চেষ্টাতো করা যাক। কেউ যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে পথের ধারে কোনো জায়গায় আমি তাকে নিয়ে অপেক্ষা করব। অন্যেরা দেখে আসবে।' আমরা ইংলণ্ডে অল্প কদিনের যাত্রী। রণজিৎমামা থাকবেন আরও এক বছর। ওখানে যাবার সুযোগ তাঁর আরও মিলবে। সুতরাং যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে বাসের টিকিট কেনা হল।

প্রেস রিপোর্টারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে তাদের তাড়া করার সময় একজন রিপোর্টার এই ছবি তোলেন। পরে এই ছবি দেখে খুশি হয়ে শ নিজেই এর নাম দেন 'The chucker out'

যে-গ্রামটাতে বাস থেকে নামতে হল তার নাম মনে নেই। নানা দিক থেকে অনেকগুলো রাস্তা এসে সেখানে মিলেছে। এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের রাস্তা বেছে নিয়ে চলতে শুরু করা গেল। আমি শেষবারের মতো সাবধানবাণী উচ্চারণ করলাম, 'যার ইচ্ছে হয় এখানে বসেও অপেক্ষা করতে পারেন। আমরা দু তিন ঘণ্টা পরে ফিরে আসব।' কথাটা শেষ করলাম মিসেস ভড়ের দিকে তাকিয়ে। অপেক্ষা করতে তাঁর যে বিশেষ আপত্তি ছিল তা নয়। কিন্তু তাঁর পুত্রটি ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ছাত্র, যাকে পিছপা দেখতে রাজি নয়। কাজেই সকলে একসঙ্গেই রওনা হলাম। তখন বেলা বারোটা হবে।

নির্জন রাস্তা। ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামকে এত কাছাকাছি থেকে এর আগে আর দেখিনি। ওদিকটায় জনবসতি যেন খুবে কম। রাস্তায় কদাচিৎ দু একটি লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। পিছন থেকে কখনও বা দু একটা মোটরগাড়ি আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। হয়তো বা এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের তীর্থযাত্রী। দুধারে পাকা শস্যক্ষেত। গমের ক্ষেতগুলো আমাদের চেনা। পথশ্রম লাঘবের জন্য আমি গল্প ফাঁদলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে রাস্তার মোড়ে এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সের নাম লেখা দেখে সকলেই আনন্দে মৃদু চীৎকার করে উঠলাম। গ্রামে ঢুকে রাস্তার দুটো বাঁক পেরতেই শ'স কর্নারের গেট চোখে পড়ল। তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে ঢুকলাম এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর শেষ জীবনের গৃহে, বার্নার্ড শ'র উত্তরায়ণে।

পরিচ্ছন্ন একটি ছোটো বাড়ি। চারিদিকে বিস্তৃত জমিতে গ্রীষ্মের মরসুমি ফুল। বাড়ির পিছনের দিকে জমিটা ঢালু হয়ে আবার অনেকটা দূরে গিয়ে ঢেউখেলানো ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে উঠেছে।

১৯০৬ সনে পঞ্চাশ বছর বয়সে বার্নার্ড শ এই নির্জন বাড়িটি কিনে এখানে বাস করতে আসেন। সে বছরেই ও'র বিখ্যাত নাটক Doctor's Dilemma অভিনীত হয়। এ-বাড়িতে বসেই লেখা হল, তাঁর Pygmalion, Man and Superman, Heart break House, Back to methuslah আর Saint Joan. গাইডের মুখে এসব কথা শুনে মনে হতে লাগল একটি অতিমানবিক চিন্তার অশ্রুত গুঞ্জনে এখনও যেন সমস্ত বাড়িটা ভরে আছে। কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, আমাদের অতি সাধারণ কৌতূহল প্রকাশিত হলে যেন একটি শাণিত ব্যঙ্গের হাসি ঘরময় বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে একটি হল ঘর। একপাশে ঝোলানো আছে বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত টুপিগুলি—তার দীর্ঘ দিনের সঙ্গীরা। তার নিচে লাঠিগুলি আর দস্তানার বাক্স। টুপিগুলির ইতিহাস শুনলাম। বড়ো আকারের একটি fawn felt তিনি ষাট বছর ধরে ব্যবহার করেছিলেন। আর একটা টুপির সঙ্গে লাগানো আছে মৌমাছি-পালকদের মুখাবরণ। বিচিত্র জ্ঞানের সঙ্গে এরকম বিচিত্র শখওয়ালা লোক পৃথিবীতে বেশি জন্মায় না।

শ'স কর্নারের সামনের দিক।

ছবি লেখকের তোলা

দরজার পাশে একটি বেতের চেয়ার। রোজ প্রাতর্ভ্রমণে বেরবার আগে উনি এটাতে বসে জুতো পরতেন। অবোলা চেয়ারটা এখনও কোল পেতে আছে; মনিবহারা কুকুরের মতো ম্রিয়মান। সেই লোকটি আর কোনো দিন এখানে এসে বসবে না। একটু দূরেই একটা পিয়ানো। নাট্যকলা বার্নার্ড শকে অমর করে রাখবে কিন্তু সংগীতেও তাঁর অধিকার ছিল। প্রকৃতপক্ষে সংগীত সমালোচক হিসেবেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ঘটে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবিধ্বস্ত ইংলণ্ডের এই নিভৃত পল্লীতে বিমান আক্রমণের সূচনায় তীব্র নিখাদে সাইরেন বেজে উঠত, তখন মেথু-জেলার দ্রষ্টা ঋষি পিয়ানোতে এসে বসতেন। তাঁর বার্ধক্যের কম্পিত গলায় ধ্বনিত হত ইটালিয়ান অপেরা সংগীত।

দর্শকদের সাধারণত প্রথমেই বার্নার্ড শর পড়ার ঘরটি দেখানো হয়। কিন্তু তাতে খুব ভিড় দেখে আমরা প্রথমে ঢুকলাম বসবার ঘরে। এই ঘরটি নাকি বিশেষভাবে শ-পত্নীরই ছিল। ঘরের আসবাবসজ্জায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। এঘরে অনেকগুলি ছবি এবং মূর্তি আছে। তার মধ্যে আকর্ষণীয় হল জোআন অব আর্কের একটি ছোটো মূর্তি। পিগম্যালিয়ান নাটকটির চিত্ররূপ ১৯৩৮ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচিত হওয়ায় 'অসকার' পুরস্কার হিসেবে এটি বার্নার্ড শকে দেওয়া হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর (১৯৪৪) কোনো সম্ভ্রান্ত অতিথি না এলে বার্নার্ড শ নাকি এঘরে ঢুকতেন না। স্ত্রীর হাতে সাজানো এই ঘরটি ছিল পত্নীহীন শর মনে বেদনার স্মৃতির মতো। সংক্ষুব্ধ বাক্যের যুদ্ধে বার্নার্ড শ জীবনে কোনো লোকের কাছে হার মানেননি। কিন্তু শোনা যায় মিসেস শ একবার তাকেও থ বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, তুমি জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে যতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছ, আমি জীবনসঙ্গী নির্বাচনে তার চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছি। এখানে তোমার কাছে আমার জিত। জীবনের এই জিত শ-পত্নী মৃত্যুতেও বজায় রাখতে পেরে-ছিলেন। মনীষী স্বামীর মৃত্যুশোক বহন করে তাকে সাধারণের কৃপাপাত্রী হতে হয়নি। অথচ বাংচতুর স্বামীর শেষ জীবনকে তিনি প্রচ্ছন্ন কারুণ্যে ভরে দিয়ে-ছিলেন।

এবার বার্নার্ড শর পড়ার ঘরে ঢুকলাম। বহু অমর গ্রন্থের জন্ম হয়েছিল এঘরে। বিচিত্র চিন্তার গোমুখী এই ঘরটিতে ঢুকতে বুক দুরু দুরু করছিল। কল্পনার জাল এড়িয়ে আরও যে-সব বিচিত্রতর চিন্তা উড়ে পালিয়েছিল, তারা কি আজও ঝাঁক বেঁধে এই ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

ঘরটি আগের মতোই সাজানো আছে। প্রতিদিন সওয়া দশটায় ঘড়ির কাঁটার মতো শ এসে এঘরে বসতেন। তাঁর হাতের অংশ চিহ্নাঙ্কিত কলমগুলি তেমনি সাজানো আছে, সে আঙ্গুলগুলির স্পর্শ তারা আর পাবে না। একপাশে তাকের উপর সাজানো নানা ভাষার অভিধান, আর একটি ঐতিহাসিক নামমালা। পড়ার টেবিলের ঠিক উপরেই শ'র বন্ধু Philip wicksteed-এর ছবি। এঁর অর্থনৈতিক চিন্তা একসময় শকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে আছে বিখ্যাত কবি William morris-এর ছবি। এঁর প্রতি শ'র গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শ'র ভাষায় ইনি ছিলেন, four great men rolled into one—একদেহে চারটি মনীষীর সংমিশ্রণ। morris-এর ছবির পাশে আছে শ'র নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অভিজ্ঞানপত্র। অন্যান্য ছবির মধ্যে yeats-এর ছবিটি চিনতে পারলাম। শ'র নিজের হাতের তোলা ছবিও আছে কয়েকটি।

পড়ার ঘর থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল খাবার ঘরে। শ নিরামিশাষী ছিলেন, ভোজনবিলাসী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল না। কিন্তু খাবার ঘরে তিনি বহু সময় কাটাতেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সংগে সংগে তাঁর পড়া চলত, কোনো কোনো দিন তাই খেতে লাগত পুরো দু ঘণ্টা। সান্ধ্য ভোজ হত ঘড়ি ধরে সাড়ে সাতটায়। তারপরে চিমনীর ধারে একটি আরাম কেদারায় বসে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে তিনি পড়াশোনা করতেন। এই প্রিয় ঘরটিতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর কাগজ-ওয়ালারা ফলাও করে প্রচার করেছিলেন যে, তাঁর ঘরে সর্বদা স্টালিনের ছবি থাকত। কিন্তু এই খাবার ঘরে চিমনী-পাঁসের উপরে যে-কজন লোকের ছবি আছে তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী অন্যতম একথা কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। ওখানে এ কয় জনের ছবি সাজানো আছে—মহাত্মা গান্ধী, Djerdjinsky, লেনিন, স্ট্যালিন, গ্রেন-ভিল বার্কার এবং ইবসেন। গ্রেনভিল বার্কার আর ইবসেনের ছবির মাঝখানে ডাবলিনে শ'র জন্মস্থানের একটি ছবি। ইবসেনের ছবিটা নাকি শ' মৃত্যুর কদিন আগে বাঁধাতে দিয়েছিলেন। যেদিন ওটা ফিরে আসে তার পরদিনই শ'র মৃত্যু হয়।

খাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে যাওয়া যায়। কী শীতে কী গ্রীষ্মে শ' ভোর পাঁচটার সময় এ বাগানে বেড়াতে বেরোতেন। বাগানের একপ্রান্তে একটি নির্জন ঘরে বসে গ্রীষ্মকালে তাঁর লেখাপড়া চলত। সে ঘরের টেবিলের উপর একতাড়া কাগজ এখনও পড়ে আছে। সেই মনীষীর চিন্তার ছবিগুলির কালো আঁচড় তাদের বুকে আর কোনোদিন লেখা হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে শ'স কর্নার থেকে বেরিয়ে এলাম ইংলণ্ডের মাটিতে বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি তীর্থযাত্রা সেরে। পথের মোড় ঘুরতেই বাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

॥ মনীষী যোগেশচন্দ্র স্মরণে ॥

ভাগবত দাস বরাট

১ ৪ঠা শ্রাবণ। সোমবার। সকাল ৮টা। গতানুগতিক প্রারম্ভিক কাজকর্মগুলো ধীরে ধীরে শেষ করে দোতালায় আমার পড়ার ঘরে এসে বসলাম। সামনের র‍্যাক থেকে তুলে নিলাম শুক্রবারের পাওয়া সাপ্তাহিক দেশ। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে চলেছি। মনটা তখনও কোন পাতার উপর আটক পড়ে নি। এমন সময় রাজপথে হরি-ধ্বনি শোনা গেল। ধ্বনিটি অতি পরিচিত। বুঝলাম স্থানীয় কোন লোকজন পৃথিবীর হিসাব নিকাশ মিটিয়েছে। এবার তার নশ্বর দেহের শোকযাত্রার পালা। হরিধ্বনি ও তার সঙ্গে খোল করতালের বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে।

তাইতো, কে আবার মারা গেল? উদ্‌গ্রীবতায় অস্থির হয়ে উঠি। ডাকে আসা খামে মোড়া চিঠি পিয়নের হাত থেকে পেলে সেটা পড়বার জন্যে যেমন কৌতূহল জাগে, ঠিক সেইরকম তৎপরতায় ছাদে উঠি। কারণ, নীচে নেমে রাস্তার ধারে দাড়াতে গেলে হয়ত শোভাযাত্রা পেরিয়ে যাবে। তাই ছাদে উঠলাম। কিন্তু শব দেখে তো সব কিছু বোঝা গেল না। দূর থেকে মৃতদেহ দেখে কে যে মারা গেল,—তা বুঝতেই পারলাম না। তবে এটা বেশ জানা গেল যে, কোন বিশিষ্ট নাগরিকের মহাপ্রয়াণ। শবাধারে পুষ্পের স্তবক ও মালা। শবানুগমনে কংগ্রেসকর্মী ও ছাত্রবৃন্দের সমাবেশ। এই সবই তার প্রমাণ। কিন্তু এই বিশিষ্ট পুরবাসীটি কে?

চঞ্চল হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি নীচে নামি। একা একা রাজপথে আসি। লোকমুখে জানা গেল যে, মনীষী যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি দেহ রেখেছেন। শহরের ভিতর দিয়ে তাঁরই নশ্বরদেহ নিয়ে যাওয়া হল। কথাটা শুনেই মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যেন ছেঁড়া পকেটের ফাঁক দিয়ে মনের অজান্তে একটা টাকা কোন সময় পড়ে গেছে। এখন সেটা জানতে পারলাম।

ভোর চারটায় উঠেছি। যেমন প্রত্যহ উঠে থাকি। প্রাতর্ভ্রমণে এগিয়ে গেছি বিদ্যানিধি মশায়ের 'স্বস্তিকা' ভবনের পিছন ধার অর্থাৎ চাঁদমারীর ডাঙ্গা পর্যন্ত। তারপর হেথা হোথা ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরেছি সকাল সাতটায়। কিন্তু কৈ,—এ হেন দুঃসংবাদ তো কারো মুখ থেকে শুনলাম না। মনে বিস্ময় জাগে। অভাবনীয় ও অবাঞ্ছিত ঘটনা। অনেককে দেখলাম ছুটতে ছুটতে চলেছে রামপুরের শ্মশান ঘাটে, গন্ধেশ্বরীর তীরে যেখানে এই প্রবীণতম মনীষীর চিতা জ্বলে উঠবে। আমারও মনে হল যাই। কিন্তু পারলাম না। বিষণ্ণ অন্তরে বাড়ি ঢুকলাম। স্বচ্ছ থিতানো জলে প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করলে যেমন তাতে ঢেউ ওঠে আমার মনেও সেই রকম আলোড়নের সৃষ্টি হল। সেই ঢেউ-এ ভেসে আসে অতীতের নানা কথা ও কাহিনী। স্মৃতির রোমন্থন করি।

আমার শৈশব সঙ্গী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এক সময় এমন ছিল যখন আমি ছিলাম আচার্য যোগেশচন্দ্রের বৈকালিক সাথী। আমি তখন দশ-এগার বছরের বালক। নূতন চটিতে মামার বাড়িতে থাকতাম। ইংরাজী ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল। সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত আনন। ডান হাতে খোলা সাদা ছাতা আর বাঁ-হাতে একখানা লাঠি। চোখে চশমা। সাদা বেশভূষায় সজ্জিত প্রবীণ মনীষী। বিদ্যানিধি ধীরে ধীরে হাঁটতেন। পিছনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলত একজন নেপালী যুবক। প্রত্যেকদিন বিকালে রায় মশায় তাঁর স্বস্তিকা ভবন থেকে বেড়াতে বেরুতেন। পাকা রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিমমুখো হাঁটতেন। তারপর নূতন চটির সীমানা পেরিয়ে 'পাঁচবাঘা' গ্রামের কাছাকাছি ফাঁকা 'আশ্রম-মাঠে' ঘোরাঘুরি করতেন। এই সময় প্রায়ই স্থানীয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

বিদ্যানিধি মশায়ের সঙ্গে আমাকে উপযাচক হয়ে আলাপ-পরিচয় করতে হয় নি। আমার মত বা আমার চেয়ে ছোট কি দু'এক বছরের বড় ছেলেকে কাছে পেলেই তাকে তিনি আক্রমণ করতেন। তারপর তাকে নানাবিধ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। সেইজন্যে সকলেই তাঁকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। আমিও অপরের দেখাদেখি

তাঁকে দূরে থেকে দেখতে পেয়েই আত্ম-গোপন করতাম। কিন্তু একদিন ধরা পড়লাম। অন্যমনস্ক অবস্থায় পথ চলতে চলতে বিদ্যানিধির সামনে পড়ে গেলাম। দেখলাম তিনি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চুরি করে সরে পড়তে গিয়ে সামনে পুলিসকে দেখলে চোরের যেমন অবস্থা হয়, আমার মনেরও ঠিক সেই রকম অবস্থা। এবার তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলেই যেন বাঁচোয়া! তাই খর-গোশের মত মুখ লুকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। হয়ত ভেবেছিলাম আমি তাঁকে না দেখলে উনিও আমাকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু তা হ'ল না। আমাকে ডাকলেন, —"ওহে খোকা শোন!" কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম কাছে। অতি সন্নিকটে। তারপর একেবারে মুখোমুখী। অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাঁকে নিরীক্ষণ করলাম। এবার আর যাই কোথা? আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন,—"তোমার নাম কি?" আমি আমার নাম বললাম। তারপর আর এক প্রশ্ন,—"তোমার নামের মানে কি?" বলেছিলাম,—"জানি না।" বিদ্যানিধির কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর বেজে উঠে,—সে কি নিজের নামের মানে জান না? যখন যা কিছু দেখবে কি শুনবে বা যা কিছু জানবে তখন তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কিছুই তো জানা দরকার। তা'হলে কি তুমি তোমার স্কুলের ইতিহাস জান না নাকি? স্কুল কখন স্থাপিত হ'ল? কে বা কারা স্থাপনা করলেন? তখন হেড মাস্টার কে ছিল? এ সব জানতে তোমার মনে কি কোন আগ্রহ জাগে না?

বলেছিলাম,—"পরে জেনে নেব। এখন আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খেলতে যাব।" তিনি বললেন,—"তোমাকে তো ছাড়ছি না। এস আমার সংগে বেড়াতে এস।"

মহা মুশকিলে পড়লাম। মনে অস্বস্তি অনুভূত হতে লাগল। অথচ কথা কেটে সরে পড়তেও পারছি না। অগত্যা তাঁর সংগে ধীরে ধীরে হাঁটতে হল। সেইদিনই তিনি আমার বাবার নাম থেকে আরম্ভ করে আমার আগাগোড়া ইতিহাস সবই জেনে নিলেন। তারপর রাস্তার ধারে আমাদের বাড়িটাও চিনে ফেললেন। সারাক্ষণ কেবল প্রশ্নই করতে থাকেন। নানাবিধ শব্দের বানান ও অর্থ জিজ্ঞেস করেন। কোনটা ঠিক হয় আবার কোনটা বা ভুল করি।

এরপর থেকে তিনি প্রায়ই বিকালে আমার সংগী হতেন। কোনদিন ঘরে এসে খোঁজ করতেন আবার কোনদিন রাস্তাতে পাকড়াও করতেন। একদিন আমাকে প্রশ্ন করলেন,—"আচ্ছা 'তাঁহার' শব্দটা ঠিক না 'তাহাঁর' শব্দটা ঠিক?" আমি বললাম, —আমরা তো সবাই 'তাঁহার' বলি। উনি বললেন,—না তা হবে না। 'তাহাঁর' হবে। কেন যে হবে তাও বলেছিলেন। কিন্তু এখন তা মনে নেই। একবার তিনি প্রশ্ন করে-ছিলেন,—"জিতাষ্টমীতে কার পুজো হয়?" আমি বলেছিলাম—"যমরাজের।" কিন্তু উনি বললেন,—"না তা নয়। জিতাষ্টমীতে ইন্দ্রের পুজো হয়।" পুজোর সময় একদিন দুর্গা-মেলায় প্রতিমা দেখতে গিয়ে দশপ্রহরিণী দেবীর দশ হাতের অস্ত্রাদির অর্থ ও তথ্যাদি তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। সাদা ছোট ছোট ফুল। সন্ধ্যাকালে ফোটে বলে সন্ধ্যামণি নামে পরিচিত। এখনও আমাদের এ অঞ্চলের লোকে ঐ ফুলকে সন্ধ্যামণি বলেই থাকে। কিন্তু তাঁর মতে ওগুলো হচ্ছে টগর ফুল। অথচ টগর ফুল নামে এদেশে যে ফুলগুলো পরিচিত সেই ফুলের সংগে এর আকৃতি ও ঘ্রাণের আকাশ পাতাল পার্থক্য। এইভাবে ওঁর সাহচর্যে প্রত্যেকদিন কত নুতন নুতন বিষয় জানতাম। তাঁর সব কথাতেই আমি অবাক হতাম। সবই যেন অদ্ভুত মনে হ'ত।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম,—এ ধারের পাড়াটার নাম 'নুতন চটি' হ'ল কেন? বিদ্যা-নিধি বললেন,—গাঁয়ে ঢুকতে গেলেই সামনে অসংখ্য মুচির ঘর দেখতে পাচ্ছ। এখন আমরা যেমন নানা আকার-প্রকারের জুতো পরি, তখনকার লোক অত রকমের জুতো পরতো না। পায়ে একজোড়া চটি জুতো হলেই তাদের দিন চলে যেত। আর এই-খানের এই মুচিরা প্রত্যেক দিন নুতন নুতন চটির জোগান দিত। এই মুচিদের পূর্ব পুরুষের আমল থেকে এদের চটি জুতোর ব্যবসা চলে আসছে। আর তখন থেকেই এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'নুতন চটি'। তা ছাড়া নুতন চটি নাম-করণের আর একটা কারণ আছে। যখন রেল-পথ ছিল না, মানুষ তখন পায়ে হেঁটে বা উটের গাড়িতে চড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন করতো। বিদেশের ব্যাপারীরা

ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানাবিধ মাল-মসলা সঙ্গে নিয়ে উটগাড়ি বা অন্য কোন যানবাহন করে এদেশ সেদেশ ঘোরাঘুরি করে মাল বিক্রী করতো। যেখানে ঐসব ব্যবসায়ীর দল আস্তানা গেড়ে ব্যবসা চালাত সেই স্থানটিকে চটি বলা হত। বাঁকুড়ায় 'ব্যাপারী হাটে' এইরকম চটি বসত। সেই-জন্যেই ঐ পাড়াটার নাম ব্যাপারী হাট। তারপর ব্যবসায়ীদের দল পুরু হওয়ায় এই নূতন চটি অঞ্চলে আর একটা নূতন চটি বসে। আর তার থেকেই এই স্থানটির নাম হয় নূতন চটি।

এরপরই তিনি আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করে-ছিলেন,—"বাঁকুড়া" নাম কেন হল? এই প্রশ্নের উত্তর "বাঁকুড়ার ভূগোলে" পড়ে-ছিলাম,—"রাজা বঙ্কু রায়ের নামানুসারে 'বাঁকুড়া' শব্দের উৎপত্তি। উক্ত বঙ্কু রায়ের শাসনে সে যুগে বাঁকুড়া শাসিত হত।

যোগেশচন্দ্র বলেছিলেন,—বেলিয়াতোড়ের সন্নিকটে 'বাঁকু রায়' নামে এক অতি প্রাচীন ঠাকুর আছেন। এই দেবতার নামানুসারে জেলার নাম বাঁকুড়া হয়েছে। এ কথাও বলতে পার।

এর পর বহুদিন যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলতাম। জ্ঞানের চর্চা ছেলেবেলায় নীরস বলেই মনে হত। কোন আনন্দ পেতাম না। তারপরে আবার যখন দেখা, তখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। গায়ে স্কুলের গন্ধ তখনও লেগে ছিল।

গ্রীষ্মকাল। মর্নিং ইস্কুল, মর্নিং কলেজ। কোর্ট কাছারি সবই মর্নিং। সেই সময় একদিন প্রত্যূষে যোগেশচন্দ্র বেড়াতে বেরিয়ে ছেলে ধরছেন। রাস্তার মাঝে ছেলেদের আটক করে জিজ্ঞেস করছেন,—কদ্দুর থেকে আসছ? কোন ক্লাশে পড়ছ? নাম কি? ইত্যাদি নানা রকম জিজ্ঞাসা। আমাকেও সেই সময় পাকড়াও করলেন। প্রথমে চিনতে পারেন নি। পরে নাম শুনেই চিনতে পারলেন। বললেন, "হ্যাঁ বরাট? তুমি এত বড় হয়েছ।" আমি হাসলাম। মাথা নুইয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। বললেন, "একদিন আমার বাড়িতে এস; বুঝলে।" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। তারপর গেলামও একদিন। আমি তখন ছোটখাটো গল্প লিখছি। গল্প লেখার খাতাটা নিয়ে ওর কাছে একদিন হাজির হলাম।

চিনতে পারলেন। বসতে জায়গা দিলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, গল্প লেখার ভূতটা আমার মাথাতেও চেপেছে, তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বললেন, "এইসব আজেবাজে কথা বলে বাংলার সাহিত্য ভান্ডার আবর্জনাযুক্ত করতে কে তোমাকে উপদেশ দিল? তোমার কি ক্ষমতা যে সাহিত্য কর।" নিরুত্তরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি ফিরলাম। আমার শৈশব কাল কেটে যাওয়াতে দুঃখ হল। আমার শৈশবাবস্থায় যোগেশবাবুর সুনজর পেয়েছিলাম। সেই সময় কোন গল্প লিখে তাঁকে দেখালে তাঁর রাগতো হতই না, পরন্তু আনন্দিতই হতেন হয়ত! অথবা আনন্দিত না হলেও নিরুৎসাহ করতেন না। সেইদিন বুঝলাম, শৈশবের কোমল মাধুর্য প্রবীণের কাম্য ও আকর্ষণীয়।

বাংলার প্রবীণতম মনীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁর সাতানব্বই বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যে "ডক্টরেট" উপাধিতে ভূষিত হলেন। তা আজ প্রায় দু তিন মাস আগেকার কথা। বার্ধক্যের জরা-ভারে গমনাগমন শক্তি রহিত, সর্বাঙ্গ শিথিল, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ও শ্রবণশক্তি হীনতর; কিন্তু এই বয়সেও তিনি বাণীর চরণ বন্দনায় পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছিলেন। তিনি বাণীর বরপুত্র। তাই তাঁর সৃজনীশক্তি অটুট ছিল।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বেই যোগেশচন্দ্রকে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করে তাঁর মনীষাকে স্বীকার করেছেন। জীবনের সমগ্র মূল্যবান সময় তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে কাটিয়েছেন। কটকেই তাঁর বাসস্থান ছিল। তারপর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে নূতনচটি পল্লীর পূর্বভাগে "স্বস্তিকা" ভবনে কাটালেন। শেষ নিঃশ্বাস এইখানেই ত্যাগ করলেন।

॥ ১২ ॥

কুমায়ুনে

গাগর গিরিশ্রেণীর নীচে নীচে পথ চলে এসেছে অনেকদূর। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখায় প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মানুষের পায়ের দাগ চলে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেতগুলি এক একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অবধি স্তরে স্তরে সাজানো।

'কাইণ্ডি' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অরণ্য সীমানার গা বেয়ে 'গাধেরা' নামক গিরিনদী ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। নানাবর্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাঙ্গভরা। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কষ্টিপাথর খুঁজতে আসে নানান দেশের লোক। ওপারে বনখেজুরের অরণ্য, তারই সঙ্গে চীড়গাছের জটলা। উপত্যকার রঙীন পাখীরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে স্নান করতে ব্যস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্ট খামারটিতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছাকাছি নেমে এলে সংসারযাত্রার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বন্য কৌমার্য—চারিদিকে সতেজ তারুণ্য। মুগ্ধচক্ষু কেবল যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়,—এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে মন বসাবার চেষ্টা পায়।

কুমায়ুন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রুত। অনেক পর্যটক আর পণ্ডিত বাইরে থেকে এসে বলে যায়, কুমায়ুন প্রাচ্যের ভূস্বর্গলোক। কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী,—ভারতের ললাটে কুমায়ুন যেন বৈদুর্যমণির মতো ঝলমল করছে। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গাড়োয়াল, মধ্য-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল; দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হোলো গাড়োয়ালেরই সীমানা। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, প্রাণীশূন্য তুষার-উপত্যকা, ভয়ভীষণ অরণ্যানী, ভয়াল-গভীর খদ, বন্য পার্বত্য নদীর উন্মত্ত রঙ্গ,—এরা এই ভূভাগকে পরমাশ্চর্য করে রেখেছে। আবার অন্যদিকে পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে ঋষির তপোবন, নিঃসঙ্গ উপত্যকায় হরিণ আর ময়ূরের আনাগোনা,—পতঙ্গ প্রজাপতি দলের বিশ্রম্ভালাপ। গিরি-নির্ঝরিণীর সুস্বাদু জল, বনে বনে ফুলের শোভা, গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল। জন-মনুষ্য যে পথে নেই, হঠাৎ ফিরে দেখো—সাধু বসে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত জেবলেছে ধুনি, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ডালপালা আর পাথরের সাহায্যে 'কুটুরী' বানালো সন্ন্যাসী,—মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করে রইলো 'পিপল' গাছ,—সেখানে সে রয়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছু নেই, দাবিও জানায় না, কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভুরা' কিংবা চরসের কল্কেতে আগুন দিয়ে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সন্ন্যাসী তার বুক ভরে। দেখতে দেখতেই 'অসার খলু সংসারঃ।' জয় শিব শম্ভো! ভিজা 'সাঁপি'-জড়ানো আঙ্গুলের মতো সরু কল্কেটি হাত-ফেরতাই হয়ে চললো কিছুক্ষণ। কেউ বা বললে, 'অওর এক ছিলম্ বনা দে।'

ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিদ্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় বুঁদ হওয়া চাই, নৈলে সংসারকে 'মায়া' বলে প্রতীতি হবে কেমন করে? ছেলেপুলে, কর্তা-গিন্নী, ঘর-সংসার,—এদের স্বীকার করি ,সেইটেই ত মায়া! তারই বাঁধন মনে মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্রে প্রলয়-বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মধুর প্রলয়ের মধ্যে হয়ত বা এসে বসলেন গ্রামের গৃহিণী সাধুর আকর্ষণে। তিনিও ওই কল্কেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্য সংসারের মায়াবন্ধ জীব সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামে সাধু এসে পৌঁছলেই গ্রামের পুণ্য, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই হোলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র্য। সাধুর অবমাননা কুমায়ুনে নেই।

মেঘ করে এসেছে পাহাড়ের কোলে কোলে কিংবা চূড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে পাহাড়ে। 'ভেড়ী-বকরিরা' গিয়েছে অনেক দূরে, কিন্তু তারা ওই মেয়ের গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শুনে তারা মুখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চড়ে উঠে এলো ছোট ছেলেমেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো এ পাহাড়ে আর ও-পাহাড়ে।

বয়েল্-গাড়ি কোন্ দূর দেশ থেকে ছেড়েছে একমাস আগে। শরৎকালের শেষ দিকে পাহাড়ী শ্রমিক তার সংসার নিয়ে উঠেছে ওই গাড়িতে। দশ-বিশখানা গাড়ি এক সঙ্গে যাত্রা করেছে এক মুলুক থেকে অন্য মুলুকে। ওরা চলেছে ফসল কাটতে ভিন্ দেশে। দুমাস ধরে চলবে ওদের

গাড়ি। ওরা শ্রমিক। গাড়ির ভিতরে থাকে শিশু কিংবা মেয়ে। পাহাড়ে পাহাড়ে রাত্রিবাস, গাছের ছায়ার নীচে রান্নাবান্না আর বিশ্রাম, গাড়ির নীচে শয়ন-শয্যা পাতা। লাঠি আর সড়কি নিয়ে পুরুষ পাহারা দেয় রাত্রিকালে—পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গরু-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা বাঁধা। কোনটা আক্রান্ত হলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে ওরা এই পথে আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বছরের সংস্থান করে নিয়ে আসবে। যেতে যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ির মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে এবং বলদগুলি আপন মনে গাড়ি টেনে টেনে চলেছে পাহাড়ের সংকটসংকুল পথের বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁধে কাঁধে সংসার যাত্রা। ওরই মধ্যে কোনও নারী প্রসব করেছে, করে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা পাহাড়ী চিতা ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়ত বা কোনও গাড়ির একটি বয়েল্ হঠাৎ মারা পড়েছে,—ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা-জোয়ারের ডেলা কিংবা 'মাক্কাই' পুড়িয়ে খেয়ে ওরা চলেছে আপন পথে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে; জন্ম-মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশেহারা করে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমানকালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একটু ফিরলেই আবার সেই নিবিড় স্তব্ধতা। কোনও একটি উড্ডীন পাখীর ডাক, সরীসৃপের সাড়া, ঝিল্লীর ঝনক—সেই স্তব্ধতাকে আরও গভীর করে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিছু যেন দেখছি আশে পাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি একটি বিচিত্র সংসারে। প্রতি ঝোপের অন্ধকারে, প্রতি গুহার গহ্বরে, প্রতি বৃক্ষের কোটরে—আছে কেউ, যাকে চিনিনে, জানিনে, বুঝিনে। একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহসা যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাচ্ছিনে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাই সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমায়ুনের পশ্চিম সীমানা বোধ করি তমসা নদীর দ্বারা চিহ্নিত। 'বন্দরপঞ্চ' পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপুরে এসে তমসা নদী মিলেছে যমুনার সঙ্গে। এই বন্দরপঞ্চেই হোলো যমুনোত্রিতীর্থ। হরিপুর থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতায় এবং সেখান থেকে সেই পথটি সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে 'রাওয়াইন' ও 'পাখড়ি' হয়ে কিন্নরদেশের দিকে শতদ্রুতীরবর্তী ওয়াংটায়। পাখড়ি থেকে ওয়াংটার পথ খুবই দুঃসাধ্য। কুমায়ুনের উত্তর ভূভাগ হোলো পশ্চিম তিব্বতের সীমানা। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালার প্রায় দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে কুমায়ুনের মতো এত অধিকসংখ্যক ঘন-সন্নিবিষ্ট তুষারচূড়া অন্য কোথাও নেই। এমন গৌরব-গরিমা, এমন সৌন্দর্যশ্রী, এমন গিরিনির্ঝরিণীর শোভা, এমন অধ্যাত্ম আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়ুনের প্রতি
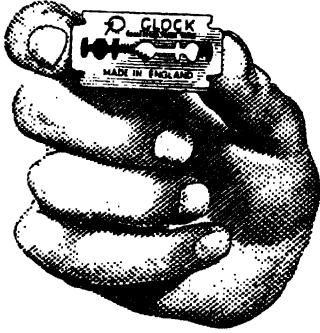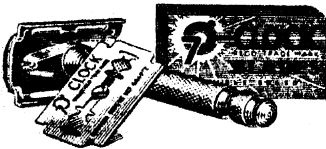
পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলধারা গঙ্গার মতো, প্রতি প্রস্তরখণ্ড বিগ্রহের মতো, প্রতি গুহাটি মন্দিরের মতো। সাধু, মহাত্মা, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, সেবক—এদের নিয়ে কুমায়ুন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়ুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পথটি কুমায়ুনেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়ুনে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে তুষারচূড়াগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের পূজো পায়, তাদের মধ্যে যমুনোপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, শতোপন্থ, বদরিনাথ, নীলকান্ত, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি, কামেত, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, পঞ্চচুলী, নন্দাঘুণ্টি, নন্দকোট—এইগুলি অতি প্রধান। এর বাইরে আছে শত শত গিরিশিখর এবং শত-সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধুর আশ্রম, আছে সন্ন্যাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটীর, আছে মৌনীর গুহা। দার্শনিক, পণ্ডিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যোগী, নাগা, ভাবুক, সত্যাশ্রয়ী, সর্বত্যাগী, নৈরাশ্যবাদী, আশাহত, স্বার্থপ্রণয়ী, সন্তানশোকাতুর, পুণ্যকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ—কে নেই কুমায়ুনে? কুমায়ুনের আকাশ নিত্য 'শিবশম্ভোর' নামে মন্দ্রিত, প্রতি গিরিনদীর কলতানে গঙ্গার স্তব মুখরিত, প্রতি পাখীর কণ্ঠে দেবতার মন্ত্র গুঞ্জিত,—কুমায়ুনে ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থলোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায় তুমি জরো জরো,—এসো কুমায়ুনে, শীতলশ্বাস মধুর সমীরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে বুলিয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পঙ্গু, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খুঁজে পাবে। এখানকার মৃত্তিকায় চন্দনের গন্ধ, তপোবনের কুসুমশয্যায় দেবসৌরভ, লতায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি, মন্দিরে মন্দিরে উদাত্ত ওঁকারধ্বনি। প্রতি তুষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাঁকে শিব ও শক্তি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কৌশিক', কেউ বা বলে 'কৌশল্যা'। ছোট্ট রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি, —আশে পাশে সামান্য পাহাড়ী বস্তি। তারপরে পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরম পানি'। আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালা নদী ছাড়িয়ে আদিম অতি প্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়ায়। মন কেঁদে উঠেছে কতবার মায়ার কাঁদনে। ভিতরের পাখী পোষ মানেনি কোনোদিন। হিমালয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ডাক দিয়েছে বিদীর্ণকণ্ঠে আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহঙ্গ নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগৎকে সে আবিষ্কার করছে থেকে-থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘুরে সামনেই পাওয়া গেল 'খয়েরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমায়ুন, ওপারে মধ্য কুমায়ুন। 'খয়েরনা' হোলো নৈনীতাল ও আলমোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতু। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম 'পিল খোলি'র ঘাটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলাম ঠুকে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান থেকে চলে গেছে রাণীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চব্বিশ বছর ধরে নতুন ভাষা দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে, নতুন কালের ঝরনা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকটু মসৃণ হয়েছে,—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তার গতির দাগ,—তবু অজানা রয়ে গেল যা কিছু প্রাণের প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শুনে গেছি যেন কতবার কার পায়ের ভাষা, নদীতে-নদীতে আগমনী, ঝাউ-পাইনের বনে-বনে মন্ত্র পাঠ,—আর চারিদিকের অনাদি অনন্ত অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কার পরম আহ্বান। জানিনে কিছু, ভাষা ছিল না কণ্ঠে, নির্দেশ দিল না কেউ, খুঁজে পেলুম না কিছু কোনোদিন,—কেবল আমার মর্মলোকের বাসা-ছাড়া সেই পাখি এক আকাশ থেকে অন্য আকাশপথে রক্তঝরা কণ্ঠে ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হয়ে এলো!

চড়াই পথ উঠে এলো অনেক দূরে। দিগন্ত এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ সরে গেছে। হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিশিখরে। উত্তরপথের বাঁক পেরিয়ে 'রাণীক্ষেত' শহরে এসে পৌঁছলুম। হিমালয়ের তুষারচূড়ারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পুরনো বন্ধু যেন দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আলিঙ্গনে। এবার এসে দাঁড়ালুম অনেকদিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের স্বারা যেন মধুর অভ্যর্থনা জানালো 'রাণীক্ষেত'—ভালো আছ ত?

মনে মনে জবাব দিতে হলো,—না, ভালো নেই। কোনোদিনও ছিলুম না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তার চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত, বুক বেয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বলি রেখা, সর্বাঙ্গে জরা! চেয়ে দেখো মুখ তুলে।

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের লেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?"

হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লুম আধুনিক উপকরণের মধ্যে। ঠিক বলা কঠিন,—বোধ হয় রাণীক্ষেত সমগ্র কুমায়ুনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর। মন নেচে উঠলো স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে। অনেক মানুষ দেখছি একত্র, পাকা ঘর-বাড়ি সর্বত্র, পাইনের বনে-বনে সাহেব-সুবোর বাংলো, এখানে ওখানে সরকারী ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর স্ট্যাণ্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়িটি আমার পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোশাক নিয়ে এসেছি। একা নই, সংগে আছেন বন্ধুবর শশাংকমোহন চৌধুরী। তিনি দড়াদড়ি ছিঁড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মঞ্জিলে'র দোতলায় একটি ঘর নিলুম। সমস্তই এবার সহজ-লভ্য। এবার পাচক আসুক, চাকর আর চাপরাসী আসুক।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো। চার-পাই খাটিয়া জুটলো কপালে,—একেবারে স্বর্গরাজ্য। ভোজ্যবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের প্লেট সাজানো হোটেল, পেয়ালা-পিরিচের ঠুনঠুনানি, বেতারে বোম্বাই গান, দোকানে-দোকানে রঙগীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্বসিত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস। কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কৌতূহল দেখছিনে কোথাও,—চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খুশি কেনো, যা চাও এনে দিচ্ছে, যাকে খুশি ডাক দাও, যখন খুশি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশস্ত উপত্যকার টুকরো রাণীক্ষেতে কোথাও নেই। এর ঠিক উল্টো,—শিলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দার্জিলিংয়ের ওই চাঁদমারী বাজারও অনেকটা প্রশস্ত সমতল, আরেকটু নেমে গেলে লেবংএর ময়দান। শিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রাণীক্ষেত সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। হয় ওপরে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উত্তরাই পথে একটু নেমে গেলে সামান্য সমতল,—নৈলে রাণীক্ষেত শহর হলো পাহাড়ের গা। পথের দুধারে দোকান, উপর দিকে অভিজাত পল্লী, নীচের দিকে জনবসতি। সমুদ্রসমতা থেকে রাণীক্ষেত হলো ছয় হাজার ফুট উঁচু এবং কাঠ-গোদাম স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশস্ত সমতলের ক্ষুধা চিরস্থায়ী হয়ে রাণীক্ষেতে থেকে যাবে, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এটি বরদাস্ত করেনি। রাণীক্ষেতের প্রচুর অরণ্য, জলের সুবিধা, প্রাকৃতিক শোভা এবং জল-বায়ুর আশ্চর্য গুণপনা লক্ষ্য করে এক-কালে লর্ড মেয়ো ভেবেছিলেন, শিমলার বদলে রাণীক্ষেতকে বড়লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহরটিকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ সৈন্য-সামন্তের ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং এখানকার গোরা হাসপাতালটি ভারত-বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। একান্তভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রাণীক্ষেতের উপর-তলার দিকে কুচকাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গল্ফ খেলার ময়দান নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্প-নগ্না তরুণী মেমদের চলাফেরার জন্য পুষ্পবীথিকা, আমোদ আহ্লাদের জন্য নিভৃত নিকুঞ্জ, শীতের দিনে মধুরহাসিনী-দের স্নানের জন্য স্ফটিকাধার তপ্তধারাকুণ্ড এবং গিরিশিখরচূড়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে জ্যোৎস্না রাত্রি যাপনের আনন্দের জন্য রক্ত-কমলদলকে আনা হোতো অনেক দূরের থেকে। তাদেরই ছিন্ন পাপড়ির অবশেষ আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে কোনো কোনো শূন্য বাংলোর আশে-পাশে।

"জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে
সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র
চিহ্ন রাখিবে না।"—

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে বলে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তার রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ যেমন অতি যত্নে অলঙ্কৃত করে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি। মুসৌরী, নৈনীতাল, ডালহাউসী, শিলং, শিমলা,—সর্বত্র ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেখানটিতে দাঁড়ালে হিমালয়ের শোভা সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নিয়েছিল। শিমলায় 'মাসোরা', নৈনীতালের টিপেন্-টপ, মুসৌরীর লাণ্ডুর, দার্জিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপর তলাটা, এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলাটি,—ইংরেজের রুচি সর্বত্র সমানভাবে কাজ করেছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বত্য শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দুরা ওদের শাসনযন্ত্রে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল আর মুসলমানরা মোতায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়িতেই হোক, আর লাটপ্রাসাদেই হোক—ওদের পাচক, ভৃত্য, আরদালী, চাপরাসী ইত্যাদি সবাই মুসলমান। এর প্রধান কারণ হলো গরু। গরু খায় এরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহারের ব্যাপারটা খুবই প্রধান। সুতরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের রুচির সংযোগ-সেতু। ওদিকে হিন্দুরাও শূকর ঘাঁটে। অনেক হিন্দু শূকর খায় এবং ইংরেজও শূকরভক্ত। অতএব শূকরেরাও অনেক সময়ে হিন্দু আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। মুরগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে বসে গেছে। যাই হোক, আগে অতটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু প্রত্যেকটি আধুনিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি মুসলমান সমাজের সন্ধান পাই। তাদের অধিকাংশই আগে ছিল মাংস-বিক্রেতা, রুটিওয়ালা, হোটেল-বয়, বাবুর্চি, আরদালি ইত্যাদি। সমগ্র ভারতীয় হিমালয়ে মুসলমানের দেখা মেলে খুবই কম, কিন্তু শহরে এলেই ওদেরকে এই সব কাজে নিযুক্ত দেখা যায়। ইংরেজ চলে যাবার পর মুসলমানদের অনেক কাজ চলে গেছে। এ আলোচনায় আমি কাশ্মীরকে বাদ দিচ্ছি।

রাণীক্ষেত শহরটি অনেকটা [illegible] বারান্দার মতো। উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অনাবৃত। এই বারান্দায় দাঁড়ালে তুষারমৌলী হিমালয়ের অনেকগুলি চূড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরিনাথ, হাতীপর্বত, গৌরী পর্বত, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও নন্দকোট—একটির পর একটি সাজানো। কখনও দুগ্ধ-শুভ্র, কখনও গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়। রূপে, বর্ণে, সৌন্দর্যে, মহিমায়,—সে যেন নিত্যকাল ধরে রাণীক্ষেতকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। বস্তুত কুমায়ুনের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিগ্বলয় প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

রাণীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর-পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চলে গেছে, এইটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ—'বদরিনাথ মার্গ'। একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হৃষিকেশ থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে ঠিক এই পথের মুখে পৌঁছতে চার শো মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিত্যক্ত, কারণ 'কোটদ্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। রাণীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সোজা বদরিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড়। আজ আর এ পথে কেউ যায় না। পুরনো কথা স্মরণ করে আমি গেলুম কিছুদূর এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে। চিনতে পারলুম না বিশেষ কিছু,—কেননা চলে গেছে অনেককাল। পথ ভেঙে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, শ্রী নেই কোথাও। বস্তির চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিত্যক্ত চালাঘর। কাঠের খুঁটি গেছে ভেঙে, ছাদ খসে পড়েছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতান্ত দেহাতী ছাড়া যাত্রীরা কেউ আর এ-পথ মাড়ায় না। মাইল দেড়েক নেমে গিয়ে পাওয়া গেল 'কেটুলি' আর 'কিলুকোট' চটি। এক আধটি দোকান, দু'একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিলুম। আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কৌতূহলে এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিস্ময়। আকাশের অগ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্না-কিরণে, ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় আর অগ্নিবাসনায়, ভ্রান্তি-প্রমাদে আর আশীর্বাদে,—এই দুঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রলাপে উদ্বেলিত।

পথ প্রশস্ত ও প্রসারিত, কিন্তু তার 'বেন্ড'গুলি বিপজ্জনক। একটির পর একটি বেন্ড। শুধু ভয় করে না, সমস্ত মন ও শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। একটু অসতর্কতা, একটু অনবধানতা, হিসাব-বোধের ঈষৎ গরমিল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপজ্জনক পথ আরম্ভ হয় 'সাঙখালি' এবং 'কালিকা' এস্টেট পার হয়ে গেলে। পথ সুন্দর, মসৃণ, চিক্কন—কিন্তু উদ্বেগজনক। প্রতি বিপদ-সংকেতের মুখ থেকে গাড়ি যেন নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। নীচের দিকটায় অনেক সময় তল দেখা যায় না। যখন দেখা যায়, তখন শীতের দিনেও কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে চৌড়-

ইনের অরণ্য, মাঝে মাঝে নদীর পাথুরে —প্রকৃতি যেন সর্বত্র ইন্দ্রজাল বুনে খছে। বাঁ দিকে মাঝে মাঝে তুষারশৃঙ্গ-লির সুদূরবর্তী শোভা, মাঝে মাঝে স্তব্ধের আবরণের বাইরে অমর্ত্য মহিমা, মাবতীর সিংহদ্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এলুম প্রায় শী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ য়েছে উত্তর-পশ্চিমে। সকালের তরুণ র্যের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারি-কের পাহাড়ের নীচে নদীর সুবিস্তৃত ই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলছে। ত্যতার সীমানা থেকে অনেক দূর। াকাল যেন এখানে স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে ড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে-কোলে সেই চিত্র বর্ণের পাথর, দূরে দূরে চির-ৌমার্য ব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন তিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-চে শিশু মানব আর মানবী যুগ থেকে গান্তরে আপন আপন অন্ন খুঁটে খেয়ে লছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশুর খেও যেন সৌরনিঃস্বব সৃষ্টিরহস্যের রম বিস্ময়।

একে একে 'পাটুলিবাজার', 'সাকার', নান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছি। ন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে নরনারী ও শিশুর খের আকার বদলাচ্ছে। গরুর মুখের ও রদাঁড়ার ভঙ্গি, শিংয়ের আকার ও গঠন, য়েপুরুষের মুখের চোয়াল এবং গালের ড়—একে একে ভিন্ন চেহারা নিচ্ছে।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমানাতেও এসে পেঁৗছেছে। পরিবর্তনের এই দ্রুত-গতি দেখে অনেক সময় বিস্ময়বোধ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি 'রানুমান' ও 'টানা' গ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বস্তি-বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদূর।

হিমালয়ের গহনলোকে এটি একটি বিস্তৃত অধিত্যকা এবং সমস্ত পাহাড়ের দ্বারা অবরুদ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিস্তার লাভ করে এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছ কাটা গুঁড়ি, পাথর এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ বাইরে চালান যায়। লগ্‌গুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি কাঠ এবং পশুর খাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পেঁৗছলুম। এটি ক্ষুদ্র শহর এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রান্তে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হলো স্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। চারিদিকেই পাহাড়, শহরটি শান্ত। মন্দিরের পিছনে ক্ষেতখামার। কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়তলীর আশে-পাশে শিব স্থাপনা। সোমেশ্বর শহরের ভিতর দিয়ে আন্দাজ চার মাইল দূরে হলো 'ছেন্দাগ্রাম'। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শুভ্রায়তন শিব-মন্দির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গান্ধী আশ্রম'। তারপরে ছাড়িয়ে চললুম কোশীর একটি পুল। আমরা কোশী ধরেই যাচ্ছি। নদী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ায় না। জল হোলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি, আবার নামছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উতরাই। আমরা 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ার নীচে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এ অঞ্চল বনময় নির্জন। বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাৎ এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষারচূড়া,—ত্রিকোণাকার 'ত্রিশূলের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মতো মনে হচ্ছে, একথা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। নিজেদের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করছি, কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন সুষমামণ্ডিত, এরূপ কচিৎ দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইন বনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে সুদূর গভীর অধিত্যকা অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে। এই পঁচিশ মাইল অধিত্যকা-প্রান্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শস্যপ্রান্তর শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবল-তুষার মৌলী ত্রিশূলশৃঙ্গের বিরাট সর্ব-কালজয়ী গৌরব। আনন্দে আমাদের কণ্ঠ শুকিয়ে উঠেছে বার বার।

উতরাই পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক সময়ে আমরা এসে পেঁৗছলুম 'গরুড়' শহরে। এইটি হলো এ অঞ্চলের শেষ শহর —এর পরে কোনও চাকার গাড়ি হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অব-রোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কাত্তুরী' অধিত্যকা, কিন্তু সমুদ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু—সুতরাং একে মালভূমি বলতে অসুবিধা নেই। 'গরুড়ের' বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম, কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই 'গরুড় নদী'। আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলুম। 'কাত্তুরী' রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কাত্তুরী' বলা হয়।

তিনটি নদী হিমালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে। 'গরুড়' ছাড়া আর দুটি হলো 'কোশী' এবং 'গোমতী'। আমরা যাচ্ছিলুম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইল খানেক পথ। 'কোশী' পুলের পর এখানে আমরা গরুড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হলুম। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবনকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা বিশাল এক একটি অতিকায় পাথর, উপলা-হত নীলাভ স্রোতস্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে রঙীন পাখিদলের কুজন-গুঞ্জন,—এদেরই মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। মুখ বুজে চারিদিকে যেন স্তব পাঠ চলছে।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গোমতীর লৌহ-সেতু অতিক্রম করে বৈজনাথের মন্দির এলাকায় এসে দাঁড়ালুম। চেয়ে দেখছি হিমালয় থেকে গোমতী প্রথম নেমেছে মর্ত্যে বিশাল গর্জের বাঁধন ভেদ করে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাথের গৈরিকবর্ণ প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে। এখানে নদীর দুই পারে মন্দির। বৈজনাথের 'তল্লীহাটে' লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষস দেউল'। এখানে মোট সতেরোটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়: সমস্তই প্রাচীন পাথরের, জোড়জোড় একেবারে আলগা—বড় একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা,—তারপরে হয়ত আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এইভাবেই নাকি চলে এসেছে প্রায় সাত আট শো বছর। এ মন্দির প্রথম নির্মিত হয় চন্দ্রবংশের কোনও এক রাজার আমলে। তার কোনও ইতিহাস আছে কি না জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি 'বৈজনাথকে'—এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদ্যনাথ'ও বলা হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'বামনী' ও 'কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শ্বেতবর্ণা 'পার্বতী'র মূর্তি কেউ বা বলেন অন্নপূর্ণা—মূর্তিটি জয়-পুরী ছাঁদে নির্মিত—কিন্তু এমন সুশ্রী সুন্দর ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেখেছি কি না মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নিকটবর্তী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড় মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দুর্গ, 'ভ্রামরী দেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হোলো তেরো মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাড়োয়ালে। প্রায় বাইশ বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের আশ্রমে বসে সন্ন্যাসিনী নারায়ণ গিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হোলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে—যেখানে 'পিন্দার' গঙ্গা ও অলকানন্দার সংগম। 'বাগেশ্বর' জনপদটি হোলো এই গোমতী এবং সরযূর সংগমস্থলে অতি রমণীয় অঞ্চল। সেই সংগমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ ভৈরবনাথ, গংগামাতা এবং দত্তাত্রেয় মন্দির। সরযূর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝুলার মতো কাছিবাঁধা সাঁকো,—তারই নীচে সরযূর গর্ভে রয়েছে অতিকায় 'মার্কণ্ডেয় শীলা'—যেখানে তপস্যাসনে বসে ঋষি মার্কণ্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গা সপ্তশতী' পুরাণ। লোকপ্রবাদ এই, সরযূ নদীর এই সংগম স্থলে 'দক্ষ হিমবান' তাঁর কন্যা দুর্গার সংগে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বাগেশ্বরে ভুটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। তিব্বত থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্যসম্ভার এখানে এসে পোঁছয়।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। 'যজ্ঞেশ্বর' আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে আছেন অনেক তপস্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ এবং শিবরাত্রি ও বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসলমানরা এই জনপদটিকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক মূর্তি ধ্বংস হয়। 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ভিন্ন সেখানে আছে একটি মস্ত গুহা, তার মধ্যে নানা দেবমূর্তি খোদিত। অন্ধকার গুহার ভিতরকার কঠিন ঠাণ্ডায় অদ্ভুত রকমের প্রাচীন পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে-দেওয়ালে মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীও খোদিত।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পথটির কথা বলছিলুম, সেটি ক্রমশ দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর 'গোয়ালদম' নামক একটি পার্বত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তর প্রান্তে সম্ভবত মূল পিন্দার গংগার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পুনরায় উত্তরপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পথটি ধীরে ধীরে চলে গেছে নদী পার হয়ে। পূর্বদিক থেকে পিন্দার গংগারই অপর একটি প্রশস্ত উপ-নদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্তুংগ এবং প্রায় দুঃসাধ্য শৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এই

দুর্গম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিশূল পর্বতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তরে। ত্রিশূলের দক্ষিণে হোলো পিন্দার গঙ্গা ও হিমবাহ এবং উত্তরে ঋষিগঙ্গা—যে-গঙ্গা গিয়ে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গায়। ভারতের সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়টি উচ্চতম চূড়াকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি। প্রথমটি ত্রিশূল—উচ্চতা ২৩,৫০০ ফুট; দ্বিতীয়টি নন্দাদেবী—২৫,৬৪৫ ফুট এবং তৃতীয়টি হোলো দ্রোণগিরি—২৩,১৮৪ ফুট। কাশ্মীরের নাঙ্গা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমান ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হোলো, নন্দাদেবীর চূড়া।

সম্প্রতি ত্রিশূল পর্বতের হিমবাহের প্রান্তবর্তী 'রূপকুণ্ড' নামক একটি তুষার সরোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট নাড়াচাড়া করছেন। 'রূপগঙ্গার' তীরবর্তী এই তুষারাচ্ছন্ন রূপকুণ্ডের আশেপাশে বহু সংখ্যক মানুষের 'কঙ্কাল' সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কঙ্কালগুলি বছরের মধ্যে দশ মাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে; কেবল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তুষার বিগলনকালে তারা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগেকার মানুষ কেউ জানেন না, কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তাও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পরাজিত সৈনাসামন্তের দল,—পলায়মান অবস্থায় এদের উপরে অতিকায় হিমবাহের আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এরা ছিল তীর্থযাত্রী। ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'ত্রিশূলী' নামক অঞ্চলে গিয়ে এই তীর্থযাত্রীর দল নন্দাদেবী তথা গৌরীদেবীর পূজো দিতে চলেছিল, এমন সময় তারা তুষারঝঞ্ঝা ও বর্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে ত্রিশূল পর্বতের দিকে আজও প্রতি বৎসর একদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যায় 'ত্রিশূলী' তীর্থে। এদের নাম 'নন্দাজাত'। এরা কখনও সেখানে পৌঁছয়—পৌঁছয় অতি কম, কেননা তুষার বর্ষণের সংকেত পেলেই অভিযানে বিরত হয়। বিগত ত্রিশ বছর আগে একটি যাত্রীদল সাফল্যলাভ করেছিল। তারপর আবার একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এই 'ত্রিশূলী' তীর্থের অন্তর্গত 'রূপকুণ্ডের' ধারে শুধু যে এই কঙ্কালগুলি পড়ে আছে তাই নয়, ওদের নিয়ে নানাবিধ প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং লৌকসঙ্গীতও নীচেকার অঞ্চলে প্রচলিত। ওরা যে তীর্থযাত্রী ছিল, এবিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গবর্নমেণ্টের নৃতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্ত মজুমদার মহাশয় সদলবলে গিয়ে 'রূপকুণ্ড' এলাকায় ঘুরে এসেছেন। তিনি কঙ্কালগুলিকে দেখতে পাননি, কারণ তারা প্রায় পনেরো ফুট গভীর তুষারের নীচে জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনেও তখন সমাধিস্থ। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিদ্ধান্ত করেন যে, রূপকুণ্ডের নরকঙ্কালগুলি 'ত্রিশূলী' তীর্থেরই অভিযাত্রী ছিল। এসম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এই তদন্ত এবং গবেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা যাচ্ছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন তুষারাবৃত সরোবর 'গৌরীকুণ্ড' দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। রূপকুণ্ডেও এক প্রকার জমে থাকে বছরের অধিকাংশ কাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ওর চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়ালদাম' হয়ে 'রূপকুণ্ড' পৌঁছতে এক সপ্তাহ লাগে।
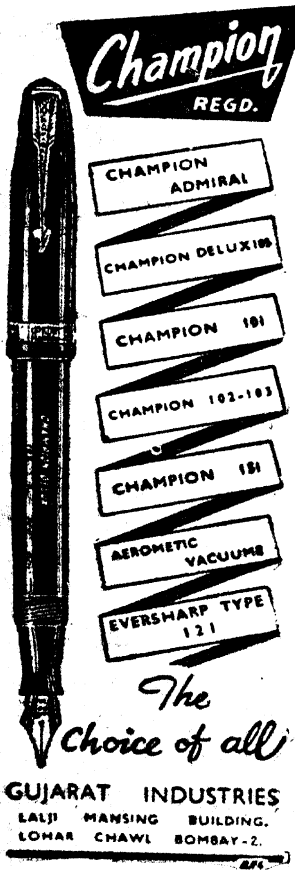
'কৌসানীর' নীচে এসে আমরা দাঁড়ালুম। পথ চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারিদিকে নিঃঝুম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোস্টআপিস, তার পাশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপরা শীর্ণকায় পথপ্রদর্শককে পাওয়া গেল।

শশাঙ্ক এবং আমি চললুম চড়াই পথ ধরে। চড়াই সামান্য, হয়ত মোট শ'তিনেক ফুট উঁচু হবে। চীড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ চূড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দাজ করতে পারিনি। নীচের দিকে যে সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে ছমছমে ভাবটি ছিল, উপর দিকে উঠে ধীরে ধীরে আকাশ যেন তার সমস্ত অর্গল খুলে সামনে দাঁড়ালো। সেই আকাশপথ কুমায়ুনের গিরিশৃঙ্গ-চূড়ায় দিয়ে না দাঁড়ালে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পৌঁছলুম এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হোলো একটি বৃহৎ সুসজ্জিত এবং আধুনিক ডাকবাংলারই প্রাঙ্গণ। মানুষের সমাগম কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠবার আগে ছিন্নজীর্ণ পোশাক পরা যে কৃশকায় লোকটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, তার চোখে মোটা চশমা এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একটু আনত। কথা বলে কম এবং অনেকটা যেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাক বাংলোর সিঁড়ির উপরে তুললো, তখন জানলুম, সে এখনকার খানসামা তথা চৌকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত ছিল, যখন আমরা উত্তরদিকে ফিরে দাঁড়ালুম। বস্তুত সমুদ্রে সাঁতার দিলে সমুদ্রের শোভা উপলব্ধি করা যায় না। হিমবাহ দেখেছি, তুষার-নদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্যে রাত্রিবাসও করতে হয়েছে বার বার,—কিন্তু তখন তার শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা করার দিকেই ঝোঁক থাকে অনেক বেশী। কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। গগনচুম্বী ত্রিশূলশৃঙ্গ যে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে, নীচে থাকতে আমরা বুঝতে পারিনি। কিয়ৎক্ষণের জন্য দুজনেই আমরা হতচেতন ও বিমূঢ় হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলুম। আমরা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে তখনকার মতো চলে গেল।

আনন্দে আর উল্লাসে শশাংকর দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ডাক বাংলোর ভিতরে ঢুকে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'বোর্ডিং হাউসকেও' হার মানায়। বড় বড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেব্‌ল, অনেকগুলি খাট-পালংক, অসংখ্য ফায়ার-প্লেস, মস্ত বড় ডিনার টেব্‌ল, ভালো ভালো কুশন চেয়ার, মাথার উপর টানা পাখা, সুসজ্জিত বাথরুম, বহুমূল্য কার্পেট দিয়ে প্রত্যেক হল-এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব—প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দুজনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস এই একটি বারান্দায় বসে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দুঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিয়েছে, কারও কথার আঘাতে কখনও বুকের মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠুর বঞ্চনায় জীবনকে কখনও শূন্য মনে হয়েছে, এই বারান্দা থেকে উত্তর হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকের মধ্যে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের পৃথিবী নীচেই পড়ে থাক, এই স্বর্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা রইলো না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা পাকা করে গেল।

চূড়ার উপরে বারান্দায় বসে আমাদের সময় কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইজিচেয়ারে বসে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে,—তিনি মহাত্মা গান্ধী। এই বারান্দাটিতে বসে বসে অতি যত্নে তিনি তাঁর 'অনাসক্তিযোগ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। বোধ হয় অনাসক্ত ভাবনার এমন একটি নিভৃত ক্ষেত্র হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঈশ্বরকে যারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়, এখানকার সন্ধান বোধ হয় তারা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ডাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ডাকামাত্রই তাঁর কানে উঠবে। সামনেই ঠিক বারো মাইল শূন্যপথে গেলে ত্রিশূলের শুভ্র-চূড়া। পশ্চিমদিকে কেদার ও বদরিনাথ, গৌরী আর হস্তী, পূর্বে নন্দাদেবী, দ্রোণগিরি আর নন্দকোট। দেবতারা দল বেঁধে এক একটি সিংহাসনে বসে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণকালে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখণ্ড স্তব্ধতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসস্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিনি। লোকটাকে এবার দেখলুম চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি কিছু একটা হবে। গায়ের কোট আর পা-জামা ছিন্নভিন্ন। চেহারায় কোনও চাঞ্চল্য নেই, কিছুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোখ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চাহনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, কপালে গভীর চিন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম, মুখে-চোখে একটি চাপা গৌরব ফুটলো, কিন্তু তার সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীজী এসেছিলেন, ওর বাবা তখন বেঁচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজীর তদারকে। বারান্দায় গান্ধীজীর আসন পেতে দিত, বিছানা করতো, দুধ আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের ব্যবস্থা করতো, বই-কাগজ গুছিয়ে রাখতো এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। ওর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী বেড়িয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন। ওর ওই আনন্দ চেহারার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন করে, আমরা মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারছি। চেয়ে রয়েছে 'ত্রিশূলের' দিকে। কৈলাসের হর-পার্বতীর কথা তুলতেই সে ঈষৎ উৎসাহ পেলো। তীর্থযাত্রীদের প্রতি তার কী গভীর দরদ! দেখিয়ে দিলে কেদারনাথ আর বদরিনাথ আর নন্দাদেবী। তারপর মৃদুকণ্ঠে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মানুষ নিজের দুঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায়, আবার অনুশোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মানুষের জন্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করছে, আবার মানুষই মানুষের দুর্গতি টেনে আনছে। গান্ধীজীর পায়ের

ছে নৈবেদ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে বললে, মি মহাত্মা, তুমিই দেশের পিতা! সেই নুষই আবার মহাত্মাজীকে হত্যা ক'রে বাই মিলে কাঁদতে বসলো।

চুপ করে লোকটার শান্ত ভাষণ নেছিলুম। ভাবছিলুম লোকটার বয়স জার হাজার বছরেরও বেশী। সভ্যতার লেখেলা যতদিন ধরে চলেছে, লোকটা ন তার চেয়েও বৃদ্ধ। যখন চলে গেল, ামরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

কৌসানীর চূড়া এবং স্বামী আনন্দের থা শুনেছিলুম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোধ্যায়ের কাছে আলমোড়ায়। স্বামীজী কেন এখানে স্থায়ীভাবে তাঁর 'গঙ্গাটীরে।' খানিকটা অরণ্যপথ অতিক্রম রে প্রায় মাইলখানের মধ্যে তাঁর ওখানে রে হাজির হলুম। তাঁর দেখা পেলুম তি সহজে। বয়স বোধ করি সত্তর হয়নি। ধবে চেহারা। তিনি বোম্বাইয়ের ধিবাসী এবং প্রকৃত নাম হলো 'অমৃতল শেঠ।' বাণিজ্যজগতে তাঁর প্রচুর তি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজীর একজন শেষ গুণমুগ্ধ অনুরাগী এবং গান্ধীজীর পমৃত্যুকাল অবধি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর র গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি ছিলেন। ন্তু স্বামীজী রক্তের চাপের রোগী এবং ন্ধীজীর পরামর্শেই তিনি এখানে রোগ-ক্ত হবার জন্য আসেন। গান্ধীজীর ত্যুসংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন ড়ালো যে, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। তঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং গান্ধীদর্শনের যোগ্য ভাষ্যকার মাশরুওয়ালার মৃত্যু-বোদ যেদিন তাঁর কানে এলো, সেইদিন কে স্বামী আনন্দ এই কৌসানীতে তাঁর রস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। হিমালয়ের ই পরমাশ্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করেন। এখানে তিনি দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তাঁর বাকি জীবনের একমাত্র কামনা হলো, শান্তি সাধনা। পড়াশুনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গল্প তিনি করলেন আমাদের সঙ্গে তাঁর বারান্দায় ওই ত্রিশূলের চূড়ার সামনে বসে। বোম্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও যুবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছু শোরগোল সেদিন ছিল। আমাদের জন্য চা-বিস্কুট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিন্তু এ তল্লাটে পাওয়া যায় না, ওরা এসব সঙ্গে এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিছু নেই। কিছু সঙ্গে আনিনি, কিছু সঙ্গেও রাখবো না যাবার আগে।

স্বামীজী আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের কয়েকখানি ছবি উপহার দিলেন। এমন সুশিক্ষিত, ভদ্র, আদর্শবাদী এবং অমায়িক সজ্জন সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিয়েছিলুম।

আসবার সময় তিনি বললেন, ত্রিশূলের ওপরে মেঘ করেছে, সেজন্য মন খারাপ করো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই সরে যাবে।

সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক টুকরো মেঘ অলকাপুরীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় ফিনুফুটছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাক বাংলোয় ফিরে এলুম। সেই রাত্রি ছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো। ঘুম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বিছানার মধ্যে। রাত যখন প্রায় দুটো বাজে, হঠাৎ শশাঙ্ক বারান্দা থেকে চীৎকার করে ডাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে এলুম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে? কোনও বিপদ?

সহসা দুজনে চুপ। মেঘের আবরণ সরে গেছে। দেবাদিদেব ত্রিশূলী চোখ মেলেছেন মহাশূন্যের বিপুল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিলুম, যা কখনও দেখিনি কোনওদিন।

উভয়ে আমরা স্তব্ধ, হতবাক। আনন্দের নিবিড় যন্ত্রণায় শুধু থরথর করে কাঁপছিলুম। স্বামী আনন্দের শুভ কামনায় যাত্রা আমাদের সার্থক হয়েছে।

পরদিন বিদায় নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তার হাতে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিলুম। পাওনা পেলেই তার চলবে। বকশিশ চায় না, দাবি জানায় না। কিন্তু যখন নিতান্তই তার সুখ্যাতিতে আমরা একটু উচ্ছ্বসিত হলুম, তখন সে একটি খাতা বার করে বললে, এখানে তবে একটু লিখে রেখে যান।

সেটি হোলো ডাকবাংলোর 'লগবুক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করলুম, তোমার নাম কি ভাই?

লোকটি সবিনয়ে বলল, হবিব আহমেদ।

তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

(ক্রমশ)
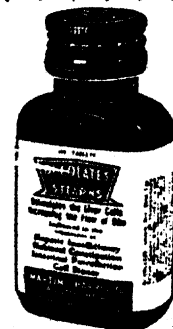
॥ চব্বিশ ॥

উপত্যকায় উপত্যকায় ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রি। ছায়া-ছায়া। পান্ডুর জ্যোৎস্না। মোরাঙের এই বাঁশের মাচানগুলি থেকে আশ্চর্য রহস্যময় মনে হয় দূরের বনদেহকে। টিজু নদীর আঁকাবাঁকা নীল শরীরটাকে আবছায়া দেখায়। দক্ষিণ-উত্তরে, পূর-পশ্চিমের তরঙ্গিত পাহাড়ের চূড়ায় বিবর্ণ চাঁদের আলো দোল খেয়ে চলেছে।

অখন্ড বাঁশের মাচানে শুয়ে শুয়ে দূরের পাহাড়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেঙাই। তার দুটি বিশাল চোখের মণিতে এই পাহাড় এই নদী এই অরণ্যের কোন স্থির কী স্পষ্ট চিত্র নেই। তার এই চেতনার পেছনে সেই কোন নিবিড় মনোযোগে দূরের ঐ পাহাড়ের দেহে সবেমাত্র ফুলের মত একটি পরম রমণীয় মুখ ফুটে উঠেছে। সে মুখ মেহেলীর। সে মুখের সৌরভে এই উত্তুঙ্গ পৃথিবী যেন সুরভিত হয়ে গিয়েছে। শুধু এই পাহাড়ী পৃথিবীই নয়, সেঙাইর অর্ধস্ফুট বন্য মনটাও আমোদিত হয়ে গিয়েছে। মাঝখানে আর দুটো মাস। একটিমাত্র ঋতুকালের ব্যবধান। নাটুসে ঋতু। বর্ষার মরশুম। অন্তে বর্ষণের দিন। তারপরেই তেলেংগা সু মাসে তাদের বিয়ে। মেহেলী! এক অপরূপা রূপকন্যা। এক পার্বতী মনোরমা। সালুয়ালাঙ গ্রামের মেয়ে সে। তাদের শত্রুপক্ষ। সেই শত্রুপক্ষের মেয়েই দু মাস পর তার দুটি কঠোর আলিঙ্গনে ধরা দেবে। দেহমন সমর্পণের মধ্যে কাছাকাছি ঘনিয়ে আসবে। নিবিড় হবে। অন্তরঙ্গ হবে। এই মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়ে তার সে কৌমার্য দুর্বার হয়ে উঠেছে, সেই কৌমার্যে প্রখর যৌবন ঢেলে তাকে চরিতার্থ করবে মেহেলী। তার পৌরুষে মেহেলীর নারীত্বে সার্থক হবে। পরিপূর্ণ হবে। আতামারী বনের ছায়াতলে একটি সুন্দর সংসার। মেহেলীর রমণীয় যৌবনের নিভৃতে একটি মনোরম নীড়প্রেম, একটি সুস্বাদু গার্হী পৃথিবীর কল্পনায় মনটা উদ্বেল হয়ে উঠলো পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর।

বুড়ো খাপেগা আর বুড়ি বেঙসানু দুটি পাকা মাথা ঘনিষ্ঠ করে, রোহি মধুর পানপাত্রে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিতে দিতে তাদের বিয়ের লগ্ন স্থির করেছিল। তেলেংগা সু মাসে আকাশে যেদিন বঙ্ক-রেখায় আনিজা উইখু ফুটে বেরুবে, তারায় তারায় বিকীর্ণ হয়ে থাকবে দূরতম ক্লান্তি-রেখা, থাকবে অকলুষ চাঁদের আলো সেই সন্দু (শুক্র) পক্ষে তাদের বিয়ে হবে।

বুকের মধ্যেটা দলিত করে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সেঙাইর। দু-দুটো মাসের ব্যবধান। কত সময়, কত প্রহর, কত দিন পর সেই পরম মুহূর্ত! বিয়ের রীতি অনুযায়ী এই দুটো মাস তার সঙ্গে মেহেলীর কিছুতেই কথা বলা সম্ভব নয়। যে সময়টিতে বিয়ের লগ্ন ধার্য হয়, তারপর থেকে সেই লগ্নটি না আসা পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মুখোমুখি হলে, একজনের দৃষ্টির সীমানায় আর একজন এসে পড়লে সে বিয়ে অসিদ্ধ হয়। সে বিয়েতে পাপের স্পর্শ এসে লাগে। কলঙ্ক লাগে স্খলনের; চরিত্রপাতের। পাহাড়ী চরিত্র বড় নির্মম। বড় অকরুণ। সেখানে এতটুকু মমতা নেই।

দু-দুটো মাস। অথচ মাত্র পাঁচটা টিলার ওপারে বুড়ো খাপেগার আজেলোতে রয়েছে মেহেলী। আচমকা পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর অস্পষ্ট চেতনায় আলো এসে পড়লো। এতকাল প্রত্যক্ষ পৃথিবী, স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলি ছাড়া আর কোন কিছুই তার ভাবনার পরতে পরতে দোলা দেয় নি। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই সর্বপ্রথম বন্য মানুষ সেঙাইর মেহেলীর 'মনের কথা ভাবতে ভালো লাগছে। মেহেলীও কী তারই মত ক্ষয়িত চাঁদের আকাশে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে তার কথা ভাবছে! তাঁর মনের তারে তারে কী ঝঙ্কার উঠেছে সেঙাইর অনুভবের? সেঙাইর আবেগ আর আবেশের?

দৃষ্টিটাকে বাইরের আকাশ থেকে মোরাঙের মধ্যে নিয়ে এলো সেঙাই। মোরাঙের দেওয়ালে দেওয়ালে বুনো মোষের মাথা, মানুষের করোটি, কালো রক্তের চিত্রকলা, হরিণের শিঙ গাঁথা রয়েছে। ক্ষয়িত চাঁদের এই আবছায়া আলোতে মোরাঙটাকে আশ্চর্য ভৌতিক দেখাচ্ছে।

এখন মধ্যরাত্রি। আকাশের নিঃশব্দ তারায় তারায় তৃতীয় যামের স্বাক্ষর পড়েছে। পাশের মাচানগুলিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে অজস্র জোয়ান ছেলে। ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকছে। এই নাক ডাকার আবহ বাজনায় ক্ষয়িত চাঁদের এই ত্রিযামা রাত্রি বিচিত্র রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সকলের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে একবার ঘুরপাক খাইয়ে আনলো সেঙাই। বুড়ো খাপেগা আজকাল মোরাঙে শুতে আসে না। মেহেলী তাকে ধর্মবাপ ডেকেছে। তার চরিত্রের নিরাপত্তার জন্য, তার কৌমার্যকে নির্বিপদ করার জন্য বুড়ো খাপেগা তার কেসুঙে থেকে মেহেলীকে পাহারা দেয়।

পাশের মাচানে শুয়ে রয়েছে গুঙুলে। নাকের বাজনার এই প্রতিযোগিতায় সে-ই সবচেয়ে বেশি সশব্দ। সবচেয়ে প্রচণ্ড।

আচমকা তার নাকটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মাচানের ওপর আড়মোড়া ভেঙে সে পিট পিট করে তাকালো। তারপর ফিস ফিস গলায় ডাকলো, "সেঙাই, এই সেঙাই—"

"কী বলছিস্ ওঙলে? ঘুম ভাঙলো?"

"ওরে টেফঙের বাচ্চা। ঘুম আমার ভাঙলো? তুই তো জেগে আছিস!" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো ওঙলে; "যাক্ সে কথা। কী করছিস শুয়ে শুয়ে?"

"ভাবছি।" নির্বিকার গলায় বললো সেঙাই।

"কী ভাবছিস? পাহাড়ী জোয়ান হয়ে রাত্তির জেগে ভাবছিস, এতো ভারী তাজ্জবের কথা!" ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত দাঁ করে উঠে বসলো ওঙলে।

আশ্চর্য নির্লিপ্ত গলায় সেঙাই বললো, "ভাবছি মেহেলীর কথা।"

"হু-হু সে তো ভাববার কথাই। দু মাস পরে তোর বিয়ে হবে। বিছানায় বউ পাবি। তোর কী মজা! আমাদের তো বিয়ে হবে না। এই মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়েই সারা জীবন কাবার করতে হবে।" একুশ বছরের পাহাড়ী তারুণ্যকে ফালা ফালা করে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওঙলের। বিলম্বিত লয়ে।

"তোরও বিয়ে হবে। সর্দার তোর বিয়েরও ঠিক করে দেবে।" সেঙাইর গলায় সান্ত্বনা।

"নারে না! বুড়ই সর্দার হলো একটা সাসুমেচু! ও কিছুতেই আমার বিয়ে দেবে না। জ্যেঠা হলে কী হবে! সর্দারটা একটা আস্ত রামখোর বাচ্চা। আমাকে বিয়ে দিতে হলে ঘর থেকে যে টেনেন্যুমিঙেলু (কন্যাপণ) বার করতে হবে। জান থাকতে একটা বর্শা খরচ করবে বুড়ই সর্দার!" সমস্ত মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো ওঙলের। তার চোখের কপিশ মণি দুটো এই আবছায়া ত্রিযামা রাত্রিতে দুটি হিংস্র অগ্নিবিন্দু হয়ে জ্বলতে লাগলো। মনে হয়, এই মুহূর্তে সে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে; "দেখছিস না, মেহেলীর জন্যে তোদের কাছে থেকে কতকগুলো খারে বর্শা নিল সর্দার। তবু মেহেলী ওর মেয়েও নয়। শত্রুদের মেয়ে। তবু রেহাই দিলে না তোদের। হুঃ—ও দেবে আমাকে বিয়ে!"

কিছু সময়ের বিরতি। এক সময় ওঙলের দেহমন থেকে সব উত্তেজনা মুছে গেল। আশ্চর্য শান্ত গলায় সে বললো; "আমার বিয়ের কথা চুলোয় যাক। যা বলছিলাম, মেহেলীর কথা কী ভাবছিলি রে সেঙাই?"

"দু মাস পরে বিয়ে হবে। এই দু মাস তো মাগীটার সঙ্গে দেখা হবে না। তাই মনটা কেমন জানি করছে! ছুঁড়িটার মুখখানা খালি দেখতে পাচ্ছি। একদম ঘুম আসছে না।"

"মোটে তো দুটো মাস! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তার পরেই তেলেংগা সু মাস আসবে। তুই ঘর তৈরী করে বউ নিয়ে মোরাঙ থেকে ভাগবি। এর জন্যে আবার পাহাড়ী জোয়ান ভাবে না কী! কোহিমা থেকে ফিরে তোর ভাবাভাবিটা বড় বেড়েছে রে সেঙাই। তাগড়া ছোকরা, রাক্ষসের মত গিলবি। ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুবি। যখন যা খুশি তাই করবি। ভাববার আবার কী আছে এর মধ্যে!" রীতিমত আলোক দান করে চললো ওঙলে; "নে, এবার ঘুমো দিকি। জেনু (মধ্যরাত্রি) পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ!" ঋজু একটা সরল রেখার মত বাঁশের মাচানে আছড়ে পড়লো ওঙলে। সঙ্গে সঙ্গে নাকের বাজনা শুরু হয়ে গেল তার। ঘুমটিকে প্রচুর সাধনায় একেবারে আয়ত্ত করে ফেলেছে সে।

এতক্ষণে মাচানের ওপর উঠে বসেছে সেঙাই। ব্যগ্র গলায় সে ডাকলো, "এই ওঙলে, এই—ঘুমিয়ে পড়লি না কী? এই তো কথা বলছিলি এতক্ষণ!"

ওঙলে নিরুত্তর। নাকের গর্জন তার প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। মাচান থেকে নেমে ওঙলের পাঁজরায় ধারালো থাবাটা বসিয়ে দিল সেঙাই; "এই ওঙলে, এই—"

"ইজাহান্টসা সালো!" লাফিয়ে উঠলো ওঙলে; "টেফঙের বাচ্চাটা তো ঘুমুতে দেবে না।" দুটি চোখ রক্তলাল হয়ে উঠলো ওঙলের।

মোলায়েম গলায় সেঙাই বললো, "থাম, থাম শয়তানের বাচ্চা। বেশি চেঁচামেচি করলে বর্শা হাঁকড়ে সাবাড় করে ফেলবো। এই জনমে আর ঘুমুতে হবে না। যা বলছি, তার জবাব দে দিকি!"

রক্তচোখে তাকিয়েছিল ওঙলে। একেবারেই নিষ্পলক। দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ তুলে সে বললো, "বেশি ঘ্যান ঘ্যান না করে কী বলবি বল্।"

"তুই তো রোজ তোদের কেসুঙে যাস! মেহেলী কী বলে রে? কেমন করে? আমার তার কাছে যাওয়া বারণ, সেই ফাঁকে তার সঙ্গে আবার পিরীতি টিরীত জমাস নি তো!"

মাচানের পাশ থেকে সাঁ করে একটা সুচেন্যু টেনে নিল ওঙলে; "একেবারে লোপাট করে ফেলবো। পরের মাগীর সঙ্গে আমি পিরীত জমাই না।"

"হু-হু—সে কথাই তো আমি বলি। তুই আমার আসাহোয়া (বন্ধু)। তুই কী তা করতে পারিস! চেঁচামেচি করছিস কেন? সুচেন্যুটা রেখে দে। আপোসে কথা বল্।" মাথার ওপর উদ্যত সুচেন্যুর ঝকঝকে ফলা। অথচ গলাটা এতটুকু কাঁপছে না সেঙাইর। এতটুকু আতঙ্ক নেই তার। একেবারেই অনশঙ্কিত সে; "দু মাস ছুঁড়িটার সঙ্গে দেখা হবে না। কী করি বল্ তো!"

"কী আবার করবি, মোরাঙে পড়ে পড়ে ঘুমুবি। আর যদি তা না পারিস, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবি। নে, এবার ঘুমুতে দে। এবার যদি আবার জাগাস তো জানে বাঁচতে হবে না তোর।" বিরক্ত গলায় সেঙাইকে শাসিয়ে মাচানের ওপর আবার টান টান হয়ে পড়লো ওঙলে; "কেসুঙে গেলে বুড়ই মেহেলী ছুঁড়িটা সেঙাইটার কথা বলবে। আর মোরাঙে এলে এই শয়তানটা বুড়ই মাগীটার কথা বলবে! রামখোর বাচ্চা দুটো একেবারে মেজাজটাকে খিঁচড়ে দিচ্ছে। ছুঁড়িটার ব্যারাম হয়ে আমার ঘ্যানঘ্যানানি বেড়েছে!"

মাচানের ওপর তরিবত করে শোয়ার তদ্বিরে ছিল সেঙাই। ওঙলের কথাগুলো কানের ওপর প্রচণ্ড শব্দ করে যেন বিদীর্ণ হলো তার। সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সেঙাই। "কী ব্যারাম? কার ব্যারাম রে ওঙলে?"

বিড় বিড় করে অস্পষ্ট গলায় ওঙলে বললো, "কার আবার ব্যারাম। বুড়ই সালুয়ালাঙের মাগীটার; তোর বউ হবে যে। চোখ লাল, গায়ে যেন আগুন ছুটছে। সকালে তামুন্যু (চিকিৎসক) এসেছিল। খাওয়া বন্ধ করে গেছে। শুয়ে শুয়ে মাগীটা বিড় বিড় করে কী যেন বকছে।"

বলতে বলতে আচমকা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল ওঙলে। আর একটা শিলামূর্তির
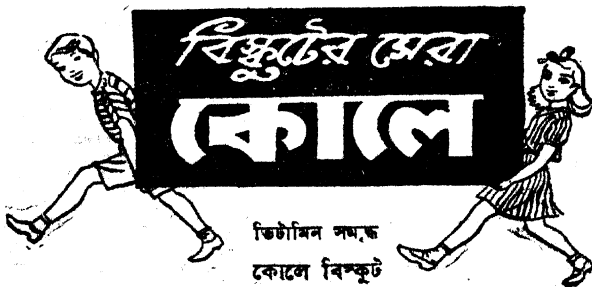
মত দাঁড়িয়ে রইলো সেঙাই। মেরুদণ্ড বেয়ে বেয়ে সাপের দেহের মত একটা শীতল হিমধারা নামতে লাগলো তার। ব্যারাম হয়েছে মেহেলীর! রক্তলাল চোখ! শরীরে প্রখর উত্তাপ! প্রলাপ বকছে! তবে কী খোন্‌কের মত তার বোন মেহেলীকেও আনিজাতে পেয়েছে! কেলুরী গ্রামের আমুন্যু কী তবে তাকেও খাদের অতল তলায় ফেলে দেবার নির্দেশ দেবে। ভাবতে ভাবতে অস্ফুট বন্য মনটা কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল সেঙাইর।

কয়েকটি মাত্র নিশ্চেতন মুহূর্ত। সহসা সেঙাইর মনে পড়লো, রাণী গাইডিলিওর কথা। প্রান্তরের মত বিশাল কপাল। দুটি দূরায়ত চোখে মধুর মমতা। যাঁর একটিমাত্র স্পর্শে মেদ-মজ্জা-রক্তের এই দেহ থেকে সব জরা, সব মৃত্যু, সব অপঘাত পলকপাতের মধ্যে পলাতক হয়। রাণী গাইডিলিওকে আজ বড় প্রয়োজন সেঙাইর। সেঙাইর দুর্বোধ্য পাহাড়ী মন একটি স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ বিন্দুতে এসে স্থির হয়েছে। কোহিমা পাহাড়ে যেদিন পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর নির্দেশে মণিপুরী, আসামী আর বাঙালী পুলিশেরা বেয়নেট আর রাইফেল আঘাতে তার দেহটাকে বিক্ষত করে ফেলেছিল তারপর অচেতন শরীরটাকে কোহিমার টিলাক্ত পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেদিন রাণী গাইডিলিও তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

এতক্ষণ পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর বাসনা সোনালু ফুলের মত রঙদার হয়ে ফুটেছিল। তার আশা আর বাসনা আবেগে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। বনস্পতির ছায়াতলে মেহেলীকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে। একটি সুখী দম্পতির কূজনে নীড় মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু তার কামনার অতল তলায় কোথায় লুকিয়েছিল এই সর্বনাশ? এই ভয়ংকর দুর্বিপাক? খোন্‌কের ব্যাধির পরিণাম সে দেখেছে। সে ছবি তার মনের ওপর শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে রয়েছে। মেহেলীও কী খোন্‌কের মত খাদের নীচে পড়ে মরবে?

নাঃ। মনটা আশ্চর্য কঠিন হয়ে গিয়েছে সেঙাইর। আশ্চর্য ঋজু হয়ে গিয়েছে তার প্রতিজ্ঞা। শপথটা একাগ্র হয়েছে। কিছুতেই মেহেলীকে সে মরতে দেবে না। মেহেলীর মৃত্যুর মধ্যে যৌবনের স্বপ্নকে সে হত্যা করতে দেবে না। তার সমস্ত পেশীর শক্তি, সকল ইন্দ্রিয়ের সামর্থ, সকল স্নায়ুর চেতনা আর ভাবনার সমস্ত ক্ষমতাকে সংহত করে সে মেহেলীর মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবে। আপাতত রাণী গাইডিলিওকে প্রয়োজন থাকলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু পাঁচটা টিলা পেরিয়ে বুড়ো খাপেগার আজ্জেলাতে এই মুহূর্তে তাকে পৌঁছতে হবে। পৌঁছতেই হবে মেহেলীর কাছে।

সমস্ত মাচানগুলোর ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে একবার ঘুরপাক দিয়ে আনলো সেঙাই। পাহাড়ী জোয়ানেরা এখন গভীর ঘুমের অতলান্তে তলিয়ে রয়েছে। বাঁশের দেওয়াল থেকে সন্তর্পণে বিশাল একটা বর্শা থাবায় তুলে নিল সে। তারপর বন-বিড়ালের মত মসৃণ পা ফেলে ফেলে বাইরের উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে গেল সেঙাই।

তিনটে টিলা পেরিয়ে এসে একটা উদ্দাম বুনো কলার বন আর পাহাড়ী আপেলের অরণ্য। এই পাহাড়ের জল-বাতাস থেকে বিন্দু বিন্দু প্রাণকণা আহরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে। এই ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রিতেও পরিষ্কার নজরে আসে, অজস্র ফল থরে থরে পেকে আছে। বনকলা আর আপেলের বন থেকে একরাশ ফল ছিঁড়ে পী মাঙ কাপড়ের ভাঁজে গুছিয়ে নিল সেঙাই। তারপর আরও দুটো তীক্ষ্ণ-চূড়া টিলা পেরিয়ে বুড়ো খাপেগার কেসুঙের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সারা উপত্যকায় ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রি নিথর হয়ে রয়েছে। পাণ্ডুর রাত্রি। আবছায়া আলো। ওপাশের উৎরাই-এর দিক থেকে প্রপাতের গর্জন ভেসে আসছে। কোথায় একটা ডোরা-কাটা বাঘ তর্জন করে উঠলো। পাশের খাসেম বন থেকে ময়ালের ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পাহাড়ী জোয়ান সেঙাই। তারপর সামনের পাথুরে চত্বরটা পেছনে রেখে আজ্জেলোর দিকে এসে দাঁড়ালো। আর এদিকে এসেই তার দৃষ্টিটা চমকে উঠলো। বুড়ো খাপেগার কেসুঙের পাশে দুটি পাহাড়ী জোয়ান সতর্ক পা ফেলে ফেলে কী যেন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

সাঁ করে কেসুঙটার বাঁশের দেওয়ালের পাশে সরে গেল সেঙাই। হাতের থাবাটা বর্শার বাজুর ওপর প্রখর হয়ে বসলো। উত্তেজনায় দ্রুত লয়ে নিঃশ্বাস উঠছে, নামছে। সারা দেহের পেশীভার তরঙ্গিত হয়ে নাচছে। দুটি পিঙ্গল চোখের মণিতে শিকারের ছায়া পড়েছে সেঙাইর। সে-শিকার দুটি পাহাড়ী জোয়ান ছেলে।

ওপাশ থেকে ফিস ফিস গলার শব্দ ভেসে আসছে।

"হু-হু—নির্ঘাৎ কেলুরী বস্তীর সর্দারের ঘরে রয়েছে মেহেলী। খবর ঠিক নিয়ে তবে এসেছি। বুঝলি ইমটিটামজাক!"

আর একটি উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল; "ঠিক—ঠিক—মেহেলীকে আজ যেমন করে

াঁরি আমাদের বস্তীতে নিয়ে যাবো। নইলে ন্দার আমাদের মাথা ছি'ড়ে মোরাঙে ালাবে।"

"হ্-হ্—খাঁটি কথা। আমাদের বস্তীর ায়ে অন্য বস্তীতে ল্কিয়ে থাকবে। অথচ তগ্লো জোয়ান ছোকরা রয়েছি আমরা! ায়ে লাল রক্ত রয়েছে! বসে বসে সবাই দেখছি! ইজ্জৎ লোপাট হয়ে গেল সাল্য়োলাঙ্ বস্তীর। সব সম্মান একেবারে খতম।" একট্ থামলো কণ্ঠটি। তার পরেই আবার পর্দায় পর্দায় সে কণ্ঠ চড়তে লাগলো; "আশে পাশের সবাই জানতে পেরেছে। অংগামীরা জেনেছে। ওপাশের সাঙ্টামরা জেনেছে মেহেলী যে কেল্রী বস্তীতে এসে রয়েছে, এ খবর জানতে আর কারো বাকী নেই।"
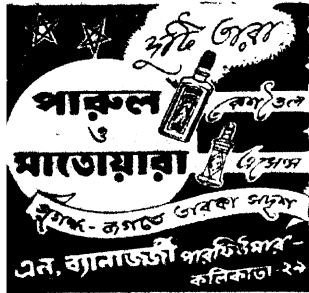
"কী করে ব্ঝলি, ওরা জেনেছে?" অপর কণ্ঠটিতে প্রবল কৌত্হল।

"সেদিন খারে বর্শা বদল করে অংগামীদের বস্তী থেকে মাটির হাঁড়ি, কোদাল আর নীয়েঙ দ্ল আনতে গিয়েছিল্ম। ওরা বদলে দিল না। তারপর গেল্ম সাঙ্টামদের বস্তীতে। তারাও দিলে না।"

"কেন দিলে না? একেবারে বর্শা হাঁকড়ে সাবাড় করে ফেলবো না রামখোর বাচ্চাদের—" প্রচণ্ড শব্দ করে গলাটা বিদীর্ণ হলো।

"চুপ, চুপ। খবরদার চিল্লাবি না। একেবারে গলা টিপে ধরবো। এটা সাল্য়োলাঙ বস্তী নয়!"

"চিল্লাবো না তো কী! সাঙটামরা, অংগামীরা আমাদের হাঁড়ি দেবে না, কোদাল দেবে না, নীয়েঙ দ্ল দেবে না তো আমাদের কী করে চলবে? কী বলেছে অংগামীরা আর সাঙ্টামরা?"

"ওরা বললে, তোদের বস্তীর মাগী পালিয়ে অন্য বস্তীতে গিয়ে থাকে, তোদের আবার ইজ্জত আছে না কী? তোদের সংগে আমরা কোন কারবার রাখবো না। সিধে কথা। তাই আমাদের সর্দার মেহেলীকে এই কেল্রী বস্তী থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে বলেছে। আজ সাঙ্টামরা আর অংগামীরা জিনিস বদল করছে না। কাল যদি কোনিয়াকরা এ খবর জানতে পেরে ধান বদল না করে তো না খেয়ে লোপাট হয়ে যেতে হবে। হ্-হ্—বস্তীর মাগী যদি বস্তীর মধ্যেই আটক করে রাখতে না পারি, তা হলে কেমন পাহাড়ী মান্ষ আমরা!" কথাগ্লোর মধ্যে আত্মদর্শন। হলো মান্ষটার।

আরও নিবিড় হয়েছে ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রি। আরো উত্তাল হয়েছে সেঙাইর ধমনী। আরও জলদ হয়ে বাজছে হৃৎপিণ্ডের ধ্ক-প্ক। আরও প্রখর হয়ে বর্শার বাজ্র ওপর নামছে অতিকায় থাবাটা।

কিছ্ সময়ের বিরতি। তার পরেই ওপাশের একটি কণ্ঠ শোনা গেল; "নে, আর দেরী করিস নি। আজ ক'দিন ধরে মেহেলীর তল্লাসে আসছি এই কেল্রী বস্তীতে। মাগীটাকে যে নিয়ে যাবো, তার আর জ্ত করে উঠতে পারছি না। আজ যেমন করে পারি নেবোই। আয়, এতক্ষণে এই বস্তীর খাপেগা সর্দারটা নির্ঘাৎ ঘ্মিয়ে পড়েছে। শয়তানের বাচ্চা ঐ ব্ড়োটা সারা রাত মেহেলী মাগীটাকে পাহারা দেয়। শ্নেছি, ওর বর্শার তাক না কী মারাত্মক! তাই তো ঘে'ষতে ভয় হয়। আয়, আয়—আর দেরী করিস নি। এই আজেলোতেই শ্য়ে রয়েছে মেহেলী—"

"হ্-হ্—"

ঘোঁত ঘোঁত করে ব্ড়ো খাপেগার আজেলোর দিকে এগিয়ে আসছে দ্টি পাহাড়ী জোয়ান। এগিয়ে আসছে মাতলা মোষের মত উন্মাদ পদক্ষেপে।

সমস্ত ক্রোধ, স্নায়্কোষের সমস্ত উত্তেজনাকে এতক্ষণ সংহত করে রেখেছিল সেঙাই। এবার বাঁশের দেওয়ালের পাশ থেকে একটা উল্কার মত বেরিয়ে এলো সে। তার পরেই হাতের থাবা থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে সাঁ করে বর্শাটা ছ্টে গেল। গি'থে গেল একটি পাহাড়ী জোয়ানের কোমরে। বজ্রের মত কঠিন হলো সেঙাইর চোয়ালটা। দাঁতের ওপর কঠোর হয়ে নামলো দাঁত। হিংস্র গলায় সেঙাই গর্জে উঠলো; "ইজা হান্টসা সালো। মেহেলীকে নিতে এসেছে! একেবারে খতম করে ফেলবো।"

"আ-উ-উ-উ-উ—" আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো জোয়ানটা। তার পরেই অমস্ণ পাহাড়ী প্থিবীর ওপর ল্টিয়ে পড়লো।

আর অন্য জোয়ানটা এই ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রিতে নিজের পার্বত্য প্রাণটাকে বাঁচাবার আদিম প্রেরণায় সামনের উতরাই-এর দিকে নেমে গেল। তারপর পলকপাতের মধ্যে বিশাল খাসেম বনটার মধ্যে অদ্শ্য হয়ে গেল। র্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে সে টিলা-বন-পাহাড়-উপত্যকা পেরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। সাল্য়োলাঙ গ্রামের নিরাপদ সীমানায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এ দৌড় বোধ হয় তার থামবে না।

"আ-উ-উ-উ—" আকাশ ফাটানো আর্তনাদটা এতক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

পী ম্যাঙ্ কাপড়ের ভাঁজ থেকে পাহাড়ী ফলগ্লি ছত্রখান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেগ্লি কুড়িয়ে কোঁচড় ভরাট করে সাল্য়োলাঙ গ্রামের জোয়ানটার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো সেঙাই। পাহাড়ী জোয়ানের তাজা রক্তে পাথ্রে মাটি লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে। দ্'টি পিঙ্গল চোখের মণি হিংস্র উল্লাসে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো সেঙাইর। একদলা থ্থ্ জোয়ান ছেলেটির ম্খে ছ্'ড়ে দিল সেঙাই। প্রবল ঘ্ণায় ম্খখানা একট্ একট্ করে বিকৃত হয়ে এলো তার; "থ্-থ্—আহে ভু টেলো! এই ম্রোদ নিয়ে আমার বউকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিস! থ্ঃ-থ্ঃ—চোরের মত চুরি করে নিতে এসেছিস! সাহস নেই লড়াই করে ছিনিয়ে নেবার!" দ্'টি চোখের ঘ্ণা আর আগ্নে জোয়ান মান্ষটির দেহকে ঝলসে ঝলসে ব্ড়ো খাপেগার আজেলোর দিকে চলে গেল সেঙাই।

(ক্রমশ)

উপরে উঠতে লাগলাম আমরা চারজন— ল্যাম্‌বেয়ার, অবেয়ার, ফ্লরী আর আমি। ফুতারকে আর দা নামগিল্‌ নেমে গেল, যে জিনিসগুলো আমরা নীচে ফেলে এসেছিলাম সেগুলো বয়ে আনতে। আর পাসাঙ ফুটার সেইখানে, সেই অনাবৃত প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে রইল তাদের অপেক্ষায়। সেই তিনজন সুইস সাহেব আর আমি ক্রমেই উপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আর আমাদের উঠতে হ'ল না। বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা এক মাহেন্দ্র মুহূর্তের সম্মুখীন হলাম। বরফ আর শিলা আমাদের সামনে সমতলে পরিণত হয়েছে, আমরা 'জেনেভা শৈলবাহুর' চূড়ায় পৌঁছে গেছি আর আমাদের সামনে ওই যে দেখা যায় 'দক্ষিণ কল'। অবশেষে তার নাগাল পেলাম। সত্যি বলতে কি 'কলটি' শুধু আমাদের সামনেই নয়, ওটা আমাদের নীচেও। লোৎসের দিক থেকে যে শৈলবাহুর চূড়ায় আমরা পৌঁছেছি সেটা 'কল' থেকে পাঁচশো ফুট উপরে। এবার আমাদের নেমে যেতে হবে। সাহেবরা সেদিকে নামতে লাগলেন। নামবার সময় আমার কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে গেলেন। যেদিক থেকে আমরা উঠে এসেছিলাম, আমি আবার সেইদিকেই নেমে চললাম। [illegible] নাগাড়ে ধরে মালপত্রগুলো নিয়ে আসছে। ভেবেছিলাম, যেতে যেতে পথেই ওদের দেখা পাব। কিন্তু তা পেলাম না। নামতে নামতে আমি সেই খোলা প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখি কি, ফুতারকে আর দা নামগিল নীচে থেকে মালপত্র বয়ে এনে ঠিকই হাজির হয়েছে। কিন্তু সে জায়গা ছেড়ে আর একপাও নড়েনি। আর পাসাঙ ফুটার, যে এতক্ষণ ধরে সেই খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারাদারী করছিল, সে দেখি তার তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে।

আমাকে সে বললে, "আমি অসুস্থ, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এইবার মরলাম।" জবাব দিলাম, "না, তুমি মরবে না। তুমি আচ্ছা হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এখখুনি তোমাকে উঠে মালপত্র সঙ্গে নিয়ে 'দক্ষিণ কলে' যেতে হবে।"

সে বললে, সে তা পারবে না। আমি বললাম, তাকে পারতেই হবে। আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হ'ল। শেষকালে তাকে কষে গালাগাল দিয়ে, থাপ্পড় মেরে, লাথি কষিয়ে তবে আমাকে প্রমাণ করতে হ'ল যে সে মরেনি। অন্যান্য লোকেরা নীচে নেমে যাবার পর অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর কারো মরজির উপর কাউকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। এই মাল যদি 'কল' পর্যন্ত নিয়ে না পৌঁছানো

যায়, তবে যে তিনজন সাহেব সেদিকে এগিয়ে গেছেন, নির্ঘাত তাদের মৃত্যু ঘটবে। আর পাসাঙকে যদি সে জায়গায় রেখে যাই, তাহলে তার মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবে না। কল্পনার মরণ নয়, সত্যিসত্যিই মরবে। হাঁ সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভেঙে পড়েছে। কিন্তু চলবার ক্ষমতা তার নষ্ট হয়নি। তাই এগুতে তাকে হবেই।

আমি তাই চেঁচাতে লাগলাম, "জকি, এই জকি ওঠ, চল্‌!" (আমরা তাকে "জকি" বলতাম, কারণ দার্জিলিঙের রেসের ময়দানে সে কখনও কখনও ঘোড়ায় চেপে অশ্ব-শিক্ষকের দৌড়াত।) শেষপর্যন্ত আমি তাকে খাড়া করে তুললাম। তাঁবু ছেড়ে সে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। পিঠের ওপর বোঝা চাপিয়ে আমরা ঝুঁকে ঝুঁকে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। উঠতে উঠতে কতবার হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম। ধুঁকতে ধুঁকতে, ঠেলতে ঠেলতে, টানতে টানতে একসময় আমরা চারজন 'শৈলবাহুরে' উপরে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর 'কলে'ও নেমে গেলাম। ফুতারকে আর দা নামগিলের অবস্থাও এর মধ্যে পাসাঙের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি কষ্টে তারা তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভাগ্য ভাল যে, তখনও আমার সেই তৃতীয় ফুসফুসটি দিব্যি বহাল তবিয়তে ছিল। তাই দু'বার আমি একাই সেই হুহু-করা প্রান্তরে নেমে গিয়ে সেই বাকী মালপত্রগুলো 'কলে' এনে হাজির করলাম। খাবার আর সরঞ্জাম বেশ অনেকটা পরিমাণেই সেখানে পড়েছিল। এখন আর

এ ভা রে স্ট বি জ য়ী শে র পা
শ্রীতেনজিং নোরগে কথিত এবং মিঃ
জেমস্‌ র‍্যামজে উলম্যান লিখিত

আমাদের জিনিসপত্রের কোন অভাব রইল না। যা যা আমাদের কাজে লাগতে পারে তা সবই আমাদের হাতের কাছে এসে গেছে। এবার এভারেস্টের চূড়ায় একবার হানা দেওয়া যেতে পারে।

জীবনে আমি বহুবার, বন্য প্রান্তরে, জনপ্রাণীশূন্য জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু 'দক্ষিণ কল্‌'-এর মত এমন একটা জায়গার সাক্ষাৎ এর আগে আর পাইনি। জায়গাটা ২৫,৮৫০ ফিট উঁচুতে, তার একদিকে এভারেস্টের মূল চূড়া আর অন্যদিকে লোৎসে। তুষারও এখানে তার কোমলতা হারিয়েছে। এ এক উন্মুক্ত শীতে-জমা শিলা আর বরফের কঠিন প্রান্তর। গজরাতে গজরাতে বাতাস অনবরত ছুটে চলেছে। এক মিনিটের জন্যও তার বিরাম নেই। এবার আমরা যত উঁচুতে উঠেছি, তত উঁচুতে এর আগে আর কোন পাহাড়ে আমরা চড়িনি। তবুও আমরা এভারেস্টের চূড়ার নাগাল পাচ্ছি না। আমাদের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথা অনেক অনেক উঁচুতে। এই চূড়াটাই যেন আলাদা এক পর্বত। আমাদের মনে হ'ল তুষারের যে লম্বা চড়াইটা উঠে গিয়ে এভারেস্টের গিরি-শিরাতে ঠেকেছে, সেই পথে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এপথে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছিলাম না সত্যি সত্যিই এদিক দিয়ে কতদূর পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। এভারেস্টের মূল চূড়াটা তো নজরেই পড়ছে না। ওর থেকে কিছুটা নীচু এভারেস্টের তুষার মোড়া দক্ষিণ চূড়াটি ওকে আড়াল করে রেখেছে।

রাত্রি এসে গেল। বাতাসের গর্জন সমানে চলতে থাকলো। ল্যাম্বেয়ার আর আমি একটা তাঁবু ভাগ করে নিলাম। আমরা আমাদের দেহকে গরম করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। এ রাত্রিটা যে আগের রাত্রের মত অত খারাপ ছিল তা নয়, তবুও বেশ খারাপ। সকাল বেলায় চারিদিক দেখে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শেরপাদের তিনজনের বারোটা বেজে গেছে। 'জকি' তখনও সমানে বকে চলেছে যে, সে আর বাঁচবে না। আর এর মধ্যে সে সত্যিসত্যিই বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্য শেরপাদের অবস্থাও কাহিল। সুইস সাহেবরা জানতেন যে চূড়ায় যদি আমাদের পৌঁছবার জন্য চেষ্টা করতেই হয়, তাহলে আমাদের মাথার উপরে যে গিরিশিরা সেখানে অন্তত আর একটি শিবির—সপ্তম শিবির—স্থাপন করতেই হবে। তাই সাহেবরা ফুতারকে

খুম্বুর তুষার প্রপাত

অর দা নামগিলকে বললেন যে, তারা যদি মালপত্র আরও এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তাদেরকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু তা তারা প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের দেহটাই যে শুধু ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তা নয় তাদের মনটাও নেতিয়ে পড়েছে। তারা যে শুধু আরও এগোতে অনিচ্ছুক ছিল তাই নয়, এগোবার জন্য তাদের যেন আর পীড়াপীড়ি না করি, তারজন্য আমার কাছে ওরা মিনতি করতে লাগলো। কিন্তু একদিক থেকে আমি যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্যদিক থেকে তারাও। শেষপর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে গেল। "জাকিকে" তার পায়ের উপর আমরা খাড়া করিয়ে দিয়ে তার কোমরে একটা শক্ত দাঁড়ও বেঁধে দিলাম। সেই দড়ির একপাশে ছিল ফুতারকে আর একপাশে দা নামগিল্। এইভাবে তারা তিনজন যখন নেমে গেল তখন আমি আর তিনজন সাহেব আরও উপরে উঠে যাবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। মালপত্র বইতে সাহায্য করবার কেউ না থাকায় সপ্তম শিবিরে গিয়ে যতখানি মালপত্রের প্রয়োজন আমরা ততখানি বইতে পারলাম না। আর তাই সফল হবার যে স্বপ্নটা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেটা মলিন হয়ে এল। কিন্তু সেখানে এছাড়া অন্য আর কিছু করবার আমাদের কোন উপায়ও ছিল না।

তাই আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। অবেয়ার আর ফ্রোরি একদড়িতে বাঁধা, আর একটা দড়িতে ল্যাম্বেয়ার আর আমি। আমরা উঠতে শুরু করলাম। উঠছি তো উঠছিই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল। 'কল' থেকে উপরে উঠে এক খাড়া তুষারচড়াই ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরার গোড়ায়। তারপর সেই গিরিশিরাটির উপরেও উঠে গেলাম। আবহাওয়া পরিষ্কার। আমরা পাহাড়টার আড়ালে পড়ে গেছি, পশ্চিমা বাতাসের হাত থেকে সেই আমাদের রক্ষা করছে। তবুও আমাদের অগ্রগতি খুব মন্থরভাবে হচ্ছিল। হচ্ছিল দুটো কারণে। একটা কারণ, সেই অপরিসীম উচ্চতা আর দ্বিতীয় কারণ, একটা নিরাপদ পথের সন্ধান। আমাদের সঙ্গে তাঁবু ছিল মাত্র একটা। সেটা আমি বইছিলাম। আর খাবার ছিল একদিনের মত। একদিনের পক্ষে তা পর্যাপ্তই।

আর ছিল অক্সিজেন। একটা করে ছোট অক্সিজেনের বোতল আমাদের প্রত্যেকের কাছেই ছিল। আমার পাহাড়ী জীবনের অভিজ্ঞতায় এই প্রথমবার আমাকে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হল। তবে এই অক্সিজেনের জন্য আমাদের খুব বেশি একটা সুবিধা হয়নি। কেননা, যখন আমরা শুধু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম অথবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছিলাম অক্সিজেনের যন্ত্রটা তখনই শুধু কাজ করছিল। পাহাড়ে ওঠবার সময় ওটা কোন কাজে লাগছিল না। অথচ এই সময়েই আমাদের অক্সিজেনের দরকার বেশি। তা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে চললাম। উঠলাম ২৭,০০০ হাজার ফিট। তারপর তাও ছাড়িয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম এবার আমি নিজের রেকর্ড ভেঙেছি। ১৯৩৮ সালে এই পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে আমি ছয় নম্বর শিবির পর্যন্ত উঠেছিলাম। এবার তারও উপরে উঠেছি। কিন্তু এখনও অনেক বাকি। আরও দু'হাজার ফিট।

প্রায় ২৭,৫০০ ফুটে গিয়ে আমরা থামলাম। সেইদিন আমাদের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব আমরা তা গেছি। আমি আগেই বলেছি খুব হাল্কা বোঝা নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সাহেবদের মতলব হচ্ছে সারাটা দিন ঘোরাফেরা করে জায়গাটার পরিচয় ভালো করে নেওয়া। ভেবেছিলাম সাহেবরা তাঁবুটা আর অল্প কিছু রসদ সেখানে জমা করে রেখে ফিরে আসবেন। তারপর যখন ভার বইবার মত কুলি বেশ কিছু পাওয়া যাবে তখন তাদের নিয়ে আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু আবহাওয়া খুব পরিষ্কার ছিল। ল্যাম্বেয়ার আর আমি এমন কিছু ক্লান্তও হইনি। আমি ছোট্ট একটা সমতল জায়গা দেখতে পেলাম। সেখানে স্বচ্ছন্দে এক তাঁবু খাটানো যেতে পারে। সেটার দিকে আঙুলে দেখিয়ে বললাম, "সাহেব, রাতটা আমাদের এখানে থাকাই উচিত।" ল্যাম্বেয়ার আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে, তখন তিনিও এই কথাই ভাবছিলেন। অবেয়ার আর ফ্রোরীও আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াল। তিনজন সাহেবের মধ্যে অনেক কথাবর্তা হল। তারপর তারা ঠিক করলেন প্রথম দু'জন নীচে নেমে যাবেন। আর সেখানে থাকব শুধু আমি আর ল্যাম্বেয়ার। তারপর সকালে আবহাওয়া যদি সুপ্রসন্ন থাকে তাহলে আমরা চূড়ায় ওঠবার একটা চেষ্টা করব।

অবেয়ার আর ফ্রোরী, তাদের কাছে অল্পস্বল্প যেসব জিনিস ছিল সেগুলো ওখানে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, "সাবধানে থেকো।" বলতে বলতে তাদের চোখ জলে ভরে এলো। ল্যাম্বেয়ার, আর আমার মত মত তাঁরাও সুস্থই ছিলেন। আমাদের বদলে তাঁরাও সেখানে থেকে যেতে পারতেন।

সুযোগ নিতে পারতেন পাহাড়ে চড়ে সফল হবার। কিন্তু তাঁবু ছিল একটা। রসদও সামান্য, তাই তাঁরা স্বার্থত্যাগ করলেন। মনে কোনরকম মালিন্য না রেখেই তাঁরা তাঁদের স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত শুধু এক পর্বতারোহীদের মধ্যেই মেলে।

তাঁরা নীচে নেমে গেলেন। ক্রমে ক্রমে ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো বিন্দুর মত তাঁদের দেখাতে লাগলো। তারপর তাও মিলিয়ে গেল। ল্যাম্বেয়ার আর আমি ছোট্ট তাঁবুটো খাটালাম। খাটাতে বেশ পরিশ্রম হ'ল। ঘন-ঘন শ্বাস নিতে লাগলাম। হাঁপাতে লাগলাম। আবার যে মুহূর্তে আমরা কাজ করা বন্ধ করলাম সেই মুহূর্ত থেকেই কিন্তু ভালো বোধ করতে লাগলাম। আবহাওয়াটা এত সুন্দর ছিল যে, আমরা কিছুক্ষণ তাঁবুর বাইরে বসে অস্তমান সূর্যের রশ্মিকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। আমাদের ভাষা বিভিন্ন। তাই কথাবার্তা খুব বেশি এগোচ্ছিল না। কথা বলার খুব বেশি একটা দরকারও ছিল না। একবার আমি উপরের দিকে আঙুলে তুলে দেখিয়ে ইংরাজীতে বললাম, "আসছে কাল—তুমি আর আমি।" আর ল্যাম্বেয়ার সাহেব একগাল হাসলেন। তারপর বললেন, "কা ভা দিয়েন!" অন্ধকার নেমে এল। ঠান্ডা বেড়ে উঠল। গুঁড়ি মেরে আমরা তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

আমাদের কাছে স্টোভ ছিল না। খিদেও পায়নি শুধু এক টুকরো পনীর আমরা একবার দাঁতে কাটলাম। সেটা তুষার দিয়ে ধুয়ে আমরা মোমবাতির তাপে গলিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের কাছে ঘুমানোর ব্যাগও ছিল না। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েছিলাম। একজন আর একজনকে দলাই-মলাই করে আমরা আমাদের রক্ত চলাচল ঠিক রাখছিলাম। আমি বেঁটে আর ল্যাম্বেয়ার ঢ্যাঙা। তাই এই ব্যাপারে সুবিধেটা আমারই হল বেশি। কারণ ল্যাম্বেয়ার আমার ছোট্ট দেহটা সহজেই দলাই মলাই করতে পারছিল। আর আমি ওর ওই বিরাট দেহের খানিকটা অংশই মাত্র ডলছিলাম। তবুও সাহেব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার পায়ে যাতে তুষার কামড় বসাতে না পারে সেদিকে সাহেব খুব কড়া নজর রেখেছিলেন। বললেন, "আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। বেশ আছি। আমার তো পায়ের পাতা নেই। কিন্তু, তোমাকে তো এখনও পায়ের পাতার উপর ভর দিয়েই চলতে হয়!"

ঘুম এলো না। ঘুমোতে আমরা চাইওনি। ঘুমোবার ব্যাগ ছাড়া অরক্ষিত অবস্থায় এখানে চুপচাপ পড়ে থাকা মানেই জমে মরে যাওয়া। তাই আমরা একজন আর একজনের শরীরে আস্তে আস্তে থাপড়ে মারছিলাম, গা ডলে দিচ্ছিলাম। আর রাত কাটাচ্ছিল ধীরে, অতি ধীরে। হঠাৎ একসময়ে তাঁবুর মধ্যে খুব মৃদু, খুব ধূসর একফালি আলো এসে ঢুকে পড়লো। গুঁড়ি মেরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। শীতে আমরা ততক্ষণে শক্ত হয়ে গেছি। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। লক্ষণ খুব ভাল নয়। আবহাওয়া অনেক খারাপ হয়ে এসেছে। একেবারে খুব খারাপ, তা নয়। ঝড়ও ছিল না। তবে যে পরিষ্কার চকচকে ভাবটা কাল ছিল, আজ তা অন্তর্হিত হয়েছে। আকাশের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকটা মেঘে মেঘে ভরে গেছে। বাতাসের ঝাপটায় তীক্ষ্ণ বরফের কণাগুলো এসে আমাদের চোখে মুখে বিঁধছে। কয়েক মুহূর্ত আমরা ইতস্তত করলাম। অবশ্য কথার কোন দরকার ছিল না। ল্যাম্বেয়ার গিরিশিরার দিকে তাঁর বুড়ো আঙুল তুলে ধরে আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন। আর আমিও মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লাম। আমরা তখন এমনই দূরে এগিয়ে গেছি, যেখান থেকে সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

অসাড় হাত দুটো দিয়ে আমাদের জুতোর তলে পাহাড়ে-ওঠা-কাঁটা লাগিয়ে নিতে মনে হ'ল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করলাম। ধীরে, অতি ধীরে। একটু একটু করে প্রায় গুঁড়ি মেরে মেরেই আমরা উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। এই তিন কদম উঠি, এই থেমে পড়ি। এই দু'কদম উঠি তো এই আবার থেমে যাই। এই এক কদম উঠি তো আবার থামি। আমাদের সঙ্গে অক্সিজেনের তিনটে পাত্র ছিল। কিন্তু সেই আগের মতই, ওঠবার সময়, ওগুলো আমাদের কোন কাজে আসছিল না। তাই কিছুক্ষণ পরে ওগুলোকে ফেলে দিয়ে আমরা বোঝা হালকা করলাম। গজ কুড়ি যেতে যেতেই আমরা আমাদের জায়গা বদলাতে লাগলাম। একবার করে আমি আগে আগে যাই আর একবার করে সাহেব। এইভাবে আমরা পথ তৈরী করবার কঠিন পরিশ্রম নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারছিলাম। শুধু তাই নয়, এইভাবে আমরা দমভরে শ্বাস টানতেও পারছিলাম আর এইভাবেই একটি ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। দু'ঘণ্টা কাটলো। তিনঘণ্টাও। উঠতে যে খুব কষ্ট হচ্ছিল তা নয়, তবে বেশির-ভাগ সময়ই আমাদের খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে হচ্ছিল। কারণ গিরিশিরার যেখান দিয়ে আমরা উঠছিলাম আর একদিকটা খুব উঁচু হয়ে উঠে গেছে। আর অন্যদিকে এক বিরাট শূন্যের মধ্যে ঝুলে আছে স্তূপাকৃতি তুষার। কখনও কখনও গিরিশিরাটি এমন খাড়াভাবে উঠে গেছে যে, তার গায়ে ধাপ কেটে আমাদের উঠতে হচ্ছিল। এইভাবে পাহাড় চড়ায় ল্যাম্বেয়ার একেবারে বাঘা-ওস্তাদ। কারণ ওর পা ছোট, পায়ের পাতা নেই। তাই একটুখানি জায়গা পেলেই ও পাহাড়ী ছাগলের মত দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। মনে হ'ল যেন একটা দিন অথবা গোটা একটা সপ্তাহই বুঝি গেল। আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ কুয়াশার আমদানী হচ্ছে। বাতাসে তাড়া-খাওয়া তুষার দিক্‌বিদিকে ছোটাছুটি করছে। এমন কি আমার যে অমন 'হিম্মতওয়ালা তিস্‌রা ফুসফুসটি', সেটিও সেই খাড়া তুষার ভেঙে উঠতে উঠতে বিগড়াতে শুরু করলো। গলা শুকিয়ে আসতে লাগলো। ঘন ঘন তেষ্টা পেতে লাগলো। আমরা এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে, দু'পায়ে ভর দিয়ে আর চলতে

পশ্চিম "কমের" সেই বিরাট বরফের ফাটলটি

রছি না। আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে তে হচ্ছে। একবার ল্যাম্বেয়ার আমার কে ফিরে কি যেন বলল। আমি তা ঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আবার ন কি বলল। তাঁর চোখের গগ্‌ল্‌স্‌ আর তাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুখে ঘন রে মাখানো প্রলেপের ফাঁক দিয়ে আমি কে একগাল হাসতে দেখলাম। এবার কে বুঝতে পারলাম।

সে বলছিল, "কা ভা বিয়েন!" বহুৎ চ্ছা।

"কা ভা বিয়েন!" জবাবে আমিও তাকে ই কথাই ফেরত দিলাম।

কিন্তু একথা সত্যি নয়। সময়টা যে টেই আচ্ছা নয়, সেকথা দুজনেই নতাম। কিন্তু আমাদের দুজনের আদান দান এইভাবেই হতো। সব কিছু যখন নুকূল, তখনও 'কা ভা বিয়েন।' সব ঠিক য়। সবকিছু যখন প্রতিকূল তখনও 'কা বিয়েন।' বহুৎ আচ্ছা। সব ঠিক হ্যায়।

এই একটা সময় যখন মনে নানা কথার দয় হয়। হচ্ছিলও। ভাবছিলাম দার্জিলিঙের থা, আমার বাড়ির কথা, আঙ্‌ লাহ্‌মুর কথা, আমার মেয়ে দুটোর কথা। ভাবছিলাম দিতের তার দ্বিতীয় অভিযাত্রী দল নিয়ে আমাদের পিছু পিছু উঠে আসছে, আমরা যদি চূড়ায় পৌঁছতে না পারি তাহলে ওরাই হয়তো উঠে যাবে। ভাবছিলাম, না, আমরাই সেখানে উঠব। ঠিক উঠতে পারবো। কিন্তু উঠতে যদি পারি, নেমে আবার ফিরে যেতে পারবো তো? ম্যালোরী আর আরভিনের কথা আমার মনে পড়ছিল। এই পাহাড়ের অন্য ধার দিয়ে উঠতে উঠতে না জানি কেমন করে তারা চিরদিনের মতই গায়েব হয়ে গেল! এখন আমরা যত উঁচুতে উঠতে পেরেছি, তারাও হয়ত এতটা উঁচুতে উঠেছিল।......তারপর হঠাৎ আমার ভাবনা-চিন্তা বন্ধ হয়ে গেল। মগজ অসাড় হয়ে গেল। আমি যেন আর আমি নয়। একটা যন্ত্র মাত্র। একটু করে উঠছি আর থামছি। উঠছি আর থামছি। উঠছি আর থামছি।

তারপর একেবারেই থেমে গেলাম। আর একপাও এগুলাম না। উড়ে উড়ে-পড়া তুষারের মধ্যে বাতাসের ঝাপটে কুঁজো হয়ে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্বেয়ার। একেবারে নিথর, নিশ্চল। আমি জানতাম যে সে একটা কিছু করবার চিন্তা করছে। আমিও কিছু ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শ্বাস টানতে আমাদের যত কষ্ট হচ্ছিল, কোন কিছু ভাবতেও সেরকম কষ্টই হচ্ছিল। কি তার থেকে বেশিই হচ্ছিল। নীচের দিকে চাইলাম। আমরা অনেকটা উঠে এসেছি—কতটা? ল্যাম্বেয়ার পরে হিসেব কষে বের করেছিল, আমরা লম্বভাবে প্রায় ৬৫০ ফুট উঠেছিলাম। আর এতটা উঠতে আমাদের সময় লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা। আমি উপরের দিকে চাইলাম। দক্ষিণ চূড়াটি আরও পাঁচশো ফুট উপরে। তবুও সেটা মূল চূড়া নয়। ওটা দক্ষিণ চূড়া। আর তার পিছনে...

ঈশ্বরে আমি বিশ্বাসী। মানুষ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন তার কর্তব্য সম্পর্কে ঈশ্বর যে নির্দেশ দেন, আমি তা বিশ্বাস করি। ল্যাম্বেয়ার আর আমিও সেদিন তাঁর নির্দেশ পেয়েছিলাম। আমরা হয়তো আরও উঠে যেতে পারতাম। হয়তো চূড়া পর্যন্তই। আমরা সেখানে পৌঁছতেও হয়ত পারতাম। কিন্তু ফিরতে কিছুতেই পারতাম না। আরও উঠে যাওয়া মানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।.....তাই আমরা আর উঠলাম না। সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর তারপর ফিরে চললাম পিছনে......২৮,২৫০ ফুট উঁচুতে আমরা পৌঁছেছিলাম। এভারেস্টের চূড়ার এত কাছে এর আগে আর কোন মানুষে পৌঁছতে পারেনি। পৃথিবীর আর কোন লোকও এর আগে এত উঁচুতে উঠতে পারেনি। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। আমাদের যা ক্ষমতা তা সব আমরা ব্যয় করেছি। তাও যথেষ্ট নয়। আমরা ফিরে চললাম। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছিলাম না। আমরা নির্বাক, আমরা নিশ্চুপ। শুধু নেমে চলেছি। দীর্ঘ গিরিশিরার গা বেয়ে বেয়ে উচ্চতম শিবিরটি ছাড়িয়ে, তুষারের উতরাই বেয়ে আমরা নেমে চলেছি। ধীরে ধীরে। এক পা এক পা করে। নীচে—নীচে—আরও নীচে।

আমার আর ল্যাম্বেয়ারের মুরোদ এই পর্যন্তই। পরদিন অবেয়ার আর ফ্লোরীর সঙ্গে আমরা 'কল' থেকে পশ্চিম 'কমে' নেমে গেলাম। আর আমাদের সামনে দিয়ে দিতের দ্বিতীয় একটা দল নিয়ে উঠে গেলেন তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। এই দলে চারজন সুইস সাহেব ছিলেন আর ছিল পাঁচজন শেরপা। বাতাস ক্রমেই বেড়ে উঠলো। শীত আরও নিদারুণ হয়ে এল। তিনদিন তিন রাত পরে ওরাও নেমে আসতে বাধ্য হ'ল। ওরা চূড়ায় উঠবার গিরিশিরা পর্যন্তও যেতে পারেনি।

যাই হোক, আমরা এক মহৎ প্রচেষ্টা করেছি।

আর আমি লাভ করেছি এক মহান্ বন্ধু। (ক্রমশ)

ইংলণ্ডের ডায়েরি

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮ই মে, শুক্রবার, ১৮৮৮

অদ্য প্রাতে দেখা গেল যে, আমাদের জাহাজ প্লিমাথ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। আবার হাঁটিয়া যাইতে হইল। প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় আমরা প্লিমাথে পেীঁছিলাম। সেখানে নামা গেল। নামিয়া অদ্যকার দিন এখানে অবস্থিতি করা গেল। এখানকার পাবলিক বাথ, পিয়ের ও কেল্লা দেখিয়া আসা গেল। মার্সেলিসে রাস্তাতে যেমন লোকে লোকারণ্য, এখানে তত লোক দেখা গেল না। ফরাসীরা বুঝি ঘরের বাহিরে থাকিতে ভালবাসে। ইংরেজরা বোধ হয় ঘরের ভিতরটাই ভালবাসে। যাহা হউক, প্লিমাথে জনতা কিছু অল্প বোধ হইল। আজ দুর্গামোহনবাবুর মধ্যম পুত্র সতীশকে (১) অনেক দিনের পরে দেখিলাম। ছেলেটি বেশ চালাক চতুর হইয়াছে এবং জ্ঞানও আছে।

আজ আহারের সময় রবিনসন (সত্যের বন্ধু) বলিলেন যে, এখানে যে সকল বাঙ্গালী আসিয়াছে, তাহাদের অনেকেই নিজেদের চরিত্রের দোষে বাঙ্গালীর নামে কলঙ্ক আনিয়াছে।

প্লিমাথে আসিয়া Mr. Tyssen (২) ও Mr. Acyrton (২) এর দুই পত্র পাইলাম। মিঃ টাইসেন যে সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়। টাইসেনের পত্রের উত্তর দেওয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করিবার কথা লিখিলাম।

এখানে আসিয়া আপাতত আমার একটা উপকার হইল। আমার সাবধানতা বৃদ্ধি হইবে, সাবধান হইয়া পত্র লিখিতে হইবে, সাবধান হইয়া কথা কহিতে হইবে, সাবধান হইয়া বসিতে হইবে। ইহাতে অনেক উপকার হইবে।

টাইসেন লিখিয়াছেন যে, তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারএ আমার বিলাত যাত্রার সংবাদ পড়িয়া জানিয়াছেন যে, আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি। মিস কলেৎকে (৩) যে আসিবার এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র লিখিলাম, তিনি কেন সংবাদ দিলেন না? তবে কি তিনি লণ্ডনে নাই; অথবা আমি আমার জীবনচরিত যা তাঁহাকে বলিয়াছি, তাহাতে কি তিনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার সহিত আত্মীয়তা ঘুচাইতে চান? তাহাই বা কিরূপে হইবে? হেরম্ব (৪) জাহাজে উঠিবার সময় কলিকাতায় আমাকে বলিলেন যে, মিস কলেৎ আমার পত্র না পাইয়া চিন্তিত আছেন। তবে কি হইল? লণ্ডনে গিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি তিনি আমাকে বন্ধুতা হইতে বিদূরিত করেন, তাহা হইলে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি যেরূপ রাখেন থাকিব ও বিনম্রভাবে আত্মোন্নতি করিয়া যাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় চিরদিন তাঁহার দাওয়া থাকিবে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। প্রাণে সেই ভাবই রক্ষা করিব। দূর হোক, এত চিন্তাই বা কেন! যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন সে বিষয় ভাবিব। স্থির হইয়া না বসিলে ভাল করিয়া উপাসনাও করিতে পারিতেছি না। সকল বিষয়েই যেন খেই হারাইয়া গিয়াছে। ছেঁড়া সূতা জোড়া দিতে কয়েক দিন লাগিবে।

১৯শে মে, শনিবার

আজ প্রাতে আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাতরাশ সমাপন করিয়া রেলযোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রেলের দুই পার্শ্বে ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে আসিতে লাগিলাম। ইংলণ্ডের কৃষিকার্যের ভাব এই প্রথম প্রাপ্ত হইলাম। ক্ষেত্রগুলি পরিস্কার, অতি উৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত; প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রই বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত। শুনিলাম গো মেষ প্রভৃতি নিবারণের জন্যই এ সকল বেড়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমরা কয়েক ঘণ্টা পরে ব্রিস্টল নগরে উপনীত হইলাম। ব্রিস্টলের নাম আমার নিকট অতি প্রিয়; নামিয়াই গাড়ি করিয়া Arno's Vale নামক সমাধি ক্ষেত্রে যাওয়া গেল। রামমোহন রায়ের কবরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া মনে কি এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের সমাধি স্থান দেখিব স্বপ্নেও ভাবি নাই; দাঁড়াইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম। অন্য লোক সঙ্গে না থাকিলে তদুপরি মাথা রাখিয়া উপাসনা করিতাম। পার্বতীবাবু কোথা হইতে কিছু ফুল আনিলেন, সেই ফুল দুজনে তদুপরি দেওয়া গেল। তৎপরে দ্বারের নিকট আসিয়া কয়জনে একখানি খাতাতে নাম স্বাক্ষর করা গেল। তাহাতে কেশববাবু (৫), প্রতাপ-বাবু (৬) ও শশীপদবাবু (৭) প্রভৃতির নাম দেখা গেল।

এই সমাধি ক্ষেত্রে মিস কার্পেণ্টার (৮) ও তাঁহার পিতারও কবর দেখা গেল।

রামমোহন রায়ের সমাধিটির মেরামত আবশ্যক বোধ হইল। দুর্গামোহনবাবু মেরামত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্বে এ কার্জটি যদি হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

৬টার সময় লণ্ডনে আসিয়া পেীঁছিলাম।

২০শে মে, রবিবার

অদ্য প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উপাসনান্তে ডায়েরি লিখিতে ও একটু পড়িতেই প্রাতরাশের সময় হইল। তৎপরে আমরা ক্লার্ক সাহেবের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বাহির হইলাম। সেখান হইতে আসিয়া মধ্যাহ্ন

---

(১) পরলোকগত ব্যারিস্টার এস আর দাস; ইনি পরবর্তীকালে এড্ভোকেট জেনারেল ও ভারত গভর্নমেণ্টের আইন সচিব হইয়াছিলেন।

(২) ইঁহারা উভয়েই ইউনিটেরিয়ান খৃীস্টিয়ান এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন।

(৩) Miss Sophia Dobson Collet—ব্রাহ্ম-সমাজের পরম হিতৈষিণী ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি জীবন চরিত "Life and Letters of Raja Rammohan Roy" এবং "Brahmo year Book"—নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িত্রী।

(৪) পরলোকগত অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

(৫) আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। (৬) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট প্রচারক। (৭) পরলোকগত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্ম-সমাজের অগ্রসর দলের অন্যতম নেতা। (৮) Miss Mary Carpenter—ইংলণ্ড প্রবাসকালে রাজা রামমোহনের চরিত্র-প্রভাবে প্রভাবিত ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; ইনি Stapleton Grove-এ রামমোহনের অন্ত্যেষ্টিকালে উপস্থিত ছিলেন এবং "The Last Days in England of the Rajah Rammohan Roy"—নামক মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্রত লইয়া ইনি অন্যান্য দেশ দেখিয়া ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। ইঁহারই স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে Mary Carpenter Hall নির্মিত হয়।

আহারান্তে মিস কলেৎ-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সেখানে যাইবামাত্র পরিচারিকা উপরে লইয়া গেলেন। মিস কলেৎকে দৃষ্টিগোচর করিলাম। যখন দেখা হইল, কিভাব হইল—আমি বর্ণনা করিতে পারি না। উনিও ভাবোচ্ছ্বাসে হাঁপাইতে লাগিলেন। কি ভালবাসা! কি ভালবাসা! আমি তাঁর পত্র না পাইয়া কত কি ভাবিতেছিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি শিলমাথে এক লম্বা পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা আমরা পাই নাই। বাপরে, পত্রখানা না পাইয়া কত কি ভাবিতেছিলাম।

মিসেস অ্যানি বেসান্ত-এর (৯) বিষয় কিছু কিছু শুনিলাম, তিনি ও স্টেড (১০) দুজনে মিলে নামে এক কাগজ বাহির করিতেছেন। শুনিলাম, মিসেস বেসান্ত মন্দ লোক নহেন; দেখিতে হইবে। অনেক কথা বলিলেন, বড় তাড়াতাড়ি কথা কহিবার অভ্যাস।

মিস কলেৎ-এর নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টা যাপন করিয়া ৭টার পর ফিরিলাম। এখানে ৮৷৷টার সময় সন্ধ্যা হয়। ৮৷৷টার সময় বাতি জ্বলিল।

লণ্ডন, মুরেক রোড, কিউতে দুর্গামোহনবাবুর সংগে আমরা রহিয়াছি। এখানে ফিরিতে প্রায় ৯৷৷টা হইল।

শুনিলাম দেশ হইতে আমার নামে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১১) নিকট রহিয়াছে।

২১শে মে, সোমবার

অদ্য প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর উপাসনা সারিলাম। উপাসনার পর প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আবার মিস কলেৎ-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি, দ্বিজদাস দত্ত (১২) ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত। তাঁহাদের সংগে বাড়ি দেখিতে বাহির হওয়া গেল। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা বাড়ি একপ্রকার স্থির করা গেল। একটি শয়নের ঘর ও তিনবার আহার সমুদয় একত্র করিয়া

---

(৯) ডাঃ মিসেস অ্যানি বেসান্ত—তখন ইনি সোশ্যালিস্ট ভাবাপন্ন ইংরেজ মহিলা। পরে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির প্রভাবে পড়িয়া থিয়সফির অনুরক্ত হইয়া ভারতে আসিয়া এই দেশকেই মাতৃভূমিরূপে বরণ করেন এবং ইহার নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক উন্নতির জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেন। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির মৃত্যুর পরে ইনি বহু বৎসরকাল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনেও ইনি পরে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসে সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

(১০) সম্ভবত ইনি উইলিয়ম টি স্টেড্, তৎকালে পল মল গেজেট-এর সম্পাদকতা করিতেন; পরে রিভিউ অব রিভিউজ নামক উদারমতাবলম্বী সুবিখ্যাত মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত"-এর ৩৯৩ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিষয় জ্ঞাতব্য।

(১১) পরলোকগত বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ডি এন মুখার্জি; ইনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ঐ সময়ে বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং শিক্ষান্তে দেশে ফিরিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন।

(১২) দ্বিজদাস দত্ত ইনি তখন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক; বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে বিলাত গমন করেন। সেখান হইতে এম এ পাস করিয়া দেশে ফিরিয়া প্রথমে কিছুকাল গভর্নমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং অবশেষে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র উল্লাসকর আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইলে পুত্রের অপরাধে পিতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি এবং উর্দুতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

রবিদা' আর সুমিতা দু'জনেই আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল ওদের ঘোরে। কতক্ষণ এমনি আচ্ছন্ন হয়েছিল কে জানে। সময়ের মনে সময় পার হ'য়ে গেল। এই দুজনে নিঃশব্দ অথচ দ্রুত নিজের নিজের মনের অদৃশ্য ধারায় চলে গেল কোন্ সুদূরে। চমক যখন ভাঙ্গল, দেখল গিরীনদা চলে যাচ্ছেন গাড়ি নিয়ে। তবে? তবে কি হল? একটু পরেই নেমে এল বড়দি বাবার সঙ্গে। পাশে পাশে উকিল অনিলবাবু। দেখল, বড়দি'র রংহীন শাদা শাড়িটাতে আগুন লেগেছে যেন। ওর সারা চোখে মুখে একটি অস্বাভাবিক দীপ্তি। একটি অদ্ভুত চাপা তীব্র হাসির ধারে চমকাচ্ছে ওর চোখ মুখ। এমন কী, ওর চলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আরো দৃপ্ত খরো হ'য়ে উঠেছে।

অনিলবাবু বিদায় নিলেন হাসতে হাসতে। কিন্তু বাবাকে তেমনি অসহায় করুণ দেখাচ্ছে।

কাউকে কিছুই বলতে হল না। বোঝা গেল, সেই অমোঘ পরিণতি ঘটে গেছে। সুমিতার সব স্বপ্ন ভেঙে, একটি ছিন্ন পত্রের মত নেমে এল বড়দি। গিরীনদা গেছেন তার আগেই। রাজশক্তি দিয়ে ওদের বিচ্ছেদ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বড়দি বলল, তোমরা বাড়ি যাও বাবা, আমি এক জায়গায় ঘুরে যাব।

বাবা যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠে বললেন, কোথায়?

বড়দি : অনেকদিন অমলাদের বাড়ি যাইনি। আজ একটু ঘুরে যাব।

বাবা ছেলেমানুষের মত করুণ গলায় বললেন, আজ থাক উমনো, অন্য দিন যাস্।

বড়দি ওর সেই দীপ্ত হাসিমুখেই বলল, না বাবা, আমার বাড়ি যেতে এখনি ইচ্ছে করছে না। তোমরা যাও আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

তারপর রবিদার দিকে ফিরে, নিজের হাতঘড়ি দেখল। বলল, এ কি, তুমি কলেজ কামাই করে ফেললে? সাড়ে বারোটায় তোমার ক্লাশ ছিল যে?

রবিদা অপ্রস্তুত গলায় বললেন, হ্যাঁ, আজ আর যাওয়া হল না।

বড়দি একমুহূর্ত দূরের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বাবা, তুমি চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি?

বলে ও চলে গেল। দৃপ্তপদক্ষেপে, ওর শাদা শাড়িতে আগুন ছড়িয়ে যেন গেল চলে। বাবা আর রবিদা' দুটি ভিন্ন মানুষ এক হয়ে গেলেন একেবারে। একটু পরে, এরা তিনজনেও অগ্রসর হল। খানিকটা এগিয়ে রবিদা বললেন, আমি আজ চলি কাকাবাবু। কাল পরশু বাড়িতে যাব। তারপর সুমিতা বাবার পাশাপাশি হেঁটে চলল।

তখনো অফিস আদালতের ছুটি হ'তে কিছু বাকী। মাঘের রোদে কাঁপছে অনাগত চৈত্রের দীপ্তি। রাস্তায় ভিড় কম। ট্রাম-বাসগুলি ফাঁকা ফাঁকা।

বাবা বললেন, রুমনো, চ', বাগবাজারে তোর জ্যাঠাইমা'র কাছে যাই আজ একটু।

রুমনির কথা বলতে ভয় হল। অনাকিছু নয়, ওর সমস্ত রুদ্ধ-কান্না ভেঙে পড়বে ব'লে। সম্মতি জানাল ঘাড় কাত করে।

(৫)

সারাটি রাস্তা মহীতোষ চুপ করে রইলেন। সুমিতা শূন্যদৃষ্টিতে দেখছিল দুপুরের ভিড়হীন রাস্তা। আর থেকে থেকে, লুকিয়ে দেখছিল মহীতোষকে। যেন এক মহা দুর্দৈবের পর, নতুন করে আবার সবটুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে।

ট্রাম মেডিকেল কলেজ ছাড়াতেই দেখা গেল পুলিস ভ্যান্ রয়েছে দাঁড়িয়ে মীর্জাপুর স্ট্রীটের মধ্যে। কোমরে রিভল-বার ঝুলিয়ে দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কোয়ারের রেলিং-এর কাছে। পুলিস বাহিনী রয়েছে একটি আলাদা গাড়িতে। হেলমেট রাইফেলে রীতিমত যুদ্ধের সাজ তাদের সর্বাঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য রকম অলস চাউনি তাদের চোখে। যেন নেহাৎ অমত অনুৎসাহিত্যে চোখ তাকিয়ে দেখছে স্কোয়ারের দিকে। মুখগুলি ভাবলেশহীন। কেবল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার দুজনকেই যা একটু বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। সেটাও বুদ্ধি ঠিক নয় ক্রোধের দীপ্তি। দুজনেই তাকিয়ে আছে স্কোয়ারের ভিড়ের দিকে।

সবই দেখা হয়ে গেল চোখের পলকে। স্কোয়ারে ছাত্রছাত্রীদের জটলা। মিটিং হচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, কোন উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা যেটুকু, সেটুকু রাইফেল হেলমেটেই সীমাবদ্ধ। এখন আর এসব দেখে ভয় বিস্ময়, কিছুই হয় না। ট্রাক, ট্যাঙ্ক, কামান কনভয়ের সারি, সৈন্যবাহিনী পুরনো হয়ে গেছে। গতবছর শেষের দিকে সারা কলকাতার অলিতে গলিতে পুলিসবেষ্টিত হয়েছে। কয়েক মাস আগে দাঙ্গা উপলক্ষেও পুলিস মিলিটারী অবরোধ করে রেখেছিল কলকাতা। এখন মুখ না খুলতেই এরা হাজির হয়।

ভয় নয়, দুর্ভাবনা হচ্ছে। সুমিতার নিজের, বাবার চোখে মুখেও সেই আভাস। স্কোয়ারের ওই ভিড়ের মধ্যে মেজদি রয়েছে। হয়তো কলেজে এলে, সুমিতাও পায়ে পায়ে চলে যেতো ওখানে। কিন্তু এখানে এই চলন্ত ফাঁকা ট্রামে অশেষ বেদনায় নির্বাক দুজনের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া এল ঘনিয়ে। কিছুই বলার নেই। যার জন্যে দুশ্চিন্তা, সেই মেজদিকে ডেকে আনা যাবে না কোনক্রমেই।

তারপর বাগবাজারের মোড়ে নেমে, দুজনে হেঁটে এসে দাঁড়াল সেই বাড়িটির সামনে। আজ আর মহীতোষ কোথাও যাবার জায়গা খুঁজে পাননি এ বাড়ি ছাড়া। সুমিতা আরো কয়েকবার এসেছে এ বাড়িতে।

এখানে কলকাতার আর এক রূপ, আর এক রস, আর এক গন্ধ। গত শতাব্দীর নির্জীব ভাংগা জীর্ণ কলকাতা বুড়ো চোখে তাকিয়ে আছে এখানে। দক্ষিণের নতুন কলকাতা এখানে এসে করুণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করে। কেমন যেন হতশ্রী, রূঢ় এখানকার পরিবেশ। এখানকার বাড়ি, এখানকার রাস্তা, দোকানপাট, লোকজন, রকের আড্ডা, ভ্রাম্যমান ষাঁড়, সবকিছুর মধ্যে একটি ভিন্ন চরিত্রের ছাপ রয়েছে। অন্তত তার বহিরাঙ্গনের বেশ দেখে তাই মনে হয়। এখানে মানুষ বাস করে চেঁচিয়ে হেঁকে ডেকে। পুরোনো বাঙালীর আস্তানা এখানে। অথচ শহুরে জীবনের বাঁধনটি আছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

এখানেই মানুষ হয়েছে মহীতোষ, এ পাড়াতেই বড় হয়েছে। যে বাড়িতে ঢুকছেন, জন্মেছেনও সেই বাড়িতেই। তবে সে বাড়ি এ বাড়িতে এখন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। তখন এত নতুন ছোট ছোট ঘর উঠে ঝিঞ্জি হয়ে ওঠেনি, এত লোকের বাস ছিল না। এখন দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে না রাখলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায় না। নীচের উঠোনটার দিকে তাকাতেও ভয় করে। প্রচুর ভাড়াটের ভিড়। তাদের ব্যবহৃত সমস্ত জল [illegible] অন্ধকার উঠোনটিকে ভয়াবহ রকম পিছল করে রেখেছে। তেতলার বারান্দা থেকে এখানে আলোটুকু এসে পৌঁছোবার আগেই অন্ধকার [illegible] আকাশটাকে। অনেক লোক, তাই অনেক গণ্ডগোল, চীৎকার। সবসময়েই ভিড়ের মধ্যে বাস।

বাড়ির মালিক যারা, মহীতোষের ভাই-পো, তারা থাকে তেতলায়। তারা এ সব ভিড়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে অনেকখানি। যেটুকু সহ্য করতে হয়, সেটুকু আয়ের কথা চিন্তা করে করতেই হয়। সব মিলিয়ে মাসে তিনশো টাকা ভাড়া পায়।

সুমিতা ভেবে পায় না, মানুষের নিজের এত বড় বাড়ি থাকতে কেন তারা আকাশের টংএ, পায়রার খোপের মধ্যে থাকে গাদাগাদি করে।

দুজনে তেতলায় এসে দাঁড়াতেই একটি বছর দশেকের ছেলে উঠল চীৎকার করে, ঠাকমা, বালীগঞ্জের দাদু এসেছে।

বলেই, খালি গা ছেলেটি চকিতে একবার বাপ-মেয়েকে দেখে উধাও হল। মহীতোষের মৃত দাদার বড় ছেলে নবগোপাল আর রামগোপালের ছেলে মেয়েদের কাছে বালীগঞ্জের দাদু বলেই তার পরিচয়। আশেপাশে নড়বার জায়গা নেই। রেলিংএ, বারান্দায়, সর্বত্র কাপড় কাঁথা শুকোচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুখদা। মহীতোষের বউঠান, সুমিতার জ্যাঠাইমা। বয়স প্রায় মহীতোষের মতই। দু' একবছর বেশীও হতে পারে। দেখায় আরো বুড়ি। কিন্তু এখনো বেশ চলা ফেরা করতে পারেন। ছাঁচা পানের দলা মুখে পুরে, বলিরেখা-বহুল ঠোঁটের কষ রেখেছেন রক্তাক্ত করে। একটু চাপা গলাতেই বললেন, কী ভাগ্যি! ঠাকুরপো যে, একেবারে মেয়ে নিয়ে। এস ভাই, এস।

সুমিতার বড় অদ্ভুত লাগে বাবা আর জ্যাঠাইমার এই সম্পর্ক। বাবার সংগে বড়দি মেজদির যেমন বন্ধুত্ব আছে, এখানে ঠিক তেমনটি নয়। তবু যেন, জ্যাঠাইমার সংগে বাবার কেমন এক রকমের একটি বন্ধুত্ব আছে।

জ্যাঠাইমার চাপা গলা শুনে, বাবা একটু বিস্মিত হলেন মনে মনে। বললেন, এসে তোমাদের বিরক্ত করলুম না তো বৌঠান?

জ্যাঠাইমা ওর কুঞ্চিত গাল কাঁপিয়ে, ঘোলা চোখ দুটি কুঁচকে বললেন, ও মা! কী যে সাহেবীপনা কর ঠাকুরপো। ঘরের ছেলে ঘরে আসবে, তার আবার ওসব কী বলছ!

কিন্তু বাবার মুখের বেদনা-ভার-গাম্ভীর্য জ্যাঠাইমা তাকিয়ে দেখেননি এখনো। সুমিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আয়রে, আয়। কী নাম বাপু তোদের, আমার আবার মনেও থাকে না।

অন্যদিন হলে মহীতোষ জবাব দিতেন, নেহাৎই বাংলা নাম বৌঠান। সুজাতা, সুগতা, সুমিতা।

কিন্তু আজ কিছু বললেন না। সুমিতার হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের একটি ঘটনা। প্রায় ছ' বছর আগের কথা। কলকাতায় ফিরে বাবা বড়দি মেজদি আর ওকে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়িতে। বড়দি মেজদিকে শিখিয়ে রেখেছিলেন জ্যাঠাইমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। তখন সুমিতা অনেক ছোট। ইচ্ছে হয়েছিল, বড়দি মেজদিকে নকল করে, প্রণাম করবে জ্যাঠাইমাকে। কিন্তু সেরকম কোন অনুমতি বা নির্দেশ ছিল না ওর প্রতি।

এ বাড়িতে ঢুকলে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তেমনি মানুষগুলিকেও খুব একটা নিজের বলে ভাবতে পারে না সুমিতা। সবাইকেই কেমন যেন একটু পারে পড়া গাছে
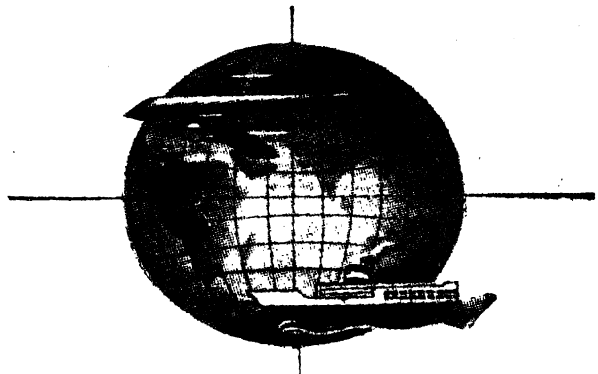
লাগে। পরিচয়ের অপেক্ষা না করেই মেয়েগুলি কাছ ঘেঁষে আসে ওর। তার সামনেই হয়তো সংসারের খুঁটি-বিষয় আলোচনা আরম্ভ করে দেয় র লোকেরা। ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে খেতে ঝগড়া করে। বাপ মা ছাড়া বাকী কে করে তুই তোকারি। কেমন যেন রুক্ষ বেয়াড়া মনে হয় সবাইকে।

কি মনে হল, সুমিতা আজ হঠাৎ ওর াইমাকে একটি প্রণাম করে বসল।

জ্যাঠাইমা একটু চমকে উঠে, পরমুহূর্তেই উঠলেন, আহা, মা আমার সোনা ক! এস মা, এস।

হীতোষও একমুহূর্তের জন্যে কেমন ঢ় হয়ে গেলেন। ভাবতেই পারেননি, ন এমন একটি কীর্তি করে বসবে। সেই াতেই সুমিতা বাবার দিকে আর াতেই পারলে না। কিন্তু জ্যাঠাইমার া, সোনামানিক' শুনে হঠাৎ যেন জল পড়ল ওর চোখ ফেটে। বুকের মধ্যে টনটনিয়ে। জ্যাঠাইমার এই সুরের কী যেন আছে, যা এ বাড়ির এই বেশ ও জীবনধারণের ঊর্ধ্বে একটি র সঞ্চার করে রেখেছে। অন্যদিন হলে, একথা শুনে হয় তো হেসেই ফেলত সুমিতা। বড়দি মেজদিরও হাসি পেয়েছিল একদিন। কিন্তু আজ ওর নিজের ঘরের অন্ধকার থেকে এসে, এই স্নেহ আপ্যায়নের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল যেন। কতকাল ধরে যেন এই অপরিচিত আদরের তৃষ্ণা ছিল বুকে।

অথচ এ ব্যাপারের জন্যে একটুও তৈরী হয়ে আসেনি। হঠাৎ ওর ছ' বছরের একটি নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার শোধ নিয়ে নিল এমনি করে। শুধু এইটুকু বুঝল না, ওকে এমনি করে প্রণাম করতে দেখে, অনেক বেদনার মধ্যেও বাবা কতখানি বিচলিত হয়ে উঠলেন। সেটুকু বিরক্ত নয়, রাগও নয়, ছোট মেয়েটির জন্যে হঠাৎ বাবার মন চিন্তা-ব্যাকুল হয়ে উঠল। কী হয়েছে রুমনিটার!

তারপরে ঘরের মধ্যে। কী ঘরে! তেতলার ঘর, তবু যেন অন্ধপুরী। তিনটি এমনি ছোট ছোট ঘর। ছোট বড় নিয়ে পনেরটি মানুষ থাকে। তেলচিটে তোষক গুটানো। ছেলেমেয়েগুলি খালি তক্তাপোষে মেঝেয় ছুটোছুটি গড়াগড়ি করে। বিছানামাদুর-গুলি ময়লা শ্রীহীন। দু' তিনখানা চেয়ার ছড়ানো এদিকে ওদিকে। ছেলেপুলেরাই কখন টানাহেঁচড়া করে রেখে দিয়েছে। আয়না আছে, টেবিল আছে। সবকিছুই যেন কি রকম। এসব দেখে বাড়ির কর্তা-ব্যক্তিরা যখন বিরক্ত হয়, মেয়েরা বলে, তা কী করা যাবে। ছেলেমেয়ের ঘর কত সাজিয়ে রাখা যায়।

মহীতোষ এখানে এসে অবশ্য সঙ্কোচ না করারই চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন, যেখানে হোক এক জায়গায় বসে সুখদার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলতে।

সুখদা বললেন তেমনি একটু চাপা গলায়, বসো ভাই ঠাকুরপো, একটু পা ছড়িয়ে তক্তাপোষে বসো।

সুমিতাকে বললেন, তুই একটা চেয়ার টেনে বোস্ মা।

এ ঘরের থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজায় এক রাশ ছেলেমেয়ে রয়েছে ভিড় করে। সঙ্গে নবগোপালের স্থূলাঙ্গী স্ত্রীও রয়েছেন। অর্থাৎ সুমিতার বউদি। মহী-তোষকে দেখেই একটু ঘোমটা টেনে এসে প্রণাম করল। মহীতোষ এখন এসব বিষয়ে একটু বিব্রতই বোধ করেন। তাড়াতাড়ি নিজেও কপালে হাতটি ঠেকিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা—

এ বেলা আর সুমিতার খেয়াল নেই যে, প্রণাম করলে, গুরুজন সবাইকেই প্রণাম করতে হয়। সেটাই রীতি।

পাশের ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। বড় ছেলে নবগোপালের কণ্ঠই বিশেষ করে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ থেকে সুখদা ও'র মোলায়েম গালে একটি অপূর্ব হাসি ফুটিয়ে মহীতোষের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আজ আমাদের শিবাণীকে দেখতে এসেছে।

দেখতে এসেছে! কথাটির সঙ্গে একটি অস্পষ্ট পরিচয় আছে সুমিতার। কোনদিন চাক্ষুষ দেখেনি। শিবাণীকে কে দেখতে এসেছে! নবগোপালদাদার বড় মেয়ে শিবাণী। বাবার নাতনী আর সুমিতাকে ডাকে ছোট পিসি বলে। সুমিতারই সমবয়সী হবে। ক্লাশ নাইন অবধি পড়েছিল স্কুলে। ওকে দেখতে এসেছে!

ভাবতেই বুকের মধ্যে ছটফট করে উঠল সুমিতার পাশের ঘরে যাবার জন্যে। সে যেন কোন এক নতুন জীবনের রংমহাল। কী এক বিচিত্র ঘটনা-ই না জানি ঘটছে ওখানে।

কিন্তু কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ ও ঘরে যাওয়াটাই বা কেমন দেখায়। কেউ না বললে যায় কেমন করে। হয়তো যাওয়াই রীতি-বিরুদ্ধ।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি পড়েছে মহাফাঁপরে। ওদের মনের যত টান পাশের ঘরে, তত টান এ ঘরের বালীগঞ্জের দাদু আর ছোট পিসির দিকে। ওদের কাছে এ দু' তরফের প্রতিই এক অনাস্বাদিতলোকের আকর্ষণ আছে।
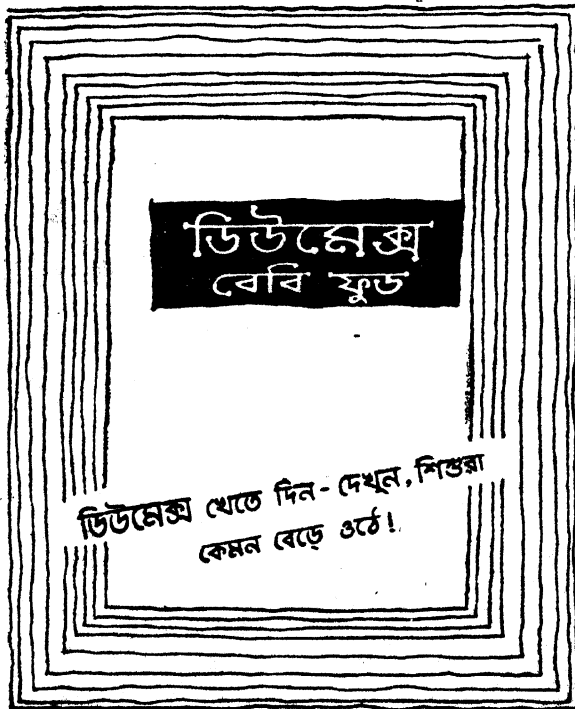
এমন সময় কী করে নবগোপাল খবর পেল মহীতোষের আসার কথা। অমনি ভারী আপ্যায়িত হয়ে, প্রায় চীৎকার করতে করতে ছুটে এল এ ঘরে। যেন মহীতোষের পায়ে কিছু ছিল, এমনি করে চোখের পলকে হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে বলল, কখন এলেন কাকাবাবু।

বোঝা যাচ্ছে, এসময়ে এসে পড়ে মহীতোষও অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, এই তো আসছি।

সুমিতার মনে হল, নবগোপালদাদা যেন প্রায় বাবার বয়সী। জার্ডিন কোম্পানীতে ক্লার্কের চাকরি করে। এর মধ্যেই মাথার চুলে ধরেছে পাক। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলি দেখাচ্ছে কয়াটে লাল। গায়ে একটা গেঞ্জি, পরনে ধুতি, কিন্তু একটি আন্ডারওয়্যারও পরেনি। বাবার সঙ্গে কথার এক ফাঁকেই সুখদাকে কানে কানে বলল, বোধ হয় পছন্দ হয়েছে, জানলে?

সুখদা বললেন, ভগবান যদি মুখ তুলে চান।

সুমিতা যতই দেখে, ততই দুর্বোধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখে সব। আর আড়ষ্ট হয়ে থাকে শরীর ও মনের মধ্যে। এরা কী কথা বলছে, কেন বলছে, কখন কেন যে হাসছে, সহসা সব ধরে উঠতে পারে না।

নবগোপাল বলল, চলুন কাকাবাবু, আপনি একটু ওঘরে চলুন।

সুমিতা দেখলে, বাবা একেবারে লাল হয়ে উঠেছেন। বললেন, আর থাক না নবগোপাল। এমনি হঠাৎ এসে পড়েছিলুম, বৌঠানের সঙ্গে একটু দেখা করে যাব বলে। আমি আর ওখানে গিয়ে কী করব।

নবগোপাল পানখাওয়া দাঁতে, একটি বিচিত্র ধরনের আবদারের হাসি হেসে বলল, তা' বললে হবে না কাকাবাবু। আজ আমার কী ভাগ্য, আপনি এসে পড়েছেন। আপনি থাকতে শিবাণীকে আমি একলা বসে দেখাব, এটা হয় না। বাবা থাকলে আজ নাতনীকে বসে দেখাতেন। বাবার হয়ে আজ আপনি রয়েছেন।

সুখদা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যাও ভাই একবার ঠাকুরপো, মনে মনে নাতনীটাকে একটু আশীর্বাদ করো যেন মেয়েটার একটা গতি হ'য়ে যায়।

মহীতোষ চকিতে একবার সুমিতার দিকে তাকালেন। সুমিতাও তাকিয়েছিল। মেয়েটার গতি আবার কী! ওর মনে হচ্ছিল, বাবা নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকাবেন। আর কার দিকে এখন তাকাবেন। বড়দি মেজদি তো কাছে নেই, যাদের দিকে তাকান অসহায় হয়ে। বাবার অস্বস্তি দেখে, সুমিতাও বিব্রত বোধ করল। কিন্তু এখানে তো ওর বলার নেই কিছু।

মহীতোষকে যেতে হল। সুখদা যেটুকু ভাবেননি হয়তো, সুমিতাও ভাবেনি, হয়তো মহীতোষও সম্যক ধারনা করতে পারেননি, সেটুকু হল নবগোপালের এক নিগূঢ় সম্মানবোধে। আজকে নিজের বাবা নেই বলেও যেমন সে মহীতোষকে পেয়ে খুশি হয়েছে, তেমনি এতবড় একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে আত্মীয়কে পেয়েও বুক ফুলে উঠেছে তার। যেন তার মেয়েকে পছন্দ করার ব্যাপারে ছেলে-পক্ষ একটি নতুন আলো পাবে।

সুমিতা বেচারীর কী দুর্দশা! ওকে তো কেউ যেতে বলছে না। একটি আলগা চেয়ারে প্রায় আলগা হয়ে বসে ও ধৈর্যের বাঁধটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। দেখছে, জ্যাঠাইমা কেমন এক সন্তর্পণে দোরে কান পেতে আছেন পাশের ঘরে। তারপরে হঠাৎ নজরে পড়ল সুমিতাকে। বললেন, যাবি ও ঘরে?

অমনি টুক্ করে ঘাড় নেড়ে দিল সুমিতা, হ্যাঁ যাবে।

বলেই কিন্তু জ্যাঠাইমাকে নিমেষের জন্যে চিন্তিত দেখাল। বুঝল না, জ্যাঠাইমা ওর দিকে চেয়ে ভেবে নিচ্ছেন, ছেলে-পক্ষ ওকে দেখে, না আবার শিবাণীকেই নাকচ করে দেয়। বোধ হয় পরমুহূর্তেই মহীতোষের মেয়ে ভেবে লজ্জায় মরে গেলেন অন্তরে অন্তরে। ও যে সাহেবের ছোট্ট মেয়ে! বললেন, যানা, যা। বড় বউমা, ওকে একটু যেতে দাও তো ও ঘরে।

চারজন ভদ্রলোকের সামনে সেজেগুজে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে শিবাণী। সুমিতাকে দেখেই বেচারীর লজ্জারুণ মুখখানি আর এক দফা লাল হয়ে উঠল। মেয়ে দর্শকেরাও সকলে একযোগে একবার তাকিয়ে দেখল সুমিতাকে। বোধ হয় একটু অবাক হয়েই দেখল। এ বাড়িতে এ মেয়েকে বড় বেমানান লেগেছে। এ আসরে সব চেয়ে বেমানান লাগছে মহীতোষকে। এসব যেন ও'র গত জন্মের ব্যাপার।

সুমিতা দেখছে আর শুনছে। নাম কি মা? কদ্দুর পড়েছ? কী রান্না জানো? গান গাইতে পারো? নামটি নিজের হাতে লিখে দাও তো। লজ্জাভরা গলায় সবই জবাব দিচ্ছে শিবাণী। যা বলছে, তাই করছে।

হঠাৎ কেমন যেন বড় রাগ হতে লাগল সুমিতার, লোকগুলির ওপর। কী বিশ্রী! ওর কোন আদর্শ নেই, নীতিও নেই, ঐ বিষয়ে কোন শিক্ষাও নেয়নি নিজেদের সমাজের কাছ থেকে। সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে ওর বিরক্তি ও বিস্ময় বাড়ল। আর বড় দুঃখ হতে লাগল শিবাণীর জন্য। নিজের অবচেতন মনে যেমন বড়দির সচেতন দীপ্তবহ্নি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, এখানে শিবাণীর এই দীপ্তিহীন নিস্তেজ বাধ্যতা ততখানি রুষ্ট করে তুলেছে।

লোকগুলি মহীতোষকে হঠাৎ বড় খাতির করতে আরম্ভ করেছে। মহীতোষও যেন সে

য়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন।
কছুক্ষণ পর মেয়ে দেখার পালা চুকল। স্টমুখ করে বিদায় হল বাইরের লোকেরা। তোষ বললেন সুখদাকে, এবার চলি যান।
সুখদা বললেন, এখুনি কি? যেয়ো, া, তোমার সংগে কথা আছে। বলেই প্রায় -গলায় হাঁকার দিলেন, এই দাসীগুলো, ল এ ঘর থেকে? সংগে সংগে নব- পাল চেঁচিয়ে উঠল।
বচারীরা বালীগঞ্জের দাদুকে দেখার চ সম্বরণ করে পালাল। গিয়ে জুটল শর ঘরে। সেখানে রয়েছে শিবাণী আর মতা।
দুজনের কেউ-ই তখনো কোন কথা নি। ভিড় দেখে শিবাণী বলল সলজ্জ য়, চল ছাদে যাই।
জনে সিঁড়ির দিকে যেতেই, ছোটরা ন নিল। ধমকে উঠল শিবাণী, দেখবি, বো বাবাকে? যা বলছি।
াজকে যে দিদির হুকুম মানতে হবে, ই ছিল ওদের বিশ্বাস। অগত্যা, স্ত হল। দুজনে ওরা উঠে এল ছাদে।
ক্ষণ সময়ের জন্যে, সুমিতার আজকের বেদনা আড়াল হয়ে রইল। মাঘের ঢলে সূর্যের চিকন রোদে ভরা ছাদে এসে ল দুজনে। শিবাণীর চোখে মুখে, সাজা- া, সব কিছুতেই একটি বিচিত্র লজ্জা রোদের মতই ঝিকিমিকি করছে। আলাপ : দুজনেরই। কিন্তু কেউ-ই কথা বলতে ছে না। সুমিতার খোলা চুলে পড়েছে। বড় বড় চোখে অবাক বিস্ময়ে দেখছে ণীকে। এ যেন সেই আগের শিবাণী যে শিবাণী ওকে সভয়ে সসংকোচে স করে পড়ার কথা। কলেজের কথা, অর্থাৎ মহীতোষের কথা, সুজাতা আর তা, বড় আর মেজ পিসির কথা। যে ন জিজ্ঞেস করে, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে : সুমিতাকে। যেন ওর এই সচকিত নারী প্রাণের কোথায় একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ে ওঠে ছোট পিসিকে দেখে। এই র মধ্যে, শিবাণীর প্রতি কেমন একটু বোধ এসে পড়ে সুমিতার। এ সংসারে, নতুন কথা শোনাবার পাত্রী শিবাণী। পিসি ডাকের মধ্যে যেমন একটু শ্রিত মেশানো খুশি অনুভব করে, তেমনি নিজেকে শিবাণীর সামনে একটু বড় বড় লাগে। অথচ বয়সে ওরা সমান।

কিন্তু আজ শিবাণীকে ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। ওর জন্যে যে সুমিতা এত দুঃখ পাচ্ছিল খানিকক্ষণ আগে, তার কোন চিহ্ন তো এ মুখে নেই। এ তো আলাদা শিবাণী। ওর ঠোঁটের এই হাসি, নত চোখের ওই চাউনি, অন্য বেশে, অন্য কোথায় দেখেছে সুমিতা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই প্রথম গিরীনদার আবির্ভাবে বড়দি হেসেছিল এমনি করে। মৃণালের সামনে দু' একবার এরকমভাবে হাসতে দেখেছে মেজদিকে। আজ, সমবয়সী শিবাণীও হাসছে এমনি করে। একে তো এই আধা-চেনা পরিবেশ, তার ওপরে এ ব্যাপার দেখে একেবারে নির্বাক হয়ে রইল ও। নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না সুমিতা। জানে না, এমন হাসি কোনদিন ফুটেছিল কিনা ওর মুখে।

শিবাণী বলল অস্ফুট লজ্জায়, এই ছোট পিসি, কিছু বলছ না যে?

নিজেকে কি রকম অসহায় মনে হল সুমিতার। বলল, কী বলব?

শিবাণী বলল হাসির নিক্কনে, কী আবার। এই......মানে......ওই সব।

ওই সব? একবার মনে হল সুমিতার, বুঝি বড়দির কথা বলতে বলছে শিবাণী। কিন্তু তারপরেই মনে হল, না, তেমন কোন দুশ্চিন্তার ছাপ তো নেই ওর মুখে। এতদিন সুমিতা এসেছে অন্য রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে। শিবাণী দেখেছে এবং শুনেছে। আজ শিবাণীর মধ্যে আর এক রাজ্যের বিপুল বিস্ময়, সেখানে থৈ পাচ্ছে না সুমিতা। বলল, কোন্ সব বলতো?

শিবাণী হেসে উঠে তাকাল সুমিতার মুখের দিকে। কী এক বিচিত্র ছটায় চকচক করছে ওর চোখ দুটি। বলল, কেন, এই যে দেখলে এতক্ষণ, এই সব দেখা টাকা, সেকথা।

সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল সুমিতা। সত্যি, কিন্তু কী বলবে? চকিত মুহূর্তে একবার ওর সেই অদৃশ্য লতার অনধিকারের ভয় হল।

তারপর বলল, এবার তোমার বিয়ে হয়ে যাবে তো?

শিবাণীকে লাল দেখাচ্ছে রোদে। বলল, যদি পছন্দ হয়।

সুমিতা: কাদের পছন্দ। ওই লোক-গুলোর?

বুঝল না, ওর গলার সামান্য অশ্রদ্ধার সুরটুকুও ব্যথা দিচ্ছে শিবাণীকে। শিবাণী বলল, হ্যাঁ।

সুমিতা: তারপর?

শিবাণী: তারপর? তারপর ওই যা বললে, তা-ই হয়ে যাবে।

সুমিতা বলল, বিয়ে হয়ে যাবে? তোমার যদি সেই লোকটিকে ভাল না লাগে?

সেই লোক, অর্থাৎ বর। শিবাণী অবাক লজ্জায় বলল, যাঃ!

শিবাণীর এ বিচিত্র অভিব্যক্তিতে আরো বেশী অবাক হল সুমিতা। বলল, ভাল লাগবেই?

শিবাণীর লজ্জার চেয়ে এখন যুক্তিটাই বড় হয়ে উঠল। বলল, নয় কেন?

আশ্চর্য! একটি লোককে ভাল না লাগার কত কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের? তারপর কী যে হল সুমিতার, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, ধরো, তার যদি আর কেউ থাকে?

শিবাণী অবাক হয়ে বলল, আর কেউ? মানে,—

বেচারী ঢোক গিলছে। বুঝতে পেরেছে, ছোট পিসি 'আর কেউ' বলতে কি বোঝাতে চাইছে। সুমিতা বুঝল না, কী তীব্র বাথার কষাঘাত করছে শিবাণীর নতুন দেখা স্বপ্নে। অভিমানের সুরে বলল, ইস্!

কিন্তু সুমিতা বেচারীর বুকখানি ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায় কৌতূহলে। ওই কথাটি জানতে চায় ও এখন। বলল, তখন তুমি কী করবে?

শিবাণীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। বলল, কী আবার? তা হবে কেন? তা হবে না।

শিবাণীর দৃঢ়স্বর শুনে একটু থতিয়ে গেল সুমিতা। বলল, কেন?

শিবাণী আবার লজ্জিত হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে বলল, আমাকে তো সে ভালো-বাসবে।

কথাটি বলে এবং শুনে দুজনেই একে-বারে চুপ হয়ে গেল। সুমিতার অন্তর্স্রোতের একমুখী গতিটিকে হঠাৎ আর এক পথে ভাসিয়ে দিলে শিবাণী। যেন ওর বরের ভালোবাসার কাছে আর কিছু থাকা না থাকা সব তুচ্ছ হয়ে গেল। বড়দি গিরীনদা, কাউকেই স্পষ্ট খুঁজে পেল না এখানে।

সোনা চিকন রোদ রক্তিম হয়ে উঠেছে। ছাদের পরে ছাদ, উঁচুনীচু বন্ধুরতার মধ্যেও কোথায় একটি ক্লুংকীট ইঁট কাঠের কঠিন ছাদ রয়েছে সাজানো। কোথাও জলের ট্যাংক, রেডিও এরিয়ালের আকাশ খোঁচানো সরু বাঁশ। নীচে ও দূরে কোলাহল শহরের।

আর এখানে, দুই ভিন্ন মনের দুই কিশোরী দুটি ঝুঁটি পায়রার মত দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। এই বিস্ময়কর রক্তিমাভার মধ্যে ওদের দুজনেরই মন কোন্ সুদূরে, কোন্ অতলে, কোন্ আলোতে, কোন্ অন্ধকারে, 'কোন্ আনন্দে ও বেদনায় গেল হারিয়ে। সুমিতার অদৃশ্য লতায় কোথায় আজ একটি নতুন কুঁড়ির সন্ধান পেল ও নিজে। (ক্রমশ)

সংবাদে প্রকাশ বৃটেন সুয়েজের ব্যাপারে মিলিটারী 'Steps' নিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু সেটা

Goose Step হবে কি Fox-trot হবে তা এখনো ঠিক হয়নি।"

* * *

এই প্রসঙ্গেই 'Evening Standard'-এর খবরে প্রকাশ যে ইডেন বলিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে সৈন্য নিয়োগ করিব; আবার 'Evening Star' জানাইয়াছেন, ডালেস বলিয়াছেন—আমরা সুয়েজ খোলা রাখিবই। আর আমাদের শ্যামলাল বলিয়াছে—"অর্থাৎ একজন বলেছেন হেনা করেঙ্গে, আর একজন বলেছেন তেনা করেঙ্গে। আর জানিনে, নাসের হয়ত বলেছেন—হাম্‌ রণ দেখেঙ্গে!!"

* * *

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবন্ধের পাঠ্য বিষয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। —"পরিবর্তনের সত্যিই প্রয়োজন; সদা সত্য কথা কহিবে—জাতীয় শিক্ষার মূল্য আর কানাকড়াও নেই"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পুণা ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রায় একলক্ষ শ্রোতার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, বোম্বাই মহারাষ্ট্রীয়ানদের হাতে গেলে তিনি খুশী হইবেন এবং তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ জানাইবেন। —"কিন্তু সংবাদটা ঘোড়দৌড়ের মাঠের কিনা, এখানে ঘোড়ার মুখের খবর খেলেও মাঠকে মাঠ কাত হয়ে যায়"—যিনি মন্তব্য করিলেন তিনি নিশ্চয়ই ঘোড়দৌড়রসিক কোন সহযাত্রী।

* * *

কাশ্মীরে তের হাজার ফুট উর্ধ্বে একটি খাল কাটা হইতেছে। সংবাদে বলা হইয়াছে পৃথিবীর কোথাও এত উঁচুতে কোন খাল কাটা হয় নাই। —"আমাদের গর্বের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু বক্সী গোলাম মহম্মদ খালে কুমীরের অতর্কিত আবির্ভাব সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে আছেন তো? খালে জল থাকলে কুমীর কিন্তু উঁচু-নীচু বড় একটা গ্রাহ্য করে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

অক্সফোর্ড অভিধানে পাকিস্তানের সংজ্ঞা দিতে গিয়া অভিধানকার লিখিয়াছেন—পাকিস্তান ভারতের মধ্যে একটি স্বাধীন মুস্লিম ডোমিনিয়ন। অর্থ সৌকর্যের জন্য পরে উল্লেখ করা হইয়াছে—পাঞ্জাব, আফগান সীমান্ত, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান এবং ভারতের অন্যান্য মুস্লিম প্রধান অঞ্চল হইল পাকিস্তান। বিশুখুড়ো বলিলেন, "আরো বলা যেতো ভারতের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য ও উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল হলো পাকিস্তান। কল্পনায় খেতে হলে বাতাসা না খেয়ে সন্দেশ খাওয়াই ভালো!!"

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্র্যাজুয়েট চাকুরির সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ফেরিওলার কাজ

নিয়াছিলেন। শুনিলাম চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টির অপরাধে পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। —"একেই বলে আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

"কলিকাতায় চলাচল সমস্যা"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। —"আশা করি এটা চলতি সিনেমা, 'চলাচল' সম্বন্ধে কোন সমস্যা নয়। সিনেমায় যেতে লাইন দিয়ে টিকিট না পেলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে তা যেন মনে থাকে"—বলিতে বলিতে জনৈক কিশোর সহযাত্রী ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

* * *

সুইজারল্যান্ডে শুনিলাম পাঁচমাইল লম্বা একটি দুধের পাইপ স্থাপন করা হইয়াছে। পশুচারণক্ষেত্র হইতে একটি দুধের কারখানায় দুধ পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পাইপ বসানো হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"দুধের কারখানায় কেন, আমাদের দেশে সরাসরি বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য আমরা পথে পথে দুধের হাইড্রেন্ট্‌ বসিয়েছি!!!"

* * *

দক্ষিণ ভারতের কাজাগাম নেতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি নাকি পোড়াইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাদ সাধিয়াছে পুলিস। —"অনেকেই এই ব্যাপারে অবাক হয়েছেন; কিন্তু আমরা হইনি। ডিমোক্রেসিতে সংখ্যালঘু শ্রীরামচন্দ্রের অর্থাৎ দেবতা রামচন্দ্রের স্থান নেই বরং তাঁর অনুচরেরাই পার্টি গঠন করুন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি অভূতপূর্ব সংবাদে শুনিলাম—কলিকাতায় ইলিশ মাছে ভেজাল চলিতেছে। যদি ভাবিয়া থাকেন পদ্মার ইলিশকে দড়ি দিয়া লেজামুড়া বাঁধিয়া বাঁকাইয়া নিয়া তক্তাঘাটের ইলিশ বলিয়া চালানো হইতেছে তাহা হইলে ভুল করিবেন। শুনিলাম অপূর্ব কৌশলে ইলিশের পেটে ভিজা ছালার চট ভরিয়া ডিমভরা ইলিশ বলিয়া চালানো হইতেছে, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে নাকি তাই করা হইয়াছে। আমরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলাম know-how আনার জন্য আমাদের কি আর বিদেশে যাবার প্রয়োজন আছে??

আলোচনা

দেবতাত্মা হিমালয়

মহাশয়, গত ১৬ই আষাঢ় তারিখে 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে আমার পত্র এবং তদুত্তরে লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমার পত্রের বিষয় ছিল শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র (২য় খণ্ড) 'কাশ্মীর' শীর্ষক অংশটির চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে। লেখক আমার যুক্তিকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া যে ভাবে নিজ বিবৃতিকে সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে পাঠকবৃন্দ হয়তো আমার বক্তব্যের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন। তর্কের বিষয়বস্তু লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করা সময়সাপেক্ষ তাই এই তর্কের পরিসমাপ্তির জন্য আমি ঘটনাপুঞ্জকে সামান্য বিস্তার করিতেছি। শ্রীসান্যালের সহিত আমার যে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে, তাহার প্রতিটিকে আধুনিকতম তথ্যের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলাম।

আমার প্রথম প্রতিবাদ ছিল চেঙ্গিস খাঁকে 'দস্যুরাজ' বলিয়া অভিহিত করিবার বিরুদ্ধে। আমি পূর্বালোচনায় উল্লেখ করিয়াছিলাম চেঙ্গিসের প্রকৃত নাম ছিল তেমোচিন (অথবা তেমোজিন)। তিনি দুর্দান্ত এবং নিষ্ঠুর ছিলেন।—মধ্য এশিয়ায় বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং সম্রাট হইয়া 'চেঙ্গিস' (অর্থাৎ পৃথিবী দাহনকারী) উপাধি গ্রহণ করেন।। 'খাঁ' শব্দটি 'বীর'দের নামের পরে ব্যবহৃত হইত। বিশ্বের ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীজহরলাল নেহরু ইহাই বলিয়াছেন। সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ ঈশ্বরীপ্রসাদের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস 'খাঁ' উপাধি ধারণ করেন। মধ্যযুগে পররাজ্য জয় করিতে গেলে সকল সম্রাটই লুঠতরাজ করিতেন।—চেঙ্গিস তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন এমন নহে। কিন্তু এই কারণেই যদি তাঁহাকে 'বর্বর' এবং 'দস্যুরাজ' বলা হয়, তাহা হইলে সুলতান মামুদ, নাদির শাহ প্রমুখ সম্রাটদের 'সুলতান' উপাধিটি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইতিহাস ভালভাবে পাঠ করিলে আমরা এমনও দেখিতে পাইব যে, চেঙ্গিস সাম্রাজ্য গঠনের পর মোঙ্গলদের লইয়া রাজনৈতিক পরিবেশও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ডাঃ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে লেখা আছে,—

"Chingiz Khan made the Mongols the greatest political and military power in Asia."

ইহার পরেও লেখক যদি কলমের সাহায্যে নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই।

চেঙ্গিসের ধর্ম সম্বন্ধে লেখক তাঁহার ধারণার অস্পষ্টতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা স্বীকার করেন নাই। লেখক একটি জনশ্রুতির (legend) উপর নির্ভর করিয়া নিজ মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। যুক্তিবাদী পাঠকবৃন্দের ধারণা ইহাতে পাল্টাইতে পারে না। চেঙ্গিসের ধর্মের কথা বলিতে গিয়া ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন :

"চেঙ্গিস ধর্মে বৌদ্ধ, জাতিতে মোঙ্গল, ব্যবসায়ে যোদ্ধা।"

এই প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে, চেঙ্গিস বৌদ্ধ ধর্মের নিকৃষ্ট শত্রু ছিলেন। ইহার কারণ হিসাবে তিনি বোধ হয় চেঙ্গিসের অত্যাচারের কাহিনী তুলিয়া ধরিবেন। চেঙ্গিস বিধর্মীকে 'কাফের'
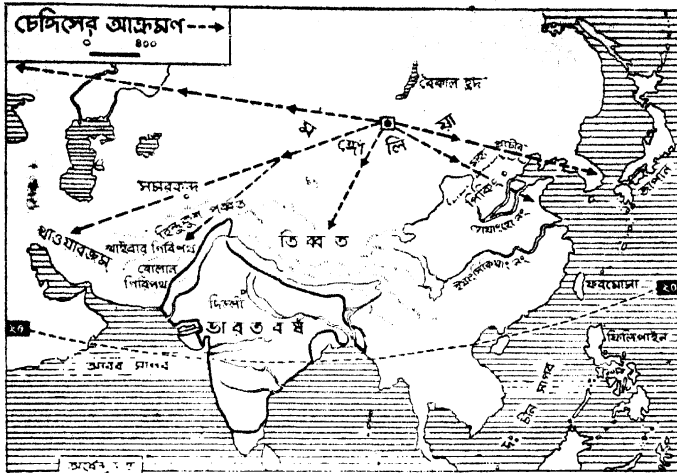
বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না, কারণ তিনি মুসলমান ছিলেন না—ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ে আমরা আরো দেখিতে পাই :

"... he horrified the Muslims by throwing the Quran under his horse's feet to be trodden upon."

চেঙ্গিস খাঁ আকাশের পূজা করিতেন, একথা চেঙ্গিস নিজেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ধর্মের নাম 'Shamanism'। কিন্তু ইঁহার কোনও পার্থিব [illegible] না থাকায় তিনি বৌদ্ধ সাধুদের সহিত ধর্মবিষয়ে সংযুক্ত ছিলেন। অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া চেঙ্গিসকে যদি বৌদ্ধধর্মের "নিকট শত্রু" বলিয়া অভিহিত করি তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে যুক্তিসংগত হইবে না। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে যখন [illegible] গজনী ধ্বংস করে, তখনকার বিবরণ পাঠ করিলে চেঙ্গিসের অত্যাচারকে অস্বাভাবিক মনে হইবে না :

"... plunder, devastation and slaughter were continuous. Every man that was found was slain, and all the women and children were made prisoners. All the palaces and edifices of the Mahmudi kings (that is, descendants of Sultan Mahmud), which had no equals in the world, were destroyed."

চেঙ্গিসের ভারত-আক্রমণ ছিল অপর একটি বিষয়। লেখক যে লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিয়েছেন, তাহার কিছু কিছু পূর্বে পাঠ করিয়াছি। বলিতে বাধা নাই যে, ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ কালিদাস নাগই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি 'ঐতিহাসিক' বলিয়া সর্বজনসমর্থিত। তিনি বলেন :

"চিঙ্গিজের ভয়ে ইলতুৎমিস পলাতক খাওয়ারিজম রাজকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে পারস্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। ভারতবর্ষও দৈবানুকূল্যে এক নিদারুণ বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।"

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন :

Thus was India saved from great calamity and Iltutmish now felt himself strong enough to crush his native enemies."

শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন :

"India escaped him.... Chengiz did not come."

তৈমুর লঙ্গ চেঙ্গিসের বংশধর কি না, তাহা অপর একটি প্রশ্ন। চেঙ্গিসের পুত্র ওগোতাই চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর 'খাঁ' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে মাঙ্গু খাঁ 'খাঁ' উপাধি পান। বলাবাহুল্য, মাঙ্গু খাঁ চেঙ্গিসের বংশধর নহেন, যদিও তিনি মোঙ্গল ছিলেন।—তাহার ভ্রাতা হুলাগু ছিলেন পারস্যের শাসক। মাঙ্গু খাঁর মৃত্যুর পর কুবলাই খাঁ 'খাঁ'-এর পদ প্রাপ্ত হন।

১২৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।—এই সময় 'খাঁ' উপাধি বা পদেরও বিলুপ্তি ঘটে সাম্রাজ্য তখন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এই সকল ঘটনা আমরা সকলেই জানি।—তা তৈমুরলঙ্গ নিজেকে হয়তো চাঘদাই বংশী বলিতেন, হয়তো বলিতেন তিনি মোঙ্গল; কিন্তু তিনি যে চেঙ্গিসের বংশধর ছিলেন না তাহা বলা যায়। এই বিষয়ে শ্রীনেহেরু আলোকপাত করিয়া বলিয়াছেন, তৈমুর চেঙ্গিসের বংশধর ছিলেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে তুর্কী ছিলেন (Ref.: Glimpses of World History)

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিতে চাই। লেখক বলিয়াছেন যে তাঁহার লেখার উপর তর্ক করায় তিনি আমাকে দোষ দিতে চান না, কারণ আমাদের বিদ্যা নাকি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। লেখকের মন্তব্য সাধারণ পাঠকবৃন্দকে কটাক্ষ করিলেও, সাধারণ পাঠক এবং উৎসাহী পাঠক হিসাবে বলিতে পারি ইতিহাস এবং সাহিত্য পৃথক। লেখকের পাণ্ডিত্যকে অশ্রদ্ধা করি না।

"History is a science without invention."

—এই কথাটুকু একবার মাত্র উল্লেখ করিতে চাই। বলা বাহুল্য, ইহা বাজারের সস্তা নোটবই-এর কথা নহে, ইতিহাসের ছাত্রদের প্রথম পাঠ। বিনীত—

বিবেকরঞ্জন দাস, চুঁচুড়া

বিদেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল

সম্পাদক মহাশয়,

৩৭ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় কালচারাল ডেলিগেশন সম্বন্ধে মন্তব্য পড়লাম, ৩৮ সংখ্যায় নন্দিতা কৃপালনী এ বিষয় বিস্তারিত খবর দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা পৃথক করে লিখলাম না। দিল্লীর কাগজগুলির কমেণ্ট পড়লেই জানা যাবে অনেক।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নন্দিতা কৃপালনীর। আশা করি বর্তমানেও আছে। তাই তাঁর অভিজ্ঞতাটুকু পড়ে শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষের চিন্তা করার সময় এসেছে যে তাঁরা এভাবে প্রতিষ্ঠানের নাম বিকোতে দিলে বিশ্বভারতী কোথায় দাঁড়াবে।

আমি প্রবাসে আজ বহু বছরের মধ্যে দিল্লী, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, সিমলা, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বহু 'ভুঁইফোড়' শান্তিনিকেতন শিল্পীকে (?) শান্তিনিকেতনের নাম ভাঙিয়ে শিল্পের প্রচেষ্টা করার চেষ্টা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেওয়ার নামে এই সব অনুষ্ঠানে তাঁরা ব্যক্তিগত পাবলিসিটির ঢোল বাজিয়ে গেছেন।

এবার দেখলাম সরকারী ডেলিগেশন যেভাবে পাঠানো হলো, তাতে শিক্ষামন্দির দপ্তর ও শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ "প্রতিষ্ঠানের নাম রসাতলে যেতে" সুবিধা করে দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দর নেতৃত্বে ডেলিগেশন পাঠানো হল অথচ তিনি এই সব ত্রুটীর খেয়াল করলেন না। শান্তি-নিকেতনের ও গুরুদেবের সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ শ্রদ্ধার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও।

দেশে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে পেট চালানোর ধান্ধা দেখা গেছে। বাইরে যাতে তাঁকে এভাবে ছোট না করা হয়, 'ছেলেমানুষী' করে, সে বিষয় শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত। ইতি—

বারীন দাস, মীরাট ক্যাণ্ট।

কাব্য-আলোচনা

কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ১২। দাম—৪৷৷৹

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রথম থেকেই অনন্য। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যযুগে যাঁর কাব্য রচনার আরম্ভ তাঁর মধ্যে কেমন করে এমন উচ্চকিত রবীন্দ্র-বিরোধী সুর ঝংকৃত হতে পেরেছিলো; অথচ তাঁর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যতীন্দ্রনাথ কোনোকালেই রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না। আপন অভিজ্ঞতায় উজ্জ্বল কবি তিনি, এবং এ সত্য প্রমাণিত যে, আধুনিক কাব্যধারার প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় বিশিষ্ট যে তিনজন কবির কাব্য সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে তিনি একজন; সুতরাং তাঁর মধ্যেকার এই আপাতবিরোধিতার মূল কোন্ স্থানে তার সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন আধুনিক কাব্য ধারাকে সম্যকভাবে বুঝবার জন্যেও। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত গবেষকের একাগ্রতায় এই মূল আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। যাঁরা কাব্যসাধনার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনধারার নিবিড় সম্পর্ককে স্বীকার করেন (যা সাহিত্য বিচারের পক্ষে খানিকটা প্রয়োজনীয়ই) তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত কর্মজীবনের দোহাই দিয়ে বলতে পারেন, তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রমানসের মধ্যে বাস করা সত্যই সম্ভব ছিল না। একদিক থেকে বিচার করলে এ কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু লেখক স্পষ্টই জানাচ্ছেন, রবীন্দ্র কাব্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কারো চেয়েই কম ছিল না। এ-অবস্থায় মেনে নিতে বাধা কি যে কবি যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এই-যে অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ আর অ-বিশ্বাসের সুর তার কারণ অন্য কিছু। লেখক বলছেন, 'রোম্যান্টিক ভাবালুতার মধ্যে যেমন একটা একতরফা নেশা থাকে, যতীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক-বিরোধী অন্তর্জগতের মধ্যেও ঠিক তেমনি অপরপ্রান্তীয় একতরফা ঝোঁক দেখা দিয়াছিল।' এবং এই একতরফা ঝোঁকের নেশায় কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন একান্তই নিজের একটি বিশেষ দৃষ্টিতে, সে-দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন। গ্রন্থকার কবির প্রাথমিক রচনাবলী থেকে অজস্র উদাহরণ উদ্ধৃত করে এবং পারম্পর্য রক্ষা করে তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণিত করেছেন।

কিন্তু নেশাও কাটে। তাই এই অস্বীকৃতি, অবিশ্বাসের মূলেও এক সময় টান পড়েছে। তাঁর মধ্যে জেগেছে দ্বিধা, এসেছে সংশয়। আর সেই উচ্চ সুর নেই, কিন্তু অভ্যাসের জেরও যায়নি। ফলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত হয়েছে ছন্দ, কবিব্যক্তির পরিস্ফুটন ঘটেছে সে সংশয়াকুল সুরে ছন্দে। লেখকের আশ্চর্য বিশ্লেষণী দৃষ্টির কাছে কবি যতীন্দ্রনাথ এই প্রথম তাঁর প্রতিভা, তাঁর দুর্বলতা নিয়ে ধরা পড়েছেন। তারপর কবিমানসের শেষ পর্যায়। এবারে মোহমুক্তি ঘটেছে কবির—প্রশান্ত উজ্জ্বল স্রোতোধারা পেয়েছে নিরুদ্বেগ সাম্যসংযম। সমস্ত সংশয়, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হয়ে কবির এই পরমপ্রাপ্তিকে সমালোচক অতন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যে বিরোধিতা প্রথম পর্যায়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত সে-বিরোধিতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে দুই কবির সাধর্ম্যকে সহজ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ করেছে—এই ক্রমপর্যায়কে লেখক এমন সুন্দর-ভাবে ধরতে পেরেছেন যে, বলতে বাধা নেই, এ-ধরনের বিশ্লেষণী পদ্ধায় কোনো কবিকে বাংলাদেশের কোনো সমালোচক বিচার করে দেখেছেন বলে মনে করতে পারিনা। রবীন্দ্রনাথ এত বড় যে তাঁকে এ-পদ্ধায় ধরতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, কিন্তু যতীন্দ্রনাথতুল্য কবিকে তো আমরা সামগ্রিকভাবে বিচার করতে পারি। তাতে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিই ঘটবে।

এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে শেষ কথায় একটি বিশেষ ত্রুটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যতীন্দ্রনাথের মতো আধুনিক কবিতার প্রথম পর্যায়ে আরো যে দুজন কবি—নজরুল ও মোহিতলাল—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, লেখক তাঁদের সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে-আলোচনায় প্রসঙ্গত যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি সামান্য আলোচনা করেছেন মাত্র; এই তিনজন কবির মধ্যে কতটুকু সাধর্ম্য এবং কতখানিই বা বৈপরীত্য অর্থাৎ একে অন্যের তুলনামূলক বিচারে তাঁদের প্রত্যেকের, অন্তত যতীন্দ্রনাথের, প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্য কোনখানে, সে-সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ে সেই আলোচনার গুরুত্ব সামান্য নয়, এ-কথা আশা করি গ্রন্থকার স্বীকার করবেন। সুতরাং এ-প্রশ্নের মীমাংসা না পেয়ে কোনো পাঠকের মন যদি শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত থেকে যায়, তার জন্য লেখক কি তাকে দোষ দিতে পারবেন?

৯৬।৫৯

যুগে-যুগেই প্রেমের কবিতার মধ্যে রূপ আর রসের আবেদন আশ্চর্য রকমের ভিন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রেম চিরন্তন: শিল্পী আর প্রেমিক সত্যের।

পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা সেই রকম একটি উৎকৃষ্ট আয়নার মতো, যাতে প্রতিচ্ছায়ার বিকার ঘটে না, সাম্প্রতিক কবিমনে চিরন্তন প্রেমের প্রসঙ্গ যে-যে বেদনা এবং উপলব্ধির সঞ্চার করেছে, তার নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায় যে আয়নাতে।

সংকলিত ৬০ জন কবির আদিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, বয়োকনিষ্ঠ কবির রচনা দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অন্তর্গত কবিতাবলীর রচনাকাল ১৩৩৬ থেকে ১৩৬১। দাম ৫৷৷৹

॥ সিগনেট প্রেসের বই ॥

সিগনেট বুকশপ, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২।১, রাসবিহারী এভিনিউ

উপন্যাস

নানা রঙের দিন—সন্তোষকুমার ঘোষ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। দাম—৪্।

নূতন সংস্করণ। বাংলাদেশের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি প্রামাণ্য উদাহরণ। অবশ্য সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্যিক-সাফল্যও এর জন্য দায়ী। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখকের বেশী নেই, তথাপি তাঁর বই এর যখন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর কৃতিত্বটাই বেশী, এ-কথা বললে দোষ নেই।

একটি বালকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী, কিন্তু তার ভৌগোলিক বিস্তার বিচিত্র কিছু নয়। একটি মফস্বলের ছেলে—স্বদেশীকরা বাপ উদাসীন, ব্যর্থজীবন মা, স্নেহকাতর অথচ অসহায় দাদু, সহায়-সম্বলহীন মাসীমা—একটি সংসার। বৈচিত্র্যের ছোঁয়া দিয়ে গেল নতুন বাড়ির সরমাদি, বালক শুভাশিস আর বয়ঃসন্ধিকালের দিদি চারুর জীবনেই নয়, তাদের মা-বাপ মাসী দাদুর জীবনেও।

যত বিপর্যয়ই আসুক, সময় থেমে থাকে না। বিপর্যয়ের মত লেগে থাকে মানুষের জীবনে, মানুষের সংসারে। ভেঙে গেল শুভাশিসদের সংসার, তার ওপর এলো স্বাদেশিকতার জোয়ার, জীবনযুদ্ধে ঘা খেয়ে ফিরে এলো বাবা, আবার নতুন জীবনের আস্বাদ নিয়ে এলো কলঙ্কিনী সরমাদি। আর শুভাশিস নিজের মূল্যে ফিরিয়ে দিলো তার মা-বাবার আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ককে। বাঁচলো তারা।

কোথাও উদ্দামতা নেই, অথচ সহজ সরলও নয় এ কাহিনী। সমস্ত ব্যর্থতার পর আছে পরম শান্তির আভাস। ক্ষণকালের মিথ্যাটাই মানুষের আসল পরিচয় নয়, তার পরিচয় তার মহত্ত্বে। শুভাশিস বোঝে না সব, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে বৃহত্তর জীবনে তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।

সন্তোষকুমার ঘোষের লেখনচাতুর্য এ-করুণ-মধুর কাহিনীটিকে আগাগোড়া এমন রসঘন করে রেখেছে যে, পাঠকমন বহুক্ষণ পর্যন্ত অভিভূত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। ২২০।৫৬

উপনদী: অনিলকুমার ভট্টাচার্য: বেঙ্গল পাবলিশার্স: ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু টাকা।

চব্বিশ পরগণার শেষ প্রান্তে একটি গ্রাম উপন্যাসের পটভূমি। চরিত্রের মধ্যে প্রধান দুটি—শিক্ষয়িত্রী ত্রিশোত্তীর্ণা সুলেখা আর তার ছোট ভাই-এর বন্ধু ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার অশোক। এ ছাড়া আছে গ্রাম্য প্রধানরা, দরিদ্র চাষীমজুর। ত্রিশোত্তীর্ণা সুলেখা হঠাৎ ভালোবেসে ফেলেছে তার ছোট ভাই-এর বন্ধু অশোককে। সুলেখার সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অশোকের যোগ নেই। দুজন বিপরীত মতাবলম্বী। এছাড়া আর একটি প্রধান চরিত্র সুলেখার ছাত্রী এবং প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী বড়লোকের রুগ্না মেয়ে মৃদুলা।

গ্রাম্যজীবনের নানা ঘটনার রকম ফেরে গল্প কোন রকমে এগিয়েছে কিন্তু কোথাও দানা বাঁধেনি। এমনকি প্রথম দিকে সুলেখার চরিত্রকে যে রকম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে মনে হবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে সুলেখাকে ঘিরেই গল্প এগিয়ে চলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপনদীর মজা খাঁড়ির মত সেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ এই সুলেখা চরিত্রটির সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া অন্য বহু চরিত্রই কারণে অকারণে আনাগোনা করেছে। তবে ছাপ রেখে যেতে পারেনি। কোন পরিণতিতে পৌঁছয়নি। ৯১।৫৬

সাধক-জীবন

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীশিশিরকুমার বসু। দি সারস্বত লাইব্রেরী, ৬১এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—৩। পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, সচিত্র, ২৮৮ পৃষ্ঠা, দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসের আর নূতন ক'রে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই; তিনি ভারতপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ। বামাক্ষেপার সাহায্যে মহাশক্তির সাক্ষাৎ পাওয়ার পরও আত্মানুসন্ধানে তিনি ভারতের সর্বত্র প্রায় পদব্রজে ভ্রমণ করে' বেড়িয়েছেন এবং বহু সাধকের নির্দেশে বহু সাধনা করেছেন। শেষে আসামে কামাক্ষা দর্শনের পর তাঁর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। কিন্তু তবুও তিনি তৃপ্ত হন না। শেষে মহাপ্রস্থানের পথের 'গৌরীমা' তাঁকে গৌরাঙ্গের পথ প্রেমধর্মে দীক্ষা দেন। তাই নিগমানন্দ দর্শনের মূলকথা হয়েছিল—শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ। অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ মহাযোগীর ঘটনাপূর্ণ চমকপ্রদ

জীবনের সম্পূর্ণ আলেখ্য, উপন্যাসের চেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক, সাধন-জীবনে বহু গূঢ় তত্ত্বে ও তথ্যে পরিপূর্ণ। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল। ১১৬।৫৬

বিবিধ

আরোগ্য—চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬৩। ডাঃ সুশীলকুমার বসু, এম বি, ডি পি এইচ পি এইচ ডি (লণ্ডন) সম্পাদিত। ৩১।২বি ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে প্রকাশিত।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রচারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য, জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও রোগ-সচেতন করার যে উদ্দেশ্য নিয়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

THE PLAINS ARE ABLAZE—Hsu Kuang-Yao. Foreign Language Press, Peging থেকে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর মধ্যবর্তিতায় এই উপন্যাসটি আমাদের হাতে এসেছে। এর লেখক তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। জাপানী ফৌজের বিখ্যাত 'Big Mop Up'-এর আকস্মিক আঘাতে মধ্য-হোপেই-অঞ্চলে যে বিপুল প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিলো, লেখক সেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেনা বিভাগের সংবাদপত্রে তাঁর কর্মসূত্র এবং চীনা সাম্যবাদী সংগঠনের সহায়তালাভ, এই তথ্য দুটিও স্মরণযোগ্য। সম্ভবত এর ফলেও কিছুটা তাঁর সাংবাদিকতা, তাঁর সাহিত্যিকতার উপর জয়ী হয়েছে। কিন্তু এই বইটির মধ্যে যে-ব্যক্তিবোধ, বন্ধুবোধ এবং জনচেতনার প্রাচুর্য পাই তা তাঁর অভিজ্ঞতার উত্তাপে সমুদ্দীপ্ত। বইটির শেষে যেখানে রণ-ক্ষেত্রের উপরে দীপ্যমান সূর্যদেব তাঁর সহস্র স্বর্ণরশ্মিতে গ্রামের মাটিকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন, মুগ্ধ হতে বাধ্য হই। এই লেখক সম্প্রতি চীনের কেন্দ্রীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে পাঠরত এবং তাঁর কাছে আমাদের আশা জানাই। ১৬।৫৬

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সিস্টার কেরী—থিওডোর ড্রাইসার অনুবাদক রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।
নাচ গান হল্লা—মৌমাছি সম্পাদিত।
কথা শুধু কথা—অসিতকুমার চক্রবর্তী।
দশচক্র—শান্তি বসু।
পরুষ ও রমণী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।
প্রাচীন ভারতকে জানো—বিধুভূষণ শাস্ত্রী।
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস।
বর্ষপঞ্জী ১৩৬৩—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত।
ছোটদের ভূদেবচন্দ্র—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।
আরব্য উপন্যাস—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।
রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়—ডক্টর রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।
দার্শনিক প্রবন্ধাবলী (মার্কসবাদের ভূমিকা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
বাদশা ও বীরবলের গল্প—শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য।
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।
ছেলে ও ছবি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
ভূত ও পেত্নী—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
রাক্ষস ও খোক্কস—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
ছোটদের গোর্কির মা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী।
মানসী—গী দ্য মোপাসাঁ, অনুবাদক—প্রফুল্লকুমার বসু।
রঙলেখা—শ্রীনদীগোপাল মজুমদার।
ইস্পাতের স্বাক্ষর—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য।
শ্রীশ্রীললিতা সখী ২য় খণ্ড—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী।

—শৌভিক—

নারকীয়

ছবির ব্যাপারে আমরা যে প্রভূত উন্নত স্তরে পৌঁছেছি তারও যেমন দৃষ্টান্ত পাই, তেমনি আবার ভাবে, ভাষায়, কল্পনায় এবং কাজে আমরা যে কতটা সেকেলে হয়েও আছি, সেকথাটাও মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবার মতো ছবিরও অভাব হয় না। শুধু তাই নয়, সুস্থ ও সুন্দরের ওপর নেহাৎই বীতরাগ এমন বিকৃত মতিও যে ছবিতে নিয়োজিত হতে পায়, সে উদাহরণও দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন ধরা যাক 'পাপ ও পাপী।' 'পাপ' এবং 'পাপী' কথা দুটো বলতেই তো অসুন্দর ও কুৎসিতের কথাই মনে পড়ে যায়, তার ওপর কাহিনীও যদি হয় তেমনি নারকীয় ব্যাপার নিয়ে তাহলে তো আর কথাই থাকে না। অশোক চিত্রের 'পাপ ও পাপী' ছবিখানি দেখে তো ভেবেই পাওয়া গেল না যে, এমনধারা একটা সমগ্রভাবে শিল্পমাধুর্যরহিত কুশ্রী গল্প আদপেই কি করে ছবির জন্য নির্বাচিত হতে পারে। একটু ভাল দৃষ্টি এই যা অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে হৃদয়ানুভূতির সাহায্যে তাদের সংশোধন করে তোলার একটা দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যায়। আজকালকারই সে চেষ্টা। কিন্তু পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়, এই নীতি প্রচারের ধুয়ো ধরে এমন কান্ড ঘটানো হয়েছে গল্পতে, যা দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে লোকে পালাই পালাই করতে থাকে। বাস্তবিকই, ছবি অর্ধেক না এগোতেই উঠে চলে যাবার জন্য সারা প্রেক্ষাগৃহের উসখুস ভাব এবং শেষ হতে খানিকটা বাকি থাকতেই হল ছেড়ে সবায়ের উঠে চলে যেতে আরম্ভ করার সে এক উপভোগ্য দৃশ্য বটে। হৃদ্যতা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা পাপীকে শোধরাবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই গল্পের অবতারণা, অথবা ঐরকম একটা অজুহাত ধরে কতকগুলি পাপ কর্ম দেখিয়ে দেওয়া, সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সুবিধে হয় না বলেই বোধ হয় ছবিখানি সেন্সরে আটকায়নি। নয়তো বিষয়বস্তু ও ঘটনা সব এমন অমার্জিতরুচিপূর্ণ এবং বিন্যাসে সে-সব এমন কটুদৃশ্য, যার সাধারণ্যে পরিবেশনের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়। রক্ষে এই যে, গল্পটি অত্যন্ত অগোছাল এবং এলোপাথারি; কোত্থেকে কি হচ্ছে তার খেই খুঁজে বের করতে করতেই দর্শকমন বিরক্তিতে ভরে ওঠে; তাই ছবিখানির ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করার দরকারই হয় না—পাপ কর্ম দেখায় লালায়িত অতি বিকৃতিপ্রবৃত্তিও ছবিখানি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠবে।

• • •

গল্পের পরিকল্পনা সেই শতাব্দী-প্রাচীন 'জমিদার দর্পণ' আমলের। সেই আমলের সব চরিত্র, আর সেই আমলের প্রজা নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, সুরাসক্তি ইত্যাদি জাতীয় ঘটনা যা এখনকার মনে মোটেই খাপ খায় না। কাহিনীটি রচনা করেছেন মুরারি সেন। একদা এই কাহিনীকেই যেন 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' অবলম্বনে গঠিত বলে প্রচার করা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। পরে বিজ্ঞাপনে তার চেয়েও বড়ো সৃষ্টি বলে প্রচার করা হয়েছে এই বলে যে, 'বাল্মীকির রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত', কালিদাসের 'শকুন্তলা', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং তারপরই

জে.এন.বি'র পরিবেশনে এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেবতা'তে বৈজয়ন্তীমালা

হচ্ছে অশোক চিত্রের এই 'পাপ ও পাপী'। কি পাতালস্পর্শী ধৃষ্টতা! বিজ্ঞাপনের ভাষার ওপরে সেন্সর বসানো যায় না?

* * *

ছবি আরম্ভেই বড়ো বড়ো হরফে গল্প ১৯৩৭ সালের ঘটনা বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমন করে তারিখ দিয়ে দেওয়ায় কাহিনী বাস্তব বা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। মনে হয়, সেন্সর থেকে পার পাবার জন্যেই সনটা দিতে হয়েছে, কারণ জমিদার-দের নিয়ে এতে যাসব কাণ্ড, তা এখনকার যুগের বলে মনে করিয়ে দিতে দেওয়া যায় না। এছাড়া "আজ থেকে বিশ বছর আগে" বলে টাইটেলে উল্লেখ করে দেবার কোন সার্থকতাই পাওয়া যায় না। তবে বিশ বছর আগে বলাটাও ভুল হয়েছে, যে ধরণের ঘটনা, তা শ' দেড়েক বছর আগের বললেই মানাতো। যাই হোক, ভেবে সূত্র ঠিক করে নিয়ে সেই সেকেলে ধরণের গল্পটি যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে এক জমিদার তনয় শঙ্কর চৌধুরীকে নিয়ে। এম-এ পাশ করার পর ছ বছর ধরে রিসার্চ স্কলার। উদ্বোধন দৃশ্যে উর্বশী নাটকের অভিনয়, উর্বশী সুরাপাত্র তুলে ধরেছে, হঠাৎ বন্ধ কর, বন্ধ কর বলতে বলতে শঙ্করের বাবা জমিদার সোমেশ্বর উত্তেজিতভাবে একেবারে মঞ্চের ওপর হাজির। সোমেশ্বর বললেন, ঐ যে নারী নিয়ে অভিনয় ঐ করতে করতেই শঙ্কর একদিন উচ্ছন্ন যাবে, আর ঐ যে সুরা পানের অভিনয়, ঐ অভিনয় করতে করতেই শঙ্কর একদিন সুরায় ডুবে যাবে। সোমেশ্বর পুত্রকে অভিনয় বন্ধ করার আদেশ দিলেন। শঙ্কর সে আদেশ অমান্য করলে। ক্ষিপ্ত হয়ে সোমেশ্বর একখানি চিঠিতে শঙ্করকে ত্যজ্যপুত্র করে দেশে চলে গেলেন। শঙ্কর ভালবাসতো লিলিকে, বড়োলোকের স্মার্ট গোছের মেয়ে। শঙ্কর ত্যজ্যপুত্র জেনে লিলি নিজেকে হাঁড়ী ঠেলার ধাপে নামাতে পারবে না জানিয়ে শঙ্করের সংস্রব ত্যাগ করলে। শঙ্করের দুষ্ট শনি তার বাল্যবন্ধু পান্নালাল। ত্যজ্যপুত্র হলেও শঙ্কর তাদের কলকাতার বাড়ীতেই রইল, পান্নালাল তার সঙ্গী। একদিন পান্নালাল শঙ্করকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মাসতুত বোন বলে আলাপ করিয়ে দিলে মঞ্জুরী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। পান্নালালের শেখানো মতো মঞ্জু তাকে নিয়ে শহর দেখিয়ে বেড়াবার জন্যে শঙ্করকে ধরলে। এক বাগানে বেড়াবার সময় মঞ্জু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভান করে শঙ্করের কণ্ঠ-লগ্ন হলো, আর পান্নালাল আড়াল থেকে ওদের সেই অবস্থার ছবি তুলে নিলে। সেই ছবি নিয়ে পান্নালাল গেল সোমেশ্বরের কাছে এবং শঙ্কর মেয়েঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে বংশের মানমর্যাদা ডোবাতে বসেছে, এই ভয় দেখিয়ে সোমেশ্বরের কাছ

থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করলে। সোমেশ্বর ওতে ভুললেন না। হার্টের পীড়া সোমেশ্বরের, পান্নালালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে দম আটকে মারা গেলেন।

* * *

সোমেশ্বর অমন হঠাৎ মারা যাবার পর শঙ্কর সদাই মনমরা হয়ে থাকে; দিনের পর দিন যায়, তার ঘুম হয় না। পান্নালাল পরামর্শ দিলে মদ খেলে ঘুম হবে এবং একদিন তোড়জোড় করে শঙ্করকে মদ খাইয়েও দিলে। ঘুমের এমন ওষুধে শঙ্কর মজে গেল। সুযোগ পেয়ে পান্নালাল ওকে হাজির করলে বুলবুল বাইজীর কাছে। শঙ্করকে মদ আর বাইজীতে ডুবে থাকতে দেখে বাধা দেবার চেষ্টা করলে জমিদারীর বিশ্বস্ত ম্যানেজার অনঙ্গ। অনঙ্গ তাই টিকতে পারলো না; ম্যানেজার হলো পান্নালাল। শঙ্কর থাকে কলকাতায়, বুলবুলের ওপর পান্নালালের নির্দেশ শঙ্করকে বাগিয়ে ধরে রাখতে। পান্নালাল গ্রামে গিয়ে প্রজাদের কুটির ভেঙে সেই জায়গায় গড়ে তুললে নাচঘর। তাই নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো; প্রজাদের ওপর চরম নির্যাতন হলো। বিদ্রোহী প্রজাদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালো অনঙ্গ। পান্নালালের কু-কীর্তির সহচর শুভঙ্কর। টাকার দরকারে হঠাৎ শঙ্কর গ্রামে এসে হাজির। পান্নালাল নাচঘরে শঙ্করের মদ্যপানের ব্যবস্থা করে দিলে আর তাকে আরও খুশী করার জন্যে অনঙ্গের বউ যমুনাকে হরণ করে নাচঘরে হাজির করে দিলে। অনঙ্গকে বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে আসা হলো। শঙ্কর ও পান্নালালের হাত থেকে সতীত্ব বাঁচাতে গিয়ে যমুনা বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গেল। ওরা দেখলে যমুনার মৃত্যু হয়েছে, তাই ওকেও ফেলে দেওয়া হলো নদীতে। শঙ্কর বুলবুলের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে যাত্রা করলে।

* * *

বুলবুলকে নিয়ে শঙ্করের নানা স্থান ভ্রমণের দৃশ্য চলতে চলতে হঠাৎ দেখা গেল একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে শঙ্কর পড়ে গেল। এক তরুণী ছুটে এসে শঙ্করের মাথাটা কোলে নিয়ে শাড়ী ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলে। পরিচয়ে জানা গেল মেয়েটির বাবা অধ্যাপক অমরনাথ, শঙ্করদের পাশের গ্রামে থাকে। মেয়েটির নাম কৃষ্ণা বা ঐ রকম কিছু। পরদিন শঙ্কর হাজির হলো কৃষ্ণাদের বাড়ীতে। শঙ্করের সঙ্গে আলাপ হলো অমরনাথের। অমরনাথ এখানে অমরাবতী নামে এক আশ্রম খুলেছেন যেখানে চোর-ডাকাত প্রভৃতিকে হৃদ্যতা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সংশোধন করা হয়। একে তাকে দেখাতে দেখাতে অমরনাথ শঙ্করকে নিয়ে হাজির হলেন এক মহিলার কাছে, পরিচয় দিয়ে বললেন মেয়েটিকে জল থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু আগের কথা ওর কিছু মনে নেই। অথচ ওর নাম যে যমুনা সেটা অমরনাথ জেনেছেন। শঙ্করকে দেখে যমুনা যেন কি রকম হয়ে গেল; শঙ্করও অনঙ্গের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়বার উপক্রম হলো। কিন্তু ভাগ্য ভালো, যমুনা শঙ্করকে চিনতে পারলে না। কৃষ্ণাদের কাছে শঙ্কর নিজের পরিচয় গোপন করে নাম বলেছে সুদর্শন। শঙ্কর ক্রমেই কৃষ্ণার প্রতি আকৃষ্ট হলো, কৃষ্ণাও শঙ্করের প্রতি। বুলবুল শঙ্করের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে। শঙ্কর গ্রামে থেকে যাওয়ায় পান্নালালের অসুবিধে হতে লাগলো। পার্শ্বচর শুভঙ্কর জানালে সে এমন ব্যবস্থা করে দেবে, যাতে শঙ্কর গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পথে রোজই শঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করতে দেখে। সেদিন কৃষ্ণার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে শঙ্কর ঠিক করে নেয় পরদিন অমরনাথের কাছে সে কৃষ্ণাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে। শঙ্কর চলে আসতেই শুভঙ্কর আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণাকে শঙ্করের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দিলে। সেদিন ছায়ামূর্তির তাড়া খেয়ে শঙ্কর নাচ-ঘরে বুলবুলের আশ্রয়ে এসে পৌঁছতেই কৃষ্ণা এসে সে যে শঙ্করের আসল পরিচয় জানতে পেরেছে তা জানিয়ে শঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। শঙ্কর বুলবুলকে কিছু টাকা দিয়ে বাকি জমিদারীর সব অমরাবতী আশ্রমের নামে লিখে দিয়ে গ্রাম ত্যাগ করার সংকল্প করলে।

শঙ্করের এই মহত্ত্ব দেখে কৃষ্ণা ছুটলো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। এদিকে পান্নালাল দিলে অমরাবতী আশ্রমে আগুন লাগিয়ে। আশ্রমের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সকলকে উদ্ধার করে পান্নালালের ভাড়াটে গুণ্ডাদের ভাগিয়ে দিলে। বুলবুলও ছুটতে ছুটতে এসে শঙ্করকে খবর দিলে। শঙ্কর বুলবুলকে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে আশ্রমের দিকে ছুটে গেল।.. ইতিমধ্যে পান্নালাল এসে সিন্দুক খুলে গয়নাপত্তর টাকাকড়ি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বুলবুল তাকে বাধা দিতে গেল। ঘরে হাজির হলো সেই ছায়ামূর্তি, পান্নালাল পিস্তলের গুলীতে নিহত হলো। দেখা গেল সেই ছায়ামূর্তি হচ্ছে অনঙ্গ। অনঙ্গ তার স্ত্রী যমুনাকে ফিরে পেলে। আর অমরনাথও শঙ্করকে কৃষ্ণার জন্য ঠিক করে নিলেন।

* * *

গল্পের কোন সারবস্তু নেই। ঘটনার এলোপাথারি জোগান, আর তেমনি বিশ্রী দৃশ্যবিন্যাস। এক এম-এ পাশ সৎ ও সুস্থ ছেলেকে ঘুমের ওষুধ বলে মদ ধরানো, তাকে বেশ্যাসক্ত করে তোলা, ব্ল্যাকমেল করার জন্য মজুরকে দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরানোর ফটো তোলা, তাকে দুর্বৃত্ত পান্নালালের আসক্ত করে রাখা ইত্যাদি যতো সব যুক্তিহীন, সামঞ্জস্যহীন ব্যাপার এমনধারা সব ছেলেমানুষী এবং নিকৃষ্ট কল্পনা যদিওবা কারুর মাথায় আসে, কিন্তু তা যে কোন ছবিতে চালানো যেতে পারে এবং যে ছবি তৈরী সাধারণে প্রদর্শনের জন্য, সেটা ভেবে দেখবার যে কেউ ছিল না এইটেই বড়ো আশ্চর্যের। ভুল-ত্রুটি ও নিকৃষ্ট কাজের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে দীর্ঘ তালিকা তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। ঐ একটু যা ভালো কল্পনা অমরাবতী আশ্রমটির কিন্তু এমনভাবে দেখানো যা ছেলেখেলাই মনে হয়। বাঁচা গিয়েছে গানের দিক থেকে; একখানি মাত্র গান আর তখন বাইরে বেরিয়ে সিরাপ খেয়ে রেহাই পাবার একটা সুযোগ মিলে যায়। আকৃতি ও প্রকৃতিতে দর্শক মনে একটুকুও রেখাপাত করার কোন যোগ্যতাই প্রযুক্ত করতে পারেননি পরিচালক বিজন সেন। টেকনিক্যাল কাজের মধ্যেও গলদেই যাতে এবং আরও আশ্চর্য লাগে যে, ভূমিকালিপিতে সিদ্ধকীর্তি শিল্পী অনেকে থাকা সত্ত্বেও অভিনয়ের নিকৃষ্টতাও উপভোগ করার কিছু পাওয়া যায় না। আসলে চরিত্রগুলিই এমনি এবং ঘটনাতে তাদের এমনিভাবে সংস্থাপন যে কারুরই অভিনয় খোলবার কোন অবলম্বন নেই। এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে আর কারইবা নাম করা যায়! ছবিখানির সংগঠনে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন আলোকচিত্রগ্রহণে বিমল মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে দুর্গা মিত্র, সঙ্গীত পরিচালনায় গোপেন মল্লিক ও সুধাংশু দাশগুপ্ত, শিল্পনির্দেশে গৌর পোদ্দার এবং সম্পাদনায় গোবর্ধন অধিকারী। আর অভিনয়ে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বসাক,

আশীষকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, নৃপতি, ডাঃ হরেন, বেচু সিংহ, শিশির মিত্র, মণ্টু গাঙ্গুলী, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, শ্যামলী চক্রবর্তী, মণিকা ঘোষ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা

থিয়েটার সেণ্টার কলকাতার উদ্যোগে দ্বিতীয় একাঙ্কিকা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৭ই আগস্ট পার হয়ে গিয়েছে। গতবারের চেয়ে এবারে উৎসাহ অনেক বেশীই পরিলক্ষিত হচ্ছে। গতবার একটি হিন্দী ও একটি তেলেগু এবং বাকি সব বাঙলাতে নিয়ে মোট তেইশটি দল যোগদান করে। এবার সে দলগুলি তো যোগদান করেছেই, তার সঙ্গে আরো বারোটি নতুন দল অর্থাৎ মোট পঁয়ত্রিশটি দল যোগদান করেছে। এর মধ্যে বাঙলা ছাড়া হিন্দী, তেলেগু ও গুজরাটি নাটিকাও আছে। চক্রবেড়ে রোডে থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে এই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নাটিকাগুলি একে একে মঞ্চস্থ হবে। আধুনিক ভারতের নাট্য-প্রচেষ্টার মধ্যে থিয়েটার সেণ্টারের এই উদ্যোগটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার যে করেছে তা এবারকার উৎসাহ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

* * *

এবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচনের তলে তলে এমন কতকগুলি ব্যাপারের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি জুড়ে জুড়ে এক করলে এমন আশঙ্কা করা অমূলক হবে না যে, "পথের পাঁচালী" আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একটি শ্রেষ্ঠ ছবি বলে পুরস্কার নিয়ে এলেও স্বদেশে বোধ হয় তাকে সম্মান ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কয়েকটি লক্ষ্য করার বিষয় আছে। প্রথমত জানা গেল যে, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচনে যোগদানের শেষ তারিখ পর্যন্তও শান্তারাম তাঁর ছবির নাম পাঠাননি। বম্বের চলচ্চিত্র মহলে রটেছে যে, শান্তারাম নাকি আঞ্চলিক নির্বাচন কমিটিকে জানান যে, তাঁর ছবি "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে"-কে কমিটি যদি একবাক্যে আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি বলে নির্বাচন করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ ছবির নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে অনুমোদন করে পাঠান তাহলেই তিনি তাঁর ছবির নাম দেবেন। এ কথাটা কতদূর সত্যি জানা নেই, বরং সত্যি না হওয়াটাই সম্ভব, কিন্তু "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে"র নাম যে তারিখ পার হবার পরেই গিয়েছে সেটা ক সপ্তাহ আগের "স্ক্রীন"-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত, এবারে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য ছবি নির্বাচনে ছবির গুণাগুণ বিচারে কলাকৌশলের দিকটাও গণ্যের মধ্যে আনার জন্য শান্তারামের কথা তোলা। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, প্রথম যেবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয় তখন শান্তারাম ছিলেন ফিল্মস ডিভিসনের উপদেষ্টা এবং সেই সুবাদে শ্রেষ্ঠ ছবি নির্বাচন ব্যাপারে তাঁরও হাত ছিল বলেই মনে করতে হয়। সেবার নির্বাচিত হয় কলাকৌশলের দিক থেকে অধম ছবি "শ্যামচী আঈ" এবং তার বেলায় শান্তারাম কলাকৌশলের গুণ বিচারের প্রশ্ন তোলেননি। এখন তিনি সে প্রশ্ন যে তুলেছেন তাতে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, হয় কলাকৌশলের কৃতিত্বের ওপর জোর দিয়ে "ঝনক ঝনক"-এর দাবীকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, নয়তো সম্পূর্ণ ভারতীয়দের তোলা প্রথম টেকনিকলার ছবি বলে "ঝনক ঝনক"-এর জন্য এমন একটা বিশেষ পুরস্কারের সৃষ্টি করে দেওয়ার ইঙ্গিত করা যা মানের দিক থেকে রাষ্ট্রপতি পদকের চেয়ে কিছু কম হবে না। "ঝনক ঝনক"কে "পথের পাঁচালী"র সঙ্গে বন্ধনীতে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করার কথাও নাকি হয়েছে। দিন কয়েকের মধ্যেই চূড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারা যাবে এবং ফলাফলের সেই তালিকায় "ঝনক ঝনক"-এর নাম সবার ওপরে দেখলেও আর বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

অলিম্পিক বার্তা ১

মেলবোর্ন অলিম্পিকের শুভ উদ্বোধনের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ২২শে নবেম্বর অপরাহ্নে এডিনবরার ডিউক একশ বছরের পুরনো মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠে ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন করবেন। সুতরাং অলিম্পিক আরম্ভ হতে আর মাত্র তিন মাস বাকী।

বিশ্ব অলিম্পিকের আয়োজন কত বিরাট এবং ব্যাপক সাধারণ লোকের তা ধারণা-বহির্ভূত। বিরাট কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় নেই। সাম্প্রতিক বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে কল্যাণী কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কল্যাণী কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজনে খরচ হয়েছিল লাখ বারো টাকা। আর মেলবোর্ন অলিম্পিকের জন্য খরচের হিসাব ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা। এর থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব এবং ব্যাপকত্ব অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়।

যোগদানকারী দেশের সংখ্যাও এবার সবচেয়ে বেশী। স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার প্রতিযোগীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং সবদিক দিয়েই মেলবোর্নের ষোড়শ অলিম্পিক অনুষ্ঠান অলিম্পিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবার সম্ভাবনা। বহুদিন ধরেই দেশে দেশে অলিম্পিক প্রস্তুতি চলছে, তার নানা খবরও আমাদের কানে এসে পৌঁছুচ্ছে। অলিম্পিকের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কে 'খেলার' পাতায় এতদিন কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহেই কিছু কিছু খবর প্রকাশ করা হবে। যোগদানকারী দেশগুলির নাম প্রকাশ করা হচ্ছে।

আফগানিস্থান	আরব
আর্জেণ্টাইন	ইসরায়েল
অস্ট্রেলিয়া	ইটালী
অস্ট্রিয়া	জাপান
বাহমাস	কেনিয়া
বেলজিয়াম	কোরিয়া
ব্রেজিল	লুক্সেমবার্গ
ব্রিটিশ গায়না	মালয়
বুলগেরিয়া	মাল্টা
বার্মা	মেক্সিকো
ক্যানাডা	নিউজিল্যাণ্ড
সিলন	নাইজেরিয়া
প্রজাতন্ত্রী চীন	নরওয়ে
চিলি	পাকিস্থান
চেকোশ্লোভাকিয়া	পেরু
ডেনমার্ক	ফিলিপাইন
ইজিপ্ট	পোল্যাণ্ড
ফিজি	পর্তুগাল
ফিনল্যাণ্ড	পুয়েরটোরিকো

একলব্য

ফ্রান্স	রুমেনিয়া
জার্মানী	সার
গোল্ডকোস্ট	সিঙ্গাপুর
গ্রেট ব্রিটেন	সাউথ আফ্রিকা
গ্রীস	সুইডেন
গুয়াতেমালা	সুইজারল্যাণ্ড

মেলবোর্ন অলিম্পিকের প্রধান কর্মকর্তা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল উইলিয়াম ব্রিজফোর্ড

হাঙ্গেরী	থাইল্যাণ্ড
হল্যাণ্ড	ইউ এস এ
হংকং	ইউ এস এস আর
ভারত	উরুগুয়ে
ইন্দোনেশিয়া	ভেনেজুয়েলা
ইরাণ	ভিয়েৎনাম
ইরাক	যুগোশ্লাভিয়া

এল স্যালভেডোর, ডাচ এণ্টিলিস, লিচেটেনস্টিন ও স্পেন যোগদান করতে অস্বীকার করেছে। যোগদানকারী আর কয়েকটি দেশের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

উদ্যোগ আয়োজন ও পরিচালনা

এতদিন ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। দক্ষিণ গোলার্ধে বা প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এই সর্বপ্রথম। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৪৯ সালের জুন মাসে তাদের রোম অধিবেশনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য মেলবোর্নের আবেদন গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৫৩ সালে মেক্সিকো অধিবেশনে এবং ১৯৫৪ সালে এথেন্সের সভায় মেলবোর্নের আবেদন চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। অলিম্পিক পরিচালনার জন্য মেলবোর্নের আবেদনের প্রধান সমর্থক ছিলেন মেলবোর্ন শহরের পৌর সভা, ভিক্টোরিয়া ষ্টেটের প্রধান সচিব এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী। এঁরা অর্থ সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়াও অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা করতে সব সময়ই যত্নশীল। প্রতিযোগী এবং অতিথিদের বাসস্থান নির্মাণ, মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠের প্রধান ষ্টেডিয়ামের উন্নতিসাধন, পৃথক ষ্টেডিয়াম রচনা, রাস্তাঘাট, জলসরবরাহের ব্যবস্থা, হোটেল রেস্তোরাঁ প্রভৃতির বন্দোবস্ত এবং খেলাধূলা পরিচালনায় যে সাড়ে ৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তার অর্ধেকই দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল গভর্নমেণ্ট। মেলবোর্নের পৌরসভা এবং ভিক্টোরিয়ান গভর্নমেণ্ট বাকী অর্ধেকের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন।

অলিম্পিকের বিরাট অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সমাধা করবার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ৫০ জন ব্যক্তিকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছেন দেশের ধনাঢ্য শিল্পপতি, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং খ্যাতনামা ক্রীড়াসংগঠক। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী ডব্লিউ এস কেণ্ট হিউজেস কমিটির চেয়ারম্যান। কেণ্ট হিউজেস অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রীড়া বিশারদ। ১৯২০ সালে এণ্টোয়ার্প অলিম্পিকে তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে অস্ট্রেলিয়ার দুইজন প্রতিনিধির অন্যতম মিঃ লুইস লাক্সটন অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান। মিঃ লাক্সটন অলিম্পিকখ্যাত নৌচালক। ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল উইলিয়াম ব্রিজফোর্ড। উইলিয়াম ব্রিজফোর্ড দীর্ঘ ৪০ বছরের সামরিক জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ১৯৫১ সালে তিনি কোরিয়ায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে সামরিক চাকুরি হ'তে অবসর গ্রহণ করে তিনি ষোড়শ অলিম্পিকের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

মিঃ ই জে এইচ হোল্ট অর্গানাইজিং কমিটির টেক্‌নিক্যাল এবং মিঃ পি ওয়ার্ড নেট এ্যাডমিনস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর। মিঃ হোল্ট জাতিতে ইংরেজ। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন
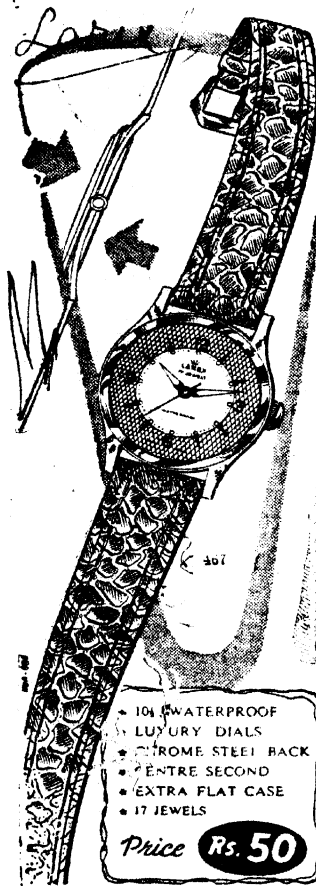
অলিম্পিক কমিটির তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। তাছাড়া [illegible] এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনেরও ইনি প্রাক্তন সম্পাদক। বহু বছর ধরে অলিম্পিকের সঙ্গে মিঃ হোল্টের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠক সমিতি অর্গানাইজিং কমিটিকে নানাভাবে সাহায্য করছেন। কাজের দায়িত্ব লাঘবের জন্য অর্গানাইজিং কমিটির সাহায্যকারী হিসাবে কয়েকটি সাব কমিটিও গঠিত হয়েছে। অলিম্পিক নগর নির্মাণ এবং খেলাধুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য টেকনিক্যাল কমিটিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। টেকনিক্যাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত দুইটি সাব কমিটির উপর অর্থ এবং নগর নির্মাণের ভার আছে। প্রচার, সাংবাদিকদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি, যাতায়াত, যানবাহন, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং খাদ্য সরবরাহের জন্যও পৃথক পৃথক সাব কমিটি পৃথক পৃথকভাবে দায়ী। ষোড়শ অলিম্পিকে মেলবোর্নে শুধু এ্যাথলীটই সমবেত হবে ছয়শত, বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

মেলবোর্নের পৌরসভা এক বিশেষ অলিম্পিক সিভিক কমিটি গঠন করেছেন। কাউন্সিলর মরিস ও নাথান এই কমিটির চেয়ারম্যান। অলিম্পিক সিভিক কমিটির প্রধান কাজ অলিম্পিকে সমাগত অতিথি অভ্যাগতদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা। তাদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠানকালে নগরসজ্জা। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় মেলবোর্নের পৌরসভা শিল্প ও কলার এক প্রদর্শনী খোলারও আয়োজন করেছেন।

মেলবোর্নের পৌরসভা ষোড়শ বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত থাকবার জন্য বিশ্বের সকল শহরের মেয়রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ'রা পৌরসভার অতিথি হিসাবে মেলবোর্নে উপস্থিত থাকবেন। ইংলণ্ডের লর্ড মেয়র, নিউইয়র্ক ও প্যারিসের মেয়র এবং সমস্ত ইউরোপ এবং কমনওয়েলথ দেশের মেয়র মেলবোর্নে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যায়।

কলকাতার ফুটবল পরিস্থিতি

চ্যাম্পিয়ানশিপ ও রেলিগেশনের প্রশ্নের মীমাংসার পর কলকাতার সিনিয়র লীগ থেকে সকল আকর্ষণই উবে গেছে। তবু যেটুকু আকর্ষণ আছে তা রানার্সের প্রশ্নের মধ্যে। কিন্তু এর জন্যও কারো বেশী মাথা ব্যথা নেই। হয় ইস্টবেঙ্গল না হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ রানার্স হবে এটা অবধারিত। ৩৮ পয়েণ্ট পেয়ে মহমেডান দল লীগের খেলা শেষ করেছে, ইস্টবেঙ্গল ২৪টি খেলায় পেয়েছে ৩৬ পয়েণ্ট। সুতরাং বাকী দুটি খেলায় ৩ পয়েণ্ট পেলে ইস্ট-বেঙ্গলই লাভ করবে রানার্সের পুরস্কার। ইস্টবেঙ্গল আর দুই পয়েণ্ট পেলেও রানার্সের সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে না। মহমেডান ও ইস্টবেঙ্গল যুগ্মভাবে লীগ রানার্স বলে পরিগণিত হবে। আর বাকী দুটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দুই পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে অসমর্থ হলে মহমেডান দলই লাভ করবে লীগ রানার্সের সম্মান।

* * *

২৫টি খেলায় মাত্র ১১টি পয়েণ্ট সংগ্রহ করায় কালীঘাট ক্লাব আগামীবার থেকে দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে খেলবার বিধানে পড়েছে। কালীঘাট ক্লাবের এখনো একটি খেলা বাকী। কিন্তু এ খেলায় জয়লাভ করলেও তাদের 'অবতরণ' রোধ হবে না। কারণ অবতরণের প্রশ্নে কালীঘাটের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২৩টি খেলায় লাভ করেছে ২২ পয়েণ্ট। সুতরাং দীর্ঘ ২৪ বছর প্রথম ডিভিশনে অবস্থানের পর কালীঘাট ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণের বিধানে পড়ল। ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে ১৯৩৩ সাল থেকে তারা প্রথম ডিভিশনে খেলতে আরম্ভ করে।

প্রথমদিকে বাঙলার বাইরের যে-সব কৃতী খেলোয়াড় সমন্বয়ে কালীঘাট ক্লাব দলপুষ্ট করেছে তাদের খেলার স্মৃতি আজও ক্রীড়ামোদীর মন থেকে মুছে যায়নি। জন, জোসেফ, আপ্পারাও, আখতার আমেদ, প্যাগসলে, সাবু, কাইজার প্রেমলাল, বেণী-প্রসাদ প্রভৃতি খেলোয়াড়কে কলকাতার মাঠের সঙ্গে কালীঘাট ক্লাবই প্রথম পরিচয় করিয়ে-ছিল। পরবর্তীকালে কালীঘাট ক্লাব বাঙালী খেলোয়াড়দের উপর বেশী নির্ভর-শীল হয়ে পড়ে এবং শুধু বাঙালী খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে দল গঠন করে সিনিয়র লীগের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে মোহিনী ব্যানার্জি, হাফব্যাক এস রায়, ব্যাক এস গুহ, সেণ্টার ফরোয়ার্ড বি দাশগুপ্ত প্রভৃতিও কালীঘাট ক্লাবে খেলে কম সুনাম অর্জন করেন নি।

খেলতে গেলে যেমন জয়পরাজয় আছে, লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তেমন আছে উত্থান পতন। শক্তিশালী টীম ইস্টবেঙ্গলকেও একদিন খ্যাতনামা সব খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণ করতে হয়েছিল। আবার তারা প্রথম ডিভিশনে দুর্ধর্ষ দল বলে পরিগণিত হয়েছে। কালীঘাট ক্লাবও আবার লীগের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসাবে পরিগণিত হক, এই আশাই করি।

* * *

বর্তমান লীগ পরিস্থিতিতে কলকাতার মাঠে কোন উন্মাদনা নেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির অন্যতম আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আবার কলকাতা

...সরদার ফুটবলের উন্মাদনায় মেতে উঠবে বলে আশা করা যেতে পারে। এই মাসের শেষদিকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হচ্ছে ১৭ই আগস্ট থেকে।

বিশ্ব ভলিবলে ভারতীয় দল

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন ১২ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত করেছেন। এই ১২ জন খেলোয়াড়ের সংগে থাকবেন একজন দলপতি, একজন ম্যানেজার, একজন রেফারী ও একজন 'কোচ'। আগামী ৩০শে আগস্ট থেকে প্যারিসে বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ান-শিপের খেলা আরম্ভ হবে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার কথা।

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতের দল গঠনের জন্য কলকাতায় ট্রায়াল খেলার আয়োজন করা হয়। ইডেন উদ্যানের ইন-ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ট্রায়ালে ১৪টি বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৮০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে অনেকেই ভলি খেলায় উন্নত কলাকৌশলের পরিচয় দেওয়ায় নির্বাচক সমিতির পক্ষে দল গঠন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এরা যে দল গঠন করেছেন আন্তর্জাতিক ভলিবল ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতের সুনাম বজায় রাখবেন বলে আশা করার সংগত কারণ আছে। ভারতীয় দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়েরা আগামী ২৩শে আগস্ট কলকাতায় সমবেত হয়ে ২৬শে আগস্ট বিমানযোগে প্যারিস যাত্রা করবেন। ভারতের স্পোর্টস বোর্ড ১২ জন খেলোয়াড়ের সমস্ত খরচ বহন করছেন। দলের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ খরচে প্যারিস যাত্রা করতে হবে। নিচে নির্বাচিত খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের নাম দেওয়া হ'ল:

পাঞ্জাব থেকে—সৎ গুরুদয়াল, অবিনাশ ও সরদারীলাল। স্ট্যান্ড বাই—আমীরচাঁদ ...গোপাল।

...ী থেকে—মোহন সিং, মোহন রিষি ...দীপ চোপরা। স্ট্যান্ড বাই—চাঁধরা ...জে এস বারা।

উত্তর প্রদেশ থেকে—দীননাথ। স্ট্যান্ড বাই—যোগেন্দ্র সিং ও কে এস দত্ত।

বাঙলা থেকে—অলোক চন্দ।

মহীশূর থেকে—শংকর নারায়ণ।

মাদ্রাজ থেকে—আধি করন। স্ট্যান্ড বাই—অরুনাচলম।

সার্ভিসেস টীম থেকে—বর্ধন। স্ট্যান্ড বাই—প্রভাকরণ নায়ার।

পেপসু থেকে—অমরাজিৎ সিং। স্ট্যান্ড বাই—বরবান্ত সিং ও কুন্দন সিং।

অন্যান্য স্ট্যান্ড বাই—খালেক (হায়দরাবাদ), এল এন গর্গ (মধ্যভারত), এস এস আম্বে (বোম্বাই), বুচি রামাইয়া (অন্ধ্র)।

দলপতি—শ্রী বি এন বক্সী (পাঞ্জাব)।

ম্যানেজার—শ্রী এস কে বসু (বাঙলা)।

রেফারী—শ্রীদীনবন্ধু ব্যানার্জি (বাঙলা)।

কোচ—...শ্রী ...পি ত্রিপাঠী (উঃ ...) অথবা শ্রী এইচ পি ...হালী (দিল্লী) অথবা শ্রী গরুড় ...মূর্তি (মহীশূর)।

অন্যান্য খবরাখবর

স্যার হাটনের ভারতে আসার কথা:—ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেংগলের সম্পাদক শ্রীঅমর ঘোষ এখন লণ্ডনে আছেন। শ্রী ঘোষ লণ্ডনে গিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য। ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে তাঁর করণীয় কর্তব্য ছাড়া তিনি সি এ বি'র রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দলকে ভারতে আনবার চেষ্টা করছেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্থানের কৃতী খেলোয়াড়দের নিয়ে এই দল গঠিত হলে দলটি কলকাতা ছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ইংলণ্ডের কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার লেন হাটনের এই দলের সংগে ভারত সফরের সম্ভাবনা আছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেট-কিপার জক লিভিংস্টোন, যিনি ইতিপূর্বে কমনওয়েলথ দলের অধিনায়করূপে ভারত সফর করেছেন, তিনিও দ্বিতীয়বার ভারতে আসবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ডাচ হকি টীমের ভারত সফর:—মেল-বোর্ন অলিম্পিকের পর ...কয়েকটি ... আগ্রহ প্র... ...চারেশ করে ... হয়েছে ... কলকাতায় দি... ...অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা। এক... দিল্লী, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতেও অনুরূপ খেলায় অংশ গ্রহণ করবে।

...পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য কলিকাতায় [illegible] ডাকঘরের উদ্বোধন করেন।

—[illegible] কমিশনের সুপারিশগুলি আরও কার্যকর করার জন্য তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার আজ রাজ্যসভায় দুইটি বিল পেশ করেন।

১লা আগস্ট—নিরীশ্বরবাদী দ্রাবিড় কাজাগামদের অদ্যকার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতি দাহন আন্দোলন সম্পর্কে সমগ্র তামিলনাদে [illegible] প্রায় আটশত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবিরকে উপশহরে রূপান্তরিত করিয়া এই সকল শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার এক পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ যুক্তভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন।

২রা আগস্ট—সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সম্মেলনে ভারতও সম্ভবত যোগ দিবে।

বোম্বাইকে কেন্দ্র করিয়া লোকসভায় যে বিতর্কের ঝড় বহিতেছিল, গতকাল অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা অনুকূল বায়ু প্রবাহে পরিণত হয়। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রকে লইয়া দ্বিভাষিক এক বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্য গঠনের প্রস্তাবে সকল পক্ষের সুদৃঢ় সমর্থনের ফলেই দেখা দেয় এই অবস্থা।

চোরাই ঔষধপত্র ধরার ব্যাপারে এক অভিযানকালে পুলিস বুধবার শহরের দুইটি স্থানে হানা দিয়া বহু পরিমাণে ঔষধপত্র উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে পুলিস এক বাড়ি হইতে পিতাপুত্রকে গ্রেপ্তার করে।

৩রা আগস্ট—বোম্বাই শহর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বৃহত্তর দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য গঠনের অনুরোধ জানাইয়া ১৮০ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি অদ্য অপরাহ্ণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

গতকল্য হইতে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদের গাঢ় রংয়ের শাড়ী পরিধান এবং চুলে ফুল ব্যবহার অথবা বেণী বাঁধা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এইরূপ আশ্বাস দেন যে, কলিকাতায় যাহাতে [illegible] দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহা [illegible] সর্বতোভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন [illegible]

৪ঠা [illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] তীরের সাহায্যে [illegible] উত্তরে আওচাগা- [illegible] চালাঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। ঐ চালাঘরগুলিতে ক্ষুদ্র একটি পুলিশ বাহিনী ঘাঁটি করিয়াছিল।

আর এম এস ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় কলিকাতা হইতে কটকে স্থানান্তর না করার যে দাবী আর এম এস শ্রমিক ইউনিয়ন জানাইয়াছে, তাহার সমর্থনে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৩২জন কংগ্রেসী সদস্য এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্ণে বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে ভারতে সর্বপ্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে। অদ্যই সরকারীভাবে এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে ঘোষণা করা হয়।

৫ই আগস্ট—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবর আবশ্যক হইলে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক জনসভায় "হিরোসিমা দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেন এইরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বর্তমানে যে হারে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা হইতেছে, তাহা আরও ২০ বৎসরকাল অব্যাহত থাকিলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক লক্ষে দাঁড়াইবে।

৬ই আগস্ট—কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে আজ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই শহর, বিদর্ভ ও মারাঠওয়ারা লইয়া একটি দ্বিভাষিক বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রী এন জি গোরে [illegible] সকল সদস্য এই প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন।

কলিকাতায় ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে ১৷৵ আনা সের দরে সরিষার তৈল বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা কার্যত সফল হয় নাই বলিয়া সরকারীসূত্রে সমর্থন পাওয়া যায়।

অদ্য বাঁকুড়ায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় এই প্রকার কলেজ এইটিই প্রথম।

৭ই আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি অদ্য অপরাহ্ণ ১-৫০ মিনিটে রাজভবনে অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে জুলাই—ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট বিরোধী দৈনিক পত্রিকা 'নেশন' জানাইয়াছেন, কয়েক শত অস্ত্রসজ্জিত কম্যুনিস্ট চীনা সৈন্য সীমান্তের ৫ শত মাইল এলাকা বরাবর ব্রহ্ম এলাকায় প্রবেশ করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের যেসব মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ বিত্ত ও সম্পত্তির অধিকারী কি করিয়া হইয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে।

মিশরের প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দুল নাসের অদ্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলেও সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা কখনই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

১লা আগস্ট—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে সুয়েজ খাল সম্পর্কে যে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জগতের অধিকার যাহাতে লঙ্ঘিত না হয়, অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২রা আগস্ট—গতকল্য রাত্রিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের বলেন, মিশর শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়াও সুয়েজ খাল রক্ষা করিবে। সাম্রাজ্যবাদী জল্লাদদের মুখোশ আজ খুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

ইউ পি আই, এ এফ পির এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সুয়েজ খাল সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হইবে, ১৬ই আগস্ট তাহার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

সুয়েজ খালে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে প্রস্তাব পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ উত্থাপন করিয়াছে, মিশরীয় সরকারী মহল অদ্য রাত্রিতে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

৪ঠা আগস্ট—অদ্য সরকারী মিশরীয় সংবাদপত্র অফিসিয়াল [illegible] আজ বলা হইয়াছে যে, সুয়েজ খালের উপর কোনরূপ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব মিশর দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিবে। কোনরূপ হুমকিতে মিশর নতি স্বীকার করিবে না।

অদ্য ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালের ২০শে আগস্ট একটি সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হয়।

৫ই আগস্ট—বৃটিশ সরকার মিশরীয় জাহাজ স্টার অব বকসারে করিয়া লেবাননের জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মিশরীয় জাহাজটি লিভারপুল বন্দরে নোঙ্গর করিয়া আছে।

কায়রোর ওয়াকিবহাল মহলে বলা হইয়াছে যে, মিশরের রিজার্ভ সেনাসমূহকে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদের নিজ নিজ ইউনিটে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্বানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইন অনুসারে অদ্য সরকারী গেজেটে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, জোহেন্সবার্গের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক হাজার ভারতীয়কে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৬ই আগস্ট—মিশরীয় সরকারী মহল হইতে আজ বলা হইয়াছে যে, সুয়েজ খাল রক্ষার্থে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য সমগ্র মিশরব্যাপী জাতীয় রক্ষীশিবিরগুলিতে স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা হইতেছে। ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত ১০ লক্ষাধিক যুবক অস্ত্র ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।